

ভারতবর্ষ

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

সূচীপত্র

একপঞ্চাশত্তম বর্ষ, প্রথম খণ্ড ; আষাঢ়—অগ্রহায়ণ ১৩৭১

লেখ-সূচী—বর্ণানুক্রমিক

আগ্রবনীর (উপভাস)—শ্রীদিলীপকুমার রায়	১৪৮, ২৮৪, ৬৩২, ৭৫২	কিশোর জগৎ	...	৭৩৮১৯
ভিষাক (গল্প)—হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	...	(ক) নব ভারতের জীবন পুরোহিত	...	
অতীতের স্মৃতি (আলোচনা)—		(গ) কাউন্ট অফ মন্টিক্রিষ্টো	...	
পুণ্ডরীক মুখোপাধ্যায়	৮৬, ১৯৯, ৩৪৯, ৫৩৩, ৭০৬, ৮১১	(গ) ছুটির ঘণ্টা	...	
খতিমান (একাঙ্কিকা)—নারায়ণ চক্রবর্তী	...	(ঘ) ধোঁধা ও হৈদোলী	...	২০২
অনুশেষ (গল্প)—বুদ্ধদেব গুহ	...	কবি লেখে কেমন (প্রবন্ধ)—পকানন ভট্টাচার্য	...	৯৬
অমনোনিষ্ঠ কবিতা (কবিতা)—কানাই বহু	...	কোজীর বিচার—জ্যোতি বাচস্পতি	১৩১, ২৫৬, ৪০২	
অপরাধ (গল্প)—হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	...	কলানবগ্রাম শিক্ষা নিকেতন (প্রবন্ধ)—পথিক	...	১৭৫
অসুন্দরিলতা (গল্প)—		কিশোর জগৎ	...	
শ্রীহরিশ্রয় বন্দ্যোপাধ্যায়	...	(ক) পরলোকে পরিচালক	...	
অভিমান (কবিতা)—শশীলকৃষ্ণ সেনগুপ্ত	...	(গ) বিষগতা—ইত্যাদি	...	
অলম্বার (কবিতা)—নরসিং চক্রবর্তী	...	কবি দ্বন্দ্বের গুপ্ত (প্রবন্ধ)—জগদীশ্বর নাথ	...	২৯৪
অশ্রুতের দেশে সন্দেশ বংশ (প্রবন্ধ)—		কেপ গেটেল (কবিতা)—অগ্নিবিন্দু ভট্টাচার্য	...	৩০৭
শ্রীকবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	...	কিশোর জগৎ	...	৩৬১
শ্রীঅরবিন্দের 'লিবি' (প্রবন্ধ)—		(ক) আদর্শ—শ্রীজ্ঞান	...	
স্বধাংসুসমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	...	বিলটু বাহক, বিচার ইত্যাদি	...	
আশা কুড়ি চোখ মেলে (কবিতা)—		কীটসের কাব্য (প্রবন্ধ)—অরুণ দে	...	৪৮৩
রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	কুঞ্জমালা (কাহিনী)—অনন্ত মুখোপাধ্যায়	...	৪৫২
আন্তরিক (প্রবন্ধ)—		কিশোর জগৎ	...	৪০২
শ্রীস্বধাংসুসমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	...	(ক) পুষ্কার প্রার্থনা—শ্রীজ্ঞান	...	
আচার্য শঙ্কর (প্রবন্ধ)—		(খ) বাহুতে পুষ্কার বাঁধা ইত্যাদি	...	
শ্রীজ্যোতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	(গ) দামাল অংশ (নাটিকা)—শ্রীনরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	...	
আগমনী গান (প্রবন্ধ)—অর্ধকমল ভট্টাচার্য	...	কাব্য চর্চা (কবিতা)—অরুণচন্দ্র ঘর	...	৬৭৮
আচার্য রামেন্দ্রচন্দ্র (কবিতা)—		কিশোর জগৎ	...	৬৮৯
এলিভ রাহচৌধুরী	...	(ক) গবেষণা ও শিক্ষা—শ্রীজ্ঞান	...	
আধুনিক বাংলা কবি গান (প্রবন্ধ)—		(ক) পুষ্কার পরে—শ্রীজ্ঞান	...	
পরমানন্দ হাটনার	...	(খ) ত্রিভুজ ভট্টাচার্য	...	
ভিত্তি কাহিনী (গল্প)—পূর্ণাঙ্গ ভট্টাচার্য	...	কলকাতার পূর্বে আমেরিকা—আবিস্কার (প্রবন্ধ)—	...	
অ্যাক্বেস দেবী উমা (প্রবন্ধ)—		শ্রীভগবতদাস বসু	...	৭৮৫
শ্রীঅরবিন্দকুমার চক্রবর্তী	...	কালো ঘোড়ার দাপট (চিত্র)—পূর্ণাঙ্গ দেবদাস	...	৮৪৫
এমন কেন ভয় (কবিতা)—লক্ষ্মীকান্ত রায়	...	কোজীর বিচার—জ্যোতি বাচস্পতি	...	৮৫৫
এই ভ জীবন (গল্প)—শ্রীমুখা ঘোষ	...	খেলোয়াড়—শ্রীঅনন্ত চট্টোপাধ্যায়	১৪২, ২৭৯, ৪০৫, ৭৪৫ ৮৬৭	
এইর বৃষ্টি (কবিতা)—শিশির মুখোপাধ্যায়	...	খেলার কথা—শ্রীকেন্দ্রনাথ রায়	১৪২, ২৭৯, ৪০৫, ৭৪৫	

অস্ট্রেলিয়া : ৩৫২ রান (বব সিম্পসন ১৫৩ এবং পিটার বার্জ ৫৪ রান। লৈয়দ আমেদ ৪১ রানে ৩ উইকেট পান) ও ২২৭ রান (২ উইকেটে। সিম্পসন ১১৫ রান। রেডপাথ নটআউট ৪০ এবং বার্জ নটআউট ২৮ রান)।

সন্তোষ ট্রফি :

গোহাটিতে নেহরু স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ২১তম জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে রেলওয়ে দল ২—১ গোলে বাংলাকে পরাজিত করে। ১৯৬০ সালে রেলদল প্রথম জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার প্রথম বোণদান করে ১৯৬১ সালে প্রথম সন্তোষ ট্রফি জয়ী হয়। বাংলা দল এই নিয়ে ১৬বার ফাইনালে খেলে পাঁচবার রানাস-আপ হ'ল। বাংলা ১১ বার (রেকর্ড) সন্তোষ ট্রফি জয়ী হয়েছে।

সুভ্রত মুখার্জি কাপ :

১৯৬৪ সালের অল ইণ্ডিয়া স্কুল ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে গোঁথা মিলিটারী স্কুল (দেবাজী) ৪—২ গোলে বোম্বাইয়ের আজমুন-ই-ইসলাম স্কুলকে পরাজিত করে সুভ্রত মুখার্জি কাপ জয়ী হয়েছে।

মোহনবাগান ক্লাব :

সর্বজনপ্রিয় মোহনবাগান ক্লাবের ৭৫ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে যে আড়ম্বরপূর্ণ জয়ন্তী উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল তা আজ শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। গত ৫ই নভেম্বর মোহনবাগান ক্লাবের প্রাটিনাম জয়ন্তী উৎসবের উদ্বোধন উপলক্ষে পূর্বা-হোর, মশাল নিয়ে রাজপথে দৌড়, কুচকাওয়াজ, ভোপধ্বনি, শপথ গ্রহণ এবং পুতায়ি প্রজ্জলন অনুষ্ঠান মহান্মারোহের সঙ্গে সম্পন্ন হয়।

এই জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে জার্মানী বনাম ভারতবর্ষের বৈত এ্যাথলেটিক্স অনুষ্ঠান, ভারতীয় অলিম্পিক হকি দল বনাম মোহনবাগান দলের প্রদর্শনী হকি খেলা, হাঙ্গেরী বনাম মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল এবং ভারতীয় দলের তিনটি প্রদর্শনী ফুটবল খেলার আয়োজন করা হয়েছিল। তাছাড়া প্রখ্যাত খেলোয়াড় নিয়ে গঠিত কমনওয়েলথ দলের সঙ্গে মোহনবাগান জুবিলী-কমিটির সভাপতির একাদশ দলের তিন দিনের ক্রিকেট খেলা এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর একাদশ দলের পাঁচদিনের এক প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলার আয়োজন করা হয়েছে।

বাৎসরিক ও বাৎসরিক গ্রাহকগণের প্রতি

অগ্রহায়ণ মাসে যে সকল বাৎসরিক ও বাৎসরিক গ্রাহকের চাঁদার টাকা শেষ হইয়াছে, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্বক ৭ই পৌষের পূর্বে মনিঅর্ডার যোগে বাৎসরিক ১৫ টাকা অথবা বাৎসরিক ৭.৫০ টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা চাঁদা পাঠাইয়া দিবেন। টাকা পাঠাইবার সময় গ্রাহক নম্বরের উল্লেখ করিবেন। ডাকবিভাগের নিয়মানুযায়ী ভি, পি,তে কাগজ পাঠাইতে হইলে, পূর্বাভূ আদেশপত্র পাওয়া প্রয়োজন। ভি, পি, খরচ পৃথক লাগিবে। যাহারা নূতন গ্রাহক হইবেন তাঁহারা মনিঅর্ডার কুপনে 'নূতন গ্রাহক' কথাটি উল্লেখ করিবেন।

কর্মাদ্যক—ভারতবর্ষ

সম্মাদকদ্বয়—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় এও সল-এর পক্ষে কুমারেশ ভট্টাচার্য কড়ক ২০৩১১, বিধান সরণী, (পুতন কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট,) কলিকাতা ৬, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে ১০/১২/৬৪ তারিখে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

পুঁহতাগ (নাটিকা)—কানাই বহু	...	৩৮	নিরুদ্বিগ্ন কবি কৰ্ণ (কবিতা)—হরি ভৌমিক	...	৬১
প্রজ্ঞাপন—	১২৫, ২৫২, ৩২৬, ৫২২, ৭৩৬		নতুন পুঁহিতা (কবিতা)—রবি গঙ্গোপাধ্যায়	...	৬৬
পুঁহসজ্জা (গল্প)—অরবিন্দ ভট্টাচার্য্য	...	৩৮১	নীলমণি বাই লেন (কবিতা)—বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত	...	২৫৮
গান—কথা—শ্রীঅখিল নিরোগী	...		নির্দেশিত প্রেম (কবিতা)—তথাগীপ্রদাস দাশগুপ্ত	...	৩০২
স্বয়ং ও স্বরলিপি—কিটীশ দাশগুপ্ত	...	৬৮২	মেলা (গল্প)—মধুকর	...	৮৫০
গান ও স্বরলিপি—শ্রীদিলীপকুমার রায়	...	৪৭৩	পত্রাবলী ও ত্রিগুপ্ত (প্রবন্ধ)		
গান—অমৃতকলা দেবী			প্রশান্তকুমার গঙ্গোপাধ্যায়	...	২৮
স্বরলিপি—রবীন্দ্রনাথ বসু	...	৫২১	পট ও পীট—'প্রিয়'	১৩৭, ২৭৩, ৩২৩, ৭৪০, ৮৫২	
গান—কথা—কামাপা সুরকার	...	৮২৭	প্রীতির ক্রমবিকাশ (প্রবন্ধ)		
সুড়ির কথা—পৃথ্বী দেবশর্মা বিরচিত	৮১, ৩৬২, ৬২৭,		শ্রীহৃৎকৃত কান্তি ভক্তিবিলাস	...	১৪৫
যমে বাইরে (প্রবন্ধ)—অর্চনা মজুমদার	...	১৬৬	পুতুলের ইতিহাস (চিত্র)—দেবশর্মা বিরচিত	...	২০৮
চন্দ্রশেখরের বক্তৃতা (প্রবন্ধ)—পঙ্কজন ভট্টাচার্য্য	...	৬৩	পুঁহিতে সংকৃত নাটক (প্রবন্ধ)—অনাথলয় কাব্যার্থ	...	২১২
ছায়াবর (কবিতা)—বাবীন্দ্রকুমার ঘোষ	...	৪৪৭	পশ্চিমবঙ্গের হস্তশিল্প (প্রবন্ধ)—কান্তপ শর্মা	২৩৫, ৬৪২	
ছায়া নেই শুধু আলো—(কবিতা)—			পটুগা (প্রবন্ধ)—শ্রীধরকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	...	৪৪৫
গোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায়	...	৫৬৭	প্রার্থনা (কবিতা)—শান্তি মুখোপাধ্যায়	...	৫৩১
অহর তিলক (কবিতা)—স্বয়ং গুপ্ত	...	৫	প্রশ্ন (গল্প)—মারা বহু	...	৫৫২
জাতীয় সাহিত্যে বিজ্ঞান (প্রবন্ধ)			পত্রলেখা (গল্প)—শৈলেনকুমার ভট্টাচার্য্য	...	৫২২
অধিকাংশ চৌধুরী	...	১৫	পল্লীকলিক ভাষ্যতর্ক (প্রবন্ধ)		
অহরলাল নেহরু	...	১৩৪	শ্রীপ্রহ্লাদচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	...	৬২৫
অলে ডাঙ্গার (চিত্র)—আব্রাহাম	৩৭০, ৫২২		পূর্ণকৃত (গল্প)—বিমানকুমার রায়গুপ্ত	...	৮২২
জোড়া পুঁহের মাথলা (কাহিনী)—ডঃ পঙ্কজন ঘোষাল	...	৫৮৪	প্রতিশ্রুতি পালন (গল্প)—চাঁদমাধন চক্রবর্তী	...	৭৩৩
জীবন নদীর কুলে কুলে (কবিতা)—			শিলায় দিয়েছি ঘারে (কবিতা)—স্বাক্ষিকিনী দেবী	...	৬৩১
শ্রীশক্তিপদ মুখোপাধ্যায়	...	৭৬২	ফুল (গল্প)—অর্চনারায়ণ ভট্টাচার্য্য	...	৭৭৩
জীবনী সাহিত্যে বসন্তের ও শ্রীম (প্রবন্ধ)—			সেদনা অশ্রু (কবিতা)—হেমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	...	২৮৩
শ্রীশান্তিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়	...	৭০১	বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞান (প্রবন্ধ)—জিতেন্দ্রনাথ সেন	...	২২৮
জিজ্ঞাসা (কবিতা)—হেমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	...	৮০০	বাংলার ধর্মোপদ (প্রবন্ধ)—হর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	...	৩৪৭
জগদ্বন্দ্ব (কবিতা)—শ্রীশান্তোব সাগাল	...	৮৩২	বর্ষা (কবিতা)—কুমুদরঞ্জন মল্লিক	...	৩৭৪
টেই টিউন (একাক নাটিকা)—নারায়ণ চক্রবর্তী	...	৭৮৭	বন্ধনা (কবিতা)—মৃদুপ্রাণ ভট্টাচার্য্য	...	৬৪১
ঠগ (গল্প)—রবীন্দ্রনাথ	...	৮০৭	বোম্বাই দর্শনে নেতাজী (প্রবন্ধ)—কামাখ্যা ভট্টাচার্য্য	...	৫২৬
ডেহরী অন সোন (কবিতা)—মণীন্দ্র দত্ত	...	৯৫	বেদ ও প্রাচীন শাস্ত্রে বদেগ প্রেম (প্রবন্ধ)—		
ডিথিরাম (প্রবন্ধ)—শেখরচন্দ্র সেনগুপ্ত	...	১৭১	শ্রীমতী রেখা সিংহ	...	৭৪৭
ডিস্ট্যান্ট সিগনাল (গল্প)—সমীর ভট্টাচার্য্য	...	৩৭১	বিবেকানন্দ (কবিতা)—তারকপ্রসাদ ঘোষ	...	৬৪৮
ডেউ (গল্প)—অনিলকুমার ভট্টাচার্য্য	...	৪৪৮	ভিত্তি পটোরির যুগচেতনা (প্রবন্ধ)		
তুরি নেই (কবিতা)—রতনচন্দ্র দাস	...	১৭০	বাংলার ধর্মোপদ (প্রবন্ধ)—ডঃ হর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	...	৭৬১
তাজোর (প্রবন্ধ)—দেবেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক	...	১২৬	রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	২০২
তাগ (প্রবন্ধ)—বাবী বিজ্ঞানানন্দ	...	৪২৪	ব্রহ্মবাক্য উপাখ্যান (প্রবন্ধ)—		
তোমাদের কাছে (কবিতা)—হাসিরাশি দেবী	...	৪২৮	শ্রীপ্রশান্তকুমার গঙ্গোপাধ্যায়	...	৮০৪
তোমাকে (কবিতা)—হাসিরাশি দেবী	...	৬৮৮	বাস্তবজ্ঞান কথা—চিত্র	...	৮২৬
দেহের ভার (কবিতা)—অমিতাভ বহু	...	৯৫	বিশুদ্ধি (কবিতা)—শ্রীকুমাররঞ্জন মল্লিক	...	৭৮৪
দার্শনিক ব্রজেননাথ (কবিতা)—শ্রীস্বয়ং গুপ্ত	...	২৭০	ভেজাল বিলাট (চিত্র)	...	৩৮১
দুই ভীর (কবিতা)—প্রাণেশ দাশগুপ্ত	...	৩৪৪	ভট্টর সঙ্গে প্রবন্ধ মৌলিকাত (শিকার)	...	৪৬৭
দুঃখের ডিকটোর (গল্প)—শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	...	৪২০	বীরেন্দ্রনারায়ণ রায়	...	৪৬৭
দুর্গামের কথা (প্রবন্ধ)—সীতারামদাস গুপ্তারনাথ	...	৫২৭	মাই.কাপোলের দৃষ্টিতে ভারত (প্রবন্ধ)		
দক্ষিণ পূর্ব এসিয়া (প্রবন্ধ)—রমেশচন্দ্র মজুমদার	...	৫৬৮	স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য	...	৬৭
দুঃখোপাধী (গল্প)—কানাই বহু	...	৬৫৫	দেয়েদের কথা—	...	১০০
দোপাটি (কবিতা)—মিনতি পাল	...	৭৮৬	(ক) আশ্ব বিলম্বণ		
দেবী দোনা (কবিতা)—শ্রীস্বয়ং গুপ্ত	...	৮৪২	(খ) আনন্দলভিকার ক্রম		
ধাত্মীকরণ (কবিতা)—বীরেন্দ্রনাথ প্রতীহার	...	৬৪০	(গ) প্রকৃতি পরিচর্যা ও শিশু-মঙ্গল		
শ্রীবি.কমল সমাধি (প্রবন্ধ)—অরুণকুমার ভট্টাচার্য্য	...	১	(ঘ) টেনিসের কার্যার্থ		
নেহরু স্মরণে (কবিতা)—জ্যোতির্ময়ী দেবী	...	২৭	(ঙ) এম.আর.আর. নৃতন নক্সা		
নেহরু উইল (কবিতা)—পুষ্প দেবী	...	২৭	(চ) রূপ চর্চা		

(৬) রীতিবদ	হাত্তরন প্রভৃতি কথার নথি (এবং) —	০
মাদাম ক্রুসি (অনুবাদ গল্প) — হুসীলকুমার দাস	শ্রীমতীবকুমার অধিকারী	০০০
মধুসূদনের মৌলবি চৈতন্য (এবং)	শ্রীরাধা — বরলিপি ও গান — শ্রীমলীপকুমার দাস	০০০
শ্রীরাসবিহারী ভট্টাচার্য	জেরনী (কবিতা) — কীরোরাকুমার বুথোপাধ্যায়	০০০
মেয়েদের কথা —	শ্রীশ্রীচন্দ্র —	০০০
(ক) শিকার সমস্তা	শেখ আর (এবং) — ডাঃ মতিলাল দাস	০০০
(খ) প্রহৃত পরিচর্যা	শেখ অংক (গল্প) — অজিত চট্টোপাধ্যায়	০০০
(গ) রূপ চর্চা উত্তাপিত	শাশ্বত (কবিতা) — শান্তীল দাস	০০০
মেয়েদের কথা —	সাঁরারাত (কবিতা) — শৈলেন্দ্র ভট্টাচার্য	০০০
(ক) শিকার সমস্তা	সীমা রেখা (কবিতা) — হরিশাধন দোলুই	০০০
(খ) প্রহৃত পরিচর্যা প্রভৃতি	সিড়ি (গল্প) — সত্বর্ষ রায়	০০০
মর্ত (কবিতা) — শ্রীকুমদরঞ্জন মল্লিক	সামরিকী —	১২০, ২৪২, ৩৭৪, ৫৭৮, ৭২৭, ১
অনের ঠিকানা (গল্প) — শক্তিপদ রায়চন্দ্র	সেঙ্গপীয়ার (কবিতা) — হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়	০০০
মঙ্গলী (কবিতা) — সুখর গুপ্ত	সেননের স্মৃতি (কবিতা) — অসিতবরণ চৌধুরী	০০০
মেয়েদের কথা —	সুতসূতা (গল্প) — মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	০০০
(ক) শিঠিপত্র বিরোধে তু	সাহসিক আধুনিক (চিত্র) — পূর্বাংশ দেবশর্মা	০০০
মিল (গল্প) — নরেন্দ্রনাথ মিত্র	সাগর সমুদ্রে (ভ্রমণ) — এবোধ রায়	০০০
মেয়েদের কথা —	সাহিত্য সংবাদ —	০০০
(ক) আধুনিকতা	সেঙ্গপীয়ারের কবিতা (সংকলিত অনুবাদ) —	০০০
মেয়েদের কথা —	ডাঃ বতীন্দ্রবিমল চৌধুরী	০০০
(ক) পাত্রী ও পতন — মীরা ঘোষ	শ্রেক তেল দিয়ে (রসরচনা ও চিত্র) — শ্রীমতিন নিরোগী	০০০
(খ) প্রহৃত পরিচর্যা ও শিকুমল	সরাসি ও আজ উদাস (রসরচনা) — চৈতন্যচরণ বড়াল	০০০
কুমারেন বন্দ্যোপাধ্যায়	স্বপ্ন শেখ (কবিতা) — আশুতোষ দাসগুপ্ত	০০০
(গ) রূপ চর্চা — সুপর্ণা দেবী	স্বপ্নজীর স্বপ্নবাদ (এবং) — হুসীলকুমার ঘোষ	০০০
(ঘ) কাদা-মাটির কার-পিল — কচিরা দেবী	সেঙ্গপীয়ার (কবিতা) — অধ্যাপক আশুতোষ সেনগুপ্ত	০০০
(ঙ) পশমী-হুতার বোনা শীতের কাড়িগ্যান-জ্যাকেট	স্বামী বিবেকানন্দ (এবং) — সমর দত্ত	০০০
হিরণ্ময়ী দেবী	বরলিপি — কালীনাথ বুথোপাধ্যায়	০০০
(৩) রাসদেব — সুবীণা হালদার	সুফ্র প্রভা (গল্প) — অরুণ দে	০০০
মার্জার কথা (রসরচনা) — রমেন মজুমদার	১৯৬৪ খৃষ্টাব্দের বিতীর্ণ (এবং) —	০০০
স্বতীন্দ্রবিমল চৌধুরী (কবিতা) — স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য	শ্রীকামাখ্যাচরণ ভট্টাচার্য	০০০
যোগজীবন (এবং) — বিমলান্দ স্বামী		০০০
স্বতীন্দ্রবিমল (জীবনী) — ধ্যানেশনারায়ণ ভট্টাচার্য		০০০
জ্যোতিষিক যুগ ও ওয়ার্ডনওয়ার্থ (এবং)		০০০
অরুণ দে		০০০
স্বয়ংকর দর্শন (এবং) — চিত্তেন্দ্রেন্দ্র মজুমদার		০০০
রেলের রাজি (বিবরণ) — প, ক, চ		০০০
রঙ্গলি (গল্প) — ভক্তপ্রসাদ রায়		০০০
রাজনীতিবিদ পরবাল (এবং) — অজিত ভট্টাচার্য		০০০
রামের স্মৃতির অভিনয় (বিবরণ) — লীলা বিজ্ঞান		০০০
রবীন্দ্রসাহিত্যে দেবী আরাধনা (এবং) — কেশবচন্দ্র গুপ্ত		০০০
রবীন্দ্রনাথ ও গীতা (এবং) — স্বাংসুতোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়		০০০
রেশ (গল্প) — তাপোপ্রব ব্রহ্মচারী		০০০
রোগ ও মনের কথা (এবং) — বিষ্ণুশ্রী মনোভোষ রায়		০০০
রিলিফ (গল্প) — হুসীল রায়		০০০
স্বপ্নজীর স্মৃতির উৎপত্তি (এবং) —		০০০
শ্রীপরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়		০০০

সামান্যক্রমিক-চিত্রসূচী

আবার — বহুদর্শ চিত্র — ১, বিশেষ চিত্র — ২, একবর্ণ চিত্র — ২
আবদ — দ্বিবর্ণ চিত্র — ১, বিশেষ চিত্র — ২, একবর্ণ চিত্র — ৮
ভাত্র — দ্বিবর্ণ চিত্র — ১, বিশেষ চিত্র — ২, একবর্ণ চিত্র — ৫
আবিন — দ্বিবর্ণ চিত্র — ১, বিশেষ চিত্র — ২, একবর্ণ চিত্র — ২০
কাঞ্চিক — দ্বিবর্ণ চিত্র — ১, বিশেষ চিত্র — ২, একবর্ণ চিত্র — ১০
অত্রহরণ — দ্বিবর্ণ চিত্র — ১, বিশেষ চিত্র — ২, একবর্ণ চিত্র — ১০



আষাঢ়-১৩৭৬

প্রথম খণ্ড

দ্বিপঞ্চাশত্তম বর্ষ

প্রথম সংখ্যা

নিবিকল্প সমাধি

অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়

শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন সমস্ত যোগই কঠিন, কারণ প্রত্যেক যোগেরই চরম লক্ষ্য নিরাকার পরমেশ্বরকে উপলব্ধি করা (All yoga is difficult, because the aim of every yoga is to reach the Divine—Sri Anandobinda) এবং এই পরমেশ্বরকেই বিভিন্ন ভাষায় পরব্রহ্ম, পুরুষোত্তম, পরম শিব বা আদি কৃষ্ণ বলা হয়েছে, তবুও তা একই। শ্রীঅরবিন্দ আগে বলেছেন এ তত্ত্ব কেউ কাউকে দিতে পারে না, এর জ্ঞান বিশেষ প্রকৃতির প্রয়োজন, হৃদীর্ণকাল তপস্যার প্রয়োজন এবং উপযুক্ত আধ্যাত্মিক প্রয়োজন; স্বামী বিবেকানন্দের মত অন্তর্ভুক্ত বিরাট আধ্যাত্মিক প্রথমে এই অধৈর্যহীনতা সহ্য করতে

পারেন নি। এ থেকেই বোঝা যায় এ তত্ত্ব লাভ করতে বিরাট প্রকৃতির ও উপযুক্ত আধ্যাত্মিক প্রয়োজন। বুদ্ধদেবও বলেছেন তোমাদের চেষ্টা করতে হবে, তথাপি প্রচারক মাত্র (‘Your feet must tread the path, the Tathagata can only point the way’, H. Dutta)। তিনি আরো বলেছেন জেনে রেখো, তাত্ত্বিক আলোচনার প্রকৃত কল্যাণ নিহিত নেই বরং অষ্টাঙ্গ ‘সাদর্শ্য’ সাধনাই এদের প্রকৃত ‘কল্যাণ’ (শব্দর দ্বারা) অর্থাৎ খালি শব্দমালায় ‘কিছুই হয় না, তার জ্ঞান কঠোর তপস্যা করতে হয়, শুধু পথ দেখান মাত্র। সাধনার পথ সকলকেই বলেছেন সঙ্কটময় এবং বিনা কষ্টে তা কেউই

লাভ করেননি। শাস্ত্র বলেছে ক্ষুরশ্র ধারা এ পথ, গৃষ্ট বলেছেন সিঁদ্ধি লাভ ঘটে অতি অল্প ভাগাবানেরই ভাগে। (Straight is the gate and narrow is the way, and few there be that find it Christ) শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন “আত্মজ্ঞান লাভ করতে মাত্র একজন্ম নয় সাধারণতঃ কয়েক জন্মও পর্যাপ্ত নয়” (The whole life and Several lives are often not enough to achieve it. Sri Aurobindo)। পতন অভ্যাস বন্ধুর পন্থা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় এবং যারা মনে করেন এ পথ কল্পমাত্র তারা ভ্রান্ত।

চিত্তের পাঁচটি অবস্থা—ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ। এর মধ্যে ক্ষিপ্ত, মূঢ় ও বিক্ষিপ্ত মনের পক্ষে যোগ অসম্ভব। একাগ্র চিত্তে (one-pointedness) যোগ সম্ভব। শেষেরটি নিরুদ্ধ বা চিত্তবৃত্তি নিরোধই যোগ। যোগ করতে হলে চিত্তবৃত্তি নিরোধ করতে হবেই। তা যে কোন যোগই হোক না কেন (যোগাচ্ছত্ত-বৃত্তিনিরোধঃ—১২ পতঞ্জলি)। অতীন্দ্রিয়তত্ত্ব ইন্দ্রিয় দিয়ে উপলব্ধি করা যায় না, মাত্র সমাধির মধ্য দিয়েই তা সম্ভব বা জ্ঞানচক্ষু দিয়েই তা লাভ্য। বাহ্য চক্ষু দিয়ে মাত্র বাহ্য বস্তুই দেখা যায় কিন্তু জ্ঞানচক্ষু দিয়ে মাত্র অতীন্দ্রিয়তত্ত্ব নয় বাহ্য বস্তুও দেখা যায়, এরই নাম দিব্যদৃষ্টি যার অপর নাম চেতনা (Consciousness); এর অর্থ এ নয় যে বাহ্য চক্ষু দিয়ে দেবদেবী দর্শন করা যায় না, তা সম্ভব হয় যখন তাঁরা আমাদের সামনে নেমে আসেন মাত্র এবং যার জ্ঞান চক্ষু খুলে গেছে মাত্র। মহাপুরুষরা ইচ্ছা করলে এই দিব্য দৃষ্টি খুলে দিতে পারেন।

শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন ভগবানকে উপলব্ধি করবার বহু পথ আছে (There are a thousand ways of approaching and realising the Divine and each way has its own experiences—Sri Aurobindo) এবং প্রত্যেক পথই সত্য। সমাধি বহু প্রকারের সম্ভব। সমাধির পাঁচটি স্তরের কথা বলা হয়েছে—যাক্, মন, বুদ্ধি বা জ্ঞানাত্মা, মহত্ত্ব ও শাস্ত্র আত্মা। বুদ্ধি, মন, জ্ঞান ও মহত্ত্বকে পতঞ্জলি বিতর্ক, বিচার, আনন্দ ও অস্পিতাভ্যুগত সম্প্রজাত সমাধিকপে বর্ণনা করেছেন। মন্থি পতঞ্জলির মতে ছয় প্রকার সমাধি আছে—

সবিতর্ক, নির্বিতর্ক, সবিচার ও নির্বিচার, সানন্দ ও সন্মিত, এই ছয় প্রকার যোগের মধ্যে প্রথম চারটি সম্প্রজাত সমাধির অবস্থা। সম্প্রজাত সমাধিতে কোন না কোন আলসন থাকে কিন্তু নির্বিকল্প সমাধিতে কোন আলসন থাকে না। অর্থাৎ “সবিকল্প সমাধিতে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, ধাতা ও ধোয়, বিষয়ী ও বিষয়, ভ্রষ্টা ও দৃষ্টের প্রভেদ থাকে কিন্তু নির্বিকল্প সমাধিতে এরূপ কিছুই থাকে না, সব একাকার হয়ে যায়—কোন ভেদ বা বৈতন্ধ্য থাকে না।” সম্প্রজাত সমাধির পরিপাকান্তে অসম্প্রজাত সমাধি তখন ত্রিপুষ্টি ভেদ হইয়া যখন নিরাকার ব্রহ্মসত্তায় চিত্ত নিদিধ্যাসিত বা লয় হয়, তখন চিত্তে চিং-সত্তাই ক্ষুরণ থাকে, বিষয়ের অধ্যাস থাকে না। অহং বা ব্যাধিবোধ থাকতে নির্বিকল্প সমাধি লাভ করা অসম্ভব। যেমন অহং বা ব্যাধি সত্তা থাকতে নির্বাণ বা নিগুণ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা অসম্ভব (There is no “one” in Nirvana...So long as “you” are there you haven’t got Nirvana, one has to get rid of all attachments and personanities before Nirvana can come and that is extremely difficult for one attached to a mental personality” Sri Aurobindo) যেমন ব্যাধি বা বৈতন্ধ্য বোধ থাকতে নির্বাণ লাভ করা অসম্ভব এবং তা পেতে হলে সমস্ত রস কম আনন্দি ও ব্যক্তিত্ব হতে আগে মুক্ত হতে হয়, তেমনিই নির্বিকল্পসমাধি লাভ করতে হলে ঐ অবস্থার অবশ্য প্রয়োজন, তার আগে নয়। এখানে একটা কথা বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার যে সমস্ত সমাধিই একটি মধ্যবর্তী চেতনা বা যার পথ মধ্যে দিয়েই মাত্র ইষ্টে পৌছানু যায়। অনেকে নির্বিকল্পসমাধিকে নির্বাণের সঙ্গে এক করে ফেলেন অর্থাৎ নির্বাণ ও নির্বিকল্পসমাধি একই বলেন কিন্তু সত্যই তা নয়। নির্বিকল্পসমাধির মধ্য দিয়েই নির্বাণ বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে হয় এটা শুধু আমার একারই নয় বাক্যের নির্বাণ বা ব্রহ্মজ্ঞানের অভিজ্ঞতা আছে তাঁরা সকলেই এ স্বীকার করবেন। তবে একথা সত্য নির্বিকল্পসমাধিতে ইচ্ছা মতন নেমে আসা যায় বা তা থেকে নির্বাণে যাওয়া যায় বা তা থেকে আসা যায়। নির্বিকল্পসমাধিতে

নির্লিপ বা ব্রহ্মজ্ঞানের অংশ আছে, সেইমাত্র শুদ্ধচেতনা (pure consciousness) আমি বহুবার এটি পরীক্ষা করে দেখেছি নির্লিকল্পসমাধিলাভ করতে সুদীর্ঘ কাল কঠোর তপস্যার প্রয়োজন এবং তার জন্য উপযুক্ত চেতনার ও প্রস্তুতির প্রয়োজন ("As for Nirvikalpa Samadhi ; it is the result of a long Sadhana in a consciousness prepared for it : Sri Aurobindo) যেমন আত্মজ্ঞান লাভ করতে বহুজন্ম তপস্যার প্রয়োজন তেমনিই নির্লিকল্পসমাধিলাভ করতে সময় লাগে। এক কথায় সমাধিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়—সবিকল্প ও নির্লিকল্প। সবিকল্প সমাধির প্রকার ভেদ আছে, নির্লিকল্পে তা নেই। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফলে বলতে পারি খাঁটি নির্লিপ বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে হলে একমাত্র নির্লিকল্পসমাধির মধ্য দিয়েই তা সম্ভব অল্প আর কোন সমাধির কথা আমি জানি না হয়তো তা অসম্ভবও নয়। ভগবানের সঙ্গে একায় হওয়াই আধ্যাত্মিকতার প্রকৃত আদর্শ (The loss of the ego in the Divine is the spiritual ideal —Sri Aurobindo এবং একমাত্র নির্লিকল্প সমাধিতেই তা সম্ভব কারণ অল্প আর সব সমাধিতেই দ্বৈতবোধ কম বেশী কিছু থাকবেই যা নির্লিকল্প সমাধিতে অসম্ভব। নির্লিকল্প সমাধি কেউ জোর করে ত্রাস্তে পারেনা, মারলে বা গায়ে আগুন দিলেও সমাধি ভঙ্গ হয় না কারণ তখন আর সে ব্যক্তি শরীরের ভিতর থাকে না (Nirvikalpa samadhi . now which one can not be awakened even by burning or branding i, e, a trance in which one has gone completely out of the body. It is a trance in which there is no formation or movement of the consciousness. It is supposed to be a complete absorption in the supranatural Turiya . there is no thought or movement of consciousness or awakens of either inward or outward things—all is drawn up into a Supracosmic Beyond"—Sri Aurobindo) অর্থাৎ নির্লিকল্প সমাধিতে কোন শক্তি বা আকৃতি কোন

দ্বৈত বোধ বলে কিছুই নেই সমস্তই তুরীয়ার সঙ্গে একাকার হয়ে যায়।

“প্রভাশূন্যঃ মনঃ শূন্যঃ বুদ্ধিঃ শূন্যঃ নিরাময়ঃ

সর্বশূন্যঃ নিরাভাঙ্গম্ সমাধিক্ত লক্ষণম্।”

সমাধি অবস্থায় নাম রূপ প্রকারাদি, মনের সকল বিকল্প-সুখশক্তি ও জ্ঞানশক্তি, এ সব আর থাকে না। চিন্তা বৃত্তি নিরোধ হইলে জাগ্রত স্বপ্ন ও স্বপ্নি এই অবস্থার উদ্ভেদ, গুণাতীত স্তব্ধ চৈতন্যই থাকে। স্বরূপাত্মত্ব। এটি অবস্থা নির্লিকল্প সমাধির অবস্থা, কারণ “সম্প্রজাত সমাধিতে কেবল ধোয় বস্তুর রূপটি থাকে-শুদ্ধ ইষ্ট, ব্রহ্ম-কলে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, ধাতা ও ধোয়, উষ্টা ও দৃশ্যের ভেদ থাকে।”

চিন্তাং চিত্তং বিজ্ঞানীয়াং তকার রহিতং ঘদা।

তকারঃ বিষয়াধ্যাসোঃ জবা রাগঃ যথা মণৌ ॥

“সম্প্রজাত বা নির্লিকল্প সমাধিতে চিত্ত তকার রহিত হইয়া চিতে পরিণত হয়। মায়া অধ্যাস হইলে চিত্ত, আর মায়া মুক্ত হইলে চিত্ত হয়।” অর্থাৎ সবিকল্প সমাধিতে মায়া থাকে, বৈত থাকে, মনের অংশ থাকে, তাই তাকে চিত্ত বলা হয়েছে-কিন্তু নির্লিকল্প সমাধি মায়া-মুক্ত তাই চিত্ত (pure consciousness) বলা হয়েছে তাকে। সবিকল্প সমাধিতে যা অহভব করা যায় তা বর্ণনা করা সম্ভব কারণ সেখানে দৃষ্টা ও দৃশ্যের ভেদ থাকে কিন্তু নির্লিকল্পে তা থাকে না। তাই শাস্ত্রে বলেছেন—

সমাধি নির্ণীত মলম্ভ চেতসো নিবেশিতস্তান্মনি যং

স্থখং ভবেৎ।

ন শক্যতে বর্ণয়িতুং গিরা, তদা স্বয়ং তদন্তঃকরেন

গুহ্যতে ॥

নির্লিকল্প সমাধিতে “কোনরূপ বিশেষ-বিজ্ঞান থাকে না বা কোন কিছু সম্প্রজাত হওয়া যায় না। ইহা স্বয়ং মাত্র...স্বরূপবোধ মাত্র—স্বরূপ লাভেই জ্ঞান ক্রিয়ার জন্ম যে সবিশেষ জ্ঞান বা সম্প্রজ্ঞান তাহা থাকে না “ন তত্র বাগ্ গচ্ছতি নো মনঃ” “বাক্য মনের অতীত সে স্বরূপ।” মন এবং মনুষ্যাণাং কারণং বদ্ধ মোক্ষয়োঃ অমৃতবিন্দু উপনিষদ।

মনই মনুষ্যের মোক্ষ ও বন্ধনের হেতু, সমস্ত সমাধিতে

মনের অংশ থাকে, কাজেই এই সমস্ত সমাধি মুক্তি বা মোক্ষ দিতে পারেন। কেবলমাত্র নির্বিকল্প সমাধি ছাড়া। নির্বিকল্প সমাধিতে মনের অংশ বলে কিছুই নেই, অবিজ্ঞা বলে কিছুই নেই, মায়া মুক্ত জীব তখন জীবমুক্ত হন। অনেকের ভ্রান্ত ধারণা আছে যে নির্বাপন বা মোক্ষলাভ যারা করেছেন তাঁরা আর জন্ম নেন না, তাঁরা লয় হয়ে যান। আমি বহুবার নিশ্চিকল্পে গিয়েছি লয় হয়ে যাইনি। বুদ্ধদেবের রূপাণ্ড আমি পেয়েছি তিনি লয় হয়ে যাননি এবং শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন নির্বাপণে মৃত্যুর পর মুক্ত জীবাত্মার লয় হয়ে যাবার পরও পুনরায় জন্ম নেওয়া সম্ভব (Souls which have passed into Nirvana may (not "must") return to complete the larger upward curve "Sri Aurobindo) অতএব নির্বিকল্প সমাধি বা নির্বাপন বা মোক্ষের নামে ভয় পাবার কিছুই নেই। মুক্তির পর মায়াবাদীরাও লীলাবাদীদের মত উপযুক্ত স্থানে আনন্দে বাস করতে পারে বা ইচ্ছা মত জন্ম নিতে পারে।

এখন লীলাবাদী ও মায়াবাদীর মধ্যে পার্থক্যের কথা এসে যায়। লীলাবাদীরা সৃষ্টির অতীত তত্ত্ব না জানলে বা সৃষ্টির অতীত যেতে না পারলে তাকে জন্ম নিতে বাধ্য হতে হয় এটা শ্রীঅরবিন্দ স্বীকার করেছেন। বৌদ্ধ না মায়া তত্ত্ব সমস্ত সৃষ্টির অতীত তত্ত্ব যদিও এর পরও আরো এক চরম বা পরম পরব্রহ্ম তত্ত্ব আছে। মায়াবাদী বা বৌদ্ধদের এক মস্ত বড় গুণিধা এই যে একবার সিদ্ধি লাভ করতে পারলেই সে মুক্ত, তাঁর জন্ম তাঁর ইচ্ছাধীন। লীলাবাদী সৃষ্টির মধ্যে থাকেন তাঁর তত্ত্ব ও প্রকৃতির মধ্যে মুক্ত হলেও বাধ্য হয়ে তাকে জন্ম নিতে হয়। ঘাঁটি মুক্ত হতে হলে হয় নির্বাপন বা পুরুষোত্তম তত্ত্বকে জানতে হবেই নাচ্যঃ পন্থা বিজ্ঞেয়নায় আর অগ্র কোন পথই নেই।

সিদ্ধিলাভের দুটি পথ আছে, একটি সহজ ও সরল, যা এই জন্মেই স্বাভাবিক সম্ভব, অপরটি কঠিন স্মরণের দ্বর্গম পথ যা শেষ করতে হয়তো মাত্র এক জন্ম নয় কয়েক জন্ম লাগে। যারা অষ্টাঙ্গ যোগের পথে যেতে চেষ্টা করেন তাদের মধ্যে অতি অল্পই স্বকঠোর তপস্বী করে সিদ্ধি লাভ করতে সক্ষম হন। গুরুকৃপা মন্ত্র বা দীক্ষা নিয়ে

সিদ্ধি লাভ করেছেন এমন একজন শিষ্যও আমার চোখে পড়েনি; যারা সিদ্ধি লাভ করেছেন জানি তারা বিধি-নির্দিষ্ট অর্থাৎ জন্মাবার আগেই তা নির্দিষ্ট হয়েছিল এঁদের পক্ষে গুরুকৃপা বা মন্ত্রের বা দীক্ষার কোন কথাই ওঠেনা। এক কথায় ধ্যান ধারণা বা গুরু কৃপায় সিদ্ধিলাভ করা সুহৃৎ আমার জানিত কেউই নেই। সেই জন্মই বলেছে "গুরু মিলে ল'খ ল'খ, শিষ্য মিলে না এক।"

অগ্র পথটি সরল যা এ জীবনেই সম্ভব এবং বিনা বিঘ্নে এবং কষ্টে। আমার গুরু মন্ত্র বা কৃপা বলে কোন প্রকারের সাহায্য মানুসের কাছ থেকে পাইনি। আমার প্রায় দশ মাস লেগেছিল নির্বাপন বা নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে এবং তা আমি সহজেই অর্থাচিত ভাবেই পেয়ে ছিলাম, নির্বিকল্প ও জ্ঞান সমাধিটির জ্ঞান আমাকে কোন যত্ন বা চেষ্টা করতে হয়নি, তা আপনিই এসে গিয়েছিল। কৃপা আমি অবশ্য পেয়েছিলাম সিদ্ধির আগে মহাকাশীর এবং সিদ্ধির পরে বুদ্ধদেবের। শ্রীঅরবিন্দের এক পত্রে "ও" মন্ত্রটির সম্বন্ধে জানতে পারি যে মন্ত্রটি ঠিক মত জপ করতে পারলে নির্বাপন বা ব্রহ্মজ্ঞানলাভ হয়, এর জ্ঞান কারো কৃপা বা মন্ত্রের দরকার হয়না। ধ্যান ধারণা আমি করিনি, মাত্র মন্ত্রটি ঠিক মত জপ করেছি এবং চেষ্টা করেছি চেষ্টনাকে মাথার ওপর দিয়ে অর্থাৎ সঁহস্রর ভেদ করে বাইরে নিয়ে যেতে এবং প্রায় দশ মাসে আমি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করি যদিও আমার লক্ষ্য ছিল পরব্রহ্ম। প্রণবো ধর্ম, শরোহায়া ব্রহ্ম তত্ত্বলক্ষ্য মূঢ়্যতে।

অপ্রমত্তেন বেদব্যাস শরবত্ত্বংমোবেৎ ॥ ২২ঃ—মুণ্ড কোপনিষদ।

"গুহারই ধর্ম, জীবাত্মাই বাণ, ব্রহ্ম উক্ত বাণের লক্ষ্য বলিয়া কথিত হন। প্রমাদহীন হইয়া ভেদ করিতে হইবে। অতঃপর বাণের দ্বারা তত্ত্ব অর্থাৎ লক্ষ্যের সহিত অভিন্ন হইবে।" স্বামী গভীরানন্দ। ও' মন্ত্রটি স্বয়ং সিদ্ধ অর্থাৎ নির্বাপন বা নির্গুণ একই ইহার মূলে লক্ষ্যস্থল, যদিও এক মাত্র নয়, মন্ত্রটি ঠিক মত জপ করিতে পারিলে নির্বিকল্প সমাধির মধ্যদিয়ে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা সম্ভব এবং এর জ্ঞান কোন দীক্ষা কৃপা বা গুরুর প্রয়োজন নেই। বাহ্যিক একাগ্রতা (one pointedness), আছে বা একপ করা অভ্যাস আছে এবং যাদের ইচ্ছা তীব্র তাহাই শীঘ্র সিদ্ধি

লাভ করেন। মহর্ষি পতঞ্জলিতে বলেছেন তত্ত্ব বাচকঃ
প্রণবঃ ১।২৭, তীত্র সং বেগানাম'সম—১।২১ এবং তত্রপ
স্তম্ভভাষনম্—১।২৮। “সাধ্যা বস্ত সাধনা বিনা কেহ নাহি
পায়” বিনা সাধনায় সিদ্ধিলাভ অসম্ভব এবং যারা নিষ্ঠা
ও বিশ্বাসের সঙ্গে লেগে থাকেন তাদেরই মাত্র সিদ্ধিলাভ
হয় pm who cleve to the path—stead fastly can
be sure of ther spiritual destiny—Sri Auro
bindo); যে কোন প্রকারেই হোক একবার শরীর
থেকে চেতনাকে বার করে নিতে পারলেই তা সম্ভব।
কি করে ব্রহ্মজ্ঞানলাভ করা যায় এব উত্তরে রমণ মহর্ষি
বলেছিলেন দৃশ্যময় জগতের বিলোপ ঘটলে তবেই ব্রহ্ম
উপলব্ধি হয়।” ইহাই যোগের সোপান চিত্র রুতি
বিরোধ যে যোগ ভাতে সন্দেহই নেই, তবে এই চিত্র

নিরোধ ভগবানের উপর নির্ভর করলে বিনা চেষ্টায়
আপনিই আসে এর জন্ত বৃথা চেষ্টা করতে হয় না।

গুরু সঘর্ষে বুদ্ধদেব বলেছেন “আত্মাই আত্মার নাথ,
আত্মার বন্ধু (আত্মাহি-অন্তনো নাথো, মোহিনাথো পরো
শিয়া); শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন “আপনিই আপনার গুরু”
(আত্মনো গুরুরাষ্ট্রক) যারা ভগবানের উপর বিশ্বাস
রেখে চলে তারা ঠকে না এবং বলতে পারে—

“The way. It opened wide
plain for all to tread easy and near,

Sir Edwin Arnold.

N. B, কতকগুলি উদ্ধৃতি আমি নিয়েছি, দুঃখের
বিষয় নামগুলি মনে নেই।

জহর-তিলক

শ্রীমধীর গুপ্ত

(১)

আজ্ঞা অলক্ষ্যে চিত্তা জলিতেই থাকে,
সংখ্যাভীত নর-নারী ভস্ম হ'য়ে যায়।
চিত্তা-ভস্ম মহাকাল উড়িয়ে বাতায়
নিশ্চিন্ত করে যে সবই; তবু তা'রই ফাকে
এ বিশ্বের চিত্তা-ভীত মানব-সভাকে
জলন্ত জহর-দীপ্তি দিবা গরিমায়
আচম্বিতে জীবনের বিজয়-টিকায়
দীপ্ত করে, প্রাণ-বহ্নি-পদ্ম ফোটে পাকে।
ভস্ম করি' কাল-চিত্তা প্রাণের অনলে,
খণ্ড-কালে সীমান্তিত জীবন ঢালিয়া,
সেই কাল-চিত্তা-ভস্ম সঁপি' ভূমণ্ডলে
জীবনের যার সে যে অমৃতত্ব দিয়া।
বিশ্ব-পথ ভরি' মৈত্রী-প্রীতি-পরিমলে
জহর-তিলক চলো সকলে পরিয়া।

(২)

ভাঙে ভাঙে চিত্তা-ভস্ম আহরণ করি'
তুঙ্গ শৃঙ্গে—মাঠে—বাটে—দক্ষমে চড়াও;
জহর-তিলক লক্ষ গ্রামেরে পরাও,
অমর সে মৈত্রী-প্রীতি এ-ভারত ভরি'
কোটি নব-জাতকের নাখে মূর্তি ধরি'
নন্দিত করুক বিশ্ব। ছড়াও—ছড়াও
তা'র শুভ্র স্বপ্ন যত; প্রেম-দীক্ষা দাও;
হিংসা-মত্ত বিশ্বে তোলা একান্ততা গড়ি'।
জীবন যা' দিতে পারে, তা'রও যে অধিক
সে দিয়েছে। ভস্ম করি' চিত্তা-ভীতি যত
ভারত-পথিক হোলো জগৎ-পথিক।
মানব-মুক্তিতে ছিলো খণ্ডিত দে-ব্রত
মরণ-অমৃত তা' যে প্রেম-পথে ঠিক
বিশ্বেরে প্রেরণা দিবে চলিতে যতত।



প্রাচীনায়



স্বাধীনতা কামার বাবা

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

গানের পরে বহিরঙ্গ ভক্তেরা সবাই প্রস্থান করলে পর আলোক হঠাৎ ব'লে বসল: “সত্যি গুরুদেব, আমার সময়ে সময়ে অবাক লাগে ভাবতে—আমরা নদীকে কত সহজে দেবীর পদে বসাতে উজ্জিয়ে উঠি! আপনিই তো বলছিলেন দেহর ইজ্রায়ী নদীর উত্তর কাহিনী—ইজ্রের অর্গা গ'লে না কি পুণ্যসলিলা ইজ্রায়ী স্রোত হ'ল—অমনি হাজার হাজার সাধক সেই জলে স্নান করে গঙ্গদ!”

জব টুকল: “বা:। ওরাও কি জর্ডন নদীকে পুণ্যসলিলা বলে না। পল রোবসনের ole man river—”

আলোক বলল: “ও কিছু না। আমরা যেমন ধূপকে বলি পবিত্র—জাপানীরা ফ্লকে। আমাদের গঙ্গাদেবী হ'লেন গঙ্গামাতা। মহাদেবী—শিবের ঘরগী—যাঁকে ভক্তি করলে ‘স্বথমুক্তি’ হাতে হাতে। এই মাত্র সাধুজিই তো গাইলেন। আর এ-সার্টিফিকেট দিলেন কে? না, জ্ঞানের সূর্যবিগ্রহ ওজসের অবতার শঙ্করাচার্য যিনি প্রচার করেছিলেন:

‘ন মৃত্যু ন শঙ্কা ন মে জাতিভেদঃ পিতা নৈব মে
নৈব মাতা চ জন্ম।

ন বন্ধু ন মিত্রং গুরুনৈব শিষ্যাক্ষিপানন্দরূপঃ
শিবোহং শিবোহম্।’

তেমনি অমন যে-স্বাবলম্বী পুরুষ, তীক্ষ্ণী ক্রিটিক ও বিষম
ভার্কিক বিজ্ঞানজ্ঞান—যিনি যৌবনে হিন্দুধর্মের কোনো

সনাতন আস্থা শ্রদ্ধা আচারকেই ছেড়ে কথা কন নি—
তিনিও কিনা পঞ্চাশ না পেরুতেই গাইলেন,

কত নগ নগরী তীর্থ হইল তব চুধি' চরণযুগ মাধ্রি!

কত নরনারী ধন্য হইল মা, তব সলিলে অবগাহি'!

বহিছ জননি, এ-ভারতবর্ষে কত শত যুগ যুগ বাহি,'

করি হৃষ্টামল কত মরু প্রান্তর শীতল পুণ্য তরঙ্গে!

না রে না—গঙ্গা যমুনা সবধরী কৃষ্ণা কাবেরী গোদাবরী...
এ সব নদীকে ভক্তি করতে না করতে আমাদের চক্ষে চলে
ধারা, বক্ষে জাগে উচ্ছ্বাস! বিলেতে আমার এক খাস
সাহেব বন্ধু বসন্তেন আমাকে বাকা হেসে:

“জলকে দেবী ব'লে স্তব ক'রে রাতারাতি স্বর্গের
দি'ড়ি পার হবার সাধনা—এ তোমরাই পারো বন্ধু!
আমরা, ছাপোষা মনিষি, জলের মধ্যে দেবীমানার কল-
কল্লোল শুনে পাই না—শুনি শুধু হাইড্রোজেনের সঙ্গে
অক্সিজেনের গলাগলির খোস খবর।”

নমিতা টুকল: “তুমি কী যে দুমদাম ক'রে যা তা
বলো, বাবা! গুরুদেবের সামনে এমন চড়ে বলতে
আছে?”

আলোক (অপ্রস্তুত হ'য়ে): বলতে নেই না কি,
গুরুদেব? যদি বলেন “না”—মেনে নেব। অতিবিশ্বাসী
হ'তে যদি নাও হ'তে পারি, অপ্রতিভ হতে বাধ্যবে না—
কথা দিচ্ছি।

সাধুজি (হেসে): না বাবা, অপ্রতিভ হোয়ো
কৃষ্ণদেব কাছে যখন ধূমধাম ক'রে পেট চিরতে গিয়ে বুক
চিরে ভুল ক'রে ফুসফুসের মধ্যে কাঁচি রেখে পাজরা ঝুঁকে
সেলাই ক'রে দেবে। সাধু-সন্তদের কাছে বেপরোয়া

হ'য়েই ব'লে ফেলো—বা তোমাদের প্রাণ চায়। কারণ তোমরা তাঁদের জগতের খবর না রাখলেও তাঁরা তোমাদের বুদ্ধির খবর রাখেন, কাজেই ভুল বুঝবেন না—আরো এই জন্তে যে, তাঁরা জানেন একদিন আসবেই আসবে যেদিন ফাঁশ হ'য়ে যাবে—এই খাস সাহেবদের আঙ্গিক তব্ব সম্বন্ধে অজ্ঞানতা কত গভীর। সেদিন তোমরাও অল্প সুর ভাঁড়বে—বৈজ্ঞানিক সংশয়ের ফুটো নৌকা ছেড়ে চাইবে বিশ্বাসের মজবুৎ জাহাজে প্রেমের পারাণি।

আলোক (হেসে) : সংশয়ের পরে আপনার কী যে জাতক্রোধ, গুরুদেব! কিন্তু সংশয়ও কি বিধাতার সৃষ্টি নয়—কুসংস্কারের হাজারো অনাসৃষ্টি কি সাফ করে না সে? শুধু খাস সাহেবরাই তো নয়, মস্ত যোগিকবি জর্জ রাসেলও কি বলেন নি সঘনে :

They are but the slaves of light

Who have never known the gloom ?”

মালতী : এর মানে কী দাদা ?

আলোক : “তারা শুধু আলোকের ক্রীতদাস হায় জানে নি জীবনে যারা কত ভ্রমসায়।”

(সাধুজিকে) বলবেন কি তিনি ভুল বলেছিলেন ?

সাধুজি (মুহূ হেসে ধরা ছোঁওয়া না দিয়ে) : ভুল যদি না ব'লে থাকেন তা হ'লে তোমাকে কিন্তু বাবা মহামুন্সিলে পড়তে হবে : একটি দাসও পাবে না কোনো দিন।

আলোক (আশ্চর্য হয়ে) : কেন গুরুদেব ?

সাধুজি : কারণ আমাদের এই পুণ্যভূমি ভারতেও এমন একটি মানুষও খুঁজে পাবে না যে, জীবনে অন্ধকারের খট্টায় না প'ড়ে আলোর শিখরে পৌঁছেছে।

আলোক (নাছোড়বন্দ) : না গুরুদেব, বার বার অমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে চলবে না। আজ হয় এম্পার নয় ওম্পার। বলতেই হবে আপনাকে—সত্যিই কি কেউ সংশয়ের মধ্যে দিয়ে না গিয়েই সটাং পৌছতে পারে ষপার্শ্ব বিশ্বাসে ?

সাধুজি (ঠোটে হাসি আরো যেন বীকা হ'য়েওঠে) : বাব্ব! সংশয় তো আমাদের দেহ-মন প্রাণের তত্ত্বীতে তত্ত্বীতে ওতপ্রোত হ'য়েই আছে। এ-হেন ছিনে-জোঁকের ওকালতি নাই বা করলে ? ঘর হাজার বন্ধ

ক'রে রাখলেও মাটিতে ধুলো জমে। তাই খ'লে কি স্রবুজি বলে—‘যাকে ঠেকানো যায় না তাকে প্রশ্ন দেওয়াই উচিত ?’ না বাবা, আমার গুরুদেব উঠতে বসতে আমাকে শাসাতেন একটি লাখ কথার এক কথা ব'লে : যে, আমরা জানার মতন অনেক কিছুই জানতে পারি না—জানতে চাই না ব'লে। আর এই না চাওয়ার মূলে ঘুপটিয়ে রেখেছে ঐ ষত-নষ্টের গোড়া সংশয়। তোমরা কথায় কথায় বিলিতি বুলি কপচাও, Knowledge is power, কিন্তু রাজসিক বাজিক হ'তে গিয়ে বেমালুম ভুলে ব'সে আছে যে, ভারতে আমরা যে-প্রজ্ঞাকে ‘শক্তিদাত্রী’ উপাধি দেই তার নাম পরাবিত্তা ওরফে আত্মজ্ঞান। এ পরমাশক্তির বর পায় কেবল সেই ভাগ্যবান্ যে তার মনের জমিতে বিশ্বাসের আবাদ করে সোনা ফলিয়েছে—যার সংস্কৃত নাম শ্রদ্ধা, সাহেবি নাম faith তাই তো ঠাকুর গীতায় বলেছেন অত জোর ক'রে যে জ্ঞানের আলো আসে শ্রদ্ধার প্রণালী বেয়েই ‘শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্।’

ঐব : কিন্তু ও শ্রদ্ধাবান্ হবে কী হুখে সাধুজি, যদি আপনি ওকে ধমকে না দিয়ে ধরেন কাকুতি মিনতির সুর ? (আলোকের দিকে চেয়ে) গুরু করার পরে এ সব কী ফাজিল তর্ক শুনি ? গীতায় বলেনি “সংশয়াক্ষা বিনশতি ?”

আলোক (ঈর্ষ উত্তেজিত সুরে) : এ তোর গাজোয়ারি কথা ঐব! সংশয় যদি মানুষকে শুধু সর্বনাশের পথেই রওনা ক'রে দিত তাহলে আজ ওদেশে বিজ্ঞানীদের এ অদ্ভুত সমৃদ্ধি হত কি ?

ঐব (হো হো ক'রে হেসে উঠে) : সমৃদ্ধি তো ষণ্টা! সারা জগৎ আজ ভয়েই কম্পমান্—কখন অগীযান্ দেবতা মহীয়ান্ অপদেবতা হয়ে ফেটে পৃথিবীকে চোচির করবেন—অথচ সঙ্গে সঙ্গে জাঁক কত : ‘দেখ, আমরা আকাশে উড়াবে পৃথিবীর চারদিকে বোঁ বোঁ ক'রে ঘুরে কী দুর্দান্ত দাপট দেখাচ্ছি গতির দামামা বাজিয়ে।’ শুধু কি তাই ? আফালন কত : আজ চাঁদে চুঁ মারব, কাল মঙ্গল গ্রহে লাফ দিয়ে নিকর জমিতে সোনা ফলাব, পরশ শনির বৃকে গুঁতিয়ে বুম্বিয়ে দেব আমরা কে ? মা প্রায়ই বলতেন নাস্তিককে ষেবটায় পেয়ে বসেই বাস

শনির দশা—এ তাই। হাসব না কঁাদব চেবে পাই নে—
শান্তি গেল, ভক্তি গেল, মৈত্রী, করুণা, সহিষ্ণুতা, সংঘম,
তপস্কা, সব গেল চুলোর দোরে—রইল শুধু গতির গর্জানি
আর হজুগের হটরোল! উত্তর দিক দিয়ে হিমালয়ের
চূড়ায় ওঠা হ'ল—এবার দক্ষিণ দিক দিয়ে হানা দেব—
অম্নি সবাই সম্মুখে হাততালি : “উঃ! কী বীরত্ব! এরই
তো নাম অতিমানব!” শুনিবি মজা? আমি বিলেত
থেকে ফিরবার পথে আমেরিকায় যাই ওখানকার খৃস্টান
সায়েন্স প্রকাশনার ম্যানেজারের নিমন্ত্রণে। সেখানে
গিয়েছিলাম এক মন্ত “শো” দেখতে। (সাধুজকে) উঃ
সে কী রোমহর্ষক ব্যাপার গুরুদেব! প্রতিযোগিতা
কিসের জ্ঞানেন? আপনি এত বড় যোগী হ'য়েও শুনে
খ' হ'য়ে যাবেন। এই বিশেষত্বের স্বস্থমস্তিক বুদ্ধিবাদী
যুগে একশো জন ধুম্রলোচন পাল্লা দিলেন—কে সবচেয়ে
বেশিক্ষণ একটানা সিগার ফুঁকতে পারে। সে একেবারে
হেঁ হেঁ ব্যাপার, রৈ রৈ কাণ্ড! চেটেয়ের পর চেটেয়ে
বুদ্ধিমত্তা ও বুদ্ধিমত্তী টিকিট কিনে পাল তুলে এলেন
দেখতে!—শুধু তাই নয়, সে কী হাততালি যখন বীরশ্রেষ্ঠ
একটানা সাতাত্তর ঘণ্টা সিগার ফুঁক পেলেন তিন হাজার
ভলার! (আলোককে) এ কি ভাবা যায়—বল তো?
হজুগের হল্লা রথে চড়ে কোন্ গোলকধামের গঙ্গোত্রী-
মুখে চলেছে ওরা শুনি বিজ্ঞানের বাহ্যাক্ষাটে?

আলোক (হেতে উঠে): সিগার প্রতিযোগিতা
আর আকাশে ঘোরার প্রতিযোগিতা এক হল? কী
বলছিস রে মূঢ়? বিশ্বাস বিশ্বাস জপতে জপতে কেবে কি
তোর বুদ্ধি লোপ হ'ল না কি? গুরুদেব! কী বলেন
আপনি? আপনাকেই সালিসি মানছি। রায় দিতেই
হবে।”

সাধুজি (স্নিগ্ধ হেসে): ধীরে ধীরে! মূনি-ঋষির
বলেন: ‘অশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ’
অর্থাৎ অশান্ত যোগী মন সে জ্ঞানের মাধ্যমে কখনো
সত্যের দিশা পায় না, আর তর্কাতর্কি অশান্তিই আনে
সাড়েপনেরঅানা ক্ষেত্রে। তাই উপনিষদে বলেছে
‘নৈবা তর্কেন মতিরাপনীয়া’। আমার নিজের কথা যদি
জিজ্ঞাসা করো তবে আমি শুধু বলতে পারি আমার
কাছে সেই পরমবেত্তাই উপাস্ত, মন বুদ্ধি তর্ক যুক্তি আর

নাগাল পায় না। (এবার দিকে চেয়ে) তুমি ওদের
হজুগ আর গতির নেশার কথা তুললে বাণী! কথাটা খুব
ভুল বলো নি। কারণ গতি আনে একটা তীব্র স্বায়াবিক
উত্তেজনা যার ফলে দিগ্ভ্রম হয় প্রায়ই। কিন্তু সেই
সঙ্গে এও কি সত্য নয় যে স্থিতিকে সত্যিই সম্পূর্ণ করে?
কিংবা ধরো বলা যেতে পারে স্থিতির প্রশান্ত মহিমার বা
সমাধির শাপ্ত রসের রসিক হ'তে শিথি আমরা তখনই
যখন ঠেকে শিথি যে, হজুগে হাওয়ার হাওয়ায় চেপে
স্বপ্নের শান্তিলোকে পৌছনো যায় না। নিঃশব্দ গতির
রণে চড়ে শেষে চোরা বালিতে পৌছিয়ে তবেই না আমরা
খুঁজতে শুরু করি আপূর্ণ্য অচল-প্রতিষ্ঠ আনন্দলোকের
চাবিকাঠি! হয়েছে কি জানো? ওদের বেসামাল প্রাণ-
শক্তিই ওদের নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়ে মারছে শক্তির মদে
মাতাল ক'রে। তাই ওরা খামতে পারছে না। অন্তরের
মধ্যে অমৃত সমুদ্র, কিন্তু সে দিকে দৃষ্টি দেবারও সময় নেই,
তাই চলে গৌরীশঙ্করে, মেকজয়ে, সমুদ্রের অতলে, বাষ্প
বায়ুলোকের ওপারে। একেই ওরা নাম দিয়েছে গতির
প্রগতি বস্তুতত্ত্বের বিজ্ঞানসিদ্ধি। এ-তাগিদেরও প্রয়োজন
আছে, পূর্ণতম আত্মবোধের অগ্রদূত হয়েই হয়ত এনেছে
এ যুগে এই গতির গর্জন, হজুগের হামবড়াই। হয়ত
অবিশ্রান্ত ঘুরতে ঘুরতে একটা সময় আসবে যখন ওদেরও
মনে হবে—শুধু হেঁ চৈ-য়ের বহিমুখী উত্তেজনালোকে
পাওয়া যায় না সে-বর যে-বর বিনা ঘোরাঘুরি হয়ে
দাঁড়ায় বিড়ম্বনা। হয়ত সে-শুভলগ্ন আসবে গতির
স্বরূপানের পরে অবসাদ এলে তবে। কখন কোন্ পথে
কী ভাবে সে লগ্ন রাঙবে কেউ জানে না বাবা, এক
ঠাকুর ছাড়া। তবে এটুকু তাঁরা সবাই জানেন ঝারা তাঁর
কৃপার স্পর্শে জী-মুক্ত হয়েছেন: যে, একদিন না একদিন
সবাইকে চাইতে হবে উত্তেজনার মোহ ছেড়ে পরমা
শান্তির স্রুধা, জীবকে শিবজ্ঞানে সেবা করার আনন্দ।
আর সে-পরম প্রার্থনা ওদের হৃদয়ে পুরোপুরি জেগে
উঠবামাত্র তার চিন্ময় আলোয় ওদের বস্তুতাত্ত্বিক
জ্ঞানের ঝুলি খসে পড়বে, অম্নি ওরা দেখতে পাবে
অন্তরাত্মার গহনলোকে যে-অকুরন্ত ঐশ্বর্য বৈচিত্র্য চরক
আমাদের আবিষ্কারের অপেক্ষায় রয়েছে, তার কাছে
বস্তুজগতের সেরা আবিষ্কারও নগণ্য। তখন দেখবে

একটা অভাবানীর volte face এই সব নাস্তিক বিজ্ঞানী-রাই ভিগবাজি খেয়ে হয়ে উঠবে রাতারাতি আশ্চর্য আন্তিক। আমাদের থামখেয়ালী ঠাকুরটি কাকে যে কবে কোন পথে দিয়ে কোথায় টেনে তাঁর আপন ক'রে নেন, কেউ কি জানে বাবা?

মালভী খুব মন দিয়ে শুনছিল, হঠাৎ আলোকের পানে তাকিয়ে বলল: “গুরুদেব! কাল পরমহংসদেবের কথামৃত পড়তে পড়তে তাঁর একটি উপমা বড় চমৎকার লাগল। মনে আছে আপনার—তিনি বলতেন, একটা পাখী অকুলপাথারে জাহাজের মাস্তুলে বসে। একবার উড়ে উত্তরদিকে, উধাও হয় ফিরে আসে কুলের দেখা না পেয়ে। তারপর দক্ষিণে, পূর্বদিকে, পশ্চিমে। ঘুরে ঘুরে কোনো দিকেই কুল-কিনারার দিশা না পেয়ে সে শেষটায় কায়ম হ'য়ে মাস্তুলের উপরেই বসল—জাহাজ যেখানে নিয়ে যায়। অর্থাৎ হতাশাই শেষে এল শাপে-বর হ'য়ে, দিল নিশ্চিন্তির পরম দিশা। এরই নাম বুদ্ধির আত্মসমর্পণ—বহুদূরের পর কুটীচক, না গুরুদেব?”

সাধুজি (প্রসন্ন কণ্ঠে): হ্যাঁ মা, আমার গুরুদেব বলেন প্রায়ই যে, এ যুগের সাধকের কাছে ঐরামকৃষ্ণকথামৃতই হ'ল গীতার গীতা। তাঁর সঙ্গে একত্রে এ বইটি যে আমি কতবারই পড়েছি। তবে কি জানো মা? শুধু পড়লেই হয় না। ঐ কথামৃতেই দেখতে পাবে ঠাকুর বলেছেন, ‘সময় না হ'লে হয় না।’ তাই তো অনেক ঘোরাঘুরির অন্তে তবে আসে শাস্তির তৃষ্ণা, অনেক ঘা খেয়ে তবে আসে পরম নিবেদ। তবে এ আমি দেখেছি মা যে, মেয়েরা স্বভাবে তর্কের ঘুরপাকের বিরোধী বলেই শাস্তির ভক্তির প্রেমের পূজারিণী হতে পারে পুরুষদের চেয়ে সহজে। পুরুষেরা অবিবাসকে বিদায় দিতে বেগ পায় আমার অর্ধিমান—অহংকারে। কিন্তু তোমরা, মেয়েরা, যদি একবার ভালোবাসে—আর ভালোবাসতে তোমরা পুরুষদের চেয়ে বেশি পটু, মানতেই হবে—তাহলে আত্মসমর্পণের ডাকে আমাদের চেয়ে ঢের বেশি সহজে বিশ্বাসে সাড়া দিতে পারো। তাই তো বৈষ্ণব কবিতা বলেছেন—গোপীরা যে বাঁশী শুনে এত সহজে ঘর ছেড়েছিল, সে-বাঁশী শুনতে হলে প্রতি ক্ষণকে হ'তে হবে হিয়া-রাধা, বার শুধু একটি

কামনা—যা কিছু আছে সবই তাঁর চরণে প্রেমের আ-প্রণামী দেওয়া। (নমিতাকে) তুমিই কাল গাইছিলে ন কী গানটি যেন? গাও না মা, তর্ক ঢের হয়েছে—এ গান করুক শাস্তি পাই।

নমিতা গাইল শুন শুন ক'রে আলোকের সঙ্গে—

কৃষ্ণের মঞ্জীরে মন্দ মৃদু সমীরে

ধায় কালিন্দীতীরে রাধা-হিয়া অভিসারে

মত্তর আশা কুঞ্জে নন্দন ফুল মুঞ্জে

মর্ম ভ্রূঙ্গ গুঞ্জে বসন্ত বন্ধারে ॥

দোল-দোল দোল গানে জয়-জয়-জয়-তানে

উধাও অলখপানে রাধা-হিয়া সুখ-স্বপ্নে।

অচিনের অমরাগে যুমন্ত প্রেম জাগে

মধুরের ঢেউ লাগে—মিলন-তৃষ্ণা লগ্নে ॥

অঙ্গর গলে পুঙ্ককে, ছালোক নামিল ভুলোকে,

সঙ্ঘার ছায়া অলকে জোয়াংরা ছুলায় মালা।

অদেখা বঁধুর বাঁশি বাজিল চিত উদ্বাসি'

“আয় আয় ব্রজবানী! আয় আয় ব্রজবালা!”

রাধা-হিয়া গায় উছলি': “লহ বসন্ত, সকলি,

শুনি' ঘরছাড়া মুরলী চিনেছি তোমারে স্বামী!

তোমারেই চির সুন্দর! চেয়েছি যুগ-যুগান্তর,

তত্ত্ব মন প্রাণ অন্তর চরণে সঁপি প্রণামী।”

সাধুজি শুনতে শুনতে ভাবন্ত। বললেন ভাবমুখে: “এই—এই—এই-ই হ'ল সত্যের সত্য মা! আর সবই বড় জোর আংশিক সত্য। শুধু এই তত্ত্ব মন প্রাণ—সর্বস্ব—তাঁর চরণে নিবেদন ক'রে তবে মাছুষ পেতে পারে তাঁর পায়ে ঠাই—সেখানে পৌঁছেলে সব তর্কাটকির শাস্তি; সব ঘুরে মরার সমাপ্তি; সব গতির মোহের ক্রান্তির অবসান। তখনই ভক্ত বলে শ্রোপদীর মতন কাতর হুরে: ‘প্রভু, তবভয় হতে তারণ করো—পাহি মাং রূপমা দেব অগতিনিং গতিভব,’ অমনি ঠাকুর বরাভয় দিয়ে বলেন: ‘মাতৈঃ, ন মে ভক্তঃ প্রণশ্চতি—আমি যাকে রাখি, তাকে মারে কার সাধ্য?’”

আলোক (একটু চুপ ক'রে থেকে): অঃহ পেতে না চায় কে গুরুদেব? কেবল—নাঃ, (এবর দিকে তাকিয়ে) কাজ কি আমার অতিবিশ্বাসী বন্ধুটির কোমল মনে ফের আঘাত দিয়ে?

মালতী (হেসে): না না, বন্ধুটি আপনার দেখতে যেমন সুসুন্দারী, আসলে তা নন। আপনি বলুন দাদা, বা প্রাণ চায়।

আলোক (সাধুজিকে): বলতে চাইছি এমন কোনো পাষণ্ডীয় মন্তন কথা নয়, গুরুদেব! তবে কি জানেন? শ্রোণী কৃষ্ণঠাকুরকে চোখে দেখে তবে পেয়েছিলেন তরঙ্গ। যে অগতির গতি বলে ডাকলে তিনি লাড়া দেবেনই দেবেন। কিন্তু হুঁতগা আমরা তো সে-ভারক-ঠাকুরটির রূপার কোনো প্রত্যক্ষ পরিচয়ই পাই নি—মানে, কোনো শেষ রক্ষার অবতনই চাক্ষুষ করিনি তো, তাই মনে হয়—যদি একবার দেখতে পেতাম স্বপ্নে, তবে বর্তে যেতাম।

সাধুজি (হেসে): কী দেখতে চাও তুমি? পরব্রহ্মকে?

আলোক (হেসে): না, বাড় এখনও অতটা বাড়েনি। আমি শুধু দু'একটা দৃষ্টান্ত দেখতে চাই যে, এ ঘোর কলিতেও ঠাকুর কথা দিয়ে কথা রাখেন—তার ভক্ত স্বপ্নেও মরে না। (করজোড়ে) একবার দেখান না গুরুদেব! লক্ষ্মীটি! শুনেছি বিষ্ণুঠাকুর আপনাকে দেখিয়েছিলেন, আপনিও নাকি পাবেন দেখাতে।

সাধুজি (দুই হাত কপালে ঠেকিয়ে): অমন কথা ঠাট্টা করেও বলতে নেই। আমি কে বলো দেখাবার? কতটুকুই বা বৃষ্টি তাঁর লীলার ছন্দের? জানি তো হাড়ে হাড়ে নিজের বিস্তারিত দৌড়। আমি শুধু এইটুকু বলতে পারি বাবা, যে অযোগ্য হয়েও আমি ঠাকুরের অপার করুণার কিছু ছিটে ফোটা পেয়েছি এই বিশ্বাসের পথেই। তাই তো তোমাদের বলতে পারি এত জোর দিয়ে যে, যারা সত্যি সত্যি বিশ্বাস করে তারা তাঁর করুণা পায়ই পায়। কাজেই বিশ্বাসকে নিয়ে যারা হাসাহাসি করে তাদেরকে বলতেই হবে 'হুঁতগা'—কেমনা করুণা আমার প্রণালীটাকেই তারা বুঝিয়ে দেয় সংশয়ের আড়াল তুলে। তাদের জন্তে দুঃখ হয় বৈকি—তাদের এখনও অনেকদিন ভুগতে হবে বলে। তবে তারাও শেষে পাবেই পাবে বিশ্বাসের চাবি, ভক্তির দিশা, তৃষ্ণার জল। ঠাকুর কাউকেই ফেলেন না বাবা—অন্ধকেও একদিন না একদিন দেবতা হতেই হবে।

গুরুদেব একটি প্রবচন আওড়াতেন প্রায়ই: "শ্রীক্ষেত্রে কেউই অতুক্ত থাকে না, তবে কেউ প্রমাণ পায় সকালে, কেউ বা সন্ধ্যায়—এই বা।"

আট

এই সময়ে দেখতে হঠাৎ বসন্তের প্রকোপ দেখা দিল—এ-রকম মহামারী এ অঞ্চলে কখনো হয় নি। সাবিত্রী দাক্ষণ ভয় পেয়ে স্বামীকে বলল: "চলো বাই কান্নী।"

সাধুজি বললেন: আমি এইমাত্র দেশাইয়ের ওখানে গিয়ে নাম লিখিয়ে এসেছি—আলোককেও টেলিফোন করেছি—সেও এল বলে। আমি চাই দস্তায়েরও আসে আর্ডের সেবা করতে।"

সাবিত্রী (তক্তমুখে): দস্তায়ের? কী বলছ? এই সময়ে?

সাধুজি (হেসে): এই সময়েই তো আসা চাই। যখন আকাশে মেঘ নেই, বাগানে ফুলের ছড়াছড়ি—তখন কে না হরি হরি বলে কেঁদে ভাসিয়ে দিতে পারে? দুদিনে যদি আতের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে না পারি, যদি প্রাণের ভয়ে পালিয়ে বাই, তবে প্রাণ বাঁচতে পারে বৌ, কিন্তু মান বাঁচবে না ঠাকুরের কাছে। তুমি কি গুরুদেবের সে-ভজনটি শোনো নি?

ভোলে মন য়ে না বিসরানা লেনদেন হৈ-বড়া পুরাণ।

পরধনওয়াল বড়া সিয়ানা অন্ত চুকানা হি হোগা।

জিমসে ছুপ ছুপ ফিরতা ভোলে সামনে জানা

জী হোগা

সাবিত্রী মুখ নীচু করে বলল: "শুনেছি, গানটি আমার গাইতেও খুব ভালো লাগে—তবে বন্দনার অহবাদ।"

সাধুজি: বন্দনা এ-গানটিরও অহবাদ করেছিল না কি? কই আমাকে শোনায় নি তো।

সাবিত্রী: শুনিয়েছিল তুমি ভুলে গেছ। অহবাদটি এই

ভুলিস নে তুই, ও ভোলা মন!

বুগ যুগের এ-একম বাঁধন

বাজিয়ে সে নেয় স্তব্ধ হৃদয়—হিসেব নিকেশ

চায় ব্যাপারী

পালাল কোথায়? মুখোমুখি হ'তেই হবে সাথে

তারি।

সাহুজি : চরৎকার। কেবল গানে বার বীজ বুনলে
জীবনে যদি তার ফল না ফলে তবে তো সে মিথো গান।
(একটু পরে সাবিজীর মাথায় হাত রেখে) তবে শোনো
বৌ, আমি বা চাই—আমার চোখের দিকে তাকাও—
যদি বলো—না, এ তুমি পারবে না, তাহ'লে আমি জোর
করব না।

সাবিজীর মুখের মেঘ কেটে গেল, স্বামীর পায়ের ধুলো
নিয়ে বলল : “তুমি বা বলবে। আমি আর ভয়
পাব না।”

সাহুজি তার মাথায় হাত রেখে বললেন : “এইই তো
চাই বৌ। গুরুদেবের কাছে যে ভাগ্যবতী দীক্ষা পেয়েছে
সেও যদি ভয় পাবে তবে অতয় দেবে কে?”

সাবিজী টেলিফোন করল। কিন্তু গুরুমা টেলিফোনে
সব শুনে খুব জোর দিয়েই বললেন : “না, দস্তাজের এখন
যাবে না।”

সাবিজী (স্বস্তির নিশ্বাস গোপন করে) : উনি
বলছিলেন—

টেলিফোনে গুরুমা : প্রসাদ বাবা যা বলেছে তার
যোগ্য কথাই হয়েছে, কিন্তু এতদূর থেকে দস্তাজের যাবে
বসন্ত রুগীর দেবা করতে এতে আমি মত দিতে পারি না।
পরোপকার ভালো কথা—কিন্তু পরোপকারের জন্তে ছোটোছুটি
করার মধ্যে একটা দেখালেননার ভাব আছে। যারা
সাধনা নিতে চার তাদের পক্ষে তাহিরিপনার ইকডাক,
লটভক্তি—এ সবই বিষ। ও যদি দেহতে থাকত আর
তুমি ওকে প্রাণ বাঁচাতে এগানে পাঠিয়ে দিতে তাহে
আমি আপত্তি করতাম। কিন্তু ও এখন এখানে খুব যেতে
আছে নানা কাজে। একটা ইকুলে র'তে পড়ার গরীব
ছেলেদের। তাদের গানও শেখায় সপ্তাহে তিনদিন।
তাছাড়া দয়াময় ওকে দুটি অনাথ শিশুর তত্বারক করার
ভার দিয়েছেন। শিশু দুটি খেলা করতে করতে কুয়ার
পাড়ে বার। দস্তাজের দড়ি বেয়ে নেমে তাদের তুলে
আনে। এসব কেউ জানবে না যা হয়ত কোনোদিন।
কিন্তু সেইজন্মেই ও জীবনের চিন্তাভাবনা হয়। ওখানে
দস্তাজকে পাঠালে কানজে লেখালেখি হবে—সাহুজির

একমাত্র বংশধর ছুটে এসেছিল শরণাপন্নদের বাঁচাতে—
হয়ত আরো বড় বড় কথা—লোকের ভাক লেগে যাবে।
তাতে ওর বিষয় ক্ষতি হবে, মনে হবে—ও একজন কেও-
কেটা নয়—যাকে কানী থেকেও ডেকে পাঠাতে হয়
পরোপকার করতে। সাধনার উদ্দেশ্য পরোপকার কথবার
জন্তে দাপাদপি ছোটোছুটি করা নয় মা, সাধনার শেষ
লক্ষ্য—পদে পদে আমি আমার ভাব জর ক'রে সকলের
মধ্যেই ঠাকুরকে দেখে শিবজ্ঞানে জীব দেবা। এ-কুয়ের
মধ্যে তফাৎ আশমান জমীন। কিন্তু সে থাক—একটা
কাজের কথা আছে। তোমার উপরে একটা ছায়া
দেখেছেন দয়াময়। তাই এইমাত্র বলছিলেন তোমাকে
ভার করতে হবে যে, তোমার একনি টিকে নেওয়া
দরকার।

সাবিজী (সত্যে) : টিকে? কিন্তু উনি বলেন—
ঠাকুরই আমাদের রক্ষা কবচ।

গুরুমা : মা, প্রহ্লাদ বাবার মুখে একথা সাজে কারণ
—কিছু মনে কোরো না মা, গুরু মনরাধা কথা বলে না
বলে সত্য কথা—তাই বলছি প্রহ্লাদ বাবা যে রক্ষাকবচ
পেয়েছে সে-রক্ষাকবচ তুমি এখনো পাও নি। তাই
তোমার নেওয়া চাই—আর আজই—এই মুহূর্তে।

সাবিজী : আচ্ছা মা, উনি আলোককে টেলিফোন
করবেন—কিন্তু সে যদি আজ না আসতে পারে?

গুরুমা : তা হ'লে—

টেলিফোন : Times up please !

নয়

টেলিফোন রেখে সাবিজী ছুটে এসে স্বামীকে প্রথম
বলল দস্তাজের কথা। সাহুজি চুপ ক'রে আকাশের
দিকে চেয়ে রইলেন।

সাবিজী : তোমার ভাবটা ঠিক বুঝতে পারছি না।
কিন্তু ঠোঁটের কোণে চাপা হাসির ফিন্‌কি চোখে পড়েছে
আমার।

সাহুজি : ভাবছিলাম বৌ, পরমহংসদেবের একটি
কথা : আমি ম'লে বৃষ্টিবে জ্ঞান। অহংকার আর
ময়কার—আমি আর আমার। এখনো আমরা মনে
মনে বলি : আমার ছেলে ধৈর্যে ব'র্তে থাকুক। তাই

হাসছিলাম। বলছিলাম : “ঠাকুর কত বাঁধনেই না বাঁধতে পারে। জীবকে আঁটে পিটে!” অথচ তোমাকে উপদেশ দিচ্ছিলাম না এইমাত্র যে অভয় হ’তে হবে ?

সাবিত্রী (খুসি হ’য়ে) : তা হ’লে তোমারও ভয় ছিল বলো ?

সাধুজি : না থাকলে কি মনে হ’ত তোমার কথা শুনে—গুরুমা বাঁচিয়ে দিলেন বড় সময়েই—আমার আর দায়িত্ব রইল না ? এরই নাম নিজের দুর্বলতার সাফাই গাওয়া। কিন্তু সে যাক—গুরুমা আর কী বলবেন তুমি ?

সাবিত্রী : বললেন তোমার টিকে না নিলেও চলবে কিন্তু আঁর্মাঁজ আজই নেওয়া চাই।

সাধুজি : আলোক কাল আসবে—

সাবিত্রী : গুরুমা বললেন গুরুদেব আমার উপরে একটা ছায়া দেখেছেন।

সাধুজি আর স্বিকৃতি না ক’রে আলোককে টেলিফোন করলেন। নমিতা টেলিফোন ধরল সব শুনে বলল : “বাণী এখন সাস্থল হাসপাতালে, একটা অপারেশন করছেন—তুতিন ঘণ্টা লাগবে। কিন্তু গুরুমা যখন বলেছেন আমি এক্ষণি যাচ্ছি মোটরে।

কিন্তু ভবিতব্য ! নমিতা তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে পা পিছলে প’ড়ে গেল স্নানের ঘরে। পা এমনি মচকে গেল যে নড়তে পারে না। শুয়ে শুয়ে টেলিফোন করল—নিরুপায়, পরদিন ভোরবেলাই যাবে।

শুনে সাধুজি আকাশের দিকে তাকিয়ে প্রণাম করলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভাব সমাধি হ’ল—মুখে দিবা হাসি, বললেন মুহূর্ত্তে : “তোমার ইচ্ছা ঠাকুর !”

দশ

সাবিত্রী গেল প্রথমে একটি বস্তিতে। সেখানে তিন চারটি বসন্ত রুগীকে ঔষধাদি দিয়ে ফিরে আসতেই এক প্রক্রিবেশিনীর ওখানে কান্নাকাটি শুনে ছুটল। দরিদ্র বিধবা—কায়ক্লেশে দিন গুজরান করে তাত বুনে। একটি দশ বছরের ছেলে, কোলেরটি পাঁচবছরের মেয়ে। সাবিত্রী এদের রোজ পড়াত ও তুবেলা হুঁসের দুধ পাঠাত।

গিয়ে দেখল আসল বসন্তে ছুজনেই কালো হ’য়ে গেছে।

সাবিত্রী ও সাধুজি দুজনে মিলে ওদের তুলে আনলেন—চাকর বাকর সব গায়ের, ছেলেটিকে সাধুজি রাখলেন তজন গৃহে। মেয়েটিকে সাবিত্রী রাখল নিজের ঘরে। তারপর সারারাত জেগে সেবা ওদের মা-র সঙ্গে। ওদিকে সাধুজি জেগে রইলেন ছেলেটির শিয়রে।

কিন্তু বাঁচানো গেল না। দুটি শিশুকে দাহ ক’রে সাধুজি বেলা দশটায় ফিরেই দেখলেন সাবিত্রী শুয়ে—জর একশো দুই। সর্বাঙ্গে বেদনা।

খবর পেয়ে আলোক ছুটে এল একাই, কারণ নমিতা তখনো শয্যাশায়ী। সাধুজি শুধু বললেন : “Too late, বাবা !”

বিকলে নমিতা এল পায়ে ব্যাগুজ নিয়ে। পিতা-পুত্রী দুজনে মিলে সারারাত জেগে রইল সাবিত্রীর শিয়রে। খবর পেয়ে নীলমণিকে মালতীর হেফাজতে রেখে ভক্তিও ছুটে এল ধ্রুবর ছোট টু-সিটারে। কিন্তু তখন সাবিত্রীর সন্ধিৎ নেই। জর একশো পাঁচ।

শেষ রাতে জ্ঞান হ’ল। স্বামীকে পায়ের ধুলো দিতে ইচ্ছিত ক’রে শেষ নিশ্বাসে ইষ্টনাম শুনে শুনে সাবিত্রী অন্তর্জলী হ’ল পূণ্য সলিলা ইন্দ্ৰাযগীর তীরে।

সাধুজি সকালবেলা তার দেহ চিতায় দিয়ে খানিকক্ষণ চিতার পাশে চুপ ক’রে বসে রইলেন চোখ বুজে। চোখ দিয়ে একটি সুরু রেখায় বয় অশ্রুধারা। শুধু অধরোষ্ঠী জপ করে : হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে—চিতার অগ্নিশিখার দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গতে।

* * *

সাধুজির কাজ শেষ হয় নি—আরো দুদিন তিনি আশেপাশের নানা দরিদ্র কুবাণের ঘরে আট দশটি রুগীর দেখা শুনো করার পর এপিডেমিক কম্বল। দেহের সিঁতিল সার্জন সাধুজিকে ধন্যবাদ দিয়ে ইস্তাহার জারি করলেন : “The situation is under control !” প্রতিবেশীরা এসে সাধুজিকে প্রণাম করল পরপর—“জয় সাধুজির জয় !”

* * *

কিন্তু জরতপ্ত সাধুজিকে মোটরে ক’রে ধ্রুব ও মালতী দেহর শ্মশান থেকে তুলে আনল তাদের ওখানে।

পরদিন সাধুজি ভোরে উঠেই কীর্তন ধরে দিলেন।
গাইলেন সাবিত্রীর একটি প্রিয় কীর্তন :

নাথ ! দিও হে শরণ শীতল চরণে—জীবনের

খেলা শেষে ।

যেন তুফানেও জপি তারকা লগনে—তোমারেই

ভালোবেসে ।

হে দীপঙ্কর দিও দীপদান

ক্লান্তি অস্তে শান্তি শিখান,

ধূসরের বৃকে স্থনীল বরণে—আলো ঝলমল রেশে ।

এগারো

প্রহ্লাদের কাছে বিষ্ণু ঠাকুরের চিঠি এল :

“হুংখ কোরো না বাবা। বলি নি কি তোমাদের
বারবারই যে, যারা বড় আধার নিয়ে জন্মায় তাদের
পরীক্ষাও হয় বড় ? তাই তোমাকে বাইরের দিকে রিক্ত
হ’তে হ’ল—শিবভূলা পিতা, অনিন্দিতা মাদিক। দিদি,
শেষে বিজ্ঞা স্ত্রী সবাই একে একে ছেড়ে গেল—কিন্তু
অনাথ করতে নয়—তোমার আত্মসমর্পণের সাধনাকে
আরো নিটোল, নিখুঁৎ করতে। হুংখ যে পায় নি বাবা
সে পরের হুংখ বুঝবে কেমন ক’রে ? নানা সাধু যোগে
নানা উপলব্ধি চায়—যার যেমন সংস্কার বা প্রারব্ধ।
তোমার সাধনার সিদ্ধি অস্ত্র। আশ্চর্য ত্যাগ বা ক্লজ-
সাধন ক’রে মহাবৈরাগী হওয়াও নয়—সংসারে একটু
আধটু জপ তপ ক’রে জীবনের তুফানে শান্তির আলোক-
স্তম্ভ হ’য়ে একলাটি দাঁড়িয়ে থাকাও নয়। তোমার জীবন
ধন্য হবে কেবল তখনই যখন তুমি ঠাকুরের আশ্রয় পেয়ে
বহু নিরাশ্রয়ের আশ্রয় হবে, তার বাণীবাহ হ’য়ে বহু
আর্তকে অভয় দেবে, অবিশ্বাসীর প্রাণে বিশ্বাস জাগিয়ে,
হৃতাগাকে প্রেমের দীক্ষা দিয়ে, অজ্ঞান বস্তুতাত্ত্বিকদের
বহিমুখী দৃষ্টিকে অন্তর্মুখী হ’য়ে অমৃত হবার দীক্ষা দিয়ে।
সাবিত্রী মা সতী লক্ষ্মী সহধর্মিণী—তোমাকে ছেড়ে য় ন নি।
তঁার এ-মহাপ্রয়াণের দিব্য আলোয় অনেক অবিশ্বাসীরই
আঁধার কাটবে, অনেক সাধিকাই বল পাবে, দেখতে
শিক্ষণে যে, এ-কলিযুগেও সহধর্মিণী কী ভাবে স্বামীর
ধর্মপথে সহায় হ’য়ে শ্রেয়ে প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারে আর্তের
সেবার। মেয়েরা আছে বলেই আজো এদেশে ধর্ম জীবন্ত

আছে বাবা। প্রেমের-আত্মসমর্পণ কাকে বলে হাতে-
কলমে ক’রে দেখাবার জন্মেই ওরা মেয়ে হয়ে জন্মেছে।
ইতি।

নিত্যানীবাদক শ্রীবিষ্ণু শর্মা”

বারো

সাবিত্রী শেষ নিশ্বাস ফেলার একটু আগে নমিতাকে
বলেছিল : “আমাদের রমা বড় একলা, তাকে বলবে যেন
বেশি হুংখ না করে। আমি ওকে ভুলে থাকব না।”

কিন্তু বুধা ! সাবিত্রীর আকস্মিক দেহরক্ষার খবর
পেতে না পেতে রমার পায়ের নিচের মাটি উঠল টলমল
করে। উপবাস ক’রে সারা রাত ও ঠাকু ঘরে চোখের
জলে ইষ্ট ও গুরুর ছবির সামনে প্রার্থনা করল। সবচেয়ে
ওর কাছে বড় হ’য়ে ওঠে ঐ একটি চিন্তা যে, শেষ মুহূর্তেও
মা জননী ওকে ভোলেন নি। বুকের মধ্যে অক্ষমাগর
ভুলে ওঠে এ রেবারেখি ছেদাছেবির জগতে এমন প্রেমও
ঠাই পায় তবে ? কোন্ সে-আলোর বীজে ফোটে এ-
অচিন ফুল ?

শেষরাতে ভূমিশযায় শুয়ে সাবিত্রীর ছবির সামনে
হাতজোড় ক’রে বলে : “মা, করুণাময়ী আপনি, তাই
ভরসা দিয়েছেন শেষমুহূর্তেও যে, ভুলে থাকবেন না।
আশীর্বাদ করবেন—যেন একথা আমিও ভুলে না থাকি—
আপনার আশীর্বাদ যেন সবসময়ে মনে রাখতে পারি : যে,
মানুষের অবজ্ঞা গল্পনা অত্যাচার কাড়াকাড়ি এসবই
মায়া। সংসারে সত্য কেবল সাধু, গুরু ও ইষ্ট। আর
তাদের সব চেয়ে বড় দীক্ষা হ’ল—নিজেকে ভুলতে পারা—
নৈলে জীবের মধ্যে শিবকে দেখা যায় না—আপনিই তো
বলেছিলেন কতবার। আজ আমি বড়ই একলা মা।
শুধু আপনার রূপার রক্ষাকবচই আমার সঞ্চল। তাই
আশীর্বাদ করুন যেন আপনার নিষ্ঠার—ভক্তির অন্তত : এক
কণিকাও আমি পাই—যার প্রসাদে মায়াতে মায়া ব’লে
চিনতে পারি—বিপদকে পরীক্ষা বলে—শাপকেও বর
ব’লে। সবশেষে, আপনার দৃষ্টান্তে যেন আমি বল পাই—
এই ভাবেই আর্তের সেবার জীবন উৎসর্গ করতে। নাচড়ে
আর সাধ নেই না—কেবল গর্ভে যে এসেছে তার জন্মেই

বীচা। সেও যেন আপনার ও গুরুদেবের কৃপা পায়—
আজ শুধু এই প্রার্থনা।”

প্রার্থনা করতে করতে আবেশ মতন এস—যুম ও
জাগার মাঝামাঝি। দেখল সাবিত্রীর প্রদীপ্ত মুখ।
যমা পায়ে লুটিয়ে পড়তেই জ্যোতির্ময়ী তাকে টেনে
নিলেন, বললেন : হুঃখ কোরো না মা—আমি কাছে
কাছেই থাকব। কেবল তোমার প্রসবের সময় হল
যাও পুনায়।”

ধান ভেঙে গেল...পূর্বদিগন্তে উষার সোনার উলুধ্বনি
বেজে উঠেছে। নমিতাকে লিখল ধানক্ষেপে পাওয়া বাণীর
কথা। সব শেষে পুনশ্চ দিয়ে লিখল :

“নমিতাদি।

পূর্বদিকে আঁধার ভেঙে আলোময়ী নামছেন আর,
আজ আমার মনে হচ্ছে মা জননীর কথা। আমেদাবাদেও
কত সময়ই না তাঁর অপার স্নেহের স্পর্শ পেয়েছি...এক
এক সময়ে এত প্রত্যক্ষভাবে যে বললে তুমি হয়ত ভাববে
মনগড়া। আমি আজও নিজেই যোগিনী বলে চিনি
দ্বি।—আমাকে যখন গুরুদেব বড় আধার বলেন সত্যি
আমি চমকে উঠি। কী আছে আমার বলো? না জ্ঞান,
না ভক্তি, না নিষ্ঠা, না প্রতিভা। একটু রূপ—কিন্তু রূপ
তো যৌবনের পঙ্গপড়ে শিশিরের জল, নমিতা দি—জল না
স্নেহে জল শুকায়, বিশেষ মেয়েদের রূপ—কতটুকুই বা
তাঁর মূল্য? আমার স্বামী প্রথম প্রথম কী উচ্ছ্বাসই না
করতেন আমার রূপ্ত্রী নিয়ে। কিন্তু এখন কিরেও তাকান
না। তাকাবেন কেন বলো? রূপের মোহ দুদিনে উবে
যায়। থাকে শুধু টাকার তৃপ্তি। তাই তো আমার সংসা
আমার প্রাণা বিবর আশ্রয় সব তাঁর ও প্রবীরের নামে
লিখিয়ে নিচ্ছেন স্তনতে না স্তনতে আমার স্বামীর স্নেহের
নেশা গেছে। তবে এ নিয়েও আজ আর মন খারাপ করি
না নমিতা দি। মা জননী প্রায়ই বলতেন না কি
যে, বেদনা না পেলে চেতনা আগে না?

“কয়েকদিন আগে ভক্তিমাসিমা এসেছিলেন খবর
পেয়ে যে, আমেদাবাদে আমাকে আজ সবাই গল্পনা
কিচ্ছে উঠতে বসতে। তিনি এসে আমাকে বুকে জড়িয়ে
ধরে কী কান্নাই না কাঁদলেন! বললেন : ‘আমার
পাণিষ্ঠা বোনের সঙ্গেই তোমার মতন লক্ষ্মীপ্রতিমার এ হাল
হ’ল—আমি এ-লক্ষ্মী রাখব কোথায় মা?’ আমার স্তনে
সত্যি হাসি পেল, বললাম : ‘প্রতিমার দায় শুধু ভক্তের
কাছে মাসিমা—শক্তের কাছে নয়। আমার অন্তরবাড়িতে
সবাই শক্ত হ’য়ে গ’ড়ে উঠেছে স্বর্ণময়ীর শক্তির ছোঁয়াতে।
তাই ও নিয়ে হুঃখ না ক’রে শুধু এই প্রার্থনা করো মা

জননীর কাছে—যেন আমাকে তিনি এবার টেনে নেন।
আমি আজ বড় ক্লান্ত, নমিতাদি।’

“মা জননী আমাকে ভরসা দিয়ে গেলেন তাঁর শেষ
নিখিলের আশ্রমে যে, আমাকে তিনি ভুলে থাকবেন না।
কিন্তু আমার যে বড় একলা মনে হয় নমিতাদি। শুধু
একলা নয়, আজ আমার মনে কেবল একটি প্রশ্ন উঠেছে :
কেন এমন হ’ল? ধনীর কত! ধনীর বধু, দেখতেও
কুৎসিত নই—তবু এমন অবস্থা আমার হ’ল কেন—উঠতে
বসতে সবাই পায়ে মাড়িয়ে যায়? শুধু একটিমাত্র অবলম্বন
ছিল আমার, তিনিও আজ চ’লে গেলেন! তবে আজ
মনে হয় যে, বৃষ্টি এ-ও আমার দরকার ছিল। সংসার
সত্তের সার—বলতেন মা জননী। এ কথা জেনেও আমি
তো এই সংসারেরই আশ্রয় চেয়েছিলাম, নৈলে বিয়ে করতে
গেলাম কেন? কই, তুমি তো করলে না? তোমার
ভুল না করার দৃষ্টান্ত দেখেও শিখলাম না কেন? মাসিমা
তো আমাকে ফেলতেন না, তাঁর কাছেই বা আশ্রয় নিলাম
না কেন? এর কারণ শুধু এটি : আমি বীক্ষা নিয়েও
স্বখই চেয়েছিলাম, ঠাকুরকে চাইনি। তাই খেদ করার
পথ নেই আমার—এমন কি অদৃষ্টের ঘাড়ের দোষ চাপাবারও
মুখ নেই। ভালোই হ’ল দ্বি। না ঠেকে জীবনে
কজনই বা পেখে বলো? তা ছাড়া গুরুদেবের একটি শ্লোক
আমার আজ কেবলই কানে বাজে : ভাগবতে বামন
বলিরাজাকে সর্বস্বান্ত ক’রে বলেছিলেন : ‘ব্রহ্মন্। যমহু
গুলামি তর্ষিশো শিখুনোমাহম্—’ অর্থাৎ থাকে আমি কৃপা
করি তাকে সব আগে করি নিঃস্ব। আমাদের তুকারামকেই
দেখ না—সম্পদের মধ্যে ভ্রমেও অনশনে অর্ধাশনে থাকে
কাটাতে হয়েছিল অকর্মণ্য ব’লে সকলেরই কাছে অবজাত
হ’য়ে। কেন? না, এই কথা মনে প্রাণে বলতে শিখতে
যে তিনি ধনমান চান নি। তাঁর ছিল শুধু একটি প্রার্থনা
‘তুকা মহাশয় প্রাণ করা দেবাসী অর্পণ’—প্রাণ মন সব
বিষ্টলদেবের চরণে নিবেদন ক’রে দেওয়া। তাই হুঃখ
পেলেও মনকে বৃষ্টিয়েছি, ক্ষোভ মেই আর। শুধু তোমরা
আশীর্বাদ করো দ্বি, যে, নিঃস্ব হওয়াও যে তাঁর
কৃপারই নিদর্শন অন্তত : এটুকু যেন উপলব্ধি করতে
পারি। শুধু মুখে আঙড়ালে শ্লোক থেকে যায় শুধু বুলি,
মন-প্রাণ-অস্তর দিয়ে যখন তাকে বরণ করি তখনই সে হয়
ময়। এই যে ময়ে বীক্ষা নিয়েছি শুধু যেন তাইই সিদ্ধি
চাই—মুখের মিষ্টি নয়, সেই ভক্তির সিদ্ধি যে-ভক্তি
ঠাকুরকে চায় আর পাঁচটার মধ্যে নয়—সব ছাড়িয়ে,
স্বর্গের আগে।

[ক্রমশঃ]

জাতীয় সাহিত্যে বিজ্ঞেন্দ্রলাল

শ্রীঅম্বিকারূপ চৌধুরী

উনবিংশ শতকের শেষার্ধ্বে বাঙ্গালীর জাতীয়-জীবনের স্বর্ণ-যুগ। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার সংস্পর্শে, তাহার নব-জাগ্রত দেশাত্মবোধ বিকল্প রাজশক্তির সহস্র নিষ্পেষণের বেদনায় যে অগ্নি-গর্ভ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল, এই যুগেই তাহার উন্মেষ। সেই স্বাদেশিকতার উদ্বোধনে এবং তাহার বৈপ্লবিক রূপায়ণে বঙ্গসাহিত্যের দান অতুলনীয়। বিদেশী বণিকের “মানদণ্ড” তখন “রাজদণ্ডে” রূপান্তরিত হইয়া ভারত-সাম্রাজ্য শৃঙ্খলিত করিয়াছে। স্বাধীনতা-যজ্ঞের প্রথম হোমকৃত্তে আত্মাহুতি দিয়া ভারতীয় সৈনিক ও রাজস্ববর্গ দিকে দিকে যে প্রচণ্ড বহির্শিখা প্রজ্জ্বলিত করিয়াছিল, তাহার সত্ত্ব নির্বাপিত ধূমে, গন্ধে গগন-পবন আচ্ছন্ন। সঙ্গে সঙ্গে পরশ্রান্ত হইতে জগৎ ও জীবন-বোধের নব নব দৃষ্টিভঙ্গী সমগ্র পাশ্চাত্যের সমাজ ও রাষ্ট্র-চেতনা বিকল্প করিয়া, প্রাচ্যের উপকূলেও তরঙ্গিত হইতে-ছিল। এই যুগ-সন্ধির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলার সাহিত্য-গগনে যে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলীর অভ্যুদয় হয়,—ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র তাহাদের প্রাণস্বৰ্ঘ্য। মন্ত্রভ্রষ্টা এই নব ভগীরথ “বন্দে মাতরম্” শাস্ত্র-নির্নাদে স্বদেশ প্রেমের মন্ডাকিনী-ধারা বঙ্গ-ভারতীর স্বরপরিসর অঙ্গনে প্রবাহিত করিলেন। নবীন বাংলা মাতৃমন্ত্রে নীক্ষিত হইল।

দেশমাতৃকার সেই চিরস্মৃতি ভাবরূপকে অনন্তজলভ কলানৈপুণ্যে বাস্তবে মূর্ত্ত করিয়া বাংলার ঘরে ঘরে তাহার মঙ্গল-বেদী রচনা করিয়াছেন, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তরসাধক, চারণ-কবি বিজ্ঞেন্দ্রলাল। তাঁহার ধ্যান-দৃষ্ট মাতৃমূর্ত্তি কবিকের ভাব-বাস্পে তবু স্বপ্ন-প্রতিমা নয়,—“সত্ত্বাত-লিঙ্গবসনা”, “সিদ্ধু লীকর-লিপ্ত-চিকুরা”—“বিমল-হাস্তে অমল-কমল-আননা” বিখণালিনী জগজ্জননী জগন্মোহিনী” প্রত্যক্ষ দেবী, এই স্মারী ভারতকুম্বি, বাহার—

“শীর্ষে গুহ্য তুহার কীরিট, সাগর উর্দ্ধি ঘেরিয়া জন্মা
বক্ষে ছলিছে মুকুট হার, পঙ্কসিদ্ধু বসুনা গঙ্গা।”

অনাদিকালের অনন্ত ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ তাহার প্রাণশক্তি দিকে দিকে সহস্র ধারায় অবিরাম উৎসারিত হইতেছে—

“এত স্নিগ্ধ নদী কাহার, কোথায় এমন ধূস্র পাহাড়,
কোথায় এমন হরিৎক্ষেত্র আকাশতলে মিশে,
এমন ধানের উপর চেউ খেলে বায় বাতাল কাহার
দেশে ?”

সেই ধাত্রী দেবতার প্রসাধনে নিরত তন্ময় বিজ্ঞেন্দ্রলালের আকুল প্রার্থনা,—

“মাগো, তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি—
এই দেশেতে জন্ম, যেন এই দেশেতেই মরি।”

এই প্রসঙ্গে অগ্নিবর্গের নেতা, শ্রীঅরবিন্দের নিকট লিখিত একটি পত্রের অংশবিশেষ উল্লেখযোগ্য : “অল্প-লোকে স্বদেশকে কত কণ্ডলি মাঠ-নদী-পর্ব্বত-বনানীর সমষ্টি বলিয়া মনে করে। আমি তাহাকে “মা” বলিয়া জানি, ভক্তি করি, পূজা করি।” বিপ্লব-তপস্বীর এই উক্তিতে বিজ্ঞেন্দ্র-কল্পিত জন্মকুম্বির “মাতৃরূপ” তৎকালে বিপ্লবী বাংলার চিন্তাধারাকে কতদূর প্রভাবিত করিয়াছিল, তাহা স্পষ্ট।

বিজ্ঞেন্দ্রলাল আত্মজীবন সাহিত্য-সেবী। পাশ্চাত্যের আধুনিক ভাব-সম্পদ ভারতের অতীত ঐতিহ্যে রসোপেত করিয়া তিনি উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষ ভাগেই সাহিত্য রচনার আত্মনিয়োগ করেন। তখন বঙ্কিমচন্দ্রের শীতরশ্মি অন্তর্মিত, রবীন্দ্র-প্রতিভার অকণালোকে দিম্বাগুল স্বর্ণাভ হইয়া উঠিয়াছে। সেই সঙ্কীর্ণ এই দিকপাল যুগলের অনিবার্য্য প্রভাব বিজ্ঞেন্দ্র রচনাবলীতে অস্বাভাবিক পরিলক্ষিত হইলেও, তাঁহার রচনাবলীতে মৌলিক উপাদানের প্রাচুর্য্যই সমধিক। পরিণত কালে বঙ্গসাহিত্যের যে বিশেষ ক্ষেত্রে বিজ্ঞেন্দ্র-প্রতিভার চরম প্রকাশ, সেই জাতীয় সঙ্গীত ও নাটকে তাঁহার মৌলিক অবদান অপরিমেয়।

অহুত্বের বাস্তব ধর্ম্মিতা এবং প্রকাশ-ভঙ্গীর সঙ্গীত

এই রচনাবলী “প্রগতি-তত্ত্বের” অগ্রদূত। এই অল্পবৃদ্ধির সমর্থনে সমালোচক প্রবর ৮ন্থশ্রেণী সমাজপতি মহাশয়ের উক্তি উদ্ধৃত করা যায়,—“বিজ্ঞানলাল আমাদের জাতীয়তার পুরোধিত, তিনি বাঙ্গালীর পথ-প্রদর্শক তিনি স্বদেশী-তত্ত্বের মহাকবি।”

বঙ্গভঙ্গের পূর্ব হইতেই বাঙ্গালীর মজ্জাগত নিজীবিতা এবং তামসিক অবসাদ দূর করিবার জন্য তিনি একদিকে যেমন তাহাকে স্নেহে, বাঞ্ছা জর্জরিত করিতেছিলেন, তেমনি আবার তেজবীর্ঘ্যের গৈরিক নিঃশ্রাবে তাহার বিশ্বাস্তার উজ্জীবনেও তৎপর ছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের প্রবল বহা যখন বঙ্গদেশ প্রাবিত করিয়া সমগ্র ভারতে পরিব্যাপ্ত হইল, তাহার উদ্দাম তরঙ্গে তিনিও মাতিয়া উঠিলেন। চারণ-কবির বীণাতন্ত্রী দীপকে ঝঙ্কার তুলিল,—

“আমরা ঘুচাব মা তোরা কালিমা,

মাহুয আমরা নহি ত মেথ,

দেবী আমার, সাধনা আমার, স্বর্গ আমার,

আমার দেশ।”

শাসক শক্তির রক্তরূপে নিখ্যাতিত হত্যাজনসংঘ মেঘ-গজীর দুন্দুভি-নিমানে তাহার আশ্বাস বাণী শুনিল,—“কোন দুঃখ নাই, বীরের রক্তই জাতিকে উন্নত করে। দুঃখ সে দেশের নয়,—যে দেশের বীর মরে, দুঃখ সেই দেশের, যে দেশের বীর মরেনা।”

“গিয়াছে দেশ দুঃখ নাই, আবার তোরা মাহুয হ।”

“সধবা অথবা বিধবা তোমার রহিবে উচ্চশির

উঠ বীর জায়া, বাধ কুন্তল, মুছ এ অশ্রুণীর।”

রাজস্বান ভারতের অতীত ইতিহাসের স্বদেশ-প্রেম ও শৌর্য-বীর্ঘ্যের কেন্দ্রভূমি ছিল। তাই মনস্বী বিজ্ঞানলাল এই দেশের আধ্যাত্মিককেই তাহার অধিকাংশ জাতীয়-নাটকের বিষয়বস্তু নির্বাচিত করিয়াছিলেন। ভাষার ঝঙ্কারে, পৌরুষের অহুপ্রেরণায় “চারণ-কবির দক্ষতা ইহাদের মধ্যেই বিশেষভাবে পরিস্ফুট। উৎকৃষ্ট ও অনবদ্য চরিত্র সৃষ্টিতে, ভাবের উদ্দাম প্রবাহে, অপূর্ণ দৃশ্য-পরি-কল্পনায়, মধুর সঙ্গীত পরিবেশনে, রসমাধুর্যে, বলিবার শক্তিমানে ভঙ্গীতে, অতুলনীয় শব্দ-বিশ্রাসে বিজ্ঞানলালের নাট্যকাব্যলীকে উচ্চাঙ্গের গম্ভীরাবলা যাইতে পারে।

বিজ্ঞানলালের যুগে অজ্ঞাবধি কোন নাট্যকার বিজ্ঞানলালকে অতিক্রম করিতে অথবা বিজ্ঞানলালের প্রভাবমুক্ত হইতে পারেন নাই। সর্বোপরি এমন দোষে গুণে গড়া স্বাভাবিক চরিত্র তাহার অজ্ঞ কোন রচনায় বিরল। বাংলার গ্রামে গ্রামে পর্য্যন্ত এই নাটক সমূহ এখনও অদম্য উৎসাহে সর্গেরবে অভিনীত হইতেছে। ভারতের বিভিন্ন ভাষায় তাহার নাট্যকাব্যলী অনুলিখিত হইয়া অভিনীত হইতেছে। স্বদূর বিলাতেও তাহার কোন কোন নাটক মঞ্চস্থ হইয়া গৌরবান্বিত করিয়াছে। এখনও গৈরিক বসন পরিহিতা চারণী দলের উদ্ভূত কণ্ঠে—

“মেবার পাহাড়, শিখরে যাহার রক্ত পতাকা উচ্চশির,
তুচ্ছ করিয়া স্নেহ-দর্প, দীর্ঘ সপ্ত শতাব্দীর—”

শুনিতে শুনিতে শ্রেষ্ঠগৃহে উত্তেজনার বিদ্যুৎ-শিহরণ বহিয়া যায়, স্থান কালের যবনিকা দীরে দীরে অপসৃত হইয়া তমসমানস-নেত্রে উদ্ভাসিত হয়—স্বাধীনতা সংগ্রামে রক্ত-স্নাত মেবারের মহিমময় দৃশ্য—আরাবল্লীর গিরি-লৌধে গৌরবের স্বর্ণরেখা। বিজ্ঞানলালের উদয়ন যুগে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ একবার লিখিয়াছিলেন, “বিজ্ঞানলাল জাতিকে শুধু হাসাইতে আদেন নাই, একদিন যে আগাইবেন ও মাতাইবেন, তাহার-ও আশ্বাস দিয়াছেন।” তাহার এই ৩বিষয় বাণী যে অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছে, বিজ্ঞানলালের জাতীয় সঙ্গীত ও নাটকের অদ্ব্যাবধি অগ্নান প্রভাব এবং অক্ষুণ্ণ জনপ্রিয়তাই ইহার অলস্ত প্রমাণ।

বিজ্ঞানলাল পাশ্চাত্যের আক্রমণশীল বা অহংসর্কিত জাতীয়তার আদর্শ প্রচার করেন নাই। বিজ্ঞানি বিশ্বেষের সর্কার্ণ নেতিবাদ এবং সাময়িক উত্তেজনাও তাহার আদর্শকে অভিত্ত করে নাই। স্বদেশের স্বাধীনতা ও সর্কার্ণ কল্যাণে উদ্ভূত হইলেও তাহার চরম পরিণতি—স্বদেশ, স্বজন, স্বধর্মের গভী অতিক্রম করিয়া, সর্কার্ণানবের, এবং সর্কার্ণের মৈত্রী-সঙ্কমে—

“অধর হইতে সম-শতধারে জ্যোতিঃপ্রপাত তিমিরে

নামি’ ধরায় হিমাচল মূলে মিলিল সাগর সঞ্চে।”

“যেমন স্বার্থের চেয়ে জাতীয়ত্ব বড়, তেমনি জাতীয়ত্বের চেয়ে মহাত্ম্য বড়। জাতীয়ত্ব যদি মহাত্ম্যের বিরোধী হয়, তবে মহাত্ম্যের মহাসমুদ্রে জাতীয়ত্ব বিলীন হ’য়ে থাক, স্বদেশ, স্বজন ডুবে থাক, এ জাতি মাহুয হোক”—বিজ্ঞান

লালের মানসকল্পা মানসীর এই ভাষণে তাঁহার বিশ্বতোমুখা আদর্শের উদার প্রশান্তি অভিব্যক্ত। এই প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের বন্ধু দেবকুমার রায়চৌধুরীর নিকট লিখিত চিঠি হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—“অবারিত উত্তম, অদম্য ইচ্ছাশক্তি, উন্মুক্ত উদার ও নির্মল মন, প্রাণময়ী চিন্তা ও জ্যোতির্ময়ী কল্পনা—এ সবার উপরে যদি কিছু থাকে ত আমার বিশ্বাস সে হচ্ছে একমাত্র ব্রহ্মচর্যা। এই এক ব্রহ্মচর্যের বলেই একদিন আমাদের স্বর্ণপ্রসন্ন ভারতভূমি অতি সহজে, এমন অনায়াসে, স্বাভাবিক শক্তিবলে এ বিশ্বদংসারে জগৎগুরুর আসনে অধিষ্ঠিত ছিল। আর আজ যদিও সে পদানত, নিজীব, অসহায় ও নিঃস্ব, তবুও ঐ একমাত্র উপায় অবলম্বন করলে এখনও সে নিশ্চয় আবার সেই শূন্য সিংহাসনে ধীরে ধীরে গিয়ে উপবেশন কর্তে পারবে। আমি সেই শুভদিনের জন্ত প্রতীক্ষা করে বসে আছি। আমি জানি, বিশ্বাস করি, বেশ দেখতে পাচ্ছি; যে পাই বলুক, যতই কেন আমাদের হেয়, নগণ্য ভেবে উপেক্ষা করুক, আমরা আবার জাগব, উঠব, মাছুষ হব। এ আধার চিরদিন কখনও আমাদের ছেয়ে থাকবে না, থাকতে পারেনা। এ স্বপ্ন নয়, কল্পনা নয়, অথবা প্রলাপ বা শূন্য অহঙ্কার নয়। “আসিবে, সে দিন আসিবে।” আমি চাই শুধু ঐ বীৰ্যবল ব্রহ্মচর্যা; চাই শুধু আসল, খাঁটি, প্রব ও নিটোল ধর্মবল আর এক কথায় “মহাযাত্রা।” কবির এই স্বপ্ন-সাধনা কি সফল হইবে না?

দার্শনিক ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলাল ভক্তিবাদী ছিলেন না। কেবল “পরপারে” নাটকে “ভবানীপ্রসাদ” ব্যতীত তাঁহার রচনার ভক্তিমূলক চরিত্র আর বিশেষ নাই। তিনি ছিলেন...“কপিল-পত্নী”—সন্দেহবাদী। যুক্তি-প্রবণ বন্ধু-

তান্ত্রিক চিন্তাধারাই তাঁহার জগৎ ও জীবনবোধের ভিত্তি ছিল। এই উপাদানে গঠিত তাঁহার অল্পময় সৃষ্টি “চাণক্যের ভাষায়, বিবেক একটা কুসংস্কার, ঈশ্বর নাই।”—তবুও সেই চাণক্যের অদ্ভুত মনোবা এবং দুর্জয় পুরুষকারের সম্মিলিত লক্ষ্য, “ভারতে জীবিত জাতির সমবায় এক মহাসম্মীত রচনা,” তাঁহার স্বদূর নিবন্ধ দৃষ্টিতে, “এই প্রধুমিতা, প্রজ্জ্বলিতা, প্রবাহিত-রক্ত-শ্রোতস্বতী, ভৈরবী ভারত ভূমির পরিবর্তে এক রক্তালকারা, পুষ্পোজ্জ্বলা, সন্মীত-মুগরা, হাসাময়ী জননী, জগদি হতে জলদি পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এক মহাসাম্রাজ্য।” আজ দীর্ঘকাল পরে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গেই সেই আদর্শ “মহাভারত” রচনার অল্পকাল পরিবেশ সৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু সাম্প্রদায়িক কলহে জর্জরিত, “খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত-ভারতে” প্রতিক্রিয়াশীল জাতীয়তাবাদ দিকে দিকে মনুষ্যবৃত্তের শোচনীয় লালচায় উদ্গত। অন্নহীন, গৃহহীন, শীর্ণ, শুষ্ক, লক্ষ মানবের বার্ষ হাহাকারে এই পুণ্যভূমির অতীত কলঙ্কিত, বর্তমান অভিশপ্ত এবং ভবিষ্যৎ ভয়দাজ্জ্বল হইতেছে। এই চরম দুর্গতিব দিনে দ্বিজেন্দ্রলালের অনাবিস স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তার সার্বভৌম আদর্শ দ্বিধাহীন জাতিকে—আশ্রয়িতাকে উদ্ধৃত্ত করুক,—“হিন্দু মুসলমান এক হোক, এক সঙ্গে মন্দিরে মসজিদে আল্লাহ ও ব্রহ্মের নাম নিনাদিত হোক, জাতিভেদ, ধর্মভেদ, আচার ভেদ ভুলে তারা একবার সমস্বরে এই ভারতভূমিকে ‘মা’ বলে ডাকুক।” আমরাও জাতীয়তাবাদ সাগরের এই একান্ত কামনা কি পরিপূর্ণ হইবেনা?*

* পূর্ণিমা সম্মিলনী কর্তৃক আহৃত দ্বিজেন্দ্র জন্ম শতবার্ষিক অর্চনানে পঠিত।





অভিযাত

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

নীলা বাড়ী ফিরিল সিঁথের সিঁড়র মুখে। মেয়েকে দেখেই মা রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল একটি কথাও না বলে।

বাপ দাঁড়ায় মাহুর পেতে বসে তামাক খাচ্ছিলেন। মুখ চোখে কোন ভাবান্তর দেখা গেল না। শুধু হাঁকোর শব্দ আরও জ্বলন্ত হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে ধোঁয়ার কুণ্ডলি। জ্বরটা যেন আত্মজার সামনে নিবিড় একটা ধূম্রজালের স্ফুট করে পরিস্থিতিটা সামলে নেবেন।

নীলা কিন্তু কোন দিকেই দেখল না। সোজা নিজের ঘরে এসে ঢুকল। অবশ্য এ ঘরটা আর তার নেই। এখন এখানে ছোট বোন তাপসী আস্তানা গেড়েছে। ছোট একটা আয়নার নীচে প্রসাধনের টুকিটাকি। এককোণে সারি সারি ড্রাক। সেই পুরণো তক্তপোষ। নতুনের মধ্যে কেবল সস্তাদরের একটা আলনা।

তাপসী রান্নাঘরে ছিল। নীলাকে দেখে তার পিছন পিছন ঘরে এসে ঢুকল।

দিদি, এভাবে চলে এলি যে? দরজার কপাটে হেলান দিয়ে তাপসী প্রশ্ন করল। তখনও কিন্তু তার নীলার শূচ সিঁথির দিকে নজর পড়ে নি।

কাঁধের কোলানো ব্যাগটা তক্তপোষের ওপর রাখতে রাখতে বিব্রণ, নিম্পূহ গলায় নীলা বলল, বনল না।

কার সঙ্গে বনল না, কেন বনল না, কে বনাতে পারল না, এ সব কথা, এত সব কথা যেন অবাস্তব। স্বামীর সঙ্গে সারা জীবনের সম্পর্কই নয়, যেন সামান্য একটা দোকানদারের সঙ্গে কোন জিনিষের দাম নিয়ে বনে নি, নীলা কথায় এমনই একটা আভাস দিল।

ঠিক একভাবে দরজায় হেলান দিয়ে তাপসী চূপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। নীলার জীবনক্লান্ত, নিস্তেজ, ভেঙে-পড়া মূর্তির দিকে চেয়ে।

এত আনন্দ, এত উচ্ছ্বাস, এত উত্তেজনা এত স্বপ্ন তার পরমাণু! মনে মনে তাপসী একবার হিনাব করার চেষ্টা করল।

কতদিন হবে? বছর দুয়েক তার বেশী নয়। মাত্র বছর দুয়েক আগে এ বাড়ীতে, এই মধ্যবিত্ত নিজীব পরিবেশে স্নকুমারের আসাটাই যেন একটা আনন্দের সংকেত ছিল।

আলাপ এ পারের নয়, ওপারের। একদল ভয় পাওয়া দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য ছুটে আসা মাছবুগুলোর দলে নীলারা যেমন ছিল, তেমনই ছিল স্নকুমার। অবশ্য দেখা হ'ল শেয়ালদা টেনে, যদিও দু পুরুষ একেবারে পাশাপাশি বাড়ীতে তারা কাটিয়েছিল।

তখনও নীলার বাবা এমন অর্থহীন হয়ে পড়েননি। গায়ে শক্তি ছিল, পেটে বিজ্ঞাও ছিল। এক বেসরকারি স্কুলে চাকরি জুটে গেল। শিক্ষকতার সঙ্গে বাড়তি আয়ের পছা টুইশনি। মতিমবাবু পাঠের তলায় মাটি পেলে। সরকার থেকে জমির ছিটে জুটেছিল, টিনের চাল। টিনের বদলে পাকা গাঁবনি হ'ল। কৃতবিত্ত ছাত্রদের দাক্ষিণ্যে একটু একটু করে স্বচ্ছল হ'ল অবস্থা।

নীলা স্কুলের পড়া শেষ করে কলেজে ঢুকল, তাপসী স্কুলের শেষ ধাপে।

স্নকুমার আগে থেকেই আসা যাওয়া করছিল, এবার তার আসাটা বেশ খন খন হ'য়ে উঠতে লাগল আর কেমন একটু উদ্বেগমূলক।

স্বল্প মূলধন সম্বল করে সুকুমার সামান্য একটা ব্যবসার পত্তন করেছিল, আজ তার অবস্থা ভালই। গাড়ী কিনতে পারে নি, কিন্তু একটা মোটর সাইকেল কিনেছে। তাতেই আসা যাওয়া করে। একটা মোটর সাইকেলের দামও নীলারদের সংসারে তখন অনেক।

তাপসী ছোট, কিন্তু তখনই সে বৃদ্ধিতে পারত। দুঃখের আগুনে পুড়ে মাংস একটু ভাড়াভাড়াই সব কিছু শেখে।

সুকুমারএলেই ছলছলো করে নীলার বাবা বেরিয়ে পড়তেন। নীলার মা তাপসীকে আটকে রাখত রান্নাঘরে। এক কথায় বাইরের ঘরে নীলা আর সুকুমারের অবাধ মিলনের পথের সব বাধা অপসারিত করা হত।

মাঝে মাঝে নীলা আর সুকুমার বেরিয়ে যেত। কোন দিন সিনেমা, কোনদিন দোকানে। সুকুমারের দেওয়া উপহারগুলো নীলা যখন তার মা বাপের সামনে মেলে ধরত তখন দুজনের হৃৎকোষে চোখ লোভের ছোঁয়ায় জলে জলে উঠত। একটা পরম প্রত্যাশার দিন গুণত দুজনে। নীলার মা মেয়েকে আড়ালে টেনে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাও করত আগামী শুভক্ষণের কথা। সুকুমার এত দেরী করছে কেন? ঐর্ষ্যচ্যুতি ঘটবার মতন বিলম্ব।

নীলা উত্তর দিত না। সলজ্জভাবে সরে যেত মায়ের আওতা থেকে।

অবশেষে সুকুমার একদিন এগিয়ে এল। নীলার বাপের কাছে ভিক্ষা চাইল মেয়েকে।

এ যেন পাকা ফলের নীচে হাত পেতে বসে থাকা। ফলপ্রাপ্তিতে একটুও দেরী হল না। ততদিনে নীলার বাবা একটু শুদ্ধিয়ে নিয়েছেন। খুব ধুমধাম না হ'লেও, একেবারে শাঁখা সিঁড়ির মেয়ের বিয়ে দিলেন না।

এর পরের বছর খানেক নীলার পা যেন মাটিতে পড়ল না। মাঝে মাঝে বাপের বাড়ী আসত, কখনও সুকুমারের মোটর সাইকেলের পিছনে চেপে, কখনও একলা ট্যাক্সিতে চেপে। সে যে অপরিণীম আনন্দে আর সুখে দিন কাটাচ্ছে তার চিহ্ন তার কথায়-বার্তায়, আচরণে-আভরণে।

সুকুমারের আরও উন্নতি হয়েছে। ব্যবসা ছাড়াও কল্লন বন্ধু মিলে সিনেমার কারবারে নেমেছে। গোটা দুধেক বইও তুল করেছেন। নায়ক অলককুমার আর নায়িকা উর্দীলা দেবী বাবের একবার চোখের দেখা

দেখবার অন্তরাত্মায় অপেক্ষা করে লোকেরা, তাদের নীল যে কতবার দেখেছে তার হিসাব নেই। শুধু দেখা নয় হুঁড়িয়েতে পাশাপাশি বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প।

শেষের প্রলোভনটুকু অবশ্য তাপসীকে লক্ষ্য করে।

তাপসীর সামনে বি, এ, পরীক্ষা। তার অবস্থা বজ্র-কুণ্ডের সামনে সমাহিতচিত্ত খবির মতন। দ্বিধার এ উচ্ছ্বাস, এ কলরোল তার হৃদয়ে একটুও আলোড়ন জাগাল না।

সুকুমারও তাকে অনেক বলেছে। তখন বি, এ পরীক্ষা শেষ করে তাপসী বিশ্রাম করছে। সকাল বিকাল শুধু দুটো টিউশনি।

চল, অলককুমারের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। বরাদ্দ জোর থাকলে একসঙ্গে দুজনের ফটোও উঠে যেতে পারে। সব সময়ে অলককুমারকে ফটোগ্রাফাররা ঘিরে থাকে তো।

তাপসীর তরফ থেকে বিশেষ কোন আগ্রহ দেখা গেল না। চায়ের কাপ আর খাবারের থালাটা সামনে রেখে বলল, মাকে ডেকে দিচ্ছি, আমি আবার একটু বেরোব।

চায়ের কাপটা তুলে নিয়ে সুকুমার বলল, পরীক্ষা তো শেষ। এখন তো লম্বা ছুটি, চল দ্বিধা ওখানে কিছুদিন কাটিয়ে আসবে।

তাপসী ঘাড় নেড়েছে, ছ্যাকড়া গাড়ীর ঘোড়ার কি ছুটি আছে জামাইবাবু। আমার টিউশনি রয়েছে না।

কথা শেষ করে তাপসী আর দাঁড়ায় নি। তার মাকে ডেকে দিতে ভিতরে বলে গেছে।

তাপসী চিরদিনই এই রকম। নীলা সুন্দরী, অসামান্য না হ'লেও চলন সহী। গৌরবর্ণা, আয়তলোচনা, দীর্ঘাকী। তাপসীর রং কালো। চোখ আরত কিনা দেখবার উপায় নেই, কারণ ছেলেবেলা থেকেই তার চোখে বেশী পাওয়ারের চশমা। দৈর্ঘ্য সাধারণ বাঙালীর ঘরের মেয়ের মতন।

তাছাড়া, তার প্রকৃতিও অস্বাভাবিক। ছেলেবেলা থেকে অধ্যয়নপরব্ব। বাইরের হুজুগের প্রতি তার আকর্ষণ কম। নিশ্চেকে ঘিরে এমন একটা দূর্ত্ত প্রাণীর গড়ে তুলেছিল যে সহজে কেউ তার ধারে কাছে বেঁধেই পারত না।

ঘেয়ালে হেলান দিয়ে তাপসী দাঁড়িয়ে রইল। নীলা

নীচ হ'য়ে স্ট্রাকেশটা খুলতে যেতেই তাপসীর নজরে পড়ল।

দ্বিদি! তাপসীর কণ্ঠে আহত বিন্ময়ের স্বর।

কিরে? পাট করা একটা শাড়ী তুলতে তুলতে নীলা উত্তর দিল।

সিঁড়র মুছলি কেন?

নীলা একটু জ্বা কৌচকাল তারপরই স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, কেন, মুছব নাই বা কেন? সিঁড়রের সম্পর্কই যখন রাখলাম না, তখন ওই লালগুঁড়োটা শিরোধার্য করতে যাব কোন হুখে।

আজকাল নীলা এই ধরনের কথা বলে। সিনেমার নায়িকাদের মতন সংলাপ। সোজা কথা পেচিয়ে পেচিয়ে কাব্য করে। এটা তাপসী লক্ষ্য করেছে।

জামাইবাবুর সঙ্গে কি ডাইভোস' হয়ে গেল তোর?

না, দুবছর আলাদা না থাকলে তো ডাইভোস' হয় না। সেইজন্তাই তো চলে এলাম। কেন, তুই শুনিস নি কিছু!

এবার নীলা তাপসীকে উল্টে প্রশ্ন করল।

তাপসী দু এক মুহূর্ত্ত ভাবল। কিছু যে একটা হয়েছে সে আভাস তাপসী পেয়েছিল। মা আর বাপের কিসকাস কথাবার্তায়, নীলার ঘন ঘন এ বাড়ীতে আসায়, কোথায় অন্ধকার দানা নাথতে শুরু করেছে সেটুকু বুঝতে অস্বীকার হয় নি। সেটা যে নীলা আর স্কুয়ারের দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে সেটুকুও আঁচ করতে পেরেছিল। তবে, এ বিষয়ে তার সঙ্গে কেউ আলোচনা করেনি, তাই সেও কোন আগ্রহ দেখায় নি।

তাছাড়া তার সময়ও কম। টিউশনি তো ছিলই, তার ওপর নিজের এম, এ পরীক্ষা সামনে। বাড়ীতে তাপসী যতটুকু থাকত, বই মুখে দিয়ে আর তার সেই বইয়ের পাতায় আর কারো, অল্প কিছু ছায়া পড়ুক এটা সে চাইত না।

তবে বাপারটা যে এমন আকার নিচ্ছে তা সে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। সে ভেবেছিল, সব সংসারের মতন, এটা বৃষ্টি সাময়িক অশান্তির বাপার। মেঘ জমেছে, আবার মেঘ কেটে যাবে।

তাপসী আর কিছু বলল না। রাত্রি ঘরে কিরে গেল।

মায়ের শরীরটা একটু খারাপ হয়েছে, তাই তাপসী রাত্রি তার নিয়েছে। এরকম আজকাল মাঝে মাঝে হ'চ্ছে। তাপসীর পড়াশুনার একটু অস্বীকার হয়, কিন্তু এ ছাড়া আর উপায়ই বা কি। পয়সা দিয়ে রাত্রি লোক রাখবে তাও যেমন সম্ভব নয়, আবার উটকো লোকের হাঙ্গামা মা মুখেও তুলবে না।

তাপসীর বিছানার পাশেই নীলার বিছানা হ'ল। এ ছাড়া আর পথও ছিল না। ঘর তো মোটে আড়াই-খানা। একটায় মা আর বাবা, আর একটাতে চিরকালই দুই বোন শুত। নীলার বিয়ে হয়ে যাবার পর, তাপসী হাত পা ছড়িয়ে একলা থাকবার অধিকার পেয়েছিল।

আর একটা ছোট ঘর আছে। সেটা রাজ্যের বাজে জিনিসে ঠাস গোকাই। ভাঙা প্যাংকিং কেস, ঘুঁটের বুড়ি, হাতল ভাঙা চেয়ার।

তাপসী বিছানায় বসে পড়ছিল, নীলা শুতে এল। এতক্ষণ গোদহয় নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে মা বাপের সঙ্গে আলোচনা করছিল। পড়ার ফাঁকে ফাঁকে তাপসীর কানে মাঝে মাঝে টুকরো কথাবার্তা কানে আসছিল। স্কুয়ারের নাম, তার উচ্ছ্বল জীবনযাত্রা, নীলার প্রতি দুর্ব্যবহার।

নীলা পাশ ফিরে শুল। তাপসীর মনে হ'ল বাতির জ্বল হয়তো তার ঘুমের অস্বীকার হচ্ছে। তাপসী একটা খাতা দিয়ে টেবিল ল্যাম্পটা আড়াল দিল। নীলার একটা অন্ধকার হয়ে গেল।

হারে তপু, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব? হঠাৎ এদিকে দ্বিদির নীলা প্রশ্ন করল।

মেটাফিজিক্সের বই থেকে মুখ তুলে তাপসী কিছুক্ষণ দ্বিদির দিকে চেয়ে রইল, তারপর বলল, কি কথা?

তোর জীবনে কোন পুরুষ বন্ধু আসেনি তো?

তাপসী অবাক হ'ল। অবশ্য তাপসী শিশু নয়, এ ধরনের আলোচনা যে তার সঙ্গে চলতে পারে না, এমন নয়। তবু এভাবে আচমকা দ্বিদি, বিশেষ করে মনের এ অবস্থায়, এ জাতীয় প্রশ্ন করবে, এটাই তাপসীর আশ্চর্য্য প্রতীক।

হঠাৎ এমন একটা প্রশ্ন?

না, এমনই জিজ্ঞাসা করছি।

ও বিলাসিতাটা আমার যে নেই, তাতো তুমি ভাল

করেই জানো দিদি। থেমে থেমে প্রত্যেকটি কথার ওপর জোর দিয়ে তাপসী উত্তর দিল।

জানে নীলা, খুব ভাল করেই জানে। নীলার জীবনে সুকুমার প্রথম পুরুষ নয়। পাড়ায়, কলেজে, গুণগ্রাহী, রূপমুগ্ধ একদল ছেলে নীলাকে ঘিরে গুঞ্জন বরত, নীলা যে তাদের একেবারেই আমল দিত না, এমন নয়। পথে ঘাটে অন্তরঙ্গতার দৃশ্য তাপসীরও চোখে পড়েছে। সুকুমারকে নীলা বেছেছিল কারণ যারা আসত, তাদের মধ্যে সেই এর চেয়ে কামা ছিল। অর্থে আর সামর্থ্যে।

হু একজন যে কিশোরী তাপসীর দিকেও নজর দেয় নি, এমন নয়। নীলাকে সামনে রেখে তার সঙ্গে আলাপ করারও চেষ্টা করেছে। তাপসী স্বন্দরী নয়, কিন্তু এমন একটা সময় আসে, যখন বয়স আর স্বাস্থ্যই সৌন্দর্য।

নীলা হু একবার চেষ্টাও করেছে। তাপসীকে দলে টানবার কিন্তু সুবিধা করতে পারে নি। ছেলে বয়স থেকেই তাপসীর একটা গাঙ্গ্রীষের আবরণ ছিল সর্দাঙ্গে। পথে ঘাটে কেউ তার সঙ্গে কথা বলতেও সাহস করে নি।

দূর থেকে হু একজন টিটকারি দিয়েছে। কেউ বলেছে সক্রিটিস, কেউ বলেছে স্মাগ্রশপ। তাপসী প্রত্যুত্তর করে নি। কথাগুলো কানে গেছে, মুখের ভাবে তারও কোন চিহ্ন ফোটে নি। সব রকমের রসিকতা তাপসীর নিম্পৃহ-তার বর্গে ঠেকে ভোঁতা হয়ে গেছে।

ঠিক বলেছিস তপু, ওটা একটা বিলাসিতাই। পুরুষের সঙ্গে কদিন মিলে মিশে আমরা মন দেওয়া নেওয়ার পালা সাজ করি, কিন্তু ওই কটা দিনে কতটুকু আমরা চিনতে পারি পুরুষ মানুষকে। তারা যখন আমাদের কাছে আসে, তখন চড়া রং মেখে আসে। আমরা ভাবি এই বুঝি তাদের আসল রূপ। তাদের মধুর কথায় ভুলি, নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনি।

তাপসী চুপচাপ কথাগুলো শুনে গেল। ভেবেই পেল না, এসব কথাগুলো তাকে বলবার কি অর্থ থাকতে পারে! সুকুমারের চড়া রংয়ে যদি নীলা ভুলে থাকে, তবে সে দোষ নীলার। তার প্রাথমিক হস্ততো সে করেছে। কিন্তু তাপসীর জীবনে এমন কোন ঘটনা ঘটে নি, ঘটবার সম্ভাবনাও কম। কাজেই তার ওপর এই উপদেশ বর্ণনের কোন প্রয়োজন নেই।

বাপ মা খোঁজ-খবর করে, বংশ দেখে, কোঠি মিলিয়ে যে পাত্র ঠিক করে তাকে গ্রহণ করাই ঠিক।

নীলা পাদরী ধর্মযাজকের মতন বাণী বিভরণ করার ভঙ্গীতে বলল।

তাপসী এবার বইটা মুড়ে ফেলল। বুঝতে পারল আজ রাতের মতন পড়াশোনার ইতি। এভাবে পাশে শুয়ে একজন জীবনের দার্শনিক সত্য আওড়ে গেলে দর্শন শাস্ত্রে মন বসার সম্ভাবনা কম।

তাপসী বাতিটা নিভিয়ে দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। নীলার দিকে কিরে বলল, এসে পর্বন্ত তো তোর গর্জনা আর দীর্ঘশ্বাসের শব্দই শুনিছি, আসলে কি ব্যাপার হয়েছে বল তো?

আলোতে যেন একটু অস্বস্তি হচ্ছিল নীলার, অন্ধকারে সে বেশ একটু স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করল। আস্তে আস্তে বলল, ভুল্লোকের ইচ্ছা আমায় সিনেমায় নামায়।

--এ অভিযোগটা নতুন। বাড়ীতে কথাবার্তার মধ্যেও এটা তাপসীর কানে আসে নি। জীবনে পাদ্রীপণের আলোর সামনে নীলা কোনদিন দাঁড়িয়েছে, তাপসী মনে করতে পারল না। সিনেমায় নামার কোন খোঁক ছিল, এমনও মনে হয় নি। তবে, সুকুমারের হঠাৎ এমন একটা খেয়াল হবার কারণ?

হঠাৎ সিনেমায়? মনের দৃষ্টি তাপসী মুখের ভাবের রূপ দিল। জানিস না, এটাই তো আজ্ঞাপনকার রেওয়াজ। বন্ধুবান্ধবরা সব নাচিয়েছে, আখ্যার চেহারা নাকি পর্দার উপযোগী। খুব মানাবে। খ্যাতি আর অর্থ অল্প সময়ের মধ্যে আহরণ করতে হ'লে এটাই নাকি একমাত্র পন্থা। আমি প্রথমে ভেবেছিলাম রসিকতা, তারপর দেখলাম সত্যি সত্যিই আমাকে টুড়িয়ার নিয়ে যেতে চায় ক্রীনটেটের স্ত্রী। একদিন পীড়াপীড়িতে ক্রীনটেটও দিয়ে এলাম, আর আবেগ সর্বনাশের কথা তাতে উত্তরেও গেলাম। বাস, অজগর বন্ধন আরও শক্ত হ'ল। আমাকে নিয়ে প্রযোজকদের সঙ্গে দরদস্তরও চলতে লাগল। তখন আমি বেকে দাঁড়ালাম। সেই বিরোধের শুরু।

সেই বিরোধ থেকে একেবারে বিচ্ছেদ। কেন, সুকুমারকে কি বোঝানো সম্ভব হ'ল না যে রূপোলী পর্দার

মোহ জীবনে কত বড় অভিশাপ আনতে পারে। অর্থের সঙ্গে দারুণ অনর্থ।

কি জানি এসব কথা ভাবতে তাপসীর ভাল লাগল না। সামনে পরীক্ষা, এখন এ সব চিন্তা মাথায় ঢুকলে বইয়ের একটি অক্ষরও মগজে যাবে না। তার চেয়ে, তাপসী পাশ ফিরে গুল। ঘুমের ভাগ ক'রে।

শুয়ে শুয়েই তাপসী শুনল, নীলার গলা, তপু ঘুমালি নাকি? উঃ মেয়ের আচ্ছা ঘুম বাবা।

পরের দিন সকালে নীলার সঙ্গে দেখা হলেও কথা বলার, অবকাশ তাপসীর হ'ল না। একটা টিউশনি আছে। 'চা মুখে দিয়েই তাপসী বাইরে ছুটল।

বিকেলের দিকে নীলার সঙ্গে আবার মুখোমুখি দেখা হ'ল।

নীলা বাইরের বারান্দায় চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল, তাপসী আসতেই তার পিছন পিছন ঘরে ঢুকল।

তোর সঙ্গে একটা কথা ছিল তপু?

বইগুলো টেবিলের ওপর রেখে তাপসী বলল, বল।

আমার একটা চাকরি করে দিবি। আই, এ পর্যন্ত তো পড়েছি। তোরা তো চারদিকে অনেক জানাশোনা।

তাপসী দিদির দিকে ফিরে দাঁড়াল, হঠাৎ চাকরি করার তোমার কি দরকার হ'ল?

যারে, মা বাপের গলগ্রহ হয়ে থাকবে নাকি? ওর কাছ থেকে একটি পয়সা সাহায্য আমি চাই না। তুই দেখ না খোঁজ করে।

বেশ দেখব। তাপসী আর দাঁড়াল না। বাথরুমে গিয়ে ঢুকল।

দিন দশেকের মধ্যে তাপসী সত্যিই একটা চাকরি জোগাড় করল। মাইনে খুব বেশী নয়, তেমনই কাজও আরামের। সকালে যে বাড়ীতে পড়ায়, সে মেয়েটির কাকার ছোটখাট একটা গুহের কারখানা ছিল, সেখানেই কেরানীর চাকরি। এগারোটা থেকে চারটে।

নীলার কৃতজ্ঞতার বেশ শেষ নেই। বারবার তাপসীকে ধন্যবাদ জানাল, কিন্তু তাপসীর মনে হল মা বাবার মূখ বেশ জ্বর। তারা খুব খুশী নয়।

মহিমাবাবু মূখ বুটে তাপসীকে আড়ালে একদিন বলেই

ফেললেন, সাত তাড়াতাড়ি নীলার একটা চাকরি যোগাড় করে দেবার তোরা কি দরকার ছিল?

বা, দিদি বারবার আমায় বলে যে।

তোমার দিদি তো কত কথাই বলছে। বেশ রাগত কণ্ঠস্বর মহিমাবাবুর।

মাও অসুযোগ করল, স্কুমারের কাছে ফিরে যাবার যাও বা একটু আশা ছিল, সে পথ তুই বন্ধ করলি তপু।

তাপসী মায়ের কথার কোন উত্তর দিল না। নীলাকে একদিন সোজা হুজি বলল, তোমার চাকরি করে দেওয়াটা আমার ঠিক হয় নি দিদি।

কেন? নীলা বিস্মিত হ'ল। কিছু পরিমাণে বিরক্তও।

মা আর বাবার ইচ্ছা নয় তুমি চাকরি কর।

এবার নীলার মূখ আরক্ত হয়ে উঠল। দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁটটা চেপে ধরে বলল, ওদের ইচ্ছা আমি ওই লোকটার কাছে ফিরে যাই। পতি পরম গুরু বলে গলায় আঁচল দিয়ে তার পায়ের ওপর আছড়ে পড়ি। কিন্তু আমার স্বামী ওসব সতীলক্ষীর অভিনয় হবে না তপু। সে যুগ আর নেই।

তাপসী কোন কথা বলল না। নীলা যদি সত্যিই স্বামীর সংসারে ফিরে না যায় তাহলে এভাবে এ সংসারের গলগ্রহ হয়ে থাকে। তার অহুচিত হবে। মহিমাবাবুর বোজগার এমন নয় যে বাড়তি একটা মানুষকে তিনি পুষতে পারবেন, সে বাড়তি মানুষটা নিজের মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও। তা ছাড়া বিয়ের আগে পর্যন্ত মেয়েদের বাপের সংসারে যে জোর থাকে, বিয়ের পর, স্বস্তরবাড়ীর পর্ধ বন্ধ করে এখানে এসে, সে শক্তি তার থাকে না। তখন নির্বিষ ভ্রূক্ষের মতন ফণা গুটিয়েই বাস করতে হবে।

তাপসী শুধু সেই দিকটাই বেবেছিল। তাই নীলাকে স্বাবলম্বী হবার সুযোগ দিয়েছিল।

যা হোক চাকরি নীলা ছাড়ল না। তাকে সোজা হুজি চাকরি ছাড়ার অসুযোগও কেউ করল না। না বাবা, না মা।

মাস কয়েক পরে নীলা নিজে থেকেই কথাটা বলল।

তাপসীর পরীক্ষা শেষ। পরীক্ষার ফলও বেরিয়ে গেছে। এখন তাপসীর ঘোরাঘুরি খুব বেড়েছে। মনের মতন চাকরি এ দেশে জোটে না, বা, বাবর মতন কিছু একটা

পেলেই সে খুশী। তবে সরকারি কলেজে হলেই ভাল হয়।
দু'একজন আশাস দিয়েছে হয়েও যেতে পারে।

নীলা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল বাঁধছিল, তাপসী
বাইরে থেকে ঘরে এসে ঢুকল।

খোপাটা ঘুরিয়ে কিরিয়ে দেখতে দেখতে নীলা বলল,
তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে তপু।

কি বল? আঁচল দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে
তাপসী উত্তর দিল।

এ মাস থেকে আমার একটু মাহিনে বেড়েছে।
অফিসের দু'একজনকে বাড়ীতে খাওয়াতে চাই। মা বাবা
কিছু মনে করবে না তো?

প্রশ্নটার তাৎপর্য তাপসী ঠিক বুঝতে পারল না।
নীলার মুখের দিকে কিছুক্ষণ দেখে অর্থ খোজার চেষ্টা
করল, তারপর বলল, তোমার পরশায় তুমি খাওয়াবে এতে
আর মা বাবার মনে করার কি আছে।

কি জানি, নীলা অদ্ভুত ভঙ্গী করে ঠোটটা ওল্টাল,
আমার সব ব্যাপারেই তো দেখ হবে এখন।

তাপসী কথা বাড়াল না। চায়ের সন্ধানে রান্নাঘরে
গিয়ে ঢুকল।

ঠিক এর দিন তিনেক পরের ঘটনা।

একদিন কলেজ থেকে বেরোবার মুখেই তাপসীর সঙ্গে
সুকুমারের দেখা হয়ে গেল। একেবারে সামনাসামনি।
তাপসী এড়িয়ে যেতে চেয়েছিল কিন্তু সুকুমারই এগিয়ে
এল।

ভাল আছ? সুকুমারই প্রথম কথা বলল।

এভাবে একটা মাতৃস্ব সাধারণ কুশল জিজ্ঞাসা করলে,
মুখ ফিরিয়ে থাকা যায় না। ঘাড় নেড়েও অন্তত উত্তর
দিতে হয়। তাপসী তাই দিল।

তোমার দ্বিধার শখ বোধ হয় মিটে গেছে?

এবার তাপসী কৌতূহনী হয়ে উঠল। ঙ্কুটকে
জিজ্ঞাসা করল, কিসের শখ?

সিনেমায় অভিনয় করার।

নির্লজ্জতার একটা সীমা থাকা দরকার। আরক্তমুখে
তাপসী বলল, শখটা দ্বিধার, না আপনার? জীবনে
অভিনেত্রীই যদি কার্য ছিল তা হ'লে ভদ্রবরে ঘরনী
বোঝাটাই আপনার অন্তর হয়েছে।

আবারটা একটু গুরুতরই হয়েছে। সুকুমারের মুখ
থেকে পলকে যেন শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত শুবে নিল। নিশ্চয়
দুটি চোখের তারা। পাণ্ডু গুঁঠাধর।

একটু সামলে নিয়ে বলল, নীলা কি এই কথাই
তোমাদের বুঝিয়েছে?

তাপসী আড়চোখে সুকুমারের দিকে চেয়েছিল। তার
এই রূপান্তর তাপসীর চোখ এড়াল না। কিন্তু এ ব্যাপারে
তার মাথা গলাবার কোন অর্থ হয় না। এটা সম্পূর্ণ
নীলা আর সুকুমারের ব্যক্তিগত বিরোধসম্বন্ধ। মিটিয়ে
ফেলতে হ'লে তারাই মেটাবে।

কিন্তু এগোতে গিয়েই তাপসী দাঁড়িয়ে পড়ল। পথ
আগলে সুকুমার দাঁড়িয়েছে।

ব্যাপারটা তোমার জানা দরকার।

আমার জ্ঞানে কি লাভ?

লাভ ক্ষতি জানি না। অথবা আমার লক্ষ্যে তোমরা
কুৎসিত একটা ধারণা করবে, এটা আমি হতে দেব না।
তোমার দ্বিধার সিনেমায় নামার মোহ এত প্রবল হয়ে
উঠেছিল যে আমি অনেক বুঝিয়েও তাকে নিরস্ত করতে
পারি নি। এমন কি, এ ভয়ও দেখিয়েছিল, আমি যদি
গররাজী হই তাহলে আমাকে অস্বীকার করে সে পর্দার
জীবন গ্রহণ করবে। বাধ্য হয়ে আমি সাব দিয়েছিলাম।
ক্রীণটেটেও কোন রকমে উৎসে গেল, কিন্তু আসল
কাজের বেলায় এগন নার্ভাস হয়ে পড়ল যে একটি কথাও
মুখ দিয়ে বের হল না। তারপর বহুকষ্টে যখন বাক্য ফুটল
তখন মুখের অভিব্যক্তি ফোটােনো সম্ভব হ'ল না। তিন-
দিনের চেষ্টায় সবাই হতাশ হ'ল। তোমার দ্বিধার
অভিনেত্রীজীবন যে সম্ভব নয়, সে বিষয়ে টুডিয়োর
সবাই এক মত। বাস, নীলার পূজীভূত আক্ৰোশ প্রচণ্ড
বিষ্ফোরণের রূপ নিয়ে ফেটে পড়ল। তার ধারণা, তার
এই পরাজয়ের মূলে আমার ছলনা। আমিই চক্রান্ত করে
তাকে তারকার জীবন থেকে বঞ্চিত করলাম। কাজেই
সব বিষটুকু আমার প্রতি লোমকুণ্ডে ঢেলে দিল। ইচ্ছন
দেবার লোকও ছুটল। স্বাবলম্বী হবার বীজময় জপল
তোমার দ্বিধার কানে। ফল কি হ'ল তাভো জানোই।

কথাগুলো তাপসী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনল বটে কিন্তু
তার দুটি চোখে অবিশ্বাসের ঝিলিক দেখা গেল।

সেটুকু হুকুমারের চোখ এড়াল না।

হয়তো, কথাগুলো তুমি বিশ্বাস করছ না, কিন্তু আমার অন্তরঙ্গ বারা সিনেমার ব্যবসায় আমার সঙ্গে জড়িত, তাদের তুমি চেন। তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তুমি সিজাসা করো, আসল ব্যাপারের খোঁজ পাবে। নীলাকে হারানো আমার পক্ষে কতখানি তা বোঝাবার বুঝা চেষ্টা করব না।

শেষের দিকে হুকুমারের কর্ণ যেন একটু গাঢ় হয়ে উঠল। ছলছলিয়ে এল দুটি চোখ। তাপসী অনেকক্ষণ চেয়ে রইল। একটা মানুষ যখন সত্যিকথা বলে তখন যেন জ্বালা যায়, বোঝা যায়।

কিন্তু এক্ষেত্রে হুকুমারের কথায় সায় দেওয়া মানে নীলাকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা। তাপসীর পক্ষে সেটা করা সম্ভব নয়। অস্ত্রায় করলেও নীলাকে সমর্পণ করা ছাড়া আর উপায় নেই।

তাপসী আস্তে আস্তে সরে গেল হুকুমারের সামনে থেকে। যেতে যেতেও কানে গেল হুকুমারের কথাগুলো।

তোমার দিদিকে বল তাপসী, আমি অপেক্ষায় থাকব। আমার দরজা চিরদিনই খোলা থাকবে তার জন্য।

তাপসী বাড়ীর উঠানে পা দিয়েই চমকে উঠল।

বারান্দায় স্নান বাতি। মুখোমুখি দুটো চেয়ারে দুজন। একজন নীলা, আর একজনকে তাপসী ঠিক চিনে উঠতে পারল না।

তাপসীকে দেখে নীলা এগিয়ে এল, কিরে এত তাড়া-তাড়ি ফিরলি যে? বলে গেলি আসতে দেবী হবে।

যাবার সময় তাপসী ঠিক কি বলেছিল তা তার স্মরণ নেই। তার মাথাটা ঝিমঝিম করছে। হুকুমার অল্প এক চিন্তার কাঠি ছুঁইয়ে দিয়েছে তার মস্তিষ্কে। নীলার দিকে মুখ তুলে সে চাইতেও পারছে না। চাইলেই বুঝি এত দিনের সমস্ত গড়ে তোলা ধারণা চুরমার হয়ে যাবে।

হুকুমার নীলার সম্বন্ধে যা বলেছে, নীলা যে তাই এ বিষয়ে তাপসীর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

কিরে কি ভাবছিল? নীলা গলা আর একটু চড়াল।

না, ভাবছি না কিছু, তাপসী আশ্বস্ত হবার চেষ্টা

করল। একটু দম নিয়ে বলল, এক জায়গায় থাবার কথা ছিল, কিন্তু মাথাটা বড় ধরেছে বলে আর গেগাম না।

আয় তোর সঙ্গে আলাপ করিয়েদি। নীলা তাপসীর দিকে আরো দু'এক পা এগিয়ে এল।

তাপসী থমকে দাঁড়াল। নিজের চিন্তায় এত বিভোর ছিল যে তৃতীয় ব্যক্তির অস্তিত্বের কথা তার মনেই ছিল না।

আমার সহকর্মী অলকেশ মেন। হুজলোক চমৎকার গান করেন। আমাদের বাড়ীতে তো আর হারমোনিয়ম নেই, থাকলে একটা গাইতে বলতাম।

তাপসী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে আরম্ভ করল। হারমোনিয়ম একটা ছিল এ বাড়ীতে। যখন নীলা গলা সাধত। তাপসীর এসব বালাই ছিল না। বোধ হয় কোন এক পরীক্ষার কি দেবার সময় হারমোনিয়মটা বিক্রি করতে হয়েছে।

কিন্তু সহকর্মী গাইতে জানে বলে তাকে বাড়ীতে ডেকে আনতে হবে! হারমোনিয়ম না পাকা সর্বোচ্চ আধো-অন্ধকার বাগান্দায় ঘনিষ্ঠ হয়ে বলে আলাপ করতে হবে অন্তরঙ্গ সুরে!

নীলা সিঁথের সিঁথুর মুছতে পেরেছে বলে সত্যিই কি একজনের অস্তিত্বও নির্গম হাতে মুছে ফেলতে পেরেছে!

নীলার কথাবার্তায় অলকেশ কিন্তু রীতিমত বিরত হ'ল। দু'হাত ষোড় করে তাপসীর দিকে চেয়ে বলল, না, না, আপনার দিদির কথায় কান দেবেন না। গান গাইতে আমি মোটেই জানি না।

তারপর নীলার দিকে মুখ ফিরিয়ে গলার স্বর সামান্য খাদে নামিয়ে বলল, আঃ, কি হচ্ছে নীলা, এভাবে মানুষকে অপ্রস্তুত করে তোমার লাভ!

নীলার মুখে কোন ভাবান্তর দেখা গেল না, কিন্তু তাপসীর সারা মুখ আবির-লাল হয়ে উঠল। অলকেশের একটি কথাও তার কান এড়ায়নি। এর মধ্যে এত অন্তরঙ্গ হয়ে গেছে দুজনে? আপনি-র দুস্তর বাধা অতিক্রম করে দুজনে তুমি-র চড়ায় পরিচয়ের ডিঙ্কি বেঁধেছে?

শুধু তাই নয়, দুজনের চোখ মুখের ভাব ভঙ্গী, কপট ঔদাসীন্ত বোঝার মতন বয়স আর বুদ্ধি দুইই তাপসীর হয়েছে।

আর কোন কথা বলল না তাপসী। ঘরের মধ্যে যেতে যেতে অক্ষুটকণ্ঠে কথাগুলো শুধু ছুঁড়ে দিল চলি, মাথাটা বড় ব্যথা করছে।

চোখের দোষ নয় তে ? চোখটা কাউকে না হয় একবার দেখান। কথার সঙ্গে সঙ্গে অলকেশ ব্যস্ত হয়ে পড়ল—অন্তত ব্যস্ত হবার একটা ভাগ।

দিনরাত লেখাপড়া, চোখের কামাই আছে। নীলার কণ্ঠ।

ঘরের মধ্যে ঢোকান পর আর কারও স্বর তাপসীর কানে এল না। এই আধ-অন্ধকার, এই নির্জনতা, এই সান্নিধ্য, এ সব হেলায় নষ্ট করতে ছদ্মনের কেউই রাজী নয়।

কথা নয়, কিন্তু রাতের অন্ধকার ভেদ করে চুড়ির কিকিনী তাপসীর কানে এল।

দিন সাতেকের মধ্যেই।

ছাত্রীর বাড়ী থেকে বেরিয়ে তাপসী দোতলা বাসে পা দিয়েই যেন ভূত দেখল।

এ সময় ভীড়টা কম। বসার সীট অবশ্য নেই, কিন্তু বাড়িঝু ঝোলা অবস্থাও নয়। স্বচ্ছন্দে দাঁড়িয়ে যাওয়া যায়। অল্প মাহুঘের ছোয়াচ বাঁচিয়ে।

একেবারে সামনের সীটে নীলা আর অলকেশ। নীলার খোঁপায় বড় সাইজের একটা রক্তগোলাপ। অদ্ভুত রং যেন কারও টাটকা হৃদপিণ্ড বলে মনে হচ্ছে। একটু পরেই তাপসী বসার আয়গা পেলে। সে বলল, দৃষ্টি কিন্তু এক মুহূর্তের জগত সামনে থেকে ফেরাল না।

বাস একটা কাঁকুনী দিয়ে থামতেই তাপসী অবাক হয়ে গেল। না, অলকেশ তো নয়। লোকটা এদিকে মুখ ফিরিয়েছে। বয়স খুবই অল্প। নীলার চেয়ে যেন ছোটই হবে। বাক ত্রাশ চুল, ত্রণ-বিমণ্ডিত মুখ।

নামবার সময় চোখাচোখি হ'ল। নীলা আর তাপসীর। নীলা একটুও অপ্রতিভ না হয়ে বলল, কিরে তুই এ বাসে ?

তাপসী বলল, আমি তো এই সময়ে এই বাসেই ফিঁকি।

ওদের পিছন পিছন তাপসী নেমে পড়ল।

চলতে চলতে নীলা দাঁড়িয়ে পড়ল। তাপসীর

কাছাকাছি এসে বলল, আমার ফিরতে একটু দেরী হবে তপু, তুই বাড়ীতে একটু বলে দিস। একটু দেরী হলেই তো মা আর বাবা একেবারে মূর্ছা যাবে। যত কড়া কড়ি কেবল আমার বেলায়।

কঠিন একটা উত্তর তাপসী অনেক কষ্টে সংবরণ করল। মনে পড়ে গেল, তৃতীয় ব্যক্তির সামনে এমন একটা কাদা ছোঁড়া ছুড়ির খেলা খুব রুচিকর হবে না।

কথাটা বোধ হয় নীলারও মনে পড়ল। পাশের ভদ্রলোকটির দিকে চেয়ে হেসে বলল, তোমার সঙ্গে আলাপ করে দিই। এ আমার বোন তাপসী, আর এ হচ্ছে প্রদীপ মজুমদার। রেবা কেমিক্যালের কেমিষ্ট। আমাদের বাড়ীর কাছেই থাকে। অবশ্য নতুন এগেছে। এর শামুক আর ঝিকের অদ্ভুত সংগ্রহ আছে। তাই দেখতেই যাচ্ছি।

কথাটা শেষ করে নীলা আর দাঁড়াল না। প্রদীপকে প্রায় টেনেই বাঁ দিকের রাস্তা ধরে হন হন করে এগিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ, বেশ কিছুক্ষণ তাপসী চূপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। বাড়ী ফিরতে হবে, পথের মাঝখানে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকাটা শোভন নয়, এ সব কথা একটি বারের জগতও মনে এল না। কেবল ভাবল, একি খেলা শুরু করেছে নীলা ? এভাবে পুরুষ ছুঁয়ে ছুঁয়ে নিজেকে তিলে তিলে নামিয়ে আনার কি অর্থ হতে পারে।

অর্থ হয়তো একটাই হতে পারে, কিন্তু তার স্বরূপ চিন্তা করেই তাপসীর মন যুগায় শিউরে উঠল! এই নারীর জগত স্বকুমার বাকুল দুটি বাহ মেলে অপেক্ষায় রয়েছে, এমন একটা কথা ভাবতেও যেন কষ্ট হল।

তাপসীর চাকরি একটা জুটে গেল। খেয়ে-কলেজে, অবশ্য বেঙ্গলকারি, তা হোক মাইনেটা নিলার নয়। মাল খানেক নতুন চাকরিতে তাপসী একেবারে ডুবে রইল। এই ব্যস্ততার মুখেই হঠাৎ একদিন স্বকুমারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

ট্রেন থেকে নামতেই দেখল প্র্যাটকর্মের ওপর স্বকুমার। কাঁধে ব্যাগ। অসংস্কৃত, মলিন চেহারা।

এবার স্বকুমার কথা বলবার আগেই তাপসী গিয়ে কথা বলল।

কেমন আছেন ?

প্রথমে একটু চকিত ভাব, তারপর সামলে নিয়ে স্বকুমার বলল, ভালই আছি—মানে কিছুদিন ভুগে উঠলাম। বেশ কিছুদিন।

সে তো চেহারা দেখেই বুঝতে পারছি।

তোমাদের খবর সব ভাল ? তুমি কোথায় গিয়েছিলে ?

আমি চন্দ্রনগর কলেজে চাকরি করি। একটু ধেমো যেন দম নিয়ে তাপসী বলল, আমি আর দিদি দুজনেই চাকরি করছি।

স্বকুমারের ক্রান্ত মুখে অবসাদের গাঢ় ছায়া নেমে এল। তাপসীর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে অল্প দিকে চেয়ে বলল, চাকরি করছে, নীলা চাকরি করছে !

আপনি একদিন আসুন না আমাদের বাড়ী।

কিছু না ভেবেই বুঝি তাপসী কথাটা বলে ফেলল।

স্বকুমার চমকে উঠল। কাঁধ থেকে খসে পড়া ব্যাগটা আঁকড়ে ধরে বলল, আমি, আমি গিয়ে কি করব ?

আপনি না পুরুষ মানুষ ! জোর করে নিজের জিনিসের ওপর দাবী জানাতে পারেন না ?

স্বকুমার স্নান হাসল, সব জিনিসে জোর খাটে না তাপসী। সব জায়গায় শুধু বাতলবেলে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। অপেক্ষা করি, হয়তো একদিন ওর মোহ কেটে যাবে।

স্বকুমার আর দাঁড়াল না। মাথা নীচু করে তাপসীর পাশ কাটিয়ে ট্রেনের দিকে এগিয়ে গেল।

* * *

কলেজ থেকেই দল বেঁধে মেয়েরা গিয়েছিল বোটা-নিক্যাল গার্ডেনে। সঙ্গে জনাচারেক অধ্যাপিকা। তাপসীও তার মধ্যে একজন। মেয়েরা ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছিল, তাপসী একটা গাছের নীচে বসেছিল চুপচাপ। বাকি তিনজন অধ্যাপিকা শ্রমিগালের অবিবেচনা, বর্তমান জিনিসের মহার্ঘতা আর নিজেদের আখের আলোচনা করছিল।

হঠাৎ মেয়েদের খিলখিল হাসি আর অজ্ঞানী দেখে তাপসীর কোতুল হ'ল। মেয়েরা সরে যেতেই সে গাছ পালার ফাঁক দিয়ে একটু একটু করে এগিয়ে গেল।

একটা কাঁকড়া বাতাবিলেবুর পাশে গিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

ঝোপের ওপাশে মাঝবয়সী একটি ভদ্রলোক তার কোলে মাথা দিয়ে শুবে রয়েছে নীলা। এগার মোটা গাছে নৌকা বেঁধেছে। পলকা হাওয়ার স্থানচ্যুত না হয়।

দেখতে দেখতে তাপসীর দুটো চোখ জ্বালা করে উঠল। একটা দাহ, মর্মান্তিক একটা শব্দ শিরায় শিরায় ছড়িয়ে পড়ল।

একজনকে নিয়ে উন্মাদনার তবু একটা ক্রীণ অর্থ হয়, কিন্তু এভাবে একাধিক পুরুষের কাছে বারং বারং দেয়, তাদের সঙ্গকে অভিধানে যে সংজ্ঞা আছে তা মোটেই প্রতিমূর নয়। কিশোর মোহে বহুচায়িত্বী হল নীলা, কোন অতৃপ্ত ক্ষুধা মেটাতে তার এই সর্বনাশা অভিযান।

সে রাঙেই তাপসী কথাটা বলল।

নীলা যখন বাড়ী ফিরল, তখন রাত অনেক। দরজা খুলে দেবার অল্প তাপসী জেগে বসেছিল।

উচ্ছ্বসিত, উল্লসিত নীলা খুলীর বস্তার মতন ঘরে ঢুকল।

আমি থেয়ে এসেছি তপু, কিছু খাব না। রোজ রোজ বাপু তোদের একঘেয়ে তরকারি খেতে ভাল লাগে না, তাই মাঝে মাঝে বাইরে একটু মুখ বদলে আসি।

তাপসী এসব কথার কোন উত্তর দিল না। এসব কথা কানে গেছে, তার কঠিন নিষ্পৃহ মুখের রেখার দিকে চেয়ে মনে হ'ল না।

নীলা জামা শাড়ী ছেড়ে বিছানায় শোবার আয়োজন করার সময় তাপসী কথাটা বলল ধীর চাপা কণ্ঠে।

স্বকুমার বাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

সামান্য ক্রুটি, চোঁটের কৃৎনে বিরক্তির ভাব, তারপর নীলা বলল, আমার খুব নিন্দা করলে তো ? একগাছা মিথ্যা কথা বললে ?

না, স্বকুমারবাবু কিছু বলেন নি, আমিই বললাম।

একটু ধেমো, দুটো গোখরী তাপসীকে জরিপ করতে করতে নীলা বলল, তুই কি বললি ? তার মতন লোকের সঙ্গে তোর বলার মতন কি থাকতে পারে ?

বললাম, এবার দিহিকে বাড়ী নিয়ে যান। এবার

দ্বিদি অভিনয়ে ঠিক উত্তরে যাবে। বিশেষত রোমাণ্টিক নায়িকার রোলে। খুব মন প্রাণ দিয়ে এতদিন রিহাসাল দিয়েছে, আর কোন ভয় নেই।

কথাগুলো বলেই তাপসী হাত বাড়িয়ে হুইচটা টিপে দিয়েছিল। ঘর ভুড়ে অন্ধকারের বগা। আশা করেছিল সেই অন্ধকারে একটা শঙ্খিনী দাক্ষণ আক্রোশে সব কিছুর ওপর ছোবল দেবে। সবটুকু ঝিঁঝিঁ চলে দেবে নিশেষে।

কিন্তু আশ্চর্য, সে রকম কিছুই হল না।

অন্ধকারে চোখ ঢুটো অভ্যস্ত হয়ে যেতে তাপসী শুধু দেখতে পেল একটা ক্লাস্ত, জীবন যন্ত্রণায় মুমূর্ষু মানুষের কাঠামো দেয়ালে হেলান দিয়ে নিঃশব্দ হ'য়ে বসে রয়েছে। রোমাণ্টিক নায়িকার মেক-আপের শেষ বংটুকু গুছে গেছে।

আলো থাকলে তাপসী আরো দেখতে পেত সেই বিগল, জীর্ণ মূর্তির গাল বেয়ে অশ্রুর বিন্দু ঝরে পড়ছে।

নেহরু স্মরণে

জ্যোতির্ময়ী দেবী

“অরণ্য তিমিরঘন মনোহর পথ।

তবু যেতে হবে মোর করেছি শপথ—

নিহ্রা নামিবার আগে। অনেক যোজন বহুদূর পথ যাব করিয়াছি পণ।”*

খ্যাতি নিল্যা ভালমন্দ খেয়া পারাপার শেষ হল। নেমে এলো গাঢ় অন্ধকার সেই ষবনিকা যার আশ্রয় গুপ্তন কেহ কতু পারে নাই করিতে মোচন। তবু কেহ বলে মানি।

কেহ বাণীরব।

তিমির আবৃত দেশ অথবা উৎসব আলোকের রাজ্য আছে সেই মহাদেশে যে করে আড়াল সব আঁখির নিমেষে। আজ নাই রাজসভা কথাতর্ক আশা। আজ এলো পুরাতন বিমূঢ় জিজ্ঞাসা ওই ষবনিকা পাছে কি আছে

কে আছে!

দাঁড়ালাম সবে সেই অমোঘের কাছে। যারা ধরিয়ছে তুল মুক নতশির আজ নিবেদিত ছই বিলু অশ্রুণীর।

* প্রধানমন্ত্রীর *টেবিলে যে রবার্ট ফ্রষ্ট-এর লেখা কবিতাটি দেখা গিয়েছিল তার ভাবানুবাদ।

নেহরু উইল

পুষ্প দেবী

নেহরু উইলপাঠ হয়ে আজ লোকে বলাবলি করে অগাধ অর্থ করিবেন দান তিনি জনহিত তরে জোয়ানদেরই তো দেবেন যা কিছু কেহ করে অজ্ঞান লক্ষ মনের লক্ষ ধারণা কত দান? পরিমাণ। গুনিয়া ইচ্ছা হতবাক সবে বিষয় মানে সবে নিজের অস্থি ভস্মই সার কিছু না নিজের হবে এই সার কথা মনে রাখে বল কয়টি বা জ্ঞানীমন অর্থের তরে কত হানাহানি অকারণ আয়োজন জানি এই কথা বলেছেন তিনি “আমার ভস্ম সার ভারতের সব জনগণ তরে মোর শেষ উপহার আমার আত্মবিলুপ্তি যেন বহে ভারতেরে ঘিরে” না বলা কামনা আবার ফিরিতে মহামানবের তীরে

কাঁদিয়া সকলে কয়

তোমার অমর ভস্ম আশীষ সবে শিরোপরে লয় দধীচি দানিল আপন অস্থি বাঁচাতে পরের প্রাণ তুমি দিলে তব অমর শক্তি তোমার ভস্ম দান শুটলে ভস্ম তিলক আঁকিয়া নতন শক্তি লভি তব পদাঙ্ক ধরি জনমিবে কত শত শিশু রবি আবার স্বরূপরাক্ষীর কোলেতে জাগিবে নতন চাঁদ স্মিত হাসি হাসি পুন মতিলাল করিবে আশীর্বাদ কোন সে কমলা ছইবে দস্ত দিয়ে গলে পরমালা শিশু ইন্দুর বন্ধ ভরিয়া পূণ্য প্রদীপ জাগ। কোন জনগণ গাহিবে আবার নেহরু অমর রচে সেই ছবিনের আশাপথ চাহি আশ্বাসবাণী কহে।

“পত্রাবলী” ও “ছিন্নপত্র”

শ্রী প্রশান্তকুমার গঙ্গোপাধ্যায় এম-এ

১৫৫৫ খ্রীঃ অব্দের একটি চিঠি বাংলা গল্পের প্রাচীনতম প্রামাণিক স্বাক্ষর। পত্রের লেখক কুচবিহারের মহারাজ নরনারায়ণ। আহোমরাজ চুকাংফা স্বর্গদেবকে পত্রটি দেওয়া হয়েছিল।

একথানা প্রাপ্ত চিঠিকে যদি বাংলা গল্পের আদিসূত্রের প্রামাণিক নজর বলে ধরা হয়, তবে বলতে হয় পাঁচশো বছর পরেও বাংলা-গল্পের পত্র-সাহিত্য আকাজিক উন্নতিলাভ করেনি।

বাংলা গল্প-সাহিত্য সমৃদ্ধ হলেও পত্র সাহিত্যের অঙ্গটি একটি ব্যতিক্রম। ছিন্নপত্রের সঙ্গে বাংলায় লেখা অন্যান্য পত্র-সাহিত্যের তুলনা অপ্রাসঙ্গিক। ক্লাসিক সাহিত্যে এবং উনিশ-শতকী পত্র-সাহিত্যে পত্রের খোঁজ পাওয়া যায়। তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্র নিশ্চয়ই একজাতীয় নয়। তেমনি সমশ্রেণীর নয় বিবেকানন্দের ‘পত্রাবলী’। ‘ছিন্নপত্র’ কবি-জীবনের চাবিকাঠি। ‘পত্রাবলী’ স্বামিজীর জীবনদর্শনের খণ্ডাংশ মাত্র। সম্পূর্ণতার দিক থেকে ছিন্নপত্র গভীর, ‘পত্রাবলী’ সেখানে পদ্যপত্রে জলবিন্দু মাত্র।

‘ছিন্নপত্র’ কেবলমাত্র বাংলা গল্পে লেখা। মাঝে মধ্যে দু’একটা কবিতা, কিছু সংস্কৃত শ্লোক, কিংবা ইংরেজী উদ্ধৃত এতে স্থান পেয়েছে। ‘পত্রাবলী’ ইংরেজী, বাংলা, সংস্কৃত ও হিন্দী ভাষার সংমিশ্রণে পূর্ণ।

‘ছিন্নপত্র’ খণ্ডহীন একক। ‘পত্রাবলী’র পাঁচটি খণ্ড। রবীন্দ্রনাথের চিঠির সংকলনে কি আছে? বাংলা দেশের মাটিতে বসে ভাবের কথা, প্রেরণার বাণী, মাহুঘের স্নেহ-ছুংথের ইতিবৃত্ত টুকরো টুকরো মেঘের মত কবিচিত্তে উদ্ভাসিত হয়েছে। সেই খণ্ডগুলো পরিণত জীবনে পরিণত হয় হয়েছিল। ‘পত্রাবলী’র চিঠিগুলি শুধু বাংলায় বসে লেখা নয়। বাংলা দেশ, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ, আমেরিকা ও ইংলণ্ড থেকে সেগুলো লেখা।

রবীন্দ্রনাথ চলিষ্-জীবনের ছবি এঁকেছেন পদ্মার মহাপীঠে বসে। বিবেকানন্দের সাইক্লোনিক-চিত্ত দেশ হতে দেশান্তরে ছুটেছে অথচ দেশের কথা ভোলেন নি। দেশের বাইরে থেকেও দেশ ও জাতির কথা স্বামীজিকে কতটা আচ্ছন্ন রেখেছিল ‘পত্রাবলী’ তার প্রমাণ।

‘পত্রাবলী’র সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য কতটা তা বিচার সাপেক্ষ। বিচার করলে দেখা যাবে বেশ কিছু সংখ্যক চিঠি সাহিত্য-গুণ-স্বাদ। এসব চিঠিতে অন্তরাবেগ এবং জীবন প্রতিতির পরিচয় রয়েছে। ‘ছিন্নপত্র’ ও ‘পত্রাবলী’র লেখক আসলে একই পথের পথিক। উপায়টি কিন্তু স্বতন্ত্র। ‘ছিন্নপত্রের’ চিঠিগুলি একাধিক ব্যক্তিকে লেখা হলেও স্বামিজীর ‘পত্রাবলী’র মত বহুজনকে ও ভিন্ন প্রদেশবাসিকে লেখা নয়। নয় বলেই ‘ছিন্নপত্রের’ মূল্যায়ন করতে হবে ভিন্ন রীতিতে। ওর গুরুত্বও পৃথক। রবীন্দ্র সাহিত্যের যে লোহার মিন্দুক, তার কলকাটি ওই ছিন্নপত্র। ‘পত্রাবলী’ সেদিক থেকে বাংলা গল্প সাহিত্যে তথা স্বামিজীর রচিত সাহিত্যের পক্ষে অবশ্য গ্রন্থ নয়।

রবীন্দ্রনাথ ও নরেন্দ্রনাথ উনিশ শতকের সার্থক প্রতি-নিধি। বন্ধিম ভাবনার ছন্দেই উৎকৃষ্ট। কিন্তু চিন্তা, জীবনচরণ এবং সৃষ্টির দিক থেকে দুই ভারত-পথিক চলেছেন দুই সরল রেখায়। একজন সাহিত্যের তপোবনে যাজ্ঞবল্ক, অজ্ঞান মাহুঘ গড়ার কাজে বিশ্বকর্মা।

রবীন্দ্রনাথের মানবপ্রেম কাব্য ও গল্প সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় সমুৎসারিত। ‘মা আমার মাহুঘ কর’ এই মন্ত্রের যিনি উদ্গাতা, তিনি কর্মযোগী, তিনিই স্বামী বিবেকানন্দ।

‘ছিন্নপত্র’-ন শুধু বাংলা চিঠিতে। ‘পত্রাবলী’র প্রথম চিঠিটি ইংরেজী। অবশ্য বাংলায় অহুনিত হয়ে বিধৃত হয়েছে ‘পত্রাবলী’তে। প্রথম খণ্ডের ছয় সংখ্যক পত্রটি নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। সম্ভবতঃ অহুবাধের সময় সাধু-

ভাষার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। এ ভাষার সাহায্য নেওয়ার একটা কারণ অতুমান করা যেতে পারে। স্বামিজীর চলিত ভাষার যে প্রবহমানতা ও বজ্র-নির্ঘোষ হয়তো অনুবাদে তা রক্ষিত হতো না—তাই।

চিঠির কথা মনের কথা। সাহিত্যে তার স্থান হওয়ার পক্ষে যুক্তি বাই থাকুক, জীবনচরিতের পক্ষে তার অপরিহার্যতা অস্বীকার করা যায় না। চিঠি লেখবার সময় হেবে ও মেপে তো লেখা হয় না। সে কারণে চিঠির শিল্পসম্ভাবনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু জীবনে যারা শিল্পী, লেখার সময়ও সেই শিল্পী-সত্তা পরিচয় রাখে। এ কারণেই বিবেকানন্দের চিঠিগুলি শিল্পগুণোপেত। ১২ সংখ্যক পত্রটির কিছুটা অংশ দেখা যাক। : “তিনখানা মাটির চিবি ও খানকতক কাঠ লইয়া এ দেশের রাঁধুনি যে স্বাস্থ্য অন্ন-বাঞ্ছন প্রস্তুত করে, তাহা আর কোথাও নাই। একটা মাছাতার আমলের একটাকা দামের তাঁত ও একটা গর্তের ভিতর পা, এই সরঞ্জামে ২০ টাকা গজের কিংখাব কেবল এদেশেই হওয়া সম্ভব। একখানা ছেঁড়া মাজুর, একটা মাটির প্রদীপ, তায় রেড়ির তেল, এই উপাদান সহায়ে দিগ্গজ পণ্ডিত এ দেশেই হয়। খেঁচা-বোঁচা জীর উপর সর্দসহিষ্ণু মাজুর ও নিগুণ মহাহুঁপতির উপর আজন্ম ভক্তি এদেশেই হয়।” এ পত্রে শিল্প-চেতনা, গৃহ-বন্ধন; পতি-পত্নী-প্রেম ও পাণ্ডিত্যের ইতিহাস ব্যক্ত হয়েছে। এই জাতি-প্রীতি ‘ছিন্নপত্র’ও আছে। সে প্রকাশ-রীতি স্বতন্ত্র। আলোচ্য চিঠিতে সাধু ভাষার সঙ্গে দ্রুতচালের মুখের কথার সুন্দর মেল-মেশা দেখা যাচ্ছে। ঠিক এমনটিই স্বামিজীর সহাধ্যায়ী উপাধ্যায় ব্রজবান্ধবের কলমে প্রকাশ হতো। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামও এই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

দ্বিতীয় ভাগের দুইসংখ্যক পত্রটি বাংলা গল্পসাহিত্যে অভিনব। “ভায়া, সব যায়, ওই পোড়া হিংসেটা যায় না।...আমাদের জাতের ঐটে দোষ, খালি পরনিন্দা, আর পরশ্রীকাতরতা। হুম্বড়া, আর কেউ বড় হবে না।” এটি চলিত ভাষার। আধুনিক চলিত রীতির যে খাপছাড়া শ্রীকীন, ছন্দশূন্য ছাঁদ, এতে তা নেই। এতে পাণ্ডিত্যের গাভীর্ষ্য অনুপস্থিত। সমব্যবী সমালোচক মুক্তকণ্ঠে জাতির দৈন্ত প্রকাশ করেছেন। এ দৈন্ত প্রকাশে ফুটে উঠেছে

গভীর বেদনা। সেই বেদনা সবেও জাতীয় দুর্দশতাকে অকপটে স্বীকার করেছেন। আত্মগর্স বা জাতিপ্রীতির অঙ্কতা নেই। অথচ, ‘ছেঁড়া-মাজুর’ ‘মাটির সেজের’ মধ্যে জাতির প্রাণ যে সজীব হয়ে আছে সন্দেহের সন্ধে তা স্বীকার করেছেন। আত্মগৌরবে আনন্দ ও নৈকট্যবোধের গভীরতার ছাপ রয়েছে, কিন্তু আত্মদস্তের স্পর্ধাটি নেই বললেই হয়। সমালোচনায় যে পরিমিত বোধ ও স্পষ্টতার প্রয়োজন এ চিঠি তারই নজীর। পাণ্ডিত্য ও পরিহাসের গলাগলি দেখুন। “কি পবিত্র, স্বাধীন, স্বাপেক্ষ, আর দয়াবতী—মেয়েরাই এ দেশের সব। বিত্তে-বুদ্ধি সব তাদের ভেতর। যা স্ত্রী: স্বয়ং স্কৃত্তীনাং ভবনেষু (যিনি পুণ্যবানদের স্বয়ং লক্ষ্মী স্বরূপিণী)।...হরে, হরে, এদের মেয়েদের দেখে আমার আকুল গুডুম, স্বঃ শ্রীস্বামীশ্বরীস্বঃ স্বী: ইত্যাদি (তুমি লক্ষ্মী, তুমিই ঈশ্বরী, তুমিই লক্ষ্মী-স্বরূপিণী)। চলিত বাংলার সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার মিলনে চিঠিও যে সাহিত্য-ধর্মী হতে পারে এ-চিঠি সেই নমুনা। ইংরেজীর সঙ্গে চলিত বাংলার মিশ্রণে যে পত্র দেখা যাক সেই নমুনাটি। “দাদা, ওই সব দেখে—বিশেষ দারিত্র্য আর অবজ্ঞা দেখে আমার ঘুম হয় না, একটা বুদ্ধি ঠাওরা-লাম—Cape-comorin (কুমারীকা অন্তরীপে) মা-কুমারীর মন্দিরে বসে—ভারতবর্ষের শেষ পাথর টুকরার উপর বসে—এই যে আমরা এতজন মল্লাসী আছি, ঘুরে বেড়াচ্ছি। লোককে metaphysics (দর্শন) শিখা দিচ্ছি, এ সব পাগলামি। খালিপেটে ধর্ম হয় না। গুরুদেব বলতেন না?” পত্রটিতে ইংরেজী বাংলার সহাবস্থান লক্ষণীয়। পত্র সাহিত্যের এই রীতিকে ‘বিবেকানন্দী ছাঁদ বলে আখ্যা দিতে দোষ কি? এই জাতীয় লেখা উপাধ্যায় ব্রজবান্ধবের পরে সম্ভবতঃ বাংলা সাহিত্যে অনু-হৃত আছে। আর একটি উদ্ধৃতি। “তোমরা হয় ত মনে করিতে পার, কি utopian nonsense (অদৃষ্টব বাস্তব কথা)!...কিন্তু গুরুদেব will show me the wayout (আমাকে পথ দেখাইবেন) ইতি। jealousy তাগ করে এককাটা হয়ে থাকতে পারে না, ঐটে আমাদের জাতীয় দোষ, national sin (জাতীয় পাপ)!!! “জাতির দোষ কখনোনাটায় স্বামিজী দ্বিধাহীন ভাবে তা প্রকাশ করেছেন। চার সংখ্যক পত্রও এই শ্রেণীর।

“ঠাকুর-ঘর মন্দ নয়, তবে ঐটা all in all (সর্বস্ব) করে সেই পুরোণ ফ্যানসানের nonsense (বাজে ব্যাপার) করে ফেলবার একটা tendency (কোঁক) আছে, আমার তাই ভয়।” এসব চিঠিতে ‘সংবার একাদশী’র নিমিষ্টদের ইংরেজী বাংলার মেশান সংলাপের কথা মনে পড়ে নাকি?

‘পত্রাবলীর’ সব চিঠিই এক ভাষায় রচিত নয়। কোথাও গুরুটা সাধু, গান্ধীর্ষ্যে কিন্তু ভেতরটা চলিতের লঘু-সরল চালে। দ্বিতীয় খণ্ডের পাঁচ সংখ্যক পত্রটি লক্ষ্য করুন। “তোমাদের পত্র পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হইলাম। ম—লীলা গুনিয়া বড়ই দুঃখিত।” এরপর আরম্ভ চলিতে গুরু-মায়া বিত্তে করতে গেলে ঐ রকম হয়।” আবার সাধু “আমার অপরাধ বড় নাই।” পুনরায় চলিত: “সে দশবৎসর আগে এখানে এসেছিল, বড় খাতির ও বড় সম্মান; এবার আমার পোহাবাণী।” সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতও রয়েছে: “যাক্ উপেক্ষিতব্যং তদ্বচনং ভবৎসদৃশানাং মহাত্মনাম্।” ইংরেজীও রয়েছে। পক্ষী উঠছে—উঠছে ধীরে ধীরে, slow but sure jealousy selfishness (ঈর্ষ্যা, স্বার্থপরতা) আদর্শে থাকবে না—তবে leader প্রথম by birth (জন্মের দ্বারা), দ্বিতীয় unselfishness (নিঃস্বার্থ), তবে ‘leader’সব ঠিক হচ্ছে, সব ঠিক আসবে, তিনি জাল ফেলছেন,—বয়সস্থ-সরাস:। প্রীতি: পরমসাধনম্ (১) বুঝলেই কিনা? love conquers in the long run (২), দিক হলে চলবে না—wait, wait (অপেক্ষা কর. অপেক্ষা কর) সবুরে যেওয়া ফলবেই।” এসব পত্র সাধু-চলিত-বাংলা, ইংরেজী ও সংস্কৃত—চতুর্বেগীর সৃষ্টি করেছে।

সাহিত্যের স্নীলতা নিয়ে ধারা ব্যস্ত, স্বামিজীর কতকগুলি পত্র তাঁদের ধারণার স্নীল বল হয়তো গণ্য হবে। স্বামিজীর মত প্রাচ্য-বিদ্বৎ কেমন অনায়াসে বললেন: “কীটগুলো—এক পা নড়বার ক্ষমতা নাই—মাগের আঁচল ধরে তাস খেলে গুঁড়ুক ফুঁকে জীবন যাপন করে, আর যদি কেউ ঐ গুলোর মধ্যে এক পা এগোয়, সবগুলো কেঁউ কেঁউ করে তার পিছু লাগে—হরে হরে।” জাতীয় চরিত্রের অলসকাতর ব্যর্থ জীবনের ছবি এঁকেছেন অনবদ্য অকপটতায়। এ চিঠি আশ্বাদ-

ঘাটনের সত্যস্বরূপ। কোন কোন পত্রে হিন্দী-মিশ্রিত বাগ্-বৈদগ্ধ্য রয়েছে। যেমন, “মাকনা ভালো না বাপ্ সে যব্ রঘুবীর রাখে টেক। রঘুবীর টেক রাখবেন দাদা—সে বিষয়ে তোমরা নিশ্চিত থেক। * * ঐ সকল দেশে তাঁকে ছড়াতে হবে—রাজপুতনায় যেখানে রঘুকুল রীতি সদ্ধা চলি আ-ই। প্রাণ যা-ই বন্ধবচন ন যা-ই।” এতে গিরিশচন্দ্রের পঞ্চরঙ্গ মার্ক। রসিকতা নেই। স্নীলতার পরিমিত বোধ এবং জাতীয় চরিত্রের লঘুত্বকে উল্লেখ্যকিত করা হয়েছে। “ঐ বিশ্বের গুঁতোয় বড় লোক তৈরী হয়ে যায়। * * মিশনরি ফিসনরির কি কর্ম এ ধাক্কা সামলায়? * * * মোগল পাঠান হৃদ হল, এখন কি তাঁতির ফার্সি পড়া? ও সব চলবে না, ভায়া কিছু চিন্তা করো না। * * * চারিজনই যুবতী—বেধা করেনি। বে-হওয়া এ দেশে বড়ই হাস্যাম। প্রথম মনের মত বর চাই। দ্বিতীয় পরস্যা চাই। ছোড়া বেটারা ইয়ারকি দিতে বড়ই মজবুত—ধরা দেবার বেলা পগার পার। ছুঁড়ীরা নেচে কুঁড়ে একটা স্বামী ঘোগাড় করবার চেষ্টা করে, ছোড়া বেটারা ফাদে পা দিতে বড়ই নারাজ। এই রকম করতে-করতে একটা ‘লাভ’ হয়ে পড়ে—তখন সাদি হয়।” এসবকে অস্নীল বলে যারা তুচ্ছ করবেন, তারা স্বামিজীর সব কিছুতেই বর্ণাশ্রম বিরোধিতার খোঁটা দেন। এ পত্রের ভাষা শিল্পীর নয় বলবো কেমন করে? এমনকি এ ভাষাকে সন্ন্যাসীরও বলবো না। মানবিক সহৃদয়তায় কোমলতায় এ চিঠির ভাষা ও ভাব পরিপূর্ণ। ঐ ভাষা ও ভাবের বহিষ্কৃতিটা দেখুন। “কৃষ্ণিহীন সায়াল ঠিক আমাদের কর্তা জজ। বল রোগ নেই—বস, ভাল হয়ে গেল, আর বল “সোহহং” রস্—ছুটি। * * এদের মেয়ে দেখে আমার আঁকল গুড়ুম বাবা! আমাকে বাচ্ছাটার মত ঘাটে-মাঠে দোকান হাটে নিয়ে যায়। * * * তোদের পুরুষগুলো এদের মেয়েদের কাছে ঘেঁসবার ঘৃণা নয়—তোদের মেয়েদের কথাই বা কি? হরে, হরে, আরে বাবা কি মহাপাপী! ১০ বৎসরের মেয়ের বে দেয়। হে প্রভু, হে প্রভু! কিমধিকমিতি।” এই পত্রে ‘সাবনী-মিশাল’ ভাষা যেমন ‘সাদি’; বাচ্ছা (পূর্বস্নায়ী) এবং গ্রাম্য ভাষা ‘বে’ প্রভৃতির অপূর্ণ মিলন আত্মজিক্তই হয়েছে। একাধিক ভাষার সংমিশ্রণের ঐচ্ছিক্য কি অনৌচ্ছিক্য আলং-

কারিকেরা তা নিয়ে তর্ক করেন। কিন্তু স্বামিজীর হাতে একাধিক ভাষার মিলন যে ভাবৈবশ্ব্য পূর্ণ হয়েছে তাতে দ্বিমত থাকবে না।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে স্বামিজীর প্রভেদ অনেক। কিন্তু দু'জনেই মানবপ্রেমিক। রবীন্দ্রনাথ শিল্পী ও কবি। স্বামিজী ধ্যানী ও তপস্বী। রবীন্দ্রনাথ শিল্পীর কলা-নৈপুণ্যে দ্বিতীয় রহিত। স্বামিজী মনের কথা অকপটে প্রকাশ করায় সবাসাচী। চিঠিগুলো পাঠ করলে মনে হয় যেন চোখের সামনে জীবন্ত চিত্র ও শিল্পীকে দেখছি।

তাই বলা যেতে পারে, 'পত্রাবলী' বাংলা গল্পে স্বকীয় রীতিতে ভাষ্যর। প্রথম চৌধুরীর গল্প-ভাষায় বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য যতটা, সহজ সাবলীল ও তরতরে প্রকাশ যেন ততোটাই স্তিমিত। স্বামিজীর চিঠিতে উপদেশ প্রাধান্য পায়নি।

'ছিন্নপত্রের' হাসি সাহিত্যের সত্যম্-শিবম্-সুন্দরমের হাসি। এতে শিল্পীর তুলির সূক্ষ্ম টান আছে। 'পত্রাবলী'র হাসি অস্ত্র জাতের। পাশ্চাত্য ভোগাভুসরণ ও মোহাফতার যে জাতি তমসাবৃত, ধর্মের তথাকথিত সংস্কার প্রচ্ছন্নতায় যে জাতি অনড়, স্বামিজী খোঁচা দিয়ে তাকে ঝুজ করতে

চেয়েছেন। একজনের দৃষ্টি সাহিত্যের স্বরসভায়। অস্ত্রের লক্ষ্য জাতীয় চরিত্রের অধঃপতিত দিকে প্রসন্ন উদারভায় পরিপূর্ণ।

আধুনিককালে রাজনৈতিক পত্রাবলীর সংখ্যা ও মূল্য উল্লেখযোগ্য। সাহিত্যের রাজ্যে এসব চিঠি স্বীকৃত না হলেও অনাদৃত হবে না। 'ছিন্নপত্র' ও 'পত্রাবলী'তে মাঝে মাঝে রাজনীতির কথা যে নেই এমন নয়। কিন্তু ওটাই প্রাধান্য বিস্তার করেনি।

রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের প্রভেদ সত্ত্বেও ঐক্য যে একবারেই নেই এমন নয়। 'পত্রাবলী'র তৃতীয় খণ্ডের সঙ্গে ছিন্নপত্রের একটা জাতিগত সম্বন্ধ রয়েছে। 'ছিন্নপত্রে' বুদ্ধিবাদ ও জ্ঞানকাণ্ড নিয়ে ছোট ছোট আলোচনা আছে। তৃতীয় খণ্ড 'পত্রাবলী'তে এই বিষয়ের আলোচনা দেখা যায়।

বিবেকানন্দ পত্রের মধ্যে যা রেখে গেছেন, তা সাময়িক কালসীমায় সীমিত। সে বর্ণনা প্রকাশের ঐচ্ছিক্যে শিল্পের স্বরসভায় কি অ-গৃহীত হয়ে থাকবে? জীবনুজ্জ্বল্যে অভয়বাণী কি সাহিত্যে অস্বীকৃত থাকতে পারে?

নিকরদ্বিগ্ন কবিকণ্ঠ

হরি ভৌমিক

নিকরদ্বিগ্ন কবিকণ্ঠ ইন্দ্রানীঃ একান্ত অভাব
উৎপাত ইচ্ছারা ঢেউ গোণে অবসন্ন সুখে।
লবণ সাগরে প্রবাল কীটের হয়না প্রাচুর্য্যাব
বলিনা তাই সোনালী খোঁপা রাখব আমার বৃকে।

মা বহুচ্ছরা বিধা হও—সীতার পাতাল প্রবেশ;
নতুন ক'রে আবার বাস্তবিকের স্তম্ভ তপোবনে
আগুনে না কত দীপ্ত দিনের রাঘব পরমেশ।
বিখাল কর আজকে আর কত্মা মিলেনা কর্ণে।

নারিকেলবনে চন্দ্র সূর্য গ্রহণে গ্রহণে কালো
মুক্তিকার বৃকে মারুতাসনের হিংস্র অভিযান।
জোনাকির দেহগুলি যেন গোবি সাহারার আলো,
সমবেত মধুকরকণ্ঠে শোন সাইরেন গান।

ইতস্তত উদ্বেগনে মৃত্যুরা দেয় হাতছানি
কানাগলির শব্দহীন রাতে—গলিত গর্ভশ্রাব
কবির মন করেছে কেবল বিযাক্ত ফুলদানী।
প'রনা প'রনা তুলে রাখ আজ স্বপ্নের কিংখাব।

দ্বাদশ



শ্রীরাধাস্তব

ভৈরবী ভৈরোঁ—ত্রি-তাল

শ্রীদিলীপকুমার রায়

সঁ সঁ । পাঁ দা পা দা । পমা পা মগা মা । সা ঋ গা মা । পা -
 এ সো ল - ঋ ম য়ী - প্রা ণ ম ন্ দি রে মা -
 অ মি জা - নি না মন্ - ত্র কি বা - গী গো মা -
 মা গা । মা দা পা দা । পমা পা মগা মা । সা গা গা দা । পা -
 এ সো ক ব্ ণ ম য়ী - ক পা ম ন্ জী রে মা -
 অ হু ক ম্ পা তে মা ব্ ত ধু মা - নি গো মা -
 মা মা । সা ঋ মা গা । মা - পা মগা । মা পা ঋ ঋ । সঁ -
 অ মি ম্মা - ন অ কি ন্ চ ন চা - হি তো মা ব্
 ত ব্ জা - জো হি রা - কে ন হ য় মা তা রা -
 সঁ সঁ । ঋ - ঋ ঋ । সঁ জঁ জঁ জঁ । সঁ মা জঁ ঋ । সঁ -
 ব য় ণে - মা অ হৈ - তু কী ত ক্ তি অ পা ব্
 ক ণ অ - লে যা উ চ্ ছু সে ল - কা হা রা -

সাঁ সাঁ । সাঁ মাঁ মাঁ পঁমাঁ । জঁরাঁ রঁরাঁ জঁরাঁ মাঁ । সাঁ জঁরাঁ জঁরাঁ ঝাঁ । সাঁ -
ডা কি অ - ঞ জ লে - চ র ণে র তী রে মা -

এসো লক্ষ্মীময়ী, প্রাণমন্দিরে মা !

আমি জানি না ময় কি বাণী গো মা !

এসো কৃষ্ণময়ী, কৃপামঞ্জীরে মা !

অহুকাপ্য তোমার শুধু মানি রমা !

আমি স্নান, অকিঞ্চন—চাহি তোমার

তবু আজো হিয়া কেন হয় মা তারা,

চরণে মা অহৈতুকী ভক্তি অপার ।

কণ-আলোয়া-উচ্ছ্বাসে লক্ষ্যহারা ?

ডাকি অশ্রুজলে চরণের তীরে মা ॥

ডাকি অশ্রুজলে চরণের তীরে মা ॥

যত বাসনা মোহ মা, দূর করো ।

দেখ যায় মা বেলা, ভাঙে রক্তমেলা !

এসো প্রেমলা, ক্ষেম-প্রদীপ ধরো ।

হ'ল ক্রান্ত দিনের শেষে সাক্ষ থেলা

আমি প্রার্থনাকুল তুলি' নিত্য আনি

এসো দাঁও মা শরণদিশা পায়ৈ টানি'

পায়ৈ অঞ্জলিতে তব রাধারাগী !

বেসে ভালো মিটাও তৃষা রাধারাগী !

ডাকি অশ্রুজলে চরণের তীরে মা ॥

ডাকি অশ্রুজলে চরণের তীরে মা ॥

সা সা । না সা ঝা ঝা । সা ঝা গা গা । সা ঝা মা মা । মা -
য ত বা - স না মো - হ মা দূ - র ক রো -
দে খ বা য় মা বে লা - ভা ডে র ং গ মে লা -

মা মা । গা মা পা পা । মা পা দা দা । পা দা সাঁ সাঁ । সাঁ -
এ সো প্রে - ম লা কে - ম প্র দী - প ধ রো -
হো সো ক্রা ন্ ত দি নে ব্ শে বে সা ং গ থে লা -

সাঁ সাঁ । সা ঝা গা মা । পা দা গা সাঁ । মা গা গা দা । পা -
আ মি প্রা ব্ ধ না ক্ ল্ তু লি নি - তা আ নি -
এ সো দা ও মা শ র ণ্ দি শা পা - য়ে টা নি -

পা প্যা । মগা মা পা দা গা সাঁ ঝাঁ জঁরাঁ । পা জঁরাঁ জঁরাঁ ঝাঁ । সাঁ -
পা য়ে অন্ - জ লি তে - ত ব রা - ধা রা গী -
বে সে ভা - লো কি টা ও তৃ যা রা - ধা রা গী -

বাংলা লঘুগুরু ছন্দে সংস্কৃত ছন্দের রীতি অনুসারে গুরুস্বর (আ ঙ্গি উ এ ও) দু-মাত্রা ও অ ই উ একমাত্রা ।
ঐ ঔ বাংলা মাত্রাবৃত্ত ছন্দেও দু-মাত্রা লঘুগুরুতেও । মিশ্র লঘুগুরু ছন্দে গুরুস্বর বিকল্পে একমাত্রা হয় এই
তফাৎ । এ-গানটি ভোটক ছন্দে রচিত অর্থাৎ প্রতি পর্বের প্রথম দুইটি মুক্তদল (open syllable) লঘু—
একমাত্রা, তৃতীয়টি রুদ্ধদল বা গুরুস্বর—দু-মাত্রা । বাকি সব দল মাত্রাবৃত্ত ছন্দের নিয়মে নিয়মিত, অর্থাৎ
মুক্তদল একমাত্রা, রুদ্ধদল দু-মাত্রা । শ্রীপ্রবোধ সেনের পরিভাষাই আমি গ্রহণ করেছি দল মুক্তদল ও রুদ্ধদল এ
তিনটি নামে । কোনো কোনো বৈষ্ণব শ্রীরাধাকে “মা” বলার আপত্তি করেন । আমার মনে হয় এ-আপত্তি
অসঙ্গত । ইতি । গীতিকার, স্বরকার ও অবলিপিকার—শ্রীদিলীপকুমার রায় ।

• ভোটক : প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরু
 এসে লক্ষ্মী ময়ী প্রাণ মন্দিরে মা

রোমান্টিক যুগ ও ওয়ার্ডসওয়ার্থ

অরুণ দে

সাহিত্যের ধারায় যখন নতুন জোয়ার আসে—তাব ও ভাবনায় যখন একটা নতুন স্পন্দন অনুভূত হয় তখন সেই নবীন গতিবেগকে আমরা একটা নতুন নামে অভিহিত করি। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত ইংরাজী সাহিত্যে ভাবে, ভাষায়, ছন্দে ও কল্পনাবিলাসে সৃষ্টির যে নবপ্রাবন এসেছিল তাকেই রোমান্টিক যুগ নামে আখ্যাত করা হয়। এই যুগ বস্তু তত্ত্ব থেকে আত্মতত্ত্বময়তার, বাহ্যিকতা থেকে আন্তরিকতার এবং গোষ্ঠী-চেতনা থেকে আত্ম-কেন্দ্রিকতার পথে অভিসারের যুগ। কবিমানসের অনিদেস্ত ব্যাকুলতা, বিষ্ময় ও রহস্যবোধ, প্রাণময় সত্তার উদাত্ত প্রকাশ প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য এই যুগের গীতিকবিতায় অজস্র ধারায় উৎসারিত হয়েছে। সৌন্দর্যপিপাসায় ব্যাকুল কবিগণ এ যুগে নতুন করে প্রকৃতির সঙ্গে অন্তরের মালাবলল করেছেন। তাঁরা জড়ে ও চেতনে একাত্মতা অনুভব করেছেন, রূপের মধ্যে দেখেছেন রূপাতীতকে এবং সামান্তের মধ্যে পেয়েছেন অসামান্তের জ্যোতস্বী। তাঁরা উপলব্ধি করেছেন যে এই ভগতের যা-কিছু আপাত বিচ্ছিন্ন ও খণ্ডিত বলে মনে হয় প্রকৃতপক্ষে তা এক অংশ ও ত্যাগপূর্ণ-স্বত্রে গ্রথিত এবং বিশ্ব-সুখময় অঙ্গভূত। এই যুগে ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলী, কীটস্, ব্যরণ প্রভৃতি যে সব কবিগণ সাহিত্যের ক্ষেত্রে আবির্ভূত হোঁছিলেন তাঁরা অজ্ঞ ও কালশ্রোতে হারিয়ে যান নি।

রোমান্টিক যুগের কাব্যে যে বিজ্ঞোহ ও মুক্তি পিপাসা ধ্বনিত হয়েছিল তার মধ্যে আমরা করাসী বিপ্লবের প্রতিধ্বনি শুনে পাই। ফরাসীবিপ্লবের সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী এই যুগের কবিগণের প্রাণে নবপ্রেরণা সঞ্চার করেছিল।

তাছাড়া রোমান্টিক যুগের কাব্যে জার্মান ভাবধারার

প্রভাবের কথাও অস্বীকার করা যায় না। মাল্লারের মনই যে সমস্ত ভাব ও ভাবনার প্রধান উৎস এবং প্রকৃতি, মানব ও জীবনভা যে এক পরম সত্তারই বিভিন্ন বিকাশ—জার্মান ভাববাদীদের এই দার্শনিক চিন্তা রোমান্টিক যুগের কাব্যে ছায়াপাত করেছে।

বাংলা সাহিত্যে রোমান্টিক কাব্যে যে বিরাট সমৃদ্ধি তার পেছনে একদিকে যেমন রয়েছে পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাব অন্যদিকে তেমনই লক্ষ্য করা যায় যে বৈক্যব কাব্য-ধারা থেকে রোমান্টিক কবিমানসের একটি কল্পধারা বিহারীলালের আবির্ভাবের বহু আগেই প্রবাহিত হচ্ছিল। ইংরাজী সাহিত্যেও সেই রকম রোমান্টিক যুগের অভ্যুদয়ের পেছনে বৈদেশিক প্রভাব থাকলেও রোমান্টিক কবিমানসের বীজ পূর্বতন সাহিত্যধারায় নিহিত ছিল। একটু অভিনিবেশের সঙ্গে লক্ষ্য করলেই ইংরাজী সাহিত্যের মধ্যযুগের সঙ্গে রোমান্টিক যুগের যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। মধ্যযুগে অতি প্রাকৃতিকের প্রতি যে সহজ-সংস্কার ও আকর্ষণ ছিল তাই কোলরিজ ও কীটসের হাতে কল্পনার মায়াজন স্পর্শে নবরূপলাভ করেছে। মধ্যযুগের সাহিত্যে দেখেছি অধ্যাত্ম চেতনার প্রাধান্য, পেয়েছি যুক্তির শৃঙ্খলে থেকে মুক্তিপ্রিয়সী উদাত্ত কল্পনার লীলাচাপল্য। তাই যদি বলি রোমান্টিক যুগের কবিকল্পনা, অধ্যাত্মবোধ ও অতি-প্রাকৃতিকের প্রতি আকর্ষণ মধ্যযুগের সাহিত্যেরই সূহৃৎ পরিণতি তবে ভুল হবে কি?

রোমান্টিক যুগের কাব্যে যে বিষ্ময়বোধ ও নিসর্গপ্ৰীতি রয়েছে অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্ত্যেই সেই অনুভূতির পদধ্বনি আমরা শুনে পাই। গতানুগতিক রচনারীতির মধ্যে একটা নতুন ভাবের অহরনয়ন অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি টমসনের 'Seasons' কবিতার সংকলিত হয়েছিল। এই কবিতায় বিভিন্ন ঋতুর আবর্তনে প্রকৃতির যে বিচিত্র লীলা

প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে রোমান্টিক যুগের কবিদের নিসর্গপ্রীতির পূর্বাভাস পাওয়া যায়। যদি বলি, জল ডায়ার, টমসন, কাউপার প্রভৃতি কবির নিসর্গ চেতনাই রোমান্টিক যুগে ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রমুখ কবিদের মধ্যে ক্রম-পরিণতি লাভ করেছিল তবে বোধহয় অসত্য হবে না।

দুই কবিবন্ধু, ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও কোলরিজের মিলিত প্রচেষ্টায় ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে Lyrical Ballads নামে কবিতা সংকলন প্রকাশিত হয়। এই বইটির প্রকাশকাল থেকে ১৮৩০ খৃঃ পর্যন্ত রোমান্টিক যুগ বলে ধরা হয়। Lyrical Ballads এর কবিতাগুলির নতুনত্ব একটি নতুন যুগ নির্দেশ করে। এর কবিতাগুলি মূলতঃ কবিদের ব্যক্তিগত অম্লভূতি থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। কবি আন্তরিক ও তীব্রভাবে যা-কিছু অম্লভব করেছেন তাকেই ছন্দে গ্রথিত করেছেন।

বাংলা সাহিত্যে বিহারীলালের কবিতা যেখন একটা নতুন যুগের সূচনা করেছিল ইংরাজী সাহিত্যে Lyrical Ballads তেমনই রোমান্টিক যুগের প্রবর্তক। এই কারণে রোমান্টিক যুগের উদ্গাতা হিসাবে বিহারীলাল ও Lyrical Ballads এর অন্ততম কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের তুলনা করা চলে। স্বদেশের ও বিদেশের এই দুই কবির মধ্যে সেদিন যে যুগ-নির্দেশক বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছিল তা হল আত্মতাবের উদ্বোধন বা ‘awakening of the self’; অবশ্য, রোমান্টিক যুগের প্রবর্তনায় ইংরাজী সাহিত্যে ওয়ার্ডসওয়ার্থের যে গুরুত্ব বাংলা সাহিত্যে বিহারীলালের গুরুত্ব ততটা নয়। তবু একথা অস্বীকার করা যায় না যে এই দুই কবিই নব্যযুগের প্রবর্তনে গীতি কবিতার ভাষা ও স্বরূপ নির্ণয়ে নতুন আদর্শের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রোমান্টিক কবিশ্রেষ্ঠার মধ্যে ওয়ার্ডসওয়ার্থই প্রাচীনতম এবং রোমান্টিক কবিমানসের প্রধান ধারক। প্রকৃতির ও মানবজীবনের বিভিন্ন প্রকাশের মধ্যে তিনি অম্লভব করেছেন অপারিষ সৌন্দর্য। তিনি বাস্তবজীবনের মধ্যে ভাবলোকের প্রদীপ জালিয়া সৌন্দর্যের অম্লসন্ধান করেছেন। তিনি যে কেবল ভাবকে অলংকার-শূন্য থেকে মুক্তি দিয়েছেন তাই নয়, ক্লাসিকাল যুগের হির ও সংহত গঠন কোশলের পরিবর্তে কাব্যলব্ধকে সাক্ষিয়েছেন নতুন আভরণে। তাঁর কবিতায় আমরা পাই অম্লভূতির

তীব্রতা ও গভীরত্ব, রূপ-রস-স্পর্শের প্রকৃতির আবেদনে আকৃত চিত্তবৃত্তি, সৌন্দর্যসিঁপাসা এবং মানবসত্তা, প্রকৃতি-সত্তা এবং পরমসত্তার ভাবগত একাধোপ।

বিষয়বস্তুর দিক থেকেও কবির পটপরিবর্তন কম লক্ষণীয় নয়। ক্লাসিক্যাল কাব্যের বিষয়বস্তু হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন প্রধানতঃ পৌরাণিক দেবদেবী, অভিজাত সম্প্রদায়, ঐতিহাসিক ব্যক্তি প্রভৃতি। ওয়ার্ডসওয়ার্থ কিছু বিপরীত দিকে এগিয়ে গেলেন। কোন বিখ্যাত বা অসাধারণ ব্যক্তি বা বস্তু তাঁর কাব্যে প্রাধান্য পেল না। প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে যারা নগ্ন, যারা অবজ্ঞাত এবং ইতিহাস যাদের কোন দিনই মনে রাখবে না তিনি তাদেরই তাঁর কাব্যের অগ্নিনায় প্রধান স্থান নিলেন। আপাত-দৃষ্টিতে যা নিতান্ত নগ্ন তারই মধ্যে তিনি খুঁজে পেলেন অসাধারণত্ব, রহস্যময়তা ও অনন্ত সৌন্দর্য। তাঁর কাব্য-বীণায় কল্পনাচাতুরীর বদলে সহজ সরল সুরের আলাপেরই প্রাধান্য দেখা যায়। তাঁর কবিকর্মের পরিচয় তাঁর ভাষাতেই বলি :—

“The moving accident is not my trade
To freeze the blood I have no ready art
'Tis my delight, alone in summer shade
To pipe a single song for thinking hearts.”

রোমান্টিক যুগের বৈশিষ্ট্য নিসর্গ কবিতায়। প্রকৃতির কবি হিসাবে ওয়ার্ডসওয়ার্থের স্থান বিশ্বসাহিত্যে আজও অধিষ্ঠিত। তাঁর মনে হয়েছিল নাগরিক সভ্যতার জৌলুসে আমরা এতই দূর যে প্রকৃতির দিকে তাকাতে ভুলে গেছি। তাই তিনি আক্ষেপ করেছেন—

“The world is too much with us ; late and soon
Getting & spending, we lay waste our powers;
Little we see in Nature that is ours ;

ইংলণ্ডের লেক অঞ্চলে মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে কবির বাল্য ও কৈশোর কেটেছিল। প্রকৃতি ছিল তাঁর আশ্রয় সহচরী। প্রকৃতির প্রতি কবির ভালবাসার বিভিন্ন পর্যায় “Tintern Abbey” কবিতায় সুন্দরভাবে ব্যক্ত হয়েছে। শৈশবে তিনি প্রকৃতির সহজাত আকর্ষণেই প্রকৃতির কোলে খেলা করেছেন। তারপর তারুণ্যে তিনি প্রকৃতির রূপ রস বর্ণে লব্ধে মোহিত হয়েছেন। সে সময়ে তিনি কেবল

প্রকৃতির ইঞ্জিয় গ্রাহ্য সৌন্দর্য উপলব্ধি করেছিলেন। বহিঃ-প্রকৃতির সৌন্দর্য তাঁকে মুগ্ধ করত কিন্তু জগতের নিবিড় অহুত্বের সাধাণ্যে প্রকৃতির সম্মুখে প্রবেশ করার শক্তি তখনও তাঁর ছিল না। তাই তখন কবিকে—

“.....the sounding cataract

Haunted me like a passion : the tall rock
The mountain and the deep gloomy wood
Their colours and their forms, were to me
An appetite.

কিন্তু প্রকৃতির বাহ্যিক রূপের কবি চিরকাল পূর্ণ তৃপ্ত থাকতে পারেন না। বয়স ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির পরে তিনি প্রকৃতির মধ্যে গুনতে পেলেন “The still sad music of humanity. প্রকৃতির সঙ্গে কবির পরিচয়ের অবশ্য এখানেই শেষ নয়। পরবর্তীকালে ভাবতত্ত্ব কবি প্রকৃতির প্রাণময় সত্তার বিশ্বাসী হয়ে উঠলেন এবং প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের একাত্মতা অহুত্ব করলেন। প্রকৃতির মধ্যে সৌন্দর্যের বাহ্যিক প্রকাশের আড়ালে যে প্রাণরসের প্রবাহ চিরবহমান তিনি তার সন্ধান পেলেন। তাঁর মনে হল—

And I have felt.....

A motion and a spirit, that impels
All thinking things, all objects of all thought
And rolls through all things,

এখানেই প্রকৃতির কবি হিসাবে কাটসের সঙ্গে ওয়ার্ডস-ওয়ার্থের পাখ্য। কীটস প্রকৃতির রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধ থেকে আকর্ষণ সৌন্দর্যগ্রহণ পান করেছেন। প্রকৃতির ইঞ্জিয়গ্রাহ্য রূপ তাঁকে মুগ্ধ করেছে। কিন্তু ওয়ার্ডস-ওয়ার্থের মত ধ্যান পরায়ণতা তাঁর ছিল না। তাই বাহ্যিক রূপের অতীত অরূপের সন্ধান তিনি ওয়ার্ডসওয়ার্থের মত পান নি। কীটসের সৌন্দর্যবোধের মধ্যে ওয়ার্ডসওয়ার্থের মত কোন অসীম রূপ পিপাসার ছোঁয়াচ লাগে নি। সুন্দর প্রিয়রোজ কুল কীটসের কাছে তার রঙ, আকৃতি ও রূপের জগতই মনোহর। কিন্তু ওয়ার্ডসওয়ার্থকে তাঁর ভাষাতেই বলি—

“The meanest flower that blows can give
Thoughts that do often lie too deep for tears.”

বস্তু জগতের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ওয়ার্ডসওয়ার্থের অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করে আর এক নতুন ভাবজগতের সৃষ্টি করত। সৌন্দর্যকে ঘিরে তাঁর কল্পনাগ্রহণ ভাবতত্ত্ব কবি-চিত্ত আবর্তিত হত। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ওয়ার্ডস-ওয়ার্থের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। উভয়েই অহুত্ব করেছিলেন যে মানুষ ও প্রকৃতি একই মহান সত্যের দুই ভিন্ন প্রকাশ মাত্র। উভয়েই প্রকৃতিকে প্রাণময়ী সত্তারূপে বন্দনা করেছেন।

প্রকৃতি কেবল ওয়ার্ডসওয়ার্থের ‘সৌন্দর্য-পিপাসা’ তৃপ্ত করেনি, তাঁকে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অহুত্বেরও দিয়েছে। তাই কবি বলেছেন—

‘She can so inform

The mind that is within us, so impress
With quiteness and beauty and so feed
With lofty thoughts, that neither evil tongues
Rash Judgements, nor the sneers of selfishmen
.....Shall ever prevail against us or disturb
Our cheerful faith, that all which we behold
Is full of blessings.

সাধারণ মানুষের চিত্ত ওয়ার্ডসওয়ার্থ যে ভাবে ফুটিয়ে তুলে-ছেন সে যুগের অন্য কোন কবি তেমন পারেন নি। পল্লী-জীবনের চিত্রগুলি কবির নীরবোচ্চ, করুণা ও মহাহুত্বের উজ্জল দৃষ্টান্ত। ‘The Ruined Cottage ও Michael এ বিষয়ে অস্বর্ণীয় কবিতা। ওয়ার্ডসওয়ার্থ মানুষকে প্রকৃতি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দেখেন নি। তাঁর প্রকৃতি লালিতা লুসি গ্রামা শিক্ষক, ফেরিওয়ালা প্রভৃতি মানব চরিত্রগুলি প্রকৃতির মানবীয় মূর্তি। কবি মানুষকে প্রকৃতিরই অংশ বিশেষ বলে মনে করতেন। প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে যে জাতিত্ব তা’ তিনি বিভিন্ন উপমার মধ্যে প্রকাশ করেছেন।

‘Excursion’ কবিতায় তিনি প্রকৃতির তুলিতে সরল প্রিয়ানন্দময় গ্রাম্য কৃষকের চিত্রটি এঁকেছেন—

“Grey locks profusely round his temple hung
In clustering curls, like ivy which the bite
Of winter cannot thin, the fresh air lodged
Within his cheek as light within a cloud.”

আবার এলেনের শিশু সন্তানের মৃত্যুতে কবি তার করুণ
অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন—

"...the green stalk of Ellen's life was snapped
And the flower dropped as every eye could see
It hung its head in mortal languishment."

মাহুয প্রকৃতিরই অংশ। তাই প্রকৃতির রূপ ও গুণের
প্রতিলিপি মাহুযের মধ্যে প্রকাশিত হয়।

দীর্ঘায়ু ওয়াড'সওয়ার্থের সমগ্র কাব্য জীবনের
'বঙ্গবর্ণন করলে আমরা একই কবির জীবনে দু'জন অষ্টকে
পাই। একজন প্রতিশাদীপ্ত, ভাব-তন্ময় এবং কল্পনার
প্রাধিকার উজ্জ্বল। এই ওয়াড'সওয়ার্থ ১৭৯৩ খৃঃ থেকে
১৮৫৮ খৃঃ পর্যন্ত বেঁচেছিলেন। কবির সুদীর্ঘ জীবনে মাত্র

এই দশ বছরেই প্রকৃত প্রতিভার ফুরণ হয়েছিল। এই
সময়ের মধ্যেই কবি তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলি রচনা করে-
ছিলেন।

১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দের পর কবি যা রচনা করেছেন তা পড়ে
মনে হয় বুঝি অল্প কোন ওয়াড'সওয়ার্থের লেখা। কবির
প্রতিভা তখন স্তিমিত। উপদেশাত্মক বাণী, নীতিবোধ ও
অধ্যাত্মচেতনার আধিক্য কাব্যের প্রাণশক্তি কণিণ হয়ে
এসেছে! তিনি তখন একজন প্রতিভাশালী কবি থেকে
পড়া লেখকে রূপান্তরিত হয়েছেন। তবু একথা স্বীকার
করতেই হবে যে মাত্র দশ বছর সময়ের মধ্যে তিনি যে
অসামান্য কাব্য রচনা করে গিয়েছেন তা সাহিত্যের
চিরস্মরণ সম্পদ।

সারারাত

শৈলেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

সারারাত

রষ্টির ফোঁটার মত

শিশির পড়েছে—

শীতের জড়া গ্রন্থ পাতার ওপর।

আমি জানালায় অতি স্নান ফাঁক দিয়ে

দেখেছি

শতাব্দীর অভীত

একটি তারা :

জেগেছিল তখনো

পাণ্ডার চুড়ায়—

নীলব দর্শকের মতো।

চারিদিকে নিশ্চিন্ত গাঢ় অন্ধকার :

অকৃতোভয় ; কারা যেন

সাংকেতিক আনা গোনা করে

শত্রুর অশেষণে।

বড়ো মমতা করে

তারাটি ;

অপলক চেয়েছিল—

ওই সীমান্ত পাহারারত

জোয়ানের দিকে।

কিন্তু

আমি জেগে

ধাকতে পারিনি

সারারাত।

কানাই বসু

এই নাটিকাঙ্ক আছেন :—

ভবদেব মিত্র, তাঁহার পত্নী ভদ্রা, ও তাঁহার ভাইকি শিবানী।

সাতুবাবু, তাঁহার পুত্র দেবব্রত ও ডাঃ বসু।

[সকাল বেলা। অধ্যাপক ভবদেব মিত্র তার বৈঠকখানায় আরাম কৈদারায় বসে সংবাদ পত্র পড়ছে। তক্তাপোষের ধারে পা খুলিয়ে বসে তার স্ত্রী ভদ্রা।]

ভব। তোমার কথা তো বলেছি ভদ্রা, এবার যাও না, সকালবেলা তোমার সংসারের কাজকর্ম নেই ?

ভদ্রা। আমার কাজের ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না। তোমার নিজের কাজের কথা ভাবো।

ভব। (সহাস্তে) তুমি তো জানো ভদ্রা, আমি হচ্ছি সেই “ভাবিতে পারি না পবের ভাবনা”রও ওপোরে নিজের ভাবনাও ভাবিতে বিশেষ পারি না। কিন্তু কাগজটা একটু পড়তে দাও।

ভদ্রা। কেন, আজ তো তোমার কলেজ বন্ধ বলে। সারা দুপুরতো কাগজ পড়বার জন্তে রয়েছে।

ভব। দুপুর আছে বটে, কিন্তু কাগজ পড়াটা, কী জানো, একটা প্রাতঃকৃত্যের মতো। সকালে অন্ততঃ একমেটে না হলে মনটা কেমন যেন মাজ মাজ করে। তাছাড়া তোমার কথা তো আমি শুনেছি, একটু সময় হলোই সব ঠিক করে ফেলবো। এখন তুমি একটু—

ভদ্রা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি উঠে যাচ্ছি। তাহলে তাই বলো যে মেয়েটার বিয়ে আর এ জন্মে দেবে না। মেয়ে বৃদ্ধি হয়ে গেল, আবার কবে তোমার সময় হবে জানি না।

ভব। (কাগজ থেকে মুখ তুলে) ইউ, ইউ! আবার ঐ সব বাজে কথা বলতে শুরু করলে ?

ভদ্রা। কী বাজে কথা বলেছি তুমি ? মাষ্টারী কল্যাতে এসেছেন আমার কাছে !

ভব। না, সে কথা চেষ্টা আর করবো না, পুরাকালে খা করেছি করেছি। কিন্তু বাজে কথা বলাটা ছাড়ো দিকি ! বৃদ্ধি মোটেই হয়নি শিব। এই তো আঠারো উনিশ বছর মোটে—

ভদ্রা। সব খবরই তো রাখো কিনা। এই আখিনে একুশ পূর্ণ হয়ে গেছে ! আঠারো-উনিশ।

ভব। বেশ একুশই হলো। একুশ বছরের মেয়েকে কেউ বৃদ্ধি বলে না।

ভদ্রা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাঙ্গালীর শাস্ত্রে মেয়েরা কুড়ি পেরোলোই বৃদ্ধি।

ভব। ফের বাজে কথা ! “কুড়ি পেরোলোই বৃদ্ধি” ওটা কোনও শাস্ত্রই নয়। তাছাড়া এজন্মে বিয়ে দেবো না মানে কী ? মাত্র জুনমাসটা অপেক্ষা করতে বলেছি— কলেজের পরীক্ষাটা আসছে তাই। এতেই এজন্মে শিবুর বিয়ে দেবো না ?

ভদ্রা। আহা, জুনমাসটা গেলেই একেবারে পরলা জুলাই যেন বিয়েটা দিয়ে ফেলছে। কত জুন যাবে, তার ঠিক কী ? এদিকে মেয়ে দিন দিন হাতী হয়ে উঠলো। আগেকার দিন হলে—

ভব। (চোখ পাকিয়ে) ইউ ! (ভদ্রা খেমে গেল। কয়েক মুহূর্ত নীরবে থেকে) তোমার এইসব অভ্যাস যদি তুমি ত্যাগ না কর ভদ্রা, তাহলে আমি তোমার কোনও কাজ বা কথায় থাকবো না। মাহুয যত বড়োই হোক, তাকে হাতী বলা চলে না কোন মতেই। বিশেষতঃ শিবু যখন মোটা নয়, তখন উপহার ছিলও ওটা খাটে না। এবার বল, কী বলছিলে ?

ভদ্রা নীরব

ভব। (কণকাল কাগজ দেখে, একটু অপেক্ষা করে) কই কী বলছিলে বল ? (কাগজ নামিয়ে চাইলো)

ভদ্রা মুখ ঘুরিয়ে বললো

ভব। কী গো, রাগ করলে? কী আশ্বা! রাগ করবার কী আছে এতে? অত্যাঙ্কি করার অভ্যাসটা কেবল ছাড়তে বলেছি, আর তো কিছু নয়। অত্যাঙ্কি-গুলো মিথো কথার জাতে পড়ে, এটা বোঝো না কেন? নাও, নাও, রাগ করে চূপ করে থেকে না, ওতে মিথো সময় নষ্ট হয় মাত্র। চিরকাল কিছু আমার সঙ্গে কথা না করে থাকতে পারবে না।

ভদ্রা। তা হলেই তুমি যাচো। আমি কথা না কইলেই বেশ সোয়াস্তিতে থাকো তুমি, তা জানি।

ভব। একেবারেই না। এটাও তোমার সত্যি কথা হলো না। তুমি কথা না কইলে আমার অত্যন্ত অস্বস্তি লাগে, তা তুমি বেশ জানো, রাগের বেশে কেন আমাকে মিথো দোষ দিচ্ছ?

ভদ্রা। দিচ্ছি, আমি যে মিথ্যাবাদী, আমি যে জোচ্চোর, আমি যে ঝগড়াটে—পাকী—

ভব। ইউ, ইউ, ইউ! (ভদ্রা খেমে গেল) নাঃ, ইউ আর ইনকরিজিবল! তোমাকে পারা যাবে না। একেবারে মিথো কথার ফোয়ারা খুলে দিলে। তুমি মোটেই মিথ্যাবাদী নও, মোটেই জোচ্চোর নও।

ভদ্রা। কেন নই? এই তো তুমি নিজের মুখে বলে—

ভব। আমি একবারও বলিনি যে তুমি মিথ্যাবাদী। আমি বলেছি তোমার কথাগুলো মিথো হয়ে যাচ্ছে, এটা বোঝো না কেন?

ভদ্রা। আহা গো! তোমাকে চোর বলিনি, খালি বলেছি তুমি বড়ো চুরি কর। মিথো কথার ফোয়ারা খুলে দিলুম, আর মিথ্যাবাদী নই। তা অত পণ্ডিতি কথা আমি মুখ্যমন্ত্রীর বুঝবো কী করে বলো?

ভব। খুব বোঝো। এতদিন পরে আর ওকথা চলে না ভদ্রা। আমি যা বলি তা তুমি বোঝো খুব, কেবল রাগের বেশে আমার কথার অর্থটা বিকৃত করে তার কদর্থ কর আর অনর্থ কর। অতিশয়োক্তি না করেও বোঝা কথা কওয়া যায়, মনের ভাব প্রকাশের কিছুমাত্র অস্ববিধে হয় না, এই আমি বলছি, বললেই পারো মেয়েটা বড়ো হয়েছে—অবশ্য বয়সোচিত বড়োই হয়েছে—কিন্তু বড়ো হয়েছে বললেই যখন তোমার বলা ঠিক হয়, আমিও ঠিক বুঝি, তখন—

ভদ্রা। আর হাতী বলে তুমি ঠিক বুঝতে পারো না, না? মনে কর শিবুর বুঝি চারটে খামের মতো পা হয়েছে, নাকটা লম্বা হয়ে শুঁড়ে দাঁড়িয়েছে, কান দুটো কুণ্ডল মতো হয়েছে, এইসব বলছি, না?

ভব। চারটে পা, লম্বা শুঁড়, কুলার মত কান যখন আমি বুঝি না, আর তুমিও যখন তা বোঝাতে চাও না, তখন মিছেমিছি ভাষার ওপোর কতকগুলো অতিশয়োক্তি, গোঁড়া চাপিয়ে তাকে ভারী করবার দরকার কী? (ভদ্রা নীরব) যাক্, আর তর্কে কাজ নেই, তোমার কথার বহি কিছু বাকী থাকে, শেষ কর।

ভদ্রা। কিসের আবার কথা? তোমারই ভাইঝি, বড়ো হয়েছে, বিয়ে দিতে হবে, দায় তোমার। তাতে এত কথাই না কী, আর তর্কই বা কিসের? সত্যিই তো আমি বাইরের লোক, আমার কথা কইবার দরকার কী?

ভব। বলে রাগ করবে ভদ্রা, এ কথাটাও তোমার সত্যি হলো না। তুমি বাইরের লোক? শিবু আমার ভাইঝি বটে, কিন্তু তোমাকে সেদিন পর্যন্ত সে যা বলে ডেকেছে।

ভদ্রা। যখন ডেকেছে, ডেকেছে। সে কথার কাজ কী? এখন তো আর বলে না।

ভব। ও তো বলতো। তুমিই বারণ করে করে কাকী বলা ধরিয়েছ।

ভদ্রা। বলাবো না? বা সম্বন্ধ, তাই বলা ভাল। কী দরকার আমার খুঁড়িয়ে বড়ো হবার? তাছাড়া লোকে কী মনে করে? সেদিন শিবুর এক বন্ধুর মা বেড়াতে এসেছেন, তোমার সাড়া পেয়ে আমায় বলেন, ‘আপনার দেওর ডাকছেন আপনাকে। ঐযে নীচে থেকে শিবু বলেছে ‘ও মা যেজকা ডাকছে।

ভব। হাঃ হাঃ হাঃ, অমনি সম্পর্ক বিচার করেছেন। সব সাত্তামার শিয় দেখছি।

ভদ্রা। সাত্তামা কেন, সম্পর্ক বিচার সকলেই করে থাকে। তোমার মতন তো নয়।

ভব। তা বটে। আমার মাখায় ওটা ঢোকে না। রিলেটিভদের (relatives) তব আমার কাছে বিওরি অফ রিলেটিভিটি (Theory of Relativity)র চেয়ে শক্ত। তা বলে মামাতো ভায়ের পিসতুতো ভাই আমার কে হয়,

তা না জানলেও, তুমি যে শিবুর মা'র চেয়ে কম নও সেটা জানি।

ভদ্রা। থাক। আমি যদি কেউ হতুম, তাহোলে আমার একটা কথাও থাকতো। ও কথায় কাজ নেই আর।

ভব। অচ্ছা, রাগারাগিতেও আর কাজ নেই শিবুর বিয়ের চেষ্টা আমি করবো, আজ থেকেই করবো। এবার যুদ্ধ থামাও, সন্ধি কর, লক্ষ্মীটি।

ভদ্রা। (গভীর ভাবে) মিথ্যে কথা বোলো না বলছি। যত বাজে কথা আর মিথ্যে কথা!

ভব। মিথ্যে কথা? না, না, সত্যি বলছি, আমি চেষ্টা করবো তুমি দেখ। এখন যাও, নিশ্চিন্ত চিন্তে কুমড়ো ট্যাডস ইত্যাদি কুটে সংসার ধর্ম পালন করগে। আমার ওপোর রাগ করে আব্দুল কুটে ফেলো না, লক্ষ্মীটি।

ভদ্রা। আবার মিথ্যে কথা? হি, হি, একী বদ্ অভ্যেস তোমার?

ভব। (সবিস্ময়ে) কোথায় মিথ্যে কথা বললুম গো? কী পাগল?

ভদ্রা। কের? নাঃ, তুমি একেবারে ইনকারিজিবল।

ভব। কী হোলো তোমার বলো তো? আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না! দয়া করে একটু বুঝিয়ে বল কী মিথ্যে কথা কইলুম আমি।

ভদ্রা। তা বুঝতে পারবে কেন? নিজের দোষ কি দেখতে আছে? লক্ষী লক্ষী করছো কাকে শুনি? আমি কি পণ্ডের ওপোর বসে আছি? পেন্টার চড়ে বেড়াই আমি, না সমুদ্র থেকে উঠেছি? বল? মিথ্যে কথা নয়?

ভব। মাই গড! (My god)! এখানে লক্ষ্মীর অর্থ—

ভদ্রা। আর যুদ্ধ সন্ধি, এসব কথা ওঠে কোথেকে? তোমাতে আমাতে যুদ্ধ হচ্ছে? ঢাল, তরোয়াল, বন্দুক, সড়কি, কী আছে আমাদের হাতে? বাজে কথা নয়?

ভব। (উচ্ছ্বাস করে) আরে, যুদ্ধ মানে বাক যুদ্ধ।

ভদ্রা। আরে বাকযুদ্ধ মানে বাজে কথা।

ভব। (হাসতে হাসতে) কী পাগল!

ভদ্রা। এখনও মিথ্যে কথা? আমি পাগল? ডাকো ডাকার। কোন্ ডাকার আমাকে পাগল বলে দেখি

একবার। বাজে কথা আর মিথ্যে কথা বলবার আর জায়গা পাঃনি?

ভব। (সহাস্তে) পেয়িং মি ব্যাক ইন্ মাই ওন্ করেন! (Paying me back in my own coin!) আমারই অস্ত্রে—

ভদ্রা। হ্যা, নিজের দোষ হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায় খুবই, মানুষকে হাতী বলে মিথ্যে কথা বলা হয়, সত্যিই তো, আর লক্ষ্মী বলে, হুস্থ মানুষকে পাগল বলে, একেবারে সত্যানুরাগের পাচালী গাওয়া হয়।

[ভবদেব হাসছে। তার হাসির ছোয়াচ লেগে ভদ্রার মুখেও রাগের ভান সেরে গিয়ে হাসি ফুটেছে। এমন সময়ে দরজায় আবির্ভূত হলেন এক বৃদ্ধ-গোছের ভদ্রলোক, পরণে কোটপ্যান্ট, মাথা প্রায় পাকা, কাঁচাপাকা এড্‌ওয়ার্ড সেভেন্‌থ দাড়িগোঁফ। হাতে একটুকরো কাগজ। তিনি এসে দরজার কাছে থমকে দাড়িয়েছেন, কারণ তাঁকে দেখেই ভদ্রা ক্রমপদে ভিতরে চলে গেছে। কিন্তু ভদ্রা অন্তর্দান হয়নি, পর্দার নীচে তার শাড়ীর পাড় ও পায়ের আভাস রয়েছে।]

ভদ্রা। এইটে প্রফেসার ভবদেব মিথের বাড়ী তো?

ভব। আজ্ঞে হ্যা। আপনি—

আগঃ। (এগিয়ে এসে) আমি ডাক্তার বোস। ভবদেববাবুর বাড়ীতে একটি মেয়েকে দেখতে এসেছি। আমাকে খবর দিয়েছিলেন দেখবার জন্তে।

ভব। আস্থন, আস্থন। নমস্কার। আমারই নাম ভবদেব মিত্র। মেয়েটি আমার তাইঝি। বহন আপনি। আমি মেয়েটিকে—

ডাঃ। নাঃ, এখানে বসে আর কী করবো। কোথায় আছে চলুন।

ভব। আজ্ঞে না, আপনি বহন। আমি তাকে এখানে আনার ব্যবস্থা করছি।

ডাঃ। এখানে আনবেন? তা আস্থন।

[ভবদেব ভিতরে যাবার জন্ত উঠলো। কিন্তু দরজার পর্দার আড়ালে তার অস্তিত্ব বোকা বাজে। সেখানে সে জীর সঙ্গে কথা কইছে।]

ডাঃ। (দরজার দিকে ও নিজের বড়ি দেখে) দেবী করবেন না। আমার কাজ রয়েছে।

ভব। (পর্দার পাশ দিয়ে মুখ বাড়িয়ে) আজ্ঞে না, এই দশ মিনিটের মধ্যেই—

ডাঃ। দশ মিনিট? এতক্ষণ দেবী হবার কারণ কী?

ভব। মেয়েদের ব্যাপার জানেন তো। আমি যত লীগ্‌গির সম্ভব আনতে বলে দিছি।

ডাঃ। আচ্ছা, আমি তবে একটা কল্‌সেরে আসছি।

[প্রস্থান]

(ভবদেব ও ভদ্রা ভিতরে এলো)

ভব। দেখ দিকি কাণ্ড!

ভদ্রা। কী আবার কাণ্ড দেখবো। ডাক্তার মাহুদ, কল্‌সেরে আসছেন।

ভব। সে কথা নয়। কোথেকে এক ঝগড়া বাধালে তুমি। কে, কী বৃত্তান্ত কিছু জানালে না আমাকে। একেবারে ডেকে আনলে ভদ্রলোককে মেয়ে দেখাতে। আচ্ছা, এতক্ষণ এতকথা কইলে, কই একথা তো বলনি যে—

ভদ্রা। বলতে দিলে কই তুমি। খালি ইউ, ইউ, আর ইউ।

ভব। তা আই আই করার চেয়ে ইউ, ইউ করা ভালো। সব তুঁহ, তুঁহ। যাক্, এখন বল, কী রকম ছেলে? কতদূর লেখাপড়া করেছে?

ভদ্রা। তা আমি কেমন করে জানবো?

ভব। তার মানে? ছেলের খবর কিছু না জেনে প্রথমেই মেয়ে দেখানো, ও আমি ভালবাসি না।

ভদ্রা। সে সব খবর তুমি নেবে।

ভব। হোপলেস! আমি তো কিছুই জানি না, ভদ্রলোককে চিনিই না—

ভদ্রা। রাতদিন বইয়ে-মুখে বসে থাকবে, তা কিছু জানবে কেমন করে বল। লেখাপড়া যারা করে তারা বুঝি ছেলে মেয়ের বিয়ে দেয় না।

ভব। আহা-হা, দেবে না কেন, খুব দেয়। আমিও কি শিবুর বিয়ে দেবো না বলছি। কিন্তু কার সঙ্গে দেবো সেটাতো দেখতে হবে। বিয়ে দেবার পাত্রটিকে—

ভদ্রা। পাত্রকে তুমি খুঁজে পেতে আনবে, না পাত্র আননা থেকে সেধে আসবে তোমার বাড়ী?

ভব। তা আসতে পারে। কেন, কেবল মেয়েরই

বিয়ে দেবার প্রয়োজন? ছেলের কি বিয়ে করার প্রয়োজন নেই? যাক্‌গে, সে তর্কের সময় নেই। ভদ্রলোক এখনই এসে পড়বেন। এই বেলা এঁর সব পরিচয়-টরিচয় বলে দাও আমাকে, কোথেকে এঁর খবর পেলে? মেয়ে দেখবার ব্যবস্থাই যা করলে কাকে দিয়ে, কে সন্ধান দিলে—

ভদ্রা। সন্ধান পাবো মনে করলেই সন্ধান পাওয়া যায়। তুমি তো মানো না, কিন্তু ওপোরে একজন আছেন তাঁকে—

ভব। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। এই চরাচর বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড যার অঙ্গুলি হেলনে চলছে, সৃষ্টি স্থিতি লয়, চতুর্বেদ, পঞ্চবাণ যার আদেশে ইত্যাদি। কিন্তু তিনি স্বয়ং কি তোমার কাছে আসবার সময় পেয়েছিলেন? নাকি, কারও মারফৎ সন্ধানটা পাঠালেন?

ভদ্রা। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন ইনি। মেয়ে চাই, বাঙ্গালী, শিক্ষিতা, সংযতাব, স্বাস্থ্যবতী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর—ঐ যেমন থাকে গো।

ভব। হঁ, কোন কাগজে? কত তারিখের কাগজে?

ভদ্রা। তা কে জানে। অত সাত সতেরো, বারো পনেরো—

ভব। ইউ, ইউ। ওসব কী হজপজ্জ বকছো? খামোকা অত ফিগার আওড়াছ কেন? যা বলবে, ইন্‌ ওয়ার্ডস্‌ (in words) বল, নট্‌ ইন্‌ ফিগারস্‌ (not in figures).

ভদ্রা। ফিগার আবার কী? কবেকার কাগজ, কোথাকার কাগজ অতশত জানি না। ঝিয়ের ছেলেটা ঘ্যান্‌ ঘ্যান্‌ করছিল ক্বিদে পেয়েছে, ক্বিদে পেয়েছে বলে, কাজ করতে দেয় না ঝিকে, সবে অস্থখ থেকে উঠেছে ছেলেটা, রাতদিন ঘ্যান্‌ ঘ্যান্‌ করে। কোলের ছেলে, দুটো নষ্ট হয়ে গিয়ে ঐটুকু আছে। দোয়ামৌটা তো মাহুদ নয়—

ভব। আহা, ঝিয়ের জীবনচরিতে আমার কী দরকার? খবরের কাগজের কথা হচ্ছে

ভদ্রা। সেই কথাই তো আমিও তোমাকে বলছি। ছেলেটা কাঁদছিল, তাই তার সঙ্গে দু'পরসার মুড়কি আনতে দিলুম। মুড়কি এনে ঝি ঠোঙাটা আমার হাতে দিলে—

ভব। তোমাকে দিলে? কেন? তোমারও কিদে
পেয়েছিল নাকি? ছেলের সঙ্গে মুড়কি এনে তোমাকে—

ভদ্রা। মুড়কি দিলে বলেছি? ঠোঙাটা দিলে।
আমি ঠোঙা পড়তে ভালবাসি ওরা জানে। অনেক
জিনিষ থাকে। একবার একটা ঠোঙাতে দেখি—

ভব। ভদ্রা, মুড়কির ঠোঙার কথা হচ্ছে প্রিজ।

ভদ্রা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানি। সেই ঠোঙাতে বিজ্ঞাপন
দেখেছিলুম। সবটা কি পড়া যায়। এমন আটা
লাগিয়েছে।

ভব। ইন্ডিড! (Indeed)।

ভদ্রা। হ্যাঁ, তাই দেখে দুখনকে আজ ভোরে পাঠিয়ে
ছিলুম তোমার নাম ঠিকানা দিয়ে।

ভব। ঠোঙার বিজ্ঞাপন? দি আইডিয়া! কত-
দিনের ঠোঙা আই মিন্ কতদিনের বিজ্ঞাপন, এখনও
তাদের দরকার আছে কিনা সে সব জানা নেই—

ভদ্রা। নিশ্চয় দরকার আছে নইলে এরই মধ্যে,
খবর দেবামাত্র দেখতে আসেন?

ভব। হঁ। হয় ঘটকালী বিজ্ঞায় তুমি একটি জিনিয়াস,
অর ইউ আর এ ফুল (or you are a fool)।

ভদ্রা। তা ফুলই হব আমি। তোমার মতন ফুল
হতে চাই না। যাক এখন সব শুনলে তো। এবার তুমি
কথা কও। বড়ো ডাক্তার বলে মনে হচ্ছে, দুখন বলে,
বেশ বড়ো বাড়ী, নতুন মটর গাড়ী। বোধহয় ছেলের
বে দেবে। আমি যাই, দেখি শিনুকে যদি—যে মেয়ে,
এম্মিন্তেই সাজতে বলে মারতে ওঠে, তার ওপোর সকালে
বলেছি তোকে দেখতে আসবে। সেই রাগে খায়নি পর্যন্ত,
মুখ হাঁড়ী। (প্রস্থানোচ্চত)

ভব। (অপ্রসন্ন মুখে) তুমি চলে যাচ্ছে? ভদ্র-
লোক এখন এনে পড়বেন যে।

ভদ্রা। তা আমি কী করবো? আমাকে তো আর
দেখবেন না। তুমি কথাবার্তা কইবে।

ভব। আরে কী কথাবার্তা কইতে হবে, তাই তো
আমি জানি না। জালাতন!

ভদ্রা। এরই মধ্যে জালাতন? তবেই তুমি মেয়ের
বিয়ের ব্যবস্থা করছ!

ভব। বিয়ের ব্যবস্থা করা তো শক্ত নয়। দোকান

বাজার পাঁচজনে করে দেবে, বামুনরা রাঁধবে, ডেকোরেটার-
দের বলে দেবো সাজিয়ে টাজিয়ে দেবে। বিয়ে হয়ে যাবে।
এতে আর শক্তটা কী, কিন্তু এই সব সম্বন্ধ ঠিক করা, কথা
কওয়া, ওঃ হরিবল্! (oh horrible!) যত সব
ছেঁদো কথা আর দৈতো হাসি—

ভদ্রা। তা কথা কইতে হবে বই কি। কথা না
কইলে বিয়ে হয়?

ভব। না হয় নাই হবে। একি একটা কথা কইবার
জিনিস? বিয়ে হ'লো ওয়ান অব দি মোষ্ট শেক্রেড ইভেন্-
টস অব মান্‌স সোশ্যাল লাইফ্ (one of the most
sacred events of man's social life) মাহুয়ের
সামাজিক জীবনে যার চেয়ে বড়ো ব্যাপার আর নেই।
সেকি অম্মনি কইলেই হোলো।

ভদ্রা। চার কাল কথা কয়েই বিয়ে ঠিক হচ্ছে।
বলে এক লক্ষ কথা না হ'লে বিয়ে হয় না। নাও বাপু,
তুমি অমন করো না। ভদ্রলোক এলে ভালো করে
হাসিমুখে কথাবার্তা বোলো। আমি যাই, দেখি যদি
মেয়েকে রাগ ভাজিয়ে একটু সাজাতে পারি।

[প্রস্থান]

ভব। (চিন্তিত ও বিরক্ত) হরিবল্, সিম্প্রি
হরিবল্!

(সাতকড়ির প্রবেশ। ভবদেবের চেয়ে কিছু বড়ো।
হাতে ছাতা, সঙ্গে একটি ৩৪ বছরের বালক।)

সাতু। কীহে ফেলু, হরিবোল, হরিবোল বলছো যে
বসে বসে! বেশ, বেশ!

ভব। এস সাতুমায়া। হরিবোল নয়, বলছি হরিবল্।
ওরে শিব, তোর বন্ধু এসেছে।

(এদের কথাবার্তার ভিতর অল্পক্ষণ পরে শিবানী এসে
ছেলেটিকে ভিতরে নিয়ে গেল।)

যাক, তুমি এসেছ ভালো হয়েছে। কথাবার্তা কইবার
ঠিক লোক পাওয়া গেল। বোসো, সাতুমায়া।

সাতু। (ছাতা ধরার কোণে রেখে, তক্তাপোবে
বসতে বসতে) আর বস। বসবার কি জো আছে
একদণ্ড। বানিগাছে জুড়ে দিয়েছে, ঘোরো, ঘোরো,
যদিই না মৃত্যু হয় কেবল ঘুরে মর। এখন যেতে হবে
বাজারে। বসবার সময় কই?...কবে ছুটি পাবো বলতে

পায়ো ফেলু? হ্যা, আমি এসেছি, ভালো হয়েছে কেন বলে বলতো? কী ব্যাপার?

ভব। এক ঝড়োটে পড়ে গিয়েছি। বলে একলক্ষ কথা নইলে বিয়ে হয় না। তার মধ্যে নব্বই হাজার নিশ্চয় বাজে কথা আর ছেঁদো কথা। কী বল?

সাতু। বিয়ের কথা উঠলো কেন? কার বিয়ের কথা হচ্ছে?

ভব। শিব্র। আছে কোনো ভালো ছেলে তোমার সন্ধান? গিন্নী তো নিজেও অস্থির হয়ে উঠেছেন আর আমাকেও স্থির থাকতে দিচ্ছেন না। আছে ছেলে, সাতুমামা?

সাতু। সেই কথাই ভাবছি। ছেলে, তা ছেলে একটি আছে বটে, আমাদের আপনা-আপনির মধ্যেই, ভালোই ছেলে।

ভব! আপনা আপনির মধ্যে? কাদের বাড়ীর ছেলে বল তো?

সাতু। হরিচরণ বাবুকে জানতে তো তুমি?

ভব। খুব জানতুম। হরিচরণকে জানি না? কী বল! আমাদের পণ্ডিত হরিচরণ তো?

সাতু। না, না, পণ্ডিত হরিচরণ নয়, সেতো থিয়েটারে মজিনা সাজতো, বার পাঁচ ছয় ম্যাট্রিক ফেল করতে বাপ রাগ করে বিয়ে দিয়ে দিলে! এদানিং উন্নতি করেছিল, মেবারের রাণা না মন্ত্রী কী হয়ে—

ভব। তবে কোন হরিচরণের কথা বলছ?

সাতু। এ হরিচরণ হচ্ছে—আমার বাবার এক জ্যাঠামশায়ের মানে আপন জ্যাঠা নয়, আমার ঠাকুরদার এক বৈমাত্রেয় ভাই ছিলেন, জানো তো?

ভব। (ঘাড় নেড়ে) না।

সাতু। হ্যা ছিলেন। তাঁরই ছেলে, মানে ঠাকুরদার সেই ভাইয়ের ছেলে হরিচরণ। তা হোলে আমার হোলো কাকা, বুঝলে তো? বাবার জ্যাঠা মানে আমার ঠাকুরদা, সেই ঠাকুরদার ছেলে, কাকা হোলো না আমার?

ভব। ও।

সাতু। তবে আমি বড়ো একটা কাকা-টাকা বলতুম না। রাগ করতো, বলতো বাবাকে বলে দেবে। হ্যাঃ, তুমিও যেমন। বাবাকে বোলে দেবে কি, বাপের ধারে

কাছেই বেসতো না। ভয়ানক রাশভারি ছিলেন কিনা, বাবার সেই জ্যাঠামশায়ের কথা বলছি, হরিচরণের বাপ। খুব রাশভারি লোক ছিলেন। সেকালের বি-এ পাশ ডেপুটি, পরে সদরাল্লা হয়েছিলেন। সরকারী মহলে খুব খাতির। সায়েংরা ভারি ভালবাসতো। কিন্তু হলে হবে কী, ছেলেটার কিছু হোলো না। ঐ হরিচরণ। বি-এ পাশও করলে, ধরাধরিও কম করলে না, কিন্তু হাকিমি কি আর আজকাল অত সম্ভ। চাকরি করে। চাকরি অবশ্য ভালো, পাকা চাকরি, মাইনে ভালো, এদিক ওদিকে ছুঁপয়সা আছে—

ভব। তা সেই হরিচরণ ছেলেটি কেমন? স্বভাব চরিত্র স্বাস্থ্য—

সাতু। আরে না, হরিচরণ ছেলে নয়। ছেলে হোলো শোনো না। হরিচরণের জী— আমি আবার তাকে বলি হরিচরণ-কাকী (হাসি)। আর বল কেন। চটে যা যায়! তবে লোক ভালো, গেলেই খুব খাওয়ায়। হাতের রান্না—

ভব। তুমি ছেলের কথা বলছিলে, সাতুমামা।

সাতু। হ্যা গো, সেই কথাই বলছি। হরিচরণ-কাকীর বড়মামা হচ্ছে স্বরেন ঘোষ। পাথুরেঘাটার ঘোষদেবেরই বংশ, মন্ত ঘর। সেই স্বরেন ঘোষের একটি দৌতুর আছে, সে আবার আমার সঙ্গে শালী নীরোদ খুড়খুড়ের—তোমার মনে আছে তো নীরোদকে, নীরোদ কেউরাম দত্তর মেয়েকে বিয়ে করেছে না—এদিক দিয়ে হলো হরিচরণ কাকার মামাতো শালীর ছেলে, আবার ওদিক দিয়ে সেই নীরোদের—

ভব। ইউ, ইউ, এনাক্ অফ ইউট (Enough of it), সাতুমামা! রক্ষে কর। এদিক দিয়ে, ওদিক দিয়ে, অত সম্পর্ক বিচারে কি দরকার? ছেলের বাপের নাম বল, তাহোলেই তো হবে।

সাতু। (রাগ করে) বাপের নাম বললেই হবে? বাপের নাম বিপিন, কী বুঝলে:

ভব। বুঝলুম বিপিনবাবু নামে এক ভদ্রলোকের একটি বিবাহযোগ্য ছেলে আছে।

সাতু। বাস্। তবে আর কী! দাও, বিয়ে দাও। (সাতু মুখ ফিরিয়ে বলল)

ভব। না, না, কে বিপিন, কোথাকার বিপিন, কেমন ছেলে, সব বল।

সাতু। (আবার মুখ ফিরিয়ে বসল) তবে? সব বলতে হবে তো ব্যস্ত হোলে কি চলে? ব্যস্ত হোলে চলে না। বিপিন দত্ত, উকিল, পটলডাক্তার বাড়ী। তাঁরই ছেলে। ছেলের আমার বাড়ী তো তোমাকে বলুম ঐ স্নরেন ঘোষের বাড়ী, আবার ছেলের পিসে, মানে বিপিনের ভগ্নীপতি ছিলেন আমাদের—আমাদের হোলো গিয়ে, এই দেখো, পেটে আসছে মুখে আসছে না, নামটা—(চিন্তা করছে)

[ভদ্রার প্রবেশ]

ভদ্রা। না বাপু, আমি তো হেরে গেলুম তোমার মেয়ের কাছে, তুমি একবার—ওমা, সাতুমামা বসে আছেন যে, (মাথার কাপড় টেনে দিল)।

ভব। তোমাকে বলুম না আজ থেকেই চেষ্টা করবো। এই দেখ, সাতুমামার কাছে একটি সম্বন্ধ পাচ্ছি। ছেলে ভালো, কলকাতায় বাড়ী, বাপ ডাক্তার—

সাতু। ডাক্তার নয়—উকিল।

(ভদ্রা ঘোমটার ভিতর থেকে ফিস্ ফিস্ করে কী বলে, ভালো শোনা গেল না)।

ভব। আঃ, তোমার এই লজ্জার অভ্যাচারে গেলুম। সাতুমামাকে দেখে এখনও ঘোমটা, এবসার্ড (Absurd) আসলে ভাগ্নে বই তো নয়। বয়সে বড়ো বলে মামা বলি। কী গো, ঘোমটা ফোমটা ছেড়ে স্পষ্ট করে কথা কইবে তো কও, নইলে আমি আর পারবো না শিশুর বিয়ের ব্যবস্থা করতে।

ভদ্রা। (ঘোমটা কিছু কমিয়ে কণ্ঠ একটু উচ্চ করে) হোন তোমার ভাগ্নে, চিরকাল মামা বলে ডাকি, মামাশুভ্র বলেই জেনে এসেছি। ওকথা থাক, বলছিলুম কী সম্বন্ধের কথা বলছেন, ভালো করে জেনে নাও, কী রকম ঘর, কী বিস্তার সব জেনে—

সাতু। সে দেখতে হবে না বোমা। আপন-আপনি মধ্য। আমার সেই হরিচরণ-কাকীকে মনে আছে তো?

ভব। এই রে! ই্যা, ই্যা, সাতুমামা, সে তো আমি

সমস্ত শুনে নিয়েছি, পরে ওকে শুনিয়ে দেবো। (দ্রীক) মজ্ব ঘর, বুঝলে?

সাতু। ই্যা, ভালো ঘর বোমা, অবস্থাও ভালো। পটলডাক্তার বিপিন উকিল, সবাই চেনে।

ভদ্রা। ওমা, বিপিন উকিল, সে তো আমাদের চেনা গো তোমার মনে নেই? বেশ বা হোক। হাজারী-বাগের কাণো মাসীর ননদের মেয়ের বিয়ে হয়েছে ঐ, বর্দ্ধমানে? সে তো ঐ বিপিন উকিলেরই বড়বোনের—

ভব। (প্রায় চিৎকার করিয়া) ইউ, ইউ! স্টপ ইট (stop it)। পাগল করে দেবে নাকি? এত সম্বন্ধের জট পাকালে মাছুষ দম বন্ধ হয়ে মারা যাবে যে।

সাতু। ওকী কথা কেলু, সম্বন্ধ বিচার করতে হবে বইকি। আমাদের কায়স্থের ঘরে সম্বন্ধই হচ্ছে মাছুষের আসল পরিচয়। তাছাড়া সম্পর্ক বিরুদ্ধ হচ্ছে কিনা, সেটাও দেখতে হয় অনেক সময়। বোমা ঠিকই ধরেছেন। সেই বিপিন উকিল। বিপিনের সেই ভগ্নীপতির কথাই তো বলছিলুম। তিনি ছিলেন বর্দ্ধমান রাজ এজেন্টের এসিষ্ট্যান্ট ম্যানেজার রায়সাহেব সরোজ গুহ। মনে পড়েছে ফেলু, সরোজ গুহ। তাঁর তিনটি ছেলে, না বোমা? সতীশ ভোলানাথ আর—

ভদ্রা। (স্বামীকে) ঐ কালোমাসীর ননদের জামাই, বুঝলে গো?

ভব। (মাথা নেড়ে) হঁ, হঁ, কালোমাসী, বুঝেছি।

সাতু। ই্যা, ভোলানাথের বিয়ে হাজারীবাগে হয়েছিল শুনেছিলুম। তা যেজো ছেলে ঐ ভোলানাথ, বড়ো ছেলে সতীশ, আর ছোট—ছোট—(চিন্তার স্নরে) সতীশ, ভোলানাথ আর ছোট—ঐ যে আমাদের নিবারণবাবুর মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হোলো যার, বর্দ্ধমান থেকে বয় এলো টানা ষোটারে,—কী নামটা, আহা, বল না বোমা?

ভব। সাতুমামা, তুমি বর্দ্ধমান থেকে পটলডাক্তার ফিরে এসো প্লিজ। তাহলে বিপিনবাবুর ছেলের সঙ্গে শ্রীবুর বিয়ে হোতে পারে, কেমন?

সাতু। আহা, দাঁড়াও না, অত ব্যস্ত হচ্ছে কেন? বোমার মনে পড়ছে না? সতীশ, ভোলানাথ আর—

ভদ্রা। জীবন বলে একজন ছিল, শুনেছিলুম।

সাতু। আরে না, না, জীবন তো হোল সরোজবাবুর

ভায়ে। জীবনকে জানি না? বাঃ, জীবনের কাকা কাজ করতে ভাঙলি জেন্সের বাড়ী। আপিসের টাকাকড়ির কী গোলমাল করেছিল সে অনেক কাণ্ড। আমার সঙ্গে আলাপ হয় তাঁর বিয়ের সময়। ওঃ, সে কি আজকের কথা। বিয়ে করেছিল হরকালী মিত্রের মেয়েকে। ঐ বিয়ের পরই তো হরকালী চাকরী করে দিলে, তারপর সে বউ গত হলে, ঐ হরকালীরই এক মাসীর—

ভব। (চীৎকার করে) সাতুমামা, আই সে (I say), সাতুমামা, আমার মাথা ঘুরছে, আমার—

(ডাঃ বোসের প্রবেশ। ভক্তার পলায়ন)

ভব। এই যে, আসুন।

ডাঃ। কার বমি হচ্ছে? সেই মেয়েটির?

ভব। আজ্ঞে না, ও অস্ত্র কথা হচ্ছিল। আপনি বহন।

ডাঃ। কই, মেয়েটি কই? আর দেরী করবেন না।

ভব। আজ্ঞে না, আমি নিয়ে আসছি। [প্রস্থানোচ্চত সাতু। ফেলু, একে তো চিন্তে পারলুম না।

ভব। ইনি ডক্টর—(ডাক্তারের দিকে চাইলো)

ডাঃ। বোস।

ভব। ডক্টর বোস। শিবুকে দেখতে এসেছেন। ইনি আমার আত্মীয় সাতকড়িবাবু, এই কাছেই থাকেন।

(প্রস্থান)

[ডাক্তার ও সাতকড়ি নমস্কার করলো। ডাক্তার খবরের কাগজ নিল]

সাতু। মশায়ের নিবাস?

ডাঃ। কোলকাতাতেই থাকি।

সাতু। তা নয়, মশায়ের আদি বাড়ি কোথায়?

ডাঃ। ওদেশ। দেশ সিন্ধুরে।

সাতু। সিন্ধুর? আমাদের 'হরিপাল সিন্ধুর। তারকেশ্বর লাইনে। বেশ, বেশ। সিন্ধুরে আমি গিয়েছি যে। বোলেদেরই বাড়ি, কৃপানাথ বোস, বেলির স্টোরকিপার ছিলেন, ছোটো ভাই নয়নাথ বোস, চুঁচড়া কোর্টের পেশকার, অতি ধর্ম ভীক লোক, উপরির টাকাটি এনে প্রত্যহ ঠাকুরঘরের চৌকাঠ স্পর্শ করিয়ে তবে বাসে তুলতো। তার ছোট স্বরনাথ, আপান থেকে বেনারসী সিন্ধু আনিয়ে কেঁপে উঠলো। চেনেন নিশ্চয়। কৃপানাথ

বাবু ছেলেয় বিয়ে দিয়েছিল শ্রামবাজারের মিত্রবর্গের বাড়ী। সেই ফ্যামিলি তো।

ডাঃ। আজ্ঞে না, কৃপানাথ বোস বা তাঁর ফ্যামিলিকে আমি চিনি না।

সাতু। দেশের দিকে যাওয়া আসা নেই আরকি। থাক মেয়ে যে দেখতে এসেছেন মশায়, ও মেয়ে দেখতে হবে না। বড়ো ভালো মেয়ে, যেমন নম্র, তেমন ধীর। আজ-কালকার মেয়ের মত মোটেই নয়। কে বলবে কলেজে পড়া মেয়ে। রাস্তা দিয়ে যায়, মাটির দিকে চেয়ে। অতি লক্ষী মেয়ে।

(নেপথ্যে দরজার পর্দার আড়ালে ভবদেব ও ভক্তার কর্ণস্বর)

ভব। (নেপথ্যে) আচ্ছা, কীদেখিস কেন? আচ্ছা তুমি আর বকাবকি করে! না!

ভক্ত। (নেপথ্যে) দেখতে এসেছেন, সেই রাগে কান্না। আমি কি বকেছি নাকি? বলুন লাল জর্জেট খানা পর—

ভব। (নেপথ্যে) আহা, ধামো না।

[ভবদেব ও শিবানীর প্রবেশ। শিবানী শ্রামবর্গের স্ত্রী মেয়ে। স্বল্প আভরণে, অনাড়ম্বর সাজ। পর্দার আড়ালে ভক্তা।]

ভব। এইটি আমার ভাইঝি শিবানী। (জনান্তিকে) শিবু নমস্কার কর। এবার বি-এস-সি দিয়েছে। (ষ্টেবৎ হেসে) ও বৈজ্ঞানিক হবে, ওসব কান্ডি উপভাস ভালোবাসে না।

ডাঃ। চোখ ছলছল করছে কেন—

সাতু। ও কিছু নয়। মেয়ে বড় ভালো, বুঝলেন ডাক্তারবাবু যেমন স্ববুদ্ধি, তেমন শাস্ত।

ডাঃ। (ভীক দৃষ্টিতে শিবানীর মুখ দেখিতেছিল) স্ববুদ্ধি শাস্ত মেয়েদেরও শরীর খারাপ হয়ে থাকে। (শিবানীকে) বহন।

(শিবানী বসলো)

ডাঃ। শরীর ভালো নয় কেন? এ বয়সে এরকম রোগা হোলে তো চলবে না।

সাতু। আজ্ঞে না, এত রোগা ছিল না। এই পূজোর সময়ে আমার বাড়ী গিয়ে—

[ভবদেব ও শিবানী বিম্বিত দৃষ্টিতে চাইলো]

ভব। সাতু মামা।

সাতু। সেখানে পুকুরের জল, বুঝলেন না ?

ভব। সাতু মামা, ওতো আমার বাড়ীতে—

সাতু। (হাত তুলে) হাঁ, সে আমি জানি, থামো না।

[সাতু চোখ টিপিলেন, ভবদেব বিম্বিত হয়ে
চুপ করে গেলেন।]

ডাঃ। হ। ম্যালেরিয়া ?

সাতু। আজ্ঞে না, না। ম্যালেরিয়া-ট্যালেরিয়া কিছু
নয়। এই একটু ইয়ে আর কি।

ডাঃ। এখনও কি জ্বর হচ্ছে ?

সাতু। কই না, জ্বর টর ওর কিছু নেই।

ডাঃ। খাওয়া দাওয়া কী রকম ? হজম ঠিক হয় ?

সাতু। কতগুলো খেতে পারো ?

সাতু। হাঃ, হাঃ, হাঃ, লেকখা আর বলবেন না।

[দরজার কাছ থেকে ভদ্রার সংকেত এলো]

ফেলু, বোমা কী বলছেন শোনো।

[ভবদেব দ্বারের কাছে গেল]

ডাঃ। দেখি হাতটা। [শিবানীর একটি হাত
টেনে নিয়ে নাড়ী দেখলো না, নখ টিপে দেখলো]

ভব। (কাছে এসে) ওর খাওয়াটা বড় কম। যত
বড় হচ্ছে ততই খেন খাওয়া কমছে। তার ওপর সম্প্রতি
পরীক্ষা গেল, তার তাড়ায়—

সাতু। য়ায়। সেইটাই হলো আমল রোগ। পরীক্ষা
দেবে, না থাকে ? নইলে স্বাস্থ্য ওর বরাবরই বেশ ভাল।

কিন্তু হলে হবে কী, রাস্তিরে ঘুম নেই, দিনে খাওয়া নেই—

ডাঃ। খাওয়া দাওয়া কমছে কেন ? ফিল্ম ঠার
হবার সাধনা চলছে বুঝি ?

[শিবানী মুহূর্তে হেসে মাথা নীচু করলো]

সাতু। (উচ্চ হাস্য করে) আজ্ঞে না, না ওসব নেই,
ঐ ব্যায়োস্কোপ, কি থিয়েটার, কি নেচে গেয়ে বেড়ানো—
ওসব নেই। ঐযে বহুমুখ, আজকালকার নভেলিয়ানা
মোটো নেই।

ডাঃ। না, না, খাওয়া কাজটাকে অবহেলা করবে
না। জাতির ভবিষ্যৎ তোমাদের হাতে, কত কাজ করতে
হবে।

সাতু। সে বলতে হবে না ভক্তারবাবু, কাজ কর্ণে খুব
দড়ো আছে। লেখাপড়া তো করছেই, তাছাড়া সেলাই
ফোঁড়াই, রান্না রান্না, বুঝলেন, যাতে দেবেন—

ডাঃ। জম্। [হঠাৎ শিবানীর চোখের কোল
টেনে দেখলো। শিবানীর জ্বকুণ্ডিত হলো। ভক্তার
মাথা নাড়লো 'না' সূচক] উহঃ খাওয়া বাড়িতে হবে।
যা তা খাওয়া নয়, সাবস্ট্যানশিয়াল ফুড (Substantial
food) বুঝছো তো ? ক্ষুধা কেমন ? ক্ষুধা ?

সাতু। আজ্ঞে, ওইখানেই তো—

ডাঃ। (সাতুর দিকে ফিরে) কাকে দেখতে এসেছি ?
আপনাকে ?

সাতু। আজ্ঞে না। (অপ্রস্তুত হয়ে)

ভব। বল না, যা জিজ্ঞেস করছেন উত্তর দে।

শিবানী। ক্ষিদে—যেমন হয় তেমনই তো—

ডাঃ। তার মানে, বেশ প্রথর ক্ষুধা নেই : ঐটের
অভাব। জল কতটা খাও সারাদিনে ? [শিবানী নীরব]
জল প্রচুর খেতে হবে। ইন্টারনাল ওয়াশিং (internal
washing) ভালো করে না হলেই, নানা ব্যাধি এসে
জন্মে। কথাটা বুঝলে তো ? ঘরবাড়ী নিত্য বেশ করে
না ধুইলে জঞ্জাল জমতে থাকে, সায়েন্স পড়েছ। শরীরটা
কত বড় আর কী জটিল ল্যাবোরেটরী তা বুঝেছ তো ?
বোজ ধুতে হবে। জল থাকে, ২৪ ঘণ্টায় অন্ততঃ আড়াই
সের জল থাকে। জিবটা বার কর দেখি। [শিবানী জিব
বার করলো না]

বায়োয়েল্‌স্‌ মুভ (bowels move) করে প্রত্যাহ ?
রেগুলার হাবিট (regular habit) ? কী, লজ্জা করছে
বলতে ? না, না, লজ্জার কিছু নেই। এও ভো সায়েন্স্‌,
শরীরটা ল্যাবোরেটরী বইতো নয়। বিশেষ করে মেয়েদের
শরীরে আবার একটা স্পেশাল (Special) ল্যাবোরেটরী
আছে, তার একটা স্পেশাল ফাংশন (function) আছে।
আচ্ছা (ভবদেবকে) উনি বলতে চাইবেন না, আপনার
জীকে জিজ্ঞাসা করে আনুন তো—(শিবানী জ্বত-
পদ্মে পলাইল) (সবিস্ময়ে) এ কী ? চলে গেলেন
কেন ?

ভব। (মুহূর্তে হেসে) সংস্কার। যতই সায়েন্স পড়ুক,
সংস্কার থাকে কোথা ? আপনার প্রশ্নগুলো, মাপ করবেন

ডক্টর বোস, একটু অ-সাধারণ, মানে আন্ ইউজুয়াল (un-usual) হচ্ছিল না কি?

ডাঃ। মোটেই নয়, মোটে অভিনারী কোম্পেন্স (most ordinary questions), যা সকলই করে থাকে।

সাতু। তা বলে, অতো বড় মেয়েকে দেখতে এসে মশায় ওসব প্রশ্ন কেউ করে না। ই্যা, প্রশ্ন করেন, লেখাপড়া, গানবাজনা, এমন কি নাচও।

ডাঃ। তার মানে? লেখাপড়া গানবাজনার খবর নিয়ে ডাক্তাররা স্বাস্থ্য পরীক্ষা করবেন, আপনি কি এই বলতে চান?

সাতু। না, তা নয়। স্বাস্থ্য পরীক্ষার কথা অবশ্য আলাদা। তবে ই্যা, আপনি ডাক্তার লোক, তাই বুঝি মেয়েকে দেখতে এসে আগে তার স্বাস্থ্য দেখেন, তারপর অন্ত কথা বলেন? তা অবশ্য ভালো, ভালো কথা।

[ডাক্তার কিছু বুঝতে পারে না, নীরবে চেয়ে আছে]

ভব। ঐটেই তো আসল কথা, সাতুমামা। অন্ত কথা সব বাজে কথা, দোকানদারি কথা। অথচ ঐ কথাটাই কেউ তেমন বলেনও না, ভাবেনও না। কেবল—রঙচঙ করা একটা পুতুল দেখেই সন্তুষ্ট হ'ল। তারপর বিয়ের পর নাইনটি নাইন পারসেন্ট (99%) বউ নিয়ে হাংকাতের অন্ত থাকে না। বল?

সাতু। তা ঠিক বলেছ। খাটি কথা। এই আমার বড় বোমার কথাই ধর না। জানা ঘর, আমার ছোট শালী গৌরীই তো সন্তুষ্ট করলে, বড় বোমা তো গৌরীর আপন মামা-খুন্তরের, মানে আমার ছোট ভায়রাভাইএর—

ভব। (হাত তুলে) সাতুমামা প্রিজ। [সাতু খেমে গেল] তুমি বরঞ্চ এঁর কাছে পাঁত্রটির সব খবর নাও।

সাতু। ই্যা, ই্যা। আচ্ছা, পাঁত্রি আপনার কে হ'ল ডাক্তারবাবু? কী করেন?

ডাঃ। পাঁত্রি? কিসের পাঁত্রি?

সাতু। এই বিবাহের পাঁত্রি। পাঁত্রের সবকিছু কিন্ত চান্নতে চাইছেন এঁরা।

ডাঃ। পাঁত্রি!! বিবাহ? এসব কথা উঠছে কেন, আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না।

সাতু। (সহাস্তে) বেশ মশায়। এগেছেন আপনি

মেয়ে দেখতে আর বিবাহের কথা উঠবে না, পাঁত্রের কথা বলবেন না। আপনি যে হাসালেন ডাক্তারবাবু।

(মুহ হাসি)

ডাঃ। তা হাসুন। কিন্তু আপনারা কি তাই মনে করেছেন নাকি? আমি বিবাহের অন্ত মেয়ে দেখতে এসেছি? না, না, না, না, আমার তো সে রকম কোনও প্রয়োজন নেই। আপনারাই খবর দিয়েছিলেন, তাই—

ভব। প্রয়োজন নেই? বলেন কী? তাহ'লে আপনি কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন কার জন্তে?

ডাঃ। আমি কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলুম পাত্রীর জন্তে? কী বলছেন আপনি?

ভব। সে বিজ্ঞাপন কি আপনি দেননি? কিন্তু আমার জ্ঞী যে বলেন, তাহ'লে কি ঠিকানার ভুল—দাঁড়ান।

(ভবদেব ভেতরে গিয়ে একটা ছেঁড়া ঠোঙা নিয়ে এলো।) এই তো। এটা কি আপনার ঠিকানা নয়? ১৭ নম্বর, যজ্ঞেশ্বর গ্যাটারির লেন—

ডাঃ। ই্যা, আমারই য়্যাড্রেস (address)। দেখি, কাগজখানা। (কাগজ নিয়ে পড়ে) মাই গুডনেস! (My goodness) এ বিজ্ঞাপন আমি দিয়েছিলুম মাসছয় আগে।

সাতু। তবে তো মশায়, ভুল নয়। মেয়ে তো একটি প্রয়োজন আছে আপনার। নাকি, সে হয়ে গেছে?

ডাঃ। না, সে হয়নি বটে। একটি মেয়ে পেয়েছিলুম, কিন্তু সে আমার স্যুট (suit) করলো না। কিন্তু সে তো বিবাহের—

সাতু। ও আর কিছু টিক্ত নয়, ডাক্তারবাবু। আমাদের মেয়েটি নিতে হবে। আপনারা সিন্ধুর বোস, এরাও বউ বাজারের মিস্ত্রি, আর বড়ো ভালো মেয়ে। সর্বোপরি বড় কথা, এমন যোগাযোগ যখন হয়ে গেছে। তাবুন্দিকি একবার, ৬ মাস আগের বিজ্ঞাপন।

ভব। সে মেয়ে খুঁজছিলেন যার অন্ত, তিনি কী করেন?

ডাঃ। আমার নিজেরই প্রয়োজন।

(ভবদেব ও সাতু বিষয়ে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন।)

সাতু। আপনার—নিজের—প্রয়োজন?

ডাঃ। হ্যা, কিছুদিন থেকে দেখছি, একা সবান্দক দেখাশোনা করে উঠতে পারছি না। হিসেবপত্র রাখা, চিঠি লেখা, ছোটগুলোকে পড়াতেও পারবে একটি এডুকেটেড ইন্টেলিজেন্ট গার্ল (educated. Intelligent girl) খুঁজছিলুম।

সাতু। মশায়ের সংসার কতদিন গত হয়েছেন?

ডাঃ। সংসার? ও, ইউ মিন (you mean) আমার স্ত্রী? (মুহু হেসে) না, তিনি আগতও হ'ননি, গতও হননি। তিনি থাকলে আর ভাবনা ছিল কী?

সাতু। তাহ'লে ঐ যে ছোট ছেলেগুলোর কথা বলেন—ওঁরা কার ছেলে?

ডাঃ। ওদের ইতিহাস খুব প্রকাশ্য বা পরিকার নয়—বোধহয়। থাক, (ভবদেবকে) ভালো কথা, আপনার ভাই-ঝি বি-এস-সি পরীক্ষা দিয়েছেন বলেন না? মেয়েটি ইন্টেলিজেন্ট, সোবার (sober), একটু রোগা বটে, তা হোক। আমার মনে হয় শি উইল ডু (She will do).

সাতু। আপনি কী বলছেন মশায়?

অবশ্য যুগা বর্জন করতে হবে। ভালোবাসতে হবে, স্নেহ প্রেম দিয়ে বশ করতে হবে। একবার ডাকুন তো দু'টো কথা—

ভব। মাপ করবেন, আমি সম্মত নই আপনার সঙ্গে আমার ভাইঝির বিবাহ দিতে।

ডাঃ। কী বিপদ! আবার বিবাহ? এমন বিবাহ পাগল লোক তো দেখিনি আপনার মত। বিবাহ করতে কে চাইছে ওঁকে? আমি ব্যাচিলর লোক, বুড়ো বয়সে বিবাহ করতে যাবো?

সাতু। তবে?

ডাঃ। কেন, বিবাহ ছাড়া কি মেয়েদের আর পথ নেই? Independent থাকবেন, মিসট্রেস হিসেবেই ধরুন টাকাকড়ি, এস্টাব্লিশ্মেন্ট (establishment)—

ভব। হাউ ডেয়ার ইউ! (How dare you)! আপনার পক্ষা তো কম নয়। আমার বাড়ীতে বসে নিলক্কের মতো—[উত্তেজনার কথা শেষ করতে পারল না]।

সাতু। ছি, ছি, ছি।

ডাঃ। (বিশ্বর বিমূর্তভাবে ভবদেবকে) আশাকে বলছেন? আমাকে আপনি এরকম অপমানকর কথা বলছেন কেন?

সাতু। আর কথা বাড়াবেন না মশায়। যান, যান, সরে পড়ুন। ছি, ছি, ছি, ছি, ভদ্রলোকের পোষাক পরে এমন ইতর মন। ছিঃ, ছিঃ।

ডাঃ। (সাতুকে) আপনিও আমাকে অপমান করছেন? কেন—কেন?

সাতু। মার খেতে না চান তো সরে পড়ুন। অপমান! ওঁর আবার অপমান! কই উঠলেন?

(ডাক্তার এতক্ষণ বিমূর্ত হয়ে উঠতে তুলে গিয়েছিল এখন উঠলো।)

ডাঃ। (দুরু স্বরে) আপনারা বাড়ীতে ডেকে এনে আমাকে অকারণে অপমান করলেন। (মাথা নেড়ে) এটা ভালো করলেন না। আমি যাচ্ছি। কিন্তু এটা আপনারা মোটেই ভালো করলেন না। হয় আপনারা খারাপ লোক, নয় তো আপনাদের মাথার ঠিক নেই। আমি চম্ভম। [ক্রত প্রস্থান]

সাতু। ছি, ছি, ছি, ছি, দেশটা কোন্‌দিকে যাচ্ছে বলতো ফেলু? বয়স হয়েছে, ভদ্রলোক, স্বচ্ছন্দে বসে মিসট্রেস হিসেবে—

ভব। থাক, থাক সাতুমামা, ওসব অন্তার কথাগুলো আর রিনিউ করো না। [ডাক্তারের পুনঃ প্রবেশ]

সাতু। আপনি যাননি?

ডাঃ। গিয়েছিলুম, ফিরে এলুম। মনটার বড় কষ্ট হচ্ছে। কেউ দুর্ভাগ্য বলে বড়ো কষ্ট হয়। (ভবদেবকে) বলছেন অন্তার কথা, কী অন্তার কথা বলেছি আমি? আপনার মেয়ে যদি বি-এস-সি পাশও করেন, তাতেই বা কী! আরো তো তিনজন মিসট্রেস আছেন আমার, তারাও সবাই গ্রাডুয়েট—

সাতু। তিনজন আছেন মিসট্রেস? বলেন কী?

ডাঃ। হ্যা, এসে দেখে যেতে পারেন। তারা সব এক্সপিরিয়েন্সড (experienced)! ইনি তো কাঁচা। একজন আছেন হেডমিসট্রেস—

ভব। ইউ মিন্‌স্‌ মিসট্রেস?

ডাঃ। Or what? আপনারা কী মিন্ করেছিলেন?

ভব। থাকে, সে কথা আর কাজ নেই!

ডাঃ। ফুলটা ঠিক সাধারণ ফুল নয়, উল্লোকদের ছেলেদের ফুল নয়। যাদের বলে স্ট্রিট অর্চিন্স (street urchins)। বাপ-মা নেই, কিনা থাকলেও সেদিকটা বেশ পরিকার নয়, জাতের বা ধর্মের ঠিক নেই—সেই সব ছেলেদের ফুল। সেই জন্তেই বলছিলুম ঘৃণা করলে চলবে না, ভালবেসে তাদের—

সাতু। আপনি ফুলের মাষ্টারগী চান? এ ছি, ছি ছি ছি।

ডাঃ। কী আশ্চর্য্য! ফুলের শিক্ষয়িত্রী চাই। তাতেও ছি ছি ছি বেশ তো আপনাদের মেয়ে না আসেন, নাই আসবেন। কিন্তু ছি ছির কী আছে? না আপনারা কিছুতেই ভাল লোক নন। আপনাদের সঙ্গে আমার কথা কয়ে কাজ নেই। [চলে যেতে উত্তত]

ভব। (তাড়াতাড়ি কাছে এসে) একটা কথা শুনে যান, ডক্টর বোস।

ডাঃ। (স্বরের কাছে ফিরে) না, আপনারা বড় রুঢ় কথা বলেন, সব কথাতেই বলেন ছি ছি; উনি বলেন মাষ্টারগী। কথাটাকে একটা বিশ্রী অশ্রদ্ধার ভাব মাথানো আছে। কেন, শিক্ষয়িত্রী বলতে পারেন না?

সাতু। (অপ্রতিভ ভাবে) আরে মশায়, ঐ হ'লো। আমরা চিরকালই ঐ বলে এসেছি; অশ্রদ্ধা করবো কেন? খামোকা মানুষকে অশ্রদ্ধা করতে পারি?

ডাঃ। খুব পারেন। এইতো আমাকে বলেন—মার খেতে না চান তো সরে পড়ুন। নিলজ্জ, ইতর, কী সব বলেন। আপনারা চিরকাল মানুষকে এইসব বলে আসছেন? তা বলুন। আমি চলুম।

ভব। সেই জন্তেই আপনাকে অপেক্ষা করতে বলছি। (হাত জোড় করে) আপনি আমাদের মাফ করুন ডক্টর বোস, আমি জোড়হাতে মাফ চাইছি।

ডাঃ। (সবিস্ময় আনন্দে) আপনি মাফ চাইছেন? আমার কাছে?

ভব। আজ্ঞে হ্যা, বার বার জোড় হাতে মাফ চাইছি। আমরা অভ্যস্ত অপরাধ করেছি। উনি যে ছি-ছি বলছিলেন সে আমাদের নিজেরই প্রতি। আমরা নিদারুণ তুল করছি।

ডাঃ। (ভবদেবের হাত ধরে) জাটস্ অল্‌রাইট।

আর বলতে হবে না। (হাসিমুখে) কিছু একটা তুল করেছিলেন না? আমিও তাই ভাবছিলুম। কেন এমন করে আমাকে অপমান—যাক্ যাক্। আপনি খুব ভালো কাজ করলেন, তুল স্বীকার করে আপনার কর্তব্য করলেন। এই তো চাই। আর উনি। উনিও তো তুল করেছিলেন। তা হ'লে ঠর-ও উচিং তুল স্বীকার করা। অবশ্য যদি তুল বলে বুঝতে পেরে থাকেন।

ভব। সাতু মামা।

সাতু। হ্যা, হ্যা। আমারও ওটা ঠিক—মানে প্রথমটা হ'লো কি জানেন—

ডাঃ। (কথা কহিতে কহিতে কাছে এসে) হাঃ, হাঃ হাঃ! ওর অবস্থাটা দেখছেন? বুঝতে পারছেন তুল করেছেন, কিন্তু সেটা স্বীকার করতে লজ্জা বোধ করেছেন। এসব ফল্‌স্ (false) লজ্জা। (গভীরভাবে) এ-ও ভালো নয়। তুল করতে, রুঢ় কথা বলতে কৃষ্ঠা বোধ করি না, অথচ তুল স্বীকার করতে, নরম কথা বলতে, কৃষ্টিত হই, লজ্জিত হই। এ ভালো নয়, ভালো নয়। জিবকে সে শিক্ষা দিইনি কিনা।

সাতু। বিলক্ষণ! অবশ্যই স্বীকার করবো। আমার তুল হয়েছিল ডাক্তারবাবু, I am sorry! আমি—

ডাঃ। আর বলতে হবে না। আর বলবেন না। আপনারা চমৎকার লোক। (বলতে বলতে চেয়ার টেনে বসে) আজ বড় শুভদিন। যেখানে একটা মনো-মালিগ হয়ে তা দূর হয়ে যায়, হৃদয়ের মিল হয়, সেখানে মঙ্গলময়ের আবির্ভাব হয়। হ্যা, আমারও কর্তব্য বাকী রয়েছে। আমি আপনাদের দুজনের কাছে মার্জনা চাইছি।

ভব। না, না, আপনি তো কিছু অগ্রায় বলেন নি।

সাতু। সেকি কথা মশায়?

ডাঃ। হ্যা, অগ্রায় করেছি বইকি। আমি আপনাদের খারাপ লোক বলেছিলুম, আমাকে আপনারা মাফ করুন, আমি তুল বুঝে—

ভব। ওকথা বলবেন না, আপনার কোন দোষ হয়নি।

সাতু। আপনি অত করে বলছেন কেন ডাক্তারবাবু,

ওরকম তো হয়ই মাহুনের। তবে বলি শুনুন, এই সেদিন আমার এক ভাগ্নে এসেছে, তার কাকার সঙ্গে— কাকা মানে আত্মীয় ভগ্নিপতির আপন ভাই নয়, পিসতুতো ভাই। স্বখীরের কথা বলছি বুঝলে কেলু—পিসতুতো ভাইও বলতে পারেন, পরিবর্তে বিবাহ বুঝলেন না? এক দিক দিয়ে পিসে, আর একদিক দিয়ে—

ভব। I say সাতুমামা, I please.....

(ডাক্তার কিছু না বুঝে ভদ্রতার খাতিরে সাতুর কথা শুনছিল, এখন বলো)

ডাঃ। আপনার কথাগুলো শুনে, আমার ভাল লাগছে, সাতুবাবু, কিছু ঠিক বুঝতে পারছি না। তা হোক। আমি এইবার বাই।

ভব। আজ্ঞে না, আমার একটি অসুস্থরোগ আছে, যদি বিশেষ কাজের ক্ষতি না হয়, তাহ'লে দয়া করে আর একটু বসুন।

ডাঃ। না কাজের ক্ষতি হবে না কিছু। Call যা ছিল সেয়ে এসেছি।

ভব। তাহ'লে দয়া করে একটু মিষ্টি মুখ করতে হবে।

ডাঃ। মিষ্টি মুখ? কেন? ওসবের কী প্রয়োজন?

সাতু। আহা, বসুন, বসুন। লোকে উপরোধে ঢেঁকি গেলে, আর একটু মিষ্টান্ন বইতো নয়।

ভব। আঃ সাতুমামা, ওটা বলো না। ঐ অসম্ভব নজীরটা সত্য কথা নয়।

সাতু। (সহাস্ত্রে) আরে ওটা একটা কথার কথা। সত্যিই কি আর কেউ ঢেঁকি গিলেছে, না গিলতে পারে। ও আমরা বলে আসছি চিরকাল, কী বলেন?

ডাঃ। কিছু মিষ্টানের প্রয়োজনটা কী?

সাতু। প্রয়োজন আর কী, মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ। মানে ওটা যত হয় ততই ভালো। এই কথা।

ভব। না ডক্টর বোস, যেদিক দিয়েই দেখুন, আপনার কাছে আমাদের একটা ঋণ হচ্ছেই।

ডাঃ। ঋণ? আমার কাছে? কী রকম?

ভব। দেখুন, আপনি জানেন আপনি এখানে রোগী দেখতে এসেছিলেন। [ডাক্তার হাসিমুখে মাথা নাড়লো] তাহ'লে আপনার ফিস্ (fees) পাওনা হয়। এদিকে

আমরা মনে করেছি আপনি স্বাক্ষর করে বলে মেয়ে দেখতে এসেছেন। স্মরণাঃ—

ডাঃ। (শিশুর মত সরল হাসি) হাঃ, হাঃ, হাঃ, ভারী চমৎকার ভুল হয়েছিল তো। বা, বা। মেয়ে দেখতে এসেছি—ও ও, তাই বুঝি মেয়েটি কাঁদছিল বলছিলেন।

ভব। স্মরণাঃ আপনারা একটু জলযোগ করানো আমাদের আনন্দের ঋণ।

সাতু। সে আমার বৌমাটি নিশ্চয় সব ব্যবস্থা করে রেখেছেন। শুভকর্মে স্মরণাতে মিষ্টিমুখ না করিয়ে কি উনি ছাড়তেন? আমাদের বৌমাটিকে আপনি চেনেন না। হবেন না কেন? কত বড় ঘরের মেয়ে! এখন বলুন, ফিজ্ (fees), না মিষ্টান্ন? [হাস্ত]

ডাঃ। ভারী চমৎকার যুক্তি। বাঃ। তাহ'লে বলি। “মিষ্টি মুখের” টানে নয়, আপনারা “মিষ্টি” মুখের টানে বসছি। আপনারা কথা বড় ভালো লাগছে। বড় ভালো লোক আপনারা।

সাতু। (খসী হয়ে) ভাল লাগতেই হবে। ফেলু, তুমি একবার দেখ ভেতরে গিয়ে, চা-টা—[ভবদেব ভেতরে গেল] বলছি, ভালো তো লাগবেই। আপনি নিজে ভালো লোক যে। এই কথা বলেছিলুম সাধুমল্লিককে। বিপর্যয় বগড়া হয়েছে, তুলকালাম ব্যাপার। রাগে চারটে হয়ে ফুলে আছে সাধুমল্লিক। কেউ কথা কইতে পারছে না। আমি গিয়ে একটি কথা। শ্রেফ একটি কথা বলুম, বাস্। সাধুমল্লিকের নাম শুনেছেন তো? হৃদয় লোক ছিল মশায়। হাতে মাথা কাটতো। হোলো বা গাঁহুদ আশুনই লাগিয়ে দিলে। তবে মনটা ভালো ছিল, বুঝলেন না, মনটা ভালো ছিল।

ডাঃ। আজ্ঞে না, মনটা ভালো, গাঁহুদ লোকের ঘরে আশুন লাগিয়ে দিলেন, আমি বুঝতে পারলুম না।

সাতু। ঐ রকম আর কী, ঐ রকম। হাঃ হাঃ— ভালো কথা ডাক্তারবাবু, আপনার ইচ্ছার অন্ত্রে ঐ যে মিষ্টান্ন—মানে শিকরিত্রী খুঁজছেন, তা সে কাজটি কি পূরুষ হ'লে চলে না? মানে, আপনার হিসেবটি সব রাখা, চিঠিপত্র লেখা, তারপর ধরুন সব ম্যানেজ (manage) করা,—ওসব কাজ, মশায়, বাই বসুন, আপনার মেয়ে-ছেলের, কি ছেলেরা ছেলেবর কাজ নয়। বেশ বয়স একস্-

পিরিয়েন্সড্ (experienced) পাকা লোক চাই।
য়া?

ডাঃ। ঐ জন্তেই বয়স্ক লোক চাই না। বয়স হলেই
মাছুষ বড়ো বেশী পাকা হয়ে যায়। নানা রকম জট
পাকিয়ে বসে মনের মধ্যে। জাতের জট, ধর্মের জট, মান-
সম্ময়ের জট। [ঘাড় নেড়ে] ছাড়ানো যায় না। তা ছাড়া
বহুদিন ধরে বাঁকা পথে চলে আর ডিপ্লোমেটিক (diplo-
matic) বাঁকা কথা কয়ে সোজা পথে পা পড়ে না, সোজা
কথা মুখে বেধে যায়।

সাতু। ঐ কথাটা মশায়, সাতু সিংগিকে বলতে
পারবেন না। সাঁইত্রিশ বছর চাকরী করে রিটারার
(retire) করেছি, একটি দিন লেট (late) নেই, একটি
লালকালির আঁচড় পড়েনি খাতায়। Wood Craফ সায়েব
বলেছিলেন—“Sinha's den will lie vacant for
ever,” সিংহের গঙ্গর চিরকাল শূণ্য পড়ে থাকবে। হাঃ,
হাঃ! আহা, কী সব সায়েব ছিল মশায়, সায়েবের মত
সায়েব। হবে না কেন? কত বড়ো ঘরের ছেলে। ওর
ঠাকুদার বাপ চৌদ্দ বছর বয়েসে খবরের কাগজ বিক্রী
করতো রাস্তায় রাস্তায়। আর চুয়ার্লিশ বছর বয়েসে হ'লো
Sir Laucalat Wood Craফ Bart, এদিকে মাতুলবংশও
কম নয়। ওর মামা ছিল Brigadier General—V. C.
পেয়েছিল। মস্ত ঘর ঠরা—[ভবদেবের প্রবেশ। পিছনে
জলখাবার ও চায়ের ট্রে হাতে শিবানী]

ডাঃ। এসো, মা এসো, আর তো বিয়ের ভয় নেই।
আমি মেয়ে দেখতে আসিনি। হাঃ, হাঃ, হাঃ। তাছাড়া
আমার মতে এখন অন্ততঃ বিশ বছর ছেলেমেয়েদের বিবাহ
না করা উচিত। [শিবানী মুহূ হাসিল] দেশে
লোক যত আছে, কাজের লোক তত নেই। কী বল
মা।

ভব। ঠিক বলেছেন। এ বিষয়ে শিবু আপনার সঙ্গে
সম্পূর্ণ একমত। ও তো বিয়ের নাম করলেই পা ছড়িয়ে
কাদতে বসে। হ্যাঁ, সাতুমামা, কার কথা বলছিলে?

ডাঃ। উড্ ক্রাফ্ট সায়েবরা মস্ত লোক, বড়ো বংশ
তাই বলছিলেন।

ভব। কেন, সম্বন্ধ করছো নাকি সাতুমামা?

সাতু। (হেসে) তা নয়, তা নয়। কথাটা হচ্ছিল,

ডাক্তারবাবু বলেন—আমরা বয়েস হয়ে সোজা পথে চলতে
ভুলে গেছি—

ভব। নিন্ডষ্ঠর বোস, [খাবারের ডিশ এগিয়ে দিল
শিবানী চা ঢালতে লাগলো]

ডাঃ। চা আমি খাই না, আপনারা নিন।

সাতু। (চায়ে চুমুক দিয়ে) সোজা পথ ছাড়া বাঁকা
পথ কোনদিন মাড়াইনি। ঐ যে বল্লম, সাঁইত্রিশ বছর
চাকরী করেছি, কেউ বলুকদিকি সাতু সিংগি কোনদিন
একটি পয়সা—

ভব। আহা, উনি কি পার্সোনালি (personally)
তোমাকে বলেছেন? সাধারণ ভাবে—

ডাঃ। তা personally এবং লিটারালি (literally)
যদি বলি। আমরা অনেকেই সোজা চলতে পারি না।
তা লক্ষ্য করেছেন?

সাতু। তার মানে, আপনি বলছেন আমরা, ধরুন
এই ফেলু, কি আমি, সোজা চলতে পারি না? (হাত
দিয়ে দেখালো সোজা)

ডাঃ। I am afraid, পারেন না। বাড়ীতে গিয়ে,
রাস্তা ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে, আলো নিভিয়ে, চোখ
বন্ধ করে পরীক্ষা করে দেখবেন। দেখবেন, মাথা কতক্ষণ
সোজা পথের ধারণা রাখতে পারে! পা কতক্ষণ সোজা
চলে?

সাতু। বহুত আচ্ছা, বাড়ী যাবার দরকার কী? এই-
খানে দেখাচ্ছি। ফেলু, আসবে নাকি? (নিজে উঠে)

ভব। দেখি আগে তোমার পরীক্ষাটা।

(সাতু উঠে দেয়ালের কাছে দাঁড়াল।)

সাতু। নিন্ড মশায়, চোখ বেধে দিন। শেষে বলবেন—

ডাঃ। চোখ বাঁধবার কোন প্রয়োজন নেই, সাতুবাবু।

সাতু। না মশায়, কাজ কী? শেষে বলবেন আপনি
দেখে দেখে চলেছেন। (বলতে বলতে পকেট থেকে
কমাল বার করে নিয়ে নিজেই নিজের চোখ বাঁধতে
লাগলো)

ডাঃ। এই দেখুন সাতুবাবু, আমি আপনাকে বিশ্বাস
করলেও আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারলেন না।

সাতু। (চোখ বেধে) এইবার ঠাট করছি। ফেলু
সামনে দাঁড়িও না যেন। (দেবদত্তের প্রবেশ। কক্ষ চুল

চোখে চশমা, বেশভূষায় কোন পারিপাট্য নেই। কয়দিন দাড়ি কামায় নাই।)

দেবু। এ কী ব্যাপার? বাবা?

সাতু। কে কথা কইলে ফেলু? দেবু না?

ভব। ই্যা। কি খবর দেবু? বহুদিন তোমায় দেখিনি। ভালো আছো তো?

দেবু। আজ্ঞে ই্যা। এই আসিনি। বাবা, আপনি বাজারে যাবেন বলে গেরিয়েছেন, বৌদি বলেন, ভুলে গেছেন বুঝি?

সাতু। ই্যা, ই্যা, বাজারে যাবো তো। ভুলবো কেন? [বলতে বলতে চোখের দাঁধা খুলে ফেলে] বাঃ ভুলে যাবো কেন? আমি এসেই ফেলুকে বলেছি, “ফেলু, বাজারে যাচ্ছি, আর বসবো না।” বলিনি ফেলু?

[ভবদেব হাসিমুখে মাথা মাড়লো]

দেবু। কিন্তু আপনি এটা কী করছিলেন, কাণামাছি?

সাতু। ও তুই বুঝবি না। ও আমাদের একটা ইয়ে হচ্ছিল।

ভব। (সহাস্ত্রে) বুঝবে না কেন? ঠিকই বুঝেছে। কাণামাছিই তো। সবাই কাণামাছি, কী বলেন ডক্টর বোস? কই, আপনি যে খেলেন না কিছুই?

ভাঃ। এই যে খাই। (একটা মিষ্টি তুলে নিলেন)

দেবু। (সাতুকে) আপনার আর এই রোদে বাজারে গিয়ে কান্না হেঁ। আমিই যাচ্ছি।

সাতু। তা তো ঘাবি। কিন্তু কদিন ছিলি কোথায় শুনি? কোথায় গিয়েছিলি? (ডাক্তার অলের গেলাস তুলে নিলেন)

দেবু। বন্ধমানের ওদিকে। (ডাক্তারকে) আপনি আর কিছু খাবেন না?

ভব। ই্যা, ডক্টর বোস—

ভাঃ। না। This is enough for me এই বেশী হলো। অসময়ে আর চলবে না।

[দেবব্রত খাবার রেকাব টেনে নিয়ে খেতে শুরু করলো]

সাতু। ও কি? তুই হঠাৎ খাচ্ছিস যে!

দেঃ আপনারা তো কেউ খেতেন না। আমার অভ্যস্ত খিবে পেয়েছে। টেনে এসেছি। (শিবানী

অতিশয় বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টিতে দেবুর দিকে চেয়ে উঠে পেল।)

ভব। ই্যা, ই্যা, খাও। খাবে বই কি। আরও কিছু এনে দিক না। (চৈচিয়ে) ওরে শিবু, তোর দেবুদাকে আর কিছু খাবার এনে দেনা!

[দেবু চিবোতে চিবোতে হাত নেড়ে বারণ করলো]

সাতু। ও কী কথা ফেলু! দেবুদা কী হে? শিবানী হলো সম্পর্কে একধাপ উঁচু! তোমার কিছু মনে থাকে না। দেখ না, তুমি হলে গিয়ে আমার মামা, স্ততরাং তোমাদের মেয়ে আমার ছেলের সম্পর্কে পিনী হয় যে! ও কী কথা হে?

ভব। (সহাস্ত্রে) অত সম্পর্ক বিচার আমার মাথায় আসে না।

[দেবব্রত খাওয়া শেষ করে ওঠে]

সাতু। ঐ ছাতার ভেতরে থলেটা আছে নিয়ে যা। শুচ্ছের কতকগুলো আনিসুনি।

[দেবু ছাতার ভেতর থেকে থলেটা নিয়ে যাবার আগে বললো]

দেবু। আপনি একটু পরে বাড়ী যাবেন তো? কিছু আলু আসছে। আমি যদি না এসে পড়ি, নীচেকার মাঝের ঘরে তুলিয়ে রাখবেন, লরীর লোকেরাই তুলে দেবে।

সাতু। লরী? কত আলু?

দেবু। একশো মণ।

সাতু। এক-শো-মণ আলু? কে খাবে?

দেবু। খদ্দেরে খাবে। ফড়েরা নিয়ে যাবে। (সাতুর বিস্মিত দৃষ্টি লক্ষ্য করে) বর্তমানে একটা চালকলে বয়লার ফিট করে দিতে গিয়েছিলুম। সুনলুম আলুর দর কিছু নেমেছে, শিগ্রী চড়বে। তাই মেমারীর হাট থেকে কিছু নিয়ে এলুম। [প্রস্থান]

ভাঃ। আপনার ছেলেটি সোজা চলতে পারে মনে হচ্ছে।

ভব। ই্যা, দেবু বেশ ছেলে। মিথো লক্ষা-টাকার বুলাই নেই, চমৎকার ছেলে!

সাতু। লক্ষ্যারও বালাই নেই, ভদ্রতারও বালাই নেই। জামা কাপড়, হোয়ার হাল দেখলেন তো? পাগল না কম্যানিষ্ট—কিছু বোঝবার ঘো নেই। কোথায় থাকে কি করে, তার ঠিক নেই। একদিন সুনলুম হাওড়ায়

হাটে গামছা বিক্রী করছে। লক্ষীছাড়া ছেলে! লেখা-পড়া ছেড়ে দিল। দিলি, বা হোক একটা চাকরী-বাকরী কর, বিয়ে থা করে ভদ্র লোকের মত থাক, তা নয়। ঐ যে বহন লক্ষীছাড়া ছেলে!

ডাঃ। সাতকোটিকে তো মায়েরা শাস্তিশিষ্ট বান্দালী করে রেখেছেন, সাতুবানু, হুঁ একটা লক্ষীছাড়া সৃষ্টিছাড়া হোক না।

ভব। যা বলেছেন ডক্টর বোস। আমরা ভালো ছেলে হয়েই বা কী করেছি সাতুমামা? কিছু লক্ষীছাড়া ছেলেই আজ দরকার।

ডাঃ। তাই তো লক্ষীছাড়া ছেলেদের নিয়ে স্কুল করেছি আমি। লেখাপড়া শেখাবো বটে, কিন্তু ভদ্র লোক করে তুলবো না, এই আমার উদ্দেশ্য। সাতুবানু বোধহয় খুশী হবেন না—

সাতু। বিলম্ব, এতো ঠিকই বলেছেন আপনি। ভদ্রলোক হয়েই তো মরেছি আমরা। ঠিকই বলেছেন।

ডাঃ। আচ্ছা, এইবার আমি উঠি। অনেকটা বেলা হ'লো, কিন্তু সময়টা বড়ো আনন্দে কাটলো। আজ বড় শুভদিন।

ভব। উঠবেন? আচ্ছা। আর ধরে রাখতে পারি না।

সাতু। আসবেন মধ্যে মধ্যে ডাক্তারবানু, আলাপ হলো যখন, আসবেন। আসা-যাওয়া নিয়েই আত্মীয়তা, আর দেওয়া খোওয়া নিয়েই কুটুম্বিতা—বুঝলেন তো? (হাস্ত)।

ডাঃ। (সহাস্তে) তা কুটুম্বিতা হোল না আত্মীয়তা-ই ভালো। আমি তো এলুম, এবার আপনারা আসুন আমার গুথানে একদিন।

সাতু। নিশ্চয়, নিশ্চয়। যাবো বইকি।

ভব। আপনার স্কুলটা দেখতে ইচ্ছে করছে, যাবো একদিন।

সাতু। তোমার তো করবেই, মাষ্টার লোক। আমরাই যেতে ইচ্ছে করছে।

ডাঃ। একদিন কেন, প্রাক্ষেপার মিত্র? আজই আসুন না। আপনি একজন শিক্ষাব্রতী, অনেক পরামর্শ পাবো আপনার কাছে। আসুন আমার গাড়ীতো রয়েছে, এখন ফিরে আসবেন।

ভব। তা মন্দ নয়। আজ কলেজ বন্ধ আছে। তাহ'লে এক মিনিট, জামাটা গায়ে দিয়ে আসি। ই্যা সাতুমামা, তুমি ঐ বিপিন ডাক্তারের—

সাতু। ডাক্তার নয়, উকিল।

ভব। ই্যা বিপিন উকিলের কাছে কথাটা একবার পেড়ে দেখো।

সাতু। চল না, একদিন তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাই।

আলাপ করে দেখ, কথাবার্তা কণ্ড, কী বল?

ভব। না, না, সাতুমামা, আমি যেতে চাই না। ও সব কথাবার্তা কণ্ডা থেকে আমাদের তুমি রক্ষা কর। শিবু—মনে কর, ও তোমারই ভায়।

সাতু। তাহ'লে তোমাকে একেবারে বিয়ের দিন এসে নেমন্তন্ন করে যাবো, এই বলছো?

ভব। বিয়ের পর আমাদের খবর দিলেও আমার আপত্তি নেই—যদি ওই কথাবার্তা কণ্ডা থেকে রেহাই পাই। একটি স্নহ সচ্চরিত্র ছেলের সঙ্গে শিবুর বিয়ে হয়েছে জানলেই হ'লো। ও, ডক্টর বোসকে দাঁড় করিয়ে রেখেছি। আই ম্যাম সরি (I am sorry), একমিনিট। (চলে যাচ্ছে)।

সাতু। আচ্ছা পাগল। বান্দালীর ছেলে, কথ কইতে ভয়? হাঃ, হাঃ, হাঃ! শুধু কলেজেই কথা কইতে পারো।

ভব। (দরজার কাছে ফিরে) আর তোমার বৌমা কাছেও পারি। জিজ্ঞেস করে দেখো। [এস্থান]

সাতু। [ডেকে বলেন] ফেল, শিবুকে বল ছেলেটাকে পাঠিয়ে দিতে।

ডাঃ। আপনি আসবেন না আমাদের সঙ্গে? আপনারা তো অফিস নেই।

সাতু। আলু আসছে শুনলেন না? আর যাঁ কী করে বলুন? তাইতো বলি বানিগাছে জুড়ে দিয়েছে বিরাম নেই। সংসার-বানির বিরাম নেই।

ডাঃ। ছুটি নিন্ না একদিন। ছুটি নিয়ে আসুন আমার গুথানে। আপনি এলে সত্যি বড়ো খুশী হবে সাতুবানু! আসুন।

সাতু। আপনি বলেছেন কেন, ছুটিই তো চাইনি ডাক্তারবানু, ছুটিই চাইছি। (দীর্ঘশ্বাস সহ) কবে

খালি সেই নোটশের কাগজে তোমার সই করাবার জন্তে
একদিন এসে—

শি। আমার মাথা কিনেছিলে, জানি।

দে। কিনেই যদি থাকি, মূল্য দিয়েই কিনেছি,
ঠকাইনি। নিজের মাথাটি দিয়েছি আগে। থাক,
রাগটাগ এরপর সারাজীবন কোরো, এখন সময় নেই।
লক্ষ্যটি। আড়াইটের সময় ডিসপোজালের [Disposal
এর একটা অকসন্ [auction] আছে, ভালো জিনিষ
কিছু আছে, যেতে হবে। তারপর কাল কিংবা পরশু
C. P. রায়পুর যাচ্ছি, কবে ফিরবো ঠিক নেই। সুতরাং
আজই এবেলায় কাজটা সেরে যেতে চাই। সময় পাবো
না বলে একটা চিঠি লিখে রাখছি।

শি। বেশ তো যাও না রায়পুর। কাল সারবার
তাড়া কিসের?

দে। না, তাড়া অবশ্য আমারও নেই, তোমারও
নেই। কিন্তু দেখতে আসা শুরু হয়েছে, ওটা তোমার
পক্ষে বড় কষ্টকর, আমি বুঝতে পারছি। না, আর দেরী
করা নয়। আজই সেরে ফেলা ভালো। তুমি এগোও।

(শিবানীর কুটিল জা সোজা হলো। সে ধীরে
টেবিলের কাছে এসে দাঁড়ালো এবং বলো)

শি। না, আমি যাবো না।

দে। (তার মুখের দিকে একমুহূর্ত চেয়ে) এটা তো
রাগ করে বলছো না, শিব কী হয়েছে? যাবে না বলছো
কেন?

শি। [ধীরে ধীরে] আমি চলে গেলে মা থাকতে
পারবে না। [তার গলা ভারী হয়ে এলো] আমি যাবো
না, তুমি চলে যাও।

দে। আহা, তুমি তো চলে যাবে না। অন্ততঃ
সম্পত্তি তো নয়। তুমি যেমন আছো, তেমনি থাকবে।

শি। তাছাড়া তোমার বাবার মনে কষ্ট দিয়ে—। না,
না, ও থাক। উনি আমাকে খুব ভালোবাসেন।

দেবু। এরপর আরও ভালো বাসবেন, দেখো।
আর বাবার মনে কষ্ট দেবো কেন? এখন বেজেন্সি করে
একটা হোক না, এরপর বাবা যেমন চান, সেই রকম
বিয়ে একটা করবো, তাহলেই হবে। কী বল? অদৃষ্টে
যদি আমাদের দু'বার বিয়েই লেখা থাকে তা খণ্ডাবে কে

বল। আর তোমারও সে ভালোই লাগবে, ভেবো না।
অধিকন্তু ন দোষায়।

শি। [রাগ করে] তোমার নিজের কথা ঝগড়া,
আমার জন্তে তোমাকে ভাবতে হবে না। দুটো বিয়ে কর,
পঞ্চাশটা বিয়ে কর, আমার তাতে কী? আমি কি
সাহুঁছি নাকি তোমাকে? যাও না।

দেবু। [মুহূর্তে] কথাটা বুঝলে না, তাই রাগ
করছো। দু'বার বিয়ে বলেছি, দুটো বিয়ে বলিনি।
রেজিষ্টার সাহেবের আইনশাস্ত্রের আচারটা যদি মানতে
পারি, পুরুত ঠাকুরের ধর্মশাস্ত্রের আচারও এরপর মানা
যাবে, যদি বাবা তাই চান, বুঝলে?

শি। [স্বর এবার নরম হয়েছে, কিন্তু বিধাগ্রস্ত]
কিন্তু ঐ যে বলে কী সম্পর্কের বাধা আছে—

দেবু। [দৃঢ় অথচ কোমল কণ্ঠে] না, নেই। তোমাকে
তো কত বার বলেছি শিবু, তুমি আমার মাসী, পিনী,
ঠাকুমা, দিদিমা, কিছু হও না। বাবার বৈমাত্রেয় ভায়ের
মামাতো আমার মেয়ে, তার সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্কই
নেই। আজ হবে। [চিঠি ভাঁজ করতে করতে] এই
দেখ, আমার চিঠি হয়ে গেল, তুমি এগোলে না তো,
তাহলে এক সঙ্গেই চল।

শিবা। না, না, তুমি আলাদা এসো। কি-ন্তু, বাড়ী
এসে কী বলবো?

দেবু। [খাবার খেতে শুরু করেছে] তোমাকে কিছু
বলতে হবে না।

শিবা। হ্যাঁ, কিছু বলতে হবে না! নিজে তো
রায়পুরে গিয়ে বসে থাকবে, এদিকে যদি আবার দেখতে
আসে?

দেবু। তা আসবে না। সে ব্যবস্থা, এই করেছি।
এই চিঠিখানা মাষ্টার মশায়কে লিখে রেখে যাচ্ছি। তারপর
রেজিষ্টারের সার্টিফিকেটটা পাঠিয়ে দেবো, বাস।

শি। মেজকাকে লিখলে? ওয়া! তোমার কি
লুজ্জা সঙ্কোচ কিছু নেই? কী লিখলে?

দে। হ্যাঁ, অকারণও দুটো আমার নেই। লিখলুম
মাষ্টারমশাই গৃহভাগ করতে শিবু চান না, আমিও ওসব
নভেলিয়ানার পক্ষপাতী নই। অল্পমতি না পেলে পাছে
অবাধ্য হ'তে হয়, তাই ওটা চাইনি। এখন আশীর্বাদ

চাইছি। এই রকম লিখে দিলুম। হ্যাঁ, আর লিখেছি, হিন্দু ল'য়ে [Hindu Law-এ] বাধে না, সে কথা বাবাকে বোঝাবার ভার আপনার। [একটু চুপ করে থেকে] বাবা বুঝবেন। বাবা তোমাকে খুব ভালোবাসেন। আর দেখ, যা গিয়ে পর্বন্ত বাবাকে যত্ন করবার কেউ নেই। বৌদি একটু অল্প রকম, জানো তো? কিন্তু তুমি আর দেবী করো না। লক্ষীটি। [শিবানী ভেতরে যাচ্ছে] ও কী? ওদিকে আবার কেন? সময় নেই।

শি। পয়সা নিতে হবে না? বা-রে। ট্রামভাড়া চাই না?

[দেবব্রত পকেটে হাত দিল]

না, তোমার পয়সা এখন কেন নেবো। সম্পর্কই নেই।

[প্রস্থান।]

[দেবব্রত নীরবে খাবার খাচ্ছে, একটু পরে শিবানী ভেতর থেকে এলো, হাতে একটা ছোট ভ্যানিটি বাগ]

দেবু। [খেতে খেতে] সামনে একটা ওয়েটিং রুম [waiting room] আছে।

শি। [দরজার কাছে ফিরে দাঁড়িয়ে] আমি ঠা করে বসে থাকতে পারবো না। আমার অত গরজ নেই।

দে। না, গরজ আমার।

শি। আর দেখ, দাড়ি-টাড়ি কামিয়ে একটু পরিষ্কার হয়ে এসো, বুঝলে? কী যে চেহারা হয়েছে!

দেবু। পছন্দ? টু লেট্ [Too late] শিবু! ভাবিতে উচিত, মানে দেখিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।

[শিবানী চলে গেল। দেবব্রত খাচ্ছে, চায়ের কাপ হাতে ভ্রমর প্রবেশ।]

ভদ্রা। [চা টিবিলে রেখে] কোথায় গেল শিবু! বলুৎ দেবুর চা-টা নিয়ে যা। না, আমি পারবো না। তোমার সঙ্গে ওর আর বন্ডো না। কতদিন পরে এলে!

দেবু। [চায়ে চুমুক দিয়ে] নাঃ, ও ঝগড় চলবে সারাজীবন।

ভদ্রা। তাই বটে! এমন পাগল মেয়ে দেখিনি। কথা নেই, বার্তা নেই, ঠক করে একটা পেরাম করে এলো। কেনরে, কেন? উত্তর নেই। কোথায় গেল জানো?

দেবু। হঁ-উ। এই পরীক্ষা-টরীক্ষার মত একটা কিছুর জোঁগাড়ে আছে নিশ্চয়।

ভদ্রা। আর পরীক্ষা দিয়ে কী হবে তা জানি না। যেমন কাকা! মেয়ের বিয়ের কথা কইতে হ'লে গিয়ে জর আসে। তোমার বাবার হাতে শিবুর বিয়ের ভার দিয়ে নিশ্চিন্দা হয়েছেন। আর তেমনি হয়েছে ভাইবো। সন্দেহ করছি শুনলেই মুখ হাড়ি, চোখ ছল ছল। আমার ওপর কী রাগ মেয়ের! আচ্ছা, তুমি বলতো দেবু, শেঠের কোলে বড় হয়েছে, চেষ্টা করবো না? [দেবব্রত ইঁদামতক মাথা নাড়লো] তবে হ্যাঁ—বিয়ের ফল না ফুটলে আমি কি বিয়ে দিতে পারি? বল? [দেবব্রত মাথা নাড়লো] আবার ফল যদি ধর, আজই ফোটে, আজই বিয়ে হয়ে যাবে। আমি কি বন্ধ করতে পারবো? যাঁরা?

(দেবব্রত না হুচক মাথা নাড়লো। চায়ের কাপ রেখে)

দেবু। কী করে করবেন? আপনারাই তো বলেন ওসব অদ্ভুতের কথা। যখন হবার, যেখানে হবার হবেই।

ভদ্রা। সে কথা একশোবার। বিধাতা যেখানে লিখেছেন, যার হাড়ীতে চাল দিইয়েছেন, সেখানেই হবে। তবে কী জানো, বিধাতা তো বরকে আমার দোরে পাঠিয়ে দেবেন না আমার মেয়েকে সাবতে। শিবু বলে, “না দিলে আর বিধাতা কিদের? আমিও মেয়ে কারও দোরে যাবো না।” এমন ধারা কথা শুনেছ কখনো?

দেবু। (মাথা নেড়ে) না, খুব বেশী শুনিনি, তবে শুনতে হবে ক্রমে।

ভদ্রা। যা বলেছ। যে কাল পড়েছে, কত শুনতে হবে। হ্যাঁ, দেবু, তুমি তো অনেক জায়গায় যাও-আসো, কত ফদী-ফিকিরে কত কাজ কর শুনি, শিবুর বিয়ের একটা ব্যবস্থা করে দাও দিকি, লক্ষী হেলে।

দেবু। আপনাকে বলতে হবে না, চেষ্টায় আছি। দেখি। আপনি ভাববেন না, হয়ে যাবে লীগ্‌গিরই।

ভদ্রা। তোমার মুখে কলসন্দন পড়ুক, তাই বল বাবা। এট দেখ, [মুহূর্তে] তোমার বাবা শুনলে বলবেন, ও কী কথা বোমা, দেবুকে বাবা বলছে কী?

দেবু। না, না, আপনি তাই বলবেন। এখন থেকে তাই বলবেন কাকীমা।

ভদ্রা। ওমা, তুমিও কাকীমা বলছো, তোমার বাবা
শুনলে—

দেবু। কাকীমা কী, শিবুর মতন আমারও আপনাকে
মা বলতে ইচ্ছে করে।

ভদ্রা। মা'র জন্তে মন কেমন করে! আহা, বাছারে!

ভদ্রা। উঠছো নাকি? এরই মধ্যে উঠবে? আর
একটু বসবে না বাবা?

দেবু। আজ্ঞে, না। জরুরী কাজ আছে, একজনকে
সঙ্গে এঙ্গেজমেন্ট (engagement) করেছি, সে আমার
জন্তে অপেক্ষা করে বসে থাকবে।

ভদ্রা। কাজ আছে? লাভের কাজ বুঝি?

দেবু। লাভ? হ্যাঁ, লাভের বইকি। হ'লে লাভ
আমারই বৈশী হবে, গরজ তাই আমার।

ভদ্রা। ওমা, তবে আর বসতে বলবো না। তাহ'লে
এসো। [দেবু ভদ্রাকে প্রণাম করলো।] ওমা, এ কী?
হঠাৎ পেন্নাম কেন গো? তুমিও কি শিবুর মতন পাগল
হলে?

দেবু। একটা নতুন কাজে, মানে নতুন পথে নামছি।
আপনি আশীর্বাদ করুন।

ভদ্রা। আহা বেশ, বেশ। সুখী হও, দীর্ঘজীবী হও।
যে কাজে যাচ্ছে তাতে সিক্সিভ কর। আবার এসো,
বাবা দেবু।

[দেবু চলে যেতে যেতে বলো]

দেবু। আজ্ঞে, হ্যাঁ। আপনারা ডাকলেই আসবো।

[প্রস্থান।]

ভদ্রা। দুর্গা, দুর্গা, দুর্গা, দুর্গা। [বাইরের দিকে
চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল]

[অলক্ষণ পরে ভবদেবের প্রবেশ]

ভব। কী গো, তুমি এখানে একলাটি বসে আছ যে?

ভদ্রা। এমনি বসে আছি। শিবু কোথায় বেরোলো।
দেবু এসেছিল। গল্প করলে, চলে গেল। তুমি যে এরই
মধ্যে ফিলে? ডাক্তারের ইন্সল দেখা হয়ে গেছে?

ভব। [সহাস্তে] আজ খুল ছুটি দিয়েছেন, সে
খেয়াল ছিল না ওঁর। আর একদিন যাবো। সাকুমামাও
আসছেন। রাত্তায় দেখলুম কার সঙ্গে কথা কইছেন।
সাকুমামাকে আবার বলুম শিবুর বিয়ের সব্বন্ধে কী বলছিলেন,

কবে ছেলে দেখতে যাবে। তোমার বোমাকে সব বলে
যাও। [ভদ্রা নীরব।] দেখেছ, শিবুর বিয়ের জন্তে কী
রকম উঠে পড়ে লেগেছি?

ভদ্রা। দেখ, একটি সব্বন্ধর কথা বলবো? সাকুমামা
যদি মনে করেন।

ভব। তা বেশ তো!

[ইতিমধ্যে ভবদেব জামা খুলে দেয়ালের হুকে কিছা
চেয়ারের পিঠে রেখেছেন। এখন খবরের কাগজ তুলে
নিলেন টেবিল থেকে। কাগজের নিচে চিঠি ছিল। দেখে]
ভব। এ চিঠি কার? (চিঠি তুলে নিয়ে) আমারই
চিঠি দেখছি। কে দিয়ে গেল? (বলতে বলতে চিঠি
খুলছেন)

ভদ্রা। তা তো জানি না।

ভব। (চিঠি পড়তে শুরু করেন) “শ্রীচরণ কমলেশ্বর”
এই এক সুসভ্য বাঙালি কথা। প্রাচীন অভ্যাস। চরণ
হলো কমল, তার ওপরেও শ্রী! যার কোনও মানে
হয় না। এবং তাও গৌরবে বহুবচন! “মাস্টার
মশার,—”

ভদ্রা। কার চিঠি গো?

ভব। কোনও ছাত্রের। মাষ্টার মশায়ের আশীর্বাদ
প্রার্থনা করছেন। মানে পার্সেন্টেজ কম পড়েছে বোধহয়।
লেখকটি কে? [চিঠি উলটে চিঠির শেষে নাম দেখে]
হুম্। বটে! মনে মনে পড়তে লাগলেন। মুখে হাসির
চিহ্ন ফুটে উঠলো। তারপর হাসির মুহূর্ত শব্দ, ক্রমে শব্দ
উচ্চ হতে হতে চিঠি শেষ হলো।

ভদ্রা। কী হলো গো? ছাত্রের চিঠিতে এত
হাসির কী আছে?

ভব। [হাসতে হাসতে] আছে, আছে। আজ্ঞা,
তখন তুমি দেবুর কথা কী যেন বলে? দেবু আবার
এসেছিল?

ভদ্রা। হ্যাঁ। দেবু এসেছিল। বৈশীক্ষণ বসতে পারলে
না। কী একটা কাজে গেল। আমাকে পেন্নাম করে
গেল। আহা, মা নেই।

ভব। তোমাকে পেন্নাম করে গেল? হঠাৎ?

ভদ্রা। হঠাৎ আবার কী? একটা নতুন কাজে
যাচ্ছে তাই। বলে আশীর্বাদ করুন। হঠাৎ বরঞ্চ শিবু

করলে। দেবু তখন বসে আছে, শিবু কোথায় বেরোলো।
হঠাৎ বোথাও কিছু নেই আমাকে একটা পের ম করে
ছুটে পালিয়ে গেল।

ভব। শিবুও পেরাম করে গেল? তুমি আশীর্বাদও
করলে নিশ্চয়? বাঃ। তবে তো সব সেরে রেখেছ।
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ। Straight indeed!

ভদ্র। কী বলছো, বাপু, খুলে বল। আমি তোমার
মতন অমন পণ্ডিত নই। পেরাম করেছে, তাতে হাসির
কী হলো?

ভব। হয়েছে। এখন সাতুমাটা খালি বাকী।
আরে, এই যে, নাম করতে করতেই।

[সাতুবাবুর প্রবেশ]

এতখণ কী বখা কইছিলে ভদ্রলোকের সঙ্গে? সবক
করছিলে না তো?

সাতু। হ্যাঁ, শিবুর জ্ঞে একটি চমৎকার সবক
পেলুম। আমার অপিসের বন্ধু! ভদ্রলোকটি কে
জানো? সাতকীরের ঘোষ। ঠুই ঠাকুরদা, আপন ঠাকুরদা,
কাপাভুয়ার প্রাক্তে পাঁচশো ব্রাক্তণ ভোজন করিয়েছিলেন,
একটাকা করে দক্ষিণে দিয়েছিলেন। আমার বড়ো
দিসিমার নন্দাই ছিলেন কিনা। লটসায়ব-বাড়ীতে
আসতেন। এক গেলাসে—বুঝলে না সেই সাতকীরের
বুঝলে—

ভব। বুঝতে পেরেছি। কিন্তু সবক আর করতে
হবে না। আমি ভেবে দেখলুম, শিবুর বিয়ের সবক পরে
হলেও চলবে, তার আগে—

ভদ্র। বটে? শিবুর বিয়ের সবক পরে হবে? আমি
জানি তো তোমাকে। বাকগে—তোমাকে কিছু করতে
হবে না। মামাকে বল—

সাতু। সবক করতে হবে না? এ আবার কী বলছো
তুমি? তবে কী করতে হবে তুমি?

ভব। সবই বলবো। তার আগে তোমার সঙ্গে
আমার সবকটা ঠিক করে নেওয়া দরকার।

সাতু। (বিস্মিত) আমার সঙ্গে সবক? সে তো
আছেই হে।

ভব। ও সাতুমারী টাকুমারী চলবে না। ভদ্রার
বড়ো অহুবিধে হচ্ছে।

ভদ্র। ওমা! আমার আবার কী অহুবিধে হচ্ছে
কী যে বল তার ঠিক নেই।

ভব। তোমার না হোক, আমার অহুবিধে হচ্ছে।
সাতুমারী বলতে পারবো না আর।

সাতু। তবে?

ভব। তোমাকে আমি সাতুদা বলবো। Show
cause why I shouldn't—

ভদ্র। কী যে বলছো তার ঠিক নেই।

সাতু। বল তো বোমা!

ভব। আমি ঠিকই বলছি। তুমি কী জ্ঞে আমার
মামা হবে বলা? বলা কেন তুমি মামা হবে?

সাতু। না, না, মামা তো তুমিই। আমার ছোটো
মা'র, মানে বিমাতার তুমি হলে মামাতো ভাই, স্বভ্রা—

ভব। না।

সাতু। না কী গো? ছোটো মা'র মা তোমার শিসিমা
ছিলেন। আমি বয়সে বড়ো বলে সেই সবক—

ভব। না, ওটা কোনও সবকই নয়।

সাতু। তা বটে। তবে কী জানো, সবক মনে করলেই
সবক। একটা করে নিতে হয়।

ভব। There you are একটা করে নিতে হয়।
স্বভ্রাং আদ্র থেকে তুমি আমার সাতুদা হলে। ও শিসীমা
বিমাতা-টিমাতা কিছু নয়। রাজী, সাতুদা?

সাতু। [সহাস্তে] বেশ। তাই বলে খুশী হও, বল।
[হাস্ত]

ভব। ভদ্র! মামাধন্তর নয় সাতুদা। রাজী?

ভদ্র। [হাসিমুখে] জানিনে বাপু।

ভব। এই হলো এক নম্বর। দু নম্বর হচ্ছে তোমাকে
দেখবার শোনবার বস্ত্র করবার একটা লোক দরকার।

সাতু। আমার বস্ত্র? সে সব সেই একজনের সঙ্গেই শেষ
হয়ে গেছে ভাই। ও আর দরকার নেই।

ভব। না, শেষ হয়ে যায়নি। শেষ হতে দেবো না।
তোমাকে আর তোমার নাতি দুটোকে লালন করবার
লোক দরকার। তোমার বড়ো বোমা তাঁর বাল্য নিয়ে
ব্যস্ত। স্বভ্রাং দেবুর বিয়ে করা উচিত।

সাতু। উচিত তো বটেই। একশোবার উচিত।
আজই করা উচিত। কিন্তু ও বাঁদরটা কি সেটা তাবছে?

না, ভাববার মতো বুদ্ধি আছে? কখন কোথায় থাকে কী করে, ওর কি কোনও মতিস্থির আছে? কোন ভ্রম-লোক ওর হাতে মেয়ে দেবে বলে?

ভব। আচ্ছা, দেবুর বিয়ের সম্বন্ধ করার ভার আমি নিলুম। তুমি রাজী!

ভদ্রা। তুমি! তুমি সম্বন্ধ করে বিয়ে দেবে? তবেই হয়েছে!

ভব। কী বলে! সাতুমা I mean, সাতুদা, তুমি রাজী তো!

সাতু। এফুগি, এফুগি, এই দণ্ডে। তুমি যেখানে খুশী ওর বিয়ে দাও, ওটাকে স্থিতি কর, আমি কথাটি কইবো না। কেবল মেয়েটা যেন স্বজাত হয়, ভালো ঘরের হয়, লক্ষ্মী মেয়ে হয়। আর কিছু চাই না।

ভব। টাকা কড়ি?

সাতু। রাম, রাম! সাঁইত্রিশ বছর চাকরি করেছি, লাখ লাখ টাকার বিল পাস করেছি একটি পয়সা উপরি নিইনি। আর আজ মালক্ষ্মী ঘরে আসবেন, তার ওপোর উপরি চাইবো? না ভাই, আমার যেটুকু সাধা খরচ করবো, পরের পয়সায় লোক খাওয়াবো না। তুমি বড়ো বৌমার বাপকে জিজ্ঞেস করে দেখো।

ভব। আমি জানি সাতুদা, আমি জানি। you are a brick.

(বাইরে ট্যাক্সির শব্দ)

ভব। [জানালা দিয়ে দেখে] দেবু না? ও দেবু শোনো, শোনো।

[বলতে বলতে বাইরে যায় এবং পরক্ষণে দেবুর সঙ্গে ফিরে আসে।]

তুমি এসে দরজা থেকে পালাচ্ছিলে যে।

দেবু। আজ, শিবুকে পৌছে দিয়ে গেলুম, একটু কাজ আছে, তাই যাচ্ছিলুম।

ভদ্রা। শিবু ফিরেছে। সকাল থেকে খায়নি, দেখি—

[বলতে বলতে ভিতরে গেল।]

সাতু। কাজ আছে, তাই যাচ্ছিলি। কাজ আছে! কাজের তো অন্ত নেই। থাকুক কাজ, কোথাও যাবি না। ফেলু যা বলছে শোন।

ভব। দেখ দেবু, তোমার বাবার ইচ্ছা যে তুমি বিবাহ কর।

সাতু। ইচ্ছে-টিচ্ছে নয়, আমার ছকুম।

দেবু। আমাকে মাফ করুন।

সাতু। মাফ করবো? শুনলে, শুনলে ফেলু? লক্ষ্মী-ছাড়া ছেলের কথা তো শুনলে? ওঁকে মাফ করতে হবে। দূর করে দেবো বাড়ী থেকে। দূর করে—

(রাগের দমকে কাশতে থাকেন)

ভব। আহা, তুমি ঠাণ্ডা হয়ে বসো সাতুদা।

ওরে, শিবু, সাতুদার জন্তে এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল আর কিছু মিষ্টি নিয়ে আর।

দেবু। [সবিস্ময়ে] সাতুদা!

ভব। হ্যাঁ, সাতুদা। তোমার আপত্তি আছে?

সাতু। [জোরে] হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওর আপত্তির কে ধার ধারে?

দেবু। আজ্ঞে না, আমার আপত্তি নেই।

[ভদ্রার প্রবেশ]

ভদ্রা। ওগো, শিবু ঘরে দোর দিয়ে বসে আছে, দোর খুলছে না। [কাতর ভাবে] কী হয়েছে জানিনা, তুমি একবার এসো।

ভব। কিছু হয় নি। তুমি বল সাতুদার জন্তে মিষ্টি আনতে। নতুন সম্বন্ধ হয়েছে, সাতুদা বলগে, দোর খুলবে।

[ভদ্রার প্রস্থান।]

ভব। দেখ দেবু, তোমার বাবা শিবুর বিয়ের ভার নিয়েছেন। কাজেই আমি তোমার বিয়ের ভারটা নিলুম। বুঝলে। এখন দু জনকার ভারই এক সঙ্গে—

সাতু। অত কথা ওকে বলতে হবে? কোনও কথা নয়। আমি বলছি এক কথা। এই ফেলু তোর মাষ্টার মশাই যে মেয়ে ঠিক করবে, যাড় হেঁট করে তাকে বিয়ে করবি। না করিস তো দূর হয়ে যা বাড়ী থেকে।

[দেবু ভবদেবের দিকে চাইলে। ভবদেব প্রশংস মূখে চেয়ে আছে, নীরবে। কিন্তু যেন দ্রব্য মাথা নড়লো। প্রবেশ করলেন ভদ্রা ও শিবু। নতমুখী শিবুর হাতে মিষ্টায়ের রেকাবি ও জল। শিবু খাবার ও জল টেবিলে রাখলে।]

ভব। শিবু, তোর খুশীকে প্রণাম কর। করে খাবার দে। লজ্জা করতে হবে না। প্রণাম কর।

ভদ্রা। (সানন্দে) হ্যাঁ গা, সত্যি? সাতুমা—

ভব। ইউ, ইউ, ভদ্রা। সাতু মা মা নয়, সাতুদা। বেয়াইকে কেউ মা মা বলে না।

সাতু। যাঁ? তুমি বলছো কী ফেলু? আমি যে গরীব। আর আমার এই লক্ষীছাড়া ছেলেটাকে তুমি— (শিবু প্রণাম করে) এসো মা এসো। আমার মা এসো।

(মাথায় চুমু খায়। চোখ মোছে) আমি আশা করতে সাহস করিনি, বলতে পারিনি ফেলু।

[শিবু ভদ্রাকে প্রণাম করে। দেবু ভবদেবকে প্রণাম করতে যায়, ভবদেব তাকে আলিঙ্গন করে।]

ভব। নো, নো, মাইভিয়ার বয়। প্রণাম নট ফর মি। ওটা তোমার শান্তডীকে কর। তোমার বাবাকে কর।

যবনিকা

সীমা রেখা

হরিসাধন গোলুই

যে যার ধর্ম মতে

ওরা চলে নানা পথে—

স্বগম, দুরূহ, বন্ধুর।

চলেছে : হয়তো যাবে আরো দূর।

কিন্তু কার অন্বেষণে?

তা নাহি জানে!

তবু কোন পথ সত্য কত—

তাই নিয়ে অবিরত

করে হানাহানি। জীবাংসার উল্লাসে মেতে

পৈশাচিক রক্তপাতে

রাঙায়ে পথের ধূলি—

সে পথে আবার চলে ধর্মের পতাকা তুলি!

নেই আজ সত্য-অন্তর্ভূতি!

তাই সৃষ্টির বৈচিত্র্য মাঝে স্রষ্টার স্তিতি

পায় না খুঁজে।

তবু তারেই খুঁজিয়া চলে ছ'চোখ বুজে।

অস্ত্রের দৃষ্টি আজ কুহেলী-ঘেরা,

তাই হৃদর নক্ষত্রলোকে গ্রহ-চন্দ্র-তারা—

বোঝে না, কার সে প্রকাশ!

আকাশ বাতাস,

শৈল, সিন্ধু, মরু-প্রকৃতির চারিধারে

সৃষ্টির বিচিত্র সম্ভারে,

মাহুঘের হুখে হুখে, আশা-নিরাশায়,

সর্বভূতে অদৃশ্য প্রেমের ধারায়—

দেখে না কার সে রূপ

অমলিন, অপরূপ!

সে রূপের জ্যোতি ওরা নাহি দেখে হায়

অজ্ঞান তমসায়!

তাই খুঁজে মরে সর্বব্যাপ্ত, অখণ্ড,

অভিন্ন দৈবরে

ধর্মের ছাঁচে গড়ি খণ্ডিত, বিযুক্ত করে

চায় তাঁরে দোখিতে বুখা

ইট আর পাথরে গাথা

গিজায়, মসজিদে, মন্দিরে!

সর্ব ধর্ম ঘিরে

নিহিত যে মহাসত্য, তারে দেয় জ্বলাজ্বলি

স্বর্গীয় স্বার্থবোধে ধর্মের কুৎসিত দশাদলি!

ওড়ায় যে যার ভিন্ন ধর্মের পতাকা,

মন্দির মসজিদ মাঝে তুলি সীমারেখা—

ঈশ্বরের নামের আড়ালে

মাহুঘবেলী দানবের খোলস খুলে ফেলে,

মুছে দেয় হৃদয়ের যত অন্তর্ভূতি—

স্নেহ-প্রেম-প্রীতি;

শুধু শতশিখা মেলে

স্বার্থান্ধ লালসার হিংস্রতা জলে!

সে বীভৎস আগুনে

কি পাপে না জ্বেনে

নিরীহ মাহুঘ মরে মুক পশুর মত

অসংখ্য, অগণিত।

আকাশ বাতাস ওঠে ভরে

শিশুহারা জননীর করুণ হাহাকাঁপে,

সিংঘির সিঁথুর মুছি কত স্বামীহারা

ফেলে অশ্রুধারা!

সৃষ্টির স্রবসা কত

হয় ভস্মীভূত!

সে ভস্মের কলঙ্ক ইতিহাস

সত্যতার গর্বে যেন করে পরিহাস।

শুধু অলক্ষ্য পেকে ব্যথার আর্ন্তনাদে

বীণ, হজরৎ, বুদ্ধ, বিবেক

ওমরি ওমরি কাদে !!

“চন্দ্রশেখর”-এর বঙ্কিমচন্দ্র

শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য

‘চন্দ্রশেখর’ের বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে কিছু বলবার বা জানবার আগে ছাত্রাবস্থায় বঙ্কিমের একটি চিত্র পাঠকের সামনে তুলে ধরতে চাই—“১৮৫০ সালে যে সময়ে হুগলী কলেজে একজন প্রধান ছাত্র বলিয়া গণ্য, ইনি তৎকালে গ্রাম্য চতুষ্পাঠীতে কোন এক অধ্যাপকের নিকট সংস্কৃত অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। বিদ্যালয় হইতে প্রত্যাগমন করিয়া, প্রত্যাহ্ন পুঁথি বগলে করিয়া চতুষ্পাঠীতে গমনপূর্বক অধ্যয়ন করিতেন। এক বৎসর মধ্যে ইনি মুম্ববোধ ব্যাকরণ, রঘুবংশ, ভট্টিকাব্য, মেঘদূত, উদ্ধবদূত প্রভৃতি অধ্যয়ন করেন। এই অল্পসময় অধ্যয়ন করিয়াই ইনি সংস্কৃত ভাষায় ও সাহিত্যে বিশেষ ব্যাপ্তিলাভ করিয়াছিলেন। এক্ষণে ইনি ইংরাজীর দ্বারা সংস্কৃত ভাষাতেও কৃতবিদ্য—বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়—“নববাণীকী” (১৮৭৩) পৃঃ ২৪০। এই উজ্জিকারী এমন এক নবাবক্তি যিনি শিবনাথ শাস্ত্রীর দক্ষিণহস্ত এবং উনিশ শতকের শেষার্ধের ব্রাহ্মসমাজের একজন কৃতবিদ্য নেতা। স্মৃতিঃ বস্তুর কথা প্রণয়নযোগ্য। যে ছাত্রের এইরূপ অমূল্যকৃতি ও জ্ঞানসম্পদ, সে যে কালে যুগবরণ্য বঙ্কিমচন্দ্র হবেন তাতে কোন আশ্চর্য নেই। অতঃ না হওয়াটাই অস্বাভাবিক। ১৮৫০ থেকে ১৮৫১—এই চারবৎসরের মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্র ‘সংবাদ প্রভাকর’ ও ‘সংবাদ সাধুরঞ্জন’ দুই পত্র ও পত্র রচনা প্রকাশ করেন। ‘এডুকেশন গেজেট’ে তিনি এই সময় ‘কিছু কিছু ইংরাজী রচনা লিখিতেন।—“While at Khulna, Bankim Chandra began a serial story named ‘Rajmohan’s wife’ in the Indian Field Newspaper, then edited by Kisor Chandra Mitra. This was his first literary effort,”

‘দুর্গেশনন্দিনী’ এবং ‘কপালকুণ্ডলা’ যথাক্রমে ১৮৬৫ ও ১৮৬৬ সনে প্রকাশিত হল। ১৮৬৯ সালে ‘সুগলিনী’ প্রকাশের পর বঙ্কিমের খ্যাতি বিদগ্ধসমাজে বীকৃত হল।

যে প্রতিভার বীজ দেখা গেছিল ‘ললিতা ও মানসে’—তা কালক্রমে মহীকররূপে দেখা দিতে লাগল। ধন্য ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত! গুপ্ত কবি ঠিক বৃত্তে পেরেছিলেন প্রতিভার সূত্র বীজকে। আকর্ষণ বঙ্গলেন বঙ্কিমকে, উৎসাহ দিলেন তাঁকে। কবি খ্যাতির পথে প্রধান সাহায্যকারীরূপে দাঁড়ালেন। শিষ্য শেষকালে গুরুচরিত কীর্তন করে গুরুবক্ষিণা দিয়েছে। জানিমাছে লোকসমাজে গুপ্তকবির নেপথ্যাচারিণী কবিন্দু ও প্রতিভাকে। যাই হোক বহরমপুরে থাকাকালে (১৮৬৯—১৮৭৪ : ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট : অস্থায়ী ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট, বহরমপুরস্থ রাজসাহী কমিশনারের পার্শ্বোত্তাল এ্যাসিষ্ট্যান্ট—অস্থায়ী) তাঁহার সাহিত্যিক প্রতিভা বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মধ্যে “বঙ্গ দর্শন” (১৮৭২) প্রকাশিত হয়। ‘বঙ্গদর্শন’ প্রকাশকালে শিল্পীসমাজের অস্থায়ী শিল্পীর নিজের কথাতেই দিই—“আমরা ইংরাজী বা ইংরাজের ঘেবক নহি। ইহা বলিতে পারি যে, ইংরাজ হইতে এ দেশের লোকের যত উপকার হইয়াছে, ইংরাজী শিক্ষাই তাহার মধ্যে প্রধান। অনন্তঃপ্রযত্নে ইংরাজী ভাষার যত অমূল্যলবন হয় ততই ভাল।……বাক্সানী, মহারাজী, তৈলঙ্গী, পাজাবী,—ইহাদের সাধারণ মিলনভূমি ইংরাজী ভাষা। এই রজ্জুতে ভারতীয় একেবারে গ্রহণ বাধিতে হইবে। অতএব ইংরাজী চলা আবশ্যক, ততদূর চলুক।”

(বঙ্গদর্শন, বৈশাখ, ১২৭৩)

এই ঘোষণার মধ্যে দুটো জিনিষ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। উনিশ শতকী রেনেসাঁর সাধনালব্ধ বস্তুর প্রতি পূর্ণ সমর্থন আছে। দ্বিতীয় অবতারতীয় ভিত্তিতে মহামিলনের পূর্ব-প্রস্তুতিস্বচক উপায় নির্দেশও আছে। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা এর বেশ কয়েক বছর পরে হয়েছে। সুরেন ব্যানার্জি, আনন্দমোহন বসু প্রমুখ জাতীয় আন্দোলনের নেতাদের ইহার কয়েক বছর পরে অগ্রপ্রবেশ ঘটেছে। বঙ্কিমচন্দ্র সত্য, শিব, স্বন্দরের আরাধনা করিতে গিয়ে

জাতীয় ঐতিহ্য ও সামাজিক চিন্তাকে উপেক্ষা করতে পারেন নি।

‘হেন্সম্যান’—এই জাতীয় সঙ্গীতটি ১৮৭১ সালে বঙ্গদর্শন সম্পাদনার সময়ে তিনি রচনা করেন। এর পর উহা ‘আনন্দমঠে’ অন্তর্ভুক্ত হয়। এর পর ‘রাজসিংহ’ (১৮৮২), ‘আনন্দমঠ’ (১৮৮২), দেবী চৌধুরাণী (১৮৮৬) এবং সীতারাম (১৮৮৭) সালে প্রকাশিত হয়। এরই সমসাময়িক কালে জেনারেল এ্যাসেম্বলির অধ্যক্ষ (বর্তমান স্কটিশ চার্চ কলেজ) পাদরি হেষ্টির সহিত কোন একটি শ্রদ্ধাভঙ্গীকে কেন্দ্র করে, ‘রামচন্দ্র’—এই ছদ্মনামে হিন্দুধর্মের মূলতত্ত্ব বিষয়ে আলোচনা করেন। “Letters on Hinduism”—এই ধরনের আলোচনারই ফল বিশেষ। পাদরি কৃষ্ণমোহন ও বঙ্কিমের বিরুদ্ধে আসরে নেমেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত লেখনীকে সংযত করেন। ১৮৯২ সালে ‘কৃষ্ণচরিত্র’ নামক গ্রন্থটি প্রকাশিত হল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য—“বঙ্গদেশ যদি অসাড় প্রাণহীন না হইত তবে কৃষ্ণচরিত্রে বর্তমান পতিত হিন্দুসমাজ ও বিকৃত হিন্দুধর্মের উপর যে অন্ত্রাঘাত আছে, সে আঘাতে বেদনাবোধ এবং কথঞ্চিৎ চেতনালাভ করিত। বঙ্কিমের জায় তেজস্বী প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি আব কেহই লোকাচার, দেশাচারের বিরুদ্ধে একপ নির্ভীক স্পষ্ট উচ্চারণে আপন মত প্রকাশ করিতে সাহস করিত না।”—বক্তা রবীন্দ্রনাথ, বিষয় বঙ্কিম মানস ও কৃষ্ণচরিত্র। কি অপূর্ব বিশ্লেষণ ও বিচার। হাজার বথায় বার প্রকাশ হয় না, রবীন্দ্রনাথ এককথায় তার উত্তর দিয়েছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন সেই সমন্বয়বাদী পুরুষ যিনি প্রাচীনকে নূতনের মনীষায়, যুক্তিতে, পাশ্চাত্য দর্শনের আলোকে বিচার করেছেন এবং সেই সঙ্গে স্বীকারও করেছেন। নির্জলা নূতন বা পুরাতন কোনটাকেই এককভাবে স্বীকার করেন নি। এইখানেই তাঁর প্রতিভার স্বাতন্ত্র্য। পরিণত জীবনে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সাহিত্যদর্শনের একটি তীক্ষ্ণ ইঙ্গিত নানা রকম বিবাদের ঝুঁকি নিয়েও দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করেন “বাংলা নব্য লেখকগণের প্রতিশ্রুতিবেদন”—নামক রচনায় “বহুি কেহ এমন বৃত্তিতে পারেন যে লিখিয়া দেশের বা মনুষ্য জাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য্যসৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন।”

“যাহা অসত্য, ধর্মবিরুদ্ধ, পরনিরা বা পরপীড়ন বা স্বার্থসাধন দ্বারা উদ্দেশ্য, সে সকল প্রবন্ধ কখনও হিতকর হইতে পারে না। সুতরাং তাহা একেবারে পরিহার্য। সত্য ও ধর্মই সাহিত্যের উদ্দেশ্য—অন্ত উদ্দেশ্যে লেখনী ধারণ মহাপাপ। (বিবিধ প্রবন্ধ, ২য়ভাগ, পৃ:—২০৬, পরিবং সংস্করণ)। ইনিই শিল্পী যার কাছে ধর্ম ও সাহিত্য প্রায় সমার্থক। সৌন্দর্য্যসৃষ্টি তাঁর চিন্তাবহির্ভূত নয় সত্য কথা। কিন্তু সেই সৌন্দর্য্যের সঙ্গে শিবের ও সত্যের আদর্শ লীনতাপ্রাপ্ত হয়ে আছে। এ যেন সেই প্রণয়ক রস—অর্থাৎ পাঁচমিণালি সরবৎ—কোনটি কতটা আছে তাহা ধরা মুক্লি, বর্তমান সময়ে বঙ্কিমের এই উক্তিকে লক্ষ্য করে কোন উগ্র প্রগতিবাদী বঙ্কিমের বিরুদ্ধে আলোচনা করতে পারেন, কিন্তু তাতে বঙ্কিমকে বোঝা হয় না, একালেব যুগ মনোহর দেকালকে বিচার করা হয়, নিজের বিশেষ ভাব-দর্শনেই জাহির করা হয়। এই কথাটির সম্পর্কে বিশেষ ভাবে বলা প্রয়োজন। কারণ ‘চন্দ্রশেখর’ উপন্যাসটি এই প্রসঙ্গে জড়িত। উক্ত উপন্যাসে যে নীতি বা ধর্ম আছে তা অনেকের বিজ্ঞপের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং ভবিষ্যতেও দাঁড়াবে। তাঁদের অভিযোগ যে ‘প্রায়শ্চিত্ত’ অংশের ভাবে বলা প্রয়োজন। কারণ ‘চন্দ্রশেখর’ উপন্যাসটি এই প্রসঙ্গে জড়িত। উক্ত উপন্যাসে যে নীতি বা ধর্ম আছে তা অনেকের বিজ্ঞপের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং ভবিষ্যতেও দাঁড়াবে। তাঁদের অভিযোগ যে ‘প্রায়শ্চিত্ত’ অংশের (চতুর্থ পরিচ্ছেদ, চন্দ্রশেখর উপন্যাস) মাধ্যমে শিল্পী বঙ্কিমের পরাজয় ঘটেছে। কারণ অপাপবিদ্ধ প্রেমের এ ছেন প্রায়শ্চিত্তমূলক চরিত্রচিত্রণ নিম্নক নীতিমার্গ-গামিতার চূড়ান্ত পরিণয় দেয়। কিন্তু যাই বলুন এ কথা, তাঁরা অসলে বঙ্কিমকে ছেড়ে নিজের পাণ্ডিত্য স্পষ্টাঙ্কে বলবতী করেন। কাজেই বিরোধ বাধে। এ ক্ষেত্রে বঙ্কিমের নিজস্ব উক্তি লক্ষ্যীয়।—“সাহিত্যও ধর্মছাড়া নহে। কেননা, সাহিত্য সত্যমূলক। যাহা সত্য, তাহা ধর্ম। যদি এমন সুসাহিত্য পাকে যে, তাহা অসত্যমূলক ও অধর্মময় তবে তাহার পাঠে দুঃখা ও বিকৃতকৃষ্টি পাঠক কেহ স্থখী হয় না। কিন্তু সাহিত্যে যে সত্য ও যে ধর্ম, সমস্ত ধর্মের তাগ এক অংশ মাত্র। সাহিত্য তাগ করিও না, কিন্তু সাহিত্যকে নিয়মোপান করিয়া ধর্মের মতে আয়োজন করা।”

“যাহারা কুকাব্য প্রণয়ন করিয়া পরের চিত্ত কলুষিত করিতে চেষ্টা করে, তাহারা তত্ত্বাদির দ্বারা মনুষ্য জাতির শত্রু এবং তাহাদিগকে তত্ত্বাদির দ্বারা শারীরিক দণ্ডের দ্বারা

দ্রুতি করা বিধেয়”—(ধর্মতত্ত্ব। বঙ্কিম রচনাবলী—২য় ভাগ, পৃ: ৬৭০ সংসদ সংস্করণ।)

আশা করি 'চন্দ্রশেখর' (১৮৭৫-প্রকাশকাল) উপন্যাসের আলোচ্য অংশের পটভূমি হিসাবে মদীয় পূর্ব আলোচনা একটু বিস্তৃত হলেও প্রাসঙ্গিক হবে। আলোচ্য বিষয় শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত ও প্রতাপের মৃত্যুর কারণ বিবরণ। প্রতাপ ও শৈবলিনী একই বৃক্ষে দুটি পুষ্পের জায়। নায়কের বধন পনের অথবা ষোল বছর বয়স, অথন সে অষ্টমবর্ষীয়া বালিকার প্রতি প্রথম নিবেদনার্থ জলে ডুবে, তার প্রেমের গভীরতার পরিচয় দেয়। যতই তারা নির্জনে বিবাহ বিধি অসার ফলী আঁটুক, শেষপর্যন্ত বিবাহ প্রস্তাব-মাজেই পর্যবসিত হয়, কার্যে আর রূপান্তরিত হয় না। যে নায়িকার প্রেমের পরিচয় শিল্পী তাঁর উপন্যাসে দিচ্ছেন, তা ঘোড়শব্দীয়র, অষ্টমবর্ষীয়ার নয়। কাণ শিল্পী নিজের কথাতোই স্বীকার করেছেন যে কাহিনী অংশের আরম্ভ চন্দ্রশেখর ও শৈবলিনীর বিবাহের আট বছর পর থেকে। চন্দ্রশেখর পুণিগত বিজ্ঞাপ্রাণ, বিগত যৌবনের স্মৃতি বহন-কারী ঘর করণেও ভক্ত কুরুপাকে চেয়েও দুভাগ্যবশতঃ অপূর্ব সৌন্দর্য লাভনাময়ী শৈবলিনীর পাণিগ্রহণ করেছে। শৈবলিনী বধন পূর্বপ্রণয়ের সম্ভবশ্চিকদংশনে কাতরা হয়ে ফটরের সঙ্গে পলায়নের সম্ভাব্য ফলাফল বঙ্গনা করতে, শুধু নায়ক (নায়ক চন্দ্রশেখর কিনা স্মৃতি বিচরণ বিষয়) চন্দ্রশেখর ব্রহ্মসূত্র পাঠে বুদ্ধ হয়ে আছে। এ হেন যেখানে অবস্থা, সেখানে শৈবলিনীর পতি পরমশুভ হয়েও কামনার নমস্কর হতে পারে না। পারে না বলেই, সে গজার উপর ফটরের নৌকায় বসে সুনদরীকে স্বামীর আলয়ে থাকাকালীনই আত্মীয়বাড়ী যাবার অথবা কালীবাড়ী হবার ইচ্ছিত যে মনে জেগেছিল, তা জানায়। তাহলে অতৃপ্ত যৌবনাকাজ্জুর বীজ শৈবলিনীর মনে যে ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সে যদি তার প্রেমের বা রূপের অথবা সৌন্দর্যের একটু স্বীকৃতি পেত, তাহলে প্রতাপ 'চন্দ্র' তার থাকতো কিনা সন্দেহের বিষয়। চন্দ্রশেখরের আচরণই তাকে প্রতাপ-চিন্তাময় হতে বাধ্য করেছে। প্রতাপের বাড়ীতেই, প্রতাপের সম্মুখে, এই দুর্জয় রূপও প্রেমের স্পষ্ট স্বীকারোক্তি নায়িকার মুখের কথাতোই প্রকাশ পেয়েছে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ্য—

“তুমি কি করিয়াছ? কেন তুমি, তোমার ঐ অতুল্য দেবমূর্তি লইয়া আমার আমার দেখা দিয়াছিলে? আমার স্মৃতিনোমুখ যৌবনকালে, ও-রূপের জ্যোতি কেন আমার সম্মুখে আলিয়াছিলে? যাহা একবার তুলিয়াছিলাম, কেন তাহা উদ্বীষ্ট করিয়াছিলে? কেন আমি তোমাকে দেখিয়াছিলাম? দেখিয়াছিলাম তো তোমাকে পাইলাম না কেন? না পাইলাম তো মরিলাম না কেন? তুমি কি জান না, গোনারই রূপ ধ্যান করিয়া গৃহ আমার অরণ্য হইয়াছিল? তুমি কি জাননা যে, তোমার সঙ্গে সখ্যক বিচ্ছিন্ন হইলে যদি কখনও তোমায় পাইতে পারি এই আশায় গৃহত্যাগিনী হইয়াছি? নহিলে ফটর আমার কে? “বিশের শতকের শেষের দিককার যে কোন দিলখোলা, রেস্তোরাঁগেই নায়িকার আচরণের সঙ্গে শৈবলিনীর এই জায়গার আচরণ ভুলনা। তবে সামগ্রিক বিচারে পার্থক্য আছে বৈ কি। শৈবলিনী মুখে বহুই বলুক “মরিলাম না কেন”—কিন্তু সে মরতে মনে ভয় পায়, মরতে পারে না। এর মধ্যে আছে তার রূপ সচেতনতা, দেহের প্রতি মমত্ব-বোধ, ব্যক্তি জীবনাকাজ্জুর প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি। প্রথম সম্মুখের সময় সে ভুগে নাই; দ্বিতীয় সম্মুখের সময় তার মনে বিপরীতভাব এলেও, ‘প্রতাপ চিন্তা’কে সে দূর করিতে চায়নি এবং পারেনি। একেবারে শেষে সে বলেছে, প্রতাপের সঙ্গে যেন তার আর দেখা না হয়। কারণ “রমণীর মন বড় অসার।” “আমি স্থগী হইব না। তুমি থাকিতে আমার স্থখ নাই”—এইরূপ বাক্য প্রতাপকে সে নিবিবাদে বলেছে। “স্বাণীকোর চিত্ত অতি অসার; কতদিন বসে থাকিবে জানি না। এ জন্মে আমি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও না”—এইরূপ উক্তি শুনে আমাদের খুব একটা অস্বাভাবিক মনে হয় না।

বরং এটাই স্বাভাবিক মনে হয়। কিন্তু এর পশ্চৎ পটভূমি দেখা প্রয়োজন। এইরূপ উক্তি কে করেছে? দ্বাদশবাষিক ব্রহ্মচারিণী, ফলমূলপত্রাচারগ্রহণকারিণী, চীরধারিণী শৈবলিনীর উক্তি। এই শৈবলিনীকে কখনও লু-বারির দ্বারা বহু পরীক্ষা করা হয়েছে। রামানন্দ স্বামীর যোগবলে এই রমণীর অন্তঃকরণে পবিত্রতা সম্পাদনের চেষ্টা করা হয়েছে। গ্রামান্তে পর্বতুটির নির্মাণ করে, তিফান্দ্র অরে নিজের পাপ কীর্তন করে জীবন বাপনের

ভারতবর্ষ



অধিবর্ষ



ଅଭ୍ୟାସକର୍ତ୍ତବ୍ୟ

•

କବିତା :

ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ବୋଷ

নির্দেশ রামানন্দস্বামী দিয়েছিলেন। সে নির্দেশ গবটা পুরোপুরি না হোক বহুলাংশেই প্রায় পালন করা হয়েছে। এ ছেন রমণী পাগলিনী সৃষ্টি ছিল। তার সেই উগ্রভঙ্গী খানিকটা কেটে গেলেও, তার সম্রাস ব্রতকে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু সেই তীব্র বৈরাগ্যের মূর্ত্তি স্বরূপিণীকে যখন রমণীর মন বড় অসার—ইত্যাদি উক্তি করতে দেখা যায়, তখন পাঠক কি মনে করেন জানিনা, তবে আমার মনে হয় বন্ধিম সমগ্র জীবন সন্দর্শন করেছিলেন—কোন বিশিষ্ট জীবনকে শিল্পায়ত মূর্ত্তিদান করেন নি। তাই এইরূপই স্বাভাবিক। আজকের উগ্রন তিগত নিষ্ঠায় এটা অস্বাভাবিক হতেও পারে। কিন্তু বন্ধিমকল্পিত সমগ্র জীবন দর্শনগত বীক্ষায় এইটাই স্বাভাবিক। তবে রামানন্দ স্বামীর অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ বা যোগবল একটু যেন প্রহসন ঘেঁষা হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্বামীর উক্তির অন্তরঙ্গণে “আমি এতকাল সর্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলাম, সর্বপ্রকার মন্তব্যের সহিত আলোচন করিলাম, কিন্তু সকলই বৃথা। এই দালিকার মনের কথা বুঝিতে পারিলাম না। এ সমুদ্রের কি তল নাই?”

আর সর্বশেষে রামানন্দ স্বামীর মূৰ্খমু প্রতাপের প্রতি হাস্যকর প্রশ্ন আমাদের আরও বিম্বিত করে। ব্রহ্মাণ্ড জয় তোমার এই ইঞ্জিয় জয়ের তুল্য হইতে পারে না—তুমি শৈবলিনীকে ভালবাসিতে? এ প্রশ্ন যেমন হাস্যকর, তেমনি মনুষ্য জীবন সম্বন্ধে অজ্ঞতাহতক। প্রতাপের প্রেমের নাম এক কথায় “জীবন বিসর্জনের আকাঙ্ক্ষা।” মৃত্যুর কিছু আগে প্রতাপ জানিয়েছে—“পাপ চিন্তে আমি তাহার প্রতি অচুরক্ত নহি……। শিরে শিরে, শোণিতে শোণিতে, অতিতে অস্থিতে, আমার এই অচুরাগ অগো-রাত্রি বিচরণ করিয়াছে, কখনও মাত্রবে তাহা জানিতে পারেন নাই……।”

কথাটা সঠিক। প্রতাপ চেয়েছিল শুধু তার প্রেমের স্বীকৃতি। শৈবলিনীর স্তম্বে তার আত্মতৃপ্তি। শৈবলিনীর অনিষ্ট কামনা সে করতে পারে না। প্রতাপ স্বর্গহে তাকে পাণ্ডিঠি বলে সম্বোধন করেছে। কিন্তু শৈবলিনীর দুর্জয় প্রেমের আত্মানে তার পূর্ব বৃত্তির আলোড়ন ঘটে। সেই বৃত্তি মাত্র সঞ্চল করে সে পরবর্তী জীবন রূপসীর সঙ্গে যাপন করতো। কিন্তু তারই প্রেমের আধারস্বরূপিণীর

মুখে যখন সে শুনল যে, সে থাকতে শৈবলিনীর স্থখ নেই তখন মৃত্যুই হল তার প্রেমের সমাধির একমাত্র পথ। প্রতাপের প্রেম খানিকটা আত্মবিলোপকাষী, নিজের অহংচেতনার অবক্ষয়কাষী। এর প্রমাণ প্রথমসত্তরণ দৃশ্যে সে নিজে দিয়েছিল এবং দ্বিতীয় সত্তরণ দৃষ্টান্তে তার অস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সর্বশেষে তার ঐ নীতিকেই সে প্রমাণ করল। প্রতাপ মরেও মরেনি। শৈবলিনী প্রতাপের মৃত্যুর খবর যখন পাবে, তখনই কি সে স্তম্ভির থাকতে পারবে? পারবে না বলেই শৈবলিনী চরিত্রের স্তম্ভ গবেষক বলবেন আশা করি। প্রণয় বা প্রেম যে কি জিনিষ, সে চন্দ্রশেখরের কাছ থেকে পায় নি। প্রতাপের প্রেমের সোনার কাঠির স্পর্শেই তার রমণী সত্যার উদ্বোধন ঘটেছিল। প্রতাপের মৃত্যুতে সেই স্পর্শকবিদ্যাতালোক-দীপ্ত রমণী সত্যার চিরকালীন সমাধিদশা ঘটবে—একথ হলক করে বলতে পারা যায়। শৈবলিনীর জন্তই প্রতাপের মৃত্যুর প্রয়োজন ছিল। চিন্ত জয়ে ইঞ্জিয় জয়ে স্থখ—এই যেন নীতি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য—“যাহার চিন্তাশক্তি নাই, তাহার কোন ধর্মই নাই। যাহার চিন্তাশক্তি আছে, তাহার আর কোন ধর্মই প্রয়োজন নাই। চিন্তাশক্তি কেবল হিন্দু ধর্মেরই সার এমত নহে। টো সকল ধর্মের সার। ইসলাম ধর্মের সার, নিরীখর কোমং ধর্মেরও সার।”

পুনরায়—“চিন্তাশক্তির প্রথম লক্ষণ ইঞ্জিয়ের সংযম। ‘ইঞ্জিয় সংযম’—ইতিবাচ্যের দ্বারা এমন বৃত্তিতে হইবে না যে ইঞ্জিয় সকলের একেবারে উদ্বেগ বা ধ্বংস করিতে হইবে। ইঞ্জিয়গণকে সংযত করিতে হইবে।”—(বিবিধ প্রবন্ধ। চিন্তাশক্তি—সংসদ সংস্করণ, পৃ: ২৫৯)

প্রতাপ চিন্তজয় করেছে। শৈবলিনী চিন্ত জয় করতে পারেনি। তার প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন ছিল। প্রায়শ্চিত্ত যদি সাধারণভাবে না দেখে, মনস্তত্ত্বমূলক দৃষ্টি নিয়ে বিচার করা হয়, তাহলে বন্ধিমের প্রতি অবিচারের সম্ভাবনা থাকে না। শৈবলিনীর এই প্রায়শ্চিত্ত কি চতুর্থ পরিচ্ছেদেই আরম্ভ হয়েছে? সম্ভবত: নয়। তার গৃহ পরিত্যাগের পর থেকে চিন্তে জেগেছে অন্তর্দ্বন্দ্ব। একদিকে তীব্র সংস্কারের পিছুটান, অপর দিকে আগামী রূপোল্লাসময় প্রতাপ-বিলনের সম্ভাব্য আকাঙ্ক্ষা। এই দুয়ের টানা

পোড়েনে কি শৈবলিনীর অন্তর ব্যথিত হয়নি ? তা যদি না হতো, তবে পর্বতগুহার চন্দ্রশেখরকে দেখবার জন্য সে কামানন্দ স্বামীকে বারবার অনুরোধ করতেন। গৃহদাহের নায়িকা অচলার দোটাঁনা মনোবৃত্তির সঙ্গে শৈবলিনীর আংশিক মিল আছে। এই দোলাচলচিত্তবৃত্তির মধ্যে প্রতাপকে সে স্বামীর আসনে বসাতে পারেনি। সেইসঙ্গে একথাও সত্য যে, সে ইচ্ছায় জয় করতে পারে নি। সে দ্বিধাবিহীন মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়েছে। এই বৈধী মনোবৃত্তির জন্য তার বন্ধিম প্রদত্ত শাস্তি। রূপজ মোহের অনলে নবকুমার সাগরে দেহ বিসর্জন দিয়েছিল, কুন্দ দ্বিধ পান করেছিল, নগেন্দ্রনাথের সোনার সংসার ছাড়বার হৈয়েছিল—রোহিণীর রূপমুগ্ধ গোবিন্দসালের জন্য। রোহিণীকে বিদায় নিতে হল, গোবিন্দলাল সন্ন্যাসী হল। বন্ধিম সাহিত্যের পাঠক আশা করি লক্ষ্য করে থাকবেন যে, বন্ধিম ইচ্ছার অবাধ বিস্তার চাননি। তিনি মানুষকে বিশেষ কালবন্ধ করে দেখেন নি, অথবা মানুষের জীবনের কোন একটি পর্যায়কে লক্ষ্য করে তিনি উপন্যাস রচনা করেন নি। তিনি সমগ্র মানবজীবনদর্শনের নিরপেক্ষ দ্রষ্টা।

বন্ধিম চিন্তাশক্তির সম্পর্কে বলেন—“এই চিন্তাশক্তি মনুষ্যদেহের সকল বৃত্তিগুলির সম্যক ক্ষুধা, পরিণতি ও সামঞ্জস্যের ফল।”

[বিবিধ প্রবন্ধ। পৃ:—২৬২]

“বস্তুত: সকল প্রকার মানসিক বৃত্তির সম্যক অনুশীলন সম্যক ক্ষুধা ও যথোচিত উন্নতি ও বিপুল জীবনের উদ্দেশ্য”—[ঐ পৃ:— ৭১]

“যখন মানুষের সকল বৃত্তিগুলিই ঈশ্বরমুখী বা ঈশ্বরানু-বর্তিনী হয়, সেই অবস্থাই তত্ত্ব।” [ধর্মতত্ত্ব পৃ:—৬২০]

“মূল কথা, অনুশীলন ধর্ম greatest good of the greatest number, গণিততত্ত্বের আর কিছুই নহে।”

[ঐ পৃ:—৬১৩]

উদ্ধৃতিগুলি লক্ষ্য করলে, পাঠক বন্ধিমের মানবিক মূল্যবোধ ও কর্তব্যজ্ঞান সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গী উপলব্ধি করতে পারবেন। এ সমস্ত আলোচনার অনুসরণ করে কেউ যেন মনে না করেন, যে বন্ধিম নিছক নীতি বা তত্ত্বপ্রতিপাদনের জন্য উপন্যাস রচনা করেছেন। তিনি অমর কথাশিল্পী এবং সর্বত্র উপন্যাস অংশে তাঁর শিল্পী সত্তাই জয়যুক্ত হয়েছে। চন্দ্রশেখর উপন্যাসে তাঁর শিল্পী সত্তাই বিজয়-মালো ভূষিত হয়েছে। তবে তিনি “মঙ্গল সাধন ও সৌন্দর্য্য সৃষ্টি”—এ দুটোকে পৃথক জ্ঞান করতেন না। তাই একালের আনুবীক্ষণিক বিচারে বন্ধিমের স্থানে অস্থানে অপব্যাখ্যা হয়—ঐ নীতি ও সৌন্দর্য্যের একক সত্তাকে বৈতজ্ঞানের ভান করে।

নতুন পৃথিবী

রবি গঙ্গোপাধ্যায়

ওরা কেন আসে কেন যায়
ওদের শাস্তির নীড় ভেঙে গেছে ; কালের চিতায়
পুড়ে গেছে স্বপ্ন স্বপ্ন ক্ষুদ্র হৃদয়ের,
ওদের জীবনে নেই আলো, আছে অন্ধকার ঢেয়।
ওদের জীবন-নদী পথহারী, সাহারার বুকে
মিশেছে যে ; জীবনের দেওয়া নেওয়া সব গেছে চুকে।
হারিয়েছে ভাই বোন ভীড়ের মিছিলে,
সোনালী সবুজ আশা হারিয়েছে আকাশের নীলে

আর কি এ অন্ধকারে হে সূর্য্য সে সোনার আলোক
ফুটবে না ? আর নীল চোখ
দেখবে না সে আলোয় জীবনে কি আর ভাই বোন
আর সে সবুজ নীড় পাবেনা কি

আর গৃহ কোন্ ?

এই অন্ধকারে আর ফুটবে কি সে সোনার ছবি
সোনার আলোক ভরা সে সকাল

নতুন পৃথিবী।

মার্কো পলোর দৃষ্টিতে ত্রয়োদশ শতকের ভারত

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে যে তিন জন ইয়োৰোপীয় বণিক ভেনিস নগরী থেকে পিকিং পর্যন্ত—তারপর সুমাত্রা, জাভা বার্মা, ভারত ও সিংহলের উৎকল ঘুরে পারশ্ব হয়ে ইটালীতে ফিরে গিয়েছেন বাণিজ্য করে, দৌত্য করে—তারা হলেন, মার্কো পলো, তাঁর পিতা নিকোলো আর কাকা মেকিও। ছাব্বিশ বছর পরে সম্রাট কুবলাই খাঁর দ্বাৰা বারে ঐশ্বৰ্যের দীপ্তি আর ঐচ্ছল্য উপভোগ করে তাঁরা তাঁদের ভেনিসের পুরানো বাড়িতে ফিরে এলেন ১২৯৫ খৃষ্টাব্দে। তাঁদের পোষাক ছিল ছেঁড়া মোটা কাপড়ের। প্রায় দেশীয় কাপড়ের পুটলী ছিল তাঁদের কাঁধে। দীর্ঘদিনের দুঃখ-কষ্টে রৌদ্রবৃষ্টিতে ওদের গায়ের রঙ পুড়ে গিয়েছিল। মাতৃভাষা তারা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। তাঁতাদের মত ছিল তাদের লম্বা দাড়ি আর পোষাক। তাঁদের ২৬ বছর বয়সে অসুস্থতায় ভেনিস সहरও অনেক বদলে গিয়েছিল। তাঁরা প্রথমে তাঁদের বাড়ী খুঁজে বের করতে পারেন নি। কিন্তু শেষে যখন অনেক কষ্টে বাড়ী খুঁজে পেলেন, বাড়ীর দ্বার তাঁদের অভ্যর্থনার জন্তে খোলা হলো না। ভ্রমণে বেরিয়ে যাওয়ার পর তাঁদের আশ্রয়রা এসে বাড়ী দখল করেছিল। তাঁরা যে জীবিত আছে একথাই তারা জানত না। অনেক ডাকাডাকিতেও কেউ বাড়ীর দ্বার খুলল না। তাঁদের বাড়ীর কুকুরই খেউ খেউ করে কানড়াতে এল তাঁদের। কোন রকমে মার্কো রাজাঠেলে বাড়ীর ভেতর ঢুকে পড়লেন, আর তাঁর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বাপ ও কাকা। বাড়ীর লোকেরা কেউ তাঁদের কথা বিশ্বাস করল না। শহরস্থিত অন্যান্য আশ্রয়রা খবর পেয়ে ছুটে এলেন। সব শুনে তারা তাঁদের কথা বিশ্বাস করলেন কিছুটা। সবাই মিলে একটা ভোজ সভার আয়োজন করলেন তাঁরা। ভোজের শেষে মার্কো পলো চাকরদের প্রাকোষ্ঠ থেকে বের করে দিয়ে তাঁদের

জীর্ণ মলিন আলখাল্লা বের করলেন, আর ছুরি দিয়ে সেলাই কেটে হীরা, মুক্তা, পাশা খুলে দেখালেন। অবাক বিষ্ময়ে সবাই তা দেখল, তখন আর তাঁদের সম্বন্ধে কারো সন্দেহ রইল না।

মার্কোপলোর জন্ম হয় ভেনিসে ১২৫৪ খৃষ্টাব্দে। তাঁর যখন বয়স ছয় বৎসর তাঁর বাবা আর কাকা বাণিজ্য করতে বেরিয়ে পড়েন, আর এগিয়ে যেতে যেতে কুবলাই খাঁনের রাজধানী পিকিং গিয়ে পৌঁছান। কুবলাইখাঁনের দরবারে ওদের খুব আদর হয়। সম্রাট খুগান ধর্ম সম্বন্ধে খুব উৎসুক হন। পোপের কাছে একশত পাজী চেয়ে চিঠি লিখে নিকোলো আর তাঁর ভাইএর মারফত পাঠান। নিকোলো এ দৌত্য কার্যে সফল হন নি। কিন্তু ফিরে যাওয়ার সময় তাঁর ছেলে মার্কো পলোকে নিয়ে চললেন। মার্কোর বয়স তখন মাত্র পনের বৎসর। ছেলে আর ভাইকে নিয়ে নিকোলো অনেক কাঁটে ফিরে গেলেন পিকিং। কুবলাই খাঁর দরবারে তাঁরা খুব সম্মানের আদায় পেয়েছিলেন। মার্কো চীনের একটি প্রদেশের শাসনকর্তাও হয়ে ছিলেন।

অনেক দিন পরে হঠাৎ পারস্তের রাজার (সম্পর্কে কুবলাইর ভাই এর নাতি) এক চিঠি পৌঁছল পিকিংএ। রাজার রাণী মারা গিয়েছিলেন। তিনি বিখ্যাত মোকল বংশের কন্যা ছিলেন। সেই বংশেরই একটি কন্যা চান তিনি। কুবলাই খাঁ ভাবলেন কি করে পাঠান যাবে। রাস্তা ভরপুর বিপজ্জনক। মার্কো পলো, তাঁর বাপ ও কাকা প্রস্তাব করলেন সমুদ্রপথে তাঁরা কন্যাকে নিয়ে যেতে পারেন। কুবলাই খাঁ অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজী হলেন। জাহাজে চড়লেন মার্কোপলো ধনরত্ন সম্বল করেছিলেন সব নিয়ে। সুমাত্রা, জাভা, বার্মা, ভারতবর্ষ, সিংহল হয়ে পারশ্ব পৌঁছতে দুই বছরের বেশী সময় লেগে গেল। রাজা

তত দিনে মারা গেছেন। নিকোলো রাজার ছেলের হাতে কস্তাকে সমর্পণ করে ইটালীর পথে যাত্রা করলেন।

ভেনিসে ফিরে গিয়ে কিছুকাল পরে দুর্ভাগ্য বশত মার্কো পলোকে জেলে বন্ড পেতে হয়েছিল। কারাগারে বসেই তিনি তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্ত বলে যান। আর জেলের অগ্র এক কয়েদী তা লিপিবদ্ধ করেন। মার্কোপলোর ভ্রমণবৃত্তান্ত ত্রয়োদশ শতাব্দীর এশিয়ার একটি প্রামাণ্য ইতিহাস। প্রথমে ইউরোপের লোকেরা এই ভ্রমণ বৃত্তান্তে বিশ্বাস করে নি। কিন্তু পরে যখন এশিয়ার ঐশ্বর্য সম্পর্কে আরও তথ্য সেখানে পৌছতে শুরু করল তখন মার্কোপলোর ভ্রমণ কথায় তাদের প্রত্যয় ফিরে আসতে লাগল ॥

মার্কোপলো বাংলা ও ভারতের অগ্র জায়গা সম্পর্কে অনেক তথ্য রেখে গিয়েছেন। তিনি বলেছেন বাঙালী দেশের লেখকেরা খুব পরাক্রমশালী ছিল। তাদের রাজাও ছিল খুব শক্তিশালী আর দুর্দান্ত। যতদিন মার্কোপলো কুবলাই খাঁর দরবারে ছিল ততদিন পর্যন্ত কুবলাই খাঁ বাঙালকে জয় করতে পারেন নি। বাঙালী ও মিশরের রাজার সঙ্গে কুবলাই খাঁর সৈন্যদের যুদ্ধ হয় মার্কোপলো যখন ভারতে আসেন তার অনেক আগে। কুবলাই খাঁর দরবারে বসে বা তাঁর বীরত্ব কথার অন্তরঙ্গ শ্রোতা হিসাবেই মার্কোপলো এসব বৃত্তান্ত জানতে পেরেছিলেন। বাঙালী ও মিশরের রাজার সঙ্গে কুবলাই খাঁর সেনাদলের ভয়ঙ্কর যুদ্ধের বিবরণ দিয়েছেন মার্কোপলো। সেই যুদ্ধে কুবলাই খাঁর যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছিল।

মার্কোপলো বলেছেন, বাঙলাদেশের লোকদের এক বিশেষ ধরনের ভাষা। তারা মূর্তি পূজা করে। এখানকার বাঁড় প্রায় হাতীর মত উঁচু, কিন্তু তত প্রকাণ্ড নয়। অধিবাসীরা মাংস, দুধ আর ভাত খেয়ে থাকে—এসবই এখানে প্রচুর পাওয়া যায়। তুলোর চাষ এখানে প্রচুর। অত্যন্ত প্রদেশের বণিকেরা এখানে নানা রকমের ঔষধ ও পণ্যদ্রব্য কেনার জন্য আসে।

ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গারও বিবরণ তিনি দিয়েছেন। ভারতের উপকূলের সকল বন্দরেই তিনি নেমেছেন। ভারতবর্ষের চলব্য রীতিনীতির উপরও অনেক আলোকপাত করে গেছেন। তিনি বলেছেন ভারতের প্রচণ্ড তাপের জন্য লোকেরা প্রায় উলঙ্গ থাকে।

রাজার মূল্যবান পোষাক পরেন। গোবর দিয়ে ঘরবাড়ী লেপা হয়ে থাকে। মটর আসন প্রেষ্ঠ আসন বলে গণ্য হয়। নারী পুরুষ সবাই দুই বেলা স্নান করে। স্নান না করে কেউ আহার করে না। ভারতের লোকেরা ডান হাতে খায়। আর বাঁ হাত দিয়ে নোঙরা পরিষ্কার করার কাজ করে। জলপানের ভগ্নে প্রত্যেকেরা পাত্র আলাদা। জলপাত্র মুখে লাগিয়ে কেউ জল পান করে না। জলের বটি মাথার উপর নিয়ে ঢুক ঢুক করে ওরা মুখে জল ঢেলে দেয়। খুব জায়বিতারের সঙ্গে দোষীর শাস্তি হয়ে থাকে। ঋণ নিয়ে যে ঋণ শোধ করে না, তার শাস্তি বড় ভয়ঙ্কর। তাকে যদি উত্তমর্গ একবার কুণ্ডলী একে বন্দী করতে পারে তবে সে ঋণ শোধ না করে সেই কুণ্ডলীর বাহিরে যেতে পারে না। যদি সে এই রকম যায় তবে তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। মার্কো পলো একবার নিজের চোখে দেখেছেন কেমন করে এক রাজাকে এক পাণ্ডনাদার কুণ্ডলী একে বন্দী করেছিল। রাজা তার ঋণ শোধ না করে কুণ্ডলী থেকে বেরিয়ে যান নি। ভারতবর্ষে মার্কো পলো দেহবিজ্ঞান আর জ্যোতিষ-শাস্ত্রের চর্চা দেখে গেছেন। তিনি এদেশের অধিবাসীদের বিশেষ করে ব্রাহ্মণদের সচ্চরিত্রতার প্রশংসা করে গেছেন। তিনি বলেছেন—

ব্রাহ্মণেরা দেশের সর্বোত্তম আর সর্বপুণ্য। ব্যবসায়ী কোন প্রলোভনই তাদের মিথ্যা বলার প্ররোচিত করতে পারে না—এমন কি প্রাণ গেলেও না। অস্ত্রের দ্রব্য গ্রহণ করা বা অস্ত্রকে বন্ধন করা তাঁরা অস্ত্র দিয়ে ঘৃণা করেন। তাঁরা এক দ্রী নিয়েই তুষ্ট থাকেন। বহু বিবাহ তাঁরা পছন্দ করেন না। যদি কোন বিদেশী বণিক কোন ব্রাহ্মণের কাছে পরিচয় দেয় তখন সে ব্রাহ্মণ তার সব কাজ করে দেন, সে কাজের জন্য তিনি কোন পুরস্কার চান না, বা আশা করেন না। তাকে তিনি বিশ্বাসযোগ্য হিসাব দিয়া থাকেন। তাঁরা মাংস খান, আর দেশে প্রস্তুত মত্তও পান করেন। তাঁরা নিজে কোন জন্তু হত্যা করেন না, মুসলমানদের দিয়ে হত্যা করিয়ে নেন। অস্ত্র জাতির লোকদের থেকে নিজেদের পার্থক্য বোঝাবার জন্য তাঁরা গলায় এক ধরনের ব্যাজ অর্থাৎ সূতো পরে থাকেন। সূতোটি এমনভাবে পরেন যাতে এক হাতের নীচে দিয়ে

তা সামনে বুকের উপরও দেখা যায়, পিছন থেকে পিঠের উপরও দেখা যায়।

ভারতবর্ষের রাজগণ-খুব ধনী ও শক্তিশালী ছিলেন, তাঁরা ধনরত্ন মণিযুক্ত আহরণে খুব মনোযোগী ছিলেন আর সকলের উপরে ছিলেন গ্রাম বিচারারায়ণ।

দক্ষিণ ভারতের রাজাদের সম্বন্ধে আরো অনেক তথ্য উদ্ধৃতি করেছেন মার্কো পলো। এক রাজার সম্বন্ধে বলেছেন : তাঁর পাঁচ শত রাণী আর উপপত্নী ছিল। যখন তিনি কোন রমণীর সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হন, তখন তাকে পাওয়া চাই। এইভাবে তিনি তার ভাইয়ের স্ত্রীকেই অধিকার করেছিলেন। কিন্তু ভাই ছিলেন-খুব দীর্ঘস্থির ব্যক্তি। তাই তাকে নানাভাবে প্রভাবিত করলেন, যাতে তিনি কোন গোলমাল না করেন।

রাজা তার দেহ রক্ষী হিসাবে কয়েকজন সেনাপতি রাখেন। তারা রাজার জন্ত উৎসর্গিত প্রাণ, তারা রাজার ইহকালের ও পরকালের সঙ্গী, তারা দরবারে রাজার সঙ্গে থাকে ; মিছিলে পাশে পাশে থাকে। রাজ্যের সর্বত্র তাদের দোঁদগু প্রতাপ। রাজার যখন মৃত্যু হয়, তখন তারা রাজার আশান চুল্লীতে ঝাঁপ দেয়, রাজার সঙ্গেই দহু হয়ে মরে, এই কার্য দ্বারাই তারা রাজার পরলোকের সঙ্গী হয়ে যায়।

দক্ষিণ ভারতের মন্দির সম্বন্ধেও কিছু বিবরণ দিয়েছেন মার্কোপলো। প্রত্যেক মন্দিরেই অনেক দেবতার মূর্তি রয়েছে। এ দেবতাদের কাছে মা-বাপেরা তাদের কন্যাদের উৎসর্গ করে দেয়। দেবতার নিকট উৎসর্গিত কন্যাগণ মন্দির পুরোহিতের নির্দেশে দেবতার সেবার যোগ দিতে বাধ্য। দেবতার কাছে ভোগ নিবেদনের সময়ে তারা গান করে ও বাজনা বাজায়। এই রকম ভাবে তারা দেবতার সেবা করে বহুদিন না তাদের বিয়ে হয়ে যায়। ওরাই হয়ত ঐ যুগের দেবদাসী।

মালাবার ও গুজরাটের বর্ণনাও মার্কোপলো দিয়ে গিয়েছেন। মালাবারেও গুজরাটে উত্তর স্থানই ভয়ঙ্কর জলমস্যার আড্ডা ছিল। সেই দস্যুদের নৃশংসতা তাঁর বর্ণনার বিশেষ আধাঙ্গ লাভ করেছে।

জেল থেকে মুক্তিলাভ করে মার্কো পলো ডোন্ডাটো নামী এক মহিলা-পাণিগ্রহণ করেন। তাঁর তিন কন্যা

অয়ে—তাদের নাম ফস্টিনা, বেলেনা ও মোরেটা। চীন থেকে ফিরে আসার বার বছর পরে এক করালী ভয়-লোককে তার ভ্রমণ কাহিনীর এক কপি দান করেন। তাঁর কামনা ছিল ইউরোপের লোকেরা প্রাচ্যের ঐশ্বর্য সম্বন্ধে জাহুক। কিন্তু তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের মনেও তাঁর কাহিনী সম্পর্কে অবিশ্বাস ছিল। ১৩২৭ খ্রীষ্টাব্দে যখন তিনি মৃত্যুশয্যায় তাঁরা তাকে সান্ত্বনা দিতে এসে অহরোধ জানাল তাঁর কাহিনীর অবিদ্যাত্ত বর্ণনাগুলি, প্রাচ্যে প্রচার করতে—যাতে তাঁর আত্মা শান্তিতে থাকতে পারে। কিন্তু মার্কো পলো শুধু বললেন, ‘আমি বা’ মেগেছি তার অধেঁকও বলি নি।’

মার্কো পলো ভারতবর্ষের সমস্ত বা রাজ্যের যে সব নাম দিয়েছেন সে-সব থেকে স্পষ্ট প্রকৃত স্থানের পরিচয় জানা যায় না। তিনি তাতার বা মোঙ্গলদের দ্বারা ব্যবহৃত নামগুলিই ব্যবহার করেছেন। বঙ্গদেশকে বাঙ্গালা বলা হয়েছে। বাঙ্গালা ও মিয়েন-এর কোন রাজ্যের সঙ্গে কুবলাই খাঁর সৈন্যের এত ভীষণ যুদ্ধ হয়েছিল তা বুঝা যায় না। মার্কো পলো রাজ্যের নাম ব্যবহার করেন নি। কুবলাই খাঁর আমলে [১২৬—১২২৪] বাঙালার সিংহাসনে দুর্বল রাজারা রাজত্ব করতেন। লক্ষণ সেন সুবর্ণ গ্রামে পালিয়ে যান, তাঁর পুত্র কেশব সেন বা পৌর মধু সেন [১২২] বীর রাজা বলে খ্যাতি লাভ করেননি। তবে মার্কোপলো কোন্ বাঙ্গালা রাজ্যের অধিপতির বীরত্ব কথায় মুগ্ধ হলে! ত্রিপুরার রাজমালার দেখা যায় বিদেশী আক্রমণকারীর সঙ্গে মহারাজী ত্রিপুরাঙ্গলীর খোরতর যুদ্ধ হয়েছিল ১২৩০ খ্রীষ্টাব্দে। ত্রিপুরা রাজ্য তখন বর্তমান বাঙলা দেশের পূর্বাঞ্চল ও বার্মার আরাকান প্রদেশ নিয়ে গঠিত ছিল। আরাকানকেই হয়ত মার্কো পলো মিনে বলেছেন। ত্রিপুরার সৈন্য বাহিনীতে প্রচুর প্রচুর হাটী ছিল। মার্কো পলো বাঙ্গালা ও মিয়েন রাজ্যের রত্নী বাহিনীর অনেক প্রশংসা করেছেন। তারপর কুবলাই খাঁর সময়েই এ যুদ্ধ হয়েছিল। আর কুবলাই খাঁকেই হয়ত রাজমালার দ্বিতীয় বলে আখ্যাত করেছেন।

অন্ত রাজ্যেচৌর্যবস্ত হিরো বহু করপ্রদঃ ॥

বঙ্গাধ্যক্ষহতি দুবৃত্ত মহাবল পরাক্রমঃ ।

তঃ রাজানমন্ত্যায় দিল্লীখরমুপাগতঃ ॥

ইতি শ্রদ্ধা ততো রাজা ক্রোধাৎ প্রচলিতোজ্জ্বরঃ

বদে মেহের কুল সংপ্রায়ামাস -মহাসেনাপতি এয়ম্ ।
রাবস্ত্র নঃক মেহের কুলের সমস্ত রাজা দিল্লীখরকে ভেট
টিয়েছিলেন । তাতে রাজা কীর্তিধর মানিক্য ছংতুংকা
র রাজ্য কেড়ে নেন । তাঁর সাহায্যার্থেই দিল্লীখর
টে আসেন বাঙলা র জগাধার কিস্ত গোড়েখর বলা
য়েছে । তখন রাজা ভয় পেয়ে সন্ধি করতে চান । কিস্ত
রাবস্ত্রনা রাণী ত্রিপুরসুন্দরী রাজ্যের সে অপমান সহ
বরতে পারেন নি । তিনি সেনাপতি যুবরাজ রাজস্বর্ষ ও
সম্মগর্গকৈন্দকে পাঠালেন ।

মহাদেবী জিজ্ঞাসিল বিনয় করিয়া
কি করিব পুত্র সব কহ বিবেচিয়া ।
গৌড় দৈত্য আসিয়াছে যেন যমকাল
তোমার নৃপতি হইল বনের শূগাল ।
যুদ্ধ করিবার আমি যাইব আপনে
সেই জন বীর হও চল আসা মনে ॥
রাণী বাক্য শুনি সবে বীর মর্মে বোলে ।
প্রতিজ্ঞা করিল যুদ্ধে যাইবে সকলে ॥ রাজ মাল।

রাণী সঙ্গে সৈন্তগণ যুদ্ধে প্রবেশিল ।

ত্রিপুরা সুন্দরী রাণী হস্তী সোয়ার হইল ॥

ছয় শত পঞ্চাশ সন ত্রিপুরা যখন

ত্রিপুরা সুন্দরী রাণী করে এই রণ ॥

[ত্রিপুর বংশাবলী]

সেই যুদ্ধে আক্রমণকারীরা পরাস্ত হয়ে পালিয়ে গিয়েছিল ।
রাজা কীর্তিধর মানিক্য যুদ্ধ ক্ষেত্রে সৈন্ত অশ্ব ও গজের
মৃতদেহ দেখে হতভিত্ত হয়েছিলেন ও আকাশে কবন্ধ
দেতে পেয়েছিলেন । সম্ভবতঃ ১২৪০ খৃষ্টাব্দে এই যুদ্ধ
হয়েছিল । কারণ ত্রিপুরা বংশাবলীর তিন বৎসর আগে
থেকে গণনা করা হয় ।

মার্কোপলো অশ্রু অশ্রু জামগায় বলেছেন বাঙ্গালা ও
মিয়েনের রাজা ১২১২ খ্রীষ্টাব্দে কুবলাই খাঁর সেনাদের
সঙ্গে যুদ্ধ পরাজিত হন । অতঃ পর বলেছেন, যতদিন তিনি
কুবলাইর দরবারে ছিলেন ততদিন বাঙ্গলার রাজাকে
পরাস্ত করা সম্ভব হয় নি । এর মধ্যে কিঞ্চিৎ অসঙ্গতি
রয়েছে । কুবলাই খাঁর প্রতি অতিরিক্ত আশ্রয়তাবশতই
হয়ত মার্কোপলো বাংলার রাজার পরাজয়কাহিনী
লিখেছেন ।

“হুগলী” নামের উৎপত্তি

শ্রীপরেণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা দেশের সাহিত্য ও ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান
অধিকারী হুগলী জেলা এ বিষয়ে সকলেই একমত । এই
জেলার নাম কবে এবং কিভাবে সৃষ্টি হল সে বিষয়ে
মোটামুটিভাবে দুইটি মত প্রচলিত আছে । সাধারণের
মধ্যে যে মতটি বিশেষভাবে জনপ্রিয় তাহা এই যে এতদঞ্চলে
পূর্বে প্রচুর পরিমাণে ‘হোগলা’ জন্মাইত এবং সেই জন্যই
এই স্থানের নাম হুগলী বলা হয় [১] । অপর একটি মত

অল্পখ্যাতী পত্নীগৌর উপনিবেশ ‘গোলিন’ থেকে এই নাম
প্রচলিত হয় [২] । উভয় মতেরই যথার্থ বিচ্যমান তবে
গত পাঁচ শত বৎসর যং ইতিহাস ও সমসাময়িক সাহিত্য
আলোচনা করলে দেখা যায় যে শেষোক্ত মতটিই গ্রহণ
যোগ্য । অবশ্য ভাগীরথীতীরবর্তী হুগলী জেলা বা হুগলী
সহরে হোগলা নিশ্চয়ই জন্মায় কিন্তু তাই বলে হুগলী
নামটি কিন্তু যে খুব পুরাতন তা বলা চলেনা এবং পত্নীগৌর-

দের উপনিবেশের সময় থেকেই এই নামের প্রচলন এটাই ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা।

সর্বপ্রথম এই নামের উল্লেখ পাওয়া যায় কবি বিপ্লবাস রচিত ‘মনসামঙ্গল’ কবিতায়। ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে রচিত এই কবিতায় ভাগীধরী বা গঙ্গার উভয় তীরবর্তী অপর কয়েকটি নিকটবর্তী স্থানের সঙ্গে এই নামের উল্লেখ আছে। কিন্তু যে পাণ্ডুলিপির ভিত্তিতে ঐ কবিতা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় উহা ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে লিখিত হয় বলিয়া ক্রীষ্ণপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের অভিমত। [৩] সেজন্য ঐতিহাসিক নজীর হিসাবে ঐ কবিতার ‘হুগলী’ নামের উল্লেখ কোনও সাহায্য করেনা।

চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পাঠান সম্রাট ফিরোজ শাহের সময়ে জাফর খাঁ ভূদেও নামে এক হিন্দু রাজার সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হন। এই ভূদেওকে কোনও কোনও ঐতিহাসিক “হুগলীর রাজা” বলিয়া অভিহিত করেন। কিন্তু এই সব ইতিহাস অনেক পরশতিকালে রচিত বলিয়া এর বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয় [৫]। ১৬শ শতাব্দীর শেষভাগে প্রকাশিত ‘আইন-ই-আকবরী’ ও ‘বাদশাহনামা’ নামক দুইটি উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক গ্রন্থে পর্তুগীজদের উপনিবেশ বা বন্দরের কথা উল্লেখ থাকিলেও ‘হুগলী’ নামের উল্লেখ নাই [৬] ও [৭]। প্রায় একই সময়ে রচিত ফেরদৌসির বিবরণীতেও এই স্থানের পৃথক হুগলী নামে পরিচয় পাওয়া যায় না।

আনুমানিক ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে পর্তুগীজেরা উপনিবেশ স্থাপন করেন এবং গোলাগঞ্জ বা ব্যবসাবেস্ত্র থেকেই তাঁরা উপনিবেশের নাম ‘গোলিন’ রাখেন। পরবর্তীকালে বাংলা মূলক ভ্রমণকারী প্রথম ইংরাজ Ralph Fitch প্রথম পর্তুগীজ উপনিবেশকে ‘হুগলী’ নামে অভিহিত করেন। এথেকেই বোঝা যায় যে পর্তুগীজদের দেওয়া নাম

অনুযায়ী তিনিই প্রথম এই নাম তাঁহার বিবরণীতে ব্যবহার করেন। [৭]

এর পরবর্তীকালে পর্তুগীজদের প্রতিষ্ঠিত কনভেন্ট Ogolym convent এর প্রস্তর ফলকে [৭] ১৫৯৪ খৃঃ লেখা থাকায় এই জাহিই যে এই নাম সৃষ্টির মূলে এতে কোনও সন্দেহ থাকে না। তবে মাত্র ৬০ বৎসর আগে ব্যাঙেল চার্চ পরিদর্শনকারী জনৈক ভ্রমলোক ঐ প্রস্তর ফলকটির সন্ধান পান নাই যদিও ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে চার্লস জোশেফ উহা দেখিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। [৮] বর্তমানকালে অনুসন্ধান করে শুধু এই মাত্র জানা গেল যে চার্চটির স্থাপনের কয়েকবৎসর আগে উক্ত কনভেন্ট স্থাপনা করা হয় এবং সামান্য পরিবর্তন সাপেক্ষে উহা আজও বিদ্যমান।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মোঘল সাম্রাজ্যের রাজস্ব বিবরণীতে পর্তুগীজের দখলে বন্দর এলাকার টোল (Toll) বা রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য ‘বাক্স বন্দর’ নামে একটি ক্ষুদ্র মৎসলের সৃষ্টি করেন [৯]। এমনকি এসংয়ের কিছুকাল পরে মোঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরকেও অনেক তদন্তের পর জানিতে হয় যে সাতগাঁও এর নিকটবর্তী পর্তুগীজ বন্দরকেই লোকে হুগলী বলে।

Ogolym বা Golin এই ‘বানান’ থেকেই যে হুগলী নামের উৎপত্তি একথাঃ আরও পরিষ্কারভাবে জানা যায় যদি পর্তুগীজদের নিজস্ব উচ্চারণের পদ্ধতির বিষয় আলোচনা করা যায়। এই জাতির উচ্চারণের স্বাভাবিক নিয়ম হাচে কোনও শব্দের আগে কণ্ঠ্য শেষের দিকে এক বা একাধিক অক্ষর উচ্চারণ না করা এবং উচ্চারণের প্রয়োজনাতরিক্ত এক বা একাধিক অক্ষরের উল্লেখ করা। এ ছাড়া ভারতীয় কোনও শব্দকে ইংরেজীতে ভাষায় রূপান্তর করিতে উচ্চারণ বা বানানে আংশিক বিকৃতি সম্ভব। হুগলী এই নামট কত রকম বানানে লেখা হয়েছে [১০] : বিভিন্ন ইতিহাসের পাতা থেকে উদ্ধার করা এই নামের

[৩] মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস।

৪। Bengal past & present—vol III

৫। Ayinee Akbari

৬। Badshahnama

৭। Calcutta Review—vol IV

৮। One week at Bandel Church.

৯। Revenue Resource of Moghal Empire,

১০। Wilson's Glossaries of India terms.



নব ভারতের জীবন পুরোহিত

উপানন্দ

যে জিজ্ঞাসা, যে ওঃ জগা দিল শব্দকে, সে জিজ্ঞাসা, সে ওঃকে ফেলে রেখেই উড়ে চলে যায় শব্দ। একাই তাকে খুঁজতে হয় তার ইথারকে। একাই উড়ে যায় বিহঙ্গম তার নীড়কে ফেলে রেখে, চলে যায় তান সুর্যোর দিকে। ফেলে রেখে যায় একটা পুরো হৃদয় স্বপ্নের নির্জনতায়। যে শব্দ অর্দ্ধশতাব্দী ধরে সমগ্র বিশ্বকে শান্তি ও মৈত্রীর আবহাওয়া সৃষ্টি করেছিল, যে শব্দ পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্তপ্রান্ত পর্যন্ত আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, সে শব্দ আজ শূন্যে বিলীন। সে কণ্ঠ আজ নীরব। ভারীকালের ঐতিহাসিক যাত্রাপথে যখন তোমরা মানব সভ্যতার নব অতুল্য আনবে তখন প্রত্যক্ষ করবে সেই শব্দের দৈবী প্রভাবে একুশ বিশ্বাস আমার আছে।

ঈশ্বর প্রেরিত সেই শব্দ গ্রহণ করেছিল মর্ত্যকায়ী, আজ সে কায়ামুক্ত—সর্ব আধরণ তার জীবন হয়ে ঝরে পেল ধলার আসনে। তাকেই আমরা জেনেছিলাম মহাভারতের মহাজীবন—পণ্ডিত জহরলাল নেহরু। এলাহাবাদে আনন্দ ভবনে তার ৬য় ১৪ই নবেম্বর ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দে আর তার তিরোভাব নয় দিল্লীতে ২৭শে মে ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দে বেলা দুটার সময়। প্রেম জানেনা সে কত খানি গভীর, যতক্ষণ না আসে বিদায়ের লগ্ন। বিরাট জনসমুদ্রের কূঁক শোকের উত্তাল তরঙ্গ মালা ভেদ করে; দিল্লীর রাজঘাটে মহাত্মা গান্ধীর সমাধি ক্ষেত্রে পাণ্ডে ২৮শে মে

সায়াকে তাঁর শোকতা সম্পন্ন করা হলো। মহান নেতাক্রমে তাঁর গৌরবময় কৃমিকা স্বরণ-মধুর। তিনি জাতির চির প্রণমা, চির বন্দনীয়।

বিশ্বের নানা রাষ্ট্রের কর্ণধার ও প্রতিনিধিবর্গ, নীরব স্থানীয় নরনারী ও বয়োগ ব্যক্তিরা এসেছিলেন বিমান যোগে এই বিরাট ঐতিহাসিক পুরুষের শবাহুগমনে যোগ দান করবার জন্তে। সমগ্র পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের এমন কি রাষ্ট্র সঙ্ঘের পতাকা অর্দ্ধনমিত তাঁর পূণ্যস্থতির উদ্দেশে। শোকাচ্ছন্ন সমগ্র বিশ্ব। অশ্রুশ্রবণ শতাব্দীর স্বর্গ্য। অস্তহিত মানব সভ্যতার অগদহতা। আমরা অসহায়। বাইবেলে উক্ত আছে—‘Perfect soul unites with the creator.’ এই মহান আত্মা সর্বপ্রকার নিন্দা প্রতি ও সমালোচনার উর্দ্ধে মৃত্যুর অতীতলোকে অমৃতময়।

পণ্ডিত জহরলাল গুপ্ত ভারতীয় রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন না, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জননায়কও ছিলেন। ভারতের পরতন্ত্রিত্ব কোটি নরনারীর সংহতি শক্তি হৃদয় করে গেছেন তিনি। পুষ্টিলাভ করেছে এই জাতি অর্দ্ধশতাব্দী ধরে তাঁরই বিরাট ব্যক্তিত্বের ছায়াছায়ায়। এলাহাবাদে যে গৃহে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেই আনন্দ ভবন শতাব্দীর ঐতিহাসিক স্থতি বহন করেছে। যে পরিবারে তাঁর আবির্ভাব, সে পরিবারের ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য, বিলাস



নব ভারতের জীবন পুরোহিত

উপানন্দ

যে জিন্দা, যে গুচ জগা দিল শব্দকে, সে জিন্দা সে
ওঠকে ফেলে রেখেই উড়ে চলে যায় শব্দ। একাধ
তাকে খুঁজতে হয় তার ইশারকে। একাধি উড়ে যায়
বিশ্বনাথ নারায়ণকে ফেলে রেখে, চলে যায় তা। পদ্যে
দিকে। ফেলে রেখে যায় একটা পুরো হৃদয় ও বর্ণের
নিজ্জনতায়। যে শব্দ অদ্বৈততাকে ধরে সমগ্র বিশ্বকে শান্তি
ও মৈত্রীর আবহাওয়া সৃষ্টি করেছিল, যে শব্দ পৃথিবীর এক
প্রান্ত থেকে অপরান্ত পন্থায় আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল,
সে শব্দ আজ শূন্যে বিদ্যমান। সে কর্তৃ আজ নীরব।
ভাবীকালের ঐতিহাসিক ঘটনাপটে যখন তোমরা মানব
সভ্যতার নব অতুল্য আনবে তখন প্রাণশক্তি করবে সেই
শব্দের দৈবী প্রভাব এরূপ বিশ্বাস আমার আছে।

ঈশ্বর প্রেরিত সেই শব্দ গ্রহণ করেছিল মহাকাব্য,
আজ সে কার্যমুক্ত—সর্ব আবেগ তার জ্ঞান হয়ে করে গেল
ধলার আসনে। একেই আমরা জেনেছিলাম মহাভারতের
মহাজীবন—পণ্ডিত জহরলাল নেহরু। এল তাবাবে
আনন্দ ভবনে তার হৃদয় ১৪ই নবেম্বর ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে
আর তার তিরোভাব নয়। দিল্লীতে ২৭শে মে ১৯৬৪
খৃষ্টাব্দে বেলা দুটার সময়। প্রেম জানেনা সে কতখানি
গভীর, যতক্ষণ না আসে বিদায়ের লগ্ন। বিবাক জনসমুদ্রের
বুকে শোকের উত্তাল তরঙ্গ মালা ভেদ করে, দিল্লীর
রাজখাটে মহাত্মা গান্ধীর সমাধি ক্ষেত্রের পাশে বসে যে

সাম্মান্যে যাব শোকার্তা সম্পন্ন করা যাবে। মহান
নেতাকর্মে তার গৌরবময় ভূমিকা অবগত হওয়া। তিনি
জাতির চির প্রণয়, চির বন্দনীয়।

বিশ্বের নানা রাষ্ট্রের কর্মসার ও প্রতিনিধিবর্গ, দীর্ঘ-
স্থায়ী নরনারী ও বর্ণের ব্যক্তিরা এসেছিলেন বিমান
যোগে এই বিরাট ঐতিহাসিক পুরুষের শব্দভাগমনে যোগ
দান করার জগে। সমগ্র পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের এমন
কি রাষ্ট্র সংসদ পতাকা অঙ্গনায়িত্ব তার পূর্ণাঙ্গতির উদ্দেশে।
শোকাক্ত সমগ্র বিশ্ব। অসংখ্য শতাব্দীর তর্ক।
অস্থিহীত মানব সভ্যতার অগদহ। অসংখ্য
বাটবেলে উক আছে—“Perfect soul unites
with the creator.” এই মহান আত্মা সর্বপ্রকার
নিষ্কা দ্বিত্ব ও সমালোচনায় উড়ে মৃত্যুর অতীতলোকে
অমৃতময়।

পণ্ডিত জহরলাল শুধু ভারতীয় রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী
ছিলেন না পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জননায়কও ছিলেন। ভারতের
পরতালিশ কোটি নরনারীর সহচরী শক্তি হৃদয় করে
গেছেন তিনি। পৃথিবীতে রয়েছে এই জাতি অদ্বৈততাকে
ধরে তারই বিরাট ব্যক্তিত্ব ছড়িয়েছে। এলাহাবাদে
যে গৃহে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেই আনন্দ ভবন
শতাব্দীর ঐতিহাসিক স্থতি বহন করেছে। যে পরিবারে
তার আবির্ভাব, সে পরিবারের ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য, বিলাস

বাসনের বৈচিত্র্য ও অহংমগ্ন আভিজাত্য একদিন মাতৃষের বৈঠকী গল্পের বিষয়বস্তু হয়েছিল।

ঐশ্বর্যশৈল্য যেভাবে অতিবাহিত হয়েছে, তাতে তাঁর পক্ষে আলালের ঘরের দুলাল, হওয়াই সম্ভাব্য ছিল কিন্তু তিনি তা হননি। ছেলে বেলায় তাঁর জননী স্বরূপরাণীর কাছে শুনতেন তিনি রামায়ণ মহাভারত। এই সব মহাকাব্যের মহান আদর্শ তাঁর শিশু মনে প্রভাব বিস্তার করতো। তাঁর ইচ্ছা হতো; তাদেরই মত একজন হতো। স্বদেশের পাল পাল্লগ সমারোহে ছেলেবেলা থেকেই তিনি যোগ দিতেন, পুলকিত হয়ে উঠতেন স্বদেশের যুদ্ধিকা সৌরভে। রোজ সন্ধ্যায় আনন্দ ভবনের চাতালে বৈশ্বকোষালক জহরলাল বন্ধু মোবারক আলির কাছে শুনতেন বাবরের শেষ বংশধর বাহাদুর শাহ পুর আর নাতিদের হত্যাকাণ্ডের কথা—ইংরেজ ফৌজ কী নৃশংস তাবেই না তাদের হত্যা করেছে দিল্লীর রাজপথে। বাসকের চোখে জল আসতো। তিনি শুনতেন কেমন করে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের স্বপ্ন ভেঙে দিয়েছে ইংরেজ, এই সঙ্গে মোবারক আলি যখন বলতো ঝালৌর রাণী লক্ষ্মীবাই আর তাঁর সহচরী তাঁতিয়া ভোপীর কথা, যখন বলতো নানা সাহেব আর স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম শহীদ মঙ্গল পাড়ের স্বদেশের জগে আত্মদানের কথা, তখন তাঁর কোলে বসে তিনি অন্তরে স্পন্দন অনুভব করতেন।

মোবারকের কাছে আরব্য উপন্যাসের মজাদার কাহিনী শুনতে শুনতে তাঁর মনে হয়েছে আরব্য রজনীর বেপরোয়া পক্ষীরাজ ঘোড়াটার চোপে সিল্লবার নাবিকের মত দূরে সূদূরে উধাও হয়ে যেতে। ফলে একদিন সে স্বযোগ এলো। প্রাসাদপুরী আনন্দ ভবনের চারটি দেয়ালের বাইরে নতুন জগতের পরিচয় নেবার জগে তিনি সবার চোখে ধুলো দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন আস্তাবল থেকে বাবার সাদা ধবধবে হুন্দর আরবী ঘোড়ার পিঠে উঠে। জোর কন্ঠে ফুটল সে, উদ্দাম বেপরোয়া গতিবেগে সহরের ধূলি ধুল্লিত পথ ধরে। ক্ষুদ্রে ঘোড়সওয়ার জহরলাল সে বেগ সামলাতে পারলেন না। তাঁকে ফেলে রেখে ঘোড়া ফিরে এলো আস্তাবলে। বাবা যা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, একটা কিছু ঘটেছে এই আশঙ্কা হোলো। অহুস্কারীরা ছুটলো ছেলের খোঁজে। বেলী দর যেতে হোলোনা।

বালক জহর গায়ের ধুলো বালি ঝেড়ে নিজেই ফিরছিলেন ঘরে। সকলের মুখে তখন ফুটল হাসি। সবাই বলতে থাকে—বিদ্রোহী বালক! তুমি বুঝি ফিরলে নতুন দেশ জয় করে তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে! বালক গুঠেন হেসে।

বাল্যকাল হোতে তাঁর ভারত আত্মায় সঙ্গে পরিচয় হোতে থাকে। ঈশ্বর তাঁকে পাঠিয়েছিলেন স্বদেশের মুক্তির জগে, স্বজাতির স্বাধ কর্ত্তে। তাঁর বাল্য জীবনে কংগ্রেসের প্রাতিশ্রুতি। তিনিই তাকে স্বাধাচ্ তেজোদীপ্ত করেছিলেন উত্তরকালে। আরাম প্রকোষ্ঠে বসে ঐশ্বর্যের বস্ত্র সম্পদ উপভোগ করবার সময় তাঁর কানে আসতে থাকে পরাধীন ভারতবাসীর ওপর ব্রিটিশ শাসকবর্গের বর্বর অত্যাচারের কথা। তাঁর প্রাণ কঁদে ওঠে। টেপের যে সব কামরা ইংরেজদের জন্ত নির্দিষ্ট সে সব কামরায় ভারতবাসীর প্রবেশাধিকার ছিলনা। যারা প্রবেশ করতে যেতো, তাদের প্রহার করতো খেতাব্দার। এই রকম একজন ইংরাজ ভারতীয়কে খুন করেও কিভাবে নিষ্কর্ত্তি পেয়ে গেল সেই সব গল্প শুনতে শুনতে শিশু জহরলালের অন্তরাত্মা ফুক হয়ে উঠতো, এর প্রতিকারের কথা ভাবতে ভাবতে তিনি চকল হোতেন।

শিশুই ভাবী মানবের জনক এই মহান সত্য, তাঁর জীবনে উদ্ভাসিত। জন্মের পর এগারো বৎসর পর্যন্ত জহরলাল ছিলেন পিতার একমাত্র সন্তান, দুই কনিষ্ঠা ভগিনী তাঁর চেয়ে অনেক ছোট। ছেলেবেলায় তাঁর পড়াশুনা শুরু হয় গৃহ শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীর কাছে। বিজ্ঞানকে পাঠাভ্যাস তাঁর ভাগ্যে ঘটেনি। যখন তাঁর বয়স এগারো, তখন তাঁকে পড়ানোর জগে ভাঃ এ্যানি বোশান্ত পাঠিয়েছিলেন ইউরোপীয় শিক্ষক কার্ভিনাল ফ্রকসকে। উৎকৃষ্ট গ্রন্থপাঠের প্রেরণা তিনি পেয়েছিলেন এই গৃহশিক্ষকের কাছে। কবিতা পাঠের আগ্রহ আর কবিতার প্রতি প্রীতি তাঁর মধ্যে ছিল ছেলেবেলা থেকে। তাঁর জীবনে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব গাঢ়ীকীর চেয়েও বেশী, একথা তিনি নিজেই বলেছেন। ছেলেবেলা থেকেই তাঁর বিজ্ঞান শিল্পকলার দিকে অত্যন্ত আগ্রহ ছিল। কার্ভিনাল তাঁকে বিজ্ঞানের দিকে আকৃষ্ট করেন। দ্বিত-সফির ওপর অহুস্কার এই শিক্ষকের জগেই তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। তাঁর বাল্যজীবনে ঘটেছিল রূপ-আপান

যুদ্ধ। এ সময়ে তিনি ঘরে বসে ভলোয়ার ঘুরোতেন আর ভাবতেন কেমন করে ভারতবর্ষকে যুদ্ধ করে বিদেশী শাসন থেকে মুক্ত করবেন। আপানীদের অয় লাভ তাঁর অন্তরে জ্বলিছে তুলেছিল প্রগাঢ় জাতীয়তা বোধ আর দেশাত্মবোধ।

১৯০৫ সালে ১৯শে অক্টোবর পুত্র জহরলালকে পিতা মতিলাল বিলাতের হারো স্কুলে ভর্তি করে মার্সেন্সির একটা হোটেলে এসে ওঠেন। রাত্রে পুত্রের জন্তে পিতার চোখে ঘুম নেই। কেটে গেল বিনিদ্র রজনী। পরদিন ভারতে যাওয়া করতে হবে। পুত্রকে লিখলেন—‘তোমার মধ্যেই আমরা আমাদের ইহলোকের এবং অনাগত ভবিষ্যতের সমস্ত সম্পদ রেখে গাচ্ছি। একমাত্র গোমার মঙ্গলের জন্তই আমরা তোমার বিচ্ছেদ বেদনা সহ্য করছি। তোমার জন্ত যে ব্যয় হবে, সেই প্রগতি বড় নয়, কেন না সে অর্থ আমি এক বৎসরের মধ্যেই উপাঞ্জন করতে পারবো। তোমাকে প্রকৃত মানুষ করে গড়ে তোলাই বড় কথা। তোমাকে কোনরূপ শিক্ষা না দিয়ে প্রচুর ঐশ্ব্যের মধ্যে রেখে গেলে পাপ এবং স্বাধীনতার কাজ হবে।... কোনরূপ গব না করে বলতে পারি, নেহরু পরিবারের ঐশ্ব্যের বনিয়াদ আমি গড়ে তুলেছি। প্রিয়পুত্র, আমি আশা করি তুমি সেই ভিত্তি তুমির ওপর স্নমহান খ্যাতির প্রাসাদ গড়ে তুলবে। তুমি আমার আশা পূর্ণ করবে, সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই’—পিতা মতিলালের এই আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করে পণ্ডিত জহরলাল খ্যাতির নভোচূড়ী প্রাসাদ নির্মাণ করে গেছেন।

হারো স্কুলে দুই বৎসর অধ্যয়ন করার পর ১৯০৭ সালে জহরলাল কেব্রিজে ত্রিনিটি কলেজে ভর্তি হন। কেব্রিজে তিনি তিন বৎসর ছিলেন। তাঁর আত্মজীবনীতে এই সময়ের কথা উল্লেখ করে পণ্ডিতজী বলেছেন—বড় বড় সমাগম, কিছু পড়াশুনা ও খেলাধুলা এবং ক্রমশঃ জ্ঞান ও বুদ্ধির বিস্তার। আমি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে ট্রাইপোস নিযোজিত। আমার বিষয় ছিল রসায়ন, ভূবিজ্ঞান ও উদ্ভিদ বিজ্ঞান কিন্তু আমার আগ্রহ ঐগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। জীবনের মৌলধাতুত্বই আমাকে আকর্ষণ করতো। যুগ ও অমার্জিত রুচির ভোগলিপ্যাকে সংযত করে জীবন যাপন এবং জীবনের কর্ত্তব্যপ্রণালীর মধ্যে পূর্ণ উপভোগের আকর্ষণ ছিল বলে আমি জীবন উপভোগ করেছি এবং উপভোগ করেছি। যে পাপ আছে একথা ভাবতে আমি অস্বীকার করেছি...

১৯১০ সালে প্রকৃতি বিজ্ঞানে দ্বিতীয় শ্রেণীর অনাদ নিয়ে গ্রাজুয়েট হয়ে কেব্রিজ ত্যাগ করেন। এরপর দুই বৎসর লণ্ডনে থেকে একের পর এক আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯১২ সালে বারিষ্টারী পাস করে আর সাত বৎসর ইংলণ্ড প্রবাস শেষ করে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৯১৬ সালে লন্ডনে অগৃহীত কংগ্রেসের অধিবেশনে তিনি যোগদান করেন। এখানে গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ। এই বৎসরে শ্রীমতী কমলা কাউলের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ১৯১৮ সালে তিনি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্যরূপে মনোনীত হন। এই সময় থেকে রাজনীতি ক্ষেত্রে তাঁর আবির্ভাব। ১৯২২ সালের মে মাসে ব্রিটিশ অব ওয়েলসের ভারত আগমনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে তিনি কারাবদ্ধ হন। ১৯২২ সাল থেকে ১৯৪৬ সালের নভেম্বর মাসে দিল্লীতে অষ্টমতী সরকারে যোগদানের পূর্ব পর্যন্ত তিনি স্বদেশের মুক্তিযজ্ঞে বারোবারে আত্মত্যাগ দিয়েছেন, বারো বারের কারাবরণ করেছেন, শাসক শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করেছেন আর একাধিকবার নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হয়ে জাতিকে প্রেরণা দিয়েছেন আর শাসক শক্তির কাছে স্বাধীনতা দাবী করেছেন। ১৯৪৭ সালে ১৫ই আগস্ট ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করলে, তিনি প্রধানমন্ত্রীর আসন গ্রহণ করেন। সেই থেকে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তিনি ভারতের নব জন্মান্তর ঘটিয়ে বিশ্ববাসীর সম্মুখে তাকে মহীয়ান করে তুলেছেন।

জীবনের উপর ছিল তাঁর অত্যন্ত দরদ। তাঁর আত্ম-জীবনী থেকে এই সত্য উদ্ঘাটিত হয়েছে। ‘অবসর বিনোদনের জন্ত আমি কখনও শিকারে লাইতাম। কিন্তু ইহাতে আমার বিশেষ যোগ্যতাও ছিলনা, আকর্ষণও ছিলনা।... একবার একটি কুকুরের যুগ শিশু শিকার করিয়া আমার শিকারে যে সামান্য উৎসাহ ছিল তাহাও নিবিয়া গেল। সেট মরণহত নিরীহ যুগ শিশু আমার পায়ের তলায় পড়িয়া অশ্রু সঙ্গল আয়তনে ক্রন্দন দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া প্রাণত্যাগ করিল। সেই কাতর দৃষ্টির দৃষ্টি এখনও আমাকে প্রায়ই উদ্ভাষা করিয়া তোলে।’ জীবনে প্রেম ও করুণাই তাঁকে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার দিকে আত্ম নিয়োগ করেছিল। যত্নাকালে একমাত্র কস্তা ইন্দিরা গান্ধী, দুই দৌহিত্র রাজীব ও সত্যী, দুই ভগ্নী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত ও কৃষ্ণ হাতিমিং আর অসংখ্য অগৃহ পরিচর রেখে গেছেন। বিশেষ শতাব্দীতে সাম্প্রতিক

কালে প্রাচ্য আর পশ্চাত্যজগতের মধ্যে যে নতুন বোঝা পড়া শুরু হয়েছে, তার মধ্যে আর আমরা পণ্ডিতজীকে পাবোনা, আমাদের কোন ভালোবাসা আজ তাঁকে ধরে রাখতে পারলো না, আমাদের কোন প্রয়োজন আজ আর রচনা করতে পারলোনা তাঁর মহাপ্রস্থানের পথের বাধা।

তোমরা যখন স্বাধীন চিন্তার উপাসনা আরম্ভ করবে তখন অনুধাবন করতে পারবে তাঁর কতখানি মানসিক ঐশ্বর্য ছিল, তাঁর ভেতর ছিলনা জ্ঞাতি বিবেক, তিনি ছিলেন মানব প্রেমিক—সর্বদেশের মঙ্গলকামের অগ্রতম জীবন-পুরোহিত। তোমরা তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে ভবিষ্যৎ ভারতকে অমরায়ত্তী করে তোলো এই আমার নিবেদন।

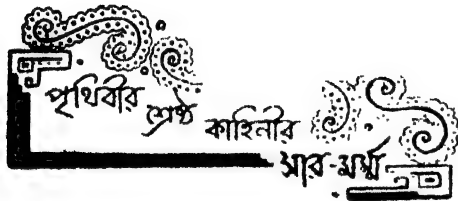
তুলসীদাস বলেছেন :—

‘অমৃ যব্ জগ্ আও, জগ্ হসে অম্ রোও।

এসা কাম্ করছে’ চলো।

অম্ জগ রোও অম্ হসে।

তোমরা এমন কাজ জগৎ সংসারে করে যাও যেন মৃত্যুর সময়ে তোমরাও পণ্ডিতজীর মত হাসিতে হাসিতে চলে যেতে পারো আর জগৎবাসী তোমাদের বিয়োগে এমি ক্রন্দন করে ওঠে।



আলোকজ্ঞানদার কামা

রচিত

দী কাউন্ট অফ মন্টি ক্রিস্টো

সৌম্য গুপ্ত

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

(৭)

প্রাচ্যের উপর থেকে উত্তাল-তরঙ্গময় সাগরের জলে কেনে দৈবিক সঙ্গে সঙ্গে দাঁতে খণ্ডন করে তুলিয়ে গেলেও, কিছুক্ষণ বাধেই সে হৃকোশলে তার আপাদমস্তকে জড়ানো চাঁদরের বন্ধনীয় দড়ির ফাঁশ কেটে নিজেকে মুক্ত করে

জলের বুকে ভেসে উঠে রাতের অন্ধকারে প্রহরীদের নজর এড়িয়ে সহপূর্ণে সাতার দিয়ে এগিয়ে চললো—প্রাণ বাঁচানোর উদ্দেশ্যে অজানা যে কোনো একটা আশ্রয়ের সন্ধানে। দীর্ঘকাল জাহাজে নাবিকের কাজ করার ফলে, সাতারে সে ছিল বেশ পটু—কাজেই প্রাণপণ শক্তিতে সে অক্ল-সমুদ্রে সাতার কেটে চললো। এমনভাবেই বহুক্ষণ সাতার কেটে পালিয়ে এসে সে অবশেষে ক্রান্ত-পরিশ্রান্ত অবস্থায় আশ্রয় নিলো সাগরের বুকে নিরালা-নির্জন ছোট একটা দ্বীপে। দ্বীপে উঠে ভগবানকে ডেকে সে বারবার বললে,—দয়াময় ঈশ্বর...তোমার অনন্ত দয়ায় যখন বন্দী-দশার দুর্ভোগ থেকে মুক্তি পেয়েছি—প্রাণে বেঁচেছি তখন বুঝছি এ যাত্রায় পরিত্রাণ পাবো!...কিন্তু আমার বুড়ো বাপ? ...মামেডিঞ্জ? ...তারার বেঁচে আছে তো? ...কি তাদের অবস্থা ইদানীং? ...এই সব ভাবতে ভাবতেই দাস্তের হুঁচোখ জলে ভরে উঠলো...তারপর কখন যে ঘুমের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে বাকী রাতটুকু কেটে গেল—দাস্তের কোনো খেয়ালই নেই!

পরের দিন একদল চোরা-কারবারী তাদের জাহাজে চড়ে এ পথে চলেছিল...তারা হঠাৎ সাগরের বুকে এই নিরালা দ্বীপে অসদায়-অবস্থায় দাস্তকে দেখতে পেয়ে, তাকে তুলে নিলে নিওদের জাহাজে। তবে দাস্তকে দেখে তাদের মনে সন্দেহ হলো...কৌতুহল-ভরে প্রশ্ন করলে,—তোমার মাথায় লম্বা চুল আর মুখে ইয়ার-লম্বা দাড়ি-গোফ দেখছি!...নিশ্চয় তুমি ডাকাত কিংবা বোম্বেটে-দস্যু।

দাস্ত বললে,—না, আমি ডাকাত নই...বোম্বেটে-দস্যুও নই!...বরাত-দোশে, সমুদ্রে জাহাজ-ডুবি হবার ফলে কোনোমতে সাতারে এসে এসে অজানা এই দ্বীপে উঠে প্রাণ বাঁচিয়েছি! তবে, মাথার এই লম্বা চুল আর মুখের দাড়ি-গোফ...এর কারণ,—আমি আজ দশ বছর হলো একটি সতাপন করেছি সে পণ রক্ষা না হওয়া পর্যন্ত এই দশ বছর মাথার চুল ছাটিনি, দাড়ি-গোফ কামাইনি।

চোরা-কারবারীরা বললে,—বটে!

দাস্তে শুধোলো,—এখন কত মাল চলেছে? আজ কোন মালের কোন তারিখ?

চোরা কারবারীরা বললে,—এখন ১৮২২ মাল চলেছে, আজ হলো—ফেব্রুয়ারী মাসের ২৮শে তারিখ!

মনে মনে হিসাব করে দাস্তে ভাবলো,—আমার কয়েক-খানায় বাস আজ চৌদ্দ বছর পূর্ণ হলো!...কিন্তু, বাবা? ...মামেডিঞ্জ? ...তারার কি এ দীর্ঘকাল আমাকে না দেখে, কোনো খোঁজখবর না পেয়ে বেঁচে আছে? ...তাছাড়া ডাক্তারলাল? ...কানান্দ? ...হাকিম জেরার্ড? ...যে তিনটে হরতের সস্ত্র বিনাদোষে আমার এমন দুর্ভোগ-দুঃখ... যখন বেঁচে ফিরেছি, তাদের উপর কড়ায়-গড়ায় এক শোধ

তুলবো! সে শোধ-না তোলা পর্যন্ত আমি কোনোমতেই
তৃপ্তি পাবো না!

চোরা-কারবারীদের জাহাজে এসে দাঁড়ে এককাল
বাদে তার মাথার চুল ছাটলো...দাড়ি-গোঁফ কামালো!
চোরা-কারবারীরা দাঁতকে দিলে নাবিকের পোশাক...এ
ব্যবস্থার ফলে, তার চেহারা হলো নতুন মানুষের মতো!

এমনিভাবে চোরা-কারবারীদের জাহাজে চড়ে, তাদেরই
দলের লোক হয়ে দাঁতের দিন কাটে...সকলে তাকে
ভালোবাসে...দাঁতেরও তাদের বন্ধুর মতো দেখে।

চোরা-কারবারীদের সঙ্গে জাহাজে যাত্রার কদিন পরে
মাগরের প্রান্তে বহুদূর জমির রেখার সন্ধান মিললো।

দাঁতের ভেঁখোলো,—ঐ দূরে...ওটা কোন্ দেশ?

চোরা-কারবারীদের লোকজন বললে,—ওটা হলো
মণি ক্রিষ্টো দ্বীপ।

মণি ক্রিষ্টো!...

দাঁতের মন উৎসাহে মেতে উঠলো। ঐ দ্বীপেই তো
এভাবে ফারিয়ার ঐশ্বর্য-ভাণ্ডার!...ভগবানের অসীম দয়া
...নাহলে ও দ্বীপ পাবো কেন—বিনা সন্ধানে!

কদিন পরে চোরা-কারবারীদের জাহাজ ভিড়লো মণি
ক্রিষ্টো দ্বীপে...অস্থির অছিল। করে দাঁতের এ দ্বীপে রয়ে
গেল...জাহাজে গেল না...চোরা-কারবারীদের বললে,—
আমার শরীর খুব খারাপ...জাহাজে পাড়ি দেওয়া সম্ভব হবে
না...আমি এখানে পড়ে থাকি। যদি বাচি—তোমরা
দেববার পথে এখানে সন্ধান করে আমাকে আবার জাহাজে
তুলে নিও।

চোরা-কারবারীদের জাহাজে থাকবার সময় দাঁত
পেয়েছিল প্রচুর গুলি-বাকদ...সেগুলি সবই দাঁতের কাছে
রাখলো...তাছাড়া কিছু অস্ত্র হাতিয়ারও সঙ্গে নিলো...
বললে,—যদি বাচি...দরকার হতে পারে!

চোরা-কারবারীরা দাঁতকে মণি ক্রিষ্টো দ্বীপে রেখে
জাহাজ নিয়ে চলে গেল। তাদের জাহাজ চোখের
আড়ালে মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে দাঁতের উঠলো দ্বীপে...
ভাবলো,—কি করে সে ঐশ্বর্যের সন্ধান পাবো?...

এভাবে ফারিয়া যে হাঙ্গামে দিয়েছিলেন, সেই হাঙ্গামে
মেনে ঘুরতে ঘুরতে সে এলো বড় একটি পাহাড়ের সামনে!
ফারিয়া বলেছিলেন,—পাহাড়ের পিছনদিকে এক গুহার
মধ্যে আছে তাঁর রক্ত-ভাণ্ডার!

পাহাড়ের পিছনদিকে এসে দাঁতের বাকদের সাহায্যে
পাহাড়ের পাথর কাটলো...তারপর সেই ফাটলের রক্তপথে
যানিক এগিয়েই সে দেখলো এক গুহা...গুহার মধ্যে ঢকে

দেখে দীর্ঘ সোপান-শ্রেণী—সোজা পাহাড়ের নীচে নেমে
চলে গেছে।

সিঁড়ি দিয়ে ক'ধাপ নেমে দাঁতের দেখে—সামনেই
আরেকটি গুহা! দাঁতের সঙ্গেই ছিল ছোট গাইতি...সেই
গাইতি দিয়ে গুহার মুখের পাথরে বা মারতেই কিছুকণ
বাদে পাথরের চড়চড় খশে গিয়ে গাইতি লাগলো কাঠের
গায়ে! দাঁতের বুঝলো,—নিশ্চয় কোনো কাঠের সিন্দুক
আছে ওপাশে!

উৎসাহে মেতে এগিয়ে গিয়েই দেখলো—সিন্দুক সত্যি
আছে...কাঠের প্রকাণ্ড সিন্দুক—লোহার পাত মুড়ে আঁটা!
সজোর গাইতির বা মেঝে সিন্দুকের মোড়ক খুলে ভালো
তুলেই দাঁতের দেখে—হীরা-মণি-মাণিকের স্তূপ...তাছাড়া
প্রচুর সোনার মোহর...যেন সেই আলাদীনের গল্পের রক্ত-
ভাণ্ডার! আনন্দে আত্মহারা হয়ে তাহাতে মুঠো ভরে
তুলে দেখে দাঁতের বলতে লাগলো,—এতদিনে বরাত ফিরলো
তাহলে!...এই দৌলতে নতুন জীবন...খ্যাতি...প্রতিপত্তি...
স্বথ...শান্তি...সবই পাবো...এমন কি, সমাজে সবার উপরে
আসন পাবো!...তারপর শোধ নেওয়া...কড়ায়-গুণায়
শোধ! যারা আমার এতদিনের অসহ্য নরক-বাতনার জন্ত
দায়ী, তাদের উপর সেই সব অসহ্য-অপকষের চূড়ান্ত শোধ
নিতে পারবো!...ভগবান আমার সহায়!

ভগবান সত্যি সহায়!...দুঃস্থ মাগরের মাঝে নিরাশ
মণি ক্রিষ্টো দ্বীপ থেকে প্রচুর সোনার মোহর আর দামী-
দামী হীরা-মণি-মাণিকের বিপুল সম্ভার নিয়ে দাঁতের ফিরলো
ফ্রান্সে। দেশে ফিরে এসে খবর নিয়ে জানলো—স্বাধীন
এই চৌদ্দ বছরের মধ্যে, তার বেড়া বাবা সরকারী কয়েদ-
খানায় বন্দী-অবস্থায় অনাচারে-ভ্রমণের প্রাণ হারিয়েছেন
...তার জাহাজের মালিক মনিব মোবেল্ বেচারী দাঁতের
জেল থেকে খানাপ্রণ করবার চেষ্টা করেছিলেন বলে—তার
পশার-প্রতিপত্তি হারিয়েছেন...শয়তান ডাক্তার
আপাতত: প্যারিসে পরম ক্রমে-প্রজ্ঞা বদলাস করছে—
সে এখন লাখপত্তি মহাজন—নামকাদা ব্যাঙ্কের মালিক
জেরাডেরও উত্তিমধ্যে পদোন্নতি হয়েছে—সে এখন
প্যারিসের সরকারী-আদালতের প্রধান-বিচারক...ফার্নান্দও
ইদানীং খুবই প্রতিপত্তিশালী হয়েছে—সরকারী-কোজে
কাজ করে বড় অর্থের মালিক হয়ে সেও প্যারিসে দিবা
জীবিকায় বসেছে...বেচারী মাসে ডিঙ্ক কিং দাঁতের কায়া-
গমনের পর হুদীর্ঘ দেড় বছর মনের ভেত্রে চোখের জল
কেলে দিন কাটিয়েছে—তখন সবাই তাকে বুঝিয়েছে যে
কারাগারে বন্দী দশাতেই দাঁতের জীবনান্ত হয়েছে...তাই
শেষ পর্যন্ত লোকের কথাসম্মত সে ফার্নান্দকে বিবাহ
করতে বাধ্য হয়েছে!

মাসে ডিঙ্কের খবর শুনে নিরাশ ফেলে দাঁতের মনে

মনে বললে,—হায় নারী...তুমি এমন চটুল...এখনই হুঁসল!

ড্যান্সার, ফার্নান্দো এবং জেরার্ড...এ তিনজনের ভাগ্যের পরিচয় শেষে দাঁতে ভাবলো,—মৃত্যু তো চকিতের ব্যাপার!...আমাকে যে দুর্ভাগ্য যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে, ওদেরও তেমনি দুর্ভাগ্যের বিধে পলে-পলে মৃত্যুর দ্বারে পড়াবে! আজ আমি বিপুল সম্পদের মালিক...আমাকে কাজের মাহুত হতে হবে!...দুর্জনের শক্তি দেবার শক্তি ভগবান নিশ্চয় আমাকে দেবেন!

[ক্রমশঃ]



চিত্রগুপ্ত

এবারে তোমাদের যে মজার খেলাটির কথা বলছি, সেটি থেকে শুধু আনন্দলাভই নয়, বরং বিজ্ঞানের এমন একটি বিচিত্র কারসাজির পরিচয় পাবে—যেটি ব্যবহারিক-জীবনে সকলেরই বিশেষ কাজে লাগবে।

ধরো, ছুটির দিনে বাড়ীতে চঠাং কোনো গণ্যমান্য অতিথি এসে হাজির...তাকে খাতির-বস্ত্র করে সাদরে ভূরি-ভোজনে আপ্যায়নের উদ্দেশ্যে বাসনের সিন্দুক থেকে রূপের তৈরী বাসনপত্র বার করে মা তোমাদের কাউকে হাতের কাছে পেয়ে করমাস করে বসলেন,—“ওরে, চটপট এগুলো মেজে-ষেয়ে ঝকঝকে করে দে তো...মানী-গুণী অতিথি এসেছেন বাড়ীতে...যোগা-বাবস্থা করতে হবে তো তার জন্ত!”

মায়ের কথা শুনে তুমিও হয় তো তখনই মেতে গেলে—রূপের তৈরী সেই সব বাসনপত্র মেজে-ষেয়ে পালিশ করে আগাগোড়া দিবা ঝকঝকে-তকতকে একেবারে নতুন মতো জোলুপদার চেহারা সৃষ্টি করে তুলতে। কিন্তু কাজ করতে বসেই দেখলে যে রূপো-পালিশের (Silverware Polishing Lotion) লোশনের কোটোটি দীর্ঘ-দিন অব্যবহারের কারণে উড়ার-ঘরের তাকের কোণে

পড়ে থাকার ফলে বেবাক শুকিয়ে নিঃশূন্য হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। অথচ, এদিকে অতিথি চটপট চলে যাবেন বলে মায়ের এমন কড়া তাগাদা যে বাড়ী ছেড়ে চট করে দৌড়ে গিয়ে বড় রাস্তার মোড়ে বাজার থেকে রূপো-পালিশের নতুন কোটো কিনে আনবে, তারও সময়-স্বযোগ মিলছে না কোনমতেই। কাজেই এমনি সজিন-অবস্থায়, কি উপায়ে চটপট অতি সহজে সুষ্পষ্টভাবে রূপের বাসনপত্র সাজ করার কাজ হাসিল করতে পার—বলো তো?

শোনো তাহলে—সেই উপায়ের কথাই বলি। খুব সহজে এবং আগাগোড়া পরিপাটিভাবে রূপের তৈরী যে কোনো সামগ্রী ঝকঝকে-তকতকে জোলুপদার এবং সাজ-স্বত্বের জন্ত বিশেষ-ধরনের যে উপায়টি আছে, একালের বিজ্ঞানীরা তার নাম দিয়েছেন—‘Electrolytic Cleaning’ বা ‘বৈদ্যুতিক-প্রক্রিয়ার পরিশোধন পদ্ধতি’। অর্থাৎ, আধুনিক বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে বিশেষ-ধরনের রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে, সমগোত্রের বিবিধ-উপকরণ-বিশিষ্ট এবং কেবলমাত্র উৎকৃষ্টতম অণুবীক্ষণ যন্ত্রে (Visible only through a good and powerful microscope) দেখতে পাওয়া যায় এমনই সূক্ষ্ম-তিক্ষ ‘প্রাণময়-কোষের’ (The Living Cell) বিচিত্র রূপান্তর ঘটে বলেই ধাতু-নির্মিত যে কোন পদার্থকে এভাবে পরিশোধন করা যায়। কিন্তু এ সব জ্ঞান হলো—বিজ্ঞানের রহস্যময় তথ্য...আসলে হাতে-কলমে কাজ করে এমন আজব কাণ্ড কি উপায়ে চোখের সামনে ঘটানো যায়, আপাততঃ, তারই মোটামুটি পরিচয় দিই।

এ কাজ হাসিল করতে হলে, টুকিটাকি যে সব ঘরোয়া সাজসরঞ্জামের প্রয়োজন গোড়াতেই তার ফর্দ দিয়ে রাখি। এ সব সামগ্রী জোগাড় করা এমন কিছু কঠিন বা ব্যয়বহুল ব্যাপার নয়...সামান্য চেষ্টা করলেই তোমাদের প্রত্যেকের বাড়ীতেই এ সব সাজসরঞ্জাম সহজেই মিলবে। অর্থাৎ, এই আজব-কারসাজির জন্ত চাই—প্রয়োজনমতো বড়, ছোট বা মাঝারি সাইজের একটি আলুমিনিয়াম-ধাতুর তৈরী গামলা (Alluminium Bowl), রূপের তৈরী সামগ্রী, একপাত্রে ফুটন্ত গরম জল (Boiling water), খানিকটা রান্নার গুঁড়ো ছন (Some cooking salt) আর কেক-তৈরীর উপযোগী ‘বেকিং-পাউডার’। তবে ‘বেকিং-পাউডার’ জোগাড় করার অসুবিধা ঘটলে বা অভাবে, রান্নার নুন আর ‘বেকিং-পাউডারের’ বদলে দু’এক মুঠো কাপড়-কাচা বা বাসন-মাজার উপযোগী ‘গুঁড়ো-সোডা’ (a handful of washing soda) হলেও, এ কারসাজি দেখানো চলবে—এতটুকু ব্যাঘাত বা অসুবিধা ঘটবে না। এ সব সাজসরঞ্জাম সংগ্রহ হবার পর, আসল কারসাজির পালা।

কারসাজি শুরু করবার সময়, প্রথমেই উপরে যেমন

দেখায়েছে, ঠিক তেমনভাবে এ্যালুমিনিয়ামের গামলাটির ভিতরে রূপোর-তৈরী সামগ্রীগুলি সাজিয়ে রাখা...তবে নজর রেখা—প্রত্যেক রূপোর-তৈরী সামগ্রী যেন গামলার এ্যালুমিনিয়াম ধাতুর স্পর্শ পায় (all the silver-articles are in contact with the aluminium)। এবারে ফুটন্ত-গরম জলের পায়ে 'গু'ডো-সোডা' কিংবা 'বেকিং-পাউডার' আর 'গু'ডো-নন ফেলে ভালো করে গুলে (stirring) জলে মিশিয়ে নাও। এ-ভাবে 'গু'ডো-সোডা' বা 'বেকিং-পাউডার' আর 'গু'ডো-নন' মেশানোর নিয়ম হলো—এক পাইট (one pint) ফুটন্ত-গরম জলে চায়ের-চামচের এক চামচ পরিমাণ 'গু'ডো-মেশানো—এ হিলাবের যেন বাতীক্রম না ঘটে সেদিকে সর্বদাই দৃষ্টি রাখা দরকার। তাছাড়া আরো একটি বিষয়ে বিশেষভাবে নজর রাখা চাই। সেটি হলো—রূপোর-তৈরী প্রত্যেকটি সামগ্রী যেন আগাগোড়া এ্যালুমিনিয়াম-গামলার জলে চোবানো থাকে। কারণ, এ কাজে ক্রটি ঘটলে, রূপোর তৈরী সামগ্রীর যে-অংশটি গামলার-জলের উপরে ভেসে থাকবে, বর্ষাযত্নভাবে না-চোবানোর ফলে, সেই অংশটিতে পালিশের স্বকৃৎকে জোলুশ হুপটি হয়ে কুটে উঠবে না...অ-পরিপাটি ও মলিন দেখাবে। কাজেই, এদিকে সজাগ-দৃষ্টি রাখা বিশেষ প্রয়োজন।

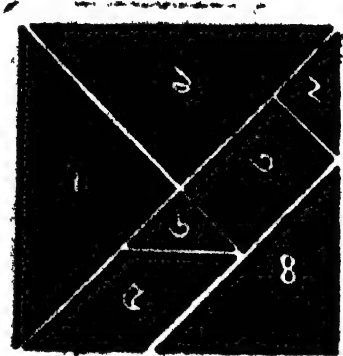
যাই হোক, এ্যালুমিনিয়ামের গামলার 'গু'ডো-মেশানো ফুটন্ত-গরম জলে রূপোর সামগ্রীগুলিকে কয়েক মিনিট পুয়োপুরি চুবিয়ে রাখার পর, সেগুলিকে জল থেকে তুলে, একটুকরো শুকনো নরম-কাপড় বা ভোয়ালে দিয়ে আগাগোড়া স্বকৃৎ করে মুছে নাও তাহলেই দেখবে—মলিন-অপরিচ্ছন্ন রূপোর-তৈরী সামগ্রীগুলি সন্ত-দোকান-থেকে কেনা নতুন জিনিষের মতোই দিবা স্বকৃৎকে-তত্বতকে পরিপাটি ও জোলুশদার-পালিশমণ্ডিত হয়ে উঠেছে—একালের বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত অভিনব-রহস্যময় Electrolytic Cleaning' বা 'বৈদ্যুতিক-প্রক্রিয়ার পরিশোধন-পদ্ধতির' কারসাজিতে।

কারসাজির আজব-রহস্যের সন্ধান তো পেলে, এবারে নিতেরা হাতে-কলমে পরখ করে রাখা—এর গুণাগুণ!



মনোহর মৈত্র

১। চিত্র-রচনার হৈয়ালি



আমাদের চিত্রকর-মশাই সেদিন একখানা হৈয়ালি-ছাঁদের আজব-ছবি এঁকে এনেছেন—তার নমুনা উপরেই দেখতে পাচ্ছি। উপরের ছবিতে ছোট-বড় নানান ছাঁদের যে কালো-রঙের সাতটি টুকরো দেখেছো, চিত্রকর-মশাই বলছেন—সেগুলি যদি বুদ্ধি খাটিয়ে স্বকৃৎশলে বর্ষা-বর্ষভাবে সাজিয়ে বসাতে পারো তো দিবা-স্বকৃৎ পথ-চলতি মাহুয়ের একটি আজব-ছবির সন্ধান পাবে। এ ছবি ছাড়াও, একটু চেষ্টা করলেই, উপরের ঐ সাতটি কালো-রঙের টুকরোকে সামান্য অদল-বদল করে সাজিয়ে বসিয়ে, পথে পা-পিছলে পড়ে যাবার ভঙ্গীতে অল্প একটি মাহুয়েরও চিত্র-রচনাও সম্ভব হবে। দপ্তরে বসাই চেষ্টা করেছেন চিত্রকর-মশাইয়ের এই আজব হৈয়ালি-চিত্রের রহস্য-সন্ধানের জন্য—কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনো সীমাংসাই করতে পারেন নি কেউ! জেনারাল জাখো তো চেষ্টা করে—কোনো উপায়ে এ ছবির সঠিক-সন্ধান পাও কিনা। যদি পাও তো, অবিলম্বে উপরের ঐ কালো-রঙের সাতটি

টুকরোকে যথাযথভাবে সাজিয়ে পরিষ্কার একখানি কাগজে স্টেটে সোজা পাঠিয়ে দাও আমাদের দপ্তরে। চিত্রকর-মশাই গানের পাঠানো ছবি দেখে বলবেন, সঠিক হয়েছে... আগামী সংখ্যায় তাঁদের প্রত্যেকের নাম দাম আমরা ছাপিয়ে দেবো।

২। 'কিশোর-কপটের' সভা-সভ্যাদের রচিত শ্রীশ্রী:

পাচটি অক্ষরেতে নাম আছে তার,
বলতে কি পারো ভাই, কিবা নাম তার ?
প্রথম, দ্বিতীয় নিলে খুবই কষ্ট হয়,
প্রথম, তৃতীয় নিয়ে সকলেই খায়।
প্রথম, চতুর্থ ছাড়া কবিতা না হয়,
দ্বিতীয়, চতুর্থ নিয়ে 'রব' উঠে যায়।
চতুর্থ, দ্বিতীয় বিবাহেতে আসে,
চতুর্থ, পঞ্চম হয় বারো মাসে।
ভাল করে ভেবে দেখো, লাবা কি আছে,
সহজেই মিলবে তা নিজেদেরই কাছে!

রচনা : গুণরাম বন্দ্যোপাধ্যায় (বালী)

৩।

রাজ-বিশেষ হয় ভাই, নামটি তিনাকরে,
ইংরাজীতে বোঝায় আইন, নিলে শেখাকরে
দীপের নাম বোঝায়, মধ্যমাকর তাগে,
সমষ্টি বোঝাতে হলে, আত্মকরটি ভাগে!
প্রথমাকরের ত্রিচরণে শত প্রণাম জানাই
কি হবে উত্তর ঠিক, বলো দেখি ভাই!

রচনা : দীপকুমার দত্ত (বাশবেড়িয়া)

গতমাসের 'শ্রীশ্রী আর হেঁয়ালি'র

উত্তর :

১।



প্রথম কলমের নীচের ছবিতে যেমনভাবে চোটে ছোট এবং চারটি বড় সাইজের দেশলাই-কাটি সাজানো রয়েছে, তেমনি ধরনে সাজিয়ে বসালেই খুব সহজেই তোমরা গত সংখ্যায় প্রকাশিত হেঁয়ালিটির সঠিক সমাধান করতে পারবে। ছবির 'ক'-চিহ্নিত কাটিগুলি হলো বড় সাইজের দেশলাই-কাটি এবং 'ব'-চিহ্নিত কাটিগুলি ছোট সাইজের দেশলাই-কাটি।

২। আলতা

৩। শাল

গত মাসের তিনটি শ্রীশ্রীর সঠিক

উত্তর দিয়েছে :

ত্রিগুণী ও কল্যাণী মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা), বজ্র ও বিজ্র (আলিপুর), বাবু মিহ্র (মৈনুতাল), রিনি ও রণি মুখোপাধ্যায় (কাইরো), লাড্ডু ও কবি হালদার (কোরবা), সত্যেন, সঞ্জয়, মুরারী ও হুনীল (ভিলাই), পিটু, বৃতাম ও বাপি (বোয়াই), মীরা, প্রবল, কৃষ্ণা ও কল্যাণ রায় (কলিকাতা)।

গত মাসের দুটি শ্রীশ্রীর সঠিক

উত্তর দিয়েছে :

খুঁ ও মিঠু রায় (কলিকাতা), বিশ্বনাথ ও দেবকী সিংহ (গরা), বুঝু ও মিঠু গুপ্ত (কলিকাতা), হুনির্দল দাস (মেদিনীপুর), দিখু, মুহু, কাজল ও প্রদীপ (কৌচ), মণিকাকুন (দীঘা), পিটু, গোরা, টোপা, বুড়ি (জয়নগর), বাণী ও ভব হাজরা (আড়াই)।

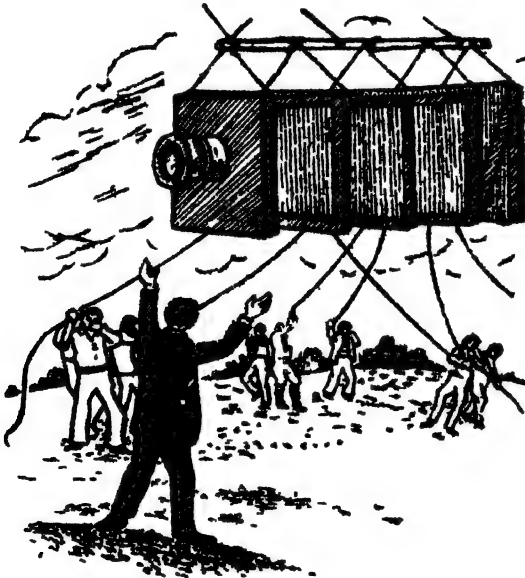
গতমাসের একটি শ্রীশ্রীর সঠিক

উত্তর দিয়েছে :

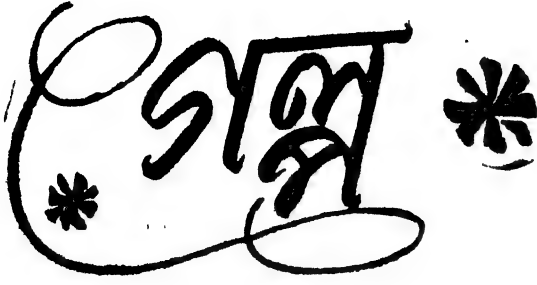
সতীশচন্দ্র দাস (দীঘা), শ্রীপতিনাথ দে (মেদিনীপুর), নন্দকিশোর, তপতী ও তাপসী গোস্বামী (ভবলাইগড়া)।

ধূতির কথা

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় দুই
নাবিকেরা একটি বৃক্ক খননের ক্ষেত্রে
হঠাৎকালে খনিজ-বালকদের
ধূতি একালের প্রতীক
কৌশলের ফলেই খনিত-
কনসার্বিৎ ধূতি-প্রাচীর
কৈশিকিত্বা নিচিৎ
উপায় প্রতিক্রিয়া
কল-প্রপাতের বাধা
কাটিয়ে নিজেদের
কৃত্রিম প্রমাণসেই
স্বতন্ত্র করে ফেলে
হিসেব। এই ঘটনাটি
খেকে ধূতিই প্রমাণ মেলে যে খেলার সৌখিন ধূতি
দরকারের সময় মানুষের কতখানি কাজে ও উপকারে লাগে।



সাধারণতঃ একটি
ধূতিরই বিভিন্ন
অতিরিক্ত খণ্ডিত
উপায় প্রচলিত
হলেও এই
'ধূতি ক্যামেরা'
সাধারণতঃ ১৮৮২
খৃষ্টাব্দে আটক
নামে এক ইংরেজ
কৈশিক, ১৮৮৫
খৃষ্টাব্দে এটি নামে
এক মার্কিন কৈশিক
১৮৮৬ ১৮৮৭ সালে
করতল নামে আরো
একজন কৈশিকের
কৈশিকের প্রচলন
আমেরিকার বৃক্ক ধূতি
১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে কৈশিক
করতল নামে
করতল নামে
করতল নামে। এই
করতল নামে
করতল নামে
করতল নামে
করতল নামে।



সিঁড়ি

সুকর্ষণ রায়

বিছানায় শুয়ে সায়ের দেয়ালে টাঙানো ক্যালেন্ডারটির দিকে চেয়ে মনে মনে হিসেব করছিল অনাদি গত এক মাসের মধ্যে চন্দ্রা ক'বার এসেছে তার কাছে।

খুব সোজা হিসেব। ত্রিশ দিনের মধ্যে সাত দিন। ছিনগুলি তার মনের মধ্যে চিহ্নিত হ'য়ে আছে গভীর ভাবে। ক্যালেন্ডারের দিকে না তাকালেও হিসেব মিলত।

অনাদি অস্থখে পড়ার আগে চন্দ্রাকে আসতে হ'ত না, অনাদিই যেত তার কাছে। মাসে ক'বার যেত সে হিসেব করবার প্রয়োজন হ'ত না অবশ্য চন্দ্রার। কারণ সে যোজাই যেত।

চন্দ্রা তাকে বোঝাতে চেষ্টা করে যে রিসার্চের কাজের চাপে সময়ের ওপর তার নিজস্ব কর্তৃত্ব নেই। সঙ্গে সঙ্গে সামান্যও দেয় যে তার শারীরিক উপস্থিতি যেখানেই থাকুক না কেন, মন তার সর্বদাই অনাদির রোগশয্যার শিয়রে উপস্থিত। নিজস্ব জাগরণে এমন একটি মুহূর্ত নেই যখন অনাদির কথা সে ভাবে না।

অনাদি চন্দ্রাকে অবিখাল করে না। কারণ চন্দ্রার ওপর আস্থা হারালে তার বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বনটি পড়বে ধ'লে।

তবু অনাদির বুকের মধ্যে একটা তীব্র বেদনা মুচড়ে ওঠে। মাঝে মাঝে বোধ হয় তা' তার হৃদরোগের সম্মুখকে ছাড়িয়ে যায়। কারণ চন্দ্রার মত স্বল্প দৃষ্টিভঙ্গী তার নেই। মানসলোকে চন্দ্রার আনাগোনা তার কাছে তেমন স্পষ্ট নয়, চন্দ্রার স্থল সান্নিধ্যেই তার পরিতৃপ্তি।

হৃদরোগের আকস্মিক আক্রমণে প্রায় ছ'মাস ধ'রে শয্যাগত হ'য়ে আছে অনাদি। চিকিৎসকেরা তার অস্তিত্বটাকে ক্ষুদ্র রোগশয্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ ক'রে রেখেছেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানের নিষ্ঠুরবিধানের নাগপাশে বন্দী সে।

চিকিৎসকদের বিশ্রামের বিধান সজ্ঞম কারাদণ্ডের চেয়েও দুর্বিসহ মনে হয় অনাদির। বিছানায় শরীরটাকে শুইয়ে রাখলেও অস্থির মনকে সে কী ক'রে বিশ্রাম দেবে!

চন্দ্রাকে কাছে পেলে অবশ্য তার এই বাধ্যতামূলক বিশ্রাম পরম রমণীয় হ'য়ে উঠতে পারে। কিন্তু চন্দ্রার সময় নেই। কাজেই শূন্য অবকাশের মধ্যে অসাড় হ'য়ে থাকে অনাদির অস্তিত্ব বোধ।

সেদিন অনেক দিন বাদে অনাদির কাছে এল চন্দ্রা। এসেই প্রশ্ন ক'লে, অনেকদিন আসতে পারি নি ব'লে নিশ্চই রাগ করেছ।

এ প্রশ্নের জবাবটা অনাদির গলার মধ্যে অশ্রুবাস্পে আটকে থাকে।

চন্দ্রা ব'লে চলে, রাগ করারই কথা। কিন্তু আমি কী করব বল—আমার রিসার্চ—

মান হেসে অনাদি বলে, জানি চন্দ্রা। তোমার রিসার্চ তোমাকে প্রায় পুরোপুরি অধিকার ক'রে রেখেছে, আমার জন্ত বিশেষ জায়গা রাখা নি।

—আমার ক্লিনিককে ডোয়ার রাইডাল ভাবছ নাকি! মাঝে মাঝে এমন অবস্থা হ'য়ে ওঠে ভূমি যে মনে হয় এত দিনেও আমাকে চিনে উঠতে পার নি।

ভীতদৃষ্টিতে চন্দ্রার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ ক'বে ঈষৎ তিক্ত হয়ে অনাদি বললে, ঠিকই বলেছ। এককালে যদিও তোমাকে চিনেছি ব'লে জানতুম, কিন্তু এখন সন্দেহ হচ্ছে বুঝি আমার চেনার বাইরে চ'লে গেছে ভূমি। তোমার

পরশের এই লাল রঙের কলমলে সিকের শাড়িটাও তোমার-
আমার এতদিনের জানাশোনা কে যেন চাপা দিতে চায়।
এমন স্বন্দর শাড়ি অনেক দিন পরো নি তুমি। আজ
হঠাৎ বী উপলক্ষ্য হ'ল বুঝতে পারছি নে।

চন্দ্রার মুখখানা সিঁড়রের মত রাঙা হ'য়ে ওঠে। গভীর
মুখে সে বললে, একটু সাজগোজ করলে কী দোষ আছে
কিছু!

—না, না, দোষ থাকবে কেন। সাজগোজ করবে
বই কি—নিশ্চয়ই করবে! এতদিন যে করো নি কেন
তাই ভাবি। আমার তো মনেও পড়ে না আমার সঙ্গে
যখন বেড়াতে বেরোতে তখন একদিনও এমি সাজ করেছ।
যাচ্ছ নাকি কোথাও?

গাঢ়তর হ'য়ে ওঠে চন্দ্রার মুখের রক্তিমতা। ঈর্ষ্য
ইতস্ততঃ ক'রে সে জবাব দিল, ভাবছিলাম আমার রিসার্চের
ব্যাপারে পরামর্শ করার জন্য আমার একজন সহকর্মীর
কাছে যাব—খীসিস্ লিখতে শুরু করেছি কিনা। অবশ্য
তার জন্য তাড়া নেই কিছু—না গেলেও ক্ষতি হ'বে না
বিশেষ।

—ক্ষতি হ'বে না! আমার তো মনে হচ্ছে যথেষ্ট ক্ষতি
হবে। রিসার্চের ব্যাপার তো!

চন্দ্রার চোখ দুটো ঝলসে ওঠে। বুকের মধ্যে বিধাক্ত
আবেগের রাসায়নিক প্রক্রিয়া শুরু হ'ল যেন। ঠোঁট
কামড়ে ধ'রে সে নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করে।

অনাদি মুখ টিপে হাসে। হাসি তো নয়, যেন
বিজ্রপের ছুরি। গভীর বিতৃষ্ণার সঙ্গে অনাদির রোগ-
শয্যায় লীন শীর্ণ দেহটির দিকে তাকায় চন্দ্রা।

হাসি থামিয়ে কী রকম অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে,
অনাদি। হুঁশোধে দুনিবার তৃষ্ণা অঙ্গারের মত জ্বলতে
শুরু করে। চন্দ্রার বুক কাঁপে। তার মনে হয় যেন
অনাদির রক্ত সত্তা তাকে গ্রাস ক'রে ফেলে রবারের মত
ঘ'বে মুছে ফেলতে চায় তার স্বকীয়তা যা কিছু আছে।
একদিন নিঃশেষ আত্ম-নিবেদনের মধ্যে নিজের পরিপূর্ণতা
আবিষ্কার করেছিল চন্দ্রা। দেওয়া-নেওয়ার সেই রসায়ন
কী শুকিয়ে গেছে যে অনাদির নিবিড় আকাক্ষ্য তাকে
তথু আঘাতই হানছে।

মনে মনে শিউরে ওঠে চন্দ্রা। মালা থেকে ফুল খ'লে

পাঙলে অবশিষ্ট থাকে তথু হুড়োর কান—বা' তথু বাঁধে,
যন্ত্রণা দেয়।

অনাদির রোগশয্যার শিরেরে ব'লে থাকে চন্দ্রা রঙিন
রেশমী শাড়ি থেকে বিকীর্ণ আত্ম-বিকারের আঙুনে
নিজেকে আবৃত ক'রে। এই আঙুনে নিজেকে পুড়িয়ে
নিঃশেষে ছাই ক'রে ফেললেই যেন তার নিজের কাছে
মান রক্ষা হ'ত।

আঙুনে আঙুনে সেরে উঠে অনাদি ইস্টা-চলা করার
ছাড়পত্র পেল ডাক্তারের কাছ থেকে। প্রথম বেদন তার
শোবার ঘর থেকে হেঁটে বাইরের ঘরে গিয়ে বসল, সেদিন
প্রথমেই সে টেলিফোন করল চন্দ্রাকে।

—চন্দ্রা আজ প্রথম টেলিফোনটা নাগালের মধ্যে
পেলায়—এই খবরটা সবচেয়ে আগে তোমাকেই দিচ্ছি।

অপর প্রান্ত থেকে ভারলেশহীন জবাব এল, তা' হ'লে
সেরে উঠেছ পুরোপুরি।

—নিশ্চয়ই। সেরে উঠে নিজেকে যেন নতুন ক'রে
ফিরে পেলাম। সেই সঙ্গে তোমাকেও।

আমাকেও! —চন্দ্রা যেন চমকে ওঠে।

পরক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়ে সে বললে, আমাকে
ফিরে পেতে হ'বে কেন! আমি তো যেখানে ছিলাম,
সেখানেই আছি।

—কিন্তু এ কয়দিন যেখানে পৌছবার শক্তি তো
আমার ছিল না—একটা বিছানার মধ্যে প্রায় তিন মাস
আটকে ছিলাম ভুলে যেও না। শোন চন্দ্রা, ডাক্তার
বলেছেন রোগ সন্ধ্যায় আমাদের বাড়ির স্নায়ের পার্কে
বেড়াতে যেতে। আজ থেকে শুরু করব ভাবছি। তুমি
এস—সন্ধ্যায় আগেই এস।

—আমি—

—তুমি ছাড়া আর কে আমাকে বেড়াতে নিয়ে যাবে!
তবে তবে চন্দ্রা বললে, রোগ যেতে হ'বে?

জোর দিয়ে অনাদি বললে, নিশ্চয়ই রোগ। রোগকাল
কটিন। ইন্জেকশন একদিন অন্তর অন্তর—কিন্তু বেড়ানো
রোগ।

—কিন্তু আমার রিসার্চ—

—বন্ধ ক'রে দিতে হ'বে। আমি যখন সেরে বিছানার



সেকালের আনন্দ-প্রমোদ

পূর্ণিমা মুখোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

সময়ে শ্রামবাজারের অনবরুদ্ধ নিয়োগীর পুত্র হু প্রসিদ্ধ
নী বাজিয়ে শ্রীরাধেন্দ্রনাথ নিয়োগী একটা একতান-
দনের দল বসাইয়াছিলেন। ইহারাই বাজাইবার জন্ত
মন্ত্রিত্ব হন। ষথাসময়ে অভিনয় হইল, কিন্তু এই রাত্রিতে
তিপয় অভিনেতা উজ্জ্বল হইয়া পড়ায় অভিনয় ভাল হয়
ই। তাহার পর কোজাগরী পূর্ণিমায় রাত্রিতে গিরীশ-
বুর খন্তরালয়ে অভিনয়ের ব্যবস্থা হইল। এই অভিনয়ে
জন্মবাবু, গিরীশবাবু, নগেন্দ্রবাবু ও রাধামাধববাবু বিশেষ
খ্যাতি লাভ করেন। এই অভিনয়ের পর রঙ্গমঞ্চ
রামতি হিসাবে ৪০ টাকার গোলমাল হয়। সেই
গোলমাল লইয়া গিরীশবাবু রঙ্গমঞ্চ আটকাইয়া রাখেন।
সুত্রে গিরীশবাবুর সহিত সমগ্র দলের বিবাদ হয়, এবং
গিরীশবাবু দল ছাড়িয়া দেন। এই অভিনয়ের পর গড-
রে জগন্নাথ দত্তের বাড়ী ইহাদের তৃতীয় অভিনয় হয়।
অভিনয়ের জন্ত রঙ্গমঞ্চের অভাব হয়। শিবপুরে
ন রুক্মকুমারীর অভিনয় হইত। সেই দলের রঙ্গমঞ্চ
করিয়া আনিয়া অভিনয় করা স্থির হয়। গিরীশবাবু
সংবাদ পাইয়া নিজ আসিয়া নিমটাদ অভিনয়ের জন্ত
হস্ত হইলেন। ষথাসময়ে অভিনয় হইয়া গেল। ১২৭৫
লয় মখে মাসে সরস্বতী পূজার দিন (১৮৬২ ফেব্রুয়ারী)
সম্রদায়ের ৪র্থ অভিনয় তোখাখানার দেওয়ান ৩রা
মহাদাদ মিত্র বাহাদুরের বাড়ীতে হয়। এই অভিনয়

বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। এই দিন ইহাদের রঙ্গমঞ্চের
মুখ পটের উপর লেখা হইয়াছিল “He holds the
mirror up to nature.” এই দিন অভিনয়ে আরও
অভিনেতা পরিবর্তন হইয়াছিল,—অজ্ঞেদ্বাবু জীবনচন্দ্রের
ও অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কেনারামের অংশ লইয়া
ছিলেন, আর সব ঠিক ছিল। এই দিন দর্শকের মধ্যে
গ্রন্থকার দীনবন্ধুবাবু উপস্থিত ছিলেন। তিনি অভিনয়
দেখিয়া এত সন্তুষ্ট হন যে গিরীশবাবুকে তাঁহার নিমটাদ
অভিনয়ের প্রশংসা করিয়া বলেন, নিমটাদ যেন তোমার
জগুই লেখা হইয়াছিল। ২য় দৃশ্যের পর যখন জীবনচন্দ্র
“আমি তোকে তাজাপুত্র কল্লম” বলিয়া প্রস্থান করে,
অভিনেতা অজ্ঞেদ্বাবু সেই সময় অটলকে একটু মুহু
পদাঘাত করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। ইহাতে দীনবন্ধু-
বাবুর এবং সমগ্র দর্শকের মধ্যে একজন্মের ভাবোদয় হইয়া-
ছিল যে, দীনবন্ধু অভিনয়ের পর জীবনচন্দ্রের অভিনেতাকে
দেখিতে চাহেন এবং দেখিয়া বলেন, আপনি ব্রাহ্মণ, পায়ের
ধূলা দিন, you have improved the author।
সম্ভবার একাদশীর ২য় সংস্করণে আমি ২য় দৃশ্যে এই
পদাঘাতটুকু লিখিয়া দিবা। এই দিনই দীনবন্ধুবাবুর
‘বিয়ে পাগলা বুড়ো’ও ইহারা অভিনয় করেন।

৮৬

রাজীব মুখোপাধ্যায়—শ্রীঅজ্ঞেদ্ব শেখর মুক্তকী
বতানাপ্তে—শ্রীরাধামাধব কর,

পেচোর মা—গোপালচন্দ্র দাস,

কনের ভগিনী—শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

শিববাবুর এই প্রথম অভিনয়। গিরীশবাবু একটি কবিতায় ইহার একটা প্রস্তাবনা লিখিয়া দিয়াছিলেন, তাহা বন্ধুসঙ্গে পঠিত হইয়াছিল। তাহার পর এট সপ্তদায়ে ২৪ পাঁচটি অভিনয় হয়। ৬ষ্ঠ অভিনয় হয় খিদিরপুরে নন্দলাল ঘোষের বাড়ীতে দুর্গা পূজার সময়ে (১২৭৬ আশ্বিন, ১৮৭৬ অক্টোবর)। সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা মহেন্দ্রলাল বসুর সহিত এই অভিনয় উপলক্ষে এই সপ্তদায়ে আলোপ হয়। মহেন্দ্র-বাবুর নিকট একটা পেশোয়াজ ছিল, কাকুনকে পরাইবার জন্ত ইহার তাহা চাহিয়া লয়েন। প্রস্তাবনাটি এই—

“মাত্ৰামীটে ফুরিয়ে গেল, দেখুন বুড়োর রঙ।

বাসর-ঘরে টোপার প’রে কিবা বিয়ের ঢঙ ॥

আয়না নসে, রতা কোথা যা পারিস তা বল।

কমা করিবেন দোষ, রসিক মণ্ডল।

আসছে এবার ছোঁড়ার দল, ভুবনো নসে রতা।

শভাগণ নমস্কার ফুরালো আমার কথা।”

এই সময়ে আর একটা ঘটনা ঘটেছিল। বহুপাড়ায় গতিনাথ দত্তের বাড়ীতে একটা সন্ধ্যার যাত্রার দল ছিল। সেখানে শমিষ্ঠার পালা গাওনা হইত। এই যাত্রার দলের এক ব্যক্তি এক দিন অর্দ্ধেন্দুবাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলেন,—“এত ঝর রঙের পোষাক পরে, রঙ করা পরদার আড়াল থেকে তুনে শুনে চাইকার আর লাফালাফি করা নয়, এতে রীতি মন্ত নাচ গান বাজনা সুর ভাল জানা চাই, অর্দ্ধেন্দুবাবু উত্তরে বলেন—“বেশ আশ্রু হতে ১৫ দিন পরে তোমাদের এই নাচগান সুর ভালগালা যাত্রা শুনিবে দেব, কিন্তু তোমরা এক মাসে আমাদের মত একটা থিয়েটার কর দেখি।” সেই দিনই নগেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে যাত্রা করার পরামর্শ টিক হইয়া গেল। মণিমোহন সরকারের “উষা অনিরুদ্ধ” নাটকে গান জুড়ে পালা বাধা হইল। গিরীশবাবু ২৬ খানা গান বেঁধে দিলেন। ঠন-ঠনিয়ানিবাসী নিতাইচাঁদ চক্রবর্তী ইহাদের দলে বাজিয়ে হলেন। বর্তমান আবোধপুত্রের স্থগারক উষাচরণ চক্রবর্তী

ও তাঁহার ভাগিনেয় কথক দুর্লভচন্দ্র গোস্বামী এই দলে জুড়ীর গায়ক হলেন। হিন্দুল খাঁ নাচগান শিখাইতে লাগিলেন। ১৫ দিনের মধ্যে পালা প্রস্তুত হয়ে গেল। মহেন্দ্রবাবুর নিকট যাত্রার উপযুক্ত পোষাক ছিল। নগেন্দ্র-বাবুর বাড়ীতে ১২৭৬ সালের জগদ্ধাত্রী পূজার পর এই যাত্রার প্রথম আসর গাওনা হয়। এই যাত্রার দলের অস্থগানের সময় প্রসিদ্ধ অভিনেতা মতিলাল সুর এই দলে যোগ দেন। এই যাত্রা গাওনার দিনে শমিষ্ঠার দলও বহুপাড়ার মাঠে এক আসর গাইলেন, শেষে উভয় দলে সঙ দিব্যর ছলে গান বেঁধে উভয় দলকে শ্লেষ বিজ্ঞপ করেন। তাহার পর চার পাঁচ আসর যাত্রার গাওনা হইয়া গেল। ইহার পরও দু একবার ‘সধবার একাদশী’র অভিনয় হইয়াছিল। এই সকল অভিনয়ে বাগবাজার অবৈতনিক নাট্যসম্প্রদায়ের সহিত গিরীশবাবুর কোনো ঘনিষ্ঠতা ছিল না। তিনি নিমটাদের অংশ মাত্র অভিনয় করিতেন। পূর্বোক্ত শমিষ্ঠা যাত্রার গানগুলিও গিরীশবাবুর রচনা এবং ইহাই তাহার প্রথম রচনা। কিছু দিন পরে অর্থাভাবে ঐ নাট্যসম্প্রদায় ভাঙ্গিয়া যায়।

যখন “কিছু কিছু বুঝি” অভিনয় হয়, সেই সময় মাইকেল মধুসূদন দত্ত অর্দ্ধেন্দুবাবুকে টিকিট বেচিয়া থিয়েটার করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। এখন অর্থাভাবে দল গেল দেখিয়া অর্দ্ধেন্দুবাবু টিকিট বেচিয়া অভিনয় করিবার উদ্দেশ্যে আবার দল গড়িতে ইচ্ছাগ করিতে লাগিলেন। এই দলে অর্দ্ধেন্দুবাবু “লীলাবতী” অভিনয় করিবেন বলিয়া শিক্ষা দিতে লাগিলেন। নগেন্দ্রবাবুর বাড়ীতেই আখড়াই চলিত, নিয়মমত চলিত না, অল্পে অল্পে কার্য্য অগ্রসর হইতে লাগিল। শেষে একটা দুঃসাহা ব্যাপার উপস্থিত হইল। “অরবিন্দ” ও “যোগদ্বীপন” সাজিবার উপযুক্ত একাকৃতি দুইটি লোকের আবশ্যক হইল। সহজে তেমন লোক পাওয়া গেল না। সে অহুংসাহের অবস্থায় তেমন আশ্রয় করিয়া খেঁজেই বা কে? কাজেই যেটুকু আখড়াই চলিতেছিল, তাহাও বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল।

এই সময়ে শ্রামপুত্রে ব্রজনাথ দেব (গিরীশবাবুর শ্রালক) নিজ বাটীতে একটি থিয়েটারের দল বলাইয়া অর্দ্ধেন্দুবাবুর হস্তে তাহার শিক্ষা ভার দিলেন। গিরীশ-

বাবুর সহিত এই দলের সংশ্লিষ্ট ছিল না। কৃষ্ণকুমারীর আখড়াই চলিতে লাগিল। ব্রজবাবুর সংকল্প ছিল, কোন স্থানে একটা রঙ্গমঞ্চ স্থায়ীভাবে বাধিয়া নিয়মিত ভাবে অভিনয় চালাইবেন। ব্রজবাবু তখন জন-এটকিন্সনের বাড়ীর বুককীপার ছিলেন। সেখানকার দালালদের নিকট হইতে টাকা তুলিয়া এই উদ্দেশ্যে কিছু টাকাও তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই অর্থের ভ্রামপুত্রে ৩গোপাল-চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীর উঠানে স্থায়ী মঞ্চের আয়োজন হইতে লাগিল। পাটাতন পর্যন্ত হইলে ব্রজবাবু সাম্প্রতিক পীড়াম শয্যাগত হইলেন, সব বন্ধ হইয়া গেল।

ব্রজবাবুর দল ভাঙিতে ভাঙিতে ভ্রামপুত্রে যুবকদিগের আগ্রহে সেই দল হইতেই লোক সংগ্রহ করিয়া এক যাত্রার দল বসান হয়। অর্ধেন্দুবাবুও যোগ দিলেন। তাহার আগ্রহে নিতাই চক্রবর্তী, উমাচরণ চক্রবর্তী, দুর্লভ গোস্বামী, হিজুল খাঁ প্রভৃতি গাইয়ে, বাজিয়ে ও নাচিয়ে ওড়াইয়া যোগ দিলেন। পাথুরেঘাটার রাজবাড়ীর বিদ্যালয়দ্বারে তিনি মালিনী সাজেন, সেই কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা “শকুন্তলা” প্রথম গাওনা হইয়াছিল। তাহার পর এই দলে “জ্যোতীর বস্ত্রহরণ” গাওনা হইয়াছিল। তাহার পর উমাচরণ চক্রবর্তীর সাহায্যে আমোদ-পুরের যাত্রার সাট “সীতার বনবাস” আনাটয়া গাওনা হইয়াছিল। এই যাত্রার দল ও ইহার পূর্ববর্তী উবা অনিচ্ছা যাত্রার দলে এই সকল থিয়েটারের অভিনেতা বা খাচার এবং অর্ধেন্দুবাবু শিক্ষক থাকায় যাত্রার ঘটকালীর বা বক্তৃতার স্বর বদলাইয়া সহজভাবে বা থিয়েটারী ঢঙে কতকটা পরিণত হইয়া পড়িয়াছিল। ইহার পর যাত্রার দল ভাঙিতে থাকে।

যখন এই শকুন্তলা যাত্রার দল বাগবাজারে চলিতেছিল, সেই সময়ে চড়কভাঙার জয়রাম বসাকের বাড়ীতে আবার একটি থিয়েটারের দল বসে। সেখানে ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের রচিত “ভ্যালারে মোর বাপের” নামক প্রহসন অভিনীত হইবে বলিয়া আখড়াই চলিতেছিল। অবশেষে এই দল আহীরীটোলার জনাইয়ের মুখোপাধ্যায় মহাশয়-দিগের বাড়ীতে উঠিয়া যায়। অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই দলের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ১২৭৬ সালের দোলের মাসিতে (১৮৭০ কেরকারীতে) মুখোপাধ্যায়দিগের বাড়ীতে ইহার অভিনয় হয়। নগেন্দ্রবাবু ও রাধামাধববাবু এই অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন। ইহা দেখিয়া আসিয়া তাহার “ভ্যালারে মোর বাপের” উক্ত বিবরণ শুনি একটি ক্ষুদ্র থিয়েটারের দল গঠন করেন।

“রত্নাবলীর” আখড়াই আরম্ভ হয়। প্রিয়মাধব বহু মল্লিক “ভ্যালারে মোর বাপের” উক্ত প্রহসন লিখিয়া দেন। অর্ধেন্দুবাবু তখন যাত্রার দলে নিবিষ্ট ছিলেন, এই ক্ষুদ্র থিয়েটারের দলে যোগ দেন নাই। [ইতিপূর্বে “কিছু কিছু বুঝি” অভিনয়ের পর বাগবাজার রাজবলভ পাড়ায় প্রিয়মাধব বহু মল্লিকের দ্বারা “রত্নাবলী” অভিনয়ের যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহা তুল। ১২৭৬ সালের এই অভিনয়ের কথাই তুলিয়া সেখানে লেখা হইয়াছে। ইহা অর্ধেন্দুবাবুর ১৩৭৭ সালের বক্তৃতায় ছাপা ছইয়াছিল। —ন, ন, ন]

এই রত্নাবলীর অভিনয় বাগবাজার রাজবলভ-পাড়ায় হয়। শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর দর্শক ছিলেন। প্রিয়বাবুর প্রহসনে ভোলানাথবাবুর নামে শ্লেষাত্মক গান ছিল। ভোলানাথবাবু তত্বতরে প্রত্যেকের প্রিয়বাবুর নামে কবিতা লিখিতেন। প্রিয়বাবুও প্রত্যেকেরই আবার তাহার উত্তর দিতেন। প্রিয়বাবুর কবিতাই বেশী স্মরণ হইত।

অর্ধেন্দুবাবু দুইবার যাত্রা করিয়া এই সময়ে বাজনার প্রতি একটু বেশী আকৃষ্ট হইয়া পড়েন এবং শকুন্তলা যাত্রার দল ত্যাগিয়া গেলে, প্রথমে ধর্মদাসবাবুর বাড়ীতে তাহার পর ১৭২নং আপার চিংপুর রোডে একটি একতান-বাগনের দল গঠন করেন। নগেন্দ্রবাবু, রাধামাধববাবু, ধর্মদাসবাবু, হিজুল খাঁ, নন্দাবু, যোগেন্দ্রবাবু, এই দলে যোগ দেন, এই বাজনার দলেও অর্ধেন্দুবাবু একটি হুতন প্রথা প্রবর্তন করেন। এতদিন বত কনসার্টের দল হইয়াছে সবাই “ডি” সুরে বাজাইত। অর্ধেন্দুবাবু নিজের দলে একেবারে “এফ” বাজনার প্রথা প্রবর্তন করেন। চড়াভাবে বাজাইবার খাতিরে এই দলের বিশেষ আদর ছিল। ১২৭৭ সালের রাসপূর্ণিমার দিন শোভাবাজার বেবেটোলার ৬কান্দিচন্দ্র ভট্টাচার্যের বাড়ীতে হাওড়া-বাটনার এক নাট্য-সম্প্রদায় “প্রাবর্তী” অভিনয় করেন। “প্রাবর্তী” সেক্সপীয়ারের “মার্কেট অফ টেনিস” অবলম্বনে লিখিত। এই অভিনয়ের সঙ্গে অর্ধেন্দুবাবু এই বাস্তবসম্মত বাজাইয়া ছিলেন। এই সময়ে হাটখোলার প্রসিদ্ধ মহাজন ব্রজেনকুমার সাহা ওরফে দ্বিগু সাহার গদীর কণ্ঠস্বরী শ্রীগোবিন্দনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এক ব্যক্তির সহিত নাট্যসম্প্রদায়ের আসাপ হয়। তিনি আখড়ার খরচ চালাইতে স্বীকৃত হওয়ার অর্ধেন্দুবাবু আবার থিয়েটারের দল গঠিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

উদ্ভট কাহিনী

পৃথীশ ভট্টাচার্য

নীল আকাশ। নীল সমুদ্র। লীলায়িত নীলিমার বৃকে লাক্ষ্মারি লাইনার চলছে। শান্ত প্রকাণ্ড সমুদ্রের বৃকে লক্ষ লক্ষ স্তনায়িত উদ্ভ্রণ তরঙ্গ দোলায়মান। আকাশের প্রান্তে ঘষা কাচের হাজার বাতির টুনি জ্বলছে—তার হলুদ আলো হাওয়ায় ভেসে চলেছে হালকাভাবে। অফেন সমুদ্রে ফেনা তুলে চলেছে লাইনার।

ডেকে একা বসে আছি আমি। রাত্রি গভীর। ক্যাবিনে সব ঘুমিয়ে। মাথার উপর জ্বলছে জাহাজের বাতি—প্রশান্ত সাগরে অশান্ত শব্দ তুলে ছা এজিনটা। 'মেরিকা থেকে ফিরছিলাম। এই জাহাজটি পৃথিবীর একটা পকেট সংস্করণ। এর বিচিত্র বৈচিত্র্য একে মাসিক সাপ্তাহিকের মলাটের মত আকর্ষণীয় করে তুলেছে। রংএর সমারোহ—অর্থহীন অসার কণিক। পরবর্তী বন্দরে ভিড়লেই মলাট পাল্টে যাবে।

'মেরিকান চল্লিশ বৎসরের তরুণী মিস্ সিলির সঙ্গে একদিনে ট্রামের হুঁখানা গাড়ীর মত একটা নৈকট্য হয়েছে—অকপট। বিনিম্র চোখ, আর বৃত্তাকৃত হৃদয় মনে মনে সিলিকে চাইছিল। আঁহা,—বিয়ে করি করি করেও সে ভয়ে বিয়ে করতে পারেনি পাছে স্বামীটি মনের মানুষ্য না হয়। অবশ্য তাই বলে পুরুষভৃৎকে সে চেনে, তার ভূকার মধু অনেকেই আকর্ষণ পান করেছে, চলে গেছে—মধুপ্রয়াসী হয়ে কেউ ডুব দেয়নি।

বিবাসীর মত চেয়েছিলাম—সিলি এসে পাশের ডেকে চেয়ারে বসল। আন্তে সন্দর্পণে নিঃশব্দে—মনে হল সে আদ্যেই এইটেই বলতে চায়।

—কি হঠাৎ এলে বে! ঘুম হয়নি?

—মনে হল তুমি ডাকছ।

—হ্যাঁ কণ্ঠস্বরে ডাকিনি, তবে আমার ইগো তোমাকে ডেকেছে—চেয়েছে।

—তাই বোধ হয় এসেছি। একটা কথা সুনতে এলাম,—আমার মধ্যে যে ইগো রয়েছে সেটা তোমার মধ্যে একটা জিনিষ খুঁজছে—তাই এত রাতে উঠে এলাম।

নির্বাক—হুজুন—পাশাপাশি। খেতকার তরুণীর স্তন্য দেহে হলুদে জোছনা পড়েছে। হঠাৎ সিলি বলল,—তোমাদের দেশ, সাপ বাঘ ভালুকের দেশ। ঋগ্বেদ-সকল অরণ্য। এ সব যখন ভাবি তখনই মনে হয় তুমি একটা কালো ময়াল সাপ।

—তারপর?

—হ্যাঁ মনে হয় তুমি কোন সময় ময়াল সাপের মত আমাকে জড়িয়ে ধরে পিশে মারবে—তুমি যেন সাপের মত কিলবিল করছ আমার মনের চারিপাশে, আর আমি ভয়ানক হয়ে রয়েছি—

—তা সাপটাকে ঠেঙিয়ে মেরে ফেলে দাও, তোমার গা-বেয়ে যেন উঠতে না পারে। সিলি হেসে ক্রীড়াভঙ্গি করে বললো,—মনের সাপকে ঠেঙিয়ে মারবো কি দিয়ে?

—সে অস্ত্র তোমাদের নেই সে কথা সত্য। ওটা আমাদের দেশে আছে—সেটা আধ্যাত্মিকতার ঠেঙা। আমার কি মনে হয় জানে! তুমি একটা বিরাট ময়দার বস্তা—আর আমি নে'টি ইঁদুর, তোমার উপর দিয়ে ছুটোছুটি করছি, ক্রিধে পেলে একটু ফুটো করে খেয়ে বলশালী হচ্ছি। ময়দার সাপের মত জড়িয়ে ধরতে সখ নেই—ময়দার বস্তাকে। ইঁদুরের মত ফুটো করতে সখ করে—বেশ মজা—

আবার নির্বাক। জাহাজের বড়িতে ১২টা বাজলো—

—আচ্ছা তুমি ত বিয়ে করেছ। কেনন করে তোমাদের বিয়ে হয়—তোমরা স্থখী? তোমাদের জীবনে স্থখ নেই, অপূর্ণতা নেই, অসামঞ্জস্য নেই?

—দুস্তর প্রেম, উত্তরও দীর্ঘ হবে।

—হোক—

—তোমরা বিয়ে কর স্থখী হতে—এই জড়জগতে মনের মাহুয খুঁজে বেড়াও। কিন্তু মনের মাহুয মিলে না, মনের মাহুয করে নিতে হয়। করে নিতে হলে তোমার ব্যক্তিত্ববাদকে, ইগোকে কিছুটা চেপে রাখতে হয়, চাপের বস্তু খেটা সেটা তোমরা হারিয়েছ। আমরা বিয়ে করি—হঠাৎ মার আদেশে, অপরিচিত কোন কুমারীকে।

—অপরিচিত?

—সম্পূর্ণ অপরিচিত। মেয়েদের সঙ্গে আমরা মিশি না, হঠাৎ পুরুতে যখন কুশ দিয়ে হাত বেঁধে দেয় তখনই দুটি জীবন সারা জীবনের মত অবচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে যায়—নিষিদ্ধ এলেকার দরজা খুলে দেখি পরম বিস্ময়। বিস্ময়ে আত্মহারা হ'য়ে যাই—তোমাদের লক্ষ্মী নর্ম পত্নী, আমাদের পত্নী ধর্ম পত্নী। আনি গরমিল হলেও মিল করতে হবে, তাই ব্যক্তিত্বকে মেড়ে পুঁছে উভয়ে একটা জায়গায় এসে যাই—করতে হবে বলেই করি এতে মুক্তি নেই, হৃদয় আছে। জীবনের সকাই তাই জীবনে ত্যাগ করতেই হয়—কিন্তু তোমরা মাথা দিয়ে হৃদয়ের কাজ করতে চাও তাই গরমিল—তাই চাওয়ার জিনিষ পাও না।

—জানি না, জানিনা, তুমি বলতে পারো তুমি স্থখী?

—হ্যাঁ, জগতে বত্থানি স্থখী হওয়া সম্ভব। অতৃপ্তি আছে, অপূর্ণতা আছে কিন্তু স্বাধীনতার স্বাদ পেলে এটা আরও বাড়ত। আমরা বিচ্ছিন্ন হতাম—নতুনের খোঁজ করতাম।

—স্বাধীনতার আনন্দ?

—হ্যাঁ, আমাদের ঘরে বধু আসে সংগোপনে ভৃত্যবশে, ভৃত্য থেকে ধীরে ধীরে সে হয় রাণী—সংসারের সম্রাজ্ঞী—আর ঘারা ছিল প্রভু তারা হয় দাসদাস—তাতেই তার তৃপ্তি—সন্তানকে কেন্দ্র করে দাসী হয় রাণী, আর প্রভু হয় দাসদাস।

—এটা একেবারেই যুক্তিহীন।

—যুক্তিহীন নিঃসন্দেহে, তবে হৃদয়হীন নয়। হৃদয় দিয়ে বুঝতে পারলে বোঝা যায়। উপযুক্ত বস্তু না হলে তুমি দূরের আকাশ দেখবে কি দিয়ে—

—অবিখ্যাত দার্শনিকতা, দর্শন জীবনে অমূল্যলন করা যায়!

—যায়, সেইটেই আমাদের বৈশিষ্ট্য—আমাদের জীবন ও সমাজে দর্শন মিশে রয়েছে অদৃশ্য ভাবে—মিলি কি যেন একটা কড়া কথা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু না বলে উত্তেজিত-ভাবে চলে গেল।

লাক্সারি লাইনার আবার চলেছে। নীল সমুদ্র—নীল আকাশ, হলদে জোছনা,—আমি একা, একক, উদাসী। সমুদ্রের উজ্জল উত্তর বৃক্কের দিকে চেয়েছিলাম। ডেকের তারের বেড়ার একটি খুঁটির মাথায় একটা মোটা লোহার মুণ্ড রয়েছে। কেন যেন সেটা মাঝে মাঝে বড় হচ্ছে আবার ছোট হ'চ্ছে। ওই মুণ্ডটাই আমার দৃষ্টিকে বাধা দিচ্ছে। ওর দিকে তাকাবো না যতই ভাবছি, ততই তাকাতে হ'চ্ছে—কি আশ্চর্য।

মুণ্ডটা বড় হ'চ্ছে—ছোট হচ্ছে, হঠাৎ বেশ বড় হ'য়ে একটা মাহুযের মাথা হল। লোহার ডাণ্ডার মাথায়, মাহুযের মুণ্ড—বেশ বড়, চোখ, মুখ, নাক, কান, সোনালী চুল। এবার তাকাতেই কি ক করে হেসে ফেলল—

—কে, কে, তুমি—

—তোমাদের দেশে যাবো বেড়াতে।

—তুমি কে? কেন বাবে আমাদের গরীবের দেশে? তোমার খড় কই? তুমি ভূত?

—হ্যাঁ, ভূত। মাঝে গেছি অনেক দিন আগে।

—তোমার নাম?

—জেমস্ জয়েন্স।

—সর্কানশ, ইউলিনিস, পোর্টেট অফ্ দি আর্টিষ্ট এন্ড এ ইয়ং ম্যান তোমার লেখা?

—হ্যাঁ—

—দোহাই তোমার, আমাদের দেশে বেঙ না। পৃথিবীর সর্বত্র যাও, আমাদের দেশটা বাদ দাও—

—কেন? দেশত্যাগে যাবো, দেখতে—তোমাদের সাগরদয় দেশ, বিবল কহোজল ধর্মী।

—কি দেখবে? তোমার ত শুধুই মাথা, বড় নেই, হৃদপিণ্ড নেই, হৃদয় নেই—কি দিয়ে দেখবে আমাদের দেশ? মাথা দিয়ে? মাথার দেশ ওটা নয় ওটা হৃদয়ের দেশ।

—মাথা দিয়েই দেখবো হৃদয়ের দেশ—

—সোনার পাথর বাটি—আর কি? মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখবে গ্রহউপগ্রহ। বেরাফক—যেও না, কিরে বাও—

—কিন্তু যেখানেই মানুষ আছে, তার মধ্যে ইগো আছে—জগো আছে তার প্রকাশ আছে—তাই দেখবো—

—আছে ত, দেখবে কি দিয়ে? শোনো, তোমরা ছিলে স্বর্গের মানুষ, স্বর্গের ইডেন গার্ডেনে ছিলে, তার পরে বুদ্ধির ফল খেতেই, ভগবানের ত্যাগ খেয়ে পৃথিবীতে এসেছ কিন্তু বুদ্ধির ফল খাওয়া ছাড়লে না। আমরা পরম ব্রহ্মের ঐশ্বর্য, অমর আত্মা, আমরা অনন্তজ্ঞানব্রহ্মের দেহকে পুরাতন বস্ত্রের মত ত্যাগ করে নতুন বস্ত্র গ্রহণ করছি, আত্মার সম্পূর্ণতার জন্যে। তোমরা বুদ্ধিবলে মূল্য দিয়েছ জড় জগতের ভোগকে, আমরা মূল্য দিয়েছি পরমার্থকে, হৃদয়কে, হৃদয় বৃত্তিকে। তুমি যেও না ওখানে, তুমিও নষ্ট হবে—আমাদেরও নষ্ট করবে—

—তোমরা কি জাগতিক জীবনের স্বখদুঃখ ভোগ কর না—

—করি, কিন্তু নির্বিকার ঐশ্বর্যসিঞ্চে ভগবানে সমর্পণ করে, অনন্তজ্ঞানব্রহ্মের কল হিসাবে। তার জন্যে আমাদের ইগো ছটকট করে না, বিদ্রোহ করে না, চিন্তাবিকার ঘটে না। ভগবানের আড়োঁচাপিরে দিয়ে আমরা হাসি—সমাজ জীবনে, ব্যক্তি জীবনে—

মুণ্ডটা হো হো করে হেসে উঠল—ভয় করছে। ভূতের সঙ্গে বসে গল্প করছি। বললাম,—শোনো, ভূতই হও আর প্রেতই হও, শোনো। সমাজ বা ব্যক্তি জীবনে আমাদের মন পুঞ্জীভূত মানি লক্ষ্য করে না, চিন্তা বিকার ঘটায় না। কাজেই তোমাদের জড়বাদের ভোগ লাগল না আমাদের কন—আমরা অধ্যাত্মবাদী—

—তুমি ত যোর রিয়াক্সনারী—

—বলা বাহুল্য রাজ। জড়বাদপ্রসূত আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তিবাদকে প্রগতিশীলতা বলে বিধারণ না করলে যদি

রিয়াক্সনারী হতে হয় তবে যেন অনন্তজ্ঞানব্রহ্ম সেই থাকে। তাই বলছি হৃদয় আর হৃদপিণ্ড যদি কিরে পাঠ্য তবেই আমাদের দেশে যেও—নইলে যেও না—

—তোমাদের দেশে ত পৌঁছে গেছি—

জানি, জাহাজচর্চি যন্ত্রপাতির সঙ্গে তুমি গেছ, তোমার বুদ্ধিগ্রাহ্য হালকা স্বখদুঃখের ভাবা গেছে, আমাদের প্রগতিবাদীরা তা নিয়ে চিন্তাবিলু লাগিয়েছে তাও জানি, কিন্তু জানো অধ্যাত্মবাদের মূল কত গভীর? বুদ্ধি দ্বারা বিশ্বমানবিকতা কি তোমরা পেরেছ? অধ্যাত্মবাদ ব্যতীত হৃদয়ের দরদ আসে না, মানবিকতাও আসে না—

মাথাটা আবার হাসল। এমনভাবে হাসলো যেন আমাকে হেসেই নির্বোধ বানাতে চায়। বললে—জাহাজটা একুনি ভাগ হয়ে ভেঙে যাবে, তুমি ছিটকে এই হাক্কর তিমিলকুল সমুদ্রে ছিটকে পড়বে,—তখন কি করবে?

—ভগবানের নামে চেঁচা করবো, পাঁচি জ্ঞান, নইলে জানি নতুন জীবন নিয়ে আবার পৃথিবীতে আসবো—হাক্করে দেহটা থাকবে। আমাকে ত থাকবে না। তোমাদের দেহটাই যে সব তাই তোমরা ভয়ে আকুল হবে ভেবে, ব্যাকুল হবে—

মুণ্ডটা আবার হাসলো,—যেন বড় একজন বিজ্ঞের হাসি। বললে,—জীবন থেকেও তা হলে কননাটা বড়।

—তোমার বুদ্ধিগ্রাহ্য জগতের উপরেও আমরা আছি একটা অতীন্দ্রিয় জগতে বিশ্বাসী, কাজেই তোমার ও বিজ্ঞ হাসি নিরর্থক—বুদ্ধিগ্রাহ্য জড় জগৎ আমাদের কাছে মূল্যহীন।

—ওই যে মিস্ সিলি বললে তুমি কালো ময়াল লাগ। তাকে জড়িয়ে ধরবে বলে ভয়ে অস্থির—ওটা কি জানো? ওটা সিংল্‌ইজন্স—

—হ্যাঁ, জানি। অর্থাৎ ওর ইচ্ছা আমি ময়াল লাগেব মত ওকে জড়িয়ে ধরি কিন্তু ধরছি না বলেই ওর চিন্তা বিকার—

ঐ সিংল্‌ইজন্স কিসের জানো?

—জানি,—জৈব প্রেরণা, ইগোর জৈব প্রকাশ।

—আর তুমি যে নেংটি ইদুর—ওটা?

—ওটা ঠাট্টা, ময়দার বস্তার মধ্যে নারীই নেই—
তাই নেংটি ইঁদুর, বুঝলে? মুণ্ডুটা প্যাট প্যাট করে
তাকিয়ে মিচকি হেসে বললে,—তোমাদের দেশে চিত্ত-
বিকার বলে কিছু নেই? অবরুদ্ধ হৃদয়বেগ ঐ কামনা
কি চিত্তকে বিকারগ্রস্ত করেনি।

—আখো, চিত্তবিকার, হৃদয়বেগ হৃদয়ের ব্যাপার,
বুদ্ধি দিয়ে তোমরা তা বুঝতে চাও ত? কামনা বাসনা
যখন রুদ্ধ হয় অর্থাৎ Strangled হয় তখনই চিত্ত-
বিকার ঘটে, কিন্তু যেখানে কামনাকে ত্যাগ করাই
জীবনদর্শ, সেখানে ব্রহ্মবিদ্যাসী অন্তরে কামনা রুদ্ধ হয়
না, আমাদের চিত্তবিকার ঘটে না,—তাই পাগলামিটা
আমাদের কম। জানো মানুষকে স্থখী হতে হলে
'barrier of the unconscious' ভাঙতে হবে আত্ম-
চেতনা পেতে হবে কিন্তু জড়বাদী তোমরা ত দে ভাঙার
অঙ্গ হারিয়েছ।

মুণ্ডুটা একবার বৃকে হাত দিতে চেষ্টা করলো, বোধ
হয় ভাল করে নিশ্বাস নিতে। আমি হো হো করে হেসে
উঠে বললাম,—বৃকটাই ত নেই। মাথায় হাত দাও—
মাথা দিয়ে নিশ্বাস নিতে চেষ্টা কর। মাথাটাই বৃকের
কাজ করুক, দেহটা ত তোমার লোহার—

মুণ্ডুটা একটু ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থেকে বললে,—
ওটা ত দর্শন, জীবন নয়।

—বললাম ত, আমাদের জীবন আর দর্শনে তফাৎ
নেই। তোমরা ইঞ্জিনশক্তির রঙীন কাচ দিয়ে, চিত্ত-
বিকারের রঙীন চশমা দিয়ে যে জীবন দেখেছ তা চরম-
মত্য নয়, তা আপাতমত্য! আচ্ছা বলত, তুমি ১৯০৪
সনে ডাবলিন শহরে, ডেভালাস রূপে বা দেখেছিলে,
ইউলিসিস্ রূপী ব্লু, পেনিলোপরূপী ম্যারিয়নের পরি-
ক্রমার মধ্যে যে কশাইখানা, কাগজের অফিস, জাতীয়
গ্রন্থাগার, আর সেই তরুণীর সম্বন্ধে উদগ্র কামনা, পঙ্কিল
বিবাহপন্থ, প্রস্তুতি আগারের ছাত্রগণ, আর ম্যারিয়নের
চারিত্রিক খলন তুমি দেখেছিলে তা তো তোমার রঙীন
চশমা দিয়ে, যেখালর থেকে তোমাকে যে ব্লু উদ্ভার
করলো সেও ত তোমার চিত্তবিকারের রূপ—তুমি বল
সীম অব কনসাসেন্স—কিন্তু এ হচ্ছে ব্রট আত্মার, নষ্ট
চরিত্রের পাগলামী। বিংশ শতকের যে আদিত্ত রূপ দেখেছ,

সে ত ক্ষেদ্রাক্ত মানবজীবনের তুল...তাই বলছি আমাদের
দেশ দেখার সময় হয়নি তোমার। হিন্দুবিবাহবিচ্ছেদ
বিল, হিন্দু নারীর উত্তরাধিকার বিল প্রভৃতি আইন দিয়ে
ধর্মদর্শনান্ধিত হিন্দু আত্মাকে বতদিন ব্যতিক্রম জীবনের
ব্যভিচারের মধ্যে এনে নিরঙ্কু চিত্তবিকারের সৃষ্টি না
করছে ততদিন তুমি যেও না। আমাদের প্রগতিবাদীরা
তোমাকে লুফে নিয়েছেন পরসী রোজগারের জন্তে, মস্তিষ্ক
দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করে পরসী আদায় করছে। যদি
যেতেই হয়, তবে আরও পরে—সমগ্র সমাজ যখন ব্রট হবে
তখন যেও। এটি অহুরোধ। তোমাদের দেশে যেমন
পাগলের সংখ্যা দিনদিন বাড়ছে, অমনি যখন পাগলামি
প্রকাশ পাবে তখন যেয়ো—

মুণ্ডুটা হিহি করে হাসছে। আকাশ আর সমুদ্রের
রেখাটা মিশে গেছে ঠিক ওর সোনালী চুলের উপরে। ও
হাসছে—তুপুর রাতে কি পাগল নিয়ে পড়লাম। বললাম,
দেখ তুমি নিছক কাটা মাথা, তোমার পাগলামী সহ
হচ্ছে না—

মুণ্ডুটা বললে,—তোমার পাগলামীও আমি দেখছি,
কি স্বপ্নবাদী তুমি?

—স্বপ্ন যদি মধুর হয় তবে তাই দেখতে দাও, বাস্তবের
যন্ত্রণায় টেনে এনো না—

হি হি—হি হি—মুণ্ডুটা ছোট হয়ে আবার লোহার
খুঁটির গোলমাথা হয়ে গেল।

জাহাজ কাঁপছে, ইঞ্জিনের আঘাতে এর সর্বাঙ্গ কাঁপছে।
প্রশান্ত সাগরের আশ্রিতহীন অশান্ত ঢেউএর মাথার তুলছে।
জাহাজের সমস্ত আয়ু, পেলী, হৃদপিণ্ড কাঁপছে ছ'লছে—
ইঞ্জিনের আঘাত লেগেছে এর আয়ুকেজ্জে—তাই থর থর
করে কাঁপছে। হৃদয়ে আলোর নীলাকাশ আর তার সাদা
মেঘ দেখছিলাম,—হনলুন্ থেকে এ জাহাজ তার স্নাট
পান্টাবে।

কাঁধের উপর যুহ স্পর্শ পেয়ে ফিরে চেয়ে দেখলাম,
বিবস্ত্রা সিলি! আমার সামনে ঘোলাটে আলোর অস্পষ্ট
ভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

—কি আবার তুমি, এমনি ভাবে—নয় দেহ নিয়ে—

—ঈগা ইঞ্জিনের আঘাতে জাহাজের আয়ু কাঁপছে,

আমার আয়ুর্কেত্র বিধ্বস্ত হ'য়ে গেছে,—গায়ে বস্ত্রের ভার লজ্জা হচ্ছে না তাই কলে দিয়ে এসেছি। জাহাজ ছলছে, বরি আসছে, তুমি দেখ—আমাকে দেখ, কি অমোঘ বিরাট বাধি আমার দেহে মনে, কি বাতনা পাচ্ছি—কামড়েছে সাপে, সর্পদংশনের যন্ত্রণা—

একটু যেন আলো এস কোথা থেকে—দেখলাম, একটা বিরাট সাপ সিলিকে জড়িয়ে ধরেছে অত্যন্ত কঠিন আলিঙ্গনে। সে ছট্ ফট্ করছে—দংশনের ভয়ে চোখবুজে জাহাজটার মত থর থর করে কাঁপছে—

আমি সাস্থনা দিয়ে বললাম—ভয় নেই, সিলি। ও সাপে বিষ নেই, চ্যামনা সাপ, দেখতে বড়, গায়েও খুব জোর—কিন্তু সহসা কামড়ায় না, কামড়ালেও লোক মরে না। ভয় নেই—ওটা কেউটে নয়, ওটা কেউটের জনক।

কিন্তু এই যে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আমাকে চাপছে, হাড় গোড় ভেঙ্গে যাচ্ছে, হৃৎপিণ্ড বন্ধ হয়ে আসছে, নিশ্বাস বন্ধ হ'য়ে আসছে, আমাকে বাঁচাও। তোমরা সাপের দেশের লোক, মন্ত্র তন্ত্র জানো—

—মন্ত্র আমাদের আছে কিন্তু তোমাদের দেহের যন্ত্রে তা কি কাজ করবে? এই জাহাজে, সমুদ্রে, শূণ্যে মন্ত্র কার্যকরী হয়না, সেজন্তু মাটি চাই—

—কাপুরুষ, আমাকে বাঁচাবে না?

—কি করে বাঁচাবো,—তোমাদের ছুঁলে আমাদের জাত যায়। ও তোমার মনের চ্যামনা সাপ তোমাকে পিশে মারছে—ওটা তোমাকেই তাড়াতে হবে।

—তবে কি মরবো? তুমি বাঁচাবে না?

—মরবে না,—ও রোগটা দাঁদের মত, চুলকোতে খুব মজা, পরে জলে পুড়ে যায়। যাক,—তুমি এসো, এগিয়ে এসো—

সিলি তার নয়দেহ নিয়ে কাঁপিয়ে পড়ল আমার বুকের মাঝে। আমি তাকে বুকের মধ্যে নিয়ে সর্কাক্কে হাত বুলিয়ে দিলাম। তার দেহ সত্যিই কাঁপছে,—গালের উপর গালটা রেখে হাত বুলিয়ে বললাম,—ভয় নেই তাখো, সাধটা নেই—চলে গেছে।

সিলি ভয়ে ভয়ে চোখ খুলে দেখলে,—সাপটা নেই। নিশ্বাস কেলে বললে,—গেছে—চলে গেছে—তোমার মত্রে?

—হ্যাঁ, মত্রে,—মত্রেটা শিখতে চাও?

—না, আমাকে জড়িয়ে ধরো, আমি তোমার কোলে ঘুমোবো, আয়ুর্কেত্রের কল্পন খেমেছে, ঘুম পাচ্ছে—

—তবে ঘুমোও, কিন্তু ভোর হ'তে বাকী নেই—

মুণ্ডটা আবার হাসছে—বড়, ছোট হচ্ছে। আমার দিকে তাকিয়ে ফিক্ ফিক্ করে হাসছে। প্রশ্ন করলে,—সাপটা ছাড়িয়েছ দেখছি, কি করে?

—তুমি বুঝবে না, মন্ত্র দিয়ে—

মুণ্ডটা আবার হাসলে অসম্ভাব্যে। বললে,—জাহাজটা দু'ভাগ হয়ে গেছে, একুনি ডুববে তা দেখছ। সিলিকে কি করবে?

—ডুবুক,—ওকে নিয়েই ডুববো—

সিলি আমার কোলের মধ্য থেকে মাথা তুলে বললে,—কি? কি হ'য়েছে—

মুণ্ডটা বললে,—ওই দেখ জাহাজটা দু'ভাগ হয়ে গেছে, ডুবছে,—ডুবছে—ডুবল—

সিলি যেমন করে আমার কোলে কাঁপিয়ে পড়েছিল তেমনি করেই সফেন সমুদ্র জলে কাঁপিয়ে পড়ল।

মুণ্ডটা হাসলো—বললে,—জীবন! জীবন বড়ই মহার্ঘ, এখানে স্বপ্ন বিলাস নেই। তুমি কাঁপ দিলে না।

—না, আমি ধীরে ধীরে বিজয়া দশমীর প্রতিমার মত ডুববো। গৌরবে, জয়ধ্বনির মাঝে—

—স্বপ্ন ছাড়ো, বাঁচতে চেষ্টা কর—নিশ্চিন্তে মরবে কেন?

—বৈঁচে আছি, মরলেও ত বৈঁচে থাকবো, তার জন্তে ব্যস্ততা কি? তোমাদের মত একবার মরি না, আমরা বার বার মরি, মরাটা অভ্যাস হ'য়ে গেছে। মরায় আমাদের হুঃখ নেই। জয়ের মধ্যেই হুঃখ। পুনর্জন্ম যাতে না হয় তাই আমাদের সাধনা।

মুণ্ডটা বললে,—ডুবছে, ডুবছে জাহাজ দেখছ? দু'ভাগ হ'য়ে গেছে, জলে ভর্তি হ'য়ে গেছে জাহাজের খোল। ঐ দেখ কাং হ'য়ে উন্টে যাচ্ছে—এখানে সমুদ্রের দেয়া হাকর কিলবিল করছে, তোমাকে একবারে গিলে ফেলবে।

আমি হেসে বললাম,—মৃত্যু জীবনের অবশ্যতাবী পরিণতি, তার জন্তে, হুঃখ কবে মোহাক ব্যক্তি। হিত-

প্রজ্ঞ ব্যক্তির। তার অন্তরে অহুশোচনা করেন না। সেই মহাজনের বাণী অহুসারে আমিও অহুশোচনা করি না। এই বসন্তগতই তোমাদের জীবনের সব, তোমরা মৃত্যুকে জীবনের শেষ মনে করে আর্ন্তকর্মে চীৎকার করবে—

রূপ করে সমুদ্রের একটি প্রকাণ্ড চেউএর মাথায় এসে পড়লাম। ডুবেরি বাচ্ছিল্য, কলাগাছের মত কি বেন একটা হাতের কাছে পেতেই তাতে চড়ে বসলাম—কালো শ্রাওলাধরা একটা বিরাট কাঠের মত, তাতে চড়ে বসতেই সেটা ঠিক টর্পেডোর মত ছুটেতে শুরু করল। কোথাও কাছে বেন একটা আবছা দীপ দেখা যায়—ঐদূরে জোছনা-লোকের অশ্রুট আলোছায়ায়—

সেই মুণ্ডটা আবার চলেছে সজে সজে, চেউএর উপর নাচতে নাচতে। বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে আছে, মিটমিট করে হাসছে। বললে,—কিসে চড়েছ? কিছু বুঝতে পারছো—

—কি আবার হবে, সমুদ্রের একটা জানোয়ার হবে, পিঠে হঠাৎ সওয়ার চেপে পড়েছে তাই ভয়ে ছুটেছে—

মুণ্ডটা হি হি করে হেসে বলল,—পিছনে তাকিয়ে দেখ, ঐ দেখ।

চেয়ে দেখলাম, সাধা একটা বৃহৎ তিমি বা হাঙ্গর পিছনে পিছনে ছুটে আসছে। বললাম,—সমুদ্রের জানোয়ার-টার হবে আর কি?

—ওটা হাঙ্গর, তোমাকে খাবে বলে পিছনে পিছনে আসছে—তোমাকে ধরল বলে—

—ধরক,—জাহাজ ত ডুবছে, এখন তুমি দয়া করে দেশে ফিরে যাও,—তোমার ঐ ধড়হীন মুণ্ডটা নিয়ে আর আমাদের দেশে যেয়ো না। তাতে আমাদের সাহিত্য যদি দীন দরিদ্র হয়ে থাকে থাক, কিন্তু তোমার ঐ হৃদয়হীন মস্তিষ্কবৃত্তি নিয়ে যেয়ো না,—ব্যক্তি স্বাভাব্যের একাকিত্ব আর অসহায় মর্মবেদনার পঙ্কিল রুদ্ধ দিয়ে আমাদের হৃদয়প্রাপ্ত জীবনকে রুদ্ধাক্ত করো না।

মুণ্ডটা হি হি করে হাসছে, এমন ভাবে হাসছে বেন সে খুব বিজ্ঞ আর আমি একটি নির্বোধ। বললে,—তোমার ব্যক্তিত্বকে বিনাশ করে মাছ হবে?

—হ্যাঁ, তোমরা ব্যক্তিবাদীনতা ও স্বাভাব্য দিয়ে কি পেয়েছ,—উচ্ছ্বল কেনের, নির্ভরহীন যৌবনের গৃহ,

শিখরাপোলে বার্ডিকোর নিঃসঙ্গতা, রিক্ততা। এ রিক্ত একক জীবন আরও চাই না—আমরা পুত্র, পুত্রবধূ, নাতিনী নিয়ে বার্ডিকাকে হৃদয় ও ব্যাপক করতে চাই। তার অন্তরে ব্যক্তিত্ব যদি একটু ধামাচাপা থাকে ত থাক—

—ও ত সেন্সিটিভ—

—হ্যাঁ, ওই জীবনকে পবিত্র করক, স্বর্গী করক। আগে একটা হৃদয় সংগ্রহ কর, সেই হৃদয়চালিত মাথাটা নিয়ে যাবে। এখন যেও না—

—হি হি—হি হি. তোমাদের সমাজ, পরিবার ত ডাকছে, তেড়েছে—

—জানি, সব জানি, হৃদয় ডাকবেও তোমাদের কণায়, কিন্তু যদি আরও কিছুকাল থাকে তাই বলছি ফিরে যাও আর তাক্ত করো না।

মুণ্ডটা ডাব ডাব করে থাকিয়ে থাকলো, চেউএর উপর তাসছে।

পাগুর চাঁদ পশ্চিম আকাশে কাস্তিহীন। দূরের আকাশে বোধহয় ফুটেছে সোনার অঁতা—আরক্তিম হয়েছিল সফেন সমুদ্র। দূরে দেখা যায় নারিকেল কুঞ্জে ঘেরা জনহীন দীপ। টর্পেডোর মত চলেছে আমার বাহন দীপ লক্ষ্য করে। পিছনে আসছে সাধা হাঙ্গর—মুণ্ডটা ভাসতে ভাসতে চলেছে সজে সজে—

সমুদ্র বেলাভূমিতে উঠে এসে আমার বাহন—মৃত-কর। বালুবেলায় পড়ে আছে মৃতের মত। সাধা হাঙ্গরটা জলের কিনারে এসে থেমে গেছে, ভাবছে হৃদয় ডাকার উঠবে, না আবার গভীর সমুদ্রে ফিরে যাবে।

বালুবেলায় পাড়িয়ে পরিচ্ছন্ন পুরাকালের দিকে চেয়ে, বিপুল বিশ্বকে প্রণাম জানাগায়,—ভাঙা মধু, মধুমধ ধরণীর ধূলি—

মুণ্ডটা বললে,—যে তোমাকে নিয়ে এস, এই দীপে সে কে জানো? ওয় ঢাকনা খুলে দেখ,—দেখবে ওটা তুমিই।

—আমি?

—হ্যাঁ, তোমার ইগো,—

—তুমি জানো না, ওটা কিছুই নয়। ওটা প্রকৃতির একটা শক্তি। এই ভাণ্ডে—আমি মৃতকর বাহনটার ঢাকনা খুলে দিয়ে বললাম,—ভাণ্ডে—চিন্তে পারো—

—না, এ ত দেখিনি কোনদিন।

—ওটা চেকি। গালাগাল দিতে আমরা বলি বুঝির চেকি।

মুণ্টা ডুব ডুব করে ডুব দিয়ে উঠে বললে,—আর ওই সাদা হাড়রটা—

—ওটা সিলি, দেখবে?

ডাকলাম—সিলি সিলি, উঠে এসো, সর্পবন্ধন থেকে তুমি ত মুক্ত, উঠে এসো—

সন্তোষাতা শুভ্রদেহী নগা সিলি ভিজ়ে ভোয়ালের ভিতর থেকে মুখ বের করে বললে,—তুমি ডাকছো?

—হ্যাঁ,—

নগা সিলি উঠে এলো নিঃসঙ্কোচে, তার শুভ্র দেহ বেয়ে পড়ছে সমুদ্রজল, সোনালী চুলে পড়ছে ভোরের সোনালী আলো, প্রশস্ত বুকের উপরে, হৃদয়াবেগে স্পন্দিত হচ্ছে তার নিঃসঙ্গ ঘোবন।

সে বললে,—আমি ভাবতে চাইনা, আমি আর বিচার করবো না, তোমার কাছে আমি আত্মসমর্পণ করছি, তোমার বুকে আশ্রয় দাও, এই আশ্রয় চিরন্তন হোক,—আমার চাওয়া আর নাই, আমি চাই তোমাকে, তোমাকেই স্থায়ী করতে, তাই আমি ত্যাগ করলাম আজ আমার অহং—আমার ব্যক্তিত্বকে।

সিলি উৎফুল্ল হৃদয় নিয়ে ছুটে এসে আলিঙ্গন করলো আমাকে। বুকের মধ্যে আশ্রয় নিল শিশুর মত—

মুণ্টা ডুবছে আর উঠছে। আমি হেঁকে বললাম,—তোমার বুঝির চেকিটা নিয়ে যাও, ফেলে বেঙ না—

মুণ্টা ডুংল,—আর উঠল না।

সিলির উত্তপ্ত আলিঙ্গন তখন রোমাঞ্চ এনেছে আমার দেহে মনে। আকাশে উঠেছে তরুণ সূর্য—সমুদ্র তরে গেছে তরল সোনায়।

ডিহরি-অনু-শোণ

শ্রীমণীন্দ্র দত্ত

মুহিত বিস্তীর্ণ চর। ধূ-ধূ বালু। শোণ শীর্ণকার :

প্রলম্বিত শীর্ণদেহ এক অঙ্গর।

আরক্ত ইম্পাত-সেতু কালজীর্ণ যেন অতিকায়

শিলীকৃত অস্থি ও পত্র।

কান পেতে শোনা যায় শীর্ণপ্রাণ শোণের ক্রন্দন :

উজ্জ্বলিত অক্ষধারা 'এজিকাট'-তলে।

হৃদয় শোণের বুকে পাখাণের দুর্বার বন্ধন।

হাহাকার তাই জলে স্থলে।

উপরে নির্মেষ নীল অব্যবহিত আকাশ উদার।

তার নিচে রাহুবেদ স্পর্ধিত প্রকাশ।

চিম্নির কালো মুখে অবিরাম অগ্নির উদ্গার :

ডিহরিতে বিজ্ঞানের কোথা অবকাশ ?

ও দেহের ভার

অমিতাভ বসু

তুমি সবে জান সেয়ে এসে

ভিজ়ে চুল সাদা পিঠময়

আয়নার দাঁড়ায় নিভেকে দেখছিলে।

দেহের ষঠনে কবে যেন বস্তা এসে গেছে।

হঠাৎ আমাদের পড়ে যেন—

বস্তার জলে যদি ভেসে যাও তুমি

আমি ছাড়া কোন সে ভূবরী—

তোমারে ভুলিতে পারে তীরে ?

তাই আজ এসে গেছি আমি ;

তোমার দেহের চেউরে সংসীতের ধ্বনি

আমার রক্তের সাথে মিশে একাকার ;

আমার দেহেতে রাখো ও দেহের ভার।

“কবি তাঁর কাব্য লেখে—বিটপীফুল ফোটায় যেমন—” বলেন কবি কুমুদরঞ্জন। এর বেশী জিজ্ঞাসা করলে তিনি হয়তো বিশ্বয়বিস্ফারিত চক্ষে তাকাবেন। এর বেশী সৃষ্টিধর্মী কবির কাছে প্রশ্নও করা যায় না। অনেক সময় তাঁদের মধ্যে অনেকেই নিজের লেখায় মধ্যেই এর উক্তর দিয়ে গেছেন। কবি রবীন্দ্রনাথ বলেন, অন্তরের এককে বাহিরের একের সঙ্গে মিলিয়ে কবি অপূর্ব আনন্দের জগৎ তৈরী করেন। রবীন্দ্রনাথ কি বলেন তা তাঁর ভাষাতেই দেখা যাক। “আমরা যাকে বলি সাহিত্য, বলি ললিতকলা, তার লক্ষ্য এই উপলব্ধির আনন্দ, বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ীর এক হ’য়ে যাওয়াতে যে আনন্দ। অহুত্বের গভীরতা দ্বারা বাহিরের সঙ্গে অন্তরের একাত্মবোধ যতটা সত্য হয় সেই পরিমাণে জীবনে আনন্দের সীমানা বেড়ে চলতে থাকে। অর্থাৎ নিজেরই সন্তার সীমানা।” বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ীর এক হ’য়ে যাওয়া মানে, বিষয়ের বস্তুসত্তার চিহ্নধর্ম রূপা-ন্তরীকরণ। জড়বস্তুর মধ্যে সৌন্দর্য নেই, আছে আমাদের ‘চিং’ অংশে।

মনীষী কাণ্ড বাহিরের প্রকৃতিকে স্বীকার করেছিলেন। তাঁর মতে বুদ্ধিবৃত্তির (understanding) সহিত বিকল্প বৃত্তির (Imagination) সামঞ্জস্যই সৌন্দর্য বা আনন্দ-স্রুতি। এই দুটি বৃত্তির সামঞ্জস্য স্বীকার করতেই হবে। শিল্পীর কাছে কল্পনার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। আজ পর্যন্ত যত মনীষী কল্পনাবৃত্তির সম্পর্কে বা বলেছেন, তার মধ্যে কোলরিঞ্জের কথা আমার কাছে নির্ভর যোগ্য বলে মনে হয়। আম্বেল টেলর কোলরিজ (১৭৭২—১৮৩৪) তাঁর Biographia literaria (১৮১৭) গ্রন্থে এই ‘secondary imagination সম্পর্কে বলেন—“dissolves diffuses, dissipates in order to recreate” কাব্য সেই দ্বিতীয় স্বজনশীল কল্পনার কাজ বলে প্রচার করেছেন। কিন্তু তিনি অহুত্বকে (feeling) একেবারে বাহ দেননি। কাব্যের লক্ষণ সম্পর্কে তিনি বলেন—

—“The excitement of emotion for the purpose of immediate pleasure through the medium of beauty.”

কাব্যের উদ্দেশ্য যে আনন্দ দেওয়া এই কথাটি নিয়ে এরিস্টটল থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত খুব একটা মতবৈষম্য হয়নি। কিন্তু ঐ আনন্দের স্বরূপ বা প্রকৃতি নিয়ে নানা মূনির নানা মত। “কাব্যের কাজ নীতিশিক্ষা দেওয়া”—এই কথাটিকে জোর গলায় টলস্টয় ঘোষণা করেছেন। টলস্টয়ের মতবাদ বড় বিপজ্জনক। তাঁর মত হচ্ছে, যে সাহিত্য কেবল আনন্দ দেয় ও সৌন্দর্যকে প্রকাশ করে, তা অতি নিন্দনীয় এবং ঘৃণ্য। “The art of our time and of our circle has become a prostitute and this comparison holds good even in a minute detail. Like her it is not limited to certain times, like her it is always adorned, like her it is always saleable and like her it is enticing and ruinous. এই নীতিগত দৃষ্টিভঙ্গির জগত তিনি অনেক পূর্বসূরীর কাব্যকে নির্মমভাবে নিন্দা করেছেন। তাঁর মতে আর্টের কাজ হচ্ছে মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনসেতু ঘোড়না করা। Art, all art has this characteristic that it unites people” রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একেত্রে টলস্টয়ের খানিকটা সাদৃশ্য আছে, রবীন্দ্রমতে ‘সহিত্য’ শব্দটিতে যে মিলনের, বন্ধুত্ব-সম্পাদনের অর্থ নিহিত আছে তা তাঁর উক্তিতে প্রমাণিত হয়। সাহিত্যের উদ্দেশ্যসম্বন্ধে তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন—“লোক যদি সাহিত্য হইতে শিক্ষা পাইবার চেষ্টা করে, তবে পাইতেও পারে; কিন্তু সাহিত্য লোককে শিক্ষাদেবার জন্য চিন্তাই করে না। কোন দেশেই সাহিত্য ইচ্ছল মাটারির ভার লয় নাই।”

নীতিশিক্ষার আদর্শের সহিত সাহিত্যের কোন বিরোধ আছে কিনা না এ’ এক সমস্যাশূলক প্রশ্ন। অন্ত প্রবন্ধে

তা' আলোচনাকল্পের ইচ্ছা আছে। এখানে শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, কবির আদর্শের সহিত কলাগ-বোধের আদর্শ থাকলেই তবে পরম সৌন্দর্য্যভূতি থেকে আনন্দভূতি হয়। কোন মহৎ কাব্য আমাদের নীতি-বোধকে আঘাত দিয়ে 'মহান' এই আখ্যা পেতে পারে না। রামায়ণে রামচন্দ্র বড় না হয়ে যদি রাবণ বড় হ'ত, তাহলে তা মহাকাব্য হতে পারতো কিনা সন্দেহের বিষয়। এখন এই যে উপদেশ, একে ভারতীয় আলঙ্কারিক মন্মটভট্ট তাঁর 'কাব্যপ্রকাশ' গ্রন্থে বলেছেন—“কান্তাসম্মিতয়া উপদেশ-খুজে”; অর্থাৎ শিল্প কান্তার দ্বারা রসিককে উপদেশ দেয়। শিল্পী বা চিত্রী যে রসাত্মকতার মাধ্যমে বিষয়বস্তুর অন্তর্নিহিত রূপসাক্ষ্যকার করেছেন এবং নিখুঁত প্রকাশ-ভঙ্গীর মাধ্যমে তার বর্ণনা করেছেন, পাঠক সেই সমস্ত পড়ে বা দেখে উক্ত রসাত্মক উপলব্ধি বিষয়কে পুনঃ পুনঃ ধ্যানপূর্বক সমবেদনার সহিত একটি সহমর্মিতা অনুভব করে। কাব্য বর্ণিত বিষয়ের সহিত একটি অর্থ যোগ-স্থল অনুভব করে। এরিস্টটল ঠিক এই কথা না বললেও, 'ক্যাথারসিস' কথাটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে দ্রষ্টার চিত্তের পরিবর্তন ও সহমর্মী মনোভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। “The katharsis, viewed as a refining process, may have primarily implied no more to Aristotle than the expulsion of the disturbing element, namely, the pain, which enters into pity and fear when aroused by real objects, (Aristotle's theory of poetry and fine art.—S. H. Butcher. page—267)

এরিস্টটলের মতে শিল্পীর লক্ষ্য “What ought to be”-র চিত্রণ করা, অর্থাৎ যেটা সম্ভাব্য তার বর্ণনা করা। তিনি আর্ট বলতে 'imitation' অর্থাৎ ‘অনুকরণ’ বলেছেন। কিন্তু এই অনুকরণ নিছক হব্ব কটোগ্রাফি নয়। এরিস্টটলের মতে—“Poetry, therefore, is a more philosophical and a higher thing than history, For poetry tends to express the universal, history the particular.” এখানে 'universal' কথাটির মানে তিনি বলেন—“By the universal I mean how a person of certain

type will on occasion speak or act according to the law of probability or necessity.” অতএব দেখা যাচ্ছে যে নিছক অনুকরণ বলতে বা বোঝায়, তা এরিস্টটল কোন কালে বলেননি। তাঁকে দিয়ে জোর করে বলিয়ে নেওয়া মানে তাঁর অপব্যাখ্যা করা। সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে তিনি গঠন সামঞ্জস্যই বুঝেছিলেন। কিন্তু বহিরঙ্গের সম্পর্কে বললেও অন্তরঙ্গের কথা তিনি ভেবেছিলেন। সৌন্দর্য্য সম্পর্কে তিনি বলেন—“Again a beautiful object, whether it be a living organism or any whole composed of parts, must not only have an orderly arrangement of parts, but must also be of a certain magnitude; for beauty depends on magnitude and order. (Aristotle theory of poetry and Fine art. P. 31) তবে এটা সত্য কথা যে, 'aesthetic' শব্দটি প্রথম বুসগাটেনই প্রয়োগ করেন (বুসগারের মতে ভিকোই প্রথম)। সৌন্দর্য্য বলতে আমরা বর্তমানে যে অভিপ্রেত পোষণ করি, তা এরিস্টটল প্রকাশ করেননি। তবে এর পূর্বসূরী এরিস্টটলেও পাওয়া যায়। কল্পনা বলতে তিনি 'phantasia' বুঝেছিলেন; এবং শিল্পশ্রুতি যেন তাঁর মতে—“Pictures which exist for the phantasy.” কল্পনা বলতে তিনি বলেন—“the movement which result upon the actual sensation.” এটা সর্বৈব সত্য যে, Plato or Aristotle এর 'creative imagination' বা স্বজনমীল কল্পনাবৃত্তির কোন ধারণা ছিল না। এর ধারণা পরবর্তী যুগে হয়।

মনোবী কন্ট কবির কাব্যকে প্রয়োজন নিরপেক্ষ বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে রসাবাদনের আদর্শ হচ্ছে—“the pure disinterested delight.” তাঁর মতে কবির কাব্যশ্রুতিকালে মনটি উদ্বেগবহির্ভূত থাকে। কবি,—“Occupies itself, still it does so without ulterior regard to any other end and yet without a feeling of satisfaction and stimulation (independent of reward) একে খানিকটা 'purposiveness without purpose' বলা যেতে পারে।

কাব্যের বাস্তবতাকে দার্শনিক হেগেলের মত রবীন্দ্রনাথও আধ্যাত্মিক পর্যায়ে টেনে এনেছেন। রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্য সমালোচনা' নামক গ্রন্থে একস্থানে বলেছেন—“মন প্রকৃতির আরশি নহে, সাহিত্যও প্রকৃতির আরশি নহে! মন প্রাকৃতিক জিনিষকে মানসিক করিয়া লয়,—সাহিত্য সেই মানসিক জিনিষকে সাহিত্যিক করিয়া তোলে।” পুনশ্চ—“জগতের উপরে মনের কারখানা বসিয়াছে এবং মনের উপরে বিশ্বমনের কারখানা,—সেই উপরের তলা হইতে সাহিত্যের উৎপত্তি।” (সাহিত্য সমালোচনা—বঙ্গদর্শন, নবপঞ্চায়, ১৩১০)

অতঃপাশ্চাত্য তিনি বলেছেন—“শেষ কথা হচ্ছে truth is beauty কাব্যে এই truth, রূপের টুং, তথ্যের নয়। কাব্যে রূপ যদি truth রূপে অত্যন্ত প্রতীতিযোগ্য না হয়, তাহলে তথ্যের আদালতে সে অনিন্দনীয় প্রমাণিত হলেও কাব্যের দরবারে সে নিষ্পত্তি হবে।”

আরও সুস্পষ্টভাবে—“সেই বিখ্যাপী যা—তা থেকে বাছাই হয়ে যা আমাদের আপন স্বাক্ষর নিয়ে আমাদের চারপাশে ঘিরে দাঁড়ায় তারাই আমাদের বাস্তব।”

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে, এই ‘যা—তা’ থেকে কে বাছাই করে এবং কার নির্দেশে এ সব বাছাই কিয়দা অস্বস্তি হয়? এর সুস্পষ্ট আলোচনা রবীন্দ্রনাথ না থাকলেও, খানিকটা আভাস দিয়েছেন তিনি। ‘সাহিত্যের তাৎপর্য’ নামক গ্রন্থে তিনি বলেছেন—“আর্টিষ্টের সামনে উপকরণ রয়েছে বিভিন্ন,—সেগুলির মধ্যে গ্রহণ বর্জন করতে হবে কল্পনার নির্দেশ মত।” কিন্তু কল্পনার সঙ্গে সৃষ্টির সম্পর্ক কিরূপ অথবা বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্গে কল্পনার সামঞ্জস্য ফলেই এটা সম্ভব হয় কিনা, তার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত অস্পষ্ট ও রহস্যময় হয়ে পড়েছেন। স্রষ্টার বা কবির আনন্দ জানার বা পাওয়ার আনন্দ নয়, হওয়ার আনন্দ। “বাহিরের সত্যের অভিঘাতে সেই হওয়ার বোধে বান থেকে এলে মন স্রষ্টা লীলার উষ্ম হয়ে উঠে।” (সাহিত্যের পথে—১৩০ পৃঃ)। ‘সাহিত্যতত্ত্ব’ গ্রন্থে তিনি বলেছেন—“রসপদার্থ বস্তুর অভীত এমন একটি একাকার্য যা আমাদের চৈতন্তে মিলিত হতে বিলস করে না। এখানে তার প্রকাশ, আর আমার প্রকাশ একই কথা।”

‘তথ্য ও সত্য’ নামক গ্রন্থে তিনি বলেছেন—“আমি

ব্যক্তিগত আমি এই তথ্যটুকুর মধ্যে, আমি মানুষ এই সত্যটিকে বহন আমি প্রকাশ করি তখনই বিরাট একের আলোকে আমি নিত্যতার উদ্ভাসিত হই। তথ্যের মধ্যে সত্যের প্রকাশই হচ্ছে প্রকাশ।”

তথ্যাত্মক নিম্পূর্ণ বর্ণনা, বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ীর একটা সম্মিলন অথচ নিরপেক্ষ মনোভাবই শিল্পের সাধ্যসাধ্য। মনীষী হেগেল অতিরিক্ত আধ্যাত্মিক। তিনি প্রকৃতিকে স্বীকার করেছেন, প্রকৃতির বা অচিৎ-এর সহিত চিৎ-এর মিলনেই কাব্য—এই হচ্ছে তাঁর মত। তাঁর মতে চিৎ-স্বভাব বহন কোন ঐজ্বরিক স্বরূপের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয় তখনই সৌন্দর্যের প্রকাশ ঘটে। আর্টে আমরা যা প্রকাশ করি তা আমাদের আশ্রয় ধর্মে চৈতন্ত্যময়। “What indeed this dead stuff is not the material with which art deals. What it creates upon or within it belongs to the domain of the spirit, and is living as it is.”

হেগেলের মতে প্রকৃতি ঠিক অজ্ঞপদার্থ নয়। তা আমাদের চিৎ-স্বরূপেরই একটি বদ্ধ ও অসীম প্রকাশ মাত্র। তাঁর মতে আর্ট মানুষের দৃশ্যকারণের ফল মাত্র। বলা বাহুল্য এই মতের সহিত রবীন্দ্রনাথের মতের প্রচুর সাদৃশ্য আছে।

যিনি যাই বলুন, শিল্পীর কাজ আনন্দ দেওয়া—এ কথা আমি স্বীকার করবই। কারণ এ আমার অন্তরের মধুর বিশ্বাস। তবে এ আনন্দের সঙ্গে কলাধর্ম বা সামঞ্জস্যবোধ যে একেবারে বিচ্ছিন্ন তা নয়। এরিস্টটল কেন সেই গ্রীক পূর্ব ৪র্থ শতকে এই কথাটার অস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন। কোন অস্বস্তিত বদ্ধ দেখে কেন মানুষ আনন্দ পায়—এই কথা বলতে গিয়ে এরিস্টটল বলেন—“The cause of this again is, that to learn gives the liveliest pleasure, not only to philosophers but to men in general...thus the reason why men enjoy seeing likeness is, that in contemplating it they find themselves learning or inferring.” এরিস্টটলের অতিরিক্ত সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত।

কাটও সৌন্দর্যকে বিবর-নিরপেক্ষভাবে দেখেন নি। এরিস্টটলের ‘মাইনেসিস’ কাটের “reflective judgment”

nt.". ক্রোচের 'Intuition'—হরেন্দ্রের যকম ফের হলেও মূলতঃ প্রায় এক। তবে ক্রোচে বিষয় (content) বলে কিছু মানেন না। তাঁর কাছে প্রকাশভঙ্গীই (form) সর্বস্ব। Intuition আছে, অথচ প্রকাশ নেই, এ তার মতে চিন্তাবিহীন বাপার। প্রকৃত বৈজ্ঞানিক দর্শন (aesthetic experience) মানেই রূপায়নিক (artistic) দর্শন। তাঁর মতে বিষয় ও বিষয়ীর কোন বৈতন্ধ্য নেই। উভয়ে মূলতঃ অভিন্ন। ক্রোচের এই বিশ্বকর মতবাদের সহিত রবীন্দ্রনাথেরও সাদৃশ্য আছে। কিন্তু বক্তব্য এই যে, প্রকাশভঙ্গী কখনও সর্বস্ব হতে পারে না। তাছাড়া বস্তুকে স্বীকার করতেই হবে। তাকে মনোময় করে নিতে হবে। বাস্তব সংসারের ধূলিমলিন জটিলতার উপর মানসী মায়ায় সৃষ্টি করতে হবে। ক্রোচে প্রতিভা বাপারকে অলৌকিক বলে মানতে নারাজ। প্রতিভা বলতে রসাহুগ বা সৌন্দর্যাহুগ শব্দাদির পরিস্ফুটি বোঝায়। তিনি 'Intuition' বা দর্শনকে (ঈক্ষা) বিশেষজ্ঞান, এবং logical knowledge' কে সামান্তজ্ঞান বলে বর্ণনা করেছেন। সমস্ত শিল্পকাজিনিষ এই বিশেষ জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। সামান্তজ্ঞান বিশেষজ্ঞান ছাড়া থাকতে পারেনা। কিন্তু বিশেষ জ্ঞান সামান্তজ্ঞান ছাড়া থাকতে পারে। তাহলে ঈক্ষাবৃত্তি (Intuitive knowledge) সামান্তজ্ঞান ছাড়া দাঁড়াতে পারে। অথচ তিনি 'impression' এর ভেদ, বহু প্রভৃতি কল্পনা করেছেন এবং এই বহু বা ভেদ নিয়ে 'impression-গুলি ঈক্ষাবৃত্তির সম্মুখীন হয়। বহু বা ভেদ প্রভৃতি সামান্তজ্ঞান ছাড়া লব বা উহাদের বহু থেকে একত্ব অহুত হতে পারেনা। অথচ তিনি এই ঈক্ষাবৃত্তিকে সামান্ত পদ্ধিকল্পনাবল্লিত করেছেন। তার চিন্তার দুর্বলতা

একেরে লক্ষণীয়। তাছাড়া বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্গে কল্পনাবৃত্তির সম্পর্কের কথাও তিনি হুস্পষ্টভাবে বলেননি।

কবির কাব্য লেখবার সময় সমস্ত কবিসত্তা চেতন-লোকের দ্বারা প্রভাবিত থাকে না। সেখানে জাগ্রত সত্তা ও অবচেতন স্তরের একটা স্ক্রয় যাতায়াত অহুত হতে থাকে। এর ব্যবধান স্ক্রয় চিরের স্তার। ফ্যাসাদ হচ্ছে এই যে, অনেকে এই ব্যাপারটিকে অলৌকিক, রহস্যময়, ব্যাখ্যার অযোগ্য, মায়াময়—ইত্যাদি বলে ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু তাতে প্রশ্ন এড়ান যায়, সমস্তার সমাধান হয় না। রবীন্দ্রনাথ পর্যাস্ত এই ধরনের রহস্যময়তার ইঙ্গিত দিয়েছেন—

“অস্তর মাঝে বসি অহরহ,

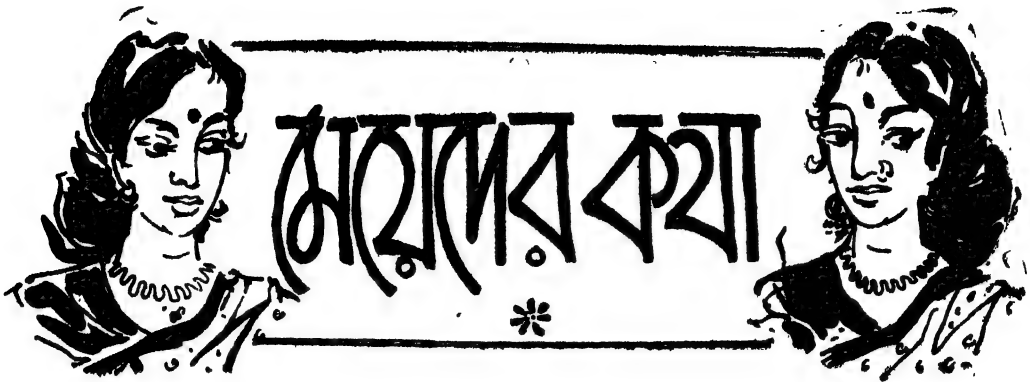
মুখ হতে তুমি ভাষা কেড়ে লহ,

মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ

মিশায়ে আপন স্তরে।”

সমালোচকদের কাছে এই ‘তুমি’ একটি দেবতার আকার প্রাপ্ত হয়েছে; একটি রহস্যময়ী নারীরূপে প্রকল্পিত হয়েছে। কিন্তু সংক্ষেপে বলতে গেলে একে কবির কাব্য-সৃষ্টি কালীন একটি বিশেষ মানসিক প্রক্রিয়া বা অবস্থাই বোঝায়। চেতন এবং অচেতন, বস্তু ও অবস্তু, রূপাগত উপকরণ এবং কল্পনার নির্দেশমত তার ছাঁটাই বাছাই ইত্যাদি নানা ব্যাপার কাব্যসৃষ্টি কালে চলে। অনেক ক্ষেত্রে কবির অজ্ঞাত অবস্থাতেই চলে। কবিও তার অনেক সময় প্রকৃত ব্যাখ্যা হরতো দিতে পারেন না। কিন্তু তাবলে একে অথবা দৈবী মায়া অথবা রহস্যময়ী রমণীর নির্দেশ ইত্যাদি বলে আসল প্রশ্ন এড়িয়ে গেলে চিরন্তন সমালোচনার ধারাবাহিকতার ক্ষেত্রে অবিচারিত সত্য কান্ন হবে।





আত্মবিশ্লেষণ

আভা পাকড়াশী

সংসারের নানা রকম অশান্তি এড়াবার জন্য আত্মবিশ্লেষণ যে দরকার তা অনস্বীকার্য। এই সম্বন্ধে কিছুকাল আগে ভগিনী মহামায়া দেবী এই মেয়েদের বিভাগে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সেই প্রবন্ধটি খুবই সমরোপযোগী হয়েছিল। এই সম্বন্ধে আরও কিছু লিখলাম। আশা করি অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

নৌটশে বলেছিলেন “Man shall be trained for war and woman for the recreation of the warrior. All else is folly”। আবার লিখেছেন “Thou goest to woman? Don't forget thy whip.” Russel এর উক্তরে বলেছেন নৌটশে সম্বন্ধে, His opinion of women, like every man's is an objectification of his own emotion towards them, which is obviously one of fear.” ইনি Marriage and the population question প্রবন্ধে লিখেছেন “As religion dominated the old form of marriage, so religion must dominate the new, But it must be a new religion based upon liberty, justice and love; not upon authority and law and hell fire.”

সমস্যাগুলোর মহারথীদের এ বিষয় কিরূপ চিন্তাধারা তা নিয়ে ভা.আলোচনা করা গেল। এবার এদেশের

চিরচিরিত “দেবান জানন্তি কুতো মহত্যাঃ” কতখানি তাৎপর্যপূর্ণ দেখা যাক। মহাভারতের মধ্যে মেয়েদের প্রকৃতি সম্পর্কে এমন সব মন্তব্য আছে—যা পড়ে মনে হয় ওদের মধ্যে সকলেই আদৌ কিছু অন্ধার যোগা নয়। আমরা বাক্যকৃত্ত বিবেকানন্দ যুগের মানুষ। বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য তাঁরা আপন আপন জীকে ত্যাগ করে সন্ন্যাসের পথ বরণ করেছিলেন। ঠাকুর কিন্তু সারসামগিকে দেবীর আসনে বসিয়ে রীতিমত পূজা করেছিলেন। নারীকে এই মর্যাদা দান ধর্মজীবনের ইতিহাসে অল্পময়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও গান্ধীজীও এই নবধর্মের জয়ধ্বনি করেছেন, যার ভিত্তি হবে স্বাধীনতার, ত্রায়ে ও প্রেমে, কর্তৃত্বে এবং অহুশাসনে এবং নরকায়ির বিভীষিকায় নয়। তাঁদের দলে অবশ্য ইবসেন এবং তাঁর যোগা শিষ্য বার্গার্ড শ'কেও টানতে পারি। রবীন্দ্রনাথের “যোগাযোগ”-এ বিশ্বদ্বাসের কর্তে এই গরিমাময় দাম্পত্য জীবনেরই জয়গান। “চিহ্নাঙ্কন”র সমাজ জীবনে নারীর আসন হবে কোথায় তার একটা স্থলপট ঘোষণা আছে।

“আমি চিত্রাঙ্কন

দেবী নহি, নহি আমি সামান্তা রমণী।

পূজা করি রাখিবে মাধার, সেও আমি

নই, অবহেলা করি পুণিয়া রাখিবে

শিছে, সেও আমি নহি। বহি পার্শ্বে রাখো

মোরে সংকটের পথে, ছরুহ চিন্তার
বহিঃ অংশ দ্বাং, বহিঃ অহুমতি কর
কঠিন ভ্রতের তব সহায় হইতে
বহিঃ স্থে দুঃখে মোরে কর সহচরী
আমার পাইবে তবে পরিচয়।”

এই সংগ্রামের ঝড়কে সাহিত্যে বহন করে এনেছেন রবীন্দ্রনাথ। জীবন পত্রের মেজবোঁ মৃণাল ঘেন ইবসেনের Doll's House-এর ‘নোরা’। স্বামীর ঘরে পুরুষের খেলার পুতুল হয়ে থাকতে মেজবোঁ শেষ পর্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে অস্বীকার করেছে। জী লিখেছে স্বামীকে, “কিন্তু আমি আর তোমাদের সেই ২৭ নম্বর মাখন বড়ালের গলিতে ফিরব না। আমি বিন্দুকে দেখেছি। সংসারের মাঝখানে নেমে মেয়ে মানুষের পরিচয়টা যে কি তা আমি পেয়েছি। আর আমার দরকার নেই।”

প্রবন্ধকে দীর্ঘতর করবার ইচ্ছা মোটেই নেই। তবে ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্তি উদ্ধৃত না করলে আত্ম-বিশ্লেষণের রূপ সত্য যে কি তাহা পরিষ্কার হবে না। ইনি “চাকচক্ষে প্রেষ্ঠ গল্প”-র ভূমিকায় লিখেছেন সাম্প্রতিক কালে উপন্যাস ও ছোট গল্পের জীবন উপাদান ভাবকেন্দ্র ও তাৎপর্য বোধ এমন অভাবনীয় রূপে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে যে, রবীন্দ্রযুগ-মানসের সহিত আমাদের একটা গুরুতর ব্যবধান দেখা দিয়াছে। সেযুগে ঠাহারা প্রগতিশীল লেখকরূপে রক্ষণশীল পাঠকসমাজের কাছে বিতর্কিতকার পাত্র ছিলেন, আজ ঠাহারা আমাদের নিকট অত্যন্ত প্রাচীনপন্থী ও নিতান্ত নিরীহ সমাজ-অহুশাসন-বাধ্যরূপে প্রতিভাত হইতেছেন—আধুনিক গল্প উপন্যাসের নায়িকারা ইহাদের অপেক্ষা অনেক বেশী অগ্রসর হইয়াছে। তাহারা ঠাহাদের দৃষ্টি হইতে একনিষ্ঠ পাতিব্রতের সমস্ত সংস্কারের মূল উপড়াইয়া ফেলিয়াছে ও ব্যক্তিচার-জীবনকে কোন মানসিক অস্বস্তি ব্যতিরেকেই এক সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ব্যবস্থা রূপেই গ্রহণ করিয়াছে। শরৎচন্দ্রের নায়িকাদের অহরূপ অবস্থায় যে একটি সংস্কারগত অতৃপ্তি ও বিবেক-বংশন বোধ ছিল তাহা ইহারা সম্পূর্ণ অতিক্রম করিয়াছে।

এই যে বিবেক বংশনবোধ ইহাই আত্ম-বিশ্লেষণের মূল। দেশের সাহিত্যে ও সিনেমায় বাহ্য প্রতিকলিত হয় তাহাই ঘরে ঘরে দাম্পত্য জীবনে কুশিকা লাভের কল

প্রস্তুত করে। সুতরাং “হিন্দুনারী অধিকার বিল,” পাশ করেই সমাজের গোড়া কাটা যাবে না, বহিঃ তার মূল ধর্মে বাধা থাকে। পণপ্রথাভিনিত সাংসারিক কলহের চাইতে আধুনিকার সাথে অতি-আধুনিকার মতানৈক্যই সংসারে আজকাল বেশীর ভাগ বিভীষিকা আনে। সুতরাং প্রকৃত শিক্ষার দরকার। যা বাপ ঘরে ঘরে যে ভাবে তাদের শিক্ষা দেবেন, সেইভাবেই মেয়েরা শব্দর বাড়াতে মানিয়ে নিতে পারবে। আমার তো মনে হয় যদি শিক্ষার দিকে জোর দেয়া যায় তাহলে আত্ম-বিশ্লেষণের সত্যিকার রূপ বুঝতে পারার অস্ববিধে থাকে না। হিন্দু আইন পাশ হয়ে গেছে, কিন্তু উইল করার ক্ষমতা তে, কেড়ে নেয়া হয়নি। জামাই বস্ত্রের সম্পত্তিতে দাবী করতে পারেনা যতক্ষণ না মেয়ে তার সন্তানাদির জন্তে ঐ বিষয়ে তাকে প্ররোচিত করে। তাই এ বিষয় অশান্তির কারণ কতকটা ভিত্তিহীন ও আশঙ্কাজনিত।

চিন্তন-মন অত্যন্ত মন্থর গতি। সে তাড়াতাড়ি ও সোজাসৃজি কোন জিনিষ বোঝেনা। বড়ো কথাটা এই যে চিন্তন মনের বা মননশক্তির পরের ব্যবহৃত চিন্তা বা “সেকেও হ্যাণ্ড” বিষয় নিয়ে কারবার। সাধারণ মানুষ তাই অবলীলায় পরের মুখে ঝাল খায়।

কিন্তু মানুষ এমন করেই বা কেন? তারও একটা কারণ আছে। আমরা সামান্য যে মনন শক্তি নিয়ে ঘর করি সেটা চিন্তন-মনের ক্রিয়া। এ মনের ইংরেজী নাম intellect, ইউরোপ intellect এর দাম খুব বেশী দেয়, আমাদের দেশ অবশ্য অতটা এগোরনি। মাঠের বাধা পথে যেমন ঘাস জমায় না, সংসারের গতানুগতিকতার বন্ধ্যাপথেও তেমনি স্বরূপজ্ঞানের বিবেকের উদয় হয়না। তাই মানুষ নিজের ভাগ্যটিকে সধা সর্বদা বিকৃত করে পিলহুজের মত সারাজীবন তেলকালি মাখা হয়ে থাকে, প্রদীপের সম্প্রকাশ শক্তিটি আর লাভ করেনা। সাধারণ মানুষ বস্ত্র বলেই চালাক লোকের স্রষ্টি করা নানা ধরনতাই বুলির দাস হয়ে থাকে ও সাধারণ জীবন পরনির্ভর হয়ে কাটায়। স্বরূপ জ্ঞানের দ্বারা আত্মকর্তৃত্ব লাভ না করলে মানুষের দুঃখ ভাগ্য ও দাস ভাগ্য প্রব হয়।

নারী জীবনকে সংসার অহরহ যে প্রতিপ্রতি দিচ্ছে

ভাঙে তার দাস ভাগ্যের কথা নেই। জীবন দুঃখের ওপর আধিপত্যের কথা বলে। এ স্বাধীনতা স্বরূপজ্ঞানের দ্বারা লভ্য, আর কিছু দিয়ে হয়না। আমাদের দেশ প্রগতি সম্পন্ন হয়েছে। অতএব আশঙ্কা অনিত-চিন্তার ওপর নির্ভর করে নিজের ভাগ্যকে বিভ্রান্ত করার কোন অবকাশ নেই। আমার প্রবন্ধটি আমেরিকান করি হইটম্যান-এর একটি কবিতার অংশ দিয়ে শেষ করি।

“The wife, and she is not one just less
than the husband.
The daughter and she is just as good as
the son.
The mothers and she is every bit as much
as the father.”

রমণী রত্ন

আনন্দলতিকা'র জন্ম

ত্রিনির্মলচন্দ্র চৌধুরী

অপরূপ দৃশ্য দেখে থমকে দাঁড়ালেন স্বতন্ত্র।

তের চৌদ্দ বছর বয়সের এক কিশোরী—গাছ কোষর বাঁধা। নীচের ডালে এক পা রেখে, উপরের ডালে আর এক পা দিয়ে, স্থলপন্থা গাছের দুটি ডালে পা রেখে ফুল ফুলছে। হৃদয়ের তার দাঁড়ানোর তাকি, যেন সিংহ আর অশ্বরের শিঠে পা দিয়ে দাঁড়ানো দুর্গা প্রতিমা।

গাছের উপর দাঁড়ানো দুঃস্বপ্ন চক্কা বালিকার লীলায়িত রূপ দেখে মুগ্ধ স্বতন্ত্র। বালিকার অধরে স্নিগ্ধ হাসি কাজলকালো মেয়েটির টানটানো দুটি চোখে স্তব্ধ মাহা। মেয়েটির সাবলীল কমনীয়তা ও হাসি মুখের মধুরিকাক্ষে মুগ্ধ হলেন তিনি। কে এ মেয়েটি?

পরিচয় পেতেও প্রশ্নের দ্বারী হলো না।

পয়ানবীর তীরে বাঁধকা গ্রামে এসেছিলেন স্বতন্ত্র। পুত্র কৃষ্ণনাথের লক্ষ্য আশ্রয়ের সন্ধানে। সংস্কৃত কাব্যের

পাঠ নেবে কৃষ্ণনাথ চতুর্পাঠিতে—তারই ব্যবস্থা করতে এসেছিলেন স্বতন্ত্র। সব কিছু ঠিক ক'রে ফিরে বাড়িলেন কোটালিগাড়ার। এমন সময়ে পথের ধারে অপরূপ দৃশ্য দেখে থমকে দাঁড়ালেন তিনি।

সন্ধান নিয়ে পরিচয় গেলেন—ব্রাহ্মণ কন্যা মেয়েটি। নাম বৈজয়ন্তী—তাদেরই পাণ্টা ঘর। তবে বড়ই দুঃস্বপ্ন; দুটো দুটি আর চক্কাপনায় অনেক ছেলেও হার মানে ওর কাছে। আরও শুনলেন অদ্ভুত স্বতন্ত্রাঙ্গি মেয়েটির। পিতার টোলের পড়ুয়াদের পাঠ শুনে শুনে কর্তৃক ক'রে ফেলে সেগুলো। একবার শুনল আর ভোলে না কখনো। মুখে মুখে যখন আবৃত্তি করে সংস্কৃত কাব্যের ছন্দোময় পঙ্ক্তিশুলি—শুনে মুগ্ধ হয় সকলেই তখন।

সকল দিকে খোঁজ নিয়ে মনে ভাবলেন স্বতন্ত্র—এই মেয়েটিকে কৃষ্ণনাথের বোঁ করে নিলে কেমন হয়? ছেলে বেগার দুঃস্বপ্ননা বড় হলেই সেয়ে যাবে।

ধীর পায়ে এগিয়ে গেলেন তিনি স্নিগ্ধ ছাত্রাঙ্কুর এক গৃহপ্রাঙ্গণে।

সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে কন্যার বিবাহের প্রস্তাব পেয়ে বিহ্বল হয়ে উঠলেন বৈজয়ন্তীর পিতা। এর জন্য প্রস্তুত ছিলেন না তিনি। মেয়ে যখন, একদিন তার বিয়ে দিতেই হবে। তবে এখনও বিয়ের বয়স হয়নি মেয়ের; তাই বিধা আগে মনে। কিন্তু স্বতন্ত্র মশাইয়ের পুত্রের মত কুলেশীলে বিচার্য বাহনীয় পাত্র পাওয়াও ত সহজ নয়। নানা দিক চিন্তা ক'রে সম্মতি জানানলেন বৈজয়ন্তীর পিতা বিবাহ প্রস্তাবে। পাত্র কৃষ্ণনাথকে আশীর্বাদ ক'রে এলেন তিনি যথারীতি বিনম্র দেখে।

বিয়ে হ'য়ে গেল; পিতৃগৃহে ফিরেও এলো বৈজয়ন্তী। স্থির হলো কৃষ্ণনাথের ছাত্রজীবন শেষ হলেই স্বতন্ত্র-বাড়ি যাবে সে।

এক ছুই ক'রে কয়েকমাস চলে গেছে। ভাগ্য হ'য়ে উঠেছে বৈজয়ন্তী। দেখতে দেখতে রীতিমত মাখাচাকা দিয়ে উঠেছে; বয়সের অস্থপাতে দীঘল হ'য়ে উঠেছে সে। চতুর্দশ বৈজয়ন্তী। দুঃস্বপ্ননা তখন তার দেহের তটে সীমাবদ্ধ হয়েছে; উন্নত হয়েছে ওর বাহ্য—মুখ চোখ বাহ হ'য়ে উঠেছে স্নিগ্ধরীমতিত। কাঁধ ছাপিয়ে শিঠ বেয়ে ছড়িয়ে পড়েছে তার কালো বেবের নক্ত চুলের রাশি।

কেহে এসেছে নববোবনের প্রাণ। মুখে কথা দিয়েছে
ত্রীড়া লকোচ,—চলন তলী ও ভাবা হয়েছে মন্থর ও মেহুর।

কাল কালো রংএও অপরূপ হৃদয়ী হয়ে উঠেছে
বৈজয়ন্তী। কী হৃদয় ওর চোখ দুটি। বোবনের প্রথম
প্রাণে ওর পেলব দেহ যেন ছন্দস্বর হয়ে উঠেছে—লীলাসিত
হয়ে উঠেছে ওর কমলীয় তলু। যে দেখে সেই মুগ্ধ হয়
লাবণ্যভরা দেহের মায়ায়।

একদিন ফুরিয়ে গেল অপেক্ষার কাল। এলো মিলনের
লগ্ন। কৃষ্ণনাথের পাঠ সমাপন হয়েছে সংবাদ এলো ধাতুক
গ্রামে। স্বামীগৃহে যাত্রাকালে বাধা কাতর মুখে ছলছল
চোখে তাকে আশীর্বাদ জানিয়ে বললেন বৈজয়ন্তীর পিতা
—“ঈশ্বরের করুণায় ঈদের কুলবধু হয়ে আজ তুমি ধন্য
হয়েছ, তোমাকে নিজের কোলে স্থান দিয়ে ঈরা
তোমার বাপ-মার স্থান গ্রহণ করলেন, তাঁদের সে
অন্তরের মহিমাটুকু কোনদিন যেন তোমার ঈরা তিলমাত্র
ক্ষণ না হয়—শুধু এই কামনা করি আজ। স্বামী
সোহাগিনী হও।”

কান্নাভরা চোখে নীরবে মাথা নীচু ক’রে রইল
বৈজয়ন্তী। তারপর ধীরে ধীরে নোকায় উঠল। পিছন
কিঁদে দেখলো কতকগুলি মোন মুক সতক্ষ দৃষ্টি তার যাত্রা-
পথের দিকে নির্নিমেবে চেয়ে রয়েছে। উজ্জ্বলিত অশ্রু
গড়িয়ে এলো বৈজয়ন্তীর হৃৎগাল বেয়ে।

স্বামী গৃহে এলো বৈজয়ন্তী। “এলো মা-লক্ষ্মী” বলে
আদর ক’রে ঘরে নিয়ে গেলেন স্বভিরত্ন।

বেলা গড়িয়ে সন্ধ্যা এলো—সন্ধ্যা গড়িয়ে এলো রাত্রি।
ক্রমে গভীর হ’তে গভীর হলো রাত্রি, নিশ্চক হয়ে এলো
চারিদিক।

শব্দায় একা জেগে বসে আছে বৈজয়ন্তী। বুকখানা
কাঁপছে কেন তার এমন ছক ছক ক’রে। লক্ষ্মীর, আশঙ্কার
—বোধকরি বা শিশির ছোঁয়াচে তুলে উঠছে তার মন।
বিয়ের সময় নানা হট্টগোলে পারনি সে স্বামীসঙ্গ; বলতে
গেলে আজই তার প্রথম স্বামী সন্তান। কে জানে কখন
এবে স্বামী ডাকবেন তাকে—‘বধু জাগো।’

‘অনেক রাতে ঘরে এলো কৃষ্ণনাথ। বধুর দিকে চেয়ে
তত্বিত হয়ে গেল সে। বধুর কালো রং দেখে তার মন
হঠাৎ এক ছন্দস্বর বরণায় ঢকল হয়ে উঠলো। এ কি

করেছে সে! এক চকলা বালিকার মুখের ছন্দস্বর মুখ
তার পিতার তুলে এক কৃষ্ণকায় রমণীকে বিয়ে করেছে
সে? মনের বরণা তীব্রতর হয় এবং মনের গণীরে ঘানি
বোধ করতে থাকে সে। এতদিন সংকুত কাব্য-সমুদ্র
মগ্নন করে তার মনে যে রূপলক্ষীর মূর্তি জেগে উঠেছিল,
তার সাথে কি প্রভেদ এই মেয়েটির! চেয়েছিল সে
রূপৈশ্বর্যময়ী প্রেয়সী, যার রূপের প্রভাব-লাবণ্যে কমলার
তলুর মায়ায় নিকরীর স্বপ্নভঙ্গের মতো তার মনে জেগে
উঠলো কবিতার ছন্দ, তার বদলে এ কে এলো তার
জীবনে?

বৈজয়ন্তীর প্রতি ঘৃণার ভরে উঠলো তার মন। মনে
হলো তার, বৈজয়ন্তী তার জীবনের অভিশাপরূপে কথা
দিয়েছে। মনে মনে স্থির করলো কৃষ্ণনাথ, মূর্তি পেতে
হবে এই কৃষ্ণকায় রমণীর কুংলিত সংস্পর্শ হতে।

বধুর কাছে এসে বললো কৃষ্ণনাথ—“যেতে হবে
তোমায়।”

—“কোথায়?”

—“তোমার পিতৃগৃহে। উদারতার বশে মনের বিব্রমে
বিবাহের পূর্বে মেয়ে না দেখেই বিয়ে করে যে ভুল
করেছিল, তার প্রায়শ্চিত্তের জন্য আজীবন আমাকে
একাকীই থাকতে হবে, তুমি থাকবে তোমার পিতার
কাছে।”

বৈজয়ন্তী চমকে উঠলো। তার হৃৎপিণ্ডটা বৃষ্টি বা
ফেটে চৌচির হয়ে গেল। পৃথিবীর সব আলো যেন
অকস্মাৎ তার চোখের সম্মুখ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। যে
শুভলগ্নের জন্য এতদিন সে কায় মনে অপেক্ষা করেছিল,
সেই মধুর লগ্ন যেন চিরকালের জন্য তার দিক থেকে মুখ
কিরিয়ে নিয়ে দূরে চলে গেল। অন্ধকার হয়ে গেল তার
ভবিষ্যত।

এই তার বিধিসিপি! হারয়ে, এর চাইতে যে কুমারী
জীবনও ভাল ছিল।

পিতৃগৃহে কিংবা এলো স্বামী-পরিভ্যক্তা বৈজয়ন্তী।
কৃষ্ণনাথের নিষ্ঠুরতার বাধা পেলেও কস্তাকে সমাদরে গৃহে
স্থান দিলেন পিতা। ভাবলেন, মেহের প্রাণে, করুণার
লিখনে মূর্তিরে দেবেন তার মনের দুঃখ, হৃদয়ে তার
স্ববিতর্পী জীবন। সে জীবনে বৃন্দন করে বৈজয়ন্তী

আশাও না পায়। আশাভঙ্গ না হয় সেই দিকে রইল তাঁর দৃষ্টি।

প্রথম প্রথম বৈজয়ন্তী অত্যন্ত অসুখী, নিরানন্দ ও নৈরাশ্র বোধ করত। সব সময়ে মন মরা হয়ে থাকে সে। মনে হতো তার জীবনটাই ব্যর্থ হয়ে গেছে যেন;— স্বাভাবিক এবং সামাজিক জীবন যেন তার আয়তনের বাইরে। হতাশায় ভেঙ্গে পড়তো সে।

বৈজয়ন্তী বিবাহ-স্নান অন্তরে ভাবে, কি বিভিন্ন তাল জীবনের গতি। কে জানতো বিবাহের সঙ্গে সঙ্গেই স্বামী গৃহে স্থান হবে না তার—পিতৃগৃহে ফিরে এসে আবার তাকে নতুন করে জীবন সূত্র করতে হবে। চোখের সামনে আলো নাই, আশা নাই, নাই কোন নতুনতর সাহায্য। জীবনের বোঝা তবু টেনে নিয়ে যেতে হবে।

এই তার ভবিষ্যৎ।

তাকে বুঝাতে থাকেন পিতা—মাছের জীবনে দুঃখের দহন শোকতাপ তো নিত্যই আছে। সে সব সহ্য করে জীবনের পথে এগিয়ে যেতে হবে। না পারলে মনের মধ্যে দুঃখ মনের মধ্যে গুমরে গুমরে মরবে। শান্তি পাবে না কখনও। চেষ্টা করো নিজেকে বোঝাতে।

বৈজয়ন্তী হেসে বলে—আবার মনে তো কোন ক্ষোভ নেই বাবা। শোক দুঃখ আমার গা সওয়া হ'য়ে গেছে।

—“তবে এমন মুখ তার কেন?”

—“এই তো হাসছি।”

বৈজয়ন্তী টেচিয়ে হেসে ওঠে। পিতা হেসে বলেন—“ওই হাসি দিয়ে কি আমাকে ভুলাতে পারবি মা? ও যে তোর দুঃখের কারা। কিন্তু এ ভাবে তো চলবে না। সব দুঃখ ভুলে গিয়ে সাহিত্যের সাধনায় ডুবে মনের গভীরে গড়ে তোল সরস্বতীর ছন্দময় রূপ—তবেই সব পাবি। সে সাধনায় চাই নিষ্ঠা আর আত্ম বিশ্বাস। অনেক ভাগ্য আর দুঃখের মধ্য দিয়েই প্রত্যেকের জীবনে মহৎ প্রাপ্তি ঘটে। আশা রাখতে হবে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। ভগ্নতার মধ্য দিয়েই সকল হয়ে উঠুক তোর জীবন। দুঃখের গানিমা থাক দূর হ'য়ে।

আশা আগে বৈজয়ন্তীর হতাশময় প্রাণে। উজ্জল হয়ে ওঠে তার কাজলকালো আঁখি।

পিতার প্রেরণায় নতুন চেতনার সন্ধান হ'লো তার

জীবনে। বৈজয়ন্তীর পিতা তাকে শান্তি দেবার জন্য উজাড় করে দিলেন নিজের ভাণ্ডার। ব্যাকরণের নিয়ম সূত্রগুলি আয়ত্ত্ব করে এগিয়ে গেল সে কাব্যের আন্ধিনায়। পুঁথি-পত্র পড়ে ফেলল বৈজয়ন্তী পিতার সঙ্গে শিকার—‘ভক্তি-কাব্য’ ‘কুমারসম্ভব’ শেষ করে তার মনে হলো কাব্য পাঠের একটা বিশেষ আনন্দ আছে, গভীরতর আবেদন আছে। তারপর যেদিন ‘শকুন্তলা’র হাত দিল, সেদিন অসুস্থত্ব করলো বৈজয়ন্তী। রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের কল্পা শকুন্তলার জীবনেও নেমে এসেছিল এক দুঃখের দহন। বার নিবৃত্তি ঘটেছিল পরম শান্তিতে। দুঃখের পরে আছে সুখ—অশান্তি রয় না চিরস্থায়ী হয়ে।

মাছের জীবনে এ প্রাপ্তির মূল্য কিছু কম নয়। নিজেকে শূন্য মনে হওয়ার বাতনা থেকে মুক্তি পেল বৈজয়ন্তী;—এগিয়ে চলে সে কাব্যলব্ধীর আন্ধিনা দিয়ে। ছন্দে বন্ধারে কাব্যের স্বরে ভরে উঠলো তার প্রাণ। ধীরে ধীরে উদার সহজ আত্ম-প্রত্যয়শীল হয়ে উঠল তার মন।

তবুও অনেক নিঃসঙ্গ অসত্যক মুহূর্তে বুকটা কেমন যেন ব্যথায় ভরে ওঠে তার। বোবনের ছোঁয়া লাগে আর দশ-জন মেয়ে যে কামনা বাসনার তরঙ্গে উবেল হয়ে ওঠে, তার চেউ এসে লাগে তার হৃদয়েও। পাড়ার সমবয়সী সখীদের প্রেম ও দাম্পত্যজীবন, শিশুপুত্র কোলে তাদের মাতৃহৃদয়ের মধুর ব্যঞ্জন, স্বামী-পুত্রের সংসারে তাদের মিলিত প্রশান্তি বৈজয়ন্তীর মনকে চঞ্চল করে তোলে মাঝে মাঝে।

এমনভাবেই এগিয়ে চলে বৈজয়ন্তীর জীবন।

ক্রমে সংস্কৃত শ্লোক রচনায় মনোনিবেশ করলো বৈজয়ন্তী। উৎসাহ দিলেন পিতা—‘এই তো বেশ হয়েছে।’

পিতার আগ্রহে একই শ্লোক একবারের জারগার হু' তিনবার আবৃত্তি করেছে বৈজয়ন্তী—উৎসাহে উদ্দীপনায় যেন ফেটে পড়তে চায় তার মন; ভিতরে ঢুকে আনন্দে জড়িয়ে ধরে অ তৃপ্তকে বা কোন সখীকে।

কিন্তু এ শান্তিও বেশীদিন রইল না বৈজয়ন্তীর জীবনে, এক মেঘমেহুর সন্ধ্যায় হৃদয় বিকল হয়ে দেহভাগ করলেন তার পিতা। ৩২ হয়ে গেল তাঁর বয়সেই চিত্তার আশ্রয়।

শেষ হয়ে গেল বৈজয়ন্তীর জীবনের একমাত্র অবলম্বন।

পিতার মৃত্যুতে বৈজয়ন্তী নিঃসঙ্গ বোধ করলো। স্বামী থেকেও নাই,—তার মেহ মমতার কোন নিদর্শন সে পায় নি। মনের মাঝে সে বরাবরই একা। কিন্তু সে যে কত একা, সেটা একান্তভাবে অনুভব করলো পিতার মৃত্যুর পর। পতি-পরিত্যক্তা মেরেকে দিয়ে ছিলেন একা তার পিতা। তার মেহের আশ্রয়ে সে নিজেকে অনুভব করতে পারত। সে মেহের বন্ধনটুকুও তার মুছে গেল। পৃথিবী শূন্য হয়ে গেল তার কাছে। পৃথিবীর অর্থ গেল বদলে।

তার জীবনে আর রইল কি ?

শুধু নৈরাশ্রের দাহ আর রিক্ততার বেদনা ?

মেহ নাই, আশ্রয় নাই,—একমাত্র মেহময় স্পর্শটিও গেল মুছে। মাথার উপর রইল না কোন আচ্ছাদন ; কোন বিকল্প সম্ভাবনা। রইল না তার কাছে জীবনের কোন নতুন পরিকল্পনা।

একটা বিরাট শূন্যতা যেন বৈজয়ন্তীকে গ্রাস ক'রে ফেলল। একটা অবিভাঙ্গ হাহাকার তার মনের মধ্যে গুমরে উঠতে লাগলো।

আর পারে না সে সহ করতে এই নিঃসঙ্গ জীবন,— দুর্ব্বল একাকিত্ব।

কাব্যের মধ্যে ডুবে মনের নিঃসঙ্গতা ঘুচাতে চাইল বৈজয়ন্তী। কিন্তু ব্যর্থ হল সে চেষ্টা। কাব্যে মন বসে না —রচনার মনোনিবেশ করতে পারে না সে। কিছুতেই যেন ঘুচাতে পারে না, তার বিপর্যস্ত মনোভাব। চোখের সামনে ধূ ধূ অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখতে পার না সে।

এক মেঘাচ্ছন্ন অপরাহ্নে আনমনে পিতার শেষ চিত্র পুঁথিগুলির পাতা উল্টাছিল বৈজয়ন্তী। দিনান্তের শেষ দীপ্তিটুকু ধীরে ধীরে স্তান হয়ে আসছে। কালো মেঘে আকাশ যাচ্ছে ছেয়ে, বুকে তার বিজলীর খেলা। থেকে থেকে শুকশুক নিনাদে ডেকে উঠছে বিদ্যুৎপ্রবাহিনী সজল কালো মেঘ—হয়ত মিলনের হুঃসহ আনন্দে, অথবা বিচ্ছেদের ভীক আশঙ্কায়।

আঁখিচের এই স্তান সন্ধ্যার বৈজয়ন্তীর আনমনা মনখানি যেন কোথায় উধাও হয়ে গেল। তুলে গেল সে তার পিতার কথা। তুলে গেল তার হাতের পুঁথিখানির কথা।

মনে জেগে উঠলো তার স্বামী কখনোকার কথা—বিরহের স্তম্ভুর বেদনায়। কেমন আছে সে—মনে পড়ে কি তার এই পরিত্যক্তা বধুর কথা কোন অলস মুহুর্তে ?

আকাশের দিকে নির্ণিমেষে চেরে চেরে কতক্ষণ যে কাটিয়েছে এইভাবে চের পারনি বৈজয়ন্তী। ঘরে আলো জলে উঠতেই যেন তার চেতনার সঞ্চার হলো—দেখলে প্রদীপ জ্বলে দিয়ে চলে যাচ্ছে ভ্রাতৃবধু মন্দাকিনী, গলবস্ত্র হ'য়ে সন্ধ্যাবন্দনা করলো বৈজয়ন্তী।

পরক্ষণেই পাশ থেকে হাতে তুলে নিল একখানা পুঁথি হুতন করে পড়বার জন্য। পাতা ওল্টাতেই চমকে ওঠে বৈজয়ন্তী—স্পন্দিত হয়ে ওঠে তার বক্ষস্থল। হাতে তার বিবাহ পদ্ধতির পুঁথি—সম্মুখে বিস্তৃত রয়েছে সম্প্রদান মন্ত্র।

ওঁ দুর্কাপুং ফলকৈচ বস্ত্রং তাদুলমেব চ।

এতিঃ কস্তা ময়া দস্তা, রক্ষণং পোষণং কুরু।

“রক্ষণং পোষণং কুরু”। কস্তার সম্পূর্ণ দায়িত্বভার গ্রহীতার উপর হস্ত করে নিশ্চিত হলো সম্প্রদাতা। রক্ষণ ও পোষণের তার গ্রহণ করেছে স্বামী—এই যদি শাস্ত্রের বিধান তবে কেন তার এই আশ্রয়হীন জীবন ?

আবার গোঁথে পড়লো তার গ্রহীতার প্রার্থনামন্ত্র—

“ওঁ ঐশ্যী তৌঃ ঐশ্যী পৃথিবী ঐশ্যী বিশ্বমিতং জগৎ।

ঐশ্যী পূর্ব্বস্তা ইমে ঐশ্যী স্ত্রী পতিকূলে ইয়ম্।”

হালোক ভুলোক অন্তরীক কান পেতে শোন। নন্তো-মণ্ডলে তারাগণ সাক্ষী থাকো—পতিকূলে এর অবস্থান ঐবরক্ষকের মত স্থির হোক, দ্যুতি হোক এর চিত্র-অন্নান।

প্রশ্ন জাগে মনে, আঁখি খবির বৈদিক মন্ত্র যদি সত্য, তবে কেন তার স্থান নাই পতিগৃহে ?

মন্ত্রপাঠ ক'রে তরু হয়ে ব'সে থাকে বৈজয়ন্তী। মনের মধ্যে তার আবেগের তরঙ্গ উত্তাল হয়ে উঠলো। বিবাহ মন্ত্রের শ্লোকগুলি তার হৃদয়কে অতিহৃত ক'রে তুলল। “ঐশ্যী পতিকূলে ইয়ম্”—কিন্তু তার জীবনে সেটা সম্ভব হলো না কেন ? কেন তার স্থান হলো না স্বামীর ভিটার ? রূপ নাই সেটা তার অপরাধ ? কেন ব্যর্থ হবে তার জীবন শুধুমাত্র রূপের অভাবে ?

হোট একটা ভণ্ড নিঃখাস বৈজয়ন্তীর বুকের মধ্যে থেকে

বেরিয়ে আসে। ঈষৎ জ্যোৎস্নার আবছা আলোর দিকে তাকিয়ে হৃদয়াবেগে তার নিঃশ্বাস প্রবাহ ত্বরী হয়ে ওঠে। আর্ধ্য ঋষিদের অনেক সাধনার ধন এই মন্ত্র। সার্থক হবে না কেন তার জীবনেও। নিদারুণ একটা ব্যথার আবেগে তার চেতনাকে ঘেন অংশ ক'রে আনে। আগে তার মনে অসহ সংবেদন। নিজের অজ্ঞাতেই বৈজয়ন্তীর বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস নেমে যায়।

মনের গভীরে অনেক কথাই আনাগোনা করে— শব্দের স্বর্গত, খাত্তী জীবিত। তাঁদের স্মৃতি পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়ে গেছে তার মন থেকে দীর্ঘকালের অদর্শনে। একবারের বেশী দেখেও নি তাঁদের কোন দিন। কী ক'রেই বা মনে থাকবে তাদের কথা!

আনমনা গাবে বৈজয়ন্তী হাতে তুলে নিলে লেখনী। স্বামীর উদ্দেশ্যে লিখে ফেলল ছোট্ট একটি শ্লোক সংস্কৃত ভাষায়—

“জিত ধুম সমূহায় জিত ব্যঙ্গক বায়তে

মশকায় ময়া কারঃ সারমারভা দীযতে॥”

সন্ধ্যা হতে আরম্ভ ক'রে সারারাত মশকগণ আমার দেহে বাধা দিচ্ছে। তারা ধুম বা ব্যঙ্গক কিছুই বাধা মানে না।

বিশ্বাসী একজন লোকের হাতে চিঠিখানা স্বামীর কাছে পাঠিয়ে দিয়ে নিজের ঘরে এসে শুয়ে পড়লো বৈজয়ন্তী। তার মনের মাঝে কোন উষ্মেগ নেই—নেই কোন দহন জ্বালা। ভালো করল কি মন্দ করল সে চিন্তা নিয়ে তার কোন ব্যাকুলতা নেই। মনে হলো তার একটা মুক্তির হাওয়া এসেছে যেন তার পথের বাধা দূর করে দিতে। দুঃখের অমানিশা কেটে গিয়ে তার জীবনের আকাশে তোরের আলো দেখা দিয়েছে।

বৈজয়ন্তীর চিঠি পেলো কৃষ্ণনাথ। চিঠিখানা দেখলেন তাঁর মা ও বোনরা।

কিছুক্ষণের মধ্যে আলোচনা বেশ জমে উঠলো। বাড়ির এঘর ওঘর থেকেও ছ'চার জন এলো। স্কুলের কর্ত্তাই প্রায় এক স্তর। বৈজয়ন্তী বিবাহিতা স্ত্রী বটে, কিন্তু বড়ই যে নিকষ কঠিন কালো। তাকিয়ে দেখা যায় তাঁর দেখতে ইচ্ছা করে না। অনেকক্ষণ ধরে এই ধরনের আলোচনা চালিয়ে খেয়ে দেয়ে যে ব্যর্থ হয়ে

বিছানায় শুয়ে পড়লো, আরাধনা করতে লাগলো নিজা-দেবীর নিশ্চিন্ত মনে।

শুধু ঘুম এলো না কৃষ্ণনাথের চোখে। মাথার কাছে পিলস্জের শ্রদীপ জালিয়ে চিঠির আকারে লেখা বৈজয়ন্তীর সংস্কৃত কবিতাটির দিকে চোখ বুলোতে বুলোতে তার মন উধাও হয়ে উঠলো আর এক চিন্তায়। এ তো শুধু চিঠি নয়, এ যে প্রতিভাদীপ্ত ছন্দময় হৃদয়! অপরূপ যে প্রতিভা সে কি শুধুই কালো? কেন যেন মনে হলো কৃষ্ণনাথের একটা প্রতিভাদীপ্ত শক্তি লুকিয়ে আছে বৈজয়ন্তীর মধ্যে। বৈজয়ন্তীর কবিতার ছন্দে তারই স্পর্শ, তার ভাষায় তারই দীপ্তি। শ্লোকের আপাতদৃশ্যমান অর্থ ভেদ করে কৃষ্ণনাথের মনে জেগে উঠলো তার কাব্যময় ব্যঙ্গনা—

তোমার বিরহে আমার নিশীথের নিদ্রা চলে গিয়েছে। মশকেরা করছে আমার দেহে দংশন—তুমি ভিন্ন এসময়ে কে আমার পাশে থেকে রক্ষা ক'রবে?

কৃষ্ণনাথের বুক কাঁপতে থাকে একটা অদ্ভুত আবেগে। মনের মধ্যে একটা অনির্কচনীয় আনন্দের চেতনা দোল খায়। একটু শ্রদ্ধা, খানিকটা সহানুভূতি এবং কিছুটা প্রশংসার পথ ধরে ছোট্ট একটা শ্লোকের মধ্য দিয়ে বৈজয়ন্তী যেন এতদিনে হৃদয়ের আঙ্গিনায় এসে দাঁড়িয়েছে কৃষ্ণনাথের। মনে হলো তার বৈজয়ন্তী ঘেন বলছে;— কবিরূপ তোমার—কাব্য ভালবাস। কবিতা দিয়েই অর্ধ্য সাজাবো তোমার জগৎ! সমস্ত মন-প্রাণ উজাড় ক'রে ছন্দের সাজি ভরে তুলবো। যদি সত্যি আমার কোন প্রতিভা থাকে, থাকে কাব্যের অহুত্ব, তার অর্ধ্য পাবে তুমি। কিন্তু দূরে আর রেখো না আমাকে।

কৃষ্ণনাথ ছোট্ট একটা লিপিতে বৈজয়ন্তীর কবিতার উত্তর পাঠালেন।

স্বামীর কাছে থেকে স্নেহময় লিপি পেয়ে উজ্জ্বলিত হ'য়ে উঠলো বৈজয়ন্তীর অন্তর। মনে হলো তার—এতদিনে কি সন্দেহ হলেন ভাগ-বিধাতা। আর একটা ছন্দোময় শ্লোক রচনা করে সে পাঠালো কৃষ্ণনাথের কাছে—

“পুন্নাগ চম্পকলবঙ্গ সন্মোজয়তি

মাতঙ্গবু বিহনিকস্ত মধুব্রতস্ত।

যৎ কুলং বৃদ্ধ কুটকোহপি পক্ষপাতঃ

সবংশজন্ত মহতো হি মহত মেতৎ॥”

হে মধুকর, তোমার ব্রত হচ্ছে নাগেশ্বর, টাণা, লবঙ্গ, পদ্ম, মল্লিকা, যুথী বাতির স্মৃতি সরস মধুপান করা। আজ যে সেই সব পুষ্পের স্মৃতি ত্যাগ করে এই সামান্য কুন্দফুলের মধুপানে অভিসারী হচ্ছে, তাতে তেঁমারই মহৎ হৃদয় ও সঙ্কল্পের পরিচয় প্রকাশ পাচ্ছে; অসম্ভব করা যাচ্ছে তোমার হৃদয়ের অন্তস্থল।

বৈজয়ন্তীর ছন্দোময় লিপি পেয়ে বিচলিত বোধ করে কৃষ্ণনাথ। বৈজয়ন্তী তার জ্ঞী সন্দেহ নাই। কিন্তু পত্নী-ভাবে কখনো তাকে ভাবতে পারে নি সে, তার কালো রংএর জন্ত। কিন্তু কবিতার অনবদ্য ছন্দে মুগ্ধ হলো কৃষ্ণনাথ, বিভোর হয়ে গেল তার কবিরূপ। বৈজয়ন্তীর মাঝে যে এত মাধুর্য্য আছে আজ সে প্রথম অনুভব করল। বীণার সবগুলি তার যেন তার মনের মধ্যে একসঙ্গে বিন্ বিন্ করে ঝকার দিয়ে উঠলো। বৈজয়ন্তীর অদ্বৈত কান্তরতা, তার ভয়হৃদয়ের বেদনা তাকে ব্যথিত করে তুললো;—তাকে আকর্ষণ করলো। সেই ব্যথা আর আকর্ষণের মাঝে একটা আনন্দমধুর স্বপ্ন জেগে উঠলো তার মনে।

কাব্যলোকের অপরূপ ছন্দে মুগ্ধিত হয়ে উঠলো কৃষ্ণনাথের মন। নিজের কবিরূপ দিয়ে বৈজয়ন্তীর হৃদয় বেদনাকে অনুভব করলো। তার মনের চিরবঞ্চিত প্রেম আকুল উন্মাদনায় জেগে উঠলো। স্বর্গরাজ্যের মধুর স্বপ্নে বিভোর হয়ে উঠলো কৃষ্ণনাথ। অজ্ঞতাপের প্রাবনে ভেসে গেল সে; নৃতন এক উন্মাদনায় তার দেহের রক্ত নেচে উঠলো। প্রেমের স্পর্শ পেয়ে শাখাপল্লব বিস্তার করে তার মনে ফুল ফুটে উঠলো। মনে হলো কৃষ্ণনাথের যেন এক অদৃশ্য শক্তি তাকে গ্রাস করতে আসছে—আর নিজেকে স্বেচ্ছায় ও সানন্দে তার কাছে উৎসর্গ করে দিয়ে কৃতার্থ হতে চাইছে তার মন।

বুকলো কৃষ্ণনাথ, তার অবহেলিতা পত্নী বৈজয়ন্তী ছন্দের ঝঙ্কারে তার মনে স্রবের প্রাবন এনে দিয়েছে—কাব্যলব্ধী কোমল স্পর্শে জেগে উঠেছে যে তিনিষ তা প্রেম দ্বি আর কিছুই নয়।

• কৃষ্ণনাথ লিপি পাঠালেন বৈজয়ন্তীর কাছে—

যামিনী বিরহ ছল মানস:

ভ্যক্তপুট মালিত কুরি কুহুঃ।

বিন্দু বিন্দু মকরন্দ লোলুপ:

পদ্মিনীং মধুপ এব ঘাবতে ॥

“হে আমার পদ্মিনী। স্বর্ঘ্যোদয়ে বিকশিত হয়ে তুমি যখন পুনরায় স্বর্ঘ্যান্তে মুদিত হতে থাক, জানি তখন সমস্ত রাত্রি তোমার বিরহে কাটে, কিন্তু ভ্রমরেরও মধুপানে ব্যাধাত হয়। জেগে থাকে আবার যখন স্বর্ঘ্যোদয় হবে তারই প্রতীক্ষায়, আর স্বর্ঘ্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই সে খেয়ে চলে পদ্মিনীর দিকে। বিরহের ক্ষণ চলেতে আর দেরী নাই।”

বৈজয়ন্তীর আনন্দ আর ধরে না।

তার প্রতীক্ষার অমানিশা কেটে গিয়ে প্রেমের স্বর্ঘ্যোদয় দেখা দিয়েছে। জীবনের অর্থা খুঁজে পেয়েছে সে। পায়ের তলায় ফিরে পেয়েছে ধরণীর কোমল মধুর স্পর্শ। স্বামীকে কেন্দ্র করে এলো তার জীবনে নারীত্বের সম্মান—আর পাঁচ জন মেয়ের মতো স্বামীর পাশে পেলো সে সম্মানের আসন। আর কি চাই জীবনে! তার বঞ্চিত জীবনে যে এত হৃৎ দেখা দেবে তাকি ভাবতে পেরেছিল সে? স্বামীর সংসার, স্বামীর প্রেম, স্বামীর ভালবাসার আশ্রানে সজীবিত হ’য়ে উঠলো বৈজয়ন্তী।

ভাবের আবেশে তার হৃৎচোখ ভরে অশ্রুর বজ্রা নেমে এলো। তার আঁধার জীবনে যে আলোর রেখা দেখা দেবে তা কি ভাবতে পেরেছিল সে? তার নারী মনের ছিন্ন বিচ্ছিন্ন বাসনাগুলি সুসংবদ্ধ হবে সারি দিয়ে গ’ড়ে উঠলো।

মুক্তির স্বপ্নে বিভোর হ’য়ে উঠলো সে।

যখন স্বামীর ভিটায় এসে পা দিল বৈজয়ন্তী, তখন সন্ধ্যার প্রদীপ জলেছে ঘরে ঘরে। পূর্ণিমার চাঁদের আলো পড়েছে গৃহের প্রাক্ষণে। মনের সব ভীতি ও আশঙ্কা তখন শান্ত হয়ে গিয়েছে। মনে হলো বৈজয়ন্তীর পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার সাথে তার পিতার আশীর্বাদ নেমে আসছে তার মাথায়।

কিন্তু কে দাঁড়িয়ে আছে ঐ আলোছায়া বেলা গৃহঘারে!

গৃহঘারে এসে দাঁড়িয়েছিল কৃষ্ণনাথ, আহ্বান করে নিতে এসেছিল সে তার হৃদয় লব্ধীকে।

তার পায়ের কাছে প্রণাম করে স্থানিত হানি হেসে বললো বৈজয়ন্তী—“আমি এসেছি।”

হুঁহাড়ে ত্রীকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বলল কৃষ্ণনাথ—“এসো।”

এই আগ্রহে সেদিন আর অনাগ্রহ ছিল না। ধীরে বলে চললো কৃষ্ণনাথ—“আর একবার বিবাহ মন্ত্রের প্রার্থনা-গুলি নতুন করে শ্রবণ করতে হচ্ছে আমার। ‘ঐবাস্ত পতিবুলে ইয়ম্’—সে তো তুমি! স্বামীর বংশে ঐবস্তারার মত বিরাজমান থাকো—এই প্রার্থনাই জানাই আজ নতুন করে। তোমারই কাছে আমি প্রার্থনা জানিয়েছিলাম বিবাহকালে—‘যদেতৎ স্বয়ং তব, তদন্ত স্বয়ং-মম’—আজ থেকে তোমার স্বয়ংখানি আমার স্বয়ংয়ের সঙ্গে মিলেমিশে এক হয়ে যাক।”

একরাশ কালো চুলে কৃষ্ণনাথের মুখ ঢেকে গেল। হুঁহাড়ে কৃষ্ণনাথের গলা জড়িয়ে ধরলো বৈজয়ন্তী নিবিড় ভাবে। এক মধুর চেতনার আবেশে তার হুঁচোখ দিয়ে আনন্দের অশ্রু ঝরে পড়তে লাগলো।

দিন চলে যায়। বৈজয়ন্তী আর কৃষ্ণনাথ উভয়েই নিজ নিজ স্বয়ংয়ের অহরাগকে কাব্যের ছন্দে আর গানের সুরে পরিণত করে কাব্য লক্ষীর পায়ে নিবেদন করতে লাগলো—ক’রে ধন্ত হলো। পূর্ণ হলো তাদের ছন্দোময় জীবনের মিলিত সাধনা।

জীর্ণ হয়ে গিয়েছে আজ ধাহুকা গ্রামের হরিমন্দির। কয়েক শতাব্দীর জরা কাটল ধরিয়ে দিয়েছে তার ইটের পাজরে। ভেঙে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে তার চূড়া। কোটালিপাড়া গ্রামেরও আজ জীর্ণদশ। কৃষ্ণনাথের বংশধরেরা আজ কে কোথায় আছেন কে জানে? কিন্তু সব গেলেও আজো বেঁচে আছে একখানি কাব্য—যে কাব্য রচনা করেছিল বৈজয়ন্তী আর কৃষ্ণনাথ দুজনে মিলে। স্বামী-স্ত্রীর যুক্ত মনের মাধুরী মিশিয়ে রচিত সে কাব্য আজো জামিয়ে রেখেছে দুটি বাহুল স্বয়ংয়ের অরান প্রেমের ছন্দ। বিনাস্তায় গাথা দুটি নামের একখানি মালার মত বৈজয়ন্তী আর কৃষ্ণনাথের নাম আজো একত্রে যুক্ত হয়ে আছে যে কাব্যের সাথে তার নাম—“আনন্দ-লভিকা।” বাংলার কাব্য সাহিত্যে “আনন্দলভিকা” একখানি অপূর্ণ গ্রন্থ—যে কাব্যের ছন্দের মায়ার আর

গানের সুরে লক্ষণভার করে উঠেছিল বৈজয়ন্তীর আর কৃষ্ণনাথের প্রেম—সেই কাব্য আজো পাছে বাদামী-জাতির প্রভা ও পূজার অর্ঘ্য।

প্রসূতি-পরিচর্যা ও শিশুমঙ্গল

ডাঃ কুমারেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-বি

প্রাক্ত :

অনেকেই হয়তো লক্ষ্য করেছেন যে সন্তান-সন্তানবানাকালে প্রসূতিদের সচরাচর স্তূথার বেশ আধিক্য হয়, এবং বিশেষ ধরণের ও কঠিকর খাতেই শরীরের পুষ্টি লাভ ঘটে। বিশেষতঃ, দৈহিক স্বাস্থ্য বৃদ্ধির ভালো, এ সময়ে তাঁদের শরীরা আরো বেশী সুন্দর-শ্রীমণ্ডিত দেখায়। এর কারণ হলো—খাত। আমরা সকলেই জানি—শরীর পুষ্টির জন্য খাদ্যের সবিশেষ প্রয়োজন আছে। তাই প্রসূতি অবস্থায় মহিলাদের পক্ষে কি ধরণের খাদ্য গ্রহণ করা দরকার এ২ কোন কোন খাদ্য নিবিদ্ধ-বর্জনীয়, আপাততঃ, তারই মোটামুটি বিচার বিবেচনা করে দেখা যাক। কারণ আমাদের খাদ্য-তালিকায় এমন অনেক খাদ্যোপকরণ আছে, সেগুলি পুরোপুরিভাবে বর্জন না করলেও পরিমাণে কম খাওয়া উচিত। এছাড়া বিশেষ ধরণের এমন অনেক খাদ্য আছে সেগুলি প্রসূতির পক্ষে বেশী পরিমাণেই খাওয়া দরকার কিম্বা সম্পূর্ণভাবে বাদ দেওয়াই সবীচীন। অনেকের ধারণা—প্রসূতি ও সন্তানের বধোপযুক্ত পুষ্টির প্রয়োজনবোধেই গর্ভধারণকালে বেশী পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ করা উচিত। এ ধারণা কিন্তু ভুল...গর্ভাবস্থার সর্বদাই যে বেশী পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ করতে হবে—এমন কোনো বাধা-ধরা নিয়ম নেই। বরং, খাদ্য-বিভাগ্য-বিশেষজ্ঞেরা অভিন্নত প্রকাশ করেন যে গর্ভধারণকালে অতি-ভোজন বা গুরু-ভোজনের কলে, প্রসূতি ও সন্তান উভয়ের পক্ষেই উপকারের চেয়ে অপকার সাধনই বেশী ঘটে। তাই প্রসূতি ও গর্ভস্থ সন্তানের সুখার্য রক্ষা করে তাঁরা সচরাচর সহজপাচ্য ও পুষ্টিকর সাধনাদি খাদ্য

গ্রহণের বিধান দিবে থাকেন এবং সে খাদ্য যেন আধৌ-
গতিপীর শারীরিক প্রয়োজনের অভিরিক্ত না হয় তার
দিকেও সম্য-সচেতন দৃষ্টি রাখেন। বাস্তবিকই, গর্ভস্থ
সন্তানের বধোপযুক্ত পুষ্টির তত্ত্বও প্রসূতির প্রয়োজনাত্মিক
খাদ্য গ্রহণের কোনো কারণ নেই।...বরং এ সময়ে
প্রসূতির পক্ষে বেশী পরিমাণে গুরুপাক খাদ্যাদি না
খাওয়াই ভালো। কারণ, বেশী পরিমাণে গুরুপাক খাদ্য
গ্রহণের ফলে, প্রাইই পরিপাক বস্তুর বিশৃঙ্খলা ঘটে,
হজমের গুণগোল বাধিয়ে তোলে—এবং তার দরুন
খাদ্যের সারংশ শারীরিক পুষ্টিসাধন ও ক্ষয় পূরণ করার
বদলে, পাচক-বস্তুকে রীতিমত কতিগ্রস্ত এবং মূত্র-বস্তুকে
ব্যাধি পীড়াময় করে তোলে। কাজেই গর্ভধারণকালে
প্রসূতির খাদ্য সাধাশিখা ধরণের এবং ব্যক্তিগত রুচি
অনুসারে সাধারণতঃ যিনি যেমন ঝাবারদাবার খেতে
অভ্যস্ত, তেমনি ধরণেই হওয়া উচিত। অত্যধিক খাল
বা মশলাদার এবং তৈলাক্ত খাদ্য প্রসূতির পক্ষে বিশেষ
অপকারী। যে সব প্রসূতি মাছ বা মাংস খেতে ভাল-
বাসেন, তাঁদের পক্ষে সম্ভ্রাহে একদিন আদ্যি জাতীয়
খাদ্য গ্রহণ করাই বিধেয়। সুউন্নত পাশ্চাত্য দেশেও
প্রসূতি অবস্থার মহিলাদের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায়
আদ্যি জাতীয় মাছ ও মাংসের বদলে উপযুক্ত পরিমাণে
কচি, রিস্কট, কেক, দুধ, স্ত্রী বা সিমুইয়ের পায়ের, ভাত
ও চিড়া প্রভৃতি পুষ্টির সহজপাচ্য নিরামিষ খাদ্যের
সুব্যবস্থা করা হয়। আমাদের দেশের প্রাচীন পন্থী
সুগৃহীণীরাও চিরচরিত রীতি অনুসারে প্রসূতির খাদ্য
রন্ধার উদ্দেশ্যে দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় মাংসের ব্যবস্থা
তো করেনই না, উপরন্তু মাছ সযত্নেও সবিশেষ বাচ-
বিচার করে থাকেন ও প্রসূতিকে নিয়মিতভাবে দুধ, মাছ,
ছানা, ডাল, কল, শাক-সজী ও মিষ্টান্ন আহার করতে
বলেন। বাস্তবিকই অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের, প্রসূতি
অবস্থার আদ্যি জাতীয় খাদ্যের পরিবর্তে কচি অনুব-রী
ও আবস্তক মতো পরিমাণে কপি, কড়াই ওটি, লেটুস-শাক
চৌধাটো ও ছানা, দুধ, মাছ, স্ত্রী বা সিমুইয়ের পায়ের,
ডাল, শাক-সজী প্রভৃতি সুপুষ্টির নিরামিষ খাদ্যের
নিয়মিত ব্যবস্থা থাকা উচিত। শাক-সজীতে প্রচুর
খাদ্যপ্রাণ ও ‘ক্যালসিয়াম’ (Calcium) থাকে...গর্ভস্থ

শিশুর পুষ্টির-বৃদ্ধির পক্ষে যেটির বিশেষ প্রয়োজন আছে।
দুধেও প্রচুর ‘ক্যালসিয়াম’ এবং ‘ফসফরাস’ (Phos-
phorus) থাকে...এ সব খাদ্য-সম্পদ সহজপাচ্য এবং
সাধারণতঃ সকলেরই প্রিয়। তাই প্রসূতির পক্ষে প্রত্যহ
নিয়মিতভাবে অন্ততঃ এক গ্লাস দুধ পান করা কর্তব্য।
কারণ গর্ভস্থ সন্তানের অস্থি-পুষ্টির তত্ত্ব ‘ক্যালসিয়াম’ বা
চূর্ণ জাতীয় উপাদানের বিশেষ প্রয়োজন। তাড়াতাড়ি
ভূমিষ্ট হবার পর, মায়ের দুধ পান করেই নবজাত সন্তান
প্রাণ ধারণ ও পুষ্টি লাভ করে। তাই প্রসূতির খাদ্য-
তালিকায় নিয়মিতভাবে দুধ-পান করা যে বিশেষ
প্রয়োজনীয়, সে বিষয়ে বিশ্বের সকল খাদ্যবিদ্যাশি-র
চিকিৎসকরাই একমত।

দুধ ছাড়াও নিয়মিতভাবে প্রত্যহ রাতে নিত্রার পূর্বে
এবং প্রভুবে শয্যাভ্যাগের পর এক গ্লাস জল পান করা
প্রসূতির আরেকটি প্রয়োজনীয় কর্তব্য। অভিজ্ঞ চিকিৎ-
সকদের মতে গর্ভধারণকালে প্রসূতির দেহাত্মকত্রে সাময়িক-
ভাবে নানা রকম পরিবর্তন ঘটে বলেই, এ সময়ে অধি-
কাংশ ক্ষেত্রেই অল্প বিস্তর কোষ্ঠ-কাঠিন্তের প্রাদুর্ভাব
দেখা যায়। প্রসূতি অবস্থায় কোষ্ঠকাঠিন্তের উপশ্রব,
শরীর, মন ও স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ অপকারী। অপকারক
এই হুর্ভোগের কবল থেকে-রেহাই পেতে হলে প্রত্যেক
প্রসূতিরই উচিত—নিয়মিতভাবে এবং স্বাভাবিক অবস্থার
চেয়ে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে জল পান করা।
নিয়মিতভাবে পর্যাপ্ত পরিমাণে জল পান করার ফলে শুধু
যে মল-মূত্ররূপে শারীরিক ক্রেন আবর্জনা পরিভ্যাগের
ব্যবস্থা সুনিয়ন্ত্রিত হয় তাই নয়, দৈহিক-স্বাস্থ্যেরও সবিশেষ
উন্নতি ঘটে। প্রসঙ্গক্রমে, আরো একটি দরকারী কথা
বলে রাখি। উপাদেয় এবং পুষ্টির হলেও প্রসূতি
অবস্থায় খাদ্যখাদ্যবিচারে অকটিকর কোনো খাদ্য না
খাওয়াই ভালো। কারণ অকটিকর খাদ্য গ্রহণে প্রসূতির
উপকার না হয়ে বরং শুধু অপকারই ঘটে।

খাদ্যপ্রাণের কথা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি। তাই
খাদ্য-প্রাণ সযত্নে আপাততঃ মোটামুটি কয়েকটি দরকারী
হদিশ দিয়ে রাখি। প্রতিদিন আদ্যি সচরাচর যে সব
খাদ্য গ্রহণ করি, তার মধ্যে এমন কতকগুলি রাসায়নিক
পদার্থ থাকে, যার অভাবে দেহের পুষ্টিসাধনের ব্যাঘাত

ঘটে এবং নানা রোগ ব্যাধির উদ্ভব হয়। ইহানীং আমাদের দেশে মূলা বৃদ্ধি, হৃৎশ্রাপাতা ও বেগরোয়া ভেজাল মিষ্টানের ফলে, সচরাচর সাধারণ গৃহস্থ-সংসারে বিশেষতঃ অল্প রে.অগারী পরিবারে যে সব খাদ্য গ্রহণ করা হয়, সেগুলিতে খাদ্য প্রাণের একান্ত অভাব দেখা যায়। কাজেই প্রস্তুতি ও গর্ভস্থ সন্তানের যথোচিত পুষ্টি ও স্বাস্থ্য রক্ষার উদ্দেশ্যে, আজকাল এত সব অভাব অনটন, দুর্ভিক্ষ অসু-বিধার দিনে খাদ্য গ্রাণ সমন্বিত টাটকা ফলমূল, শাকসব্জী, মাখন, ছানা, ডিম, চুখ প্রভৃতি আহার্যের ব্যবস্থা করা বাস্তবিকই রীতিমত সমস্তা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কি উপায়ে এ সমস্তার সূচক সমাধান করা যায়—সমাজের প্রত্যেকটি চিত্তাশীল ব্যক্তিই তাই নিয়ে নিবিড় আগ্রহে ভাবতে শুরু করেছেন। তাঁদের দৃষ্টান্ত অনুসরণে আমরাও তাই প্রস্তুতিদের উপযোগী খাদ্যখাদ্য বিচারের প্রসঙ্গালোচনা করছি।

পাশ্চাত্য-সভ্যতার অনুসরণে অধুনা আমাদের দেশীয় সমাজের বহু উগ্র আধুনিক সৌখিন সংসারে আজকাল ফলে ছাঁটা চাল, ময়দা, টিনের-কোটার প্যাকিং করা মাছ, মাংস, শাকসব্জী, ফলমূল, 'মার্গারিন' (Margarine), বনস্পতি বী, বোতলে প্যাকিং করা বাজারের মুখরোচক কাল-মশলাবার চাটনী, 'পিকল্‌স্' (Pickles), 'হুইস্কী' (Whisky), 'জিন' (Gin) প্রভৃতি মাদক পানীয়, সিগারেট প্রভৃতি তাজকুট জাতীয় খাদ্যাদি গ্রহণের ব্যাপক প্রাচুর্য্য দেখা দিয়েছে এবং অনেকেরই ধারণা—এ সব বিলাতী রীতি অনুসরণ না করে চললে হয়তো তাঁরা প্রগতিশীল স্বসভ্যতার 'অভিজাত গৌরী' মাহু হিসাবে এফালের বিলাসী-উন্নয়ন সমাজে ঠাঁই পাবেন না। নিতান্তই 'একঘরে' এবং অবহেলিত হয়েই দু'রে সরে থাকেন। আমাদের দেশের প্রাচীন অভিজ্ঞ চিকিৎসক ও ধাত্তবিশারদদের মতে এ ধরনের খাদ্য গ্রহণ কিছু প্রস্তুতি ও গর্ভস্থ সন্তানের পক্ষে পরম অহিতকারী। কারণ টাটকা শাকসব্জী ফলমূল প্রভৃতিতে যে পরিমাণ খাদ্য-গ্রাণ থাকে, টিনের কোটার বা বোতলে প্যাকিং করা মাছ মাংস ও বাসি খাদ্যগ্রহণে তার খণ্ডেই অভাব নজরে পড়ে। টিনের কোটার বা বোতলে প্যাকিং করা খাদ্যগ্রহণের প্রচলন—যদি বিবেচ্য অভিমান, বিশেষ

পরিভ্রমণ প্রভৃতি বিবিধ কারণ উপলক্ষ্যে সাময়িকভাবে বিশেষ কোনো অচল অবস্থার একান্ত আবশ্যকীয় আহার্য বা 'Emergency Food' হিসাবে—নিত্যনৈমিত্তিক খাদ্য তালিকার এগুলির শুধু রসনা তৃপ্তিকর, বিচিত্র সৌখিন বিলাসী খাবার ছাড়া অল্প কোন স্থান নেই। 'মার্গারিন' ও 'বনস্পতি-বী'য়ের চেয়ে টাটকা মাখন ও বী, প্রস্তুতির স্বাস্থ্যের পক্ষে অনেক বেশী প্রয়োজনীয় এবং উপকারী। সন্তান প্রসবান্তে প্রস্তুতির স্বাস্থ্যোন্নতির উদ্দেশ্যে টাটকা গাওয়া বীয়ে ফুলকো লুচি ভেজে খাওয়ানো—আমাদের দেশের একটি পুরনো রীতি। পাশ্চাত্য রীতি অনুসারে প্রস্তুতির ও সন্তানের শারীরিক পুষ্টি ও স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য নিয়মিতভাবে 'কড লিভার তেল' (Cod Liver Oil) ও 'মল্ট' (Malt) খেলেও সবিশেষ উপকার হয়। আমাদের দেশের মহিলা মহলে সচরাচর পান, দোস্তা, জর্দ, প্রভৃতি খাওয়ার যে রীতি চলিত আছে প্রস্তুতিদের পক্ষে সেটি পুরোপুরিভাবে সম্ভবপর না হলেও সাময়িকভাবে বর্জন করা উচিত। তাছাড়া এদেশে নিম্ন সম্প্রদায়ের মহিলাদের মধ্যে ধূমপান এবং মাদক দ্রব্য সেবনের যে কু-অভ্যাস আছে প্রস্তুতি অংস্থায় সেগুলিও একান্তভাবে বর্জনীয়। কারণ এ সময়ে ধূমপান ও মাদক সেবনের ফলে প্রস্তুতি ও সন্তান উভয়েরই স্বাস্থ্যহানি ঘটতে পারে সবিশেষ।

[ক্রমশঃ]



হাতের কাজ

স্টেন্সিলের কারু-শিল্প

রুচিরা দেবী

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

কাগজের উপরে ছবি, কবের রেড (Safety Razor Blade) বা নরকের সাহায্যে স্টেন্সিলের কারু-শিল্পের

উপযোগী নক্সার ছাপ কি উপায়ে কাটতে হয়, গতবারে তার মোটামুটি আভাস দিয়েছি। এবারে বলছি—কাগজ, কাঠ, কাপড় প্রভৃতি উপাদানে তৈরী বিভিন্ন সামগ্রীর গায়ে কি প্রথায় এবং কেমনভাবে রঙ ফলিয়ে সেই সব টেন্সিলের নক্সার নিখুঁত-ছাপ তোলা যায়—তারই কথা।

ধরুন, যদি কাগজের তৈরী কোনো সামগ্রীর উপর টেন্সিলের নক্সার ছাপ তুলতে হয়, তাহলে সচরাচর ছবি-আঁকার জন্ত যে-ধরণের ‘জল-রঙ’ বা ‘Water colours’ ব্যবহার করার রীতি আছে, তেমনি-ধরণের রঙ হলেই চলবে। কিন্তু মাঝে-মাঝে ধোণার বাড়ী পাঠিয়ে কিছা ঘরে সাবান দিয়ে কেচে নিতে হবে—এমনি ধরণের কাপড়ের তৈরী কোনো সামগ্রীর উপর টেন্সিলের নক্সার ছাপ তোলার জন্ত সাধারণ ‘জল-রঙ’ বা ‘Water colours’-এর পরিবর্তে কাপড়-ছোবানোর উপযোগী ‘পাকা-রঙ’ ব্যবহার করাই যুক্তিযুক্ত। কারণ, বারবার সাবান দিয়ে কাচা ও জলে ধোয়ার ফলে কারু-শিল্প-সামগ্রীর উপরে সঘৃহে রচিত টেন্সিলের নক্সার ছাপ সহজেই বিনষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা...তাই এ সব ক্ষেত্রে সাধারণ কাঁচা-রঙের বদলে দীর্ঘস্থায়ী পাকা রঙ ব্যবহার করাই সমীচীন। তবে কাঠের বা কোনো ধাতু-নির্মিত সামগ্রীর উপরে টেন্সিলের নক্সার ছাপ তুলতে হলে, ‘তেল-রঙ’ বা ‘Oil-Colours’ ব্যবহার করাই ভালো। এই হলো—বিভিন্ন ধরণের উপাদানে-গড়া সামগ্রীর উপরে বিবিধ-বিচিত্র রঙ ফলিয়ে টেন্সিলের নক্সার ছাপ তোলার চিরাচরিত রীতি। এই রীতি অনুসরণে টেন্সিল কারু-শিল্পের কাজ করার সময়, আরেকটি বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা দরকার—অর্থাৎ, কাপড়, কাগজ, কাঠ বা ধাতু-নির্মিত যে কোনো সামগ্রীর উপরে টেন্সিলের নক্সার ছাপ তোলার জন্ত যে রঙ ব্যবহার করবেন, সেটি যেন খুব পাতলা বা জলবৎ-তরল না হয়ে বরং ঈষৎ-গাঢ় বা ঘন থকথকে ধরণের হয়। কারণ, রঙ যদি জলবৎ-তরল বা খুব পাতলা হয়, তাহলে সেটি নক্সার ছাপ তোলার সময় অসমানভাবে ছাঁচের কিনারার চারিদিকে গড়িয়ে এবং ছড়িয়ে গিয়ে টেন্সিলের কারু-শিল্প-সামগ্রীটিকে রীতিমত অহুসার ও বেরাড়া অপরিচ্ছন্ন করে তুলতে পারে। কাজেই টেন্সিলের কারুশিল্পের কাজের সময়

সর্বদা এদিকে সজাগ-দৃষ্টি রাখা একান্ত প্রয়োজন। এ-কাজে হাত-পাকাবার সময় শিক্ষার্থীদের অবশ্য গোড়ার দিকে অল্প বিস্তর দোষ-ত্রুটি ঘটতে পারে, তবে কিছুকাল নিয়মিত-অনুশীলনের ফলে, ক্রমশই তাঁরা এ বিষয়ে যে যথোচিত দক্ষতা লাভ করবেন—সে কথা বলাই বাহুল্য।

সচরাচর ছবি-আঁকার জন্ত শিল্পীরা যে ধরণের তুলি ব্যবহার করেন, টেন্সিল-কারুশিল্পের ছাপ তোলার সময় কিন্তু তেমনি ধরণের তুলি দিয়ে কাজ করা চলবে না। টেন্সিলের ছাঁচের উপরে রঙ-ফলানোর জন্ত বিশেষ-ধরণের যে তুলি ব্যবহার হয়—নীচের ছবিতেই তার নমুনা দেখতে পাবেন।



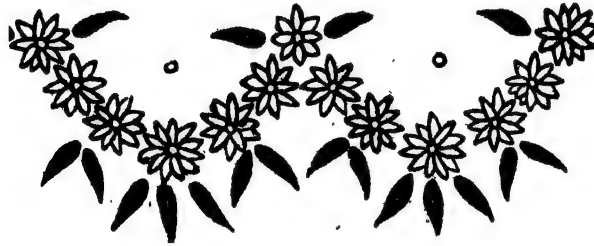
এমনি ধরণের সরু, মোটা ও মাঝারি নানান ছাঁচের তুলি বাজারে রঙের দোকানে সহজে এবং অল্প-বয়ে অনায়াসেই কিনতে পাওয়া যায়। তবে যদি কোনো বিশেষ কারণে শিক্ষার্থীদের কারো পক্ষে এই বিশেষ-ধরণের টেন্সিল-কারুশিল্পের উপযোগী-তুলি সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য হয়, তাহলে সচরাচর বাজারে গঁদের আঠার শিলির সঙ্গে যে-ধরণের ‘মুখ-ছাঁটা’ তুলি পাওয়া যায়, সেগুলিও ব্যবহার করা যেতে পারে:...অন্তর্ধায়, ভালো কাঁচির সাহায্যে উপরের ছবির নমুনামতো-ছাঁচে সাধারণতঃ ‘জল-রঙ’ বা ‘তেল-রঙের’ কাজের জন্ত যে সব তুলি ব্যবহার করা হয়, সেগুলির ডগা বেশ সমান ও পরিপাটিভাবে খাটো-ছাঁচে ছেঁটে নিয়ে অনায়াসেই টেন্সিল-কারুশিল্পের নক্সার ছাপ তুলতে পারবেন। প্রসঙ্গক্রমে, আরো একটি জরুরী বিষয় মনে রাখা দরকার। অর্থাৎ, টেন্সিল-কারুশিল্পের নক্সার ছাপে রঙ-ফলানোর সময়, কেবলমাত্র একটি তুলির সাহায্যে বিভিন্ন বর্ণ ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা না করাই ভালো—তাতে বর্ণ-স্বথার পাতিপাট্য সবিশেষ ব্যাহত হয়। এ রীতি অনুসরণ করার পরিবর্তে বরং বিভিন্ন রঙের জন্ত আলাদা-আলাদা তুলি ব্যবহার করাই যুক্তি-সঙ্গত।

জানাভাবেই করলে, আপাততঃ এখানেই এ প্রসঙ্গ শেষ করছি। আগামী সংখ্যায় এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করার বাসনা রইলো।

এমব্রয়ডারীর নতুন নক্সা

কল্যাণী মুখোপাধ্যায়

সংসারের দৈনন্দিন কাজকর্মের অবসরে, সচরাচর ক্রমে সব মহিলা নিজের হাতে সেলাই-কাঁড়াই করে সূচী-শিল্পের নানারকম শোখিন-সুন্দর সামগ্রী রচনার অমুরাগী, তাঁদের সুবিধার জন্য এবারে সূচী, রেশমী অথবা পশমী কাপড়ের উপর বিচিত্র-ছাঁদে ও বিবিধ-বর্ণে মনোরম-ভাবে এমব্রয়ডারী-সূচীশিল্পের কাজ করে ফুটিয়ে তোলার উপযোগী নতুন একটি 'প্যাটার্ন' বা 'নক্সা-নমুনা' সাহায্যে উপহার দেওয়া হলো।



'ফুল ও পাতার' সরল-সুন্দর বিচিত্র-আলংকারিক রূপ-সমাবেশে এমব্রয়ডারী সূচী-শিল্পের উপযোগী যে নতুন 'প্যাটার্ন' বা 'নক্সা' নমুনা উপরে দেখানো হয়েছে, সেটি মহিলাদের ব্যবহার্য শায়া, পেটিকোট, ব্রাউজ এবং ছোট মেয়েদের ক্রক প্রভৃতি পরিচ্ছদের কিনারায় সুদৃশ্য-শোখিন 'বর্ডার' (Edge-Border) বা 'পাড' হিসাবে এক বা একাধিক রঙের এমব্রয়ডারী-সূতোর সাহায্যে অনারাসেই নিখুঁতভাবে সেলাইয়ের কাজ করে মনোহর-ছাঁদে ফুটিয়ে তোলা যেতে পারে। এছাড়াও, উপরোক্ত 'নক্সা-নমুনাটিকে' সহজেই বিছানার চাদরের ও সুজানীর, এবং শরের ধরজা-জানলার পর্দার কিনারায় শোখিন 'বর্ডার' বা 'পাড' হিসাবে বসিয়ে অভিনব-ছাঁদে সুশোভিত করা

চলবে। এমন কি, সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করতে পারলে, এই অভিনব-সুন্দর 'প্যাটার্ন' বা 'নক্সা-নমুনাটিকে' অনারাসেই মেয়েদের ক্রকের, বালিশের ওরাড়ের, 'টেবিল-কুশের' ও 'টি-কোজির' (Tea-cosy) কিনারাতেও 'আলংকারিক পাড' (Decorative-Border) হিসাবে এমব্রয়ডারী করে অপরূপভাবে ফুটিয়ে তোলা যায়।

কোন রঙের কাপড়ের উপরে কি ধরণের রঙীণ এমব্রয়ডারী সূতো ব্যবহারে উপরের এই 'ফুল পাতার' বিচিত্র 'প্যাটার্ন' বা 'নক্সা-নমুনাটি' ফুটিয়ে তুলতে হবে—সেটা একান্তভাবে নির্ভর করে—সূচী-শিল্পীর ব্যক্তিগত কচি ও কলাজ্ঞানের উপর—কাজেই এ সম্বন্ধে কোনো নির্দিষ্ট মতামত না দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত। তবে মোটামুটি-ভাবে বলা যায় যে—সূচী-শিল্পের কাপড়টি যদি গাঢ়-রঙের হয় তাহলে, নক্সা-এমব্রয়ডারীর জন্য মানানসই-ধরণের হালকা-রঙের সূতো ব্যবহার করাই সমীচীন; এবং সেলাইয়ের কাপড়ের রঙ যদি হালকা-ধরণের হয়, সেক্ষেত্রে এমব্রয়ডারী সূতোর রঙ অপেক্ষাকৃত গাঢ়-জাতীয় হওয়াই

বাঞ্ছনীয়। এ ছাড়াও আরো একটি অভিনব-বিচিত্র রীতি আছে—সে রীতিটি হলো—একই ধরণের—হালকা অথবা গাঢ় রঙের কাপড়ের উপর সেই রঙেরই জবৎ গাঢ় অথবা হালকা রঙের সূতো ব্যবহার করে নক্সাটিকে অপরূপ-ছাঁদে এমব্রয়ডারী করে তোলা। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যেতে পারে যে শায়া কাপড়ের উপর কাঁধা-রঙের এমব্রয়ডারী-সূতো ব্যবহার করলে সূচী-শিল্পের শোভা শুধু যে সুন্দর হয়ে ওঠে তাই নয়, সাধুর্ধ্য-শ্রী-মণ্ডিত দেখার নানা-রঙের সূতো দিয়ে রচিত সূচী-সামগ্রীর চেয়েও আরো অনেকখানি বেশী।

বারাংবারে, এমনি ধরণের আরো করেকটি সূচী-শিল্পের উপযোগী বিচিত্র-নতুন নক্সা-নমুনা প্রকাশিত করার বাসনা রইলো।



স্বপর্ণা দেবী

ইতিপূর্বে গ্রীষ্মকালে মুখলী ও অঙ্গ-প্রসাধন সম্বন্ধে মোটামুটি যে হুদিশ দিয়েছি, বর্ষাকালেও সচরাচর সেই রীতিগুলিই অঙ্গসরণ করা চলবে। কারণ, আমাদের দেশে গ্রীষ্মকালীন তপ্ত-আবহাওয়ার সঙ্গে বাতাস বইতে থাকে বলে দেহে তখন প্রচুর ঘর্ষণসঞ্চারিত হলেও, সহজেই সে সব তকিরে বাওয়ার সুযোগ পায়। কিন্তু বর্ষাকালে বাতাস ও বারি-বর্ষণ হলেও, অধিকাংশ সময়েই বিশ্রী-বেয়াড়া ভ্যাপসা-গুমোট ও তপ্ততায় আবহাওয়া বিশেষ ভারাক্রান্ত হয়ে থাকে বলেই অস্বাস্থ্যকর ক্রান্তি-অবসন্নতার দেহ-মনের প্রচুর ক্ষয়-ক্ষতি ঘটে। তাই বর্ষাকালে দেহ-মনের ক্ষয়-ক্ষতি কারক এই ক্রান্তি-অবসন্নতার অস্বাস্থ্যকর উপভবের কবল থেকে রেহাই পেতে হলে, রূপচর্চা ও অঙ্গ-প্রসাধন সম্পর্কে একান্ত-প্রয়োজনীয় যে কয়েকটি রীতি মেনে চলা দরকার, আপাততঃ মোটামুটিভাবে তারই উল্লেখ করছি।

অনেকের ধারণা—রূপচর্চা ও প্রসাধনের ব্যাপারে মনোবোগ দেওয়া মানেই ব্যয়বহুল-বিলাসিতার প্রশ্রয় দেওয়া। কথাটা কিন্তু আদৌ ঠিক নয়। কারণ রূপচর্চা ও অঙ্গ-প্রসাধনের মূল-উদ্দেশ্যই হলো—স্ব-সবল, স্বন্দর-সুঠার দৈহিক স্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া...রূপ লাভের উন্নতি সাধন করা...বিধ-প্রকৃতির বিভিন্ন-স্ববাহার মাকে ফলের মতোই নিজের সৌন্দর্য-শ্রী পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করে তোলা। কাজেই উপযুক্ত উপায়ে প্রসাধন চর্চার ফলে, নিজের দেহ-বক, শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির অশোভিত উন্নতিসাধন করে শুধু রূপ-লাভণ্য লাভই নয়,

উপযুক্ত স্ব-নীযোগ, সবল-স্বন্দর, সুঠাম-স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়ে ওঠার দিকে প্রত্যেক নারী-পুরুষেরই আজকাল সজাগ-সম্মত দৃষ্টি সজ্ঞাশীল করা একান্ত কর্তব্য।

স্ব-সবল সুঠাম দৈহিক-দৌন্দর্য লাভ করতে হলে, প্রথমেই দৈনন্দিন খাদ্য-তালিকার দিকে সচেতন-দৃষ্টি রাখা দরকার। অতিরিক্ত বি, চেন, লব, মশলা প্রভৃতি দিয়ে রান্না করা গুরুশাক খাদ্য, যেতে রসনাভূষিকর হলেও, আদৌ সহজপাচ্য নয় এবং স্বাস্থ্যের পক্ষেও যথেষ্ট ক্ষতিকর—এ কথা হুনিয়ার প্রায় সকল অভিজ্ঞ-বিজ্ঞ শরীরতত্ত্ববিদ চিকিৎসক ও দৌন্দর্যবিদগণেরই সুস্পষ্টভাবেই স্বীকার করেছেন। অর্থাৎ দীর্ঘদিন স্বাস্থ্য সৌন্দর্য্য-শ্রী অমান্য ও অটুট রাখতে হলে, চর্বি ও শর্করা জাতীয় উপকরণ যতখানি সম্ভব, দৈনন্দিন খাদ্য-তালিকা থেকে কমিয়ে রাখাই যুক্তিযুক্ত। যে সব খাদ্য-উপকরণে বিভিন্ন ধরনের 'ভিটামিন' সম্পদ প্রাচুর্য আছে, সেগুলিকে নিয়মিত ভাবে দৈনন্দিন খাদ্য-তালিকার অন্তর্ভুক্ত করতে পারলে শুধু যে অচিরেই শারীরিক সৌন্দর্য ও স্বাস্থ্যের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে তাই নয়, ব্যক্তিগত রূপ-লাভণ্যও অমান-অটুট থাকবে সুদীর্ঘকাল। আমাদের দেশের সাধারণ গৃহস্থ-সংসারে সচরাচর যে ধরনের খাদ্য-তালিকা অল্পহুত হয়ে থাকে, সেগুলির পর্যালোচনা করে মোটামুটিভাবে বলা চলে যে—প্রত্যহ নিয়মিতভাবে কলা, বেগু, পেঁপে, আম, আনারস, কমলা লেবু, মোঙ্গাশাক বা মৌসুমী লেবু, বাতাবি লেবু প্রভৃতি কোনো না কোনো একটা টাটকা মরতমী ফল, কলা-সম্বত ভিজানো ছোলা, মৃগ অথবা মাসকলাই ও কাবলী-মটর দানা, আদার কুচো, দই, দুধ, ছানা, মাখন, ডিম, মাছ, মাংস, আটার কুটি, শাক-শাকী প্রভৃতি জল ও সহজপাচ্য খাদ্যোপকরণগুলি আহারাদির স্বাবহা করলে স্বাস্থ্য-অঙ্গের পক্ষে সবিশেষ সুবিধা হবে।

স্ব-সবল দৈহিক রূপ-লাভণ্যের মাধুর্য অক্ষর-অটুট রাখার জন্য শুধু যথোপযুক্ত খাদ্যোপকরণের স্বাবহা করলেই চলবে না—সে সব খাদ্য যাতে সহজপাচ্য হয় এবং প্রত্যহ নিয়মিতভাবে যাতে কোঠ পরিষ্কার থাকে—তার দিকেও সজাগ দৃষ্টিবান করা দরকার। গুরুশাক খাদ্য-সেবনে হজমের গণ্ডগোল ছাড়াও, নিয়মিতভাবে দৈনন্দিন

কোষ্ঠ-পরিষ্কারেরও নানান বিশৃঙ্খলা ঘটে...কলে, বৈদিক-বাহ্যের অবনতিকর অজীর্ণতা ও কোষ্ঠবদ্ধতার উদ্ভব হয় এবং খাণ্ড-পরিণাক-বস্ত্রের অপটু-ক্রিয়ার উপদ্রবে শারীরিক ক্লম-লাবণ্যও বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ওঠে...নারী-পুরুষের ব্যক্তিগত শ্রী-দৌলভ্যা নিতান্ত অকালেই ঝরে পড়ে তাঁদের রীতিমত অজীর্ণ ও পাণ্ডুর-মলিন করে তোলে। কোষ্ঠবদ্ধতার উপদ্রব থেকে মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে, আমাদের দেশে অনেকেই আজকাল বাজারের ওষুধের দোকান থেকে বহু-বিজ্ঞানিত ও সচরাচর-প্রচলিত নানা রকম সৌধিন 'জোলাপ' বা 'Purgative'-এর 'বটিকা' (pills and Tablets), 'চূর্ণ' (powder) ও 'তরল-ওষুধি' (Liquid Mixture) নিয়মিত এবং পর্যাপ্তভাবে ব্যবহার করে থাকেন। এই বিশেষ-ধরণের 'জোলাপ' বা 'purgatives' কোনো-কোনো ক্ষেত্রে সাময়িকভাবে উপকার সাধন করলেও, দীর্ঘকাল ব্যবহারের ফলে, অধিকাংশ-স্থলে উপকারসাধনই যে বেশী করে, সে কথা বিশদভাবে হয়তো বুঝিয়ে না বললেও চলে। কারণ, এ সমস্ত ইদানিং প্রায় প্রতি ঘরে-ঘরেই ব্যাপকভাবে নারী পুরুষ প্রত্যেককেই রীতিমত চিন্তাকুল করে তুলেছে। কাজেই প্রসঙ্গক্রমে, কোষ্ঠ-পরিষ্কার রাখার কয়েকটি খুব স্বলভ ও সহজসাধ্য 'ঘরোয়া-প্রক্রিয়া' সম্বন্ধে মোটামুটি হৃদিশ দিয়ে রাখছি।

প্রথমটি হলো—প্রত্যহ রাতে নিত্রার আগে এবং প্রাতে শয্যাভ্যাগের পরেই নিয়মিতভাবে এক গ্রাশ করে ঠাণ্ডা বা গরম জল পান করলেই দেখবেন—কোষ্ঠবদ্ধতার উপদ্রব থেকে সহজে এবং অচিরেই রেছাই পেতে পারবেন।

কোষ্ঠবদ্ধতার কারণে জোলাপ বা purgative ব্যবহারের প্রয়োজন হলে, নিয়মিত প্রক্রিয়াগুলি অনুশীলনে সবিশেষ উপকার লাভ করবেন :—

(১) নিয়মিতভাবে প্রত্যহ প্রাতে ঘুম থেকে উঠেই প্রয়োজনমতো দুই বা তিনটি শুকনো হরিতকী, বড়ড়া ও আমলকী চূর্ণ-মিশ্রিত 'ত্রিকলার জল' পান ;

(২) নিয়মিতভাবে প্রত্যহ প্রাতে শয্যাভ্যাগের পর, এক গেলস ঠাণ্ডা বা গরম জলে প্রয়োজনমতো পরিমাণে এক বা দুই অথবা তিন চামচ হরিতকী বা ত্রিকল

চূর্ণের সঙ্গে দুই থেকে ছয় চামচ পরিমাণ চিনি মিশিয়ে পান ;

(৩) প্রত্যহ প্রাতে শয্যাভ্যাগের পর, নিয়মিতভাবে একগেলস গরম জলে পুরো একটি পাভিলেবুর রস মিশিয়ে পান।

উপরোক্ত এই তিনটি প্রক্রিয়ার যে কোনোটির সহায়তায়ই অনায়াসে কোষ্ঠকে নিয়মিতভাবে পরিষ্কার রাখা চলবে। এ ছাড়া নিয়মিতভাবে প্রত্যহ পেটের পেঙ্গী স্বস্থ-সঞ্চালিত রাখার উপযোগী বিশেষ-ধরণের একটি ব্যায়াম-অনুশীলন করেও কোষ্ঠবদ্ধতার উপদ্রব থেকে সহজেই পরিত্রাণ লাভ করা যায়।



সুধীরা হালদার

এবারে বলছি—বাঙলা দেশেরই বিচিত্র-মুখরোচক বিশেষ এক-ধরণের মিষ্টান্ন-জাতীয় খাবার রান্নার কথা। অভিনব-স্বাদু এই খাবারটির নাম—'কুমড়োর মালপোয়া'। ছুটি-ছাটার দিনে বাড়ীতে কোনো ঘরোয়া উৎসব-অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে প্রিয়জনদের পাতে সাদরে ও স্বল্প-ব্যয়ে নতুন-ধরণের এই মিষ্টান্ন-জাতীয় খাবার পরিবেষণ করে অনায়াসেই তাঁদের রসনার পরিতৃপ্তি-সাধন করা যায়... এমন কি, বৈকালিক-জলযোগের আসরে চায়ের সঙ্গে মাঝে মাঝে বিচিত্র উপায়ে এই 'কুমড়োর মালপোয়া' খাবারটির ব্যবস্থা করলেও ছেলে-বুড়ো সকলের কাছেই রীতিমত উপভোগ্য হয়ে উঠবে বলেই ধারণা হয়।

'কুমড়োর মালপোয়া' রান্নার জন্য যে সব উপকরণ প্রয়োজন, গোড়াতেই তার একটা মোটামুটি বর্ড দিয়ে

রাখি। অর্থাৎ, এ খাবারটি রান্নার জন্য চাই—আধসের কুমড়ো, একপোয়া চিনি, একমুঠো আটা বা ময়দা, গোটা চার-পাঁচ স্বগন্ধী ছোট এলাচ, সামান্য কিছু গুঁড়ো-মৌরী এবং আন্দাজমতো পরিমাণে খানিকটা ঘি।

ফর্দমতো উপকরণগুলি সংগ্রহ হলে, রান্নার কাজে হাত ধেবার আগে ছুরি বা বঁটির সাহায্যে পরিপাটিভাবে কুমড়োর ফালিটিকে খোশা ছাড়িয়ে ছ'টুকরো করে কুটে ও পরিষ্কার-জলে আগাগোড়া ধুয়ে নেবেন। তারপর উনানের আঁচে রন্ধন-পাত্র চাপিয়ে, সেই পায়ে আন্দাজমতো পরিমাণে জল দিয়ে কুমড়োর টুকরোগুলি স্ব-সিদ্ধ করে নিন। কুমড়োর টুকরোগুলি আগাগোড়া স্ব-সিদ্ধ হলে, উনানের উপর থেকে রন্ধন-পাত্রটিকে নামিয়ে সবুজ ফুটন্ত-জল থেকে সেগুলিকে অল্প একটি পরিষ্কার পাত্রে তুলে রাখুন। এ কাজ সমাধার পর, পুনরায় উনানের আঁচে রন্ধন-পাত্র চাপিয়ে চিনির রস পাক করে নিন এবং কিছু-ক্ষণ ফোটানোর ফলে, রসটি বেশ ঘন গাঢ় হলেই রন্ধন-পাত্রটিকে নামিয়ে রেখে জুড়োতে দিন।

এবারে ইতিপূর্বে আলাদা-পাত্রে তুলে-রাখা স্বসিদ্ধ কুমড়োর টুকরোগুলিকে বেশ মিহি-ছাঁদে চটকে 'সেই'

বানিয়ে নিয়ে, তার সঙ্গে আটা বা ময়দা, এবং ছোট-এলাচের ও মৌরীর গুঁড়ো মিশিয়ে দিন। তাপের পুনরায় উনানের আঁচে রন্ধন-পাত্র চাপিয়ে, সেই পাত্রে স্থি-গরম করে নিন এবং রন্ধন-পাত্রের ঐ ফুটন্ত-তরল ঘিয়ে গোলাকৃতি মালপোয়ার আকারে একের পর এক কুমড়োর 'মিশ্রণ' ছেড়ে খুন্তীর সাহায্যে কিছুক্ষণ সেগুলিকে নাড়া-চাড়া করে আগাগোড়া স্বচ্ছভাবে ভেজে নিন। ফুটন্ত-ঘিয়ে এমনভাবে ভাজার ফলে, কুমড়োর মালপোয়াগুলি বেশ বাদামী রঙের হলে, সেগুলিকে সযত্নে রন্ধন-পাত্র থেকে তুলে নিয়ে রসের পাত্রে চুবিয়ে রাখুন। অন্ততঃপক্ষে, আধঘণ্টাকাল রসে চুবিয়ে রাখার ফলে, কুমড়োর মাল-পোয়াগুলি যখন আগাগোড়া বেশ টুপ-টুপে হয়ে উঠবে, তখন সেগুলিকে রসের পাত্র থেকে তুলে নিয়ে সাদবে প্রিয়-জনদের পাতে পরিবেষণ করুন। আপনার হাতের রান্না এই অভিনব-মুখরোচক কুমড়োর মালপোয়ার স্বাদে তাঁরা যে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠবেন—সে কথা বলাই বাহুল্য।

আগামী সংখ্যায় এমনি ধরনের আরেকটি বিচিত্র-উপাদেয় ভারতীয় খাবার রান্নার হৃদিশ ধোবার বাসনা রইলো।

আশা কুঁড়ি চোখ মেলে

রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার আশার কুঁড়ি তুমি চোখ মেলে,
বর্ণ ছড়াও, ছড়াও গন্ধ রাজি;
কেন সে ভ্রমর উন্মাদ কিরে গেলো—
ভারে ডাকো আর ভরাও পূজার সাজি।

অলি হলে ডাকো পরাগ পড়ুক হেসে,
হলুদ আভার বীনতা পড়ুক ঢাকা।

লোভাতুর বারা তারিও দেখুক এসে,
কাঁটা নেই এর অথচ চয়ন বাঁকা।

কাঁট সে তো হবে! (কুট সে স্বভাব হোক!)
কাটবে এ ফুলে তার সে সাধা নেই;
মধুলোভী ভরে মধুরস ভরা রোক,
চোখ মেলে কুঁড়ি আমার আশা যে এই।

অনুবাদ সাহিত্য



ম্যাদাম-দ্য-লুসি

অনাতোলে ফ্রাঁস

ঘরের ভিতরে ঢুকেই ম্যাদাম-দ্য-লুসি আমার দিকে হাত বাড়ায়। মূর্তকাল নিস্তক আমরা। ওড়না আর টুপিটা হাতলওয়ালা চেয়ারের ওপর রাখে সে। জানালার কাছে আরো এগিয়ে এসে অন্তরীক রক্তাক্ত সূর্যের পানে তাকায়।

আমিই হুক করি, প্রিয়ে, মনে আছে কি তোমার বছর দুই আগের সেই কথাগুলো—ঠিক এমনি একদিনে এই রকম সময়ে নদীতটলয় সেই পাহাড়ের তলায় বা বলেছি—তোমার দৃষ্টি সেইমিকে একবার কিরিয়ে দেখ—সেখানে কি আছে? নিশ্চয়ই অরণ্যে আছে তোমার, কেমন করে তবিস্ত্র বস্ত্রের তংগিমার ওপরে হাত ছুলিয়ে আমারই সামনে স্বপ্রাক্করের মতো উচ্চকণ্ঠে বলেছি, অপরাধ বিচারের দিন এসেছে। জানো যে তোমায় কত ভালোবাসি আমি। আর তুমিও আমারই সুরে বলেছি, স্তায় আর স্বাধীনতা-লাভে আত্মবিসর্জন দিও। বন্ধু, তোমার হাত পঞ্চাশ চুষন দিয়ে সিক্ত করিনি বটে, কিন্তু সেই নির্দেশ বতদ্র সম্ভব পালন করে এসেছি। তোমার কথামত চলেছি, সংগ্রামের জন্ত লিখেছি বিস্তর আর বক্তৃতাও দিয়েছি অনেক। ঐক্যবোধ শক্তিহীন ঘৃণা নির্বোধ ঐ ক্ষুধিতের জন্তে, কপট লব্ধবোধের বিভ্রান্ত বিগ্রহী জননারক আর তবিস্ত্রের প্রকাশকির হয়ে দু'বছর ধরে লড়াই করেছি।

হাত তুলে ইংগিতে আমার বক্তব্য ধামিয়ে দূরের একটা অশ্লীল ধনি শোনার উদ্দেশ্যে লুসি ইলার করে আমার।

হুজনেই তখনে পাই—পুণ্ডিত বাগানের বিষত প্রান্তর পার হয়ে বহু দূরের চীৎকার,—যত্ন, অভিযান্ত্রিকের কানি দাঁত, শূন্য দাঁত ও কঁক।

বিবর্ণ স্তব্ধ হয়ে ওঠাধরের ওপর একটিবার অংশুলি রাখে সে।

আমি আন্তে আন্তে বলি, সর্বহারী কোনো হতভাগার পিছনে পিছনে তাড়া করে ছুটে আসছে কেউ। প্যারিসের ঘরে ঘরে দিনরাত অহুসঙ্কান আর গ্রেপ্তারির কাজ চলছে। এখানেও জোর করে তারা ঢুকবার হয়ত চেষ্টা করতেও পারে। এখানে থাকার চাইতে আমার সরে যাওয়াই বরং বাঞ্ছনীয়। এ জায়গায় একরূপ অচেতনা আমি। এমন দুর্দিনে তরংকর অতিথি ছাড়া আমি আর কি হতে পারি?

অহরোধ করে সে জানার, চূপ করে ত।

দ্বিতীয়বার সাদ্য আকাশ বিদীর্ণ হয়ে চীৎকার শব্দ আকাশে ওঠে। মিলিত অসংখ্য কণ্ঠধ্বনির সংগে আগেরোত্তরের ঝন্ঝনানি আর পদক্ষেপ শব্দ মিশে বাজে। বিচিত্র ধ্বনি ক্রমে ক্রমে নিকটবর্তী হচ্ছে। তারপরই তখনে পাচ্ছি—একটি কণ্ঠ থেকে চীৎকার ভেসে আসছে, চারদিক ঘেরাও করো যেন দুশমনটা পালিয়ে না যায়।

বিপদের বিতীর্ণতা ক্রমে ক্রমে এগিয়ে আসে বত কাছে, ম্যাদাম-দ্য-লুসি ততই শান্ত, আরো গভীর মনে হয়। দীরকণ্ঠে বলে, চল আমরা তেতলায় বাই। সারির মধ্যে দিয়ে বাইরের সমস্ত কিছুই তাহলে দেখতে পাবো।

কিন্তু দরজা খুলেই দেখতে পাই হৃদয়ে অর্থের এক গলাভক। মুখ তার আঙুলে বিবর্ণ, দাঁতের ঠক্কর শব্দ আর ঠাট্টা দুটির ঠোকাঠকির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। বহুব্যমূর্তি রক্তমরে অশ্রুতে বলে, আমাকে বাঁচান, আমাকে

লুকিয়ে ফেলুন। ওই যে ওরা এলো বলে। আমার বাইরের ফটক ঠেলে তেতরে ঢুকেছে ওরা। আমার বাগান উচনচ্ লগুতগু করছে। ওরা এসে গেছে প্রায়।

‘বৃদ্ধ দার্শনিক প্ল্যানচনেট পাণের বাড়িতেই থাকেন। চিনতে পেরে তাঁকে লুসি কানে কানে বলে, আমার রাঁধুনী কি দেখতে পেয়েছে আপনাকে? মেয়েটি কিন্তু বিপ্লবী জ্যাকোবিন্ দলভূক্ত।

—না দেখতে পায়নি।

—প্রতিবেদী, ভগবানকে ধন্যবাদ দাও।

শোবার ঘরে তাকে নিয়ে যায়। ওদের সংগে আমিও গেলাম। দরকার পরামর্শের। কোনো একটা গোপনীয় স্থানে প্ল্যানচনেটকে সাতদিন কিংবা অন্তত ঘণ্টাকয়েকের জন্তও লুকিয়ে রাখা দরকার যেন সঙ্কানকারীরা প্রত্যাশিত হয়ে প্রাস্ততাবে ফিরে চলে যায়। শেষে এটাই ঠিক করা হয় যে তাদের আগমন পর্যবেক্ষণ করবো আমি এবং ইসারায় যে মুহূর্তে জানাবো, হতভাগ্য লোকটি যেন বাগানের ফটকের ভিতর দিয়ে সংগে সংগে পলায়ন করতে পারে।

কর্ণকাল মাত্র ভ্রলোকটি অপেক্ষারত, কিন্তু পরমুহূর্তেই দাড়িয়ে থাকা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। কারণ এমনই তিনি আতংকগ্রস্ত।

তিনি শুধু আমাদের এইটুকুই বোঝাতে চেয়েছেন যে মসিহ-স্ত-ক্যাজোটে’র সঙ্গে রাষ্ট্রের বিপক্ষে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার জন্তে তাঁকে শিকারীর মতো খুঁজে খুঁজে ওরা বেড়াচ্ছে এবং যেহেতু ১০ই আগষ্ট তারিখে টুইলাবিস একাকারীদের মধ্যে তিনিও অন্ততমরূপে কাজ করেছেন। তিনিই হচ্ছেন রাজার এবং পুরোহিতদের শত্রু। বাস্তবিক এটা একটা কদম্ব অপবাদে’র মতো। লুসিনের বরাবরের একটা ঘৃণা আছে তাঁর ওপরে। লুসিন এখন তো পুরোপুরি কসাই, জল্লাদ। কত শতবার মনে হয়েছে ওই লোকটাকে বিশেষভাবে শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন। হীন প্রকৃতির ঐ নরদামটা বর্তমানে একটা সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সভাপতি। কিছুদিন আগেও সে ছিল একজন সাধারণ হোকানদার মাত্র।

ঐ নায়টি রুদ্ধঘরে বলতে বলতেই তিনি যেন প্রত্যক্ষ করছেন, অসম্ভব করতে করতে লুসিন তাঁর হৃদয়ে এসে

দাঁড়িয়েছে। কিন্তু সত্যিকার ঘটনাটা এই যে সি ডি থেকে কতকগুলো পক্ষপন্থি কানে আসছে। লুসি কিপ্রহায়ে দরজা বন্ধ করেই ঘুমকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে আসে একটা পর্দার পিছনে। ঘরে পুনঃ পুনঃ করাঘাত। রাঁধুনীর কঠোর লুসি চিনতে পারে। দরজা খোলার জন্তে তার ডাকাডাকি। বলে, মিউনিসিপাল কম্‌চারীবৃন্দ জাতীয় রক্ষীবাহিনী নিয়ে ফটকে উপস্থিত, গোটা বাড়িটা খুঁটিয়ে’ তার দেখতে চায়।

রক্ষনকারিনী বলে, ওদের বিশ্বাস, প্ল্যানচনেট্ এই বাড়িতেই আছে। ভালো রকমে আমি জানি ওদের ভুল ধাবণা এটা। আরো জানি, এ ধরণের ছদ্মবৃত্তকে কখনই আপনি আশ্রয় দেবেন না। আমার কথাও ওদের সন্দেহ হচ্ছে না।

দরজা বন্ধ করে মুখ রেখে লুসি লম্বা বেষ্ট, বেশ ভো, উত্তম কথা। আশুক না কেন ওরা ওপরে চলে। ছোট বড়ো সব রকম ঘর থেকে আরম্ভ করে চিলেকোঠা পর্যন্ত সমস্ত বাড়িটাই ওদের দেখতে দিও।

এই কথোপকথনটা শুনতে শুনতে পর্দার পিছনে দাঁড়িয়ে বেচারী প্ল্যানচনেট্, কেমন ধারা মুচ্ছিত মস্তন হয়ে পড়েন। তখন আর কি করারই বা আমার আছে—তাদাতাড়ি কপালে, মুখে জলের ছাঁট দিয়ে দিয়ে অনেক কষ্টে তাঁর জান ফিরিয়ে আনি। জলদী যুবতী ওই সময় প্রাচীন প্রতিবেদীর কানে কানে বলে, বন্ধ আমার বিশ্বাস করো। মনে রেখো—জীজ্ঞাসি সাধারণত কৌশলী।

রোজকার মত বাড়ির কোনো না কোনো কাজে স্থির হয়ে সে নিযুক্ত আছে—এমনি ভাব দেখিয়ে আপন খাটিয়াটাকে সে ঘব থেকে বাইরে টেনে আনে। তারপর বিছানার চাদরপত্র তুলে নিয়ে আমার সাহায্যে এমনভাবে তিনটি ভোবক সাজিয়ে রাখে যে দেওয়ালের পাশে ছুটি উচু ও নীচু পাঁচিল তৈরী হয়ে মধ্যখানে খালি কারাগার মতো খানিকটা ফাঁকা পেকে যায়।

এই সব উন্মোচন আরোজনে যখন সে ব্যস্ত, এমনি সময় অনেকগুলো ছুতো’র মসৃণ শব্দ, চাবীদের কাঠের তৈরী পাড়কার আওয়াজ, বন্ধুর ঠকাঠক নির্মম ধ্বনি আর বহুকণ্ঠের কর্কশ চীৎকারে সিঁড়ির প্রতিটি ধাপই মুখর। আমাদের ডিন জনের পক্ষে এই সময়টা একটা ভয়াবহ

মুহূর্ত। ওদিকে কিন্তু আগুয়ান একটু একটু করে মিড়ি ছাড়িয়ে মেজের ওপর দিয়ে আমাদের মাথার ওপরে ছড়িয়ে পড়ে। মনে মনে বৃষ্টিতে পাচ্ছি আধরা, অস্বস্তিকারীনের একজন অ্যাকোবিন রাঁধুনীর নেতৃত্বে প্রথমত চিলেকোঠাটা ভ্রম ভ্রম করে খুঁজে দেখে। ছাদ কেটে বাওয়ার মতো চড়াং শব্দ করে ওঠে। চোখ-রাঙানো শালানি আর অভয় হাসির শব্দ পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে। গৃহভিত্তির কাঠের আওরণটিকে লাথি আর বেয়নেটের ওঁতো দেওয়ার শব্দ বেশ টের পাচ্ছি। আমরা নিঃশাস ফেলছি বটে, কিন্তু এক মুহূর্ত নষ্ট করার অবকাশ পর্যন্ত মেলে না। প্ল্যানচনেটকে তাড়াতাড়ি চাপাচাপি তৌষক ছুটির মধ্যকার নির্দিষ্ট স্থানের ভেতর ঢুকিয়ে দিতে এই অবসরে কিছুটা আমি সাহায্য করি।

আমাদের এই চেষ্টা সে লক্ষ্য করছে যখন, লুসি সে সময় মাথাটা একটু নড়ায়। এই রকম বিপৎস্থ বিছানা দেখলে যে কোনো লোকেরই মনে সন্দেহ জাগতে পারে।

বিছানাটিকে শেষরক্ষার মতো চেহারার আনতে লাদামত চেষ্টা করে সে। কিন্তু ঠিকমত হয় না। কারণ তক্ষুই স্বাভাবিক অবস্থার ফিরিয়ে আনা যে কতো কঠিন।

সে বলে, বিছানায় শুতে যাচ্ছি। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে, কাঁটায় কাঁটায় সাতটা। মনে হয়, এত সকাল সকাল ঘুমুতে যাওয়া কেমন দেখাচ্ছে। অস্থখের ভান অর্থহীন। অ্যাকোবিন রাঁধুনী এ ছলটা ধরে ফেলবে।

কয়েক সেকেন্ড কি ঘেন চিন্তা করে। তারপর, রাষ্ট্র-স্বাক্ষর ব্যাপার ঘেন কিছুই ঘটেনি—এমনি স্তব্ধভাবে সরল মনে পোষাক পরিচ্ছদ খুলে বিছানার শুতে যায় আর বলে, আমার জুতো জোড়া, কোটটা আর গলাবন্ধ সমস্ত নিয়ে যাও।

আমি বলি, এ রকম আরগায় তোমার পক্ষে আমার প্রেমিক হওয়ারটাই বিশেষ লাভ। ওদের আদার আগে ইতস্তত জড়ান তোমার কাপড়চোপড়গুলো পুনরায় সাজিয়ে ওড়িয়ে রাখার মতো যে সময় দরকার, তা পাওয়া যাবে না হয়ত। তখন কিন্তু তোমার কুক্কিত কেশরাশি এলিয়ে শুধু সাহায্যে কতগুলো পরে দরজা খুলে দিও।

এই সময় বন্দোবস্ত তখনকার মত ঠিক হয়। এরই মধ্যে সন্ধানকারীর দল চিলেকোঠা থেকে নানারকম চীংকার করতে করতে নামতে থাকে—প্রতিজ্ঞা করছি, ধ্বংস চাই।

হতভাগ্য প্ল্যানচনেট ভয়ের চরম আক্ষেপে এমনভাবে কাঁপতে শুরু করে যে গোটা বিছানাটাই নড়বড় করে কেঁপে কেঁপে ওঠে। ঘন ঘন শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ এত স্পষ্ট যে স্থমুখের লম্বা বারান্দা থেকে পর্যন্ত শোনা যায়।

লুসি বিড় বিড় করে বলে, হায়! কি দুঃখের কথা, আমার এই ক্ষুদ্র চাতুরীটায় এখন পর্যন্তও আমরা ভুট। কিছু মনে করো না। নিরাশ কিছুতেই আমরা হবো না। ভগবান আমাদের সাহায্য করুন।

একটা জোরালো মৃগাঘাতে দরজাটা খরখর করে কেঁপে ওঠে।

লুসি জিজ্ঞেস করে, দরজায় কে ঘা দেয়?

—জাতির প্রতিনিধিরা।

—এক মিনিট কি অপেক্ষা করতে পারেন না?

—খোল, নইলে দরজা ভেঙে ঢুকবো।

—বন্ধু! চল, গিয়ে দরজাটা খুলে দিই।

ঘেন কোন অলৌকিক কারণে প্ল্যানচনেটের কম্পন আর হাঁপানি হঠাৎ থেমে যায়।

গলায় স্বাক্ষর জড়িয়ে, পিছনে বর্ষা হাতে জনা বারো লোক নিয়ে প্রথমেই লুসিন প্রবেশ করে। লুসির প্রতি প্রথম দৃষ্টিক্ষেপ করে, তারপর আমার দিকে চেয়ে বলে, মনে হয়েছে, আমরা এক প্রেমিকদ্বয়কে বাধা দিচ্ছি। হে স্বন্দরী! আমাদের ক্ষমা করে। সংগীদের পানে ফিরে বলে, আমরা জানি, লোকের সংগে কেমন করে ব্যবহার করতে হয়। কিন্তু উদার মতামত সত্ত্বেও এই সংগ্রাম প্রত্যক্ষভাবে তার মনে একটা উৎসাহব্যঞ্জক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে।

শব্দ্যর একাংশে বসে ঐ স্বন্দরী সন্ন্যাস মহিলার চিবুক তুলে ধরে সে বলে, পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, ঐ স্বন্দর মুখ থেকে খ্রীষ্টীয় প্রার্থনা দিনরাতের কোনো সময়েই অস্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয়নি। সভ্যই যদি তাই হতো, তাহলে সেটা কত বড়ো দুঃখের ব্যাপার। সমস্ত কিছুকে ছাপিয়ে স্বর্গস্থানীয় আমাদের এই প্রজাতন্ত্র। আমরা বিশ্বাসবাক্য

প্রান্‌চনেটকে খুঁজছি। নিশ্চয়ই এখানে আছে। এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। যেমন করে হোক, তাকে পাওয়া চাই-ই। তাকে ধরে গিলোটিনে লটকাতে হবে। এতে আমার যে বহু ধনসম্পদের মালিক হওয়ার সম্ভাবনা।

ওদেরই একজন বলে, তাহলে তাকে খুঁজে বের করো।

চেয়ার-টেবিলের নিচে, আলমারীর ভেতর তারা অন্বেষণ করে দেখে। বর্শা বিছানার ভেতর ঢুকিয়ে দেয়। বেয়নেটের তীক্ষ্ণ ফলা দিয়ে তোষকগুলো ভালো রূপ পরীক্ষা করে।

লুইস আপন কান চুলকিয়ে একবার আমার দিকে ধৃওভাবে তাকায়। লুইসের ভয়—পাছে আমাকে কোনো একটা বিপজ্জনক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। তাই সে বলে, প্রিয় বন্ধু, এ বাড়ির সব কিছু তো জানো আমারই মতো। চাবিটি নিয়ে মঁসিয়ে লুইসকে বাড়ির সমস্ত জায়গা দেখিয়ে দাওগে। আমি নিশ্চয় জানি—প্রদর্শক হয়ে এই দেশসেবকদের কথামত কাজ করলে চমৎকার আনন্দ পাবে।

তাদের আমি কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে নিয়ে যাই।
* পীকৃত সাজানো কাঠের আঁটিগুলো ওলটপালট

করে তারা দেখে। তারপর অনেকে কয়েক বোতল মদ পান করে। লুইস বন্ধুকের কুঁদো দিয়ে ধাক্কা বেয়ে তরাসদের পিপাগুলোর মুখ খুলে ফেলে। ঘরটি পলকেই মদে প্রাবিত হয়ে যায়। তারপর লুইস চলে যাওয়ার একটা সংকেত দ্বনি করতেই ওরা প্রস্থানোত্তম ভঙ্গীতে দাড়ায়।

তাদের গেট পর্যন্ত পৌছে দিয়ে সকলের সামনেই মদ দ্বন্দ্ব আমি বন্ধ করে দিই। পরক্ষণেই ছুটে বাই লুসিকে খবর দেবার জন্য যে আমরা এখন বিপদমুক্ত।

এই কথাটা শুনেই সে দেওয়ালের পাশে শয্যার ওপর হুঁকে তাকে, মঁসিয়ে প্রান্‌চনেট। মঁসিয়ে প্রান্‌চনেট।

উত্তরে শুধু একটুখানি ক্ষীণ স্বাস্থ্যমাত্র বের হয়ে আসে। আনন্দে সে প্রায় লাফিয়ে ওঠে, ভগবানকে ধন্যবাদ! মঁসিয়ে প্রান্‌চনেট, আপনাদের জন্তেই এতক্ষণ ভয়াবহ আতংকের মধ্যেই কাটিয়েছি। ভেবেছিলাম, আপনি মৃত।

তারপর আমার দিকে চেয়ে সে বলে, বেচারী বন্ধু আমার, মাঝে মাঝে বলতো যে তুমি আমার ভালবাস এবং এতে প্রচুর আনন্দ পাও। আব কখনো কিরে এ কথা বলো না।

অনুবাদক : শ্রীমূলকুমার দাস





কেবলমাত্র নতুন প্রধান মন্ত্রী—

ভারতের প্রধান মন্ত্রী জহরলাল নেহরু হঠাৎ ২৭শে মে বুধবার বেলা ২টার দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে লোকান্তরিত হন। কিছুদিন হইতে তিনি অসুস্থ থাকিলেও মৃত্যুর দিন সকালেও তাঁহার শরীর ভাল ছিল। হঠাৎ শরীর অবসন্ন হয় ও কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তাঁহার অমর আত্মা দেহত্যাগ করে। পরদিন উপযুক্ত মর্যাদার সহিত তাঁহার দেহ যমুনাতীরে তস্মীকৃত করা হয়। তাহার পর ২৯শে মে হইতে নতুন প্রধান মন্ত্রী নিবাচন সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হয়। কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকে. কামরাজ দিল্লীতে ছিলেন—তাঁহার ও বাংলার কংগ্রেস-নেতা শ্রীঅতুলা ঘোষের মর্যাদা চেষ্টা ও বুজির ফলে শ্রীলাল-বাহাদুর শাস্ত্রী পরবর্তী প্রধান মন্ত্রী হির হন ১লা জুন। বলা বাহুল্য অতুলাবাবু বর্তমানে কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির সদস্য এং নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির কোষাধ্যক্ষ। লালবাহাদুর শাস্ত্রী বহু বৎসর কেন্দ্রে মন্ত্রী ছিলেন—কামরাজ পরিকল্পনায় তিনি অস্ত্রান্ত্র মন্ত্রীদের সহিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর পদ ত্যাগ করেন। তাহার পর গত জাহ্নবীর মাসে প্রধান মন্ত্রী কটকে হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়িলে নেহরুজী শাস্ত্রীজিকে মন্ত্রিসভায় গ্রহণ করেন ও সে সময় হইতে লাল-বাহাদুর দপ্তরহীন মন্ত্রীরূপে কাজ করিতেছিলেন। ঐ সময়ে তিনি নেহরুজী কর্তৃক একবার নেপালে ও কয়েক-বার কান্সারে বিশেষ দৃষ্টরূপে প্রেরিত হইয়াছিলেন। ১লা জুন দিল্লীতে কংগ্রেস পার্লামেন্টারী দলের সভায় লাল-বাহাদুর দলের নেতা নির্বাচিত হন। ঐ সভায় বহু প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীও উপস্থিত ছিলেন। নির্বাচন সর্বসম্মত হওয়ার সকলেই উল্লাস প্রকাশ করেন। নেহরুজীর মত নেতার মৃত্যুতে ভারতের মত বিরাট দেশে একজন সর্ব-সম্মতিক্রমে নতুন প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হওয়া সভ্যই আশ্চর্য জনক ব্যাপার বলিতে হইবে। কংগ্রেসদলে বড়ই দলদলি

ও মতভেদ থাক না কেন, ভারতের স্বাধীন প্রতি দৃষ্টি দিয়া সকলে কংগ্রেস-সভাপতি কামরাজ ও অতুলাবাবু এই প্রস্তাবে সম্মতি দান করেন।

প্রধান মন্ত্রী পদের জন্য ৩ জনের নাম হইয়াছিল—(১) শাস্ত্রীজি (২) মোরারজী দেশাই (৩) জগজীবন রাম ও (৪) গুলজারিলাল নন্দ। শ্রীমদ প্রথমেই প্রধান মন্ত্রিত্ব গ্রহণে অসম্মত হন ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীরূপে কাজ করিতে চাহেন। জগজীবন রায়ের নাম বিশেষ সমর্থন লাভ করেন না—অধিকাংশ সদস্য শাস্ত্রীর পক্ষে মত প্রকাশ করার শ্রীদেশাই শেষ পর্যন্ত প্রধান মন্ত্রী হইবার জন্য ভোটাতুটে রাজী হন নাই। কাজেই শাস্ত্রীজি সর্বসম্মতিক্রমে প্রধান মন্ত্রী নির্বাচিত হন।

৮ই জুন নেহরুজীর শোককাল শেষ হইলে ৯ই জুন মঙ্গলবার সকালে রাষ্ট্রপতিভবনের অশোক হলে শ্রীলাল-বাহাদুর শাস্ত্রীর নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যগণ শপথগ্রহণ করেন। নেহরুজীর মৃত্যুর দিন হইতে শ্রীগুলজারিলাল নন্দ অস্থায়ী প্রধান মন্ত্রীরূপে কাজ চালাইতেছিলেন। নতুন মন্ত্রিসভায় ৩ জন নতুন লোককে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে—(১) এম-কে পাতিস (২) শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও শ্রীগজীব রেড্ডী। নেহরুজীর মন্ত্রিসভার সদস্য সংখ্যা ছিল ১৩—এখন সংখ্যা হইল ১৬। পুরাতন মন্ত্রিসভায় সকলেই নতুন মন্ত্রিসভায় যোগদান করিয়াছেন। শ্রীপাতিস পূর্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ছিলেন—কামরাজ পরিকল্পনায় পদত্যাগ করিয়াছিলেন—এখন আবার ফিরিয়া আসিলেন। শ্রীমতী ইন্দিরা নেহরুজীর কন্যা—তাঁহাকে নতুন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী করা হয়। শ্রীরেড্ডী—কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি ও বর্তমানে, অজ্ঞানায়ের মুখ্যমন্ত্রী। তাঁহাকে ও শ্রীমতী ইন্দিরাকে নৃদৈ করিয়া এম-পি হইতে হইবে।

নতুন প্রধান মন্ত্রী শ্রীশাস্ত্রী পররাষ্ট্র ও আর্থিক শক্তি

কমিশনের ভার পাইবেন। (নেহরুজীর উপরও এই ২টি দপ্তরের ভার ছিল।) শ্রীমতী ইন্দিরা তথ্য ও বেতার দপ্তরের ভার পাইবেন। শ্রীমতিজি রেলওয়ে বিভাগ দেখিবেন। তা ছাড়া শ্রীমতী নবগঠিত ইম্পাত ও খনি দপ্তরের ভার পাইবেন। শ্রীমদ্র, শ্রীটি-টি-কুম্ভাচারী, শ্রীশোককুমার সেন, শ্রীচাবন, শ্রীহম্মাউন কবীর, শ্রীচাগলা, শ্রীডি, শ্রীবাবা ও শ্রীমহাবীর ভাস্কর উপর পূর্বে ওঁহারা যে যে দপ্তরে কাজ করিতেন, সেই সেই দপ্তরের ভার দেওয়া হইবে।

ভারী এজিনিয়ারিং ও কারিগরি উন্নয়ন সম্পর্কে একটি নতুন দপ্তর খোলা হইবে—তত্পূর্ব খাত ও কৃষি মন্ত্রী সেই বিভাগ পাইবেন। তত্পূর্ব ইম্পাত মন্ত্রী শ্রীহরপ্রসাদ কৃষি মন্ত্রী হইবেন। শ্রীসত্যনারায়ণ সিংহ সংসদীয় ব্যাপার ছাড়া অসাময়িক বিমান বিভাগের ভার পাইবেন। তত্পূর্ব রেল মন্ত্রী শ্রীদামাশ্রী সেচ ও বিদ্যুৎ শক্তি বিভাগের ভার পাইবেন। এইভাবে নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হইল।

শ্রীশাস্ত্রীতলীক পত্রিকা

ভারতের নবনির্বাচিত নেতা ও প্রধানমন্ত্রী শ্রীলাল বাহাদুর শাস্ত্রীর জন্ম ১৯০৪ সালের ২রা অক্টোবর উত্তর প্রদেশের বারাণসী জেলার এক গ্রামে। কালী বিভাগীর্থে শিক্ষালাভ করিয়া তিনি শাস্ত্রী উপাধি লাভ করেন। ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়া কারাবরণ করেন। ১৯৩০ সালে লবণ সত্যাগ্রহে আড়াই বছর জেল হয়। ১৯৩৫ সালে উত্তর প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও ১৯৩৭ সালে উত্তর প্রদেশ আইন সভার সভ্য হন। ১৯৪০ সালে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ করিয়া আবার জেলে যান; ১৯৪২ সালে আবার ভারত ছাড় আন্দোলনে কারাবরণ ও ১৯৪৬ সালে আইন সভায় পুনর্নির্বাচিত হইয়া মুখ্যমন্ত্রীর পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী হন। ১৯৪৫ সালে কংগ্রেস পার্লামেন্টারী দলের সম্পাদক হন ও ১৯৫৭ সালে পুলিশ ও পরিবহন মন্ত্রী হন। ১৯৫৫ সালে মন্ত্রিসভা ত্যাগ করিয়া নিখিল ভারত কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক হন। ১৯৫৯ সালে রাজ্যসভায় নির্বাচিত হইয়া কেন্দ্রে রেল ও পরিবহন মন্ত্রী হন। ১৯৫৬ সালে কয়েকটি স্থানে রেল দুর্ঘটনার গুরু কেন্দ্রে মন্ত্রিসভা ত্যাগ করেন। ১৯৫৭ সালে

কংগ্রেস দলের নির্বাচন অধিকর্তা হইয়াছিলেন, এই বৎসর দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনে পার্লামেন্টের সভ্য নির্বাচিত হইয়া কেন্দ্রীয় পরিবহন ও যোগাযোগ মন্ত্রী হন। ১৯৫৮ সালে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রীর কার্যভার গ্রহণ করেন ও ১৯৬১ সালে কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী নিযুক্ত হন। ১৯৬১ সালে কাছাড় দ্বোতা, ১৯৬২ সালে কেরল দ্বোতা ও ১৯৬৩ সালে নেপাল দ্বোতা নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৬৩ সালে কামরাজ পরিকল্পনার মন্ত্রিসভা ত্যাগ করেন ও ১৯৬৪ সালের ফেব্রুয়ারীতে জহরলাল কতৃক কেন্দ্রে দপ্তরহীন মন্ত্রী নিযুক্ত হন। এই সময় হইতে কামীরে বহবার প্রধান মন্ত্রীর দূত রূপে প্রেরিত হন। নেহরুজীর জীবনাবসানের পর গত ১লা জুন ভারতের সর্বসম্মত নেতা নির্বাচিত হইয়া ৯ই জুন প্রধান মন্ত্রীর কার্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

১৩টি পণ্যের ফটক নিষিদ্ধ—

১লা জুন কেন্দ্রীয় সরকার এক আদেশ প্রচার করিয়া নিম্নলিখিত ১৩টি পণ্যের ফটক বন্ধ করিয়াছেন। (১) চীনাবাহাম (২) বাহাম ঠৈল (৩) সরিষা বীজ (৪) তিসি বীজ (৫) বাহাম ঠৈল (৬) সরিষা ঠৈল (৭) যেথি (৮) ধনিয়া (৯) তুলাবীজের ঠৈল (১০) তিল ঠৈল (১১) তিসি ঠৈল (১২) অড়হর (১২) ফুল ও (১৩) মৌরী। এই সকল জিনিষের ফটক বাজারে খুব বেশী হইত।

পূঁজিপতির ক্ষমতাপাত কংগ্রেস—

১২ই জুন লক্ষ্যে কংগ্রেসকর্মীদের এক সভায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীগুলজারিলাল নন্দ বলেন—পূঁজিপতির আাজ কংগ্রেসে প্রভুত্ব করিতেছেন—কংগ্রেসের ইহাট প্রকৃত অবস্থা। শ্রীমদ্র বলেন—জৈনিক পূঁজিপতি তাঁহাকে জানাইয়াছেন যে সংসদের ৪১ জন সভ্য উক্ত পূঁজিপতির কথা উঠেন বলেন। পূঁজিপতির অর্থে কয়েকটি রাজ্যে কংগ্রেসের সংগঠনিক নির্বাচন চালানো হইয়াছে। কলে অকংগ্রেসীরা কংগ্রেসে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। শ্রীমদ্র কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী—বর্তমান নতুন মন্ত্রিসভায় তাঁহার প্রভাব বৃদ্ধি। তিনি চেষ্টা করিলে কি এই অবস্থার অবসান ঘটাইতে পারেন না?

রাজ্যসভায়—

রাজ্যসভায় যে নতুন ডক নির্মাণ করিয়া জাহাজভিড়বার স্থান করা হইয়াছে, এই জুন কেন্দ্রীয় সরকার সেই ডকের

বিক্রমপুরের ইতিহাস লিখিয়া খ্যাতি লাভ করেন—পরে ১০ খণ্ড শিত্তারতী সম্পাদন করিয়া বাংলা সাহিত্যের একটি বিক পূর্ণ করেন। তিনি শিত্তারতীর পরিশিষ্ট ৭৩০ ভৈয়ার করিয়া গিয়াছেন—তাহা এখনও প্রকাশিত হয় নাই। তাহা ছাড়া বঙ্গের মহিলা কবি, ভারত মহিলা, নাথক রায়প্রসাদ, মহাপুরুষ বিজয়রূপ প্রভৃতি গ্রন্থ তিনি রচনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি সাহিত্যিক পেন্সন পাইতেন। তাহার ৩ পুত্র ও ৬ কন্যা বর্তমান। তাঁহার স্বয়ং ব্যবহার ও সামাজিকতা তাঁহাকে জনপ্রিয় করিয়াছিল। তিনি দীর্ঘকাল রবিবারের সদস্য ছিলেন এবং তারতবর্ষে তাঁহার বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা তাঁহার অমর আত্মার উদ্দেশে প্রকৃত্তি জ্ঞাপন করি।

আচার্য সুনীতিকুমার—

খ্যাতিমান অধ্যাপক ও কোবিদ আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ৫ বৎসরের জন্ত জাতীয় অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের সভাপতি আছেন। সে কালও করিয়া বাইবেন। এ পর্বত ভারতে ৮ জন জাতীয়-অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন—তন্মধ্যে ৩ জন বাকালী (১) সত্যেন্দ্রনাথ বসু (২) বর্গত শিশিরকুমার মিত্র ও (৩) আচার্য সুনীতিকুমার। তিনি মোট ২৫০০ টাকা বেতন পাইবেন। তিনি মানববিজ্ঞা সম্বন্ধে গবেষণা করিবেন ও কলিকাতায় থাকিবেন। আমরা তাঁহার সুদীর্ঘ কর্মময় জীবন কামনা করিয়া তাঁহাকে প্রভা প্রণাম জানাই।

শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়—

শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় আজীবন দেশ সেবক ও কংগ্রেসনেতা। তিনি ১২ বৎসর সেচমন্ত্রী কাজ করার পর কামরাজ পরিকল্পনার বেঙ্কার মন্ত্রিপদ ত্যাগ করিয়াছিলেন, সম্প্রতি তিনি সর্বসম্মতিক্রমে পশ্চিম বঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস করিটার সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। তাঁহার অমায়িক

সবহার ও নৌজ্ঞ তাঁহাকে সর্বজনপ্রিয় করিয়াছে। তিনি অবিবাহিত।

শ্রীরবীন্দ্রলাল সিংহ—

হাওড়ার খ্যাতিমান কংগ্রেস সেবক শ্রীরবীন্দ্রলাল সিংহ কিছুকাল পূর্বে পশ্চিম বঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস করিটার সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। গত ৪ঠা জুন শিকারী রায় শ্রীহরেন্দ্রনাথ চৌধুরী বেঙ্কার পদত্যাগ করার রবীন্দ্রলাল হুতন শিকারী নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি অবিবাহিত এবং তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধি ও কর্ম শক্তি সকলকে মুগ্ধ করে। আমরা তাঁহার কর্মলাল্য ও দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

সুনীতগোপাল চট্টোপাধ্যায়—

হুগলী জেলার কোরগর নিবাসী খ্যাতিমান দেশ সেবক ও কংগ্রেস-নেতা সুনীতগোপাল চট্টোপাধ্যায় গত ১লা জুন ৬৬ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার পিতা নৈহাটী কাঠালপাড়ানিবাসী কেশবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের জাতি ছিলেন—তাঁহার অগ্রজ শ্রীরামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কাঠালপাড়ার বাড়ী মিল কর্তৃক গৃহীত হইলে কোরগর সি-এস-মুখার্জি স্ট্রীটে বাড়ী কিনিয়া বাস করেন। সুনীতবাবু অবিবাহিত ছিলেন। তিনি সারা জীবন পয়োপকার কার্যে নিজেকে নিযুক্ত রাখিয়াই অকলে জনপ্রিয় ছিলেন।

শ্রীঅজয়কুমার পাল—

খ্যাতিমান আইনজীবী নতুলেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্নী লক্ষ্মীমণি দেবী গত ৫ই জ্যৈষ্ঠ ৮০ বৎসর বয়সে কলিকাতা ৩২ জে সাহিত্য পরিষদ স্ট্রীট বাসভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। লক্ষ্মীমণি সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের বংশে জন্মগ্রহণ করেন ও সম্পর্কে পৌত্রী ছিলেন। তিনি হানসীলা, ধর্মপরাগণা ছিলেন এবং ২ পুত্র ও ৫ কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন।



ছুভোগের দাওয়াই



শ্রী—কি যে হয়েছে ওঁর কিছুই ঠাওরাতে পারছি না।...ক'দিন ধরেই দেখছি, অকস থেকে বাড়ী
কিরে সব সময়েই কেমন যেন মনমরা আর উদ্বাস হয়ে রয়েছেন...তাই আপনাকে টেলিফোন
করে...

ডাক্তার—বটে।... [রোগীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া]...তা, কষ্টটা কি যোগ করছেন এখন,
বলুন তো ?

শ্রী—কষ্ট।...সে আর কি বলবো, ডাক্তার!...সারারাত জেগেই কাটছে ক'দিন...মুহূর্তের জড়ও
ছ'চোখের পাতা এক করতে পারিনে...ছিটে কোঁটাও ঘুম নেইকো আমার!...শিরীর
আবদারের কর্ণ আর কাঁকালো বাক্যবানের ঠেলায় অকস থেকে কিরেই রোজ জ্বাবে
পালিরে আঙা আর তাস-খেলা বন্ধ করে দেওয়া ইত্যক, দেখছি এই ছুভোগ !

ডাক্তার—হ!...তা, এ ছুভোগের আলল দাওয়াই হলো—গৃহীণীটিকে অবিলম্বে তাঁর শিখালরে
পাঠিয়ে দিয়ে রোজ সন্ধ্যার জ্বাবের বন্ধ-বাক্যবানের সাহায্যে বাড়ীতে ডেকে এনে তা,
অলখাবার আর পান লিগারেট খাইয়ে আপ্যায়িত করে তোকা আঠামে আঙায় আসন্ন
ঝাকিয়ে বসবেন।

শ্রী—তাহলেই ওর আগের মতোই রোজ রাতে আবদার ভালো ঘুম হবে ?

ডাক্তার—ঘুম না হোক...মদরটা অন্ততঃ আনন্দেই কাটাবেন।...আপনার আবদার আর উপদেষ্টার
দলগট থেকে স্নেহই পেয়ে তবু ছ'দণ্ড নম্ কলে বীচতে পারবেন তো।

শ্রী—গৃহী দেবশর্মা



জ্যোতিষের আলোচনা

উপাখ্যায়

শুক্র দশমাধিপতি দ্বাদশাধিপতির সঙ্গে সংযুক্ত না সযুক্ত বিশিষ্ট হোলে জাতক মৃত্যুর পর পার্শ্বিক জগতে প্রত্যাবর্তন করে। দ্বাদশাধিপতি রাহু বা কেতুর সঙ্গে অসংযুক্ত ভাবাপন্ন হোলে জাতক বিফলোক হতে ফিরে আসে। নবমাধিপতি ও দশমাধিপতি দ্বাদশে সহাবস্থান করলে জাতক ব্রহ্মলোকে গমন করে এবং সেখান থেকে পৃথিবীতে অবতরণ করে। যদি বৃহস্পতি দ্বাদশে থেকে শুভগ্রহের দৃষ্টি লাভ করে এবং দ্বাদশাধিপতি উচ্চ হর ভাংলে জাতক মোক্ষলাভ করে এবং পৃথিবীতে আর জন্ম গ্রহণ করে না। দ্বাদশাধিপতি এবং দ্বাদশস্থান পাপ-সংযুক্ত ও পাপদৃষ্টি হোলে মৃত্যুর পর জাতকের নরকবাস হয়। দ্বাদশাধিপতি নীচস্থ অথবা নীচস্থ গ্রহসংযুক্ত ও রাহুকেতুর সহিত সযুক্ত বিশিষ্ট হোলে নরকে কষ্ট ভোগ করতে হয়। দ্বাদশে মঙ্গল, শনি, রবি, রাহু এবং দ্বাদশাধিপতি নীচস্থ হোলে জাতক মৃত্যুর পর বিশেষভাবে নরক ভ্রমণা ভোগ করে। দ্বাদশাধিপতি পাপগ্রহসংযুক্ত বা পাপগ্রহদৃষ্টি, পরাক্রান্ত, নীচস্থ ও অতমিত হোলে জাতকের কাগধ ও ভোগ করতে হয়। দ্বাদশে রবি, মঙ্গল এবং রাহু অবস্থান করলে এবং দ্বাদশাধিপতি দুর্বল ও পাপগ্রহ দৃষ্টি হোলে জাতকের অল্প প্রত্যয়ের ঘোব ও দুর্বলতা প্রত্যক্ষ করা যায়। দ্বাদশাধিপতি পাপগ্রহ হর দুঃস্থানগত বা শত্রুগৃহস্থ হোলে এবং পাপ গ্রহের দ্বারা দৃষ্টি বা পাপ গ্রহের সহিত একত্র থাকলে দারিদ্র্যভোগ বটে। দ্বাদশাধিপতি পাপগ্রহের সহিত একত্র থাকলে দ্বাদশে পাপগ্রহ

থাকলে এবং পাপগ্রহের পূর্ণ দৃষ্টি দ্বাদশে পড়লে জাতক নানাদেশ পরিভ্রমণ করে বেড়ায়। দ্বাদশাধিপতি সপ্তমে রাহুর সঙ্গে থাকলে এবং রবি ও মঙ্গলের দ্বারা উচ্চ স্থানে পূর্ণ দৃষ্টি হোলে চুরির জন্ম স্ফুট হয়। রবি, মঙ্গল, শনি এবং রাহুর দ্বারা সংযুক্ত হোলে অথবা মঙ্গলের দ্বারা পূর্ণ দৃষ্টি হোলে দ্বাদশাধিপতি নীচস্থ অবস্থার থাকলে ভৃত্যের দ্বারা বহু অনিষ্ট সাধিত হবে। দ্বাদশাধিপতি অষ্টমে স্থানে থাকলে বিমলাযোগ হয়। এ যোগ শুভগ্রহ। জাতক সুখী স্বাধীন এবং সম্ভ্রান্ত পদাধিষ্ঠিত হয়ে প্রচুর অর্থ লাভ করে।

লগ্নাধিপতি একাদশ স্থানে শুক্র নবমে এবং বৃহস্পতি কেন্দ্রে থাকলে পিতার সৌভাগ্য সম্পদ সুনিশ্চিত। পঞ্চমাধিপতি নবমে স্থানে অথবা নবমাধিপতির সহিত সহাবস্থান বা পূর্ণ দৃষ্টিতে আবদ্ধ হোলে এবং বৃহস্পতি পঞ্চমে থাকলে পুত্রের মাধ্যমে জাতকের সৌভাগ্য সম্পদ লাভ হয়। চতুর্থ স্থান (মাতৃ স্থান) থেকে চন্দ্র বর্জিত, অষ্টমে অথবা দ্বাদশে অবস্থিত হয়ে পাপ গ্রহের দ্বারা দৃষ্টি বা সংযুক্ত হোলে জাতকের পিতার দুইটা স্ত্রী হয়। নবমাধিপতি অথবা রবি, শনি ও মঙ্গলের সঙ্গে সহাবস্থান করলে পাঁচ বৎসর বরসের সময় পিতৃবিয়োগ বটে। দশমাধিপতি নবমে, লগ্নাধিপতি দশমে এবং চন্দ্র পঞ্চমস্থানে থাকলে জাতকের সৌভাগ্য লাভ হয়। দশমাধিপতি শুভগ্রহ হোলে এবং শুভগ্রহের সঙ্গে সহাবস্থান করলে বা দৃষ্টি হোলে জাতক বিশেষ বিখ্যাত ব্যক্তি হয়। শুভগ্রহসং

কেজে বা জিকোণে এবং শুভ দৃষ্টি হোলে অম্লরূপ ফল হয়। দশমাধিপতি রাহুর সঙ্গে অষ্টম স্থানে থাকলে জাতক মনুষ্য-বিদ্বেষী ও কুখ্যাত বর্বর ব্যক্তি হয়। ষষ্ঠাধিপতি কর্ম-স্থানে এবং ভাগ্যাধিপতি দুঃস্থানে থাকলে অম্লরূপ কুখ্যাত হয়। রবি ও শনি দশম স্থানে সহাবস্থান করলে অথবা উক্ত স্থানে পাপগ্রহ থাকলে বা স্থানটি পাপদৃষ্ট হোলে জাতক কুখ্যাত ব্যক্তি হয়। দশমে রাহু বা কেতু থাকলে এবং দশমাধিপতি নীচস্থ হোলে অম্লরূপ ফল ঘটে। আমেরিকার বর্তমান প্রেসিডেন্ট জনসনের দশমস্থানে দুটো অবস্থিত। শুক্র নেপচুনের সঙ্গে অবস্থিত হয়ে হার্গেলের দ্বারা পূর্ণ দৃষ্ট হয়, এজন্য তাঁর পক্ষে কুখ্যাতি বা অপবাদে বোঝা আছে। রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভের জীবন ফুরিয়ে এনেছে, সুতরাং তিনি এখন সমালোচনার বাহিরে।

রবি এবং চন্দ্র শনির দ্বারা এবং চন্দ্র মঙ্গলের দ্বারা পীড়িত হোলে বহুনাংশে তাদের শক্তি ক্ষয় হবে যায়। লগ্ন অথবা লগ্নাধিপতি নেপচুনের দ্বারা, হানেল বা শনির দ্বারা রবি এবং শনি বা মঙ্গলের দ্বারা চন্দ্র পীড়িত হোলে সাহসের দুর্ভাগ্য ব্যাধি ঘটে। মঙ্গল জয়কুণ্ডলীতে মঙ্গল ও শুভ হয়ে দশম স্থানের সঙ্গে সন্ধ করলে জাতক চিকিৎসক হয়। শনির প্রতিকূল অবস্থা হোলে দন্তরোগ ঘটে। কর্কট লগ্নগত চন্দ্রের ওপর শনির পূর্ণ দৃষ্টি থাকলে জাতক কুজ হয়। সপ্তমে শনি থাকলে জাতক পরিচারিকা লোলুপ হয়। রবি, শুক্র ও শনি একত্র থাকলে দুশ্চরিত্র। রবি, চন্দ্র, মঙ্গল ও শনি একত্র থাকলে জাতকের জী কুলটা হয়। চন্দ্র, মঙ্গল, বুধম্পতি একত্র থাকলে অত্যন্ত কাম-প্রবণতা। চতুর্থে মঙ্গল ও বুধ থাকলে বান্ধব রহিত। সপ্তমে বুধ ও শুক্র থাকলে বিবাহ হয় না, তবে শুভগ্রহের দৃষ্টি গেলে বেশী বয়সে বিবাহ হোতে পারে। লগ্নে শনি ও জিকোণে মঙ্গল থাকলে জীর্নবন্ধে উন্নাদ বৃদ্ধি। লগ্নে লগ্নপতি ও সপ্তমে সপ্তমপতি অথবা উভয়েই লগ্নে বা সপ্তমে থাকলে জাতক জাতকাসক্ত হয়। সপ্তমে শুক্র থাকলে জাতক অত্যন্ত কাষুক হয়। চন্দ্র দ্বিতীয়ে বা অষ্টমে থাকলে প্রচুর বর্ষ হয়। দ্বাদশে শুক্র থাকলে জাতক স্বাধীন, অস্বাধীন, গোপাল, শূন্যোপাধি ও পরদারগত হয়। চতুর্থে একত্রিক পাপগ্রহ থাকলে চিত্তের ভিতরে কপটতা। সপ্তমে রবি ও বুধ থাকলে বন্য রোগ হয়। লগ্নে বুধ

ও মঙ্গল থাকলে জাতক চোর হয়। লগ্নে বা অষ্টমে শনি এবং চতুর্থে বা অষ্টমে মঙ্গল থাকলে জাতক মহাপাপী হয়। বুধ বা বুধ লগ্ন হোলে আর তাতে পাপগ্রহ থাকলে বা দৃষ্টি করলে জাতকের টাক রোগ হয়। সপ্তমে বুধ ও রাহু থাকলে দস্তরা জী লাভ। দশমে চন্দ্র ও বুধ থাকলে জাতকের শেষ বয়সে বন্ধুহীন অবস্থা ঘটে। দ্বিতীয়ে চন্দ্র ও মঙ্গল থাকলে ধননাশ। দ্বাদশে রাহু থাকলে জাতক অসহায়ী, পাপবুদ্ধিসম্পন্ন, কপট ও কুলদূষক হয়। সপ্তম ভাব চররাশি হোলে জীলোকের স্বামী প্রবাসী হয়। জীলোকের কোষ্ঠিতে লগ্ন বা চন্দ্রের সপ্তমে বুধ বা শনি থাকলে স্বামী স্ত্রী ব হয়। রবি সপ্তমে থেকে শক্রগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট হোলে জাতিকা পতিতাক্তা হয়। মঙ্গলগ্রহ লগ্ন এবং তাতে শুক্র ও মঙ্গল থাকলে জাতিকা পতিবেশী হয়।

ব্যক্তিগত দ্বাদশ রাশির ফল

মেষ রাশি

কৃত্তিকাভাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম। অধিনীতি ব্যক্তির ফল মধ্যবিধ। ভগ্নীভাত ব্যক্তির পক্ষে অমঙ্গল। শরীর মন্দ বাবে না তবে পিতৃপ্রকোপজনিত কিছু কষ্ট ভোগ। পারিবারিক সুখস্বচ্ছন্দতা। আর্থিকক্ষেত্র মন্দ নয়। বাড়ীওয়ারা, ভূখণ্ডিকারী ও কৃষিকারীর পক্ষে এক-ভাবেই বাবে, কোনপ্রকার ভাল-মন্দ অবস্থা দেখা যায় না। চাকুরির ক্ষেত্র অতীব উত্তম। পদোন্নতি, নতুন পদ-মর্যাদা, প্রতিযোগিতায় সাফল্য প্রভৃতি শেখাও প্রচুর হয়। ব্যবসারী ও বৃত্তিকারীর পক্ষে খোটাছুটি মন্দ নয়। জী-লোকের পক্ষে দুঃসময়। সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে নানাপ্রকার অপ্রীতিকর ঘটনার সম্মুখীন হোতে হবে। জী-ব্যতির প্রকোপ। বিচারী ও পদীকারীর পক্ষে শুভ।

বৃষ রাশি

কৃত্তিকা জাতকের ফল উত্তম। রোহিণী জাতকের ফল মধ্যবিধ। মৃগশিরা জাতকের ফল নিকট কল। পারিবারিক

কর। এমন উৎসব ও লসারি। পিতা প্রকোপ ও উত্তর-
জনিত বর্জ্যতা। পুরাতন বাতপ্রত ব্যক্তির সঙ্কট
প্রয়োজন। আর্থিক দুর্ভিক্ষ হোলে ও অর্থ ঘোড়াটি
হস্তান্তর হবে। ব্যাধিক্য সবচেয়ে সঙ্কট প্রয়োজন।
বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে আশাহরণ
নয়। কিন্তু চাকুরির ক্ষেত্রে আশা প্রদ। ব্যবসায়ী ও
বৃত্তিজীবীর পক্ষে যাবটি মিশ্রকলদাতা। জীলোকের
পক্ষে উত্তম। সামাজিকক্ষেত্রে প্রতিপত্তি লাভ। বিভাবী
ও পরীক্ষার পক্ষে আশাহরণ নয়।

অসুস্থতা-প্রাণি

জাতীয় ব্যক্তির পক্ষে কিছুটা ভালো। সুশিরা
ও পুনর্জন্ম পক্ষে আশা প্রদ নয়। বাহ্যের অবনতি
বর্জ্য না, আহাঙ্গনি বহুকে সতর্ক হোলে পেটের ধোঁসামাল
হবে না। পারিবারিক শান্তি থাকবে। সামান্য ক্ষতি
ও কিছু ব্যাধিক্য হোলেও অর্থাগরবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়।
বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে ভালো
কলা বার না। চাকুরির ক্ষেত্রে তত নয়। উপরওয়ালার
পক্ষে হয় কৃষাকৃষি। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে
অত্যন্ত অসুস্থ। তাহের বিশেষ আর বৃদ্ধি। জীলোকের
পক্ষে অতীব উত্তম। অবিবাহিতাদের বিবাহ যোগ।
জটিলতা ও সামাজিক ক্ষেত্রে অর্থপ্রদ বৃদ্ধি। বিভাবী ও
পরীক্ষার পক্ষে মন্দ নয়।

অসুস্থতা-প্রাণি

পুণ্যজাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম। পুনর্জন্মজাত
ব্যক্তির পক্ষে মন্দ। অসুস্থজাত ব্যক্তির পক্ষে অধম।
যাহা ভালোই, যাহা। সামান্য পারিবারিক কলহ।
সন্তানকে পারিবারিক অসুস্থতার সন্ধান। আর্থিক
অসুস্থতা, কেবল কিছু ক্ষতি। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী
ও কৃষিজীবীর পক্ষে উত্তম। এখানে আর বৃদ্ধি।
চাকুরির ক্ষেত্রে তত। পহোরতি বা অসুস্থ পরিবর্তনের
ইচ্ছা। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে উত্তম।
জীলোকের পক্ষে প্রশস্তি ব্যাপার অতীব মন্দ কেনেই
তত। বিভাবী ও পরীক্ষার পক্ষে মন্দ নয়।

সিহ্নতা-প্রাণি

উত্তরকলনীজাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম, হতার পক্ষে মধ্যম
এবং পূর্বকলনীজাত ব্যক্তির পক্ষে নিকট। বাহ্য ভালোই

বাবে। পারিবারিক শান্তি ও সুখ-সমৃদ্ধতা।
মাসিক অসুস্থতা। আর্থিক অবস্থা উত্তম হবে।
স্পেন্সেলেনেও সাকল্য। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও
কৃষিজীবীর পক্ষে আশা প্রদ নয়। চাকুরির ক্ষেত্রে উত্তম।
কমতাসম্পন্ন ব্যক্তির সহিত বন্ধুত্বের দ্বারা লাভ। পহোরতি
বা পদমর্যাদা লাভ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে
বিশেষ আর বৃদ্ধি ও লাভ। জীলোকের পক্ষে উত্তম নয়।
মন্দ বা চিত্রে নিযুক্ত নারীর পক্ষে অতীব উত্তম। সু-
জননে সাকল্য। বিভাবী ও পরীক্ষার পক্ষে আশা প্রদ।

অসুস্থতা-প্রাণি

উত্তরকলনীজাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম, হতার পক্ষে মধ্যম,
চিত্রার পক্ষে নিকট। পারিবারিক দুর্ভিক্ষতা, বাহ্যের
অবনতি। সামান্য দুর্ভিক্ষতা। বন্ধু ও অসুস্থবর্গের সহিত
কলহ। আর্থিক অবস্থা একই প্রকার। বাড়ীওয়ালা,
ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটি মন্দ নয়। চাকুরির
ক্ষেত্রে ভালো কলা বার না, নানা প্রকার উৎকর্ষ ও অশান্তির
উল্লেখ হবে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে মন্দ।
জীলোকের পক্ষে মাসটি বিশেষ অসুস্থ। খ্যাতি, প্রতিপত্তি
পদমর্যাদা ও প্রভাব প্রতিপত্তি। উত্তমবাহ্য। বিভাবী
ও পরীক্ষার পক্ষে নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি।

ভুলতা-প্রাণি

যাতীজাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম। চিত্রা ও বিশাখাজাত
ব্যক্তির পক্ষে ততাত্ত কল। বাহ্যের অবনতি, দুর্ভিক্ষতা,
অসুস্থতা, পারিবারিক সুখসমৃদ্ধতার অভাব।
আর্থিক অবস্থা মন্দ নয়। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও
কৃষিজীবীর পক্ষে একইভাবে কোন পরিবর্তন নেই।
চাকুরির ক্ষেত্রে উত্তম নয়। কোন প্রতিযোগিতামূলক
পরীক্ষার লক্ষ্যলাভ করবে নেই। ব্যবসায়ী ও বৃত্তি-
জীবীর পক্ষে অতীব উত্তম। জীলোকের পক্ষে তত।
অনেকের পক্ষে বর্তমান প্রসব প্রতিষ্ঠিত হয়। আর্থিকোচ্ছৃঙ্খল।
বিভাবী ও পরীক্ষার পক্ষে তত নয়।

অসুস্থতা-প্রাণি

অসুস্থজাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম, বিশাখাজাত ব্যক্তির
পক্ষে মধ্যম এবং যোড়াজাত ব্যক্তির পক্ষে নিকট। বাহ্যের
অবনতি। পেটের ধোঁসামাল, চোখের অসুস্থতা, পারিবারিক
দুর্ভিক্ষতা, পারিবারিক কলহ, বাহ্যের উৎসব, অসু-

বিচ্ছেদ, শান্তির অভাব। আর্থিক অবস্থা আশঙ্কাজনক নয়, নানাপ্রকারের দ্বি। বাড়ীওয়ারা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মন্দ নয়, সম্পত্তি'ভও সুরচিত হয়। চাকুরির স্থান সুবিধাজনক নয়। উপরওয়ারার বিভাগভাজন হবার সম্ভাবনা, ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে মাসটি শুভাশুভ ফলদাতা। গার্হস্থ্যক্ষেত্রে ছাড়া জীলোকের অজ্ঞাত ক্ষেত্র নৈরাশ্রজনক। স্বাহোর অবনতি। বিচারী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশাশ্রয় নয়।

অশ্রু ক্রান্তি

উত্তরাধারা-জাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম, মূল্যজাত ব্যক্তির পক্ষে মধ্যম এবং পূর্বাধারা-জাত ব্যক্তির পক্ষে অধম। স্বাস্থ্য ভালোই যাবে। পারিবারিক সুখস্বচ্ছন্দতা, কেবল মাত্র জীর সহিত মনকষাকষি ও কলহ বিবাদ। বন্ধুরূপী ছদ্মবেশী মতলববাজ ব্যক্তিদের সংসর্গ পরিহার কর্তব্য। আর্থিক সুখস্বচ্ছন্দতা ও সম্ভাব্যজনক আয়। লাভের অস্বস্তি, নানাপ্রকার অর্থাগম। স্পেকুলেশনে লাভ। বাড়ীভাড়া বৃদ্ধি করায় সাফল্য। বাড়ীওয়ারা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে উত্তম। চাকুরিরক্ষেত্রে বিশেষ আশা প্রদ ও শুভব্যঞ্জক। ব্যবসারে প্রসার এই মাসে বিশেষ শুভকর। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে উত্তম। জীলোকের পক্ষে উত্তম সময়, অবিবাহিতার বিবাহ। বিচারী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

অক্ষয় ক্রান্তি

উত্তরাধারা-জাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম, প্রবণার পক্ষে মধ্যম, ধনিষ্ঠাজাত ব্যক্তির পক্ষে অধম। স্বাহোর অবনতি এবং শারীরিক দুর্বলতা। সন্তানের জন্ম উষ্মকাল, দুর্ঘটনার আশঙ্কা এবং তৎসহ জর। পারিবারিক স্বচ্ছন্দতা থাকলেও মধ্যে মধ্যে মতভেদজনিত কলহ। অর্থাগমের পক্ষে কষ্টভোগ। সুযোগ সুবিধা থাকলেও ঘটনাচক্রে অর্থ-প্রাপ্তির পক্ষে দুর্ভোগ—বাড়ীওয়ারা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে আশাশ্রয় নয়। চাকুরিজীবীর পক্ষে নৈরাশ্র-জনক। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে মন্দ নয়। জীলোকের পক্ষে মাসটি ভালো বলা যায় না। বিচারী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

অশ্রু ক্রান্তি

শ্রুতিজাত ব্যক্তির পক্ষে শুভ। ধনিষ্ঠা ও পূর্ব-

ভাদ্রপদজাত ব্যক্তির পক্ষে আশাশ্রয় নয়। হজমের ব্যাধাত। স্বজনবর্গের জন্ম কিছু পারিবারিক অশান্তি। আর্থিক অবস্থা অশ্রুজল নয়। সময়ে সময়ে নগদ টাকার অভাব। ব্যয়াদিক্য। বাড়ীওয়ারা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটি কষ্টপ্রদ। চাকুরির ক্ষেত্রেও সুবিধা-জনক নয়। উপরওয়ারার বিভাগভাজন। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষেও ওঠাপড়ার মধ্য দিয়ে মাসটি চলে যাবে। জীলোকের পক্ষে উত্তম। অনেকের কল্যাণসন্ধান প্রসব। আর্থিক সুখ-স্বচ্ছন্দতার প্রার্থ্যা। বিচারী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশাশ্রয় নয়।

মীন ক্রান্তি

উত্তরভাদ্রপদজাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম, পূর্বভাদ্রপদজাত ব্যক্তির পক্ষে মধ্যম, রেবতীজাতকের পক্ষে নিকৃষ্ট। স্বাহোর অবনতি যোগ নই। পারিবারিক সুখস্বচ্ছন্দতা ও স্বজনবন্ধুস্বীতি। আর্থিক অবস্থা আশাশ্রয় নয়, তবুও কিছু লাভ যোগ আছে। বাড়ীওয়ারা ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটি বিশেষ ভালো বলা যায় না। প্রথমার্ধে ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে সম্ভাব্যজনক, শেষার্ধে আশাশ্রয় নয়। শিক্ষাবিভাগীয় মহিলাদের উত্তম সময়, বৃত্তিজীবীদের পক্ষেও মন্দ নয়, অজ্ঞাত স্তরের নারীদের পক্ষে আশাশ্রয় নয়। বিচারী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ বলা যায় না।

—

ব্যক্তিগত দ্বাদশ লগ্নের ফল

মেঘলগ্ন—

দেহভাব শুভ। ধনাগম যোগ। ভাগ্যোন্নতি, নিজ-কমতা বৃদ্ধি, সৎসঙ্গের সহিত মনোমালিন্য। ব্যবসা-বাণিজ্যে লাভের আশা ফলবতী হবে না। সম্বললাভ। গুণশুদ্ধি। জীলোকের পক্ষে শুভ। বিচারী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

বৃষলগ্ন—

দেহভাব মধ্যম। হ্রাসবৃদ্ধি সম্পন্ন ধনাগম। ব্যয়াদিক্য। সহোদর ভাব সুবিধাজনক নয়। সহোদরের পক্ষ।

ক্রান্তিবৃত্তের উত্তরে আট অংশ এবং দক্ষিণে আট অংশের মধ্যে যে নক্ষত্রপুঞ্জগুলি দেখা যায় সেগুলিকে একটি চওড়া পটির মত কল্পনা করলে, আকাশের গারে নক্ষত্র খচিত একটি চাকা পাওয়া যাবে। তাকে পৃথিবী থেকে দেখলে মনে হবে যে, সেটি পৃথিবীকে বেড়ি দিয়ে পূর্ব থেকে পশ্চিমে রোজ একবার করে ঘুরে যাচ্ছে। নক্ষত্র খচিত এই পটির চাকাটিকেই “রাশিচক্র” বলা হয়ে থাকে। রাশিচক্র মানে হচ্ছে একাংশ নক্ষত্রের চাকা, অর্থাৎ যে চাকার উপর রাশীকৃত নক্ষত্র দেখা যায়। এই রাশিচক্রের মধ্যে যে সব নক্ষত্রপুঞ্জ আছে, তা ছাড়াও আকাশে অল্প অনেক নক্ষত্র দেখতে পাওয়া যায়, এবং তার মধ্যে সপ্তর্ষি ইত্যাদির মত চের বড় বড় জলজলে নক্ষত্রও আছে কিন্তু তাদের অবস্থানের সঙ্গে কলিত জ্যোতিষের কোন সম্পর্ক নেই। এর কারণ কি? এর কারণ অহুসমান করতে গেলে এইটুকু বোঝা যায় যে, শুধু সেই নক্ষত্রপুঞ্জগুলিরই আমাদের উপর প্রভাব আছে যারা সূর্যের গতিপথ অর্থাৎ ক্রান্তিবৃত্তকে প্রভাবিত করতে পারে। পুনঃ পুনঃ পরীক্ষার দ্বারা এটা স্থিরীকৃত হয়েছে যে, শুধু সেই জ্যোতিষগুলিরই পৃথিবীর উপর প্রভাব আছে যাদের দৃষ্ট ক্রান্তিবৃত্ত থেকে উত্তরে বা দক্ষিণে আট অংশের বেশী নয়। কাজেই ক্রান্তিবৃত্তের উত্তরে ও দক্ষিণে আট অংশ করে ১৬ অংশ চওড়া ভাগগাটিকুর মধ্যে যে সব নক্ষত্রপুঞ্জ আছে তাদের নিয়েই রাশিচক্র কল্পনা করা হয়েছে।

রাশি

রাশিচক্রটিকে সমান বার ভাগে ভাগ করে তার এক এক ভাগের নাম দেওয়া হয়েছে রাশি। সমস্ত রাশিচক্রটি বৃত্ত হিসাবে মাপলে হয় ৩৬০ অংশ। অতএব এক একটি রাশি হয়েছে ৩০ অংশ করে। রাশিচক্রটি গোল, তার আগাগোড়া নেই, কাজেই তাকে ভাগ করতে হলে, একটা জায়গাকে গোড়া বলে মেনে নিতে হয়। রাশিচক্রের মধ্যে চিত্রা (Spica Viginis) নামে একটি খুব উজ্জ্বল তারা আছে। এই চিত্রা তারার ঠিক বিপরীত দিকের বিন্দুটিকে (চিত্রা তারা থেকে ১৮০ অংশ ওকাতে যে বিন্দু সেই বিন্দুটিকে, রাশি চক্রের গোড়া বুলে ধরা হয়েছে। চিত্রা তারা যে সময় পশ্চিম দিকতে অস্ত যায়, ঠিক সেই সময় পূর্ব দিকতে রাশি

চক্রের যে বিন্দুটি থাকে অথবা চিত্রা তারা যে সময় পূর্ব দিকতে উদিত হয়, সেই সময় পশ্চিম দিকতে রাশি চক্রের যে বিন্দুটি থাকে, সেইটাই রাশি চক্রের আদি বিন্দু। এই আদি বিন্দু থেকে রাশি চক্রটি সমান বার ভাগে ভাগ করে এক এক ভাগকে বলা হয়েছে রাশি। গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত এই বারটি রাশির আলাদা আলাদা নাম দেওয়া হয়েছে। নিচে পরপর বারটি রাশির সংস্কৃত ও ইংরাজি নাম এবং তার মানে দেওয়া গেল :—

সংস্কৃত নাম	পাশ্চাত্য নাম	অর্থ
মেঘ—	Aries	ভেড়া
বৃষ—	Taurus	বাঁড়
মিথুন—	Gemini	দ্বী-পুরুষ, দম্পতি
কর্কট—	Cancer	ঠাকড়া
সিংহ—	Leo	সিংহ
কন্না—	Virgo	কুমারী
তুলা—	Libra	নিকি, পাড়িপালা
বৃশ্চিক—	Scorpio	কাঁকড়া বিছা, বিছুর
ধনু—	Sagittarius	ধনুক
মকর—	Capricorn	মকর, হরিণ
কুম্ভ—	Aquarius	কলঙ্গী
মীন—	Pisces	মাছ

উপরে রাশি চক্রের আদি বিন্দু এবং রাশির সংক্ষেপে বা বলা হল প্রাচ্য বা হিন্দু জ্যোতিষবিদেরা কলিত জ্যোতিষের বা কিছু বিচার এই আদি বিন্দু ও রাশি ধরেই করে থাকেন। আদি বিন্দু বা রাশি সংক্ষেপে অল্প দেশে অল্প রকম ধারণাও আছে, কিন্তু আমার মনে হয়, উপরের এই প্রাচ্য ধারণাই চের বেশী বিজ্ঞান-সম্মত। কেন, তা বলছি। আমাদের দেশে আজকাল অনেকে কলিত জ্যোতিষের পাশ্চাত্য গ্রন্থগুলি পড়ে থাকেন। যে গ্রন্থগুলিতে রাশি চক্রের আদি বিন্দু বা রাশি সংক্ষেপে বা ধারণা দেওয়া আছে, তা প্রাচ্য ধারণা হতে ভিন্ন।

উপরে বলেছি, যে ক্রান্তিবৃত্ত আর আকাশ বিবৃহ জায়গার কাটাকাটি করেছে। এই দুটি কাটাকাটির জায়গার দুটি বিন্দুকে ক্রান্তিপাত বলে। এই ক্রান্তিপাতের উপর যেদিন সূর্য আসেন সেদিন পৃথিবীর সব জায়গার দিন আর রাতি সমান হয়। কাজেই বছরের দু’দিন

পৃথিবীর সব জায়গায় ১২ ঘণ্টা দিন আর ১২ ঘণ্টা রাত্রি হয়। একবার দিন রাত্রি সমান হবার পর, দিন ক্রমশঃ বাড়তে থাকে এবং রাত্রি ছোট হতে থাকে। তারপর বতরুর বাড়বার বেড়ে উঠে আবার কমে কমে শেষে আর একবার দিন রাত্রি সমান হয় এবং তা'পর ক্রমশঃ দিন ছোট ও রাত্রি বড় হতে থাকে। তারপর দিন বতরুর ছোট হবার হয়ে, ফের একটু একটু করে বাড়তে থাকে এবং আবার একদিন দিনরাত সমান হয়। এই রকম বরাবর চলে।

পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিদ্যেরা রাশিচক্রে গোড়া ধরেন এই ক্রান্তিপাতকে। দুটি ক্রান্তিপাতের মধ্যে তাঁরা সেই ক্রান্তিপাতটিকে গোড়া ধরেন যেখানে সূর্য আসবার পর আমাদের দেশে (অর্থাৎ ভূ বিম্বের উত্তরের বেশে) দিন ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। এখন এই ক্রান্তিপাতটি ঠিক স্থির নয়; রোজ একটু একটু করে পূব থেকে পশ্চিমে সরে যাচ্ছে। এক বছরে এর গতি ৫০৪ বিকলা। এই গতি যদিও খুব সামান্য, এবং এক আধ বছরে যদিও এতে বিশেষ কিছু যায় আসে না, তাহলেও বেশীদিন পরে এর অনেক তফাৎ হয়ে যায়। প্রায় দেড় হাজার বছর আগে এমন একদিন ছিল, যখন প্রাচ্যদের রাশিচক্রের আদি-বিন্দু এবং এই ক্রান্তিপাত প্রায় ২৩ মংশ পেছিয়ে পড়েছে। অর্থাৎ প্রাচ্যদের মীন রাশির প্রায় ৭ অংশে ক্রান্তিপাত আছে। পাশ্চাত্যেরা এই ক্রান্তিপাতকেই রাশিচক্রের আদি বিন্দু ধরেন।

কাজেই, তাঁদের ধারণায় রাশিচক্র সচল। প্রাচ্যদের মতে যেটা মীন রাশি, পাশ্চাত্যদের মতে তার বেশীর ভাগই এখন মেঘরাশির মধ্যে এবং আরও দেড় হাজার বছর পরে পাশ্চাত্যদের মতে এই মীন রাশির অর্ধেকটা হবে মেঘ এবং অর্ধেকটা হবে বৃষ। তখন প্রাচ্যদের কুন্ত্যরাশির মাঝখান থেকে পাশ্চাত্যদের মেঘরাশির শুরু হবে। ধারা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দুইমতের গ্রহ পড়েন, তাদের অনেকের মনে এই রাশির ব্যাধার নিয়ে একটা বিষয় গালগোপের সৃষ্টি হয়। কাজেই, গোড়াতেই কোন ধারণা বিজ্ঞান-সম্মত ও যুক্তির অঙ্কুল তা ঠিক করা দরকার। আগে বলেছি যে ক্রান্তিবৃত্তের দু'পাশে ৮ অংশের মধ্যে যে নক্ষত্র-পুঞ্জগুলি আছে, তাদের নিয়েই রাশিচক্র কল্পনা করা হয়েছে। অতএব, বুঝতে হবে ক্রান্তিবৃত্তের উপর কতকগুলি নক্ষত্রের প্রভাব আছে, এ আমরা গোড়াতেই মেনে নিছি। এই নক্ষত্রগুলি স্থির, কাজেই রাশিগুলিও স্থির হওয়া দরকার। আমরা যদি স্বীকার করি নক্ষত্রগুলির এক এক রকম প্রভাব আছে, এবং এ যদি স্বীকার করি, যে প্রত্যেক রাশির কতকগুলি অপরিবর্তনীয় বৈশিষ্ট্য আছে, তাহলে রাশি কোন মতেই সচল হতে পারে না।

আজ যে নক্ষত্রগুলি মেঘরাশির মধ্যে আছে, কিছুদিন পরে সেইগুলিই যদি বৃষ রাশির মধ্যে যায়, অথচ রাশিগুলির বৈশিষ্ট্য যে একই থেকে যায়, তাহলে নক্ষত্রের যে কোন প্রভাব আছে, একথা স্বীকার করা চলে না। আর নক্ষত্রের প্রভাব যদি স্বীকার করা যায়, তাহলে পাশ্চাত্যদের কল্পিত রাশির বৈশিষ্ট্য বরাবর সমান থাকতে পারে না। যদি স্বীকার করতে হয় যে নক্ষত্রের প্রভাব আছে এবং রাশির বৈশিষ্ট্য বা কারকতা চিরকাল এক, তাহলে নক্ষত্র ও রাশি দুই স্থির হতে বাধ্য। অতএব রাশির সম্বন্ধে প্রাচ্যদের ধারণা যে যুক্তি ও বিজ্ঞানের অঙ্কুল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। প্রাচ্যধারণাই যে ঠিক সে সম্বন্ধে আরও অনেক যুক্তি ও প্রমাণ আছে, কিন্তু তার উল্লেখ এখানে নিম্নয়োজন।

নক্ষত্র

রাশিচক্রে যেমন আদিবিন্দু থেকে বার ভাগে ভাগ করে এক এক ভাগের নাম হয়েছে রাশি, তেমনি আদি বিন্দু থেকে সাতাশ ভাগে ভাগ করে তা'পুঞ্জের নাম দেওয়া হয়েছে নক্ষত্র। গোড়া থেকে পর পর সাতাশটি নক্ষত্রের নাম নীচে দেওয়া গেল—

[১] অশ্বিনী [২] ভরগী [৩] কৃত্তিকা [৪] রোহিণী [৫] মৃগশিরা [৬] আর্দ্রা [৭] পূর্বাষা [৮] পুষা [৯] অশ্লেষা [১০] মঘা [১১] পূর্বকন্বীনী [১২] উত্তর কন্বীনী [১৩] চিত্তা [১৪] চিত্রা [১৫] স্বাতী [১৬] বিশাখা [১৭] অশ্লেষা [১৮] জ্যেষ্ঠা [১৯] মূল্য [২০] পূর্বাষাঢ়া [২১] উত্তরাষাঢ়া [২২] শ্রবণা [২৩] ধনিষ্ঠা [২৪] শতভিষা [২৫] পূর্বভাদ্রপদ [২৬] উত্তরভাদ্রপদ [২৭] রেবতী

রাশি বারটি, নক্ষত্র সাতাশটি, কাজেই এক এক রাশিতে সওয়া দুই করে নক্ষত্র পড়ে এবং চারটি রাশিতে নয়টি নক্ষত্র পেরে। মেঘরাশি আর অশ্বিনী নক্ষত্রের গোড়া একই জায়গায়, কাজেই মেঘ থেকে চতুর্থাংশি কর্তে যেখানে শেষ হয়েছে, অশ্বিনী থেকে নবম নক্ষত্র আরম্ভ ও সেইখানেই শেষ হয়েছে। আবার মেঘ থেকে পঞ্চম রাশি সিংহ যেখানে আরম্ভ হয়েছে, অশ্বিনী থেকে দশম নক্ষত্র মঘাও সেইখানে আরম্ভ। কাজেই সিংহ থেকে চতুর্থাংশি যুক্তি যেখানে শেষ হয়েছে, মঘা থেকে নবম নক্ষত্র জ্যেষ্ঠাও সেইখানে শেষ হয়েছে এবং ধনু রাশি ও মূল্য নক্ষত্র আরম্ভ হয়েছে একই জায়গায়।

রাশি আর নক্ষত্রের এই সম্বন্ধ স্থায়ী হতে পারে না, যদি না নক্ষত্রের মত রাশিও স্থির হয়।

রাশিচক্রে ২৬০ অংশ সূত্ররায় এক একটি রাশি ৩০ অংশ এবং এক একটি নক্ষত্র ১০ একের ষ্ট্রিন অংশ]

জহরলাল নেহেরু

যিনি ১৯১১ সালে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করে মহাত্মা গান্ধীর দক্ষিণ হস্তরূপে দীর্ঘ ২৫ বৎসরকাল সে আন্দোলন পরিচালন করিয়াছিলেন ও ১৯৪৬ সালে নতুন কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত হইলে প্রধানমন্ত্রীর কার্যভার গ্রহণ করিয়া ১৯৪৭ সালের ১৭ই আগষ্ট হইতে ১৯৪৮ সালের ২৭শে মে পর্যন্ত সুদীর্ঘ ১৭ বৎসরকাল ভারতের কর্তৃপক্ষরূপে ভারতের ৪০ কোটি নর-নারীর ভাগ্য বিধাতা ছিলেন, তিনি সহস্রা ২৭শে মে বুধবার সকাল সাড়ে ৬টার অস্থূহ হইয়া অজান হইয়া যান এবং বেলা ২টার তাঁহার মহাপ্রয়াণ



জহরলাল

ঘটিয়াছে। তিনি তৎপূর্বে ৪ দিন ডেরাডুনে থাকিয়া বিজ্ঞান লাভ করেন—সঙ্গে ছিলেন কস্তা ইন্দিরা গান্ধী। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বিমানে দিল্লীতে ফিরিয়া আসেন—বিমান বন্দর হইতে শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী তাঁহার সঙ্গে আসেন—সন্ধ্যায় ভারতের শাসন সম্বন্ধে বহু আলোচনা করেন। অস্থূহ ও প্রফুল্ল জহরলাল রাত্রির আহার শেষ করিয়া নিজা ঘান। তোরে উঠিয়া কাগজপত্র পড়েন—এবার হইতে ওষধ কয়েকবার বাতায়িত করেন—সাড়ে ৬টার হঠাৎ অজান

হইয়া পড়েন। জ্ঞান আর ফিরিয়া আসিল না। সব শেষ। ৭৫ বৎসর বয়স্ক কর্মঠ, সবল জহরলাল ভারতের ৫০ কোটি মানুষের মায়া—বাহারা জহরলালকে ভালবাসিত এবং বাহাদের জহরলাল শুধু ভালবাসিতেন না, বাহাদের মঙ্গলের জন্য তিনি অবিজ্ঞায় পরিশ্রম করিতেন—রাত্রিকালে নিজা ঘাইতেন না—অতি অল্প সময় মাত্র শয্যাগ্রহণ করিতেন—বাহাদের সকল প্রকার উন্নতি বিধান তাঁহার সর্বদা চিন্তার বিষয় ছিল—সকলের কথা তাঁহাকে বিস্মৃত হইতে হইল।

১৯৬১ সালের জাগ্রদারী মাসে তুবেনখর কংগ্রেসে বাইয়া তিনি অস্থূহ হইয়া পড়েন—তাঁহার পর দীর্ঘ ৫ মাস কাল তিনি অস্থূহ শরীর লইয়াই প্রধানমন্ত্রীর কাজ করিয়া গিয়াছেন—শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী কামরাজ পরিকল্পনার নির্দেশে কয়মাস পূর্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কার্য ত্যাগ করিয়াছিলেন—অস্থূহ জহরলাল তাঁহার ৪০ বৎসরের সহকর্মী বন্ধু লালবাহাদুরকে ডাকিয়া আনিয়া দপ্তরহীন মন্ত্রী নিযুক্ত করিয়া—যে কাজ নিজে করিতে পারিতেন না—লালবাহাদুরকে দিয়া সে সব কাজ করাইয়া লইতেছিলেন—তাঁহার বিশ্বাস ছিল, শরীর আবার ভাল হইবে এবং তিনি পূর্ণ দায়িত্ব লইয়া আবার কাজ করিবেন।

১৯৬৬ সালে তাঁহার পত্নী কমলা নেহরু একমাত্র কস্তা ইন্দিরাকে রাখিয়া পরলোকগমন করেন—পরে ইন্দিরার স্বামী ফেরোজ গান্ধীও পরলোকগমন করিয়াছেন—বর্তমানে ২ দৌহিত্র রাজীব ও সঞ্জীব বর্তমান।

১৮৮৯ সালে ১৪ই নভেম্বর এলাহাবাদে জহরলাল জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মতিলাল নেহরু খ্যাতনামা আইনজীবী ছিলেন—মাতার নাম স্বরূপরানী। মতিলালের পিতা ১৮৬১ সালে মারা যান—তাঁহার কয়েক মাস পরে মতিলালের জন্ম হয়। মতিলালের অগ্রজ নন্দলাল মতিলালকে দেখাশুনা করিতেন। মতিলাল বি-এ পাশ না করিয়াই তকীল হন এবং জীবনের প্রথম ভাগ হইতে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। জহরলালের জন্ম সময়েই তিনি ধনী হইয়াছেন, তবে পরবর্তীকালে তাঁহার উপার্জন এত বাড়িয়া

যায় যে তাহা উত্তর ভারতের লোকের গল্পকথা হইয়াছিল। আন্দোলনে যোগদান করে তিনি প্রথম কারাবরণ করেন ও

১০ বৎসর পূর্বে মতিলালের বাসগৃহ এলাহাবাদের আনন্দ-ভবন ও তাহার আসবাবপত্র দেখিলেই তাহা বুঝা যাইত।

জহরলালের বয়স যখন ১০ বৎসর তখন মহীয়সী মহিলা এনি বেসাণ্ট কর্তৃক প্রেরিত ফার্ডিনাও ব্রুক্স নামক এক ইংরাজ ডক্টরলোক তাঁহার গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন। ব্রুক্সের নিকট ৫ বৎসর শিক্ষালাভের পর ১৫ বৎসর বয়সে তিনি বিলাতের হারো স্কুলে প্রেরিত হন। হারো স্কুল বিলাতে সম্ভ্রান্ত ও ধনী পরিবারের ছেলেদের অগ্র স্থাপিত ছিল। তথায় ২ বৎসর পড়িয়া তিনি কেম্ব্রিজ কলেজে ভর্তি হন এবং কেমব্রিজ, জিওলজি ও বটানি পড়িয়া ১৯১০ সালে কেমব্রিজ হইতে ডিগ্রী পরীক্ষায় পাশ করেন। সেখানে বিপিনচন্দ্র পাল, লাল লালমণ্ড রায় ও গোপালকৃষ্ণ গোখলে তাঁহার সময়ে কেম্ব্রিজে বক্তৃতা করিতে গিয়াছিলেন। কেম্ব্রিজে দেশপ্রিয় স্বামীমোহন সেনগুপ্ত, নইফুদ্দীন কিল্লু, সৈয়দ মামুদ প্রভৃতি জহরলালের সহপাঠী ছিলেন। তৎপরে ২ বৎসর বিলাতে থাকিয়া ১৯১২ সালে জহরলাল ব্যারিষ্টারী পাশ করেন ও দেশে ফিরিয়া আসিয়া ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করেন। ১৯১৬ সালে বসন্ত পঞ্চমীর দিন দিল্লীতে কমলা কাউলের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

বিলাতে কয় বৎসর থাকার সময় তিনি রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হন এবং একবার সেখানকার সাধারণ নির্বাচন দেখিয়া রাজনীতি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করেন। তিনি বাল্যজীবন হইতেই গ্রন্থকীট ছিলেন এবং হারো ও কেম্ব্রিজে থাকার সময় রাজনীতি সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন। দেশে ফিরে তিনি ১৯১২ সালের শেষ দিকে বাকিপুর কংগ্রেসে ও ১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে যোগদান করেছিলেন। ঐ সময় সিমলায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সহিত সাক্ষাৎ হয় এবং তিনি এলাহাবাদে ফিরে কিষাণ আন্দোলনে যোগদান করেন।

বিরাট ধনী পিতার পুত্র জহরলাল এত দিন ভারত-বাসীর দুঃখ দুর্দশার কথা পুস্তকেই পাঠ করিতেন, কিষাণ আন্দোলনে যোগদান করিয়া তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া দরিদ্র দেশবাসীদের প্রকৃত অবস্থার কথা প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন। ১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাতের পর হইতে তাঁহার জীবনের পরিবর্তন শুরু হয় ও ১৯১৮ সালে তিনি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য হন। ১৯২১ সালে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ

পরে ১৯২৩ সালে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক হইয়া পুনরায় গ্রেপ্তার হন। ১৯২৩ সালের জাহ্নসারীতে মুক্তি লাভের পর তিনি বিলাত যান ও ১৯২৬ সালের শেষে কেম্ব্রিসে নিপীড়িত জাতিসমূহের কংগ্রেসে ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে যোগদানের পর ভারতে ফিরিয়া আসেন।

১৯২৯ সালে তিনি প্রথম কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন—পূর্ব বৎসর ১৯২৮ সালে তাঁহার পিতা মতিলাল নেহরু কংগ্রেসের সভাপতি হইয়াছিলেন। জহরলাল ৬ বার কংগ্রেস সভাপতি হন—১৯২৯, ১৯৩৫, ১৯৩৭, ১৯৩৯, ১৯৫৩ ও ১৯৫৪ সালে। এত বার আর কেহ কংগ্রেস-সভাপতি হন নাই। ১৯৫৮ সালে জহরলালের কন্যা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কংগ্রেস সভাপতি হইয়া ছিলেন।

১৯৪২ থেকে ১৯৫৫ তিন বৎসর কারাবাসের পর জহরলাল মুক্তি লাভ করিয়া ১৯৪৫ সালেই আজাদ—হিন্দ ফৌজের বিচারে ব্যারিষ্টারী করেন। ১৯৪৭ সালে তিনি নয়াদিল্লীতে এশিয়া সম্মিলন আহ্বান করেন। ১৯৫৫ সালে ভারতের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রচনার পর তিনি ইহা ব্যাখ্যা করিয়া বক্তৃতা করেন। ঐ বৎসর বাল্মুকী সম্মিলনে যোগদান করিয়া ভাষণ দেন। ঐ বৎসর সোভিয়েট দেশ ও পূর্ব ইউরোপ ভ্রমণ করেন। ১৯৫৫ ডিসেম্বর ভারতে রূপ নেতা ক্রুশ্চেভ ও বুলগারিয়ার সদর্দন করেন।

নেহরু সারা জীবন কত বক্তৃতা করিয়াছেন তাহার সংখ্যা নাই—সাপারগ নির্বাচনে তিনি এক এক দিন ৭৮টি করিয়া বক্তৃতা দিতেন। মোটরে ও পেনে সারা ভারতের গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। ১৯৬৩ সালের জাহ্নসারী মাসে ভুবনেশ্বর কংগ্রেসে যাইবার পথে ও ২১৩ দিন বহু স্থানে ভাষণ দিয়াছেন।

তিনি কখন ও ক্লান্ত হইতেন না। একবার কংগ্রেস অধিবেশনের সময় কয়েকজন বাঙ্গালী নেতা ১৫ মিনিটের জন্য তাঁহার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিলে তিনি রাত্রি ১টা (ডিসেম্বর মাসে) তাহাদের সহিত দেখা ও আলোচনা করেন। বাড়ীতে কয়েকজন ঠোনোগ্রাফার থাকিত, সারা রাত্রি (২১৩ ঘণ্টা নিদ্রা বাদে) তিনি অনেক সময় তাহাদের ডিক্টেশন দিতেন। লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে বাইয়া সকলের সহিত কথা বলিতেন। কল্যাণী কংগ্রেসে তাঁহাকে ভীষণ ভিড়ের মধ্যে বাইয়া সকলকে শান্ত করিতে দেখা গিয়াছে।

শেঙ্গুয়ার

উপাচার্যী শ্রীহরিশ্রম বন্দ্যোপাধ্যায়

তোমার রচনা কবি, বত পাঠ করি,
বত মরি,
তত মনে হয়
কবি তুমি নয়,
বিশ্বের বিশ্ব তুমি, তুমি জাহ্নবী !
মহা শক্তিধর
লেখনী তোমার ।
সে বেন মায়ার কাঠি স্পর্শ মাত্র যার
প্রাণহীনে প্রাণ দেয়, নিখিলে আগার,
উত্তম আশায়
সহজ মাত্রে দেয় উন্নত করিয়া ।

কুহর কোমল বাহা ছিল নারী হিয়া
আচম্ভিতে ধরে ভিন্ন বেশ,
দেয় উপদেশ
সকল মানব ধর্ম দিয়া জলাঞ্জলি
আপনার মাত্র অতিথিরে নিজ হাতে দিতে বলি ।
বলে দর্প ভরে,
উচ্চাকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ করিবার ভরে,
জনহর্য অসহায় আপন তনয়—
বলি প্রয়োজন হয়
বন্ধ হতে ছিন্ন করি আপনার হাতে
চূর্ণ করি দিতে পারে নিষ্ঠুর আঘাতে ।

বেধা ফুটেছিল শুষ্ক প্রাণের জ্বল
সৌরভে অতুল,
হৃৎসার সরল হৃদয় বেঁধেছিল শ্রীতির বন্ধনে,
ভাগ্য দোষে কি কুক্ষেপে
কুচক্রীর বিষদৃষ্টি পড়িল যেমন
ঈর্ষ্যহুট প্রণয়ীর মন
ধরিল বিভিন্ন রূপ
বিকৃত বিকল্প,
কুহর কোরক নয় নির্মলা বালায়
নিজ হতে নিল প্রাণ হাস ঘোষি তার ।

বাহারে আঁকিলে তুমি অতি অজ্ঞান মন,
কুনীলজীবী, লোভী ও রূপণ,
অকস্মাৎ কি খেয়াল হল মনে,
সেই জনে
সাজালে নতুন করি ।
মরি মরি,
মুখেতে নতুন ভাষা, মন তার স্বর,
হৃদয় বিদারী কিবা
বেদনা আত্মর—
নির্ঘাতন ক্রিষ্ট কীর্ণ মূর্ত্তিখানি তার
পলকে হরিয়া নিল হৃদয় সবার ।

তোমার মায়ার কাঠি শক্তির আধার—
নাট্যগুলি দেয় তব পরিচয় তার ।
ভাষার বন্ধনে
মানবের হৃদয়ের সকল স্পন্দনে
অন্যায়ালে বাঁধিলে সকলি ।
তব কথা বলি,
বিশ্ব মানবের মনে
জাগে আর লয় হয় ক্ষণে ও অক্ষণে,
বত ভাব, বত ব্যাখ্যা,
আকৃতি ও আশা,
দিল তারে ভাষা ;
অনবদ্য ছাতি তার, হৃদয় মধুর
বিশ্ব মানবের মন করিল বিধুর ।

আজি কবির,
তব জনমের চারি শতবর্ষ পর,
তাই হেরি
তব স্মৃতি তর্পণের তেরি
বাজে এই বিশেষ দিনে, দেশে দেশে ;
প্রতিধ্বনি তার
বিশ্বের বাতাসে হেলে,
করেছে সুগম
বিশ্বের আকাশখানি, ওগো জাহ্নবী ।

পাট ও পাঁচ

খ্রীঃ—

॥ তথ্য ও চিত্র ॥

মহাত্মা গান্ধী একথা বলেছিলেন, ‘আমার জীবনই আমার বাণী’। শুধু কথার মধ্য দিয়ে নয়, তাঁর সমগ্র জীবনব্যাপী কর্ম সাধনার মধ্য দিয়েই গান্ধীজী তাঁর বাণীকে রূপায়িত করে গেছেন—উদাহরণ স্বরূপ রেখে গেছেন তাঁর কঠোর সাধনা-সমৃদ্ধ জীবনের পূত কাহিনী ভারতের অপামর জনসাধারণের জন্ত—তাদের পথ দেখাবার, বিপদে সাহস দেবার, সত্যপথে অবিচলিত নির্ভর অগ্রসর হবার প্রেরণা দেবার জন্ত। গান্ধীজীর জীবন-কাহিনী যেন ভারতেরই মর্মবাণী।

ভারতের আর একজন মহান সন্তান সম্বন্ধেও আজ ঐ কথাই বলবার দিন এসেছে। ভারতের এই সুসন্তান মহাত্মা-জীরই মন্ত্রশিষ্য, নবীন ভারতের শ্রুতা, বিংশশতাব্দীর অন্ততম মহামানব পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। গান্ধীজীর মতন নেহরুজীও কঠোর কর্মসাধনার মধ্য দিয়ে তাঁর জীবনকে অতিবাহিত করেছেন এবং কর্মের মধ্যেই এই অক্লান্ত কর্মবীর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। কর্মই ছিল তাঁর জীবন, তাঁর ধ্যান, তাঁর জ্ঞান। দেশ সেবক রূপে, কর্মীরূপে, নেতাক্রমে, প্রধানমন্ত্রীরূপে সর্বসময়ই তিনি অক্লান্তভাবে কর্ম করে গেছেন ভারতের স্বাধীনতার জন্ত, ভারতের সমৃদ্ধির জন্ত। নিজের স্বথ, শান্তি, স্বাস্থ্যকে চরম অবহেলা করে তিনি বিশ্বের শান্তির জন্ত চেষ্টা করে গেছেন আশ্রয়। তাই আজ সমগ্র বিশ্ব তাঁর বিরোগে বেদনা-বিধ্বংস।

স্বাধীনতা-পূর্ব যুগে গান্ধীজী ভারতকে দিয়ে এসেছেন নেতৃত্ব। গান্ধীজীর অবর্তমানে স্বাধীনতা-পরবর্তীযুগে নেহরু-

জীর নেতৃত্বে ভারত অগ্রসর হয়েছে দৃঢ় পদক্ষেপে, উন্নত শিবে, সমস্ত বাধাবিরুদ্ধে সবলে সরিয়ে দিয়ে। ভারতের এই দুই মহামানব—এই গুরুশিষ্যের সংঘ-সম্মেলন, সাধনা-সমৃদ্ধ জীবনের কাহিনী ভারতের অমূল্য সম্পদ। এই সম্পদকে রক্ষা করার দায়িত্ব ভারত সরকারেরই শুধু নয় ভারতের তথা বিশ্বের অপামর জনসাধারণেরও। আর এই জীবন-কাহিনী শুধু বর্তমানের জন্তই নয়, এর থেকে প্রেরণা পাবে, নির্দেশ পাবে অনাগত কালের বংশধরগণও। তাই এই দুই মহান নেতার জীবনকে পুস্তকের মধ্য দিয়ে, সাহিত্যের মধ্য দিয়ে, শিল্পের মধ্য দিয়ে, সজ্জা সজল কিছু মধ্য দিয়েই বাঁচিয়ে রাখতে হবে ভবিষ্যতের জন্ত। তবে আধুনিক যুগের সবচেয়ে কার্যকরী ও জনমনের ওপর প্রভাব সৃষ্টিকারী শিল্প হচ্ছে চলচ্চিত্র। তাই, এই চলচ্চিত্রকেই সর্বোপযোগী এগিয়ে আসতে হবে এই মহান দায়িত্ব গ্রহণ করতে। চলচ্চিত্রে জীবনীচিত্র রূপে ঠিকমত রূপায়িত করতে পারলে এই দুই মহাপুরুষের জীবন-কাহিনী দীর্ঘস্থায়ী হবে এবং সর্বত্র একাধিকবার প্রদর্শিত হয়ে জনমনেও প্রভাব সৃষ্টি করতে পারবে।

গান্ধীজীর প্রামাণ্য জীবনী-চিত্র নির্মাণের একটি প্রধান অসুবিধা হচ্ছে তাঁর জীবদ্দশায় প্রামাণ্য চিত্র গ্রহণের বিশেষ চলন না থাকায় এবং বিশেষ করে পরাধীন ভারতের বিপ্লবী নেতার চলচ্চিত্র গ্রহণে বিদেশী সরকারের আগ্রহ না থাকা প্রভৃতি নানা কারণে, তাঁর চলচ্চিত্রে তোলা চিত্র বেশী নেই। কিন্তু নেহরুজীর ক্ষেত্রে এ অসুবিধা একেবারেই নেই। স্বাধীন ভারতে চলচ্চিত্রের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভারত সরকারের “ফিল্মস ডিভিসন”-এর প্রবর্তনের জন্ত তথ্য ও সংবাদ-চিত্রের মাধ্যমে নেহরুজীর অসংখ্য চিত্র ভারত সরকারের “ফিল্মস ডিভিসন”-এর ভাণ্ডারে সঞ্চিত আছে। তার থেকেই সুযোগ্য সম্পাদনার নেহরু জীবনের একটি সুন্দর সুসঙ্গত প্রামাণ্য চিত্র নির্মাণ করা সম্ভব। এর মধ্যেই নেহরুজীর শোক বাজা, তম্র নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি করেকটি সংবাদ-চিত্র নির্মিত হয়ে প্রদর্শিতও হয়েছে। “ফিল্মস ডিভিসন” নেহরুজীর জীবনী অচলমানে একটি তথ্য চিত্রও নির্মাণ করেছেন বলে জানা গেছে। এগুলি খুবই প্রশংসনীয় ও সমরোপযোগী সম্বন্ধে

নেই। কিন্তু এতে আশ্রয়ের মন ভরছে না। জাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, অমলতা গুপ্ত, এই বিশ্ব-বন্দিত মহান নেতার একটি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের জীবনী-চিত্র। যে চিত্র নির্ভা, একাগ্রতা, সাধনা ও সর্বোপরি জগৎপরিচালনার দ্বারা স্বেচ্ছাবে নির্মিত হয়ে ভারতকেই শুধু নয় বিশ্ব-বাসিকেও দেবে শান্তির নির্দেশ, কর্মের প্রেরণা। আমরা এই মহাজীবনেব এই রকম এক মহাচিত্রের অপেক্ষায় আছি।

অমলতা গুপ্ত

জীবনী-চিত্র পরিচালনায় শ্রীমু বহু সিদ্ধান্ত। এবার তিনি হাত দিয়েছেন ছবি বহিরের জীবনী-চিত্রে। তিনি এখন ছবিখানির চিত্রনাট্য রচনার ব্যাপ্ত আছেন।

অভিনেত্রী-পরিচালিকা মঞ্জু দে 'রক্তজবা' নামে এক-খানি ছবি তৈরীর পরিকল্পনা নিয়েছেন। ছবিখানি প্রযোজনা করবেন শ্রীমতী দে নিজেই এবং তিনিই এই ছবিতে নায়িকার ভূমিকায়ও অবতীর্ণ হবেন। তাঁর দ্বিপরীতে নায়কের চরিত্রে থাকবেন সত্যবন্ত বসন্ত চৌধুরী।

শ্রীকৃষ্ণ পিকচার্স 'বাহাদুর' পর যে ছবিটির প্রযোজনায় হস্তক্ষেপ করছেন সেটি গড়ে উঠবে সুবোধ ঘোষ রচিত 'তাপসী' উপন্যাস অবলম্বনে।

এই উপন্যাসের নাট্যরূপ বর্তমানে রক্তজব ও অভিনীত হচ্ছে।

'কিন্ম গিত'-এর অসিত সেন পরিচালিত "তুকা" নামক ছবিখানির চিত্রগ্রহণ আরম্ভ হয়ে গেছে। বিশ্বজিৎ ও জ্যোৎস্না বিখ্যাত ছবিখানির মুখ্য চরিত্রে রূপদান করছেন। চিত্রটি সঙ্গীত পরিচালনা করবেন জ্ঞানেন্দ্র মিত্র।

গৌর শ্রী-র কাহিনী 'পতি সংশোধনী সমিতি'-র যে চিত্ররূপ দেওয়া হচ্ছে তার নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় আছেন লতীজ চট্টোপাধ্যায় এবং নবাগতা রূপা প্রদান।

শান্তিবরণ, পাহাড়ী সান্তাল, জহর রায় প্রভৃতি।

"প্রোডাকশন্ সিঙ্কিট"-এর "নতুন তীর্থ" চিত্রটির কাজ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হচ্ছে। বিহারক তট্টাচার্যের একটি গল্প অবলম্বনে চিত্রটি নির্মিত হচ্ছে। প্রধান দুটি চরিত্রে অভিনয় করেছেন উত্তমকুমার ও হলতা চৌধুরী। অন্তান্ত শিল্পীর মধ্যে আছেন হলিনা দেবী, ছায়া দেবী, ভগতী ঘোষ, জহর গঙ্গোপাধ্যায়, জীবনেন বসু, তরুণকুমার প্রভৃতি। জহর মুখোপাধ্যায় চিত্রটি পরিচালনা করছেন, আর জহর দিচ্ছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

'কে-এম-বি পিকচার্স'-এর প্রথম প্রয়াস 'নিষিধান'-এর সঙ্গীত গ্রহণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। গানগুলিতে কণ্ঠদান করেছেন লক্ষ্মী মুখোপাধ্যায়।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করছেন প্রফুল্ল চক্রবর্তী।

অরোরা কিন্ম কর্পোরেশনের সঙ্গীতবহুল চিত্রার্থ্য "রাধাকৃষ্ণ" বর্তমানে মুক্তিপ্রতীকার রয়েছে। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ তত্ত্ব রচিত চিত্রনাট্য অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করেছেন অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় এবং স্বারোপ করেছেন রথীন্দ্রনাথ ঘোষ। ২০খানি গান ছবিটিতে সংযোজিত হয়েছে। গান-গুলি গেয়েছেন ধনঞ্জয়, মানবেন্দ্র, সতীনাথ, পান্নালাল তট্টাচার্য, লক্ষ্মী মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা, উৎপলা, রাধী চট্টোপাধ্যায়, হুমিতা ও মানস মুখোপাধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকার চরিত্রে রূপদান করেছেন উত্তম বন্দ্যোপাধ্যায় ও ললিতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বোম্বাইয়ে একখানি বাংলা ছবির প্রযোজনায় পরিকল্পনা করেছেন প্রযোজক ফিলীপ সরকার। ছবিখানি পরিচালনা করবেন 'লুকোচুরি'-খ্যাত কমল মজুমদার। ছবি মুখ্য পুরুষ চরিত্রে অভিনয় করবেন বিশ্বজিৎ ও কিশোরকুমার, আর নায়িকার ভূমিকায় থাকবেন একজন নবাগতা।

সঙ্গীত পরিচালক সলিল চৌধুরী বোম্বাইয়ে গিয়ে



ঐক্য সমাপ্তির পথে “অন্ধ দ্বিধে লেখা” চিত্রের নায়িকা শ্রীভান্সি সান্স

ছবি ‘পিত্তরে কে পতী’ (‘খাঁচার পাখী’) নিয়ে এখন ব্যস্ত আছেন। সলিল চৌধুরী নিজেই এই ছবির কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন। সুরারোপও করেছেন তিনি নিজেই, আর সবচেয়ে বড় কথা, তিনি ছবিখানি পরিচালনাও করেছেন।

* * *

প্রযোজক-পরিচালক এস, ইউ, সুরি তাঁর ঝেঁয়ানু কলারের ছবি ‘পাকি’র জন্তে লক্ষ্মী সহরে আড়াই লক্ষ টাকার এক ব্যরবহল ‘সেট’-এর পসন্দ করেছেন। ‘সেট’টির পরিকল্পনা করেছেন শিল্প-নির্দেশক ভি হাদব রাও। ছবিখানির ভাষা উর্দু। নায়ক-নায়িকার ভূমিকার আছেন রাজেন্দ্রকুমার আর ওরাহিরা রহমান।

* * *

প্রযোজক-পরিচালক পি, এন, আরোরা তাঁর “সিকবান আলিবাবা ও আলাদিন” নামের রঙীন চিত্রের জন্তে আরব মূলক থেকে দুইজন নর্তকী আমদানী করেছেন। এই দুইজনের একজন আসছেন বেইকট থেকে। নাম সুহাইলা আব্বাস। অপরজন আসছেন কারবো থেকে। নাম জোহরা খামাল। অন্তান্ত নাচের সঙ্গে ‘বেলিড্যান্স’ও এঁরা নাচবেন। এই ছবির কতকগুলো ‘ট্রিকশট’ নেওয়া হচ্ছে টোকিওতে। ছবিখানির ভাষা হবে হিন্দী। প্রধান ভূমিকার আছেন প্রদীপকুমার, হেলেন, সজিদা খান, আগা প্রভৃতি।

* * *

প্রযোজক-পরিচালক-অভিনেতা রাজকাপুরের বিদ্যুৎ ব্যরবহল চিত্র ‘সদ্য’ ইংরেজীতে ‘ভাব’ করে ভারতের



প্রখ্যাত চিত্রাভিনেত্রী
সুলভা চৌধুরী

বাইরে দেখানো হবে বলে জানা গেছে। ইংরেজী সংস্করণ-
টিকে অবশ্যই দৈর্ঘ্যে অনেক ছোট করে দেখানো হবে।

৮০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই টেকনিকলার ছবি-
খানির মোট ১৫০ খানা প্রিন্ট সবই করানো হচ্ছে লওনে।
এই উপলক্ষে রাজকাপুরকে অনেকদিন লওনে কাটাতে
হয়েছে। ছবিখানির মুখাংশে অভিনয় করেছেন, রাজ-
কাপুর, বৈজন্তীমালা এবং রাজেন্দ্রকুমার। আর চিত্র গ্রহণ
করেছেন শ্রীধর কর্মকার।

* * *

আগামী ১৯৬৫ সালের ৬ই থেকে ২১শে জাহ্নবীর
তারিখে ভারতে এবার আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব
অনুষ্ঠিত হবে। এটি হবে এদেশের তৃতীয় আন্তর্জাতিক চল-
চ্চিত্র উৎসব। প্রথমটি ১৯৫২ সালে এবং দ্বিতীয়
উৎসবটি অনুষ্ঠিত হয় ১৯৬১ সালে। কেন্দ্রীয় তথ্য
ও বেতার মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই উৎসবের
অন্তে আশাতত: যে কর্মসূচী নির্ধারিত হয়েছে তবুবা ১
৬ই থেকে ২১শে জাহ্নবীর দীর্ঘ দুই সপ্তাহ ধরে

রাজধানী দিল্লীতে উৎসবটি অনুষ্ঠিত হবে। তারপর
২২শে থেকে ২৮শে জাহ্নবীর কলিকাতার ও মাদ্রাজে
এই উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। সর্বশেষে ২৯শে জাহ্নবীর
থেকে ৪ঠা ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত বোম্বাইতে অনুষ্ঠানের পর
উৎসবটি সমাপ্তি লাভ করবে।

এবারকার উৎসবের ধরণ পাল্টানো হচ্ছে। অত্যন্ত
বারের মত না হয়ে এবার প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে উৎসব
অনুষ্ঠিত হবে। বিশ্বের প্রত্যেক দেশ থেকে একখানা করে
পূর্ণ দীর্ঘ এবং একখানা করে 'শর্ট কিব্য' গ্রহণ করা হবে
এই উৎসবের অন্তে।

ভারত সরকারের এই উদ্যোগ বাড়ে আন্তর্জাতিক
চলচ্চিত্র প্রযোজক সমিতির স্বীকৃতি লাভ করতে পারে, সেই
মর্মে ভারত সরকার প্যারিসে ফেডারেশন কন্ট্রোলকে
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন।

* * *

হেবল মুখোপাধ্যায় ও হশজন শিল্পীর একটি হল
সম্মতি পাশ্চাত্য লকবে বেরিয়েছেন। লকে শ্রীমুখোপাধ্যায়

সহযোগী কণ্ঠশিল্পী বেলা মুখোপাধ্যায় এবং কস্তা রেগুজ আছেন।

বিলাতে ব্র্যাডফোর্ড, বার্মিংহাম এবং লীডস্-এ তাঁদের অস্থান শেষ করে এই শিল্পীদল এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গেছেন। সেখানে তাঁদের অস্থান করবার কথা নিউ ইয়র্ক, ওয়াশিংটন এবং লন্ডন এন্জেলীস্ শহরে। তারপর তাঁদের ওয়েস্ট ইন্ডিজ-এ যাবার কথা আছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ-এ হেরল্ড মুখোপাধ্যায় ও তাঁর দলের শিল্পীরা প্রায় ছুড়িটি অস্থান পরিবেশন করবেন। এর পর তাঁরা হনলুলু এবং হংকং হয়ে দেশে ফিরবেন আগষ্ট মাসে।

—

ছবি তোলায় কথা

রবীন সরকার

(সভা, এসোসিয়েটেড সিনেমা ও টেলিভিশন

টেকনিসিয়ান ইংলণ্ড)

আমি এদেশে সহকারী ক্যামেরাম্যান ও বুয় ও সাউও ক্যামেরা অপারেটর হয়ে কাজ করি। এই কাজের ভিত্তর দিয়ে একের টেকনিকগুলি দেখে চলি। আমাদের দেশের লোকেরা টেকনিক টেকনিক বলে হাঁকডাক দিয়ে চলে; কিন্তু টেকনিক জিনিষটা প্রত্যেকের কাছে এখানে বিভিন্ন ধরনের। এরা যে ধার মতে চলে। তবে যে জিনিষটা দেখাতে হবে বোঝাতে হবে তা যাতে ঠিক মত দেখানো ও বোঝান যেতে পারে সেইটাই হচ্ছে টেকনিক।

একটা চিঠি বার করে পড়ছে নায়ক। এখন লেখা ও ছবির মধ্যে পার্থক্য দেখাতে হবে। লেখা যদি ব্যাক-গ্রাউণ্ডের সঙ্গে মিলিয়ে যায় তবে ক্যামেরার কোশল ঠিক-মত হয় নি বুঝতে হবে। এখানে যদি ক্যামেরার “এপারচার” আর “ক্যামেরা এঙ্গেল” ঠিক থাকে তবে পার্থক্য যেমন সম্ভব হয়। আবার আলোর দিকেও লক্ষ্য দিতে হবে। ব্যাকগ্রাউণ্ড অর্ধেক আঁধার ও অর্ধেক আলোকবরষেন না হয়। যদি দৃশ্য সাজানো হয় সেই আলো আঁধারের

দাঁড়িলা হলে ভাল হয়। আর আলো যেখানে কম সেখানে অন্ধরগুলি একটু ঘন হওয়া উচিত। তাতে পড়তে সহযোগী হয় না। চিঠির অন্ধরগুলি যাতে স্পষ্ট বোঝা যায় তাও দেখতে হবে।

মনে রাখতে হবে যে ছন্দই হচ্ছে প্রাণ। দৃশ্য-ছবির ভিত্তর ছন্দ ঠিক মত চলতে থাকে তা দেখতে হবে। কাঁট, ডিম্বলত, মিল্ল এবং ফেডস্ যখন হবে তখন তার ছন্দ-ছন্দ রাখতে হবে। ছন্দ ঠিক না থাকলে ছবি দৃষ্টিকটু দেখাবে।

ক্যামেরা যখন প্যান করিয়ে দৃশ্যর ছবি দেখাচ্ছে তখন মাকপথে ক্যামেরা থামিয়ে দিতে নেই। যদি থামান হয় তবে দৃশ্য দর্শনীয় হতে পারেনা।

গতির সময় “কাট” করতে হয় যদি দরকার মনে হয়। যেমন বসতে যাচ্ছে বা দাঁড়িয়ে উঠছে, অথবা ঘুঁড়তে যাচ্ছে তখন “কাট” করতে হয়, স্থির জিনিষ থেকে “কাট” করা ভাল নয়। “ক্লোজ আপ” থেকে “কাট” করা যায় যখন মাথার কোন গতি হয়ে থাকে। সবই নির্ভর করে সময় জ্ঞানের উপর।

দেখা যাচ্ছে ‘লংসটে’ যে দূরে একটা চেয়ার পড়ে আছে। নায়ক ঢুকলো দৃষ্টে। এগিয়ে চললো। এখন নায়ককে ‘ক্লোজসটে’ দেখাতে হবে। এর ক্ষত লংসটে ছবি নেওয়া হল যখন নায়ক বসতে যাচ্ছে। তখন কাট করে দেখাবো ক্লোজসটে যে নায়ক চেয়ারে বসে আছে। সেই রকম আবার ক্লোজসটে দেখান যেতে পারে যে নায়ক চেয়ার ছেড়ে উঠছে—আর দাঁড়ানো যখন, তখন তাকে লংসটে দেখা গেল। উঠবার আগে কোন মতেই লংসটে কাটা উচিত নয়। দেখতে হবে কাটের সময় যেন দুটি ক্যামেরা স্থিতি অবস্থায় থাকে। আবার, দুজনে কথা কথা বলছে। দরকার চোঁকা হারার শব্দ তেলে এসে। মুখ ঘুরিয়ে দুজনে দরকার দিকে মুখ করল। তখনই ‘কাট’ করে দেখালাম যে কে চোঁকা দিয়েছিল দরকার। যদিও এতে গতি খুব ছোট বা কম তবে একটু চোখের গতির ক্ষত এ রকম করা অস্বাভাবিক নয়।

স্থিতির উপর যেমন ‘কাট’ করা যায় তেমনি এক-মনের উপর ‘কাট’ করা যায়।

উপর 'কাট' করতে হয়। আবার যে শুনছে তার উপরও 'কাট' করে দেখাতে হয়। সবই বুদ্ধির উপর নির্ভর করে। যা করলে মানাবে—তা করতে হয়।

দৃশ্য বদল করতে হয় বলে দৃশ্য কিছু বদলাবে না। অর্থ না থাকলে কোন মতেই দৃশ্যবদল করা উচিত নয়।

'ভিজলতস্' ও 'মিজ্জ'—দুটির মধ্যে পার্থক্য আছে। ঠিকমত পার্থক্য না দেখানো যায় যদি—তবে অর্থ বোঝান যাবে না। ফলে কোন প্রয়োজনীয়তা বোঝা যাবে না। এ সম্বন্ধে আগেও কিছু কিছু বলেছি।

ছবি কোন মতেই কেবল 'ক্লোজআপ্' দিয়ে তুলে যেতে নেই। তাতে মন অস্থির হয়, অর্থ বোঝা যায় না। সেই জন্ত আগে 'লংসট' দিয়ে ছবি দেখিয়ে পরে 'ক্লোজ-আপ্' দিতে হয়। তবে স্থান বিশেষে আগে 'ক্লোজআপ্' দিতে পারা যায়। যেমন ছবি আরম্ভ হল একটা ছোরার ক্লোজআপ্ দিয়ে। ক্যামেরা পেছিয়ে নেওয়া হল তখন দেখা গেল যে একটা লোকের বুকে গেঁথে আছে। যখন ক্যামেরা আরও দূরে নেওয়া হল লংসটে তখন দেখা গেল যে একটি ঘরের ভিতর লোককে ছোঁরা মারা হয়েছে।

চোখের এক ঘেঁষেয়া দূর করবার জন্ত গতি সৃষ্টি করার জন্ত নানাভাবে 'কাট' করে নানা রকমের স্টের বদলোবস্ত করতে হয়।

নতুন স্ট অরস্তের সময় লংসট দিয়ে ছবি নিয়ে স্থান বোঝাতে হয়, কেন না যেখানে অভিনয় হবে সেখানটা আগে দেখিয়ে না দিলে দর্শকদের মনে খটকা লাগতে পারে। তারা মনে মনে জিজ্ঞাসা করতে পারে যে ঘটনাটি কোথায় হচ্ছে?

কোন সাপেপেন্সমূলক ছবির আরম্ভ 'ক্লোজআপ্' দিয়ে আরম্ভ করা যেতে পারে। যেমন ছোঁরা মারার দৃশ্য যা আগে জানিয়েছি।

কোন মূল চরিত্রকে স্পষ্ট করে দেখাবার জন্ত 'ক্লোজ-আপ্' দিয়ে দেখাতে হয়।

ঘর থেকে বার হয়ে গিয়ে যদি আবার মূলচরিত্র ফিরে আসে তখনও 'ক্লোজআপে' দেখাতে হয়। লংসটে জানাতে হয় উপস্থিতি। ক্লোজসটে রূপ দেখাতে হবে যে লোকটি কে। ক্লোজআপে মনের ভাব বোঝাতে হয়। নতুন কোন চরিত্র যদি দৃশ্যে আসে তাকেও এইভাবে দেখাতে হয়। দর্শকদের মনের সূধা দূর করবার জন্ত শিল্পীদের মনোভাব বোঝাবার জন্ত নানারূপ 'কাট' অবলম্বন করতে হয়।

কখনও লংসটের পর ক্লোজসট দেখাতে নেই। লংসটের পর রিতে হয় মিডিয়ম্ স্ট—পরে ক্লোজসট। নইলে ছবি জাশ্প বা লাফ দেবে। তাতে অর্থ বোঝা যাবে না। তবে

লংসটে চরিত্রের সম্মুখভাগ স্পষ্ট করে দেখিয়ে পরে ক্লোজসট দেখানো যেতে পারে।

নায়ক চলছে পথ দিয়ে। লংসটে ছবি নিলাম, মিডিয়াম স্টে দেখালাম একটা বাড়ী দেখা যাচ্ছে, সেখানে নায়ক এসে ঢুকলো বা ক্লোজসটে দেখালাম—যে নায়ক এসে হাজির হয়েছে।

লংসট থেকে ক্লোজসটে এনে সকলকে দলের মধ্যে দেখানো যায় না। তবে দেখান যেতে পারে যদি কোন দর্শনীয় বা বিশেষ কোন অংশ দেখাতে হয়। কাউকে আগে থেকে না দেখিয়ে হঠাৎ ক্লোজসটে দেখানো উচিত নয়। তাতে গোলমাল হয়ে যেতে পারে।

ক্যামেরাতে বড় ওয়াইড এক্সেল লেন্স পড়িয়ে ক্যামেরা প্যান করতে নেই। তাতে গতি ঠিক থাকে না। রেখা এঁকে বেকে যায়। ক্যামেরা আবার এগিয়ে পেছিয়ে নিতে নেই যখন ওয়াইড এক্সেল লেন্স লাগানো থাকে। তবে ৪০° ডিগ্রির মধ্যে যেটুকু থাকে তাতে ভুল দেখা যায় না।

অনেকেই মনে করে যে ২০° ডিগ্রি কোণ ঠিক করে নিয়ে ক্যামেরাতে লেন্স লাগিয়ে ভিতরে ও বাইরে যেতে আসতে পারে। সেটা ভুল ধারণা। কেন না ২০° কোণ বড় সর্কীর্ণ। ক্যামেরা এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকলে একটু তফাৎ দেখা যাবে। এগিয়ে না গেলেই ভাল হয়। কোন জিনিষ ক্যামেরা থেকে দূরে রাখা হয়েছে। এখন ক্যামেরা এগিয়ে চলতে থাকলে জিনিষটা ক্রমশঃ বড় হতে থাকে। ফলে অমানান দেখায়, সেই জন্ত বুঝে বুঝে কাজ করতে হয়।

ক্যামেরাতে যদি সর্কীর্ণ কোণযুক্ত লেন্স ব্যবহার করা হয়—তখন যদি ক্যামেরা নড়তে থাকে তবে ছবি লাফাতে থাকে। সেই জন্ত সর্কীর্ণ লেন্স লাগিয়ে ক্যামেরা এগিয়ে পেছিয়ে নেওয়া উচিত নয়। তাতে ছবি ভাল হতে পারে না।

অনেক সময় দূরের জিনিষ দেখাবার জন্ত ক্যামেরা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ফলে অনেকটা স্পষ্ট দেখা যায়। তবে আজকাল আর কেউ অত কষ্ট করতে যায় না। একটা জুম লেন্স ব্যবহার করেই কাজ সেবে থাকে। সেটা ভাল কি মন্দ বলতে চাই না, কেননা সবই কচির ব্যাপার। কে কি ধরণের ছবি দ্বারা অর্থ বোঝাতে চায় তা আমি জানবো কি ভাবে? ধরা যাক—ক্রিকেট খেলা হচ্ছে তা দেখাতে হবে। তখন জুম লেন্স ব্যবহার করে খেলা দেখান যেতে পারে। তবে তাতে মনের সাধ পূর্ণ হয় না। বাই হ'ক অবস্থা বিশেষে জুম লেন্স কাজ দিয়ে থাকে।



সম্পাদনা : শ্রী প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়



স্বধাংসুশেখর চট্টোপাধ্যায়

খেলার কথা

ক্ষেত্রনাথ রায়

ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া ৪

ইংল্যান্ড : ২১৬ রান (৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড।
জিওফ বয়কট ৪৮ রান। ভিভার্স ৩২ রানে ৩ এবং হক
৬৮ রানে ৩ উইকেট)

ও ১৯৩ রান (২ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। টেড
ডেলটার ৬৮ রান। ম্যাককেন্নি ৫৩ রানে ৫ উইকেট)

অস্ট্রেলিয়া : ১৬৮ রান (ববি সিম্পসন ৫০
রান। ট্রুমান ৫৮ রানে ৩ এবং কোল্ডওয়েল ৪৮ রানে
৩ উইকেট)

ও ৪০ রান (২ উইকেটে)

ইংল্যান্ডের নটিংহাম শহরের অন্তর্গত ট্রেণ্টব্রিজ মাঠে
অস্থিত ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার ৪ তম টেস্ট ক্রিকেট
সিরিজের প্রথম টেস্ট খেলাটি বৃষ্টির জন্তে পরিত্যক্ত হয়।
ফলে খেলার ফলাফল অসীমায়িত থেকে যায়। প্রথম
দিনে ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের খেলায় মাত্র ৫২ রান
(১ উইকেটে) দাঁড়ায়। বৃষ্টির জন্যে পুরো সময় খেলা
হয়নি। লাঞ্চের আগে বা ৮৬ মিনিট খেলা হয়েছিল।
দ্বিতীয় দিনের বৃষ্টিতেও খেলা ভুল হয়। ইংল্যান্ডের ৮
উইকেট পড়ে ২১৬ রান দাঁড়ায়। বৃষ্টির জন্যে তৃতীয়

দিনে খেলা আরম্ভ করাই সম্ভব হয়নি। চতুর্থ দিনে
ইংল্যান্ড প্রথম ইনিংসের খেলার জের টানেনি, দ্বিতীয়
দিনের ২১৬ রানের (৮ উইকেটে) উপরই প্রথম ইনিংসের
সমাপ্তি ঘোষণা করে। অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের
খেলা এই দিনেই ১৬৮ রানের মাথায়, শেষ হয়ে যায়।
বাকি সময়ে ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলার কোন
উইকেট না পড়ে ৭১ রান ওঠে। ফলে ইংল্যান্ড ১১২
রানে অগ্রগামী হয়।

খেলার পঞ্চম অর্থাৎ শেষ দিনে ইংল্যান্ড তাদের
১৯৩ রানের (২ উইকেটে) মাথায় দ্বিতীয় ইনিংসের
সমাপ্তি ঘোষণা করে অস্ট্রেলিয়াকে খেলার দান ছেড়ে
দেয়। তখন খেলা ভাঙতে ১২০ মিনিট বাকি ছিল এবং
খেলায় অস্ট্রেলিয়ার জয়লাভ করতে ২৪২ রানের প্রয়োজন
ছিল। কিন্তু বৃষ্টি নামার দরুন নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত খেলা
হয়নি। যেটুকু সময় অস্ট্রেলিয়া খেলতে পেয়েছিল তাতে
৪০ রান (২ উইকেটে) উঠেছিল।

এশিয়ান ফুটবল কাপ ৪

তেল আবাবে আয়োজিত এশিয়ান ফুটবল কাপ
প্রতিযোগিতায় ইস্রায়েল অপরাজিত অসম্ভাব্য চ্যাম্পিয়ান
হয়েছে। বিরাট এশিয়া মহাদেশের মাত্র এই চারটি
দেশ প্রতিযোগিতায় যোগদান করেছিল—ইস্রায়েল,
ভারতবর্ষ, দক্ষিণ কোরিয়া এবং হংকং। স্বতরাং
প্রতিযোগিতার মহৎ উদ্দেশ্য যে ব্যর্থ হয়েছে সে বিষয়ে
কোন দ্বিধা নেই। ভারতবর্ষ রানার্স-আপ হয়ে কোন

রকমে দেশের মুখরক করে এসেছে। চ্যাম্পিয়ান ইন্ডিয়ান ১-০ গোলে হংকংকে, ২-০ গোলে ভারতবর্ষকে এবং ২-১ গোলে দক্ষিণ কোরিয়াকে পরাজিত করে অপরাজিত থাকে। অপরদিকে রানাল-আপ ভারতবর্ষ দু'টি খেলায় জয়ী হয়—দক্ষিণ কোরিয়াকে ২-০ গোলে এবং হংকংকে ৩-১ গোলে পরাজিত করে।

চূড়ান্ত ফলাফল

খেলা	জয়	ড্র	হার	খ:	বি:	প
ইন্ডিয়ান	৩	৩	০	০	৫	১
ভারতবর্ষ	৩	২	০	১	৫	৩
দক্ষিণ কোরিয়া	৩	১	০	২	২	৪
হংকং	৩	০	০	৩	১	৫

হকি টেস্ট ১

ভারত লঙ্কায় মালয়েশিয়া বনাম ভারতবর্ষের হকি টেস্ট খেলার ফলাফল:

ভারতবর্ষের জয়: দ্বিতীয় টেস্টে (বোম্বাই) ২-০ গোলে, চতুর্থ টেস্টে (জলন্ধর) ৪-১ গোলে, ৬ষ্ঠ টেস্টে (নিউ দিল্লী) ১-০ গোলে এবং সপ্তম টেস্টে (কটক) ২-০ গোলে।

খেলা অসম্মানিত: প্রথম টেস্ট (ভিলাই) ০-০ গোলে, তৃতীয় টেস্ট (ইন্দোর) ২-২ গোলে এবং পঞ্চম টেস্ট (চণ্ডীগড়) ১-১ গোলে।

হকি লন্ডন টেনিস প্রতিযোগিতা ৪

১৯৬৪ সালের ক্রেক লন্ডন টেনিস প্রতিযোগিতার মোট পাঁচটি অফিসিয়াল অস্ট্রেলিয়ার প্রতিনিধি চারটি খেতাব নিয়ে অফিসিয়াল প্রতিষ্ঠা করেন। কাইনালে অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে জয়লাভ করেন: মহিলাদের সিকলসে কুমারী মার্গারেট স্মিথ, মহিলাদের ডাবলসে কুমারী মার্গারেট স্মিথ এবং কুমারী লেসলী টার্নার, পুরুষদের ডাবলসে রয় এয়ারসন এবং কেন ক্রেগাব এবং মিস্ত্র ডাবলসে কুমারী মার্গারেট স্মিথ এবং কেন ক্রেচার। পুরুষদের সিকলস খেতাব বা অস্ট্রেলিয়া পায়নি—সিকলস খেতাব পান স্পেনের ম্যাক্সুয়েল সান্তানা। প্রতিযোগিতায় অস্ট্রেলিয়ার প্রাধান্য আর একদিক থেকে লক্ষ্যীয়—অস্ট্রেলিয়ার কুমারী মার্গারেট স্মিথ একাই তিনটি অফিসিয়াল কাইনালে খেতাব পান এবং পুরুষদের ও মিস্ত্র

ডাবলসের কাইনালে অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড় ছাড়া অন্য কোন দেশের খেলোয়াড় উঠতে পারেন নি। ১৯৬৪ সালের খেতাব নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার কুমারী মার্গারেট স্মিথ ক্রেক লন্ডন টেনিস প্রতিযোগিতার ছ'বার সিকলস খেতাব পেলেন।

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ ৪

গত ১১ই মে থেকে ১৯৬৪ সালের প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ খেলা শুরু হয়েছে। ২০শে জুন পর্যন্ত খেলার ফলাফল ধরে লীগ খেলার তালিকা তৈরী করলে দেখা যায়, তালিকার শীর্ষ দেশে আছে ইস্টার্ন রেলওয়ে—১০টা খেলায় ১৫ পয়েন্ট, খেলা জয় ৫ এবং ড্র ৫; গোলের সংখ্যা স্বপক্ষে ৮ এবং বিপক্ষে ০। মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল এবং মহম্মেডান স্পোর্টিং এই তিনটি বড় ক্লাবের বিপক্ষে ইস্টার্ন রেলওয়ে গোলশূন্য অবস্থায় খেলা ড্র করেছে। গত বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগান আছে দ্বিতীয় স্থানে—৮টা খেলায় ২ পয়েন্ট। খেলার তারা ৭টা গোল দিয়ে ২টা গোল খেয়েছে। মোহনবাগান ৪টে খেলা ড্র করেছে—মহম্মেডান স্পোর্টিং এবং হাওড়া ইউনিয়নের সঙ্গে, ১—১ গোলে এবং ইস্টার্ন রেলওয়ে এবং বালী প্রতিষ্ঠা দলের বিপক্ষে ০—০ গোলে। লীগের তালিকার তৃতীয় স্থানে আছে ইস্টবেঙ্গল—৮টা খেলায় ১১ পয়েন্ট। ইস্টবেঙ্গল ৫ পয়েন্ট নষ্ট করেছে—স্পোর্টিং ইউনিয়ন, ইস্টার্ন রেলওয়ে এবং বি এন আর দলের সঙ্গে ০—০ গোলে, মহম্মেডান স্পোর্টিংয়ের সঙ্গে ১—১ গোলে এবং জর্জ টেলিগ্রাফ দলের সঙ্গে ২—২ গোলে খেলা ড্র করে। বি এন আর দল আছে চতুর্থ স্থানে—৯টা খেলায় ১১ পয়েন্ট।

ইংল্যান্ড সফরে অস্ট্রেলিয়ান দল ৪

১৯৬৪ সালের ইংল্যান্ড সফরে গত ১৬ই জুন পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দল ১৩টি খেলায় বোম্বার্ডন করেছে। খেলার ফলাফল: অস্ট্রেলিয়ার জয় ৪, খেলা ড্র ৭ এবং বৃষ্টির জন্তে খেলা পরিত্যক্ত ২।

ইউরোপীয় নেশনস ফুটবল কাপ ৪

মাদ্রিদে অনুষ্ঠিত ১৯৬৪ সালের ইউরোপীয় নেশনস ফুটবল কাপ প্রতিযোগিতার কাইনালে স্পেন ২—১ গোলে গতবছরের বিজয়ী রাশিয়াকে পরাজিত করে কাপ বিজয়ী হয়েছে। গত ২১ বছরের মধ্যে স্পেনের মাটিতে অনুষ্ঠিত ফুটবল খেলায় রাশিয়ার এই প্রথম পরাজয়।

সম্পাদকদ্বয়—শ্রীমশীভ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে কুমারেশ ভট্টাচার্য কলিকতা ২০৩১১, বিধান সভা (পূর্বতন কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট),

কলিকতা ৬, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হাউসে প্রিন্ট করা হয়েছে তারিখে মুদ্রিত ও প্রকাশিত



ভারতবর্ষ

শ্রাবণ- ১৩৭৬

প্রথম খণ্ড

দ্বিগুণাশতম বর্ষ

দ্বিতীয় সংখ্যা

প্রীতির ক্রমবিকাশ

শ্রীম্মধাংশুকান্তি ভক্তিবিনাস এম-এ, পি এইচ-ডি

শাস্ত্রে প্রীতিরই প্রয়োজনীয়তা নির্ণীত আছে। কিন্তু অবিবেকীদের বিষয়প্রীতি যে লক্ষণযুক্ত, ভক্তের ভগবৎ-প্রীতি সেই লক্ষণযুক্ত নহে। কারণ বিষয়ের আত্মকলাহ প্রীতির প্রাণ। প্রীতি অর্থ প্রিয়তা অর্থাৎ যদ্বারা বিষয়ের আত্মকলাহ হয়, তদনুগতভাবে বিষয়প্রাপ্তির জন্য যাহাতে স্পৃহা জাগে এবং সেই স্পৃহাহেতু বিষয়ানুভব অগ্গ যে উল্লাসময় ভাবের উদয় হয় তাহাকে প্রিয়তা বনে। বিশেষতঃ অবিবেকীদের বিষয়প্রীতি মায়াক্রান্তি বৃত্তিময়, আর ভক্তের ভগবৎ-প্রীতি স্বরূপশক্তি বৃত্তিময়।

ভগবৎ-প্রীতি ভাববদ্ধ হইলেও ভগবদ্ধামে মূর্ত্তমান হইয়া

এই প্রীতির অবস্থান আছে। ভক্তিরসিকগণ এ অগ্গ তাহার স্বরূপ, আকার ও দেহ-এই তিনটির পৃথক বর্ণনা করিয়াছেন। বস্তুর মূল সত্তাই বস্তুর স্বরূপ, তাহার মূর্ত্ত অভিব্যক্তিই দেহ ও দেহের অবয়ব সংযোগে যে বৈশিষ্ট্য— তাহাই উহার আকার। এই প্রীতি মূলতঃ ভাববদ্ধরূপে ফলাদীনীসার বৃত্তিবিশেষ ও ভক্তের মনোবৃত্তি বিশেষরূপে উহার অভিব্যক্তি এবং আত্মকল্যানাদিময় অভিলাষরূপে ইহার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ। অর্থাৎ এইরূপে ভগবৎপ্রীতির আবির্ভাব বৈশিষ্ট্য হইলেও প্রীতি কেবল ভক্তহৃদয়ের আত্মকল্যানাদিময় অভিলাষের আদিকা বিস্তার করে। এ

সদক্ষেপে জীবগোষ্ঠী পাদ প্রীতিসম্পদে বলিয়াছেন—
 ‘প্রীতি: খলু ভক্তচিন্তমূল্যায়তি, মমতয়া যোজয়তি, বিশ-
 জয়তি, প্রিয়ত্মাতিশয়েনাভিমানয়তি, দ্রবয়তি, স্ববিষয়ং
 প্রত্যভিলাষাতিশয়েন যোজয়তি, প্রতিক্ষণমেব স্ববিষয়ং
 নব নবত্বেনাত্মভাবয়তি, অসমোদ্বিগমংকারেণোন্ম-
 দয়তি চ’। অর্থাৎ, গুণান্তরের উৎকর্ষের তারতম্যা-
 লুসারে প্রীতির যে তারতম্যভেদ হয়, তাহা দুই
 প্রকারের। প্রথমতঃ—ভক্তচিন্তা সংস্কারের দ্বারা, দ্বিতীয়তঃ—
 ভক্তের ভগবান সদ্ব্যক্য অভিমান বিশেষের দ্বারা। কারণ
 উক্ত গুণসকল ভক্তগণের অভিমানবিশেষের হেতু। এই
 প্রকারে প্রীতির গাঢ় হইতে গাঢ়তর অবস্থায় সে ক্রম-
 পরিণতি, ‘তাহাও চিন্তনসংস্কারের দ্বারা সাধিত হয় বলিয়া
 প্রীতির উৎকর্ষেরও তারতম্য হয়। আর সেই অভিমান-
 বশে প্রীতির যে তারতম্য, তাহাকে অবলম্বন করিয়া শাস্ত্র,
 দাস্ত্র, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসতত্ত্ব। এই পঞ্চরসের
 মধ্যেও ‘পূর্বরসের গুণ পরে হয়।’ এখানে উক্তব্য তথ্য
 এই যে, প্রীতির পরমানন্দরূপতা স্বতঃসিদ্ধ হইলেও কার্য-
 সামান্য চেষ্টা হইল—স্বীয় আশুকুল্য তাৎপর্যা, আর শুদ্ধ
 প্রীতি চেষ্টা হইল—প্রিয়াত্মকুল্য তাৎপর্যা। অর্থাৎ এই
 প্রিয়াত্মকুল্য তাৎপর্যতাই রুক্ষস্থৈরিকতাৎপর্যা, এবং এই
 শুদ্ধ প্রীতির চরম পরিণতি বৃন্দাবনের গোপীভাব;
 সুতরাং ইহাই প্রীতির চরমোৎকর্ষ বৈশিষ্ট্য। অতএব
 শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছাই প্রেম। এই প্রেমই প্রীতির
 প্রাণ, এই প্রীতিই ভক্তচিন্তে নানা ক্রিয়াক্রমে আত্মপ্রকাশ
 করে, চিন্তকে উল্লসিত করায়, মমতাবোধ দ্বারা প্রীতির
 বিষয় শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুক্ত করায়, আপ্ত করায়, প্রিয়ত্বের
 অতিশয়ত্বহেতু অভিমান করায় এবং স্ববিষয়ের প্রতি
 প্রত্যভিলাষাতিশয় দ্বারা (প্রচুর অশ্রিলাব দ্বারা) আদৃত
 করে বা যুক্ত করে, প্রতিক্ষণ স্ববিষয়কে নব নবত্বের দ্বারা
 অতুভব করায়, অসমোদ্বিগম কার্যের দ্বারা চিন্তকে
 উন্মাদিত করে। অতএব উক্তরূপে উল্লাসের মাত্রাদিকা-
 ব্যঞ্জিকা যে প্রীতি তাহারই নাম রতি। যথা,
 তত্ত্বোন্মাদ মাত্রাধিক্য ব্যঞ্জিকা প্রীতি: রতি:। এই
 যে প্রীতি বা রতি, ইহা কেবল উল্লাসের আধিক্য-
 ব্যক্ত করে এবং শ্রীভগবানেই ইহার তাৎপর্যা, অর্থাৎ
 একমাত্র প্রেমাস্পদেই তাৎপর্য্যবোধ, তত্ত্বিন্ন অন্ত সকল

বস্তুতে তুচ্ছবুদ্ধি জন্মে। “রতি গাঢ় হইলে ধরয়ে প্রেম
 নাম”।

গোষ্ঠানীপাদ প্রেম সদক্ষে বলিয়াছেন—

মমতাশয়্যাবির্ভাবেন সদ্ব্যক্য প্রীতি: প্রেমা। অর্থাৎ
 মমতাবোধের আতিশয়ের আবির্ভাব সদক্ষে যে প্রীতি
 তাহাই প্রেম নামে অভিহিত। এই প্রেমের আবির্ভাব
 হইলে তৎপ্রীতিভঙ্গ-হেতুসমূহ তাহার উদাম বা স্বরূপকে
 বাদ্য দিতে পারে না, অতএব মমতার আধিক্য প্রেমভক্তির
 বৈশিষ্ট্য। প্রেমের আবির্ভাবে ভক্তচিন্ত সম্পূর্ণরূপে আত্ম
 হয় বলিয়া এ সংসারে কোন বাধাবিঘ্নই এই প্রীতির
 পথকে রুদ্ধ করিতে পারেনা।

বিশদ্ব্যতিশয়ত্বকঃ প্রেমা প্রণয়:।

এই বিশদ্ব্যতিশয়ত্ব প্রেম অর্থাৎ প্রিয়জনের সহিত
 অভেদবুদ্ধি-রূপ প্রণয়ের উদয় হইলে সমুদায় তিরোহিত
 হয়, অর্থাৎ স্বীয় মন, প্রাণ, বুদ্ধি, দেহ ও পরিচ্ছদাদির
 সহিত প্রণয়ীর অভেদবুদ্ধি হয়। ইহাতে নিজের প্রতি
 যেমন গৌরববুদ্ধির প্রভাব হয়, প্রিয়তমের প্রতিও সেই
 রূপ গৌরববুদ্ধির অভাব হয়। এই প্রণয়ই অবস্থা বিশেষে
 মানরূপে পরিণত হয়। যথা—

প্রিয়ত্মাতিশয়াভিমানেন কোটিল্যাতাসপূর্ণতাববৈচিত্রী:
 দধৎ প্রণয়ো মান:।

অর্থাৎ প্রিয়ত্মাতিশয়ের অভিমান দ্বারা কোটিল্যাতাস-
 পূর্ণক ভাববৈচিত্রী দান করে যে প্রণয়, তাহা হইল
 মান। এখানে প্রিয়তার অতিশয়তাহেতু অভিমান এবং
 এই অভিমান হইতে প্রণয়ের কোটিল্য (বক্রতা বা বাঁকতা),
 ঐ কোটিল্য হইতেই ভাবমৈত্রেয়ী সঙ্গাত হয়। অতএব এই
 মান জাত হইলে স্বয়ং ভগবানও সেই প্রণয়কোপ হইতে
 ভয় পান। এখানে প্রিয়ত্মাতিশয়ের অভিমান এইরূপ—
 ‘আমি প্রিয়তমকে কত ভালবাসি তাহার সীমা নাই, আর
 প্রিয়তমও আমার প্রেমাদীন।’ কিন্তু এই প্রণয় যখন
 বাহ্যিক কুটিলতা প্রকাশ করিয়া উহাকে কোন এক
 বিচিত্র অবস্থায় উন্নীত করে, তখন বাহিরে উপেক্ষা এবং
 অন্তরে প্রচুর প্রণয়ের সমাবেশ হয়। এজন্য মানে প্রণয়ের
 গাঢ়তা সম্পাদিত হয় বলিয়া শ্রীভগবানও প্রণয়কোপে ভয়
 প্রাপ্ত হইলেন।

এই প্রকার অত্যন্ত চিন্তদ্রাবক প্রেমই স্নেহ। যথা—

চেতনোত্তরাতিশয়ায়কঃ প্রেমৈব স্নেহঃ। অর্থাৎ যে প্রেম চিত্তকে অতিশয় দ্রব করে তাহাই স্নেহ। এই স্নেহ সঙ্গীত হইলে প্রিয়তমের সম্বন্ধাভাসেই মহাবাস্পাদিবিকার, প্রিয়দর্শনাদিতে অহৃষ্টি, প্রিয়ের অত্যন্ত মান্থা থাকার মত্বেও তাহার কোন অনির্দিষ্ট অনিষ্টের আশঙ্কা প্রভৃতির উদয় হয়। এখানে সম্বন্ধাভাস বলিতে যে কোনরূপে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসঙ্গ দর্শন, বাক্যশ্রবণ ও তাঁহার স্মৃতিপথে উদয় হইলে চিত্ত বিগলিত হইয়া প্রচুর অশ্রু নির্গমন করাষ্টয়া দেয় বলিয়া হৃদয়ের গোপনভাব ব্যক্ত হইয়া পড়ে। এই প্রকার অতিশয় অভিলাষায়ক স্নেহই রাগ। যথা—স্নেহ এবাভিলাষাতিশয়ায়কো রাগঃ। চিত্তে এই রাগ সঙ্গীত হইলে ক্ষণিক বিরহেও অত্যন্ত অসহিষ্ণুতা বোধ হয়। আবার তাঁহার সহযোগে পরমদুঃখও যুগপৎ প্রতিভাত হয়। অতএব প্রণয়ের উৎকণ্ঠাতাহেহু অতিশয় দুঃখও চিত্তে যুগপৎ অহুত্ব হইলে—মেই উৎকণ্ঠকে রাগ বলা হয়।

ব্রজদেবীগণই রাগের পরাকাষ্ঠা। পরম মর্গাদাসম্পন্ন কুলবধূগণের চরম দুঃখের কারণ হইতেছে—স্বজন ও অর্গ্যপথ ভ্রংশন। অগ্নিপ্রবেশে বা বিষপানে মরণও তাহারা নাদরে অঙ্গীকার করেন, কিন্তু তাঁহাদের পক্ষে লজ্জা তাগ সর্বথা অসম্ভব। অথচ রাগাতিশয্যে বেদমযাদা ও পূন্মযাদা অতিক্রমণেই তাঁহাদের রাগের পরাকাষ্ঠা প্রকাশিত হয়। অতএব এইপ্রকার শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক প্রবল কৃষ্ণাই রাগ নামে অভিহিত হয়। এই রাগই আবার নিজের বিষয় আলম্বন শ্রীকৃষ্ণকে অমুক্ষণ নব নব রূপে অন্তত্ব করাইয়া নিজেও অমুক্ষণ নব নব ভাব ধারণ করে—তাহাই তখন

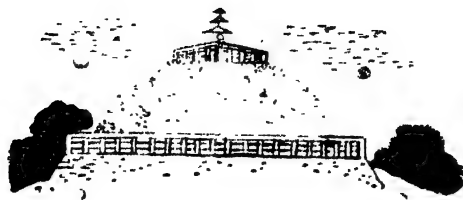
অমুরাগ। যথা—স এব রাগোত্তমক্ষণঃ স্ববিষয়ঃ নবনবভেদো নানুভাবয়ন স্বয়ং চ নব নবীভবনমুরাগঃ।

এই অমুরাগ সঙ্গীত হইলে পরস্পর বশীভাবের অতিশয়তা ঘটে, প্রেম বৈচিত্র্য (ইহা একপ্রকার বিরহ ভেদ, অর্থাৎ প্রিয় নিকটে থাকিলেও বিরহ অহুত্ব, ইহা প্রেমের উৎকণ্ঠতা হইলেও বিচ্ছেদ ভয়ে আত্মরূপে ক্ষুরণ হয়) শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধী অপ্রাণ্যত্বেও জন্মানন্দা এবং বিশ্রান্তে বিশ্রুতি প্রভৃতির উদয় হয়।

এই উন্মাদক অমুরাগই অসংযুক্তি চমৎকারিতা দ্বারা মধেবনযোগাদেশা প্রাপ্ত হইলে ভাবরূপে পরিণত হয়। কোন কোন স্থলে এই ভাবই মহাভাব নামে অভিহিত হয়। যথা—

“অমুরাগ এব”সমযুক্তিচমৎকারিণোগাদিকো মহাভাবঃ। এই মহাভাবের উদয়ে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে নিমেষ অসহিষ্ণুতা, কল্পপরিমিত কালকে ক্ষণকাল মনে করা। আর বিরোগে ক্ষণকালকেও কল্পপরিমিত মনে করা ইত্যাদি অবস্থা দেখা যায়। এই মহাভাবই হইল শ্রীরাবিকার স্বরূপ এবং অপরাপর ব্রজসুন্দরীগণ তাহার কায়বাহ বলিয়া তাঁহারাও মহাভাববতী। কিন্তু মহিষীগণ শ্রীরাবার প্রকাশরূপা বলিয়া তাহাদিগের মহাভাবের উন্মত্ত অমুরাগ পয্যন্তই প্রতির শেখ সামা, ইহার পর মহিষীগণের আর কোন অঙ্গিকার দৃষ্ট হয় না।

এই মহাভাবেরও যে পরাকাষ্ঠারূপ অধিকত মহাভাব তাহা একমাত্র শ্রীরাবিকা বা তাও অমু কাহাতেও সম্ভবে না। এই অধিকত মহাভাবে যুগপৎ মিলন ও বিরহের ক্ষুদ্র হইয়া থাকে।





জীবনী



সীমিত কথন

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

তেরো

আলোক হাসপাতাল থেকে ফিরতেই দেখে বারান্দায় নমিতা একটা চিঠি পড়তে পড়তে চোখ মুচছে। কাছে এসে তার মাথা বুকে টেনে নিতেই নমিতা কঁদে ফেলল হুচ ক'রে।

“কী হয়েছিল মা?”

নমিতা কোনো কথা না বলে নমিতার চিঠিটা তার হাতে দিয়ে একটু দূরে গিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে থাকে, আর থেকে থেকে চোখ মোছে।

চিঠিটা পড়া শেষ হ'লে আলোক নমিতাকে ডাকে। সে পাশে এসে বসতেই আলোক তার কণ্ঠবেষ্টন ক'রে বলে : “সবই তো বুঝি মা, কেবল এইটা বুঝতে আজো বেগ পাই যে ঠাকুর ভক্তদের নিঃশ্বর করবার একনিষ্ঠ সাধনা না ক'রে যদি অসুস্থদের দিকে একটু বেশি নজর দিতেন তো হয়ত দিন দুনিয়ার চেহারা আজ এমন সজ্জিন হয়ে দাঁড়াত না।”

নমিতা রাগ ক'রে বলে : “তোমার সব তাতেই ঠাট্টা!—যাও।”

আলোক (হেসে) : না মা। ডি-এল-রায় একে বলতেন করুণ হস্ত। কিন্তু আমি সত্যি পাষাণী নই—বিশ্বাস কর। কদিন থেকে কেবল কেবলই রমার করুণ মনে হচ্ছে—মনে পড়ছে ওর অপরূপ মুখখানি—যেমন সুন্দর তেমনি ক্লান্ত। কিন্তু আজকাল কই ও আর তেমন আসে না তো পুনায়?

নমিতা : তোমার কি কিছুই মনে থাকে না বাবা? ওর যে আজ আট মাস—বললাম না সেদিন?”

আলোক : ও! (একটু থেমে) আহা, যদি এ সময়ে ওর মা থাকত রে! দেখে দেখি—সাধে কি আমি ঠাকুরকে বলি তাঁর ভক্তদের একটু কম করুণা করতে? এমন মেয়েটা—অথচ তার সব থেকেও যেন কিছুই নেই আজ—একেও বলতে হবে করুণাময়ের অপার করুণা? গৌতমটাকে একটু চলনসৈ ব'লে জানতাম মানুষ হিসেবে, কিন্তু সে-ও হ'য়ে দাঁড়ালো কি না—অথাত!

নমিতা (চোখের জলের মধ্যে দিয়ে হেসে) : যা বলেছ বাবা! আমি ওর কী নাম দিয়েছি জানো?—যমের অকচি। একদিন মাথাও ধরে না ওর শুনেছি। কিন্তু দে থাক, রমার জন্তে কী করা যায় বলো তো? শুধু “আহা আহা” ক'রে চুপ ক'রে বসে থাকবে?

আলোক (হেসে) : দাপাদাপি ক'রে হুঙ্কারী হ'লে কি কল বেশি হবে মা? শোন্—এক কাজ করলে কী হয়? শুকে এখানে আনার চেষ্টা করলে—এখানেই প্রসব হ'লে?

নমিতা (খুশি হ'য়ে হাততালি দিয়ে) : এই তো বাবার মতন বাবা : রোলো।

বলেই চিঠি লেখে খশ্ খশ্ ক'রে। আলোক চুপ ক'রে বসে বাইরের আকাশের দিকে চেয়ে থাকে। কেবলই মনে পড়ে এই দুঃখিনী অপকরণ কথন। সব দিকেই স্বথ হবার কথা যার—কিছুই যার অভাব ছিল না তার আজ কী অবস্থা?.....

একটু পরে নমিতা উঠে এসে ওর হাতে চিঠিটা দেয়।
আলোক পড়ে :

“রমাদিদি আমার।

কী লিখব তোকে ভাই? কীই বা সাহসনা দিতে পারি আমরা বল? তাছাড়া গুরুদেব শ্রায়ই বলেন তুই মস্ত আধার—তোকে কী বলব যা তুই জানিস না? তবু তুই আমার গুণগান সুরু করলি কেন বল তো? আমি কেন বিয়ে করিনি—সে তোকে বলব একদিন। আজ শুধু একটি কথা বলতে চাই তোকে—শুধু সেইজন্যই এ-চিঠি লিখছি। বাবা বললেন তোকে জানাতে যে, যদি তোর এখানে আসা সম্ভব হয় তবে তুই সোজা আমাদের এখানে চলে আস। তোর স্বামীর মত করাতে পারবি না?

“তুই আমার মনের জোরের কথা লিখেছিস। কন্সলিমেণ্টটা ফিরিয়ে না দিয়ে পারছি না। আচ্ছা বলতো আমি যদি এমন দেবতুল্য পিতা না পেতাম—(যিনি বলেন—বিয়ে মাতুষের একবারই হয়)—তা হ’লে কী গতি হ’ত আমার? যদি কোনো সংসার হাতে আমার নিজের ঠিক এই হাল হ’ত তা হ’লে কি আমি পারতাম তোর মতন এ দুর্ভাগ্যকে ঠাকুরের বর ব’লে মেনে নিতে? না রমা, তোকে আশীর্বাদ করবার স্পদা আমার নেই। তবে তোকে দেখতে ইচ্ছা হয়, তোর সেবা করতে ইচ্ছা হয় তোর এ-দুর্লয়ে।”

চোদ্দ

ছদ্দিন বাদেই রমার উত্তর এল। নমিতা আলোককে দিয়ে বলল : “এবার চাই তোমার পরামর্শ—নৈলে হবে না।”

আলোক ওর মুখের দিকে চেয়ে একটু আশ্চর্য হ’য়ে বলে : “মানে?”

নমিতা হেসে বলে : “হাতে পাঞ্জি মঙ্গলবার! পড়লেই মালুম হবে।”

আলোক পড়ল :

“নমিতা দি,

তোমার চিঠি পেয়ে এই প্রথম সত্যি ভরসা পেলাম—বিশ্বাস কোরো, একটুও বাড়িয়ে বলছি না। ভরসা পেলাম এই ভেবে যে ত্রৈতা যুগে যক্ষপুত্র বন্দিনী সীতার

কাছেও আসন্ন ত্রাণের খবর পৌঁচেছিল যেমন অভাবনীয়া দূতের মাধ্যমে, তেমনি আমার কাছে কলিযুগে পৌঁছল তোমার আর আলোককাকার মাধ্যমে।

“কেবল প্রতি ফুলের পথেই কাটা বাদ মাধে দিদি। আমার স্বামী কিছুতেই মত দিতে পারেন না—বললেন। আর কেন জানো? তিনি বলেন আমার কর্তব্য এখন বাবার কাছে গিয়ে যে ক’রে হোক উইল বদলাতে তাঁকে বাধা করা। তাই আমার প্রসব পুনায় পিতৃগৃহেই হবে এই-ই চান আমার স্বস্তর শান্তি নন্দ জা স্বামী সুবাই। এরই নাম সংসার দিদি—যার ভিত্তি হ’ল টাকা। তাই তাঁদের জুলুম—যে ক’রেই হোক বাবাকে বোঝাতে হ’বে তুতিয়ে পাতিয়ে। তাই তোমাদের ওখানে যাওয়া আমার অসম্ভব—বললেন আমার পতি পরম গুরু—সতীর কর্তব্য কী দেখিয়ে দিয়ে।

“এক হতে পারে যদি বাবা নিজে বলেন তোমাদের ওখানে যেতে। আমার স্বস্তরালয় তা হ’লে মত দেবেন কারণ তাঁরা সব আগে চান বাবাকে তুষ্ট করতে। কাজেই যদি গোমরা—মানে তুমি আর আলোককাকা বাবাকে ব’লে ক’য়ে তাঁর মত করাতে পারো তাহ’লে যক্ষপুত্র বন্দিনীর কপাল ফিরলেও ফিরতে পারে, নৈলে নয়।

“নমিতাদি ভাই, পিতৃগৃহ আমার কাছে আজ জুতৃগৃহ মনে হয়। কেন—জানি না। মনে হয় সেখানে গেলে আমার মরণদশা ঘনাবেই জনাবে। তাই তোমাকে বলা—লক্ষী দিদি আমার—যে ক’রে হোক বাবার মত করাও—আমি তোমার কাছেই থাকতে চাই এ-দুঃসময়ে।”

আলোক (প’ড়ে) কিং মন্তভাই কি মত দেবেন? মনে তো হয় না।”

নমিতা (উদ্দীপ্ত) : কেন দেবেন না তিনি? তিনি কি জানেন না রমা তাঁর পীর চক্ষুশল? এখানে অন্ততঃ রমা মনের শান্তিতে থাকবে। আর প্রসবের আগে যে প্রসূতির শান্তি দরকার একথা—

আলোক : ধীরে মা, ধীরে! এ-তো যুক্তিতর্কের কথা নয় তোমার মনটি মমতার মাখন দিয়ে গড়া, তাই বুঝতে পারো না তাদের কথা, যাদের মন বিধাতা গড়েছে ইট কাঠ চুন স্তম্বক দিয়ে। মন্তভাই কী বলবেন-জানো হবে প্রক্ষেপ? বলবেন—মেয়ের প্রসব পুনায় হ’লে তাঁ

ওখানেই হ'তে হবে নৈলে তাঁর মাথা-কাটা যাবে। (হেসে) সংসারী তো হও নি মা, তাই জানো না যে, সংসারী সব পারে, কেবল ঠাট বজায় রেখে তবে। অপিচ শ্রীমন্তিনী শোভনা দেবী কি অশোভন কিছু করতে পারেন?

নমিতা (স্নান মুখে) : তা হ'লে?

আলোক (একটু ভেবে) : আচ্ছা, দু'জনে মিলে গিয়ে দরবার করা যাক। টাগ অফ ওয়ার যদি করতেই হয় তো আমার দিকে গুজন যত বাড়ানো যায় ততই ভালো। (ধেম্বে একটু হেসে) : কেবল—না, যাক। তোমার মন খারাপ হবে ফের।

নমিতা : না, হবে না। বলো...বলতেই হবে।

আলোক : আমার মনে হয়—আমাদের এখানে রমা আসতে চায় শুনলে শ্রীলা শোভনা দেবী বলবেনই বলবেন : সে কি কথা? যেয়ে প্রসব হবে মা-র কাছে এইই হয়ে আসছে চিরকাল। তবু দেখা যাক একবার বেয়ে চেয়ে। গুরুদেব প্রায়ই আওড়ান একটি শ্লোক : যত্নে কতে যদি ন সিধ্যতি কোত্তর দোষঃ। আর জানোই তো হাড়ে হাড়ে আমি কী বিধম পরম-ভাগবত—গুরুবাক্য যার কাছে বেদ-বাক্য!

নমিতা : তুমি বাবা ভারি দুষ্ট। যা নও কেবলি তার ভঙ্গি করো। গুরুদেব তোমার বিশ্বাস সম্বন্ধে কী গল্প বলেছিলেন সেদিন?

আলোক : গল্প? কবে?

নমিতা : দিন পনের আগে? মনে নেই? যখন ঋবদা তোমাকে অবিখ্যাসী বলে গাল দিল?

আলোক : কী? যে আমি বিশ্বাসকে অবিখ্যাস করলেও অবিখ্যাসে আমার বিশ্বাস অটল অটল?

নমিতা : ফের? যাও, তোমার সঙ্গে যদি আর কখনো কথা কই!

আলোক (হেসে) : না মা, না, বল তুই। আমি আর প্রগল্ভতা করব না কথা দিচ্ছি। কী বলেছিলেন গুরুদেব?

নমিতা : তুই ভাই ছিল। বড় ভাই—পুরুষ—খুব আচারী ও বিখ্যাসী কিন্তু একটু বোকা। ছোট ভাই তবঘুরে। আজ এ-তীর্থে কাল সে-তীর্থে। একবার ফিরে

এসেছে কৈলাস ঘুরে। বড় ভাই বললে : “ওয়ে আমি পাশের গায়ে যাচ্ছি দুর্গাপূজা করতে, দিন তিনেক বাদে ফিরব। এর মধ্যে যদি কোনো যজমান আসে শাস্ত্র হাতড়ে বিধান দিস্।” পরদিন প্রতিবেশী এক ব্রাহ্মণকে সাপে কামড়ায়। ব্রাহ্মণী কেঁদে কেটে জিজ্ঞাসা করল : সর্পাঘাতে মরলে দাহ করতে হয়, না কবর দিতে হয়? ছোট ভাই বলল : “কবর দেওয়াই বিধি।” বড় ভাই তিন দিন বাদে ফিরে শুনে রেগে আগুন : “তুই নরকে যাবি। ব্রাহ্মণকে কবর? তুই হিন্দু না স্নেহ—শাস্ত্রের কথাও বিশ্বাস নেই! ধিক্!” ছোট ভাই বললে : “দাদা কেন মিথ্যে অপবাদ রটাচ্ছ আমার? শাস্ত্রে বিশ্বাস আছে ব'লেই তো এত ভয় করে আমার বিধান দিতে—কি জানি কখন কোন্ অশাস্ত্রীয় বিধান দিয়ে বসি? তাই বলেছিলাম কবর দিতে এই ভেবে যে যদি তুমি ফিরে বো—না দাহই বিহিত, তখন দিবি কবর থেকে তুলে ব্রাহ্মণকে চিতায় শোওয়ানো যাবে। কিন্তু ভাবো তো : যদি শাস্ত্রের বিধান হ'ত—সর্পাঘাতে মরলে কবর দেওয়াই বিধি, তা হ'লে কী হ'ত যদি বলতাম—দাহ করাই ঠিক? ব'লে গুরুদেব হেসে বলেছিলেন : আমার এই স্তব্ধ শিষ্যটিও এই জগেই যা জানেন তাকেও বলেন অজ্ঞান। তবে আমার মনে হয় একথা বলেন তিনি উপনিষদের এজাহারে তাঁর বিশ্বাস আছে ব'লেই যে. অবিজ্ঞাতঃ বিজ্ঞাতম্ অবিজ্ঞানতাম্—অর্থাৎ যে ভাবে ব্রহ্মকে জেনেছে সে জানে না তাঁকে, যে জানে না সে অন্তত এটুকু জানে যে তাঁকে পুরোপুরি জানা যায় না।

আলোক (হো হো ক'রে হেসে) : আর আমার ভয় নেই তো, এমন উকিল যখন মা হ'য়ে এসেছে তখন আমাকে অজ্ঞান কি অবিখ্যাসী বলে কার সাধ্য—কিন্তু চল যাই মজুভাইয়ের কাছে—এখনি না গেলে হয়ত দেখাই হবে না—সে দশটার আগেই বেরিয়ে যায় কাজে।

ক্রিং ক্রিং ক্রিং...

নমিতা (টেলিফোন) : হ্যালো! কে?...ওমা! ভক্তিদি!...কী?...হ্যাঁ, রমা আমাকেও লিখেছে সে আমেদাবাদে থাকতে চায় না।...কী?...তুমি পাশে একটি ঘরভাড়া নেবে?...না না, আমাদের ইচ্ছা প্রসব হবে আমাদের এখানেই—কী? রমার বাবা মত করবেন না?

হ্যাঁ, বাবাও ঠিক এই কথাই বলছিলেন, এবটু আগে—
তা শোন ভক্তিদি, আমার এই নিয়ে আলোচনা করতেই
যাচ্ছিলাম মনুভাইয়ের ওখানে। কী? তাঁর অস্থখ?...
কী সর্বনাশ। ক্যান্সার? (আলোককে) ধরো
টেলিফোন—

আলোক (টেলিফোন ধরে): ক্যান্সার? মনু
ভাইয়ের?...কী? বসে টাটা ক্যান্সার ইনস্টিটিউটে যাবেন
কাল সকালে? আচ্ছা আমি যাচ্ছি এগুনি।...হ্যাঁ বাপার
তা হ'লে দেখছি রীতিমত সন্ডিন।...বেচারি মেয়ে! তবে
ভেবো না দিদি—ওর জন্তে শুধু দেহের তুক্যারাম নয়, কাশীর
শিবও ভাবছেন।...হ্যাঁ হ্যাঁ—কাশীর শিব এখন বিফটাকুর
ছাড়া আর কে?...হ্যাঁ, তিনি বলেছেন সাধুজিকে যে রমার
দুর্গতি হ'তেই পারে না। কী?...আচ্ছা, আমি মনুভাইয়ের
সঙ্গে কথাবার্তা ক'য়েই তোমাকে জানাব।

পনেরো

মনুভাই বাইরের “লন”—এ একটি আরাম কেদারায়
হেলান দিয়ে একটা অ্যালবামের পাতা উলটোজিল।
ওদের মোটর ঢুকতেই উঠে দাঁড়ালো।

মুখ হান, চোখেয় নিচে কালি...

আলোক: উঠো না হে—উঠো না, বোসো।

মনুভাই উঠে দাঁড়িয়ে: না, চলো ভিতরে যাই। এ
ছবিটা দেখেছ কি তোমরা?

অ্যালবামের একটি পাতায় গৌরীর একটি চমৎকার
ছবি...তিনি বছরের ফুটফুটে মেয়ে রমা টলমল করতে
করতে আসছে, আর গৌরী হাত বাড়িয়ে ডাকছে।
নমিতার চোখে জল এল, কোনোমতে গোপন ক'রে বলল,
কী সুন্দর ছবি! আমাকে এক কপি দেবেন? কপি না
থাকলে আমি এ থেকে তুলে নেব। -আমার খুব ভালো
ক্যামেরা আছে।”

মনুভাই: তা বেশ তো। কিন্তু চলো আগে ঘরে—
মোদের তাত বেড়ে উঠেছে।

* * *

ঘরে একটা ডিভানে আলোক ও নমিতা বসল, সামনে
একটি আরাম কেদারায় মনুভাই। বলল: “আমার পেটে

বাথা হয়েছে—শুনছি ক্যান্সার, তাই আরাম কেদারাতেই
বসি। কোথাও বেরই না।”

আলোক (একটু চুপ ক'রে থেকে): শুনছি। কিন্তু
ক্যান্সার বলে ঠিক জানা গেছে কি? মানে
ডায়াগনোসিস—

মনুভাই (যান হেসে): কয়াজির হাসপাতালে দুজন
বড় শাজন বলেছেন। তবে আমি কাল যাচ্ছি বপে—টাটা
ইনস্টিটিউটে।

নমিতা: হ্যাঁ, ভক্তিদি বলেছে। (একটু চুপ ক'রে
থেকে) আশা করা থাক তাঁরা বলবেন ভাল ডায়াগনোসিস
হয়েছে।

আলোক (একটু চুপ ক'রে থেকে): রমা জানে?

মনুভাই: না, তাকে বলি নি। ভাবছি বপে থেকে
যাব সোজা তাব কাছে।

নমিতা (প্রীতি কণ্ঠে): খুব ভালো। সে খুব খুশি
হবে আপনাকে—মানে একটু একলা পেলে। সে আজ
বড় একলা।

মনুভাই (মুখ নিচু ক'রে): একলা এ জগতে কে নর
বলো? (একটু চুপ ক'রে থেকে) আমি খুব ভুল করে-
ছিলাম।

আলোক: ভুল?

মনুভাই: ভুল ছাড়া আর কি? (দীর্ঘ নিশ্বাস)
এখন সবাই জানে, তাই গোপন ক'রে আর ফল কী বলো?
ভেবেছিলাম শোভনা আমাকে ভালোবাসে—blind old
fool! বলে না—no fool like an old fool?

আলোক (একটু চুপ ক'রে থেকে): হ্যাঁ, আমরা
সবাই জানতাম—ভক্তির কাছে নমিতাও শুনছিল শোভনা
তোমাকে কেন বিয়ে করেছিল। কিন্তু সে থাক, গতকাল
শোচনা নাস্তি। সে বাড়ী নেই তো?

মনুভাই (তিক্ত হেসে): বাড়ীতে সে খুব কমই
থাকে আজকাল। দিনকয়েক আগে গেছে জুহুতে
প্রবীরকে নিয়ে। শুনলাম সেখানে রোজ ১৬ পুরুষের সঙ্গে
সকাল বিকেল সঁতার দেয়—আর সম্ভায় হোটেলের নাচে।
She's rippling along, don't you know.

নমিতা (ঈর্ষ্য বিব্রত): সে জানে আপনার কানু—
অস্থখের কথা?

মহুভাই : জানে না? সার্জন হুজুন তাকেই তো আগে বলেছিল ডায়াগনোসিসের পরে।

নমিতা (আশ্চর্য) : তবু আপনাকে ফেলে গেল ছুততে নাচতে?

মহুভাই : যে নাচতে আর নাচাতেই জন্মেছে—কিন্তু মরুকগে। তুমি এইমাত্র বলছিলে রমা আমাকে একলা পেলো খুশি হবে। কী ক'রে জানলে? সে তোমাকে লিখেছে না কি?

নমিতা : হ্যাঁ। (একটু চূপ ক'রে) আর লিখেছে অনেক দুঃখ ক'রেই। বলতে কি, আমরা তার জন্তেই এসেছি (আলোককে) বলে না।

আলোক (জোর ক'রে) : বলতে বাধে, কিন্তু না বললেও নয়।... হয়েছে কি—রমাকে ওরা খুব গল্পনা দিচ্ছে—উইলের জন্তে। তাই আমি ভাবলাম তোমাকে... মানে...

মহুভাই (বিষন্ন) : Too late, Doctor! আমার মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছে এই—বুদ্ধত্ব তরুণী ভাণ্ডা—বলে না? The old old story.

আলোক : কিন্তু it's never too late to mend এ-ও তো বলে।

মহুভাই (দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে) : না। আমি এখন—কী বলব?—more dead than alive...তা ছাড়া—

আলোক : Don't be a fool—You must—উইল তোমাকে বদলাতেই হবে—রমাকে অন্ততঃ অধেক—

মহুভাই : সাহস নেই ভাই। শরীর যদি সুস্থ থাকত তো হয়ত পারতাম to rise to the occasion—কিন্তু অসুস্থ দেহে আর সয়না কুরুক্ষেত্র কাণ্ড। শোভনা রাগলে যে কী মৃত্তি ধরে জানো না তো।

নমিতা : আপনি এ কী বলছেন? আপনি না পুরুষ মানুষ?

মহুভাই (স্নান হেসে) : ছিলাম একদিন। কিন্তু সে থাক্। রমা—

নমিতা : না, সে যাবে না। যদি আপনার ভুল না ভাঙত তাহ'লেও বা কথা ছিল, কিন্তু ভুলকে ভুল ব'লে চেনার পরেও—না, আপনাকে ছাড়ব না আমরা কিছুতেই রমাকে এভাবে বঞ্চিত করবে একজন বাইরের মেয়ে—

কিন্তু তার কথা থাক—আমি কারুর নিন্দে করতে আসি নি। এসেছি শুধু রমার হ'য়ে কিছু বলতে।

মহুভাই : কেন মিথ্যে পণ্ড্রম করছ নমিতা? And why flog a dead horse? আমার কর্মফল—

আলোক (আতপ্ত) : তোমার কর্ণের ফল যদি শুধু তোমার উপরেই বর্ততো তা হ'লে বলার কিছু ছিল না। কিন্তু রমা মাতৃহারা মেয়ে—তা ছাড়া এত চমৎকার মেয়ে সবাই ওকে ভালোবাসে—

নমিতা : শুধু ভালোবাসা নয়—শ্রদ্ধা করে সত্যিই। না। এত বড় অবিচার আমরা হ'তে দেব না। উইল আপনাকে পালটাতেই হবে ওকে অন্তত বিষয়ের অধেক দিয়ে।

মহুভাই (একটু চূপ করে থেকে) : উইল পাটানো?...ভয় করে।...যদি শোভনা টের পায়—

নমিতা : না, পাবে না। আপনি আজই হুপুরে আহুন আমাদের ওখানে আপনার উকিলকে নিয়ে। নতুন উইল হোক ও আজই রেজিষ্টারি করুন।

মহুভাই : কিন্তু ও যদি কোনো সূত্রে জানতে পারে?

আলোক : না, পারবে না—যদি অবশ্য তোমার দুর্বল মূহুর্তে তুমি নিজেকে ব'লে না ফেলো।

মহুভাই (একটু হেবে) : আচ্ছা, একটু ভেবে কাল জবাব দেব। না, কাল না—পরশু—না, আমেদাবাদ থেকে ফিরতে তিনচারদিন হবে। সামনের রবিবার?

আলোক : ততদিনে আপনার গৃহলক্ষ্মী জুহু থেকে ফিরে আসবেন না তো?

মহুভাই (স্নান হেসে) : আনন্দ ছেড়ে কেউ কি ফিরতে চায় নিরানন্দ স্বামীর কাছে? ও চিরদিনই চেয়েছে টাকা আর আমোদ প্রমোদ।

নমিতা : তা বটে। কিন্তু যদি ধরুন, হঠাৎ ফিরে আসে?

মহুভাই (ভাবিত) : তা হ'লে...তা হ'লে—কী করব?

আলোক (অসহিষ্ণু) : এত ভয় किसের তোমার—একটু বলবে খুলে? বিষয় তো তোমার—you have the whip hand.

মহুভাই (করুণ হেসে) : বীরবর! তুমি হ'লে

উইডোয়ার, তাছাড়া (ইতস্ততঃ ক'রে) এখন আর গোপন ক'রে কী হবে বলা—যা সবাই জানে? আমি দুর্বল, কিন্তু অন্ধ নই তো। জানি আমার প্রতিবেশীরাও আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করে, বলে : I have bitten off more than I can chew ! (আম্বাধিকাবী হ'রে) জানো, গৌরী মারা বাবার পরে আমি ঠিক করেছিলাম আর বিয়ে করব না! বাইরের দিনিক লেখায় মতিহা রস পেতে শুরু করেছিলাম—তিনি লিখেছেন : "But—oh ! ye lords of ladies intellectual...have they not henpecked you all? কিন্তু তখন কি ভেবেছিলাম যে intellectual lord যারা নয় তাদেরও এই একই অবস্থা?

নমিতা : কী বলছেন আপনি? একটু ইচ্ছে করলেই পারেন—

মহুভাই (ক্রান্ত হেসে) : নমিতা, তুমি ছেলেমানুষ, তার উপরে শুনেছি আইডিয়ালিস্ট, চিরকুমারী থেকে দেশের দশের সেবা করতে চাও। তুমি কী বুঝবে—henpecked হয় মানুষ কিসের ফেরে পড়ে? তোমার বাবা হয়ত একটু খুলেও বুঝতে পারে—

আলোক (হেসে) : বুঝিছে, বুঝি। কেবল আমার পিতৃভক্ত মেয়ের সামনে আমার গলদশ হবার কথা নাই বা বললে ভাই! কিন্তু সে থাক, আমার বক্তব্য এই যে তোমার স্বীর সামনে যখন তুমি এতটুকু তখন এটাই তো মাহেন্দ্রগুণ উইল পালটানোর—যখন সে জুততে নাচ-গান ও সাঁতারে মশগুল আছে। Ther's a tide in the affairs of men জানোই তো!

মহুভাই (ইতস্ততঃ ক'রে) : জানি—কিন্তু কাল যে আমাকে বসে যেতেই হবে—Tata Institute এ তখন ভক্তারকে কোন করেছি—

আলোক : তাই তো বলছিলাম—শুভগু শীঘ্র—তুমি আজই আমাদের ওখানে একটার সময় লাগে এসো—তারপর—

মহুভাই : থ্যাংকিউ ডক্টর, কিন্তু আমি কিছুই খেতে পারি না আজ কাল—শুধু একটু দুধ খাশ ফলের রস মানে লিকুইড ডায়েট—

নমিতা : ভাই দেব আপনাকে। আপনি আহ্নন

আপনার উকিলকে নিয়ে—না দেরি নয় আর। আমরা ছাড়ছি না, আপনাকে আসতেই হবে—আজই নতুন উইল হয়ে যাক—

মহুভাই : কিন্তু রেজিস্টারি করতে হবে তো—

আলোক : সে তার আমার—আমি কোন ক'রে সব ঠিক ক'রে রাখব। না, আর কথা না। let's make hay while the sun shines শোভনা দেবী জুহু তীর্থে আনন্দ করুন রমাকে ঠকিয়েছেন ভেবে, আমরাও এখানে আনন্দ করি তাকে পালটা ঠকিয়ে—oh the joy of double-crossing!

মহুভাই : কিন্তু...শেষটা...যানে যদি পেরে না উঠি?

নমিতা : কেন এত ভড়কাচ্ছেন বলুন তো? পারবেন পারবেন পারবেন—আমরা আছি কী করতে? আপনাকে পারাবোই পারাবো। ভক্তিমাসিমাও আছেন আমাদের দিকে।

মহুভাই : ভক্তি? সে কি? শোভনা যে তার আদরের বোন। শোভনা আমাকে সেদিনও বলছিল : "দিদি কী যে খুশি হয়েছে—উইলে তুমি আমাকে সব দিয়েছ শুনে!"

নমিতা : নির্জলা শিখো। ভক্তিমাসিমার মতন মন আমি দেখি নি আর একটুও—এক আমাদের গুরুমা ছাড়া। আর তিনি কী যে ভালো বাসেন রমাকে!

মহুভাই : বটে! কিন্তু শোভনা আমাকে খে বলল—

নমিতা : দেখুন, আপনি বুকিম্যান, ক্রতীপুরুষ, জগৎকে বেখেছেন আজ প্রায় ষাট বৎসর হ'তে চলল। সংসারো সচরাচর কেমন হয় এও কি আপনাকে বাখ্যা ক'রে বলতে হবে? তাছাড়া টাকার লোভে কলিবাঙ্গ হওয়া কি এতটুকু বিপদ যে আপনার দী টাকার জন্তে মিথ্যা বলেছে ভাবতে আপনি এত বেগ পাচ্ছেন?

আলোক (হেসে) : মা, মাগুষ যখন মোহে পড়ে তখন এমনিই হয়—বিশেষ বৃদ্ধবয়সের মোহ—কিছু মনে কোরো না মহুভাই!

মহুভাই (স্নান হেসে) : মনে করতাম হয়ত ছমাস আগেও—কিন্তু আজ আমার মন ভেঙে গেছে ডক্টর—

নমিতা : জানি—আমি রাজি আছি।

মহুতাই (সবিস্ময়ে) : মানে ? টেলিপ্যাথি ?

নমিতা : তাই। সময়ে সময়ে আমি সত্যিই টের পাই কে কী ভাবছে। গুরুদেব বলেন কারুর কারুর অপ জমতে না জমতে এ ধরনের দৃষ্টি লাভ হয়—মানে, বিভূতি।

মহুতাই : ফের মুকিলে ফেললে চাপ দিয়ে। অতটা বিখ্যাসী হওয়া আমার পক্ষে অসাধ্য।

নমিতা : তাহ'লে প্রমাণ দিতেই হবে—আমার আর অপরাধ নেই। রাগ করতে পারবেন না কিন্তু। আপনি ভাবছিলেন আমি যদি আপনার সঙ্গে আমেদাবাদ যাই তা হ'লে রমা হয়ত একটু ভরসা পাবে আপনার সঙ্গে পুণায় আসিঁকে।

মহুতাই : ওডহাউসের ভাবায়—Lord love a duck ! তুমি কি দেবী ?

নমিতা (হেসে) : না। বড় জোর ডানাকাটা পরী। কেবল নাকটা টিকোলো নয় এই যা। তা শুহুন। আমি যেতে রাজী। কাল বসে থেকে আপনি কখন রওনা হবেন ?

মহুতাই : বিকেলের প্লেনে। আমেদাবাদে পৌঁছব লক্ষ্যাবেলা, পরন্তই ভোমের প্লেনে ফিরব সোজা আমেদাবাদ থেকে পুণা। তুমি যদি আমাকে সান্তাজুজে meet করে বিকেল পাঁচটায়—

নমিতা : রাজি। কেবল এই সর্তে যে আজই দুপুরে আপনি উকিল নিয়ে আসবেন আমাদের ওখানে উইল পাঁচটাতো।

মহুতাই : রাজী। I am a new man now—না না, ভেবো না—ভড়কাব না আর।

আলোক : যতক্ষণ না গৃহিণী ফিরছেন গোষ্ঠ থেকে।

ভিনজনেই হেসে ওঠে।

বোলো

ভক্তির ওখানে মোটরে ক'রে বেতে বেতে আলোক বলে : “মহুতাই লোক খারাপ নয়—”

নমিতা : অত সহজে গ'লে যেওনা বাবা। মহুতাই নিজেই কী বলেছেন মনে করে : বিবদাত ভেঙে গেছে। মা-জননী একটি মেয়েলি প্রবচন বলতেন প্রায়ই : উড়তে না পেয়ে পাখী শোষ যেনেছে।

আলোক : তুই ভারি সিনিক।

নমিতা : সিনিক ? মোটেই না, তবে আমি যে যেয়ে-ছেলে বাবা ! আকাশের স্বপ্ন দেখলেও পা আমাদের মাটি ছাড়া হয় না—বলেন স্বয়ং ভক্তিদি। তাঁকেও কি সিনিক বলবে ? কিন্তু শোনো ভক্তিদির ওখানে দেরি কোরো না—মহুতাই খেতে আসবেন ঠিক বারোটায়। তবে ফলের রস ও স্প। কাজেই ভাবনা নেই। তবু বারোটায় মধ্যে পৌঁছেতেই হবে। এক কাজ করো বরং আমাকে বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে ভক্তি মাসিমাকে গিয়ে নিয়ে এসো। আমি খাওয়া দাওয়ার জোগাড় করি, উকিলও তো খাবেন। ভালো ক'রে খাওয়ালে প্রসন্নও হবেন বৈ কি একটু।

আলোক হেসে নমিতাকে বাহবা দিয়ে বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে ভক্তির ওখানে গেল।

ভক্তি সব শুনে খুব খুসি হ'য়ে নীলমণিকে মালতীর কাছে রেখে আলোকের সঙ্গে এল সোজা ওদের বাড়িতে। সেখানে মহুতাই যথাকালে হাজির হ'য়ে ভক্তিকে দেখে বললেন হেসে : “এই যে ভক্তিমতী দিস্টার-ইন-ল !”

ভক্তি : শক্তিমান্ ব্রদার ইন-ল-র সঙ্গে শক্তির সঙ্গে পালা দিতে পারব না বলেই তো তাই অগত্যা ভক্ত-বংশলের কাছে হাত পেতে ভক্তিমতী হ'তে হয়েছে। কিন্তু ঠাট্টা থাক, শোনো—তোমার ক্যান্সার হয়েছে এ কি সত্যি ? ডাক্তারে ভুলও তো করে।

আলোক : আমার মন বলে ক্যান্সার নয়। কিন্তু এ-দুরন্ত আলোচনা থাক এখন। শোনো ভক্তিদি, মহু-তাইয়ের সঙ্গে নমিতা কাল আমেদাবাদ যাচ্ছে রমাকে আনতে। কিন্তু রমা পুণায় একটু একলা পড়বে তো এখন। তাই তুমি হুচারদিন ওর কাছে এসে থাকবে ?

ভক্তি : সে কি ?

মহুতাই : সে কি মানে ? রমার প্রসবের আর মাত্র মাস দুই দেরি। আমার ওখানে শোভনা তো নেই।

—জুহ থেকে ফিরবে দিন পনের বাদে। তারপরেই হয়ত বাবে কলঘো—আলোক বলে নি এসব তোমাকে ?

ভক্তি : হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি থাকব বৈ কি। রমার জন্মে শুধু মুখেই আছা উহ ক'রে খেয়ে যাব ভেবেছ ? জানো, গত কদিন রোজই ওকে স্বপ্নে দেখছি। সারাদিনই ওর কথা আমার মনে ঘোরাকেরা করে আজকাল। তবু তুমি

কী বলে ভাবতে পারলে যে আমি এ-ব্যাপারে তাকে ছেড়ে আমার ঘোনের দিকে হব? হি হি! রমার মতন মেয়েকে পেয়ে তুমি না চিনতে পারো—বলে না প্রদীপের নীচেই সবচেয়ে অন্ধকার?—কিন্তু আমরা তো জানি ও কী বস্তু। আর হবে না কেন? কেমন মা-র মেয়ে।

মহুতাই (কল্পন হেসে): কিন্তু এবার হেরে গেলে দিদি—তুমি! কারণ এক্ষেত্রে বাপ যে মাকে ক্যান্সেল করল! ইংরাজিতে বলেন 'beauty and the beast'?

ভক্তি: হি ভাই, অমন কথা বলে না। নারায়ণ সবার মধ্যেই আছেন—বলেন গুরুদেব। তোমার মধ্যেও—

মহুতাই: তিনি আছেন মানি—কেবল একটু ভোল বদলে—কারণ আমার মধ্যে তাকালে তাঁর শরী চক্ৰী রূপ দেখতে পাই না, দেখি শুধু নখী দন্তী রূপ—নুসিংহ না কী দেব বলে তো?

ভক্তি: অমন কথা ঠাট্টা ক'রেও বলতে নেই। কাউকেই ঠাকুর ফেলেন না। তবে যে চায় তাঁর প্রসাদ সে আগে পায়—যে চায় না তাকে চাইতে হয় অনেক ভুগে—তাই সে পায় পরে। তোমার যখন শেবমেশ স্মৃতি হয়েছে তখন আর ভয় কী? কেবল একটা কথা—শোভনার সামনে এবার শক্ত হ'তেই হবে। আর তা হ'লেই দেখবে সে হবে নরম। ওকে আমি চিনি তো হাড়ে হাড়ে: ও শক্তের তক্ত নরমের যম—তুমি এই শেষেরটাই দেখেছ এতদিন, এবার দেখতে পাবে প্রথমটা। কেবল দেখতেও পায় সে-ই যে চায় দেখতে।

এমনি সময়ে উকিল কেশবরাও আগে এলেন। খাওয়া দাওয়ার পরে নতুন উইলের স্পষ্ট লেখা হ'ল—রমা পাবে অর্ধেক বিষয় প্রায় তুলসী টাকা, শোভনা ও প্রবীর পাবে বাকি অর্ধেক।

মহুতাই ও আগে উইল রেজিষ্টারি করতে প্রস্থান করলেন বেলা তিনটেয়। আলোক ভক্তি ও নমিতার পানে চেয়ে বলল: একটু জয়ধ্বনি করা বাকি এবার গুরু-রূপার। খালি বিষয়-আশয়ের কথা ব'লে ব'লে মনটা কালো আলকাংরা হয়ে গেছে। একটু আলো না আনলেই নয়।

ভক্তি বলল নমিতাকে: “আগে তুমি ঐ গানটি গাইবে ভাই—তারপরে আরতি করব সবাই মিলে। ঐ গানটি—যেটি গতমাসে বন্দনার সঙ্গে তুমি গাইছিলে—সাধনপথে অশুষ্টি বাণীর গান।”

নমিতা গায়:

তোমার পথে খায় না বাধা গোনা
মেঘের পরে মেঘের মেলে দেখা।
তবু জানি—হবেই জানা শোনা
জানি যখন—নই আমি আর একা।

জানি বলি যেই—ভয় ছায় মনে,
বাধা তো নয় মনগড়া এ-পথে,
অশাস্তিদের চেয়েও ক্ষণে ক্ষণে
শাস্তি আড়াল করে শুভ ব্রতে।
একটু ভালোবেসেই থাকি স্বপ্নে,
অগ্নে যে নেই স্মৃতি—যাই হায় ভুলে!
ওগো অচিন! তাই কি যুগে যুগে
ব্যপার চেউষেই আসে হুলে হুলে?

সবল তোমার পথ—বলে কোন্ জনা?
গন্ধ সোপান—আবছা চরণ রেখা!
তবু জানি—হবেই জানাশোনা
জানি যখন—নই আমি আর একা।

[ক্রমশ:



বরষবেশ মত্রে অধির কণ্ঠে শুনেছি—শরীর ভস্মাক্ত হোক,
হে মন স্মরণ করো, স্মরণ করো—কতো স্মর, কতো স্মর।

একশো বছর আগেকার তখনকার কলকাতার বৃকে
শ্রীমতাং গেহে ২০শে জুন, ১৮৬৪ সাল্‌ একটা শিশু মায়ের
কোলে এলো, পৃথিবীর আলো দেখলে—তারই কথা
আজ স্মরণ করবো। তিনিই কবি কুন্তিবাসবংশীয়,
স্ববিখ্যাত চিকিৎসক গঙ্গাধরসাহের পুত্র স্বনামধন্য
আশুতোষ। আমাদের সত্যিকার প্রজা পৌছুক তাঁর
চুয়ায়ে—প্রজ্ঞা সৌম্য। গতকরেক বছরে বহু মনীষির
ও মহামানবের শতবার্ষিকী জন্মোৎসব আমরা করলাম—
হৈ হরোড়, গানবাজনা, আলাপ আলোচনা, প্রশস্তি প্রবন্ধ,
স্মারক পুস্তিকা, ইনিয়ের বিনিময় কতো ভাষণ নিবেদন—
প্রধানরা এলেন, বকীবর শুনলেন, প্রবোধনা করলেন
স্মৃতির রোমন্থন, তবু রবীন্দ্রজয়ন্তীতে যে কথা আমি বলে-
ছিলাম, তারই পুনরাবৃত্তি করি—

সেদিন প্রত্যতে

মালা-চন্দন হাতে

স্নান শ্রেণে, গান গেয়ে, তরে নিয়ে সাজি

শালগ্রাম মহাকুন্ডে প্রণাম নিবেদিতে আজি

চলেছি আসরে বাসরে স্মরণের উৎসবে

প্রধানগণের নিবেদন বোধন গৌরবে

কতো মন্ত্র হ'ল পাঠ; কতো গীত হ'ল গাওয়া

ভাষণের শাসনে প্রশস্তিতে চাওয়া

সুধু হ'ল না ধ্যানেতে তোমার উদ্দীপন

চেতনার এলে না জীবনে জীবন করিতে উদ্ভাবন

আজকের দিনে আমরা ভুলে যাই, সেদিন আমাদের কর্ম-
ক্ষেত্রের পরিধি কতটুকু ছিল, পরিবেশ কী ছিল, কতো
বাদবিত্ততা বিরুদ্ধতার মধ্যে তাঁকে চলতে হয়েছিল।
স্বল্প ভীক্ৰমণ ও মনীষার অধিকারী সেই অসামান্য কর্মী
তাঁর স্থির অবচলিত বিশ্বাসটির দীপ জালিয়ে আহিতাশ্রি

হাতে এগিয়ে চলেছিলেন—সে কথা আমরা, তাঁর উত্তর-
পুরুষরা যেন ভুলে না যাই, সেই পিতৃরিকথাকে নষ্ট না
করি।

আশুতোষ স্মরণীয় বরপুত্র—না বড় উকীল, আইনজ্ঞ—
না গণিতজ্ঞ, মন্তো বড় জজ বা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের
অনিপুণ কর্ণধার, দেশপ্রাণ মহান্ না আচারপরায়ণ ব্রাহ্মণ,
এসব পরিচয় এহ বাছ। এসব ছাপিয়েও তাঁর ব্যক্তি-
স্বরূপের একটি অভাবনীয় রহস্য ছিল বা ধরা পড়েছিল
বিশ্বকবির সাধনলব্ধ গভীর দৃষ্টিতে। আশুতোষের মহতী
ইচ্ছার সম্পূর্ণ স্বরূপটির কথা এত স্পষ্ট করে রবীন্দ্রনাথ
ছাড়া আর কেউ বলেছেন কিনা জানি না—ভারত-পথ
পথিক রবীন্দ্রনাথ মহামানবের সাগরতীরে দেখতে পেয়ে-
ছিলেন একজন সমধর্মী ও সমস্বামী ভারতপুরুষকে,
রামমোহন ও বিভাসাগরের সমন্বয় ঝর মধ্যে হয়েছিল।
রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—ভারতীয় সাহিত্যের ভবিষ্যৎ
নামক প্রবন্ধে আশুতোষ ভারতব্যাপী বিশাল ভূমিকার
তাঁর মনের সর্বোচ্চ কামনার ও সাধনার যে চিত্র এঁকেছেন,
তাতে এই কর্মবীরের ধ্যানের মহত্ত্ব আমি স্পষ্ট রূপে
অহুঁতব করেছি। তাঁর বলিষ্ঠ প্রকৃতি শিক্ষা নিকেতনে দ্রুত
বাধার বিরুদ্ধে আপন সৃষ্টিশক্তির ক্ষেত্র অধিকার করে-
ছিল। এইখানে তিনি সমস্ত ভারতের চিন্তাশক্তি ও জ্ঞান
সম্পদের ভিত্তি স্থাপন করতে প্রবৃত্ত ছিলেন। তাঁর
অসামান্য কৃতিত্ব ও উদার কল্পনাশক্তি সমস্ত দেশের
ভবিষ্যৎকে এবং আশ্রয় দেবার অভিপ্রায়ে সেই বিভা-
নিকেতনের প্রসারীকৃত ভিত্তির উপর স্থায়ী কীর্তি প্রতিষ্ঠার
উদ্দেশ্য করেছিল।

আশুতোষের নিজের কথাই ভুলে দিই—কেহ কেহ
বলেন—সমগ্র ভারতে এক ভাষার প্রচলন আবশ্যক, কেন
না ভাষাতেই মনোভেদ, স্বভাব মতভেদ অনিবার্য। তাই
তঁাহার মতে অন্ততঃ হিন্দিভাষা সমগ্র ভারতের জাতীয়-
ভাষা হওয়া উচিত। আমি কিন্তু এরূপ সমর্থন করিতে

পারি না। যে কারণে ইংরাজী ভাষা আমাদের জাতীয় ভাষা হইতে পারে না, সেই কারণেই হিন্দি বা অস্ত্রকোন একটা নির্দিষ্ট ভাষাও ভারতের একমাত্র সার্বজনীন ভাষা হইতে পারে না। ইংরাজী ভাষা ভারতের জাতীয় ভাষারূপে গৃহীত হইলে যেমন প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষ তাহার নিজের বৈশিষ্ট্য হারাইয়া অস্বাভাবিকভাবে উপন্যূনের মত হইয়া পড়িবে, সেইরূপ হিন্দিকে সমগ্র ভারতের ভাষা করিতে গেলেও ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ-সমূহ তাহাদের নিজের নিজের বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিত্ব হারাইয়া ফেলিবে।

আন্তোভোভের উদ্দেশ্য ছিল স্পষ্ট—প্রত্যেক প্রদেশ স্ব স্ব জাতীয় ভাষায় সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সম্পন্ন হইয়াও অস্ত্রদেশের ভাষার যাহা গ্রহণযোগ্য তাহা স্ব-স্ব ভাষার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লউক। এইরূপ করিতে পারিলে কিছুকাল পরে ভারতের সকল প্রদেশের মধ্যে একটি ভাবের একতা, চিন্তার একতা এবং ক্রমে মনের একতা জন্মিবে। নানা ভাষা থাকা সত্ত্বেও একতাবে ভাবিত হইয়া ভারত একই লক্ষ্যের দিকে সমবেতভাবে অগ্রসর হইবে।

এই স্বপ্ন প্রসারী দৃষ্টি ছিল বলৈ আন্তোভোভ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অসমীয়া, হিন্দী, তামিল, গুজরাটী, মারাঠী প্রভৃতি ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষণের ব্যবস্থা করেছিলেন, পোষ্ট গ্র্যাডুয়েট বিভাগ খুলিতে পেরেছিলেন, বাসবিহারী ঘোষ, তারক পালিত, খয়রার রাজা প্রভৃতি দানবীরদের সাহায্যে নূতন করে বিজ্ঞানসমন্বিত বোধন করতে পেরেছিলেন। স্বপ্ন দেখেছিলেন যে স্নাতকোত্তরেরা দেশে বিদেশে কলকাতার, তথা বাংলার, তথা ভারতের নাম নিয়ে যাবে—

ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।

যেমনা সাহা, সত্যেন বসু, জ্ঞান ঘোষ, জ্ঞান মুখার্জী, রমেশ মজুমদার, স্বনীতি চট্টোপাধ্যায়, হেব রায়চৌধুরী, স্বরেন সেন প্রভৃতি অধ্যাপকরা বলতে গেলে তাঁরই আবিষ্কার। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, ব্রজেন সীল, বাধাকৃষ্ণ, স্বরূপ, গণেশপ্রসাদ, কালিদাস, লেভী, ক্রম, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, বীলেশ সেন তাঁরই সহযোগী।

কবির ভাষার বলতে গেলে আন্তোভোভ চেয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধু বিভাগ কলস জ্বালানো নয়, কলস

ফলানোরও ক্ষেত্র তৈয়ারী হবে। লোকের অভাব, অর্থের অভাব, স্বল্প-পরিচয়নের প্রতিকূলতা কিছুই তিনি গ্রাহ্য করেননি। বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়ত্বের প্রবর্তন হয়েছে এইখানেই। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের কথা মনে পড়ছে (বঙ্গবাসী অগ্রহায়ণ ১৩৩২) কবির বাণী উদ্ধৃত করে তিনি বললেন—
The elements so mixed in him that nature might stand up and say to the world, this was a man.” স্বদেশীয় ‘আসার ব্যবহার যেমন প্রচার সহিত পালন করেছেন তেমনি কর্তব্যবোধে বিশ্বব্যাপী বিবাহ দিতেও কুণ্ঠিত হন নি। রায়মোহন বিজ্ঞানাগর বন্ধনের প্রচেষ্টা আত্মা তাঁকে কুশলভিত্তিক কর্মে ক্রিয়ামান করেছে, শীলপালনে উদ্বুদ্ধ করেছে, সপ্তদ্বাগম চক্রবর্তী করেছে।

এই সেদিনেও অসমীয়া সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু অল্পসন্ধান করতে গিয়ে নম্বরে পড়লো আন্তোভোভ প্রবর্তিত “অসমীয়া সাহিত্যের চানেকী” চল্লিশ বছর পরে আজও প্রামাণ্য গ্রন্থ। ভেবেছি যে কী দূরদৃষ্টি নিয়েই তিনি ‘আমার এ ঘরে আপনাব করে গৃহদীপ থানি’ জেলে দিয়েছিলেন।

‘জ্ঞানপাল ইন্টিগ্রেশন বা জাতীয় সংহতির কথা ত আজ মুখে মুখে। মনে পড়ছে অসহযোগ আন্দোলনের প্রবল প্রাবনের দিনে তিনি ধীর সংযত হয়ে বোকাঙ্কন ছাত্রদের যে অধ্যয়নই তাদের পক্ষে তপস্বী। গোলদিঘীর এক ধারে রবীন্দ্রনাথ বলছেন শিক্ষার মিলনের কথা, আর একদিকে আন্তোভোভ শিক্ষা ধারাবাহিকতার কথা, বাস্তব-থানে বস্তার প্রাবন ধারার সাথে দেশবন্ধু চিন্তামণি তপস্বীর মত শব্দ বাজিয়ে চলেছেন। সেদিনকার সেই দ্বিতীয় প্রাজ্ঞের ছবি আজও মনে আঁকা আছে। বিশ্ববিদ্যালয় গোলামখানা নয়—হয়নি যে তা আন্তোভোভের জন্মই। তাঁর মায়ের নাম ছিল অগস্ত্যারীণী। সাততন্ত এই বাস্তবটি সর্বক্ষেত্রেই মায়ের ডাক শুনেছিলেন, তাঁকে জীবনে প্রতীক করেছিলেন, শিক্ষাক্ষেত্রে তা প্রকাশ পেয়েছিল সাতা সপ্তমতীর সেবার ঘর সন্ধে মিশেছিল অসাধারণ চরিত্র বল, ভেজাচিতা ও ব্যক্তিত্ব।

একটি দিনের গল্প বলৈ শেষ করি—ব্যক্তিগত কথা অবশ্য, আবেদন নিবেদনে থালা নিয়ে চলেছি আন্তোভোভ সন্দর্ভে ৭৭ নং রসায়োডে। বহি তিনি আঁত তুট হয়ে বর বেন, মনের বাস্তবপূর্ণ করেন সন্ত পিতৃলীন একটি কিশোরের

অসংস্থান করে তরলক্ক সংসারসমুদ্রে পাড়ি দেবার জ্বাবস্থা করে' নেন। ভয়ে ভয়ে পৌছলাম—অর্থী প্রাত্যর্থী প্রার্থীর দলে ভর্তি ঘর ও সংলগ্ন সিড়ি ও বাঁধানা—কতো লোক আসছে, কতো লোক যাচ্ছে—সকাল আটটা থেকে বসে আছি—ছক ছক কম্পমান বুক। আন্ততোষের দৃষ্টি পড়েছে এই ভীষণ কালো শীর্ণ ছোকরাটির প্রতি। আজও সেই গুরুগভীর আঙ্গান কানে লেগে আছে—কী চাই—যেন ঘটা বেজে উঠলো মন্দিরে—উদাত্ত কণ্ঠ, কিন্তু বিরক্তি-বিজড়িত নয়, আশ্বাসে ভরা। গমগম করে উঠলো ঘর, মন্থন করে উঠলো মন। আমার নামধাম ও পরিচয় শুনে বকুলেন অপেক্ষা করতে। গ্রীষ্মকাল, নিদ্রাঘন্তু দিন। বিশালবপু মাহুঘটির লোমশ বৃকের উপর ধপধপে সাধা পৈতে আজও যেন জল জল করে ওঠে চোখের সামনে। লোক নাকি তাঁকে বলতো বাংলার বাঘ। কয়ালীনতো ক্লে'মাসার সঙ্গে ধীর সাদৃশ্য ছিল বহিরঙ্গে ও অন্তরঙ্গে।

পরিচয় নিলেন আমার নহন করে, মহামহোপাধ্যায় মহেশ জায়রদের সঙ্গে সম্পর্কের কথা শুনলেন, পিতা ও পিতা-মহকে চিনতেনই। সঙ্গে ছিল দু' একজন পুজনীয় শিক্ষক-দের সহায়ত্বভূক্তিক পুরিচয়পত্র—তাঁদের মধ্যে একজন শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আজও 'ল' কলেজের অধ্যক্ষ, সেনেট সিন্ডিকেটের সদস্য। অপরিচয়ের ব্যবধান কেটে যেতে সে কী সম্মেহ আদর, উদার আপ্যায়ন, বাইরের কল্পভার পিছনে কী অগ্নি রসনিধি মন—বটিমধুর মতন একটু না চিবুলে সে রসের সন্ধান মেলেনা। এর পূর্বেও দু' একবার দলে বেদলে ছারভাঙ্গা বিল্ডিংএ তাঁর কাছে গিয়ে প্রশ্ন জানিয়েছি, দু' থেকে তাঁর সন্দেহ খাওয়ার রোমাঙ্কিত দৃষ্টি দেখেছি। 'একদিন আমার এক মাতুলের বিবাহ উপলক্ষে নিমন্ত্রণসভার পরিবেশন করে খাওয়ার সৌভাগ্যও হয়েছিল, তবু তাঁর বাড়ীতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করা সেই প্রথম ও সেই শেষ। প্রায় বিশমিনিট ধরে আমার আবেদন নিবেদন মন দিয়ে শুনলেন, অকালে পিতৃ-বিরোগের কথা, হৃৎযন্ত্রের কথা, পড়াশুনার কথা, পাশকলের কথা। তার পরে বলিষ্ঠ আশ্বাস দিলেন—এক পক্ষ পরে যখন পাটনা থেকে ফিরে আসবো, দেখা করিস, একটা কিছু হবে যাবে। এলেন না তিনি—এগো শুখু তাঁর মরদেহ সর্ভাকারী শত সহস্র লোকের চোখের জলে অতিবিক্ত হয়ে ফুলের মালার, পুষ্পস্তবকে ভূষিত হয়ে। শেখবাবের মত দেখার জন্ত ছুটে গেলার ছাওড়া টেনে।

নাই নাই, তিনি নাই, তাঁর অমর যাত্রার পথ শাখতলোকে গিয়ে মিশেছে—সমুদ্রপর্বত সে পথ রোধে নাই, তবু,

মরিষ্যামি মরিষ্যামি মরিষ্যামীতি ভাবণে

ভবিষ্যামি ভবিষ্যামি ভবিষ্যামীতি নেকসে।

তাই আজ বলবো—তিনি আছেন বাঙালীর মনের অমৃত লোকে, ভারতবাসীর চিন্তার জগতে—তিনি আছেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি অণুতে ছন্দে, স্পন্দনে। আজও আমরা আন্ততোষকে পাই তাঁর সৃষ্টির মধ্যে—শুনি Academic freedom-এর কথা, পড়ি লীটনের কাছে পাঠানো চিঠি। স্ট্রাডলার কমিশনের গল্প আজও ফুরোর নি, নটে গাছটি মুড়োয়নি। আজও স্মরণে পড়ে লক্কো ইউনিভারসিটি ইউনিয়নকে কী উপদেশ তিনি দিয়েছিলেন—When a democracy imperiously demands control over the University; I answer without hesitation—Pause, my friends, your claim would be admissible only when democracy ceases to be democracy and is translated into an intellectual aristocracy.

No university man will seriously suggest that we should hand over the control of the university to a democracy which has not yet come under the influence, much less realized the value of the highest education in the life of the nation. It is the function of the university to raise the nation, to guide the nation, to elevate the leaders of the democracy not to be guided by them.

বিশেষক, সমাজকে সর্বাচারক তিনি স্বত্যন্ত ভালো-বাসতেন বলেই স্বাধীনতার এই 'Qualitative aspect' এর দিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল প্রথম।

আজকের লোকায়ত্ত সুবকারের কাছেও এ প্রশ্ন সমীচীন, এবং স্তূ মীমাংসার প্রয়োজন। আন্ততোষকে আজ আবার স্মরণ করি—স্মরণ করি—স্মরণ আন্ততোষ।

একদা তোমার নামে সর্বস্বত্বী রাখিলা স্বাক্ষর
তোমার জীবন তাঁর মহিমা বোহিলা নিরন্তর।
এ মন্দিরে সেই নাম ধ্বনিত করুক তাঁরি জয়
তাঁহার পুজোর সাথে স্মৃতি ভব হটক অক্ষর।

মধুসূদনের সৌন্দর্যচেতনা ও রেবেকা

শ্রীরাসবিহারী ভট্টাচার্য

মাত্রাজ প্রবাস (১৮৪৮-১৮৫৬) মধুসূদনের ব্যক্তি-জীবন ও কবি-জীবনের সবচেয়ে বড় ঘটনা। এই সময়ের মধ্যে তাঁর ব্যক্তি-জীবনের বিচিত্র দৃশ্য-সংঘাত ও আলোড়ন ঘটে—বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ ও পুনঃ পত্নীগ্রহণ—এই সময়েরই ঘটনা। অল্প দিকে মাত্রাজপ্রবাসই মধুসূদনের কাব্য-জীবনের ষথার্থ প্রতিষ্ঠাত্মমি, কবি-মানসের নির্দেশ-লগ্ন। মাত্রাজের কয়েকটি পত্র-পত্রিকায় তাঁর অনেকগুলি বিচ্ছিন্ন গীতিকবিতা এবং “ভিশনস্ অব দি পাস্ট” ও “ক্যাণটিভ্ লেডি” নামক দুখানি খণ্ডকাব্য প্রকাশিত হয়েছিল। ইংরেজিতে লেখা “রিজিয়া”-নাটকও মাত্রাজ-প্রবাসকালেই লিখিত। হিন্দু কলেজ ও বিশপস্ কলেজের যুগের রচনা-গুলি কবির কিশোর বয়সে রচিত—অপরিষ্কৃত কামনা ও অপরিণত কবিস্বপ্নের অস্পষ্ট কুশাসায় কবিমানসের দিগন্ত হ্রস্বীক্য। কিন্তু মাত্রাজ-প্রবাসের রচনাগুলির মধ্যে কবিমানসের অভিশ্রাব ক্ষুটতর—তরুণ কবির অধীর কবিস্বপ্নের সঙ্গে কিছু পরিমাণে অভিজ্ঞতার রঙ লেগেছে। ব্যক্তি-জীবন ও কবিজীবনের এক বৃত্তাঙ্গরী অধৈতরূপ একক লেই নিঃ-সংশয়িত হয়ে উঠেছে। নবযুগের-কাব্যলক্ষীর আবাহন মাত্রটি অবশ্য মাত্রাজপ্রবাসের বহুপূর্বেই উচ্চারিত হয়েছিল :

Fond Fancy, sweet enchantress

oft with her visions gay

Does chase my sad heart's deariness

And banish it far away.”—

কিন্তু তার প্রতিষ্ঠা পর্ব মাত্রাজেই।

১৮৪২-এর ১৪ই ফেব্রুয়ারিতে মধুসূদন গৌরদাসকে একটি চিঠি লিখেছেন—কলকাতা থেকে মাত্রাজে আসার পর প্রথম চিঠি :

“Mrs. D is of English parentage. Her father was an indigo-planter of this presidency. I had great trouble in getting her. Her friends, as you may imagine, were very much against this match. However, all is well that ends well !”

নানা বাধাবিঘ্নের ভিতর দিয়ে মধুসূদন শেষ পর্যন্ত রেবেকাকে লাভ করেছিলেন। রেবেকার সঙ্গে মধুসূদনের বিবাহিত জীবনের স্থায়িকাল প্রায় সাত বছর। এই সাত বছরের পারিবারিক জীবনের একমাত্র সাক্ষী মধুসূদনের পত্রাবলীর অতি সংক্ষিপ্ত দু একটি মন্তব্য। মন্তব্য-গুলিতে পারিবারিক জীবন সম্পর্কে মধুসূদনের স্বথাবেশ-তৃপ্ত মনোভাবই ফুটে উঠেছে। মাত্রাজ থেকে তিনি গৌরদাসকে শেষ যে চিঠি লিখেছিলেন (২০শে ডিসেম্বর, ১৮৫৫) তাতে তাঁর পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে লিখেছেন : “Yes, dearest Gour, I have a fine English wife and four children.” এর স্বল্পকাল পরেই মধুসূদনের সঙ্গে রেবেকার বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়, হেনরিঘেটাকে তিনি পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। রেবেকার সঙ্গে মধুসূদনের বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্পর্কে মধুসূদনের দুজন জীবনীকাহ্নে নীরব। হেনরিঘেটাকে প্রসঙ্গে জীবনীকাহ্নে উল্লেখিত ও সুপ্রাংস মন্তব্য করেছেন। তাঁর সহিষ্ণুতা ও কলাগী গৃহীণীমূর্তি মধুসূদনের চরমমুহুরে দিনেও একটি নম্র-সুন্দর স্নিগ্ধ জ্যোতি বিস্তার করেছিল। কিন্তু মধুসূদনের পরিত্যক্তা রেবেকা? জীবনীকার থেকে আরম্ভ করে মধুসূদন-বিশেষজ্ঞেরা সকলেই নীরব। কিন্তু মধুসূদনের মত সঙ্গম্য মাতৃস্বের সঙ্গে মাত্রাজের সাত বছরের বিবাহিত জীবনের স্থিতি কেমন করে মুছে ফেলা সম্ভব হল ?

প্রকৃতপক্ষে মধুসূদন রেবেকার স্থিতি বিশ্বস্ত হতে পারেন

নি। প্রাথমিক জীবনের মধ্যে তাঁর কোন প্রমাণ নেই—প্রমাণ আছে মধুসূদনের কাব্যে। হেনরিরোটো কল্যাণী ১৮. জাড-মুহুরী—যেবেকা প্রেমসী বন্ধনমুক্ত কবিকল্পনার বন্দনিনী। হিন্দু কলেজে যে নীলাকী স্মরণীয় অলঙ্কিত ও গোপন পরস্কার কিশোরকবির স্বপ্নাবেশকে অধীর হয়ে তুলেছিল। তাকেই “ক্যাপটিভ লেডি” কাব্যে কবি আদর্শ নিঃসংশয়ভাবে উপলব্ধি করেছেন—নবযুগের কাব্য-দর্শীর সৌন্দর্য ও প্রোমথুভূতির সেই প্রথম আরাতি :

“Life hath its dreams to
beautify its sense—
And sun-light for its desert
—but there be
None softer in its stare—of
brighter scene—
Than love—than gentle
Love, and thou to me
Art that sweet dream mine
own ; in glad reality”

“ক্যাপটিভ লেডি” কাব্যের ভূমিকা কবিতাটি একাধারে প্রেম ও সৌন্দর্যভূতির স্বপ্নাবেশে রচিত হয়েছে। গোর-হাসনের কাছে লিখেছেন : “Talking of my good Lady puts in mind of the introduction of the ‘Captive’ addressed to her.”

বাঙালীর রোমান্টিক কল্পনাপ্রের অধীর আকাঙ্ক্ষা ইয়েবেকাকে অবলম্বন করেই দূরদৃষ্টিভের সন্ধানে উদ্ভূত হয়ে উঠেছিল। “ক্যাপটিভ লেডি” কাব্য নবযুগের রোমান্টিক কবিত্বের প্রথম কাব্য। “ক্যাপটিভ লেডি” ছই সর্গের একটি আধ্যাত্মিক-কাব্য। পৃথিবী-সংস্কার জ্বিখাত কাহিনী তিনি অবলম্বন করেছেন। কিন্তু মধুসূদন ইতিহাসের পব অঙ্গসরণ করেননি, ইতিহাসের আভাসটুকুই যেন তাঁর কবিত্বের পক্ষে বশেষ। ইতিহাস এখানে মুখ্য নয়, কবিত্বের উচ্চ বন্ধনমুক্ত প্রেম ও সৌন্দর্যের অঙ্গ-লঙ্কারই এখানে মুখ্য। বন্দিনী সংস্কারই যেবেকা—নব-যুগের সৌন্দর্য-দর্শী। পৃথিবী-সংস্কার তটবেশে গিরিজার বন্দিনী রক্তকুমারীকে হরণ করেন। পৃথিবী-সংস্কার ও মধুসূদন স্রষ্টা। দর্শ ও স্বপ্নের দ্বন্দ্ব বাধা অতিক্রম করে

মধুসূদনের যেবেকালভের কাহিনীই কি “ক্যাপটিভ লেডি”র আধ্যাত্মিক বন্ধন নয়? পৃথিবী-সংস্কার কাহিনীর মধ্যে মধুসূদন তাঁর কবিত্বপুর্ন পেয়েছেন। “ক্যাপটিভ লেডি” বিরোগাত কাব্য। হস্তিনাপুরীতে সুসলমান আক্রমণ ও অলঙ্কৃত আঙনে পৃথিবী-সংস্কার প্রাণত্যাগের কাহিনীতে এর উপসংহার। মধুসূদনের কবি-জীবন ও ব্যক্তিজীবনের নিরুত্তি কি একই সঙ্গে অনিবার্য ভাবীকালের ইঙ্গিত করেনি ?

“ক্যাপটিভ লেডি” কাব্যে অপরিণতি ও অসঙ্গত স্বপ্নোচ্ছ্বাস, শব্দ ও অর্থের বৃথা উদ্ভাবন ও অসংযত খেয়ালী কল্পনার বহু পদক্ষেপের আভিষেক লক্ষ্যীয়। মাত্রাজের “এথেনিয়াম” পত্রিকার সম্পাদকের কাছে একজন পাঠক এই কাব্য সম্পর্কে একখানি চিঠি লিখেছিলেন। চিঠিখানিতে মধুসূদনের এই সময়ের কবি-মানসের অভি-প্রায়টি পরিস্ফুট হয়েছে :

“The poem itself, too much and too fatally perhaps for its popularity recalls the overburdened sentimentality of the Byron-school—and may probably, be the effusion of youthful unpractised musing”

এই সময়ে মধুসূদন শোপ, মুর ও স্কটের প্রভাব কাটিয়ে উঠেছেন—বায়রনের প্রভাব কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি।

“ক্যাপটিভ লেডি” মধুসূদনের কল্প পৃথিবীর অপরিণত কলিকা—কিন্তু প্রকৃতি ও প্রেম ধীরে মধুসূদনের বন্ধ-হীন সৌন্দর্যবপ্ন এই স্বপ্ন-পরিসর কাব্যটিতে নিঃসংশয়িত হয়ে উঠেছে। সমুদ্র-পর্বতবৈষ্ণু গিরিজার বর্ণনার একটি স্মরণীয় আবেশ আছে। বর্ণনাবর্ধী আধ্যাত্মিক কাব্যে দৃশ্যপটের বর্ণনার একটি উদ্ভাবন স্বপ্নাব্যবহারে। প্রথম সর্গে মধ্যরাত্রির বর্ণনাটি একটি স্মরণীয় স্বপ্নাব্যবহার। মধ্যরাত্রি, মেঘগুটিত চাঁদের পাতুর আলো, নৈল-বন্ধুর ধীপে যান আলোছারার বেধা—কবির রোমান্টিক সৌন্দর্যকে লালন করেছে। নারহীন রাত্রি-ময়, অপস্রীষী ভাবনা ও বিস্ময়কর স্বপ্ন রোমান্টিক সৌন্দর্যভূতির চিরসংস্রব—

“Some undefin’d—and nameless spell
Awakes the thoughts and dwells,

And tenant—all embalm'd with tears,
The sepulchre of by-gone years—
Where memory her vigil keeps,

And the lone Heart in sorrow weeps !”

নভাচারী কল্পনা, নামহারা •নির্দেশ আকাঙ্ক্ষা ও দুঃ-
খভির বিষয় বেরনা রোমান্টিক কবিদের মনোজীবনের
বরূপ নির্দেশ করেছে। অসংযত কল্পনা ও বর্ণময় উচ্ছ্বাস
মধুসূদনের সৌন্দর্য চেতনার বিরোধী নয়। রেবেকাকে
লাভ করার বিজয়োৎসব তাঁর “ক্যাপটিভ লেডি” কাব্যে
স্বাক্ষরিত।

মধুসূদনের সৌন্দর্যচেতনার পরিণততর রূপ গ্রীক
সৌন্দর্য-ভাবনার প্রভাবিত হয়েছে। “তিলোত্তমাসম্ভব
কাব্য”-এ কবি গ্রীক-সৌন্দর্যচেতনার নিগূঢ় মর্মার্থ
রূপায়িত করেছেন। “তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য”—এ কাহিনী
অংশের ক্রমভাঙে বর্ণনার আতিশয্যে ভরে ভুলতে
হয়েছে। তিলোত্তমাসম্ভব মধুসূদনের কাব্য-কৌতুহল
মাত্র—তাই পৌরাণিক কাহিনীর অল্পপরিমিত আভাসটুকু
নিরে অসম্ভব ও অবাস্তব রস-রহস্তের দিগন্ত-সীমার কবি
পাড়ি জমিয়েছেন। কিন্তু তিলোত্তমার উদ্ভব ও স্থলউপ-
স্থলের মৃত্যুবৃত্তান্ত বাংলা কাব্যের রোমান্টিক সৌন্দর্য-
ভিলাষকে নতুন অর্থমণ্ডিত করেছে। তৃতীয় স্বর্গে বিশ্ব
সৌন্দর্যরূপিনী নারীর উদ্ভবের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে—
সংস্কৃত কবিপ্রসিদ্ধির অল্পসংখ্য আছে,—কিন্তু সৌন্দর্য-
চেতনার বরূপ রোমান্টিক ভাব কল্পনার রঞ্জিত।

তিলোত্তমা সিন্টিনের জেডের মত আদিম নারী—
সৌন্দর্যের আকর্ষণবরূপ তাকে বিবাহে মৃত্যু হয়েছে।
তিলোত্তমা বিশ্ব সৌন্দর্যরূপিনী, আবার ঐ সৌন্দর্যই শেষ
পর্বস্ত সর্বনাশের কারণ হয়েছে। স্থল ও উপস্থল দেবজয়ী
বীর, কিন্তু তিলোত্তমার কাছে শোধ, বীর্য ভ্রাতৃপ্রেম ও
অর্গলমাত্রা সমস্ত কিছুই পরাজিত হয়েছে। কিন্তু বিশ্ব-
সৌন্দর্যরূপিনী নারীর মোহিনীমূর্তির পায়ে তারা জীবন
পর্বস্ত অলাঞ্ছন দিয়েছে। উনিশ শতকের বাংলা কাব্যের
রোমান্টিক সৌন্দর্যভূত্বের বৈভবরূপ। স্বর্গ মর্ত্যবাসী
সৌন্দর্যকে সম্বোধিত করে দ্বার অপরূপ মূর্তি রচনা করা হয়েছে,
সে নবীজলে আপন সৌন্দর্য দেখে বিস্মিত হয়—একটি ভাব-
মুগ্ধ আকর্ষণনির্দেশ সৌন্দর্য, ভ্রমাপি সে সৌন্দর্যনারী সম্পর্ক
বিবাক্ষিত নয়—সেই মোহিনীরূপের মধ্যে একটি আকর্ষণ

যাতী কান্নাও জড়িত আছে। রোমান্টিক সৌন্দর্যচেতনায়
সেই প্রথম যুগে বিশ্বসৌন্দর্যরূপিনীর সঙ্গে বাঙালী কবি
চিন্তে যে বিতোরতা লেগেছিল, তার রূপ হুটী : তিলোত্তমার
রূপিনী বিশ্বসৌন্দর্য ও নারীর মোহিনীরূপ। “বিভক্ত
সৌন্দর্যকল্পনার মধ্যে যখন মানব-সম্পর্ক এসে দাঁড়িয়েছে
তখনই গ্রীক জীবন রসিকদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বলাতে
হয়েছে :

“And Fate is the name of her, and his
name is death.”

“তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য”-এ গ্রীক সৌন্দর্যভাবনা
জরযুক্ত হয়েছে। সৌন্দর্যের মধ্যে নিষ্করণ নিরতিব
অলঙ্ঘনীয় প্রভাবের কথা গ্রীক কবিরা বার বার বলেছেন।
রোমান্টিক যুগের কবিরা সেই ক্লাসিক্যাল সৌন্দর্য
চেতনাকে অনেক সময় নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। হাইন-
বার্ণের “অ্যাটলান্টা ইন ক্যালিডোন” কাব্যের গ্রীক জীবন-
মর্শেব অপরূপ স্থলর ব্যাখ্যা আছে। কাব্যটি “তিলোত্তমার
সম্ভব কাব্য”—এর পাঁচ বছর পরে প্রকাশিত হয়।
কাব্যটির মূলতত্ত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে :

“...love is an extremely dangerous power
The Greek poets often dwell on this, and
Swinburne agrees with them In this play
the incalculable, reckless, pitiless power of
love is at work ” —(Romantic Imagination—
C M, Bowra.)

তিলোত্তমাসম্ভব বহু অপরিণত কাব্যের মত যা দেখে
গ্রীকসৌন্দর্য ভাবনার মূল স্থর এখানে অপরূপ।
মধুসূদনের রোমান্টিক সৌন্দর্য চেতনারই পূর্বসূরী
পরবর্তীকালে কবিকণ্ঠে প্রসূত হয়েছে :

“জগতের অশ্রুধারে খোঁজ তব

ভয়র ভসিমা,

জ্বলোকের হৃদয়কে আঁকা তব

চরণ শোণিনী।”

“ক্যাপটিভ লেডি” কাব্যে নিরতিব শাসন খুব শক্ত
অনেকখানি বহিরাশ্রয়ী। “তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য
প্রেম-সৌন্দর্যরূপিনীর আর এক নাম নিরতি। “তিলো-
সংব” মধুসূদনের রেবেকা চেতনার শেষ কাব্য
“ক্যাপটিভ লেডি” কবিপ্রসূত।



ক্ষণপ্রভা

অরুণ দে

ফোনটোটা ছেড়ে দিল স্ক্রুটি। কিন্তু যন্ত্রটার কাছ থেকে নাকি শব্দ আসল না। স্তব্ধ হয়ে অনেকক্ষণ সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল।

জন্মদিন কত ফোন এসেছে। কিন্তু আজকের মত এমন ব্যস্ততাপ্রাপ্ত কণ্ঠস্বর কোনদিন যন্ত্রটার মধ্যে বেজে উঠেনি। আর পাঁচমিনিট সে ফোনে কথা বলেছে। কিন্তু অন্য যন্ত্রটার অপেক্ষে মত মনে হচ্ছে। নিজেই কিছুকথা করতে পারছে না যে পাঁচ বছর আগে হারিয়ে গেল। ফোনটার সঙ্গে সে এককথ ফোনে কথা বলছিল।

সে পড়ল অমিত বছর পাঁচেক আগে কলকাতা থেকে লে ফিরেছিল। কোথায় গিয়েছিল সে কথা অবশ্য কেউ জানত না। জেনে কি স্ক্রুটিও নয়। সেই অমিত আজ কটিকে হঠাৎ ফোন করেছে। সামান্ত কয়েকটা কথা গেছে। সে নাকি মাত্র কয়েকদিনের জন্য কলকাতায় এসেছে। স্ক্রুটির সঙ্গে সে একবার দেখা করতে চায়। বিশেষ দরকার। স্ক্রুটি বেন অবশ্যই আগামী সাত দিনের মধ্যে একবার অমিতের বাড়ী যায়। তার সঙ্গে একবার উপরই নাকি অমিতের ভবিষ্যৎ জীবন নিয়ে কথা বলেছিল।

স্ক্রুটি আর করেছিল—“বিশেষ দরকারটা কি?”

জবাব—“সব বলব”—বলেই অমিত ফোন ছেড়ে

স্ক্রুটি অনেকক্ষণ জাবল “বিশেষ দরকার” কি হতে। দরকার বাই হোক তার বাওয়া উচিত কি?

জাবল, সে বাবে না। কেনই বা বাবে? পাঁচ

মধ্যে যে কয়েকটা তার কোন খোঁজ পর্বত নের সে ডাকলেই স্ক্রুটি যেতে হবে? সে কি এতই সস্তা? নিশ্চিন্তা ঘরে হয়ে নিজেই এত ছোট করবে কেন?

বেশ তো, দেখা করার না হয় অসুবিধা ছিল—তা’ বলে কি পাঁচ বছরের মধ্যে অমিত একটা চিঠিও লিখতে পারে নি? যে তাকে এতকাল অপেক্ষা করেছে তার কাছে সে যাবে কেন?

ফোনটার দিকে আবার তাকাল স্ক্রুটি। ফোনটার পাশেই হরগৌরীর মৃগল মূর্তির দিকে চোখ পড়তেই পুথানো দিনের কথা মনে পড়ল। এই মূর্তিটা অমিতই তাকে দিয়েছিল। জন্মদিনের উপহার। এটাই অমিতের শেষ উপহার। সেই জন্মদিনটার কথা আজও স্ক্রুটির মনে পড়ে। উপহারটা পেয়ে স্ক্রুটি খুব খুশী হয়েছিল। অমিতকে আলাদা ঘরে ডেকে উপহারটার সম্বন্ধেই সে কি যেন বলছিল। সেই সময় স্ক্রুটির বাবা খুব গভীর মুখে ঘরে ঢুকে অমিতকে বলেছিলেন—“অনেক হয়েছে। এ বাড়ীতে তুমি আর এসো না। আমি চাই না আমার মেয়ে একটা বেকার ছোকরার সঙ্গে যেলামেশা করুক।”

সামান্ত কয়েকটা কথা। কিন্তু ওদের জীবনের মিলনের পথে তাই অসামান্ত বাধা হয়ে দাঁড়াল। এরপর অমিত আর স্ক্রুটির বাড়ী আসে নি। কয়েকদিন পর অমিত সেই যে কোথায় অনুভূত হল আর তার খোঁজ পাওয়া যায় নি। হয়ত বেকার বলেই তার পৌকবে খুব আঘাত লেগেছিল।

স্ক্রুটি জাবল—অমিত কি জানে যে সে আজও বিয়ে করে নি। তার বাবার শত চেষ্টা সফলও না। শেষ পর্যন্ত মেয়ের কাছে হার মেনে তিনি হাল ছেড়ে দিয়েছেন।

সে বাই হোক সে বাবে না; একটা চাপা কান্না তার বুক পর্যন্ত ঠেলে উঠছে বলেই কি ডাকলেই যেতে নিশ্চিন্তা ঘরে হয়ে নিজেই এত ছোট করবে কেন?

না, সেসেবের কাছে সত্য হওয়া ঠিক নয়। সহজে সে বাধে না।

কিন্তু কয়েকদিন পর অমিত চলে বাবে বলেছে। তা হয়ত আর জীবনেও দেখা হবে না। সেটা কি ভাল হবে! আজ্ঞা, অমিত কি বিয়ে করেছে? যদি করে থাকে তবে তাকে কেন ডেকেছে? না, নিশ্চয়ই করে নি। এককালে তো ভালবাসত—এতকাল পরে সে ভালবাসা কি একেবারে মুছে গেছে!

হঠাৎ একটা অজানা আশায় সুরচির মুখ লজ্জার আরক্ত হল। অগণপরেই মনে হল সে মিথ্যা স্বপ্ন দেখছে। এতকাল পরে অমিত কখনই বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসে নি। পুরুষমানুষ এতকাল পুরানো ভালবাসা মনে রাখে না। কিন্তু অমিত যদি হঠাৎ বিয়ে প্রস্তাব করে তবে সে কি বলবে?

দেখা করতে না গেলে অবশ্য এসব কথা উঠবে না। তবে এতকাল পরে যখন বিশেষ দরকার বলেছে তখন তত্ত্বতার খাতিরেও অন্তত একবার যাওয়া উচিত। তবে সহজে সে বাবে না। আজকে তো নয়ই। কালকেও নয়। অমিত সাত তারিখে চলে যাবে বলেছে। সে যদি যায় তো ঠিক তার আগের দিন অর্থাৎ ছয় তারিখে বাবে। তার আগে গেলে অমিত ভাববে যে তাকে সহজেই পাওয়া যায়। তার থেকে বরং কিছুদিন অপেক্ষা করুক। দেখা করার ভূষণ গভীর হোক।

ছয় তারিখে যাবার দিন স্থির করে সুরচি অস্ত্র কাজে মন দিল।

ছয় দিন নয়, যেন ছয় বছর। প্রতিদিনটাই সুরচির কাছে স্মৃতি মনে হল। যাবার জন্য প্রতিদিনই ব্যাকুলতা অনুভব করল। তবু সুরচি যায় নি। সে আর বাই করুক নিজেকে সন্তা করতে পারে না।

যাবার নির্দিষ্ট দিনে খুব ভোরেই তার ঘুম ভেঙে গেল। ক'দিন ধরে সে ভেবেছে অমিতের জন্য কিছু নিয়ে যাবে কিনা। এতদিন পরে একেবারে খালি হাতে যাওয়া ভাল দেখায় না।

একটু বেলা হতে সে দোকানে গেল। অমিত বা কিছু পছন্দ করত সবই তার মনে আছে। অমিতের খাতি বাঙ্গালীরানার কথা মনে পড়তে মনে মনে হাসল সুরচি। বাংলা ভাষা, বাংলা গান—বাঙ্গালীর সব কিছু অমিতের প্রিয় ছিল। খুঁটি পাঞ্জাবী ছাড়া অস্ত্র কিছু পরত না। বাঙ্গালীর দোকান ছাড়া অস্ত্র দোকানে জিনিস কিনত না। এমন কি করে একটা ইংরেজী কালেক্টার রাখত না। বত খারাপই হোক বাংলা কালেক্টার বয়ে রাখত। এখনও কি সে লেখকই আছে?

অমিত ছবি ভালবাসত। সুরচি তাই চিত্রকলা সম্পর্কে অবনীঠাকুরের একটা বই কিনল। কি মনে করে একটা হরগৌরীর ঘুগল মুড়িও কিনে ফেলল। ..

সুরচি দোকান থেকে বেরিয়ে শোভা বাজীর দিকেই বাজিল। হঠাৎ কোথা থেকে একটা প্রাপ্তি উড়ে এসে তার কাপড়ের উপর বসল। সুরচি খুঁজতে খুঁজতে তাকাল। হলদে প্রাপ্তি। হঠাৎ সুরচি প্রাপ্তিটা সরিয়ে দিতে গিয়ে কি মনে করে আবার দাঁত গুটিয়ে নিল।

অমিতের সঙ্গে দেখা হলে প্রথমে কি বলবে এখনও তা ঠিক করতে পারে নি। অথচ অনেক কথাই মনে ভেবেছে। কোনটাই মনের মত হয় নি। অমিত যেতে যেতে আবার তবল কি বলা যায়। কিছুই বিবেচনা করতে পারল না। অমিত তাকে কি ভাবে অভ্যর্থনা করবে সে দৃষ্ট একবার কল্পনা করল।

“বিশেষ দরকার” কথাটা মনে পড়তেই আবার সে অস্ত্র মনা হয়ে গেল। কি এমন দরকার? জাহা, পুণ্ড্রা পাওয়ার উপর অমিতের ভবিষ্যৎ জীবন কেনই বা নির্ভর করছে কিছুই ভেবে পেল না।

অমিতের বাড়ীর দরজার কাছে পৌঁছে সুরচি চমকে উঠল। কখন যে এতটা পথ অতিক্রম করে এসেছে খেয়াল ছিল না। দরজার কড়া নেড়ে সে দাঁড়িয়ে রইল। নিজের হৃদয়ের স্পন্দন সে নিজেই অনুভব পাচ্ছিল। হঠাৎ তার মনে হল, দেখা না করে পাশের যাবে। কিন্তু চলে যাওয়া হল না। ততক্ষণে দরজা খুলে একজন অপরিচিত লোক তাকে বলল—“কাকে চান?”

সুরচি বলল—“এ বাড়ীতে কি অমিতবাবু থাকেন?”

লোকটি বলল—“থাকতেন। তবে এখন গেছেন।”

সুরচি বলল—“কোথায় গেছেন?”

লোকটি বলল—“তা তো জানি না। তিনি এক-সপ্তাহের জন্য এখানে এসেছিলেন। দিন পাঁচেক আগে চলে গেছেন।”

ঘরের মধ্যে বড় বাংলা। কালেক্টারটা সুরচির হাতে পড়ল। আজ থেকে পাঁচ দিন আগে বাংলা মাসের মাস তারিখটা জল জল করছে। সে ভুলেই গিয়েছিল অমিত বাংলা মাসের তারিখ দেখে চলত। কিন্তু সে এলেহে তার সঙ্গে দেখা করতে ইংরেজী মাসের ছয় তারিখে।

উদ্ভাস দৃষ্টিতে সামনের বাংলা কালেক্টারটার দিকে তাকিয়ে রইল সুরচি। অস্ত্রমন্ডল তার হাতে অনেক হর-গৌরী মন্ডলটি গেল পড়ে।

ঘরে বাইরে' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক বোধ

অর্চনা মজুমদার

রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক বোধ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে সর্বপ্রথমই মনে রাখতে হবে যে অল্প বেশনেতাধের কবির কীর পার্থক্য থাভীর এবং ব্যাপক। কবির বহু প্রবন্ধ ও পত্রের মধ্য থেকে শুধু যে এই পার্থক্যই ধরা পড়ে যায়, নয়, কবির নিজস্ব রাজনৈতিক দর্শন সম্বন্ধেও অসংখ্য স্পষ্ট ধারণা হয়। কিন্তু কেবল প্রবন্ধাদিতে নয়, বরং উপন্যাসেও কবির রাষ্ট্রনৈতিক বোধ ও দর্শন নানাভাবে পরিচ্ছন্ন হ'য়েছে।

'গোরা'র এই দর্শন এক সর্বজনীন রূপ পেয়েছে, কিন্তু 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে এটিকে নানাভাবে সমতাকারে প্রকাশিত হয়েছে এবং বিশিষ্ট দর্শনমূল্যে এর আলোচনাও হয়েছে। এখানে এই কথাই সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

উপনিষদ শতাব্দীর শেষদিকে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির যে রূপ স্মারক বোধে পাই তাকে শুধুমাত্র জাতীয়তাবাদ না বলে স্বাধীনতাভাব বা সাম্প্রদায়িকতা বলা হইতে পারে। এই নতুন জাতীয়তাবোধ পৌরাণিক বিশ্বব্দের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। বসিষ্ণুর উপন্যাসগুলিতেও এই জাতীয়তাবাদের কথাই রয়েছে।

জিলক, অরবিন্দ, বিশিষ্ট, ব্রহ্মবাক্য প্রভৃতি চরমপন্থী নেতারা যে পথ অনুসরণ করে দেশবাসীর মনে দেশের প্রতি ভালবাসা জাগিয়ে তুলতে চাইছিলেন, তা বর্ণনিরপেক্ষ নয়। দেশের স্বাধীনতাকামী ব্যক্তিরা যেভাবে হিন্দুদের বর্ণ-পদার্থকে উত্তেজিত করে স্বাধীনতা সংগ্রামে প্ররোচিত করছিলেন তাতে একটা সত্ত্ববদ্ধ ভ্রম থেকে গিয়েছিল। দেশের অহিন্দু জাতিরা নিজের ধর্ম-বিরোধী কোনো কিছুকেই অন্তরের মধ্যে মেনে নিতে পারেনি।

'বন্দোবস্ত' সঙ্কটকে জাতীয় সঙ্কটরূপে গ্রহণ করে দেশের সেবী-রূপে অধ্যয়ন করা বিন্দুদের পক্ষে সম্ভব হ'লেও বঙ্গবাসীদের পক্ষে তা সম্ভব হ'য়ে উঠেনি।

এই ধরনের উৎকট আবেশিকতা, যা দেশের উপরে আর কোনো কিছুকেই মানতে চায় না, বার কাছের জাতীয়তাবাদের দোহাই পাড়া মিথ্যা এবং দারুণ বলতে চায় সত্য-ভূমির স্বত্বের ক্ষতি বা করা যাবে তা অর্থ হ'তে পারে না—তাদের সংগে রবীন্দ্রনাথের মতের মিল ছিল না।

রবীন্দ্রনাথের আবেশিকতার সংগে বিশ্বমানবিকতার কোনো ভেদ নাই। ১১ই ডিসেম্বর, ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে শান্তিনিকেতন থেকে পিয়রসনকে লিখিত একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—'দেশপ্রেমের অহংকার আমার ক্ষমতা নয়। এই পৃথিবী ছেড়ে যাবার আগে সর্বত্র আমি আমার ঘর খুঁজে পাব, এই একান্ত আশা আমার আছে।'১ সর্বত্র বিশ্বের ভাবনা থেকে দেশের ভাবনাকে বিচ্ছিন্ন ক'রে যে সার্বিকতা লাভ করা যায় না একথাও কবি বারবার বলে গিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ ইউরোপীয় জ্ঞাননালিজমকে কোনোটিনিই মানেন নি। রবীন্দ্রনাথের যে জাতীয়তাবাদ তাকে বিশ্ব-জাগতিকতা (Internationalism) বলা যায়।

পাশ্চাত্য জগতে জ্ঞাননালিজমের যে তরঙ্গের রূপটি প্রত্যক্ষ হ'য়ে উঠেছে তাতে রবীন্দ্রনাথ ভীত হ'য়ে জগতের সমুখে ঘোষণা করলেন—'This nationalism is a cruel epidemic of evil that is sweeping over the human world of the present and eating into its moral vitality.'২।

নৈবেদ্যের ৬৪ সংখ্যক কবিতার তাই কবির কণ্ঠে শুনি—

১। বিশ্বভারতী পত্রিকা বাব-১৫৭ পৃঃ ৩১৬

২। Nationalism in the west, Nationalism P, ১৫,

“বার্ধে বার্ধে বেয়েছে সংসার, লোভে লোভে
যটেছে সংগ্রাম—প্রলয় মন কোভে
তত্ত্ববোধী বর্বরতা উঠিয়াছে আগি
পঙ্কশ্যা হতে। লজ্জা শরম ভেরাগি।
জাতিপ্রেম নাম ধরি প্রচণ্ড অস্ত্রায়
ধর্মেরে ভালাতে চাহে বলের বস্ত্রায়।”

জাশনালখের চেয়ে মনুষ্যত্বকে রবীন্দ্রনাথ অনেক উপরে
প্রাধান্য দিয়েছেন। ন্যাশনালিজমের মধ্যে একটা বিরাট
স্বার্থপরতা রয়েছে তা ক্রমশই সংকীর্ণতার দিকে আকর্ষণ
করে।

‘বিরোধমূলক আদর্শ’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বিবেচনা—
‘জাশনাল স্বার্থের আদর্শকে খাড়া করলেই বিরোধের
আদর্শকে খাড়া করা হয়। সেই আদর্শ লইয়া আমরা কি
কোনো কালে যুরোপের মহাকাব্য স্বার্থদানবের সহিত
লড়াই করিয়া উঠিতে পারিব?’ ৩

স্বাধীনতা সঙ্ঘে কবি স্পষ্টভাবেই বলেছেন—
‘স্বাধীনতার ভাবনা এই যে, স্বদেশের উর্ধ্বে আর
কিছুকেই স্বীকার না করা। স্বদেশের লেশমাত্র স্বার্থে
বেখানে বাধে না—সেইখানেই ধর্ম বল, দয়া বল, আপনার
স্বার্থ উত্থাপন করিতে পারে, কিন্তু বেখানে স্বদেশের স্বার্থ
লইয়া কথা, সেখানে সত্য, দয়া, মঙ্গল সমস্ত নীচে তল ইয়া
যায়।’ ৪

কিন্তু জাতীয় স্বার্থের উপরে ও মনুষ্যত্বকে প্রাধান্য দিতে
হবে, ধর্মকে রক্ষা করতে হবে। এ-ধর্ম কোনো সাম্প্রদায়িক
ধর্ম নয়, তা মানুষের অন্তর ধর্ম। বাহ্য কললাভের মোহে
মানুষ যেন নিজের মনকে না খোঁচায়। এ কথা জানতে
হবে যে অধ্যবসায়ই শক্তি আর অধৈর্যই দুর্বলতা, প্রশস্ত
ধর্মের পথে চলাই নিজের শক্তির প্রতি সম্মান। কিন্তু
উৎপাতের সংকীর্ণ পথে এগিয়ে গেলেই মানুষের মনুষ্য
ধর্মের প্রতি অবিধান প্রকাশ পায় এবং সেই সংগে
কাপুরুষতারও পরিচয় পাওয়া যায়।

৩। বিরোধমূলক আদর্শ: আত্মশক্তি ও সমূহ রবীন্দ্র
রচনামণ্ডলী ১২শ খণ্ড পৃ: ৮৮০

বিলাতী বস্ত্র ব্যবহারের বিরুদ্ধে দেশময় যে বিরাট
আন্দোলন উপস্থিত হ’ল এবং তারই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ যে
কাপড় শোড়ানোর আন্দোলন চলছিল তার বল যে কখনও
ভঙ হ’তে পারেনা তা রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রত্যক্ষ হ’য়ে
উঠেছিল। এই ধ্বংসমূলক কাজের প্রতি তাঁর শক্তি
বিশেষ ছিল। তিনি বলেছেন—‘এখানকার লোক তাই
তিলে তিলে কিছু গড়ে তোলবার ভ্রম বল বাধে না, বুল
বাধে গড়া জিনিসকে ভাঙবার শৈশাচিক আনন্দে।...’
দেশের একপ্রণয়ী লোকেরা সমস্ত অস্ত্র:করণ যে স্বদেশীয়
বিলুপ্ত চিরদিনের জন্য বিজোহী হ’য়ে উঠেছিল তা স্বদেশী-
প্রচারকের বল উপস্থিত প্রয়োজনের তাগিদে সম্পূর্ণ বিস্মৃত
হ’য়েছিল। রবীন্দ্রনাথ গঠনমূলক কাজে বিশ্বাস করতেন,
ধ্বংসমূলক কাজে নয়। ‘ঘরে বাইরে’তে নিখিলেশ
বলেছে—‘আমি বলছি—গড়ে তোলবার কাজে ভোঁদের
সমস্ত শক্তি দাও, অনাবস্তক তেজে ফেলবার উদ্দেশ্যে
তার নিকি পরশা বাজে খরচ করতে নেই।’ উদ্দেশ্যময়
স্বাধীনতা, আড়ম্বরের দ্বারা কখনও কার্যসাধন হতে পারেনা।
‘উদ্দেশ্যনা আড়ম্বরের কাঙাল, আড়ম্বর কর্ম নয় কার্যসাধন
পর্যন্ত। আজ নানা স্থানে নানা কাজ লইয়া আমরা
নানা লোকে বহি লাগিয়া থাকি তবেই গড়িয়া উঠিয়া
অভ্যাগাস আমাদের পাকা হইতে থাকিবে। এমন কি কিছুকি
ভিতরে ভিতরে স্বদেশ গড়িয়া উঠিবে এবং স্বাধীন গঠনের
স্বার্থ অবকাশ একদিন উপস্থিত হইবে।’ ৬

রবীন্দ্রনাথের এই রাষ্ট্রনৈতিক বোধ রাষ্ট্রনীতির পেশাদার
নেতাদের মনের স্বীকৃতি পাননি।

‘ঘরে বাইরে’ উপভাষে সন্দীপ ও নিখিলেশের মধ্যে
দিয়ে তৎকালীন দেশপ্রেমিকদের তীব্র স্বাধীনতার ভাব
বেগন প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি রবীন্দ্রনাথের স্বাধীনতা ও
স্বাধীন হ’য়ে উঠেছে।

যেমন ধর্মের ক্ষেত্রে, তেমনি জীবনব্যাপার ক্ষেত্রেও
ধ্যানভিত্তিক শাস্ত্রতাবকেই রবীন্দ্রনাথ অস্বাভাবিক
বেশতেন। মননশীলতার প্রতি কবির গভীর বিশ্বাস ছিল।

৪। রবীন্দ্রনাথ ও সমাজবাদ: শনিবারের চিঠি ৩৭শ
বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, মাস ১৩৮০, পৃ: ২৮০

দেশপ্ৰীতির ক্ষেত্রেও এই ভাব দেখা যায়। উদ্ভেজনার ঘূর্ণিন্তোর মধ্যে থাক খেয়ে ফিরতে তাঁর কখনও কচি হয়নি। ধারা নিতুতে চিত্তা ও নিঃশব্দে কাজ করে যান, অথবা শক্তির অপব্যয় ও চিন্তের বিক্ষেপ ঘটান না—রবীন্দ্রনাথের সমস্ত সহানুভূতি তাঁদেরই প্রতি—

নিখিলেশ আত্মসমাহিত, সংযতচিত্ত ও সত্যের পুণ্যরি।
 ষাণ্ডেশিকতার উচ্ছ্বাসকে সে কোনোদিনই পছন্দ করেনি।
 উদ্ভেজনার কড়া মন খেয়ে উন্নতির মতো দেশের কাছে লাগবে না বলে সে পণ করেছে! সন্দীপের দল দেশকে দেবতা বলিয়ে যখন অস্ত্রায়কে কর্তব্য, অধর্মকে পুণ্য ব'লে চালাচ্ছে চেয়েছে তখনই তার হৃদয়ে আঘাত লেগেছে বেশি। দেশের উপরেও রয়েছে ধর্ম। তাই দেশের উপরেও যারা ধর্মকে মানছে না...তারা দেশকেও মানছে না।' কিন্তু সন্দীপ বলে 'দেশে আপনাপনি অয়েছি বলেই দেশ আমার নয়, দেশকে বেদীন লুট করে নিয়ে জোর করে আমার করতে পারব সেইদিনই দেশ আমার হবে'...তাই অধর্ম, অত্যাচার, লুণ্ঠন—স্বার্থসাধনের পক্ষে এই ভিনটিই প্রয়োজনীয়। সত্য মাহুষের লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য হচ্ছে ফললাভ। উপস্থিত প্রয়োজনের ভাগিদে সে যে-কোনো পথ বেছে নিতে পারে। অসাধ্য সাধন করা চাই সেই ক্ষেত্রেই দেশকে দেবতা করা দরকার। মাহুষ দেশকে লহজে মানতে পারেনা কিন্তু দেশের প্রতিমাকে অনায়াসে মানতে পারে। মোহ না হ'লে তো ইউরলোকের চলেনা, তাই মাহুষের মনে মোহের সৃষ্টি করতে হবে।

কিন্তু নিখিলেশ প্রমত্ততা থেকে দেশকে বাঁচাতে চায়। যে-কাজকে সত্য ব'লে প্রমাণ করা যায় তাকে সাধন করবার ক্ষেত্রে মোহকে দলে টানা চলবে না। এ ছাড়াও মনে জুলিয়ে যারা কাজ আদার করতে চায় তারা কাজটারই স্বামি বড়ো ক'রে দেখে, যে-মাহুষের মনকে ভোলায়, সেই মনের দ্বার তাদের কাছে কিছুই নেই।

রাষ্ট্রনীতিতেও যে ধর্মনীতির স্থান আছে এ কথা সন্দীপের দল মানতে চায় না।

নিখিলেশ সত্যকে বিশ্বাস করে, সে জনে জনের চেয়ে আত্মবদ্ধ। দেশের উপরেও যেমন ধর্ম, তেমনি মাহুষের মহত্ব থেকে তো বঞ্চিত করা চলতে পারে না।

দেশী প্রচারকরা যখন বিলাতী বক্তৃকর্ষদের সম্মুখ

জোর করতে লাগলো তখন নিখিলেশ এবং তার মাষ্টার-মণার চক্রনাথবাবু উভয়েই তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন। দেশের লোক যখন বিশি জিনিস কিনছেন। তার একমাত্র কারণ সমস্ত দেশ তাদের ত্রুত গ্রহণ করতে পারেনি, কিন্তু অবরুদ্ধি করতে গেলে তার কল কখনও ভালো হয়না। কিন্তু নিখিলেশ বলেছে—'মাহুষ নিজে কী কাপড় পরবে, কোন্ দোকান থেকে কিনবে, কী খাবে, কার সংগে বসে খাবে এও যদি ভয়ের শাসনে বাঁধা হয় তাহলে মাহুষের ইচ্ছাকে একেবারে গোড়া ঘেঁষে অস্বীকার করা হয়। সেইটাই হল মাহুষকে মহত্ব থেকে বঞ্চিত করা।'

'সত্বপায়' প্রবন্ধেও রবীন্দ্রনাথ এই কথাই বলেছেন—'বুদ্ধির ও আচরণের স্বাধীনতা যে মাহুষের পক্ষে কী অমূল্য-ধন তাহা আমরা জানি না। আমরা মনে করি, আমরা মতে সকলকে চালানোই সকলের পক্ষে চরম প্রেরণ; অতএব সকলে যদি সত্যকে বুঝিয়া সে পথে চলে তবে ভালোই, যদি না চলে তবে ভুল বুঝাইয়াও চালাইতে হইবে—অথবা চালানোর সকলের চেয়ে সহজ উপায় অবরুদ্ধি।' কিন্তু এতে মাহুষের বিষেবই চিরস্থায়ী হয়ে উঠে। বাদের সংগে আমাদের কোনো হৃদয়ের যোগ নেই; বাদের আমরা চিরদিন উপেক্ষাই করে এসেছি আজ হঠাৎ তাদের উপকার করতে চাইলে তারা বিশ্বাসই বা করবে কেন, আর নিঃস্বের ক্ষতি স্বীকার ক'রে তা করতেই বা চাইবে কেন?

দেশের হিতের দোহাই দিয়ে নিখিলেশের শুকসায়রের হাট থেকে বিলিতি জিনিস একেবারে উঠিয়ে দিতে বললে চক্রনাথবাবুও তীব্রভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছেন—'দেশ বলতে মাটি তো নয়, এই সমস্ত মাহুষই তো। তা, তোমরা কোনোদিন একবার গোখের কোণে এদের দিকে তাকিয়ে দেখেছ? আর, আজ হঠাৎ মাঝখানে পড়ে এরা

৭। এখানে পিয়রসনকে লেখা রবীন্দ্রনাথের উক্তি 'শ্রীমত'—'সত্যি বলতে জোর খাটোনোটা মূল্যবান। কারণ বিশ্বাস না পেয়ে জোর পেয়ে তরুণের হয়ে ওঠে। বিশ্বাসের ভিত্তি। মাঘ-১৯৭০, পৃ: ৩১৪

৮। আত্মপক্ষি ও সমুদ্র: পদ্মশ্রী: ব, ব, ব, ১২শ খণ্ড প. ৮০৫

কী মন থাকে আর কী কাণ্ড পরবে তাই নিয়ে অত্যাচার করতে এসেছে, ওরা নইবে কেন ?

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'রাজা প্রজা' প্রবন্ধে লিখেছেন 'যে মানুষ ভ্যাগ করছে তার অনেক কাণ্ড আছে, আর থাকে জোর করে দুখ ভোগ করাচ্ছি সে কাণ্ডের অভাবে ঘরের বায় হতে পারছে না। এমনতরো অবস্থান্তর প্রায়শ্চিত্তে পাপকালন হয় না।'১০ রবীন্দ্রনাথের এই কথাই প্রতিধ্বনিত হয়েছে 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের চর্যনাথবাবুর মুখে—

'তোমাদের পরমা আছে, তোমরা দু পরমা বেশি দিয়ে দিলি জিনিস কিনছ...

কিন্তু ওদের তোমরা যা করাতে চাচ্ছ সেটা কেবল জোরের উপরে।

ওরা প্রতিদিনই মরণ-বাচনের টানাটানিতে পড়ে ওদের শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত লড়ছে কেবলমাত্র কোনোমতে টিকে থাকবার জন্যে—ওদের কাছে দুটো পরমার দাম কত, 'সে তোমরা করনাও করতে পার না'...

ধর্মকে সরিয়ে দেশকে তার জায়গায় বসালে দিনে দিনে পাণেই বোকা বাড়িয়ে তোলা হয়।

আর সেই পাণের জবাবদিহিরও দিন একদিন আসবেই। যুরোপ একথা মানতে চায়না।

নিখিলেশ বলেছে—'বড়ো বড়ো ডাকাত-সভ্যতারও জবাবদিহির বিন কখন আসে তা বাইরে থেকে দেখা যায় না। কিন্তু, একটা জিনিস কি দেখতে পাচ্চনা—ওদের পলিটিক্সের স্ক্রলি তরা মিথ্যা কথা, প্রবন্ধনা, বিশ্বাসঘাতকতা, গুপ্তচরবৃত্তি, প্রেস্টিজ্ রক্ষার লোভে স্তায় ও সভ্যকে বলিধান, এই যে সব পাণের বোকা নিয়ে চলেছে এর তার কি কম ? আর এ কি প্রতিদিন ওদের সভ্যতার বৃক্কের রক্ত শুষে থাকছে না ?'

রবীন্দ্রনাথ বারবার বলেছেন 'বাহু কল লাভই যে চরম লাভ—এ কথা সমস্ত পৃথিবী যদি মানে তবু তারতর্য বেন না মানে' ১১...সেই কথাই চর্যনাথবাবু বলেছেন—'সভ্যের

অস্বস্তি জননের মধ্যে এই তারতর্যবোধই বাট উঠুক পরতানের অন্তঃকরণে মটহাসির দাক্ষ্যানে'। বাহু কল চমকপ্রদ সভ্য দেশপ্রেরকে মহৎ ব্যক্তির নিত্যক অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখেছেন। বার্লড শ এই ধরণের দেশপ্রেমিকদের সম্বন্ধে বলেছেন—'They are not public-Spirited', only patriotic,'—১১

রবীন্দ্রনাথও 'প্যাট্রিওট'কেই সর্বোচ্চ বলে মেনে নিতে পারেননি। নিকট আদর্শের আকর্ষণে তবাকবিত্ত দেশপ্রেমিকরা যে কতটা কপটতা, প্রবন্ধনা ও অস্বস্তির পথে পা বাড়িয়েছে তা সন্দোপের মধ্যে দিয়ে সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। আগে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, রবীন্দ্রনাথ আবেগপ্রবণ মনের গতিক দেখে বেশি সমর্থন করতেন না। জনতার উচ্ছ্বাস (Crowd mentality), তা যে প্রকারেই আশ্রক—দেশভক্তির মধ্যে দিয়ে, অথবা ধর্মের মধ্যে দিয়ে, রবীন্দ্রনাথ তাতে প্রজ্ঞা রাখতে পারেননি। সন্দোপের মধ্যে কোণলপ্রবণতা তো ছিলই, কিন্তু তা না থাকলেও ঐ যে সে বহুজনের মুখপার হ'য়ে উপস্থিত হ'ল—আর দেশবাসীকে ডাক দিতে লাগলো, ঐখানেই রবীন্দ্রনাথের আপত্তি।

'ঘরে বাইরে' সম্বন্ধে অধ্যাপক টমসন লিখেছেন—

'The novel would always keep a niche, if only for its historical interest, as the best picture of Bengal's time of political awakening. ১২

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—'ঘরে বাইরে গল্প বখন লেখা যাচ্ছে তখন তার সংগে সংগে লেখকের সাময়িক অভিজ্ঞতা জড়িত হ'য়ে পড়েছে'...১৩

তাই সমসাময়িক কালের দেশপ্রেমের চিত্রটুকু যেমন

১১। 'Men and Superman' Act III. p, 386
The 'Complete plays of Bernard shaw,
First volume

১২। Rabinranath Tagore by Edward
Thompson, P, 246

১৩। র, ব, ব, ৮-ম খণ্ড, প্রথম পরিচয় পৃ: ৫২১,

১০। সভ্যের আদর্শ : রাজা প্রজা : র, ব, ব, ১২খ
খণ্ড, পৃ: ২১২

১১। রোডো-কবিতা : র, ব, ব, প: ১১৩

এখানে ফুটে উঠেছে, সেই সংগে বেশপ্রীতি সযত্নে কবির ব্যক্তিগত ধারণাও প্রকাশ হ'য়ে পড়েছে।

কিন্তু তারজগ্রে কবিকে কম বিদ্রূপ সহ করতে হয়নি।

‘রাজা প্রজা’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

‘যে কাল পড়িয়াছে এখন ধর্মের দোহাই দেওয়া মিথ্যা, কারণ রাষ্ট্রনীতিতে ধর্মনীতির স্থান আছে একথা যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ বিশ্বাসে প্রকাশ করে, লোকে তাহাকে হয় কাণ্ডজ্ঞানহীন, নয় নীতিবায়ুগ্রস্ত বলিয়া অবজ্ঞা করে। প্রয়োজনের সময় প্রবল পক্ষ ধর্মকে যাত্রা করা কার্যহস্তারক দীনতা বলিয়া মনে করে’...১৪ নিখিলেশের ক্ষেত্রেও ঘটেছে তাই—দেশের লোক ভাংছে ভিতরে

তার কুমতলব আছে বলেই বাইরে সে এমন ভালো মাহুব। বিষলাও তাকে দুর্বলভাবে আর সঙ্গীপ বলে—আইভিয়ার মাহুবকে যে কত কাহিল করে দেয়, তার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত হ’ল নিখিল। কিন্তু তবুও সে সত্যের থেকে বিচ্যুত হয়নি, অবিশ্বাস ও অপমানের পথেই চলেছে।...

এ অপমান রবীন্দ্রনাথকেও ভোগ করতে হয়েছে, কিন্তু তবুও তিনি যা বিশ্বাস ক’নে তাকে জোর গলায় প্রকাশ করে গেছেন—‘দেশের প্রেমে যদি দুঃখ ও অপমান সহ করি তা, হলে মনে এই সান্ত্বনা থাকবে যে কাঁটা বাঁচিয়ে চলবার ভয়ে সাধনার মিথ্যাচরণ করিনি।’^{১৫}

১৪। রাজা প্রজা : র, র, ব, পৃ: ২৭৭

১৫। র, র, ব, স্টেম খণ্ড, গ্রন্থ পরিচয় পৃ: ৫২৬,

তুমি নেই

রতনচন্দ্র দাস

তুমি আজ নেই।

চলে গেছ কোন সে অনন্ত আলয়ে

যেথেকে গেছ প্রদীপ্ত জীবন মাঝে

আপন সন্তায় অমলিন এক

বীর্ঘবস্তা। মুকুটহীন ভারত;

দিকে দিকে অজস্র স্মৃতি ভব

হতেছে আজ জীবন্ত, মৃত, বাকাহীন

আধারের বৃকে। অযুত তারার আলো

তোমায়ে করেছে সাথী নিঃসীম বিবরে।

হেথা মোরা করিতেছি সারা

ক্রন্দনে বাতাস ভারী : রক্তগোলাপ

ঝরে গেছে জীবনবৃন্ত হতে, কেড়ে নেছে

বিশ্বজয়ী অমৃতের হাসি—

নিরতি নিহর।



ডিধিরাহো

শেখরচন্দ্র সেনগুপ্ত

এক

গ্রীক নাটকের জন্ম-কথা আমাদের বিশ্বাসের খোঁরাক।

উৎপত্তি এর গ্রীকদেবতা ডিওনিসাসের পূজা-উৎসব থেকে।

গ্রীক-দেবতাদের বংশ পরিচয় তালিকা থেকে আমরা জানতে পারি, ডিওনিসাস আশে কুগান দেবতা নন। তাঁর নাম আমরা পাই পরবর্তীকালের যোজনায়। তিনি দেবরাজ জেউস এবং থিবির হুম্মরী রাজকন্যা সিমিলের পুত্র। এ সম্বন্ধে একটি চমৎকার কাহিনীর সন্ধান আমরা পাই প্রাচীন গ্রীক-পুরাণে। সিমিল বার বার প্রার্থনা জানান দেবরাজ জেউসকে তাঁর স্ব-মহিমায় আবির্ভূত হতে। দেবরাজ প্রথমে সেই প্রার্থনায় কর্ণপাত করেন নাই। পরে সিমিলের কাতর প্রার্থনায় হির থাকতে না পেরে আবির্ভূত হলেন নিজ মূর্তিতে। সাথে সাথে অবটন ঘটলো। তৎক্ষণাৎ চারধারে আগুন জ্বলে উঠলো দাউ দাউ করে। সেই আগুনে পুড়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করলেন রাজকুমারী সিমিল।

সিমিল মারা গেলেন।

কিন্তু দেবরাজ তাঁর গর্তজাত সন্তানকে অকালে বিনষ্ট হতে দেন নি। স্বয়ং নিজের উরুতে রক্ষা করলেন সেই অনাগত সন্তানকে, যথাকালে ডিওনিসাসের জন্ম হলো।

কুরোটদের হাতে এই নব-জাতকের ভার অর্পণ করা হলো। কিন্তু ভীষিতা দেবী হেরার প্ররোচনায় টাইটানরা শিশু ডিওনিসাসকে হত্যা করলো। এ' কথা জানতে পেরে জেউস ক্রোধে জ্বলে উঠলেন।' নিক্ষেপ করলেন তাঁর তরঙ্গর বজ্র। ধ্বংস হয়ে গেলো টাইটানদের সমস্ত প্রাক্কম।

ডিওনিসাসকে আবার পুনর্জীবিত করা হলো।

এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, ডিওনিসাসই একমাত্র গ্রীক-দেবতা, যার জনক অর্গ-নিবাসী দেবতা, কিন্তু জননী মর্ত-মানসী।

চারণ কবি হোমারের কাব্যে ডিওনিসাসের স্থান অতি নগণ্য। তিনি মাত্র চারবার এই দেবতার নাম উল্লেখ করেছেন। হোমারের যুগে তাঁর মহিমা তেমন প্রকাশ পায় নি।

গ্রীক-নাটক সম্বন্ধে যারা গবেষণা ক'রে গেছেন, তাঁদের অনেকেই মত, ডিওনিসাস আসলে গ্রীক-দেবতা নন; মূলতঃ তিনি এশিয়া মাইনরের ফ্রিজিয় ও লিডিওদের দেবতা। এই জন্তই তিনি যখন থেস ও থিবিতে পূর্ণাঙ্গ করেন, তখন তাঁকে প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এশিয়া মাইনর থেকে তিনি এসে দাঁড়ালেন ইজিরান সমুদ্রের উত্তরকূলে। দূরন্ত সমুদ্র স্বাস্থ্যবান শিশুর উচ্ছ্বাসে নিয়ে তাঁর পদ-চুম্বন করলো। বাতাস তাঁকে আচ্ছান জানালো। দূরে বজ্রদূরের নগর, গ্রাম, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত তাঁকে হাতছানি দিলো। ডিওনিসাস তাই এগিরে চললেন। চলতে চলতে থমকে দাঁড়ালেন। থমকে দাঁড়ালেন ঠিক গ্রীসের মাটিতে দাঁড়িয়েই।

তাঁর এই একটানা অগ্রগতি নিরাপদ ছিল না।

সময় সময় প্রকৃতি উদ্ভাস হ'য়ে উঠেছে। আবার সময় সময় অনেক শত্রু, অনেক অপদেবতা তাঁর অগ্রগতির বিক্ষেপে অস্ত্র ধারণ করেছে। কিন্তু জেউসের ঐরস-আঁত সন্ধান ডিওনিসাস তো অপ্রতিরোধ্য। তিনি তাঁর শত্রুদের, সমস্ত বাধা-বিষকে ছিন্ন-ভিন্ন করতে করতে এগিয়ে এলেন। শত্রুরা পরাজিত ও নিগৃহীত হ'য়ে মাথা হেঁট করলো।

প্রাচীন গ্রীসে ডিওনিসাস হলেন আঙ্গুর-খেত ও মদের দেবতা, কিন্তু অজান্তে অনেক বস্তুর সঙ্গেই তাঁর নাম ও মহিমা ছিল জড়িত। বস্তুতঃ তিনিই ছিলেন সমগ্র অরণ্য প্রকৃতির দেবতা। আঙ্গুরের লতা-পাতায় মোড়া দণ্ড (Thyrsis) তাঁর একটি প্রতীক। মজ্জ্বল্যে তিনিই প্রথম-আঙ্গুরের চাব শিখিয়েছিলেন। ফুল ও ফলের তিনি রক্ষক। তাই এক কথায় তাঁকে বলা হতো—'ফুটন্ত'!

ডিওনিসাস আবার কবি ও শস্যের দেবতা। তিনিই

গানের সাথে সাথে তাদের আত্মিক অথবা পক্ষে পরস্পরের সঙ্গে কথোপকথন করতে হত। এই কথোপকথনের বিষয়বস্তু ছিল ডিওনিসাসের জীবনের ঘটনাবলী। দার্শনিক এ্যারিস্টটল বলে গেছেন, গ্রীক ট্রাজেডির মূলবীজ নিহিত ছিল এই ডিওনিসাসের পূজাপ্রাঙ্গণে পক্ষে পরস্পরের কথোপকথনের মধ্যে। ক্রমশঃ যুগ উন্নততর হয়; সভ্যতার আলো আরও তীব্রতর হয়ে আসে। গ্রীসের বুকে জন্ম নেন আরও শক্তিশালী কবি-নাট্যকারের দল। কালক্রমে তাই ডিথিরাম্বো রূপ পরিগ্রহ করে সার্বকালের বিশ্বয় গ্রীক নাট্য সাহিত্যে।

[চার]

আধুনিকের, মৃত্যুর পর তাঁর পরবর্তী গ্রীক কবিদের হাতে ডিথিরাম্বো আরও উন্নত, আরও মাজিত হয়ে উঠে। এই

গানই কালক্রমে একটি বিশিষ্ট-শ্রেণীর কাব্য-গাথার পরিণত হয়েছিল। এরপর দেখা দিল সম্পূর্ণ বিপরীত দুইটি শাখা—প্রথমটি সঙ্গীত-মূলক; অপরটি নাট্য-মূলক।

এখেলের উন্নত সভ্যতা এই ডিথিরাম্বোকে সাধারণ গ্রহণ করলো। এর চাকচিক্য বৃদ্ধি পেলো। সাহিত্যের নানাশাখার ডিথিরাম্বো তার প্রাণ বিকীর্ণ করতে থাকে।

ডিথিরাম্বোর নাট্য-শাখার বিশ্বদেয় উন্নতি ট্রাজেডি স্থাপিত। ট্রাজেডিস্থিতির পূর্ণগৌরব এখেলবাসীদের প্রাপ্য। বলা বাহুল্য, পাশ্চাত্য তথা আধুনিক বিশ্বের নাট্য সাহিত্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে গ্রীক নাটকের প্রভাব অপরিণীম। তাই এই প্রসঙ্গে ডিওনিসাসের পূজা উৎসব এবং তাঁর ডিথিরাম্বো সঙ্গীত সাধনা প্রভৃতির সঙ্গে অবশ্যই স্মরণীয়।

সেদিনের স্মৃতি

শ্রী অসিতবরণ চৌধুরী

সেদিনের স্মরণগুলো রঙিন রঙিন
কর্ণের পাখাণ ঘারে মাথা খুঁড়ে মরে...
বেদনার হতাশাস, ... অকাল মৃত্যুর মতো
নিশ্চক্ৰ অনড়.....
আনি আমি, একদিন বতগুলো কুঁড়ি ছিলো
বৃক্ষে তার নরম ফুলের
বাস্তবের কল্পনার—একান্ত নির্ভর কাছে
ঝরে পেল—অনাদৃত কবিতার মতো।
সেদিনের বনলতা—বনলতা নয় আর...
মাধবীর শীর্ণ গালে ভ্রমরের
লাগেনা চুম্বন...

জ্যোছনার ফিকে নীল শাড়ী মনে আনেনা আবেগ-
রজনীগন্ধার ধূপ আগায়না আর
বাসর শস্যার রাজি ॥
সেদিনের বাধাগুলো—বাধা হোক—
তবুও স্বন্দর...
সেদিনের অশ্রুগুলো—অশ্রু হোক—
তবুও নিটোল ছাপা মৃত্যুর মতো...।
সেদিনের আশাগুলো—আশা বটে—
তবুও মধুর.....
এধের তুলনা নেই—
স্বপ্নের কণ্ঠসবটে এরা শুধু স্মৃতি।

কলানবগ্রাম ও শিক্ষানিকেতন

“পথিক”

বর্ষে ইংরেজ রাজত্ব কায়েম হবার পর হতেই ইংরেজী ধারা প্রচলিত হ’ল এই বিষয়ে মিশনারী পাণ্ডীদের এর সম্পূর্ণ ভার পড়’ল এবং তারই সঙ্গে এগিয়ে সেই সব ভারতীয়, বীরা বিশ্বাস করেছিলেন যে যাদের সর্বপ্রকার উন্নতির জন্য ইংরেজী শিক্ষা ও তৎ-প্রবর্তিত শিক্ষানীতি অবশ্য অপরিহার্য। নানা মূল অবস্থার মধ্যে দেখতে দেখতে সেই শিক্ষা সমগ্র লাড়ো আগিয়ে তুললো। ইংরেজের চিন্তাধারার, বর্তনায় বীরা প্রকালীন তাঁরাই বিশেষ উৎসাহে পরোক্ষভাবে সর্বপ্রকার শক্তি নিয়োজিত ক’রে হন। তাই খুব শীঘ্রই ইংরেজী শাসনের বিস্তারের সাথে ইংরেজী শিক্ষার বিস্তৃতি ঘটেছে সারা বর্ষে। দেশের জননায়ক, দেশনায়ক ও মনীষী-মকলেই ইংরেজী শিক্ষার নিঃস্বের অজ্ঞানতার রকে আলোকিত করে সর্বলোকে পরিচিত হয়েছেন। বর্ষ সর্বজন-বরণীয় প্রতিভাবান ব্যক্তিরা ইংরেজী শিক্ষা-অনেক ক্রটিও লক্ষ্য করেছেন—তার মন্ত দেশকে, শিক্ষিত সম্প্রদায়কে সচেতনও করেছেন। বীরা কথ্য শুনেছে তাঁরা অনেকেই নিজের হয়ে নানা বাগ বিতণ্ডার বিস্তার ক’রে স্বাধীনতা লাভের উপায় হাতিয়ারে সেই কুফল কতটা দেশের ক্ষতি সাধন তার কাজে লাগিয়েছেন। আর বীরা ছুঁচোর জন তে তাঁদের চিন্তা ও ভাবনাকে গভীরভাবে বিশ্বাস হন, নূতন পথের ঠিকানা লাভ ক’রে একা একা করেছিলেন।

ইংরেজের ভারতবর্ষে সেই পথ অনুসরণ করা খুব একটা ঠিক ব্যাপার ছিল না। কেবল মাত্র রবীন্দ্রনাথই নিকেতনের মাধ্যমে একা এগিয়ে এসে শিক্ষাক্ষেত্রে যতটুকু। ভারতের সর্বলোকে যে সত্য ও ঐতিহ্য গী হ’তে জেগে আকাশস্পর্শী হয়েছিল একদিন,

সেই সত্যকে সম্মুখে রেখে রবীন্দ্রনাথ তপোবন ও আশ্রমের চিন্তাধারার “সর্বজনহিতায়” বজ্র সর্বপ্রাণ সমর্পণ ক’রে এগিয়ে চলেছেন। সদিন কবি ছিলেন প্রায় বহুলোকের কাছে “কলনাবিলাসী”। সমাজ গঠনে জাতি গঠনে শিক্ষার স্থান যে কত বড় অংশ জুড়ে আছে তা একমাত্র রবীন্দ্রনাথই বার বার দেশের রাষ্ট্রনায়ক, দেশনায়কদের বলেছিলেন।

গান্ধীজীও বুঝলেন—বিশ্বাস করলেন—দেশের সর্বতরে মজল হ’বে তখনই যখন তার শিক্ষা ব্যবস্থায় সর্বতরের উৎকর্ষের দিকে আত্মনির্ভরশীল। তাই রাজনীতির সাথে সাথে ‘চরকা’ আন্দোলন এবং ‘বুনিয়াদি শিক্ষা’ প্রকল্পের উপর জোর দিলেন। স্বাধীন ভারতবর্ষের নূতন সমাজ গঠনে, রাষ্ট্রগঠনে, মানব গঠনে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী প্রবর্তিত চিন্তাধারার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হ’বে—এই আশা পোষণ করতে লাগলেন অনেক স্বদেশ-প্রেমিক।

দেশ স্বাধীন হ’ল। চারিদিকে চললো একটা দুগো-ঝাড়ার এবং নূতন কিছু ক’রবার বা ভাববার তীব্র আয়োজন—উৎসবও বটে। যে বৈদিক দিবে পারছে—কিছু একটা করার মস্তভায় প্রায় মত্ত। কিন্তু দেশের শৃঙ্খল খসেছে, শৃঙ্খলাঘোষণা দিনে দিনে জাতীয় জীবন হ’তে অনেক দূরে সরে গেছে। জাতি গঠনে যে দিকটার কথা সবচেয়ে প্রথম ভাবা প্রয়োজন সেই দিকটা সকলের পেছনে লাইন দিয়ে নিজের নখর রাখলো। শাসনতন্ত্রের গঠনতন্ত্রের চিন্তায় দেশতক লোক যেতে উঠেছে। তুলে গেছে রবীন্দ্রনাথের—গান্ধীজীর চিন্তাধারা—শিক্ষার পরিকল্পনার কথা। তাই তো স্বাধীন হ’বার দীর্ঘদিন পরেও হিসেবের খাতির খুব একটা ‘হাসি নেই’ নেই ‘আনন্দ’।

তার কারণ, যে করজন রবীন্দ্র-গান্ধীজীর শিক্ষাধারার প্রতি আকর্ষণ, প্রাণবন্ত এবং জব্বরের সর্বথ উদ্বুদ্ধ ক’রে

দিয়ে তার সার্থক রূপায়ণে 'স্বতী,' তাঁরা সামাজ্য দু'চোরজন।
সমগ্র ভারতবর্ষে একশজনও হবেন বলে মনে হয় না।

কিন্তু তার ক্ষমতা নেই। কারণ রবীন্দ্র-গান্ধী প্রযুক্ত শিক্ষাধারার মত বীরা জগৎ করে চলেছেন তাঁদের সংখ্যা যতই কম হোক না কেন, একদিন সকল 'পরীক্ষা—নিরীক্ষার' মাধ্যমে দেশের জন-সমাজে তা ব্যাপকতার রূপ পরিগ্রহ করবে—যেমন করেছে একদিন ইংরেজী শিক্ষা ব্যাপক।

পুরাতনকে বর্জন করা যতই কঠিন হোক তার চেয়ে বেশী ভয় ও সংশয় নতুনকে গ্রহণ করতে। তাই তো শিক্ষাবিভাগ সর্বত্র খুঁজে চলেছেন সেই সব আদর্শবাদী দেশ সেবাদের—যাদের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা রবীন্দ্র-গান্ধী শিক্ষা ও চিন্তার প্রতি সম্পূর্ণ সংশয়হীন—সর্ব-তর্কজড়িত বেড়া-জালের বাইরে। তাঁদেরই হাতে সরকার রবীন্দ্র-গান্ধীর শিক্ষার নতুন প্রকল্প বাচাই করে নিচ্ছেন। এ চিন্তা খুবই বিবেচনা প্রসূত। সমগ্র ভারতবর্ষের জনমানসে যে শিক্ষা আন্দোলনের মত মনো-জীবনকে আহ্বান করে আছে তাকে এক মুহূর্তে শেষ করে দেওয়া যায় না।

নতুন ভারতবর্ষের সমাজগঠনে শিক্ষার ভূমিকা হবে সবজনীন। তার ক্ষমতা এখন হতেই প্রস্তুতি চলছে গুটী-কয়েক আধার।

কলানবগ্রাম সেইরূপ একটি কর্মসূচ্যশালা। নাম শুনেছি অনেকদিন থেকে, কিন্তু এতদিন তা দেখবার সুযোগ হয়নি। সেইদিন ভারতবর্ষের সম্পাদক সর্ব-জন প্রজ্ঞার ফণীনা ও আমি বেরিয়ে পড়লাম সেই কলানব-গ্রামের অভিমুখে।

কলানবগ্রাম। একটি মাল্লবের বিখ্যাত ও আশ্চর্য্যাপূর্ণ প্রাণ সম্পন্ন উদ্ভিদ। সেই মাল্লবটি সেই অঞ্চলে "মট্টার মশাই" বলে পরিচিত। সহজ সরল বিজ্ঞান। জীবির কুমার ভট্টাচার্য। গান্ধীজীর আদর্শে অল্পপ্রাণিত একটি আছতি। গান্ধীজীর সহিত খুব সাদৃশ্য ছিল না। জীবনে ২৩ বার দেখা হয়েছিল। ২৩ কথা হয়েছিল। কাছে পাবার সুযোগ থাকলেও বিজ্ঞান তা গ্রহণ করতেন না বরং গান্ধীজীর চিন্তাধারা ও মানসিক সত্যের অমূল্যত্ব করে জীবনে ও কর্মে তার রূপ ধান করতে সর্বনিষ্ঠা ও প্রেরণাকে নিয়োজিত করেন।

বড় বড় কথা আর রাজনৈতিক আভিজাত্যের বাইরে থেকে 'সেবার' মাধ্যমে দেশ ও দেশবাসীকে ভালবাসতে শ্রদ্ধা করতে এগিয়ে গেলেন গ্রামে-গ্রামে। হরিণালের সতীশবার প্রেরণা এবং আশ্বার ব্যাকুলতা একত্রিত হয়ে বিজ্ঞানকে ঘর ছাড়া করল।

দেশ স্বাধীন হল। নেতৃত্বের মোহ এবং ক্ষমতার ভোটাভুটি যখন আদর্শের বৌদ্ধিতে অশান্ত হয়ে উঠল তখন সহরের phone, fan-এর মাধ্যমে কাটিয়ে কলানবগ্রামে নিজেকে নিয়োজিত করলেন ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষের নব পরিকল্পনার শিক্ষাপ্রসারে।

১৯০৫ সালে শিক্ষা-নিকেতনের প্রতিষ্ঠা হয়। নান কারণে ১৯৪১ সাল হইতে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত কাজ বন্ধ থাকে। ১৯৫১ সালেই নতুনভাবে এর কাজ নবপরি-কল্পনার আরম্ভ হয়। এতদ্ব্যতীত অনেকগুলি শিক্ষা ও সেবা প্রতিষ্ঠান আছে যার প্রায় অনেকগুলি শিক্ষানিকে-তনের অঙ্গভূত। ৭ জন গান্ধীবাদী সহকারীর সহযোগিতায় [কর্মপরিষদের সপ্তরূপে] বিজ্ঞান কলানবগ্রামে যে সকল আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন তা বাঙলা দেশে দুর্লভ। ভারতবর্ষের বহু স্থানের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান [বেসরকারী] লেখক দেখেছেন, কিন্তু এমন প্রাণবন্ত এমন ভবিষ্যৎ মাল্লব গঠনের পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ণ খুব একটা নজরে পড়েনি।

প্রথমেই এলাম শিশু বিদ্যালয়ে। প্রি-বেসিক-মাস্টারী বিদ্যালয়। ৪২টি শিশু, যাঁদের হাতে হরত ভবিষ্যৎ ভারতের স্বাধীনতা শক্তির ও কর্মের পরিচয় বহন করবে। গাছের ছায়ার ঘেরা, পরিবেশের পরিচ্ছন্নতা, মনকে প্রথমেই আকর্ষণ করল। বারে বারে ভুল হতে লাগল, শান্তিনিকেতনে এলাম না তো! ২জন মাত্র শিক্ষিকা রয়েছেন। এদের সকলের চুপুরের খাবার দেওয়া হয়। প্রধানত: অল্পমত প্রেণীর ছেলেমেয়েদের মত প্রতিষ্ঠিত হলেও এখানে উচ্চ প্রেণীর ছেলেমেয়েদের দেখলাম। লেখাপড়ার চেয়ে খেলাধুলা এবং গানের মাধ্যমে শিক্ষা। ৫ বৎসর বয়সের মধ্যে সবাই বেশ পুষ্ট, আনন্দ-বৈ-কাসিতে কুটে উঠছে। ঘরে ঢুকে ঘেঁষি ক, খ, গ সারিতে নিয়ে বড়ো বলে আছে। সরকারী সাহায্য নাম মাত্র। এর সম্পূর্ণ খরচ শিক্ষা নিকেতন বহন করেন। মাঝে

মাঝে পালা করে school mother-রা এসে এদের তত্ত্বাবধি করেন গ্রামের চাষী, মজুর মেয়েরা তাদের সম্ভ্রামের আলের ধাবে পাতার আড়ালে শুইয়ে রেখে কাজ করত, মাঝে মাঝে এসে মাই দিত। এই দৃশ্য বিজয়দার হৃদয়কে বেদনা দিল। আমাদের কথিত সম্ভ্রামের সম্ভ্রাবনা এইভাবেই প্রতিদিন প্রতিটি গ্রামে অকুরেই বিনাশ হয়ে যায়। শিকানিকৈতনের কিছু কিছু কাজের মাঝে এ উপায় সম্পর্কে চিন্তা হল। চোখে পড়ল একটা তড়ির তাত্ত্বিকানা। বেশ জরুরী : কিন্তু লোকজন খুঁ একটা জমছে না। মালিক ছেড়ে দেবে ভাবছে। এমন সময় বিজয়দার গোল এস—তাত্ত্বিকানা হয়ে উঠলো জাতিগঠনের সাধনার তীর্থ এই বিভাগের শিকার বিষয় হচ্ছে—পথ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, স্পষ্ট ও শুদ্ধ করে কথা বলার অভ্যাস করা, নিজের প্রয়োজনীয় কাজ নিজেরা করতে থাকা। পাঁচজন মিলে বিশেষ থাকা ও ভাগ করে খাওয়া। ‘রঘুপতি বাবু’ ওদের প্রার্থনার মধ্য হাতে তালি দিয়ে আধো আধো কণ্ঠে ওবা মনেব আনন্দে গেয়ে যায়।

এই পাশে রয়েছে গুরুমা—শিক্ষণ-কেন্দ্র। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উপযুক্ত শিক্ষা দেবার জন্য উপযুক্তবয়স্ক মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা। তাছাড়া স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন ও সামাজিক কল্যাণকর কাজে যুক্ত থাকা এর মাধ্যমে সম্ভব। লেখাপড়া তো আছেই, তার সাথে শিল্প ও হাতের কাজের শিল্প শিক্ষা দেওয়া হয়। এঁরাই এখন হাতে উপযুক্ত হয়ে পূর্ব বনিয়াদী বিদ্যালয় বা ‘নিয়াদী বিদ্যালয়ের প্রাক প্রাথমিক বয়সের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেবার কাজে ব্রতী হন। এই কেন্দ্রের শিক্ষাগান ১৩ জন মাস। ২০ জন শিক্ষার্থী একসঙ্গে শিক্ষা লাভ করতে পারেন। শিক্ষার্থীদের মাসে ৩০ টাকা সহকারী ভাতা দেওয়া হয়। কিন্তু ভাতাও কুলের না। বাকী অনেকটাই শিকানিকৈতনকে বহন করতে হয়। পশ্চিম বাংলায় এই ধরনের গুরুমা শিক্ষণ কেন্দ্র এইটাই প্রথম। ওঁরা মনে হুগলী জেলার হরিপাল গ্রামে আর একটি গুরুমা শিক্ষণকেন্দ্র হয়েছে।

লেখান থেকে নির বনিয়াদী বিদ্যালয়। ‘রাশাটা’ এত ‘পরিষ্কার’—জিজ্ঞাসা করতেই বিজয়দার বলেন, ‘ছেলে

যেদেরা নিজেমা ভোর হতেই পরিষ্কার করে’। কথা শেষ না হতেই বেথলাব ঝাড়ু হাতে কয়েকটি ছেলে মেয়ে অভ্যস্ত নিষ্ঠার সাথে পথ বাগান ঝাড়ু দিচ্ছে। মনটা বেশ স্নায়ু হ’ল। আমাদের ছেলে মেয়েদের মধ্যে এমন কর্তব্য—অহরহ! জীপ আগতেই চোখে পড়লো বিদ্যালয়ের পরিবেশ। ৪ বিঘা জমির উপর—বল আর রজনীগন্ধার গাছ—এক সঙ্গে এত কুল ফুটে আমি এম পূর্বে কোথাও দেখিনি। সবটাই ভেলে মেয়েদের দ্বারা। নতুন সমাজ-গঠনে সমাজের কল্যাণকর উৎপাদনাত্মক শ্রমই গাছের উদ্দেশ্য। শুধু লেখাপড়া নয়, মানব করে তোলা। বিজয়দার বললেন, এ বিভাগে আমার কাজের সার্থকতা কিছুটা অল্পত করি—ছেলেমা একে অন্তরঃস্থ লাভব করে এবং পরম্পর সহযোগিতা করে কাজ করে।

কাজের মাধ্যমে শিকা লাভ। সামনেই চোখে পড়লো রান্নার ঘর। ১৩টি স্থানীয় ছেলে মেয়ে (ছয় হইতে দশ বৎসরের) পাঁচটি শ্রেণীতে পড়ে। সামনের ক্ষেত্রে ছেলেরা আপন আনন্দে কাজ করছে—নতুন কল কিছু বলাবে। বিদ্যালয়ের দরিয় ছেলেদের জন্য আহাঁবের ব্যবস্থা করা হয়। তার জন্য ছেলেদের দ্বারা উৎপন্ন আলু ও কুমড়া এবং গ্রাম হাতে সংগৃহীত মুষ্টিভিক্ষা। পূর্বে গ্রামের ছেলেরা বাবুদের বাড়ীতে রাখাশি করত, লেখাপড়া শেখার সুযোগ পেত না। এই বিদ্যালয়ের প্রত্যেক তার রয়েছে মনীষবাবু ও তাঁর স্ত্রী রঘু বহুর উপর। বিজয়দার পরিকল্পনায় বেণু দেবার সহযোগিতাও কথা বার বার আমাদের কবে এসেছে। স্বাধীনতার সম্মিলিত নিষ্ঠার ও প্রমে বিদ্যালয়ের উত্তরোত্তর বেড়ে উঠেছে। ৫ জন শিক্ষক ও ১ জন কুল মগার রয়েছেন। কুল ঘোড় সাহায্য করে থাকেন। কিন্তু শিকানিকৈতনকেই সবচেয়ে বেশী খরচ বহন করতে হয়।

শিকানিকৈতনের প্রাণবল্লভ উচ্চ বনিয়াদী বিদ্যালয়। বিজয়দার সহধর্মিণী শ্রদ্ধেয়া সাধবা দেবার স্ত্রীও স্পর্শে এই বিদ্যালয় যেন একটা বৃহৎ সৃষ্টিশীল। একদিকে চলেছে কর্ম, আর একদিকে চলেছে ছাত্রের বৈরাগিকতার পরিবেশে মানসিক উন্নতির সাধনা। ৭৬টি ছেলে মেয়ে : (এগার হাতে তের বৎসর পর্যন্ত) তার মধ্যে ১৪ জন মেয়ে, বাকী সব ছেলে। দু’রে ভেলে অসহজ স্বপ্ন, এগিয়ে

যেতেই ভেসে এ'ল—‘বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু’ গান। এমন পরিবেশে এ-গানই ভাল শোনায়। সহরের কৃত্রিম পরিবেশে যত ভাল ভাবেই গীত হোক না কেন, এমন আকুল করা, উজাড় করা, দরদ উপলব্ধি করা যায় না। গানটি শেষ হ'বার পর আর একটি গান শুনলাম। গানটি শান্তিনিকেতনের কবি প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত। সুরও খুব পরিচিত। রবীন্দ্রনাথের ‘আমাদের শান্তিনিকেতন, সবচেয়ে আপন’—সেই সুর, সেই সব কথার মাসা—‘আমাদের শিক্ষানিকেতন। আমাদের প্রাণের প্রিয় ধন, আমাদের পরশ রতন’ তার আকাশ-দেয়াল মাঠে মোদের আনন্দে দিন কাটে, ও তার বনের ছায়া জাগায় মায়া মায়েই মতন ॥ ইত্যাদি। ভ্রম হয়, এ শান্তিনিকেতন! ঐঠাল গাছের ছায়ায় ছেলে-মেয়েরা কাজ করছে। কেউ ড়িল, কেউ আবার গাছের কলমে ব্যস্ত; কেউ কাঠের কাজ; তাঁত ও চাষ। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়া হয়। এখানকার পড়া সমাপ্ত করে ছাত্ররা উচ্চ বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীতে ভর্তি হতে পারে। শিক্ষার সময় সকাল ৭টা হ'তে ৪টা পর্যন্ত। মাঝখানে বিরাম আছে—সেই সময় বাঁদের বাড়ি নিকটে তারা খেয়ে আসে। অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীরা বিদ্যালয়ে আহার করে। রান্নার কাজও ছেলে-মেয়েদের। দেখলাম, ছেলেরা কয়লা ভাংগছে, পেয়াজের ও পটলের খোলা ছাড়ানো, মেয়েরা কুটি বেলছে, উনান ধরাচ্ছে। সারাদিন বিদ্যালয়ে থেকে পড়াশোনা, কাজকর্ম ও খেলাধুলা। যে সব ছেলে-মেয়েরা বিদ্যালয়ে আহার করে তাদের মাসে পাঁচসের করে চাল দিতে হয়। এই বিদ্যালয়ে আছে দাক্ষকর্ষশালা, বয়সশালা, গ্রন্থাগার, কলাভবন ইত্যাদি। সব কটাই প্রাণ-চাঞ্চল্যে ভরপুর।

এই বিদ্যালয়টি নামকরণ করা হয়েছে ‘অরবিন্দপ্রকাশ বিদ্যালয়’ এই নামে। অরবিন্দপ্রকাশ ঘোষ। বর্ধমান জেলার অন্তর্গত অকালপৌর গ্রামে তাঁর পিতৃভূমি। হিন্দু-মুসলিমের বিখ্যাত কেন্দ্রীয় পণ্ডিত মহাশয় তাঁর পিতা। হিন্দু-মুসলিমের শিক্ষকতা করবার সময় ভারতের আদিম অসহযোগ আন্দোলনে অরবিন্দপ্রকাশ অংশ গ্রহণ করেন। সে সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের রত্নরূপ বীরা গভর্নমেন্ট স্কুলের শিক্ষকতা ত্যাগ করেন তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ,

রাধাকৃষ্ণন মুখোপাধ্যায়, চারাগচন্দ্র চাকলাবাস, বিনয়কুমার সরকার ও অরবিন্দপ্রকাশ ঘোষ অন্যতম। তাঁরপর হ'তেই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে যোগদান করলেন। অরবিন্দপ্রকাশ হাতে-কলমে কখনও বিপ্লব করেন নি; বোমা হিডলতার ছোড়েন নি। কিন্তু তিনি ছিলেন বিপ্লবের শ্রষ্টা-পুরুষ—ভাববিপ্লবী। তাঁদের শিক্ষায়, অনুপ্রেরণায় তদানীন্তন যুগে বহু দেশ-সেবক বিপ্লব-কর্মে ব্রতী হয়েছিলেন।

নিকটেই আন্তোষ গ্রন্থাগার, ডাঃ আন্তোষ দাস মহাশয়ের স্মৃতিতে নামাঙ্কিত ঠিক শান্তিনিকেতনের ছাতিমতলা। সভার ভায়গা, সামনে প্রকাণ্ড বেদী—চারদিকে তপোবনের স্নিক্ততা সামগ্রিক পরিবেশ মোঃ জাগায়। শ্রীহরলাল শীল মহাশয়ের পরিকল্পনাসারে উপাসনার ‘বেদীটি নিমিত। গ্রন্থাগারটি সরকারী অর্থায়নকৃত। অত্যন্ত আধুনিক পদ্ধতিতে পরিচালিত। কলিকাতা মগনগরীতে এমন পাঠাগার দেখা যায় না। ছিপ্রচর ছ'বটিকায় এর কাজ আরম্ভ হয়, রাত ৮টা পর্যন্ত চলে। শিশুদের, মহিলাদের ও বয়স্কদের জন্য পৃথক পৃথক ব্যবস্থা। গ্রামের বহুলোক এই গ্রন্থাগারে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে থাকেন। শিক্ষানিকেতনের তত্ত্বাবধানে এ গ্রন্থাগার গ্রামের সাংস্কৃতিক ও শিক্ষার মান উন্নত করার কাজে প্রাণশক্তি অর্জন করেছেন।

শিক্ষানিকেতনের অঙ্গীভূত শিল্পবিদ্যালয় বর্ধমান জেলার নামকরা বিদ্যালয়। সতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয়ের নামে এই বিদ্যালয় উৎসর্গীকৃত। সতীশবাবুর বাড়ী শ্রীরামপুর। কর্মজীবনে তিনি প্রথম হরিপালে পরে কলকাতার মডার্ণ ও শেষবয়সে মেট্রোপলিটন মেইনে প্রধান শিক্ষকরূপে কাজ করেছেন। উচ্চস্তরের বক্তা ও লেখক হিসেবে খুব খ্যাতি ছিল। বিনয় সরকার সম্পাদিত ‘গৃহস্থ’ কাগজে নিয়মিত লেখা প্রকাশিত হত। বঙ্গোপসাগরে নানা সমস্তার একমাত্র সমাধানবদ্ধ ছিলেন সতীশ সেনগুপ্ত। প্রথমে ‘বিপ্লব আন্দোলনে’ যুক্ত হলেন, পরে বিপিন গাঙ্গুলির ‘আন্দোলন প্রতিষ্ঠান’ সমস্ত হন। নিজে বিপ্লবী দল গঠন করে বহু লোককে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। ১৯২৯ সালে সব ত্যাগ করে সতীশবাবু গান্ধীবাদী আন্দোলনে যোগ দেন। গান্ধীবাদী যখন কলকাতার এলেন সতীশবাবু একটি লেখায় লিখেছিলেন

ভবিষ্যৎ ভারতের ভার একদিন এই গাঙ্গীকেই নিতে হবে—।’

অষ্টমশ্রেণীর পাঠ শেষ করে বা উচ্চ বুনিয়ার পাঠ শেষ করে ছেলেরা এ বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করে। জীবিকা অর্জনের উপযোগী শিল্প-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ হবার শিক্ষাও দেওয়া হয়।

বুনিয়ারী শিক্ষণ-মহাবিদ্যালয়, বৃত্তি-শিক্ষা-বিভাগ, সঙ্গীত ও চিত্র শিক্ষা-বিভাগ, সমাজ-সেবা-কেন্দ্র, চক্ষু চিকিৎসা কেন্দ্র ইত্যাদি সবটাই শিক্ষানিকেতনের অঙ্গ।

কলানবগ্রাম ভারতের গ্রামগুলির অন্যতম। সহরের Phone-fan এর মোহ ত্যাগ করে আমরা গ্রামে গিয়ে কাজ করতে কেউ চাই না। আদর্শের নামে অনেক কথাই বলি। আমাদের দেশের যুবকরা কিম্বা নেতৃগণ যদি গ্রামে গ্রামে ভোট ভিক্ষা না করে বিজ্ঞানার আদর্শে কাজ করতে অগ্রসর হতেন তবে এই ১৯১৭ বৎসরে ভারতবর্ষের চেহারা বদলে যেতো নিঃসন্দেহে। কিন্তু তা হল না। গাঙ্গীজীর অতি নিকটসম্মুখে থাকা ছিলেন তাঁরা প্রায় সকলেই আজ মন্ত্রী কিংবা সহরের নেতা।

বিজ্ঞানার চিন্তা গ্রামের উন্নতি। তাই স্বাধীনতা লাভের পর গ্রামের কল্যাণে ও মঙ্গলকর্মে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করলেন নিজেকে। আর তাঁর সাথে শক্তিরূপা হয়ে এলেন তাঁর সহযোগী সাধনাদি। হাসিটি মুখে লেগেই আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ, ডিগ্রী পাওয়া গেয়ে সকল জ্ঞান, ধারণা, নিষ্ঠা, শ্রম উজাড় করে দিয়ে স্বামীপাশে ঘেন হর-পারতী। সেই মোটা লাল পেড়ে শাড়ী আর সকলের জন্ত উৎকর্ষ।

নিজের হাতে সকল কাজ দেখা-শোনা করার পর যতটুকু সময় পান—তাও স্বামীর সেবায় নিযুক্ত। সেই পরমা-স্নিগ্ধা সাধনাদি। চোখে মুখে অভাবনীয় তৃপ্তি, বিজ্ঞানার প্রেরণা ও কর্মশক্তিকে ঘেন সকল সময় প্রসন্নতা দান করে এসেছে।

রবীন্দ্রনাথের চিরকালের আশা গ্রামে গ্রামে ‘সমবায়’ গড়ে তোলা। আমাদের দেশে অধিকাংশ ‘সমবায়’ নানা কারণে অসার্থক হয়ে উঠে। তা জানা সত্ত্বেও বিজ্ঞানাদি রবীন্দ্রশতাব্দীকোত্তে কলানবগ্রামে একটি ‘সমবায়’ গড়লেন। এটি পল্লী নিয়ে এই সমবায়। গ্রামের

লোকের উদ্যোগিতা আছে—কিন্তু তবুও শিক্ষানিকেতনে পরিপূর্ণ তত্ত্বাবধানে আজ উগা সার্থকরূপ লাভ করেছে গ্রামের লোকদের এ এক পরম আশ্রয়, পরম নির্ভর।

পরিণামে এই কথা বলতে হয় যে, রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারাকে কর্মে ও তপস্তায় বিজয়না কলানবগ্রামে শিক্ষানিকেতনে সফল করতে চেয়েছেন। শিক্ষা-প্রসঙ্গে কবি বলেছিলেন, “আদর্শ বিদ্যালয় যদি স্থাপন করিতে হয় তবে লোকালয় হইতে দূরে নির্জনে মুক্ত আকাশ ও উদার প্রান্তরে গাছপালার মধ্যে তাহার ব্যবস্থা করা চাই। যদি সম্ভব হয় তবে বিদ্যালয়ের সঙ্গে খানিকটা ফসলের জমি থাকা আবশ্যিক; এই জমি হইতে বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় আহাৰ্য সংগ্রহ হইবে, ছাত্ররা চাবের কাজে সহায়তা করিবে। পাঠের বিশ্রাম-কালে তাহারা স্বহস্তে বাগান করিবে, গাছের গোড়া খুঁড়িবে, গাছে জল দিবে, বেড়া বাঁধিবে। এইরূপে তাহারা প্রকৃতির কেবল ভাবের নহে, কাজের সম্বন্ধও পাঠাইতে থাকিবে।” রবীন্দ্রনাথ পাবনা প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণে দেশব্রতী যুবকদের আহ্বান জানিয়েছিলেন এই বলে,

“তোমরা যে পার এবং যেখানে পার এক একটি গ্রামের ভার গ্রহণ করিয়া সেখানে গিয়া আশ্রয় লও। গ্রামগুলিকে ব্যবহাবদ্ধ কর। শিক্ষা দাও, কৃষিশিল্প ও গ্রামের ব্যবহার সামগ্রী সম্বন্ধে নূতন চোঁটা প্রাণিত কর; গ্রামবাসীদের বাসস্থান যাহাতে পরিহ্রম স্বাস্থ্যকর ও সুন্দর হয় তাহাদের মধ্যে সেই উৎসাহের সঞ্চার কর, এবং যাহাতে তাহারা নিজেরা সমবেত হইয়া গ্রামের সমস্ত কর্তব্য সম্পন্ন করে সেইরূপ বিধি উদ্ভাবিত কর। এক কর্মে খ্যাতির আশা করিও না; এমন কি গ্রামবাসীদের নিকট হইতে কৃতজ্ঞতার পরিবর্তে বাধা ও অসিদ্ধাস স্বীকার করিতে হইবে। ইহাতে কোন উত্তেজনা নাই, কোন বিরোধ নাই, কোন ঘোষণা নাই; কেবল ধর্ম এবং প্রেম, নিভৃত তপস্তা—মনের মধ্যে এই একটি মাত্র পণ্য, দেশের মধ্যে সকলের চেয়ে যাহারা দুঃখী তাহাদের ভাগ্যলীলা সেই দুঃখের মূলগত প্রতিকার সাধন করিতে সমস্ত জীবন সমর্পণ করিব।” বিজয়না ও সাধনাদির জীবনে সেই ব্রত—সেই দুঃখী-দের দুঃখ ছুরী করণে সমর্পিত প্রাণ।



স্মৃতি



শ্রীমতীলক্ষ্মী বন্দ্যোপাধ্যায়

পাঁচুড়, পাথরমতি, নাহারটিলা কোথাও এমন জায়গা নেই যে লীজ নিয়ে পাথর কেটে একসঙ্গে গভর্ণমেন্ট এবং রেলোয়েন্স পাথরকুচি যোগান দেওয়া যায়, কিন্তু এই অবস্থাতেও মোটা লাভের লোভে আমাদের ঈর্ষণ সাপ্লায়ার কোম্পানী লড়াইয়ের বাজারে বিরাট এক অর্ডার নিয়ে বসল। রেলোয়ের জন্ত পঞ্চাশ লক্ষ কিউবিক ট্রাইকি শিওর এবং মিলিটারীদের জন্ত এক ইঞ্চি, তিনঞ্চ, পাঁচ-ছত্ৰো, আধ ইঞ্চি, নানা সাইজের পাথর কুচি মোট বারো লাখ কিউবিক, সেই সঙ্গে পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় এয়ার সিঁপ তৈরীর জন্ত ছোট পাথর কুচি, তার পরিমাণও কম নয়। কর্তা ভেবে বসেন, যত পার বন্দোবস্ত কর। বসেন, যেখান থেকে পাও, সন্ধান করে কালো পাহাড়ের খবর নিয়ে এস, এখুনি লীজ নিতে হবে। কাছাকাছি রেলোয়ে সাইডিং না থাকলেও চিন্তা কোরো না, পাঁচ, সাত-দশ মাইল ব্রড গেজ মিটার গেজ-যে কোন লাইন পাতার দরকার হলে পাভা থাকবে; কিন্তু পাহাড়ের সন্ধান চাই। অন্ততঃ কুড়ি তারিখের মধ্যে এবং মনে রাখবে আলহে আসের পচিশ তারিখ থেকে আমাদের ডেলিভারী শুরু করতে হবে।

ডালহৌসী কোয়ারে টিফেন হাউসের তিনভলার ঘরে পাথর তলার মোটা গদি আঁটা চেয়ারে বসে কাঁচমোড়া সেক্রেটারিয়েট টেবিলের কাঁচের তলার পাভা ক্যালেন্ডারের তারিখ দেখিয়ে কাপুর সাহেব বসেন, কুড়ি তারিখের মধ্যে পাহাড়ের সন্ধান পেলে গভর্ণমেন্টের সাহায্যে পচিশ ছাব্বিশ তারিখের মধ্যে পাহাড়টা গ্রাভুইজিশন করিয়ে একই সঙ্গে পাহাড়ে ক্লাসিং ও ব্রেকিং চলতে থাকবে এবং

সেই সঙ্গে বতটুকু দরকার রেলের সাইডিং পাভাও হয়ে যাবে। এই ভাবে প্রিলিমিনারী ও সেকেন্ডারী সমস্ত কাজ শেষ করে আমি চাই আগামী মাসের পচিশ তারিখে ওয়্যগনে লোডিং শুরু করতে। দেখবেন এই হিসেবের যেন এদিক ওদিক না হয়।

উত্তর বিহার থেকে ছোটনাগপুর পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চলের সার্ভেয়াপ আলমারী থেকে নামিয়ে টেবিলের ওপরে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে করতে বসুন, কোন্, অঞ্চলে খোঁজ করি বসুন তা। ৮০১০ লক্ষ কিউবিক মাল এখনই চাই এবং সাইডিং পাভাতে হলে অন্ততঃ একশ কোটি কিউবিকের প্রস্পেক্ট রেখে কাজ করতে হবে। এতখানি বেগার ব্রাক রক পাই কোথায়?

তিনি বসেন, জাটস্ ইওর হেড-এক। আপনারা টেক-নিকাল্ ম্যান, আপনারা বুঝবেন। কিন্তু টাইমের ডেড লাইনের মধ্যে মাল আনার চাই।

কাপুর সাহেব কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হলেও আমাদের কাছে খুবই 'মাইন্ডিয়ার' লোক। মুখে বাই বসুন, মনে মনে আমার সঙ্গে অন্তরঙ্গতা আছে। ওর হৃদকীভে জ্ঞাপন না করে ম্যাপ দেখতে দেখতে বসুন, সরঞ্জাম স্টেটের রায়স্কট পাহাড়টা কেমন হবে বসুন তা? জিওলজিক্যাল সার্ভে রিপোর্ট থেকে—

অলহিহু কঠে কাপুর বসেন, এনি ড্যাম্ হিল, আই ডোন্ট মাইণ্ড—। একটু খেমে বসেন, ওটা কোথায়? খুব বেশী দূর হলে রেলোয়ে ক্রেট পড়বে অনেক।

বসুন, ছোটনাগপুরে।

তিনি বসেন, জাটস্ রাইট। আপনি খোঁজ করুন।

মুখ থেকে পাইপটা নামিয়ে ছোটো কাপুর আমার মুখের দিকে চেয়ে বলেন, ছপ্পাখানেকের জন্ত আমি বেকব। আপনাদের টি এ বাবদ কত দরকার হবে বলুন, অর্ডার দিয়ে যাই।

বলুন, হাজার দুয়েক দিয়ে যান। গোটা এরিয়ার স্টাক নিয়ে ঘুরতে হবে ত!

তিনি বলেন ও, কে। তাঁর পি, এ-কে ডেকে পে-অর্ডার লিখতে বলেন।

তাই

আমার স্টাক নিয়ে বেরিয়েছি। স্টাকের প্রথম ব্যক্তি লিনির্যাল সেন জিওলজিতে এম-এস-সি, মাত্র ছ'বছর হোল পাস করেছে, স্মার্ট, চটপটে, কাজ পাগল ছেলে। দুটো কাঠের সিকুকে তার চলমান ল্যাবোরেটরী নিয়ে আমার সঙ্গে এসেছে, আর এসেছে আমার বহুদিনের সঙ্গী রাইফেলধারী বনুহাতির রানা। বাহাতির নেপালী, ভয় কাকে বলে সে জানে না, তার সঙ্গে আছে তার দশজন অল্পবয়স্ক বাদ্যের বলা হয় পোটোরম্যান, অর্থাৎ কুলী। তারা মালপত্র বর, তাঁবু খাটার ও গোটা, বুনো জন্ত জানোয়ার তাড়ায় এবং কোন বিপদকে বিপদ বলে মনেই করে না। এ ছাড়া আমার নিজস্ব বৃদ্ধ বয় শরণ সিং পাঙ্গাবী। যে কোন বেথাপ্লা অবস্থায় রুটী ও মাংস বানাতে ওস্তাদ, বুটের লাখি মেরে গোখরো সাপের মাথা সেপ্টে দিয়ে জ্বল কাঁপিয়ে হাসে, এক বোতল বিলাতী মদ গিলেও এতটুকু টলে না। এক সময় মিলিটারীতে ভারী ট্রাক চালাত, এখন বুড়া হয়ে আমার কাছে হাফা আমার কাজ নিয়ে প্রায় স্বাধীনভাবেই চাকরী করে। কোম্পানী ভারও হাতে একটা রাইফেল তুলে দিয়েছে।

ক'দিন ঘুরে ঘুরে রামগড়ে এসে তাঁবু ফেলেছি। এরগাটা দুর্গমই বটে। নিকটবর্তী রেলস্টেশন থেকে আঠারো মাইল মোটরে এসে সেখান থেকে হস্তীপৃষ্ঠে দশ মাইল পাহাড় ও জঙ্গল ভেঙ্গে তবে এই রামগড়; নিকটবর্তী লোকালয় ঐ দশ মাইল দূরে। এখানে এসেই মন হোল, পথপ্রসার সার্থক হয়েছে, কারণ—

কিন্তু পথপ্রসার সার্থক হওয়ার বৃত্তিকল্পিত কারণ খুঁজে পেলুম পরের দিনে, যে দিনে বেথলুম, পাহাড়ের পশ্চিম দিকে উচু উচু অনেকগুলি কালো পাথরের মস্ত টিলা,

বেথানে একটা ঘাস পর্যন্ত জন্মায় নি, বুনো বাগি পর্যন্ত পাহাড়ের গায়ে জন্মতে পারে নি। ছেনী হাড়ুড়ী নিয়ে নমুনা পাথর কেটে নির্মলকে দিতে সে তার ল্যাবোরেটরীতে পরীক্ষা করে বলে, দাদা, এই কোয়ালিটির পাথর কংক্রিটের পক্ষে একেবারে আইডিয়াল। এ রকম নমুনা পোরাস অর্থাৎ হাফা পাথরে যে এতখানি কম্প্রেশন দিতে পারে এবং এই পাথর যে এমন বিপুল পরিমাণে কমার্শিয়াল স্কেলে এখানে আছে তা আমাদের কোন সার্ভে কেতাবে কোথাও পাই নি। আমি জোর করে বলতে পারি, এই পাথরের কংক্রিটে লোড বেরানিং সমান রেখে পাকুড়-চীপের তুলনায় এর টেনার-ওয়েট শতকরা পনের থেকে কুড়ি ভাগ কম হবে।

সেদিক থেকে এটা অবশ্য আবিষ্কারই বটে, কিন্তু অল্প দিকে অনেক ঝামেলাও আছে। নিকটবর্তী লোকালয় দশ মাইল দূরে, সেখান থেকে রেল লাইন আঠারো মাইল। এই আঠারো মাইল পথ এমনই হুমুসর যে ফোর্ডের টি-মডেল গাড়ীতে, অথবা জীপে ছাড়া যাওয়া যায় না। মাপ ধরে হস্তীপৃষ্ঠে সোজা রেল লাইন বাবার জন্ত দু'দিন ধরে চেষ্টা করে দেখলুম, রেল লাইনের সর্ব-নিম্ন দ্রব উনিশ মাইল; কিন্তু আরগাটা এমনই অসমতল যে, রেলের লাইন পাততে গেলে উনিশ মাইলের মধ্যে বারো মাইলের কতকটা আরগায় ২৫০০ ফিট পর্যন্ত কেটে নামাতে হবে এবং বাকী আরগা কোথাও কোথাও এমন কি ৩০৪০ ফিট ভরাট করে তবে লেভেল পাওয়া যাবে। এছাড়া তিনখানা ছ'শো ফিট চওড়া সাঁকো বানাতে হবে এবং নীচু জমি ভরাট করার ফলে অন্ততঃ দু'জন দু'হুটী কালভার্ট দেওয়া অবশ্যই দরকার। তবে এ পথে সুবিধে এই যে, সিরঙরা ট্রেকের হকুমটা নিতে পারলেই কাজ আরম্ভ করা যেতে পারবে, কারণ এখানে কোথাও কোন লোকালয় বা কেত খামার না থাকার জন্ত কাজে অস্ত কোন বাধা পড়বে না বা কাউকে কোন ক্ষতিপূরণও দিতে হবে না। অপরপক্ষে বেহাতী রাত্তর পাশে পাশে রেল লাইন চালাতে গেলে মোট দূরত্ব হবে আটদশ মাইল এবং আটদশ মাইলের প্রথম দশ মাইল বিল্ডি উচু নীচু পাহাড়—বেথানে হেভি রাষ্ট্র-এর দরকার এবং পরের আঠারো মাইল কেতখামার লোকালয় থাকার

জন্ম মালিকদের মোটা টাকা খেসারত দিতে হবে। অথচ এদিকে জংলী উনিশ মাইল পথে কাজ করবার আর একটা বড় অসুবিধা এই যে, এই পথের কাছাকাছি কোন লোকালয় না থাকার দরুন প্রত্যেকটি শ্রমিককে বাইরে থেকে এনে তাদের খাকা, খাওয়া ও চিকিৎসার বন্দোবস্ত করতে হবে এবং এই লাইনের একজায়গায় একটানা সাত মাইল পথে নদী বা জলাশয় না থাকায় এই সাত মাইলে যখন কাজ হবে তখন প্রত্যেকের প্রয়োজনীয় সমস্ত জল দূর থেকে আনাতে হবে।

আগাগোড়া সমস্ত সরঞ্জামে তদারক করে জায়গাটার একটা পেন্সিল-স্কেচ মাপ এঁকে নির্মলকে সমস্ত বুঝিয়ে মিঃ কাপুরের কাছে একখানা রিপোর্ট নির্মলের হাতে দিয়ে পাঠিয়ে দিলুম এবং কাপুর সাহেবের পরবর্তী নির্দেশের জন্ত অপেক্ষা করে এখানকার তাঁবুতেই রয়ে গেলুম। যে চারটে হাতী ভাড়া করে আমরা মোটর থেকে নেমে এখানে এসেছিলুম তার তিনটে হাতী ছেড়ে দিয়ে শুধু একটা হাতীকে রেখে দিলুম, আমাদের দৈনিক বাজার ও জন্ত যোগাযোগ করার জন্ত।

তিন

দুদিন আগে নির্মল চলে গেছে। ওদিককার কোন খবর এখনও পাইনি। আমার এখানে খবর বলে কিছুই নেই, খবরের কাগজ নেই। বুড়ো মাহত সকালে হাতীকে খাওয়াবার জন্ত জঙ্গলে নিয়ে যায়, বেলা ১টা নাগাদ জঙ্গল থেকে ফিরে নিজে আহারাশি শেষ করে বেলা আড়াইটে-তিনটে নাগাদ গ্রামে যায় হাট করতে; সেখান থেকে আমাদের সকলের জন্ত বাজার সেরে সন্ধ্যার পর ফিরে আসে। কাল সে খবর এনেছিল, কোথায় নাকি বাঘ বেরিয়েছে, তবে মাছুষ-থেকে নয়, অতএব—ইত্যাদি। বলেছিলুম, খবরের কাগজ পেলে নিয়ে এসে। সে হেসে বলেছিল, তাদের গ্রামে কেউ কোনদিন পরশা দিয়ে খবরের কাগজ কেনে না, কোন কাগজ বিক্রীও হয় না।

আপন মনে ডেকা য়ারে বসে থাকি। একএকবার মনে হয় কাছাকাছি সমস্ত জায়গা থেকে স্তম্ভল নিয়ে নির্মলের ল্যাবরেটরীতে টেস্ট করে দেখি, আরও কি কি কোরালিটি আছে, কিন্তু ভালো লাগে না। চুপ করে

বসেই থাকি। পাঞ্জাবী বয় আমার ও বাহাদুরের জন্ত রহুই করে এবং আরও খানিকটা দূরে দশজন পোর্টারের রান্না তারা নিজেরাই পালা করে সেরে নেয়। কাপুর কোম্পানীর পয়সা হাতীর পিঠে বোঝাই দিয়ে সেই খাবার দশমাইল দূরের হাট থেকে আসে। প্রায় যেন অশ্রমমন্ড হয়েই দুটো দিন ও দুটো রাত্রি পার হয়ে গেল।

লোকে বলে, গোলামী জীবনে সুখ নেই। আমি কিন্তু এই সুখহীন জিনিষটা ঠিক বুঝি না। কেন জানি না এটা হয়ত আমার স্বাভাবিক অসুভূতির খর্বতা, কোন কিছুতেই আমার কষ্ট অথবা আনন্দ হয় না। একথা আমি জোর করেই বলব যে, আমি মহাপুরুষ নই, অস্ত্রায় কাজ দরকার হলেই করি, কিন্তু তবুও যে আমি সুখ-দুঃখের অতীত তার কারণ আমি স্থির জানি, আমার অসুভূতি শক্তির অভাব, ঐ বিষয়ে আমি নিশ্চয়ই বিকলাঙ্গ। জন্মাক্ষের কাছে আলো-আধারীর কোন ভেদ নেই, জন্ম-বধির গান ও গালাগালির কোনটিতেই বিচলিত হয় না, আমিও বোধ হয় সেইরূপেই সুখদুঃখের অসুভূতি সম্বন্ধে অসাড়, তা এতে আমি মহাপুরুষ না হলেও সন্তোষ তুলনায় ভালই থাকি। পদ্মপত্র জলের দাগ না-লাগাটা পদ্মপত্রের মাহাত্ম্য না বলে জল-টানবার অক্ষমতা বলেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ দিয়ে অধিকতর সত্যভাষণ হয়। বসে বসে এই সব সাত পাঁচ এলোমেলো ভাবতে ভাবতে দিন কেটে যায় এবং নিজের আশ্চর্য হয়ে যাই, এরকম অলস অপ্রয়োজনীয় চিন্তা আগে আগে কখনও-কখনও মনে এলেও এখানে এই জঙ্গলে এসে দেখছি, এই জাতীয় কর্মনাশা আমার চিন্তা যেন আমাকে চব্বিশ ঘণ্টাই পেয়ে রয়েছে। এটা বোধ-হয় প্রাকৃতিক প্রভাব।

তৃতীয় দিন সকালেও তাঁবুর সামনে চুপ করে অশ্রম-মনস্কভাবে বসে আছি, বাহাদুর এসে খবর দিলে, দেহাতীয়ে হুঁজন সাহেব আসছে।

বয়স আমাদের অকিসের কেউ আছে? নির্মলবাবু? সে বলে, নেহি জী।

ডেয়ার ছেড়ে উঠে এগিয়ে এলুম। একটু পরেই হস্তী-পৃষ্ঠে সোলা-টুপি মাথায়, সিভিল স্কেট আগন্তুকদের দেখা গেল। ভালো করে দেখলুম, কাউকেই চিনি না।

তীব্র কাছাকাছি এসেই হাতী দুটো দাঁড়াল' তারপর মাহুতের ইঙ্গিতে সে দুটো বসল। লোকগুলো হাতীর পিঠ থেকে লাফিয়ে নামল।

বিস্মিত জিজ্ঞাসনত্রে তাদের দিকে এগিয়ে যেতেই ওদের মধ্যে যিনি ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠ তিনি গুড্‌মনিং না দিয়ে দুহাত জোড় করে কপালে তুলে পরিকার বাংলায় বলেন নমস্কার, মাহুতের কাছে গুনলুম আপনি এখানে তাঁবু ফেলে আছেন, তাই প্রথমেই আপনার কাছে এলুম।

বললুম, বেশ বেশ, খুব ভালো কথা, অস্থান আপনার। বাহাত্তরকে বললুম, বাহাত্তর, তাঁবু থেকে গ্রাউণ্ড শীটটা এনে এইখানেই পাতো একসঙ্গে বসা যাক। আগন্তুকদের বললুম, ভূমিশয্যা ভিন্ন আর গতি নেই দাদা, কারণ আমার সম্বল আছে মাত্র দু'খানি ক্যাম্প চেয়ার।

তিনি বলেন, ঠিক আছে, সে জ্ঞান আপনাকে বাস্তব হতে হবে না। বয়ঃকনিষ্ঠ পাঁচজনকে তিনি বলেন, গোসো, একটু বিশ্রাম করে নাও, তারপর এই দাদার সাহায্য নিয়েই—

বললুম—কি ব্যাপার বলুন ত? শিকার টিকারের উদ্দেশ্য আছে বুঝি?

তিনি বলেন, না ভাই, শিকারের উদ্দেশ্য নয়। আমরা এসেছি বেড়াতে এবং একটা জিনিষ দেখতে।

বিস্মিত হয়ে বললুম—বেড়াতে এবং জিনিষ দেখতে! এখানে বেড়াবার স্থান এবং দেখার জিনিষ ত কিছুই নেই।

তিনি বলেন, কি জানি, আছে কি না বলতে পারি না, তবে ছিল বলেই ত জানি। তা যাক আপনি ত এসেছেন রেল লাইন বসাবার জ্ঞান। তা আপনি বি, এন, পেনের তরফ থেকে এসেছেন, তাই না।

হাসি এল। বললুম, তা ঠিক নয়, তবে এ আপনি শুনলেন কোথা থেকে?

বললুম, কেন, মাহুতরা বলে। ওরাই ত আপনাদের এখানে এনে বসিয়ে গেছে। ওরাই ত আপনার কাছে আমাদের নিয়ে এল।

তা বটে! এই মাহুতদের পরও আমি ছেড়ে দিয়েছি। যথেষ্ট বললুম, আমি এসেছি একটা জিওলজিক্যাল সার্ভের ব্যাপারে, তা সে কাজ কতদূর কি হবে বলতে পারি না, কিন্তু আপনাদের জ্ঞেয় জিনিষটা কি বলুন ত?

তিনি বলেন, আমাদের হচ্ছে ইতিহাসের পাণ্ডালামি। এখানে এই রামগড় পাহাড়ে কোথায় নাকি বোগিমায়া গুহা আছে, সেই গুহাটা আমরা দেখতে এসেছি। ঐ গুহার খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর মগধী প্রাকৃত্তে ব্রাহ্মী অক্ষরে খোদাই করা একটা গিরিলিপি আছে, এটা দেখব। ইতিহাসে ঐ লিপিটার নাম দেওয়া আছে 'স্বতন্ত্রতা গুহা লিপি'।

কেন জানি না, নামটা শোনা মাত্রই আমার সমস্ত শরীরটা কঁপে উঠল। অকারণে সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হ'ল। কিছুক্ষণ কোন উত্তরই দিতে পারি নি। শেষে প্রায় 'তোৎলা'র মত কণ্ঠস্বরে জিজ্ঞাসা করলুম, ঐ গুহা-লিপির কথা কে বলে আপনাদের?

তিনি আমার মানসিক ভাবান্তর বোধ হয় লক্ষ্য করেন নি। প্রাণপণে চেষ্টা করেই আমি আমার ভাবান্তর গোপন রেখে আশ্চর্য্য হয়ে ভাবছিলাম, এই অকারণ আত্ম-লতার কারণ কি!

তিনি বলেন, ঐ গুহালিপির কথা আমরা পেয়েছি ১৯০৩-০৪ সালের আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া'র বার্ষিক বিবরণী থেকে। ঐ গুহালিপি থেকে দুটো বিশেষ জিনিষ পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, পূর্বদেশীয় মগধী প্রাকৃত্তের প্রত্যক্ষ রূপ এবং দ্বিতীয়তঃ বারাণসীর তৎকালীন প্রচলিত ব্রাহ্মী লিপি। গুগুলোর ফটোস্টাট ছাপানো বইয়ে আছে, আমরা চেষ্টা করব ওর আশে পাশে আরও যদি নতুন কিছু পাওয়া যায়, কারণ আমার বিশ্বাস এখানে নিশ্চয়ই আরও কিছু আছে।

আমাকে অগ্রমনস্ক দেখে তিনি খেমে গেলেন, কিস্তি হয়ত আরও কিছু বলেছিলেন যা আমার কানে ঢোকে নি। সর্বশেষ তিনি বলেন, গুহাটা কোথায় আমাদের কিছু হৃদিস্ দিতে পারেন।

বললুম, গুহাটা ঠিক কোনখানে জানি না, তবে জায়গাটা বোধহয় যেন দেখেছি বলেই মনে হচ্ছে।

কথাটা বলা শেষ করেই মনে হোল, একি কথা বলে ফেললুম, গুহা-টুহা ত কোথাও দেখি নি।

ছোকরাদের মধ্যে একজন উৎসাহ দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন এখান থেকে কতদূর স্তার?

নিজের মাথাটা ঝাঁকিয়ে নিয়ে বললুম, আপনারা বুঝি ইতিহাসের গবেষণা নিয়ে বেরিয়েছেন।

তিনি বলেন, হ্যাঁ, এই রকমই একটা ব্যাপার। এরা পাঁচজন হচ্ছে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের এম. এ. ক্রাশের ছাত্র, আর আমি এদের সঙ্গে আসছি।

বলুম, ও, আপনি বুঝি ইউনিভারসিটির প্রফেসর।

বাড় নেড়ে তিনি বলেন, লেকচারার।

মুখে হাসি এনে বলুম—বাক, ভালই হোল, আজ সকালে এতগুলি শিক্ষিত লোকের সাক্ষাৎ পেলুম। বাহা-তুরকে ডেকে বলুম, বাহাতুর, বয়সে বল, চট করে চা, হালুয়া এবং ডিম যদি থাকে তাহলে আমলেট করে দিতে।

অধ্যাপক বলেন—এই সব আবার কেন হাকানো করছেন। আমরা আহাঙ্গাদি পূর্ব শেষ করেই এসেছি।

বলুম, তা হোক। এই জঙ্গলের মধ্যে আর ত কিছুই নেই, এমন কি বসবার জায়গা পর্যন্ত দিতে পারলুম না।

ছাত্রদের মধ্যে ঔৎসুক্য প্রবল। ওরা আবার প্রশ্ন করলে, গুহাটা এখান থেকে কতদূরে স্ত্রাং, কোন্ দিকে?

বলুম, তা ত জানি না তাই। আমি এখানে মোটে হুপ্তাখানেক হোল এসেছি এবং গুহা-টুহা কিছুই দেখি নি।

অধ্যাপক বলেন, আপনার মাহত কোথায়? শুনলুম সে নাকি সব জানে।

একজন ছাত্র বলে, আমাদের মাহত বলে যে, আপনার কাছে হাতী নিয়ে যে বুড়ো মাহতটা আছে সে হচ্ছে ওদের সর্দার এবং সে এখানকার সমস্ত জায়গা জানে। তাকে পেলে সব সন্ধান পাওয়া যাবে।

বলুম, তবেই হয়েছে। সে সকালে তার হাতী নিয়ে জঙ্গলে গেছে হাতীকে খাওয়াতে, একটার আগে সে কোনদিন ফেরে না।

ছেলেটি বলে—আমাদের একজন মাহতকে হাতী দিয়ে তাকে খুঁজে আনবার জন্য পাঠালে হয় না?

অধ্যাপক চিন্তিত হয়ে পড়লেন। বলেন, মুন্সি। আমাদের কিত্ত বেলা তিনটের মধ্যে এখান থেকে বেরিয়ে পড়া দরকার। কারণ জিনিষপত্রের সঙ্গে কিছু আনা হয় নি, সমস্তই ওখানে পড়ে আছে।

বাহাতুর ধারে কাছে কোথায় ঘেঁসেছিল। সে যে

আমাদের কোন কথা শুনছে তা আমরা ভাবি হয় নি। হঠাৎ এগিয়ে এসে সেলাম ঠুঁকে দিলে, মাহত আসিয়া সাব। বলতে বলতেই দেখা গেল, আমাদের হাতীটা বুড়ো মাহতকে নিয়ে ওপাশ থেকে এগিয়ে আসছে।

ওকে দেখে খুসিমনে মাহতকে বললুম, কি হে, এরই মধ্যে আজ যে ফিরে এলে?

সে বলে, ঐ যে ওরা সব এসে গেছে, তাই। বললুম, টের পেলে কি করে?

সে বলে, আমি টের পাই নি স্ত্রাং, হাতী টের পেয়ে আমাদের জানালো, তাই ওদের সঙ্গে দেখা করতে এলুম।

প্রফেসরকে বললুম, তাহলে দেখুন, জন্তু আনোয়ার-দেরও নিজস্ব একটা ওয়ারেন্স আছে। মাহতকে বললুম, তুমি এসেছ, ভালোই হয়েছে; এখন রামগড় পাহাড়ে বোগীমরা গুহা কোথায় আছে বলতে পার? সাহেবরা সেই গুহা দেখতে এসেছেন।

মাহত একটু ভেবে নিয়ে বলে, ও ধারে একটা গুহা আছে সা'ব। সেখানে সাহেবরা দু'বার এসেছিল আমি জানি। একবার যখন আমি খুব ছোট ছিলাম, সেই তখন। আমার বাবা সেই সাহেবদের এনেছিল। দ্বিতীয় বারে আমি অস্ত্র একটা দল নিয়ে এসেছিলাম। আমার এই হাতীই এসেছিল। হ্যাঁ জী, সে গুহা আমি জানি।

বলুম এখান থেকে কত দূর?

মাহত বলে, দো মিল হোগা সা'ব।

বলুম—এখন গেলে বিকেলে কেয়া যাবে ত?

সে বলে, জরুর।

ছাত্রদের মধ্য থেকে একজন জিজ্ঞাসা করলে, হাতী থেকে নেমে কতটা হাঁটতে হবে?

মাহত বলে, বাস, খোড়াই।

অধ্যাপক আমাদের নিয়ন্ত্রণ জানানেন। বলেন, আপনিও চলুন না কেন আমাদের সঙ্গে, যদি আপনি আপনার কাজের কোন ক্ষতি না হয়।

বলুম, নাঃ, ক্ষতি আর কি, বেতে পারি। সত্যি কথা বলতে কি, আজ আমার হাতে কোন কাজই নেই।

তিনি বলেন, বাস, তা হলে তৈরী হয়ে নিন।

ইতিমধ্যে গা এবং হালুয়া তৈরী হয়ে এল।

সেই অজানা গুহার দিকে তিনটে হাতী নিয়ে রওনা হওয়া গেল।

চার

প্রথম যাচ্ছে আমার হাতীটা, তার পিঠের ওপরে আমি আর প্রফেসার। চালক সেই সর্দার মাহত। পেছনের দুটো হাতীতে পাঁচটি পোষ্ট-গ্রাজুয়েট ছাত্র। প্রফেসার বলেন, এই ভাল হোল, না হলে ছেলেগুলো আমার সঙ্গে থাকলে সিগারেট খেতে-৷ পেয়ে পেট ফুলে মরত, আর আমাদের অভিযাপ দিত।

আমি বলুম, ঠিক আছে। সামনের দিকে মুখ করে বসুন, পেছন ফিরে চাইবেন না যেন।

তিনি হাসতে লাগলেন। বলুম, আপনারা এত খরচ-পত্র করে রামগড় পাহাড়ে আসছেন, কিন্তু ঐ যোগীঘরা গুহার কি এমন অপূর্ণ জিনিষ আছে!

তিনি বলেন, দেখুন, ঐ গুহার যে গুহালিপিটা আছে সেটা নানা দিক দিয়ে খুব দামী। প্রথমতঃ, ওর ভাষাটা হবে প্রাচীন। পণ্ডিতরা অনুমান করছেন যে ওটা হচ্ছে খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের প্রাচীন মাগধী-প্রাকৃত ভাষা। ভাষার দিক দিয়ে ওটা রাজা অশোকের শিলালিপিগুলির সমাময়িক। দ্বিতীয়তঃ ঐ ভাষার আর একটা মাধুর্য আছে, যেটা প্রিয়দর্শীর লিপিতে নেই।

বলুম, প্রিয়দর্শী কে?

তিনি একটু হেসে বলেন, অশোক অনুশাসন বলে যেগুলো প্রচলিত আছে সেগুলোর কোনটার অশোকের নাম নেই। ওর সবগুলোর নির্দেশনাকারীর নাম পাওয়া যায় 'দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা' এই নামে। পণ্ডিতরা মনে করেন যে প্রিয়দর্শী হচ্ছেন অশোক। তা প্রিয়দর্শীই হোন আর অশোকই হোন, তাঁর লেখার একেবারে সমস্তের স্বভাউৎসারিত ভাষার রূপ ঠিক পাওয়া যায় না। কারণ রাজারাজড়ার ব্যাপার, যেটুকু স্বাধীনভাবে খোঁদাই করে লেখা হবে সেটা নিশ্চয়ই পণ্ডিতদের দ্বারা ভাল করে সমালোচনা করিয়ে তবে লেখানো হয়েছে। অর্থাৎ ওর মধ্যে সভাপণ্ডিতের মূল্যবান থাকবেই। কিন্তু এখানকার এই ঘটনার সে দিক কোন গুহিরে লেখবার চেষ্টা নেই। এটা হচ্ছে 'ভেইশ-শ' বছরের আগেকার একজন ব্যক্তি প্রেমিকের স্বভাবের উচ্ছ্বাস। কাজেই এখানে যে ভাষা আর যে

বানান পাওয়া যাবে তা একেবারে খাঁটি সাধারণ লোকের ভাষা। দ্বিতীয়তঃ, এই লিপিতে যে ব্রাহ্মী অক্ষর পাওয়া যায়, তাই হচ্ছে সত্যিকার ব্রাহ্মী অক্ষরের রূপ। কারণ এটা ঐ ভাস্কর-লেখক বহুতে খোঁদাই করেছেন এবং ভাস্করটিও বড় কম নয়। ইনি সেকালের কালীর এমন নামকরা ভাস্কর ছিলেন যে একে নির্দোষ দিতে তৎকালীন কালীর রাজা বেশ একটু বিচলিত হয়েছিলেন। অতএব এই লিপির সব দিক দিয়ে একটা শ্রেষ্ঠত্ব আছে।

বলুম, ভাস্কর-লেখকটি কে ছিলেন বলুন ত? জিনিষটি এতই ভাল, তাহলে কালীর রাজা নির্দোষই বা দিচ্ছে-ছিল কেন?

অধ্যাপক হাতীর পিঠে একটু নড়েচড়ে ঠিক হয়ে বসে একটা সিগারেট ধরিয়ে বলেন, যেটুকু বোঝা যায়, এর মধ্যে খুব একটা মর্যাদাসিক ভাষা আছে। আজ থেকে 'ভেইশ-শ' বছর আগে কালীভোগদেবদত্ত নামে এক ভাস্কর ছিল। তার হাতের কাজ খুব ভালো দেখে তৎকালীন কালীরাজ একে মন্দিরের দেওয়ালে কারুকার্য করার জন্য স্বাধীনভাবে নিযুক্ত করেছিলেন। মনে করুন, একজন তরুণ শিল্পী, সেকালের খাঁটি আর্থ্য সম্ভান। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বংশাচক্রমে বাস করার ফলে দুধে-আলতায় রং, চওড়া বুক, তাতে ঝুলছে হার, বাতির মত নিটোল হাত তাতে কংকণ, সরু লম্বা আঙ্গুলগুলি শিল্পী মনের পরিচায়ক। খাড়া নাক, টানাটানা চোখ, জোড়া দাঁত, প্রশস্ত কপাল, ঘন কৃষ্ণ চুল বাবরী করে মাথার পেছন দিকে বাড়ি পর্যন্ত নেমে এসেছে, কুন্তলভূষিত কর্ণ, অভলম্পর্শী বস্ত্রভূষণ দৃষ্টি। সে চাউনিতে পারিপার্শ্বিক কঠোর বাস্তব অবাস্তব হয়ে কল্পনার মায়াজালেই বাস্তবতার মূর্তি হয়ে ওঠে। এমনি এক তরুণ শিল্পী প্রবলপ্রভাপ কালীরাজের একনিষ্ঠ পূজ্যপোষকতার সব রকম সামাজিক নিয়ম-কানূনের গভীর ভেঙ্গে নিজের খুশিখোয়াল মত রূপচর্চাই করত। সেই শিল্পী রাজার নিজস্ব দেওয়ালের কারুকার্য করতে গিয়ে সেই দেওয়ালে দেখল এক তরুণী নর্তকীকে। দে-দেবদাসী। সেকালের নিয়ম জানেন ত? বিবাহের পর যদি ছুঁচর বছরের মধ্যে দাম্পত্যের কোন সন্তান-সম্ভাবনা না হোত তাহলে স্বামী স্ত্রী একত্রে মানসিক হোত যে সেই অগুরুত্ব কোলে সন্তান যদি সম্ভান দেন,

তাহলে প্রথম সন্তানটিকে তাঁরা দেবসেবায় নিযুক্ত করবেন। প্রথম সন্তান কন্যা হলে তাকে মন্দিরে দেবদাসী করে দেওয়া হবে, পুত্র হলে তাকে দেবদাস বা সন্ন্যাসী করে দেওয়া হবে। পরবর্তী সন্তানগুলি পিতামাতার সঙ্গে সংসারী হয়ে থাকবে।

অধ্যাপককে বাধা দিয়ে বল্লম, বাস্তবিক, নিয়মটা কি নিষ্ঠুর ছিল বলুন ত? সেকালের লোকেরা নবজাতকের জীবনের যে অন্ত কোন সার্থকতা থাকতে পারে তা যেন স্বীকারই করত না!

শ্লিষ্ট দিয়ে তালুর সঙ্গে একটা শব্দ করে অধ্যাপক বলেন, এ ত অনেক ভাল নিয়ম মশাই। পৃথিবীর অত্যাচার প্রাচীন সভ্যতায় এবং আমাদের এখানেও পরবর্তী কাল, এবং পূর্ববর্তী কালেও বটে, এর চেয়ে আরও যে কত নিষ্ঠুর নিয়ম প্রচলিত ছিল তা শুনবেন? কার্থেজীয়রা দেবতাকে সন্তুষ্ট করার জন্য প্রথম ছেলেটি পাঁচ বছর বয়সে পূর্ণাঙ্গ করলে তাকে জীয়েন্তে বেড়া-আঙনের মধ্যে ফেলে দিয়ে দেবতার মানসিক রক্ষা করত। সেই ছেলে বাপ মায়ের সামনে প্রাণান্তকর চিৎকার করতে করতে আঙনে দগ্ধ হোত। কিনিসীয়রা দেবতার মন্দিরে জীয়েন্ত ছেলের বুক ছুরি বিঁধিয়ে তার গরম রক্তের দ্বারা দেবতার নামে অর্পণ করত। সেই পৈশাচিক কাজে ছেলের মা ছেলেকে চেপে ধরে থাকত এবং বাপ তার বুকের মধ্যে ছুরি চালিয়ে দিত। খাস ইংলণ্ডের কর্ণওয়াল নামক জায়গায় যে ষ্টোনহেঞ্জ আছে সেটা এখনও পর্যন্ত দর্শকরা দেখতে যায়। সেখানে একশ'জন জীবন্ত মানুষকে মাথা নীচে পা গুণোরে—এই অবস্থার পাঁথরের খামে খুব ক'বে বেঁধে মাথার তলায় আঙন জেলে দেওয়া হোত, এবং সেই ধোঁয়ায় মাথা নিচু করে বাঁধা মানুষগুলোর প্রথমে দম বন্ধ হয়ে আসত এবং তারপর আঙন জগতে নুক হলে একশটা জীবন্ত লোকের মাথার খুলি খুব ধীরে ধীরে পুড়তে থাকত। এই একশটা লোকের আত্ম আর্জ-নাশের মধ্যে দাঁড়িয়ে ইংলণ্ডের কেট জাতি এবং তার জইত পুরোহিত দেবতার উপাসনা করে আত্মতৃপ্তি লাভ করত মাত্র দুহাজার বছর আগে।

আমাদের দেশেই বা কি! প্রাচীন কামরূপে ছেলের

করে অর্থাৎ মন্দিরে বলিদান দিয়ে দেশবাসীর মধ্যে গৌরব অর্জন করতেন। সতীদাহই বলুন, গলাগাপের ছেলে ফেলাই বলুন, আর নরবলিই বলুন—সবই ত ঐ এক, সে হিসেবে মেয়েকে দেবদাসী করা ছেলেকে সন্ন্যাসী করা কি বেশী খারাপ?

অধ্যাপক আমার মুখের দিকে চেয়ে একটু গভীর হয়ে বলেছিলেন, দেখুন, ধর্মের নামে মানুষ মানুষের গুণের যে পরিমাণ অত্যাচার পরম আশ্রয়ে নিয়ম-তান্ত্রিকভাবে সারা পৃথিবী জুড়ে চালিয়ে এসেছে, তুমাত্র শত্রুতার দ্বারা উদ্ভূত হয়ে সে পরিমাণ অত্যাচার আশ্রয় অত বিপুল পরিমাণে বোধহয় করা হয়নি।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেছিলেন—সত্যি, সেকালের লোকেরা অল্প বিখ্যাসে বাস্তবিকই বড় নিষ্ঠুর ছিল।

তিনি ফোস করে উঠলেন, সেকাল মানে? এখনও, এই কালেও এই রকম অত্যাচার অহরহ হয়ে চলেছে। এখনও বামূনের ঘরে বিধবা মেয়েকে একাদশীর দিন নিক্কলা উপোশী রেখে বাপ মা নিজেরা পেট ভরে খায় না? এখনও এইকালেও বিধবা মেয়ে, বোনকে বস-বাসের অযোগ্য একটা ঘরে একলা ফেলে রেখে তার বাপ, দাদারা সস্ত্রীক রাত্রি যাপন করে না? এখনও এই সভ্য জগতের আইন অনুসারে অপরাধীকে পচিশ ত্রিশ পঞ্চাশ ঘা বেত মারা হয় না? প্রাণদণ্ড কি সারা পৃথিবী জুড়ে বন্ধ হয়ে গেছে? ভেবে দেখুন ত, আইনানুগ প্রাণদণ্ড কি খুনের চেয়েও অনেক বেশী নৃশংস এবং ঘৃণিত নয়? ভাল করে বুঝে দেখুন, আপন'র সঙ্গে আমার একটা তুলন ঝগড়া হোল। টাকাকড়ি নিয়ে, মেয়েমানুষ নিয়ে, মান সম্মান নিয়ে এমনই একটা মানসিক অবস্থার সৃষ্টি হোল যে আপনাকে আমি আর এক ভিলও সহ্য করতে পারছি না, মনের দুর্বলতাবশতঃ আমি আপনাকে মেয়ে বলব, তাতে আপনার জীবনান্ত হোল। এ-খুনের তবু একটা কৈফিয়ৎ আছে। কিন্তু এই খুনের অপরাধে বিচারের নামে দেশের একজন শিক্ষিত সম্মানিত বিবেচক ব্যক্তি বিচারকের আসনে বসে লিখিতভাবে প্রাণদণ্ড দিলেন। জেলখানার আর-একজন শিক্ষিত কারাবিভাগের অফিসার, যিনি

তত্ত্বাবধান করে এসেছেন, তার সামনে আর একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে ঠিক সময়মত ঘড়ি ধরে গলার দড়ি দিয়ে একজন জীবন্ত মানুষকে ঝুলিয়ে হত্যা করা হোল। এই যে আইনসম্মত খুন, একে cold blooded নয় coldest blooded murder বলা উচিত। এই খুনের কী কৈফিয়ৎ আপনি দিতে পারেন বলুন ত? তা ছাড়া আজ আমরা সারা পৃথিবী জুড়ে প্রতি নিয়ত কসাইখানায় যে পরিমাণ প্রাণীহিংসা কংছি তার কি কৈফিয়ৎ আছে? আজকের সুসভ্য পৃথিবীর সঙ্গে সাড়ে তিন হাজার বছর আগেকার মিশরীয় রাজা দ্বিতীয় থামেশেসের রাজত্বের তুলনা করুন। তেইশ শ বছর আগেকার ধর্ম্মাশোকের রাজত্বের তুলনা করুন। মানবিকতার দিক থেকে ওদের তুলনায় আমরা এখনও অনেক পেছনে পড়ে আছি। তবুও আমি বলব যে নিষ্ঠুরতার দিক থেকে আমরা অর্থাৎ ভারতীয়েরা অনেক কম। আমাদের তাত্ত্বিকদের ক্রিয়াকলাপ শ্রবণ রেখেই শব্দ, তারা অন্ধ বিশ্বাসে নরবলি দিয়েছে বটে, কিন্তু মানবিকতার দিকটাও একেবারে ভোলে নি। নরবলির পূর্বে সেই মানুষটিকে প্রসাদের নামে এমন সব ভাঙ্ মিশ্রিত সরবৎ খাওয়াত যে তার বোধশক্তি লুপ্ত হোত, বলির নিয়মও ছিল এক কোপে কাটা, জবাই করা দূরের কথা এক কোপে না কাটলে তারা সেটা সাজ্জাতিক অপরাধ বলে মনে করেছে। ছেলে মেয়েদের জীবন্ত আগুনে পুড়িয়ে না মেরে তাদের যে দেবদাসী এবং দেবদাস করে ছেড়ে দিত, আমি বলব এটা দেবতার নামে সম্ভান অর্পণ করার একটা অহিংস ভদ্র সংস্করণ। সারা পৃথিবীর নিষ্ঠুর পরিবেশের মধ্যে এটাই যে সে আমোলের সব চেয়ে ভদ্র এবং সহন্য ব্যবস্থা, সে কথা স্বীকার না করে উপায় নেই।

অধ্যাপকের বক্তৃতায় বাধা দিয়ে মাহত বলে, উদ্বার দেখিয়ে সাব—ওহি হার আপকো গুহা।

হুজনেই চেয়ে দেখলুম, পাহাড়ের মাঝামাঝি জায়গায় একটা গুহামুখ দেখা দিয়েছে।

অধ্যাপক বলেন, ও, তাহলে খুব বেশী দূর নয় দেখছি। পেছন ফিরে ছেলেদের দিকে লক্ষ্য করে বলেন, দেখতে পাচ্ছ তোমরা? আমরা এসে গিয়েছি।

সকলেই উৎসুক হয়ে উঠল। মাহতরা হাতী তিনটেকে বসালে আমরা মাটিতে নেমে পড়লুম।

গুহারের মত এখারও কালো পাথর, তবে খুব খাড়াই নয়। ঘুরে ঘুরে যতদূর ওঠা যায়, কিন্তু কি আশ্চর্য্য, জায়গাটা যে আজ প্রথম দেখছি একথা কিছুতেই মনে হয় না। কেমন যেন মনে হয়, এর সবটাই আমার পরিচিত। পায়ে পায়ে সকলের সঙ্গে গুহামুখে এসে দাঁড়ানো গেল।

গুহার মধ্যে বিশ্রী এক দুর্গন্ধ। অন্ধকার গুহাত্তরে টর্চের আলো ফেললেই এক রাশ চামচিকে উড়তে শুরু করলে। প্রফেসার সিগারেট ধরালেন—আমিও পকেট থেকে পাইপ বার করে অগ্নি সংযোগ করলুম। টর্চের আলো নিয়ে একজন ছাত্র উৎসাহের আতিশয্যে গুহার মধ্যে ঢুকে পড়ল। পেছন থেকে অধ্যাপক বলেন—সাবধান, ভাল করে দেখে পা ফেলো। সাপ খোপ বাঘ ভালুক না থাকলেও বোলতা-ভীমকলের চাক থাকতে পারে। ভাঙ্গা চোরাও অসম্ভব নয়। আমার দিকে ফিরে বলেন, আপনি কি এর আগে এদিকে এসেছিলেন?

চলুন হ্যা, এ-ত—

খেমে গেলুম। মনে মনে ভেবে বললুম, কই না ভ।

আমার উল্টো পান্টা কথায় প্রফেসার আমার মুখের দিকে রীতিমত সন্দেহের দৃষ্টি দিতে লাগলেন। আমিও যেন কেমন সঙ্কোচ বোধ করলুম।

ইত্যবসরে ছেলেরা সকলেই ভেতরে ঢুকে পড়েছে। একটি ছেলে বলো—স্তার এদিকে—এই দিকে।

গুহার শেষ প্রান্তে সোজা সোজা লম্বা লম্বা অক্ষর পাথরে দেওয়ালের গা খোদাই করে সারি সারি সাজানো রয়েছে। অধ্যাপক কাছে গিয়ে সেই লেখার ওপোর হাত বুলিয়ে বলেন, হ্যা হ্যা, এই ব্রাহ্মী অক্ষরই বটে। পকেট হাতড়ে বার করলেন এক মাঝারী সাইজের লেল। টর্চের আলোয় লেলের সাহায্যে সেই অক্ষরগুলি বড় হয়ে চোখে পড়ল। ওরা এক একটা করে অক্ষর পড়ার চেষ্টা করতে লাগলেন, কিন্তু সম্পূর্ণ অকারণেই আমার চোখের জলে আমার নিজের দৃষ্টি এমন ঝাপসা হয়ে এল যে কিছুই দেখতে পেলুম না। কেবলই মনে হতে লাগল, পকাশ একশ বছর নয়, পাঁচশ সাতশ বছর নয়, হাজার, দেড়-

হাজার এমন কি দুহাজারও বছর আগেও নয়, দুহাজার তিনশ বছর আগে আমারই মত একজন মানুষ, এক নির্বাসিত প্রেমিক, এই জনশূন্য পাহাড়ে একাকী বাস করেছে, এর প্রাণের আবেগ যোধ করতে না পেরে বা মনে এসেছে তাই লিখেছে, পাগল, সে নিশ্চয়ই পাগল হয়ে গিয়েছিল। হয়ত এই আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি এইখানেই দাঁড়িয়ে ঝাঁপত হাসত, নিজের মাথার বাবরী জটা নিয়েই দুহাতে ছিঁড়ত, নিজের চোখের নোনতা জলের আশ্রয় নিজের জিত দিয়ে একা একাই গ্রহণ করত সে। কথা বলার একটি লোক নেই, অসুস্থ হলে মুখে এক ফোঁটা জল দেবার কোন সহায় নেই, খাতের সংস্থান নেই, পানীয় বহনের কোন পাত্র নেই, পরিধেয় যা ছিল কালক্রমে পচে নষ্ট হয়ে গেলে লজ্জা নিবারণের কোন উপায় নেই, নিজের চোখ ছাড়া লজ্জা করার উপযুক্ত কোন দৃষ্টি নেই, হিংস্র জন্তুর কাছ থেকে আশ্রয় করার কোন ব্যবস্থা নেই, হয়ত আশ্রয় করার কোন ইচ্ছাই তার ছিল না। এই ভাবে দিনের পর দিন বছরের পর বছর অতিবাহিত করে—শেষে একদিন এই নির্বাসিত গিরিগুহার রূপ অশক্ত দেহ নিয়ে হয়ত বা এইখানেই মৃত্যুবরণ পড়েছিল এবং সেদিন বতস্পন জ্ঞান ছিল ততক্ষণ পর্যন্ত সেই হতভাগ্য ক্ষুধার তৃষ্ণায় একান্ত ভাবে বিপর্যস্ত হয়ে শেষে এক সময় অজ্ঞান অচেতন অবস্থার সব দুঃখের হাত থেকে নীরবে অব্যাহতি পেয়েছিল। দীর্ঘদিনের নিশ্চিন্ত অবস্থার তার সেই লীর্ণ অশক্ত দেহখানি মৃত্যুর কোলে হিমশীতল কাঠিন্বে দিনের পর দিন এই গুহাত্যস্ত-রেই পড়েছিল। কোন শব্দকৃত জন্তুর কবলে না পড়লেও অসংখ্য জীবগণ ও মাংসাশী কৃমিকীটের খাদ্য হয়ে সমগ্র গুহার পুতিগন্ধ বিকীর্ণ করে এই দেহ যে কতদিন যাবৎ এই গুহার সমস্ত পরিবেশকে কলুষিত করে রেখেছিল, তা কে বলবে? যে রাজশক্তি তাকে নির্বাসন দিয়েছিল, সে কি কোনদিনও সংবাদ নিয়েছে সেই হতভাগ্য নির্বাসিতের পরিণাম কি হোল! হয়ত সেই অপরাধীর ভেতন কোন অপরাধই ছিল না, কিবা হয়ত তার অপরাধ এতই তুচ্ছ ছিল যে তার চেয়ে অনেক বেশী অপরাধের বিচার তারা অগ্রহ করে থাকত, কিন্তু সে কথা ভেবে কোন মানুষ আছে কি? কেবলই মনে হতে লাগল একজন সামাজিক মানুষ সমাজবর্জিত অবস্থায় ধীরে ধীরে ভিলেভিলে সহায়-

শব্দ শূন্য অবস্থার এইখানে, এই গুহার মধ্যে মৃত্যুকে বরণ করতে বাধ্য হয়েছিল।

হঠাৎ আমার জ্ঞান হোল ফটো ক্যামেরার ফ্লাস্ বাথের আলোয়। অধ্যাপক নিজেকে ফটো তুললেন, ছেলেরাও কেউ কেউ ফটো তুলতে লাগল। শেষে অধ্যাপক আমাকে ডেকে বলেন, আপনিও আহুন, এই গুহাকে ব্যাক গ্রাউণ্ড দিয়ে আমাদের সাতজনের ফটো তোলা হবে।

বল্লম সাতজনের তোলা হবে কি করে—যিনি তুলবেন তিনি ত অবশ্যই বাদ পড়বেন।

একজন ছাত্র বলে, না স্যার, আমার ক্যামেরা আছে। এক মিনিট টাইমে বেঁধে দিয়ে আমিও এসে গ্রুপের মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়ব, তারপর ঠিক এক মিনিট পরেই এক্স-পোজার পড়বে। ঠাণ্ডে দাঁড় করিয়ে ঠিকমত ফোকাস করতে পারলে চমৎকার ছবি ওঠে!

ওদের সঙ্গ অগত্যা দাঁড়াতে হোল। হঠাৎ পেছন দিকে মনে হোল কে যেন আমার পিঠে এসে হাত দিলে। ভাবলুম, দু লাইনে ফটো উঠছে না কি? কিন্তু না আমরা ত এক লাইনেই ঘেঁষা ঘেঁষি করে সাতজনে দাঁড়িয়েছি। কে জানে পেছনে বোধহয় কে এসেছিল পরে সরে এসে লাইনে দাঁড়িয়েছে।

ফটো শেষ করে অধ্যাপক ও ছাত্রের দল এদিক ওদিক ঘুরতে লাগল, যদি অল্প কোন লেখা বা স্বাক্ষর কোথাও কিছু পাওয়া যায় তারই সন্ধানে। আমিও ওদের সঙ্গে একটু ঘুরে হঠাৎ কেন জানি না, পশ্চিম-উত্তর কোণের দিকে এগিয়ে চলে গিয়েছিলুম। সে দিকটার যাওয়া বড়ই দুরূহ, একটু অসাবধান হলেই পড়ে বাওয়ার ভয়। অধ্যাপক একবার মাত্র জিজ্ঞাসা করলেন, ওদিকে কোথায়? তার পর ধেমে গেলেন। ভাবলেন, আমি বোধহয় প্রকৃতির আহ্বানে সাড়া দিতেই দলছাড়া হয়ে ওপাশে সরে যাচ্ছি। কিন্তু ওদিকে গিয়েই একটা মন্থণ পাথরের ওপোর বসে পশ্চিম দিকে দোজা চেয়ে চেয়ে আমি কি দেখেছিলুম, জানি না। হঠাৎ সেই পাথরের বাস দিকে পাহাড়ের সমতল গায়ে অঙ্কিত এক অপকল্প-ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠল। ঠিক মনে হয় যে পাথরে আমি বসেছি সেই পাথরে বসে ডান হাত দিয়ে বা দিকের গিরিগায়ে কেউ বোধহয় ধীরে ধীরে বহুদিন ধরে এই নারী মূর্তি অঙ্কন

করেছে। অপরূপ প্রাণবন্ত ছবি! পূর্বে হয়ত আরও হৃন্দর, আরও স্পষ্ট ছিল, জল আর বোদে পাথর করে বর্তমানে ছবিখানা নিপ্পত্ত হয়ে গেছে। ছবির দিকে চেয়ে চেয়ে পুনরায় দুটোখ জলে ভরে এল, কিন্তু সেদিক থেকে কিছুতেই চোখ ফেরাতে পারি নি, দলের কাউকে ডাকতেও পারি নি। দলের মধ্যে কার যেন দৃষ্টি পড়েছিল আমার দিকে। শেষে অধ্যাপক এং জন হুই ছাত্র ওদিকে এসে আমার গায়ে হাত দিতে আমি চমকে ওদের দিকে ফিরেছিলুম। অধ্যাপক বলেন—কি মশাই এখানে বসে কি দেখছেন? মুখে কিছু বলতে পারি নি—আজুল দিয়ে গিরিগাজের ছবিখানা ওদের দেখিয়ে দিয়েছিলুম। অধ্যাপক আমার পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর লেন্স বার করে ছবিখানা নিরীক্ষণ করে দেখেই বলেন, এই ত, এই ত নতুন জিনিস পেয়েছি। তাহলে এই—এই সেই হুতুকা—

হুতুকা! অভ্যন্তর মত চিংকার করে ফেলেছিলুম। আমার সেই চিংকারে ওরা সকলেই আমার দিকে এমন করে চেয়েছিলেন যে হঠাৎ লজ্জিত হয়ে নিজেকে সামলে নিয়েছিলুম, আর একটু হলে হয়ত বা খাণ্ডে পড়েই যেতুম।

অধ্যাপক আমাকে ধরে নিরাপদ স্থানে এনে আমার চোখের দিকে পূর্ণভাবে দৃষ্টিপাত করে বলেছিলেন, অস্থবোধ করছেন নাকি? হঠাৎ ওরকম করলেন কেন?

চৌক গিলে বলেছিলুম—কিছু না।

ক্যামেরার সাহায্যে ওরা সেই ছবিখানার ফটো তুলেন। অধ্যাপক সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলেন, দেখতে পাচ্ছেন; অল্প সব পাথরের তুলনার এখানকার এই পাথরটা কত মসৃণ। মনে হয় এই পাথরের ওপোর বহুদিন ধরে বসে বসে কোন লোক এটাকে এত মসৃণ করে গেলেছে।

ছেলেরা সবাই ঘাড় নেড়ে সায় দিলে। আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি যে দেখেছিলুম স্বরণ নেই, তবে মনে মনে বোধ হয় যেন হাজারবার উচ্চারণ করেছি—‘হুতুকা’ ‘হুতুকা’ ‘হুতুকা’।

আমাদের বৃদ্ধ সাহিত্যী কাছে এসে বলে, ওখানে কিছু আছে নাকি সার? ওখানে ত এর আগে কেউ আসে নি।

ছাত্রদের মধ্য থেকে কে যেন ওকে কি বলতেই এগিয়ে এসে উকি মেরে গিরিগাজের ছবিখানা দেখে গেল।

এবার ফেরার পালা। যে যার হাতীতে করে এলুম। হাতী চলতে শুরু করতেই অধ্যাপককে জিজ্ঞাসা করলুম, গুহালিপিতে কি লেখা আছে?

তিনি বলেন, ই্যা ই্যা, আসল গল্পটাই যে আপনাকে বলা হয় নি। ব্যাপারটা কি জানেন, দেবদত্ত নামক একটি ভাস্কর হুতুকা নামক দেবদাসীর প্রেমে পড়ে। কিন্তু সেকালের নিয়মে দেবদাসীরা বিবাহ করতেও পেত না, বা প্রধান পুরোহিতের নির্দেশ ছাড়া কোন পুরুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতেও পেত না। হুতুকা, অর্থাৎ হৃন্দর তহু বা দেহ বাহার। মেয়েটি নিশ্চয়ই খুব বড় ঘরের মেয়ে ছিল। কারণ তা না হলে রাজ্যের প্রধান মন্দিরের দেবদাসী হতে পেত না। মানে খারাপ চেহারা বা নিয়মের মেয়ে দেবদাসী হলে ছোটখাটো মন্দিরেই স্থান পেত, রাজমন্দিরে আসতে পারত না। তা সেই মেয়েটি দেবদত্তকে ভালবাসলে, দেবদত্তও তাকে ভালবেসেছিল। ফলে পুরোহিতরা ক্রুদ্ধ হয়ে একাধিকবার সাবধান করে দিয়েছিল। ওরা কিন্তু কেউই পুরোহিতদের নিষেধ শোনেনি। সেই অপরাধে পুরোহিতরা দেবদত্তকে নির্কাসন দণ্ড দিয়ে রাজ্যের মারকং জোর করে সেই হুতুম খাটিয়ে দেবদত্তকে এই রামগিরি বনে নির্কাসন দেয়। দেবদত্ত তার বাকী জীবন এইখানেই কাটিয়ে দেয় এবং মনের দুঃখে এই পাহাড়ের গুহার স্পষ্ট করে খোদাই করে দিয়েছিল যে—হুতুকা আমার, আর কারুর না।

বলুম এ্যা? কি লিখেছিল?

অধ্যাপক বলেন, ভাষাটা শুনতে চাইছেন? ভাষাটা হচ্ছে :—

হুতুকা নাম দেবদাসিকি

তম্ কয়মিণ:

বলানদেয়ে দেবদত্তে নাম লুপনকে।

অর্থাৎ হুতুকা নামক দেবদাসী তাহাকে কামনা করে বারাদাসীর দেবদত্ত নামক রূপদক্ষ। ই্যা, একি আপনার কি হোল হঠাৎ? বুঝলুম, অধ্যাপক আমাকে ধরে ফেলেছেন।

কি যে হোল ঠিক বুঝলুম না, হঠাৎ যেন বাঘাটা ঘুরে গিয়ে চোখের ওপোর বিজ্ঞাতের চমকানি দেখেছিলুম। অধ্যাপক আমাকে চেপে ধরতেই আমার হৃদয় হয়ে গেলুম।

ততক্কে মাত্তও হাতী চালাতে চালাতে পেছনে ফিরে আমাদের দেখছিল। শেষে বল্ল—বাবু সাহেবের তবিরং ঠিক নেই কি ?

বল্লম, না, ঠিকই আছে, তুমি চালাও।

কিছুক্ষণ পরেই তাঁবুতে ফিরে এসেছিলুম এবং অল্প কিছুক্ষণ পরেই অধ্যাপক তার পঞ্চ শিষ্ট নিয়ে তাঁদের ছুটো হাতীতে চেপে রওনা দিয়েছিলেন। খাবার সময় তিনি আমাকে অনেক খদ্দবাদ দিয়েছিলেন, এবং আমি না থাকলে তাঁদের যে বহু অসুবিধা হোত, এমন কি ঐ ছবিটা যে তারা আধিকার করতেই পারতেন না এই সব বলে অনেক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে গেলেন, কিন্তু আমি এমনই আচ্ছন্ন অতিক্রমের মত হয়ে পড়েছিলুম যে ওদের আর একবার চা দেওয়ার কথা কি ছুটো মিষ্ট আপ্যায়ন করার কথা প্রায় বেন কুলেই গিয়েছিলুম।

পাঁচ

ঘুম ভেঙে গেল। হারিকেনের স্তিমিত আলোর দেখি, আমার খাটির পাশে দাঁড়িয়ে আছে অপরূপ স্তম্ভরী একটি মেয়ে, মুখ টিপে হাসছে। হস্তত্বের মত ভাড়াভাড়ি উঠে বসে ওর মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়েছিলুম। লীলারিত ছন্দে মেয়েটি আমার খাটির এক কোণে চূপ করে বসে পড়ে, আমার দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রইল।

স্পষ্ট মনে আছে, চোখের সামনে স্পষ্ট দেখলুম, যেমন আর সব পদার্থকে দেখি তেমনই ভাবে দেখলুম, মেয়েটি খাটির আমার সামনে হাসি মুখে বসে আছে। তবে তবু বল্লম তুমি—আপনি—

চিন্তে পারলে না? মধুর কণ্ঠস্বরে কি আবেগময়ী ভাবা!

হঠাৎ মনে হোল এই স্তম্ভরী? হাত বাড়তেই সে তার হাতখানা এগিয়ে দিলে। ওর হাতটা নিজের হাতের মধ্যে ধরে বল্লম—স্তম্ভরী স্তম্ভরী।

কান্নার উজ্জ্বল একেবারে ভেঙ্গে মুখ ওঁড়ে উপুড় হয়ে পড়ল আমার কোলের ওপোর। ওর পিঠে—ওর মাথায় হাত বুলুতে বুলুতে তেকেছিলুম; স্তম্ভরী, স্তম্ভরী, স্তম্ভরী—

সে তার মুখখানি উঁচু করে আমার দিকে চেয়ে দেখলে। হু চোখ দিয়ে গালের ওপর জল গড়িয়ে পড়ছে।

মুখে বল্ল কতদিন—ওঃ, কতদিন পরে তোমার আবার পেলুম। আন্তে আন্তে কাৎ হয়ে আমার কোলে মাথা রেখে এমনভাবে তুলো যাতে আমার মুখ সে স্পষ্ট দেখতে পায়।

ওর কপালে ওর গালে হাত বুলুতে বুলুতে বল্লম, এতদিন কোথায় ছিলে হু, কেমনভাবে এতদিন কাটিয়েছ ?

সেই শোয়ার অবস্থাতেই হুহাত দিয়ে আমার গলাটা জড়িয়ে ধরে সে বল্ল—কোথায় কালী, আর কোথায় রামগিরি! শেষ তোমাকে পেয়েছিলুম মার্গশীর্ষের স্তম্ভ চতুর্দশীতে। মনে পড়ে দেব, সেদিনের কথা কি তোমার মনে আছে ?

ওর কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে বেশ সজ্ঞানে আমার বেন সমস্ত কথাই মনে পড়ে গেল। সেদিন, সেই 'ডেইশশ' বছর আগেকারের অগ্রহায়ণ মাসের স্তম্ভ চতুর্দশী রাত্রির তৃতীয় বাম অস্ত্রে কলনাদিনী খরস্রোতা গন্ধার কুলে ওরই জন্ত আমি অপেক্ষা করে বসে যখন প্রহর গুনছিলুম তখন পেছন থেকে হঠাৎ নিঃশব্দচরণে এসেই ও তার পেলবকোমল দুই করপল্লব দিয়ে আমার চোখ দুটি বন্ধ করেই খিল খিল করে হেসে উঠেছিল। তারপর লীলারিত স্তম্ভরীতে আমার কোলের ওপোর এলিয়ে পড়ে হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করেছিল—রাগ কর নি তু, আসতে দেবী হোল বলে ?

মুখে কোন উত্তর দিই নি, শুধু ব্যবহারে বুঝিয়ে দিয়েছিলুম যে ওর ওপোর রাগ করা আমার পক্ষে অসম্ভব।

গম্ভীর মুখে সেদিন ও বলেছিল, ওগো দেব, এ-ভাবে আর চলবে না। তোমাকে আমাকে একসঙ্গে মন্দিরের গর্ত-গৃহে দেখার পর থেকেই বড় পুরোহিত অত্যন্ত ঘৃণিতভাবে সন্দেহ করছে। একটুও চোখের আড়াল করতে চায় না, সব সময়ই কেমন যেন আড়াল দিয়ে রাখার চেষ্টা, বেন আমি কত অপরাধী!

বলেছিলুম, অপরাধী কি নও? তুমি দেবতার নৈবেদ্য হয়ে সামান্য মাহুকের কাছে—

অসহিষ্ণুভাবে মাথায় ঝাঁকি দিয়ে সেদিন ও বলেছিল না—না—না, আমি পাথরের প্রাণহীন দেবতার নই, দেবতাকে নিয়ে ব্যবসা করে যে সমস্ত অসুর আমি তাদেরও নই, আমি একান্ত ভাবে আমার প্রাণের দেবতার, আমার

দেবদত্তের আমার দেবের। এর পর বহুক্ষণ বাবু আমার কোলের ওপোর মুখ ওঁজো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল, তারপর ঠিক আজকের মতই অশ্রুসিক্ত চোখ তুলে সেদিন, সেই তেইশশ বছর আগেকার নৈশ আকাশতলে শুক্লাচন্দ্রদীপীৰ চক্সালোকে একান্ত আকৃতির সঙ্গে বলেছিল, এখানে আর নয় দেব আর নয়। চল তোমাতে আমাতে চলে যাই, কোন দূর দেশে—দূর দূর অনেক দূর—যে দেশে কোন রাজা নেই কোন মন্দির নেই, কোন পুরোহিত নেই, ধর্ম অধর্ম পাপ পুণ্যের অতীত কোন দেশে গিয়ে এমনি এক নদীর তীরে ছোট্ট এক পর্ণকুটির নির্মাণ করে তোমাতে আমাতে বাস করব। এমনি চান্দনী রাতে সেই লোকবর্জিত স্থানে আমি তোমাকে তোমার সামনে আমার সমস্ত শিক্ষাদীক্ষা উজাড় করে নৃত্যকলার পরাকাষ্ঠা দেখাব, আর একমাত্র তুমি হবে সেই লীলাছন্দেব দর্শক। অস্ত্র কেউ থাকবে না, কোন নিয়ম নীতি থাকবে না, কোন বধ্যধর্মের বালাই থাকবে না।

স্বতন্ত্ৰতার সেদিনকার সেই করুণ মুখ আজ তাঁবুর মধ্যে খাটিয়ার ওপোর বসে বসে স্পষ্ট মনে পড়ল। মনে হোল এ যেন কালকের ঘটনা—এমন ইম্পট, এমনই প্রত্যক্ষ। স্বতন্ত্ৰ হাতখানি হাতের মধ্যে ধরে আজ বলুম, মনে আছে স্ত, সেদিনকার সেই কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। সেদিন সেই জ্যোৎস্নালোকিত নৈশ গন্ধার প্রবাহধ্বনির সঙ্গে স্বর মিলিয়ে বলেছিলুম, তোমাতে আমাতে একই সঙ্গে দেশে দেশে প্রবাহিত হয়ে চলব, যেমন চলেছে এই গন্ধার ধারা এমনই যবাব, এমনই নির্মল, আমাদের প্রেম জ্যোৎস্নায় সেই জীবনধারা হবে এমনই উজ্জল। বলেছিলুম, কাল পূর্ণিমার রাত্রে মন্দিরের দেবতার শ্রীচরণে তোমার শেষ প্রণাম প্রণতিলাভে তুমি বিদায় নিবেদন করে আমার কাছে এমনই ভাবে রাজির বিতীর বাস অন্তে চলে আসবে, আমি তোমার অস্ত উপযুক্ত শিবিকার ব্যবস্থা রাখব, তারপর তুমি যাবে শিবিকার আমি যাব পদব্রজে, এই ভাবে আমরা এই পবিত্র অঞ্চল কলুষিত বারাগনী পরিত্যাগ করে চলে যাব—দূর হতে দূরান্তরে। শিবিকাকে বিদায় দিয়ে দুই পশ্চিম পদব্রজে গ্রামের পর গ্রাম অতিবাহিত করে নদ নদী পার হয়ে অধুনা পর্বত উন্নয়ন করে ক্রমাগত চলে যাব পূর্ব

হতে আরও পূর্বে সূর্যোদয়ের দেশে। সেদিন আমার জানি ছিল হিরণ্যপর্কতে অর্থাৎ, বর্তমানের কামাখ্যায় প্রেমিক-প্রেমিকার মিলনে কোন বাধা ছিলনা, তাই সেদিন সেই পবিত্র নদীতীরে তোমার কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলুম, তোমাকে নিয়ে সেই হিরণ্যপর্কতে গিয়ে নীড় রচনা করে বাকী জীবন তুমি থাকবে স্বরাস ধনা নিয়ে, আর আমি থাকব আমার রেখা শিল্প অবলম্বন করে। ওঃ, সেদিনের সেই স্বপ্নের মুহূর্তটি আমার মনে এখনও এমন স্পষ্টভাবে জেগে রয়েছে যে মনে হচ্ছে আমরা—যেন সেই জ্যোৎস্নারাত নদীতীরেতে এখনও বসে আছি।

শুনতে শুনতে হঠাৎ আমার মুখের ওপোর হাত চাপা দিয়ে স্বতন্ত্ৰতা বলে, আর নয়, আর নয় দেব, এবার থেমে যাও। কারণ এর পরেই যে পৈশাচিক ব্যাপার শুরু হয়েছিল সে কথা মনে পড়লে আমি এতদিন পরেও আর একবার সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ব।

সত্যিই ত, সেই দুর্দিন আমার এখনও স্পষ্ট মনে আছে, ভীমদর্শন তিনজন শত্রু নিঃশব্দপদে আমাদের পেছন থেকে এসেই সেই শেষরাত্রে সেইখানেই আমাদের আক্রমণ করে। প্রধান পুরোহিতের বিষম অজ্ঞচর তারা। প্রধান পুরোহিত যে কবে থেকে সেই তিনজনকে আমাদের পেছনে চরক্রে লাগিয়ে রেখেছিল তা জানতুম না। মন্দিরের নৃত্য অন্তে কালো রঙের কাপড়ে সর্দার আচ্ছাদন করে চীরথণ্ডে দুই পায়ে নুপুরকে বন্ধন করে নিঃশব্দ চরণে স্বতন্ত্ৰতা যখন আমার সঙ্গে মিলিত হবার জন্য গোপনঅভিযারে নদীতীরে এসেছিল তখন কি সে জানত যে তার এবং আমার মৃত্যুদূত নীরবে সন্ধ্যাপনে এমনই ভাবে তার পশ্চাদ্ভ্রমণ করেছে। আমরা কেউই জানতুম না, কিন্তু তারা এসেছিল গোপনে, আমাদের পরামর্শ সমস্তই শুনেছিল এবং আমাদের বিশস্তালাপের মধ্যেই এক সময় আমাদের আক্রমণ করেছিল। তাদের সঙ্গে শক্তিতে আমি পারি নি, দৈহিক শক্তিতে কোনরূপ-কার কোনদিনই জন্মদের সঙ্গে পারে না। তারা আমাদের ছজনকেই বন্দী করেছিল। মনে আছে স্বতন্ত্ৰতা সেদিন একজনদের হাতের উপর এমনই এক প্রাণান্ত ধংশন দিয়ে ছিল যে সেই পাখও ওকে ভীম মুষ্টির আঘাতে অচেতন্য করে শেষে পরাধাত পর্যন্ত করেছিল। পরে অবশ্র

দেবদাসী বলে তক্তিতে প্রণামও করেছিল, পদধূলিও গ্রহণ করেছিল। কিন্তু আমরা বন্দী হয়েছিলুম এবং ওকে যে পূর্বে কোথায় সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল তা আর আমি জানতে পারি নি। তারপর সকালে রাজার সভাকক্ষে বসেছিল বিচারসভা। প্রধান পুরোহিত আমাকে শূলে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। রাজমন্ত্রী বিচার সভায় বলেছিলেন—আমাকে এবং হতভূতাকে একত্রে বন্ধ করে তুখানলে দ্বন্দ্বকরা উচিত। এই মন্তব্যে প্রধান পুরোহিত আপত্তি জানিয়ে বলেছিলেন, হতভূতকার শাস্তির ব্যবস্থা তিনি নিজেই করবেন, কিন্তু আমার শাস্তি হওয়া উচিত পূন্যস্রুণু প্রাপ্তও। সেদিন কালীরাজের মুখে ফুটে উঠেছিল কি অপরিণীত কল্পনা, কি অসহায় আতঙ্ক। তিনি যেন কৌনদিক দিয়েই কোন সারস্বত বিধান করতে পারছিলেন না। শূন্যলিত রুদ্ধপদে অগ্রসরণের শীতের বন্দীত্ব দেহে প্রহরীবেষ্টিত অবস্থায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেদিন সেই বিচারসভায় বহুসংখ্যক সভাসদদের সামনে আতুল আগ্রহে হতভাগ্য আমি রক্তিমুখনিঃসৃত আদেশের প্রতীকার দাঁড়িয়ে ছিলাম। শেষে রাজার আদেশ বাণী শ্রুত হোল। তিনি বলেছিলেন, এই জেলীর রূপদক্ষ লক্ষেও একটিমাত্র বিরল, এই অলোকসামান্য রূপকারকে মুক্তি দিতেই আমি চাই। এই পর্যন্ত বলেই—তিনি সকলের মুখের দিকে দৃষ্টি পাত করে সভাসদগণের মনোভাব পরীক্ষণ করতেই চেয়েছিলেন, এবং যেমনই বোকা গেল যে প্রধান পুরোহিত এবং সভাপতিত্বের মুখে প্রতিবাদের ইজিত স্পষ্ট ফুটে উঠেছে তেমনই তিনি বলেন, কিন্তু দেবকৃত্যের সঙ্গে ব্যক্তির কখনই ক্ষমাবোগ্য নয়, উপরন্তু এর পূর্বে অপরাধীকে একবার সাবধান করে সংশোধনের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু সে সুযোগ যে গ্রহণ করে নি—

বনে আছে, সেই চরম মুহূর্তে সভার সমস্ত প্রাণী নিঃশব্দে রুদ্ধবাসে রাজমুখের দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি হয়ে বসেছিল, প্রহরী পাখাণ পুতলির মত জড়বৎ স্থির ছিল। চরমধারিণী বারেকের জন্তই চরম বীজন করতে বিশ্বস্ত হয়ে পড়েছিল, রাজকক্ষের বাইরে দৌবারিকও তার নিয়মিত পদচারণা ব্যারিয়ে ব্যারণ দিয়ে রাজাজ্ঞা শোনবার জন্ত উৎকর্ণ হয়ে প্রতীক্ষা করেছিল। রাজা

একবার মাত্র আমার দিকে দৃষ্টিপাত করেই নতাক্ষে মন্ত্র-মুখের মত যেন অপরের কণ্ঠেই ঘোষণা করলেন—আমার রাজ্য থেকে দেবদত্তের ব্যবসায়ীজন নির্বাসন, তাহার নৈপুণ্যের জন্ত এই মৃত্যু শাস্তিই তার উপযুক্ত।

তবু সভা সেদিন আর মুখর হয় নি। বাড়ি ছেঁটে করে রাজ্য অভ্যুত্থানে প্রবেশ করলেন, সভাসদরা আপন আপন আসনে ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ছিলেন, সেদিনকার শূন্যলিত আমাকে প্রহরীগণ সভার গভীর কারাকক্ষে নিয়ে গিয়েছিল এবং পরদিন প্রহরী বেষ্টিত অবস্থায় আমার নির্বাসনযাত্রা শুরু হয়েছিল।

এর পরের কথাগুলো স্মৃতিগটে অস্পষ্ট। কত গিরি নদী গ্রাম জনপদ অতিক্রম করে প্রহরীদের অধীনে পদ-ব্রজে আমাকে বেতে হয়েছিল। ভয়মনে ভয়মুখে শ্লথিত পদে কুংপিপাসার ক্লান্ত হয়ে বহুদিন পরে অরণ্যসরাসরী রামগিরি বনপ্রান্তে প্রহরীরা আমাকে বন্ধন করে এবং বাবার সময় তীব্রভাবে আর একবার স্মরণ করিয়ে দেয় যে এই নির্বাসন থেকে প্রত্যাবর্তনের চেষ্টা আনবে শূলগানে মৃত্যু। মৃত্যুভয় নয়, মনের দুঃখে এবং হতভূতাকে না পাওয়ার অবসাদে আমি আর লোকালয়ে ফেরবার কথা কোনদিন মনেও করি নি। এই রামগিরিতেই জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করেছিলাম। উদ্বেগবিহীনভাবে অরণ্যে পরিভ্রমণ করতে করতে গুহাটি নজরে পড়েছিল এবং তারপর সেখানেই বাস করি। বনের ফল, নদীর জল আমার প্রাণধারণে সাহায্য করেছিল। জীবনের বাকী কটা দিন হতভূতকার স্মৃতি সঞ্চল করেই সেই 'তেইশ শ' বছর আগেকার দেবদত্তের অবসান হয়েছিল।

কিন্তু হতভূত! সে তার বাকী জীবনে কি করেছিল। হতভূত বলে, তুমি জানো কেব, সেদিন সেই শেষ রাত্রে তোমাকে শেষ দেখেছিলাম, কিন্তু তারপর থেকে তুমি তাত জানো না, সেই শেষ রাত থেকে আজ পর্যন্ত জন্মদায়ী আমি আমার মনের মাহুৎ দেবদত্তের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে একত্রই বাস করছি। আমাকে জোর করে বলিনী ভাবে নিয়ে গেল প্রধান পুরোহিতের বাকীতে—হাতীর ডলার এক অঙ্কার ঘরে। সেখানে পুরোহিত আমাকে একদিকে দিয়েছিল, অশেষ প্রলোভন এবং

গরভবর্ষ



ভুলমার্গের পথে (কান্দীর)

ফটো : রণীন চক্রবর্তী



মালভার্গের পথে (কামৌর)

ফটো: সত্যেন্দ্র কুমার দাস

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

অল্পদিকে দিয়েছিল প্রাণভয়। কিছুতেই আমি বিস্মিত হই নি, তবে আমার সেই জীবনের পার্থিব দেহটাকে নিয়ে তারা যথেষ্ট ব্যবহার করেছে। আমি বাধা দিইনি, বাধা দেওয়ার ক্ষমতাও আমার ছিল না, কিন্তু সেদিনের পরে আর একবারের জন্মও মন্দিরে যাই নি। কি করে যাব? তুমিই বল দেব, অন্তরের নৃত্যগীত শুধু হয়ে গেলে দেবতার কাছে কি নিয়ে নিবেদন করব।

শুধু কণ্ঠে বলুম, তারপর?

সে বলে, তারপর কোন একদিন, আমি জানি না, প্রধান পুরোহিত বাইরে প্রচার করে দিয়েছিল স্বতন্ত্রতা রোগে দেহভাগ করেছে। একথাও জানলুম আমি অনেক পরে। কত দিন পরে তা জানি না, কারণ যে স্বতন্ত্রতাকে আমার বন্দি করে রাখা হয়েছিল সেখানে অর্থাৎ স্বাধীনতার সংবাদ পৌঁছত না, স্বতন্ত্র পরিবর্তনের কোন আভাস পেতুম না, আমার সঙ্গে বহির্জগতের কোন যোগ ছিল না, আমি ছিলুম পুরোহিতের খেলার পুতুল, তবু পুরোহিতের নয়, তার ছেলেও আমার কাছে লুকিয়ে আসত। আমি কাউকেই বাধা দিইনি, কোন কিছুতেই বাপতি করি নি, কারণ তখন আমার মন হাত, আমি জীবন্তভাবেই দেহভাগ করেছি। মৃত্যুর পর দেহের সঙ্গে যেমন কোন সঙ্গ থাকে না, জীবন্ত অবস্থাতেই আমার তখন সেই বোটা এসে গিয়েছিল। কে, কি ভাবে আমার দেহটাকে নিয়ে পৈশাচিক মেলায় মত্ত হোক সে খবরও আমি রাখি নি, শেষে ওরা আমাকে সেই স্বতন্ত্রতাকে থেকে এক স্বতন্ত্র বর্ণনামূলক রায়ে শিবিকায় তুলে কানী থেকে বহুদূরে এক লোকালয়হীন শূন্য প্রান্তরে পরিভাগ করে চলে যায়। ওরা কেন আমাকে হত্যা করে নি, তা জানি না, কারণ মনে হয় কীতান্দী প্রকার হত্যা করলে আর কোন রাজস্বের ভয় থাকত না। কিন্তু তা ওরা করেনি। হয়ত এক সময় যখন বন্দকী ছিল তাকে হত্যা করলে কোন প্রত্যাবর্তন হবে এই আশংকাতাই ওরা হত্যা থেকে বিরত ছিল।

কিন্তু কণ্ঠে বলুম, তারপর?

সে বলে—তারপর প্রায় মাসাধিককাল সেগেছে আমার মৃত্যু হতে। প্রথম কয়েকদিন স্বাধীনলোক কিছুই

দেখতে পেতুম না, কারণ বহুদিন যাবৎ স্বাধীনলোক থেকে বঞ্চিত ছিলাম। তারপর চলাফেরা করাও কষ্টসাধ্য ছিল, কারণ ক্ষুদ্র একটি প্রকোষ্ঠে দীর্ঘকাল বন্দিরা অবস্থায় বাস করার ফলে শরীরের শিরা পেশী সমস্তই শুক হয়ে গিয়েছিল। তবে আহাৰ ও বাসস্থানের অভাব হয়নি। সেই প্রান্তরের এক অংশে এক সিঁধ্যের গায়ে বাস করতেন। তিনি আমাকে তাঁর কুঠীতে স্থান দিয়েছিলেন।

বলুম তারপর?

সে বলে—একদিন সেই যোগী আমায় প্রশ্ন করেছিলেন আমি কে, কি চাই, এবং সেখানে রয়েছি কেন। এর পূর্বে তিনি আমার সঙ্গে বিশেষ কোন বাক্যালাপই করেনি। যোগীবরকে সমস্ত জ্ঞাপন করার পর তিনি কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ হয়ে বলেন—তোমার দ্ব্যিত তোমার চিন্তার দ্ব্যিত স্বাধীন অবস্থায় মৃত্যু খায় শায়িত। এখান থেকে কখনো পশ্চিমে একমাসের পথ রাখগিরি; সেই গিরির এক গুহায় সে মুমূর্ষু অবস্থায় মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছে। আকুলভাবে তাকে বলেছিলাম—তাত, এ অভাগিনীকে তার কাছে প্রেরণ করার ব্যবস্থা করে দিন। তিনি ধ্যানস্থ থেকে বলেছিলেন—আমার প্রারম্ভ আমাকে রাখগিরিতেই আকর্ষণ করেছে। সেইখানেই আমার জীবনান্ত হবে। বলে তিনি বলেছিলেন যে তিনি শুধু হরোদগৌড়ে রাখগিরি অভিমুখে যাত্রা করবেন এবং তাঁর সঙ্গেই রয়ে আমার যাত্রা। আর একবার কৈদে কৈদে তাঁর কাছে নিবেদন করেছিলাম, অত বিলম্ব অনর্থ, কারণ তোমার সংবাদ পেয়ে এবং তুমি মুমূর্ষু তনে আমি তত অপেক্ষা করতে পারছিলাম না। তিনি আমাকে সাশ্রনা দিয়ে বলেছিলেন, সে হয় না মা, দেবদেবের নবর জীবন তুমি জীবিত অবস্থায় এ জগতে দেখতে পাবে না, এই তোমার প্রারম্ভ। এর পর যেদিন সেই দিক যোগীর সমভিগ্যাহায়ে রাখগিরির গুহায় আসি সেদিন তোমার মৃতদেহের দর্শন পাই। সেই দেহ দেখে মনে হয়েছিল, তুমি মাত্র কয়েক মুহূর্ত পূর্বেই দেহভাগ করে গেছ।

এই পর্যন্ত বলেই স্বতন্ত্রতা নীরব হোল। মনে হোল সেইদিনকার সেই জগতে সে আর একবার মুমূর্ষু। কিছু পরে বলুম, তারপর?

অতঃপর কণ্ঠে স্বতন্ত্রতা আরও কিছুক্ষণ

থেকে যেন কথাবলার শক্তি সংগ্রহ করছিল। তারপর ধীরে ধীরে আবার আরম্ভ করলে। বসন্তে, গুহার বাইরে তোমার শেখরত্ন সম্পাদন করে সেইদিন থেকে বৈধব্য গ্রহণ করেছিলুম। তারপর দীর্ঘদিন যাবৎ এইখানে এই রামগিরিতে তুমি যেখানে যেখানে ঘুরতে, যেখানে বসতে, সেই সমস্ত স্থানেই ঘুরেছি, বসেছি। সিদ্ধযোগী আশাকে বলেছিলেন; তোমার দেবদত্তর সাধনা বড় কম নয়। তিনি বলেছিলেন, তুমি প্রেমের স্বরচিত রেখা মস্ত্রে তোমার অন্তরের দ্বিগতাকে দেবীর আসনে বসিয়ে অহর্নিশি ধ্যান করো, তোমার রচিত ভাষাময় তুমি ঐ গুহাগাত্রে উৎকীর্ণ করে রেখেছ। গুহার পশ্চাতে ঐ শিলাখণ্ডে বলে বলে তুমি বারাগণীর দিকে মুখ করে আপন মনেই তোমার নিপুণ হাত দিয়ে গিরিগাত্রে আমার রূপ অঙ্কন করেছে—যে অঙ্কন তুমি আজ নতুন করে আবিষ্কার করে আগন্তুকদের কাছে তুলে ধরেছ। আমি তোমার ঐ কেলে-বাওয়া শিলাসনে দীর্ঘকাল ধরে বারাগণীর অস্তিমুখীন হয়ে তোমারই প্রতীক্ষায় জ্ঞানশূন্য অবস্থায় শতাব্দী ও সহস্রাব্দী অতিবাহিত করেছি। এই-খানেই ছেদহীন চিন্তায় স্রবণ করেছি গঙ্গাতীরের সেই শেষ মিলনরাত্রিকে। এখানে আমার অনন্তলক্ষী দিনগুলি অশায়ে কেটে যেত, দৃষ্টিপটে একের পর এক ভেসে যেত দিনের সূর্য্য, রাতের জ্যোৎস্না। পরিবর্তনশীল জগৎ আমার কাছে স্তব্ধ, আর সেই নিশ্চল প্রচ্ছদপটে চির-ভাস্বর ছিল তোমার অমলিন স্মৃতি।

একটু স্থির হয়ে বসে, এতদিন—এতদিন পরে আমি তোমাকে আবার পেয়েছি। এ আমি জানতুম, আমি জানতুম তুমি আসবে; সেইজন্যই ত আমার প্রতীক্ষা। কত হাজার হাজার বসন্ত বিফলে পার হয়ে গেছে, কত অগণিত মার্গলীর্ণ তার ওক্সা চতুর্দলীর জ্যোতির্স্বয় চাঁদকে নিয়ে আমার দৃষ্টি অতিক্রম করে চলে গেছে, কতদিন কত হতাশায় আমার বুক ভরে উঠেছে। কিন্তু একবারের জন্যও নিরাশাস হই নি, একবারের জন্যও নয়—

তার পিঠের ওপোর হাত বুলোতে বুলোতে জিজ্ঞাসা করলুম, আমি যে আসব, তা তুমি জানলে কি করে?

সে বলে, আমি জানি। সেই সিদ্ধ যোগী তার কে-

ঐকান্তিক আকর্ষণ তাকে আকৃষ্ট করে এইখানেই নিয়ে আসবে। তুমি তার প্রতীক্ষায় থেকে। তাই আমি জানতুম, তুমি আসবে, একদিন না একদিন তোমার দর্শন আমি পাবই। আজ আমার শুভদিন, আমার প্রতীক্ষা আজ সার্থক।

গভীর আরামে ও পরম নির্ভরে সে আমার অন্ধশায়িনী। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বসে, আচ্ছা দেব, কোন বিখ্যাত কবি কি তোমাকে নিয়ে কোন কাব্য রচনা করে তোমাকে অমরত্ব দান করেছে?

ভাবতে ভাবতে আমি বল্লম—কই, তা ত জানি না, তবে ই্যা আজকে যে অধ্যাপক এসেছিলেন, তিনি বলেছিলেন কোন গ্রন্থে নাকি দেবদত্তর লেখা ঐ গুহার বা আছে সেগুলো মুদ্রিত হয়েছে।

সে বলে, না—না, তা বলি নি। কোন বিখ্যাত কবি এই রামগিরিকে নিয়ে কোন নির্কাসিত শ্রেয়িকের হতাশা কি মূর্ত্ত করে তুলেছে?

হঠাৎ মনে পড়ে গেল কালিদাসের মেঘদূত। কিন্তু সংস্কৃত মেঘদূত আমার পড়া হয় নি, গল্পটা মাত্র জানতুম। বল্লম, ই্যা ই্যা শুনেছি বটে কবি কালিদাস তাঁর মেঘদূত কাব্যে রামগিরি বনের নির্কাসিত যক্ষকে নিয়ে এক অমর কাব্য করেছিলেন, কিন্তু—কিন্তু সে ত আমাদের নিয়ে নয়, সে এক নির্কাসিত যক্ষের কথা—তার বিবাহিতা স্ত্রীর উদ্দেশে বিরহ নিবেদন, আর সে রামগিরি বন এখানে নং, সেটা বিজ্ঞাচলের পশ্চিম অংশে।

হাসিমুখে ঘাড় নাড়তে নাড়তে হতভুলকা বলে, ঠিকই হয়েছে। সিদ্ধযোগী বলেছিলেন, এক বড় কবি জগদগ্রহণ করেছেন, তিনি তোমার দ্বিগতকে নিয়ে এক অমরকাব্য রচনা করবেন। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে তোমাদের নাম এবং ঘটনার স্বরূপ প্রকাশ করতে পারবেন না। ঘটনাকে তিনি বিকৃত করতে বাধ্য হবেন, কিন্তু অন্তরের গভীরতাকে যথাযথ পরিস্ফুট করবেন। শুধু রামগিরি নামটুকু মাত্র রক্ষা করে বাকী সমস্তই গোপন রাখতে বাধ্য হবেন।

বাইরে দু'একটা পাখীর ভাক শোনা গেল। হতভুলকা পরম আরামে আলস্ত পরিহার করে শয্যাশ্রান্তে উঠে বসে বলে তাহলে আমার আশা পূর্ণ হয়েছে, তোমার দর্শন আমি

বল্লভ, সে কি, তুমি উঠই নাকি ?

তেইশ'শ বছর আগেকারের ছুঁ হাঁসি হেসে খুঁকীর মত কণ্ঠস্বরে সে বললে, উঠব না। আমার সময় যে ফুরিয়ে এল !

বল্লভ, তার মানে ? এখানে প্রধান পুরোহিত নেই, রাজার প্রহরীও নেই, তোমার বাস্তবতার কারণ কি ?

তেমনি হাঁসিমুখেই সে বললে, তা ত নেই, কিন্তু আমিও যে নেই ! আমি বাস্তব নই, আমি যে একটি ঘনীভূত বাসনা, দিনের আলোয় মুক্তির আঘাত সহ্য করতে অপরাগ আমি, বাস্তব মানুষের দৃষ্টি আমি সহিব কি করে ?

বল্লভ—তাহলে—তাহলে আমার কি হবে ?

পরম আগ্রহে সে আমার হাত দুটি ধরে বললে, কেন গো, তুমি তোমার দেবদত্ত জন্মে নিরবচ্ছিন্ন আঘাত সহ্য করে করে এমনই পাষণ হয়ে গেছ যে কোন দুঃখই ত তোমার দুঃখ বলে মনেই হয় না। তা ছাড়া কাল রাত্রি পর্যন্ত তুমি ত আমাকে ভুগেই ছিলে, আজ সকাল থেকে আবার আমাকে ভুলে যাবে। পারবে না ?

দু হাত দিয়ে জোর করে তাকে চেপে ধরে প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছিলুম, সে হয়না হু। তুমি আসবে সেই আশায় এতদিন কোন দুঃখকেই দুঃখ বলে মনে করিনি, কিন্তু আজ তোমাকে পেয়ে যদি আবার হারাতে হয়, তা হলে সেই দুঃখ ভুলব কি মূলধন দিয়ে ? সে হয় না, তুমি যেও না।

কপট গান্ধীর্ঘ্যে শব্দ হয়ে সে বললে, ছিঃ, অব্যবহায়ে

না। বাস্তবের সঙ্গে অবাস্তবের স্থায়ী মিলন অব্যবহায়ে। তুমি বাস্তব আমি অবাস্তব, এই কঠোর সত্যকে স্বরণ রেখ।

আকুল হয়ে বলেছিলুম, আমি বাস্তব থাকতে চাই না, অথবা তোমাকে অবাস্তব থাকতে দেব না—

দুটামির হাঁসি হেসে সে বললে, ঠিক আছে, তুমি যখন বাস্তব থাকবে না, তখন আমি তোমার সামনে আত্মপ্রকাশ করব, আর তুমি যখন বাস্তব থাকবে তখন আমি তোমারই মধ্যে লীন হয়ে ঘুমিয়ে পড়ব। বলতে বলতেই হুতুতুকা—আমার স্পষ্ট প্রত্যক্ষ বাহ্যিক হুতুতুকা—অস্তিত্বহীন অদৃশ্য হয়ে গেল।

তীব্র থেকে বাইরে বেরিয়ে এলুম। উষালোকে জনশূন্য দিগন্ত পাথীর ডাকে ও প্রহরারত বাহাদুরের বুটের শব্দে অল্পে অল্পে জাগরিত হচ্ছিল।

সারাদিন দাক্ষণ অবস্থিতে কেটে গেল। বিনা প্রয়োজনে আজ আর একবার সেই গুহা দেখে এসেছি। সেই লেখা, সেই ছবি, সেই শিলাখণ্ড। কিন্তু কালকের মত আজ আর কোথাও কাকের কোন প্রাণস্পর্শ পাই নি। রাত্রিও কেউ এল না। আর কোনদিন সে আসবে কিনা জানিনা। তবে একটা আশা আমি মনে মনে এখনও পোষণ করি, যেদিন যে শুভ মুহূর্তে আমি অবাস্তব হব, সেদিন আমার তেইশ'শ বছরের অবাস্তব হুতুতুকা হয়ত আবার কাছে ফিরে আসবে, যেমন করে এসেছিল তেইশ'শ বছর আগে এবং সর্বশেষ তেইশ'শ বছর পরে মাত্র গতকাল রাত্রি।



তাঞ্জোর

শ্রীদেবেন্দ্রচন্দ্র বহু মন্দির

মাদ্রাজ প্রদেশের মধ্যে তাঞ্জোর একটি ঐতিহাসিক সहर। মাদ্রাজ সहर হইতে ২১৮ মাইল দক্ষিণে, কাবেরী নদীর তীরে এই পৌরাণিক সहरটি অবস্থিত। এই সहरের মধ্যে বৃহদীশ্বর মহাদেবের স্মরণ্য দেবালয়টি অগণবিস্ময়াত। গত বর্ষে কাঙ্ক্ষিত মাসে কুণ্ড কোম্পানির স্পেশাল ট্রেনে ভারত-প্রদক্ষিণের সময় সমগ্র ভারতের প্রধান প্রধান দেবালয়-গুলির মধ্যে দক্ষিণ ভারতে রামেশ্বরম, মাদুরা এবং তাঞ্জোরের যে তিনটি দেবালয় দেখিয়াছি সত্যিই সেগুলি বর্ণনাতীত। ইহার মধ্যে শিল্প ও ভাস্কর্য-কার্য সত্যিই অতুলনীয়।

বাহির-হইয়াছি তীর্থ ভ্রমণে কিন্তু প্রাচীন যুগের শিল্প, ভাস্কর্য ও স্থাপত্য বিজ্ঞা দেখিয়া মোহিত ও স্তম্ভিত হইলাম। ষ্টেশনের পার্শ্বেই ঝটকা বা আচ্ছাদিত গোলকট ভাড়া করিয়া বাহির হইলাম। ষ্টেশন হইতে এক মাইল দূরে মন্দির, বহু দূর হইতেই মন্দিরের গগনভেদী চূড়া দেখা বাইতেছে। তাঞ্জোর সहरটি বহু প্রাচীন, ঘনবসতিপূর্ণ এবং মধ্যে মধ্যে দুই ধারে বৃক্ষ লাগান। অনেক প্রশস্ত রাস্তা।

এই নগরের নামোৎপত্তি সম্বন্ধে জনপ্রবাদ যে পুরাকালে এই স্থানে তাঞ্জোর নামে এক ভীষণ দৈত্য বাস করিত। তাহার উৎপাতে জনসমূহ ভীত হইয়া বিষ্ণুর আরাধনা করিলে, বিষ্ণু এই দৈত্যকে দমন করিয়া প্রাণিগণকে পরিজ্ঞান করেন। ঐ দৈত্য মৃত্যুকালে বিষ্ণুকে অস্ত্ররোধ করে যে তাহার নামানুসারে যেন এই নগরের নামকরণ হয়। সেই কারণে এই সहरের নাম তাঞ্জোর হইয়াছে।

মন্দিরটি যেন একটি দুর্গের মত। চতুর্দিকে খালকাটা এবং উচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত। মন্দিরের চারিদিকে চারটি গোপুরম্। দক্ষিণাত্যের প্রত্যেক বৃহৎ মন্দিরের প্রবেশ দ্বারের প্রথমই স্মরণ্য গোপুরম্ রহিয়াছে। প্রত্যেক গোপুরম্ চতুর্কোণাকৃতি এবং উচ্চতায় একশত হইতে দুইশত ফিট এবং পর পর ছয় হইতে দশতালার বিস্তৃত। প্রত্যেক গোপুরমের উপর অসংখ্য দেবদেবী প্রাণী ও ফুল-

ফলের আকৃতি নিপুণ ভাস্করের দ্বারা ক্ষোদিত। প্রত্যেক গোপুরমের উপর অপর শিল্প নৈপুণ্য ও কারুকার্য দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়। অধিকাংশ গোপুরম্ মূলমন্দির অপেক্ষা উচ্চ হয়, কিন্তু তাঞ্জোরে মন্দিরের প্রথম গোপুরমটি এক শত ফিট উচ্চ এবং প্রধান মন্দিরটি প্রায় আড়াই শত ফিট উচ্চ। প্রধান গোপুরমের পর আরো দুইটি ষাট ফিট উচ্চ গোপুরমের মধ্য দিয়া গিয়া প্রধান মন্দিরের প্রবেশ দ্বার।

প্রধান মন্দিরটির চতুর্দিকের গায়ে পাথরের উপর অপরূপ ভাস্কর্যকার্য করা নানা মূর্তিসমূহ। মন্দিরের অভ্যন্তরে শ্রীশ্রীবৃহদীশ্বর মহাদেবের লিঙ্গমূর্তি বিরাজমান। একথণ্ডে গ্রেনাইট প্রস্তরের বার ফিট উচ্চ এই মূর্তি, এত বড় লিঙ্গমূর্তি দক্ষিণ ভারতের আর কোন মন্দিরে দেখি নাই। প্রধান মন্দিরের একধারে পার্কতী দেবীর এবং অপরদিকে সূত্রঙ্গণিয়ার বা কাঙ্ক্ষিকের কারুকার্য-করা ষাট ফিট উচ্চ দুইটি মন্দির রহিয়াছে। ইহা ভিন্ন আসে-পাশে কারুকার্য-করা নানা দেবদেবীর ছোট ছোট কয়েকটি মন্দির রহিয়াছে।

প্রাঙ্গণের পশ্চিমভাগে একথণ্ডে কৃষ্ণবর্ণ গ্রেনাইট প্রস্তরে প্রস্তুত বারফিট উচ্চ এবং সোল ফিট লম্বা শিবের বাহন নন্দী বা খাঁড় পা ছুটি মুড়িয়া দেবতার সম্মুখে উপবিষ্ট। একটি বারাগুড়ার মধ্যে ছোট বড় শতাব্দিক শিব-লিঙ্গ বসান রহিয়াছে।

দেবালয়ের মধ্যে একধারে চতুর্দিক পাথরের ঘাট-বাসান শিবগঙ্গা নামক একটি জলাশয় রহিয়াছে—ইহাতে মন্দিরের সৌন্দর্য আরো বৃদ্ধি পাইয়াছে। সকল মন্দিরের গায়ে মণ্ডপের মধ্যে এবং বারাগুড়ার বড় বড় পাথরের উপর ক্ষোদাই করা অপরূপ মূর্তি সমূহ এবং এক স্থানে মন্দিরের মধ্যে পাথরের উপর নিপুণভাবে ক্ষোদাই করা রামায়ণে বর্ণিত রাম-সীতা এবং মহাভারতে বর্ণিত পঞ্চ পাণ্ডবের উপাখ্যান পর পর দেওয়ালের গায়ে বসান। এক স্থানে দেওয়ালের গায়ে কৃষ্ণরথার নানা লীলা ও নানা দেব

মহাত্মা বিষয়ে রক্ষিত বহু চিত্র সুন্দরভাবে নিপুণ চিত্রকরের দ্বারা চিত্রিত রহিয়াছে। মন্দিরের চতুর্দিকের কারুকার্য ও শিল্পসম্ভার দেখিয়া স্তম্ভিত হইলাম। প্রাচীন যুগের হিন্দু ভাস্করগণ ছেনি ও হাতুড়ি দিয়া কি অপূর্ণ মূর্তি সকল গঠন করিয়াছে! কালের কোন ছাপই এ যাবৎ এগুলিকে নষ্ট করিতে পারে নাই।

মন্দিরের মধ্যে কোন পাণ্ডা দেখিলাম না। পূজার জগা নানা ফুল এবং সুন্দরভাবে গাঁথা মালা সকল মন্দিরের মধ্যে বিক্রয় হইতেছে। দক্ষিণাত্যের কোন দেব-দেবীর মন্দিরের অভ্যন্তরে গিয়া স্পর্শ করিতে বা পূজা করিতে কোন ব্যক্তিকেই দেয় না। নাট্যমন্দির হইতে দেবতার দর্শন হয়। আমার সঙ্গে ছিলেন আমার ভ্রাতৃ, কণা ও গাঙ্গী সাহেব। তাঁহারা পূজার জগা ফুলমালা পরিষ্কার করিয়া মন্দিরের মধ্যে পুরোহিতের হস্তে প্রণামী দণ্ড দিলে তিনি তাহা দেবতাকে উৎসর্গ করিলেন এবং অল্প প্রসাদী ফুল ফেরৎ দিলেন।

মন্দিরের পার্শ্বেই একটি প্রাচীন বৃহৎ রাজপ্রসাদ দৃশ্য দেখিতে যাইলাম। অস্থান ৮৭। পৃষ্ঠা৬৬ দক্ষিণাত্যের পঞ্চব রাজবংশকে জয় করিয়া চোল রাজ-বংশের বিজয়ালয় এক মহাপরাক্রমশালী রাজা স্থাপন করেন। তাঁহার পৌত্র রাজরাজ প্রবল নৌশক্তির অধিকারী ছিলেন এবং তিনি সিংহল ও ভারত সাগরের অনেক দ্বীপ অধিকার করেন। তিনি স্বদূর জাভা হুমাত্রা পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। এই চোল বংশের নির্মিত বহু বৃহৎ কারুকার্য-করা মন্দির এখনও হুমাত্রা ও ভাভায় প্রাচীন ভারতের গৌরব ঘোষণা করিতেছে। রাজরাজের পুত্র বিখ্যাত রাজা রাজেন্দ্র চোল গঙ্গার উপকূল ও ব্রহ্মদেশের কিয়দংশ এবং আন্দামান, নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ জয় করিয়া রাজ্য বিস্তার করেন।

প্রবাদ যে এই রাজা রাজেন্দ্র চোল ১০২৩ হইতে ১০৬৫ খ্রীষ্টাব্দ অবধি ৪২ বর্ষ ধরিয়া বহু অর্থ ব্যয় করিয়া মহামূল্য প্রস্তরাদি আনাইয়া, শ্রেষ্ঠ ভাস্করদের দ্বারা রাজ্যের এই বিশাল মহিমময় অপূর্ণ মন্দির নির্মাণ করান। এই ভাঙ্গোর চোল রাজবংশের রাজধানী ছিল। ঐরকমের তাঁহার রাজত্বের সময় ইহা দেখা যায় যে কিস্তি বেশী দিবস ব্যয় করিতে পারেন নাই।

পশ্চিম ভারত হইতে মারাঠারা আসিয়া ভাঙ্গোর দখল করে। সহরের চতুর্দিকে মারাঠাদের অতীত কীর্তির নানা নিদর্শন এখনও দেখা যায়। প্রধান মন্দিরের পার্শ্বেই এই বৃহৎ প্রাসাদ ও দুর্গ রাজা বিজয়-রাম নিৰ্মাণ করান। প্রাসাদের দুই ধারে দুইটি উচ্চ মিনার এবং মধ্যে একটি পাথরের উপর কারুকার্য করা বৃহৎ দরবার হল। ইহার মধ্যে একটি পাথরের সিংহাসন রহিয়াছে। প্রবাদ যে বীর শিবাজী কয়েক বর্ষ এই সিংহাসনে বসিয়া রাজকাযা পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন। মহারাষ্ট্রীয় ভোসলী বংশীয় রাজারা একসময় এই স্থানে রাজত্ব করিতেন।

ভাঙ্গোর মন্দিরের পার্শ্বেই একটি কলা-মন্দির বা যাদুঘর রহিয়াছে। ইহার মধ্যে মন্ত্ৰসম্বন্ধে গঠিত পুতুলসমূহ দেখিলে মনে হয় যেন জীবন্ত যাদুঘর।

দক্ষিণ ভারতের মধ্যে ভাঙ্গোর একটি বিখ্যাত শিক্ষা-কেন্দ্র। এখানে সংস্কৃত ও তামিল ভাষা শিক্ষার জন্য বহু বিজ্ঞান ও প্রাচীন চৌল রহিয়াছে। 'শাঙ্গোরের 'সারস্বত মণ্ডল' একটি প্রাচীন গণাগার ও শিক্ষালয়। জুনিলাম ইহার মধ্যে সংস্কৃত ও তামিল ভাষায় লিখিত পাঠ্যবো হাজার প্রাচীন পুঁথি আছে। প্রাচীন হিন্দু রাজারা কেবল যুদ্ধ বিগ্রহ বা মন্দির-প্রাসাদ ও দুর্গ-নিৰ্মাণই করান নাই, তাঁহারা বিজ্ঞা-শিক্ষা-জগৎ নানা ভাবে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন।

ভাঙ্গোর সহরের চতুর্দিকে বহু নদীমালা রহিয়াছে এবং প্রচুর বৃষ্টি হয়। সেই কারণে জমিসকল বঙ্গদেশের জায় উপর। এখানে ধান ও নানা ফসল এবং নারিকেল, কলা, আম প্রভৃতি নানা ফল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

হিন্দু রাজ্যগণের শাসনকাল হইতে এখানও এই স্থানে নানারূপ শিল্প কার্য সূচাক্রমে সম্পন্ন হইতেছে। সহরের মধ্যে বিবিধ বস্ত্র ও বস্ত্রকার শিল্প শ্রবণের দোকান অনেকগুলি দেখিলাম। ভাঙ্গোর হইতে নানাবিধ কারুকার্যযুক্ত বস্ত্র, কার্পেট শিল্প ও রৌপ্যের দ্রব্য ভারতের চতুর্দিকে রপ্যনি হয়। কাকীভরম ও মাহুরার জায় ভাঙ্গোরের সূতা ও শিল্পের মাড়ী এখনও অগ্নি বিখ্যাত। ভারতের বাহিরেও রপ্যনি হয়।

কাস্তিক মাসের অমাবস্তার দিবস রাত্রে হিলাম তাজোরে। আজ কালীমাতার পূজা। উত্তরভারতে সর্বত্রই এই দিবস দেওয়ালী উৎসবের কি ধুম, চতুর্দিক আলোক মালায় সজ্জিত করা হয়, কিন্তু দক্ষিণ ভারতে দেওয়ালী উৎসব কিছুই দেখিলাম না। বাল্লারীরা মা কালীর বিশেষ ভক্ত। পল্লীতে পল্লীতে ও কলিকাতার অলিতে গলিতে মাটির কালী প্রতিমা গঠন করিয়া পূজার কত ধুম। দক্ষিণ ভারতে কোথাও মা কালীর মূর্তিও দেখি নাই।

দক্ষিণ ভারতে অধিকাংশ মন্দিরে শিব বা মহাদেবের মূর্তি স্নানভাবে পূজিত হয়, পরে বিষ্ণুর আরাধনা হয়। রামসীতা বা কৃষ্ণ-রাধার মন্দির বা পূজা কম। দাক্ষিণাত্যে

শঙ্করাচার্যের শৈবধর্মের প্রাধান্যই সর্বত্র বেশী বলিয়া মনে হয়।

সৌভাগ্যক্রমে আমাদের স্পেশালট্রেনে ছিলেন শ্রীশ্রী গুরু মহারাজ মোহনানন্দ স্বামী ও তাঁহার অনেক শিষ্য ও শিষ্যা। রাত্রি আটটা হইতে একটি কমপার্টমেন্টে মাইক ফিট্ করিয়া এবং মাথায় লাউড স্পিকারের সাহায্যে গ্রাণ-মন মাতোয়ারা মহারাজের স্তলিতকণ্ঠের ধর্ম সঙ্গীত ও কীর্তন শ্রবণে প্রত্যেক যাত্রীই তন্ময় হইয়া গেল।

রবীন্দ্রনাথের দুইটি কলি মনে উদয় হইল :—

‘কবি বলে যাত্রী আমি চলিব রাত্রির নিমন্ত্রণে।
যেখানে সে চিরন্তন দেয়ালির উৎসব প্রাক্ষণে॥’

প্রাবণে

শক্তি মুখোপাধ্যায়

প্রাবণের রিম্ রিম্ বৃষ্টি ধারায়
উতলা হয়েছে মন, জীবনে জোয়ার
এসেছে আজকে এই হৃদয়ের নীড়ে ;
আবার পেলাম খুঁজে পুরণো স্বতি।

সবুজ বনস্থলী বাতাসের সাথে
কাপছে, অবিজ্ঞাম বৃষ্টির রেখা
ছড়িয়ে পড়ছে নিচে, পাতার আড়ালে
পাখিরা ভিজেছে বসে ; ভিজে সঁাৎসেতে।

উৎসব ঘনঘটা মেঘের প্রাসাদে
বৃষ্টির গান শুনি রিম্ রিম্ রিম্ ,

কত পরিচিত মুখ আজকে আবার
ক্রমাগত ভিড় করে সজল স্মৃতিতে।

কলিতা এখন তুমি দূর বাতায়নে
বসে আছো আনমনে, স্নিগ্ধ চোখে
স্বপ্নিল ছায়া পড়ে, মনোরম চুলে
কনক চাঁপার বাস, মিষ্টি...মধুর...

আজ তুমি পরবাসী ; ভালোবাসা নাম
এখনো বায়নি মুছে, বৃষ্টি রেখায়
তোমার পদধ্বনি শুনেছি বলেই
হৃদয়-বীণায় বাজে ইমন...বেহাগ...



সেকালের আন্দোল-প্রবোধ

পৃথীরাজ মুখোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

পূর্বে যে হরলাল মিত্রের স্ট্রীটে শ্রীঅরুণচন্দ্র হালদারের বাড়ীতে বাগবাজার “অবৈতনিক নাট্য সম্প্রদায়” সধবার একাদশীর আখড়া দিতেন, সেই স্ট্রীটের ৩৮ নম্বর বাড়ী গোবিন্দবাবুর স্বত্তরবাড়ী। ইহার উত্তরপূর্বকোণে বড় বৈঠকখানায় এবার দল বসিল। এই দলের প্রতিষ্ঠাতা নগেন্দ্রবাবু, অর্ধেন্দুবাবু, রাধামাধববাবু ও ধর্মদাসবাবু। এইবার যে দল বসিল, ইহাই স্থপরিচিত জ্ঞানাত্মক থিয়েটারের মূল।

এই দলের প্রতিষ্ঠাতা চারিজন ব্যতীত “সধবার একাদশীর” সময়কার হিজুল খাঁ, যোগেন্দ্রবাবু প্রভৃতি সকলেই যোগ দিলেন। কেবল গিরীশবাবু যোগ দিলেন না। উষা-অনিরুদ্ধ যাত্রা হইতে মতিলাল স্বর এবং সধবার একাদশীর অভিনয়ের সময় হইতে মহেন্দ্রলাল বসু ইহাদের সহিত মিশিয়াছিলেন, তাঁহারাও এই দলে রহিলেন। এতদ্ভিন্ন যতুনাথ ভট্টাচার্য্য, ত্রিক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীহরেশচন্দ্র মিত্র, কান্তিকচন্দ্র পাল প্রভৃতি কতকগুলি নতুন-লোক এই দলে যোগ দিলেন। ধর্মদাসবাবু বিশেষ উৎসাহে কার্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। ১২৭৭ সালের পৌষ মাসে (১৮৭১ সালের প্রথমে) এই দল বসে। অর্ধেন্দুবাবু শিক্ষাদাতা হইলেন। লীলাবতীর আখড়াই চলিতে লাগিল।

গোবিন্দবাবু যে সাহায্য করিতেন, তাহাতে আখড়া খরচ চলিত মাত্র। তাহাতে রঙ্গমঞ্চ বা পোষাক-পরিচ্ছদাদি হইবার আশা ছিল না, সুতরাং অর্ধেন্দুবাবু প্রস্তাব করিলেন, এ রকমে অর্থনষ্ট না করিয়া কোন টেকজাড়া করিয়া আনিয়া টিকিট বেচিয়া অভিনয় করা হউক। বিক্রয়ের অর্থে শেষে কোথাও একটা স্থায়ী মঞ্চ প্রস্তুত করা যাইবে। এই পরামর্শ গৃহীত হইল। অবশেষে

১২৭৮ সালের বৈশাখে (১৮৭১ এপ্রিলে) নগেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে একদিন পরীক্ষার্থে অভিনয় (Dress-rehearsal) হইল, এই অভিনয়ে ধর্মদাসবাবুই “ললিতের” অংশ অভিনয় করিয়াছিলেন। অভিনয়ের স্মৃতি রাখি হইলে গিরীশবাবু আসিয়া যোগ দিলেন। টিকিট বেচিয়া অভিনয় করার প্রস্তাবে তিনি কোন মতেই সম্মত হইলেন না। শেষে তিনি বলিলেন, মাইকেলের প্রস্তাব মত বরং পাঁচ হাজার টাকা তুলিবার চেষ্টা করব। “কিছু কিছু বুঝি” অভিনয়ের সময় মাইকেল অর্ধেন্দুবাবুকে বলিয়া-ছিলেন, এক্ষণে ব্যক্তিবিবেচনের অর্থাত্তুলোর উপর নির্ভর করিয়া কোন থিয়েটার চলিবে না।

বাহা হউক অতঃপর চাঁদার খাতা প্রস্তুত হইল। একখানি খাতায় রাধামাধববাবু, ধর্মদাসবাবু, নগেন্দ্রবাবু ও অর্ধেন্দুবাবু প্রত্যেকে ২০ করিয়া সহি করেন। তাহার পর মতিবাবু ও গোলাপবাবু এই খাতা লইয়া প্রথমেই নাট্যামোদী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়ী যান। সেখানে কোন ফল হয় না, বরং স্বেচ্ছাকৃত্তা অনিয়া অনিয়া তাঁহারা ফিরিয়া আসেন এবং আর কোনও বড় লোকের ঘরস্থ হইবেন না, এইরূপ স্থির করা হয়। পরে প্রতিবেশী গৃহস্থগণের নিকট হইতে দুই একটাকা করিয়া ৩০০ টাকা টাকা স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। ইহার ২৫০ টাকা মাত্র আদায় হয়। তাহা লইয়াই রঙ্গমঞ্চ প্রস্তুত আরম্ভ করা হয়। গোবিন্দ পোটো একখানি রঙ্গমঞ্চের দৃষ্ট আঁকিয়া দিলে টাকা ফুরাইল। রং ও কাপড় কেনা ছিল। পোটো বিক্রয় করিয়া ধর্মদাসবাবু নিজের তুলি ধরিলেন। এই সময় আবার গোবিন্দনাথবাবু দেশে যান। অর্থাত্তাবে আখড়াই প্রায় বন্ধ হইয়া আসিল। মতিবাবু, মহেন্দ্রবাবু, নগেন্দ্রবাবু ও অর্ধেন্দুবাবু মাকে মাঝে ১০ টাকা ২০ টাকা দিয়া দল বজায় রাখিলেন। অর্ধেন্দুবাবু এই সময় অর্থাত্তাবে



পরলোকে 'কিশোর জগৎ' পরিচালক

বিদ্যাসহস্র নন্দী,

আমি তোমাদের শৈশবভারত নামে আনছি 'কিশোর জগৎ' এর পরিচালক 'মোহন', আর আসব নতুন কবি অপূর্বরূপ ভট্টাচার্য, তিনি গ. ১৫৪ অবসর গ্রহণ করে পরলোকগমন করেছেন। গত ১৩ নং সংখ্যক তিনি এই 'কিশোর জগৎ' বিভাগট দক্ষাৎ করে পরিচালনা করে এসেছেন এ তো তোমরা জানই। 'ভাড়া বাঁকালী কিশোরদের মন ও মস্তিষ্ক যাতে পোষিতরূপে তৈরী হয়, তারা যাতে দেশাত্মবোধ সম্বন্ধে গড়ে উঠতে পারে, স্বাধীন দেশের স্বাধীনগণিক রূপে যাতে তারা পূর্বে পরিচয় দিতে পারে, জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে যাতে তারা এগিয়ে চলতে পারে, শানে ও গরিমায় যাতে তারা কপিত হয়ে উঠতে পারে, সংস্কৃতি ও সংসারসম্পদে যাতে তারা উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারে, আধুনিক কালের দোষগুলি যাতে তাদের স্পর্শ না করে, অগত্যা কালোপযোগী জ্ঞানিক তারা পায় এবং দীর্ঘজীবিত হয়ে গড়ে উঠতে পারে—এই মহৎ উদ্দেশ্য মনে রেখেই তিনি এই বিভাগটি পরিচালনা করে এসেছেন। আজ তিনি নেই, কিন্তু তাঁর আদর্শ প্রায় থাকবে এবং এই বিভাগটিও সেইভাবেই পরিচালিত হবে।

তোমরাও আশাকরি এই বিভাগটির আদর্শ অনুযায়ী নিজের পড়ে তুলতে চেষ্টা করবে—চেষ্টা করবে স্বাধীনতা, স্বাস্থ্য, স্বাধীনগণিক হয়ে উঠতে অবিরাম জীবনে। মনে রাখবে তোমাদের ওপরই নির্ভর করতে আমাদের দেশের

জীবন। উরাবো একটি কথা আরও—'Wild is the child of nature' আর 'শাবক' ছোট্ট খিচু কিছু পাবে নতুন হা 'কিশোর' হয়ে পড়া, অভিজ্ঞতাক, নেতা, শিক্ষক—কামবর্জিতালিয়ে নিয়ে যাবে জাতিকে, সমাজকে, দেশকে। তাই তোমাদেরই আগে গড়ে উঠতে হবে এই দক্ষাৎ হয়ে যোগা দাও। কবি অপূর্বরূপ এই 'কিশোর জগৎ' এর মধ্য দিয়ে কতদিন সেট শিক্ষার, সেট জানই তোমাদের দিয়ে এসেছেন। আশাকরি তোমরা সেই শিক্ষা, সেই অভিজ্ঞতার গোলাপ গড়ে দাও।

গত 'আবার' সংখ্যায় 'কিশোর জগৎ' এ পণ্ডিত জগদীশ্বর নেতাকর উদ্দেশ্যে যে বর্ণনাগুলি তিনি লিখে গেছেন তারই কিছুটা অংশ এ দিলাম তাঁরই উদ্দেশ্যে।

"একটি উড়ে যায় বিহীন নদী নদীকে ফেলে রেখে, চলে যায় তার অর্গের দিকে। কোন রেখে যায় একটা পুরো প্রদয় অরণের নিষ্কলিত। সে কদম আঁচ নীরব... আজ সে কাগামুক্ত—সদা স্বাধীন হয়ে ছা। হয়ে করে গেল পূনার আদর্শ"। কবি অপূর্বরূপ আর আর নেই। কঠোর আঁচ নীরব। কিছু কাল পরপর যে সাধনা তিনি করে গেলেন তা বঙ্গ-ভাবতীর ভাবাবেগে মগ্নে রচিত হবে। তোমরাও তাঁর কবিগণী ও উপগামগুলি পড়ে দেখ—আনন্দ পাবে নিশ্চয়ই।

কবি অপূর্বরূপ ভট্টাচার্য সম্পর্কে এই সংখ্যায় 'সাম্বিকীভে' যা লেখা হয়েছে 'কিশোর জগৎ' পড়ে দেখ।

—শ্রীমান





আলেকজান্ডার ডামা

রচিত

দী কাউন্ট অফ মন্টি ক্রিস্টো

সৌম্য গুপ্ত

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

(৭)

ভয়পূর্ণ দীর্ঘ নয় বছর পরে ড্যান্সার্স, ফার্নান্দ অর
জেরাড—এদের তিনজনের শান্তি বিধানের অন্ত দাঁড়ের
চললো নিপুণ প্রজ্ঞা...তার বিশ্বাস—ওদের শান্তি দেবার
অনাই ভগবান তাকে প্রাণে বাঁচিয়ে এখানে এনেছেন...এত
বিশ্বাসী করেছেন!

এমনভাবে দিনের পর দিন তিলে-তিলে-নিজেকে
প্রস্তুত করে তুলে অবশেষে ১৮৩৮ সালে দাঁড়ে এলো
প্যারিসে বাস করতে—কাউন্ট অফ মন্টি ক্রিস্টো ছদ্মনামে।
ফার্নান্দ তখন, গণ্যমান্য অভিজাত-পুরুষ...কাউন্ট অফ
রসিক—ফরাসী দেশের রাজ্য-সভার (French parli-
ament) 'দেবার অফ পিয়ার্সের' (Chamber of Peers)
অন্যতম সদস্য...তার পত্নী মাসেভিজ...তাদের একটি
পুত্র হয়েছে...পুত্রের নাম—আলবার্ট। প্যারিসে আসবার
আগে দাঁড় এক বিপদের দিনে হাতে করেছিল আলবার্টের
জীবন-রক্ষা। তাই প্যারিসে পদার্পণ করেই সে এলো
আলবার্টের গৃহে...তার সঙ্গে দেখা করতে।

আলবার্ট কৃতার্থ হয়ে বললে,—মামার বাড়ীতে এসেই

আপনি বিপদে আমার প্রাণরক্ষা করেছেন...আবার আমি
মা শুনেছেন, আপনার মতো দরদী-উৎসাহী হিত্যাকাজী
সঙ্গে দেখা এবং আলাপ করবার জন্য তাঁরা ছাড়াই
আকুল।...আপনি বহন...আমি তাদের খবর দিই!

ছেলের-মুখে কাউন্টের মতো হিতৈষী-অভিধির আগমন
সংবাদ পেয়ে ফার্নান্দ এলো আলাপ-পরিচয় করতে। কিন্তু
দীর্ঘকাল পরে দেখা...কাউন্টে দাঁড়কে সে চিনতে পারলো
না...সাদরে অভ্যর্থনা করে তাকে বহু সম্ভাব জানালো।
উভয়েই যখন আলাপ-পরিচয় ব্যস্ত, এমন সময় সে ঘরে
এসে হাজির হলো ফার্নান্দের স্ত্রী মাসেভিজ। মাসেভিজ
দেখলো মন্টি ক্রিস্টোর কাউন্টকে...দেখবামাত্র মাসেভিজের
মাথা গেল ঘুরে...তার মুখ হলো বিবর্ণ। মাসেভিজের
হঠাৎ এমন মানসিক-চাকলা লক্ষ্য করে আলবার্ট শুধোলো
—শরীরে কোনো অসুখ বোধ করছেন, মা?

কোনোমতে আত্মসম্বরণ করে মাসেভিজ বললে,—
না...ইনিই তোমার প্রাণরক্ষা করেছিলেন?...এঁকে
দেখে আবেগে আমি কেমন চঞ্চল হয়েছিলুম!

মুহূর্তে কাউন্ট বললে,—মামাম, আপনি আমাকে
বড় বেশী কৃতার্থ করলেন! কোনো মানুষকে বিপদ থেকে
বাঁচানো...তার মা-বাপের যাতে চুখ-বাখার কারণ না
ঘটে—এমন কাজ করার মহত্ব নেই আদ্যে! এ কাজ
করার মানুষ মহত্বের পরিচয় দেয় মাত্র...সে তা না করে,
সে অমানুষ!

মাসেভিজ বললে—আপনি যদি দয়া করে আমাদের
এখানে অভিধি হয়ে ছ'চারদিন বাস করেন, তাহলে আমরা
বাস্তবিকই ধন্য হবো।

নিখাস ফেলে কাউন্ট জবাব দিলো,—আমাকে কমা
করবেন, মামাম, আমার দায়িত্ব তা সত্য হ'বে না।

—তাহলে আমার আসবেন, বলুন?...!

উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে কাউন্ট বললে, নিশ্চয়, আসিবে
মামাম?

পরের দিন কাউন্ট গিয়ে দেখা করলো তার প্যারিস-
সহরের ব্যাঙ্কার (Banker) ড্যান্সার্সের সঙ্গে...
আসেকার নামক ফ্রান্সিস, এমন অভিজাত ব্যাঙ্কার

কাউন্টকে দেখে খই ডাকলাশ বললে,—যেহে আপনাব
বা কারের কাছ থেকে ইতিমধ্যেই আমি পত্র পেয়েছি,
কাউন্ট সে পত্রে তিনি আমাকে জানিয়েছেন—এখানে
খামি আপনাকে যত টাকা যখন যেমন চাইবেন,
যেন দিই।

হেসে কাউন্ট বললে,—এই 'সামান্য' হবার কিছু
নই, বারন্ ডাকলাশ।

ডাকলাশ বললে,—তিনি লিখেছেন,—'৩৩ টা হা
১৪ বেন' 'তার কোন্ সীমা পরিসীমা নেই' তার
মান।

যুগ হেসে কাউন্ট বললে,—আপনি ভাবছেন, আপনাব
'দেব' মন্তব্য অর্থাৎ (Capital) চেয়েও আমি বেশী
ক নেবে।

কোনো কথার না দিয়ে ডাকলাশ অল্প কাউন্ট
এবং শোনে 'বাবো' তারপর বললে—আমার বাবো
'৩৩' অর্থাৎ ৩৩ টা একটা কথ ও ১৪ বেনে পারবেন।
অপনি যদি দশ লাখ চান 'এ' এখান

এখা দিয়ে কাউন্ট বললে—আমি দশ লাখ চান'গ আমি
ব করবো এত ঘন টাকা গচ্ছ। 'এ'খে আমি আপনাব
'৩৩' 'এ'কাউন্ট' (Account) পুনতে চাই না।
'এ' এক বছরেই আমার দরকাব হবে যত্নে পক্ষে যদি
'৩৩' টাকা।

কাউন্টের কথা শুনে হঠাৎ কপলে তুলে ডাকলাশ
বললে,—যাট লক্ষ। ..

নিশ্চয়! ..তা না হলে ভো কলোবে না কোনোমতেই।
পরের দিন।

কাউন্টের ব্যবস্থামতো তার এক ভৃত্য করলো জেরার্ডের
'পুত্রের প্রাপরক্ষা।' সেজন্ত জেরার্ড এলো কাউন্টের
'কো'—তাকে যত্নবান জানাতে।

কাউন্ট বললে,—ছেলেকে রক্ষা করে যে তার বাপের
পাছে পাঠাতে পেরেছি, তাতেই আমি খুশী।

জেরার্ডকে সাবরে খাতির করে বসালো কাউন্ট ..
পরপর এক কথা, ও কথা নানা কথার পর ভক্তনে হলো
খাদ্যভোজের বিচার সম্বন্ধে আলোচনা।

কাউন্ট বললে,—আমি সব দেশের বিচার-পদ্ধতির
'যে' লক্ষ্যে নিয়েছি। 'জায়-বিচার' বা জায়গার বিচারের

সঙ্গে আমি 'জায়-মাফিক' বিচার-পদ্ধতির ভূমনা করেছি
...জায়গার বা জায়-বিচার যথাযথভাবে নির্ধারিত হয়—
যে'ধবোধের রীতিতে। 'গোজারী' নামের বিচার হয়,
মাফিনা-করা হাকিম বিচারক দিয়ে আর জায়-বিচার
করে বিশিষ্ট-অধিকারে সাধারণ মানুষ। এসব মাফিনের
এত হলো—জায়-বিচার করা।

জেরার্ড বললে,—আপনাব কি এত বড়?

কাউন্ট বললে,—হাঁ। 'বিভাতার' বিধান যেন বিচার
করা আমার বড়... তার সত্তা, নিঃস্বত্রে আমি তৈরী করেছি
.. সে বিচার করবার সময় আমি আর মাত্র পাঁচ না।

প্যারিসেই ঘটনা-কে কাউন্টের সঙ্গে দেখা হলো তখন
যুগ মাকসিমিলিয়ান মোরেলের। দাঁধের কৃৎসল মনিব
মোরেলের পুত্র মাকসিমিলিয়ান - 'এ'সা কোজের বিশিষ্ট
একজন ক্যাপ্টেন (Captain)। 'কো'ক কাজ করলেও
মাকসিমিলিয়ানের যেমন সাহস, তেমন মন তার খুঁট
উদার সকলেই হ্যাঁতি করে, 'এ'—'গো'র এমন উচ্চ-
মনের মানুষ আর নেই। তার সঙ্গে খাপ করে কাউন্ট-
বেলো দাঁধে বুললো—পুত্রের যোগ্য পুত্র মাকসিমিলিয়ান।
তাকে ভারী ভাগ্য লাগলো কাউন্ট 'এ'সা দাঁধের। কিন্তু
তখন মাকসিমিলিয়ান 'এ' জেরার্ডের 'এ'দ-পক্ষের স্ত্রী
তখনী ভালেটিনকে প্রানের চেয়ে ভালোবাসে, সে কথা
কাউন্ট জানতো না। ভালেটিনের মন মাঝে মাঝে পর,
জেরার্ড দ্বিতীয় পক্ষে আবার বিবাহ করেছে তত্ক্ষণাত্।
প্যালেটিনকে মাকসিমিলিয়ান বল—আমাকে যদি বিবাহ
করো, তোমাকে যা বলো, 'এ'খে 'এ' করবো আমি'।

ভালেটিন বললে,—কিও বাবা 'এ'বিবাহে ম' দেবে না।

ভালেটিন আরো বললে,—বাব আমার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ
নিষিদ্ধ 'বিবাহ' আমাকে 'চ'চকে দেখলে পারেন না
বিবাহ'প ছেলে আছে—এডোয়ার্ড তার 'এ'বে বিবাহ
আমাকে দেখেন যেন 'এ'। 'এ'বিবাহের দেখার কারণ—
—আমার স্বামীর মরণ সম্পত্তি সে সম্পত্তি আমি
পাবো, তাঁদের মৃত্যুর পর বিবাহ'চান ও সম্পত্তি থাক
তার ছেলে—এডোয়ার্ড।

কাউন্ট একদিন জ্ঞানলো এসব 'পুত্র' 'পোন'বাবার পর,
কাউন্ট 'এ'সে দেখা করলো জেরার্ডের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী
সঙ্গে।

মাদাম্ জেরাড হেলেকে বললে,—যাও তো এডওয়ার্ড, তোমার বোন ভ্যালেন্টিন্ কোথায় কি করছে, দেখে এসো!...

এডওয়ার্ডকে বিদায় দিয়ে মাদাম্ জেরাড নানা কথা কইতে লাগলো কাউন্টের সঙ্গে।

কথায় কথায় মাদাম্ জেরাড কাউন্টকে জানালো যে নানারকম বিষের সম্বন্ধে তার খুব ঝোঁক...বিষ আর বিষের প্রতিষেধ কি, এ বিষয়ের অস্থূললনে তার বড় আনন্দ! মাদাম্ বললে,—‘আর্সেনিক’ (Arsenic) বা ‘শকো-বিষ’ আমি জানি, অর্থাৎ! কিন্তু ‘আর্সেনিকে’ ঝিক্কোয়ো মৃত্যু হয়, তা’র দেহ পরীক্ষা করলে, সে বিষের চিহ্ন প্রমাণ পাওয়া যায়!

কাউন্ট বললে,—কিন্তু মাদাম্, এমন বিষও আছে, যা খাওয়ালে মানুষ মরবেই, অথচ লক্ষ্যাদি দেখে তা কেউ ধরতে পারবে না...বলবে—সন্ধ্যাস-রোগে মৃত্যু হয়েছে... বড়-বড় ডাক্তারেরও সাধ্য নেই যে বিষের ফল বলে বুঝবে!

কাউন্টের কথা শুনে একটু চিন্তা করে মাদাম্ জেরাড বললে,—কিন্তু অপরাধ তো...অপরাধ সব সময়েই অপরাধ...পাপ! ধরা না পড়লেও, বিবেক...বিবেকের কাছে কি কৈফিয়ত দেবেন?

কাউন্ট বললে,—কিন্তু বিবেককে বোঝাবার জ্ঞান হাজার হাজার কাবল থাকতে পারে, মাদাম!

—কি রকম?

কাউন্ট বললে,—ধরুন, মায়ের রেহ...সন্তানের মঙ্গলের জ্ঞান, যদি প্রয়োজন হয়, বিনা খাইয়ে তার লক্ষ্যে হটানো...তার বাধা-বিলম্ব দূর করা!

একটু চিন্তা করে মাদাম্ জেরাড বললে,—না, মানে, এ সব কথা বলা...মানে, বললুম তো...এমায়নে আমার খুবই ঝোঁক!

—বটে! কাউন্ট বললে,—আপনি তাহলে পরখ করে দেখুন...আমি কতকগুলো নমুনা আপনাকে পাঠানো কাল সকালে!

সেদিনকার মতো কাউন্ট বিদায় নেবার পর, মাদাম্ জেরাড ভাবলো,—খানোই হলো...আমার আশা-তরু এবার তাহলে ফুটিত হবে!

কাউন্টের এবার লক্ষ্য হলো—ডাক্তার ল্যাং প্যারিসের

একজন টেলিগ্রাফ-প্রেরককে মোটা টাকা খুঁড়িয়ে তার মাঝে টেলিগ্রামে একটা মিথ্যা খবর পাঠাবার ব্যবস্থা করলো কাউন্ট...সে খবর প্যারিসের কাগজে-কাগজে প্রচারিত হলো। খবরটি হলো—

স্পেনে দারুণ বিপ্লবের আশঙ্কা—প্রচণ্ড বিপ্লব বাধবে!

এ খবর পড়ে ডাক্তার ল্যাং ভাবলো—তাহলে দেবী নয়...আমার ‘স্প্যানিশ-বণ্ডগুলো’ (Spanish Bonds) এখনি বেচে দেবো।

এই ভেবে সে আর এতটুকু বিলম্ব না করে তার জম’নো সব ‘স্প্যানিশ-বণ্ডগুলো’ জলের দরে বাজারে বেচে দিলে।

পরের দিন কিন্তু খবরের কাগজে খবর ছেপে বেরুলো—

স্পেনের সম্বন্ধে যে খবর কাল কাগজে প্রকাশিত হয়েছে, সে খবর সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তুল টেলিগ্রাফি ছাপা হয়েছিল।

সামাগ্র এই একটি অসত্য-খবরের ফলে, ডাক্তার ল্যাং রাতারাতি লোকসান হলো—নগদ দশ লক্ষ টাকা!



বিষলতা

জয়হরি রায়

বিষলতা। বলে একপ্রকার লতা বিপ্লবের বনে জঙ্গলে দেখা যায়। কৃষি, শিল্প প্রভৃতি আদিবাসীরা সেই বনের দল শস্য, খাল-বিল, ছড়া (বা খুদ) নদীতে দখল করে নিয়ে নেমে আসে। আগেবার দিনে পান্যতা গোলাবের বিষলতার দল আখিযে মদ কবানতা। এত দিনে ছায়া মধ্যাহ্ন সময়ে পাহাড়ীদেব মনো একটা ঢলকরা গাছের কাছে।

এই দেশের মসাপি (বা বাঁসা, কুঁকি-কাষায়) স্বদেশের এক গণবানী কথা ছিল। এক বৃষ্টিসনারেব মাঝে গোপনভাবে তার বিষে ছোঁল, কিন্তু বাসরগরেই বরষা মরে। কী ভাবে যে জানে? ছয়ভাই ছিল তার। বড় ভাইয়ের মৃত্যুর পর তার বউকে সম্বল হ'লে দেবর বৈবে কবান পাঁবে। এমনি বরে মোদ মাংসহলের মধ্যে ছয় ভাই-ছয় বউ মেয়েকে নিয়ে কবে বাসর গরম মৃত্যুরণ করণো। কানদ শাই বাক্তে পরণে না কন ওবা মরে গেল। সে ভাবলে, আমার ছয় দাদাভাইরে গেলেন, আমি একা লেটে পেকে বা করণো? সে শুখগাছ ভাইদের মতো মেয়েটিকে বিয়ে করলে, কিন্তু মেয়েটি যে পালকে হয়ে ছিল, সেখান থেকে দূরে মেয়েতে খাণ্ডন জেলে সারারাত জেগে রইলো।

রাজি গভীর। নিম্নম। রাজকন্তা যুমে অচেতন। হঠাৎ ছোট ভাইয়ের তল্লা ছুটে গেল। কী ভাবনক? রাজকন্তার নাক থেকে একটা সাপ বেরিয়ে চতুর্দিক ঘুরে দেখলে, কাইকে না পেয়ে আবার সরাং কবে নাকের ভিতর ঢুকে গেল। সবনাশ! ভয়ে ঘরের বাইরে সারারাত কাটালো বর। ঠিক করলে, এ মেয়েকে ঘরে ফেরাতে হবে।

পরের দিন বেড়ানোর কথা বলে গভীর জঙ্গলে নিয়ে সে রাজকন্তাকে মেয়ে একটা গর্তে পড়ে ফেললো। ফিরে

এসে কঁকেকটে বললে, বনের ভিতর হঠাৎ আমার হারিয়ে গেছে।

রাজা দলবল নিয়ে নিজে গুজতে বকলেন। পেটে না। মনে খবর দুখ হোল একমার মেয়েকে হারিয়ে

একদিন রাতে রাজা স্বপ্ন দেখলেন, মেয়ে বললো বাগা, আমার সঙ্গে দুখে কোর না।

সং আমি কল্যাকণে হুহুয়া স্বপ্নভাব।

এ ম ছলম ছয়জন ল'ল বাঁসার।

'তা' মবার ছোটভাই আমাকে মারিয়া।

নদ'বলে বতমলে য'গেছে পুঁ'খিয়া।

না'ভ ভেদ' একলতা উঠিছে আমার।

সপের গরম মা'ছে বসতার কয়েগ।

রাজা সৈন্য সামন্ত নিয়ে বুঁজে গয়ে দেখলেন সত্যিই। এ হোল বিষলতার উৎপত্তি। ("রাজমালা অবলম্বনে")



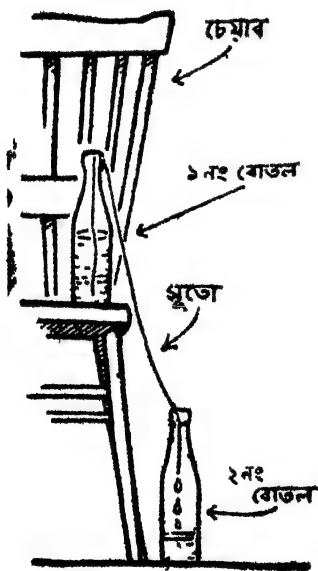
চিত্রগুপ্ত

এবারে শোনা—বিজ্ঞানের অংকট বিচিত্র-মজা খেলার কথা বলি। ঠিকমতে কাবদা করে দেখাবে পারলে এ খেলার আজব কারসাজ। পরিচয় পেতে তোমাদের আশ্রয় বন্ধ, সঙ্গ সাধারণ। যে রীতিমত অবাধ হয়ে যাবেন—সে বিষয় জানো সন্দেহ নেই

যরো, হঠাৎ কেউ যদি গোমাদের বলেন যে কোঁলে যাও-মুগু কিলা ছাত্তর কারচুপির সভায়তা না নিয়ে, অথবা এতটুকু চালাচালি না করে—কেবলমাত্র সামান্ত এককাঁক সঙ্গ শ্রমের সাহায্যে মন ওরা একটি বোতল থেকে আরেকটি গুজ-বোতলে সেই জলটক জড়ি করার পাত্র

‘তাহলে কি জবাব দেবে টাকে?’ কথামা শুনে তেমনরা তরতো খুবই জবাব হবে বলবে,—এমন কাজ আবার সম্ভবপর নাকি।

পাশ্চাত্যিকই, সাধারণজ্ঞান বিচার করে দেখলে, এমন কাণ্ড ঘটানো সম্ভবপর নয়। তবে বিজ্ঞানের ইচ্ছাময়-কৌশলটি যদের জানা আছে, তাহলে পক্ষে অবস্থা এ-ধরণের আজব কাণ্ড ঘটায় শোনা নিতাস্থই সম্ভবসাধ্য কাজ। কি উপায়ে এ কাজব কাণ্ড সম্ভবপর করে তোলা যায়—শোনো তাহলে। আপাততঃ তারই আশয় কলা কৌশলের পরিচয় দিই। কিন্তু কলা কৌশলের কথা শুধু বলবার আগে বিজ্ঞানের এই মজার খেলাটি দেখানোর জন্য যে সব সাধারণতঃ প্রয়োজন, সেগুলির ঘোঁটামুটি ফল দিয়ে রাখি। যথাঃ এ খেলার স্রষ্টা চাই—ছুটি বড় সাইজের বোতল, একদার জল একখানা চেয়ার অথবা টুল এবং ২১০০ ফুট লম্বা এককালি ‘টোয়াইন’ স্ট্রো (Twine-chord)।



সামগ্রিক এই মজার কাম করেকটি জোলাড় হবার পর কামোদের সঙ্গী সাথী, আত্মীয়-পরিজনদের সাক্ষনে খেলা খানোয় সময় প্রথমেই বোতল দুটিব মতো একটি হালু করে নাও এবং সেটিকে উপরের ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, হিক তেমনি ভকীভেই চেয়ার বা

টুলের আসনে বসিয়ে রাখো। এবারে শক্ত-বোতলটিকে বসিয়ে রাখো—চেয়ারের পদ-প্রান্তে মেঝের উপর—ছবিতে যেমন দেখছো, অবিকল তেমনিভাবে। এ কাজ সারা হলে, চেয়ারের আসনে ও মেঝেতে বসিয়ে-রাখা বোতল দুটির ভিতরে লম্বা ‘টোয়াইন’ স্ট্রোর দুই প্রান্ত খুলিয়ে দাও—উপরের ছবিতে যেমন দেখানো রয়েছে, অবশ্য তেমনি ভকীভে। এভাবে রাখার ফলে, কিছুক্ষণ বাদেই দেখবে—স্ট্রোব যে-প্রান্তটি চেয়ারের আসনে জল ভরা বোতলের ভিতরে ডুবে রয়েছে, সেটি থেকে অল্প অল্প জল চুইয়ে ছোট-ছোট ফোঁটার আকারে ক্রমশঃ মেঝের উপর বসিয়ে রাখা শক্ত বোতলটির মধ্যে বারে পড়ে, খালি বোতলটিকে বিনা-কলরতে দিবা-অনায়াসে জলপূর্ণ করে তুলে। এই হলো—এ খেলার আজব-কারসাজি।

কারসাজির কাহিনীর পরিচয় তো পেলে কিন্তু এমনটি কেন ঘটে, চানো। এর কারণ হলো—স্ট্রোর শোষণ আকর্ষণ ক্রিয়া। অর্থাৎ, সচবাচর রট্টা-কাগজ বা আদ-কাপড়ের চুকবো অথবা জনসিক্ত জলের পুঁটলি যেমনভাবে কালি কিষা জল ভবে নেয়, একেএক তাই ঘটে বলেই। বিজ্ঞানীদের মতে, এ ধরণের শোষণ-ক্রিয়ার নাম—‘ক্যাপিলারী অ্যাট্রাকশন’ (Capillary Attraction) বা ‘কৈশিক-আকর্ষণের’ ফলেই, চেয়ারের আসনে রাখা জল-ভরা বোতল থেকে লম্বা স্ট্রোর অঙ্গ চুইয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল ক্রমাগতই নীচে গড়িয়ে এসে মেঝেতে বাসিয়ে রাখা শক্ত বোতলটিকে জলে পরিপূর্ণ করে তোলে। এবারের মজার খেলাটির এই হলো আসল রহস্য।

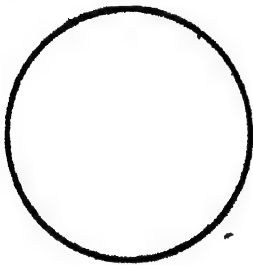
আগামী সংখ্যায় এমনি ধরণের আরেকটি আজব মজাদার বিজ্ঞানের খেলার পরিচয় দেবার বাসনা রইলো।





মনোহর মৈত্র

১। চক্রেণ হেঁজাটিন ৪



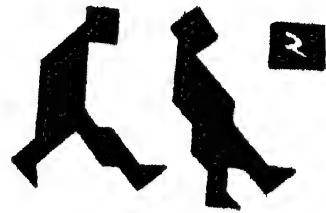
উপরের ছবিতে যে গোলাকাব চক্ৰটি দেখেছো—
মগজের বাক্সি খাটিয়ে সেটিকে মাত্র তিনটি বক-রেখার
(curved Line) ছাড়া কেটে এমন নিপুণ-কায়দায়
সার-প্রাণে বিভক্ত করো, যার ফলে—এ চক্রেণ ভিতরকাব
সারটি বিভক্ত-অংশ যেন প্রত্যেকটি সমান-মাপের হয়.
অর্থাৎ, এদের কোনোটি যেন আকারে অপরটির চেয়ে
কোনোমতেই ছোট বা বড় না হয়ে যায়। এ কাজটুকু
যদি হুটুভাবে করতে পারো তো, গোমায়ী আঁকা সেট
ছবিটি আমাদের দপ্তরে পাঠিয়ে দিও।

২। 'কিশোর-জগতের' সত্য-সত্যাদের জড়িত আঁশা :

চার অঙ্কের নাম আমার...খেতে হুয়াত বিশেষ এক-
রপের মরুতমী ফল। প্রথম ও শেষ-করের সাহায্যে মাহ
এরা যার এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্কের জোড়া দিলে
বালুকায় বিজীর্ণাকল বোঝায়। প্রথম অঙ্কর দুটিতে এক-
রকম কলের নাম বোঝায় আর শেষের দুটি অঙ্কর দিয়ে
কাগজের কুক লবা লাইন আঁকা যায়। বলা তো আমি
কি ফল?

১। কিশোর-জগতের (কলিকাতা)

- ৩। প্রথম বর্ণের মাঝে প্রাণীদের নাম;
দ্বিতীয় অঙ্কের পাশে পানি-পাত্র নাম;
তৃতীয়ের অর্থ হয়—ইংরাজী 'অ ইন',
দ্বিতীয় তৃতীয় মিলে বসে চলাকাব 'লাইন'।
শুন বর্ণ একাকারে গুড়ে খেট কথা—
প্রথমেই তবের তার সৃষ্টি জনো 'তথা'।
৪। চনা দ্বিতীয়কমাব দশ (পানি-ভেঁজা)
পতমাসের 'না' আঁকা আর হেঁজাটিন



আমাদের খামখেয়ালী চিত্রকর মশাইয়ের আঁক
আজব-চবির সাতটি টুকরোয় টিকমতো কারুকা
সাজিয়ে বসালে, উপরেব ছবিতো যেমন দেখছে
তেমনি পরণের পথ চলণি মাচকের চম-বচনা করে
পারবে গোমরা খনাদামেট।

১। ভাবতবণ

৩। মাহল

পতমাসের তিনটি আঁশার সঠিক

উত্তর দিকেরে

১। ৩ ও ১৫ (আলাপুত্র), ১৭ মির (কলিকাতা)
২। ৩ ও ১৫ যুথোপাধায় (কাইরো), ১৬ ও
১৭ মির (কোরবা), ১৮ ও ১৯ মির (কোরবা) ও ২০
(ভিলাই), ২১ ও ২২ যুথোপাধায় (কলিকাতা)।

পতমাসের দুটি আঁশার সঠিক

উত্তর দিকেরে

১। ৩ ও ১৫ (কলিকাতা), ১৬ ও ১৭
২। ৩ ও ১৫ (কলিকাতা), ১৮ ও ১৯ (কাইরো),
(কাইরো)।

পতমাসের একটি আঁশার সঠিক

উত্তর দিকেরে

১। ৩ ও ১৫ মির (কাইরো)

‘খেলা-পুতুল’ ইতিকথা

পৃথিবী দেবশক্তি রচিত ও চিত্রিত



বিচিত্র ছাঁদের এই যে নকশাদার পুতুলটি
দেখাছো — এমনি ধরনের পুতুল
নিষে খেলা করতে প্রাচীন
আমলের মিশর-দেশের ছোট
ছেলেমেয়েরা। মানুষের মতো
চেহারার এসব পুতুল
ছিল তাদের খুবই
প্রিয় খেলনা।

আর
কাঠের মুণ্ডের
মতো চেহারার
এই আজব বস্তুটি
নিষে আনন্দ খেলা
করতো খৃষ্টীয় ষোড়শ
শতাব্দীর ইংরাজ
ছেলেমেয়েরা।
এটি ছিল
তাদের
খেলার
পুতুল।



কাদা-মাটির
তৈরী কিছুত-
চেহারার এই
গুড়িয়া-পুতুল
চিরকাল
ভারতীয়
শিশুদের
খুবই
আদরের
খেলনা



মাথায় পাঁচি-বাঁধা আর
অঙ্গে লোম্বাক আঁটা এই যে
আজব-ছাঁদের মানুষ-
পুতুলটি দেখাছো, এগুলির
প্রচলন ছিল পুরাকালের
সুমত্য-বৃদ্ধ গ্রীষ্ম দেশে।
এমনি পুতুল নিষে খেলায়
মোভ মে-খুণের মৌখিক-
সম্বাদের ছেলেমেয়ের দল।



রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ঔপন্যাসিক ও কবি টমাস হার্ডি (Thomas Hardy : 1840-1928) নাম আজ বিশ্বের সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত । হার্ডিকে যুগোত্তীর্ণ ঔপন্যাসিক বলতে কোন বিধার অবকাশ নেই । কেন না ভিক্টোরীয় যুগকে অতিক্রম করে তাঁর সাহিত্য সমরোচিত বলে বিবেচিত হয়েছে । আধুনিক সাহিত্যের ধারায় তাঁর একটি স্বতন্ত্র স্থান রয়েছে । উনবিংশ শতাব্দীর প্রাক-বিভীয়ার্থে তাঁর জন্ম হলেও এই বিংশশতাব্দীর বিভীয়া দশক পর্যন্ত, জীবিত থেকে জীবনের শেষ দিন অবধি তাঁর সাহিত্য সাধনা অব্যাহত ছিল ।

কাব্য অথবা উপন্যাস—সাহিত্যের এই বিমুখী ধারায় কোনটিতে হার্ডির শ্রেষ্ঠত্ব তা নিয়ে দীর্ঘকাল বিতর্ক চলেছে । আজ সকলেই একথা একবাক্যে স্বীকার করেন কাব্য অপেক্ষা উপন্যাস রচনাতেই তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব । হার্ডি একালের একজন শ্রেষ্ঠ উপন্যাসকার, কিন্তু তার অর্ধ এই নয় যে তাঁর কবিতা সংখ্যার খুব কম । তিনি বহু কবিতা লিখেছেন এবং সেগুলি সমগ্র কাব্য-পাঠকের মন জয় করতে সক্ষম ।

ভিক্টোরীয় যুগের মানস-জগতে সাহিত্যের বিভিন্ন গুণন শোনা গেলেও একথা জোরগলার বলা যায় উপন্যাসেই এ যুগের সার্থক ক্ষুতি । টমাস হার্ডি ভিক্টোরীয় যুগের সাহিত্যপ্রতিষ্ঠার অগ্রদূত বলেই তাঁর উপন্যাস রচনার আবেশন এত গভীর । হার্ডি তাঁর পূর্বজ এবং সমকালীন প্রখ্যাত রূপ ও করাসী ঔপন্যাসিক-দের রচনা পড়েছিলেন । হার্ডির উপন্যাস তিনটি ঘটনার বাঁধা পড়েনি কোথাও—তাঁর প্রায় সবগুলি উপন্যাসের কাহিনীই সরল দেখাইগ, বিশেষ কোন 'ism' প্রচারের উদ্দেশ্যে তাঁর ছিল না । মানব-মনের উচ্চাভিলাষ, ইধা, মোহ, ঘোহ, প্রেম ইত্যাদিকে উপন্যাসের উপজীব্য

করবার জন্য তিনি প্রয়াণী হয়েছিলেন । হার্ডির উপন্যাসের পাত্রপাত্রীর সংখ্যাও অল্প । কলে কাহিনী কোথাও তারাজাত হয়নি ।

টমাস হার্ডি সাহিত্যের আলরে উপস্থিত থেকে একটু স্বতন্ত্র স্বভাবত প্রকাশ করেছেন । তৎকালীন বহুবার ও প্রচলিত খুটান ধর্মবোধের মধ্যে তিনি আপনাকে আবদ্ধ রাখেন নি । তাঁর The return of the native, Tess of D' Urbervilles এবং Jude the obscure খুবই প্রসিদ্ধ । রক্ষণশীল সমাজের প্রচলিত ধ্যান-ধারণায় মূলে কুঠারঘাত করলেন হার্ডি । Tess D. Urbervilles উপন্যাসে তিনি তাঁর নারিকার সংজ্ঞা দিবেছিলেন — 'A pure woman !' বিশেষ ক'রে ভিক্টোরীয় যুগে এই জাতীয় উক্তি ঔদ্ধত্য বলেই গণ্য হতো । হার্ডির সঙ্গে এ ব্যাপারে প্রাচীন গ্রীক ও সংস্কৃত-এলিফাবেরীর নাট্যকারদের মনের মিল হয়েছিলো বলে তিনি তাঁদের প্রশংসা জানিয়েছিলেন ।

হার্ডির উপন্যাসগুলির পটভূমিকার রয়েছে গ্রামের সরল পরিবেশ, বড়জোর তা এগিরে এসেছে মহরতলীতে । সেখানেও প্রাণ দিয়ে অস্তিত্ব করলে পাণ্ডুরা বাবে সবুজের গন্ধ । হার্ডি তাঁর উপন্যাসের পটভূমি হিসেবে বেছে নিয়েছেন ইংল্যান্ডের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, নাম যার 'ওয়েসেক্স' (Wessex) । তাঁর 'ওয়েসেক্স' অঞ্চলের 'স্বর্ধহার্য অরণ্য' জীবনের নৈসর্গিক প্রকৃতির অভিজ্ঞতা, বিচিত্র । হার্ডি এই অঞ্চলে প্রায় কৃতিবহু বসবাস করেছিলেন, পরিচয় পেয়েছিলেন অঞ্চলটির একমিকে গ্রীণউড গাছের ভ্রামররূপ অন্যাকি এগভরমিলের, দুর্ভেদ্য নিষ্ঠুর আগ্রত অন্ধ-শক্তি ! 'ওয়েসেক্স' অঞ্চলের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অপূর্বভাবে রূপায়িত হয়েছে Tess D. Urberilles উপন্যাসে ।

টেস্ জগে'ছ গ্রায়ে। তারপর বাধ্য হয়েছে সে শহরে ধনী আত্মীয় অ্যালেকের বাড়ীতে আসতে—আর নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অ্যালেকের সন্ধানকে গভে' ধরতে হয়েছে তাকে। সম্ভানটি বাঁচেনি, হয়ত বা এই বিশ্বের আলোর সে তার মুখ দেখাতে চায়নি। টেস তারপর একটি কাজ নিয়েছিলো—সেখানে সে ভালোবাসলো শিক্ষিত বাজক-পরিবারের সন্ধান এনজেলকে। টেস্ এত দিনে বুঝলো সে নারী, সে কামনারাজ্যের রানী। বিয়ের আগে অনেক চেষ্টা করেও পূর্বের কথা বলতে পারেনি টেস্, বধূরাজ্যের পর টেস্ জানালো তার বোদনভরা কাহিনী। তার কথা শোনার পর কমা করতে পারেনি এনজেল। টেসের বুকের সামান্য মাত্র হৃৎকের অস্বাভাবিক সে অতীব করতে পারেনি। টেস্ কত অল্পবয়স্ক বিনয় করেছে কমা চেয়েছে—পারে লুটিয়ে পড়ে মার্জনা ভিক্ষা করেছে। কিন্তু গ্রামের কৃষক কত টেসের সেই বুকফাটা ক্রন্দন এনজেলকে তার প্রেমীগত, সমাজগত সংস্কারের পথ থেকে সরতে পারেনি। এনজেল তাই বলেছে—

'Do't Tess, don't argue. Different societies, different manners. You almost make me say you are an unapprehending peasant woman, who have never been initiated into the proportions of social things.'

টেসকে ভাগ্য করলো এনজেল। অথচ এয়ার কিন্তু টেস্ কানলো না, করণা ভিক্ষা করলো না। টেস কিরে গেল জেহুনিবিড় গ্রামটিতে, আর এনজেল কিরে গেল তার বাবা-মা'র কাছে'র থেকে দূরে ত্রেজিলে।

এর পরের কাহিনী বিচিত্র। পবিত্র ধর্মে নীকিত অ্যালেকের সঙ্গে আবার বধন দেখা হলো টেসের তখন জাহের দারিজোর সীমা নেই। অ্যালেকের 'বিলটেন' হলো টেস—এদিকে অত্যাশে দহ হরে কিরে এলো এনজেল। টেস কিন্তু কঠোর হলো—কিহিরে বিল তাকে। এনজেল চলে যেতে টেসের বুকটা হাটাকা'র করে উঠলো—অ্যালেককে ছুঁ দিবে খুন করে এনজেলের পাশে এলো টেস, আবার করেকটি দিন অপজ্ঞ রাধুরীতে কাটলো অজান্তেবালে। শেষে বস পড়লো টেস, তার কানী হলো। হাভির বিজোহ উপভাসের স্বেচ্ছা'য়ে হুটে উঠেছে। হাভির

উপভাসের অজান্তে চরিত্রের মত টেসও বাঁধার নিয়মিত বিধানে হৃৎকে সজ্জিত হয়েছে, কোন এক অজান্তে হাভির খেলার সে হরে পড়েছে অসহায়। সেই নিয়মিত ভাবে অব্যাহত হৃৎকের পথে, চরম Tragedy-র পথে চালাক করেছে। কিন্তু তা সবেও হাভি তাকে দিয়েছেন চরম শক্তি ইবলেনের নোদার মত তার টেসও মুখ বুজে থাকে নি। সে বিজোহ করেছে।

টমাস হাভির Jude the obscure (1895) একটি যুগান্তকারী গ্রন্থ। হাভির আধুনিক মননের কলঙ্ক আলোচ্য উপভাসটি। এই উপভাসের উপর সমাজনৈতিক সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রভাব গভীরভাবে পড়েছে। উপভাসের মুখ্যচরিত্র জুডের জীবনে ছুটি নারী এলো, আরাবেজা আর হ্যা। আরাবেজার মধ্যাহ্ন পরতাপ আর হ্যা'র গোপলি ছটা—এ দুয়ের মধ্যে জুড ছুটি ভাব আবিষ্কার করলো। আরাবেজার মাতৃস্বের ছলনার জুড বুঝলো শিক্ষার ফলে কচিহীনতা কী পর্দায় পৌঁছতে পারে অতদিকে গ্রামের মেয়ে হ্যা'কেও সে চিনতে পারলো অনেক পরে—বধন জানলো হ্যা'ও নারী, তারও মনে ঈর্ষার আগুন জলছে—তখন হ্যা ছাড়া তার আর কোন নারী রইলো না। এরপর আবার হ্যা এলো—জুড বিয়ে করলো তাকে। ক'দিন মাত্র বিবাহ-জীবন কেটেছে এমন সময় রাহর মত তাদের মধ্যে উপস্থিত হলো জুড এবং আরাবেজার সন্ধান ফাদার টাইল। এরপর সমাজপতিরা খেঁপে উঠলো হ্যা ও জুডের চার্চ বিহিত বিবাহ না হওয়ার। চাকরী রইলো না জুডের। তারপর একদিন হ্যা'জনে বাড়ী কিরে দেখে ফাদার টাইল হ্যা-এর ছেলে ছুটিকে খুন করেছে আর নিজে করেছে আত্মহত্যা। এরপর আর একটি যুতসন্ধান প্রসব করলো 'হ্যা', তাবলো নিচরই 'পাপ' হয়েছে তার, যে কিরে বেশ পূর্বের দারী ফিলটসনের কাছে। এদিকে হ্যা-এর সঙ্গে জুড-বধন বরণার ছট্‌কট্‌ করছে তখন বিবাহ আরাবেজা কিরে এলো, জুডিক মত খাইরে চার্চে নিয়ে গিয়ে কিরে

প্রকৃতি'র হরে জুড আবার কিরে গেল হ্যা'র কাছে, —'I was gin drunk, you were crud-drug. Either form of intoxication takes away the nobler vision,' হ্যা' পুরানার কিরে করলো জুডকে

উপেক্ষা করতে পারলো না। এবার ভূত অহুৎ পড়লো।
আরাবোতা তখন ভূতকে হারিয়ে বাতেন না। তাকারকে হাওয়ার
তার চেঁচান বাত। ভূতাক্ত ভূতের গলায় অল দেবার
তখন কে আছে ?

জনৈক সমালোচক * বলেছেন—‘ভূত দি অবস্কিওর’
পড়তে পড়তে গোটের ফাউসট’-এর কথা মনে পড়ে। ..
ফাউসটের একদিকে মর্ডোর বন্ধন ফেলে উর্দালোকে দ্বিবা-
হুধা পানের কামনা, অপরদিকে নরকের অন্ধকায়ে দেহ-
স্থার আধির লালনা। গোটে মৃত্যুর পূর্বে বলে
উঠেছিলেন ‘আলো, আরও আলো।’ তাঁর ফাউসটও

* উপজ্ঞানের কথা : দেবীদাস ভট্টাচার্য, পৃ: ১৩৫-৩৬।

আলোক-ভীষণের অগ্নির বাহী। ভেদনি হাড়ির
চরিত্রের একদিকে দেখি হ্যা অপরদিকে আরাবোর
উর্দোর spirit ও নিম্নের flesh এর দ্বন্দ্ব। একদিকে
বর্গের স্থবরা, অপরদিকে নরকের ভয়না। একদিকে
প্রেমের স্থা, অন্ধদিকে দেহের স্থা।

ভিক্টোরীয় যুগের উপজ্ঞান রচনার ক্ষেত্রে হাড়ির এবে
শ্রেষ্ঠত্বের কারণ চিন্তাধারার স্বকীরতা এবং গভীর মন
শক্তি। বস্তুত: ভিক্টোরীয় যুগের সাহিত্যের একেবারে
লক্ষণ এবং বৈশিষ্ট্য তাঁর উপজ্ঞানে প্রতিভাত। হাড়ি
উপজ্ঞানে মাটির গন্ধ, উপজ্ঞানগুলি যেন মৃত্তিকার উন্মি
আর সব মিলিয়ে হাড়ি তাই ইংরাজী সাহিত্যের অজস্র
শ্রেষ্ঠ উপজ্ঞানিক।

শ্রেয়সী

শ্রীকীর্ত্তনকুমার মুখোপাধ্যায়

হৃদয় জড়িতা ব'য়েছে শ্রেয়সী তোমার ছবিটি আঁকা
তোমার বিহনে হ'য়ে গেল মোর জীবনের সব কাঁকা,
দিবসে নিশিতে শয়নে স্বপনে তোমারেই ভাবি মনে
তোমার প্রণয়ে পাগল হইয়া ঘুরি আমি বনে বনে,
কৈশোর হ'তে বুজিতেছি তোমা যৌবন চ'লে যায়
ওগো অকরণা! তবুও তোমার দেখা না পাইছ হার,
দেবালয়ে কত ক'রেছি মানত তোমারে পাবার লাগি
কত নিশি বোর হ'য়ে গেছে তোমার

তোমার ঘেঁষানে আগি।

কত কান্ডন এসে গেছে কিসে, কত চৈতন্য-লক্ষ্য
ভূমি নাই ব'লে কিঁছু নাই বোর হ'য়ে আছি বেন বধ্যা,
তাই ভাবি তোমা ছিনাকৈ আনিব রক্ষিত পুরী হ'তে
তব্বর লেখ্যে ছুপি ছুপি গিয়ে গভীর আঁবার রাতে।
তোমারে লইয়া গরিত বুক বসিত পদ-ভরে
বন-জরী বীর লর উন্মালে কিরিতা আসিবে ধরে।

লুপ্তিত ধন লুপ্তিত-মনে শক্তি হ'য়ে উঠি
মনে পড়ে যায় জেলখানা আর দারোগার দালালিটি।
নিজ জীবনের ভগ্ন-অংশ মনে মনে ক'বে দেখি
ছটি ভাগ ভাগ হ'য়ে গেছে শেব আর একভাগ বাঁকী,
এর লাগি আর পাগ করিবারে ভীক মন নাহি চায়
তোমারে পাবার সোজাপথে হ'ল বিবেক অন্তরায়।
তবুও কপালাতে বসিত হ'য়ে—হ'য়ে গেল তবুও
হ'য়ে গেল মোর মহাজীবনের সবখানি অপচয়।

এখনও তোমারে পেলে

শীর্ণ শরীরে যৌবন মোর ত'রে ওঠে কুলে কুলে,

এখনও তোমারে পেলে

সার্বক হয়, বসিত বাতেন হয়ে আছি পলে পলে,

এখনও তোমারে পেলে

লজিতে পারি ভূগম গিরি কাঁটার অবহেবে।

তাই বলি ভূমি লক্ষ হইয়া একবার দাও দেখা,

হৃদয়ীকর শ্রেয়সী আমার ওগো অকরণা “টাকা”

পুরীতে সংস্কৃত নাট্যাভিনয়

পণ্ডিত শ্রী অনাধরন কাব্যব্যাকরণতীর্থ

অনিবার্য! ভারতবর্ষীয়দের যুগযুগান্তব্যাপী আনন্দ-
সংহাসন। এই মহাপবিত্র উৎসব উপলক্ষে পুরীতে
আমন্ত্রণ পাইয়া আমরা সকলেই বিশেষ উৎসুক হইলাম।
আমন্ত্রণ জানাইলেন পুরীর দুইটা সুবিখ্যাত সংস্থা—দুর্গা-
বাড়ী-ক্লাব উদ্ভিষ্টাসরকারের সর্ব-উদ্ভিষ্টা সংস্কৃত সমিতি
(Orissa Govt. Association of Learning and
Culture for Sanskrit) শেখোক্ত সংস্থার বার্ষিক
সম্মেলন উৎসবে বিদ্বদীগ্রবরা অধ্যক্ষ ডক্টর রমা চৌধুরী
সম্মেলন ভাষণ প্রদান করিবার জন্য আমন্ত্রিত হইরাছিলেন
এবং সেই সঙ্গে আমন্ত্রিত হইরাছিলেন ডক্টর বতীন্দ্রবিমল
চৌধুরীও।

এই সূচী অনুসারে বিগত ২০শে জুন ১৯৬৪, আমাদের
“প্রাচ্যবাসী” সংস্কৃত-পালি-নাট্যসঙ্ঘের ১০ জনের একটা
বল কলিকাতা হইতে রওনা হইয়া ২১শে জুন সকালে এই
পুণ্যভূমিতে আসিয়া পৌছিলাম। আমাদের থাকিবার
স্থান নির্দিষ্ট হইল “শিবনাথ-সংস্কৃত কলেজে”। অতি
সুন্দর এই কলেজভবন ও তৎসংলগ্ন উদ্যানটা।

আমাদের প্রথম দিনের অভিনয় হয় ২০শে জুন,
১৯৬৪ সাল—সন্ধ্যা ৭-৩০ হইতে ১০টা পর্যন্ত—দুর্গা-
বাড়ীতে। অতি সুন্দর ব্যবস্থাদি করেন পুরীহ রামকৃষ্ণ-
মিশনের পরম্পূজ্যপাদ অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী আত্মানন্দ,
শ্রীমৎ বিধান সত্যরাজ এবং সুবিখ্যাত ব্যবহারাজীব
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়, ইহাদের নিকট
আমাদের অর্থের সীমা-পরিসীমা নাই। শ্রীমৎ স্বামী
আত্মানন্দ রামকৃষ্ণ-মিশনের অতি সুন্দর Guest houseটা
আমাদের কয়েকজনের ব্যবহারের জন্য প্রদান করিয়া এবং
শ্রীমৎ জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের কয়েকজন
কেহকে নিজগৃহে অতি সমাধরে রাখিয়া আমাদের অপের
ভক্তভক্তভাঙন হইরাছেন। বক্তব্য এক-একটি শব্দকালের

সকলান্ত কচিং কচাচিং ভাগো ঘটে। সে জন্য আমরা
সকলেই পরম-ধস্ত।

দুর্গা-বাড়ীতে অভিনীত হয় শুদ্ধ শ্রীমদ্রামায়ণের পুণ্য-
জীবনী অবলম্বনে ডক্টর বতীন্দ্রবিমল চৌধুরী বিরচিত এবং
বহুবার অভিনীত সুবিখ্যাত সংস্কৃত নাটক “অমর-বীরম্”।
শ্রীভগবৎকৃপায় ঐহিনের অভিনয় অতি সুন্দর হয় এবং
উপস্থিত জনমণ্ডলীর বিশেষ তৃপ্তি সাধন করে। অভিনয়ের
পরে শ্রীমৎ জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এবং অন্যান্য
সুধীগণ প্রাচ্যবাসীর অভিনেতৃমণ্ডলীকে বিশেষ অভিনন্দন
প্রদান করেন এবং প্রত্যন্তরে ডক্টর চৌধুরীও তাঁহাবিগকে
হার্দিক ধন্যবাদ প্রদান করেন।

পরেরদিন ২২শে জুন, ১৯৬৪, পুরীর সুবিখ্যাত নারী-
সেবা-সমনে উদ্ভিষ্টাসরকারের সংস্কৃত-সম্মেলন-উৎসব
মহাসমারোহে অংশগ্রহণ হয়। সত্যরাম উদ্ভিষ্টা প্রবেশ
হইতে বহু সুবিখ্যাত পণ্ডিত ও ছাত্র সমাগত হইরাছিলেন
এবং উদ্ভিষ্টা সরকারের ভিরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন,
প্রফেসর ডক্টর সত্যনাথ মিশ্র মহাশয় ৪টা হইতে ৯টা পর্যন্ত
সর্বক্ষণ উপস্থিত ছিলেন। এই সত্যরাম প্রবেশের ডক্টর
রমা চৌধুরীর ভারতের প্রাণস্বরূপ “ব্রহ্মবাদ” সত্যকীর্তি
অতি সুশ্লীল ভাষণ এবং ডক্টর বতীন্দ্রবিমল চৌধুরীর উদ্ভিষ্টা
প্রবেশের সংস্কৃত সাহিত্যে দান এবং উদ্ভিষ্টা ও বক্তৃতা-
সংলগ্ন যুগযুগান্তরের হার্দিক মিলন বিষয়ক বক্তৃতা উপস্থিত
সকলেরই অত্যন্ত প্রশংসাগাত করে। পণ্ডিতভবন সকলেই
এবং সত্যপতি ত্রিকিশোরীমোহন বিবেকী, দ্বিচর
শ্রীলালকেশর শতপথী প্রভৃতি সকলে ডক্টর চৌধুরী-মণ্ডলীর
সংস্কৃত সাহিত্যের এই প্রচার ও প্রণয়নের প্রচেষ্টাকে শত-
মুখে সাধুবাদ প্রদান করেন।

সত্যরাম “অমর-বীরম্” নাটকটি পুনরায় প্রদর্শন করা
হয়। এই অতি বহিঃস্বর্ণ পরিবেশের নিমিত্তই নিম্নের

দিনের অভিনয় অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছিল। এই বিশাল পণ্ডিত-বগলী প্রায় আড়াই বর্ষ কাল চিত্রাশিল্পবৎ বলিয়া আমাদের এই অভিনয় দর্শন করিলেন—তাহাতে আমরা সকলে কৃতজ্ঞতার বোধ করিলাম। সত্যান্তে সকলকে হার্দিক অভিনন্দন ও আশীর্বাদ জ্ঞাপন করিলেন ভিয়েটের অব পাবলিক ইনস্ট্রাকসন্স প্রফেসর ডক্টর শ্রীসদাশিব মিশ্র, সংস্কৃত এলোমিয়েশনের সচিব শ্রীলাডুকেশ্বর শতপথী এবং প্রখ্যাত পণ্ডিত শ্রীসুদারিমোহনশাশিগ্রাহী প্রমুখ পণ্ডিতবর্গ। ডক্টর শ্রীসদাশিব মিশ্র আবেগতরে বলেন যে, ডক্টর চৌধুরী-দম্পতী যে এইভাবে ভারতবর্ষের প্রতি প্রান্তে সংস্কৃত-শিক্ষার আলোকবর্তিকা বহন করিয়া লইয়া বাইতেছেন বহু বৎসর ধরিয়া—তাহার তুলনা সত্যি নাই। অত্যন্ত সকলেও ডক্টর যতীন্দ্রবিয়ল চৌধুরীর অপূর্ব সংস্কৃত রচনা-শৈলীর তৃষ্ণা প্রকাশ করেন। বিশেষ করিয়া মীমার রচিত কয়েক খানি সংস্কৃত ভজনের অতি সাবলীলা সংস্কৃত রূপায়ণ সকলেরই মন এক মধুরভাবে আকৃষ্ট করিয়া তোলে।

মীমার কৃত্তিকার পরম নেহাঙ্গদ শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী চক্রবর্তী অভিনয় করেন। তিনি বয়সে নবীন—কিন্তু তাঁহার অতি ভাবগভীর অভিনয় সকলেরই বিশেষ করিয়া প্রাণ স্পর্শ করে। মীমার গানগুলি করেন অশেষ স্নেহভাজন অধ্যাপিকা শ্রীমতী স্বপ্না মুখোপাধ্যায়। যেমন

গানের কথা, তেমনি গানের স্বর, তেমনি গায়িকার স্বরধ্বনি কণ্ঠ, এই তিনের সম্মেলনে, “অবধ বীরম্”এর সঙ্গীতাংশ ভাবাবেগে সকলেরই চক্ষু অশ্রুসিক্ত করিয়া তোলে।

অত্যন্ত কৃত্তিকার অংশ গ্রহণ করেন শ্রীমতীময়ী বিদ্যা, শ্রীঅনিলাকঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, শ্রীনিরঞ্জন গাঙ্গুলী, শ্রীমসীমকঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপিকা শ্রীমতী শান্তি চক্রবর্তী, শ্রীউর্মি চট্টোপাধ্যায় এবং এই বীর লেখক।

সত্যি সর্ব দিক্ বিরাট আমাদের পুরীভ্রমণ অত্যন্ত আনন্দের হইয়াছে। এই মহাপুণাত্মি, শ্রেয়ত্মি, সেবাভূমিতে যে আমরা প্রেম-সেবার মূর্ত প্রতীক শ্রীশ্রীমীমার পরমপবিত্র নামগান করিয়া আনিতে পারিয়াছি সকলের সম্বন্ধে আশীর্বাদ ও অভিনন্দন সহ—তাহাই আমাদের ‘প্রাচ্যবাণীর’ জীর্ণের একটি মহাসম্পদ হইয়া রহিল চিরকাল। সংস্কৃত মহাবাণীর বিজয়-বৈজয়ন্তী কিতাবে ভারতের সর্বত্র আজও উজ্জীন হইয়া রহিয়াছে তাহাও পুনর্বীর স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়া পরম ধন্য হইলাম। এই যে সহস্র সহস্র লোক আড়াই বর্ষ ধরিয়া বলিয়া সংস্কৃত-নাটকের রসস্বধা পান করিলেন, তাহাতে কি ইহাই সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় না যে, সংস্কৃত ভাষা কোনও দিনও ভারতবর্ষে মৃত্যু হয় নাই?

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

হে যতীজ যতি-শ্রেষ্ঠ হে জ্ঞান ভাণ্ডার,
ছায়াহীন চিত্তজয়ী উদ্ভূত মানস,
আদি ভাষা জননী বর পুত্র তুমি,
ভোবারে ধরিয়া যুকে ধন্য অমৃত্তুমি।
তুমি কবি প্রাচ্যবিজ্ঞা-ধারক বাহক,
কালিবালা ভবভূতি-উত্তরসাধক।

কাব্যে গানে নাট্যে আর বিজ্ঞা বিতরণে,
লেবিলে বেশেয়ে নিত্য দেহে প্রাণে মনে,
কোন নব রাজ্যে আজ বিজ্ঞা বিতরণে
বাজা তব কোন লোকে প্রীতি সাধিতে ?
আনিতে চাহিনা তাহা শুধু জানি তুমি,
রহিবে অমর হয়ে যত দিন তুমি

স্বর্গবের রবে বাস, যবে কাব্য জালি,
বীর যবে প্রাচ্য ভাষা অমৃত্তুমি।



শ্রীনরায়ণ চক্রবর্তী

পাত্রপাত্রীগণ

বিকাশ : নব বিবাহিত যুবক।
 রেবা : বিকাশের শিক্ষিতা, রূপসী স্ত্রী।
 হরি : বিকাশের ছোকরা চাকর।
 মনোশ : রেবার দাদা।
 সুরমা : মনোশের স্ত্রী।

টুট }
 পুট } মনোশ-সুরমার বাচ্চা মেয়ে।

বন্দনা : মণিমালা গার্লস্ স্কুলের শিক্ষিকা। রিক্সা-অলা, কুলি, আসানসোল স্টেশনের কয়েকজন যাত্রী, টিকিট কালেক্টর ইত্যাদি।

সময় অপরাহ্ন।

অন্ন দূরের রাস্তা থেকে মাঝে মাঝে ট্রাম-বাসের শব্দ ভেসে আসছে।

কড়া নাড়ার শব্দ।

বিকাশ। (ঠক ঠক ঠক ঠক) রেবা দোর খোলো, আমি বিকাশ।

[দোর খোলার শব্দ]

রেবা। আজ শনিবার, তাও এত দেরী যে বিকাশ?

বিকাশ। (দোর বন্ধ করবার শব্দ) আর বোলো না। সলিল মিত্তির একটা পলিসি করবে বলে আশা দিবেছিল, আপিস ছুটির পর ছুটে গেলাম ওর বাড়ি—

রেবা। দেখা হল?

বিকাশ। তা হল বৈকি, সলিলের সঙ্গে তো বটেই,

উপরত—

রেবা। তার বোঁ এর সঙ্গে?—খুব রূপসী শুনেছি—

বিকাশ। আরে দুব দুব, ...তার বোঁ হচ্ছে থাকে বলে

আলট্রা-মডার্ন লেডী, সখের সমাজসেবিকা, আমাদের মতো হেঁজিপেজি ইনফরেন্স এজেন্টের সঙ্গে দেখা করবে? হুঁ:

রেবা। তবে?

বিকাশ। দেখা হল আগে ভাগে বসে থাকা নিউ ইণ্ডিয়ার হোকরা এজেন্ট মতিলাল দত্তর সঙ্গে—

রেবা। ও, সেই লোকটা? ওই তো তোমার সব শাসালো মকেলদের ভাঙ্গিয়ে নিচ্ছে, তাই না?

বিকাশ। ঠিক ধরেছ। আমাকে দেখেই পাণের ঘরে নিয়ে গেল সলিল, বলল—তুই রাগ করিস নে বিকাশ। মতিদত্ত আমার শ্বশুর মশায়ের হাত—চিঠি নিয়ে এসে ছাঞ্জির হয়েছে। কি আর করি,—গৃহশান্তি রক্ষা করতে গিয়ে ওর কাছেই তিরিশ হাজার—

রেবা। সে কি গো। সলিল মিত্তি না তোমার ক্লাস ফ্রেন্ড?

বিকাশ। বিয়ের পর মিত্ততাটাকে ওর পদবীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রেখেছে সলিল।

রেবা। ছনিয়ার সবাই বোঁএর বাধ্য, অবাধ্য শুধু তুমি—

বিকাশ। কথাটা কিঞ্চিৎ অবোধ্য হল না কি? কিন্তু বাধ্যতার পরীক্ষাটা একটু পরে করলে হয় না রেবা? গলা যে এদিকে শুকিয়ে কাঠ হয়ে এলো—

রেবা। চা আর জলখাবার তৈরী, মশায়ের এখন হাত পা ধুয়ে এসেই হয়—

[সেতারে পিলু বাজতে লাগল। চায়ের পেয়ালার ক্লেং টাং শব্দ ভেসে এলো]

রেবা। (রাগাখর থেকে) হরি, বারান্দায় চায়ের টেবিলটা পেতে দে—

হরি। দ্বিচ্ছি দ্বিচ্ছিমণি—

বিকাশ। শুক্রে বাবা, বসগোলা, অমলেট পরোটা
চা—এবে তুরিতোজের আয়োজন করেছ রেবা—

রেবা। তা না হলে ভুঁড়িটা ভরবে কি দিয়ে?

বিকাশ। তা বটে। (চায়ে চুমুক দিয়ে) আঃ,
চায়েও যে আজ অলাদা স্বাদ দেখছি—

হরি। (ঘর থেকে গলা বাড়িয়ে) হবেক নাই কেনে
আইজা! দিদিমণির মন আজ ভাল আছে যে—

রেবা। (বিস্তৃত ভাবে) আঃ, তুই খাম তো হরি—

বিকাশ। না রে, খামিস নে, বল তো খুলে কি
ব্যাপার—

হরি। (দাঁত বার করে) দিদিমণির বাপের বাড়ির
লোক এসেছিলেন যে, তাতেই তো মোড়ের দকান থেকে
মিষ্টি কিনে আইনলম,—মিকি পাউণ্ড ভাল চা আইনলম—

বিকাশ। অ, তাই বুঝি এই বিশেষ বিপুল আয়োজন,
এদিকে আমি ভাবছি যে এসব বুঝি এই হতভাগোর
জন্তেই—

রেবা। তা কেন? তোমার ভাগটুকু কি পাচ্ছনা
তুমি?

বিকাশ। আংশিক। বৌ এর আদর যত্নের ভাগ
মার কেউ পাক তা আমি চাই না রেবা, আমি চাই
সবটুকুন—

রেবা। (চাপা গলায়) আঃ কী বকছ, হরি
রয়েছে না?

রেবা। (জোরে) হরি, উছন খালি যাচ্ছে, তাতের
হাড়িটা বসিয়ে দে—

হরি। যাচ্ছি দিদিমণি—

(প্রস্থান)

বিকাশ। আমাদের কুঁড়ে ঘরে কোন রাজাধিরাজ
এসেছিলেন শুনি—

রেবা। সমীরণ গো, পাটনার পিসেমশায়ের বড়ো
ছেলে, শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়ে—

বিকাশ। সমীর? কৈ, আমার তো—

রেবা। বাঃ, বিয়ের সময়ে দেখেছিলে মনে নেই!
সেই যে কৌকড়ানো চুল, লম্বা, কসাঁ, চশমা চোখে—

বিকাশ। ও, হ্যাঁ, মনে পড়েছে—

রেবা। এ বাসার ঠিকানা জানতো না তো তাই

এদিন আসে নি। তোমার জন্ম অনেকক্ষণ বসেছিল,
এই তো কাল—

বিকাশ। তা তাঁর হঠাৎ আগমনের উদ্দেশ্য, নিছক
ভদ্রাশ্রম না আরো কিছু?

রেবা। তোমার সব তাতেই খুঁত ধরাটা অভ্যাসে
দাড়িয়ে গেছে বিকাশ—

বিকাশ। আচ্ছা মুন্সিল, ঠাট্টার ভরও নয় না দেখছি—

রেবা। না। বাপের বাড়ি নিয়ে ঠাট্টা কোনো
মেয়েরই নয় না।

বিকাশ। বেশ। ক্রটিবীকার করছি—কমাপ্রার্থী
আমি বরাননে—

রেবা। আঃ, ছাড়ো ছাড়ো, হরি দেখতে পাবে—

বিকাশ। আচ্ছা বেশ। মূলত্বী রইল রাস্তারের
জন্ত, এবে কহ আর—

রেবা। সমীরদার বোন সুনন্দার বিয়ে সাতই অম্বাণ
—তাই বলতে এসেছিল। আমাকে তো দশ বারো দিন
আগেই পাটনা যেতে হবে, বার বার বলে দিয়েছেন
পিসিমা—

বিকাশ। দশ বারো দিন! বিরহের স্মৃতির কি
অত ভাব সইবে?

রেবা। সইবে গো সইবে। ছ'মাস হল বিয়ে
হয়েছে আমাদের, এর মধ্যে একটি দিনের জন্তও তো
যাইনি কোথাও—

বিকাশ। সেই জন্তেই তো বেশী ভাবনা। বিরহ-
বস্তটার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হয়নি বলেই তো ভরটা আরো
বেশী—

রেবা। ঈশ্, দেখো, বুক ফেটে না যায় আবার!

বিকাশ। মন্দিরে যতদিন দেবতা থাকেন ততদিনই
তার মর্যাদা, তা না হলে সেটা ঈট কাঠ আর পাথরের
টিবি ছাড়া আর কিছুই না। তেমনি জন্মেরখরী না থাকলে
জন্মেরই বা কী দাম বলা?

রেবা। বাবা বাবা! একটু ধাবার নাম করেছি
অমনি—

বিকাশ। তা হলেই বুকে দেখ, ধাবার নাম করলেই
যখন হৃৎকম্প উপস্থিত হয়েছে তখন সত্যি সত্যি চলে গেলে
আমার অবস্থাটা কী হবে—

রেবা। আহা তুমিও হো যাবে ক দিন পরে। টেশনে নেমে জঙ্গ সায়েব-ক-কোঠি যাওয়া—বললেই যে কোনো লোক পিসেমশায়ের বিরাট বাঙালোটা দেখিয়ে দেবে।

বিকাশ। নিতান্তই যাবে রেবা?

রেবা। আচ্ছা তুমি কী গো। পিসিমা এত করে লিখেছেন, না গেলে কি চলে? তা ছাড়া সুনন্দাকে দেখি না কতকাল? কটা দিন বৈ তো নয়—

বিকাশ। সে জন্ত ভাবছি না বেবা, ভাবছি যে আমরা গরীব আর গুঁরা অত বডলোক—

বেবা। বডোলোক হলে কী হবে, পিসিমার মোটেও দোষ নেই,—

বিকাশ। তাঁর না থাকতে পার, কিন্তু আর সবাই কি কেরানীর বউ বলে তোমাকে কুপার চক্ষে দেখবে না? —যাওয়া আসা, মেলামেশা নিজের গণ্ডীর মধ্যেই ভালো।

রেবা। এটা তোমার হীনমন্ত্রতা বিকাশ, আত্মীয়-স্বজন সবাই এক স্তরে থাকে না, তাই বলে কি তাদের সম্পর্ক ত্যাগ করতে হবে? আমি দেখিযে দেন যে আমিও কারুর চেয়ে কম নই—

বিকাশ। না না, সামাজিক স্তরে তাঁদের সঙ্গে পালা দিতে যেও না রেবা, নিজের সামর্থ্যের কথাটাও একবার ভাবো। আমাদের সব চেয়ে দামি প্রীতি উপহারও জঙ্গ সাহেবের বাড়ির মহার্ঘ উপহারেব জুড়ে দেখাবে নেহাৎই যেমানান—

রেবা। আমার প্রীতির স্পর্শে তাই হয়ে উঠবে সব চেয়ে মূল্যবান্।

বিকাশ। একদিন তাই হয়তো সত্য ছিল, কিন্তু আজকের সামাজিক জীবনে তার চেয়ে মিথো আব নেই রেবা। ব্যক্তিগত গুণপণা বা প্রতিভাও চেয়ে পৈত্রিক-বিস্তার সমাদরই বেশী—

রেবা। ও সব বডো বডো কথা ভাববার উচিত সময় পাওয়া যাবে পরে, এখন সুনন্দাকে কি দেওয়া যায় তাই বলো—

বিকাশ। ছাত্র ফেল করার ট্রানশি দুটোও গেছে, এ বছরে কেসও দিতে পারিনি তেমন, মাইনেটুকু ভরসা—

রেবা। আমাদের বিয়ের পর এই প্রথম একটা বিয়েতে বাচ্চি আর এতেই তুমি এমন কাহিল হয়ে পড়লে?

বিকাশ। যার যেমন অবস্থা তাই কাহিল তাই যে উচিত—

রেবা। আমি কী এমন হাতি বোড়া খরচ করছি এ সব কথা শোনাচ্ছ? বেশ তো হরিকে ছাড়িয়ে দাও আমি একাই পারব সংসার চালাতে—

বিকাশ। আহা, তুমি কথাটা ওভাবে নিচ্ছ কে রেবা, আমি কি তাই বলছি? আমি বলছি যে—

রেবা। ঠিক আছে, মাসে দু'টো সিনেমা দাঁ তোমার সঙ্গে—এ মাস থেকে আর যাবো না।

বিকাশ। কী মুন্সি! সিনেমার ঘাবার কথা আ কি কবে? সে সব তো দু'চার টাকার মামলা, বৃহ খবচেব ব্যাপার তো নয়।

রেবা। বৃহৎ খরচ। কেন, আমি কি দু'দশ হাজার টাকার জিনিষ দিতে বলছি—

বিকাশ। না, স্থল-কলেজে নজিক পড়লে কী হবে লোকে যে বলে মেয়েবা তর্কের বেলা মুক্তির ধার ধারে। তা একেবারে মিথো নয় দেখছি—

রেবা। এখন তো এ সব বাজে কথা বলবেই, কথা এঁটে উঠতে পারছ না কিনা—

বিকাশ। বেশ আমার আমদানী রপ্তানী যে তোমার অজানা নয়, তুমিই বলো কী দেওয়া যায়—

রেবা। আমি বলব? বেশ। একটা লেভিস্ বি গুয়াচ।

বিকাশ। রিট ওয়াচ। তার দাম জানো?

রেবা। কতো আর হবে দেড়শো টাকা—

বিকাশ। আড়াইশ'র এক নয় পয়সা কম নয় আ যদি জঙ্গ দুহিতার উপযুক্ত ঘড়ি কিনতে চাও তবে সাচোর শো টাকা—

রেবা। তা হলে ঘড়ি থাক। সোনার জিনিষ তো দেওয়া চলবেনা, কী দেওয়া যায় তা হলে? শা'র এক খানা ঢাকাই শাড়ি কিনে দেওয়া যাক, কী বলো—

বিকাশ। একশো টাকা দাম যাতায়াতে আর একশ—

রেবা। (য়েগে উঠে) তবে খালি হাতেই বাই—

বিকাশ। তা কেন? একখানা ধনে খালি নি বাও—

রেবা। একটা টাক্সি ডেকে আন, হাওড়া স্টেশনে
সামনে মাথা উচু করে আমি দাঁড়াতেই পারব না—

বিকাশ। বেশ তো, তিনি তো গুরুজন, মাথা নীচু
করেই দাঁড়িও—

রেবা। আমার মাথা কাটা যাবে—

বিকাশ। দারিদ্র্যের মধ্যে লজ্জা নেই রেবা, আমার
দারিদ্র্য একটা সামাজিক অসাম্যের অনিবার্য ফল—

রেবা। ও সব আমি বুঝি না, আমার ঢাকাই
শাড়িই চাই, তুমি ধার করে কিনে দাও—

বিকাশ। ধার এ তুমি কি বলছ রেবা?

রেবা। ঠিকই বলছি। সামাজিকতা রক্ষা করতে
গেলে কিছুটা আত্মত্যাগ করতেই হয়।

বিকাশ। কিন্তু এতো আত্মত্যাগ নয়, এ যে আত্ম
হনন।

রেবা। কিসে?

বিকাশ। ধারের জালে একবার জড়িয়ে পড়লে
জীবনেও আর মুক্তি পাবো না।

রেবা। আমি অত শত শুনতে চাই না। ঢাকাই
শাড়ি আমার চাই-ই চাই। এই আমার শেষ কথা।

বিকাশ। আমার পক্ষে যা সম্ভব নয় তা আমি পারব
না, আমারও এই শেষ কথা।

রেবা। আমার মুখ হেঁট করতে চাও যত ইচ্ছা
করো, কিন্তু মার মুখ হেঁট হবে আর তুমি দাঁড়িয়ে
দাঁড়িয়ে তাই দেখবে?

বিকাশ। মা-র মুখ।

রেবা। মা সবার কাছে জাঁক করে বলে বেড়িয়েছেন
যে, তাঁর জামাই ভালো রোজগারে, কলকাতার ওপর এক
খানা বাড়ি আছে—

বিকাশ। মা-র এ কথা বলা উচিত হয় নি।

রেবা। কী? আমার মা-র নিন্দে কর তুমি? এত
খানি সাহস তোমার—

বিকাশ। নিন্দে নয়, উচিত কথা—

রেবা। আমাকে অপমান করলে আবার আমার মা
কেও? ঠিক আছে, এ বাড়িতে আর এক দণ্ডও না—
হরি—হরি—

হরি। (দূর থেকে) কি দিদিমনি।

রেবা। একটা টাক্সি ডেকে আন, হাওড়া স্টেশনে
যাবে।

হরি। যাচ্ছি দিদিমনি।

বিকাশ। ওকি, শাড়ি জামা সব স্ট্রটকেশ তরছ যে?

কোথায় বাচ্ছ?

রেবা। (রুদ্ধ কণ্ঠে) আসানসোলে দাদার ওখানে—

বিকাশ। কী আশ্চর্য, সামান্ত কথা নিয়ে—

রেবা। তোমার কাছে সামান্ত হতে পারে, কিন্তু
আমার কাছে অসামান্ত—

[ট্রাক খোলার শব্দ, ঝগাৎ করে চাবি ফেলার শব্দ।
পাশের বাড়িতে বেড়িওতে সেতারে বেহাগের সুর]

বিকাশ। একি, তুমি যে সত্যি সত্যিই চললে
দেখছি—

রেবা। হরি—হরি—

হরি। টেক্সি আইনলাম দিদিমনি।

রেবা। এই নে ভাঁড়ারের চাবি।

বিকাশ। কিন্তু এখন কি আসানসোলে যাবার ট্রেন
পাবে?

রেবা। (কঠিন কণ্ঠে) না পাই তো স্টেশনে পড়ে
থাকব, সে-ও এ বাড়িতে থাকবার চেয়ে ভালো হবে—

বিকাশ। কিন্তু—

রেবা। আমাকে বাধা দিও না, আমি চললাম—
এই হরি, হাঁ করে দেখছিস কি, স্ট্রটকেশটা নে—

(তর তর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল)

[জুতোর শব্দ। টাক্সির শব্দ। হাওড়া স্টেশনের
মিশ্র কলরব। ট্রেনের শব্দ]

রেবা। (স্বগতঃ) উঃ, কী জেদ। আমি যেন একটা
মাল্লুই না। আমার ইচ্ছা অনিচ্ছার যেন কোনো দামই
নেই। ঠিক আছে, আমিও আর সহজে ক্ষিরছি না।
শত সাধুসাধনা করলেও না। দাদা তার একটি বোনকে
ছ' মূঠো ভাত দিতে খুব পারবে।

[ট্রেন ধামার শব্দ।]

জনতা। আসানসোল—আসানসোল। চা-গ্রন্থ।
পান-ব্রি-সিগারেট-পান। ও বুঁচি ইদিকে আর ইদিকে
আয়। ঐ ববুয়া কঁহা য়েব? বড়া ঠাণ্ডা লপতিয়া হো—
(ইত্যাদি)

রেবা। এই কুলি, এই স্ট্রাকেশটা। হাঁ। রিক্সা সে
যাওয়া।

টিকিটবাবু। টিকিট প্রিন্ট—

রেবা। এই নিন। কুলি। রিক্সামে স্ট্রাকেশ
রাখো। হাঁ ঠিক হয়, এই নাও চার আনা—

কুলি। বকশিশ মাইজী—

রেবা। এই নাও ছ নয় পয়সা। এই রিক্সা অলা,
চলো হটন রোড উকিল বাবুকা কোঠি—

রিক্সাঅলা। (ঠুন ঠুন শব্দ) কোন উকিলবাবু
মাইজী? বিশম্ভর বাবু?

রেবা। না না, সান্যালবাবু, মণীশ সান্যাল, চেনো তাঁর
বাড়ি?)

রিক্সাঅলা। সানিয়াল বাবু? হাঁ হাঁ, হয় পছান্ডা
মাইজী—

[ঠুন ঠুন শব্দ। মোটরের হর্ণ।

ট্রাকের শব্দ ইত্যাদি]

রিক্সাঅলা। আ গিয়া মাইজী—

রেবা। আচ্ছা, এই নাও ভাড়া—

রিক্সাঅলা। সেলাম মাইজী। জয় হিন্দ—

(প্রস্থান)

রেবা। জয় হিন্দ। (স্বগতঃ) বৈঠকখানা ঘর তো
অন্ধকার দেখছি। দাদা কি বাড়িতে নেই? ঐ যে কে
বেন আসছে—

মণীশ। (দূর থেকে) কে দাঁড়িয়ে ওখানে?

রেবা। দাদা! আমি রেবা—(প্রণাম করল)

মণীশ। থাক থাক। একি, রেবা? তুই হঠাৎ?
ওগো দেখে যাও রেবা আর বিকাশ এসেছে—

রেবা। (বিস্ময়ভাবে) না না, ও আসেনি, আমি—
আমি একাই এসেছি—

স্বরমা। (দূর থেকে) কে এসেছে বললে? রেবা?
কই দেখি—দেখি, আরে, সত্যিই তো, রেবাই তো, আমি
স্বপ্ন দেখছি না তো?

টুটু ও পুটু। (নাচতে নাচতে এসে) কই মা,
কই মা—

রেবা। (পুটুকে কোলে তুলে নিয়ে) ওমা, টুটু পুটু
কত বড়ো হয়ে গেছে।

স্বরমা। আর ঘরে আর রেবা, পুটু কুছি এবার পিসি-
মণির কোল থেকে নামো তো, ওয়ে ভজ্জহরি—স্ট্রাকেশটা
নিরে আর। আর রেবা, বোস ঐ চেয়ারটার। তারপর
কী ব্যাপার? এমন একা একা—

রেবা। কেন, আসতে নেই?

স্বরমা। না না, সে কথা নয়। বলছি যে বিকাশ
যে তোকে ছেড়ে দিল বড়ো—

রেবা। মাঝে মাঝে ছাড়াছাড়ি হওয়া তো ভালোই
বোদি—

টুটু। মা। পিসিমণি এসেছে আজ আর পড়ব না
কিন্তু, গল্প করব পিসিমণির সঙ্গে—

পুটু। আমিও মা—

স্বরমা। আচ্ছা রে আচ্ছা, এখন ওকে একটু জিরোতে
দে, কতদূর থেকে এসেছে, মনও বিশেষ ভালো নেই
হয়তো—

টুটু। কেন মা? মন কেন ভালো নেই মা?

স্বরমা। সে হোমরা এখন বুঝবে না, আগে বড়ো
হও। রেবা কল ঘরে সাবান তোয়ালে, জল সবই
আছে—

রেবা। যাই বোদি—

(প্রস্থান)

[রেডিওতে কেদারা রাগে সেতার]

টুটু। মা, আমি কিন্তু পিসিমণির সঙ্গে শোব—

পুটু। না মা, আমি। লক্ষী মেয়ের মতো সবটুকু দুধ
খাইনি আমি?

স্বরমা। আজ পুটু শোও, টুটু কাল শোবে, কেমন?
নাও শুয়ে পড়ো এবার, রাত সাড়ে দশটা বেজে গেছে।

পুটু। পিসিমণি গল্প বলো।

রেবা। গল্প? আচ্ছা শোনো। এক ছিল পিসি,
সে দাঁতে দিত মিশি, মিশি নিলো চোরে, পিসি রেগে
মরে। (স্বগতঃ) ঘুমিয়ে পড়েছে পুটু। আমিও ঘুমই।

(সেতারে টুং টাং শব্দ)

(স্বগতঃ) নাঃ ঘুম আসছে না। রাত এখন কত কে
জানি? অন্তমনস্ক মাহুদ! হরি কি আর সব দিক মায়ের
রাখতে পারবে? অস্বিধে হচ্ছে নিশ্চয়, সাত পাঠা চিঠি
পাঠাবে। যেমন এক ভঁরে মাহুদ, হোক একটু শিক্ষা।
লংসার বেন ওর একার, আমার নয়। বেশ জো-জোতে

টাকা নেই ভালো মুখে বুঝিয়ে বললেই হোত, তা না, একেবারে কৌশল। নাঃ, ঘরে গরম লাগছে, বারান্দার খোলা বাতাসে ঘাই।

[ঘোর খোলার শব্দ]

আঃ কী আরাম। রাতের জি, টি, রোডটা যেন একটা ঘুমন্ত অজগরের মতো একেবৈকে পড়ে আছে। আকাশের খালি কে যেন লক্ষ প্রদীপ জেলে দিয়েছে, কলকাতায় এমন আকাশ দেখা যায় না। ফিসফিস শব্দ আসছে কোথেকে? দাদা-বৌদি কি ঘুমোন নি এখনো। আমার নামে কী আবার বলছে বৌদি? দরজায় কান পেতে শুনি তো—

স্বরমা! আমার মনে হয় কিছু হয়েছে ছুটিতে, তা না হলে এভাবে আসে কখনো? না চিঠি, না পত্র—

মণীশ। ঠিকই বলছ তুমি স্বরমা। এর আগে কতবার এখানে আসবার জন্য চিঠি দিলাম। বিকাশচন্দর ফ্যাটলি রিফিউজ করে দিলে—

স্বরমা। (হেসে উঠে) নতুন বিয়ে কলকাতার নিরবিচ্ছিন্ন ফ্যাট ছেড়ে আসবে কেন বলো?

মণীশ। ব্যাপার স্থাপার বেশ সন্দেহজনক, কী বলো?

স্বরমা। তা আর বলতে! মাঝে মাঝে রেবার মুখখানা ধমধমিয়ে উঠেছিল, কেমন যেন অকমনস্ক হয়ে পড়ছিল মাঝে মাঝে—

মণীশ। ঝগড়া ঝাটি নয় তো?

স্বরমা। তাই তো মনে হয়। তোমারই তো বোন, পেছনে লাগতে ওস্তাদ—

মণীশ। আহা নিজে যেন ভাঙ্গা মাছটি উটে খেতে জানো না—উ—

স্বরমা। আরে, ছাড়ো ছাড়ো, টুটু ঘুমিয়ে আছে না পাশে, জেগে উঠবে যে—

মণীশ। তাই বলে দুট্টীর সাজা দেব না?

রেবা। (স্বগতঃ) ছি ছি! আড়ি পাতা আমার উচিত হয় নি। কিন্তু অবাক কাণ্ড, বৌদি আসল ব্যাপারটা আঁচ করল কী করে। কলকাতায় বেখে এলাম থাকে, সে এতদূরেও আমার জালাচ্ছে। ঘাই

ঘুমিয়ে পড়ি এবার নইলে সকালে বৌদির কাছে এ মুখ আর বার করা যাবে না—

কয়েক দিন পরে [সেতারে ভৈরবী ঠুংরি পাখির কলরব।]

ভোর

পুটু। পিসিমণি তুমি আমার কাছে বোসো, দেখ আমি কী স্বন্দর পড়তে শিখেছি: মহারাজা অশোক যখন কলিঙ্গ দেশ জয় করেন—

টুটু। না পিসিমণি, তুমি আমার কাছে বোসো। পুটুটা তো পুচ্কে, ইংরিজী জানে না, আমি কেমন ইংরিজী শিখেছি শুনবে? M-O-R-N-I-N-G মর্নিং, মর্নিং মানে, সকাল। D-A-R-L-I-N-G ডার্লিং, ডার্লিং মানে—

পুটু। ইংরিজী না জানলেও কতি নেই, আমরা তো এখন স্বাধীন, তাই না পিসিমণি?

রেবা। লক্ষী মেয়ে পুটু। কে শিখিয়েছে এ কথা তোমাকে।

পুটু। বন্দনা মাসি।

রেবা। বন্দনা মাসি? সে আবার কে?

টুটু। ওমা, তাও জানো না? তবো মা যে সেদিন বাবাকে বলছিল যে বন্দনা মাসির সঙ্গে পিসেমশায়ের খুব ভাব ছিল আগে?

রেবা। (স্বগতঃ) টুটু বলে কি! খোঁজ নিতে হচ্ছে তো?

স্বরমা, (দূর থেকে) এই দুট্টুয়া, পিসিমণিকে খুব জালাচ্ছ বুঝি? রাস্তাঘরে এসো সবাই, চা হয়ে গেছে—

[চায়ের পেরালার টুং টাং শব্দ]

স্বরমা। শুকি রেবা, চোটখানা রেখে দিলে যে!

রেবা। খিদে নেই বৌদি—

স্বরমা। আর এক কাপ চা ঢেলে দি?

রেবা। না, থাক—আচ্ছা—ইয়ে—আচ্ছা বৌদি টুটু পুটুকে এ সব আজ-বাজে কথা বাইরের লোক এসে শিখিয়ে যায়, আর তোমরা চূপ করে থাকো!

স্বরমা। আজ-বাজে কথা শেখা? কে রে—

রেবা। ঐ যে পুটুই বলছিল, বন্দনা না কোন একটা মেয়ে—

স্বরমা। (হেসে) ও, তাই বল। এরই মধ্যে বন্দনার কথা বলা হয়ে গেছে ওদের? খুব ভালোবাসে ওরা বন্দনাকে।

রেবা। কে এই মেয়েটা?

স্বরমা। সে কি! বন্দনাকে চিনিস না? কেন বিকাশ কিছু বলে নি তোকে?

রেবা। (থেমে থেমে আড়ষ্টভাবে) বিকাশ? কৈ, না তো—মানে হয়তো বলেছিল ভুলে গেছি আমি—

স্বরমা। ভুলে যাবার মতো ঘটনা তো নয় এটা। নিশ্চয়ই ওর কথা তোর কাছে লুকিয়েছে বিকাশ। এটা কিন্তু অস্ত্রায়, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এ সব ব্যাপার গোপন থাকার মোটেই উচিত নয়—

রেবা। (দুর্বল স্বরে) কী বলছ তুমি বৌদি? আমি তো কিছুই—

স্বরমা। বন্দনা থাকে ডক্টর নিকলস্ রোডে! মণিমালা গালস্ স্কুলে টিচারী করে আর অবসর সময়ে লাইফ-ইনশিওরের এজেন্সি করে। বিকাশ তো আগে আসানসোলেই ছিল, তখন থেকেই খুব আলাপ অন্তরঙ্গতা ছাটিতে। এমন কি—

রেবা। বলো বলো, খামলে কেন?

স্বরমা। শুনেছি যে বিকাশ ওর প্রতি খুব খুঁকেও ছিল,—অবশ্য এ সবই তোর সঙ্গে বিয়ে হবার আগের ঘটনা।

রেবা। (স্বগতঃ) ওঃ, ভেতরে ভেতরে এত! ওর মিষ্টি মিষ্টি মন কেড়ে নেওয়া কথাগুলো তা হলে আসলে শূন্যগর্ভ! হয়তো ঠিক সেই কথাগুলোই বন্দনারও কানে কানে একদিন বলেছিল বিকাশ!

স্বরমা। কি রে, শুধু মেরে গেলি কেন? বলেছি তো, ওসব কবেই চুকে-বুকে গেছে, বিকাশের দিক থেকে অন্ততঃ—

রেবা। (ভীত কণ্ঠে) তার মানে?

স্বরমা। মানে বন্দনা বোধ হয় এখনো ভুলতে পারেনি বিকাশকে।

রেবা। (স্বগতঃ) বিকাশই কি ভুলতে পেরেছে

বন্দনাকে? উঃ কী শঠ আর কণ্ঠ এই পুরুষ জাতটা—
—একদিনের জন্তও ওর নাম করে নি আমার কাছে—

(টুটুর প্রবেশ)

টুটু। মা-মা বাবা ডাকছে তোমাকে, শিগ্গিস এসো—

স্বরমা। এই যে যাই, টুটু তুমি পিসিমণিকে তোমার ছবির বইটা দেখাও, কেমন—

টুটু। আচ্ছা। এসো পিসিমণি— (প্রস্থান)
[সেতারের টুং টাং]

মণীশ। কৈ গো পাঁচটা টাকা দাও, বাজারে যাবো—

স্বরমা। বাজারে তো যাবে, কিন্তু খাবার আজ মুখে কচবে তো তোমার বোনের?

মণীশ। কেন, কী হল আবার?

স্বরমা। বন্দনার কথা শুনেই কেমন গুম মেরে বসে আছে, একবার দেখেই এসো না—

মণীশ। (গলা নামিয়ে) ওয়ুধ ধরেছে তা হলে? বিকাশকে লিখে দি যে আর দেবী হবে না—

স্বরমা। না না, এখন লিখতে যেও না ওসব। আর এক ডোজ পড়ুক তার পর—

মণীশ। বেশ তেজী ওয়ুধ, কি বলো?

স্বরমা। (তরল স্বরে) বিলক্ষণ তেজী—

[সেতারে তিলোক কামোদ] দুপুর বেলা

রেবা। এই টুটু, শোন শোন—

টুটু। কী পিসিমণি?

রেবা। (গলা নামিয়ে) পিওন এসেছিল?

টুটু। হ্যাঁ—

রেবা। আমার কোনো চিঠি ছিল?

টুটু। কৈ, না তো।

রেবা। (অধীর স্বরে) ছিল ছিল, তুই জানিস না, দেখে আয় না দাদার বৈঠকখানায়। যদি জানতে পারিস, তবে লেবেলুশ্ দেবো। লক্ষ্মী, সোনা আমার, বা—

টুটু। তোমার চিঠি আমি চিনব কি করে?

রেবা। দেখবি সবুজ বা গোলাপী খাম—

টুটু। আমি তা হলে পাকার মেল হয়ে যাই, কেমন?

পু—ঝিক্ ঝিক্ ঝিক্ ঝিক্—

[শব্দ ক্রমে দূরে মিলিয়ে গেল। আবার ফিরে এলো]
না পিসিমবি নেই। আমার লেবেকুশ ?

রেবা। এই নে দশ নয় পয়সা। এক কথা কাউকে বলিসনে কিন্তু, লক্ষী ছেলে। (স্বগতঃ) চার দিন হয়ে গেল আজও একটা চিঠি এলো না। আমি চলে আসার ও যেন ইপ ছেড়ে বেঁচেছে। হয়তো বন্দনার কাছেই প্রেম-পত্র লিখছে মনের আনন্দে,—উঃ, কী যে করি আমি—ঐ যে বৌদি আসছে আবার জালাতে—

স্বরমা। হুপ্পুরে তো কিছুই মুখে তুললি না। শরীরের যা হাল করেছে, শেষকালে বিকাশ আমাদের নামে ক্ষতি-পূরণের মামলা না করে বসে—

রেবা। (আতঙ্কিত) ওর কথা আর বোলো না বৌদি—ও একটা,—ও একটা—

স্বরমা। ছি ছি ছি, কী যা তা বলছিস। বিকাশের মতো ছেলে হাজারে একটাও মেলে না তা জানিস ?

রেবা। (ক্লান্তকণ্ঠে) ওর কথা থাক বৌদি। (স্বগতঃ) বৌদিকে তো আর ভুগতে হচ্ছে না, তাই প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ—

স্বরমা। ক'দিন হল এসেছিস, কোথায় হৈ হাজারে আয়োদ আহ্লাদে বাড়ি মাথায় করে রাখবি, তা না, একেবারে ঝিম মেরে বসে আছিস—

রেবা। শরীরটা কেমন মাজ-মাজ করছে বৌদি, তাই—

স্বরমা। তা শরীরের আর দোষ কি ? এসে অদি তো ঘরেই বসে আছিস। না গেলি মাইথন বাঁধ দেখতে, না গেলি কল্যাণেশ্বরী। কাল এত করে বললাম যে, চল 'সাতপাকে বাঁধা' দেখে আসি "গোখুলি"তে, তা ও গেলি নে।

রেবা। ওটা যে আমার দেখা ছবি।

স্বরমা। বেশ তো, 'ডুরাণ্ডে' চল, 'মহানগর' দেখে আসি—

রেবা। আজ থাক বৌদি—

স্বরমা। তা হলে চল ঘুরে আসি একটু—

রেবা। কোথায় বৌদি—

স্বরমা। বন্দনার ওখানে। তোকে তো দেখে নিও। খুব খুশী হবে।

রেবা। (স্বগতঃ) বন্দনা! সবই তো জানলাম, চোখের দেখাটা আর বাকী থাকে কেন ? (জোরে)

আজ্ঞাঃ, তুমি যখন এত করে বলছ—

স্বরমা। তা হলে চটপট তৈরী হয়ে নে।

[সেভাবে কাফি]

স্বরমা। ওরে বাব্বাঃ, তুই যে দারুণ সেজেছিস রেবা—

রেবা। কী আর এমন। বাও, বাবে ? না—হাঁ করে তাকিয়ে থাকবে আমার দিকে ?

স্বরমা। তা আমার তাকানোটা না হয় ধমক দিয়ে বন্ধ করলি, কিন্তু রাস্তার সব লোক যখন তোর ঐ আঙনের মতো রূপের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকবে, তখন ?

রেবা। এমন করলে আমি যাবো না কিন্তু বৌদি—

স্বরমা। বাব্বাঃ, ঠাট্টাও নয় না মেয়ের—

[সাইকেল রিস্টার ঘড়ির শব্দ, ট্রাক চলবার শব্দ, জনতার কোলাহল ইত্যাদি]

স্বরমা। ঐ যে লাল রং এর একতলা বাড়িটা দেখছিস ওটাই বন্দনাদের বাড়ি,—ঐ যে গেটের কাছেই দাঁড়িয়ে আছে বন্দনা—

বন্দনা। ওমা, স্বরমাদি যে! কী ভাগ্যি আমার। আহুন আহুন, ভেতরে আহুন—বহন, দাঁড়ান, পাখাটা খুলেদি—

স্বরমা। তোমাকে অত বাস্তব হতে হবে না বন্দনা, আমার সঙ্গে এই রূপসীটি কে বলা তো ?

বন্দনা ? কৈ, আমি তো ঠিক—

স্বরমা। পারলে না তো বলতে। এ হচ্ছে আমার নন্দ—রেবা, বিকাশের বো—

বন্দনা। (কলকণ্ঠে) ওমা। বিকাশদার বো আপনি ? কী ভাগ্যি যে দেখা হ'ল আপনার সঙ্গে। ভীষণ কগড়া আছে কিন্তু বিকাশদার সঙ্গে আমার। চুপি চুপি বিয়ে করে মিল্লির অঙ্কে শক্ত বসানো বার করব আমি, দেখা হোক না একবার! মজাটা টের পাইয়ে দেবো না—

রেবা। (স্বগতঃ) কী নির্লজ্জ আর কী অসভ্য মেয়েটা। অতখানি লো—কাট রাউজ বুঝি পাবে কেউ।

গায়ের রং তো মাজা-মাজা আর ঐ তো শিড়িকে শরীর,
কী দেখে ভুলেছে বিকাশ।

বন্দনা। স্বরমা দি, একটু বসুন, চায়ের কথা বলে
আসি—

স্বরমা। নানা। চা থাক। তুমি বোসো, গল্প
করো রেবার সঙ্গে—

বন্দনা। গল্প কি এক তরফা হয় স্বরমাদি? উনি
তো কথাই বলছেন না আমার সঙ্গে—

রেবা। আচ্ছা বাসন্তী রং এর শাড়ির সঙ্গে লাল
রঙের ব্লাউজ পরেছেন কেন বলুন তো?

স্বরমা। (স্বগতঃ) ছি ছি, এসেই যে বগড়া শুরু
করল রেবা—

বন্দনা। (শান্ত স্বরে) লাল রংএ আমাকে মানায়
না জানি তবু পরি এই রংটা আমার ভাল লাগে, আর
বিকাশদাও তো এই রংটা খুব পছন্দ করেন, তাই না—

রেবা। (স্বগতঃ) ওঃ, এত দূর। (প্রকাশ্যে)
বৌদি, বাড়ি চলো, ভয়ানক মাথা ধরেছে আমার—

স্বরমা। সে কি রেবা, ফাঁকা হাওয়ায় বেরিয়েও
মাথা ধরা সারল না?

বন্দনা। একটু বসুন না, চা খেলেই সেরে যাবে,
আমি না হয় একটা সারিডন ট্যাবলেট আনিয়ে দিচ্ছি
বাজার থেকে, ওরে,—ও মুনিয়া—

রেবা। আপনার সৌন্দর্যের কথা মনে রাখবার চেষ্টা
করব কিন্তু চা বা সারিডনের দরকার হবে না। কই
বউদি, ওঠো না—

স্বরমা। চল তবে। কী যে স্বাস্থ্য হয়েছে আজকাল-
কার মেয়েদের! দেখ তো আমাকে,—তোর দাদা বলে
যে দশটা বাঘেও খেতে পারবে না—

(বেবার প্রস্থান)

বন্দনা। (হেসে) বাড়িয়ে বলাটা জামাইবাবুর
একটা অবোসে দাঁড়িয়েছে—দশটা বাঘ নয়, পাঁচটা বাঘ—

স্বরমা। বন্দনা! তুমিও আমার শরীরের ওপর
নজর দিচ্ছ? কিন্তু আর না, পালাই এবার, রেবা আগে-
ভাগেই রাস্তার গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—

রেবা। (দূর থেকে) আঃ, বউদি! কী করছ
ঘরের ভেতরে, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে?

স্বরমা। বাবা বাবা, মেয়ের বেন আর ভর নয় না—
আচ্ছাঃ, তা হলে চলি বন্দনা—

বন্দনা। রেবা বউদিকে নিয়ে আর একদিন আসবেন
কিন্তু স্বরমা দি—

[সেতারাে খাষাজ]

স্বরমা। রেবা, এই নে তোর চিঠি।

রেবা। চিঠি! কই দেখি, আঃ দাও না, কেন মিছে
জালাচ্ছ?

কাগজ ছেঁড়ার শব্দ

স্বরমা। কার চিঠি রে?

রেবা। মা লিখেছেন নবদ্বীপ থেকে, আমি কেন
বিকাশের অসুবিধা ঘটিয়ে এতদিন এখানে পড়ে আছি
তাই—হ্যাঁ বৌদি, আমি কি তোমাদের ভার বোকা হয়ে
আছি?

স্বরমা। বালাই ঘাট, ভার বোকা হবি কেন তুই?

রেবা। তা যদি হয়ে থাকি তবে স্পষ্ট ভাবে বলো,
বি-এ পাশ যখন করতে পেরেছি, একটা স্কুল-মাষ্টারীও
জুটিয়ে নিতে পারব।

স্বরমা। ছি ছি, এমন কথা মনেও আনিস নে রেবা,
তোর দাদা শুনলে কিন্তু ভয়ানক রাগ করবে—

মণীশ। (দূর থেকে) ওগো শুনছ,—আমার চশমাটা
কোথায় গেল!

স্বরমা। আসছি—

(প্রস্থান)

রেবা (স্বগতঃ) নিজে লেখনি, মাকে দিয়ে লিখিয়েছে।
যাবো না তো, কক্ষনো যাবো না। কী এমন অজায়বটা
করেছিলাম আমি? যেখানে ভালো বাসা নেই সেখানে
কেনই বা যাবো?

স্বরমার প্রবেশ

স্বরমা। আর রেবা, তোর চুল বেঁধে দি। ইশ কী
ছিরি হয়েছে, এমন অস্বস্তি করলে ক'দিন থাকবে এমন
মেয়ের মতো চুল—

নাচতে নাচতে টুটুর প্রবেশ

টুটু। মা, মা, বন্দনা মাসি এসেছে, এই জাখো,
আমাকে চকোলেট দিচ্ছে—

স্বরমা। কোথায় সে,—একি! তুই উঠলি কেন
রেবা?

বন্দনার প্রবেশ

বন্দনা। এই যে আমি।

স্বরমা। এসো বন্দনা, বোসো ঐ চেয়ারটার—

বন্দনা। ওকি! আপনি কোথায় চললেন রেবা
বৌদি! আমার যে আপনার সঙ্গেই বিশেষ দরকার—

রেবা। (রুই মুখে) আমার সঙ্গে কাকর কোনো
দরকার নেই, থাকতে পারে না— (প্রস্থান)

(দড়াম করে দরজা বন্ধ হবার শব্দ)

বন্দনা। ব্যাপার কি স্বরমা দি?

স্বরমা। কী জানি ভাই। তোমরা হচ্ছ আধুনিক।
শিক্ষিতা মেয়ে, তোমাদের মনের ভাব আমাদের মতো
সুখ-সুখা মানুষ কি করেছে বা বুঝবে বো—

বন্দনা। কিন্তু ওর মতটা না জানতে পারলে—

স্বরমা। কিসের আবার মত?

বন্দনা। স্কুল থেকে বি, টি পড়তে আমাকে পাঠাতে
চায় কলকাতায়। বোর্ডিংয়ে যা খরচ। তাই ভাবছিলাম
যে এই ন'টা মাস বিকাশদার ওখানেই থাকবো, দুটো ঘর
আছে শুনেছি—কিন্তু রেবা বউদির যা তিরিকি মেজাজ
দেখছি—

স্বরমা। তা তুমি সরাসরি বিকাশকেই লেখ না কেন
বন্দনা?

বন্দনা। তা অবশ্য লিখতে পারি, আর এও জানি যে
আমাকে না করতে পারবে না বিকাশদা—

স্বরমা। সেই ভালো—কালকের ডাকেই একটা চিঠি
লেখো তুমি।

বন্দনা। রেবা বউদিকে এ সব কথা আবার বলবেন
না কিন্তু, বাগড়া দিতে পারে তো?

স্বরমা। না না, আমি কিছু বলব না। বি টিটা পাশ
করতে পারলে মাইনেও বাড়বে নিশ্চয়?

বন্দনা। তা তো বাড়বেই। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো,
আজ তা হলে উঠি স্বরমাদি—

স্বরমা। এসো ভাই—আমিও উঠি এবার, ঠাকুর ঘরে
মাঝে দিতে হবে— (উত্তরের প্রস্থান)

রেবার প্রবেশ

রেবা। (স্বগতঃ)—কী মেয়েরে বাবা! লাজ লজ্জা
কিছুই কি নেই! পাশের ঘর থেকে সব শুনেছি। হু,

বাওয়াছি তোমাকে। কালই আমি কলকাতা যাবো,
তারপর দেখে নেবো, কী করে আমার বাড়িতে চুকছে
পাও তুমি। বৌদিটাই বা কি। মুখে এমন মিষ্টি, কিন্তু
মনটা একেবারে বিধে ভরা। এ বাড়িতে আর এক মুহূর্তও
থাকতে ইচ্ছে করছে না...বিকাশ হয় তো হাসবে, হাসুক,
তা বলে আমি তো আর আমার সাজানো সংস্কারের কতৃৎ
ওই মেয়েটার হাতে তুলে দিতে পারি না। আশ্চর্য
কতো! বলে কিনা বিকাশদা আমাকে না করতে
পারবে না—

[সেতারে পূরবীর স্বর]

পরদিন

মণীশ। সে কি রে! আজই যাবি? এই তো
সেদিন এলি। মাস দুই থাক না এখানে—

রেবা। না দাদা; আমি আজই কলকাতা যাবো তুফান
এক্সপ্রেসে—

স্বরমা। অন্ততঃ টুটুর ঠগদিনটা পর্যন্ত থেকে যা
রেবা—

রেবা। বৌদি, তুমি আর বাধা দিও না, আমি
ওখানে থেকেই ওকে আশীর্বাদ করব—

স্বরমা। শরীরটা ভালো নেই বনছিলি, ওখানে
গিয়েই তো আবার সংস্কারের জোয়ারল কাঁধে তুলে নিতে
হবে।

রেবা। মেয়েমানুষ হয়ে যখন জন্মেছি তখন তুলতে
হবে বৈ কি বৌদি,—তবে কেউ তা আনন্দে তোলে, আর
কেউ বা নিরানন্দে—

স্বরমা। বুঝলাম না তোর কথা—

রেবা। আর বুঝে কাজ নেই। ও দাদা, একটা
বিক্সা ডাকো না, ট্রেনের ঘে আর দেবী নেই।

মণীশ। যাচ্ছি রে যাচ্ছি— (প্রস্থান)

স্বরমা। রেবা, এই খামে আঁটা চিঠি খানা বিকাশের
হাতে দিল, নিজে খুলে পড়িল না কিন্তু, সাড়ে চারাত্তর দিয়ে
দিলাম।

রেবা। আজ্ঞা গো আজ্ঞা। দাঁড়াও, প্রণাম করি—

স্বরমা। আশীর্বাদ করি, সুখী হও—

মণীশের প্রবেশ

মণীশ। কৈ রে রেবা, বিক্সা এসেছে—

রেবা। এসেছে। তা হলে চলি বৌদি। টুট
পুটুতো এখন ইস্তলে, ওদের আমার আদর দিও—
স্বপ্নমা। এসো বোন। দুর্গা, দুর্গা, দুর্গা—
[রিম্মার টুং টাং। ট্রাকের শব্দ। টেশনের কোলাহল।
ধাবমান ট্রেনের শব্দ]

(সোতারে জয়-জয়ন্তীর স্বর)

রেবা। (কড়া নাড়ছে) খট্ খট্ খটা-খট্।
বিকাশ। (ভেতর থেকে) কে ?
রেবা। আমি, রেবা। দোর খোলো।
বিকাশ। (দোর খোলার শব্দ) একি, রেবা তুমি !!
রেবা। হ্যা, আমি। কেন ? আসতে নেই ?
বিকাশ। না না। তা নয়, কিন্তু...এত রোগা হলে
কি করে রেবা ? ওকি চোখে জল কেন ? কাঁপছ কেন ?
পড়ে যাবে যে—

রেবা। (কাঁপা গলায়) তুমি কি নিষ্ঠুর বিকাশ—
বিকাশ। নিষ্ঠুর আমি ! তা তো বলবেই। স্নানদার
জন্ম ঢাকাই শাড়ি কিনবার জন্ম নাওয়া-খাওয়া ভুলে নতুন
পাঁচটা কেস করলাম কিনা—

রেবা। দরকার নেই ছাই শাড়ির—
বিকাশ। সেকি রেবা ! যার জন্ম এত কাণ্ড—
রেবা। হ্যা, যাবো না আমি স্নানদার বিয়েতে—
বিকাশ। এ তুমি বলছ কি রেবা ?
রেবা। তুমি আমাকে ভালোবাসো না, একটুও না,
একটুও না—তা না হলে কি আবার দূরে পাঠিয়ে দিতে
চাইতে ?

বিকাশ। তোমার আজ হয়েছে কি বলো তো ?
রেবা। জানি, জানি। তোমার সব ভালোবাসা
লুটে-পুটে নিয়েছে আর একজন—
বিকাশ। তুমি কি পাগল হলে রেবা ! কী সব
আবোল-তাবোল বকছ ?

রেবা। পাগল ? তা তো বলবেই এখন। বন্দনাকে
আমি নিজের চোখে দেখে এসেছি, বুঝলে—
বিকাশ। বন্দনা ? কোন বন্দ—ওঃ হো, বুঝেছি
বুঝেছি। আমার মামাতো বোন বন্দনার কথা বলছ তো ?

রেবা। (অবিশ্বাসের স্বরে) বোন ! বললেই হল ?
বিকাশ। কি আশ্চর্য ! বোনকে বোন বলব না তে
কি ভাই বলব ?
রেবা। ঈশ, বোন হলে আমি বুঝি আর জানতাম
না—

বিকাশ। আচ্ছা মুন্সিল তো ! চিনি-মামার নাঃ
শোনোনি ? তাঁরই বড়ো মেয়ে বন্দনা। মণিমালা গাল
ঝুলের টিচার—

রেবা। তবে যে বৌদি বলল—
বিকাশ। কী বলল তোমার বৌদি ?
রেবা। (হাল্কা স্বরে) নাঃ, কিছু না, ও হ্যা, বৌদি
একটা চিঠি দিয়েছে তোমায়,—এই নাও—
বিকাশ। আমার চিঠি ! কৈ দেখি—
কাগজ ছেঁড়ার শব্দ

উম্ উম্, একি ! এ যে তোমাকেই লেখা—
রেবা। কৈ দেখি,—হ্যা, তাইতো : পড়ি :—
রেবা,

তোমার অভিমান ভাঙাতে গিয়ে একটু জোরাবে
ওষু দিয়েছিলুম। মাথা ধরা, গা মাজ-মাজ ইত্যাদি
ব্যাধি সব সেরে গেছে তো ?

ইতি

বৌদি।

উঃ, বৌদিটা কী দুট্ট। এমন ভাবে ঘটনাগুলো
সাজিয়েছিল যে—

বিকাশ। কিন্তু আমি তো কিছুই বুঝলাম না, ওঃ
ব্যাধি তো একটা বিশেষ অবস্থারই উপসর্গ বলে জানি,
তোমার কি—

রেবা। ধেং, অসভ্য কোথাকার। নাও খা
এসো। সকাল সকাল শুয়ে পড়তে হবে আজ—

বিকাশ। সকাল সকাল শুয়ে পড়তে অবশ্য আপা
নেই, কিন্তু সকাল সকাল ঘুমোনো নৈব নৈব চ, বুঝলে ?

রেবা। (হেসে উঠে) বুঝলাম।

(সোতারে বসন্ত-বাহার বাজতে লাগল)

সমাপ্ত



মহিলার কথা



শিক্ষার সমস্যা

শৈল চট্টোপাধ্যায়

আজকাল জীশিক্ষার ব্যাপক চলন হয়েছে। যে সব গৃহে আগে মেয়েরা সামান্য মাত্র এবং কোন কোন ক্ষেত্রে শুধু বর্ণপরিচয় অবধি পাঠের সুযোগ পেত, বর্তমানে সেই সব গৃহের নবীনারা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরীক্ষার উত্তীর্ণ হয়ে উচ্চশিক্ষিতা হবার সুবিধা পাচ্ছেন। সমাজের এবং অভিভাবকদের মনের এই প্রশংসনীয় পরিবর্তন অবশ্যই অভিনন্দনের যোগ্য। জীশিক্ষার প্রচার এবং প্রসার হওয়া যে কত বাঞ্ছনীয় তা একালের শিক্ষিত মানুষের অজানা নয় বলেই, দেশে দেশে জীশিক্ষা বিস্তার লাভ করছে এবং ভবিষ্যতে আরও করবে।

যে দেশে জীশিক্ষার প্রসার নেই, যে সমাজে জীশিক্ষার আদর নেই—সে দেশ, সে সমাজ অগ্রসর হতে পারে না এই চলমান যুগের সঙ্গে তাল রেখে। এই যত্নসত্যতার দিনে প্রগতিশীল যে কোনও দেশের দিকে দৃষ্টি দিলেই দেখতে পাওয়া যায় সে দেশের নারীরা শিক্ষার ক্ষেত্রে কতটা অগ্রসর। রাষ্ট্রের দিক থেকে, সমাজের দিক থেকে, সংসারের দিক থেকে শিক্ষিতা নারীর প্রয়োজন আজ অনস্বীকার্য। তাই সব দেশেই, সব সমাজেই এবং সব সংসারেই আজ জীশিক্ষার প্রচলন হয়েছে এবং প্রসারও হচ্ছে ব্যাপক ভাবে। কিন্তু, জীশিক্ষার এই প্রবর্তন, প্রচলন ও প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে দেশের, সমাজের ও সংসারের আর্থিক, নৈতিক, চারিত্রিক ও মানসিক উন্নতিও

কি সমান তালে হচ্ছে? না অবনতি হচ্ছে?—এ প্রশ্ন আজ চিন্তাশীল, দায়িত্বশীল অনেকের মনেই জাগছে। কারণ? কারণ, একটু চোখ খুলে আশেপাশে দেখলেই দেখা যাবে আজকালকার শিক্ষিত ছেলে মেয়েদের নীতি বোধ কোথায় নেমেছে, চারিত্রিক সংযম তো লুপ্ত প্রায়, আর মানসিক দৌর্যল্যা প্রকটিত হয়ে উঠছে পদে পদে! কিন্তু, কেন? এ কেনর উত্তর রয়েছে অনেক গভীরে। তার বিস্তারিত আলোচনায় সুযোগ এখানে নেই: তবে মোটামুটি ভাবে বলা চলে পাশ্চাত্য ভাবপুট শিক্ষাধারার কিছুটা দৃষ্ট প্রভাব এবং তার সঙ্গে অভিভাবকদের গাফিলতিই অর্থাৎ সম্ভানদের নীতি ও সংযমের পথে ঠিকমত চালিত করবার চেষ্টার ত্রুটিই, এই অধঃপতনের জন্ম মুখ্যতঃ দায়ী। অবশ্য পারিপার্শ্বিকের প্রভাব, অর্থনৈতিক সংকট প্রভৃতিও এর মধ্যে আছে। আমার এই মতের সঙ্গে অনেকই হয়ত একমত হবেন না তা জানি,—বিশেষ করে শিক্ষিতা আধুনিকারা তো আমার ওপর খড়গহস্ত হয়ে উঠবেন। কিন্তু সে ক্ষেত্রে আমি তাঁদের প্রশ্ন করব আধুনিক শিক্ষিতারা ক'জন সংসাবে শ্রীবুদ্ধি আনতে পারছেন, ক'জন শান্তি ও সুখ বজায় রাখতে পারছেন? ক'জন পুত্র কন্যাদের স্ত্রী ভাবে মাতৃক কর্তব্যে পারছেন? আজ যিনি কল্যাণ, কাল তিনি হবেন বধু এবং এবং তারপর মাতা ও গৃহকর্ত্রী। দায়িত্ব ক্রমশঃ বাড়তে

বাড়িতে গুরুদায়িত্বের বোঝারূপে স্বল্পে চাপবে এবং তাঁর ওপরই নির্ভর করবে গৃহের সুখ-দুঃখ, শান্তি-অশান্তি। কিন্তু এই আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতা আধুনিকারা কি সেই গুরুদায়িত্বের বোঝা হয়ে গড়ে উঠছেন? অনেক অভি-ভাবিকা মনে করেন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেই শিক্ষা লাভ সম্পূর্ণ হয় এবং ছেলে মেয়েরা যাতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে সেই দিকেই শুধু দৃষ্টি দেন না। তার ফলে দেখা যায় অনেক মেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারিণী হয়েও সাংসারিক সং-শিক্ষার অভাবে সংসার জীবনে অনভিজ্ঞার স্ত্রায় আচরণই শুধু করেন না, নিজেদের এবং বিবাহ পরবর্তীকালে স্বশ্রমালয়েও অশান্তির সৃষ্টি করে সংসারে, বিপর্যয় আনয়ন করেন। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার যে তাঁরা বা তাঁদের পিতামাতারা একবার ভেবেও দেখেন না যে এই অশান্তির প্রধান কারণ হচ্ছে তাঁদের কন্যাদের অশিক্ষা বা কুশিক্ষা। পোক চক্রে পাশ করা মেয়েদের শিক্ষিতা বলে চালান গেলেও মেয়ে যে পুঁথিগত বিদ্যার বাইরে কোনও শিক্ষাই পায় নি এটা অভিভাবকরা বোঝেন না বা বুঝতে চান না। আর তাঁরা বোঝেন না বা স্বীকার করতে চান না বলেই তাঁদের কন্যারা অনেক ক্ষেত্রেই সং ও মেয়েদের উপযুক্ত শিক্ষার থেকে বঞ্চিত থেকে বান। কালিদাস, শেক্সপীয়ার, রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ করতে পারলে পরীক্ষায় ভাল নম্বর পাওয়া যেতে পারে। নিউটন, এভিসন, আইনস্টাইন, জগদীশ, সত্যেন্দ্রনাথ, হরেল-নারলিকেরও খিওরী মনে রাখতে পারলে পরীক্ষায় সাফলা লাভ করা সম্ভব হতে পারে, কোটলা, কাণ্ট, হেগেল, মিল, এমারসন, রাধাকৃষ্ণণের প্রবন্ধ বিবৃত করতে পারলে পরীক্ষায় কৃতকার্যতার সঙ্গে হয়ত ভাল চাকরীও পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু পারিবারিক জীবনে সাফলা লাভ করতে হলে, সংসারে শান্তি বজায় রাখতে হলে, সুখী ও মানসিক সুস্থ থাকতে হলে, এই পুঁথিগত শিক্ষাকে শুধু পরীক্ষা পাশের সহায় বলে মনে না করে, তাকে মনে প্রাণে গ্রহণ করে সংসার-জীবনেও কাজে লাগতে হবেই শুধু নয়, এর বাইরেও অনেক কিছু শিখতে হবে, বুঝতে হবে, জানতে হবে। তবেই শিক্ষা কিছুটা সম্পূর্ণ এবং সফল হয়ে ছাত্রীকে হবে তার অতীত ফল। কিন্তু এই স্থল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের

বীধাধরা পুস্তকের বাইরের সংসার জীবনের উপযোগী এই শিক্ষা মেয়েরা পাবে কোথায়? —এ প্রশ্ন অনেকেই করতে পারেন। তার উত্তরে বলব এ শিক্ষা তারা পাবে মায়ের কাছ থেকে; পাবে ঠাকুমা, দিদিমা, পিসিমা, মাসিমা, দিদি প্রভৃতি গুরুজনদের কাছ থেকে, পাবে প্রাচীনগ্রন্থীয়া মহীয়সী মহিলাদের জীবনীর থেকে। শিখবে কি করে কুমারী জীবনের পবিত্রতা রক্ষা করতে হয়; শিখবে কি করে বিবাহিত জীবনে চরিত্র মার্ঘ্যে, শাস্ত বাবহারে, স্ত্রী আচরণে স্বামী ও স্বশ্রমালয়ের সকলকে সুখী করে নিজেও সুখী হতে হয়; শিখবে কি ভাবে মাতা রূপে সন্তানকে চরিত্রবান, নিষ্ঠাবান, স্নানবান, সদাচারী, সত্যনিষ্ঠ কর্তব্যোগী, ধীমান করে তুলতে হয়; শিখবে কি ভাবে পরিণত বয়সে গৃহকর্ত্রীরূপে সত্য, শিব ও হৃদয়ের আরাধনা করে, সদাচার, ধর্মনিষ্ঠাও সেবার মধ্য দিয়ে জীবন অভিবাহিত করে, সংসারে আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হয় ও পারিবারিক শান্তি ও সুখ বজায় রাখতে হয়। যে সংসারে একরূপ আদর্শ নারীর অবস্থান হয় সে পরিবারের সন্তানেরা দেশের মুখোজ্জলকারী রূপেই গড়ে ওঠে। আর যে সব মেয়েরা এসব বিষয়ে লক্ষ্য না রেখে, পুঁথিগত বিদ্যাজ্ঞানেই সন্তুষ্ট থেকে, নিজেদের আমোদ, আশ্লাদ ও উচ্ছ্বাসভার গা চেলে দিয়ে চলেন, তাঁদের সন্তানদেরই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় রোয়াকে, রাস্তায় আড্ডা জমাতে, আর রেষ্টারার ‘ড্রেন্ পাউন্’ ও ‘স্ট্রাক্সম্’-এর প্রাধান্তে প্রগতির পরিচয় দিয়ে নকার-জনক ‘টুইষ্ট’ ও ‘শেক্’ নৃত্যের আনন্দে ও পান ভোজনে মত্ত হয়ে আছে। (‘টপ লেশ্’ এর আবির্ভাব এখনও হয়নি, তবে ভবিষ্যতের কথাবলা যায় না)। প্রগতির পরী-ক্ষাধ এরা অবশ্যই কৃতকার্য, স্থল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাতেও এরা অনেকেই সাফল্যলাভও হয়ত করেছে; কিন্তু সামাজিক জীবনের পরীক্ষায় তারা হয়ত সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়ে যাবে এবং তাদের ব্যর্থতাই সংসারকে, সমাজকে, দেশকে টেনে নিয়ে যাবে অধঃপাতের পথে। তাদের আত্মসমর্পণ আনন্দ একদিন তাদের জীবনেই হয়ত তেঁকে আনবে মহানিরানন্দ।

এর ওপর আছে বিদেশী প্রভাব ছুঁই শিক্ষায়তনগুলী। সেখানে বিদেশী ভাষা, বিদেশী ধর্ম, বিদেশী ভাব, বিদেশী

অভ্যাস, প্রভৃতির মধ্য দিয়ে শিক্ষা দান করা হয়ে থাকে। বিদেশী ভাষা, বিশেষ করে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করা নিন্দনীয় তো নয়ই, বরঞ্চ প্রশংসার যোগ্য—অবশ্য যদি ঐ সঙ্গে মাতৃভাষাকে অবজ্ঞা না করে নিজ ভাষাতেও ব্যুৎপত্তি লাভ করা হয়। কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় ছোট বেলার থেকে ইংরাজীতে ব্যুৎপত্তি লাভ করতে গিয়ে মাতৃভাষাকে সম্পূর্ণরূপে অবজ্ঞা করা হয় এবং ফলস্বরূপ নিজ ভাষাতে হয়ে পড়ে দুর্বল। অবশ্য তাতে তারা লজ্জা পায় না ইংরাজী ভাষা জানার অঙ্ক গর্বের! কিন্তু একজন ইংরাজ কখনও ফরাসী বা জার্মান ভাষা শিখতে গিয়ে নিজ মাতৃভাষাকে অবজ্ঞা করেছে বলে শোনা যায় না। এর পর আছে বিদেশী ধর্মের প্রচার ও বিদেশী অভ্যাসের প্রভাব, যা আমাদের সংসারে সব সময় চলে না তো বটেই বরঞ্চ আনে অশান্তি। কিন্তু আজকালকার ফাসনই হচ্ছে বরঞ্চ করবার সামর্থ্য থাকলে অকারণ খরচ করেও ছেলে মেয়েদের ঐ সব বিদেশী প্রভাবিত স্কুলে শিক্ষা দেওয়া। অবশ্য সব ক্ষেত্রেই যে ফল খারাপ হচ্ছে তা বলব না। আমাদের দেশীয় স্কুল-কলেজেও অনেক ‘শিব গড়তে বান্দর গড়া’ হচ্ছে।

যাই হোক, আমার এত কথা বলবার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে শিক্ষার গোড়াপত্তনের সময়ই যদি বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন না করা যায় তাহলে উত্তরকালে কৃষিকার বা অল্পপয়স্ক শিক্ষার প্রভাবে ছেলে মেয়েরা অস্থায়ী হয়ে পড়ে। বিশেষ করে মেয়েদের ক্ষেত্রে এই কৃষিকার প্রভাব হৃদয় প্রসারী হয়। এই কৃষিকা স্কুল-কলেজ থেকেই আহুক বা পিতা-মাতার কাছ থেকেই পাক, মেয়েদের জীবনে ঘোর বিপত্তির সৃষ্টি করে। সুতরাং এ বিষয়ে বিশেষ সাবধান প্রত্যেক পিতা-মাতার, বিশেষ করে মেয়েদের হওয়া উচিত। কারণ মেয়েদের প্রভাব মেয়েদের ওপর খুব বেশীই পড়ে।

এই প্রবন্ধটি পড়ে আমার অনেক পাঠিকা বোনেরই ‘কিম ক্র হরত কুক্ষিত হবই শুধু নয়, সনাতন পন্থী বলে অনেকই হরত আমাকে বিক্রপও করবেন। কিন্তু তার উত্তরে আমি শুধু এই কথাই তাঁদের বলব যে অতীতের বৃদ্ধ শ্রীমতী, শ্রীমতীর কথা ছেড়ে দিলেও, এই আধুনিক কালের রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রাস্ত্রী, রসীকনাথ, আন্তোভাব, প্রমুখ, জগদীশচন্দ্র শরৎচন্দ্র,

সুভাষচন্দ্র প্রমুখ দেশ বয়েশা মণীষীদের, বাঁদের অনেকের জন্ম শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করে দেশ আজ ধ্বংস হচ্ছে, তাঁদের স্মরণে এই আধুনিক যুগের আলোক প্রাপ্তি, উচ্চশিক্ষিতা মহিলাদের ক’জন তৈরী করেছেন এবং ক’জন করবার আশা রাখেন? ঐ সব মণীষীদের জননীরা উচ্চশিক্ষিতা তো ছিলেনই না, অনেকে আবার নিরক্ষরও ছিলেন! কিন্তু তাই বলে সন্তানদের হুশিক্ষা দিতে তাঁরা অপারগ ছিলেন না। তাঁদের সহজ, সরল ও নীতি, নিষ্ঠার সমুজ্জল জীবনাদর্শ; অস্বার্থপর ও ধর্মনিষ্ঠ আচরণ; শান্তিকামি, সেবাপরায়ণ সহৃদয় মন প্রভৃতির উজ্জল দৃষ্টান্তই ঐ সব মহীয়সী মহিলাদের সন্তানদের হুশিক্ষিত করে তুলত। প্রসঙ্গত উল্লেখ করি বর্তমান ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ললিতা দেবীর কথা। তিনি হুশিক্ষিতা হয়েও তাঁর চরিত্রগুণে, হৃদয় মাধুর্য্যে, ঐকান্তিক নিষ্ঠায়, ধর্মোচরণে আজ ভারতের মহিলাগণগণ্য বলে বিবেচিত হচ্ছেন। তাঁর চরিত্রই ভারতীয় মহিলাদের নিকট আদর্শ চরিত্রের উদাহরণ হওয়া উচিত বলেই মনে করি। আশা করি আমার মা বোনেরা আমার এই সব কথাগুলি ভেবে দেখবেন।

প্রসূতি-পরিচর্যা ও শিশুসম্ভল

ডাঃ কুমারেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম.বি

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

(৩)

প্রসূতি-অবস্থায় প্রত্যহ নিয়মিতভাবে দুধ পান ও ছানার তৈরী মিষ্টান্ন, শাকসবজী, ফলমূল প্রভৃতি ‘ক্যালসিয়াম’ (Calcium), ‘ফসফরাস’ (Phosphorous) ও ‘ভিটামিন’ (Vitamins) উপাদান-বিশিষ্ট পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ জননী ও শিশুর পক্ষে উপকারী। গর্ভধারণকালে প্রসূতি ও জন্ম-সময়ের অস্থি-পুষ্টির উদ্দেশ্যে এগুলি খেঁদন প্রয়োজনীয়, সন্তান-প্রসবের পর মাতৃসত্ত্ব পান করে শিশুর

শারীরিক উন্নতির জন্য এ সব খাদ্যোপকরণের ঠিক তেমনি আবশ্যকতা আছে। কারণ, গর্ভনিবেকের পর জননীর খাওয়ার খাবতীর পুষ্টিকর উপাদান পাচন-ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেহের রক্তনালী ও লসিকা-পথে বাহিত হয়ে জঠরভ্যন্তরে জমায়াস্থিত 'ফুল' বা 'প্লাসেন্টার' (placenta) ভিতর দিয়ে জগ্ন-শরীরে উপনীত হয়। বিধাতার বিচিত্র নিয়মানুসারে এই 'ফুল' বা 'প্লাসেন্টার' ভিতর দিয়ে শুধু পুষ্টিকর রাসায়নিক-পদার্থ ও খাদ্যপ্রাণ মাত্রই জগ্ন-শরীরে প্রবেশ লাভ করে এবং খাবতীর রোগ-জীবাণু ও বিষাক্ত-পদার্থকে গম্ভব্য-পথের গোড়াতেই বাধা দিয়ে প্রস্রাবের গর্ভস্থ-জগ্নের জীবন-রক্ষার সহায়ক হয়। এই সব রাসায়নিক ও খাদ্যপ্রাণ উপাদানের দৌলতেই জননী-জঠরস্থ জগ্ন-সন্তান তিলে-তিলে দৈহিক-পুষ্টিলাভ করে উত্তরোত্তর আকারে-আয়তনে ও গঠন-বৈশিষ্ট্যে পূর্ণাঙ্গ শিশুরূপে বর্ধিত হয়ে ওঠে। এ সময়ে কিন্তু ক্রমবর্ধমান সেই জগ্নের পক্ষে মুখ দিয়ে খাদ্যগ্রহণ করা কোনোমতেই সম্ভবপর হয় না। কাজেই 'ফুল' বা 'প্লাসেন্টার' ভিতর দিয়ে জননীর শরীরের রক্ত থেকে সংগৃহীত অক্সিজেন (Oxygen) ও বিবিধ পুষ্টিকর-উপাদান সেবন ছাড়া গর্ভস্থ জগ্ন-সন্তানের জীবন-ধারণের আর কোনো উপায় থাকে না। এই কারণেই গর্ভাবস্থায় প্রস্রাবের শারীরিক সুস্থতা রক্ষা এবং খাদ্যখাদ্য-বিচারের দিকে সবিশেষ সজ্ঞান করা দরকার। গর্ভাবস্থায় যে সব প্রস্রাব নিষিদ্ধভাবে ও যথোচিত পরিমাণে দুধ, ডিম, মাংস, শাকসব্জী, ফলমূল, ছানা-জাতীয় মিষ্টান্ন, কড লিভার তেল (Cod Liver Oil) প্রভৃতি সুপুষ্টিকর খাদ্যগ্রহণ করেন, তাঁদের সন্তান সচরাচর বেশ সজীব-স্বাস্থ্যবান ও সুঠাম-দৈহিক-গঠনের অধিকারী হয়ে ওঠে। গর্ভধারণকালে প্রস্রাবের খাচ্ছে উপযুক্ত 'ক্যালসিয়াম' বা চূর্ণ-জাতীয় উপাদান ও 'ভিটামিন' বা খাদ্যপ্রাণের অভাব ঘটলে, নবজাতকের 'রিকেটস' (Rickets) বা অস্থি-পুষ্টির ব্যাধাত ও রোগদ্রবতা দেখা দেয়... এমন কি, বন্ধা প্রভৃতি চুরারোগা-ব্যাধি, সরাসরি মৃত্যুগত থেকে সংক্রামিত না হলেও, অতি সহজেই এই সব অপরিপুষ্ট সন্তানকে প্রাণঘাতী-রোগের কবলে টেনে অকালেই বিশেষভাবে জীর্ণ-ক্ষতিগ্রস্ত করে তোলে। সুতরাং সন্তানের জীবন

বাহ্যমুক্ত রাখার উদ্দেশ্যে, প্রত্যেক প্রস্রাবেরই নিজের শারীরিক-স্বাস্থ্যোন্নতি ও যথোচিত খাদ্যখাদ্য-বিচারে সম্বন্ধে রীতিমত সাবধানতা অবলম্বন করা একান্ত প্রয়োজন। এ সম্পর্কে পাশ্চাত্য জগতের সুবিখ্যাত খাদ্যবিজ্ঞানবিদগণ ডাঃ পিঙ্ক যথার্থই বলেছেন—গর্ভসঞ্চারণে সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যেক জননীই এমন এক অমূল্য সম্পদের অধিকারিণী হন, সেটি দুনিয়ার কোনো কোটিপতির অর্থের বিনিময়ে লাভ করা আদৌ সম্ভব নয়।" বাস্তবিকই আজকালকার দিনে সুঅভিজ্ঞ মণীষীর এই সারগত উক্তিটি সকল প্রস্রাবেরই বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। কারণ অধুনা বিবিধ সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা-কটকিত আমাদের দেশে ব্যক্তিগত সুবিধা-সঙ্গতির দিকে সজাগ দৃষ্টি রেখে সংসারের নিত্যনৈমিত্তিক শত-সহস্র অভাব অভিযোগ, লাভ-লোকসান ও দায়-দায়ীত্বের প্রশ্ন শীঘ্রাংসা করে চলতে হয় ছোট-বড় প্রত্যেকটি গৃহস্থকেই। কাজেই ধরে-ধরে সুস্থ-সবল আনন্দোজ্জল শিশুর আবির্ভাব সম্ভবপর করে তোলা এবং ভবিষ্যতে রোগ-শোক ও নির্যাসীন সহস্র রক্তনীর উষ্ম-উৎকর্ষার অবাচ্ছন্দ্যকর উপদ্রব থেকে রেহাই পেতে হলে, শুধু যে প্রস্রাবের খাদ্যখাদ্য বিচার আর পরিচর্যার দিকেই মনোযোগ দেওয়া কর্তব্য তাই নয়, উপরন্তু, অহেতুক বহু সন্তানের জন্মদান রীতিও যথাযথভাবে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুপরিকল্পিত করে তোলা বিশেষ আবশ্যক। তাহলেই এদেশের সকল গৃহস্থের পক্ষেই সাংসারিক ও সামাজিক জীবনে সুষ্ঠুভাবে সর্বাঙ্গীন শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা সম্ভবপর হয়ে উঠবে।

গর্ভ-সঞ্চারণ ৪

এ সম্বন্ধে প্রত্যেক মহিলারই অল্প-বিস্তর ধারণা আছে, তাই বিশদভাবে আলোচনা না করে, আপাততঃ, মোটামুটি কয়েকটি দরকারী কথা বলে রাখি।

সাধারণতঃ, কোনো বিবাহিত-মহিলার স্বাভাবিক 'স্বত্ব' বা মাসিক রক্তস্রাব (Menstruation) যদি একাদিক্রমে দুইমাসকাল বন্ধ থাকে, তাহলে ধরে নেওয়া যায় যে তিনি গর্ভবতী হয়েছেন। তবে সকল ক্ষেত্রেই যে এ ধরণের লক্ষণ প্রকাশ পেলে গর্ভ-সঞ্চারণ হয়েছে বা সন্তান-সম্ভাবনা

সুনিশ্চিত, এমন ধারণা পোষণ করাও যথাযথ নয়। কারণ, দেখা যায় যে অনেক সময় ভয়ে-ভাবনায়, শোকে-দুঃখে, মানসিক দুশ্চিন্তা-অশান্তির ফলে এবং যক্ষ্মা, নিউমোনিয়া, ইনফ্লুয়েন্সা, স্ফুস্ফুসের প্রদাহ, মধুময় প্রভৃতি বিবিধ রোগের প্রকোপেও কোনো কোনো মহিলার স্বাভাবিক ‘স্বত্ব’ বা ‘মাসিক রক্তস্রাব’ সাময়িকভাবে বন্ধ থাকে। এমন কি, যথাযথভাবে গর্ভ-সঞ্চার হওয়া স্ববেশেও, কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় যে মহিলাদের কারো কারো বা হঠাৎ নিয়মিত স্বত্ব-স্রাবের পরিবর্তে দু’একদিন সামান্য রক্তস্রাব হবার পর, একাদিক্রমে নয়-দশমাসকাল ‘স্বত্ব’ বা ‘মাসিক-স্রাব’ বন্ধ থাকে এবং সন্তান-প্রসবের কয়েক মাস বাঁদে পুনরায় স্বাভাবিক রীতি-অনুসারে ‘স্রাব’ হয়।

গর্ভ-সঞ্চারের সুস্থিষ্ট এবং সনাতন লক্ষণ হলো—সকালের দিকে প্রসূতির গা বমি-বমি করা। তবে সকল প্রসূতিরই যে এমনটি হবে, তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই। প্রকৃতপক্ষে, সকল প্রসূতিরই অবশ্য সকালে ঘুম থেকে উঠবার পর অন্ন-বিস্তার এ ধরণের উপসর্গ দেখা যায়। সাধারণতঃ, সকালে প্রাতরাশের পর, রুচিকর খাদ্য-গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই এ উপসর্গের উপশম ঘটে। উপরন্তু, অলসভাবে চুপচাপ শুয়ে বসে সময় না কাটিয়ে সংসারের কাজকর্মে ব্যস্ত থাকলে ও স্বাস্থ্য সম্মত যথাযথ নিয়মাদি পালনেও প্রসূতিদের এই ‘গা-বমি-বমি’ উপসর্গের উপদ্রবটি সর্বশেষ প্রশমিত হয়ে যায়। তাছাড়া নিয়মিত ভাবে পরিমিত ও পুষ্টিকর খাদ্যগ্রহণ যথাযথ বিশ্রাম ও চিন্তা এবং কোষ্ঠকাঠিন্য দূরীকরণের উপযুক্ত ব্যবস্থাদি অহুসরণের ফলে, প্রসূতির পক্ষে এ-ধরণের উপসর্গের হর্তোগ থেকেও রেহাই পাওয়া সম্ভব হয়। অভিজ্ঞ-চিকিৎসকদের মতে, প্রসূতি অবস্থার এই সময়টিতে, কমপালেবু, টাটকা ফল, শাকসব্জী, মধু, ফলের রস প্রভৃতি বেশ উপকারী। প্রসূতিদের মধ্যে কারো কারো আবার আচার, চাটনী, মোরব্বা প্রভৃতির রসাস্বাদনের প্রতি বিশেষ অহুসাগ থাকে এবং এ সব মুখরোচক উপকরণগুলি খেলেও তাঁদের শরীরের কোনো গোলাযোগ ঘটে না। তবে সাধারণতঃ প্রসূতি-অবস্থার এ সব খাদ্য-বস্তু বর্জন করাই যে বিধেয়—বহু বিচক্ষণ প্রবীণ চিকিৎসক এমন অভিমত প্রকাশ করে থাকেন। শাস্তাত্য-চিকিৎসকদের

মতে, প্রসূতি-অবস্থায় রুটি বা পাউরুটি অথবা চোকল-মুগ [Whole meal] বিস্কুটের সঙ্গে মধু দিয়ে খাওয়া বেছে পায়ে। আমাদের দেশে পল্লীগ্রামে প্রসূতিদের মধ্যে ভাজা-চিড়া, মুড়ি, মুড়কী, খই প্রভৃতি খাদ্যগ্রহণের সর্বশেষ রেওয়াজ আছে। নিয়মিতভাবে পাতিলেবুর রস দিয়ে চিনি বা মিছরীর সর্বসং পান প্রসূতি-অবস্থার বিশেষ তৃপ্তিকর হবে। তবে যে সব প্রসূতির বেশী মিষ্টভার অহুসাগী নন, তাঁদের পক্ষে, ‘সুগার অফ্ মিল্ক’ [Sugar of Milk] অথবা ‘ল্যাক্টোজ’ [Lactose] ব্যবহার করাই উপযুক্ত। প্রসূতি-অবস্থায় অনেকে লেবুর রস মিশিয়ে চা পান করতে ভালবাসেন ও আরাম পান। তবে প্রসূতি-অবস্থায় চর্পি-বৃদ্ধ খাবার কম খাওয়াই ভালো এবং নিয়মিতভাবে কোষ্ঠ-পরিষ্কার রাখার উদ্দেশ্যে মাছ, মাংস আহার করাও কমিয়ে দেওয়া উচিত। যে সব প্রসূতি কোষ্ঠকাঠিন্যতার ফলে কষ্ট পান, তাঁদের পক্ষে প্রত্যহ নিয়মিতভাবে খেজুর, কিসমিস, মনাক্কা, ডুম্বর, ‘প্রুণ’ [Prunes] খাওয়া পরম-উপকারী। প্রতি সপ্তাহে মাত্র তিনটি ডিম [অর্থাৎ একদিন অন্তর একটি] হিসাবে খাওয়াই প্রসূতির স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে যথেষ্ট। এছাড়া নিয়মিতভাবে সাগু কিংবা সুজার পায়ের খাওয়াও প্রসূতির স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ হিতকারী। যথোচিত খাদ্য ও নিত্যনৈমিত্তিক কাজকর্মের ফলেও, যদি প্রসূতির বমন-তাব বন্ধ না হয়, তাহলে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়াই কর্তব্য।

[কপতর্ক]



সুপর্ণা দেবী

স্ব-স্বন্দর দৈহিক রূপ-লাবণ্যের মাধ্যমে অসংখ্য-অটুট রাখার উদ্দেশ্যে, শুধু যে নিয়মিত স্নান-প্রসাধন, যথোপযুক্ত

খাত্তোপকরণের ব্যবস্থা ও সাময়িকভাবে জোলাপাদি সেবনের দিকেই নজর রাখা দরকার তাই নয়, প্রত্যহ সহজ-সরল বিশেষ-ধরনের কয়েকটি ব্যায়াম-অস্থলীলনের আবশ্যকতা আছে। প্রতিদিন প্রাতে বা সন্ধ্যায় সামান্য কিছুক্ষণ নিয়মিতভাবে এই সব সহজসাধ্য ‘ঘরোয়া’-ব্যায়ামগুলির চর্চার ফলে, শরীরের পেশী-অঙ্গ, রক্ত-সঞ্চালন ও পাচন-ক্রিয়া প্রভৃতির ক্রমোন্নতি হয় এবং দেহ-মন সজীব-স্বঠাম হয়ে ওঠে। শারীরিক-স্বস্থতার জন্য নারী-পুরুষ প্রত্যেকেরই প্রত্যহ অল্প-বিস্তর ব্যায়াম-চর্চা যে একান্ত প্রয়োজনীয়—এ বিষয়ে বিশ্বের সকল অভিজ্ঞ-চিকিৎসকেরাই একমত। অর্থাৎ, আমাদের দেশে সকল সমাজের নারী-পুরুষেরই এদিকে তেমন বিশেষ আগ্রহ-অনুরাগ নেই...নিয়মিত ব্যায়াম-অস্থলীলন করা, অনেকের কাছেই নিতান্ত অসার-অপ্রয়োজনীয় এবং সময়ের অপ-ব্যবহারেরই সামিল মনে হয়। তাই তাঁরা রূপচর্চার এই একান্ত-আবশ্যকীয় কর্তব্যটি সম্বন্ধে আদৌ সচেতন হতে চান না! অটুট-স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়ে নীরোগ-দীর্ঘ-জীবনের আনন্দ-শান্তি উপভোগের বদলে, তাঁরা নিত্য-দিন ছোট-বড় শারীরিক-ব্যাধির উপভব সহেন আর ডাক্তার-বস্ত্র ওষুধের দৌলতে দৈনন্দিন-দুর্ভোগের সঙ্গে রীতিমত লড়াই চালিয়ে অসার বিলাস-প্রসাধনের মোহে তিলে-তিলে নিজেদের প্রাণ-শক্তির অপব্যয় করে অকালে অরোগ-দীর্ঘ হয়ে কোনোমতে বেঁচে থাকারটাই যেন বেশী পছন্দ করেন। কিন্তু সামান্য কষ্ট স্বীকার করলেই, এ দুর্ভোগের কবল থেকে তাঁরা সহজেই এবং সারা জীবনের মতো মুক্তি-লাভ করতে পারেন...প্রতিদিন মাত্র কিছুক্ষণের জন্য সরল-সহজসাধ্য কয়েকটি ব্যায়াম-অস্থলীলনের ফলে, অটুট-স্বন্দর দৈহিক-রূপ-স্বাস্থ্যের কলাপে নীরোগ দীর্ঘ জীবন তাঁদের পরম মধুর ও আনন্দোজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

রূপচর্চা-এসঙ্গে এবারে তাই সরল-সহজসাধ্য নিত্যসুই ‘ঘরোয়া’-ধরনের কয়েকটি ব্যায়াম-পদ্ধতির পরিচয় দিচ্ছি। এ ব্যায়ামগুলি যে মহিলাদের উপযোগী—সে-কথা বলাই বাহুল্য।

পাশের ছবিতে যে ব্যায়ামের বিশেষ-ভঙ্গীটি দেখানো হয়েছে—লেটি নিয়মিত অভ্যাসের ফলে,—মহিলাদের বক্ষ ও পৃষ্ঠদেশ, বাহু, কনু এবং উদরদেশের পেশী-ধমনী সমূহ

পরিপাটি-স্বঠামসৌষ্ঠব মণ্ডিত হয়ে ওঠে। এই ব্যায়াম-ভঙ্গীটির অস্থলীলন-পদ্ধতি হলো—পায়ের পাতা দুটি একত্রে জোড়া রেখে ঘরের মেঝের উপর সোজা-সটান দাঁড়িয়ে, ১নং ছবির ধরণে হাত দুখানিকে সিঁধাভাবে মেলে দিয়ে ধীরে ধীরে নীচে থেকে মাথার উপরে তুলুন। তারপর পুনরায় মাথার উপর থেকে ধীরে ধীরে হাত দুখানিকে বরাবর সিঁধাভাবে দেহের সামনে প্রসারিত রেখে শরীরটিকে সামনের দিকে ঝাঁকিয়ে ক্রমশঃ (কোমরটিকে দেহের সামনের দিকে নীচুভাবে ঝাঁকিয়ে) দেহের নীচের দিকে নামিয়ে এনে দুই হাতের আঙুলের ডগা দিয়ে দুই পায়ের পাতার উপরাংশ স্পর্শ করুন। কণকাল শরীরটিকে নিচু ভঙ্গিতে ঝাঁকিয়ে দুই হাতের আঙুলের ডগা দিয়ে দুই পায়ের পাতা স্পর্শ করে থাকবার পর, পুনরায় হাত দুখানিকে আগের মতোই শরীরের সামনের দিকে সিঁধাভাবে প্রসারিত করে ধীরে ধীরে মাথার উপর তুলে রাখুন। ব্যায়ামের এই বিশেষ ভঙ্গীটি অভ্যাসের সময়, হাত দুখানি উপরে-তোলা ও নীচে-নামানোর গতি-চন্দ্রের সঙ্গে সমানভাবে তাল রেখে ধীরে ধীরে নিশ্বাস-প্রশ্বাস নেবেন। এই হলো—



১নং ব্যায়ামের ভঙ্গীটির মোটামুটি পদ্ধতি। এ ভঙ্গীটি, যন্ততঃপক্ষে, দশবার আগাগোড়া অভ্যাস করা প্রয়োজন।



উপরে ব্যায়ামের যে ২নং ভঙ্গীটি দেখানো হয়েছে সেটি নিয়মিত অভ্যাসের ফলে, প্রথম ভঙ্গীটির অল্পরূপই দৈহিক-সৌষ্ঠ্যব হুগতিত করতে। ২নং ব্যায়াম-ভঙ্গীটির পদ্ধতি হলো—পায়ের দুটি পাতা একত্রে জোড়া দিয়ে ঘরের মেঝেতে আগের ভঙ্গীর মতোই সোজা-সটান দাঁড়িয়ে দুই হাতের কনুই বাঁকিয়ে মাথার পিছনে হাতের তালু দুইটি ছুঁইয়ে রাখুন এবং ধীরে ধীরে নিশ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে কেবলমাত্র কোমর থেকে দেহের উপরাংশটুকু ঈষৎ বামে ও দক্ষিণে বাঁকিয়ে একবার এদিকে এবং আরেকবার ওদিকে হেলান। এই ভঙ্গীটিও যন্ততঃপক্ষে, দশবার অভ্যাস করা দরকার।

স্থানাভাবের কারণে, আপাততঃ ব্যায়ামের বাকী ভঙ্গীগুলি প্রকাশ করা সম্ভব হলো না। আগামী সংখ্যায় সেগুলির চিত্র ও বখাযথ পদ্ধতি সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করবো।



হাতের কাজ

ষ্টেন্সিলের কারু-শিল্প

রুচিরা দেবী

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

কাঠের, কাগজের, কাপড়ের অথবা পোড়া-মাটির কিম্বা টিন বা লোহার তৈরী কোনো সামগ্রীর উপর ষ্টেন্সিল-কারুশিল্পের নক্সার হাঁচে রঙ ফলানোর সময় লচরায়ত একখানি 'ছাঁইচ' ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কিন্তু এ রীতি মেনেই যে সব সময়ে ষ্টেন্সিল কারুশিল্পের নক্সার হাঁচে রঙ-ফলানোর কাজ করতে হবে, এমন কোনো ধরা বাধা নিয়ম নেই। আসল কথা, যতটুকু তাতে শিল্প কাজ-করবার জন্য এক বা একাধিক 'চাঁচ' ব্যবহার—শিল্পীর যেমন সুবিধা হবে, তেমনভাবেই 'রঙ-ফলানোর' পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত। তাছাড়া যাত্র একটি 'ছাঁচ' ব্যবহার বলেই যে আগাগোড়া এক-বর্ণে নক্সার 'রঙ-ফলানোর' কাজ সারতে হবে—এমন ধারণা রাখাও ঠিক নয়। নক্সার হাঁচ একটি হলেও, এক-রঙার বস্তু সেটিকে সুবিধাবশত বহু-বর্ণে বিচিত্রিত করে তোলাও সম্ভব। এ প্রসঙ্গে দৃষ্টান্ত হিসাবে, ইতিপূর্বে গত জ্যৈষ্ঠ-১৩৭১ সংখ্যার প্রকাশিত ফুল-পাতার সহজ-সরল নক্সা-নমুনাটি এবং এবারের সংখ্যায় প্রকাশিত পরপুষ্পার আঙ্গারিক-নক্সার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

ষ্টেন্সিল-কারুশিল্পের উপযোগী এ দুটি নক্সা-নমুনাকে কুলির সাহায্যে অনায়াসেই যে কোনো সৌধিন-সামগ্রীর উপর অনোরম-ছাঁচে বহু বিচিত্র বর্ণে রঙ-কলিয়ে তোলা যাবে। অর্থাৎ, ফুলের পাতা ও ভাঁটা ফুটিয়ে তুলতে হবে

হালকা অথবা গাঢ় সবুজ রঙে...পাতার রঙ হালকা-ধরণের হলে, পাতার শিরাগুলিকে গাঢ় সবুজ রঙের রেখা টেনে



যে কোনো একটি রঙ ব্যবহার করে ফুলের পাপড়ীগুলিকে সযত্নে রঙ-ফলিয়ে তুলবেন। তাহলেই দেখবেন—কি সহজে আর কি অপরূপ-সুন্দর পরিপাটি ছাঁদে সৌখিন সামগ্রীটির উপর টেন্সিল-কার্‌কশিল্লের বিচিত্র নক্সা ছাঁচটি সূচিত্রিত হয়ে উঠেছে।

টেন্সিলের কার্‌কশিল্লের এই হলো মোটামুটি পদ্ধতি সামান্য চেষ্টা করলেই কয়েক দিন সযত্নে অঙ্কশীলনের পর শিক্ষার্থীরা যে অনায়াসে শুধু ফুল-পাতার নক্সার ছাঁচই নয়, টেন্সিল-কার্‌কশিল্লের আরো নানান বিচিত্র সুন্দর সুদৃশ্য মনোরম ছাঁদের আলংকারিক চিত্র রচনা করতে পারবেন—সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই।

আগামী সংখ্যায় আরেকটি অভিনব-অপরূপ কার্‌কশিল্ল সামগ্রীর রচনা পদ্ধতি সযত্নে আলোচনা করার বাসনা রইলো।

টেন্সিল কার্‌কশিল্লের কাজ করতে! হবে। পক্ষান্তরে, পাতার রঙ গাঢ়-সবুজ হলে, পাতার শিরাগুলি ফুটিয়ে তুলবেন—হালকা-সবুজ অথবা কাস্‌চে-সবুজ রঙের সাহায্যে। ফুলের পাপড়ীর রঙ হবে—যে সামগ্রীটির উপর টেন্সিল-কার্‌কশিল্লের নক্সার ছাঁচ তুলছেন, সেটির পশ্চাদ-পটের রঙের (Colour of the background) সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে, লাল, হলুদে শাদা, নীল, গোলাপী, আশমানী, হালকা-বেগুনী (Mauve or violet) এমন কোনো মানানসই ও পছন্দমত রঙে।

এক বা একাধিক রঙে সূরঞ্জিত করে সৌখিন কোনো সামগ্রীর উপর মনোরম-ছাঁদে উল্লিখিত টেন্সিল-কার্‌কশিল্লের নক্সা ছুটির ছাঁচে রঙ-ফলানোর সময়, প্রথমেই পাতা ও ডাঁটার অংশগুলি ভরাট করে তুলবেন। পাতা ও ডাঁটার অংশে প্রস্রোপিত-রঙটুকু আগাগোড়া বেশ শুকিয়ে যাওয়ার পর, সযত্নে-সতর্কভাবে সূর-তুলির সাহায্যে পাতার শিরাগুলিকে বধ্যাযথ রঙ-ফলিয়ে ফুটিয়ে তুলতে হবে। শিল্পীর সৃষ্টি আনুসারে, পাতা ও ডাঁটার ছাঁচে প্রথমবার ও দ্বিতীয়বার রঙ-ফলানোর ফাঁকে অথবা এ ছুটি পূর্বে পুরোপুরিভাবে সারা হলে, প্রয়োজনমতো লাল, হলুদে, শাদা, গোলাপী, নীল, হালকা-বেগুনী, অথবা আশমানী



ম্যাগিয়ার ব্রাউশ

সুলতা মুখোপাধ্যায়

সংসারের দৈনন্দিন কাজকর্মের অবসরে যে সব সৃষ্টিহীণ সৃষ্টি-শিল্পের অঙ্কশীলন করেন, তাঁদের সৃষ্টিধারী-জন্ম বিচিত্র সৌখিন-সুন্দর বিশেষ এক ধরণের ইউরোপীয়-ক্যাশানের ব্রাউশ রচনা-পদ্ধতির মোটামুটি পরিচয় দিচ্ছি। এ ধরণের ব্রাউশের নাম—‘ম্যাগিয়ার ব্রাউশ’...এ পরিচ্ছদের প্রচলন শুরু পূর্ব-ইউরোপ অঞ্চলে...এখন অবশ্য



স্বধীরা হালদার

এবারে ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অপরূপ স্বস্বাদু অতীব-উপাদেয় একটি আমিষ-খাবার রান্নার কথা বলছি। এ খাবারটির নাম 'টিকা-কাবাব'।

দু-তিন জনের আহ্বারোপযোগী 'টিকা-কাবাব' রান্নার জন্য উপকরণ চাই—একপোয়া মেটলি, আধখানা পাতি-লেবু এং প্রয়োজনমতো পরিমাণে ঘি, গোলমরিচের গুঁড়ো আর ছুন। এছাড়া এই খাবারটির প্রধান উপকরণ—অর্থাৎ, মেটুলির টুকরোগুলিকে আগুনের আঁচে ঝলসে বা শেঁবে-নেবার জন্য বিশেষভাবে দরকার স্বচ্যগ্র-প্রাস্তবিশিষ্ট লম্বা একটি লোহার শিক। এ ছাড়া প্রিয়জনদের পাতে পরিবেশনের সময় খাবারটিকে উপাদেয় করে তোলার উদ্দেশ্যে চাই—সরু ছাদে কুচানো কাঁচা পেয়াজ ও টোম্যাটোর ফালি।

উপরের ফর্দমতো উপকরণগুলি সংগ্রহ করে রান্নার কাজে হাত দেবার আগে, ধারালো একটি ছুরির সাহায্যে মেটুলিটিকে আগাগোড়া "৪।৩" ইঞ্চি আকারের ছোট-ছোট টুকরো করে কেটে, মেটুলির টুকরোগুলিকে পরিষ্কার-ঝলে ধুয়ে সাফ করে নিন এবং সেগুলিকে ভালো-

ভাবে ছুন, গোলমরিচের গুঁড়ো ও লেবুর রস মাখিয়ে রাখুন। এ কাজ সারা হলে আর একটু ঘি গলিয়ে নিজে লোহার শিকটির গায়ে পরিপাটিভাবে সেই উক তরং ঘিয়ের প্রলেপ মাখিয়ে আগাগোড়া বেশ 'তেলা' (Greasy) করে ফেলুন। এবারে ঐ 'তেলা-শিকের' সঙ্গে মেটুলির টুকরোগুলিকে একের পর এক স্তূভভাবে গেঁথে দিন এবং মেটুলির টুকরো-আটা লোহার-শিকটিকে দুই হাতে ধরে উনানের গরম-আঁচের ঈষৎ-উর্দ্ধে রেখে, সেটিকে অনবরত ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে মেটুলির টুকরোগুলিকে আগুনের তাপে বেশ ভালোভাবে শেঁকে-ঝলসে নিন। এভাবে ঝলসানোর ফলে, লোহার-শিকে আটা মেটুলির টুকরোগুলির প্রত্যেকটি আগাগোড়া বেশ 'স্ব-সিদ্ধ' (Perfectly roasted) হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে, সে গুলিকে সযত্নে ও সাবধানে লোহার শিক থেকে খুলে ফেলে পরিষ্কার একটি পাত্রে সঞ্চিত করে রেখে, সস্তা রান্না-করা 'টিকা কাবাবের' টুকরোগুলির উপরে কাঁচা পেয়াজের কুচো ও টোম্যাটোর ফালি ছড়িয়ে দিয়ে প্রিয়-জনদের পাতে পরিবেশনের উদ্দেশ্যে সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখুন। তাহলেই ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের রন্ধন-প্রণালী অল্পসারে 'টিকা-কাবাব' বানানোর কাজ শেষ হবে।

এবারে প্রিয়জনদের পাতে বিচিত্র-মুখরোচক এই আমিষ-খাবারটি সযত্নে পরিবেষণ করুন—আপনার হাতের রান্না 'টিকা কাবাবের' স্বাদ গ্রহণ করে তাঁরা প্রত্যেকেই যে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হবেন—সে কথা বলাই বাহুল্য।

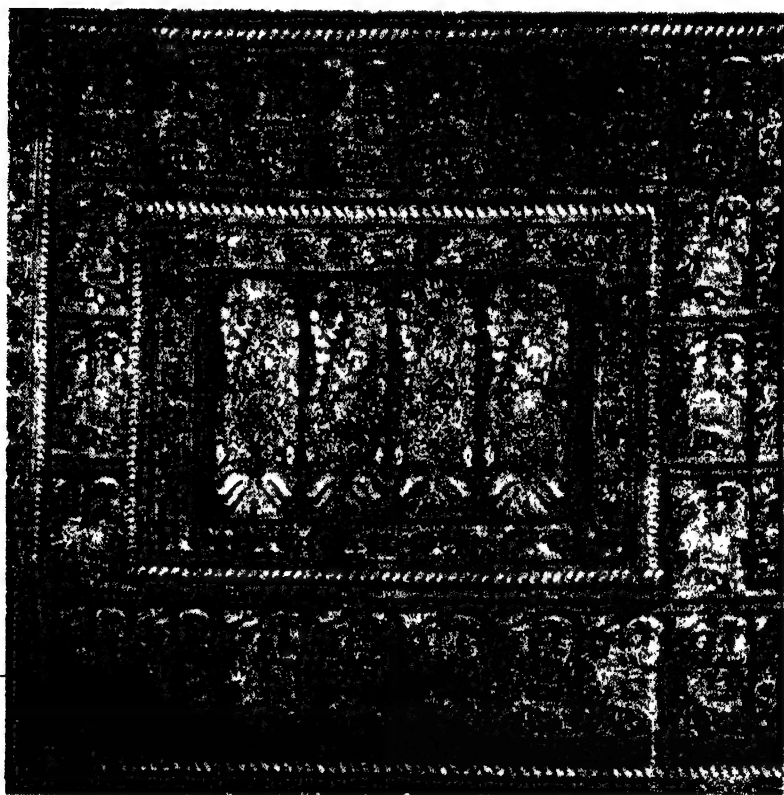
আগামী সংখ্যায় এমনি ধরণের আরেকটি অভিনব-উপাদেয় ভারতীয় খাবারের রন্ধন-প্রণালীর হৃদিশ দেবার বাসনা রইলো।



আবরণে রূপস্ফটি

মেশিনের যুগেও যে গ্রামের কারিগরের হাতের কাজ একেবারে মরে যায়নি, তার কয়েকটা কারণের মধ্যে একটা হচ্ছে—এ কাজের শিল্প সৌকর্য, এর বিশিষ্ট রূপ, এর মনুষ্যের সৌন্দর্য-পিপাসা যেটানব ক্ষমতা। আজ যে

করেন নি; করেছিলেন নেহাৎই মাত্রের প্রয়োজন যেটানব ক্ষমতা। আদিযুগে তাই অত্যন্ত সাধারণ জিনিষ, মাটি দিয়েই এদের প্রবর্তন হয়েছিল। অভ্যাসের বিবর্তন, জীবনধারণের বিবর্তনের সঙ্গে এলো ধাতু—তামা, পিত্তল, লোহা। তৈরী জিনিষগুলি আরো টেকসই হোল, হোল



বালুচর সাড়ার আঁচলার কলকার কাজ। চারদিকে হাতীর পিঠে সওয়ার দেখা যাচ্ছে।

জিনিষকে নিছক শিল্পকলার নিদর্শন বলে আমরা বাহুঘরে রেখে দেই, গতকাল তা ছিল দৈনন্দিন প্রয়োজন যেটানব সাধারণ জিনিষ। একটা প্রদীপ বা পিলুজ, মাটির খট, খাবার থালা, জলখাবার গেলান—এগুলির উদ্ভবের আদিতে এদের অষ্টা রূপের কথা চিন্তা করে এদের স্ফুটি

আরো কাজের উপযোগী। নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এগিয়ে চলেছে সভ্যতা। সেই পরীক্ষা-নিরীক্ষায় কেমন করে মাটির প্রদীপের ভাঙ্গণ-স্বয়ং ঘর আলো করল নিয়নের টিউব—সেকথা এখানে অবান্তর। শুধু একটু কবাই মনে করা যেতে পারে যে এই ক্রমবিবর্তনে প্রদীপ গড়বার

ধাতু ইত্যাদির যেমন বহুল হয়েছে, তেমনই নানা সময়ে এর আকৃতিরও হয়েছে পরিবর্তন। কালের যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে যেতে যেতে এর স্তম্ভাশিল্পী প্রয়োজন মেটাবার উদ্দেশ্য ছাড়াও, এর সঙ্গে নতুন রূপ সৃষ্টি করে মানুষের মনে আনন্দ দিতে চেয়েছে।

হস্তশিল্পের এই রূপসৃষ্টির একটা দিক আলোচনা করি।

সভ্যতার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ নিজেকে আবৃত করতে শিখেছে। দেশে দেশে জলবায়ুর তারতম্যের অনুসারে, এই আবরণ বা পোষাকের রীতিভেদ দেখা যায়। সূক্ষ্ম-বস্ত্র বয়নের ঐতিহ্য বাংলায় অতি প্রাচীন। কার্পাস তুলোর ব্যবহার বাংলাদেশে সূদূর অতীতে ছিল এবং মিশরের মমির গাত্রাবরণ সূক্ষ্মবস্ত্র যে বাংলাদেশজাত, কোন কোন ঐতিহাসিক এমন ধারণাও পোষণ করেন। পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত খৃষ্টপূর্ব তিনচারশ বছর আগেকার পোড়া-মাটির মূর্তি থেকে সেকালের এদেশের পরিধেয় সম্পর্কে সূক্ষ্মচিত্র পরিচয় পাওয়া যায়। আরো পরবর্তীকালের বাংলার পাথরে গড়া মূর্তিতে নানাকারুকার্য-খচিত সূক্ষ্ম-বয়নের নিদর্শন প্রচুর দেখতে পাই। বাংলার কুশনী তাঁতশিল্পীদের একদা সবিশেষ নাম ছিল প্রাচীন রোমে। এখানকার বয়ন-শিল্পীদের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন সেকালের রোমীয় ঐতিহাসিকেরা। বাংলার মল'লনের নাম ত' ভূবনবিখ্যাত।

বাংলার তাঁত-শিল্পীরা তাঁদের সৌন্দর্য্যসৃষ্টির এক অত্যাশ্চর্য্য নিদর্শন রেখেছেন সুনিপুণ-কৌশলে বোনা নানারকম নকসা-করা রেশমী ও সূতীর সাড়ীতে। এমনই এক শিল্প-সৃষ্টি বালুচর সাড়ী। মুর্শিদাবাদ জেলার জিয়াগঞ্জ সহরের উত্তরে বালুচর গ্রামের থেকেই এ সাড়ীর নাম। 'মটকা' বা 'কেটে' জাতীয় রেশমী সূতো দিয়ে এ সাড়ী বোনা। সাধারণতঃ রেশমী সাড়ী যে সূতো দিয়ে বোনা হয়, তাকে বলে 'খয়র'। এই সূতো বের করতে গুটি কেটে গুটিপোকা বেরিয়ে যাবার আগেই গুটিগুলিকে সিঁদ্ধ করে নিতে হয়। মটকার সূতো, পোকা গুটি কেটে বেরিয়ে যাবার পরে—সেই গুটি থেকে কাটা। ধর্মপ্রাণা হিন্দুনারী ধর্মীয় কাজে শুদ্ধ-বস্ত্রের ব্যবহারই শ্রেয় মনে করে থাকেন। মটকার সূতো কাটার জন্য প্রাণীহত্যা

করা হয় না, তাই এই সূতোর কাপড় বিস্তৃত বলে ব্যবহার করা হোত। আর হিন্দুসমাজে নারীর সেকালে যে উৎসবেই যোগদান করতেন, তারই মূলে ছিল ধর্মাহুষ্ঠান—তাই এ সাড়ী ধনীগৃহের গৃহিণীদের উৎসবের সাজ হিসাবে বিশেষ আদরের জিনিষ ছিল।

সৌন্দর্যের দিক দিয়ে বালুচর সাড়ীর তুলনা নেই বললেই চলে। পনরটি রং বালুচর সাড়ী বয়নে ব্যবহার দেখা যায়। জামনী, কালো, আশমানী, গাঢ় নীল, আনারদান, হলুদ, কমলা, সাধারণতঃ বালুচর সাড়ীতে সৌন্দর্য্যসৃষ্টির জন্য এই রংগুলিরই প্রয়োগ দেখা যায়।

বালুচর সাড়ীর রূপসৃষ্টির কথা বলতে গেলে, যার কথা না বলে আরম্ভ করা যায় না—তার নাম দুবরাজ দাস। ১৮১৩ সালে তাঁর জন্ম। বালুচর সাড়ী যদিও নবাবী-আমলের সৃষ্টি, তথাপি এর প্রসারে দুবরাজের দান অসামান্য। নক্সা-তাঁতে বালুচর বোনা হয়। দুবরাজ তাঁর সাড়ীর রূপবিজ্ঞানের জন্য তাঁত-গঠনের কাজেও ছিলেন সূক্ষ্ম কারিগর। দুবরাজই শেষশিল্পী যিনি বাজারের জন্য বালুচর সাড়ী বয়ন করে গিয়েছেন। দুবরাজই শেষ শিল্পী যিনি তাঁর স্বাক্ষর-সমন্বিত কাজ রেখে গেছেন। দুবরাজের তাঁতগুলি এখনও আছে। এই ধরনের তাঁতে তাঁর স্বযোগ্য শিষ্য শ্রীহরষ ভট্টাচার্য কিছুদিন আগে একটি সূন্দর বালুচরী কমাল বয়ন করেছেন। একাজে তাঁর সময় লেগেছিল ১৪ মাস।

দুবরাজ দাস ও তাঁর সাক্ষরদ্বারা যে বিভিন্ন নক্সার সৃষ্টি করে গিয়েছেন, তা দেখে বিস্মিত হতে হয়। যে বর্ণাঢ্য বয়নসম্ভার সত্ত্বেও দুবরাজের কোন সাড়ীর রংই চোখের পীড়াদায়ক ত' হয়নি—বয়ন নয়নানন্দকর হয়েছে। অথচ প্রচলিত রীতি লঙ্ঘন করে নক্সা বানা ও রংএর ব্যবহার করে যে সাহস তিনি দেখিয়েছেন তা সে যুগে অতুলনীয়। যে বিচিত্র সাড়ী তিনি বয়ন করেছেন, তার জমির লহরের কাজ, পাড়ের অলঙ্কার, কোণার 'কুঞ্জর ছবি, জমকাল নক্সা করা আঁচলার কাজ সেকালের অভিজাত নারী-সমাজে বহুল সমাদর লাভ করেছে। এ সাড়ীগুলি দৈর্ঘ্যে ১০ হাতের বেশী আর চওড়ায় ৪২ থেকে ৪৫ ইঞ্চি হোত। সেকালে এরকম এক একখানা সাড়ীর দাম ১০ টাকা থেকে ৫০ টাকা পর্যন্ত হোত। অবশ্য

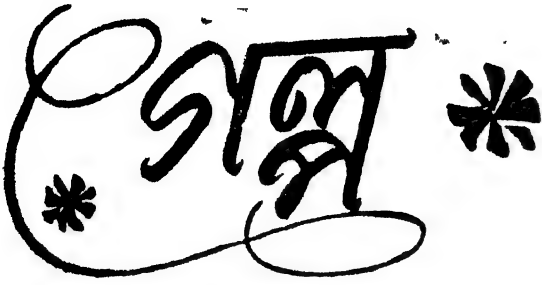
এখনকার হিসাবে, এর দাম অন্ততঃ পক্ষে দশগুণ বেশী হবে। সম্ভাব্যের সাড়ীগুলির আঁচলার বদলে থাকত চার কোণায় চারটি ‘কুঞ্জ’ বা ‘কলকা’। হুবহু তাঁর তাঁতে চৌকোণা কুমাল, আর টেবিলরূপে বুনছেন। টেবিলরূপে গুলি ৬ হাত লম্বা আর ৩ হাত চওড়া হোত, দাম হোত, ৫০৫০ টাকা। এছাড়া নামাবলী ধরণের একরকমের গার-বস্ত্রও হুবহু তাঁতে বুনতেন—যার অঙ্গে ধর্মগ্রন্থ হতে উদ্ধৃত শ্লোক বোনা থাকত। কিন্তু শোনা যায়, বৃদ্ধ বয়সে তিনি নিজে এধরণের অঙ্গবস্ত্র বোনা ছেড়ে দিয়েছিলেন। কারণ এধরণের বস্ত্রবয়নের সময় ৭৭ দিয়ে সূতো সরিয়ে দিতে হোত। এতে তাঁর ধর্মবিশ্বাসে আঘাত লাগত। তাই এ জিনিষ বোনার জ্ঞান তিনি ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভব হেরদেব ভট্টাচার্যকে তাঁর শিষ্যত্বে গ্রহণ করেছিলেন।

হুবহুজের নক্সা তাঁতের এক আধুনিক সংস্করণ কিছুদিন হোল চালু হয়েছে। বাংলায় তার কোন নাম আছে কিনা জানিনা, তবে ইংরেজীতে তাকে ‘জ্যাকার্ড-লুম’ (Jacquered Loom) বলা হয়। এ তাঁতে নক্সাদার কাপড় বোনা যায়। তবে, নক্সা তাঁতের অনেক কাজ, যেমন পর পর চৌখপী-নক্সা আঁচলের চারপাশে পর পর বোনা—যা বালুচর সাড়ীর এক বৈশিষ্ট্য—সেটি এ তাঁতে সম্ভব হয়নি এখনও।

বালুচর সাড়ী এখন আর বোনা হয়না। যে সব সাড়ীর নমুনা এখনও দেখা যায়, তার বৈশিষ্ট্য তার জমি, আঁচল আর পাড়ের নক্সায়। নক্সাগুলি বিশেষভাবে রঙানো রেশমী সূতোয় বোনা। সম্ভবতঃ প্রথমে নক্সা-গুলি কাগজে আঁকে নেওয়া হোত—তারপর সেই নক্সা দেখে বোনা হোত। বৃটিশার বালুচর জমিতে সাধারণতঃ, ‘বুটি’ বা ‘ফুল’ বা ‘কলকা’ বোনা হোত। নিপুণ শিল্প-বোধ দিয়ে সৃষ্ট এই বুটিগুলি—এত স্বন্দরভাবে সাজান যে দেখলে মনে হয়—যেন ফুলে-ঢাকা একটি সুসজ্জিত বাগান। বৃটিশার বালুচর সাড়ীর প্রধান আকর্ষণ—এর আঁচলার কাজ। এই আঁচলা-বোনার মধ্যেই বয়নশিল্পীর শিল্প-উৎকর্ষ দেখা যায়। নানা চণ্ডের নানা চিত্রের সাহায্যে বোনা আঁচলার শিল্পশৈলীর—অর্থাৎ যাতে পাড়ের কাজের সঙ্গে সমন্বয় থাকে, সে সম্বন্ধে শিল্পী যথেষ্ট সতর্ক। বালুচর সাড়ীর আঁচলার মধ্যে যেমন ফুল,

কলকা ইত্যাদির সমাবেশ থাকে তেমনই থাকে বিশেষভাবে আঁকা সমাজজীবনের বিচিত্র নক্সা। কোনটাতে যুগলমুতির চৌকো প্যানেলে আঁচলের চারিদিক ভরিয়ে দেওয়া হয়েছে, কোনটাতে নর্তকী, কো-টাতে আবার জনাকীর্ণ রাজসভার ছবি। ১৮২০ সালের পরে বোনা বালুচর সাড়ীতে সাহেব, মেমসাহেব, সিপাহী, সাত্তী, গোলন্দাজ ইত্যাদির প্রাদুর্ভাব দেখা গিয়েছে। একখানা বালুচর সাড়ী এখনও দেখা যায়, যার আঁচলার প্যানেলে বোনা হয়েছিল—বেল ইঞ্জিন—তাতে টুপিমাখায় দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ইঞ্জিন ড্রাইভার, আর সে ইঞ্জিনের পেছনেই রেলগাড়ীর কামরায় বসে আছে যুগল ইয়েরোপীয় আরোহী। সাড়ীর আঁচলার বিচিত্র নক্সাদার প্যানেলগুলি বিষ্ণুপুর বা বীরভূমের প্রাচীন মন্দিরগায়েত্র পোড়ামাটির প্যানেলকে মনে করিয়ে দেয়। আগেকার দিকের বোনা বালুচর সাড়ীর আঁচলার দেখা যায় কলকার প্রাধান্য। কলকার ও নানা রূপবিস্তার। কখনও কখনও বড় বড় কলকার ভেতরে ছোট কলকা অথবা কলকার ভেতরে ফুল বা শাখের প্রতিলিপি। আর একটি নক্সার প্যানেল এ যুগের সাড়ীতে দেখা যায়—তাতে অঝোরোহিনী এক মহীয়সী মহিলার চিত্র। স্থানকাল বিবেচনা করে অনেকে মনে করেন, এ চিত্রটি রাণী ভবানীর প্রতীক। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে বালুচর অথবা মীরপুর গ্রামের ওপারে গঙ্গাতীরে বড়নগরে ছিল এই মহীয়সী নারীর আবাসস্থান।

বাংলার তাঁতশিল্প তথা হস্তশিল্পের ঐতিহ্যে বালুচর সাড়ী এত বিশাল স্থান অধিকার করে আছে যে ‘অঙ্গ-কথায় বলে সে কাহিনী শেষ করা যায়না। বালুচর ছাড়াও বাংলার তাঁতশিল্পীদের কীর্তির আরো বহু নিদর্শন রেশমে ও কার্পাসে আজও বাংলাদেশে ছড়িয়ে আছে। সারা পশ্চিমবাংলায় আজও পাঁচলক্ষ বয়নশিল্পী বাংলার হাতে হাতে তাদের যে শিল্প নৈপুণ্যের পসরা প্রতিদিন নিয়ে আসছেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য আরো অনেক কিছুই আছে। শান্তিপুর, ধনেখালি, বেগমপুর, রাজবলহাট, করাসড়াঙ্গা, বিষ্ণুপুর, মুর্শিদাবাদ আর মালদার এই সব হুনিপুণ শিল্পীদের কথা বারাস্তরে বলবার ইচ্ছা রইল।



অবশেষে

বুদ্ধদেব গুহ

তাপস গত দু'মাস ধরে বেবাকে পড়াচ্ছে। নিঃস্বার্থ ছাত্রী। ইংরাজীতে কাঁচা। তাপসকে রাখা ইংরেজীটা দেখিয়ে দিতে।

পড়ার সময় লক্ষ্য করেছে তাপস মেয়েটির হাবভাব। তেমন ভাল লাগেনি। পড়া শুনতে শুনতে অথবা অল্পমনস্ক হয়ে যায়। কখন সোজা তাপসের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে খুব অল্পকারণেই হেসে লুটিয়ে পড়ে। তাপস মুখ গভীর করে থাকে প্রবীণশিক্ষকের ভঙ্গিতে। ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কে তিলমাত্র ভেজাল থাকা উচিত নয়। নিজের ক্ষেত্রে ভেজাল থাকার কোন প্রয়োজনও বোধ হয়নি তাপসের। কারণ, সে ইতিমধ্যেই প্রেমভিত্তিক হয়েছে অল্প। নায়িকা থাকেন অংশু প্রবাসে—জামসেদপুর। তাই পরস্পরের কথা সাক্ষাৎ নেই অনেক দিন। গত পূজোয় শেষ দেখা। তা বলে পত্রবিনিময়ে জ্ঞাতি নেই কোন। ইদানীং নায়িকা প্রতিটি পত্রই নায়ককে জামসেদপুর যাবার ব্যাকুল আমন্ত্রণ জানাচ্ছে।

তাপসের নিজেকে অপরাধী মনে হয়েছে একেক সময়। তার খুবই উচিত অন্তত একটিবার করবীর সাথে দেখা করে আসা। এমন কীইবা দূর। মেলে চাপলে ঘটা চারেক। প্রত্যেকবার ভাবে তাপস আগামী মাসে নিশ্চয় যাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অর্ধে ঘাটতি পড়ে যায়। হয় জামাগুলো সব একসঙ্গে ছিঁড়তে আরম্ভ করে, নইলে স্বপ্ন হয় মার' হাটের অস্থখটার বাড়াবাড়ি। বাওয়া আর হয়ে ওঠেনা শেষ পর্যন্ত। করবীকে জানায় সে-কথা পত্রযোগে।

করবী উত্তর দেয় গুটা ওর নিছক ছল। আসলে ও অল্প...। এখানে ইনটারেট জুরিয়ে যাচ্ছে ক্রমশঃ।

কোন কোন মুহূর্তে এ-কথাটা তাপসেরও যে মনে হয়নি তা নয়। করবীর প্রতি আকর্ষণ ঠিক আগের মতই অটুট আছে এমন কথা সে নিজেই হলপ করে বলতে পারেনা। ভেবে মনে মনে লজ্জা পেয়েছে তাপস। কিন্তু কথাটায় যেহেতু কিছু সত্য আছে, সেহেতু ভাবনাটাকে মন থেকে এক নিমেষে উড়িয়ে দেওয়া যায় কেমন করে?

করবীর প্রতি আকর্ষণ কমে যাচ্ছে কেন? মনকে প্রশ্ন করেছে তাপস। যে কারণটা তার প্রথম এবং খুব সহজেই মনে হয়েছে তা আর কিছুই নয়, করবী বড় পুণনে হয়ে গেছে। খুব স্বাভাবিক। করবীর সাথে প্রেম তার বহু কালের।

এছাড়া অল্প কোন কারণ? নতুন কারোও দিকে তার আগ্রহ বাড়ছে নাকি? অবচেতন মনটার গভীর সমীক্ষায় বাস্তব হয়ে পড়ল সে। নতুন পরিচিতাদের মধ্যে...রেণা? দূর, ছোট্ট একটা মেয়ে, কীইবা বোঝে এ-সবের। কীই বা বোঝে—কথাটা মনঃপুত হল না। কারণ রেণার চলনে বলনে ও যে অনেক কিছু বোঝে এটাই বরং তার সময় সময় মনে হয়েছে।

'বেশী ছাত্রী', অন্ততঃ এ কথাটাই বলে বন্ধুদের মুখ বন্ধ করেছে বহুবার। কেউ কেউ অবশ্য তীক্ষ্ণ প্রশ্ন আরও ছুঁড়েছে! বলেছে, ছাত্রী তো কি? লাভ ইজ রাইও। বলে হেঃ হেঃ করে হেঁহায়ার মতো মুখের দিকে তাকিয়ে হেসেছে।

পরের দিন যথারীতি পড়াতে গেলো তাপস। সেদিনও সে লক্ষ্য করল রেণার মাত্রাতিরিক্ত চঞ্চলতা। মাষ্টার মশাইর চেয়ে সে-ই বেশী কথা বলে। নানা রকম বাগ্মন্য ধরে। বলে, আজ থাক রাণেলের প্রবন্ধটা। গুটা বড় শক্ত। তার চেয়ে একটা কবিতা পড়ি আজ, কেমন?

'ট্রাভেলিং গ্রাজু এ পাট' অব 'এডুকেশন' ইংরাজী আপোচনা শুনতে শুনতে অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন ফুলতে থাকে রেণা। বেড়াতে কি সজাং লাগে না? আপনি বেড়াতে ভালবাসেন? বেড়াতে কোথাও গিয়েছেন?

তাপসের ব্যক্তিগত জীবনে ভ্রমণ অভিজ্ঞতা খুবই সন্ধিপ্ত। চিন্তা করে দেখলে বড়জোর গিরিডির কথাই মনে পড়ে। গত মহাযুদ্ধে বোমার ভয়ে পালিয়ে ছিল সেখানে। তখন তার ছোটবেলা। এ ছাড়া—হঠাৎ মনে পড়ে যায় জামসেদপুরের কথা। করবীদের বাড়ি জামসেদপুর। বেশ কয়েকবার গিয়েছিল সে সেখানে। রেবাকে জানালো তাই তার বিশাল ভ্রমণ অভিজ্ঞতার কথা। এক গিরিডি, দুই জামসেদপুর।

জা-ম-সে-দ-পুর? চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল রেবা, দুই তুরু তার কপালে গিয়ে ঠেকেছে।

জামসেদপুরের কোথায়? আবার কোতুল।

উত্তরটা দেবার ইচ্ছে ছিলনা তাপসের। প্রেমের ব্যাপারে একটা গোপনতা রক্ষা করার প্রবণতা সব প্রেমিকেরই অঙ্গবিস্তার থাকে। তবু বলল, বিটুপুরে।

বি-টু-পুরে? মাঝাতিরিক্ত বিষয় রেবার।

সেখানে আমার এক ঘনিষ্ঠ বান্ধবী আছে জানেন?

হবে। নিলিপ্তভাবে উত্তর দিল তাপস। কে আছে, কি আছে, সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ কি দূর তাতে তার প্রয়োজন কি? তাই প্রশ্নস্রোতের তৎক্ষণাৎ চলে গিয়ে চড়া গলায় বোঝাতে শুরু করল শিখা ক্ষেত্রে দেশভ্রমণের ভূমিকা কি।

সেদিন জরুরী একটা কাজ ছিল বলে তাপস একটু আগে উঠল। কিন্তু তবু বাধা পড়ল বেরতে গিয়ে। আগামী রোববার সকালে মেট্রোতে জুলিয়াস সীজার আসছে, দেখেছেন?

না, দেখিনি।

আপনি যাবেন দেখতে?

না।

কেন? চলুন না, আমিও যাবো। একটু খেয়ে বলল, বাড়িতে নিয়ে যাবার মত কেউ নেই তো, তাই বলছি। বাবার মায়লার কতগুলো জরুরী কাজ পড়ে গিয়েছে, উকিলের কাছে দৌড়তে হবে।

রেবার মাও ঠিক সেই সময় এক কাপ চা হাতে নিয়ে টুকলেন। এমনি কপাল, আলোচনার বিষয়বস্তু পুরোপুরি না তুললেও তিনি মেয়ের কথার অন্তর্দৃষ্টিভাবে বহুবৎ সার দিয়ে গেলেন।

অগত্যা তাপসের গররাজী হবার উপায় রইল না।

ছবিটা দেখার আত্মপক্ষসমর্থনে শেষ কৈফিরং দিল রেবা: 'জুলিয়াস সীজার' আমাদের কোর্সে' আছে তো। ছবিটা দেখলে পড়ার কাজটাও হয়ে যাবে।

'জুলিয়াস সীজার' দেখার পর থেকেই রেবার সঙ্গে তাপসের অন্তরঙ্গতা অপ্রতিরোধ্যভাবে বেড়ে গেল। ছবি দেখার দিন থেকেই শুরু হয়েছিল খুব স্বাভাবিক রীতিতেই। পাশাপাশি বসে দেখতে দেখতে সেক্সপীয়রের শব্দ লাইন-গুলোর তর্জমা করে দিচ্ছিল। রেবা খুব কৃতার্থ বোধ করছিল। তাই ছবিটা দেখতে দেখতে সে একসময় বলল, আপনি না এলে বইটা কিছুই উপভোগ করতে পারতাম না। তাই না?

শো' ভাঙ্গলে হলের পাশের কান্ধে ডি মনিকোতে চা খাওয়া হল ছোট্ট কেবিনে ঢুকে মুখোমুখি বসে। কেমন কেমন বোধ হচ্ছিল তাপসের। তারা খেন শহরের আর পাঁচটা প্রেমিকের মত। এক সময় মনেও পড়ল করবীর কথা। করবীকে নিয়ে মনিকো'তেও একসঙ্গে বসে চা খেয়েছে গত পূজোয়। করবী তখন কলকাতা বেড়াতে এসেছিল।

পরের দিন টিউশনিতে যেতে নিজের পরিবর্তনটা নিজের কাছেই ধরা পড়ল তাপসের। রেবার প্রগল্ভতা, মাঝাতি-রিক্ত উজ্জলতা, প্রশাসনের আতিশয্যা কোনটাই খারাপ লাগে না তার। পড়বার ফাঁকে ফাঁকে বিষয়ান্তরে চলে যাচ্ছে নিজের অগোচরে। পাঠ্যপুস্তকের বাইরে একটা তুলন্ত জগতের সন্ধান দেবার বাসনা অহরহ মনের মধ্যে উকি দিচ্ছে, রেবাও তাপসের মুগ্ধচোখের ভাবসার তার স্বভাবস্বলভ কৌতুহলের সঙ্গে নিরীক্ষণ করে চলেছে এবং মাঝে মাঝে অকস্মাৎ বেনামাস হাসিতে তাপসের বক্তৃতাকে অতিনিদ্রিত করছে।

করবীর একখানা চিঠি এল। এবার চিঠির মধ্যে কিছু ফুলের আলুগা পাপড়ি পুরে দিয়েছে সে। চিঠিতে অদ্ভুত একটা স্বপ্নের কথা লিখেছে। স্বপ্নটা দেখেছে যে রাতে—তার পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই চিঠিটা লিখে ফেলেছে বিছানার ভেতর তরে। সম্প্রতি অস্থির ভুগছে সে। স্বপ্ন দেখেছে, তাপস গিয়েছে জামসেদপুর। আর

বিছানার পাশে রাখা ছোট্ট কাঠের চেয়ারটার বসেছে সে। বসে বসে তার অগ্রতপ্ত মাথার হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। পরে কোয়া ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে নিজে হাতে কয়েকটা কমলাও খাইয়েছে। করবী আনন্দে মরতে চেয়েছে সেই মুহূর্তে।

আশ্চর্যের কথা এই চিঠিতে সে আর যেতে লেখনি তাপসকে। লিখেছে, তোমার যা খুশী তাই কোরো। হুঁহু কবিতাও উদ্ধৃত করেছে চিঠির সমাপ্তিতে—

যদি আর-কারে ভালবাসো, যদি আর ফিরে

নাহি আসো

তবে তুমি যাগা চাও তাই যেন পাও, আমি

যত দুঃখ পাই গো।

চিঠিটা পড়ে একটা বৃত্তিক দংশন অস্বভব করল তাপস। নাঃ, এরপর আর চূপ করে কলকাতায় পড়ে থাকা যায় না। ধার করেই হ'ক বা নিজের টাকায় হ'ক একটাগার জামসেদপুর যেতেই হবে, গিয়ে দেখা করে আসতেই হবে করবীর সাথে।

আর যেতে হলে এখনই। করবীর অস্থখের খবরটা শুকে সত্যিই বিচলিত করে তুলেছে। কিন্তু বাওয়ার প্রধান উপকরণ টাকা, সেই টাকা পাবে কোথা থেকে। এ মুহূর্তে কার কাছেই বা হাত পাতবে। মাসের শেষ, সবার হাতই খালি। সেদিন পড়াতে পড়াতে একসময় রেবার কাছে বিনয় প্রকাশ করে বলল, কয়েকদিনের জগা তোমার পড়ার ক্ষতি হবে রেবা। আমি জামসেদপুর যাচ্ছি।

রেবার ঠোটে সর্কোতুক হাসি ফুটে উঠল, কবে?

টাকা পেলোই। বলেই ভাবল—চাইবে নাকি কিছু টাকা ধার? চাইবার কথাটা ঠোঁটের কাছে এসেই পরমুহূর্তে মিলিয়ে গেল। আত্মসম্মানে বাধল মুখ ফুটে বলতে।

কিন্তু রেবার কাছে রেহাই নেই, রোজ পড়াতে এলেই একবার জিজ্ঞেস করবে, টাকা পেলেন?

সভ্য কথা গোপন করবার পথ ছিল না, ফলে প্রতিদিনই একবার করে লজ্জার সন্মুখীন হতে হল।

অবশেষে একদিন পড়িয়ে উঠে আসতে যাবার সময় রেবা প্রায় একরকম জোর করেই বাট্টা টাকার ভাণ্ডার দিল

তাপসের হাতে। আর আবদারের ভঙ্গিতে বলল, আগামী সপ্তাহটা আমার ছুটি, আমি পড়ব না।

তাপস বুঝতে পারল সে কথার অর্থ। তবু আত্ম-সম্মানের খাতিরে বুঝলাম কি বুঝলাম না—এমন একটা ভান করে সেদিনের মত বিদায় গ্রহণ করল।

এতদিন পর জামসেদপুরে গেল তাপস। কিন্তু প্রায় প্রথম সাক্ষাতেই করবীর সাথে ঝগড়া হয়ে গেল। দেখল, ওর অস্থখের খবরটা বানানো। ও স্বপ্নে দেখেছিল ওর অস্থখ হয়েছে, যার আত্মপূর্বিক ঘটনা ইতিমধ্যেই সবিস্তারে চিঠিতে জানিয়েছে। নানান কথা ইনিতে বিনিতে বলে আর সবকথার সারমর্ম হল এই যে সে নিজেদের এত-দিনকার গোপন সম্পর্কের ব্যাপারখানা এখন পাকাপাকি করে ফেলতে চায়। না হলে বাড়ির পাঁচজনের প্রবল গল্পনা সহ্য করতে হচ্ছে। একসময় কথার ফাঁকে এও জানাতে ভুলল না যে ইতিমধ্যে ওর বেশ কয়েকটা বাঘা বাঘা সখস্ক এসেছিল, শুধু তাপসের কথা মনে করেই সে সব প্রত্যাখ্যান করেছে।

তাপসের ইচ্ছে হচ্ছিল তার পরের দিনই চলে আসে। শুধু ভদ্রতা করে থাকার মেয়াদ আর একটি দিন বাড়ালো সে।

রেবা খুব অবাক হয়ে গেল তাপসকে দেখে। একি! আপনি এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলেন?

হাঁঃ—যেন একটা বিরক্তিসূচক স্বর বেরিয়ে পড়ল মুখের থেকে।

তাহলে জামসেদপুর ভাল লাগল না? হুঁহু হুঁহু হাসতে লাগল রেবা, যেন কিছু একটা বুঝতে পেরেছে। বইয়ের পাতা থেকে মুখ তুলে তাকাল একবার তাপস রেবার মুখের দিকে। একেই সময় তাপসের মনে হয়েছে রেবা অসাধারণ বুদ্ধিমতী। আপশোষ করেছে ওর বুদ্ধির সিকিপরিস্রাও যদি করবীর থাকত!

টাকাটা ও মাসের গোড়ায় দিয়ে দেবো। তোমার হয়ত বেশ কিছু অসুবিধা হচ্ছে। ক্ষেদ প্রকাশ করল তাপস।

না—না—কিছুমাত্র নয়। আপনার যখন সুবিধা হবে দেবেন।

তাপস রোজই এসে এই টাকার বিষয়ে একবার করে দুঃখ প্রকাশ করে এবং রেবাও বখারীতি প্রভৃতির সৌজন্য প্রকাশ করতে কার্পণ্য করে না।

হঠাৎ একে ক সময় তাপসের মনে হয়েছে রেবা তার জন্ত ত্যাগ স্বীকার করতে ভালবাসে। টাকাটা যত দামন্তই হ'ক ওটা দিয়ে সাহায্য করে ও মনে মনে একটা চাপি লাভ করছে। তবে রেবা কি তাকে মনে মনে কামনা করে? একই সঙ্গে এও মনে পড়ল তাপসের জামসেদপুর থেকে ফিরে এসে করবীকে কোন পত্র দেওয়া হয়নি। এমনকি একটা মামুলি পৌছ সংবাদও না।

পরের দিন টিউসনিতে গিয়ে প্রথমেই লক্ষ্য পড়ল রেবা রাজ ভীষণ সেজেছে।

কি বাপার? অগোচরে প্রস্তুত মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ল তাপসের।

বাঃ, আমার সাংগেতে ইচ্ছে করে না? আমি কি বুড়িয়ে গেছি নাকি?

না, না, তা কেন।

জানেন? গলাটা অনেক নামিয়ে বলল, আজ আমার জন্মদিন। বুড়ো হয়ে গেছি তো তাই জন্মদিনটা আর পালন করার কথা কেউ বলেনা।

তাই নাকি? এঃ, আগে জানলে তোমাকে কিছু উপহার দিতাম নিশ্চয়। বিব্রত বোধ করে তাপস।

আচ্ছা উপহার আমি চেয়েই নিচ্ছি। বলে হাসতে থাকে রেবা।

কি?

আজ আমার ছুটি।

ওঃ! এই। খুব হাসতে থাকে তাপস। ওঃ, তুমি এত অল্পে সন্তুষ্ট থাকতে পারো রেবা? সত্যিই তুমি অসাধারণ। কেমন বেকাঁস কথাগুলো বলে ফেলে তাপস। বলে ফেলে লজ্জায় জড়সড় হয়ে পড়ে মুহূর্তকয়েক।

রেবা কিছু মনে করে না। দাঁড়ান, বলে অন্দরমহলে কোথায় কিছুক্ষণের জন্য অদৃশ্য হয়ে যায়।

কিছুক্ষণ পরে এক কাপ চা হাতে নিয়ে ঢোকে।

আর অন্য হাতে ভাঁজ করা—তাপস লক্ষ্য করে ভালো করে—একটা নীল চিঠি।

বুকেটা এবার কেমন একটু একটু করে কাঁপতে থাকে তাপসের।

চায়ের পেয়ালটা সামনে নামিয়ে রাখে রেবা। বলে চা খান। তারপর অনর্গল কত কথা, হাসি, গল্পের ফোয়ারা ছোটে।

রেবার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে গল্প শুনতে ভাল লাগে তাপসের।

তাপসকে এগিয়ে দিতে রেবা বেরিয়ে আসে বারান্দায়। সিঁড়ির আলোটা জালিয়ে দেবার আগেই হাতে কি একটা শব্দে দেয় তাপসের।

তাপস বুকেতে পারে সেই নীল চিঠিটা, আনন্দে হৃৎপিণ্ডটা গলার কাছে ঘেঁষে লাফিয়ে উঠতে চায়। হন্ হন্ করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে গলিটা পার হয়ে একটা নির্জন গ্যাসপোটের নিচে তৎক্ষণাৎ খুলে ধরে জ্বলন্ত চিঠিখানা। এক মুহূর্তে নির্বিচার সিদ্ধান্ত করে ফেলে, করবীর চেয়ে রেবা অ-নে-ক ভাল।

প্রথম নজরেই হাতের লেখাটা কেমন চেনাশোনা ঠেকে, ছ'লাইনের ছোট একটা চিঠি।

সুপ্রিয় তাপস,

রেবাকে টাকাটা দেয়ত দেবার জন্যে তোমাকে ব্যস্ত হতে হবেনা। টাকাটা আমার। আমিই পাঠিয়েছিলাম রেবাকে। নিজে গরজ করে তো আসতে না জামসেদপুর, টাকার অজুহাত দেখিয়ে পড়ে থাকতে কলকাতায় অ-ন-স্ত-কা-ল।

ইতি

তোমার

করবী।

পুঃ ছাত্রীর দিকে নজর রেখো। রেবাও গুব ভাল মেয়ে।

কবি অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য—

বাংলায় খ্যাতিমান কবি ও লেখক অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য গত ২৯শে জুন সোমবার রাত্রিতে তাঁহার কলিকাতা শোভাবাজারের বাসাবাটিতে মাত্র ৬০ বৎসর বয়সে করোনাবী ঋষ্যসিস বোগে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি ১৯৪৮ পরগণা জেলার গোবরডাঙার নিকটস্থ গৈপুয়ের অধিবাসী ছিলেন এবং দীর্ঘকাল হাইকোর্টে কাজ করিয়া



কবি অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

একটিয়াট রেজিষ্টার হইয়াছিলেন—আগামী ডিসেম্বর মাসে তাঁহার অবসর গ্রহণের কথা ছিল। তিনি জী, ২ পুত্র ও ৪ কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন।

ছাত্রাবস্থাতেই তিনি কবিতা লেখা আরম্ভ করেন এবং বাংলা দেশের সকল সাময়িক পত্রে তাঁহার লিখিত বহু কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। ভারতবর্ষ মাসিক পত্রের

সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল এবং ভারতবর্ষে তাঁহার অসংখ্য কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। গত কয় বৎসর তিনি উপানন্দ নামে ভারতবর্ষের কিশোর জগৎ বিভাগ ও উপাধ্যায় নামে গ্রহজগৎ বিভাগ সম্পাদন করিতেন—এ ২টি বিভাগেও তাঁহার বহু মূল্যবান লেখা প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি সর্বদা লিখিয়া বাইতে পারিতেন—সারাদিন হাইকোর্টে কাজ করার পর রাত্রিতে প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প, উপন্যাস প্রভৃতি লিখিতেন। প্রথম বয়সে তিনি জ্যোতিষার্চায় আকৃষ্ট হন এবং রায় বাহাদুর কৈসাম চন্দ্র জ্যোতিষার্চ মহাশয়ের অধীনে দীর্ঘকাল জ্যোতিষ আলোচনা করিয়া জ্যোতিষবিদ্যায় সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন। তাঁহার কবিতা গ্রন্থ মধুচ্ছন্দা, সায়ন্তনীর, দীপায়ন, নিরাজন প্রভৃতি পাঠক সমাজে খ্যাতি ও আদর লাভ করিয়াছিল এবং উপন্যাস—প্রথম প্রণাম, উনিশে আষাঢ়, তুষিত মক, নূতন দিনের কথা, ভগ্ননীড়, অন্তরীপ প্রভৃতিও সর্বজন-সমাদৃত হইয়াছিল। মূলতঃ তিনি কবি ছিলেন এবং যৌবনে কবিতা রচনা আরম্ভ করিয়া জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত হাজার হাজার কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন। সহৃদয়, বন্ধুবৎসল অপূর্বকৃষ্ণের কথা সহজে বিস্মৃত হইবার নহে—আমরা তাঁহার আত্মার চিরশান্তি কামনা করি ও তাঁহার আত্মীয় স্বজনকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করি।

শতীন্দ্রবিমল চৌধুরী—

কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক, কলিকাতা গভর্নমেন্ট সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক, পশ্চিমবঙ্গ সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের সম্পাদক, খ্যাতনামা সংস্কৃত পণ্ডিত ডক্টর শতীন্দ্রবিমল চৌধুরী গত ১০ই জুলাই রাত্রিতে শো:ন ১০টার সময় কলিকাতা মেডিকেল

কলেজ হাসপাতালে মাত্র ৬৬ বৎসর বয়সে সহসা শেখ নিখাস ত্যাগ করিয়াছেন জানিয়া আমরা মর্মান্বিত হইয়াছি ও অজ্ঞান বিয়োগ বেদনা অনুভব করিতেছি। তিনি ঐ দিন সন্ধ্যার কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে এক সভার বক্তৃতা করার সময় অসুস্থ হইয়া পড়েন—তখনই তাঁহার দক্ষিণ হস্ত অবশ হইয়া যায় ও মেডিকেল কলেজে নীত হইয়া কয় ঘণ্টার মধ্যে পরলোক গমন করেন।

যেবনে বিলাতে শিক্ষা লাভ করিয়া আসিয়া তিনি সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের আলোচনা দ্বারা ভারতীয় সংস্কৃতি প্রচারে মনোযোগী হন। খ্যাতনামা দেশনেতা ও কংগ্রেসের অন্ততম জনক আনন্দমোহন বসুর পুত্র ব্যাংকিয়ার সুখাংশুমোহন বসুর বিদ্যুৎ কন্যা রমা দেবীকে বিবাহ করিয়া উনয় প্রায় গত ৩০ বৎসর ধরিয়া সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শনের সেবার আত্মনিয়োগ করিয়া সময় কাটাইতেছিলেন। রমা দেবী বর্তমানে কলিকাতা লেডী রেবোর্ণ কলেজের প্রিন্সিপ্যাল। তাঁহাদের সন্তান হয় নাই। উভয়ে বহু সংস্কৃত প্রাচীন গ্রন্থের সম্পাদন ও পুনর্মুদ্রণ করিয়া ও প্রায় ৫০খানি নূতন সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিয়া সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিতেছিলেন। গত কয়েক বৎসর কাল তাঁহারা তাঁহাদের বাসগৃহ ৩নং ফেডারেশন স্ট্রীটে প্রাচ্য-বাণী মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া বহু পুরাতন সংস্কৃত নাটকের অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন ও উক্ত বতীজ্জবিল ও রমা দেবী নিজেরা বর্তমান সময়োপযোগী কয়েকখানি সংস্কৃত নাটক রচনা করিয়া ভারতের বিভিন্ন সংস্কৃতি কেন্দ্রে প্রাচ্য-বাণীর সদৃশদিগের দ্বারা সেগুলির অভিনয়ের ব্যবস্থা করিতেছিলেন। নাটকগুলি সংস্কৃত ও হুল্ললিত সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বলিয়া জনপ্রিয় হইয়াছিল এবং আমরা গত কয়েক বৎসরের ভারতবর্ষে বিভিন্ন নাটক অভিনয়ের বিবরণ সম্বলিত বহু প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া সে বিষয়ে বেশবাসী সংস্কৃতভাষাগী জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। সেজন্য বতীজ্জবিলের অকাল মৃত্যুতে আজ শুধু বাংলার নহে, সারা ভারতের সংস্কৃতভাষাগী মাহুষের দল শোক সাগরে নিমগ্ন হইয়াছে। যে ভাবে তাঁহারা সংস্কৃত নাটক অভিনয়ের দ্বারা সংস্কৃত ভাষাকে সর্বজনপ্রিয় ও সকলের বোধ্য করিয়া উল্লিখিত ছিলেন, তাহাতে একদল লোকের বিবাস হইয়াছে

যে একদিন সংস্কৃত ভাষাই সর্বভারতীয় রাষ্ট্রভাষারূপে পরিণত হইবে।

বতীজ্জবিল ছাত্রাবস্থায় বিলাতে বাসকালেই ভারতবর্ষ পত্রিকার জন্ত প্রবন্ধ রচনা করিয়া পাঠাইতেন এবং তদবধি গত প্রায় ৩০ বৎসর ভারতবর্ষে তাঁহার লিখিত কত প্রবন্ধ যে প্রকাশিত হইয়াছে তাহার সংখ্যা নাই।

তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক রূপে ও বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের সম্পাদকরূপে এদেশে সংস্কৃত ভাষাতে পঠন-পাঠন পুনঃ প্রবর্তনের জন্ত সবার পরিশ্রম করিতেন এবং এ বিষয়ে তাঁহার নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা তাঁহাকে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত মহলে বিশেষ জনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল—তিনি ও রমা দেবী তাঁহাদের উপার্জিত প্রায় সমস্ত অর্থ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের সেবার নিয়োজিত করিতেন—সে জন্ত আজ বতীজ্জবিলের মৃত্যুতে সারা ভারতের সংস্কৃত শিক্ষালয়সমূহের (টোল) অধ্যাপকগণ শুধু তাঁহাদের একজন অকুসুম বন্ধু হারাইলেন না—তাঁহাদের বিপদের সময় সাহায্য করার লোক হারাইয়া নিজেদের নিঃসহায় মনে করিতেছেন। বিলাতে শিক্ষা লাভ করিয়া বা ব্রাহ্ম পরিবারে বিবাহ করিয়াও বতীজ্জবিল ভারতীয় মনে ভাব বর্জন করেন নাই, বরং ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শ্রুতির প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ভক্তি দেখিয়া আশ্চর্য্য অনেক সময় বিস্ময়ান্বিত করিয়াছি। ইংরাজী না পড়া পণ্ডিতের দল যাচাতে সর্বদা সর্বত্র উপযুক্ত সম্মান, শ্রদ্ধা ও অর্থ লাভ করেন, সেজন্য বতীজ্জবিল শুধু নিজে চেষ্টা করিতেন না, বা নিজের কার্য দ্বারা তাহা প্রকাশ করিতেন না, সুযোগ পাইলে সকলকে সে কাজে প্রেরণা দান করিতেন। আমাদের সহিত তাঁহার দীর্ঘদিনের পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতার ফলে আজ তাঁহার বহু দিনের বহু কার্যের কথা মনে হইতেছে এবং সেজন্য তাঁহার কথা লিখিবার সময় চক্ষু অশ্রু-সঞ্জন হইয়া উঠিতেছে। মাত্র ১ সপ্তাহ পূর্বে তাঁহার সহিত দেখা হইলে তিনি বাংলা দেশে সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে দীর্ঘ সময় ধরিয়া আমাদের সহিত আলোচনা করিয়াছিলেন, সেকাজ অরাধিত করার জন্ত বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষ পত্রিকাকে তিনি ভালবাসিতেন এবং ভারতবর্ষ দীর্ঘকাল ধরিয়া তাঁহার সংস্কৃত

প্রচার কার্যে যে সাধারণ দান করিয়াছে সে কথা অকপটে সকলের কাছে স্বীকার করিতেন।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি সদালাপী, নিরঙ্কর ও বন্ধু-বৎসল ছিলেন এবং প্রভূত অর্থ উপার্জন করিয়াও তিনি ও রমা দেবী সহজ ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিতেন, তাহা দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইত। বহু সময়ে লেখকের তাঁহাদের গৃহে যাওয়ার সুযোগ ঘটিয়াছে—বিলাতে শিক্ষা প্রাপ্তা ধনী ও অভিজাত পরিবারের কন্যা রমা দেবী যতীন্দ্র-বিমলের সহিত একান্ত হইয়া উভয়ে যে বিনয়, মাধুর্য ও সহনশীলতা-পূর্ণ ব্যবহার করিতেন, তাহা স্মরণ করিলে অভিভূত হইয়া পড়িতে হয়। আজ উক্ত রমা চৌধুরীর এই শোকে সার্থনা জানাইবার ভাষা নাই—তিনি দর্শনশাস্ত্রে অভিজ্ঞা, পাণ্ডিত্যের অধিকারিণী—কাণ্ডেই আমাদের বিশ্বাস ভগবৎ-কৃপা তাঁহাকে সকল দুঃখ সহ্য করিবার শক্তি দান করিবে। আমরা আজ যতীন্দ্রবিমলের স্বর্গত আত্মার উদ্দেশে প্রজ্ঞা জ্ঞাপন করিয়া প্রার্থনা করি তাঁহার আত্মা বাহ্যিকভাবে চিরশান্তি লাভ করুক এবং তাঁহার অসমাপ্ত কার্য সম্পাদনের জন্য যেন সর্বনিয়ন্তা উপযুক্ত ব্যবস্থা করেন।

কলিকাতার ফ্ল্যাটের মালিকানা—

এতদিন পর্যন্ত কলিকাতাবাসী ভাড়াটিয়ারা ফ্ল্যাট ভাড়া করিয়া বাস করিতেন। গত ১লা জুলাই কলিকাতা ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্ট নিমিত্ত ১০টি ফ্ল্যাটের মালিকানা স্বয়ং ৪০ জনকে প্রদান করা হইয়াছে। বাড়িটির নাম বিজ্ঞান-সাগর ভবন—ইন্ডার কলিকাতা গোরাবাগান, রাজকৃষ্ণ স্ট্রীটে অবস্থিত। বিজ্ঞানসাগর সমবায় সমিতির ৪০ জন সদস্য ৪০টি ফ্ল্যাট পাইয়াছেন। প্রতি ফ্ল্যাটে ২টি শয়ন ঘর ছাড়া অন্যান্য সকল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা আছে। এক একটির দাম ১৭ হইতে ২১ হাজার টাকা। কলিকাতা ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্টের সেক্রেটারী শ্রীবিমল মুখোপাধ্যায় ঐ দিন বাড়ীর চাবি সমবায় সমিতির সভাপতি শ্রীপ্রসাদ দেবকে অর্পণ করিয়াছেন। কলিকাতার মধ্যস্থলে এত কম টাকায় নিজস্ব বাস-গৃহ প্রাপ্তি সত্যই আশ্চর্যের বিষয়। সহরে বোম্বারের মত একরূপ বহু গৃহ নির্মিত হইলে লোক উপরুত হইবে।

ডাঃ সতীনাথ বাগচী—

কলিকাতার খ্যাতনামা খাদ্যবিজ্ঞানবিদ ডাঃ

সতীনাথ বাগচী গত ২রা জুলাই বৃহস্পতিবার ৭৪ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি আর-জি-কর মেডিকেল কলেজের খাদ্যবিজ্ঞান ও খাদ্যরোগ চিকিৎসার অধ্যাপক-ডিরেক্টরের পদ হইতে ১৯৫২ সালে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি জনপ্রিয় চিকিৎসক ছিলেন। ২২৩০০ ছাত্র ছাত্রীকে বৃত্তি—

কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় ১৯৬৪-৬৫ সালে ২২৩০০ ছাত্র-ছাত্রীকে প্রবেশিকা-উত্তর বৃত্তিদানের প্রস্তাব করিয়াছেন। প্রাক-স্নাতক পর্যায়ে ২২ হাজার, স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ২২০০ এবং এম-এ, এম-এস-সি পর্যায়ে ১০০ ছাত্রছাত্রী বৃত্তি পাইবে। পূর্বে শিক্ষা-খণ্ড হিসাবে যে বৃত্তি দেওয়া হইত এখন তাহার পরিবর্তে দান হিসাবে এই সকল বৃত্তি দেওয়া হইবে। শুধু যোগ্যতাই বৃত্তির মাপকাঠি হইবে।

প্রতিরক্ষা প্রস্তুতি জোরদার—

চীন কর্তৃক ভারত আক্রমণের পর হইতে ভারতে প্রতিরক্ষা-প্রস্তুতি জোরদার করা হইয়াছে। ১৯৪৭-৪৮ সালে ভারতে যুদ্ধসরঞ্জাম প্রস্তুত হইয়াছিল ৫ কোটি টাকা দামের। ১৯৬২-৬৩ সালে ৬৪ কোটি টাকা ও ১৯৬৩-৬৪ সালে ১০০ কোটি টাকা টাকা মূল্যের যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম প্রস্তুত হইয়াছে। ১৯৬৪-৬৫ সালে ১৫০ কোটি টাকা দামের যুদ্ধ সরঞ্জাম প্রস্তুত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ভারতে ২৫টি অস্ত্র প্রস্তুতের কারখানা পুরো দমে কাজ করিতেছে। ১৯৫৪ ৬৫ সালে আরও ৪টি নতুন কারখানা খোলা হইবে। নাগপুরের নিকট যে কারখানা হইয়াছে তাহা ভারতের সর্ববৃহৎ অস্ত্র উৎপাদন কারখানা। ইছাপুর কারখানার উৎপাদনও বিস্তৃত করা হইয়াছে। অস্ত্র উৎপন্ন হউক ভাল কথা, কিন্তু যুদ্ধ বাহাতে না বাধে, সে জন্য সকলের চেষ্টা করা কর্তব্য।

ডক্টর শ্যামাপ্রসাদে মৃত্যু -

গত ৩০শে জুন মঙ্গলবার সকালে ভারতের রাষ্ট্রপতি ডক্টর সর্বশক্তি রাধাকৃষ্ণন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গৃহে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য, খ্যাতনামা রাজনীতিক ও শিক্ষাবিদ ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের একটি আবক মৃত্যুর প্রতিষ্ঠা উৎসব সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। ঐ মৃত্যু দান করিয়াছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাণাখানার ভগান

ড্রাইভার কৃষ্ণকুমার দে মহাশয়। ১৯১০ সালে ডক্টর
শ্রীমা প্রসাদ কৃষ্ণকুমারকে চাকরী দিয়াছিলেন। সে কৃষ্ণ-
কুমার সারা জীবনের ১৫০০ হাজার টাকা দিয়া ঐ
মৃত্যু করাইয়া দিয়াছেন—মৃত্তি নির্মাণ কবি-ভেদ, কৃষ্ণ-
নগরের শিল্পী কে-সি-পাল। মৃত্তি-প্রতিষ্ঠা উৎসব
কৃষ্ণকুমার উপস্থিত ছিলেন ও রাষ্ট্রপতি তাঁহার সহিত
করমদন কবিয়া তাঁহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।
কৃষ্ণকুমারের এই আদর্শ অমূল্যবর্ণনীয়।

সম্প্রদায়িকতার পথে—

গত ১লা জুলাই স্বর্গত মৃত্যুমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র বায়ের
১২তম জন্মদিবস ও দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিক দিবসে বাংলা
কংগ্রেস নেতা শ্রীমতী জ্যোতিলাল ঘোষ কলিকাতা মহাজাতি সদনে
এক অল্পটানে সমৃদ্ধ ভারতের পথে নামে একখানি গ্রন্থ
মৃত্যুমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনকে উপহার দিয়াছেন। ঐ গ্রন্থ
খানির সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি শ্রীমতী জ্যোতিলাল ঘোষ।
এই খানিতে ডাঃ বিধান চন্দ্রের বক্তৃতা ও লেখার মধ্য দিয়া
তাঁহার কর্মজীবন দেখানো হইয়াছে। ৪৬০ পৃষ্ঠার পুস্তকের
মাত্র ২০ টাকা। সে অল্পটানে কংগ্রেসসভাপতি শ্রীকাম-
দাস নানাব উপস্থিত ছিলেন। এই ধরণের গ্রন্থ প্রকাশ
করিয়া পরলোকগত নেতাদের জন্মদিবস পালন কবিলে
দেশ সব দিক দিয়া উপকৃত হয়—দেশনেতাকে স্মরণ করা
হয় ও গ্রন্থ সম্পদ বর্ধিত হয়। আমরা এই কার্যের জন্য
প্রতিট সর্বজনীনভাবে অভিনন্দিত করি।

স্মরণীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায়—

গত ২৯শে জুন সোমবার কলিকাতার বাংলার পুষ্ক-
প্রেষ্ট স্মরণীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ৪৫শ বার্ষিক
উৎসব আদৃত হইয়াছে। প্রায় ৬০ বৎসর পূর্বে স্মরণীয়
আশুতোষ পাটনার লোবাস্তরিত হইয়াছেন। কিন্তু বহু
একবার তাঁহার সম্পর্কে আসিয়াছেন, তাঁহাকে ন দিন
স্মরণীয় আশুতোষের কথা ভুলিতে পারিবেন না। আজিকার
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে স্মরণীয় আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়
বলা যাইতে পারে। তাঁহার মত স্বাধীনচেতা মানুষ
সে যুগে সত্যই বিরল ছিল। তিনি হাইকোর্টের বিচার-
পদ্ধতিতে সরকারী চাকরী করিতেন বটে, কিন্তু সে জন্য
তাঁহার মনের স্বাধীনতা বা কর্ম-স্বাধীনতা একটুও ক্ষুণ্ণ হয়
নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের বিভিন্ন বিষয়ে এম-এ ক্লাসে

পঠন-পাঠনও তাঁহার মনোরম কীর্তি। তিনি বিশ্বাস করিতেন,
সংস্কৃত না শিখিলে ভারতের মনুষ্য ভারতীয় হইতে বঞ্চিত
হইবে। কিন্তু তাঁহার কীর্তি আরও মহৎ ছিল—ইংরাজ
এদেশ জয় কবিয়া দেশবাসীকে ইংরাজি শিখাইবার জন্য
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। স্মরণীয় আশুতোষ সেই
বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় এম-এ পড়াইবার ব্যবস্থা করিয়া
অক্ষয়কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন। বাংলার সহিত তিনি
ভারতের অপর সকল ভারতীয় ভাষা—হিন্দী, আসামী,
উড়িয়া, গুজরানী, মারাঠি, তামিল, তেলুগু, মালিয়ালাম,
কানাড়ী, পুস্তক প্রভৃতি শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করেন।

তিনি দেশেব শিক্ষা স্কুল ও মহল কবিয়া দিয়া, পল্লীকার
পাশেব তার পাড়াইয়া দেশে শিক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধির ব্যবস্থা
করিয়াছিলেন। তাঁহারই রূপায় শিক্ষাপ্রাপ্তি হাজার হাজার
বেকার যুবক সে যুগের রাজনীতিক আন্দোলনকে পুষ্ট
করিত। সাব আশুতোষ সক্রিয়ভাবে রাজনীতি করিতেন
না বটে, কিন্তু তাঁহার সাহায্যে রাজনীতিক তত্ত্ব বিপ্লব
আন্দোলন পুষ্ট হইয়াছিল।

পরাধীন ভারতে সহস্র শতাব্দির মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া
তিনি যে ভাবে স্বাধীনচিত্তে পরিচর্য দেখাইয়া
গিয়াছেন, আজ তরুণ দেশবাসীদের সে সকল কথা প্রচার
সহিত স্মরণ করা কর্তব্য। তাঁহার জন্মদিনে রাষ্ট্রপতি
রাধাকৃষ্ণন কলিকাতায় আসিয়া স্মরণীয় জনসভায় সেই
কথাই বলিয়া গিয়াছেন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিজ্ঞান শিক্ষা-
দানের জন্য স্মরণীয় আশুতোষ চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন।
তাঁহার একান্ত আগ্রহে দীনবীর স্মরণীয় রাসবিহারী ঘোষ ও
স্মরণীয় তারকনাথ পালিতের অর্থসাহায্যে দৈনিক কলিকাতা
বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বতন্ত্র বিজ্ঞানকলেজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব
হইয়াছিল। ২৯শে তারিখে ভারত সরকার স্মরণীয় আশু-
তোষের ছবি সমেত ডাক টিকিট বাহির করিয়া তাঁহার
প্রতি উপযুক্ত সম্মান দান করিয়াছেন। স্মরণীয় আশুতোষ
৭৭, রসা রোডে যে গৃহে বাস করিতেন তাঁহার পুত্র-পৌত্র-
গণের চেষ্টায় তাহা এখন জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত
হইয়াছে এবং ২৯শে জুন রাষ্ট্রপতি সে গৃহে একটি নূতন
ভাষা বিজ্ঞান মন্দিরের উদ্বোধন করিয়া গিয়াছেন।
সেখানে বিভিন্ন ভাষা সম্বন্ধে গবেষণা ও শিক্ষা দান
হইবে।

আমরা তার আন্তোষকে প্রকার সহিত স্মরণ করিয়া জন্ম শতবারিকীতে প্রাণনা করিব, আমাদের মধ্যে যেন তাঁহার ভাষাধারা সংক্রামিত হইয়া তাহা দেশবাসীর কল্যাণ সাধনে সমর্থ হয়।

শ্রীমহিষলাল গাঙ্গুলী—

গত ২২শে জুন বোম্বায়ে প্রেসট্রাষ্ট অফ ইণ্ডিয়ার বার্ষিক সাধারণ সভায় অমৃতবাজার পত্রিকার শ্রীমহিষলাল গাঙ্গুলী সর্ব-সম্মতিক্রমে নতুন চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইয়াছেন, কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলারের কার্য করিয়াও শ্রীগাঙ্গুলী সুনাম অর্জন করিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

শ্রীমহিষলাল গাঙ্গুলী—

গত ২২শে জুন সেমবার রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণ কলিকাতায় আসিয়া রাসবিহারী এভেনিউতে শ্রীমহিষলাল গাঙ্গুলী পরিষদের উদ্বোধন করেন ও নতুন গৃহের শিলাস্তম্ভ করেন। তাঁহার তথায় ১০ মিনিট ভাষণ দেওয়ার কথা ছিল কিন্তু তিনি ২০ মিনিট ভাষণ দিয়াছিলেন। পরিষদের সভাপতি হিদিগুটী স্বামী ভক্তিবিলাসতীর্থ রাষ্ট্রপতিকে স্বাগত জানান ও মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন উপস্থিত সকলের সহিত রাষ্ট্রপতির পরিচয় করাইয়া দেন। রাষ্ট্রপতি তাঁহার ভাষণে বলেন—সামাজিক বিবর্তনের সঙ্গে ধর্ম বিবর্তিত না হয়, সে ধর্ম মরিয়া গিয়াছে। পরধর্মের প্রতি প্রকৃষ্টাঙ্গ হওয়াই আজিকার সবধর্মের মূল কথা হওয়া উচিত। ধর্মের অপর নাম সক্রিয় সত্য। সত্যের আবিষ্কার ও প্রয়োগই ধর্মের মূল কথা। বিজ্ঞান বাদ দিয়া ধর্ম হইতে পারে না। রাষ্ট্রপতির মুখে এই সবল কথা শুনিয়া বর্তমান ধর্মহীন জগতের চোখ বিস্মিত হইয়াছিল।

কলিকাতায় কংগ্রেস সভাপতি—

কংগ্রেসের নতুন সভাপতি, অজুর্বা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকুমারস্বামী কামরাজ নান্দার গত ১লা জুলাই কংগ্রেস সভাপতিরূপে প্রথম কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। সে দিন ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের চতুর্থ ষষ্ঠাদিন থাকায় তিনি বিধানচন্দ্রের গৃহে ও মহাজাতি সন্মানে ঘাইয়া বিধানচন্দ্রের প্রতি প্রকৃষ্টাঙ্গন করিয়াছেন। সন্ধ্যায় গাড়ের মাঠে এক জনসভায় তিনি ভাষণ দিয়াছিলেন এবং কলিকাতা কর্পোরেশন ঐ দিন কলিকাতাবাসীদের পক্ষ হইতে

তাঁহাকে অভিনন্দন পত্র প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার ভাষণে নতুন সমাজ ব্যবস্থা চলনে ও দেশ গঠনে কাজে বাংলাদেশের নেতৃত্ব কামনা করেন। তিনি বলেন দারিদ্র্য ও বৈষম্য দূর করিয়া সমাজবাদ প্রতিষ্ঠায় বাংলাই সারা ভারতকে পথ দেখাইবে। তিনি বাংলার নেতা শ্রীঅতুলা ঘোষের প্রণামা করিয়া বাংলাদেশকে তাঁহার নেতৃত্বের অন্তর্গামী হইতে উপদেশ দিয়াছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী—

জুন মাসের শেষ ভাগে ভারতের নতুন প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়ায় চিকিৎসকগণ তাঁহাকে লগুনে কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মিলনে যাইতে নিষেধ করেন। সে জন্য তিনি ঐ সম্মিলনে নিজে না গাইয়া অর্থমন্ত্রী শ্রীটি-টি-কৃষ্ণমাচারী এবং তথা ও বেতার মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে তাঁহার প্রতিনিধিরূপে প্রেরণ করিয়াছেন। বর্তমানে শ্রীশাস্ত্রীর স্বাস্থ্য পূর্বাশংকা ভাল হইয়াছে। যোগ হটক আক্রমণকারী ও শ্রীমতী গান্ধী উভয়েই যোগা ব্যক্তি—তাঁহারা লগুনে ঘাইয়া ভারতের সকল প্রকার স্বার্থরক্ষায় সমর্থ হইবেন বলিয়া ভারতবাসী আশা করে।

পাঞ্জাবের নতুন মুখ্যমন্ত্রী—

সদীর কাইরন পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রীপদ ত্যাগ করিতে বাধ্য হওয়ার নতুন মুখ্যমন্ত্রী হইয়াছেন—শ্রীরাম কিশন। তাঁহার জন্ম ১৯১০ সালে পশ্চিম পাঞ্জাবের বান জেলার এক ক্ষুদ্র গ্রামে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে। দেশ বিভাগের পর তিনি জলন্ধর জেলার অধিবাসী হন। ১৯২৯ সালে ছাত্রাবস্থায় তিনি প্রথম রাষ্ট্রপতি আন্দোলনে কারাবরণ করেন, তারপর ১৯৩০, ১৯৩১, ১৯৩২, ১৯৩৩ ও ১৯৪২—৬বার তিনি কারাবরণ করেন—২বার তাঁর জ্যেষ্ঠ ভাই তাঁর সঙ্গে জেলে বন্দ—একবার ২ পুত্র ও বৃদ্ধ পিতাও কারাবরণ করেন। তিনি সর্বসাধারণের কাছে কমরেড রামকিশন নামে পরিচিত। ১৯৫২ সালে প্রথম বিধান সভায় প্রবেশ করেন। দেশ বিভাগের পূর্বে মিউনিসিপাল কমিশনার ছিলেন—১৯৫৭ সালে লোকসভা নির্বাচনে পরাজিত হন—১৯৬০ সালে আবার লোকসভায় সদস্য ও রাষ্ট্রপতি হন কিন্তু কামরাজ পরিকল্পনায় মন্তব্য দায়। এখন তিনি

মুখ্যমন্ত্রী— তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মশক্তি তাঁর জীবনকে গঠন করিবে।

নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়—

স্বর্গত জহরলাল নেহরু প্রায় ২০ বৎসর কাল ভারতের মত এক বিরাট ও বিবিধ সমাস্ত্রাসঙ্কুল দেশের প্রধানমন্ত্রী রূপে যে অসাধারণ কর্মশক্তি, অপূর্ব কুশলতা, অনন্তসাধারণ শ্রমশীলতা প্রভৃতির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহার তুলনা ইতিহাসে বিরল। কাজেই যত অধিক স্থানে, যত অধিক প্রকারে আমরা তাঁহার স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করি না কেন, কিছুই নেহরুর উপযুক্ত হইবে না। তথাপি সম্মেল জাতিয়া অনন্দিত হইবেন যে শীঘ্রই দিল্লীতে একটি নূতন দ্বিতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হইবে ও তাহার নাম দেওয়া হইবে নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়। সেখানে বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষাই প্রাধান্য লাভ করিবে। দিল্লীর উপকণ্ঠে রামকৃষ্ণপুরের নিকট ননিরকা গ্রামে এক হাজার একর জমী লইয়া তথায় নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইবে। সেজন্য প্রয়োজনীয় আইন রচনা করা হইছে ও কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীসাগলা জমী দেখিয়া আসিয়াছেন। ভারতের সকল বাদে নেহরুজীর উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন।

শরণার্থী আগমন অব্যাহত—

গত ১লা জুন হইতে ৩০শে জুন পর্যন্ত এক মাসে পেট্রপল, গেদ, হাসনাবাদ, হিজলগঞ্জ ও মোজাডঙ্গা নামক দিয়া মোট ৬১ হাজার শরণার্থী পূর্বপাকিস্তান হইতে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করিয়াছেন। ২০শে জুন পর্যন্ত তথ্যে মাত্র ২৫০০ পরিবারে ১০ ৬৯ জনকে দণ্ডবারণ্যে রাখানো হইয়াছে। ভারতের বহু রাষ্ট্রে পূর্ববঙ্গ হইতে আগত শরণার্থীদের চাষ ও বাসের জন্য ভূমি দিতে উৎসুক কিন্তু বাংলার দুর্ভাগ্য, একদল বিপাগামী নেতা শরণার্থীদের ভুল বুকাইয়া তাহাদের পশ্চিমবঙ্গের বাগিরে বাইতে দেন না। মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, অন্ধ্র, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, পাঞ্জাব প্রভৃতি রাষ্ট্রে বাইলে বাঙ্গালী শরণার্থীরা তথায় ভালভাবে থাকা ও উপার্জনের পথ পাইতে পারেন। কিন্তু কে শরণার্থীদের বুকাইবার ভার লইবে? একদল কংগ্রেস-সেবকের এ বিষয়ে উত্তোষী হওয়া প্রয়োজন।

সাম্প্রদায়িক দল নিষিদ্ধ—

মুসলমানীগ, হিন্দু মহাসভা, রামণাথ পরিষদ, জনসংঘ প্রভৃতি কয়েকটি সাম্প্রদায়িক দলের কার্য—বিশিষ্ট শ্রেণীর লোকের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি—বন্ধ করার জন্য কেন্দ্রীয় সংসদ হইতে প্রাক্তন খাতিমন্ত্রী শ্রী মজিতপ্রসাদ

জৈনের নেতৃত্বে একটি বিশেষ কমিটি গঠিত হইয়াছিল— এই কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। ৭ জন সদস্যের মধ্যে ৫ জন সাম্প্রদায়িক দলগুলির কার্য নিষিদ্ধ করার পক্ষে মত দিয়াছেন—আর ২ জন সদস্য শ্রীমতাবীর ত্যাগী ও শ্রী এম-তারিক দলগুলির কার্য নিষিদ্ধ করার বিপক্ষে মত দিয়াছেন। সমস্তটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, বহু চিন্তাশীল ব্যক্তি সাম্প্রদায়িক দলের মণা দিয়া কাজ করেন, তাঁহাদের এই কাজ বন্ধ করা হইলে তাঁহাদের কাঁপারে রাখার প্রয়োজন হইবে। সাম্প্রদায়িকতা প্রচার যে বেশখানীর পক্ষে ক্ষতিজনক সে বিষয়ে সন্দেহ না থাকিলেও বিষয়টির গুরুত্ব কেহ অস্বীকার করিবে না।

রূপকুণ্ড ও হোমকুণ্ড অভিযান—

অভিযাত্রী সংঘের ৭জন সদস্য হিমালয়ের ১০ হাজার ফিট উচ্চ রূপকুণ্ড এবং ১০ হাজার ফিট উচ্চ হোমকুণ্ড ঘুরিয়া গত ৩রা জুন কলিকাতায় ফিরা আসিয়াছেন। তাহাদের নাম—(১) দক্ষিণ পূর্ব রেলপথে বমী জুনীল চৌধুরী—নেতা (২) বৈজ্ঞানিক রক্ষিত (৩) জ্যোতি পাল (৪) কেন্দ্রীয় খাদ্যদপ্তরের সমর বন্দ্যোপাধ্যায় (৫) গেইকিন্ উইলিয়ম্‌সের অসাম বন্দ্যোপাধ্যায় ও (৬) জেসপ কোংর স্তান রায়। এ যাত্রাও দারুন কষ্টসাধ্য। বাঙ্গালী তরুণের দল স্বৈরাচার ও সকল অভিযান করিতেছেন— ইহা খুবই অনন্দের কথা। আমরা সকলকে অভিনন্দিত করি।

দণ্ডের দণ্ডের যোগাযোগের অভাব—

কেন্দ্রীয় পরিবহন কর্মশনের সদস্য এবং পশ্চিম বাংলার কৃষির ইন্সটিটিউটের পূর্ণবেক্ষক দলের নেতা খাতিমন্ অর্থনীতিবিদ ও কংগ্রেস সেবা গ্রাম্‌ নারায়ণ গত ৪ঠা জুলাই কলিকাতায় আসিয়া জানাইয়া গিয়াছেন যে ক্ষুদ্র সেচ ও ভূমি সংরক্ষণ ব্যবস্থার প্রসারের জন্য পশ্চিমবঙ্গকে পরিকল্পনা কমিশন ১৯৬৫—৬৫ সালে নির্দিষ্ট ১৩ কোটি টাকা ছাড়াও অতিরিক্ত ১০ লক্ষ টাকা দান করিবেন। তাহার পূর্বে পর্যবেক্ষকদলের সদস্যগণ বিভিন্ন জেলায় ঘুরিয়া দেখিয়াছেন যে পশ্চিমবঙ্গে কৃষি, পশুপালন, মৎস্য চাষ, সেচ, ভূমি সংস্কার প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগের কাছারও সহিত অপরের কোন যোগাযোগ নাই। সেজন্য সকল খাতে বহু টাকা ব্যয় না হইয়া পড়িয়া থাকে। শ্রীমন্ নারায়ণ মুখ্যমন্ত্রীর ঘরে অন্ত্যায় মন্ত্রীদেব সম্মুখে এই কথা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সতর্কভাষ্যে বাকী কি শাশন কর্তৃপক্ষের কানে পৌছিতে।

সাহসিকা-আধুনিকা



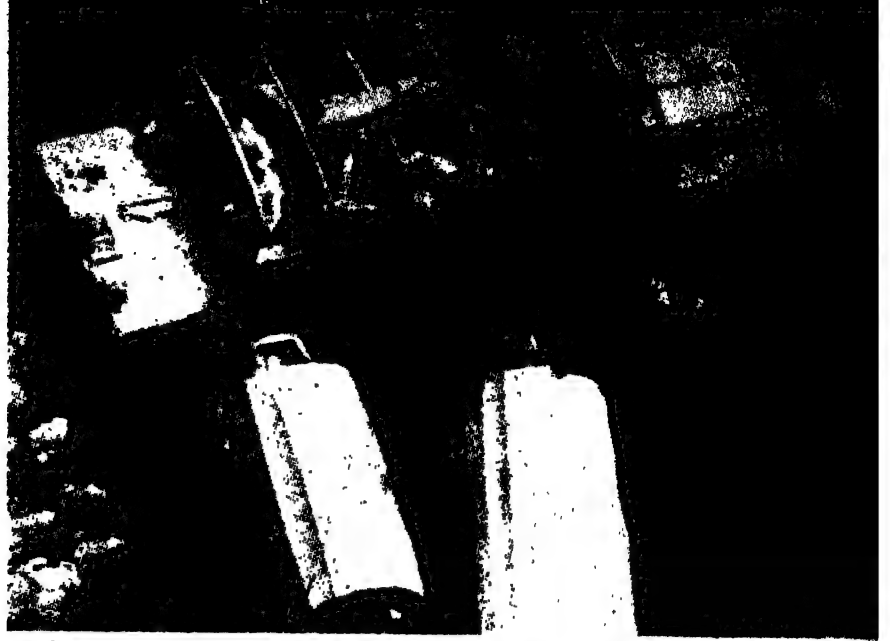
আধুনিকা-ভাৰ্গ্যা :—ওগো...শুনছো...কাজটি, অকিস
থেকে বাড়ী ফেরবার সময় দোকান
থেকে নতুন আরেকটা ইঁদুর ধরা
কল কিনে এনে আজ মনে করে!

অকিস-গমনোত্তর ভর্তা :—সেকি !...কাল বিকালেই তো
একটা আনকোর-নতুন ইঁদুর
ধরা কল কিনে এনে দিলুম
তোমার হাতে! ...সেটা কি
ভালো।

আধুনিকা-ভাৰ্গ্যা :—বারে...সেটার মধ্যে যে একটা নেটে
ইঁদুর আটকে রয়েছে...ছুঁতে ভয়
করছে...হাত দিই কেনন করে! ..
তাই তো বলছি তোমাকে...আজই
একটা নতুন কল নাহলে...

শিল্পী—পূৰ্ণা দেবদাসী

ত্রিবেণী-সঙ্গমে পরলোক-
 গত প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত
 জহরলাল নেহেরুর ভাস-
 বিসর্জন। চিহ্নটি ভারতীয়
 বিমান বাহিনীর একটি
 হেলিকপ্টার হইতে গহীত
 হইয়াছে



জহরলালজীর প্রৌঢ়বয়স জগৎ ও রাজীব এলাহাবাদে সঙ্গমে চিত্তাক্ষম বিসর্জন দিতেছেন। পার্শ্বে
 শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতকে যুক্তকরে অগাম জানাইতে দেখা যাঠতেছে

২৪৯





গত ২৬শে জানুয়ারীর প্রজাতন্ত্র দিবসের কূচকাওয়াজ অহুঠানে পণ্ডিত জগদ্রলল নেহেরু ।
পাখে শ্রীমতী গান্ধীকে ও পশ্চাতে শ্রীসগলকে দেখা বাইতেছে ।

২৫৭



কস্তা শ্রীমতী ইলিরা গান্ধী ও শোভনঃ মহ পণ্ডিত জহরলল নেহেরু ।



১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টের সেই অমরীয় দিবসের প্রাতঃকালে ৮-৩০ মিনিটের সময়
লর্ড মাউন্টব্যাটেন পণ্ডিত নেহেরুকে স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধান
মন্ত্রীরূপে শপথ গ্রহণ করাইতেছেন।

২৫১

নেহেরু পরিবার—যুবক জহরলালকে পিছনের সারিতে
বাম দিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে দেখা যাইতেছে।



গ্রে-ডেগে

মিহিরাচার্য

যুগ্ম এংন অর্থনৈতিক। হুতরাং অর্থচিন্তা চমৎকার।
সবাই ভাবেন, হঠাৎ যদি মবলগ কিছু পেয়ে যান, তাহলে
বোধহয় এ-যাত্রা কোন রকমে উঠতে পারেন। এই
হঠাৎ মবলগ পাওয়া ঘটনা পারে যাতে তা হচ্ছে লটারী বা
ঐ জাতীয় কিছু। অনেকে আশায় আশায় টিকিট কেনেন,
আবার কেউ কেউ কেনেনও না। যারা কেনেন না,
তাদের যুক্তি হচ্ছে, দর, আমার ভাগো ও হবে না, পাণর-
চাপা কপাল। কেউ যদি যুক্তি দেখান যে, তা যদি বলেন
তো, আমাদের অমুক কর্তৃকার, সে কি কোরে পেলো!
একটা টিমটিমে শান-পালিশেং দোকান থেকে কোনদিন
একবেলা জুটত, কোনদিন বা তাও নয়। মশাই শাস্ত্রে
বলেছে, পুরুষস্ত ভাগ্যাম্।

সুনতে সুনতে ইতিমধ্যে তিনি কিন্তু ‘অপটিমিষ্ট’ হয়ে
গেছেন। জ্যোতিষ যেহেতু ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে,
সেখানে এ সম্বন্ধে কি নির্দেশ পাওয়া যায়, তাই নিয়েই
এ আলোচনা।

সেকালে লটারী ছিলনা বটে, তবু ছাত্তকীড়া ও বাসনাধি
ব্যাপারকে অল্পরূপ আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। কারণ
এতেও বাজি ধরা হোত, হারজিতে লাভ-লোকসান নির্ণীত
হোত। জ্যোতিষে শাস্ত্রকার একটি যোগের কথা ইল্লখ
করেছেন, যার নাম অমৃত-লাভযোগ। অর্থাৎ যত্ন না করেও
যে লাভ হয়, এ হচ্ছে তাই। শাস্ত্রকার বলেছেন—লগ্নপতি
ও ধনপতি যদি ক্ষেত্র বিনিময় করে, তাহলে এই ক্ষেত্রের
ফল হয়। ক্ষেত্র বিনিময় কথাটির মানে হচ্ছে, ক্ষেত্র
অর্থাৎ ঘর বদলাবদলি করা। একেই লটারী প্রাপ্তি বলে
অল্পমান হয়।

অভিজ্ঞতায় ওটি ছাড়াও আরো অনেক প্রকারে
যোগাযোগে লটারী প্রাপ্তি দেখা গেছে। কথা হচ্ছে কে
কোন ভাব (মোটামুটিভাবে ঘরও বলা যেতে পারে) বলব
থাকলে লটারী বা ঐ জাতীয় কোন কিছুর সংস্পর্শে হঠাৎ
মবলগ কিছু পাওয়া যায় তা-ই দেখা যাক। এ ব্যাপার
নিম্নোক্ত ভাব বা ঘরগুলি বিচারে বলবান এবং পর
কোন না কোন লক্ষ্যযুক্ত হওয়া চাই।

যথা, দ্বিতীয় (যাকে ধনস্থান বলা হয়), পঞ্চম (যা
পুত্র, মন্ত্র, বা প্রতিভা ও আংশিকভাবে ধনস্থান বলা হয়
নবম (যাকে পূর্বপুণ্য বা ভাগ্য স্থান বলা হয়) ও একাদশ
অর্থাৎ বিনা আশ্রাসে লাভ স্থান। তাহলে ২য়, ৫য়,
এবং একাদশ এই চারটি। এ ছাড়াও আরো একটি
দেখতে হবে সেটি লগ্ন বা তত্ত্বস্থান। জ্যোতিষে
হয়েছে যে, যত বড় ও বলবান শুভযোগই থাকুক, লগ্ন
বা লগ্নস্থান যদি দোষযুক্ত বা পীড়িত হয় তো, সে জাতবে
রাজযোগ বা শুভযোগ ব্যর্থ হবে।

এখন বলবান বলতে কি বোঝায়, তা নিয়ে আলোচনা
করা যাক। ধরা যাক দ্বিতীয়ভাব। প্রথমে দেখতে হ
সেই ঘরের অধিপতি অর্থাৎ মালিক যিনি, তিনি কোণে
তিনি যদি কেন্দ্র-কোণ-গত না হয়ে দুঃস্থানগত (অথ
যষ্ট, অষ্টম, দ্বাদশ) হন, তা হলে তিনি দুর্বল। আর
যদি কেন্দ্র-কোণ গত হয়েও কোন শত্রুগৃহ বা শত্রু
বা পাপগ্রহ দৃষ্ট বা যুক্ত হন, তাহলেও তার বলক্ষয় হয়ে
বলে ধরে নিতে হবে। তাহলে অধিপতিগ্রহ বলব
হবেন, যদি তিনি কেন্দ্র-কোণ-গত হন, মিত্রের গৃ
থাকেন, শুভগ্রহের দৃষ্টলাভ করেন, শুভযুক্ত হন কি

হুজী, স্বগৃহী, মূল ত্রিকোণস্থ কিম্বা নবাংশ বিচারে ঐ সব গুণ পান বা বর্গোত্তমী নবাংশে থাকেন তাহলে তিনি বল-যুক্ত হবেন। প্রথমে সেই ভাব বা ঘরের অধিপতির অবস্থা দেখা দরকার। যদি ঘরের মালিকই নিপীড়িত হন তো শান্তি আসতে পারে কি? এ ছাড়া আর একটি বিচার আছে তাকে বর্গবিচার বলে। উপরোক্ত গুণগুলি পেয়ে বর্গবিচারে সেই অধিপতি গ্রহ যদি উত্তরে যান অর্থাৎ স্ববর্গ বা শুভবর্গ বেশী পান, তাহলে সেই অধিপতি গ্রহকে বিশেষ বলবান বলে রায় দেওয়া যাবে। এইবার দেখতে হবে ঐ যে চারটি ঘর এবং লগ্নস্থানের কথা বলেছি, তাদের অধিপতির সঙ্গে এই দ্বিতীয়স্থানের অধিপতিগ্রহ কোন সম্বন্ধ করেছে কি না? যদি ওদের কারো সঙ্গে ধনপতিগ্রহ যুক্ত, দৃষ্ট, বিনিময় বা একেতর প্রভৃতি সম্বন্ধ কোরে থাকে ত তার ধনলাভ সম্বন্ধে বলবত্তা আরো কায়ম হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে। এরপর দেখতে হবে অষ্টমে (ধনস্থানের ঠিক বিপরীত ঘর) অর্থাৎ রক্ষস্থানে কোন পাপগ্রহ বসে থেকে ধনপ্রাপ্তিতে বিঘ্ন ঘটচ্ছেন কিনা। কোন গ্রহ লগ্ন থেকে কেন্দ্র ত্রিকোণ পতি হয়ে যদিভুক্ত, স্বগৃহী, স্ব-নবাংশ, মূলত্রিকোণ বা বর্গোত্তমী প্রভৃতি যে গুণ-গুলির কথা আগে বলেছি, সে গুণ পেয়ে অষ্টম থেকে ধনস্থানে দৃষ্টি দেন, তাহলে তা অর্থপ্রাপ্তির পথ আরো স্বগম করবে।

তারপর দেখতে হবে ঐ দ্বিতীয়, পঞ্চম, নবম ও একাদশ স্থানগুলিতে কোন গ্রহ আছে কিনা? যদি থাকে সে গ্রহ, শুভ কি অশুভ? আর দেখতে হবে ওরা (তৃতীয়), বঠ, অষ্টম বা দ্বাদশস্থানের অধিপতি কিনা? উপরোক্ত ঘরগুলির অধিপতি হলে তারা প্রাপ্তিযোগ্যকে পণ্ড করে দিতে পারে। অবশ্য তৃতীয়স্থানের অধিপতি ওদের মত অতটা ক্ষতি করতে পারে না, তবু কিছুটা করে।

অভিজ্ঞতায় আরো একটি দেখা গেছে—যথা ধনপতি স্বগৃহী এবং ভুক্ত নবাংশপ্রাপ্ত এবং ধনপতির সপ্তম ছাড়া তিনটি কেন্দ্রেই বলবান্ তিনটি গ্রহ এবং লগ্নপতি স্বগৃহী। ইনিও লটারী পেয়েছেন। এক্ষেত্রে বক্তৃতি হচ্ছে যে কোন গ্রহ পূর্ণরাজ্য স্বকল দিতে পারে, যদি তার কেন্দ্রে বলবান্ গ্রহ থাকে। অবশ্য এ কোডীটিতে একাদশ ও ভাগ্য বলবান্ না হোলেনও দুর্বল ছিল না।

ঐ যে আমরা কথায় কথায় বলি না, ভাগো নেই। এর আসল অর্থ হচ্ছে, পূর্ণরাজ্যে বিখ্যাত হিন্দুরা ভাগেন, পূর্ণ-জন্মের স্বকৃতির কথা। এই পূর্ণজন্মের স্বকৃতির বিচার করা হয়, লগ্ন থেকে নবম স্থানে।

এর মধ্যে আরো একটি কথা বলা উচিত। সেটি হচ্ছে, লগ্ন ছাড়াও আরো একটি ঘর আছে, যেখানে চন্দ্রগ্রহ অবস্থান করেন। একে চন্দ্রলগ্ন বলা হয়। এই ঘরটি থেকেও ঠিক লগ্নের মত বিচার করা উচিত। শুদ্ধ উত্তর ঘরেরই সমান। বর্গবিচারে যেটি উত্তীর্ণ হয় এবং বেশী পরিমাণ শুভবর্গ পায়, সেই ঘরের শুদ্ধ অপর ঘরটির চেয়ে বেশী বলে ধর নেবার জগ্রে জ্যোতিষে উপদেশ আছে।

ব্যক্তিগত দ্বাদশ রাশি ও

লগ্নের কল

[বার রাশি ও লগ্ন ভিন্ন তিনি দুটি ফলই পড়ে দেখবেন।]

শ্রাবণের গ্রহ পরিস্থিতি

রবি সংক্রমণকালীন চন্দ্র ধনুর্রাশিতে, পরদিন শুক্রের মকর রাশিতে ও পরে সপ্তমী দুদিন এক এক রাশিতে অবস্থান করে শ্রাবণ সংক্রান্তিতে পুনরায় মকর রাশির শ্রবণা নক্ষত্রে। রবি-ককটে, বুধ-সিংহে বক্রী হচ্ছেন ২৮ তারিখে—শুক্র মাসের প্রথমে বুধে, পরে সমস্ত মাসই মিথুনে—মংগল সারা মাসই মিথুনে—বৃহস্পতি মেবে ১৩ই শ্রাবণের পর বুধে—শনি বক্রী অবস্থায় কুস্তে।

মেঘ রাশি

মাসের প্রথমদিকেই একটু ভাল যাবে—বার সংক্রান্তি করার জগ্রে পরিকল্পনা করতেও পারেন। মংগল সারা মাস বুধে থাকায় আর কিছুটা বৃষ্টি পেতে পারে, অর্থ-নৈতিক দিকটার একটু সুবিধা দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা। প্রথমদিকে চিঠিপত্রের সংবাদ পাওয়ার আশা দেখা যায়। শেষের দিকে প্রায় সব কাজেই অনাবশ্যক বিলম্ব দেখা দেবে। কৃত্তিকা নক্ষত্রে বৃহস্পতি মেবে থাকায় গুপ্তশক্তির

কক্ষে দাড়াবার সাহস পাবেন। মায়ের শরীর মোটামুটি
দুঃস্থ হবে না। ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য ভালই যাবে। ছোট
টি ভ্রমণে অভ্যস্ত দেখা দেবে। ব্যবসায়ী হলে এ মাসে
ভি হবার বিশেষ সম্ভাবনা, সেই সঙ্গে সম্মানও। জীব
ক্ষে ব্যয়াদিকা নিয়ে বচসা হবে। পিতার অর্থলাভ যোগ
যায়।

স্বপ্ন ভাষি

আয় বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা। মাসের শেষদিকে
কোন কাজ সম্পূর্ণ করতে গিয়ে অকারণ বিলম্ব সৃষ্টি হতে
পারে। আফিস বা কার্যক্ষেত্রে খাটাখাটনি বেশী বাড়বে।
দিক্কেটে খণ্ডের জ্ঞান সরকারের কাছে দরখাস্ত করে
কেন এ মাসে তা পাবার আশা করতে পারেন। কনিষ্ঠ
ভ্রাতা ভগিনীদের কেউ চাকরীতে নিযুক্ত থাকলে উন্নতির
সম্ভাবনা। কণ্ট্রাক্ট বা এজেন্সি পাবার জগ্গে চেষ্টা করলে,
কিছু ঐ জাতীয় কোন কাজ হলে সফল পাবেন। মায়ের
স্বাস্থ্য ভালই। তাঁর কথায় কোন কাজ করে লাভবান
বার যোগ আছে। জী কোনস্থানে যাতায়াত বাবদে
তিরিক্ত ব্যয় জ্ঞান বিরক্তিজান হতে পারেন। পিতার
না মানসিক অশান্তি ও বিব্র ঘটতে পারে।

মিথুন ভাষি

মাসের প্রথম দিকটা ভালই যাবে। সরকারী চাকুরে
লে অনেক সুযোগ এসে উপস্থিত হতে পারে। কিন্তু ২২
তারিখের মধ্যে যদি সে সুযোগ কাজে লাগাতে না পারেন,
লো পরিস্থিতির উদ্ভব হবে। কিন্তু রাহ যদি আপনার
অ-সময়ের কোণ্টিতে বলবান ও সফলদায়ী থাকেন,
গলে অনেক ভাল সুযোগ আপনি কাজে লাগাবেন বলে
আশা হয়। মাতার মানসিক দুশ্চিন্তা, পিতার সম্মান
ভাঙ। কনিষ্ঠ ভ্রাতার চাকরী প্রাপ্তি প্রভৃতি ফলাফল
আশা করতে পারেন। চিত্র-শিল্পী বা সঙ্গীত-শিল্পীরা
না পাবার ভরসা করতে পারেন। জীব শরীর, মাঝে
মাঝে উদ্বিগ্নে ব্যতিব্যস্ত হবার সম্ভাবনা।

কর্কট ভাষি

১৮।১৯—৩৬।৩৭—৫৫।৫৬ বয়সের লোকেরা যোগ ভোগ
পাবেন এ মাসে। বাত, হৃদযন্ত্রণা, উদরাময় প্রভৃতির
সম্ভাবনা দেখা যায়। অল্প বয়সের লোকের দিনকতকের
কর্মস্থলে অদল-বদল বা বদলীর নির্দেশ আসবে।

কাজে কখনও কখনও শত্রুর দ্বারা ক্ষতির আশঙ্কা
দেখা দেবে। মায়ের শরীর সম্ভবস্থলে মরণাপন্ন পীড়ার
সম্মুখীন হবে। পিতার উন্নতি। পত্নীর মাঝামাঝি।
পুত্রকন্যাদের মধ্যম ফল। বন্ধুবান্ধব বা নিকট প্রতিবেশীর
কবলে পড়ে কিছু খেদারং দিতে হতে পারে।

সিংহ ভাষি

পত্নীর ওপর মন আপনার প্রায়ই অগ্রসর থাকবে।
সমস্ত কাজেই বিলি-ব্যবস্থার অভাব দেখা দেবে। ভাড়া-
বাড়ীতে থাকলে মালিকের সঙ্গে কলহের সম্ভাবনা।
ভাগের বাড়ী হলে ভাগীদারদের সঙ্গে বিবাদ। তবে
আর্থিক যোগাযোগ এ মাসে আপনার ভালই। ডাক্তার
বা কনট্রাক্টর হলে অর্থ এবং সুনাম দুই-ই। ছেলে-
মেয়েরা অসং মঞ্চে পড়ে সামাজিক ও পারিবারিক সুনাম
ক্ষুণ্ণ করবে। মায়ের শরীর ভালই যাবে—পিতার উন্নতি
হওয়ার সম্ভাবনা। মাসের শেষাংশে কনিষ্ঠ ভ্রাতার দূরে
যাবার সংবাদ আসতে পারে।

কন্যা ভাষি

এ মাসে ব্যবসা-বাণিজ্যে বিরত থাকলে আশাতীত
পরিমাণ লাভের সম্ভাবনা আসবে। চাকুরেদের পদোন্নতি
হবার আশা আছে। কোন জীলোকের যোগ-সাজসে
কিছু লাভের আশা করতে পারেন। উপরি লাভের উপায়
থাকলে এ মাসে আয় ভালই হবে। জীব স্বাস্থ্য মাঝে
মাঝে দুশ্চিন্তা জাগতে পারে। মায়ের স্বাস্থ্য মন্দ যাবে
না। পিতার উন্নতি হতে পারে কিছা পদবৃদ্ধি। ছোট
ভ্রাতার কোন রকম দুর্ঘটনা কিছা মানহানি ঘটতে পারে।
ছেলে মেয়েরা গুরুজনের বিরুদ্ধতা করতে পারে—কিন্তু
তাঁদের লেখাপড়া বাধা-বিয়ের ভেতর দিয়ে ভালই যাবে।
জীব সাহায্যে আপনি নিজে কিছু সুযোগ সুবিধার সন্ধান
পেতে পারেন।

ভুল্ল ভাষি

মাসটি বড় সুন্দর যাবে। অর্থাগম বেশ মনোহর হবে।
যদি ব্যবসাদার হন, সরকারের সংস্রবে এসে সম্মান পাবেন।
যদি চাকুরে হন, কাজে কর্মে দায়িত্ব নিয়ে সুনাম কুড়োবেন,
বেতন বৃদ্ধির আভাবকিন্তু পদোন্নতির আশা পেতে পারেন।
সম্ভব স্থলে সম্মান লাভ হতে পারে। পুত্রকন্যারা লেখা-
পড়ায় সুসংবাদ বহন করে আনবে। শিল্পীরা সহসা

প্রতিভার উপযুক্ত সম্মান পেয়ে খুশি হনেন। মায়ের স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে। সম্ভবস্থলে বিবাহ হতে পারে। পিতৃস্বথ বৃদ্ধি হবে। ভাগ্যের জোরে কিঞ্চিৎ লাভ করে ফেলতে পারেন। ধর্মকর্ম বা পূজাহুষ্ঠানে কিছু ব্যয়াদিকা ঘটান সম্ভাবনা। পত্নীর প্রীতি জন্মাবে এমন কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়া স্বাভাবিক।

হস্তিক রান্ধি

এ মাসে কোন ফলিবাজ জীলোকের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন ছোঁয়ে ফাঁদে পড়তে পারেন। ফলে অর্থব্যয়, সম্মান-হানি, গৃহিণীর গল্পনা, ঐর্ষ্য হবার সম্ভাবনা আছে। যাদের অর্শাদি গুহ্য রোগ আছে, তাঁদের রোগবৃদ্ধি হতে পারে। শারীরিক দুর্ঘটনা ঘটানও কিছু লক্ষণ দেখা যায়। পত্নীর সঙ্গে সম্প্রীতি নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা ছেপে-মেয়েরা শারীরিক অসুস্থতায় দু'একদিন বিছানা নিতে পারে। লেখাপড়ায় কোন বিঘ্নের সম্ভাবনা নেই। মাসের শেষে কোন প্রকার উদ্বেগজনক খবর পেতে পারেন। মায়ের স্বাস্থ্য ভালই। পিতার দৈহিক দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

শশু রান্ধি

১লা এবং ২৭/২৮/২৯শে শ্রাবণ কিছু অর্থলাভের সম্ভাবনা দেখা যায়। দ্বাতাদিতে যাদের আসক্তি আছে তাঁদের ভাল খেতে পারে। ছাত্রদের, বিশেষ করে বিজ্ঞানের ছাত্রদের এ মাসটি পড়াশোনায় উন্নতি দেয়া যায়। স্ত্রীর সাহচর্যে কিঞ্চিৎ সঞ্চয়ের যোগ দেখা যায়। কারো কারো বিশেষ করে যারা সরকারী চাকুরে, তাঁদের পদবৃদ্ধির সম্ভাবনা। মাসের শেষে বদলীর সংবাদ বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারে। পুত্রকন্যাদের পড়াশোনায় সফল দেখা যায়। পত্নীর সঙ্গে মতৈক্য না হতে পারে। সম্ভবস্থলে সম্মান লাভ। পিতামাতার স্বাস্থ্য অসুস্থ। কনিষ্ঠ ভ্রাতার কর্মলাভ।

অক্ষর রান্ধি

আর্থিক সঞ্চয়ের যোগ পরিস্ফুট হয়। শত্রুবৃদ্ধি হবে কিন্তু নিবিধ ভুক্তকমে মত তাদের আপশোষই বাড়বে।

হঠাৎ স্বাস্থ্য কষ্ট উপস্থিত হতে পারে। অনুচ্চ-অনুষ্ঠান বিবাহ যোগ দেখা যায়। স্ত্রীর স্বাস্থ্য অসুস্থ। মাতুল গোষ্ঠীর মধ্যে কলহের সম্ভাবনা। পরিবারে বে জীলোক ভাঙ্গন ধরাবার চেষ্টা করতে পারে। আপঃ জন্ম কোষ্ঠিতে যদি রাহ শুভফলদায়ী হয় কিম্বা তৃতীয়, একাদশে বলবান থাকে তাহলে এ মাসে বিশেষ উন্নতি আর্থিক সুবিধা লাভ ঘটবে। ১৩ই শ্রাবণের পর কনিষ্ঠ ভ্রাতার পদমর্যাদা বৃদ্ধি পেতে পারে। পিতামাতার স্ব অসুস্থ খাবার সম্ভাবনা।

কুন্ত রান্ধি

স্বাস্থ্য ভালই যাবে। শ্রাবণের ৫/৬ তারিখে বি অর্থ লাভের সম্ভাবনা আছে। পুত্রকন্যাদের পরীক্ষা সাক্ষ্যের সংবাদ এ মাসে পেতে পারেন। প্রণয়স্বীকৃত যোগাযোগের সম্ভাবনা আছে। অকারণ ভীতি আশঙ্কার মাঝ দিয়ে কাটানর জন্তে মানসিক শাস্তি ব্যাধ হতে পারে। কর্মস্থানে গুপ্তশত্রুতারও কিছু আশঙ্কা দে যায়। স্ত্রীর স্বাস্থ্য অসুস্থ। সম্ভব স্থলে পত্নীর বিছালায়ে যোগ দেখা যায়। সঞ্চয়ের চেষ্টা থাকবে, কিন্তু না পরিস্থিতিতে তা সম্ভব হয়ে উঠবে না।

মীন রান্ধি

স্বাস্থ্য মাঝে মাঝে খারাপ যাবে। বায়ুগন্ধি, রক্তচাপ্রতিতে উদ্বেগ দেখা দেবে। আর্থিক যোগাযোগ মধ্য প্রকারের। ব্যবসায়ীদের অনিশ্চয়তার মধ্যে কাটা হবে। স্ত্রীর কোন রকম শারীরিক দুর্ঘটনার সম্ভাবনা দে যায়। পরিবারে কোন মহিলার আবির্ভাব পরিস্থিতি জটিল করে তুলতে পারে। গুপ্তশত্রুতার বিরাগাজন হা মানসিক শান্তি বৃদ্ধি হবার আশঙ্কা। ভাড়া বাড়ীতে বা করলে বাসস্থান নিয়ে বিবাদ বিসম্বাদের সম্ভাবনা। ১৬ শ্রাবণের পর পরিস্থিতি জটিলতর হবে। দ্বাতাদিতে আসক্তি থাকলে শ্রাবণের ৭/৮ তারিখ ভাল খেতে পারে পিতার স্বাস্থ্য ভাল যাবে না। মাতার মধ্য প্রকার।

কোষ্ঠীর বিচার

জ্যোতি বাচস্পতি

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

ভাব

জ্যোতিষ কলিত জ্যোতিষের বিচারের একটি প্রধান অবলম্বন। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, ভাব বস্তুটি যে কি, সে সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা কোন গ্রন্থে কোথাও নেই। ভাব কববার নানারকম পদ্ধতি নানাগ্রন্থে আছে বটে, কিন্তু তা থেকে বোঝা যায় এই যে ভাব সম্বন্ধে এক একজনের ধারণা এক একরকম এবং স্পষ্ট যুক্তিসঙ্গত বা বিজ্ঞান-সম্মত ধারণা কারও নেই। অন্ততঃ সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দী, ইংরাজি ও ফরাসী ভাষার যে গ্রন্থগুলি আমি পড়েছি তার মধ্যে কোথাও ভাবের কোন স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেখেছি বলে মনে পড়েনা। ভাব বলতে আমি যা বুঝি এবং যা আমি যুক্তি ও বিজ্ঞানের বিরোধী নয় বলে মনে করি, তা নীচে লেখা হল।

পূর্বে বলেছি যে পৃথিবীর দৈনিক ও বার্ষিক এই দু'রকম গতির দুটি রেখা আছে—একটি আকাশ-বিষুব, আর একটি ক্রান্তিবৃত্ত। এর মধ্যে ক্রান্তিবৃত্তের সঙ্গে রাশিচক্র রাশি ও নক্ষত্রের যেমন সম্বন্ধ আছে, তেমনি আকাশ-বিষুব নিয়ে আমাদের ভাব গণনা করতে হয়। ভাবের সঙ্গে মূখ্য সম্বন্ধ হচ্ছে আকাশবিষুবের আর গৌণ সম্বন্ধ ক্রান্তিবৃত্তের কি ভাবে তা দেখা যাক। ক্রান্তিবৃত্তের দুপাশে ৮ অংশের মধ্যে যে তারা, গ্রহ বা জ্যোতিষ্ক থাকে তারই প্রভাব ক্রান্তিবৃত্তের উপর পড়ে। কিন্তু, ক্রান্তিবৃত্তের উপর গ্রহনক্ষত্রের এই প্রভাব পৃথিবীতে অভিব্যক্ত হয় কি করে? পৃথিবী কোন রেখা বা কোন বিন্দু দিয়ে এই প্রভাবগুলি নিজের মধ্যে আকর্ষণ করে? এর উত্তর এই যে, পৃথিবী প্রত্যেক জায়গায় বিষুবরেখার বারটি বিন্দু দিয়ে রাশি চক্রের প্রভাব পৃথিবীতে টেনে আনে। এই

বারটি বিন্দুর মধ্যে চারটি বিন্দু মূখ্য। তাদের কেল্ল করেই অপর ভাবগুলি গড়ে উঠেছে। এই চারটি বিন্দু কি? পৃথিবীর যে কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে সেইখানকার আকাশে আমরা যদি মনে মনে আকাশ-বিষুব রেখাটির কল্পনা করি, তাহলে আমাদের মনে হবে যে রেখাটি দু'জায়গায় পৃথিবীকে স্পর্শ করেছে। এক পূর্বদিগন্তে, আর পশ্চিমদিগন্তে। জ্যোতিষের ভাষায় এই দুটিকে উদয়লগ্ন ও অস্তলগ্ন বলে। কিন্তু জ্যোতিষে শুধু লগ্ন বললে উদয়লগ্নকে বোঝায়, লগ্ন কথাটির মানে, যা পৃথিবীর সঙ্গে লেগে আছে। তাহলে আমরা আকাশ-বিষুব রেখার উপর প্রথমেই দুটি বিন্দু পাচ্ছি এক উদয়লগ্ন আর এক অস্তলগ্ন।

আমরা যে কোন জায়গায় যদি আকাশের গা দিয়ে আর একটি রেখা কল্পনা করি, যা খাড়া উত্তর থেকে দক্ষিণে পৃথিবীকে বেড় দিয়ে রয়েছে, তাহলে যে বৃত্তটি পাব, তাকে সেই জায়গায় যামোত্তর-বৃত্ত (Meridian) বলা যেতে পারে। এই যামোত্তর-বৃত্তটি উত্তর-দক্ষিণে পৃথিবীকে বেড় দিয়ে থাকতে যে কোন সময়ে আকাশ-বিষুববৃত্তটি একে দু'জায়গায় স্পর্শ করবে, এক মাঝার উপরে আর আকাশে, আর এক পারের নীচে উল্টো দিকে মাঝ আকাশে। উপরের আকাশের এই বিন্দুটিকে স্বর্গ এবং উল্টোদিকের আকাশের বিন্দুটিকে পাতাল বলা হয়ে থাকে।

উপরের এই ব্যাপারটি আর এক রকমে প্রকাশ কর যেতে পারে। যদি মনে করা যায়, এক ব্যক্ত যে কোন জায়গায় এক দিগন্তবিশিষ্ট প্রান্তরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে, যে প্রান্তরের কোন জায়গায় গাছপালা বা বাড়ীবাড়ী নেই, তাহলে সেই ব্যক্তি প্রত্যেক দিকতে পাবে যে, দিগগোলাকে ঘিরে একটি বৃত্ত রয়েছে। এই বৃত্তটির নাম বিষুব

চক্রবাল (Horizon)। এখন সে যদি ঠিক উত্তরমুখো দাঁড়ায় এবং কল্পনা করে যে ঠিক তার মাথার উপরে আকাশের গা দিয়ে উত্তর-দক্ষিণে আর একটি বৃত্ত আছে, যা এই দিক্চক্রবালকে উপর-নীচে বেড় দিয়ে রয়েছে, তাহলে সেই বৃত্তটিই হবে যাম্যোত্তরবৃত্ত উত্তরে এক জায়গায় এবং দক্ষিণে এক জায়গায় কাটাকাটি করে পরস্পরকে সমান দু'ভাগে ভাগ করেছে এবং কাটাকাটির জায়গা দুটিতে যে কোণ হয়েছে তা সমকোণ।

তাহলে পৃথিবীর যে কোন জায়গায় আমরা দুটি করে বৃত্ত পাচ্ছি—এক সেই জায়গার দিক্চক্রবাল (Horizon,) আর এক সেই জায়গার যাম্যোত্তর বৃত্ত (Meridian) যে কোন জায়গায় এই দুটি বৃত্ত স্থির, কিন্তু আকাশ-বিষুব কিংবা ক্রান্তিবৃত্তও পূর্ব থেকে পশ্চিমে জায়গাটিকে বেড় দিয়ে ঘুরছে। আকাশ বিষুব বা ক্রান্তিবৃত্তের এক পাক ঘোরা শেষ হতে ঘড়ির সময়ের প্রায় ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট লাগে। কাজেই যে কোন জায়গায় সারা রাত-দিনে আকাশ-বিষুব এবং ক্রান্তিবৃত্তের প্রত্যেক বিন্দুটি দিক্চক্রবাল এবং যাম্যোত্তর বৃত্তকে স্পর্শ করে যায়। যখন যে বিন্দুটি দিক্চক্রবালের পূর্বদিক স্পর্শ করে তখন সেইটাই হয় উদয়লগ্ন, আর আকাশ-বিষুবের যে বিন্দুটি দিক্চক্রবালের পশ্চিমদিক স্পর্শ করে সেইটি অস্তলগ্ন। যে বিন্দুটি যাম্যোত্তর বৃত্তকে মাথার উপরকার আকাশে স্পর্শ করে সেইটি হয় স্বর্গ এবং যে বিন্দুটি পায়ের তলার উটোদিকের আকাশে যাম্যোত্তরবৃত্তকে স্পর্শ করে সেইটি পাতাল। অতএব প্রত্যেক জায়গায় আকাশ-বিষুবের মাঝে আমরা চারটি বিন্দু পাচ্ছি—(১) উদয়লগ্ন (২) অস্তলগ্ন (৩) স্বর্গ (৪) পাতাল।

এই চারটি বিন্দুর প্রত্যেকটিকে মাথা মনে করে আমরা যদি চারটি সমবাহু ত্রিভুজ মনে মনে আকাশ-বিষুবের মধ্যে একে নিই, তাহলে আমরা আকাশ-বিষুবের মধ্যে আর আটটি বিন্দু পাব। গোড়ার চারটি আর তাহের প্রত্যেক ত্রিকোণের দুটি করে আটটি বিন্দু নিয়ে আকাশ-বিষুবের মধ্যে তাহলে সর্বসমেত বারটি বিন্দু পাওয়া গেল। এই বিন্দুগুলিকে যদি আকাশ-বিষুবের একটা ছবি একে দাঁগ দিয়ে নেওয়া যায়, তাহলে দেখা যাবে যে ৩০ অংশ অস্তর একটি করে বিন্দু পড়েছে। অর্থাৎ

এই বারটি বিন্দু দিয়ে আকাশ-বিষুবকে যেন সমান ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

এখন যদি উদয়লগ্নকে গোড়া ধরে এই বারটি বিন্দু পশ্চিম থেকে পূর্বে গুণে যাওয়া যায়, তাহলে উদয় হবে প্রথম, তার পরের বিন্দুটি দ্বিতীয়, তার পরেরটি তৃতীয় এইভাবে দ্বাদশ পর্যন্ত। এই বকম গুণে গেলে দেখা যাবে, আমরা যে বিন্দুকে পাতাল বলেছি সেটি হবে চতুর্থ, যাকে অস্তলগ্ন বলেছি সেটি হবে সপ্তম, যাকে স্বর্গ বলেছি সেটি হবে দশম।

প্রত্যেক জায়গায় এই বারটি বিন্দু দিয়ে রাশিচক্রের প্রভাব পৃথিবী গ্রহণ করছে। রাশিচক্রের উপর যারি প্রভাব সবই সমানভাবে যদি এই বারটি বিন্দু দিয়ে পৃথিবী গ্রহণ করত, তাহলে একই সময়ে সব জায়গার উপর রাশিচক্রের প্রভাব সমানই হত এবং তাহলে ভাব কষবার কোন সাধকতা থাকত না। বস্তুতঃ আকাশ-বিষুবের উপর বা বিন্দু রাশিচক্রের উপর অহরূপ বারটি বিন্দু থেকে প্রভাব ক'রে পৃথিবীকে দান করে।

কোন এক স্থানে কোন একটি বিশেষ সময়ে রাশিচক্রের এই বারটি বিন্দুর উপর গ্রহনক্ষরের যা কিছু প্রভাব থাকে সেই স্থানে সেই সময়টিতে শুধু সেই প্রভাবটুকুই অস্তিত্ব হয়। যদিও প্রকৃতপক্ষে ভাববিন্দুগুলি আকাশ-বিষুব উপর কল্পনা করা হয়, তাহলেও রাশিচক্রের উপর যে অরূপ বারটি বিন্দু পাওয়া যায়, ফলিত জ্যোতিষে সেইভাবেই ভাব বলা হয়ে থাকে। ফলিত জ্যোতিষে লগ্ন প্রথম ভাব বলতে রাশিচক্রের সেই বিন্দুটিকে বোঝায়—বিন্দুটির প্রভাব আকাশ-বিষুবের উদয়লগ্নের মধ্যে পৃথিবীতে অতিব্যক্ত হচ্ছে।

আকাশ-বিষুবের বারটি বিন্দু দিয়েই প্রত্যেক জায়গায় রাশিচক্রের বারটি বিন্দু নিকষিত হয়। কিস্তাবে নিষিত হয় তা মংগ্রীত “সরল জ্যোতিষে” বর্ণিত হয়েছে। অতএব ফলিত জ্যোতিষের ভাব শব্দটির আসল মা রাশিচক্রের মধ্যে বারটি বিন্দু, যে বিন্দুগুলি উপর রাশিচক্রের প্রভাব একটি বিশেষ স্থানে একটি বিশেষ মুহূর্তে পৃথিবীর উপর অতিব্যক্ত হচ্ছে।

যে কোন স্থানে ২৪ ঘণ্টার রাশিচক্রের চাকা একবার করে পূর্ব থেকে পশ্চিমে ঘুরে থাকে। কিন্তু সেই স্থানে

আকাশের পূর্ব-দিকন্ত, পশ্চিমদিকন্ত, মাঝার উপরকার মাঝ-
আকাশ প্রভৃতি দিকগুলিও যেমন স্থির আছে, তাব-
বিন্দুর অবস্থানের দিকগুলি তেমন স্থির আছে। অতএব
রাশিচক্র একবার ঘুরে গেলেই রাশিচক্রের সবখানি প্রত্যেক
ভাববিন্দুকে স্পর্শ করে যাচ্ছে। এ থেকে বোঝা শক্ত নয়
যে রাশিচক্র রাতদিন ঘুরছে, তখন যে কোন স্থানে প্রত্যেক
মুহুর্তে রাশিচক্রের ভিন্ন অংশ ভাব-বিন্দুগুলিকে স্পর্শ করছে,
কাজেকাজেই বিভিন্ন মুহুর্তে রাশিচক্রের ভিন্ন অংশের
প্রভাব সেই স্থানে অভিব্যক্ত হচ্ছে। এ থেকে এও বোঝা
যায় যে একই মুহুর্তে বিভিন্ন স্থানের ভাব-বিন্দুগুলি বিভিন্ন।
কিন্তু একই মুহুর্তে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের রাশিচক্রের ভিন্ন
ভিন্ন অংশের প্রভাব অভিব্যক্ত হয়ে থাকে। ভাব-বিন্দু
নির্ণয় করতে হলে স্থান ও সময় দুটিই জানা চাই। অনেক
মনে করতে পারেন যে ভাবসমক্ষে এত বিস্তারিত করে
বলার প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু আমার মনে হয় ভাবের

ব্যাপার সংক্ষেপে বলতে গিয়ে একটা ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি
করার চেয়ে, অনাবশ্যক বাহ্যিক বাহ্যিক, যদি তাতে
ব্যাপারটা স্পষ্ট করে বোঝার পক্ষে সাহায্য করে। তা'
ছাড়া ভাবের ব্যাপারটি এত বিস্তারিত করে বলবার আরও
আবশ্যক আছে। এরপরে বিচারের ব্যাপারে “আত্মকারক”
নির্ণয় সম্বন্ধে যা বলব, তার সঠিক মর্ম ততক্ষণ কখনই
বোঝা যাবে না—ততক্ষণ ভাব সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণা
না হয়। পরিশেষে প্রথম শিক্ষার্থীকে দু'টি কথা বিশেষ
ভাবে স্মরণ রাখতে অনুরোধ করি।

১। বারটি ভাব রাশিচক্রের উপর বারটি বিন্দু
মাত্র।

২। বারটি ভাব-বিন্দু আমাদের জানিয়ে দেয়, কোন
এক বিশেষ স্থানে কোন এক বিশেষ সময়ে রাশিচক্রের
কোন অংশগুলির প্রভাব সেই স্থানের উপর অভিব্যক্ত
হচ্ছে।

[ক্রমশঃ]

নীলমণি বাইলেন

বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

সময়ের স্রোতে তইলে আটকে নিয়ে
কে দ্রুত টানছে? ক'বছর বাদ দিয়ে
শেকালিকা বোস এল আমাদের বাড়ি
জোলুস টেনে—ধূপছায়া-রং শাড়ি।

নিঃস্বাম বাড়ি নীলমণি বাইলেনে
হঠাৎ হলদে মিহি রোদুর টেনে
ঝলকে উঠল। দেখি—আকাশের নীল
ছ'য়ে আছে বাড়িটার ইটের পাচিল।

শেকালি নামল, মুখর কথার ঢেউ
ছিটকিয়ে দিল ভিড়ল অনেক কেউ।
কথা অগুণতি—তা'তেই সাঁতার কাটে।
নীড়াভিমুখী পাখিরাও পাখ্যসাটে—

সময় গড়ায়—সে খেয়াল একটু কী
মনের মুকুরে একটু দিল না উকি?
আমার সঙ্গে একটি কথাও নয়,
দৈবাৎ কানে চুড়ির আওয়াজ হয়।

জানিনা তাকে তো কে-যে সময়ের স্রোতে
ঘুরিয়ে চলছে? হুকুম মাকিক—দ্রুত
শেকালি বোসকে ভুলে দিতে হয় ট্রেণে,
মেঘ কি করল নীলমণি বাইলেনে?

ট্রেণ ছেড়ে দিল, কি বলব—অপলক
চেয়ে রইলাম, মনে হল তার চোখ
কী কথা বলছে, মোম-গলা মিহি স্বর,
ধমকে গেলাম—হাওড়ায় নামে ঝড়।

(ক) নিষাকারও সত্য, সাকারও সত্য। যতক্ষণ তুমি নিজে সত্য, জগৎও সত্য। ঈশ্বরের নানারূপও সত্য—রামকৃষ্ণ।

(১) সত্য বলতে কি বোঝা যায়? প্রতিনিয়তই আমরা এই শব্দটা ব্যবহার করি। আমরা বলি সত্যমেব জয়তে। রামকৃষ্ণ অগ্রর বলেছেন—সত্যই কলিগুণের তপস্বী। সত্য কি পদার্থ?

(২) বস্তুতঃ সত্য কোনও পদার্থ কিনা তাও জানা দরকার। তাহলে আরও হুজু প্রশ্ন উঠবে, পদার্থ কি?

(৩) এই পরিদৃষ্টমান জগতে আমরা যা—কিছু না কেন দেখি বা অনুভব করি বা জানি বা গোগ করি বা ইচ্ছা করি, তারই পরিবর্তন আছে, তারই নাশ আছে ও অপলাপ বা অবসাদ আছে। আমাদের এই বাক্যটা সত্য কেন? আমাদের এই বিচারের সত্যতাটা কি জিনিষ? সত্য কোনও দ্রব্য নয়, কোনও দেশদিককাল সম্পন্ন বা গুণবিশিষ্ট সামগ্রী নয়। সত্য এক বিশেষ প্রকারের ধর্ম। কিসের ধর্ম? আমাদের অনুভবের, আমাদের বিচারের একবিধ ধর্ম হল সত্য। সত্যকে জানা মানে সত্যনামক কোনও বস্তুকে জানা নয়। সত্যকে জানা মানে এমন কোনও বস্তু জানা—যার সঙ্গন্ধে আমাদের জ্ঞান সত্য। সত্যের ধর্ম বস্তুত্ব নয়। বস্তুর একরকম ধর্ম হচ্ছে সত্য। এই ধর্মটা কি?

(৪) ধাবমান জলপ্রোতের মধ্যে একটা সরল যষ্টি স্থাপন করলে সেটাকে বাঁকা দেখা যায়? এই প্রতীতি বা অনুভব বা জ্ঞানকে সত্য বলা চলে—কি না? অর্থাৎ এমনত অবস্থায় যষ্টিটাকে যে রূপ প্রতীতি হচ্ছে যষ্টিটা মেরূপ এই বাক্য বা বিচার সত্য, না যষ্টিটাকে এমনত অবস্থায় ঋজু বা সোজা বলা সত্য? স্বরার নেশায় কাউকে যদি ছুঁই ব'লে প্রতীতি হয় তাকে ছুঁই ব'লে বিচার করা কি সত্য বিচার? বিষেবের বশবর্তী হ'য়ে কারও চরণ যদি বাঁকা মনে হয় তাকে বক্রগামী বিচার করা কি সত্য বিচার?

(৫) প্রায়টা কঠিন। দুই দিক থেকে বিচার করতে হয়। প্রতীতি যতক্ষণ হচ্ছে—ততক্ষণ কোনও একটা জিনিষকে যে রূপ প্রতীয়মান হচ্ছে—সেটা সেইরূপ না বলতে চাইলে সত্যের অপলাপ হয়। এই একটা দিক। যদি লানসুখ্যের দিকে কিছুক্ষণ তাকাবার পর সাদা দেওয়ালে তাকান যায় সবুজ রঙ দেখা যায়; সেই দেখাটা ও সেই দেখাসম্বন্ধীয় বাক্যটা না স্বীকার ক'রে উপায় কি? কিন্তু কিছুক্ষণ পরে সবুজ রঙের খোর কেটে যায়। সুতরাং আমরা বলি দেওয়ালকে সবুজ দেখাটা ৩ কালের অজ্ঞ, অতএব সত্য হ'লেও দেওয়ালটা কোনও কালেই সবুজ নয়। সুতরাং সেই দেখাটা ও তদর্শনসংক্রান্ত বাক্যটা মিথ্যা। সত্যের আর একটা অর্থ আছে। এটা আর এক দিক। সেটা কি? কোনও একটা দ্রব্যকে এখন মিষ্ট মনে হচ্ছে কিছুক্ষণ পরে যদি সেটাকে তিক্ত মনে হয় তাহ'লে দ্রব্যটাকে মিষ্ট বা তিক্ত কিছুই বলা চলে না। কোনও একটা জীবকে এখন সবুজ খাবার পরক্ষণে হলুদ মনে হলে জীবটাকে সবুজ বা হলুদ কিছুই বলা চলে না। তাকে কোনও এক বিশেষ বর্ণের অধিকারী বলা চলে না। কারণ তাহ'লে সংশয় জাগে কোনও একটা বিশেষবর্ণের অধিকারী হ'য়ে সে অজ্ঞ বর্ণ ধারণ করে কি ক'রে? জীবটাকে সেইজন্ত হয় বহুরূপী, নতুবা অরূপ বললে সত্য বলা হয়। সুতরাং সত্য কি?

(৬) অগ্রসর হওয়ার আগে পদার্থ সম্বন্ধে ধারণাটা পরিকার করে নেওয়া দরকার। দ্রব্য, গুণ, দেশ, কাল, পরিমাণ, ধর্ম, সংখ্যা, কার্য, কারণ, এগুলির প্রত্যেকটাকে আমরা এক এক রকম পদার্থ বলে থাকি। সুতরাং পদার্থের অর্থ হচ্ছে চিন্তার প্রধান প্রধান বিষয়। এই অর্থে সত্যকেও পদার্থ বলতে বাধা নেই। তবে এই পদার্থটার স্বরূপ বুঝতে বেশ বেগ পেতে হয়।

(৭) যে-জীবকে এখন সবুজ ও পরক্ষণে হলুদ দেখা যাচ্ছে সেটাকে কেবল সবুজ বা কেবল হলুদ বললে মিথ্যা

হবে; কারণ পরক্ষণে হলুদ মানে পরক্ষণে সেটা অসবুজ হচ্ছে এবং জীবের পক্ষে সবুজ হতে গেলে এক্ষণে সবুজ ও পরক্ষণে অসবুজ হওয়া চলে না। অন্তরূপে বলতে হয় জীবটাকে সবুজ হতে গেলে সবসময়ের জন্ত সবুজ হওয়া দরকার; অন্তত যতক্ষণ জীবটা টিকে থাকে ততক্ষণ সবুজ থাকা দরকার। আবার এখন সবুজ ও পরক্ষণে হলুদ (অ-সবুজ) এবং এখন হলুদ ও পরক্ষণে সবুজ (অ-হলুদ) হওয়াতে জীবটা অন্ত কোনও এক বিশেষ বর্ণের অধিকারী এরকম বর্ণনাতেও ভুল হয়। কারণ একই; সব সময়ের জন্ত কোনও একই বর্ণ আসছে না। অপরি-বর্তনশীলতা সেইজন্য সত্যের একটা মাপকাঠি।

(১৮) প্রশ্ন উঠবে জীবটা বিভিন্ন বর্ণের অধিকারী এরকম বলাতেও কি মিথ্যা আছে? এইক্ষেত্রে পরিবর্তনশীলতা জীবটার স্বভাব, এরকম বিচারকে বা বোধকে মিথ্যা বলা চলে না। কারণ তাহলে এখন সবুজ ও পরক্ষণে অসবুজ, এখন নীল পরক্ষণে অনীল, এরূপ বাক্যগুলোর মধ্যে কোনও সংঘর্ষ হয় না; প্রত্যেক বর্ণনাটাই আর একটা বর্ণনার সঙ্গে খাপ খায়, কোনও বিরোধ হয় না। অবিরোধ বা সংঘর্ষহীনতা বা সামঞ্জস্য সেইজন্য সত্যের আর একটা লক্ষণ বা পরিচয়।

(১৯) কিন্তু ধরুন যদি এমন হয়—যে জীবটাকে লাল কাচের মধ্যে দিয়ে দেখার ফলে লাল দেখাচ্ছে এবং পরক্ষণে সবুজ কাচের মধ্যে দিয়ে সবুজ দেখাচ্ছে, আবার আর এক সময় স্ববর্ণবর্ণ কাচখণ্ডের মধ্যে দিয়ে সোনালী দেখাচ্ছে—এই অবস্থার জীবটা বহুরূপী অর্থাৎ বহুরূপ ধারণ করা জীবটার স্বভাব এই জ্ঞান বা বাক্য সত্য হবে কি? স্বভাবগত গুণ বলতে আমরা বুঝি এমন গুণ যা বাহ্য কতকগুলো নিমিত্তের দ্বারা উৎপন্ন নয়; স্বভাব বর্তমান ক্ষেত্রের বহুবর্ণসম্পন্নতাকে স্বভাব বললে এই ছরকম বাক্যের ও ভিন্নহিত জ্ঞানের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়। বিচার্য বোধটির বহিঃস্থ অজ্ঞাত সর্ববিধ জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গতি হল সেইজন্য সত্যের আদর্শ।

(২০) যে বস্তুকে রঙীন কাচের মধ্যে দিয়ে রঙীন দেখা যায় তার সম্বন্ধে যদি বলা হয় যে কতকগুলো অবস্থা-বিশেষে সে বস্তুর বাঃনিজ বর্ণ—তার চেয়ে অন্ত বর্ণ তার হতে পারে এরকম বাক্য সত্য ও নির্দোষ হবে কি?

অর্থাৎ কোনও এক বস্তুর একটা যথার্থ রূপ ও আর একটা আবর্তাসিক রূপ থাকতে কোনও বাধা আছে কি? আমরা বলতে বাধ্য যে কোনও বাধা নেই। তবে আবর্তাসিক বা তাৎসিক রূপ কখনও এমন কিছু হতে পারে না যা বুদ্ধির কাছে অসম্ভব। যেমন কোনও বস্তুর যুগপৎ ত্রিকোণ এবং গোলাকার এ দুটো রূপ থাকতে পারে না; অর্থাৎ স্বরূপত বস্তুটি বর্তুলত্রিকোণ কিংবা ত্রিকোণবর্তুল-কাররূপে বস্তুর অবভাস হচ্ছে, এরকম উক্তির দুটোই মিথ্যা। স্বভাবাং কতকগুলো ক্ষেত্রে মিথ্যাকে সোপাধিক সত্য বলা চলে। কিন্তু যা অসম্ভব তা কখনও সত্য হতে পারে না; এমন কি সেটা সোপাধিক বা অবস্থাবিশেষের সত্যও হতে পারে না। এটা সত্যের আর একটা নির্ণায়ক।

(২১) ট্রেণে চলবার সময় যখন গাড়ী জোরে চলে, তখন স্থির গাছগুলো দৌড়ুচ্ছে বলে প্রতিভাত হয়। গাছ-গুলো সত্য সত্য চলে না, কিন্তু চলমতীর অবভাস সৃষ্ট হয়। যে সময় দৌড়ুচ্ছে মনে হয়—সে সময় গাছগুলো ধাবন্ত ও স্থির দুই-ই একথা বললে কি মিথ্যা হবে? অর্থাৎ স্বরূপত: গাছগুলো স্থির, ভূমিবদ্ধ কিন্তু অবভাসত: সেগুলো চলন্ত ও ধাবন্ত এরকম বলাতে কি মিথ্যা আছে? এরকম বলাকে মিথ্যা বলা চলে না। তবে স্বরূপত বা অবভাসত গাছগুলো যুগপৎ স্থির ও অস্থির এরকম উক্তি সত্য হতে পারে না, কারণ দুই বিপরীত ধর্মের যোগপণ্য অসম্ভব। সূর্য্য নড়ে না অথচ সূর্য্য নড়ে মনে হয়। কিন্তু যথার্থত: নড়ে এবং নড়েও না—এরকম বিচার গ্রহণীয় নহে। কতকগুলো অবস্থায় সূর্য্য অস্থির রূপে প্রতীয়মান হয়, কিন্তু বহুতর জ্ঞাত তথ্যাদির দৃষ্টি দিয়ে বিচার করলে সূর্য্য হচ্ছে যথার্থত: স্থির। অতএব জ্ঞানের অস্তিত্ব দ্বারা জ্ঞান বাধিত হয় না। জ্ঞানের রূপান্তর সম্ভবপর। যেমন, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণশক্তি অতিক্রম করে অনেক উর্দ্ধে গিয়ে পৃথিবীকে ইন্দ্রিয় দিয়ে দেখা সম্ভবপর হ'লে আমাদের ধরাকে সচল ব'লেই দেখা যাবে। পরমসত্যনির্ধারণের সময় এই সূত্রটাও মনে রাখতে হয়। এবার বিচার্য বিষয়ে আসা যাক।

(২২) পরমসত্য সাকার ও নিরাকার। আমরা কি নিরত দেখছি মা যে সাকার নিয়েই আমাদের

অধিকাংশ কার্যকার। সাকার বা আকারবান্ সত্তাগুলো নেই—এই বলে চোখকানকে অস্বীকার করা যুক্তিসঙ্গত হতে পারে না। তবে থেকেও সেগুলো অলীক বা মিথ্যা এরকম হয়ত কেউ বলতে চাইবেন; কিন্তু এগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে পারলেও সত্য বস্তুর সাকারকে প্রতীয়মান হওয়ার সঙ্গত ও সমর্থ কারণ থাকতে হয় এবং যখন সমস্ত সাকার বস্তু নিয়ে কথা উঠেছে, তখন কারণটা সত্যবস্তুর মধ্যেই মিশে থাকতে বাধ্য, যেহেতু সেই বস্তুর বাইরে কোনও দেশ বা রাজ্য নেই। এই দিক থেকে দেখলে পরমবস্তুকে সাকার ও নিরাকার দুইই বলাতে খুব দোষাবহ হয় না। নিরাকারের মধ্যেই আকারিত হওয়ার অভিসন্ধি বা সংকল্প আছে মনে করতে হয়।

(১৩) শুধু নিরাকার আছে এ উক্তি প্রাকৃত অভিজ্ঞতা দ্বারা সমর্থিত নয়। ব্যবহারিক সত্যরূপে সাকারকে স্বীকার করা কতদূর জায়সঙ্গত এবং কি তার তাৎপর্য বিচার করে দেখা দরকার। ব্যবহারিক সত্য বলে আমরা বুঝতে চাই যে যাকে সাকার বলি তাকে সাকার বলা একরকম সংস্কার বা একরকম রেওয়াজ। কিন্তু সংস্কারই বলি বা রেওয়াজই বলি, আকারকে কাজে কথায় চিন্তায় ভাবনায় মেনে নিয়ে চলতে হয়। কোনও রকম আকারকেই বেকার বলে পরিভ্যাগ করা যায় না। আমাদের কাছে আকারের বিপরীত হল শূন্য। আমাদের চৈতন্য বা মন সম্বন্ধীয় ধারণাও আকারগত। কারণ মনস্তত্ত্বের কম বেশি বা পরিমাণ আছে এবং পরিমাণও একরকম আকার। স্মৃতিশক্তি সংস্কার বলতে চান বলুন। সন্ধে সন্ধে আপনাকে স্বীকার করতে হবে এই সংস্কার অবিনাস্তিক। যতক্ষণ প্রচলিত জগতের জ্ঞান আছে, আস্থা ও অনাস্থার মোহ আছে, আমি এবং ইদংএর জ্ঞান আছে, ততক্ষণ সাকার সত্তার বিশ্বাসকে এক রকম সংস্কার বা ব্যবহারিক নৌকর্য বলা শুধু শব্দের খেলা মাত্র, বস্তুত: সেই বিশ্বাসকে ব্রহ্মজ্ঞান না হওয়া অবধি অল্প বিশ্বাস দ্বারা বিনিময় করা অসম্ভব। যেখানে বিনিময়ে বা পরিবর্তে অল্প কোনও বিশ্বাস রাখা অসম্ভব, সেখানে ব্যবহারিক সত্তাই হ'ল কার্যত: বাস্তবিক সত্তা।

(১৪) যুক্তি দ্বারা যদি সাকার ও সীমার বোধ্যতা প্রতিপন্ন না করতে পারা যায় তাহ'লে সেগুলো সত্য নয়

বলতে হয়। কারণ সত্য কি? আমরা আগেই দেখেছি যে কোনও উক্তিকে স্বীকার করার ফলে যদি বাধা, বিরোধ বা অসামঞ্জস্য আসে, তাহ'লে সেই উক্তিকে অসত্য বলতে আমরা বাধ্য। পৃথিবীকে কমলালেবুর আকারে না দেখতে পারলেও পৃথিবী যে অনেকটা কমলালেবুর আকার, আমরা সত্য বলে এই কারণেই মানি।

(১৫) আকার হল দেশকাল নিমিত্ত ও শক্তি দ্বারা অবিস্তারিততার এক বিশেষ রূপ। কিন্তু দেশ, কাল শক্তি ও নিমিত্ত প্রত্যেকটাই ধারণা অপ্রাপ্ত দুসোধ্য। দেশকে বুঝতে হ'লে কালের ধারণার সাহায্য নিতে হয়। কোনও বস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা ও দিক নির্ণয় বা পরিমাপ করতে সময় লাগে, এই সময়টুকুকে স্বীকার করে তবে বস্তুটির প্রকৃত দেশগত ধারণা সম্ভবপর, অথচ পরিমাপের জন্য যতটুকুট না কেন সময় লাগুক সেই সময়ের মধ্যে পরিবর্তন অবগতরাবী। সময়ের শাসনাবীন না হ'লে দেশকে নির্দ্ধারিত করা যায় না। সময় ধেম গিয়েছে—এরকম কল্পনা করে দেশেব যেকোনও আমরা পাহ'তা হল একেবারে কাল্পনিক দেশ। মেরকম দেশ শুধু একটি বিন্দু মাত্র। অংশের অংশ, তার অংশ কল্পনা করতে করতে বিন্দুতে আশ্রয় নিতে হয়, কিন্তু কালের ধারণা ব্যতীত বিন্দু থেকে বৃহতে আগমন নিত্যস্থির অসম্ভব। বৃহৎকে দেশ দ্বারা ক্ষুদ্রে পরিণত করা যায়, ক্ষুদ্রে কাল দ্বারা বৃহতে পরিণত করা যায়। দেশের ধারণা ব্যতীত আবার কালের ধারণাও অসম্ভব। কোনও একটা কিছুই আর একটা কিছুতে পরিণতি হল কালের লক্ষণ। পরিণতি হচ্ছে পরিবর্তন এবং দেশ থেকে পৃথক ও অসংযুক্তরূপে এবং দেশের সহায়তা বিনা পরিবর্তনকে মাপা যায় না। শুধু কলনী নামক কিছু পদার্থ আমাদের গোচরে নেই। অতএব আকারের সত্য প্রতীত হ'লেও বিচার দ্বারা প্রতিপাদিত নয়, এর সত্যতা বুদ্ধির কাছে রহস্যময়ী।

১৬। রহস্যময় আকার ও নিরাকারের মধ্যে বড় কোনও বিরোধ নেই। নিরাকার বস্তুর পক্ষে রহস্যময় আকারে আকারিত বা প্রতীয়মান হওয়ার মধ্যে সাংঘাতিক কোনও অসুবিধা বা ব্যাঘাত ধরা পড়ে না। এই দৃষ্টিতে নিরাকারও সত্য, আকারও সত্য। আকারের স্বরূপ যদি অনির্কটকীয় না হত, আকারের মধ্যে যদি সংশোধন বা

সম্পূর্ণের কোনও অবকাশ একেবারেই না থাকত তাহলে আকারকে নিরাকারের সঙ্গে সত্য বলা যেত না। যেহেতু আকারের স্বভাব রহস্যময়, এরকম ধারণা করা অসম্ভব নয় যে রহস্যভেদ করলে বোঝা যাবে যে সাকার ও নিরাকার অপ্রভেদ; সাকার স্বরূপ ও নিরাকার স্বরূপ দুইই এক বস্তু।

১৭। বর্তমান বিজ্ঞানে যেমন শক্তি ও জড়কণার মধ্যে প্রভেদ খুব বেশী নয়, তেমনি পরমবস্তুর পক্ষে আকারশূন্যতা ও আকারযুক্ততা দুইই সম্ভবপর এবং বর্তমান বিচারে সম্ভবপরতা মানেই সত্যতা। কারণ, বর্তমান প্রশ্নটা হচ্ছে সমগ্র বিশ্বের সম্বন্ধে এবং সব-কিছু এই বিশ্বের মধ্যে নিহিত এবং এই দুই দিকের সামঞ্জস্য অবশ্যস্বাভাবী। আকার প্রত্যয় থেকেই নিরাকারের জ্ঞান আসতে বাধ্য। এই জগতে আকারকে প্রত্যাখ্যান করা সম্ভবপর কি করে? তবে আকার আকার দ্বারা প্রতিবাধ্য নয়। নিরাকারকে স্বীকার না করলে আকারের উদ্ভব বোধ্য নয়। যা-কিছু কোনও বিশিষ্ট আকারে আকারী তার আকার-পরিবর্তন বোঝা যায়; কিন্তু আকারের জন্ম কি ক'রে হয়? আকার দ্বারা আকার-সাধারণ্য বা আত্মাকারের জন্ম বোঝা যায় না। কারণ, আত্মাকারের মানে হল যেখানে কোনও আকার বা আকারের আভাস নেই, সেখানে আকারের উদয়। সেইজন্য নিরাকারকেই আকারের আধার-ভূতমানে করতে হয়। নিরাকারই হল সব আকারের আকর। আকার ও নিরাকারের অর্ধৈক্য অবশ্যস্বীকার্য। নিরাকার থেকে জিগমিষার ফলে আকার জন্মে। এই জিগমিষার ক্রিয়া সর্বত্র দেখা যায়। এরই প্রভাবে যেখানে কোনও বিশিষ্ট ভাব নেই, সেখানে বিশিষ্ট ভাবের উদয় হয়। এই জিগমিষাই মহামায়া।

(১৮) আকারজ্ঞান নিভর করে ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়ার ওপর ও মাহুষের মন ও বুদ্ধি ও সংকল্পের কার্যশীলতার ওপর। যতক্ষণ সেগুলো ক্রিয়মান থাকবে, দেশ-কাল-নিমিত্তাদির বোধ থাকবে, ততক্ষণ আকারকে স্বীকার করা অসম্ভব। আকারজ্ঞান যখন আছে তখন পরমবস্তুকে মূখে নিরাকারী বললেও, সাকাররূপে ধারণা করতে আমরা বাধ্য। এই অবস্থায় নিরাকার আমাদের কাছে অগ্রমের্যাকার ব্যতীত আর কি? এই অবস্থায় পরমচৈতন্য আমাদের কাছে

সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ ও অশেষকারণিক এক ব্যক্তিবিশেষ। এই বোধকে অবহেলা করা চলে না, উপেক্ষা করা চলে না, স্বীকার করা চলে না। অহং-প্রত্যয় ও মীমাংসার প্রত্যয় যতক্ষণ জাগরূক থাকে ততক্ষণ পরমেশ্বর এক পরমপুরুষ সেই প্রত্যয়ও যায় না, চেষ্টা করলেও যায় না। সুতরাং জড়বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যেমন আধ্যাত্মিকবোধের ক্ষেত্রেও তেমনি আপেক্ষিকতা হচ্ছে একটা অত্যন্তরূঢ় সত্য।

(খ) “তিনি নিরাকার। আবার সাকার। ভক্তের জগৎ তিনি সাকার—ধারা জ্ঞানী অর্থাৎ জগৎকে যাদের স্বপ্নবৎ মনে হয়েছে তাদের পক্ষে তিনি নিরাকার। ভক্ত জানে আমি একটি জিনিস। জগৎ একটি জিনিস। তাই ভক্তের কাছে ঈশ্বর ব্যক্তি হয়ে দেখা দেন। জ্ঞানী ব্রহ্মকে বোধে বোধ করে। তিনি যে কি মুখে বলতে পারে না। কে বলবে? যিনি বলবেন, তিনিই নাই; তাঁর ‘আমি’ আর খুঁজে পান না। আর খুঁজবেই বা কে? সেখানে ব্রহ্মের স্বরূপ বোধে বোধ হয়। কিরূপ হয় কে বলবে?”—রামকৃষ্ণ।

(১) পরমবস্তুকে যে অসামান্য ব্যক্তিরূপে প্রতীতি হয় মাহুষী বুদ্ধির সংস্কারগুলো তার অন্তর্নিহিত ও মৌলিক কারণ। তাহারও আর একটা কারণ আছে। পরম-বস্তুর প্রতি যখনই ভক্তি ও উগাসনার বৃত্তিগুলো উদ্ভিত হয় তখন একপ্রকার মানসিক সৃষ্টি-ক্রিয়া আরম্ভ হয়। যাকেই বা যে-বস্তুকে ভালবাসা যায় তার সম্পর্কে এক-প্রকার কল্পনাসৃষ্টি অনিবার্য। এই ক্রিয়াকেই জৈনিক ফরানী মনীষী “crystallisation” (দানাবাধার ক্রিয়া) নাম দিয়াছেন।

(২) প্রেমাস্পদের মধ্যে পূর্ণব্যক্তিতা দেখা প্রেমের স্বভাব এবং সেই-দেখাতেই তার রস, বৈশিষ্ট্য ও আনন্দ। ব্যক্তি হয়েও যিনি ব্যক্তির বাড়া সেই ব্যক্তি যে কেবল-ব্যক্তির বাড়া সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তবে ব্যক্তি হ'য়ে ব্যক্তির বড়ো হওয়া সম্ভবপর কি না সে অন্য কথা। ভক্তির কাছে পরমায়্যা হল ঈশ্বর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এবং এটা হয় ভক্তির আবেগবশতঃ। শুদ্ধচৈতন্য বা সন্ন্যাসের জ্ঞান যখন হয় তখন আত্মা বা অনাত্মা, আমি বা ইহা, কিছুই নেই। সুতরাং সেই বোধের মধ্যে কোনও

ভেদজানই নেই। এইজন্য রামকৃষ্ণ বলেছেন : “ব্রহ্মণোহে বোধ হয়। কিরূপ বোধ হয় কে বলবে।” তাহলে কি বিশ্বের দুটো দিক : একদিকে নির্বিশেষ চিন্মাত্র ও অল্প-দিকে ঈশ্বর জীব-জগৎ বিশিষ্ট ব্রহ্মাণ্ড। এ দুটোর মধ্যে কি একটা বিরাট ফাঁক? বিশ্ব কি তাহলে দুটো আলাদা আলাদা টুকরো? তা হতে পারে না। যা-কিছু আছে সবই এক বিশ্বের অন্তর্গত থাকতে বাধ্য। সুতরাং এই দুই দিকই হচ্ছে একই পরমবস্তুর দুই কলা। রামকৃষ্ণ তাই বলতেন : “তার ইতি করা যায় না। তিনি নিরাকার, আবার সাকার। যিনি নিগুণ, তিনিই সগুণ।”

(গ) “জল স্থির থাকলেও জল, তরঙ্গ ভূড়ভুড়ি হলেও জল। অহলোম, বিলোম। ঘোলেরই মাখন, মাখনেরই ঘোল। যারই নিত্য, তাঁরই লীলা। যারই লীলা তাঁরই নিত্য। সা, রে, গা, মা, পা, নি,। নিতে অনেককণ থাক। যায় না। “আমি যায় না” : তখন দেখে ‘তিনিই আমি, তিনিই জীব, জগৎ সব। এর নাম বিজ্ঞান।”

(১) স্থির জল ও বহতা জলের মধ্যে উপাদানগত ঐক্য বা অভেদ আছে। সংস্থিতাবস্থা থেকে চঞ্চলাবস্থায় যাওয়া হল তরঙ্গাদি আকারের উৎপত্তির নিমিত্ত এবং অধীরাবস্থা থেকে শান্তাবস্থায় গমন হল তরঙ্গাদি নাশের কারণ। সুতরাং উপাদান-অতিরিক্ত আর একটা জিনিষ আছে : সেটা হচ্ছে এক অবস্থা থেকে অল্প অবস্থায় যাওয়ার শক্তি বা প্রবণতা। প্রতীয়মান জগতের পদার্থের ক্ষেত্রে এই প্রবণতার কারণ হচ্ছে অগণ্য বাহ্য কারণস্থানীয় ঘটনাসমূহ। যেমন, জলের ক্ষেত্রে বাতাসের বেগের কমিবেশী, বৃষ্টির জলের প্রকোপ ইত্যাদি বাহ্য ঘটনাগুলো এই প্রবণতার কারণ। প্রত্যক্ষ ব্রহ্মাণ্ডে দেশকালনিমিত্ত গঠিত অসংখ্য নামরূপের। প্রবাহের নিরসনে যা থাকে তা হচ্ছে নির্বিকার ও নিরাকার সচ্চিদানন্দ। সব সময়েই এই সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ হচ্ছে প্রতিষ্ঠাত বিশ্বের অধিক; সুতরাং তা বিখ্যাত। কিন্তু বিখ্যাতীভবের অল্পভব অপ্রাকৃত। সংগ্রহ ও পূর্ণ পরমবস্তুর একদেশমাত্র এই নিরাকার ব্রহ্মস্বরূপ, এই নামরূপহীন দেশকালাদি বর্জিত শুদ্ধ সত্তা। প্রত্যক্ষ ও অহমানের সদীয় ও সমস্ত জগৎও পূর্ণসত্তাই এককলার প্রকাশ; সুতরাং পূর্ণসত্তাই

প্রত্যক্ষ বিশ্বের উৎস বা কারণ। পূর্ণসত্তার অন্তরে এমন একটা অন্তর্গত আকৃতি আছে যার রহস্যময় স্বতঃক্রিয়ার ফলে নামরূপ ও দেশকালনিমিত্তের সদীয় ও সগুণ সংসার উদ্ভূত হয় এবং তারই বকে সমগ্র সংসার আবার প্রলয়ের সময় প্রত্যাবর্তন করে। বর্ণগন্ধময় জগৎকে স্বরূপতঃ মিথ্যা বলাই মিথ্যা; দেশলোকে বড়জোর তথাভূতরূপে মিথ্যা বলা চলে। এই জগতের কারণরূপে সচ্চিদানন্দ বা পূর্ণসত্তার ঘে-অংশ অবস্থিত তার নাম কালী বা শিব বা ঈশ্বর। সুতরাং বলতে হয় পূর্ণ সংই ঈশ্বর, জীব, জগৎ ইত্যাদি রূপে প্রকাশিত হয়েছে। এবং পূর্ণসত্তার মধ্যেই আছে মহামায়াশক্তি অর্থাৎ অপ্রমেয় বা অসীম থেকে মেয় বা সীমাকপে প্রকাশিত হওয়ার প্রচণ্ড আবেগ। রামকৃষ্ণ তাই বলতেন : “তিনি ঈশ্বর, মায়া জীব জগৎরূপে প্রতীয়মান হচ্ছেন। তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি। যিনি পুরুষ তিনিই প্রকৃতি হয়েছেন। আত্মাশক্তি ও ব্রহ্ম অভেদ।”

(২) বিশ্বকে চার রকম গোথে দেখা যায়। বাহ্যতঃ এই পরিদৃশ্যমান প্রকাশিত জীবজগৎ সমন্বিত বিরাট বিশ্ব ব্রহ্মের ক্ষর বা অপর রূপ। এই বিশ্বরূপ ভ্রাবোধ ও রহস্যময় এর অন্তর্গত তথ্যগুলোর মধ্যে সংগতি এবং সামঞ্জস্য নেই। এই রূপ মূলতঃ মেয়। মাপ ও মানের অশ্রান্ত প্রয়োগের ফল আধুনিক বিজ্ঞান। মেয় বলেই এই রূপকে মায়া (মীয়াতে যেন) বলে। বিশ্বের দ্বিতীয় রূপ হচ্ছে তার অমেয় রূপ, এই দৃষ্টিতে সর্গশক্তির নিদানস্বরূপ হচ্ছে ঈশ্বর, তিনি এই বিশ্বের মধ্যে ওতপ্রোতরূপে অকুহাত হ’য়ে আছেন। মেয় ও মায়ায় জগৎ এই অপ্রমেয় ঈশ্বর শক্তির প্রকাশ। ঈশ্বরই হচ্ছেন আত্মাশক্তি অর্থাৎ মৌলিক শক্তি; তাকে মাণা যায় না; ঈশ্বরসম্বন্ধে কোনও বিজ্ঞান সম্ভবপর নয়। তৃতীয়রূপ হচ্ছে ব্রহ্মের বিখ্যাতীভূত রূপ। প্রকাশের মধ্যেই পরব্রহ্মের সমস্ত সত্তা নিঃশেষিত হয় না। ঈশ্বর, জীব জগৎ, সবরকম প্রকাশ; আকার ও গুণের অধিক সত্তাও আছে। ব্রহ্মের এই রূপ হচ্ছে নিগুণ, নিরাকার, অব্যক্তিক ও চিৎস্বরূপ। এই তৃতীয়রূপের জ্ঞান হচ্ছে অধৈতজ্ঞান। এ ছাড়া আর এক দৃষ্টিতে বিশ্বকে দেখা যায়। সেটা হল পূর্ণদৃষ্টি। পরমব্রহ্ম যিনি তিনিই এক সত্তা (১) নিগুণ ব্রহ্ম (২) সগুণ ঈশ্বর ও (৩) তার

প্রকাশ ; ব্রহ্মই বিশ্বাতীত সত্তা, ঈশ্বর, আত্মশক্তি ও চেতনাচেতন বিশিষ্ট, বহু জীব ও বহু জড় পদার্থের প্রকাশমান ও প্রত্যক্ষ অঙ্গ। সত্তার সমগ্ররূপ হল ব্রহ্ম। এই পূর্ণ বা অখণ্ড সত্তার তত্ত্বই গোটা বেদের উপমা দিয়ে রামকৃষ্ণ বুঝাতে চেয়েছেন। এই মতে, সত্তার একাংশ মাত্র পরম ব্রহ্ম নয় ; সত্তার সমগ্রটা নিয়ে পরমব্রহ্ম। এই জ্ঞানকেই রামকৃষ্ণ বিজ্ঞান বলতেন। বিজ্ঞান শব্দের সেই জ্ঞাত দুটো অর্থ। এক অর্থে অপর ব্রহ্মের সম্বন্ধে বিশেষ

জ্ঞান হচ্ছে বিজ্ঞান, এর আধুনিক নাম সায়েন্স। এই বিজ্ঞানকে অপর-বিজ্ঞান বলা চলে ; এইটে হল নিয়ন্তম জ্ঞান। দ্বিতীয় অর্থে বিজ্ঞান হল ব্রহ্মের স্বরূপের পূর্ণ বা বিশেষ জ্ঞান ; পরমসত্তার চতুর্থ রূপের জ্ঞান ; এই বিজ্ঞানকে পরবিজ্ঞান বলতে হয় ; এবং এইটেই হল পরম বা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান। রামকৃষ্ণের দর্শনে পূর্ণ ও অখণ্ড সত্তাই হল পরম-বস্তু ; সমগ্রই ব্রহ্ম ; পরমসত্তা সমগ্রের একাংশমাত্র নয় অদ্বৈতজ্ঞান একাংশের জ্ঞান মাত্র।

ওরে বৃষ্টি তুই স্বষ্টির চেতনা নিয়ে আয়

শ্রীশিশির মুখোপাধ্যায়

ওরে বৃষ্টি তুই স্বষ্টির চেতনা নিয়ে আয়
ও মেঘ তুই ময়ূর পক্ষী হবি ?
আকাশ পটে বাতাস হোল ঢেউ আর
হালে পানি তুই দেখিস পাবিই পাবি।

সজনে গাছে ভিজবে বলে কাকটা।
ডানা মেলে আকাশটাকে ঢাকছে
চড়ুই গুলো এধার ওধার করছে ছড়োছড়ি
কতই কথা কিচির মিচির ডাকছে।

ওরে বৃষ্টি তুই স্বষ্টির চেতনা নিয়ে আয়
ও মেঘ তুই ময়ূর পক্ষী হবি ?
আলসে বেয়ে আইত্তি লতার গাছটায়
ঘুম জড়ানো শান্তি পরশ দিবি।

ওদিক পানে মুখ কিয়দে কালের ছলে দেখিস দিকি
দীন ধরণী সমল চোখে আকাশ পানে চায় ;
বীজভলার বীজগুলো সব পায়রা ভিড়ির মুখে
ওরে বৃষ্টি তুই স্বষ্টির চেতনা নিয়ে আয়।

এমন কেন হয়

শ্রীলক্ষ্মীকান্ত রায়

তোমায় দেখে এ মন আমার এমন কেন হয়,
প্রথম দেখেই ভাবছি যেন অনেক পরিচয়।
দূর আকাশের চাঁদ দেখেছি, ফুল দেখেছি গাছে—
তাদের চেয়ে কোন্ মাধুরী আছে তোমার কাছে ?

তোমায় যেন এদের চেয়ে অনেক ভালো লাগে,
এমন কথা বলবে না কেউ তোমায় দেখার আগে।
তাইতো ভাবি এমন দেখার কিসের প্রয়োজন—
দূরে থাকার জালায় যদি জলবে এ জীবন।

অনেক কথা বলণো ভেবে ভাবছি কি যে বলি,
এ পথ দিয়ে চলবো ভেবে, ওপথ দিয়ে চলি।
একটি কথাই শিখেছি আজ তোমায় ভালোবেসে—
মনের মায়াব দেয়না ধরা সবার কাছে এসে।

হয়তো কত জনম থাকে, হয়তো দুজন্য—
এমন করে হয়তো দেখা মিলবে নাকো আর।
এ মন আমার হারিয়ে কেলে ভাবছি তুধু তাই—
অধিকারের কোন দাবীতে তোমায় কাছে চাই।

এই তো জীবন

শ্রীযত্ননা ঘোষ

“ধর! ধর! ধর! আমার মারলে। আমার মারলে।
দেখ, দেখ, মারছে, মারছে। না! না! আমি আর
করব না। আমাকে মের না! আর আমাকে মের না।
নয়নতারা, মা, মা, নয়নতারা, ও নয়নতারা, মা, মা,
দেখ, দেখ আমার মারছে। কে? কে তোমরা? আমাকে
অমন করে মারছ? মের না! কৈ, কৈ, আমার নয়ন
তারা কোথায়? কোথায় আমার মা, নয়নতারা, না,
না, তুলে গেছি—আমার মা কোথায়? হাঃ! হাঃ!
হাঃ! আমি এখন গান গাইব। না, না, কাঁদব না? কাঁদব
কেন? কিসের জন্ত আমি কাঁদব—আচ্ছা, তোমরা
আমাকে কেউ দেখবে না! দেখি, আমার কেউ দেখে
কি না! যিনি দিনরাত্রির দেবতা, আমি তাকেই জানাব।
সেই তিনিই আমার দেখবেন। তিনিই আমার সব
শাস্তি করে দেবেন।”

বৌমা, ও বৌমা! দরজা খোল—আমি এসেছি।
আমি তোমার মা নয়নতারা। দরজা খোল—

—ঐ আবার এসেছে! আবার এসেছে আমার
‘মারতে, না! না! আমি খুব না! আমি খুব না
দরজা—ও নয়নতারা ওমা দেখ, দেখ—আবার কারা
এসেছে—আমার মারবে—আমি খুব না! খুব না
দরজা।

—ও বৌমা, আমি, আমি তোমার নয়নতারা।
তুমি দরজা খোল। বলিয়া তিনি দরজাতে করাঘাত
করিতে লাগিলেন।

উন্মাদিনী হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। আমি
দরজা খুলব না। আমার তোমরা মারবে। না! না!
না, খুলব না—

—‘বৌমা, লক্ষী মা আমার, দরজাটা খুলে দাও, আমি

যে তোমার মা নয়নতারা—তোমার শান্তী—লক্ষীমা
আমার, ওঠ মা—একবার তুমি দরজাটা খুলে দাও—তুমি
যে এতক্ষণ আমার ডাকছিলে—আমি এসেছি—আমি
তোমার মা, নয়নতারা”

“এ্যা! মা তুমি”—বলিয়া উন্মাদিনী উঠিয়া দরজা
খুলিয়া দিয়া শান্তীর পায়ের কাছে পড়িয়া চীৎকার
করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। কহিল,—“দেখ মা, আমার কি
রকম করে মেরেছে—আমার গায়ে সব বাখা হয়ে গেছে—
তুমি দেখ”—

শান্তী বধূকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া আঁচল দিয়া
তাহার চোখমুখ মুছাইয়া দিয়া কহিলেন, ছিঃ! কেঁদ না
মা—কেউ তোমায় মারবে না। তুমি ওঠ—চলো আমার
সঙ্গে—নীচে চলো—স্নান করবে, কাপড় ছাড়বে।

—না! না আমি যাব না। আমার আবার ধরবে,
ওরা—আবার মারবে—আমি যাব না—

—না মা, তোমায় কেউ মারবে না। তুমি চলো—
চলো আমার সঙ্গে। বলিয়া তিনি বধুর হাত ধরিয়া নীচে
নামাইয়া আনিলেন।

নয়নতারা নীচে আসিয়া বড় চৌকাতা থেকে জল
তুলিয়া বধুর মাথায় ঢালিয়া দিলেন। তাহার পর এক-
খানি পরিষ্কার কাপড় তাহাকে পরাইয়া ঠাকুরঘরে লইয়া
আসিলেন। কহিলেন, “এইখানে বসো—ঠাকুরকে
প্রণাম করো।”

উন্মাদিনী অমনি মাথায় কাপড় দিয়া গলায় আঁচলটা
জড়াইয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া হেঁট হইয়া ঠাকুরকে
প্রণাম করিল। প্রণাম সারিয়া উঠিয়া ঠাকুরের দিকে
চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

শান্তী বড়ঘটীতে করিয়া কাঁচা দুধ ও মিছরীর জলের

সরবৎ করিয়া আনিয়া বধূকে কহিলেন, এই নাও, বৌমা, সরবৎটা খেয়ে দেলো—

আজ্ঞাবহ গোলামের মত বৌমা সরবৎটা খাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “মা আমি গান গাইব—

“গাও”। বলিয়া শাওড়ী ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

কিছুক্ষণ পর একটা ঔষধের ট্যাবলেট লইয়া আসিয়া জলে গুলিয়া কাঁচের গ্লাসে করিয়া উন্মাদিনীকে খাওয়াইয়া দিলেন।

—বৌ আবার কাঁদিয়া উঠিল। “ও মা! দেখ, দেখ আবার সব কি বলছে—তুমি শোন, এসে দেখ—

—না মা, তোমায় কেউ কিছু বলবে না।

—না! না! আমি এখান হতে যাব না। আমি তোমার কাছে থাকব—

—আজ্ঞা, তুমি এইখানেই ঘুমোও।

পাগলিনী শুইয়া পড়িতেই গিন্নী ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া বাহির হইয়া আগিলেন।

* * *

কর্তা নলিনবাবু বাজার আনিয়া ডাক দিলেন,—কই গো—তোমরা সব কোথায় গেলো—! ছোট বৌমা, ও ছোট বৌমা, তোমার, মা কোথায় গেল—

শিবানী ভাড়াভাড়ি বঁটি রাখিয়া মাথায় কাপড় দিতে দিতে আসিয়া কহিল, “আমায় ডাকছেন বাবা”—

—হ্যাঁ তোমার মা কোথায় গেলো? এই বাজার এনেছি দেখ—ডাক তোমার মাকে—

—মা এখন দিদিভাইকে ঘুম পাড়িয়ে ওদিকে গেছেন।

—পাগলীটা তাহলে ঘুমিয়েছে—! উঃ! কাল শেষরাত্রি থেকে কি চীৎকারই না করতে আরম্ভ করেছে, মাহুযকে জালিয়ে খেল—বলিয়া বাজারের মুড়ি হইতে মুখ তুলিতেই দেখিলেন গৃহিণী তাহার দিকেই আসিতেছেন। কাছে আসিতেই জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায়, গেছলে—? পাগলীটা কোথা? ঘুমিয়েছে তো?

—আবার তুমি বৌমাকে পাগলী বলে কথা কইছ— তোমায় না আমি বায়ণ করে দিয়েছি, বৌমাকে কেউ পাগলী বলে কথা কইবে না। তোমাদের অন্তেই তো ওর রোগ আরও বেড়ে গেছে।

কর্তা কহিলেন,—“আমাদের অন্তে বেড়ে গেছে—

দুট স্বরে গিন্নী উত্তর দিলেন হ্যাঁ। তোমাদের অন্তেই— তোমার উপর তার দিয়েই বৌমাকে রেখে উত্তরপাড়া গেছলুম বাবার মৃত্যুর সময়—

কর্তা কহিলেন—ওর এখন শাসনের প্রয়োজন। শাসন না করলে ওর পাগলামী কমবে না। মাহুযকে একেবারে জালিয়ে পুড়িয়ে খাচ্ছে—

তীব্রস্বরে গিন্নী কহিলেন, কারুর ক্ষমতা নেই আর আমার বৌমাকে শাসন করবে বা তার চুল স্পর্শ করবে— তোমরা কেবল জান শাসন করলেই পাগল ঠাণ্ডা হয়। কিন্তু তা হয় না। পাগলকে ঠাণ্ডা করতে হলে চাই ধৈর্য, চাই স্নেহ, মমতা। মায়্যা, দয়া না থাকলে পাগল ঠাণ্ডা হয় না। আগুন নেবাতে হলে প্রয়োজন হয় জলের।

—আক্ষেপের স্বরে কর্তা কহিলেন,—“এতবড় পাগল। আমার এত বড় শত্রু ছিল, সে নিজে চলে গেল, আমাদেরও শাস্তি দিয়ে গেল।”

এমন সময় একটি পাঁচ-ছয় বৎসরের শিশু কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া কহিল,—দিদা, আমি—মার কাছে যাব”—

—যাবে বাবা! তুমি এসো, আমার কোলে এসো, থোকন তুমি দুধ খেয়েছ? জিজ্ঞাসা করিয়া গৃহিণী তাকে কোড়ে তুলিয়া লইলেন।

—না দিদা, আমি দুধ খাইনি।

—ছোট বৌমা, তুমি আমার থোকনকে এখনও দুধ দাওনি—থোকনের দুধ দিয়ে বাও।

—আমি দুধ খাব না। আমি মার কাছে যাব।

—যাবে বাবা মার কাছে। মা যে এখন ঘুমুচ্ছে, মার অস্থ কবেছে—তুমি এখন আমার কাছে থাক—বলিয়া তিনি নাতিকে কোলে লইয়া ভাঁড়ার ঘরে বসিয়া নীরবে অশ্রু মোচন করিতে লাগিলেন। উঃ! কত দুঃখ, কত বাধাই তুমি দিয়েছ দেবতা—

প্রাণের ধারার তার অশ্রুধারা নরনতারার বন্ধ আবরণি সিক্ত করিয়া তুলিল। আজ সে জীবনসারাহে উপস্থিত হইয়াছে, তরু স্রবের মুখ দর্শন হইল না। কত দুঃখই না নির্ঝিন্দায়ে লুপ্ত করিয়া আসিয়াছে। যেসব

আকাশের চিকিচিকি বিদ্যুতের আলো দু'দিন দেখা দিয়েছিল, মাত্র কয়েকটা বছর। কিন্তু বিধাতা তাহাও সহিতে পারিলেন না।

সে আজ কয়েক বছর পূর্বের ঘটনা।

রজত আই, এ, পড়িতে পড়িতে ছাড়িয়া দিয়াছে। কারণ টিউশনী করিয়াও আর পড়ার খরচ চালাইতে পারে না। বাহা কিছু উপার্জন করে সামান্য মাত্র পড়াইয়া মাসকাবারে সেটা জননীর হাতেই তুলিয়া দেয় সংসার চালাইবার জন্য। পিতা আদেশিকতার জন্য আজ তিন বৎসর জেল বাস করিতেছেন। সংসার একেবারে অচল। আপনার কলেজ এবং কনিষ্ঠের স্কুল এবং সংসার এই দু'দিনের বাজারে বোঝা হইয়া উঠিয়াছে। বহু সন্ধান করিয়াও যখন সামান্য একটি চাকরী কোথাও জুটাইতে পারিল না, অবশেষে ছোট্ট একটি কাঠের ব্যবসা আরম্ভ করিল। এখন তাহা বিশালকায় হইয়া উঠিয়াছে।

সংসারে আজ দুঃখের অবসান হইয়াছে দেখিয়া জননী পুত্রকে বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। গরীবের ঘরে বিবহার একটি মাত্র সন্ধান। মেয়েটির রূপ তেমন না থাকলেও গুণ আছে অসাধারণ।

যোগমায়ার পদার্পণে নয়নতারার সংসার উল্লাসে উঠিল। মেয়েটি অত্যন্ত ধীর, নম্রপ্রকৃতির স্বল্পভাষী এবং স্থনিপুণ, কর্ণশক্তিও অপরিমিত। নয়নতারাকে সংসারের আর কোন কর্মই করিতে হয় না। সকলেরই মুখে মুখে জোগাইয়া থাকে প্রয়োজনীয় বস্তু।

শান্তডী বলিয়া থাকেন, বোমা আমার সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। আজ আমার অভাব মোচন হয়েছে। রজু আমার সব পূর্ণ করেছে। সে বেঁচে থাক। তার পরসাতেই তো আজ ভাই বিলেতে বসে আছে। বোমা আমায় বলেছে, 'মা আপনি ৬ত্বপূজা করুন, আমি আপনার সব কাজ করে দেব। আপনার কোন ভাবনা নেই—

তা শান্তডীকে দিয়ে যোগমায়া চারি বৎসর পূজাও করাইয়াছিল।

একদিন স্বামীজী বলিয়া গল্প করিতে করিতে এক সময় যোগমায়া বলিল—“আচ্ছা, তুমি দিনরাতই কাজ নিয়ে থাক। একবারও একটু বিশ্রাম করো না। এমন কি আমার কাছেও আস না। আমার কি ইচ্ছে করে

না যে তুমি এসে আমার কাছে একটু বসো বা গল্প কর। আর যদি বিশ্রাম না করো তবে শরীর থাকবে কেমন করে?—আমি বলি কি, তুমি দিন কয়েকের ছুটি নিয়ে কোন বিদেশে চলে। এক সঙ্গে থাকও হবে, আর মনেরও পরিবর্তন হবে, হাওয়াবদলও হবে।

পত্নীর পিঠের উপর হাতটি রাখিয়া রজত উত্তর দিল—কিন্তু কি করে যাই বলা যায়—কত কাজ। যদি আমি না থাকি—না দেখ, তাহলে সব চুরিতে আমার লোকসান করে দেবে।

অভিমানের স্বরে যোগমায়া কহিল—“তাহলে তোমার ব্যবসাই হলো শরীর অপেক্ষা বড়। যদি শরীরই ঠিক না থাকে, তবে ব্যবসা চালাবে কি করে?—আর সেইটাই কি তোমার স্ত্রী, পুত্র—সেই জন্য তার কাছেই থাক, দিবারাত্র।

জীকে আদর করিয়া নিজের বুকের উপর টানিয়া লইয়া রজত কহিল,—না! না। তা কি কখনও হয়! তুমিই যে আমার সব—আমার লক্ষ্মী। তোমার জন্যেই তো আজ আমার এত নাম ডাক—তোমার কি কোন মুহূর্তে অবহেলা করতে পারি—

স্বামী জীও মবু মিলনে বাধা পড়িল। চাকর আসিয়া কহিল,—দাদাবাবু, মা আপনাকে ডাকছেন।

“যাচ্ছি।” বলিয়া জীও পানে চাহিয়া কহিল, “মা কেন ডাকছে, একবার শুনে আমি” বলিয়া মাতৃসমিধান সে চলিয়া গেল।

—মাতৃকণ্ঠে প্রবেশ করিয়া কহিল—আমায় ডাক মা—

“হ্যাঁ। আমার কাছে একটু তুমি বসো। বলিয়া তিনি বিছানার উপর একটু সরিয়া শুইয়া পুত্রকে বসিতে স্থান দিলেন। তারপর কহিলেন—দেখ, আজ আমার মনটা কি রকম করেছে, কিছু ভাল লাগছে না। তাই তোকে ডাকলাম। অজানা আশঙ্কায় বড় ভয় করছে।

—ও কিছু নয়। একলা শুয়ে আছি। আর মন খারাপের কি আছে। প্রত্যোৎ বিলেত হতে ব্যারিটার হয়ে ফিরেছে। এখানে প্রাকটিস করছে—তাতেও মন কেমন করেছে? ও কিছু নয়, তুমি ঘুমিয়ে পড় মা।” বলিয়া রজত চলিয়া গেল।

রাতে স্বামী-স্ত্রী ঘুমাইতেছে, এমন সময় টেলিফোন আসিল—তাহার কাঠের গোলায় আগুন ধরিয়াছে। রজত তাড়াতাড়ি উঠিয়া পাঞ্জাবীটা গায়ে দিয়া চটী পায়ে দিতে যাইতেছে। যোগমায়া তাহার হাতটা চাপিয়া ধরিল। কহিল,—“ওগো, তুমি যেও না। আমার বড় ভয় করছে। তুমি আগুনের কাছে যেও না—

—বাঃ। আমার ব্যবসা পুড়ছে, আর আমি বাব না। এক্ষণি কত টাকার ক্ষতি হয়ে যাবে, সমস্ত কাগজ পত্র আবার সেইখানেই আছে। বলিয়া সে আর কাল বিলম্ব না করিয়া গ্যারেজ হইতে গাড়ী বাহির করিয়া নিজেই ড্রাইভ করিয়া চলিয়া গেল।

সেখানে গিয়া দেখিল লোকজন সব জিনিষপত্র সরাচ্ছে। কিন্তু অনল তাহার লেলিহান জিহ্বা দিয়া সমস্তই গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। দমকল কয়েকখানি আসিয়াছে কিন্তু তাহাকে আয়ত্তে আনা দুঃসাধ্য হইয়া পড়িতেছে। রজত স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া চিন্তা করিতেছে, এমন সময় একটি ভোজপুরী কণ্ঠচারীর স্ত্রী তাহার পায়ের উপর আসিয়া পড়িল,—বাবুগে,—আমার ছেলেটা ওই ঘরে আছে পুড়ে গেল গো—বাহির করে দিন গো—ছেলে আমার পুড়ে গেল গো—বলিয়া সে চীৎকার করিয়া কঁাদিতে লাগিল।

রজত তাহাকে সাহায্য দিয়া কহিল—“আমি তোমার ছেলে এনে দিচ্ছি—তুমি কেঁদ না, চুপ করো বলিয়া সে তৎক্ষণাৎ আগুনের মধ্যে কাঁপাইয়া পড়িল। সকলেই চীৎকার করিয়া উঠিল, “কি করেন, কি করেন—যাবেন না, চলে আসুন—”

“আর যাবেন না।”—ততক্ষণে সে ভিতরে প্রবেশ করিয়া পুত্রটিকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া কোলে তুলিয়া বহন আসিল, তখন তাহার সর্বাঙ্গ পুড়িয়া গিয়াছে।

তাহাদের উভয়কেই তাড়াতাড়ি হানপাতালে লইয়া যাওয়া হইল। শিশুটি কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মারা গেল এবং ইহারই দিনটুকু পরে রজতও এই মায়ার সংসার ত্যাগ করিল।

স্বামীর শোকটা যোগমায়া কিছুতেই আর লম্বা করিতে পারিল না। ক্রমে মস্তিষ্কবিকৃতির লক্ষণ দেখা দিতে

লাগিল। শাওড়ী অনেক সাহসনা দেন, কিন্তু সকলই মরুতে বীজ বপন করা হয়। অবশেষে একদিন তাহাকে লইয়া বায়ু পরিবর্তনের ব্যবস্থা হইল। বধু কিন্তু কিছুতেই সন্মত হইল না। শাওড়ীকে জানাইয়া দিল, স্বামীর ঘর ছাড়িয়া কোথাও সে নড়িবে না।

ডাক্তার মতামত দিল,—শোকটা বড় বেশী আকস্মিক পেয়েছেন কিনা, সেইজন্য দুর্বল মস্তিষ্ক সেটা সরাতে পারছে না। প্রচুর ঘুম, এবং আনন্দই হলো এর ঔষধ এবং পথ্য—

* * *

চিন্তার শ্রোতে বাধা পড়িল। কনিষ্ঠ পুত্র প্রত্যোৎসাহিয়া ডাক দিল,—“মা কোথায়—মা”—

রান্নাঘরে ব্যঞ্জন কবিত্তে কবিত্তে শিশ্রা উত্তর দিল,—“মা ভাঁড়ার ঘরে।

“মা, মা” করিয়া ডাকিতে ডাকিতে প্রত্যোৎসাহি ভাঁড়ারে আসিয়া উপস্থিত হইল।

কক্ষে প্রবেশ করিয়াই অভিযোগের স্বরে কহিল,—তুমি ওখানে বসে আছ—আর আমি তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছি।

জননী উত্তর দিলেন,—“কেন আমায় কিসের প্রয়োজন”—

—একি! মা—! তুমি কাঁদচ—না! তোমায় আর কাঁদতে হবে না, আমি তোমার সব দুঃখ মোচন করবার ব্যবস্থা করেছি। একটা কথা আছে মা—

—কিসের কথা—বলিয়া তিনি অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছিয়া পুত্রের পানে চাহিলেন।

—আমি মা একটা ব্যবস্থা করে এসেছি।

—কিসের ব্যবস্থা—?

—বাঃ! তুমি কিছু জান না—! বাগা তোমায় কিছু বলেনি—। থাকগে আমি বলি পোন—উঃ! সে কত কাণ্ডকারখানাই না করে তবে আজ সব কিছু ঠিক হলো।

—আমি বাপু তোমার অত হৈয়ালীর কথা বুঝি না।

কি হয়েছে! কিসের ব্যবস্থা তাই বলো আমায়—

—কেন! বৌদিকে রাঁচী পাঠাবার সমস্ত ঠিক করে এলাম। কালই নিয়ে যাওয়া হবে। কোন কষ্ট হবে না। কাষ্টক্লাসে থাকবে। এখান হতে মাসে মাসে তিনশো করে

টাকা পাঠান হবে। বাবাও বলেছেন, যা হয় একটা ব্যবস্থা করো প্রদ্যোৎ তাড়াতাড়ি করে—আর তো পারা যায় না। তাই আমি এখন তোমায় বলতে এলুম।

ক্লদ শাদ্দুলের মত তীব্র গর্জন তুলিয়া নয়নভারা কাহলেন,—“কি! এতবড় স্পর্ধা তোদের! তোরা ওকে রাঁচী পাঠাবি! কেন, আমি কি মরে গেছি! বলি, কার পরসাতে আজ এখনো নবাবী করছি! কার পরসাতেই বা মুখে অন্ন উঠছে—তা কি জানিস্ না। কেন, নিকটক পুরী হয়ে স্থখে রাজত্ব ভোগ হবে। আর এই চঞ্চপোষা শিশুটার উপর অত্যাচার করে মেরে ফেলবে—বাপ-বেটাতে মিলে সেই পরামর্শই চলছে বুঝি দিবারাত্র—তাই রাঁচীর ব্যবস্থা হয়েছে। শুনে রেখে দাও, যতক্ষণ আমি বেঁচে থাকব, ওকে কেউ কিছু করতে পারবে না। আর স্থখের রাজত্ব ভোগও হবে না।

কেন—এখানে কি চিকিৎসা হয় না, যে রাঁচী পাঠান হবে। কত অস্থখের চিকিৎসার ব্যবস্থা এদেশে আছে, আর পাগলের চিকিৎসা এখানে নেই? কেন সেটা কি অস্থখ নয়? মাথার অস্থখ বুঝি অস্থখ নয়?—আমি ওর চিকিৎসা করাব। দেখি আমার বৌমা ভাল হয় কি না—। আজ ওর জগতে কেউ নেই বলে কি যথেষ্টাচার হবে ওর উপর—। মনে রেখে দাও তোমরা, বোমার কেউ না থাকলেও, সে পথের ভিখারী হলেও, আমি আছি। আমিও বাপের বেটা—

* * *

সেদিন দুর্গাবস্থা। চারিদিকেই ঢাক ঢোলের শব্দ ভাসিয়া আসিতেছে। যোগমায়াাকে তাহার ঘরে বন্ধ করিয়া শান্তডী আসিয়া নিজের ঘরে প্রবেশ করিল। দেখিল, শিবানী তাহার বিছানা করিতেছে। কিছুক্ষণ নীরবে দণ্ডায়মান থাকিয়া তারপর বধুকে লইয়া ‘গল্প’ করিতে বসিলেন—যোগমায়া তাঁহাকে দিয়া কেমন করিয়া পূজা করাইয়াছিল। আজ দুর্গাবস্থা। তাহার বৃকের ভিতরটা যেন কেমন করছে—এই ঢাকের বাজ্ঞ শ্রবণে। একদিন তাহার বাড়ীও এইরূপ উৎসব মুখরিত হইয়া উঠিত। আর আজ কিনা তাহার সেই বৌ’এর কি দুঃসহ অবস্থাই না হইয়া গিয়াছে। বলিয়া চোখের জল মুছিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া নীচে নামিতে গিয়া সিঁড়িতে পা পিছলাইয়া

একবারে কয়েক ধাপ নীচে গড়াইয়া পড়িয়া গেলেন। আঘাতটা বুকেই লাগল বেশী।

শিবানী চীৎকার করিয়া উঠিল,—মা পড়ে গেছেন—সকলেই ছুটিয়া আসিল। তাহাকে তুলিয়া আনিয়া ঘরে শোওয়াইয়া দিল। ডাক্তার আসিল, মন্তব্য করিল, বুকে আঘাত লেগেছে, তিন দিন না কাটলে কিছু বলা যাব না।

নয়নভারা চোখ মেলিয়াই প্রথমে কহিলেন—আমার যোগমায়া—তাকে তোমরা দেখ। সে যেন ঠিক সময়ে খেতে পায়। সে যে আমার সাক্ষাৎ যোগমায়া—তাকে আমার কেউ চিনতে পারলে না।

মহানবমীর দিন ভোর বেলা নয়নভারা শিবানীকে কহিল,—ছোট বোমা, আমার যোগমায়াকে একবার তুমি এনে দাও। তাকে আমি একবার দেখব—দে কেমন আছে—শিবানী উত্তর দিল, “সে যে কাল সমস্ত রাত্রি যুগ্মোন্নয়ন মা—কেবলই চীৎকার করেছে। এখন কান্দছে—বদি আমি কাছে খাই, তাহলে আমার হয়ত মারবে—

শান্তডী কহিলেন,—“না তুমি একবারটি তাকে এনে দাও—প্রত্যোৎকেকে বলা, তাকে আনতে। আমার কাছে এলেই সে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে—

অনেক বলা কওয়ার পর কান্দ পুত্র তাহাকে মায়ের কাছে আনিয়া দিল।

আলথালু বেশে বধুকে দেখিয়া শান্তডী কহিলেন,—“এদো! এসো। এসো আমার মা এসো—তুমিই যে আমার সাক্ষাৎ দুর্গা! তুমি আমার কাছে এসো—এখানে এসো, বলিয়া তিনি নিজের বালিশের পাশে তাহাকে বসাইলেন।

ময়নুতবারি সিঞ্চন করিলে মাথায় যেমন তাহার নীতৃত হইয়া যায়, সেই রকম বশীভূত হইয়া উন্মাদিনী তাহার পায়ের কাছে বসিয়া দুইটি পা ধরিয়া উপুড় হইয়া পড়িল। যেন বাধন হারা তটিনীর মত অশ্রুশালি দিয়া যশমাতার পদধূলি ধোত করিয়া দিতে থাকিল।

গিন্নীও বধুর হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া বোধ হয় পরম স্নেহের পুত্রের উদ্দেশ্যেই যাহা করিলেন।

দেবর যোগমায়াাকে সজ্ঞের আকর্ষণ করিয়া তাহার কক্ষে পুরিয়া চাবি বন্ধ করিয়া দিল।

কর্তা কহিলেন, প্রদ্যোৎ তোমার তো সমস্ত বন্দোবস্তই

আছে, কাল ফিরে এসে একাদশীর দিন ওকে পাঠিয়ে দাও। তা না হলে, তোমার আর কাজকর্ম হবে কি করে—
পুত্র উত্তর দিল,—হ্যাঁ, তাই করতেই হবে। আর এখন তো কোন বাধাই রইল না।

পাড়া-পড়শি সকলেই ধন্য ধন্য করিতে লাগিল।
হ্যাঁ, সতীলক্ষ্মী ছিল বটে! বৌমার কি যত্নই না করত—অমন উন্মাদিনী কি স্বপ্নের কাছে যেন একেবারে কলের পুতুল। এইবার বৌটার কি দুর্দশাই না হবে।

অপর একজন কহিল,—না, না, পাগলীকে পরশুদিন রাঁচী পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

জননী শোকাতুরা সারিয়া সকলেই ফিরিল। বিকালে শিবানী স্বামীকে কহিল, কাল থেকে দিদিভাইকে কিছু খাওয়ান হয়নি, সেই মার হাতে যা সবৎ খেয়েছেন।

প্রমোদ কহিল, তাও তো বটে। কি করেই বা খাওয়ান যাবে—। তা তুমি একবার চেষ্টা করে দেখলে না কেন—

“বাবায়ে! আমি! পারব না পাগলের কাছে যেতে।
স্বামী উত্তর দিল,—“কাল তো পাঠিয়ে দিচ্ছি। একটা রাত্রি না হয় নাই খাওয়া হলো—আর চীৎকার করেনি তো—

শিবানী উত্তর দিল,—না মাকে যখন তোমরা নিয়ে যাও, জানালা দিয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল। তারপর আর কোন সাড়াশব্দ পাইনি—

পিতা আসিয়া কহিলেন,—হ্যারে, পাগলীকে কিছু খেতে দিয়েছিস তো—

না! কি করে দেওয়া হবে! কিছুতেই পারা যাচ্ছে না।

“মরে যাবে যে। একবার চেষ্টা করে দেখ—
উন্মাদিনীকে আহার করাইবার জন্য যখন স্বামী-স্ত্রী খাতা লইয়া ঘরের দরজা খুলিয়া সজ্জিত হইয়া দেখিল কখন সে মা নয়নতারার ডাকে স্বামীর সান্নিধ্য লাভের জন্য মহাযাত্রা করিয়াছে!

দার্শনিক ব্রজেননাথ-স্মরণে

শ্রীস্বধীর গুপ্ত

দর্শন-গহনারণ্য ভীষণ—সুন্দর;
বন্ধিম—বন্ধুর বন্ধু বিভ্রান্তি জাগায়;
পদে পদে পাছ-প্রাণে

চমক লাগায়;

চিত্ত-স্বৈর্য্য-সংরক্ষণ সেধা যে দুত্তর।

তবু পাছ মুগ্ধ হয়; পন্থা নিরন্তর

রহস্য-জটিল যত ছায়ায় মায়ায়।

কী আশ্চর্য্য! জলদৃষ্টি মাকে মাকে যায়

সহসা স্মৃতিপু করি' অরণ্য দুত্তর।

সেই মহারণো তুমি বিশ্বধ্বংস মত

শত শত উপপথে—পথে আজীবন

আন্দোলিত-মহানন্দে চলেছো সত্যত

অরণ্য-মর্শ্বেরে রচি' রহস্য-স্বপন।

এক যেথা মত—পথ—সত্য—

মিথ্যা যত,

মৌন বাচরণই সেধা 'ব্রজেন'-লক্ষণ।



যাত্রী বোঝাই ট্রেন ছুটে চলেছে স্টেশন থেকে স্টেশনে উদ্দাম গতিতে। ঘনিষ্ঠে আসছে অন্ধকার আশেপাশের ক্ষুণ্ণ অপস্রম্যান পথে, প্রান্তরে, পুষ্করিণীর ঘাটে ঘাটে। রাত্রি এল নেমে। কামরার কামরায় জলে উঠল বৈদ্যাতিক আলো, ছড়িয়ে পড়ল তার কিছুটা অংশ তিথ্যাক্ ভাবে কামরার গরাদ লাগান জানালার বাইরের জমাট অন্ধকারের বুকে—যেন ক্ষণিকের জন্তেও আলোকের স্পর্শ লাগিয়ে দিতে চায় অন্ধকারে প্রেতের মত সরে যাওয়া গাছপালার গায়।

আপনি যে কামরায় আছেন সেটির মধ্যেও ঘনিষ্ঠে এল অন্ধকার রাত্রির আগমনে। কোনও এক যাত্রী উঠে হয়ত বৈদ্যাতিক আলোকের হুইচ্ টিপলেন কামরাটিকে আলো-কোম্বাসিত করবার জন্তে। হুইচ্ টেপার আওয়াজ হল ‘খট’ করে,—আলো কিন্তু জ্বলল না! অন্ধকার যেন আরও চেপে বসল কামরার মধ্যে। উচ্চকিত, বিরক্ত কয়েকটি কণ্ঠস্বর কেটে পড়ল অন্ধকারের মধ্যে—“কি হল মশাই, আলো জ্বলে না কেন?” “আরে, ভাল করে জালুন না”—আর ভাল করে জালুন না। বতবারই জ্বালা যায় সেই খট্ খট্ আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই হয় না। “কোথায় আলো, কোথায় আলো”—কোরে ‘ড্রেন্ পাইপ্’ ও ছুঁচাল জুতা পরা ফকড় কোনও ছোকরা হয়ত হুঁলাইন গানই গেয়ে ফেলল, অন্ধকারের সুযোগে দরজার কাছে বসে থাকা তরুণীটির উদ্দেশে। হুঁচারটে দেশলাইএর কাঠি জলে উঠল অন্ধকারের মাঝে ফস্ ফস্ করে, ফকড় ছোকরা মুখ ঘুরিয়ে ফেলল চট্ করে, গম্ভীর নিলিখ মুখে তরুণীটি চেয়ে রইল জানালার বাইরের অন্ধকারের মাঝে, আর স্ত্রীকস্তাসমভিযাহারে সতর্ক যাত্রীর হাতের টর্ক অন্ধকারের বুক চিরে গিয়ে পড়ল বৈদ্যাতিক আলোকের স্থানে। বিন্মিত সকলে চেয়ে দেখল আলোর ডুম্বই হয়ত নেই বখান্য়ানে, কাঁচের আধারও নেই, হুইচ্ থেকে যে তার থাকে সে তারও হয়ত নেই—শুধু রয়ে

গেছে হুইচ্ টাই! অনেক ক্ষেত্রে আবার হুইচ্ ও উধাও হয়ে যায়—লেগে থাকে শুধু কয়েকটা আঁচড়ের দাগ চৌধাবৃত্তির সাক্ষা হয়ে।

তারপর হয়ত দেখা গেল হুন্দের ছোট বৈদ্যাতিক পাখাগুলির হুঁটি একটিও উধাও হয়ে গেছে—পড়ে আছে শুধু শূন্য গহ্বর? বাথরুমের জলের কলের কলটারই হয়ত পাতা পাওয়া গেল না, আর দামী স্লাম-রাবার আসনের বেল্মিন্ আচ্ছাদনের অনেকটাই হয়তো দেখা গেল কেউ ছিন্ন করে নিয়ে গেছে তাঁফ ছুরিকার নিখম আঘাতে।

কিন্তু, কেন এমন হচ্ছে—কেন, কেন? এ প্রশ্ন আজ জাগছে ভ্রমযাত্রীসাধারণের মনেই শুধু নয়, তাঁরা চাইছেন এর প্রতীকারও। কিন্তু এই নিখম, নিষ্করণ, নিরুপ্ত-স্তরের উচ্ছ্বলতা ও চৌধাবৃত্তির প্রতিকার শুধু রেলওয়ে রক্ষীদের দ্বারা করা সব সময় সম্ভব নয়—এর জন্ত চাই জনসাধারণেরও অকুণ্ঠ সহযোগিতা। এই উচ্ছ্বলতা দমনে সর্বসাধারণের সদিচ্ছা ও সহযোগিতা থাকলে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষও মনে করেন তাঁরা অতিরিক্ত এই চৌধাবৃত্তি দমন করে যাত্রীসাধারণের ভ্রমণকে আরও আরামদায়ক করে তুলতে পারবেন।

জনসাধারণের অবগতির জন্ত পূর্ব-রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ একটি বিবৃতিতে জানিয়েছেন রেলওয়ে তথা জনসাধারণের সম্পত্তির কি বিপুল ক্ষতি সাধিত হচ্ছে এই উচ্ছ্বলতার জন্ত। ১৯৬৩ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯৬৪ সালের মে মাসের মধ্যে—এই মাত্র ছয় মাসে পূর্ব-রেলওয়ের হাওড়া ও শিয়ালদহ বিভাগের যথাক্রমে ২৯২,৯৮৬ টাকা ও ৪৩৭, ৩১৩ টাকার সম্পত্তির ক্ষতি সাধন করা হয়েছে। শুধু-মাত্র যে মাসেই হাওড়া ও শিয়ালদহ বিভাগে চুরি ও নষ্ট করে যথাক্রমে ৬১,৮১২ টাকা ও ৬৬,৯১৬ টাকার সম্পত্তির ক্ষতি করা হয়েছে।

১৯৬৩ সালের ডিসেম্বর মাসের প্রথমে শিয়ালদহ বিভাগে বৈদ্যাতিক ট্রেন্ চালু হবার পর চরম উচ্ছ্বলতার

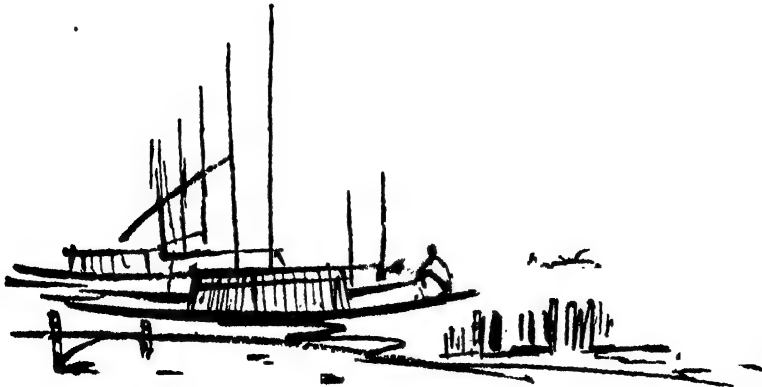


১৭
রেল কামরার ছিন্ন, উৎপাটিত ও বিনষ্ট মূল্যবান আসনগুলির এই দৃশ্য, পূর্ক রেলপথের উচ্ছৃঙ্খলতা ও নাশকতার সাক্ষ্য বহন করছে।

ও সম্পত্তি নষ্টের যেন হিড়িক লেগে যায়। গত এপ্রিল মাসেই পূর্ক-রেলওয়ের শিয়ালদহ বিভাগের ট্রেনগুলির থেকে ৬০,০০০ টাকা মূল্যের যান্ত্রিক ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির ক্ষতি করা হয়।

তাবলে সত্যই আশ্চর্য লাগে যে কি নিকট মনোভাব নিয়ে একটা সমাজ-বিরোধী শক্তি এই বিরাট ক্ষতি সাধন করে চলেছে। তাদের লোলুপ হস্ত থেকে রেলকামরার মূল্যবান বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, শব্দাভ্রবা, কোম-রবারের বসবার আসন, রেজিনের চাদর প্রভৃতি কিছুই রক্ষা

পাচ্ছে না। অথচ এইগুলি জাতীয় রেলকর্তৃপক্ষের অত্যন্ত গর্বের সম্পত্তিই শুধু নয়, যাত্রীসাধারণের আরাম ও স্বথ-সুবিধার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বিশেষ। তাই আজ পূর্ক-রেলপথের কর্তৃপক্ষ এই উচ্ছৃঙ্খলতা, এই নাশকতা, এই চৌর্যাবৃত্তি রোধের জন্য রেলপথের যাত্রীদের কাছে তাঁদের সর্বপ্রকার সহযোগিতা চেয়ে আবেদন জানাচ্ছেন। আশা করি যাত্রীসাধারণও রেলকর্তৃপক্ষের এই আবেদনে সাড়া দিয়ে দেশের বুক থেকে এই জঘন্য অস্তায় ও অত্যাচার উৎপাটনে সহায়তা করবেন।



পাট ও পাঠ

শ্রী‘শ’—

॥ পরিচালক ও পুরস্কার ॥

১৯৬৩ সালের চতুর্দশ বার্লিন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে সত্যজিৎ রায় তাঁর “মহানগর” চিত্রটির পরিচ্ছন্ন পরিচালনার জন্য শ্রেষ্ঠ চিত্র-পরিচালকের সম্মান লাভ করলেন। অবশ্য এর আগেও তিনি দু’বার শ্রেষ্ঠ পরিচালকের আন্তর্জাতিক সম্মান অর্জন করেছেন। ১৯৫৫ সালে সান-ফ্রান্সিস্কো চলচ্চিত্র উৎসবে “পথের পাচালী” শ্রেষ্ঠ চিত্রের সম্মান পায় এবং পরিচালক সত্যজিৎ রায় পান শ্রেষ্ঠ পরিচালকের পুরস্কার। ১৯৫৭ সালে আবার সান-ফ্রান্সিস্কো চলচ্চিত্র উৎসবে শ্রীরায় তাঁর “অপরাজিত” চিত্রের পরিচালক রূপে শ্রেষ্ঠ পরিচালকের পুরস্কার লাভ করেন। তাঁর পরিচালিত “পথের পাচালী” ১৯৫৫ সালে সান সান-ফ্রান্সিস্কো চলচ্চিত্রোৎসবে এবং “অপরাজিত” ১৯৫৭ সালে ভেনিস চলচ্চিত্রোৎসবে শ্রেষ্ঠ আন্তর্জাতিক সম্মানে ভূষিত হয়ে ভারতীয় চিত্রের গৌরব বৃদ্ধি করেছিল। তাঁর পরিচালিত “দুই কন্ঠা” চিত্রের অন্ততম “পোষ্টমাস্টার” চিত্রটিও ১৯৬০ সালে মেলবোর্ণ চিত্রোৎসবে শ্রেষ্ঠ চিত্ররূপে ‘গোল্ডেন বুমেরাং’ পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিল। এছাড়া শ্রীরায়ের প্রায় প্রতিটি চিত্রই স্বদেশে-বিদেশে সম্মান ও পুরস্কার লাভ করেছে।

“মহানগর”—এর ভাগ্যে হয়ত আরও পুরস্কার লাভ ঘটেতে পারে। মন্ট্রিল আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে “মহানগর” আমন্ত্রিত হয়েছে। তাছাড়া শ্রীরায়ের এক মহান কীর্তি “চাকলতা” চিত্রটিও ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে পাঠান হবে। আশা হয় “চাকলতা”ও আন্তর্জাতিক সম্মান অর্জন করতে পারবে।

সত্যজিৎ রায় আজ শুধু বাংলারই নয়, সার্বা ভারত তথা এশিয়ার মহা গর্বের ও সম্মানের পাত্র। নব নব যুগশক্তির প্রভাবে তিনি সৃষ্টি করে চলেছেন নতুন নতুন চিত্র—নবীন ভাবে, নতুন টেকনিকে, নব আদিকে। তাঁর জয়যাত্রা অগন্তজোড়া হোক, তাঁর পরিচালনা প্রতিদ্বন্দ্বী বিহীন হোক, তাঁর প্রচেষ্টার পরিণতি সিদ্ধি ও সাফল্যে গরীয়ান হয়ে উঠে আমাদের অনন্ত গর্বের বস্তু হয়ে উঠুক।

“চাকলতা” ও তাঁর আগামী চিত্রগুলিও আরও আন্তর্জাতিক সম্মান ও পুরস্কার অর্জন করে বাংলা তথা ভারতীয় চিত্রকে অদিকতর গৌরবে ভূষিত করে তুলবে বলেই আমরা আশা করে আছি।

অবসান

“কালকাটা ফিল্ম সোলাইটি” বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের সামগ্রিক পরিচয়বাহী একটি চলচ্চিত্র উৎসবের পরিকল্পনা করেছেন। দু-তিন মাসের মধ্যেই তারা এই উৎসব আরম্ভ করতে চান। নির্দীপ সূত্রের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত বাংলা ছবির অগ্রগতির একটি পরিচয় যাতে দর্শকরা পান সেই ভাবে উৎসবসূচী গঠন করা হবে। উত্তোক্তারা ইতিমধ্যেই ছবি সংগ্রহের কাজ শুরু করে দিয়েছেন।

* * *

শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের সর্বধর্মসম্ময় সাধনার বিধববস্ত্র অবলম্বনে সম্প্রতি একটি প্রামাণিক চিত্রের দৃশ্য গ্রহণ শুরু হয়েছে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে। শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের জীবনদর্শন কীভাবে গাঙ্গীজী, হুতাশচন্দ্র ও নেহরুর চিন্তাধারায় প্রভাব বিস্তার করেছিল তারও একটি পরিচয় এতে সন্নিবেশিত হবে।

মিহির ঘোষের প্রযোজনা ও সম্পাদনায় এই চিত্রটি পরিচালনা করছেন স্বকুমার রায়চৌধুরী ও বীরেন বসু-মলিক। সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন আশীষ ঘোষ।

ও ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য্য। আর ধারাতাষা করছেন মমতাজ আমেদ।

* * *

‘ভারা চিত্রম’-এর প্রথম ছবি ‘ভারাপীঠ’-এর শুভারম্ভ অচলিত হয়েছে ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে। অনন্ত চট্টোপাধ্যায়ের কাহিনী ও চিত্রনাট্য অবলম্বনে ছবিখানি পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন শোলা আচ্য। আলোকচিত্র গ্রহণ ও শিল্প-নির্দেশনার রয়েছেন যথাক্রমে প্রবোধ দাস ও বটু সেন।

* * *

বোম্বাইয়ের জনপ্রিয় অভিনেতা ধর্মেন্দ্রকে সর্বপ্রথম যে বাংলা ছবিটিতে অভিনয় করতে দেখা যাবে, সেটি হ’ল ‘পুনিউ ইণ্ডিয়া পিক্চাস’-এর ‘পরী’ নামক চিত্রটি। এই সামাজিক চিত্রটি প্রযোজনা করছেন প্রণতি ঘোষ এবং তিনি স্বয়ং এর একটি বিশিষ্ট ভূমিকাতেও অংশ নেবেন।

জয়াসঙ্কর লেখা ঐ নামেরই কাহিনী অবলম্বনে ‘পরী’র চিত্রনাট্য রচনা করেছেন বিধায়ক ভট্টাচার্য্য এবং সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন প্রখ্যাত সুরকার মল্লিক চৌধুরী। অসীম পালের পরিচালনায় কলিকাতার উপকণ্ঠে এবং আন্দামানের পরিবেশে ছবিটির চিত্রগ্রহণ করা হবে।

* * *

প্রযোজক দীপটাদ কাকরিয়্যার নতুন ছবি হচ্ছে ‘অন্তরাল’। অগ্রদূতগোষ্ঠী ছবিটি পরিচালনা করছেন। দুটি অটল চরিত্রে রূপদান করছেন ছায়া দেবী ও বিকাশ রায়। অগ্রাঙ্গ কয়েকটি বিশিষ্ট ভূমিকায় আছেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, অরুণকুমার, তরুণকুমার, দিলীপ রায়, পাহাড়ী সান্তাল প্রভৃতি। স্ববীন দাশগুপ্ত চিত্রটির সুরকার।

* * *

সঙ্গীতশিল্পী শ্রীমল মিত্র প্রযোজক রূপে ঋত্বিক ঘটক রচিত কাহিনী অবলম্বনে একখানি ছবি প্রযোজনার পরিকল্পনা করেছেন। উত্তমকুমার ও নবাগতা রিণা এই ছবির দুই প্রধান চরিত্রে অবতীর্ণ হবেন বলে মনে হয়।

প্রযোজক শ্রীমিত্র নিজেই এর সঙ্গীত পরিচালনা করবেন।

* * *

পরিচালক তরুণ মজুমদার মনোজ বহুর একটি কাহিনী অবলম্বনে তাঁর নতুন ছবি “একটুকু বাংলা”-র কাজ শুরু করে দিয়েছেন।

নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় আছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও সন্ধ্যা রায় এবং অগ্রাঙ্গ উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলিতে অভিনয় করছেন পাহাড়ী সান্তাল, রবি ঘোষ, অরুণকুমার ও জহর রায়। তরুণ মজুমদার নিজেই ছবিখানি প্রযোজনা করবেন।

* * *

‘বি-এস ফিল্মস’-এর প্রথম ভোজপুরী ছবি “গোরিয়া চলি নইহরবা”-র চিত্রগ্রহণ ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। শক্তি চট্টোপাধ্যায় ছবিখানি পরিচালনা করছেন। চিত্রটিতে বোম্বের শিল্পীদের মধ্যে রয়েছেন অসীমকুমার, বদ্রীপ্রসাদ, ইন্সানী মুখার্জি, মনোমোহনকৃষ্ণ, মদনপুরী, সুরেখা, অমল সেন প্রভৃতি এবং কলিকাতার শিল্পীদের মধ্য আছেন বিপিন গুপ্ত, লিলি চক্রবর্তী, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় ও আশীষকুমার।

ইতিমধ্যে বেণুসবাই ও পাটনায় কয়েকটি প্রযোজনীয় বহিদৃশ্য তোলা হয়ে গেছে এবং আটখানি গানও রেকর্ড করা হয়েছে। গানগুলিতে কণ্ঠদান করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, মামা দে, সুনন্দা কল্যাণপুরী প্রভৃতি।

* * *

প্রভাত মুখোপাধ্যায় পরিচালিত ‘চিত্তরঞ্জন ফিল্মস’-এর ‘দেবতার দীপ’ ছবিটির চিত্র গ্রহণের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এলো। এর কাহিনী-সুত্রটি ডঃ খগেন সুরের এবং পরিবর্তন ও চিত্রনাট্য রচনার কৃতিত্ব পরিচালক শ্রীমুখোপাধ্যায়ের নিজের। ছবিটি সম্পর্কে অপর উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, এই কাহিনীর ভিত্তিতে পরিচালক শ্রীমুখোপাধ্যায় ইতিপূর্বে যে অসমীয়া চিত্রটি তৈরী করেন এবং আঞ্চলিক ভিত্তিতে বা প্রথম স্থান লাভ করে রৌপ্যপদক লাভ করে, সেটি তারই বাংলা রূপ।

ছবিটির ভূমিকালিপিতে অংশ নিয়েছেন :—অনীল চট্টোপাধ্যায়, মাধবী মুখোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, বীণা রায়, জহর রায়, ভাস্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমান সুনন্দা প্রভৃতি।

স্বয়ংসিদ্ধ করেছেন রবীন চট্টোপাধ্যায়, আর এই ছবিটির পরিবেশক হচ্ছেন 'টাস্ পিকচার্স'।

শঙ্কু মিহ, জ্ঞানেন মুখোপাধ্যায়, দিলীপ রায়, অসিতবরণ, মঞ্জু দে, সুমিতা লাল, গীতাদি রায় প্রভৃতি। স্বয়ংসিদ্ধ কালীন্দ্র সেন ছবিটিতে স্বরূপ করেছেন এবং



নবাগতা সুবীরা রায় "রাধাকৃষ্ণ" ছবিতে আত্মপ্রকাশ করেছেন। সুশীল মজুমদার প্রযোজিত 'লালপাথর' চিত্রেও একে দেখা যাবে।



'সি, কে, প্রোডাকশন্স'-এর হাসির ছবি "মেরী দস্তের স্ট্যাট"-এর কাজ সমাপ্তির পথে। ছবিটির কয়েকটি বিশিষ্ট চরিত্রে অভিনয় করেছেন অম্বুপকুমার, নবাগতা আরতি বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, ভাস্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণকুমার, উৎপল দত্ত, গঙ্গাপন বহু, গীতা দে, রেণুকা রায়, শ্রাম লাহা প্রভৃতি। 'পথিক' গোষ্ঠী চিত্রটি পরিচালনা করছেন।

সঙ্গীতে কণ্ঠদান করেছেন শ্রামল মিহ, নির্মলা মিশ্র ও আরতি মুখোপাধ্যায়।

'মাদবী পিকচার্স'-এর "মোমের আলো" ছবিটির কাজ প্রায় শেষ হয়ে এল। সাবিন্দ্রী চট্টোপাধ্যায়ের একটি নৃত্য দৃশ্যের হুটিংও একাডেমি অফ ফাইন্ আর্টস-এর হলে নেওয়া হয়ে গেছে। চিত্রটি পরিচালনা করছেন সলিল দত্ত।

কুপেন রায় পরিচালিত 'গুপ্তপ্রী প্রোডাকশন্স'-এর রহস্যচিত্র "নিশাচর"-এর চিত্রগ্রহণ আর সমাপ্তির পথে। ছবিটির বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছেন বিকাশ রায়,

প্রযোজক-পরিচালক স্বর্গীয় মুখোপাধ্যায় তাঁর রতন চিত্র 'নতুন জীবন'-র চিত্র গ্রহণ শেষ করেছেন। আগষ্ট মাসের মাসিকায় ছবিখানি মুক্তিলাভ করবে।

অন্যথাএ। একাট বাসের বাবুজ্ঞ শ্রেণীর এবং বিচিত্র চরিত্রের ব্যক্তীদের নিয়ে ছবির কাহিনীটি রচনা করেছেন বিধায়ক ভট্টাচার্য। আর এই চরিত্রগুলিকে অভিনয়ে জীবন্ত করে তুলেছেন উত্তমকুমার, সুলতা চৌধুরী, মলিনা দেবী, ছায়া দেবী, য়েণকা রায়, ভপতী, তরুণকুমার, জহর গাঙ্গুলী এবং আরো অনেকে।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গীত এই চিত্রের এক বিশেষ আকর্ষণ হবে।

কেন্দ্র-চিত্রকেন্দ্র ৪

যে বাঙ্গালীর ছেলে বিলাতে বসে ইংরাজীতে চিত্র-নাট্য লিখে এবং প্রযোজনা করে যশস্বী হয়েছেন, সেই উমেশ



শ্রীউমেশ মল্লিক

মল্লিক বাংলার নবাব সিরাজদ্দৌলাকে কেন্দ্র করে তাঁর লেখা “শ্রীমন্ ওও ট্রাম্পেটস্” নামের চিত্র-নাট্যটি হলিউডের এক চিত্র-প্রতিষ্ঠানকে সস্তর হাজার টাকায় বিক্রী করে দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন। ছয় কোটি টাকা খরচ করে এই চিত্রটি নিষ্পিত হবার কথা ছিল, কিন্তু শ্রীমল্লিকের চিত্র-প্রতিষ্ঠানের অন্ততম অংশীদার অক্ষুণ্ণ হত্যার দৃষ্টটি চিত্র-নাট্য অহুযায়ী না করে পরিবর্তন করতে চাওয়ায় তাঁর সঙ্গে শ্রীমল্লিকের বর্তমানক্য ঘটে এবং শ্রীমল্লিক চিত্র-নাট্যটি তাঁর প্রতিষ্ঠানকে না দিয়ে হলিউডের

ঐ-চিত্র প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে দেন। ক্ষতিপূরণ স্বরূপ তাঁর প্রতিষ্ঠান থেকেও তিনি সর্বসম্মত এক লক্ষ টাকা পেয়েছেন।

মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর ছেলে উমেশ মল্লিক বিলাতে গিয়ে বর্ণবিবেষ, অসহযোগিতা, অর্থনৈতিক প্রভৃতি নানা প্রতিবন্ধক অবস্থার মধ্যে থেকে নিজের চেঁচায় ও যত্নে আজ অর্থ, প্রতিষ্ঠা ও সুনামই শুধু অর্জন করেন নি—এই চিত্র-নাট্যের ব্যাপারে অসামান্য সং-সাহস প্রদর্শন করে তাঁর স্বদেশ প্রীতির পরিচয়ও প্রদান করেছেন।

বর্তমানে শ্রীউমেশ মল্লিক তাঁর নিজের প্রতিষ্ঠান “Molliko Films (London) Ltd”-এর মালিক। এঁরা “Kubla-Khan” নামে একটি চিত্র শীঘ্রই নির্মাণ করবেন বলে জানিয়েছেন। শ্রীমল্লিকের এই অসামান্য সাফল্যের পিছনে আছেন তাঁর ভ্রাতা শ্রীপ্রভাস মল্লিক ও বিলাতে তাঁর সহকর্মী ও পরামর্শ দাতা জ্যানেট, বেনেট।

আর, ডি, বনশঙ্ক প্রযোজিত ও সত্যজিত রায় পরিচালিত ‘মহানগর’ ছবিখানি পঞ্চম মণ্ডল আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ভারতীয় চিত্র হিসেবে প্রদর্শনীর জন্য আমন্ত্রিত হয়েছে।

এবারের বালিন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবেও এই ছবিখানি ভারতীয় ছবি রূপে সরকারীভাবে প্রেরিত হতেছিল এবং পুরস্কারও লাভ করেছে। পরিচালক সত্যজিৎ রায়ও শ্রেষ্ঠ পরিচালকের পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন।

সত্যজিৎ রায় পরিচালিত ‘গার্লস’ চিত্রটিও এ-বছরের ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে পাঠানো হবে। উৎসব আরম্ভ হবে আগস্ট মাসে।

ভারত সরকার কার্ণাটীভ্যারী আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে বিমল রায় প্রযোজিত “বন্দিনীকে” সরকারীভাবে প্রেরণ করেছেন। শ্রীরায়ও ঐ উৎসবে যোগদান করতে গেলেন।

কে, এ, আকবাস প্রযোজিত ও এ বৎসরের রাষ্ট্রপতির অর্পণদক প্রাপ্ত “শেহর ওর সপ্না” ছবিটিও কার্ণাটীভ্যারী চলচ্চিত্র উৎসবে আমন্ত্রিত হয়েছে। প্রযোজক শ্রীআকবাস এবং ছবির নায়ক-নায়িকা মিলীপারায় ও সুখেখাও এই উৎসবে যোগদান করেছেন।

“বুল কা বুল” নামক ছবিটি ব্যবসায়িকভিত্তিতে রাশিয়ার পরিবেশনার্থে ক্রয়ের জন্য ‘গোল্ডেনস্’ পোর্ট ফিল্ম-এর ভারতীয় প্রধান প্রতিনিধি মি: এ, ডি, ডোব্রাভস্কি এবং বি, আর, ফিল্মসের শ্রী বি, আর, চোপরার মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

ওই একই চুক্তি অনুযায়ী বি, আর, “ফিল্ম মেডেন স্পি” নামক সেভিয়েত চিত্রটি ব্যবসায়িক ভিত্তিতে এদেশে পরিবেশনের জন্য ক্রয় করবেন।

বিশ্বেন্দ্রী প্রবন্ধ :

ছাত্রচিত্রে টার্জানের ভূমিকা অভিনয়ে বিখ্যাত এবং একদা অনিষ্পিক-সাতারু জনি উইলমুলার বর্তমানে খণের দ্বায়ে আদালতে অভিযুক্ত হয়েছেন। তিনি সাত হাজার টাকা খণ শোধ করেন নি বলে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে। আদালতে দাঁড়িয়ে উইলমুলার বলেছেন সপ্তাহে তাঁর মোট খরচ ৩৯০০ টাকা, আর আয় ৬৫০ টাকা, তাই তিনি আজ খণগ্রস্ত।

বিচারকের রায় জানা যাবেনি।

শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসেবে এ বছরে যিনি আকাদেমি পুরস্কার লাভ করেছেন, সেই বিশিষ্ট মার্কিন নিগ্রো শিল্পী সিডনি পোইটিয়ার কলম্বিয়া পিকচার্সের আরও তিনখানি ছবিতে অভিনয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। আগামী ১৮ মাসের মধ্যে এই ছবি তিনখানি তোলা হবে।

এই ছবিগুলির মধ্যে প্রথম যেটি তোলা হবে তার নাম ‘সিনানন হাউস’।

‘প্যারামাউন্ট পিকচার্স কর্পোরেশন’ এবং ‘সেভেন্টি আর্টস প্রোডাকশন্স’ যুগ্মভাবে একখানি ছবি তৈরির পণ্ডা করছেন। ছবিটির অবলম্বন টেনিসি উইলিয়ামসের একাধক নাটক “দিস্ প্রপাটি ইজ কন্ডেমন্ড”। রিচার্ড বার্টনের পরিচালনায় এই চিত্রে নায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণা হচ্ছেন শ্রীমতী এলিজাবেথ টেলর (বার্টন)।

“দিস্ প্রপাটি ইজ কন্ডেমন্ড” ছবিটির গুটিং শুরু হবে আগামী বছরের ফেব্রুয়ারী মাসে। হলিউড এবং যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলের ‘লোকেশন’-এ ছবিটি তোলা হবে

এবং এই ছবিতেই অভিনেতা রিচার্ড বার্টনকে সর্বপ্রথম পরিচালকের ভূমিকায় দেখা যাবে। তবে অভিনেতা রূপে এই চিত্রে তাঁর কোনো ভূমিকা থাকবে না।

ইস্রায়েল-এর একটি নতুন ছবিতে অভিনয়ের জন্য এলিজাবেথ টেলর ও তাঁর স্বামী রিচার্ড বার্টনকে বৈশিষ্ট্য ১৬৬০০০ ডলার (প্রায় ০৩০০০০ টাকা) প্রদানের প্রতিশ্রুতিতে একটি প্রস্তাব এসেছে। এই প্রস্তাবটি দিয়েছেন, কাল কুংগার যিনি প্রাচীন ও আধুনিক ইস্রায়েলের উপর একটি ছবি তৈরী করতে চান। ছবিটির সূটিং করতে লাগবে প্রায় নব্বই দিন।

জাপানের বিখ্যাত চিত্র পরিচালক আকিরা কুরোসাওয়া এবং ইতালির অভিনেতা মার্চেলো মাস্ট্রোয়ানি এবছরের সেলজুনিক “গোল্ডেন ট্রফি” লাভ করেছেন। শ্রেষ্ঠ চিত্র হিসাবে “গোল্ডেন লবোন” অর্জন করেছে ফেদারিকো ফেলিনির “এইদ অ্যাণ্ড এ হাফ” চিত্রটি।

‘সিল্ভার লরেল’-এ ভূষিত চিত্রের তালিকাগুলি হচ্ছে : ‘দি এল গেম্ ড্রাম’ (ব্রিডান, ফরেষ), ‘দি স্পোর্টিং লাইফ’ (লিওনে আণ্ডারসন্), ‘টম স্লোনস্’ (টনি রিচার্ড), ‘দি সাং লাইফ’ (মিনো রিনি), ‘দি সাউথ অর্থ ইন্সপেক্টস্’ (হারমানো ওলমি), ‘উইটার লাইট’ (ইস্টমার রেগার্ম্যান) এবং ‘মাই মেন ইজ ইভান’ (তারকোভস্কি)।

‘টোয়েন্টিয়েথ সেন্টুরী ফক্স’ শ্বারের “দোজ ম্যাগনিকি-সেন্ট মেন হন দেয়ার ফ্রাংস্ মেশিন” নামক ছবিটির জন্য জাপানের অজ্ঞাতন শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ইউজিরো ইশিহারাকে চুক্তিবদ্ধ করেছেন। টড্ এণ্ড এন্স ফিল্মস্ কলারে তোলা এই আডভেঞ্চার-কমেডি চিত্রটির সূটিং সম্প্রতি শুরু হয়েছে।

আন্তর্জাতিক ভূমিকা সমৃদ্ধ এই ‘দোজ ম্যাগনিকি-সেন্ট মেন হন দেয়ার ফ্রাংস্ মেশিন’ ছবিটিতে এ ধারণা বিভিন্ন দেশের যে সব শিল্পীরা অংশ নিয়েছেন, ইশিহারার স্থান দেশের দিক থেকে সেখানে যষ্ঠ। উল্লেখযোগ্য যে ইশিহারা এ পর্যন্ত প্রায় ৬০খানি জাপানী ছবিতে অংশগ্রহণ করেছেন। টেলিভিশনেও তিনি অভিনয় করেন এবং গায়ক হিসেবেও তাঁর খ্যাতি আছে। তাঁর নবতম ছবিটি ‘মাই এনিমি, দি মী’ কান চলচ্চিত্র উৎসবের অজ্ঞাতন প্রতিযোগী।

গত “অবস্থা” সংখ্যার ও এই সংখ্যার কয়েকটি লেখার ছাপার ভুল সংশোধন করে দেওয়া হল।

নিম্নলিখিত কারণে, গতমাসের ‘খাঁদা ও হেয়ালি’ যে সকল উত্তরদাতার নাম ‘কিশোর-জগৎ’ স্তম্ভে প্রকাশ করা গিয়েছিল, সেগুলিও নীচে প্রকাশিত হল।

—সম্পাদক

গত ‘অবস্থা’ সংখ্যায় ‘শকানাই বহু’ লিখিত “গৃহভাগ” নীচের ছাপার ভুলগুলি থেকে গেছে তা নীচে সংশোধন করে দেওয়া হল —

পৃষ্ঠা	কলাম	যা আছে	যা হবে
৪৫	প্রথম	“ভা, কার বসি হচ্ছে?”	‘কার মাথা ঘুরছে?’ হচ্ছে।”
৪৮	প্রথম	“অবস্থা গণা বজন করতে হবে “হত্যা” কথা- গুলির বক্তার নাম নাই	এ কথ গুলির বক্তা— ভাঙার।” “হত্যা” কথা- গুলির বক্তার নাম নাই
৬৮	দ্বিতীয়	“আর রিনিউ কবোনা।”	“আর রিনিউ কবো না।”
৭০	প্রথম	“পিলতুতো ভাইও বলতে পারেন, পরিবর্তে বিবাহ...”	‘পিলতুতো ভাইও বলতে পারেন, মামাতো ভাইও বলতে পারেন. পরিবর্তে বিবাহ...”
১১	প্রথম	Larcelat wood eral	Larcelot woodcroft
৭৪	দ্বিতীয়	“শিবকে নিয়ে”, “শিব নীরব” “শিবসহ”	শিব’র স্থানে শিব।

* * *

এই “অবস্থা” সংখ্যার “মেরেদের কথা” বিভাগের “শিক্ষার সমস্যা” প্রবন্ধটির নিম্নলিখিত কয়েকটি বিশেষ ছাপার ভুলগুলি সংশোধন করা হ’ল:—

পৃষ্ঠা	কলাম	যা আছে	যা হবে
২২৬	প্রথম	“সেই দিকেই শুধু দৃষ্টি দেন না।”	“সেই দিকেই শুধু দৃষ্টি দেন।”
২২৬	দ্বিতীয়	“স্বাক্ষর”	“স্বাক্ষর”

“কিশোর জগৎ” বিভাগে:

গত মাসের তিনটি খাঁদার সঠিক

উত্তর দিয়েছে:

দিলীপকুমার দত্ত (বাশবেড়িয়া)

গত মাসের দুটি খাঁদার সঠিক

উত্তর দিয়েছে:

ধীরেন্দ্রনাথ, সহদেব, সুনীল, জামল, সত্যবান (পাথর মহড়া) শমিতকুমার ঘোষাল (কলিকাতা), ধর্মদাস বায় (বিজ্ঞানপুর), মিষ্ট ও চৈতালী (ভূগাপুর), সন্ত, মন্টি, গান্ধী, বুট, মন্টিলা, টুটু ও টুকি সিংহ (খদনপুর), বাণী, শুভ্র ও পাথ হাজরা (আড়াই), প্রভাতরঞ্জন সরকার (আড়াই), প্রদীপকুমার বসু (বাশবেড়িয়া), পরাগময়, বিরাগময়, সুরাগময়, দীর্ঘাগময়, সিন্ধুধারা ও মণিমালা হাজরা (বড়বাড়িয়া), নিতাইচাঁদ পাল, শচীন্দ্রনাথ ও নীলমণিচাঁদ পাল (পূর্বচিচ্চা গ্রাম)

গতমাসের একটি খাঁদার সঠিক

উত্তর দিয়েছে:

স্বিরাম, কুদ্রাম, গোপাল ও শশীশেখর মিত্র (কইনান), সুনীতিকুমার, মনোবদা, গৌরীবালা ও বদনমোহন মিত্র (রাগপুর),



সম্পাদনা : শ্রী প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়



সহযোগিতার চট্টোপাধ্যায়

খেলার কথা

ক্ষেত্রনাথ রায়

ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া ৪

ইংল্যান্ড : ২৬৮ রান (জিম পার্কস ৬৮ এবং টেড ডেভিস্টার ৬৬ রান। নীল হক ৭৫ রানে ৫ উইকেট এবং গ্রাহাম ম্যাকক্লি ৭৪ রানে ৪ উইকেট পান)

ও ২২৯ রান (কেন ব্যারিংটন ৮২ রান। কলিং ৫২ রানে ৩, ম্যাকক্লি ৫৩ রানে ৩ এবং ভিভান ৭০ রানে ৩ উইকেট পান)

অস্ট্রেলিয়া : ৩৮৯ রান (পিটার বার্জ ১৬০ রান এবং উইলিয়াম লরী ৭৮ রান। ফ্রেডি টিটমাস ৬৯ রানে ৪ এবং ফ্রেডি টুম্যান ৯৮ রানে ৩ উইকেট পান)

ও ১১১ রান (৩ উইকেটে। রেডপাথ নট আউট ৫৮ রান। টিটমাস ২৫ রানে ২ উইকেট পান)

লিডস মাঠে অনুষ্ঠিত ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার চলতি ৪৭ তম টেস্ট সিরিজের তৃতীয় টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়া ৭ উইকেটে জয়ী হয়ে বর্তমান টেস্ট সিরিজে ১-০ খেলার অগ্রগামী হয়েছে। বৃষ্টির দরুণ ট্রেট ব্রিজের প্রথম টেস্ট এবং লর্ডস মাঠের দ্বিতীয় টেস্ট খেলা পরিত্যক্ত হয়—জয়-পরাজয়ের সীমান্সা হয়নি। সুতরাং অস্ট্রেলিয়া ১-০ খেলার অগ্রগামী থেকে আগামী ২০শে জুলাই তারিখে ম্যাকক্লিয়ার চতুর্থ টেস্ট খেলার আসরে নামবে। পঞ্চম টেস্ট-খেলা স্বক হবে ওভাল মাঠে, আগামী ১৩ই আগস্ট থেকে। খেলায় এই অবস্থার ইংল্যান্ডের থেকে অস্ট্রেলিয়া অনেক সুবিধাবানক অবস্থার আছে। আর একটা টেস্ট

খেলায় তারা জয়ী হলে তারা সম্মানের সঙ্গেই খারজি 'এ্যাসেস' পুরস্কার হাতে রাখতে পারবে। এমন কি বাকি দুটো খেলা ড্র গেলেও অস্ট্রেলিয়ার কোন ক্ষতি হবে না, পুরস্কার তাদের হাতেই থেকে যাবে। অস্ট্রেলিয়া কতক অধিকৃত 'এ্যাসেস' পুরস্কার পুনরুদ্ধার করতে হলে ইংল্যান্ডকে ৪র্থ এবং ৫ম টেস্ট খেলায় জয় লাভ করতেই হবে। সুতরাং ইংল্যান্ডের খেলোয়াড়দের মধ্যেই মনোবল শক্তি এবং ক্রীড়া নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে হবে। ইংল্যান্ডকে আজ অগ্নি-পরীক্ষার সামনে দাঁড়াতে হয়েছে।

লিডসের আলোচ্য তৃতীয় টেস্টে ভাগ্যদেবী প্রথমে ইংল্যান্ডের পক্ষেই ছিলেন। ইংল্যান্ড টমে জয়ী হয়ে ব্যাট করার প্রথম সুযোগ পায়। কিন্তু এই সুযোগের পুরো সদ্ব্যবহার করতে তারা পারেনি। প্রথম দিনে খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ের ১০ মিনিট আগে ২৬৮ রানের মাধ্যমে ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের খেলা শেষ হয়। খেলার উপযুক্ত আলো ছিল না বলে এই দিন অস্ট্রেলিয়া আর ব্যাট করেনি।

দ্বিতীয় দিনে অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসের খেলা শুরু করে ৮ উইকেট খুইয়ে ২৮৩ রান হুলেছিল। পিটার বার্জ ১০০ রান করে অপরাজিত ছিলেন। অস্ট্রেলিয়ারও প্রথম ইনিংসের খেলার এক সময়ে দারুণ ধস নেমেছিল।

তৃতীয় দিনে অস্ট্রেলিয়ার ৩৭২ রানের মাধ্যমে ২য় উইকেট (গ্রাউট) পড়ে যায়। নবম উইকেটের জুড়িতে গ্রাউট (৩৭ রান) এবং পিটার বার্জ মোট ৮৯ রান যোগ করেছিলেন। অস্ট্রেলিয়ার পিটার বার্জ নিঃশব্দে তৃতীয় টেস্ট খেলার নায়েকোচিত ভূমিকায় অংশ নিয়েছিলেন এবং তাঁকে খেলার সহযোগিতা করেছিলেন ৮য় উইকেটের জুটি হক (৩৭ রান) এবং ২য় উইকেটের জুটি গ্রাউট (৩৭ রান)।

তৃতীয় দিনের খেলার বাকি সময়ে ইংল্যান্ড দ্বিতীয়





ভাদ্র-১৩৭৬

প্রথম খণ্ড

দ্বিগুণাশতম বর্ষ.

তৃতীয় সংখ্যা

যোগ-জীবন

বিমলানন্দ স্বামী

যোগজীবন লাভ করিতে হইলে ইহকালের উপযোগী গীতোক যোগই শ্রেষ্ঠ সত্য বলিয়া মনে হয়। ইহা সার্বজনীন যোগ অর্থাৎ হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান সকল জাতিই এই যোগের আচরণ বা সাধনা করিতে পারেন। আর তা ছাড়া এই গীতোক যোগের সাধনাকরাও বেশ সহজ বা অনারামসাধ্য। কিন্তু “গীঃ” সম্বন্ধে অনেকেরই অনেকরকম ধারণা। তাই “গীতোক যোগ” বলিলেই হয়ত তাঁহাদের সেই সেই ধারণার মূলে কুর্জবাস্তব হইতে পারে। ইহার কারণ, প্রায় বৈশ্বকোণ ব্যক্তিই নির্বিচারে এক-একটা মতের পক্ষপাতি।

যদি শাস্ত্র সঠিকভাবে বুঝিবে হয় তবে সব দিক ভাবিয়াই বুঝিতে হয়। অবশ্য সে বেশ কষ্টের ব্যাপার। জাহ্নবী আছে তার অন্তর্গত বা আধ্যাত্মিক অর্থ। এই “আধ্যাত্মিক” কথাটাই আবার অনেক মানিতে চাছেন না বা গোলমালে ঠেকে। আশ্চর্য কথা শুনিতে চাই ও আশ্চর্য বুঝিতে চাই, কিয়ৎ আধ্যাত্মিকতা মোটেই মানিব না—এ কথা মহামুর্খের মুখেই কি শোভা পায় না? তবে ইহাও অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, শাস্ত্র ব্যাখ্যাকারিগণও এদিকে সেক্ষণ দৃষ্টি না দিয়া নিজ নিজ বুদ্ধিগ্রস্ত ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। তাঁহারা শাস্ত্র পড়িয়া

নিজ নিজ পণ্ডিত বা গুরুর নিকট যেরূপ ব্যক্তিগত ভাবে, তাঁহাদের সম্বন্ধে বলিবার কিছুই নাই, আর তাঁহাদেরই বা বৃথা এ সব ব্যক্তিগত লাভ কি ?

যাক, বাচা বলিতেছিলাম। একটু প্রণিধান করিলেই প্রায় সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, এতাবৎ যে-কেহ ধর্মপ্রচারকরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং যে যে ধর্মমত তাঁহাদের দ্বারা প্রচারিত হইয়াছিল, সে সবের মধ্যে এত বাধা-নিষেধ যে তাহার আচরণ করা সাধারণের পক্ষে একরূপ অসম্ভব। কিন্তু একমাত্র গীতোক্ত ধর্মের আচরণের পক্ষে ওরূপ বাধা নাই; বরং ইতিকর্তব্যতা-বোধে সংসারের যাবতীয় কর্মকরিয়াও এই সহজকর্মের আচরণ করিতে সেরূপ কোনই বাধা দৃষ্ট হয় না। স্বয়ং ভগবানই গীতামুখে সর্বকর্ম করিবারই নির্দেশ দিয়াছেন। গীতার কর্মসংক্রান্ত মানে কর্মকলাকাজ। তাগ, কর্মভ্যাগ নহে। আর কর্মভ্যাগ কি কেহ ইচ্ছা করিলেই করিতে পারে ?

সাধনার ক্ষমতা বরং শাস্ত্র না পড়িলেও ক্ষতি নাই, শুধু গুরুমুখী সাধন প্রণালী অনুসারে সাধনা দ্বারা প্রকৃত সত্য বা ভগবানকে পাওয়া যায়। আর যাহারা ভগবানকে লাভ করিয়াছেন তাঁহারা সত্য দৃষ্টিতে দর্শন করিয়া যাহা বলেন তাহাই “আপ্তবাক্য” বা “শাস্ত্র-বাক্য” বলিয়া শাস্ত্র-গ্রন্থে লিখিত হয়। সুতরাং তাঁহারা সত্যিকার শাস্ত্র-প্রণেতা, পাঠ্যিতারা নহেন। কিন্তু সাধন-বিহীন পণ্ডিতকে ঠিক ঠিক ভাবে শাস্ত্রের মর্মকথা প্রণিধান করিতে হইলে সাধনা না করিয়া উপায় নাই। তাই ঋষি বা তত্ত্বজ্ঞানী বলেন—

“মথিষা চতুরো বেদান্ সর্লশাস্ত্রাণি চৈব হি।

সারস্ব যোগীভিঃ পীতং তক্রং পিবন্তি পণ্ডিতাঃ ॥

—অর্থাৎ চারিখানি বেদ ও সমুদয় শাস্ত্রকে দৃঢ় ভাবিয়া উহাকে মথিতে পরিণত করা হইল। ঐ মধি মখন করতঃ মাখন ও ঘোল প্রস্তুত হইল। যাহারা যোগী বা সাধক, তাঁহারা ঐ মাখন বা সারবস্তুটুকুই খাইয়া আত্ম পরিপূষ্টি লাভ করিলেন। আর পুঁথিপড়া পণ্ডিতগণ মাখনে বস্কিত হইয়া ঘোল খাইয়াই আত্মতৃপ্তি লাভ করিলেন।

অতএব বৃদ্ধা যাইতেছে যে, সাধনেই জীবনের সার্থকতা বচনবাগীশতায় নয়।

শাস্ত্রও তাই বলিতেছেন—

“নায়মাশ্রা প্রবচনেন লভ্যঃ”

সাধনের নাম শুনিতেই যাহারা নিজেদের সাধনে অক্ষম মনে করিয়া দূরে সরিয়া যান, তাঁহাদের এ বিষয়ে আলোচনা করা কেবলমাত্র পাণ্ডিত্যের বড়াই ছাড়া কিছুই নয়।—শাস্ত্রবচন—

“নায়মাশ্রা বলহীনেন লভ্যঃ।”

“ন হি কশ্চিং কণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃতং।

কার্য্যতে হবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈগুর্গৈঃ ॥

—জানীই হউক আর অজানই হউক, কোন লোকই কর্ম না করিয়া মুহূর্তকালও থাকিতে পারে না; প্রকৃতি-জাত গুণসকল (রাগ দ্বেষাদি) মানুষকে অবশ করিয়া কর্ম করাইয়া থাকে।

“গীতা-ধর্ম”কে নেহাৎই সাধারণ ধর্মমত মনে করিয়া প্রায় অনেকেই আবার কি ভুলই না করেন! তাই গীতার ভাষা ও ব্যাখ্যার চাপে সত্যকারের গীতা প্রায় লোপ পাইতে বসিয়াছে! গীতার প্রকৃষ্ট পরিচয় গীতার ৪র্থ অধ্যায়ের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোকটি একটু লক্ষ্য করিলেই পাওয়া যাইবে।

“ইমং বিবস্বতে যোগং শ্রোক্তবানহমব্যয়ম্।

বিবস্বান্ মনবে গ্রাহ মজ্জরিক্ণাকবেত্সবীৎ ॥

এবং পরম্পরাশ্রোতৃমিমাংস রাজর্ষয়ো বিদ্বঃ।

স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরম্বপ ॥

—অর্থাৎ জগতের প্রসবকর্তা সূর্য্যকেই এই যোগ শ্রীতগবান কর্তৃক বহুবছদিন পূর্বে প্রদত্ত হইয়াছিল। সূর্য্য মল্লকে ও মল্ল ইন্দ্রাকুকে বলিরাছিলেন। তারপর মহংকালের দ্বারা এই যোগ ইহলোক হইতে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল

(অল্প তথ্যই জানিগণের নিকট তাহা পূর্বেও ছিল, এখনও আছে ও পরেও থাকিবে) ।

তাই সেই অতি পুরাতন, অব্যয়, সনাতন ও শাশ্বত ধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য মহাযোগেশ্বর শ্রীহরির আবির্ভাব। তাঁহার মুখ নিঃসৃত এই পবিত্র ও উত্তম যোগের নাম রাজবিজ্ঞা, রাজগুহ্য যোগ। ধর্মসম্বত, অব্যয়, প্রত্যক্ষ অমৃতত্বগ্রাহ্য এই যোগে যাহারা অশ্রদ্ধাবান, তাহারা সেই প্রাণের প্রাণ সর্বহুঃখহারী শ্রীভগবানকে না পাইয়া এই মূঢ়াসংসারবন্ধ্য জনমে জনমে যাতায়াত করেন ও ভীষণ যন্ত্রণা ভোগ করেন। সর্বশেষ কথা এই যে মানুষের বুদ্ধিগ্রাসিত যে ধর্মমত, তাহা কখনও অব্যয় হইতে পারে না। একে গড়ে, অস্ত্রে ভাঙে। বুদ্ধ যাহা গড়িয়াছিলেন, আচাধ্য শব্দর তর্কযুক্তিগণে তাহা নশ্রাং করিলেন। আবার তাহার প্রচারিত বেদ বা সন্ন্যাস-ধর্ম মহাপ্রভু প্রতৃতি বৈষ্ণবাচার্য্য-

গণ মার্মার বলিয়া খণ্ডন করিলেন। সর্বশেষে সর্ববিশ্ব-সম্বয়কারী পরমহংসদেব একমাত্র হরিনাম যাঁহাতি অস্ত্রে যে কোনও ধর্মবান্ধব যাহাও যে ভগবৎপ্রাপ্তি হইতে পারে নিজ জীবনে উপলব্ধি করিয়া তাহার প্রমাণ ও প্রচার করিলেন। সুতরাং জীব জীব প্রেমভাব প্রতিষ্ঠার স্থলে সম্প্রদায়ভাবেরই যে প্রসারতা ঘটিল ও পরম্পরের মধ্যে বিবেচ্য ভাবই যে বৃদ্ধি পাইল—একের কাছে যাহা বিধি, অস্ত্রের কাছে তাহা অবিধিক্রমে প্রতিষ্ঠাত হইয়া প্রেমের পরিবর্তে শত্রুতার পর্য্যবসিত হইল। হায় রে ধর্ম! সুতরাং এইভাবে চিন্তা করিলে স্পষ্টই বোঝা যাইবে যে গীতার ধর্মই একমাত্র এ সব হইতে মুক্ত—তাই সকলেরই উচিত এই সার্বজনীন নিঃস্বার্থ প্রেমের একমাত্র নিদান গীতোক্ত যোগ অবলম্বন পূর্বক যোগ-জীবন লাভ করা।

বেদনা অশ্রু

কবিকঙ্কণ হেমস্তুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মণী জমে গেছে বরণা কলমে
ভাবা আজ মুক স্তব্ধ মনে।
কি কথা বলিব ভুলে যাই সব—
বেদনায় মন গ্রহর গণে।
বাসর রজনী হয়নিক ভোর
ভারতের বৃক উজাপাত,—
সত্য হলেও নিষ্ঠুর এষে
বজ্র দহনে নামিল রাত।
দিকে দিকে আজ বিজলী রেখায়,
অশ্রু ঝরাণো বেদনা গাথা।
নব্য ভারত কর হানি বৃক
শিলার উপরে কুটিছে মাথা।
সারা বিশ্বের ঘরে ঘরে যার
ভ্রায়ধর্মের বারতা ছিল;
নব ভারতের সেই যে ছালা
নিয়তি শাপন তারেও নিল।
ছূর্তাগা দেশ কাঁদিস নে আর
শিরেরে দেখ না ডাঁড়ায়ে অরি।
এ সময় নহে বেদনা গাথার
উজানে ঠেলিয়া ভিড়াও তরী।

একটি জীবন পুষ্প স্তবক
কুটে রবে ভারত জননী কোলে।
উজ্জল তার দীপ্ত আভাষ,
ছলিবে জননী নতন দোলে।
অর্দ্ধশতক একটি জীবন
একটি মনের সাধনা বাণী—
বিশ্ব মনের মণিকোঠা মাঝে,
ভারত মায়েরে সাজালো রাণী।
শান্তি যজ্ঞের পুরোহিত আজ
ঢলিয়া পড়েছে অস্তাচলে।
নিভে গেছে দীপ দেউটি আধার
জোনাকির জালা মিছিল চলে।
চুধোগ ঘেরা আধার রজনী
কে ধরিবে আজ মশাল আলো।
আগামী দিনের নতন পুরুষ
কে আর আদরে বাসিবে ভালো?
ধন জননী তোর কোলে যাগো
এমন সম্মান জনম দিল।
বিশ্ব কাঁদায় চলে গেল সে যে,
আবার রিক্ত, কাঁড়াল হলি।



মহাভাবনীয়



শ্রীমদভাবনীয়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

সতেরো

নমিতা সাটা ক্রম্বে বিকেল পাচটায় পৌঁছেতেই এক নোটস সার্মিনে: “আকাশ-গরুড় উড়বেন আধঘণ্টা দেরিতে—ছটায়।” খানিকক্ষণ বুকমটলে এ-বই ও-বই দেখতে দেখতে চোখে পড়ল “পাজে পিও”। এ মহাত্মার সম্বন্ধে ও কাগজে পড়েছিল—ইতালিতে কোন্ এক বিজন প্রদেশে পাহাড়ে এক ক্যাথলিক মঠে তিনি হাজার হাজার ধর্মার্থীকে আজও অক্লান্তভাবে দিনের পর দিন ভাগবতী কথা বলেন, কত তুচ্ছকিংশ্র রোগ সারান—ক্যান্সার, পক্ষাঘাত, আর্থরাইটিস। একাহারী, ঘরটি প্রায় গুহার মতন, কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য—তার দেহে ক্রসের চিহ্ন ও ক্ষত থেকে প্রস্ফুট রক্তক্ষরণ হয়। আলোকের সঙ্গে এ নিয়ে কত যে আলোচনা হয়েছে তার। পরে আলোক ইতালিতে গিয়েছিল তাঁর সঙ্গে দেখা করতে—প্রধানত: এই ক্রসের ক্ষত থেকে রোজ রক্তক্ষরণ হয় এই জনশ্রুতি সত্য কি না জানতে। সম্প্রতি কিছুদিন থেকে নমিতা অস্বাভাবিক লিঙ্গের লেখা এই বিখ্যাত বইটির খোজ করছিল।*

বইটি নিয়ে রেন্ডেরা গৃহে ঢুকে এক পেয়লা চায়ে চুমুক দিতে দিতে নমিতা বইটির এ-পাতা ও-পাতা উল্টায়, আর অনিন্দে ওর চোখে জল আসে। হঠাৎ গাঙ্গে পিওর একটি বড় উদ্ভূত উক্তি পড়তে না পড়তে ওর বকের তার বেজে উঠে “মাহুষ স্বভাবে এত অহঙ্কারী যে, যখন

তার স্বাস্থ্য ও টাকা থাকে তখন সে নিজেকে ভাবে সর্ব-শক্তিমান ভগবান, কিন্তু শেষে যখন নিয়তির আঘাতে সে বিকল হয়ে পড়ে তখন তার মনে পড়ে যে ভগবান আছেন।”

পিছনে পায়ের শব্দে নমিতা চমকে ওঠে। মহুতাই হেসে “এত তন্নয় হ’য়ে কী পড়ছিলে গো পরহুংখাতরা দেবী? আগাখা কিস্তির পোয়োরো, না না ওভহাইসের জীওস্?”

নমিতা (হেসে উঠে): ছয়ের একটাও না। পড়ছিলাম—বহন দেখাচ্ছি—আপনার কথাই মনে হচ্ছিল, সত্যি বলছি। ওয়েত্তির! আর এক পেয়লা চা।

* * *

চায়ে চুমুক দিয়ে মহুতাই বলল: “বড় ভালো পাগল পাজে পিওর কথা শুনে—বিশেষ ক’রে স্বথের সময় ভগবানকে ভুলে থেকে শুধু হুংথের সময়ে তাঁর কাছেই ধর্না দেওয়ার কথা।”

নমিতা: এর আগে কখনো শোনেন নি এ মহাপ্রাণ মাছুষটির কাহিনী?

মহুতাই: আমি কি তোমাদের মতন বিশ্বাসী নমিতা যে—

নমিতা: ফের self pity—আত্মবিকার ছাড়ুন।

মহুতাই: আত্মবিকার নয়। তবে কি জানো? এযুগে আমাদের পক্ষে ধর্মে বিশ্বাস করা যে কী কঠিন হয়ে উঠেছে—সায়েন্সই আজ বসেছে ঈশ্বরের সিংহাসনে।

নমিতা (মৃদুহেসে): মানে পিটো তো—আপনার কাছে অন্তত: ?

• Oscar De Liso—Padre Pio (All Saints Press)

মহুভাই : না না পিণ্টো কেন—বদিও সে একজন
মস্ত—

নমিতা : জগতে এক ভগবান ছাড়া মস্ত কেউ নেই—
তবে ব্যস্ত বলতে পারেন। সেদিনও গুরুদেব ফের
বলছিলেন যে এ-যুগে পিণ্টোদের আমরা অত্যন্ত দিশারি
মনে করি ব'লেই আমাদের আজ এ দুঃস্বপ্ন। একটু
আগেই পড়ছিলাম পাত্রে পিওর মন্তব্য, শুহুন—না, শুনতেই
হবে—বিশেষ যখন আপনার স্মৃতি হয়েছে আজ।
(বাইট খুলে) পাত্রে পিও শেষ অধ্যায়ে বলেন একদল
ধর্মার্থীকে : “ভগবানকে জানা যায় সত্যিই। কিন্তু
আজ তোমরা যে চলেছ ভুল পথে মিথ্যা ও অহকারের
নির্দেশে। বিজ্ঞানের পথে তাঁকে জানা যায় না। বিজ্ঞানের
ধন্যতম কীর্তিও ভাগবত মহিমার পাশে নগণ্য। যদি
ভাগবত সত্যকে চাও তবে কাম ক্রোধ লোভ মর্প ছাড়ো
—ধূলোয় লুটিয়ে থাকো তাঁকে।” * না শুহুন—এঘরে
তো কেউ নেই তখন একটু মন খুলেই ভগবানের কথা
কওয়া থাক—কারণ কী জানেন ?

মহুভাই : কী ? শুধু সায়েন্সে বিশ্বাস ক'রেই আমি
আজ ভুগছি ব'লে ?

নমিতা : না, আঘাত পেয়ে নত হয়েছেন ব'লে—
বুঝতে পেরেছেন ব'লে যে রমাকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত
ক'রে ভগবানের চোখে অপরাধী হয়েছেন।

মহুভাই : সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত অসম্ভব করেছি
কাল। রমাকে অধিক সম্পত্তি দেব ভেবেছিলাম—কিন্তু
ভেবে দেখলাম যে, যে স্ত্রী আমার টাকার জন্তেই বিয়ে
ক'রে আমাকে ঠকিয়েছে তাকে একটু পান্টা ঠকালে
ভালোই হবে—quits, শোধবোধ। তাই উইলে আমি
রমাকে দিয়েছি তিনলক্ষ, শোভনাকে ও প্রায়ীকে একলক্ষ।
তবে বাড়িটা শোভনাকেই দিয়েছি কারণ রমার থাকার
জায়গা আছে, এদের নেই। কী ? ঠিক করেছি তো ?
না, বলবে once a জৈব always a জৈব ?

নমিতা (উৎফুল্ল) : না না ঠিকই করেছেন।
আপনি স্ত্রীর ভয়ে মেয়ের পুরে অবিচার না করলে

আপনাকে জৈব বসবই বা কেন ? তাছাড়া আমরা গুরু-
মন্ত্র নেওয়ার পরে চাইবই বা কোন মুখে যে আপনার স্ত্রীর
অপরাধের জন্তে ছেলে দুঃখ পাক ? তবে একটা জায়গায়
আমরা বীকা ঠাকুরের সঙ্গে একমত যে, যে কুটিলতার
সঙ্গে সরল ব্যবহার করা চলে না। অর্থাৎ শঠে শঠিৎ
সম্যচরৎ আর কি। এইখানেই পাত্রে পিওর সঙ্গে বিষ্ণু-
ঠাকুরের তফাত।

মহুভাই (আশ্চর্য) : একটু ভরসা পেলাম—সত্যি
বলছি নমিতা। কারণ...কারণ আমি যে আজ কী রকম
দুর্বল হয়ে পড়েছি তোমরা—মানে সবলারা—কল্পনাও
করতে পারবে না। এই তোমার সামনে এত জোর দিয়ে
বলছি তো যে, রমার পাওয়া উচিত বারো আনা—কিন্তু
যদি ধরো শোভনা জানতে পেরে কুরুক্ষেত্র করে তবে
হয়ত আমি পারব না শেষপর্যন্ত—ফের হয়ত উইল
বদলে ফেলব—

নমিতা (ব্যস্ত হয়ে) : না না না—অমন কথা মুখেও
আনবেন না আপনি। পারতেই হবে আপনাকে।
পরমহংসদেব বলতেন যে নিজেকে যে অষ্টগ্রহের পাপী
পাপী বলে সে পাপীই হয়ে যায়। আপনার এখন অপবার
সময় হয়েছে যে আপনি মাহুধ, আপনি কতা, আপনি মরদ,
বুঝলেন ? তবে একথা আমিও জানি যে আপনার
স্ত্রীকে আপনার এই উইল বদলাবার কথা গুণাকরেরও
জানতে দিলে চলবে না—

মহুভাই : শ্—শ্—!

নমিতা : কী ?

সঙ্গে সঙ্গে পিছনের টেবিল থেকে একটি veil-পর
মহিলা ওঠে গেল।

নমিতা : কেউ শুনছিল পিছনে ব'সে ?

মহুভাই : হ্যা, আর কে জানো ? অলিভিয়া।

নমিতা (চমকে) : অলিভিয়া ? সেই রমার
গভর্নিসটা ?

মহুভাই : তাকে কি দেখেছ তুমি ?

নমিতা : না দেখিনি, তবে (ধেম) তার সবচেয়ে
শুনছি অনেক কিছুই।

মহুভাই (সত্যে) : কী শুনেছ বলবে ?

নমিতা (এড়িয়ে গিয়ে) : মাহুধ কত কি শোনে—

৭৭। ক মনে থাকে ছাই? তবে...রমা বলেছে সে খুব
খারাপ মেয়ে ব'লে আপনি তাকে ডিসমিশ করেছিলেন—
তবে সে কলগো গিয়েছিল না?

মহুভাই (বিত্ত): হ্যা—তবে পিণ্টো বললে সম্প্রতি
ফিরে এসেছে। শুনলাম...মানে...পিণ্টোই বলছিল...
আমাকে একটু সতর্ক থাকতে।

নমিতা: কেন?

মহুভাই (এড়িয়ে গিয়ে): স্বভাবে কুচক্রী তো—
তাছাড়া She has to live by her wits, আর তার
মানে কী—বুঝতেই তো পারো।

নমিতা (ভাবনায় প'ড়ে): তা হ'লে? ও যদি
কিছু শুনে থাকে?—শুভন, শোভনাকে ও জানে?

মহুভাই: না...তবে (ইতস্তত: ক'বে) পিণ্টো নাকি
ওকে দুঃখ ক'রে বলেছে যে আমি রমাকে বঞ্চিত ক'রে
শোভনাকে সব বিষয় দিয়েছি শোভনার পীড়াপীড়িতে।

নমিতা: সে কি? পিণ্টো এতে খুসি হয়নি?

মহুভাই (উদ্দীপ্ত): পিণ্টোকে প্রহ্লাদ দেখতে
পারে না জানি—তার কোনো দোষ ত্রুটি নেই এমন কথাও
বলব না। কিন্তু তাই ব'লে সে নীচ নয়। আমাকে
বকেছে কতবারই স্ত্রীর মন রাখতে গিয়ে রমার প'রে
অবিচার করেছি ব'লে। (চারিদিকে তাকিয়ে) না কেউ
নেই। (স্বর নামিয়ে) তোমাকে বলি একটি কথা
আজ: পিণ্টো বলে ও খবর পেয়েছে—(ফিশ
ফিশ ক'রে)—অলিভিয়া রাক মেল করার পেশা
নিয়েছে।

নমিতা (শিউরে উঠে): রাকমেল! মানে—

মহুভাই: হ্যা, মানে তাই। পিণ্টোর কাছে ওর
এক বন্ধু বলেছে—সে বড় জঘন্য কথা, থাক গে। মোট
কথা, ও বড় ঘরের নানা গুপ্ত খবর রাখে—কয়েকটি চরও
নাকি লাগিয়েছে।

নমিতা (শক পেয়ে): বিলেতে এরকম বদমায়েস
আছে বইয়ে পড়েছি—কিন্তু আমাদের দেশেও—

মহুভাই: ঐ ঐ ঐখানেই তো আমাদের মতন
অবিশ্বাসী বিপদে পড়ে নমিতা! আমাদের দেশ কী এমন
আহামরি দেশ শুনি? মাতৃষের স্বভাব—হিউয়ান নেচার
—সবত্রই এক-এক-এক। পিণ্টো বেশ বলে কোনো

বেড়ালকে বনে পাঠিয়ে বনবেড়াল করা যেতে পারে, কিন্তু
ফলফুল খাইয়ে সেট বেড়াল করা যায় না—কী?

নমিতা: না, দেখছিলাম—ও কোথায়। অনেক
দূরে বুকিং অফিসে।

মহুভাই (তাকিয়ে): ওকি আমাদের পিছু নিয়েছে
মনে হয়?

নমিতা (হেসে): আগাখা ক্রিসটির রুব কাউন্ট না
ইতিহাসের খাতাহরি?

মহুভাই: না ইতিহাস নয় নমিতা। কোথায় পড়ে-
ছিলাম বার্টরাও রাসেলের একটি কথা: “বাইবেলের
ভগবান আছেন বিশ্বাস করতে না পারলেও শয়তান আছেন
এ-বিশ্বাস আমার অচল অটল।

নমিতা (হেসে): বলেছেন ভালো। তবে ও যে
মেয়েছেলে হয়ে আমাদের পিছু নেবে গুপ্তচরের মতন—
এতটা—

মাইক্রোফোনের অটোনাদ: “আমেদাবাদের প্লেনের
যাত্রীরা এগিয়ে আসুন, প্লেন ছাড়ল ব'লে।”

আঠারো

নমিতা ও মহুভাই পাশাপাশি বসে—শেষের দিকের
সীট-এ। তাদের সামনে চার পাঁচটা সার সীটে একটিও
আরোহী নেই দেখে ওরা নিশ্চিন্তি হ'য়ে বসল। মহুভাই
দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল: “খ্যাংক গড্! সে আসে নি।”

নমিতা বলল: দাঁড়ান, রথ উড়ুক আগে। যা জননী
বলতেন: মরবে নারী উড়বে ছাই, তবে নারীর গুণ গাই।
আগে শেষ পর্বস্ত দেখুন ধুমকেতু উদয় হল কি না।”

ভ ব...ব...ব...ব...

মহুভাই (বেন্ট বাঁধতে বাঁধতে) এ-বার?

নমিতা (ভয়ংকর হেসে): এবার সংকটভারণের গুণ
গাই:

হরি! বাঁচালে বাঁচালে বাঁচালে হে!

তাকে খেদালে খেদালে খেদালে হে!

মহুভাই (হেসে): তোমাকে আর তোমার বাবাকে
এইকন্ঠে আমার এত ভালো লাগে, জানো? You have
not a care in the world—যেন উড়ে চলেছ সর্বদাই।

নমিতা (হেসে): আর আপনি?

মহুতাই (হঠাৎ বিষয়) : আমার দিন ফুরিয়েছে—
কোনো আশাই নেই আর।

নমিতা (সাত্বনার স্বরে) : অমন কথা বলে না। যদি
সত্যিই ক্যান্সারই হয় তা হ'লেও আজকাল তত ভয় নেই,
রেডিয়ামে কত রোগীকে সারতে দেখেছি।

মহুতাই (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে) : সে আশা ছরাশা।
অপারেশন করলে হয়ত বাঁচতেও পারি, কিন্তু না করলে
বড়জোর আর তিন চার মাস—

নমিতা : ডাক্তার কি স্পষ্ট বলেছেন একথা?

মহুতাই। নৈলে কি আমি বানিয়ে বলছি? ঠিক
হয়েছে আগষ্টের প্রথম সপ্তাহেই অপারেশন হবে—আজ
জুলাই মাসের পয়লা তো? মাত্র আব এক মাসের
মেয়াদ, হয়ত অপারেশন টেবিলেই—

নমিতা : কী যে ছেলেমানুষি করেন! আজকাল
সার্জারির এত উন্নতি হয়েছে—

মহুতাই : কেন ছেলে ভোলাচ্ছ নমিতা? আমার
বয়স আজ পঞ্চাশ হ'তে চলল। আমাদের দেশের পক্ষে
যথেষ্ট বৈচিত্র্য।

নমিতা : অমন করবেন না। বারবার কুড়াক ডাকতে
নেই। আপনি ভালো হয়ে যাবেন—আমি বলছি। তাই
তো আপনার সুমতি হয়েছে।

মহুতাই : সুমতি? সাহেবেরা বলে : “Coo!”
খানিকক্ষণ নিশ্চুপ। সামনের সীটে তিনচারজন
মেম ও সাহেব তন্দ্রায় হ'য়ে এলিয়ে পড়ল। নমিতাও
চোখ বুঁজল।

মহুতাই : নমিতা! ঘুমোলে?

নমিতা (চোখ খুলে) : না। এমনি ভাবছিলাম।

মহুতাই : ঘুমিও না। একটু কথা বলো।

নমিতা : কী বলব বলুন?

মহুতাই (সহসা) : নমিতা, আমি অনেক অন্তরায়
করেছি। গৌরীকে কষ্ট দিয়েছি, প্রহ্লাদকে সাবিত্রীকে
রমাকে—কাকে নয়? কিন্তু আমি এরকম ছিলাম না,
সত্যি বলছি। বড় একলা আমি...তাই।

নমিতা : একলা এ জগতে কে নয় বলুন? গুরুদেব
প্রায়ই বলেন : ‘মা, মানুষ্য জন্ম থেকে মরণ পর্যন্ত তার
ছোট আত্ম-র স্বীকৃতিতে কাটায়। মানুষ্যের সঙ্গ যেন

নোকা ক'রে এ স্বীকৃতি থেকে ও-দিশে যাওয়া বা ও-
দিশের লোক এদিকে আসা—খানিকক্ষণের জন্তে।
তারপরই যে একলা সেই একলা—বয়স আরো
একলা—ঠিক যেমন হঠাৎ বিদ্যায় কলকের পরে
অন্ধকার গভীর হয়। একমাত্র ভগবানের সঙ্গ
পেলে তবেই কাটিয়ে পাবে মানুষের একলা হবার
দুঃখ—ওরফে বন্ধ—আমি না দেহের খাটায়-বন্দী আমি
দুঃখ। ভাবুন তো কী দুঃখ এ? আমার পচিশ
বৎসর বয়স, আপনার পঞ্চাশ, কিন্তু আমি এ পচিশ বছরে
নিজের সঙ্গে ঘর ক'বে নিজেকে যতটা জেনেছি চিনেছি
বুঝেছি, আপনি পঞ্চাশ বৎসরেও তার চেয়ে বেশি জানেন
নি, চেনেন নি, বোঝেন নি। যখন নিজের কাছ নিজেকে
অচিন বিদেশী মনে হয় তখন আত্মীয় স্বজন এক
কি পরদেশী মনে না হয়ে পারে? আমার কাছে শুনেছি—
আপনি উঠতে বসতে মানুষের বিশ্বাসকে নিয়ে হাসা-
হাসি করেন, বলেন গুরুত্বকর সব কুসংস্কার, ভগবান একটা
মনগড়া মিথ্যে কল্পনা, আরো কত কী। কিন্তু আমরা—
যারা আপনার চেয়ে জগৎকে অনেক কম জানি—এইটুকু
বুঝেছি যে, মানুষকে গুরুত্বকে শাস্ত্রকে বিশ্বাস করলে শুধু যে
নিজেকে আর তেমন একলা মনে হয় না তাই নয়, গভীর
দুঃখেও শান্তি পাওয়া যায়, নিরাশায়ও ভরসা আসে। কিন্তু
আপনি, হয়ত মনে মনে হাসছেন আমার বক্তৃতা শুনে—
ভাবছেন হয়ত blue stockings!

মহুতাই (নমিতার হাত চেপে ধ'রে) : ছি নমিতা!
অমন কথা বলে?—(হাত ছেড়ে দিয়ে) বলো কী
বলছিলে—সত্যিই ভালো লাগছিল, যদিও কেন—
জানি না।

নমিতা : দুঃখ পেলে মন গ্রহিষ্—receptive হয়,
তাই হয়ত শুনেতে চাইছেন—আমারও বসতে ভালো
লাগছে। বলতে যাচ্ছিলাম কী জানেন? গুরুদেবের
একটি প্রিয় শ্লোক—মহাভারতে—যুধিষ্ঠির বলেছিলেন
জ্যোপদীকে :

অফলো যদি ধর্মঃ শ্রীং চরিতো ধর্মচারিতঃ

অপ্রতিষ্ঠে তমস্তেতদ্ ভগবন্তেজ্ঞানিন্দিতো!

এর মানে—ধার্মিকের আদর্শ ধর্ম যদি নিফল হ'ত তাহ'লে
এজগৎ বহুদিন আগেই অন্ধকারে ডুবে নিশ্চল হ'য়ে

যেত। কিছু মনে করবেন না কিন্তু—চাবেন না আমি উপদেশ দিচ্ছি। আপনি এত দুঃখ পাচ্ছেন বলেই বলছি এসব কথা, বিশ্বাস করবেন।

মহুতাই : করি নমিতা। আর তুমি রমার সখী, বোন শুভার্থিনী বলেই নয়, তার স্বপ্নে তোমাকে মনে হয়—সত্যি বলছি—যেন নিজের মেয়ে। তাই আমার অহুরোধ তুমিও একথা অবিশ্বাস কোরো না। না, হাসি নয়, যদি সত্যি বিশ্বাস করো—তবে আর একটা কথা বলব, যদিও বলতে বাধছে।

নমিতা : বলুন না। আমি বিশ্বাস করেছি আপনার কথা। তাই নির্ভয়েই বলুন।

মহুতাই (ওর হাত চেপে ধরে) : আমার মনের মধ্যে অন্ধকার ছেয়ে গেছে। শুধু মৃত্যুভয় নয়—তার চেয়েও বেশি ভয় যদি রমাকে ফের হারাই—

নমিতা (চমকে) : কা অলুক্ষণে কথা বলছেন।

মহুতাই : না, শোনো। আমি রমার মৃত্যুর কথা বলছি না। বলছি যদি শোভনার মোহ কাটাতে না পারি শেষ পর্যন্ত ?

নামিতা : উত্তর দিতে পারি এ কথার—কেবল যদি চান সত্যি উত্তর।

মহুতাই : বলো না—স্বামীটি। আমি সত্যিই চাই একটু আলো—একটু মনের জোর। বললাম না—আমার মনের মধ্যে শুধু অন্ধকার—পথ দেখতে পাচ্ছি না।

নমিতা : তাহলে শুধুন : আপনি গোড়ায় যে ভুলটি করেছেন সেটি শুধরে নিলে তবেই পথের দিশা স্থির হবে। বৈঠক পথে যতই এগোবেন ততই ঠিক পথ থেকে দূরে সরে যাবেন। আপনি—

মহুতাই : শোনো নমিতা। আমি জেনেও কবুল করতে চাইনি যে, আমি ভুল করেছি। গোঁরী তাই একদিন ভবিষ্যৎগী করেছিল যে, তুলকে ভুল বলে চিনেও যে-গুরুজোহী অহুতাপ করতে চায় না তার কপালে অশেষ দুঃখ আছে। সে প্রায়ই গাইত কবীর সাহেবের একটি বিখ্যাত শ্লোক যে, ভগবান কষ্ট হ'লে বাঁচাতে পারেন, কিন্তু গুরু কষ্ট হ'লে কেউ বাঁচাতে পারেন না।

নমিতা : জানি, বন্দিতা প্রায়ই আবৃত্তি করত :

কবীর তে নয় অন্ধ হৈ, গুরু কো কহতে ভয়,
হরি রুঠে গুরু ঠৌর হৈ ; গুরু রুঠে নহি ঠৌর

মহুতাই : ই্যা এই গানটিই সে গাইত আর বলত আমাকে যে, আমার প্রতি যখন গুরু বিমুখ হয়েছেন তখন I am doomed.

নমিতা : কিন্তু গুরু তো আপনার প্রতি বিমুখ হন নি—আপনিই বিমুখ হয়েছেন তাঁর প্রতি। কমা চাইলেই ফের দয়া পাবেন তাঁর।

মহুতাই (সাগ্রহে) : পাব ? সত্যি বলছ ? না, অহুমান ?

নমিতা : অহুমান নয়, আমি জানি। কারণ গুরুদেব আমাকে বলেছেন এ কথা।

মহুতাই : কী ? যে, আমার গুরুদেব আমাকে কমা করবেন এত অপরাধের পরেও ?

নমিতা : করবেন করবেন করবেন—আমি নিশ্চয় ক'রে বলতে পারি—কেবল একটি সূত্রে : যে, অধর্মের পথে আর চলবেন না। গুরুদেব বলেন : আলো আর অন্ধকার একসঙ্গে বাস করতে পারে না। পূর্ব দিকে চলতে হ'লে পশ্চিমের দিকে পিঠ ফেরাতেই হবে। কি বলেন ? রাজী ?

মহুতাই : আমার সাহস হয় না। তুমি একবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করবে ?

নমিতা : কেন করব না ? আপনি রমার জন্মদাতা, গোঁরীদেবীর স্বামী—সবচেয়ে বড় কথা : গুরুদেবের গুরু-তাই—আপনি তো আমাদের আপনজন। আর আপনজনকে কাছে টানতে না চায় কে বলুন ? কেবল একটি কথা বলতে চাই যদি ভরসা দেন—কিছু মনে করবেন না।

মহুতাই : না না বলো না। তোমাকে কি বলি নি তুমি আমার মেয়ের মতন, সত্যি নমিতা, তোমাকে হঠাৎ কেন এত আপন মনে হ'ল...মনে হয় যেন কত কালের চেনা...যেন—(অশ্রু আভাষে কণ্ঠ রুদ্ধ হ'য়ে আসে)

নমিতা (কোমল কণ্ঠে) : আমি বুঝতে পারি : গুরুদেব প্রায়ই এ অসম্ভব সম্ভব হয়েছে। গুরুদেব প্রায়ই বলেন একটি কথা যে, গুরুকে শিষ্য ছাড়লেও গুরু ছেড়ে যান না, শিষ্য যখন ছেড়ে যায় তখনও তিনি অপেক্ষা

করেন। রজনী সেনের একটি গান আছে আমার কী যে
ভালো লাগে : (মুহু হুহু আনন্দ করে) :

- (আমি) অকৃতী অধম বলে তো আমার
কম ক'রে কিছু দাও নি।
(পরে) যা দিয়েছ তার অযোগ্য ভাবিয়া
ফিরিয়েও কিছু নাও নি।
(আমায়) রাখিতে চাও গো, বাঁধনে আঁটিয়া,
শতবার যাই বাঁধন কাটিয়া,
(পরে) ভাবি—ছেড়ে গেছ, ফিরে চেয়ে দেখি—
এক পাও ছেড়ে যাও নি!

নমিতার চোখে জল ভ'রে আসে, মমুভাইয়েরও চোখ
চিক চিক ক'রে ওঠে, সে ওর হাত কপালে ঠেকিয়ে
পরে চোখ ঢেকে খানিকক্ষণ মাথা হেঁট ক'রে থেকে
বলে গাঢ় কণ্ঠে : “কী কথা বলতে চাইছিলে?”

নমিতা (একটু ভেবে সাবধানে) : বলা একটু
মুশ্কিল... কারণ আপনি ভুল বুঝলে—

মমুভাই : না না ভুল বুঝব না। তবে আমি জানি
কী বলতে চাইছ—শোভনার কথা তো?

নমিতা (মুখ নিচু ক'রে) : হ্যাঁ। মানে, গুরুদেবের
কৃপা যদি ফিরে পেতে চান তবে শোভনা দেবীর প্রসাদের
মায়া কাটাতেই হবে। অর্থাৎ, রমার সখকে, কি আপনার
উইল সখকে, কি গুরুদেবের সখকে—তাকে কিছুই বলবেন
না আর এখন থেকে। কথা দিতে হবে।

মমুভাই (একটু চুপ ক'রে থেকে) : আমি কিছু
বলব না কথা দিতে পারি। কেবল... যদি সে কোনো
সত্রে জানতে পারে?

নমিতা : মানে?—অলিভিয়া?

মমুভাই : হুম্। আমার মনে হয় We have n't
seen the last of her ladyship.

নমিতা : একথা আমারও মনে হয়েছে। কিন্তু—
যাক এখন ভাববেন না। এখন শুধু ভাবুন গুরুদেবকে।
আর ডাকুন তাঁকে।

মমুভাই (জোর ক'রে হেসে) : ঠিক বলেছ। নাহেব
প্রার্থণেও বলে : you don't have to cross the
bridge before you get to it.

আকাশ-গরুড় আবেগাবাদে নামবার মুখে ফের ফুলে
ওঠে। ওরা কোমর বন্ধ বাঁধে ফের।

উনিশ

রমাকে বুকে ক'রে মমুভাই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে—
প্রায় শিশুর মত।

কান্না থামলে রমা বলল চোখের জলে হাসির আলোর
ঝিলিক দিয়ে : “বাবা, একটা কথা বলব এখন?”

মমুভাই (হেসে) : একটা কথা কেন মা? একশো
একটা কথা বলতে পারিস। তোর নমিতাদিকে জিজ্ঞাসা
কর না—কী বলেছি আমি তাকে।

রমা (নমিতাকে) : কী দিদি?

নমিতা (মমুভাইকে) : আপনি তো অনেক কথাই
বলেছিলেন—

মমুভাই : কিন্তু কথার মত কথা একটাই বলেছি : যে,
আমার বিবদাত ভেঙ্গে গেছে।

রমা (পিতার ছুটি হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে
নিয়ে) : অমন কথা বলে না বাবা। গুরুদেব বলেন :
চক্রাৎ পরিবর্তন্তে দুঃখানি চ স্থানি চ। দুঃখ পেয়েছেন
আপনি অনেক, এবার ঘুরে স্ব্থের দিন ফিরে আসবে—
যদি অবিগ্রহ সব আগে ধর্যকে চান।

মমুভাই (দীর্ঘ নিশ্বাস) : স্ব্থের দিন? সে আশা
আর করি না মা, কেবল... যদি দিন আমার ফুরিয়েই এসে
থাকে তবে... যেন ক্যান্সারের অপারেশনের টেবিলেই
সব শেষ হয়ে যায়—বৎসরের পর বৎসর কাৎরাতে
কাৎরাতে মরতে চাই না।

রমা : অমন কথা বলে না বাবা! অপারেশন তো
না করতেও হ'তে পারে?

মমুভাই (গাঢ় কণ্ঠে) : সে আশা নেই মা, ডাক্তার
বলেছে অপারেশন না করলে বাঁচবার কোনো আশাই
নেই।

নমিতা (ব্যাগ থেকে “পাজে পিও” বইটি বের ক'রে)
বহন। (কয়েকটি পাতা উলটিয়ে) পড়ুন—কাকাবাবু
—আপনাকে এখন থেকে কাকাবাবু বলব, কেমন?

মমুভাই (ম্লান হেসে) : তোমার দয়া মা। তবে
গৌরী আমাকে উপাধি দিয়েছিল : “গুরুজোহী।”

রমা : কিন্তু আপনি তো আর এখন সে-মাহুষ নেই বাবা।

মহুভাই : মা, মাহুষের পঞ্চাশ বৎসরের অভ্যাস সংস্কার দুর্বলতা কি একদিনেই যায় ?

রমা : যায় বাবা, যায়। গত গুরুপূর্ণিমার দিন গুরুদেব গীতার একটি শ্লোক বলেছিলেন যে অতি দূরচাষও যদি ঠাকুরকে একমনে ডাকে তাহ'লে সে কিপ্রাং ভবতি ধর্মায়া—দেখতে দেখতে ধর্মায়া হয়। গীতার কথা কি কাটা যায় বাবা ?

মহুভাই : মা, অতটা বিশ্বাস আমার হয়নি এখনো—হবেও না হয়ত কোনো দিন। আমি এই পঞ্চাশ বৎসরে একটি মাহুষকেও রাতারাতি ধর্মায়া হ'তে দেখি নি তো—গীতা বললে কী হবে ? আমি শুধু দেখেছি যে, মাহুষ বহু চেষ্টায় তবে একটু এগোয়। কিপ্রাং ভবতি ধর্মায়া ? —ও হয়ত গীতার দ্বাপর যুগে ঘটত—কিন্তু এ-যুগে হবার নয় মা, the age of miracles is past—অঘটন আর ঘটনা এ-যুগের বলিতে।

নমিতা : কে বললে ঘটে না ? (পাদ্রে পিওর বইটি খুলে) মন দিয়ে শুনুন ডাক্তার জিওভান্নি গিলি-য়োৎসির (Giovanni Gigliozzi) কাহিনী—এই বারো অধ্যায়ে আরো অনেক অঘটনের কথা পাবেন, আমি শুধু একটা পড়ে শোনাজি (ব'লে ফের পড়ে) “তিনি পাদ্রে পিওকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। ১৯৫৬ সালে এপ্রিল মাসে রোমে তাঁদের ডাক্তার তাঁকে বলেন যে তাঁর মা-র ক্যান্সার হয়েছে। (মুখ তুলে) এরপর অনেক খুঁটিনাটি আছে। তার সারমর্ম এই যে জিওভান্নি পাদ্রে পিওর কাছে যেতেই পাদ্রে পিও তাঁকে বলেন : “তোমার মা জানান যে আমি তাঁর জন্যে প্রার্থনা করব।” এক সপ্তাহ পরে ডাক্তার পরীক্ষা ক'রে দেখে ক্যান্সার সেরে গেছে।*

মহুভাই : বলো কি ? দেখি।

নমিতা : পড়বেন পরে—এখন বিশ্রামের সময়—শুয়ে ঘুমান, আপনি বড় ক্লান্ত, অস্থখ শরীরে রাতভাগা ভালো নয়। কাল সকালে পড়বেন শেষ দুটো অধ্যায়—দেখছেন ইতালীর বিখ্যাত পত্রিকায় বড় বড় ডাক্তারের রিপোর্ট :

(পাতা উলটোতে উলটোতে) জিওর্নালে দেমেলিলিয়াতে (Giornale dell' Emilia) লিখেছে—১৯৫৩ সালের ১০ই ডিসেম্বর—ক্রোমোনিনি ব'লে এক ৬৭ বৎসরের বুড়ির লিউকেমিয়া হয়। তার ছেলে পাদ্রে পিওর একটি ছবি মা-র বালিশের নিচে রেখে দেয়—সঙ্গে সঙ্গে বুড়ী নিরাময় হয়। (রমাকে) তুই ওঁকে কেবল বলবি—উঠতে বসতে—যে, পিণ্টোর বিজ্ঞানের চেয়ে ঢের বেশি অঘটন ঘটতে পারে সাধুর আশীর্বাদ, গুরুর কৃপা। কেবল চাই বিশ্বাস করা।

মহুভাই : সত্যি কথা এ সব ? না, আবারে গল্প—old wives' tales ?

নমিতা (হেসে) : কাকাবাবু—এ যাত্রা এজাহার দিচ্ছে সাহেবদা। লুভ-এর জলেও কত শত রোগ আরোগ্য হয়েছে পড়েন নি কি ?

মহুভাই : শুনেছি কিছু কিছু। তবে পিণ্টো বলে এ-সব গুজব।

নমিতা (অধীর কণ্ঠে) : কাকাবাবু পিণ্টো কিছুই জানে না এ সব দৈবী অঘটনের। সাহেব পুরাণে একেই বলে talking through one's hat. বিখ্যাত সার্জন নোবেল লরিয়েট অ্যালেকসিস ক্যারল লিখেছেন যে তিনি বারবারই প্রার্থনায় অনেক সাংঘাতিক অস্থখ সারতে দেখেছেন ডাক্তাররা হাল ছেড়ে দেওয়ার পরেও।

মহুভাই (ভাবিত) : তাই তো মা !...আচ্ছা আমি ভেবে দেখব, কেবল ভয় করে কেন বলব ? পাছে বিশ্বাস ক'রে ঠিকি।

রমা : অবিশ্বাস করেও কি মাহুষ কম ঠকে বাবা ? যদি তুমি তোমার গুরুদেবকে অবিশ্বাস না করত তাহ'লে আজ তোমার হয়ত ক্যান্সার হ'তই না।

মহুভাই : কী বলছি তুই রমা ? ক্যান্সার যে কার কবে কেন হয় কেউ জানে না।

নমিতা : ঠিক তেমন সাধুর শক্তি গুরুর কৃপাও যে কেন ও কী ভাবে মাহুষকে বদলে দেয় কেউ জানে না—এমনকি আপনার সবজ্ঞাতা পিণ্টোও না।

ক্রিং...ক্রিং...ক্রিং...

রমা (উঠে টেলিফোন ক'রে) : কে ?...আমি রমা। ...আপনি কে ?...না, বাবা ক্লান্ত তাঁর

উপর অস্থ—বারা নাম বলে না তাদের সঙ্গে টেলিফোনে আসতে পারবেন না।...কী? হ্যালো!...শুনতে পাচ্ছি না একটু জোরে বলুন...আপনি কী চান কেবল তাঁকে বলতে পারেন?...না, এক মিনিটের মধ্যে আসতে পারবেন না তিনি?...কী? ফের বলুন...আপনি যা বলতে চাইছেন না শুনলে তাঁরই ক্ষতি?...আপনি কোথা থেকে কথা কইছেন?...বসে থেকে? আচ্ছা দাঁড়ান একটু (বিনীতারের মুখ হাত দিয়ে ঢেকে): এক মেয় সাহেবই মনে হয়—চাইছেন আপনাকে একটি কথা বলতে—আপনার সঙ্গে তিনি আশপটমেন্ট করতে চান। কথা কইতে চান?

মহুতাই (নমিতার দিকে তাকায় বিব্রত মুখে): না, না, না—ব'লে দে, আমি দেখা করতে পারব না।

রমা (টেলিফোনে): হ্যালো! শুধুন ম্যাডাম। বাবা এখন ক্লান্ত...আপনি মিথ্যা বকছেন...না। কাল তিনি পুনায় ফিরবেন। চান তো সেখানে তাঁকে টেলিফোন করবেন ফের।...না, মিথ্যা পীড়াপীড়ি করবেন না ম্যাডাম—গুড্‌নাইট!

কুড়ি

মহুতাই আমেদাবাদ থেকে বসে ফিরে নমিতা ও রমাকে নটরাজ হোটেলে রেখে গেল টাটা ইনস্টিটুটে। সেখান থেকে টেলিফোন করল ছপুর বেলা—ডাক্তারেরা আরো কী একটা পরীক্ষা করতে চান, তাই রমা ও নমিতা যেন ডেকান কুইনে বিকেলে পুণা রওনা হয়, তিনি পরদিন সকালে ফিরবেন মোটরে।

নমিতা রমাকে একটি কথাও বলে নি অলিভিয়া সন্ধ্যা। পুণায় ডেকান কুইন পৌঁছল রাত সাড়ে আটটায়। আলোক নিজে এসেছিল স্টেশনে। নমিতা বলল: রমা একা, রাতে সে থাকবে তার ওখানে, মহুতাই পরদিন ফিরলে আলোক যেন তাকে নিয়ে যায়। রমা ফোন করে তিন জনের ঝগড়ার ব্যবস্থা করতে বলেছিল।

মহুতাইয়ের সুন্দর বাড়িতে পৌঁছে ওরা গিয়ে বসল ড্রয়িং রুমে। রমা স্নান করতে গেল।

আমেদাবাদ ও বসের গরমের পর পুণায় ফিরে নমিতা যেন হাঁপ ছেড়ে বসে। ওরা জুলাই—বর্ষাকাল—পুণায়

বসন্ত কাল হ'ল আঘাত প্রাণ ভাঙ্গ। নমিতা আলোককে বলল প্রথমে মহুতাইয়ের অস্থতাপের কথা।

আলোক (ভেবে): হুম্। লক্ষণ তো মোটর উপর ভালোই মনে হচ্ছে। ভোলও ফিরেছে, রংও ধরেছে কেবল ধোপে টিকলে হয়।

নমিতা (ধমকে): অমন অবিশ্বাসের কথা বলে না। (হেসে) এতক্ষণ আমরা গুরুত্বহীনকে বোঝাচ্ছিলাম বিশ্বাসের মহিমা। কিন্তু এখন দেখছি গুরুত্বকে বোঝানো আরো বিধম দায়!

আলোক (হেসে): মা, তোমরা মেয়েছেলে—উচ্ছ্বাসের হাউইকে হাওয়া করে চলতে ভালোবাসো, আকাশ টিপ করে প্রথম দিকে ভণ্ণ করে ওঠোও অনেক উচুও—

নমিতা (পাদ পূরণ করে): কেবল যা উঠতে না উঠতে ধরসে পড়ি ছাই হ'য়ে, এই না? বাবা! বাবা বাবা! তোমাকে সব আগে পড়াতে হবে পাসে পিওর বই। কিন্তু সে হবে পরে, এখন একটি জরুরি পরামর্শ আছে। কী করি বলো তো?

ব'লে বলল অলিভিয়া সন্ধ্যা সব কথা—টেলিফোন পর্যন্ত।

আলোক (মন দিয়ে শুনে চিন্তিত হয়ে): হুম্। রাত না পোহাতে আঁধি এল হয়েছে। অলিভিয়াকে আমি বিলক্ষণ চিনি। দু'তিনবার সে আমাকে ডেকেছিল। শরীরে তার নানা নোংরা রোগ। এরকম বৈরিনীগীরা পাকতে পাকতে শেষে ব্রাকমেলারই হয়ে দাঁড়ায়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস—ও মহুতাইকে সহজে ছাড়বে না—মানে চাইবে hush money.

নমিতা: আমারও তাই মনে হয়েছিল বাবা, কিন্তু তা হ'লে কী করা যায়? শোভনাকে ও জানালে সে তো কুরুক্ষেত্র করবেই করবে। অথচ মহুতাই ব্রাকমেলারকে hush-money দেবে কোন্‌ মুখে? তবে ধর্মের দিক মুখ ফিরিয়ে অর্থের সঙ্গে চুক্তি করা চলে না তো।

আলোক (চিন্তিত মুখে): তাবনার কথা বৈ কি। বিশেষ রমার এই অবস্থায়। আমাদের প্রতিপদেই সব আগে ভাবতে হবে ওর কথা। তা ছাড়া মহুতাইয়ের সঙ্গেও দুঃখ হয়। কারণ তোমার বিশ্বাসের বহর দেখে

আমি বাহবা দিতে পারলেও “বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে
বহুদূর” বলে সেন্টিমেন্টাল দোরার দিতে পারি না তো।

নমিতা: না, তা পারবে কেন? তোমরা পারো
শুধু ‘বাক্যের ঝড় তর্কের ধূলি’-র মধ্যে বোকা বিজ্ঞতার
তুফান তুলতে। কিন্তু সে ঝাক। এখন প্রশ্ন হচ্ছে—
রমাকে অলিভিয়ার কথা বলব, না বলব না? একটু
বলে রাখা ভালো নয় কি? ধরো, যদি ও হঠাৎ এখানে
এসে হাজির হয়?

আলোক (করুণ হেসে) আমি শুধু নামেই আলো
মা—কাজে—জোনাকি, পারি শুধু অন্ধকারকেই
দেখাতে, পথ দেখাতে না। সে পারেন কেবল গুরুদেব
ঈশ্বর দৃষ্টিপাতে কালোও হ’য়ে ওঠে আলো। তাই এ-
সংকটে তাঁর কাছে দরবার করাই পছন্দ।

নমিতা (ওর হাতে চাপড় মেরে হেসে): তবু জাঁক
ক’রে বলা হয়—বিশ্বশতাব্দীর ডাক্তারের আলোকিত
মন বিশ্বাসের কুয়াশার সঙ্গে ঘর করতে পারে না। কবে
ছাড়বে এই উন্টো পান্টামি—বলতে পারো?

আলোক (হেসে): যেদিন অহুতাপে তহু জলে
পুড়ে হবে ছাই। এখন জলুনি সবে আরম্ভ হয়েছে।
দীক্ষা পাওয়ার দিন সেই গান বেঁধেছিলাম মনে নেই?
(স্বর ক’রে)

হাঁচি টিকটিকি চরণতুলসী তিলকুল কোশাকুশি গো,
এই শুধু পুঁজি এই শুধু খুঁজি এ-দেহই আদরে পুঁজি গো।
বুদ্ধিরে মেনে বিশ্বাসে হায় এতদিন মানিনি যে গো,
যত ভাবি অহুতাপে হায় তহু জলে যায়,
হবে কী যে গো।

নমিতা হেসে গড়িয়ে পড়ে।

রমা (চুকে হাসিমুখে): কাকাবাবুর হাসির হরির
লুটের একটু ভাগ পাই না দ্বিধা?

নমিতা: না। বাবা বিশ্বাসকে নিশানা ক’রে বে-
রাস্য ফেমি স্ক্রু করেছেন তোর মত ভক্তিমতীর কানে
শোনাও পাপ। হাওয়াও অশুদ্ধ হ’য়ে গেছে তাই হেল্পে
উড়িয়ে দিচ্ছি।

রমা (হেসে): নৈলে পাছে কেঁদে ভাসাতে হয়
এই ভয়ে?

একশ

খাওয়া দাওয়া শেষ হ’লে সিগার ধরিয়ে আলোক
বলল: “শোভনা দেবী এখন তা হ’লে ফিরছেন না জুহ
থেকে?”

রমা: বাবা তো তাই বললেন। তবে মা-র তো
জানেনই—মতিস্থির নেই। হয়ত হঠাৎ একদিন ফিরে
আসবেন ছুট ক’রে।

নমিতা (হেসে): আমরা প্রার্থনা করব গুরুদেবের
কাছে যেন এ-স্বর্গভিত্তি তাঁর না হয় অন্তত আরো দু-মাস।

আলোক (গম্ভীর হ’য়ে): না, এ হাসির কথা নয়।
রমাকে বড় দুর্বল দেখাচ্ছে। খুব সাবধানে রাখা চাই।
আর সবচেয়ে বেশি চাই প্রফুল্ল রাখা। ভূমি মন খারাপ
করবে না মা কিছুতেই, কেমন?

রমা: না, কাকাবাবু। কেবল বাবার কথা
ভাবতে বড় কষ্ট হয়। ক্যান্সার শুনেছি সারে না।

নমিতা (ধমকে): কে বললে সারে না? ডাক্তারিতে
সারতে না পারে। কাল কী স্তন্যে পাচ্ছে পিওর কথা?

ক্রিং...ক্রিং...ক্রিং...

রমা (উঠে টেলিফোন ধ’রে): কে?...গুরুদেব?
প্রণাম।...হ্যাঁ আমি আজই ফিরেছি।...হ্যাঁ, কাকাবাবু ও
নমিতাদি এখানে।...কী?...হ্যাঁ নমিতাদি কথা দিয়েছেন
রোজ আসবেন সকাল সন্ধ্যা। আপনি আশীর্বাদ করুন
গুরুদেব।...জানি। কেবল আরো আশীর্বাদ চাই।...হ্যাঁ
গুরুদেব, ঠাকুরের কৃপায় অবশেষে বাবার স্বমতি হয়েছে।
...হ্যাঁ, ক্যান্সার, আপনি কী ক’রে জানলেন?...কী?
কালী থেকে গুরুমা বলেছেন?...কিন্তু কী হবে তাহ’লে?
...বাবা কি ক্ষমা পাবেন না?...না গুরুদেব, আপনি গুরু-
মাকে ধরুন—তাঁকে পায়ে ঠাই দিতে।...না, তিনি না
চাইলেও চাওয়াতে হবে—তাঁদের কৃপায়ই বাবার স্বমতি
হয়েছে—আমি জানি। কিন্তু আরো অনেক অনেক অনেক
কৃপা চাই।...হ্যাঁ গুরুদেব, তিনি সত্যিই অহুতপ্ত হয়েছেন
—তাহাজা কী যে অশান্তির উষ্মগের মধ্যে তাঁর দিন
কাটছে কী বলব।...হ্যাঁ। মা জুহতে, তবে ফিরে আসতে
পারেন যে কোনোদিন, বলা যায় না। আর তিনি ফিরে
আসবেন ভাবতেও আমার মনের সব আলো ভরসা নিভে
যায়। আপনি শান্তি হিন। কী?...আজ্ঞা বাটলাম।

আপনি কানীতে গুরুমাকে বললে সব ঠিক হ'য়ে যাবেই যাবে।...হ্যাঁ আমি ভালোই আছি...প্রণাম।

বাইশ

নমিতা পরদিন সকালবেলা নারায়ণ পেটে ধ্রুবর ওখানে রমার খবর দিতে গেল পরমানন্দে। আলোক এসে ওকে নিয়ে গেল সেখানে। ওরা গিয়েই দেখে—কী আনন্দ!—সাধুজি!

ধ্রুব কাজে বেরিয়ে গিয়েছিল। মালতীর সঙ্গে চা খেতে খেতে নমিতা সাধুজিকে সব বলল। শেষে বলল অলিভিয়ার কথা।

সাধুজি সব শুনে গভীর হয়ে খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে ছোট্ট একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন: “এই-ই হ'য়ে এসেছে মা আবহমান কাল। হয় কি জানো?—সাধনা যারা মন দিয়ে করতে চায় না তাদের পরীক্ষা কম—কিন্তু বারাই ঠাকুরকে সত্যি চায় তাদের তিনিও বাজিয়ে নেন। তাই মন খারাপ কোরো না—মনে রেখো—যা কিছু ঘটে যদি ঠিক ভাবে গ্রহণ করতে পারি তবে আঘাতও হবে বর, কালোও আলো। ভুগতে হয়ত হয় প্রথমটায়, কিন্তু শেষরক্ষা হয়ই হয়। গুরুদেব আমাকে বলেছেন—রমাকে ঠাকুরের কৃপা আগলে থাকবে।

নমিতা: শুনে ভয়সা পেলাম গুরুদেব। তবে কি জানেন? শোভনা দেবী হঠাৎ কিরে এসে রমাকে দেখে যদি কেঁপে ওঠেন—

সাধুজি: তা হ'লেও রমাকে শাস্ত থাকতে হবে। “সমস্ত যোগ উচ্যতে”—এ-গীতার কথা মা। প্রতিকূল অবস্থায় যদি শাস্ত না থাকতে পারি তবে পরীক্ষায় পাশ হবে কেমন ক'রে?

মালতী: কিন্তু মন যখন কাতর হয় তখন যে অধীর হ'য়ে উঠি গুরুদেব—বিশেষ দেহ যখন অপটু থাকে। রমার এখন সব আগে দরকার শাস্তি। আপনি আশীর্বাদ করুন যাতে মহতাইয়ের এ-সুমতি রাতারাতি উবে না যায় তাঁর দজ্জাল স্ত্রীর দাপাদাপি হানাহানিতে।

নমিতা: আমি বলি কি, আপনি এবার নিজ মূখে মহতাইকে বলুন। এখন সে শুনে আপনার কথা। রমা চ'লে আত্মক আমাদের ওখানে। ও-ও তাই চায়। কারণ

ওর মনে ভয় আছে—ওর সংমা কবে হঠাৎ কিরে আগের তাঁর তো মতিস্থির নেই।

সাধুজি (শাস্ত কর্তে): না মা, পরীক্ষাকে এড়িয়ে গেলে নিকৃতি পাওয়া যায় না—পাশ করতে হয়। রমাকে ওর বাপের বাড়িতেই থাকতে হবে।

আলোক: কেন গুরুদেব?

সাধুজি: এখন বলতে পারব না—কারণ সবটুকু দেখতে পাই নি। তবে এটুকু ঠাকুর আমাকে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, রমার এখন আর কোথাও আশ্রয় পেতে গেলে চলবে না।

নমিতা (আতপ): কেন চলবে না গুরুদেব? নরকে ব'সে মাথা না খুঁড়লে কি স্বর্গের সিঁড়ির খোজ পাওয়া যায় না?

সাধুজি (কোমল কর্তে): মা, মনে রেখো তুমি দীক্ষা নিয়েছ।

নমিতা (মাথা নিচু করে): আমার অন্তায় হয়েছে গুরুদেব। কিন্তু ওকে অশান্তির বাহের মধ্যেই বা থাকতে হবে কেন—বলুন দয়া ক'রে—আপনার ছুটি পায়ে পড়ি।

সাধুজি: তুমি তো ঠাকুরের কণামত পড়ো রোজই। মনে নেই—তিনি কী বলতেন? যে সময় সে-ই রয়?

মালতী (গাঢ় কর্তে): আপনি নিজে যখন বিধান দিলেন গুরুদেব, তখন আর কী বলব বলুন? কেবল ভয় হয়—এমন লক্ষ্মী প্রতিমাকে পাছে অকালে বিদর্জন দিতে হয়।

সাধুজি: ঠাকুর অর্জুনকে বলেছিলেন ‘মজিস্তঃ সর্ব-দুর্গাপি যৎপ্রসাদাৎ তরিস্বসি’—যে মনোয়তা কাটিয়ে ভয় হয় তাকে তিনি সমস্ত বিপদ থেকে তারণ করেন। (ব'লে ফের সেই বার্তা হাসি হেসে) তবে কি না, ভক্তকে তিনি একটু পরীক্ষা করেন মাঝে মাঝে।

আলোক (টুকল): সবই ত বুঝলাম গুরুদেব! কিন্তু সবাই ত আপনার মতন তন্ময় হতে পারেন না—তাই সয়ে বাও বললেই সওয়া যায় না। পরীক্ষার চাপ বেশি হ'লে যদি ভেঙে পড়ে?

সাধুজি (হেসে): বাবা, একটা ধোপাও তার গাধার পিঠে এমন বোঝা চাপায় না যাতে সে ভেঙে পড়ে। আমাদের দজ্জাল ঠাকুরটি কি ধোপার চেয়েও বোঝা

তিনি ঠাকুরকে এমন চাপ দেবেন যত্নে সে পিষে যাবে ?
 ঠাকুরা একটা কথা তুলো না—তুলো না—তুলো না—
 অনেকবার বলেছি আবার বলছি : যে রূপা পাওয়ার দায়িত্ব
 আছে। যে বত বড় হয় তাকে তত সহিতে হয়। গড়-পড়তা
 দেয়কে অধীরতা মানায়, মানাতে পারে কিছু মহংকে না।
 (একটু থেমে) তোমাদের সামনে আব একটি মেয়ে আছে
 তাকে দেখেও অনেক কিছু শিখবার আছে তোমাদের
 সকলেরই। সে ভক্তি। জানো তো—ওর স্বামী মায়ার
 বাওয়ার পরে এক ধনী ওকে বিয়ে করতে চায় ওর রূপে
 পাগল হয়ে—বলে : “আমি তোমাকে রাগীর হালে রাখব।”
 ও তাতে বলেছিল : “আমি দাঁকা নিয়েছি—বাগীর হালে

ধাকতে নয়, ঠাকুরের পায়েই ধাকতে—তাতে আমার বে
 হালই হোক না কেন।” রমাকে একথা মনে করিয়ে
 দিয়ে বলে গে, মনে যদি ফের অশান্তি আসে তা হ’লেও
 যেন সে এই কথাটি না ভোলে যে, ঠাকুর তার চোখের
 সামনে শুধু তো সংমাকেই দাঁড় করান নি, ভক্তিকেও
 ধরেছেন ভরসা দিতে। কত দুঃখে পড়ে ও কী ভাবে অটল
 আছে ভেবে দেখেছ কি একবার ?

নমিতা . শুকদেব। আপনি নিজে রমাকে বলবেন
 চন্দন এসব কথা। ও সকাল থেকে ঠাকুরঘরে কেবল
 আপনারই নাম করছে।

[ক্রমশঃ

মধ্যযুগের কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

শ্রীজগদ্বন্ধু নাথ

মধ্যযুগের কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত আজ আমাদের জীবন
 চুইতে অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছেন। আজ বাংলার
 সমাজ জীবনের বড় পরিবর্তন ঘটিয়াছে। বাংলায়
 ইংরাজের আগমনের পর সমাজ জীবনে বিরাট পরিবর্তন
 ঘটে। বাংলার মানুষ ইংরাজের সভ্যতার প্রতি আকৃষ্ট
 হয়। আর অল্পকরণ-প্রিয় ব্যঙ্গালী ইংরাজের আচা-
 ব্যবহার অনুকরণ করিতে শুরু করে। সেদিন আমাদের
 এই জাতীয় চরিত্রের দোষকটি ঈশ্বরচন্দ্রকে পীড়া দিয়াছিল।
 কলিকাতায় বসিয়া কবি স্বচক্ষে সব দেখিয়াছেন, আর
 পীড়া অনুভব করিয়াছেন। ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতা ব্যঙ্গাত্মক।
 তিনি ছিলেন কলিকাতার সমাজ জীবনের সার্বক বাণীকার।
 একদিকে যেমন ব্যঙ্গাত্মক কবিতা, অন্যদিকে তেমনি
 দেশপ্রেমমূলক কবিতার দ্বারা বাংলার দোষকটির প্রতি
 ইঙ্গিত করিয়াছেন কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

আমরা জানি তিনি প্রাচীন যুগের কবি। বঙ্কিমচন্দ্র
 ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কাব্যকে প্রথমে স্বীকৃতি দেন নাই। এখানে
 ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্বন্ধে তাঁহার উক্তি স্মরণীয়। “He was
 ignorant and uneducated man and uncultiva-

ted. His writings were generally disfigured
 by the grossest obscenity.” “কিন্তু পরবর্তীকালে
 বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। আধুনিক
 যুগের কবিবৃন্দও তাঁহার কাব্যের মূল্য অস্বীকার করিতে
 পারেন নাই।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কাব্য সম্বন্ধে সব চাইতে বড় অভি-
 যোগ এই যে, তাঁহার কাব্য অশ্লীলতা দোষে চুই ও
 তিনি প্রাচীনপন্থী। ঈশ্বরচন্দ্রের কাব্যে অশ্লীলতা বর্তমান—
 একথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তখনকার সমাজ
 জীবনের কথা যদি চিন্তা করি, তাহা হইলে দেখিব
 যে ঐ অশ্লীলতার বিষ সমাজের মধ্যেই বর্তমান ছিল।
 কবি সমাজকে অস্বীকার কবিতাে পারেন না। সমাজের
 ছাপ তাঁহার কাব্যের উপর পড়িতে বাধ্য। বাংলা
 সাহিত্যে জয়দেবের কাব্যেও অশ্লীলতার ছাপ বর্তমান।
 শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনও অশ্লীলতা দোষে চুই। তাহা ছাড়াও
 ভারতচন্দ্রের কাব্যের মধ্যেও ঐ অশ্লীলতার ছাপ প্রচুর
 পরিমাণে বর্তমান। সুতরাং ঐ একমাত্র অপরাধে বহি-
 স্কৃত কবিকে অপরাধী করি, তাহা হইলে জয়দেব, শ্রীকৃষ্ণ-

কীৰ্ত্তন ও ভাবতচক্ৰ একই অপরাধে অপরাধী। দ্বিতীয়তঃ তাঁহাৰ কাব্যেৰ বিৰুদ্ধে প্ৰাচীন পন্থাৰ অভিযোগ আনা হৈয়াছে। একথা অস্বীকাৰ কৰা যায় না যে, তাঁহাৰ প্ৰাচীনতাৰ প্ৰতি স্বভাবসুলভ অমুৰাগ ছিল। তিনি যেমন বিধবা বিবাহকে সমৰ্থন কবিতো পায়েন নাই, ঠিক তেমনি সতীদাহ প্ৰথাৰ উচ্ছেদ কৰাৰ ব্যাপাৰে তিনি সমৰ্থন জানাইয়াছিলেন। বিধবা বিবাহ প্ৰথাৰ অস্বীকাৰ কবিতাৰ একমাত্ৰ কাৰণ এই যে বেনো বয়সেৰ বিধবা বিবাহে তিনি সমাজেৰ অকল্যাণ দেখিয়াছিলেন।

ঈশ্বৰচক্ৰ গুপ্তেৰ কাব্য সমাজেৰ ছাপ পড়িয়াছে। কলিকাতাৰ ঈশ্বৰচক্ৰ সমাজেৰ সুন্দৰ প্ৰতিচ্ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে। কয়েকটি উদাহৰণ সংগ্ৰহ কৰিলে এই বিষয়ে ভালভাৱে অবগত হওয়া যাইবে।

বিধবা বিবাহ প্ৰসংগে তিনি বলিয়াছেন,—

“সকলেই এইকপে বলাবলি কৰে
ছুড়িৰ কল্যাণে যেন বুড়ি নাহি তৰে।

অথবা,

“যাৰে ইচ্ছা তাৰে হয় ডাকিয়া আনিয়া
ঘৰেতে বিধবা কত পৰিচয় নিয়া।
গোপনেতে এই কথা বলিবেন তাৰে।

জননীৰ বিষে দিতে পাবে কিনা পাৰে।”

এই জননীৰ বিষে দেওয়াতেই তাঁহাৰ ঘোৰ আপত্তি।

স্বী শিকা প্ৰসংগে তিনি বলিয়াছেন,—

“যত ছুঁড়িগুলো তুডি মেৰে কেতা হাতে
নিছে যবে।

তখন এ, বি, লিখে বিবি সেজে বিলা
বোল কবেই কবে।”

অথবা,

“এয়া পূৰ্ণা তুলে ঘোমটা খুলে সেজেগুজে সভায় যাবে।
ডাম হিন্দুয়ানী বলে বিন্দু বিন্দু ব্যাতি থাকে।”

এখানে দেখা যায় সমাজেৰ ত্ৰুটিৰ প্ৰতিই তিনি ইংগিত কৰিয়াছেন। স্বীশিকাৰ বিৰুদ্ধে তিনি কোন দিন মত প্ৰকাশ কৰেন নাই। তাঁহাৰ আপত্তি ঐ অশ্লীলতাপ্ৰিয়তাৰ জন্ত। ইংৰেজেৰ ভাল গুণ আছে ইহা সত্য। আমৰা ঐ সকল গুণাবলী নিশ্চয় অনুসৰণ কৰিব। কিন্তু ইংৰেজেৰ দ্বাৰা প্ৰভাবিত হৈয়া আমৰা যখন হিন্দু

আদৰ্শ ত্যাগ কৰি, তখনই আমাদেৰ এই ইচ্ছাৰ ঈশ্বৰচক্ৰ গুপ্ত প্ৰতিবাদ জানান। স্বীশিকা লাভ এ, বি, লিখে বিলাতী বোল কেন বলিব? কেন ডাম হিন্দুয়ানী বলিয়া বিন্দু বিন্দু ব্যাতি থাকে? এইখানো ঈশ্বৰ গুপ্তেৰ ঘোৰ আপত্তি। সংবাদ প্ৰকাশকৰে বাৰ বা তিনি স্বী শিকাৰ প্ৰতি সমৰ্থন জানাইয়াছেন। স্বীশিকা অভাবে দেশেৰ ক্ষতি হইতেছে একথা স্বীকাৰ কৰিয়া তিনি পাঁডাবোধ কৰিয়াছেন।

আব একটি কবিতাৰ মধ্যে তৎকালীন বাংলা সমাজেৰ নিখুত ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

“মানমদে বিবি সব হইলেন ফেস।
খোদৰেৰ ফোলোৱিম দুটি কাটা ডেস।
দিলো কৃষ্ণ মাননেক স্থায়ী কৃষ্ণ জয়।
মেৰি দাতা মেৰি স্তত ভেৰি গুডবয়।
যা থাকে কপালে তাহ টেবিলেতে থাক।
ডুবিয়া ডুবৈ টবে চ্যাপেলেতে থাক।”

ইংৰাজেৰ অনুকৰণে বাস্তব বাস্তবীৰ বিৰুদ্ধে তিনি তাঃ প্ৰতিবাদ কৰিয়াছেন। এই কবিতাটিৰ মধ্য দিয় তৎকালীন দলী পুষ্টানদেৰ বিৰুদ্ধে তাত্ৰ ব্যঙ্গ ধ্বনিও হইয়াছে।

বাকগুলি কবিতাৰ মধ্য দিয়া বিমল ও শুভ হাস্যৰস ফুটিয়া উঠিয়াছে।

“কাটা” কবিতায় :—

“এইপেৰে তৰে লোক তব নাম নিয়া।
পাণে দক্ষৰ প্ৰাণ নিজ মুণ্ণ দিয়া।
পৰম বৈষ্ণৱী যিনি দক্ষৰ ছুটিয়া।
ছাগ মাংস বন্ধে তিনি সদাই মোহিতা।

অথবা,

“এঙাওয়ালা তপসে মাছ” কবিতায় :—

“কয়িত কনককান্তি কমনীয়া কায়।
গালভয়া গোফদাড়ি তপস্যা প্ৰায়।

“আনারস” কবিতাটিও সুন্দৰ। এখানে আনারসে বৰ্ণনাৰ মধ্য দিয়া কবি সুন্দৰ বস পৰিবেশন কৰিয়াছেন।

“বন হতে এলো এক টিঙ্গ বনোহৰ।
সোনাৰ চৌপৰ শোভে মাখাৰ উপৰ।”

অথবা,

“সকল নয়ন মাঝে রক্ত আভা আছে
মনে হয় রূপসীর চক্ষু উঠিয়াছে ॥”
‘পৌষ পার্বণ’ কবিতায় হান্তরসের ইংগিত আছে ।
“স্বথের শিশির কাল স্বথে পূর্ণ ধরা ।
এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রক্ষে ভরা ॥
বধূর মধুর খনি মুখ শতদল ।
সলিলে ভাসিয়া যায় চক্ষু শতদল ॥”

“পৌষড়ার গীত” কবিতার মধ্য দিয়া সাধারণ মানুষের
মর্মবেদনা সুন্দরভাবে প্রকাশ পাইয়াছে ।

ঘরে বাড়ি ধনধানান্তি
মশা মাছি ভননভনান্তি
শীতে শরীর কনকনান্তি
একটু কাপড় নাইক পিটে ।
দারাপুত্র জন অনান্তি
অস্তি নান্তি ন জানান্তি
দিবে রাত্রি খেতে চান্তি
আমি ব্যাটা মরি খেটে ॥”

ইহা ছাড়াও ঈশ্বরচন্দ্রের কাব্যের মধ্যে স্বদেশ বঙ্গলতার
ছায়া বর্তমান । তিনি দেশকে ভালবাসিয়াছেন তাই
দেশের দুর্দশা তাঁহাকে পীড়া দিয়াছে । ঈশ্বরচন্দ্রের এই
স্বদেশপ্রেমীতি শুধু তাঁহার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিলনা । “সংবাদ-
প্রভাকর” তখন বাংলার সাহিত্যজগতে উজ্জল জ্যোতিষ্ক
রূপ । ঐ সংবাদ প্রভাকর বাংলার বহু সাহিত্যিককে
অনুপ্রাণিত করিয়াছিল । বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু মিত্র, অক্ষয়-
কুমার দত্ত, রত্নলাল, মনোমোহন বসু ঐ সংবাদ প্রভাকরের
নিয়মিত লেখক ও পাঠক ছিলেন । তাঁহারা ঐ পত্রিকার
রচনার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন ।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে এক দৃঢ়
পদক্ষেপ স্থাপন করিয়াছিলেন । “মাতৃভাষা, স্বদেশ,
ভারতের অবস্থা” ভারতের ভাগ্য বিপদ প্রভৃতি কবিতায় ঐ
স্বদেশ বঙ্গলতার ছায়া বর্তমান ।

মাতৃভাষা কবিতায় বাংলা ভাষার প্রতি দরদ সুন্দর-
ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে ।

“যে ভাষায় হয়ে স্রীত পরমেশ গুণ গীত,
বৃদ্ধকালে গান কর মুখে ।

মাতৃসম মাতৃভাষা, পুরালে ভোমার আশা
তুমি তার সেবা কর মুখে ॥”
অথবা ‘স্বদেশ’ কবিতায় স্বদেশের প্রতি কবির ব্যাকুলতা
প্রকাশ পাইয়াছে ।

“জান না কি জীব তুমি জননী জন্মভূমি,
সে তোমায় হৃদয়ে রেখেছে ।

আসিয়া মায়ের কোলে, সন্তানে জননী ভোলে,
কে তোমায় এমন দেখেছে ।

‘ভারতের ভাগ্যবিপ্লবে’ কবির ব্যক্তিগত হৃদয়ের বেদনা প্রকাশ
পাইয়াছে ।

‘জননী ভারতভূমি, আর কেন থাক তুমি,
ধর্মরূপ ভূবাহীন হয়ে ?

তোমার মত বত, সকলেই জ্ঞান হত,
মিছে কেন মর ভার বয়ে ?

পূর্বকার দেশাচার কিছুমাত্র নাহি আর
অনাচারে অবিরত রত ।

কোথা পূর্বরীতি নীতি অধর্মের প্রতি পীতি,
শ্রুতি হয় শ্রুতিপথ হত ।

দেশের দারুণ দুঃখ দেখিয়া বিদরে বুক,
চিন্তায় চঞ্চল হয় মন ।

লিখিতে লেখনী কাদে স্নানমুখ মসিছাদে,
শোক অশ্রু করে বরিষণ ॥

“ভারত সন্তানের প্রতি” কবিতায়, কবি ভারতের সম্মান-
দেয় প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন ।

“উঠ উঠ শয্যা ছাড় শুয়ে কেন আর ।

বাহিরিতে কি হয়েছে দেখ একবার ॥

কেন আর ঘুমাইয়া সময় হারাও ।

মশারির দ্বার খুল মুখ তুলে চাও ॥

এখন আলস্য নহে বিধান বিহিত ।

সাধ্যমতে সিদ্ধকর স্বদেশের হিত ॥

এইভাবে আরও বহু কবিতা হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখান
বাইতে পারে যে কবি ঈশ্বর গুপ্তের স্বদেশবঙ্গলতার মধ্যে
কোন ফাঁক ছিল না । তিনি স্বদেশকে প্রাণ দিয়া ভাল-
বাসিয়াছেন । স্বদেশের দোষ ত্রুটি; দুর্বস্থা দর্শনে কবি
পীড়া অনুভব করিয়াছেন ।

ইহা ছাড়াও কবি ঈশ্বর গুপ্তের আরও বহু কবিতা

আছে। ধর্মমূলক রসমূলক কবিতা ও অন্তর্ভুক্ত বিবিধ বিষয়ে কবিতা বর্তমান। ঐ সকল কবিতার মধ্যে একদিকে যেমন রসের ধোঁরাক পাই, অন্যদিকে তেমনি কবির হিন্দুধর্মের প্রতি অত্মরাগও ফুটিয়া উঠিয়াছে। হিন্দুধর্মের দোষ ত্রুটিও তাঁহার মনকে পীড়া দিয়াছে। আর কবি ভালবাসিয়াছেন বাংলা দেশকে। বাংলা দেশের আকাশ-বাতাস, প্রকৃতির আশ্রান কবিকে বার বার অত্মপ্রাণিত করিয়াছে। আবার পক্ষণেই বাংলার দোষ ত্রুটি কবিকে পীড়া দিয়াছে। ঐ সকল কবিতার মধ্যে আমরা কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে পাইয়া থাকি। তিনি শিল্পী—তিনি কবি। এইখানেই তাঁহার সার্থকতা।

আর একদিক দিয়া কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে বিচার করা যায়। তিনি অতীত ও বর্তমানের যোগসূত্র রচনা করিয়াছেন। তাঁহার মধ্যে অতীত বাংলার সমাজের ছাপ বর্তমান। কবি যুগকে অস্বীকার করিতে পারেন না। যুগের প্রভাব তাঁহার উপর পড়িতে বাধ্য। এ যুগসন্ধিক্ষণের পটভূমিকায় গুপ্তকবির আবির্ভাব।

তাঁহার উপর অতীতের ছাপ বর্তমান। পয়সারের বন্ধনকে তিনি অস্বীকার করিতে পারেন নাই। অশ্লীলতা ও গ্রাম্যতাকে তিনি কখনও ত্যাগ করিতে পারেন নাই। তাহা ছাড়া ঐ সময় কবিওয়ালাদের প্রভাব বাংলার কাব্যের উপর পড়িয়াছে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কবিওয়ালাদের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন। কবিওয়ালাদের অত্মকরণে শ্লেষ, ধমক, প্রভৃতি অলংকার তিনি তাঁহার কাব্যে ব্যবহার করিয়াছেন। ইহা ছাড়াও কবি ঈশ্বর গুপ্ত কবিওয়ালাদের অত্মসরণে দেবতা কণ্টকিত বাংলা কাব্যকে সমাজের সমস্তার মধ্যে নামাইয়া আনিয়াছেন। সমাজের সাধারণ মানুষ ও তাহাদের আচরণকে উপেক্ষা না করিয়া, কবি তাঁহার কাব্যে স্থান দিয়াছেন। এইভাবে বিচার করিলে দেখা যায় যে তিনি সত্যই প্রাচীনপন্থী।

কিন্তু আর একটা দিক আছে। যে দিক হইতে বিচার করিলে তাঁহার কাব্যকে সম্পূর্ণরূপে প্রাচীনপন্থী বলা যায় না। তিনি আধুনিকতাকে অস্বীকার করেন নাই। আধুনিক ইয়োরোপীয় সভ্যতার প্রতি তাঁহার আকুল আগ্রহ সত্যই বিশ্বস্তের বিষয়। তিনি ইংরাজী সভ্যতাকে অস্বীকার করেন নাই। ইংরাজের ভাল গুণগুলিকে গ্রহণ করিতে বহুপরিশ্রম ছিলেন গুপ্ত কবি। একদিকে প্রাচীন অন্তর্ভুক্ত আধুনিক, একদিকে অতীত, অন্যদিকে আগামীকাল; উভয়ের সংমিশ্রণে কবির কাব্য সার্থকতার সীমা

স্পর্শ করিয়াছে। তিনি নারী শিকার বিরোধী নহেন। ইংরাজী শিক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রতি তাঁহার আগ্রহ অসীম। আবার হিন্দুমান্যের সংরক্ষণে অধিক ব্যস্ত। তিনি সতীদাহ প্রথা বিরোধী—আবার বিধবা-বিবাহের পক্ষপাতী নহেন। একদিকে তিনি প্রাচীনকে স্বীকার করিয়াছেন, আবার অন্যদিকে তিনি আধুনিকতাকে আশ্রান জানাইয়াছেন।

গুপ্তকবির যুগ যুগসন্ধিক্ষণের যুগ। এই যুগসন্ধিক্ষণে তাঁহার কাব্য বার বার আলোড়িত হইয়াছে দুই দিক হইতেই। ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর একশত বৎসর পর তাঁহার মৃত্যু হইল। এই যুগে একমাত্র তিনিই শক্তিমান কবি। কবিওয়ালাদের কাব্য-কৃতিকে অস্বীকার না করিয়াও কবি অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছেন, যাঁরা কবিওয়ালাগণ পারেন নাই।

১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হইল। আর ১৮২৪ সালে স্থাপিত হয় সংস্কৃত কলেজ। একদিকে আধুনিকতার প্রতীক আর অন্যদিকে প্রাচীনতার সংরক্ষণ। দুই দিক দুই পথে। প্রাচীন বলিয়াই যে তাগার সব কিছুই ভাল একথা সত্য নয়। আবার আধুনিক বলিয়া তাহার সব কিছুকেই বিনা বিচারে গ্রহণ করিতে হইবে একথাও স্মৃতি-গ্রাহ্য নহে। উভয় মতেই মধ্যে যেমন ভাল আছে, ঠিক তেমনি দোষও আছে। আমরা যেমন ভালকে গ্রহণ করিব, ঠিক তেমনি ত্রুটিগুলিকেও ত্যাগ করিব বিনা বিধায়। এইখানেই তো মানবজীবনের সার্থকতা। এই বিচার না থাকিলে সভ্যতার রূপান্তর ঘটে না। একদিকে জড়বাদ আর অন্যদিকে আধ্যাত্মিকতাবাদ। উভয় দিক লইয়া স্থিরচিত্তে শাস্ত্রমতিকে আলোচনা করিতে হইবে। গুপ্ত কবি ঐ আধুনিক সভ্যতাকে যেমন আশ্রান জানাইয়াছেন, ঠিক তেমনি ঐ সভ্যতার ত্রুটিগুলির প্রতিও ইংগিত করিয়াছেন। আবার ভারতের আধ্যাত্মিকতা-মণ্ডিত সভ্যতার প্রতিও অকুণ্ঠ সমর্থন জানাইয়াছেন। স্তবধার বলা যায় যে তিনি অতীত ও বর্তমানের সেতুবন্ধন রচনা করিয়াছেন। বর্তমান যুগে জড়বাদ ও আধ্যাত্মিকতাবাদের সমন্বয়ের আকাজক্ষা প্রবল রূপ ধারণ করিয়াছে। এই সমন্বয়ের মধ্যেই মানবসভ্যতার প্রকৃত মুক্তি ঘটিবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। ঈশ্বরচন্দ্রের মধ্যে ঐ সমন্বয়ের বীজ নিহিত ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বাংলার কাব্যজগতে ও সাহিত্যক্ষেত্রে যে দিলন-তীর্থ রচনা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার জন্যই আমরা হইয়া থাকিবেন।

এখানে বিজ্ঞান শব্দের অর্থ বিশিষ্ট জ্ঞান (knowledge of material essence) আর প্রজ্ঞানের অর্থ প্রকৃষ্ট জ্ঞান বা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান অর্থাৎ বাহ্য হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই ভবিষ্যৎ জ্ঞান (পরমাত্মজ্ঞান)। নির্বিশেষ নিক্রিয় শাস্ত্র ব্রহ্মের বৃক্ যখন তাহার ক্রিয়াশক্তি প্রকাশ পায়, তখন ঐ ক্রিয়া শক্তির নাম হইতেছে প্রকৃতি। ঐ প্রকৃতি হইতে প্রকাশ পাইয়াছে অনন্ত দৃশ্যরূপে, পদার্থরূপে জীব-জগৎ। ঐ জীব-জগতের পদার্থসমূহকে তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া যজ্ঞাগারে যজ্ঞ সাহায্যে যে জ্ঞান লাভ হয় উহার নামই বিজ্ঞান। আমাদের পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের শক্তি-সমূহ সসীম ও অপূর্ণ, তাই নানাবিধ যজ্ঞ সাহায্যে উহাদিগের শক্তি বৃদ্ধি করিয়া প্রকৃতির অজ্ঞাত বিষয়কে আমাদের জ্ঞান গোচর করাই এই বিজ্ঞানের কার্য্য। যতকিছু আবিষ্কার এই বিজ্ঞানবলেই সাধিত হইয়াছে। মানুষের অভাববোধ দূর করিয়া দুঃখের নিবৃত্তি করিবার জন্তই মানবমনের এই প্রয়াস। অনাদিকাল হইতেই এই চেষ্টা চলিয়া আসিতেছে। যতই বিজ্ঞান সহায়ে মানুষ তাহার অভাব দূর করিতেছে ততই মানুষের অদমিত কামনা বাসনা নূতন নূতন অভাব সৃষ্টি করিতেছে এবং বিজ্ঞান তাহা দূর করিতে করিতে বর্ত্তমানে এই সত্য জগৎ গড়িয়া তুলিয়াছে। মানুষ বাহ্য স্বপ্নেও ভাবে নাই সেই সমস্ত স্বথ-সম্পদ লাভ করিয়া মানুষ কি প্রকৃত স্বথ লাভ করিয়াছে? মানুষ কি তাহার বাসনার তাড়না হইতে নিবৃত্তি লাভ করিয়া প্রকৃত শান্তিলাভ করিয়াছে? বিজ্ঞান দিয়াছে মানুষকে অতুল সম্পদ মানুষের দুঃখ নিবারণের জন্ত এবং সঙ্গে সঙ্গে বাড়াইয়া দিয়াছে তাহার অতৃপ্ত ষিণ্ডণ অভাব। আবার বিজ্ঞানই দিয়াছে মারণাস্ত্র মানুষের সর্বনাশের জন্ত। তাই আমরা দেখিতে পাই বিজ্ঞান জন-কল্যাণে এতদূর অগ্রসর হইয়াও মানবের অভাববোধকে আদৌ দূর করিতে পারে নাই, বরঞ্চ

তাহাদের সর্বনাশেরই কারণ হইয়াছে। কামনার প্রলুব্ধ মানুষ তাহার নিজের দেশকে বড় করিবার জন্ত, তাহাদের স্বকীয় স্বথ: সম্পদ, ও স্বথসমৃদ্ধি বাড়াইবার জন্ত বহু যুদ্ধ সরঞ্জাম, এটম বম, হাইড্রোজেন বম প্রভৃতি স্বজন করিয়া অপর রাষ্ট্রকে পদদলিত করিয়া রাখিয়াছে। বাহারা তাহাদের সমকক্ষ বা শ্রেষ্ঠ হইবার চেষ্টা করিতেছে তাহাদের ধ্বংসের নিমিত্ত কতই যড়যন্ত্র ও মতলব আঁটিতেছে। কেহই চেষ্টা করিতেছেন। এই সমগ্র বিশ্বকে একই সংসার, একই পরিবার মনে করিয়া বন্ধুত্ব-মুদ্রে গ্রথিত করিতে। কেহই মানুষকে মানুষে, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে, জাতিতে জাতিতে ভ্রাতৃত্বাবস্থাপন করিয়া এই সংসারকে স্বথময় করিবার চেষ্টা করিতেছে না। ইহার কারণ মানুষ চায় প্রধানত: নিজ স্বথ, তারপর নিজের সঙ্গে বাহার। জড়িত অর্থাৎ বাহাদের সুখের সহিত নিজের স্বার্থ জড়িত তাহাদের স্বথ, আর চায় নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্ত অপরের সঙ্গে একত্র হইয়া বা সংঘবদ্ধ হইয়া যে নিজস্ব সমাজ ও ক্ষুদ্র দেশ গড়িয়া তুলিয়াছে, সেই নিজ দেশ ও নিজ সমাজের স্বথ ও উন্নতি। স্বার্থসংকীর্ণ মানবচিত্ত নিজ স্বার্থ লাভের জন্তই সর্বদা প্রয়াসী, তাই অপরের স্বার্থে হানাদ দেয়, অপরের দেশ জয় করিয়া তাহাদের দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ করে। মানবগণ নিজ সমাজ ও ধর্মকে বড় করিতে গিয়া অপরের সমাজ, দেশ ও ধর্মকে আক্রমণ করে, তারই ফলে মানুষে মানুষে, সমাজে সমাজে, দেশে দেশে, ধর্মে ধর্মে মারামারি। ইহাই যত যুদ্ধ বিগ্রহের ও সাম্প্রদায়িক অশান্তির কারণ। মানুষের মনে যতদিন হিংসা, ঘেব, সংকীর্ণতা ও স্বার্থ লোলুপতা থাকিবে ততদিন পরপীড়ন প্রবৃত্তি থাকিবেই থাকিবে এবং ততদিন বিশেষ কিছুতেই প্রকৃত শান্তি আসিতে পারে না। সুতরাং বিজ্ঞান যতই উন্নতি করুক প্রজ্ঞানবিহীন বিজ্ঞান আমাদের প্রকৃত শান্তি ও পূর্ণানন্দ কিছুতেই দিতে পারিবে না। বিজ্ঞান

দিয়াছে আধাঙ্গিক প্রকৃতির বাহ্য বিষয়ক জ্ঞান অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে জাত যে পদার্থ ও জীব-সমূহ তাহাদেরই জ্ঞান (knowledge of material science) আর প্রজ্ঞান দিয়াছে প্রকৃতির অন্তরে অর্থাৎ প্রতি পদার্থে ও প্রতিজীবের অন্তরে প্রকৃতির আচ্ছন্নভাবে আছেন যে চৈতন্য, ওই আনন্দময় চৈতন্য সত্তার জ্ঞান। ওই চৈতন্যময় সত্তাই সূত্রাত্মকপে (প্রাণরূপে) সমগ্র বিশ্বের জীবসমূহকে, পদার্থসমূহকে এবং অগণিত গ্রহনক্ষত্রাদিকে গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছেন একই সূত্রে—গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন “ময়ি সর্গমিদং প্রোক্তং সূত্রে মণিগণা ইব” অর্থাৎ সূত্রে যেমন মণিসমূহ গ্রথিত থাকে তেমন আমাতে (ভগবানে) সমস্ত জীব-সমূহ ও সৃষ্ট পদার্থ-সমূহ গ্রথিত রহিয়াছে। শাস্ত্র বলেন যে এই সমগ্র বিশ্বের জীবগণ সেই ব্রহ্ম বা ভগবানেরই ইচ্ছায় তাহারই প্রকৃতির নিয়মে সকলেই প্রকৃতিনির্দিষ্ট নিজ নিজ কর্মামুদ্বর্তন করিতে করিতে এই সমগ্র সংসারকে ক্রমোন্নতির পথে লইয়া যাইতেছে। সূত্রাত্মক বিশ্বের মানবগণ একই প্রকৃতির কোলে জন্ম গ্রহণ করিয়া একই মাতার কোলে ভ্রাতৃত্বাবে পালিত হইতেছে এবং পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত হইয়া, ওই ব্রহ্ম প্রকৃতির ইচ্ছায় অমুদ্বর্তন করিয়া ব্রহ্মকর্মই করিতেছে। এই যে ব্রহ্মপ্রকৃতির বা ব্রহ্ম-শক্তির নিয়ম উহা পালন করাই জীবের কর্তব্য কর্ম ও ধর্ম। পূর্বে বলিয়াছি যে প্রকৃতি আর ব্রহ্ম একই বস্তু, কারণ শক্তি ও শক্তিমান অভেদ। সূত্রাত্মক প্রকৃতির যে নিয়মে এই বিশ্ব শাসিত হইতেছে, চালিত হইতেছে উহাই ভগবৎ ধর্ম, উহাই বেদ বা প্রজ্ঞান। ওই প্রজ্ঞান যখন প্রকাশ পায় তখন আমরা প্রত্যেক সত্য জ্ঞান উপলব্ধি করি। তখন আমরা বুঝিতে পারি যে আমরা সকলে পরস্পরে এমনই অংশাংশভাবে প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধযুক্ত যে প্রকৃতির কোন অংশ অর্থাৎ কোন জীব নিজ স্বার্থের অজ্ঞ অপার কোন জীবের প্রতি অন্যায় আঘাত করিলে প্রকৃতির বুকেই লাগে। কোন জাতির প্রতি কোন জাতি অন্যায় করিলে, কোন ধর্মের প্রতি অপার ধর্মাবলম্বীজীব অন্যায় আঘাত করিলে প্রকৃতির নিয়ম (Administrative laws of god) সেই আইনভঙ্গকারী জীবকে বা জাতিকে শাস্তি দিবেনই—ইহাকেই বলে প্রকৃতির প্রতিশোধ। প্রকৃত পক্ষে ইহা প্রতিশোধ নহে—ইহা হইতেছে

প্রকৃতিরূপিনী জননীর সন্তানকে শাস্তি দিয়া প্রকৃত জ্ঞান দিবার ব্যবস্থা। সূত্রাত্মক ইহাও তাহার করুণা, সূত্রাত্মক প্রজ্ঞান মানুষে মানুষে জাতিতে জাতিতে ধর্মে ধর্মে ভ্রাতৃত্বাবেরই শিক্ষা দিয়া প্রকৃত শান্তি বিধে স্থাপন করে। এই প্রজ্ঞানই মনুষ্যগণের কামনা বাসনা শাস্ত করিয়া এবং তাহাদের উদ্যম লাগলকে সংযত করিয়া তাহাদের অহিংসা সত্য অন্তের ব্রহ্মচর্যাাদি গুণাবলিতে প্রতিষ্ঠিত করে। এই প্রজ্ঞানই মানবজাতিতে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করিতে সমর্থ এবং প্রজ্ঞানের অমূল্য শীলনই আমাদের সর্ব অঙ্গবের তড়ানা হইতে বিনিবৃত্ত করিয়া পরম শান্ত অবস্থায় স্থিত করে। সূত্রাত্মক যতদিন বিজ্ঞানের সহিত প্রজ্ঞানের (ধর্মের) অমূল্য শীলন না হইবে ততদিন মানবের প্রকৃত সুখশান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে না এবং এই প্রজ্ঞান মানুষ যতটুকু লাভ করিবে ততটুকু তাহার সুখশান্তির কারণ হইবে। একদিন এমন আসিবে এবং সেদিনের দেবী নাই, যেদিন এই ভারতই তাহার প্রজ্ঞান বা প্রকৃত বেদজ্ঞান সমগ্র পৃথিবীকে দান করিয়া জগতের বরণ্য হইবে।

পরম আত্মারসের আশ্বাদন বা পরম

আত্মমিলনানন্দ সন্তোষ

রস শব্দের অর্থ আনন্দ, যে বিস্তৃত আনন্দ হইতে এই বিশ্ব প্রকাশিত হইয়াছে, যাহাতে স্থিত রহিয়াছে এবং যাহাতে লয় প্রাপ্ত হয় বা হইতেছে তিনিই “রসো বৈ সঃ”। জীব কি ভাবে ঐ পরম রসের আশ্বাদন বা সন্তোষ করিতে পারে এবং উহার সহিত মিলিত হইতে পারে তাহাই এখানে আলোচ্য বিষয়।

যে অখণ্ড বিষ্ণু সত্তা অখণ্ড রস-রূপে, অখণ্ড সচ্চিদানন্দ-রূপে এই সৃষ্টির অন্তর-বাহে “অন্তি, ভ্রাতি, প্রিয়রূপে” নাম রূপের আবরণে অদৃশ্য রূপে রহিয়াছেন, ঐ আনন্দময় সত্তা তোমারও অন্তর বাহে চিত্তের আকাশের মত রহিয়াছেন। বিশ্বাস কর ঐ চিত্তের আকাশ সত্তার অন্তিম, তারপর ধীরে ধীরে মন একাগ্র করিয়া নিজের আত্মবোধকে অর্থাৎ আত্মিক রূপ জীব-বোধকে চিত্তের সাহায্যে—কল্পনা বলে উপবিষ্ট করাও ঐ ব্যাপক আকাশবৎ বিষ্ণুসত্তার মাঝে। তারপর চিন্তা কর যে যেমন রসের মাঝে একটা রসে পূর্ণ রসগোলা ভাসিতে থাকে, যেমন একটি জলপূর্ণ ঘট

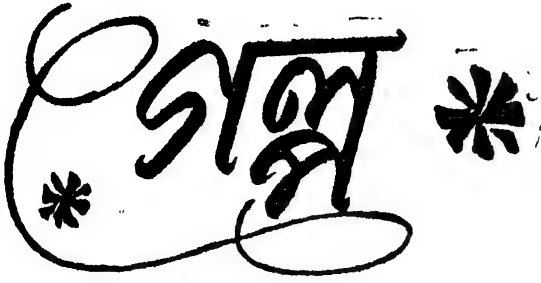
অথও জলসমুদ্রের মাঝে ডুবিয়া থাকে, তেমনি ভূমিও ঐ বিষ্ণুসত্তার মাঝে ডুবিয়া আছে। তোমার উর্দ্ধে, নিম্নে, সম্মুখে, পশ্চাতে অন্তরে বাহিরে অথও আনন্দময় চিন্ময় রস ব্যতীত আর কিছুই নাই। তারপর তোমার নিজ জীব চৈতন্যকে (নিজ দেহস্থিত খণ্ড জীব বোধকে)—আমিত্ব বোধকে ঐ অন্তর-বাহ্যবাপী চিন্ময়বোধের সহিত একত্ব উপলব্ধি করিতে থাক। এই রূপ সাধন কালে তোমার অন্তরস্থিত চৈতন্যকে আবরিত করিয়া তোমার ঘে দেহাঙ্গিয়াদি বোধ ও সংস্কারাদি নানা চিন্তার আকারে প্রকাশ পাইতে থাকিবে এবং তোমাকে তোমার চিন্ময় আনন্দময় বোধ হইতে বিচ্যুত করিবার অশ্রু চেষ্টা করিতে থাকিবে উহাদিগকে লয় করিবার অশ্রু ব্যাকুলচিত্তে তোমার অন্তর-বাহ্য-বাপী ঐ প্রাণময় বিষ্ণু সত্তার দিকে লক্ষ্য করিয়া প্রার্থনা করিতে থাক—“হে করুণাময় প্রাণ-রমণ, তুমি আমার এই দেহবোধ ইন্দ্রিয়বোধ ও সংস্কারবোধসমূহ বাহায়া আমাকে তোমার ঐ অথও আনন্দময় প্রাণ সত্তাকে উপলব্ধি করিতে এবং উহাতে পূর্ণ-ভাবে মিলিত হইতে বাধা দিতেছে উহাদিগকে গ্রাস কর, লয় কর”। এই প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে ভূমিও মন একাগ্র করিয়া উপলব্ধি করিতে চেষ্টা কর যে ঐ অথও প্রাণসত্তা তোমার দেহের প্রতি অণু পরমাণুতে প্রতিষ্ঠিত হইতেছেন। কিছুদিন মানস-পটে এইরূপ ধ্যান বা চিন্তা প্রবাহকে চালিত করিবার অভ্যাস করিলেই দেখিতে পাইবে যে ক্রমে ক্রমে তোমার অন্তরে একটা সময়, ফ্লাসময় পরশ তোমার ঐ স্থূলবোধকে এক অথও আনন্দময়বোধে পরিণত করিতেছেন। ক্রমে ক্রমে তোমার অন্তর্বাহ্যে এক আনন্দরসের আবির্ভাব হইবে।

এই যে সত্তার কথা বলিলাম—ইহা যতই সাধক তাহার মনকে স্থির করিয়া পূর্বোক্ত প্রকারে ধ্যান প্রবাহকে ধরিয়া রাখিতে পারিবেন, ততই ঐ সত্তা ঘন আকাশবৎ তাহার অন্তর্বাহ্যে ছুটিতে থাকিবে এবং সাধক এক অপার আনন্দ-সাগরে ভাসিতে থাকিবেন। ইহাই পাতঞ্জল যোগ দর্শনোক্ত “বিশোক্য জ্যোতি” দর্শন। ইহাই “ওঁ” মিলন।

তথিকোঃ পরমং পদং সদা পশুন্তি স্বরূপং দিবীং চক্ষুরাততম্”। অর্থ—জ্ঞানিগণ সর্বদাই এই সর্বব্যাপী বিষ্ণু সত্তাকে তাঁহাদের চতুর্দিক আকাশবৎ একটি বিস্তৃত চক্ষুর দ্বারা দেখিতে পান অর্থাৎ তাঁহারা দেখিতে পান ঐ আকাশবৎ ব্যাপক সত্তাটি যেন তাহাদের দিকে জীবন্ত প্রাণময় সত্তারূপে চাহিয়া আছেন এবং তাহার ঐ আকাশ-বৎ ব্যাপক সত্তার মাঝে ডুবিয়া আছেন। ইহাই চিদাকাশ দর্শন।

এই যে সর্বব্যাপক প্রাণময় আনন্দময় সত্তার কথা বলিলাম ইনিই সকলের একমাত্র উপাস্ত। যিনি বাহারই উপাসনা করুন না কেন—সকলেই জ্ঞানে বা অজ্ঞানে ঐ ব্রহ্মসত্তারই—ঐ সচ্চিদানন্দ সত্তারই উপাসনা করিতেছেন। ঐ যে ব্রাহ্মণগণ ত্রিসন্ধ্যা “তুত্বঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্বরেন্যঃ স্বর্গোদেবস্ত ধীমহি ধियो যো নঃ প্রচোদয়াৎ” বলিয়া গায়ত্রী মন্ত্রের উপাসনা করিতেছেন, উহা আনন্দময় ব্রহ্ম-সত্তারই উপাসনা। ঐ মন্ত্রের সহজ ও সরল অর্থ হইতেছে এই—যিনি স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ-রূপে এই চতুর্দশ অর্থাৎ এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে প্রসব করিয়াছেন বা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড রূপে প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছেন তিনিই আবার আমাদের প্রতি জীবের অন্তরে থাকিয়া আমাদের প্রতিকর্মে ব্রহ্মাণ্ড মুখে (অথবা ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষের দিকে) পরিচালিত করিতেছেন। এখানে কেহ কেহ পরিচালিত করিতেছেন এইরূপ অর্থ ধরিয়া ধ্যান করেন, অথবা কেহ কেহ পরিচালিত-করুন এই প্রার্থনা সহ ধ্যান করেন। ফল কথা এই গায়ত্রী মন্ত্রেরও ভাব হইতেছে—ধ্যান সহায়ে সেই অথও ব্রহ্ম-চৈতন্য যিনি এই ব্রহ্মাণ্ডকে প্রসব করিয়াছেন এবং চালিত করিতেছেন তাহার সহিত আমাদের অন্তরস্থ ব্যক্তি চৈতন্যের একত্ব উপলব্ধি করা।

সকল সাধনারই প্রাণ হইতেছে নিজের ব্যক্তি-বোধকে এক আনন্দময় অথও প্রাণ-বোধে (চৈতন্য-বোধে) ডুবাইয়া দিয়া দুঃখের আত্যস্তিক নিবৃত্তিপূর্বক পরমানন্দ লাভ করা। ইহাই পরম রসের আবাদন ও পরম-



হৃদ-সজ্জা

অরবিন্দ ভট্টাচার্য

মাত্র চোদ্দ দিনের ব্যবধানে সপ্তম চাকরের গদান যা'বার পর রীতিমত শক্তিত হয়ে উঠলাম আমি। গৃহে গৃহিণীর এ'হেন সাময়িক আইন আর কতদূর সহ করা যায়। ক্ষীণ কণ্ঠে প্রতিবাদ করতে গেলাম অগত্যা, "সন্ধ্যা, তুমি বুঝছো না—"

—"আমি কি বুঝি না বুঝি সে' আমি বুঝবো। তোমায় তা বলে দিতে হ'বে না।" হাইকোর্টের বিচার-পত্রির মত কড়া কলিং। সামান্য একটু থতমত খেয়ে আবার চেষ্ঠা করলাম।

—"কিন্তু হারাদন তো চাকর হিসেবে"—

—"পুকুর-চোর। পাইকারী হারে চুরি করে ও'। পর পর ছ'দিন লক্ষ্য করে দেখেছি। তারপরও যদি তুমি রাখতে চাও তা'হ'লে," নাটকীয় ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল সন্ধ্যা, "তোমার সংসার তুমিই—"

—"আঃ, রাগ করছো কেন। আমি এমনি- তা' যা'ক। তোমার নতুন লোকটি কে?"

—"মনে হচ্ছে এ'বার একটি খাঁটি চাকরের সন্ধান পেয়েছি।" চেয়ারে বসে বলল সন্ধ্যা, "কাবেরীদি অত্যন্ত ঈংলি রেকমেন্ড করেছে।"

প্রত্যেকটি চাকর নিযুক্ত করার সময় উচ্চ-প্রশংসা শুনেছি এই রকম, তাই বিশ্বস্ত হ'লাম না মোটেই। মনে মনে দীর্ঘায়ু কামনা করলাম নতুন লোকটির।

নতুন বাড়ীতে উঠে আসবার পর থেকেই সন্ধ্যার

মেজাজের এই উর্দ্ধগতি। বাড়ীর মধ্যে তার একাধিপত্য। তার কথাই ওপর কথা বলবার মত বুকের পাটা নেই কাকর। বকুনীর গুলিতে খুন হয়ে যা'বে সে তৎক্ষণাৎ।

—"আমার বাড়ী আমি মনের মত করে সাজাব।" বলল সন্ধ্যা একদিন, "ফুলের বাগান থেকে চাকর-বাকর পর্যন্ত।"

উত্তম প্রস্তাব। প্রশংসা করলাম সন্ধ্যার ইচ্ছার। উৎসাহিত হয়ে বলল সে—

—"ভাল হ'বে না? বাড়ীটা হ'বে জীবির মত। বাইরের লোক এসে দেখবে আমাদের ছ'নাশ ছোট্ট সংসারটি। আমরা বিকেলবেলা সামনের লনে গিয়ে বলব সবুজ ঘাসের ওপর—"

আমার রোল এ'খানে শ্রোতার। দাম্পত্য নাটকে বিধাতা আমার জ্ঞাত খুব বেশী কথা বলার সুযোগ রাখেন নি। তাই সন্ধ্যাকে ফাঁকা মাঠ ছেড়ে দিয়ে আমি গোল পোষ্টের পেছনে দাঁড়িয়ে বললাম, "বেশ হয়।"

অচিরেই সন্ধ্যার প্রান কার্যাকরী হ'তে শুরু করল। বাগ'নে নতুন মালীর আবির্ভাব ঘটায় সঙ্গে সঙ্গে রান্নাঘরে নতুন রাঁধুনের মুখ দেখতে পেয়ে শক্তিত হ'লাম। সর্বনাশ, অষ্টম চাকরের পর খার্ড রাঁধুনী!

—"আগেরটা বড় খ্যাতি ছিল," কৈফিয়ৎ দিল সন্ধ্যা, "আমি একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাটা বেশী পছন্দ করি।"

সন্ধ্যার বাড়ী সাজাবার কথা শুনে যে' ভয় করেছিলাম, অবশেষে তাই হ'ল। বিকেলে চা'খেতে খেতে বলল সে, "চলো আগামীকাল দাদার বাড়ী যাই। একদিন থেকেও আসা যা'বে, আর এ'দিকে—"

"এ'দিকে?" এখন আর উৎকর্ণ হই না, নেহাৎ অধ্যাসবশতঃ প্রশ্ন করলাম।

—"বসবার ঘরটাকে রঙ করা'ব তা'বছি," বলল সন্ধ্যা, "ম্যাটম্যাটে সাদা রঙ বিচ্ছিরি লাগে দেখতে।"

—"থাক না, মিছিমিছি—"

—"কিন্তু একটা ডিসেন্দী আছে তো," একটু বেন আহত হয়ে বলল সন্ধ্যা।

অগত্যা। গোবিন্দ মিস্ত্রীকে ভলব করা হ'ল। বখা-কালে গোবিন্দ হাজির হ'ল!

—“এই ঘরটাকে রঙ করবে, বুঝলে,” বলল সন্ধ্যা,
“ঠিক এই রঙ হ’বে,” ঘরের কোণে রাখা ফুলদানীটা হাতে
নিয়ে দেখিয়ে দিল।

—“হ্যাঁ মা।” গোবিন্দ বলল।

গোবিন্দ বহুদিনের পরিচিত এ’বাড়ীর সঙ্গে। আমি
তো প্রায় ছেলেবেলা থেকেই জানি তা’কে। ফুলদানীর
রঙ দেখে তাই স্বভাবতঃই সহানুভূতি জেগে উঠল
গোবিন্দের জন্ম। বললাম।

—“কিন্তু সন্ধ্যা, ও’রকম টাইপের সবুজ রঙ দে’য়া কি
সম্ভব হবে? আমার তো মনে হয় না।”

—“হ’বে, নিশ্চয়ই হ’বে। ফুলদানীতে যদি এ’রঙ
দে’য়া যেতে পারে তো দে’য়ালেও দে’য়া যাবে।” দৃঢ়তার
সঙ্গে বলল সন্ধ্যা।

—“ও’রঙ দিতে পারবো বাবু,” গোবিন্দও সাঁয় দিল
দেখলাম। এরপর, আর কিছু বলতে যাওয়া অসুচিত,
অতএব চুপ করে থাকতে হ’ল।

সন্ধ্যা ভেতরে যেতেই উদ্বিগ্ন হয়ে বললাম গোবিন্দকে

“কি রে, পারবি তো? ওকে তো জানিস, কি’রকম কড়া
মেজাজ—”

—“ও’ আমি ঠিক করে নেব বাবু,” হেসে বলল গোবিন্দ।

এবং আশ্চর্য্য, করলও তাই। এই প্রথম কাকর
কাজ দেখে উচ্চকণ্ঠে প্রশংসা করতে শুনলাম সন্ধ্যাকে।
“দেখলে? বলেছিলাম না—সত্যিকারের কাজের লোক
ও’। যা’ বলে গিয়েছিলাম ঠিক তাই করেছে।”

অবাক হ’লাম আমিও। আড়ালে ডেকে নিয়ে গেলাম
গোবিন্দকে। প্রশ্ন করলাম।

—“কি হে, ব্যাপার কি বলতো?”

একগাল হাসল গোবিন্দ। বলল,—“বাবু, আপনি
ঠিক-ই বলেছিলেন। ও’রঙ হচ্ছে কাঠে মাটির জিনিষে
লাগাবার রঙ। ও’তে কি দে’য়াল রাঙানো যায়?”

—“তবে? তুমি এ’কাজ করলে কি করে?”

—“ফুলদানীটাকেই দে’য়ালের রঙে রাঙিয়ে নিয়েছি
বাবু।” হাসল গোবিন্দ, “গাফা কাজ, ধরবার উপায়
নেই কাকর।”

নিঃশেষিত প্রেম

শ্রীভবানীপ্রসাদ দাশগুপ্ত এম-এ

ফেলে এসে পশ্চাতের সব কোলাহল,

আনন্দে বিহ্বল,

তোমারেই সঁপেছি হৃৎ ব্যাধা স্থখ;

কোঁলে হুমি তুলে নিলে

উৎসুক উন্মুখ।

হে অস্থির, হে উদ্ভাস, হে চঞ্চল,

নির্বিকার টেনে নিলে আমার অঞ্চল।

অধরে অধীর উষ্ণ চূষন তোমার,

উচ্ছ্বাসে উল্লসিয়া উঠি বার বার,

তোমার দুর্নিবার দুরন্ত কন্মোল

আমারেই করেছিল বিন্মিত বিহ্বল।

(সেদিন) তব উবেলিত উদ্ভাস ঘোবন,

উল্লসিয়া উঠেছিল তীর-ভাড়া ঢেউএর মতন।

সঙ্গ স্বপ্নেগৌন, ছিলে নিশিদিন,

আজ প্রিয় কেন উদাসীন?

উচ্ছল গান তব সঙ্গরণ স্বরে—

কীর্ণ কণ্ঠে বাজে কেন দূরে বহু দূরে

যেন বেহাগের স্বরে

বল প্রিয়, আজ তুমি আনমনে যেন

অন্তরালে নিজেরে লুকাতে চাও কেন?

দীপ্ত তব স্মৃতি আজ চিন্তে আনে ব্যাধা উত্তরোল

সাহাবার বুকে মোর ক্রন্দন কন্মোল।

সাগর-সংগমের মহামিলনে

শ্রী প্রবোধ রাউৎ

পৌছবার আগে পথ, না পথের আগে পৌছনো—এ প্রাণ সে-দিন ছিলনা, যে-দিন মটরমাসী তার মিশি-মাখানো কালো দাঁত বের করে মাকে বললো—সত্যিই দিদি, সাগর একবার—তারপর যে বর্ণনা শুরু করলেন তাতে আমি মায়ের কোল ঘেসে বসে হা-হ'য়ে গেলুম। মানুষ-থেকো সাগরটা যেন সরে আসতে লাগলো আমার কাছে, তাই আসতে আসতে মায়ের কোলে উঠে বসলুম। স্নতে স্নতে ভগীরথ যখন শাঁখ-বাজিয়ে গঙ্গা এনে সাগরে ফেললো, যখন গঙ্গা-সাগর একাকার হয়ে গেলো, তখন আমিও বোধহয় ঘুমের সঙ্গে একাকার হ'য়ে গিয়েছিলুম। তারপর সমুদ্র স্বপ্নে ঢেউয়ের তালে তালে জীবনটা কত নেঁচেছে কৈদেছে হেসেছে, কিন্তু যে-দিন স্বপ্ন সত্য-রূপ পেলো, সত্যিই ককিয়ে উঠে ঝাড়া পাঁচহাত একটা লাক দিয়েছিলুম। অবশ্য, সাগর পার হ'তে পারিনি।

গঙ্গা পার হ'তে পজছানি দিয়ে ডাকলেন আমার জীবন-দ্রাতি “জীবনদা।” খুলেই লিখেছেন—গঙ্গার খেয়াঘাটে অপেক্ষা করছে সাগরগামী ষ্টিমার-লঞ্চ-নৌকো, তাড়াতাড়ি এসো জোয়ার আসতে দেবিনেই, “কপ্লে-বাকী জয়” বলে লাকিয়ে পড়ি।

পত্র পেয়ে আমি উঠি-পড়ি ভাবে বোচ্কা বুচকি বাধতে লেগে গেলুম। অবশ্য, আজ স্বর্গে গেছেন মটরমাসী—মর্তে রেখে গেছেন তাঁর বোচ্কাতে একটা অপেরা মালা, নামাবলী, আর একটা লোটা। খুঁজে পেলুম চরম-পথের পরম-পাথের হিসাবে-এগুলো। তাই, বেডিং কোল্ডারে গুটিয়ে নিলুম, আর নিলুম ফ্রান্স ও ক্যামেরা, যদিও এগুলো বিশেষণের বিশেষণ, তবুও সভা ব্যাকরণের ব্যক্তি-ব্যবহারিকা হিসাবে চলন্তিকা।

“জয় কপ্লে-বাবা!” যাত্রায় পা বাড়িয়েছি, অমনি আমার জীবনের একাধারে প্রভু, একাধারে ভূতা, পঞ্চ-শত পঞ্চগব্য অরূপ পঞ্চভৌতিক একটি কান্না করজোড়ে

“কম্বন্ধ” বলে উঠলো। ইনি চলতি-যুগের কহরাম পাল, দাবী—শুধু সাথী হবার নয়, সব দুঃখে ভাগী হবার। এ হেন পাল মশাইকে তার দাবী থেকে দমন করা বোধহয় এ যুগের বেল্চি কোদালেরও সাধ্য নেই, বৈজ্ঞানিক চেষ্টা করতে গেলে হয়তো সে নিজের বুকটাতেই ছুরি বসিয়ে বলে উঠবে—এ ছুনিয়া বুটা ছায়।

আমার কিছু বলবার আগেই সে বোচ্কা-বুচকি ঝাড়ে চাপিয়েছে, আমার ওপর দৃঢ় নির্দেশ—আগে বাড়ো। পা বাড়িয়েছি, মা পিছু ডাকলেন—“বাবা, সাবধান!” আমি থমকে গেলুম, পাল মশাই গড়ে উঠলো—আগে থেকে পিছু ভালো, যদি ডাকে মায়, ওহে, এ যে খনার বাকিয়া—অকাটা, আগে বাড়ো!

পথ পরিক্রমায় কখন বেড়েছি—কমেছি, জানিনা, তবে যে-জীবনদা শবরী-প্রতীক্ষায় কালযাপন করছিলেন, একেবারে তাঁর কোলে গিয়ে পড়লুম। জীবনদার একটি চাটনি-চাপড় পড়লো পিঠে, মুখে ফুটলো—মেয়ে জান, জড়িয়ে ধরলেন বুক। পাল-মশাই বোচকা ফেলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ঝেড়ে তার অভ্যাসমতো কাপড়ের কুঁপিটা নাকে গুঁজে শরীরটা ফোলাতে লাগলেন, বোধহয় হাঁচবেন! এ পদ্ধতি সম্বন্ধে পাল-মশাইয়ের আট্ কাট্ অর্থাৎ অকাটা মত এই যে, হাঁচলে শুধু দেহ মন কোন ছার, কোনো বিপদ বালাই-ই কাছ ঘেঁষতে পারেনা।

আমাদের সাগর যাত্রার আলোচনা যখন গুরুত্বরূপ ধরেছে, পাল মশাই তখন লোটা সাকী রেখে সাক্ষাৎ চিড়ে-গুড়ের গুরুত্ব ভোগ করছেন।

সিদ্ধান্ত হলো—সা-রীপ পর্যন্ত স্টেট্ বাসে, বাকি লঞ্চ কিংবা নৌকায় সমুদ্র-বুকে। “তথ্যস্তু” বলেই পাল-মশাই কোমর কবে তৈরি, জীবনদা বললেন—ধীরে, বন্ধু। ধীরে, যাত্রী হ'তে হ'লে আগে অধিকারী হতে হবে। পাল-মশাই তো অগ্নিশর্মা—বলো কী দাদা, আমরা কি

যাত্রার দল, তাই অধিকারী সাজবো? জীবনদা বললেন—
আরে, না-না, তা' নয়, তবে—কলেরা বসন্তের টাকে ফিকে
গুলো তো নিতে হবে!...চৌচিয়ে উঠলেন পাল-মশাই—
দেখিস মা ওলাইচণ্ডী!

টিকিট এবং টিকের জন্তে সকালে যেতেই হলো—
হাওড়ায়। সেখানে দেখি ছোট্ট লাল আর তেওয়ারি-
গুটি বেশ গুণগোল পাকিয়েছে টিকিট-লাইনে, টিকে-
ওয়ালারা বসে আছে লাল ফেস্টুনে খবরদারির হুঁশিয়ারি
ছড়িয়ে। সাম্নে যেতেই প্যাট প্যাট ক'রে ফুড়ে দিয়েই
হাতের পেশীটা দিলো চিরে, তারপর নাম-গোত্রের নিকুচি
লিখে একটা চিরকুট হাতে দিয়ে বললো—যান! পাল-
মশাইয়ের চোখ-দুটো দপ্-দপ্ করে উঠলো—যেমন
উঠেছিলো শকুন্তলার ওপর দুর্বার! চোয়াল চেপে
তিনি চিবিয়ে বলেছিলেন—বাটারা পাকা-পাষণ্ড।

বিকলেই বেরিয়ে পড়লুম সোজা হাওড়ায়, চড়তে হবে
কাকদ্বীপের স্টেট-বাসে, চড়তে হবে বললেই কি হলো?
এ যে ভীষণ গুঁতোগুঁতি পথের বাবা! সাগরী-ঘাঘরী
ঘরগীরী সবাই কোমর বেঁধেছে—তুষ্ট পালমশাই উর্ধ্বে
ছুটো হাত তুলে খোলা-খুলি আকাশওয়ালাকে বললেন—
দেখো প্রভু, এ-সময় আমার হাত দুটো যে-শালারা ফোঁড়া
ফুঁড়ি করে বেহাত করে দিলে, সেই কুলঙ্কারদের তুমি
কাস্তে দিয়ে কোতল ক'রো। এদিকে চৌচিয়ে উঠলেন
জীবনদা—আরে, বাস এসেগেছে, এক-ধাক্কায় চোখে ধাঁধা,
তুধু “উঠিয়ে-হাটিয়ে” শব্দ, মাত্র এক মিনিটে পিছুওয়ালারা
সায়ের মাহুযগুলোকে ধেন বস্তা গোঁজা করে দিলো বাসের
ভিতর, ভাগ্যে জীবনদা পালমশাইয়ের বোঁচকাটা সাম্মা-
ছিলো, নইলে পাল মশাইয়ের নিপাতনে সিদ্ধ অনিবার্হই
ষটে যেতো।

মহামেলার যাত্রী, মহামত্রে দীক্ষিত, অন্তরে অন্তঃ-
সলিলা মহামিলন, তাই দেহ-জাতের কোনো বাধা নেই,
বালাই নেই। বাসের ভিতর দিসারি দোসাদের পায়ের
তলায় একটু ঠাই পেলুম, তাও আবার তার লোটাটা আর
আমার ফ্ল্যাজটা ঠোকাতুঁকি লেগে গেলো, মিঠুটি যদি তাঁর
কোলের মেয়েটাকে একটু কাৎ করে' কোমরটা না
ব্যাকর, তাহোলে দিসারি দোসাদের নাগরা-জুতার শুঁড়টি
নিশ্চয়ই মাথা নাড়তো। পালমশাই তো ছ'বাহ বাড়ারে

ক্রুণ-বিক্রয়করী মতো দণ্ডায়মান, সৌভাগ্যবান জীবনদা
শ্রীখণ্ডী ছেদী-মহারাজের দাবনা-সেবার ভার পেরেছেন—
অর্থাৎ, জু'জনের আসনে তিনজন স্থানধিকারী হোলে
অপর একজনের অর্ধাংশ যে—নিজ-অংশের গুরুত্বরূপ ধারণ
করে, এ-বিষয়ে মার্কেস বা শুভরূপের একমত।

বাঙালী কণ্ঠাঙ্কুর হিন্দীতে খেঁকিয়ে উঠলো—আউর
নেহি হোগা। বাস ছাড়লো, সন্ধ্যা শব্দে বাড়াচ্ছে,
সদন্তে ছেদী-মহারাজ চিমটে ঠুঁকে বলে উঠলেন—জয়
গঙ্গামাইকী!...যাত্রীরা নোলাসে...জয়! আবার সদন্তে—
জয় কপ্পে বাবাকী—জয়!

পাল-মশাই চট ক'রে একবার নাক-কান মলে'
নিলেন। বাস চলছে মহানগরীর ভিড় ঠেলে, দেখতে
পাচ্ছি কি ছাই, তবু উকি-ঝুকি মেয়ে দেখলুম—তখনো
অটালিকার আড়ালেই চলেছি, মনটা চাইছে ফাকা
মাঠ—নিরালা পথ, তাই মাঝে-মাঝে সে গুমুরে উঠছে,
বিদেশি-যাত্রীরা স্বদেশি-গান ধরেছে—জয় সীয়ারাম জয়,
জয় সীয়ারাম!...পাল-মশাই মাথা চালছেন, আমি
কিংকর্তব্যবিমূঢ় হোয়ে একটা সিগারেট বের ক'রে ফেল্লুম
—দেশলাই জালতেই একটা অপরিচিত ঠাত এগিয়ে
এলো—দাদা, আখায় একটু ফিরে দিখি, বাংলার সরদ-
মাটির একটি বিশুদ্ধ মাহুয—শ্রামবাজারের শিবু নন্দী
আর তার মঙ্গী ভুগুরাম কোলে। বেশ আলাপ
জমালুম নন্দী ভূকীর সঙ্গে, শীত যে কখন সরে' পড়েছে—
জানতে পারিনি, লং-কোটের বোতামটা খুলতেই হলো,
বাকু—এবার বাচলুম, শহর ছাড়িয়ে পড়লুম ডায়মণ্ড-
হারবারের দোজাপথে। বাকু আলপথটা দূরে আঁধার
রাজ্যে মিশে গেছে, যে যার শীতের ঠাণ্ডার ঘোঁরা
চাপা দিয়েছে, কাছাকাছি জু' চারটে নারকেল গাছ মাঝে
মাঝে মাথা নাড়ছে, সব চুপচাপ, তুধু বাসের চাকার চট্ট-
চট্ট শব্দ...

ভূকীমশাই, অর্থাৎ ভুগুরাম কোলে একবার গঙ্গা-
ঝাড়া দিয়ে বললেন—থান দাদা, একটা শ্রামবাজারের
কড়াবিড়ি, ফস করে' নিজেও ধরিয়ে ফেললো একটা,
নন্দী-মশাই প্রদ্ব করলেন—কখন নাগাদ কাকদ্বীপ
পৌছুবে দাদা, কণ্ঠাঙ্কুরই উত্তর দিল—আরে মশাই,
লাগে তো ভিনবন্টা, জুবে রাজিকাল, খাল-জোবা-দাতা,

তাতে আবার আমাদের বাসটার একটা চোখ নেই—
তাই ঘণ্টা-চারেক লাগবে। সবিস্ময়ে পাল-মশাই বলে
উঠলেন—তার মানে? কণ্ঠাক্তার জবাব দিলো—মানে
কিছু নেই মশাই, একটা হেড-লাইট জ্বলে—আর একটা
দেখে। দিসারি দোসাদ মুখে থৈনি গুঁজে বললো—
সরকারি হাল ওই কিসমকিই হার বাবুজি! গর্জে
উঠলো নন্দী—ভুলী—হোলোই হলো! নগদ যাতায়াতের
আট আটটা টাকা কান মলে' নিয়েছে। বেশ সোরগোল
উঠলো যাত্রী মহলে। সায়ের যাত্রীরা এক বাক্যে হাসতে
হাসতে সাগ দিল—সত্যিই, আমাদের বাসটার একটা
চোখ কানা—আলো নেই।

পিছু বাসগুলো শন-শন পেরিয়ে যাচ্ছে টিটকারি
দিয়ে, দাঁত কড়মড় করছেন পাল-মশাই। এ-দিকে
মিঠুটি আমার কাঁধটাকে বালিশ করে' নিশ্চিন্ত হয়েয়েছে,
তার কোলের মেয়েটা মাঝে-মাঝে খুঁৎ-খুঁৎ করছে,
কী জালা, দিসারি দোসাদের জুতোর গুঁড়টা আবার
খোঁচা দিচ্ছে কেন, কে-একজন গরম হোয়ে উঠলো—
আরে ঠিকসে বৈটো!

ছেদী মহারাজ ছোটো-কলকের ছিলিম চড়িয়েছেন—
চোরাটে ধোঁয়া বেশ আমেজ আনছে। লাকিয়ে উঠলো
নন্দী-মশাই—ঐ তো আলো, এসে গেছি। অনেকেই
হকচকিয়ে উঠলো।

শ্লেষটানে কণ্ঠাক্তার বললো!—বহন বহন, ওটা তো
ডায়মণ্ডহারবার, এখনো ত্রিশ-মাইল বাকি।

বাস দাঁড়ালো, যে বার হাত-পা ছাড়াতে নামলো,
পালমশাই গালে হাত দিয়ে পথে বসলেন, জীবনদা ধাঁ
করে' এক-কপ্‌টী চা ধরলেন পালমশাইয়ের সায়ে,
পিছনদিকে চারের কপ্‌টীটাকে উল্টে দিয়ে করজোড়ে
প্রার্থনা করলেন পালমশাই—এক গেলাস জল—দয়াময়!
কেউ বিড়ি ফুঁকছে, বড়ো-কলকের ভুটরার মাথায়
মাথায় আগুন ছাপিয়েছে ছাপরা জেলার মিছরি-দুবে।
জীবনদা আঙুল বাড়ালো—আরে, ঐ তো বন্দর, ঐ তো
সমুদ্র। চির-রহস্য সমুদ্র, চির চঞ্চল, চির স্বাধীন, দূর
থেকে ঘেন একটা রূপোলি রেখা...পালমশাই তো
একবার নাক-কান মলে' প্রণাম ঠুঁকেই ফেললেন।
কণ্ঠাক্তার ভাড়া দিলে—উঠে পড়ুন, পালমশাই দেখি নৃত্য

ভক্তিয়ার পা-হাত ছোড়াছুড়ি করছেন, অর্থাৎ শেব-
বারের মতন অন্ধ-প্রত্যঙ্গের অবশতা ছাড়াছেন। হড়মড়
করে' সব উঠে পড়লো, এ কী কাণ্ড! সেই না চেঁকিং-
অফিসার পালমশাইকে প্রশ্ন করলেন—টিকে নিয়েছেন?
পরশুরামের ভুলী আর দুর্বাসার চোখ নিয়ে খিচুড়ি-
ভাষায় শুনিয়ে দিলো—জ্বারে মশাই, তা' নাহ'লে এতক্ষণ
আপনি কি আসতো রাখতেন? এই দেখুন—ডান
হাতে টিকে আর, বাঁ-হাতে ফোঁড়—এক-হাতে গুলাই-
চণ্ডী, আর এক হাতে বসন-চণ্ডী, হাত দু'টোই শালা
বেহাত! মুচকি হেসে অফিসার নেমে গেলেন, গাঁটরি-
চাপা মাহুঘটা টিকি নেড়ে জিগোস করলো—বাবুজি,
সুইওয়ালা সাহাব ভাগ্‌গিয়া?

বাস ছুটছে, জীবনদা গোটাকতক নেবু-কোয়া কোলে
ছুড়ে দিলো, আমি আবার ছুড়ে দিলুম হ'-চারটে নন্দী-
ভুলীকে, এক-কোয়া চুষতে লাগলুম, মনে হোলো মিঠুটিকে
দিই, পারলুমনা, তবে পেরেছিলুম তার পিঠে ঠেস রেখে
ঘুমিয়ে পড়তে। মিটিঠর মিটি আগুয়াজ—বাবুজি, আগিয়া
চমকে উঠেদেখি—এ কী মিটিঠকে যে একবারে তাকিয়া
করেনিয়েছি! ধড়মড় করে' সোজা হোলুম, গায়ে গা
বুলিয়ে সোহাগ জানালো দিসারি দোসাদের নাগরী
জুতোটা। হাঁপ'ছাড়লো বাসটা, কাকদ্বীপের কয়েদীদের
নিয়ে। যে বার মত নেমে পড়লো, আবার বেতে হবে আধ-
মাইল রাস্তা, নইলে গঙ্গার জেটি পাবোনা, জেটি না পেলে
লঞ্চ পাবোনা। উধাও বুচকি' পালমশাই প্রস্তুত, তবে
একচোট টিকাওয়ালাদের গালদিয়ে। পিছুনিলো নন্দী-
ভুলী, মালবাহী রিকশার প্যাক-পোক শব্দ, সমস্তে পাল-
মশাইয়ের স্পষ্ট জবাব—নেহি মাওতা হ্যায়। জীবনদা তো
জোর করেই বোচকা বুচকি নামালো রিকশায় পাল-
মশাইয়ের খেদোক্তি—উজ্জরদিলে দেশটা তোমাদের মতো
ফটিকচাঁদ ফুটকলাই বাবুরা।

সর্বনাশ...এ যে দাঁতকপাটি পর্বরে বাবা! রাতকে
দিন ক'রেছে হাসাক আলোয়, অসংখ্য-মাহুঘ কিলবিল
করছে, শান্তিরক্ষীরা হাঁকাহাঁকি ছুটোছুটি করছে, মাইকে
ঘোষণা করছে শান্তি শৃংখলার কণা, কিন্তু কে কার
কথা শোনে, বিশৃংখলাতে মাহুঘের একটা বিশেষ বীরত্ব
রয়েছে বইকি, সেটাকে আবার বিশেষণে ফেললে বেশ

আমোদ পাওয়া যায়, তাই সোজা দরজার কপাট ঠালায় চেয়ে পাঁচিল উপকানোর চের আনল।

আংকে উঠলুম মিঠঠিকে দেখে, গদগদভাবে—বাবুজি হামারা আদমী ছুটগিয়া, নাও ঠালা, কী করি, এ-দিকে জীবনদা চান্দর ধরে টানাটানি—আরে জলকরের টিকিটটা কেটেনিয়ে এসো, নইলে লঞ্চে কিংবা নৌকোর স্থান হবেনা। আবার মিঠঠির কাতরোক্তি বাবুজি, হাম ক্যা করে।...চুলো জালাগ হারামভাদী—পালমশাইয়ের স্পষ্ট জবাব, তারপরই এক ধাক্কা আমাকে। দশহাত ছিটকে পড়লুম একেবারে বাজীস্রোতের ভেতর, ব্যাস। টেনেনিলো চুষকের মতন, কোথায় বাচ্ছি, কেমন করে বাচ্ছি জানিনা, নন্দী-ভূটো নামমাত্র মাটিতে ঠেকে আছে, তখনো একটা কীপ-স্বর কানে বাজছে—“বাবুজি”...আর এক ধাক্কা পাসপোর্টের গেটপাস করলুম, পাস ফেল জীবনদা বুঝে—আমি তো ভ্রমরি খেয়ে পড়লুম মা গঙ্গার কোলে। কত পাসকরা বাজী দেখি কবল মুড়ে’ এ পাশ ও পাশ করছে। ধূসর ধূসরির মতো একজন লম্বা লোককে জিজ্ঞাসা করলুম—“লঞ্চ কব ছোড়গা জী?” হেসে ফেললো লোকটা, উত্তর দিলো বাংলায়—“গুনছি তো যখন তার মজি হবে। মুচড়ে গেলো পেটের নাড়িগুলো, সঙ্গে স্নায়ু ছিলো, হুঁ-টোক চা খেয়েনিলুম। নন্দী-ভূটীকে দেখতে পাচ্ছি না, পালমশাইয়েরো পাস্তা নেই, জীবনদা এলেন হস্ত-বস্ত ভাবে—হাতে পাসপোর্টের টিকিট, হাঁপ ছাড়লেন কোমরে-কথা রূপারটা খুলে নন্দী-ভূটী দেখছি নেদিয়ে নেদিয়ে আসছেন, পালমশাই এলেন যুদ্ধে জয় করার মতন কান্না-মাটি মেখে, কোটের পিছনটা বেশ খানিকটা ফেটে গেছে। বিস্কৃত বাংলার জীবনদা বাণী দিলেন—বাবু, জলকর তো দেওয়া হলো এখন জলপোত পেলেই বাঁচি, হেঁচে ফেললেন ধূসর ধূসরির, বেশ পরিপাটিতে দক্ষিণ বাহু প্রসারিত করে দেখালেন, “ঐ দেখুন, জেটি বাবার বাঁধ, তারপর জেটি—তারপর লঞ্চ।” সে কী—জীবনদা খেপে উঠে জবাব দিলেন—ককখনো না, সরকারি-লোক বললো, এইঘাটেই লঞ্চ ছাড়বে। পাগড়িটা কবে নিয়ে ধূসরির হাসতে হাসতে বললো—সরকারি লোকের লম্বা আঙো সব-লোক খুঁজে পেয়েছে বাবুজি? জীবন-ভোরই ধনী দিচ্ছি শুধু ধাঁধা আর ধোঁকা!...ধমক দিলো

পালমশাই—চলোনা হে ফুটকলাইয়ের দল, ঐ-দলে ঢুকেই ঢোক গিলিয়ে, কথাটা খুব সহজ, কিছ কাগজটা? আবার বেকতে হবে মাস্তবের জমাত ঠেলে, আর যে-পথ রয়েছে তার পথিক নেই—কাঁটা গারে বেরা, ঘোরা ফেরাই সার।

এ কী কাণ্ড। এ-দিক ও-দিক বাজীদের বাঁধ দিয়েছে হ’টো পুলিশ-ভ্যান, ভ্যান ভ্যান করছে বাজীরা ঐখানেই, এগুবার জো নেই। আর বাবেইবা কোথায়, তার আগেই তো জমে আছে প্রায় হাজার দশেক লোক, মা গঙ্গা ওদের টানলে তবে আমাদের টান পড়বে, তার আগে লটান দেওয়াই ভালো। পালমশাইয়ের কাঁচ-পাকা-খবর—লঞ্চ ছাড়বে রাত-বারোটায়, ততক্ষণ পেটটাকে পুরো করে’ নিই এসো। তাই হলো, নন্দী-ভূটী তো কুটির দিল্লী খুললো, পালমশাই তো গণ্ডে-পিণ্ডে গিলে ঘটিটাকে মাটিতে ঠুকলেন, জীবনদা তো একটা গানই ধরে ফেললেন গুনগুন করে—“ওরে পথিক, পথচলা তোর অনেক বাকি।”

একদল হারিকেন বাজীকে দেখলুম, দলপতি কামাক্সা-চরণ, আমার ক্যামেরাবন্ধটার দিকে কটাক্ষ হানছেন, একটু তফাতে আড়চোখে দামিনী-বৌ, পঞ্চদাসের মাথায় পটুলি, তাতে ঝুলছে হুঁটো হারিকেন। সহযাত্রীর সহায়-ভূতির অস্ত নেই, কামাক্সাচরণ চরণের মশা চাপড়ে বলে’ উঠলো—হ্যাঁগো বাবু-মশাই, তোমরা বুঝি জাহাজে যাবেন? শুধু সারদিলুম। এ-দিকে হাঁপুচুপু খেয়ে হেঁকে উঠলেন নন্দীমশাই—আরে এইতালে দেখছেন তো কত বাজী পাস করছে পুলিশ-গাড়ির তলাদিয়ে। পালমশাই তো বৌচকা বাগিয়ে বলে উঠলেন—মাত্তঃ। গিয়ে দেখি—ওমা, এবে জিশব্ব স্বর্গলাভ। কতক বাজী ঢুকেছে বটে ফাঁক পেয়ে, তার পরেই বাহুরা টের পেয়েছে, মাঝখানে আটকে গেছে, ও-দিকে পুলিশ-লাঠির গুঁতো, জান বাঁচাও জান বাঁচাও রব, কিছ বাঁচাবে কে? ভাগো বন্দী পাকড়ে আর অবদমন্ত খা ছিলো, তাই টেংরী ধরে টেনে-হিঁচড়ে গোটা-কতককে উদ্ধার করলো। কেঁদে উঠলো সিন্ধা তপী, তার সর্বস্বল পোটলাটাকে কে হজম করেছে!

কাঁচা-খবর কানে এলো—ও-দিকে পুলিশ নাকি স্নায়ু পুন করছে, তাই চলো। হায় অদুট! কোথায় কী! শুধু হৈ হৈ—বৈ-বৈ শব্দ, চিড়ে চ্যাপ্টা হ’রে চৈচিয়ে উঠলো কার একটা কোঁসের বাচ্চী, বাজখাই আওয়াজে একজন

বলে উঠলো—আরে রাম, কোন্ গরম-পানি ঢালতে হো। হো হো করে' হেসে উঠলো পূর্ব-বন্ধের পুলিশটা, প্রাণপণে সে কলটা ঘুরিয়ে দাঁড়ালো। তবে একটি মাচ্চা কথায় সে সাফ বলেদিলো—লঙ্কের আশা ছেড়ে নৌকায় যাবার চেষ্টা দেখুন, কারণ আপৎকালীন অবস্থায় অল্প লক্ষ্য দেওয়ায় আরো আপদ বাড়িয়েছে। সে পথে প্রণাম হুঁকে পালমশাই তো মুখ ফেরালেন, চলো গঙ্গার ধারে—নৌকোয় যাবো, সবাই শায় দিলো—তবে যেইনা গঙ্গার পলিতে পা দেওয়া, অমনি প্যাক করে পা-টা পাঁচ ইঞ্চি বসেগেলো, পালমশাই তো হেসেই খুন, ক্ষমা করলোনা মাথার পুঁটলিটা, পালমশাই বতই হাসেন পোটলাটা ততই টিপে ধরে নন্দী-ভৃঙ্গী আবার টানাটানি করে সে ক্ষেত্রে উদ্ধার করলো।

এখন গঙ্গার ভাঙা, তাই নৌকোগুলো তার নেবে না, শুধু দেখবে যাত্রীদের ভাব-ভামাশা। আর তাকাবো না জেটীর দিকে—যা' থাকে কপালে—যাবো নৌকোয়। লেংচে-লেংচে এবার শীতের আকির্ভাব, একে খালি-পা, তার ওপর জল-কাদার ঠাণ্ডা, পা-হু'টো আছে কিনা তাই দেখবার জন্তে সরে গিয়ে দাঁড়ালুম হাসাক-লাইটটার তলায়, এখন বেশ অসুস্থ করলুম—আমার পদোন্নতি ঘটেছে—মানে, পা-হু'টো জল-কাদায় কেজি-দশেক ভারি হ'য়েছে। মন চাইছে—চাওয়া-চায়ির বালাই চুকুই। চমকে উঠলুম বামা-কণ্ঠে—তোমরা কি নৌকোয় যাবে বাবা? ঠিক মটর-মাসীর যথো, তবে দাঁতে যিশি নেই, উত্তর দিলুম—ইচ্ছা তো নৌকোয় যাবা, তারো তো উপায় দেখছি না। সহাত্রে তিনি তাঁর দলকে ডেকে বললেন—“এখানে উপায় করে নিতে হবে রে বাবা!” কথায় বেশ স্নেহের চুম্বকি, গলায় তুলসীর মালা, পরনে কেটের কাপড়, কাঁখে একটা পুঁটলি, পিছু ফিরে ডাকলেন—ওরে ও কান্ত, এইখানেই সব দাঁড়া। পিল-পিল করে' জন-পনেরো এসে জমলো বেশ, বেশিকণ তারা হাঁপ ছাড়তে না ছাড়তেই আর এক বুঝা-যাত্রী হাজির—“দাদা কি বোটে যাবেন?” কী জালা! জলে' উঠেই জবাব দিলুম—ইচ্ছে তো হচ্ছে দাদা, পাচ্ছি কই? শাধা দাঁতে সজ্জব—“পাবেন বইকি, নিশ্চয়ই পাবেন! এতদূর যখন টানিয়েছে, তখন কি টান মেরে ফেলে রেবে তাবছেন?” কী বিপদ, এত ইয়ালি কে শুনেতে চায়

বাপু, কে' যেন ফিক করে' হেসে উঠলো—আর চাইতে হবে না, চাইলেই, চাক-চাকি, মাসীয়ার দলে একটা উনিশ-বছরের খুকি হাসছে।

আমি হাঁক দিলুম—ও জীবনদা, হেথায় এসো, হোথায় আর পাক ঘেঁটে কাজ নেই। জীবনদা লাড়ো দিলেন—সবুর ভায়া একটা কুল পেয়েছি। তন্তোর কুল, এদিকে আমি যে নিমূল হতে বসেছি। আবার বুঝা-যাত্রী প্রশ্ন করলো—তাহলে বোটেই যাবেন তো? য়েগে উত্তর দিলুম—কেন বলুন তো?—তাহলে আপনাদের মঙ্গী হতুম, আমরাও আছি তেইশজন, উথলে উঠলেন মাসীয়া, গলা চড়িয়ে বললেন—ভালোই হলো, আমরাও যে আছি—দ্বিবি একটা মাঝার নৌকো বিজার্ত যাবে। এদিকে জীবনদাও এসে পড়েছেন, মাসীয়ার হতেই মত, বুঝক ছুটলো তার দল ডাকতে, কেন জানি না, পালমশাই আবার নাক কান মলে' করজোড় কপালে হুকলেন, ভৃঙ্গী রণে ভক্ত দিয়ে জুতো জোড়াতাকে গলায় ঝুলিয়েছেন, উপস্থিত সবাই ক্রম কতি তুলে ক্ষান্ত হয়েছি, কে খুক-খুক করে' কেসে উঠলো, আর-কেউ নয়—সেই মাসীয়ার দলের উনিশ-বছরের খুকিটি, ডুব-ডবে চোখে চাওয়া-চাওয়ি করছে, চিমটি কেটে বললো জীবনদা—হিঃ, চাইতে নেই, তুমি না তীর্থযাত্রী?

বলতে গিয়ে উলটে পড়লো নন্দীমশাই, মুখে তার খই ফুটেছে—ঐ তো, ঐ তো হনহন করে' আসছেন ওনারা। সত্যিই আসছেন সেই তেইশ-যাত্রীর দল। বাঃ! একটা খোলও আছে দেখছি, তাহলে করতাল নিশ্চয় থাকবে। এসে পড়লেন সব। সবীর আগে একটি সংবত সখবা মূর্তি, সাক্ষাৎ পল্লীসমাজের জ্যোঠাইমা, তবে সখবা, মিষ্টি ডাক—খোকা, আমরা তাহলে কতজন হচ্ছি দেখো।...সে আর দেখতে হবে না মা, আমি সব দেখে নিয়েছি, হবে, খুব হবে—একটা মাঝার নৌকো বিজার্ত হবে, উত্তর দিলো মেদিনীপুরের মাসীয়া, খোকা তখনো গুণছে—খাট্টি-ফট্টি করে, একটু গলা কমালো খুকিকে দেখে, তারপর গলা ছেড়ে গা বেড়ে বলে উঠলো—ফট্টি জি অনলি, পিসিমা। শান্তভাবে সম্মতি দিয়ে পিসিয়ার দৃঢ় নির্দেশ—ডাক একজন মাঝিকে, মাসীয়া বাবা দিয়ে—ডাকতে হবে না মা, সময় হলে ওরা আপনাই

আসবে, পিসিমার সংঘত উত্তর—একটু আগে আসাই ভালো।

মাঝির এক কথা একট্রোপে—একশো টাকা, মাসীমার জিন্দ—আশি, পিসিমার—পঁচাশি, সাত-পাঁচে সময় যাচ্ছে, সবাই এগুচ্ছে, পিছুচ্ছে—মাথা নাড়ছে, শুধু হেসে মরছে মাসীমার দলের খুকিটা, যেন খোঁজা দিয়ে খোঁচা দিচ্ছে, তাই খেঁকিয়ে উঠলুম মাঝিকে—ভেড়ে ব্যাটা নৌকো, তাই দোবো। মাঝি তো আহ্লাদে আটখানা, মাসীমা, বললো—ছেলে বড়ডো বোকা, ওতেই তো ও রাজি হতো—তা হতো, তবে রাত পোয়াতো, উত্তর দিলো খুকি। খোঁকা দেখি আমার পিছুদিকে ধোঁয়া ছাড়ছে। একটা জীর্ণ-শীর্ণ যাত্রী জড়িয়ে ধরেছে—হামতি চলগা মাইজী। পিসিমার ক্ষমাহীন চোখে প্রত্যুত্তর—নেহি হোগা। মাসীমা দাঁতনিকূচে—আহা, তাতে ক্ষতি কী দিদি, ওতো ভাড়া দেবে। ভাড়ার চেয়ে গুরু ভারটা হবে বেশি—স্পষ্ট জবাব পিসিমার। পিছিয়ে এলেন মাসীমা পাঁচ হাত। ও-দিকে অল্প যাত্রীরা মার-মার শব্দে নৌকায় উঠছে, আমাদের মাঝিটা হাত নেড়ে হাঁকছে, হাতটা তার শুধু উত্তর থেকে দক্ষিণে ঘুরছে, মনে হচ্ছে অটো-মেটিক, অর্থাৎ নৌকো আমাদের কাছে আসবে না, আমাদেরকেই যেতে হবে নৌকোর কাছে, তাও আবার তটের ক্ষুদে-খালটা পেরিয়ে—তাই চলে।

পিচ্ছিল পথ—দুর্য়দ কাদা—যাত্রীরা হুঁশিয়ার! হন হন করে পা বাড়ালো পালমশাই, হঠাৎ ধমকে টেঁচিয়ে উঠলো—এ কী হে, এ যে ভীষণ বৈতরণী, বাঁধের জল বোধহয় এই-পথেই নামে বর্ষায়, এখন একটা ফুটো জল-ভিক্রি পূল হয়েছে, পেরুতে হবে তার কানার-কানার ধীর কন্ডমে, কোমর বঁকলেই কাৎ, তখন আর শ্রীহরির হাত থাকবে না, তাই তার আগে চোখ বুঁজে শ্রীহরি স্মরণ করে জীবনদার হাত ধরলুম, জীবনদা যে কী ক’রে জড়িয়ে-মড়িয়ে পার করলেন, তা’ জানতেই পারলুম না, চোখ খুলে দেখি—পার হয়েছে।

সামনেই গঙ্গাতীরে আছাড় থাচ্ছে আমাদের নৌকো। জলে পাটা ফেলে আদর ক’রে ডাকছে আমাদের মাঝিরা—চলে আশুন বাবুরা, খুব সামলে, বড়ডো পিচ্ছিল, ডানদিক চেপে, বাঁয়ে খাল। এইতো আসল বৈতরণী, এ সময় একটা

এঁড়েবাহুরও নেই। হড়বড় করে তো সব নেমে পড়লুম, কাপড় চোপড় বেশ উর্ধ্বে উঠতে লাগলো, শুধু নামো নামো শব্দ নাহেহাল যাকে বলে হতে হচ্ছে, শুধু নাছোড়বান্দা যাত্রী, যেমন ক’রে হোক জল ঠেলে, পাক ঠেলে, শীত ঠেলে উঠতেই হবে নৌকোয়। মাঝিরা একটা দশ-ফুট লম্বা আর দশইঞ্চি চওড়া পাটা ফেলে পায়তারা কষছে, কিছু ভয় নেই বাবুরা, উঠে আশুন, চলে আশুন, খুব সামলে।

সর্বনাশ! পা যে পাটার দাঁড়াতেই চায়না, শুধু পিছিয়ে আসে। আসবেই তো, একে পায়ে পাক, তাতে আবার পাটাটার পেটটা চিতিয়ে আছে, তার ওপর অবলম্বনের কোনো বালাই নেই, শ্রেফ নিরালম্ব মিশন। স্মরণ করলুম তেনজিং-হিলারীকে, সঙ্গে সঙ্গে ফল পেলুম, শুরু করলুম বাদরের মতো হাতে পায়ে উঠতে, ককিয়ে উঠলো হেসে সেই কচি খুকিটা, আমার দাঁত কড়মড়িই সার হলো, ঘাড় কেরাবার উপায় নেই, শুধু সংখেদে শ্রীহরি, মনে মনে বলতে লাগলুম—সগুগো চাইনা প্রভু, শুধু ওপরের ঐমাক্সি ব্যাটার দিগ্-দরাজ হাতটা ধরিয়ে দাও। যখন মাঝির কড়াহাতটা আমার ধরেছে না কামড়াচ্ছে বুঝতে পারছি না, এমন সময় ভূঙ্গীমশাইয়ের গলার ভয়ঙ্কর শব্দ—গেলো, গেলো, সব গেলো, ধরো-ধরো, কী ধরবে, কাকে ধরবে, না পেয়ে সবাই টেঁচিয়ে উঠলো—ধরো ধরো, শুধু পালমশাই হাঁকড়াচ্ছেন, পাকড়াও পাকড়াও, তারপর সত্যিই একজন পাকড়ে ফেললো, তবে সাত-পাঁচ এমন কিছু নয়, মাত্র ভূঙ্গীমশাইয়ের একপাট জুতো। আমি তখন জুত ক’রে নৌকায় বসেছি, হেলে বেকে নেদিয়ে লেংচে যাত্রী উঠছে পাটাবেয়ে, ম্যাগনেটের মতো টেনেনিচ্ছে মাঝির হাতটা—তারপর হাতড়ে হতুড়ে, হেঁকে ডেকে নৌকোর ওপর হাঁপ ছাড়া।

নৌকোর মিটমিটে হারিকেনটা যখন তীরের হাসাকটা দেখে হাসছিলো, ভূঙ্গীমশাই তখন গায়ে চাষর ঢুলিয়ে সাশুন দিচ্ছিলেন তাঁর হাবুডুবু খাওয়া জুতোটাকে। যে যার ছড়িয়ে শুছিয়ে বসেছে, বসবেই তো। একশো জনের জায়গায় মাত্র তেতাল্লিশজন, কে যেন জিজ্ঞেস করলো কটা বাজলো হালা? হাত ঘুরিয়ে দেখি থাক। খেয়ে ঘড়িটা ঘুরিয়ে গেছে, তাই হেসেই বলতে হলো—

ঘড়িটার বারোটা বেজে গেছে, থোকা সায় দিয়ে উঠলো ঠিকই বলেছেন তো, বারোটাই বাজছে এখন, অবশ্য দশ মিনিট ফার্স্ট আছে।

ঘড়িঘড়ে গলায় মাঝি বলে উঠলো—তাহলে পাটা তুলে দিই বাবুরা, সবাই উঠেছেন তো—না, নির্লজ্জভাবে উত্তর দিলো সেই ফিকফিকে খুকিটা। খুনকরাভাবে কেপে উঠলেন মাসীমা—বলি, তুই কেন ফড়ফড় করছিল বলতো যুধি—কেন করবোনা, দেখছোনা এখনো একজন জলে দাঁড়িয়ে হি-হি করছে? হঠাৎ সবার দৃষ্টি হুমড়ি খেয়ে পড়লো তার দিকে, সেই জীর্ণ-জীর্ণ মাছঘটা, যাকে পিসিমা বলেছিলেন—ভাড়ার চেয়ে ভার হবে বেশি। পিসিমা বেশ পাকাভাবেই পোটলার ওপর পা তুলে বললেন—কেন অনেক আগেই তো বলেছি, ওকে নিয়ে অনর্থক আর ভার বাড়াবো না। খুকি সহাস্ত্রে সহজ ভাবে—তাহলে সবই যে অভার হবে মা! কেন হবে—কিসে হবে, কে যেন বারফাটকা প্রশ্ন করলো, নির্ধাৎ উত্তর—সজ্জা করে না সহযাত্রীর সহায়ত্বভূতি ভুলতে? ভড়কে গেলো সবাই, উত্তেজিতভাবে থোকাই হুকুম ঝাড়লো—উঠাও উস্কে।

মাকড়িপর মাঝিটা হাল ধরলো, আর দুজন ধরলো দাঁড়। পিসিমার দলের একজন বলে উঠলো—“জয়। গঙ্গা-মায়িকী”, শব্দ উঠলো সহযাত্রীদের—“জয়”। যাত্রা হলো শুরু, ঝপ-ঝপ দাঁড়ের শব্দ, জয়ধ্বনি আরো আসছে অল্প নৌকো থেকে, আগে-পিছে নৌকাগুলো সার ধরেছে, মিট-মিটে আলোর একটা মালা যেন ঢেউয়ের তালে তালে ভেসে যাচ্ছে, শাঁখ-ঘণ্টার শব্দ উঠছে, তার মাঝে উঠছে সংকীর্ণনের স্বাবলীল স্বর, এ যেন এক মহালগনের মন্ত্রধ্বনি বিরাটের বৃকে সরাতের শ্রাণোচ্ছ্বাস।

কোথায় চলেছি, কেন চলেছি তার প্রশ্ন নেই, চলার ধর্মই চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে চলার পথে শুধু সহযাত্রীদের সোলাস জয়ধ্বনি সারা সাগরে ছড়িয়ে পড়েছে।

অশান্ত জলধি, আপন খেয়ালে আত্মহারা, কুরাশা-রাতের কুহেলি কেলি করছে, তাই প্রাণে বাজছে তার কল-কল-ছল ছল ছেলেমাছের হাসি। যাত্রীরা যে বার মত ছড়িয়ে ঝড়িয়ে বসেছে, একধারে একধারে হয়ে বসেয়েছে তারী-বাবা, পিসিমার সেই তারী-মাছঘটা, হঠাৎ টাটি

পড়লো খোলে, ঝন-ঝন করে উঠলো করতাল, স্বর উঠলো সাগর সঙ্গমে—হরেকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ-রাম রাম হর হরে। এই কণ্ঠ যে আদিম-অকৃত্রিম, অনাহত নাগের আত্মাদিনী-রসে মাথানো মাছঘর, আমাদের সহযাত্রী নদীয়ানন্দন আর ব্রজমণি। পরনে গেরস্থ বাস গেকরা নয়, স্বরণে কৃষ্ণদাস, ক্লান্ত নয়, চাতকের মতো চায়।

স্বরের মুছনা মন কেড়ে নেয়—স্বরণ করায় সেই কাল-জয়ী কৃষ্ণকে। ককিয়ে উঠার মতো সবাই স্বর স্বর দিলো, নন্দীমশাই মাথা চালতে লাগলো, কেউ হাসলো, কেউ কাঁদলো, কেউ তাল ঠুকলো ঘণ্টাখানেক ধরে, কয়ে এলো কলকণ্ঠ, কিন্তু কমে নাই পালমশাইয়ের পোটলার ওপর পদনৃত্য, তার ছায়াটা তখনো নাচছে খুকির মাথার ওপর, চাঁদ এবার মেঘের ফাকে মুখবারিয়ে সাগরকে চুমু দিলো, ছমছমে রাত, জলের ছিনিমিনি খেলা, কতক-কেউ সটান শয্যাশায়ী, কতক তুলে তুলে মাথা খুঁড়ছে, মাত্র দু’ চারজন সোজা আছে, তার মধ্যে একজন সরে এসে আমার প্রশ্ন করলো—কী দেখছো? উত্তর দিলুম—জলধি—কী বুঝছো? পার হতে হবে—মুর্থ—বলেই সে-মুখটা বিপরীত দিকে ঘুরে গেলো, এবং বিনা কথায় একেবারে কাঠ হয়ে গেলেন, আর ঘোটেই কথা কইলেন না, তিনি জীবনদা, ডাকলুম—ও জীবনদা, এ কী হলোরে বাবা। অথবাবে জীবনদা বললেন—মুর্থ, ঝড় উঠবে, ই্যা-ই্যা, নিশ্চয়ই উঠবে। ভেবে কূল পাইনা, একে তো অকূলে ভাসছি, তাতে আবার ঝড়, ঝট-পট করে উঠলো আত্মার পাখিটা। ডানহাতের তর্জনীকে তীরের মতো করে বললো জীবনদা—কী দেখছো? অনন্ত অদৃশ্য, কখনো না, ও ঝড়ের ঝংকার মুর্থ, ঝেড়ে তেড়ে উঠেপড়লো থোকা, দূরবীণের মতো দেখতে লাগলো হাতের মুঠো কাঁক করে, এ-দিকে ফুঁপিয়ে কাঁদছে স্বপ্নদেখে পাখীর মা, পিসিমার দেহরক্ষী, ঝড় কই? থোকার গলায় কাঁক ফুটলো, কেটে পড়লেন জীবনদা, দেখতে পাবেকি অন্ধ...তবে তোমরাই তার উত্তরসাধক, সবাই যেন একটু-একটু করে সরে এলো জীবনদার কাছ ঘেঁষে, শুধু একপ্রান্তে সেই জীর্ণ বেশ নির্ণয়কায় মাছঘটা। থোকা মাক্‌লারটা খুলে গলা ঝেড়ে প্রশ্ন করলো—তারপর? জীবনদা উত্তর দিলেন—এই মহাস ভারতে ধর্মবিপ্লবই আনবে ও কৃত রাষ্ট্রচেতনা, আর সেই

রাষ্ট্রই মানুষের অন্তঃসত্তাকে সঞ্জীবিত করবে মানবিক সাম্য-মন্ত্রে, শান্তি-সখা সংযোজিত হবে ঠিক এই গঙ্গাসাগরের মতো, প্রকৃতই সত্য-সাম্যের হোমায়নি জগৎবে এই ভারত-ভূমিতে, তাতে সারা বিশ্বের বিজ্ঞানীদের আহুতি দিতেই হবে এই মহাযজ্ঞের যজ্ঞ-কুণ্ডে।

কনকনিরে উঠলো আমার ভিতরটা, ধানভানতে শিবের স্নিত কেনরে বাবা। খুকি বেশ এক খোঁচা মারলো—আপনি যে অভ্যস্ত, তার প্রমাণ?—প্রমাণ আমার আত্ম-চেতনার পরাকাষ্ঠা আর বর্তমান বিশ্বের বিজ্ঞান-দৃষ্টি,—আপনি ইমোশনাল, অস্তিত্বে আধিক্যই এ্যাবনর্মাল এবং ইমোশনাল, তাকে পাগলামি বলতে বাধা কী?—বাধা এইটুকু, মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত-সহ্যার সহগামী বলেই কম-বেশি পাগল, তবে পাগলা-গারদে নয়।—পাগলারা তাহোলে গারদের আশাও রাখে বলছেন?...পালমশাই পাশফিরলেন—রাখে মাধবঃ ধলে, নদীয়ানন্দন বেশ নিচু গলাতেই মাড়া দিলো—এ যে ভাবের পাগল মা, অভাবের তো নয়!—তা বুঝছি-কত-গোঁসাই, তাই তো আপনারা কৃষ্ণ-কালীতে সারা দেশটাকে কালো করে, রেখেছেন!—তারো তো একটা কারণ রয়েছে মা!—অকারণটাই বেশি, কেন বলতে পারেন—আপনারা অভাবের কাঁখে চোখের জল কেলে তাকে কৃষ্ণভাবে বলেন? কেন বলতে পারেন ঈশ্বর—ঈশ্বর করে সারা জাতির ইচ্ছাশক্তিকে সম্পূর্ণ পঙ্গু করে দিচ্ছেন?—তারো একটা প্রয়োজন আছে মা!—আছেই তো, নিশ্চয়ই আছে! যেমন প্রাণটাকে ছুড়ে দাও কৃষ্ণ বলে' সে-কেউ আছে, আর হাত দুটো তুলে দাও হাত-ঝাঁটা বলে—বাস হ'য়ে গেলো ইহকালের ইত্তফা।

নৌকোটা যেন দাঁড়িয়ে গেলো, নিংড়ে দিলো মনটা, চুকটটা দাঁতে চেপে একবার চাইলুম মুখের দিকে, দেখতে পেলুম না, কার যেন মাথাটা আড়াল করেছে। এ-সংসারে যারা জয়মালা চায়না, অথচ জানতে চায়, জীবনদা ভাদেদি একজন, তাই আগিরে দিয়ে ঘুমিয়ে দেখেন, আর যারা জয় করতে চায়, জয়মালা চায়, নিজেরা আগে, অপরকে ঘুম পাড়ায়, তাই বোধহয় নদীয়ানন্দন, খোকা-খুকি জগৎমণি জেগেছিলো।

একদিন যেমন সাগরের তরে মায়ের কোলে ঘুমিয়ে-ছিলুম, আজ কিন্তু মানুষের তরে সাগরের কোলে জেগে

রইলুম, চেয়ে আছি আর মাঝে মাঝে চুকট টানছি, আর দেখছি চেউয়ের তালে চাঁদ নাচছে। কে যেন ভাবগাঢ় স্বরে বলে উঠলো—সুন্দরই সত্য, সত্যই ঈশ্বর।—প্রতিবাদ করলো চড়া-পর্দায় কে একজন—আধি-ব্যাধি সত্য তা বলে কি সুন্দর? অতএব সেখানে ঈশ্বরের অস্তিত্ব কোথায়?—তাহলে ঈশ্বর মানেন না?—মানি, তর্কে নয়, তামাশায়।

ঠক করে যেন কার মাথাটা ঠুকে গেলো, এ কী, সেই জীর্ণ মানুষটা হঠাৎ পড়ে গেলো কেন? বসেই তো ছিলো, ব্যস্তভাবে মাঝি হৈকে উঠলো—গীর গিয়া, গীর গিয়া, উঠাও জলদি। উঠে পড়ে সব ছটোপাটি লাগিয়ে দিলো, হৌচট খেয়ে আমি পড়লুম টপ্পরের বাইরে, এদিকে নৌকো কাৎ, মাঝি চেঁচাচ্ছে—নৌকো ডুবলো, এক-পেশে হয়ে গেছে, কে কার কথা শোনে, শুধু দেখতে হবে—মানুষটা রইলো না মলো! দেখা গেলো পিসিমাই তার মাথাটা কোলে নিয়ে নাড়া-চাড়া করছেন, ব্রজমণি পা দুটো টানাটানি করছে, কেউ বললো—মৃগীরোগ, কেউ বললো—জীতে, আবার কেউ বললো—অনাহারে, শেষে শুধু জীবনদা বললেন—সকল সব, ও-সব কিছু নয়, একে ভাব-সমাধি বলে। সবাই শিউরে উঠলো, সত্যি তো সাধারণ মানুষ জলসমাধি দেখেছে, মাটি-সমাধি দেখেছে, ভাব-সমাধি আবার কী? ভাবতে দিলো না ব্রজমণি, আর নদীয়ানন্দন, যখন তারা ভাবকণ্ঠে শুরু করলো ভারীবারার কর্ণকূহরে—“কুলকুণ্ডলিনী ঘুমভঙ্কর হে, হৃদিগ্রন্থি-বিদারণ কারণ হে, মম মানস চঞ্চল রাত্র-দিনে, গুরুদেব দয়া কর দীনজনে।”

ফুলের পাঁপড়ি খোলার মতো চোখের পাতা খুললো সেই জীর্ণ মানুষটা—যেন মৃত্যুর কোলে জাগলো চিন্ময়, সবই যেন এ-ভূমায় ভূমিষ্ট হলো। শাঁখ বাজিয়ে উঠলো নদীয়া-নন্দন। খোল-করতালের কলরোল সোরগোল তুললো, আবার, “হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে”—কিছুক্ষণ পর সব ঠিকঠাক হয়ে গেলো, তবে বেঠিক লাগলো আগেকার আবহাওয়া, এখন অনেকেই পেয়ে বসেছে ভারীবাবাকে, নিমেষে যেন লালবাতিটা নীল হোয়ে উঠলো। নাস্তিকান্তির মা তো নিজের কবলটাই চড়িয়ে দিলো ভারীবাবার ওপরে, নৌকোর টপ্পরের ভেতর জানা হলো ভারীবাবাকে, খোকা-বিছিয়ে দিলো তার দানো

শালটা, মেহিনীগরের মাসীমা তো একখালা কলা-নেবু ধরলো মুখের কাছে, মুচকি হাসিতে খুকি মুখ টিপে আছে, জীবনবা আর নদীরানন্দন হাততালি দিয়ে হরিনাম করছে, হঠাৎ হারিকেনটা দপ্‌দপিয়ে নিবে গেলো, একটা ঝড়োহাওয়া গায়ে বাজলো, মাঝি বলে উঠলো—বাবুরা হুঁশিয়ার, জোয়ার এসেছে। এক আঁচলা জল যেন কে ছুঁড়ে দিলো গায়ে, এ কী, নৌকোটা ডুববে নাকি, এত হলুছে কেন! বাতি তো নিবে গেছে, পরস্পর চেনা যাচ্ছে না, তবে বোকা যাচ্ছে, আবার জানিয়ে দিলো মাঝি—বাবুরা, হুঁশিয়ার, ঝড়ো হাওয়া চলছে, এদিকে ত্রাহিত্রাহি রব, দে দোল দে দোল, ডোবে আর দেহি নেই।

চেউঙলো কণা তুলে যেন ফোসফোস করছে, ফিসফিস করে থোকা বললো—সাঁতার জানেন? উত্তর দিলুম—ডুবতে জানি, পাশমশাই আমার পাটা প্রাণপণে টিপে ধরছে, থোকা তো খুলেই ফেললো গায়ের জামা, যে যার পোটলা-পুঁটলি ফেলে কোমর বাঁধছে, মাসীমা জপমালাটা বেশ করে জড়িয়ে নিলো গলায়, যাক দেহ—যাক প্রাণ, বৈঁচে থাক ধর্ম-মান! যে যার মানব-মানসিক দিতে লাগলো অশাস্ত্র সাগরকে, পালমশাই তো একটা ঝড়ওয়াল ভাল ছুঁড়েই মারলো, সর্বনাশ, এ যে আরো কেপে উঠলো সাগর, যেন বলতে চাইলো—এখন তোরা ফাঁকি দিচ্ছিল! জানিস, একদিন মা কোল থেকে ছেলে ফেলেছে; তবু ফাঁকি দিয়েছে, দেয় নি তার মনের মানত, তাই আজও চাইতে হচ্ছে নির্লজ্জ মাছুষের কাছে, সে যুগেও ফাঁকি দিয়েছিল, আবার এযুগেও কাজলাষি করছিল।

ভাবছি—এ সাগরের দাবি কী, এর ফাঁকিই বা কী আর মানতই বা কী? ঠিক দৈববাণীর মতো কানের কাছে অক্ষুট আওয়াজ—আপনার মানত দিয়েছেন? মর্মে স্পর্শ করলো—এ যেন এক মহামন্ত্র, সর্বাঙ্গ শিউরে উঠলো, কিন্তু এ মধুকর্ষ কার? এ যে কোকিলের চেয়েও কমলীয়, দাবানলের চেয়েও দহনীয়—মাত্র দু'টি কথা—মানত দিয়েছেন! এ সাগরকে তো এ সংসারে অদেয় কিছুই নেই, জাতকুলধনমান সবই দিয়েছে কালের যাত্রীরা, এমন কি সার্থক সৃষ্টি শিশুকেও মা নাড়ি ছিঁড়ে

ছুঁড়ে দিয়েছে সাগরকে, আরো দিচ্ছে—আরো দেবে, তাই তো বাত্মা এদের ধামেনি, তবে আবার কী অদেয় মানত আছে এ অমৃতভোগী মাছুষের। শাস্ত হলো না সমুদ্র, যেন সাক্ষাৎ ক্রুদ্ধ, তাওবনুতো আত্মহার। বেহুঁ খাঁচায় আত্মহার, অভলস্পর্শ মুক্তির স্বাদ, চে'খের নোনা জলেই মিটিয়ে নিচ্ছেন। মাটির মাছুষ মিলিয়ে বাবে জলে, তার অস্ত্রে এত খেদ, এত ভয়, এত ভাবনা কেন? জানীরা “বাণী দিয়েছেন—ভবসাগর পার হতে হবে”, তার জায়গায় অজানীরা মানে করেছে—ভাবনা সাগর, তাই ডুবে মরেছে।

যাত্রীরা এক জায়গায় জড়ো হয়েছে, প্রাণপণে আঁকড়ে ধরেছে তাঁধে নাচন নৌকোটাকে, “হায়! মরিতে কি চাহে মন সুল্লর ভূবন ছাড়ি!” কার একটা হাত যেন চট করে কাঁধে পড়লো, আবচা-আধারে দেখা না গেলেও বোকা গেলো জীবনদার, যে-হাত বহু ক্ষেত্রে বহবার জীবন-সন্ধিকে সন্ধান দিয়ে আগিয়েছে ঠিক শলতে কাঠির মতো সমসতো, সেই পেশীপোক্ত হাতই যেন হাতুড়ির ঘায়ে হঠিয়ে দিলো মৃত্যু-কল্পনা। বাঁশমাথানো বাতাস ঠেকলো মুখে, আবার প্রশ্ন—মানত দিয়েছেন? মরীয়া হয়ে মুখ বেকিয়ে দেখি, খুকির আবছা আকৃতি, চোখ গেলো না তার রূপ দেখতে, মন পেলো না গুণ বুঝতে, তবু, তবু যেন মনে হলো—যেন এ সমস্ত-কালের অনবদ্য নাটিকা, তাই এতকণে এই মানত নিয়ে যে মনটা মাথা-কুটছিলো; সেই কক্ষম মেজাজে প্রশ্ন করলো—কী, কী সেই সর্বগ্রাসী কালান্তক সাগরের শাস্ত মানত? টুপ করে বলে উঠলো খুকি আপনার পাপ।

প্রাণটাকে কে খামচে ধরলো—পাপ? প্রাণি-জগতে প্রাণরক্ষার যদি প্রয়োজন থাকে, তাহলে পাপেরও প্রয়োজন আছে, প্রত্যক্ষভাবে এইটুকুই বঝি, অবস্ত বুঝিয়েছেন শাস্ত্রপাতা—সর্বযুগের শেষ কথা পুণ্য। পুণ্যার্থী যাত্রীরা তো পাপকে প্রলেপ দিয়েছে পুণ্যে, দান দিয়ে, দানা দিয়ে প্রার্থনা করেছে—প্রভু, পূর্ণ করো মনোবাসনা, এই বাসনাই তো দেহ পেরালায় মকলিপানা, এই শিপাসাই যদি পাপ হয়, প্রয়োজন কী তার পুণ্যে, প্রয়োজন কী তীর্থে, প্রয়োজন কী কুচ্ছে? জন্ম-জরা-জীবন্মৃত্যু বধন সত্য, তখন বাসনা

কায়না, তৃণা-ভোগ কেন সত্য নয়, যদি পাপকেই খুঁট খুলে মানত দিতে হয়, তাহলে পুণ্যকেই বা খুঁটে গাঁট দেবো কেন? এ স্বন্দ-সংশয়ের সীমা কোথায়? তাই খুকিকে সঙ্গেহে বললুম—পাপ দিলে পুণ্যও দিতে পারবো। খুকির বজ্রাহতের মতো প্রশ্ন—পারবেন? পরিকার অবাব—পারবো, পারতেই হবে, সর্ব-কালের সর্ব-যাত্রীর মানত যদি পাণ্ডাই হয়, তাহলে তার কড়ার-গুণায় স্বদসহ পুণ্য দিয়েই শোধ করবো! শুকিয়ে গেলো গেরতটা, সাগর ঘেন সতিাই স্বকর্ণে শুনলো, এগিয়ে আসছে একটা বিরাট ঢেউ ঠিক কাল—নাগের মতো মুখময় ফেনা নিয়ে, আঁকে উঠলো নৌকোটা। ‘আছাড়-কাছাড়’ভাবে, মনে মনে করলুম—জুড়িয়ে থাক জন্ম-জালা, নাস্তির মা কেঁদে উঠলো—আমার নাস্তি-কাস্তির কী হবেগো! কার কী হবে কে বুঝে, কৈ—কোথায় গেলো নামকীর্তন, কোথায় গেলো ঈশ্বর—নিরীশ্বর কোথায় গেলো নন্দ-ভূঙ্গীর নাক ডাকা, এখন যুগকাঠই জপমালা, জন্ম-জীবন-যৌবন সব মিথ্যা, শুধু-শুধু সত্য মৃত্যু, শুধু সত্য এই সুনীল ফেনিল বারি-সমাধি, কী স্বন্দর দু’ বাহু তুলে এখন আলিঙ্গন দেবে, কী স্বন্দরতম এই একটি লগ্ন, হয়তো বলতেও লময় পাবোনা, “বরণ রে, তুঁহঁ মোর জাম সমান।”

থাক কল্পনা, শোধ করতেই হবে ওর মানত, তা স্বেচ্ছায় দেওয়াই গেলো, কেড়ে নেবে কেন? সাপটে ধরলুম লংকোটের কলারটা, খুলে ছুড়ে ফেলে দিলুম, থপ করে কে ধরলো আমার কব্জিটা, এ-হাত তো পেশি পোক্ত নয়, এ যে স্থানাসিক্ত সন্ধিং, কে বলে মৃত্যু সত্য? কখনো না, কখনোই না, বাঁচাই সত্য, বাসনাই সত্য, হোক মৃত্যু, আবার জন্মাবো, আবার যৌবন পাবো, আবার ভোগ পাবো! নেয় নিক সাগর কায়নাটা, নিক পাপ-পুণ্য, বাসনাটা তো নিতে পারবে না!

ছিং, এ যে খুকির হাত, এ তো বন্ধন, এ তো সেই কুহেলি কবোঝ, এই হাতই তো চাঘেলি-চঞ্জিমা রাতে মৃত্যুর ধরেছিলো সুরাপাত্র, কৈ সে-স্বথ তো স্থখী কঁদতে পারেনি, কেন পারেনি—সেই প্রশ্ন নিয়ে ছুটেছি জালামুখী জঙ্গ-পিপাসায়, দুঃখতন্ত্রী কপিলকে জিজ্ঞাসা করতে।

• খুকি এখন হাতটা ছেড়ে সামনে দাঁড়িয়েছে, দৃষ্টকর্মে

বললো—কী করতে চান?—মানত শোধ! পারবেন? নিশ্চয়ই, বলেই খুকিকে ধাক্কা দিয়ে পা বাড়িয়েছি অমনি ঝপ করে পড়লো ঘাড় সেই পেশীপোক্ত হাত, পিছিয়ে আসতেই হ’লো, শাস্ত-গভীর স্বরে জীবনদা বললেন—মূর্থ, খাঁচাটা জলে ফেললে পাখিটা উড়ে যাবে, কে শুধবে সাগর—মানত, তোমার কায়-কংকাল?

কানে এলো স্তিমিতকণ্ঠের স্মৃষ্টি স্বর—ওঁ শান্তি: ওঁ শান্তি: ওঁ শান্তি:! এবে ঝক-বেদের ঝঙ্কি-বাণী, উর্ধ্বে ছুটো হাত তুলে ভারীবাবা প্রার্থনা করছেন।

কোথায় গেলো পাহাড়-প্রমাণ ঢেউ, কোথায় গেলো ঝড়, সতিাই শান্তি ধীরে ধীরে ফিরে এলো, আবার জললো বাতি, আবার বিছানো হ’লো কঘল, ঝাক, এ-যাত্রা বাঁচা গেলো, নৌকো-খলে যাত্রী-বাটনা শেষ হ’লো। থোকা ফার্স্ট-এড্‌বল্ল খুলে যাত্রীদের কাটা-ছেঁড়ায় তুলো টিপলো, ভক-ভক বমি করছে ব্রজমণি, পালমশাই ঘন ঘন হাই তুলছেন, তখনো টিপ-টিপ করছে আমার বুকটা, বাড়িয়ে দিলো হাতটা নন্দীমশাই, বললো—নিম্ন এবার কোটটা চাপান! আড়চোখে মুচকি হেসে খুকি মুখ ফেরালো।

পিসিমার সংযত কণ্ঠ—প্রকাশ, স্টোভ জালা, চা কর। পোটলা খুললো কাস্তির মা, চৈচিয়ে উঠলো—চিনি কই? বাধলো হট্টগোল, ভুলটা কার? পিসিমা বললো—তোর, কাস্তির মা বললো—সেই কেঁটা ক্যাব্লার, থোকা তো স্টোভে স্টার্ট দিলো। মীমাংসা করলো মেমিনীপুরের মাসীমা—মুন দিলেও তো হবে মা, বেশ ভালো লাগবে। হেসে উঠলো যাত্রীরা, গুজ-গুজ ক’রে নন্দীর কানে ভূঙ্গী বললো—তার সঙ্গে ষংকিত্বিং লংকা-গুঁড়ো।...এদিকে লংকাকাণ্ড বাধালো থোকা, লেজাও চিনি—লেজাও সুগার, লেজাও জলদি। নাস্তির মা তো কেঁদে-কেঁদে বলে উঠলো—আমার কী কসুর বার, সেই কেঁটা মুখপোড়াই তো পুঁটলি বেঁধেছিলো।...ও-নব নেই জানতা, লেজাও জলদি—লেজাও হারিআপ্‌-নইলে স্টোভ ছুঁড়ে তোর মুখ পোড়াবো! সতিাই থোকা স্টোভ ধরলো, সর্বনাশ! কেঁদে উঠলো কাস্তির মা, হাসতে হাসতে খুকি বললো—এই নিম্ন, এতেও মিষ্টি হবে, তবে মিছরি, ফল হলো বিত্ৰী, থোকা ছুড়ে দিলো কোটোটা, লাগলো নদীমানন্দনের কোলে, নীরবে একটা হাত এলো এগিয়ে, কবে দিলো

খোকার গালে এক চড়। হৈ-টৈ পড়লো বাজীমহলে, হাসতে হাসতে পিসিমা বললো—খোকা পঞ্চাননের মানত-ছেলে, তাই মাঝে মাঝে পঞ্চমুখী হয়, তাই পঁচিশ বছরেও ওকে পাঁচটা আঙুল না দেখালে খামে না।

অবশ্য আমরাও খেমে গেলুম কিছুক্ষণ, কার স্থিতি স্থর জমিয়ে তুললে—“সম্মুখে শান্তি পারাবার...পার করোহে কর্ণধার”, অশ্রুধারায় বুক ভিজছে, সবার দিকে পিঠ পড়েছে খোকার, যেন সাগরকেই স্থর শোন'ছে।

ক্ষান্ত হলোনা খুকি, কেটলি চাপানো স্টোভে, জ্বরী জ্বর চিনেছে, জীবনদা আর নদীয়ানন্দন জমে আছে ভারী বাবার কাছে। নাক সিঁটকে, মুখ বৈকিয়ে, গলা কমিয়ে পালমশাই বললো—জাত-জন্ম জানা নেই, ওর হাতে চা খাবে? ...মোকম্ব প্রশ্ন—জাত-জন্ম...সামাজিক চোখে জন্মালেই জাত থাকবে, প্রাণি-জগতে জাত কী? আজ যে প্রয়োজনে জাতিভেদ, ভাবীকালে অস্ত্র প্রয়োজনে জাতি এক হবেনা কেন? ...জাত জন্মের কোন কথা শুনে পাল মশাই তো বটেই, আরো অনেকেই হয়তো নৌকো থেকে লাফ মারবেন।

চায়ের কাপ ঠুকলো খুকি, ধরলো খোকার সামনে, খোকা তখন নিম্পলক-চোখে চেয়ে আছে সাগরের দিকে, খুকির কথায় কান নেই, তাই খুকি ধরিয়ে দিলো কাপটা তার হাতে। ...চায়ে চুমুক দিয়েছি, চিমটি কাটলো পালমশাই—খবরদার, এ-খবরদারি আমি একজন পাকা সমজদার, তাই না খেতে পেয়ে ঢোক গিলছি, গলায় ঠেকছে গরম, মুখে ঠেকছে কষা, তবু চূপচাপ, যেহেতু নেশা। খুকি কাপটা পালমশাইয়ের কাছে ধরতেই ঠিক শিং নাড়ার মতো মাথা নাড়লেন তিনি, চায়ের কাপের চা একটু চলকে পড়লো খুকির হাতে, বেজার মুখে বলে ফেললেন—ঐ কটিকবাবুকেই দিন, আমার দিকে চোখ পাকিয়ে—এটাকেও চালিয়ে দাওনা হে চান-জল ভেবে!

দূরে দৈত্যপুত্রীর মতো লাগলো, ক্রাশা ঢাকা কতক-গুলো মিটমিটে আলো, মাঝি বললো,—ওটা নামখানা বাবু, সরকারি সড়ক ঐদিকেই সাগরমেলা যাবে, সার্বক হবে জনপদ, এ-ভূগর্ভের সেই সাধনাই তো একদিন ছিলো, ঐ পথই আরো স্পর্শ দেবে কালবাতীকে কপিলপ্রসবে।

ফিসফিস করে কী আলোচনা চলছিলো ভারীবাবার

মহলে, ব্রজমণির বিনীত সুরে কৃষ্ণকান্তার ভাংপর্ব, নদীয়া-নন্দনের জীব-জগতের জন্মবহুত, জীবনদা পরা-অপারার পরাকাষ্ঠা বেশ জমিয়ে তুলেছে, পালমশাই মুখ ফিরিয়েছেন, পোখহর এ-বদন আর দেখবেন না, কোয়রটা কট-কট ক'রে উঠলো, তাই একটু কাৎ হোলুম নৌকোর কাপার মাথা রেখে, একটা অযাচিত হাত মাথায় গুঁজে দিলো একটা পোটলা, ভূঙ্গীতো শুক করেছে—ভোঁস-ভোঁস, আবার দাঁড়ের ছপ্-ছপ শব্দ তালিম দিচ্ছে সমুদ্রের সুর-লহরীতে, লটকে পড়েছে যে বার মত, মাত্র দু-চারজন ইষ্ট-অনিষ্টকে নিয়ে বাটনা বাটছে। রাতের শেষদিকে ঠাণ্ডা বেশ চেপে ধরলো, কার একটা গরম হাত আমার পাটাকে টেনেই বালিশ করলো, একটা ঠ্যাং পড়লো পিঠে, বোধহয়, নন্দীমশাই পাশ ফিরলেন, ঘুম তো অনেকক্ষণ থেকেই ঘুর-ঘুর করছিলো, এবার ঘুরিয়ে দিলো মুখটাকে চোখ দুটো টিপে।

স্বপ্নকে যদি অকপটে স্বীকার করতে হয়, তাহ'লে সত্য কবাই বলবো—“পালমশাই একটা আধখোড়া কাঠ নিয়ে প্রাণপণে ভাড়া করছে সগর রাজার বাট হাজার ছেলেকে, সাত সমুদ্র পার করে হাঁপ ছাড়লো পালমশাই, সঙ্গে সঙ্গে নন্দী সহাস্তে সলজ্জে বাড়িয়ে দিলো একঘটি সিদ্ধি, সঙ্গে সঙ্গে এক লাখি নন্দীকে, নন্দী এসে পড়লো ভূঙ্গীর ঘাড়ে, ভূঙ্গী পড়লো খোকার ওপর, পোকা ঝাড়লো এক ঘৃষি কান্তির মায়ের নাকে, ঘুম তো খায়েল হলো, এতকাণ্ডে মাত্র একটা মশার অপমৃত্যু ঘটলো অবশ্য আমারি গালে—পালমশাইয়ের চাপড়ে। চায়ের চামড়া চিন-চিন ক'রে উঠলো কার কানঘরায়, তুলতে পারতিনা পা-টাকে, খোঁচা দিচ্ছে কানের ঢুলটা, তাই চূপ-চাপ পড়ে আছি।

স্বর্ঘ উঠছে, বেশ মাড়া পড়লো সারা নৌকোয়, সবাই স'রে—ফিরে সোজা হলো, আমি শুধু শুয়ে আছি, কে যেন শুইয়ে রেখেছে, জলদ গন্তীরে জীবনদা শুরু করলেন স্বর্ঘ স্বব—“আদিদেব নমস্তাতং প্রসীদ মম ভাস্কর। দিবাকর নমস্তাতং প্রভাকর নমস্ততে।”...সবার কণ্ঠ মিললো এক কণ্ঠে। ব্রজমণির ব্রজবুলি করতালে ঠোকা দিলে—“রাই জাগো, রাই জাগো -শারী-শুক ডাকে,” আবার জেগে উঠলো নদ-নদী-গিরি-কান্তার, বনানী-প্রান্তর, এবার পা-টাকে জোরেই নাড়া দিয়ে খুকি বললো—উঠুন, স্বর্ঘ উঠছে,

উঠতেই হলো কাঁথা-কবলের মাঝা ছেড়ে, উঠেই দেখি
স্বপ্নের মুখে ক্যামেরা ধরেছে থোকা, করজোড়ে চোখ মুদে
পালমশাই।

অপূর্ব অনবদ্য অনাদি উঠছে শান্ত সমাধিস্থ জলধি হ'তে,
কাঁপসা তমসা কুয়াশায় ধরেছে রক্তিমাতাস। ওগো ভাস্কর,
কে বলে নম্বর ভূমা, নমস্কার করি, কোটি নমস্কার তোমায়,
শতকোটি নমস্কার তোমার শান্ত সৃষ্টিকে, তোমার দিব্য-
জ্যোতি: দীপ্তিকে। দাও, আরো দাও দিব্যময় দিব্য-
জ্যোতি:, যুচুক আঁধার, যুচুক অসার আসক্তি। ওগো
অনন্ত, ওগো অমৃত্যু, দাও আরো, দেখাও অখিল—
অসীমকে নিখিল-নিত্যে। চর্যচক্রে চেয়ে আছি চিন্ময়ের
দিকে, সমুদ্র গর্ভে যেন একটি জ্বল, নির্বিকার, নিরাকার,
তুলতুলে রক্তপিণ্ড। রাখা হলো যেন আবির্-খালায় নব
জাতকের নগ্ন কলেবর, খেলা হলো শুরু, জ্বলপিণ্ড পেলো
প্রেরণা, পেলো প্রাণ, পেলো আকৃতি, আকৃষ্ট হলো ইহ-
লোক, সরে' গেলো তমসাবৃত আঁধার, ফুটলো দিব্যজ্যোতি
চকু, স্রষ্টা দেখলো সৃষ্টিকে, সৃষ্টি দেখলো স্রষ্টাকে, হলো
ভক্তলগ্নে ভক্তদৃষ্টি।

সঙ্গীত সাগরে সতীর্থ যাত্রী নৌকো; রাত্রে দেখেছি
একদ্বন্দ্ব, আবার দেখলুম অত্বন্দ্ব। গাঁদাগুলের মালা ঝুলছে
নৌকোর গলায়, শাদা পালে বাতাস লেগেছে, যাত্রী দিচ্ছে
জয়ধ্বনি জয়যাত্রার, দাঁড় পড়ছে একতালে, এক কায়দায়,
জীবনযোদ্ধা চলেছে পুণ্য পথে, প্রাণকে স্পর্শ দিতেই হবে
আদি—বিধানের পাদপীঠে। জয় করতেই হবে পাপকে,
লাভ করতেই হবে পুণ্য।

গাংচিল ঘুরছে মাথার ওপর, শুভক মাছ চিংপাং
খেলছে, ঢেউয়ের ওপর ঢেউগুলো ঠেসাঠেলি করে ঠেসে
নিরে যাচ্ছে মানত দেওয়ার ফুল ফল। চোখ এবার কুল
পেলো, ঐ তো চড়া, চমৎকার বালুবেলা, কোলে যেন
সবজের কার্পেট, কাং হয়ে একটা নৌকো আটকে রয়েছে,
বালুকণার সঙ্গে খেলছে রশ্মিকণা যেন সাতরঙা ছড়ানো
মাণিক। চোখ দু'টো এন্ডার কুড়তে লাগলো, আমিও
ভরতে লাগলুম মনের আঁচলে, কচি ঘাসগুলো হঠাৎ
লাগলো কচি গালে।

শক্ত শুকনো বিকুটটা ঠোটে হুঁকে দিলেন পালমশাই,
জ্বলন্তা খুলতে হুঁম দিলো, নন্দী দেখি বেশ তদ্রিৎ

করেই মাথায় চিকণী দুগ্ধে, ভুজী একটা বিড়ির মুখে
হুঁ দিচ্ছেন—বোধহয় মুখায়ি করবেন, থোকা মাঝি
কাছে হালধরা শিখছে, ভারীবাথার দল জীব জগতের
বাটনা বাটছে। খুকি খোঁপাটা জড়িয়ে পিছু ফিরলো, এ-
কী, এত চুল খুকির, সে-কালেব সেই কবির কথা মনে
এলে—“কুঁচবরণ কস্তারে সেই মেঘবরণ কেশ,” কিন্তু
এ-কালের কবি হয়তো বলবেন—“খোঁপায় সংবদ্ধ যার
জীবনের লোকারত কুল!”...পিসিমা বেশ পরিপাটি করে
পানের থিলি গুঁজছেন, মাসীমা মমতা-মাখানো মুখে
হাসতে হাসতে আমায় বললেন—ছেলের বড়ো কষ্ট
হচ্ছে, খুকি সায় দিলো—সত্যিই তো,—উনি পেনে
এলেই পারতেন, পরিষ্কার দেখলুম খুকিকে—নিত্যকালের
পাশনাটিকার এ যেন শুধু একদৃষ্টের পার্শ্বনায়িকা, স্পর্শ
দেয়—পরিচয় দেয় না।

পালমশাই হঠাৎ আমার কানটাকে টেনে নিলেন
টার মুখের কাছে, ময় দবার মতো বললেন—এখানে মল-
মূত্রের ব্যবস্থা কী হে? সত্যিই তো, এ-প্রশ্নের সন্ধিয়েলা
শক্ত, তবে জলের মতো সহজ করে দিলো মাঝিভাই,
দেখিয়ে দিলো দ্বিবি একটা বাঁশের ত্রিখণ্ড-ত্রিভুজকে, যেটা
নৌকোর গায়ে দোল দিচ্ছিলো, জাহি মধুসূদন বলে
রসি ধরে ঝুলে পড়া তার ওপরে।

আবার দেখা দিলো একটা চড়া, এ এক দৃশ্য, নিবিড়
বনানী, বেগুন, কেমন ক'রে ঝঁলো চোখ দুটো, তুলনাম
খুকি শোনাচ্ছে মাসীমাকে সে কালের কপালকুণ্ডলার
কাহিনী। ঐ বনে কাপালিক থাকতো, হয়তো এইরকম
চড়ায় নবকুমারের নৌকো ঠেকেছিলো...মাসীমা চোখ
বড়ো করে' থামিয়ে দিলো—থাক থাক যুঁধি, ও-সব অমঙ্গল
কথা এখন রাখ।

খুকি তো হেসেই খুন—তা বলে আর কাপালিক
তো খাঁড়া হাতে বসে নেই মাসীমা! বলে ফেললুম—
তবে, খুঁজলে কপালকুণ্ডলাকে পাওয়া যাবে, খুকির সাক্ষ্য
জবাব—সেটা নবকুমারের কাজ। আবার চোখ চেয়ে
নিলো চড়ার দিকে, নৌকোটা যেন চড়ার দিকেই চলেছে।
একপাল গোলক চরছে, গোটাভক্ত জ্বাটা-ছেলে বাসি
ঘেঁটে খেলা করছে, মাঝি জিগ্যেস করলো—নৌকো
চড়ায় ঠাকাবে কি বাবু? পান্টা জিগ্যেস করলেন

পিসিমা—সাগর-বীণে কখন পৌঁছবে বাবা? মাঝি একবার সূর্যের দিকে মুখ করে উত্তর দিলো—আর ঘণ্টা-দুই লাগবে মা। অনেকেই বলে উঠলো—তবে আর দরকার নেই। তখন সকাল সাড়টা।

হিল খুলে পালমশাই কাঁদছেন না হাসছেন বোকা গেলো না, তবে একটা দরদী স্বর কানে শুড়শুড়ি দিতে লাগলো, একটু পরেই বোকা গেলো তিনি শুক-শারীর বন্দ পড়ছেন। থোকা এবার হাল ছেড়ে দাঁড় ধরেছে, বেশ এঁটে-সেঁটে মাঝি সেজেছে, কারো সাধা নেই থোকা বলবার, এখন সে পাক মাঝি, হাতের শক্ত পেন্সি ফুলে উঠছে থোকর দাঁড়টানার তালে তালে, বজ্রমুঠিতে দাঁড় ধরেছে, যেন নব-নবগুণগান ধরেছে জীবনভরকে নিশানদণ্ড, খণ্ড-খণ্ড করছে দাঁড়ের ঘারে ঢেউগুলো, থোকা তালে-তালে স্বর দিচ্ছে—“হিঁঙোমারি, খেলনা বারি, নৌকো ঘাবে সাগর-দাঁড়ি, ও ভাই শতরবাড়ী”...

শন-শন নৌকা চলছে, দু'-একটা লঞ্চ ভট্-ভট্ করে ভেঙি কেটে বেরিয়ে যাচ্ছে, ভুলীমশাইয়ের কোঁতুক-কটাক পড়লো সেই দিকে, অমনি ঘুরিয়ে দিলো তার মুখটাকে আলতো-আড়ুলে পালমশাই, স্নেহে বলে উঠলেন—দাদারে, ও বঁধুর মুখ আর দেখিস না, তবে পিতিজ্ঞে করলাম পাঁচের কাছে, আসবার সময় ঐ ভট্-ভটের ঘাড়ে চড়ে আসবো আসবো আসবো। পাল-মশাইয়ের পিতিজ্ঞের ভীষণ ভয় পায়, তবে ভয় পেলো না খুকি, বেশ ভারি মজাজে বললো—ধরুন, যদি ভাগ্যে না জোটে!...ইট ছুড়বো, পাথর ছুড়বো, বালি ছুড়বো, শেষে জুতো ছুড়বো—তিরিকিমিজে পালমশাই তড়পে উঠলেন।

সর্বনাশ—খুকি আবার হেসে উঠলো, তাতে জলন্ত আগুন যি পড়লো, ছুড়ে ফেললেন গারে জড়ানো চোকা-চাদর—পালমশাই, খুকির দিকে অগ্নিশর্মা হয়ে বললেন—তুমি কী জানো হে লবঙ্গলতিকা, এই ক্রান্ত কহরাম পালকে কত শালা দিকপাল সাত হাত মাপে চলে, আর তুমি ফ্যাক্-ফ্যাক্ করছো? খুকি মুখে কাপড় গুঁজে তখনো হাসছে, পালমশাই রক্তমুঠিতে পোটলা খুলে তখনই করতে লেগে গেলো, ভয় পেলো অনেকেই, এমন কি মালীমাও, মালীমা তো হিড়হিড় করে টানতে

লেগে গেলো খুকিকে। দিহিদিকশূন্য হোয়ে পালমশাই দুহাতে কী ঘেন ছুড়তে লাগে সারা নৌকোর, সর্বনাশ. শুধু ভটাকট শব্দ, হৈ-টৈ পড়ে গেলো যাত্রীদের—আঃ, গেলুমরে, মলুমরে শব্দ, তারপরেই কী একটা হাতের কড়া মঠায় টিপে এগিয়ে গেলেন পালমশাই খুকির দিকে, মালীমা তো আঁংকে চেঁচিয়ে উঠলেন—ঠিক ছোয়া মারার মতো খুকির হাতে বসিয়ে দিলেন পালমশাই একটা মর্তমান কলা। তারপরেই প্রাণখোলা হাসিতে কেটে পড়লো কহরাম পাল। হাসতে হাসতে তার চোখে জল এসে গেলো। যাত্রীমহলে হাসির ধুম পড়ে গেলো, পালমশাই সেগুলো ছুড়েছিলেন—সেগুলো নেবু। তাই থোকা খুলেই বললো—দাদা, আর একটা ছুড়ুন না। যেই না বলা, পালমশাই গেলেন আবার বিগড়ে, এগার সতিয়াই একটা ভোতা ছোরাতে ঘষতে লাগলো নৌকার কাণায়, কঁদে উঠলো কাস্তির মা—ওমা, কী হবে গো! দাঁত খিঁচিয়ে কথা চিবিয়ে পালমশাই বলে উঠলেন—তোমার মাথা উড়োবো—নির্ঘাণ উড়িয়ে দেবো, ঠিক এগি করে...বলেই একটা ডাবের মাথা উড়িয়ে দিলেন পালমশাই এককোপে, ধরলেন আমার মুখের সামনে, বললেন সহাত্তে—সদমানে—ধরুন দয়াময়, ফাটকা-বাজারের ফটিকচাঁদ!

নৌকোটা গুচ্ছ, না চড়াটা পেচুচ্ছে—বোকা শব্দ, ঠিক কলহাসের মতো লাফিয়ে উঠলো থোকা, সোজা দাঁড়িয়ে সদন্তে চেঁচিয়ে উঠলো—নাইসল্যাও এসে গেছি—জ্বরে!...ভটোপাটি লাগিয়ে দিলো যাত্রীরা, লাফিয়ে উঠলো অনেকেই, নৌকোটা টলমল করে উঠলো!

মায়াবী-কুশার আঁচলে ঢাকা ঐ তো মায়াপুরী, ঐ তো কাঞ্চন-চূড়া, ঐ তো আদি জ্ঞানীর আগুপীঠ ঐ ভো নিরীশ্বরবাদীর লীলাতট। খেপে উঠলো যাত্রীরা, জয়ধ্বনি দিলো জীবনদা—জয় কপলে বাবাকী—জয়! জয় তীর্থ-পথিককী জয়, জয় গঙ্গা-সাগরকী—জয়। অস্ত্র নৌকো থেকেও যাত্রীরা প্রতিধ্বনি ফুললো—জয়!...এ-জয় যেন আর ফুরায় না, এ জয় যেন জীবনের জয়মালা ছিঁড়ে পড়ছে, তাই এর শেষ নেই—

এই তো তৃষ্ণার্ত পথিকের তিতিকাতট, মনে হয় জড়িয়ে ধরি বুকে, সারা অঙ্গে মাখি ওর পদবোধু, লুটিয়ে দিই অজান অঙ্ক এই নাস্তিক মাথাটাকে। দূর থেকে

সাগর-বীপকে কী স্বন্দর দেখাচ্ছে, অসংখ্য তাঁবু পড়েছে
 জীবন-যোদ্ধা যাত্রীদের, কত রঙের কত বিচিত্র পরিচ্ছদ,
 কত যাত্রীর কতভাবেই পরিচয়, জানে মস্ত কত বিচিত্র
 ভংগির নর-নারী। আর পারা যাচ্ছেনা নৌকায় থাকতে।
 তীরে নৌকো ঠেকতে আর মিনিট দশেক দেরি, আবার
 উঠলো জয়ধ্বনি, পালমশাই বেশ করে নাক-কান মলে’
 হাতে কপাল ঠুকলেন, মাঝি বললো—আর তো এ-নৌকো
 যাবে না বাবু, এ-বার ঐ ছোটো ছিপ-নৌকোতেই
 আপনাদের তীরে যেতে হবে।...সে আবার কী, সবিস্ময়ে
 জানতে চাইলেন পিসিমা, মাঝি বললো—এখন যে তাঁটা
 মা, বড়ো নৌকো আটকে যাবে!...ইয়ারকি পেয়েছো!
 একেবারে অগ্নিবৎ ভূঙ্গীমশাই, নন্দীমশাইও তাই, পাল-
 মশাইয়ের তো কথাই নেই, থোকা আবার এইতালে টিনের
 টঙ্করে দামামা বাজাচ্ছে, বেশ বেধে গেলো হট্টগোল! হার
 কেউ মানতে চায় না, শেষে হাসতে হাসতে জীবনদা
 বললো—আমরা পূণ্যপ্রার্থী, মানেই কষ্টপ্রার্থী, তাছাড়া,
 যে-ক্ষুদ্রকে আমরা এতদিন ক্ষুদ্র বলেই ভেবেছি, এ-তীর্থে
 সেই ক্ষুদ্রই নেবে আমাদের প্রথম তর্পণ, তাতে ক্ষতি
 কী!...তড়পে উঠলো কে একজন—ভারি মজা আর কি!
 পারবো না...পারবো না আমরা মোটবহর নিয়ে ঝাঁপা-
 ঝাঁপি করতে, সবার মাঝখানেই ঝাঁপিয়ে পড়লো খুকি,
 বেশ খুশি-আমেজই হেলে-তুলে বলতে লাগলো “পারিব
 না একথাটি বলিও না আর, কেন পারিবে না তাহা ভাব
 একবার।”...পোটলার ওপর বসে পালমশাই প্রথম হাঁকড়ে
 উঠলেন—নিশ্চয়, নিশ্চয় পারতে হবে, অবশ্য কী পারতে
 হবে, সেটা জানলে পালমশাই হয়তো পাষণ ফাটাতেন।
 জেলেডিজিটা যখন হেলেতুলে এসে আমাদের নৌকোটায়
 সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধলো, সেই সঙ্গে আমাদেরও এই দশঘণ্টা
 সহঅবস্থানের গাঁট খেন শিখিল হলো, পিসিমা থোকাকে
 পরিষ্কারভাবেই বললেন—থোকা, আর একটা জেলেডিজি
 ডাকো, আমরা অল্প ঘাটে নামবো!

মেদিনীপুরের মাসীমা দাঁতের মাড়ি বের করে
 বললেন—তা’ হবেনা দিদি, একসঙ্গে এলুম, একসঙ্গে
 থাকবো, একসঙ্গে খাবো, কথটা কানে না নিয়েই পিসিমা
 লটবহর ছুড়তে শুরু করলো আর একটা জেলে ডিজিতে,
 নির্বাক মাসীমা যেন—ঠা! হোয়ে গেলো। পিসিমার বল

পাড়িলিলো আগে, থোকা বেতে-বেতে হাতনাড়তে লাগলো
 নদীমানন্দন-ব্রহ্মমণি চলেগেলো, রেখেগেলো একটা
 অশুভির আঁচল। আমরাও লাফিয়ে পড়লুম একে-একে
 জেলেডিজির ওপর, ডিগবাজি দিয়ে পড়লেন ভূঙ্গীমশাই, কী
 আশ্চর্য প্রতিশোধ যে-ভিজে জুতোটাকে এতক্ষণ কোলে
 রেখে শুকনো করলেন, পায়ে গলাতেই সে প্রেঙ্টিজ বোধে
 স্লিপ কাটলো, ফেটে পড়লো খিল খিল হাসিতে খুকি—মুখটা
 তার লাল হয়ে উঠলো, ডিজিটাও ডিগবাজি দেয় আরকি,
 ধমক দিল মাসীমা, খুকি জবাব দিল—আর ধর্ম্য কাজ নেই
 মা, পায়ের জুতোও পাপের মর্ম্য বুঝেছে। যখন ঠাংটাকে
 নন্দীর ঘাড়ে চাপিয়ে শুয়ে শুয়েই জয়ধ্বনি দিলেন ভূঙ্গীমশাই
 সাগরবীপের তীরে ঠেকলো ছোটো ডিজিটা, আর পারিনা,
 সত্যিই আর পারছিনা, লাফিয়ে পড়লুম বালুতটে, কিন্তু
 বালু কই, এতো পাক! হায়রে চর্মচর্ম, আরও চেয়ে দেখ,
 ভালোকরে দেখ। এষে যুগযুগের লক্ষপদরজ পলি, হাতে
 মাখলুম, মাথায় মাখলুম, মনেহ.লা তপ্ত বাসনাতেও মাথাই,
 থপকরে হাত ধারলেন জীবনদা—সাবধান, বড়ো পিছল,
 পা টিপে একবার দাঁড়ালুম, চেয়ে দেখলুম সামনের দিকে,
 বীপের ওপর দুঃখদর্শী দিব্যজ্ঞানীর মূর্তিমন্দিরে কৌশিক
 নিশান, কিন্তু এতো নিশান নয়, এতো নম্বর মর্ত’ অবিনশ্বর
 দণ্ড, কো-দণ্ড কালতন্ত্রী পঞ্চভৌতিক কায়ায় পঞ্চবিংশ-
 তম্বের পাদপীঠ মর্তপ্রেমিক, বাসনাবিলাসী মাছুষের মিলন-
 পীঠ।

হাতছটো আপনা-আপনিই যুক্ত হয়ে কপালে ঠেকলো,
 যুক্তকণ্ঠ চাইলোগান গাইতে, গলা নেই তাই হলোনা, তবুও
 গুন-গুন করতে ছাড়লুম না, “যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে যুক্ত
 করো হে বন্ধু”...

মাসীমা বললো—বাবা এ জায়গা বড়ো নোংরা, চলো
 ওপরে উঠে হাঁপ ছাড়বো, সত্যিই চন্দন বিষ্ঠার সমজ্ঞান
 চাই এখানে, খুখু ফেলবার অবকাশ নেই, তবে বমি করতেও
 বাধা নেই, চটকট করে উঠলুম সবাই—শুধু নির্বিকার জীবন-
 দার দৃঢ় নির্দেশ—এগিয়ে চলো কিন্তু এগুবে যে পাছটো,
 সে ছটোই যেন ধর্ম্যক্ষেত্রে ধর্ম্যঘট করে বসলো। ধর্ম্যঘটি-
 দের ওপর যেন ঘটি ছুড়ে মারলো খুকি, এলানো খোঁপাজড়িয়ে
 আঁচলটাকে কোমরে কবে আগে পা বাঁড়ালো। খোঁড়ার
 পা খানার পড়ে, পরিজাতি চিংকার ভূঙ্গীমশাইয়ের পলি-

মাটির গোরাগতে বিনাশতে ভূকীর অখম পাটা জমে গেছে, এক ঝটকায় খুকি তাকে তুলে নিলো এ কি! একি প্রমীলা না উত্তরা, এ পদক্ষেপ কি যুদ্ধযাত্রার না লয়ভট্ট অভিসারিকার? এ দিকে পালমশাই চিংপাত চন্দন বিষ্ঠার সমজ্ঞানে চৈতন্তরহিত, শুধু তার খেদোক্তি রক্ষা করতে আর বলবোনা প্রভু তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ করো, আপাততঃ এক্ষেত্রে হাত ধরে জীবনদাই তার বাসনা পূর্ণ করলেন।

এবার বালুতে ইঁপ পড়লো, হাসি ফুটলো, 'বাধা' নামলো। জীবনদাই বলে উঠলেন—ভারীবাবা কই? ভারি মজাতো এইতো ছিলো, ছিলো মানে দস্তুর মতো আমার আগে আগেই তো আসছিলো—উত্তরদিলো নন্দীমশাই আশ্চর্য ব্যাপার একমুহূর্তে উবে গেলো। এইতো—এইতো তার পায়ের পাঁজ, প্রাণপণে চেষ্টায়ে উঠলো পালমশাই আমাদের চোখভূটো তাকে কতবার কতভাবে এইখানেই ঘোরাঘুরি করতে দেখলো অথচ। এটা ভৌতিক না ভোজবাজি। মাসীমাও বললেন—এইমাত্র তো আমাকে “মাইজী ব’লে কী বললে!”...এর জন্তে এত হট্ট-চট্টের কারণ কী—খুকি প্রসন্ন করলো উত্তর দিলো জীবনদা—কাঁচটা যখন রয়েছে তখন কারণটা খুঁজতে দোষ কী?

গর্জে উঠলো পালমশাই—দোষগুণের মুখে আগুন, আগে পেটের আগুনটা নেভাই চলো, চলতে মন চাইছে না, অথচ লোকটা কী করে চলে গেলো, এতো মেলায় ঢোকবার গেট দিবি দেখা যাচ্ছে, ভিড়ওতো তেমন নেই,

অথচ—অনর্থক ভারি হলো মনটা, সেইকালেই পিসিরা বলেছিলেন—ভার বাড়াবোনা, কত মজার ম্যাজিক দেখেছি আশ্চর্য হয়েছি, বিশ্বাসী হইনি, এ ঘটনার কিছু আশ্চর্যের চেয়ে বিশ্বাসী হলাম বেশি।

নন্দীমশাই আমার কানে কানে বললো—চলুন, এবার আমরা কেটে পড়ি, জীবনদাও সাঙ্গদিলো—সত্যিই তো, আবার বাঁধন কেন? ক্ষোভে টেনে বলে উঠলো খুকি—এটা তো যুক্ত ক্ষেত্রে নয় জীবনবাবু, এটা যে যুক্তক্ষেত্রে, জীবনদাও খীরগজীয়ে উত্তর দিলেন—যুক্তের জীবন-যজ্ঞই তো যুক্তমন্ত্রে, তাই তো সীমার মাঝেই অসীমকে খুঁজি, খিল-খিল করে খানিক হেসে উঠলো খুকি, মুখটিপে বললো—ও বলতে চাইছেন আপনি বন্ধনহীন গ্রন্থী। জীবনদা ঠোটে লবঙ্গ টিপে বললেন—তাহলে তো রজ্জুতে সর্পভ্রমই রয়ে গেলো। গেলো গেলো বয়েই গেলো, তা’ এখন চলো দেখি চেষ্টায়ে উঠলো পালমশাই, তাকে আবার রহিত করলেন মাসীমা, আমার কাছে সরে’ এসে বেশ মিষ্টি কথায় স্রষ্টি শোনালেন—কী ভাবছো বাবা, জগৎ থাকবে, মায়া থাকবে, আর তোমার এই মাসীমাও থাকবে, এটা যে কলারের জায়গা বাবা, এখানে সাধু, সংসারী, জ্ঞানী, অজ্ঞানী সবাই মায়ায় পাথরবাটিতে ফলার মেখে খামচে তুলে থাকবে, প্রসাদ পাবে কোথা? এটাতো ঠাকুরতলা নয়, যে হাত পেতে পিত্তোশ করবে। এসো, চলে এসো, আমি থাকতে যাবে কোথা, বোকা ছেলে।

কেপ্. হোটেল

অরবিন্দ ভট্টাচার্য

এ’খানে সন্ধ্যা নামে

ধাপে ধাপে ইমণ কলাপে।

সোঁদা গন্ধ। নীচে কোন মশক পাতালে

মুণ্ডুরের দ্রুত শব্দ। নৃত্যরতা ভারতনাট্যম

নর্ভকী পায়ের তালে

অসংখ্য সাপের স্বপ্ন মধুর, পরম

উপভোগ্য করে তোলে সন্ধ্যার সকালে।

এ’খানে সময়

মলবার-কন্টার মত স্বভৌল, মন্থণ আর অনিন্দ্য

বলে মনে হয়।

অনলস সংস্কৃতসেবী যতীন্দ্রবিমল

অধ্যাপক শ্রীধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী

বিশ্বের বিশ্বয় এবং ভারতের গৌরব সংস্কৃত ভাষার মর্ম-
কোষে বিধৃত। হ'য়ে আছে, ভারতের চিরন্তন কালের
অখণ্ড সংস্কৃতি। ১৯৪৭এর ১৫ই আগষ্ট খণ্ডিত ভারতের
রাজনৈতিক স্বাধীনতার অধিকার আমরা পেলেও পাইনি
সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা। তাই খণ্ডিত দেশের মতো আমাদের
স্বাধীনতাও আজ খণ্ডিত। ভারতের রাজনৈতিক মুক্তি-
যোদ্ধাদের আমরা এখনো স্মরণ করি, আলোচনা করি
তাঁদের সাধনার অজ্ঞান এবং আত্মত্যাগোজ্জ্বল মহিমার
কথা। কিন্তু, স্বাধীনতার অপর অংশের অর্থাৎ সাংস্কৃতিক
স্বাধীনতার সেনানীদের অপরিমিত দানের কথা যথাযথ-
ভাবে আলোচিত হয় না। তার কারণ, পরিপূর্ণ সাংস্কৃতিক
স্বাধীনতা আমরা এখনো অর্জন করতে পারিনি। ভারতীয়
সাংস্কৃতির ধাতী সংস্কৃত ভাষায় আমাদের যথাযথ জ্ঞান
এবং প্রচার অভাবই রয়েছে এই কারণের পশ্চাতে
তাই, প্রাক-স্বাধীনতার যুগে এবং স্বাধীনোত্তর ভারতে
সংস্কৃত ভাষার পুনঃপ্রচারে এবং অহুশীলনে ধারা জীবন
উৎসর্গ করেছেন, তাঁরা আমাদের সাংস্কৃতিক মুক্তিযোদ্ধা
রূপে নন্দনীয়। সেই স্বল্পসংখ্যক দুর্লভ মুক্তিযোদ্ধাদের
অন্ততম নায়ক ছিলেন সত্যস্বর্গত পরম প্রচেষ্টা উক্তর
যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী। প্রাক-স্বাধীন যুগে এবং
স্বাধীনোত্তর ভারতে জনসমাজের মধ্যে সংস্কৃত ভাষাকে
ছড়িয়ে দেবার ক্ষেত্রে তিনি যে অনলস পরিশ্রম করে
গেছেন, তা অতুলনীয়। সংস্কৃত প্রচারের বেদীমূলেই তাঁর
অমূল্য জীবনটি তিনি উৎসর্গ করে গেছেন।

প্রাক-স্বাধীনতা যুগের বাংলার পূর্বতম প্রাক্তবর্তী এবং
বর্তমানে পূর্বপাকিস্তানের অন্তর্গত চট্টগ্রাম জেলার কচুয়-
খিল গ্রামে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে আদর্শনিষ্ঠ মধ্যবিত্ত গৃহী
রমণিকচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের পুত্ররূপে যতীন্দ্রবিমলের
জন্মাবির্ভাব। যতীন্দ্রবিমলের জন্মকৃষ্ণি পুরাণবন্দিতা, ইতিহাস-

শ্রুতি, শৈলকিরীটিনী, সাগরকুন্ডলা, সরিষালিনী চট্টলা বহ-
বরণ্য পুরুষের মাতৃকুমিরূপে নন্দিত। হ'লেও আজ যতীন্দ্র-
বিমলের জন্মস্থলেও বিশেষ গোষ্ঠীবিভা। প্রকৃতির অনিন্দ্য-
সুন্দর এই লীলা নিকেতনে শৈশব এবং কৈশোরের বিস্তার্তাস
সমাধান করে যোবনে তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সী
কলেজে ছাত্ররূপে প্রবিষ্ট হন। কৈশোরেই চট্টলের
দুইজন বরণ্য সন্তান মহাকবি নবীনচন্দ্রের বাংলা এবং
সাহিত্যচর্চার রজনীকান্তের সংস্কৃত রচনাবলী পাঠে তাঁর
সহজাত সাহিত্যরসপিপা। চিত্ত পরম পরিতৃপ্তি লাভ
ক'রত। কৃতিত্বের সংগে প্রেসিডেন্সী কলেজ হ'তে
স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে তিনি উচ্চতর জ্ঞানার্জনের
অদম্য স্পৃহায় যাত্রা করেন লণ্ডন মহানগরীর উদ্দেশে।
বিশেষ উল্লেখনীয় যে বর্তমানের বিখ্যাত আন্তর্জাতিক
প্রাচ্যতত্ত্ববিদ সংস্কৃত কলেজাব্যাক্ত ডক্টর শ্রীযুক্ত গৌরীনাথ
শাস্ত্রী ছিলেন প্রেসিডেন্সী কলেজে তাঁর অন্ততম প্রিয়তম
সুহৃৎ ও সতীর্থ। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের
সংগে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিপ্লোমা এবং সংস্কৃত সাহিত্যের
ওপর গবেষণা করে "পি এইচ ডি" উপাধি অর্জন করে
যতীন্দ্রবিমল বিশ্বের বিবিধ গোষ্ঠীতে বিশেষ সম্মানের
আসন লাভ করেন। তখন তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে
School of Oriental Studies এ সংস্কৃত এবং বাংলা
ভাষার অধ্যাপক রূপে যোগদান করেন এবং লণ্ডনস্থ
India House Library এবং British Museum এ
সংরক্ষিত সংস্কৃত গ্রন্থাবলী এবং পাতুলিপির বিরাট
ভাণ্ডারে গবেষণার নিয়ম হন। সেই গবেষণাকালে
ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের, বিশেষ করে সংস্কৃত
সাহিত্যের ক্রমপরিণতির বহু নতুন তথ্যের তিনি সম্ভান
পান। ফলে তাঁর লেখনীতে প্রকাশিত হ'ল নব নব
সন্দেশ-বহু একাধিক গবেষণা গ্রন্থ।

বিলেভ থেকে ফিরে কিছুদিন ক'লকাতা সিটি কলেজে অধ্যাপনার পর তিনি এসিয়ার প্রখ্যাততম মহাবিদ্যালয় ক'লকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন। বিশ্বের বহু মনীষী তখন এই মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র। এই প্রতিভাধরদের মধ্যে স্বতন্ত্রবিমল অচিরকালেই সহকর্মী এবং আচার্যরূপে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তারপর স্বাধীনতার অব্যবহিতপূর্বে তিনি বিশ্বের প্রাচ্য বিজ্ঞান শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র ক'লকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদ অলংকৃত করেন। প্রাচ্য:সরগীয় বিজ্ঞানাগর, পণ্ডিতপ্রবর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, দার্শনিকমূর্য্য স্বরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রমুখ মনস্বীদের দ্বারা অলংকৃত সংস্কৃত কলেজের এই বরেণ্য অধ্যক্ষপদ লাভ করে তিনি বহুবিধ সংকর্মের দ্বারা স্বাধীনোত্তর ভারতে সংস্কৃত কলেজের হৃদয়গোচরকে পুনরুদ্ধার করেন। তখন তিনি ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও আংশিক সময়ের অধ্যাপক রূপে অধ্যাপনা ক'রতে থাকেন। তারপরে “বংগীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের” সম্পাদকপদে নিযুক্ত হ'য়ে আমৃত্যু সেই পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন।

এত গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত থেকেও সরকারী কর্মের বাইরেও তাঁর কর্মধারাকে তিনি প্রসারিত ক'বে দিয়ে ছিলেন। ইংরেজী, বাংলা এবং সংস্কৃত অসংখ্য প্রবন্ধ, গবেষণ-গ্রন্থ এবং গবেষণাপত্রের রচনা ও সম্পাদনায় এবং ইদানীন্তনকালে মৌলিক নাট্য-রচনায় তাঁর কৃতিত্ব অতুলনীয়। ভারত বিভাগের পর পূর্ববাংলাগত পণ্ডিত-মণ্ডলীকে অপ্রকাশিত সংস্কৃত পুঁথিমালার সম্পাদনায় নিযুক্ত ক'রে তিনি এই অর্ধদান অথচ বিতাত্ত্বিষ্ট পণ্ডিত-মণ্ডলীর জীবনধারণের ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে যেমন মানব প্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন, তেমনি স্মৃতিত করেন বিজ্ঞাবিবর্ধনে তাঁর অতুলনীয় আগ্রহ। সমাজ-রাষ্ট্র-অব-হেলিত, ভারতাস্থার ধারক-বাহক এই বঙ্কিত সংস্কৃত-পণ্ডিতমণ্ডলীর প্রতি-এতো সম্মান এবং এতো সহায়ত্বটি বাংলাদেশে আর কেউ প্রদর্শন ক'রেছেন কিনা জানি না। তাই এই পণ্ডিতবর্গের অকুরন্ত স্নেহ এবং অমেয় আশীর্বার্য তিনি নিয়ত অভিব্যক্ত হ'তেন। উচ্চতম সরকারীপদে অধিষ্ঠিত, ইংরেজী বিজ্ঞান নিকাত, বিলাত ফেরত এই পদস্থ ব্যক্তির মস্তক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত (তিনি পরিচিত অপরিচিত

যেই হোন না কেন), সাধক এবং বরষ ব্যক্তির চরণ-ধূলি নেবার জন্তে সর্বদাই ব্যগ্র থাকতো। “বিভা দক্ষাতি বিনয়ঃ” এই সনাতন বাক্যের চূর্ণত প্রতিক্রম ছিলেন তিনি।

সংস্কৃত প্রচার এবং জ্ঞানসাধনার ক্ষেত্রে তিনি অতুলনীয় অবদান রেখে গেছেন দুটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। বলা বাহুল্য প্রতিষ্ঠান দুটি হ'চ্ছে সর্বজনপরিচিত “প্রাচ্যবাণী মন্দির” এবং “বংগীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষৎ”। ১৯৪৩ খ্রষ্টাব্দে ক'লকাতায় ৩ সংখ্যক ফেডারেশন স্ট্রীট তার বাস-গৃহে প্রাচ্যবিজ্ঞা প্রচারের জন্ত কিছু সংস্কৃতপ্রেরিক বন্ধুত্ব ব্যক্তির দানে ও উৎসাহে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন “প্রাচ্যবাণী মন্দির” নামক এই বিখ্যাত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানটি। এই প্রতিষ্ঠানের জন্মলগ্ন থেকে আজীবন তিনিই ছিলেন সম্পাদক এবং প্রাণপুরুষ। অবশ্য, তাঁর স্বযোগ্য সঙ্গমিণী বিখ্যাতা বিহুদী অধ্যক্ষা ডক্টর শ্রীকান্তা রমা চৌধুরী ছিলেন মুখ-সম্পাদিকা এবং তাঁর সকল কল্যাণ-কর্মের একান্ত সহকারিণী। এই প্রতিষ্ঠান থেকে শতাধিক গবেষণাগ্রন্থ প্রকাশিত হ'য়েছে, সম্পাদিত হয়েছে, গবেষণাপত্র এবং নিখিল ভারতে অভিনীত হ'য়েছে প্রাচীন ও আধুনিক শতাধিক সংস্কৃত নাটক। এই সকল কর্মের জন্ত পূর্ণাঙ্গ সাহায্যরূপে সরকার হ'তে নিয়মিত অর্থানুদান ও তিনি সংগ্রহ ক'রতে পেয়ে-ছিলেন। “প্রাচ্যবাণী” নামে ইংরেজী এবং বাংলায় যে দুটি গবেষণা মুখপত্র এই প্রতিষ্ঠান থেকে তিনি সম্পাদনা ক'রতেন, তা' এক সময়ে গবেষণা জগতে আলোড়ন তুলে-ছিল। কত অমূল্য অতি প্রয়োজনীয় রচনা বিভিন্ন বিদ্বৎ ব্যক্তির লেখনীতে গ্রহণ হ'য়ে এই পত্রিকাষয়ে তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হ'য়েছে তাঁর ইয়ত্তা নেই। বেশ কয়েক বছর ধ'রে এই পত্রিকা দুটি আর প্রকাশিত হ'চ্ছে না দেখে দুঃখ হয়। এই প্রতিষ্ঠান থেকেই বহু অমূল্য মৌলিক এবং গবেষণাগ্রন্থ পূর্বে তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হ'য়ে বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ ক'রেছে। মহামহো-পাধ্যায় ডঃ যোগেন্দ্রনাথ তর্ক সাংখ্য-বেদান্ততীর্থের “প্রাচীন ভারতে দণ্ডনীতি”, “ভারতীয় দর্শনের সমন্বয়”, ডঃ রাধা-গোবিন্দ নাথের “গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন”, “চৈতন্যচরিতামৃতের ভূমিকা”, ডঃ গিরীন্দ্রশেখর বসুর “পৌরাণিকী”, ডঃ রমা চৌধুরীর “স্বকী ও বেদান্ত দর্শন” প্রভৃতি বিখ্যাত

গ্রন্থ তাঁরই সম্পাদনার “প্রাচ্যবাণী” থেকে প্রকাশিত হয়েছে

তা’ছাড়া তাঁর নিজের রচিত বহু মৌলিক এবং গবেষণাগ্রন্থ ও সংস্কৃত নাটকাবলী এই প্রতিষ্ঠান থেকেই প্রকাশিত। গোড়ার দিকে গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনাতেই ছিল তাঁর প্রবণতা। বিশেষ করে তাঁর “The contribution of Muslims to Sanskrit Literature” এবং “Muslim Patronage to Sanskrit Learning” এই গ্রন্থদ্বয়ে তিনি ভারতে সংস্কৃত চর্চার এক অজ্ঞাত অধ্যায় উদ্ঘাটিত করেন। সংস্কৃত ভাষার মন্দা-কিনী ধারা যে ভারতের মননভূমিতে কখনো বিলুপ্ত হয়েছে, যারিনি, তা’র নিদর্শন মেলে এই গ্রন্থদ্বয়ে। এই স্মৃধুর এবং সুপরিণত দেবভাষার স্বাভাবিক গুণেই বিজ্ঞতা মুগ্ধমান-রাও বিজিতদের ভাষা এই সংস্কৃত চর্চায় আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। তাঁরা যেমন সংস্কৃতের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন, তেমনি অনেকে সংস্কৃতে প্রকৃত পরিমাপ রচনাও রেখে গেছেন। সম্রাটপুত্র দ্বারা শিকোহ, খানখানান্ আবদুর রহমান, মহম্মদ শাহ, দরফ খাঁ প্রভৃতির সংস্কৃত রচনা তিনি সম্পাদিত ও প্রকাশিত করে সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় সংযোজিত করেন। এই স্বর ভাষার মাধ্যমেই সেদিন যে হিন্দু মুসলমানের রাখীবন্ধন হয়েছিল, এই শুভ সন্দেশ তিনিই বোধ হয় আমাদের প্রথম দান করেন। তা’ছাড়া সংস্কৃত ভাষার রচিত তাঁর “বঙ্গীয় দূতকাব্যোতিহাসঃ” বাংলার সংস্কৃত চর্চার একটি বিশিষ্ট ধারাকে বিশেষ ভাবে তুলে ধরেছে। এ ছাড়া “The position of women in the Vedic Rituals” “The Contribution of Bengal in Smriti Literature” এবং “The Contribution of women to Sanskrit Literature” এই তিনটি গ্রন্থ রচনায় তিনি অসাধারণ ধীশক্তি পরিশ্রম এবং বিভাবতার পরিচয় দিয়েছেন। এ ছাড়া আরো বহু গ্রন্থ তাঁর সম্পাদনার প্রকাশিত হয়েছে আমাদের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। জীবনের শেষের দিকে তিনি সংস্কৃত নাটক রচনাতেই বিশেষ করে আত্মনিয়োগ করেন। ভারতের বিখ্যাত ধর্মসম্প্রদায়গুলির দ্বারা ছিলেন বরণ্য প্রবক্তা, তাঁদের প্রায় সকলের জীবনকে নিয়েই তিনি নাটক রচনা করেন। বিশেষ করে শক্তি-

রূপিনী নারীগাথিকাদের জীবনকে নাটকে রূপান্তরিত করার দিকে ছিল তাঁর সবিশেষ প্রবণতা। তাঁর রচিত সংস্কৃত নাটকাবলীর মধ্যে “মহাপ্রভু হরিদাসম্”, “শ্রীতিবিস্মুপ্রিয়ম্” “নিষ্কিন বশোধরম্” এবং “দীনদাসবসুনাথম্”—এই নাটক চতুষ্টয়কে সংলাপের সারস্বা, ভাবের বৈচিত্র্য এবং ঘটনার সংঘাতের দ্বারা রসোত্তীর্ণ প্রথম শ্রেণীর নাটকরূপে অনার্যসে চিহ্নিত করা চলে। এ ছাড়া “শক্তিনারদম্”, “ভক্তিবিস্মুপ্রিয়ম্”, “ভারতহৃদয়ারবিন্দম্”, “ভারতভাস্করম্”, “ভেনিসবনিজম্”, “বিমল বতীন্দ্রম্”, “মুক্তিনারদম্”, “অমর-মৌরম্”, “রক্ষক গোরক্ষম্” প্রভৃতি তাঁরই লেখনীপ্রসূত বহু অভিনীত নাটক। পালি ভাষায় রচিত প্রথম নাটক “বিশ্বহৃদরীপটবিশ্বনম্” তাঁরই রচনা। এ ছাড়া আরো বহু গ্রন্থ তিনি রচনা ও সম্পাদনা করেন।

তাঁর আর একটি মহৎকর্ম হচ্ছে বাংলাদেশে “সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়” প্রতিষ্ঠার জন্ত আন্দোলন সৃষ্টি। বহুদিন পূর্বে, স্বাধীনতার সংগে সংগেই সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্ত বহু সভাসমিতির মাধ্যমে তিনি জনচেতনাকে উদ্বুদ্ধ করেন। আজ, তা’ ফলপ্রসূ হ’তে চলেছে। কিন্তু, হয়, সে ফল দর্শন করে যাবার মতো আয়ু তিনি পেলেন না। সংস্কৃতকে রাষ্ট্রভাষা এবং অবশ্য পাঠ্য করার জন্তে তাঁর প্রয়াসের কথা সর্বদাই স্মরণীয়। “আকাশ বাণী”তে সংস্কৃত নাটকের অভিনয় এবং সংস্কৃতমূলক ভাষণাদির নিয়মিত অনুষ্ঠান অনেকটা তাঁরই অক্লান্ত চেষ্টায় আরম্ভ হয়েছিল।

নানাভাবে সংস্কৃতপ্রচারের জন্তে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করতেন বিশেষ করে সংস্কৃত নাটকের অভিনয়কে তিনি তার শ্রেষ্ঠ উপায় রূপে গ্রহণ করেছিলেন। অধঃপতন পূর্ব হ’তে বাংলা দেশে যদিও “সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ” নিয়মিত ভাবে সম্মেলনমানের সংস্কৃত অভিনয় বাংলায় ও বহির্বঙ্গে করে আসছিল, তা প্রধানতঃ সীমিত থাকতো সংস্কৃতজ্ঞ বিদ্বৎ গোষ্ঠীর মধ্যেই এবং অভিনয়ও হত বছরে দুই-তিনবার মাত্র। কিন্তু, ডঃ চৌধুরীর অদ্বয় উৎসাহে সর্বভারতে সর্বজনের কাছে প্রতিবৎসর বহুবার সংস্কৃত নাটকের রসধারা পরিবেশিত হতে লাগলো। সংস্কৃতের গণসংযোগে তিনিই এক বরকম পথিকৃত। প্রথমেই দিকে, “প্রাচ্যবাণী” বার্ষিকোৎসবে একটি করে প্রাচীন সংস্কৃত

নাটক মহাসমারোহে অভিনীত হ'ত। তাঁরই নেতৃত্বে ১৯৪৪ এ “অভিজ্ঞান শকুন্তলম্”, ১৯৪৬ এ “মিবারপ্রতাপম্” এবং “মধ্যমব্যায়োগম্”, ১৯৩৭ এ “চণ্ডকৌশিকম্” ১৯৪৯ এ “বেণীসংহারম্”, ১৯৫০ এ “মুচ্ছকটিকম্”, ১৯৫১ তে “প্রতিমানাটকম্”, ১৯৫২ তে “চণ্ডকৌশিকম্”, ১৯৫৩ এ “নাগানন্দম্”, ১৯৫৪ এ “অভিষেকম্” প্রভৃতি নাটকের সুপ্রযোজিত অভিনয় বিদগ্ধগোষ্ঠীকে মুগ্ধ করেছে। স্বাধীনতার পর অধিকাংশ নাটকই “রাজভবনে” অভিনীত হ'য়েছে রাজ্যপালগণের পৃষ্ঠপোষকতায়। ১৯৫৬ হ'তে তাঁর স্বরচিত নাটক অভিনীত হ'তে শুরু হ'ল। ১৯৫৭ এর জাহ্নবীরীতে অভিনীত “স্বপ্নরঘুবংশম্” নামক নাটকটি তাঁর স্বরচিত নাটকের প্রথম অভিনয়। তারপর তিনি দশ-বারোটি সংস্কৃত নাটক রচনা করেন এবং প্রায় প্রতি মণ্ডাহেই সেগুলোর অভিনয় নানাস্থানে নানাভাবে করাতে থাকেন। তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত এবং অসীম স্নেহে আকৃষ্ট হ'য়ে বাংলার প্রায় সকল বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজের প্রখ্যাত অধ্যাপকদের অনেকেই এবং অগাধ পদস্থ শিক্ষিত নরনারী এই অভিনয়গুলিতে প্রথমে দিকে অংশগ্রহণ করতেন। ফলে অভিনয়ও প্রায়ই হ'ত সর্বাঙ্গ-সুন্দর। এই নাট্য-গোষ্ঠী নিয়ে সারা ভারত এবং ভারতের বাইরেও তিনি গমন করেন এবং অভিনয় প্রদর্শনের দ্বারা অনেককেই পরিতুষ্ট করেন। পূর্বের অভিনেতৃমণ্ডলীর প্রায় সবাই নানা অসুবিধায় নিয়মিত ভাবে তাঁর অভিনয়ে যোগদানে অপারগ হ'য়ে প'ড়লেও অতুলনীর তৎপরতার সংগে বহু নতুন অভিনেতাকে শিক্ষিত ক'রে তিনি নিখিল ভারতে অভিনয় করিয়েই যেতে থাকেন। নাটকের অভিনয় কেবল অর্থসাধ্য নয়, প্রভূত ভ্রমসাধ্য ব্যাপারও বটে। বহুজনকে একত্রিত করে, বহুদিকে লক্ষ্যরেখে, সকল প্রকারের দ্ব্যবস্থার ভার নিজে বহন ক'রে অভিনয় করাতে হ'ত বলে তাঁকে অসামান্য পরিশ্রম ক'রতে হ'ত। মনে হয় এই অভিনয়ের জন্তে যে অপরিমিত পরিশ্রম তাঁকে করতে হ'য়েছে, তাতেই তাঁর জীবনীশক্তি নিঃশেষ হ'য়ে গিয়ে তাঁর অকালমৃত্যুকে স্বাধীত ক'রেছে। দেশের বৃহত্তর কল্যাণে এবং সংস্কৃতির প্রশস্ততর প্রয়োজনে তাঁকে এই অসামান্য পরিশ্রম হতে সংবত ক'রে বাঁচাবার সেন্দ্বিন কেউ ছিলনা ব'লে দুঃখ হয়।

যাই হোক, সংস্কৃতভাষার সর্বাঙ্গীণ প্রচার এবং প্রসারে তাঁর যতো এই ভাবে আত্মোৎসর্গ আর কেউ করেছেন ব'লে বলি হয় না। বহুবিধ প্রতিকূলতার মধ্যেও সংস্কৃতির

দীপশিখাটি তিনি যে ভাবে নিজের জীবনের বিনিময়ে জালিয়ে রেখে গেছেন, তা অতুলনীয়। স্বাস্থ্য হিসাবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত অসামান্য। অতি সামান্য অবস্থা হ'তে পরিশ্রম এবং একাগ্রতার দ্বারা ই তিনি যশ এবং উন্নতির সমুচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিলেন। কখনো তাঁকে বিচলিত হ'তে দেখা যেতো না। শাস্ত্র, অনলস এবং স্থিতদী এই মনোমীর দুর্লভ মধুর ব্যক্তিত্বে পরিচিত— অপরিচিত, ছোট বড়ো সবাই মুগ্ধ না হ'য়ে পারতেনা। মতান্তরেও কখনো তাঁর মনান্তর হতনা। সংস্কৃত, বাংলা এবং ইংরেজীতে তাঁর বাগ্মিতাও ছিল অনন্তসাধারণ। যে কোন বিষয় নিয়ে তিনি অনর্গল ভাবে সংস্কৃতভাষায় ভাষণ দিতে পারতেন।

যে “সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদ” ভারতের সনাতন সংস্কৃত শিক্ষার ধারাকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে চ'লেছে, তাঁর সরকারী নিয়ন্ত্রণ ছিলেন তিনি। তাঁরই কর্মকুশলতায় বাংলার এই শিক্ষাপরিষদের পরীক্ষাকেন্দ্র সার্বভারতে দূরদূরান্তে প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে। টোলের উন্নয়নের জন্তে তাঁর চেষ্টায় তাঁরই হাত দিয়ে প্রতি বৎসর বহু লক্ষ টাকা সরকার হ'তে ব্যয় হ'ত। তাঁরই অদম্য কর্মনৈপুণ্যে এই পরিষদের দিন দিন বিবর্ধন সম্পাদিত হইয়াছে এবং প্রায় একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ ক'রে চ'লেছে এই প্রতিষ্ঠান।

যাক, এই ভাবে জ্ঞান-কর্মের সমগ্র সাধন ক'রেছিলেন তিনি তাঁর জীবন-সাধনায়। এই প্রকার জ্ঞান-কর্মাক্রান্ত জীবনই আদর্শ জীবন এবং এই সমগ্র-মার্গের পথিকেরাই দেহান্তে ব্রহ্মপদ লাভ করেন ব'লে আমাদের শাস্ত্রকারেরা ব'লেছেন। যোগবাশিষ্ঠে র'য়েছে—

“উভাভ্যামেব পক্ষাভ্যাং যথা থে পক্ষিণাং গতিঃ।

তথৈব জ্ঞান-কর্মভ্যাং জায়তে পরমং পদম্।”

তাই, মনে হয়, এই সমগ্র-সুন্দর জীবনের অধিকারী, কল্যাণকর্মা, জ্ঞানপ্রতী যতীন্দ্রবিমল আজ দেহান্তে পরমপদ লাভ ক'রে অথও ব্রহ্মানন্দ স্থখ অনুভব করছেন। বিশ্ব-ভারতের কল্যাণে সংস্কৃত ভাষা এবং তদাশ্রিত সংস্কৃতির প্রসারে আমরা যদি আজ সবাই মিলিতভাবে তাঁর প্রায়ক কর্মাবলীকে সমাপ্তির পথে নিয়ে যেতে পারি, তবেই তাঁর অমর আত্মার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি সার্থক হ'য়ে উঠবে। তাঁর মহনীয় কর্মাদর্শ ভবিষ্যৎ ভারতের পট-ভূমিকায় চিরকালের জন্তে সজীবিত থাকুক—“জিজীবিষৎ শতং সমাঃ” এই তো প্রার্থনা।



রসকলি

গুরুপ্রসাদ রায়

মহেশ্বর বাড়ী ফিরল, সন্ধ্যা তখন রাত্রির দিকে অনেকখানি এগিয়ে গেছে, বর্ষাকাল, বন বাদাড়ে ঝিল্লির অবোধা ঐক্যতান এতটুকু সজাগ করতে পারল না। মাথার ভেতর ছিল নেশার একটানা কিম্বিকিম প্রলাপ, উপোগী পাক-স্থলীর বিস্ত্রী হাটাকার সে শুনছিল।

আগড় ঠেলে ঢুকলো মহেশ্বর। অম্পট প্রদীপের আলোয় তার আরক্ত চোখ দুটো বস্ত্র হায়নার মতো জল-ছিল, কমলা এগিয়ে এসে বলে—কি এত রাত করলে যে বড়। চাপিটা না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়লো—কিছু এনেছ ?

মহেশ্বরের মুখে একটা কথা নেই, ভাঙা পিঁড়েটা পেতে বসে পড়ে বলে—নে ভাত নিয়ে আয়। ভাত! কমলা স্বামীর রক্ত চক্ষুর দিকে চেয়ে থাকে। ব্যাপারটা এতক্ষণে বুঝতে পারে সে। কমলার বহু কষ্টে সঞ্চিত দশটা পয়সা স্বামীর নেশার সেবার উবে গেছে। হা ভগবান! কমলা ছেঁড়া কাঁথার এক কোণে বসে দীর্ঘশ্বাসটা চেপে নেয়।

মহেশ্বর ঝিঁচিয়ে ওঠে—কি হারামজাদির কানে কথাটি গেল না। ভাত নিয়ে আয় শিবগির...পিটিয়ে ছাল খুলে নেব।

কমলা আর সামলাতে পারে না নিজেকে, ঝাঁঝিয়ে ওঠে—রাত দুপুরে মরদগিরী ফলাচ্ছেন, বলি মিন্‌সে, মুড়ী ভাজানির যে দশ দশটা পয়সা দিছু কোন গব্বে খুইয়ে এলে শুনি। আমার দুধের বাছা না খেয়ে ঘুমুলো, আর উনি তখি করে বলছেন, ভাত নিয়ে আয়, মরণ মরণ আরকি ? মুয়ে আঙুন !

—কাল যে বোসেদের ঠেঙে একপালি ধান নি'এক্কি করলি শুনি ? বল কায় সাথে পিরীত করতে বেচেছিস, সেই ছোড়াটা বুঝি এয়েছিল। হারামজাদি বল শিগ'গির, নছার মাগী....

—আহা ক্যানা ঢালা মিন্‌সে। তোমার ধান ঐ তো চক্ষের সামনে ভিজুনি আছে ইয় মধ্যে চান্নিশে ধরল।

—বলি ভিজুনি থাকলে কি পেট ভরবে ? যোদে দিসনি কেন ?

—আহা কথার ছিরি দেখনা—হুথি ঠাকুর যেন আমার বাবা। উঠ বল্লিই উঠবে, বলে আজ কদিন ধরে ভিজু পান্‌সি কাপড় পিন্‌দে কাটাছি, আর ওনার এক পালি ধান শুকুতে হুথি উঠবে—বলিহারি ! রাত দুপুরে মিনলের ভিমরতি ধরেছে।

এর পরেও শেষ হয়না। আরো অনেকক্ষণ চলে। চাপা কাঁথার তলা থেকে বাপ মায়ের এই বিচিত্র দৈনন্দিন জীবন নাট্য দেখতে থাকে। বয়েস তার আট। অভিজ্ঞতার আঠার। এর পরের অবস্থাটা চাপা বলে হিতে পারে। মা কাঁদতে কাঁদতে বিছানায় লুটিয়ে পড়ে তাকে বুকের কাছে আঁকড়ে ধরবে। অনেক গভীর রাতে বাবার গরম নিশাস মার মুখে এসে পড়বে। এই সময়টা তারী অবন্তি লাগে ওর। ছোট বুকটা কি এক অব্যক্ত আশংকায় টিপ্‌, টিপ্‌ করতে থাকে।

দাম্পত্য কলহের শেষ দৃশ্য দেখা যায় কমলা লক্ষীর পটের সামনে অক্লান্ত ভাবে মাথা কুটে চলেছে—ভাগি ভাগি, সব আমার এ পোড়া কপালের দোষ, নেশাখোর সোন্‌দারী, বৌপুতের ভাত যোগাতে পারে না, তা আমার কত যোধ, মা লক্ষী গো তুলে নাও—কবে আমি সতীমার মতো এক চিত্তে যাবো....

চাপার এ সব আর তেমন বিশ্বাস লাগে না। বরং মনে মনে একটু যেন হাসি পায়।

কিন্তু আজ মায়ের শেষ কথার ও মুহুর্তে পড়ে সতীমার কথা মনে পড়লে সেইনের হকিই খেসে ওঠে।

মাসখানেক আগের কথা। পাঁচ-সাতটা গ্রামের লোক ভেঙে পড়েছিল 'বামুনগাছির' বিশালাকী স্থান ঘাটে। কি সমারোহ, ব্যস্তিবাঞ্ছনা। মুখ্যো বাড়ীর ছোট ভরফের বো, যেন ছগ্গা প্রতিমা, মাথায় কপালে সিঁদুরের গাঢ় লেপ, লাল চওড়া পাড় তাঁতের কাপড়, পা দুটো আলতায় ডুবে গেছে, শাস্ত দৃষ্টি, ঝেথলে অঙ্কায় মাথা হয়ে পড়ে।

কিন্তু চাঁপার সেদিন সমস্ত সমারোহ ব্যস্তি বাঞ্ছনাকে চাপা দিয়ে একটা কুটিল ভীতি গলা চেপে ধরেছিল। শুধু ধোঁয়া আর ধোঁয়া। সেই ধোঁয়া ফুড়ে মাঝে মাঝে আগুনের হুকা নেচে নেচে উঠছিল। বেশীকণ চেয়ে থাকতে পারেনি, চোখ জলে ভরে গিয়েছিল। চাঁপার শিশু অস্তর সেই ভীষণ দৃশ্যের কথা ভাবলে ঘুমের মধ্যেও চমকে ওঠে। সতীমার অদ্ভুত আচরণের ব্যাখ্যা সে আজোও তৈরী করতে পারেনি। এখনোও চোখ বুজলে সে শুনেতে পায় সেই প্রচণ্ড হট্টগোল—তুর্থা নিনাদ, 'সতী-মাকি জয়—সতীমার জয়!'

* * *

এ কাহিনীর আখ্যানবস্তু আজকের নয়, অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা দেশ। শাস্ত্র আর কুমংকার শানিত শাস্ত্রের মতো সাধারণের জীবনে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিল। তখনও বৈদিক সাত্বে বাংলা মূলকে আসেনি। সবে মাত্র রাম-মোহন দ্বারকানাথের নোতুন কথা একটু একটু করে ছড়িয়ে পড়ছিল। কিন্তু পল্লীর ধূমাক্ষর চণ্ডিমাগুপের গুমোট ঠেলে প্রবেশ করতে পারেনি। বঙ্গী শেতলা জগাবুড়ী মাকাল চণ্ডী কালী—পাজী পুখি আর আটপোরে নীতিবাক্য নিয়ে বাংলার পল্লীমা তখন ইহকালের জীবনকে পরকালের কাঁদে বুলিয়ে কেঁদে মরছে। সে গ্রন্থীর প্রচণ্ড বন্ধনে কারও মুখ থেকে বের হতো না প্রতিবাদ। 'মহু' আর খনার বচন সোনার দামে বিকাতো; ভট্টাচার্য টিকি থাকতো উর্দ্ধমুখী—স্বর্গের দেবতাদের কাছ থেকে নীতি ধর্ম শাস্ত্রের অমৃত বাণী গ্রহণ করবার জন্যই বুঝি সবার ওপর শিথিপুচ্ছ বিরাজ করতো, জমিদারের বস্তুচকু বে অধমকে বরাত্তর দান করতো, রাতের অন্ধকারে জমিদারের লেটেল সে অধরের সর্বস্ব হুলিমাং করে দিলেও প্রতিবাদ করার কোন শক্তি ছিল না।

গাঁয়ের মহামাত্র মাতঙ্গরমা ব্যক্তিচারের পাকে ডুবে, ব্যক্তিচারের বিচার করতেন, তাঁদের রায় ছিল চূড়ান্ত, জীবন ছিল ধর্মের ফাঁকা উপদেশে কণ্টকিত। সাধারণের স্বার্থ অর্থ বুঝতো না, তাই মেনে নিরেও মানতে পারতো না। নারীর মর্যাদার কথা বলতে গিয়ে উদাহরণের অভাব ঘটতো না, তবু সমাজ আর ধর্মের দোহাই দিয়ে ৬০ বছরের বৃদ্ধ ২ বছরের মেয়েকে ঘরে আনতো। এ বিষয়ে কুলীন ব্রাহ্মণরা একটু বেশী অগ্রণী ছিল। অনেকের জীবনী থেকে দু একশো শব্দর বাড়ীর সংবাদ অনায়াসেই মিলতো। নারীর নারীত্বের থেকে বড় ছিল সতীত্ব। আর সেই সতীত্বের চূড়ান্ত পরীক্ষা দিতে হত জ্বরন্ত চিতায়। স্ব-ইচ্ছায় বাও ভাল, তোমার জন্তে স্বর্গের পুষ্পক রথ তোমারই অসহায় ছেলেটাকে চাপা দিয়ে উঠানে এসে দাঁড়িয়েছে। তোমার আশা আকাঙ্ক্ষা ভালবাসা সমস্ত মায়া—সবার উর্দ্ধে স্বর্গের পুণ্য স্থান।

আর যদি না বাও, শক্তি আছে। ধর্মের দেশে ব্যক্তিচার হতে দিতে তো পারি না!' ধর্মের জরনাদ, ধর্মরাজের কানে পৌছার কিনা কেউ জানে না। যদি বা পৌছায় নিশ্চয়ই তিনি কানে আঙুল দিতেন। যদি মহামাত্র ধর্মরাজ একবার কোন রকমে নীচের দিকে তাকাতেন, দেখতেন যে অভাগিনীকে এইমাত্র দাঁহ করা হল, তারই পাঁচ বছরের ছেলেটা ঘরের দাওয়ার লুটো-পুটি বাচ্ছে। ই্যা, প্রচুর সমবেদনা ছিল বৈকি? পুরুত ঠাকুর ফর্দ করতে বসেছেন। শুধু 'সতী' হলোই চলে না ব্রাহ্মণ ভোজন আর দক্ষিণা না দিলে যে ২০ তাগ পুণ্যই উবে যাবে। তাই অভাগিনীর আত্মীয়কে ছুটতে হত মহাজনের কাছে। সমারোহের কিছু বাধে যায় না। কেবল সেই দেখল না যার জন্তে এত কাণ্ড সে কোন পুণ্য সাগরে এখন হাবুডুবু খাচ্ছে।

'সতীদাহ'! ধর্মের নামে সমাজের চরম ব্যক্তিচার নিষ্ঠুরতম জঘন্ততম নিয়ম। পরকালের অজ্ঞাত পুণ্যের মহত্ত্বের ছলাকলায় আশাবীপ জীবনের সমাপ্তি। কলনার সীতার আদর্শে বাস্তবের শত সীতার আত্মহত্যা, পরম লাভ পুণ্য—লোকসান এতটুকু নেই।

সত্যই কি নারীর সঙ্গে অমৃত্যু হলে অকল স্বর্গ লাভ হয়? স্বর্গ বলে কিছু আছে তো? সতীমা নিশ্চয়ই এখন

অর্গে স্বামীর সঙ্গে আছে। তবু কোথায় যেন একটু
সন্দেহ! কমলা মনে মনে এর বেশী চিন্তা করতে পারে
না। না, আজ্ঞা সঞ্চিত সংস্কারকে ধুলায় নামালে যে
পাপ হবে। কমলা আর ভাবে না, এসব ভাবনাও পাপ—
অজ্ঞায়। শুধু নিজের দুর্ভাগ্যের কথা আর একবার ভেবে
লক্ষ্মীর পটে মাথা নোয়ায়।

* * *

কদিন পরে আজ রোদ উঠেছে। কমলা ঝাঁতলায়
ওপর ধানগুলো বিছিয়ে দিয়ে আকাশের দিকে তাকায়।
না, আজ বোধহয় তাকাবে না। মুখপোড়া আকাশের
কথা কিছুই বলা যায় না। ভাদরের শেষ, ঘন সবুজ
ধানের ডগাগুলো জলের ওপর উঁকি দিচ্ছে। বেশ লাগে
ভাদরের এই রোদ চকচকে সকাল। কমলার দৃষ্টি আলোর
দিকে পড়ে। উঁচু আলপথ দিয়ে হেঁটে আসছে সেই
ছেলেটা। কপালে রসকলি, কাঁধে ভিক্ষের বুলি, পরণে
আঁটহাতি কাপড়, বয়েসটা ১৪।১৫, দেখে মনে হয় আরো
বেশী।

বাপ মায়ের কথা জিগেস করলে বলে—সে কি গো
তুমিই তো আমার যশোদা মা-ঠাকুরণ, গান ধরে রাখাল,
খজুরী শব্দ ওঠে—

থেনে থেনে কান্দি লুটাই রাই রথ আগে

থেনে থেনে হরি মুখ চাহ,

থেনে থেনে মনহি করত জানি ঐছন

নাহ সঞে জীবন বাহ।

ভাগর ভাগর চোখ তুলে চাঁপা এসে দাঁড়ায়। অবাক হয়ে
রাখালের গান শোনে। এক একদিন হুজনে গল্প করে,
রাখাল শোনায় অভূত সব কাহিনী, তেঁতুল গাছে ঠেস
দিয়ে চাঁপা শোনে কেমন করে কোন মহাস্ত বাঘের মুখ
থেকে ফিরে আসে শুধু গানের জোরে, পদ্মাবতীর মহিমায়।
কোনদিন রাখাল শোনায় অগাই মাখাইয়ের কথা, ‘মেরেছ
কলসীর কানা তাই বলে কি প্রেম দেব না।’ চাঁপা গোবা
বিশ্ময়ে চোখের সামনে কুটে ওঠে অনেক ছবি।

কচি আমড়া মুখে ফেলে বলে—তুমি এতো কোথায়
শিখলে গা। রাখাল হাসে, তুই শিখনি, রসকলি কেটে
হব, দিনেরবেলায় গাঁয়ে গাঁয়ে ভিক্ষে করে বেড়াব, বেশ

মজা হবে, থাকবি আমাদের আখড়ায়, চুল বেঁধে দেব
মোহন চূড়া করে...কিছু ঝকি নাই...বাবি!

এত কথা শোনার বা বোঝবার দরকার নেই চাঁপার—
সে হয়তো তখন খজুরীটা কেড়ে নিয়ে বাজাতে আরম্ভ
করেছে। রাখাল চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

—না বাবু পারবনি এ বড় বেয়াড়া। এক দৌড়ে চলে
যায় চাঁপা। রাখাল তখন আর একখানা ধরে...

থেনে মুখে তৃণ ধরি রাখাল আঙুলসারি

আছাড়ি পড়য়ে নিজ অঙ্গে

থেনে পুন মুরছই থেনে পুন উঠই

ডুবল বিরহ তরঙ্গে।

ধীরে ধীরে রাখাল চলে যায়। কমলার বড় ভাল লাগে
রাখালকে। সবুজ মাতৃঘর ঘেন টনটন করে ওঠে। এমন
করে রাখাল আজ দুবছর আসে আর যায়।

বিছান ধানের ওপর এক ঝাঁক শালিক উড়ে বসে।
কমলা তাদের তাড়িয়ে বাদলকে স্বাগত জানায়। কি
গো কাহ্ন, এদিন কোথা ছিলি?

—আর বেলো কানো, কদিনের তরে গেলুম চলে
হরিন্দাসপুরের আখড়ায়। আহা নটহরি বাবা এ্যামনি
মচ্ছপ করলো—প্রাণ জুড়িয়ে যায়। লাভপুর থেকে
ত্রিশূলী মহাস্ত এয়েছিল, আরো কত বড় বড় গায়েন—
কি সব পদ! জানো ঠাকুরণ, ত্রিশূলী বাবা বলে কি...

আশে পাশে একটু দেখে নেয় রাখাল। এতবড় একটা
কথা চাঁপার অসাক্ষাতে প্রকাশ করতে মন চায় না। কিন্তু
চাঁপার ছায়া কোথাও নেই। নিরাশ হয়ে কমলাকেই
বলে—

—ত্রিশূলী বাবা কইলেন কি আর বছরে আমি মূল
গায়েন হতে পারবো। ঠাকুরের পার ধুলি নিয়ে কইলুম—
সেই আশীর্বাদ করো মোহাস্ত বাবা...আর যায় কোথা,
বুকে জড়িয়ে নিল।’

চাঁপা সত্যিই খুব ব্যস্ত। কক্ষির ছিপটা একহাতে,
অন্যহাতে কচু পাঞ্জায় মোড়া কি ঘেন ধরা, হয়তো চার
অথবা চারো মাছ। খজুরী শব্দে চমক ভাঙে চাঁপার,—
কখন এলে গো রাখালদা?

—এয়েছি তো অনেক আগে, তোমর দেখাই মেলেনা
বে—কি করছিলি? রাখাল বসিষ্ট হয়ে দাঁড়ায়, চাঁপা

পায়ের নুড়া আঙ্গুলের ওপর ভর দিয়ে একটা যুংসই জায়গায় বড়শী ফেলে।—

—এই দেখনা, কিছুতেই গড়ুইয়ের বাচ্চাটা গিলতে চায়না। শুধু ফুটুর ফুটুর করে বেড়ায়। ঠিক তোমার মতো।

বাড়ন্ত গড়নে ওকে অনেকখানি বড় দেখায়। এই বয়েসেই চুলের ঝারি আঁখাটের মেঘের মতো কোমর পর্যন্ত নেমে গেছে। অদূরের দূরবিস্তৃত ধানের চারার মতো ওর চোখে নেমেছে গাঢ় স্ফামলিমা। ওর কটাক্ষে যেন আগত বসন্তের নিশ্চিৎ পূর্বাভাস, রাখাল হাসে—

—আমার মতো? আমিষিক গড়ুই মাছ।

—তা নয়তো কি, আজ এগাঁ কাল উগাঁ, পরন্ত বাকুই চণ্ডিপূর। একবার ইখানে ফুট কাটো, একবার উখানে ফুট কাটো-গড়ুই ছানার মতো, কোণা খিঁতু হলে নি!

—তা যা বলেছিস চাঁপি! বোষ্টমের এই তো গাঁতি। ভিক্ষে করে বেড়ালে কেউ কি খিঁতু হয়। নামগান খামাদের সওদা, এই বেচেই দিন কাটে। পথ আমাদের ধর, সেই খে পদাবলীতে আছে মাধুকরী লইছি...।

চাঁপা বাধা দেয়, ফ্যামা দে রাখালদা। গনজুনির বালে গড়ুই ছানা পালাবে। হ্যাঁগা ই-কথাটি কী হোল, মাধুকরী...ওটা আবার কী কথা?

—ভিক্ষে, ভিক্ষে করাকে মাধুকরী বলে—

একটুকুণ চূপচাপ। চাঁপা জয়ের আনন্দে লাকিয়ে ওঠে। গড়ুই ছানা এবার ধরা পড়েছে।

চলতে চলতে খাদল হঠাৎ বলে—হাঁরে মাছ েতে খব ভালবাসিস, না?

—খুউব বাসি।

—তাহলে বোষ্টমী হতে পারলিনি!

—কেন?

—বোষ্টমদের মাছ খাওয়া নিষেধ।

—খুং ই কি কথা। না বাপু বোষ্টমী হব নি। নাকে তলক কেটে ই গাঁ উ গাঁ, মাধুকরী...ছি-ছি-ছি...

রাখাল মুখে পড়ে। তবু গলায় জোর এনে বলে—তাকে বোষ্টমী হতেই হবে।

চাঁপা কেমনধারা চূপ হয়ে যায়। জীবনের এই গৃহ

দিকটার ইশারা ও যেন ভালভাবে বুঝতে পেরেছে। যেকালে বার বছরে মা হ'তে হতো, সেকালে ২ বছরের চাঁপার পক্ষে জীবনের গভীর রহস্যটাকে জানা কী খুব অগ্গায়!

রাখাল প্রসঙ্গ বদলায়।—জানিস ত্রিশূলী বাবা কি কয়েছেন?

—কি?...

—কয়েছেন আর বছরে আমি মূল গায়ের হতে পারব। ভারি মজা হবে চাঁপি। হরিদাসপুরের আখড়ায় দুজন খাকবো, রোজ সকালে রসকলি কেটে দেবো, মাথায় বেধে দেব মোহন চূড়া মাধুকরী করতে বেকো ভিন্ গায়ে, ভারি মজা হবে...।

রাখালের চোখে একরাশ স্বপ্ন টলমল করে। চাঁপা হাসে, সকালের চাঁপার মতো, হাসতে হাসতেই সে ছুটে চলে যায়। রাখালের হঠাৎ খেয়াল হ'ল অনেকটা বেলা হয়েছে।...আপনা আপনি গান বের হয়...

রূপ লাগি আঁখি বুঝে গুণে মন ভোর

প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর।

* * *

মহেশের নুকটা আজ আনন্দে ভরা, গামছার খুঁটে বাধা সের তিনেক চাল, কিছু আনাঙ্গ, আর হাতে দুটো বড় বুনো নারকেল। হাটুর ওপর কাপড়, খোলা নুক। কোমরের এক কোণে একখণ্ড সূতো দেখা যাচ্ছে। নারকেল দুটো মশকে দরজায় আছড়ে ফেলে হাঁক পাড়—কিগো কোথা গেলে? দাওয়ায় আগলে চাঁপা মাছ কুট-ছিল, কমলা গিয়েছিল বাসন মার্জতে। চাঁপা আশ্চর্য হয়ে গেল বাবার দরাজ গলা শুনে। বাবার এমন গলা তো কচিং দেখা যায়। কাজেই পরিচিত চিত্রের পরিবর্তন দেখে চাঁপা বাবার দিকে এগিয়ে এলো।

—এই চাঁপি, এগুলো তুলে রাখ—মা কোথা?

চাঁপা হাত ধুয়ে এসে জিনিস দেখতে বসে। কিছু কাঁচা আনাঙ্গ, আন্ত কল, মশলা আরো কিছু টুকটাকি।

—বা: ভারী সোল্লর গামছাটা, এটি আমি নেক...।

—জানিস এর দাম কতো? বাকুইচণ্ডির গামছা বেশে গামছা নয় হাঁ। গাঙ্গুলী গিন্নি কথা দিয়ে ভোয়ের করে এনেছে। পেত্যেখানায় দাম চৌদ্দ পরস।

চাঁপা হাঁ করে বাবার কথা গেলে। কমলা ঘাট সেরে এসে কাছে দাঁড়াতে মহেশ্বর গম্ভীর স্বরে বলে—নাও তুলে রাখ, গাঙ্গুলী গিন্নির আজ ব্রত (ব্রত) উদ্‌ঘাপনের দিন ছিল...

কমলা জিনিসগুলো ঘরে তোলে আর মহেশ্বর আঁকপের স্বরে বলে—আর কি সেদিন আছে! লোকে সিঁদে বললে চমকে উঠতো। ছোটো লোক বয়ে নিয়ে যেতে হিমালিম খেয়ে যাবে না? আর সে কী সামগ্রী, ম্যায় তেজপাতাটি পেরজন্ত—বামুনের বাড়ীর দুমাসের খোরাক! রাম রাম! সে বামুনও নেই আর দরাজ ভূমামীও নেই, এখন সব ব্যাগার চোলা কোন রকমে সারা, ই আবার সিন্দি, ব্যাটা কিপ্টের জাহ্নু, হুদের পয়সায় মাগের গয়না গড়াবে...কলি কলি—কলিকাল!

চাঁপার ছোট্ট মাথায় কিছুতেই এর অর্থ ঢুকলো না যে যার বাড়ী থেকে এতোগুলো চাল ডাল আনা জিনিস পয়সায় এলো সেই দাতার প্রতি কেন এই কটুক্তি!

কমলা বলে—হ্যাঁগা গাঙ্গুলী গিন্নীর কি বেরতো ছিল...

—ওই যে কি বলে সাবিত্রী ব্রত। মাগো সিন্দির কি ছিরি দেখনা...পয়সায় ছাতলা পড়ে যাচ্ছে তবু বামুন পুরুষদের নামে আংকে ওঠে।—ওর নরক নির্ধাৎ।

কমলা ভাবে গাঙ্গুলী গিন্নীর কথা; তার চেরা-চেরা ভীষনের বিক্ষিপ্ত ঘটনা। সেই গাঙ্গুলী গিন্নী যে বছর দশেক আগে একমাত্র আলোচনার বিষয় ছিল।

গাঙ্গুলীমশাইয়ের বয়সের সীমাটা অপরাহ্নের একটা বিশেষ ধাপে ধমকে দাঁড়ালেও সন্ধ্যায় বোধ হয় বিশেষ দেরী নেই। সেই সময়ে ঘরে আনলেন একজোড়া বোঁ। তা একজোড়া কেন বিশ জোড়া বোঁ পোষার অবস্থা তাঁর আছে। ভেজারতি কারবারটা বর্ষার পুতুরের মতো কৈপে উঠেছে। রূপোর জোরে মল্লিকপুত্রের স্বাদশী রূপসী মণিমালা যখন গাঙ্গুলী বাড়ীর অন্দর মহলে প্রবেশ করলো, গায়ের লোকের মুখ হাঁ হয়ে গিয়েছিল এবং তা বুঝতেও হয়েছিল। গাঙ্গুলী মশাইয়ের এক জায়গায় একটু ভুল হয়েছিল—চাঁদ্রির জোরে মণিমালাকে কিনলেও কিনতে পারেন নি মণিমালার মনকে—তার ভালবাসাকে। সুন্দরী মণিমালা পঞ্চাশোর্ধ্বে গাঙ্গুলী মশাইকে সময় সময় 'দাদা-

মশাই' বলতেও ইতস্ততঃ করতো না। বাপ-মায়ের আঁতুরে মেয়ে, যেমনি তেজী তেমনি মুখরা। স্তবরাং গাঙ্গুলী মশাই তৃতীয়ার স্বদয়স'গরে প্রেতের তরঙ্গ তুলতে পারলেন না। তীরে দাঁড়িয়ে শুধু নিশ্বাস চেপে গেলেন। এমনি ভাবেই কেটে গেল কটা বছর। তারপর একদিন মণিমালার মা হবার সম্ভাবনার কথাটা অন্দর মহল ডিঙিয়ে বার মহলে ছড়িয়ে পড়লো। সবাই অবাক। সন্দেহ উকি দিল—

গাঙ্গুলীমশাই চমকালেন! তারপর একটুখানি শ্রুপ হাসি টেনে গম্ভীর হয়ে গেলেন।

তার মাস চারেক পরের কথা, গাঙ্গুলীর প্রিয়দাসী সতু এক সন্ধ্যায় আমবাগানের ধারে কি যেন পুঁতে রেখে গেল। ভাগ্যক্রমে কজনায় চোখেও পড়েছিল। কিন্তু তারা মুখ খুলতে পারেনি, গাঙ্গুলী তাদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছিলেন কথানা কাগজে। মরণাপন্ন মণিমালা বাপের বাড়ী গেল।

আজ সন্ধ্যাসী নেই, মরার কদিন আগে কমলাকে গল্পটা বলেছিল। গাঙ্গুলী মশাইয়ের ছোট ভাই লক্ষ্মীনারায়ণ এই ব্যাপারের পর গাঁ ছেড়ে ছিল। আর গাঙ্গুলী মশাই দিয়েছিলেন উদ্ধত মণিমালাকে চরম শাস্তি!

মণিমালা ভুল করে ঝাঁঝাল পানীয়টুকু খেয়ে ফেলেছিল। শরীরটা কিছু বাদেই টলতে থাকে—তুলে পড়েছিল মণিমালা। অজস্র ক্লান্তির মধ্যে একবার ককিয়ে উঠেছিল শুধু। পেটের ওপর তখন ভারী দুখানা পা আলোড়িত হয়ে উঠেছিল...কি এক অসহ যন্ত্রণা...ব্যাখায় চীৎকার করে উঠতে গিয়ে কেমন বিবশ হয়ে গিয়েছিল...

আজ সেই মণিমালা স্বামীর কল্যাণের জন্তে সাবিত্রী-ব্রত উদ্‌ঘাপন করলো! জগতের কী বিচিত্র নিয়ম!

—কি হে মহেশ আছ নাকি? কমলা ধড়মড়িয়ে ওঠে। সিদ্ধান্তবাগীশের গলা। এই লোকটা সম্পর্কে অনেক কথা রটেছে। তবে এর চরিত্রে একটা নিভুল সত্য আছে। সিদ্ধান্তবাগীশ মশাই বা কিছু করার সিদ্ধান্ত করেন—তা স্থির, দ্রব। চাঁপা যখন নোতুন গামছাটা নিয়ে বাইরে এলো এঁর বুদ্ধি তখন একটা চরম সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছে। চাঁপার লবল গতির পিছনে সিদ্ধান্তের চক্ষুমন ছুটে চলল।

—কি দেখছেন গো কাকামশাই...ও হো ও আমাদের চাপি !

নিজেকে সংযত করে বাগীশমশাই দৈতো হাসি হেসে বলেন—ই হে তাইতো বলি চাপি না হলে হবে কে?... তা ইদিকে কি করছ, গড়ন দেখে তো মনে হয় এগারোয় পড়লো...বেশ ভাগর হয়ে উঠেছে...ই হে...

—কি বে বলেন কাকামশাই, চাপি তো সব আট পের হল, তবে ই্যা বাড়ন্ত গড়নে বার তের তো ভাখায়।... ই্যা, কি জন্তে এয়েছেন...

—আর বলোনা আমার হল গিয়ে শাঁকের করাতে। গেলেও কাটে আসলেও কাটে। ইপক্ষ রাখি তো উ পক্ষ যায়, আবার উপক্ষ রাখি তো এ পক্ষ যায়। প্রথম (প্রথম) পক্ষের উনি হঠাৎ আবদার ধরলো—দুঃস্বপ্ন দেখিছি শেতলার কাছে পাটা বলি দিতে হবে, গেল থাম্কা কটা টাকা। আজ দ্বিতীয় পক্ষ ধরেছে বিশালাক্ষী ব্রেত করবে।...

—এতো আহ্লাদের কথা গো কাকামশাই। এমন পরিবার কজনে পায়। সোয়ামীর কল্যাণের জন্তে বার ব্রেত, উপোসতিরস, পুজো-আচ্ছা—এ তো সত্যীর্থ। আমাদের শাস্ত্রে আছে।...

—তা যা কয়েছ মহেশ। এমন পরিবার কজনে পায়, একালে যা সব দেখছি...মাগো বলিহারী বলিহারী নন্দ-গিন্নীর কাণ্ডটা শুনেছ? ছিঃ ছিঃ এই বুড়ো বয়েসে...

বাগীশ মশাই চুপি চুপি নন্দ ঘোষালের হৈসেলের খবর মহেশের কানে ঢেলে দিল। এ কাজটা তিনি নিজের কর্তব্য বলেই ধরে নিয়েছেন, খবর আদান প্রদান করা তিলকে ভালে পরিণত করার বুদ্ধিটা এঁনার বিশেষ আয়ত্বাধীন।

যাবার আগে বলেন—ভাখ মহেশ, একটা কথা আছে, আমার কথা ছেড়ে দাও, আজ বাদে কাল গলায় যাবো। দুঃখ রয়ে গেল ছেলটাকে সংসারী করতে পারলুম নি। তাই বলি কি...তোমার চাপি তো আর নেহাৎ ছোট নয় যদি,...আহা তোমাকে এক্ষুণি কথা দিতে কইছি না... ভাখ ভেবে যদি...।

মহেশর চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। ঘর থেকে কমলাও কথাটা শুনেছে। বাগীশ মশাইয়ের পুত্রস্বত্রীমান হাবুল-

চজের খুব স্নানম আছে। এখন হয়তো সে বাউরী পাড়ায় একটা বিশেষ বাড়ীতে তাড়ি খেয়ে আড্ডা দিচ্ছে।

চাপার অনাগত কুংসীং ভবিষ্যতের কল্পনার কমলা শিউরে ওঠে। লক্ষ্মীর পটে কমলা শ্রণাম করে, মহেশ বেরিয়ে গেল বাগীশ গিন্নীকে ব্রত কথা শোনাতে।

* * *

কাল স্থা পিয়া তাপিত ই হিয়া

না পুরিল অভিলাষ,

তেত্রি আসি ফিরি চল করি হরি

পরি-আ কলঙ্কী ফাঁদ।

আমি আমি গো বঁধুয়া.....

কমলার উঠানে এসে শেষ করল রাখাল। চাপা দাওয়ার এক কোণে ঠেস দিয়ে বসে হাসছে। কমলা ঘর থেকে বলে—কি গো থামলি কেন কান্না, আর একখানি গা...

চাপা ঠোট বেকিয়ে বলল—ই আবার গাওন—মাগো ছ্যা...খজুনীতে গিটকিরি তুলে রাখাল ধরলো নূতন পথ—

মধু বোলী পাখী শ্রাম দিলা ফাঁকি

ছিকল ছিঁড়িয়া সহ

ধৈর্য যাতনা আর গো মহেনা

কত বৃগ কহ বই।

বিশখা ললিতে পার-ই বলিতে

(কোথা) মধুরা নিরুরা পুরী

তিতিয়া তিতিয়া বিরহ আসারে

পিরীতি অনলে পুড়ি...

গান থামলেও রেশ কাটে না। চাপার চোখে শ্রশংসা। রাখাল দাওয়ার ওপর জাঁকিয়ে বসে।

—ই্যাগা রাখালদা ই পদ তো কুনদিন গাউনি...

রাখাল হাসে—ই পদ আমাব নিজের বাধা...

—ইসু...তোমার বাধা, পদাবলী লিখা যে সে কথা নয়...

—সত্যি চাপি ই আমার নিজের। আরো অনেক বৈধেছি—শুনবি...

উ কালা কালিয়া গেলা যে চলিয়া

বাঁকার পিরীতি লতি

বিজনে বিপিনে সি কাছ বিহনে

কাঁদে গো ধবলী গাভী

যমুনে সন্ধ্যা কাল মেঘ দলে

কাল রূপ হেরি তারা

রাখালে স্মরিয়া নাচে ধিরা ধিরা

বিকুল পাগল পায়া।

মুঁহ হতে তুণ পড়ি যায়

লাঙুল উপরি চলে ধীর ধীর

গোপালে হেরীতে পিছ চায়।

চাপা মুগ্ধ হয়ে গেল, তবু বিশ্বাস হয়না এটা রাখালদার
বাধা।

—সত্যি তোমার বানানো...

—হ্যারে, মিথ্যে কয়ে কি লাভ। চাপি আমার ওপর
তোর একটু প্রেত্যয় নেই, কই সিঁদ্রিনের কথাই জবাব
দিলিনি তো—

ধৈর্য খাতনা আর গো সহেনা

কত যুগ কহ রই।

রাখালের চোখে আবেশ। চাপা নিরুত্তর।

—কি চাপি কথা ক', কথা দে তোর জন্তে...

চাপার চোখে ভয়। ব্যাকুল ভাবে চার পাশ তাকায়।
নুকের ভেতর হাতুড়ীর শব্দ ওঠে।

রাখালের হাতটা সরতে গিয়েও ইতস্ততঃ করে...

—ছিঃ রাখালদা, মা ঘরে আছে...আমার বড় ভয়
কচ্ছে। গা-দেশ বুঝতো রাখালদা, কে কোথা ঠেঙে দেখে
ফেললে মুখ দেখাতে পারবনি...আজ যাও।

রাখাল তবু হাড়ে না,—আমায় কথা দে...

—কোন কথা?

—বোষ্টমী হবি, তোর জন্তে আমি আখড়া বানাবো...
ঠিক সেই মুহূর্তে ওঘর থেকে কমলা ডাকে—কি
গো কাহ্ন বের হলি নাকি?

—এই যে মা ঠাকরুণ—চাপির সনে কথা কইছি।
রাখাল উঠে দাঁড়ায়।

চাপা অনাবশ্যকভাবে রাখালের পিছু পিছু অনেকদূর
এগিয়ে গেল। বিলের পাড়ে আমড়া-তলায় দুজনে দাঁড়াল
কিছুক্ষণ। রাখাল খজ্ঞনীতে বোল তুলে বলে—

—চলি গো সই, শনিবারে আসব।

মহেশ্বর ব্রতকথা শুনিয়ে কিরছিল সেই সময়।

সিংগীদের বাগান আঁড়াল ছিল বলে এককণ দুজনে দেখে
পায়নি, হঠাৎ মহেশ্বরকে সামনে দেখে রাখাল মুখে
পড়লো।

রাখাল চেনে চাপার বদমেজাজি বাবাকে। তা
ওপর যে মহেশ্বর বদ সন্দেহ আছে—রাখাল তা বোঝে।

—এ্যা। ইখানে তোরা কি করছিস। এ ভরতুপ
প্রহর—ফাঙ্গিল ছোঁড়া কোথাকার—তিলক কেটে মো
ফুল্লাতে এয়েছ—বেয়ো। বোষ্টমগিরী একবার
জাহান্নামে পাঠাব। ব্যাটা কেটের অহুচর...

রাখাল একরকম ছুটেই পালাল। মহেশ্বর রা
মেয়ের ওপর পড়ে—ধেড়ে ধিকি মেয়ে, ই ভরতুপের পা
বেড়াতি বেরনো, পরপুরুষের সাথে ঢলানি, কুলে কারি
দিবি যে...মরনা...মরনা।

হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে গিয়ে কমলার সামনে দা
করাল।...

—নাও এখন সামলাও। ভরতুপের বোষ্টমের সা
পিরিত করতে গেছল, আমি পইপই করে কয়েছিছ
ছোঁড়াকে ব্যাকুল মাড়তে দিও না! নাও এখন গা
ধরো...কোন দিন কুলে কালি দেবে। ও ঢলানি কা
চোখে পড়লে আর বিয়ে খা হবে? একঘরে করে রাখ
বুঝলি!

কমলা ব্যাপারটা সমস্ত না বুঝলেও গুরুত্ব দেয় না
স্বামীর এ শাসানী তো আজ নোভুন নয়! কেব
একটা জিনিস আজ কমলার চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠলো—
চাপা সত্যিই বেয়াড়া রকম বড় হয়ে উঠেছে। কম
অনেকক্ষণ মেয়ের দিকে চেয়ে রইল। তারপর বাংলা
দেশের মা-বাবাদের যা চিন্তা হয় সেইটাই গভীরতা ধার
কবল—নাঃ এইবার একটা পাত্র দেখতে হয়। সমস্ত
অনেক, ঘর খরচ আর অন্তত দেড় কুড় টাকা পণ
আগরতলির জমিটা বতদিন আছে সে ভাবনা নেই
কিন্তু ভাবনা হচ্ছে সৎ পাত্রের সন্ধান পাওয়া!

মহেশ্বরও হঠাৎ টান দিতে দিতে ভাবছি
বাগীশ মহাশয়ের কথা। একমাত্র ছেলে হাবুলচন্দ্র। ছোট
গুড়ের দোকান। তিলের একটা ব্যবসা আছে। জমি
জমা নেহাৎ কম নয়। ছেলেও কুৎসিত নয়—জোয়া
ছেলে। দোষের মধ্যে একটু বাউরা পাড়ায় ঘনঘ-

যাতায়াত করে। জা স্তো একটু করবেই। যৌবনে ও-
রোগ সবারই থাকে, কথায় বলে চাঁদেরও কলক আছে...

মহেশ্বর মনে মনে একটা হিসাব নিকাশ সেরে নেয়।
কমলা কাছে আসতেই বলল—এবার চাঁপির তো একটা
বিয়ের ঠিক করতে হয়, কি বল কমলমণি। মহেশ্বরের
আদরের ডাক, অবশ্য চাঁপার কান বাঁচিয়ে।

—তা তো বটে! চেষ্টা চরিত্তির করে ত্যাগ ভাল পাত্র
যদি মেলে—

—হা হা... চেষ্টা করবো কি গো! পাত্র তো হাতের
নাগালে, কথা দিলেই—

কমলা যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত হয়। এত বড়
স্বসংবাদের সে এতটুকু জানে না! কোতুহলী কমলা
বলে—কোথা ঠিক করলে গো! বাবা, তুমি এস্তো চাঁপা!

নাক মুখ দিয়ে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে মহেশ্বর উত্তর
দেয়—এ কি তোমার মত মেয়েছেলে, আমি মরদবাচ্চা...
চাঁপির সম্বন্ধ আপনি পায়ে হেঁটে ঘরে এয়েছ...
হা-হা।

—সত্যি কও কোথা ঠিক করলে?

—কেন সকালে বাগীশ মশাইয়ের কথা শোননি,
হাবুলের সনে...

কমলা নিমিষে জল হয়ে গেল। উঠে যেতে যেতে
বলল—মরণ! মরণ আর কি—এ বয়েসে ভীমরতি
ধরলো, বিয়ে দেবার আগে গলায় ফাঁস দিয়ে দিও,
মা হয়ে কইছি তাতে চাঁপি আমার স্থখী হবে।

মহেশ্বর এক কথায় বিচলিত হবার পাত্র নয়। বিয়ের
হিসাবে ব্যস্ত রইল।

আর এদিকে বার বিয়ের জন্তে বাবা মায়ের ঠাণ্ডা
লড়াই হয়ে গেল সে তখন সিংগীদের বাগানে কাঁচা
পেয়ারা চিবাতে ব্যস্ত। সিংগীদের বৌ বলে—কি দজ্জাল
মেয়েরে বাবা! তাড়া খেয়েও পাড়া জালানির চোখ
টারানি যায় না।

• • •

সিদ্ধান্তবাগীশ মশাই আবার এলেন। কমলার মন
গললো না। আর আশ্চর্য—মহেশ্বর চাঁপার বিয়ের ব্যাপারে
সম্পূর্ণ নীরব হয়ে গেছে, মুখে যা নেই।

শ্রীমান হাবুল সামনের রাস্তার দিনে করেকবার করে

আসাযাওয়া শুরু করে দিল। কমলার নজর এড়ালো
না। চাঁপা যে তার লক্ষ্য বস্তু, তা অতি বড় বোকাই
চোখও ভুল কঃবে না। কমলা প্রমাদ গুললো।

আজ একেবারে উঠানে এসে হাজির হল শ্রীমান।
কদিন আর দূর থেকে তৃষ্ণা মেটান যায়। সিদ্ধান্তের ছেলে
চক্রান্তের যোলকলা পূর্ণ করেই এসেছে। হাতে একটা
মাটির তিজেল।

—ও কাকিমা কি করছ?

—কে গা? ও তুমি, কি মনে করে...

হাবুল পান খাওয়া দাঁত বের করে বলল—মা পাঠালো,
কি আর করি নি' এলুম মাটির তিজেলটা রাখল।

কমলাকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে হাবুল
বললো—তা একেবারে সরেস মাল, কাঁধি থেকে এক
নাগরী সরেস এ্যাকো এনেছিলুম, বাবা কইলে—দি' আর
মহেশ কাকাকে কিছু। নাও তুলে রাখ।

কমলা সব বুঝেও শুড়ের তিজেলটা ফেলে রাখতে
পারলো না। কমলা চলে যেতে হাবুলের দৃষ্টি চারধার
ছুটে বেড়ায়। অপরাধী ফাঁক দিয়ে একজোড়া ডাগর
চোখ তাকে যে অহুসরণ করছে তা জানতে পারলো
না। সে চোখে বিশ্বয়ের সঙ্গে চাঁপা জিজ্ঞাসা উগ্র হয়ে
উঠেছে। সেই বহুশত বর্ষরটাকে বোধ হয় ভাল করে
দেখে নিচ্ছে।

কাঁচা মুখের সন্ধান করে হাবুল নিরাশ হল। কোন
স্বযোগ পেলনা।

—ও কাকিমা, বড় ভেট্টা পেয়েছে। ভেবেছিল এই-
বার চাঁপা আসবে জল নিয়ে। কমলার হাত থেকে নিরাশ-
ভাবে জল নিয়ে হাবুল বলল—বাড়ীতে আর কেউ নাই
নাকি? বড় চূপচাপ যে?

কমলার বৃকতে দেবী হ'লনা কি বলতে চাইছে হাবুল।
খুসি হয়ে উত্তর দিল কমলা—থাকবার মাধ্য আর কে—
চাঁপি! তেতরে কুটনো কুট্ছে। তা আজতো তোমার
কাজ নি।

—উ তা বলতে? একুনি হরিদাসপুরে যেতে হবে...
ব্যস্ত ভাবে হাবুল পথে নাথে।

মহেশ্বর সব শুনলো। কিছু বলল না। কমলা বৃকল,
কথা অনেক দূর গড়িয়েছে। এর পর থেকে সময়ে অসময়ে

কিছু না কিছু সংসারে আসতে লাগল। আগে থেকে
'দাদন' দিচ্ছে বোধ হয়। চাঁপার কানেও কথাটা গেল।

* * *

শনিবার সারা সকাল আনমনা হয়ে কাটাল চাঁপা,
সকাল দুপুর সন্ধ্যা গেল—আবার সকাল এলো শুধু
এলোনা রাখাল, বাজল না খঞ্জনীর গোল—রাখালের বাঁধা
গানের মতো—

লাথো বরষ ধরিয়া বঁধিয়া লাগিয়া কত না জাগিব নিশি
ঋতুতে ঋতুতে ব্যথুর হৃদিতে কাটে কাল আশীষিবি ॥

চাঁপার সবুজ মন অবুজ ব্যথায় ভরে গেল। শঙ্কিত তরে
একগ্র আগ্রহ কেন এমন উন্মুখ চকল করে তোলে! তবে
এই কি পিরীতি! কি জানি কি এটা, শুধু চাঁপার ভাবনা
রাখালকে ঘিরেই চক্রাকারে আবর্তিত হয়।

ভাত্র গেল, আশ্বিনের মাঝামাঝি একদিন রাখালের
কণ্ঠ শোনা গেল। চাঁপা ছুটে এলো না, আমড়া গাছে
ঠেস্ দিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল।

রাখাল বলে গেল একটানা অল্প কথ। ত্রিশূলী
মহাস্ত তাকে ডেকেছিল লাভপুরে গান গাইতে যাবার
জন্তে। জমিদার বাড়ীতে বিরাট মজ্জব। পঞ্চাশখানা দল
এসেছিল। সে এক এলাহি ব্যাপার। যেমন যত্নশ্রদ্ধা
তেমনি গান। আহা প্রাণ জুড়িয়ে যায় যখন শ্রীরামপুরের
গোপাল দাস প্রভাস মিলন ধরল। “মানভঞ্জন” পালা
দিননাথের মতো কে গাইতে পারে?...

রাখালের হঠাৎ খেয়াল হল চাঁপার কানে কথা যাচ্ছে
না। রাখাল মান ভাঙাতে বসল, বহু সাধ্য সাধনা, চাঁপার
মুখে রা নেই।

—এই চাঁপা ক'থা ক, নইলে আবার চলে যাবো।

—রাখালদা তুমি বড্ড এতদিন পরে...

রাখাল হাসে—মনে আছে গো সই মনে আছে, তোকে
কি ভুলা যায়। জানিস্ সভাতে আমিও একটুখান পদ
গেয়ে দিমেছি।

এতকণে চাঁপা স্বাভাবিক হয়—তাই নাকি? কি
গাইলে গো। মোহাস্তরা কিছু কইল না?

—কইবে না? বলিস কি? তাজব করে দেখি
লবাইকে—

—জানিগণ জানে, শাস্ত কখনে, দুয়া দুয়া হয় চারি

প্রেমিক সৃজনে, পিরীতি গণনে গরমিল হ'ত তারি

রসের সাগরে রসিক ভূবিয়া রতন খুঁজিছে দেখে,

গণিত বুদ্ধি তল নাহি পায়—দৌহে দৌহে হয় এক।

চাঁপা ডাগর চোখে রাখালের দিকে তাকিয়ে থাকে, একটু
পরে চাঁপা ফিস্‌ফিসিয়ে বলল—জান রাখালদা আমার
বিয়ে—

—তাই নাকি? কোথা? কার সাথে? কবে?

—চাঁপার লজ্জা আসে বলতে। মুখে বিষাদের ঝায়া
ঘনায়—

—উপাড়ার বাগীশমশাইয়ের ছেলে—

—হাবুল! রাখাল আনমনা হয়ে পড়লো, গুণগুণিয়ে
গান ধরে—মনের উত্তাল চিন্তাকে বুঝি এমন ভাবে চাঁপা
দিত্তে চায়। আবার নিজের কাছেই বড় বেহুয়ো ঠেকল
সে সুর

—আজ আসি গো সই।

—ফির কবে আসছ?

রাখাল ক হাত এগিয়ে গিয়ে উত্তর দিল—জানিনি।

রাখাল ক্রমে ক্রমে দূরে চলে যাচ্ছে, সিংগীদের পুকুর,
আগরতলির ক্ষেত, বিলের পাশ ফেলে সিংগীদের বড়-
বাগানের বাক রাখালের ছবিটা অন্তর্হিত হল।

চাঁপার দৃষ্টি ফিরে আসে, পিছনে তাকাতেই চমকে
উঠল চাঁপা, ভূত দেখে বুঝি অমন কেউ চমকায় না।
জ্যাস্ত ভূত হাসে।

—কি গো চাঁপামণি! ইখানে কি করছিল, বা
সোল্লর দেখাচ্ছে তোকে। বিস্মিতাবে এগিয়ে আসে
হাবুল, চাঁপা একটুও কাঁপল না। এক ঝটকায় হাত
ছিনিয়ে দৌড় দিল। হাবুল তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে শুধু
একটু হাসল।

না, মেয়েটার দেখছি তেজ আছে। দেখা বাবে আগামী
অত্ৰাণে এই তেজের কতটুকু থাকে, হাবুল আবার হাসে।

কমলার চোখে ঘুম নেই। সর্বক্ষণ একটা গুমোট
অশ্রু তার কণ্ঠরোধ করে রেখেছে। চাঁপার পেলব
দেহটা বুকের মধ্যে ঘন করে নিয়ে মার চোখে নামে
অগাধ বপ্ন, অকুরান্ত চিন্তা, ভাবাহীন অহুকারিত অব্যক্ত
কাঁপন! এই সোনার প্রতিমাকে কেমন করে বর্বরের
সামনে বলি দেবে!

যুক্তির সমস্ত অস্ত্র শেষ হয়ে গেল এক একে। শেষে কমলা কাদল। নারীর আদি অকৃত্রিম অস্ত্র। সেখানেও ব্যর্থতা। চোখের জলের বীধ মহেশ্বরের দুর্বীর ইচ্ছার স্রোতকে আটকাতে পারল না।

সমস্ত বাধা তুচ্ছ করে মহেশ্বর নিজের কথাই বজায় রাখল। বিয়ের নোতুন কাপড়, শাঁখা, চেলি, কড়ির মালা সব একে একে এলো। চাপা দেখল সমস্ত—একটা চাপা চঞ্চলতা মনের কোণে ঢেউ তুললো বৈকি? নোতুন জীবনটা কেমন হবে? খেলা-ঘরের খেলা ছেড়ে জীবন-খেলায় এমনি কি আনন্দ থাকবে?

তবু অনিবার্য কারণে অস্ত্রাণে বিয়ে হল না। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ ছাড়া শুভদিন নেই, অতএব...। কমলার মনে খণ্ডী হাওয়া লাগল।

এর মধ্যে একদিন রাখাল এলো। কমলা মনের কথা বলে রাখালকে—বলি কান্না, তুই তো ই-গাঁ উ-গাঁ করে বেড়াস, একটা জানা শোনা সংপাত্তর দেখনা বাবা। আমার চাপিকে তো দেখিস, দশখানি গাঁয়ের মধ্যে এ্যামনি রূপ নেই। যদি খোঁজ পাস তো খবর দিস্ কান্না।... দেখিস, কাক-পক্ষী যেন টেরটি না পায়, কথা দে তুই, দেখবি।

রাখালের বুকটা হঠাৎ বড্ড বেশী ভারী হয়ে গেল। কেন এমন হয়? অনেক কষ্টে বলল—আচ্ছা, চেষ্টা করে দেখব। রাখাল পথে নামে।

রাস্তার বাঁকে চাপা দাঁড়িয়ে আছে, কোমরে আঁচল বাঁধা। কপালে স্বপ্ন বিন্দু। ছোট্ট বাছুরটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। রাখাল মুগ্ধ হয়। ভাবে এগিয়ে গিয়ে কথা বলে, কিন্তু দূর থেকে কি কম ভাল লাগে—

বিজ্ঞাপতি ধরে—

জনম অবধি হাম রূপ নিহারতু

নয়ন না ভিরপিত ভেল।

সোই মধুর বোল শ্রবণ হি শুনল

ঋতিপথে পরশ না গেল,

কত মধু ঘামিনী... ..

রাখালের গলা ধীরে মিলিয়ে যায়। চাপা ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। কেন? সে কি জানে, হয়তো জানে—হয়তো জানে না।

* * *

এই সময়ে রাজা রামমোহন রায়ের আবির্ভাব ঘটে, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁর নব মত, তাঁর প্রতিভা মনীষার কথা ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রচারপত্রের মাধ্যমে তিনি হিন্দু সমাজের মূলে কঠারঘাত করতে আরম্ভ করলেন। কুসংস্কারাচ্ছন্ন বাংলার প্রতি স্তরে তিনি জ্ঞানের আলোকে যুক্তির আলোকে উদ্ভাসিত করতে চাইলেন। তাঁর নোতুন কথা শহরের সীমানা ছাড়িয়ে গাঁ অঞ্চলেও পৌছাতেও দেরী হয়নি। হয়তো সর্বত্র যায়নি, অনেকেই তাঁর মতকে অস্বাভাবিক বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছে, তবু সমাজের বিশেষ কয়েকটা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁর তীব্র প্রতিবাদ সমাজের বড় কঠীদের যথেষ্ট বিব্রত করে তুলেছিল।

সতীদাহনিবারণ, অস্পৃশ্যতাবর্জন, কৃষিকা দূরীকরণ ইত্যাদি বিষয়ের ওপর এখন এক চাপা আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছিল।

নোতুন কথা নোতুন স্বরে বাজল। ধর্মতীক সমাজের ভিত্তিমূলে কিসের বেন সাড়া জাগে। চণ্ডিমণ্ডপে সমাজপতিদের সভা হয়ে গেল।

—শুনছ হে তর্কালঙ্কার, রামকান্তের বাটা একটা ব্রহ্মজ্ঞানি, কবুছর বিলেতে গিধে নাকি অথাত্ত সব খেয়ে এসেছে, রাম রাম কোলকেতার পালিশী বাবু সব কথার ভড়ং।

—তা আর কইত, বাটা দৈম্যকে ছোড়া। বলে কিনা সতীদাহ দূর কর, সব মানুষ সমান সবাইকে কোল দাও। এ্যাং, দুপাতা ইংরেজী পড়ে দিগ্গঙ্গ হয়ে পড়েছে। ছোটলোককে লাই দিয়ে মাখায় তুললে, সমাজ থাকবে, ধর্ম থাকবে? আরে বাবু এঁর শ্রম আমরা তৈরী করেছি? সমস্ত মূনিরা মানে দেবতাদের সৃষ্টি।

—আমরা মাত্র তাদের অহুসরণ করছি। তাঁদের লেখা বেদবাক্য, সমাজকে বাঁচাতে গিয়ে তো অধর্ম করতে পারিনা, আর দেখ এঁ সব শতরে ছোড়াগুলোকে গায়ে ঢুকতে দিওনা, হিন্দু শাস্ত্র কি যে সে জিনিস, কটা লোক বুঝতে পারে?

ঈ সতাই হিন্দু শাস্ত্র বড় শক্ত জিনিস। আর শক্ত জিনিষের পাল্লায় পড়ে নিচের দিকটা ক্রমে সৃষ্টি চলেছে। কিন্তু মাঝে মাঝে যখন সেই করে যাওয়া জীবন্তলো হঠাৎ

মাথানাড়া দিয়ে ওঠে তখন একটা বিফোরণের সৃষ্টি হয়।
বাউরী পাড়ায় কেমন একটা গম্বুজে হাওয়া।

ঐ সব ছোট লোকগুলোর হঠাৎ যে কি হল কে
জানে, আজ তারা প্রতিবাদ করতে উঠেছে। বিপিন
মোড়ল বুক ফুলিয়ে জমিদারের সামনে দাঁড়াল।

আজ আর ওর কোমর হুয়ে পড়েনি, প্রশান্ত বুক আরও
একটু যেন প্রশান্ত ঠেকল। জমিদার আশ্চর্য হয়। একটু
যেন খাপছাড়া লাগে—

—কি যে তোরা আবার শিমুলতলির বিলে মাছ
ধরেছিল—বল সত্যি কিনা?

বাউরী পাড়ার মধ্যে এই শিমুলতলির বিল। বছরের
কয়েকমাস এর ওপরেই এদের অনেকটা নির্ভর করতে হয়।
কয়েক পুরুষ আগে থেকে এই বিলটার ওপর ওদের
অধিকার চলে আসছে। ওরা বত মাছ ধরে—তার তিন
ভাগের এক ভাগ জমিদারের পাওনা, তা ছাড়া আমলা
পেত্রাদারী যা পায়ে সেটা ফাউ।

একমাস আগে জমিদারের আদেশ হয়েছে—মাছ
ধরতে পাবে না। বাউরীদের বিল জমা নেবার অর্থ নেই,
কাজেই এতদিন চূপ করে ছিল। কিন্তু গত কাল আর
তারা নিজেদের আটকাতে পারল না।

বিপিন হাতজোড় করে বলল—হ্যাঁ রাজাবাবু, যোরা
মাছ ধরিছি।

—বলি তোদের বাবারকেলে বিল নাকি? স্তায়
ছোটলোক জানোয়ার, কার হুকুমে ধরেছিল? পচিশ
টাকা জরিমানা কবুল কর—একুণি!

মুহূর্ত্ত দূর হয়ে বিপিন জানালো—পচিশ গৈসে
দ্বিতে লারব রাজাবাবু, আপুনি প্রজাদের মা বাপ, কন,
পোলাপানরা যখন বিলে লাগে, কামনে বাধা দি, মাপ
করেন বাবু, বিল না বইলি তিন মাস লা খেয়ে মরব।

—তোরা মরবি কি বাচবি আমার তাতে কি?
পচিশটাকা খেপারং নিয়ে আর...

কঠিন ভাবে বিপিন দাঁড়িয়ে রইল—মুখে একটা ক্রোড়া
—মাপ করি দেন।

—বেশ মাপ করতে পারি কিন্তু এক সর্কে, কিরে
পারবি তো এক মাস 'বেগার' দ্বিতে। বল রাজি
আছিস?

বিপিন চলে গেল। বলাবাহুল্য সেই সময়ে সমাজ-
পতিরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। জমিদারের দ্বার বিচার
সমর্থিত হল। একমাস বেগার অর্থাৎ ছোটলোক-
গুলো উপোস করে মারবে।

ছদ্দিন বেগার দ্বিতে বাউরীদের জোয়ান মরদগুলো এলো,
জমিদার খুশী, তার থেকে খুসি সাক্ষপাকরা। কিন্তু সবাই
অবাক হল তৃতীয় দিনে। কারু দেখা নেই। পাইক
ছুটলো খবর নিতে ছোট লোক গুলোর হল কি?

পাইক ফিরে এলো। সবাই বেরিয়ে গেছে মজুরী
খাটতে। জমিদারের মুখ শক্ত হয়ে গেল। পরের দিন
দুজন সেপাই বিপিনকে ধরে আনল। ওর ইচ্ছিতেই
বাউরী পাড়া ওঠে বসে, হুতরাং ওকেই কিছু উত্তমমর্ধ্যম
দেওয়া থাক—সব ব্যাটা চূপ হয়ে যাবে।

সকালে যে বিপিনকে লোকে জমিদার বাড়ীতে
চুকতে দেখেছিল, দুপুরে সেই বিপিনকে আর চেনাই
যায় না। কালো শরীরটার সর্বত্র রক্ত জমে গিয়ে আরো
কালো হয়ে উঠেছে। কপালের একপাশে রক্তের রেখা
তখনো শুকায়নি।

বাউরী পাড়ায় যাবার সোজা পথ চাঁপাদের বাড়ীর
সামনে দিয়ে। বিপিন যাবার পথে ক্রান্ত হয়ে মহেশ্বরের
উঠানে বসে পড়লো। চাঁপার গলায় কাতর বিন্ময় ফুটে
উঠল—বিপিনকা...একি হান হইছে...

চাঁপার ছোট্ট মন বিপিনের নির্ধর্ম অবস্থার জন্তে
কঁদে ওঠে। বিপিনকে চেনে না কে? সাতখানা গাঁয়ে
তার নাম ছড়ানো, বিপিনকাকাকে যেন আজ চেনাই যায়
না! সেই ছোট্ট বেলা থেকে চাঁপা চেনে। ওই তো
আগরতলির লকলকে ধানের ক্ষেতটা বিপিনকাকার
নিজের হাতে করা।

—চাঁপি মা...এটু জল। বিপিনের গলা শুকনো।

ঘটিভরা জল এগিয়ে দিলে চাঁপা। না, তা হবে না,
তেলে দ্বিতে হবে হাতে। চাঁপারা যে বামন।

—ই দশা, কে করলে গো বিপিনকা...ইস্ কপালটা
কেটে গ্যাছে...কটের মধ্যেও বিপিন হাসে—ও কিছু লয়。
তুদের জমিদারের পাউনি শুধে এহু—

—জমিদারের পাওনা, কি কইছ বিপিনকা—

—হ্যাঁগো চাঁপি মা, মোদের তাজা রক্ত না পেলি

জমিনদারের পাউনি শুধু হয়নে, এক মাইনে 'বেগার' না দিবার ফল। তু কইতে পারিস এক মাইনে 'বেগার' দিয়া মোদের পোলারা প্যাটে কি দিবে? রাজাবাবু লারাজ—

—ট, বুঝ্ছি, ইর জবাব দিতে পারুনি? তুমরা না মরদ, মেয়েদের মতেন জমিদারের লবাৰি সইচ...বুকে তাগদ নাই...

পঞ্চাশ বছরের বিপিন অবাক হয়। ন' বছরের চাঁপার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে অনেকক্ষণ। কেমন যেন মাথা কিম্বিস কর।

ঠিক এই সময় মহেশ্বর উপস্থিত হয়। বিপিনকে উঠতে হয়। প্রহরগ্রস্ত বিপিন যে এ বাড়ীতে বসে জল খেয়েছে একথা জমিদারের কানে গেলে কি যে হবে কে জানে। কথায় বলে—বাঘে ছুঁলে আঠার যা।

টলতে টলতে বিপিন চলেছে। তার মাথার মধ্যে ঘুরে চলেছে একটা কচি গলার শক্ত কথাগুলো—তুমরা না মরদ, ইর জবাব দিতে পারুনি।

* * *

এরা মাটির জীব, মাটির বুকে যেমন জীবনের বীজ অঙ্কুরিত হয়ে আবার একদিন শুকিয়ে যায় তেমনি এরাও হঠাৎ জেগে ওঠে আবার শান্ত হয়ে যায়।

ওদের আগরণের সাক্ষী হয়ে থাকে বিক্ষিপ্ত ধ্বংস স্তূপ। ওদের মনের গভীরে সৃষ্টি হয় বড় বড় রক্তাক্ত কত। বিকৃত মানবাত্মা গুমরে মরে আক্রোশে।

বাউরী পাড়ার ভাঙা রক্তবীজগুলো, শক্তিবানের নিষ্ঠুর চক্রান্তে হিম হয়ে গেল আশ্রয় রূপে। কিন্তু পরাজিত হয়েও অদূর ভবিষ্যতের জন্তে তারা চূড়ান্ত জবাব খাড়া করে রাখলো।

* * *

দিন বসে থাকে না, এগিয়ে চলে, অবসরহীন ক্রান্তি-হীন কাল-স্পন্দনের তালে তালে চাঁপার জীবনের পরম লগ্ন শব্দধ্বনির অপেক্ষায় দিন গুণছে। বাগীশমশাই এবার ব্যস্ত হয়েছেন। আর দেবী নয়, হাতে রাজ ১৫টা দিন। হাবুল আসে। ভবিষ্যতের স্বপ্নকে এখনই পূর্ণ-ভাবে পেতে চায়। চাঁপা ধরা দেয় না!

মনমরা কনলা বিয়ের জোগাড়ে ব্যস্ত হয়। আর

চাঁপা হয় আনমনা...সিংগীদের বাগানের শেষ প্রান্ত অবধি তার চকল দৃষ্টি বার বার ঘুরে আসে। বাছুরটাকে অনাবশ্যকভাবে রাস্তার অনেক দূরে টেনে নিয়ে চলে, জোঠের সোনালী বিকেলে।

সামনের আগরতলির ভমিটা ধু-ধু করছে। অ-শ্রামল শস্ত্রহীন। চাঁপার দৃষ্টি স্থির হয়ে গেছে। সত্যিই কে একজন আসছে। তার রাখালদা!

রাখাল হাসে মিষ্টি করে, চাঁপা অভিযানে, না দেখার ভান করে।

—কি গো সই। এখনি ভুলবার চেষ্টা করছিল, আর কটা দিন সবুর কর সব ভুলবি...

চাঁপা নিচু হয়ে বাছুরের গায়ে হাত বোলাচ্ছে। রাখাল এগিয়ে এলো—

—সত্যি আর কথা কইবিনি সই।—আজ্ঞে চিবুকটা তুলে ধরল রাখাল।

চাঁপার কাজল চোখে ভরা বাদলের আভাস। রাখাল আবার হাসি টেনে বলে—কাঁদিসনি চাঁপা! বিয়ে হবে, কত আনন্দ, কত স্বখে রইবি সোনারামির আদর স্বর...

চাঁপা ঝাপ্টা দিয়ে ধামিয়ে দেয়—তুমি খাম রাখালদা-ই বিয়ে করবনি।

—সে কি সই! উ কথা বলতে নাই। লোহন হয়ে গিয়ে পলক তরে রাখালদার কথা আর মনে পড়বেনি, সব ভুলে যাবি।

রাখাল এগিয়ে যায়। চাঁপার গলা করুণ হয়ে ওঠে—তুই কথা দে রাখালদা বিয়ের পরেও আসবি।

—কি লাভ? যার তবে আসা তাকে কি আর দেতে পাব, তুই ভখন পর স্বরণী।

—না, উ কথা শুভতে চাইনে। রাখালদা তোদের রাখাও তো পর স্বরণী ছিল।

—হ্যা, তুই সেই রাধা! জলকে বাবার হল করে পরপুরুষের সাথে দেখা করলে সোনারামী ভোকে দুধের বাটা দেবে। দেখা দিয়ে শুধু ব্যথা বাড়ানো, ওতে কাজ নাই, কাল হরিদাসপুয়ে চলে যাবো।

—কাল চলি যাবে? আর দেখা হবে নি?

—না, আসি সই। রাখালের ঠোঁট কাঁপছে।

দশ পনের হাত গিয়ে থমকে রাখাল দাঁড়াল আবার।

চাঁপা কাঁপছে। রাখালকে আঁকড়ে ধরলো পরম নিশ্চিন্তে।
তুলে গেল কুটিল পল্লীসমাজকে, বাবা মায়ের শাসন,
পরিবেশের অসহন্যতা, শাস্ত্রের কটাক্ষ।

—কিছু দিয়ে যাও রাখাল দা। চাঁপার গলার স্বরে
আতি।

রাখাল ক্ষণকাল ভাবে। তারপর গলা থেকে একছড়া
তুলসীর মালা খুলে দেয় চাঁপার হাতে।

—ইতে আমার সব রইল সই। আমার সব কথা ইতে
লিখা আছে...

রাখাল চলে যাচ্ছে। নিশ্চল পাথরের মতো দাঁড়িয়ে
দেখছে চাঁপা।

রাখাল যাচ্ছে তার হরিদাসপুরে, রাখালের স্বপ্নে গড়া
হরিদাসপুরের আখড়ার কথা মনে পড়লো চাঁপার। চাঁপা
শুনতে পাচ্ছে এখনো—তুই কথা দে, হুজনে চলে যাবো
হরিদাসপুরে, সকালে এঁকে দেব রসকলি, মাথায় বেঁধে
দেব মোহনচূড়া, তিন গাঁয়ে যাবো—মাধুকরী করতে,
জরী সোন্দর হবে চাঁপি,—তুই বোষ্টমী হবি?

চাঁপার মনে পড়েছে অনেক কথা। অনেক স্বপ্ন—অনেক
আশার কথা। সেই রাখাল আজ শেষ ভিক্ষা দিয়ে বিদায়
নিল চাঁপার জীবন থেকে।

—মধুকররূপে গিয়াছিছ হায়
মাধুকরী হইল সার
হৃদয় দহন জুড়াইল না তার
বিরহ কণ্ঠ হার।

চাঁপা ভাবায় হয়ে শোনে। চাঁপা জানে এ গান রাখাল-
দার বাঁধা। শেষ সুরের রেশটা হৃদয়ে ভরে নিল সে।
পশ্চিম আকাশ তখন দিবাকর বিরহে লাল হয়ে গেছে।

* * *

সিদ্ধান্তবাগীশ মশাই পুত্রকে বিয়ে দিয়ে সংসারী করতে
চেষ্টাছিলেন। তেবেছিলেন রূপসী চাঁপা হাবুলের জীবন-
ভরীর হাল ধরে গতি পরিবর্তন করবে।

কিন্তু ঘটলো তার বিপরীত। চাঁপা হাল-তো ধরলোই
না, পরন্তু গভীর জলে ডাসিয়ে দিল। সুন্দরী তেজী
মেয়েটাকে বশ মানাতে সবাই অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। চাঁপার
ভাগ্যে ছুটলো অনেক কিছু। লাহুনা—অত্যাচারের কথা

বাদ দিয়ে যতটুকু অবশিষ্ট থাকে, সেটা হ'ল নিষ্ঠুর অবহেলা,
এই জায়গায় চাঁপার একটু লাগে।

মার-ধর বাপ-বাপাস্ত করো তাতে কিছু যায় আসে না,
কিন্তু এই অবহেলা এসে সইতে পারে না, অবহেলাই তো
পরিশেষে ঘৃণার রূপ নেয় তার এই উষর জীবনে একটি
মায় সাস্থনা ছিল। মরুভূমির বুকে জেগেছিল একটু
শ্রামল আভাস। একটা দরদি প্রাণ।

গিরিবালা।

বাগীশমশাইয়ের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। চাঁপার সং-
শান্তি। রূপের ছটা ছিল না বটে, গুণের ঘটা ছিল।
বামুনগাছির চৌধুরী বাড়ীর মেয়ে। বাবার কাছে লেখা-
পড়া শিখেছিল লুকিয়ে। গিরিবালা মতাই এক ক্ষুদ্রিক!

সিদ্ধান্তবাগীশমশাই অবশ্য এসব জানতেন না।
জানলে নিশ্চয়ই তিনি লেখাপড়া জানা মেয়েকে ঘরে
তুলতেন না। আর গিরিবালাও নিজেকে সম্পূর্ণভাবে
আড়াল করেই রেখে এসেছে এতকাল। তখনকার দিনে
শিক্ষিতা মেয়ের নাম শুনলে লোকে চমকে উঠতো।
মাগো! খেট্টানির আর বাকী রইল কি? কুললক্ষ্মী,
মা-লক্ষ্মীদের মুখে পাণ্ডিত্য শুনে ধৈর্য ধরতে পারেন এমন
মহাশয় ব্যক্তি গ্রামে ছিল কিনা সন্দেহ।

মেয়েরাও চেষ্টা করতো না। লক্ষ্মী, ভগবতী, জগৎ-
জননী মহামায়া—কড়া কড়া চড়া বিশেষণের ধাঁধায় পড়ে
অসাড় হয়ে থাকতো মেয়েরা। এই বিশেষণের তোষামোদ-
টুকুই ছিল তাদের লাভ—পরম পুণ্য! নিজেদের অজ্ঞাতে
এই ফাঁকির বোঝা আরো কটা শতাব্দির জন্তে তুলে
রাখছিল তারা।

চাঁপা আঁকড়ে ধরলো গিরিবালাকে। গিরিবালাও
হাঁফ ছাড়ে। এতদিন পরে মনের মতো একজনকে পেয়ে
আনন্দ পায়। শোনার নূতন কথা-কাহিনী। পুরাণ,
মহাকাব্য, রামায়ণের গল্প। মনের ভেতরের চাঁপাভাষা এত-
দিন পরে আত্মপ্রকাশ করে।

চাঁপা সব বুঝতে না পারলেও শুনতে খুব ভাল লাগে।
গিরিবালায় মুখ থেকে গাঙ্গী, মৈত্রেরী, লোপামুদ্রার কাহিনী
শুনে অবাক হয় চাঁপা।

—কি লো অবাঁক হালি যে? ওরা সব তিন দেশের
মেয়ে নয়, ওরা আমাদের দেশের মেয়ে! সত্য সমাজে

পুরুষের পাশে বসে ধর্ম-শাস্ত্রের বড় বড় তর্ক যুক্ত করতো। কত বড় বড় বিদ্বান পুরুষ তাদের কাছে হেরে গেছে। তারাও তাঁর আমার মতো মেয়েমানুষ, ঘর-সংসার করতো—

চাঁপার চোখে ঘোর বিস্ময়। গিরিবালা পুরুষের কার-সাজির রহস্য ভেদ করে শোনায। মেয়েদের শিক্ষা দেয় না পুরুষ, পাছে তাদের অজ্ঞতা প্রকাশ হয়ে পড়ে। মেয়েদের জ্ঞান শুধু রান্নাঘর আর আত্মঘর নয়, তাঁরা সন্ধ্যোগ পোলে অনেক বড় কাজ করেও দেখাতে পারে।

পুরুষরা আমাদের কাছে যে শিকল পড়িয়ে দিয়েছে তা আমাদেরই ভাঙতে হবে, আমার মনে হয় কি জানিস,—ওদের চোখের তারা উপড়ে ফেলে দেখাই নারীত্ব মাতৃত্ব দেবীত্ব এই সব বড় বড় কথাগুলো কত অসমর্থ—অর্থহীন! আমাদের দেবীর মর্যাদা দিয়ে তোমরা আমাদের ঠকিয়েছ, অত্যাচার করেছ, সব রকমে বঞ্চিত করে এসেছ—এখনো করছো! ভোগের বেলায় তোমরা, উচ্ছ্বসিত পাবো আমরা। চাইনা তোমাদের স্তুতি পাঠ, চাইনা ধর্মের ভড়ং! নীতি, শাস্ত্র ধর্মের খোলস ঢাকা তোমাদের মধ্যে থেকে সর্বদা উঁকি মারছে নর স্বার্থের ইঙ্গিত! নারী শুধু বাজারের পণ্য, গোগের উপকরণ!

গিরিবালা ভুলেই গেল শ্রোতা মাত্র দশ বছরের বধু। তা হোক! গিরিবালা তৃপ্তি পায়। অবরুদ্ধ চিন্তার মুক্তির আনন্দ!

তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় এরকম বিস্ফোরণ একান্ত অসম্ভব। কোন নারীর মধ্যে এই রকম বিদ্রোহ-মনোভাব, একটা অচিন্তনীয় ব্যাপার ছিল।

গিরিবালা সত্যিই এক বিস্ময়। একবার পুরুষ ঘাটে তর্কালংকারের স্ত্রীকে কটা কথা বলায় তিনি মাথা ঘাত দিয়ে বলেছিলেন—ওমা, ইসব কি কথা বো মাথার সিঁদুর হাতের নোয়া অক্ষয় হোক, মঙ্গলচণ্ডী, শেতলা বস্তির কিশুপা থাক, পাঁচু গোপালের দোর ধরা পঞ্চাননের অযুত আয়ু হোক, কামনা কর বো ওঁদের রেখে যেন যেতে পারি।

গিরিবালা মুচকি হেসে বলেছিল—জ্যোঠাইমা, তা না নয় গেলে তোমার স্বর্গে, কিন্তু বলি, জ্যোঠামশাই যে

পঞ্চান্নে পা দিয়ে, আবার একটা ন'বছরের মেয়েকে ঘরে তুলছে কবছর পরে বিধবা করবার জন্তে—কৈ একটা ভো বাধা পর্যন্ত দিচ্ছ না। তোমার না হয় বয়স হয়েছে, সাধ আহ্লাদ মিটেছে, কিন্তু যে আসছে তার কী হবে ভেবেছ? গঙ্গামুখো বুড়ো কী তাকে স্থখী করতে পারবে, তুমি মেয়ে-ছেলে হয়ে আর একটা মেয়ের সর্বনাশে বাধা দিতে পারছ না—ছিং—

—কি? কি বললি ছুড়ী! আমার সোয়ামী গঙ্গামুখো! তাঁর চোখে ছানি পড়ুক, কড়ে রাঙা হ', ওলাই বিবির...

গিরিবালা দাঁড়ায় নি। হাসতে হাসতে চলে এসে-ছিল। নির্ঘাতনের চাপা আগুন হঠাৎ একটু বেরিয়ে গিয়েছিল।

আজ চাঁপার কাছে মুখ খুলে খানিকটা হাফা হয় সে। এতক্ষণ গিরিবালা ঘরের দরজা বন্ধ করে কথা হচ্ছিল। শিতলপাটা ওপর চাঁপা গা এলিয়ে দিয়েছে। এমন সময় বাইরে ডাক পড়ে—

—ছোটমা, বো আছে।

—বা লো, হাবুল এয়েছে।

চাঁপার উঠতে ইচ্ছা করেনা, তবু গিরিবালা জোর করে পাঠিয়ে দেয়। হাবুল খিঁচিয়ে ওঠে—

—বলি হারামজাদীর বেটীকে কতবার ডাকতি হয়—গাল গলা ফুলে গেল। জোর তলবের কারণ না বুঝে চাঁপা ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ে।

—দাঁড়িয়ে আর চং দেখাতে হবে না! লাও, এক ঘটি জল নি' এস, কি আমার লবাব পুস্তীর রে, শেতলপাটিতে আরাম নেওয়া হচ্ছিল...অমন গতর লাথিয়ে ভেঙ্গে দেব না..."

চাঁপা জল দিয়ে মনে মনে খানিকটা আশ্বস্ত হয়। তবু ভাল আজ এখনো লাথিটা পড়েনি।

এরপর হাবুল চিং হয়ে শুয়ে পড়ে। ঘুমাবার চেষ্টা করছে বোধহয়। চাঁপা একটু অপেক্ষা করে ঘরের চৌকাত পার হবার আগেই হাবুলের তল্লা টুটে গেল।

—কোথা বাস, শোন।

—কওনা, কি দরকার।

—মাজাটা বড় বেদনা করছে একটু টিপে দে...

—একটু পরে আসবখন সঙ্গে দি আসি...ভর সন্ধেতে শুতে নেই লক্ষীছাড়ে।

—হারামজাদী লক্ষী ছাড়ে?—ছাড়ে ছাড়ুক তোমার কি? সোয়ামীর আদেশ যা হয়েছে পালতে হবে। শিখ গির আর।

চাঁপা জলতে থাকে। রাগে নয়—একটা শিরশিরে ক্রোড়াক্ত ঘুণায়। মাজার বাধা উপলক্ষ মাত্র—এ আত্মহত্যার মধ্যে একটা বিশেষ কিছু আছে।

সেই বিশেষটাকে ভাবতে চাঁপা শিউরে ওঠে। গলায় কণী অছন্ন এনে বলল—গেরস্থি বাড়ীর বৌ, ভর সন্ধেতে সোয়ামীর পাশে বসে থাকলে লোকে কি কইবে শুনি, ছিঃ বেবেনা। একটু অপেক্ষে কর সন্ধে দি আসি। কিন্তু হাবুল অতো কাপুরুষ নয়। মেয়েছেলের যুক্তিতে সে টলেনা, কাজেই যা হবার তাই হল। চুলের গোছাটা সঙ্গে রে ধরে একটানে তক্তাপোষের ওপর আছড়ে ফেলে, ঘেঁষ চাঁপাকে। অক্ষুট গোঙনি, ছায়াচ্ছন্ন ঘরকে আরো রহস্যময় করে তুলল।

শিশু যেমন খেলাচ্ছিলে ফুলকে দলে পিষে ফেলে তেমনি হাবুলের কঠিন বাহর নিস্পীড়নে জীবন্ত চাঁপা ওষধে ওঠে।

এই তার দু'বছরের বিবাহিত জীবনের ইতিহাস।

বাপের বাড়ী মাত্র ক' মিনিটের পথ। দু'বছরে দু'বার ছাড়া ভাগ্যে যাওয়া ঘটেনি। মার জন্যে মন কেমন করে, বাবা মাঝে মাঝে আসে, তাও নেহাৎ প্রয়োজনে, খুঁচিয়ে সমস্ত কিছু জিগোস করবার সুযোগ ঘটেনা। রাখালদার কথা, আগরতলির জমির কথা, সিংগীদের বাগানের পিয়ারা গাছের কথা—কিছুই জানা হয়না। চাঁপা ভাবে এত কাছে থেকেও সে যেন অনেক দূরের মানুষ, দুর্ভেদ্য কারার বাইরের জগতের সমান পাওয়ার অধিকার তার যেন নেই।

মাকড়সার জালে শিকারের মতো সাতপাকের বাঁধনে পড়ে ভিল ভিল করে সে যেন চরম লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে। মুক্তির আকৃতি গলা ফেটে বের হবার পথ খোঁজে! সে যেন আজ পথভ্রান্ত। একজন পথ দেখাতে পারতো। কে জানে হয়তো সে আজ হরিদাসপুরে। হয়তো এখন মাথুকরী করে কিরছে! চাঁপাকে কি ভুলে

গেছে! ভুলে গেছে কি শেষ দিনের শেষ ঘানের কথা, চাঁপা তো তাকে কোন প্রতিদান দেয়নি, তবে?

নকসা করা কাঁথাটার সূচের শেষ কোড়িয়ে ভাবে—না অসম্ভব, রাখালদা তাঁকে কিছুতেই ভুলতে পারেনা।

—কি লো কাঁথাটা শেষ হল?

ঘাট সেরে ফিরলো গিরিবালা, নিটোল স্বাস্থ্য। চুলের ঝাঁরি বেয়ে তখনও দু'এক ফোঁটা জলপড়ছে। বিয়ে হয়েছে ন বছর। অথচ বিয়ের ফল ফলেনি। লোকে বলে বন্ধ্যা। কথা শুনে গিরিবালা হাসে। মনে হয় এর পিছনে এক গভীর রহস্য লুকোচুরি খেলছে। সেটা কি, একমাত্র গিরিবালাই জানে, আর জানেন সিদ্ধান্তবাগীশ মশাই।

প্রথম প্রথম চাঁপা ভাকতো মা' বলে। হাজার হোক শান্তভীতো। কিন্তু গিরিবালাই দমকা হাসিতে উড়িয়ে দিল সে সম্পর্কটাকে।

—না না আমি ওসব মা'টা হতে পারে না লো। কি বলবি জানিস?—সই। আবার এক দমকা হাসি, চাঁপা বিষ্ময়ে বলেছিল—সই। যাঃ উ বলতি পারবনি...

তবু গিরিবালা জোর করে লিয়েছিল—বল সই মনের কথা কই।

অবশ্য সন্ধানটা একমাত্র গোপনেই প্রকাশ পায়। চাঁপাকে এতকণ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে গিরিবালা বলল—

—কি লো. ই! করে তাকিয়ে রইলি কেন? জ্ঞাথ পছন্দ হল নাকি? বল তাহলে আর একবার বিয়ের সাজ পরি।

—বা-ও! ইচ্ছে হয়তো আর একবার বসনা, মান। করছে? কে ওরূপে আরো দশবার বিয়া দিয়া আন। যার।

—বাঃ বেশ কথা ফুটেছে, থাম, কাপড় ছেঁড় আসি কথা আছে। একটু পরেই ফিরে এলো সে। বস্ত্রখানি পারে ঘুণা মিশিয়ে জানাল কেমন ভাবে তর্কালঙ্কার মশাই তর্কবুদ্ধে পরাজিত হয়ে ফিরে এসেছে।

এ আর যে সে লোক নয়—রামমোহন রায়। তার সংগে তর্ক করবার জন্যে তর্কালঙ্কার মশাই কলকাতায় গিয়েছিলেন, তেবেছিলেন হিন্দুধর্মের সংস্কারকে জয় করে ফিরে আসবেন। কিন্তু রামমোহনের বুদ্ধি, বিজ্ঞার কাছে সমস্ত হুঁ-শাব্দ স্তব্ব হয়ে গেছে। সমাজে নারীর অধিকার,

জীলিকা, বালা বিবাহ, সতীদাহ ইত্যাদির বিষয়ের অহুকুলে যে সকল ব্যক্তি তিনি দেখেছিলেন, তা খণ্ডন করার শক্তি তরলকারের নেই। স্বঃরাং পরাজয়ের মানি নিয়ে তিনি ফিরে এসেছেন এবং নোতুন উজ্জ্বল রামমোহনকে বিপদ-গ্রস্ত এবং অপদস্থ করার জন্য উপায় খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

—বুঝলি সই, ওরা এতকাল আমাদের ঠিকিরে এসেছে, অত্যাচার করেছে, ভাবে যে আমরা বুঝি কিছু বুঝি না, ওদের এ অত্যাচার আর বেশী দিন নয়। একদিন এর প্রতিফল ওরা পাবেই...দেখিস একদিন মেয়েরাই বাইরে বেরিয়ে পড়বে...

—বলি দিনরাত এত ফুস-ফুস, গুজুর-গুজুর কি হয় লা বো। এদিকে ডালে যে পোড়া গন্ধ উঠলো, ম্যাগো দিন দিন কি সব আদিত্যোতা—

হেঁসেল থেকে বাগীশ মশাইয়ের প্রথমার তীক্ষ্ণবরে আসরটা ভেঙে গেল। চাঁপা কাজ করতে করতে ভাবে গিরিবালার কথা। এত কথা কেমন করে আর কোথা থেকে শিখল সই! চাঁপা যদি লেখাপড়া জানতো তাহলে সেও এমনি কথায় লেখা বই পড়তে পারতো!

কিছুদিন আগে চাঁপা চেষ্টা করেছিল। কিন্তু কেমন করে যেন হাবলু জানতে পারে। বাস! বন্ধ ঘরে কি যে ঘটেছিল কেউ জানে না, তবে তার পরদিন থেকে চাঁপার অক্ষর শেখার চেষ্টাটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

দাওয়ায় ওপর খানিকটা জল পড়েছিল। খেয়াল বেশে তারি ওপর ভুলে যাওয়া অক্ষরগুলো আঁক কাটে, বড় বড় করে লেখে—‘অ’ ‘আ’। আর সেই মুহূর্তে শান্তদীর স্বর চাঁপাকে চমকে দিল—যত বড় হচ্ছেন বুদ্ধি পাকছে, ইয়ারে হারামজাদী জলের উপর আঁক কাটলে যে সোয়ামীর দেনা হয় এটাও কি শিখতে হবে? হাড় হাঙাতে, ছোটলোকের বাড়ীর মেয়ে—ধেড়ে শালকি!

হায়রে! জলের ওপর আঁক কাটলে নাকি দেনা হয়? রবি মন্ডলে বাঁশ কাটতে নেই, বৃহস্পতিতে টাকা দিতে নেই, গোয়ালের গোবরদিতে নেই; পেটভরে তেলে লক্ষী ছাড়ে, পঞ্চমীতে পটল খাওয়া নিষেধ, এমনি শত শত সংস্কারের বেড়া জালে বাংলার পল্লী সমাজ অরাজক মুমূর্ষু! শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে বা চলে আসছে তার অস্ত্রধা কে করবে?

ঠিক হুপুর। হাবলু এখনো ফেরেনি। যদি নাও ফেরে চাঁপার চিন্তায় কোন কারণ নেই। হয়তো ওদের কাজে ব্যস্ত, নয়তো বাউরী পাড়ায় একপাক ঘুরে আগতে গেছে। যতক্ষণ হাবলু না থাকে—চাঁপার মুক্তি।

বাদাম গাছটাকে কি অভূত স্নেহ দেখাচ্ছে। গাছটা যেন দোল খেলেছে—ময়ূবকঙ্গী রঙে। চকচকে পাতার ওপর রোদ পড়ে আরো পিচ্ছিল মন্থ স্নেহ দেখাচ্ছে। হুপুরের মেঠো পথ নীরব মায়াময়। মন যেন কি পেতে চায়, পায়না; কার পিছু ছুটে যায়—নাগাল মেলে না।

আশ্চর্য মাহুঘের চিন্তার মিল। চাঁপা কি ভাবছিল কেউ জানে না! হঠাৎ খঞ্জনীর মিষ্টি বোল। শুনে চমকে ওঠে। নিজের কাছে ধরা পড়ে গেছে চাঁপা। নিশ্চয়ই এই খঞ্জনীর বোল, গলার স্বর তার—সেই তান্ন রাখালদার।

বালোর চাঁপাকলিকে যে জাগিয়েছিল, সকালের আলোর স্পর্শে, দীর্ঘ দিন পরে চাঁপা ওর সেই রাখালদাকে দেখল। জানালার একটা কপাটের আড়াল থেকে, সমস্তই ঠিক আছে অনেকখানি যেন লগা আর রোগা হয়ে গেছে রাখালদা।

কেন, কে জানে ও কিছুতেই রাখালের সামনে দাঁড়াতে পারল না। একটা অপ্রাকৃত ব্যাকুলতা এসে আচ্ছন্ন করে দিল ওকে।

বড়গিন্নীর অগ্ররোধে রাখাল পরপর ক'খানা গান গাইল। রাখাল কয়েকবার আড়চোখে দরজাগুলোর দিকে দেখে নিল, কিন্তু যাকে দেখার জন্যে রাখালের এতদূরে আসা তার দেখা মিললনা সে তখন জানালার ফাঁক দিয়ে তারি দিকে চেয়েছিল। আবেগে ঢুলছিল চাঁপা। মনে হল ছুটে গিয়ে বলে তার বিডম্বিত জীবন-কাহিনী। শোনাতে চায় লাঞ্ছিতা বক্তার জীবনের অকথিত বাধা। অজস্র কথা আবেগে মুখ দুটে বের হতে চাইল। তবু চাঁপা একবার সামান্য দেখা দিতেও পারল না।

চাঁপা বুঝি ঢুলছে চৈতন্যের ঝড়ে, এখনি বুঝি বুর বুর করে ঝরে পড়বে তার পাণ্ডীগুলো।

রাখাল তখন ধরেছে—

মধু বোলী পাখী ক্রাম দিলা ফাঁকি

ছিকল ছিঁড়িল সই

ধৈর্য বাতনা আর গো সছে না

কত যুগ কহ রই।

সেই পুরাণো গান। অনেক স্মৃতি মাথা, কত স্বপ্নে ভরপুর। কত মোহমুগ্ধ ভাবের আবেশে ভুগ্ন! মনে পড়লো বিলের ধাব, আমড়া গাছের তলা, আগরতলার জমি সেই ছোট বাছুরটাকে...

রাখাল বেরিয়ে আসছে বাড়ী থেকে। রাখালকে যেতে হবে তারি জানালার কোল দিয়ে। চাঁপা দেখা দেবে নাকি?

আন্তে ভাবে—রাখালদা!

রাখাল নিম্পলকে চেয়ে থাকে মিনিটখানেক। একটু এগিয়ে আসে। রাখাল হাসে সেই বহুপরিচিত মিষ্টি হাসি—আসি সই।

মাত্র দুটো কথা, চারটে অক্ষরের মধ্যে কি ছিল জানি না। চাঁপার চোখে বাদল ঘনিয়ে এলো। একটু পরে ঝাপসা চোখে যখন দেখল, রাখাল তখন চলে গেছে অনেক দূরে। চোখের জলে বুক ভারি হয়ে ওঠে। চারটে অক্ষর তেমনি ঘুরে ঘুরে আসে—আ-সি স-ই।

গিরিবালা নিঃশব্দে কখন এসে দাঁড়িয়েছে, চাঁপা জানে না। ছল ছল চোখের দিকে তাকিয়ে বলে—কি লো, মন খুইয়ে বসলি নাকি?

—অনেক আগেই।

—পোড়ার মূখী একি ভুল করেছিস তুই, পরপুরুষকে ভালবাসা মেয়েদের পাপ-তুনিস নি পাচালীতে...

—তুনিছি, কিন্তু পাণালী লিখবার আগেই মন তৈরী হয়। পাণালী পড়া যায়, খুশী মতন বদলানি যায়, কিন্তু মন বদলানি যায় না, পড়াও যায় না।

—হ্যাঁলো, নাগরটিকে চিনিস নাকি—ভারী মিষ্টি গলা। নামটা কি? চাঁপা নিঃশব্দে হেসে বলল—আমার রাখাল।

* * *

দীর্ঘ চার বছর পর আবার সেই পোড়ামাটিগুলো নড়ে চড়ে উঠলো। বাউরীপাড়ার কালো কালো ছোট-লোকগুলো একহাতে আহত পাঞ্জর চেপে অস্ত্র হাতে দাঁড়ালো লড়কী লাঠি। সে বিদ্রোহের কাহিনী কোন ঐতিহাসিকের গবেষণায় স্থান পায়নি। তার চিহ্ন কালের

পেৰণে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তবু সেই একরাজ্যের আগরগী, আগামী কালকে শুনিয়েছিল, নব উন্মেষের বাণী।

সেই শিমুলতলির বিল। যার প্রত্যেক জলবিন্দুর সাথে মিশে আছে বাউরীদের কয়েক পুরুষের বালা কৈশোর বার্থক্যের স্মৃতি। একবার হেরেছিল বিপিন। এবার সে হারবে না—জীবন মৃত্যুর বাজী ধরেছে। চার বছর আগের কানশিরেগুলো এখনো মিলায় নি। তারি ওপর না হয় নোতুন করে আঁকবে রক্ত আঁচড়। নড়বে না তারি বিলের ধার থেকে।

—কদিন আগে জমিদারের খেয়াল হয়েছে এ বছরে বিলের মাছগুলো বিক্রি করে দেবে। কে এক মাছ বাবসারী লোভ দেখিয়েছে। কিন্তু মাছধরা তো মুখের কথা নয়। দস্তুর মতো লড়াই করতে হবে। জমিদার বললেন—ঠিক আছে, জাল নামাও, মাছ ক্রেতার তাঁবেও কিছু লোক আছে।

হৈ হৈ করে জাল নিয়ে ছুটলো সবাই। বিলের পাড়ে এসে সবার চক্ষুস্থির। বাউরীদের ছেলে বুড়ো সবাই দাঁড়িয়ে পড়েছে বিলের পাড়ে। কিছুতেই তারা জাল নামাতে দেবে না। হল বাকবিতণ্ডা, গালাগালি, কিন্তু বাউরীরা অটল।

বার্থ হয়ে ফিরে গেল জমিদারের লোক। জমিদার গম্ভীর হলেন। আবার লোক গেল। বারবার তিনবার বাউরীদের চকচকে লাঠির সামনে থেকে পালিয়ে গেল ওরা—এবার জমিদার চাতুর্যের আশ্রয় নিলেন।

রাতের অন্ধকারে জাল নামলো। কিন্তু ততক্ষণে বাউরীদের সময় সজ্জা আরম্ভ হয়ে গেছে। যে যা পেলো তাই নিয়ে ছুটলো—রাতের অন্ধকারেও ধারালো সড়কী-গুলো ঝিলিক দিয়ে ওঠে।

বিপিন িংকার করে—জান কবুল রইল তাই সব, এগিয়ে চল, হঠাৎ হুমকি।

শিমুলতলির বিল সেই রাত্রে শিমুলের মতো লাল হয়ে গেল। তাল্লা রক্ত বিলের জলকে ঘোলা করে তুললো।

বিপিনের লাঠির সাথে নায়েব পড়লো লুটিয়ে। বড় ছেপে এসে রক্তাক্ত দেহটাকে ভাসিয়ে দিল বিলে। এই ব'র মিটাক ও অনন্ত পিশাশ।

কিন্তু পারবে কেন এই সব ছোট লোকেরা। শতাব্দীর সঞ্চিত ক্ষোভে মুহূর্তের জন্তেই জলে উঠে। শক্তিমানের নবনব অভ্যাসের কৌশল সর্বাঙ্গাঙ্গত। শিমূলতলির বিলের পাড়ে এরা যখন জয়োল্লাসে মত্ত, ঠিক সেই সময় সবার চোখ ঠিকরে পড়লো অলস পল্লীর দিকে।

ধূ ধূ সর্বাঙ্গানী কুটিল গ্রাসে নিশ্চিহ্ন করে দিচ্ছে একটার পর একট ঘর। উত্তপ্ত বাতাস গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে নিয়ে চলে সর্বহারাঘের বেদনার্ত্ত বাণী নির্মম নিষ্ঠুর।

বাউরীরা এগিয়ে যায়। কিন্তু বড় দেবী হয়ে গেছে। যে চোখে ছিল জয়ের দীপ্তি যেখানে ঘনিয়ে এলো অসহায়ের করুণ ছায়া।

ওরা চেয়ে থাকে। ঘরের যুগ্ম শিশুগুলোর কান্না কারো কানে গেলে না।

এই রাতেই বিপিনের দল নোতুন জীবনের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লো, নিঃসঙ্গল নিকুপায় বিকৃত দলটা শেষ-বারের জন্তে চেয়ে দেখল তাদের স্মৃতি বিজড়িত পল্লীটাকে। শিমূলতলির বিল নির্মম ঐক্যসীমায় অচঞ্চল অবস্থায় তেমনি তারাভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে।

সারা গাঁয়ের পুরুষরা দেখতে গিয়েছিল দাঁড়া। মেয়েরাও বাইরে থেকে দেখছিল বাউরীপাড়ার আগুন। গিরিবালা আর চাঁপা দাঁড়িয়েছিল একটু ফাঁকা জায়গায়। প্রথমে চাঁপা ভূত দেখার মতো চমকে ওঠে। বিপিনের কালো দীর্ঘ দেহটাকে অন্ধকারে ভূতের মতই দেখায়।

—চল-হু চাঁপি মা।

—কে? বিপিন-কা! চাঁপায় গলায় বিশ্বয়, গিরিবালা নিকুন্তর, বিপিন হাসে। ফিকে হাসি—চল-হু চাঁপি মা। আর বোধায় দেখা হবে না, শুধু বলতি এহু, মোরা জবাব দেছি, মোরা মরম, জাব ইচ্ছে রয়ি গেল, ভূস্বামীর নাগাল পেলুমনি, ই লাঠি ই গাঁয়েই রেখে গেছ যেদিন ই লাঠি রক্তে রাঙা হবে সিঁদনি ফিরি আসব...

—কোথা চললে বিপিনকা?

—রায়গঞ্জে। নীল কুঠিমালাঘের ওখানে। হেথায় মোদের ঠাই হলনি, দেখি ইবার লতুন ধর্ম কি শিকে দেয়—চলি গো—

বিপিনের পিছু পিছু চলে গেল দলটা। দূর থেকে হুস্কায়। এগিয়ে চলেছে ওরা পথ থেকে পথান্তরে, ধর্ম

হতে ধর্মান্তরে তারা পরিণত হতে চলেছে। রায়গঞ্জে খুঁটন মিশনারীদের আস্তানা খুঁজে নিতে খুব বেশী দেরী হবেনা ওদের।

* * *

সময়ের বড় কাজ হ'ল ভুলিয়ে দেওয়া। কয়েকদিন আগে যে বাউরীপাড়ায় একটা প্রলয় হয়ে গেছে, তার লক্ষণ এখন একটুও বোঝা যায় না। বাউরীদের ভিটের ওপর জমিদারের মজুরগুলো কাজের ফাঁকে বাউরীদের কথা বলে। জমিদার ওদের ভিটের ওপর শাবানী জরি বের করছেন। কয়েকমাস পরে হয়তো সেনাই যাবে না, এখানে একদল লোক বাস করতো, জমিদারের নান্নেবকে ভাসিয়ে দিয়েছিল ঐ বিলে। এখানেই একদিন কতকগুলো ছোটলোক শক্তিমানের বিরুদ্ধে লাঠি ধরেছিল—জবাব দিয়েছিল। এখান দিয়েই চলতো একজন লোহা মাছুব, যার সামান্য ইশারায় বাউরীরা উঠতো বসতো। দশ-বিশ বছর পরে হয়তো ভুলে যাবে অনেকে।

চাঁপা সে রাতে ঘুমোতে পারেনি, গিরিবালাও নয়। এই অঘটন অভ্যাসের সমাধান খুঁজেছে দুটো মন, গিরিবালা তাকে নোতুন কিছু শোনাতে পারেনি।

কদিন পরে স্বামীকে জিগ্যোস করলো চাঁপা—হ্যাঁগা এটা কি ঠিক হল?

—কোনটা? হাবুল আড়মোড়া খায়।

—এই জমিদারটা বাউরীদের ভিটামাটি খেয়ে দেশান্তরী করলো তোমরা একটু প্রতিবাদ করলে নি?

—এ্যাঃ! কি কইছ, ভূস্বামী কি হেলা-ফেলা লোক, ওনার বিপক্ষে কথা কয়—কার কটা জান? পাঁচখানি গেরাম গুর। আড়ুলের ডগায় ওঠে বসে। তর্কালঙ্কার জোটা কর ভূস্বামী আমাদের সাক্ষেৎ নয়সিংহ।

—তা বলে, নয়সিংহকে পূজো করতে হবে নাকি? এতগুলো মাছুব যে বেধর্মী হয়ে গেল, কার পাপে তনি। তোমাদের গায়ে রক্ত নাই—থাকলে এ অন্তায় মুখ বুজে সহ্য করতে না!

হাবুল একটু নরম হয়—তা আমরা কি করতে পারি কও। সাহেবগো ভূস্বামীর হাতের লোক, কলকাটি যেহিনি ঘোরায়ে তেমনি চলে।

—হ্যাঁ ঠিক কয়েছ। আর ইদিকে যে ভলে ভলে

হিঁদুরা দলে কমে যাচ্ছে তার হিসেব রাখো। তোমাদের অতোচারে হাজার হাজার ডোম, তুলে, বাউরী, বাঙ্গী, বেধমণী খেঁটান হয়ে যাচ্ছে; সাহেবরা এটো তো চায়, বিদেশে তাদের দল ভারী হ'ক, তারপর তোমাদের অস্তর দিয়ে তোমাদের গলা কাটবে।

হাবুল ই করে তাকিয়ে থাকে। এতটুকু মেয়ে এসব শিখলো কোথা থেকে। মনে মনে বৌয়ের প্রশংসা না করে পারে না।

কথাগুলো চাপার নয়। গিরিবালা শুনিযেছিল হিন্দু-সমাজে ব্রাহ্মণ আর জমিদারের অত্যাচারের ফলাফল। কেমন করে আজ মিশনারিদের খাতায় হিন্দুদের একটা শ্রুতম অংশ ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে। সমাজের অপাংক্তেয়ের দল কেমন ভাবে ধর্মাস্তরিত হচ্ছে। গিরি-বালা একজনের নাম কিন্তু বারবার করে বলে। চাঁপা যেন খুব চিনে ফেলে ছ দেওয়ান রামমোহন রায়কে।

* * *

মহেশ অনেকদিন ধরেই শয্যাশায়ী। কিন্তু চাপার কানে তা ওঠেনি। আজ শতরমশাই নিজে এসে খবরটা দিলেন। শুধু বললেন—বাবার অস্থ চাপাকে একবার দেখতে চায়।

চাপার বাবার কথা শুনেই হাবুল জলে উঠলো—এঁা রোজ রোজ বাপের বাড়ী। অতো যদি ছটকটানি বাপের বাড়ী রওগে যাও, সোয়ামীর খর করতে হবে না।

চাপা নিঃশব্দে কাঁদল। গিরিবালা হাবুলকে অনেক-ক্ষণ বোঝাবার পর হাবুল আঁদাল, আজ সন্ধ্যার পর নিজে গিয়ে দেখে আসবে; যদি তেমন কিছু বোঝে তো পাঠাবার ব্যবস্থা করবে।

সে সন্ধ্যায় হাবুলের সময় হলনা। তার নোটুন গুড়ের হিসাব দেবে বড়। যখন ফিরল—রাত দশটা।

পরের দিন সকালেও কাজের চাপে যাওয়া হলনা—দুপুরেও নয়, বৈকালের দিকে প্রতিবেশী হিরেন ঘোষাল বাগীশমশাইয়ের কাছে এলেন চাপাকে নিয়ে বাবীর প্রার্থনা জানিয়ে। অবস্থা শুনে বাগীশমশাই চাপাকে পাঠিয়ে দিলেন।

পাড়াগাঁয়ের অনেক অস্থের মধ্যে, এ অস্থটাও ঠিক

ধরা গেল না। কবিরাজ থলহুড়ি দিয়ে ওষুধ করলেন, তুচ্ছ হ'ল, ঝাড়ফুক হয়ে গেল।

ভোর রাতে পূর্ব আকাশে শুকতারাকা যখন হাসতে আরম্ভ করেছে ঠিক সেই সময়ে কমলার চোখ বেয়ে নামলো কান্নার দ্রাবন। সেই অশান্ত বুকফাটা বিলাপে পঞ্জী-প্রকৃতি গুমরে উঠলো।

বাগীশ এলেন, হাবুল এলো আরো অনেকে এলো, সমাজের মাথার ফর্দ করলেন, হাঁক পাড়লেন, আহা উহ করে কান্ড হলেন। উঠানে সভা বসলো। পাঁজি এলো, পুঁথি এলো, শাস্ত্রের বুলি ছুটলো, একাদেশীতে মৃতের ক'-পোয়া দোষ হয় তাও ঠিক হয়ে গেল।

সিদ্ধান্তবাগীশ স্ব-ইচ্ছায় মহেশ্বরের দাহ খরচের ভার গ্রহণে সিদ্ধান্ত করলেন। কিন্তু কঠিন সমস্যা হল কমলাকে নিয়ে। কে নেবে কমলার ভার? চাপা একবার কি যেন বলতে গিয়ে হাবুলের রক্ত চক্ষু দেখে শুক হয়ে গেল।

কমলার ছাব্বিশ পেরুনা শরীরে য'টুকু যৌবন অবশিষ্ট আছে তা নেহাৎ অবহেলা করা যায় না, ব্রাহ্মণ-কুলে ব্যভিচারের আশঙ্কায় সবাই শিউরে উঠলেন। যৌবনপুষ্ট একক জীবনের বিপদের সম্ভাবনায় পণ্ডিতকুল আর একবার শাস্ত্রমুখে প্রবৃত্ত হলেন।

উপায় স্থির হয়ে গেল। এ উপায় ছাড়া কমলার আর বিতায় কোন বাঁচার পথ নেই। অর্থাৎ সতী পুণ্যবতী হয়ে স্বর্গে বাঁচার প্রকৃষ্টতম পথ—সহমরণ।

কমলার সামনে বর্ণনা করা হল—স্বর্গের সুখ, অক্ষয় পুণ্য, সংসারের অসারতা, আগামী জন্মের উজ্জল নোঁতাগ্য। কমলা কিছু বলল না, চাপাকে বুকে নিয়ে কাঁদলো অশান্ত-ভাবে।

কমলা জানে সমাজের বিধান না মানলে, তার ভাগ্যে কি আছে। সামান্ত বিব্রোহ প্রকাশ পেলে তার পরিণতিটা কি রকম কুৎসিত হয়ে উঠবে।

অনেক বছর আগে কমলা প্রার্থনা জানিয়েছিল কবে সে সতীমার মতো এক চিতায় উঠবে। সেই কামনা পূরণের দিন সমাগত। কিন্তু কোথায় ছিল লুকিয়ে এই ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভয়টা। একটা হ্রস্ব শিহরণ বারবার শরীরটা অবশ করে আনছে।

সবাই এলো সাক্ষাতে, রক্তরাগে, রক্তপাড় শাড়ী,

সীমন্তে রক্ত সিঁদূর—চরণে অলঙ্কার। লালে লাল হয়ে গেল কমলা। কমলার চরণ অভিনীত-লগ্ন হ'ল আসন্ন। নীল নীল শিখার সহস্র বাহু প্রসারিত করে নিবিড় আলিঙ্গনে বাঁধবার অস্ত্রে হাতছানি দিচ্ছে সর্বভূক্ত। মরণের মহাতৃপ্তি জীবনের আহুতিতে।

চাপা পালাল। পালিয়ে এলো মার শেষ যাত্রা দেখে, শত শত হিংস্র কুটিল কটাক্ষের সম্মুখ থেকে। শতকণ্ঠের 'হরিবোল' চাপার কানে বিষ ঢেলে দিল। সমস্ত মিথ্যা, মিথ্যা! তোমরা মুক্তি দাও, এই গলিত পিষ্ট সমাজ-বন্ধন থেকে মুক্তি দাও। চাপা যেন শুনতে পেলো - ওগো আমি আরো বাঁচতে চাই! এই বিশাল পৃথিবীর স্তম্ভের জিনিসকে ভোগ করতে—উদার বাতাসে মুক্তিশ্বাস নিতে।

মধ্যাহ্ন সূর্য্য ঠিক তমনি ভাবে নির্লজ্জের মতো চেয়ে আছে। কে বলে তোমায় রক্ত? সত্যি যদি রক্ত—এই মুহূর্তে তোমার ঐ রক্ত-তেজ ভস্মীভূত করে দাও এই সমস্ত জরাজীর্ণ অত্যাচারী সমাজের কঙ্কালগুলো।

বাড়ী ঢুকতেই গিরিবালা এসে চাপাকে বুকে টেনে নিল।

গিরিবালা সান্দ্রনা দেয়—ছিঃ সই, এখন কীদতে নেই। সমাজের বিধানে তোর মা এখন সীতা সাবিত্রীর মতো পুণ্যবতী হতে চলেছে, যুগ যুগ ধরে এই নিয়ম চলে আসছে—আরো কতকাল এ অত্যাচার চলবে কে জানে! মনে রাখিস সই, আমাদের ভাগ্যেও যদি এই দুর্দিন আসে সেদিন যেন কীদতে বসিসনি। আর চোখের জল নয়—এবার নিষ্ঠুর প্রতিবাদ! সমাজ শাসন, তুয়া ধর্মনীতি—শাস্ত্রের পাক ঠেলে আমরা এগুবো নোতুন পথে, মরণের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে যদি জীবনের পরাজয় ঘটে কতি নেই—তবু জীবন্তে মরণকে আলিঙ্গন করবো না। পরলোকের অশৌক পুণ্যের প্রত্যাশার ইহলোকের সমস্ত আশাকে চূর্ণ করে দিতে পারবো না। এ অত্যাচার অপমান শুধু তোর আমার ওপর নয়, মানুষের স্রষ্টার বুকেও সমান ভাবে আঘাত করে।

চাপা অগাক হয়ে দেখলো গিরিবালায় চোখে চমকে ওঠা বিহ্বল।

রাতে স্বামী শব্দের ফিরল দাহ সেরে। চাপার মন হাবুলের ওপর বিষিয়ে রইল। কেন এমন কি ক্ষমতা

নেই যে একজনের প্রতিপালন করা অসম্ভব। মায়ের একটা সামান্য ভার নিলে কি খুব অভাবে পড়তো?

হাবুল সত্যি আজ উন্মনা, প্রতিদিনের মতো আজ দেহ নিয়ে কাটা ছেঁড়া করলো না। নিঃশব্দে শুয়ে পড়লো, চাপা একটু আশ্বর্ষ হলেও কিছুই বললো না। হাবুল কি ভাবছে? অনেক রাতে চাপা যখন ঘুমের ঘোরে কেঁদে উঠলো—হাবুল বিরক্ত তো হলই না, উপরন্তু চোখের জল বড় মমতায় মুছিয়ে দিল, এতদিন পর সত্যি যেন তার চোখে ভালবাসার রঙ লেগেছে। চাপার মনের কাছাকাছি যেন পৌঁছবার চেষ্টা করছে।

কি আশ্বর্ষ? আজ হল কি হাবুলের। চাপার তদ্রাস মাথাটা কোলের ওপর নিয়ে সেও কাঁদছে শিশুর মতো। চাপা যদি এতটুকু সজাগ থাকতো নিশ্চয়ই বুঝতো স্বামীর পশুত্বের আড়ালে একটা ক্ষমাকল্প সমব্যাপী অস্তুর তারিই অস্ত্রে সদা জাগ্রত।

হাবুলের চোখে সারারাত্রি ঘুম নেই। কেঁপে কেঁপে ওঠা লালচে তপ্ত জটার বন্ধনে একটা জীবনের মর্মভঙ্গ আকুলতার খোলা খোলা স্বপ্নে জেগে রইল সারারাত। চাপা তখনো ঘুমের ঘোরে ফোপাচ্ছে!

* * *

এই বিশাল পৃথিবীর পরীক্ষাশালায় মানুষকে প্রতি পদক্ষেপে পরীক্ষা দিতে হয়, তার মহাবাহু, ধর্ম, শিক্ষা, অর্থ, প্রেম সব কিছুই জন্ত। প্রতিটি মুহূর্ত আমাদের যাচাই করে নিচ্ছে আমাদের শক্তিকে, যোগ্যতাকে।

হাবুল এতদিন পর সত্যি চাপাকে ভালবাসতে চাইল, নিবিড় গের পরিপূর্ণভাবে; কিন্তু ধীরে ধীরে জমে ওঠা অজস্র তুলের মাসুল কে দেবে? চাপাকে মনের কাছে আনতে গিয়ে আরো নাগালের বাইরে ছুঁড়ে দিল হাবুল। স্বামীর এই হঠাৎ সোহাগ চাপার মনকে বিধিয়ে তুলল। হাবুল শেষে হয়ে উঠলো দুর্দান্ত।

চাপার পঞ্চদশী মনের বন্ধ কবাট তেমনিই বন্ধ হয়ে রইল।

অতৃপ্ত বাসনা মেটাতে হাবুল তার পুরাণো পথ আবার নোতুন করে চিনে নিল।

ভিন্ গাঁয়ে খুঁজে নিল মনের মতো আশ্রয়। দিন-রাত্রির বেশীরভাগটা সেখানেই কাটাতো। চাপা হাঁপ

ছাড়ে। পরিপূর্ণভাবে গিরিবালায় সংস্পর্শে আসতে পারল
চাঁপা। প্রথম প্রভাতের নবীনালোকে নিঃশব্দে জেগে
ওঠা চাঁপার মতো চাঁপাও পাপড়ি মেলে ধরল।

আরো কটা মাস কেটে গেল। কমলার আলোচনাটা
খিতিয়ে এসেছে। সমাজপতির বিধান দিয়ে বেড়াচ্ছেন
ভেমনি। আরো কিছু নোতুনের প্রতীকার তাঁরা চঞ্চল
বুঝি!

সন্ধ্যা হব হব। বক্সিবাগানের শৃগালগুলো সব
মাত্র ঋগত জানাতে আরম্ভ করেছে রাজিকে। সামনের
পাকুড়াগছটার একঝাঁক বাছুরের কলহ স্পষ্ট শোনা
যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে চামচিকের অস্পষ্ট পাখা ঝাপটানো।
সমস্ত পরিবেশটা বিধানকরণ। চাঁপা শাখে শেব ফুঁটা
দিয়ে শিছন কিরতেই দেখে সামনে হাবুল। চোখ দুটো
পাকা করমচার মতো।

হাবুল বড় ক্রান্তিতে দরজায় বসে পড়ল। বেশ
ক্লিমাচ্ছে।

—কি হোলু, বসলে যে—দোর ছাড়...

—বড় কষ্ট, একটুখানি জল.....

হাবুলের ভেজা করণ স্বর শুনে চাঁপার একটু বিষয়
আগে। এই রকম স্বর চাঁপা জীবনে প্রথম শুনল।
লোকটার কি কিছু হ'ল নাকি? এমন সময় তো কোন
দিন বাড়ী ফেরে না? নিশ্চয়ই অঘটন কিছু ঘটেছে।
ভাবতে ভাবতে জল নিয়ে এল চাঁপা।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও একবার স্পর্শ করল। ও যা ভেবেছে,
গা পুড়ে যাচ্ছে অরে, মুখে দুর্গন্ধ।

—ফের গিলেছ ছাই পাশ। ছিঃ ছিঃ ঘেমা ধরে না।
বদ অভ্যাস মলেও যাঁবে না—হাবুলের কাতরোক্তি শুনে
চাঁপা থমকে গেল। সত্যিই লোকটার কষ্ট হচ্ছে।

শান্তডী কঁদে আকুল—মা শেতলা গো, কি হবে গো
...এই ভরা বিয়ুৎবারের বার বেলা, বাছার আমার রোগ
বালাই সারিয়ে দাও মা। কি অলুপ্তে হারামজাদী বৌ
এনেছিল বাবা...দিন রাত কঁদল ঝগড়া। বাছাকে
আমার বৈরেন্দ্রী করে দিলে গা। ওরে আবাগীর বেটা,
তোরা হাড়ি কলসী জোটে না। মা ওলাইবিবি তোকে
দেখেনা।

চাঁপা রাগলও না, হাসলও না। শান্তডীর এ রকম

আলীবাৎ প্রথম প্রথম ভয় করতো। এখন গা সুওয়া হয়ে
গেছে। আড়ালে গিরিবালায় কাছে অনেকদিন হেসেছে
চাঁপা।

আজ চাঁপা গভীরভাবে কি ঘেন ভাবছে। দুর্দান্ত
লোকটার চোখ দুটো কি রকম অসহায় করণ দেখাচ্ছে।
পুরু ঠোঁট দুটো কাঁপছে, কণালের রেখাগুলো আরো
কুঞ্চিত, দৃষ্টি উদ্ভ্রান্ত।

চাঁপার মনে কি সমবেদনার কম্পন জেগেছে? যন্ত্রণা-
কাতর হাবুলের চোখ দুটো কি এক পরম নির্ভরতার খোঁজে
চঞ্চল হয়ে পড়েছে!

বিশ্ব বস্তি এসে নাড়ী ধরল। বিশ্ব বস্তিকে লোকে
বলে ধ্বংসরী। বয়স আটের কোঠা পার হতে চলল।
তিন আঙুল চেপে তিনি সমস্ত বুকে নিলেন—শ্লেষা, বায়ু,
পিত্ত।

খল নেড়ে ওষুধ হল, বটিকা বের হল, বাবার আগে
বস্তি জানালেন—কাল সকালে যদি রোগী ভাল থাকে তো
আসব।

আড়ালে বাগীশমশাই শুনলেন রোগের বৃত্তান্ত।
কাল এসে বাসা বেঁধেছে। জীবনের আশা কম।

বাগীশগৃহিণী সেই রাত্রে আনলেন শেতলামায়ের
চরণামৃত। মানসিক করলো জোড়া পাঠার। গিরিবালা
করলো অক্লান্ত সেবা। চাঁপা হয়ে গেল অচল পাথর।
মাত্র ক'ঘন্টার হাবুলের দেহটা হয়ে উঠেছে ক্যাকাশে
রক্তহীন।

বিরাট কৃমিকপ্পে ঘেন সমস্ত ওলোট পালোট হয়ে
গেল। চোরাবালুর ধ্বংস চাঁপার জীবননদী বৃষ্টি অন্তর্ধানে
বইবে এবার, কিলের আহ্বান শুনতে পেরেছে চাঁপা।
সাগরের, যে সাগরের ডাক আজ সাত বছর ধরে তার অন্তর-
তটনিকে উদ্ভ্রান্ত-উদ্ভ্রান্ত করে রেখেছে।

প্রদীপের সলতেটা একটু বাড়িয়ে দিয়ে দরশন ভেজিয়ে
দিল গিরিবালা। ভেতরে মাত্র দুজন, গিরিবালা আস্তে
ডাকল—চাঁপা! বসে বসে সারা রাত ভাবলে—যা হয়ে
গেছে তা আর কি কি হবে? এখনো রাত অনেক আছে
কথাটা ভেবে দেখ।

ভেজা স্বরে উত্তর দিল চাঁপা—তা হয়না সই, না আমি
পারবনি...তোকে পারতেই হবে। এই রাত্রেই তোকে

ঘর ছাড়তে হবে...বেখানে ইচ্ছা, বেথা খুঁচি চলে যা, এই বিবাক্ত মানুষগুলোর ছায়া এড়িয়ে তোকে বাঁচতে হবে চাপা। সে জায়গা যদি নরকও হয় কতি নেই—এই সমাজের মতো এমন নির্মম নয়, অত্যাচারী নয়, গলিত বিবাক্ত পজু নয়...

—ওঃ চূপ কর সই, যা ভাগো লিখা আছে তাই ঘটক আমি যেতে পারবনি, না—পারবনি।

গিরিবালা ঘন হয়ে বসল—ওরে পোড়ারমুখী, অবুজ হসনি, রাত পোহালে কাল কি অবস্থা ঘটবে জানিস না? তোর মার মতো নির্মমভাবে নিজেকে আগুনে সঁপে দিতে হবে। সমাজের শাসন, শাস্ত্রের বিধান, ধর্মের দোহাই, সতীত্বের অলীক পুণ্য—সমস্ত তাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিতে হয়ে সই। আমার সময় আসেনি, যদি আসে দেখাব কেমন করে জবাগ দিতে হয়... কি তুই পেয়েছিস? জীবনের কতটুকু তুই জানতে পেরেছিস...অত্যাচার, অবিচার আর চোখের জল, এই তোর সারাবয়েসেরপুঁজী। আজ সমস্ত পাক সরাতে হবে চাপা। জীবনকে ভরাতে হবে নোতুন স্বপ্নে। আর কতকাল আমা এই অন্ধকারে হাতড়ে মরবো। অন্তত: তুই একজন সত্যকারের মুক্তির আন্দল পা, তুই-ই প্রথম দেখা আলোপথ। তোর কঠিন আঘাতে এই ঘুণ-ধরা সমাজটা একবার কঁপে উঠুক। আমি চোখ ভরে দেখি ওদের ভীতিবিহ্বল, অসহায় ধর্মভীরু পাণ্ডুর মূর্তিগুলো...ওঃ তুই কাদছিস? কাদবার এ সময় নয় সই, তোকে আজ পথে নামতেই হবে, আর সাজিয়ে দি, আজ চরম পরীকার রাত্রি। জানি জানি তুই পারবি পারবি।

চাপা অঝোরে কঁদছে বাড়ীর উঠানে বাইরে অনেক-গুলো চাপা স্বর ঘুরে বেড়াচ্ছে। শাওড়ীর হুউচ্চ ক্রন্দন বজ্রের থেকেও শোনা যায়, কয়েক জন দরজায় ধাক্কা দিয়ে গেছে গিরিবালা দরজা খোলেনি।

—আমার কথা রাখ চাপা। সকাল হতে আর দেহী নেই। এ সুযোগ হারালে জীবনও হারাবি। ওরা তোকে পুড়িয়ে মারবে। ঐ স্থল্লর দেহটা আগুনের তাপে ঝলসাবে, না না, অসহ! পোড়া মাংসগুলো দেখে ওদের চোখ-আনন্দে নাচবে, তোর ছাই দিয়ে ওরা গাঁথবে সমাজের কঙ্কাল ভিত্তি... তেবে দেখ, একদিকে মৃত্যু, অন্যদিকে

জীবনের ইশারা। একদিকে মনগড়া ফাকা পুণ্য সতীত্ব, অন্যদিকে—প্রেম ভালবাসা যথ, তোর হরিদাসপুর—তোর রাখাল দা...

শেষ কথায় চাপা চমকে ওঠে, অস্পষ্ট শিরশ সর্বান্দে ছড়িয়ে পড়ে।

তবু এই অন্ধকার অনিশ্চিতের মধ্যে চাপা বাড়াতে গা ছম ছম করে। ঘিরাট একটা শব্দ পথ আগলে দাঁড়াতে চায়। সামনের নিখুঁত রাত্রির মতো তারও ভবিষ্যৎ কি অন্ধকার?

তুই সখী শেষ বারের মতো আলিঙ্গনে বুক ভরে নিল। সঙ্গে কিছুই নিল না চাপা, শুধু বহু স্বপ্নে রক্ষিত কি একটা জ্বিনিস আঁচলের তলায় লুকিয়ে নিল।

গিরিবালা সমস্ত ঠিক করেই রেখেছিল। আগুনের মালসাটা মাথার ওপর বসিয়ে দিয়ে একগার পেছনে চেয়ে নিল। না কেউ নেই, বাইরে বাঁশ কাটার শব্দ।

কোঁচড ভর্তি রইল গুড়ো ধুনো। তার পথের অস্ত আগুনের মালসা আর ধুনো—এই নিয়ে কাটাতে হবে দীর্ঘপথ।

এক মুঠো করে ধুনো ছড়িয়ে দেয় আগুনের মালসার ওপর তখনি জলে ওঠে দপ করে। তারি আলোর পথ চিনে চলে চাপা। নাক পর্যন্ত ঘোমটা নান্দা কাপড়ে ঢাকা মূর্তিটা খিড়কির দোর দিয়ে এসে দাঁড়াল বাঁশ বাগানে। এগিয়ে চলেছে চাপা। ঐ তো সামনে বাউরীদের ভিটের জমি, শিমুলতলির বিল বিশিনকাকার হাতে লাগান আমগাছ।

আবছা অন্ধকারে চাপা দেখল আগড়তলির জমি শস্যহীন। আম গাছটার বোধহয় বৌল এসেছে। তেঁতুল তলায় এসে একটু দাঁড়াল চাপা, অদূরে আধ-হাঙা পৈত্রিক ভিটেটা তারি দিকে ঘেন চেয়ে আছে।

এক মুহূর্তে ঘেন সমস্ত বালা কৈশোরটা ছলং করে উঠল। না, আর দাঁড়ালে চলবে না, অজানার পথে নেমে জানাকে নিয়ে মিথ্যা টানাটানি! হে প্রিয় অতীত, কুমি স্থিতি হয়েই থাকো, বিদায়।—

সেই রাত্রে গ্রামের অনেকেই দেখল আলোয় ভূত। প্রাচীনরা বললেন--নিশ্চয়ই অমঙ্গল কিছু ঘটবে। গ্রামের ছেলে বুড়ো বিস্মিত হয়ে দেখল কেমন করে আলোয় ভূত

দূরে বকদূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। একবারের জন্যে আর নেভে
প্রভেদবোধের প্রত্যক্ষ দর্শনে সেই রাতে অনেকেরই চোখে
ঘুর এলো না।

* * *

এখানেই এই রাতে মাঠের মধ্যে চাপাকে ছেড়ে
দিয়ে আমরা ফিরে যেতে পারি। কিন্তু তবু মনটা কেমন
খচ্ছৎ করে। এই অভিসারিকাটির শেষ পরিণতিটা
দেখবার জন্যে আর একটু এগিয়ে চলুন।

* * *

রাত গোর হল। পাখীর ডানায় জাগল শব্দ, পদ্ম-
কলির বৃকে জড়িয়ে গেল জাগরণী স্বর, নবদিবসের বার্তা-
বাহী উষা ছুটলো দিক হতে দিগন্তে—গ্রাম থেকে
গ্রামান্তে। জাগল সবাই, পড়ল লাড়া, কাঁপল সূর্য্যমুখী!

আলো ফুটলো, চিরশায়ল বনে—চাপার মনে।
রাখালের ছোট্ট আঙিনায় লুটিয়ে পড়ল সোনালী আলো।
রাখাল গাইছে গোবিন্দদাসের পদ :

নন্দনন্দন চন্দচন্দন গন্ধ নিন্দিত অঙ্গ
জগদ্বন্দ্বের কল্প কন্দর নিন্দিত সিকুর ভঙ্গ ॥

প্রায়ে আকুল গোপ গোঁকুল কুলজ কামিনী কান্ত
কুহুম বজ্র মঞ্জু বজ্র কুল মন্দিরে শান্ত ॥

ঠিক সেই সন্ধিক্ষণে আঙিনায় এসে দাঁড়াল চাপা—
রাখালদা!

ভোরের শুকতারা যেমন এসে দাঁড়ায় উষার ঘারে।
চাপার এ আসা নয়—আবির্ভাব। সেই বহুশ্রুত ডাকটা
আজ এই নির্জন নিস্তব্ধ ঘারে নোতুন স্বরে আলোড়িত
হয়ে ওঠে। এ ডাক শুধু নীরব শব্দই নয়—ছন্দিত নন্দিত
স্বর মাধুর্য্যে ভরা।

রাখাল এগিয়ে এসে হাত ধরে—এতো দিনে মনে
পড়ল সই! এসো—

চাপা আঁচল থেকে খোলে বহুযত্নে রক্ষিত সেই
তুলসীমালা।

রাখাল গান ধরলো। একে দিন তার সাধের
“রসকলি”। এতদিনে ফুটল চাপাকলি।

কেমন এক উদাস দৃষ্টিতে চাপা পিছন ফিরে তাকাল।
ফেলে আসা পথটা কি যেন বলতে চায়। কে জানে
গিরিবাগার লাহুনা কতদূর এগিয়েছে। চাপা তাকে কি
ধেবে? কিছু নয়, শুধু কৃতজ্ঞচিত্তে জানাল একটা ভক্তি-
নম্র প্রণাম।

দুই তীর

শ্রীপ্রতীপ দাশগুপ্ত

কোমল রোজ-ছোয়ান আলো আর ভীক ভীক
চোখে স্নানিয়া-ঝরা মানসের দুই তীর,
দ্রুতিমান, মহীয়ান আর অস্বর্গ-কালোয়
যারা করে ভীড়
তাঁদেরই কথা—তরুণ রোজ, বৃদ্ধ আঁধার
মানসের; যুবক আমি একে যাই,
শুধু অঁকি; ভাল, না-ভাল লাগার
বিলেবণে মন স্ববির, তবু অবসর নাই।

এক তীরে মনসিদ্ধ স্বপনের
উর্ধ্ব শুধু বোনে,

অন্ত ভীরে অ-বাযাবরী রাতের
বিষাক্ত গ্রহর সে গোণে।
স্বমধুর-কাকলি-ঘেঁষা স্বরভিত
ছায়াচ্ছন্ন পুষ্প-বীধি,
আগে আছে বীভৎস বিভীষিকা,
প্রভেদের কারাগার... অন্তত তিথি।

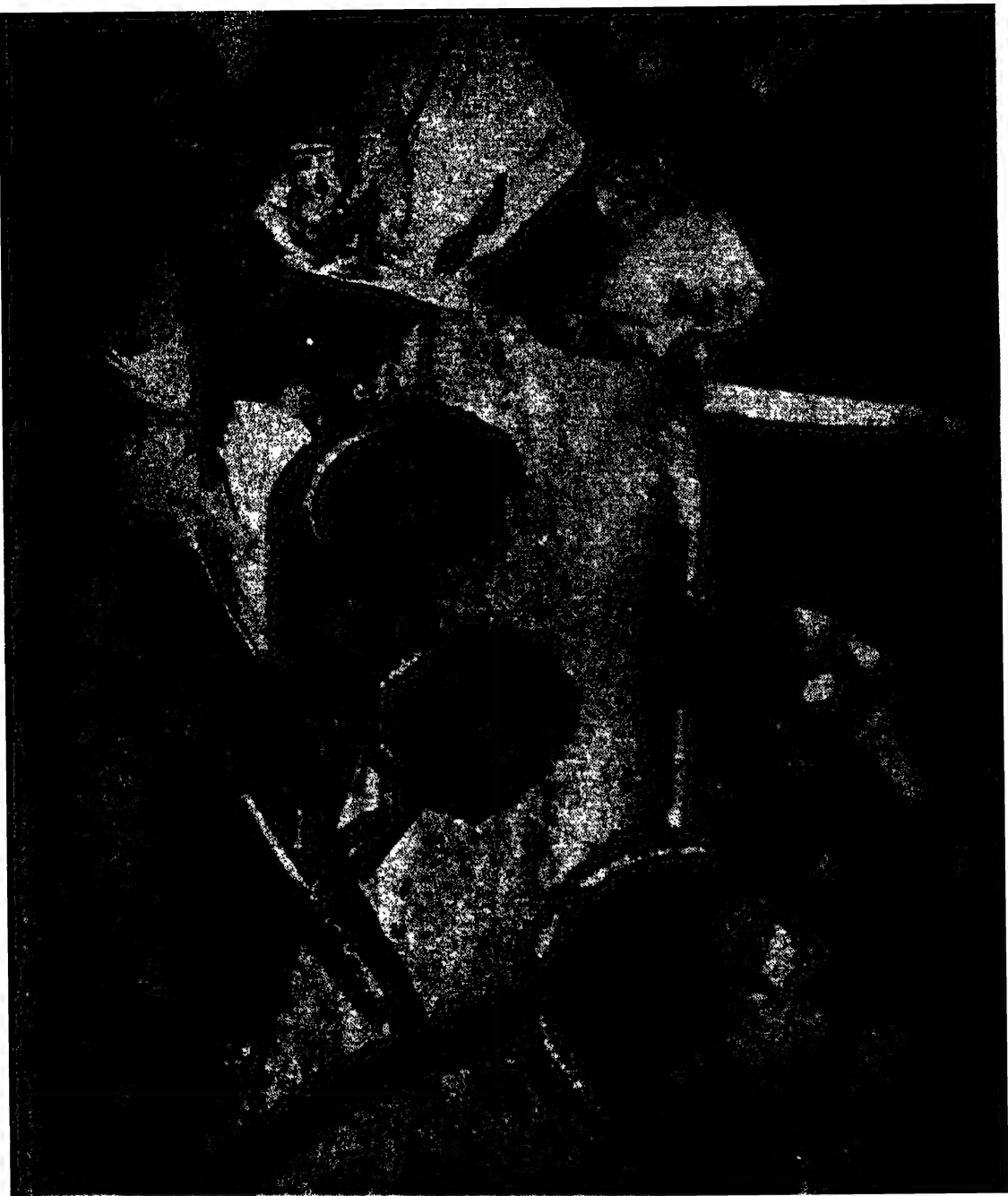
এক দেশ গহন স্থপ্তি-মগন
স্বপ্নের আলোভরা,
অন্ত দেশ মৃত, অস্বন্দর
অন্ধকার-ঝরা।

ভারতবর্ষ

বিজ্ঞান



কর্তা : অমল হুগোপাধ্যায়



•

ବିଜାପ

•

କ. ଡି : ଆଲିକ ମୁଖ୍ୟାଧିକାରୀ

ଭାରତର କିଛି ଭାଗ

(১)

স্বাধীনতা স্বপ্নের যুগে যে করুণ দেশনেতার নাম আমাদের সর্বাগ্রে মনে পড়ে, তার স্মৃতিস্বরূপে সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ইংরাজকে দেশ থেকে বিতাড়িত করে স্বদেশী শাসন প্রতিষ্ঠায় তাঁর ছিল মূর্ত্যুঞ্জয়ী সাধনা। কিন্তু দেশ-প্রেমিক হিসাবে সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের সেদিনের ভূমিকা আজ আমাদের অনেকেরই কাছে অজ্ঞাত থেকে গেছে। এ প্রবন্ধে সেদিনের স্বাধীনতা আন্দোলনে কথা-শিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবনের কিছু ঘটনা সম্বন্ধে আলোকপাত করিবার চেষ্টা করছি।

শরৎচন্দ্র রেজুন থেকে এলেন কলকাতায় ১৩০৩ সালে। লেখক হিসাবে তখন তাঁর খ্যাতি বাংলাদেশে যথেষ্ট—পল্লী-সমাগ, চন্দ্রনাথ, বৈকুণ্ঠের উইল, আর অরুণীরা তখন প্রকাশ হয়েছে। রামের স্মৃতি, বিদ্যুর ছেলে সারা ব্রহ্মদেশে কটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। সে সময় “ভারতবর্ষ” পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়। বঙ্ক প্রমথবাবুর অধ্যরোধে শরৎচন্দ্রের উপস্থান “বিরাজ-বৌ” ভারতবর্ষে প্রকাশিত হল। ভারতবাসী শরৎচন্দ্রকে প্রতিভাশীল সাহিত্যিক বলে মেনে নিলেন। এর পর যমুনার প্রকাশিত হতে থাকল “চরিত্র হীন”। দেশ-বাসীগণ বিস্মিত হোল এক প্রবাসী সাহিত্যিকের এই অপূর্ণ প্রতিভায়।

রেজুনে চাকরী করা কালীন এক ইংরাজ অফিসারের সাথে শরৎচন্দ্রের একদিন প্রায় ষণ্ডযুদ্ধের স্থানা হয়। সাহেব ইরেস্পনসিবল্ মনসেল বলায় শরৎচন্দ্র সেদিন তাকে কমা করেন নি। সাহেবের নাকের উপর হাত হুলে সেদিন তিনি বলেছিলেন—“তোমার চাকরীর পরোয়া করিনে সাহেব, জেনো আমরা বাদলী, চিনি লাঠি আর বলেট।” সেদিন আর সেই মুহূর্ত থেকেই আরম্ভ হয়েছিল সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন।

শরৎচন্দ্র কিরে এলেন কোলকাতায়, প্রমথবাবুর চেষ্টায় “ভারতবর্ষে”—শ্রীকান্ত ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ হতে আরম্ভ করল। সারা দেশে আলোড়ন পড়ে গেল “শ্রীকান্ত” নিয়ে। তাঁর অর্থ নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিও প্রমথবাবু প্রকাশক হরিন্দাসবাবুর মারফৎ মাসিক ১০০ (এক শত টাকা)র ব্যবস্থা করে কিছুটা লাঘব করে দিয়েছিলেন। সে সময় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস কিছু কিছু সাহিত্য চর্চা করতেন। তাঁর পরিচালনায় একটি মাসিক পত্রিকাও প্রকাশ হতো তখন, শরৎচন্দ্রের প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে নিজেই আলাপ করলেন শরৎচন্দ্রের সঙ্গে এবং তাঁর বন্ধুত্বপ্রার্থী হলেন। দেশবন্ধুর সাথে তাঁর শ্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠল সাহিত্যের মাধ্যমেই।

দেশবন্ধুর পত্রিকায় শরৎচন্দ্রের সে সময় কয়েকটি গল্প প্রকাশ হয়েছিল, তার মধ্যে উল্লেখ যোগ্য গল্প হোল “বাসী”। এই সময় শরৎচন্দ্র আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের নেতৃত্বে চরকা আন্দোলনে যোগ দেন। দেশবন্ধুর সম্পর্কে শরৎচন্দ্র হাওড়া কংগ্রেস কমিটির সভাপতি হয়ে প্রকাশ্যে আন্দোলনের মধ্যে কাঁপিয়ে পড়লেন। কোলকাতায় ওয়েলিংটন স্কোয়ারে বসল কংগ্রেসের অধিবেশন। আফ্রিকায় জয় লাভের পর মহাত্মাজী কিরে এলেন দেশে। গান্ধিজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হোল, শরৎচন্দ্রও সেদিন পিছিয়ে থাকলেন না। সত্যায়ত্ত পরিচালনায় তার নিলেন তিনি। আই, সি, এস, এর চাকরীর মায়া ত্যাগ করে স্বভাবচন্দ্র এ সময় কিরে এলেন দেশে। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে স্বভাবচন্দ্রের এ সময় বন্ধুত্ব হোল, ইলেক্সন, বর্জ্জন নীতির বিরোধিতা করলেন শরৎচন্দ্র। দেশবন্ধুও তাঁর সঙ্গে এক মত হলেন। ১৯২২ সালে গয়া অধিবেশনে দেশবন্ধু সভাপতি হলেন।

রাজাগোপালাচারী মহাত্মাজীর বর্জ্জন নীতির পক্ষ হয়ে এক মূলত্ববী প্রশ্ন তুললেন। দেশবন্ধুর পরাজয় আসিল

দেখে শরৎচন্দ্র নির্বাচনের পূর্বেই অসুস্থতার অজুহাতে কোলকাতায় ফিরে এলেন। দেশবন্ধুও এ সময় কংগ্রেস সভাপতিত্বে ইস্তফা দিয়ে কোলকাতায় ফিরে এসে স্বরাজ্য পার্টি গঠন করে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার স্থির করলেন। দেশবন্ধুর পার্শে এসে সেই সময় দাঁড়িয়েছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও কথাসিঙ্গী শরৎচন্দ্র। শরৎচন্দ্র সে সময়ও ছিলেন হাওড়া কংগ্রেস কমিটির সভাপতি। শরৎচন্দ্রের “পথের দাবী” তখন প্রকাশিত হয়েছে। দেশের বহু যুগ শরৎচন্দ্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ছুটে এসেছে তাঁর কাছে। শরৎচন্দ্র বুঝিয়েছেন সব্যসাচীর অবলম্বিত পথেই দেশের মুক্তি সম্ভবপর, দেশের কাজে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন, শরৎচন্দ্র গোপনে যোগদান করলেন এনাকিষ্টি পার্টির সঙ্গে। এ সময় গোয়েন্দা বিভাগও তৎপর হয়ে উঠল। শরৎচন্দ্রের সহযোগী বিপিন গাঙ্গুলী ও কানাই গাঙ্গুলী পুলিশের স্ত্রেন দৃষ্টিতে নজরবন্দী হলেন। শরৎচন্দ্র কিছু নির্বিকারভাবে কাজ চালিয়ে চলছেন। গোয়েন্দা বিভাগ আগলে বসেইরইল তাঁর দরজা। এই সময় প্রকাশ হোল “দেনা-পাওনা”, “নব-বিধান।” লেখক হিসাবে উৎসাহী পাঠকের ছদ্মবেশে সহযাত্রীর মাধ্যমে গোয়েন্দা পুলিশের চোখে খুলো দিয়ে কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন তিনি। অহিংসা নীতির সমর্থক শরৎচন্দ্র কোন দিনই ছিলেন না। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে এ নিয়ে তার প্রায়ই আলোচনা হোত। তিনি বলতেন, “সব্যসাচীর অবলম্বিত পথেই দেশের স্বাধীনতা আসা সম্ভব। তার জন্তে বীরের মত লড়তে হবে। পড়ে মার খাওরাকে বার। সমর্থন করেন আমি তাদের দলে নেই।” দিল্লীর বিশেষ অধিবেশনে দেশবন্ধু নীতির সমর্থনে রেজলিউশন পাশ হবার পর গান্ধীজী পদত্যাগ করলেন। পণ্ডিত মতিলাল নেহরু সভাপতি হলেন। এর অল্পদিন পরেই দেশবন্ধু পরলোক গমন করেন।

দেশবন্ধুর মৃত্যু সংবাদ শরৎচন্দ্রের কাছে এসে পৌঁছাতে ছোট শিশুর মত ডুববে কঁদে উঠলেন তিনি। তিন দিন তিন রাত জল স্পর্শ না করে শুধু অঝোর ধারিণী কাঁদলেন।

সুভাষচন্দ্র এখন কর্পোরেশনের কর্মকর্তা, শরৎচন্দ্র তখন হাওড়া কংগ্রেস কমিটির সভাপতি। রাজনীতি ক্ষেত্রে

তখন কে, এম, সেনগুপ্ত আর সুভাষচন্দ্র। এদের দুটি দল নিজ নিজ প্রাধান্ত বিস্তারে চেষ্টা করে চলেছেন। এ সময় বীরেন শাসনের অভ্যুদয় ঘটেছে রাজনৈতিক আকাশে সুভাষচন্দ্রের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ। শরৎচন্দ্র অসুস্থতার জন্ত রাজনৈতিক জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করতে চাইলেন। বীরেন শাসন বললেন, “দেশবন্ধু নেই, আপনি যদি এ সময় সরে দাঁড়ান, তা’হলে এই মুক দেশবাসীর জন্ত লড়বে কে?”

শরৎচন্দ্র সাহস না দিলেন, আমি জানি তোমরা অত্যন্ত, তোমরাই একমাত্র পারবে দেশবাসীর এই চরম দুর্দিনে দাঁড়াতে। সুভাষচন্দ্রকে বললেন, “জান সুভাষ, তোমাকে নিয়ে আমার কত স্বপ্ন। পথের দাবীর সব্যসাচীর স্বপ্ন কোন দিন মিথ্যা হতে পারে না।” সাহিত্য সাধনায় মন দিলেন তিনি, প্রকাশ হোল “শ্রীকান্ত” তৃতীয় পর্ব আর “রমা”। এ সময় সুভাষচন্দ্র ও কে, এম, সেনগুপ্ত উভয়েই বন্দী হলেন। কর্তৃপক্ষের খামখেয়ালীর প্রতিবাদে সুভাষচন্দ্র অনশন শুরু করলেন। শরৎচন্দ্র তখন অসুস্থ। তাঁর কাছে এখন পৌঁছাতে তিনি ছুটলেন প্রেসিডেন্সি জেলে। সুভাষচন্দ্রকে বোঝালেন, “আমার পথের দাবীর সব্যসাচীর সাধনা কি এই? সুভাষ, তুমি অনশন ত্যাগ কর। তোমাকে জ্বললে চলবে না, তুমি বীর। ওঠ, তাজা রক্ত নিয়ে তোমাকে খেলা করতে হবে। যদি মরতে চাও, বীরের মত মর। আমার পথের দাবীর সব্যসাচীর এভাবে মুহূর্ত হতে পারে না। আমি অসুস্থ শরীরে তোমার কাছে ছুটে এসেছি। আমার নিরাশ করো না।” শরৎচন্দ্রকে গুরুদেবের মত মন্ত্রণ করতেন সুভাষচন্দ্র, তিনি অনশন ত্যাগ করলেন।

শরৎচন্দ্রের শেষ প্রাণ, শ্রীকান্ত চতুর্থ পর্ব, বংশ ও সভ্যতা এর কিছুদিন পরে প্রকাশ হোল। সুভাষচন্দ্র অসুস্থ হয়ে স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্ত ইটরোপ যাত্রা করলেন। গুজবে শোনা গেল যন্ত্রা রোগে আক্রান্ত হয়েছেন তিনি। শরৎচন্দ্র একেবারে যুঝড়ে পড়লেন। ভাবলেন তার সব্যসাচীর স্বপ্ন তাহলে কে সফল করবে? শরৎচন্দ্র দেবতার কাছে গিয়ে কঁদে পড়লেন, এবার রাজনীতি হতে সভ্য সভ্যই বিদায় নিলেন তিনি। চারিদিক তখন তাঁর অন্ধকার ঠেকেতে লাগল। কারণ ঘনের সাথী তখন তাঁর কেউ ছিল

না। শরৎচন্দ্র রাজনীতি থেকে বিদায় নিচ্ছেন শুনে কাজী নজরুল ইসলাম এলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। অমরোষ জন'লেন, "দেশের কাজ থেকে আপনি সরে যাবেন না। এখনো আপনার কাছে দেশ অনেক কিছু আশা করে।" শরৎচন্দ্র নজরুলকে অনেক বোঝালেন। বললেন, আমার শরীর ভেঙ্গে গেছে, তোমরা মিথ্যা অমুযোগ করছ আমাকে। শরৎচন্দ্র ধীরে ধীরে ত্যাগ করলেন তাঁর

রাজনৈতিক জীবন। কারণ সংসদাঙ্গীর অভাব তখন তিনি
এতই অসুস্থত্ব করলেন যে রাজনীতি নিয়ে আলোচনা
করবার মত মানসিক অবস্থা তাঁর তখন আর ছিল না।

এরপর ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে বহু পরিবর্তন এসেছে; কিন্তু সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের জীবনের এই দিকটা আমাদের দৃষ্টির বাইরে থেকে গেছে, যা ছিল স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসের একটি উজ্জ্বল অধ্যায়।

বাঙলার চর্যাপদ

ডক্টর দুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ, পি-এইচ-ডি, অধ্যাপক, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

ରାଗ ପଟମସରୀ ।

কাঁচা তরুণ পঞ্চ-বি ডাল ।

চঞ্চল চীত পইঠো ক'ল ॥

ନିତ୍ କରନ୍ତି ମହାତ୍ମା-ପରିମଳ ।

ମୁଁ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣୁ ମୁହିଁ ଅଜ୍ଞାନ ॥

सकल समाहित काहि करिअहे ।

ସୁଖହୂତେ ନିଚିତ ସମ୍ପାଦି ॥

এড়ি এউ ছান্দকবান্ন করণক পাটের আস ।

সুস্থপাথ ভিড়ি লাহরে পাস ॥

ভগই লুই আয়ুহে সাণে দিঠা ।

ধমণ চমণ বেণি পাস্তি বইঠা ॥

পটমঞ্জরী রাগিণীতে গের পদটি বাংলা ভাষা ও
সাহিত্যের আদি নিদর্শন। পদকর্তা যে লুই বা লুইপাদ
তা ভগ্নতাতেই সন্দেহ।

দেহ একটি বিশাল বৃক্ষ এবং পঞ্চেন্দ্রিয় তার শাখা।
পঞ্চেন্দ্রিয়কে সংযত না করার চিন্তা হয়েছে চক্ষু; পরিদৃষ্ট-
মাম বস্তুগণের মধ্যে মন আছে একবারে ডুবে; তাতে
কামনা-বাসনা ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে; সুতরাং এই দেহকে

রক্ষা করা বড়ই স্বকঠিন। কাল অর্থাৎ মৃত্যু পোহের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে তাকে কবলিত করতে উদ্ভত। এই অবস্থায় সিদ্ধার্থ লুইশাদি দেহকে লক্ষ্য করে উপদেশ দিলেন যে মৃত্যু তার অন্তিমকটবর্তী। এখনও তুমি সাবধান হও ; চিন্তকে দূঢ় করে সংযমী হও ; ইন্দ্রিয়ের শক্তিকে একেবারে নষ্ট করে দাও এবং বস্তুগ্ৰন্থ থেকে মনকে বিচ্ছিন্ন করে আত্মানুভূতী করে। যে-স্বপ্ন স্বপ্নের সন্ধানে ছুটই ইন্দ্রিয়-চালিত হয়ে, সে-স্বপ্ন মর্যাদিকাবৎ মায়াজগৎ। স্মৃতরাং সেই মহাস্বপ্নের মোড়ে তার পেছনে না ছুটে ‘মহাস্বপ্নের’ অহুসন্ধান কর। সেই মহাস্বপ্ন-লাভে তুমি হবে অজয়, অমর। একমাত্র গুরুই সেই মহাস্বপ্নের সন্ধান দিতে পারেন। তথাকথিত জপ-তপ, তন্ত্র-মন্ত্রে মহাস্বপ্নের সন্ধান মেলে না। দেহ সাধনে এই স্বপ্নের অধিকারী হওয়া যায় ; কিন্তু এই দেহসাধন কি করে করা যায় তা অভিজ্ঞ গুরুই শুধু জানেন ; স্মৃতরাং এই সাধনবিজ্ঞা অধিগত করতে হলে কেবল গুরুকেই আশ্রয় করতে হবে ; অনভিজ্ঞ অল্প কাউকে অবলম্বন করলে ভ্রোণার কারসাধন হবে না। অতএব কাম্যধোগী গুরুর কাছে গিয়ে সাধনার প্রণালী জিজ্ঞাসা করে তেনে নাও।

কেউ হয়ত বলতে পারেন, দেহসাধনের প্রয়োজন কি? সমাধিই হলোই তো প্রকৃত সুখ সত্য। চিত্তবৃত্তিনিরোধে সমাধির কথা শাস্ত্রেও আছে এবং মুনি ঋষিরা যখন সমাধিতে অবস্থান করতেন, তখন জাগতিক জ্ঞান তাঁদের থাকতো না এবং চিন্তের বৈকল্যও আসত না। কাজেই শাস্ত্রসম্মত সমাধির ব্যবস্থাই তো গ্রহণ করা যেতে পারে। এর উত্তরে কায়যোগী বলছেন, সমাধিতে ইন্দ্রিয়বর্গ সংযত হওয়ার সুখের অভ্যাস হয়; কিন্তু সমাধিভঙ্গে মন পুনরায় ইন্দ্রিয়-বলীভূত হয়ে বস্তুজগতের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং আপাত সুখের মায়াপাশে আবদ্ধ হয়ে চরম দুঃখকেই বরণ করে। সুতরাং সমাধি অবস্থায় সুখ এবং সমাধিভঙ্গে দুঃখ—এই দুইয়ের মধ্যে পড়ে দেহী অনতিকালেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই হেতু সিদ্ধাচার্যরা চিরদিনই সমাধির বিরুদ্ধে। লুইপাদ স্পষ্টতঃ নির্দেশ দিচ্ছেন যে প্রকৃত সুখ বা ‘মহাসুখ’ লাভ করতে হলে ছন্দোবদ্ধ ইন্দ্রিয়ের পরিপাটিতাকে ত্যাগ কর। করণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়রাশি ছন্দোবদ্ধের দ্বার্য সর্বস্বই অবিচ্ছিন্ন। ইন্দ্রিয়গুলির এমনই অকৃত শক্তি যে চোখে কিছু দেখলে বা কানে কিছু শুনলে মন পরিতৃপ্ত হয় না; তার আত্মাণ, স্বাদ গ্রহণের পর তাকে স্পর্শ করতে ইচ্ছা করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, কোনো একটি ইন্দ্রিয়ের কাজ আরম্ভ হলেই অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলি পরপর এসে সহায়তা করে। এইরূপে দেহকে সম্যক আয়ত্তে এনে তারা হয় পরিপুষ্ট এবং ফলে হয় দেহের অনতিকালেই বিনাশ সাধন। সেইজন্য সিদ্ধযোগী নির্দেশ দিলেন, পঞ্চেন্দ্রিয়ের কৌশল বুঝে তাদের ত্যাগ করে শূন্যতারূপ পক্ষকে পাশে চেপে ধর। ‘শূন্যতা করুণা ভিন্নম্ বোধিচিন্তম্’। জগৎ সংসারের শূন্যতাজ্ঞান ও বিশ্বব্যাপী কলুষের বোধিসত্ত্ব বা মহাসুখ। জগতের কোনো বস্তুই নিজের কোনো অস্তিত্ব নেই, নিজের বতমান স্বরূপের জন্য প্রত্যেকেই অন্য কোন স্বরূপ-ধর্মে নির্ভরশীল; সুতরাং প্রত্যেক বস্তুই অস্তিত্বহীন—এই বোধই শূন্যতাজ্ঞান। এই শূন্যতাজ্ঞানে জাগতিক তথাকথিত সব সুখ মায়া বা মিথ্যা বলে মনে হয়। সেইজন্য লুইপাদ বলেন, শূন্যতাকে গ্রহণ কর। তিনি সাণে অর্থাৎ ইকিত্তি ইশারায় বা অহুত্ব দ্বিমে এই শূন্যতাকে দেখেছেন। পুণ্ড-পত্র, তন্ত্র-মন্ত্র, ব্যাখ্যা আলোচনায় তিনি এই জ্ঞানের সন্ধান করতে পারেন নি। তিনি আরও বলেছেন, এই

শূন্যতার সাহায্যে মহাসুখ লাভ করতে হলে ধমন-চমনকে আসন করে বসতে হবে। এই ধমন-চমন হল যথাক্রমে ইড়া ও পিজলা। দেহযোগী সাধনার সূত্র কুল-কুণ্ডলিনী শক্তিকে আগ্রহ ও উৎসাহিতমুখী করে যখন তাঁকে নিয়ে যান সুসুয়ার পথ দিবে, তখন সেই কুণ্ডলিনী বা অবধূতিকা শক্তি পার্শ্বস্থিত নাড়ীদ্বয় ইড়া-পিজলার সঙ্গে মিলিত হবার বিশেষ চেষ্টা করেন। যদি মিলন-সংঘটন হয়, তবে সাধকের সব সাধনা ব্যর্থ হয়ে যায়; আর যদি সেই শক্তি এই দুইটি নাড়ীকে এড়িয়ে মধ্যবর্তী সুসুয়ার পথে ষট্চক্র ভেদ করে মস্তকস্থিত সহস্রারপদ্যে মিলিত হতে পারেন, তবেই সাধকের হয় ‘মহাসুখ’ লাভ। এই মহাসুখ লাভে সাধকের মধ্যে সব একাকার হয়ে যায়; আত্ম-পর জ্ঞান হয় লুপ্ত, ভবমোহের হয় অবসান; দিন-রাত্রির কোনো ভেদ থাকে না, সুখে সুখানুভূতি বা দুঃখে দুঃখবোধ হয় বিনষ্ট, বস্তু-জগতের জ্ঞান একেবারে তিরোহিত হয়। এই মহাসুখ-লাভের পথে কটকস্বরূপ হল ধমন-চমন বা ইড়া পিজলা নাড়ীদ্বয়। তাই সিদ্ধাচার্য লুইপাদ বিশেষ করে বলেছেন যে কায়সাধনে ঐ দুই নাড়ীকে আসন করে বসে থাকতে হবে, যাতে তাদের শক্তি সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে যায়। পিড়িতে চেপে বসলে যেমন তার নিচের থেকে কোনো জিনিস উঠতে পারে না, তেমনই অত্যন্ত সংযমী হয়ে মহাসুখের পরিপন্থী উক্ত নাড়ীদ্বয়কে নিষেজ করে রাখলে তবেই হবে শূন্যতাজ্ঞান বা মহাসুখ-লাভ।

পদকর্তা লুইপাদ আরি সিদ্ধাচার্য বলে বিদিত। এঁকে কোথাও কোথাও রুইপাদন্ত বল্য হয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্যে ইনি মৎস্তেন্দ্রনাথ নামে পরিচিত। সুতরাং লুই বা রুইপাদ ও মৎস্তেন্দ্রনাথ অভিন্ন বলে মনে হয়। এর জন্মস্থান বাংলাদেশে চন্দ্রদ্বীপে। প্রজন্ম শ্রীবৃদ্ধ সুকুমার সেন মহাপুত্র বলেছেন যে লুই ‘অভিসময়বিজ্ঞ’, শ্রীভগবদভিসময় ও তৎস্বভাব দোহাকোষগীতিকাদৃষ্টি’ নামে তিনখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। [জটব্য, চর্যাগীতি পদাবলী, পৃ ৭] অভিসময়-বিভক্ত-রচনাকালে দীপংকর প্রাজ্ঞান লুইকে সাহায্য করেন। ১০৬ খ্রীষ্টাব্দে দীপংকর যখন তিব্বত যাত্রা করেন, তখন তাঁর বয়স ৪৮ বৎসর। লুই দীপংকরের সমসাময়িক হলে তিনি একাদশ শতকের প্রথমার্ধে আবির্ভূত হয়েছিলেন, অল্পমান করা যায়।



সেকালের আদ্যোদ্য-প্রদ্যোদ

পৃথীরাঙ্গ মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এই সময়ে আবার অর্থ কষ্ট ঘটিল। রাজেন্দ্রবাবু উঠানে বর্ষায় ভিজিয়া ষ্টেজ ধারাপ হইতে লাগিল। অর্ধেন্দু বাবু আবার টিকিট বেচিবার প্রস্তাব তুলিলেন। গিরীশ-বাবু আবার বাঁকিয়া বসিলেন। তিনি এবার বলিলেন, যদি ছাত্তাবুর মাঠে প্যাভিলিয়ন (নাট্যশালা) বাঁধিতে পার, সম্মত আছি, তখনকার পক্ষে এ অসম্ভব প্রস্তাব শুনিয়া সকলে চমকাইয়া উঠিল। গিরীশবাবু আবার দলভাগ করিলেন। রাজেন্দ্রবাবুর বাড়ীর উঠান এত বড় নয় যে তাহাতে টিকিট বেচিয়া দর্শকের স্থান কুলাইতে পারা যায়, কাজেই ইতিকর্ষব্যতা ভাবিতে ভাবিতে দিনও চলিয়া গেল, ষ্টেজও পচিয়া গেল, দলও ভাঙ্গিয়া গেল। নগেন্দ্র বাবু, ধর্মদাস বাবু, মতিবাবু ও অর্ধেন্দু বাবু অতি নিকট প্রতিবেশী ছিলেন। ইহার নূতন পছা চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ইতিপূর্বে চাঁদা আদায় হুজ্রে ইহার কয়েক জন গাঞ্জর সহায়ত্ব পাইয়াছিলেন। শ্রীমোহননাথ পাল, শ্রীমোহননাথ পাল [২য়] ওরফে বুধো পাল, অমৃতলাল পাল, শ্রীবিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় ইনস্পেক্টর, ব্রজনাথ চট্টোপাধ্যায়, নন্দগোপাল নিয়োগী [পরে এটর্নী], কটক ওরফে হংকুমার গঙ্গোপাধ্যায় [যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের ভ্রাতার অভিনেতা], নগেন্দ্রবাবুর বড় ভাই দেবেন্দ্রনাথ

বন্দ্যোপাধ্যায় ও পিসতুতো ভাই কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ইহারাই যেন শেষে এই নাট্যসম্প্রদায়ের অভিভাবকরূপে দেখা শুনা করিতেন ও পরামর্শ দিতেন।

চাঁদা আদায়ের সময় ৩০সিকমোহন নিয়োগীর মধ্যম পৌত্র শ্রীভুবনমোহন নিয়োগী ইহারদের কিছু চাঁদা দেন। শেষে এই ব্যক্তি ইহারদের দুর্দশার সময়ে সাহায্য করিতে আপনা হইতে প্রবৃত্ত হইলেন। ভুবনবাবু তখন কিশোর-বয়স্ক তাঁহার ভরণ্য পাইয়া অর্ধেন্দু বাবু আবার দল গড়িতে প্রস্তুত হইলেন। স্থানের কথা বলায় ভুবন বাবু খীর পিতামহ-প্রতিষ্ঠিত অন্নপূর্ণার ঘাটের চাঁদনীর উপর বার-ঘারী বৈঠকখানা ছাড়িয়া দিলেন। ১২৭৮ সালের শীতকালে ১৮৭২ সালের প্রথমে এই বাড়ীতে দল বসিল। গিরীশবাবু ব্যতীত লীলাবতীর দলের সকলেই আসিয়া জুটিলেন। পূর্বোক্ত বন্ধুবান্ধবগণের বন্ধে এবার কার্যের একটা শৃঙ্খলা স্থাপিত হইল। নগেন্দ্রবাবু সম্পাদক [পেজেন্টারী], ধর্মদাস বাবু কর্মাধ্যক্ষ [ম্যানেজার], কান্তিকবাবু বেশকারী [ড্রেসার] আর অর্ধেন্দু বাবু পরিচালক ও শিক্ষক [Director ও Teacher] হইলেন। অর্ধেন্দু বাবু ব্রাহ্ম সমাজের গায়ক বিজ্ঞচরণ চট্টোপাধ্যায় আংশিক মত নেগণ্য হইতে গান গাইতেন। এই সময়ে হইতে হরেশ চন্দ্র মিত্র, শ্রীমোহননাথ মিত্র, শ্রীমদলাল ঘোষ, শ্রীমোহননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েক জন

আর থিয়েটার করিবেন না বলিয়া ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন। ইহার পর শ্রামবাসীর বৈশিষ্ট্য মিত্র এই দলের সভাপতি হন। অর্ধেক বাবুর প্রস্তাবে “নীলমর্ষণ” অভিনয় করা স্থির হয়। আখড়াই আরম্ভ হইল। অতি উৎসাহে কার্য লীজ লীজ অগ্রসর হইতে লাগিল। বৈশিষ্ট্য বাবুও অতি যত্ন সহকারে ইহাদের কার্য পরিদর্শন করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে গিরীশ বাবু একটি সন্ধ্যা ব্যতীত দল বসাইয়া দিলেন। এই দলে তিনিই একটি সন্ধ্যা পালনা বাধিয়া দেন। তাহাতে একটি গানে প্রয়াগের লুপ্ত বৈশিষ্ট্য দ্বারা ভাগীরথী বর্ণনাত্মক একটি বড় সুন্দর গান ছিল। এই গানটিতে অর্ধেক বাবুদিগের নাট্যসম্প্রদায়ের সভাপতি হইতে গ্রন্থকর্তা দীনবন্ধু মিত্রের নাম পর্যন্ত এমন কোণে গীতা যে, শুনিলে গিরীশবাবুর কবিত্বশক্তি ও শব্দচয়ন-ক্ষমতার প্রশংসা না করিয়া থাকি যায় না। রাধামাধব বাবু এই সময়ে কোন কারণ বশতঃ বিদেশে যান। বিদেশ হইতে আসিয়া তিনি গিরীশবাবুর দলে যোগ দেন। তিনিই গিরীশবাবুর এই গানটি গাইতেন—

“লুপ্তবৈশিষ্ট্য ব’লে তেরো ধার।

তাতে পূর্ণ অর্ধ-ইন্দু-কিরণ, সিঁদুরমাখা মতির হার।

নগ হতে ধারাদধর সরস্বতী ক্ষীণকায়,

বিবিধ বিগ্রহ ঘাটের উপর শোভা পায়,

শিব শঙ্কর মহেশ্বরাদি অবতার।

অলক্ষ্যেতে বিষ্ণু করে গান, কিবা ধর্মক্ষেত্র স্থান,

অবিনাশী মুনিষ্যকি কল্পে বসে ধ্যান,

সবাই মিলে ডেকে বলে দীনবন্ধু কর পার।

কলঙ্কিত শশী হরবে অমৃত বরষে,

জ্ঞান হয় দীনের গৌরব যায় বুঝি খসে,

স্থানমাছায়ে হাড়ী শুঁড়ী পরসা দে দেখে বাহার।

কিবা বালুময় বেলা, পালে পালে রেতের বেলা

ভুবনমোহন চরে করে গোপালে খেলা।

মিলে যত চাষা করে আশা নীলের গোড়ার দিচ্ছে সার ॥

এই গানটির বর্ণিতার্থ সহজেই বুঝা যাইতেছে। ইহার কলিতার্থ এইরূপ,—“লুপ্তবৈশিষ্ট্য”—সভাপতি বৈশিষ্ট্য মিত্র, “তেরো ধার”—১২১৩ জন পৃষ্ঠপোষক ও অভিভাবক,

“তাতে পূর্ণ-অর্ধ-ইন্দু”—পূর্ণচন্দ্র মিত্র, শ্রী অর্ধেকশেষের মুক্তকী ও কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। “সিঁদুরমাখা মতির হার”—মতিলাল সুর। “নগ হতে ধারাদধর”—নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সেক্রেটারী, তাহা হইতেই দল চলিতেছে। “সরস্বতী ক্ষীণকায়”—সকলেরই বিজ্ঞাত্য। “বিবিধ বিগ্রহ”—অন্নপূর্ণার ঘাটের উপর এই সকল বিগ্রহ অর্থাৎ উচ্ছৃঙ্খল হুক জুটিয়াছে। “শিবশঙ্কর মহেশ্বরাদি অবতার”—শিবচন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কার্তিকচন্দ্র পাল, মহেন্দ্রলাল বসু প্রভৃতি। “অলক্ষ্যেতে গান”—বিষ্ণুবাবু নেপথ্য হইতে গান গাহিতেন। “কিবা—ধর্মক্ষেত্র স্থান”—শ্রীধর্মদাস সুর ও শ্রীক্ষেত্রমোহন গলোপাধ্যায়। “অবিনাশী”—অবিনাশচন্দ্র কর। “দীনবন্ধু কর পার”—দীনবন্ধু মিত্রের পুস্তক অবলম্বন। “কলঙ্কিত শশী”—শশিলাল দাস স্নেহাত্মক নাম বিসাদী হইয়া কলঙ্কিত। “অমৃত-বরষে”—অমৃতলাল পাল একজন অভিভাবক। “পরসা দে দেখে বাহার”—টিকিট বিক্রয় করিবার প্রস্তাবের প্রতি লক্ষ্য। “বালুময় বেলা”—অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় ওরফে (কাপ্তেন) বেলবাবু। “পালে পালে”—রাজেন্দ্রনাথ পাল, কার্তিক পাল প্রভৃতি পাল উপাধিধারী ব্যক্তিবর্গ। “ভুবনমোহন চরে”—শ্রীভুবনমোহন নিয়োগী তাহার গলাতীরের বারধারী বৈঠকখানায়। “গোপালে খেলা”—গোপালচন্দ্র দাস। “মিলে যত চাষা”—সদ্যোপ জাতীয় অভিনেতা ও বন্ধুবান্ধবগণ। “নীলের সার”—নীলমর্ষণ লইয়া আখড়াই চলিতেছে।

গিরীশবাবুর এই গান স্নেহাত্মক হইলেও ইহা লইয়া উভয় পক্ষে কোন শত্রুতা ঘটে নাই।

বাংলা হউক এইরূপ আন্দোলন আন্দোলনে উৎসাহের মধ্যে জাশাস্ত্রাল থিয়েটার সম্প্রদায় অন্নপূর্ণার ঘাটের উপর ভুবন নিয়োগীর বৈঠকখানায় দৃঢ় অধ্যবসারে ও মহাধৈর্য নীলমর্ষণের আখড়াই চালাইতে লাগিলেন। ১২১৯ সালের কার্তিক মাসে (৮৭২ নবেম্বরে) জগদ্ধাত্রী পূজার দিন নগেন্দ্রবাবুর বাড়িতে ইহাদের ড্রেস্ রিহান্সাল হইয়াছিল। এই অভিনয়ের কিছু পূর্বে স্থগতিস্থ নাটককার শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু এই সম্প্রদায়ে যোগদান করেন। তিনি তৎপূর্বে কাশীতে হোমিওপ্যাথী ডাক্তারী করিতেন। এই সময়ে তিনি কলিকাতায় আসিলে অর্ধেক বাবুর আগ্রহে

নাট্যসম্প্রদায়ে বোগদান করেন। অমৃতবাবু পূর্বে বহুনাথ ভট্টাচার্য্য “সৈরিকীর” অংশ লইয়াছিলেন। তিনি দীর্ঘজন্ম পুরুষ ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে বহু সাজা হলে মানাইত না। অমৃতবাবু সেই অংশ লইলেন। অমৃতবাবু নিজের মূখ্য শুনা গিয়াছে যে অর্জুন্দুবাবুর নিকট তাঁহার থিয়েটারের হাতে খড়ি হইল। নবীনমাধবের মৃত্যু শব্দ্যার দৃষ্টে সৈরিকীকে যে ‘মড়া কামা’ কীদিতে হইত, অমৃতবাবু সহজে তাহা আয়ত্ত করিয়া উঠিতে পারেন নাই। শেষে অমৃতবাবু নিরু বাড়ীর পার্শ্বস্থ একটা খালী ভাড়া বাড়ীতে প্রত্যহ দু’গ্রহর বেলায় গিয়া এই ক্রন্দন শিখিবার জন্ত সাধনা করিতেন। অর্জুন্দুবাবু সেখানে গিয়া কীদিতে থিখাইতেন, উভয়ে গলা মিলাইয়া কান্না অভ্যাগ করিতেন। আট দশ দিন এইরূপ কঠোর সাধনায় অমৃতবাবু “মড়া কামা” আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রত্যহ এই সাধনার বিষয় পল্লীস্থ স্ত্রীলোকেরা জানিত না, কাজেই রটিয়া গেল যে ভাড়া বাড়ীতে ভূতে রেজ কীদে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে অভিনয়টিকে দর্শকপ্রকারে সহজ এবং ভাবগুরু করিবার জন্ত এই সম্প্রদায় ক্রীড়া যত্ন ও পরিশ্রম করিতেন। ১৩০৭ সালের ২২ অগ্রহায়ণ তারিখে অর্জুন্দুবাবু বাঙ্গলা-থিয়েটারের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে এইরূপ নানা ঘটনার উল্লেখ করিয়া ছিলেন। ফল কথা যতদিন প্রত্যেক কথার প্রত্যেক শব্দের উপযুক্ত উচ্চারণজন্য অভিনেতাদের স্বয়ংস্ব ও অস্বীয়কৃত না হইত, ততদিন তাঁহারা ছাড়িতেন ন। উক্ত অভিনয়ে নিম্নলিখিত দর্শন ও ভূয়োদর্শনের জন্তই স্ত্রীশ্রীনাথ থিয়েটারের অভিনেতৃবর্গ যাহা শিক্ষা করিতে পারিয়া ছিলেন, তাহা নাট্যকলা-কৌশল প্রদর্শনে সর্বতোভাবে উপযুক্ত হইয়াছিল। এই ব্যক্তিগণ এইরূপ অংশ লইয়াছিলেন,—

গোপ বসু	শ্রী অর্জুন্দুশেখর মৃত্তকী
উড্ সাহেব	”
জনৈক রাইয়ত	শ্রী অর্জুন্দুশেখর মৃত্তকী
নবীনমাধব	নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
বিন্দুমাধব	কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
তোরাণ	মতিলাল সুর।
মাইচরণ	”

গোপ	মতিলাল সুর
নীলকরদিগের মোক্তার	”
সাধুচরণ	মহেন্দ্রলাল বসু
ম্যাক্সিট্রিট	”
রেজ সাহেব	অবিনাশচন্দ্র কর
গোপীনাথ দেওয়ান	শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
নবীনমাধবের মোক্তার	গোপালচন্দ্র দাস
কবিরাজ	শশিলাল দাস
লাঠিঘাল	শ্রীপূর্ণচন্দ্র মিত্র
রাখাল	বহুনাথ ভট্টাচার্য্য
খালানী	গোলোকনাথ চট্টোপাধ্যায়
সাবিত্রী	শ্রী অর্জুন্দুশেখর মৃত্তকী
সৈরিকী	শ্রী অমৃতলাল বসু
সরলতা	শ্রী ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
রেবতী	তিনকড়ি মাসা
পদী মররাণী	মহেন্দ্রলাল বসু
খুজী	অবিনাশচন্দ্র কর
আতুরী	গোপালচন্দ্র দাস

নগেন্দ্রবাবুর বাড়ী ড্রেস রিহার্সাল হইয়া বাইবার পর অভিনয়ের অতিমাত্র সূচ্যাত হইয়াছিল। এই উৎসাহ আর কাল বিলম্ব না করিয়া টিকিট বেচির অভিনয় করিবার জন্ত স্টেট চসিতে লাগিল। অবশেষে পাথুরে-ঘাটার মোড়ে মধুসূদন সান্তালের বৃহৎ বাড়ী পাওয়া গেল। এই বাড়ী এখন জোড়াসাঁকোর বড়ী ওলাবাড়ী নামে খ্যাত। সান্তালদিগের তখন গুপ্তদশা। তাঁহারা মাসিক ৩০ টাকা ভাড়ায় উঠানটা ছাড়িয়া দিলেন। ধর্ম্মদাস সুর উঠানে স্টেজ বাধিতে লাগিলেন। ১৮৭৯ সালের ২৩ অগ্রহায়ণ (১৮৭১। ৭ই ডিসেম্বর) শনিবার এখানে টিকিট বেচিয়া প্রথম অভিনয় হইবে স্থির হইল। বেলা চারিটার সময় হইতে টিকিট বিক্রয় আরম্ভ হয় এবং সন্ধ্যা ৭টার মধ্যে সমস্ত টিকিট বিক্রীত হইয়া গিয়াছিল। সহরের অধিকাংশ ধনী রিজার্ভ সিটের টিকিট লইয়াছিলেন। তখন নাচের মজলিসে লোকে যেমন পোষাক পরিধান করিয়া বাইত, এই থিয়েটার দেখিতেও সেইরূপ পোষাক পরিধান করিয়া আসিয়াছিলেন। এখনকার মত যথেষ্টবেশে তখন কোন মজলিসে বাওয়া ঘৃণ্যকর ছিল। সেদিন যে একতান

বাস্তবায়িত ছিল, তাহাতে কালিদাস সান্তাল হারমোনিয়াম, নিমাই ওস্তাদজী, গৌরদাস বাবাজী ও বহুগাভার সুবিখ্যাত রাজাবাবু বেহালা বাজাইয়াছিলেন, এবং শ্রামপুকুরের শ্রীবোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ঢোল বাজাইয়াছিলেন। নীলদর্পণের ইহা প্রথম অভিনয় নহে। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে যখন ঢাকায় ইহা প্রথম মূদ্রিত হয়, তখন গ্রন্থকারের উৎসাহে ঢাকাতেই ইহার অভিনয় হইয়াছিল। বাহা হটক, প্রথম রাত্রিতেই ৭০০ টাকা বিক্রয় হওয়ার শ্রামশ্রমাল থিয়েটারের উৎসাহ বাড়িয়া গেল। পরে ইংলিসম্যানের ছাপাখানা (জোল কোম্পানীর ছাপাখানা) হইতে দস্তর মত কেবল ইংরাজীতে প্রাকার্ড ছাপান হইয়াছিল। ৩০শে অগ্রহায়ণ শনিবারে নীলদর্পণ অভিনীত হইল। বিক্রয় বাড়িয়া গেল। পর সপ্তাহে অর্থাৎ ৫ই পৌষ শনিবারে ইহার “জামাই বারিক” অভিনয় করেন। দুই রাত্রির উৎসাহে তৃতীয় সপ্তাহে নূতন অভিনয় করিবার ইচ্ছা হয়। অর্ধেন্দুবাবুর প্রস্তাব মত জামাই বারিক গৃহীত হয়। নীলদর্পণের অভিনয়ে দর্শকেরা কানিয়া হাপাইয়া উঠিত, জামাই বারিকের অভিনয়ে হাসিয়া গড়াইয়া পড়িত, আবার করুণ রসে আর্দ্র হইয়া পড়িত। যুববার রাত্রি হইতে শনিবার প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত প্রত্যহ তিনবার রিহাসাল দিয়া জামাই বারিক খেলা হয়। নীলদর্পণের রিহাসাল এক বৎসর চলিয়াছিল। ৫ম রাত্রিতে নবীন তপস্বিনী খেলা হয়। ইহাও আড়াই

দিনের পরিভ্রমে অভিনীত হইয়াছিল। যুববারে ১২ খানা নবীন তপস্বিনী আনি। প্রধান প্রধান অভিনেতার অধ্যয়ন করেন। এইরূপে শ্রামশ্রমাল থিয়েটারের এই মধ্যে একে একে দীনবন্ধুর নীলদর্পণ, জামাই বারিক, নবীন তপস্বিনী ও বিয়ে পাগলা বুড়ো অভিনীত হয়। তাহার পর মাইকেলের “কৃষ্ণকুমারী” অভিনীত হয়। কৃষ্ণকুমারীর অভিনয়ের পূর্বে পর্য্যন্ত গিরীশবাবু এই দলে মিলিত হন নাই এবং তিনি “Fathers” এই গুপ্ত নামে Indian Daily News এ শ্রামশ্রমাল থিয়েটারের বিবরণে ক্রমাগত প্রবন্ধ লিখিতেন। ১৮৬০ সালের বঙ্করাম অর্ধেন্দুবাবু বলিয়াছিলেন,—“নীলদর্পণ ৩ জামাই বারিকে সাময়িক ও সামাজিক ছবি দেখাইয়া থিয়েটারের অভিনয়ে আদর্শের সমান অমুকুতি না হইলে যে দর্শনগ্রাহী ও স্তম্ভভক্ত হয় না, তাহা আমরা বেশ বুঝাইয়া দিয়াছিলাম এবং থিয়েটারে সামাজিক কুপ্রথা নাটক অভিনয় করিলে যে তাহা সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে, তাহাও বুঝিতে দিয়াছিলাম। তাহার পর নবীন তপস্বিনী দর্শককে করুণা সাহায্যে একটু উচ্চ আদর্শের প্রতি লক্ষ্য করিতে অবসর দিলাম। তাহার পর কৃষ্ণকুমারীতে এই উচ্চ আদর্শ আরও উচ্চ করা হইয়াছিল। পুস্তক নির্বাচনের এ সকল হেতু আমারই মনে মনে থাকিত, এ সকল কথা নিয়ে কাহারও সহিত কোন দিন পরামর্শ করিতাম না।” [ক্রমণ:



লখনৌ পূজা উপলক্ষ্যে আমাদের কলেজের মেয়েদের অভিনয়, বর্ষীয় দিনে বাঁধা বরাদ্দ, অনেক বছর ধরেই চলে আসছে। প্রত্যেক বছর আমরা একটা করে নতুন বই অভিনয় করাই। পূজোতে নতুন কিছু না করলে আমাদের চলে না, যেমন নতুন কাপড় জামা চাই—তেমনি নাটকও নতুন হ'তেই হবে, এই আমাদের মন।

এবারে অনেকগুলো অলটারনেটিভের কথা ভেবেছি, অনেকদিন ধরে। রক্তকরবী বই অভিনয় ক'রে কলকাতার লোকেরা নাম করেছেন, সেই নামে ভাগ বসাবার উচ্চাকাঙ্ক্ষাও যে মনে মনে হয়নি তা নয়।

কারো কারো ধারণা যে, শিশু অভিনেতার অভিনয় বৃষ্টি নিত্যন্তই ছেলে খেলা। এই জন্তে আমরাও কয়েক বার অভিনয় কালে ষ্টেজের উপর থেকে সমবেত দর্শকদের সামনে শিশুদের হয়ে ক্ষমা ভিক্ষা চেয়েছি। কিন্তু পরে ভেবে দেখলাম এ ক্ষমা-ভিক্ষা নিত্যন্তই বৈফল্য-বিনয়। শিশু অভিনেতা বুড়ো অভিনেতার চেয়ে কোনখানে কম তো নয়ই, বরং অনেক বিষয়ে সে বুড়োকে ছাড়িয়ে যায়। যেখানে কোন গুরুগম্ভীর বিষয় হ'ল, যেমন মাতৃস্নেহ, বিচ্ছেদের বেদনা, ইত্যাদি—সেখানে শিশুকে কষ্টে হাসি চেপে অভিনয় করতে হয় বটে, কিন্তু যেখানে অভিনয়ের বিষয় শিশুর স্বভাবের সঙ্গে মেলে সেখানে বড়োরা তার সঙ্গে পাল্লা দিতেই পারে না। শিশুর মত অমন উজ্জল প্রাণাবেগ বড়োদের মধ্যে কখনই আসতে পারে না। বড়োরা যেখানে প্রাণাবেগের উজ্জলতা দেখায়, সেখানে সেটা খানিকটা কৃত্রিম—কিন্তু শিশুর মধ্যে সেই প্রাণোচ্ছলতা একান্তই স্বাভাবিক। তাই দুট্টুনি আর হাসিখুসির অভিনয়ে ছোট বাচ্চাদের জুড়ি নেই।

কিন্তু 'রামের স্মৃতি' তো হাসির বই নয়। এতো সেই মাতৃস্নেহের আবেগ আর মাতৃহত্যার বেদনা নিয়েই লেখা। তবু এবারকার আমাদের পূজা প্রোগ্রামে স্থির হ'ল 'রামের স্মৃতিই।' 'রক্তকরবী' ঢের উচুচরের বই

বটে, কিন্তু আমাদের পূজা মণ্ডপে যে দর্শক সমাবেশ হবে সেই আমাদের মা মাসীমা এবং দিদি ও বোনদের সামনে রক্তকরবী পরিবেশন করতে আমার একটু দ্বিধা হ'ল। ভাবলাম, সে দেখা যাবে অল্প কোন সময়ে। এখন যখন আমাদের ঘরের মেয়েরা আশা ক'রে আসবেন আনন্দ, তখন যদি কোন দুর্ভাগ্য তত্ত্ব তাদের সামনে পরিবেশন করি তো তাকে অনেকটা সরল রূপ দিতে হবে যাতে সবাই বুঝতে পারে। ঐ বইকে অতখানি সরল যে কী ক'রে করব, তা নিয়ে ভাবতে সময় লাগ'বে, আপাতত হাতে অত সময় ছিল না। এদিকে আবার আমাদের বিদ্যাস্ত-কলেজের সিলভার-জুবিলী নিয়ে অল্প তিনদিন অভিনয় করতে হবে, ঐ অক্টোবর মাসেই। তাছাড়া রামের স্মৃতির জিত হ'ল আরো একটা কারণে। একদিন বইখানা পড়ছিলাম, পড়তে পড়তে শেষ দিকে যেখানে রাম নিজেকে বৌদির পরিত্যক্ত মনে করে মামার বাড়ী আশ্রয় নেবার জন্তে তৈরী হ'য়ে হাতে একটি ছোট পুটুলি নিয়ে এসে বৌদির কাছে দাঁড়াল, তখন গোথের জলে আর বইয়ের অক্ষর দেখতে পাই না। এমনি হ'ত যখন অনেক দিন আগে ছোট বেলা এ বই পড়েছিলাম। ইতিমধ্যে বয়স এবং নিজের ধারণার, বিজ্ঞা—জুইই অনেক বেড়ে গেছে। কিছু দিন হ'ল মনে মনে ভাবতাম, শরৎচন্দ্র পড়ে যে বয়সে কৈঁদেছি সে বয়স বৃষ্টি পার হ'য়ে এসেছি। শরৎচন্দ্র বৃষ্টি অপরিণত মনের খোঁরাকই দিতে পারেন, আমার মত এমন সুপরিণত, এমন রবীন্দ্রনাথ এবং সেন্সপীয়ার এবং বার্ণার্ড শ পড়া বিদ্যুতের কাছে বৃষ্টি তিনি অকিঞ্চিৎকর হ'য়ে উঠেছেন! নিজেকে সবাই এমনি একটা কিছু ভয়ঙ্কর বিষান ব'লে মনে করে, তাই আমার এই অপরাধ যেন ক্ষমা করা হয়। কিন্তু সেদিন 'রামের স্মৃতি' পড়ে অবশেষে আমারও স্মৃতি ফিরে এল, বুঝলাম মাতার-লেখক আজও তেমনি অপ্রতিহত ক্ষমতাই রাখেন আমার মনের ওপরে। তাঁর বই পড়ে অতিকৃত হব না,

এমন বিজ্ঞা আজও উপার্জন করতে পারিনি, এবং কোন দিন পারবও না।

অথচ 'রামের স্মৃতি' বইতে আছে কি? ও সে নিতান্তই স্বয়ং ব্যাপার। মেয়েদের ঝগড়া স্বন্দ, আর তার মাকধানে অবুধ পুরুষের পুরুষ হস্তক্ষেপ, এতো বাংগালী সংসারের নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার।

পুরুষ মনে করে তার ভারি ক্ষমতা, তার ভারি বুদ্ধি, সে তার তীব্র বুদ্ধিতে উজ্জল চোখ ও কান দিয়ে সংসারের সমস্ত খবরই রাখে এবং সেই হিসেবে তার অপ্রতিহত ক্ষমতা নিয়ে আদেশ নিদেশ জারী করে। আসলে যে সংসার ব্যাপারে এবং অস্তিত্ব কোন কোন ব্যাপারেও সে নিতান্তই চমূর্ণহীন, একথা সে বুঝতেই পারে না। সে দেখে মেয়ে মাহুকের গোধ দিয়ে, শোনে মেয়ে মাহুকের কান দিয়ে। সংকৃত আলঙ্কারিক বলেছেন— 'কাস্তানস্মি তত্ত্বয়োপদশমুজ্জ'। অর্থাৎ কাব্যের উপদেশ হ'ল প্রিয়র উপদেশের মতই সরস। পুরুষ মাহুকের জীবন ও সংসার সম্বন্ধে যে মতামত সেটাও অনেক সময়েই কাস্তার উপদেশে সরস হ'য়েই তার কাছে ভিন্ন ভিন্ন রকম রসীয় হ'য়ে দেখা দেয়। কাস্তা তাকে যে রসে রসিয়ে যে রঙে রাঙিয়ে, চাখান এবং দেখান তিনি তাঁর রূপরসের অহুস্তব তেমনি করেই করেন। শুধু তাঁর অহুস্তব টুকু বাক্য থাকে যে তিনিই সংসারের হর্তা কর্তা বিধাতা।

এখানে কাস্তা মানে সাধারণ অর্থে মেয়েমাহুস বুঝতে হবে, সে যে স্ত্রীই হবে এমন নাও হতে পারে। সে বোনও হতে পারে, মাসী, পিসী কি শাশুড়ীও হতে পারে। রামের স্মৃতির 'শ্যামলালের' বেলায় এই কাস্তা হ'লেন তাঁর শাশুড়ী, নারায়ণীর বিধবা মা।

আহা বিধবা নিরাশ্রয় মেয়ে মাহুস! তার একমাত্র সখল কমা। অর্থাৎ অগ্রতঃ শ্যামলালের সামনে তিনি তাঁর গলার সমস্ত স্বাভাবিক ক্ষমতা তো প্রয়োগ করেন না, শুধুই করুণ হরের চটা ক'রে থাকেন। তাই শ্যামলাল তার প্রতি করুণার অভিভূত হ'য়ে উঠেন। নিরাশ্রয় নারীর প্রতি পুরুষের যে করুণা তারই জন্তে শ্যামলাল নিজের বৈমাত্র্য তাই রামের ওপরে রেগে গেলেন। তা নইলে এর আগে রামের প্রতি তার কোন বিরাগই ছিল না। রামের প্রতি শ্যামলালের মনোভাব যেন অনেকটা

উদাসীন। এর মধ্যে হরত মনস্তত্ত্ব বিদ্যা শ্যামলালের মনের গোপন কোণায় রামের প্রতি একটু গোপন ঈর্ষার কথাও খুঁজে বার করতে পারেন। শ্যামলাল জানতেন নারায়ণী রামকে কতখানি স্নেহ করেন। কিন্তু এটা তাকে মেনে নিতেই হয়েছিল, কারণ শরৎচন্দ্র বলে দিয়েছেন শ্যামলাল প্রকাশ্যে না হ'লেও মনে মনে স্ত্রীকে ভয় করতেন। স্ত্রীকে মনে মনে ভয় করে না এমন বাঙালী বীর দুনিয়ার কম আছে। আহা, কথায় কথায় কেবল বাঙালীর বদনামই বা দ্বিই কেন, বা বাঙালী প্রকৃতি তাই নিশ্চয় বিশ্ব প্রকৃতি।

কিন্তু যখন অসংখ্য নারীর প্রতি করুণা এসে ঝোং দিল এই গোপন ঈর্ষার কণাটির সঙ্গে, তখন সে প্রবল হ'য়ে উঠে নারায়ণীর স্নেহের কর্ণাটির পথ বোধ ক'রে দাঁড়াতে চাইল।

'রামের স্মৃতি'র অকিঞ্চিৎকর সোজা গল্পটি নিয়ে কখনো এমন ক'রে ভাবিনি। কিন্তু ড্রামা করতে গিয়ে আমি ঐ সহজ গল্পটির অন্তরে একটি গভীর সত্যের সন্ধান পেয়ে অবাক হয়ে গেছি।

শরৎচন্দ্র সমাজস্রোতী লেখক। সমাজ-প্রচলিত অনেক সংস্কারকেই তিনি অমান্ত করেছেন, তাঁর অনেক রচনায়। সমস্ত বড় লোকের মধ্যেই রয়েছে সমাজস্রোতিতা অর্থাৎ সমাজের কুসংস্কারগুলোকে দূর ক'রবার একটা চেষ্টা। সমাজপ্রচলিত রীতিনীতির জয়গান করেছেন এমন কোন বড়লোকের নাম করা যাবে না। তা থাড়া করেছেন তাঁরা ব্রতকথা, পাঁচালির ছড়া আর মংগলকাব্য লিখে গেছেন। অবশ্য ওসব লেখা ভালো করে জানি না, কে জানে ওঁদের মধ্যেও কোন সমাজস্রোতী লেখক ছিলেন কিনা। আমার জানায় সমাজস্রোতিতা বাংলা সাহিত্যে প্রথম নিয়ে এলেন কবি মধুসূদন—বাংলা সাহিত্যের সেই নৃতন যুগের প্রবর্তক। রায়-লক্ষ্যকে হীন ক'রে রাক্ষসবীরদের বড় ক'রে তোলা সেদিন কম দুঃসাহসের কাজ ছিল না।

এই সমাজস্রোতিতা দেখেছি রবীন্দ্রনাথে, দেখেছি শরৎচন্দ্রে। 'চরিত্রহীন' বইতে 'গৃহদাহে' শরৎচন্দ্রের সমাজ-স্রোতিতা তো পাঠাই বোকা বার। এই জন্তে অনেক দুর্নীতি-বিরোধী মাহুস শরৎচন্দ্রের এই বই দুখানাকে বিশেষ ক'রে নিন্দা করেন। কিন্তু আমার হাতে তাঁরা শরৎচন্দ্রকে ভুল বোঝেন।

‘গৃহদাহ’ বইতে শরৎচন্দ্র এমন প্যাম্পর্শ স্নেনি যে লোকে যেন বন্ধুর স্ত্রীকে নিয়ে পালিয়ে যায়। তিনি শুধু এই বলতে চেয়েছেন যে অনেক মানুষ এমন আছে যারা হৃদয়বাক্যকে লম্বন করতে জানে না। এতে যেমন তারা অনেক অপরাধ করে তেমনি অনেক মহৎ কাজও করতে পারে। শরৎচন্দ্র বলতে চান একটা মানুষকে যেন আমরা তার চরিত্রের সমস্ত ভালো এবং মন্দ মিলিয়ে বিচার করি। শুধু তার একটা দোষ বা একটা গুণ যেন আমাদের চোখে একমাত্র সত্য বলে দেখা না দেয়। যে সুরেশ বন্ধুর স্ত্রীকে নিয়ে চলে গেল, সেই যে আবার প্রেমের গুণের পেয়ে দূর গ্রামে গেল তাদের সেবা করতে, এটাও যেন আমরা ভেবে দেখি। ও বেচারার হৃদয়-বেগটা ছিল প্রবল, তাকে ও সব সময়ে সামলাতে পারেনি। ও যেমন অচলাকে ভালোবেসেছে, সেই একই প্রবল হৃদয়বেগ নিয়ে ও বিপন্ন মানুষকে দয়া ক’রেছে। অচলার প্রতি ভালোবাসার আবেগে ও যেমন বন্ধুকে বঞ্চনা ক’রেছে, তেমনি মানুষের প্রতি দরদর বশে ও নিজের জীবনকেও বিপন্ন ক’রেছে।

শরৎচন্দ্র দেখেছেন হৃদয়বেগশূন্য আর্থপর মানুষ অনেক সময় সূচরিত্র হ’তে পারে, কারণ তাদের হৃদয়ের বালাই নেই। তারা মেরে মানুষকে ভালোবাসে না, তারা অনেক হিসাব ক’রে পণের টাকার সংগে জীবনযাত্রা নির্বাহের অল্পরোধে স্ত্রীকে ঘরে নিয়ে আসে।

যাই হ’ক, শরৎচন্দ্র সুরেশের জুল দেখিয়েই বই সমাপ্ত করেছেন। শেষকালে শরৎচন্দ্র এই কথাই বলেছেন যে এমন ক’রে ছিঁড়ে আনলে তো ফুলকে পাওয়া যায় না। তখন সে যে শুকিয়ে কালো হ’য়ে ওঠে। ফুল যে তার আপনার বোঁটাতেই ফুল্লর।

আমি যে ক্লাশে বাংলা পড়াই তাদের পাঠ্য আছে রবীন্দ্রনাথের ‘চরিত্রপূজা’। ওতে বিভাগের কবগান করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর এবং তাঁর মাতৃদেবী ভগবতী দেবীর প্রসঙ্গে এই কথাই বলেছেন যে ওঁদের দয়া ছিল উদ্ভূত। ওঁদের দয়ার সঙ্গে সাধারণ মানুষের দয়ার পার্থক্য বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—সাধারণ মেরেদের দয়া যেন হেশলাইরের বাজবন্দী। অর্থাৎ তা সংস্কারের গভী দিয়ে ঘেরা। এটা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ছাত্রীদের

সামনে বছরের পর বছর যে উদাহরণ আমাকে দিতে হয় সে ঐ একমাত্র ‘গৃহদাহ’ উপন্যাসের একটি কাহিনীর। এমন চমৎকাব উদাহরণ আমি যা কিছু পড়েছি তার মধ্যে অন্য কোথাও খুঁজে পাইনি।

সুরেশ গেছে অচলাকে নিয়ে ভিহিবিতে। সেখানে তারা বাসা বেঁধেছে। সেখানে এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ ভক্ত-লোকের সঙ্গে তাদের আলাপ হ’ল। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অচলাকে ভালোবাসলেন মেয়ের মত। তিনি বশাক ছাড়া খেতেন না কিন্তু তিনি স্নেহবশে অচলার হাতের রাসাও খেলেন। অবশেষে যেদিন প্রেমে আক্রান্ত সুরেশের কাছে এল অচলা, এক অপরিচিত দূরের গ্রামে, তখন এই বিপদের খবর পেয়ে সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ছুটে এলেন অচলা ও সুরেশকে সাহায্য করতে। ম ক্রমিক রোগের ভয় তাঁর দয়াকে নিবৃত্ত করতে পারেনি। কাজেই তিনি যে সহদয়, তিনি যে দয়ালু—একথা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু নির্দাক্ষ সংক্রামক রোগ যেখানে তার পথ বোধ করতে পারল না, সেখানেও কিন্তু সংস্কার এসে তার দয়াকে বিকল ক’রে দিল। যে মুহূর্তে তিনি জানতে পারলেন যে অচলা ও সুরেশের সম্পর্ক সমাজবিহিত নয়, সেই মুহূর্তে তিনি সেই বিপন্ন মেয়েটিকে ত্যাগ ক’রে চলে এলেন, তাকে যে সেই মুহূর্তে ঐশ্বর্য ধরতেই হবে, কান্না গিয়ে প্রাণশক্তি করবার ক্ষমতা তিনি যে অচলার হাতের রাসা খেয়েছেন। একেই তো বলে দেশল ই বাস্তব মধ্যে বন্ধ দয়া। বতকর্ণ সংস্কার সে দয়ার অন্তর্গত। ততক্ষণই সে কাজ দেয়, যে মুহূর্তে সমাজ সংস্কারের দেয়ালে ধাক্কা লাগে অমনি তা বিকল হ’য়ে ফিরে আসে। কিন্তু বিভাগের দয়া তাঁর প্রবল পৌরুষ দিয়ে তেজে ফেলেছে সমস্ত সংস্কারের দেয়াল। তিনি মেথরের কলেবা রোগীকেও নিজের ঘরের মধ্যে নিয়ে গেছেন। কলেবাও তাঁকে ভয় দেখায় নি, মেথরও নয়। আর ঐ ব্রাহ্মণ—তাকে প্রেম তো ঠেকাতে পারেনি, কিন্তু শুচিবাতিক পেরেছে।

যাক্গে, সে তো হ’ল, কিন্তু ‘রামের স্মৃতিস্তম্ভ’ সমাজ-দ্রোহ কোথায়? সেটাই আমি এবার নতুন আবিষ্কার করেছি। এ বইটা যে এমন বিপ্রাশয়ক, একে যে সমাজ নীতির অল্পরোধে অবিলম্বে বাজেয়াপ্ত করা দরকার এ কথা আমি কেউ যদি জেনেও বা থাকেন, অন্ততঃ আমি তো

জানতাম না। আমার মনে হয় কেউই জানতেন না, কারণ তা হ'লে শরৎচন্দ্র এতদিন তাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতেন না। শরৎচন্দ্রের অনেক বই-ই সমাজহিতৈষীদের হাতে লাহিত হ'য়েছে কিন্তু এই আপাতনিরীহ বইখানির প্রতি কারো দৃষ্টি পড়েছে ব'লে মনে হয় না। কিন্তু আসলে এ বইখানিও ঠিক ততটা নিরীহ নয়। এতেও আছে শরৎচন্দ্রের সমাজবিপ্লবের অগ্নিকণা।

সেটা কী? প্রচলিত সমাজ মতে নারীর ধর্ম পতি-দেবতার কথা মেনে চলা। আর মাতৃভক্তি, পিতৃভক্তি এত সামাজিক অহুশাসন। যখন কোথাও কোন বিরোধ নেই তখন নারী এই সমস্ত অহুশাসন নম্রচিত্তে, ভক্তিতরে মেনে চলে। নারায়ণী স্বামীকে ভক্তি করে না এমন নয়। স্বামী অভূক্ত থাকলে সে খায় না, সে কখনো স্বামীর প্রতিকূলচারিণী নয়। স্বামীর অমঙ্গলের কথা কেউ উচ্চারণ করলেও সে শিউরে ওঠে। তার বোন সুরধুনী যখন রামকে, শ্রামলালের দিবি, যে রামকে খেতে দিলে কথা বললে তিন দিনের মধ্যে নারায়ণীকে তার মড়া মুখ দেখতে হবে, এটা বলতে যায়, তখন এই সব অন্তত কথা উচ্চারণ করতেও সে স্বরোকে বাধা দেয়। এই সব থেকে বোকা যায় নারায়ণীর, স্বামীর প্রতি সঙ্গ-শংকিত ভালোবাসা কতখানি গভীর।

আর নারায়ণীর প্রকৃতিতে মাতৃভক্তিও দৃঢ়মূল। মাকে নিরাশ্রয় জেনে সে তাকে নিজের বাড়ীতে আনিয়ে নিল। তারপরে তার মা যখন রামের সঙ্গে দুর্ব্যবহার শুরু করল তখনও সে চেষ্টা করল রামকেই শাস্ত করতে। রাম যখন বলল, আমি আর ওকে কিছু বলব না—কিন্তু ও কেন আমাকে অমন ক'রে বলে, তখন নারায়ণী যুক্তি দিলেন, 'বললেই বা, মা হয় যে।' এমনি ক'রে বারে বারে তিনি এই যুক্তিহীন যুক্তি দিয়ে রামকে নিরস্ত করতে চেষ্টা করলেন—'চুপ্ কর পাঞ্জি, মা হয় যে।' দিগম্বরী তার মা, এই জন্তেই নারায়ণী তার সমস্ত উপজীব্য নীরবে সহ্য করতে চাইলেন। তাকে সাধারণ ভাবে জ্ঞান অজ্ঞানের মাপকাঠি দিয়ে তিনি মাপবেন না—এই তার মন। এমনি ক'রে নারায়ণী তার নারীপ্রকৃতির উপরে বাইরের সামাজিক অভিভাবকদের উপজীব্য এবং আক্রমণ সহ্য ক'রেই থাকলেন, কিন্তু যখন এই আক্রমণ একেবারে

চরমরূপ নিল, তখন নারীর অন্তরের যে প্রাকৃতিক শক্তি সেও প্রস্তুত হ'ল চরম প্রত্যুত্তর দেবার জন্তে।

বাইরের হুকুম যখন তাকে তার প্রকৃতি থেকে ভ্রষ্ট করবার জন্তে স্পর্ধিত উল্লাসে এগিয়ে গেল, তার নম্রতা, তার বাধ্যতা, তার ভক্তিকে দুর্বলতা মনে করে যখন সে তার ওপরে আরো বেশি উৎপাত করবার জন্তে এগিয়ে এল, তখন সেই দুর্বল নারী, সংসারের বেশে বশীকৃত নারী, ভক্তিমতী কর্তব্যপরায়ণ নারী আপনার প্রকৃতিকে রক্ষা করবার জন্তে এই আক্রমণের বিরুদ্ধে ফিরে দাঁড়াল।

অসহায় শিশুকে ত্যাগ করতে বলা নারী-প্রকৃতির উপরে চরম অত্যাচার। সে আর সমস্ত অত্যাচার সহ্য করতে পারে কিন্তু এখানে তার প্রকৃতি কোন মতেই হার মানতে পারে না।

প্রকৃতিই তাকে দিয়েছে এই মাতৃপদ। সে যে এই সৃষ্টির মাতৃরূপিণী। এখানে প্রকৃতি আপন প্রবল শক্তিতে নারীকে দেয় তার সমর্থন। নারী প্রকৃতির বলে বলীয়ান হ'য়ে সমস্ত আক্রমণকে প্রতিহত করবার শক্তি লাভ করে। এমনটি যে হ'তেই হবে, তা না হ'লে প্রকৃতির উদ্দেশ্য যে ব্যর্থ হবে। নারীর মাতৃস্নেহ না হ'লে প্রকৃতি তার এই বিপুল প্রাণীমগ্নকে বাঁচাবে কেমন ক'রে? তাই সে এই নারীকে কোন প্রতিকূল শক্তির কাছেই হার মানতে দেবে না—এই তার পণ।

প্রতিকূল সমাজশক্তির উর্ধ্বে নারীর এই প্রাকৃতিক শক্তির জয় ঘোষণা করবার জন্তেই শরৎচন্দ্রের এই বই লেখা।

অজ্ঞাত অনেক বাঙালী বড় লেখকদের মতোই শরৎচন্দ্রের লেখারও প্রধান উপলব্ধি নারী। নারীর শক্তিকে শরৎচন্দ্র সমস্ত অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছেন এবং তার বেশির ভাগ রচনা সেই উপলব্ধিরই প্রকাশ।

নারী তার আপাতনম্র বিনীত দুর্বল প্রকৃতির অন্তরালে গোপন ক'রে রেখেছে প্রকৃতির হাতের দেওয়া আশুন। তাকে জালিয়ে তুললে তার তাপে বাইরের বাধাকে পুড়ে ছাই হ'তেই হবে।

দিগম্বরী যখন বললেন—“যে দিবি দিয়েছে তার হুকুমটাও তো নিতে হবে,” তখন নারায়ণী বললেন, “কুসি কী ক'রে জানবে মা, আমি কার কাছে কখন হুকুম নিয়েছি।

মা, বার মুখ আছে সেই দ্বিবি দিতে পারে, কিন্তু বাকে বকে ক'রে এতটুকু এতবড় ক'রে তুলতে হয় সেই জানে হুম কোথা দিয়ে কেমন ক'রে আসে।”

নারায়ণী হুম পেয়েছে কার কাছে? সে তার অন্তর-প্রকৃতি, তার চরম নারীসত্তাব, তার কাছে, অল্প সময় হুমেব বাড়া হুম।

গল্পটাকে যদি আরও একটু টেনে নেওয়া যায় তো কী হয়? শ্রেষ্ঠ লেখক অনাবশ্যক একটা কথাও বলেন না। এর যদি সিনেমা হয় তো—হয়ত’ সিনেমা প্রযোজক দেখাতেও পারেন যে এর পরে নারায়ণীও শ্রামলালের মধ্যে একটি কথোপকথন চ’লছে। কিন্তু এখানে সে ভয় নেই, কারণ এটা তো প্রচলিত অর্থে প্রেমের পল্ল নয়। প্রেমের গল্পে অসাধারণ লেখক যেখানে থাকেন, সাধারণ অভিনয় বা সিনেমা প্রযোজক বেশির ভাগ সেখানে থাকতে পারেন না। এটা শরৎচন্দ্রের অনেক বইয়ের সিনেমা এবং মঞ্চ অভিনয়ে আমি দেখেছি।

তবু ধাম্লে কি হবে, শ্রেষ্ঠ লেখকের লেখা ছাপাখানার সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই সমাপ্ত হয় না। তার ধ্বনি, তার ব্যঙ্গনা অহুরণিত হ’তে থাকে, আরো অনেক দূর কালকে ব্যাপ্ত ক’রে। ‘রামের স্বমতি’ গল্পে এর পরে কী হ’ল সেটা লেখক না বললেও তার ইঙ্গিত আসছে আমাদের কানে। সে ইঙ্গিত এই,—শ্রামলাল যদিও শান্তির প্রতি করুণাবশে, তার প্ররোচনায় প্ররোচিত হ’য়ে এবং সেখানে নিজের স্বার্থ-বুদ্ধির অহুকুলে প্রেরণা পেয়ে নারায়ণীর মাতৃ-স্নেহের পথরোধ করতে উত্তত হ’য়েছিলেন, তবু পরিণামে তিনি তাঁর জীবন মধ্যে নারী-প্রকৃতির এই স্বন্দর বিকাশকে প্রকাশ্য চোখে দেখবেন তাতে সন্দেহ থাকে না।

স্বার্থবুদ্ধি মাগুনের সহজাত প্রকৃতি। রাম শ্রামলালের বৈমাত্র ভাই, তাকে নিয়ে থাকলে অনেক বিপদ, সে বাইরের ক্ষমতাপালী লোকদের পর্বত খাতির ক’রে চলে না। এমন লোককে ঘরে রাখা বিপদ—এটা হ’ল শ্রামলালের স্বার্থেরই প্ররোচনা। তার সঙ্গে এসে যোগ দিল নিরাস্রয় আশ্রিতা-নারীর অহুনয়। সেখানে কুটিল নারী-প্রকৃতির ছলনা, তার পুরুষের বুদ্ধি বৃদ্ধিতে পারেনি। তাই তার দয়া সে আকর্ষণ ক’রেছে। এমনি ক’রেই এই দয়া তার স্বার্থ-বুদ্ধি যোগ দিয়েই তাকে প্ররোচনা দিয়েছে

নারায়ণীকে দ্বিবি দিয়ে তার প্রকৃতির প্রতিকূলে তাকে দিয়ে জোর ক’রে কাজ করিয়ে নিতে। কিন্তু যখন সে জোর খাটল না তখন সে কি রাগ করবে, মনে করবে অপমানিত হচ্ছে তার পৌরুষ? না, তা সে করবে না, আপনাব স্বরের জীব মধ্যে বিশ্বপ্রকৃতির মানস-শতদল-বাসিনী সত্যিকারের নারীকে পেয়ে সে ধস্ত হবে।

নারায়ণী যদি রামকে ত্যাগ করত, তা হ’লে সে নারী-প্রকৃতির প্রতিকূলচারিণী রাক্ষসীর হাতে শ্রামলালের নিঃস্বয়ও রক্ষা ছিল না, এটা সে নিশ্চয় বুঝে থাকবে।

‘রামের স্বমতি’কে নাটক ক’রে রচনা ক’রে তার অভিনয়ের অহুমতির সঙ্গে সরকারী দপ্তরে তার সারস্বর্ষ পাঠাতে হ’ল, তাতে লিখে দিয়েছি—

“এই গল্পে আছে সমাজ-সম্মত অহুশাসনের সংগে নারী-প্রকৃতির সংঘর্ষ, তার আপাত-পরাজয় এবং তার চরম জয়ের কথা।”

নারীর কাছে যা তার নিজস্ব প্রকৃতি সে তো কোন মতেই অধর্ম হ’তে পারে না, চাই সে সামাজিক অহু-শাসনের সংকে মিলুক আর নাই মিলুক। এই একই বিচার নিয়ে শরৎচন্দ্র পতিতা নারীর মধ্যেও নারীর সত্য-রূপকে দেখেছেন।

নারী গৃহত্যাগ করে কেন? সে তা করে তার স্বন্দর-বেগের প্রবলতায়, তার ভালোবাসার নিবিড় আকর্ষণে। ভালোবাসাকে নারী প্রতিহত করতে পারে না, তার হাতে তাকে অসহায় হয়ে আত্ম-সমর্পণ করতে হয়। তার পরে তার জীবনে দুর্গতি আসে সেই-দিন, যেদিন পুরুষ তার লালসা মিটিয়ে নিয়ে নারীকে পথের মধ্যে ত্যাগ করে চলে যায়।

তখন আসে নারী প্রকৃতিতে বিকৃতি। কিন্তু আবার যেদিন কোন পুরুষ তাকে সত্যি ক’রে লালসা-নিমুক্ত বল নিয়ে ভালোবাসে সেই মুহূর্তে সে আবার আপনাব সত্য-প্রকৃতিতে পুনঃ প্রতিষ্ঠা লাভ করে—এই কথাটাই শরৎচন্দ্র বলেছেন তাঁর সমস্ত পতিতা স্ত্রীদ্বীপে।

আমাদের কলেজে সিলভার-জুবিলী উপলক্ষে তিন দিনের অভিনয় আমরা করেছি হিন্দী অহুবাদে ‘রামের স্বমতি’, নৃত্যনাট্য চিত্রাংগনা, আর সেক্সপীরের টুয়েলফ্‌ নাইটের বাংলা অহুবাদ থেকে হিন্দী অহুবাদ অভিনয়।

শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ এবং দেক্সট্রার অভিনয় করতে গেলেন।
কার জিত হবে, কোনটা সব চেয়ে লোককে বেশী আকৃষ্ট
করবে, এ নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি। রিহাসার্সালের সময়
দেখেছি ‘রামের স্মৃতি’ দেখবার জন্তে আমাদের ছাত্রীরা
তত জিৎ করেনি, বস করেচে চিত্রাংগদা এবং টুয়েলভ্
নাইট দেখবার জন্তে। এমন কি যারা রামের স্মৃতিতে
পার্ট নিয়েছে তারাও ফাঁক পেলেই গেছে চিত্রাংগদা ও
টুয়েলভ্ নাইটের রিহাসার্সাল দেখতে। তাদের ডাক্তে
ডাক্তে প্রায় আমাদের হররাণ হতে হয়েছে। এমন কি
আমার নিজেরও রামের স্মৃতির চেয়ে চিত্রাংগদা ও
টুয়েলভ্ নাইটের রিহাসার্সাল দেখতে বেশী ভাল লেগেছে।
অবশ্য তার কারণ এও বটে যে ও-দুটো আমার আগেকার
ষ্ট্রাক্সী করাছিল। তাই বিতীয়বার অভিনয়ের জন্তে আমাকে
আর খাটতে হয়নি। কিন্তু ‘রামের স্মৃতির’ জন্তে নতুন
ক’রে সব কিছু তৈরী করতে হচ্ছিল বলে সেটা বেশী কষ্ট-
কর লাগছিল।

কিন্তু যেদিন অভিনয় হ’ল সেদিন দেখলাম দর্শকের
জিৎ এবং দর্শকের মনোযোগ রামের স্মৃতিতে কম ছিল
না। তা ছাড়া অল্প অভিনয়গুলো ছিল বিনা পয়সার
নিয়ন্ত্রণ, আর রামের স্মৃতিতে ছিল টিকেট। অভিনয়ের
দিন গেছেন এবং পাশে থেকে দর্শকদের যে কথোপকথন
উল্লেখ্য তাতে মনে সন্দেহ থাকল না যে এ অভিনয় সবার
প্র ভাল লেগেছে। পরিচিতিদের সংগে যখন পূজা
সম্বন্ধে দেখা হ’ল তাঁরা আমাকে বললেন—“অভিনয়
ক্ষেত্রে বড় আনন্দ পেলুম”। তাঁরা বেশির ভাগ অল্প-
শিক্ষিত। আমাকে যিনি রান্না ক’রে খাওয়ান, আমার
সেই মাসী বললেন, “হেলেটির অল্প বড় মন খারাপ হ’য়ে
গেল, আচ্ছা ওর মা বাপ কেউ নেই।” তিনি দ্বিগুণর
প্রপরে ভারী চ’টে গেছেন, যেন সত্যিই সে কোথাও
আছে।

কিন্তু এই আমাদের ঘরের মাতৃস্বপ্নী নারায়ণীদের
মতামতের কথা ছেড়ে দিলেও যারা আমাদের সার্বজনীন
পূজার অঙ্গবরসী কর্তার হল, তারাও এসে আমাকে বলল,
অভিনয় অপূর্ণ হ’য়েছে, এমন কি আপনাদের নৃত্যনাট্যের
চেহেরাও এ অভিনয় আমাদের বেশি ভাল লেগেছে।

কিন্তু সংসারে কঠিনতা তো আছেই। হু এক জায়গা

থেকে বিদ্রূপ মন্তব্যও যে শুনিমিত্ত নয়। কিন্তু তারা
সংখ্যায় অনেক কম, আমার জ্ঞানীয় মাত্র দুজন। তার
মধ্যে একজন হ’লেন আমারই এক বান্ধবী। তিনি
বললেন, “আমার তো ‘ভাল’ লাগছিল না, খানিকক্ষণ
দেখার পরে আমি তো এসে গ্রীপকমে ব’সে রইলাম।”

উনি আমাকে ভাবিয়ে তুললেন, এ কী ক’রে সম্ভব
হ’ল। আমার নিজের কথা যদি ভাবি তো দেখলাম
আমার তো ‘রামের স্মৃতি’ সংচেয়ে বেশী ভাল লেগেছে।
সে নিজের তৈরী ব’লে নয়। অন্তগুলোও তো আমারই
তৈরী। আমি ঠিক অল্পশিক্ষিত লোকও নয় যে অন্ত-
গুলো বুঝিনি ব’লেই আর শরৎচন্দ্রের ঘরোয়া কাহিনীটাই
বুঝেছি ব’লে, ভাল লেগেছে। তাবতে ভাবতে মনে
হ’ল, যে মাহুকের মন বাৎসল্য রসে বঞ্চিত, সে এ বইয়ের
রস উপলব্ধি করতে পারবে না।

রামের স্মৃতির রস বাৎসল্য রস ছাড়া আর কিছু নয়।
তাই আমি এ অভিনয়ের সমাপ্তিতে যে গানটি লিখেছিলাম
সে হ’ল :—

হাদে গো নন্দরাগী

ঐ ননীচোরা তোমার কাছ

খেয়েছে মোর ঘরের ননী।

ওরে ধরতে গেলে যার পালিয়ে

ওরে যারতে গেলে দেয় কাঁদিয়ে

ও যে মন চোরের শিরোমণি।

আর একজন পরিচিতি রিপোর্ট দিলেন যে দিল্লী শহর
থেকে কয়েকজন লোক এসেছিলেন আমাদের অভিনয়
দেখবার জন্তে। তারা নাকি রামের স্মৃতির মাঝখানে
উঠে চ’লে গেলেন এবং ব’লে গেলেন যে এ বই বড় নীরস!
আমরা তো শিশুভূষণ কলেজের নৃত্যনাট্যের নাম শুনেই
দেখতে এসেছিলাম।

আবার ভাবতে বসলাম। দিল্লী শহরে বুদ্ধি বাৎসল্য
পঞ্জীরসের ধারাটুকু আর বয়না। সে ধারাটি বুদ্ধি রাজ-
ধানীর, রাজপদের পাখরতলার চাপা পড়ে গেছে। যারা
পরমার্থবাদ আর পদোন্নতি নিয়ে মস্ত তারা শরৎচন্দ্রের
লেখায় এবং তার স্বঅভিনয়েও রস খুঁজে পায় না। আর
সত্যি কথা বলতে কি যারা রামের স্মৃতিতে রসের সন্ধান
পায় নি তারা চিত্রাংগদার রসের কাছে গিয়ে পৌছতে

পারিও তাও সত্যি নয়। তবে চিত্রাঙ্গদার পোষাকের বল্লরলানি আর নাচের মত্ততা তাদের কোন এক রকমের একটা মত্ততার আবেদন এনে দিত বৃষ্টি এই রকম দর্শকরা মনের গভীরতর স্তরে যে রসলোক আছে সে পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না, এরা শুধু চোখ দিয়ে দেখে, মন দিয়ে নয়। তাই যেখানে চোখ ভোলানোর আয়োজন কম, সেখানে ওদের নীরস মন রসের পথ খুঁজে পায় না।

রামের স্মৃতির আবেদন মাত্রের শাস্ত সমাহিত মনের কাছে। এব রস মানব মনের আদিমতম প্রেরণা, যে প্রেরণার বলে এই সৃষ্টি রক্ষা পেয়ে এসেছে আদিমতম যুগ থেকে আজ পর্যন্ত। তাই তো রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :—

“মাতৃস্নেহ সব চেয়ে পবিত্র প্রাচীন

• একেলা জাগিয়ে বসেছিল

তরুণ বিশ্বের কোলে লয়ে।”

যে মা আদিম সৃষ্টিকে কোলে ক’রে বসেছিল সেই মা আজও তেমনি বসে আছে। তার কথা বাদে ভালো পাগে না, তাকে বাদে নীরস বসে মনে হয় তারা মানব মনের আদিমতম রসতীর্থ থেকে অনেক দূরে সরে এসেছে। কিন্তু সৌভাগ্যের কথা এই যে বেশীর ভাগ লোক এরকম নয়। তাই বহুর সম্মতিতে জয় হয়েছে অপরাধের কথা-শিল্পী শরৎচন্দ্রের।

সম্প্রতি শিশু স্নেহের একটি উৎসপথ খুলে গেছে আমারও জীবনে, বৃষ্টি নেই জন্তেই আমি বেছে নিয়ে ছিলাম এই বই। আমার সেই স্নেহাশ্রদ্ধা ৪৫ বছরের ডুই মেরেটি ক’রেছে শিশু রামের পাট। ওব পাট এত চমৎকার হ’য়েছে যে ওর জীবনের এই প্রথম অভিনয়ে ও স্থানীয় অন্ত এক অভিনয় ডাইরেক্টরের কাছ থেকে পুরস্কার পেয়েছে একটি ছোট কাপ, ঠিক ওরই মাপে তৈরি।

আর আমার যে ভয় ছিল আমার কল্লেকের মেয়ে ১৫ বছরের ‘লিলি’কে নিয়ে যে—সেও বৃষ্টি পল্লীঘরের লক্ষী ৬ বছরের নারায়ণীর মনোভাবটিকে আয়ত্ত ক’রে তাকে

ছুটিয়ে তুলতে পারবে না। অভিনয়ের দিনে আমার সে আশংকাও মিছে প্রমাণ হ’ল। ও আমাকে সেদিন কাঁদিয়েছিল এবং আমার মত অন্ত অনেককেও।

ভগবানেব অনেক দয়া যে শরৎচন্দ্রের লেখা পড়ি এবং তার অভিনয় দেখে আমার চোখে আজও জল আসে। এই অভিনয়ের পালা এবার এই নান্দী-বাক্য উচ্চারণ ক’রে শেষ করি—

“সব ভকতে তব আন এ পরিষদে

বিমুখ চিত্ত যত হ’ক নত তব পদে।”

রসরাজ অরসিক বিমুখ চিত্তে রসের সকার করুন।

রসের মধ্যে প্রণয় রসের আবেদন সব চেয়ে বেশী এবং সবচেয়ে সহজ। এই জন্তেই সংস্কৃত আলংকারিকরা ওকে রসের তালিকায় প্রথম জায়গা দিয়ে ওর নাম দিয়েছেন আদিরস।

কিন্তু শরৎচন্দ্রের লেখার বাংলায়রসও কম সার্থক হ’য়ে ওঠেনি। বাংলায়রস বিশেষ ক’রে বাংলার আপন রস। এই জন্তেই বাংলার নিমাই এমন সর্বজনপ্রিয়। নিমাই কোন ধর্মতত্ত্ব প্রচার করেছেন বাংলায় মনের কাছে সে আবেদন বড় নয়। নিমাইর মা যে কেমন ক’রে বাধা পেয়ে কাঁদেছেন, সেই গান বাংলায়র বাঙালীর আঙ্গিনায় বৈষ্ণবীর গানে আর তার যাত্রার আসরে নিমাই সন্ন্যাস পালার, তাকে চিরদিন ধরে অভিজ্ঞত ক’বে তাকে কাঁদিয়েছে। কিন্তু এই বাংলায় প্রকৃতি কি বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর্গত নয়? এখানে কি বিশ্বের অন্ত মাত্রের সংগে বাংলায়র কোন বিশেষ বা কোন অমিল সত্যিই আছে? যদি বা থাকে তো থাক না। শরৎচন্দ্র যদি বিশ্ব কবি নাও হন তবু তিনি আমাদের আপন কবি।

কিন্তু মনে জানি যিনি বাংলায়র আপন তিনি বিশ্বেরও আপন। বাংলায়র নিশ্চয় সৃষ্টিছাড়া জীবন নয়। সমগ্র সৃষ্টির সংগে তার মিল নিশ্চয়ই আছে।





আদর্শ

শ্রীজ্ঞান

‘আদর্শ’।—এই কথাটার অর্থ তোমাদের দাঁকরই খজানা নয়। কিন্তু, হুঃখের বিষয় কথাটির মূলগত অর্থ জানা থাকলেও সাধারণতঃ দেখা যায় সেই অর্থ অনুযায়ী কাজ খুব কম লোকেই আজ্ঞাকাণ করে থাকেন। একটা আদর্শকে অনুসরণ করে চলা উচিত প্রত্যেক মানুষেরই। প্রত্যেক মানুষের মনের গঠন অনুযায়ী, শিক্ষা অনুযায়ী, পরিবেশ অনুযায়ী তার ‘আদর্শ’ গড়ে ওঠে এবং সেই আদর্শকেই সে কণ দিতে চায় তার জীবনে। তবে সব মানুষেরই যে একটা আদর্শ থাকে, আব সেই আদর্শকেই সে অনুসরণ করে চলে, তা অবশ্য নয়। অনেক লোক আছে যাদের জীবনের কোনও আদর্শই নেই। তারা শুধু গতানুগতিক ভাবে কাজ করে যায়, কিংবা হয়ত কিছুই করে না বা অকাজে সময় নষ্ট করে—কোনও আদর্শেরই তারা ধারণা ধারে না। এটা কিন্তু মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। প্রত্যেক মানুষেরই জীবনে একটা আদর্শ থাকা উচিত—বিশেষ করে তোমাদের মতন কিশোরদের, যারা আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ, তাদের সব সময়ই একটা উচ্চ আদর্শকে অনুসরণ করে চলা উচিত। তা নইলে আদর্শহীন হয়ে জীবনটাকে গড়ে তুলতে পারবে না কোনও হুনির্দিষ্ট পথে লক্ষ্যহীন ভাবে শুধু ভেসে বেড়াবে।

আদর্শ অবশ্য একরকমেরই হয় না—তার বহুমুখ্যতা আছে। আর, কার জীবনের কি আদর্শ হবে সেটা নির্ভর

করে ব্যক্তিবিশেষের প্রতি অনুযায়ী। তোমাদের মনে কেউ হয়ত চাপ বড় পাণ্ডিত্য বা জ্ঞান হব জ্ঞান বিস্তরণ করতে, কেউ হয়ত বৈজ্ঞানিক চর্য বৈজ্ঞানের সাধনায় জীবন উসর্গ করতে চাপ লেখক হবার ইচ্ছা হয়ত অনেকে মনে পোষণ কর শিল্পের সাধনায় অনেকে হয়ত মগ্ন থাকতে চাপ, কেউ হয়ত বড় বাগদার হবার চর্য প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে, কাঙ্গাল মনে হয়ত সরকারী অফিসের বড় কামরদ হবার ইচ্ছা থাকে আবার কেউ বা হয়ত চাপ দেশের নানা দূর দেশের সেবা করতে। সৈনিক হবার, বৈমানিক হবার, কৃষাটিক হবার, বড় খেলোয়াড় হবার, এমনকি আত্মনিতা হবার স্বপ্নও হয়ত তোমরা অনেকের মধ্যে থাক। কিন্তু যে ইচ্ছাই তোমাদের মনে থাক, তাকে আদর্শরূপে নিতে হলে অর্থাৎ সেই অনুযায়ী জীবনকে গড়ে তুলতে হলে—প্ৰথম নিষ্ঠা ভরে, হৃদয় ভালো, দ্বিধা গণ্ডা অগম্য হতে হবে সেই আদর্শের কণায়ণ। আদর্শটা হলে চলবে না, বা খামখেয়ালী করে জ্ঞান আদর্শের আলো পরিবর্তন করাও যুক্তিযুক্ত নয়।

আদর্শ ঠিক করবার আগে তখন করে ভেবে দেখবে তোমার জীবনে তা সন্ধান করে তোলা সম্ভব হবে কি না। আকাশ-কুস্তম গড়ে তুলে দিবা স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে কাল কাটান বা নিজের পক্ষে যা করা সম্ভব



আদর্শ

শ্রীজ্ঞান

'আদর্শ'—এই কথাটির অর্থ তোমাদের কাছেরই অজানা নয়। কিন্তু, ছুঃখের বিষয় কথাটির মূলগত অর্থ জানা থাকলেও সাধারণতঃ দেখা যায় সেই অর্থ অনুযায়ী কাজ খুব কম লোকেই আজকাল করে থাকেন। একটা আদর্শকে অনুসরণ করে চলা উচিত প্রত্যেক মানুষেরই। প্রত্যেক মানুষের মনের গঠন অনুযায়ী, শিক্ষা অনুযায়ী, পরিবেশ অনুযায়ী তার 'আদর্শ' গড়ে ওঠে এবং সেই আদর্শকেই মেরুপ দ্বিতে চায় তার জীবনে। তবে সব মানুষেরই যে একটা আদর্শ থাকে, আর সেই আদর্শকেই সে অনুসরণ করে চলে, তা অবশ্য নয়। অনেক লোক আছে যাদের জীবনের কোনও আদর্শই নেই। তারা শুধু গতাত্তরিক ভাবে কাজ করে যায়, কিংবা হয়ত কিছুই করে না বা অকাজে সময় নষ্ট করে—কোনও আদর্শেরই তারা ধারণা ধারে না। এটা কিন্তু মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। প্রত্যেক মানুষেরই জীবনে একটা আদর্শ থাকা উচিত—বিশেষ করে তোমাদের মতন কিশোরদের, যারা আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ, তাদের সব সময়ই একটা উচ্চ আদর্শকে অনুসরণ করে চলা উচিত। তা নইলে আদর্শচ্যুত হয়ে জীবনটাকে গড়ে তুলতে পারবে না কোনও হুনির্দিষ্ট পথে—লক্ষ্যহীন ভাবে শুধু ভেসে বেড়াবে।

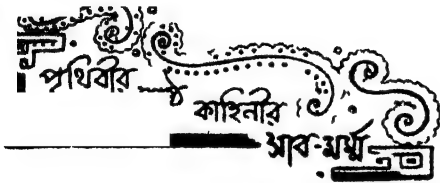
আদর্শ অবশ্য একরকমেরই হয় না—তার রকমকের যাচ্ছে। আর, কার জীবনের কি আদর্শ হবে সেটা নির্ভর

করে ব্যক্তিবিশেষের কক্ষি অনুযায়ী। তোমাদের মতো কেউ হয়ত চাও বড় পাখত বা জানা হয়ে কান বিতরণ করতে, কেউ হয়ত বৈজ্ঞানিক হয়ে বিজ্ঞানের সাহায্যে জীবন উন্নয়ন করতে চান। লেবক হবার ইচ্ছা হয়ত অনেকে মনে পোব কর, শিল্পের সাহায্যেও অনেকে হয়ত মগ্ন থাকতে চান, কেউ হয়ত বড় বাগসাদার হয়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে চান। কিন্তু মনে হয়ত সরকারী মক্কাসব বড় কামকর্মে তার হচ্কা আছে আবার কেউ বা হয়ত চান দেশের কোনও দেশের সেবা করতে। মৈনিক হবার, বৈমানিক হবার, ভূপাটিক হবার, বড় খেলোয়াড় হবার, এমনকি অগ্নিনিভা হবার স্বপ্নও হয়ত তোমরা অনেকেই দেখে থাক। কিন্তু যে ইচ্ছাই তোমাদের মনে থাক, তাকে আদর্শরূপে নিতে হলে অর্থাৎ সেই অনুযায়ী জীবনকে গড়ে তুলতে হলে—পরম নিষ্ঠা ভরে, সৃষ্টি ভাবে, তির লক্ষ্যে অগম্য হতে হবে সেই আদর্শের কদায়ণে। আদর্শহীন হলে চলবে না, বা পামথেষালী করে জীবনদর্শের অবস্থা পরিবর্তন করাও মুকিয়ুক্ত নয়।

আদর্শ ঠিক করবার আগে ভাল করে ভেবে দেখবে তোমার জীবনে তা মকন করে তোলা সম্ভব হবে কি না। আকাশ-বৃষ্টি গড়ে তুলে দিবা স্প্রের মধ্যে দিয়ে কাল কাটান বা নিজের পক্ষে যা করা অসম্ভব

এমন কোনও পরিকল্পনাকে আঁকড়ে পড়ে থাকা অসম্ভবই শুধু নয়, নিজের প্রতি অবিচার করাও। এরকম কোনও অসম্ভব বা অসম্ভব আদর্শকে অসম্ভব কবোঁতে গেলে অসাধারণ আসবেই, আর সেই আশাও অনিশ্চিত মনস্তাপ হয়ত 'তোমার ভবিষ্যৎ জীবনে বিপর্যয়ের দৃষ্টি করতে পারে। 'তাই কোনও আদর্শ নির্ধারণ কববার সময় বা অসম্ভব কববার সময় স্থির মস্তিষ্কে ভেবে দেখবে তোমাদের কচি, পরিবেশ, শিক্ষা প্রভৃতি সম্ভাব্যী সেটা হচ্ছে কি না। আদর্শ যদি তোমাদের মনের ঠিক উপযোগী হয়, আর তাকে যদি সঠিক ভাবে অসম্ভব কবোঁতে দিতে পার তোমাদের জীবনে তাহলে তোমরাই শুধু সুখী হবে না, আরও পাঁচ জনে তোমাদের দষ্টাফ দেখে এবং অসম্ভব করার জীবনে স্তম্ভিত হতে পারবে।

যদি তোমাদের কারও মনে এই 'আদর্শ' স্থির করা সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ উপস্থিত হয়, তাহলে এস 'কিশোর জগৎ' বিভাগে পত্র লিখে সব জানিও। সাধামত চেষ্টা করব উপদেশ দিয়ে তোমাদের সাহায্য করতে।



আলেকজান্ডার ডায়

বচিত

দী কাউন্ট অফ
মন্টি ক্রিস্টো

সৌম গুপ্ত

(পূর্বপ্রকাশিত পত্র)

(৩)

তাবপর কাউন্টের লক্ষ্য—কার্ণার উপর।

গ্রীস আর তুর্কীর যুদ্ধের সময় কার্ণার গ্রাকরী করতো। উদ্ভেদিতভাবে পাগলের মতো সত্য-কক ত্যাগ করে

গ্রীস পক্ষীয় নেতা আলি তেবেলিনের কাছে। সে যুদ্ধের হান্ধার্য তেবেলিন নিহত হয় তুর্কীদের হাতে...তার মৃত্যুর পর, আলির বিপুল সম্পত্তির মালিক হয়েছে কার্ণার...এ খবরটুকু কাউন্ট ইতিমধ্যেই সংগ্রহ করে-ছিলেন।

কিছুদিন বাদেই ফরাসী রাজ্যের খবরের কাগজে কাউন্ট মার কয়েকটি ছাত্র একটি সংবাদ ছাপিয়ে বার করলো। সংবাদটি হলো—

একটি বিশেষ খবর—এতবাল বা অপ্রকাশিত ছিল, সম্পত্তি সেটি জানা গিয়েছে। অর্থাৎ, আলি তেবেলিনকে তাঁর এক ফরাসী কাম্ভারী বেইমানী করে সঁপে দিয়েছে তুর্কীদের হাতে। চরম এই বিশ্বাসঘাতকতার পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাবে তেবেলিনের সেই ফরাসী অল্পচর বিশাল ক্রাউন-মুদ্রা পেয়েছিল তুর্কীদের কাছ থেকে। নিহত তেবেলিনের সেই ফরাসী-অল্পচরের নাম—কার্ণার। জ্ঞাতে ফরাসী এবং বিদেশী হলেও, কার্ণার নামে এই কাম্ভারীটিকে আলি তেবেলিন একান্ত আন্তরিকভাবেই বিশ্বাস করতেন।

সংবাদ-পত্রে এ খবর ছেপে বেকনোব সঙ্গে সঙ্গেই সাবা ফরাসী-রাজ্যে রীতিমত সাড়া পড়ে গেল এমন কি, রাজ্যের বিধান-পরিষদের 'চেম্বার অফ পিয়াদের' ((chamber of peers) গণমাধ্যম-সম্প্রদায় পঞ্চাঙ্গ বিশেষ বিচলিত হয়ে এ ব্যাপারের তদন্ত শুরু করলেন। তাঁদের তদন্তের উত্তরে কার্ণার জবাববন্দী দিলে—আমি সম্পূর্ণ নিরোষ।

কিন্তু তাই এ তদন্তের নিষ্পত্তি হলো না। নিহত আলি তেবেলিনের ছিল একটি বজ্র-বত চেম্বার কাউন্ট তাকে প্যারিসে এনে হাজির করলেন। তদন্তকালে সে কস্তাকে কাউন্ট বিচার-সভার এজলাসে সাক্ষী-হিসাবে দাঁড় করিয়ে দিলেন। সভাব আসরে কার্ণারকে দেখে তেবেলিনের কণ্ঠা বললে,—তোমার ললাটে আমার পিতার ~~কণ্ঠা~~ রেখা...তুমি খুনী...নিশ্চয়ভাবে খুন করেছো আমায় পিতাকে।

বিচার-সভায় তেবেলিনের কণ্ঠাকে দেখে কার্ণার উদ্ভেদিতভাবে পাগলের মতো সত্য-কক ত্যাগ করে

গেল...তার আর্জি স্বাক্ষর লক্ষ্য করে বিচারে তাকে দোষী সাব্যস্ত করে আদালতরায় দিলেন—বিশালঘাতকতা, দেশদ্রোহিতা এবং হত্যাঅপরাধে সহায়তা করার অপরাধে কার্ণান্দকে শাস্তি পেতে হবে।

আদালতের বিচারে কার্ণান্দ হলো প্যারিস থেকে বহিষ্কৃত।

কার্ণান্দের তরুণ-পুত্র এ্যালবার্ট তার কিছু দূত-ধারণা হলো—পিতার এই দুভাগ-তদন্তের অন্তরালে রয়েছে কাউন্ট অফ্ মন্টি ক্রিস্টোর নিপুণ চক্রান্ত! সে ভাবলো—কেন...কেন...কি কারণে কাউন্ট হঠাৎ তার পিতাকে এমন গুরু-অপরাধেব ফাঁশি জড়িয়ে দোষী সাব্যস্ত করলো?

সূক্ষ্মশীল এ ব্যাপারেব আসল মর্মে অনুসন্ধানের আগ্রহে সেই রাত্রেই তরুণ এ্যালবার্ট কাউন্ট অফ্ মন্টি ক্রিস্টোকে অনুসরণ করে সটান এসে হাজির হলো প্যারিসের মৌখিন-নাট্যশালা 'অপেরা-হাউসের' আসরে। সেখানে অভিনয়-বিয়তির এক ফাকে সে সরাসরি দেখা করলো কাউন্টের সঙ্গে...মোজাহ্জি প্রস্থ কবে বললো,—কেন আপনি আমার পিতাকে এমন কদর্যা-অপমানকর অপরাধে দায়ী করলেন?

কাউন্ট বললে,—বটে! তুমি দেখছি, অনর্থক গায়ে-পড়ে আমার সঙ্গে বিরোধ বাধিয়ে তুলতে চাইছো হে ছোকরা!

দৃঢ়কণ্ঠে এ্যালবার্ট বললো,—আমার প্রপ্নের স্পষ্ট-জবাব জানতে চাইতে এসেছি আপনার কাছে।

এমনি কথাস্থ-কথায় দুজনের তুমুল তর্ক চললো। 'অপেরা-হাউসে' যাবার সময় এ্যালবার্টের ক'জন বন্ধুও ছিল তার সঙ্গী...উভয়ের তর্ক বিতর্কের ঝড় কমেই সঙ্গী হয়ে উঠছে দেখে, তারা শশব্যস্ত হয়ে 'মিটমাটের' চেষ্টা করলো...কিন্তু এ্যালবার্ট নাছোড়বান্দা...কারো কথাই তুললো না। উপরন্তু, কোঁকের মাথার কাউন্টকে সে সম্মুখে তার সামনে মুখোমুখি দাড়িয়ে 'ডুয়েল' (Duel) বা 'বন্দ্যুচ্ছে' আহ্বান জানিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে সে রাত্রের মতো 'অপেরা-হাউস' থেকে বিদায় নিলো।

এ্যালবার্টের সঙ্গে এই বাক-বিতর্কের সময়, 'অপেরা-হাউসে' ক্রিস্টোর সঙ্গেই ছিলেন...কারণী-মতচর যাক...

মিলিয়ান। এ্যালবার্ট বাইরে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই ম্যাক্সমিলিয়ান উদ্বিগ্নভাবে কাউন্টকে জিজ্ঞাসা করলো,—এ্যালবার্টের লক্ষ্যে কি আপনি করতে চান?

শান্ত-দৃঢ়কণ্ঠে কাউন্ট জবাব দিলো,—আমি ওর প্রাণ নেবো, ম্যাক্সমিলিয়ান... 'ডুয়েল' (Duel) লড়াই হবে কাল ভোরে ছ'টায়—সেই সময়।

—কিন্তু কাউন্ট...এ ছেলে হলো ওর বাপের প্রাণ-স্বরূপ!..

কাউন্ট গভীরভাবে বললে,—ও ক! আমি তখনতে চাই না!..বাপ ভয়ানক শোক পাবে—এই কথা বলতে চাও!...কিন্তু আমি চাই, ওর বাপ পাক পুরুষোক!..

সেদিন গভীর রাতে কাউন্টের সঙ্গে দেখা করতে এলেন আপাদমস্তক-বগ্নাতা এক মহিলা।

তাকে দেখে কৌতূহলভরে কাউন্ট জিজ্ঞাসিলে, আপনি কে, মাদাম?..

মুখের আবরণ সরিয়ে মহিলা অন্তরঙ্গ করে বললেন,—আমার ছেলের তুমি প্রাণবৎ কবো না, এড্‌মণ্ড!..

মহিলার কথা শুনেই কাউন্ট ক্ষুব্ধিত করলো...বললে,—কার নাম কবছেন?

আবেগ-ভরা কণ্ঠ মহিলা বললেন;—তোমার...তোমার নাম!..এতদিন কেটে গেছে 'আমর' স্বপ্ন ও নাম তুলিনি, এড্‌মণ্ড! চিনতে পারছো না? আমি মার্সেডিজ...তোমার কাছে এসেছি।

মুহূর্তের জন্য মহিলার মুখের পানে ত্র্যকিয়ে নিখাম ফেলে কাউন্ট বললে,—কিন্তু মার্সেডিজ তো বেঁচে নেই, মাদাম!..এতদিন আগেই মারা গেছে।

—না!..মার্সেডিজ মরেনি...এখনো বেঁচে আছে!..

তোমাকে দেখানায় সে তোমাকে চিনতে পেরেছে। কিন্তু কেন...কেন কার্ণান্দের উপর তোমায় এত আকোশ?..তুমি যখন সরকারী-পারদে বন্দী তখন তাকে বিবাহ করার জন্য অপরাধ যদি কেড করে থাকে তো সে আমি মার্সেডিজ!..

—কিন্তু জানো, মাদাম!...এ কার্ণান্দ আমার কারাবাসের মলে।

—তার মানে?..মার্সেডিজ শিউরে উঠে প্রশ্ন করলো!

কাউন্ট তখন মাগে ডিজ্জকে বললে—তার কারাদণ্ডের
মূলে কার্ণালের চক্রান্তের কাহিনী...জ্যাক্‌লাসের সঙ্গে
মিলে তার শয়তানী কীষ্টি-কলাপের ইতিহাস।

[ক্রমশঃ

বিন্টু বাবুর বিচার

রমেশ মজুমদার

রাতদিন কাদে বিন্টু। সংসারে তার মা ছাড়া আর কেউ
ছিল না। সারাবিশ্বে ঐ টুকুই সখল মাত্র। বাবা মরে
গেছে এখন বিন্টুর বয়স তিন বছর। সেদিন কিছু
বোঝেনি শোক কি। মাকে কাদতে দেখে সেদিন চোখ
ঘষে একটু কাদতে চেষ্টা করেছিল।

আজ সব কিছু বুঝতে শিখেছে। তাই মায়ের
মৃত্যুতে বেঁচে পড়েছে। মা তাকে কতকি এনে খাইয়েছে।
নিজে না খেয়ে বিন্টুকে খাইয়েছে। কত আদর-যত্ন
করেছে। তাই মায়ের জন্ত এত বাখা, এত অশ্রু
বিসর্জন।

পূজার সময় নিজের কাপড় কিনতে পাবেনি, কিছু
বিন্টুকে পাণ্ট-জামা-জুতো পরিচ্ছে। যে বাড়ীতে কাজ
করতো তার মা, সেই বাড়ী থেকে চেয়ে এনেছে অগ্রিম
টাকা। কাজ করে পরে শোধ করবে বলেছে।

বাতে খেয়ে দেয়ে মায়ের বুকে মাখা গুঁজে ঘুমিয়েছে
বিন্টু। সে খাশ্রয় আর সাহনা আজ নেই। আজ সে
অসহায়, সন্মহার।

শেষরাতে মা মরে গেল। তখনও বিন্টু তার পাশে
ঘুমিয়ে ছিল। বুঝতে পারেনি প্রথমে। পরে ডাকাডাকি
করেছে ‘মা মা’ বলে। জবাব পায়নি। আজ দু’দিন
হলো জর হয়েছিল। মাঝে-মাঝে অজ্ঞান হয়ে পড়তো।
বিন্টু ভাবলে, এবারও হয়তো তাই হয়েছে। তাই
খানিকটা জল নিয়ে মাথায় ঢেলেছিল। দিয়েছিল চোখে-
মুখে।

তারপর পাখা নিয়ে বাতাস করেছিল কচি হাত দুখানা
দিয়ে। আর মাঝে মাঝে ডেকেছে ‘মা-মা’ বলে। মা তেমনি
নিঃসাড় হয়ে রইলো। আট বছরের বিন্টু এখন মায়ের
গায়ে ধাক্কা দিয়ে ডাকলে। মাড়া পেলোনা। তখন
একটা আশঙ্কায় কঁদে ফেললে মাকে জড়িয়ে ধরে। কি
হয়েছে মায়ের?

ওর মাকে চিকিৎসা করবার জন্ত কোন ডাক্তার

আসেনি। পরসার অটো ডাক্তার আনতে পারেনি।
কোথায় পাবে ডাক্তারের ‘কী’ আর অস্থির দাম? খুঁজে
চাঁর আনি পরসার মাত্র সখল, আর আংলের চাল। হুঁটো
টিনের থালা।

দুঃখীদের ঘরে এর বেশী আর কি থাকতে পারে?
কোথায় পাবে তারা এর বেশী?

তাই ওর মা আজ দু’দিন বিন্টুকে দিয়ে আনিয়ে
নিয়েছে শেফালী গাছের পাতা, ক্ষেত পাপড়ী। পাচন
করে খেয়েছে। ফল হয়নি। জর বেড়েছে বৈ
কমেনি। অস্থির অবস্থাতেই বিন্টুকে শাক-অন্ন রেখে
দিয়েছে।

সকাল বেলা চারদিক গোদে ঝলঝল করে উঠলো।
বিন্টুর রোজকার মত ফুল কুড়ানোর সময় হলো, সময়
হলো শাবলা-দীঘির পাড়ে গিয়ে লগা দিয়ে ফুল ছিঁড়ে
আনবার। কিম্বা বকুলতলায় ঘাবার।

মায়ের ঐ অবস্থা দেখে আজ যাওয়া হলো না। দূরের
ঐ বাড়ী থেকে এলো এক বৃদ্ধা। দেখতে এলো বিন্টুর
শাকে। কেমন আছে আজ?

ডাকাডাকি করলো প্রথমে। মাড়া পেলোনা। পরে
গায়ে হাত দিয়ে দেখতে পেলো গা ঠাণ্ডা। চোখ দুটো
মলে আছে।

এবার বৃদ্ধাও কঁদে ফেললো। সরলা মরে গেছে রে!
ওগো, তোমরা কে কোথায় আছ, এগিয়ে, এসো। মৃতদাহ
করে এসো।

সহসা বিন্টু যেন আকাশ থেকে পড়লো—মাটিতে ‘মা-
মা’ বলে কঁদে গড়াগড়ি দিল। আকাশ বাতাস সে
কান্নায় ভরে উঠলো। দূর থেকে চেয়ে দেখলো কয়েকটি
লোক। সাহুনা দিতে কাছে গেল না।

বেলা বারোটা নাগাৎ কয়েকটা লোক এসে নিঃশব্দে
মড়া নিয়ে গেল। বিন্টু তখন কঁদে-কঁদে ঘুমিয়ে পড়েছে
মাটিতে।

বিকেল বেলা ঘুম ভাঙলো। চেয়ে দেখলো মা নেই।
এবার বুক ভেঙে গেল। কান্নার দাপটে ভেঙে পড়লো
বিন্টু। কউ সাহুনা দিতে কাছে গেল না—পাড়ার
বিনোদিনী বোষ্টুমী ছাড়া।

বোষ্টুমী কাছে গিয়ে অনেক বুঝিয়ে বললে। অনেক
সাহুনা দিলে। বললে, আজ থেকে আমার ‘মা’ বলে
ডাকবি। যা চাইবার আমার কাছে চাইবি। আমার
কাছে থাকবি, খাবি, লেখাপড়া শিখবি।

রাজী হলো না বিন্টু। এ বাড়ী ছেড়ে সে যাবে না,
কান্না কাছে না।

কোন কথাই যখন শুনলো না সে, তখন বোষ্টুমী
হঠাৎ করে চলে গেল। ছেলেটার কথা ভেবে বুক-পোড়া
একটা নিঃশ্বাস বেরিয়ে গেলো। তাবলো, সন্ধ্যার পর এসে

দেখা যায় কি বলে বিল্টু। তখন অন্ধকারে এই কোণ-
বাড়ের ভেতর ভারি ভয় করবেই।

ক্রমে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। চারিদিক থেকে ডেকে
উঠলো ঝিঁঝি পোকা। জোনাকীরা চারিদিকে পিট-
পিট করে আলো জালিয়ে ছুটাছুটি করলো। গাছের
মাথা থেকে ডেকে উঠলো পেচা।

বিল্টু ক্রমশ ভীত হলো। চারিদিকে চাইলো ভয়ে।
নিজেদের ছোট ঘরখানি ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে
না। ঘরের ভেতরও থাকতে পারে না, বাইরেও না।

নিরুপায় হয়ে কান্দতে কান্দতে অন্ধকারের ভেতর
ছুটেতে আরম্ভ করলো পথের দিকে। পথ বেয়ে ছুটলো
সেনবাবুদের বাড়ীতে। তাঁদের বাইরের রকটাতে গিয়ে
বসলো। শান্তি পেলো মনে। শুয়ে পড়লো রকের
উপর।

পাশের গ্রাম থেকে বাড়লের দল মেতে উঠলো শুয়ে
চুপ করে শুনলো। মাঝেমাঝে মায়ের কথা মনে পড়ে।
মোচড় দিয়ে উঠে বুকটা। নিঃশব্দে ঠোট ছোটো ফুলিয়ে
কান্দে। আজ নিজেকে একান্ত অসহায় মনে করলো।
আপন বলতে তার আর কেউ নেই।

একটু পরেই সেনবাবু দরজা খুলে বের হতেই দেখলেন
একটা ছেলে শুয়ে আছে। হাঁকলেন, কেরে? কে তুই
এখানে শুয়ে?

—আমি বিল্টু!

—বিল্টু! তা তুই এখানে কেন রে লক্ষীছাড়া?
যা, দূর হয়ে যা এখান থেকে! এখানে থাকতে
পারিনে!

প্রায় তেড়ে উঠলেন সেনবাবু। ভয়ে আর বাধ্যয়
কেন্দে ফেললো বিল্টু। বললে, আমার মা মরে গেছে
তাই—

—তাই কি হয়েছে! যা, বাড়ী চলে যা! ভারী
আশঙ্কা পেয়ে গেছে!

বিল্টু এবার এই আঁধার রাতে নিজেকে চরম অসহায়
বোধ করলো। পথে বের হলো কান্দতে-কান্দতে। বাড়ীর
দিকেই রওনা দিলে চারিদিক চাইতে চাইতে।

বোষ্টুমীও লঠন হাতে এতক্ষণ খুঁজছিল বিল্টুকে।
বাড়ীতে না পেয়ে পথে-পথে ফিরছিল বিল্টুর নাম ধরে
ডাকতে-ডাকতে। সহসা দেখা বিল্টুর সাথে। তখনও
বিল্টু কান্দছিল।

বোষ্টুমী বললে, কোথায় গিয়েছিলি, বাবা? আমি
যে তোকে খুঁজে হারান হয়ে গেছি।

সব কথা বললে বিল্টু। বললে সেনবাবুর কথা।
শুনে বাখিত হলো বোষ্টুমী। অনেক বুঝিয়ে নিজের
আবাসে নিয়ে গেল বিল্টুকে। তার নিজের ছেলের মত

আদর বর আদর রেহ-মমতা দিয়ে জুলিয়ে রাখলো।
তাছাড়া জামা-প্যান্ট দিলে।

বিল্টুর মায়ের শ্রাদ্ধে যা খরচ করবার বোষ্টুমীই
করলে। তারপর এলো লেখাপড়ার পালা। বই-স্টে-
পেন্সিল কিনে স্কুলে ভর্তি করে দিলে ছেলেটাকে।

রাতে বিল্টুকে কোলের কাছে শুইয়ে কত পরামর্শ,
কত উপদেশ দেয় বড় হবার জন্য। তা শুনে বিল্টু মনে-
মনে উচ্চাশার স্বপ্ন দেখে। খুব বড় হবে সে। মস্ত
বড় বিদ্বান ও বুদ্ধিমান হতে হবে। দেখাতে হবে
সবাইকে।

বোষ্টুমী লোক দিয়ে বিল্টুদের বাড়ীর জায়গাটুকুতে
শাক-সজ্জি লাগিয়েছে। বিক্রী করে যা পয়সা পায়, তা
সব পোষ্টাফিসে জমা করে বিল্টুর নামে। তার বিল্টুর
উপর ভারী আশা। মস্ত বড় লোক গড়তে হবে বিল্টুকে।
ছেলেটাও বেশ মন দিয়ে লেখা-পড়া করে। বিকেল;
বেলা ছাড়া আর কখনো খেলা ধলা করে না।

ক্রমে ছ'মাস গত হতেই একদিন সেনবাবুরা ঢোল
পিটিয়ে বিল্টুর জায়গাটুকু দখল করে নিলে। কাছে
এগিয়ে গেল বোষ্টুমী ছেলেটাকে নিয়ে। প্রতিবাদ
করলো। বললে, নাবালক ছেলের সম্পত্তি কি করে দখল
করেন?

সেনবাবু হেসে হুঁড়িটা ফুলিয়ে বললে, বটে! তাহলে
ছেলেটার উপর ভারী দরদ দেখা যাচ্ছে!

—তা দরদ আছেই তো। অসহায়কে সহায়তা করাই
মানুষের ধর্ম।

সেনবাবু তেমনি হেসে একখানা কাগজ দেখিয়ে
বললে, তাহলে দেখে নাও বিল্টুর মায়ের অর্থাৎ সরলা
দেবীর টিপসহি। মরবার কয়েকদিন আগে বিক্রী করে
গেছে।

বোষ্টুমী কাছে গিয়ে দেখলো বটে। কিন্তু সে টিপসহি
যে কার, কে জানে? অজানার পেছনে ছুটে সাহস
পেলো না সে। ফিরে এলো বিল্টুকে নিয়ে। বিল্টু
বারংবার ফিরে চাইলো তাদের জমিটুকুর দিকে। ও
জায়গার উপর তাদের আর দাবী থাকবে না।

এদিকে বোষ্টুমীর উৎসাহে আর উদ্দীপনায় দিনে-দিনে
মাড়ম হয় বিল্টু। ক্রমে উন্নতির মৌপান বেয়ে উঠতে
থাকে। বহু কষ্টে দিন চলে বোষ্টুমীর।

উচ্চশ্রেণীর মাইনা এবং বই দিতে হাণ্ডিয়ে ওঠে বিল্টুর
মা। শেষে বিল্টু চুপে-চুপে ছোট ছেলেদের পড়িয়ে ঘে
টাকা পেয়েছে, তা দিয়ে কিনেছে বই-খাতা, জামা-
কাপড়। স্কুলের হেডমাস্টার এবং সেক্রেটারীকে ধরে
মাইনা 'ফ্রী' করিয়ে নিয়েছে। মায়ের অত কষ্ট আর

বোম্বাইমা একদিন ছেলের দিকে চেয়ে বললে, এক
কষ্ট করচিস বাবা, তা যেন সাথক হয়। দশ বিশ
গাঁয়ের ভেতর নাম করা লোক হওয়া চাই।

দুট প্রতিজ্ঞা করে বি।। তাকে একদিন বড়
হতেই হবে। শুনে গুণ হলো বোম্বাই।

কমে নানা ছু.গ কষ্ট সহ্য করে বি-এ পাশ করে বি।।
গ্রামের লোক বিশ্বাসে তার দিকে চেয়ে থাকে। গুণী
হয়েছেন গুণ কলেজের শিক্ষকগণ। আনন্দিত হলো
তার মা, তাই বলে এতদূর যত্নের নেই বিটুর। যেমনি
সরল সরল, তেমনি পবোপকারী। কেউ কোনদিন তাকে
কটু কথা বলতে শোনেনি।

এবার বি.সি-এ পড়বে সাবাস্ত করলো।
অনেক কষ্টে টাকা সংগ্রহ করে বের হলো মাকে রেখে।
যাবার সময় কনকে অন্ন করলেন মা। তিন যেন এই
অলহাঙ্গ সন্তানের প্রতি লক্ষ্য রাখেন।

বোম্বাই আবার এক। ছেলেকে নেই বলে আজ
চারদিক গুণ বাল মনে হলো। মাতৃহৃদয় ছেলের জগু
ব্যথিত হলো। ভাল থাক, সুস্থ থাক। বিজয়মালা
পরে কীরে আহুক।

কয়েক বছর পর সম্মানে বি.সি-এ পাশ করে
কিরলো বি।। ম'য়ের বক ভরে গেল। নখে কুটলো
হাসি। আনন্দে ছেলেকে বুকের ভেতর জড়িয়ে ধরে
শিরশ্চন্দন করলো। গ্রামে গ্রামে হৈ হৈ পড়ে গেল। জুচে
এলো অনেকেই। এলো না কেবল ধনী মান্য
সেনবাবু।

এরপর বিচারকের আসন পেলো বি।। সহরে সুন্দর
একটি বাসা পেয়েছে। মায়ের সাথে সেখানেই থাকে।
ঠাকুর চাকর রেখেছে। মাকে বলেছে, বিশ্রাম করতে।
সারা জীবন বড় কষ্ট সহতে হয়েছে, আর কেন? মায়ের
আনন্দ আর ধরেনা। কষ্ট করে ছেলেটাকে মানুষ করা
সাধ্যক হয়েছে। তাই ভিত্তি রাখা থেকে আজ সে রাজ
হাভা।

রাত দিন কত বড় জানী ত্রাণ লোক তায়াক্ত করে
তা দেখে চরিত্রে অন্ন করে বানাক।

কোট খেতে বাড়ীতে ফিরে বি.সি-বাবুর কত কাজ।
রাত দিন তার বই পড়া, আর কাগজপত্র নিয়ে মেতে

থাকা। তা দেখে মা ঠাকুরকে পরামর্শ দেয়। বোম্বাই
ছেলেটার সামনে দিতে। নইলে মাথা ঠিক থাকে
নাকি।

এমনি আনন্দের মাঝে তাদের প্রায় বছর দুই কেটে
গেল। একদিন বিল্টু জানতে পারলো যে, তাদের গাঁয়ের
সেই সেনবাবুর বাড়ী ঘর দোনার দ্বায়ে নিলামে উঠেছে।
জমিদার টাকার পরিবর্তে বাড়ীটাই দখল করতে চায়।
শুনে যেমনি ব্যথিত হলো বি.সি., তেমনি মৃত হাসলো।
একদিন ঐ সেনবাবু তাদের জমিটুকু বেচ ইনী ভাবে
দখল করেছে—মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে। আজ সেই
সেনবাবুর বাড়ী ঘর সব চলে যায় পাঁচ হাজার টাকার জগু।

অসহায় সেনবাবু। মনে পড়ে বিল্টু বাবুর কথা। তার
কাছে সাহায্য চাহতে বাবে, ভাবে। কিন্তু তাদের উপর
যে সে অত্যাচার করেছে, বিল্টু বাবু নিশ্চয়ই তা ভুলে যায়-
নি। তবু আশ্রয় ক বাধে বাবংবার, সেনবাবু বিল্টু বাবুর
বিচারককে ঢকে চা। বিচারকের দিকে।

বিচারাসনে বসে তা লক্ষ্য করে বিল্টু বাবু। পরে
আদালতকে দিয়ে খবর পাঠায় সেনবাবুকে বাসায় গিয়ে
দেখা করতে।

এদিকে বাড়ী নিলামে কিনে নিলে জমিদার। সন্ধ্যায়
সেনবাবু বিল্টু বাবুর বাসায় গেলেন লজ্জাবনত শিবে।
খবর পেয়ে বেরিয়ে এলো বিল্টু বাবু। নমস্কার করে সেন-
বাবুকে একখানা চেয়ারে বসতে বললে। একটু পরে
বললে বিল্টু বাবু, আপনার বাড়ী ঘর নিলাম হয়ে গেল
শুনাম।

সেনবাবু এক, যৌন থেকে বললে, আপনার বাড়ী
অগ্রায় করে নিয়েছিলাম, এ তারই প্রতিফল।

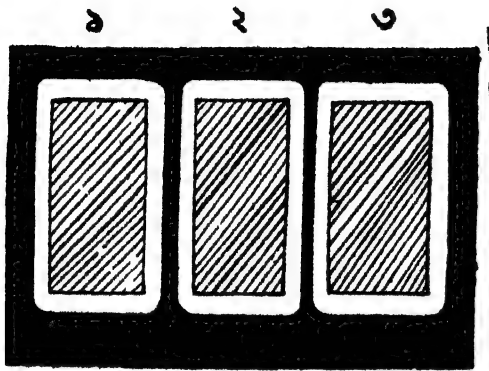
—তা থাক, আপনার কাজ আপনি করেছিলেন,
আমার কাজ আমি করি। আপনাকে পাঁচ হাজার টাকা
সংগ্রহ করে কাগ দেওয়া। অবশ্য অজ্ঞতার পত্রে আপনাকে
সহি করতে হ'বে যে, পাঁচ বছরের ভেতর এ টাকা পরিশোধ
করবেন।

—ধন্যবাদ। তাহলে আপনার কাছে আমি চিরকন্তজ
থাকবো। বলে চলে গেলেন বন্ধ সেনবাবু। আজ তাঁর
চোখ শুনে দিশে তখন বিচারক নিলটবাস।



মনোহর মৈত্র

১। তাসের হেয়ালিঃ



উপরের ছবিতে দেখাচ্ছে—তিনখানা তাস উলুড় করে পেতে রাখা আছে। উপুড়-করে ঢেকে রাখা এই তাস খানির মধ্যে—একটিতে লুকোনো রয়েছে হরতন কিশা ইঙ্গাপনের ‘সাহেব’ (king) এবং অগ্ন তটির একখানিতে আছে হরতনের ‘বিবি’ (queen of Hearts), অপরটিতে ইঙ্গাপনের ‘বিবি’ (queen of spades)। আসল হেয়ালিটি হলো—এই তাস তিন-খানির কোনোটিকে আদৌ স্পর্শ না করে, শুধু চোখে দেখে এবং মগজের বুদ্ধি খাটিয়ে মনে-মনে হিসাব কবে সঠিকভাবে তোমাকে বলতে হবে—এর মধ্যে কোন তাসটিতে লুকোনো রয়েছে হরতনের বিবি, কোনটিতে ইঙ্গাপনের সাহেব। তোমাদের হিসাব কবে দেখার সুবিধার জন্ত, আমরা অবশ্য নীচে কয়েকটি হদিশ দিয়ে রাখলুম। সেই হদিশগুলির বখাবথ মর্মান্বসরণ করে তোমরা যদি একটু মগজের বুদ্ধি খাটিয়ে বিবেচনা করে

জাখো তো খুব সহজেই এ হেয়ালি মটক-ময়াদান করতে পারবে। কাজেই সবার আগে নীচের হদিশগুলি ভালোভাবে পড়ে নাও আগাগোড়া হাবপব বুদ্ধি খাটিয়ে হিসাব কবে খুঁজে বার কবো, দেবদ করে ঢেকে রাখা এই তাস তিনখানির মধ্যে কোনটিতে লুকোনো রয়েছে হরতনের বিবি, কোনটিতে ইঙ্গাপনের বিবি এবং কোনটিতে আছে হরতন অথবা ইঙ্গাপনের সাহেব। নীচের হদিশগুলি হলো—

(ক) সাহেবের ঠিক ডানদিকেই রয়েছে, হরতন কিশা ইঙ্গাপন—কোনো একটি তাসের বিবি।

(খ) হরতন কিশা ইঙ্গাপন, কোনো একটি তাসের বিবির ২১ দিকে রয়েছে—এ দুটি তাসের মধ্যে অপর একটি বিবি।

(গ) কোনো একটি হরতন-রঙের তাসের দাঁদিকেই রয়েছে—ইঙ্গাপন রঙের আরেকটি তাস।

(ঘ) কোনো একটি ইঙ্গাপন-রঙের তাসের ডানদিকেই রয়েছে—ইঙ্গাপন-রঙের অপর একটি তাস।

যাই হোক, হদিশের ক্ষেত্রে তো মোটামুটি পেলে, এবার তোমরা বুদ্ধি খাটিয়ে বলা দেখি—দাঁড় করে সাজিয়ে-রাখা ১নং, ২নং আর ৩নং তাসের মধ্যে কোনটিতে লুকোনো রয়েছে ইঙ্গাপনের বিবি, কোনটিতে হরতনের বিবি এবং কোনটিতে আছে ইঙ্গাপনের কিশা হরতনের সাহেব? তোমাদের মধ্যে যারা এ হেয়ালির সঠিক উত্তর দিতে পারবে, আগামী সংখ্যায় তার নাম-বাম আমরা ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করে সবারই জানিয়ে দেবো—প্রতিশ্রুতি দিবে রাখলুম।

‘কিশোর-জগতের’ সভ্য-সভ্যাদেশ

সম্পাদিত শ্রীশ্রী

২। ১০০ সংখ্যাটিকে এমন চারটি অংশে বিভক্ত করো, যাঁহাব প্রথম অংশের সহিত ৪ যোগ করিলে, দ্বিতীয় অংশ হইতে ৪ বিয়োগ করিলে, তৃতীয় অংশকে ৪ দ্বারা গুণ করিলে এবং চতুর্থ অংশকে ৪ দ্বারা ভাগ

করিলে—যোগকল, িয়োগকল, গুণকল ও ভাগকল একই
মার্থ্য্য হইবে? চারিটি অংশ কি কি হইবে—বলো তো
দেখি?

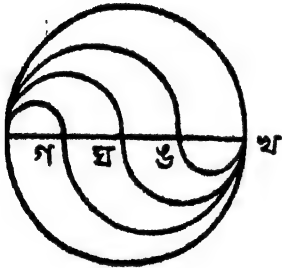
রচনা : দিলীপকুমার দত্ত (বাঁশবেড়িয়া)

৩। তিন অক্ষরে নাম তার...পুরোটিতে বোঝায়—
আগুন-জ্বালানোর উপকরণ...মাষের অক্ষর ছেড়ে দিলে
আমাদের প্রিয়-স্বখাত্ত এক রকম ফল বোঝায়। বলো
তো, সেটি কি জিনিষ?

রচনা : সুলতা মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা)

পতমাসের 'ঈশ্বর' আর 'হেঁয়ালি'র

উত্তর :



উপরের ছবিটি দেখলেই, তিনটি মাত্র বক্র-রেখার
আঁচড় টেনে কি উপায়ে গোলাকার-চক্রটিকে সমান-
মাপের চার-অংশে বিভক্ত করা যাবে—তার সঠিক
পরিচয় জানতে পারবে।

১। জামরুল

৩। ভুগোল

পতমাসের তিনটি 'ঈশ্বর' সঠিক

উত্তর দিচ্ছে :

পুপু ও ভূটিন মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা), পুতুল, সুরমা
হাবলু ও টাবলু (হাওড়া), কবি ও লাড্ড হালদার (কলিকাতা),
শাশতকুমার গোস্বামী ও প্রকাশ
বন্দ্যোপাধ্যায় (বাঁশবেড়িয়া)।

(পানীগড়), সৌর্যসু ও বিজয়া আচার্য্য (কলিকাতা)
সত্যেন, মুরারি, সুনীল ও সঞ্জয় (ভিলাই), কলু মি
(কলিকাতা), বাপি, বৃতাম ও পিটু গঙ্গোপাধ্যায়
(বোম্বাই), মিঠু ও বুবু গুপ্তা (কলিকাতা), সবাসাট
সেন (মাস্ত্রাজ), রিনি ও রনি মুখোপাধ্যায় (কাইরো)
শশিষ্ঠা ও সম্মিষ্টা রায় (কলিকাতা), বড়ো দেবশর্মা
(লক্ষ্মো)।

পতমাসের দুটি 'ঈশ্বর' সঠিক

উত্তর দিচ্ছে :

বিশ্বনাথ ও দেবকী সিংহ (নওয়াদা), ইন্দ্ৰ দাস
(কটক), হিম্মন্ত মুখোপাধ্যায় (শিলিগুড়ি), হারান,
ঘুঘু ও বালু (কাঁচড়াপাড়া) মদন, সত্যনারায়ণ, বুধ, মিঠু
ও মঞ্জু সরকার (নগৌ), মমতা ও বাবুই ভট্টাচার্য্য (ধুবড়ী),
প্রিয়রঞ্জন নাথ, রবি, নারায়ণ, সুনীল ঘোষ, গোপী মণ্ডল
ও অনিস্বর রহমান (খুজুটিপাড়া), প্রদীপকুমার বসু
(বাঁশবেড়িয়া), দীপালি, অপর্ণা, রীতা ও প্রদীপ বাগচী
(কোঁচ), গোপালচন্দ্র পাঁজা (কলিকাতা), তপ্তি মিত্র
(গুড়াপ), মিঠু ও চৈতালী বসু (কলিকাতা), ধর্ম্মদাস
রায় (বিছাধরপুর), নন্দকিশোর ও রামকমল গোস্বামী
(ভালাইগোড়া), মহদেব, সুনীল, শ্রামল, শক্তি, তারাপদ
ও কবিতা (ভেলাইগড়া), স্বকৃতিকুমার, সুনীতিকুমার,
মনোরমা, গৌরীবালা ও মদনমোহন মিশ্র (রাগপুর),
অংকুমার মিত্র (কটক), পরাগময়, বিরাগময়, সুরাগময়
ধীরাগময়, সিদ্ধাধারা ও মণিমালা হাজরা (বড়বড়িয়া),
সীতেশপ্রসাদ ও নির্মলচন্দ্র দত্ত চৌধুরী (জনাড়াড়ী)।

পতমাসের একটি 'ঈশ্বর' সঠিক

উত্তর দিচ্ছে :

রবিন রায় (বোম্বাই), নিপু ও সঞ্জীব মুখোপাধ্যায়
(হাওড়া), রাণা ও বুনা (কলিকাতা), রীণা ঘোষ ও
গোপীকান্ত মণ্ডল (খুজুটিপাড়া), গোতম, কল্লনা ও
বন্দ্যোপাধ্যায় (বাঁশবেড়িয়া)।

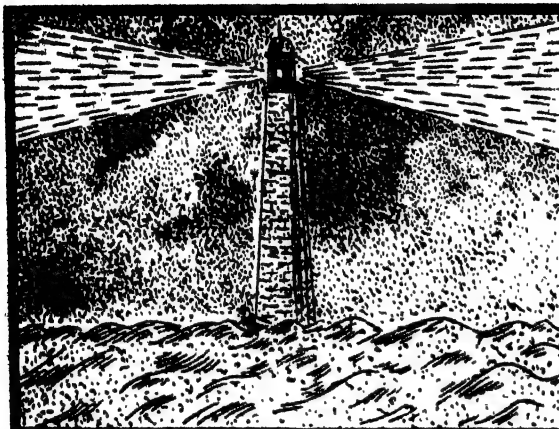
ঘুড়ির কথা

বিচিত্র-ছাঁদের এই যে সব
 ঘুড়ির নমুনা দেখেছো —
 আকাশের বুকে এমনি ধরনের
 বায়ু-প্যাটার্নের আর নানান
 রঙে পরিপাটি-মাজে মাজানো
 ঘুড়ি ওড়ানোর বেওয়াজ আজো
 পাশ্চাত্য-দেশের বহু ছোট-বড়
 গ্রামে-শহরে তিড়িই
 নজরে পড়ে। শুধু
 নিছক খেলার জন্যই
 নয়, বিজ্ঞানের বহু
 নব-নব তথ্য-রহস্য
 আবিষ্কার আর
 গবেষণার
 উদ্দেশ্যেও
 এমনি সব
 ঘুড়ি
 ওড়ানোর
 রীতি অনুমৃত
 হয়ে থাকে
 ওদেশে।

... আর
 বিশ্বকর্মা-পুজোর
 দিন আমাদের দেশের আকাশ
 ছেয়ে যায় ছোট-বড় হরেক রঙের
 কত সব ঔখিত-ছাঁদের বিচিত্র-
 অতিশয় ঘুড়ির
 লীলা-খেলায়



ଜଳେ-ଡାହାୟ



ସମୁଦ୍ରର ମଧ୍ୟେ
 ବିପଦନକ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା
 ଆଲୋକ ଚୁମ୍ବୁ ଖୁଲିଛି
 ଯଥା । ବାତେ ଓ ଧନ
 କୁହାଯାଉଛି ଦିବ୍ୟେ
 ଇହାର ଆଲୋ
 ନାହିଁ କେ ଜାହାଜୁମି
 ଦୂରେ ମରିଯା ଯାଏ ।
 ମନେ ବଞ୍ଚିଯାଉ
 ବିପଦର ହାତ
 ଥିବେ ରକ୍ଷା ପାଏ

ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମେଲେ
 କଥାଟା ଯେଉଁଠି
 ମାତ୍ର ଯାଏ । ନିଶ୍ଚୟ
 ମା ଯିବିବି ତୁଳନା
 ମାତ୍ର ଯେ ମା ହୁଏଟି
 ଧର ଓଟେ । ଯେଉଁଠି
 ଇହାର ଧନ ଲାଗିଯା
 ଚଳିବେ ମାତ୍ର ।
 ଇହାର ଧନ ଲାଗିଯିବି
 ମେଲେ ମିତେ
 ଧନ ଲାଗିଯିବି
 ଧନ ଲାଗିଯିବି



—ଆବ୍ରାହାମ ଚିତ୍ର

টেব থেকে নেমে প্রাচীরের ওপর দিয়ে কয়েক পা এগিয়ে যেতেই একজন লোক প্রায় ছুটে ছুটে আমার কাছে এসে দাঁড়াল। আমার আপাত মস্তক একবার চোখ বুজিয়ে নিয়ে বলল,—আপনার নাম কি সুপ্রকাশবাবু? কোলকাতা থেকে আসছেন?

বললাম—হ্যাঁ, হাওড়া থেকে এখানে বদলি হয়ে এলাম—আমার মুখের কথা শেষ করতে না দিয়ে, স্টাফ-কেশটা হাতে তুলে নিয়ে লোকটি বলল,—আর বলতে হবে না। আপনিই এখানকার নতুন এস্. এম্. হয়ে এলেন তো?—আজ্ঞে আমার নাম শ্রীপতি মোহন। আপনার জন্তেই আমি এখানে অপেক্ষা করছি। পুরাণো এস্. এম্. মালতীবাবুই পাঠিয়েছেন আমাকে আপনাকে নিয়ে যাবার জন্ত। তিনি আমাকে বিশেষ করে বলে দিয়েছেন বাতে পথে আপনার কে ন অহুবিধে না হয়। ইন্ট্রানের বাইরে আমি টাক্সা ঠিক করে রেখে এসেছি,—এখন হজুরের হকুম হলে জিনিস-পত্রের গাড়ীতে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করি।

ভাল করে লোকটির দিকে চাইলাম। চেহারার বয়েসের ছাপ পড়েছে। অবস্ত বয়েসের থেকে একটু বেশী শৈথিল্যের আভাস টেনে এনেছে যেন ওর বেহে। পরনে একটা আধময়লা ধুতি। তার ওপর একটা পুরাণো কালো রঙের গলাবন্ধ কোট। কোটের রেল-কোম্পানীর বগেই মনে হল। পায়ে একটা পুরাণো তালি বেওয়া ব্রাউন রঙের কেডস্ জুতো। হুঁশে ছুটো আঙ্গুলের চাপ পড়ে ছিঁড়ে গেছিল বোধ হয়, সেখানটিতে একটা বেমানান কালো চামড়া বলিয়ে তালি বেওয়া হয়েছে। কলে, লম্বাটে আন্তর-মুখের মত দেখতে ছুতো জোড়ার মাথায় ওই তালি ছুটোকে কালো-কালো চোখের মত দেখায়।

আমার বলার অপেক্ষা না করেই সন্দের বাক্স-বিছানা

পাঠিয়ে দিয়েছে শ্রীপতি। এবার আমার কাছে এগিয়ে এসে হাত ছুটো জোড় করে অভ্যস্ত কৃষ্ঠাভরা গলার বলল,—এবারে আমুন স্তার। অনেককণ গাড়ীতে এসেছেন, এখন তাড়াতাড়ি করে বাগার ফিরে একটু বিশ্রাম করবেন।

শ্রীপতিকে দেখতে দেখতে একটু আনমনা হয়ে পড়ে-ছিলাম। ওর সর্বাঙ্গে দারিদ্র্য যেন স্থায়ীভাবে বাসা বেঁধেছে। একটা অপরিচ্ছন্ন তাব সারা বেহে। মুখে বেশ বড় বড় দাঁড়ি গৌড়। অচ ঠিক যে ধরনের দাড়ি-গৌড়কে মাহুযকে অস্থলর বেওয়ার না, এ ঠিক সে ধরনের নয়। মনে হয় বেশ কিছুদিন গালে সুরের ছোয়া পারনি। খোঁচা খোঁচা একরাশ ঘাসের মত অযত্ত বর্ধিত।

ষ্টেশন ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়লাম। পাশে একটা টাক্সার আড্ডা। শোরারী পেয়ে তাদের অনেকেই আমার চারদিকে এসে ভিড় করে দাঁড়াল। কিন্তু আগে থেকে গাড়ী নির্দিষ্ট করে রেখেছিল শ্রীপতিমোহন। কোন দিকে ক্রসেপ না করে সে আমার জিনিসপত্র তোলাতে লাগল সেই গাড়ীটাতে। সেই সঙ্গে কুলিগুলোকে ধরকে-ধরকে অস্থির করে তুলল।

—এয়ার—এয়ার—অত জোরে নয়। আন্তে! আন্তে! স্তারের সব দামী দামী জিনিস আছে ওর মধ্যে।—ধরদার, একটা যেন নষ্ট না হয়। এয়ার—কেলজিতো জিনিসটা?

এমনভাবে অভি ব্যস্ত হয়ে উঠল যেন শ্রীপতি। দাড়িরে দেখছিলাম শ্রীপতির কার্যকলাপ। ওর ওই ধরনের মাহুতিবিক্ত আচরণে বেশ বাড়বাড়ি বলে মনে হচ্ছে আমার। অবস্ত এরকম ব্যবহার আমার কাছে নতুন নয়। রেলের চাহুরী করে এই বাবাধরী-জীবনে

অনেক রকম মাছই দেখেছি। বৃষ্টিতে যে কোন কারণেই হোক লোকটি মনিবকে অত্যন্ত সমীহ করে চলে। সেটা অবশ্য অনেকেই করেন। কিন্তু শ্রীপতিমোহনের এই মনিব-তন্ত্রের পিছনে অন্য কারণ ছিল, আগে সেটা আমি জানতে পারিনি। জেনেছিলাম বেশ কিছুকাল পরে। তখন আমি এস, এম হয়ে পুরোপুরিভাবে ওই শব্দরপুর্বেই বসবাস করছি।

গাড়ীতে উঠে বসলাম। শ্রীপতি কিছুতেই আমার পাশে বসতে সম্মত হল না। সে টাঙ্কাচালকের পাশে বসল।

গেকরা রঙের ধুলো আর হুড়ি পাথরে বোকাই রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চলল টাঙ্কা। হু'পাশে মাঠ। মাঠের অপর পারে সারি-সারি শাল আর মহড়া গাছের সমাবেশ। পথের দু'পাশে শেরা'কুলের জঙ্গল। ভুট্টা আর বেধানের চাষ হয়েছে মাঠে। বাতাসে মুহু মুহু ঢুলছে সেকুলি। এখানে এখানে শিশু-পর্বত মাথা তুলেছে। অনেক দূরে থমকে দাঁড়িয়ে থাক। যেষের মত বয়স্ক পর্বতের সারি।

মল লাগছেনা জায়গাটা। বেশ জনবিরল। মাছবের ভীড় আর কোলাহল বর্জিত। যেন কোন ধ্যানমগ্ন মৌন সন্ন্যাসী। নির্জনতা আমি ভালবাসি। বহুদিন কোল-কাতার অনারণ্যে বাস করে মনটা যেন পজু হয়ে গেছে। তাই মনের কচি বদলাতেই বাইরে চলে এসেছি। এখানে এসে আমার সেই প্রসুতি-মনে যেন নতুন করে কচির ছোঁয়া আগল।

একটা রেল কোয়ার্টারের কাছে গাড়ী দাঁড়াতেই দরজার সামনে এসে দাঁড়াল শ্রীপতিমোহন। আমার নায়তে বলে বাস-বিছানা নামাতে লাগল।

বাইরের একটা ঘরে আমার জিনিসপত্র রেখে ভিতরে চলে গেল শ্রীপতি।

কিছুক্ষণ পরে বাইরে এসে আমাকে বলল,—তেতরে চলুন স্ত্রী, মুখ হাত ধুয়ে নি।

হাত-মুখ ধুয়ে চা খাচ্ছি। হঠাৎ অত্যন্ত ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়াল শ্রীপতি। হু'চাং বার ঘরের মধ্যে পট্টা পরি করল। একবার দরজার বাইরে ঘুরে এল। তার হাব-ভাব দেখে আমার মনে হল, যেন কোন কারণে সে চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

আমার কাছে এসে দাঁড়াল শ্রীপতি। বলল,—আপনার হাত-বড়িতে এখন ক'টা বেজেছে স্ত্রী ?

বড়ি দেখে বললাম,—চারটে।

কথাটা শুনে অত্যন্ত ব্যস্ত হল শ্রীপতি, বলল,—বয়্য করে আমাকে একটু ছেড়ে দিন স্ত্রী। একটা জরুরী কাজ লেগে আমি এখুনি আসছি।

কথাটা বলে আমার কোন মতামতের অপেক্ষা না করেই দ্রুতপদে চলে গেল সে।

পরদিন সকালে মালতীবাবু চলে গেলেন আমাকে সব চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে। শ্রীপতিমোহনের সম্পর্কে ছ'একটা কথা জিজ্ঞেস করবার ছিল আমার, কিন্তু তাড়াতাড়িতে কিছুই হল না।

আপিসে দেখা হল শ্রীপতির সঙ্গে। আমার সামনে এগিয়ে এসে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলল,—আমিই আপনার জন্ত এই জায়গাটাতে বসবার ব্যবস্থা করলাম স্ত্রী। এখানে বসলে আপনি খোলা আলো আর বাতাস দুই-ই পাবেন। বিকেলে চারটে বাজার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীপতি এসে দাঁড়াল আমার সামনে। নতুন জায়গায় এসেছি। কাইল আর খাতাপত্তর বেশ ভাল করে দেখছিলাম। শ্রীপতি বলল,—আমাকে একটু ছুটি দিতে হবে স্ত্রী।

বললাম,—কোথায় যাবেন এখন ?—এই তো সবে চারটে বেজেছে। আপনার ডিউটি তো রাাত্রি পর্যন্ত। কি একটা কথা খুব অস্পষ্টভাবে বলল শ্রীপতি। ঠিক শুনে পেলাম না।

ওকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আমি জিজ্ঞেস করলাম,—আমাকে আর কিছু বলবেন ?

শ্রীপতি বলল,—এখন একবার আমাকে যেতেই হবে স্ত্রী। বড় দরকার।

এরপর আমার সমস্তির অপেক্ষা না করেই চলে গেল সে।

তরানক রাগ হল আমার শ্রীপতির—ওই ধরনের ঐক্যভেদ জন্ত। পরপর আরও কদিন দেখলাম, ঠিক একই সময়ে আপিস থেকে চলে গেল সে। তাবল্য, প্রতিদিন নিরমিতভাবে একই সময়ে বার কোথায় লোকটা। কোন খারাপ মেশাটেণা করে নাকি। যে ধরনের চেহারা তাতে মেশাখোর হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

একদিন শ্রীপতিকে বললাম,—প্রতিদিন এমনভাবে আঁপিস ছেড়ে যাওয়া চলবে না। এটা অঁপিস ডিসিপ্রিন নয়। এরপরও যদি আপনি আমার নিবেধ না শোনেন, তাহলে আপনার নামে আমি ওপরওয়ার কাছে লিখে চার্কলীট দিতে বাধ্য হবো।

আমার কথা শুনে ক্যাল ক্যাল করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল সে। তার মুখে যেন একটা বেদনার ছাপ।

কিন্তু আমার নিবেধ সত্ত্বেও প্রতিদিন আঁপিস ছেড়ে চলে যায় শ্রীপতি। কোন পরিবর্তন হল না তার।

একদিন সত্যি সত্যি একটা দরখাস্ত লিখে ফেললাম। এ, এস, এম সুধীরবাবুকে বললাম,—এখানা টাইপ করিয়ে যথাস্থানে পাঠিয়ে দেবার জন্ত।

পরদিন টাইপ করা দরখাস্তটা আমার সামনে ধরে সুধীরবাবু বললেন,—নিম্ন স্তার, একটা সই করে দিন এটাতে—

কলমটা তুলে নিয়ে বললাম,—কথাটা শ্রীপতি শুনেছে? সুধীরবাবু বললেন,—হ্যাঁ স্তার!—ওর কথা আর বলবেন না। আগে এইভাবে প্রতিদিন এসে আমাদের জালাতন করত। শেষে আমি দিতাম ওকে মালতীবাবুর কাছে পাঠিয়ে।—একটা পাগল মেয়ে নিয়ে ও যেন জলে—পুড়ে মরছে।

বললাম,—ওঁর সংসারে আর কে আছে?

সুধীরবাবু বললেন,—শুধু একটা পাগল মেয়ে।—কিন্তু কি বরাত দেখুন মেয়েটার, এমন সুন্দর ছেলের সঙ্গে বিয়ে খা হল, কিন্তু হতভাগীর ভাগ্য বুঝি সে সুখ মেনে নিল না!

সুধীরবাবু বলতে লাগলেন,—লিগ্‌স্ত্রালায় শ্রীপতির মেয়ে মল্লিকা। কিন্তু যেন পটের ছবি। নামের সঙ্গে রূপের এমন সাদৃশ্য বড় একটা দেখা যায় না। শুভ্র-মল্লিকা ফুলের মতই নিরুজ্জ্বল সে রূপ। আমাদের এই শহরপুর টাউনটার মধ্যে এমন রূপবতী মেয়ে আমি আর একটিকে দেখিনি। শুনেছি, শ্রীপতির স্ত্রীও নাকি ছিলেন অপরূপ সুন্দরী, কিন্তু থাক সে কথা। আমাদের এস, এম, তখন ছিলেন ধরনীবাবু। তিনি ক্যামিলি নিয়ে বাস করতেন এই শহরপুরে। ধরনীবাবুর বড় ছেলে অবনী

কোলকাতায় থেকে পড়াশুনা করতো। মাঝে মাঝে ছুটিছাটার আসতো এই শহরপুরে। হঠাৎ বুঝি কেমন করে তার দৃষ্টি পড়েছিল শ্রীপতির মেয়ে মল্লিকার ওপর। তারপর যা হয়, চোখের ভালো লাগা থেকে মনের ভালোবাসা। অবনী প্রায়ই লুকিয়ে চুরিয়ে বাতারাচ্ছিল কংতো শ্রীপতির বাড়ী। সে মনে মনে হির করেছিল যে, মল্লিকাকেই বিয়ে করবে।

কংটা কেমন করে যেন ধরনীবাবুর কানে উঠেছিল। তিনি ছেলের ওপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। শেষে যখন ব্যাপারটা বাড়াবাড়িতে পৌঁছালো তখন ছেলের আসা-যাওয়ার পথ বন্ধ করার জন্ত এই শহরপুর থেকে বদলী হয়ে গেলেন।

কিন্তু নিজেকে ঠাই নাড়া করলেও, ছেলের আসা-যাওয়ার পথ বন্ধ করতে পারলেন না ধরনীবাবু। বাপের অমতেই শহরপুরে এসে মল্লিকাকে বিয়ে করেছিল অবনী।

.. কিন্তু বিধির কি বিডঘনা! নয়তির কি নিয়ম, পরিহাস। কে জানতো তখন যে, ওই বিয়ের মিলন-টুকুই তাদের জীবনের চরম লগ্ন হয়ে থাকবে।

বিয়ে বেশ নির্বিঘ্নেই কেটেছিল। সবাই একবারের বলেছিল, হ্যাঁ, জামাইভাগা বটে, শ্রীপতির। না হলে ওর যা অবস্থা, তাতে এমন ছেলে পাওয়া ওর পক্ষে কোনদিনই সম্ভব হ'ত না। কেউ কেউ আবার ঈর্ষা করে বলত 'ও'সব ওই ব্যাটারই কারসাজী। সুন্দরী মেয়েরা চোপ করে ছেলেটার মাথা খারাপ করে দিয়েছিল, তারপর তাকে গর্বে তুলেছিল শরতানটা। নাহলে কোলকাতায় কি সুন্দরী মেয়ের অভাব ছিল কিছু? কিন্তু তখনও কেউই জানতো না যে, মল্লিকার দুর্ভাগ্যই অবনীকে টেনে এনেছিল এই শহরপুরে।

সকালে কুশণ্ডিকা শেষ করে বিকালের ট্রোপে অবনী যাবে কোলকাতায়। সেখানে বাসা ঠিক করে মল্লিকাকে নিয়ে যাবে। ওখানেই বোভাত হবে।

অবনীকে ট্রোনে তুলে দিতে গেছে শ্রীপতি। সঙ্গে মল্লিকাও আছে। গাড়ী দাঁড়িয়ে। মল্লিকা আর অবনী প্র্যাটকর্ষের ওপর দাঁড়িয়ে কথা বলছে। সে কথায় যেন আর শেষ নেই। কিছুদূরে দাঁড়িয়ে আছে শ্রীপতি।

গাড়ী-খাত-পা খাচ্ছে অবনী। একা মাহুব, তাঁর পুরুষ,
গাড়ীতে উঠতে আর কতক্ষণ।

গাড়ী ছেড়ে দিয়েছে। দূর থেকে দেখতে পেরে ছুটে
আগছে শ্রীপতি, চিংকার করে বলছে,—গাড়ী যে ছেড়ে
ছিল অবনী! ওই গাড়ীর পর আর কোন গাড়ী নেই
কোলকাতা বাওয়ার। অবনীও যেন কেমন বিভ্রান্ত হয়ে
পড়ল।

—তাই ওই ট্রেন ধরার জন্তই সে চেষ্টা করল।
অবনীকে চলন্ত-ট্রেনের দিকে যেতে দেখে মল্লিকাও যেন
কেমন ভয় পেয়ে গেল। সে অবনীকে বাধা দেবার জন্ত
চিংকার করে উঠল,—বেণু না, ও গাড়ীতে তুমি উঠতে
পারবে না, তুমি বেণু না—

—কিন্তু অবনীর সেই জুবার গতি তখন রুদ্ধ করে কে?
সে যে যুড়ার ডাকে এগিয়ে চলেছে!

সেদিন আর গাড়ীতে উঠতে পারেনি অবনী। বাপ
আর মেয়ের চোখের সামনে একটা মাহুকের রক্তাক্ত দেহ
ছিটকে পড়েছিল লাইনের পাশে! তখন আর অবনীকে
চেনাই রায় না।

...তাই চারটে বাজার সঙ্গে সঙ্গে যখন ওই ট্রেনের শব্দ
জনতে পার মল্লিকা, তখন সেই বেদনাতুরা মুহূর্তটি এসে

দাঁড়ায় তার সামনে। ওই সময় সে কীভাবে চিংকার
করে! কোন সময় বা ছুটে চলে যেতে চায়। বলে,—
আমাকে এমন করে আটকে রেখোনা তোমরা! তোমার
হুটি পারে পড়ি বাবা। সে যে বলেছিল, খুব তাড়াতাড়ি
আসবে। আমাকে নিয়ে যাবে।—বাবা, আমার কাপড়
হাও? গয়না বাস করে হাও আমি পরবো। খত্তর বাড়ী
যাবো না? বাবা, আমি খত্তর বাড়ী যাবো না?

ঠিক ওই সময়ে শ্রীপতিও আলিস ছেড়ে বাড়ী
চলে যেতে চায়। ঘরে তালাচাবি দেওয়া থাকে
মল্লিকা।

শ্রীপতি ছুটে চলে যায় নিজের বাড়ীতে। মল্লিকার
ঘরের জানালার সামনে গিয়ে চূপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।
আর ওই সময়ের ছুটিটুহু পাবার জন্ত বাবু মহলে সকলকে
সতর্ক রাখে শ্রীপতি।

স্বধীরবাবু তাঁর বক্তব্য শেষ করে বললেন,—নিম্ন স্তর,
সইটা করে দিন, আজই ফাষ্ট আওয়ারে ওটাকে ডেস্‌প্যাচ
করার ব্যবস্থা করি—

দরখাস্তটা যেন ভয়ানক কাপসা হয়ে আসছে আমার
চোখের সামনে,—ভয়ানক অস্পষ্ট।...সই করতে আর
কলম উঠল না!

শ্রীকুমারগুন মল্লিক

বর্ষা তুমি, অর্ণা ঝরাও, মৃতিমতী পবিত্রতা,
নবীনতা জলে স্থলে, বনে আনো প্রসন্নতা।
ধূয়ে কেল আবর্জনা,
রাখ না মলিন কণা,
বাঁড়াও রাঙা-পলির জলে তুমি ধরার উর্জিতা।

২.

শান্তি আনো, কান্তি আনো, তরুলতার কামলিনা
তোমার রৌদ্র মেঘের খেলায় গরিমা যে পার নীলিমা।
ছুটাও নতে রামধনুক,
চুনিকণা ধরার হুক,
ভুবন-ভবন আলো করা রূপের তোমার নাই যে নীলা।

৩
মৃৎকরী, শিথকরী, তৃপ্তিকরী, শুভকরী—
বুক যে ভরে বর্ষে বর্ষে হর্ষে তোমার বরণ করি।
তোমার বস্তা তোমার পাখার,
সরায় অপার কণা যে তাঁর,
আনন্দে মোর প্রাণ আনে সকল বাধা লয় যে হরি।

৪
তুমি মহালক্ষ্মী ঘোঁরুর, অন্নপূর্ণা, সত্যি গো।
সোনার ধানের সন্তানবান বুক যে কর তত্ত্বি গো।
ভাগ্যবতী, রূপবতী,—
ভগবতী তুমিই নতি,
নববয়স বড়ন এলো ভবিষ্যতের কর্ত্তা গো।



শশিভূষণ দাশগুপ্ত—

একাডেমী পুরস্কারপ্রাপ্ত খ্যাতনামা সাহিত্যিক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান, তথা রামতল্লাহ সাহিত্যী অধ্যাপক, 'ভারতবর্ষ'ের দীর্ঘদিনের লেখক শশিভূষণ দাশগুপ্ত গত ২১শে জুন মঙ্গলবার বিকাল ৩টার সময় মাত্র ৫৩ বৎসর বয়সে ১০ মাস কর্কট রোগে কষ্ট পাইয়া পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি টালীগঞ্জ-চার এভেনিউতে নিজগৃহে বাস করিতেন এবং বিধবা পত্নী, একমাত্র পুত্র অমিতাভ ও একমাত্র কন্যা সংঘমিত্রাকে রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ৮৫ বৎসর বয়স্কা বৃদ্ধা মাতা ও দুইজন অগ্রজ সোদপুরে বাস করেন। তিনি শুধু অধ্যাপনার কৃতিত্ব দেখাইয়া সুনাম অর্জন করেন নাই, বহু-লেখক, প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প ও উপন্যাসগ্রন্থ রচনা করিয়া সাহিত্যিক সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই অকালমৃত্যু দেশবাসীর প্রত্যেককে ব্যথিত করিয়াছে— কারণ তিনি দীর্ঘজীবন লাভ করিলে ছাত্রসমাজ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তথা বাংলাভাষা ও সাহিত্য তাঁহার বহু দানে সমৃদ্ধ হইত।

১৯১২ সালে বরিশাল জেলার চন্দ্রহার গ্রামে তাঁহার জন্ম এবং তিনি ১৯৩৫ সালে বাংলার এম-এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথমস্থান লাভ করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষক নিযুক্ত হন। ৩ বৎসর পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং ১৯৫৫ সাল হইতে ঐ বিভাগের প্রধান তথা রামতল্লাহ সাহিত্যী অধ্যাপক পদে কাজ করিতেছিলেন। তিনি পি-আর-এস এবং পি-এইচ-ডি হইয়াছিলেন এবং ১৯৬২ সালে বাংলার শক্তি সাধনা ও শান্ত সাহিত্য সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করিয়া একাডেমী পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৯৬১ সালে তিনি ইউ-নেকো আয়োজিত বিশ্বব্যাপী সম্মিলনে বোম্বাইতে গিয়া হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিত্ব করিয়াছিলেন।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি সঙ্গীত, সুর ও অনাক্ষয় ছিলেন। তিনি গান্ধীজির তত্ত্ব এবং খাদির প্রতি প্রভাবশীল ছিলেন—সারাজীবন খন্দের ব্যবহার করিতেন। তিনি সম্মানিত বিনোবাজীর সর্বোচ্চ আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন এবং সে বিষয়েও বহু প্রবন্ধাদি রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার সহস্ররুপ অমূল্য ব্যবহার তাঁহাকে সকল সমাজে প্রিয় করিয়া দিয়া ছিল এবং এরূপ উচ্চশিক্ষিত ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তি সাধারণত যে মনোভাবাপন্ন হন, শশিভূষণ তাহা হন নাই। সারা জীবনই তিনি নিজেকে পত্নীগ্রাহকের একজন সাধারণ অধিবাসী বলিয়া মনে করিয়া সকলের সহিত শ্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। তিনি 'ছাত্রসমাজ' হইতে আমাদের পরিচিত ছিলেন এবং এখনই তাঁহার লিখিত সাক্ষ্য হইয়াছে, তিনি বিনয় ও সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহারের দ্বারা আশ্রয়িত করিতে বিমুগ্ধ হন নাই। তাঁহার বিরোধে তাঁহার আত্মীয়-বন্ধন, অগণিত গুণমুগ্ধ ছাত্র-বন্ধুগণের সহিত আত্মীয়-বন্ধন-বিরোধ-বেদনা অস্বস্ত্য করিতেছি এবং ভগবৎচরণে প্রার্থনা জানাই, তাঁহার বিশেষ আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক।

স্বাক্ষরপুস্তক সংরক্ষিত মহাবিশ্ববিদ্যালয়—

গত ২৪শে জুলাই শুক্রবার শুকপূর্ণিমার সন্ধ্যায় বারাকপুরে মণিরামপুরস্থ ভোলানন্দ গিরি আশ্রমে একটি সুসংযত মহাবিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বোধন উৎসব হইয়াছে। আশ্রমের অধ্যক্ষ বামী জ্যোতির্দয়ানন্দ গিরি মহারাজের চেষ্টায় ঐ আশ্রমে কয়েকটি নিম্ন বুনিয়াদি, উচ্চ বুনিয়াদি, বালক ও বালিকাদের উচ্চ বিভাগ, নিম্ন টেকনিক্যাল স্কুল, ছাত্রাবাস প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত ও পরিচালিত হইয়াছে। সংযত মহাবিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বোধন উৎসবে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি ও পশ্চিমবঙ্গ সংসদ শিক্ষা পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায় সভাপতি, পণ্ডিত প্রবর শ্রীশ্রীবিহারীদাস প্রধান অতিথি ও শ্রীকৃষ্ণ-

ভারতের রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধা-
কৃষ্ণ নতুন বিদ্যার আশ্রয়
ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরীর
সভা-গৃহে “সায়ন্স এণ্ড দি
নেশন” (“Science and
the Nation”) বক্তৃতা-
মালার উদ্বোধন করি-
তেছেন।



হৃদয় হিমালয়ের অগ্র-
বর্তী ঘাঁটির ভারতীয়
সৈনিকদের জন্য এক
নতুন ধরনের ত্ববারের
উপযোগী সম্পূর্ণ পোষাক
প্রস্তুত করা হইয়াছে।
এই পোষাক ওজনে
হালকাই শুধু নয়, অত্যন্ত
গরম এবং বিদ্যেপে
প্রস্তুত এই ধরনের
পোষাকের সমতুল্য।
চিহ্ন এই পরিচ্ছদে
ভূষিত অগ্নিদেবের দেখা
বাইতেছে।

হইতেছে। বহু দুর্নীতিপরাগণ চোরাকারগামীকে ধরা হয়, কিন্তু তাহাদের শাস্তি হয় না—এ বিষয়ে সরকারী শাসনব্যবস্থা শুধু দুর্বল নহে, সেখানেও উপযুক্ত বিধান ও ব্যবস্থার সম্পূর্ণ অভাব। সরকার একদল দুর্নীতিপরাগণদের কাছে যে চাল ধরে—তাহা জনসাধারণ না পাইয়া আর একদল দুর্নীতিপরাগণের হাতে চলিয়া যায়। সরকারী কর্মচারীরা তাহা দেখিয়াও দেখে না। ইহা চাল ও আটার অবস্থা। সরিষার তৈল ব্যবসায় গত ৩ মাসে যে খেলা দেখান হইতেছে, তাহাতে হাসিব কি কাঁদিব বুঝিতে পারি না। আড়াই টাকা কিলোর তৈল সরকারী ব্যবস্থার ফলে ৪ টাকা কিলো হইয়াছে—কেহ ক্রয়িয়াও দেখে না। মন্ত্রিমণ্ডলী দুর্বল, বড় বড় সরকারী কর্মচারীরা এ বিষয়ে উদাসীন এবং নিয়ন্ত্রকের কর্মচারীরা দুর্নীতিপরাগণ—দেশবাসী সংঘবদ্ধ হইতে বা দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে জানে না—তাহাদের সে শক্তি বা বুদ্ধি নাই। কাজেই দেশ ধ্বংসের পথে আগাইয়া চলিয়াছে। তৈল সমস্যার সমাধান হইল না। বাঙ্গালী বহু শত বৎসর ধরিয়া সরিষার তৈল ব্যবহার করে, তাহা ভ্যাগ করাও তাহার পক্ষে সহজ নহে। ‘বল মা তারা দাঁড়াই কোথা’—সকলের এক অবস্থা। তাহার পর মাছের কথা। মৎস্য মন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী মাছ সম্বন্ধে বড় বড় কথা বলেন—কোন স্থান হইতে মাছ আনিতে পারেন না। চোরাবাজাবে ৬ টাকা কিলো দরে গোপনে মাছ পাওয়া যায়—তাহা ক্রয়ের ক্ষমতা সাধারণ লোকের নাই। মৎস্য-প্রিয় বাঙ্গালীকে মাছ খাওয়া ছাড়িতে হইয়াছে। সপাহে এক বেলাও মাছ খাওয়া সম্ভব নহে। চাল, আটা, তৈল, মাছ প্রভৃতির মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে তরি-তরকাবী, জাল, মশলা প্রভৃতির দাম বাড়িয়া গিয়াছে। বাজারে দুধ দুগ্ধাণ্য। সরকারী দুধও পর্যাপ্ত পাওয়া যায় না—তাহা যে খাঁটি দুধ নহে, এ কথা বলাই বাহুল্য মাত্র। ১৯১০ সালের দুর্ভিক্ষের সময়ও জিনিষের দাম এত বাড়ে নাই—হয় ত মাহুকের আর বাড়িয়াছে—সে লজ্জা আজও পথে হুতুমেহ পড়িয়া থাকিতে দেখা যায় না। গত কয়েক দিন বিধান সভার বিরোধী দলের সমস্তগণ চীৎকার করিয়া তাহাদের কর্তব্য সম্পাদন করিলেন—কিন্তু হরিজ হাছবের দুখে কষ্ট বাড়া ছিল, তাহাই থাকিরা গেল। আরও—

সাংবাদিকরা কাগজে লিখি—কর্তৃপক্ষ পড়াও প্রয়োজন মনে করেন না—কাজেই অরণ্যে বোদনই সার। কে এ বিষয়ের প্রতীকার করিবে? মুখ্যমন্ত্রী শ্রীশঙ্করচন্দ্র সেন জনগণের প্রতিনিধি ও বন্ধু—তাহার নিকট জনগণ অনেক কিছু আশা করিয়াছে—কিন্তু সব আশাই নিফল হইয়া বাটতেছে। কেন্দ্রে নতুন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমাল বাহাদুর শাস্ত্রী ও বরাট মন্ত্রী শ্রীশঙ্করলাল নন্দ বড় বড় কথা বলিতেছেন—কিন্তু দুর্নীতি কমিতেছে না, দুর্নীতিপরাগণ লোক ধরাও পড়ে না—ধরিলেও তাহাদের শাস্তি হয় না। এই শাসন ব্যবস্থার ফলে লোক কংগ্রেসের উপর আস্থা হারাইতেছে—সকল শাসন ব্যাপারে শাসকগণ অকর্মণ্য বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে, খাড়াবহা ছাড়াও শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমস্যা, সেচ, শিল্প—কোন কেন্দ্রেই শাসকগণ দেশবাসীর দুঃখ দুর্দশা দূর করিতে পারেন না। তাহার পর কি হইবে?

শশিভূষণ সান্নাধ্য চৌধুরী—

শশিভূষণ সান্নাধ্য চৌধুরী ২৪ পরগণা জেলার সোদপুরের পূর্বদিকে তেঘরিয়াগ্রামের অধিবাসী ছিলেন—তিনি ৫০ বৎসর পূর্বে বিপ্লবী আন্দোলনে যোগদান করিয়া বৃটিশ সরকারের আইনে আটক হন ও মুক্তির পর বন্দারোগে আক্রান্ত হইয়া ৪০ বৎসর পূর্বে পরলোকগমন করেন। তিনি এদেশে প্রথম প্রমজীবি-শিক্ষা আন্দোলন প্রবর্তন করেন এবং কিছুকাল শান্তিনিকেতনে থাকিয়া কবিগুরু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। যুগ্মকালে—হরিজ হইলেও তিনি কয়েক বিবাহ অমি দান করিয়া বান—এখন তথায় সরকারী সাহায্যে বুনিয়াদি বিভাগের ও পল্লী-স্বাস্থ্য-কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। গত ২৬শে জুলাই রবিবার সন্ধ্যায় শশিভূষণ ঐকিককল্যাণ ট্রাস্টের পক্ষ হইতে বুনিয়াদি বিভাগের সংলগ্ন মাঠে তাহার বার্ষিক স্মৃতিসভা হইয়াছিল। সভার ২৪ পরগণা জেলাব কংগ্রেস-নেতা শ্রীহংসেন্দ্র বাড়া সভাপতিত্ব করেন, পশ্চিমবঙ্গের অজিতম মন্ত্রী শ্রীকল্লর রহমান প্রধান অতিথি ও পশ্চিমবঙ্গের সাহাবিভাগের কয়েক ডায়েরটর ডাক্তার শিবদাস বহু বিশিষ্ট অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন। ইন্ডিয়ান সভাপতি শ্রীকীর্ত্তনাথ মুখোপাধ্যায় সভারতঃ শশিভূষণ বাবুর জীবন ও কর্মের পরিচয় দিয়া সকলকে অশ্রুপূর্ণ

করিলে স্থানীয় প্রবীণ-কর্মী শ্রীহরিশোহন রায়চৌধুরী শশিবাবুর স্বদীর্ঘ জীবনী লিখিত করেন। সভাপতি বাড়া মহাশয় ও প্রধান অতিথি মহাশয়ও স্বদীর্ঘ ভাষণে শশিবাবুর আদর্শ ধরিয়া বর্তমান সমুদ্রে দেশবাসীকে কর্তব্য পালনে উপদেশ দেন—উভয়ের বক্তৃতা ই জয়-গ্রাহী হইয়াছিল। ট্রাষ্টের সম্পাদক শ্রীপারীমোহন রায়-চৌধুরী ও স্থানীয় কর্মী শ্রীচন্দ্রবল্লভ সবকারের অল্পায়ু পরিশ্রম ও চেষ্টায় উৎসব সাকল্যমণ্ডিত হয়। বহুদিন পরে এ ভাবে উৎসব হইতে দেখিয়া সকলে আনন্দ প্রকাশ করেন।

আর্থশাস্ত্র—

শ্রীশ্রীমতীভারদাস ওকারনাথ কিছুকাল যাবৎ আর্থ-শাস্ত্র নামক সাময়িক পত্র প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। গত ৩৭০ সালের পৌষ মাস হইতে (দ্বিতীয় বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা) ১০৭১ সালের জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত ৬ মাসে বাস্তবিক রামায়ণ একাংশ প্রকাশিত হইয়াছে। যুগ-সম্পাদক মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীন্দ্র তর্কচাঁদ ও শ্রীশ্রীশ্রী তর্কচাঁদ ত্রায়তীর্থ। মূল সংস্কৃতের সহিত বঙ্গভাষায় প্রকাশ করা হইতেছে। অধ্যাপক শ্রীনারায়ণ-চন্দ্র গোস্বামী ভাষ্যচাঁদ বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হইতেছেন। প্রতি খণ্ডের মূল্য ১ টাকা ৫০ পয়সা। ৬ খণ্ডে মোট ৬৩৬ পৃষ্ঠায় আদি ও অবোধা কাণ্ড সম্পূর্ণ ও আরণ্য কাণ্ডের যে ডল সর্গ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম খণ্ডে ২৮ পৃষ্ঠায় রামায়ণ মহাভাষ্য প্রস্তুত হইয়াছে।

প্রায় এক শত বৎসর পূর্বে পণ্ডিতপ্রবর পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের চেষ্টায় বঙ্গবাসী কার্যালয় হইতে মূল রামায়ণ ও তর্করত্ন মহাশয়রচিত উহার বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হইয়াছিল—তাহা মাত্র ১ টাকা মূল্যে ক্রীত হইত। এখনও বহু গৃহে তাহা পাওয়া যায়। তাহার পর প্রায় ১০ বৎসর পূর্বে মেট্রপলিটান পাবলিশিং কোম্পানীও মূল সংস্কৃত রামায়ণ প্রকাশ করিয়াছিলেন—তাহার মূল্য ৫০ টাকারও অধিক ছিল। ইহানীং মূল সংস্কৃত রামায়ণ বঙ্গভাষায় ছাপা পাওয়া বাইত না। সে জন্য শ্রীশ্রীমতীভারদাস আর্থশাস্ত্র প্রকাশ কালে রামায়ণ প্রকাশ করিতেছেন। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিবর্তনায় আকলিক ভাবার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি করণের কার্যে অর্থসাহায্য পাইয়া ঠাকুর এই

কার্যে প্রস্তুত হইয়াছেন। দেশের লোকের ঘন হইতে এখনও সংস্কৃত পাঠের অবহাগ যায় নাই—কাহ্নেই সীতারামের এই প্রচেষ্টা সর্বত্র প্রসংসিত হইতেছে—আমাদের বিশ্বাস, এই রামায়ণ বাংলায় শিক্ষিত সমাজে উপযুক্ত সমাদর লাভ করিবে এবং লোক সংস্কৃত রামায়ণ পাঠ করিয়া নিজ সংস্কৃতির কথা জ্ঞাত হইয়া বিপদগমন হইতে বিরত হইবে। পূজ্যপাদ সীতারামের এই সাধু প্রচেষ্টা আমাদের সকলের কল্যাণকর হউক।

আত্মাই জগৎ উজ্জ্বল—

গত আত্মারী মাস হইতে পূর্ণপাকিস্তানের কমবেশি আড়াই লক্ষ হিন্দু অধিবাসী মুসলমানগণের অত্যাচারের ফলে পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছে। তাহাদের একাংশ—কয়েক হাজারকে বাংলার বাহিরে দণ্ডকারণ্য প্রতীতি স্থানে প্রেরণ করা হইয়াছে—বাকী অধিকাংশ পশ্চিমবঙ্গে বাস করিতেছে। আগে হইতেই পশ্চিমবঙ্গে স্থানান্তর ও ঘন লোকবসতি থাকায় তাহাদের পুনর্বাসন সমস্যা পরকায়কে বিরত করিতেছে। শ্রীমহাবীর ভাষ্য পুনর্বাসন মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়া অনেক আশার কথা পুনর্বাসন ছিলেন, কিন্তু কাহ্নে কিছু করিতে পারিতেছেন না। পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস—নেতা শ্রীমহেশ্বর ঘোষ এ বিষয়ে যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। সম্প্রতি তৃপালে প্রবেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীমহেশ্বরমহার মুখোপাধ্যায় এষ্ট সমস্যার কথা সর্ব-ভারতীয় নেতাদের জানাইয়াছেন। বাংলার একদল বাঙালী নেতা উদ্ভাসদের বাংলার বাহিরে যাঁতে বাধা দেয় ও সে জন্য আন্দোলন করে। তাহার ফলে বহু উদ্ভাস বাংলার বাহিরে যাঁতে তর পার। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় বাংলার স্থানান্তর, সে জন্য বহু উদ্ভাস বাংলার বাহিরে না বাইলে উদ্ভাস সমস্যার সঠিক সমাধান সম্ভব হইবে না। আমরা এ বিষয়ে বাংলার কংগ্রেসী নেতা ও কর্মীদের অবহিত হইয়া আন্দোলন করিতে আহ্বান করি। রামায়ণ বিপনের কর্মীরাও একদল নুতন উদ্ভাসকে দণ্ডকারণ্যে প্রেরণ করিয়া তাহার তাহাদের উপযুক্ত পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। বাংলার জনসংখ্যা-সমস্যাই বাংলার স্বাভাবিকের মূল কারণ—অত্যাচার হইতে অধিবাসী আসিয়া বাংলার বাসস্থান করিয়া লয়—তাহাতেও বাধা প্রদান করা প্রয়োজন। বাঙ্গালী বাংলার বাহিরে কোন প্রবেশে বাইলে বসবাসে

কাধাপ্রাপ্ত হয়—আর অবাকালী বাংলায় আসিয়া সহজে বসবাস ও কর্ম সংগ্রহ করে—এ ব্যবস্থার প্রতি দেশ-নেতাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া প্রয়োজন হইয়াছে।

মুসলমান বিত্যাড়ন—

পূর্বপাকিস্তান হইতে যেমন হিন্দুরা আসিয়া ভারত-রাষ্ট্রে প্রবেশ করিতেছে, তেমনই গত কয় বৎসর ধরিয়া মুসলমানরা ধলে ধলে ভারতরাষ্ট্রে চলিয়া আসিতেছে। বহু মুসলমান আসাম, মণিপুর ও ত্রিপুরা রাজ্যে প্রবেশ করার তথ্য ক্রমে মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা বহু পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। বহু মুসলমান বিহারে ও পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসিয়াছে। সে সকল মুসলমানকে ভারতরাষ্ট্র হইতে বিতাড়ন করা ভারতরাষ্ট্রের এক লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ বিষয় লইয়া পাকিস্তান ও ভারতের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা আলোচনা করিয়াছেন, কোন ফল ফলে নাই। কলিকাতার মত সহরেও মুসলমান অধিবাসীরা—পুরাতন অধিবাসী হউক আর নবাগতই হউক, এমন অস্তায় আবদার করিয়া বলেন, যে ভারতরাষ্ট্রের পক্ষে সে সমস্তার সমাধানে হিমশিম খাইতে হয়। বস্তীবাসী মুসলমানগণকে অস্ত্র বাসস্থান দিয়াও বস্তী হইতে তাহাদের উচ্ছেদ করা কলিকাতা ইম্প্রভ-মেন্ট ট্রাষ্টের এক লক্ষ্য হইয়াছে—মুসলমানগণের অস্ত্রই বহু বস্তী আজও ভাঙ্গা সম্ভব হয় নাই। পাকিস্তান-কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে সকল কথা জানিয়া কর্তব্য সম্পাদন করেন না, উদাসীন থাকেন। সীমান্ত অঞ্চলে মুসলমানরা মধ্যে মধ্যে বলপূর্বক হিন্দু এলাকায় প্রবেশ করিয়া যে অনর্থ সৃষ্টি করে, সে বিষয়েও পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ নীরব। এখন ভারতের রাষ্ট্রনেতাদের কঠোর হস্তে এই সকল সমস্তার সমাধান করিতে হইবে। তাহার অস্ত্র বলপ্রয়োগ ও অর্থব্যয়ে কার্পণ্য করিলে চলিবে না। আমরা এ সকল বিষয়ে ভারতরাষ্ট্রের নতুন প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে দৃঢ়তার সহিত কর্তব্য পালন করিতে আহ্বান জানাই।

হুর্গাপুরে ৬০জন পাকিস্তানী প্রেষ্টার—

বর্তমান জেলার বহু স্থানে বিশেষত হুর্গাপুর অঞ্চলে বহু পাকিস্তানী—(তাহারা অস্ত্রাভাবে ভারতে প্রবেশ করিয়াছে—ভিসা বা পাসপোর্ট নাই) আসিয়া স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছিল এবং স্থানীয় মুসলমানদের মধ্যে হিন্দুবিদ্বেষী প্রচার কার্য চালাইতেছিল—গত ৪ঠা অক্টোবর হুর্গাপুরে সেরূপ ৬০ জন পাকিস্তানী গুলুচরকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে—কলে বহু মুসলমান পলায়ন করিয়াছে—অনেকের বিক্ষেপে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা থাকিলেও তাহাদের পুছিয়া পাওয়া বাইতেছে না। ভারতরাষ্ট্র কর্তৃপক্ষ এ

বিষয়ে কঠোরতার সহিত কর্তব্য পালন করিলে ভারত অনেক বিপদ হইতে রক্ষা পাইবে। আমরা এ বিষয়ে শাসন কর্তৃপক্ষকে কঠোরতার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে অতুরোধ করি।

প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির স্বাধীনতা—

সদার শরণ সিং কংগ্রেস পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিযুক্ত হইয়া প্রথমেই প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির প্রতি অধিক বন্ধুত্ব করার চেষ্টায় মনোযোগী হইয়াছেন। ১৫ই সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে রাষ্ট্র-পুঞ্জের বৈঠকে যোগদানের পূর্বে তিনি কলম্বো, কাবুল, কাঠমণ্ডু ও রেজুনে ভ্রমণে সফরে বাইবেন। তিনি নিউইয়র্ক হইতে ফিরিয়া কাররোতে অক্টোবরের প্রথমে স্নোট-নিরপেক্ষ সম্মিলনে যোগদান করিবেন। তাহার এ সকল কার্য হইতে বুঝা যায় যে চীন ও পাকিস্তানের সহিত ভারতের বিরোধ বাধিবার সম্ভাবনা বাড়িয়া গিয়াছে। ভারতবাসী সকলকে আজ এই সমস্তার কথা চিন্তা করিয়া কর্তব্য পালন করিতে হইবে।

কংগ্রেস সভাপতি সম্মিলন—

গত ৮ই ও ৯ই আগস্ট ২ দিন মধ্যভারতের তৃপালে কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজ নাদারের সভাপতিত্বে সকল রাজ্যের কংগ্রেস সভাপতি ও সম্পাদকগণ এক সম্মিলনে মিলিত হইয়া সারা ভারতের কংগ্রেস-সংগঠন সম্বন্ধে আলোচনা ও প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। কংগ্রেসের ২ জন সাধারণ সম্পাদক ছাড়াও কোষাধ্যক্ষ শ্রীঅতুল্য ঘোষ সম্মিলনে উপস্থিত ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশকংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় তথায় পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্ত সমস্তার অস্ত্রাস্ত্র সকল রাজ্যের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ভারতের সকল রাষ্ট্রেই কংগ্রেস মন্ত্রিসভা প্রতিষ্ঠিত—কাজেই প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতিগণের মিলনে সকলের উপকার হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যায়।

হুর্গেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—

বর্তমান জেলার আত্মই গ্রামের অধিবাসী ও কলিকাতার প্রসিদ্ধ গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারক হুর্গেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গত ৩রা জ্যৈষ্ঠ ৮৪ বৎসর বয়সে তাঁহার ৬৬ কৈলাস বহু ষ্ট্রীট, কলিকাতা বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। কোমরগর নিবাসী স্বর্ণত শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা হেমন্তকুমারীকে তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন। তিনি বঙ্গদেশী আন্দোলনের সময় হইতে দেশসেবক ছিলেন ও উপার্জিত বহু অর্থ দেশের কল্যাণকার্যে ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্ত্রী, তিন পুত্র, ৬ কন্যা প্রভৃতি বর্তমান।

তেজাল-বিদ্ভাট



সরকারী-আদালতের বিচারক : বটে! বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলে!...জানো, ফৌজদারী আইনে আত্মহত্যা করা গুরুতর অপরাধ! এ অপরাধের সাজা...

বাঙালী-গৃহস্থ : আজ্ঞে...কি করবো বলুন হুজুর! ঘরে চাল নেই, তেল নেই, মাছ নেই, দুধ নেই, শাক-সব্জী, তরী তরকারীর দামও আগুন...হাতে পরসাত নেই এমন যে বৌ-ছেলেমেয়েগুলোর মুখে ছ'বেলা ছ'মুঠো অন্ন জোগাই। তাই লজ্জায় দুঃখে দ্বিধের আলার মরবো বলে বিষ খেয়েছিলুম! কিন্তু এমনই দিনকাল—যে 'বিষেও তেজাল মিশিয়েছে!...শেষ পর্যন্ত প্রাণে তো মরলুম না...উপরন্ত, বিষ-খাওয়ার অপরাধে পেরানার পাকড়াও করে টেনে আনলো এই সরকারী আদালতে!

শিল্পী—পৃথ্বী দেবশর্মা

দ্রাণী



গান

(মিশ্র কাহাব্বা)

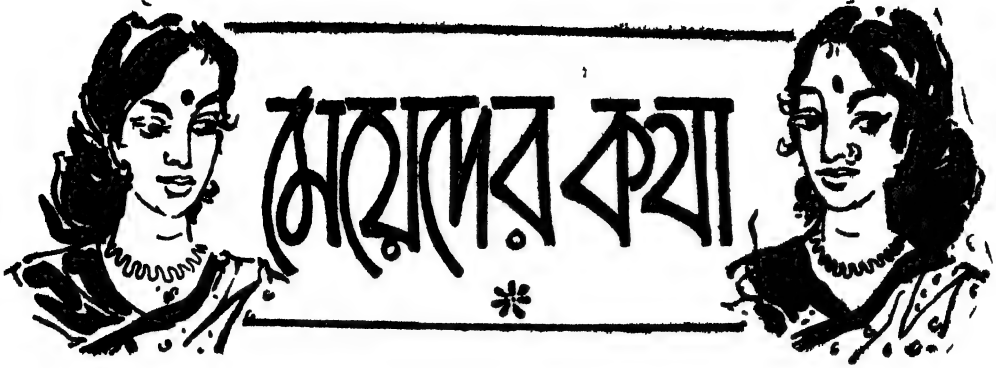
দূর হ'তে শুধু গান ভেসে আসে
তোমারে দেখিনি চোখে
অবগুঠনে আছি কি লুকায়ে
অপকণ মায়া লোকের ।
তুনি দূর থেকে নপুরের তান
তুনি কান পেতে কণ্ঠের গান
কুরাশায় তব মুখটি দেখিনা
দূর থেকে তারি ও কে ।

দূরে থাকিলেও তোমার প্রাণের
স্বধা যে গো মোরে টানে
কখনো সে ডাকে মধুর হাসিতে
কহু সে বেদনা হানে —
আশা নিরাশার আগায় যে দোল
তব মুখ চেয়ে পবাণ উত্তোল
আকাশের চাঁদ টেনেছে সাগরে
জোয়ার যে মরলোকে ।

কথা—অখিল নিয়োগী :

স্বর ও স্বরলিপি : ক্রিষ্ণ দাশগুপ্ত

॥ পা-সাঁ সাঁ না । সাঁ-সাঁ-না-সাঁ । -১ -পগা-সঁগা-প্যা । জমা-পমা-জা-রা ।
• দূ র হ তে • শু ধু • গা নু ভে লে • আ সে
-১ -গা-সা-সা । -১ -রা-গা-মা । জমা-জা-রা-পা । -১ -১ -১ -১ ।
• তো হা রে • দেখি নি চো • খে • • • •
সা-গা-মা-দা । পা-পা-পা-১ । পা-দা-গা-সাঁ । পা-দা-পা-মা ।
অ ব গ ণ্ঠ • নে • আ হ কি লু কা • রে



“শিকার সমস্যা”

(আলোচনা)

সুচিত্রা রায়

গত “প্রাচীন” সংখ্যায় শ্রীমতী শৈল চট্টোপাধ্যায়ের ‘শিকার সমস্যা’ প্রবন্ধটি আজকালকার যুগের মননশীল ব্যক্তিমাত্রকেই তাবিye তুলবে। এর কারণ, লেখিকা দেশের নারী-শিকার পদ্ধতিতে যে-সব গলল রয়েছে সে সকলের নরুপ তুলে ধরেছেন। আমি তাঁর সঙ্গে যদিও অনেক বিষয়েই একমত, তবুও কয়টি কথা এলায় লোভ সংবরণ করতে পারছি না।

লেখিকা আধুনিকাদের সমালোচনা সমাপ্ত করে খুব জীত হয়ে বলেছেন: “এই প্রবন্ধটি পড়ে আমার অনেক পাঠিকা বোনেরই বহিম জু হয়ত কৃকিত হবেই শুধু নয়। সনাতনপন্থী বলে অনেকেই হয়ত আমাকে বিক্রপও করবেন।” লেখিকা যে ধরণের তথ্য সরবরাহ করেছেন তাতে যে তিনি সনাতন সমাজের নন, বরং শিকিত আধুনিকাদের দলেই একজন, তা আমরা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করতে পারি। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে বরং শিকিতা ও আধুনিক হয়েও আধুনিকাদের প্রতি তিনি এত বিগত-স্বা কেন তাই একমাত্র চিন্তার বিষয়। খুব সম্ভবত:

আজকালকার আধুনিকাদের পক্ষে যে বুদ্ধ, শংকর, চৈতন্য দ্বরে থাক, রামমোহন, বিজ্ঞানাগর, গান্ধী, রবীন্দ্র-নাথ, আভুতোষ, প্রফুল্লচন্দ্র, জগদীশচন্দ্র, স্বতাবচন্দ্রদের যত স্ব-সম্মানদের জন্মান করা সম্ভব হচ্ছে না, সেটাই তাঁকে সবচেয়ে বেশী চিন্তাকুল করে তুলেছে। কিন্তু আমার সন্দেহ হচ্ছে তিনি তুলে গিয়েছেন, শুধু সাধক প্রফুল্ল, প্রব, বীণ, কবীর, যে সমাজ ও যে ধরণের ঘরে জন্ম নিয়েছিলেন তাতেই প্রমাণিত হয় কোন রকমের কদাচারই মহামানবের আবির্ভাবকে আটকে রাখতে পারে না। রাজা রামমোহন রায়ের কথাই তালুন। তিনি যে সমাজ ও সংসারে জন্ম নিয়েছিলেন, তা তাঁর ব্যক্তিত্ব বিকাশের পক্ষে সহায়ক তো ছিলই না, বরং প্রতিকূল ছিল। তবু রামমোহন এসেছিলেন—তবু রামমোহন আসবেন। শৈল দেবীর এ বিষয়ে নিরাপ হওয়ার বিন্দু-মাত্র কারণ নেই।

ধর্মজ্ঞান বিবর্জিত বিদেশী শিক্ষার যে একশ্রেণীর উচ্ছৃঙ্খল তরুণ-তরুণীর উদ্ভব ঘটছে তা অবশ্যই

এই বিভাগে প্রকাশিত প্রবন্ধাদি সব্বদে কোনও পাঠিকার যদি আলোচনা করতে চান, তবে “যেহেতু কথা” বিভাগ, “ভারতবর্ষ” পত্রিকা, ২০ পৃষ্ঠা ১ বিধান সব্বদী—এই ঠিকানায় প্রবন্ধাদি বরং কথার, পরিষ্কার করে লিখে পাঠাবেন।

—সম্পাদক

বীকার্য। কিন্তু আমি শৈল দেবীকে অস্বস্তি করছি।
 কিছুদিনের মধ্যে হাজি-সমাজের হাজি-সমাজের কথা
 একই শরণ করতে। শৈল দেবী হাজি-সমাজের
 উচ্চ অলতা উৎকালীন প্রাচীনদের চোখেও বড় বিসদৃশ
 টেকেছিল। তবু তাঁদের মধ্য থেকেই তো আবির্ভূত
 হয়েছিলেন মধুসূদন, কৃষ্ণ প্রভৃতি। আজকালকার 'টুইট'
 ও 'শেক' ভ্যানসারদের মধ্য থেকেই আগামীকালের মধু-
 সূদন বেরিয়ে আসবে সে কথা আমি বলতে চাই না। শুধু
 বলতে চাই—যদি মধুসূদনের আবির্ভাব ঘটবার মুহূর্ত এলেই
 হায়, তখন এই উচ্চ অল পরিবেশ তাকে প্রতিহত করতে
 পারবে না—এই অশালীনতার মধ্যে থেকেই সে জন্ম নেবে।

শৈল দেবী যেসব আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে
 চেয়েছেন সে সবই আমাদের কোন বক্তব্য নেই।
 কিন্তু পশ্চিমীশিকার প্রতি তিনি যেরূপ মনোভাব
 ধারণ করেছেন তা কিন্তু লম্বর্নন যোগ্য নয়। পাশ্চাত্য-
 শিকা নিয়ে এসে যদি কেউ নীতিগঠিত আচরণ করে
 থাকে, সেটাকেই তিনি পাশ্চাত্যশিকার দোষ বলে প্রমাণ
 করবেন কি করে? পাশ্চাত্য শিকা না পেলেও তো
 অনেক অশোভন আচরণ করে। তাছাড়া আমাদের
 এদেশের শিকারও যে অনেক দোষ জন্মে আছে এ কথা
 তো অনস্বীকার্য। শৈল দেবী নিজেও তো বলেছেন যে,
 এ দেশের শিকাতেও অনেক সময় 'শিব গড়তে বাঁধের
 গড়া'ই হচ্ছে। সুতরাং পাশ্চাত্য বা মিশনারী খুল
 কলেজের শিকাকেই এই নীতিগঠিত আচরণের জন্ম
 একান্তভাবে দায়ী করা যায় না। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে
 যে বিদেশী শিকারতনে শিক্ষিতা মেয়েরা তাদের শিকার
 দোষে বা দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যে বাঙ্গালী হিন্দুসমাজে
 অশান্তির সৃষ্টি করছে এ কথাও অস্বীকার করছি না।
 কিন্তু তবুও বলব—পাশ্চাত্য ধরণের শিকা বা বিদেশী
 শিকাই যে এই উচ্চ অলতার জন্ম একান্তভাবে দায়ী
 তা মনে করা অসম্ভব। ওবেশের শিকার কি ওবেশের
 দোষ বড় হচ্ছে না? বরঞ্চ বঙ্গব আদর্শের চেয়েও
 অনেক অনেক বেশি গুণেই তারা গুণাবিত হয়ে উঠেছে
 এবং শিকার ক্ষেত্রেও বহুদূর এগিয়ে আছে। তবে
 অস্বাস্থ্য, দুর্নীতি, আর অপস্বাস্থ্য-প্রবণতার আদর্শের
 পাশ্চাত্যের তুলনায় শিকার নেই।

তাই আজ সমাজে শান্তি নেই, প্রতিটি মানুষ যেন
 দেশলাইয়ের বাজ আর কাঠি, কোন রকমে একই ধরা
 লাগলেই আগুন জলে উঠেছে। এর কারণ কি? কারণ
 নিশ্চয়ই আছে। দেশের চিত্তাশীল মন-নারীকে আজ সে
 কারণ ও তার প্রতিকারের পথ খুঁজে বার করতেই হবে।

প্রসূতি-পরিচর্যা ও শিশুমঙ্গল

কুমারেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম.বি

৪

প্রসূতি-অবস্থায় মহিলাদের জন-ক্ষীতি গর্ভসঙ্গারের
 আরেকটি লক্ষণ। গর্ভে জন্ম-আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে
 মহিলাদের বিবেচনাবে প্রথম প্রসূতির জনস্বয় বাতাবিক
 অবস্থার চেয়ে আকারে অপেক্ষাকৃত বড় ও ক্ষীত হয়ে
 ওঠে এবং এই সময়ে জনস্পর্শ করলেই অনেক অস্ব-
 বিস্তর ব্যথা অনুভব করেন। তবে সকলক্ষেত্রেই যে
 জনক্ষীতি এবং বেদনা-বোধের উপসর্গ দেখা দিলে,
 মহিলাদের গর্ভ-সঙ্গার হয়েছে বলে সিদ্ধান্ত করতে হবে—
 এ কথাটাও ঠিক নয়। কারণ, গর্ভ-সঙ্গার না হলেও,
 বহু মহিলাই অনেক সময় মাসিক-কৃত্তর পূর্বভাসকালে
 তাঁদের জন-স্বগলে এ-ধরণের ব্যথা-বেদনা অনুভব করে
 থাকেন। কিন্তু কোনো মহিলার মাসিক-কৃত্ত্যাব যদি
 একাধিকবার আট সপ্তাহ বন্ধ থাকে এবং সেই সময় তাঁর
 জন্মের বোটার চারিদিকে বাদামি-বড়ের বৃত্ত বা 'ভেলা'
 (Arcola) বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তাহলে সেটিকে গর্ভ-
 সঙ্গারের স্বস্পষ্ট-লক্ষণ হিসাবে ধরে নেওয়া যেতে পারে।
 প্রথম-প্রসূতির ক্ষেত্রে, জন্মের বোটার চারিদিকে এমনি
 ধরণের বৃত্ত বা 'ভেলা' বীতিমত স্বস্পষ্ট-প্রতীয়মান হয়ে
 ওঠে এবং গর্ভের জন্ম ক্রমশঃ পরিণত হয়ে ওঠার
 সঙ্গে সঙ্গে গর্ভস্থ জন-স্বগলও ধীরে ধীরে ভবিষ্যৎ-
 সন্তানের খাড়াপকরণ-প্রসূতির উদ্দেশ্যে ক্রমাগত ক্ষীত
 ও স্থগুই হয়ে বৃহৎকার ধারণ করতে থাকে। দ্বিতী-
 বিভাবিশারদ হুটিকিৎসকদের দ্বারা—প্রসূতির পক্ষে,
 এক-প্রকার, কৃত্ত্যাব মহিলাদের বেদন-বীতিমত 'বডি'

‘প্রেশিয়ান’ কাঁচুলী বা ‘বক-বন্ধনী’ ব্যবহার করেন, সেগুলি সাময়িকভাবে বর্জন করাই উচিত। কারণ, এমন অবস্থায় সর্বদা আঁটসাঁট বক-বন্ধনী ব্যবহার করা, প্রসূতিদের শারীরিক-বাহ্যের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর।

প্রসূতি-অবস্থায় মহিলাদের উদর-ক্ষীতি যে গর্ভ-সঞ্চারের অন্ততম প্রধান লক্ষণ—এ কথা সকলেরই জানা আছে। গর্ভাধানকালে প্রসূতি যখন চতুর্থ মাসে উপনীত হন, তখন তাঁর উদরের তলদেশাংশ (তলপেট) আকারে দিনে-দিনে ক্রমশঃ ক্ষীত ও বিঘাট হয়ে ওঠে এবং সরাকৃতি ‘মেছ-ভাগের’ বা বস্তুর অন্তর (Peleric Bones) উপরে মহিলাদের জরায়ুর অবস্থান ঘটে। ‘ছয়-মাসকালে জরায়ুর অবস্থিতি প্রসূতির নান্নিদেশে এবং আটমাসকালে সেটি থাকে গর্ভিণীর নান্নিদেশ ও বক্ষস্থির মাঝামাঝি-স্থানে।

এছাড়া প্রসূতি-অবস্থায় গর্ভস্থ-জন্মের নড়াচড়ার জুম্পে-স্পন্দন (Quickening) প্রথম অল্পকৃত হয়—গর্ভাধানের প্রায় আঠারো থেকে কুড়ি সপ্তাহ অর্থাৎ মোটামুটিভাবে অন্ততঃপক্ষে চার-পাঁচ মাস পরে। গোড়ার দিকে প্রসূতি গর্ভস্থ সন্তানের যত্ন-সন্দ নড়াচড়া-স্পন্দনের অল্পতর-উপলব্ধি করেন এবং দিনে-দিনে গর্ভের জন্ম-শিল্প ক্রমেই যত পরিণত হয়ে ওঠে আর প্রসবের স্তম্ভকণ এগিয়ে আসে, ততই এ-ধরণের নড়াচড়া-স্পন্দনের গতি-বেগ আগেকার চেয়ে আরো বেশী-বেশী, ঘন-ঘন ও জোরালো হয়ে উঠতে থাকে। প্রসূতিদের কাছে গর্ভস্থ-সন্তানের এই নড়াচড়া-স্পন্দনের অল্পকৃতি বিচিত্র-অশরূপ এক আনন্দময় অভিজ্ঞতা...অনাগত-শিল্পের আবির্ভাব-মুহূর্তের আশায়—আগ্রহে ঘন তাঁর নিরন্তর আহুল-বিতোর...রঙীন স্বপ্ন করনায় তরপুর হয়ে থাকে। এমন কি, গর্ভস্থ-সন্তানের এই অশান্ত-স্পন্দনের উপজীব, প্রসূতির পক্ষে অনেক সময় অসহনীয় এবং রীতিমত অস্বস্তিকর হয়ে উঠলেও, অপরিসীম ধৈর্যবলে অনাগত সন্তানের মেহময়ী জননী হিসাবে তাঁরা শারীরিক কষ্ট-দুঃখের সকল অস্থিবিধাই অকাতরে সহ্য করে চলে। কিন্তু এ-ধরণের অস্বস্তিকর-দুঃখ-অল্পকৃতিকালে, কোনো কারণে গর্ভস্থ-সন্তানের স্পন্দন-নীলা হঠাৎ বন্ধি বেশ কিছুদিনের অস্ত-নিস্তর হয়ে যায়, তাহলে অবিলম্বে অভিজ্ঞ-

ধাত্রী অথবা হুচিকিংসকের পরামর্শ গ্রহণ এবং প্রসূতি শারীরিক-বাহ্য সযত্নে তাঁদের উপদেশ মতো যত্নোপবি ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার। অন্যথায়, প্রসূতি গর্ভস্থ-শিল্প-উত্তরেরই সর্বশেষ ক্ষতি হবার সম্ভাব দেখা দিতে পারে।

প্রসূতি-অবস্থায় সচরাচর সকল মহিলাদের মতে মোটামুটিভাবে গর্ভস্থ-সন্তানের প্রসব-কাল কখন আসে সেটির পূর্বাভাস জানবার জন্য সর্বশেষ ঔৎসুক্য জাগে। এ তথ্যটি সব সময় সঠিকভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব হলেও, অভিজ্ঞ ধাত্রী এবং হুচিকিংসকেরা প্রসূতি এ গর্ভস্থ-সন্তানের বিবিধ শারীরিক-লক্ষণাদি পরীক্ষা ব পূর্বাভাসেই কাছাকাছি সময়টুকুর বধ্যবধ হৃদিশ দিতে পারে। ধাত্রী-চিকিৎসকের সহায়তা ছাড়াও, প্রসূতির প মোটামুটিভাবে সন্তান-প্রসবের কাল নির্ধারণের এ সহজ উপায় আছে। সে উপায়টি হলো—প্রসূতি মাসিক ঋতুস্রাব স্থগিত থাকার দিনটি থেকে দুইশত-ত দিন গণনা করে নেওয়া। যদিও গর্ভস্থ-সন্তান বেঁচে নেই নির্দিষ্ট-দিনেই ভূমিষ্ট হবে—এ কথা জোর করে যায় না, তাহলেও এইভাবে হিসাব কবে দেখে মোটামুটিভাবে একটা কাছাকাছি সময়ের আন্দাজ করা সম্ভব হয়। অর্থাৎ সেই সময়ের এক থেকে সাতদিনের মধ্যে প্রসূতির গর্ভস্থ-সন্তান যে ভূমিষ্ট হবে—সে সযত্নে কত স্থানান্তিত থাকা যায়।

প্রসবক্রমে প্রসূতিদের আরেকটি দরকারী কথা রাখা ভালো। সন্তান-সম্ভাবনার কারণ ঘটলেই অবি অভিজ্ঞ ধাত্রী এবং হুচিকিংসকের পরামর্শ গ্রহণ উচিত। ব্যক্তিগত-চক্ষুসাক্ষা, সাংসারিক-অস্থিবিধা ও আর্থিক অসুবিধার কারণে এ বিষয়ে আদৌ বিলম্ব বা গ লতী করা উচিত নয়...এসব অহেতুক-সঙ্কোচের ফলে, পর্যাপ্ত প্রসূতি এবং গর্ভস্থ-সন্তানের জীবন-বিপন্নতার আশঙ্কা আছে। কাজেই বধ্যসময়ে হুচিকিংস সাহায্যে প্রসূতির মাসিক ঋতুস্রাব বন্ধের তিন মাসের প্রাথমিক-পরীক্ষার ব্যবস্থাবস্থা করা একান্ত আব বাংসারিক-অস্থিবিধা কিংবা আর্থিক অসুস্থতার কারণে প্রসূতির পক্ষে নিজ-ব্যয়ে হুচিকিংসকের সহায়তা-লভবণর না হলে, যে কোনো প্রসূতি-সময়ে এই

পাঠালে গিয়ে প্রাথমিক-পরীক্ষার সুযোগ নেওয়া একান্ত-কর্তব্য। তাছাড়া প্রাথমিক-পরীক্ষার সময়, খাজী-চিকিৎসকের কাছে অকপটে প্রস্তুতির শারীরিক-বাস্তব্যের সব কিছু খুঁটিনাটি অবস্থার ও লক্ষণাদির পূর্ণ-বিবরণ খোলাখুলিভাবে অভিযুক্ত করা উচিত। এ সবকে এতটুকু স্কোচ বা দ্বিধার ভাব পোষণ করে স্ত্রীচিকিৎসার অন্তরায় সৃষ্টি করা কোনোমতেই যুক্তিসঙ্গত নয়। কারণ, গর্ভে সম্ভান-সম্ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে প্রসূতি বা ভারী-জননীর দায়িত্ব বৃদ্ধি পায় সবিশেষ এবং সেই গুরু-দায়িত্বভার স্মৃষ্টভাবে পালনের উদ্দেশ্যে অনাগত-শিশুর মাতাকে অভিজ্ঞ খাজী-চিকিৎসকের সুপারামর্শ ও উপদেশাহুসারে যথারীতি সকল রকম পরীক্ষার অস্ত্র সর্বতোভাবে প্রস্তুত থাকতে হয়। এ বিষয়ে এতটুকু অসাবধানতার প্রদর্শন দিলেই, অনর্থক বিপদ ডেকে আনা হবে। সুতরাং প্রসূতি-অবস্থায় প্রত্যেক মহিলার গোড়া থেকেই নিজের ও গর্ভস্থ-সন্তানের মঙ্গলের অস্ত্র যথোচিত সাবধানতা অবলম্বন এবং শারীরিক-সুস্থতার প্রতি সজাগ-দৃষ্টিদান ঐকান্তিক পালনীয় কর্তব্য। (ক্রমশঃ)



রূপচর্চা দেবী

রূপচর্চা-গ্রন্থকে ইতিপূর্বে মহিলাদের উপযোগী ঘরোয়া-ঘরপের সরল-সহজসাধ্য যে দৈনিক-ব্যায়াম পদ্ধতির আলোচনা করেছি, আশাততঃ তার বাকী ভাগগুলির প্রকাশের পথিক্রম দিই।



উপরের ৩নং ছবিতে ব্যায়ামের যে বিশেষ-ভঙ্গীটি দেখানো হয়েছে, মহিলাদের উদ্বাংশের পেশী, ধমনী ও স্নায়ু, পাক-বস্তু (Liver), মেরুদণ্ড, বস্তী এবং কন্ঠের পরিপুষ্টি-সাধনের পক্ষে সেটি প্রথম-উপকারী। প্রতিদিন অন্ততঃপক্ষে দশবার এ ভঙ্গীটি নিয়মিত-অভ্যাসের ফলে, নারী-দেহ ক্রমেই স্থায়-মৌলিকমণ্ডিত হয়ে উঠবে—অভিজ্ঞ পাক্ষাত্য-বাস্তব্যবিদেহা এই অভিমত পোষণ করেন। এই ব্যায়াম-ভঙ্গীটির অহুশীলন-পদ্ধতি হলো—সমস্তল-অঙ্গির উপর দাঁড়িয়ে, পা দুটিকে পাশাপাশি বিস্তৃতভাবে ছড়িয়ে রেখে ধীরে ধীরে নিশ্বাস গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে মাথা হেলিয়ে দেহের উদ্বাংশটিকে সামনের দিকে ঝুকিয়ে, ইংরাজী 'X' হরফের ছাঁদে বাম-হাতের আঙুলের ভগা সাহায্যে একবার ডান-দিকের পারের পাতার কিনারা স্পর্শ করবেন এবং কণকাল স্তর থেকেই ধীরে ধীরে প্রবাস-ভ্যাগের সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় মাথা ও দেহের উদ্বাংশ উপরদিকে উঠ করে পুনরায় সটান-বিধা হয়ে দাঁড়াবেন। তারপর কণকাল স্তরভাবে দাঁড়িয়ে থেকে, আবার আগের বারের মতোই ধীরে ধীরে নিশ্বাস-গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে মাথা ও দেহের উদ্বাংশ সামনের দিকে হেলিয়ে নীচু করে ইংরাজী 'X' হরফের ছাঁদে ডান-হাতের আঙুলের ভগা দিয়ে বাঁ-দিকের পারের পাতার প্রান্ত-নীচা স্পর্শ করবেন এবং আগের বারের মতো এবারও কণকাল স্তর থাকার পর, ধীরে ধীরে প্রবাস-ভ্যাগের সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় মাথা ও দেহের উদ্বাংশ উপরদিকে উঠ করে সটান বিধা খাড়া হয়ে দাঁড়া যেন। এসমিভাবে একবার বাঁ-হাতের আঙুলের ভগা দিয়ে ডান-দিকের পারের পাতার কিনারা স্পর্শ এবং

আরেকবার জান-হাতের আঙুলের ভগ্না দিয়ে বাঁ-দিকে
পায়ের পাতার কিনারা স্পর্শ...বার-বার এই নিয়মে
ব্যায়ামটি হুঁত ভাবে অভ্যাস করতে হবে।

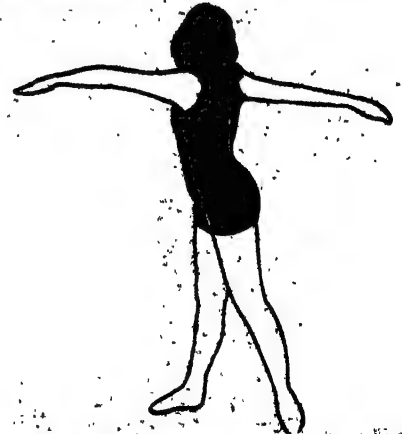


উপরের ৪নং ছবিতে বরাহা-ব্যায়ামের যে বিশেষ-
ভঙ্গীটি দেখানো হয়েছে, মহিলাদের পিঠ, বুক, পেট
ও কাঁধের পেশী-ধমনী স্তোম-সৌষ্ঠবমণ্ডিত করে তোলার
পক্ষে সেটি পরম-উপযোগী। এই ব্যায়াম-ভঙ্গীটির অহ-
শীলন পদ্ধতি হলো—ঘরের সমতল মেঝের উপর পা ছুটি
পাশাপাশি জেং তফাতে রেখে সটান সিধা খাড়াভাবে
দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে নিখাল নিয়ে মাথা নীচু করে দেহের
উর্দ্ধাংশটিকে সামনের দিকে হেলিয়ে, হাত দুখানি দুই
পায়ের মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গার ভিতর দিয়ে পিছনদিকে
সুপ্রসারিত করে দিল। এভাবে দাঁড়ানোর কণকাল
বাহেই পুনরায় ধীরে ধীরে নিখাল গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে
মাথা এবং দেহের উর্দ্ধাংশ নীচের দিকে হেলানো
অবস্থা থেকে ক্রমশঃ উপরদিকে উঁচু করে তুলে ইতিপূর্বে
যেমন সটান সিধা খাড়াভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন, সেই
ভঙ্গীটিতে ফিরিয়ে আনুন। এমনভাবে ব্যায়ামের ভঙ্গীটি
প্রতিদিন অন্ততঃপক্ষে দশবার নিয়মিত অহশীলন করা
হরকার।

৫নং ছবিতে ব্যায়ামের যে বিশেষ ভঙ্গীটি দেখানো
হয়েছে, মহিলাদের কোমর, বস্তীকেশ, পদবৃগল,
বাহুগল, জীবা ও ঝড়ের পেশী-ধমনী স্পষ্টস্বী গড়ে
তোলার পক্ষে, সেটি খুবই উপযোগী। ব্যায়ামের এই
বিশেষ ভঙ্গীটিও প্রতিদিন অন্ততঃপক্ষে দশবার নিয়মিত
ভাবে অহশীলন করা প্রয়োজন। এই ব্যায়াম পদ্ধতিটির
অহশীলন পদ্ধতি হলো—ঘরের সমতল মেঝের উপর সটান
খাড়াভাবে দাঁড়িয়ে, ধীরে ধীরে নিখাল-গ্রহণের সঙ্গে হাত



দুখানি উঁচু করে বাকিয়ে মাথার পিছনে রাখুন এবং
তালেতালে দক্ষিণ পদটিকেও ক্রমশঃ উপরদিকে
দক্ষিণবাহুর কনুইয়ের প্রান্তভাগ স্পর্শ করুন।
কণকাল স্তব্ব দাঁড়িয়ে থাকবার পর, পুনরায় ধীরে
নিখালগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণপদটিকে উপর
নীচে নামিয়ে, ইতিপূর্বে যেমন সটান খাড়া দাঁড়িয়ে
সেই ভঙ্গীটিতে ফিরে আনুন। অতঃপর বাঁ
উপরে তুলে ব্যায়ামের যে বিশেষ ভঙ্গীটি ধারণ করো
কণকাল স্তব্ব দাঁড়িয়ে থাকার পর, পুনরায় বাম
বাহুর সাহায্যে অহরূপ ভঙ্গীটির অহশীলন করুন।
এভাবেই অন্ততঃপক্ষে দশবার, একবার জানদিকের ও অ
বাঁ দিকের পর এবং বাহ উত্তোলন-অবতরণের
পুনরাবৃত্তি করতে হবে।



উপরের ৬নং ছবিতে ব্যায়ামের যে বিশেষ

খেঁখানো হয়েছে, মহিলাদের গোট, পিঠ, বুক, কাঁধ, শ্রীখা, কক্ষীদেশ ও বাহুগুলোর মেকআপ কমানো এবং পেশী, ধমনী সুপুট সৌষ্টবমণ্ডিত করে তোলার পক্ষে যেটি একান্ত উপযোগী। ব্যায়ামের এই ভঙ্গীটিও, প্রতিদিন অন্ততঃপক্ষে দশবার নিয়মিত অনুশীলন করা দরকার। এই ব্যায়াম পদ্ধতিটির অনুশীলন পদ্ধতি হলো—ঘরের সমতল মেঝের উপর সটান সিঁধা খাড়াভাবে দাঁড়িয়ে, ধীরে ধীরে নিখাল-গ্রহণ ও ত্যাগের তালে-তালে, দুই বাহু সুপ্রসারিত করে দেহের উর্দ্ধাংশটিকে একবার ডানদিকে এবং অন্যবার বাঁ-দিকে হেলাবেন। এভাবে হেলানোর সময়, দেহের উর্দ্ধাংশটিকে দক্ষিণে বা বায়ে—যেদিকে যখন হেলাবেন’ মুখটিকেও সেই তালের সঙ্গে তাল রেখে অনুরূপভাবে সেদিকেই হেলিয়ে দিতে হবে।

প্রবন্ধে উল্লিখিত সহজ-সরল ঘরোয়া-ধরনের এই ব্যায়াম-ভঙ্গীগুলির নিয়মিত-অনুশীলন অচিরেই স্থলাঙ্গী এবং কুশাঙ্গী—সকল শ্রেণীর মহিলাদেরই দৈহিক-সৌন্দর্য্য গঠনে যে বিশেষ সহায়তা করবে—সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই।

সাহায্যে রঙীণ-কাপড়ের জরিব-বুকে নৃতী-শিল্পের কাণ করে কুম-পাতা, পত-পক্ষী প্রভৃতি নানা ছাঁহের আলঙ্কারিক চিত্র (Decorative Motifs) রচনার প্রথা নিজস্বই ‘সেকলে’ এবং ‘শস্তা-খেলা’-জাতের কারুকলা হিসাবে উৎকৃষ্ট-অনাদৃত হলেও, পরী অঞ্চলের বহু ছোট-বড় গৃহস্থ-সংসারে এখনও এই অভিনব-শিল্পটির কিছু-কিছু নিদর্শন মেলে। সেই নিদর্শনগুলি দেখলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে হৃদয় শিল্পীর নিপুণ হাতের স্পর্শে সামান্য করেকরি মাছের আঁশ আর রঙীণ পুঁতি-চুমকীর সাহায্যে কাপড়ের বুকে কী অপূর্ণ-স্থলর আলঙ্কারিক-চিত্র রচনা করা সম্ভব! আজ থেকে প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগে, বাংলাদেশের ঘরে ঘরে এই ধরনের ‘মাছের আঁশের কারুশিল্পকলার’ ব্যাপক-অনুশীলন ছিল—সে নৃপতি একালের প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধদের অনেকেই হয়তো মনে আছে। কাজেই একদা বাংলার ঘরে ঘরে যে বিভিন্ন শিল্পকলার এতখানি প্রসার ছিল, সেই কারুশিল্পের পুনরনুশীলন একালের সৌধিন-কলারসিক সমাজে হয়তো নিতান্তই অংহেলিত হবে না—এই ধারণাতেই এবারের প্রসঙ্গটির আলোচনা করছি।

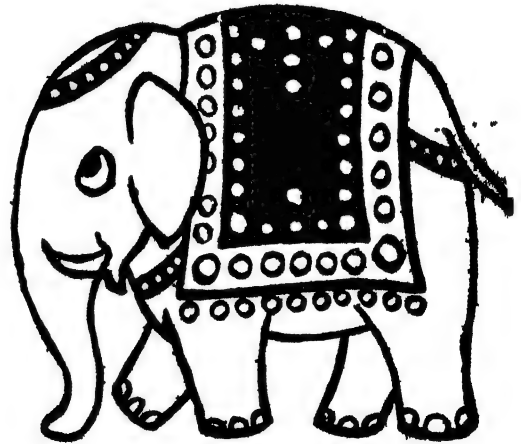


হাতের কাজ

মাছের আঁশের কারু-শিল্প

রুচিরা দেবী

এবারে অভিনব-ধরনের যে কারুশিল্পের কথা বলছি—সেটি আমাদের বাংলাদেশের মহিলাসমাজে বহুদিন আগেই প্রচলিত হয়েছে। আজকাল শহরের সৌধিন-



উপরে যে সহজ সরল নক্সার নমুনাটি দেওয়া হয়েছে, রঙীণ-কাপড়ের বুকে মাছের আঁশ আর পুঁতি-চুমকীর কাণ করে নিখুঁত-ছাঁহে তার প্রতিমূর্ণি-রচনা প্র একটা কঠিনসাধ্য এবং ব্যয়বহুল হাণ্ডার প্র...প্রসঙ্গ...প্রসঙ্গ...

কার্পিন সামগ্রী বানানো যেতে পারে। তবে শিক্ষার্থীদের পক্ষে গোড়ার দিকে জটিল-ধরণের আলংকারিক নক্সা-চিত্রণের বদলে কিছুদিন সহজ-সরল প্রতিলিপি-রচনার অঙ্গীকরণ করাই সুকৃতিযুক্ত। কারণ, কাঁচা হাতের তৈরী শিল্প-কাজে নানানু ক্রটি থাকারই সম্ভাবনা এবং তার ফলে, অল্প-বিস্তর আর্থিক-লোকসানও ঘটতে পারে। কাজেই কিছুকাল হাতে-কলমে কাজ করে মোটামুটি অভিজ্ঞ পারদর্শী হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এ-ধরণের কার্পিন রচনার কলা-কৌশলগুলি ভালোভাবে আয়ত্তাধীন হলে, তখন জটিল-নক্সা চিত্রণের দিকে দৃষ্টিদান করাই সমীচীন।

এ-ধরণের শিল্পকাজ করতে হলে, যে সব কলা-কৌশল পদ্ধতি জেনে রাখা দরকার—আপাততঃ তারই মোটামুটি ইঙ্গিত দিই।

কার্পিন-সামগ্রী রচনার কাজে হাত দেবার আগে, স্ফুটভাবে কয়েকটি একান্ত-আবশ্যকীয় প্রাথমিক-আয়োজন নেবে নেওয়া প্রয়োজন। প্রথমেই কার্পিনের উপযোগী নক্সাটিকে চুখু মনে মনে পরিকল্পনাই নয়, আগাগোড়া পরিপাটি হাঁদে প্রয়োজনমতো আকারে পরিষ্কার একটি কাগজের উপর পেন্সিল, কলম বা তুলির রেখা টেনে নিখুঁতভাবে এঁকে নিতে হবে। যারা নিজের হাতে ছবি আঁকতে পারেন, তাঁদের পক্ষে এ কাজটুকু এমন কিছু দুঃসাধ্য ব্যাপার হবে না। তবে যাদের ছবি-আঁকার দক্ষতা নেই, তাঁদের পক্ষে, প্রয়োজন ও পছন্দমতো হাঁদের কোনো ভালো নক্সা বেছে নিয়ে পরিচিত কোনো শিল্পীর লহারতায় সেটিকে অবিকল ‘ট্রেসিং (Tracing)’ বা ‘নকল’ (Copy) করে নেওয়াই সুকৃতিযুক্ত। কারণ, ‘মূল-নক্সাটি’ (Original Design) যদি নিখুঁত-পরিপাটি না হয়, তাহলে শেষ পর্যন্ত রঙের কাপড়ের অমিতে রচিত কার্পিন প্রতিলিপিটিও যে ক্রটিপূর্ণ ও অসুন্দর দেখাবে—দে কথ্য বলাই বাহুল্য। কাজেই মূল নক্সাটি যেন আগাগোড়া স্ফুট পরিপাটি এবং নিখুঁত হাঁদের হয়, অমন, ‘ট্রেসিং’ বা ‘নকলের’ সময় নৈদিকে সমাগ-দৃষ্টি রাখা দরকার।

কাগজের বৃক স্ফুটভাবে মূল নক্সাটির ‘খণ্ডা-চিত্র’ (Motif-chart) এঁকে নেবার পর, শিল্পকাজের উপযোগী পছন্দমতো রঙের কাপড়ের টুকরো বেছে নিয়ে, সেটির

উপর নক্সার প্রতিলিপিটিকে আগাগোড়া বহু নিখুঁত হাঁদে ‘ট্রেসিং’ করে ফেলুন। তাহলেই কাপড়ের বৃক নক্সার অবিকল ছাপ তোলায় কাজ চুকবে।

এবারে কার্পিন সামগ্রী রচনার সাঙ-সরঞ্জাম জোগাড়ের পালা। এ কাজে হাত দেবার সময় প্রথমেই সিদ্ধান্ত করে নিতে হবে—আসল শিল্পসামগ্রীটি রচনার জন্ত ছোট, বড় অথবা মাঝারি—কোন মাপের মাছের আঁশ ও কোন রঙের আর আকারের পুঁতি এবং চুম্বকি ব্যবহার করবেন। এ সবকিছু সচরাচর যে রীতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে, সেটির মোটামুটি ব্যবস্থা হলো—কই, কাতলা প্রভৃতি বড় মাছের আঁশের সঙ্গে বড় সাইজের পুঁতি ও চুম্বকি ব্যবহার এবং ছোট সাইজের মাছের আঁশের সঙ্গে অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের পুঁতি আর চুম্বকি বসিয়ে শিঁ কাজ করা—মাঝারি ধরণের মাছের আঁশের সঙ্গে অল্পরূপ ছাঁদের পুঁতি আর চুম্বকি গেঁথে দেওয়া। এছাড়া প্রয়োজনানুযায়ী মাছের আঁশ সংগ্রহেরও বিশেষ পদ্ধতি আছে। অর্থাৎ, প্রথমেই বাঁটিতে কুটে সবুজে মাছের আঁশ ছাড়িয়ে, সেগুলিকে আগাগোড়া পরিষ্কার জলে পরিপাটিভাবে ধুয়ে সাক্ষর করে নিতে হবে। এভাবে ধুয়ে সাক্ষর করে নেবার পর, চূর্ণের জল ভর্তি একটি পাত্রে মাছের আঁশগুলিকে অস্ততঃপক্ষে পুরো একদিনকাল বো ভালোভাবে ভিজিয়ে রাখবেন। চূর্ণের জলে ভিজিয়ে রাখার ফলে, মাছের আঁশগুলি আগাগোড়া বেশ নর হয়ে যাবে এবং আঁশের আঁশ-টোংগছও সম্পূর্ণ ভিরোহি হবে। মাছের আঁশগুলি নরম ও গন্ধহীন হয়ে যাবার পর, সেগুলিকে পুনরায় গরম জলের পাত্রে চুবিয়ে রেখে ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে নেবেন। তাহলেই মাছে আঁশগুলি শিল্পকাজের উপযোগী হয়ে উঠবে। তবে এতটা বারবার ধোয়ারধুরির আর সাক্ষরতরোর ফলে, মাছে আঁশগুলির চেহারা ক্রমেই সুকোমর মতো স্বকৃৎক শা হয়ে উঠবে। কেবলমাত্র শাফা রঙের মাছের আঁশ ব্যবহার করলেও কার্পিনের সামগ্রী রচনা সম্ভব—তবে প্রয়োজ বোধে মাছের আঁশগুলিকে বেশ কিছুকণ বিভিন্ন ধরনের রঙ-গোলা জলের পাত্রে চুবিয়ে সেগুলিকে ইচ্ছামতো রঙ করে তোলা যায়। মাছের আঁশগুলিকে রঙীণ-ক চুবিয়ে নেবার জন্ত সর্বদা কাপড়-ছোপারোয় উপরে

তালো এবং পাঁকা-রঙের ড্রডো ব্যবহার করাই উচিত।
এ ব্যবহার কলে, মাছের আঁশের গারে রঙের ছোপ
দীর্ঘস্থায়ী হয়ে থাকে।

মাছের আঁশগুলিকে প্রয়োজনমতো রঙে পাঁকা পাঁকি-
ভাবে রাঙিয়ে নেবার পর, কাকশিল্পীর পছন্দ অনুসারে
কাপড়ের সঙ্গে মানানসই দেখার এমনি ছাঁদের ও রঙের
পুঁতি আর চুম্বকি জোগাড় করে নেওয়া আবশ্যিক। কিন্তু
স্থানান্তরের কারণে, এখানে সে সম্বন্ধে বিশদ-আলোচনা
করা সম্ভবপর নয়। তাই আগামী সংখ্যায় এ বিষয়ে
আলোচনা করবার বাসনা রইলো। (ক্রমশঃ)

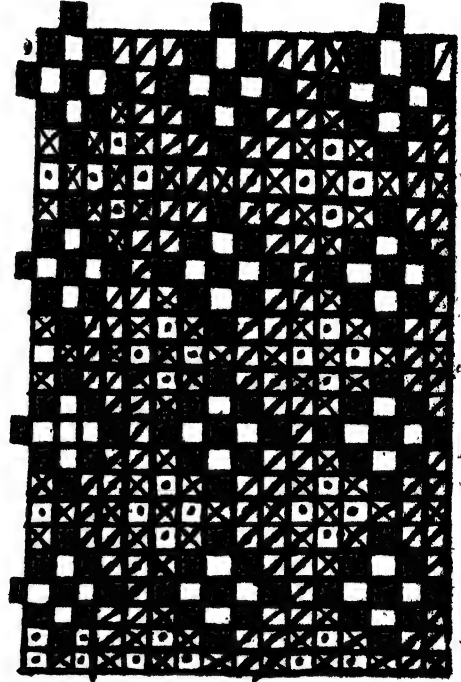


কাঁথা-সেলাইয়ের নক্সা-নমুনা

কল্যাণী মুখোপাধ্যায়

বাংলাদেশের কাঁথা-সূচীশিল্পের অপ্রসিদ্ধি বহু প্রাচীনকাল
থেকেই। অধুনা যান্ত্রিক-সভ্যতার আমলে, বাংলার
বিশিষ্ট লোক-কলা কাঁথা-সূচীশিল্পের পূর্ক-গৌরব অপেক্ষা-
কৃত ম্লান হয়ে এলেও, যুগযুগান্তব্যাপী অভিনব-ঐতিহ্যের
অবলান ঘটেনি। শহরের সুসভ্য-সৌখিন পাশ্চাত্য-
রীতি-অনুকারী আধুনিক-সমাজে দেশী-বিদেশী মিলের
তৈরী সামগ্রীর সস্তা-জৌলুশের মোহ আর কদর বেগী
হলেও, বাংলার পরী-অঞ্চলে সাধারণ গৃহস্থ-সংসারে কাঁথা-
শিল্পের সমাদর আলো বজায় রয়েছে বলেই, জাতীয়
শিল্প-কলার অগ্রগামী সূচীশিল্প-নিপুণা মহিলাদের
অহুসীলনের উদ্দেশ্যে এখানে হৃদয়-হৃদয় কাঁথা-সেলাইয়ের
একটি সহজসরল অথচ বিভিন্ন-অভিনব ছাঁদের নক্সা-
নমুনা সাদরে উপহার দিতে অগ্রসর হয়েছি। ঘর-সংসারের
দৈনন্দিন-কাজকর্মের অবসরে এ-ধরনের নক্সার কাঁথা
সেলাই করা খুব একটা চুঃসাধ্য বা ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার
নয়...এমন কি, নবীন সূচীশিল্প-শিক্ষার্থীরাও সামান্য

চেটাইতে নিজের হাতে সেলাইয়ের কাজ করে অনায়াসে
পরিপাটি ভাবে জাতীয় লোক-কলার এ সব অপূর্ণ সামগ্রী
রচনা করতে পারবেন।



উপরে যে নক্সা-নমুনাটি দেখানো হয়েছে, সেটি একটি
একটি প্রমাণ-আকারের কাঁথার আংশিক-চিত্র মাত্র।

প্রয়োজনমতো মাপে সম্পূর্ণ-কাঁথাটি রচনার ক্ষেত্রে
উপরোক্ত আংশিক নক্সা-নমুনাটিকে কয়েকবার আড়াআড়ি
এবং লম্বালম্বিতাবে পুনরাবৃত্তি করে গেলেই খুব লম্বা
পছায় যে কোনো বড় আকারের সূচীশিল্প সাজানো
এটিকে ব্যবহার করা চলবে। তাছাড়া সূচীশিল্পের কাঁথা
করে শাদা কিম্বা রঙীন কাপড়ের বৃক উপরোক্তচিত্রিত
নক্সা নমুনাটি সূচিতে তুলতে হলে, সূচীশিল্পীর ব্যক্তিগত
কচি এবং অভিজ্ঞতার অনুসারে মানানসই ধরনের যে
কোনো রঙের সূতোর সাহায্যে—নক্সার প্রতিটি ঘর, ছা
আলাদা আলাদাভাবে বিভিন্ন রঙের সূতো দিয়ে কাপড়
বোনার ধরণে আগাগোড়া 'ভরাট' করে, কিম্বা 'এম্ব্রয়-
ডারী-সূচীশিল্পের' ধরণে কেবলমাত্র নক্সার রেখাগুলি
'লাইন' সেলাই দিয়ে রচনা করা যেতে পারবে। সময়ে
নিপুণত্বক্রীতে এ ছুটি পদ্ধতির যে কোনোটি অনুসরণ
বধ্যবধভাবে সূচীশিল্পের কাজটুকু শেষ করতে পারলে
ঘরে বলে নিজের হাতে রচিত এ-ধরনের বনোঁর-সুন্দর
কাঁথাগুলি ছোট-বড়, পরিচিত অপরিচিত সকল প্রজাতি

নর-নারীর কাছেই যে সবিশেষ সমাদরলাভ করবে—সে কথা বলাই বাহুল্য।

প্রসঙ্গক্রমে, একটি কথা বলে রাখা প্রয়োজন। স্টুডী-শিল্পের কাজে যারা পারদর্শিনী, তাঁদের পক্ষে এই ধরনের সহজ সরল নক্সাদার রঙীন কাঁথা রচনা করা আরো অস্বাধিকার নয়। কিন্তু যারা নবীন শিক্ষার্থিনী—তাঁদের কাজের স্ববিধার জন্য উপরের নক্সা নমুনাটি বিভিন্ন রঙের সূতো ব্যবহারের 'সঙ্কেত চিহ্ন' হিসাবে প্রত্যেকটি 'ঘর' আলাদা আলাদাভাবে হ্রস্বিদ্ধি করে দেখানো হলো। আশা করি, এই 'সঙ্কেত চিহ্নের' হিসাব অনুসারে, মানান-সই রঙের কাপড়ের উপরের শিল্পীর ব্যক্তিগত ক্রটি ও অভিজ্ঞতারমতো ব্যাবধভাবে বিভিন্ন মানানসই-রঙের সূতো ব্যবহার করে নবীন শিক্ষার্থিনীরা অনায়াসেই বিভিন্ন নক্সাদার কাঁথা রংনার কাজে তাঁদের নিজস্ব শিল্প প্রতিভার সুযোগ পরিচর দিতে পারবেন।

বাঁদাঙের বাংলার বিশিষ্ট লোক-কলা স্টুডীশিল্পের আরো করেকটি নতুন নতুন নক্সার নমুনা উপহার দেবার বাসনা রইলো।



সুখীরা হালদার

এবারের বলছি—বাংলাদেশের বিচিত্র-স্বভাব বিশেষ এক-ধরনের মিটার রান্নার কথা। এ মিটারটির নাম—'কুমড়োর মালপোয়া'। প্রিয়জনদের পাতে পরিবেশনের পক্ষে, এ মিটারটি শুধু অভিনবত্বের দিক দিয়েই নয়, ঠিক রমতো পাক করলে, খেতেও অপকরণ মুখরোচক হিসাবে সবিশেষ উপযোগ্য হয়ে উঠবে।

চার-পাঁচ জনের আহ্বারোপযোগী অভিনব এই 'কুমড়োর মালপোয়া' মিটার রান্নার জন্য উপকরণ চাই—আখসের কুমড়া, একপোয়া চিনি, একমুঠো ময়দা কিংবা আটা, দোটা চার-পাঁচ ছোট এলাচ সামান্য কিছু মৌরী এবং প্রয়োজন মতো পরিমাণে অন্ন একটু ঘি।

উপকরণগুলি সংগ্রহ করার পর, রান্নার কাজে য দেবার আগে কুমড়োর খোসা ছাড়িয়ে নিয়ে ছোট্ট রে টুকরো করে কুটে খলে ধুয়ে-নিন। এ কাজে সাব্বা হ মৌরী আর ছোট এলাচগুলিকেও খলে ধুয়ে পরিষ্কার করে ফেলুন।

এবারে উনানের আঁচে রন্ধনপাত্র চাপিয়ে কুমড়ে টুকরোগুলিকে আগাগোড়া হ্রস্বিদ্ধ করে নিন। কুমড়ে টুকরোগুলি ভাঙোভাবে শিদ্ধ হয়ে গেলে, সেগুলি রন্ধন-পাত্রের ফুটন্তজল থেকে তুলে লম্বা এক পরিষ্কার পায়ে সরিয়ে রাখুন। অতঃপর পুনরায় উনা আঁচে ডেকচি চাপিয়ে, সেই ডেকচিতে আন্দাজমা পরিমাণে খানিকটা জল ও চিনিটুকু মিশিয়ে 'মিশ্রণটি' কিছুক্ষণ ভালোভাবে ফুটিয়ে চিনির রস পাক করে নি-এভাবে পাক করার কলে, চিনির রসটুকু প্রয়োজনমত ঘন-ভরলাকারে হয়ে উঠলেই, ডেকচিটিকে উনানের উ থেকে নামিয়ে নিয়ে লম্বা মালপোয়া সরিয়ে রাখুন।

চিনির রসটুকু স্ফুটভাবে পাক করে নেবার পর, ই পূর্বে হ্রস্বিদ্ধ করে তুলে-রাখা কুমড়োর টুকরোগুলি হাতের তালুর সাহায্যে আগাগোড়া বেশ মিহিভাবে চট 'মণ্ড' (Pulp) বানিয়ে ফেলুন। এবারে এই হ্রস্বিদ্ধ কুমড়োর-মণ্ডের সঙ্গে মৌরী, ছোট এলাচের দানা এ আটা কিংবা ময়দা মিশিয়ে পুনরায় ভালোভাবে চট য়ে নিন। তাহলেই মালপোয়া-রান্নার 'মিশ্রণ'-রচনা কাজ শেষ হবে।

'মিশ্রণ' রচনার পর, মিটার-রান্নার পালা। রাত কাজ শুরু করতে হবে—উনানের আঁচে রন্ধন-পাত্র চাপি সেই পাতে প্রয়োজনমতো পরিমাণে ঘি ফুটিয়ে নি-আগুনের উত্তাপে ঘিটুকু বেশ তরল ও ফুটন্ত হয়ে উঠা রন্ধন-পাত্রের একের পর এক মালপোয়ার আকারে রান্না কুমড়োর 'মিশ্রণ'গুলিকে ছেঁড়ে কিছুক্ষণ খুঁটির সাহায্যে নাড়াচাড়া করে, সেগুলিকে বেশ ভালোভাবে ভে নিন। ফুটন্ত-ঘিয়ে এভাবে তাজার কলে, মালপোয়া আকারে টুকরোগুলি আগাগোড়া বাহারী রঙের হয়ে উঠা সেগুলিকে খুঁটির সাহায্যে লম্বা রন্ধন-পাত্র থেকে তুলে নিয়ে চিনির রসে পাতে চুবিয়ে রাখুন। অতঃপা আরম্ভকাল চিনির রসের চুবিয়ে রাখার কলে, কুমড়ে মালপোয়ার প্রত্যেকটি আগাগোড়া শিউল ও বেশ শিদ্ধ হয়ে উঠলে, মিটারটি প্রিয়জনদের পাতে পরিবেশ করবেন।

এই হলো 'কুমড়োর মালপোয়া' রান্নার রোটা-নীতি।

পাট ও পাঁচ

শ্রী‘শ’—

॥ পরিবেশের পরিবর্তন ॥

অধুনা ভারতীয় চলচ্চিত্রে একটা নতুন ধারার দেখা পাওয়া যাচ্ছে। গতাহুগতিক ছুঁড়িও অভ্যন্তরের দৃষ্টের মাধ্যমে চিত্র-গ্রহণের রীতির একেবারেই চিত্র-নিখাতাদেরও বোধ হয় স্পর্শ করেছে। তাই আজকাল প্রায়ই ভারতীয় চিত্রে বহিদৃষ্টের দর্শন দর্শকেরা পাচ্ছেন।

আর, ডি, বনশল নিবেদিত ও বিহু বর্ধন পরিচালিত ‘মুন্সী ফাইনালিস-মাস’ এন্টারপ্রাইজেন্স-এর “হুই পর্ব” চিত্রে নবাগত সুরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও জ্যোত্স্না বিশ্বাস।



প্রযোজক-পরিচালক-অভিনেতা রাজকাপুরের সম্প্রতি মুক্তিপ্রাপ্ত রবিন, ব্যরবহল, স্বদীর্ঘ চিত্র “সঙ্গম”ই এই দিক থেকে ভারতীয় চিত্রঙ্গতে সীর্ষস্থান অধিকার করল। ভারতীয় চিত্রে বহিদৃষ্টের প্রচলন থাকলেও সাগর পারের ইউরোপ প্রভৃতি দেশের দৃষ্ট এবং সেই পরিবেশে ভারতীয়

অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অভিনয় বড় একটা দেখা যায় না। এর প্রধান কারণ হচ্ছে ব্যরবাহল্য। অল্প স্বযোগ, সুবিধা প্রভৃতি অল্প নানা কারণও আছে। সেই সব অসুবিধার অপসারণ করে, ব্যয়ের দিক দিয়ে নতুন আঙ্গিকের দিক থেকে, চিত্র-গ্রহণের ব্যাপারে এক গটভূমিকার নতুনযে “সঙ্গম” ভারতীয় চিত্র-ঙ্গতে নতুন যুগের সূচনা করেছে বলা চলে। রাজকাপুরের এই প্রচেষ্টা প্রশংসার।

বাংলা চিত্রেও আজকাল এই পরিবেশের পরিবর্তন প্রায়ই দেখা যাচ্ছে। গৃহাভ্যন্তরের একেবারে কথপো-কথনের বদলে আজকাল প্রায়ই রাজপথের চিত্র, পল্লীর দৃষ্ট, নদী-নালা-সমুদ্র-পর্বত-বনানীর ছবি পর্দায় ফুটে উঠে দর্শকচক্ষু তৃপ্ত করেছে। কিন্তু এখনও প্রযোজনের তুলনায় এসব দৃষ্ট অনেক কম দেখান হয়ই শুধু নয়, অনেক সময়

চিত্রগ্রহণের অপটুতার দৃষ্টান্তলিও ঠিক যত ফুটে উঠতে পারে না। এ বিষয়ে ক্যামেরার কাল আরও নিখুঁত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাছাড়া আগেই বলেছি ব্যরবাহল্যের কথা। বাংলা চিত্রের নিখাতারা বিরাট ব্যরবহল বহিদৃষ্ট সন্ধানিত চিত্র বহি নির্মাণ করতে পারেন, তাহলে বাংলা গল্পের

শ্রেষ্ঠ, বাঙালী শিল্পীদের অভিনয় কুশলতার এবং বাঙালী পরিচালকের নৈপুণ্যে তা ভারত তথা বিশ্বের অল্পতম শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্ররূপে পরিগণিত হতে যে পারবে এ বিশ্বাস আমাদের আছে। বাংলা চিত্র-নির্মাতারা আশা করি এ বিষয়ে অবহিত হবেন এবং বিদেশী চিত্রের দিকে লক্ষ্য রেখে বাংলা চিত্রের পরিবেশের বা পটভূমিকার নামাঙ্কন পরিবর্তন সাধন করে ও নতুন আনয়ন করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন।

স্বাভাবিক সর্বস্বত্বাধারী ও বাংলা চলচ্চিত্রের এই পরিবেশের পরিবর্তনের প্রাথমিক প্রচেষ্টার অল্প চিত্র-নির্মাতাদের অভিনয়ন আনন্দি ও তাঁদের এই স্ব-প্রচেষ্টার উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

প্রথম অধ্যায়

সমাজিক রায় তাঁর পরবর্তী যে ছবিটি তৈরীর পরিকল্পনা করেছেন তার নামকরণ করা হয়েছে “কাপুরুষ ও মহাপুরুষ”। ছ’টি গল্প নিয়ে এই চিত্রটি রচিত হবে। প্রযোজনা করবেন আর, ডি, বনশল।

এই চিত্রের প্রথম অংশ অর্থাৎ ‘কাপুরুষ’ অংশ তৈরী হবে প্রথমে মিত্র রচিত “অনেক কাপুরুষের কাহিনী” অবলম্বনে, আর দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ “মহাপুরুষ” অংশ তৈরী হবে প্রবন্ধরায় রচিত “বিবিকিণা” গল্প অবলম্বনে।

প্রযোজকের তিনটি মূখ্য চরিত্রে অভিনয় করবেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, রাধাবী মুখোপাধ্যায় ও হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়। আর দ্বিতীয় অংশের প্রধান চরিত্রগুলিতে অবতীর্ণ হবেন চাক্রপ্রকাশ ঘোষ, রবি ঘোষ, রেণুকা রায়, শীতালি রায় প্রভৃতি।

যে চারণ কবি একদা নারা বাংলাদেশকে বোশাখুদ্রোখে টেনে নিয়ে ফুলেছিলেন, সেই মুহূর্তসময়ের জীবনী অবলম্বনে “চারণ কবি মুহূর্ত হাস” নামে একটি ছবির কাজ শীঘ্রই শুরু হবে। ‘কিন্মা ক্লাসিক’ ছবিটি নির্মাণ করবেন এবং

পরিচালনা ও সুরারোপের দায়িত্ব নিভ্রহেন বখাজমে নির্মল চৌধুরী ও পবিত্র চট্টোপাধ্যায়।

এই চিত্রে মুহূর্ত হাসের গাওয়া গানগুলিতে কণ্ঠদান করবেন সবিভাবত দত্ত ও নির্মল চৌধুরী এবং ছবিটির নামভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন সবিভাবত দত্ত।

শোনা যাচ্ছে বৈজয়ন্তীমালা ও রাজেন্দ্রকুমার দ্বিজই বাংলা চিত্রে অভিনয় করবেন। প্রযোজক আর, ডি, বনশলের একটি বাংলা ছবিতে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে অভিনয় করবেন বৈজয়ন্তীমালা এবং বনশলের অপর একটি বাংলা চিত্রে রাজেন্দ্রকুমারের অভিনয়ের কথা আছে।

প্রযোজক দ্বিলীপ সরকারের পরবর্তী বাংলা ছবিটির নাম হ’ল ‘একটুকু ছোঁয়া লাগে’। বোকাইয়ে ছবিটি তোলা হবে এবং প্রধান তিনটি ভূমিকায় অভিনয় করবেন কিশোরকুমার, বিশ্বজিৎ ও আঞ্জরা।

প্রযোজক-পরিচালক কনক মুখার্জি তাঁর পরবর্তী যে ছবিটি নিবেদন করছেন তার নাম “মায়াবিনী লেন”। সঙ্গীতে কণ্ঠদান করবেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়।

সরচিত কাহিনী ও চিত্রনাট্য অবলম্বনে “মায়াবিনী লেন” ছবিটি প্রযোজনা ও পরিচালনা করবেন শ্রীমুখার্জি নিজে। ছবির বিশিষ্ট চরিত্রগুলিতে আত্মপ্রকাশ করবেন বিকাশ রায়, হুলতা চৌধুরী, সন্ধ্যারাগী, নির্মলকুমার, অরুণ-কুমার, জহর রায়, তাহা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।

প্রযোজক বিজয় চট্টোপাধ্যায়কে এবারে পরিচালকের ভূমিকায় দেখা যাবে এবং যে চিত্রটি তিনি পরিচালনা করবেন সেটির নাম হচ্ছে ‘রঙের খেলা’। এর কাহিনী রচনা করেছেন শেখর চট্টোপাধ্যায় এবং তিনি স্বয়ং এ-ছবির একটি প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণও হবেন।

রবি ঘোষ, জহর রায় ও তাহা বন্দ্যোপাধ্যায় এই কয়েকটি চিত্রের অত্যন্ত বিশেষ ভূমিকায় অভিনয় করবেন।

‘দ্বন্দ্বীনারায়ণ শিকড়ান’-এর প্রথম ছবি ‘সুখা

শা'র শুভ-সূচনা উৎসব রাধা কিশোর টুডিওতে অহুত হয়ে গেছে।

ছবিটির চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন অর্ধেন্দু সেন। বল্লভ চৌধুরী ও লাবিট্রী চট্টোপাধ্যায় এই চিত্রের নায়ক-নায়িকা চরিত্রে অভিনয় করবেন। স্ব-যোজনা করবেন স্বধীন দাশগুপ্ত।

গত ১৫ই আগস্ট ক্যালকাটা হুটিটন, ইন্ডি কল্লনা প্রোডাকশনের প্রথম ছবি 'লভার বর্ষ'র শুভ-অহুত হয়েছে। স্বরচিত কাহিনী অবলম্বনে ছবি পরিচালনা করবেন কল্লনা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং চিত্র এ সম্বন্ধে পরিচালনা ও সম্পাদনার দায়িত্ব বহন কর স্বাক্ষরে নির্মল গুপ্ত, কট বোবাল ও হুম্মার মুখোপাধ্যায়।



বার্লিন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে যোগদানকারি প্রযোজক আর, ডি, বনশল ও "বহানগর" চিত্র নায়ক অনিল চট্টোপাধ্যায়কে অভিনন্দন জানাচ্ছেন 'আর, ডি, বি'র সর্বাধ্যক্ষ বিমল দে

কৃষ্ণ কিশোরের "একটি নাটকী ঘটনা" নামে একখানি ছবির শুভ-সূচনা সম্প্রতি সম্পন্ন হয়েছে। ভারত মিত্র এবং আরতি মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে ছ'খানি গান প্রথমেই রেকর্ডিং করা হয়।

শৈলেন দে স্বচিত্র কাহিনী অবলম্বনে এই ছবিখানি পরিচালনা করছেন শব্দ দে।

"লক্ষ্য হীপের শিখা" চিত্রের কয়েকটি বহির্দৃষ্ট প্রহেলিকা পরিচালক হরিদাস ভট্টাচার্য তাঁর বলবল সহ কর্মী রচনা হচ্ছেন।

শিল্পীদের মধ্যে তাঁর সঙ্গে থাকবেন হুটিটন'সে বিকাশ দাস, দিলীপ মুখোপাধ্যায় ও অনিল চট্টোপাধ্যায়।

পরিচালক তপন সিংহ বনকুল রচিত “হাটে বাজারে” কাহিনীটির চিত্ররূপ দেবেন হিন্দীতে।

ছবিখানি প্রযোজনা করবেন বোম্বাইয়ের প্রযোজক-অভিনেতা দিলীপকুমার।

দিলীপকুমারই সম্ভবতঃ এই চিত্রের নায়কের ভূমিকায় অভিনয়ও করবেন।

* * *

‘শুভকল্প চিত্রম’-এর ‘রূপ সনাতন’ ছবিটির চিত্রগ্রহণ শেষ হয়েছে এবং ছবিটি মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে।

শ্রীগোবিন্দদেবের প্রথম মস্ত্র দীক্ষিত রূপ ও সনাতনের কাহিনী অবলম্বনে এই ছবিটির গল্পাংশ ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং পরিচালনা করেছেন চঞ্চল পরিচালক সুনীলবরণ।

ছবিটির প্রধান চরিত্রগুলিতে অভিনয় করেছেন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিন গুপ্ত, জহর গাঙ্গুলী, নীতীশ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

* * *

চলচ্চিত্রকার অদ্বৈত ঘটক একটি ভোজপুরী ছবি নির্মাণ করছেন এ খবর আগেই দেওয়া হয়েছে। এই চিত্রটির নাম হচ্ছে—‘জাম সে নেহা লাগে’। রাজকুমার মৈত্রের লেখা একটি গল্প এই ছবিটির অবলম্বন।

শ্রীঘটক বলেছেন যে তাঁর ধারণা ভোজপুরী ছবির মধ্য দিয়ে দেশের মাটির কথা বলা যায়—ছবিতে এনে দেওয়া যায় সেই মাটির স্পর্শ। বর্তমানে কলিকাতার টুডিওতে ভোজপুরী ছবি তৈরি হওয়ার ফলে বাংলা দেশের কলাকুশলী এবং শিল্পীরা কাজ পাচ্ছেন—তিনি এই আশা প্রদ ব্যাপারটিরও উল্লেখ করেন।

ছবিটি কলিকাতার টুডিওতে নির্মিত হবে এবং প্রধান চরিত্রে অসীমকুমার রূপ দেবেন। শুটিং আরম্ভ হবে সেপ্টেম্বরে।

* * *

গুজরাটের প্রেক্ষাগৃহ সমূহে “অথও সোভাগ্যবতী” নামের গুজরাটি ছবিখানি বিনা প্রমোদ করে প্রদর্শিত হচ্ছে ৩০শে জুলাই থেকে।

গুজরাটের রমণীদেব ব্যাপক আকর্ষণত্যা—এই বৃহৎ সমস্যার পটভূমিকাতেই চিত্রটি নির্মিত হয়েছে। মহেশ

বেশাই এই ছবির নায়ক ও আশা পার্বেশ এর নায়িকা। প্রযোজনা করেছেন রাজা সইদা, আর পরিচালক হলেন মনোহর রাজকাপুর।

“অথও সোভাগ্যবতী”ই একমাত্র গুজরাটি ছবি, যা গুজরাটি সরকারের প্রমোদকর থেকে অব্যাহতি পেলো। গুজরাটি রাজ্যের এক জটিল সমস্যার পটভূমিকাতে ছবিখানি তৈরী হয়েছে বলেই হয়তো ছবিটি রাজ্যে প্রমোদকর থেকে অব্যাহতি লাভ করেছে।

* * *

যে নাটক দর্শনে একদা শ্রীরামকৃষ্ণদেব অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিলেন, মহাকবি গিরিশচন্দ্রের সেই “চৈতন্য-লীলা” নাটকটি গিরিশ সংসদ কর্তৃক পরিবেশিত হয়ে অসংখ্য দর্শককে বিমুগ্ধ করেছে।

এই “চৈতন্য-লীলা” নাটকটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে নাটকখানিকে পঞ্চাশটি গানে সমৃদ্ধ করা হয়েছে। সঙ্গীতমাংশে আছেন পবিত্র দে, হাপী চৌধুরী, কল্যাণী রায়চৌধুরী, মঞ্জু দে, পূর্ববী মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

* * *

বাংলা মঞ্চ ও চলচ্চিত্র জগতের প্রবীণ ও যশস্বী অভিনেতা নটেশ্বর নরেশচন্দ্র মিত্র তাঁর স্বর্ণতা সহধর্মিণী মুকুল মিত্রের স্মৃতি রক্ষার্থে একটি শযা স্থাপনের জন্ত, দরিদ্র বান্ধব ভাণ্ডার পরিচালিত বালানন্দ ব্রহ্মচারী সেবারতন টি, বি হাসপাতালে ৭,৫০০ টাকা দান করেছেন।

সেবাধর্মের জন্ত শ্রীমিত্রের এই দান বিশেষ প্রশংসনীয়।

* * *

দেবদেব দ্বিদেশদেব ৪

সত্যজিৎ রায়-রচিত “মহানগর” চিত্রটি নিউইয়র্কের বিভিন্ন বার্ষিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শনের জন্ত নির্বাচিত হয়েছে। আগামী ১৪ই থেকে ১৬ই সেপ্টেম্বর “মহানগর” ঐ উৎসবে প্রদর্শিত হবে। এই উৎসবের উদ্বোধনী করেছেন যে “মহানগর” সহ আরও তিনটি ইউরোপীয় চিত্রও নির্বাচিত হয়েছে এবং মোট নির্বাচিত চিত্র হচ্ছে এগারটি।

* * *

চেকোস্লোভাকিয়ার সংশ্লিষ্ট নাটক একাডেমি খাজা মহম্মদ আলীস রচিত, রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক প্রাপ্ত “শেহর

অপর 'সপনা' চিত্রটিকে পুরস্কৃত করেছেন। একটি বিশেষ অঙ্কঠানে একাভেরির রেজের প্রোফেসর এ, এম, ক্রসলি আকসাগের হাতে পুরস্কারটি প্রদান করেন।

* * *

কার্লোত্তি ভ্যারি চলচ্চিত্র উৎসবের সমাপ্তি হয়েছে। উৎসবের সর্বোচ্চ সম্মান পেয়েছে চেক চিত্র 'দি ভিকেন্ড্যাট'। মার্কিন বুদ্ধরাষ্ট্রের ছবি 'দি বেট ম্যান' উৎসবের বিশেষ পুরস্কারটি জয় করেছে। এই ছবিটির প্রধান চরিত্রে হেনরি ফন্ডার অভিনয়ও বিচারক-মণ্ডলীর বিশেষ স্বীকৃতি লাভ করেছে।

নীতিগত মূল্যের অল্প সোভিয়েট চিত্র "দি লিভিং অ্যাণ্ড দি ডেড" এবং শিল্প মূল্যের অল্প হাঙ্গেরির ছবি 'কারেণ্ট' উৎসবের আরও দুটি প্রধান পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছে।

শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার পেয়েছেন ক্রীমতী জেরান, মরো, ব্রুয়েল-কৃত 'দি ডায়ারি অফ এ চেম্বারমেড' ছবিতে অভিনয়ের অল্প এবং শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার

লাভ করেছেন পোলিশ চিত্র 'একো'র নায়ক তরিত মিনস্কি। রুম্যানিয়ার 'দি ট্রেন্সার' এবং স্পেনের 'স্পান্টেনিয়ার'—এই দুটি ছবির দুই ভরণ অভিনেতা ভেকান ইওরহান্ এবং লুই ফেরিন্ উৎসবে বিশেষ প্রশংসা অর্জন করেছেন।

* * *

হলিউডের একটি হাস্যপাতালে বর্তমানে রোগশয্যায় শায়িত বিখ্যাত হাস্যরসিক অভিনেতা ট্যান্ লরেল্ তাঁর অহুয়োগীদের কাছ থেকে প্রতিদিন প্রায় একহাজার করে চিঠি পাচ্ছেন। ট্যান্ লরেল্ এখন পঁচাত্তর বছরের বৃদ্ধ। অধুনায়ত অলিম্ভার হার্ডির সঙ্গে কোচুক অভিনয় করে লরেল্ হার্ডি জুটি বিশ্ববিখ্যাত হয়ে জনচিহ্নে হারী আসন দখল করেন। হার্ডি আগেই পরলোকগমন করেছেন, আর লরেলও আজ রোগশয্যায়। কিন্তু বিশ্বের চিত্রাঙ্গুরাগী জনতা তাঁদের ভোলে নি, তাই বৃটিশজাত এই কোণদেহী মাহুটি এখনও শত শত পত্রের মধ্য দিয়ে অহুয়োগীদের অভিনন্দন পেয়ে চলেছেন।

আগামী শাব্দীক্ষা (আশ্বিন) সংখ্যায় এঁদের এবং আরও অনেকের লেখা আপনারা পড়তে পারবেন :

গল্প লিখবেন :-

পৃথ্বীশ ভট্টাচার্য
হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়
মায়া বসু
শক্তিপদ রাজগুরু

নরেন্দ্রনাথ মিত্র
অখিল নিরোগী
কানাই বসু
প্রব্রজ রায়

বীরেন্দ্রনারায়ণ রায় (শিকারকাছিনী), প্রভৃতি

প্রবন্ধ লিখবেন :-

রমেশ মজুমদার
শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

কবিতা লিখবেন :-

দিলীপকুমার রায় (গান ও বঙ্গলিপি)
হাসিনারানি বৈবী

হুম্মদরক্তন বসিক
শান্তকীল হাস

যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

গ্রহ-ভাগে

মিহিরাচার্য

জ্যোতিষে জীবিকানির্গর লব্ধে উপদেশ আছে যে, চন্দ্রলগ্ন বা লগ্ন থেকে যেটি বড়বর্গ বিচারে বলবান, সেই ঘর থেকে দশম ঘরে জীবিকার বিচার করতে হবে।

প্রথমে জানা উচিত চন্দ্রলগ্ন বা লগ্ন কি? লগ্ন হচ্ছে জাতকের জন্ম সময়ে যে রাশির উপর হয়েছিল, সেই রাশিই তার লগ্ন। আর চন্দ্রলগ্ন হচ্ছে যে রাশিতে জন্মের সময় চন্দ্রগ্রহ অবস্থিত ছিলেন। বড়বর্গ কি এবার তাই বলছি। বর্গবিচার করতে হলে স্কুট জানা দরকার। স্কুট মানে হচ্ছে সূক্ষ্মভাবে গণিতের বিচার। যেমন ধরুন অঙ্ক কষে বের করা হোল যে আপনার লগ্ন সিংহরাশিতে— কিন্তু ঐ সিংহরাশির ঠিক কোনখানে আপনার লগ্ন তা জানতে হলে কবে বের করতে হবে কত অংশ কত কলার আপনার লগ্ন। চন্দ্রের বেলায়ও তাই। চন্দ্র সেই রাশিতে কত অংশ কত কলার আছেন, এ না জানলে বর্গবিচার করা যায় না। বড়বর্গের নাম হচ্ছে (১) ক্ষেত্র (২) হোরা (৩) ত্রেকোণ (৪) নবাংশ (৫) দ্বাদশাংশ (৬) ত্রিংশাংশ। ক্ষেত্র অর্থে যে রাশি তার অধিপতি গ্রহ। এক একটি গ্রহ এক একটি রাশির মালিক—মর্ধ্যাৎ ঐ ঘরের তিনিই হলেন অধিপতি। হোরা মানে আধাআধি করে একটি রাশিকে দুভাগ করা। যেমন একটি রাশির বিভূতি হচ্ছে ত্রিংশ অংশ। একে দুভাগ করলে ১৫ অংশ করে এক একটি ভাগ হয়। এই এক একটি ভাগের আবার এক একজন মালিক। ত্রেকোণ হোল তিনভাগে ভাগ। প্রত্যেক ভাগ ১০ অংশ করে। নবাংশ হোল ৭ ভাগে ভাগ। প্রত্যেক অংশ ৩ অংশ ২০ কলা। এই ন' ভাগের এক একজন মালিক। এই বকর দ্বাদশাংশ হোল

এক একটি ভাগ আড়াই অংশ করে আর ত্রিংশাংশ হোল এক একটি এক অংশ কোরে। এই সব ভাগেরই এক একটি গ্রহ অধিপতি বা মালিক। যখন লগ্ন ও চন্দ্রের স্কুট পাওয়া গেল তখন ঐ বড়বর্গের বিচারে দেখতে হবে চন্দ্রলগ্ন বা লগ্ন কোনটি বেশী শুভ বা মিত্রবর্গ পেয়েছে। যেটি বেশী বর্গ পাবে তাকেই বলবান বলে গ্রহণ কোরে গুণে দেখতে হবে দশম ঘর কোনটি—দে ঘরে কেউ আছে কিনা—যদি না থাকে তার অধিপতি গ্রহ কোথায় আছে? কোন্ কোন্ গ্রহ তার ওপর দৃষ্টি দিয়েছে প্রভৃতি। একটা উদাহরণ দিয়ে দেখালে বক্তব্যটা আরও পরিষ্কার হবে। ধরা যাক, একজনের লগ্ন সিংহ, রাশি মকর। ঐ যে বর্গ বিচারের কথা ওপরে বলেছি, স্কুটের সাহায্যে বর্গবিচার কোরে দেখা গেল চন্দ্রলগ্ন, লগ্নের চেয়ে বেশী শুভ ও মিত্র বর্গ পেয়েছে। তাহলে নিরসু অমুবায়া এ ক্ষেত্রে চন্দ্র লগ্নকেই গ্রহণ করা গেল। মকর থেকে গুণে দশম ঘর পাওয়া গেল তুলারাশি যার অধিপতি হচ্ছেন শুক্র। দেখা গেল, দশম ঘর ঐ তুলারাশিতে বুধগ্রহ আছেন, তাহলে বুধই হলেন ঐ কর্মদাতা। কিন্তু যদি কোন গ্রহ দৃষ্টি দেয় তারও বিশ্রণ থাকবে কর্মের সঙ্গে—তাছাড়া শুক্রের ঘরে থাকার জন্য শুক্রনির্দিষ্ট কর্মেরও স্পর্শ থাকবে।

এইবার দেখা যাক জ্যোতিষে কোন গ্রহ লব্ধে কি জীবিকার উল্লেখ আছে।

রবি গ্রহের : চিকিৎসা, বর্ণ ক্রয় বিক্রয়, ঔষধ বিক্রয়, মনি বা ভাস্কর্য ব্যবসা (বিক্রয়াদি), শাস্ত্রোপদেশ, কবি, দোতা-কার্য, দালালি, নৈবিকবৃত্তি, বিবাহ, সরকার বা রাষ্ট্রীয় সংশ্লিষ্ট কার্য।

চক্রগ্রহের : বজ্র, তুলা, দুর্ভাগি দেহজন্ম (বর্তমানে নিশ্চয়ই ভালভা—কি বলুন ?), স্বধনজন্ম, পুণ্য, অলঙ্কার, শব্দ, মুকল, জলজাতিবস্ত্র, ঔষধের জন্ম বিক্রম, জীজনপ্রেরণ, গীত, বাস্ত, চিত্র (ফোটোগ্রাফী) প্রভৃতি।

মহলগ্রহের : সৈনিক—আয়েম্যাস ব্যবহারকারী পুলিশ, খনি বা তুরিআত জন্ম, সহজদাহ পদার্থ বা বিস্ফোরক, অগ্নি, বিজ্ঞান সংক্রান্ত কর্ম, ঔষধ প্রস্তুত (কেমিষ্ট), চিকিৎসা, রুবিকার্য, বিবাহ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, কুশীলজীবী।

বৃহগ্রহের : সংগীত, বাস্ত, চিত্রাঙ্কন, লেখক, কেরাগী, কাব্য, গণিত, শিল্পকর্ম, জ্যোতিষ, চিকিৎসা, রাসায়নিক, শাস্তি প্রচার, বিবাহে মধ্যস্থতা (আরবিট্রেটর) প্রভৃতি।
বৃহস্পতিগ্রহের : দেবপূজা, উপদেশ, ধর্মচর্চা, শাস্ত্রাভ্যাসন, আইনব্যবসা, মন্ত্রিত্ব, রাজসরকারে উপদেষ্টা, জননেতৃত্ব, বিচারক প্রভৃতি।

শুক্রগ্রহের : গৌ, মহিষ, অশ্ব, হস্তী, গুড় প্রভৃতির জন্ম বিক্রয়, স্ত্রীসেবা, পৌস্পতি ভোগ, অধ্যাপনা, বাজকার্য, নাগরিকের সঙ্গে বাজা বা সরকারী যোগাযোগ, কাব্যচর্চা, বক্তৃতা, আইনজ্ঞ বা ব্যবসায়ী, গীত-বাস্ত প্রতিষ্ঠানের পরিচালক।

শনিগ্রহের : চাকুরী, শ্রমিক, কনষ্ট্রাকটর, লোহ, কাঠ প্রভৃতির তর-বিক্রয়, এজেন্সী, বস্ত্রচালনা, যানবাহন পরিচালনা, শ্রমিক নেতৃত্ব, দৈহিক পরিশ্রম, ঋণ-দান, লোহবস্ত্র নির্মাণ, কুটুম্বগণাণ্ডা, সঞ্চয় কার্য প্রভৃতি।

রাহগ্রহের : পুণ্ড, অন্ধার, মাংস, মদ্য, প্রস্তুত, লোহ, তুণ জন্ম-বিক্রয় হুঃসাহসিক কর্ম, বাবতীয় ছুনীতি, চুরি, ডাকাতি, খুন, রাহাজানি প্রভৃতি।

কেতুগ্রহের : গুপ্তশক্রতা, চরবৃত্তি, লীচতা, গুপ্ত-প্রতিষ্ঠানের পরিচালক, ছবুচ্চি, কৃত্যতা প্রভৃতি।

তাহলে আগে যে মকররাশি থেকে দশমস্থান বিচারের কথা বলেছি, দেখা যাক, সেটি ওপরে দেওয়া তালিকার সঙ্গে মিলিয়ে। ইয়া মিলছে। এই জাতক জ্যোতিষ জানেন, সাহিত্যকে আংশিকভাবে জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এগুলি শুন, যুগের অন্তর আর উনি চাকরী করেন আদালতে। এটি শুক্রের ঘরে থাকার দৃষ্ট।

এবার নিশ্চয়ই যেন হচ্ছে যদি কোন গ্রহ ঐ বলমান লগ থেকে দশম ঘরে না থাকে ?

যেন করুন, তুলার বৃহ নেই। তাহলে দশম ঘরের অধিপতি শুক্র কোথায় আছেন দেখতে হবে। তিনি যদি ১০ম ঘরের অধিপতি হয়ে কেবল অর্থাৎ এক, সাত, চার, দশ এই চারটি ঘরের কোন একটিতে থাকেন তাহলে সেই ঘরগুলির মালিক যে গ্রহ সে গ্রহের প্রভাব থাকবে কর্মের মধ্যে। আর যদি ৬ষ্ঠ, অষ্টম, দ্বাদশ ঘরে দশম ঘরের অধিপতি থাকেন, তাহলে কর্ম লাভ কঠিন হবে এবং পেলেও তা স্থায়ী হবে না। মোট কথা কোন গ্রহ যদি দশম ঘরে না থাকে তাহলে দশমপতি যে গ্রহের ঘরে গেছেন এবং যে গ্রহের নবাংশ পেরেছেন তারই সংশ্লিষ্টে কর্ম নির্দিষ্ট হবে।

ব্যক্তিগত রাশি ও লগ্নফল

[যার রাশি ও লগ্ন ভিন্ন তিনি দুটিই পড়ে সামঞ্জস্য করবেন]

তারের গ্রহ সংস্থান

রবিসংক্রমণের সময় চক্র ধরতে। রবি সিংহে, মকর মিথুনে—১১শে তার ককটে। বুধ সিংহে বক্রী ২১শে মার্গী। বৃহস্পতি বুধে—২৩শে বক্রী। শুক্র মিথুনে ১১ই ককটে। শনি কুন্তে বক্রী। রাহ মিথুনে। কেতু ধরতে।

অমস রাশি

প্রথম সপ্তাহে মানসিক চাকলা বুদ্ধি পাবে। দুই নানা কথ্যে অশান্তি সৃষ্টি হতে পারে। ২৪ তারিখ পর্যন্ত অর্থ লাভলা থাকবে। মালের পেশাশেবি অর্থ-কল্প তার কারণে মানসিক তারসাম্য নষ্ট হবার সম্ভাবনা দেখতে পাওয়া যায়। অধিনী নকজে জন্ম হলে ৬ তারিখে কিছু প্রাপ্তির সম্ভাবনা—ভরসী বা কৃত্তিকা হলে ৭ তারিখে। ১১ তারিখের পর অর্থে নতুন ব্যবসার

আত্মসংপত্তে পারেন। ২১ তারিখের পর কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিদেশ থেকে প্রত্যাগমনের সংবাদ বা অজ্ঞ কোন সুখবর পেতে পারেন।

স্বাস্থ্য রাশি

২৫শে পর্য্যন্ত স্বাস্থ্য ভালই যাবে। পত্নীর স্বাস্থ্যের উন্নতি ও গৃহস্থালীতে পটুতা দেখা যায়। সন্তানদের জন্মে ২৮শে তারিখের পূর্ব পর্য্যন্ত উদ্বিগ্ন থাকার সম্ভাবনা দেখা যায়। ৮২ তারিখ দুটি দিন আপনার পক্ষে কিছু প্রাপ্তির দিন। দ্যুতাদিতে আসক্তি থাকলে এবং সুযোগ পেলে কিছু লাভ করবেন। কর্মস্থানে উপরওয়ালার বিরাগভাজন হবার আশঙ্কা আছে—অনেক প্রকার দায়িত্ব ঘাড়ে নিতে হতে পারে। কোন কিছুতে সই করে ক্ষতি স্বীকার করার সম্ভাবনা। চর্মরোগে আক্রান্ত হতে পারেন মাসের শেষ দিকে।

মিত্রস্ব রাশি

২১শে তারিখ পর্য্যন্ত নানা প্রকার শারীরিক পীড়ায় ও মনঃকষ্টে জীবনে বীতশুভ হয়ে পড়তে পারেন। তবে এ সবই সাময়িক ভাবে প্রভাবিত করবে। ১২শে তারিখের পর অর্থসাম্প্রদায় হবার আশা দেখতে পাবেন। ১৩/১১ তারিখে ব্যসনাদি ব্যাপারে কিছু প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে বলে অনুমান হয়। জীবন সংগে মনান্তর হতে পারে এ মাসে। পিতার স্বাস্থ্যস্থানি ঘটতে পারে। প্রণয়ার্থী ছেলে-মেয়েরা ২৮শে তারিখের পর প্রণয়বিহারে মনোমত সঙ্গী পেয়ে আনন্দ লাভ করবেন।

কর্কট রাশি

১২/১০ তারিখ দুটিই আপনার পক্ষে ভাগ্যবুদ্ধির সহায়ক। চাকুরীর জন্মে দেখা করা। উচ্চপদ বা কোন সুবিধার জন্মে তদ্বির করলে ভাল ফল পাবেন। ধনসঞ্চয়ে অক্ষমতা দেখা দেবে। ১২শের পর আয়বুদ্ধি হবে কিম্বা অনায়াসে টাকা বা কিছু উপরি পেয়ে যেতে পারেন। জীবন স্বাস্থ্য ভাল যাবে না। ব্রাহ্ম-প্রেশার থাকলে তা বৃদ্ধি পাবে। মাসের প্রথমে কিছু খোয়া গিয়ে ক্ষতি হতে পারে। সন্তানেরা মাসের শেষের দিকে উন্নতি করবে।

মিথুন রাশি

পুরো মাসটি প্রায় ভাল যাবে। পূর্বকল্পনী (১১)

নক্ষত্রে যদি জন্ম হয়ে থাকে—এমানে অনেক সুযোগ আপনার হাতে আসবে। ২১ তারিখে এমন ঘটনা ঘটতে পারে যা আপনার মানসিক, আর্থিক প্রভৃতি অনেক দিকে আনন্দ দিতে পারে। প্রণয়ার্থী ছেলে-মেয়েরা বিবাদ করে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারেন। অনেক সম্মানজনক দায়িত্ব নিয়ে সম্মানের সঙ্গে উত্তীর্ণ হতে পারেন। কোন সন্তান বিদেশে কার্য্যাহারে যেতে পারে। মোটামুটি মাসটি ভাল।

কন্যা রাশি

কর্ম ১২ তারিখের পর পরিবর্তন আসতে পারে—সেই সংগে জটিলতাও। তবে এই সব ভবিষ্যতের শুভচিন্তা করবে। অর্থসাম্প্রদায় ভালই, মঞ্চের তেমন আশা নেই। রোজগার পরিমিত হলেও খরচের প্রাবল্য টানাটানি কিছুটা থাকবে। জীবন স্বাস্থ্য মাসের শেষের দিকে কিছুটা খারাপ হবে। ২১শে পর্য্যন্ত আপনার শরীরও মাঝে মাঝে গুণ্ডগোল করবে—লো-প্রেশার দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা, সন্তানেরা বিপরীত আচরণ করবে।

ভুল্ল রাশি

ব্যবসায়ী হলে ২১/২২ তারিখে সরকারের কোপে পড়ে খেসারৎ দিতে হতে পারে। চাকুরে হলে কোন কারণে উপরওয়ালার কাছে কৈফিয়ৎ দাখিল করতে হতে পারে। ২৫ তারিখটিতে কিছু প্রাপ্য বা লাভ হবার সম্ভাবনা আছে। ১২ তারিখের পর জীবন সাহায্য পাবেন নানা দিক থেকে। কিছু পরিবর্তন বা অদল-বদলের সম্ভাবনা দেখা যায়। সন্তানরা উচ্ছৃঙ্খল হতে পারে তাদের জন্মে মনঃকষ্ট দেখা দেবে।

হস্তিচক রাশি

২৭ তারিখটি আপনার পক্ষে ভাল। বেকার হলে এইদিন কাজ কন্মের জন্মে দেখা-করা বা তদ্বির করে দেখতে পারেন। জীবন সাহায্যে ভাগ্যবুদ্ধির আশা দেখতে পাওয়া যায়। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান হওয়া কর্তব্য। শরীর মাসের শেষের দিকে খারাপ হতে পারে। প্রেশারের গুণ্ডগোল হওয়ারই আশঙ্কা। সন্তানদের ২৪ তারিখের পর সুস্থ পাওয়ার আশা কমে যাবে। ব্যবসায়ী যদি অংশীদার-স্বত্রে আবদ্ধ থাকেন, তা হলে কলহ ও বিবাদ হবার আশঙ্কা।

অসুস্থতা

২৪শে চৈত্রের পর থেকে মানসিক ও শারীরিক ক্রেশের সম্ভাবনা। মাসের প্রথম দিনটি আশনি বেশ কিছু স্বযোগ স্ববিধা ও অর্থশাচ্ছল্য পেয়ে যাবেন। ভ্রাতা-ভগিনীর মধ্যে কারো সংবাদ না পেয়ে উৎকণ্ঠা হতে পারে। জ্বর সঙ্গে সাংসারিক বা কুটুম্বিতা ব্যাপার নিয়ে বচলা ও মন কষাকষি হতে পারে। সম্ভবস্থলে সম্ভানলাভের যোগ আছে। ভাগ্যহানির ভয়ে শঙ্কিত হতে পারেন। পিতার সঙ্কটাপন্ন পীড়া দেখা দিতে পারে। বন্ধুদের সম্প্রীতি নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা।

অকল্লভতা

সমস্ত কাজেই বিলম্ব ও কিছু কিছু বিষয় দেখা দেবে। দূর ভ্রমণ না করাই উচিত। ফিরে আসতে দেরী এবং বিলম্ব ছইই হবার সম্ভাবনা। মাসের ২৭।২৮ তারিখ দুটি ভাল যাবার সম্ভাবনা। পত্নীর শরীরে মাসের মাঝামাঝি থেকে কিছু ক্রেশ দেখা দিতে পারে সম্ভানদের তেমন কিছু পরিবর্তনের আশা দেখা যায় না। অংশীদারী হিসেবে ব্যবসা করতে ইচ্ছে থাকলে এ মাসে শুরু করতে পারেন শেষের দিকে চাকরীজীবীদের মালটি ভাল যাবে।

অসুস্থতা

জ্বর শরীর নানা প্রকার রোগে আক্রান্ত হবে। অমাবস্তার ভীষণ ভাবে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা। দুর্ভাবনার ভাবে আপনারও শরীর ভাল যাবে না। কোন কষ্টের সম্বন্ধে শুভসংবাদ এ মাসে পেতে পারেন। অর্থব্যয় হবে কিন্তু আয়ের পথও স্বাগত হবে। কনিষ্ঠ সম্বন্ধে কোন সংবাদ আপনাকে বিচলিত করবে। মাতার স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা। তৃত্য কতৃক কতিগ্রস্ত হতে পারেন। মাসের ৫।৬ তারিখ আপনার পক্ষে শুভদিন।

মৌনতা

মামলা মোকদ্দমা প্রভৃতিতে ব্যয় হবার সম্ভাবনা। শত্রুতা কোরে কেউ ক্ষতি করে দিতে পারে। রাজস্বারে অভিশ্রুত হয়ে জরিমানা দেবার আশঙ্কা দেখা যায়। উদ্ধতন কর্মচারীর বিরাগভাজন হয়ে কাটাতে হতে পারে। গৃহস্থালী ব্যাপারে সাময়িক থাকবে না। দীর্ঘদিনের শত্রুতায় কোন বন্ধু আপনাকে কারু করে ফেলতে পারে। কোন ছোট দুর্ঘটনায় মাসের তৃতীয়-চতুর্থ সপ্তাহে সামান্য রক্তপাত হতে পারে। জ্বা লোক শত্রু থেকে অপবাদ হুড়োতে পারেন।



কোষ্ঠীর বিচার

জ্যোতি বাচস্পতি

গ্রহ

(পুৰণিকাশিতের পর)

ফলিত জ্যোতিষের গ্রহের ধারণা এবং গণিত জ্যোতিষের গ্রহের ধারণা ঠিক এক নয়। গণিত জ্যোতিষের হিসাবে সূর্য একটি স্থির তারা, চন্দ্র একটি উপগ্রহ, রাহু ও কেতু এ দুটি চন্দ্রের কক্ষার দুটি গাণিতিক বিন্দু মাত্র, কিন্তু ফলিত জ্যোতিষে এ সবগুলিকে গ্রহ বলে মেনে নেওয়া হয়েছে। ফলিত জ্যোতিষে গ্রহ কথটির মানে হচ্ছে আকাশের এমন কতকগুলি ভ্রমণশীল পদার্থ, তা' তারাই হোক, উপ-গ্রহই হোক বা বিন্দুই হোক—যারা রাশি চক্রের উপর একটা বিশেষভাবে প্রভাব স্থাপন করে। ফলিত জ্যোতিষের গ্রহের সংজ্ঞা যদিও গণিত জ্যোতিষের গ্রহকে লক্ষ্য করে করা হয়েছে সূর্যের দিক থেকে। যে সব গগনচারী নিজের কক্ষায় সূর্যের চারদিকে ঘোরে তাদেরই বলা হয়েছে গ্রহ। কিন্তু ফলিত জ্যোতিষের গ্রহকে লক্ষ্য করা হয়েছে পৃথিবীর দিক থেকে। যে সব গগনচারী পৃথিবী থেকে দেখলে রাশিচক্রের গা দিয়ে যোজ্য একটু করে সরে যাচ্ছে মনে হয়, তাদেরই গ্রহ বলে অভিহিত করা হয়েছে। বস্তুতঃ প্রকৃতপক্ষে গ্রহগুলি সূর্যের চারদিকে ঘুরছে, কি পৃথিবীকে বেড় দিয়ে গ্রহ নক্ষত্র ঘুরছে, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এ সত্য বিচার করে কোন লাভ নেই। যেখানে ফল নিয়ে কথা, সেখানে পৃথিবীর দিক থেকে আমাদের দেখতেই হবে সত্য বাই হোক। যদি কোন বৈজ্ঞানিক বলেন যে সূর্য উদ্ভিত হন না অস্ত ও যান না, তিনি যেমন তেমনি আছেন, তোমাদের দেখাটা ভুল ধারণামাত্র, তাতে বাস্তব জগতে রাতি দ্বিগ্রহের সূর্যের আলোর দীপ্তি পাওয়ার কোনই সম্ভাবনা থাকে না। সূর্য যেখানকাব সেখানকার থাকলেও পৃথিবীর দিক থেকে তার গতি স্বীকার করতেই হবে। ফলিত জ্যোতিষ

ব্যবহারিক প্রয়োগের শাস্ত্র, কাজেই তার গ্রহের ধারণা পৃথিবীর দিক থেকেই করা হয়েছে।

ফলিত জ্যোতিষের মতে এখন গ্রহ বারটি যথা :—

রবি, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, বাহু, কেতু, প্রজাপতি (ইউরেনাস) বরুণ (নেপচুন) ক্রতু (প্লুটো)।

গ্রহ যে বারটি একথা জোর করে বলা চলে না। এইটুকু শুধু বড় জোর বলা যায় যে আজ পর্যন্ত বারটি গ্রহ আবিষ্কৃত হয়েছে। এরপর হয়ত আরও গ্রহ আবিষ্কৃত হতে পারে। আমাদের প্রাচীন পুঁথিগুলিতে নবগ্রহের নামমাত্র উল্লেখ আছে। অনেকে বলেন না'টি মাত্র গ্রহ দিয়ে প্রাচীনকালের জ্যোতির্বিদরা যখন এত ফল মেলাতে পারতেন, তখন আর বেশী গ্রহ নিয়ে বিচার করবার দরকার কি? এ কথা যুক্তিযুক্ত নয়। শুধু রবির অবস্থান (মাসফল) দিয়ে এবং লগ্নরাশি (লগ্নফল ও রাশিফল) দিয়ে মোটামুটি অনেক কথা মেলান যায়। তা বলে কে এমন কথা বলতে পারে যে, অল্প গ্রহের সংস্থান বা স্থান ভাব ফুটের কোন আবশ্যকতা নেই। ভাল করে বিচার করতে পারলে অনেক সময় দুটি তিনটি গ্রহ দিয়েও অনেক সময় অনেক কথা বলা চলতে পারে, কিন্তু সঠিক ফলা-ফেলের জন্য সূর্য গ্রহ-সংস্থান এবং সমস্ত গ্রহের পরস্পর সম্বন্ধ ভালভাবে বিচার করা চাই। দুটি তিনটি গ্রহ কম হলেও কতক বিচার চলে, এবং তাতে কতক ফল মেলে, কিন্তু তাতে ফলাদেশ কখনই সম্পূর্ণ হতে পারে না।

রাহু, কেতু, ছাড়া বাকি দশটি গ্রহ এক একটি স্থূল জড় পদার্থের গোলকমাত্র—এই গোলকগুলির মধ্যে সূর্য সব চেয়ে বড় এবং চন্দ্র সব চেয়ে ছোট। কিন্তু, গোলক গুলির গুরুত্ব বা আয়তন খরে জ্যোতিষে ফল বিচার করা হয় না। পৃথিবীর উপর তাদের যেটির যেমন প্রভাব অভিজ্ঞতার দ্বারা দেখা যায়, সেই হিসাবেই তাদের বিচার

করতে হয়। গ্রহগুলির প্রভাব মূলতঃ পড়ে ক্রান্তিবৃত্তের উপর, এবং ক্রান্তিবৃত্তের যে বিন্দুর উপর গ্রহের প্রভাব পড়ে, সেই সেই বিন্দুগুলিকেই গ্রহের অবস্থান বলে ধরা হয়। পৃথিবী থেকে দেখলে সূর্য বা চন্দ্রকে বেশ বড় এবং ক্রান্তিবৃত্তের অনেকখানি জায়গা জুড়ে তারা থাকতে পারে, কিন্তু সূর্য বা চন্দ্র যতখানি জুড়ে থাকে তার সব-খানিকে তাদের অবস্থান বলে ধরা হয় না। সূর্য বা চন্দ্রের মধ্যবিন্দুট যেখানে পড়ে সে বিন্দুটকে সূর্য বা চন্দ্রের অবস্থান বা ফুট বলা হয়। সূর্য এবং রাত্ৰ কেতু বরাবর ক্রান্তিবৃত্তের উপরেই থাকে, কিন্তু চন্দ্র এবং বাকি আটটি গ্রহ সব সময় ক্রান্তিবৃত্তের ঠিক উপরে থাকে না। তারা কখনও ক্রান্তিবৃত্তের একটু দক্ষিণে কখনও বা উত্তরে থাকে। কোন একটি গ্রহ ক্রান্তিবৃত্ত থেকে যত অংশ উত্তরে বা দক্ষিণে থাকে তত অংশ গ্রহটির সর (Latitude)। গ্রহ ক্রান্তিবৃত্তের উপর না থাকলে, গ্রহটির মধ্যবিন্দু থেকে একটি লম্বরেখা যদি ক্রান্তিবৃত্তের উপর টানা যায়, সেই রেখাটি ক্রান্তিবৃত্তের যে বিন্দুকে স্পর্শ করবে, সেই বিন্দুটির উপরেই গ্রহের পরিপূর্ণ প্রভাব।

গ্রহটি ক্রান্তিবৃত্তের কোন খানে আছে অর্থাৎ গ্রহটির ফুট স্পষ্ট বা সূক্ষ্ম অবস্থান কি তা' দু'রকমে জানা যেতে পারে :—

(১) আদিবিন্দু থেকে তা কত অংশ দূরে আছে
(২) তা কোন রাশির কত অংশে আছে। একটি গ্রহ যদি আদিবিন্দু থেকে ২৭১ অংশ দূরে থাকে, তাহলে এও-বলা যেতে পারে যে, গ্রহটি মকরের ১ অংশে আছে। আমাদের দেশীয়তে এটা অনেক সময় ২১ লিখেও জানানো হয়, ২১ এর মানে গ্রহটির অবস্থান আদিবিন্দু থেকে ২১রাশি ১ অংশ দূরে। অনেক সময় একটি গ্রহের অবস্থান অংশের চেয়ে সূক্ষ্ম করে দেখানো হয়ে থাকে। তার পর্যায় এই রকম :—

৬০ অঙ্কলায় ১ বিকলা

৬০ বিকলায় ১ কলা

৬০ কলায় ১ অংশ

৬০ অংশে ১ রাশি

অঙ্কলার চিহ্ন (।।), বিকলার চিহ্ন (।) কলার চিহ্ন (।) অংশের চিহ্ন (.)।

গ্রহের মত ক্রান্তিবৃত্তের ভাবের অবস্থানও, আদিবিন্দু থেকে কত অংশ দূরে তাই দিয়ে কিংবা রাশি, অংশ প্রভৃতি দিয়ে প্রকাশ করা যেতে পারে। সে কথা পরের অধ্যায়ে বলছি। (ক্রমশঃ)

—

১৯৬৪ খৃষ্টাব্দের দ্বিতীয়ার্দ্ধ

পণ্ডিত শ্রীকামাখ্যাচরণ ভট্টাচার্য্য

স্মৃতিরত্ন, সরস্বতী

১৯৬৪ খৃষ্টাব্দের ২ই জুন প্রচলিত নিয়মে ভারতীয় সময় দিবা ১১টা ৩০ মিনিটে, দিল্লী মহানগরীতে মাননীয় শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীকে প্রধান মন্ত্রীত্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া নতুন ভারতীয় মন্ত্রিসভা গঠিত হয়।

তৎকালে গগনপটে পূর্বদিকে হোরাইজাণ্ডেলে সিংহ-রাশি উদীয়মান। উক্ত লগ্নাপেক্ষা সপ্তমে স্বর্গহুগত শনি ও সৌভাগ্যগগনে বৃহস্পতি। উদ্ভাকাশে রবি, চন্দ্র, মঙ্গল এবং বুধ। প্রধানে উপায়ে (লাভে) রাহু শুক্র ও পক্ষ্মে কেতু এইরূপ গ্রহ সংস্থানে, বিশেষ শুভ লগ্নে ও অপূর্ব গ্রহসংযোগে মাননীয় শাস্ত্রীজী ৪৪ কোটি ভারতসন্তানের নেতৃত্বভার গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা ক্রম সত্য। রাশিজে দৃষ্টে বিবেচিত হয়, জ্যোতির্বিদ্যে ষাশাই সময় নির্দ্ধারিত হইয়াছিল।

এইরূপ গ্রহসংস্থানে যোগব্রষ্ট মহাপুরুষগণই নবরূপে যুগে-যুগে ধরাপৃষ্ঠে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, এমন কি বাক্সা, অভিব্যেকাদি মাসলিক কার্যেও সফল লাভ হয়। রাজস্থানীয় ধনকুবের ব্যবসায়িবৃন্দ, স্থির পরিচায়ক ঐ সিংহলগ্নেই লক্ষ্মী, গণেশাদি পূজা, এবং খাতা মহরৎ প্রভৃতি করিয়া থাকেন।

১৯৬২ সনের ৩রা ফেব্রুয়ারী মকর রাশিতে অষ্ট-গ্রহের সমাবেশ হইতে পৃথিবীর, বিশেষতঃ ভারতের বক্ষে, যে গরল-রশ্মি নিক্ষেপিত হয়, তাহার দ্বারা গোল-যোগ ও কালকূট নামক ষোগের উৎপত্তি ঘটে। উক্ত ষোগধর্মের কল সমূহ ১৯৬১ সনে ভারতের বিভিন্ন সংবাদ-

পত্রে প্রকাশ করা হইয়াছিল এবং ১৯৬২ সনে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রীপ্রমুখ নেতৃবৃন্দকেও পরের দ্বারা জানানো হইয়াছিল।

অষ্টগ্রহ যোগের স্থিতিকাল ২ দিন ৬ ঘণ্টা মাত্র। সমবেত গ্রহশক্তির প্রভাব ৫ বর্ষ ৪ মাস ২ দিন ৬ ঘণ্টা মতান্তরে ৬ বর্ষ ১০ মাস ২ দিন ৬ ঘণ্টা। উক্ত বর্ষকাল পর্য্যন্ত বিশ্বে, বিশেষ করিয়া যে দেশের রাশিতে গ্রহ-বৃন্দের মিলন হয় সেই দেশ, উক্ত গ্রহশক্তির প্রভাবে চালিত হইয়া থাকে। এ স্থলে মকর রাশিতে গ্রহসংযোগ হেতু ভারতবর্গেই যোগের কুফলসমূহ ফলবতী হইবে।

উক্ত বর্ষকাল মধ্যে বিভিন্ন রাশিতে গ্রহসংযোগে ফলের কথঞ্চিৎ ভারতম্য ঘটে এবং অংশাদির ভারতম্যাহসারে নির্দিষ্ট বর্ষকাল মধ্যে আশু বা বিলম্বে অষ্টগ্রহজনিত কুফল সমূহ নানারূপে প্রকট হয়।

পুরাণ, ইতিহাস এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণাদি হইতে ইহাও দৃষ্ট হয়, যে কোন সময়ে মকর রাশিতে সমগ্র গ্রহশক্তির মিলন ঘটে উক্ত যোগের ১০ মাসকাল মধ্যে বিশেষতঃ কান্তিক মাসে ভারতের “ঐ প্রশাণ কোণে” অকস্মাৎ ঘনাইয়া আসে দুর্যোগের ঘন অন্ধকার। ঋষি বাক্যাত্ম-সায়ে গ্রহযুদ্ধ বিচারে বিবেচিত হয় ১৯৬৭ সনের ৫ই জুলাই পর্য্যন্ত সীমান্ত-বিরোধ পূর্ণ মাত্রায় অব্যাহত থাকিবে এবং শাক্তিস্থানের সহিত ভারতের ১৯৬৮ সনের মধ্যে আপোষ মীমাংসার সম্ভাবনা কম।

১৯৬৭ সনের ৫ই জুলাই পর্য্যন্ত বিশ্ব-যুদ্ধের স্ফূর্তপাত ঘটিলেও যুদ্ধ হইবে না। ভগবৎকৃপায় উক্ত বর্ষাদি কাল অতিক্রম হইলে ১৯৬৮ সনের প্রথমার্ধে ক্ষণস্থায়ী বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা রহিয়াছে। উল্লিখিত অভিশপ্ত ৬৮ সন বিশ্বের পক্ষে অতীব অন্তঃ।

তদ্রূপ ভারতের পক্ষে ১৯৬৪ সন ১৯৬২ সন হইতেও অধিকতর অন্তঃ। ৬৭ সনে ভারতবর্ষ ‘কালকূট’ যোগের তীব্র বিধে অর্জ্জুরিত। কালকূট ও গোলযোগ নামক যোগদ্বয়ের শাস্ত্র লিখিত কুফল সমূহ ভারতের বক্ষে ৬৪ এবং ৬৫ খৃষ্টাব্দের ১৮ই মার্চ পর্য্যন্ত পূর্ণমাত্রায় ফলবতী হইবে যথা—প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দর্ভিক, রাষ্ট্রপিড়া, অকাল মৃত্যু, পৈশাচিক যুদ্ধ, বিশ্বশান্তিকামী নেতৃবৃন্দের জীবন সংশয়, পশ্চিমনোভাবাপন্ন নরঘাতক-রূপী দহ্মাদের সাময়িক বলবৃদ্ধি, জনগণের বর্জিত্বংশ, ধর্ম-ভ্রষ্ট প্রভৃতি বহুবিধ ঘটনা ঘটিবে। শাস্ত্রীয় প্রমাণ আন্দোলন পূর্বক ইহাও অস্বীকৃত হয়, অষ্টগ্রহজনিত গোলযোগে স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্রের মৃত্যু হয় কিনা বলা

অসম্ভব, তবে ইন্দ্রের পদ হইতে মৃত্যুগাত ঘটে। হুতরাং শান্তিকামী অধিনায়কগণের জীবনাংগান বা পদচ্যুতিতে কাচিষ্ঠা? কেনেডি ও জহরলালের মৃত্যুর কারণও অষ্টগ্রহের মিলিত শক্তি। যদি কোন জিজ্ঞাসুর জন্মের সন্দেহ উপস্থিত হয় যে অষ্টগ্রহ যোগ তো কেবল শেষ হইয়াছে, তবে ৬৩ সনে কেনেডি ও ৬৪ সনে জহরলালের মৃত্যুর সহিত ইহার সম্বন্ধ কি? ইহার উত্তরে বলিব—

বীজবিশেষ রোপণমাত্রই কি বৃক্ষবিশেষ রূপধারণ করে? ভিন্ন হইতে পক্ষীর জন্ম ইহা ক্রম নিশ্চিত, কিন্তু সময়ের প্রয়োজন। ১৯৬২ সনের অষ্টগ্রহজনিত দুই ফল সমূহ—১৯৬৮ সন পর্য্যন্ত বিশ্বের নানা দেশে বিপর্যয় ঘটাইবে।

শনি এক রাশিতে ২ বর্ষ ৬ মাস অবস্থান পূর্বক নিজ স্বভাবানুযায়ী ফল দান করিয়া থাকেন। যদি একটি গ্রহের ফল দানের শক্তি ২ বর্ষ ৬ মাস হয়, তাহা হইলে অষ্টগ্রহের মিলন শক্তির যোগজ ফল, ২ দিন ৬ ঘণ্টার মধ্যে সংঘটিত হইয়া কখনও কৌ যোগজ ফলের সমাপ্তি হইতে পারে? ১৯৬৮ সন পর্য্যন্ত বিশ্বে যাহা যাহা ঘটিবে সমস্তই অষ্টগ্রহের যোগজ ফল।

উক্ত গ্রহযোগ অস্বীকার করিয়া যাঁহারা বিশ্ব-পরিস্থিতি বা রাষ্ট্রফল গণনা করেন অথবা সমন্বয়যোগী বিশ্ব-পরিস্থিতি অস্থান পূর্বক গ্রহগণের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া রাষ্ট্রফলের নির্দেশ দেন তাঁহাদের বিচারগত ফল, দৈববলে সাময়িক দুই একটি ফলবতী, হইলেও, উহা গজভূক্ত কদবেলের জায়।

উক্তযোগে (ব্যক্তিগত) শ্রেষ্ঠ রাজকূলে জন্মগ্রহণ করিলেও জীবন বিষময় হইয়া রাজযোগ সমূহের ফল ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়।

বিষসংস্পর্শে অমৃতও যেমন জীবননাশের হেতু হইয়া থাকে, তদ্রূপ স্বর্গত প্রধান মন্ত্রীর শূন্য আসন পূর্ণ কালীন, ১৯৬২ খৃষ্টাব্দের কালকূট বিধে অর্জ্জুরিত ৬৪ সনের ভারতবর্ষে পুনরায় কালসর্প যোগজনিত বিষের সংশ্লিষ্টে ভারতের সৌভাগ্যাকাশ দূষিত হইয়া ৪৪ কোটি ভারত-সন্তানের সংশয়ের কারণ হইতেছে। ১৯৬৫ সনের ১০ই মার্চ পর্য্যন্ত কালসর্পবর্ষের অজস্র দংশন সহ্য করিয়াও যিনি উক্ত আসনে উপবেশন করিতে সমর্থ হইবেন “তিনি” স্বয়ং নীলকণ্ঠ এবং তাঁহার দ্বারাই সোনার ভারত ক্রমশঃ পুনরায় রামরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইবে। বোধকর্তা শ্রীহরির নিকট অনতিবিলম্বে উক্ত শুভ দিনের কামনা করি।



সম্পাদনা : শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়



লেখকশ্রী শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

খেলার কথা

ক্ষেত্রনাথ রায়

ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া ৪

চতুর্থ ১৯৩৩

অস্ট্রেলিয়া : ৬৫৬ রান (৮ উইকেটে ডিক্লার্ড)।
ববি সিম্পসন ৩১১, বিল লরী ১০৬ এবং রায়ান বুথ ৯৮
রান। গ্রাইস ১৮০ রানে ৩, রামসে ৯২ রানে ২ এবং
কাটরাইট ১১৮ রানে ২ উইকেট) ও ৪ রান (কোন
উইকেট না খুইয়ে)।

ইংল্যান্ড : ৩১১ রান (বারিংটন ২৫৬, ডেক্সটার
১৭৪, পার্কস ৬০ এবং বয়কট ৫৮ রান। ম্যাকক্লি ১৫৩
রানে ৭ এবং ভিভার্স ১৫৫ রানে ৩ উইকেট)।

ম্যাঞ্চেস্টারে ওল্ড ট্রাফোর্ড মাঠে ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার
৪৭তম টেস্ট সিরিজের ৪র্থ টেস্ট খেলা হুঁ যায়। অস্ট্রেলিয়ার
প্রথম ইনিংসের বিরাট ৬৫৬ রানের (৮ উইকেটে
ডিক্লার্ড) বোঝা মাথায় নিয়ে ইংল্যান্ড যে প্রথম ইনিংসের
খেলায় ৩১১ রান তুলতে পারবে তা কেউ আশা
করেননি। এই খেলা হুঁ যাওয়ার ফলে ইংল্যান্ডের পক্ষে
অস্ট্রেলিয়ার হাত থেকে 'এ্যাসেন্স' সম্মান পুনরুদ্ধার করার
সকল সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যায়। আলোচ্য টেস্টে কয়েকজনের
ব্যক্তিগত সাক্ষ্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এই চতুর্থ টেস্টে উভয় দলের মোট চারজন সেকুরী
করেন : অস্ট্রেলিয়ার ববি সিম্পসন (৩১১ রান) এবং বিল
লরী (১০৬ রান); ইংল্যান্ডের কেন বারিংটন (২৫৬
রান) এবং টেড ডেক্সটার (১৭৪ রান)। অস্ট্রেলিয়ার
রায়ান বুথ মাত্র দু' রানের জগ্রে সেকুরী রান করার
গৌরব থেকে বঞ্চিত হন। বোলিংয়ে উল্লেখযোগ্য
সাক্ষ্য—গ্রাহাম ম্যাকক্লি (অস্ট্রেলিয়া) ১৫৩ রানে
৭টা উইকেট লাভ

অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক ববি সিম্পসনের প্রথম
ইনিংসে তিন শত রান (৩১১ রান) আলোচ্য চতুর্থ
টেস্ট খেলার বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই ৩১১ রান
তুলতে সিম্পসনের ১২ খণ্ড ৪৩ মিনিট সময় লেগেছিল।
ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট খেলায় যে-কোন দেশের
খেলোয়াড়ের পক্ষে সময়ের দিক থেকে এইটি দীর্ঘতম
ইনিংসের রেকর্ড। তাছাড়া যেকোন দেশের বিপক্ষে
টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়দের পক্ষেও দীর্ঘতম
ইনিংসের রেকর্ড হিসাবে গণ্য হয়েছে। আরও উল্লেখ-
যোগ্য, ওল্ড ট্রাফোর্ড মাঠে প্রথম শ্রেণীর খেলার সিম্পসনের
এই ৩১১ রান এক ইনিংসের খেলায় ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ
রান হিসাবে রেকর্ড হুক্ত হয়েছে।

তৃতীয় দিনে অস্ট্রেলিয়া তাদের ৬৫৬ রানের (৮
উইকেটে) মাথায় প্রথম ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা
করে। এই দিন ইংল্যান্ড দুটো উইকেট খুইয়ে ১৬২ রান
করে।

পঞ্চম দিনে খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ের মাত্র পাঁচ

মিনিট আগে ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংস ৬১১ রানের মাথায় শেষ হয়। তৃতীয় উইকেটের জুটিতে ডেক্সটার এবং ব্যারিংটন দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে ১৪৭ রান যোগ করেন। এই দু'জনই ইংল্যান্ডকে 'ফলো-অন' করার অপমান থেকে রক্ষা করেন। কেন ব্যারিংটন তাঁর টেস্ট ক্রিকেট খেলায় সর্বোচ্চ ২৫৬ রান করেন।

অস্ট্রেলিয়া পঞ্চম অর্থাৎ শেষ দিনের খেলার বাকি ৫ মিনিটে কোন উইকেট না খুঁয়ে ৪ রান করলে খেলাটি অসমাপ্তি থেকে যায়।

শেষের টেন্ডে ৪

ইংল্যান্ড : ১৮২ রান (কেন ব্যারিংটন ৭ রান। নীল হক ৪৭ রানে ৬ এবং ম্যাকেঞ্জি ৮৭ রানে ৩ উইকেট)

ও ৩৮১ রান (৪ উইকেটে। জিওফ বয়কট ১১৬, এক জে টিটমাস ৫৬, কলিন কাউড্রে নটআউট ২৩ এবং কেন ব্যারিংটন নটআউট ৫৪ রান। ম্যাকেঞ্জি ১১২ রানে ৩ উইকেট)

অস্ট্রেলিয়া : ৩৭৯ রান (বিল লরী ২৪, ব্রায়ান বুথ ৭৪ এবং ভিভার্স ৬৭ রান। ফ্রেডী ট্রুম্যান ৮৭ রানে ৪ এবং কার্টরাইট ১১০ রানে ৩ উইকেট)

ওভাল মাঠে ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার ৪৭তম টেস্ট সিরিজের ৫ম অর্থাৎ শেষ টেস্ট খেলাটিতে জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয়নি—খেলা ড্র যায়। ফলে আলোচ্য ৪৭তম টেস্ট সিরিজে অস্ট্রেলিয়া ১—০ খেলায় ইংল্যান্ডকে পরাজিত করে 'এ্যাসেজ' খেতাব লাভ করে। ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার এই ৪৭তম টেস্ট সিরিজে প্রাকৃতিক দুর্ভাগ্য একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। বৃষ্টির জগ্রে পাঁচটি টেস্ট খেলার মধ্যে এই তিনটি খেলা পরিত্যক্ত হয় ট্রেস্ট ব্রীজের প্রথম, লর্ডস মাঠের দ্বিতীয় এবং ওভাল মাঠের পঞ্চম টেস্ট খেলা। জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয়েছে কেবল লিডস মাঠের তৃতীয় টেস্টে—অস্ট্রেলিয়া ৭ উইকেটে ইংল্যান্ডকে পরাজিত করে। এবং এই জয়লাভের দৌলতেই অস্ট্রেলিয়া কাল্পনিক 'এ্যাসেজ' পুরস্কার লাভ করেছে।

আলোচ্য পঞ্চম টেস্ট খেলার বিশেষ উল্লেখযোগ্য

ঘটনা—ইংল্যান্ডের বোলার ফ্রেডী ট্রুম্যান প্রথম ইনিংসের খেলায় অস্ট্রেলিয়ার নীল হককে বোল্ড আউট করে তাঁর টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবনে :৩০০ উইকেট পূর্ণ করেন। আলোচ্য পঞ্চম টেস্ট খেলা শেষ হওয়ার পর টেস্ট ক্রিকেট খেলায় তাঁর উইকেট পাওয়ার সংখ্যা দাঁড়ায় ৩০১টি। টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে একমাত্র ফ্রেডী ট্রুম্যান ৩০০ উইকেট পেয়েছেন। দু'শত উইকেট পাওয়ার পরে আছেন এই পাঁচজন : ইংল্যান্ডের ব্রায়ান স্ট্যাথাম—২৪৫ উইকেট এবং এ্যালেক বেডনার ২৩৬ উইকেট, অস্ট্রেলিয়ার রিচি বেনো—২৩৬ উইকেট, রেলিগুওয়াল ২২৮ উইকেট এবং ক্লারি গ্রিমেট ২১৬ উইকেট। আলোচ্য টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ইংল্যান্ডের কলিন কাউড্রে তাঁর টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবনে ৫০০০ রান পূর্ণ করেন।

ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের মাত্র ১৮২ রানের উত্তরে অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসের খেলায় ৩৭৯ রান তুলে ১৯৭ রানে অগ্রগামী হয়। খেলার তৃতীয় দিনে অস্ট্রেলিয়ার ৩৯২ রানের মাথায় প্রথম ইনিংসের খেলা শেষ হলে ইংল্যান্ড দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় দুটো উইকেট খুঁয়ে এইদিন ১৩২ রান করে। চতুর্থ দিনে ইংল্যান্ড আরও দুটো উইকেট খুঁয়ে তৃতীয় দিনের ১৩২ রানের সঙ্গে ২৪২ রান যোগ করলে তাদের ৩৮১ রান (৪ উইকেটে) দাঁড়ায়। তখন প্রথম ইনিংসের ১৯৭ রানের খাতিতে শোধ হয়ে ইংল্যান্ড ১৮৪ রানে অগ্রগামী হয়—হাতে জমা ছিল ৬টা উইকেট। ইংল্যান্ডের পক্ষে ওপনিং ব্যাটসম্যান জিওফ বয়কট সেঞ্চুরী (১১৩ রান) করেন—টেস্টে তাঁর প্রথম সেঞ্চুরী। তৃতীয় উইকেটের জুটিতে বয়কট এবং টিটমাস দলের ৮০ রান যোগ করেন এবং পঞ্চম উইকেটের জুটিতে কাউড্রে (২৩ রান) এবং ব্যারিংটন (৫৭ রান) ১২৬ রান যোগ করে অপরাধিত ছিলেন।

বৃষ্টির জগ্রে পঞ্চম অর্থাৎ শেষ দিনে খেলা আরম্ভ করা কোনক্রমেই সম্ভব হয়নি। ফলে খেলাটি পরিত্যক্ত হয় এবং খেলাটি অসমাপ্তি থেকে থাকে।

বর্তমানে ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট সিরিজ এবং টেস্ট খেলার ফলাফল এই রকম দাঁড়িয়েছে : টেস্ট সিরিজ ৪৭—অস্ট্রেলিয়ার জয় ২২, ইংল্যান্ডের জয় ২১ এবং ড্র ৪

টেবল খেলা ১৯৩—অষ্ট্রেলিয়ার জয় ৭৮, ইংল্যান্ডের জয় ৬৪ এবং ড্র ৫১।

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ ৪

১৯৬৪ সালের ক্যালকাটা ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতার প্রথম বিভাগে মোহনবাগান ক্লাব অপরাজিত অবস্থায় লীগ চ্যাম্পিয়ানশীপ পেয়ে উপযুপরি তিন বছর (১৯৬২-৬৩) এবং মোট ১২ বার লীগ বিজয়ের গৌরব লাভ করেছে।

খেলায় জয়ী হয়ে চ্যাম্পিয়ান হয়েছে মাত্র এই ভিনটি ক্লাব—১৯০১ সালে রয়েল আইরিশ রাইফেলস, ১৯০৮ সালে গার্ডনস এল আই এবং ১৯১২ সালে প্র্যাকটিক্যাল মাদ্রাইট এই দুটি দল দু'বার করে অপরাজিত অবস্থায় লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে: ১৯০০ ও ১৯০১ সালে রয়েল আইরিশ রাইফেলস এবং ১৯১৬ ও ১৯২২ সালে ক্যালকাটা এফ সি। ১৯০১ সালে রয়েল আইরিশ রাইফেলস দল

১৯৬৪ সালের প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগান ক্লাব।



ইতিপূর্বে মোহনবাগান একবার উপযুপরি তিন বছর (১৯৫৪-৫৬) লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল। তাছাড়া ১৯৪৬ সালে লীগ চ্যাম্পিয়ান ইষ্টবেঙ্গল দলের থেকে এক পয়েন্ট কম পেয়ে মোহনবাগান অপরাজিত অবস্থায় রানার্স-আপ হয়েছিল। প্রথম বিভাগের লীগ খেলার ইতিহাসে অপরাজিত অবস্থায় রানার্স-আপ হওয়ার নজির একমাত্র মোহনবাগান দলেরই। মোহনবাগানকে নিয়ে এ পর্যন্ত ১০টি দল প্রথম বিভাগের লীগ প্রতিযোগিতায় অপরাজিত অবস্থায় চ্যাম্পিয়ান হয়েছে—৬টি সামরিক দল এবং ৪টি বেসামরিক দল। এদের মধ্যে লীগের সমস্ত

কোন গোল না খেয়ে এবং সমস্ত খেলায় জয়ী হয়ে লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল—এ রেকর্ড অত্র কোন দল এ পর্যন্ত করতে পারেনি।

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় সর্বাধিক বার লীগ চ্যাম্পিয়ান হওয়ার রেকর্ড মোহনবাগানের—মোট ১২ বার। তিন বা তার বেশিবার লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে এই ৬টি ক্লাব—মোহনবাগান ১২ বার (রেকর্ড), মহম্মেডান স্পোর্টিং ৯ বার, ক্যালকাটা এফ সি ৮ বার, ইষ্টবেঙ্গল ৭ বার, ডাংহোসি ৩ বার এবং ডারহামস এল আই ৩ বার।

সাহিত্য জহবদ

কণশিখা : অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

রবীন্দ্রোত্তর কবিদের মধ্যে যারা বাণীর সাধনায় সিক্ত-লাভ করে কীভাবে করেছেন, কবি অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য তাঁদের অন্ততম। তিনি যে শুধু কবি ছিলেন তাই নয়—শিশু-সাহিত্যে, জ্যোতিষশাস্ত্রে, তত্ত্ববিজ্ঞান ও তাঁর অসাধারণ অধিকার ছিল। এর ওপর উপজ্ঞান রচনাতেও তিনি ছিলেন দীক্ষিত এবং কবিতা রচনার সঙ্গে অল্প কয়েক সংসরে তিনি পাঁচখানি উপজ্ঞানও রচনা করে গেছেন। জীবিত থাকতে পারলে হয়ত আরও উপজ্ঞান রচনা করে বঙ্গসাহিত্যের ভাণ্ডারকে আরও সমৃদ্ধ করতে পারতেন। কিন্তু অকস্মাৎ তাঁর জীবনপ্রদীপ নির্বাপিত হওয়ায় সে আশা আর ফলবতী হতে পারল না।

এই “কণশিখা” উপজ্ঞানটি অপূর্ববাবুর শেষ রচনা। এই উপজ্ঞানে আধুনিক ভারতের সরকারী অফিসে যে সব অনাচার, অবিচারের রাজত্ব চলছে তারই এক নিখুঁত চিত্র লেখক তুলে ধরেছেন পাঠকের সম্মুখে। আর নোমিজ, অজয়ার পরকীয়া প্রীতি, বাসবীর ভালো-বাসা, অরুণজীর মত পরিপূর্ণ নারীষের ছবি নিয়ে যে সাহিত্যের মায়াজাল রচনা করেছেন হ্রস্বপুণ কৌশলে তাও এই উপজ্ঞানটিকে জনপ্রিয় করে তুলবে বলেই আশা হয়।

[প্রকাশক—বিষয়াভ্যাস প্রকাশন, ৮১ বি, শ্রীমাচরণ বৈষ্ণব, কলিকাতা-১২। মূল্য ২৫০ পয়সা]

—শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রয়োগ বিজ্ঞান কথা : জ্ঞানন্দ চট্টোপাধ্যায়

বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের উদ্বোধনে বিজ্ঞানতত্ত্ব প্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলা ভাষায় যে গ্রন্থমালা প্রকাশের পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে, হাওড়া-উন্নয়ন সংস্থার মুখ্যবাস্তকার শ্রীযুক্ত জ্ঞানন্দ চট্টোপাধ্যায় লিখিত ‘প্রয়োগ বিজ্ঞান কথা’ তাহার প্রথম গ্রন্থ। এই গ্রন্থে নাগরিক জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট যে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া সমূহ নগর স্বাস্থ্য ও বাজ্জল্য বিধানের জন্য অত্যাবশ্যকীয় তাহাদের একটি সং-

গঠন সহজবোধ্য বর্ণনা বাংলা ভাষার মাধ্যমে পরিবেশিত হইয়াছে। গ্রন্থকার যে সমস্ত পরিভাষিক শব্দের বাংলা রূপ উদ্ভাবন করিয়াছেন সেগুলি সূচু প্রয়োগের নিদর্শন রূপে অভিনন্দিত হইতে পারে। ইহাদের মধ্যে বৈদেশিক ভাব বা অনুবাদ আড়ষ্টতার কোন লক্ষণই দেখা যায় না। এই নবনির্মিত শব্দাবলী ভাবের স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল প্রবাহ ও বিষয়ের সহজবোধ্যতার পথে কোন বাধা সৃষ্টি করে না। গ্রন্থকার শুধু ইট-কাঠ-লৌহ-পাইপ প্রভৃতি জড় উপকরণের বিজ্ঞান কৌশলেই পারদর্শী নহেন, তাঁহার শব্দ প্রয়োগ নৈপুণ্যের মধ্যেও তাঁহার বাস্তব-নির্মিত বিষয়ে অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় মিলে। তাঁহার ছোট স্থলিখিত বইখানি আমাদের মনে এই আশাই জাগায় যে আমরা হয়ত মাতৃভাষায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থরচনার দ্রুতগতাকে বেশী বড় করিয়া দেখিতেছি। তাঁহার এই সার্থক পথিকৃৎ রচনার সঙ্গে তাঁহাকে অকুঠ অভিনন্দন জানাই।

[প্রকাশক—বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন। ২০৩২বি বিধান সরণী কলিকাতা-৬ মূল্য—১০০ টাকা]

—শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বিউটি স্পট :—জগন্নাথ সরকার

বিউটি স্পট, লেখক ও নায়িকা, সার্বজনীন নব দুর্গোৎসব নাম করণ, অথ শাড়ীবিউট, প্রপোজাল, বৈধব্য কবি ত্রিলাচন দাস, সাইকো-এনালিসিস, আত্মবিশ্বাস প্রার্থনীর নিজের ঢাক, (নয়া টেকনিক) বিরহ মিলন কথা, দেবী মাহাত্ম্য, রবোজ জরাজীর্ণ, সাহিত্য সজাট, এই কয়টি রম্য রচনা ও ছোট গল্পের মধ্যে যেন হাত্তরদের বান ডেকেছে। রচয়িতার লেখকের সামর্থ্য প্রত্যেকটি গল্পে ফুটে উঠেছে। রসিকসমাজে এ গ্রন্থের সমাদর হবে নিঃসন্দেহ।

[প্রকাশক—বেঙ্গল বুক ব্যাংক, ৫৫, কলকাতা-১২। মূল্য ২০ টাকা মাত্র]

—স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

সম্মাদকদ্বয়—শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় এও সল-এর পক্ষে কুমারেন ভট্টাচার্য রচক ২০৫১১, বিধান সরণী, (পূর্বতন কলিকাতা স্ট্রীট), কলিকাতা ৬, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং প্রেসে বহুতে ২০৫১১, প্রিন্টে প্রিন্টে ও প্রকাশিত



আশ্বিন- ১৩৭৬

প্রথম খণ্ড

দ্বিপঞ্চাশত্তম বর্ষ

চতুর্থ সংখ্যা

ওঁ নমঃশচি কায়ৈ

ভূয়শ্চ শতবার্ষিক্যামনাবৃষ্ট্যামনন্তসি ।
 মুনিভিঃসংস্তুতা ভূমৌ সম্ভবিষ্যামযোনিজা ।
 ততঃ শতেন নেত্রাণাং নিরৌক্ষিষ্যামি যমুনীম্ ।
 কীর্তয়িস্যন্তি মমুজাঃ শতাক্ষীমিতিমাং ততঃ ॥
 ততোহহমখিলং লোকং আশ্বদেহসমুদ্ভবৈঃ
 ভরিস্যামি পুরাং শাকৈরারবুট্টেপ্রাণধারকৈঃ ॥
 শাকন্তরীতি বিখ্যাতিং তদা যাস্ত্রামহং ভূবি ॥
 তত্রৈব চ বধিস্যামি দুর্গমাখ্যং মহাসুরং ।
 দুর্গা দেবীতি বিখ্যাতং তস্মৈ নাম ভবিস্যতি ॥

শ্রীশ্রীচণ্ডী, দেব্যাঃ স্তুতি—৪৬-৭৫

ঋগ্বেদে দেবী উমা

শ্রীঅমিয়কুমার চক্রবর্তী এম-এ

ভারতীয় শক্তি সাধনার প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে গবেষণাকারী অধিকাংশ পণ্ডিতেরই ধারণা যে ভব-পত্নীর উমা নামের উল্লেখ সামবেদীয় তলবকার বা কেনোপনিষদ ও কৃষ্ণযজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় আরণ্যকের পূর্ববর্তী কোন বৈদিক গ্রন্থে পাওয়া যায়না। তাই সংহিতা ও ব্রাহ্মণগ্রন্থ সম্পর্কিত কোন গবেষণামূলক পুস্তক বা প্রবন্ধে উমা নামটির প্রয়োগ চোখে পড়েনা; কারণ পণ্ডিতগণ ধরিয়া লইয়াছেন যে দেবী ভবানীর এই নামটি খুব প্রাচীন নয় এবং পরবর্তী কোন যুগেই সম্ভবতঃ ইহা বৈদিক সাহিত্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকিবে। কোন কোন পুরাণ ও পুরাণোক্তর গ্রন্থে উমা শব্দটি নানা অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে দেখা যায়। শব্দটির অর্থ-বৈচিত্র্য লক্ষ্য করিয়া কেহ কেহ বলিয়াছেন যে নামটি সম্ভবতঃ আদবেই একটি বৈদিক বা সংস্কৃত শব্দ নয়, অত্ৰ কোন ভাষা হইতে সংগৃহীত হইয়া, পরবর্তীকালে বৈদিক ও সংস্কৃতসাহিত্যে প্রচলিত হইয়াছিল। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত রচিত “ভারতের শক্তি সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য” নামক গ্রন্থে এই শেষোক্ত মতবাদটি ব্যক্ত হইয়াছে দেখা যায়। প্রখ্যাত গবেষক হিসাবে সুপরিচিত কতিপয় বৈদেশিক ও ভারতীয় পণ্ডিতের মতে উমা শব্দটি সম্ভবতঃ বেবিলোনীয় “উম্মু বা উম্ম” অথবা দ্রাবিড়ী “উম্ম” শব্দ হইতে গৃহীত হইয়া উপনিষদ ও আরণ্যকে স্থানলাভ করিয়াছিল। এই সকল অহুমান বা ইঙ্গিত সংশ্লিষ্ট গবেষকগণের সন্দেহবৃত্তির পরিচায়ক হইলেও, মূলতঃ ভুল; কারণ একটু পরেই আমরা দেখিতে পাইব যে, শব্দটি কেবল সংস্কৃতই নয়, পুরাপুরি ঋগ্বেদীয় এবং ঋগ্বেদে শব্দটি নৈবাং ব্যবহৃত হয় নাই, বরূপে এবং বহুক্ষেত্রে ইহার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। বেবিলোনীয় বা দ্রাবিড়ী উম্মু বা উম্ম শব্দের অর্থ মাতা। আমরা ইহাও দেখিতে পাইব যে, বৈদিক সাহিত্যে ত’ নয়ই—এমন কি, পুরাণাদিতেও কুত্রাপি উমা শব্দটি মাতা অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই। সুতরাং যেদিক দিয়াই বিচার করা হউক না, কেন এই প্রচলিত ধারণা বা সিদ্ধান্তসমূহ ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন সন্দেহ

নাই। ইহাতে অহুমান হয় যে, এক্ষেত্রে আদি গবেষকগণের কাহার দৃষ্টিতে মূল ঋগ্বেদে উমা শব্দটির অবস্থিতি, যে কোন কারণেই হউক ধরা পড়ে নাই, এবং তাঁহারা কেনোপনিষদ বা তৈত্তিরীয় আরণ্যকে দ্রুত শব্দটিকে একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিয়া, অথবা প্রচলিত ২১ খানি বৈদিক পদ-কোষের উপর অতিনির্ভরশীল হইয়া, এ সম্পর্কে স্ব-স্ব সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। পরবর্তী গবেষকগণের মধ্যেও কেহই হয়ত স্বাধীনভাবে বিষয়টির বিচার করেন নাই এবং তাঁহারা মোটামুটিভাবে পূর্ব-সুরিগণকেই অহুসরণ করিয়াছেন মাত্র; কারণ তাঁহাদের কাহারও গ্রন্থে পূর্ব-পূর্ব মতের পুনরাবৃত্তি ছাড়া, নূতন কোন অভিমত বা সিদ্ধান্ত ব্যক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

বৈদিক সাহিত্যে উমা শব্দের প্রয়োগ

আমাদের মস্তব্য একটু রুঢ় শুনাইলেও যে একেবারে অমূলক নয়, তাহার একটা উদাহরণ দিতেছি। কেনোপনিষদের ৩।১২ অধ্যায়ে উমা শব্দের অবস্থিতি সম্পর্কে কোন গোলযোগ দেখা যায়না। কিন্তু তৈত্তিরীয় আরণ্যকে দ্রুত উমা শব্দটি সম্পর্কে একটু বক্তব্য আছে। আরণ্যকের (১০ম প্রপাঠক) যে অংশে এই শব্দটি দ্রুত আছে বলিয়া কথিত হয়, তাহার প্রকৃত নাম নাংায়গীরা বা ষাজিকী উপনিষদ। সে যাহা হউক, এই উপনিষদে দ্রুত যে মন্ত্রটিতে হুর্গা বা হুর্গা নামের সমার্থক হিসাবে উমা শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়, তাহা বাস্তবিক পক্ষে উপনিষদমন্ত্র নয়, ঋগ্বেদের মন্ত্র (৯।৯।৪০), উপনিষদে, উপনিষদ-মন্ত্র বা বাক্যের সমর্থনে, অথবা উপনিষদ-মন্ত্রের সঙ্গে একত্রে পঠিত হইবার উদ্দেশ্যে, উদ্ধৃত হইয়াছে মাত্র। সুতরাং তৈত্তিরীয় আরণ্যকসম্পর্কিত অভিমতটি ভুল। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ভাষ্যকার আচার্য্য সায়ন এতদীয় প্রতিটি মন্ত্রের প্রথমে, ইহার। যে ঋক মন্ত্র, তাহার উল্লেখ করিলেও, গবেষকগণের কাহারও দৃষ্টিতে এই তথ্যটি এতাবৎ ধরা পড়ে নাই! সুতরাং এই একটি মাত্র উদাহরণেই প্রমাণিত

হয় যে, উমা শব্দটি মূলতঃ ঋগ্বেদীয়, আরণ্যকীয় বা উপনিষদীয় নয়।

এবার আমরা ঋগ্বেদের নানা স্থান হইতে “উমা” শব্দটির নানা-রূপে প্রয়োগের উদাহরণসমূহ দেখাইব। আমরা দেখিব যে, প্রায় সবকয়টি ক্ষেত্রেই দীর্ঘ-উকারান্ত উমা শব্দটির পুংলিঙ্গে এবং বহুবচনে ব্যবহার হইয়াছে :—
উমা :—

ঋগ্বেদ :—৩।৬।৮ উমা বা যে স্ত্রহাসো যজ্ঞা আযেমিরে
ইত্যাदि ॥

৪।১৯।১ এবা আমিন্ত বজ্রিন্ত বিধে দেবাসঃ
স্ত্রহাস উমাঃ ।

৫।৫২।১২ তে মে কে চিন্ন তায়ব উমা
আসন্দ শি ত্রিষে ॥

৭।৩৯।৪ তে হি যজ্ঞেযু যজ্ঞিয়াস উমাঃ সধস্বং
বিধে অভিসন্তি দেবাঃ ।

১০।৬।৭ তং তে দেবাসো অহু কেতমায়ন্নধাবর্ধন্ত
প্রথমাস উমাঃ ॥

১০।৩১।৩ অধায়ি ধীতিরস স্গমং শাস্তীর্থে
ন দম্যয়ুপ যন্তু মাঃ ।

১০।৭৭।৮ তে হি যজ্ঞেযু যজ্ঞিয়াস উমা
আদিতোন নায়্য শংভবিষ্ঠাঃ ।

১০।১২।১১ সত্তো জজ্ঞানো নি রিণাতি শক্রনহু
যং বিধে মদন্ত্য মাঃ ॥

১০।১২।১৩ স্তে ক্রতুমপি বৃদ্ধন্তি বিধে দ্বির্ঘদেতে
ত্রিভবন্ত্য মাঃ ।

উমাসঃ :—১।১৬৬।৩ যম্মা উমাসো অমৃত্য অরাসত
রায়স্পোষং...

উমেতিঃ :—৫।৫১।১ অগ্নে স্ততশ পীতয়ে বিষ্টৈরুমেতিঃ
আগহি ।

উমেভ্যঃ :—১০।৩২।৫ জয়া বা যেষযুতেষু দাবনে পরি
উমেভ্যঃ সিকতা মধু ॥

উমৈঃ :—১।১৬৯।৭ যে মর্ত্যং পৃথনায়ন্ত মূমৈ ঋণাবানং ন
পত্যন্ত সর্গৈঃ ॥

ওমাসঃ :—১।৩।৭ ওমাসসর্ঘীগীযতো বিধে দেবাস
আগন্ত ।

উমা :—৯।২৭।৪০ বুধা পবিত্রে অধি সানো অব্যে
বৃহৎসোমো বাবুধে স্ববান ইন্দুঃ ॥

তৈত্তিরীয় সংহিতা :—উমাঃ
৪।৪।৪।৭ পাঞ্চজনেষপোধ্যগ্নেযাবা অযাবা এবা
উমাঃ সদঃ সগরঃ স্রমেকঃ ।

উমাশব্দের বৈদিক অর্থ

উল্লিখিত উদাহরণ সমূহ হইতে দেখা যাইবে যে, একটিমাত্র ক্ষেত্র ব্যতীত, অত্র সব ক্ষেত্রেই দীর্ঘ-উকারান্ত “উম” শব্দটি নানা-বিভক্তিতে এবং নানা-রূপে পুংলিঙ্গ ও বহুবচনে ব্যবহৃত হইয়াছে। আচার্য্য যাক্শের (খঃ পুঃ ৭ম শতাব্দী) নিকর গ্রন্থে (৬২ ও ১২।৪০) ঋগ্বেদের ১।৩।৭ম মন্ত্রে ব্যবহৃত “ওমাসঃ” শব্দটির ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, “অবিতারঃ” বা রক্ষকবৃন্দ ঋগ্বেদের অত্রতম ভাগ্যকার স্বন্দরামী এই মন্ত্রটির ব্যাখ্যাকালে “ওমাসঃ” শব্দের যাদুকৃত ব্যাখ্যাই গ্রহণ করিয়াছেন। পরবর্তী বেদভাষ্যকার বেদসংগ্রহ ও সায়ন প্রথমা-বিভক্তি-যুক্ত ও বহুবচনান্ত উমাঃ এবং উমাসঃ শব্দদ্বয়ের “অবিতারঃ” বা রক্ষকগণ, এরূপ অর্থই সাব্যস্ত করিয়াছেন। এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে, ঋগ্বেদের ৯।৩।৭ মন্ত্রটি শুক্লযজুর্বেদ (৭।৩৩ এবং ৩৩-৪৭) এবং শতপথব্রাহ্মণেও (৪।৩.১.২৭) দ্রুত আছে। ভাষ্যকার উবট এবং মহাধর উভয়েই “ওমাসঃ” শব্দে রক্ষকগণ, এই অর্থই পরিয়া লইয়াছেন। স্তত্রাং প্রথমা-বিভক্তি-যুক্ত ও বহুবচনান্ত ওমাসঃ, উমাঃ ও উমাসঃ, এই তিনটি শব্দেরই অর্থ হয় রক্ষকাঃ বা রক্ষকবৃন্দ, এবং ঠিক একই অর্থে তৃতীয়া ও চতুর্থী বিভক্তিযুক্ত উমৈঃ উমেতিঃ এবং উমেভ্যঃ, এই শব্দদ্বয়ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। উল্লেখযোগ্য বিষয়টি এই যে, দীর্ঘ-উকারান্ত “উম” শব্দটি যে বিভক্তিতে এবং যে ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত হইয়া থাকুক না কেন। তাহা কতিপয় দেবতাই হউন, আর বহু দেবতাই হউন, অথবা নিষদেবগণ বা পিতৃদেবতা-গণই হউন,—সর্বত্রই ইহার একটিমাত্র অর্থ দেখা যাইবে, দ্বিতীয় কোন অর্থ নয়। স্তত্রাং প্রথমা-বিভক্তি-যুক্ত ও একবচনান্ত পুংলিঙ্গ “উম” শব্দের অর্থ দাঁড়ার রক্ষক, আর একবচনান্ত স্ত্রীলিঙ্গ “উমা” শব্দের অর্থ হয় রক্ষিকা বা রক্ষিণী।

বৈদিক পদের রূপ ও বানান বৈচিত্র্য

বহুবচনান্ত উমা: ও উমাস: রূপ দুইটির জায় বেদে একই পদের দুইপ্রকার রূপ প্রায়শ: দেখা যায় :—যেমন, হস্তা: ও হস্তাস:, দেবা: ও দেবাস:, বজ্রা: ও বজ্রাস:, রুদ্রা: ও রুদ্রাস: ইত্যাদি। তেমনই বানানের ক্ষেত্রেও হ্রস্ব ও দীর্ঘস্বরের প্রয়োগে কোন বাধাধরা নিয়ম অনুসরণ করা হয় নাই, যেমন :—উর্ব ও উর্ব, উষা ও উষা, উরু ও উরু, রাত্রি ও রাত্রী, পথিভি: ও পথিভী: ইত্যাদি। এই বৈদিক নজীর অহুযায়ী জীলিঙ্গায়ক উমা ও উমা শব্দদ্বয় এক এবং একার্থবোধক, এই সিদ্ধান্ত করা অযৌক্তিক নয়। সুতরাং হ্রস্বউকারান্তই হউক, আর দীর্ঘ উকারান্তই হউক, উমা শব্দের (জীলিঙ্গের) একবচনে প্রথমা বিভক্তিতে বৈদিক অর্থ হইবে রক্ষিকা বা রক্ষিণী। শব্দটি ত্র্যবিভী কিংবা বেবিলোনীয় হইলে ইহার একটি মাত্র অর্থই হইত “মাতা”, রক্ষিকা বা রক্ষিণী নয়; এবং ইহা কদাপি পুংলিঙ্গে ব্যবহৃত হইত না, সর্বত্রই একমাত্র জীলিঙ্গেই ব্যবহৃত হইত। পক্ষান্তরে আমরা দেখিয়াছি যে, একটিমাত্র ক্ষেত্রে ব্যতীত সর্বত্রই শব্দটি ঋক ও যজু:, এই দুই বেদে পুংলিঙ্গে ব্যবহৃত হইয়াছে, এবং সেই একটিমাত্র ক্ষেত্রেও শব্দটির অর্থ মাতা নয়। মুসলমান রাজত্বের সময় যেমন বহু বহু আরবী ও ফারসী শব্দ ভারতীয় ভাষাসমূহে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, তেমনই ইংরেজ আমলেও বহু-বহু ইংরেজী ও ইউরোপীয় শব্দ ভারতীয় ভাষায় স্থান পাইয়াছে। এই সকল বহিরাগত শব্দের কোন কোনটির ক্ষেত্রে অর্থ-বিষয়ে কিছুটা হের-ফের ঘটিলেও, কোথাও লিঙ্গান্তর ঘটয়াছে বলিয়া জানা যায় না, সম্ভবত: ভাষাতত্ত্ববিদগণও ইহার কোন নজীর দেখাইতে সক্ষম হইতেন না। আমীর, সুলতান, নবাব, বাদশাহ প্রভৃতি শব্দ যেমন ভারতীয় ভাষায় “বেগমে” রূপান্তরিত হয় নাই, তেমনই বাদী, আশ্মা প্রভৃতি জীলিঙ্গ বাচকপদও ‘গোলাম’, আশ্মা ইত্যাদিতে পরিণত হয় নাই। ইংরেজী বা অপর ইউরোপীয় ভাষা হইতে গৃহীত শব্দাবলীও পুরুষের ক্ষেত্রে জীলোকে, এবং জীলোকের ক্ষেত্রে পুরুষে রূপান্তরিত হয় নাই। ভাষাতত্ত্বের এই নজীরে, এবং ঋগেদে ও যজুর্বেদে “উম” শব্দটির লিঙ্গ, বানান ও রূপ-বৈচিত্র্যের নজীরে এই সিদ্ধান্ত করা

অসমীচীন হইবে না যে, এ ব্যাপারে ধারকর্জের কো প্রশ্ন উঠিলে, সম্ভবত: তাহা অপর পক্ষ হইতেই ঘটিয়া থাকিবে। ভারত এ ব্যাপারে উদ্ভূত বা ঋণদাতা, অধমণ বা ঋণগ্রহীতা নয়। মাতা বুঝাইতে ঋগাদি বেদে ‘মাতা’, জনিতা, জনয়িত্রী ইত্যাদি পদই বহুলভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং জীলিঙ্গবাচক উমা শব্দটি বহিরাগত, এই মতবাদ ভ্রান্ত ও গ্রহণের সম্পূর্ণ অযোগ্য।

উমা-শব্দের নানা অর্থ ও তাহাদের উৎপত্তিস্থল

বৈদিক ও বেদোত্তর সাহিত্যে উমা পদটি নানা অর্থেও ব্যবহৃত হইয়াছে দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে কয়েকটি অর্থ অসম্ভবত: পক্ষে বিগত ৩০০০ বৎসর ধরিয়া ভারতে প্রচলিত আছে বলিয়া অসম্ভব করা যায়। উমা নামটি দেবী ভবানীর বহুবিধ নামের অগ্গতম মাত্র। আদিত্যে হয়ত যাহা একটি ডাক-নাম বা উপাধি মাত্র ছিল, পরবর্ত্তী যুগসমূহে তাহাই ভিন্ন ভিন্ন আচার্য্য ও পণ্ডিতের হাতে ভিন্ন ভিন্ন অর্থপরিগ্রহ করিয়াছে, সন্দেহ নাই। নিম্নে আমরা এজাতীয় কয়েকটি প্রয়োগের উদাহরণ দিলাম :—

(ক) উমা পদের বৈদিক অর্থ রক্ষিকা বা রক্ষিণী। ঋগ্বেদীয় ৯.৯৭.৪০তম মন্ত্রের ব্যাখ্যায় (তৈত্তিরীয় আরণ্যক বা যাজ্ঞিকী উপনিষদের ব্যাখ্যাকালে) আচার্য্য সাযন উমা অর্থে হৈমবতী হিতা দেবী পার্কটীকে বুঝাইয়াছেন। এখানে উমা একটি বিশেষ্যপদ বা নামমাত্র এরূপ মনে করা যায়। উমা শব্দে এখানে নাম না ধরিয়া যদি রক্ষিকা বা রক্ষিণী ধরা হয়, তাহা হইলেও বেদ-মন্ত্রটির সামগ্রিক অর্থ বিষয়ে বিশেষ কোন তারতম্য হইবে না। যাজ্ঞিকী উপনিষদে উমা পদটি দেবী দুর্গা বা দুর্গিরই নামান্তর হিসাবে উল্লিখিত হইয়াছে।

(খ) কেনোপনিষদে দেবী উমা হৈমবতী যক্ষ-রূপী ব্রহ্মের স্থলবর্ত্তিনী, এবং সেই হিসাবে তিনি ব্রহ্মশক্তি বা ব্রহ্মবিচারুপিনী,—আচার্য্য শব্দর তদীয় ভাষ্যে এরূপ আভাসই দিয়াছেন। আচার্য্য অবশ্য একথাও বলিয়াছেন যে দেবী হৈমবতী সর্বজ্ঞ পরমেশ্বরের (শিবের) নিত্যসঙ্গিনী। এখানে উমা পদটিকে দেবী হৈমবতী তথা দেবী দুর্গা বা পার্কটীর একটি নাম বলিয়া ধরিয়া লইলেও উপনিষদমন্ত্রের অর্থের কোন ব্যত্যয় ঘটিবে না।

(গ) কোন কোন পুরাণ অহুযায়ী “উমা”, দেবী

পার্কতীর পিতামাতার দেওয়া অপর একটি নাম মাত্ৰ। দেবী উমা দেবাদিদেব শব্দের বিতীয়া পত্নী। প্রথমা পত্নী দেবী সতী দক্ষ-হুহিতা ছিলেন; বিতীয়া পত্নী দেবী উমা-পার্কতীর সঙ্গে তৎকালীন প্রজাপতি দক্ষের বা তদ্বংশের কাহারও কোন সম্পর্ক ছিলনা। এ প্রসঙ্গে আমরা প্রবন্ধের শেষদিকে সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

(ঘ) কোন কোন পুরাণে আবার উমা পদটি দেবী পার্কতীর একটি উপাধি হিসাবে উল্লিখিত হইয়াছে। এখানে উমা অর্থে, ষাঁহাকে কোন বিষয়ে নিষেধ করা হইয়াছে, এমন কোনও মহিলাকে বুঝাইতেছে:—যথা

নিষেধস্তা চোমেতি মাতৃস্নেহেন হু:খিতা ॥৮৫

সা তথোক্তা তয়া মাত্ৰা দেবী দুষ্টচরিত্রিণী।

তেনৈব নামা লোকেযু বিখ্যাতা স্বরপূজিতা ॥৮৬

ব্রহ্মপুরাণ, ৩৪শ অধ্যায়।

অর্থাৎ মাতা মেনা বা মেনকা কন্ঠার কঠোর তপস্তার ক্লেশ দর্শনে দু:খিত হইয়া, স্নেহভরে তাঁহাকে “উ-মা” বলিয়া এরূপ কঠোর তপস্তা করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। (মাতার নিষেধ সত্ত্বেও তিনি স্বকীয় সঙ্কল্প হইতে বিরত হন নাই)। এই নিষেধের জন্তই উত্তরকালে তিনি উমা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

পুনশ্চ:—

উ মেতি চপলে পুত্রি ন ক্মং তাবকং বপু:।

সোচুং ক্লেশস্বরূপস্ত তপস: সৌম্যদর্শনে ॥২২৪

... ..

উ মেতি চপলে পুত্রি স্বয়োক্তা তনয়া তত: ॥২২৮

উমেতি নাম তেনাস্তা ভুবনেযু ভবিষ্যতি ॥২২৯

মৎস্ত পুরাণ, ১৫৪ অধ্যায়।

এখানে পিতা শৈলরাজ তদীয় দুহিতাকে বলিতেছেন, “উ, মা”, অর্থাৎ তুমি এরূপ উত্তম করিও না; তোমার এই কোমল শরীর তপস্তার উপযুক্ত নয়, তপস্তা ক্লেশস্বরূপ; সুতরাং সে ক্লেশ তোমার সঙ্কল্প হইবে না।.....কিয়ৎকণ পরে দৈববাণী হইল যে, “উ, মা” এই বলিয়া তপস্তা বিষয়ে নিষেধ করার জন্ত অতঃপর এই কন্তা বিধে উমা নামে কীৰ্ত্তিতা হইবেন।

মহাকবি কালিদাস কুমারসম্ভব কাব্যে উমা শব্দের এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন, দেখা যায়:—

তাং পার্কতীত্যাভিজ্ঞেনৈ নীমা

বন্ধুপ্রিয়াং বন্ধুজ্ঞানো জুহাব।

উমেতি মাত্ৰা তপসো নিষিদ্ধা

পশ্চাদ্ভয়াখ্যাং স্মৃখী জগাম ॥

—২৬শ শ্লোক, ১ম সর্গ।

বন্ধজন, বন্ধুপ্রিয়া সেই পার্কতীকে ‘পার্কতী’ এই পৈত্রিক নাম ধরিয়া ডাকিতেন। তাহার পর, “উ-মা” এই বলিয়া মাতা মেনকা তপস্তা করিতে নিষেধ করেন বলিয়া, সেই স্মৃখী উমা আখ্যা লাভ করেন।

(ঙ) উমা = উ + মা: উ অর্থে শিব বা মহেশ্বর, আর মা অর্থে স্ত্রী বা লক্ষ্মী = শিবলক্ষ্মী = শিবপত্নী।

এতদ্ব্যতীত পরবর্ত্তী সুগম্ভূহে এই উমা নামের আরও ২১১টি ব্যাখ্যা হয়ত প্রচারিত হইয়াছিল; কিন্তু এগুলি তেমন সুপ্রচলিত নয় বলিয়া আর এখানে উল্লিখিত হইল না।

ক হইতে ঘ পর্য্যন্ত যে ব্যাখ্যাসমূহ এখানে দেখান হইল, এই সবকয়টি অর্থেই সংস্কৃত সাহিত্যে উমা নামের ভূরিভূরি প্রয়োগ দেখা যায়। ক ও খ সম্পর্কে আর বিশদ-ভাবে বলিবার বিশেষ কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না। গ সম্পর্কেও একই কথা বলা যায়, কারণ এখানে উমা দেবী পার্কতীর অপর একটি নাম মাত্ৰ। কিন্তু ঘ ও ঙ সম্পর্কে বিষয়টি পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন। ক ও খ-এর মত ইহাদেরও কোন বৈদিক নজীর আছে কিনা, তাহার অনুসন্ধান করা গাইতে প’রে; কারণ ইহা একান্ত সম্ভবপর যে, প্রাচীন আচার্য্য ও পুরাণপ্রবক্তাগণের মধ্যে এই দুইটি অর্থেও উমা নামের প্রয়োগ প্রচলিত ছিল।

আচার্য্য যাক্শের নিরুক্ত গ্রন্থ অনুসারে বৈদিক (সংহিতা গ্রন্থে প্রযুক্ত) “উ” নিপাতটি কোন কোন ক্ষেত্রে “এব” অর্থাৎ নিশ্চিত অর্থেও ব্যবহৃত হইয়াছে (অথাপ্যকার এতন্মিয়্নেগার্ব উকরণে। ১৫)। আর “মা” নিপাতটি নিষেধ বা প্রতিষেধ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে (যেমন, মেতি প্রতিষেধে ১৫)। উক্তয়ক্ষেত্রেই আচার্য্য যাক্শের হইতে উদাহরণ তুলিয়া নিপাত দুইটির উল্লিখিত অর্থে প্রয়োগ দেখাইয়া দিয়াছেন, যেমন:—নিরুক্ত ৩২, ৩১০, ৩১২, ৩২০ প্রভৃতি, এবং ৩.২, ৩.৫, ৫.৮, ৬.২৪ প্রভৃতি অধ্যায়। সুতরাং উ + মা = উমা অর্থে নিশ্চিত নিষেধ বা কোন

ব্যাপারে বিশেষভাবে নিষেধ বুঝাইবে। এবং কোন ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রে এই “উমা” শব্দটি প্রযুক্ত হইলে বুঝিতে হইবে যে তাহাকে কোন কিছু সম্পর্কে বিশেষভাবে নিষেধ করা হইয়াছে। সূত্রাং ঘ-এ উল্লিখিত উমা নামের ব্যাখ্যার বৈদিক নজীর আছে বুঝিতে হইবে। আদি কবি বাঙ্গালী-রচিত রামায়ণের আদিকাণ্ডের দ্বিতীয় সর্গে (১৭শ শ্লোক) এই নিষেধার্থেই “মা” নিপাতের প্রয়োগ আছে দেখা যায় :—

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ভ্রমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ ।

যং ক্রোধমিখুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্ ॥

কুমারসম্ভব কাব্যের কোন কোন টীকাকার অবশ্য উমা শব্দের “উ” অর্থে ওহে (সম্বোধনে) এরূপ অর্থও করিয়াছেন, দেখা যায়। কিন্তু এরূপ অর্থ বৈদিক অর্থের বিরোধী, সন্দেহ নাই।

শ্রী বা লক্ষ্মী অর্থে “মা” পদের (নিপাত নয়) ব্যবহার ঋগ্বেদীয় শ্রীসূক্তে দেখা যায়। শ্রীসূক্তটি ঋগ্বেদের একটি খিল সূক্ত, এবং ইহা পঞ্চম মণ্ডলের সর্বশেষ সূক্তের (৮৭ সূক্ত) পর পঠিতব্য। সূক্তের ৩য় মন্ত্রের শেষাংশে আছে, “শ্রীমা দেবী জ্যোতাম্”। এখানে শ্রী ও মা একার্থ বোধক। তৈত্তিরীয় সংহিতা বা কৃষ্ণযজুর্বেদে মাধব পদটি দেখা যায় :—মাধব পাত্মহান্ দিবো বরুণঃ পৃথিব্যা অশ্বেশানা অগতো বিষ্ণুপত্নী ইত্যাদি ৪।৪।৪।১২। মাধব অর্থে মা+ধব বা লক্ষ্মী+পতি বা লক্ষ্মীপতি বিষ্ণুকে বুঝায়। আর বেদের আত্মকর বা প্রণবমন্ত্র ও—এ, অ+উ÷ম, এই তিনটি অক্ষর আছে। ভাষাকার-গণের মতে এই তিনটি অক্ষরে যথাক্রমে বিষ্ণু, মহেশ্বর ও ব্রহ্মা, এই প্রধান ত্রিমূর্তিকে বুঝায়। ঋগ্বেদের ৪।৫৮।৩ মন্ত্রের এরূপ ব্যাখ্যা দেখা যায়। এখানে উ অক্ষরে মহেশ্বরকে বুঝাইতেছে বলিয়া, উ+মা=উমা অর্থে মহেশ্বরপত্নী দেবী উমা-পার্বত্যীকেই বুঝাইতেছে। সূত্রাং এক্ষেত্রেও উমা শব্দের অর্থের বৈদিকনজীর আছে বলিয়া ধরা যায়। পরবর্তীকালে রচিত মেদিনী ত্রিকাণ্ডশেষ, একাক্ষরকোষ প্রভৃতি কোষগ্রন্থে এ জাতীয় ব্যাখ্যা দেখা যায়। সাহিত্যে এ শ্রেণীর প্রয়োগ পূর্ক হইতে চলিত থাকিলে তবেই তাহা

কোষগ্রন্থে স্থান লাভ করে, নতুবা নয়। ঋগ্বেদের সেই প্রসিদ্ধ মন্ত্রটি হইল :—

চত্রারি শৃঙ্গা ত্রয়ো অশ্রু পাদা যে শীর্ষে সপ্ত

হস্তাসোঅশ্রু ।

ত্রিধা বজ্রো বৃষভো রোরবীতি মহো দেবো সত্যঃ

আ বিবেশ ॥ ৪।৫৮।৩

উপরে উমা শব্দের যে ৫টি প্রচলিত অর্থের উদাহরণ দেখান হইল, তাহাতে এই বিষয়টি সুস্পষ্ট হইয়াছে যে, কোন ক্ষেত্রেই উমা শব্দে “মাতা”-কে বুঝাইতেছে না, এবং এই শব্দে মাতৃ-অর্থের আরোপ নিতান্তই গোণ, বেবিলোনীয় বা প্রাবিড়ী শব্দভাষ্যের মত একমাত্র বা মুখ্য অর্থ নয়। ইহাও সুস্পষ্ট হইয়াছে যে, একমাত্র গ ব্যতীত অন্ত সব কয়টি ক্ষেত্রেই শব্দটির অর্থের বৈদিক নজীর বর্তমান। গ-এর ক্ষেত্রেও যে প্রয়োগটি অবৈদিক, এমন কথাও কিছুতেই বলা যায় না; কারণ দেবী উমা হৈমবতীর শুভ আবির্ভাব আদি-বৈদিক যুগেই ঘটয়াছিল এবং আমরা দেখিয়াছি যে উমা শব্দটি একটি অতি বিস্তৃত বৈদিক পদ। বৈদিক ও বেদান্তের সাহিত্যে শব্দটির প্রয়োগের ব্যাপকতা বা নানা অর্থে প্রয়োগ নিঃসন্দেহে ইহার প্রাচীনত্ব এবং মৌলিকত্বেরই চোতক, বহিরাগত শব্দরূপে বৈদিক সাহিত্যে প্রবিষ্ট হইয়া একটি মাত্র অর্থে প্রযুক্ত বা ব্যবহৃত হইবার চোতক অবশ্যই নয়। ইহা বৈদিক তথা সংস্কৃত ভাষার ধাতু এবং পদকোষের সমৃদ্ধিরই সূচক মাত্র। আচার্য্য যাস্কের নিরুক্তে আমরা বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাচীনতর বেদাচার্য্য কর্তৃক ব্যাখ্যাত একই পদের বিভিন্ন অর্থ দেখিতে পাই। কোন কোন ক্ষেত্রে একই পদের ৬৭টি পর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা দেখা যায়; অথচ সর্বক্ষেত্রেই শব্দগুলি খাটি বৈদিক পদ হিসাবে অবিসংবাদিতরূপে স্বীকৃত। উমা শব্দ সম্পর্কে এরূপ দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণে আপত্তি কি, আর বাধাই বা কি? ঋগ্বেদে ও কৃষ্ণযজুর্বেদে ব্যবহৃত পুংলিঙ্গাত্মক উম বা উম পদ, এবং ইহার স্ত্রীলিঙ্গাত্মক উমা বা উমা রূপ যদি গবেষক গণের দৃষ্টি এযাবৎ এড়াইয়া গিয়া থাকে, তবে দেবীটির অবশ্যই পদদুইটির নয়, এতৎ সংশ্লিষ্ট গবেষকবৃন্দেরই, কারণ পদদুইটি স্মরণাতীত কাল হইতেই সংহিতা গ্রন্থদ্বয়ে বর্তমান আছে। যে সকল প্রাখ্যাত বৈদেশিক

গবেষক প্রথমে এতৎ সম্পর্কিত আলোচনার স্বত্বপাত করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই বেদজ্ঞ হিসাবে সারা পৃথিবীতে স্বীকৃতি ও সমাদর লাভ করিয়াছিলেন। অথচ তাঁহাদের ক্ষেত্রে এরূপ মারাত্মক ভুলের কারণ কি? কারণ সম্ভবতঃ এই হইতে পারে যে, তাঁহারা প্রথমাবধিই এ সম্পর্কে মনে মনে একটা সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়া, সেই সিদ্ধান্তেরই অমূল্য প্রাপ্ত কয়েকটি হাক্ক ধরনের প্রমাণ পত্র লইয়া গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এবং নানা প্রকার যুক্তিভাল বিস্তার করিয়া, সেই ভুলসিদ্ধান্তের সমর্থনেই সকল প্রচেষ্টা নিবন্ধ রাখিয়াছিলেন, মূল গ্রন্থের প্রতি ততটা সতর্ক দৃষ্টি রাখিবার প্রয়োজন অমূল্য করেন নাই। ক্ষেত্রবিশেষে এমনও হইতে পারে যে, সংশ্লিষ্ট গবেষক প্রচলিত ও প্রকাশিত অসম্পূর্ণ বৈদিক নির্দষ্ট বা পদবৃত্তী, অথবা বিগত শতাব্দীতে ও বিংশ শতাব্দীতে ইউরোপপথে প্রণীত বৈদিক শব্দকোষজাতীয় গ্রন্থের উপরই অত্যধিক নির্ভরশীল ছিলেন। সুতরাং তাঁহাদের নিকট কেনোপনিষদ, বা তৈত্তিরীয় আরণ্যকই এতৎ সম্পর্কিত প্রাচীনতম গ্রন্থ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল, যেখানে উমা শব্দের উল্লেখ আছে। সে যাহা হউক, কেনোপনিষদে উল্লিখিত দেবী উমা হৈমবতী সম্পর্কে একটু বক্তব্য হয়ত এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবেন। কেনোপনিষদ খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ বা ৭ম শতাব্দীতে রচিত হইয়া থাকিলেও, উহাতে উল্লিখিত উমা নামটিও খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ বা ৭ম শতাব্দীরই, এই ধারণা বা যুক্তি অনৈতিহাসিক ও অবৈজ্ঞানিক। কেনোপনিষদে যে ঘটনাটি বর্ণিত হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহে বহু প্রাচীন কালের, গ্রন্থ-রচনার কালের অবশ্যই নয়। অথচ পাশ্চাত্য গবেষক-সমাজ নামটি যে অপ্রাচীন, তাহা ২য় অধ্যায়ের জগৎ এই শ্রেণীর অনৈতিহাসিক যুক্তিভালেরই অবতারণা করিয়া ছিলেন, আর শক্তি সাধনার ইতিহাস রচয়িতা কতিপয় ভারতীয় গবেষকও এই ভুল দৃষ্টিভঙ্গীটিকেই বিনা বিচারে অমূল্য করিয়াছেন। বাইবেলের old Testament বর্তমানে যে আকারে পাওয়া যায়, তাহা খ্রীষ্টীয় কোন সালে রচিত বলিয়া পণ্ডিতগণ অমূল্য করিয়া থাকেন। এ ক্ষেত্রে এই যুক্তি যদি দেখান হয় যে, যেহেতু বর্তমান আকারে প্রাপ্ত গ্রন্থটি অপ্রাচীন, সেহেতু তাহাতে বর্ণিত

Genesis, Exodus প্রভৃতি অধ্যায়গুলি বা সেখানে উল্লিখিত আদি পিতা-মাতা অথবা আদি পয়গম্বরগণের নাম ও কাহিনীসমূহও অপ্রাচীন, তবে তাহা গ্রন্থসমূহ বা ইতিহাস-সম্মত বা বিজ্ঞান-সম্মত যুক্তি হইবে কি?

বৈদিক দেবতার বহু-নামের রহস্য

বৈদিক প্রধান দেবদেবীগণের প্রত্যেকেরই বহু নাম ছিল। ভবপত্নী দেবী ভবানীর উমা নামটিও তাঁহার অনেকানেক নামের মধ্যে একটি মাত্র। প্রাচীন ঋষি, আচার্য্য ও নিরুক্তকারগণ এই বিভিন্ন নামের উৎপত্তির কারণসমূহ সম্যক জ্ঞাত ছিলেন, এবং যাস্থ রচিত নিরুক্ত (৭ম অধ্যায়), শৌনকীয় বৃহদেবতা (১ম অধ্যায়) এবং কাত্যায়ন-রূত ঋগ্বেদীয় সর্গাক্রমণী প্রভৃতি বৈদিক ব্যাখ্যাগ্রন্থে তাহা স্পষ্টভাবে উল্লিখিতও আছে। পরবর্তী কোন কালে যাগাতে কেহ এই সন্দেহ করিতে না পারে যে, একই দেবতার এত নাম কেন এবং কি ভাবে হইল, তজ্জগৎই ক্রান্তদর্শী ঋষি ও আচার্য্যগণ এতৎসম্পর্কীয় প্রকৃত কারণ সমূহ সম্ভবতঃ সন্নিহিত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বৃহদেবতায় যাস্থ ও তাঁহার বহু পূর্ববর্তী ঋষি ও আচার্য্যগণের মতামতসমূহ লিপিবদ্ধ আছে। যেমন, যধুক, খেতকেতু (ঋষি উদালক আরণ্যিকের পুত্র) ও গালব প্রভৃতি প্রাচীন ঋষি ও নিরুক্তকারগণের মতে ৯ প্রকার বিভিন্ন কারণ হইতে, এবং যাস্থ, গার্গ্য ও রথীতর (শাকপণি) প্রভৃতি বেদাচার্য্যের মতে ৪ প্রকার বিভিন্ন কারণ হইতে বৈদিক দেবদেবীগণের বিভিন্ন নামকরণ হইয়াছিল। এই ৯ প্রকার বিভিন্ন কারণ হইল:—নিবাস, কর্ম, রূপ, মাজলা-দান, বাক্য, আশিষ বা প্রার্থনা, ষড়চ্ছ বা ঘটনা, উপবসন বা প্রবৃতি ও জন্মরহস্য; আর ৪ প্রকার বিভিন্ন কারণ হইল:—আশিষ, অর্থ-বৈরূপা (বিভিন্ন অর্থ-সাধন), বাক্য ও বিভিন্ন কার্য্য প্রভৃতি (বৃহদেবতা—১২৩।৮)। সুতরাং প্রতিটি প্রধান বৈদিক দেবদেবীর অন্ততঃ পক্ষে ৯টি বা ৪টি বিভিন্ন কারণপ্রসূত ভিন্ন ভিন্ন নাম ছিল। এতদ্ব্যতীত রূতজ্ঞ ঋষি ও স্তাবক কর্তৃক বিভিন্ন উদ্দেশ্য-সাধক উপকার প্রাপ্তির জগৎও দেবতাগণের আরও অনেক নামকরণ হইত, সন্দেহ নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এতৎ সম্পর্কে বিভিন্ন স্থপ্রাচীন ঋষি ও

বেদাচার্যের স্পষ্ট নির্দেশ বর্তমান থাকার সত্ত্বেও বৈদেশিক গবেষণাগার ইউরোপীয় নব্বীর অহুসারে ভারতীয় দেবদেবীর বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া, বৈদিক দেবদেবীগণের মধ্যে বহু বিভিন্ন দেবতার সংমিশ্রণ আছে বলিয়া পাকা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইহাতে এই কথাই মনে হইবে যে, হয় তাঁহারা মনোযোগ সহকারে এই সমস্ত গ্রন্থ পাঠ করেন নাই, নয় সবকিছু জানিয়া শুনিয়াও প্রকৃত রহস্য অহুসাবনে তাঁহারা অসমর্থ হন, অথবা ইচ্ছা করিয়াই তাঁহারা সত্যের বিকৃতি ঘটাইয়াছেন। বৈদিক ব্যাখ্যাগ্রন্থ সমূহ পাঠ না করিয়া, যে সমস্ত ভারতীয় গবেষক দেবদেবী সম্পর্কে ইউরোপীয় মতের অহুসরণে গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদি রচনা করিয়াছেন, তাঁহারা দেশের ও ধর্মের উপকারের পরিবর্তে যথেষ্ট অপকারই সাধন করিয়াছেন, ইহা নিঃসন্দেহ। অপরের অন্ধ অহুসরণে অগৌরব ছাড়া গৌরবের কিছুমাত্র নাই এবং ইহা আত্মাবমাননারই নামান্তর মাত্র। প্রাচীন ইরাক, ইরান, এশিয়া মাইনর, মিশর এবং ইউরোপখণ্ডে যে সকল দেবদেবীর পূজা-উপাসনা প্রচলিত ছিল। তাঁহাদের মধ্যে কাহারও একটি অথবা দুইটির বেশী নামের অস্তিত্বের প্রমাণ অজাবধি পাওয়া যায় নাই। পক্ষান্তরে প্রাচীন ভারতের একই বৈদিকদেবতার বহুবিধ নামের অস্তিত্বের জাজ্ঞামান নিদর্শন আছে, এবং এই বৈশিষ্ট্য একমাত্র ভারতেরই নিজস্ব বস্তু। আর্ধ্যজ্ঞাতির প্রাচীনতম গ্রন্থ বলিয়া স্বীকৃত বেদের অস্তিত্ব যেমন একমাত্র ভারতবর্ষেই আছে, তেমনই আর্ধ্যজ্ঞাতির আদিম বাসস্থানও হয়ত এই ভারতের উত্তর ও উত্তরপশ্চিমাংশের পর্বত সংলগ্ন পার্বত্যপ্রদেশ সমূহেই ছিল, এই ধারণাই ইহাতে দৃঢ়তর হয়। এই ভারতভূমি হইতেই হয়ত সূদূর এক অতীতে আর্ধ্যজ্ঞাতির বিভিন্ন শাখা পৃথিবীর নানা স্থানে বিস্তৃত হইয়াছিল। মহাভারত ও পুরাণাদিতে মহাদেবী ভবানীর বহু বহু নামের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। সে-সকল নামের তালিকা উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধকে ভারাক্রান্ত করা নিম্প্রয়োজন। তবে এ প্রসঙ্গে বোদ্ধপণ্ডিত অমর সিংহ-কৃত অমরকোষ নামক গ্রন্থ হইতে মহাদেবীর কয়েকটি মাত্র প্রধান প্রধান নামের উল্লেখ এ-স্থলে করা দরকার বলিয়া মনে করা যায় :—যেমন, উমা (সর্বপ্রথম নাম), কাত্যায়নী, গৌরী, কালী, হৈমবতী,

ঈশ্বরী, শিবা, ভবানী, রুদ্রাণী, সর্বানী, সর্বমঙ্গলা, অপর্ণা, পার্বতী, দুর্গা, মৃড়ানী, চণ্ডিকা ও অম্বিকা। (স্বর্গবর্গ) বলা বাহুল্য যে, এই বোদ্ধগ্রন্থকার তৎকালীন সমাজে বহুল-প্রচলিত এবং উত্তরাধিকার স্বত্রে প্রাপ্ত একই মহাদেবীর কয়েকটি বিভিন্ন নামের উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র, সাম্প্রদায়িক দৃষ্টি-ভ্রমে প্রভাবিত হইয়া মহাদেবী শিবানীকে লোকচক্ষে বিশিষ্ট করিয়া দেখাইবার জগ্ন এই সমস্ত নামের একত্র সমাবেশ করেন নাই।

ভব-পত্নী সতী ও পার্বতী

পুরাণাদিতে দেখা যায় যে, দেবাদিদেব শব্দর প্রথমে প্রজাপতি দক্ষের কন্যা সতী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। দৈবকারণে এই বিবাহ দৌর্গম্যায়ী হয় নাই। বিবাহের কিয়ৎকাল পরেই দেবী সতী স্বামীর অবমাননার ক্ষুব্ধ হইয়া পিতার বজ্রশুলে দেহতাগ করেন। পতিপ্রাণা দেবী সতীর এই অপূর্ব আত্মোৎসর্গ পিতার বজ্রনাশই শুধু ঘটায় নাই, ইহার ফল হইয়াছিল সূদূরপ্রসারী। তদীয় পুত্র দেহাবশেষ সর্ব-ভারতের বহু-স্থানকে, এমন কি, সূদূর তিব্বত ও লঙ্কাদ্বীপের ২১টি স্থানকে পর্য্যন্ত, পবিত্র পীঠ-স্থানে পরিণত করিয়াছিল। তাঁহার এই অনন্তসাধারণ পতিপ্রেম ও পতিভক্তির স্মারক হিসাবেই সম্ভবতঃ ভারতের তাবৎ পতিব্রতা রমণীর শ্রেষ্ঠতম সন্মান হইল এই “সতী” উপাধিটি। সতী শব্দের বৃৎপত্তিগত অর্থ হইল, যিনি বর্তমান আছেন, এমন কোন মহিলা (সং শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ-রূপ)। সং শব্দ অস্-ধাতু হইতে আসিয়াছে। কেহ কেহ অবশ্য বলিয়া থাকেন যে, সতী দেবীর পূজা প্রচলিত না থাকিলেও তিনি দেবী পার্বতীর ভিতর দিয়াই পূজা পাইয়া আসিতেছেন। কথাটা সত্য হইলেও সম্ভবতঃ পুরাপুরি সত্য নয়। দেবী সতী ভারতের তাবৎ পতিপ্রাণা রমণীর মধ্যেই অক্ষয় ও অমর হইয়া বিরাজ করিতেছেন।

মহাদেবী সতী পরজন্মে হিমালয়-রাজের দুহিতারূপে জন্মগ্রহণ করেন। এ সম্পর্কে কোন পুরাণেই ঘিমত দেখা যায়না। এমন কি, মহাকবি কালিদাস-রচিত কুমার-সম্ভব কাব্যেও, সতী দেবীই যে পরজন্মে হিমালয়-রাজ-দুহিতা দেবী পার্বতী নামে পরিচিতা ছিলেন, এই পৌরাণিক তথ্যেরই পুনরাবৃত্তি দেখা যায়। যে ২১টি পুরাণে সতী দেবীর আত্মোৎসর্গজনিত ঘটনার উল্লেখ নাই,

সেগুলির নীরবতার কারণ ব্যাখ্যা এখানে অবাস্তব।
কুমারসম্ভব কাব্যে মহাকবি বলিতেছেন :

অখাবমানেন পিতুঃ প্রযুক্তা

দক্ষশ কণা ভবপূর্ণপত্নী।

সতী সতী যোগ বিশ্বদেহা

তাং জন্মেন শৈলবধুং প্রপেদে ॥ ১ম সর্গ

২১শ শ্লোক।

তাহার পর মহাদেবের পূর্বপত্নী পতিব্রতা (সতী) দেবী সতী পিতৃদত্ত অপমানে প্রণোদিত হইয়া যোগবলে দেহত্যাগ করিয়া (পুনরায়) জন্মগ্রহণ করিবার নিমিত্ত সেই শৈলরাজ-বধুর গর্ভে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

পুনশ্চ :— যদৈব পূর্বে জন্মেন শরীরং

সাদক্ষ রোষাং সূদতী সমর্জ্য।

তদা প্রভূতোব বিমুক্তসঙ্গঃ

পতিঃ পশ্চ্যামপরিগ্রহেৎ ॥ ১ম সর্গ,

৩৩ তম শ্লোক।

সেই শোভনদম্পতী পার্শ্বতী পূর্বজন্মে দক্ষের ক্রতি ক্রোধবশতঃ যখন দেহত্যাগ করেন, তখন হইতে পশুপতি শব্দর পত্নীবিহীন হইয়া বিখ্যাসক্তিগ্ণ হইয়াছেন।

কোন কোন গবেষক (ইহাদের মধ্যে ভারতীয়ও আছেন) এই পুনর্জন্মের ঘটনাটিকে বিশ্বাস করিতে পারেন নাই বলিয়া মনে হয়। যুক্তিটা এই যে, পুনর্জন্ম ঘটিল এই কাহিনীর সত্যতার কোন প্রমাণ নাই। পুরাণ-রচয়িতাগণের বাক্য ছাড়া সত্যসত্যই আর কোন প্রমাণ এখানে অল্পস্থিত। কিন্তু ভারতীয় সাহিত্যে এজাতীয় উদাহরণ অজস্র। রামায়ণ ও মহাভারতে যত্রতত্র এ-শ্রেণীর উদাহরণ দেখা যাইবে। মহাভারতে কৃষ্ণজন্মের পূর্বজন্মের কথা বহুবার উল্লিখিত হইয়াছে। (পূর্ব-জন্মের নারায়ণ ও নর নামক ঋষিধ্বয়)। মহাভারতেরই অন্তর্গত গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাণীতে আছে :—

বহুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন।

তান্নহং বেদ সর্বাণি ন জং বেখ পরন্তপ ॥ ৪র্থ অধ্যায়,

৫ম শ্লোক

হে শক্রতাপন অর্জুন, তুমি এবং আমি বহুজন্ম পার হইয়া আসিয়াছি; আমি তৎসমুদয় জ্ঞাত আছি, কিন্তু তুমি তাহা বিস্মৃত হইয়াছ।

এক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ নিজের এবং সখা অর্জুনের পূর্ব-পূর্ব সমুদয় জন্মের বৃত্তান্ত অবগত ছিলেন বলিয়া কথিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত তিনি আরও কয়েকজনের পূর্বজন্মের কথা বলিয়াছেন বলিয়া মহাভারতে দেখা যায়। পিতামহ ভীষ্ম দ্রুপদপুত্র শিখণ্ডীর পূর্বজন্মের বৃত্তান্ত অবগত ছিলেন বলিয়া, তাহার শরীরে অস্ত্রাঘাত না করিয়া, স্বয়ংই যুদ্ধাবরণ করেন। ভগবান বুদ্ধও জাতিস্মরণ ছিলেন। বৌদ্ধ-জাতক গ্রন্থসমূহে তাহার বহু-বহু জন্মের কাহিনী বিবৃত আছে, এবং সেই সঙ্গে সারিপুত্র, মহামুদগলান প্রভৃতি তদীয় প্রধান কয়েকজন শিষ্যের পূর্ব-পূর্ব জন্মের কাহিনীও তিনি বিবৃত করিয়াছেন, দেখা যায়। এ-যুগের শ্রীমদ্ভগবৎ পরমহংসও জাতিস্মরণ ছিলেন। কথামৃত ও অস্ত্রান্ত প্রামাণ্য গ্রন্থপাঠে জানা যায় যে, তিনি উপদেশ প্রদানে কেবল নিজের জন্মকথাই ব্যক্ত করেন নাই, বিবেকানন্দ, গিরিশচন্দ্র, বলরাম বসু, রাখাল মহারাজ, সারদানন্দ মহারাজ প্রভৃতি অন্তরঙ্গ অনেক শিষ্যেরই পূর্বজন্মের কাহিনীও ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। ঋগ্বেদ হইতে অতীত যুগের ২১টি উদাহরণ এখানে দিতেছি। ঋগ্বেদের ৪র্থ মণ্ডলের প্রথাত ঋষি গোতম বামদেব মাভুগর্ভে অবস্থান কালেই দোাগণের জন্মবৃত্তান্ত অবগত ছিলেন।

গতে হু সন্নবেযামদেহমহং দেবানাং জনিমানি বিশ্বা।

৪।২৭।১

এবং তিনি পূর্ব-পূর্ব যুগের বহু সৃষ্টি ও বহু কাগোর মধ্যে নিজেকে লিপ্য দেখিয়াছিলেন (৪।২৬ সৃজ)। ঠিক এই জাতীয় কথাই ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলস্থ ইন্দ্র বৈকুণ্ঠ-দৃষ্ট যন্ত্রদে (১০-৫৭-৩২) উক্ত হইয়াছে। ঋগ্বেদ বামদেবের এই অদ্ভুত জাতিস্মরণের প্রশস্তি বৃহদারণ্যকোপনিষদেও আছে। এ শ্রেণীর আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়। হুতরাং ভারতীয় ঋগ্বেদ ও অবতারকল্প মহাপুরুষগণের পক্ষে নিজের জন্মকথা জ্ঞানা যেমন একটি সাধারণ ব্যাপার তেমনই, ইচ্ছা হইলে, অপরের জন্মবৃত্তান্ত জ্ঞাত হওয়াও ঠিক একটি সাধারণ ব্যাপার মাত্র। বাগবত সতী-পার্কীতী কাহিনীকে বানান কথা বলিয়া উড়াইয়া দিতে চান, বামদেব, শ্রীকৃষ্ণ, তথাগত বুদ্ধ অথবা শ্রীমদ্ভগবৎ বাণী বলিয়া কথিত এই সব ঘটনাকে অস্বীকার করার সাহস তাহারা রাখেন কি?

জাতক সমূহের সংখ্যা ৫৫০টি বলিয়া ধরা হয়। প্রতি জাতকে একটি করিয়া জন্মবৃত্তান্ত ধরা হইলে, ৫৫০টি জাতকে মোট ৫৫০টি বিভিন্ন জন্মের বৃত্তান্ত ধৃত আছে, একথা বলা যায়। জাতক গ্রন্থের অগ্রতম অম্ববাদক Prof Cowell তৎপ্রকাশিত অম্ববাদ-গ্রন্থের মুখবন্ধে বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে মূনি-ঋষি ও মহাপুরুষগণের পক্ষে জাতিস্মরণতা একটি সাধারণ ব্যাপার বলিয়া গণ্য হইলেও, সমগ্র ইউরোপখণ্ডে মাত্র একটি ঐতিহাসিক উদাহরণই আছে, এবং তাহা গ্রীক দার্শনিক Pythagorus এর, যিনি নিজস্ব ৮টি জন্মের কথা বলিতে পারিতেন।

পুরাণাদিতে বর্ণিত আখ্যান অম্বযায়ী ইহাই বুঝা যায় যে, শিব হই বার দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করেন। সতী দেবীর মৃত্যুতে ব্যথিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া শিব প্রথমবার দক্ষ যজ্ঞ ধ্বংস করেন। দ্বিতীয়বারের ঘটনা ইহার অনেক পরবর্তীকালের। তখন শিব হিমালয়-রাজ-হুহিতা দেবী পার্শ্বতীর স্বামী। এবারও যজ্ঞকর্তা নবজন্মগুরু সেই প্রাচীন দক্ষ প্রজাপতি, যিনি এবারে প্রাচীন বহির পৌত্র এবং প্রচেতার (বা প্রচেতাগণের) পুত্র প্রজাপতি দক্ষ; যজ্ঞস্থলও সেই প্রাচীন গঙ্গাধার বা স্বর্গধার বা হরিধার-সংলগ্ন কনখল নামক স্থান। এ জন্মেও দক্ষ পূর্ব-বিষেববশে শিবকে যজ্ঞে আহ্বান করেন নাই। দেবী পার্শ্বতী ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া স্বামীকে উত্তেজিত করেন এবং দক্ষের ধৃষ্টতার সমুচিত শাস্তি বিধানের নিমিত্ত, স্বামীসহ বিনা আমন্ত্রণেই যজ্ঞস্থলে উপনীত হইয়া, সেই যজ্ঞ ধ্বংস করেন। সুতরাং এই জন্মে দেবী পার্শ্বতী দক্ষ বা তদংশের কেহ নহেন। শৌনকীয় বৃহদেবতা-মতে মরীচিপুত্র ঋষি কল্পপ, অদিতি দিতি, দমু, দনায়, কজ, বিনতা প্রভৃতি ত্রয়োদশ দক্ষকন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন (৫।১৪৮)। এই প্রজাপতি দক্ষবংশীয় রাজগণের রাজ্য হরিধার ও তৎসংলগ্ন প্রদেশে বহুকাল বিচরমান ছিল বলিয়া জানা যায়। শুরুযজ্ঞব্দীয় শতপথ-ব্রাহ্মণে প্রসঙ্গক্রমে এই দাক্ষায়ণ রাজবংশের কাহিনী কতকটা বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে কথিত আছে যে (২।৪।৪), প্রজাপতি দক্ষ সন্তান কামনায় একটি বিশেষ-ধরণের পৌর্ণমাসীয় যজ্ঞের অম্বষ্ঠান করিতেন এবং তাঁহার নামাঙ্কন্যে এই যজ্ঞের নাম হয় দাক্ষায়ণ যজ্ঞ। ঋষি প্রতীদর্শ বৈকু এই যজ্ঞবিধি আয়ত্ত করিয়াছিলেন এবং

তিনি এতৎ সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ বলিয়া সেই যুগে পরিজ্ঞাত ছিলেন। স্বজ্ঞবংশীয় (পাঞ্চালগণের আদি নাম) অম্বন্ বৈকুরের শিষ্য গ্রহণ করিয়া এই দাক্ষায়ণ যজ্ঞ ও মৌত্রামণি নামক অপর একটি যজ্ঞবিধিও শিক্ষা করেন। অম্বন্ স্বদেশে প্রভাববর্তন করিলে, তাঁহার পৌরোহিত্যে স্বজ্ঞগণের প্রকৃত উন্নতি সাধিত হয়। তৎপর প্রথ্যাত ঋষি দেবভাগ শ্রোতর্ষ ইহা আয়ত্ত করেন, এবং তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া, কুরু ও স্বজ্ঞ, এই উভয়-রাজ্যেরই প্রধান রাজপৌরোহিত্যের পদে বৃত্ত হন। ইহার পরে দক্ষবংশীয় রাজা দক্ষ-পার্বতি পুনরায় এইযজ্ঞের অম্বষ্ঠান করেন, এবং শতপথ ব্রাহ্মণের রচনাকালেও এই দক্ষবংশীয় রাজগণের রাজ্য বজায় ছিল বলিয়া এই গ্রন্থে উল্লিখিত আছে (ঋগ্বেদের দেবী অদিতি শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য, ভারতবর্ষ, চৈত্র-১৩৭০)। শতপথ ব্রাহ্মণের প্রকৃত রচয়িতা ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য অথবা তদীয় কোন শিষ্য, তাহা সঠিক জানা যায়না। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য পরীক্ষিত পৌত্র রাজা শতানীকের মৃত্যুর পরেও জীবিত ছিলেন, ইহা বৃহদারণ্যকোপনিষদের প্রমাণ অম্বযায়ী জানা যায় (৩৩য় ব্রাহ্মণ)। সুতরাং এই দক্ষবংশীয় রাজগণের রাজ্য হরিধার অঞ্চলে-মহাভারতীয় যুদ্ধের পর অন্ততঃ পক্ষে ৪।৫ পুরুষ পর্য্যন্ত বলবৎ ছিল, ইহা ধরিয়া লওয়া যায়। অষ্টাধ্যায়ী রচয়িতা আচার্য্য পাণিনিকে দাক্ষীপুত্র বলা হইত। তাঁহার মাতা দক্ষবংশের কন্যা ছিলেন, দাক্ষীপুত্র নাম হইতে এই তথ্যটি জানা যায়! পাণিনীয় ৬।২।১২২ সূত্রের উদাহরণে, “দাক্ষিসংকু” ও “দাক্ষিকর্ষঃ” এই দুইটি পদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। পদ দুইটিতে দক্ষবংশীয়গণের অধ্যুষিত অঞ্চলকে বুঝায়। সুতরাং পরবর্তী কোন কালে দক্ষবংশের রাজ্য লোপ পাইলেও তাহাদের বংশলোপ ঘটে নাই, ইহা স্পষ্ট বোঝা যায়। পাণিনি উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অন্তর্গত শলাতুর নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন বলিয়া কথিত হয়। শলাতুরের পরবর্তী নাম লাহোর বলিয়া অনেকে অম্বমান করিয়া থাকেন। ইহাতে বোঝা যায় যে প্রাচীন দক্ষবংশের কোন শাখা সম্ভবতঃ সীমান্তপ্রদেশ বা পাঞ্জাবের কোন স্থানে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন, যেখানে পাণিনির মাতুলালয় অবস্থিত ছিল।

উপসংহার

বৈদিক গ্রন্থপাঠে আমরা জানিতে পারি যে প্রাচীন আৰ্য্য জাতি অত্যন্ত গর্বিত প্রকৃতির ছিলেন, এবং তাঁহারা আৰ্য্যোত্তর জাতিসমূহকে যাতুধান, রাক্ষস, দহ্মা, দাস ইত্যাদি ঘৃণার্থে আখ্যায় আখ্যায়িত করিতেন। এমন কি, জাতিগুলোর মধ্যেও ধর্ম্মাচরণ ও আচারব্যবহারে সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতি দেখা গেলে, তাঁহাদিগকে অসুহ্র, দৈত্য ইত্যাদি বলা হইত। এতেন গর্বিত জাতি ঘৃণিত অনাৰ্য্য জাতি হইতে কোন দেবীকে আমদানী বা গ্রহণ করিয়া মহাদেবীর আসনে বসাইয়া দিবেন, ইহা কিছুতেই আশা করা যায় না। ধর্ম্মাস্তর সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যাপার, কিন্তু যেখানে ধর্ম্মাস্তরের কোন প্রশ্ন নাই, সেখানে অপর কোন জাতির সঙ্গে ধর্ম্ম-সম্পর্কিত আদান-প্রদান সম্পূর্ণ অবাস্তব ও অবাস্তর। ইতিহাসে এরূপ কোন নজীর নাই বা দেখা যায় না। বিচার্জন এবং সভ্যতা সংক্রান্ত ব্যাপারে আদান-প্রদান অনেকটা চলিতে পারে, এক ভাষা হইতে অপর ভাষায় শব্দ-চয়নও চলিতে পারে, কিন্তু ধর্ম্ম-চয়ন চলিতে পারে না। প্রাচীন গ্রীক ও রোমক জাতি অপর তাবৎ জাতিকেই “বর্বর” বলিয়া অভিহিত করিতেন। খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হইবার পূর্বে অথবা পরে তাঁহারা সংখ্যা-গরিষ্ঠ তথাকথিত বর্বর জাতিসমূহ হইতে কোন দেবদেী গ্রহণ করিয়াছিলেন, এমন কোন প্রমাণ বা নজীর আছে কি? ঠিক তেমনই জিজ্ঞাসা করা যায় যে, ভারতে বস-বাসকারী খ্রীষ্টান ও মুসলমান সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিগত ১৫০০ বৎসর অথবা ১২০০ বৎসরের মধ্যে সংখ্যাগুরু হিন্দু সম্প্রদায় হইতে কোন দেবতা বা মহাপুরুষকে গ্রহণ করিয়াছেন কি? যদি ধারকর্জের প্রশ্ন এসব ক্ষেত্রে না উঠে বা না খাটে, তবে তাহা একমাত্র হিন্দুধর্ম্মের বেলায়ই বা উঠিবে কোন্ ঐতিহাসিক যুক্তিতে? “এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে” বহু জাতির মিলন হইয়াছে, সন্দেহ নাই, কিন্তু শাস্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মহিমায় কোন্ খ্রীষ্টান বা মুসলমান ভক্তলোক, গীর্জা বা মসজিদ ছাড়িয়া, হিন্দুর দেবালয়ে যাইয়া পূজা দিতে আরম্ভ করিয়াছেন? বা জয় শিবশঙ্কর, জয় মা দুর্গে, জয় মা কালি, জয় রাধে

গোবিন্দ, বা জয় রামজীকি, ইত্যাদি ধ্বনি তুলিয়া দোহাই পাড়িতেছেন? আর কয়টি হিন্দুই বা তাহাে বিগলিত হইয়া, আল্লা হো আকবর, অথবা জয় ব্রহ্ম বীশ, ইত্যাদি বলিয়া মাতামাতি করিয়া থাকেন?

সুতরাং প্রাচীন আৰ্য্যগণ কোন অনাৰ্য্য দেবীকে গ্রহণ করিয়া মহাদেবীর পাটে বসাইয়া দিয়াছিলেন, এই যুক্তি সম্পূর্ণ অবাস্তব ও অনৈতিহাসিক। উমা নাম মহাদেবীর বিভিন্ন নামের অগ্রতম মাত্র, উমা নামে আলাদা কোন দেবী আৰ্য্যসমাজে কোন কালে ছিলও না, বা বর্তমানও নাই। নাম-সাদৃশ্য দেখিয়াই যাহারা দিশাহারা হইয়া পড়েন, তাঁহারা একথা স্বীকার করিবেন কি যে, বীশ-খৃষ্ট নামটি খৃষ্টের আবির্ভাবের প্রায় ১৫০০ বৎসর পূর্ব-বর্তী ঈশ কৃষ্ণ বা ঈশ কৃষ্ণ হইতে ধার করা? অথেষ্টে অন্ততঃপক্ষে ৪০টি দেবীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এই সংখ্যা অপ্রচুর ছিল কি?

আদিকালে যাহাই থাকুক, পরবর্তীকালে অনবর্ণ-বিবাহ বা সঙ্গমের ফলে অনেক সঙ্গর বা মিশ্রজাতির উদ্ভব আৰ্য্যসমাজে ঘটিয়াছিল, এবং মদ্যাদি ধর্ম্মশাস্ত্র-সমূহে আমরা ইহার ভূরিভূরি দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। স্ব-সমাজের মধ্যে বর্ণ-রক্ষণ সম্পর্কেই যেখানে এত কড়াকড়ি ছিল, সেখানে, সেই পরবর্তী যুগেই, এক বৈদেশিক দেবীর আমদানী ঘটিল, এবং তিনি একেবারে শ্রেষ্ঠ দেবীর আসনে যাইয়া বসিয়া গেলেন, এরূপ কল্পনা উদ্ভট ও অবাস্তব। কেবল দেবদেবীর কথাই নয়, তাহার বিলুপ্ততা পরিবর্তনও যে অপরিদ্রাঘ্য সত্যকথা অবলম্বিত হইত, তাহার প্রমাণ, পূর্ব-পূর্ব যুগের কথা ছাড়িয়া দিলেও, আমরা বহু-পরবর্তী কালে পতঞ্জলির মহাভাষ্যেও পাইয়া থাকি, ভুল শব্দের উচ্চারণের মারাত্মক ফল এবং শুদ্ধ শব্দের উচ্চারণে ধ্বনির সামান্য ত্রুটিতে। ফলশ্রুতি যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান ঘটিয়াছিল, তাহারই দুইটি উদাহরণ মহাভাষ্যকার গ্রন্থের প্রথমভাগেই দিয়াছেন। সুতরাং দেবী উমা হৈমবতী বহিরাগতা, এই যুক্তি পরিপাক করা অসম্ভব। আমরা দেখিয়াছি যে, উমা পদটি একটি বিশুদ্ধ অথেনীয় শব্দ। এ সম্পর্কে পণ্ডিতসমাজও জনসাধারণের সম্যক্ ওয়াকিবহাল হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয় ও বাঞ্ছনীয়।



আবার দুঃস্বপ্ন !

থস্ থস্, দপদপ্, ঠক্ ঠক্, হুমদাম্, ঝন্ঝন্, নানা রকম শব্দ হচ্ছে চারিপাশে,—বাড়ীর চতুর্দিকে, উপরে, নীচে। ব্যাপার কি ? ডাকাত কি দলে দলে এল ? এসে অবস্থা মেটে হাঁড়ি, আর কলাইকরা বাসন ছাড়া নেবার কি আছে ? না কি ভৌতিক ব্যাপার ! ফিস্ ফিস্ করে ডাকলাম,—ওগো—হ্যাঁগো—[সেকেলে আমরা এই-ভাবেই ডাকি—]

গভীর নিদ্রামগ্ন, 'হ্যাঁগো'র কোন সাড়া নেই, নিঃসাড়া।

তারপরেই ঘন ঘন কড়া নাড়ার শব্দ। গভীর রাত্রি, নিরুন্ম অন্ধকার, কে ডাকবে আমাকে ? খাই হোক যদি কোনরূপ ব্রহ্মভক্তি থাকে বলা ত যায় না। জাত বিচার উঠে গেছে, সরস্বতী পূজায় সবই একাকার, কিন্তু তবুও

পূজার ব্যাপারে 'বামুন' চাই, ওটা নিজেরা এখনও সেরে নিতে পারেনি। তাড়াতাড়ি নামাবলীটা কাঁধে ফেলে, পৈতাটা বেশ ভাল করে রোমশ বুকের উপর দিয়ে টান করে দিয়ে, দরজাটা খুললাম, নইলে হৃদয় ভেঙ্গে ফেলত—অস্বস্তি: বামুনকে নিরীহ মনে করে ছেড়ে দিতেও পারে—

অন্ধকারেও বুঝলাম মিলিটারী। তাদের মধ্যে একজন বললে, আপনি শ্রীমন্মুক ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ—তা আপনারা ?

—ভিতরে চলুন বলছি—গোপনীয়—

—একটু দাঁড়ান আমার গোপনীয়াকে সরে যেতে বলি—

ঘরে এসে আলো জালিয়ে দেখি তিনি আমাকে একাকী ফেলে পালিয়েছেন। বললুম—আহ্ন আপনারা—

সর্বনাশ!—আলোয় দেখলুম,—একেবারে সেনাপতি সব, তেমনি ডেস্। কত কি ঠার, ছাপ লাগানো, কোমরে তরবারি।

মিলিটারী কায়দায় পাঠকে সেলাম করে দাঁড়ালেন। আমি হরিনাম জপ করে নিয়ে বললুম,—আপনারা, এত রাতে—

—হ্যাঁ, পরিচয় করিয়ে দি,—আমি ফিল্ড মার্শাল খাঙ্গা, উনি এ্যাডমিরাল খাঙ্গা, আর ইনি এয়ার মার্শাল লারে-লাঙ্গা।

—তা আপনাদের শুভাগমনের হেতু? কি ভাবে আপনাদের আপ্যায়িত করি?

—কিছু না, কিছু না,—আমরা বাস্তু, তাড়াতাড়ি কাজ সারতে হবে—

সবিনয়ে বললাম,—দেখুন, আমি সত্যিকার সেনাপতি কোনদিন দেখিনি, যাত্রাগানের সেনাপতিই দেখেছি। আপনারা কি রকম সেনাপতি তা জানি না, কি করে আপ্যায়িত করতে হয়—আমার ক্রটি নেবেন না—

খাঙ্গা জানলা খুলে দিয়ে বললেন,—দেখুন—

ও বাবা! একি সামনের মাঠে, কোটি কোটি মশার জন্মস্থান পবিত্র এই ড্রেগসমুদ্র মাঠে, সৈন্য সামন্ত গিস্ গিস্ করছে—সব সসজ্জীষ রাইফেল কাঁধে দাঁড়িয়ে, যতদূর দৃষ্টি যায় কেবল, সৈনিক, নাবিক, এয়ারবাহিনী।

—বুঝলেন, আমরা যাত্রার সেনাপতি নয়, আসল সেনাপতি। আপনাকে আমাদের বিশেষ দরকার—

কাঁদ কাঁদ স্বরে বললাম,—আমি? বুড়ো বায়ুন, আমাকে দিয়ে কি করবেন—আমাকে ছেড়ে দিন,—কোন পাপ করিনি—

—সেই জগ্গেই চাই আপনাকে। শুধুন, কথাটা গোপন, —দেশ অরাজক হয়েছিল, নীতি ধর্ম বলে কিছু ছিল না, তাই আমরা ক্রূপ করে দেশের শাসনব্যবস্থা দখল করেছি— এখন আমাদের দরকার মনের মত একটি ডিক্টেটর।

—ডিক্টেটর? তা এখানে কেন?

লারেলান্গা বললেন,—এই শাসন তরঙ্গী, তথা ঝড়ের এই ছুঁতিনে দেশের ডুবু ডুবু নৌকার হাল আপনাকে ধরতে হবে—

খাঙ্গা বললেন,—আপনি মধুমতীতে যেমন পালের নৌকার হাল ধরতেন তেমনি ভাবে—

খাঙ্গা বললেন,—আপনার পাঠশালায় অটলা পটলা ভূতোর মত ছেলেকে যেমন নীলু বুধু জুলুকে দিয়ে ঠাণ্ডা করেছেন, তেমনি করে—

—কিন্তু রাজনীতি, বৈদেশিক নীতি—এসব ত জানি না, ধারও ধারি না—

—দরকার নেই।

খাঙ্গা খাঙ্গা হ'য়ে বললেন,—অত শত বুঝি না, আমরা মিলিটারী লোক। ডিক্টেটর আমাদের একুণি চাই। দেশ দখল হয়ে গেছে,—এখন জাতির উদ্দেশ্যে রেডিওতে একটা বাণী দিতে হবে। শিগগির জীপে উঠে চলে আহুন— নইলে—

যাত্রাগানে সেনাপতি যেমন রক্তচক্ষু করে তরবারিতে হাত দেন, তেমনি করে হাত দিতেই বললুম,—খাঙ্গি, আপনারা যখন বলছেন তখন যাবোই ত, কিন্তু—

—কিন্তু কি?

—না কিন্তু নেই, তবে জাতির উদ্দেশ্যে একটা বাণী দিতে হবে,—অভ্যাস নেই। একটু এখানে রিহার্সাল দিয়ে নিলে হত না? ধরুন যদি বেকাঁস কথা বলে ফেলি, তার পরে আমি ডিক্টেটর, আপনারা আমার কথা অবশ্যই মানবেন। সেখানে মতেব মিলও হওয়া দরকার—

—দেশের মঙ্গলের জগ্গেই আমরা কৃপ্ করেছি, দেশের মঙ্গলের জগ্গে আপনার আক্কাবহ আমরা—কিন্তু মঙ্গলটা প্রকৃত কিসে হবে তাই বুঝতে পারি না বলেই আপনার শরণাপন্ন। থাক্, অত কথার সময় নেই, আপনি রিহার্সালটা আরম্ভ করুন—

—হঁকোটা সেজে নিলে ভাল বলতে পারতাম, তা—

—না না, সময় নেই, আরম্ভ করুন।

—আচ্ছা বলছি—শুধু ভাষায়ই বলি—অয়মারম্ভ: শুভায় ভবতু—

আমি দেশের স্থল জল অন্তরীক্ষবাহিনীর সর্বাধিনায়ক ডিক্টেটররূপে দেশবাসীর প্রতি ভগবানের নামে আজ যে ঘোষণা করছি, তা ঘোষণা সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে দেশের সংবিধানরূপে গণ্য হবে এবং আইনরূপে বলবৎ হবে।

আজ দেশ উত্তর পূর্ব পশ্চিম তিন দিক থেকে বহিঃ-

শত্রুর দ্বারা বেষ্টিত, যে কোন সময় আমরা আক্রমণে বিপর্যস্ত হতে পারি। সেই হেতু আজ দেশবাসীকে প্রস্তুত হতে হবে—এমন ভাবে প্রস্তুত হ'তে হবে যে যদি কেউ এদেশের মাটি দখলই করে তবে যেন দেশে একটিও জীবন্ত মানুষ বেঁচে না থাকে। পাঁচ বছরের শিশু থেকে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে রণাঙ্গণে প্রাণ দেবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে হবে,—হাতিয়ার থাকে ভাল, জোটে ভাল, নইলে তীর ধুক নিয়েই আমরা এ্যাটম বোমার সঙ্গে যুদ্ধ করে মরবো—মরবো কিন্তু পরাজিত হব না—দেশের মাটি পরাধীন হলেও দেশের মানুষ পরাধীন হবে না—

বৈদেশিক নীতি হবে আমাদের একটি,—যারা আমাদের এক ইঞ্চি দখল করবে আমরা তাদের এক মাইল দখল করবো, যারা আমাদের একটি মানুষ হত্যা করবে আমরা তাদের একশ' মানুষ হত্যা করবো। যে বন্ধুভাবে হাত বাড়াবে তাকে আলিঙ্গন করবো, তার জন্তে প্রাণ দেবো, যে শত্রু বলে মনে করবে তাকে সংহার করবো। যে বন্ধুর বেশে এসে শত্রুতা করবে তাকে আগুনে পুড়িয়ে মারবো—

দেশত্রোহিতার শাস্তি আজ থেকে ঘোষণা করা হচ্ছে—দেশত্রোহিতার একটি মাত্র শাস্তি মৃত্যু, ভয়াবহ মৃত্যু। এই দেশত্রোহিতার নীতি হচ্ছে যে,—যার জীবন, যার অবস্থিতি, জীবিকা, কার্য অস্ত্রের পীড়াদায়ক হবে, যার বাক্য, কার্য, চলন অস্ত্রকে দুঃখ দেবে, তার বেঁচে থাকবার কোন অধিকার নেই এই দেশে। যার কার্য বচন ও জীবন অস্ত্রকে স্থগী করবে, যাওয়ায় পথে আনন্দ ছড়িয়ে যাবে কেবল সেই এ দেশের নাগরিক বলে গণ্য হবে। মানুষ কাজ করবে নিকাম ভাবে দেশের জন্তে, দেশের জন্তে, অর্জন করবে দান করতে,—অগ্রতিগ্রহ, অর্থাত্ প্রয়োজনের অতিরিক্ত সঞ্চয় দেশত্রোহিতা বলে গণ্য হবে। এই পৃথিবীতে প্রাণ, কৃষিকর্ম, ঝড়, মহামারী বাঘ-ভালুক মানুষকে যত দুঃখ দিয়েছে মানুষ মানুষকে দুঃখ দিয়েছে তার অনেক বেশী, এই দুঃখের অবসান করবো আমি।

ওনারা তিনজন পরস্পর একটু মুখ চাওয়াচাষি করতেই বক্তৃতায় ফ্লোটা কেমন খেমে গেল। বললুম,—তা কি রকম হচ্ছে বলুন, আপত্তি থাকলে তাও প্লুন—

লারেলান্সা বললেন,—না ঠিক হচ্ছে, আপনি বলে যান। বাইরের সৈনিক-সমূহ আপনার বাণী শুনে উবেল

হ'য়ে উঠেছে। তাদের সমর্থন আপনি এতদিন বুঝতে পারবেন। এই উবেল সমূহই দেশের জনগণ, জনগণের প্রতীক—

ফস করে একটা বিড়ি ধরিয়ে ছুঁটান দিয়ে নিয়ে বললাম, তা হলে রিহাল'লটা ফুট করি—

—হ্যাঁ—করুন।

দেশের এবং দেশবাসীর স্বার্থ বিরোধী যারা তারাই দেশত্রোহী, তাদের শাস্তি গুলি করে হত্যা। যে গয়লা দুপে জল দেয় আর যে তেজাল বি তৈরী করে, চালে কাঁকর মেশায়—এরা সমান বধ্য। তারা দেশের জনস্বাস্থ্য নষ্ট করছে, তিলে তিলে দেশবাসীকে ব্যাধি দিয়ে হত্যা করছে। আমার নীতি হচ্ছে, হাসপাতাল তৈরী করে রোগীর চিকিৎসা করা নয়, দেশবাসীকে পুষ্টিকর নির্ভোজ খাদ্য দিয়ে স্বাস্থ্যবান করা, যাতে হাসপাতালের প্রয়োজন নগণ্য হ'য়ে যায়। দেশভর্তি ডেক্সাল খাদ্য, ঔষধ দিয়ে জনগণকে স্বাস্থ্যহীন করে, আর বড় বড় হাসপাতাল তৈরী করে করতালি পেতে আমি চাই না। এদের সব ময়দানে দাঁড় করে গুলি করা হবে, যারা এই মজা দেখতে যাবে তাদের একটাকা করে দর্শনী দিতে হবে, এটা জাতীয় ভাণ্ডারে যাবে—

যারা বেশী লাভের মোহে আজ চিনি, কাল চাল, পরন্ত মাছ, তার পরদিন সরিষার তৈল উধাও করে জনগণের গায়ের মাংস ছিঁড়ে থাকছে, তাদের গায়েরও মাংস ছিঁড়ে নেওয়া হবে অভিনব উপায়ে—জাহাজ বোঝাই করে এদের নিয়ে যাওয়া হবে সমুদ্রে—যেখানে প্রচুর মাংসানী হাঙ্গর আছে। এদের কাণে বঁড়ী দিয়ে জলে নামিয়ে দেওয়া হবে, হাঙ্গর মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে—এই চমৎকার স্থলদ দৃশ্য দেখবার দর্শনী হবে মাত্র দশ টাকা। এটাও জাতীয় তহবিলে যাবে।

খাল্লা ধাল্লার দিকে একটু চেয়ে বললেন,—আমার খন্তর মশায় যে চিনির টকিট। কটে'ল চিনিতে ত ব্যবসা পোষায় না—

বাইয়ের সৈনিকসমূহে কেমন যেন একটু বেহুসো আলোড়ন দেখা গেল।

—আরও বলবো ?

লারেলান্সা বললেন,—বলুন, তবে গোড়ার বেহুস

আদর্শের কথা বলছিলেন সেটা বেশ লাগছিল কিন্তু এখন একেবারে বৈষয়িক কথা বলছেন, এটা ঠিক সাহিত্যধর্মী হচ্ছে না, কিন্তু—তবুও বলুন—

—দেখুন, ওটা ত ঠিক সাহিত্যিক নয়, ওটা বিধম কর্মই বটে।

ধাঙ্গা বললেন,—আচ্ছা বলুন দেখি কতদূর যায়—

—যারা আফিসে রেল ডকে কেরাগী, অফিসের কাজ করে, তাদের উপর নির্ভর করছে সমস্ত জনগণের সুবিধা অসুবিধা, তাদের কাজে যদি গাফিলতি হয়, এতটুকু কর্তব্যকর্মে শিথিলতার জন্তে যদি একজন লোকেরও অসুবিধা হয়, তবে তাকে জু-গার্ডেনের বাঘ-ভালুকের খাঁচায় পুরে দেওয়া হবে,—এতে দেশের মাংসের খরচ কমবে এবং অভুক্ত জন্তু জানোয়ারদেরও পেট ভরবে। জু-গার্ডেনের এই দৃশ্য দেখবার দর্শনী হবে মাত্র পাঁচ টাকা।

তারপরে শিক্ষা ব্যবস্থা—[এইবার একটু সাহিত্যধর্মী ভাবে ভাষণ দেব] দেশের শিক্ষা হবে এমন যে দেশের তরুণ-তরুণী সব দেশের গুণ্য প্রাণ দেবে। তারা হবে মহাহুভব, ব্যক্তিকে ছেড়ে তারা ব্যক্তিকে আপনার করে নেবে। তারা সৃষ্টি করবে ঝটিকা-বাহিনী,—দেশের সমস্ত অনাচার অবিচারকে ব্যক্ত করবে, কর্তরোধ করবে। বাবা যদি ভুলেও ঔষধের কুঁড়ি খান করে, তবে ছেলে এসে খবর দেবে পুলিশে। পুলিশের দায়োগী ঘুষ খেলে তার মেয়ে এসে বলে দেবে সে খবর সরকারে—

ধাঙ্গা বললেন,—এটা কিন্তু ঠিক আদর্শ শিক্ষা হচ্ছে না, পিতামাতার প্রতি এমন অশ্রদ্ধা শিক্ষা দেওয়া তারন্তর মাটিতে অন্ততঃ চলা ঠিক নয়—

ধাঙ্গা বললেন,—দেশপ্রেম, ত্যাগ, ব্যক্তি সমষ্টি যা বলছিলেন তা একটা আদর্শবাদ বটে কিন্তু ওটার বৈষয়িক ব্যাখ্যা যেন ঠিক খাপ খাচ্ছে না। দেশের জন্তু জীবন অবশ্যই দেব, তবে তার সঙ্গে, নকল পেনিসিলিন কারখানার কি যোগাযোগ আছে—ওটা বোঝা যাচ্ছে না।

লারেলান্সা বললেন,—বাইরে জনসমুদ্রে ঢেউ উঠেছে, সামাল তরঙ্গী এবার—

আজ্ঞে এটা ত রিহাসার্গাল, পছন্দ না হয় আবার অন্তরকর্ম বলব।

—হ্যাঁ তবে বলুন—

কলেজ খুল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষক হবে আদর্শ, জান তপস্বী, পাশ তপস্বী নয়—বই সামনে খুলে দিলেও নকল করবে না এমন ছাত্র, লাখটাকা ঘুষ দিলেও অসৎ পথে পা বাড়াবে না এমন শিক্ষক। এমনও এখন হচ্ছে যে বাইরের ছেলে কলকাতার কলেজে পরীক্ষায় মার্কসিট নিতে চারদিন এসে ২০ টাকা খরচ করেছে, পঞ্চম দিনে এসে বেয়ারাকে একটাকা ঘুষ দিয়ে তবে মার্কসিট পেয়েছে, রোজ ১০ টাকা খরচ করে তিন চার দিন বর্ধমান যেখানে একখানা সার্টিফিকেট পায়নি,—আর এক দিন এসো বলে ভাগিয়ে দিয়েছে। এই অববেচনা ও সহাতুত্বহীনতার জন্তে একটা অভিনব শাস্তি ব্যবস্থা হবে। ইডেন গার্ডেনের ক্রিকেট মাঠে এদের নিয়ে যাওয়া হবে এবং ক্রিকেট মাঠের খাঁচায় ভরে ৫৬টা স্থলরবনের বাঘ ছেড়ে দেওয়া হবে। এই খেলা দেখার দর্শনী হবে টেট ক্রিকেটের সমান।

এমনি করে যদি এক বছর দেশ শাসন করা যায় তবে দেখতে দেখতে খাণ্ডসময় সমাধান হ'য়ে থাকত এমন প্রার্থী হবে যে খাণ্ড খাওয়ার লোকই দেশে থাকবে না বলে অনুমান হয়—

বাইরের বীরবৃন্দ হঠাৎ উদ্বেল হয়ে দাপাদাপি শুরু করল। ওঁনারা ছুটে বাইরে চলে গেলেন—যাক বাবা।

নিভন্ত বিড়িটায় ছুটে। টান দিয়ে একটা নিঃশ্বাস ফেললাম।

লারেলান্সা ছুটে ছুটে এসে বললেন, ভয়ানক ব্যাপার, আবার বিপ্লব শুরু হয়েছে, একুণি স্থলবাহিনী জল-বাহিনীতে যুদ্ধ বেধে যাবে। পুনরায় আরম্ভ করুন। অন্য হুঁর, অন্য আদর্শ নিয়ে, অভ ব্যবহারিক হবেন না। শিগগির—নইলে ওরা একুণি এসে পেটে সঙ্গী চুকিয়ে দেবে—

বিড়িটা ফেলে দিয়ে শুরু করলাম—

ভ্রাতৃবৃন্দ,—আমাদের এই রাষ্ট্র হবে সেকুলার, এখানে সকলে সমান। হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান জৈন কোন ভেদাভেদ নেই—সকলে সমান, সকলে স্বাধীন। স্বাধীন ভাবে বুদ্ধিবলে, কৌশলে, বুদ্ধির জোরে, গায়ের জোরে, যে যেমন ভাবে করে খেতে পারে সে যেমনি ভাবেই করে খাবে। মামার জোরে; খুড়োর জোরে যে যেমন করে পারে

উপার্জন করবে, বড় হবে, এতে কোন বাধা নেই, আমরা হব এই গায়নিষ্ঠ সাম্যের পূজারী। ভেজাল দিয়ে, দাম-বাড়িয়ে, সংঘ করে, সমিতি করে আমরা পরস্পরের মাংসে উদর পূর্তি করবো, এতে কেউ কোন আপত্তি করবে না—পররাষ্ট্রকে খুশী করতে নিজরাষ্ট্রের জনগণকে আমরা গুলি করবো, এত মহৎ হবে আমাদের আদর্শ।

বাইরে ঘন ঘন জয়ধ্বনি হল,—আনন্দে উদ্বেল হ’য়ে উঠল বীরবৃন্দ। তরণারির ঝন্ ঝন্, সঙ্গীনের ঠন্ ঠন্। স্টের উচ্ছ্বাস চারিদিক মুখরিত করে দিল।

ধাঙ্গা ছুটে এসে বললেন,—চমৎকার চমৎকার, চালিয়ে খান, চালিয়ে খান—

আমরা সব ভাই-ভাই, সব সমান। উচ্চ নীচ ভেদাভেদ নেই, রাজা প্রজা নেই, শিক্ষিত অশিক্ষিত নেই। দ্বিজ-চণ্ডাল নেই, সব সমান—কেবল যারা ছিল অস্বাভাব্য, যারা ছিল আদিবাসী তারা থাকবে কুলীন। তারা বেশী করে ভাল চাকুরী পাবে। আমরা হব পরম বৈষ্ণব, আদর্শ বৈষ্ণব, যদি কোন বিদেশী এসে এক কান ধরে টানে, আমরা অল্প কান এগিয়ে দেব মলবার জন্তে বলবো ভাই হাতে বাধা লাগে নি ত? আমার কানটা বড়ই শক্ত। যদি কেউ বলে তোমার দেশের কিছু জায়গা দাও, তখুনি দেশের অন্ততঃ সিকিটাক দিয়ে দেব। কারণ দানই ধর্ম, এটা দাতাকর্ণের দেশ।

বাইরে গ্লোগান শোনা গেল,—মাধু! মাধু!

মাহু হবে সব স্বাধীন, আইন আর শৃঙ্খলার শৃঙ্খল দিয়ে ব্যক্তিস্বাধীনতা স্থাপন করা চলবে না।

আমাদের মধ্যে এমন মহামুভবতা ও উদারতার আদর্শ প্রচার করতে হবে যে, যে লোক পরস্রব্য নিজের প্রয়োজনে নেবে, বুদ্ধি বলে, কৌশলে, ঠেকিয়ে, ঠকিয়ে নেবে, তাকে কেউ ‘চোর’ আখ্যা দিতে পারবে না। সবই জাতীয় সম্পত্তি যে-কারও কাছে থাকলেই হবে। এমন মানসিকতা ও মানবিকতা সৃষ্টি করতে হবে যাতে সকলেই মনে করতে পারে টাকা ব্যাঙ্কে থাকলেও যা, নিজের নিজের বাড়ী নিয়ে গেলেও তাই অর্থাৎ তোমার টাকাও আমার টাকা আমার টাকাও আমার টাকা, এমন একটা আত্মগত ভাবের সৃষ্টি করতে হবে—

বাইরে ধ্বনি উঠল,—তোকা! তোকা!

দেশে নানাবিধ সংস্কারের জন্ত প্রভূত পুরস্কার দেওয়া হবে। আমাদের কালচার হবে এসথেটিক, ontology ও axiologyর উর্ধ্বে যাবে আমাদের কৃষ্টি। কাজেই যারা বুদ্ধ ক্ষেত্রে স্বকৌশলে, সুন্দরভাবে ত্রিবিধগতিতে পশ্চাদপসরণ করতে পারবে তাদের আকাদেমী পুরস্কার দেওয়া হবে।

বাইরে জয়ধ্বনি হল,—জয় ডিক্টেটর জী কি জয়—

—দিনেমায়ে যে সব ছবির গান এমন জনপ্রিয় হবে যে তরুণ-তরুণীরা একসঙ্গে রক-বৈঠকে বসে মাথা হুলিয়ে হুলিয়ে তা গাইতে বাধ্য হবে, যে সব নটনটী মূর্ত করে, ব্যক্ত করে চারিপাশে মৃত-সঙ্গীবনী ছড়িয়ে দিতে পারবে, তাদের সকলকে পরম-মহাবীর পদক দেওয়া হবে।

তারপরে যে সব দেশকর্মী সার্বজনীন দুর্গাপূজা-সরস্বতী পূজার জন্তে জন-পকেট নিংড়ে যত টাকা আদায় করতে পারবে, এবং যত বেনীক্ষণ ধরে, যত বিকট স্বরে যারা মাইক বাজাতে পারবে এবং এমনভাবে বাজাতে পারবে যাতে পাঁচমাইলের মধ্যেও কোনও দুর্জন লেখাপড়া নামক কুকার্য করতে সাহসী না হয়, সেইসব নির্ভেজাল দেশকর্মীকে স্বর্ণপদ্মালকার উপাধি দেওয়া হবে।

—ডিক্টেটরজী কী জয়! ডিক্টেটরজী কী জয়—

লারেলান্সা ছুটে এসে বললেন,—কোন ভাবনা নেই। চমৎকার! চমৎকার! জনসমুদ্র আপনাকে অভিনন্দিত করবার জন্তে উবেগ-বাকুল হয়ে উঠেছে। আর আমাদের কুপ যদি অকৃতকার্যও হয় তাতেও আপনার ভাবনা নেই, আপনি নির্বাচনে জয়লাভ করে জাতির নায়ক হবেন এ বিষয়ে সন্দেহ নেই—আপনিই সত্যিকার জননায়ক। আমাদের ডিক্টেটর!

—আর একটুও ত বলবার ছিল—

—বলুন—বলুন—

আর যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক সাহিত্যিক এমন বেগবান আদর্শ প্রচার করতে পারবেন, ভাষায় ও ভাবে এমন উদ্ভাটনা সৃষ্টি করতে পারবেন, চরিত্রচিত্রণের অপূর্ণ বিকাশে তরুণ-তরুণীগণকে এমন বেসামাল করতে পারবেন, আত্মবিশ্লেষণ ও অজ্ঞান মন বিশ্লেষণে এমন আপন ভোলা করতে পারবেন যাতে দেশের ভবিষ্যৎ

তরুণ-তরুণীরা পবনস্পরের প্রেমে ভাবোন্মাদ হ'য়ে বিবসনা
হয়ে, রাস্তাঘাটে পথে পার্কে আত্মনিবেদন ও আলিঙ্গন
করতে পারবে, সেই সমস্ত প্রতিভাধর সাহিত্যিককে এক
লক্ষ টাকার সেক্সপিয়ার পুরস্কার দান করা হবে।

—জয় ডিক্টেটর জী কি জয়! হুড় হুড় করে জনসমুদ্র
দেয়ালভেঙ্গে ঘরের মধ্যে ঢুকে আমাদের কাঁধে করে
হাঁকলো,—চল দিল্লী চল, রাজভবন চল—

তার। সত্যিই চলল। চীৎকার করে বললাম—

গোপালের মা রইল যে, তাকে ডেকে আনি। সেও ত রাজ-
ভবনে যাবে। কে-কার কথা শোনে, তারা চললো—আমি
গৃহিণীর শোকে চীৎকার করে কেঁদে উঠলাম—

—ওগো, ওগো শুনছ, এমন গোঁ গোঁ করলে ঘরের
মধ্যে আর একটা লোক ঘুমোয় কি করে? সারাদিন
থেটে খুঁটে বাত্রে যে ঘুমোবো তারও উপায় নেই—

আঁ।—ও আজ ভাস্কর লবণ খেতে ভুলে গেছি তাই
একটু বায়ুর প্রকোপ হয়েছে।—

মর্ত

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

মোদের মর্ত গঠিত হয়েছে,—
স্বর্গের অম্বকরণে।
অমৃতের ছিটা লাভণ্যে তার,
গীতে ও গঞ্জে বরণে।
স্থায়িত্ব নাই কিছুতেই তার,
ক্ষণিক লইয়া শুধু কারবার,
অপূর্ণতার চিহ্ন তাহার
সকল অঙ্গে গড়নে।

২

নরক তাহার অতিকাছে বটে
স্বর্গও নহে বেশীদূর,
স্বর্গের দান কম নহে তার।
ঠাই ঠাই তাহা স্প্রচুর।
পুণ্যের চেয়ে পাপ বেশী তার,
স্থধা আছে বটে, গরল বেজার
স্ব ও অস্বর বেহুঁরে তাহার
ভাণ্ডার সদা পরিপুর।

৩

তার স্নেহ মায়া প্রীতি ও ভক্তি
নিবিড় তাহার অম্বরাগ,
তাহার আকৃতি তাহার মিনতি
দেবতারো বৃকে রাখে দাগ।
তাহার মিলনে, তাহার বিরহে,—
অমৃতের ধারা অবিরাম বচে
তার তপস্বী তাহার সাধনা
থুয়ে সব অভিশাপ।

৪

ভগবান সেখা আগাইয়া যান
সকল লক্ষ্য হরণে,
হেথাকার ফুল চন্দন আমি
নিতি পড়ে তাঁর চরণে।
তাঁহার রূপার অধিকারী সে যে,
প্রেমাত্ম ধারে বৃক উঠে ভিজে
করে স্নান মহিমাধিত
জয় জয়া ও মরণে।

রবীন্দ্র সাহিত্যে দেবী আরাধনা

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রধান অঙ্গ সুসজ্জিত ভক্তির মনোহর সাজে। অনবত্ত তার মাধুরী। মানবের তিমিরঘন চিস্তের দুঃখের আঁধার ঘূচাবার প্রচুর দীপ জ্বলেছেন কবি। অথচ যে বাস্তব প্রতীতি বিশ্ব জুড়ে—তাকে এক কথায় কবি মায়ায় খেলা বলে মুছে দেবার প্রয়াস করেননি। মায়া প্রতিষ্ঠা করে নিজের প্রাণহীনতা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোমল রূপেরই অন্তর-নিহিত জ্ঞানে উপলব্ধি পুষ্ট করে চিন্তকে যখন বৃষ্টি—

যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে

তোমার আনন্দ আছে তার মাঝখানে।

তিনি বহুবার উপনিষদের শিক্ষা আমাদের পরিবেশন করে বলেছেন—বাক্য মন কিরে আসে তার মন্দির দুয়ার থেকে। কিন্তু মাইভঃ। তাঁর আনন্দের উপলব্ধি প্রফুল্ল করে চিন্তকে।

যতো বাচঃ নিবর্তন্তে অপ্রাপ্যমনসা সহ।

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান ন বিভেতি কদাচন।

সেই আনন্দঘনই ব্রহ্ম বিদ্যা, কবি তাঁর হাতের বীণার নানা ললিত ঝঙ্কারে কবিতার মহিমা গরিমা শোনাবার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি সীমাহীন কিন্তু সীমার মধ্যে বিহার করেন। আমাদের সঙ্গীম প্রাণকে আনন্দ লোকে প্রয়াণের আয়োজন করেছেন নিজ লীলায়। মধুর গান—

সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন স্বর।

আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এতো মধুর।

তিনি অসীম অরূপ, তবে প্রকাশ আমার মাঝে। এই বোধ আগালেন তিনি—তাই রবি বিশ্বকবি। সর্বং খণ্ডিতং ব্রহ্ম—এ সত্যের ব্যাখ্যা তাঁর অক্ষরস্ত কাব্য-রচনায় বোঝালেন—

কত বর্ণে, কত গন্ধে, কত গানে কত ছন্দে,

অরূপ, তোমার রূপের লীলায় জাগে হৃদয়পুর।

মায়ায় অধিলকে চোখ বুজে বোঝবার উপদেশ রবীন্দ্রনাথের নয়, ভোগের দিব্যরূপ দেখলে আসে ত্যাগ।

মায়াবের মন যখন আপ্ত হই পরম ভক্তির বানের জলে, তখন সে অরূপের রূপ দেখে আনন্দে করে পূজা। ভগবানকে সাধারণ জ্ঞান গভীর মাঝে নামিয়ে আনতে হয়। যাকে ভালবাসি তাকে রূপ দিতে হয়। রাম-প্রসাদ তাকে “মা” বলে ডাকতেন—কিন্তু মানতেন বেদের সত্যতা।

তাজিৎ সব ভেদাভেদ, ঘুচে যাবে মনের খেদ।

ওরে শত শত সত্য বেদ, তারা আমার নিরাকার।

অথচ

শ্রীরাম প্রসাদ বটে, মা বিরাজে সর্ববটে

ওরে, অঁখি অন্ধ দেখরে মাকে

মা আমার তিমির হরা।

এমন দিন কি হবে তারা।

ভক্তিরস রবীন্দ্র রচনায় যেমন প্রচুর তেমনি অনবত্ত।

তাঁর বিশ্ব প্রাণ উদ্ভাসিত ছিল স্পষ্ট চেতনায়—

—হে পূর্ণ তোমার চরণের কাছে

যাহা কিছু সব আছে আছে আছে। কারণ তিনি উপলব্ধি করেছিলেন—

তোমার অসীমে প্রাণ মন লয়ে বতদূরে আমি যাই

কোথাও দুঃখ, কোথাও মৃত্যু, কোথা বিচ্ছেদ নাই।

বলছিলাম ভক্তের চেতনার জ্যোতি এক—যদিও সাধনার ভঙ্গী বিভিন্ন। যেভাবে রামপ্রসাদ পরমহংসদেব প্রভৃতি ভগবানকে মাতৃ সন্ধান করেছেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁকে নাথ, দেব, পিতা, দেবতা, গুণী, দণ্ডবিধাতা রাজা, বিশ্বভূবনরাজ, জীবনস্বামী প্রভৃতি বিশেষণে বিবৃতি করেছেন।

আমার দাও সুধাময় স্বর

আমার বাণী করো হৃদয়

আমার প্রিয়তম তুমি এই কথাটি

বলতে দাও হে বলতে দাও।

মাতৃ-সম্বোধনে দেবীর নামে স্তবস্ততি অপেক্ষাকৃত অতি অল্প
রবীন্দ্র সাহিত্যে সাক্ষাৎভাবে। নৈবেদ্য, শেফালী, গীতা-
ঞ্জলির অবশ্য বহু কবিতায় পিতা বা মাতার বিশিষ্টতা
নাই। তবে অধিকাংশই পুরুষ কল্পনা—দাস্ত, সখা
প্রভৃতি ভাবের অভাব নাই। সেদিন বলেন না তিনি
মাতা কি পিতা, যেদিন গাইলেন—

কাদিয়া তোমায় এনেছি ডাকিয়া

ভাঙা মন্দির ঘারে।

কিন্তু হৃৎকের নিবেদন যে অভিমতী ছেলের মায়ের কাছে।

যে লতাটি আছে শুকায়েছে মূল

কুঁড়ি ধরে শুধু নাহি ফোটে ফুল

আমার জীবনে তব সেবা তাই

বেদনার উপহারে।

এমন অর্থা আছে প্রচুর। কিন্তু অধিকাংশ স্থলে দাস্ত, সখা
ভাবে তিনি পুরুষ দেবতাকে দেখেছেন হৃদয় মন্দিরে।

“বলাকা”য় জননী লক্ষ্মীর যে প্রভেদ দেখিয়েছেন
বিশ্বের বাসনা রাজ্যের রাণী, স্বর্গের অপ্সরী উর্ধ্বলীর সাথে
তা উপভোগ্য।

কোন কণে

স্বপ্ননের সমুদ্রময়নে

উঠেছিল দুই নারী

অভিলের শয্যাতল ছাড়ি।

একজন উর্ধ্বলী—

অশ্রুজনা লক্ষ্মী সে কল্যাণী

বিশ্বের জননী তাঁরে জানি

স্বর্গের ঈশ্বরী।

উর্ধ্বলী মাত্র ভোগ স্পৃহা আগার—

রাগরক্ত কিংতকে গোলাপে

নিজ্রাহীন যৌবনের গানে।

মা লক্ষ্মী—

আরজন ফিরাইয়া আনে

অশ্রুর শিশির আনে

স্নিগ্ধ-বাসনায় ;

হেমন্তের হেমকান্ত সকল শান্তির পূর্ণতার,

ফিরাইয়া আনে

নিখিলের আলীকাদ পানে

অচকল লাভণ্যের স্মিতহাস্ত সুধায় মধুর।

জননী লক্ষ্মীর দয়া মানে অচকলভ্য যদি লক্ষ্মীবস্ত বোকে—

ফিরাইয়া আনে ঘীরে

জীবন মৃত্যুর

পবিত্র সঙ্গম তীর্থ তীরে

অনন্তের পূজার মন্দিরে।

কবির বীণায় মাতৃ—আরাধনা মধুর মস্ত্রে বন্ধার দিল দেশ-
মাতার স্তবস্ততিতে। সে স্বরের আগুন চিরদিন রাঙিয়ে-
তুলবে দেশ-ভক্তের অন্তরাত্মা। বহু রচনার মাতৃ-পূজার
আন্তরিকতা কবির ললিত কণ্ঠে অমোঘময় হয়ে উঠেছে
ফুটে।

হে মোর চিত্ত পুণ্য তীর্থে

জাগরে ঘীরে—

প্রভৃতি গানটিকে কবি নাম দিয়েছিলেন—মাতৃ অভিষেক।
এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে ক্লিষ্ট হল কবির
চিত্ত যখন দেখলেন—

সেই হোমানলে হেরো আজি জলে হৃৎকের বক্তৃতিখা,
কিন্তু মার প্রতি বিশ্বাস এ ছেলের অগাধ। তিনি আর্ধ্য,
অনার্য, হিন্দু-মুসলমান সবাইকে ডেকে বান্ধেন—

মার অভিষেকে এসো এসো স্রা

মঙ্গল ঘট হয়নি যে ভরা

সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থনীরে।

দেশের পূজোপকরণ হোম, তীর্থনীর প্রভৃতিকে পবিত্র
করতে পারে সব সন্তানের একপ্রাণতা।

তরুণ কবি রবি ১৩০৩ সালের দ্বিতীয় কংগ্রেসের শুভ-
মিলনে কলিকাতার মঞ্চ হতে যখন গাইলেন আবেগভরে
মাতৃ-সঙ্গীত, শুনেছি স্তম্ভিত হয়েছিলেন দেশহিতৈষীর
দল। সতাই কল্যাণ-মধুর মনোরম মনোভাব মিলনে।
—আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে।

গাইলেন—

কত দিনের সাধন ফলে

মিলেছি আজ দলে দলে

ঘরের ছেলে সবাই মিলে হেথা দিয়ে মায়ের ডাকে।

কথা সুরল, কিন্তু তাব হিলোল তোলে মনের গহনে।

কংগ্রেস ফোটাচ্ছে সেদিন দেশাত্মবোধ। শাসনযন্ত্রের
কঠোরতা ছিল নির্ধব। রাজপুরুষের হঠকারিতা ছিল
হৃদ্বিষহ। কবি, সাহিত্যিক, সংবাদপত্র সেবক, দেশ-ভক্ত
মায়ের ছেলের ঘুম ভাঙাতে ছিল বন্ধ-পরিকর। রবীন্দ্র
জ্যোতির ভাতি ছড়িয়ে পড়ল সেদিন দেশের দিক্দিগন্তে।

১৮৯৭ সালে বিভূষিত হ'ল কংগ্রেস সভার দ্বাদশ
অধিবেশন। ডাক পড়ল কবির। তিনি গাহিলেন সেই
সালের কলিকাতা জাতীয় সভায়—চিরস্মরণীয় গান—যার
পুলকে চেতনার প্রেরণা উৎস হয় উচ্ছ্বসিত দেশ-প্ৰীতি
মাতৃভক্তি এবং গৌরবের গরিমায়। তৈরবী সুরের মধুর
ছন্দে গাহিলেন গায়কেরা কবির নেতৃত্বে—

অগ্নি ভুবন মন-মোহিনী

অগ্নি নির্মল সূর্য্য করোজ্জ্বল ধারিণী

জনক জননী জননী।

মোহ-পর্দা সরে গেল দাসত্ব মনোবৃত্তির। দেশ-বাসীর
চোখের সামনে জ্বলে উঠলো জ্যোতির্ময়ী মাতৃ-মূর্তি—
গৌরবদীপ্ত মায়ের অঙ্গশোভা। মন্ত্র আবাহন করলে
প্রাণবীণার সুর। সে মিলে গেল প্রাণের সুরে।
সত্যাই তো—

নীল সিদ্ধ জল ধৌত চরণতল

অম্বর-চুম্বিত ভাল হিমাচল

শুভ্র তুখার কিরীটিনী।

কিন্তু এ তো মৃন্ময়ী রূপ ভারত মাতার। কবি চিরময়ী
রূপের আভাষ দিলেন—

প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে

প্রথম সাম-রব তব তপোবনে

প্রথম প্রচারিত তব বন-ভঞ্জে

জান ধর্ম কত কাব্য-কাহিনী।

শুধু কি তাই। মা যে আমাদের দেবী অন্নপূর্ণা।

চির কল্যাণময়ী তুমি বনু

দেশ বিদেশে বিতরিছ অন্ন

জাহ্নবী যমুনা বিগলিত করুণা

পুণ্য পীযুষ স্তম্ভ বাহিনী।

যেমন ছন্দ তেমনি ভক্তির উচ্ছ্বাস। নাই জননীর মারাত্মক
ক্ষেপণাত্মক কথা, বিদেশ জয়ের রক্ত-শ্রোতের নৃশংসতার
আক্ষফলন।

পরব্রহ্মকে পিতৃ-সম্বোধন যেমন রূপক, মা বলে ডাকাও
তেমনি—তীর স্মৃদন ও সংরক্ষণশক্তি স্মরণ ক'রে।
মাতৃ রূপে তীর বিকৃতির আরাধনা বা আবাহন সত্ত্বে মাত্র
—কিন্তু তার সঙ্গে জড়ানো থাকে বাস্তব-জীবনের মাতৃ-
প্রাণের কোমল স্নেহের চেতনা। কবি নিজে ছিলেন
বাণীর বর-পুত্র। সরস্বতীর প্রভাব তীর উপর অপার।
তাই মাঝে মাঝে তিনি বাগ্‌দেবীর উল্লেখ করতেন—তীর
প্রকাশ্য স্তব করতেন। এ কথা বিশদভাবে পরে বলব।
এখন দেশ সেবার উল্লেখ করছি—যে সেবা বিধানের অর্থ্য
এবং উপকরণ। ১৩১৩ সালে সেদিনের দেশ-বরণ্য নেতা
সুরেন্দ্রনাথের এক অভ্যর্থনা সভায়—“দেশ-নায়ক” প্রবন্ধে
কবি পড়েছিলেন—“ব্রাহ্মণের ধৈর্য্য ও ক্ষত্রিয়ের তেজ
ঐহাতে একত্রে মিলিত, যিনি সরস্বতীর নিকট হইতে বাণী
পাইয়াছেন”—সেই সুরেন্দ্রনাথকে বরণ করেছিলেন,
সরস্বতী দেবীর বর-পুত্র রবীন্দ্রনাথ।

তীর দেশ-মায়ের পূজার অর্থ্য প্রচুর। আমি মাত্র
আর দু-একটির উদাহরণ দেবার প্রলোভন সঞ্চার করতে
পারছি না। গানে স্বদেশকে মাতৃ সম্বোধন না করলে
উচ্ছ্বাস হয়না নির্মল ও প্রাণস্পর্শী।

সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি।

মার বাহিরের রূপ কী কম তৃপ্তিকর।

ওমা ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে

ওমা অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে কী দেখেছি

মধুর হাসি।

সেই মার সবাই তো ছেলে, সাংসারিক অবস্থা যার যেমন
হ'ক,

ওমা আমার যে ভাই তারা সবাই তোমার রাখাল

তোমার চাষী।

তাই কবির কণ্ঠে শুনি—

সার্থক জনম আমার জন্মেছি এ দেশে

সার্থক জনম যাগো তোমায় ভালোবেসে।

আমাদের জাতীয়সঙ্গীতে জনগণমন অধিনায়ক—দেশ-
নায়ককে পিতৃ সম্বোধন করেছিলেন কবি। ১৯১৮ সালের
মাঘ মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় সঙ্গীতটি প্রকাশিত হ'ল,
কংগ্রেসে গীত হবার পর। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং সে পত্রিকায়
সম্পাদক। গানের নাম দেওয়া হয়েছিল “ভারত বিধাতা”।

“ব্রহ্ম-সঙ্গীত”। শ্রীমতী সরলা দেবী “ভারতী” পত্রিকায় সম্পাদিকা। “নমো হিন্দুস্থান”ও কংগ্রেসে গীত হয়েছিল। “ভারতী” বলেছিল—“স্বমধুর বালিকাকণ্ঠের সহিত যুবক-দেব স্ব-গম্ভীর কণ্ঠে যখন এই স্তব-গান সকল ধ্বনিত হইত, তখন হৃদয় ভক্তিপরিপূর্ণ এবং নয়ন অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিত। ধূপ-স্বগন্ধ যেমন মনকে পূজার অহুকুল অবস্থা দান করে, এই সকল বন্দনা গান তরুণ যুবক ও বালিকা-দেব কণ্ঠে গীত হইয়া অন্তরে এই প্রকার ভক্তি সঞ্চার করিত।

পিতৃরূপেও রবীন্দ্রনাথ স্বদেশকে দেখেছিলেন ১৯০৬-৪ খৃষ্টাব্দে।

হে বিশ্বদেব, মোর কাছে তুমি দেখা দিলে
আজ কী বেশে।
দেখিছ তোমাতে পূর্ব গগনে, দেখিছ তোমাতে
স্বদেশে।

হৃদয় খুলিয়া চাহিছ বাহিরে, হেরিছ আজিকে নিমেষে
মিলে গেছ ওগো বিশ্ব দেবতা মোর সনাতন স্বদেশে।
অপূর্ব দেশ-ভক্তি।

বলেছি কবি বিশ্ববিধাতাকে নাথ, প্রভু, জীবনস্বামী
প্রভৃতি সম্বোধন ক’রে প্রাণের আবেগ নিবেদন করেছেন।
কিন্তু তাঁর চিত্ত ভাবাবেশে পরব্রহ্মের প্রকৃতির রূপেও
করেছে প্রসাদ লাভ। তাই অনেক কবিতায় তিনি মাতৃ-
সম্বোধন করেছেন বিশ্বনিয়ন্তাকে। একদিন চিন্তের গহন
হ’তে গাহিলেন—

তোমার সোনার থালায় সাজাব আজ
হৃৎখের অশ্রুধার
জননী গো গাঁথব তোমার গলার মুক্তাহার।
তোমার বুকে শোভা পাবে আমার
হৃৎখের অলংকার।

গভীর অহুঃস্বাস যেথা নাই, সেথায় আসতে পারেনা
অভিমান। সেই আবেগ ভরে গড়তেন অলংকার। মা
আনন্দময়ী সুসজ্জিতা—

চন্দ্রহর্য্য পায়ের কাছে
মালা হ’য়ে জড়িয়ে আছে।

এ রচনা ১৩১৫ সালের।

আর একটি কবিতা ঋতু বর্ণনা নিম্নরূপ। কিন্তু তার

প্রেরণামূখে আছে মরালগামিনী দেবী সরস্বতীর চেতনা।
আনন্দ হল বেঁধে ছুটে আসে যখন কবির বীণায় শুনি—

আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ আমরা গেঁথেছি
শেফালি মালা

আবাহন করলেন কবি বীণার ঝঙ্কারে—

এসগো শারদলক্ষ্মী তোমার
শুভ্র মেঘের রথে

এসো নিখিল নীল পথে
এসো ধৌত শ্রামল আলো ঝলমল
বন-গিরি পর্বতে

এসো মুকুট পরিয়া ষেত শতদল
শীতল শিশির ঢালা।

মরাল-বাহিনী বাণী দেবী। সে উচ্ছ্বাসে কবি গাহিলেন—
ফিরিয়ে মরাল ডানা পাতিবারে
তোমার চরণ-মূলে

গাহিলেন—
গুঞ্জরতান তুলিযো তোমার
সোনার বীণার তারে
মধু মধু ঝঙ্কারে
হাসি ঢালা স্বর গলিয়া পড়িবে
কণিক অশ্রুধারে।

আর একটা উদাহরণ দিই। ঋতু বর্ণনায় মুগ্ধ কবি জননীর
রূপ দেখেছিলেন, ক্রন্দনবের দহন হৃৎখে আবার বরষার
আনন্দে। শেষ-সপ্তকে তিনি গেয়েছিলেন—
বিশ্বলক্ষ্মী,

তুমি একদিন বৈশাখে
বসেছিলে দারুণ তপস্কার
করত চরণতলে।

গ্রীষ্মের হৃৎখের দহনেও তিনি দেখলেন লক্ষ্মী—
শুককে জালিয়ে ভস্ম করে দিলে
পূজার পুণ্য ধূপে

কালোকে আলো করলে
তেজ দিলে নিস্তেজকে
ভোগের আবর্জনা লুপ্ত হ’ল
ত্যাগের হোমায়িতে।

যা প্রকৃত কবি তার বিরুদ্ধবাদ করে বৃথা ক্লেশ পাননি।

তাই অবশ্যতাবীকে তিনি যেনে নিয়ে, বৈশাখের রক্তভেজের
নিকট মাথা নত করে বিখলস্বীর কৃপা ভাবলেন সে
অবস্থাকে।

আবার “সংযোজনে” যখন আঘাত কবিতা পাঠ করি,
দেখি প্রকৃতির বর্ষার মনোরমতা আদর অত্যাধিক পেয়েছে
কনি-বীণার মধুর ছন্দে। শুনি—

নব বরষার দিন

বিখলস্বী তুমি আজ নবীন গৌরবে সমাসীন

রিক্ত তপ্ত-দিবসের নীরব প্রহারে

ধরণীর দৈন্ত্য পরে

ছিলে ভগ্নশায় রত

রক্তের চরণ তলে নত।

বলেছি মেনে নিয়েছেন গ্রীষ্মের উত্তাপ। বর্ণনা করলেন
তাকে।

উপবাসলীর্ণ তত্ত্ব, পিঙ্গল জটিল কেশ পাশ

উত্তপ্ত নিঃশ্বাস

দুঃখে কবিলে দক্ষ দুঃখে রি দহনে

অহনে অহনে

ভারপর পূর্বোক্ত শেষ সপ্তকের কবিতার অংশ এ কবিতায়
স্থান দিলেন—স্বকের জলনকে পূজার পুণ্য ধূপ বিখাসে।

“নটরাজ ঋতুরসশালা”। সেখান হেমন্ত সম্বন্ধে শুনি—

হায় হেমন্ত লক্ষী তোমার নয়ন কেন ঢাকা—

হিমের ঘন ঘোমটাখানি ধূল রঙে আঁকা।

কিন্তু তা’ হলেও—

ভরেছ, হেমন্ত-লক্ষী, ধরার অঞ্জলি পঙ্ক ধানে,

দিগঙ্গনে দিগঙ্গনা এসেছিল ভিকার সঙ্কানে

শীতরিক্ত অরণ্যের শূন্য পথে। বলেছিল ডাকি—

“কোথায় গো অরপূর্ণা ক্ষুধার্তেরে অন্ন দিলে নাকি।”

এতো বিশ্ব-প্রাণ না হ’লে ববীজনাথ কি বিশ্ব-কবিরূপে
বরণীয় হতেন?

এবার দিনের কথা বলি। অবশ্য উষা উজ্জলিত করে
সকলকে। দিনের প্রথম আলোক দেখে একদিন কবি
গাইলেন বিশ্বদেবতাকে মাতৃরূপে আরাধনায়—

জননী তোমার অরুণ চরণখানি

হেরিছ আজি এ অরুণ কিরণরূপে

সে আলোকে বাণী শুনলেন কবি—

জননী তোমার মরণ হরণ-বাণী

নীরব গগনে ভরি উঠে চুপে চুপে

অংশ হ’তে বিরাটের চেতনা—

প্রাণ ছড়িয়ে পড়ল তুবন মাঝে

তোমায়ে নমি যে সকল জীবন কাজে

তবু ধন মন নিবেদন করি আজি

ভক্তি পাবন তোমার পূজার ধূপে।

বহু কবিতায় কবির আবেগ স্পষ্ট ক’রে উল্লেখ করে নিবেদন
করেছেন মাতার কি পিতার চরণে। তেমন আরাধনাও
বহু তাঁর রচনায়। যথা—

অগৎ জুড়ে উদার স্বরে

আনন্দ গান বাজে,

সে গান কবে গভীর হবে বাজবে হিম্মার মাঝে।

বিশ্বপ্রেমের আকাজক্ষায় বলেন—

বাতাস জল আকাশ আলো

সবারে কবে বাসব ভালো

জন্ম সত্য জুড়িয়া তারা—

বসিবে নানা সাজে।

এ-প্রত্যয়ে ভক্তি আসবে যখন

রয়েছ তুমি এ-কথা কবে

জীবন মাঝে সহজ হবে—

আপনি কবে তোমারি নাম

ধনিয়ে সব কাজে।

ভক্তি মানুষকে নিয়ে যায় উদ্ভূত। ভক্তি উদ্দীপিত
হয় নামে—কিন্তু ভক্তি যদি হয় আন্তরিক, কোন নামে
শ্রদ্ধা নিবেদন করে মানুষ সে সমস্যা। আপনি ঘুচিয়ে দেয়
নিষ্ঠা। অতি কঠোর হীন নৃগুণস কাণ্ডে যদি ভ্রমবশতঃ
মানুষ আপনাকে নিযুক্ত করে এবং সেই কণ্ঠে সাক্ষ্য
লাভ করবার জন্য দেবদেবীর উপাসনা করে। সে
উপাসনা আন্তরিক হলে প্রাণে জেগে ওঠে ধারণা সে
কৃষ্ণের অসারতা সম্বন্ধে। কাহনার ভক্তিও প্রাণে
তোলে রেছ, প্রেম, বিশ্ব-সম্প্রীতি যদি ভক্তি হয় গভীর
ও অমল।

এই সত্যকে হুটিয়েছেন কবি তাঁর “বান্দীকি প্রতিভা”
নাটকে। লুটতরাঙ্গের কাজে সাক্ষ্য লাভ করবার
অসাধু উদ্দেশে বান্দীকি কালী-পূজার আত্মনিয়োগ

করত। উদ্বেগ অশাধু হলেও তার মন বুদ্ধি প্রাবল্য হত প্রকৃত ভক্তির স্রোতে। নরবলি দিত দস্যুর দল নবের অহিত উদ্দেশ্যে। কিন্তু বাম্বীকির ভক্তি পরা-ভক্তির পথে হ'ল অগ্রসর। লোল জিহ্বা কালীকে সে জানতো মণি-রক্ত-লোলুপা। ভক্তি কোটালে তার চেতনা, যার ফলে সে বুঝলে দয়াও তাঁরই দান। যেমন তিনি করালবদনী তেমনি তিনিই বাণী—যে দেবী বিতরণ করেন স্নেহ, দয়া, জ্ঞান, প্রকৃত বিজ্ঞা।

তাই বাম্বীকির কালীভক্তি পরিণত হল সরস্বতী-ভক্তিতে। বাম্বীকির জীবনের উভয় ভাগের স্তব স্তুতি মন্ত্র মাতৃ-আরাধনার বিশিষ্ট নৈবেদ্য।

ভাকাত-কালীর উপাসক বাম্বীকি যে স্তোত্রে মাতৃ আরাধনা করত, তাঁদের মধ্যে মলিনতা ছিল না। তারা তাই জাগালে তার প্রাণ, ভাঙলে তার যোহ নিদ্রা।

দস্যু দলপতি গদগদ কণ্ঠে গাহিল—

ত্রিভুবন মাঝে আমরা কাহারে করি না ভয়

যাহার উপরে রহেছেন কালী, সম্মুখে রয়েছে জয়।

এ ধারণা তার আন্তরিক ও স্পষ্ট। সংশয়ান্বিত বিনষ্ট হয়। বিশ্বাসে ও শ্রদ্ধায় যে ভক্ত যে দেবতার উপাসনা করে সে সাধনারূপ ফল পায়। কিন্তু সে ফল স্বার্থসিক্তি মাত্র, কণিক।

অমাবস্তার রাত্রে বলি দেবার অশ্রু দস্যুরা ধরে আনলে এক কুমারী। বাম্বীকি স্তবময়। স্তবে মাতুরূপ দেখেছে দস্যুরাজ আন্তরিক সাধনায়।

রাঙা পদদ্বয়ে প্রণাম করিগো ভবদারা

আজ এ ঘোর নিশিতে পূজিব তোমারে তারা।

প্রার্থনা কিন্তু দস্যুরাজের উপযুক্ত।

ঝলসিয়ে দিশি দিশি ধূয়াও ভড়িত অসি

ছুটাও শোণিত স্রোত ভাসাও বিপুল ধরা।

অবশ্য পুষ্পাঞ্জলি দেবার সময় চিন্তে জাগলো চেতনা—তিনি পরাংপরা। সেদিন ভাকাত বাম্বীকি গাহিল—

উরোকালী কপালিনী মহাকালি সিমন্তিনী

লহ জবা-পুষ্পাঞ্জলি মহাদেবী পরাংপরা।

এই প্রার্থনাটি উল্লেখযোগ্য। কারণ এর প্রথম অংশে চিত্ত দেখলে মা কালীকে রক্ত লোলুপা মূর্তিতে। কিন্তু প্রার্থনা আন্তরিক তাই দেবীকৃপা অভিব্যক্ত করলে,

প্রকৃত লুকিয়ে থাকা মানব-চরিত্রে আধ্যাত্মিকতা। মহা-দেবী পরাংপরা—ভক্তির ভাষা আন্তরিক, তাই মন আকৃষ্ট হ'ল সেই বিভূতিতে।

দস্যু বাম্বীকির স্তবের উভয় অংশই প্রভাব বিস্তার করলে তার মনে। প্রথম ভাগে চাহিল মন শোণিতাঞ্জলি নিবেদন করতে।

দস্যুরা সেই বলিনী বালিকাকে নিয়ে এলো বলির যুগ্ম-কাষ্ঠের সমীপে। কাতরা বজ্রে—

দয়া করো অনাধারে, কে আমার আছে

বন্ধনে কাতর তহু মরি যে ব্যথায়।

নেপথ্যে বনদেবীও দয়া ভিক্ষা করলেন।

দেবী মাহাত্ম্য জাগালো বাম্বীকির অন্তরাত্মা। সে মহাদেবী পরাংপরাকে নিবেদন করেছে পুষ্পাঞ্জলি। সে রক্তজবা রঙীন করলে তার প্রাণ—রক্ত-লাল নয়, স্নেহ-দীপ্তির উজ্জলতা। তার চেতনার অভিব্যক্তি ওঠালো দস্যুকে স্বরভাবের স্তরে অস্বর নিঃসৃত হতে। মন বজ্রে—

সব ভেসে গেল গো সব ভেসে গেল গো

মরুভূমি ভরে গেল বরষার প্রাবনে।

বলিনী কুমারী বন্ধন মুক্ত হ'ল। বাম্বীকি মুক্তি লাভ করলে নির্দয় আবেগের করাল বেগ হতে। রুধির-লোলুপতা দৃষ্টি পথে এলো না—লোল-জিহ্বা নিঃসৃত নিধন বলি চায়।

বাম্বীকি প্রতিভা রচিত হয়েছিল ১২৮৭ সালে—প্রায় আশী বৎসর পূর্বে : এর মাঝে দেবী-বিকৃতির মহান দিক ফুটিয়ে তুলেছিলেন তরুণ কবি। বোঝালেন ভক্তি যদি হয় প্রবল, ভগবানের কল্যাণময় বিশ্বকরণার জ্যোতি হয় উদ্ভাসিত নর-বাতক দস্যুরও চিত্তে।

বাম্বীকির অন্তরাত্মা সত্যের অল্পসঙ্কানে আত্মনিয়োগ করলে। যুগ্ম-শিকার করতে গিয়েও সেই পরিস্থিতি। অহিংসার দীপ জলে উঠেছে প্রাণে। দেখলেন—হরিণ শাবক দুটি, প্রাণভয়ে ধীর ছুটি। শিকারী দস্যুদের বজেন সন্দার—

থাক থাক থাক ওরে এ দারুণ খেলা রাখ

আজ হতে বিসর্জিত্ব এ ছার ধ্বংস-বাণ।

অহুচরেরা বিস্মিত হল—ত্যাগ করলে অহিংসক রাজাকে। বজ্রে—

তোর দশা রাজা ভালো তো নয়।
পাখিটি মারিলে কাঁদিয়া খুন
না জানি কে তোরে করিল গুণ

হেন কতু দেখি নাই।

তারপর সেই ঐতিহাসিক ক্রৌঞ্চ-মিথুন বধ। কবিতার
স্বললিত বাণী, দেবভাবার অপ্রাণ্যশিত প্রকাশ তাকেই
বিস্মিত করলে। অতীত দিনের দহ্যরাজ দেবভাবার
প্রাণস্পর্শী ভাবায় বসে—

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং স্বয়মগমঃ শাস্বতীঃ সমাঃ
যং ক্রৌঞ্চমিথুনাদেককমবধীঃ কামমোহিতম্।

এ যে বাণীদেবী প্রণোদিত বাণী। দেবী সরস্বতী এলেন।
সে শুভ্র প্রতিমা অভিতূত করলে আদিকবিকে। হৃদি
কমল হতে উঠলো স্তব—

পূর্ণ হ'ল বাসনা দেবী কমলাগন।
ধন্য হ'ল দহ্যপতি গলিল পাখাণ

ভক্তি-বিগলিত প্রাণ গাহিল—

তব কমল পরিমলে রাখে হৃদি ভরিয়ে
চিরদিবস করিব তব চরণ স্থা পান

একি ধর্ম-পরিবর্তন? এক দেবীর বিসর্জনে অস্ত্র দেবীর
পূজার বেদী সাজানো। মা কালীর ভক্তিই তো দহ্য
ভক্তকে পৌছে দিয়েছে বাণী-মন্দিরে। ভক্তি উদ্দীপন
করে জ্ঞান। মা তো এক—নাম বিভিন্ন। পূজার
উপকরণে নৈবেদ্য সাজানো হয় রুচি অহুসারে। শ্রীকৃষ্ণ
স্বয়ং বলেছেন—বান্ধীকি যুগের অবশ্য পরে—

যো যো বাং বাং তত্ত্বং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়র্জিতুমিচ্ছতি
তস্ত তস্তাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্।

যে যে ভক্ত, সপ্রকৃতভাবে যে দেবতার আরাধনা করতে
ইচ্ছা করে, সেই ভক্তের সেই দেবতার প্রতি অচলা শ্রদ্ধার
বিধান করি আমি।

সেই শ্রদ্ধাই পথ চিনে নেয়। তাই বান্ধীকির কালী
ভক্তি প্রেরণা আনলে বাণী উপাসনার। বুঝলেন মা কালী—
এতদিন পরে প্রকৃত পথ দেখালেন। সেই পথে চলবার
প্রয়াসে আত্মনিয়োগ করলেন উপাসক।

এতদিন কি হল করে তুই পাখাণ করে রেখেছিলি
(আজ) আপন মায়ের দেখা পেয়ে নরন

জলে গলেছি মা।

যে কালো সেই মা-ইতো আলো। গাহিলেন—

কালো দেখে ভুলিনে আর আলো দেখে ভুলেছে মন
আমার তুমি ছলে ছিলে, (এবার) আমি তোমার
হলেছি মা।

মায়ের মায়ী কাটিয়ে এবার মায়ের কোলে চলেছি মা।
অপরূপ স্তোত্র। মা মায়াময়ী শ্মশানকালী আবার সেই
মায়েরই কেলি—স্রোতঃস্রাবরা আশ্রয় শুভ্রকরণ মায়ার
আধার কাটে সে শুভ্র-বরণার জ্যোতিতে।

প্রার্থনায় তুষ্ট হয়ে মা সরস্বতী বর দিলেন—

বসি তোর পদতলে কবি বালকেরা যত

শুনি তোর কর্ণস্বর শিখিবে সঙ্গীত কত,

এই নে আমার বীণা দিহু তোরে উপহার

যে গান গাহিতে সাধ ধ্বনিবে ইহার তার।

আদিকবি বান্ধীকির মুখের স্তব আমাদের বিশ্বকবির
আন্তরিক আরাধনা।

কবিগুরু বান্ধীকিকে নমস্কার করে আমাদের কবি
মধুসূদন আরম্ভ করেছিলেন—মেঘনাদবধ কাব্য

নমি আমি কবিগুরু তব পদাধুজে

বান্ধীকি হে ভারতের শিরশ্চুডামণি

তব অহুগামী দাস।

অবশ্য কৃত্তিবাসের মতে রত্নাকর দহ্য রাম নাম জপে হয়ে
ছিলেন বান্ধীকি।

রামনাম ব্রহ্ম স্থানে পেয়ে রত্নাকর

সেই নাম জপে যাতি হাজার বৎসর।

তার সর্বাক্র খাইল বান্ধীক কীটগণ।”

ব্রহ্মা তাকে নাম দিলেন বান্ধীকি, গাহিতে আজ্ঞা দিলেন
রাম নাম।

তখন বর দিলেন—

সরস্বতী রহিবেন তোমার জিহ্বায়

হইবে কবিতা রাশি তোমার ইচ্ছায়।

শ্লোকহন্দে পুরাণ করিবে তুমি ব'হা

জন্মিয়া শ্রীরামচন্দ্র করিবেন তাহা।

কবিগুরুর আর একটি মাতৃ স্রোতের উল্লেখ করব। এ
কবিতা বাণী বন্দনা। কাব্য-কাহিনী পুরস্কারের এটি
অন্তত্বুক্ত। কবির প্রাণে সরস্বতী-ভক্তি অমল উৎসে
বিভরণ করেছেন তিনি দারিদ্র্যতুষ্ট পণ্ডিতের মুখে।

বিমলমানস সরসবাসিনী। গুরুবসনা গুরুহাসিনী
বীণাশুভিত মঞ্জুভাষিণী কমল কুঞ্জালনা জননীরে হৃদয়ে
রেখে, ব্রাহ্মণ বজেন—

“ক্যাপার মত আছি চিরদিন উদাসীন আনমনা—যদিও
অপরে চারিদিকে সব ছুনিয়া বাঁটিয়া নিতেছে। মার
রাগিণী বিশ্বপ্রাবিনী অমৃত উৎসধারা।

যে রাগিণী শুনি নিশি দিনমান

বিপুল হর্ষে শ্রব ভগবান

মলিন মর্ত্যমাঝে বহনান নিয়ত আশ্বহারা।

যে রাগিণী সদা গগন ছাপিয়া

হোমশিখা সম উঠিছে কাঁপিয়া

অনাদি অনীমে পড়িছে কাঁপিয়া বিশ্বতরী হতে।

যে রাগিণী চিরজন্ম ধরিয়া

চিত্তকুহরে উঠে কুহরিয়া

অশ্বহাসিতে জীবন তরিয়া ছুটে সহস্র শ্রোতে।

কবির রাশি রাশি কবিতার শ্রোত বিপ্লবেষণ করলে সত্যই
কি মনে হয় না কত আন্তরিক উপলব্ধির উপাদানে গড়া
এই স্তোত্র।

প্রাণের উৎস মুখের পবিত্র নিবেদন—

তুমি মানসের মাঝখানে আসি

দাঁড়াও মধুর মুরতিবিকাশি

কুন্দ-ধবল সুন্দর হাসি বীণা হাতে বীণাপানি।

শেষে ভাসিয়া চলিবে রবিশশী তারা

সারি সারি যত মানবের ধারা

অনাদি কালেব পাশ্চ যাঁহারা তব সঙ্গীত শ্রোতে

দেখিতে পাইব যোমে মহাকাল

ছন্দে ছন্দে বাজাইছে তাল

দশ দিগবধু খুলি কেশজাল নাচে দশ দিক হতে
এর ওপর টাকা ভাষা চলেনা। কাব্যের নায়কের মুখে
ফুটেছে বিশ্ব কবির চিত্তের আকৃতি—বাণী বন্দনায়।

“বোঁঠাকুরাণীর হাট” আগমনী কবিতা স্বর্নস্পর্শী।

সারা বরষ দেখিনি মা, মা তুই আমার কেমন ধারা

নয়নতারা হারিয়ে আমার অন্ধ হল নয়ন-তারা

এলি কি পাখাণী ওরে

দেখব তোরে আঁখি ভরে

কিছুতেই আসেনা যে মা পোড়া এ নয়নের ধারা।

একি মাত্র অভিনেতার উক্তি?

বলা বাত্বে, মাত্র আবেগ ভরে সামান্য দু একটা উদা-
হরণ দিলাম বিশাল রচনাবলী হতে কবীন্দ্র রবীন্দ্রের।
প্রকৃতির মাপুরী স্বদেশের মাপুরী তাঁর মধুর অন্তরাশ্রয়
বিরাজ করতো সুন্দর বিমোহন আবেগে।

মাত্র বঙ্গলক্ষ্মী হতে দুকথা ভুলে প্রলোভন শেষ
করছি তাঁর মাতৃ বন্দনার মনোলোভা শোভা।

তোমার মাঠের মাঝে, তব নদী তীরে

তব আশ্রবনে ঘেরা সহস্র কুটীরে

দোহন মুখর গোষ্ঠে, ছায়া বটমূলে

গঙ্গার পাশে ঘাটে সহস্র দেউলে

হে নিত্য কল্যাণী লক্ষী হে বঙ্গ জননি

আপন অঙ্গন কাজ করিছ আপনি

অহর্নিশি হাপ্রমুখে।

বিশ্বের সৌন্দর্য বঙ্গলক্ষ্মীর সর্দাঙ্গ। বিশ্বকবি এ বিশ্বের
সৌন্দর্য প্রাচুর্যের প্রতিফলনে পরমানন্দ লাভ
করেছেন।



মনের ঠিকানা



সকালে বের হয়ে যায় অলক, চেয়ার সেয়ে সেখান থেকে হাসপাতাল, সেখানে কাষের চাপ রোগীদের ভিড় তো আছেই। বড় সড় অপারেশন থাকলো তো কথাই নেই। অনেকদেরী হয়ে যায় বাড়ী ফিরতে।

কাষকে কোনদিন অবহেলা করেনি অলক, ভয়ও করেনি। সারাদিনরাত ওর মাঝে মশগুল হয়ে থাকতে পারে, থাকেও।

ছক বাঁধা জীবন ডাক্তার অলক সেনের।

হাসপাতাল থেকে ফিরে লাঞ্চ সেয়ে ঘণ্টা দুয়েক বাড়ীতে একটু বিশ্রাম নিয়েই আবার বৈকালে বের হয়ে যায় চেয়ারে। ফেরে গভীর রাত্রিতে কাষে, ঠাসবুনোন দিনগুলো কোনদিকে কেটে যায় জানতেই পারেনা।

এ নিয়ে শমিতা প্রথম প্রথম একটু বিরক্ত হোত।

একটা মেয়েকে জীবনে সঙ্গিনী করে এনে—তাকে

দূরে সরিয়ে রেখেছে অলক নির্মম ভাবে। চেষ্টা করেছিল শমিতা কথাটা জানাতে। সারাটা দিন তার কাঁটতে চায় না।

কিন্তু অলক হেসেছিল ওর কথায়। জবাব দিয়েছিল—কি করি বল, ডাক্তারদের সময় থাকেনা।

শমিতা চুপকরে শুনেছিল কথাটা, জবাব দেয়নি। মনে হয়েছিল তার অসীম নিঃসঙ্গতাকে সে বোঝাতে পারবেনা। বোঝাতে পারবেনা কি নিবিড় বেদনা তার মনে জমে ওঠে।

অলক গাড়ী নিয়ে বের হয়ে যায় বৈকালেই। কয়েকটা জরুরী কেস আছে। একটা রোগীকে কিছুতেই স্থস্থ করে তুলতে পারছেননা, একটা ছেলের হাতে গ্রাংগ্রিণ কর্ম করেছে কোন উপায় নেই। হাতটা কেটে বাদই দিতে হবে।

নিজের অগতে হারিয়ে যায় অলক, এখানে শমিতার কোন ঠাই নেই।

সেদিন লাঞ্চার সময় ওরা খেতে বসেছে।

শমিতা এই একটু সময় অলককে কাছে পায়, ক' বছরই কেটে গেছে। ক্রমশঃ শমিতার এই নির্জনতা সয়ে গেছে। অজানার ঘরে অথও অবসরের মাঝে সে যেন নিজেকে নোতুন করে খুঁজে পেয়েছে।

খাওয়ার পরই অলক সিগারেট টানতে টানতে উপরের ঘরে গিয়ে একটা মোড়কে কথানা বই দেখে একটু অবাক হয়।

একই বই কয়েককপি প্রকাশকের দোকান থেকেই সোজা এসেছে। মোড়কটা খোলা। লেখক নয়, কোন ভ্রমহিলার লেখা বইটা।

শমিতার পত্র-পত্রিকা আসে কয়েকখানা, বইও কেনে। অলক বাধা দেয় না, সে জানে সময় কাটাতে গেলে এগুলোর দরকার।

শমিতা একাই রয়ে গেছে, ক'বছর তাদের বিয়ে হয়েছে ঠিক খেয়াল নেই অলকের। তাদের ঘর শূন্যই রয়ে গেছে।

শমিতাও এই শূন্যতার মাঝে নিজের সময় কাটাবার ব্যবস্থা করে নিয়েছে, বলে ওঠে অলক।

—একই বই এতগুলো কপি কি হবে?

হাসে শমিতা। মিষ্টি একটু হাসি। নির্জন অলস মধ্যাহ্নে ওকে কেমন ভালো লাগে দেখতে। স্নান সেরে একরাশ ভিজ়ে চুন খুঁজে দিয়েছে, সাদা শাড়ীর সঙ্গে পরেছে লাল একটা ব্লাউজ। মেঘনামা আকাশের মত ওকে রহস্যময়ী বলেই মনে হয় অলকের।

ওকে ঘিরে ফুটে উঠেছে যুহু একটা স্বপ্ন।

শমিতা খুশীভরা কণ্ঠে বলে ওঠে—আমার লেখা বই, ছাপাতে আদি চাইনি। ওরা কপিটা দেখে একরকম জোর করেই নিয়ে গেল।

অলক অবাক হয়ে চেয়ে থাকে স্ত্রীর দিকে। ওর ডাক নাম ওই রজনাই—নামটা তার খুব চেনা, কিন্তু কল্পনাও করেনি যে এই বই শমিতারই লেখা ওর ছেলেবেলার নামে।

...কখন লিখল তাও জানেনা অলক, শমিতাও

তাকে কিছু বলেনি, প্রকাশকরাই বা কি করে খবর পেল, এই কপি নিয়ে গেল তাও জানানয়নি এর আগে।

শমিতা অনেক কাঁদে করে খার কোন খবরই রাখে না অলক, শমিতা ও তাকে জানানোর প্রয়োজন বোধ করেনা।

বই এর কথা ও এতদিন জানানয়নি। বইটা বের হয়েছে মাস খানেক হয়ে গেল। শমিতা ওর হাতে একখানা বই তুলে দেয়।

—পড়বে না?

অলক সহজ ভাবে বলবার চেষ্টা করে—নাও। সময় তো নেই। তবু পড়তেই হবে। তোমার লেখা বই।

বইখানা হাতে নিয়েই বিছানায় শুয়ে পড়ল অলক। দু'এক পৃষ্ঠা খুলে দেখেছে। শমিতা এ সময় আর ওকে বিরক্ত করতে চায় না। তবু পড়ছে বইটা পড়ুক সে।

অলক ভাবছে হাসপাতালের কথা, সাপুকা ড্রাগল ব্যবহার করে বেশ স্বফলই পাচ্ছে অনেক কেসে। সেই ছেলেটার হাতের ঘাটা শুকিয়ে আসছে, মনে হয় অপারেশন করতে হবেনা।

ক্লান্তিতে চোখ বুঁজে আসে—বইটা কয়েকপাতা পড়েছে মাত্র, ঠিক ভালো লাগেনা। কেমন একঘেঁয়ে লাগে। চোখবুঁজে আসে খুঁমে।

বৈকালবেলায় চেয়ারে বোঁগী দেখে চলেছে। বেয়ামা এক জনের পর অগ্রজনকে ডাকছে। এমন সময় ওর পাশের চেয়ারের আই-স্পেশালিষ্ট ডাক্তার করকে চুকে দেখে মুগ্ধতুলে চাইল।

ডাঃ কর বলে ওঠে

—কনগ্রাচুলেশন জানাতে এলাম।

ঠিক ব্যাপারটা বুঝতে পারে না অলক, ডাঃ কর বলে চলেছেন,—চমৎকার লিখেছেন বইটা। আপনাদের জীবনে এমন একজন স্থলেখিকা তাতো বলেননি মশায় কোনদিন। লাকি ফেলো।

অলক হাসবার চেষ্টা করে, ও। হ্যাঁ হ্যাঁ লেখেন বটে। —লেখেন মানে? রীতিমত জাভলিথিয়ে। একদিন দেখা করে অভিনন্দন জানিয়ে আসবো।

ডাঃ কর বের হয়ে গেলেন। অলক চুপ করে কি

ভাবছে। তার জীবন খবর এরা যেন তার থেকে বেশী রাখে। তার জন্ত অলককে এসে ধন্যবাদ জানায়।

—স্মার। বয়সার ডাকে চমক ভাঙে তার, বলে ওঠে অলক,—হ্যাঁ, অল্প রোগীকে আসতে বলা।

সব যেন তার কেমন ওলট পালট হয়ে যাচ্ছে। বই খানা পড়তে দিয়েছিল শমিতা। কপিটা এনেছে এখানেও।

পরবর্তী রোগী মিঃ দত্ত, মস্ত বড় ব্যবসায়ী তাঁর স্ত্রী। ভদ্রমহিলা টেবিলে বইটা দেখে বলে ওঠে—আপনার জীবন লেখা শুনছিলাম।

অলক যেন মুখের উপর একটা আঘাত খেয়েছে। জবাব দিলনা। ভদ্রমহিলা বলে চলেছেন।

—পত্রিকায় বেকার সঙ্গে সঙ্গেই আমি পড়েছি। কি চমৎকার লেখা। একদিন গিয়ে আলাপ করে আসবো। এতবড় লেখিকা আপনার স্ত্রী—আপনি তো ভাগ্যবান, ভাক্তারবাবু।

অলক হাসবার চেষ্টা করে, মিসেস দত্তও যেন আজ তাকে অল্প চোখে দেখছে।...অলক গভীরভাবে ওকে পরীক্ষা করে প্রসঙ্গপূর্ণ লিখতে থাকে।

...আজ মনে হয় তার ভাক্তারীর চেয়ে রাতারাতি শমিতা অনেক খ্যাতি পেয়ে গেছে, সমাজের অনেক উপরে উঠে গেছে।

...একটু সকাল সকালই আজ ফেরবার আয়োজন করে অলক। দেহমনে মাঝে মাঝে কেমন ক্লান্তি বোধ করে, সত্যিই সে অতিরিক্ত পরিশ্রম করে চলেছে দিনরাত। একটু বিশ্রাম চায় সে।

বাড়ী চুকছে।...বাইরের ঘরে কাকে বসে থাকতে দেখে একটু অবাক হল। এসময় সে বাড়ী ফেরেনা। অসময়ে ওকে ফিরতে দেখে শমিতা এগিয়ে আসে। মুখে-চোখে একটু বিস্ময়ের চিহ্ন। আগে এসব লক্ষ্য করতো না অলক, আজ সে করে। সেও অবাক হয়েছে।

শমিতাই পরিচয় করিয়ে দেয়—ইনিই প্রগতি প্রকাশক-এর মালিক নিখিলবাবু, আমার স্বামী ডক্টর সেন।

ভুললোক উঠে নমস্কার করেন। নিখিলবাবু বলে চলেছেন—তিন মাসে ছুটো এডিশন শেষ হয়ে গেছে, সত্যিই এমন বই অনেকদিন বাংলা সাহিত্যে বের হয়নি।

পুরস্কার পাবেই—সিনেমাতেও উঠবে। এমন করে প্রেমের গল্প অনেকদিন কেউ বলেনি। জীবনে প্রেম আসে, তা আবার হারিয়ে যায় সেইটাই চিরন্তন সত্য, কিন্তু সেই হারাণা প্রেম মনে যে স্মৃতি রেখে যায় তা শাশ্বত। উনি সেই চিরন্তন প্রেমের জয়গান গেয়েছেন। উপভাস কবিতা কাব্য সবই বলতে পারেন একে। এই তো সমালোচক বিধুশেখরবাবু লিখেছেন—

বাগ থেকে একটা দৈনিক কাগজের পৃষ্ঠা বের করে এগিয়ে দেন তিনি।

...শমিতা ইতিমধ্যে উঠে গেছে ভেতরে, চায়ের পেয়ালার প্লেটের শব্দ শোনা যাচ্ছে। ক্লান্ত পরিশ্রান্ত অলক, এসব কথা তার মাথায় ঢোকেনা। লোকটির দিকে চেয়ে থাকে। অনেক কষ্টে যেন তাকে সহ্য করছে সে। শমিতার কোন প্রেম কাহিনী নিয়ে এত প্রকাশ্য আলোচনা তার বিশ্রী লাগে। কণাটা কেমন আপত্তিজনকও।

শমিতা ইতিমধ্যে চা—কিছু সন্দেশও এনেছে। নিখিলবাবুর সামনে সেগুলো রেখে দিয়ে শমিতা বলে ওঠে—নিম্ন।

নিখিলবাবু খেতে খেতে বলে চলেছে অলককে।—পরশু সন্ধ্যায় একটা পার্টি দিচ্ছি, ফিলিমে উঠছে বইটা, পুরস্কারও পেয়েছে। ক’জন সাংবাদিক সাহিত্যিককেও ডাকবো। যদি আপনি দয়া করে আসেন।

শমিতার দিকে চাইল অলক। শমিতা স্বামীর দিকে চেয়ে আছে। মুখে-চোখে তার খুলীর আঁকা। শমিতাকে এত হাসি-খুশী অনেককাল দেখেনি সে।

শমিতাই বলে ওঠে—সময় করতে পারলে ইনিও যাবেন।

অলককে কোন জবাব দেবার অবকাশ দিল না শমিতা, যেন অলকের সব কিছুর ভার তার উপরই।

...বইখানা আজ পড়তে বসে অলক। নিখিলবাবুর কথাগুলো ভোলেনি সে। কেমন একটা কালো ছায়ার মত ওই কথাগুলো মনের নির্মল আকাশটুকুকে ঘিরে তুলেছে।

শমিতার কোন প্রেমের কাহিনী, শমিতা তার স্ত্রী, তার প্রেমের কাহিনী মন দিয়ে পড়ে চলেছে সে, এটা তার জানা দরকার।

রাজিকৃত জানে না, আজ অলক পড়ায় মন দেয়।
এতদিন যাকে কোন আমলই দেয়নি, আজ তাকে যেন
এড়াতে পারে না।

ক্রমশঃ বইএর মধ্যে ডুবে গেছে সে। শমিতা এগিয়ে
আলে।—কতো রাত হয়েছে, শোবেনা?

—উহঁ।

অলক মাথা নাড়ে, পাতার পর পাতা উল্টে যায়।
শমিতাও মনে মনে খুশী হয়েছে। এতদিন দেখেছে কাথ
নিয়েই বাস্তব থাকে অলক, কোনদিন খবরের কাগজ আর
মেডিক্যাল জার্নাল ছাড়া আর কিছু পড়েনি। আজ তার
বইখানা পড়তে দেখে খুশী হয়।

শমিতাকে তা হলে আজ অলকও স্বীকৃতি দিয়েছে,
এতদিন বাইরের অনেক লোকের মুখেই শুনেছে নানা
প্রশংসা, কিন্তু অলক বইখানা পড়েওনি। আজ সে
পড়ছে।

...এই পরিবেশ অলকের চেনা। সেদিন সেও এই
বাড়ীতে গিয়েছিল, সামনেই বাথানো বকুল গাছ—পিছনে
একটু বাগান, ছায়াঘন বকুল গাছের নীচে এমনি চাঁদনো
রাতে সেও বসেছিল, শমিতাকে সেদিন কি এক অল্প
দৃষ্টিতে দেখেছিল সে।

চেনেনি, জানেনি—শমিতা এই বকুল ছায়ায় ইতি-
পূর্বেও বসেছিল—সেদিনকার স্মৃতি ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল
ওর নীরব বেদনার সুরে।

কিন্তু আর একজনকে ঘিরে। অল্প কোনজনকে ঘিরে
শমিতার নারীমনের প্রথম মুকুল প্রস্ফুটিত হয়েছিল,
মনের আকাশ ভরে তুলেছিল আনন্দের সৌরভে মার্ককতার
স্বপ্নে।

কিন্তু সব সেই আয়োজন তাকে কেন্দ্র করে নয়।

সারা বই এর ছত্রে ছত্রে কি অসীম ব্যাকুলতা কুটে
উঠেছে—একটি হারানো মাহুঘের অন্তে। কে সে
জানে না অলক।

আজ মনে হয় শমিতার সব কিছুই কেমন অর্থপূর্ণ,
এতটা সে কোনদিনই ভাবেনি, আজ সব কথা তার এই
এড়িয়ে থাকার অর্থ পরিষ্কার হয়ে গেছে।

বারো বৎসর এক সঙ্গে বাস করেছে তারা, এক
মুগ্ধই বলা যায়; কিন্তু শমিতা তার অতীতের স্মৃতির

মাঝেই ডুবে রয়ে গেছে—মনে মনে অন্তর্যজনকে কামনা
করে এসেছে, স্বপ্ন দেখেছে সেই হারানো মাহুঘটিকে,
তাই এড়িয়ে গেছে অলককে।

রাত হয়ে গেছে, নিশ্চক্ তারাকিনী রাজি। রাতের
বাতাস হু হু ঝড় তুলেছে গাছগাছালির মাথায়, ওরই
সংক্রমণ লেগেছে অলকের মনে। আজ জীবনের অনেক
পথ সহজভাবেই এসেছে—ভাবেনি সেই পথের নীচে
এতবড় ফাঁক আর ফাঁকি রয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ সেটা
ধরা পড়তে সে চমকে উঠেছে।

এতদিনের বিশ্বাসের কোন মূল্য নেই। সব ক্রীতি
প্রেম ভালবাসা নিছক অভিনয় মাত্র।

ওদিকের বিছানায় শমিতা নিশ্চিন্তে ঘুমচ্ছে—ঘুমের
স্তব্ধতায় তার মুখে একটা প্রগাঢ় শান্তি ফুটে উঠেছে।
অলকের মনে হয় ও কোন রহস্যময়ী রাজি, অন্ধকারে
ঢেকে রেখেছে নিজের সব কিছু। ওকে চেনা যায় না—
ধরা যায় না।

দূর আকাশে তারার মতই রহস্যময়ী, অধরা সে।

...ওকে নিয়েই এতদিন বাস করে এসেছে, স্বপ্ন দেখেছে
মনে, নানা রংএর স্বপ্নাঙ্গ বুনেছে।

নিজের কাষে মন দেবার চেষ্টা করে অলক।

কোথায় একটা প্রস্ন বরং তার মনে জেগে
উঠেছে, কীটার মত বিধেছে খচ-খচ করে। শমিতা চায়ের
টেবিলে বসে টোটে মাখন মাথাতে মাথাতে বলে ওঠে—

—আজ সন্ধ্যায় তাহলে যাচ্ছে।?

অলক কথাটা তুলেই গিয়েছিল, ওর দিকে চেয়ে
থাকে, শমিতাই বলে।

—এত করে বলে গেলেন ভদ্রলোক, গেলে খুশী হবেন,
অনেকেই আসবেন। আজ অলকও মনে মনে যেতে চায়।

সেও যেন দেখতে চায় অনেকের মধ্যে শমিতার সেই
হারানো মাহুঘটি আছে কিনা।

এসব অস্থানে কোনদিন আসেনি অলক। তার
নিজের পরিচয়ে এখানে সে আমন্ত্রিত নয়, এসেছে শমিতার
পরিচয়ে।

অনেক অধ্যাপক সমালোচক সাহিত্যিক বোঝা
পাঠক পাঠিকারা এসেছেন, অলক ওদের কথাবার্তা, দর্শন
আর আলোচনার বিরক্তি বোধ করে।

শমিতা ওদিকে কোন সাহিত্যিকের সঙ্গে কথা বলছে, একজন অধ্যাপক কাম্ কলা-সমালোচক ওকে কি একটা সাহিত্যের সমস্যা নিয়ে বোঝাতে চাইছে। দর্শনের অধ্যাপক বোধ হয়।

তাই প্লেটো—এরিলাস থেকে শোপেনহাওয়ারের নেতিবাচক দর্শনের তত্ত্ব নিয়ে পড়েছে, বর্তমান সাহিত্যে শোপেনহাওয়ারের প্রভাব যে অপরিমীম তাই প্রমাণ করতে তিনি বন্ধপরিকর, এই নেতিবাচক পরিবেশে শমিতাদেবীর বই যে একটা বিস্ময়, এর মাঝে প্রতিটি ছত্রে যে প্রাণের সত্যকার আবেগ ধনিত হয়েছে—তাই বলতে চান তিনি।

অলক ঘড়ির দিকে চাইল। রাত হয়ে গেছে। শমিতার কাছে পৌছাবার উপায় নেই, অনেকেই ওকে ঘিরে রয়েছে।—অপরিচিতের মত এককোণে দাঁড়িয়ে আছে অলক। এখানে যেন সে রবাহৃত। এতগুলো রোগী আজ ফিরে যাবে, হাসপাতালে একটা অকরুণ কাণ্ড আছে।

দু'একজন মহিলা গুর দিকে চেয়ে কি বলাবলি করছে, হাসছে! অলক চমকে ওঠে। এই অর্থপূর্ণ হাসির অর্থ সে জানে, যেন ব্যঙ্গ করছে ওরা তাকে।

কোন বক্তা তখন শমিতাদেবী প্রেমের যে শাস্ত্র সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তারই বর্ণনা করে চলেছে। প্রেম মাহুকের জীর্ণে আসে—সেই প্রেম মাহুকে সার্থক করে তোলে।

...অলক বের হয়ে এল ভিড় থেকে, মেয়েদের অর্থপূর্ণ হাসিটা তখনও চোখের সামনে ভেসে ওঠে; এখানে এসে সে ভুলই করেছিল। এখানে তাকে সম্মান করবার কেউ নেই, সে এখানে অপরিচিত অনাহৃত।

রাগে—অপমানে আজ অলকের মন বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে।

শমিতা এখানে এসে একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে; তাকে ঘিরেই সব আয়োজন, নিজেও জানে না এসবের যোগ্য কিনা।

লেখাটায় হাত দিয়েছিল নেহাৎ সময় কাটাবার জন্তাই। একা একা বিত্রী লাগলো, কি খেয়াল বশে সে চেষ্টা করেছিল লিখতে।

...নিজের অতীত পরিবেশ—আর চেনাআনা মাহু-গুলোকে এনে উপস্থাপনের মধ্যে হাজির করেছিল; সেই বই যে রাতারাতি তাকে এত খ্যাতি পরিচিতি এনে দেবে ভাবেনি। সকলেই জিজ্ঞাসা করছে—নোতুন কি লিখছেন? প্রকাশক নিখিলবাবু তো এখন থেকেই কপির জন্তু ত্যাগ দিচ্ছেন। হিতবাণী পত্রিকার সম্পাদক লেখার জন্তু বুলো-বুলি, তার মাঝে ওই সভায় তার মানপত্র কে পাঠ করে চলেছে; কেমন যেন হারিয়ে যায় শমিতা নোতুন কোন জগতের ভিড়ে। নিঃসঙ্গ জীবনের ঘেরাটোপ থেকে সে এসে পৌঁচেছে একেবারে হাটের মাঝে, আলোর চোখ ধাঁধিয়ে গেছে—হারিয়ে গেছে ভিড়ে—তার ভাষা শুক হয়ে গেছে হাজারো কণ্ঠের কলরবে।

...অভিনন্দনপর্ব শেষ হতে হঠাৎ শমিতার মনে পড়ে অলকের কথা, কোন কর্মকর্তাদের হাতে ওকে নুঁপে দিয়ে সে ডায়ালিসিসে গিয়ে উঠেছিল, সে কর্মকর্তাকেও ঠিক খুঁজে বের করতে পারে না।

অলকও নেই। এদিক ওদিক খুঁজতে পায় না। চলে গেছে। সেই প্রকাশক ভদ্রলোকই গাড়ীতে করে ওকে পৌঁছে দিচ্ছে বাড়ীতে।

রাত হয়ে গেছে। নির্জন পথে চাঁদের আলো পড়েছে। শুক হয়ে বসে আছে শমিতা।

অলকের সামনে নিজেকে আজ অপরাধী মনে করে শমিতা। মনটা খুলীতে ভরপুর। হাতে এক গাছা রজনী গন্ধার সুবক, ম্লান স্মৃতি ওঠে ওর থেকে।

...অলক ওকে গাড়ী থেকে নামতে দেখে চাইল মাত্র, ভদ্রলোক ওকে নামিয়ে দিয়ে হাত নেড়ে বের হয়ে গেল, শমিতার মুখে হাসি ফুটে ওঠে। অলক চাঁদের আলোর গুর দিকে চেয়ে আছে। এই লাস্তময়ী শমিতাকে হঠাৎ সে বারো বছর পূর নোতুন করে দেখছে।

—চলে এলে যে?

শমিতাই অভিযোগটা করে তার কাছে। অলক বলে ওঠে—দেখলাম ওখানে আমাকে কেউ চায় না। তাই চলে এলাম।

শমিতার মুখ-চোখে একটা পরিবর্তন ফুটে ওঠে। অলক বলে চলেছে—তোমার জগৎ তোমারই থাক।

—তাই বলে রাতের বেলায় একা ফেলে রেখে চলে এলে?

অলক বিরক্তি বোধ করে ওর কথায়। দেখেছে সেখানে ওর স্বাক্ষরের ভিড়, বলে ওঠে—তোমাকে পৌছে দেবার লোকের অভাব হবেনা তা জানতাম।

তুমিও চাওনা যে আমি ওখানে থাকি।

—মানে! শমিতা চমকে ওঠে ওর কথায়।

অলক কথার জবাব দিল না। উঠে পড়ে।—রাত হয়েছে। কাল আবার সারাদিন কায করতে হবে। শুভ নাইট।

অলক এগিয়ে গেল ঘরের দিকে। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে শমিতা, হাতের ফুলগুলো কেমন ভারি ঠেকে। অলকের মুখে-চোখে আজ কি নোহুন একটা পরিবর্তন দেখে চমকে উঠেছে সে। কি বলতে চেয়েছিল কিন্তু বলেনি।

শমিতার রাতে ঘুম আসে না। ছোটো পাশাপাশি ঘর—মধ্যে একটা দরজা, সেইটাই আজ ব্যবধান রচনা করেছে। শমিতা অবাক হয়, যেদিন সে ছিল অপরিচিত কেউ তাকে চিনতো না, সেদিন অলকও তাকে অবজ্ঞার ফেলে রেখেছিল ঘরের কোণে, আজ বাইরের জগতে তার ডাক শুনেও সে কেমন স্বার্থপর হয়ে উঠেছে। হয়তো মনে মনে হিংসা করে শমিতাকে। না হয় আরও কিছু ভাবে। এ প্রশ্নের সম্মুখীন হয়নি সে কোনদিনই।

অলক জানলার দিকে চেয়ে আছে—ঘুমের প্রশান্তি আজ চোখে নামেনি। অশুপতি তারার মাঝে নীল প্রব-তারটা জলছে কি অসীম বেদনায়।

আজ মনে হয় অলকের জীবনের একটা দিককে অবহেলা করেছিল, সেই অবহেলিত দিকটাই তার অজ্ঞাতে এতবড় আঘাত হানবে জানতো না। স্বপ্নেও ভাবেনি অলক।

ওই ভদ্রলোককে ঠিক চিনতে পারেনি। মনে হয় ও যেন শমিতার অনেক দিনের চেনা। ওই ওকে লেখার ব্যাপারে উৎসাহিত করেছে, নিজেই প্রকাশ করেছে ওর বই।

অতীতে একদিন কোন যোগাযোগে পরিচয় ছিল ছদ্মনামে তাকে আজও ভোলেনি তারা। ছদ্মনামেই তাই ঘনিষ্ঠত্ব হয়ে উঠেছে এই লেখার ব্যাপারে।

মাননীকে আজ লেখিকার মর্যাদা দিয়ে নিখিল অতীতের সেই স্বপ্নস্বৃতিকে সার্থক করে তুলতে চায়। পেরেছেও।

অলককে তাই আজ অবজ্ঞা করে শমিতা, ডেকে নিয়ে গিয়ে প্রকাশ্যে আজ তাকে বোঝাতে চেয়েছে তারও একটা মর্যাদা আছে, প্রতিষ্ঠা আছে।

যাকে সে এতদিন অগ্রহণা করেছে সে সেই আঘাত বেদনা আজ ফিরিয়ে দিয়েছে তাকে। রাত কত জানেনা—জানলা দিয়ে হু হু হাওয়া আসে—মনের মাঝে সেই ঝড়টা কেমন স্তব্ধ হয়ে আসছে।

সকালে চেয়ারে বের হওয়ার আগেই একজন ভদ্র-লোককে আসতে দেখে বেয়ারা তাকে থবর দেয়। কোন রোগীই হবে বোধ হয়।

অলকের মনটা এমনিতেই ভাল নেই। কাল রাত্রেই সেই ঘটনাটা মনে একটা নীরব জ্বালায় তীব্রতা এনেছে। তবু কায তাকে করতে হয়। অভ্যাসবশতঃই বের হয়েছে সে।

সামনেই ভদ্রলোককে দেখে থামল।

—আমি শমিতা দেবীর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

অলক স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল। মুখে-চোখে একটা কাঠিন্য ফুটে ওঠে। চারিদিক থেকে একজনের জ্ঞানই সাড়া পড়ে গেছে। অনেক কষ্টেই ভদ্রতার মুখোশ বজায় রেখে জবাব দেয়—

বেয়ারা ডেকে দিচ্ছে আপনি বসুন।

অলক আর দাঁড়াল না, বের হয়ে গাড়ীতে উঠে চলে গেল। শমিতা বার বার তার মনের সব শাস্তি—তার বাড়ীর সমস্টুকুও বিপন্ন করে তুলেছে।

ঘরে-বাইরে অলক ক্রমশঃ নিজেই যেন অসহায় হাশাস্পদ বলে মনে করে। শমিতা রাতারাতি তাকে সামাজিক মর্যাদার আসন থেকে টেনে নামিয়ে নিজেই সেখানে উঠে বসেছে।

কি মূল্য দিতে হয়েছে এর জ্ঞান তা জানে না শমিতা। আজ সেও বুঝেছে অলকের মনের অবস্থা।

প্রকাশকরা অনেকেই আসছেন, কিন্তু শমিতা কাউকে কোন কথা বলেনি। সে বুঝতে পারছে না কি করবে।

...দুপুরে খেতে আসে অলক, বহুদিন পর আজ তার ব্যতিক্রম ঘটেছে। ফোন করে খবরটা তবু দেয়।

...শমিতাই ধরেছিল ফোনটা।

দুপুরের নির্জনতার মাঝে কথাটা বার বার ভেবেছে সে। আজ একদিকে কর্মব্যস্ত স্বামী—তার সংসার—পরিচয়, অগ্নিদিকে তার নিজের লেখার প্রতিষ্ঠা। দুটোর মাঝখানে আপোষের কোন আশাই কি নেই? ভেবেও পথ পায় না সে। সমস্ত সংসারের বিরুদ্ধে মাথা তোলার ক্ষমতা নেই, এটাকে অগ্রাহ্য করতে পারে না সে।

অলকের মনের প্রশ্নটাও জানে না সে, তার জবাব দিতে পারতো, ফোনটা বেজে ওঠে। অলক বলে চলেছে হাসপাতাল থেকে।—আজ যেতে পারছি না, তুমি লাক্ষ্মী নিয়ে নিও।

প্রাণহীন কণ্ঠস্বর। শমিতা মনে মনে যে আপোষের স্বর খুঁজেছিল—একটা আঘাতেই তা খেন স্তব্ধ হয়ে গেছে।

কথা জোগায় না মুখে। হঠাৎ যেন প্রতিবাদ করে ওঠে শমিতা। ...শুনছ! না—না!

...ওদিকে লাইনটা তখন স্তব্ধ হয়ে গেছে। ওর কোন কথাই শুনতে পেলনা অলক।

বৈকালের আলো বাগানের গাছের মাথায় বিবর্ণতা এনেছে। পাখীগুলো ফিরে আসছে বাসায়, শমিতা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এ ভাবনার শেষ নেই। অলকের মনের বেসুর আজ তাকেও বিচলিত করে তুলেছে। এভাবে বাঁচতে সে চায়নি, এতদিন অবহেলা সয়ে এসেছে। সয়েছে তার মনের বেদনাদায়ক নিঃসঙ্গতা, নির্জনতা। তবু প্রতিবাদ করেনি সে।

...আজ অলক তাকে ভুল বুঝবে এটা কল্পনাই করেনি সে।

অলক কাশ করার অসুপ্তেরণা আজ পায়নি। নিজের জীবনের নিদারুণ বার্থতা আজ তাকে মনে মনে হুঁতল করে তুলেছে। রোগীর ভিড় বেড়ে ওঠে।

বেয়ারাকে বলে দেয়,—

আজ ওদের আসতে বলো।

বেয়ারা অবাক হয়ে চাইল ডাক্তারবাবুর দিকে। এতকাল সে দেখছে ডাক্তারবাবুকে, কোনদিন কাষে ফাঁকি

দিতে দেখেনি। শরীর খারাপ নিয়েও চেয়ারে এসেছে ইতিপূর্বে। অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সে।

—সাব!

অলক ওর কথায় বিরক্ত হয়। বলে ওঠে

—বললাম তো! জানিয়ে দাও ওদের।

...সুইং ডোরটা আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে আসে। কি ভাবছে অলক। রোগীরা ফিরে গেছে। স্তব্ধতা নেমেছে ঘরখানায়।

...আনমনে কি ভাবছে।

...শমিতার কথাই মনে আসে। আজ থেকে বারো বৎসর আগেকার কথা, সেদিন শমিতাকে চেনেনি। ভুলই করেছিল।

অগ্নমন, তবু রূপণের মত যা কিছু সঞ্চয় তাই নিয়েই বাঁচতে চায়; সে বলে—অতীতের ঘটনা অতীতই থাক। আজ সব ক্ষমায় প্রেমে তাকে আপন করে নিয়েই বাঁচতে হবে।

কিন্তু তবু মন মানে না। সারা সমাজ যেন তার দিকে চেয়ে হাসছে, যাকে আপনতম বলে জেনে সব বিশ্বাস ভাল-বাসা সে উজাড় করে দিয়েছে, সে যে এতবড় একটা বঞ্চনা তা ভাবতেই পারে না।

অলক মুক্তির পথ জানে না।

কদিনেই অসুভব করেছে দমবন্ধ হয়ে আসছে, এখান থেকে মুক্তির আশা খোঁজে সে। তার জগৎ; এই কাষ নিয়েই বাঁচতে চায় সেখানে কোন আপোষ নেই।

আজ দুজনেই তারা যেন সহজ পথ চলতে চলতে এসে একটা অতলস্পর্শী খাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

এ পথ আর এগোয়নি—এইখানে ওই অতল খাদের মুখে এসে থেমে গেছে।

...হঠাৎ ফোনটা বেজে ওঠে!

বিরক্ত হয়ে ওঠে অলক, কোন রোগীই হবে বোধ হয়, দিনরাত রোগ আর রোগী, তার জগতে হুঁহু মাহুঁহুয়ের ঠাঁই নেই। মনের সব কি পঙ্কিল কদর্যতা মাথা ঠেলে উঠেছে এখানের চারিদিকে। ...ফোনটা ধরে বিরক্তি ভরে।

বাড়ী থেকে সরকার কোন করছে। শমিতা হঠাৎ কেমন অস্থির হয়ে পড়েছে। একটু বাড়াবাড়িই।

...কেমন চমকে ওঠে অলক! মুক্তি! ...মনের মাঝে

একটা সাড়া যেন জেগে ওঠে। প্রায়ই দেখেছে এমন ঘটে। অতিমাত্রায় স্পর্শকাতর শিল্পীমন সামান্যতম অবহেলা আর অপমানে একটা সাংঘাতিক কিছু বাধিয়ে বসে। নিজের জীবনটুকুকে পর্যন্ত তারা শেষ করে দিতে বিধা করে না।

—কি হয়েছে?

সরকার এসব বিশেষ কিছুই বলতে পারে না। শুধু তার ব্যাকুল কণ্ঠস্বর শোনা যায়—ঠিক বুঝতে পারছি না। আপনি একবার এখুনি আসুন।

কেমন যেন নিজেও ঠিক করতে পারেনা অলক।... কে জানে কি কাণ্ড ঘটে গেছে। শমিতার মুখে বেদনায় কালো ছায়া তার দৃষ্টি এড়াইনি। এমন একটা সাংঘাতিক কিছু ঘটানোর অজ্ঞ সেও তৈরী হতে পারে।

বের হয়ে পড়ল অলক। ডাঃ করকেও সঙ্গে নেয়। কে জানে যদি তেমন কিছু হয় তাহলেও সাহায্য করতে পারবে। একটা ভয় জাগে একটা আনন্দের মুক্তির

আভাসও মনে আসে। একটা সমস্তার সমাধান হবে অলকের।

...রাত নামছে।

চাঁদের আলো ঢাকা রাত, পাখী-ডাকা এই আলো-আধারির রাজ্যে বেগে উঠেছে বকুলগন্ধ। বিছানার উপর একফালি চাঁদের আলো এসে পড়েছে শমিতার পাণ্ডুর বিবর্ণ মুখে।

আজ একটা শান্ত্রী ছড়িয়ে আছে ওকে ঘিরে, অলক চূপ করে বসে আছে—ওর হাতটা শমিতার হাতে। সারা ঘরে একটা প্রশান্তি নেমেছে।

প্রশান্তি নেমেছে ওদের মনে।

...পূর্ণতার প্রশান্তি।

শমিতা মা হতে চলেছে। ওদের শৃঙ্গ ঘর—শৃঙ্গ মন তাই পূর্ণতার আবেশে মধুময় হয়ে উঠেছে। কোথায় ডাকছে রাতঘাগা একটা পাখী। ওর ডাকটা ছড়িয়ে পড়েছে আলো-আধারি ঢাকা আকাশ বাতাসে।

বন্দনা

মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

নমামি ভারত জননী আমার,
নমামি নিখিল নন্দিতা।
নমামি অচল জলধি কস্তা,
স্বয়ং নর চির বন্দিতা ॥

শিয়রে তোমার
গিরি হিমালয়,
তরুণ অরুণ কিরণ দীপ্ত।
অমল ধবল তুষার কিরীট,
সিদ্ধ তত্ত্ব সচিতা লিপ্ত।
পহতলে তব কস্তা-কুমারী,
চির কলৌল ছন্দিতা ॥

গগনে গগনে শত গ্রহতারা,
গাহিছে তোমার কীৰ্ত্তি গান
শস্ত্র শ্রামলা, তুমি মা কমলা,
দশ ভুজের কর অন্নদান ॥
পিক কুহরিত বন উপবন,
বিকশিত ফুল গন্ধিতা ॥

কৃচ্ছ সাধনে নহ মা ক্লান্ত,
শত্রু শাসনে অকুতোভয়।
বিতরি' জগতে শান্তি-মন্ত্র,
বিশ্ব হৃদয় করিলে জয়।
নমো নমো নমঃ জগজ্জননী,
নিখিল বিশ্ব বন্দিতা ॥

...দুপুরে খেতে আসে অলক, বহুদিন পর আজ তার ব্যতিক্রম ঘটেছে। ফোন করে খবরটা তবু দেয়।

...শমিতাই ধরেছিল ফোনটা।

দুপুরের নির্জনতার মাঝে কথাটা বার বার ভেবেছে সে। আজ একদিকে কর্মব্যস্ত স্বামী—তার সংসার—পরিচয়, অগ্নাদিকে তার নিজের লেখার প্রতিষ্ঠা। দুটোর মাঝখানে আপোষের কোন আশাই কি নেই? ভেবেও পথ পায় না সে। সমস্ত সংস্কারের বিরুদ্ধে মাথা তোলার ক্ষমতা নেই, এটাকে অগ্রাহ্য করতে পারে না সে।

অলকের মনের প্রশ্নটাও জানে না সে, তার জবাব দিতে পারতো, ফোনটা বেজে ওঠে। অলক বলে চলেছে হাসপাতাল থেকে।—আজ যেতে পারছি না, তুমি লাঞ্চ খেয়ে নিও।

প্রাণহীন কণ্ঠস্বর। শমিতা মনে মনে যে আপোষের স্বর খুঁজেছিল—একটা আঘাতেই তা যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে।

কথা জোগায় না মুখে। হঠাৎ যেন প্রতিবাদ করে ওঠে শমিতা। ...শুনছ! না—না!

...ওদিকে লাইনটা তখন স্তব্ধ হয়ে গেছে। ওর কোন কথাই শুনতে পেলনা অলক।

বৈকালের আলো বাগানের গাছের মাথায় বিবর্ণতা এনেছে। পাখীগুলো ফিরে আসছে বাসায়, শমিতা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এ ভাবনার শেষ নেই। অলকের মনের বেস্বর আজ তাকেও বিচলিত করে তুলেছে। এভাবে বাঁচতে সে চায়নি, এতদিন অবহেলা সয়ে এসেছে। সয়েছে তার মনের বেদনাদায়ক নিঃসঙ্গতা, নির্জনতা। তবু প্রতিবাদ করেনি সে।

...আজ অলক তাকে ভুল বুঝবে এটা কল্পনাই করেনি সে।

অলক কাষ করার অল্পপ্রেরণা আজ পায়নি। নিজের জীবনের নিদারুণ বার্থতা আজ তাকে মনে মনে হ্রস্ব করে তুলেছে। রোগীর ভিড় বেড়ে ওঠে।

বেয়ারাকে বলে দেয়,—

আজ ওদের আসতে বেলো।

বেয়ারা অবাক হয়ে চাইল ডাক্তারবাবুর দিকে। এতকাল সে দেখছে ডাক্তারবাবুকে, কোনদিন কাষে ফাঁকি

দিতে দেখেনি। শরীর খারাপ নিয়েও চেয়ারে এসেছে ইতিপূর্বে। অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সে।

—সাব!

অলক ওর কথায় বিরক্ত হয়। বলে ওঠে

—বললাম তো! জানিয়ে দাও ওদের।

...সুইং ডোরটা আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে আসে। কি ভাবছে অলক। রোগীরা ফিরে গেছে। স্তব্ধতা নেমেছে ঘরখানায়।

...আনমনে কি ভাবছে।

...শমিতার কথাই মনে আসে। আজ থেকে বারো বৎসর আগেকার কথা, সেদিন শমিতাকে চেনেনি। ভুলই করেছিল।

অগ্নমন, তবু রূপণের মত যা কিছু সঞ্চয় তাই নিয়েই বাঁচতে চায়; সে বলে—অতীতের ঘটনা অতীতই থাক। আজ সব ক্ষমায় প্রেমে তাকে আপন করে নিয়েই বাঁচতে হবে।

কিন্তু তবু মন মানেন না। সারা সমাজ যেন তার দিকে চেয়ে হাসছে, যাকে আপনতম বলে জেনে সব বিশ্বাস ভালবাসা সে উজাড় করে দিয়েছে, সে যে এতবড় একটা বঞ্চনা তা ভাবতেই পারে না।

অলক মুক্তির পথ জানে না।

কদিনেই অল্পভব করেছে দমবন্ধ হয়ে আসছে, এখান থেকে মুক্তির আশা খোঁজে সে। তার জগৎ; এই কাষ নিয়েই বাঁচতে চায় সেখানে কোন আপোষ নেই।

আজ দুজনেই তারা যেন সহজ পথ চলতে চলতে এসে একটা অতলস্পর্শী খাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

এ পথ আর এগোয়নি—এইখানে ওই অতল খাঁড়ের মুখে এসে থেমে গেছে।

...হঠাৎ ফোনটা বেজে ওঠে!

বিরক্ত হয়ে ওঠে অলক, কোন রোগীই হবে বোধ হয়, দিনরাত রোগ আর রোগী, তার জগতে স্বস্থ মানুষের ঠাই নেই। মনের সব কি পঙ্কিল কদর্যতা মাথা তেলে উঠেছে এখানের চারিদিকে। ...ফোনটা ধরে বিরক্তি ভরে।

বাড়ী থেকে সরকার ফোন করছে। শমিতা হঠাৎ কেমন অস্থস্থ হয়ে পড়েছে। একটু বাড়ীবাড়ীই।

...কেমন চমকে ওঠে অলক। মুক্তি! ...মনের মাঝে

একটা লাড়া ঘেন্নে জেগে ওঠে। প্রায়ই দেখেছে এমন ঘটে। অতিমাত্রায় স্পর্শকাতর শিল্পীময় সামান্যতম অবহেলা আর অপমানে একটা সাংঘাতিক কিছু বাধিয়ে বসে। নিজের জীবনটুকুকে পর্যন্ত তারা শেষ করে দিতে দ্বিধা করে না।

—কি হয়েছে?

সরকার এসব বিশেষ কিছুই বলতে পারে না। শুধু তার ব্যাকুল কণ্ঠস্বর শোনা যায়—ঠিক বুঝতে পারছি না। আপনি একবার এখুনি আসুন।

কেমন যেন নিজেও ঠিক করতে পারেনা অলক।... কে জানে কি কাণ্ড ঘটে গেছে। শমিতার মুখে বেদনায় কালো ছায়া তার দৃষ্টি এড়ায়নি। এমন একটা সাংঘাতিক কিছু ঘটানোর জন্ত সেও তৈরী হতে পারে।

বের হয়ে পড়ল অলক। ভাঃ করকেও সঙ্গে নেয়! কে জানে যদি হেমন কিছু হয় তাহলেও সাহায্য করতে পারবে। একটা ভয় জাগে একটা আনন্দের মুক্তির

আভাসও মনে আসে। একটা সমস্তার সমাধান হবে অলকের।

...রাত নামছে।

টানের আলো ঢাকা রাত, পাখী-ডাকা এই আলো-আধারির রাজ্যে জেগে উঠেছে বহুগলক। বিছানার উপর একফালি টানের আলো এসে পড়েছে শমিতার পাণ্ডুর বিবর্ণ মুখে।

আজ একটা শান্ত্রী ছড়িয়ে আছে ওকে ঘিরে, অলক চুপ করে বসে আছে—ওর হাতটা শমিতার হাতে। সারা ঘরে একটা প্রশান্তি নেমেছে।

প্রশান্তি নেমেছে ওদের মনে।

...পূর্ণতার প্রশান্তি।

শমিতা মা হতে চলেছে। ওদের শূণ্য ঘর—শূণ্য মন। তাই পূর্ণতার আবেশে মধুময় হয়ে উঠেছে। কোথায় ডাকছে রাতজাগা একটা পাখী। ওর ডাকটা ছড়িয়ে পড়েছে আলো-আধারি ঢাকা আকাশ বাতাসে।

বন্দনা

মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

নমামি ভারত জননী আমার,

নমামি নিখিল নন্দিতা।

নমামি অচল জলধি কন্যা,

স্বর নর চির বন্দিতা ॥

শিয়রে তোমার

গিরি হিমালয়,

তরুণ অরুণ কিরণ দীপ্ত।

অমল ধবল তুষার কিরীট,

স্বিষ্ট স্তল সচিতা লিপ্ত।

পদতলে তব কন্যা-কুমারী,

চির কমলোৎসব নন্দিতা ॥

গগনে গগনে শত গ্রহতারি,

গাহিছে তোমার কৌন্তি গান

শশু শ্রামলা, তুমি মা কয়লা,

দশ ভূপ্তে কর অন্নদান ॥

পিক কুহরিত বন উপবন,

বিকশিত ফুল গন্ধিতা ॥

কৃচ্ছ সাধনে নহ মা ক্লান্ত,

শত্রু শাসনে অকুতোভয়।

বিতরি' জগতে শান্তি-ময়,

বিশ্ব স্বয়ং করিলে জয়।

নমো নমো নমঃ জগজ্জননী,

নিখিল বিশ্ব বন্দিতা ॥

বাংলা দেশে শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব বা তিরোভাব-উৎসবের কথা খুব কমই শোনা যায়। জন্মশতবার্ষিকীর ত কথাই নাই। প্রধান কারণ বোধ হয় তাঁর জন্মবর্ষ বা জন্ম-মৃত্যুর তারিখের সঠিক নির্ধারণ আজও হয়নি। অথচ তাঁর রচিত “মোহনুদগরে”র প্রথম কয়েকটি শ্লোক অন্নবিস্তর সকলেরই জানা আছে। পণ্ডিতেরা ইংরাজী সপ্তম হইতে নবম শতাব্দীর মধ্যে তাঁহার ৩২ বৎসর ব্যাপী কার্য্যকাল স্থির করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন ইং ৭৮৮তে জন্ম, ৮২০ খ্রীষ্টাব্দে শেষ।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মানবের উদ্ধারের জন্ত গীতায় জ্ঞানপথ, কর্মপথ ও ভক্তিপথের নির্দেশ দিয়া তিনেরই সামঞ্জস্য বিধান করিয়া যান। দুর্বল মানব সে শিক্ষাধারণ করিতে পারে নাই—ক্রমশঃ নানা ধর্মশিক্ষকের ধর্মশিক্ষা মানব চরিত্রের বিকৃতি অল্পস্বারে বিকৃত হইয়া পড়ে—আচার ও কুসংস্কার সমাজ দেহে ক্ষত উৎপন্ন করিয়া ধর্মকে কেবল জীবঘাতী যাগযজ্ঞে পরিণত করিল। তখন শ্রীবুদ্ধদেব (আবির্ভাব ইং ৫৫৯ খৃষ্টপূর্বাব্দে) আবির্ভূত হইয়া এই শোচনীয় অবস্থার পরিবর্তন করেন। কিন্তু দৈবরতন বিষয়ে তাঁহার নীরবতার জন্ত ও অজ্ঞাত কারণে তাঁহার পরবর্তী বৌদ্ধ-যাজকেরা বহুলাংশে স্বার্থ প্রণোদিত হইয়া ঘোরতর নিরীশ্বরত্ব ও জড়ত্ব, চরিত্রহীনতা ও নির্মমতার আতিশয্যে হিন্দুসমাজকে ধ্বংসের পথে লইয়া গেলে ভারতের সৌভাগ্যক্রমে ‘মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য আবির্ভূত হইয়া জ্ঞানপথের সহজ সরল আবেগময়ী ভাষায় ব্যাখ্যার দ্বারা বৌদ্ধধর্মের জড়ত্ব ঘুচাইয়া উহাকে তাঁহার সার্বভৌম জ্ঞানবাদে বিলীন করেন।

দক্ষিণভারতের কেরলে ত্রিবান্দুর জেলার পূর্ণা-নদী-তীরে অবস্থিত কলাদী নামক একটি ক্ষুদ্রগ্রামে এক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ বংশে তাঁর জন্ম হয়। পিতা শিবগুরু, মাতা বিশিষ্টা। তিন বৎসর বয়সে পিতাকে হারাইয়া শঙ্কর মাতার মেহনীড়ে থাকিয়া দেবাদিদেব মহাদেবের কৃপালাভ

করিয়া শৈশবে জিজ্ঞাসু মন লইয়া শাস্ত্রপাঠ নিবিষ্ট হন। অল্পদিনের মধ্যেই ধর্মশাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া উঠেন। সংসারে আশক্তির পরিবর্তে দারুণ অনাসক্তি ও বৈরাগ্য তাঁহাকে সন্ন্যাসের দিকে প্রভাবিত করিল; মাতা কিন্তু সর্বদা তাঁহাকে ঐ পথ হইতে নিবৃত্ত হইতে বলিতেন এবং শাস্ত্রজ্ঞ ও কিশোর সুদর্শন পুত্রের বিবাহের চেষ্টায় বিফল হইয়া তাহার মঙ্গলার্থে নিবিড়ভাবে মহাদেবের শরণ লইলেন। একদিন শঙ্কর মাতার সহিত নদীতে স্নান করিতে গিয়া কুমীরের দ্বারা আক্রান্ত হন; মাতার আর্তনাদ শুনিয়া শঙ্কর বলিলেন—কে যেন আমার সাহস দিতেছে, যা যদি আমার সন্ন্যাসী হইবার অহুমতি দেন, তিনি রক্ষা পাইবেন। মাতা তৎক্ষণাৎ অহুমতি দিলে শঙ্কর অক্ষতগেহে তাঁহার কোলে আসিল। এইবার সন্ন্যাস গ্রহণে আর কোন বাধা রহিল না—কিছু পরে গোবিন্দ আচার্য্য নামক এক শিবভক্ত সন্ন্যাসীর নিকট যোগ শিক্ষা করিয়া কঠোর সেবা দ্বারা ব্রহ্ম-জ্ঞানোপদেশ প্রাপ্ত হন। গুরুর আদেশে এই লব্ধবিশ্বা কাশীধামে গিয়া সম্পূর্ণ করিয়া তীর্থে তীর্থে শাস্ত্রব্যাক্যসমূহের প্রকৃত তাৎপর্য্য প্রচার করিতে উদ্যোগী হইলেন। স্নান সারিয়া একদিন কাশীর গঙ্গাতটে এক চণ্ডাল কর্তৃক তাঁহার গতি অবরুদ্ধ হওয়ায় তাহাকে তিরস্কারের উত্তরে তাহার নিকট অনেক বৈদান্তিক তথ্যের সন্ধান পাইয়া মুগ্ধবিশ্বয়ে নিজের ক্ষুদ্রতা ও শিক্ষার ক্রটি বুঝিতে পারিলেন। এইভাবে তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান সম্পূর্ণ হইল।

কাশী পরিক্রমায় একদিন তাঁহার ১৪ জন শিষ্য লইয়া এক বিশিষ্ট পণ্ডিতের গৃহের পাশে দাঁড়াইয়া তিনিতে পাইলেন, বৃদ্ধ পণ্ডিত মহাশয় ব্যাকরণের সূত্রগুলি উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করিতেছেন। শুনিয়াই তাঁহার মনে হইল, পণ্ডিতজী শ্রীভগবান গোবিন্দের কথা চিন্তা না করিয়া বৃথা ব্যাকরণের সূত্র মুখস্থ করিতেছেন।—কথিত আছে, তৎক্ষণাৎ তাঁহার শ্রীমুখ হইতে নির্গত হইল—

“ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং

ভজ গোবিন্দং মৃতমতে ।

সংপ্রাপ্তে সন্নিহিতে কালে

নহি নহি রক্ষতি হৃকৃৎ করণে ॥

[হৃকৃৎ করণে = ব্যাকরণ স্বয়ং]

এইখানে “মোহমুগ্ধের”র জন্ম হইল ।

ওই শ্লোকটির পরবর্তী দ্বাদশটি শ্লোক মহাত্মা শঙ্কর মুখে মুখে রচনা করেন । মূল শ্লোকটির শেষের লাইন ধুয়া করিয়া পরবর্তী শ্লোকগুলিকে বলা হয় “দ্বাদশ মঞ্জরিকা স্তোত্রম্”; প্রথমটি বহুজন বিদিত—

“মৃত জহীহি ধনাগমতৃষ্ণাং

কুরু সত্বৃদ্ধিঃ মনসি বিতৃষ্ণাম্ ।

যল্পভূলে নিজ কর্ণোপাত্তং

বিস্তং তেন বিনোদয় চিত্তম্ ॥

(ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ইত্যাদি)

Oh, fool ! give up the thirst to possess
wealth.

create in your mind, devoid of passions,
thoughts

of the Reality, With whatever you get (as a
reward)

of the past, entertain your mind (be content).

Seek Govind, Seek Govind

Translation Swami Chinmoyananda, “Bhaja
Govindam” Chinmaya Pullicatins Trust

MADRAS

আচার্য্য শঙ্করের অপূর্ণ প্রেরণায়, তাঁহার মুখনিঃসৃত দ্বাদশটি ছন্দমধুর, প্রাণময় শ্লোকের মধুর শব্দবন্ধারে তদাত্তচিত্ত হইয়া তাঁহার সঙ্গী ও শিষ্য ১৪ জনের প্রত্যেকে একটি করিয়া শ্লোকের ঘোষণা করেন । শঙ্কর শেষে চারিটি শ্লোকে মোহমুগ্ধের সমাপ্ত করেন । শিষ্যগণের মধ্যে ত্রিপুরাশান (“জটিলঃ মৃত্যৌ লুপ্তিতকেশঃ ”) ত্রীতোটকাচার্য্য “অক্লংগলিতং পলিতং যুগুং” ত্রীহস্তামলক (অগ্রে বহিঃ পৃষ্ঠে ভাঙ্গঃ ”) ত্রীহুবোধ (“কুরুতে গঙ্গাসাগরং গমনং ”), ত্রীহুবোধ (“স্বপ্নমদ্রিতকমলনিবাসঃ ”) ত্রীনিত্যানন্দ

(“যোগরতো বা ভোগরতো বা ”) ত্রীমানন্দগিরি (“ভগবদগীতা ”)... ইত্যাদি ।

এই চতুদশ শ্লোকের সত্তার “চতুদশ মঞ্জরিকা-স্তোত্রং” নামে অভিহিত । এইগুলি শুনিয়া শঙ্কর পুনরায় ৪টি ছন্দমধুর শ্লোক ঘোষণাধারা শিষ্যগণকে আশীর্বাদ করিয়া ৩১টি শ্লোকে মোহমুগ্ধের সমাপ্ত করেন । স্বামী চিন্ময়ানন্দ সতর্ক করিয়া দিয়াছেন—শ্লোকগুলির পারস্পর্য্য বা রচয়িতার নামের যথার্থ্য বিজ্ঞানসম্মত নহে ।

সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক জলধর সেন মহাশয় পরিব্রাজক রূপে ১৮২০ সালের মে মাসে যোশীমঠ গিয়াছিলেন । [আচার্য্য শঙ্করের প্রতিষ্ঠিত মঠের অগ্রভূমি—স্বারকার “শারদামঠ ” দলিগভারতে “শঙ্কেরি মঠ ” পুরুষোত্তমে “গোবিন্দন মঠ ” ও হিমালয়ের দুর্গম প্রান্তে “যোশীমঠ ”] অনেক প্রাচীন পুঁথি ও নিদর্শন আছে, এবং অভিজ্ঞ মঠাধ্যক্ষের বিশ্বাস সেই সমস্ত জীর্ণ গ্রন্থে শুধু যে শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব কালেরই নিরূপণ হবে তা নয়, তাতে সেকালের সামাজিক অবস্থা, তাত্‌কালিক রাজনীতি, হিন্দু-ধর্ম ও ধর্মাদির উন্নতি বিস্তৃতি ও অবনতি, সাধারণ লোকের ধর্মে আস্থা ও ধর্ম সন্দেহ মতামত প্রভৃতি জাতব্য বিষয় বর্ণিত আছে । জলধরবাবু ঠিকই বলিয়াছেন “এ সকল পুঁথির সাহায্যে প্রাচীন ভূগুণ সত্য আবিষ্কার দ্বারা দেশের যে অনেক উপকার সাধন করা যেতে পারে তার কিছু মাত্র সন্দেহ নাই—কিন্তু কে এতখানি কষ্ট স্বীকার করে এই দুর্গম দুরারোহ পর্ব্বতে এসে এই কঠিন কাজে হস্তক্ষেপ করবে ? ”

সাধারণ বাঙালীর কাছে আচার্য্য শঙ্কর বিশেষ প্রিয় বলিয়া হলে হয় না । রামাচরণ, মপাচার্য্য প্রভৃতি পরবর্তী বৈদান্তিক-গণ তাঁহার সহিত একমত হইতে পারেন নাই । নৈয়ায়িক চূড়ামণি মহামহোপাধ্যায় ৩রাখালদাস ত্রায়রত্ন মহাশয় অষ্টৈতবাদ-খণ্ডন লিখিয়া শঙ্করের অষ্টৈতবাদের কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন । ত্রায়রত্ন মহাশয়ের সুবিদ্বান পুত্র ৩হরকুমার শাস্ত্রী বাংলা ভাষায় উক্ত পুস্তক খানির মর্ম্মার্থ প্রকাশ করিয়াছেন এবং পরে শঙ্করের বিকল্পমতাবলম্বী আনন্দগিরি মাধবাচার্য্য চিৎ‌দাস, সদানন্দ প্রভৃতির রচিত “শঙ্করবিজয় ” নামক গ্রন্থদ্বয়দ্বারা

বাংলাভাষায় (অথবা ছন্দোপ্য) “শঙ্করাচার্য্য” নামে একটি নাটক রচনা করেন। উপরোক্ত শঙ্কর বিজয় গ্রন্থে শঙ্করের জন্মদিনে একটি অশাস্ত্র, স্বকপোলকল্পিত ঘটনার অবতারণা করা হইয়াছিল। সম্ভবতঃ ইহা বিবেচ্যপ্রসূত ও প্রক্ষিপ্ত। তাহা এই—“শঙ্করের মাতা বিশিষ্টা দেবীর স্বামী বিশ্বজিৎ বিবেকী হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন; বিশিষ্টাদেবী শাস্ত্রনির্দিষ্ট কালপর্য্যন্ত সধবার চিহ্নসকল রক্ষা করিয়া বৈধব্য-ব্রত পালন করিতে লাগিলেন। মহাদেবের কৃপায় সেই বৈধব্যাবস্থাতেই তিনি শঙ্করাচার্য্যকে লাভ করিয়াছিলেন” [উদ্ভটমাগর ত্রীপূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন বি, “ঐ” প্রকলিত “মোহমুদগর ও মোহকুঠার” পৃ ২৫ খ্রীষ্টাব্দ ১৮৬৮ বঙ্গাব্দ ১৩৪৫]

পিতার নাম শিবগুরু, মাতা বিশিষ্টা একথা দে মহাশয় ওই পুস্তিকার অন্তর্ভুক্ত লিখিয়াছেন। নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় তাঁহার “শঙ্করাচার্য্য” নাটকে (প্রথম অভিনীত ১৩১৬ সাল ২রা মাঘ) সপ্তম গর্তাঙ্কের শেষে শঙ্করের মাতা বিশিষ্টা দেবীর শবদাহের দৃশ্যে পিতার নাম শিবগুরু উল্লেখ করিয়াছেন।

রাজা রামমোহন রায় বেদের কিয়ৎংশের অপূর্ণ ইংরাজী অনুবাদের জন্য সুপ্রসিদ্ধ; কিশোপনিষদের এক অধ্যায় অনুবাদ প্রসঙ্গে ১৮১৬ তিনি পুস্তিকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন “The present is an endeavour to translate the principal chapters of the Vedas in conformity to the comments of the great Sankar-Acharya.

পুস্তিকার প্রচ্ছদপটে দেখা যায় “Translation of the Ishopanishad one of the Chapters of the

Yajur-Ved according to the celebrated Shanka-ra acherya establishing the unity and incompre-hensibility of the suprem-being and that His worship alone can lead to Eternal Beatitude” শঙ্করের নানা উচ্চ প্রশংসায় প্রত্যেকটি অনুবাদ-পুস্তিকার প্রচ্ছদপট অলঙ্কৃত।

মনীষী জবাহরলাল নেহরু তাঁহার সুবিখ্যাত The Discovery of India গ্রন্থে বলেন ইং অষ্টমশতাব্দীতে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিকদিগের অজ্ঞাতম শঙ্করাচার্য্য সুপ্রাচীন বৌদ্ধ সংঘের ধারায় কয়েকটি সংস্থা বা মঠ হিন্দু ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীদের জন্য স্থাপিত করেন। ধীরে ধীরে যুক্তিসহ বিচারে অর্ধৈত বা একেশ্বরবাদ প্রচার করিতে করিতে কুমারিকা হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া অপূর্ণ প্রেরণা ও উদ্দীপনার পরশ দিয়া বহু বিবদমান মতবাদকে একত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করিতে সমর্থ হন। তিনি একাধারে দার্শনিক ও স্থপতিত্ব কবি ও ঋষি, an agnostic and a mystic এবং সর্বোপরি a practical reformer রূপে অপূর্ণ মনীষা ও সংগঠন শক্তি বলে তদানীন্তন ধানবাহনের অভাব ও পথের দুর্দশা সত্ত্বেও ভারতের চারি কোণে চারটি মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার বিপুল পরিক্রমায় সংস্কৃত ভাষায় সম্যক ব্যবহারে বুঝা যায় সেকালের ভারতে অন্তর্নিহিত ঐক্য ও ঐতিহ্যের অস্তিত্ব। শঙ্কর এই উপাদানের সহিত যোগ করিয়াছিলেন জাতীয় একতা ও সাধারণ বোধশক্তি। অজস্র প্রশংসায় নানাদিকবিচারে নেহরুজী শঙ্করকে ভরিয়া দিয়াছেন। মাত্র ৩২ বৎসর বয়সে তুষারচ্ছন্ন কেদারনাথে মহাদেবের বরপুত্র প্রতিভার অবতার শঙ্করাচার্য্য তত্ত্ব্যাগ করেন।



পটুয়া

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

আমাদের রাঁচ অঞ্চলে একটি সম্প্রদায় ছিল পটুয়া। লোকে ইহাদিগকে পেটো বলিত। আমাদের গ্রামে পেটোপাড়া আছে, কিন্তু পটুয়ারা নাই। নিকটবর্তী কুল তোড় গ্রামে বাল্যকালে প্রায় কুড়ি ঘর পটুয়ার বাস দেখিয়াছি। এখন সেখানে একটি মাহুও নাই। সম্প্রদায়টাই নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। সিউড়ীর নিকটবর্তী পাথুড়িয়া গ্রামে বোধহয় এক আধ ঘর আছে, মাহুও দুই চারিজন। আমি ইহাদের অহুসন্ধানে মূর্শিদাবাদ জেলারও দুই-এক জায়গায় ঘুরিয়াছি। দক্ষিণখণ্ডের নিকট কয়েক ঘর আছে, আউর্গায়ে দুই-এক ঘর। অন্তত আছে কিনা জানি না।

এখন হইতে প্রায় বাইশ শত বৎসর পূর্বে যে কুশাগ্রধী ব্রাহ্মণের মন্ত্রণাকোশে মৌর্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্ত ভারতবর্ষে প্রথম চাতুরস্ত বা সার্কর্ভৌম নরপতি রূপে পরিচিত হইবার সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছিলেন সেই মহামতি চাণক্যের গুপ্তচর ছিল জমপট্টিক সম্প্রদায়। মহাকবি বিশাখদত্ত স্বপ্নীত মৃত্তারাক্ষসে এই কথা বলিয়া গিয়াছেন। নন্দ-মন্ত্রীর গুপ্তচর ছিল বাদিয়ার দল। ইহারা গ্রামের লোকের বাড়ী বাড়ী বিষধর সপের খেলা দেখাইয়া বেড়াইত। সর্পবিষ কবিরাজগণ এই সেদিন পর্য্যন্ত ঔষধে ব্যবহার করিতেন। বাদিয়ার দল নানারূপ জড়িবুটীও বিক্রয় করিত। সুতরাং লোকে তাহাদের আদর করিবে ইহাই স্বাভাবিক। এই সুযোগ লইয়াই ইহারা গুপ্ত তথ্য সংগ্রহ করিত। সৈন্ত শিবিরেও ইহাদের যাতায়াত ছিল।

জমপট্টিক দল জমরাজার পট দেখাইয়া বেড়াইত। গান করিত “পণমহ জমস্ চলনে” × × “জমের চরণে প্রণাম কর। অন্ত দেবতার কাজ কি? জমরাজ অন্ত দেবতাদের ভক্তদের মারেন, তাহারা ধড়কড় করে।” বাণভট্টের “হর্বচরিতে” ইহাদের উল্লেখ আছে। হর্ববর্দ্ধন নগর প্রবেশ মুখে ইহাদের দেখিয়া অমঙ্গলের আশঙ্কা করিয়াছিলেন। রাজ অন্তঃপুরে গিয়া দেখিলেন পিতা

প্রভাকরবর্দ্ধনের অন্তিমকাল উপস্থিত হইয়াছে। এক সময় ইহারা “অযাত্রা” ছিল। ইহাদের মুখদেখা অমঙ্গলের চিহ্ন বলিয়া মনে হইত।

আমরা দেখিয়াছি পটুয়া পুরুষেরা রামলীলা এবং কৃষ্ণলীলার পট দেখাইয়া বেড়াইত। কচিং গৌরাজলীলার পটও দেখাইত। কিন্তু যে পটই দেখাইত তাহারই শেষে জমরাজা, চিত্রগুপ্ত ও জমালয়ের ছবি খচিত। সমাজে যাহারা পাপাচরণ করে, তাহারা জমালয়ে গিয়া জমপুতগণের কত না কঠিন কঠিন শাস্তি পায়—তাহারই জীবন্ত ছবি। ছবি দেখিয়া লোকে শিহরিয়া উঠিত, সার্বধান হইত। ইহারা উচ্চকণ্ঠে গান করিতে করিতে ছবির সঙ্গে নানাবিধ পাপ ও তাহার শাস্তি শাস্তির বিবরণ দিত। এই পট সমাজশিক্ষার একটা অঙ্গ ছিল। হাজার বক্তৃতায় বাহা হয় না, গ্রামের মধ্যে একজন পটুয়া একখানা পট দেখাইয়াই তাহাতে সাক্ষ্য লাভ করিত।

কিন্তু সম্প্রদায়টা দুইহাজার বৎসর বাঁচিয়া ধীরে ধীরে নির্বংশ হইয়া গেল কেন? যে সদাশর সরকার বনের পুত্র খোজ খবর রাখেন, তাহাদের কন্মতি-বাড়তির হিসাব খতাইয়া দেখেন, তাহারা এমন একটা সম্প্রদায়কে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিলেন না, বা রাখিবার কোন চেষ্টাও করিলেন না। আমার মনে হয় ইহারা না-হিন্দু না মুসলমান বলিয়া বাঁচিল না। মুসলমান রাজত্ব হয়তো ইহাদের মধ্যে মুসলমান ধর্মগ্রহণের প্রলোভন জাগিয়াছিল, কিন্তু যে কারণেই হউক ইহারা সম্পূর্ণরূপে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে নাই। ইহাদের মধ্যে একটা অংশ ছিল মুসলমান ভাবাপন্ন, ইহাদের বাড়ীর মেয়েরা শণকাঠী-প্যাকাটীকে টুকরা টুকরা করিয়া ভাদিয়া তাহারই দুই মুখে গন্ধক গলাইয়া লাগাইয়া বিক্রয় করিত, নাম ছিল “জিয়া কাঠী”। তখনো “ফয়েধ বাক্স” অথবা দিয়াশলাই আমদানী হয় নাই। লোকে ঐ জিয়াকাঠী আঙুলে দিয়াই প্রদীপ জালিত। এই অন্ত একটু আঙুল

যে কোন উপায়েই হউক সংগ্রহ করিতে হইত। জিয়া-কাঠীর সঙ্গে থাকিত চাব্‌কী, সুনী, চুসিকাঠী লাটু, (ছেলেদের খেলবার বিষয় প্রমাণ রাজাপাঠী, মোহাগের নাম লাটু) নতুন আমদানী কাচের চুড়ি ইত্যাদি। পুরুষেরা জনমজুর খাতিত, পট দেখাইয়া বেড়াইত। অপর সম্প্রদায় প্রায় হিন্দু, তবে পুত্রের শৈশবেই প্রত্যক্ষ বিশেষের অকচ্ছেদের অহুষ্ঠান করিত। মসজিদেও যাইত, মুসলমানদের বাড়ীতেও খাইত, কিন্তু পুত্রের নাম রাখিত সুরেন্দ্র, কালিদাস। ইহাদের মেয়েরা কোনকিছু বিক্রয় করিতে বাহির হইত না। পুরুষেরা পট দেখাইয়া বেড়াইত, জুর্গা, কাণী, অন্নপূর্ণার প্রতিমা গড়িত। কেহ কেহ ভাল খোল বাজাইতে শিখিয়াছিল। তাহারা দৈন্য মাসে হরিনামের দলের গ্রামপ্রদক্ষিণে যোগ দিত। চব্বিশ প্রহরে খোল বাজাইতে যাইত। আমাদের ব্রজেন্দ্র পটুয়া এমন খোল বাজাইত যে নামকীর্তন গাহিতে গাহিতে আমার মাতামহ তাহাকে জড়াইয়া ধরিতেন। গায়ের দোপাট্টা তাহার মাথার বাধিয়া দিতেন। বাল্য কালে এমন কত গল্পই না শুনিয়াছি।

ইহাদের কৃষ্ণলীলার পটে একটা বৈশিষ্ট্য সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কৃষ্ণলীলার পটের এক অংশে “ভারথগের” ছবি আছে। বড় চণ্ডিদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে ভারথগু পালা আছে। ব্রজাণ্ড পুরাণে ভারথগের বিবরণ আছে। আর একটানি গ্রন্থেও ভারথগের স্নোক পাইয়াছি। পটে ছবি আছে,—আগে পশুরা মাথায় রাধিকা, মাঝখানে ভার কান্ধে কৃষ্ণ, পিছনে বড়াই বুড়ি। কিছুদিন পূর্বে মূর্শিদাবাদ জেলার আউর্গায়ের তিমু পটুয়া গান শুনাইয়া গেল—

খেয়েছ মজুরীর কড়ি হয়েছ বেগারি।

এখন কেন বলছ কৃষ্ণ ভার বইতে নারি ॥

বাল্যকালে এমন কি যৌবনেও ইহাদিগকে পট লইয়া গ্রামে গ্রামে ফিরিতে দেখিয়াছি। বিশেষ করিয়া ৬ পুঞ্জার পূর্বে ইহারা দলে দলে আসিত। এখন আর বড় একটা দেখিতে পাই না। বেলেদে ‘আঠা দিয়া কাগজ জুড়িয়া পুরু কাগজে, কেহ বা কাপড়ের সঙ্গে কাপড় জুড়িয়া লম্বা পট তৈরী করিত। তেতুল বিচি সিক্ত করিয়া তাহারই ঘন অংশও ইহারা কাজে লাগাইত। ইহাদের

ছবি আঁকিবার পদ্ধতি ছিল কালীবাটের পটের মত। নানান ঐতিহ্যের সঙ্গে ছবি আঁকিবার একটা অতি প্রাচীন ধারাও ইহারা পুরুষায়ক্রমে রক্ষা করিয়া আসিতে-ছিল। বংশলোপের সঙ্গে সঙ্গে অনেক কিছুই গিয়াছে।

দক্ষিণখণ্ডের নিকট যে পটুয়াদের দেখিয়া আসিয়াছি, তাহাদের আচার ব্যবহার হিন্দু মত। মেয়েরা সিন্ধিতে সিন্ধুর পরে, নাম হিন্দুর মত। কিন্তু ইহাদের মেয়েরা আর চুড়ি চাব্‌কী বিক্রী করে না, পুরুষেরাও পট দেখায় না। সাপ ধরে, সাপ খেলাইয়া বেড়ায়, সাপের বিষ ও জড়িবুটি বিক্রী করে। অথঃ ইহারা বেদিয়া নয়—পটুয়া।

রাঢ়ের সিদ্ধল গ্রামে কয়েকঘর বাজীকরকে দেখিয়া-ছিলাম। মুখ হইতে স্ত্রী বাহির করা, হাতের গুটিকে অদৃশ্য করিয়া দেওয়া, একটা ছোট নলী মুখে গিলিয়া পিঠ দিয়া বাহির করা ইত্যাদি বাজী দেখাইয়া পুরুষেরা জীবিকা নির্বাহ করিত। মেয়েরা হাবু গাহিত। হাবুর আবার খেউড় গান ছিল। গ্রামের মধ্যে গৃহস্থবাড়ীর মেয়েরা যাহা শুনিত, তাহার মধ্যে অশ্লীলতা থাকিত না। কিন্তু গ্রামপ্রান্তে যুকের দল যাহা শুনিত তাহা খেউড়। প্রোচা এবং যুবতীরাই হাবু গাহিয়া বেড়াইত। ইহারা নিজেদের ভট্টরাজার চর বলিত। প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে আমি সিদ্ধল গ্রামে গিয়া ইহাদিগকে দেখিয়া আসিয়া-ছিলাম। বীরভূমের এই সম্প্রদায়টিও নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। জানি না এখন কেহ বাঁচিয়া আছে কি না। আমি ইহাদিগকে ভবদেব ভট্টের গুপ্তচর বলিয়া অহুমান করিয়াছিলাম।

মহামতি চাণক্যের একটি নাম বিষ্ণু গুপ্ত। অপর নাম কোটীলা। বন্ধুবর ভট্টের শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক কোটীল্যের অর্থশাস্ত্রের অহুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা হইতে জানিতে পারি, পূর্বকালে ভারতবর্ষীয় রাজসুত্রবন্দ গুট পুরুষ বা চর নিয়োগ করিতেন। এই গুটপুরুষদের এক সম্প্রদায়ের নাম ছিল সংস্থ। ইহারা একস্থানে বসিয়া চেলা-চামুণ্ডার দ্বারা সংবাদ সংগ্রহ করিতেন। সংস্থগণ মধ্যে পাঁচ শ্রেণীর নাম পাওয়া যায়।

(১) কাপটিক—পরমর্ষবিদ প্রৌঢ় ছাত্র।

(২) উদাস্ত—সন্ন্যাসভ্রষ্ট পর্যটক।

(৬) গৃহপতি ব্যঞ্জন—কৃষক শ্রেণীর গৃহস্থের ছদ্মবেশ-ধারী।

(৮) বৈদেহক ব্যঞ্জন—বণিকের ছদ্মবেশধারী।

(৫) তাপস ব্যঞ্জন—জাড়াখা বা জটাধারী তাপসের ছদ্মবেশধারী। এই তাপস ব্যঞ্জন গুপ্তচরগণ বলিত আমরা লোকের ভবিষ্যৎ বলিতে পারি। ভবিষ্যৎ বলিয়া শিষ্যদের দ্বারা সেই ঘটনা ঘটাইয়া বলিত—দেখ যাহা বলিয়াছি তাহাই তো হইল। লোকে ইহাদিগকে সম্মান করিত।

গুপ্তচরদের দ্বিতীয় শ্রেণী ছিল সঞ্চারী। ইহারা দেশ-বিদেশে ঘুরিয়া সংবাদ সংগ্রহ করিত। ইহারা চারিটি বিভাগে বিভক্ত ছিল। ১ম বিভাগ সত্রী—ইহারা রাজ্যের গোপীভুক্ত স্বজন হইতে নিৰ্বাচিত হইত। ইহারা লক্ষণ বিজ্ঞা, অঙ্গ বিজ্ঞা, বশীকরণাদি ও অস্ত্রাদিবিজ্ঞা, ইন্দ্রজাল, আশ্রম ধর্ম, শাকুন বিজ্ঞা, ও পক্ষিব্যয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করিত। ২য় বিভাগে থাকিত ভীক—প্রাণের মায়া ভাগ করিয়া সাধারণ দুঃসাহসের কাজ করিত। ৩য় রসদ-বিশ প্রদানকারী। ৪র্থ পরিব্রাজিকা—রমণী গুপ্তচর। ইহারা কেহ কাহাকেও চিনিত না। আর এক শ্রেণীর চর ছিল “উভয় বেতন”। ইহারা দুই রাজ্যেরই মাহিনা খাইত। তবে যে রাজ্যের ইহারা প্রকৃত সাহায্যকারী সেই রাজ্যের নিকট ইহাদের স্ত্রী-পুত্রাদি প্রতিভূ স্বরূপ থাকিত।

দূতগণও আর এক শ্রেণীর চর। নিম্নোক্ত দূত—রাজ-প্রতিনিধি, পূর্ণ দায়িত্ব লইয়া কাজ করিত। অমিতার্থ বা পরিত্যাগ দূত,—কোন বিশেষ বিষয় নিৰ্বাহের জন্য নিযুক্ত হইত। শাসনহর দূত—মাত্র পত্রবাহক। স্ত্রীপাদ রূপ গোস্বামী নায়ক-নায়িকার দূতীপ্রকরণেও এই বিভাগই গ্রহণ করিয়াছেন। নিম্নোক্ত দূতী, নায়ক বা নায়িকা বলিয়া দেন নাই, নিজ দায়িত্ব লইয়া সেই কথা বলিয়া আসিতেন, যে কাজের ভার লইতেন, অতিরিক্ত কিছু করিয়াও সেই কার্য উদ্ধার করিয়া ফিরিতেন। অমিতার্থ দূতী—আজ্ঞাবাহিকা, নির্দেশ প্রতীপালন করিতেন, কিন্তু তাহার অতিরিক্ত কিছু করিবার সামর্থ্য রাখিতেন না। পত্রধারী—মাত্র পত্রবাহিকা। আমাদের দেশে একটা কথা আছে “চার চক্ষু”, অর্থ চারিটি চক্ষু নয়, যিনি চরের চক্ষুতে দেখেন। চাণক্য স্বর্ণীত অর্থশাস্ত্রে যম পট্টিক বা বাদিন্যায় স্থাপ্ত উল্লেখ করেন নাই। তবে “সত্রী” চরেরা যে সব বিজ্ঞা শিখিতেন, সেই সমস্ত বিজ্ঞালয়বিশেষজ্ঞগণের যে চর নিযুক্ত হইতে কোন বাধা নাই, ইহা সহজেই বুঝা যায়। আমরা মুদ্রারাক্ষসের সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া যমপট্টিকগণ যে চাণক্যের গুপ্তচর ছিল ইহা মানিয়া লইয়াছি, এবং ইহারা ইহা যে পরে পটুয়া নামে পরিচিত হইয়াছিল, ঐতিহ্য অনুসরণে তাহা নিশ্চিত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি।

ছায়া-বর

বারীন্দ্রকুমার ঘোষ

সোনালী রোদের ছায়া-ঘরে
মেঘ আলো হরিণের আঁখি রং-খেলা
কোনদিন তুমি দেখেছ কি ?
নূপুরের বুড়ি-ছোয়া ভ্রাণে
সাগরের উৎসবে, প্রাণে
লতা, ফুল, পাখীদের ছবি।

নক্ষত্রের, জোনাকীর আলো—
যে নয়নে জলে সাঝারাত,
মাধবীর সেই মধু-ভিষি
কখনও বেগেছ নাকি তালো ?

এ-নদীর ছবি আঁকব না !
সীমাহীন ভূগোলের স্বরে—
জানি সব স্মৃতি আছে গাথা।
প্রত্যাহের প্রবল হাওয়ায়,
ভীক-পাতা ক্রমে ঝরে যায়
সঙ্গীত-স্বরভি আনে কবি।

তবু, চাওয়া—পাওয়া এই নিয়ে
পৃথিবীর রূপ চলে গড়া।
দূর্বো বোঝে না তার শিশিরের আঁখি,
হয় না যে জড়ের শেষ-বই পড়া।



অনিগকুমার ভট্টাচার্য

সেদিনের কথা মনে পড়ে শুক্রার।

একটি কচি তরুণ, কাঁচা চললে মুখ; সেই তাকে আখাস দিয়েছিলো। তার বিপদে অবাচিতভাবে সেই সাঁহায্য-কর প্রসারিত করেছিলো। অথচ, কোন প্রত্যাশার বিনিময়ে নয়। স্বার্থেরো কোন সম্পর্ক ছিলো না তার সঙ্গে। আপিসের আর আর সহকর্মীদের মাঝে সে এক ব্যতিক্রম। স্বল্পভাষী তরুণ, সবেমাত্র কৈশরের সীমানা অতিক্রম করেছে। হিসেব করে দেখতে গেলে দেখা যাবে সেও বোধহয় শুক্রারই সমবয়সী।

ড্যালহাউসি স্কয়ারের আপিস-পাড়ায় তখন এখন-কার মতন মেয়েদের এতো ভিড় ছিলো না। যুদ্ধের বাজারে কিছু লেখা-পড়া জানা মেয়ে কেবল চাকরির দরজায় পা দিয়েছে। যুদ্ধের দরকারে হঠাৎ গজিয়ে-ওঠা আপিস। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে সে-সব আপিসেরো দরজা বন্ধ হয়ে গেলো।

শুক্রার ভাগ্য নিতান্তই সুপ্রসন্ন। সাপ্লাই আপিসের মাত্র কয়েকমাসের চাকরিতেই সে এক মাস্তানী-সাহেবের স্থানজরে পড়ে যায়। তাঁরই রেকমেণ্ডেশনে তাঁর এক স্বজাতি বন্ধু শুক্রাকে টেনে নিলেন তাঁদের সওদাগরী আপিসে।

শুক্রাই সেখানে প্রথম মহিলা-কর্মী।

‘মেয়ে মানুষের আবার পুরুষালি কাজ কেন?’—ছড়া, টিপ্পনি, এপাশে, ওপাশে শুকন,—শুক্রার জীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

‘হের শুক্রা একাদমী,

নিজাছারা শশী!’—টেবিলের ওপর লেখা স্লিপ। শুক্রা নিঃশব্দে হজম করে। এতবড় আপিসে সেই একমাত্র মেয়ে; তাই প্রতিবাদের কণ্ঠ জোরাপো নয়। ‘কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন!’ শুক্রার রং কালো; তাই এ সম্ভব্য। অপর

দিক থেকে কে একজন আবার বলে ওঠে—কোকিল যে কালো তাতে কি বা আসে যায়!

আর বড়বাবুও বিরূপ। হয়ত কোন শ্রালক-শ্রেণীর আত্মীয়ের প্রবেশ-পথ বন্ধ করেছে আঠার বছরের শ্রামলাঙ্গী এই ছিপছিপে মেয়েটি। তবে নেহাৎ বড়-সাহেবের ক্যাণ্ডিডেট; তাই ভাতে মারা যায় না।

আই-এ পর্যন্ত পড়া শ্রামলাঙ্গী মেয়ে। রূপ নেই, কিন্তু রূপের চটক আছে। আর গগনস্পর্শী গান্ধীর্ষী। চল্লিশ টাকা’র জুনিয়র গ্রেডের চাকরিতে মাটিতে ঘেন পা পড়ে না। সকলকে এড়িয়ে চলে। কথার পিঠে কথার প্রত্যুত্তর দেওয়ারো কোন প্রয়োজনীয়তা বোধ করে না।

তবুও নিমাই দত্তই প্রথমে শিতালরি দেখাতে এগিয়ে এসেছিলো ক্যান্টিনে একদিন চায়ের টেবিলে আমন্ত্রণ জানিয়ে।

শুক্রা স্পষ্টই জবাব দিয়েছিলো, ‘ক্যান্টিনে আমি খান নে। আমার টিফিন বাড়ি থেকেই আসে।’

আর একদিন হাফ্ হলিডেতে আপিসের ছুটির প মিড-ডে-শোতে বিলিতি সিনেমা দেখার আমন্ত্রণ এতে আর এক চটপটে তরুণ সহকর্মীর কাছ থেকে।

শুক্রা জানালে, পুরুষমানুষ বন্ধুর সঙ্গে বলে সিনেমা দেখার অভ্যাস তার নেই।

‘ওঃ, তারি আমার লতীপণারে!’

‘কী বললেন? স্বাউগেল কোথাকার!’—শুক্রা ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেলো। তার তীর্থক কণ্ঠস্বরে সহকর্মী তরুণ ঘুরে দাঁড়িয়েছিলো।

শুক্রা তবু ছাড়লে না। তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললে ‘ভুল্লোকের মতন কথাবার্তা বলতে শিখবেন। না হলে আমাকে আইন নিজের হাতেই নিতে হবে।’

গুরুরা সেদিন থেকেই সকলে চিনে নিয়েছে। এরপর আর তার কাছে এগুবার সাহস আর কারুর হয়নি।

তবে বড়বাবু সহজে ছাড়েন নি।

ডেসপ্যাচ সেকশনে কাজ করার। চিঠির খামে পরিচ্ছন্ন হরকের ঠিকানা লেখা। তাতে তুলচুক নেই। তুলচুক শুধু এর চিঠি ওর খামে, ওর চিঠি এর খামে। সহকর্মীদের মধ্যে খোঁগসাজসে তাকে বিপদে ফেলা।

বড়বাবু নালিশ জানালেন উপরওয়ালার কাছে—‘ওকে দিয়ে একাজ চলবে না। চিঠির ভীষণ গোলমাল হচ্ছে।’

এমন কী গুরুর কাজের নমুনাও তুলে ধরেছিলেন সাহেবের নজরে। বড় সাহেবের ঘরে ডাক পড়লো।

মাদ্রাজী সাহেব সুনলেন, সংসারে একমাত্র রোজগারে মেয়ে। একটি মধ্যবিত্ত ভদ্র পরিবারের একমাত্র আশাভরসা। অথর্ব পিতার চাকরি যাওয়া বাঙলাদেশের পর্দানবীন পরিবার থেকে কলেজের পাঠ চুকিয়ে দিয়ে সেই নেয়েছে শহরের রাজপথে একটি নিমজ্জমান সংসারকে টেনে তুলতে।

স্বল্প কথাতাই মাদ্রাজী-সাহেব মুগ্ধ হলেন।

বড়বাবুকে ডেকে বড়সাহেব নিজেকে আদেশ দিলেন, ‘ডেসপ্যাচে নয়, ওকে দাও ফাইলিং-এ।’

সেখানেও বিপদ।

রাশি রাশি চিঠির তাড়া। দরকার অদরকারে বড়বাবু চিঠির রেফারেন্স চেয়ে পাঠান।

হুজিওতাই তাকে তখন রক্ষা করলে। কচি চলচলে মুখ, তারই সমবয়সী তরুণ-কিশোর।

‘কী চিঠি চাইছেন?’

‘নতুন একটা পারচেজের করস্পণ্ডেন্স।’

‘ফার্মের নাম?’

গুরুর জবাব দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হুজিওতাই একটি ফাইল টেনে বার করলে। তাইতে সবকিছুই পাওয়াগেলো।

গুরুর কৃতজ্ঞতার আর অন্ত নেই। অথচ হুজিওতাই কাজ করে তার পাশের সেকশনে, রেকর্ডসে। সলাজ, নতুন-প্রকৃতির ছেলে, চলচলে মুখকান্তি। আশাসভরা কণ্ঠে জানালে, বখনই দরকার পড়বে ডাকবেন আমাকে।

আর সর্বকণ্ঠই দরকার পড়ে গুরুর হুজিওতাকে।

নিজের নির্দিষ্ট কাজের চেয়ে গুরুর কাছেই তাকে রত থাকতে দেখা যায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে। গুরুর নিশ্চিন্ত। বড়বাবুর আক্রমণ প্রতিহত হয়।

কিন্তু শুধু একখানি সাহায্য-করই প্রসারিত মাত্র। হুজিওতের আর কোন আগ্রহ নেই। বিপুল সহায়ত্বভি-ভরা মন। একটি বিপন্ন সহকর্মীকে বিপদের আওতা থেকে রক্ষা করা মাত্র।

দিনের পর দিনের পরিচয়ে এবং সাহচর্যে হুজিওতের মধ্যে অপর কোনো ভাবান্তর লক্ষ্য করা যায় না।

গুরুর সনেছে শুধু একটি অভাবগ্রস্ত পরিবারের ছেলে হুজিওত। অত্যন্ত কায়রুশে তাকে এই অল্প বয়সেই একটি সংসারের গুরুভার কাঁধে তুলে নিতে হয়েছে।

গুরুর সঙ্গে হুজিওতের অবস্থা এবং দায়িত্বের ঘন মিল। এক জায়গায় শুধু অমিল। এতো অল্প বয়সেই বিধবা মায়ের চোখের জলের অহুনের কাছে হুজিওতকে হার মানতে হয়েছে। কুড়ি বছরের ছেলে এরই মধ্যে বিবাহিত। সংসার শুধু তার বিধবা মা, কনিষ্ঠ-ভাই-বোনদের নিয়েই নয়,—তার সঙ্গে নব পরিণীতা স্ত্রীও আছে। আর দিনে দিনে আরো আরো আগন্তুক সন্তান।

গুরুর সে দায়িত্ব নেই। তবু হুজিওতের মধ্যে অদ্ভুত মিল। হুজিওতই স্বল্পবাক, সংযত, সংহত। কাজের কথাই বাইরে কেউ কারুর ব্যক্তিগত কথায় থাকে না। অহেতুক আগ্রহের চাপলাও তাদের হুজিওতের কারুর মধ্যে নেই।

শুধু ফাইলিং আর রেকর্ডস কেন, আপিসের নানা সেকশনে এখন মেয়ে-পুরুষ একসঙ্গে কাজ-কর্ম করে।

বড়বাবুদের আর চোখ টাটানি নেই। সহকর্মী পুরুষ-কেরানিদেরো কণ্ঠে এখন আর মেয়েদের নিয়ে প্রকাশ্যে ছড়াগান, ব্যঙ্গ কবিতা কিংবা ইতর রসিকতার কথা প্রকাশ পায় না।

ট্রামে, বাসে, রাজপথে প্রকাশ্যে মেয়েদের ভিড়। আপিসের টেবিলে পাশাপাশি বসা, এক সঙ্গে ক্যাফিনে টিফিন খাওয়া, ব্যক্তিগত স্বখ-দুঃখের আদান-প্রদান এখনকার চাকরি-জীবনে সাধারণ ঘটনা। মেয়ে আর পুরুষ এক সত্তা। হশটা-পাঁচটায় একই জীবন-ধারণ প্রবাহিত চলে।

আপিস থেকে খেলার মাঠে, সিনেমা বা থিয়েটার যাওয়া নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা।

সেক্ষণে সেক্ষণে মিল। এর ওর কাজে সহায়তা। এক সঙ্গে ট্রেড ইউনিয়ন করা, ধর্মঘটের পথের ধুলোয় নামা, মিটিং করা।

সিভিল ম্যারেজ রেজিষ্টারের খাতায় সহকর্মী সহকর্মীদের দু'চারজনদের নাম যে গুঠে না এমন নয়। স্বামী-স্ত্রীর ঘোষণা রোজগারে সংসার চলে। একই আপিসে পাশাপাশি দু'জন। যেমন একই সংসারে পাশাপাশি দু'জন। এখন অনেক পরিবর্তন। পরিবর্তন যুগের, পরিবর্তন কালধর্মের। পরিবর্তন মাহুশের মধ্যে। স্ত্রী-পুত্রের সত্য সত্য।

পরিবর্তন নেই কেবল গুরু দাশের। বিশ বছরের চাকরি-জীবনে সেই একই ধারা। অথর্ব পিতার সংসারের জোয়াল আঁজা কাঁধ থেকে নামেনি। ভাইয়েরা বিশেষ কেউ মাহুশ হলো না। আর যেবা একটু আধটু রোজগারের মুখ দেখেছে—সেই স্ত্রী-পুত্র নিয়ে ভিন্ন সংসারী। বাপ-মায়ের প্রতি কর্তব্য নেই। বোনেরা কেউ কেউ বিবাহিতা। নিজের সংসারের ভাবনার বাইরে আর তাদের বাপের বাড়ির ভাবনা নেই।

গুরুর দায়িত্ব এখনো অনেক। নিজের ভাবনা ভাববার সময় কই? চল্লিশ টাকার জুনিয়র গ্রেড থেকে চারশো টাকার সেকশন-ইন্সচার্জ। কিন্তু এই মাগ্গি-গণ্ডার দিনে শহরের জীবনে এ আয়ের মূল্য কী?

হুজিৎ বহু আছে। ফাইলিং-এর পাশে রেকর্ডসে নয়। অল্প সেকশনের এখন ইন্সচার্জ। গুরুর সেকশন থেকে অনেক দূরে।

ফরসা ধবধবে চেহারার আর সে জোলুস নেই। চল-চলে চোখ দুটির মাদকতাও মসীবর্ণ। ছাঁ-পোষা মাহুশ।

তবে স্বভাবটি তেমনই আছে। সেই স্বল্পবাক, পরোপকারী, আপিসের কাজে চোঁখস কাজের লোক।

কখনো-সখনো দেখা হয় বৈকি হুজিৎের সঙ্গে গুরুর। কুশল বিনিময়ের সৌজন্যমূলক ব্যবহার। তার বেশি আর কিছুই নেই।

আপিসে সেদিন ভীষণ-কাণ্ড।

হঠাৎ খবর পাওয়া গেলো পারচেঞ্জ সেকশনের বাহুদেব চক্রবর্তী আত্মহত্যা করেছে। ওই সেকশনেই কাজ করতো শোভনা নন্দী।

বাহুদেবের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা তার বনিষ্ঠ। আপিসে তাই নিয়ে সকাল থেকেই আলাপ-আলোচনা।

মাত্র কয়েকদিন আগেও দেখা গেছে চৌরঙ্গীর সম্ভ্রান্ত রোস্তোরাঁয় আপিসের ছুটির পর স্বতন্ত্র কেবিনে দু'জনে পাশাপাশি বসে কফি পান করেছে। গীততাপ-নিয়ন্ত্রিত সিনেমা হাউসে পাশাপাশি দু'জনে বসে ইভনিং শোতে বিলিতি ছবিও দেখেছে।

তারপর শোভনা নন্দী হঠাৎ আপিসে আসা বন্ধ করেছে। আর বাহুদেবের মনও বিমর্ষ। হলো কী?

হঠাৎ খবর পাওয়া গেলো শোভনা নন্দীর অন্তর্ধানের খবর। বড় গাছের মগ ডালে সে নাকি বাসা বেঁধেছে। একজন অবাকালী বড় কনট্রাক্টরের সঙ্গে দু'চার দিনের কোটসিপের পর সিভিল ম্যারেজ এ্যাক্টে মিস নন্দী মিসেস চোপরা হয়ে দূর দেশে পাড়ি জমিয়েছে। সওদাগরী আপিসের জুনিয়র গ্রেডের মেয়ে-কেরানীর আর সহকর্মী বাহুদেবের পাশে ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই।

সেই আঘাতেই সেক্টিমেন্ট্যাল বাহুদেব সায়নাইড খেয়ে আত্মহত্যা করেছে। রাত্রে ঘরে খিল দিয়ে শুয়েছিলো। সকাল গড়িয়ে দুপুর হয় তবু দরজা খোলে না। দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে বাপ-মা, ভাই-বোনের আর্ত চীৎকার—বাহুদেব আর নেই!

মাথার বালিশের তলায় চিরাচরিত দুটি ছত্রের স্লিপ। বাহুদেবের নিজের হাতের লেখা,—“জীবনের আর কোন অর্থ নেই। স্বেচ্ছায় বিদায় নিচ্ছি। আমার মৃত্যুর জন্য কেউই দায়ী নয়!”

আপিসময় ছড়িয়ে পড়লো খবরটা। ‘পুন্ডোর বাহুদেব!’ সমস্ত দিন ধরেই এখানে সেখানে চাপা গলার ফিস-ফিসানি—‘পুন্ডোর বাহুদেব!’ এই কালকেও যার সঙ্গে একত্রে বসে কাজ কর্ম করা গেছে, দিনের পর দিন যার সাহচর্যের স্বত্তি, তাকে চিরকালের মতন হারিয়ে আজ কী আর আপিসের কাজ করা চলে? সকলের মধ্যেই কেমন যেন একটা শূন্যতাবোধ।

আর কী শয়তানী মেয়ে শোভনা নন্দী! একটা মাহুষের জীবন নিয়ে এ কী কোঁচুক তার!

গায়ের বংটা মাজা মাজা। অনেকটা গুরুর মতনই। দেহের গড়নটি সুন্দর। বেহের ঘোঁবনকে সব সময়ে পুরুষের চোখের সামনে মেলে ধরার কায়দা তার আয়ত্নে। বাহুদেব তাইতেই মজ্জছিলো। মিষ্টার চোপরা, তিনিও তাইতেই মজ্জছেন।

হঠাৎ যেন একটা জোয়ারের ধাক্কা এসে লাগলো গুরুর বুকে। তার দেহের গড়নেও মাধুর্য ছিলো। শ্রামল অক্ষী ঘিরে ভরস্তু দেহ-ঘোঁবন। চোখ দুটিও সুন্দর। লম্বাটে চেহারা কুঞ্চিত কেশদাম। শোভনা নন্দী নিজেকে সাজাতে জানতো, পুরুষের চোখের সামনে নিজেকে মেলে ধরার কায়দাও জানতো।

আর গুরুর ঠিক তার বিপরীত। সে নিজেকে ঢেকে রাখতেই শিখেছিলো; আঠারো বছর বয়সে যে গুরুর এসেছিলো জুনিয়র ক্লার্ক হয়ে, কুড়ি বছর বাদে সেকশন্সাল ইনচার্জ সেই গুরুরাই আছে। দেহ বল্লরীতে এখন আরো কিছু মেদ। কুঞ্চিত কালো চুলগুলিতে একটু একটু পাক ধরেছে। টানা টানা চোখ দুটিতে বয়েসের ছাপ।

প্রথম থেকেই নিজেকে শুধু আড়াল করে রাখা! রূপ কিছু ছিলো, ঘোঁবনও ছিলো।

অনেকেই তো তার দিকে এগিয়ে এসেছিলো। শুধু আপিসে কেন, পাড়াপ্রতিবেশীদের মধ্যে, ট্রাম-বাসের সহযাত্রীদের মধ্যে, দূর এবং নিকট আত্মীয়দের মধ্যে, টুকিটাকি কথার আদান-প্রদানে, গুরুর নারীত্বকে সম্বর্ধনা জানাতে এসেছিলো বৈকি অনেকেই! কিন্তু গুরুর শুধু নিকন্তাপ। মজা নন্দী—স্রোতের আবর্ত নেই সেখানে।

হঠাৎ বাহুদেব চক্রবর্তীর আত্মহত্যা তাকে নাড়া দিলে। বোকা বাহুদেব, প্রেম করতে জানে; অথচ ছিনিয়ে নিতে জানে না!

চূপ করে বসেছিলো গুরুর। কাজে আজ তারো মন নেই।

আপিস ফাঁকা হয়ে গেছে।

সেকশনের সবাই চলে গেছে। গুরুর শুধু চূপচাপ

বসে। এই নির্জনতা এখন তার ভালো লাগছে। আপিসের মধ্যে এই নির্জনতা। বাইরে বেরলেই এখনি জনারণ্যে মিশে যেতে হবে। বাড়ি ফিরলে আরো ভয়কর। অর্ধ পিতার মনস্তাপ, ম'য়ের শরীরের নানা জটিল ব্যাধির ফিরিস্তি, আর গুরুর এই আত্মত্যাগে মহিমাম্বিত জীবনের যশোগাথা বর্ণনা—অসহ্য, অসহ্য আজ গুরুর কাছে।

তার থেকে আপিসের মধ্যে নিজের এই সংরক্ষিত জায়গাটুকু এখন বেশ নির্জন। নিয়মের আলোতে বেশ মাদকতা। মাথার ওপর ঘূর্ণায়মান দ্রুতগতি পাখার হাওয়ায় ক্লান্তি বিনোদনের আমেজ।

আয়ত্ন হয়ে বসেছিলো গুরুর। নিজের তন্ময়তা। হঠাৎ কার ডাকে তার আয়ত্ন-সদৃশ ফিরে এলো।

‘মিস দাস, শরীরটা আজ খারাপ নাকি?’

গুরুর মুখ ফিরিয়ে দেখলে, সজ্জিত বহু। আশ্চর্য হয়ে গেলো সে। অল্প সেকশনের মাহুষ,—আপিস-বাড়ির অগ্রতলার লোক। এ-ঘরে তার আসবার দরকারো হয় না।

‘বাড়ি যাবেন না?’

সজ্জিতের দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে সংক্ষেপে গুরুর বললে, ‘হ্যাঁ, যাবো এইবার।’

সজ্জিত গুরুর আরো কাছাকাছি এসে দাঁড়ায়,—‘চূপ-চাপ নিরিবিবি এমনি ভাবে বসে আছেন! শরীর-টরীর খারাপ নাকি?’

‘না, এমনি বসে আছি। ভাল লাগছেন না কিছুই।’

‘খদি কিছু মনে না করেন একটা কথা জিগোস করবো?’

গুরুর তাকিয়ে দেখে সজ্জিতের দিকে,—‘কী বলুন!’

‘সংসারে কোন কিছু—’

গুরুর চোখে বিষ্ময়। এতো আত্মীয়তার কণ্ঠ কখনো শোনেনি সে। সজ্জিত বহু তার চাকরী জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু। অনেক করেছে সে তার জগে। তবে সে শুধু আপিসের কাজে সাহায্য। কিন্তু এমন অন্তরঙ্গতাকে কোনদিনই প্রকাশ করেনি সে।

‘কই উঠুন!’ সজ্জিত আবার হাগিদ দিলে।

‘আমার সঙ্গে আপনার কী কোন দরকার আছে?’

গুরুর প্রশ্ন করলে।

‘না, দরকার কিছু নেই। তবে এইদিক দিয়ে যাবার সময় দেখলাম একলাটি বসে আছেন। মুখ ভার। ভাবলাম, যদি কিছু উপকারে আসি।’

স্বজিতের কথায় শুক্লা বললে, ‘আচ্ছা, আপনি কী শুধু মাহুঘের উপকারই করেন?’

স্বজিত বললে, ‘হঠাৎ এ প্রশ্ন? কেন বলুন তো!’

‘এই তো আমারই কতো উপকার আপনি করেছেন। আপনি না থাকলে এ আপিসে আমার চাকরি কী থাকতো?’

‘কী যে বলেন!’ কৃত্তিত স্বরে স্বজিত বললে।

শুক্লা জিগ্যেস করলে, ‘আপনি কারুর কাছে কিছু প্রত্যাশা করেন না?’

‘মানে?’

‘মানে প্রতিদানে কিছু—’

‘দানটা স্বতঃস্ফূর্ত, প্রতিদান চেয়ে নেওয়া। না, ও ভিক্ষাবৃত্তিতে আমার আগ্রহ নেই।’

শুক্লা বিস্মিত-চোখে স্বজিতের দিকে তাকিয়ে থাকে। এ যেন অন্য স্বজিত, স্বাভাব্যে উজ্জ্বল, বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রথর।

‘রেখা মিস্তিরের চাকরি যাচ্ছিলো। বড় সাহেবকে বলে-কয়ে আপনিই তাকে বাঁচিয়ে দিলেন।’ শুক্লা আবার কথার জের টানলে।

‘রেখা মিস্তিরের অনেক লায়বলিটিস্। এই বাজারে চাকরি গেলে ভারি বিপদে পড়তো মেয়েটি!’

‘এতো জনের এতো উপকার করেন, আর বাহুদেব চক্রবর্তীকে আত্মহত্যার কবল থেকে বাঁচাতে পারলেন না?’

শুক্লা হঠাৎ এ-কথায় স্বজিত বহু বিস্মিত হয়ে ওঠে। বাহুদেব চক্রবর্তীর আত্মহত্যার সঙ্গে তার সম্পর্ক কী? ফাল ফাল করে সে শুক্লা দিকে তাকিয়ে রইলো। এতোক্ষণের বুদ্ধিমত্তা বোকাটে অন্ধকারে ডুবে গেছে।

শুক্লা আবার বললে, ‘মানে, হয় শোভনা নন্দীকে বাহুদেবের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে পারতেন, না হলে বাহুদেবকে তার হাত থেকে উদ্ধার করতে পারতেন।’

‘মানে, আপনি কী মনে করেন শোভনা নন্দীর চোপরা-ঘটিত ব্যাপারে আমার কোন হাত ছিলো?’

‘না, না, হিঃ, হিঃ, ওকথা কী বলছেন?’

‘তবে?’—স্বজিত বহু কণ্ঠে উত্তেজনা।

শুক্লা হেসে ফেললে, ‘না, আপনি এখনো দেখছি সেই ছেলেমানুষটাই থেকে গেছেন। সামান্য একটা ঠাট্টাও বোঝেন না!’

স্বজিত আশস্ত হলো।

‘বাহুদেবের কথা আর বলবেন না। বামন হয়ে আকাশের চাঁদে হাত বাড়াতে গেছলো।’

শুক্লা আগ্রহের স্বরে জিগ্যেস করলে, ‘চাঁদটা কে?’

‘কেন, শোভনা নন্দী!’

‘চিনতেন ওকে?’

‘ওকে আবার কে না চেনে? কতো ঘাটের জল খেয়ে কতো ঘাটের জল বোলা করে তবে বাহুদেবকে ধরে-ছিলো। আর বাহুদেব তো উপলক্ষ মাত্র! বাহুদেবকে ভর করেই ধরতে চেয়েছিলো চোপরা সাহেবকে, এ্যাও সী হাজ বিন সাকসেসফুল!’

‘বাহুদেবের সঙ্গে চোপরা সাহেবের সম্পর্ক?’

‘অফিসিয়াল কন্টাক্টে এসে তারপর পারসোন্সাল রিলেশনস্। চোপরা সাহেব ওকে রেসের টিপস্ দিতো। তা না হ’লে ওই মাইনেতে অত নবাবী করতে পারে?’

‘তাই নাকি?’

‘হ্যাঁ। এসব খবর আপনি জানতেন না? আপিসের আর সবাই তো জানে।

স্বজিতের কথায় শুক্লা বললে, ‘আমি আর কতোটুকুই বা জানি! কিন্তু আমার ধারণা ছিলো আপনিও আমার মতন কিছুই জানেন না।’

শুক্লা দিকে স্বজিত তাকালে, ‘কেমন করে বুঝলেন?’
‘পুরুষদের মেয়েরা সহজেই চিনতে পারে।’—শুক্লা হাসলে।

স্বজিত আগ্রহ প্রকাশ করলে, ‘আচ্ছা, আর কী জানেন আমার সম্পর্কে বলুন তো!’

‘তাতে আমার লাভ?’

‘লোকমানই বা কী?’

শুক্লা তাকিয়ে দেখলে স্বজিতের দিকে। স্বজিত বহু একদিন যে নিজেকে আড়ালে বিচ্ছিন্ন করে রাখতো, আশে লে নিজেকে মেলে ধরেছে।

শুক্লা জিগ্যেস করলে, ‘কোথায় যাবেন এখন?’

‘কোথায় আর থাকো বলুন!

‘কেন, বাড়ি, ঘর, সংসার?’

স্বজিত বিমর্ষ কণ্ঠে বললে, ‘আপনি তো সবই জানেন।

ঘর ভেঙে গেছে। ঘরে ফিরতে আর মন চায় না।

হঠাৎ শুক্লা ক্রোড়ে গেলো, ‘তাই কী এসেছেন আমার সঙ্গলাভ করতে? হিঃ, হিঃ, আপনি যে এতো ছোটো আমার তা ধারণাতেই আসে নি। হু’মাসও হয়নি এখনো আপনার স্ত্রী বিয়োগ ঘটেছে, এরই মধ্যে সব স্মৃতি মুছে ফেলে দিলেন?’

শুক্লা হঠাৎ এ ভাবান্তরে স্বজিত বহু অপ্রস্তুত হয়ে ওঠে। কী বলতে কী বলে ফেলেছে বুঝি! অহুনের হয়ে বললে সে, ‘কমা করবেন! আপনার প্রতি ইঙ্গিত করবার মনোভাব নিশ্চয়ই আমার নেই। ভেবেছিলাম আপনার নিঃসঙ্গতার সঙ্গে আমার নিঃসঙ্গতার হয়তো কোনো মিল আছে।’

শুক্লা তখন আপিসের চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছে।

স্বজিত বহু আবার কুণ্ডা প্রকাশ করলে, ‘আশা করি আমার প্রতি কোনো অবিচার করবেন না। আমার কথাগুলো শুধু কোনো অর্থ বুঝবেন না।’

হু’জনেই বের হয়ে এলো ড্যালহাউসি স্কয়ারের আপিস বিল্ডিং থেকে। ড্যালহাউসি স্কয়ার তখন পাতলা।

সন্ধ্যা অতিক্রান্ত। নিরুন্ম হয়ে পড়েছে রাজপথ। একখানা ফাঁকা ট্যাক্সি যাচ্ছিলো।

শুক্লাই তাকে সংকেতে থামালো। স্বজিত বহুকে আহ্বান জানিয়ে বললে, ‘চলুন, আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে যাবো।’

কুণ্ঠিত স্বজিত ট্যাক্সিতে উঠে গেলো। . শুক্লাও।

স্বজিত খানিকটা দূরত্বের ব্যবধান রাখতে একপাশে বসেছে।

সরে বসেছিলো। শুক্লা কিন্তু অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে, ‘এই বয়সে স্ত্রী বিয়োগ, সত্যিই আনবেগায়বেল!’

বিমূঢ় স্বজিত তাকিয়ে দেখে শুক্লার দিকে।

শুক্লার কণ্ঠস্বর আরো আত্ম—আরো সহানুভূতিশীল,

‘আচ্ছা স্বজিতবাবু আপনার ছেলে পুঁলে কটি?’

‘কাকা-বাক্সা সমেত জন ছয়েক।’

‘তাদের দেখা শুনা করে কে?’

‘সেইখানেই তো বিপদ মিস দাস। বড় মেয়েটিই সাবালিকা। তাও বিয়ে হয়ে যাওয়ায় সে এখন পরের ঘরের বউ। নিতান্ত দায়ে পড়ে তাকে এই হু’মাস এনে রেখেছি।’ স্বজিতের গলার স্বর ভারি হয়ে আসে।

‘একটা বয়স মেয়েকে বিয়ে করুন। কাকা-বাক্সাদের তো দেখাশুনা চাই!’

শুক্লা কথায় স্বজিত চমকে ওঠে, ‘ঠাট্টা করছেন? এই বয়সে আবার বিয়ে?’

‘ঠাট্টা করবো কেন? বিয়ে করা ছাড়া আপনার অন্ত উপায়ই বা কী?’

চিন্তরঞ্জন এতেন্ত্র ধরে তখন ট্যাক্সি দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। গাড়ির কাঁকানিতে হু’জনেই হুঁলছিলো। সামনে একখানি দোতলা ভারি বাস এসে পড়ায় ট্যাক্সি ড্রাইভার দ্রুত গতিতে গাড়িটাকে ঘুরিয়ে নিয়েছে। সেই ঘূর্ণীতে স্বজিত একেবারে শুক্লার গায়ের ওপর পড়ে গেছে। ভয়াত শুক্লাও তাকে জড়িয়ে ধরলো।

‘খুব বেঁচে গেলাম। ভীষণ এ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছিলো একুনি।’

মুহূ হেসে শুক্লা বললে, ‘সত্যি কী ছিলো তাতে? কাল আপিসে আমাদের নিয়েই শোকসভা হতো!’

পাঞ্জাবী ড্রাইভার বাসওয়ালাকে ‘অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল দিয়ে আবার গাড়ি চালাচ্ছে।

শুক্লা আর স্বজিত এতোকণে পাশাপাশি সোজা হয়ে বসেছে।



“আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।

চিরদিন তোমার আকাশ, তোমায় বাতাস

আমার প্রাণে বাজায় বাণী।”

বাংলা মায়ের সজল শ্রামল কোলে প্রাচ্যাত্মিক জীবনের ধাঁধায় ঘুরে মরছি—আর মনে ভাবছি কি পেলাম এই জগৎ পরিভ্রমণে? বিশ্বময়ীর যে মাধুর্য অহুপম, তা ছুঁচোখ ভরে পান করেছি—সেই ত পরম সার্থকতা। পার্থিব অভ্যুদয়ের আশালতা ছিঁড়ে পড়েছে—আজ এ বোধ সম্পূর্ণ জাগ্রত—বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়।

পৃথিবীর ইতিহাস এই শিক্ষা দেয়—গতি ঋজু ও সরল নয়, সে বৃত্তাকার। আজ আমরা পতনের গভীর গহ্বর তলে—আজ উদ্ধার অসম্ভব, তথাপি আমরাতির নিবিড় অন্ধকারে—রক্তবীণা বাজাতে হবে—বলতে হবে ভাবীকালের কথা। যে অনাগতকাল আসছে, তাকে মহোজ্জ্বল করতে চাই দধীচির তপশ্রায়। চাই দুর্জয় শক্তিসম্পৎ।

ভারতবর্ষে আজ রিক্তের জয়োল্লাস। যে স্তুভাষচন্দ্র ছিল ভারতের স্বাধীনতা, তাকে ভুলে শুধু চলেছে চক্রান্তের আবর্ত। অন্ধমের হাতে ক্ষমতার দর্প অসহনীয়। তাই এই মহাহুর্দিনে নবীন আশার ধ্বজা হাতে নিয়ে বাঙালীকে চলতে হবে—দুঃখের পথে, দুঃসহ বেদনার মাঝে তাকে লড়তে হবে—জীর্ণতার নাগপাশ ছেদন করে আনতে হবে নব অরুণোদয়—নব জাগ্রত প্রাণে অপরাজিত বাণী প্রকাশ করতে হবে।

“যদি তোর ভাক শুনে কেউ না আসে

তবে একলা চলো রে

একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো,

একলা চলো রে ॥

যদি কেউ কথা না কয়, ওরে ওরে ও অভাগা,

যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে, সবাই করে ভয়—

তবে পরাণ খুলে

ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে ॥”

কবিগুরু এই গান আজ বাংলার প্রতি তরুণ ও তরুণীর কণ্ঠমালা হোক—তারা জীবনের নিষ্ঠুর স্বন্দে লোভের মোহে যেন জড়িয়ে না পড়ে—তারা যেন মনে রাখে বাঙালীকে মৃত্যুর হলহলের মাঝে আনতে হবে অমৃত-বাণী—পূর্ববঙ্গের হেলেরাই ফাঁসির কাণ্ডে মরণের জয়গান গেয়ে স্বাধীনতা এনেছে—আজ সেখান থেকে সেই বীর শহীদগণের পরমাত্মীয়ের দল—তাদের মা ও বোনেরা পথকুকুরের মত রাজপথে আজ একান্ত অসহায়ের মত ঘুরে বেড়ায়—তাদের জ্ঞাত কি আমাদের কোনও কর্তব্য নাই? তাদের ভারত আগমনের পথ রুদ্ধ করে, ক্ষীর সর নদী উপভোগের দুর্কল লোভে পাকিস্থানের সকল অপমান ক্রীষের মত সহ্য করে চলা কি আমাদের উচিত? আর সেই ক্লেশ ও কলুষ থেকে মানুষের দৃষ্টি ফেরাবার জ্ঞাত কেবল চলছে মিথ্যা গরিমার হুকার।

“প্রাণ লভুক সকল ভুবন, নয়ন লভুক অন্ধ।”

অজ্ঞানের অন্ধকারের গভীরতম গহ্বরে থেকে চলছে যে বিলাস সমারোহ—কোটি কোটি টাকা নিয়ে যে ছিনিমিনি খেলা চলছে—তার শেষ যতদিন হবে না—ততদিন বৃথা আশ্বালন।

হে আমার বাংলার ভাই বোন, মনে রেখো তুমি বহুমুখের ভাবধারার উত্তরাধিকারী, তুমি বিবেকানন্দের দীক্ষিত শিষ্য, তুমি রবীন্দ্রনাথ ও অরবিন্দের সাধনার ফল-ভোগী, তোমাকে যেন কেউ ভ্রান্ত না করে। তুমি গড়বে মহাভারত—অথও, অপূর্ব, কল্যাণ-সমৃদ্ধ ভারতবর্ষ। বল, পুনরায় তারস্বরে বল “বন্দে মাতরম্।” ভারত জননীর অঙ্গকে আজ বিধাবিত্ত করা হয়েছে। সেই পাণের প্রায়শ্চিত্ত তোমাদেরই

করতে হবে। তোমরা নির্ভর হও, জ্যোতির্ময় জাগবেনই জাগবেন। ভারতের যে বিধাতা পুরুষ, তিনি গভীর, শুদ্ধ, শান্ত, নিরবিকার, আজকের কলকোলাহলের মাঝে তোমরা ভুল না—তঁার প্রসন্ন প্রসাদ, তাঁর স্নেহঘন আলীকাদ তোমাদের জন্ত অক্ষয় ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ। উদ্ভিষ্টত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।

ভারতের মহামানবের সাগরতীরে হে বীরব্রত সৈনিকের দল, তোমরা ভেরী মঞ্জিত করো—ভারতের শাস্ত্র ও সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা করো—দেবডায়া সংস্কৃতির পীযুষ সর্বমাহুষের দ্বারে পৌছে দাও—ভারতের ব্রহ্মদর্শন সকলের অবিচল মঙ্গলের জন্ত প্রচারিত করো—সেই চিরসারথির চিরায় কর্তাকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করো।

ভাবীকালের হে নায়কগণ! সঙ্কটের দুর্জয় আত্মনাকে তোমরা বরণ করো, ধূলিশয্যা ছেড়ে জগতের জয়যাত্রায় আপন আসন গ্রহণ করো—বল দর্পে, বল বিজয় গর্বে—

“বাঙালির পণ, বাঙালির আশা, বাঙালির কাজ,

বাঙালির ভাষা

সত্য হটুক, সত্য হটুক, সত্য হটুক হে ভগবান্।”

তোমাদের পণ কি? তোমাদের ব্রত কি, হে তরুণ ও তরুণীর দল, তোমাদের কাম্য কি?

তোমাদের পণ এক অদ্বিতীয় অথও ভারতবর্ষের প্রতিষ্ঠা—আসন্ন হিম্মত যে জননীর অঞ্চল প্রসারিত সেই জগন্মোহিনী জগজ্জননীর জ্যোতির্ময়ী আবির্ভাবের জন্ত তোমাদের হবে আয়ত্ন ব্রতসাধন। কিন্তু ভারতীয়তা বাঙালিদেরই পরিপূর্ণি একথা ভুলো না—ভুলো না। বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের স্বধি বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুহীন অপরাধিত বাণী স্মরণ করো—

“চিনিলাম এই আমার জননী জন্মভূমি—এই মৃন্ময়ী-মুক্তিকারুণিণী—অনন্তরত্নকুণ্ডিতা এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা। রত্নমণ্ডিত দশভুজ—দশদিক্ দশ দিকে প্রসারিত, তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত; পদতলে শত্রু বিমর্দিত, পদাঞ্জিত বীর কেশরী শত্রু নিপীড়নে নিযুক্ত—এ মূর্ত্তি এখন দেখিব না—আজি দেখিব না—কাল দেখিব না—কালস্রোত পার না হইলে দেখিব না—কিন্তু একদিন দেখিব—দ্বিগ্ভূজা, নানা-প্রহরণধারিণী, শত্রুমর্দিনী, বীরেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিণী—দক্ষিণে

লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী বিজ্ঞাবিজ্ঞান মূর্ত্তিময়ী, সাথে বলরূপী কার্ত্তিকেশ, কার্য্যাদিক্তিরূপী গণেশ—আমি সেই কালস্রোত মধ্যে দেখিলাম এই সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা।”

অবিবেচনার, লোভে ও দুর্জলতার সে স্বপ্নপ্রতিমা আজ বিধ্বিতা—তাহার সঞ্জীবনের জন্ত চাই মহান তাগ—দুর্জয় সংকল্প, অবিচল উৎসাহ, আর অপরাধের কল্পনা।

তোমরা স্মরণ করো নেতাজীর অনমনীয় বীৰ্য্য। বঙ্কিমচন্দ্রের অব্যর্থ মন্ত্রকে যিনি রূপ দিয়াছিলেন, সেই মহাসাধক সাংঘিক তপস্বীর তপস্তা অহুসরণ করো—সমস্ত সংশয়, সমস্ত ভয়, সমস্ত সংকীর্ণতা দূর হয়ে তোমাদের জীবনে আসবে অকুতোভয়তা, আসবে সর্বজগৎ আলোকিত করার মত ভাস্বর প্রেমের যজ্ঞাগ্নি শিখা।

বর্তমানের সংকোচ, পরিবেশের বিহ্বলতা তোমাদের যেন স্রিয়মাণ না করে—তোমরা দুঃস্থ কাণ্ডে ভ্রাতী, তোমাদের আপন জন হয়ত তোমাদের সাথে চলবে না, কিন্তু তা বলে ভাবনা করা চলবেনা—তোমাদের সম্মুখে রয়েছে কেবল পথ—সীমাহীন দূতর দুল্লভ্য পথ। ছুঁথ করিনা—শোক করিনা। এই অধঃপতন আমাদের প্রাপ্য ছিল—আমাদের নীচতা, আমাদের অপরাধ—আমাদের পাপ আজ ক্লদহন হয়ে দেখা দিয়েছে, একে ভোগ করতেই হবে—কিন্তু তাই বলে নিরাশা নয়। সমস্ত বিরূপতার মাঝে মুক্তকণ্ঠে কবির আন্তরিকতা দিয়ে বলব—এ ছুঁথ চিরন্তন নয়। এ ক্রন্দন শাস্ত্র নয়। নূতন আলোক জাগবে—আসবে অভয়, আসবে অশোক, জগৎ সভায় আবার বাঙ্গালী শ্রেষ্ঠ আসন নেবে।

বিশ্বমানবতার পটভূমিকায় আমরা আজ গড়ব আমাদের অভ্যুদয়ের মন্দির। এই বাংলার মাটিতে আমরা বলিষ্ঠ ও ত্রুটিষ্ট বাঙ্গালী চরিত্রের প্রতিষ্ঠা করব, বাংলার সংস্কৃতিকে সাম্রাজ্যবাদীর আত্মসর্ব্ব্ব নিষ্ঠুর নিপীড়ন থেকে আমরা বাঁচাবো—ইসলাম একদিন বাংলাকে ভোবাতে চেয়েছিল সেদিন চৈতন্যদেব এনেছিলেন মহাজাগৃতি—বৃটিশের সাম্প্রতিক এবং রাষ্ট্রীয় সংঘাতের মূলে বঙ্কিমচন্দ্র এনেছিলেন অনন্তসাধারণ ও অদ্বিতীয় উজ্জীবন—আর আজ এক নবনির্ধাতনের সন্ধিক্ষণে আমাদের আত্মস্থ হতে হবে।

বর্তমান আক্রমণ একান্ত গুরুতর—কারণ আক্রমণ-কারীর হাতে শুধু ক্ষমতার বজ্র আছে তাহাই শুধু নয়—তাহার মধ্যে ভারতীয়তার ঐক্যবোধের এক ভাগ আছে। আজ তাই প্রতিরোধ সর্বত্র হয়ত স্বতঃস্ফূর্ত হবেনা—বহু লোকেই বিভ্রান্ত হয়ে যাবে—আত্মীয়-বিরোধ মনে করে বিক্ষিপ্ত-চিন্ত হবে।

কিন্তু এখানেই আমরা যেন স্মরণ রাখি—ঐক্য ও সমন্বয়ই ভারতধর্ম। কিন্তু সে সমন্বয় বহুকে অস্বীকার করে নয়—সে বিচিত্রকে পূর্ণতায় পরিপূর্ণ করে সফল হয়। যে নেতৃমণ্ডল বাংলার অবদান এবং বাঙ্গালীকে অস্বীকার করে পশ্চিমের অহুতরণে এক অপভ্রাত সৃষ্টিতে ব্যস্ত তাহাদের সহিত সহযোগিতা করতে যাওয়া মূর্খতা।

আমি বাংলাকে এবং বাঙ্গালীকে বলব—বাঙ্গালীর নেতৃত্ব এবং বাঙ্গালীর মনীষা আজ স্রিয়মাণ মনে হতে পারে—কিন্তু এই বাংলায় এই বাংলার মাটিতেই হবে সে নবযুগের সূচনা।

সে নবযুগের মস্ত ঈশান কখন আপন বিাণ বাজাবেন কেহ তা জানে না—সেই মহামহোৎসবের কোনও আয়োজনই আজ আর চোখে পড়েনা—কিন্তু তবু সেই ইচ্ছিত দেখতে পাচ্ছি।

বাংলাকে হোমায়ি জ্বালাতে হবে তার আপন প্রতিভার বেলীম্লে। ভারতবর্ষকে নব জীবন দিয়েছে বাঙ্গালী—বাংলার রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, সুভাষ, রবীন্দ্রনাথ ও অরবিন্দ নব ভারতের স্রষ্টা ও ব্রষ্টা। তাদের পথেই বাঙ্গালীকে চলতে হবে। বাংলার সাধনা, বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য, বাংলার সংস্কৃতিকে আমরা কিছুতেই তুলতে পারিনা।

জীবন রথের সারথিকে নমস্কার করে আজ নূতন তপস্রায় ব্রতী হতে হবে। চারিদিকে বিপদের ঝঞ্ঝা—কাতরতার আন্তি—মৃত্যুর জগবম্প, এই শ্মশানেই মুণ্ডমালিনী বরাহরদায়িনী চণ্ডিকার পূজা করতে হবে—মাতৈঃ মায়ের সন্তানেরা, তার আবির্ভাব-সমারোহ দিকদিকান্তে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে—ভারত কলঙ্কশূন্য হয়ে মহাভারত হবেই হবে। আমার অহুরাগী পাঠক হয়ত ভাবছেন—ধান ভানতে শিবের গীত কেন? তাদের বলব তা নয়।

পাশ তুমি, পাশ জনের সখা হে

পথে চলা সেইত তোমায় পাওয়া।

যাত্রাপথের আনন্দগান যে গাহে

তারি কণ্ঠে তোমারি গান গাওয়া।

পথে চলেছি পথিক। কিন্তু সে যাত্রা ত তুমার পানেই যাওয়া। বাংলার সায়িক, বাংলার কবি, বাংলার তপস্বী যে মহাভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন—যে মহাভারতের জাগরণের কথায় আত্মোৎসর্গ করেছিলেন—যে ভারতের সত্য ও চিন্ময় বাণী প্রচারে দেশে দেশে ঘুরে এলাম—সে ভারতবর্ষ কোথায়?

কোথাও নেই! ফিরে এসে দেখলাম—পরিকল্পনার মোহময় নামে ভারতের ধনসম্পৎ অপব্যয়িত হচ্ছে—ভারতের অন্ধ মূঢ় মুক্ মাছুষদের জাগরণে অর্থব্যয় না করে—আতপনিয়ন্ত্রিত হোটেলের জন্ত, বৈদ্যুতিক রেলওয়ের জন্ত টাকার হরির লুট হচ্ছে, তখন বুকলাম—আমরা পতনের গুহাতলে ছুটে চলেছি—আর এই অধোগতি দুর্নিবাধ্য—কারণ অধোগামী বিমুঢ়তায় স্বপ্ন দেখছে যে তার উদ্ধাতি-সরণ হচ্ছে।

কোথায় তবে পথ? কোথায় মুক্তি? কোথায় ব্যাধির ঔষধ? আমি যে নিদানের কথা বলছি—অনেকের হয়ত তা ভাল লাগবে না—কিন্তু যা আমার সত্য অহুত্ব—সমানধর্ম্য সংবেদনশীল মানুষের জন্ত সেই কথা, একান্ত বিশ্বাসে লিপিবদ্ধ করছি—জানি পৃথিবীতে কিছুই হারায় না।

আজ দেশে চাই চরিত্র ও ঋত। আমাদের কলঙ্কিত জীবনের কোথাও আজ নেই স্বস্থ মানবতা। রাষ্ট্রে, সমাজে পরিবারে এবং ব্যক্তিতে ষোলমানা ঘুণ ধরে গেছে। ধনমোহ স্বার্থ ও লোভ দেশের মেরুদণ্ডকে বাঁকিয়ে দিয়েছে, সর্বীক্সে দূষিত কৃত, মন পীড়িত ও ব্যাধি কাতর।

আজ বিবেকের জাগরণ চাই। কলুষ-নাশন ভীষণতা চাই। সকল পাপহর প্রেমের উদ্দীপনা করতে হবে। সংশয় উদ্ভ্রান্ত আমাদের আশ্রয়—ভারতের যুগসঞ্চিত ধর্ম বোধ।—ভারতের সেই সংস্কৃতিকে যদি প্রতিষ্ঠা করতে পারি, তবেই দেশে আসবে মহাশান্তি এবং মহাপ্রেম।

কিন্তু ভারত-সংস্কৃতি তার মুহূর্ত্তর মহিমা পাবে বিচিহ্নের সমন্বয়ে। বাঙ্গালীকে তাই সত্যকার বাঙ্গালী

হতে হবে—শিখকে শিখ হতে হবে—নরনারীকে হতে হবে সরলী। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যেক লোককে পরিপুষ্ট হয়ে সমগ্র ভারতকে পরিপুষ্ট করতে হবে।

কিন্তু তা ঘটছেনা—বাংলা দেশ সবচেয়ে সমস্তা-লঙ্ঘন—বাঙ্গালীর ছেলেরাই দেশে দেশে মৈত্রীর বন্ধন প্রতিষ্ঠা করে ভারতের স্বাধীনতা এনেছে।

অতএব বাঙ্গালীকে আত্মহু হতে বলা দৃশ্যীয় নয়। একান্ত কর্তব্য। এটা বিরোধের কথা নয়—প্রদেশিকতার কথা নয়, মৃত্যুর ঘানি মিলিন বাংলার পুনরুজ্জীবনের কথা। বাংলার এই ঘোর দুর্দিনে এই ভাবে কেহ ভাবেন না। কেবল অধ্যাপক মোহিতলাল মজুমদার এই ধরনের চিন্তা করতেন। সে চিন্তাকে আজ বহব্যাপক করতে হবে। বাঙ্গালী একদিন ভারতের চিন্তানায়ক ছিল—সর্ব-কর্মে অগ্রণী ছিল—সেজ্ঞা মজ্ঞাত যে ঈর্ষ্যা ও হিংসা তা আজ নয় হয়ে প্রকাশ হয়েছে—এই সত্যকথা সবাই জানি অথচ ভয়ে ভয়ে সে কথা কেউ বলি না। এই ভয়ই আমাদের চরম পরাজয়। এই ভয়কে দমন করে অভয়-বীর্যের উপাসনা করতে হবে।

কতিপয় রাজনীতিক ছাড়া শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবানরা ভারতবর্ষের উজ্জীবনে বাংলার অবদানকে প্রকাশ্য স্বরণ করেন। সেই অগণিত সংস্কৃতি-উপাসক সাধারণ মানুষের স্রীতি ও প্রেমের উপরই বাংলার বুদ্ধির সংগঠন শক্তি, ভাবাবেগ সমৃদ্ধ সাধনাকে পরিচালনা করতে হবে। বাংলা মরেনি, মরতে পারেনা এবং মরবে না—সেই অনাগত কালের স্রষ্টাদের অভিনন্দন জানিয়ে আনার শেষ প্রহরের সমাধান করছি।

জীবনের মহৎ পরিক্রমায় আসছে প্রাণহিলোলে হিলোলিত অমৃত রস, আসছে নব নব মাধুরী। মঙ্গলের শব্দধ্বনি বাজছে—তার মুহূ নিমগ্ন আসছে তাই 'ভবিষ্যতের পানে চাহি আশা-ভরা আত্মদান' সন্তাপহরণ নব উদ্বোধনের অসীম সম্পদ ও অসীম মহিমা বাঙ্গালী কোটি কণ্ঠেই গাইবে—স্বন্দরের উপাসনা তার শক্তির উপাসনা হয়ে আনবে সংহতি, আনবে অমিতবীৰ্য্য, আনবে অপরা-জয় সাধনভূমি ভিত্তি। সেই তিমিরবিদারী উদার অত্যাশ্রয় বহুদূরে নয়, বহুদূরে নয়।

আমার বেদনায় কোভের স্বর বেজেছে, কিন্তু সে স্বর ঈর্ষার নয়, ঘৃণার নয়, সে হল মহুগ্ধের। অজ্ঞায়কে নইতে আমাদের ঋষিরা বারণ করেছেন। কিন্তু এই প্রতিরোধ ত বড় কথা নয়।

বিশ্বমাতৃষের প্রেমমগ্ন সঙ্গলাভ করে যে বার্তা এনেছি হৃৎখতপ্ত দেশে, সে বার্তা মিলনের—সেবানী প.ম প্রেমের। নবীন সামরিকারে বিশ্বজগৎ বন্ধুত্ব হয়ে উঠবে। সার্বভৌম মৈত্রীর পতাকা হস্তে আমরা বিশ্বজনীনতার জয়ধ্বনি করব। বনব জয় জগৎ—সর্বজগতের বিজয় হোক, সর্বমাতৃষের মঙ্গল হোক।

তার অগ্ৰ চাই শিক্ষা। বাগদাদের একটি ইংরাজী কাগজে এই কথাই বসেছিলাম—জগতের মাতৃষকে এক করতে চাই এক ভাষা, এক বর্ণমালা, এক ধরনের শিক্ষা দিয়ে। পৃথিবীতে ইংরেজী ভাষাই সর্বাধিক প্রচারিত জগজনের ভাষা হওয়ায় সুযোগ ও ভাবগোঁরব তারই—তাই ইংরেজী বঙ্গবনের কথা আমাদের মরণের পর—ইংরেজীকে ভারতের সর্বমাতৃষের ভাষা করলেই ভারত জগৎসভায় সকলের সাথে চলতে পাবে অবার সুযোগ। রোমক লিপির ইংলিশ, তার রদবদল করে ভারতীয় সমস্ত ভাষা লেখা যাবে—কলে টাইপ রাইটার, লিনোটাইপ প্রভৃতি আধুনিক বাস্তবিক যুগের সকল সুবিধা আমরা পাব।

কিন্তু তাই নয়—শুধু লিখতে হবে বিশ্বমাতৃষের সমান স্বার্থের দৃষ্টিভঙ্গিতে পৃথিবীর ভূগোল ও পৃথিবীর ইতিহাস। 'জগৎজুড়ে এক জাতি—দে জাতি মাতৃষ জাতি—এটা শুধু কাব্য হলে চলবে না, এটা হবে প্রতি মাতৃষের ধ্যান, কল্পনা ও মননের বস্তু। নমস্কার করি বিশ্বমাতৃষের দেবতা বৈশ্বানরকে ঋষি সংবননের অমোঘ মন্ত্র আজ সফল হোক—জগতের মাতৃষ এক পথে চলুক, একই কথা বলুক। এক হোক তাদের মন্ত্র, এক হোক তাদের আরাধনা—এক হোক তাদের সমিতি। সব সংঘাতের নিবৃত্তি এই সুগভীর ঐক্যে—এই প্রেমের মাতৃষের পরমা নিষ্ঠুরি। হে বিশ্বপাবন! পাপক্ষালন! তে মার অমোঘ আশীর্বাদ বাজা করি—দেবজন্মের দিব্যজীবনের এই স্বপ্ন সত্য হোক, স্বন্দর হোক ও সার্থক হোক।



অপরাহ্ন



হরিনারায়ন চট্টোপাধ্যায়

পা মুড়ে বসে ফিরোজাবাদি তানপুরা তুলে নিল। এতক্ষণ ধরে স্বর বাঁধছিল। এইবার মনের মতন হয়েছে।

গান শুরু করার আগে মুখ তুলে একবার জমজমাট আসরের দিকে দেখে নিল।

তাকিয়ায় হেলান দিয়ে রায়-বেবিলির ছোট নবাব। চারপাশে পারিষদ আর বয়স্ক। যখন বসেন, এইভাবেই বসেন, বয়স্ক-পরিবৃত হয়ে। বলেন, সঙ্গীত হচ্ছে আস-মানের জিনিস। খোদাতায়া দান। এ জিনিস একলা ভোগ করলে গুনাহ্ হয়। সবাইকে নিয়ে উপভোগ করতে হয়।

এ লোকটা সত্যিই সঙ্গীত-পাগল। যতক্ষণ ফিরোজাবাদিয়ের গান চলে, ছুঁচোখ বন্ধ করে বসে থাকেন। মনে হয় ডুব গেছেন স্বরের সাগরে। সাড় নেই, চেতনা নেই।

ফিরোজাবাদিয়ের নিখুঁত রূপ, নিটোল বোঁবন কোথায়

তলিয়ে যায়। শুধু অপরাণিন্দিত কণ্ঠ। স্বরের গমকে গমকে ওঠানামা করে।

ঝাড়ের বেলোয়ারী কাঁচগুলোর পর্যন্ত একটু শব্দ হয় না। বাতাসও যেন তাদের স্পর্শ করতে ভয় পায়।

শুধু সমের মাথায় ছোট নবাবসাহেবের তারিফ শোনা যায়। কেয়াবাত, কেয়াবাত, শোভানাল্লা।

ফিরোজাবাদি মুচকি হেসে হাত মাটিতে ঠেঁকিয়ে কুর্শি করে আবার গানের তরঙ্গে ভেসে যায়।

সবাই ছোট নবাব নয়। অন্তলোকও আসে। অন্ত ধরনের মানুষ। সবাবে বে-এক্জিয়ার, টলতে টলতে কোন রকমে আসরের ওপর বসে পড়ে। স্বরের লহরীতে তাদের আসক্তি কম। তারা আসে রূপের মহিরা পান করতে।

পরে শুধু ফিরোজাবাদি বললেই চক এলাকার সবাই চিনতে পারত, কিন্তু প্রথম প্রথম বলতে হত ফিরোজাবাদি

কৈজাবাদী। কৈজাবাদ থেকে এসেছিল বলে। নিজে আসে নি, এরা নিজে আসে না। তবলচি ইকবাল রহুল নিয়ে এসেছিল।

তখন সারা চক জুড়ে আর এক ফিরোজাবাদিয়ের প্রতিপত্তি। ঠুংরি আর গজলের রাণী। দূর দূরান্তর থেকে রহিম আদমিরা গান শুনতে আসত।

সবাই বলল, তোমার নাম হোক ছোট ফিরোজাবাদি। এই নামে একজন যখন রয়েছে।

তব্বী ফিরোজাবাদি বেকে দাঁড়িয়েছিল। স্নাকৃষ্ণিত কবে বলেছিল, ছোটটি? ছোটটি কেন? তার মানে মোড়ের ওই ফিরোজাবাদি বড়? কিসে বড়? গানের গলায় না রূপযৌবনে?

ভঙ্গী দেখে কেউ আর এ নিয়ে আলোচনা করে নি। ফিরোজাবাদি নিজেই নিজের নাম দিয়েছে ফিরোজাবাদি কৈজাবাদী।

বেশীদিন এ নাম ব্যবহার করতে হয় নি ফিরোজাবাদিকে। তিন বছরের মধ্যেই বড় ফিরোজাবাদিয়ের এস্তকাল হয়েছিল। বিচিত্র মৃত্যু। জলসার আসরে গান গাইতে গাইতে গলা চড়াতে গিয়ে বুকে একটু ব্যথা। প্রথমে সামান্য, তারপর অসহ্য যন্ত্রণায় সারা মুখ আরক্ত হয়ে উঠেছিল।

আসরের ওপরই চলে পড়েছিল, আর ওঠে নি।

ফিরোজাবাদি চলে যাবার পর, কৈজাবাদী বলার এই ফিরোজাবাদিয়ের আর প্রয়োজন হয় নি।

চোখের সামনে ছবির মত ভেসে ওঠে। ইকবাল রহুল এনেছিল বটে, কিন্তু সঙ্গে থাকে নি। বড় বড় আমীর ওমরাহদের ভীড়ে সে হারিয়ে গিয়েছিল।

ইদানিং বয়সও হয়েছিল। তবলায় সব বোল কোটাতেও পারত না। হাত কাঁপত। তাল কেটে যেত। কাটকে কিছু না বলে নিজেই সরে গিয়েছিল।

ফিরোজাবাদি ভেবেছিল ইকবালের অল্প তার কষ্ট হবে। অনেকদিনেব সম্পর্ক। মালুঘটা বুঝি মজ্জায় মজ্জায় মিশেছিল।

কিন্তু না, অল্প কিছুদিনের অল্প ফিরোজাবাদি একটু অন্তমনস্ক হয়ে পড়েছিল, তারপরই সামলে নিয়েছে নিজেকে।

না সামলে উপায়ও ছিল না। কাণপুরের কামতা-প্রসাদ তখন আসাযাওয়া করছেন। বিরাট ধনী। এক এক রাতের মুজরায় আশাতীত খরচ করেন। তাঁর অর্থের বন্ধারের মধ্যে মধ্যবিত্ত একটা মালুঘের তবলায় বোল কোথায় হারিয়ে গেল। তারপর তবলচী এসেছিল মিশিরলাল। বেনারস থেকে। ফিরোজাবাদিয়ের গুরু-দেবের চিঠি নিয়ে।

ছোকরা বয়স, কিন্তু এলেম আছে মিশিরলালের। হাতের ছোয়ায় তবলায় মেঘের গর্জন তুলত। মিশিরলালের সঙ্গত ছাড়া ফিরোজাবাদিয়ের গান জমত না।

সেদিনও তাই ফিরোজাবাদি আড়চোখে মিশিরলালের দিকে একবার দেখল।

আসরে টু শব্দ নেই। সবাই উম্মুখ।

হাত জোড় করে ফিরোজাবাদি গুরুকে প্রণাম করে গান শুরু করল। স্বরেনা কণ্ঠে থাপাজ ঠুংরি। বাল-মওয়া, মেরে পুট খোল গয়ি।

ছোট নবাব সাহেবের দুটি চোখ নিমীলিত। গানের তালে তালে শুধু মাথাটা অল্প অল্প হুলছে। বরজদেবও সেই অবস্থা।

প্রায় ঘণ্টাখানেক ফিরোজাবাদি যেন সকলের চেতন-হরণ করল। গমক, মীড়, গান, রমকের অপূর্ব লীলা নৈপুণ্যে শ্রোতার মনোহিত। বোলতান, পলটতান, ছুটতানের নিপুণ কারুকার্য। উদার, মদার, তারায় অবলীলাক্রমে বিহার করণ কর্তব্য।

গান শেষ হতে নবাবসাহেব সব চেয়ে আগে ইনাম ছুঁড়ে দিলেন রূপোর থালায়। সিন্ধের কুমালে বাঁধা আশরফি। তারপর অল্প সকলে টাকা দিল। এটাই রেওয়াজ।

এই রেওয়াজ না মানার জন্ত একবার কুরুক্ষেত্র কাণ্ড হয়েছিল।

ফিরোজাবাদিয়ের স্পষ্ট মনে আছে ঘটনার খুঁটিনাটি।

আসরে নবাবসাহেব ছিলেন। অবজ্ঞা তখন তাঁর পড়তি অবস্থা। তবু শের শেরই। আর ছিলেন মনোহর পুরী। কোটিপতি বাপের শিবরাত্রির সলতে। কাপড়ের মিল, তেলের কল, মাঝারি ব্যাক একটা, তার ওপর আখের চাষ তো ছিলই। উত্তর ভারতে সুরেন্দ্র পুরীকে

বাগিচাকম্বলে লোকে একডাকে চেনে। মনোহর পুরীর জন্ম বাপের পরমা ওড়াতে।

ফিরোজাবাদি মালকোব রাগে একটা খেয়াল শেষ করতেই তারিফের ঝড় বয়ে গেল, তারপরই গুণগোল শুরু হয়েছিল।

মনোহর পুরী ক্রমালে বাঁধা টাকার তোড়া ছুঁড়তেই মাঝপথে ছোট নবাব লুফে নিলেন। দু'এক মুহূর্ত তোড়াটা হাতে রেখেছিলেন, তারপরই ফেলে দিলেন আসরের বাইরে।

কর্কশ একটা শব্দ করে টাকাগুলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

তার চেয়েও কর্কশ শব্দ করে মনোহর পুরী কথো দাঁড়াল।

ছোট নবাব নিরুত্তেজ, শাস্ত কণ্ঠে বললেন, আসরের একটা নিয়ম কানুন আছে, সহরত আছে, সেটা না জেনে আসরে ঢোকা উচিত নয়। বয়স কম বলে কিছু বললাম না, তা না হ'লে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দিতাম।

মনোহর পুরী বেশ কিছুক্ষণ চোঁচামেচি করল, কিন্তু জ্বিধা করতে পারল না। কারণ সে একেবারে একলা, আর ছোট নবাবের সাঙ্গপাঙ্গ অনেক।

ফিরোজাবাদি রীতিমত ভয় পেয়ে গিয়েছিল। এইবার বুঝি একটা খুনোখুনি, রক্তারক্তি কাণ্ড হবে। এ আসরে সেটা স্বাভাবিক।

কিন্তু হয়নি। মনোহর পুরী টলতে টলতে আসর ছেড়ে চলে গিয়েছিল। যাবার মুখে শুধু বলে গিয়েছিল—এর বদলা সে নেবেই না। উপযুক্ত প্রতিশোধ।

দিন দুয়েক পরে প্রতিশোধ নিরেছিল। প্রতিশোধের ধরণটা এই রকম হবে ফিরোজাবাদি ভাবতেও পারে নি।

এক দুপুরবেলা একেবারে অসময়ে মনোহর পুরী এসে হাজির। ফিরোজাবাদি শুয়েছিল। একজন পরিচারিকা হু হাতে মেহ্নী মাথিয়ে দিচ্ছিল। চোখে তজ্জার ভাব আসতেই ফিরোজাবাদি মাথাটা ঝেঁকে নিয়ে ঘুমটা স্মরণে দেবার চেষ্টা করছিল। দুপুরে ঘুমালে শরীরটা ম্যাকম্যাক করে। আসরে বসার মন থাকে না। তা ছাড়া চর্বির বলয় জমে পেটের চারপাশে। মৌলদর্ষের অপমৃত্যু।

মনোহর পুরীর আসার খবর শুনে বিরক্ত হল। ক্র

কুঁচকে বলল, এখন দেখা করতে এসেছেন? এই অসময়ে?

চক দ্বিদের বেলা কেউ ঢোকে না। দ্বিদের চক যেন কবরভূমি। সাড়া নেই, শব্দ নেই, নিশ্বাস। চক রাগে জাগে। গানের সুরে, ভাবের ঝঞ্ঝারে, ফুলের সুবাসে চকের নবযৌবন শুরু হয়।

বিশেষ দরকার। মিনিট পাঁচেকের বেশী বিয়স্ত করবেন না।

মন না চাইলেও ফিরোজাবাদিকে উঠতে হ'ল।

এ জীবিকায় মনকে আমল দিলে চলে না। মন অনেক কিছুই চায় না। বিদ্রোহ করে, বঁকে বগে। তবু তাকে শাস্ত করতে হয়। তার অস্তিত্ব ভুলতে হয়।

বিশেষ করে রহিস আদমিদের চটালে এ পেশার পক্ষে ক্ষতিকর।

একটু প্রসাধন সেরে ফিরোজাবাদি গিয়ে দাঁড়াল।

মনোহর পুরী একটা চেয়ারের হাতল ধরে দাঁড়িয়েছিল। পায়ের শব্দে মুখ ফেরাল।

ফিরোজাবাদি কুনিশ করল। মুখ থেকে অসন্তোষের শেষ রেখাটুকুও মুছে ফেলল, তারপর যৌবনপুষ্ট দেহের খাঁজে খাঁজে হিলোল তুলে বলল, কি ব্যাপার হজরত, দাসীকে অসময়ে স্মরণ করেছেন!

মনোহর পুরী দু পা এগিয়ে এল। তার শরীর বেশ টলছে। এই ভয় হুপুরেও বে-সামাল অবস্থা।

তোমার সঙ্গে একটা দরকারী কথা আছে ফিরোজা।

বলুন। গরীবাইন আপনার সামনেই হাজির।

ওই বুড়ো শিয়ালকে তুমি ছেড়ে দাও ফিরোজা। ওর নবাবী তো খতম। ধারদেনা করে ফুঁতির পরমা জোটাচ্ছে। আর কদিন আসবে তোমার কাছে। তুমি আমার হও। আমি তোমায় রাগীর হালে রাখব। আমিনাবাদে আমার দু খানা বাড়ী রয়েছে। তার একখানা লিখে দেব তোমার নামে।

এই ভাবে নির্জন দুপুরে লোভের পর লোভের আগুন জালিয়েছিল মনোহর পুরী। সেই আগুন ফিরোজাবাদিদের মুখটা উজ্জ্বল করে উঠছিল কিনা আভ্যুত্থানে চেয়ে চেয়ে সেটা পরখ করার মতন খেয়াল মনোহর পুরীর ছিল।

দু-এক মুহূর্তের দ্বিধা আর ইতস্তত ভাব। পায়ের

আঙুল দিয়ে মেঝের ওপর কিছুক্ষণ ঘবল। ছোট নবাব-সাহেবের পড়তি অবস্থার কথাটা তার অজানা নেই। আজকাল উপঢৌকন দেওয়া আশরফি-গুলো কি করে সংগৃহীত হচ্ছে তার ইতিহাসও ফিরোজাবাদিয়ার জানা।

কথায় কথায় ছোট নবাব সাহেব হাজার ছাড়ার চেষ্টা করেন, বুড়ো হ'লেও শের শেরই থাকে।

হয়তো থাকে, কিন্তু নখদস্তহীন, হাবির অধর্ব সেই ব্যাত্তের ব্যাত্ত থাকে না। অমিত তেজ, শক্তি, সাহস সব অন্তর্হিত, শুধু অতীতের কৌলীজ-নির্ভর পক্ষ সেই শেরের ওপর ফিরোজাবাদিয়ার লোভ কম।

কেবল ফিরোজাবাদিয়ার কেন, সারা চক এলাকাটার দস্তুরই আলাদা। এখানে অর্থই মনুষ্যত্ব। যেমন বাদীজীদের যৌবনই জীবন।

মনোহর পুরীর হাতে অটল পয়সা। উঠতি বয়স, উচ্ছ্রাঙ্ক মন। এদের প্রসাদখণ্ড হতে পারলে ফিরোজাবাদিয়ার চিন্তা করার কিছু থাকবে না।

কি ফিরোজা, রাজী!

অভিষ্ঠ মনোহর পুরী মেঝের ওপর নাগরা ঠুকল। অসহিষ্ণু আরবি ঘোড়ার মতন।

শুধু বুকি পলকের জন্ত, ছোট নবাব সাহেবের জরা-রেখাক্তি মুণ্ডা ফিরোজাবাদিয়ার মানসপটে ভেসে উঠল। অসহায়, ক্লান্ত মুখ। তারপর ফিরোজাবাদি মনোহর পুরীর দিকে ণ্ণে বিলোল কটাক্ষ করে বলল, আমি তো চির-দিনই আপনার।

ছোট নবাবসাহেব গেলেন, এল মনোহর পুরী। মনোহর পুরীও থাকল না।

বাদীজীর জীবনে কেউ থাকলেই সর্বনাশ। ছলা, কলা, বিলাস, বিভ্রম সব সাময়িক। বিশেষ কোন ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে অহুত্বিত প্রকাশ পেলেই বাদীজীর মৃত্যু। প্রেম, ভালবাসা, ঐকান্তিকতা ও সব কথার চক এলাকায় কোন দাম নেই। যারা দাম দেয়, তারা মরে।

এদের জীবন শুধু ভেসে যাওয়া। তরঙ্গ ছুঁয়ে ছুঁয়ে। তরঙ্গ পার হয়ে দীপের জীবন যারা খোঁজে, তারাই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

মনোহর পুরী থাকার জন্ত আসে নি। গান তার কোনদিন ভাল লাগে নি। তার আসক্তি যৌবনপুঞ্জিত

দেহে। তাই ফিরোজাবাদিয়ার আসরে বসল বটে, কিন্তু চর পাঠাল এদিক ওদিক। আনকোরা বেহলতার অহুসন্ধান।

জুটেও গেল! দিল্লী থেকে সিনেমার অভিনেত্রী যমুনা এসেছিল স্টুডিওর ব্যাপারে। মনোহর পুরী তাকে সিনেমা ছাড়িয়ে নিজের কুক্ষীগত করল।

কোন ক্ষোভ নয়, দুঃখ নয়, গানের অস্থায়ী, অন্তরা, আভোগ, সকারীর মতন মানুষের এ আশা যাওয়ার ফিরোজাবাদি যথেষ্ট অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল।

তারপর হৃদয় মীরাট থেকে এল বেগী প্রসাদ।

লম্বায় ছ-ফুটের কাছাকাছি। অগ্নিবর্ণ, প্রদীপ্ত লোচন। বয়স একেবারে কম।

গান শোনবার ভাগ করে এল, কিন্তু কয়েকদিন যেতেই অল্প কথা শোনাল।

মস্ত বড় তালুকদার। অধিক পরগণা জুড়ে তার জমিদারী। এ ছাড়া ব্যবসাও আছে। মাথার ওপর কেউ নেই। বাপ যাবার পর মার দিন কাটে ঠাকুরদেবতা নিয়ে।

বেশ মনে আছে ফিরোজাবাদিয়ার। বাইরে কিব্বি-কিব্বি বর্ণণ। জানলায় জানলায় চিক ফেলে দেওয়া হরেছে। ঘরে আর কেউ নেই। শুধু ফিরোজাবাদি আর বেগী প্রসাদ। সামনে খালার ওপর আশরফি নয়, রাশীকৃত ফুল। বেল, জুই, চামেলী। ফুল ছাড়া বেগী প্রসাদ কখনও আসে না।

ফিরোজা! বেগী প্রসাদের কণ্ঠ আবেগতরল।

বল। কোন গানের করমায়েসের জন্ত অপেক্ষা করছে এমনই ভঙ্গীতে ফিরোজাবাদি উত্তর দিল।

আমি তোমাকে বিয়ে করব ফিরোজা। আমার ঘরের বৌ হবে তুমি।

আচমকা শব্দচূড়ের ছোবলেও বুকি ফিরোজাবাদি এত বিচলিত বোধ করত না। এত সমস্ত।

তোমার মাথা খারাপ হয়েছে প্রসাদ। তুমি হেঁকিম দেখাও।

ফিরোজা বাদি প্রশ্নটার পাশ কাটাল।

না, না, মাথা আমার ঠিক আছে। এ নরকে আমি তোমাকে থাকতে দেব না।

নরক! ফিরোজাবাদি হাসল। এ নরক নয়, এ

আমাদের স্বর্গ। বাদ্জীদের বেহেস্তে। আমরা ছোটবেলা থেকে এই স্বর্গের সান্নিধ্য পাবার আরাধনা করি।

বেণীপ্রসাদ আর কিছু বলল না। চিক সরিয়ে বাইরের মেঘপুঞ্জের দিকে চেয়ে রইল।

কিন্তু ফিরোজাবাদ্জি প্রমাদ গণল। এ সব বিকারের লক্ষণ। এ লক্ষণ ভাল নয়।

আসরে এস, গান শোন, ফুটি কর, বাড়ী যাও। এই রেওয়াজ। এখানে এই সুর। এই গৎ। অল্প সুরে কেউ কিছু বললেই চিন্তার কথা।

মাঝে মাঝে বেণীপ্রসাদ ফিরোজাবাদ্জিকে নিয়ে মাইরেও বেরিয়েছে। চারদিক পর্দা দিয়ে ঘেরা টাঙ্গায় চড়ে। ভুলভুলাইয়া বাগ, ইমামবাড়া, শা নাজফ, গোমতীর ধার।

লেখানেও কিন্তু পাগলামী। এক কথা।

উদ্‌ কবিদের লেখা বয়ে শুনিয়েছে। প্রেমসীকে নিয়ে নীড় বাঁধার ছন্দোবদ্ধ স্তব।

ফিরোজাবাদ্জি অল্প কথা বলেছে। নতুন অলঙ্কারের কথা, নতুন পরিচ্ছদের ফিরিষ্টি, মাসোহারার অঙ্ক।

অতিষ্ঠ ফিরোজাবাদ্জি অল্প পথ ধরল। বাক্য পথ।

শরীর খারাপের অভ্যুত্থাতে বেণীপ্রসাদের সঙ্গে দেখা করা বন্ধ করে দিল। দরজা থেকে বেণীপ্রসাদ ফিরে ফিরে গেল।

তারপর একদিন ফিরোজাবাদ্জিয়ের লোক গেল বেণীপ্রসাদের কাছে। স্পষ্ট কথা। আর তার সঙ্গে দেখা করা ফিরোজাবাদ্জিয়ের সম্ভব নয়। মাসোহারার নজরানা দুটো বাড়ালেও, নয়।

বেণীপ্রসাদ চূপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনল, একটি কথাও না বলে। যখন মুখ তুলল, হুটোখ জলে ভর্তি।

বেণীপ্রসাদ আর আসে নি। বাদ্জীদের জীনে কাপের প্রয়োজন নেই। এখানে শুধু বিনিময় প্রথা। একজন দেবে, আর একজন নেবে। এই দেহ, এই সুর, এই জীবন—সবই টাকার মূল্যে ক্রয় করা সম্ভব। কিন্তু দেহ ছাড়িয়ে, বাইরের জীবন পার হয়ে যারা মনের দিকে হাত বাড়াবার চেষ্টা করবে, তারাই ঠকবে। এখান থেকে তাদের সরে যেতে হবে।

শালায়ামের গোকুলনারায়ণ লঙ্কো এসেছিল জমিদারিয়

কাজে। জমিদারির কাজ চলেয় গেল। এক রাত গান শুনতে এসে সে ফিরোজাবাদ্জিয়ের আসরে বাঁধা পড়ল।

খানদানী ঘরের ছেলে। সুগায়ক। এক সময়ে খুব রেওয়াজ করত, কিন্তু ফিরোজাবাদ্জিয়ের কণ্ঠে ভৈরবী ঠুংরি আর দরবারি কানাড়ায় খেয়াল শুনে নিজের টুপি খুলে কার্পেটের ওপর রাখল।

এই সময়টা ফিরোজাবাদ্জিয়ের যৌবনের মধ্যাহ্ন। অগ্নিশিখাকে ঘিরে উন্নত পতঙ্গের দল আত্ম-নিলয়ের ত্রুত গ্রহণ করেছিল। কেউ সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হ'ল, কেউ পাখা পুড়িয়ে ফিরে গেল।

পরিবর্তে ফিরোজাবাদ্জিয়ের অঙ্গে উঠল চুণী-পান্না-বৈদূর্ঘ-মণির বিন্দিয়া, আর ঝাপটা, জুমকো, বেসর, কেয়ুর, কঙ্কণ, বাহুবন্দে যৌবন দীপ্তিময়ী হয়ে উঠল। সারা চক তখন ফিরোজাবাদ্জিয়ের নামে মশগুল।

হু-চোখে ঈশার ঝিলিক, অস্তরে তীব্র বেদনার রেশ, চকের অল্প বাদ্জিওয়া মুহাম্মান, মনস্কুল। তবু তারা ভীড় করে এসে দাঁড়'য় ফিরোজাবাদ্জিয়ের চারপাশে। মনের নিভৃত পুড়তে পুড়তেও তারিফ করে তার কণ্ঠের, তার ঐশ্বর্যের।

গোয়ালিয়র থেকে ফিরোজাবাদ্জিয়ের ডাক এল। বিরাত জলসার বন্দোবস্ত। সারা দেশ থেকে শুণী ব্যক্তির এসে হাজির হবে। সঙ্গীত-পাগল শ্রোতার দল।

ফিরোজাবাদ্জি গাইবে ঠুংরি আর খেয়াল। তবলচী মিশিরলাল সঙ্গে চলল।

জয়মালা গলায় নিয়ে ফিরোজাবাদ্জি ফিরল। শুধু জয়মালা নয়, সঙ্গে এল বরোদার মকবুল হোসেন। গানের পোকা। ঐশ্বর্যের পড়তি, তবু এখনও যা আছে, নিন্দার নয়।

কেবল গান আর গান। ফিরোজাবাদ্জি গায়, মকবুল হোসেন শোনে আলবোলায় নল মুখে ঠেকিয়ে।

এক মুহূর্তের অল্প ফিরোজাবাদ্জিয়ের মনে হয়েছিল, জীবনটা বৃষ্টি এমনই কেটে যাবে। এমনই তর তর করে বায়ুর অল্পকূলে পানসী বয়ে যাওয়ার মতন।

কিন্তু সুর কাটল।

মকবুল হোসেন মাঝা গেল। ফিরোজাবাদীরে
বাড়ীতে।

আগের দিন শরীরটা খারাপ হয়েছিল। আসরে বসে
গান শুনে শুনেও শুনেই বলেছিল মাঝার অসহ্য যন্ত্রণা। বসে
থাকতে পারছে না।

থাকতে পারেও নি। শুয়ে পড়েছিল। লোকজন
দিয়ে ধরাধরি করে তাকে নীচের ঘরে ফিরোজাবাদী শুইয়ে
দিয়েছিল। ভেবেছিল বয়স হয়েছে, শরীর একটু খারাপ
হওয়া খুবই স্বাভাবিক। তাই আর ডাক্তার বতি ডাকার
কথা ভাবেনি।

পরের দিন সকালেই খবর পেল মকবুল হোসেন নেই।

সব কিছুই নশ্বরতার কথা ফিরোজাবাদীরে খুবই জানা
ছিল, কিন্তু এ ভাবে, এত দ্রুত সরে যাওয়াটা কিছুতেই
যেন বরণান্ত করতে পারল না।

সে রাতে ফিরোজাবাদী আর আসরে বসল না। দু
একজন ছুটকো-ছাটকা যে মেহমান এসেছিল, তবিত
খারাপ বলে তাদের ফিরিয়ে দিল।

সন্ধ্যা থেকে বিছানায় শুয়ে রইল। প্রসাধন করল
না। উঠল না। খেলও না। মকবুল হোসেনের চলে
যাওয়ার জন্মই শুধু নয়, আর একটা কিসের বেদনা, অব্যক্ত,
জুজের একটা শূন্যতা ফিরোজাবাদীরে সমস্ত অন্তর ছেয়ে
রইল।

আবার ফিরোজাবাদী সামলে নিল। নতুন মাহুশ নিয়ে
আসর শুরু হল। গান, হৈ-হল্লা, ফুঁতির মধ্যে ডুবিয়ে দিল
নিজেকে।

কিন্তু পারল না। একদিন ধরা পড়ে গেল।

বার কয়েক চেষ্টা করেই থেমে গেল। গলা চড়াতে
পারল না। তাল কেটে গেল। তবলটার সামনে ফিরোজা-
বাদী অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল।

একদিন নয়, পর পর তিন দিন। অবলীলাক্রমে গলা
চড়াতে খাদে নামাতে পারত। কোন কষ্ট হত না। স্বর
যেন ওর নিজের বশ। যেভাবে দরকার সেভাবে খেলাতে
পারত।

আসরে ছিল বাদশাবাগের মোহন সাকসেনা।
গানের সমজদার লোক। সে বিরক্ত হল। জু কৌচকাল।

সবাই চলে যেতে ফিরোজাবাদী তবলটার বিকে ফিরল।

গলা একবারে ওঠাতে পারছি না কেন বল তো?
কদিনই এরকম হচ্ছে।

তবলটা বলল, নির্দম নিষ্ঠুর সত্য।

বয়স তো হচ্ছে, সেইজন্য দম পাচ্ছেন না। গলা
চড়াতে গেলেই হাঁপ লাগছে।

বয়স হচ্ছে! ফিরোজাবাদী চমকে উঠল। তার
মানে রূপ-বৌবন সব বিদায় নেবে এইবার। একটু একটু
করে। সেই সঙ্গে সম্মান, প্রতিপত্তি, অর্থ।

রাত্রে শুতে যাবার আগে দেয়াল-আয়নার সামনে
দাঁড়িয়ে ফিরোজাবাদী খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নিজেকে দেখল। তন্ন
তন্ন করে।

চুলের মতন সরু সরু আঁচড় পড়েছে কপালে, হাতের
উল্টো পিঠে। চোখের দুপাশে মাকড়সার জালের মতন
অস্পষ্ট দাগ। মেয়ের বলয়ের স্থিতি হয়েছে থুতনিত,
কটিতে। প্রসাধন ভেদ করে বয়সের ছাপ স্পষ্টতর।

তারপর খুব দ্রুত। কয়েকটা বছরের মধ্যেই শরীর
ভেঙে গেল। দুএক কলি গেয়েই থেমে যেতে হয়। দম
পায় না। বুকের মাঝখানে একটা যন্ত্রণার অহুভূতি।

আন্তে আন্তে আসর ফাঁকা। যারা ফিরোজাবাদীরে
দর্শন পাবার জন্য ব্যাকুল ছিল, তারা এ পথও মারান না।
বাড়ীর সামনে রহিস আদমিদে গাড়ী আর ভীড় করে
না। যারা দু একজন আসে তারা নিতান্ত মধ্যবিস্ত,
এককালের নামকরা বাঙ্গালী ফিরোজাবাদীকে দেখতে
আসে। কম দর্শনীর বিনিময়ে।

ঝাড়ের বাতির সংখ্যাও কমে আসে। কার্পেটের
বদলে জালিম। তবলটা অল্প কোন বাঙ্গালীর ঘরে আশ্রয়
নেয়। ঝড়ে কাত হয়ে পড়া পোত থেকে যেমন সবাই
সরে পড়ার চেষ্টা কবে নিজেদের প্রাণ বাঁচাবার জন্য,
তেমনই একে একে সকলে বয়স বাঙ্গালী ফিরোজাবাদীকে
পরিত্যাগ করে।

সঞ্চিত অর্থ দিয়ে সংসার চলে। মেপে মেপে, হিসাব
করে করে। তাও সঙ্কয় একদিন শেষ হয়। জানাশোনা
দু একজন রহিসকে ফিরে জাবাদী পত্র পাঠায়, সাহায্য
চেয়ে। পত্রের উত্তর পায় না।

বড় বাড়ী থেকে ফিরোজাবাদী ছোট বাড়ীতে উঠে
আসে। একতলায়। মহার্ঘ আসবাব মহামূল্য পরিচ্ছদ

জীবন বাঁচাবার তাগিদে সব যায়। পরিচরিকারা বিদায় নেয়।

সঙ্গী শুধু তানপুরা। বসে বসে ফিরোজাবাদি সুর বাঁধে। তার ছিঁড়ে গেলে যত্ন করে আবার তার পরায়। আঙুল দিয়ে দিয়ে টুং টাং করে। বাজিঙ্গীর জীবনে সুর থাকবে না, তা কি হতে পারে!

ছোট ঘুলঘুলি নিয়ে আকাশ দেখা যায়। নীল মেঘ-শুভ্র আকাশ। তারার চুমকি দেওয়া।

ফিরোজাবাদিদের অনেক পুরোনো কথা একটা মনে পড়ে গেল।

অদ্ভুত ধরণের সব লোক আসত আসরে। বিচিত্র তাদের শখ।

বেনারসের তিলকচাঁদই বোধ হয়, না না, তিলকচাঁদ নয়, রামগড়ের বিজয় সিং। হঠাৎ খেয়াল হ'ল, জলসা হবে নীল আকাশের তলায়। মাথার ওপর অস্ত্র কোন আচ্ছাদন থাকবে না।

তাই হ'ল। গোমতীর ধারে আসর বসল। তবলচী মিশিরলাল। প্রায় সারা রাত ধরে গাওনা চলল। উটকো মাহুঘের ভীড় জমে গেল চারপাশে। লক্ষ্মী শহর কেঁটিয়ে লোক এল। সঙ্গীত মস্ত জনতা।

গানের সুরে কাঁপন লাগল গোমতীর জলে, গাছের পাতায় পাতায়। ফিরোজাবাদি একটার পর একটা গেয়ে চলল। অকুরন্ত সুরের শ্রোতে ভাসিয়ে দিল নিজেকে।

ঠিক তেমনই তারা-ছাওয়া রাত আজও। ফিরোজাবাদি পরিবেশ ভুলল। নিজের ছিন্ন, মলিন পরিধেয় দিয়ে তানপুরাটা সযত্নে মুছে নিল। তবলচী নেই, না থাক।

ফিরোজাবাদিদের কোন অস্থবিধা হবে না।

সে রাতের মতনই দরবারি কানাড়ায় খেয়াল শুরু করলে। প্রথমে আলাপ। সুরের বিস্তার। একটা হাত কানে দিয়ে, আর একটা হাতে তানপুরার তার ছুঁয়ে ছুঁয়ে। দুটি চোখ নিম্নলিখিত। সে রাতের সমস্ত আসরের ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠল। প্রশংসমান এক রাশ চোখ মুখের সার।

ভাস্কর হয়ে ফিরোজাবাদি গেয়ে গেল। বিরতি নয়। সারা রাত ধরে চলবে এই গানের আসর।

হঠাৎ সুর ছিঁড়ে গেল। প্রস্তুত একটা ধাক্কা খেয়ে ফিরোজাবাদি চমকে চোখ খুলল।

গোমতীর ধারে সে রাতের আসর নিশ্চিহ্ন। আধ-অন্ধকার প্রকোষ্ঠ। কোণে কোণে আবর্জনার জুপ, মাকড়সার জাল। একেবারে কোণের দিকে শানকিতে রাতের অহাৰ্ঘ্য। সোরাইতে জল।

দরজার সামনে একপাল মেয়ে। হাসি-টিট-কারিতে তাদের ঘোবনোচ্ছল দেহ আছড়ে আছড়ে পড়ছে।

বা, নানী, থামলে কেন, আর একটা ছোক!

কে একজন পরিহাসের ছিটে ছড়াল!

বুকের মাঝখানে পুথোনো বাখাটা আবার জেগে উঠল। হু হাতে বুক চেপে ফিরোজাবাদি উদ্ভাস্তের মতন এদিকে ওদিকে দেখতে লাগল।

আবার সেই ভীক্স হাসি বিজ্ঞপাতক।

আসরের রেওয়াজ জানে না, নিয়মকানুন মানে না, বেতমিজ মেয়েরা। এমন চমৎকার আসর একেবারে মাটি করে দিল!

চীংকার করে গালাগাল দিতে গিয়েই ফিরোজাবাদি থেমে গেল। না, চীংকার ক'রে, গালিগালাজ করে, এদের শাস্ত করা যাবে না। এদের সর্বনাশ এদের সঙ্গে সঙ্গেই ফিরছে!

মুন্সাবাদি, সরযুগঙ্গি, আলোয়ারী, ছোট কেশরীবাদি এরা কেউ জানে না, কেউ বুঝতে পারছে না, অলক্ষ্যে সময় এদের পিছু নিয়েছে। ছায়ার মতন অহসরণ করছে। কাল পূর্ণ হলেই টুঁটি টিপে ধরবে। দেহের বাঁধন শিথিল হবে, রূপযৌবনলাবণ্য সব মুছে যাবে তিলে তিলে, মধুর কর্ণধর কর্ণশ. ভগ্ন হয়ে যাবে।

তারপর এক এক করে সবাই চলে আসবে আধো-অন্ধকার এই কুঠুরিতে। আজকের লাগুন্নয়ী যৌবনবতী সবাই একদিন ফিরোজাবাদি হয়ে যাবে।

অবশস্তাবী সেই দিনের কথা স্মরণ করে ফিরোজাবাদি খিল খিল করে হেসে উঠল। লোল, জরাজীর্ণ, হাজারে বৈধাঙ্কিত দেহ কাঁপিয়ে।

দরজার সামনে দাঁড়ানো মেয়ের দল সেই বীভৎস হাসির শব্দে শিউরে উঠল। বুড়ী নানীর বুকি মাখাটা ধারণ হয়ে গেল।

তানপুরার তার ছুঁয়ে ছুঁয়ে একি উৎকট হাসি ফিরোজাবাদিদের।

আগমনী : বাঙলার মাতৃহৃদয়ের গান ॥

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

দুর্গাপূজা বাঙালীর জাতীয় উৎসব। বার মাসের তের পার্বণের নিত্যনৈমিত্তিকতাকে অতিক্রম করে হৃদয়ের একটা গভীর আলোড়ন যেন নিয়ে আসে প্রতিবৎসর বাঙালীর ঘরে ঘরে অকাল বোধনের মন্ত্র। আবালবৃদ্ধ-বণিতা এই উৎসবে মেতে উঠেন। সানাইএর স্বরে, শেফালিকা কুসুমের স্নিগ্ধ মধুর গঞ্জে যেন কি এক মোহময় আবেশ রচিত হয়। মায়েরা ভাবেন মেয়ে এসেছেন ঘরে, ছেলেরা ভাবেন, মা এসেছেন ঘরে। কিন্তু বিজয়া দশমীর ঢাক বেজে উঠলেই যেন সকলের মন একটা বিচ্ছেদের করুণ রসে ভরে উঠে, প্রতি হৃদয়ে বেদনা জাগে—মা যে চলে যাচ্ছেন—মেয়ে যে চলে যাচ্ছেন।

সারা ভারতে দুর্গা, বিজয়দাত্রী দেবী। শক্রনাশনের অমোঘ মন্ত্রে তাঁর আবাহন, পূজা। কিন্তু বাঙালী মায়ের কাছে দুর্গা তাঁর এক স্নেহের মেয়ে। বাঙলার মায়ের প্রাণ মেনকা-মায়ের অন্তরের সমস্ত দরদ নিঙড়িয়ে নিয়ে গড়া। তাই শরভের সুনীল আকাশে তারা ফুটে উঠতে না উঠতেই কেঁদে উঠে তাঁদের সারা অন্তর। গিরিরাজ, মেনকা, উমা, আর মহেশ্বরকে নিয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দীতে কবিরে যে গান গেয়েছেন সেই সব গানের সুর বেজে উঠে তাঁদের মনে। উমার জন্তে মেনকা-মায়ের যে হৃদয়ের আকুলি বিহ্বলি সে ব্যাকুলতা তাঁদেরও জেগে উঠে। তাঁরা গান :

গিরিরাজ,
বাও দেখি আজ
আনতে উমা ধনে।
বিগত রজনী যোগে
(উ) মাকে দেখেছি স্বপনে।
তুমি রাজ্য অধিকারী
আমি তো অবলা নারী,

জীবন শূন্য হলে ভাল

উমা তারা অদর্শনে।

(স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য)

উমাতারার অদর্শনে মেনকা মায়ের দুঃখই ব্যাকুল করে তাঁদের। বাংসল্যের এ কী রস ঘন মূর্তি!

উমা হরের ঘরে কত কষ্টে থাকে, সে কথা স্বরণ করে মেনকা-মায়ের বুক কেঁপে উঠে। তিনি গিরিরাজকে আরো মিনতি করেন :

ভয়ে তুচ্ছ কাঁপিছে আমার,
ওহে প্রাণনাথ গিরিবরহে।
কি শুনি দারুণ ব্যথা দিবসে আঁধার।
বিছায়ে বাঘের ছাল ঘারে বসে মহাকাল,
বেরোও গণেশমাতা ডাকে বার বার
তব দেহ হে পাষাণ, সে দেহে পাষাণ প্রাণ
এই হেতু এত ক্ষণ না হলো বিদায়।
তনয়া পরেব ধন বুঝিয়া না বুঝে মন,
হায় হায় একি বিড়ম্বনা বিধাতার।
প্রসাদের এই বাণী হিমিগিরি রাজরানী
প্রভাতে চকোরী যেমন নিরাশা স্থধার।

(রামপ্রসাদ সেন)

উমার কথা ভেবে ভেবে মেনকার আর চিন্তে শান্তি নেই। তাঁর রাত্রির নিদ্রা দুঃস্বপ্নে বার বার ভেঙ্গে যায়। তিনি তাঁর সে দুঃস্বপ্নের কথাই গিরিরাজকে বলেন :—

কুস্বপন দেখেছি গিরি, উমা আমার শ্মশানবাসী,
অসিত বরণা উমা মুখে অটু অটু হাসি।
এলোকেশী বিবসনা, উমা আমার শবাসনা।
ঘোরাননা জিনয়না, ভালো শোতে বাগলশী,
যোগিনী দল সন্নিহী 'ভ্রমিছে সিংহবাহিনী,
হেরিয়া রণরঙ্গিনী, মনে বড় ভয় বাসি।

উঠছে উঠ অচল, পরাণ হল বিকল,
 স্বরায় কৈলাসে চল. আন উমা স্থধারামি।
 (গিরিশচন্দ্র ঘোষ)

মেনকার মিনতিতে অচলের মন টলেছে। তিনি
 কৈলাস থেকে উমাকে আনবার ব্যবস্থা করছেন। মেনকা
 এবার তাঁকে ধরে বসেছেন, উমা এলে পরে আর তাঁকে
 কৈলাসে পাঠান হবে না।

গিরি এবার আমার উমা এলে
 আর উমা পাঠাব না।
 বলে বলণে লোকে মন্দ, কারো কথা শুনব না।
 যদি আসে মৃত্যুঞ্জয় উমা নেবার কথা কয়,
 এবার মায়ে ঝিয়ে ঝগড়া করব
 জামাই বলে মানব না।
 দ্বিজ রামপ্রসাদে কয় এ দুঃখ কি প্রাণ নয়,
 শিব শ্রাণানে মশানে ফিরে
 ঘরের ভাবনা ভাবে না।
 (রামপ্রসাদ সেন)

বোধনের বাণী বেজে উঠেছে। উমা এসে পৌঁছে
 গিয়েছেন পিছালয়ে। পর্বতের প্রাণেও আনন্দের
 লহর উঠেছে। তিনি মেনকাকে ডেকে বলেছেন, কোথায়
 আছ, এসো, আমার উমাকে দেখবে।

আমার উমা এলোরে দেখ গো রাণী নয়ন ভরে।
 দশ ভুজ ধরি, আহা মরি মরি, বিহরে সিংহোপরে।
 কিবা হেমোজ্জ্বল বরণে, লোটে চাঁচর চিকুর চরণে,
 কিবা রক্তোৎপল আভা হেম জড়িত বিজলী প্রভা,
 মরি ঢল ঢল ঢল, সুধা চল চল, বিমল মধুর অধরে।

(গিরিশচন্দ্র ঘোষ)

মেনকা ছুটে গিয়ে উমার কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করেন।
 হরের ঘরে উমা কেমন করে ছিল সেই ভাবনাই তাঁকে
 ব্যাকুল করে বেশী।

ওমা, কেমন করে হরের ঘরে
 ছিলে উমা বলমা ভাই।
 কত লোকে কত বলে শুনে ভেবে ময়ে বাই
 মার প্রাণে কি বৈধ ধরে
 জামাই নাকি ভিক্ষা করে,—

এবার নিতে এলে বলবো হরে
 উমা আমার ঘরে নাই।
 (গিরিশচন্দ্র ঘোষ)

উমা মায়ের কাছে হৃদয় খুলে পতি-গৃহের সমস্ত স্থ-দুঃখ
 বর্ণনা করেন :

তুমি তো মা ছিলে ভুলে
 আমি পাগল নিয়ে সারা হই।
 হাসে কাদে সদাই ভোলা, জানে না মা আমি বই।
 ভাং খেয়ে মা সদাই আছে
 থাকতে হয় মা কাছে কাছে
 ভাল মন্দ হয় গো পাছে, সদাই মনে ভাবি ওই।
 দিতে হয় মা মুখে তুলে
 নয় তো খেতে যায় গো তুলে,
 ক্ষেপার দশা ভাবতে গেলে
 আমাতে আর আমি নই।
 তুলিয়ে যখন এলেম ছলে
 ওমা ভেসে গেল নয়ন জলে
 একলা পাছে যায় গো চলে,
 আপন-হারা এমন কই।

(গিরিশচন্দ্র ঘোষ)

মেনকা-মায়ের দুঃখ জেগে আছে বাঙলার ঘরে ঘরে
 মায়ের বৃকে। পতি-গৃহে মেয়েরা কী দুঃখে দিন
 কাটাচ্ছে, সে-ভয় আর ভাবনাতেই মায়ের প্রাণে শাস্তি
 নেই। মেয়ে যখন ঘরে আসে মায়ের বৃকে বাৎসল্যের
 যেন বান ডাকে। প্রতিবৎসর শারদীয় উৎসবে বাঙলার
 ঘরে ঘরে আগমনীগানের যে-স্বর বেজে উঠে তাতে যেন
 দুঃখ-দুশ্চিন্তা-পীড়িত বাঙলার মায়ের হৃদয় বেদনারই
 প্রতিধ্বনি। মেয়ে যখন স্বামীগৃহের অভাব, অনটন,
 দুঃখ, লাক্ষনা সর্বত্র হতভাগা স্বামীর ভাবনায় ব্যাকুলতা
 প্রকাশ করে, তখনই মায়ের মনে কেমন একটা প্রশান্তি
 ফিরে আসে। পতিপরায়ণা কস্তার প্রতি রমতার সঙ্গে
 একটা প্রকার ভাবও জেগে উঠে। তাতে করে দশমীর
 রাতে মেয়েকে বিদায় দেওয়ার সময় বিচ্ছেদের দারুণ
 দুঃখও সমবেদনার করুণ রসে ধুয়ে মুছে যায়। পুনরা-
 গমনের আকুতিতে বিদায়ের কণটি মধুর হয়ে উঠে।



ভন্টুর সঙ্গে প্রথম
মোলাকাৎ
শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

জোড়া ভালুকশিকারের কাহিনী শেষ করেই অজুন সেন
মন্তব্য করে—

—এ সবই এক ভন্টুযুগের ঘটনা।

প্রশ্ন করি—

—ওকে পেলে কোথায়? ডিটেকটিভ রবার্ট রেকের
সহকারী শিথের মত এমন করিৎকর্মা অমুচর তো সচরাচর
দেখা যায় না।

মেজর সেন তার গোঁফে হাত বুলিয়ে নেয়, তারপর
আত্মপ্রসাদের স্বর তার কণ্ঠে বেজে ওঠে,

—অভুগত কী এমনি হয়? করে নিতে জানা চাই।
তবে হ্যাঁ, করিৎকর্মা ও চিরদিনই। আমার কাছে
আসার আগেকার যে কাহিনী আমি যোগাড় করেছি—
তার মধ্যেও ওর সদাজাগ্রত কত্ৰব্যবুদ্ধি ও বেপরোয়া
সাহসের বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়।

—কোথায় প্রথম দেখা হল ?

—ডুয়াসে। মিলিটারী ট্রেনিং শেষ হবার পর চালান হলাম ইষ্টার্ন কম্যাণ্ডে—পোষ্টিং হল ভোটারন কন্ট্রিয়ারে। দালসিংপাড়ার কাছাকাছি সন্তোষাবাড়ীতে আমাদের ক্যাম্প।

বেশ আছি, খাই দাই, ঘুরে বেড়াই। দালসিংপাড়ার হাট রবিবারেই বেশ জমে ওঠে। একবার গিয়েছি সেই হাটে কিছু নেপালী, কিছু ভুটিয়া, হিন্দুস্থানী আর বাঙালী-ব্যবসায়ীরা হাটে দোকান করে। মাঝে মাঝে লামা গোছের দু'চারজন তিব্বতীও দেখা যায়। আম-ধানীর মধ্যে দেখলাম, মাখন, কমলালেবু, ডিম, মুরগী, আলু, কোয়াস আর গারো কচু। তেল, লবণ, মশলারদোকানও আছে। কাঠের আসবাবপত্র তৈরী করে গ্রামের লোকেরা হাটে এনে বিক্রয় করে। ঘুরতে ঘুরতে দেখি, একপাশে বেশ কিছু লোক জড়ো হয়েছে। কৌতূহল আমারও কম নয়—সেই ভিড়ের মধ্যে দিশে গেলাম।

ব্যাপারটা কী ?

ব্যাপার আর কিছুই নয়—মোরগের যুদ্ধ। প্রতিদ্বন্দ্বী দুটি মোরগ—পাখা ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—তাদের পায়ে দড়ি বেঁধে মোরগের মালিক দুজন দরের আদান প্রদান চালাচ্ছিল, সমবেত দর্শকদের মধ্যও কেউ বা বাজি রাখে।

বুকে নিতে কষ্ট হলনা—মোরগের ওপর বেটিং চলছে—রজা মন্দ নয়।

বেটিং এর কথা বাদ দিয়ে মোরগের কথায় আসা যাক ! জাঁদরেল দুটো মোরগ—দুটোর মাথায় বড় বড় বুঁটি—বুকের ওপর খানিকটা জায়গা লাল—পালক নেই। একটা সাদা আর একটা মেটে লাল রংএর। দুটোরই পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের সঙ্গে ছোট ধারালো ভোজালির মত ছুরি বাঁধা আছে। তাই দিয়েই যুদ্ধ হবে। নিয়মটা এই—যে মোরগ ছুরি দিয়ে প্রথম তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে আঘাত করবে সেই জিতবে। লড়াই এর ওপর বাজি রাখা হয়—যার মোরগ জিতবে বাজির টাকা ও ঘারেল করণ ফুজুট তারই প্রাপ্য।

লড়াই দেখছিলাম। মোরগ দুটো লাকিয়ে লাকিয়ে ওঠে, আর এ ওকে আঘাত করতে চায়। কখনও বা দুটো ছুরিতে ঘন লেগে কাঁচ করে আওয়াজ ওঠে, কখনও

বা একটা মোরগ অপরটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে চৌকর মায়ে। শেষ পর্যন্ত লাল মোরগটাই সাদাটার ওপর ছুরি বসিয়ে দিলে।

একটা হৈ হৈ আওয়াজ উঠল—ভিড়ের মধ্য থেকে গুণ্ডাগোছের একটি লোক ছুটে এসে আহত মোরগটিকে বুকে তুলে নিয়েই সে কী কান্না !

পলকের মধ্যে যেন একটা ম্যাজিক হয়ে গেল। যে লোকটি সাদা মোরগের মালিক বলে জাহির করেছিল সে উণাও। বেগতিক বুঝে দর্শকের মধ্যে অনেকেই কেটে পড়ে। শুধু লাল মোরগের মালিকটি এসে বুকে চেঁচা করে, ব্যাপারখানা কী !

কৌতূহল আমারও কম নয়। পায়ে পায়ে এগিয়ে যাই। সেই গুণ্ডাগোছের মানুষটির চোখে আর জল নেই—তার বদলে ফুটে উঠেছে একটা মারাত্মক প্রতিজ্ঞা—চোখ দুটো যেন আগুনের গোলা। দাঁত কিড়মিড় করে সে বা বলে, তার অর্থ সেই মোরগ-চোরের রক্তে সে তর্পণ করবে।

লোকটি বাঙালী, কিন্তু এমন স্তম্ভিত দেহ সচরাচর চোখে পড়ে না। তাকে ডাকতেই, আমার মিলিটারী পোশাক দেখে প্রথমটা সে বেশ হকচকিয়ে গেল—তারপর সটান আমার সামনে এসেই লম্বা সেলাম।

বুঝলাম—লোকটি কারদা-দুরন্ত। তাকে একপাশে ডেকে খুঁটিনাটি সব জিজ্ঞেস করি। লোকটি জাতে কুর্খী, আদি বাড়ী তাগলপুর—পূর্বপুরুষ রজি-রোজগারের সন্ধান বাংলায় আসে—এখন তারা পুরোদস্তর বাঙালী।

জিজ্ঞেস করি—তোর নাম কী রে—

—ভণ্টুরাম—

—কোথায় থাকিস ?

—কিছু ঠিক নেই, যেখানে রাত সেখানেই কাত।

তবে আপাততঃ এক কমলালেবুর ব্যাপারীর সঙ্গে আছি। সেই খেতে পরতে দেয়।

—কী কাজ করিস ?

—এমন কিছুই নয়—কমলালেবুর দর নিয়ে ভুটিয়াদের সঙ্গে কালিয়া হলে আমি সামনে দাঁড়াই—বাস্ কিসসা খতম্।

—সাদা মুরগীটা কার ?

ভট্টর বুক ফুলিয়ে বলে—

আমার নিজের—আবার কার!

তাকে উদ্ধে দিই—

মোরগটা হেরে গেল যে!

—বাচ্চা কিনা, খাড়ী মোরগটার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে কেন?

লোকটার ভাবভঙ্গী, কথাবার্তার তার ওপর আমার কী রকম আকর্ষণ হ'ল। সরাসরি প্রস্তাব করি—আমার কাছে কাজ করবি?

—কী কাজ?

—সব কাজ—

—যুদ্ধ করতে হবে?

—হবে বৈকি! আমি যখন যেখানে থাকব, তাকেও সঙ্গে থাকতে হবে। আমি যখন মিলিটারী, তুইও মিলিটারী হবি। শিকার করেছিস কখনো?

অগ্নিবন্দনে ভট্টর বলে যায়—

ঢের ঢের শিকার করেছি। আমার ঠাকুরদার একটা গাদা বন্দুক আছে—সেটা এখন আমার দখলে।

—তা হলে ঠিক তো? কত মাইনে চাস?

ভট্টর দাঁত বের করে হাসে—তারপর একটু লজ্জার ভাব দেখিয়ে বলে—

মাইনে আর কী চাইব? এই খাওয়াপরা—আমি আবার একটু বেশী খাই কিনা—তাই মাইনে যে যা দেয় আপত্তি করি না।

—বেশ, তবে চলে আর আমার কাছে! তোর মনিবের কাছে বলতে হবে না?

—কে মনিব? ইং ভারী তো কমলালেবুর ব্যাপারী! আপনার কাছে থাকতে পেলো আমি আর কিছু চাই না। তবে একবার গিয়ে আমার টিনের তোরঙ্গ আর বন্দুকটা নিয়ে আসতে হবে।

—তবে চল আমার সঙ্গে ক্যাম্প—

আমার পথে তাকে একটু একটু করে তালিম দিতে থাকি। আচার ব্যবহার, কাজ-কর্ম, পোষাক পরিচ্ছদ—সব কিছুতেই তাকে নতুন করে ঢেলে সাজতে হবে। আজ পর্যন্তও তাকে পুরোপুরি আয়ত্বে আনা যায়নি। মাঝে মাঝেই গোঁয়ারসুঁমি করে বলে। তবে হ্যাঁ,

বিশ্বাসী খুব, আর আমাকে প্রাণের চাইতেও ভালবাসে।

মেজর সেন ভট্টর কথায় যেন পঙ্কমুখ। সেই মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলি—

সে কথা একশ'বার। তোমার কাছেই ওনেছি, শিকারে তার বিক্রয়ের কথা। শেষ পর্যন্ত তোমাকে আগলে রাখার মধ্যে যদি কখনো অজায় সাহস দেখিয়ে থাকে, সেটা যে তোমাকে ভালগাসে বলেই করে, এটা হুনিশিত। ভট্টর তোমার প্রথম শিকারের কাহিনীটা আজ শুনতে চাই।

—সেই কথাই বলব—তার আগে সামান্য ভূমিকা।

ভট্টর আমার কাছে বহাল হয়ে গেল। বেশ দিল্লি কাজকর্ম করে—বিশেষ কিছু বলে দিতে হয় না—কিন্তু মাঝে মাঝেই ছুতিন ঘণ্টার ভ্রম্ভে সে যে কোথায় উধাও হয়ে যায়—অনেক জিজ্ঞেস করেও উত্তর পাই না।

চিন্তার কথাই বটে! যে গুণ্ডাধরণের লোক—ঝোঁকের মাধ্যম তাকে পছন্দ করে ফেললাম—কিন্তু যদি কোনও বদমাইসের দলে থাকে—কিংবা খুনে ডাকাত হয়—তাহলেই হয়েছে আর কি—কোন দিন কোন ফ্যাসাদে না পড়তে হয়।

আমার ক্যাম্পেই সহযোগী মিঃ তলোয়ারকরকে একদিন কথাটা খুলে বলি। ভরলোক মারাঠা ব্রাহ্মণ, মিলিটারীতে এসেও দৈনন্দিন পূজা-আত্মিক ত্যাগ করেন নি। সমস্ত শুনে তিনি তার নিলেন, এরহস্ত উদ্ধার করবেন।

হুপ্তাথানেকের মধ্যেই ভট্টর গোপন আড্ডার খোঁজ পাওয়া গেল। সেটা আর কিছুই নয়—যাকে ইংরেজীতে বলে জিম্ভাসিয়াম—আমাদের ভাষায় ব্যায়ামাগার, সেই ধরণের একটি খুদে প্রতিষ্ঠান। আটদশজন পাহাড়ী, নেপালী আর হিন্দুস্থানী ছোকরাদের নিয়ে সেই আখড়া—ভট্টর তাদের মাষ্টার। নিজের হাতে গড়া জিনিষের ওপর মাহুসের যে মায়া থাকে—তারই টানে ভট্টর মাঝে মাঝে গরছাঞ্জির হয়।

তলোয়ারকর উপদেশ দেয়।

—লোকটা বিশ্বাসী আর সরল—গোঁয়ার বটে তবে সাকরেদরা ওকে ভালও বাসে খুব, ভক্তিও করে—ওকে যদি পোষ মানাতে পারো কোনো দিন আকশোস করছে হবেনা।

একদিন কথায় কথায় ভল্টুকে শিকারের বিষয়ে বলেছিলাম। সেও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, খুব লীগঙ্গীর খবর আনবে।

শীতকাল, বিকেল চারটে বাজতেই পাহাড় আর জঙ্গলের ছায়া নেমে আসে। অকালে অন্ধকার এসে আমাদের ক্যাম্পে বাসা বাঁধে। কাজেই আমরাও হাত পা গুটিয়ে পেন্সনভোগী বৃদ্ধের মত চুপ করে হয় বই পড়ি, নয়তো অফিসের চিঠি পড়ে মন দিই। সাতটা বাজতেই নৈশভোজন শেষ—তারপর কবল মুড়ি দিয়ে রাতের প্রহর গোণা ছাড়া আর কিছু থাকে না। পাশের ক্যাম্পখাটে শুয়ে পড়তেই ভল্টুর নাসিকা গর্জন সেই যে শুরু হয়, একটানা ঘর ঘর সেই আওয়াজ থামে সেই ভোর রাতে।

সেদিনও বিছানায় শুয়ে ঘুম আসেনা। এলোমেলো আকাশ পাতাল কত কী চিন্তা করি—শেষ খুঁজে পাইনা। এদিকে হেড্ কোয়ার্টার থেকে চিঠি এসেছে—আমার মেয়াদ সেখানে আর দিন পনেরো—তার পরেই যেতে হবে আসামে। বাংলা দেশের শেষ প্রান্তে থেকেও মনে হত বাংলাতেই আছি—এবার দেশছাড়া হতে হবে! এই সব এলোমেলো চিন্তার মধ্যেই কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি জানিনা—হঠাৎ ক্যাম্পের মধ্যে কোনও প্রাণীর জোরে নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ ঘুম ভেঙ্গে গেল। চোখ মেলে সেই অন্ধকারের মধ্যেই একজোড়া জলন্ত বিন্দু দেখতে পেলাম। চট করে বিছানার ওপর উঠে বসার খুঁকি নেওয়া উচিত নয়। বালিশের নীচে আমার রিভলবার আর টর্চটা থাকেই। এক হাতে রিভলবার ধরে, অপর হাতে টর্চটা জেলে সেন্নিকে ফেলতেই দেখি গায়ে জোঁকাটা একটা প্রাণী বিচিত্র ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে—যেন কিছু একটা মতলব আঁটছে।

গায়ের রক্ত হিম হয়ে যাবার উপক্রম। টর্চটা নিভিয়ে শোয়া অবস্থায়ই রিভলবার ছুঁড়ব কিনা ভাবছি এমন সময় হঠাৎ ভল্টুর নাসিকা ধ্বনি থেমে গেল—সঙ্গে সঙ্গেই সেই জলন্ত চোখের অধিকারী জানোয়ারটা ঘাবড়ে গিয়ে ছুটে ক্যাম্পের বাইরে যাওয়ার সময় ভল্টুর খাটে এমন একটা থাকা দিয়ে গেল যে বিছানা থেকে সে পড়ে যায় আর কি?

ভূমিকম্প ভূমিকম্প, বলে এক চীৎকার দিয়ে ভল্টু লাফিয়ে ওঠে। তলোয়ারকরও তার ক্যাম্প থেকে ছুটে আসে। আমি ভল্টুকে আশ্বাস দিয়ে বলি—

ভূমিকম্প নয়, ব্যাককম্প—হৃৎকম্প থামাও—তোমার বরাত ভাল। তোমার শরীর থেকে বাব হৃৎক সের মাংস খাবলে নিয়ে যায়নি।

বাঘের নাম শুনেই ভল্টু তার গাণা বন্দুক হাতে তখনই ছুটে সেই অন্ধকারের মধ্যে বেরিয়ে পড়ে আর কি।

আমি আর তলে যারকর তাকে অনেক কষ্টে নিরস্ত করি।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি রাত্রি শেষ হয়ে এসেছে—আলো দেখা দিতে বড় জোর আধঘণ্টা বাকী।

তখনই ক্যাম্পের মধ্যে আমাদের তিনজনের বৈঠক বসে গেল।

বাঘের দেখা যখন মিলেছে—তখন একটু কষ্ট করে জঙ্গলে ঢুকলে মোলাকাৎ নিশ্চয় হবে।

ভল্টু তৎক্ষণাৎ সাহা দিয়ে বলে—আলবৎ, আমার সাকরেদদের খবর দিলে তারাও আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে। আর দেবী নয়—কাল সকালেই এর ব্যবস্থা করা উচিত।

তলোয়ারকর বয়সেও বড়—বিচক্ষণও কম নয়, সে প্রস্তাব করে—

ভল্টুর সাকরেদ তো বেশী নয়—আরও লোকজন চাই যে।

মাথা ঝাঁকিয়ে ভল্টু বলে—তার জন্তে ভাবতে হবেনা, কুলী লাইনে গিয়ে আমি আরও কিছু নেপালী জোঁগাড় করে আনবো।

আমাদের দিক থেকে আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ, ভল্টু একবার বাজারের দিকে গিয়েই মাঝ পথ থেকে ফিরে এল, তার সঙ্গে একটা নেপালী।

ভয়ে বিবর্ণ, মুখে একটা কথা নেই, ঠোঁট ছুটো খরখ করে কাঁপে। ভল্টুই তার হয়ে জানালো—আজ জোরো তার গোয়াল ঘরে একটা বাঘ ঢুকেছিল—বাছুরকে ঝায়ে করে গাইগরুটার ওপরেও হামলা চালিয়েছিল, কী লোকজন উঠে পড়ায়, জানোয়ারটা পালিয়েছে।

তাকে সাহস দিয়ে বলি—

কিছু ভয় নেই—এই এখনি আমরা যাচ্ছি—তোমার দুশমনকে খতম না করে ফিরবনা।

ভল্টুরকে তাড়া দিয়ে বলি—

বাজার বন্ধ থাক—যাও, তোমার সাক্ষরদের খবর দাও—আর আমরা কুলী লাইনেও লোক জোগাড় কর। ন'টার মধ্যেই বেরুতে হবে।

ভল্টুর উৎসাহ দেখে মনে হ'ল, অনেকদিন পরে একটা কাজের মত কাজ সে পেয়েছে। সে ছুটে চলে গেল। নেপালীটা এক কোণে বসে বিড়বিড় করে কী সব বক্তৃতা থাকে।

মি: তলোয়ারকর ছাড়া ক্যাম্পের আর কেউ আমাদের সঙ্গী হতে চাইল না। কে-না-কে একটা খবর এনেছে আর তাই নিয়ে জল্পলে জল্পলে ঘুরে বোড়ানো কারো পোষাবে না।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই লোকজন সব হাজির। প্রত্যেকের হাতেই লাঠি, বস্ত্র, ছোরা, টাঙ্গি—যার যা কিছু অস্ত্র-সম্বল ছিল, তাই নিয়েই চলে এসেছে। কারো হাতে বা ক্যান্সা টিন।

আমার কোমরে রিভলবার, আর হাতে বন্দুক—ভল্টুরও তার ঠাকুরদার আমলের গাদা বন্দুকটা সঙ্গে নিলে। গুলীর পেটিটা তার কাছে দিইনি—নিজেই গুলার মুলিয়ে নিয়েছি। তলোয়ারকর শিকারে যাওয়ার কথা শুনেই কখন যে নিজের ক্যাম্পে ঢুকে ধ্যান-ধারণায় মন দিয়েছিল খেয়াল করিনি, কিন্তু সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে সে যখন বেরিয়ে এল, তার মুখের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ আমারও মুখে কথা নেই।

ভলোয়ারকরের প্রশস্তললাটে রক্তচন্দনের তিলক জল জল করছে—উজ্জ্বল নাসিকাটি ঘেন খাপ খোলা ঝাঁক। ভলোয়ার, পরণে খাকি প্যান্ট ও হাক সার্ট—হাতে বন্দুক।

ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে পাহাড় বেয়ে চলেছি।

প্রায় মাইলখানেক এই দলবল নিয়ে যখন আঁকা-ঝাঁকা পথে নীচে নেমে যাই—মনে হল আমরা ঘেন খুব বড় একটা এ্যাডভেঞ্চারে চলেছি। সকলের আগে ভল্টুর আর সেই নেপালী, তারপর আমি, পেছনে তলোয়ারকর। ভল্টুর সাক্ষরদের সব একজোট হয়ে গল্প গুজব করতে থাকে—তার মধ্যে বেশীর ভাগই কে কোথায় কোন

বীরত্বের কাজ করেছে তারই ব্যাখ্যান। নেপালী কুলীর দল বিটারের কাজ করবে, তারা নিশ্চয় আসতে থাকে।

আমরা একটা বস্তীর কাছে আসতেই সংবাদদাতা সেই নেপালী তার কুঁড়ে ঘরটির কাছে আমাদের নিয়ে গেল। তার গোয়ালঘর বলে যা দেখালো—তাকে ঘর বলা চলেনা। ওপরে খড়ের ছাউনি—নিচে চারিদিকে বাঁশের বেড়া তার মধ্যে যা ফাঁক—ভেতর দিয়ে হিংস্র জানোয়ারের অবাধ প্রবেশ।

গোয়ালঘরে ঢুকে বাঘের পায়ের ছাপ দেখতে পেলাম। বাছুরটা মরে গিয়েছে—গাই গরুটার কাঁধে একটা বড় গোছের থান্ডের দাগ—নখের আঁচড়ে বেশ খানিকটা মাংস উঠিয়ে নিয়েছে।

গরুর মালিক, সংবাদদাতা সেই গ্রাম্য লোকটি হাউ মাউ করে কঁদে উঠতেই ভল্টুর তাকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দেয় তারপর আমাকে বলে—

—চলুন, এই পায়ের ছাপ ধরে আমরা এগিয়ে যাই!

নরম মাটির ওপর বাঘের পায়ের ছাপ কিছুদূর পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা গেল—কিন্তু তারপর যে কোন্ দিকে যাওয়া উচিত কিছুই ঠাহর করতে পারিনি।

তলোয়ারকরের স্ববিজ্ঞ মন্তব্য

—বাঘটা ধারে কাছেই কোথাও আছে। মুখের গ্রাস ছেড়ে যে সে দূরে চলে যায়নি এটা স্থানিশ্চিত।

ভল্টুর সাক্ষরদেরা অস্থির হয়ে ওঠে—তারা তখনই বিক্রমপ্রকাশের স্বযোগ চায়। তাদের বুঝিয়ে বলি—

—এখন নয় ভাই—কার্যকালে কার কতখানি হিম্মত দেখিও; এখন চল, সবাই মিলে সামনের জঙ্গলে ঢুকে পড়ি।

জঙ্গলে ঢুকে প্রথমে তেমন কিছু ঝোপকাড় দেখা গেলনা। সৰু মোটা, লম্বা লম্বা শাল গাছ—তারই ফাঁকে ফাঁকে লতাকুলের ঝোপ। এর মধ্যে বাঘমশাই যে কিছুতেই থাকতে পারেনা—সে সন্দেহ স্থানিশ্চিত হয়ে আরও খানিকটা এগোতেই এক জায়গায় এসে থমকে গেলাম।

জায়গাটি বিচিত্র। দুধারে শাল গাছগুলো সত্যক প্রহরীর মত মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। সামনের কিছুটা অংশ ঘন ঝোপজঙ্গলে ঢাকা—সোজা ঢালু হয়ে নিচে নেমে

গিয়েছে। তার মধ্যে ঢুকে পড়াটা বৃদ্ধিমানের কাজ হবে না। কারণ সেই জঙ্গল থেকে উপরের দিকে বাঘটা যদি আচমকা ছুটে আসে আমাদের পক্ষে সেই ঢালু জমিতে দাঁড়িয়ে এখার ওখার এক পাও নড়বার উপার থাকবে না।

ঠিক ঢালু হবার মুখেই কিছু ছাড়াড়াড়ি করে কটা জংলী গাছ ডাল-পালা ছড়িয়ে যেন আমাদের আশ্রয় দেবার জন্তেই দাঁড়িয়ে ছিল। তলোয়ারকরকে একটা গাছে তুলে দেওয়া হল। ভন্টু আমাদের সঙ্গে ছাড়ে নি, আর একটা গাছে আমার পেছনে উঠে শক্ত হয়ে বসে। তার সাকরেন্দ্রের দুজন অপর একটি গাছে উঠে পড়তেই, ভন্টুর নির্দেশে বাকী সবাই নেপালীকুলীদের নিয়ে জঙ্গলের এক পাশ দিয়ে বিট শুরু করে। উদ্দেশ্য এই তাড়া খেয়ে যদি সেই নিচের জঙ্গল থেকে জানোয়ারটা ওপরে উঠে আসতে চায়, আমাদের নজরে তাকে পড়তেই হবে। আর ভন্টুর গাদা বন্দুকে না হোক, তলোয়ারকর কিংবা আমার ১৪ বোলের বন্দুকের হাত থেকে নিস্তার পাবে না।

কিছুক্ষণ পরেই জঙ্গল খেলা শুরু হল। ক্যানেক্সা টিন বাজিয়ে কানে তালা লাগানো-চীৎকারে বিটারের দল এগিয়ে আসে—আমরাও যে যার জায়গায় চক্কু কর্তৃক সজাগ রেখে বসে থাকি।

হঠাৎ নিচে থেকে চীৎকার হেসে এল

—বাঘ, বাঘ, ঐ বাঘ !

আমরা এদিক ওদিক তাকাই কিছুই দেখতে পাই না—হঠাৎ ভন্টুর কণ্ঠে একটা চাপা উত্তেজনা—

—ঐ যে বাটা—

—কৈ, কোথায় ?

ভন্টু অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখায়।

—ঐ যে বা দিকের বড় ঝোঁপের আড়ালে আমাদের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে !

আমাদের কাছ থেকে ত্রিশো গজের ওপর দূরত্ব, কাজেই এত দূরপাল্লায় আওয়াজ করার সুবিধা নেওয়া যায় না। তাছাড়া জানোয়ারের পেছনে গুলী করে লাভ নেই।

কিন্তু বাঘটা সম্ভবতঃ বিটারদের হৈ-হুল্লোড়ে বিরক্ত হয়েই তার নিভৃত নীড় থেকে বেরিয়ে এসে দেখতে চায়

কারা তার বিজ্ঞানের ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছে। তারপর হয় তো নিজেকে কোনো নিরাপদ জায়গায় লুকোবার চেষ্টাতেই সেই জানোয়ারটা সেই ঢালু জমি বেয়ে ওপরে আসতে থাকে। ঠিক ওপরে উঠে আসার মুখেই আমার আগ্নেয়াস্ত্র অগ্নি উদগীরণ করে।

একটা ক্রুদ্ধ গর্জন শোনা গেল। একবার বুরপাক খেয়েই পায়ে ওপর দাঁড়িয়ে পরমুহুর্তেই যেন লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটে থাকে কিন্তু নিচে নামতেই সামনে সেই জনপঞ্চাশেক বিটার এমন একটা হুল্লোড় বাধিয়ে এগিয়ে এল যে পথ না পেয়ে ব্যাঘ্র মশাই ফিরে আবার আমাদের দিকেই ছুটে আসে। কিন্তু, হঠাৎ একী হল, বাঘটা গেল কোথায় ?

ভন্টুকে সে কথা বলতেই সে সাহস দেখিয়ে বলে, একবার নেমে দেখব না কী ?

—থাক—তার দরকার নেই—ভূমি চূপটি করে বসে থাকো।

ভন্টুর সাকরেন্দ্র দুজন কিছু দূরেই অপর একটি গাছে আশ্রয় নিয়ে ছিল—হঠাৎ তারা আওয়াজ দিলে—

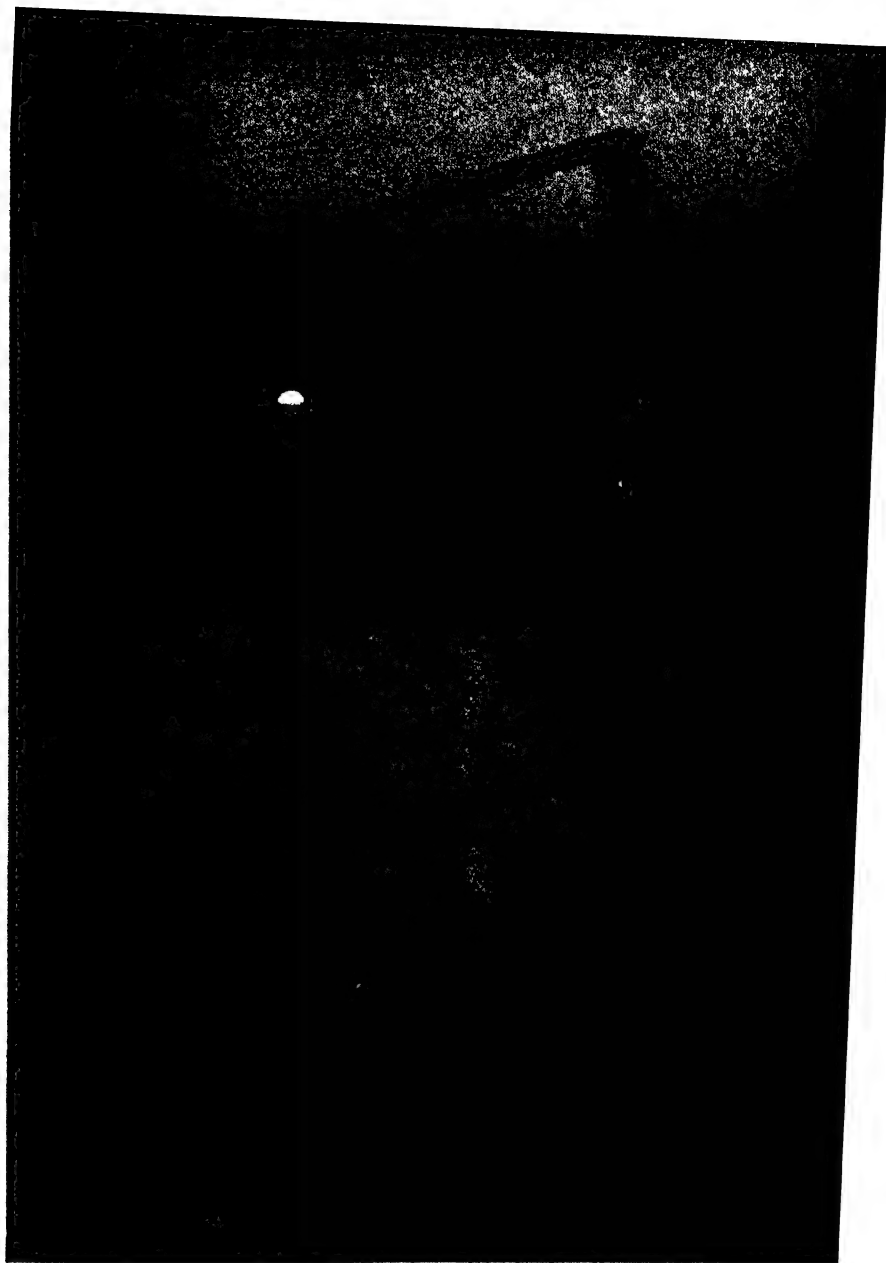
—ঐ যে বাঘ—বাঘ। এই গাছের তলা দিয়ে ছুটে পালালো।

সঙ্গে সঙ্গেই আর একটি বন্দুকের আওয়াজ শুনলাম। বুললাম, সেটা তলোয়ারকরের। জানোয়ারটা ছুটে আমাদের গাছের কাছাকাছি আসতেই আমার দ্বিতীয় গুলীতে বাঘ মাটিতে ছিটকে পড়ে গেল—একটা গর্জন পর্যন্ত করে নি।

গাছের ডাল ধরে তুলে ভন্টু মাটিতে লাফিয়ে পড়ে—তলোয়ারকরও ছুটে আসে।

ভন্টুর সাকরেন্দ্র দুজনে গাছ থেকে নেমে লাঠি হাতে সন্দর্প পা ফেলে—যেন বাঘ বাঘ বলে চৌকিয়ে ওঠাও কম বীরত্বের নয়।

ভন্টু তার গাধা বন্দুকের ওপর হাত বুলিয়ে বলে—কেমন পয়লা নম্বর শিকার করিয়ে দিলাম, দেখলেন হুজুর ? এবার আমাকে আর সাকরেন্দ্রের একদিন ফিটি খাইয়ে দিন।



ইষ্টিকোণ



ନୈରବ୍ଧେ (ସାହିତ୍ୟ)
ଗୀତେକ୍ଷମୀ—କଳାପୋ)

କର୍ତ୍ତା : ସର୍ବେନ ଯୋଷ

দ্রাণী



মিশ্র-লবুগুরু-মন্দিরা ছন্দ

উচ্ছল শিঞ্জে ঝঙ্কারিয়া হিয়া শ্রামপ্রিয়া,
এসো লাস্তলীলায় ।
সন্ধ্যা বিবল পরাজিত অন্তর চন্দ্রিকা ফুল
করো করুণায় ।
প্রেম বসন্ত হুরে এসো ক্ষেমময়ী অপরাধেয়া
মজু বিভায় ।
এসো উষা বরদাতী চিরন্তনী ! রাত্রি বিশকিনী
মান হিয়ায় ॥

শ্রীচরণে বিরহে মিলনে শয়নে স্বপনে ভব
যাচি শরণ ।
মা, শুভদা, ধনদা ! পুলকে ঝলকে ঝলকে ভব
জালো ভপন ।
ছন্দময়ী ! তব কান্তি দোলে তোলো আন্দোলিয়া
কালো মন্থরতায় ।
এসো উষা বরদাতী চিরন্তনী ! রাত্রি বিশকিনী
মান হিয়ায় ॥

কামনা ভ্রান্তি বিলাস অয়ে রমা শান্তিময়ী,
এসো প্রাণ ক্লে ।
পাগুর মর্মেয় বালুচরে এসো গাঙ্গ বিভঞ্জে
ভরঙ্গ তুলে ।
বন্দন ধন্ত করো মনো মন্দির নন্দন মুছ'না
রাগ মালায় ।
এসো উষা বরদাতী চিরন্তনী ! রাত্রি বিশকিনী
মান হিয়ায় ॥

কোকিল কৃষ্ণনে পল্লব নর্তনে কান্দন ফাগে
আনন্দময়ী,
রঞ্জি' করো লয় ক্রান্তি নিরাশা নবীন যুগান্তর
বাগী বহি' ।
লুপ্ত করো রাধা গর্বনিশা বাধা ! সর্বনিবেদন-
মন্ত্রদিশায় ।
এসো উষা বরদাতী চিরন্তনী ! রাত্রি বিশকিনী
মান হিয়ায় ॥

কথা ও হুর—শ্রীদিলীপকুমার রায়

সংস্কৃত মদিরা ছন্দ

মা ধ ব । মা সি বি । ক স্ব র । কে শ র । পু ঞ্জ ল । স ম্ভ দি । রা মু দি । তৈঃ
 ত্রী চ র । বে বি র । হে মিল । নে শ র । নে স্ব প । নে ত ব । যা চি শ রণ
 উ চ্ছ ল । শি ঙ্গ নে । ঝং কা রি । যা হি য়া । শ্রা ম প্রি । রা এ সো । লা স্ত্র লী লায়

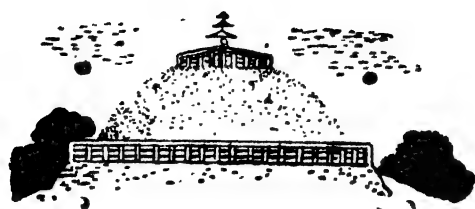
মিশ্র লঘুগুরু ছন্দে অনেক পদ পাওয়া যায় বৈষ্ণব পদাবলীতে তথা হিন্দি কবিদের গানে। তাঁরা এসব পদে পর্বের প্রথম অক্ষরে মুক্তদল গুরুস্বরে দুমাত্রার মর্যাদা দিতেন। পর্বের মাঝের কোনো অক্ষরে মুক্তদল গুরুস্বর থাকলে একমাত্রাই ধরতেন। হেতু এই যে পর্বের প্রথম অক্ষরে একটি স্বাভাবিক প্রশ্নন যাতে—মুক্তদল গুরুস্বরকে (অর্থাৎ আ ঙ্গে উ ও) তাই সহজেই দু-মাত্রা ধরা হয়। উপরের ত্রীচরণে...পংক্তিটি আদ্যন্ত বিভক্ত লঘুগুরু ছন্দে পড়া যায়, কিন্তু উচ্ছল শিঞ্জনে পংক্তিটির নে, দ্বিতীয় রা, এ, সো লী এক মাত্রা। অথচ প্রথম রা, তৃতীয় রা ও শ্রা দুমাত্রা পর্বের প্রথম অক্ষর বলে।

ইতি।

চতুর্মাত্রিক ছন্দ—

•	১	+	৩
সা রা রা রা ।	সা গা গা গা ।	রা মা মা মা ।	গা পা পা পা ।
উ চ্ছ ল	শি ন্ জ নে	ঝং কা রি	য়া - হি রা
ক্ষা ধা ধা ধা ।	পা না না না ।	ধা রী রা না	সী -১ -১ -১ ।
শ্রা - ম প্রি	য়া - এ সো	লা - স্ত্র লী	লা - - য
গী -১ রী সী	না -১ ধা না	রী -১ দী না	ধা -১ পা ধা ।
স ন্ ধ্যা বি	ব ণ্ ৭ প	রা - জি ত	অ ন্ ত র
সী -১ না ধা	পা ক্ষা পা ধা	পা মা গা রা	সা -১ -১ -১ ।
চ ন্ ত্রি কা	কু ল্ ল ক	য়ো - ক ক	ণা - - য
সা পা পা গা ।	পা পা পা গা ।	রা ধা ধা ধা ।	ধা ধা ধা ধা ।
প্রো - ম ব	স ল্ ত হ	রে - এ স	ক্ষে - ম ম
ছ ন্ দ ম	য়ী - ত ব	কান্ তি দো	লে - তো লো
ক্ষা না না না ।	না না না না ।	পা রী রা না	সী -১ -১ -১ ।
য়ী - অ প	রা - জে রা	সান্ জ বি	ভা - - য
আ ন্ দো লি	য়া - কা লো	ম ন্ থ র	তা - - য
সী গী গী গী ।	গীমা পা ক্ষা পী	গী মা গীরা গী	রীমা রী সীনা সী ।
এ - স উ	ধা - ব র	দা - ত্রী চি	বন্ - ত নী
নধা না ধপা ধা ।	পক্ষা পা মগা মা	গরা গা রমা রা	সা -১ -১ -১ ।
ধা - জি বি	শং - কি নী	রা - ন হি	য়া - - য
সা মা গা মা ।	রা গা মা পা	গা ধা পা ধা	ক্ষা পা ধা না ।
কা - ম না	ভ্রা ন্ তি বি	লা - স জ	য়ে - র রা
পা সী না সী ।	ধা মা সী রা	না গী রা না	সী -১ -১ -১ ।
শা ন্ তি ম	য়ী - এ সো	প্রো - ৭ কু	লে - - -

সাঁ -১ সাঁ সাঁ | পা -১ পা পা | না -১ না না | মা -১ মা মা |
 পা ৭ ড় র ম ব্ মে র বা - লু চ রে - এ সে
 ধা -১ ধা ধা | গা -১ গা গা | পা -১ পা পা | সা -১ -১ -১ |
 গা ২ গ বি ভ ২ গে ত র ২ গ তু লে - - -
 না -১ না সাঁ | খনা -১ খপা ধা | না র'সা না সাঁ | খনা -১ না না |
 ব ন্ দ ন ধ ন্ ন ক যো - ম নো ম ন্ দি র
 লু প্ ত ক যো - রা ধা গ র ব নি শা - বা ধা
 পা না সাঁ রী | রী -১ রী র'রী | না র'রী র'রী সাঁ | না -১ -১ -১ |
 ন ন্ দ ন য়্ ব্ ছ্ ন্ রা - গ মা লা - - র
 স র ব নি বে - দ ন ম ন্ ত্র দি শা - - র
 মা পা পা পা | পা -১ পা ধা | মা ধা পা ধা | মা পা গা মা |
 শ্রী - চ র গে - বি র হে - মি ল নে - শ দ
 মা পা পা পা | পা -১ ধা না | পা না ধা না | খপা -১ -১ -১ |
 নে - স্ব প নে - ত ব ষা - চি শ র - - প্
 ক্ষপা ধা ধা শা | ধা -১ ধা না | পধা না না না | না -১ না রী |
 মা - শু ভ দা - ব ল দা - পু ল কে - স্ব ল
 ধগ সাঁ সাঁ সাঁ | নসাঁ রী রী রী | না র্গা রী না | সাঁ -১ -১ -১ |
 কে - পু ল কে - ত ব জা - লো ত প - - ন্
 সা মা মা মা | মা মা মা বগা | গা পা পা পা | গা পা পা গা |
 কো - কি ল ক্ - জ নে প ল্ ল ব্ ন ব্ ত নে
 ক্ষা পা ধা পা | ধা -১ পা ধা | ক্ষপা ধা পা ধা | খমা -১ -১ -১ |
 ফা ল্ শু ন ফা - গে আ নন্ - দ ম য়ী - - -
 পা -১ পা গা | খনা স'রী সাঁ সাঁ | ব'ধা -১ ধা পা | খপা -১ পা পা |
 র প্ কি ক যো - ল য় ক্কা ন্ তি নি রা - শা ন্
 রা -১ গা মা | ধা -১ পা পা | মা গা রা গা | খসা -১ -১ -১ |
 বী - ন য় গা ন ত ব বা - নৌ ব হি - - -



ফরিদপুর জেলার দক্ষিণে আড়িয়ালখাঁ নদী প্রবাহিত। তারি খরস্রোতা নদী। কখন কোন পাড় ভাঙে তার ঠিক নেই। আর যখন ভাঙ্গন ধরে তখন গ্রামকে গ্রাম শেষ করে দেয়। কোন দয়া মায়া নেই। কীত্তিনাশা কোথায় লাগে? এ যেন রাক্ষসের মত খাই খাই করছে।

তারই তীরে নতুন চরের ধারে একটা গ্রাম সম্প্রতি গড়ে উঠেছে। এদিক হতে সেই সর্বগ্রামী নদীর কুদৃষ্টি মরে আছে বলেই বোধহয় গৃহস্থরা নতুন ঘর বেঁধে সেখানে উঠে আসতে সাহস করেছে। যার যেমন অবস্থা তার তেমন বাড়ী। কুঁড়ে ঘরের পাশে টিনের ঘর পরম সৌহার্দ্যের সূত্রে আবদ্ধ হয়ে অবস্থান করছে। দু'একটা যে পাকা বাড়ীও দেখা যায় না তা নয়।

সেটা ছিল শীতের দিন। পৌষ মাসের শেষাংশেই হবে। পাশেই বড় নদী। কাণ্ডেই স্থবিধা পেয়ে শীত বাড়াবাড়ি শুরু করেছে। হাড় কাঁপান শীতের দৌবায়া এড়াতে গ্রামের মানুষ খাওয়া দাওয়া সেরে প্রথম রাতেই আলো নিবিরে শুয়ে পড়েছে। নিম্ন রাত। নীরবতার একছত্র রাজ্য। আশপাশের অঞ্চলে একটানা ঝিঁঝির ডাকের শব্দ ছাড়া তার কোন ব্যাঘাত নেই। বরং সেই একটানা ডাক নিশার গভীর নীরবতাকে যেন একটা গান্ধীর্ঘ্য দান করেছে।

শীতের সেই অনবচ্ছিন্ন নীরবতাকে ভেদ করে হঠাৎ গ্রামের কুহুরগুলো এক সঙ্গে ডেকে উঠল। গোলমালটা যেন চরের দিক থেকেই আসছে। কলে অনেক গৃহস্থেরই ধুম ভেঙ্গে গেল, কিন্তু অজানা বিপদের আশঙ্কার কেউ ঘরের বাইরে এসে খবর নিতে সাহস পেল না। দিন-কাল ত ভাল নয়, বন্ধ জ্ঞানলার আড়ালে থেকে কোতুলল নিকাপিত করার চেষ্টাই স্ববুদ্ধির কাজ।

তারপর হঠাৎ দেখা গেল তাদের বীরত্ব ব্যঙ্গক ডাক পরিহার করে একান্ত আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে চরের উল্টোদিকে

গ্রামের সদর রাস্তা ধরে ছুটে পালাচ্ছে। তারা যে রীতি-মত ভয় পেয়েছে তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। লেজ-গুলো তাদের পেছনের দুই পায়ের মাঝের ফাঁক দিয়ে পেটের তলায় ঢোকান। তাদের বীরদর্পের ডাক এখন কাঁহুনিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

বাঁপারটা হল কি? সকলের মনে একটা অজ্ঞাত ভয়ের আশঙ্কা উঁকি মারে। তারা অধীর অপেক্ষার উৎকর্ষ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ওদিকে যেমন পলায়মান কুহুরদের কান্না ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসতে লাগল, এদিকে চরের দিক থেকে একটা নতুন শব্দ কাণে এসে ঠেকল। সে শব্দের একটা ছন্দ আছে, তাল আছে। সে শব্দ ক্রমশ উচ্চতর হয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠল। এখন বোঝা যায় শব্দটা কিসের।

শব্দটা অনেক মানুষের সবুট পায়ে তালে তালে এক সঙ্গে চলার শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে নায়কের কণ্ঠধ্বনিও শোনা যাচ্ছে। তাও এখন স্পষ্টতর হয়ে উঠল। 'তা' তালের সঙ্গে মিশিয়ে চলছে—লেকফ্‌ রাইট, লেকফ্‌ রাইট, লেকফ্‌ রাইট।

তবে কি আপানীরা দেশে ঢুকে পড়ল না কি? ইংরেজরা আগার রণে ভক্ত দিয়ে পালাল? এখন এই সহায় সম্বলহীন প্রজাদের উপায়!

গৃহস্থদের এমন কথা ভেবে আতঙ্কগ্রস্ত হওয়া মোটেই অশ্রায় হয়নি। সেটা ছিল ১৩৫০ বাংলা সাল। ইতি-হাসের পাতায় তার নাম উঠেছে পঞ্চাশের মহত্তর বলে। বহুদিনের আনন্দময়ের বর্ণিত ছিয়াস্তরের মহত্তরের মন্তই তার সম্মুখ। হয়ত খানিকটা বেশী।

যেদিন অতর্কিতে পার্লামেন্টের আক্রমণ করে মার্কিন-দের অনেকগুলি রণতরী ডুবিয়ে দিয়ে আপানীরা মার্কিন আর ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে নেমে পড়ল সেদিন ভারতের পূর্বাঞ্চলের ভাগ্যে অতি দুর্দিনের ইতিহাস রচনা শুরু হয়ে

গেল। ইংরেজ যখন হিটলারের ঝটিকা-বাহিনীর ভড়িত-বুদ্ধে মার খেয়ে প্রাণ নিয়ে ইউরোপ মহাদেশ ত্যাগ কবে দেশে পালিয়ে গেল, মার্কিনরা তখন কৃষ্ণকর্ণের নিদ্রায় বিভোর। তাদের দেশে দুই দিকে মহাসমুদ্র যখন আছে, তারা নিজেদের একরকম নিরাপদই মনে করেছিল। তাই ইউরোপের রণক্ষেত্রে হিটলার বাহিনীর কুচকাওয়াজ উপভোগ করে চিত্তবিনোদন ছাড়া আর কিছু করবার আছে বলে তাদের মনে হয় নি। মার খেয়ে তবে তাদের ঘুম ভেঙেছে। প্রস্তুত হতে এখনও অনেক দেরি।

এদিকে ইংরেজ ঘর সামলাবে না সাম্রাজ্য সামলাবে—কাজেই জাপানীদের আক্রমণ হতে সাম্রাজ্য রক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থার জন্ত তারা তৈরি ছিলনা। তাই আক্রান্ত হলে ধীরে ধীরে সরে আসা ছাড়া কোন নীতি প্রয়োগ করা তাদের সাধ্য ছিলনা। সিজাপুর গেল, রেঙ্গুন গেল, মান্দালয় গেল, আকিরাব গেল। এখন কক্সবাজার অঞ্চলে যুদ্ধের সীমারেখা এগিয়ে এসেছে। ওদিকে জাপানী রণতরী অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে ওলন্দাজের নৌশক্তি ধ্বংস করেছে। পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের বিস্তৃত এলাকা হতে ওলন্দাজদের তাড়িয়ে নিজেরা জাঁকিয়ে বসল। ওদিকে ঘর সামলাতে ইংরেজের হাত জোড়া। সর্বাধিনায়ক উইনস্টন চার্চিল দুখানি বড় রণতরী পাঠিয়েই তাঁর কর্তব্য শেষ করেছিলেন। কিন্তু জাপানী বোম্বার্ক বিমান তাদের অতি সহজে ডুবিয়ে দিয়ে বিখের মাহুধকে যেমন বিন্ময়ান্ত্রিত করল, তেমনই বঙ্গোপসাগর হতে ইংরেজের নৌশক্তিকে সম্পূর্ণ বিতাড়িত করল।

তারপর ইংরেজদের করবার কিছু রইল না। কোন রকমে বর্মার সীমান্ত অঞ্চলে জাপানী স্থল বাহিনীকে আটকে রেখে মার্কিনদের সহায়তায় ধীরে ধীরে তারা সামরিক শক্তিসঙ্কয়ে মন দিল। পূর্বাঞ্চলে সৈন্যদের খোরাকের জন্ত রীতিমত খাদ্য শস্ত সংগ্রহের ব্যবস্থা হল। সাধারণ মাহুধের খাবার মত চাল বাজারে রইল কিনা তাদের ভাববার প্রয়োজন হলনা। ওদিকে রণাঙ্গণে পরিণত হয়ে জাপানীদের দখলে চলে যাওয়ায়, বর্মার হতে যে লক্ষ লক্ষ টন চাল আসত বাংলায়, তা রপ্তানি বন্ধ হয়ে গেল। ফলে কতকগুলি কৃত্রিম কারণে বাংলার অসম্ভব রকম খাদ্য শস্যের ঘাটতি সৃষ্টি হল। যে মোটা চালের

দাম ছিল তিন টাকা মণ, তার রাতারাতি দাম উঠে গেল চল্লিশ হতে পঞ্চাশ টাকায়। সাধারণ মাহুধের মুখে আর অন্ন জোটে না। আর চাইলেই কি কিনতে পাওয়া যায়! লোক খুদ খেতে শুরু করল। যখন খুদ জুটলনা তখন শাক পাতা খেতে শুরু করল। পুষ্টির অভাবে দেহ শুকিয়ে অস্থিচর্মসার হল। খাদ্যভ্রুণের অভাবে মাহুধের বেরি-বেরির লক্ষণ প্রকাশ পেল। যখন গ্রামে আর কিছু জুটলনা মাহুধ সহরের দিকে চলতে শুরু করল। আশা, ভিক্ষা করে যদি কিছু জোটে। কোথাও কোথাও সাধারণের সংগৃহীত অর্থে লক্ষরখানা খোলা হ'ল। সেখানে যদি এক মণ খিচুড়ি পাওয়া যায় এই আশায় গ্রামের লোকের যাত্রা শুরু হল সহরের পথে -অস্থিচর্মসার দেহ আর ফোলা ফোলা পা নিয়ে। কিন্তু তা' প্রায় পাণ্ডবদের মহাপ্রস্থানের অবস্থায় পরিণত হল। পথে চলতে চলতে মরণের বুকে আশ্রয় পেয়ে অনেকে বেঁচে গেল। যাদের ভাগ্যে তা' জুটলনা তাদের জগৎ ইংরেজ এক অভিনব ব্যবস্থা করল। মফঃস্বলের সহরগুলির প্রাণের রাতারাতি দর্যার বেড়া আর খড়ের ছাউনি দিয়ে বড় 'বড় চালা' তৈরি হল। তাদের নাম দেওয়া হল অক্সিজেনারি জেনারেল হাস্পিটাল, ছোট কথায় এ, জি, হাসপাতাল। তার কাণ্ডটা হল ততটা চিকিৎসা নয়, যতটা না যেতে পেরে যারা পথেও মরতে পারেনি তাদের মরবার একটা জায়গা নির্দিষ্ট করে দেওয়া।

এরই নাম হল পঞ্চাশের মনস্তর। এখন জাপানী সৈন্য কক্সবাজারের কাছে। বাংলা দেশের দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চল তাদের নাগালের মধ্যে। মাঝে খালি মেঘনার মোহনা! ইংরেজের জলবাহিনীর এখন অস্তিত্ব নেই যে বাধা দেবে। কাজেই জাপানীদের যে কোন মুহূর্তে ফরিদপুরের দক্ষিণ অংশে নেমে পড়া বিচিত্র নয়। ব্যাপারটি সম্পূর্ণ তাদের ইচ্ছাধীন। এক্ষেত্রে ইংরেজ করে কি? তাদের উর্ধ্বর মস্তিষ্ক একটা কর্তব্য নির্ধারণের নীতি ঠিক করে ফেলল। তার নাম হল 'ডিনায়াল পলিশি' অর্থাৎ না দেওয়া নীতি। এ অঞ্চলের যাতায়াতের জন্ত রেলপথ নেই, পাকা রাস্তাও নেই। যা কাঁচা রাস্তা আছে তা বছরে অন্তত ছ'মাস কর্দমাক্ত হয়ে ব্যবহারের অযোগ্য থেকে যায়। এ অঞ্চলের প্রশস্ত রাজপথ হল

অসংখ্য নদী-নালা। নৌকা এখানে মাছবের বাহন। গ্রামের অভ্যন্তর দেশ পূর্ণান্ত তার গতি। ঠিক হল, সা গৃহস্থের নৌকা জ্বরদস্তি করে কেড়ে নিয়ে নষ্ট করা হবে—যাতে জাপানীরা এদেশে নামলে ব্যবহার করতে এক-খানিও নৌকা না পায়। কাজেই মাছবের চলাচলের উপায় নষ্ট হয়ে গেল। মানব জাতির তাদের বিপদ হতে রক্ষা করার শক্তি নেই বলে তাদের নিজেদের নিজস্ব যে পালাবার শক্তিটি ছিল তাও তারা নষ্ট করে দিল। এখন জাপানীরা আসলে, ভাগ্যের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে বলে থাকা ছাড়া আর উপায় রইলনা।

সুতরাং সামরিক কার্যদায় ক্রমে পা ফেলে নদীর চর হতে যদি একদল মাছব আকস্মিক ভাবে গ্রামের বৃকের মধ্যে এগিয়ে আসতে থাকে, গ্রামের মাছবের তাদের জাপানী আততায়ী ভাবা মোটেই যুক্তিহীন নয়। হিন্দু বলল—হায় ভগবান, তুমিই এখন ভরসা। মুসলমান বলল, আল্লা, তুমি আমাদের দেখো প্রাপটা যেন বাঁচে।

ওদিকে তারার অস্পষ্ট আলোয় ফুটে উঠে নৈমিত্তিক একদল মাছব। তাদের পায়ে বুট, পরনে থাকি রং-এর হাফপ্যান্ট, আর গায়ে থাকি রং-এর হাত ঢাকা গরম গেঞ্জি। মাথায় একই রং-এর থাকি বালারাজা টুপি। ইংরেজ সরকারের অধীনে এই ধরনেরই পশ-মের গেঞ্জি আর টুপি সরকারী কর্মচারীদের বাড়ীর মেয়েরা কত বুনে দিয়েছে, ভারতীয় সৈন্যদের ব্যবহারের জন্ত। সারিবদ্ধ জন কুড়ি লোক হবে, প্রতি সারিতে ৪ জন করে আর আগে আসছে একজন মাত্র মাছব। সেও একই ধরনের পোষাকে সজ্জিত, তবে তার মাথার টুপি অন্তর্ধরনের। সেই মুখে বলছে লেফট্ রাইট্, লেফট্ রাইট্, লেফট্ রাইট্, আর তার কথার সঙ্গে তাল মিলিয়ে সবুট পদক্ষেপে দলটি এগিয়ে আসছে।

গ্রামের বড় রাস্তা-বরাবর মাঝামাঝি এসে হঠাৎ তাদের নায়ক চিংকার করে জুহু দিল ‘হল্ট’। আর সঙ্গে সঙ্গে বিশ জোড়া সবুট পায়ে সগর্ভ ধরনি হঠাৎ থেমে গিয়ে একটা থম থমে ভাব স্থিতি করল। যেখানে থামল তার সামনেই একটা সুন্দর দোতলা বাড়ী! বাড়ীটা নতুন এবং সহজেই এই গ্রামের পরিবেশে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

বাড়ীটা তারাপদর বাবা করে গিয়েছেন। তিনি ছিলেন আসামের চা বাগানের বড়বাবু। বয়স হওয়ার চাকুরী ছেড়ে কয়েক বছর আগে দেশে চলে এসেছিলেন। সারা জীবনের সঞ্চিত অর্থ তিনি মনের মত করে এই বাড়ীখানি করেছেন। কিছু জমি-জমাও কিনেছেন। বড়মাছব বলে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়েছে। বড় হেলে তারাপদ যুবক হয়েছে। সম্প্রতি ঘটা করে বিয়ে দিয়ে পুত্রবধূকে ঘরে ফেরেছেন। কিন্তু ভাগ্যে বেনীদিন এ সম্প্রতি তাঁর ভোগে আসেনি। পত্নী, দুটি নাবালক সন্তান আর এই নবীন দম্পতীকে রেখে তিনি সম্প্রতি দেহরক্ষা করছেন।

ঠিক তারাপদর বাড়ীর সামনে এই দলটি থামল কেন? আশে পাশে প্রতিবেশীরা ঠিক বুঝে উঠতে পারলনা এই জাপানীগুলির মতলব কি। তবে কি ওদের বাড়ীতেই ঘাঁটি স্থাপন করবে নাকি?

তাদের আচরণে ব্যাপারটা শীঘ্রই পরিষ্কার হয়ে গেল। দলপতি একটা শক্তমান টর্চ বার করে বাড়ীটার চারিদিকে আলো ফেলে দেখতে লাগল। সেই আলোতে দলের মুখগুলোও খানিকটা ফুটে উঠল, মুখগুলো কিন্তু জাপানীদের মত ঠেকলনা। চাপটাও নয় নাকগুলো, খাবড়াও নয়, রংও ফরসা নয়। এবে আমাদের দেশের মাছবের মুখ। শ্রামবর্ণ মুখে মাঝারি নাক। তবে এরা কারা? এরা কি দেশী সৈন্য নাকি? তারা যে আসলে তাও-নয়, তাদের আচরণ তা’ শীঘ্রই প্রমাণ করে দিল। দলপতি তারাপদর বাড়ীর সামনে সুসংবদ্ধ দলটি থামিয়ে পকেট থেকে একটা হুইসল বার করে বাজাল। তারপর দলের চার জনকে ডাক দিল, নাম ধরে নয় নম্বর ধরে। দলের দু নম্বর, চার নম্বর, ছ নম্বর আর আট নম্বর তার সামনে এসে মেলামঠুকে দাঁড়াল। সে তাদের হুকুম দিল তারাপদর বাড়ীর উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম চারিদিকে বাড়ীর দিকে পিছন করে দাঁড়াতে। অর্থাৎ তাদের কাজ হল বাড়ীর চারিদিকে নজর রাখতে হবে। তারপর দলের বাকি সঙ্গীদের দুভাগ করল। এক ভাগ রইল রাস্তায় দাঁড়িয়ে, আর অল্প দলটির সঙ্গে সে এগিয়ে চলল তারাপদর সদর দরজার দিকে।

এখন আর কারও বুঝতে বাকি রইলনা যে এরা জাপানী সৈন্যও নয় দেশী সৈন্যও নয়। এরা শ্রেণি ভাঙাতের হল। বুকের আবহাওয়ার যুগে এরা লেপাই এর বেপে

আবির্ভূত হয়েছে তারাপদদের বাড়ী ভাঙাতি করতে।
তাদের ভাগ্যে আজ কি আছে কে জানে ?

তারাপদদের বাড়ীর সদর দরজার খোঁগ সোজা বৈঠক-
খানার সঙ্গে। সেখানে কতকগুলি নীচু তক্তপোষ পাতা,
উপরটা মাহুর দিয়ে ঢাকা। এখানে দিনের বেলা,
গোমস্তারা কাজ করে, বাহিরের মাহুর বাড়ীর কর্তার সঙ্গে
দেখা করে, আর রাতে এখানে বাড়ীর বামুন ও ছজন
চাকর শুয়ে থাকে। তার থেকে বেরিয়ে গেছে একটা
সরু দালান, আর সঙ্গে সংলগ্ন দুটি ঘর। দালানের অল্প
প্রান্তে ওপরে ওঠবার সিঁড়ি। ওপরেও ঠিক এই রকম
ব্যবস্থা।

ডাকাতের দলটি যেমন সদর দরজার দিকে এগিয়ে এল
বৈঠকখানা ঘরের যে জানালাটা আধখানা খোলা ছিল,
সেটা হঠাৎ সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল। আসলে হয়েছিল কি
তারাপদর বামুন আর চাকরদ্বয় জানালা অল্প ফাঁক করে
এই আগন্তুক দলটির কূচকাওয়াজ দেখছিল। খানিকটা
ওঁৎসূকা, খানিকটা ভয় জড়ানো একটা অল্পভূতি তাদের
বুকের খড়ফড়ানি স্রু করে দিয়েছিল। এখন ডাকাতদের
আচরণটা যখন তাদের প্রকৃতরূপটি প্রকাশ করে দিল এবং
দেখিয়ে দিল তাদের বাড়ীতেই তাদের হানা দেবার ইচ্ছা,
তারা তখন নিজেদের জীবন একান্ত বিপন্ন বোধ করল।
কিন্তু আত্মরক্ষার জন্তে করে কি ?

এদিকে ডাকতারা ত এসে দরজায় সম্মুখে ধাক্কা দিচ্ছে,
ডাক দিয়ে বলছে দরজা খুলে দিতে। তাদের আদেশ
পালন করলে ত তাদের মুখোমুখি পড়তে হয়। দুই চাকর
দুই হাতে তাদের বামুন দাদার কাঁধ ধরে ভারি স্বরে
বলতে থাকে—বামুন দাদা, রক্ষা কর। বামুন দাদা
তাদের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতেই অস্থির, তা
তাদের কথা ভাববে কি ?

এদিকে বাহিরে ডাকাতের দল ভেতরে মাহুরের কোন
সাড়া না পেয়ে নিজেরাই দরজা ভেঙ্গে ভিতরে ঢুকবে
ঠিক করল। দরজাটা ছিল নতুন মোটা কাঠের
খিলেন বসান, শক্ত শাল কাঠের হড়কো দিয়ে বন্ধ। সহজে
তাই খুলতে চাইল না। খুলবার কৌশল এসব পটু
ডাকাতদের অজানা নয়। আলানির জন্তে অনেক
কাঠ পড়েছিল উঠানে। তার থেকে একটা মোটা কাঠ

ভিনচার জনে বয়ে নিয়ে এসে ভাল চুঁকে একযোগে তারা
দরজায় আঘাত দিতে আরম্ভ করল। আঘাতের পর
আঘাত পেয়ে দরজার পাল্লা কেঁপে উঠল। তারপর কজা
আলগা হয়ে নড়ে উঠল। আর দুচার ঘা খেলেই
ভেঙ্গে খুলে পড়ে।

ওদিকে ঘরের ভেতর বিপদ ঘনায়মান দেখে বামুনদাদা
মরিয়া হয়ে এবার আত্মরক্ষার জন্ত শেষ চেষ্টা করে দেখতে
চাইল। প্রাণবান বলে তাদের ছজনকে ঠেলে দিয়ে
সেই তক্তপোষের তলায় সে কোন রকমে দেহটাকে
চুকিয়ে অদৃশ্য হয়ে পড়ল। চাকর দুজনও তার অঙ্গদগরণ
করে আত্মগোপনের ব্যবস্থা ঠিক শেষ সময়টিতে ক'রে
নিল।

সুতরাং ডাকাতদের দল যখন দরজা ভেঙ্গে ফেলে
বৈঠকখানা ঘরে প্রবেশ করল তারা দেখল তা' শূন্য। দল-
পতি টর্চ ফেলে চারিদিকে একবার দেখে নিয়ে পাশের
বারাণ্ডায় প্রবেশ করল। সেখানেও কারো সাক্ষাৎ না পেয়ে
তারা সিঁড়িবেয়ে ওপরে উঠে গেল। সেখানেও বারাণ্ডায়
কাউকে পেলনা। তবে ওপরে বড় ঘরের দরজা ভেতর
থেকে বন্ধ দেখে দলপতি দরজায় আঘাত করে, বলল, কে
আছে, দরজা খোল।

এটাইছিল বাড়ীর বড় শোবার ঘর। এখন তারাপদ
তার সমুদ্রবিবাহিতাপত্নীকে নিয়ে এখানেই শোয়। দম্পতীর
খুম অনেক আগেই ভেঙ্গেছিল। এতক্ষণ কি ঘটছিল তাও
যে তারা পর্যবেক্ষণ করে দেখেনি তাও নয়। কিন্তু করবে
কি ? অজ্ঞাত বিপদের আশঙ্কায় তাদের উভয়ের মন
আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কি করবে তবে পাচ্ছিলনা।
বিপদ যখন অত্যন্ত কাছে এসে দরজায় আঘাত হানল
তখন তারাপদ নিরুপায় হয়ে তার চাকর বামুনদের
ডাকল। কিন্তু তারা যে প্রাণভয়ে আত্মগোপন করে
আছে, তারা সাড়াদেবে কেন ?

হঠাৎ তারাপদ কি রকম বেপরোয়া হয়ে গেল।
বিপদের সম্মুখে কি করতে হবে তবে না পেয়ে সে চটকরে
এসে দরজা খুলে দিয়ে দরজার সামনে ডাকাতদের মুখো-
মুখি হয়ে আফালন করে গর্জন করে উঠল, খবরদার।

কিন্তু বীরের মত গর্জন করে উঠে হবে কি ? সেত
সম্পূর্ণ নিরস্ত্র। একখানা ছড়িও হাতে ছিলনা তার।

এদিকে পাঁচ সাতজন ডাকাত সশস্ত্র দাঁড়িয়ে। দলপতি টর্চ ফেলে দেখে নিয়ে অবস্থাটা বুঝে ফেলল। বেশ ধীর ভাবেই বলল, হাঁক ডাক দিয়ে লাভ হবেনা বাপু। ভাল চাওত চুপ করে দাঁড়াও দেখি।

ভারাপদ একটা অন্ধ আক্রোশে কি রকম মরিয়া হয়ে উঠেছে। সে দলপতির কথায় কর্ণপাত করলনা। আবার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে গর্জে উঠল, খবরদার।

সঙ্গে সঙ্গে ডাকাতদের একজন তার হাতের ব্যাটিন দিয়ে করল আঘাত তার মাথায়। কপালের চামড়া কেটে দর দর করে মুখ বেয়ে রক্ত পড়তে আরম্ভ করল।

ভারাপদর স্ত্রী এতক্ষণ ঘরের একটু ভিতরে দাঁড়িয়ে ছিল। সন্ত-বিবাহিতা নবীনা বধু সে, কি করবে। কিন্তু স্বামীর ওপর এই আকস্মিক আক্রমণ তারমধ্যে এমন এক অভিনব প্রতিক্রিয়া সূত্র করল, যা তাকে বুঝিয়ে দিল যে স্বামীকে রক্ষা করতে তাকেই এখন ডাকাতদের সঙ্গে মোকাবেলা করতে হবে। তার মধ্যে এক নিস্ত্রিভশক্তি হঠাৎ জেগে উঠে তার মনে বুদ্ধি জোগাল, মুখে জায়া জোগাল—আর বৃকে জোগাল চরম হুঃসাহস। নলিনী ভারাপদের পাশ দিয়ে বেরিয়ে এসে তাকে আড়াল করে ডাকাতদের সামনে দাঁড়াল। ধীর শান্ত গলায় সে বলল—

দোহাই তোমাদের, তোমরা আর মার খোর কোর না। তোমরা যা চাও, তা নাও, আমরা কোন বাধা দেবনা।

ডাকাতদের সর্দার বলল, বেশ বলেছ, মা। তুমি যা বললে তাই হবে। ভারাপদর বড় শোবার ঘরেই লোহার সিন্দুকটা ছিল। তারপ্রতি নলিনীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে সর্দার বলল, ঐ সিন্দুকের চাবিটা দাও ত মা।

নলিনী বলল, সিন্দুকের চাবিটা মার কাছে আছে, এনে দিচ্ছি। ভারাপদর মা-ই বাড়ীর গৃহিণী। কাজেই সিন্দুকের চাবি তাঁর কাছেই থাকত। তিনি পাশের ঘরে গেলেন। ছুটি ঘরকে সংযোগ করে মাঝখানে একটা দরজাও আছে। সেটি বন্ধ ছিল।

সর্দারকে কথা দিয়ে নলিনী শাওড়ী ঠাকুরের দরজার দিকে মুখ ফেরাতেই দেখল যে সেই দরজার চৌকাঠের ওপরই তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। আসলে হয়েছে কি—ছেলের ঘরে হৈ হমা ও পুত্রবধূর উত্তেজনাপূর্ণ স্বপ্নে

অজানা আশঙ্কার উদ্বিগ্ন হয়ে তিনি দরজা খুলে কেলেঙ্কি-লেন। সামনেই ডাকাতের দলকে দেখে তিনি কি রকম হক চকিয়ে গিয়েছিলেন।

এই নির্দাক্ষণ বিপদের পরিবেশে, কিন্তু নলিনীর স্বৈচ্ছায় নেওয়া নেতৃত্বের ভার গ্রহণ করবার ক্ষমতা, তার মধ্যে অবস্থিত কোন অজ্ঞাত শক্তি তাকে দিল। সন্ত-বিবাহিতা ঘরের বধু লজ্জা ও জড়তা ত্যাগ করে ডাকাতের সর্দারের সঙ্গে যেমন সহজে বাক্যালাপ করবার সাহস পেল তেমনই সহজে শাওড়ীর নিকট সোজা গিয়ে বলে বলল, সিন্দুকের চাবিটা দাও ত মা।

তিনি স্বল্পচালিতের মত পুত্রবধূর হাতে বিনা বাক্য-ব্যয়ে তখন চাবি ভুলে দিলেন। চাবি সঙ্গে সঙ্গে অতি তৎপরতার সঙ্গে সর্দারের হাতে গিয়ে পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে সিন্দুকের তালো খোলা হয়ে গেল। সর্দার এক এক করে গয়নামূল্যি বার করে তার এক সঙ্গীর হাতে ভুলে দিতে লাগল, আর সে সেগুলি মেঝেতে লাজিয়ে রাখতে লাগল। সন্তবত সেই দলের উপসর্দার হবে, তা না হলে এমন গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার তার ওপরে পড়বে কেন?

অল্পক্ষণের মধ্যেই সিন্দুকের গভর্টি খালি হয়ে গেল আর তার মধ্যে যা সোনা-দানা আশ্রয় পেয়েছিল মাটিতে জড় হল। সর্দার বললে, তোমার গায়ের গয়নাগুলো খুলে দাও ত মা। সন্ত-বিবাহে লক্ষ সেগুলি তার বাপমার দেওয়া উপহার। কত মায়া তার তাদের ওপর। নলিনীর হৃদয়ের ভেতরটা কেমন মোচড় দিয়ে উঠল। তার স্ববুদ্ধি বলল না দিয়ে উপায় নেই। কিন্তু এদিকে অনিচ্ছা প্রবল বাধা দেয়। তাই সর্দারের কথায় তার সাড়া দিতে দেরি হয়ে যায়-তার মনের মধ্যে যে দো-টাকার বুদ্ধি চলেছে সর্দার বেশ তা' বুঝতে পারছে। তাই তার কর্তব্য ঠিক করে নিতে সাহায্য করতে সে বলে উঠলো।

কথা কি জান মা, তোমার এ গয়নাগুলো আমাদের চাই। এখন নিজেই যদি খুলে দিতে ভালো হত, তোমার গায়ে হাত দিতে হতনা। তুমি যদি না সাহায্য কর, অগত্যা নিজেদেরই ও-গুলো খুলে নিতে হয়।

এ উক্তিভে ছিল বৃষ্টিকল্পনের আলা। ডাকাতদের হাতের কলুব স্পর্শের কথা তাতে স্বপ্নের ভার সর্দার

শিউরে উঠল। তার ঘোঁষা ভাব সে তখন ত্যাগ করল। সে বলল, আমি নিজেই খুলে দিচ্ছি। তোমাদের খুলে নিতে হবেনা।

নিজের অক্ষের ভূষণগুলি নিজেই খুলে ডাকাতদের হাতে জুলে দেবার পালা শুরু হয়ে গেল। আট গাছি চুড়ি নলিনী এক এক গাছি করে খুলছে আর তুলে দিচ্ছে সর্দারের হাতে। এমন সময় নীচে একটা সোর-গোল পড়ে গেল। খানিকটা হৈহুল্লা খানিকটা কারা আর গোঙানি মিলিয়ে একটা শব্দ। উপসর্দারকে লক্ষ্য করে সর্দার বলল—তুই এগুলো বুঝে নে। আমি একবার নীচ হতে আসছি। বলেই সে সিঁড়ি দিয়ে নীচে মেয়ে গেল।

নীচের তলায় যে ব্যাপারটা ঘটেছিল তা খানিকটা করুণও বটে, খানিকটা হাস্যকরও বটে। বৈঠকখানায় দরজার কাছেই দুজন ডাকাত পাহারায় ছিল। এখন হয়েছে কি, বাড়ীর যে তিনজন চাকর বামুন তক্তপোষের তলায় আত্মগোপন করেছে তারা আশ্রয় নিয়েছিল খালি মেঝের ওপর। একে শীতকাল, তায় রাত্রি। সে মেঝে যেমন ঠাণ্ডা তেমন স্যাঁতসেঁতে। তার ওপর খানিকক্ষণ শুয়ে সে বেচারীদের শীত ধরে গেছে। হাত পা কাঁপতে শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু উপায় কি, বাহিরে গেলেই যে ডাকাত ধরবে। তাই তারা চুপ করে পড়ে থাকে।

কিন্তু ভাগ্য যে হয়ে দাঁড়াল তাদের প্রতিকূল। খানিক শীতভোগের পর যেমন হয়ে থাকে, বামুনটার ঠাণ্ডার দাপটে নাক শির শির করতে লাগল। সে প্রাণপণে হাঁচি খামাতে চেষ্টা করে, কিন্তু পারল কৈ? হঠাৎ পটকা ফাটার মত আওয়াজ করে সে হেঁচে উঠল।

সেই বিকট হাঁচিধ্বনি পাহারায়ত ডাকাতদের কানে না গিয়ে পারে? তারা তখন ঘরে ঢুকল। সামনে কাউকে না দেখে তক্তপোষের তলায় ঢুক ফেলল। ওমা, একজন নয়, দুজন নয়, তিন তিনটে মাছব উপুড় হয়ে শুয়ে আছে।

শালা, তোমরা এখানে লুকিয়েছ। এই বলে তারা তাদের পা ধরে টানতে লাগল। আর ওদিকে তারা তখন হাউমাউ ক'রে ভয় পেয়ে কাঁদতে শুরু করে দিল। সেই শব্দ ডাকাত সর্দারের কাণে গিয়েছিল বলেই সে নেমে

এসেছিল। তার ওপর গুরুদায়িত্ব স্তম্ভ হয়েছে। যেখানে গোলমাল সেখানেও তার নজর দিতে হয়।

ব্যাপারটা কি হয়েছে জরুরী করতে সর্দারের বেশী সময় লাগল না। চাকর-বামনের দুর্দশা দেখে আর তাদের আত্মপ্রকাশের কাহিনী শুনে সে হেসে ফেলল। তারপর পাহারাদারদের বলল তাদের পিঠমোড়া করে বেঁধে তক্তপোষের ওপর ফেলে রাখতে। তার বেশী নজর দেবার এ ব্যাপারে সে প্রয়োজন বোধ করলে না। সে আবার ওপরে উঠে গেল।

ওদিকে ওপর তলায় নলিনীর ভূষণ বর্জন পূর্ব শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু একটা নতুন ব্যাপার নিয়ে উপসর্দারের সঙ্গে লেগেছে তার বাদামুখ।

উপসর্দার বলছে, আর তোমার ওই ঠা হাতে যে ওটা রয়ে গেল ওটা এবার খুলে দাও।

নলিনী বলছে, ওটা আমি খুলতে পারব না।

বেশ তাহলে আমি খুলে নিচ্ছি।

ওটা তোমার চাই? তোমাদের ত সব দিয়েছি। ওটা খুললে যে আমার স্বামীর অকল্যাণ হবে।

সেটা ছিল হাতের লোহা। হিন্দুনারী বহুকাল ধরে গড়ে ওঠা সংস্কারমতে সেটা এয়োত্তীচি এবং খুলতে বারণ, খুললে স্বামীর অকল্যাণ হয় যে। সেই পুরুষাভ্য-ক্রমিক সংস্কারই তাকে সেটা খুলতে দেরশি। তা না হলে যে বিনা বিধায় সব অলকার স্বহস্তে খুলে দিয়েছে, সেটা তার খুলে দিতে বাধা কি?

ওদিকে উপসর্দারটিও দারুণ লোভী। অনেক সময় হাতের লোহার ওপরটা সুরু সোনার পাত দিয়ে মোড়া থাকে। এ লোহাটা সেই ধরণের। তাই ওই দুচার রতি ওজনের সোনার পাতের ওপর তার লোলুপ দৃষ্টি।

নলিনীর আপত্তি শুনে উপসর্দার রাগে ফেটে পড়ল। সে বলল, বটে খুলে দেবে না? তাহলে নিজেই খুলে নিচ্ছি। সে অর্থ চায়।

এদিকে সর্দার কখন পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিল কেউ দেখতে পায়নি। সে ব্যাপারটা সব শুনেছে। নলিনীর সোনার পাত দেওয়া নোরা খুলে দিতে কেন আপত্তি তাও জেনেছে। হঠাৎ সে কথা বলল। তার গলার স্বর শুনে

সকলে তার দিকে ফিরল। উপ-সর্দারেরও দৃষ্টি তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ল।

সর্দার বলল, সত্যিই তুমা, তুমি যা বলেছ ঠিক। এ নোয়া ত' তোমার হাত থেকে খোলা চলবে না!

তারপর উপসর্দারের দিকে চেয়ে বলল, তুই মাকে বিরক্ত করিসনি, থাক।

এদিকে সব সংগৃহীত গয়না একটা থলেতে ভরা হয়ে গেছে। সেটা উপসর্দারের পাশেই ছিল। সর্দার তাকে বলল, থলেটা আনত দেখি।

সঙ্গে সঙ্গে থলে তার কাছে হাজির করা হল। সর্দার তার ভেতর হাত ঢুকিয়ে হাতে নলিনীর হাতের থেকে নেওয়া কয়েকগাছি চুড়ি বার করল। তার কাণে দেখে ডাকাতরা তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে ভাবে, করে কি সর্দার?

সর্দার যা করল, তা' যাদের বাড়ী ডাকাতি হল, না তাদের কারও, না সঙ্গীদের কারও কলনায়ও আসতে পারে! সে সেই চুড়িগুলো নলিনীর হাতে দিয়ে বলল, এই নাও মা এইগুলো। তোমার হাতে পর। তোমার হাত কি খালি রাখতে আছে, মা? স্বামীর অকল্যাণ হবে যে!

তার এই বহাগ্রভা ডাকাতদের কারও পছন্দ হল না। তবে সর্দারের ওপর কথা বলবে কে? সকলে চুপ করে রইল। কিন্তু উপসর্দারের কাছে এটা বড় বাড়ী বাড়ি ঠেকল। তার সহশক্তি হাল ছেড়ে দিল। সে মুহূর্তে প্রতিবাদ করল, এ কাজটা কি ভাল হচ্ছে সর্দার?

সর্দার গর্জন করে উঠল, খবরদার, তোদের কাজ সর্দারের হুকুম তামিল করা। বাড়ীবাড়ি করলে মুখে জুতো মারব।

তার উত্তরে কারও টু শব্দ করবার সাহস হল না।

সর্দারের হুইসিল বাজল। দলকে নিয়ে সর্দার বাইরে এল। আবার হুইসিল। সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে ছটকান মাহুয একসঙ্গে জড় হল। তারপর সারিবদ্ধভাবে সর্দার তাদের সাম্মাল। তারপর হুকুম এল, কুইক মার্চ, লেফট্, রাইট, লেফট্, রাইট।

যে দিক দিয়ে তারা এসেছিল সেই নদীর চরের দিকে দলটা এগিয়ে চলল। খানিক বাদে তারা অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। আরও খানিকক্ষণ দলবদ্ধ পদপাতের শব্দ বাতাসে ভেসে এসে তারপর মিলিয়ে গেল।

সেকঙ্গীয়ার-মহোদয়স্য যট্ সপ্ততিতম। চতুর্দশদী কবিতা

ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চতুর্ধুরীণেন অনুদিতা

কথং শ্লোকাবলী মম নবগর্ভ বিবর্তিতা।
ভিন্নমার্গং ন জানাতি স্মরিতভাগ-মোহিতা ॥২
কথং বা সময়ে নাহং কৃত্বা বহির্নিরীক্ষণম্।
নবীনং পছত্তিৎ যামি বৃত্তা সমাসত্বণম্ ॥৩
রচনা মে সঙ্গা সমা নবীনতা-বিবর্তিতা।
নববিত্তাবনা তত্র শ্রোতসি বেত্তসী যথা ॥৪

প্রতিশব্দো নহু স্পষ্টো লেখকনামহতকঃ।
ঘোষিতজন্মবৃত্তান্তো গতিপথপ্রদর্শকঃ ॥৫
প্রাণপ্রিয়তমং বিদ্ধি লেখকো বিষয়ো ক্রবন্ম্।
কেবলং ত্বক্ মে প্রেম প্রচার-কারণং নবম্ ॥৬
প্রকৃষ্টং মম রচনং নবীন-বেশ-সংবলম্।
প্রাচীনভাবশেলং পূর্বব্যয়েঃ নবং কলম্ ॥৭

যথা সূর্যো নবো ভাতি প্রাচীনোঽপি স্ননুতনঃ।

ভাষতে প্রেম মে তব পুনরুক্তং পুনঃ পুনঃ ॥৮

কীটসের কাব্য

অরুণ দে

মহাকালের প্রাকণে জীবন কণিকের খেলাঘর। সেই খেলাঘরে যারা সার্থকভাবে কাব্যের বীণা বাজান, তাদের স্রবের মূর্ত্তনা জীবনের মত ক্ষণস্থায়ী নয়। সে স্রব দেশ ও কালের গভী অভিক্রম করে চিরন্তনের সম্পদ হয়ে ওঠে। ইংরাজীসাহিত্যে রোমান্টিক যুগের কাব্য তেমনই চিরন্তনের সম্পদ। সেই রোমান্টিক যুগের অত্যন্তম প্রতি-নিধি হলেন কীটস।

সে যুগের নিসর্গপ্ৰীতি, সৌন্দর্যপিপাসা, রহস্য ও বিস্ময়বোধ ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলী ও কোলরিঞ্জের মত কীটসের কাব্যেও ধ্বনিত হয়েছে। তবু সমসাময়িক কবিদের মধ্যে থেকে তাকে আলাদা করে চেনা যায়।

কীটসের কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন সৌন্দর্যলক্ষ্মী। সৌন্দর্য পিপাসাই তার কাব্যের প্রধান স্রব। সে সৌন্দর্য কোন অলৌকিক সৌন্দর্য নয়। রূপের মধ্যে অরূপের আরাধনা নয়। বরং পৃথিবীর রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধ ও গানে যে সৌন্দর্য ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে ধরা দেয়, কীটস তারই আরাধনা করেছেন। প্রেম ও সৌন্দর্যসুধাপানের আকর্ষণ পিপাসায় তাঁর কবিচিত্ত মথিত হয়েছে। সৌন্দর্যতৃষ্ণার পরম আবেগই তার কবিকর্মের মূল প্রেরণা। তার কাছে—

“A thing of beauty is a joy for ever :

Its loveliness increases ; it will never

Pass into nothingness ; but still will keep.

A bower quiet for us and a sleep

Full of sweet dreams.”

কীটসের সৌন্দর্যবোধের সঙ্গে তাঁর সমসাময়িক যুগের কবিদের সৌন্দর্যবোধের পার্থক্য আছে। প্রকৃতির সৌন্দর্য ওয়ার্ডসওয়ার্থকে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রেরণা দিয়েছিল। ভাবভঙ্গ্য কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে সৃষ্টির প্রাণধারার রহস্য উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি প্রকৃতির মধ্যে দেখেছিলেন এক “all pervading spirit”কে। রূপজগতের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে তিনি

রূপাতীতের স্পর্শ অহুত্ব করেছিলেন। কীটসের মধ্যে ওয়ার্ডসওয়ার্থের ধ্যানপরায়ণতা ছিল না। খণ্ড সৌন্দর্যের স্রুয়ময় তার কবিচিত্ত মুগ্ধ হয়েছে, কিন্তু সৌন্দর্য নিজেই অখণ্ডতা নিয়ে কীটসের কাছে ধরা দেয় নি। তাই ওয়ার্ডসওয়ার্থের মত প্রকৃতির মধ্যে সৌন্দর্যের বাহু-প্রকাশের আড়ালে যে প্রাণরসের প্রবাহ চিরবহমান তার সন্ধান তিনি পান নি।

শেলীর কবিতা বস্তু থেকে ভাবের দ্বারা বেশী অহু-রঞ্জিত। তার কবিতায় রূপজগতের মূর্ত্তি প্রাধান্য পায় নি। তার স্বপ্নময় গীতিপ্রবণ কবিচিত্ত করনার ডানায় ভর করে মিষ্টসিদ্ধি পরিণতি লাভ করেছে।

‘Homage to Intellectual Beauty’ কবিতায় শেলী বিশ্বের অন্তরালে সৌন্দর্যের এক অধিষ্ঠাত্রী দেবীর আরাধনা করেছেন। কীটস শেলীর মত নিরালস্য সৌন্দর্য পূজারী নয়।

রূপজগতের ইন্দ্রিয়ভোগ্য সৌন্দর্যই কীটসের কাব্যে প্রাধান্য পেয়েছে। শেলীর মত সৌন্দর্যের মধ্যে অসীমের উপলব্ধির স্রব তাঁর কাব্যে বড় একটা শোনা যায় না। তিনি শেলীর মত আদর্শবাদী হলেও, রূপজগতের মূর্ত্তি অতিক্রম করে শেলীর আকাশবিহারপ্রবণতার পথে যান নি।

রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন যে সৌন্দর্যের স্বরূপ প্রকৃতির খণ্ড খণ্ড রূপের মধ্যে বিকশিত, কিন্তু খণ্ড সৌন্দর্যের কোন একটিতে সীমাবদ্ধ নয়। খণ্ডরূপের মধ্যে থেকেও সে রূপাতীত, সীমার মধ্যে থেকেও তা অসীমের আগাসে আলোকিত। কীটসের সৌন্দর্যবোধের মধ্যে এই রবীন্দ্র-অহুত্ব অহুত্ব। রবীন্দ্রনাথ একাধারে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও ইন্দ্রিয়াতীত রূপের পূজারী। কীটসের মধ্যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সৌন্দর্যবোধেরই প্রাধান্য।

ওয়ার্ডসওয়ার্থের নীতিবোধ বা শেলীর অপার্থিব ভাব-লোকের দ্বারা অহরঞ্জিত না হলেও কীটসের সৌন্দর্যবোধ

একটা দার্শনিক উপলব্ধিতে পরিণতি লাভ করেছে। উপলব্ধির গভীরতায় 'সত্যম্-শিবম্-সুন্দরম্'-এর একাত্ম-বোধের প্রতিভাস তাঁর কাব্যে পাওয়া যায়। তিনি মনে করেছেন যা সত্য তাই সুন্দর। যা শাপ্ত তাই সুস্বা-মণ্ডিত। সত্য ও সুন্দরের মধ্যে কোন বিভেদ নেই। তাই তিনি বলেন—

Beauty is truth, truth is beauty—that is all
Ye know on earth and all ye need to
know.

জীবন ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু আর্টের মধ্যে সৌন্দর্যের রূপায়ণ সত্য বলেই চিরস্থায়ী। শিল্পকলায় ও সাহিত্যে প্রেম ও সৌন্দর্যের যে মূর্তি চিত্রিত হয় তা' ক্ষণস্থায়ী জীবনের চিরস্থায়ী মূর্তি। ক্ষণস্থায়ী রূপজগতে ও পরিবর্তনশীল ভাবজগতে মহাকাালের রথচক্রে ব্যক্তিজীবনের অহুভূতি, প্রেম ও সৌন্দর্যবোধ বিলুপ্ত হয়। কিন্তু সেই প্রেম, সৌন্দর্য ও অহুভূতি যখন শিল্পের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে তখন তা সহজে নিশ্চিহ্ন হতে পারে না তাই Grecian Manকে সন্ধান করে কবি বলেছেন—

“Cold Pastoral !

When old age shall this generation waste
Thou shalt remain in midst of other woe
Than ours, a friend to man—”

কীটস জগতের নশ্বরতার উপর শিল্পের চিরন্তনতার জয়গান গেয়েছেন। জগতের নশ্বরতা কীটসের মনে বেদনাবোধের সৃষ্টি করেছিল। রুঢ় বাস্তব জগৎ থেকে সৌন্দর্যের জগতে প্রবেশ করার যে ব্যাকুলতা তাঁর কাব্যে ধ্বনিত হয়েছে, তার মধ্যে কীটসের পলায়নী মনোবৃত্তির পরিচয় অস্বীকার করা চলে না। দুঃখ, শোক, ভয় ও নিরাশ-প্রণয়ে আকীর্ণ যে বস্তু জগৎ তার থেকে সৌন্দর্যজগৎ কীটসের কাছে অনেক বেশী প্রিয় ও সত্য। প্রথম জীবনে তিনি অবশ্য তাঁর Sleep and Poetry কবিতায় বলেছিলেন—

“Yes, I must pass them for a nobler life
Where I may find the agonies, the strife
of human hearts.”

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁর এই সংকল্প কার্যে পরিণত হয়নি।

মানবজীবনের বাস্তব-স্পন্দন তাঁর কাব্যে প্রাধান্য পায় নি।

ফরাসী বিপ্লবের সারা, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণীতে রোমান্টিক যুগের প্রত্যেক কবিই অহুপ্রাণিত হয়েছিলেন। বিপ্লবের দুন্দুভিনিদারের প্রভাব বায়রণ, ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও শেলীর কাব্যে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। বিপ্লবপন্থী শেলী মানবসমাজকে নতুন করে গড়ার প্রয়াসী ছিলেন। ফরাসীবিপ্লবের তরঙ্গ-বিক্ষোভের স্মৃতি ও অস্তিত্বতা ওয়ার্ডসওয়ার্থের ভাবতন্ময় শাস্তিবাদের পটভূমিকা রচনা করেছিল। প্রাচীন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বায়রণের যে বিদ্রোহ, তার মধ্যে ফরাসীবিপ্লবের ভাবোন্মাদনার প্রভাব-বিস্তার অলঙ্কিত নয়। এক মাত্র কীটসের উপরই সে সময়ের রাজনৈতিক ঘটনাগুলি কোন প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। নিজের কল্পলোকে ও সৌন্দর্য-লোকের মধ্যে তিনি আত্মনিমগ্ন ছিলেন। তাঁর সৌন্দর্য-পিপাসু কবিচিত্ত কঠোর বাস্তবকে এড়িয়ে যেতে চেয়েছিল।

নিরাশ-প্রণয়, রোগযন্ত্রণাময় ক্ষয়িষ্ণু জীবন, ভ্রাতার মৃত্যু ও ব্যক্তিজীবনের অতৃপ্তি তাঁর মনে এই জগৎ ও জীবন সম্পর্কে যে ধারণার সৃষ্টি করেছিল তা' তাঁর নিজের ভাষাতেই বলি—

“Here men sit and hear each other

groan

Where palsy shakes a few sad, last

grey hairs,

Where youth grows pale and spectre

thin and dies.

Where but to think is to be full of sorrow

And leaden-eyed despairs.

Where beauty can not keep her

lustrous eyes

Or new love pine at them beyond to-

morrow.”

কীটস এই জীবনযন্ত্রণাময় জগতের কুশ্রীতা থেকে মুক্তি নিয়ে এক চিরস্থায়ী সৌন্দর্যলোকে প্রবেশ করতে চেয়েছিলেন। তাই সৌন্দর্য ও অদ্বৈতের বার্তাবাহী নাই-

টেক্সলের কাছে তাঁর আর্ট-নিবেদন—

Fade far away, dissolve and quiet forget
What thou amongst the leaves hast never
known

The weariness, the fever and the fret...

যদিও কীটসের কাব্য প্রধানতঃ আনন্দেরই বার্তাবাহক, যদিও রূপকথা ও রোমান্সের রাজ্য থেকে আনন্দের আহরণেই তিনি উৎসাহী ছিলেন তবু তাঁর কাব্যে মাঝে মাঝে ক্লান্ত দুঃখবোধ করুণরাগিণীতে ঝংকৃত হয়েছে। সেই বেদনাবোধ যে কেবল La Beke Danne Sans Merci এবং Ode to Nightingale কবিতায় শিহরিত হয়েছে তাই নয়, তাঁর সৃষ্টির প্রথম পর্বের Endymion কাব্যেও Indian Maid এর কণ্ঠে কবির আত্মবিলাপ শোনা যায়—

To sorrow
I bade good morrow
And thought to leave her far away behind
But cheerly, cheerly
She loves me dearly ,
She is so constant to me and so kind
I would deceive her.

But ah ! she is so constant and so kind,

কবি নিজে আনন্দ ও সৌন্দর্যের অনুসরণ করেছিলেন, কিন্তু কবিকে অনুসরণ করেছিল দুঃখ ও যন্ত্রণা। তাই আনন্দ ও সৌন্দর্যের জয়গানে কীটসের কাব্য মুখরিত হয়ে উঠলেও স্তম্ভ বেদনাবোধ সেই কাব্যবধুর রক্তাণ ঘোমটার আড়ালে মাঝে মাঝে উকি দিয়েছে।

মধ্যযুগের স্বপ্নময় আবেশ ও গ্রীসের রূপকথা ও রোমান্সের রাজ্য কীটসের কাব্যে যে একটা বিরাট স্থান অধিকার করে রয়েছে তার কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে সমসাময়িককালের বিধাগ্রস্ত ক্লাস্তিকর বাস্তব-জীবন কবিকে আকর্ষণ করতে পারে নি। সে-জীবন তাঁর কাছে যন্ত্রণাময় বোধ হয়েছিল বলেই তিনি নিকটকালের জীবন ত্যাগ করে দূরত্বের মহিমায় স্বপ্নময় রাজ্যে প্রবেশ করেছিলেন। তাঁর স্বভাব-রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গি মধ্যযুগীয় রহস্যের এবং বীরত্ব ও সৌন্দর্যের প্রতিমূর্তি বিভিন্ন দেব-

দেবীর লীলার সৌন্দর্য তৃপ্ত করেছিল। রোমান্টিক যুগের কবিদের মধ্যে কীটসই ছিলেন সবচেয়ে বেশি গ্রীকভাবাপন্ন বা হেলেনিক কবি। তার কারণ একমাত্র এই নয় যে তিনি গ্রীসের রূপকথা কেন্দ্র করে অনেক কবিতা রচনা করেছেন। গ্রীকমূলত অপার বিষয়বোধ, ক্লাসিকাল সংঘম ও পরিমিত-বোধ এবং প্রকৃতির দীপাকে কেন্দ্র করে উপকথা রচনার দক্ষতা তাঁকে হেলেনিক বৈশিষ্ট্যে বিভূষিত করেছে। গ্রীকমূলত দ্রাণপ্রাচুর্যেই তিনি এক ফুল থেকে আর এক ফুলে, এক রূপকথার রাজ্য থেকে অল্প রোমান্সের রাজ্যে সৌন্দর্যসুধা আহরণ করেছেন। কীটসের কাব্যে নেই নীতি উপদেশ; নেই গভীর অধ্যাত্মবোধ; নেই অতীন্দ্রিয় কল্পনার আকাশবিহার। তিনি শুধু অস্তর-লোক হতে বচন আহরণ করে আনন্দলোক রচনা করেছেন। তাঁর কবিকর্মের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন :—

What though I am not wealthy in dower
Of spanning wisdom , though I do not
know

This shifting of mighty winds that blow
Hither thither all the changing thoughts
Of man ; though no great ministering
reason sorts

Out the dark mysteries of human souls
To clear conceiving : yet there ever rolls
A vast idea before me and I glean
Therefrom my liberty : thence too I
have seen

The end and aim of poesy"

রোমান্টিক যুগের অল্পাধিক কবি কীটস মাত্র চার বছরের প্রচেষ্টায় যে অতুল ঐশ্বর্যময় কাব্য রচনা করে গেছেন তা সকলের সীমানা অতিক্রম করে আজও আমাদের মনে দোলা দেয়। ক্ষয়রোগে যদি মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে তাঁর জীবনদীপ নিভে না যেত তবে তিনি রোমান্টিক যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিরূপে স্বীকৃতি লাভ করতেন।



তেলের বোতলটা ঠকাস্ করে মেঝেতে রাখতে গেল
পঞ্চানন পাকড়ালী।

গিন্নি ভূক কুঁচকে জিজ্ঞেস করলে, ও কি? তেল না



গিন্নি ভূক কুঁচকে জিজ্ঞেস করলে—ও কি? তেল না
নিয়েই ফিরে এলে যে!

নিয়েই ফিরে এলে যে বড়? আমি এদিকে উঠনে কড়াই
চাপিয়ে বসে আছি!

পঞ্চানন পাকড়ালী গৌক্ বেকিয়ে বসে, ওই কড়ায়ের
জ্বলা আগুনের আঁচে ফেলে যাবে, তবু এককোঁটা তেল
মিলবে না।

গিন্নির মেজাজ ততক্ষণে সপ্তমে চড়ে গেছে। তাই
ফোঁড়ন কাটলে, এই কি তোমার রসিকতা করবার
সময় হল? সেই সকাল থেকে আমি শুধু উঠনে করলা
ঠাসছি। ছেলেরা ওদিকে হা-পিতোশ্ করে বসে আছে!
আর তুমি কিনা এতক্ষণ বাদে খালি বোতল নিয়ে ফিরে
এলে?

পঞ্চানন পাকড়ালী উৰ্দ্ধনেত্র হয়ে উত্তর দিলে, ফিরে
এলাম কি আর সাথে? যত সরষের তেলের দোকান
ছিল—প্রত্যেক দরজায় গিয়ে জনে জনে খোসামুদ
করেছি। বলে, এককোঁটা তেল নেই। আবার এক
মোটো দোকানদার খ্যাক-খ্যাক করে হেসে রসিকতা
করলে, সরষে নিয়ে আহ্নন, পিষে তেল তৈরী করে
দিচ্ছি! শোনো কখা ব্যাটােদের! না হয় তেলই বিক্রী
করিস! তাই বলে এত তেলাতে হবে তোদের। এতক্ষণ
ওদের পেছনে না ঘুরে যদি ইলেকট্রিক ট্রেনে চেপে
ভারকেশ্বরে বাবার দোরে হত্যা বিতেন—তা হলে বাবা
তোলানাথ তুই হয়ে নিশ্চয়ই একটিন তেলের বর দান
করত!

আসল ব্যাপারটার স্মৃতি হয়—সেইদিন রোবার খুব সকালবেলা।

পঞ্চানন পাকড়ানীর একপাল ছেলেমেয়ে। প্রতি-বেশীরা বলে, হাত গুণে শেব করতে পারবেন না মশাই। পরিসংখ্যানতত্ত্ব অফিসে ছুটতে হবে।

সেই বালখিলা দলে আজ খুব ভোরেই আনন্দ-কোলাহল জেগে উঠেছিল।

বহুদিন বাদে দেশ থেকে দাছ এসেছেন। সঙ্গে চিঁড়ের মোয়া, নারকেল নাড়ু আর আমলবের টিন—দিদিমা পাঠিয়েছেন—নাতি-নাত্নীদের জন্তে। যাক্বরের ইস্ত্র-জালের মতো তা কয়েক মুহূর্তেই অদৃশ্য হয়ে গেছে।

তারপর নাতিরা দাছকে বলেছে, দাছ, তুমি দিদিমার হাতের এত সব মজার মজার জিনিস খাওয়ালে,—আমরা এইবার তোমাকে কল্কাতার এক আজব চীজ খাওয়াবো। তার স্বাদ তুমি জীবনে ভুলতে পারবে না।

দাছর মুখে-চোখে তখন কোতুক। তিনি নাতি-নাত্নীদের শুধোলেন, সে আবার কি খাবার? খুলে বল—

বড় নাতি বলে, হঁ-হঁ। বাগবাজারের তেলেভাজা। একবার চাখ্লে—চিঁতের উঠেও লোকে ভুলতে পারে না।

দাছ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, অঁ। এখন আবার তোদের বাগবাজারে ছুটতে হবে নাকি?

আর এক নাতি বুদ্ধি বাতলে দিলে, না-না দাছ, সে সব তোমায় কিছু করতে হবে না। বাজার থেকে টাট্কা তাজা বেগুন, পটল আর কুম্ভড়া নিয়ে এসো,—আর।

ভয় পেয়ে দাছ জিজ্ঞেস করেন,—আর?

নাতি জবাব দেয়, আর, একটিন সরষের তেলের দাম দাও। বাবাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি বাজারে। একটু বাদেই দেখবে—মার ল্যাবরেটরীতে কেমন—বেগুনী, পটলী, আর কুম্ভড়ি ছাঁক—ছাঁক করে বেরিয়ে আসে—।

নাত্নী বলে, হ্যা দাছ, মুখে দিয়েই মানস-সরোবরে উধাও হয়ে উড়ে যাবে—

সঙ্গে সঙ্গে আর এক নাতি দার্শনিকের মতো মন্তব্য করলে, তখন তুমি নিজেই বলে উঠবে দাছ,—পৃথিবীতে যদি কোথায়ও স্বর্গ থাকে তা—তা—এইখানে—এইখানে—এইখানে!!!

ভুলে দাছর টেকো মাথার যে কটি পাকা চুল ছিল—তা একেবারে রোমাক্তিত হয়ে উঠল। বলে, অঁ। এমন পদার্থ বাগবাজারের বেগুনী—পটলী—আর কুম্ভড়ি? তা হলে ত' আমার চেখে দেখতে হচ্ছে। নইলে তোর দিদিমার কাছে গিয়ে কি গল্প করবো?

নাতি-নাত্নীদের নিয়ে দাছ ওই ভোরেই বাজার চুড়ে কচি কচি বেগুন—পটল-আর কুম্ভড়া নিয়েএলেন। আর ঝাঁজওয়ালা সরষের তেলের টিন আনতে কড়কড়ে একটা নোট বের করে দিলেন নাতির হাতে।

তার পরবর্তী যে নাটকীয় ঘটনা ঘটল—সে কথা গল্পের গোড়াতেই বিবৃত হয়েছে।

নাতি-নাত্নীরা যখন জানতে পারল যে, বাজারে একফোঁটা সরষের তেল মিললো না—তখন ঝাঁঝের অভাবে তাদের লোচনগুলি অশ্রুশিক্ত হয়ে উঠল।

নাত্নীরা আক্ষেপ করে উক্তি করলে, দাছ, তোমাকে আমরা বেগুনী, পটলি আর কুম্ভড়ি খাওয়াতে পারলাম না, তবে দিদিমার জন্তে চকোলেট পাঠিয়ে দেবো। দাঁত নেই বলে তাঁর কোনো অস্ববিধে হবে না। ক্ষণ মনে দাছ জবাব দিলেন, তাই দিস তোরা। আমিও হয় ত' খানিকটা ভাগ পাবো। কিন্তু মনে দুঃখ রয়ে গেল—তোর মার ল্যাবরেটরীর বেগুনী, পটলি, কুম্ভড়ির সোয়াদ না পেয়েই বোধ করি দেশে ফিরতে হল। যা বলছে হয়েছে—আর কি কখনো কল্কাতার ফিরতে পারবো? মনে অতৃপ্ত আশা নিয়েই চলে যেতে হবে। হয়ত আবার এই বাগ-বাজারের তেলে ভাজার জন্তেই নতুন করে জন্ম নিতে হবে।

বড় নাতি মাশুনা দিয়ে বলে, তুমি কিছু ভেবো না দাছ। আমার এক বন্ধুর বোনের স্বস্তরের তেলের কল আছে। আমি সেইখান থেকে ঝাঁঝালো সরষের তেল জোগাড় করে নিয়ে আসবো। আগে থেকেই তোমায় খবর দেয়া থাকবে। তুমি মায়ের ল্যাবরেটরীর হাতে-গরম বেগুনী, পটলী, কুম্ভড়ি খেতে কল্কাতার আসবে! তোমার নাতি-নাত্নীর দল সব তোমায় ঠেগে 'রিসিভ' করতে যাবে। চিয়ার আপ্ দাছ—

বশব্দবাবু বড় মাতৃ-ভক্ত-ব্যক্তি। প্রতিদিন মায়ের পানোদক পান না করে বাড়ীর বাইরে পা বাড়ান না।

মা বিশ্বস্তরী দেবীও ছেলে বলতে অজ্ঞান। যখন দিনে একবার অন্নগ্রহণ করবেন—ছেলের জন্তে একটু প্রসাদ না রেখে উঠবেন না। ছেলেও ভেমন। অফিস থেকে ফিরেই সেই মায়ের প্রসাদ মুখে দিয়ে তবে তার অন্ন কাজ।

তবে বিশ্বস্তরী দেবীর কি একটা মানিত আছে। তাই তিনি প্রতি হপ্তায় ‘শনিবার’ করেন।

বাজারে যত রকম আনাঙ্গ-তরকারী পাওয়া যায় সব একসঙ্গে আতপ চালের সঙ্গে তুলে দিয়ে মুখ ঢেকে সেদ্ধ করেন। দিনের শেষে তাই নামিয়ে নিয়ে ‘এক ঢালা’ করেন। এক ঢালা মানে ওতে আর দ্বিতীয় বস্তু মাখবেন না। এক সঙ্গে সব সেদ্ধ হবে। একবারে ঢেলে নিয়ে—তাই সারা দিনের মতো খাওয়া। এর সঙ্গে শুধু চাই কাঁজালো সরষের তেল আর কাঁচা লকা।

মায়ের পাতের এই ‘এক ঢালা’ খেতে বশব্দবাবুও খুব ভালো বাসেন। তাই প্রতি শনিবার অফিস ছুটি হলেই ভাড়াভাড়া বাসায় ফিরে আসেন,—মায়ের পাতের একঢালা খেতে হবে।

বশব্দবাবুর জী বহুদ্রা দেবী এমনি খুব ঠাণ্ডা মানুষ। সাত চড়ে রা বেয়ে না।

কিন্তু যখন ঝাণ্ডী বউতে লাগে—তখন কাক-চিল বাড়ীর জিসীমানায় ঘেঁষতে পারে না।

সেই শনিবারের কাহিনী বলি।

বশব্দবাবু সারা কলকাতা শহর চষে ফেলে—নতুন-বাজারের আলু, কলেজ ষ্ট্রীটের সরেস পটল, মানিকতলার মান কচু, বউবাজারের পেঁপে, শেয়ালদর কুমড়া আর চেতলার বড় বেগুন কিনে দিয়ে গেছেন।

সেদিন মা-জননী বিশ্বস্তরী দেবী ‘এক ঢালা’ করবেন। বশব্দবাবু বার বার করে বলে দিয়ে গেছেন,—শ্রাকড়ায় বেঁধে ভাজা মুগের ডালও যেন সেদ্ধ দেয়া হয়। কেন না এই বস্তুটি মা-ব্যাটার অতি প্রিয় খাদ্য।

ছেলেকে টাকা দিয়ে গেছেন,—সে যেন মাণিকতলা থেকে ঘানির খাঁটি সরষের তেল এনে মাকে দেয়। শ্রীমানী মার্কেটের লকায় খুব কাঁজ। সেখান থেকেও ও বস্তুটি সংগ্রহ করতে হবে। সৈদ্ধব লবণ ত’ ঘরেই আছে।

নিশ্চিন্ত মনে মায়ের পাদোদক পান করে বশব্দবাবু অফিসে চলে গেছেন। মা-জননী বিশ্বস্তরী দেবী ঠাকুর-

পূজা সমাপন করে এক ঢালা চাপিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু নাতি আর সরষের তেল নিয়ে করে না! বশব্দবাবুর জী বহুদ্রা দেবী উষেগের সঙ্গে ঘর-বার করতে থাকেন।

কলকাতার রাস্তার এতটুকু বিশ্বাস নেই। যে দানবের মতো লরীগুলো ছুটে চলে। ঘরের মানুষগুলো ঘরে ফিরে না এলে প্রাণে শান্তি আসে কি করে!

ওদিকে “এক ঢালা”ও ফুটে উঠেছে।

বিশ্বস্তরী দেবীও বড় অস্বস্তি বোধ করছেন। সারা দিন খাটা-খাটনি গেছে। ব্যেস হয়েছে। উদরের আগুনটাও বোধ করি একটু বেশী জ্বলে উঠেছিল,—এমন সময় ভগ্নদুত্তের মতো নাতি খালি হাতে ফিরে এলো।



ঠাকুমাকে ডেকে বলল, কোনো দোকানে সরষের তেল পাওয়া গেল না!

ঠাকুরমাকে ডেকে বলল, কোনো দোকানে সরষের তেল পাওয়া গেল না। সারা কলকাতা শহর থেকে তেল উধাও হয়েছে।

বহুদ্রা দেবী এই খবর শুনে প্রমাদ গুল্লেন। বলেন, তা হলে উপায়? তোর ঠাকুরমার এক ঢালা যে ফুটে গেছে!

নাতি চীৎকার করে জবাব দিলে, ফুটে গেছে তার আমি কি করবো? সারা কলকাতা শহর টহল দিয়ে এলাম। সরষের তেলের পাখা গম্বিয়েছে। আমি আর অপেক্ষা করতে পারবো না। আজ আবার মোহন-বাগানের খেলা আছে। দেবী হয়ে গেলে যারগা পাবো না! আমি চলাম—

—কিন্তু সরষের তেল?

—চুলোয় যাক সরষের তেল। ভি, আই, পি-দের পায়ে মালিশ করে সরষের তেল ফুরিয়ে গেছে! যা হয় করো তুমি, আমার আর দাঁড়াবার সময় নেই। ফর ফর করে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল নাতি।

আগ্নেরগিরি বোধকরি এতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিল। এই বার ধীরে ধীরে তার ঘুম ভাঙছে বলে মনে হল।

বিশ্বস্তরী দেবী এগিয়ে এলেন—বহুক্ষরা দেবীর কাছে।
—বলি হ্যাঁ বোমা, আমি বুড়ী বিধবা,—সংসারের এক কোণে জঞ্জালের মতো পড়ে আছি,—তা বুঝি আর সহিছে না! ঝাঁটার মুখে বাড়ীর বার করে দিলেই হয়।

বহুক্ষরা দেবী লজ্জিত হয়ে বল্লেন, এ সব কথা আপনি কি বলছেন মা? আপনার ছেলে হল বাড়ীর কর্তা। আপনি জঞ্জাল হতে যাবেন কোন্‌ হুখে।

বিশ্বস্তরী দেবী উত্তর দিলেন, জঞ্জালই যদি না হবো তবে বিধবার জন্তে দিনান্তে এক ফোঁটা সরষের তেল জোটে না তোমার সংসারে? এই যে তোমরা মা-ব্যাটার ইলিশ মাছের মুড়ো দিয়ে কচুঘট খেলে—আমি তা কিছু বলেছি?

বহুক্ষরা দেবীও এইবার তেলে-বেগুনে জলে উঠলেন। বল্লেন, আজ শনিবার, আপনি আমাকে আজ মাছ খাওয়ার খোঁটা দিলেন? আপনারা মা-ব্যাটায় যে এক ঢালা খাবেন—সেটাও কি আমার দোষ। আপনার ছেলে আজ মাছ খাবেন। কিন্তু স্বামীর কল্যাণের জন্তেই ত' শনিবার আমাকে মাছ খেতে হয়। না খেলে আপনিই আমাকে কত অকথা কুকথা শোনাবেন।

বিশ্বস্তরী দেবীও গলা উচু করে বল্লেন, বেশ কথা, ভালো কথা। শনিবার বাড়ীর বোয়ের এয়োতি রন্ধার জন্ত মাছ মুখে দিতে হয়। কিন্তু এই যে বুড়ী বিধবা সারা-দিনে গলায় এক ফোঁটা জল দেয়নি, তার জন্তে কি এতটুকু সরষের তেলও জোটে না? তুমি জানো,—সরষের তেল আর কাঁচা লব্ধা না হলে ভাত আমার গলায় নায়ে না,—তবু ছেলের সঙ্গে বড় করে তুমি সেই সরষের তেল আনায়ে না! আমি উপোস করে থাকি—এই কি ফুরি চাও?

বহুক্ষরা দেবী চুল এলো করে হাত নেড়ে উত্তর দিলেন, আমার বাবার কি সরষের তেলের ঘানি আছে? যে, ফরমাস করলেই আমি টিন ভর্তি করে বাপের বাড়ী থেকে নিয়ে আসবো? আর এতই যদি সরষের তেলের সন্ধান—তাহলে একটি কলুর মেয়েকে বোঁ করে ঘরে আনলেই পারতেন। আর কোনো দুঃখ থাকত না।

বিশ্বস্তরী দেবী তখন সপ্তমে চড়ে গেছেন। কী? আমরা কলু? তাই কলুর মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে দেবো? তোমার মুখে যা আসে তাই আমার বলবে? আচ্ছা, আজ আশুক বশব্দ, তোমার সংসারের জলটুকু পর্যন্ত আমি মুখে তুলতে চাইনে! আজই আমার কাশী পাঠিয়ে দিক। এ পাপ পুরীতে আমি আর থাকতে চাইনে। বিশ্বনাথের চরণে গিয়ে পড়ে থাকবো। তোমরা মা-ছেলেতে খুব করে মাছ মাংস খাও। আমি উকি মেয়ে দেখতেও আসবো না। যে সরষের তেলের খোঁটা তুমি আমার দিলে, জেনে রাখো, বিশ্বনাথের রাগে তার অভাব ঘটবে না।

হেডমাষ্টার মশাই মাথায় হাত দিয়ে তাঁর খাস্কারদার বসে পড়লেন।

এবার এত ছেলে বার্ষিক পরীক্ষায় কেল করল কি করে? মাষ্টার মশাইরা কি সারা বছর ছেলেদের কিছু পড়ান নি?

এখন স্কুল কমিটির কাছে তিনি কি কৈফিয়ৎ দেবেন? এমনিতেই ত' নানা কারণে স্কুলের আয় কমে গেছে। ছেলেরা সময় মত মাইনে দেবেন। বেগরকারী স্কুল। চাঁদর ওপর চলে। অধিকাংশ অভিভাবক চাঁদা দেবার নামও করেন না। স্কুলবোর্ড থেকে যে সাহায্য পাওয়া যায়—পরীক্ষার এই ফল দেখলে তাও বন্ধ হয়ে যাবে!

এখন উপায়!

অনেক উচ্চ-আদর্শের কথা ভেবে তিনি এই শিক্ষা-দানের ক্ষেত্রে পা বাড়িয়েছিলেন।

খণ্ডরমশাই নামকরা ব্যবসায়ী। তিনি বহুবার জামাইকে তাঁর সঙ্গে ব্যবসা করতে বলেছিলেন। কিন্তু আদর্শ-চ্যুত হবার ভয়ে হেডমাষ্টার মশাই-সম্মত হননি। এখন যে শিক্ষিতসমাজে মুখ দেখাবার বোঝাইল না।

গৃহিণী প্রত্যহ প্রভাতে উঠে খোঁটা দেন যে, বারো বছর মাষ্টারী করে বুদ্ধি স্বদ্ধি যা কিছু ছিল সব গঙ্গাগর্ভে বিসর্জন দিতে হবে। এখনো নাকি সময় আছে, এখনো তাঁর বাবাকে হাতে-পায়ে ধরলে তিনি তাঁর ব্যবসার মধ্যে ঢুকিয়ে নেবেন!

কিন্তু চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী।

হেডমাষ্টার মশাই নিজের পথে অচল-অটল আছেন।

তাঁকে সেখান থেকে এক চুলও নড়ানো যাবে না!

যাই হোক এইবার বৃষ্টি হেডমাষ্টার মশায়ের আদর্শের খুঁটি একটুখানি নড়ে উঠল।

ইন্ডুল একজন ছোকরা আছে—সে প্রতি ক্লাশের পর খুঁটা বাজায়। এই ছেলেটিকে তিনিই চাকরী দিয়েছিলেন। বেশ বুদ্ধিমান, বিশ্বাসী আর চটপটে। নামও তার চটপটি।

অনেক ভেবে-চিন্তে হেডমাষ্টার মশাই চটপটিকে ডেকে পাঠালেন।

চটপটি স্নলে হেডমাষ্টার মশায়ের গুপ্তচরের কাজ করে। শিক্ষক মশাইরা তাঁর অবর্তমানে কি জাতীয় মন্তব্য করেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোথায় কি জাতীয় গলদ ঢুকেছে সব খবর চটপটি গিয়ে তাকে জানায়। এই জগ্রেই চটপটিকে তাঁর সময় মতো হাতের কাছে চাই।

হেডমাষ্টার মশায়ের খাস-কামরায় তখন আর কেউ উপস্থিত নেই।

চটপটি এসে প্রণাম করে কাছে দাঁড়ালো। হেডমাষ্টার মশাই জিজ্ঞেস করলেন, ইয়ারে ক্লাশ ঠিক মত চলছে ত?

চটপটি মাথা নেড়ে জবাব দিলে, আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তবে এত ছেলে এবছর ফেল করলে কেন? কেউ কি পড়াশোনা করেনি? সারা বছর ফাঁকি দিয়েছে?

চটপটি বিনয়ের অবতারণা।

উত্তর দিলে, আজ্ঞে ভেত্তরের রহস্য জানতে আমাদের একদিনের সময় দিতে হবে।

হেডমাষ্টার মশাই বজ্রেন, আচ্ছা, তাই হবে। কাল কিন্তু খাটি-খবর চাই।

চটপটি কম কথা বলে। মাথা নেড়ে নিশঙ্কে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পরদিন টিফিনের ঘণ্টায় চটপটির আবার ডাক পড়ল। চটপটি ঘরে ঢুকে গরুড়পক্ষীর মতো দুই হাত জড়ো করে মাথা নীচু করে নীরবে হেডমাষ্টার মশায়ের সামনে দাঁড়ালো।

—কারণ কিছু জানতে পারলি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, জেনেছি।

—কি কারণ?



—কি কারণ?

—আজ্ঞে কারণ তেল!

—আজ্ঞে কারণ তেল।

—তেল!!!

হেডমাষ্টার মশাই যেন আকাশ থেকে পড়লেন। অবাক হয়ে খানিকক্ষণ চটপটির মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

—জ্যা! তেল কিরে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ তেল। তেল ছাড়া আর কিছুই নয়।

—তা হলে সেই তেলের ভাঁড়টা খোল। আসল কারণটা বুঝিয়ে দে।

—আজ্ঞে, কারণ অতি সোজা। বাজারে এক ফোঁটা সরষের তেল পাওয়া যাচ্ছে না! মাষ্টার মশাইরা গিন্নিদের কাছ থেকে কেবলি তাড়া খাচ্ছেন। তাই মরিয়া হয়ে ছেলেদের ডেকে বলেছেন, যারা একটিন করে সরষের তেল নিয়ে আসতে পারবে—তারাই পাশ। নইলে সব ফেল!

হেডমাষ্টার মশাই নিজের গৃহিণীর তাগিদের কথা মনে করলেন। নিজের হেসেলের খবরও তাঁর অজানা নয়। তাই নির্বাক হয়ে রইলেন। মাষ্টার মশাইদের ডেকে আর ছেলেদের ফেল হার কারণ জিজ্ঞেস করলেন না।

তেলের জগ্ৰেই ইন্ধনটা তা হলে বন্ধ হবে!

সেদিন জোয় ফুটবল মাচ।

মোহনবাগানের সঙ্গে ইষ্টবেঙ্গলৰ সেমি-ফাইনাল খেলা।

সারা কলকাতাশহরের মানুষ খেলার মাঠে ভেঙে পড়েছে।

টিপি-টিপি করে বৃষ্টি পড়ছে।

তাতে লোকদের জ্বৰুপ মাত্র নেই।

কখনো সমুদ্রের জল-কল্লোলের মতো তাদের মনো-বাসনা উদ্বেল হয়ে উঠছে,—আবার পর মুহূর্তেই নিভে-যাওয়া দেশলাই কাঠির মতো হ—সু করে মিলিয়ে যাচ্ছে! কখনো অতি উল্লাসে ছাতা জুতো নিক্ষিপ্ত হচ্ছে—উর্দ্ধ নীলাকাশে,—আবার তার পরক্ষণেই মাছুষের সমবেত ক্ৰোভের তীব্র দীর্ঘশ্বাস বাতাসে হারিয়ে যাচ্ছে।

বিজয়লক্ষ্মী কার অন্ধ-শাহিনী হবেন কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

সেই বিরাট জন-সমুদ্রে ক্ষণে ক্ষণে উত্তাল-তরঙ্গ জাগছে। শেষ মুহূর্তে একটি পেনালটি সটে মোহনবাগান ইষ্টবেঙ্গলকে হারিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল—‘বাঙাল’ আর ‘ঘটির’ বাক-বুদ্ধ। শেষকালে বাক্য বিনিময় ছেড়ে একেবারে হাতাহাতি। কত রসিকের নাক ভাঙল, কত উজোগীর চরণ যুগল মচকে গেল, কত পেটকের পেটে অবিরাম ঘূষি বর্ষিত হল।

কেনারাম যখন এই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কৌশলে পশ্চাদপ-সরণ করে বাইরে বেরিয়ে এলো, তখন তার পাঞ্জাবীৰ শিঠের অংশটি অপহৃত হয়েছে এবং আর দুটি পায়ের মধ্যে একটি জুতো অবশিষ্ট আছে!

কেনারাম খোঁড়াতে খোঁড়াতে গঙ্গার ধারে চলে গেল। সেখানে বহুক্ষণ নীতল স্তম্ভন-সমীৰণ সেবন করে স্তম্ভবোধ করল!

হঠাৎ তাকিয়ে দেখে নীচে গঙ্গার একেবারে কিনারায় জেলেরা একেবারে তাজা রুপোলী ইলিশ মাছ বিক্রী করছে।

‘গভয়ের’ সব গানি গঙ্গার জলে বিসৰ্জন দিয়ে কেনা-রায় এক জোড়া ইলিশ মাছ কিনে ফেলল, তারপর একটি রিক্সা ভাড়া করে সগৌরবে গৃহে প্রত্যাবর্তন করল।

বাড়ীতে পৌঁছেই সে সিংহ-গৰ্জন শুরু করে দিল।

দাদার চীংকারে বই ফেলে বিনি ছুটে এলো। বলে, এমন করে পাড়া মাতিয়ে বিচ্ছিরি আওয়াজ বের করছ কেন দাদা? পাড়ার লোক অল্প কিছু ভাবতে পারে।

কেনারাম জবাব দিয়ে বলে, হঁ! বিচ্ছিরি আওয়াজ! —এই নে এক জোড়া ইলিশ! একটা একুনি ভেজে ফেল, আমরা সবাই মিলে চা দিয়ে খাবো। বাকিটা দিয়ে ইলিশ



এই নে এক জোড়া ইলিশ।

ভাতে হবে। বিনি তার বেণী ডলিয়ে বলে, মোহনবাগান খেলায় জিতেছে বুঝি দাদা? নইলে তুমি হঠাৎ জোড়া ইলিশ কিনে আনো?

কেনারাম এবার আনন্দের আত্মকলন করলে। বলে, যা—যা, আর বখাষি করতে হবে না। যা বললাম, তাড়াতাড়ি তাই করে ফেল। চায়ের জলও চাপিয়ে দে—

বিনি জবাব দিলে, তা না হয় দিচ্ছি। কিন্তু তুমি খোঁড়াছ কেন দাদা? অতি আনন্দে নাকি?

কেনারাম সে কথার আর কোনো জবাব দিলেনা, হাত-পা ধুতে বাথরুমের দিকে চলে গেল।

একটু থাড়েই বিনি বিচিহ্ন নাস নাচতে নাচতে বেরিয়ে এলো। দাদার সামনে গিয়ে দুই হাত উঁচু করে স্তম্ভভাৱে মতো বলে, ইলিশ মাছ তাজা হবে না—

—কেন ?

—বাড়ীতে সরষের তেল এক ফোটা নেই।

—সে কি কথা ? এই সে দিন একটিন তেন কিনে দিলাম।

বিনি ওরই ফাঁকে এক পাক ঘুরে নিলে। বলে, ঠাকুরার বাতের ব্যাথা বেড়েছে। কবরেজ্ঞান্হ এসেছিলেন, তিনি বলেন, কি একটা কবরেজী তেল তৈরী করে দেবেন রতুন ফুটিয়ে। তাই বাড়ীতে যে সরষের তেল ছিল সব তাকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন রান্নার জন্তেও এক ফোটা তেল নেই। ধীরু খানিক আগে দোকানে গিয়েছিল— ফিরে এসে বলে, বাজারে এক ফোটা সরষের তেল পাওয়া যাচ্ছে না।

—তাহলে এখন উপায় ?

—চা আর মুড়ি দিচ্ছি খাও—

—হুঁ! মুড়ি খাবো। তুই খা মুখপুড়ি—। আমি ক্লাবে চললাম।

পায়ের ব্যথার কথা বেমানম ভুলে কেনারাম ঝাংচাতে ঝাংচাতে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল।

বিনি জোড়া ইলিশ হাতে নিয়ে সেই দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

জামাইবতী এসে গেছে।

তাই গণপতি গোস্বামীর চোখে ঘুম নেই!

কিছুদিন আগেই একমাত্র মেয়ে মাধুরীর বিয়ে দিয়েছেন। মেয়ে-জামাইকে জোড়ে আনবেন, জামাই-বতীতে একটু খটা করবেন—কর্তা-গিন্নির বড় সাধ।

কিন্তু সব সাধে বাদ সাধল সরষের তেল। মুখপোড়ার বাজার থেকে তেল লুকোলা কোথায়? সবই কি মজীদের পায়ে মালিশ করতে ফুরিয়ে গেছে?

ভেবে ভেবে গণপতি গোস্বামীর অনিদ্ৰা রোগ হল। এক পরিচিত বন্ধুর ভেড়ী আছে। তিনি মাছ দেবেন কথা দিয়েছেন। ফলের বোকানের সঙ্গে দীর্ঘ কালের আলাপ। তারা ঝাংড়া আম আর মর্ন্তমান কলা পাঠিয়ে দেবে। বেহালায় এক বন্ধু পাঠার ব্যবসা করেন। তিনি জামায়ের জন্তু কচি পাঠা পাঠিয়ে দেবেন। দৈ-সন্দেপেরও ভাবনা নেই। মানিকভলার এক ময়রা ছেলেবেলার এক

সঙ্গে ইকুলে পড়ত। তাকে সব কথা বলা আছে। ছেলে-বেলার বন্ধু খাতির করেই বলেছে, তোমার জামাই কি আর আমার জামাই নয়? না হয় তোমার বাড়ী একদিন পাত পেতে খেয়ে আসবো। দৈ মিস্তির জন্তে তুমি কিছু ভেবোনা। আমি সরেস মাল পাঠিয়ে দেবো।

সব ব্যাপারে নিশ্চিন্ত আছেন গণপতি গোস্বামী। কিন্তু ওই সরষের তেলই তার চোখে সরষের ফুল ফুটিয়েছে।

গণপতি গোস্বামী ভেবে ভেবে কুল-কিনারা পান না! বাড়ীর কর্তার অনিদ্ৰা—গিন্নির অকুচি, আর ছেলেমেয়েরা মনমরা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে...

এমন সময় বেনারস থেকে একটি দেশোয়ালী লোক এসে হাজির। তার এক হাতে চিঠি, আর এক হাতে ইয়া বড়া একটি টিন!



আর এক হাতে ইয়া বড়া এক টিন।

গণপতি গোস্বামী শুণোলেন, কাঁহাসে আয়া তাই? লোকটি জবাব দিলে, চিঠিমে সব কুছ লিখা হায়। আপ পড় লিভিয়ে।

হাত বাড়িয়ে চিঠি নিলেন গণপতি গোস্বামী। আরে! এ যে তার বড়ছেলে নিরঞ্জনর পত্র। ছেলে লিখেছে—

“বাবা” কাগজে দেখলাম, কলকাতা থেকে সরষের তেল কালো বাজারে উধাও হয়ে গেছে। সামনে জামাই বটী। তোমরা নিশ্চয়ই বিপদে পড়েছ। আমাদের বিরজ-লাল তার দোকানের জিনিস-পত্র কেনাকাটা করতে কলকাতায় যাচ্ছে। তার সঙ্গে বড় এক টিন সরষের তেল পাঠালাম। কালীর তেল খুব ভালো। এখানে ভেজান দেয়া হয়না। আশাকরি এই টিনেই তোমাদের জামাই বটীর ব্যাপার নির্বিঘ্নে সমাধা হবে। ততদিনে বাজারের আবার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসবে।

আমি এখানে ভাল আছি। পরোত্তরে সকলের কুশল প্রার্থনা করি। টিনের প্রাপ্তি সংবাদ দিও।

ইতি—প্রণতঃ নিরঞ্জন

কালীর তেলের টিন পেয়ে বাড়ীর কর্তা-গিন্নির মুখ আবার খুলিতে বল্মলিয়ে উঠল।

গিন্নি কর্তার কাছে এগিয়ে এসে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলেন, এইবার বাছাদের ভালো করে মাছের কালিয়া কোর্মা খাওয়াতে পারবো। সরষের তেল না হলে কি আর বাঙালীর মনোমত রান্না হয়?

গিন্নি একটু চুপ করে থেকে কর্তার পিঠে হাত বুলিয়ে গদগদ কণ্ঠে কইলে, আচ্ছা, তোমার মনে আছে, প্রথম যে বছর জামাই বটীতে তুমি আমাদের বাড়ী গিয়েছিলে, মা তোমায় কত মাছের রান্না করে খাইয়েছিল—কই, ইলিশ, পাবতা, আড়মাছ, শিলং, চিতোল—

কর্তা নিজের টেকো মাথায় একটা চাপড় মেয়ে বলেন, সে সব কথা আর মনে করিয়ে দাও কেন গিন্নি? তোমার চেছারাটার জৌলুই বা তখন কেমন ছিল!

—সরষ আর কি!

বলে গিন্নি সরে গেল।

সেদিন অফিসে যেতেই গণপতি গোস্বামীকে বড়বাবু ডেকে পাঠালেন।

ঘরে ঢুকতেই বড়বাবু গণপতিবাবুর ছোটো চাত জড়িয়ে ধরে বলেন, ভাই, তোমরা অফিসের পুরোণো মাস্তব, আমাকে একটা বিপদ থেকে উদ্ধার করতেই হবে।

বড়বাবুর মুখে এই জাতীয় কথা শুনে গণপতি গোস্বামী হৃৎকিয়ে গেল!

আঁ! ব্যাপারটা কি? বড়বাবুর বিপদ?

বড়বাবু বলেন, শোনো গণপতি, হঠাৎ মেয়েস বিয়ে ঠিক হয়ে গেল। এই জামাই বটীর দিন তারিখ পড়েছে। সব ব্যবস্থা করে ফেলেছি। একটিন সরষের তেল আমার জোগাড় করে দিতেই হবে। নইলে আমার মান ইচ্ছত যায়!

গণপতি গোস্বামীর চোখে তখন কালীর সেই বড় টিন সরষের তেল ভেসে উঠল। আবার পরমুহুর্তেই গিন্নির মুখ ভেবে চুপ করে রইল।

বড়বাবু বলেন, চুপ করে থেকে না গণপতি। যে করে হোক, ব্যবস্থা করে দিতেই হবে। আমি কথা দিচ্ছি, আসছে মাসে তোমার পকাশ টাকা মাইনে বাড়িয়ে দেবো।

লাকাতে লাফাতে গণপতি গোস্বামী ঘরে ঢুকলেন। গিন্নি বলেন, আজ এত খুশী কেন? জামায়ের চিঠি এসেছে বুঝি? কবে ওরা রক্তন্য হচ্ছে?

কর্তা নিজের ছোঁড়া ছাতাটা টেকো মাথায় ওপর একবার দুরিয়ে নিয়ে বলেন, ঢুলোয় থাক ওই জামাই বটী, আসছে মাসে আমার পকাশ টাকা মাইনে বাড়ছে। শীগ্‌গির ওই কালীর তেলের টিনটা বের কর ত! বড়বাবু আবার মেয়েস বিয়ে ঠিক হয়ে গেল সামনের জামাই বটীর দিনে! এক্ষুণি আমায় ওই টিনটা নিয়ে ছুটতে হবে বড়-বাবুর বাড়ী। ফিরে এসে তোমায় সব বুঝিয়ে বলব'খন!



উষার অরুণালোকে আকাশ রাঙা। বনে বনে ফুটে অজস্র ফুল। বাতাস বয়ে আনে গন্ধ। জোরের পাখিরা ধরে গান। ছল ছল করে বয়ে যায় নদী। এ সবই স্রষ্টার দিব্যোন্মাদ। সৃষ্টির বৃক্ষে নব সৃষ্টির জন্তে সবারই অফুরন্ত আত্মত্যাগ। এ এক আনন্দময় পরিপূর্ণ বিভাব, তিনি নিজেই নিজের স্বরূপ থেকে হ'লেন বিচ্যুত। ত্যাগ মন্ত্রে অভিষিক্ত হ'য়ে হ'লেন বিখণ্ডিত। হ'লেন পুরুষ (নর) আর প্রকৃতি (নারী) (দ্বিধা কৃত্যাত্মনো দেহমধেন পুরুষোত্তমঃ। অধেন নারী তত্ত্বাংস বিরাজমহজং প্রভুঃ) আনন্দ আর ফ্লাদিনী শক্তি—এর ফলে জীবও ছুটে চলেছে যুগ যুগ ধরে ঐ প্রেম ও আনন্দ লাভের জন্তে। যে পথে অবতরণ করেছে আবার সেই পথেই আরোহণ করেছে। এই হ'ল দেওয়ান পথ। পরমানন্দকে লাভ করতে হলে, সত্যকে জানতে হলে, কর্তৃত্বকে, বিত্তকে বিলুপ্ত করতে হ'লে ত্যাগাত্ম্যই হ'তে হবে। এষণা ও লোভের গর্ত থেকে উঠে আসার মই হ'ল ত্যাগ। মান যশের প্রাচীর যখন সামনে পড়ে, তখন ত্যাগের মৃদুগরই সে প্রাচীরকে ভেঙ্গে দিয়ে পথ করে দেয়। মনের অসংখ্য তৃষ্ণায় ত্যাগই একমাত্র নির্মল পবিত্র গঙ্গোদক—যা ঐ তৃষ্ণাকে নিবারণ ক'রে আনে শান্তি। মানুষ প্রবৃত্তির বেগেই সর্বদা ধাবিত হয়।

বন্ধঃ প্রবৃত্তিতো বিদ্ধি মুক্তং বিদ্ধি নিবৃত্তিতঃ।

প্রবৃত্তিরেব সংসারো নিবৃত্তিমুক্তি রিযাতে ॥ সার্ববেদান্ত-
সিদ্ধান্ত সার সংগ্রহ

প্রবৃত্তির দ্বারা জীব বন্ধন প্রাপ্ত হয় এবং নিবৃত্তি দ্বারা মুক্তি লাভ করে। পণ্ডিতগণ প্রকৃতিকেই সংসার এবং নিবৃত্তিকেই মুক্তি বলিয়া থাকেন।

এই প্রবৃত্তির প্রবেগকে নিমূল করে নিবৃত্তিকে আশ্রয় করাই হচ্ছে ত্যাগ। প্রবৃত্তি থেকে ভোগ, নিবৃত্তি থেকে ত্যাগ। ত্যাগের প্রতিবন্ধক হচ্ছে মর্ত্যাতৃষ্ণা। মর্ত্য ভোগাতৃষ্ণা যখন মানুষের ষড়ৈশ্বর্যে বসে তখন ত্যাগের

পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। অর্থের আশায় দীর্ঘপথ ভ্রমণ করে, জাতিকূল জলাঞ্জলি দিয়ে ধনীজনের সেবা করে, ইঞ্জির তৃপ্তিই স্বেচ্ছা হয়। স্বর্থ পেতে চার ভোগোপ-
করণে। 'স্বার্থ করে খোজে অনিবার, স্বার্থাবে হুঃখ আসে বারে বার।' মানিক পাবার আশায় সাগর-তলা হাতড়ায়। হীরকের খোজে ঝিলুক কুড়ায়। তথাপি তৃষ্ণা মিটেনা। এ চাওয়া পাওয়ার শেষ নাই। যতই পায় ততই চায়। এই ভাবে তৃষ্ণা ক্রমেই বেড়ে যায়। ফলে প্রাকৃত নিয়মেই আসে চরম আঘাত। সে আঘাতে চাওয়া পাওয়ার নেশা টুটে যায়। চাওয়া পাওয়ার ক্ষুদ্র আবেষ্টনী ভেদ করে বেরিয়ে আসে প্রদীপ্ত চেতনার মাঝে। বুঝতে চেষ্টা করে এই ধনরত্ন তো অনিত্য, এরা তো দেয় না কতু নিত্যের সন্ধান। পুরাণে যযাতির উপাখ্যানে তা দেখতে পাওয়া যায়। যযাতি মহর্ষি শুক্রাচার্যের অভিলাষে জরাগ্রস্ত হলেন। কনিষ্ঠ পুত্র পুরু তাঁর জরা নিয়ে যৌবন দিলেন। যযাতি পুত্রের যৌবন নিয়ে হাজার বছর ধরে যৌবন ভোগ করলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর তৃষ্ণা মিটলো না। আগুন ঘি ঢাললে যেমন আগুন বেড়েই চলে তেমনি কাম-কামনা উপভোগের দ্বারা বেড়েই যায়—বললেন—“ন জাতু কামঃ কামানাং উপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণায়ে বভূয় এবাভিবর্দ্ধতে ॥ এ পথে স্বর্থ নাই, এ পথে শুধু তৃষ্ণাই বর্দ্ধিত হয়! ভূমা স্বর্থ পাওয়া যায় না, শাশ্বত আনন্দ মিলে না। তিনি পুরুষ যৌবন কিরিয়ে দিলেন। পুনরায় জরাগ্রস্ত হলেন, ব্রহ্মারাদনার জন্তে বনে গেলেন।

যথার্থ ত্যাগেতে অদীম প্রশান্তি

সদা জ্ঞেগে রয় মনের ভিতর।

হিয়াভল হ'তে অশেষ অশান্তি

হয়ে যায় পার দূর দিগন্তর ॥

মনের বা কিছু ধূলি আবিলতা,

গন্ধাজলে যেন ধুয়ে মুছে যায় ॥

নীচতা নীনতা আর কুটিলতা

তখন ঘেসতে পারে নাক গায় ॥

অজ্ঞানতা মাঝে জানের বিকাশ

হ'তে পারে নাক কখনো এ ভবে ।

নিমীষ আকাশে থাকে কালো রাশ

তপনকে কেহ দেখেছে কে কবে ॥

রজনীর শেষে উঠলে তপন—

সব কালো যায় সাগরের পার ।

আলোকে উজল সকল ভূবন—

আলোকে আলোকে সবি একাকার ॥

কোন বৃহত্তর বস্তুকে লাভ করার উপায় হ'ল ত্যাগ, ক্ষুদ্রতম বিষয়কে পরিহার করা—অতএব ত্যাগের জগৎ আকৃতি থাকা একান্ত প্রয়োজন । ভালহওয়ার কামনা করে মন্দ ভাবকে ত্যাগ করে এগিয়ে যেতে হবে । ব্যাপারটা হ'ল এই প্রেয় বস্তুকে হটিয়ে দিয়ে শ্রেয় বস্তুকে গ্রহণ করতে হয় । জাগতিক প্রলোভনের ক্ষমতাও অসামান্য এর হাত থেকে রেহাই পেতে হবে একটা নিশ্চিত মহতী আশ্রয়কে আঁকড়িয়ে ধরেই । তা না হলে কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্ঘ্যের দাঁস হ'য়ে মানুষ পশুর স্তরে নেমে যায়, রূপ রস গন্ধ স্পর্শের মোহনীয় তৃষ্ণায় হয় আকুল । এই আকুলতা চকলতার মাঝে ত্যাগের বাতিগুলো একে একে নিভে যায় । যার পরিণাম উদ্দালক—

উদ্দালক স্বর্গপ্রাপ্তির কামনায় বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করেন, তাতে দক্ষিণা দান করেন রুগ্না প্রজ্ঞান-অক্ষম গাভীগুলিকে, যে আর কখনো দুধ দেবে না । এরূপ দানের ফলে স্বর্গতো পায়ই না বরং দুঃখময় লোকে গমন করে । কিন্তু যে ঐ সব প্রলোভনের হাত থেকে মুক্ত হয় অর্থাৎ লোভনীয় বস্তুকে ত্যাগ করে নির্লোভ হয় সেই দিব্যবস্তুর অধিকারী হতে পারে । তাই উদ্দালকের পুত্র নচিকেতা পিতার এই অন্ধ তামস বুদ্ধি নিরীক্ষণ করে ত্যাগের বহিঃতে উদ্দীপ্ত হ'য়ে পিতাকে বল্লেন—“পিতঃ । আমাকে কার কাছে অর্পণ করছেন ?” একবার ছবার তিনবার একই প্রশ্ন করায় উদ্দালক অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বল্লেন “তোমাকে যমরাজকে অর্পণ করছি ।” পিতার আজ্ঞা পেয়ে নচিকেতা যমরাজের দ্বারে উপস্থিত হ'লেন । সে সময় যমরাজ ছিলেন প্রবাসে, তিনদিন পরে ফিরে এলেন । দেখলেন

এক তরুণ ব্রাহ্মণ অতিথি তিনদিন উপবাসী হয়ে আছেন যে বাড়ীতে ব্রাহ্মণ অতিথি অনাহারে অবস্থান করে যে গৃহস্থের অমঙ্গল হয়, যাগযজ্ঞ ব্রত দান সব কিছুই ফল বিনষ্ট হয় । তিনদিন ধরে অতীত অতিথিকে দেখে যমরাজ ভীত হস্ত হ'লেন । যমরাজ নচিকেতাকে নমস্কার করে যথোচিত অভ্যর্থনা করলেন এবং তিনটি বর প্রার্থন করতে বল্লেন ।

নচিকেতা প্রথম চাইলেন “পূর্বে যেমন পিতা আমায় প্রতি প্রসন্ন ও স্নেহপরায়ণ ছিলেন, তেমনি সেন থাকেন—” দ্বিতীয়টি চাইলেন “ঋষিবিদ্যা সহায়ে অমরত্ব প্রাপ্তির বিষয় উপদেশ করুন” । যমরাজ নচিকেতার দুটি প্রার্থনাই পূরণ করলেন সম্বৃষ্টচিত্তে এবং পুণী হয়ে চতুর্থবার দিলেন অগ্নি নচিকেতা নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করবে । অতঃপর নচিকেতা তৃতীয় বরটি প্রার্থনা করলেন “হে যমরাজ ! মৃত্যুরহস্তটুকি তাই দয়া করে বলুন” । যমরাজ মৃত্যুরহস্ত বিষয় প্রকাশ করতে কুণ্ঠিত হ'লেন । বল্লেন এ প্রার্থনা না করে ভূমি অগ্নি প্রার্থনা কর । শতায়ু পুরণোদ্রসমূহ প্রার্থনা কর, তাহাড়া যত বৎসর বাঁচতে চাও ততকাল জীবন ধারণ কর—বহু গবাদি পশু হস্তী অশ্ব স্বর্ণ এবং এই পৃথিবীতে বিশাল সাম্রাজ্য প্রার্থনা কর, নৃতাপীতপরায়ণ অম্পরাধি স্তন্দরী রমণী প্রার্থনা কর, কিন্তু ঐ মৃত্যু রহস্য জানতে চেওনা । নচিকেতা বল্লেন, হে যমরাজ । আপনার বর্ণিত এই সব ভোগ্যবস্তুসমূহ কালপর্ণস্ব থাকবে কিনা সন্দেহ, উগা তো ইন্দ্রিয়গণের শক্তিই কেবল ক্ষয় করে (সর্বৈজিয়ানাং জরয়ন্তি তেজঃ) এবং জীবন তো অহ (জীবিতমন্নমেব) এসব আপনারই থাক । এসব কিছুই চাই না (যৎ সম্পরায়ো মহতি কুহি ন স্তং । কঠোপনিষৎ ১।২।২৩) যা পারলৌকিক বিপদের মহৎ সাধক কলাপকর তাই আমাকে বলুন ।

যমরাজ নচিকেতাকে এই ভোগ্য বিষয়ের লোভ দেখিয়ে পরীক্ষা করছিলেন । নচিকেতা সে পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়েছেন । যমরাজ বল্লেন—

স ত্বং প্রেয়ান প্রিয়রূপাংস্ কামা-

নভিধ্যায়নচিকেতোত্যাদ্যাকীঃ ।

নৈতাং সৃজাং বিস্তময়ীমবাপ্তো

যন্তাং মজ্জন্তি বহুবো মনুষ্যাঃ ॥ কঠ ১।২।৩

হে নচিকেতা! তুমি প্রিয় ও সুখোৎপাদক ভোগ্য বিষয়-সমূহকে পরীক্ষা করে ত্যাগ করেছ। যে ধনবহুল মার্গে অনেক মনুষ্য নিমজ্জিত হয় তা তুমি গ্রহণ কর নাই, অতএব তুমি আত্মতত্ত্ব অবগত হওয়ার অধিকারী।

প্রাকৃত বৃত্তিতে যে জন মজ্জায় সে ত্যাগ করতে পারে না। তার কাছে ত্যাগ বিষয়টা দুর্বোধ্য। ধন জন ও জীবনের তৃষ্ণা—ভোগস্বখের পিপাসা অদম্য। একে বর্জন করে ত্যাগের পথে যাওয়া ত্বরধিগম্য। কিন্তু একবার ত্যাগব্রতে ব্রতী হলে ত্যাগের পূণ্য সলিলে স্নান করলে ভোগ স্বখের আবিলতা আর তম মনকে মলিন করতে পারে না। সেখানে জীবন যৌবন সবই তুচ্ছ প্রতিপন্ন হয়। তাই তো কর্ণ তার কবচকুণ্ডল ত্যাগকরে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছিলেন। ভীষ্ম গাণ্ডীব ত্যাগ করে পরশষা গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত হন নি। দ্রৌচি আত্ম-ত্যাগ করে অস্থিধান করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু জলেনি যেখানে ত্যাগের প্রদীপ, সেখানে দুঃখ যন্ত্রণায়, লাজনার, কষ্ট পেতে হয়—যার পরিণাম রাবণ, কংস, দুর্যোধন এটনী, ক্রটাস সোজার, কেট স্বখের জন্ত, কেউবা যশঃ-স্ব্হায়, কেহ আধিপত্য বিস্তার হেতু, ত্যাগের পথ ভুলে গিয়ে এই চরমাবস্থায় উপস্থিত হয়েছিলেন।

মাতৃষ বিত্ত নিয়ে সন্তুষ্ট হতে পারে না (ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যো-কঠ ১১.২৭)

এতে কেবল স্বার্থ বুদ্ধি বেড়ে চলে। জনগণ মঙ্গল কর্মে অগ্রসর হওয়ার পথ একমাত্র ত্যাগ। ত্যাগাদর্শে অল্পপ্রাণিত হলে ক্ষুদ্র স্বার্থ বুদ্ধি সাময়িক মর্ত্যস্ব-আনন্দ তুচ্ছ মনে হয়। তখন কুক্ষুতার আশ্রয় নিতে কুণ্ঠিত হয় না। জয়-পরাজয়ের শোক স্বর্থ থেকে নিশ্চিন্ত হ'য়ে এক মাত্র ত্যাগের মহিমাময় পথে হয় অগ্রসর, তার ফলে ঐক্যেই লাভ করে, সত্যকে অবগত হয়, জীবন পরমানন্দ-ময় হ'য়ে উঠে।

যুধিষ্ঠির রাজস্বয় যজ্ঞ করে পরিতৃপ্তির নিখাস ছাড়লেন—নিজেকে মহাপুণ্যবান বলে ভাবলেন। শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে হাসলেন। একটু শিক্ষা দেওয়া দরকার, এই ভেবে এক মায়ায় খেলা খেললেন। অর্দ্ধেকটাদেহ সোনা হয়ে গেছে এমন একটি বেজি এসে যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞস্থলে লুটোপুটি দিতে লাগল। যুধিষ্ঠির বললেন, কি ব্যাপার বলতো কৃষ্ণ!

কৃষ্ণ বললেন—বুললেন না এক ব্রাহ্মণের কুটির গিয়ে এমনটা হয়েছে, বাকী আধখানা যাতে সোনা হয় তাই এখানে এসেছে, গড়াগড়ি দিচ্ছে। যুধিষ্ঠির বললেন কিছুই বুঝলাম না। শ্রীকৃষ্ণ বললেন—এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ গ্নী পুত্র নিয়ে বাস করতো আপনার রাজ্যে। সপরিবারে কয়েকদিন ক্ষুধার্ত থেকে ভিক্ষাকরে এনেছে কিছু ছাতু। এমন সময় এলো এক অতিথি। ব্রাহ্মণ অতিথি সৎকার করলো সবটুকু ছাতু দিয়ে। ব্রাহ্মণ পরিতৃপ্ত হয়ে চলে গেল। আর না খেতে পেয়ে ক্ষুণ্ণর জ্বালায় ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণী ও ব্রাহ্মণপুত্র মারা গেল, সেই পুণ্যবান ব্রাহ্মণের বাড়ীতে খাণ্ডাঘেবণে ঐ বেজিটি গিয়েছিল। ঐ পুণ্যভূমির স্পর্শে ওর অর্দ্ধেকটা দেহ সোনা হয়ে গেছে। আধখানা যাতে সোনা হয় তাই আপনার এই পুণ্যযজ্ঞস্থলে এসে গড়াগড়ি দিচ্ছে। যুধিষ্ঠির লজ্জিত হলেন, এই বিরাট যজ্ঞে সেই ব্রাহ্মণের দানের তুল্য পুণ্য হয়নি। যুধিষ্ঠির যে তৃপ্তির ভাব করেছিলেন তা ভুলে গেলেন। এই যে তৃষ্টি—এও এক প্রকার প্রলোভন। অতএব ত্যাগের ফলে যে একটা নিষ্কৃতির ভাব আসে তাকেও ত্যাগকরা একান্ত অপরি-হার্য। মহানারায়ণোপনিষদে উক্ত হয়েছে (ন কর্মণা ন প্রজয়া ধনেন, ত্যাগেনৈক নমমৃতত্বমানস।) কর্ম, যজ্ঞ কর্ম বা পুত্র বা ধনাদি দ্বারা ব্রহ্মকে লাভ করা যায় না, কেবল মাত্র ত্যাগেই অমৃতত্ব লাভ হয়। রাজার ছেলে হয়েও ত্যাগের পথে গিয়েছিলেন গোতমবুদ্ধ। শঙ্কর, যিশু, চৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, এই ত্যাগপথ অবলম্বন করে, ত্যাগমন্ত্রে অভিষিক্ত হয়ে জগতের পরমপূজ্য হয়েছেন। মহাত্মা গান্ধী, নেতাজী সু-নাথ, ক্ষুদ্ররাম, নিবেদিতা এঁরা সবাই ত্যাগব্রতে ব্রতী হয়ে ইতিহাসের পাতায় অমর হয়েছেন। ত্যাগের পুণ্যে একবার তম্মনপ্রাণ উদ্ভাসিত হ'লে ভোগাকাজ্ঞা আর থাকেনা। কেবল ত্যাগের মহৎ প্রত্যয়ে চিত্ত শান্ত হ'য়ে যায়। মাতৃষ আশাপাশে বদ্ধ হ'য়ে যুগ যুগ ধরে প্রবৃত্তির পথে এগিয়ে চলে। জয়-জয়ান্তর ধরে যাগযজ্ঞ দানব্রত করে একটা আত্মকেজ্রিক পরিতৃপ্তির ভাবে জড়িয়ে পড়ে, ফলে জয় মৃত্যুর অধীন হয়। অন্তরে অযুত তৃষ্ণা জাগে। জীবনকে সর্বশ লার বলে মেনে নিয়ে কামিনী কাঞ্চন বিষয়ের মধ্যে ডুবে গিয়ে আনন্দ খোজে। কিন্তু এগুলো যে ছেলেখেলা, পুতুল নাচ

সে কথা অবজ্ঞেই পারে না। মর্ত্য-বাসনার মাঝে নিজেকে একান্তই জড়িয়ে ফেলে। বলা বাহুল্য বাল্যকালে বালক পুতুলখেলা নিয়েই সুখ পায়। কৈশোরে এসে সে খেলা কখন যে বিদায় নেয় জানতেই পারে না, কৈশোরে সে সঙ্গী সাক্ষী নিয়ে যে আনন্দলোক গড়ে যোবনে পদার্পণ করলে তা চলে যায় তখন যোবনের প্রাবল্যে জাগে প্রেম, সে প্রেম দিয়ে, স্বন্দরী যমুণী নিয়ে রচনা করে পুষ্পশয্যা, সেও কয়েকদিন পরেই উবে যায় যখন আসে বারুক্য। এমনি করে মর্তের ধন-জন-যোবন বিদায় নেয়। অতএব দেখা যাচ্ছে ভোগের সিঁড়ি ভেঙ্গে ভেঙ্গে ত্যাগের মণিকোঠার আরোহণ করে। এই ভাঙ্গাগড়ার সংসার থেকে একটি মহৎ পরিবেশে আসার জ্ঞাত ঋষিগণ ব্রহ্মচর্য-গার্হস্থ্য-বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস আশ্রম প্রবর্তন করেছেন।

ব্রহ্মচর্যাশ্রমে জীবন সৌধ গড়ে উঠে একটা মহান আদর্শ। তারপর সংসারাত্মকে এসে সে জীবন আত্ম-ত্যাগের মহিমায় মহিমায়িত। তার ফলে হচ্ছে মহৎ সৃষ্টি। জীবনী শক্তি বিলিয়ে ঈশ্বর জীবন গড়ছে। অন্যাকারের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে পরমাচারে একনিষ্ঠ হয়ে উঠে। অতঃপর বাণপ্রস্থে এসে শান্ত জীবনযাপন করতে চেষ্টা করে, ধ্যান তন্ময়তায় লিপ্ত হয়। সর্বশেষে সবই ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করে, ঈশ্বরে সমস্ত অর্পণ করে, নিশ্চেষ্ট হয়ে স্থিতপ্রজ্ঞ হয়। এই হ'ল ত্যাগের মোটামুটি একটা পন্থা।

যখন মানুষ সমস্ত বিষয় ভোগস্পৃহা ত্যাগ করে তখনই হয় বার্থসন্ন্যাস। বিষয় বাসনাময় অন্তর্জ চিন্তে সন্ন্যাস হয় না বা বিষয়ে বৈরাগ্যভাব উদ্ভিত হয় না। শঙ্করাচার্য বলেছেন—

ব্রহ্মাদি স্বাবরাস্তেহু বৈরাগ্যং বিষয়ে নহু।

বর্থেব কাকবিষ্ঠান্যং বৈরাগ্যং তচ্ছিনির্মলম্॥

সর্ববৈরাগ্য সিদ্ধান্ত সারসংগ্রহ ১১৪

অর্থাৎ কাকের বিষ্ঠার যেমন বিরক্তি থাকে ব্রহ্মলোক হতে স্বাবর পর্যন্ত ভোগ্যবস্তুতে সেরূপ বৈরাগ্য থাকাই নির্মল বৈরাগ্য বা তৃষ্ণা শূন্য বলে বিবেচিত হয়।

মানুষ আনন্দিক ত্রিবিধ এষণার সংস্কৃত, পুণ্ড্রবর্ণা, বিদৈবর্ণা ও লৌকিকবর্ণা।

পুণ্ড্র, বিদ্বৈ ও বর্ণ লাভের আশায় জীব উদ্ভাস্ত।

কামোপভোগ দ্বারা পুণ্ড্র কল্লাদি লাভ করে, পৃথিবীতে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়, ধন রত্ন দিয়ে পৃথিবীকে একান্ত করে ভোগ করতে কামনা করে এবং নাম বর্ণ খ্যাতি প্রতিপত্তি বিস্তার করে নিজেকে বিশ্বমাঝে ছড়িয়ে দিতে চায় এইভাবে মানুষ ত্রিবিধ এষণার ভূত। এ সবই পার্থিব ভোগ (লৌকিকবর্ণা) বলতে স্বর্গাদি লাভের আশাও হতে পারে, আচার্য শঙ্কর বলেছেন—

ঐহিকামৃগিকার্থেষু হনিতাত্মনো নিশ্চর্যং।

নৈস্পৃহং তুচ্ছবুদ্ধিৎ তদ্বৈরাগ্যমিতীর্থতে॥

সং বে: সিং সা: ২৩

অর্থাৎ ঐহিক ও পারলৌকিক সর্বভোগ্য বস্তুতে অনিত্যত্ব রূপে নিশ্চয় হওয়া প্রযুক্ত যে নিস্পৃহতা বা তুচ্ছ বুদ্ধি তাহাই প্রকৃত ত্যাগ বা বৈরাগ্য।

এইসব পার্থিব ভোগ বাসনা ত্যাগ না করলে বার্থসন্ন্যাস হয় না। তাই জাগতিক ভোগস্পৃহাকে বর্জন করে ত্যাগের দ্বারা নিরাসক্ত চিত্ত হলে প্রকৃত সন্ন্যাস হয়। এবং তখনই প্রকৃত আনন্দ লাভ হয়। ঈশোপনিষদে উক্ত হয়েছে “তেনত্যাক্তেন ভূত্বাঃ” নিরাসক্ত চিত্তে ভোগ কর অর্থাৎ নিরাসক্ত চিত্ত হয়ে ত্যাগের দ্বারা চিত্তকে পরিশুদ্ধ করতে পারলে ব্রহ্মবোধ জন্মে। এই ব্রহ্মভুক্তি দিয়ে তখন যে ভোগ হবে তা দিবা ভোগ। তখন অন্তর ও বাহির ত্যাগের দ্বারা পরিমণ্ডিত। মেকালে গ্রহণ ও বর্জন দুটোই সমান। ত্যাগ তখন আত্মকেদ্রব হ'য়ে আত্মস্পৃহা ও অস্পৃহাকে আকর্ষণ করে রাখে অন্ধানন্দকে প্রকাশ করে। কারণ কিছুকে তো দূরে ফেলে রাখার মতো নাই সবই যে ব্রহ্মবাস্তব পরিবৃত্ত (ঈশাবাস্তবমিৎ সর্বম্)। সে ক্ষেত্রে ত্যাগই আনিয় দিচ্ছে নূতন করে সেই পরমকে যা জীবনে মরণে জনমে জনমে চিরসঙ্গী। মাজারি জনক তাই ত্যাগী হয়েও ছিলেন ভোগী আবার গৃহস্থ হয়েও ত্যাগী সন্ন্যাসী। এট পরিবেশে এসেও নিস্তার নাই কিছু করতেই হবে। তবে এখানের যা করণ তা যোগযুক্ত হয়ে। করেও করে না। বন্ধনেও বন্ধ হয় না। ক্ষুদ্র চেতনার সঙ্গে রহৎ চেতনা মিশে একাকার হয়ে আছে। ব্যক্তিত্বকে কর্তৃত্বকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করে ঈশ্বরকেই আশ্রয় করে ব্রহ্মকর্ম সমাধা করে। ত্যাগের প্রোজ্ঞস আলোর তত্ত্বাত্ত একাকার হ'য়ে যায়। একটি শাখত

ঈশ্বরের পানে সত্যের পানে নয়ন মেলে ধরে। সকল কর্ম
ও কর্মফল ঈশ্বরের হাতে ছেড়ে দেয়।

“সর্বকর্ম ফল ত্যাগং প্রাহন্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ গীতা ১৮।২
এবং পরিশেষে নিজেকেও তারি পায়ে লুটিয়ে দিয়ে ত্যাগের
মহাব্রতে অবস্থান করে। তাই বলি—

ঈশ্বরের রূপা হলে কারো প্রতি
সত্যই সেজন ত্যাগে হয় ত্রুতী
তবে তার কাছে অতি দ্রুত যায়
সাধক জীবন প্রশান্তিরে পায়।
তার আকর্ষণ আমার সাধনা
আমার আকৃতি তাঁহার প্রেরণা
রাখবে না মোটে আত্মপ্রবঞ্চনা
একেই বলবো ত্যাগের সাধনা।
করতে হয় যে এই অল্পভব
তাঁর রূপা হলে সবি সম্ভব

চলে যায় দূরে ভোগস্পৃহা সব
ফুটে রয় চিতে তাঁহারি বৈভব ॥

অতএব সত্যকে লাভ করতে হলে ত্যাগের পথই পরম
পথ। ত্যাগেই নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ, অনন্ত সুখ, অসীম শক্তির
মুখোমুখি হতে পারা যায়। ত্যাগের শক্তি অসীম ও
অমোঘ। অতএব ত্যাগের জন্তও এষণা ত্যাগ করা
দরকার। অর্থাৎ ত্যাগব্রত পালনের নিমিত্ত সর্বাঙ্গ
একান্ত আবশ্যক। সর্বাঙ্গ না করলে ত্যাগ হয় না। আর
যেখানে ত্যাগের পথ শেষ হয় সেখানেই ঈশ্বরের সঙ্গে ঘটে
মিলন।

আর এই ত্যাগমার্গে যেতে হলেও ঈশ্বরের রূপা
সর্বাঙ্গে চাই-ই। তাঁর রূপা না হলে কিছুই হয় না।
তাঁর রূপা হলে জীব এক মুহূর্তে মহাত্যাগী হয়ে যেতে
পারে। তাই এসো এই ত্যাগ পথে অগ্রসর হওয়ার জন্তে
সেই পরম প্রেমময় পুরুষোত্তমের শরণ বিশ্বাস করি।

তোমাদের কাছে

হাসিরিশি দেবী

নাম লেখ, নামটাকে লেখ,—
সাদা এ কাগজে তবু লিখে রাখ নাম,
যে নামে নিজেকে চেনো, যে নামেতে নিজেকে ভেদেছ,—
সে নামের অক্ষর ক’টিকে

একে একে বসাঁও সাজিয়ে।

না, তোমার ভয় নেই, এতে নেই ক্ষতির ভাবনা,
অমূলক আশঙ্কা,—সন্দেহ!

তবু যদি দ্বিধা জাগে

না হয়—তা মুছে ফেল—কাটাকুটি ক’রে,—

কিন্তু শুধু জলে ধুয়ে ধুয়ে।

কারণ,—এ ধাতু নয়, তাতে নয় অক্ষর খোদাই,

কিন্তু নয় পাথরেরে লেখা,

যা রবেনা প্রাসাদে,—দেউলে

কৌশলে বসানো।

এ শুধু কাগজে লেখা!

সস্তায় যা পাওয়া যায়,—হবিধায় বা হয় খরচ—

অসংখ্য হাতের স্পর্শে ছাপ পড়ে ধূসর রঙের,

মুছে যায় উজ্জ্বল স্তব্ধতা!

বেচা আর কেনা নিয়ে ঘোরে হাতে হাতে,

তারপর চিরুহীন হয়—

কিন্তু হয় কুটি কুটি কীটের কল্যাণে।

তবু ফিরি তোমাদের কাছে

লেখা চেয়ে চেয়ে শুধু, তোমাদের নামের সঞ্চয়।

কারণ, হয়তো হবে একদিন বিখ্যাত মানুষ,

না হয়তো মিশে যাবে

না চেনা—না-জানার আড়ালে।

তবুও তোমার দিকে চেয়ে

আমরা দাঁড়িয়ে আছি হাতে নিয়ে কলম কাগজ,

যেখানে তোমরা-পারো হাসাতে,—কান্নাতে

কাগজের পাঠকেরে।

কারণ, তোমরা আমাদের

সাহিত্য সৃষ্টির স্রষ্টা!—তোমরা নামক,—

আমাদের লেখনীতে—ঝরে ঝরে তোমাদের নাম

আর প্রকৃতির ছায়া

আর তার সাক্ষী রব আমি একধারে—

কাগজ আমি যে সাহিত্যিক।

রবীন্দ্রনাথ ও গীতা

শ্রীস্বধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

সেদিন কলকাতার আকাশে মেঘমেঘন প্লাবন, বাতাসে তার সজল হাওয়া, পায়ের নীচের মাটি জলমগ্ন, বসে বসে রবিবাসরীয় আড্ডা জমাচ্ছি হোর। কারো কণ্ঠে বরষা-মঙ্গলের স্বর,—আষাঢ় সন্ধ্যা ঘনিষে এলো, শ্রাবণগগন অঙ্গনে, ভাদ্র নদীর ভরা স্রোতে, এমন সময় হঠাৎ তাগভঙ্গ করে একজন বলে বসলো—রবীন্দ্রনাথ গীতা মানতেন, গীতার কোন প্রভাব তাঁর চেতনায়, চিন্তায়, লেখন্য পড়েছে কিনা, সঙ্গে সঙ্গে আর একজন উত্তোর গাইলেন—তিনি ত ভক্তদের কাছে গুরুদেব ছিলেন, কিন্তু মনে মনে গুরুবাদী ছিলেন কি ?

ভাবলুম দুটি প্রশ্নেরই জবাব দিই বাউলের হৈয়ালীতে—

ভিতরে রস না হইলে কি
বাইরে কিরে রং ধরে

বা গুরু বলে কারে প্রণাম করবি মন
তোর অধিক গুরু, পথিক গুরু, গুরু অগণন
গুরু যে তোর বরণডালা
গুরু যে তোর মরণজালা
গুরু যে তোর স্বয়ং ব্যাধা
যে স্বয়ং হু নয়ন।

বা গুরে কাজলে আর করবে কত
যদি নয়নে নজর না থাকে
প্রেম যদি না মিলে ন্যায্য
তবে সাধন ভজন, কদিন রাখে।

কথাটা কিন্তু মনে লেগে রইলো—ভাবলাম রবীন্দ্রনাথ নিজে সহস্রের সাহিত্যিক, বেদব্যাস বিশেষ—তাঁর সারাজীবনের রচনা ও বাণী এক মহা ধারত এবং যা নেই ভারতে তা নেই ভারতে এ কথা মনে হয় কবিগুরুর সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। অতএব খোঁজো কোথায় কী বলেছেন গীতার সম্বন্ধে।

অপরোক্ষভাবে গীতার আদর্শ ও উপদেশ তো ভারতবর্ষের সব সাধনার শুদ্ধ সমন্বয় নয়, পরিপূর্ণ ইতিহাসও। ভারতের কোনো মনীষীই আজ কেন, হাজার হাজার বছর ধরেও, তার প্রভাব থেকে মুক্তি পান নি। অবশ্য সবাই এক-মতাবলম্বী নন, যুগে যুগে ভক্ত ও পাষাণী এসেছে, কেউ তত্ত্বের দিকে ঝাঁক দিয়েছে, কেউ তথ্যের দিকে, মার্গ হিসাবে কেউ কর্মকে ধরেছে, কেউ জ্ঞানকে নিয়েছে, কেউ বলেছে—না, না, না, কেউ বলেছে হাঁ, হাঁ, হাঁ, চেতনায় রং লাগাও, রসে জারিত করে নাও, পান্না হবে সবুজ। তবু গীতার ভাষায় “মোঘাশা”, “মোঘাশ্মা”, “মোঘজ্ঞানা”, মোহিনী, রাক্ষসী ও আহুত্রী প্রকৃতির লোকেরাও আছে।

রবীন্দ্রনাথ বলছেন “আত্মস কাচের একপিঠে যেমন ব্যাপ্ত সূর্যালোক এবং আরেক পিঠে যেমন তাহারই সংহত-দীপ্তি রশ্মি, মহাভারতেও তেমনি একদিকে ব্যাপক জনশ্রুতিরানি আরেকদিকে তাহারই সমস্তটির একটি সংহত জ্যোতি—সেই জ্যোতিটিই ভগবৎগীতা।...মাহুষের সকল চেষ্ঠাই কোন্‌খানে আলিয়া অবিরোধে মিলিতে পাবে মহাভারত সকল পথের চৌমাথায় সেই চরম লক্ষ্যের আলোটি জালাইয়া ধরিয়াছে। তাহাই গীতা...বৃহৎ একটি জাতীয় জীবনের অনির্বচনীয় ঐক্যভব”।

গীতা ‘উপনিষৎস্ব ব্রহ্মবিজ্ঞানঃ যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণাঙ্কুর সংবাদ’। উপনিষদরূপ গাভীকে দোহন করে গীতারূপ দুগ্ধ দিয়েছেন ভগবান্। রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের বৃহৎ ছায়ার গড়ে উঠেছেন—তেন তাক্তেন ভূদ্বীপাঃ তাঁর মন্ত—ঈশা-বাশ্বত্বিৎ সর্বং। তা ছাড়া গীতার প্রকৃত শিক্ষা হচ্ছে—ভূখ রাজ্যং সমুদ্রম্। শ্রীমদ্রবিন্দ্রের কথায় এর জ্ঞান প্রয়োজন ভিতরের ত্যাগ, অন্তরের সাধনা, বাহিরের সম্যাস নয়, ভাগবত চৈতন্তের প্রতিষ্ঠা। কৃষ্ণ অর্থাৎ যে শক্তি আমাদের সর্বদা ও সর্বত্র আকর্ষণ করছে, সে শক্তি ‘যোগেশ্বর’ যুক্ত করে দিচ্ছে সকলের সঙ্গে এবং যোগ মানেই কর্মের

কৌশল। কবির কাছে তাই সহজ কর্ম করার পন্থাই হচে—

বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারে।

এই মহাযোগেশ্বরই অজুনকে দেখিয়েছিলেন—

দর্শন্যামাস পার্থায় পরমরূপমৈশ্বরম্

কবি মাঝেই সেই বিশ্বরূপের দর্শনার্থী, সেই খেলাঘরের অংশীদার। সেখানে নিত্য যাওয়া আসা চলছে রূপ থেকে ভাবে। রূপ নিয়ে আমরা বাঁচি, অরূপের দিকে ছুটি, অপরূপকে পাবো বলে—তাই তো আমরা মহামায়াকে বলি রূপমোহিনী আবার তিনি রূপাতীতা রূপশূন্য।

বিশ্বরূপং হরিণং জাতবেদসং

পরায়ণো জ্যোতিরেকম্ তপস্তম্

সহস্ররশ্মিঃ শতধা বর্তমানঃ

প্রাণাঃ প্রজ্ঞানামৃদয়তোয স্বর্গঃ

রবীন্দ্রনাথের কাছে এবং আরো স্বল্প ও ব্যাপকভাবে শ্রীঅরবিন্দের কাছে বস্তু রস রূপ এরা মায়ী নয়, বন্ধন নয়। অরূপ আবহমান কাল এদের মধ্য দিয়েই নিজেকে জানান দিয়েছেন। যে কষে বাঁধে তার নাম আসক্তি। তাই বর্জনীয় রূপ নয়, রূপের মোহ। কিন্তু মোহকে কাটাতে হবে বলে প্রাণের দোললীলাকেও পাশ কাটিয়ে নিস্তরঙ্গ নীরসশূন্য মজতে চাইলে আমরা যে দেবতার দানের অমর্যাদা করে শুধু যে অপরাধী হব তা নয়, হব আত্ম-ঘাতী। এই ছিল কবির নিঃসংশয়িত মত।

বহুদিন পূর্বে ‘পূর্বাশায়’ প্রকাশিত হয়েছিল “বাসুদেব কৃষ্ণ ও গীতা” সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় প্রবোধচন্দ্র সেনের একটি স্মৃতিস্তম্ভ অতিমত। তাতে তিনি দেখিয়েছিলেন যে গীতার প্রভাব সদধর্ম-পুণ্ডরীকে আছে, মহাকবি অখবোধের রচনাতে আছে, নাগার্জুনের লেখায় আছে, কালিদাসে আছে (বিশেষ করে রঘুবংশে), মহাকবি বাণভট্টের কাদম্বরীতে আছে। বাসুদেব কৃষ্ণের সর্বপ্রথম উল্লেখ ছান্দোগ্য উপনিষদে—যাদব জাতির অন্তর্গত সাতত কুলে জন্ম এঁর। তাঁর গুরু ঘোর আদ্বিরস ছিলেন সূর্যোপাসক—পুরুষ যজ্ঞ-বিভা দেন ইনি—দার দক্ষিণা হচে—‘তপোদানমার্জবমহিংসা সত্যবচনম্’। শান্তিপর্বে এই সাতত ধর্মকে “প্রাক্ সূর্যমুখ-নিঃসৃত” বলে বর্ণনা করা হয়েছে এবং আদ্বিরসী ঐতি’ এই আখ্যা দেওয়া হয়েছে। ছান্দোগ্য উপনিষদের

‘মাহু’ কৃষ্ণ, পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে ‘ভক্তির পাত্র কজির প্রধান’, পাটঞ্জলির মহাভাষ্যে তিনি ‘দেবতা’, কোত্তার গুরুভৃত্তে তিনি ‘দেবদেব’, গীতায় তিনি কৃষ্ণস্ত ভগবান স্বয়ং’ কিন্তু “গীতা” গ্রন্থটি কৃষ্ণের সমকালীন কিনা তা বলা যায়না, মহাভাবতে প্রসিদ্ধ কিনা তাও জানা যায় না। মনে হয় ষড়্ দর্শনের সমন্বয় সাধনের জন্যই এর উদ্ভব যখন সমাজ বিপ্লব, স্বধর্মত্যাগ, ধর্ম্যানির আশঙ্কা এসেছিল। নবমশতাব্দীতেই গীতার চারজন টীকাকারের নাম পাওয়া যায় বহুগুপ্ত, ভাস্কর, আনন্দবর্ধন ও রামকঠ। ‘সর্বতো-ভদ্র’ টীকার প্রসিদ্ধি তখনই। অভিনব গুপ্তও এর উল্লেখ করেছেন।

এই প্রসঙ্গে ভারতপুরুষ শংকরাচার্যের নাম স্মরণীয়—তিনিই গীতার প্রথম ভাষ্যকার—যদিও তাঁর ভাষ্য, অদ্বৈতবাদের প্রচার। তারপরে এলেন কতো আচার্যের দল রামাহুজ, বামুন, নিধার্ক, মধ্ব বিষ্ণুস্বামী—মহারাত্রে উঠলেন জ্ঞানেশ্বর (তাঁর জ্ঞানেশ্বরী টীকার আজও প্রসিদ্ধি, সোভাগ্যের বিষয় বাংলাভাষাতেও এর অনুবাদ হয়েছে সম্প্রতি)। শ্রীধর স্বামীর টীকা ত অতি প্রসিদ্ধ। বলভাচার্য বা মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব গীতার প্রত্যেক টীকা করেন নি বটে, কিন্তু তাঁদের জীবনই গীতার টীকা। এ ছাড়াও মধ্যযুগে ছিলেন কেশব কাম্বীরী, মধুসূদন সরস্বতী, শ্রীহরমংস্বামী, রাঘবেন্দ্র স্বামী প্রভৃতি।

আধুনিক কালে রবীন্দ্রনাথের পিতা ষয়ং দেবেন্দ্রনাথ, তাঁর ছই ভ্রাতা, দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, কালীনাথ ত্র্যম্বক তেলঙ্গ, বঙ্কিমচন্দ্র, তিসক, গান্ধী, শ্রীঅরবিন্দ, হারেন্দ্রনাথ দত্ত, নবীন সেন প্রভৃতি কতো মনীষী কৃষ্ণচরিত্র ও গীতার সম্বন্ধে লিখেছেন তার ইয়ত্তা নেই। তাই স্পর্শকাতর রবীন্দ্রনাথের মনেও গীতার প্রভাব যে পড়েনি তা কেমন করে বলা যায়।

তাঁর নিজের কথাতাই পড়ি (জীবনস্মৃতি) যে ভগবদগীতার পিতার মনের মত শ্লোকগুলি চিহ্নিত করা ছিল। সেইগুলি বাংলা অনুবাদ সমেত আমাকে কপি করতে মহর্ষি দিয়েছিলেন। ‘বাস্তবী’তে তিনি লিখেছেন—মাহুকে নারায়ণ সখা বলে তখনই সন্মান করেছেন যখন তাকে দেখিয়েছেন তার উগ্ররূপ, তাকে দিয়ে যখন

দৃষ্টান্তে রূপগ্রন্থ তবৎ লোকত্রয় প্রব্যথিতং মহাত্মন
যখন মাহুয প্রাণমন দিয়ে এই স্তব করতে পেরেছে

অনন্তবীর্ঘমিত্তবিক্রমঃ

সর্বং সমাপ্তোষি ততোর্বসি সর্ব :

তুমিই অনন্তবীর্ঘ, তুমিই অমিত্তবিক্রম, তুমিই সমস্তকে
গ্রহণ করো, তুমিই সমস্ত (রবীন্দ্রচন্দ্রাবলী উনবিংশতঃ
পৃঃ ৪৬৪)। অবশ্য সাহিত্যের আদর্শের দিক থেকে গীতাকে
তিনি অগ্রতাবে দেখেছিলেন। তিনি বলছেন—ভগবদগীতা
আজও পুরাতন হয়নি, হয়তো কোনো কালেই পুরাতন
হবে না। কিন্তু কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকে খমকিয়ে রেখে
গীতাকে আত্মিক করা সাহিত্যের আদর্শ অহুসারে
নিঃসন্দেহই অপরাধ—(সাহিত্যের স্বরূপ বিশ্ববিদ্যালয়গ্রন্থ)।
মনে পড়ছে আমাদের পরলোকগত আত্মিক-সম্পাদকীয়
বিশিষ্ট বন্ধু শশীভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয়ের কথা—মূল্যবোধের
মধ্যদিয়েই প্রকাশিত মাহুযের অন্তরের পরিচয় জীবনকে
যেখানে ভালোবাসি সেখানে তাহার সার্বজনীন এবং
সর্বকালিক তত্ত্বরূপটিকেই ভালোবাসিনা, ভালোবাসি
তাহার স্বাদ-বর্ণ-গন্ধ-ময় সমগ্র রূপটাকে...

ঋষি কাকে বলি—যিনি উষ্টা, যিনি দর্শন করেন, বেদ
হচ্ছে জানা, প্রেরণাময় স্বীকৃতি—আমরা পেয়েছি বেদের
মেধাবী কবিগণের সাক্ষ্য, আরণ্যক উপনিষদের ঋষি
রাজর্ষিদের সাক্ষ্য, মহাত্মারতের বিপুল জীবন কাহিনীর
মধ্যে কৃষ্ণার্জুনের সাক্ষ্য—কিন্তু যতই তিনি বলেন কর ও
অক্ষর উভয়ের অতীত তুমি আমার শরণ লও—তবু মাহুয
শংকরাচার্য বললেন—কৃষ্ণ একটা ব্যক্তি ভগবানের করুণা।

বৈতবাদীর সাক্ষ্য নিয়ে আসলেন রামানুজ, মধ্ব, নিখার্ক
বলভাচার্য—শাস্ত্রগ্রন্থাণ তর্কজালকে এড়াইয়া এলেন চৈতন্য,
রামানন্দ, কবীর, তুলসীদাস, নানক—আজও রামকৃষ্ণ
অরবিন্দ, রমণ মহর্ষি যেমন এসেছিলেন দেশা, মূল্য মহত্মদ।
(বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৭০)।

এরই সঙ্গে আমরা রবীন্দ্রনাথের কথা জুড়ে দিই—

বৈদিক মহত্মের বাণী কণ্ঠে যদি থাকিত আমার

মিলিত আমার স্তব স্বরু এই আলোকে আলোকে

ভাষা নাই, ভাষা নাই

“একটা মুক্তির আনন্দ পেলুম। চোখ দিয়ে জল পড়ছে
তখন, ইচ্ছে করছে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন করে তুমিই হয়ে
প্রণাম করি কাউকে। কে সেই আমার পরম অন্তরঙ্গ
সঙ্গী যিনি আমার সমস্ত কণিকাকে গ্রহণ করছেন তাঁর
নিত্যে। তখনই মনে হল, আমার একদিক থেকে
বেরিয়ে এসে আর একদিকের পরিচয় পাওয়া গেল—
এখোঁস্ত পরম আনন্দ।” এই বাণী বৃহদারণ্যকের ঋষি
যাজ্ঞবল্ক্যের—

তপস্বীর কণ্ঠে কণ্ঠে উচ্ছাসিয়া শুন বিশ্বজন

শুন অমৃতের পুত্র, হেরিলাম মহাত্ম পুরুষ

তমিস্রের পার হতে তেজোময়, যেখান মাহুয

শুন দৈববাণী।

সহসা পায় সে দৃষ্টি দীপ্তিমান

দিক্‌দীমা প্রান্তে পায় অসীমের নতুন সন্ধান।

গীতা তাই সুগীতা। সেই সন্ধানই দেয়।

আমার জন্মভূমি

শান্তশীল দাশ

স্বর্ণ হতেও গরীমসী তুমি জন্মভূমি আমার,
তোমার এ মাটি সব সেবা মাটি,
সকল তীর্থ সার।

জন্ম লভেছি এ মাটির বুকে,
কৈদেছি হেসেছি হুঃখে ও হুঃখে;
আলোকে আধারে সদা প্রসন্ন
দিয়েছ আশিস্‌ তার।

দেবভূমি কোথা কোন দূর লোকে,
চাটিনা সেবার ঠাই;
মা তোমার মাটি চির আরাধ্য
তুলনা তাহার নাই।
এই ধূলিকণা মাগি সারা দেহে
স্বর্ণ স্রবমা লভি এই গেহে;
এই মাটিতেই শেষ ঠাইটুকু
পাই যেন মা তোমার।

কুঞ্জমামা

অসমৰ নৃত্যশাস্ত্র

কুঞ্জমামাৰ কথা জীৱনে ভুলগো না ; অৰ্থাৎ ভোলা যায় না। বৰং কোনও দিন যদি নিজেৰে ভুলে যাওয়া সম্ভব হয়, তা'ও যেতে পাৰি, কিন্তু 'কুঞ্জমামাকে' ভুলতে পাৰা যায় না। আমাদেৰ বালক এবং কিশোৰ বয়সে তাঁৰ প্ৰভাৱেৰে যে ছাপ আমাদেৰ ওপৰ পড়েছিল, স্থিতি থেকে সে দাগ ভুলতে হোলে, তাৰ ঘৰ্ষে আমাদেৰ অস্তিত্ব বজায় থাকে কিনা সন্দেহ।

কুঞ্জমামাৰ পুৰো নাম কুঞ্জবেহাৰী বা কুঞ্জলাল নয়,— নিকুঞ্জ ; নিকুঞ্জমোহন। ওঁৰেৰ পদবী গাঙ্গুলী। তিনি আমাদেৰ সকলকাৰই কুঞ্জমামা, হোতেন ; অৰ্থাৎ আমাৰ কুঞ্জমামা, আমাৰ মায়ের কুঞ্জমামা, আমাৰ মাসিদেৰ কুঞ্জ-মামা, আমাৰ মামাদেৰ কুঞ্জমামা, আমাৰ দিদিমাৰও— প্ৰত্যেকে না হোক, পৰোক্ষে—কুঞ্জমামা। কুঞ্জমামাৰ এক বুড়ী মা ছাড়া সে সময় সংসাৰে আৰ কেউ ছিল না।

যখনকাৰ কথা বলচি, তা খাট-পয়ষটি-সন্তৰ বছৰ আগেকাৰ কথা। তখন আমাদেৰ ঐ কালীঘাট ছিল ঠিক একটা পল্লীগ্রামেৰ মত। আজকালকাৰ মত এমন কোঁৱে কোলাহল-হট্টগোল আৰ জন-সমুদ্ৰেৰ মাঝে হাৱিয়ে যায় নি। তখন দুটি অগ্নেৰ জন্তে কা'কেও এমন কোঁৱে হজে হোয়ে আকিস-আপালত ছোটাছুটি করতে হোত না। যে গৰীব তাৰও নিৰ্ভাবনাৰ মধ্যেই দুটি অগ্নি-বস্ত্ৰেৰ সহজ সংস্থান ছিল। সকলোই এক ৰকম সুখে-আনন্দে দিন কাটাতো। বাড়ী-বাড়ী গান-বাজনাৰ খুব রেওয়াজ ছিল। এৰ-থেকে সেকালে একটা ঘৰোয়া-প্ৰবাদেৰ সৃষ্টি হোয়েছিল :—

'ভাল-মান গান-সুৰ,

কালীঘাট আৰ ভবানীপুৰ'।

কালীঘাটে তখন বাছা-বাছা লোক নিয়ে, উচ্চ-সঙ্গীত— 'হাফ্-আখ্-ডাই'য়েৰ দল ছিল। বোধ হয়, শেষ হাফ্-

আখ্-ডায় প্ৰতিযোগিতা হয়—কালীঘাট আৰ জোড়া-সাঁকোৰ মধ্যে—জোড়া-সাঁকোৰ নন্দমল্লিকের বাড়ীতে। আমি তখন ছোট, কিন্তু কুঞ্জমামাৰ সঙ্গে আমি গিয়েছিলুম। মনে পড়ে, কালীঘাট দলেৰ পক্ষে সেদিন গানেৰ বাঁধনদাৰ ছিলেন—স্বনামধন্ত নাট্যকাৰ ও অভিনেতা ঐগিৰীশচন্দ্ৰ ঘোষ। সে আনৰে কালীঘাটেৰই জিত্ হোয়েছিল। কুঞ্জমামা দোয়াৰকীতে গাইতেন ও গৈয়েছিলেন। 'চিতেন', 'পৰ্-চিতেন', 'ফুকো', 'ডবল-ফুকো' 'মেলতা'—ইত্যাদি হাফ্-আখ্-ডাই গানেৰ মধ্যে বিভিন্ন অঙ্গ বা কলি থাক্বে, হাফ্-আখ্-ডাই গান আমাদেৰ ছেলেদেৰ মোটেই ভালো লাগতো না এবং আমাৰা তাৰ একটি বৰ্ণও বুঝতুম না। তবু যেতাম ; যেতাম—পেস্তা-বাদাম-কিস্মিস্-দেয়া, ঘি জ্বজ্ববে-হালুয়া আৰ গরম দুধেৰ লোভে। এ দুটি ভ্ৰবোৰ ঢালো ব্যবস্থা, যে যত পাৰ—খাও। তখন চা'য়েৰ রেওয়াজ হয় নি। 'হাফ্-আখ্-ডাই'য়েৰ দলে কমপক্ষে ১০০১৫০ জন লোকেৰ দৰকাৰ হোত। ওৰ মধ্যে জনা-পঞ্চাশ থাকতো ঐক্যবাদনেৰ জন্তে—তানপুৰো, বেহালা, এস্ৰাজ, সেতাৰ, হাৰমোনিয়াম, বাঁশী, কৰতাল মন্দিৰে, ঢোল, পাখোয়াজ...কত কি! বাকী শ'থানেক লোক মিলে গাওয়া হোত ; তাৰ মধ্যে মূল গায়ক থাকতো জনা-পঁচিশ, আৰ বাকী '৭৫ জন থাকতো—দোয়াৰকী'। তা ছাড়া, হেড্-বাঁধনদাৰ, মাসিস্ট্যান্ট বাঁধনদাৰ, সুৰ-দাৰ, লিপিকার,—আয়ো কত-কি! লিপিকারদেৰ কাজ থাকতো—গানেৰ ভেতৰ দিয়ে বিপক্ষ দল যে কুট্-কচালে প্ৰশ্নটা কোৱেচে, তাৰেৰ গাইবাৰ সময় মধ্যে যে যে-পংক্তি পাৰে লিখে নিয়ে, সেটা এ-পক্ষের বাঁধনদাৰেৰ কাঁছে দাখিল কৰা। তিনি সেই খণ্ড-খণ্ড পংক্তিগুলি এক কোঁৱে এবং তাৰ প্ৰকৃত অৰ্থ নিৰ্ণয় কোঁৱে। তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ

রচনা করবেন ও সঙ্গে সঙ্গে স্বরকার তাতে স্বর যোজনাকারে, গায়কদের দ্বারা তার মহলা দেওয়াবেন। আসল কথা, হাফ্-আক্‌ড়াইটা ‘তর্জা-গানে’রই উচ্চতম পর্যায়। এর গানের স্বর—ঞপদী। এসব ব্যাপারে আমার নিজের কোন জ্ঞান নেই, একেবারেই আমি খাজা। গানের বিষয়ে যে সব বিবরণ দিলাম, তাতেও কিছু ভুল হয় ত থাকতে পারে, তবে ঘটনার মধ্যে কোন ভুল নেই।

গাওনা শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গেই কুঞ্জমায়া আমার কাছে এসে বললেন—“আয়, এইবার সট্‌কে পড়ি”, বলে আমার হাতটা ধরে বাইরের দিকে নিয়ে যেতে লাগলেন। জিজ্ঞাসা করলুম—“কেন কুঞ্জমায়া?” কুঞ্জমায়া বললেন—“আরে, হয় ত মারামারি বেধে যেতে পারে!” অর্থাৎ প্রায়-স্থানেই এ জিনিসটার ভয় না কি থাকতো। যে পক্ষ হেরে যেত, অত্র পক্ষকে তাদের কবলে পেলে, নাকি মারামারি বাধাবার চেষ্টা করতো। বাইহোক আমাদের জন্তে অনেকগুলো ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ী রাস্তার ওপর তৈরী ছিল; ওরি একখানায় কুঞ্জমায়া আমাকে নিয়ে উঠে বসলেন। আরো আমাদের কালীঘাটের তিন জন তাতে উঠলেন।

আমরা বাড়ী এসে পৌছাবার ঘণ্টা দুই পরে, হৈ-হুল্লোড় করতে করতে দলের সবাই এসে পড়লেন ও সরাররি একেবারে কালীমন্দিরের সুবৃহৎ চত্বরে গিয়ে জমায়েৎ হলেন। সকলের কপালে কালী-মায়ের সিঁদুরের বড় বড় ফোঁটা, আর গলায় ফুলের মালা—জয়মালা। তারপর, সে কী আনন্দ। কী উৎসব! সমস্ত কালীঘাট সে আনন্দ-উৎসবে মুখরিত হোয়ে উঠলো; আর সেই সঙ্গে সারা কালীঘাটে কুঞ্জমায়ার গলাবাজি ছুটে বেড়াতে লাগলো—“আরে, কালীঘাটকে কেউ কখনো হারাতে পারে? কালীঘাটের জয় সর্বদা। মা অম্বরনাশিনী এখানে হাতের খাড়া উচিয়ে দাঁড়িয়ে র’য়েচেন!—

জয় মা কালী—

কলকাত্তা-ওয়ালী!”

একদিন সকালে আমাদের রাস্তার ওপরকার রোয়াকের ওপর আমরা তিন-চার জন ছেলে বোসে আছি। সামনেই মহানন্দ ঠাকুরের খাবারের দোকান। মহানন্দ রোজ দোকান খুলেই প্রথমে এক কড়াই হালুয়া তৈরী করতো;

তারপর করতো কচুরি, আর কচুরির পর করতো সিদ্ধড়া। কুঞ্জমায়া মাঝে মাঝে এসে সিদ্ধড়া কিনে খেতেন। আমরা থাকলে, আমাদেরও এক-আধ খানা দিতেন। কুঞ্জমায়া এসে দেখলেন, সিদ্ধড়া তখনো ভাজা হয়নি, হ’ব হ’ব হচ্ছে। কুঞ্জমায়া আমাদের রকের ওপর এসে, পা খুলিয়ে বসলেন। আমাদের মধ্যে একজন বলল—“সিদ্ধড়া ত সব চাপালে, দেবী হবে; তার চেয়ে গরম-গরম কচুরি খান্না কেন।” কুঞ্জমায়া বললেন—“তা কি হয় রে! সিদ্ধড়া যে কি-জিনিস তাও তোবা জানিস না!” আমি জিজ্ঞাসা করলুম—“কি জিনিস কুঞ্জমায়া?” কুঞ্জমায়া একবার মহানন্দের সেই উনানে-চাপানো বড় কড়াইটার দিকে একটুখানি চেয়ে নিয়ে বললেন—“ওটা কি বা? তা খাবার না কি! ও হোল সগ্গের জিনিস!”

আমরা ক’জনেই চমকে উঠলুম—“সগ্গের জিনিস!

“নয় ত কি? ওর লোভে, ওর তিন শৃঙ্গে তিন দেবতা চেপে বোসে আছেন। বুঝি না?”

“তিন দেবতা!”

“হ্যাঁ; ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। তার মানে……

মানেটা আর বলা হোল না, মহানন্দ ভাজা সিদ্ধড়া-গুলো ঝাঁঝি হাতা দিয়ে ছেকে চুবড়ীতে রাখতে-রাখতে কুঞ্জমায়ার উদ্দেশে ঠাক দিল—“এসো গো কুঞ্জবাবু!

একবার একজন বিলিতি সাহেব কালীবাড়ীটা দেখতে এসেছিলেন। কুঞ্জমায়া তাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছিলেন। হাড়-কাঠ-তলায় পাঁচা-বলি দেখে সায়েব সেখানে দাঁড়ালেন। কুঞ্জমায়ার মুখের দিকে চেয়ে সায়েব ঘেন কিছু জিজ্ঞাসা করলেন। যা জিজ্ঞেস করেছিলেন, হয় ত কুঞ্জমায়া তা বুঝতে পারলেন না, কিন্তু জবাব একটা দিলেন। বললেন—“জয়মাকালী speaking হাড়কাঠ cutting goat going sky”—মানে, জয়মা কালী বোলে হাড়কাঠে পাঠাকে বলি দিলে, সে পাঠা স্বর্গে চলে যায়। সাহেব কি বুঝলেন জানিনা, চুপ কোরে থেকে অগ্নজ গেলেন। নকুলেশ্বর শিবকে দেখিয়ে কুঞ্জমায়া বললেন—“Husband of মা-কালী here is ,” পাথরের বাঁড়টার বিষয়ে বুঝিয়ে দিলেন—“শিব’s cow—শিব sit it।” মানে বলা নিম্নরোজন। বাই হোক ঘুরে ঘুরে সব

দেখাবার পর, সায়েব তাঁর হাতে দুটা টাকা দিতে এলে, কুঞ্জমামা বললেন—“two rupce ! very little, sir !” সাহেব আর একটা টাকা পকেট থেকে বার করলেন। কুঞ্জমামা তাও না নিয়ে বললেন—three enemy is sir, four give—মানে, ‘তিন শত্রু’ হয়, দিতে নেই; চারটে দিন। সায়েব আন্দাজে বুঝে নিয়ে আর একটা টাকা বার কোরে, তাঁকে চার টাকা দিলেন। আমরা ছেলের দল বরাবর কুঞ্জমামার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছিলাম। হায় কুঞ্জমামা তোমাকে কি ভুলতে পারি। ভোলা কি সম্ভব ? কুঞ্জমামার গায়ে শক্তিও ছিল যেমনি, খেতেও পারতেন যেমনি। শিব বাঁড়ুয়োর বাড়ী কিসের উপলক্ষ্যে একটা নেমন্তন্ন ছিল। তখনকার দিনে এখনকার মত রাত্রে কারো বাড়ী খাওয়ানোর ব্যবস্থা হোত না,—এক বিয়ে ছাড়া। সবই হোত—মধ্যাহ্ন-ভোজন। কিন্তু সব স্থলেই মধ্যাহ্নটা অপরাহ্নে গিয়ে দাঁড়াতে। বাঁড়ুয়ো বাড়ীর ভোজে সারি সারি সব খেতে বসা হোয়েচে। খাওয়াও প্রায় শেষ হোয়েচে। এমন সময় শত্রু বাঁড়ুয়ো বললেন—“আচ্ছা কুঞ্জ, এই তরা পেটে আর ক’গুণ্ডা সন্দেশ তুমি খেতে পার ?”

কুঞ্জমামা বললেন—“পেটটা বড় ভরে গেছে, আর বেশী পারবো না খুড়ো।”

“ভবু ?”

“গুণ্ডা পাঁচ-ছয় হয় ত পারি।”

তখন পাঁচ গুণ্ডা সন্দেশ আনিয়া তাঁর পাতে দেওয়া হোল। কুঞ্জমামা উবু হোয়ে বোসে ছিলেন, আবার আদন-পিঁড়ী হোয়ে বোসলেন; বললেন—তা হোলে, কিছুটা দই ত চাই; তা না হোলে অহুবিধে হবে।”

আধ হাঁড়ী টাক দই তাঁর পাতের সামনে দেওয়া হোল।

আন্তে আন্তে, একটা-একটা কোরে সেই পাঁচ গুণ্ডা সন্দেশ-আর আধ হাঁড়ী দই কুঞ্জমামা নিঃশেষ কোরে উঠে পড়লেন। তখন সকলের আনন্দপূর্ণ কণ্ঠের হরিবোল ধ্বনিতে বাড়ুয়ো বাড়ীর স্বরূহ অঙ্গন মুখরিত হোয়ে উঠলো।

একদিন কি একটা কথার সূত্রে জিতু হালদার

কুঞ্জমামাকে বললেন—“তুই কুঞ্জ যদি একটু লেখাপড়া শিখতিস্, তা হোলে লাট-বেলাটের মাথা একেবাবে চিবিয়ে খেতিস্। কুঞ্জমামা বললেন—“সেটি ত আর হবার জো নেই, জিতুদা।”

“তার মানে ?”

“তার মানে,—ছোটবেলার আমাদের বাড়ীপুকু সবাই যখন পুরীতে ভীর্থ করতে গিয়ে ছিল, সে কথা তোমার মনে আছে ত ? সেখানে বাবা, মা, জ্যেষ্ঠাশাই, জ্যেষ্ঠাইমা, বিন্দুশিশি ওরা সকলে জগন্নাথকে এক একটা ওদের প্রিয় ফল দান করলে; কেউ আম, কেউ ডাব, কেউ আতা, কেউ পেঁপে...এই রকম। আমার ন’বছর বয়স, কিছুই বুঝি না; জগন্নাথের সামনে দাঁড়িয়ে মনে মনে বললুম,—‘ঠাকুর! আমার লেখাপড়াটা আমি তোমায় দিয়ে গেলুম।’—হো হো কোরে হেসে উঠে জিতু হালদার কুঞ্জমামার পিঠে একটা কিল্ মেয়ে বললেন—“তাই না কি ?”

কেউ বলুক, এ-হেন কুঞ্জমামাকে কি ভোলা যায় ? যায় না। কুঞ্জমামা যে আমাদের জীবন-স্মৃতির আঁঠে-পিঠে জড়িত। কুঞ্জমামাকে সে দিনই ভুলবো, যেদিন এ জীবনের শেষ হবে, তার এই স্মৃতি চিরতরে লুপ্ত হবে।

এ জগতে অনেকদিনই কাটালাম। অনেক—অনেক দিন! একটা একটা কোরে আজ নব্বইয়ের কোঠাতে পা ফেলে চলছি। বর্তমান ভাল লাগে না। নীরস, কঠোর মনে হয়, মনে হয়, এ যেন নিজেদের দেশ নয়, এ যেন কোনো অচেনা-অজানা বিদেশ-ভূই। হেথা দয়া, মায়া, স্নেহ ভালবাসা, সহানুভূতি, সখ্য হাসিখুসি—কিছুই নেই। তাই, বালা-কৈশোরের মধুময় স্বপ্নময় স্মৃতি নিয়েই আজ একান্তে পড়ে থাকি। তাতেই স্থখ, তাতেই আনন্দ, তাতেই তৃপ্তি। জীবন-প্রভাতের সেই ফেলে-আসা দিনগুলির কত কথা, কত হাসি-কান্না, খেলা খুলো আজ মনের গহনে স্বপ্নের তুলি বুজিয়ে দেয়। আজ কবির অহুসরণ কোরে তাঁরই কথায় বলি—

‘এই খেলাইড আমি ভালোবাসি।

একদিকেতে ভাসাও অঁ খিঞ্জলে,
আরেক দিকে জালিয়ে ভোল’হাসি।’



পূজার প্রার্থনা

শ্রীজ্ঞান

শরতের আগমনের সাথে সাথেই আগমনীর স্বপ্ন বাঙ্গালীর প্রাণে একটা আনন্দের—একটা অনিসঙ্গীয় সুখের পরশ যেন বুলিয়ে দেয়। বালক, কিশোর, যুবা, বৃদ্ধ সকলের মনই পুনীতে ভরে ওঠে, আর অপেক্ষা করে থাকে বিশেষ কাঁটি দিনের জন্তে যখন মহাদেবীর আগমন হবে বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে। এই যে আগমনীর আনন্দ এর একটি বৈশিষ্ট্য আছে যা অকল নানা পূজায় পাওয়া যায় না।

দেবী দুর্গার এই পূজা বাঙ্গালীর সবচেয়ে বড় উৎসব। এই উৎসবের উৎস বাংলাদেশে যে নয় তা তোমরা জান। শ্রীরামচন্দ্র রাবণ-বিজয়ের জন্ত লঙ্কার সহস্রতটে দেবী দুর্গার আবাহন করেছিলেন। তখন দেবীর পূজার কাল নয়। এখন যে বাসন্তীপূজা হয়, তাই দুর্গাপূজার আসল কাল। কিন্তু রামচন্দ্রকে সেই অকালেই দেবীর আরাধনা করতে হয়েছিল রাবণ বধ করে সীতাকে উদ্ধারের জন্ত। তাই এই দুর্গাপূজার আর এক নাম অকাল-বোধন এবং সেই থেকেই এই অকাল দুর্গাপূজার প্রচলন হয় ভারতবর্ষে। তারপর সেই হুদর ত্রোভাগ থেকে কিভাবে ধীরে ধীরে এই পূজা বাঙ্গালীর জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছে তার সঠিক ব্যাখ্যা করা আজ আর সম্ভব নয়। তবে প্রায় পাঁচশ বছর আগে থেকে বাংলার কংক-জন রাজা বা জমিদারের পৃষ্ঠপোষকতায় এই মহিষাসুরমর্দিনী দশভূজা দুর্গা দেবীর পূজা লোকপ্রিয়তা লাভ করতে থাকে। বাঙ্গালী আজ অস্বর-বিনাশিনী দেবী দুর্গাকে অস্তর

দিয়ে আরাধনা করে, আশ্রয় করে, তাঁর আগমনের প্রত্যাশায় উজাখ হয়ে থাকে মাঝে মাঝে। দেবী দুর্গা মহিষাসুরকে নিবন করে জগৎকে তার পীড়ন থেকে মুক্ত করেছিলেন। আজকের দিনেও সেই একম অবস্থাটি যেন ঘনিয়ে আসছে বলে মনে হয়। তুর্কের প্রচণ্ড আক্রমণ, দুর্নীতি আর চতুর্দিকে, তুর্কদের মধ্যে চতুর্দিক আজ অন্ধকার প্রায়, তুর্কল আজ সমস্ত মূল্যের পীড়ন। এই দুর্দিনের মাঝে মহাদেব-পাত্রী মহাদেবীর আশ্রয়, মহাদেবীর আবির্ভাব, মহাশক্তির বিকাশ আমাদের কাছে নতুন আশা, আগিয়ে তুলবে, নবীন বলে তোমাদের জ্ঞান হবে তুলবে, নব নব সৃষ্টির প্রেরণায় সকলকে উত্তর করে তুলবে।

আজ এই বঙ্গভঙ্গিক দুর্গে সাময়িক কালের আত্ম-সর্গের আবহাওয়ায় অনেকেই আজ ভগ্যান বা ঠাকুর দেবতাকে মানতে চান না। পূজার দেবী দুর্গার অস্বর বিনাশের কথা চিন্তাসময়ে প্রমাণিত হয় নৈতিক কথা, কিন্তু এই পৌরাণিক কাহিনীর সে বিশেষ মূল্য আছে সে কথাও অস্বীকার করা যায় না। রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনীরও ঐতিহাসিক সত্যতা নিকপিত হয় নি বটে, কিন্তু অজস্র কাহিনী, উপদেশ, তত্ত্ব, তথ্য, নীতি, বিদ্যা, আচরণ, অতীত সংবলিত এই দুই অতুলনীয় মহাকাব্য আমাদের এক অমূল্য সম্পদ। এ সম্পদ সব জাতির ভাগ্যে মেলে না। কিন্তু ভাগ্যান আমরা ভগবৎ রূপায় এই সম্পদ লাভ করেছি। তোমাদের মধ্যে অনেকেই হয়ত সম্পূর্ণ

রামায়ণ ও মহাভারত পড়ি নি। মুখে মুখে কিছু কাহিনী শুনেছি বা সন্ধিপাঠ করে পড়েছি। কিন্তু আমার অন্তরোধ তোমরা বিশ্বের এই শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য দুটি পড়ে ফেল। মূল সংস্কৃত থেকে পড়া হয়ত তোমাদের অনেকের পক্ষেই সম্ভব হবে না। তবে বাংলায় এদের সুন্দর অনুবাদ করে গেছেন কবি রুদ্ভিবাস ও কবি কাশিরামদাস। রুদ্ভিবাসের রামায়ণ ও কাশিরামদাসের মহাভারতের প্রাঞ্জল অনুবাদ অতি সুন্দর। তোমরা পড়লেই তা বুঝতে পারবে।

সামনেই তোমাদের পূজার দীপ অবকাশ। এই ছুটিতে তোমাদের মধ্যে অনেকেই, যাবা কলকাতায় থাক তারা হয়ত বাইরে যাবে ভ্রমণ বা হাওয়া বদলানর উদ্দেশ্যে। আবার যারা বাইরে থাক তারা হয়ত অনেকে বাড়ীতেই থাকবে। যেখানেই থাক ছুটির সমস্তটা সদ্ব্যবহার কর এই মহাকাব্য দুটি পড়ে। গল্প পড়ার আনন্দ ও সু-শিক্ষার উপকার একই সঙ্গে লাভ করবে। হাঙ্গা গল্প, উপহাস পড়ে বা শুধু আলসে, আরামে ও আড্ডায় অমূল্য সময় ব্যয় কর না। তোমাদের এখনও প্রকৃত জীবন আরম্ভ হয় নি। এই সময় সুশিক্ষার দ্বারা জীবনের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে তুলতে পারলে তবেই সারা জীবন আনন্দে কাটাতে পারবে—জীবন-সংগ্রামে কখনও পরাস্ত হলে না। প্রাতঃস্মরণীয় প্রাচীন, প্রাজ্ঞ মুনি দ্বিধা মাছুষকে শিক্ষা দেবার জগ্গে যে অমূল্য উপদেশাবলী গল্প, কাহিনীর মাধ্যমে রেখে গেছেন তার থেকে শিক্ষা লাভ করে আজ জগৎ ধরা হচ্ছে। তত, ভবিষ্যত, বর্তমানদশী এই ত্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষদের নাকি তোমরা অবহেলা

কর না, এর থেকে জ্ঞান আহরণের চেষ্টা কর, সফল লাভ করবেই তাতে।

আজ দিকে দিকে দুর্নীতি, দুষ্কৃতির যে প্লাবন দেখতে পাচ্ছ তার কারণ “অহং” ভাবাপন্ন অন্তঃসারহীন, অহংকারী আধুনিক যুগের মানুষ এই সব নীতিকে, উপদেশকে, আচার-আচরণকে দৃষ্ট ভরে হেয় করে, অবহেলা করে, মিথ্যা গর্বে আত্মপ্রশাদ লাভ করে সমাজের বুকের ওপর তুরাচারের রাজত্ব চালিয়ে যাচ্ছে। জাতির জনক গান্ধীজীর রামরাজ্যের স্বপ্ন আজ কোথায়? তাই আজ তোমাদের অন্তরোধ করছি আমাদের প্রাচীন কিংবদন্তি, শাস্ত্র, স্মৃতি, শিক্ষাদাতাকে অবহেলা কর না—তাকে পাচিয়ে রাখ, পুনরুজ্জীবিত কর এবং নিজেরাও উজ্জীবিত, উদ্দীপিত হয়ে উঠে দেশকে, জাতিকে, সমাজকে রক্ষা কর। জগৎ-জ্ঞানদেবী দুর্গা দুষ্কৃতিকারী অসুরকে সংহার করে জগৎকে রক্ষা করেছিলেন, তোমরাও সংশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে আচারে, আচরণে, সংস্কে, শাসনে সেই মহামায়ার আশীর্বাদ-পূত উপযুক্ত স্থানরূপে গড়ে ওঠ—এই প্রার্থনাই আমি আজ জানাই মহাদেবীর চরণে।

তোমরাও আগামী পূজায় পূজার মণ্ডপে মণ্ডপে দেবী দুর্গার বরাভয়দায়ী মূর্তির সম্মুখে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করবে যেন ভারতমাতার সদাচারী, সুশিক্ষিত, সুস্থানরূপে তিনি তোমাদের গড়ে তোলেন, যাতে তোমরা জাতির গর্ব হয়ে উঠতে পার। এবারকার পূজায় এই প্রার্থনাই তোমরা কায়মনোবাক্যে জগন্মাতার চরণে জানাও, আর উচ্চারণ কর যদি বর্জ্যের অমর মন্ত্র ‘বন্দে মাতরম্’।

বাজছে পূজোর বাঁশী

শ্রীরঞ্জিতবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

শরৎ এলো ভুবন তরে
নীল আকাশের গায় :
শিউলিগুলো কুর কুরিয়ে,—
তাই কি বরে যায়।
নীল আকাশে মেঘের ভেলা,
যায় সে দূরে সকালবেলা,
শরৎ ভোরে উঠলো হেসে
শরৎ সোনার রবি,
মা এসেছেন আজকে ঘরে
তাই তো আঁকি ছবি

হাস ছ হাসি তিলিখিলিয়ে
ছোট শিশুর হাসি,
এমনি দিনে মা এসেছেন,
বাজিয়ে পূজোর বাঁশী।
ভাটীয়ালাইর ঘরের সাথে,
গাইছে মাঝি বৈঠা হাতে,
উজ্জলে উঠা নদীর জলে
ছড়িয়ে গানের ধারা,
ফুলের রেণু হাওয়ায় মেশে,
মাতার পাগল পারা।

দামাল সুরেশ

তীনরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

চরিত্র

সুরেশচন্দ্র	
গিরীশচন্দ্র	সুরেশচন্দ্রের বাবা
কৈলাসবাবু	ঐ কাকা
নিস্তারিণী দেবী	ঐ মা
মগধ	ঐ ভাই
জিতেন	
পলাশ	সুরেশচন্দ্রের বালামঙ্গলী
শিশির	
ভবানন্দবাবু	জিতেনক শিখিত ভদ্রলোক
রতন	ঐ পুত্র
রচিম	জিতেনক চাষী
মালী	বাগান রক্ষক

প্রথম দৃশ্য

কলবাগান। ভবানন্দবাবু লুঙ্গি পরে গোক গায়ে নিডানী হাতে নিয়ে কলগাছের গোড়া মাফ করছেন। এমন সময় কর্ণেল সুরেশচন্দ্রের ছবি তাতে পুষ বতনের প্রবেশ।

রতন। বাবা—এটা কার ছবি?

ভবানন্দবাবু। (বতনের দিকে ফিরে) কৈ দেখি—

(রতন ছবিখানা দেখালো) প্রণাম করো।

রতন। কেন, প্রণাম করবো কেন বাবা? জানি কে?

ভবানন্দবাবু। ইনি একজন মস্ত বড়ো বীর! নাম কর্ণেল সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস। মজার বদেয়া বাঙালী সন্তানের মত ইনিও আমাদের নম্র।

রতন। কেন কী করেছেন ইনি? (ছবির দিকে চাইলো)

ভবানন্দবাবু। (নিডানীর মাথায় মাটি মাফ করতে) ইনি আমাদের ভীকতার অপবাদ ঘুচিয়েছেন। বাঙালী বীর—বাঙালী জ্বন্ত জ্বার তারই পরিচয় বয়ে নিয়ে গেছেন সাগরপারের দেশে। জাতির লগাটে ইনি একে দিয়েছেন বীরত্বের জয়তিলক। (ছবিখানির চন্দ্রে প্রণাম জানিয়ে রতনের দিকে চেয়ে) নাও প্রণাম করো।

রতন। (প্রণাম করে) খাচ্ছা বাবা, এর সঙ্গে জানো ভূমি কিছু?

ভবানন্দবাবু। নিশ্চয়। বাঙালী হয়ে এতো বড়ো হুগুত দামাল বাঙালীর পরিচয় আমাদের সকলেরই জানা

উচিত রতন। ইংরাজী ১৮৬৮ সালের ১২ই জাহায়া নদীয়া জেলার নাথপুর গ্রামে ইনি জন্মেছিলেন।

রতন। আমাদের কবি-দাহি রবীন্দ্রনাথের জন্মও তো ঐ বছরেই—

ভবানন্দবাবু। হ্যাঁ।

রতন। তাহলে এবও তো বঙ্গ রবীন্দ্রনাথের মত একশো বছর পেরিয়ে গেছে।

ভবানন্দবাবু। হ্যাঁ তা গেছে—

রতন। তাহলে এর জন্মতবার্ষিকী উৎসব হোলো না কেন?

ভবানন্দবাবু। আমিও তাই ভাবছি রতন। হয়তো আজকের বাঙালী তাকে ভুলে গেছে। কিন্তু তোমরা, আগামী দিনের বাঙালীরা তাকে ভুলো না। যে সাহস— যে শৌর্য পরিচয় তিনি এবে গেছেন তা পেকে অনেক কিছু আমাদের শেখাবার আছে।

রতন। এর সঙ্গে বাবা আমাদের যা হচ্ছে হচ্ছে বাবা—বলো না এর আনন্দটা শুনি—

ভবানন্দবাবু। উৎসব হয়েছে বোনুবো বৈ কি, নিশ্চয় বোনুবো। এরা কী কামিনী গাছের গোড়াটির বসি। (হুতনে একটা কামিনীগাছের গোড়ায় বসল, নিডানীটা পাশে রেখে ভবানন্দবাবু সেজা হয়ে বসলেন। রতন বসল তাঁর সম্মুখে) সুরেশচন্দ্রের বাবা গিরীশচন্দ্র ছিলেন সবকারী কন্যাবাবু। দুই ছেলে, দুই নিস্তারিণী দেবী আর তিন মেয়ে নিয়ে তার সমার। ছেলে দুটির মধ্যে সুরেশচন্দ্রই বড়ো—এগা ছিপছিপে গড়ন। কিন্তু রঙা ছিল উজল। চোখে বৃন্দে একটা কঠিন প্রতিজ্ঞা, ভারি ছেদী ছিলেন সুরেশচন্দ্র।

রতন। খাচ্ছা অতো বড়ো ছিলেন—ওর মা বাবা কিছু বলতেন না তাকে?

ভবানন্দবাবু। বলতেন বৈ কি, একেক সময় বিরক্ত হোতো তারা পক্ষাতেন—কঠিন সাজা দিতেন মারও লাগাতেন।

রতন। এখন উনি কি করতেন?

ভবানন্দবাবু। তখন এও জিন্দ অতো চেপে বসতো। হুগুতনার চড়াব করে ছুড়তেন। কিন্তু যদি তিনি অন্যায় কিছু করেছেন বলে বুঝতেন, তাহলে নিবিচারে পাকনা শাস্তিটুকু সহ্য করতেন। তবে কাপুরুষের মত কখনো চোখের জল কেনতেন না একটুকু। বাবা ছিলেন গোড়া বৈয়্য, মোমা শাক সুপকব। অলচ সুরেশচন্দ্র কিন্তু পড়ে গোড়ামিকে কখনো প্রায় দিতেন না।

রতন। (ছবিখানির দিকে চেয়ে মুখ তুলে) বাবা—বেশ তো!

ভবানন্দবাবু। হ্যাঁ—বড়ো গাঁরা ছন—মাগুদের মত মাগু হোয়ে যারা দেশের গৌরববুদ্ধি করেন তাঁরা এই

রকমই হন। (রতনের হাত থেকে ছবি-খানা নিয়ে দেখতে দেখতে) ছাখোনা ছবিখানার মধ্যে কেমন একটা বলিষ্ঠ ভাব! এ ছবি দেখলে কে বলবে বাঙালীর মেকদণ্ড ভেঙ্গে পড়েছে?

রতন। তুমি ঠিকই বলছ বাবা—

ভানন্দবাবু। আর একটা মজা কি জানো—বিপদকে জয় করার একটা প্রচণ্ড নেশা ছেলেবেলা থেকেই ছিল স্বরেশচন্দ্রের মধ্যে। তাই বিপদে পড়ে ভয়ে তিনি পিছিয়ে আসতেন না কোনদিন। খু-উ-ব ছোট বেলাকার একটা ঘটনা বলি শোনো—

রতন। (ঘন হয়ে বসল) বলো—

ভানন্দবাবু। বয়স তখন সবে বছর খানেক। ওই বয়সেই ওঁর সংগে পেরে উঠতেন না ওঁর মা নিস্তারিণী দেবী। জিনিস পত্র ভেঙ্গেচুরে ছিটিয়ে ছিটিয়ে একাকার করতেন সব। একদিন নিস্তারিণী সন্ধ্যাবেলায় ঘরে প্রদীপ জালিয়ে রেখে কী একটা কাজে গেছেন। দুইটা তক্ষণি গিয়ে ধুয়ে প্রদীপটা। জনশ্রুতি শিখার সামনে মুখ বাড়িয়ে দিচ্ছে, অবোধা ভাবায় কী সব আবোল তাবোল বলছে। এমন সময় ঘরে ঢুকলেন ওঁর মা। দুইটা পুড়ে মরবে ভেবে হাত থেকে কেড়ে নিলেন প্রদীপটা। জেদী ছেলে তক্ষণি একটা চীংকার দিয়ে মাটিতে গড়াতে লাগল। রাগে মা তখন প্রদীপটা ওঁর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, নে ধনু দেখি, ধনু—মা তখন কি করলেন জানো?

রতন। কি করলেন?

ভানন্দবাবু। অল্প প্রদীপের শিখার ওপরে স্বরেশচন্দ্রের একটা আঙ্গুল ঠেসে ধরলেন। উদ্দেশ্য অজ্ঞ কিছু নয়, ভবিষ্যতে যাতে ছেলেটা আর কখনো আঙুলে হাত না দেয় তার জন্তে একটু সজাগ করে দেওয়া।

রতন। উঃ কী সাংঘাতিক! তার পর কি হোলো?

ভানন্দবাবু। সবার বেলায় যা হয় তাই হোলো। যন্ত্রণায় চোঁচিয়ে উঠল শিশু, কিন্তু কঁদে রসাতল করলে না। সমস্ত যন্ত্রণাটুকু মুখ বুজে সহ্য করলে!

রতন। ভারি আশ্চর্য তো!

ভানন্দবাবু। আর একবার—বয়স তখন মাত্র দু বছর। সেই সময় একদিন প্রাচীরের গায়ে একখানা মই খাড়া ছিল। ছেলে সেই মই বেয়ে দিবা তরতর করে উঠে গেল! ভয় ভর কিছু নেই। হুড়ি হুট আন্দাজ উপরে বসে খিলখিল করে হাসতে লাগল। একটা চাকর তাই দেখে ছুটেতে ছুটেতে বাড়ীর মধ্যে গিয়ে খবর দিল। হৈচৈ পড়ে গেল বাড়ীতে—সবাই ছুটে এলো। ভয়ে তাঁরা অস্থির। লোকজন দেখে ছেলে তো আরো খুশী হোয়ে মইয়ের ওপর থেকেই লাফ কাঁপ শুরু করে দিল। সকো-নাশ—পড়ে গেলে হাড়গোড় সমেত একেবারে ছাতু হয়ে যাবে! কি হবে এখন! কেমন করে নামানো যায়

ছেলেটাকে! মায়ের বুক টিপ্‌টিপ্‌ করছে। ভয়ে তাঁর বুক ঠেলে কাঁদা আসছে।

রতন। খুব সাংঘাতিক ব্যাপার তো।

ভানন্দবাবু। হ্যাঁ—তাই ভাবো—দু বছরের একটা শিশু—অথচ কেমন নিষ্ঠুর। একটুও না ঘাবড়ে ছেলে দিবা মই ধরে দাঁড়িয়ে রইল।

রতন। তারপর কি হোলো?

ভানন্দবাবু। তারপর খুব সাবধানে একজন মই বেয়ে উঠে গিয়ে তাকে কোলে করে নামিয়ে নিয়ে এলো। সবাই স্বস্তি পেলো। মায়েরও ধড়ে প্রশ্রয় এলো। ঐ বয়স থেকেই স্বরেশচন্দ্রের দুইটি স্বক। দুইটি আর দস্তিপনার মধ্যে দিয়েই কেটেছে তার শৈশব আর কৈশোরের দিন-গুলি। বনে বনে—গাছে গাছে ঘুরে বেড়ানো ছিল তার নেশা। পড়াশুনার চেয়ে দুইটিতেই মন ছিল তার বেশী। তবু বড় হয়ে অনেকগুলো ভাষা শিখেছিলেন স্বরেশচন্দ্র। ইংরাজী-জার্মান ফ্রেন্স, স্পেনিশ-ডাচ, পোর্চুগীজ, ইটালী, ডেনিশ আরো অনেকগুলো ভাষা তিনি গড়গড় করে বলে যেতে পারতেন।

রতন। বায়ে, কোথা থেকে কোথায় টেনে নিয়ে চললে—আগে ছোটবেলার কথাগুলো সব বলো—

ভানন্দ। হ্যাঁ ছেলেবেলার কথাই আগে বোলবো—কিন্তু—

রতন। আবার ‘কিন্তু’ কি? বলো—

ভানন্দবাবু। (চারদিকে তাকিয়ে) না—মানে, সম্ব্যে ঘনিয়ে এলো তো—আচ্ছা ওঠো রতন হাত মুখ ধুয়ে ঘরে গিয়ে বসি।

রতন। বোলবে তো।

ভানন্দবাবু। (হুজুনেই উঠে দাঁড়াল) নিশ্চয় তুমি তাঁরই দেশের ছেলে। তাঁর দুর্বার জীবন থেকে অনেক কিছু তোমায় নিতে হবে। শুধু তুমিই বা কেন বলছি—তোমার মতো যারা কিশোর—জীবন যাদের একটু একটু করে গোলাপ কুঁড়িটির মত ফুটে উঠছে তাদের প্রত্যেকেরই উচিত স্বরেশচন্দ্রের মধ্যে যে বীরত্ব—যে দুঃসাহস ছিল হৃদয় দিয়ে তা অনুভব করা। বাঙালী আজ জীবনসংগ্রামে পিছিয়ে পড়েছে। ভীকৃতার অপবাদ আবার তার ঐতিহ্যকে কলঙ্কিত করছে। বেশ বুঝতে পারছি শক্তিশালী সাহসী আর দুরন্ত-দামাল না হতে পারলে বাঙালীর পতন অনিবার্য। এ পতন রোধ করতে হ’লে চাই বীরত্বের সাধনা—চাই মহাশক্তির আগরণ। চলো—ধরে গিয়ে নিশ্চিন্তে বসে আবার স্বরেশচন্দ্রের কথা তোমায় শোনাবো।

রতন। বেশ, চলো।

[উভয়ের গ্রন্থান ও পর্দা]

দৃশ্য

[আমবাগান। পলাশ ও জিতেন। দুজনে ঘরে ঘরে একটা গাছের দিকে তাকিয়ে আম খুঁজছে।]

পলাশ। ইস, মাইরি জিতেন—কৌ ফাস্কেলাস্—পেকে একেবারে টস্‌টস্‌ করছে—

জিতেন। কইরে, আমি তো দেখতে পাচ্ছি নে—

পলাশ। দেখতে পাচ্ছিসনে—চোখের মাথা খেয়েছিস নাকি (জিতেনের গলা ধরে আঙুল উঁচিয়ে) উই ছাখ্ আমার আঙুল বরাবর তাকা—দেখেছিস?

জিতেন। কই রে—

পলাশ। ধোং, আচ্ছা দুটো ডাল জড়া জড়ি ক'রে রয়েছে দেখেছিস?

জিতেন। হুঁ, ডাল দুটো তো দেখতে পাচ্ছি।

পলাশ। পাচ্ছিস?—এই ডাল দুটোর মধ্যে দিয়ে চোখ ঢালা দিকিনি—পেয়েছিস?

জিতেন। ই-স্ (লাফিয়ে উঠে) এ্যান্ডোবডো একটা—রাঙা টুকটুক করছে রে—

পলাশ। এবার তা'হলে ঝাঁ ক'রে উঠে পড় দিকিনি—

জিতেন। অ-নেক উঁচুতে গে—একেবারে মগডালে—

পলাশ। তা'হোক, পাড়তেই হবে—

জিতেন। গাছের গুঁড়িটা কি রকম মোটা দেখেছিস?

পলাশ। হোক—তাকে উঠতেই হবে—নে ওঠ্ শিগগীর।

জিতেন। নারে ভয়সা হচ্ছেনা—খদি পড়ে যাই।

পলাশ। পড় বি কেন—সাবধানে ওঠ্। দেখিসনি সুরেশ কেমন চটপট করে উঠে যায়—

জিতেন। সুরেশের কথা বাদ দে—ওতো একটা পাক্কা গেছড়ে। এই সময় সুরেশটা থাকলে ভালো হোতো। তাই না?

পলাশ। তা'হলে দাড়া এখানে—চট্ ক'রে ডেকে আনি ওকে এঁা?

জিতেন। তাই যা—দৌড়ে যাবি বলো (পলাশের দ্রুত প্রস্থান) দেখিই না চেষ্টা ক'রে পারি কিনা—সব তাতেই সুরেশটা বাহাদুরি নেবে কেন! (উইংগ্‌সের গা ঘেঁসে একটা গাছ জড়িয়ে ধরে উঠবার মত হাবভাব করবে এবং কিছু পরে মঞ্চের মধ্যস্থলে স'রে এসে) ওঃ বুকটা হাঁচড়ে গিয়েছে—জালা করছে বডো—(উপরের দিকে চেয়ে উশুশু করতে থাকবে। এমন সময় সুরেশ ও পলাশের প্রবেশ)

সুরেশ। মাকোর একটা আমের ভল্লো অদ্‌, ও উঠে কি হবে রে?

জিতেন। (ওদের দিকে ঘুরে) একটা নয় রে অনেকগুলো পেকে রয়েছে।

সুরেশ। কই—কোথায়? দেখা দিকিনি—

জিতেন। উই যে একেবারে সকলের উচু ডালটা (সুরেশকে আম দেখালো)।

সুরেশ। আচ্ছা, ঠিক আছে। দাড়া (গায়ের জামাটা খুলে) ধর এটা—

পলাশ। (জামাটা হাতে নিয়ে) সবগুলো চুটিয়ে পাড়বি কিম্বা।

সুরেশ। (উইংগ্‌সের কাছে গিয়ে) তোরা দেখিস্, মালীটা যেন টের না পায়। আমি একটা একটা করে ছুঁড়ে ফেলবো—কাচ্ ধরবি—বুঝলি তো?

পলাশ ও জিতেন। আচ্ছা—(কেউ আসছে কিনা দেখার জন্য চারপাশে ঘন ঘন তাকাবে, সুরেশ উইংগ্‌সের পাশে দাড়িয়ে গাছে উঠবার মত উইংগ্‌সের পাশে রাখা মই বেয়ে উঠে যাবে)।

সুরেশ। নে ধর—

পলাশ। (ক্যাচ ধরার ভংগীতে উপরের দিকে চেয়ে) দে কেলে দে... (সুরেশ আম ফেলতেই ক্যাচ্ ধরে নিলো)

সুরেশ। ধর—আব একটা—

জিতেন। দে—(ক্যাচ্ ধরল। এইভাবে ৭৮টা আম পাড়া হোলো)

নেপথ্যে মালী। কে রে বাগানে!—

জিতেন। এই সেরেছে—সুরেশ, শীগগীর নেমে আয়।

সুরেশ। দাড়া, আরো গোটা কতক।

পলাশ। না-না, শীগগীর নেমে পড়্ (উঁকি দিয়ে দেখে) মালীটা হয়তো এই দিকেই আসছে...

জিতেন। নেমে পড় সুরেশ—

নেপথ্যে মালী। এই কোড়ারা, দাড়া—দেখাচ্ছি মজা—

পলাশ। এহ মরেছে, এসে পড়েছে যে!—

সুরেশ। (নামতে নামতে) কদ্দুর রে মালীটা?

জিতেন। (উঁকি দিয়ে দেখে) বডো কাঁঠাল গাছটার কাছে শীগগীর নাম্—

সুরেশ। তোরা আম কটা নিয়ে পালো—

(পলাশ ও জিতেন আম কটা কোঁচড়ে নিয়ে পালিয়ে গেল। মালীর প্রবেশ)

মালী। ধরতে পারলে কান ছিঁড়ে দিতাম একেবারে। (গাছের দিকে চেয়ে) গাছে ও কে? ও—বিশেষ-মশাইয়ের হুজমানটা (তেড়ে গিয়ে) নাম বলছি—নাম—

সুরেশ। নামছিট তো দেখতে পাচ্ছো না! (একটা লাল পিঁপড়ের বাসা মালীর গায়ের ওপর ফেলে দিয়েই ঝপ করে মাটিতে লাফিয়ে পড়ে আচমকা পায়ে চোট পেলো। তবু খোঁড়াতে খোঁড়াতে অদৃশ্য হয়ে গেল। পিঁপড়ের ঝাকের আক্রমণে মালী পক্ষবান্ধ হুক করল। হুহাতে গায়ের পিঁপড়েগুলো ঝাড়তে ঝাড়তে)

মালী। পাজীটার জালায় একেবারে অতিষ্ঠি হ'য়ে পড়লাম যেন এঁা! গাছের আম, কলা, পেপে, পেয়ারা কিছু কি থাকতে জায়। পই পই করে বলি, খাবি খা—চেয়ে নিয়ে খা। তা নয়, চুরি করে খাওয়া—ছিঃ ছিঃ কাউকে যেন গেরাতির মধ্যেই আনতে চায় না—উঃ—(চোখের পাতা থেকে একটা পিপড়ে ছাড়িয়ে নিয়ে) ভাগি। চোখটায় কামড়ায়নি। বাগানের ফলপাকড় একটাও খরে ওঠে না ওই দৃষ্টি ছেলের জালায়।

(রহিম মণ্ডলের প্রবেশ)

রহিম। কার কথা বলচো গো বুড়ো?

মালী। কার কথা বলছি বুঝতে পারছ না? (বিরক্ত হয়ে) বলি, এই গায়ের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ভয় পাও কাকে মণ্ডল?

রহিম। ভয়! ভয় আবার কাকে পাবো?

মালী। পাও না?

রহিম। উহ—মোটাই না।

মালী। তাহ'লে তোমার মর্তমানের গাছটায় কাঁদি পুড়েছে—খবরটা সুরেশচন্দরের কানে পৌছে দিষ্ট—কি বলো?

রহিম। না, না বুড়ো, দোহাই তোমার, ওই কন্মোড়া কো'রো না।

মালী। ক্যান ভয় পাওনা কাউকে?

রহিম। উরে বান্ধা—উড়া তো একটা ক্ষুদ্র ডাকাত—

মালী। অ-ই—ওরই কথা বলছিলাম। ব্যাটার হাড়ে হাড়ে ছুঁমি বুদ্ধি। দেখনা—চুরি ক'রে আম পাড়তে উঠেছিল। বলতে গেছি তো এই এ্যাক্সোবড়ো একটা লাল পিপড়ের বাঁনা ওপর থেকে দিলে লেলে গায়ের ওপর!

রহিম। তা এ হ'নে দাঁড়ায়ে বন্ধু করলি কি হবি! যাও-বিশেষ মশাইকে গিয়ে কও।

মালী। বলছি কি মণ্ডল—নাশি? সুরেশচন্দরের নামে? তাহ'লেই হয়েছে। উল্টোফল ফলবে বুঝেছ? যাওবা জুতারটে ফলপাকড় বচ্ছর অন্তর ঘরে ওঠে তাও যাবে। গাছ শুকু'কেটে লোপাট করে দিতে পারে। মনে করছ বুঝি একা ঐ ছেলে! গায়ের সবকটিই তেনার চ্যালা—বুঝেছ? ওর বাবা গিরীশবাবু কি বলেন জান?

রহিম। কি কন?

মালী। বলেন ছেলেবেলায় একটু আদটু ছুঁমি সকলেই করে থাকে। তা বলে যখন তখন নাশি করটা ভাল নয়। বুড়ো বয়সে কেউ ছুঁমি করে না হে যাও। মারাত্মক কিছু ঘটলে তবেই এসো—

রহিম! তা-কতাতা বিশেষ মশাই ঠিকই কন। না কি কও বুড়ো।

মালী। কথাটা অবিশি মিশো নয়। সেই জন্তেই তো ওই একটু আদটু ভরমিক হামকা ছাড়া আমিও বিশেষ

কিছু বলিনে। সুরেশচন্দর এমনিতে ভাল মানুষের সাথে কথাবার্তাও কয় ভাল। একটু ডানপিটে এই যা দোস ওর। তা তুমি হঠাৎ বাগানে? যাচ্ছিলে কোথায়?

রহিম। তোমার কাছেই আলাম। তোমার বাবু-মশাই নাকি চরের জমিতে ভাগে দেছেন? বাবুকে বলে ক'য়ে একটা বন্দোবস্ত করে দাও না আমাকে। গরীব মানুষ—বেচে যাই।

মালী। তুমি নেবে? তা চলো, বাবু এখন বাড়ীতেই আছেন। (গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে) উঃ এখনো জলে যাচ্ছে মণ্ডল।

রহিম। জলবেই তো, গেছো পিপড়ের কামড়ে ভারি যন্ত্রণা হয় যে—

[উভয়ের প্রস্থান ও পদা]

ভূতীয় দৃশ্য

[রান্নাঘরের দাওয়ায় খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে আছেন নিস্তারিণী দেবী। সামনের উঠানে দাঁড়িয়ে রহিম মণ্ডল]

নিস্তারিণী। তুমি বলবে কি রহিম আমার ছেলে—আমি চিনি নে ওকে! ওই ছেলের জালায় হাড় মাল ভাজা ভাজা হ'য়ে গেল আমার। সেই সকাল থেকে তার টিকিটি পধন্ত দেখবার উপায় নেই। লেখাপড়া নেই—কেবল টো টো ক'রে বেড়ানো। বলি ও মনো—মনো, সে কুচকে বাদরটারই কি পাতা আছে! মন্থ অ-মন্থ, বাদরগুলো সব গেল কোথায় এঁা!

[কৈলাসবাবুর প্রবেশ]

কৈলাসবাবু। আঃ গলাটা একটু খাটো করো বৌদি। বাইরের ঘর থেকে শোনা যাচ্ছে। পাচটা ভদ্রলোক রয়েছেন। ভাববেন কি তাঁরা?

নিস্তারিণী। ভাবলে আর করবো কি বলো! যে সব অপোগণ্ড পেটে ধরেছি, ওদের জালায় মান সম্মান সবই যাবে। শোনো ঠাকুরপো, রহিম কি বলে শোন।

কৈলাসবাবু। কি বলছ রহিম?

নিস্তারিণী। বলি কালই বাদরটাকে সারাদিন ঘরে আটকে রেখেছিলে না?

কৈলাসবাবু। কেন আজ আবার করল কি?

নিস্তারিণী। আজ আবার নাকি কার বাগানে ঢকেছিল। সেই একেবারে মগডালে উঠে আম পাড়ছিল। ও ঠাকুরপো-ও যে প'ড়ে মরবে একদিন—

রহিম। তা অসম্ভব নয় মা ঠাকুরপো। গাছের পাতায় পাতায় ঘোরে বুন্দো খরার গর্ভে হাত ঢুকায়। একটা বিশদ ঘটতি কতক্ষণ! সাপ খোপের হাতেও তো পড়তি পারে—

নিস্তারিণী। আর বোলো না বাপু। ওকে নিয়ে আর পারছিনি। সেই বচ্ছর থানেক বয়স থেকে স্ব

হয়েছে ওর দস্তিপনা-এর মধ্যে একটুও ছেদ পড়লো না তাতে। যতো বড়ো হচ্ছে ততোই বেশী বেগাড়া হয়ে উঠছে। (মুহূর্ষে) সেই বেড়ালের মুখ থেকে কাঠ-বেড়ালি ছিনিয়ে নেবার কথা তোমার মনে আছে ঠাকুরপো?

কৈলাসবাবু। মনে আবার নেই! ওর সমস্তই অদৃষ্ট। তাইতো ওকে আমার ভালই লাগে। বড় হলে একটা অসম্ভব কাণ্ড কিছু ও করবে, বললে বোদি? ওর সমস্তে আমার ধারণাটা বরাবরই উঠে। তাই মাঝে মাঝে নেহাৎ দ্বায়ে পড়ে যখন শাস্তি দিই ওকে তখন মনে হয় ক্ষুদ্র ওট আশ্চর্যগিরির মধ্যে যে প্রচণ্ড অশান্তিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে তাকে ঠেকিয়ে রাখা কি সম্ভব!

নিস্তারিণী। তোমাদের দুই ভাইয়ের আশ্বাসাতেই দাঁদরটা অমন মাথায় চড়ে বসেছে। সে না হয় যাক কিন্তু অমন করতে করতে কবে যে মরেই যাবে ও! সেবার সেই কাঠবেড়ালির বাচ্চ। কেড়ে নিতে গিয়ে হাতখানা ক্ষত বিক্ষত হোয়ে গেল বোধেষ্টে বেড়ালের আঁচড়ে। ঝরঝর করে রক্ত ঝরছে। বুকে রহিম, ছেলের চোখে তবু এক ফোটা জল নেই! বছর পাঁচেক মাপের বয়স-এ রকম একটা কাণ্ড ঘটল অগচ একটুও ভয় ভর নেই। গোবিন্দ আসছিল খামার থেকে। দেখতে পেয়ে ছেলেকে বেড়ালের হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে এলো। অদৃষ্ট পত্নর বাণেশ্বর এটা ওটা কতো কি চললো কদিন ধরে সমানে। তবে সে খাত্তা রক্ষা পায়। (পেয়ারা খেতে খেতে মন্থর প্রবেশ) ঠাঁয়ে পেয়ারা পেলি কোথায়?

মন্থর। (অসম্ভবভাবে পেয়ারায় কামড় বসিয়ে) দাদা দিয়েছে। অ-নেক পেয়ারা আছে মা দাদার কাছে—এই এ্যান্ডো বড়ো বড়ো (ছিবড়ে ফেলে দিয়ে) আঃ কী মিষ্টি।

নিস্তারিণী। দাদা কোথায়?

মন্থর। খিড়কি দোরের আড়ালে—লুকিয়ে লুকিয়ে পেয়ারা খাচ্ছে। দেখ মা—দাদাকে বললাম ছোড়দিকে ছুটো দে তা দিলে না—বললে বড়দিকে দেবে।

নিস্তারিণী। ও ঠাকুরপো, ডাকোনা দাঁদরটাকে একবার।

কৈলাসবাবু। সুরেশ—এই সুরেশ—

নেপথ্যে সুরেশ। যা-ই কা—কা—(কিছুক্ষণ পরে পেয়ারা চিবোতে চিবোতে সুরেশের প্রবেশ। চুলগুলো উম্কে খুসকো—প্যাণ্টের দুই পকেটে ভর্তি পেয়ারা।)

কৈলাসবাবু। লেখাপড়ার বালাই নেই—রাতদিন শুধু বনবাগাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি—পড়াশোনা করতে ইচ্ছে করে না তোরা?

নিস্তারিণী। অমন ক'রে নয়। ছ'চার ঘা বসেও—গায়ে কি ওর মাজের চামড়া আছে যে ভালো কথা শুনেবে?

কৈলাসবাবু। কিরে, চুপ করে আছি! যে—জবাব দে। লেখাপড়া করতে ভাল লাগে না?

সুরেশ। না—

কৈলাসবাবু। বনবাগাড়ে জানোয়ারের মত ঘুরে বেড়ালে জীবনে বড় হওয়া যায় না বুঝেছ হে? লেখাপড়া তোমাকে করতেই হবে। আচ্ছা এই যে সেদিন শিবাজীর গল খনে বললি বড় হয়ে শিবাজীর মত বীর হবি। বোকা হবি। এই নাকি তার নমুনা?

সুরেশ। তবোই তো—

নিস্তারিণী। হবি? জাই—দাঁদর ছাড়া আর কিছুই হবি নে ভুই।

সুরেশ। উঃ দাঁদর হোতে যাব কেন? দেখবে—শিবাজীর মতই বীর হব আমি। ইয়া বড়ো এক ঘোড়ার চড়ে মাথায় পাকড়ি দিয়ে হারে-রে-রে করতে করতে ছুটবো। লোকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবে আর বলবে—সুরেশচন্দ্র-কি-জয়। মস্তবড় এক মৈত্রদল থাকবে আমার। তাই নিয়ে শত্রুদের ওপর আপিয়ে পড়ব। ভয়ে তারা কাঠের পুতুলের মত ঠকঠক করে কাঁপবে। আমি কোমর থেকে তরবারি বার করে তাদের কচুকাটা করে ছাড়ব।

(সকলো হাসি)

মন্থর। ইস্ সক্তি দাদা—তা'লে কী মজাই যে হবে। আমাকে নিবি তো তোর দলে?

সুরেশ। আলবৎ—শুধু তই কিবে—পলাশ, জিভেন, অনল, শিশির ওরাও থাকবে।

কৈলাসবাবু। আচ্ছা বেশ, কেমন বাতাজুর হও দেখা যাবে। এখন যাও দিকিনি চান করে খাওয়া দাওয়ার পাট চুকিয়ে নাও দিকিনি। রোববার আছে তপুরে অজুনের গলটা বলব কেমন? মহানারতের সেই বীর অজুন।

সুরেশ। ঠিক—বলবে তো?

কৈলাসবাবু। ঠি—ক বোসবো।

সুরেশ। আচ্ছা কাকা, শিবাজী অজুনের চেয়ে বড়ো—নয়? আমার কিন্তু তাই মনে হয়। অজুনের শ্রীকৃষ্ণ মাহাত্ম্য করেছিলেন আর শিবাজী একাই একশো।

কৈলাসবাবু। তুজনেই বীর—তুজনেই খোকা—তুজনেই বড়। মহাপুরুষদের ছোট বড়ো বাছতে নেই। (সুরেশচন্দ্র ও মন্থর প্রস্থান। কৈলাসবাবু রান্নাঘরের দাওয়ার বসলেন) দাদা এলে এবার তুমি কোলকাতায় বাওয়ার ব্যবস্থা করো বোদি। কোলকাতায় দাদার হেপাওতে থাকলে ওর পড়াশুনাতোও মন বসবে আর নিয়মিতভাবে কোন ব্যায়ামের আখড়ায় যাওয়া-আসা করলে শরীরটাও মজবুত হবে। মাঝে মাঝে ছুটিছাটায় আসবে—দেখা সাক্ষাৎ হবে।

রহিম। সেই ভাল মাঠাকরুণ—

নিস্তারিণী। ও আমি তো তোমার দাদাকে কবে থেকেই বলছি। আমার সে কথায় উনি তো ঝানই দেন না।

কৈলাসবাবু। আচ্ছা-এবার দাদা আসুন। সেই ব্যবস্থাই করা যাবে বুঝলে? (রহিমের দিকে চেয়ে) তা রহিম, তোমাকে যে আজকাল দেখাই যায় না। বহুদিন আসো নি—ব্যাপার কি?

রহিম। হেঁ হেঁ কতামশাই থাকলি তেনার কাছে আসি। দুদণ্ড ব'সে আলাপ সালাপ করে একটু আধটু সুখশান্তি পাই। তা তিনি তো সেই কোইলকাতায় তাই—

কৈলাসবাবু। তাই আর আসতে নেই কেমন?

আরে আমরা তো আছি। তা গেছিলে কোথায়?

রহিম। এজ্ঞে হ'রে মালীর কাছে গিয়েলাম।

কৈলাসবাবু। কেন? তার কাছে আবার কি?

রহিম। হ'রে মালীর বাবু নাকি চরের অমিটা ভাগে দেবেন। তাই গিয়েছিলাম সন্ধান—বদি পাই। তা'হলি এবার আসি—কস্তা আদাব—

কৈলাসবাবু। আচ্ছা এসো।

প্রস্থান

রহিম। আসি মাঠাকরুণ—(নত হয়ে হাত জোড় করে নমস্কার জানাল)

নিস্তারিণী। এসো—

[রহিমের প্রস্থান ও পর্দা]

চতুর্থ দৃশ্য

[ছাড়ু খেলা চলছে। স্বরেশ মঞ্চ প্রবেশ করতই ছেলেরা হৈ হৈ করে তাকে ছেকে ধরল।]

জিতেন। এই যে স্বরেশ কখন এলি? একেবারে যে সাহেব বনে গেছিস। বাব্বা, ক'মাস হোলো গিয়ে অন্নি একখানা চিঠি পর্যন্ত দিলিনে?

পলাশ। ওকি আর নাথপুরের ছেলে এখন—খাটি ক্যালকাটার বাবু কি বলিস? কোলকাতায় গিয়ে নিশ্চয় পড়াশুনার খুব মন দিয়েছিস। আচ্ছা ওখানে কোন্ ইস্কুলে ভর্তি হয়েছিস?

স্বরেশ। লণ্ডন মিশনারী সোসাইটি ইন্সটিটিউশন। কিন্তু যাই বলো বাপু আমি নাথপুরেরই ছেলে। কোলকাতা আমার আদৌ ভাল লাগেনা। ইচ্ছে মতন ছুটোছুটি করার জো নেই সেখানে। কথায় কথায় শুধু শাসন আর মানা। পঞ্চ চলতেও আইন। ক'মাসেই যেন ঝুপিয়ে উঠেছি একেবারে। অথচ এখানে এই গ্রামের বৃকে কতো অবাধ আমার গতি। কদিন বেশ খুশীমত বেড়াতে পারব-তারপর আবার সেই খাঁচা। থাকগে—আচ্ছা জিতেন, যাবার সময় তোকে যে হ'ড়েলের বাচ্চাটা ধরে দিয়েছিলাম সেটা আছেতো?

জিতেন। আরে ধ্যৎ ঐ টুকু বাচ্চা বাঁচে কখনো?

পলাশ। এক জায়গার গেলে কিন্তু হ'ড়েলের বাচ্চা ধরা যায় স্বরেশ—যাবি?

জিতেন। কোথায় রে?

পলাশ। আত্তিবেড়ের সেই বুড়ো আমগাছটা দেখেছিস তো—ওখানে অ-নেক গুলো হ'ড়েল বাসা বেঁধেছে।

স্বরেশ। মাইরি-সতি বলছিস?

পলাশ। সত্যি বলছি—

স্বরেশ। তবে চল এজুগি যাবো। একটু দাড়া তোরা চট করে জামা জুতোটা খুলে আসি।

পলাশ। তুই আর আমরা এগোই। (স্বরেশের প্রস্থান) এই ফণ্টে, শিশির, আজ আর খেলা হবে না ভাই। আমরা হ'ড়েল পাখী ধরতে যাচ্ছি (স্বরেশের বিপরীত দিক দিয়ে জিতেন ও পলাশের প্রস্থান। খেলা শুরু হোলো আবার। খেলা চলতে চলতেই পর্দা নেমে এলো)।

শব্দম দৃশ্য

[পর্দা উঠলেই উইংগদের পাশে দেখা যাবে স্বরেশ, পলাশ ও জিতেনকে, স্বরেশের পরণে হাফপ্যান্ট গায়ে গেঞ্জি]

স্বরেশ। তোরা নীচে দাঁড়িয়ে থাক আমি উঠছি। (উইংগদের পাশে রাখা মই বেয়ে এমনভাবে উঠে যাবে যেন দর্শক দেখতে পায়। জিতেন ও পলাশ ওর দিকে চেয়ে থাকবে)

পলাশ। এ-ই আছে আছে—(আনন্দে লাফিয়ে উঠে) মা-ই-রি অ-নেক গুলো ধাড়ী হড়েল। তাকে দেখে ভয় পেয়েছে স্বরেশ।

জিতেন। খু-উ-ব সাবধানে, পারিস তো ধাড়ীও একটা ধরবি।

(কিছুক্ষণ সকলেই নীরব)

স্বরেশ। (মইয়ের ওপর এমনভাবে দাঁড়িয়ে মুখ বাড়িয়ে দেবে যাতে দর্শক তাকে দেখতে পায়) আরে ব-বাপ্ কী প্রকাণ্ড সাপ! ফণা উচিয়ে আছে।

জিতেন ও পলাশ। স্—সা—প্! ওরে ব—বাবা! নেমে আয়—দরকার নেই স্বরেশ নেমে আয় নেমে আয় লীগ্গি।

স্বরেশ। চু—প্! (কিছুক্ষণ পরে শক্ত মুঠোয় একটা গোথরো সাপের গলা চেপে ধরে ধীরে ধীরে এমনভাবে নেমে আসবে যেন দর্শক তার লেজটা দেখতে পায়। মাটিতে এসে সাপটাকে উঁচু করে ধরে রইল। জিতেন ও পলাশ বেশ কিছুটা দূরত্ব নিয়ে দাঁড়াবে)।

জিতেন। উঃ কী সাংঘাতিক! এ যে সাক্ষাৎ যম রে বাবা।

পলাশ। আমার ভাই ভীষণ ভয় করছে। যদি একবার মঠে খুলে বেরিয়ে আসতে পারে তাহলে আর তাকে উঠে বসতে হবে না সুরেশ।

জিতেন। আচ্ছা, এই এনোবো গোথরে, মাপ ছুট পরলি কি করে এঁরা?

সুরেশ। (একচোখে কপালের ঘাম মুছে) হুড়েলের বাসা বরাবর এগিয়ে যেতেই হিস্‌হিস্‌ শব্দ শুনে চমকে উঠলাম। সামনে চাইতেই দেখি বাবাজী এককভাবে প্রস্থত। কণা টুটিয়ে তালু বদে লাড়িয়েছে। রেগে বোম্‌ হয়ে কাঁদাচ্ছে আমার দিকে। হিংসায় জ্বলন্ত লকলক্‌ করছে। দেখে প্রথমটায় একটু গাবড়ে গেলাম। হেঁচকা হুঁসে আলবৎ মাথা পুরে পাঁড়ে যেতিন। কিছু অসম জমিন, বিপদের সামনে কখনো সাহস হারানো নেই। তাই ভাবলাম, মতামত খাবারিও, এখন তার সঙ্গে পাতা কটেই মরব। মামলি নিয়ে উত্তরি ছোয়ে গেলাম। বাচ্চাদন সেই মোক্ষম চেতনটি কাড়লে, আমিও তখন মাপ করে পলাত। মাপে পরলাম। হাতের মতো এমন জোরে মোচ দিতে লাগল যে মনে হোলো এই বুঝি যায় পালিয়ে। কিছু অসম তখন মরিয়া। ক্ষমতা কি বাবাজীর যে ট্যাঁকো করে। ব্যাটের পকেট থেকে চুরি বাব করে। হুঁকার জাখ এর দণ্ডটি কেমন গরম করে চাড়ি।

জিতেন। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক—কেবে কান দড়টা—কিছু মামলি—খুঁট মামলি

সুরেশ। (মাপটাকে কয়েকবার মুড় পরেই মাটিতে আছড়ালো) তারপর বসে পাঁড়ে চুরিটা দিয়ে মাথাটা কচ করে কেটে নিল।

মাম—মাথাটা ছুঁতে সজোবে ফেলে দিল।

পলাশ। তোর আজ মস্ত কিডা কেটে গেল। কাই না?

সুরেশ। তা ঠিক। কিন্তু এই রকম বিপদের মুখো-মুখি দাড়ালে আমার ভেতর থেকে যেন প্রচণ্ড একটা শক্তি জেগে ওঠে। ভয় অবিজি একটু করে, কিন্তু আমার বিশ্বাস সে ভয়কে আমি জয় করবই। (মাপটার কণা ধড়ট মাটিতে রেখে দিল)

জিতেন। চল্‌ এবার বাড়ী ফেরা যাক। আর নয় বাবা।

সুরেশ। দাঁড়া—ছানাটা পেড়ে আনি। (গাছে উঠে গিয়ে পাণীর ছানা নিয়ে নেমে এসে একহাতে ছানাটা এবং অপর হাতে মাপের ধড়টা নিয়ে) চল্‌ কাকাকে দেখাবো এটা।

[সকলের প্রস্থান ও পর্দা]

ষষ্ঠী দৃশ্য

[পড়ার ঘা। ভবানন্দবাবু ও রতন মুখোমুখি চেয়ারে বসে]

ভবানন্দবাবু। গোথরো মাপে মশার কথা তো শুনলে, এবার শোন আর একটা ঘটনা—

রতন। বলো—বলো—খুব ভাল লাগছে আমার—

ভবানন্দবাবু। আর একবার—কয়েকজন শিকারী সাহেব এসেন নখিপুবে। সেই সময় এক বুনা জঘোরের উপরবে পবচনা বিপাকনক হোবে উঠে ওল। মারাদিন বরে সাহেবগুলো জায়েরটাকে খুঁজে বেড়ালেন। শেষে শিকারি সময় এক শীশখাডের মতো তাকে দেখতে পেয়ে গাড়া কবলেন। এমন সময় জঘোরখ কয়েকজন বজুর নাজি ছিঁপ হাতে নদা থেকে মত পত্র কিংজিলেন। জঘোরব কথা শুনে জঘোরখের বদমা তো যে যেদিকে পারল তাকে পালান। জঘোরখ কিছু প্রতিজ্ঞা খটল। যে পাবে জঘোরটা খসিকিৎ দেউ পুরে ওপব প্রস্থত হোয়ে লাড়ালেন। কানো পদক্ষেপ হোয়ে জিপখানা দিয়ে সজোরে একটা বদমা দ্বিগেন জঘোরের মুখের ওপর। মুরেই প্রচণ্ড লড়াই শুরু হয়ে ওপব তখন। শিকারী সাহেবগুলো কান্টই লুকিয়ে ছিলেন। জঘোর বুঝে তার উদ্দেশ্য জঘোরখকে মার লা দিলেন। বেশ কিছুকাল লক্ষ্যবস্তির পর জঘোরটা রক্ত হয়ে গিলিয়ে পড়ল। সাহেবরা তখন বন্দুকের বাঁটি দিয়ে মুরেই ঘঘাত করতে লাগলেন। কানে জঘোরটা খসে গেল। জঘোরখ হলেন বিকল। তার সাহস পাল সাহেবরা হলেন মুক্ত। এই সাহেবরা নাকটায় লোক। এমনভাবে নীলুটীর সাহেবদের সঙ্গে হোলো তার পাবার। এই ঘটনার পর আবার কোলকাতায় গিয়ে তখন জঘোরখ। এখানেও প্রস্থান মহলে শুরু হোলো, কানো জঘোরখ। অগণেবে একদিন মুরবমেই তিনি দীক নিয়ে ফেরলেন। বয়স তখন মায় সাহেব বছর। একটা কানো জঘোরখ গিণীশচন্দ্র অজ্ঞান মনোহর হলেন। একদিন জঘোরখকে তিনি নিজের ঘরে ডাকলেন। বলাৎ বলাৎ কষ্টে ভবানন্দবাবু প্রস্থান করলেন এবং তার পক্ষের রতনও প্রস্থান করবে।

দমাসুর

(চেয়ারে বসে আছেন গিণীশচন্দ্র। সামনে নত মুকুকে দাড়িয়ে প্রবেশ)

গিণীশচন্দ্র (মুকু স্বরে)—আমার ছেলে হয়ে তুমি প্রাণ ধর্ম গ্রহণ করবে এ আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি সুরেশ। এ দুর্মতি কেন হোলো তোমার? আমার বৈষ্ণব। যেছ ইংরাজের সাহায্য কখনই আমারের কামা নব। অগে সেই..... বংশের তুমি বড় হলে। তোমার পুণ্যে অনেক আশা ভরসা ছিল। কিন্তু আমার সমস্ত-সম্প্রদায় মুহুর্তে বিচূর্ণ করে দিয়েছ তুমি। তোমার মুখ দেখলে

পাপ। বংশের কুলদ্বার ভূমি। আঙ থেকে আমার এ সংসারে তোমার স্থান হবে না। ক্রমতা থাকে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে নিজের ভাত নিজে করে খেও।—যাও—আর কখনো খেন তোমাকে এ বাড়ীর দ্বিসৌমানায় দেখতে না-পাই। কি চূপ করে দাঁড়িয়ে রইলে যে! যাও! দূর হয়ে যাও, আমার সামনে থেকে। (হরেশ এগিয়ে এসে পায়ের ধুলো নিতে গেল। গিরীশচন্দ্র চেয়ারে ঠেলে উঠে পিছিয়ে গিয়ে)। না—না, ভূয়ো না ভূমি আমাকে—দে অধিকার ভূমি হারিয়েছ।

হরেশ। (দূর থেকেই মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে) না জেনে—না বুঝে দৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়ে আপনার অন্তরে হয়তো খাষা দিয়েছি। যদি পারেন ক্ষমা করবেন। কিন্তু আপনার আদেশ যতো কঠোরই হোক মাথা পেতে নিলাম। জীবনে যতো দুঃখই পাই না কেন, তবু আপনার ওপরে আমার কোন অভিযোগ নেই। কারণ আপনি পিতা প্রণম্য-শ্রুত।

(দীর্ঘে ধীরে প্রস্থান)

গিরীশ। (চঞ্চলভাবে পায়চারী করতে করতে হরেশের গমন পথের দিকে চেয়ে) চ'লে গেল—চ'লে গেল—হয়তো আর কখনো ফিরবে না। দূরস্থ দুর্বার অবস্থা দস্তান হরেশ আমার চলে গেল! হায় ধর্ম, তোমার কাছে কি পিতৃশ্রদ্ধেরও কোন মূল্য নেই! (কিছুক্ষণ চূপ করে থেকে) যা—ক, যাক—কিন্তু যেখানেই যাক—হে ভগবান, ভূমি তাকে রক্ষা কোবো! এর জীবনে একমাত্র তোমার করুণা ছাড়া আর কোন সংলগ্ন রইল না। আমি ওকে ক্ষমা করতে পারলাম না—তাই ব'লে ভূমিও যেন ওর ওপরে বিরূপ হয়েছে থেকে না ঠাকুর!

(দুহাতে মাথা চেঁকে বসে পড়লেন)

দৃষ্টান্ত

| পদা উঠলেই দেখা যাবে ভবানন্দবাবু ও রতন

দুঃখোমুখি মেখের ওপর বসে)

রতন। তারপর?

ভবানন্দবাবু। তা—র—প—মরি কি নাচি, যাহোক একটা কিছু করতেই হবে সংকল্প নিয়ে একদিন ভায়মও-হারবারের বন্দরে এক বিলাতী জাহাজের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে আলাপ করলেন। নিজের জুগের কথা সমস্ত তাঁকে বললেন। সাহেবের মন গল্গলো। শেষে জাহাজের ক্ষন গলার পরিদর্শক রূপে বিনে মাইনের একটা কাজ তাঁকে দিলেন। কথা রইল, জাহাজে থাকা থাওয়া আর লগুন ঘরে পৌছে দেওয়া ছাড়া হরেশচন্দ্রের অন্ত কোন গিস্কি তিনি গ্রহণ করবেন না।

রতন। লগুন শহরে পৌছে তিনি কি করলেন?

ভবানন্দবাবু। (আন্তে আন্তে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লেন। রতনও দাঁড়ান) খবরের কাগজ, খেলনা, নানারকমের পুতুল বিক্রী শুরু করলেন। শেষে জার্মানীর এক সার্কাস দলে পেলেন একটা চাকরী। এই সার্কাস দলের সঙ্গেই একদিন দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিল রাজ্যে পৌছে গেলেন হরেশচন্দ্র।

রতন। তার পর?

ভবানন্দবাবু। তার পর। ব্রেজিলের রাষ্ট্রীয় সৈন্ত বিভাগে একটা চাকরী জুটিয়ে নিলেন। ১৮৮২ কি ৯০ সালে মাত্র পঞ্চাশ জন সৈন্ত নিয়ে ব্রেজিল সরকারের পক্ষে সন্দ্রভীরে নাখীরয় নামে এক জায়গায় শত্রুপক্ষের সঙ্গে তার প্রচণ্ড লড়াই হলো। একদিন গভীর রাতে হঠাৎ শত্রু পক্ষের দুর্গে আগুন লাগিয়ে দিলেন। দুর্গের অস্ত্রাগার পুড়ে ছাই হয়ে গেল। হরেশচন্দ্রের জয় হলো। তাঁর অদ্ভুত রণকৌশলে খুশী হয়ে ব্রেজিল সরকার তাঁকে লেফটেন্যান্ট করে দিলেন। তারপর একদিন নিজ প্রতিভাবলে তিনি হলেন ব্রেজিলের সৈন্ত বিভাগের সনময় কতা অর্থাৎ কর্নেল।

রতন। তার পর?

ভবানন্দবাবু। তার পর? তারপর আর নাই বা জন্মে রতন। মহাপুরুষদের জীবনের তো খেন নেই। তাই হরেশচন্দ্রের জীবনেরও মৃত্যু নেই। তবু মৃত্যু এসেছিল। ১৯০৫ সাল—। তখন আমাদের বাংলাদেশ জুড়ে চলছে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন। লর্ড কার্জনের বাংলা বিভাগ রোধ করবার জন্তে বাঙালী তখন মরিয়া। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ পথে পথে ঘুরে রাখী বেঁধে বেড়াচ্ছেন। পার্কে চলছে লর্ড কার্জনের বিকট বিবোধার। সেই বছরই বাইশে সেপ্টেম্বর মাত্র পয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে হৃদর ব্রেজিলের মাটিতেই শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন হরেশচন্দ্র।

রতন। এমনি এমনি হঠাৎ মারা গেলেন?

ভবানন্দবাবু। না—এমনি এমনি ঠিক নয়। হঠাৎ তিনি নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হন। দুইর শহর থেকে ডাক্তার আর অল্প পত্র এসে পৌছোবার আগেই তিনি মারা গেলেন। (কিছুক্ষণ চূপ করে থেকে) না, না, ভুল হোলো আমার রতন, ভুল হোলো। মারা তিনি যান নি। বাঙালীর বুকে নতুন আশা ও প্রেরণার সঞ্চার করে বাঙালীর বাহতে মহাশক্তির ডেউ জাগিয়ে, তার উন্নত লগাটে বিজয়ীর জয়তিলক এঁকে তিনি নোতুন করে বাঁচলেন বাঙালীর ইতিহাসের পাতায়। এমন লগজয়া পুরুষ জগতে বেশী লগগ্রহণ করেন না। জীবন এঁদের হয়তো দীর্ঘস্থায়ী নয়। কিন্তু এঁদের কীর্তি সৌরভ দেশ-কাল-পাত্রেব সংকীর্ণ সীমা পেরিয়ে ছড়িয়ে যায় বাতাসে বাতাসে। আমরা বাঙালী। আমাদের মধ্যেই জন্মেছিলেন হরেশচন্দ্র। এ আমাদের

পরম সৌভাগ্য। এসো, আমরা তাঁকে আবার স্বরণ করি। এসো সহস্রবার তাঁকে প্রণাম করি। তাঁর জীবন থেকে নতুন প্রেরণা নিয়ে দরদর হৃদয় গতিতে জেগে উঠি।

(উইংসের সাথে টাঙানো স্বরেশচন্দ্রের প্রতিচ্ছবির উদ্দেশ্যে উভয়ের প্রণাম ও ধীরে ধীরে পদা)

যবনিকা

সাদা আর হলদে

(জাপানী উপকথা।)

সতীন্দ্রনাথ নাথ

অনেক দিন আগে একটা পোড়ো নিচু জমিতে যাদা আর হলদে দুটি সুন্দর চন্দ্রময়িকা পাশাপাশি কুটে ছিল। 'সাদা' যেন দু'টি রূপসী বোন, পাশাপাশি নাড়িয়ে সারা জায়গাটা মাতিয়ে তুলেছে, তাদের আলো করা রূপ।

এক বৃদ্ধ মালী হঠাৎ একদিন এদের দুটিকে দেখে ফেলে। এদের অপকণ লাবণ্য দেখে বৃদ্ধ মালীর মন ভরে যায়।

হলদে কলটির দিকেই মালীর বেশী নজর পড়ে। হলদে সুন্দরীকে মালী জিজ্ঞেস করে,—কি গো হলদে মেয়ে! আমার সঙ্গে আসবে? আমি তোমাকে খাইয়ে পরিবে আরো অনেক সুন্দরী করে তুলতে পারি। রাজি থাক তো! আমার সঙ্গে আমার বাগানে চল। ভাল ভাল রেশমের শাড়ি দোব। নানা রকম মিষ্টি কল দোব। আগে কতো কি দোব।

বুড়ো মালির কথা শুনে হলদে সুন্দরীর মন ভরে গেছে। লোভ বেড়ে গেছে। পাশে সাদা বোনটির কথা তার মনেই পড়লো না।

আগ্নিদে আটখানা হয়ে সে মালীকে বলে,—কেন যাব না! আমি তো তোমার সঙ্গে যাবার জন্তে পা বাড়িয়ে আছি। তুমি আমাকে আদর করে কত কি দেবে, আর আমি তোমার সঙ্গে যাব না। তাও কি কখনো হয়? এখানে নিচু জমিতে পড়ে থেকে আমার কি হবে? এখানে কেউ আমাকে চেয়ে দেখেও না। রূপের তারিফও করে না। এক দণ্ডও আমার এখানে ভাল লাগছে না, তুমি আমাকে হাত ধরে নিয়ে চল। তেলা ফেলাষ পড়ে থাকতে চাই না।

বুড়ো হলদে সুন্দরীকে বুকে করে নিয়ে এসে নিজের বাগানে একটা ভাল জায়গা বেছে যত্ন করে বসিয়ে দিল।

শেতসুন্দরীকে তার একমাত্র বোন ছেড়ে যাবার পর ব্যাচারা হুঁহাতে মুখ ঢেকে কুঁপিয়ে কঁদে উঠলো। তার শান্ত কোমলমুখখানি চোখের জল মলিন হয়ে গেল। সারা

পুখথানা তার বাথায় টুন্টু করে উঠলো। ফ্যালফ্যাল জমির একদারে সে একাই পড়ে রইলো। বাকে ছাড়া সে আর কাউকে জানতো না, সে-ই এখন তাকে ছেড়ে গেল তখন না কঁদে সে কখনো থাকতে পারে? মনের কথা শোনাতে একজনও কেউ পাশে বইলো না। মনপ্রাণ দিয়ে যাকে এতো ভালবাসতো সে-ই মালীর মিষ্টি কথায় শুনে তাকে একলা ফেলে ড্যাং ড্যাং করে চলে গেল। শেতসুন্দরী কাদে, আর নিষেই নিষেই বুকে হাত বুলায়।

যতট দিন যার হলদে সুন্দরীর রূপ ততই আরো বেশী। মালীর বাগানে তার আদরের শেষ নেই। এমন যার কেউ বদার না—এই না সেহু নিচু জমিটার এক পাশে সাদা বোনটির গা-দেহে হঠাৎদিন নাড়িয়ে ছিল। গকে কি এখন চেনবার ড্যাং আছে! রূপের গুমোরে সুন্দরীর মাটিতে অবস্থা পড়ে না এখন। রূপের জাকে তিনি যেন মোটে পড়েন না। সব সময় সেজে-গুজে পটেব বিবিটি হয়ে আছেন।

তার লম্বা লম্বা পাতা আরো ঠান হয়ে নৌচকালো। তার প্রতিটি পাতা কেমন দারদার করে শাফানো। তাকে খচ করতে করতে মালী নাওয়া খাওয়া বুলে যায়। মালীর আদর আরও তো আরো এই অশেষ কথা। এতো আরামে গানিয়ে মোড়ে থেকেও হলদে সুন্দরীর মাঝে মাঝে মনে পড়ে তার হতভাগা সাদা বোনটির কথা। সে বুঝতে পারে না—একা একা এখনো কি করে সে নিচু পোড়ো জমিটার এক কোণে পড়ে আছে! তেলায় ছেদায় অমন কবে একটের পড়ি থাকতে ভালো হো লাগে তার! তার সাদা বোনটি পোড়া বরাতে নিয়ে এখন যে মোটে মাতে সে 'জা' বুঝে উঠতে পারে না।

—মালিকে এখন কোঁ (এক সুন্দরী) বললেই পারতো। —আমাকেও সঙ্গে করে নিয়ে চল, হলদে বোনকে ছেড়ে একলা আমি এই বন-বাদাড়ে নিচু জায়গায় থাকবো কি করে? মালির কাছে নিচু হয়ে মিনতি জানাতে তখন বালো,—এখন থাকো বন-বাদাড়ে একলা পড়ে! বরাতে ভোগ না থাকলে কেউ কি ভোগ দিতে পারে!

রূপের গুমোরে হলদে সুন্দরী এখন বরাকে দূর জান করে। ছোট বোনটির জন্তে তার মনে বড়ো টুক দরদ নেই। শুধু বিড় বিড় করে গালাগাল দেয়।

গায়ের এক মোড়ল হঠাৎ একদিন বুড়ো মালীর বাগানে এসে ছাঞ্জির। তার মালিকের জন্তে একটা আদল আভের বাছাই চন্দ্রময়িকার চারা চাই।

বুড়ো মালিকে তিনি বললেন যে লম্বা লম্বা অনেক পাণ্ডি'চালা চন্দ্রময়িকা তার পচন্দ নয়। বোলটি পাণ্ডি'চালা চন্দ্রময়িকাট তিনি পছন্দেন।

সাদর আশ্বাস জানিয়ে বুড়ো মালি তাঁকে তার হলদে-সুন্দরীর কাছে নিয়ে গেল। মোড়ল হলদে চন্দ্রময়িকা

দেখে বললেন,—এর তো অনেক পাপড়ি, বড় মোটামোটা, আমি আসল জাত চন্দ্রমল্লিকা চাই। ছিমছাম গঠন হবে। ষোলটির বেশী পাঁপড়ি হলে চলবে না। মালির বাগানে তেমন চন্দ্রমল্লিকা নেই।

মোড়ল বুড়ো মালির বাগান ছেড়ে অন্ধদিকে চলে গেলেন। বাড়ি ফেরার পথে মোড়ল তাকে বন-বাদাড়ে পোড়ো নীচু জায়গাটায় একটা মাদা চন্দ্রমল্লিকা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

মোড়ল জিজ্ঞাস করে—কাঁদছো কেন? কি হয়েছে?

খেত হুন্দরী বলে, আমাকে একলা ফেলে হলদে-দি' ড্যাং ড্যাং করে মালির কাঁধে চেপে তার মাজানো বাগানে চলে গেল, যাবার সময় আমার দিকে ফিরেও চাইলেন না। একটা কথাও বললেন না। বন-বাদাড়ে দুটো কথা বলতেও কেউ আমার কাছে আসেন না। কেউ দ্বিষ্টসও করেন। কেমন আছি—তাই কাঁদছি। তা ছাড়া হলদে দি'র অনেক রূপ, অনেক গুণ, আমার তো সে সব কিছু নেই। পোড়া বরাত ছাড়া দেবতা কিছুই দেন নি আমাকে।

মাথুনা দিয়ে মোড়ল বলে—মালির বাগান থেকে এই তো আমি ফিরছি। তোমার হলদে বোনের কথা আর বোলো না। তোমার রূপের সিঁক ভাগও তার নেই। এক গাদা পাঁপড়ি থাকলেই তো আর ভাল বলবে না। আগে দেখবো বংশ, আগে দেখবো জাত, তারপর অস্ত্র কথা। ষোলটির বেশী পাঁপড়ি হলেই তার পতন, সে জাত হারিয়েছে।

মোড়লের আদর মাথানো কথা শুনে খেত হুন্দরীর মুখে হাসি আর ধরে না। চোখের জল নিমেষে শুকিয়ে গেল। মায়া অঙ্গে নাচের চেষ্টা খেলে গেল। আর তার নেতিয়ে পড়া ভাব নেই, এখন সে ছোট পা দুটিতে ভর করে খাড়া হয়ে দাড়িয়েছে। উগমগ করছে আনন্দে।

মোড়ল বলে—চল, তোমাকে নিয়ে যাই আমার মালিকের কাছে। তিনি খুব সুখী হবেন তোমাকে পেয়ে।

মাজানো পাখীতে বসিয়ে মাননীয় দেইমিওর প্রাসাদে খেত হুন্দরীকে নিয়ে আসা হলো।

প্রাসাদের লোকজন সকলেই ছুটে এসেছে তাকে দেখতে। সকলের মুখেই এক কথা—এমনটি কোথাও কখনো দেখিনি, যেমন সৃষ্ঠা গঠন তেমনি কোমল মুখ। আহা! এ যে নিখুঁত হুন্দরী।

দূর,কাছের নামকরা শিল্পীরা রং তুলি নিয়ে ছুটে এলো খেত হুন্দরীর ছবি আঁকবে বলে। মুহূর্তের মধ্যে ভ্রূর রূপের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে। দলে দলে লোক আসছে তাকে দেখতে।

রূপের এতো খ্যাতি শুনে লো কা'র না ইচ্ছে করে—আয়নাতে মুখখানা একবার দেখি। কিন্তু খেত হুন্দরীর আয়নার দরকার হলো না। তারই মুখখানি আঁকা আছে

দেইমিওর সব আসবাবপত্রে, তার জামায়, তার হাতার আস্তিনে, গালার বাক্সে, গদীমোড়ী কেদারায়—সর্বত্র। যে-দিকে চোখ ফেরানো বাবে সেখানেই ষোল পাঁপড়িওয়ালা জাত চন্দ্রমল্লিকা।

সে কি জানতো তার রূপের এতো কদর! এতো মহিমা!

আপানে একবাক্যে সকলেই স্বীকার করবে ষোল পাঁপড়িওয়ালা চন্দ্রমল্লিকার রূপের তুলনা নেই। শ্রেষ্ঠত্বের দাবী সেই একমাত্র করতে পারে। তারই কদর সর্বত্র।

এদিকে মালির বাগানে হাজার পাঁপড়ির ভারে হলদে হুন্দরীর মাথা পড়েছে ঝুঁকে। পরের পর অনেক পাঁপড়ি ছড়িয়ে সে ভেবেছে—আমার মত রূপসী পৃথিবীতে আর কেউ নেই। সে তো জানে না তাঁর কুঁকে পড়া মুখের আর কোন কদর নেই। কেউ ফিরেও চাইছে না তার দিকে।

একদিন মালি সকলকে বললে—মাথা মোটাটাকে জঙ্গলের গাদায় বসিয়ে দিয়ে আমি। বাগান থেকে অপেক্ষা বিদায় হোক।

—

একটি মাথা, আটটি পা

গৌর আদক

একটি মাথা আটটি পা! কথাটা শুনে ভাবছ এটা আবার কি রে বাবা, মাথা নয় একটা হয়, পা আবার আটটা হয় নাকি, হাত-পা মিলিয়ে নাহয় চারটে হয়। এ একেবারে আটটি পা! এ আবার কি জন্তু? এই শুনেই আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছ। এরকম কত অদ্ভুত অদ্ভুত জন্তু আছে সমুদ্রের তলায় তা জান! সে তোমরা না দেখলে ভাবতেও পারবে না। হয়তো এমন একদিন শুনেবে যে, এরকম একটি জন্তুর সন্ধান পাওয়া গেছে যার আটটি মাথা একটি পা।

যেটির কথা তোমাদের কাছে বলছি এটি কি জান? এটি একটি মাছ। 'কথাটা শুনে একেবারে অবাক হয়ে গেলে, নয়? যে মাছেব আবার হাত-পা হয় নাকি!' শুধু হাত-পা নয়, আরো অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিসও দেখা যায় সমুদ্রের মাছে। এ মাছটির নাম হচ্ছে 'কটল' মাছ'। ঐ পাগুলিই হচ্ছে ওদের সব। ঐ দিয়েই ওরা সাতারও কাটে এবং শিকারও ধরে। পাগুলিই হচ্ছে ওদের শিকার ধরার এক-একটি অস্ত্র। ঐ অস্ত্রের উপরে দেখা যায় গোল গোল মাংস পেশীযুক্ত চামড়ার গুটি, ঐ গুটিগুলির মধ্যে বাতাস পরিপূর্ণ থাকে। যখন এরা

কোন শিকার ধরে তখন ওদের মধ্যে থেকে বাতাস বার করে দিয়ে শিকারকে খুব জোরে জড়িয়ে ধরে। তখন কার মাথা আছে যে ওগুলোকে ছাড়ায়।

শিকার যদি একবার এরা দেখতে পেয়েছে তাহলে আর রক্ষে নেই। সঙ্গে সঙ্গে তাকে জড়িয়ে ধরে মেঝে ফেলবে—সে থাক আর নাই থাক। এদের স্বভাবটাই এরকম।

তা বলে মনে করে না যে এদের কোন শত্রু নেই। এরা যেমন একজনের শত্রু, তেমন এদেরও একজন শত্রু আছে। এদের সব চেয়ে বড় শত্রু হচ্ছে মানুষ, কারণ বহু লোক আছে যারা এদের মাংস খেতে খুব ভালবাসে। আর জল জন্তুদের মধ্যে উঁড়, মাছ তো আছেই—এ ছাড়া মানুষের আরো অনেক বড় বড় মাছ আছে যারা এদের শত্রু। এই সমস্ত শত্রু হোক পোক গাড়া কেমন হবে রক্ষা পায় জানি। তবে বসি শোন। এ কথাটা মনে সতী তোমরা বেশ একটা অশ্রদ্ধা হয়ে যাবে। এই সমস্ত শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য মানুষকে এদের একটি উপায় দিয়েছে। এদের শরীরের ভিতরে একটি পলি আছে, সেই পলিতে কালির মতন বালু বা—এর এক রকম তরল পদার্থ থাকে, যখনই কোন শত্রু তাদের আক্রমণ করতে আসে সঙ্গে সঙ্গে সেই কালু বা—এর সাহায্যে জলে ছুটতে দেয়, ডুবিয়ে নেবার সঙ্গে সঙ্গে জলের কিছুটা আশে কালি হয়ে যায় এবং সে কালিজলেই মরো তরো মদুগা হয়ে গভীর জলে পালিয়ে যায়। তাইপূর আর কেউ খোঁজ পায় না এদের।

অপূর্ব-কারসাজিটি দেখিয়ে, তোমরা শুধু যে তোমাদের আত্মীয়-বন্ধুদের রীতিমত তাক লাগিয়ে দিতে পারবে তাই নয়, নিজেরাও সেই সঙ্গে হাতে নাতে পরিচয় পাবে—রহস্যময়-অপরূপ বিজ্ঞানের এক অজানা-তথ্যের।

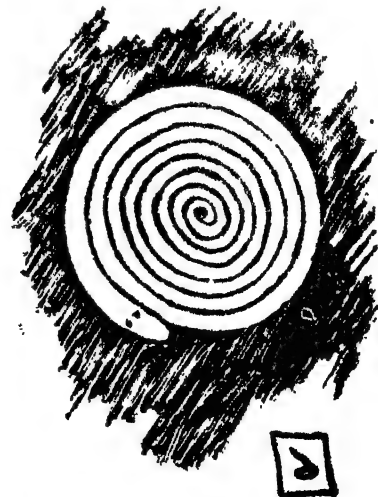
খেলাটির কলা-কৌশল আয়ত্ত করা খুবই সৌজা-সহজ এবং এ খেলা দেখানোর জন্য টুকিটাকি সামগ্র্য যে কয়েকটি সাজ-সরঞ্জাম প্রয়োজন, সেগুলিও নিতান্তই ঘরোয়া-সামগ্র্য...তোমাদের প্রত্যেকের ঘরে বিনা-বায়ে এ সব উপকরণ অনায়াসেই জোগাড় করা যাবে। তাই গোড়াতেই এ সব উপকরণের একটা মোটামুটি তালিকা দিয়ে রাখি। 'অর্থাৎ, এ খেলার জন্য চাই—সুতো-রাখার এবটা পলি কাঠিম, একটি লম্বা পেন্সিল অথবা শক্ত-মজবুত কাঠি, সূত্রটির নিমজ্জ-পূর্বে যেমন ব্যবহার হয়—তেমনি-ববনের এক টুকরো ঝুং পুরু-মোটা কাগজ বা 'কাউবোর্ড',—কাগজ কাটবার উপযোগী একখানা ভালো কাঁচ, কয়েকটা খালিপিন, এক টুকরো 'শেলা' কিম্বা 'বকর' (bone) ছিপ, কাঠি-মনেও একবার দশলাই, মোটা-ছাঁদের বড় একটি মোমবাতি কিম্বা তেল-সলিতা-সমেত একটি 'দুপি আগুন' (oil lamp with oil and wick) এবং পেন্সিল-কাটার উপযোগী একখানা দারালো ছুরি।

ফকমতো উপকরণগুলি সংগ্রহ হবার পর, প্রথমেই পুরু-কাগজ বা পাতলা-কাউবোর্ডের একপাশে চক্রাকারে পেন্সিলের অথবা তেল-নীচের মন ছুরির নমুনা-অনুসারে পরিপাতি ছাদে আগুনের চেহারাটি এঁকে নিয়ে, কাঁচির সাহায্যে সেটিকে আগাগোড়া নিখুঁতভাবে ছাঁটাই করে নাস। তাহলেই নিতান্ত সহজ ভাষায় দ্বিবা চমৎকার একটি কাগজের-মাপ বানিয়ে ফেলতে পারবে। তবে



চিত্রগুপ্ত

এবারে তোমাদের আরেকটি আজব-মজার বিজ্ঞানের খেলার কথা বলছি। এ খেলাটির নাম—'কাঠি বা পেন্সিলের ডগায়-জাঁতা পরন্ত কাগজের সাপের উদ্ভব-কারসাজি'। খেলাটির নাম যেমন অদ্ভুত-ধরণের, কলা-কৌশলও তেমনি বিচিত্র-অভিনব। আজব-মজার এই



হাঁসিয়ার...এভাবে ছাঁটাইয়ের সময় খেয়াল রেখো—

কাগজে-আঁকা সাপের লাজের মাঝখানে গোলাকার যে কালো-চিহ্নটি রয়েছে, অসাবধানতার ফলে, সেটুকু যেন কোনোমতেই কাটা না পড়ে—তাহলেই খেলার মজা সব মাটি হয়ে যাবে... আজব-কারসাজি দেখানোও সম্ভব হবে না শেষ পর্যন্ত। কাজেই এদিকে সজাগ-নজর রাখা বিশেষ প্রয়োজন।



সুস্থভাবে এ কাজটুকু শেষ হলে, উপরের ২নং ছবির নমুনা-অনুসারে সমতল টুল, টেবিল, চেয়ার কিম্বা ঘরের জানলার ধারে অথবা দেয়ালের তাকের কিনারায় সুতোর কাটিমটিকে খাড়াখাড়াভাবে সাজিয়ে রেখে, কাটিমের মাঝামাঝি অংশে আপাদমস্তক একোড়-গুঁকোড় যে গর্তটি (hole) রয়েছে, সেই গর্তের মাথায় বেশ পাকাপোক্ত-মজবুত ধরণে ঐ লম্বা পেন্সিল বা কাটিটিকে এঁটে বসিয়ে দাও। এবারে উপরের ২নং ছবিতে যেমন দেখানো রয়েছে, অবিকল তেমনি ভঙ্গীতে সজ-ছাটাই-করা কাগজের-সাপের লাজের প্রান্তভাগটিতে সমস্ত সমাচ্ছাদিত করে সেটিকে ছুরির সাহায্যে সরু-ছুচোলো-ছাদে-কাটা ঐ লম্বা পেন্সিলের বা কাটির মাথায় গেঁথে বসিয়ে রেখে, পেন্সিল বা কাটির ডগা পাকাপোক্তভাবে বন্ধ করে দাও—আলপিন দিয়ে শোলা বা কর্কের দ্বিপির টুপি এঁটে। তাহলেই দর্শকদের সামনে খেলার কশরতী দেখানোর সময়, পুরস্কৃত অবস্থায় ঐ উড্ডম কাগজের-সাপটি আর কোনোমতেই ছিপির টুপি-আঁটা পেন্সিল বা কাটির মাথা থেকে ছিটকে-থলে বেরিয়ে আসার সুযোগ পাবে না—বরাবর যথাস্থানেই সুস্থভাবে বন্ধ-আঁটক থাকবে এবং

খেলা-দেখানোর আসরের মাঝে আদৌ বিভ্রাট সৃষ্টি করবে না।

এমনিভাবে উদ্যোগ-পর্কের ব্যবস্থাদি সেরে নেবার পর লোকজনের সামনে খেলার আসল-কারসাজি দেখানোর পালা শুরু করতে হবে। সে কারসাজি দেখানোর উপায়টিও নিত্যন্ত সহজ-সরল...বিশেষ কোনো হাঙ্গামার প্রয়োজন নেই।

আসরে খেলা-দেখানোর সময়, দর্শকদের চোখের সামনে কাটিমের-উপর-বসানো ছিপির-আঁটা পেন্সিল বা কাটির ডগায় গেঁথে রাখা কাগজের-সাপের গুঁটিটিকে, উপরের ৩নং ছবির নমুনা-অনুসারে সমতল একটি টুল, টেবিল বা চেয়ার অথবা ঘরের জানলার ধারে কিম্বা দেয়ালের তাকের প্রান্তসীমায় সুস্থভাবে স্থাপন করে সেটির ঈষৎ নীচে... অর্থাৎ ঠিক-ওলদে, মোমবাতি কিম্বা তেলের আলোর কুপিটিকে বসিয়ে দেশলাই শলাকার সাহায্যে সলিতাটি জ্বলে দাও। তবে এই কাজটুকু খুব হুঁশিয়ার হয়ে করা দরকার...কারণ, দেশলাই-কাঠি জালবার সময় সামান্য অসাবধান হলেই আগুনের শিখার স্পর্শে কাগজের সাপটি পুড়ে গেলেই কারসাজির কেরামতী সব পণ্ড হয়ে যাবে! কাজেই খেলা-দেখানোর সময় এদিকে সজাগ-দৃষ্টি রাখতে ভুলো না বেন!

বাতিটি জ্বলে ওঠার কিছুক্ষণ বাদেই দেখবে—বিজ্ঞানের বিচিত্র-নিয়মে কাগজের তৈরী সাপটি ক্রমশঃ দ্বিবি-সজীব হয়ে উঠে অবিরাম-গতিতে ঘূর্ণপাক খেয়ে কাটিমের গর্তে-বসানো পেন্সিল বা কাটির নীচের দিক থেকে উপর দিকে নিজে-নিজেই বেশ স্বচ্ছন্দ্যভঙ্গীতে উড়ে চলতে শুরু করেছে। কাগজের সাপের এই আজব-লীলা দেখে আসরের দর্শকরা যে বিষয়ে অভিভূত হবেন—তার প্রমাণ তোমরা নিজেরাই চোখে দেখতে পাবে।

এমনটি কেন হয়, জানো?...এই আজব-কাণ্ড ঘটবার কারণ—শীতল-বায়ুর চেয়ে উষ্ণ-বায়ু ওজনে হালকা...কাজেই শীতল-বায়ুর চেয়ে উষ্ণ-বায়ু অপেক্ষাকৃত দ্রুতগতিতে উড়ে-তেলে ওঠে। কাটিমের উপর গেঁথে-রাখা কাগজের সাপের নীচে বাতি-জালানোর সঙ্গে সঙ্গে আশপাশের শীতল-বায়ুর ক্রমশঃ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং তখন-সেই উষ্ণ-বায়ু উড়ে-হেঁসে উঠে বায়ু বলেই, উষ্ণ-বায়ুর গতিবেগে কাগজের সাপও ঘূর্ণপাক খেয়ে উপরের দিকে উড়ে চলে। এবারের আজব-খেলাটির এই হলো—আসল রহস্য।





মনোহর মৈত্র

১। বুদ্ধির-দোড়ের হৈয়ালী ৪

উপরের ছবিতে কালির আঁচড় টেনে যে সমান-রেখা (Straight Line) আঁকা রয়েছে, সেটির কোনো অংশ আঁদো স্পর্শ না করে, স্বেচ্ছা মগজের বুদ্ধি খাটিয়ে এমন কৌশল ঠাওরান, যে তার ফলে, খুব সোজা উপায়ে ঐ সমান-রেখাটিকে অনায়াসেই মাপে খাটো...অর্থাৎ সাইজে বেশ অনেকখানি ছোট দেখানো যাবে। বুদ্ধি খাটিয়ে এই কৌশলের সাহায্য যদি সে কাজটুকু যথাযথভাবে হাসিল করতে পারো তো, চিঠির কাগজে তার সবছ নক্সা এঁকে সরাসরি 'কিশোর-জগতের' দপ্তরে পাঠিয়ে দিও। নক্সা-আঁকা হৈয়ালির উত্তরটি সঠিক হলেই, পরের মাসের সংখ্যায় ছাপার হরফে তোমার নাম-দাম ছেপে সবাইকে জানিয়ে দেবো—বুদ্ধিতে তুমি কতখানি সাহসী হয়ে উঠেছো এই কিশোর-বয়সেই।

রচনা : কল্যাণী মুখোপাধ্যায়

'কিশোর-জগতের' সভ্য-সভ্যাদের

:স্বাভিত শ্রীশ্রী:

২।

কালী-পদপ্রান্তে থাকি—নাম হ'অমরে,
উলটিয়ে দিলে মোরে—সংহার করি নরে!

রচনা : নবকুমার শাসিমল (চেতুয়া রাজনগর)

৩।

গাছে আছে তিন নারিকেল—পাড়া বাগু, খাই!

তোমরা দুই বাপ-বেটা, আমরা দুই বাপ-বেটা—

সবাই মোরা একটা-একটা করে যেন পাই!

রচনা : পরেশ মজুমদার (ওকরাবাড়ী)

গতমাসের 'শ্রীশ্রী' আর হৈয়ালির

উত্তর :

১। 'ক' তাসের হৃদিশ থেকে বোঝা যায় যে ৩নং তাসখানি সাহেব হতে পারে না। 'খ' তাসের হৃদিশ থেকে বোঝা যায় যে ২নং তাসখানি সাহেব হতে পারে না। সুতরাং ১নং তাসখানাই সাহেব। আবার 'গ' তাসের হৃদিশ থেকে বোঝা যায় যে ১নং আর ২নং তাস দুখানি, দুটিই হৃদতন হতে পারে না; এবং 'ঘ' তাসের হৃদিশ থেকে বোঝা যায় যে, দুখানি ইঙ্গাপনের তাসই পাশা-পাশি থাকবে। কাজেই ১নং আর ২নং তাস দুখানি হলো ইঙ্গাপন। এভাবে হিসাব কষে বোঝা যায় যে ১নং তাসটি হলো ইঙ্গাপনের সাহেব, ২নং তাসখানি হলো—ইঙ্গাপনের বিবি এবং ৩নং তাসটি হলো—হরতনের বিবি। এই হলো—তাসের হৈয়ালির উত্তর।

২। প্রথমংশ,—১২; দ্বিতীয়ংশ,—২০; তৃতীয়ংশ,—৭; এবং চতুর্থংশ,—৬৪। অর্থাৎ—

যোগফল : ১২ + ৪ = ১৬; বিয়োগফল : ২০ - ৪ =

১৬; গুণফল : ৭ × ৮ = ৬৪; ভাগফল : ৬৪ ÷ ৪ = ১৬;

১২ + ২০ + ৭ + ৬৪ = ১০৩।

৩। কয়লা।

গতমাসের তিনটি শ্রীশ্রীর সঠিক

উত্তর দিচ্ছে :

পুতুল, হুয়া, হাবলু ও টাবলু (হাওড়া), বুদ্ধ ও বিদ্ধ (কলিকাতা), কবি ও লাডু হাসদার (পানাগড়), কুলু মিত্র (কলিকাতা), রিনি ও রণি মুখোপাধ্যায় (কাইরো), রাণা ও বুনা (কলিকাতা), সত্যেন, সত্যয়, সুবারি ও হুনীল (ভিলাই), পুপু ও ভুটিন মুখোপাধ্যায়

(কলিকাতা), জবা চট্টোপাধ্যায় (কলিকাতা), দেবাশিষ ও চন্দ্র মৈত্র (কলিকাতা), ধীরেন্দ্রনাথ মোদক (পাশ-বেড়িয়া), সৌমেন মুখোপাধ্যায় (কালনা), ন, চ, মি, ও ধ, ম (রাইনান), সুরুতিকুমার, সুনীতিকুমার, মনোরমা, গৌরীবালা ও মদনমোহন মিশ্র (রাগপুর), গোপী মণ্ডল, রবি ঘোষ, মীনা ঘোষ, নারায়ণ ঘোষ, দেবপ্রসাদ ধাড়া (খুজুটপাড়া), প্রেমানন্দ, সাত্ত, ধীরেন্দ্রনাথ ও মদানন্দ (হুন্ডা), চন্দন সাহা (জাহানগর), শিবরাম, কদরাম, গোপালচন্দ্র ও শশাঙ্কশেখর মিশ্র (রুইনান সবং), মদন, বাণী, ভারতী, মিঠু ও মণ্ডু সরকার (নন্দী), ভদেব, স্বদেব, জয়দেব, বাসুদেব, আলোক ও পুলক মুখোপাধ্যায় (রাজপুর), মিঠু ও চৈতালী বসু (কলিকাতা), কমা, সীমা, দীপালী, রীতা, জয়ন্ত, অপর্ণা ও প্রদীপ বাগচী (কৌচ), নন্দকিশোর ও রামকমল গোস্বামী (ভালাইগোড়া), অমলকুমার দে (দামিন্যা কবিকল্প), সীতেশ ও অলকা (জেনাদাডী), গোপালচন্দ্র পাড়া (কলিকাতা), চিত্তলেখা, পূর্ণিমা, ইলা, বাসুদেব, রেডিরাম ও স্বকুমার (কলিকাতা), জয়ন্তী, দীপকর, তীর্থকর বানার্জী (মেদিনীপুর)।

পতমাসের দুটি ষাঁধার সঠিক

উত্তর দিহেছে ৪

বু ও মিঠু গুপ্তা (কলিকাতা), সবাসাচী মেন (মাজাজ), শর্মিষ্ঠা ও সঞ্জমিত্রা রায় (কলিকাতা), পিটু বৃতাম ও বাপি (বোম্বাই), দেবকী ও বিশ্বনাথ সিংহ (নওয়াদা), জোৎস্না, রবি, বাপি ও মিঠু (তমলুক), কড়ি, কুমকো, টুকি, নটু ও মিলু বসু (কাংরাগড়), সমীর, শিশির ও প্রবীর দে (চন্দননগর), বিশ্বনাথ অধিকারী (খুজুটপাড়া), বিবেকা-হল, বাণিজ্য-বিভাগ, দশম শ্রেণী, 'খ' বিভাগের সভ্যবন্দ (?) অশোক দাস, প্রিয়নাথ ও সীতল রায় (খুজুটপাড়া), কালী, কৃষ্ণ, শঙ্করী, ও প্রতিমা নন্দী (চকহানা), রীতা, রেণু, রুণু, সোমা ও মঞ্জু (শিবপুর), পরাগময়, বিরাগময়, স্বরাগময় ধীরাগময় শিপ্রাধারা ও মণিমালা হাজরা (বড়বড়িয়া), সুনীল, ভপন ও ছায়া ঘোষ (বঙ্গহুত্র), অশেষ ও অংক বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতা), বাণী ও শুভ্র হাজরা (আড়ুই শাকনাড়া),

অমৃতভা মেনগুপ্ত (যাদবপুর), ধর্মদাস রায়, বিজয় গড়াই খাঁহ, বসু, বাবলু ও বাবু (বিজ্ঞানপুর), রণবীর ও দীপকর নিয়োগী (কলিকাতা), স্বকান্ত, স্বমন্ত, স্বশান্ত ও বনানী সিংহ (মদনপুর), অংকুমার মিশ্র ও ইজাগী রায় (কটক), নরেন্দ্রনাথ ঘোষ (ভগলী) তপ্তি, যুগল, যতুল মিশ্র (ভগলী)।

পতমাসের একটি ষাঁধার সঠিক

উত্তর দিহেছে :

প্রমীলা দাস (বারুইপুর), হরিদাস মহলানবিশ (কলিকাতা), অজয় মিত্র (চন্দননগর), কল্যাণ, শচীন, রঞ্জিত, ইন্দু ও বিমল (কলিকাতা), শকুন্তলা, শান্তনু, সাত্তিকি, সুনন্দা ও স্মিত্রা হাজরা (নাগপুর), পূর্ণিমা ও মনতোষ মজুমদার (কালনা), অভিরাম মেন-রায় (নন্দগাঁও), অনিস্বর রহমান, নজরুল জেহান (?), পূর্ববী ও স্মিত্রাভ চোডার [বাতানল], অনিতা বসু [কটক], রবীন্দ্রনাথ পাল [লোহাপুর]।

—

শরৎ-এল

অপিত মজুমদার

শরৎ এল। মিষ্টি আলো,
স্বহি-মামা ছড়িয়ে দিলো,
ধানের ক্ষেত—নদীর জলে।
লক্ষ 'তারার' প্রদীপ জেলে,
গগন তলে শরৎ শলী
মুছিয়ে দিলো—আঁধার মনী।
শিউলি গাছে শিউলি ফোটে
উষার আলোয়—মধুপ ছোট,
কাজল-কালো—দীঘির জলে
পদ্মকলি চক্ষু মেলে।
নহবতের মিষ্টি স্বরে...
জানিয়ে দিল কোন স্বদে,
'মা'—আসছে—দশভুজা,—
হাসবো মোরা,—কেমন মজা!

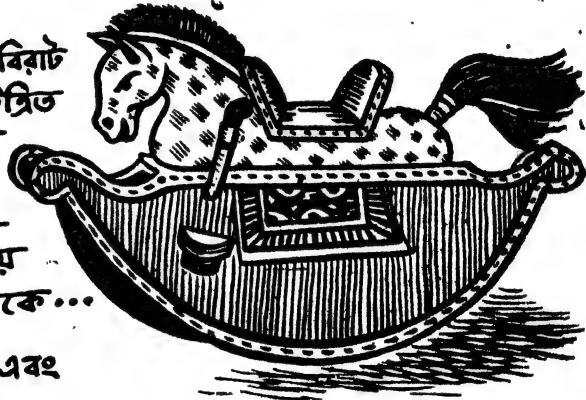
‘খেলনা-পুতুলের’ ইতিকথা

পুণ্ডরী দেবশর্মা রচিত ও চিত্রিত

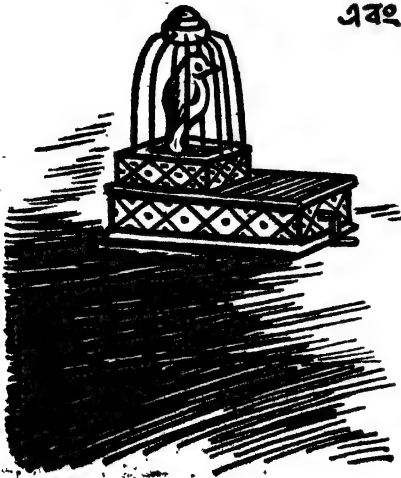


রঙচঙে দামী-বাহারী বেশামী-জরিদার কাপড়ের
পোষাক-পরিচ্ছদ পরা, পায়ে বুড়ী-মথমনের
জুতো-আঁটা মহিলা-বেশী এই যে বিচিত্র
‘ডল’ পুতুলটি দেখাছো — এ-ধরনের পুতুল
নিয়ে খেলা করতেন খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকের
ইংলন্ডের ছেলেমেয়েরা। তবে একালে এই
সব মোখিত-পুতুল তৈরী হতো কাঠের
ছোট-বড় টুকরো খোদাই করে এবং সেগুলিকে
ইচ্ছামতো সাজসজ্জায় সাজিয়ে। পরে এমনি
পুতুল ক্রমশঃ তৈরী হতে লাগলো — কাঁদা-মার্টি,
কাঁচ, পোর্সিলেন প্রভৃতি নানা উপকরণে।

আর এই যে দোলক-বিরাট
কাঠের তৈরী চিত্র-বিচিত্রিত
ছাঁদের ঘোড়া-খেলনার
নমুনা দেখাছো — এটির
প্রচলন শুরু হয়েছে —
পাশ্চাত্য-দেশে খৃষ্টীয়
সপ্তদশ-শতক থেকে...



এবং



খাঁচায়-রাখা দম-দিয়ে চালানোর ব্যবস্থা
সম্প্রতি এই যে বিচিত্র-ছাঁদের ‘কলের’
পাখী’ খেলনাটির নমুনা দেখাছো
— এমনি ধরনের আরো কত সব
মজার-মজার দম-দেওয়া কলে-চলা
খেলনার আবির্ভাব ঘটলো ইংলন্ডে
খৃষ্টীয় ঊনবিংশ-শতকের শেষার্ধ্বে।
একালের মতো একালেও এমনি সব দম
দিয়ে চালানো কলের খেলনা-পুতুলের
বীভীষিত কদর-আদর-আগ্রহ ছিল
ছোট ছেলেমেয়েদের মহলে।

জলে-ডাওয়ায়



—আব্রাহাম বতি



শেষ অংক

অজিত চট্টোপাধ্যায়

বাসটা খামতেই নেমে পড়ল নিরঞ্জন। পিছনে পিছনে হুলতা, পা রাখবার আরগায় স্টকেসটা ঠেসিয়ে রেখেছিল। কণ্ঠকূটর নিজের হাতে নামিয়ে দিল সেটি। ওরা নামতেই আবার নড়ল বাসটা, ধুলোবালি, মবিল আর ডিজেলের একটা মিশ্রগন্ধ নাকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। নাকের কাছে কুমাল চাপা দিয়ে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল দুজনে। ধুলো-গুড়া একটু কমলে এদিক ওদিক চাইল নিরঞ্জন। না, কেউ আসেনি। নিরঞ্জনই ভুল করেছে। অন্তত চাপরাশীটাকে সঙ্গে নিয়ে এলে ভুলেও গটা কম হত।

অত্যাণের শেষ। বেলা মর মর। আলো নিভতে বেশী বাকী নেই আর। গ্রামটা বেশী দূর নয়। বাসের রাস্তা থেকে মাইলখানেকের মত হবে। কিন্তু ডাকবাংলোটা কোনদিকে হবে? নিরঞ্জন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজের মনে চিন্তা করতে লাগল। হুলতা হেসে বলল,—‘কি, কেউ আসেনি’ত? আচ্ছা হাকিম হয়েছিল বটে। চৌকিদারেও খাতির করে না।’

নিরঞ্জন কথাটা গায়ে মাখল না। ওকে বিয়ে করে খুব আশান্তক হয়েছে হুলতার। নিরঞ্জন তা জানে। তাই সময় আর স্বযোগ পেলেই ওর পদমর্যাদার অক্ষমতাটা খোঁচা দিয়ে জানাতে সে ভোলে না। একটু গম্ভীর হয়ে নিরঞ্জন উত্তর দিল,—‘ভাবছি তোমার কথা, মাঠের উপর দিয়ে হেঁটে ডাকবাংলো পর্যন্ত যেতে পারবে কি? ভারী কষ্ট হবে—’

ততক্ষণে চৌকিদারটা কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। আত্মি প্রণত হয়ে বলল,—‘একটুকুন দেবী হয়ে গেল মশায়। বাসটাকে আসতে দেখে পেরার দৌড় লাগিয়েছি।

ওর কাঁধে স্টকেসটা তুলে দিল নিরঞ্জন।

হুলতা বলল—‘ডাকবাংলোটা কতদূর হবে?’—

—‘দূর কুখায়?’ লোকটা একগাল হেসে কেলল। বলল,—‘তই যি দেখা যায়’। সে আনুল বাড়িয়ে একটা বাড়ীর দিকে নির্দেশ করল।

অপরিসর যেঠো পথ, ওরা হেঁটে চলল। দুপাশে পাকা ধানের ছবি। মাঠের উপর হয়ে পড়েছে গাছগুলো। ধান কেটে নিয়ে গোন্ধর গাড়ী চলেছে। ধুলো উড়ছে পথে। শব্দ হচ্ছে ক্যাচকোঁচ। আকাশে শংখচিল পাক খেয়ে খেয়ে ঘুরছে। কোখায় দূরে যেঠোহরে গান করছে রাখালছেলে।

অল্প সময়ের মধ্যেই ওরা পৌঁছল।

খড়ে ছাঁওয়া ডাকবাংলো, নতুন হয়েছে, পাকা মেঝে। দেওয়াল মাটির হলেও বেশ নিকোনো পোছানো, বারান্দার চেয়ার পেতে একটা সিগারেট খাচ্ছিল নিরঞ্জন। হুলতা ঘরের মধ্যে ঠোঁত জালিয়ে রান্নাবান্নার স্টো করছে। নিজের মনে নানাকথা ভাবছিল নিরঞ্জন। অতীতের কথা, যে অতীত আজ টুকরো টুকরো ছবিতে বারংবার উঁকি দিয়েছে ওর মনে।

প্রায় বিশ বছর আগে। এই গ্রামেই পড়াশুনো করত নিরঞ্জন। ওর বাবা তখন এখানকারই সাবরেজিষ্টার। কতদিন আর ছিল নিরঞ্জনরা? বছর দুই হবে। তার বেশী নয়। টুয়ে আসবার আগে থেকে ওর মনে সেই পুরানো অতীতটাই বারবার কথা বলছিল। পুরাণো বন্ধুবান্ধব আর মাষ্টারমশাইরা কে কেমন আছেন? কি করে সবাই?...

হুলতা এসে ওর অন্তমনস্কতা দেখে ডাকল।

—‘এই, কি ভাবছ বলে?’—

—‘কই, কিছু না তো’।—নিরঞ্জন হাসল।

—‘চা খাবে এখন? করে আনব’—

—আনো না। তুমিও এক কাপ নিয়ে এসে বস।

সিগারেটে শেষ টান দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল নিরঞ্জন। চাহরটা ভালো করে জড়িয়ে নিল গারে, এ অঞ্চলে শীত আছে খুব। ঠাণ্ডা হাওয়া গারে কামড় বসিয়ে দেয়।

সেলস্ট্যাক্সের অফিসার নিরঞ্জন। কেস করতে এসেছে এখানে। আরগাটা গজ মতন। এখন বিস্তৃত হয়েছে খানিকটা, বড় বড় দোকানপাট হয়েছে। তারাই ট্যাক্স আঁগায়। দোকানের খাতাপত্র দেখে ট্যাক্স ঠিকমত ধার্য করতে প্রতিবছরই আসতে হয় একজন অফিসারকে। নিরঞ্জনের এবারই প্রথম। কলকাতা ছেড়ে মফঃস্বলে এসেছে যেচারা। টুরে আসবে শুনে স্থলতা ছাড়েনি। খাস কলকাতার মেয়ে। জন্ম, শিক্ষাদীক্ষা সব ওখানেই। ওর কাছে মফঃস্বলই বিতীষিক।। পরীগ্রামের তো কথাই উঠে না।

টুরের কথা শুনে স্থলতা প্রবল আপত্তি আনাল।

বলল,—‘রাস্তিরে আমি একা থাকতে পারব না কিছ। আমাকে তাহলে কলকাতায় রেখে আসবে চল।’

কলকাতায় মানে বাপের বাড়ীতে। নিরঞ্জন তাই হাসল। বলল,—আমাকে তো প্রতিমাসেই বেরোতে হবে দু তিন দিন করে। তুমি কি কি বাঃই কলকাতা যাবে?’

শেষটা রকম হল! টুরে স্থলতাও যাবে, নিরঞ্জনের সঙ্গে। ডাকবাংলাতে উঠলে এমন আর অস্বিধা কি!

—‘তাছাড়া’, স্থলতা বলল—‘এইটুকু শহরে থেকে ইফিরে উঠেছি বাপু। তোমার সঙ্গে একআধবার ঘুরে এলে মনটা ভাল হয়। তা সে পাড়ারগাই হোক, আর যাই হোক।’

রাস্তিরে শুয়ে প্রথমটা ঘুম আসেনি নিরঞ্জনের। নতুন জায়গা আর অপরিচিত পরিবেশে চোখের পাতা জোড়া লাগেনি। শুবু লারাদিনের রাস্তিতে শরীরটা ভারী হয়ে উঠেছিল। একটা ঘুমঘুম ভাব আচ্ছন্ন করে তুলেছিল তাঁকে।

চারিদিক নিঃশব্দ আর নিঃশব্দ, শীতের রাত, নিঃসাড়, নিশ্চল পৃথিবী, শিরালের হল ডেকে উঠল বাশবনে। ডানা কাটপট করে উড়ে গেল একটা নিশাচর পাখী।

ঠেলা দিয়ে স্থলতা খুব ভাবাল ওর।—‘এই, তুমি ঘুমোবে নাকি এখন?’

নিরঞ্জন রসিকতা করল।—‘না, সাধারণত বেগে তোমার পাহারা দেব।’

—‘কাজলারি রাখ। আমার ভীষণ ভয় করছে।

—‘ভয় কিসের? আমি তো আছি।’

—‘হ’, ভারী বীরপুরুষ, এই ডাকবাংলোর ভয়ে আছি, যদি চুরি ডাকাতি করতে আসে।’

—‘ভয় নেই তোমার, কেউ আসবে না।’

—‘তুমি হাত গুণতে জান বুঝি?’

চোখ বড়ো বড়ো করে নিঃঞ্জন বলল—‘বড় বড় সব ব্যবসাদার থাকতে ছোটখাটো সরকারী অফিসারের ঘরে চোর আসবে কেন? চোর যে লজ্জা পেয়ে যাবে। আসবে কিসের জন্ত?’

একটু পরেই মুচকি হেসে বলল,—‘অবিশ্রু তুমি আছ। তাহলে চোর আসতেও পারে।’

অন্ধকারেই একটা মোক্ষম চিমটি খেল নিরঞ্জন। একটু কাংরে উঠল।

স্থলতা বলল,—‘কাল বিকেলের বাসেই উঠছ তো?’

—‘কাল বিকেলে? তা কি করে হয়? আটটা কেস আছে। অন্তত দুটো দিন লাগবে। তাছাড়া এখানে পুরাণো বন্ধুবান্ধব, মাটারমশাইরা আছেন। দেখাশালাত করে যাব না?’

মুখ ঘুরিয়ে স্থলতা শুয়ে রইল। নিরঞ্জন বুঝতে পারল ভীষণ রেগে গেছে সে। এখন আর রাগ কমবার আশা নেই। নিরঞ্জনও ঘুমোতে চেষ্টা করল।

সকাল হতেই দোকানীরা ভীড় করল ডাকবাংলোর বাসালয়। একটা টেবিল আর চেয়ার পেতে ঘরের মধ্যে বসেছিল নিরঞ্জন। লাল হলুদের খতিয়ান আর জাবেদা খাতাগুলি পরীক্ষা করছিল। এখানে দেখানে রাগ দিয়ে কেনাবেচার হিসেব মিলিয়ে নিচ্ছিল। মাঝে মাঝে ছোট ছোট কাগজে লিখছিল কিছু।

দোকানীরা কেউ কেউ বসিষ্ঠ হতে চাইছিল।—‘কাল আসতে কোন কষ্ট হয়নি তো ভয়?’

—‘কষ্ট? না ভয়ন কিছু নয়—

—‘রাতে খাওয়া বাওয়ার কোন অসুবিধে...

নিরঞ্জন হেসে বাড় নাড়ল।

ওদের আন্তরিকতা ভাল লাগছিল নিরঞ্জনের। তবু খানিকটা সতীর হয়ে বসেছিল সে। ছোটবেলার হরত এদের দোকানেই পেঙ্গিল খাতা কিনতে গিয়েছে নিরঞ্জন।

একজনকে জিজ্ঞেস করল,—‘আপনার বেচাকেনা তো বেশ বেড়ে গিয়েছে।’ নিরঞ্জন কাইলের পুরাণো রেকর্ডগুলো ঘাটছিল।

—‘আজ্ঞে হ্যাঁ। জায়গাটাও দিন দিন বড় হচ্ছে। দেখুন না, পনের বছর আগে এখানে একটা এম-ই স্টল ছিল মাত্র। আর এখন বিয়াট হাজার সেকেণ্ডারী স্টল। অফিস বলতে ছিল পোষ্ট-অফিস আর রেজিষ্ট্রি অফিস, এখন ছোট বড় মিলিয়ে পনের বোলটার কম হবে না।

ঘরের মধ্যে রোদ এসে পড়েছে। নরম আর নিকুতাপ, উত্তরে হাওয়া ঢুকছে আনালায় কঁক দিয়ে। ডাকবাংলোর পিছনের একটা বুনো ঝোপে তিন চারটে বুলবুলি উড়ে উড়ে বসছে।

হঠাৎ খাতা থেকে মুখ তুলে নিরঞ্জন প্রশ্ন করল,— ‘আপনার এই খাতাপত্র কে লিখেছেন বলুন তো?’

—‘সরকারমশাই এসে পৌছননি হজুর’। লোকটি সবিনয় নিবেদন করল। বলল,—‘বুড়োমাহুষ। ছাড়াতেও মায়া করে। তিনদিনের ছুটি নিয়ে মেয়ের বাড়ী গিয়েছেন। আজও এলেন না।’

নিরঞ্জন অকিসারের ভঙ্গীতে রায় দিল—‘খাতাপত্র ঠিক লেখা হয়নি আপনার। এখানে সেখানে ভুল।’ খানিকটা বিরক্তি প্রকাশ করল। লোকটি ভীত দ্রুত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল ওর দিকে।

ছোট ছোট কাগজে এটা সেটা লিখে নিল নিরঞ্জন— লম্বের গিয়ে রায়টা লিখে কেলবে। এই স্লিপ কাগজগুলোই তখন তরসা।

থিকেলের দিকে গরম প্যাণ্ট আর কোট পরে বেরল নিরঞ্জন। চৌকিদারটাকে রেখে গেল স্টলভার কাছে। একই ঘুরে দেখবে। শৈশবের স্মৃতিবিজড়িত স্থানটা, কত বিনকার কত সব কথা ভীড় করে মনে আসে।

একদম থাকাটা খেল নিরঞ্জন স্টল বাড়ীটার কাছে এসে। সেই ছোট্ট এম-ই স্টলটা কোথায় হাবিরে গেছে। সামনে

দাঁড়িয়ে আছে তিনজনলা উচু বিকিং। স্থল বাড়ীর লাক্ষ্য নানাবর্ণের ফুলগাছ লাগিয়েছে ওরা। শীতের প্রথমে মরতুরি ফুলে ভরে গেছে বাগানটা। কিন্তু সেই ফুল-ছাওয়া এম-ই স্টলটা? বুনো ঝোপেঝোপে ভরা প্রাকৃতিক নিরঞ্জন বুঝতে পারল সে ছবিটা শুধু মনেই আঁকা হয়ে থাকবে। আর কোনদিন দেখতে পাবে না।

বাজারটার কাছে এসে একটু দাঁড়াতে হল। একটা সিনেমা হল হয়েছে। সামনের দেওয়ালে কোন একটা অভিনেত্রীর ছবি। পূর্বদিকে খানিকটা খোঁয়া খোঁয়া কি যেন বেরুচ্ছে। নিরঞ্জন শুনল একটা বাইস মিল হয়েছে ওদিকে। আর সিনেমা হলটা বায়ো মাস চলে লা। শুধু শীতের সময়।

পথে লোক চলাচল কম। ঠাণ্ডাটা জাঁকিয়ে পড়েছে। নিরঞ্জন একটা খড়ে ছাওয়া বাড়ীর কাছে এসে দাঁড়াল।

দাওয়ার একজন বুড়োমাহুষ বসে। ওকে দেখে বলল,— ‘কাকে চাই আপনার?’

—‘সন্তোষকে। সন্তোষ রায় আছে?’

—‘ঐ’ত পেহিয়ে এলেন দোকানটা। গলির মোড়ে তেলে ভাজার দোকান আছে না? ওখানেই পাইবো ওকে—’

এবারও ফিরতে হল। তেনেভাজার দোকানে হেঁসে-বেলার বন্ধু সন্তোষ রায়কে খুঁজে পাওয়া যাবে না। নিজে গায়ের দামী গরম স্টুটার দিকে চাইল একবার। এই পোষাকে ছোট্ট তেলেভাজার দোকানে গিয়ে কোথায় বসবে?—

ডাকবাংলোতে ফিরতেই স্তলটা এগিয়ে এসে বলল,— ‘শোনো, এক বুড়ো ভদ্রলোক তোমার জন্ত কখন খেবে বসে। বত বলি আপনি কাল সকালে আসবেন না কিছুতেই শোনেন না।’—

নিরঞ্জন ঘরে ঢুকে দেখল স্ততির চাবর জড়িয়ে এম বুড়ো ঘরের কোণে বসে কিমুচ্ছে। ওকে দেখে শশব্যস্ত হয়ে দাঁড়াল।

—‘কি চাই আপনার?’—

—‘সকালে মালিকের সঙ্গে আসতে পারিনি। যেহেতু বাড়ী গিয়েছিলার হজুর। কাল কিছুতেই ছাড়লন মেয়েটা—’

—‘বেশ’ত তাতে কি হয়েছে?’

—‘আমার খাতা লেখা নাকি ঠিক হয়নি? সব ভুল হয়েছে হজুর।’

নিরঞ্জন উত্তর দিল না। চুপ করে রইল।

—‘বেশী টাক্স হলে আমাকে ছাড়িয়ে দেবে। বুড়ো হলে কি খাব তাহলে? আপনি একটু দেখুন হজুর—

—‘খাতাপত্র লেখেন না কেন ঠিকমত?’—

—‘আগে স্থলে মাঠার হিলাম অংক করা যায়। এখন বুড়োবয়সে’—লোকটা চাদরের খুঁটে চোখ ঢুটো মুছল।

—‘মাঠার হিলেন? কোথায়?’—

—‘এখানেই। আগে এম-ই স্থল ছিল,—তখন পড়াশোনা।’

—‘ছাড়লেন কেন?’

—‘ওরা ছাড়িয়ে দিল। বলল,—বড় স্থলে ম্যাট্রিক পাশ মাঠারের প্রয়োজন নেই আর।

লঠনটা তুলে বুড়ো মাছবটার মুখখানা ভাল করে দেখল নিরঞ্জন। পাকা চুল হাড়িতে মুখখানা আচ্ছন্ন। তবু অংকের মাঠার গুণধরবাবুকে চেনা যায় বৈকি। এত বুড়ো হয়ে গেছেন মাঠারমশাই। আজ খাতা লিখছেন বোকাণে।

গুণধরবাবুকে হাত ঢুটো ধরে চেয়ারে বসাল নিরঞ্জন। জিতর থেকে স্থলতাকে বলল,—‘চা আর খাবার দিতে। ভালো করে খাইয়ে দাইয়ে জিজ্ঞেস করল,—‘আপনি আমাকে কখনও দেখেছেন?’

—‘আপনাকে হজুর?’—মাঠারমশাই ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলেন।

পরিসরটা ইচ্ছে করেই চেপে গেল নিরঞ্জন। কিছু বলল না। শুনলে মাঠারমশাই হরত চাঁদ পান হাতে। কিন্তু আর একটা দিক রয়েছে। স্বযোগ বুঝে এখানকার ব্যবসায়ীর দল মাঠারমশাইকে পাঠাতে শুরু করবে তার কাছে। তখন ক্যাসাদে পড়বে নিরঞ্জন। শ্রাম আর কূল দুই ভেসে যাবে।

ডাকবাংলো ছেড়ে আর একবার বেরতে ‘ছিল নিরঞ্জনকে। এসে দাঁড়াল মাঠারমশাইয়ের মালিকের

বোকাণে। ওকে দেখে সবাই কান কেন্দ্রে উঠে দাঁড়াল।

নিরঞ্জন বলল,—‘আপনার সেই বুড়ো তহলোক আমাকে সব বুঝিয়ে বলেছেন। আমারই ভুল হয়েছিল মশায়। খাতাটা স্থলর সিখেছেন তিনি। আচ্ছা! আনি—

মালিক কিছু বলবার আগেই নিরঞ্জন বোকাণ থেকে নেমে এল। মুখ ফিরিয়ে আবার বলল,—‘ওকে ছাড়াবেন না বেন! বুড়ো হলেও তহলোক কাছের। স্থলর রেখেছেন হিলেবপজ।’

তোরের দিকে স্থলতার ঘুম ভাঙিয়ে নিরঞ্জন বলল,—‘চল, আজ সকালের বাসেই ফিরে যাই। শরীরটা ভাল লাগছে না।’ স্থলতা ওর গায়ে কপালে হাত বুলািয়ে দিয়ে দেখল এ-বার।

বলল,—‘কই তেমন কিছু তো দেখছি না, তোমার কেসগুলোর কি হবে?’

—‘পরে দিন দিয়ে দেব। চৌকিদারটা বলবে’খন যে শরীর খারাপ। তাই, চলে গেছেন।’

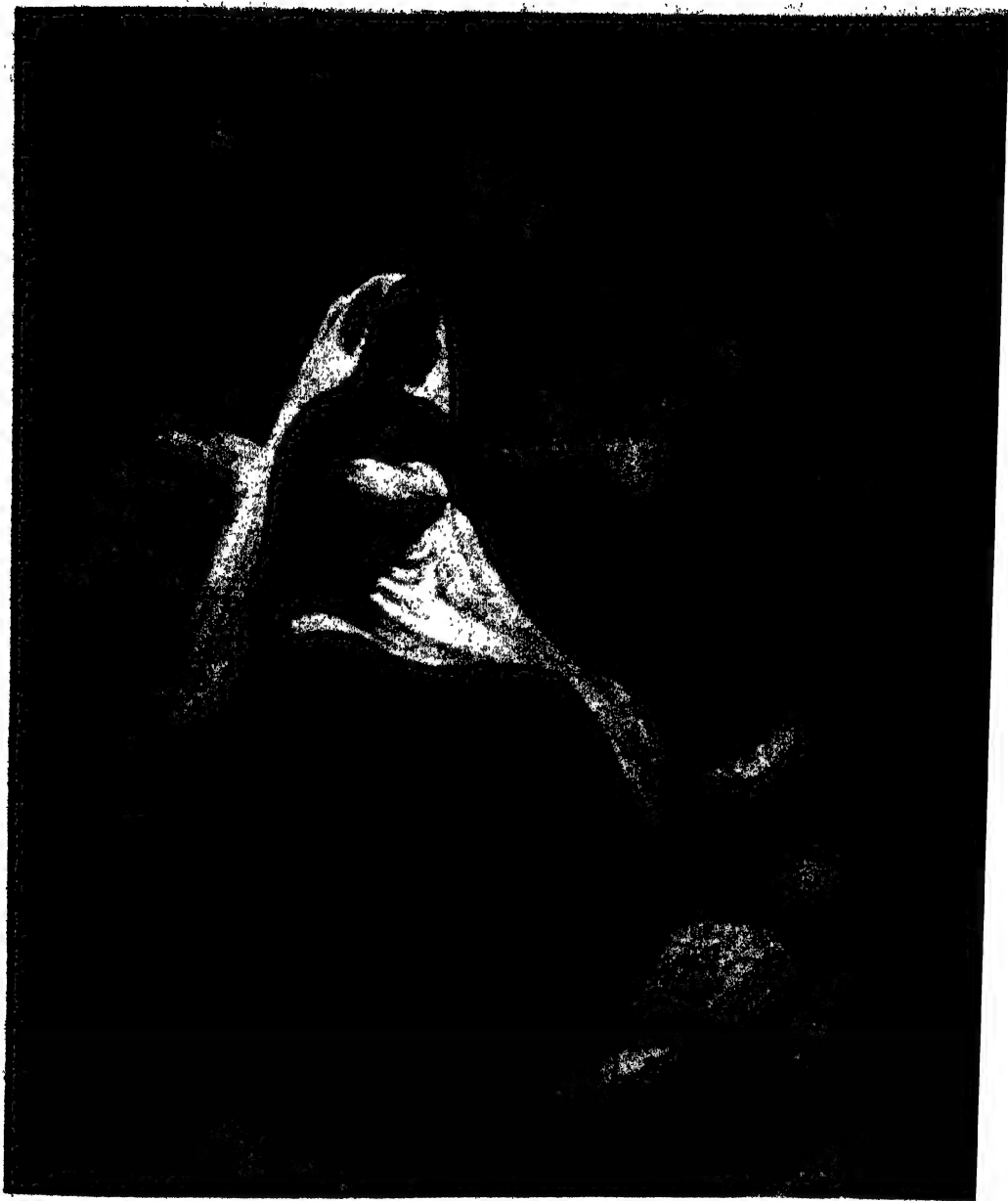
অন্ন-অন্ন বোদ উঠেছে। চৌকিদারটার কাঁধে স্টকেসটা চাপিয়ে ওরা এগিয়ে চলল। আগে আগে স্থলতা। নিরঞ্জন পিছনে। মাঠের পথ শিশিরে তেজা। গাঁয়ের পথে আগুন জালিয়ে কারা বেন শীত পোয়াচ্ছে।

কি ভেবে একবার পিছন ফিরে চাইল নিরঞ্জন। সব কিছু বদলে গেছে। আর একদিন থাকলে আরো কত কি দেখতে হত নিরঞ্জনকে। তার চেয়ে সরে পড়াই ভাল।

বড় ভাল অংক কবাতেন গুণধরবাবু। খুব স্থলর করে গোঝাতে পারতেন। নিরঞ্জনের সব মনে পড়ল। কিন্তু পরক্ষণেই হাসল সে। আগল অংকটাই কবতে পারেননি মাঠারমশাই। জীবনের অংকটা। তাই আর শেষ অংকে জাবোনা খতিয়ান হাতে দাঁড়াতে হয়েছে নিজের ছাত্তের কাছে।

অনেকটা এগিয়ে গেছে স্থলতা।

নিরঞ্জন দর দেওয়া খেলনা-পাড়ীর মত নিশ্চাপ হেঁটে চলল।



গিরিবাল।

দুর্গানামের কল

শ্রীশ্রীগীতারামদাস ওকারনাথ

হরিচরণের নাম হরিচরণ হইলেও লোকে তাহাকে দুর্গানাম বলিয়া ডাকিত। অবশ্য তাহার একটু কারণও ছিল। সে যখন দীক্ষা লয়, তখন তাহার গুরুদেব বলিয়াছিলেন, ‘বাবা! সর্বদা দুর্গা দুর্গা জপ করিবে।’

দুর্গা দুর্গেতি দুর্গেতি দুর্গানাম পরং মতুঃ।

যো অপেৎ সত্যতঃ চতি জীবমুক্ত সঃ মানবঃ।

দুর্গা দুর্গা দুর্গা—এই দুর্গানামই পরম মন্ত্র, এ নাম যে মানব সত্যত জপ করে সে জীবমুক্ত। শ্রীগুরুদেবের মুখে এই কথা শুনিয়া পর্যন্ত হরিচরণ দুর্গা দুর্গা বলিতে আরম্ভ করিল। হরিচরণ সকালে দুর্গা দুর্গা করিতে করিতে উঠে, অবিরাম দুর্গা দুর্গা করিতে করিতে স্নান করিয়া আসে, পূজা অপান্তে দুর্গা দুর্গা করিতে করিতে শাঁখার পুঁটুলি কাঁধে করিয়া যাত্রা করে।

হরিচরণ জাতিতে শাঁখারি, শাঁখা বিক্রয় আরাই তাহার জীবিকানির্ভর্য্য হয়। এইরূপ কিছুদিন দুর্গা দুর্গা করার পরই সকলে সম্মুখে তাহাকে দুর্গা দাস আড়ালে ঢুগো পাগল বলিতে লাগিল। হরিচরণ সে সব কথাই লক্ষ্য না করিয়াই আপন ভাবে দুর্গা দুর্গা করিত। সারাদিন দুর্গা দুর্গা করিত, শাঁখা বিক্রয় করিয়া বেড়াইত। সন্ধ্যার পর কর্ণক্লান্ত দেখে দুর্গা দুর্গা বলিয়া শয়ন করিত। তাহার এইরূপ অবস্থা হইল—সে নিমজ্জিত থাকিলেও তাহার ভিহ্না জপ করিত।

তাহার এইরূপ মতিভ্রম দেখিয়া কামিনী-কাকনের ক্রীতদাস ভোগবিষ্ঠার ক্রমি প্রতিবাদিগণ স্থির করিল—তাহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে—নচৎ দিবারাত্রি দুর্গা দুর্গা করিবে কেন? যখন রোগে, শোকে, স্তবে হুখে সকল সময়েই হাসিমুখে দুর্গা দুর্গা করিতেছে তখন এ পাগল না হইয়া যায় না। এ একটা পুরা পাগল। বাহারা বরষা উৎসাহে দুর্গাদাস বলিয়া ঠাট্টা করিতে লাগিলেন, আর হুটুহুটুয়ে ছড়া বাঁধিয়া বলিত—

দুর্গা বলে ঢুগো খাপা শাঁখা নিয়ে যার।

দুর্গা তার পিছু পিছু ঘুরিয়া বেড়ায়।

হরিচরণের শরীরটা রোমাক্ষিত হইয়া উঠিত, সে পিছু

ফিরিয়া বেশিত বাস্তবিক দুর্গা তার পিছুতে আছে কিনা আর ছেলেরা হাত তালি দিয়া হাসিয়া উঠিত এবং তাহার গারে যে ধূলা না দিত এমন নয়। সে সে-সব অস্বাভাবিক করিত ও শাঁখার পুঁটুলি কাঁধে করিয়া দুর্গা দুর্গা বলিতে বলিতে গ্রন্থান করিত।

যাই হোক, অবিরাম দুর্গানাম করার জন্য তাহার পিতামাতার দত্ত ‘হরিচরণ’ নামটি লোণ হইয়া গেল। জনসমাজে দুর্গাদাস বলিয়া সে পরিচিত হইল, তাহারো তাহার কোন হুঃখ ছিলনা। সে এইরূপ দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর ‘দুর্গা দুর্গা’ বলিয়া অতিবাহিত করিতে লাগিল।

২

বৈশাখ মাস। জপুরবেলা রোজ ক’। ক’। করিতেছে, দুর্গাদাস শাঁখার পুঁটুলি কাঁধে লইয়া দুর্গা দুর্গা করিতে করিতে তারিণীপুরের সীমা ছাড়াইয়া মাঠে পড়িল।

কিছুদূরে বাইবার পর মাঠের মাঝখানে একটি বীদি আছে, দুর্গাদাস, দীঘি পার হইয়া গিয়াছে এমন লক্ষ্য তাহার কানে একটা আওয়াজ গেল—ওছেলে ‘আমায় শাঁখা দিবে?’ দুর্গাদাস এমন মিটি কথা কখনও শুনে নাই। সে পিছু ফিরিয়া দেখিল একটা মেয়ে আসে দাঁড়াইয়া পা রগড়াইতে রগড়াইতে তাহাকে ডাকিতেছে। সে পিছু ফিরিয়া অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। অসম্ভব বড় বড় লোকের বাড়ী সে শাঁখা পরাইয়াছে, কিন্তু এমন রূপ কখনও দেখে নাই। সে বলিল, ‘কেন দিব না বা!’

একটা বট-গাছের তলায় সে বলিল। বীরে বীরে মেয়েটি তাহার নিকটে আসিল, সে অশরূপ রূপ দেখিয়া দুর্গাদাস ভাবিল যে, ছেলেরা বলে দুর্গা তাহার পিছু পিছু ঘুরিয়া বেড়ায়—আজ সত্যই তাহা হইল না কি। মেয়েটি বলিল। কি যুবতী দুর্গাদাস ঠিক করিতে পারিল না। কখনও তাহার মনে হইতেছে যুবতী—কখনও মনে হইতেছে বালিকা। মেয়েটি হাসিতে হাসিতে কাছে আসিয়া বলিল, ‘বেশ ভাল দেখে আমার শাঁখা দাওনা হেলে।’

‘দুর্গাদাস বাহিরা বাহিরা খুব ভাল শাঁখা বাহির করিয়া পরাইতে লাগিল। যেমন মেয়েটির অঙ্গ স্পর্শ করিয়াছে, লমনি তাহার শরীর রোমাকিত হইয়া থর থর করিয়া কাশিয়া উঠিল। দুর্গা দুর্গা বলিয়া সে তাহা সামলাইয়া দিল। দুর্গা দুর্গা বলিয়া শাঁখা পরাইতেছে। মেয়েটি—
‘হ্যাঁ ছেলে! অমন করে দুর্গা দুর্গা বলছ কেন? আর বললে কি হয়?’

দুর্গাদাস কথা কহিতে পারিতেছে না। খানিক পরে দুর্গা দাস বলিল, ‘ওক ঠাকুর দুর্গা দুর্গা বলতে বলছেন তাই বলি মা, আর দুর্গা দুর্গা বললে মা দয়া করেন।

—‘হ্যাঁ ছেলে, তুমি মাকে দেখেছ?’

—‘না মা! আমি এমন পুণ্য কি করেছি যে মাকে দেখতে পাবো?’

—‘কেন দুর্গা দুর্গা করলে কি দেখা যায় না? যদি দেখা না যায়, তবে ডাক কেন?’

দুর্গাদাস বলিল, ‘মা! আমি মুখ্য মাহু বড় জানিনে। যদি নাম করলে দেখতে পাওয়া যায় তবে দেখা পাবই।’

শাঁখা পরান শেষ হইল। মেয়েটি হাসিতে হাসিতে বলিল, ‘ওই বা! ও ছেলে! আমার কাছে তো পরশা নেই। তোমার কি করে নাম দেবো? তোমার শাঁখা খুলে নাও।’

দুর্গাদাস বেন কেমন হইয়া গিয়াছে। ‘না থাকুক এয়োদী মাহু সাক্ষাৎ ভগবতী, আমি হাতথেকে শাঁখা খুলতে পারবো না; আমার দামের কাজ নেই, বলিয়া দৌটলা বাহিতে লাগিল।

মেয়েটি বলিল, ‘তা হরে কেন? আমিই বা তোমার কাছে অমনি শাঁখা পরব কেন? তুমি যেও না, তুমি এক কাজ কর; গ্রামের ভিতর যাও। আমার বাবার মায় উমাপদ ভট্টাচার্য। তাঁর কাছে থেকে দামটা আনগে। বললে আপনার মেয়ে শাঁখা পরেছে, দাম দিন। তিনি যদি বলেন—কৈ আমার মেয়ে তো নেই। মেয়েকে তো এখনও দেখিনি। তুমি সে কথা শুনো না, বোলো—এই মায় শাঁখা দিয়ে এলাম। মেয়ে নেই বলে শুনবো কেন? ওই দুর্গাঠাকুরের পায়ে তলার সিঁদুরের কোঁটাতে একটা আঙুলি আছে তিনি দিতে বলছেন বলে। দাঁড় ছেলে, যাও।’

‘আবার বাব আবার বাব—’বলিতে বলিতে দুর্গাদাস অগ্রসর হইল, আর মেয়েটি জলে নামিল।

[৩]

দিন তো আর চলে না। দোকানদার অনেক দিয়াছে তাহার গতিক ধারাপ বুঝিয়াও এখনও ধার দিতেছে। প্রতিবেশীরা বুঝিয়াছে উমাপদ ভট্টাচার্যকে ধার দিলে আর পাইবার আশা নাই, তথাপি ধার দেয়।

উমাপদ ভট্টাচার্যের অবস্থা যে চিরদিন একরূপ তা নয়, আগে অবস্থা খুব ভালই ছিল। এক্ষণে উমাপদ ভট্টাচার্য দীকা লইল—দীকার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মতি ও অবস্থা দুইই পরিবর্তন হইতে লাগিল। বাড়ীতে দুর্গা প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা, পাঠ, নামজপ, ধ্যান, আত্মবিচারে দিব্য-রাজের অধিকাংশ ভাগ কাটাইতে লাগিলেন। সাধ্বী পত্নী অন্নপূর্ণাও পূজা-পাঠের সঙ্গিনী হইয়া সহধর্মিণী নামের সার্বকতা করিলেন। পাঁচ ছয় বৎসরের পুত্র শিবরাম দুর্গা দুর্গা করিয়া হাততালি দিয়া নৃত্য করিয়া পিতা-মাতার আনন্দ বর্দ্ধন করিত। তাহাদের ভোগের বাসনা কীপ হইতে লাগিল। শ্রীভগবানের মন্দির দেখ; তাহার রন্ধার জন্ত আহা, আর রহিল অতিথিসেবা।

উমাপদ ভট্টাচার্য নিত্য ব্রাহ্মমুহূর্তের পূর্বে উঠিয়া দুর্গা দুর্গা বলিতে বলিতে স্নান করিয়া আসিতেন, প্রাতঃ-সন্ধ্যা, জপ ইত্যাদি সারিয়া পুস্পচয়ন করিতেন, তদন্তে গীতা ও চণ্ডী পাঠ করিতেন, অথবা স্তোত্র পূজা, হোম, মায় ভোগ দিতেন, তাহার পর বৈশ্বদেব-বলি, গোশ্রাদ দিয়া অতিথির অপেক্ষা করিতেন। অতিথি সেবার পর প্রসাদ গ্রহণ করিয়া দেবীভাগবত, মহাভাগবত, দেবীপুরাণ, দেবুপনিষৎ ইত্যাদি গ্রন্থের আলোচনার অনুরোধ অতি-বাহিত করিতেন। বখাসময়ে সাংস্কৃত্য সারিয়া দেবীর আয়তন করিয়া শীতল দিয়া রূপে বলিতেন। বহুক্ষণ জপান্তে লীলাচিন্তা করতঃ কটকিতবেহে আত্মবিচার করিয়া সাংস্কৃত্য সমাপনান্তে অতিথি থাকিলে অতিথির সেবার পর কিছু প্রসাদ গ্রহণ করিতেন। আবার বধ্য-রাজে জপ বধন নিত্যক হইত তখন রুদ্ধকমলে চিত্ত ধারণা করিয়া মায় আশাপথ চাহিয়া বলিয়া থাকিতেন। এইরূপে তাহার দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল।

(৩)

অন্নপূর্ণা সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা। তিনি দুর্গা দুর্গা করিতে করিতে সাংসারিক কাজ করিতেন। গৃহকর্ম, শ্রমোৎসব, দেবসেবা, অতিথিসেবা লইয়াই তিনি সর্বদা থাকিতেন। জিহ্বা কিন্তু একদণ্ড দুর্গা দুর্গা না করিয়া স্থির থাকিত না।

উমাপদ তটীচাখ্যের পৈতৃক বজ্রমান কয়েক ম্বর ছিল। উপনয়ন ও বিবাহ ভিন্ন আর পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না, কাজেই বজ্রমান থাকা-না-থাকা সমান হইয়াছিল। তিনি অল্প কোন প্রকারে অর্থ চেষ্টা করিতেন না।

উপার্জনের ঔদাসীন্ডে ধীরে ধীরে অভাব আসিয়া আপন প্রভাব দেখাইতে লাগিল। বাজারে ধার হইয়া পড়িল, যদি কোন দিন অভাবের কথা মনে পড়িত, অমনি গুণ গুণ করিয়া গাহিতেন—

ভাবিলে শঙ্করীপদ সমপদ কোথা পাবে।

সমপদনাশা সে পদ নইলে শিব কেন

শ্রমশানবাসী হবে ॥

গাহিতে গাহিতে তৃপ্ত হইয়া যাইতেন, অভাব আর বোধ হইত না। প্রাণের ভিতর একটা সাড়া পেতেন, অভয় আশাস মাঠে: ধনি শুনিয়া দুর্গা দুর্গা করিতেন।

একটি সংশয় তাঁহার মনে মাঝে মাঝে উঠিত—দেবতার কর্ণন ভাবের উপরই হয়, অথবা চর্যচক্রে হয়। কালর জীব চর্যচক্রে দ্বারা দেবদর্শন লাভ করিতে পারে কিনা? এ সংশয়ের কোন সীমাংসা করিতে পারেন নাই। জয়-দেবের গীতগোবিন্দ “দেহি পদপল্লবমুদারম” মিলাইয়া দিয়াছিলেন একথা তিনি জানিতেন। গীতাভক্ত ব্রাহ্মণকে উপলক্ষ্য করিয়া “ভেবাং নিত্যভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহায়াহম্” এই বাক্যের সত্যতা প্রতিপাদনেব জন্ম নরাকার ধারণ করিয়াছিলেন, সে উপাখ্যানও তাঁহার অবিকৃত ছিল না। ভুলসীদাস মহারাজদী একাধিক বার শ্রীমহাচন্দ্রের কর্ণন লাভ করিয়া ছিলেন—তিনি ভুলসীদাসের জীবনীতে তাহা পড়িয়াছিলেন। লোক রাক্ষসগণের বেড়া বাঁধার কথাও যে শুনে নাই জানেন; তথাপি তাহার সংশয় ছিল। কারণ: যখন প্রসিদ্ধ হইয়া পড়িল তখন তিনি বলিলেন—না, আর

কখনও করিব না, কাহারও নিকট প্রার্থনা ও করিব না। মনে খাব, না যেন না খাব; কখন করিয়া অপরকে কতিপয় করিব কেন? দেখি না কি ব্যবস্থা করিয়াছেন—প্রাণ যার সেও স্বীকার, তথাপি না ছাড়া আর কাহারও কাছে প্রার্থনা করিব না। সঙ্কল্পপূজাদি করিলেন; আর আর ভোগ দিবার কিছুই নাই। মধ্যাহ্ন অতীত হইয়া গেল, তিনি ধ্যানমগ্ন, শিবরাম ক্ষুধার জ্বালায় কাঁদিতেন, অন্নপূর্ণা দুর্গা দুর্গা করিতেছে। এমন সময় বাহির হইতে কে ডাকিল, ও শিবরাম! একবার বাহিরে এস না। শিবরাম চক্ষু মুছিয়া বাহিরে বাইল, একটু পরে একটি সুড়ি করিয়া কয়েকটি আর ও চারিটি সন্দেশ লইয়া বাড়ীতে আসিয়া মাকে দিয়া বলিল, মা—কে একজন ব্রাহ্মণ ভোগের জন্য আম সন্দেশ দিয়া গেলেন। কে দে দিয়াছেন অন্নপূর্ণার আর বৃত্তিতে বাকী রহিল না, অন্নপূর্ণা নয়নে দেই সমস্ত লইয়া গিয়া দেবীর সম্মুখে রাখিলেন। কিছুক্ষণ পরে উমাপদের ধ্যান ভঙ্গ হইল। তিনি দেখিলেন মার ভোগের যোগাড় হইয়াছে; জিজ্ঞাসা করিলেন, এসব কোথায় পেলেন? অন্নপূর্ণা বলিল, কে দিয়া গেছেন। উমাপদ মনে করিলেন আমার অভাব আর ত কেউ জানে না, তবে কি তিনি নরাকারেও আসেন। আচ্ছা দেখা যাক।

দেবীর ভোগ দিলেন—বলিলেন শিবরামের জন্য মা পাঠিয়েছেন, আমরা উপবাস করি এস। তাহাই হইল। দুর্গা দুর্গা করিয়াই ব্রাহ্মণ দম্পতীর দ্বিবারাত্র চলিয়া গেল। দ্বিতীয় দিন মধ্যাহ্নে কে এক ঘণ্টা দুধ শিবরামের হাতে দিয়া গেল, তাহার দ্বারা ভোগ হইল, শিবরামের জীবন রক্ষা হইল। ব্রাহ্মণ দম্পতী দুর্গা দুর্গা করিয়া দ্বিবারাত্র উপবাসে অতিবাহিত করিলেন। তৃতীয় দিন পূজা শেষ হইল, মধ্যাহ্ন অতীত হইয়া গেল, ক্ষুধার জ্বালায় শিবরাম অত্যন্ত কাঁদিতেছে, তাহাকে আর কিছুতেই রাখা যাইতেছে না।

উমাপদ প্রতিবার নিকট গিয়া মার মুখপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—মা তুমি কি আছ? তিনি যেন তাঁর অধরকোণে ক্ষীণ হাসির রেখা দেখিলেন। এমন সময় বাহির হইতে কে ডাকিল, তটীচাখ্য মহাশয় বাড়ী আছেন? একবার বাহিরে আসুন, আমরা অতিথি।

উমাপদ তাড়াতাড়ি বাহিরে গিয়া দেখিলেন, তিন জন সন্ন্যাসী দাঁড়াইয়া আছেন; সাধরে বাহিরের ঘরে লইয়া গিয়া পা ধোয়াইয়া দিয়া বসিবার আসন দিলেন, তারপর পাখা লইয়া বাতাস করিতে লাগিলেন। এইবার তাঁহাদের মধ্যে যিনি প্রধান তিনি বলিলেন, কাল হইতে আমাদের আহার হয় নাই আমরা অত্যন্ত ক্ষুধার্ত আমাদের আহারের ব্যবস্থা করুন।

উমাপদর মাথায় আকাশ ভাবিয়া পড়িল,—কি করবো কেমন করে অতিথির সেবা করবো—কিছুই যে নাই, কি হবে অরপূর্ণা। অরপূর্ণা দুর্গা দুর্গা বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। উমাপদ উমাপদের মত মার কাছে ছুটিয়া গিয়া বলিল, মা অতিথি বিমুখ হয়ে যায়। ওমা বিপৎতারিণী, ওমা মহাত্মনামাশিনী, মা দুর্গা রক্ষা কর মা। এমন সময়, বেওয়ার্থের গায়ে মুণ্ডমালাভরের একটা স্নোক লিখিয়া রাখিয়াছিলেন তাহাতে লক্ষ্য পড়িল।

মহোৎপাতে মহারোগে মহাবিপদসঙ্কটে।

মহাতুঃখে মহাশোকে মহাতরলমুখিতে॥

ব স্নরেং সততং দুর্গা অপেং ব পরমং মহঃ।

স জীবলোকে দেবেশি নীলকণ্ঠসমাপ্তয়াৎ॥

দুর্গা দুর্গা দুর্গা। মা আমি নীলকণ্ঠ হইতে চাইনা আজ এ দ্বার হইতে রক্ষা কর। ছেলে বার দুঃখ নাই, অতিথি বিমুখ হয়ে যায়। রক্ষা কর মা।

বাহির হইতে অতিথিরা ডাকিলেন, দেবী কচ্ছেন কেন? আমরা কি অন্তর্যাব? উমাপদ পাগলের মত বলিতে লাগিলেন—বাড়ী থেকে অতিথি কিরে যাবে। কি করবো? কাহার কাছে কি প্রার্থনা করবো! আমি মার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি, মা ভিন্ন আর কাহারও কাছে কিছু চাহিব না, কি করি, কি করি? বাহির হইতে অতিথিরা বলিলেন—আমরা অত্যন্ত পিপাসিত, একটু জল নিয়ে আস্থন। অরপূর্ণা সেইখানে লুটাইয়া লুটাইয়া কাঁদিতোছে, সর্কনাশ হলো, আজ অতিথি বিমুখ হয়ে যায়, মা-মা মাগো।

উমাপদ বলিলেন, ‘অরপূর্ণা! ভাতার ঘর বেশ ক’রে তর তর ক’রে খুঁজে দেখ, বহি কিছু মিটি থাকে নিয়ে এস, এখানে জল আছে এই নিয়ে খাই।’ অরপূর্ণা চলিয়া গেল। লম্বা একটা বিড়াল লাকাইয়া পড়িয়া আসে কললীটা

কেলিয়া দিল। কি সর্কনাশ! বাড়ীতে জল পর্যন্ত নাই! না না, অতিথি বিমুখ দেখবো না—তার আগে আস্থহত্যা করি—এই বলিয়া তাড়াতাড়ি মারের হাত হইতে খাড়া গ্রহণ করিয়া আস্থহত্যার উদ্যোগ করিলেন।

ঠিক এমন সময় দুর্গাদাস গিয়া ডাকিল, ‘ভট্টাচার্য্য মশাই! ও ভট্টাচার্য্য মশাই! কি করছেন, একবার আস্থন না। তিনি, খাড়া ফেলিয়া বলিলেন, ‘আবার কে ডাকে?’ দেখি আরও কি আছে।’ মা-মা বলিতে বলিতে বাহিরে গেলেন। দুর্গাদাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘কি বাপু?’ অতিথিরা বলিলেন, ‘দেবী করেন কেন?’ তিনি ঘোড়হাতে কাতরভাবে বলিলেন, ‘দয়া ক’রে একটু অপেক্ষা করুন।’

দুর্গাদাস বলিল, ‘আপনার মেয়ে শাঁখা পরেছেন দাম দিন।’

—কি বলছো?

—আপনার মেয়ে শাঁখা পরেছেন দাম দিন।

উমাপদ সান্ত্ব্যে বলিলেন, ‘সে কি! আমার তো মেয়ে নাই।’ দুর্গাদাস বলিল, ‘আপনি ও কথা বলবেন—তিনিও তাহা বলেছেন। আমার তিনি ব’লে দিয়েছেন—তুমি সে কথা শুনো না।’

—মেয়েকে কোথার দেখলে?

—ঐ মাঠের মাঝখানে দাঁড়িতে।

—এ কি ব্যাপার—আমার মেয়ে। আচ্ছা দেখতে কেমন! দুর্গাদাস বলিল, ‘দুর্গা প্রতিমা, আমি অমন রূপ আর কখন দেখিনি। হাঁ, তিনি ব’লে দিয়েছেন—আপনার প্রতিমার পায়ের তলায়, সিঁদুরের কোটার একটা আঙুলি আছে আমার দিতে।’

তিনি তাড়াতাড়ি ছুটিলেন, দেখিলেন—সত্যিই একটা সিঁদুরের কোটা—তাহাতে একটা আঙুলি রহিয়াছে। তিনি সেই আঙুলিটা লইলেন। এ কি! আবার একটা আঙুলি রহিয়াছে। আবার লইলেন, আবার আঙুলি। ‘এ কি ব্যাপার! শুধু কোটার এত আঙুলি কোথা থেকে আসছে!’ হাত পূর্ণ হইয়া গেল। একটা ছোট কোটার এত আঙুলি! একি ব্যাপার! এ কি ইন্দ্রজাল! মার মুখপানে চাহিয়া বলিলেন, ‘বাজিকরের মেয়ে! একি বাজি মা!’

এমন সময় বাহিরে আবার কে ডাকিল, 'ভট্টাচার্য্য মহাশয়! বাড়ী আছেন?' ডাক্তর হইতে বলিলেন, 'কে হে?' এই জরিদারবাবু সাহেব ভোগের অন্ত সিধা পাঠাইয়াছেন। তিনি বাহিরে গিয়া দেখিলেন—এক বড় ধামার দশ বারোজনার উপবোগী চাল, ডাল, ভেল, ছন, তরকারি, আম, লন্দেপ। এইবার উমাপদ—'করুণাময়ি করুণাময়ি বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। একটু দ্বিধা হইয়া বলিলেন, 'মহাশয়গণ! এইবার আপনাদের আহাবের ব্যবস্থা ক'রছি।' ঘরপানে চাহিয়া দেখিলেন—কেহই নাই। কি সর্বনাশ! অতিথি বিমুখ হইয়া গেলেন। দুর্গাদাস বলিল, 'ও ঘর থেকে কেউ বেরোন নি; এখান দিয়ে কেউ যান নি।' উমাপদ বলিলেন, 'ও গৃহের ত অপর দ্বার নাই—এ প্রকান্ত দিবালোকে কি আমার দৃষ্টি-ভ্রম হলো? আমি কি আগ্রত অবস্থায় স্বপ্ন দেখিতেছি মা মা! এ কি—প্রহেলিকা মা! দুর্গা দুর্গা দুর্গা! মা! একি পরীক্ষা মা! মা যেমন বিপদ দিস্, তেমনি বিপদ থেকে উদ্ধার করিস্।'

তিনি আম ও মিষ্টি দেবীকে নিবেদন করিয়া দিয়া দুর্গাদাস ও শিবরামকে প্রসাদ দিলেন; নিজে চরণামৃত লইলেন। দুর্গাদাস ভোজন করিবার পর তাহার হাতে আধুলি দিয়া উমাপদ বলিলেন, 'বাবা! কোথায় আমার মেয়েকে দেখেছ নীচ আমার সেখানে নিয়ে চল!' দুর্গাদাস

কেমন হতভম্ব হইয়া গিয়াছে। সে অতিরিক্তপক্ষে দেখিয়াছিল, তারপর তাহার কোথা দিয়া চলিয়া গেছে কিছু টিক করিতে পারিল না। বাহা হউক উত্তরে দীর্ঘ দিকে ছুটিলেন।

'কোথায় দেখেছিলে বাবা?' দুর্গাদাস বলিল, 'এ স্থানে ছিলেন।' সে স্থানে কেহ কোথাও নাই। 'ও র অবিবাহিত অবিবাহ চূর্ণ ক'রে দিয়ে কোথা লুকালি মা! একবার দেখা দেমা, একবার আর ম এত করুণা তোমার আমি তা'ত জানি না মা।' উদ্ভ্রাণ মা মা বলিয়া বালকের মত আকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

দুর্গাদাস এইবার ব্যাপারটা বুঝিতে পারিল—আম কাহাকে শাঁখা পরাইয়াছে, এতকণে তাহার জ্ঞান হইল সেও হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। 'ওরে! আমি পেয়েও পেলুম না যে, ওরে! ধরেও ধরতে পারলুম না যে' বলিয়া বুক চাপড়াইতে চাপড়াইতে কাঁদিতে লাগিল 'ওমা তোকে পেয়েও চিনতে পারলাম না। ওমা একবার দেখা দে মা। তুই শাঁখা পরেছিস্—একবার বল আমার কথা সত্য কর মা!'

ধীরে ধীরে দীঘির কালজল ভেদ করিয়া শাঁখা-পাল টুকটুক দুখানি নদীর মত হাত বাহির হইল। 'ও যে মা' বলিয়া দুজন মুচ্ছিত হইয়া পড়িল।

প্রার্থনা

শান্তি মুখোপাধ্যায়

আমার ঘরের মাণিক আমার—হে রাজাধিরাজ!
তোমার কাছে জানাই আমার, এই মিনতি আজ।—
পূজার মত নিষ্ঠা নিয়ে
কায়মনপ্রাণ সঁপে দিয়ে
ক'রে যেন যেতে পারি জীবনভরা কাজ।
বতই তুমি হ'কনা কেন
করিনা কাজে দ্রুপা যেন
মাথায় ক'রে তুলে নিতে পাইনা যেন লাজ।

সব দেহ যে দেবালয়
সমাই যেন মনে রয়
সক যেন পাই তোমারই সবার সঙ্গ মাক।
মুখোপ পরা অভিনয়
আর যেন না করিতে হয়
অঙ্গ হ'তে নাও খুলে নাও, এ ভগ্নামির লাজ।
প্রবঞ্চনা শঠতা আর
হিংসা ঘেব দুর্জীবহার

ধ্বংস কর হৃদয় হ'তে, শিরে ছানি বাজ।
তোমার কাছে জানাই আমার এই মিনতি আজ।



সেকালের আন্দোল-প্রবোদ

পৃথীরাঙ্গ মুখোপাধ্যায়

ইহার পর “কৃষ্ণকুমারীর” আখড়াই বসিয়াছিল। এই সময়ে গিরিশবাবু আসিয়া যোগ দিয়াছিলেন। তিনি ভীষসিংহের অংশ গ্রহণ করেন। নাটোরের রাজা চন্দ্রনাথের পরামর্শে পোষাকের আদর্শ প্রস্তুত হইল। রাজা চন্দ্রনাথ এই সময়ে কলিকাতায় ছিলেন। তিনি প্রতিদিন অভিনয় দেখিতে আসিতেন এবং ইহার হিতৈষী ছিলেন। তিনি কয়েকটি পোষাক, কয়েকখানি তলওয়ার, আর একটা মহলন্দ দান করেন। গিরিশবাবু প্রথমদিন “ভীষসিংহ” অভিনয় করিয়াই বিনা কারণে দল ত্যাগ করেন। দ্বিতীয় দিনের অভিনয়ে অর্দ্ধেন্দুবাবু একাই “ভীষসিংহ” এবং তাঁহার নিজের অংশ “ধনদাস” অভিনয় করেন। এই অভিনয়ে এক ব্যক্তি ষাড়া যুগপৎ দুই বিরোধী রস—করণ ও হান্ত সের অভিনয় দেখিয়া রাজা চন্দ্রনাথ মুগ্ধ এবং বিস্মিত হইয়া অর্দ্ধেন্দুবাবুকে উপহার দিয়াছিলেন। তখন সহরে যে সকল প্রাত্যহিক ঘটনা ঘটিত, তাহা হইতেই অভিনয়ের বিষয় নির্বাচিত হইত। ইহার অন্ত পূর্ব হইতে বিশেষ আয়োজন করা হইত না। অর্দ্ধেন্দুবাবু, অমৃতবাবু, গিরীশবাবু, মহেন্দ্রবাবু প্রভৃতি প্রধান প্রধান অভিনেতার। কোন একটা বিষয়ে আপন আপন বক্তব্য স্থির করিয়া লইয়া টেজে বাহির হইয়া পড়িতেন। এইরূপে “চারিটে-বল ডিপেন্দ্রারী” “মডেল স্কুল” ক্যাফে সাহেবের “লাবডে-পুটি একজা মনেশান” “পাবলিক সংকল্পসান লিট”,

“গ্রীণরুম অফ্ এ প্রাইভেট থিয়েটার” “বিলাতীবাবু” “মুক্তবী সাহাবকা পাক। তামাসা” “ভারতে যৎন” “পরী-স্তান” ইত্যাদি বিষয় অভিনীত হইয়াছিল। এইগুলিতে অর্দ্ধেন্দুবাবু ও অমৃতবাবুকে লক্ষ্যপেক্ষা খাটিতে হইত। এই সময়ে রাজা চন্দ্রনাথের স্ত্রায় সার্ব ডাব্রিউ, ডাব্রিউ, হাণ্টার ইহাদের আর একজন হিতৈষী বন্ধু হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইনি প্রতিরায়ে ইংরাজ দর্শক সংগ্রহ করিয়া আনিতে, এক মঙ্গলবারে তখনকার বড়লাট সাহেব নিজে থিয়েটার দেখিতে আসেন। তিনি পূর্বে কোন সংবাদ না দিয়াই অভিনয়ের প্রাক্কালে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। একেবারে দরজায় গাড়ী আসিয়া লাগিলে, সকলেই জানিতে পারিলেন, বড়লাট সাহেব আসিয়াছেন। এই সময়ে সংবাদপত্রের সম্পাদকেরাও ইহাদের বিশেষ হিতৈষী হইয়াছিলেন। তাঁহারা আত্মীয়তা ঘনিষ্ঠতা করিতেন বটে, কিন্তু কখনও দোষ প্রদর্শনে ত্রুটি করিতেন না বা কেবল প্রশংসামূলক সমালোচনা ছাপিতেন না। এই সময়ে অমৃতবাবুকে প্রকৃত-প্রস্তাবে মানেজার বা অধ্যক্ষের কার্য করিতে হইত। ১২৭২ সালের বর্ষার প্রাক্কালে (১৮৭০ মার্চ) স্ত্রাস্ত্রাল থিয়েটার অভিনয় বন্ধ করিতে বাধ্য হন। বন্ধ হইবার কিছু-দিন পূর্বে গিরীশবাবু আবার আসিয়া যোগ দিয়াছিলেন। যে দিন থিয়াটারের শেষ অভিনয় হইল, সেই দিন গিরীশ-

ব্যবস্থায় রচিত নিম্নলিখিত গানখানি সাহিত্য নাট্যসম্রাট
সে সময়ের অন্য বিদ্যার লইলেন। গানটি থিয়েটারের উদ্ভি-
লেখ। বহু হইবার কিছু পূর্বে গিরীশবাবু বঙ্কিমচন্দ্রের
কপালকুণ্ডলা নাটকাকারে পরিবর্তন করিয়া দেন। উপজ্ঞান
হইতে নাট্য গঠন এই প্রথম। ইহার অভিনয় হইয়াছিল।

“কান্তর অন্তরে আমি চাহি বিদায়।
সাধি ওগো স্বধীতর তুল না আমারে ॥
এ সভা রসিকে মিলিত,
হেরিয়ে অধীন-চিত, আধ-পুলকিত,
আধ হতাশে শুকাই।
অন্তগামী দিনমণি,
যেহাতি হেরি নলিনী অভিমান-বিমলিনী,
আধ হাসি চায় ॥
মমপ্রতি ঋতুপতি,
হয়েছে নিদ্র মতি, হাসাইছে বসুমতী,
আমারে কাদায়।

* * * * *
নির্দাহিয়ে নাট্যালয়, আরম্ভিব অভিনয় ॥”

সান্তালদিগের বাড়ীতে জ্ঞানানাল থিয়েটারের অভিনয়
দেখিতে আসিয়া ৮ আশুতোষ দেবের (ছাত্তাবাবু) দৌহি-
৮ শরচ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় সাধারণ থিয়েটার করিতে প্রবৃত্ত
হন। ছাত্তাবাবুর বাড়ীতে ইহার আখড়াই বসে। অনেক-
গুলি মাত্রগণ্য সম্ভ্রান্ত লোক এই দলের হিতৈষী ও পরামর্শ-
দাতা ছিলেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত
(W. C. Dutta Esqr.) পণ্ডিত শ্রীসত্যব্রত সামশ্রমী
প্রভৃতি। অভিনেতার মধ্যে শরচ্চন্দ্র ঘোষ, বিহারীলাল
চট্টোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ (স্থলকায়), দেবেন্দ্রনাথ
মিত্র, বটকৃষ্ণ বল্লভোপাধ্যায়, ক্ষেত্রমোহন ঘোষ, শ্রীমহেশ-
চন্দ্র মজুমদার, শ্রীমহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অখিলচন্দ্র চট্টো-
পাধ্যায় প্রভৃতি ছিলেন। বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়,
অখিলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং শরচ্চন্দ্র ঘোষ ইহার প্রধান
উজ্জ্বল। ছাত্তোপাধ্যায় মহাজনদিগের মধ্যে অনেকে এই
দলের পৃষ্ঠপোষক হইয়াছিলেন। ছাত্তাবাবুর বাড়ীর সম্মুখের
মাঠে ৪০ টাকার জমী ভাড়া লইয়া শরৎবাবু খোলার ঘরে

এই নাট্যশালা স্থাপন করেন। ১২৮০ সালের ১লা ভাদ্র
(১৮৭৩ আগষ্ট) বেঙ্গল থিয়েটারে প্রথম অভিনয় হয়।
“শর্মিষ্ঠা” এখানকার প্রথম অভিনীত পুস্তক। পার্শ্বমোহন
রায় ইহার ধনাধ্যক্ষ ছিলেন। শর্মিষ্ঠার অভিনয়ে ইহার
সুবিধা হয় নাই। শেষে মাইকেলের “মায়া-কানন”
“বিষ কি ধনুর্গণ” নামক দুই খানি নূতন নাটকের প্রথম
ক্রয় করিয়া লওয়া হইয়াছিল। শর্মিষ্ঠা অভিনয়ের সময়
মাইকেল জীবিত ছিলেন না। নূতন নাটকের প্রথম
তাহার পূর্বেই ক্রীত হইয়াছিল। নূতন থিয়েটার হইলেও
শ্রদ্ধে মাইকেলের মৃত্যুর পর একদিন তাঁহার নামে
সাহায্যরজনীর ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। উমেশবাবু, পণ্ডিত
সত্যব্রত ও মাইকেলের পরামর্শে বেঙ্গল থিয়েটারে প্রথম
হইতেই বারাদনা লইয়া জীচরিত্র অভিনয়ের ব্যবস্থা করা
হয়। ছাত্তাবাবুদিগের বাটীর দেওয়ান রামচাঁদ মুখো-
পাধ্যায়ের স্বাক্ষর দলে শ্রী অভিনেত্রী দেখিয়া শরৎবাবু এ
বিষয়ে সাহসী হইয়াছিলেন। প্রথমে চারিটি মাত্র শ্রীলোক
লওয়া হইয়াছিল। এই চারিজন ব্যতীত আবশ্যকমত
পুরুষেও জীচরিত্র অভিনয় করিত। শর্মিষ্ঠার স্থায় “মায়া-
কাননেও” বেঙ্গল থিয়েটার সুবিধা করিতে পারিলেন না।
অখিলবাবু. মায়াকাননের প্রকাশক হইয়াছিলেন। এই
সময়ে এলোকেশ মেন্তাস্ত-বিজাট লইয়া দেশে মহা গোল-
যোগ উপস্থিত হইয়াছিল। বেঙ্গল থিয়েটার এই হুজু-
“উঃ মোহান্তের এই কি কাজ” নামে একখানি নাটক
অভিনয় করেন। ইহা হইতেই এই দলের যথেষ্ট প্রতিপত্তি
হয়। তাহার পর বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের
দুর্গেশনন্দিনী নাটকাকারে গঠিত করিয়া দেন। দুর্গেশ-
নন্দিনীর অভিনয়েই বেঙ্গল থিয়েটারের যশঃ বিস্তৃত হইয়া
পড়িল। দুর্গেশনন্দিনীতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ প্রথমে
অভিনয় করেন,—

অভিরাম স্বামী	বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়।
জগৎসিংহ	শরচ্চন্দ্র ঘোষ।
ওসমান	হরিদাস দাস (বৈকব)
বিমলা	গোলাপ।
তিলোত্তমা	জগন্নারীণী।
আসমানী	এলোকেশী।
আরেনা	চৌরে, ওরফে চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

ইহার পর ১৮০ সালের ক্রান্তি মাসের শেষে (১৮৭৪ ২৮ ফেব্রুয়ারি) বেঙ্গল থিয়েটারে “স্বাধীনী” ও “এইরাই আবার বাঙ্গালী সাহেব” নামে প্রথম অভিনীত হয়। এই-দিন বহুবাচারের অবৈতনিক একতান-বান-সম্প্রদায় বাজাইয়াছিলেন। ইহার পর ১৫৩ মাসে (১৪ই মার্চ তারিখে) “বিজ্ঞানন্দ” ও “যেমন কণ্ঠ তেমন ফল” অভিনীত হইয়াছিল। মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, পারালাল শীল, ছন্দলাল রায় প্রভৃতি এই দিন উপস্থিত ছিলেন। এইদিন শ্রীযুক্ত মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়ীর অভিনেতৃ-সম্প্রদায়ের দু’একজন অভিনেতা অবৈতনিক ভাবে এই অভিনয়ে যোগ দিয়াছিলেন।

জ্ঞানাল থিয়েটার তারিবার পর দুইটি দল হইয়া যায়। একদলে ধর্মদাসবাবু প্রভৃতি ও অপর দলে অর্ধেন্দুবাবু প্রভৃতি।

ধর্মদাসবাবু ২২এ মার্চ তারিখে টাউনহলে ষ্টেজ বাঁধিয়া জ্ঞানাল থিয়েটার নাম দিয়া “দেশীয় হাসপাতালের সাহায্য-রজনী” বলিয়া “নীলদর্পণ” অভিনয়ের বিজ্ঞাপন দিলেন। এই সময় হইতে গিরীশবাবু রীতিমত সাধারণ নাট্যাশালায় মিশিলেন। ধর্মদাসবাবুর দলে গিরীশবাবু উজ সাহেবের অংশ লইয়াছিলেন। বিজ্ঞাপনে লেখা হইয়াছিল,—“The National Theatre will reopen for the benefit of the native Hospital at the Town Hall.” ৪, ২, ১ তিন প্রকার মূল্যে টিকিট বিক্রয় হয়। এই অভিনয় উপলক্ষে উক্ত হাসপাতালের সাহায্যার্থে ইহার ৫০০ টাকা দান করেন। ২ই এপ্রেল তারিখে আবার অভিনয় করেন। এই দিন বিজ্ঞাপনে লেখা হইয়াছি,—“For the benefit of the charitable section of the Indian Reform Association,” এই দিন “সখার একাদশী” ও “ভারতমাতা”র অভিনয় হইয়াছিল।

টাউনহলে ধর্মদাস বাবুর দলকে অভিনয় করিতে দেখিয়াই অর্ধেন্দুবাবুর দলও লিগুস স্ট্রীটে “অপেরা হাউস” ভাড়া লইয়া “হিন্দু জ্ঞানাল থিয়েটার” নাম দিয়া অভিনয় করিয়াছিলেন। ৫ই এপ্রেল তারিখে ইহাদের অভিনয় আরম্ভ হয়। মাইকেলের “শর্মিষ্ঠা” অভিনীত হয়, সঙ্গে সঙ্গে “কডেল ফুল” “বিলাতী বাবু” “উপাধি বিতরণ”,

মৃতকী সাহেবের পাঁকা ভায়াস ও অভিনীত এবং ব্যাঙ্গামবীর অমিলবাবুর কীড়া প্রদর্শিত হইয়াছিল।

অর্ধেন্দু বাবুর দল অপেরা হাউসে দুই রাত্রি অভিনয় করিয়াই ঢাকায় গমন করেন। ধর্মদাসবাবুর দল ২ই মে শুক্রবার শোভাবাজার নাট্য-মন্দিরে কপালকুণ্ডলা অভিনয় করিয়াই ঢাকায় যান। ঢাকায় এই সময়ে “পূর্ব-বঙ্গ-সঙ্গতমি” নামে একটি বাধা নাট্যাশালা ছিল, অর্ধেন্দু-বাবুর দল এই নাট্যাশালার অভিনয় আরম্ভ করেন।

কিছুদিন পরে উভয় দল কলিকাতায় আসেন, কিন্তু মিলন হয় নাই। তাহার পর দিবাপতিয়ার কুমার (এখন রাজা * * * অর্থাৎ শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু সঙ্কলিত “বিশ্বকোষ” গ্রন্থ-প্রকাশকালে) প্রমদানাথ রায়ের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে দিবাপতিয়ার বাইবার জন্ত জ্ঞানাল থিয়েটারের বাধনা হয়। এই উপলক্ষে উভয় দল একত্র হয়। পূর্ণদল দীবা-পতিয়ার চারি রাত্রি অভিনয় করে, পরে বহরমপুরে আসে।

এই সময়ে বেঙ্গল-থিয়েটারে “মোহান্তের এই কি কাজ” অভিনীত হইতেছিল। একদিন ধর্মদাসবাবু আর ভুবন-বাবুতে এই অভিনয় দেখিতে যান। পথে ইহাদের সঙ্গে নগেন্দ্রবাবু মিলিত হন। সে দিন এত লোক হইয়াছিল যে চারি টাকার টিকিট আট টাকা দিয়াও ইহার কিনিতে পান নাই। এই বিক্রয় দেখিয়া ভুবনবাবু উত্তেজিত হইয়া উঠেন। বেঙ্গল থিয়েটারের সম্মুখে পাড়াইয়া তিনজনে পরামর্শ স্থির করেন, একটা নাট্যাশালা বাঁধিতেই হইবে। ভুবন বাবু তখনও নাবালক হইলেও টাকা দিতে প্রস্তুত হইলেন। ইহার পর এগুটি ছোট দল লইয়া ধর্মদাসবাবু চুঁচড়ার ব্যারাকে জ্ঞানাল থিয়েটার নাম দিয়া “মোহান্তের এই কি কাজ” অভিনয় করেন।

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ২২ সেপ্টেম্বর সোমবারে গ্রেট জ্ঞানাল থিয়েটারের ভিত্তি স্থাপিত হয়। ধর্মদাসবাবু তখনকার লুইস থিয়েটারের (বর্তমান রয়াল থিয়েটারের আদর্শে * * * অর্থাৎ “বিশ্বকোষ” গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশনার আমলের) এই নাট্যাশালা প্রস্তুত করান। ভিত্তিস্থাপনের দিন সভা হইয়াছিল, অনেক বাস্তবগ্য লোক উপস্থিত ছিলেন।

তাহার পরে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর শনিবার

কোম্পানীর আমলে প্রাচীন কলিকাতার
একটি বিলাতী নাট্যশালা



গ্রেট স্ত্রাশানাংল থিয়েটার খোলা হয়। ইহার কিছুদিন পূর্বে ৭ই ডিসেম্বর তারিখে স্ত্রাশানাংল থিয়েটারের প্রথম বার্ষিক অধিবেশন হয়। রাণা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর সভাপতি হইয়াছিলেন। নবগোপাল মিত্র, মনোমোহন বসু ও অর্ধেন্দুবাবু বক্তৃতা করিয়াছিলেন; তখনও উভয় দল স্বতন্ত্র ছিল। অর্ধেন্দুবাবু একা ধর্মদাস বাবুদের সঙ্গে যোগ দিয়া গ্রেট স্ত্রাশানাংল থিয়েটার নাম গ্রহণ করেন এবং মতিবাবু, বেলবাবু প্রভৃতি স্ত্রাশানাংল থিয়েটার নামে স্বতন্ত্র রহিলেন। বার্ষিক উৎসব একত্র হইল বটে, কিন্তু কার্যাবলীর মধ্যে স্বতন্ত্র ভাবে উভয় দলের নাম উল্লিখিত হইয়াছিল। গ্রেট স্ত্রাশানাংল থিয়েটারের পক্ষ হইতে সংস্কৃত স্লোকে আশীর্ষচন পাঠ এবং স্ত্রাশানাংল থিয়েটারের পক্ষ হইতে সঙ্গীত দ্বারা কার্য্যারম্ভ হইয়াছিল।

তাহার পর ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে বেঙ্গল থিয়েটারের অঙ্করণে গ্রেট স্ত্রাশানাংলে স্ত্রী-অভিনেত্রী লইবার প্রস্তাব হয়। এই ক্ষেত্রে অর্ধেন্দুবাবু ও মতিবাবুদের মধ্যে মত ভেদ হওয়ার অর্ধেন্দুবাবু স্বতন্ত্র দল করিয়া ঢাকা, বগুলা, কক্সবাজার প্রভৃতি স্থানে গমন করেন। পরে ত্বনবাবুর আগ্রহে উভয় দল একত্র হইয়া গেল। তখন বেঙ্গল অভিনেত্রী লওয়া হইয়া গিয়াছে। ১২ সেপ্টেম্বর (১৮৭৪) “সত্য কি কলহিনী” খোলা হয়। এই থিয়েটারে প্রথমে ছয়জন অভিনেত্রী লওয়া হইয়াছিল। তখন ম্যানেজার ধর্মদাস বাবু, সেক্রেটারী নগেন্দ্রবাবু, শিক্ষক অর্ধেন্দুবাবু।

কিছুকাল পরে দশচক্রে ত্বনবাবুর অবস্থা-বিপর্যায় ঘটিলে গ্রেট স্ত্রাশানাংল থিয়েটার উদ্ভিষ্টা যায়। নাট্যশালা ভাঙা দেওয়া হয়। প্রথমে গিরীশবাবু, তাহার পর তাঁহার ভ্রাতৃক আরকানাথ বোষ, তাহার পর কোদারনাথ চৌধুরী, তাহার পর মহেন্দ্রলাল বসু, তাহার পর কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় উহা ভাঙা লইয়াছিলেন। তাহার পর উহা বিক্রীত হইয়া

গেলে প্রতাপচাঁদ জহরী ক্রয় করেন। গিরীশবাবু ম্যানেজার হন। প্রতাপ জহরীর আমলেই গিরীশবাবু নাটক লিখিতে আরম্ভ করেন। তাহার প্রথম নাটক রাবণ-বধ। তাহার পর নগেন্দ্রবাবুর ভ্রাতা কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারা প্রলোভিত হইয়া গুরুমুখ রায় নামক এক ব্যক্তি থিয়েটার করিতে প্রস্তুত হইলে গিরীশবাবু, অমৃতবাবু প্রভৃতি কয়েক জন মিলিত হইয়া ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর থিয়েটার (৬৮নং বীচন স্ট্রীট * * * “বিশ্বকোষ” গ্রন্থ প্রকাশনাকালে) স্থাপন করেন। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জুলাই তাঁর থিয়েটার খোলা হয়। গিরীশবাবুর দক্ষদত্ত নাটক এখানে প্রথম অভিনীত হয়। গুরুমুখ রায়ের মৃত্যুর পর তাঁর থিয়েটারের প্রধান অভিনেতা শ্রী অমৃতলাল বসু ও শ্রী অমৃতলাল মিত্র, কর্মদায়ক হরিপ্রসাদ বসু ও ধর্মদাসবাবুর তাসিনেত্রী ত্রীদাশচরণ নিয়োগী এই চারিজনই তাঁর থিয়েটারের নাট্যশালা ক্রয় করিয়া লয়েন। তাহার পর বখন বাবু গোপাললাল শীল এম্বারেন্ড থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন, তখন ইঁহারা তাঁর থিয়েটারের বীভনস্ট্রীটের নাট্যশালা বেচিয়া কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের বর্তমান নাট্যশালা (বেটি অধুনা অধি স্থাপিত হইয়াছে) প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর বর্তমান নাট্যশালার অগ্নি ও বাটি উভয়ই থিয়েটারের সম্পত্তি। এই নূতন বাটি হইতেই অমৃতবাবু ইঁহার অধ্যক্ষতা করিতেছেন (অমৃতলাল বসু মহাপ্রণয়ের জীবিতকালে)। “নদীরাধ” এখানকার প্রথম অভিনীত পুস্তক। তাঁর কর্তৃত্ব লইয়া কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। তবে গিরীশবাবু উত্তরকালে নানা নূতন থিয়েটারে যাতায়াত করার এবং মধ্যে মধ্যে তাঁর বোণ দেওয়ার কিছুদিন এই সম্প্রদায়ে স্বশৃঙ্খলে কার্য্য করিবার পক্ষে অনেক বাধা ঘটয়াছিল। তাঁর বরাবর সমান আদর পাইয়া প্রতিপত্তির সহিত স্বশৃঙ্খলে কার্য্য করিয়া এখন বর্তমান রহিয়াছে। (কনক)

সদাশিবও আজ উদাস্ত

শ্রীচৈতন্যচরণ বড়াল

পৌষমাসের হাড় কাঁপানো শীতে ঘনকুয়াশাচ্ছন্ন অন্ধকার রাজ্যে কালীর মহামহিম পাণ্ডারা ধূতরা ও ভাস্করের নেশায় বিস্তার বাবা বিশ্বনাথকে মন্দির থেকে সরিয়ে কালীর সীমানা পার করে গঙ্গার ধারে এক নির্জন অশ্বখ বৃক্ষের তলায় রেখে মন্দিরে ফিরিল—উচ্চকণ্ঠে প্রচার করিল আজ হরিজনস্পর্শে কলুষিত লিঙ্গ-মূর্তি—তিনি ছেড়ে চলে গেছেন—আবার নব-কলেবরে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করলে তিনি কিরবেন—নগে নয়!

আঁধার—আলোর লুকোচুরি খেলা শেষ হ'লে উত্তর-বাহিনী গঙ্গাজলকণা-মাখানো উষার বায়ুহিল্লোল-স্পর্শে ধীরে ধীরে সদাশিবের জ্ঞান ফিরিল—তিনি স্নেহাজড়িত-কণ্ঠে হাঁক দিলেন—কোথায় গেলিরে সবাই?

ভূঙ্গীর নেশা অনেক আগে কাটিয়াছিল—বিরক্তির স্বরে বলিল,—কি চান ঠাকুর!

সদাশিব—শুনতে পেয়েছ? তবু ভাল—এক হিলিম লাজ না বাবা।

ভূঙ্গী—ভাল করে চেয়ে দেখুন না কোথায় আছেন!

সদাশিব চোখ খুলিলেন, দেখিলেন—বিস্মিত হইলেন! এয়ে বৃক্ষতল—তিন দিকে প্রাস্তর—বামে গঙ্গা। তারিলেন এখনো নেশা কাটে নাই, বলিলেন—না, তোকে নিয়ে আর চলে না—কাল রাতে ভাস্করের সঙ্গে কালকূট খুব বেশী দিয়েছিলি দেখছি—এখনো মাথাটা সাক হয়নি। পূজারীরা গেল কোথা? মঙ্গলারতি হবে না?

ভূঙ্গী। হায়! হায়!! ঠাকুর বেশ আছেন! মনে পড়ছেন! তো—কাল রাজ্যে মন্দিরে—গোলমাল—যখন হরিজনেরা আপনার লিঙ্গদেহ স্পর্শ করতে চাইলো! পাণ্ডারা সবলে বাধা দিল—হাক্কামা হোল—হরিজনেরা জোর করে মন্দিরের ভেতর এস—পূজা দিল! কলে দেই

রাগে সব পূজারীরা একজোট হয়ে আপনাকে মন্দির থেকে বার করে এনে এখানে কলে দিয়ে গেল! কিছুই মনে নাই? সার্থক আশনার ভোলানাথ নাম!

ঠাকুরের মনে পড়িল,—লোহার কাঁটা তার দিয়ে ঘেরা তাঁর লিঙ্গ মূর্তির চারধারের খাঁচা—যার ভিতর মন্দিরের খাস পূজারী ছাড়া কারও আস্বার অধিকার ছিল না!

দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—তা এ ফাঁকার হাওয়াটা মন্দ লাগছে না!

ভূঙ্গী। বাঃ—বেশ! এই কনুকে পাথুরে শীতে থাকতে পারবেন?—আচ্ছা পূজা আরতি না হয় না হোল—সেবার কি হবে?

সদাশিব। সেবা তো বহুদিন তুলে গেছি বাপধন!

ভূঙ্গী। আফিং—গাঁজা ও ভাং সেবাও?

সদাশিব। না না—ওর জোরেই তো এতদিন কোন রকমে সেখানে আটকে ছিলাম—ছুঁৎমার্গের অত্যাচার কতকাল ধরে সহ করেছি ভাব, দেখি!

সে কত অতীত যুগযুগান্তের কথা! ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর কথামত পার্বতীকে নিয়ে আবার সংসারী লাজলাম! অন্নপূর্ণা ভূর্ণা—উমারূপে তাদের মা আমার এই ছরছাড়া! শ্রাণনবাসীর পাশে এসে দাঁড়ালেন—আমার তিক্তার কুলি যড়ৈবর্থে ভরে দিলেন। তখন এদিকে বড় বড় সাধকেরা মহাজনেরা যুগ যুগ ধরে তপস্তার—সাধনার আবার তক্তি-ভোরে বেঁধে ফেললেন—আমায় দিয়ে বলিরে নিলেন যে তাদের সাধনার ধাম, এই আনন্দ-কানন বারানদী—আমি কখনো ছাড়বো না!—উচ্চকণ্ঠে বলেছিলাম—

যেবাং কাপি গতির্নাস্তি—তেবাং গতিঃ বারানদী!

যদিও আমার সাধকরা—পূজারীরা কালি ছাড়া

আরও এগারটি লিঙ্গমূর্তি স্থাপন করেছিল এই শ্রীর ভারতে ।

সৌরাষ্ট্রে সোমনাথক ত্রিশৈল মল্লিকার্জুন ।

উচ্ছিন্নভাং মহাকাংক ওংকারমমরেশ্বরে ।

পরগ্যাং বৈভনাথক ভাকিত্তাং ভীষনকরম্ ।

সেতুবন্ধে রাবেশ্বরং নাগেশং দাক্ষিণে বনে ॥

বারাণস্তাং বিম্বেশ্বরং ত্র্যম্বকং গোমতীতটে—

হিমালয়ে কেদারক জম্বেশ্বাং শিবালয়ে ॥

এদের কত উৎসাহ কত ধুম—কত জপ, কত তপ, কত কামনা—কত সাধনা আমার পাবার জন্য ! আমার এদের মধ্যে সৌরাষ্ট্রে সোমনাথের মন্দিরের পূজা ! মনে আছে তো—সাদে তিনশো ক্রোশেরও বেশী পথ বেয়ে রোজ তাক বসিয়ে ঘড়া ঘড়া গজাঙ্গল আসতো আমার পূজার জন্য !

ভূদী । মনে তো আছে—কিন্তু যখন বিধর্মীরা বার বার আপনার মন্দির অপবিত্র করল—চূর্ণ করল, আপনার চোখের সামনে নৃশংস হত্যার তাণ্ডবলীলা করল তখন তো আপনিও কোন সাড়া দিলেন না !

সদাশিব । কি করে করব ? তখন আমরা যে গৃহ-বিবাদে আত্মহারা ! নারায়ণ সাগর-ছেঁচা লক্ষ্মীদেবীকে নিয়ে সরে গেলেন ক্ষীরোদসাগরে—আর সঙ্গে নিয়ে গেলেন আমার দেহরক্ষী শাপের হলকে । তাদের দিয়ে শয্যা তৈয়ারী করে লক্ষ্মীদেবীর পদসেবা উপভোগ কর্তে কর্তে ঘুরিয়ে পড়লেন । ব্রহ্মা তাঁর মানসকন্যা সন্ধ্যার পেছনে ধাওয়ার খবরে আমি রাগের মাথায় তাঁকে ত্রিশূল নিয়ে তাড়া করেছিলাম—তাই তিনি লজ্জা ঘৃণা রাগ বা অভিমানে আমার সামনে আসা দূরে থাক, তাঁর একমাত্র আড়তা পুঙ্করের সারিজী মন্দির থেকেও উধাও হয়ে গেলেন ! আজও বোগী ঋষিরা তাঁর লন্ডানে বৃথা বোরা-ঘুরি করছে ।

ভূদী । সব তো জানি ! কিন্তু তারপর—এই আপনার সাধের বারাণসী—সাব্বকদের লক্ষ্যাদিক মন্দির-শোভিত বারাণসী—ভক্তের আনন্দকানন বারাণসী বিধর্মী কালাপাহাড় ভেঙ্গে মাটির সঙ্গে মিলিয়ে দিল—আপনার লিঙ্গমূর্তি জানবাপীতে ফেলে দিল, কৈ—তখনো তো আপনি কিছু করেন নি ।

সদাশিব । কি করে করব বল—যে ব্রহ্মা বিষ্ণু আমার ধন্যক বাণ হয়েছিলেন—যাদের প্রেরণায় ত্রিপুর ধ্বংস করেছিলাম—ত্রিপুরাসুরকে বধ করেছিলাম—ভারা তো একবার এল না আমার পাশে ।

আর আমি যে বিরক্ত সন্ন্যাসী—বৈরাগী—আশানবাসী—নরকপালধারী ছাই-ভস্মমাখা দিগম্বর । আমি কি নিজের জন্য কিছু করতে পারি ?

তারপর জানিস তো কালাপাহাড় ছিল খাটি হিন্দু, নাম কালাচাঁদ সান্তাল—এই নিত্য গলাঘারী জুপুকখটি বিধর্মী বাদশাহ কত্মার নজরে আসে—কলে তাকে জোর করে মুসলমান করা হয় । সে হিন্দুদের মধ্যে কিরে-আসবার জন্য কি আশ্রাণ চেষ্টা না করেছিল, কিন্তু তখন আত্মদর্শন অদূরদর্শী ব্রাহ্মণরা তার অন্তর্ভুক্তি আর্জিনায়ে, কর্ণপাত করেনি । তারপর ত্রীকৈতবের পাণ্ডারা যে ত্রীকৈতবে অন্নগত—জাতিভেদ নাই—একাদশী পর্যন্ত নাই—যেখানে জগন্নাথদেবের শক্তি হলেন বিমলা দেবী—যাঁর প্রসাদ না পেলে জগন্নাথকে উৎসর্গীকৃত অন্ন মহাপ্রসাদ হয় না, যাঁর শারদীয় পূজায় নবমীর দিন ছাগবলি দিয়ে পূজা হয়—সেই জগন্নাথ-বিমলা-মন্দিরের পাণ্ডারা—বৈষ্ণব বিগ্রহের পূজারী হ'লেও সব শাক্তধর্মাবলম্বী (আরও আশ্চর্য্য যে কাম্যরূপ কামাখ্যার পূজারী সবই বৈষ্ণব) তারা একমত হয়ে বেত্রাঘাতে অর্জরিত করে কালাচাঁদ সান্তালকে মন্দিরঘার থেকে বিতাড়িত করে—তখন তাঁর প্রতিশোধম্পৃহা আমার লজ্জা করা কিছু অন্তায় হয়নি । যাঁর ধর্ম্মনীতে খাটি ব্রাহ্মণ—আর্য্যব্রত—যে ব্রাহ্মণের শাপে-বিষ্ণুকেও মাহুৎ হ'তে হয়েছিল—শ্রীরামরূপে ভূগু কষ্ট-ভোগ কর্তে হয়েছিল—যে বিষ্ণুকে মহাবি ভক্তুর পদাঘাত বুকে সহ করে তাঁর পাদপূজা কর্তে হয়েছিল—যে ব্রাহ্মণ-দের মহিমাকীর্তনে ব্যাসদেব মহাভারত প্রণয়ন করে-গর্ব্ববোধ করেছিলেন—সেই ব্রহ্মণ্যঘৃণে ব্রাহ্মণকে শাস্তি দিতে গিয়ে আমি নতুন ক্যাঁসাঘের স্রষ্টি করব ! তাই এখন কালাপাহাড় চিঙ্কাত্রে জগন্নাথের লুকানো মূর্তি খুঁজে বের করে তাতে অগ্নিগর্ভোগ করল—কান্ডিতে আমার লিঙ্গমূর্তি জানবাপীতে ফেলে দিল—আমি কোনরকমে এক-লক্ষ লিঙ্গমূর্তির মধ্যে একমাত্র অকলুষিত কেদারেশ্বরের মন্দিরে আশ্রয় নিলাম । তারপর রাণী অহল্যাবতী

মাটোরের রাণী ভবানী আরও কত ভক্তিমতী নারী
 বারাগনীকে আবার নতুন সাজে সাজালো। অন্নপূর্ণার
 মন্দির, দুর্গাবাড়ী, বীরেশ্বর, সন্ধ্যা, আরও নানা দেব-
 দেবীর মূর্তির সঙ্গে ফুটে উঠলো সোনার কিরীট নিয়ে রূপার
 ভামার আর নানা রংয়ের পাখর দিয়ে তৈয়ারী আমার
 নতুন মন্দির। তখন গঙ্গাভীরে নগরের অলিতে গলিতে
 সাধু সন্ন্যাসী সাধক ভক্ত গৃহী পূজারী নরনারীর মিলিত
 আস্থানে—ভোত্রপাঠে—বেদ উপনিষদ ইত্যাদি শাস্ত্র-
 চর্চায়—আবার বারাগনী হোল ভারতের গীঠস্থান—সে
 সব কি দিনই গিয়েছে।

ভূকী। যাক—এখন কি অহমতি করেন—আপনার
 এ ছদ্মশা আমার দেখতে হবে ?

সদাশিব। (আপন মনে বলিতে লাগিলেন)

সেদিন যখন গৌড়া পাণ্ডার দল শুধু আমার নয়—
 অন্নপূর্ণার দরোজাও লোহার কাঁটাতারে ঘিরে জীবরূপী
 শিবের অপমান কর্ণ—এমন কি তোর মায়ের সঙ্গেও
 আমার বিচ্ছেদ ঘটালো সেইদিন থেকে যে আমার তৃতীয়
 নয়ন, জ্ঞান-নয়ন ঘোলা হয়ে গেল! এখন যে আমি একে-
 বারে দৈবাধীন! ফলে গেল সেই আপ্তবাক্য—

হরিগাঁপি হরগাঁপি ব্রহ্মগাঁপি হুইরগাঁপি।

ললাটে লিখিতা রেখা ন শক্য পরিমার্জিতম্ ॥

শোন—মানস সরোবর যেতে পারি ?

ভূকী। সে রাস্তা তো চীনারা বন্ধ করে দিয়েছে।

সদাশিব। নন্দীকে ডাক—হুঁজনে যদি চেষ্টা করিস
 একবার! মানস সরোবর পার হয়ে কৈলাস পাহাড় থেকে
 ঈশান দিকে চলে গিয়ে এক বিরাট স্তম্ভোৎসব বৃক্ষ দেখতে
 পারি—সেখানে থাকে জরাসরপের অতীত বায়স-প্রবর
 ভূবন্তী—সে ত্রিকালজ্ঞ—তাকে ধরে আনতে পার যদি—

বাধা দিয়া ভূকী বলিল—

হায়! হায়! সত্যই দেখছি আপনার বাহাদুর্য্যে
 পেয়েছে! তুলে গেলেন যে নন্দী কবে অন্তর্ধান হয়েছে!

সদাশিব। কেন? তার আবার কি হোল?

ভূকী। বাহর ধরায় হিড়িক তুলে গেলেন? দেশ
 স্বাধীন হতেই রামচন্দ্রের বাহনদের বিশেষ চালান দিয়ে
 বিক্রী করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা ব্যাপকভাবে শুরু
 হোল। বিশেষী চিকিৎসকের দল বাহরের এহি নিয়ে

মাহুঘের সঙ্গে লাগিয়ে কত তেতী কত পরীক্ষা শুরু করে
 দিল। সে সময় আপনার নন্দী আপনার নেশার জোগাড়
 বনে বনে গাঁজা তাম্বুরের জোগাড় কর্তে গিয়ে শিকারীর
 জালে ধরা পড়ে! শুনেছি কোন রকমে জাল ছিঁড়ে
 পালিয়েছে—কিন্তু কোথায় যে পালিয়েছে তাতো আজ
 অবধি জানি না!

সদাশিব। তোমার ধরে নি?

ভূকী। আমি তো নন্দীর মত গোয়াল নই—আপনার
 মন্দির ছেড়ে যেতে ভরসাই হয়নি।

সদাশিব। তাহলে কি হবে?

ভূকী। দিন একটু পায়ের ধূলা—দেখি চেষ্টা করে
 আপনার—বায়সপ্রবরের সন্ধানে।

* * *

অনেক খোঁজাখুঁজির পর ভূকী স্তম্ভোৎসব বৃক্ষ পাইল—
 তার ঘন পত্র পল্লবের আড়ালে ভূবন্তীকে দেখিল। দেখিল,
 সে একটি সোনা ব্যাংএর অন্তঃস্থলী চকুতে ধরে প্রান্তরায়
 সমাপনের উল্লেখে বাগায় ফিরিতেছিল। ভূকী নমস্কার
 জানিয়ে বলিল,—সদাশিব আপনাকে স্মরণ করছেন!

ভূবন্তী। চলে এস আমার বাসায়—সব শুনবে।

ভূকী। আপনার অত সূক্ষ্ম ডালে কি যেতে পারব
 —বরং আপনিই একটু নেমে আসুন—বিশেষ দরকার—
 সদাশিব আজ বিপর।

ভূবন্তী। দাঁড়াও আগে খাওয়াটা শেষ করি। পরে
 বলিল,—কেন এসেছ জানি—কিন্তু আমাচার্য্য বিশেষ
 স্তুতিধা হবে বলে মনে হচ্ছে না—কারণ, আমি লোকালয়ে
 যাব না—কিছুতেই না।

ভূকী। সদাশিবের অস্বরোধ!

ভূবন্তী। রাখে তোমার সদাশিবের অস্বরোধ। তাঁর
 এখন না আছে জ্ঞান বুদ্ধি, না আছে অস্ত্র শস্ত্র, না আছে
 বাহন, না আছে শক্তি। তিনি এখন বেকার ভবঘুরে—
 উদ্ভ্রান্ত—তাঁর অস্ত্রে লোকালয়ে গিয়ে কি বিপদ ডেকে
 আনবে।

ভূকী। আপনার বিপর?

ভূবন্তী। ওহে কপিশূণ শোন তবে।—একবার
 গিয়েছিলাম নীলাচলে—ব্রহ্মার আদেশে নীলাম্ববের
 প্রকটিত হবার জন্য সাহায্যে।

সেটা সভ্যবৃগ! নীলাচলের রাজা ইন্দ্রহ্যায় বৈষ্ণব-চুড়ামনি—তঁার খেয়াল হল ব্রহ্মা স্বয়ং গিয়ে নীলাচলে নীলমাধবের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করবেন। অতএব ব্রহ্মলোকে গিয়ে ব্রহ্মার কাছে হত্যা দিলেন। কিছুদিন কেটে গেল। তারপর ব্রহ্মাকে রাজী করে যখন নীলাচলে ফিরলেন—দেখলেন—তখন না আছে নীলমাধব, না আছে তাঁর রাজত্ব, না আছে কোনকিছু। ব্রহ্মার একদিন মর্তের এক হাজার বছর—সেটা তিনি খেয়াল রাখেন নি। ব্রহ্মার ক’দিনে যে—সভ্য দ্বৈতা দ্বাপর চলে গিয়ে কলিযুগ আরম্ভ হয়েছে। তখন সেখানকার রাজা গালমাধব—তিনি ইন্দ্রহ্যায়কে মন্দিরে পর্যন্ত চুকতে দিলেন না—বিবাদে সেটাতে ব্রহ্মাকে আসতে হোল এবং তাঁর কথামত তুঁরাজা আমায় সাক্ষী মানলেন—আমিও ব্রহ্মার আদেশে গিয়ে ইন্দ্রহ্যায়ের পক্ষে রায় দিলাম। গালমাধব হেরে গেল। আর নীলমাধব প্রতিষ্ঠা করে ইন্দ্রহ্যায় আমায় পরম যত্নে কিছুদিন আটকে রাখলেন, আমিও তাঁর উপরোধে চর্বচোষা খেয়ে পরমানন্দে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। তারপর একদিন ব্যাধের জালে ধরা পড়লাম—তখন রাজভোগ খেয়ে আমার যৌবন ফিরে এসেছে বললেই হয়; আমার চক্চকে রং দেখে নীলকণ্ঠ পাখী ভেবে পিঙ্কর বোণে প্ররোগ প্রেরণ করে ব্যাধ। সেখানে প্রায় অনাহারে অনিদ্রায় অনেকদিন কাটিয়ে গেবে এক মাড়ওয়ারী ধনী দম্পতীর নজরে আসি। তাঁরা নগদ মূল্যে আমার কেনেন ও আমি তাঁদের স্বর্গের পথ দেখিয়ে দৌব এই আশায় আমার প্ররোগের তীরে মুক্ত করে দেন।

তারপর অনেক বাধা বিপত্তি কাটিয়ে—আবার ডেরায় ফিরেছি। এই চিরকালের আশ্রয় আমার বাসা ছেড়ে আর কোথাও যাব না—কারও অহরোধ উপরোধে নয়।

এই বলে বায়ল-প্রবর গুটি কয়েক সুপক জগোধ ফলে মুখভঙ্গি করলেন।

অবশেষে ভূজী বৈষ্ণব হারাইয়া বলিল,—যিনি রামচন্দ্রের আদেশে বিশালকরণী ওষধী না পেয়ে গন্ধমাদন পর্বত মাধায় করে নিয়ে লঙ্কার গিয়েছিলেন—আমি তাঁরই কণ্ঠধর—আবার সদাশিবের পূজারী ভক্ত। যদি যেচ্ছায় না যান সবত পাহাড়টি মায় আপনার বাগদান—এই

জগোধ গাছটি পর্যন্ত নিয়ে যাব—কেউ বাধা দেয় পারবে না!

অগত্যা বায়লপ্রবর যাত্রা করলেন—ভূজীর সঙ্গে সদাশিবের কাছে।

প্রণত ভূজীর গগার পালকে হুড়হুড়ী দিতে দিতে সদাশিব বলিলেন,—সব ভো ভনেছো! এখন পরামর্শ দাও কি করি—তার আগে আমার বাহন বুঝরাজী কোথা গেল বলতে পার?

ভূজী। সে ইংরেজ আমলের ব্যাপার। তখনকার বড়লাট নানা দেশ থেকে ভাল ভাল বাঁড় আনাতে লাগলেন—রাজধানীতে তাদের প্রদর্শনী খুললেন। তাঁর লোকদের নজর গেল আপনার বাহনের উপর। তিনি যে কালীতে আপনার ভরুদের প্রদত্ত হালুয়া জিলেপী চান্দোলী গমের কুটি ইত্যাদি পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্য খেয়ে এমন স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য লাভ করেছিলেন, যে প্রদর্শনীতে বসন্তোষ্ঠ খেতাব পেয়ে গলায়-সোনার মালা শূক্রে সোনার টোপর দিয়ে সরকারী গো-প্রজনন বিভাগে সর্গারী কর্তেন। আর তাঁকে পেয়েই বা কি হবে? ঐ আকিমকালের বাহন এ যুগে শুধু অচল নয়—গত রক্ষা সমিতি হয়তো আপনার নামে জীবকে নিহতভাবে যখন তখন চালানোর জন্য ফৌজদারী মামলাও কর্তে পারে! মাটির ওপর এখন আগুনে টানা—তেলে টানা—বিছাং টানা গাড়ী ছুটছে—আকাশে শত শত পুংকরখ—যা দেখতে আমাদের নায়ক দেবতার বাহনের মত—তুধু উড়ছে না—গ্রহ উপগ্রহকে তাড়া করছে—বিষ্ণুর বাহন গরুড়কে হার মানাচ্ছে। এ যুগে যাঁড়ের পিঠে চেপে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র!

জটা চুলকে সদাশিব বললেন।—বিনা বাহনে এ বয়সে কি করব বল!

আচ্ছা এক কাজ কর—গন্ধাকে খবর দাও—তার মকরটা আমার বাংলা দেশে অগত্যা জলপথেই পৌছে দিক! সেখানে শুনেছি এখনো আমার ভৈরবী আগম-মতে—তত্ত্বমতে ভূগার, কালীর, দশরহাবিভার পূজা হয়—অন্নপূর্ণার, লক্ষ্মী-সরস্বতী ইত্যাদিরও পূজা হয়।

থক থক করে কাশতে কাশতে বায়লপ্রবর বলিল।—ভাল কথা! বাংলা দেশে ঐ সব পূজার ব্যাপার

গঙ্গা খুব ওয়াকিবহাল, তাঁর অবস্থা যে খুব ভাল তা নয়—জানি আর তাঁর স্তনধারাপুট সন্ততিদের আটপুটে বেঁধে মুখ ঘুরিয়ে দিয়ে কোথাও বা ভরাট করে—বা অবস্থা করেছে অধুনা স্বাধীন এই দেশ—তা' মা গঙ্গার মুখেই শুনবেন! দেখি তাঁকে খুঁজে।

* * *

গঙ্গা দেবী আসিরা সদাশিবের পদধূলি নিলেন—তাঁর হুকোটা তপ্ত অশ্রু সদাশিবের পারে পড়িলে তিনি চকু উয়িলিত করিলেন—দেখিলেন, শীর্ণকায় কোটরগত আশি, ধূলিবাণিমাখা কেশরাশি—আতরণহীনা মলিনবসনা গঙ্গা!

অন্ত বিষয়ে বলিলেন—একি—তুমি গঙ্গা, তোমার একি চেহারা! লজ্জা নিবারণের জন্য একথানা ৮ হাত মলিন শাড়ী মাত্র তোমার সখল! গহনা কি হোল—বাহন কোথায় গেল? শুনেছিলাম বাংলার শাঁক-বট্টা বাজিরে তোমার পূজা হয়—তোমার বাহনের পূজা হয়!

সাক্ষনরনে গঙ্গা ধীরে ধীরে বলিলেন,—হারের অতীত! তখন ভগীরথের স্তোকবাক্যে ভুলে সদভে আপনায় জটাভূট ভেদ করে ইজের ঐরাবতকে তরঙ্গা-ঘাতে ভাসিয়ে দিয়ে সোনার বাংলার পদার্পণ করেছিলাম—সে বাংলা এ বাংলা নয়—তখন ভৈরৱী করেছিলাম পঞ্চ-গৌড়—আমার ক্রোড়ে চড়ে বার বিরাট নৌবাহিনী শুধু ভারতের বন্দরে বন্দরে নয়—হুদ্র সিংহল—সুমাত্রা স্ববীপ কবোজ—চম্পা স্তবর্ণপুর চীন জাপান ঘুরে আসতো—দক্ষিণ ও পূর্ব সাগরে গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। আমি সেই গঙ্গা বার বৃকে নৌবাহিনী দেখে বিশ্বজয়ী আলেকজান্দার চমকে যায়—শিঙা হটে যায়। আমি সেই গঙ্গা বার পবিত্র স্রোতবারি নৈবার জন্ত চোল গঙ্গা ও শিব গঙ্গা লয়েবর আমার জলে তরিয়ে পবিত্র কর্বার জন্ত জল ও হল বাহিনী নিয়ে রাজেন্দ্র চোল গৌড় পর্যন্ত ছুটে আসে—বিভীষন মহীপালকে মাথার করে গঙ্গাজলের কলসী বহায়। আমি সেই গঙ্গা যে নিজেও তার ক্রীড়া সন্ধিনী-দের নিয়ে প্রত্যেক জমিটি উর্বর শস্য সমৃদ্ধ করে, পথের দু'পাশে কত নগরনগরী তীর্থভূমি গড়ে বোঁবন জোয়ার-তরঙ্গে নাচতে নাচতে লাগর সকলে কপিল মূনির আশ্রয়ের উদ্ভাব বৃকে ক'পি করে পড়েছিলাম! তখন কত সাধক, কত

তপস, কত সন্ন্যাসী, কত পুহী আমার এককোটা জল মাথার নিয়ে বস্ত হোত—ঘাটে ঘাটে ঘরে ঘরে আদিনার আদিনার আমার স্তব জোড়পাঠ হোত!

ভারপর? ভারপর খুঁত লোভী বিদেশী বণিকরা ছপে বলে কৌশলে রাজা হয়ে বোসলো। তাদের বাংলার প্রথম কাজ হোল—ভগীরথের পূর্তবিস্তার খ্রেষ্ঠ নিদর্শন রাজমহলের উত্তর মোহানার—যেখানে আমি দক্ষিণগামী ভাগীরথী ও পূর্বগামী যমুনা হয়েছিলাম—সেখানে দেড়-ক্রোশব্যাপী তাত্রপট দিয়ে আমার জলধারা ভাগীরথীর বৃকে ফেরানো ছিল—সেইখানে অর্থের লোভে সরিয়ে নিয়ে বিদেশে চালান দিল। ফলে সেই থেকে আমার ভাগীরথীর ছদ্দিন হুক! যেখানে বড় বড় বাণিজ্য পোত রপপোত আমার ক্রোড়ে আনন্দখেলা করে বেড়াতো সেখানে আজ শৃগাল কুকুর হেঁটে পার হয়ে চলেছে। আমার ক্রীড়াসঙ্গীরা সরস্বতী, মাধাভাঙ্গা, চূর্ণি, জলঙ্গী, ইছামতী আর কত নাম করব—তুকিয়ে কুঁকড়ে খাশানে বালিচরে পরিণত! ভারপর বড় বড় বাঁধ জলধারা সঁকো—বিদেশী আমল থেকে হুক আজও তার গতি অব্যাহত। সময়ে জল না পাওয়ায় অক্সা। এখন জল নিয়ন্ত্রণ—শস্ত্র-নিয়ন্ত্রণ আরও কত নিয়ন্ত্রণ!

সেদিন আকাশ জল দেখনি—হুতরাং খাল কেটে আমার সব জল নিয়ে নেওয়া হোল—এ শুধু বাংলার নয়—বিশ্বশাসপুতঃ হয়ে হিমালয়ের বকোভেদ করে—আপনার জটা ভেদ করে বেদগানমুখরিত হরিষারের কুন্তঘাটে যেখানে আমি প্রথম ধরগীতকে ধরা দিয়েছিলাম, যেখানে আমার বাহন মকর সপরিবারে মন্তকুল নিয়ে খেলা কর্ত—পরম্পর জীবহিংসা ভুলে গিয়ে—সেখানেও খাল কেটে সব জল টেনে নিয়ে গেল। তুকনো পাখর আর পরিজ্যক্ত ঘাটগুলি পড়ে রইল আমার—আমার বেদনামখিত হাধাকার শোনবার জন্ত! এ অবস্থাও একদিন আমার হয়েছিল। আবেগে তাঁর খবর রুদ্র হইল।

তুঙ্গী। মা বাংলাদেশের খবর তুমি ভাল জান—সেখানে সদাশিবকে নিয়ে বাও না কেন?

গঙ্গা। হার আমার কপাল! সেখানে আমার ফেরন অবস্থা বাঙ্গালীদেশও সেই অবস্থা। সবী-বাহুক দেশ আজ

হিস-ভিন্ন। আৰ্ণাৰেবী-কালীৰ তথা ভারতীয়েৰ চক্ৰে
আলল বাকানীৰ আৰু সন্ত—বিসৰু বিস্ত।

ভূকী। কেন? সেখানে তো আজও মা দুৰ্গা—
কালী—অৰপূৰ্ণা—লক্ষী—সৰস্বতী—কাৰ্তিক মায় বিখ-
কৰ্ম্মৰ পৰ্বন্ত পূজা হয়, খুব ধুমধাম হয়। সার্বজনীন পূজা
হয়—ছোট ছোট ছেলেমেয়েৰা পৰ্বন্ত আনন্দে মাতোয়াৰা
হয়।

গংগা। আনন্দ? শোন তৰে—সবাই—সব
প্রতিদ্বাই বিসৰ্জন হয় আমার বুকে। তখন কি দেখি
জান? দেখি যে—পূজার নৈবেদ্য নাই—যাগ, যজ্ঞ, হোম
নাই—মন্ত্ৰচৈতন্তকে আগাবার কোন আহ্বান বৈদিক বা
তান্ত্রিক কিছুই নাই, প্রাণতরা শুধু মূখের আকুল আহ্বানও
নাই। আছে কি জান? শুধু বাজনা-বাণ, বিজলীর
আলো, বেতারযন্ত্ৰের চীৎকার। নৰ্দমার ধারে পথের
ধুলার উপর ঘাটে মাঠে যেখানে অগ্র সময় বিড়াল কুকুরে
মলত্যাগ করে—পাড়ার সবাই প্রাত্যহিক জঞ্জাল ফেলে,
সেখানে চাঁদোয়া াটিয়ে, প্রতিবেশিদের কাছ থেকে জোর
করে চাঁদা তুলে, আলো জ্বালিয়ে আর বেহুৰো বেতাল
নোংরা, এমনকি শালিনতাবিজিত গান গেয়ে, রকমারী
দৃষ্টিকটু পোষাক পরা কিশোরী যুবতীদের নিয়ে আনন্দের
উৎস বয়ে যায়। উৎকট অৰ্থাৎ পৌরাণিক অপ্সরী—
কিন্নরীর সঙ্গে মাকে সাজিয়ে প্রতিদ্বার অধিষ্ঠান হয়, আর
তাদের না হয় প্রাণ প্রতিষ্ঠা না হয় আরতি বা হোম। এ
পূজার নাম কি জান? এর নাম সার্বজনীন পূজা।
অলিতে গলিতে রাজপথে নৰ্দমার ধারে শুধু হয় নিজেদের
মধ্যে শালীনতাবিহীন প্রতিযোগিতা আর—হে-হুয়া!
দিনরাত খালি শুনবে পরস্পরের প্রতিযোগিতাসুলক
চীৎকার।

দুৰ্গাপূজা? বিজয়া দশমীর দিন যে কোন বিসৰ্জনে
ঘাটে গেলে দেখবে তিন দিন কেন কোথাও সপ্তাহতোর
শুধু হে-হুয়া। পূজার বাথে দুৰ্গা অকৃতক থাকেন সপরিবারে,
কলে আমার জলে বিসৰ্জন হলে—কাদামাটিমাথা জলে শুধু
অক শীতল করেন না—সেই জলপান করে কদিনের দুখ-
তুকা নিবারণ করেন।

সদাশিব। সেকি? তবে তিনি যান কেন সেখানে?

গংগা। স্বহাৰা—নিজেও যে স্বাৰাৰ অতীত নন—

এটা প্রমাণ করার জন্য বোধহয়। কোন অতীতের
স্মৃতির ডাক এখনো তুলতে গােনেনি যে। প্রতিদ্বারই বলেন
এই শেষ আর আসবে না—আবার লেকখা তুলে যান
আগমনীর গান মনে পড়লে।

সদাশিব। অতো আলো বাজনা—অমন পোষাক
পরিচ্ছদ সব প্রাণহীন ভক্তহীন—আচারহীন!

গংগা। প্রতিদ্বার গঠন—পোষাক দেখেছ। দেখলে
লজ্জায় চোখ বুজতে হবে—দুৰ্গা-লক্ষী-সৰস্বতী—বেন
ইন্দ্রসভার উৰলী-মেনকা-রস্তার সঙ্গে পালা দিয়ে আসরে
নেবেছেন—মাতৃদেবের মহান ছাপ, না দেখে না সাজ পোষাকে।
আছে, আছে শুধু নগ্ন—কদৰ্ঘ উৎকট—শিল্পকলার ছাপ
সেই শুধু অতীত যুগের বিলাসিতার অন্ধ অহুৰণ!

সদাশিব। সঙ্গে কাৰ্তিক গণেশ থাকে তো—তারা
আপত্তি করে না?

গংগা। তাঁরা এরকম পূজায় গা ঢাকা দিয়ে থাকেন
নিশ্চয়। আর যাবেনইবা কি করে—বাহনবা কোথা?
ইদুর বংশ তো অহিংস ধর্মঘট করে গণেশের চাকরী ছেড়েছে
—বস্তীতে মালগুদামে নৰ্দমার ধারে এত উপভোগ্য খাদ্য
পায় যে তাদের শুধু বংশবৃদ্ধি নয় চেহারাও বিষম ফিরে
গেছে। কুকুর বিড়ালকে তারা শুধু ভয় করেনা নয়—তাদের
সঙ্গে সমানে লড়ে যায়—পরাজিত করে। তাদের জাতি-
কুটুম্ব খরগোস, গিনিপিগ ইত্যাদিরাও যৌন জ্ঞানিক
পরীক্ষার বন্ধ হয়ে জীবন দিচ্ছে! আর কাৰ্তিকের বাহন
ময়ূর সম্প্রতি রাজ্যের সেরা পাখী বলে স্বীকৃতি পেলেও
সহরের বৈরিণী—বিনোদিনীরা ময়ূরবাহন কাৰ্তিককে
নিয়ে পূজার নামে যে বিকট বেলেঙ্গার হাটি করে—তাতে
কুমারপ্রবরের আত্মগোপন ছাড়া আর কোন উপায় ছিল
না! যখন অধনয় ফকির গান্ধীজী—অহিংসার উদাত্ত
আহ্বান আর দেশাত্মবোধের শক্তিমন্ত্ৰের মূর্ত প্রতীক
নেতাজীর ঠৈরব রণহুকার তাঁর আভাষ কোজের দিল্লী
চলো চীৎকার সামলাতে না পেয়ে বিদেশীরা দেশবিভাগকে
বিসবন্ধ রোপণ করে দেশ ছাড়লো বটে—কিন্তু হোল কি
রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি সব যে উটেপাণ্টে গেল।
ত্যাগীর হল রাজনীতি হাতে দিয়ে বিষম ভোগী হয়ে গেল,
হাতী ঘোড়া উটের মিছিল সোনার ছাতা সোনা রূপার
ধ্বজা এসবের বিলাস ব্যসনের হুকাহুড়ি হোল—দেশবিশেষে



ভারতের নামের জন্ত লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় হোল—একদল লোক ক্রোড়পতি হোল। কিন্তু যে দরিদ্র সে দরিদ্রই রয়ে গেল। বিদেশে এক দম্পত্যের ও তাঁদের আত্মীয় সুদূর বন্ধুবান্ধব জাঁকজমকে আগেকার জমীদার তো দুব্বের কথা রাজামহারাজাদেরও ছাড়িয়ে গেল—বিদেশীরা মোটে বুঝতে পারল না যে ভারত কত গরীব! তারপর আগেকার জমীদাররা যেমন ঋণ করে হোলজর্গোৎসবে নাচগানে খানাপিনার সাধারণের চোখ ঝলসে দিত এখনকার কালেও ক্রোড় ক্রোড় টাকা বিদেশ থেকে ঋণ ও দান হিসাবে নিয়ে সমান জোলুসে রাজস্ব চালান হচ্ছে—ঋণের তাজমহল তৈয়ারি হচ্ছে! হায়! হায়—গান্ধীজীর আদর্শবাদ কোন অঙ্ককারে মুখ লুকিয়েছে! চাষীদের, বথার্গ গরীবদের, এমনকি মধ্যবিত্ত গৃহস্থদের—যারা বেশের মেরুদণ্ড তাদের দুপায়ে পিবে তাদের অন্ন-বস্ত্রের একটু মাথা রাখবার কোন ব্যবস্থাই নাই—আছে কি না কোটি কোটি টাকার ঋণ বা ভিক্ষা করা পরিকল্পনা—বিদেশ থেকে আনা অনেক খরচ করে বিশেষজ্ঞের দ্বারা তৈয়ারী কাজ আরম্ভ—তারপর গুলদ বাহির—ফলে প্রায় সব পরিকল্পনা বানচাল। আর দেশের আসল লোক যে ভিমিরে—সেই ভিমিরে।

আর বিলাসিতার ব্যয়? শুনেছি এক একজন দৈনিক খরচ করেন হাজার টাকা। নইলে যে তাঁর মান-সম্মত থাকে না!

সদাশিব। তাহ'লে আসলে সবারই আমার মত অবস্থা!

ভুবণ্ডী। আপনি তো সন্ন্যাসী, সাধারণের জালা আপনি কি বুঝবেন।

অনেককণ্ড ভাবিয়া সদাশিব ভুবণ্ডীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আচ্ছা চন্দ্রনাথ পাহাড়ে তো আমার একটা পীঠস্থান আছে, সেখানে—

ভুবণ্ডী। ওরে বাবা! সে তো এখন পাকিস্তান—তুই ভিসা পাসপোর্ট নয়—বিধবীর তাক্কা আছে—এ বয়সে পার্বেন থাকতে? তার চেয়ে এক কাজ করুন—সোমনাথের মন্দির নতুন করে তৈয়ারী হয়েছে—যাবেন সেখানে?

সদাশিব। একটা বাহন তো চাই।

ভুবণ্ডী। আমার পরামর্শ শুনুন—জটাজুট কাষিরে

ফেলুন, চলুন উষাক্ত শিবিরে নার শিখিরে দি। ভিক্ষাবৃত্তি তো আপনার অভ্যাস আছে—সরকারী ভোল নিয়ে কিছু মিন চালিয়ে মিন—লক্ষ লক্ষ নরনারী এখন এই বৃত্তি নিয়েছে।

সদাশিব। সরকার ভিক্ষা দিচ্ছে?

ভুবণ্ডী। না দিলে উপায় কি—খোল আনা থেকে কেটে কুটে নিয়ে দেয়—তাতে আপনার মত ভিখারীর চলে যেতে পারে!

সদাশিব। ভিক্ষা করব শেষে?

ভুবণ্ডী। কেন ভিক্ষায় আপনার অক্লিট হোল কবে?

সদাশিব। আরে মুখ! আমি কি নিজের জন্ত কখনো ভিক্ষা করেছি, না-যার তার কাছে ভিক্ষা করেছি? যে ভক্ত আমার মনে প্রাণে ডাকে সে ছাড়া আর কারও দ্বারে আমি গেছি! আর তোর মার কাছে—অন্নপূর্ণার কাছে ভিক্ষা? সে তোর মা জ্ঞানেন আর আমি জানি! নাঃ—বিষ্ণুর পথই নোব—“অসারে থলু সংসারে সারং শঙ্করমন্দিরম্”। দেখনা বিষ্ণু কেমন শঙ্কর বাড়ী কীরোধ সন্ত্রে গা ঢেলে দিয়ে লক্ষ্মী দেবীর সেবা নিচ্ছেন! যাক তাহলে আমি হিমালয়েই বাব! সেই আমার শেষ আশ্রয় হোক।

ভুবণ্ডী। সেখানে কে খুঁজে দেবে আপনার ডেরা? হিলারী, তানজিং আরও অনেকে তুবার মাহুঘের খোঁজ করবার চলে সব পাহাড় ভোলপাড় করে কেলছে। তারপর চীনা হারলা হ'রে পথঘাট সব বন্ধ হয়ে গেছে।

সদাশিব। চীনারা তো বৌদ্ধ?

ভুবণ্ডী। এরা বৌদ্ধ বটে কিন্তু কমিউনিষ্ট—ঠাকুর দেবতা তো দুব্বের কথা বাপমায়েরও ঋণ স্বীকার করে না! বাপমায়ের চেয়ে এদের কাছে বড় হোল কমরেড্—কমরেডনী!

সদাশিব। সে আবার কি বাবা!

ভুবণ্ডী। সে সব আমি বোঝাতে পারব না! বড় জটিল তত্ত্ব। এখন বলি শুনুন—উষাক্ত বলে নাম লেখান।

গংগা। সে কি? এঁকে কি হওকারণ্যে পাঠাবে?

ভুবণ্ডী। বেকার হুড়ো বেথে নাও পাঠাতে পারে—

লেখানোও তো সব ভর্তি হয়ে গেছে। ভনেছি শীত আবার
নাম লেখানোও বন্ধ হবে!

সদাশিব দীর্ঘ নিঃশ্বাস কেলিলেন বলিলেন, কাজ

নাই অত গোলমালে। বাবা নন্দী একটা বড় করে কবে
তৈয়ারী কর বাবা—একটু বেশী করে কালকূট বিশিষ্ট—
এলয় না হওয়া পর্যন্ত নেশা করেই কাটিয়ে দিই।

মসলিন্

শ্রীস্বধীর গুপ্ত

(১)

একী রূপান্তি—রূপ-মাধুর্য্য-মাথা,
রূপ-কল্পনা—রূপের স্বপন আঁকা,
রূপসী নগরী মসলিনময়ী ঢাকা!

(২)

অহুত্ব-ভরা রূপ-দ্রব-করা হাতে
বোনে মসলিন্ শিল্পের মৌভাতে
মশ্ণুল হ'য়ে রূপসী কল্পনাতে।

(৩)

স্বপ্নতম সে রূপ-কল্পনাটিও
বুনিয়্য বুনিয়্য করে কত কমনীয়,—
চিরস্তনী সে তরী-তরুরও প্রিয়!

(৪)

বোনে মসলিন্—বোনে মসলিন্ স্থখে ;
রূপসী বৃষ্টি বা বসিয়া শিল্পী-বৃকে
মসলিন্-বোনা যেখে অপলক স্থখে !

(৫)

বিস্মিত চোখে কত না উৎসুকতা !
মসলিনে-রূপে মিলিয়া একাত্মতা ;—
শিল্পী হত্যার ফুটায় ভয়ত।

(৬)

মসলিন্-পরা প্রেয়সী প্রেয়সী রূপ
শিল্পী কি ছেয়ে অপরূপ নিশ্চূপ !
বোনে মসলিন্ রূপসীর রস-কূপ।

(৭)

মিহি মসলিনে শিল্পের লেখালেখি ;

বোনে মসলিন্—বোনে মসলিন্, একী
মসলিন্-পরা প্রিয়ায়ে যে পাশে দেখি !

(৮)

অহুত্ব-ভরা শিল্পীর বাহু-হাতে
রূপসী যে ধরা পড়েছে কল্পনাতে ;
মসলিনী-মধু উপজে নয়ন-পাতে।

(৯)

মেঘ-মসলিনে অস্ত্রে চক্ষু রাঁকা ;
তা'রও চেয়ে মিহি অক-রাগে যে পাকা
মসলিনী-বাস শিল্প-স্থায় মাথা।

(১০)

দুঃস্বপ্ন গতি ছুটিছে কালের ঢাকা ;
উদ্ভস্ত আয়ু যেন বে পাখীর পাখা,—
যায় না জগতে কিছুতে যে ধ'রে রাখা !

(১১)

তবু রূপসীর মসলিনী-মায়া-মাথা
ধ্যানী শিল্পীর রূপাবেশে চেয়ে ঝাকা
চিরস্তনী যে মসলিনময়ী ঢাকা !

(১২)

বোনে মসলিন্—চলে চির-রূপ চাখা ;
চির-রূপসীয়ে মসলিন্ বুনে ডাকা ;
ওগো, মসলিনে একী রূপান্তি আঁকা !

(১৩)

রূপ-মসলিনে রূপ তো পড়ে না ঢাকা !
রূপ ঠিকরে গো চমকিত চোখে ঝাকা ;—
শিল্পী-মোহিনী মসলিনময়ী ঢাকা !



মহাশয় কথ্য



পিতা-পতি-বিরোধে তু

শ্রীমতী কমলা ভট্টাচার্য্য

সংসারে দেখা যায় বাপ আর স্বামীর মধ্যে অনেক সময়, মনের অমিল, এমন কি গুরুতর কলহ পর্যন্ত ঘটয়া থাকে। এই প্রকারের বিরোধ কেন হয় ফ্রেডেরীয় মনোবিজ্ঞানীর তার কারণ বিশ্লেষণ করিয়াছেন। কারণ তাঁরা বিশ্লেষণ করিয়াছেন, কিন্তু এই সব অগ্রীতি কর যটনা ঘটিলে সত্যী নারীর কর্তব্য কি তাহা তাঁহারা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। শ্রীমদ্ ভাগবতে কিন্তু সে কর্তব্য সূহৃৎ নির্ধারিত হইয়াছে। সত্যীর দক্ষ-বজ্র উপস্থিতিতেও আত্মবলিদানের উপাখ্যানে—সেই উপাখ্যানেরই পুনরাবৃত্তি করিতেছি।

“মৈত্রেয় কহিলেন, ভগবান তব সত্যীকে এই প্রকার কহিয়া নীরব হইলেন। কিন্তু শিবের এই চিন্তা উদ্ভিত হইল, ‘যাইতে অহুমতি দিই, কি বলপূর্বক নিবারণ করি, দুই দিকেই সত্যীর শরীর নাশের সম্ভাবনা। এদিকে সত্যীও বহুবর্শন বাসনায় নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া একবার গৃহ হইতে নির্গতা হন, আবার ভবের ভয়ে গৃহমধ্যে প্রবেশ করেন;—তাঁহারও চিন্তা উভয় দিকে ছলিতে লাগিল, ক্রমে বহুবর্শনের সহিত সাক্ষাৎ করিবার বাসনা প্রতিহত হইল তাবিয়া সত্যী অতিশয় দুর্শ্বনা হইয়া পড়িলেন এবং স্নেহবশতঃ রোদন করিয়া অশ্রুধারায় ব্যাকুল হইয়া অতুলা পূর্ব ভগবান ভবকে যেন ভষ্মসাৎ করিবেন এই ভাবে তাঁহার প্রতি সকোপ দৃষ্টিপাত করিলেন। কতকালে ক্রোধে তাঁহার সর্বশরীর কম্পমান হইতে লাগিল, তিনি বায়ব্যার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। স্বীয় ভাবপ্রসূক তাঁহার বুদ্ধি এতদূর বিক্ষুব্ধ হইয়া পড়িল যে, যে সাধুপ্রিয় ভব প্রীতিবশত আপনাকে দেহাচ্ছিন্ন প্রদান করিয়াছিলেন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া বেজ্ঞাক্রমে বিস্মৃত্যে যাজ্য করিলেন। সত্যী একাকিনী অতিবেগে

যাইতে আরম্ভ করিলে, পার্শ্ব মণিমানু আদি বক্ষ, এবং মদ প্রভৃতি সহস্র সহস্র শিবের অমুচর নিভয়ে বুবেদ্রকে অগ্রে করিয়া তাহার পশ্চাৎ-পশ্চাৎ ধাবমান হইল। অনন্তর তাহার দেবীর সমীপবর্তী হইয়া তাঁহাকে সেই বুবে আরোহণ করাইল। সারিকা, কম্বুক, দর্পণ, অম্বুদ, খেতচ্ছত্র, ব্যহন, মালা, গীতাপ্রায় শব্দ বেণু ও হৃন্দুতি প্রভৃতি রাণোচিত দ্রব্য সামগ্রী দ্বারা স্তম্ভজিত হইয়া সকলে যাইতে লাগিল। অতঃপর সত্যী পিত্রালয় প্রাপ্ত হইয়া বজ্রস্থানে প্রবেশ করিলেন। তথায় বজ্রীয় পদবধের কোলাহল, বেদপাঠের শব্দে মিশ্রিত হইয়া অপূর্ব মধুরভাবে শ্রুতিগোচর হইতেছিল। দেবগণ ও ব্রহ্মরিগণ সকলে স্থানে স্থানে উপস্থিত ছিলেন বজ্র সযস্কীর দ্রব্যাদি সংস্থাপনার্থ মৃত্তিকা, কাষ্ঠ, লৌহ, স্বর্ণ, কুশ এবং চন্দ্রনির্মিত নানাবিধ পাত্র সর্বত্র আয়োজিত রহিয়াছে। কিন্তু দক্ষ সত্যীকে দেখিয়া কোন প্রকার অভ্যর্থনা করিলেন না। সত্যীর জননী ও ভগিনীগণ ভিন্ন অস্ত্র কোন ব্যক্তিকে বজ্রকারী দক্ষের ভয়ে তাঁহার সম্বাদর করিল না। কেবল তাঁহার মাতা ও ভগিনীগণ শ্রেমাঙ্গ দ্বারা নিকট কণ্ঠ হইয়া সাদরে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। সত্যী দেখিলেন, পিতা ও কথা দ্বারাও আদর করিলেন না। যদি ভগিনীগণ সহোদরা বলিয়া তাঁহাকে সমুচিত সম্ভাষণ পুরস্কার প্রীতিপ্রদর্শন করিল এবং মাতা ও মাতৃব্যাগণ উৎকৃষ্ট আসন ও অলঙ্কার প্রদান করিলেন, তথাপি তিনি কিছুই গ্রহণ করিলেন না। তিনি দেখিতে পাইলেন, এই বজ্র ভগবান ক্রোধের অংশ নাই। তাহাতে তাহার স্পষ্ট বোধ হইল যে, দক্ষ দেবদেব ক্রোধকে অংজা করিয়াছেন। আর বজ্র সত্যীর নিজেরও বিশেষ সম্বাদর না দেখিয়া কোপান্বিত হইলেন। অবি-

কবেই তাঁহার ক্রোধান্বিত হইয়া একদা ভয়ঙ্কর ভাব ধারণ করিল, যেন তদ্বারা সমস্ত লোক ধ্বংস হইয়া তন্ময় হইয়া পড়ে। সতীর ক্রোধাবেশ হইবামাত্র দক্ষবিনাশার্থ তৎকণাৎ সতীর ভেঙ্গে কচকগুলি ভূত সমুখিত হইল। কিন্তু দেবী তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন। শিবদেবী দক্ষ কর্মমার্গে বহুতর পরিশ্রম করিয়া গর্বিত হইয়াছিল, সতী পৃথিবীস্থ সমস্তলোকের সমক্ষেই যৌব জন্ত অপরিষ্কৃত বাক্যে কহিলেন,—পিতঃ! ইহলোকে বাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহ নাই, বাহার শ্রিয় অথবা অশ্রিয় কাহাকেও দেখি না এবং যিনি দেহধারীদিগের শ্রিয় আত্মার কারণ স্বরূপ,—কাহারও সহিত বাহার বিরোধ নাই, তোমাব্যতীত আর কোন ব্যক্তি সেই ভগবানের প্রতিকূল আচরণ করিবে? তোমার মৃত ব্যক্তিগণ প্রায় অহুয়া-পরবশ হইয়া থাকে, তাহারা পরের গুণ সহ্য করিতে পারে না,—অস্ত্রের বহু গুণ বর্তমান থাকিলেও গুণ পরিহার করিয়া দোষই গ্রহণ করে। কিন্তু যে সকল ব্যক্তি তোমাদের তুল্য অহুয়া পরবশ নহেন, তাঁহারা কাহারও দোষ গুণ থাকিলে দোষমাত্র গ্রহণ করেন না,—দোষ গুণ যেমন থাকে, তেমনি বিচার করিয়া গ্রহণ করেন। ইহাদিগকে মহৎ বলা যায়। আর যে সকল সাধু পুরুষ কেবল গুণই গ্রহণ করেন, কখন দোষ গ্রহণ করেন না, তাঁহারা মহত্তর। কিন্তু যে সকল ব্যক্তি অস্ত্রের দোষ থাকিলেও তাহা গ্রহণ করা দূরে থাকুক, প্রত্যাতি অতি সামান্য বৎকিঞ্চিৎ গুণ দেখিতে পাইলে, তাহাকেই বহুমাত্র করেন, তাঁহারা মহত্তর। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! আপনি সেই সকল মহত্তর পুরুষের প্রতি পাপ করনা করিলেন। বাহারা এই জড় দেহকেই আত্মা কহে, তাদৃশ দুর্জয় পুরুষেরা ঈর্ষাবশত এই প্রকার মহাজনদিগের নিন্দা করিবে আশ্চর্য্য নহে, বরঞ্চ তাহা আবশ্যক, কারণ যদিও সাধু ব্যক্তিরা আত্মনিন্দা সহ্য করেন, তথাপি তাঁহাদের পরেণু তাহা সহিতে সমর্থ হয় না, তাঁহাদের চরণগুলি এই সকল ব্যক্তির ভেদে নাশ করে। অতএব সত্য প্রতিকূল পাওয়াতে অসং পুরুষের পক্ষে মহাজনের নিন্দা করাই ভাল। পিতঃ! বাহার নাম 'শিব'—এই দুইটি অক্ষর কেবল কথা দ্বারা একবার দ্বারা উচ্চারণ করিলেও তৎকণাৎ মানবদিগের সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়।

বাহার কীর্তি অতি পবিত্র, বাহার শাসন কাহারও লঙ্ঘনীয় নহে তুমি সেই শিবের বিবেচ্য করিতেছ, কি আশ্চর্য্য! তুমি এমনই অমঙ্গল স্বরূপ। বাহার পাদপদ্মে মহৎ ব্যক্তিদিগের মনোভূক্ত, ব্রহ্মানন্দরূপ মকরন্দ পানার্থী হইয়া নিরন্তর ভজন করে এবং বাহার চরণ সন্ধ্যা পুরুষদিগের সমক্ষে অভিলষিত মঙ্গল বর্ষণ করিয়া থাকে—তুমি সেই বিশ্ববদ্ধ শিবের বিবেচ্য করিতেছ। পিতঃ! তুমি গর্ভাক্ত হইয়া শিবনামে যে সেই অশিব তত্ত্ব আরোপ করিয়াছিলে, ব্রহ্মাধি দেবগণ কি সেই তত্ত্ব অবগত নহেন? কেননা ভগবান্ ভব, জটাজাল বিকীরণ পূর্বক চিতামালা, ভস্ম ও মৃত মনুষ্যের কণোল ধারণ করিয়া শিশাচরণ সহিত আশানে বাস করিলেও, দেবগণ তাঁহার চরণভ্রষ্ট নির্মালা স্ব স্ব মতকে ধারণ করিতেছেন। তোমার দ্বারা তাঁহারা যদি শিবের তত্ত্ব জানিতেন, তবে তাঁহার চরণ বিগলিত নির্মালা কখনই তাঁহারা মস্তকে ধারণ করিতেন না। বাহা হটক, দুর্ভাগ্য ব্যক্তি যে স্থানে ধর্ম্মরক্ষক স্বামীর নিন্দা করে, পতিব্রতা কামিনী সেখানে যদি তাহাদের বিনাশ করিতে সমর্থ না হয়, তবে কর্ণধর আচ্ছাদনপূর্বক তথা হইতে তাহার নির্গত হওয়া কর্তব্য। যদি শক্তি থাকে, তাহা হইলে যে দুঃখীরা এইরূপ অকল্যাণ কথা প্রয়োগ করে, তাহার জিহ্বা বলপূর্বক ছেদন করিয়া দিবে; পরে আপনাতঃ প্রাণও পরিত্যাগ করিবে;—এইরূপ করাই ধর্ম্ম। তুমি ভগবান্ নীলকণ্ঠের নিন্দাকারী; তোমা হইতে আমার এই যে দেহ উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা আমি আর ধারণ করিব না। নিশ্চিত অন্ন যদি মোহবশতঃ ভক্ষণ করে, তাহা হইলে তাহা বমন করিয়া কেলিলে তবে তাহার শুদ্ধি হয়। যে পুরুষ আত্মানন্দ-সন্তোষেই পরি-তুষ্ট, তাঁহার বুদ্ধি কখন বিধি-নিষেধরূপ বেদ-বাক্যের অহুগামী হয় না। দেব ও মনুষ্য—এই দুয়ের গতি যেমন পৃথক, সেইরূপ বাহার যে ধর্ম্ম, তিনি তাহাতেই অবস্থিত থাকিবেন; অস্ত্র ধর্ম্মের বা অস্ত্র ব্যক্তির কখনও তিনি নিন্দা করিবেন না। প্রযুক্তি এবং নিযুক্তি—এই দুই প্রকার কর্মই সত্য। বেদে এই উত্তর কর্মেরই বিধান আছে। এই দুই কর্ম বিবেচনাপূর্বক ব্যবস্থা দ্বারা বিহিত হইয়াছে,—অবশেষে বিধান হয় নাই। এই দুই কর্ম একইকালে এক কর্তৃতে পরস্পরবিরুদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু শিব সাক্ষ্য ব্রহ্ম; তাহাতে কোন কাঁচাই নাই। হে পিতঃ! আপনি

অগ্নিরাশি যে সমস্ত ঐশ্বর্য আশ্রয় করিয়াছি, তোমরা কখন তাহা চক্ষেও দেখ নাই। তোমাদের ঐশ্বর্য ত কেবল যজ্ঞশালাতেই থাকে। যজ্ঞার পরিভূষ্ট মানবগণই তাহার প্রশংসা করে এবং কর্তৃকাণ্ড-পথাগ্নিত পুরুষেরাই তাহা তক্ষণ করিয়া থাকে। আমাদের ঐশ্বর্য সেরূপ নহে, তাহা ইচ্ছামাত্রের উৎপন্ন হয়। তাহার হেতু অব্যক্ত। ব্রহ্মজ ব্যক্তিগণই তাদৃশ ঐশ্বর্য ভোগ করিয়া থাকেন। তোমার সহিত আর কথার প্রয়োজন নাই। তুমি ভগবান্ ভবের নিকট অপরাধী, তোমার দেহ হইতে আমার এই যে দেহ উৎপন্ন হইয়াছে, ইহার জন্ম অতি কুৎসিত। ইহা আর ধারণ করা উচিত হয়না। তুমি অতি কু-জ্ঞান। তোমার সম্বন্ধ বশতঃ আমার বড় লজ্জা হইতেছে। মহত্তের অগ্রিম কর্ত্তা হইতে যে জন্ম হয়, সে জন্ম ধিক্। ভগবান্ বৃষধ্বজ আমার সহিত পরিহাস সময়ে যখন আমাকে ‘দাক্ষায়ণি’ বলিয়া সম্বোধন করেন, তখন আমার পরিহাস-বিষয়ক হাস্য অকর্ষিত হয়; তখন আমি অতিশয় দুঃখিত হই। তোমার অজ্ঞ হইতে উৎপন্ন এই অজ্ঞ আমি ভাগ করিব। ইহা মৃতদেহের তুল্য। মৈত্রেয় কহিলেন, ‘হে শক্রনাশন বিহ্বর! দাক্ষায়ণী সতী এই প্রকারে যজ্ঞ মধ্যে দক্ষের প্রতি নিন্দাংক্য প্রয়োগ করিয়া মৌনাবলম্বন পুরঃসর উত্তরযুগ্মী হইয়া ক্ষতিভলে উপবিষ্ট হইলেন। তৎপরে আচমনপূর্ব্বক পীতবর্ণ পট্টবসন দ্বারা শরীর আচ্ছাদন করিয়া মুজিত চক্রে ধোগপথের পথিক হইলেন। হর-সুন্দরী তখন আসন জয় করিয়া, প্রাণ ও অপান বায়ুকে নিরোধ দ্বারা সমান করিয়া নাভিচক্রে স্থাপন করিলেন। তদনন্তর নাভিচক্রে হইতে উদান-বায়ুকে অগ্নে অগ্নে উত্তোলন করিয়া বৃদ্ধির সহিত হৃদয়ে স্থাপন করিলেন। পশ্চাৎ উদান বায়ুকে কণ্ঠমার্গ দ্বারা জ্বরের মধ্যস্থলে লইয়া গেলেন। মহৎ ব্যক্তিদ্বিগের পূজ্যতম ভগবান্ রুদ্র, যে দেহকে আদর করিয়া ক্রোড়ে স্থাপন করিতেন, সতী, দক্ষের প্রতি ক্রোধ করিয়া এইরূপে সেই দেহও পরিত্যাগ করিবার বাসনার সর্ব্বাঙ্গে বায়ুকে রুদ্ধ করিলেন। অনন্তর তিনি জগৎ-শূন্যপতির পদারবিলম্বের মকরন্দ চিন্তা করিতে লাগিলেন; তখন পতি তির অল্প কোন ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলেন না। একিকে তাঁহার দেহ পাশশূন্য হইয়া সমাধি সমুৎপন্ন অনল দ্বারা সত্ত্ব প্রজ্জ্বলিত হইল। (৪।৪ ঐশ্বত্যার্গবত্)

তারপর সতীর পরিত্যক্ত দেহ লইয়া শিব কি করিলেন তাহা সকলেই জানেন। আশমুদ্র হিমাচল ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইল বাহার পীঠস্থান। ভারতের সতী নারীদের সম্মুখে স্থাপিত হইল এক অভুলনীর, সমুদ্রত আদর্শ—পতি আর-পিতার বিরোধে সতী নারীর অবশ্য কর্তব্যের অলঙ্ঘ্য দৃষ্টান্ত। তার ব্যাখ্যা নিম্নয়োজন।

সার্কাসে বঙ্গনারী

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চৌধুরী

অনেকদিন আগে, ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে, ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আইন-সভায় স্বর্গগত গোথলে মহোদয় বাঙ্গালীর নব-জাগরণের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন—“বাঙ্গালীগণ বহু বিষয়ে সর্ব্ব-ভারতে গণনীয়। ভারতবাসীর সম্মুখে যতগুলি কর্ত্ত-পথ মুক্ত রহিয়াছে, তাহার সকল পথেই বাঙ্গালী বিশেষ প্রসিক্ষিত করিয়াছে।” বলা বাহুল্য, বাঙ্গালার যুবক-গণের মত বাঙ্গালার রমণী সমাজেও নূতন যুগের নবীনময়ে জাগরণের সাড়া উঠিয়াছিল। জ্ঞানে ধর্মে, শিল্পে সাহিত্যে, সমাজসেবা ও রাজনীতিতে তাঁহারা যেমন সমুদয় ভারতে অগ্রণী হইয়াছিলেন, তেমনি ক্রীড়া-কৌশলেও অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করিয়া বঙ্গরমণীগণ সমগ্র ভারতে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

এই নবজাগরণের প্রথম পর্যায়ে “হিন্দু-মেলা” অবদান অপরিণীম। সে মেলার কাহিনী আজ বিস্মৃত ও বিলুপ্ত-প্রায়। “জীবনমুভিতে” বিধকবি রবীন্দ্রনাথ এই মেলার বিষয়ে লিখিয়াছেন—“আমাদের বাড়ির সাহায্যে হিন্দুমেলা বলিয়া একটি মেলায় সৃষ্টি হইয়াছিল। ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চোটা সেই প্রথম হয়। বেঙ্গদাদা (সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর) সেই সময়ে বিখ্যাত জাতীয় সঙ্গীত ‘মিলে সব ভারত সন্তান’ রচনা করিয়া-ছিলেন।” এই মেলায় দেশের ভবগান স্বীত, বেশাঙ্গারসের

কমিউনিষ্ট, দেশী শিল্প ব্যায়াম প্রভৃতি প্রদর্শিত ও দেশী
 উদ্যোগ পুষ্কৃত হইত। হিন্দুদের অল্পতম প্রবর্তক
 নবগোপাল মিত্রের এচেষ্টার হিন্দুদের তদাবধানে একটি
 ব্যায়াম বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। শুধু তাহাই নহে,
 নবগোপাল এদেশে সার্কাসেরও স্থাপত্য করেন।
 জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁহার ‘আত্মজীবনীতে’ লিখিয়াছেন—
 “কতকগুলো মড়াথেকে ঘোড়া লইয়া নবগোপাল এই
 সর্বপ্রথম বাঙ্গালী সার্কাসের স্থাপত্য করেন।” শুনিতে
 পাওয়া যায়, তিনি ওয়ার তাঁহার কত কুসুমকেও ঘোড়ায়
 চড়ানো শিখাইতেন। তাঁহারই অত্মপ্রেরণায় স্বদক
 ব্যায়ামবীর প্রিয়নাথ বসুর অধীনায়কত্বে প্রফেশার বোসের
 গ্রেটবেঙ্গল সার্কাস গড়িয়া উঠে। ক্ষুদ্র বালিকা কুসুমকে
 লইয়া বাহার উদ্ভব, কালক্রমে তাহাতে যোগদান করিয়া
 কয়েকজন বঙ্গমণী বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন পূর্বক বিখ-
 জগতকে বিমোহিত করিয়াছিলেন।

যে সময়ের কথা হইতেছে, সে যুগে কোন বাঙ্গালী
 মেয়ের পক্ষে প্রাক্ত সার্কাসে অবতীর্ণ হইয়া ক্রীড়াকৌশল
 প্রদর্শন করা অসম্ভব ব্যাপার ছিল। নব আগরণের
 উদ্বোধনায় আগ্রহ হইয়া সার্কাসে অবতীর্ণ হইয়া বাঙ্গালার
 বীর রমণীগণ বাঙ্গালীর ভীকতার কলঙ্ক দূর করিয়াছিলেন।

সার্কাস জগতে প্রথম বাঙ্গালী মহিলা যিনি োগ দেন,
 তাঁহার নাম সুনীলাসুন্দরী। ইহার পূর্বে অপর কোন
 বাঙ্গালী মহিলা সার্কাস খেলার যোগদান করিয়াছিলেন
 বলিয়া জানা যায় নাই। শুধু যোগদান করাই নহে, সুনীলা-
 সুন্দরীর কৃতিত্ব—তাঁহার শারীরিক শক্তি প্রদর্শনের ক্ষমতা
 ছিল অসাধারণ। অনেকের মতে, সুনীলাসুন্দরী সমগ্র
 ভারতের মধ্যে—হিংস্র বাঘের খেলা দেখাইতে প্রথম মহিলা
 খেলোয়াড়। শ্রীমতী সুনীলাসুন্দরী ব্যতীত অন্য কোন
 ভারতীয় রমণী বস্ত্র ব্যতীক লইয়া প্রাক্ত সার্কাসে খেলা
 দেখাইয়া দশমিনী হইতে পারেন নাই। নির্ভয়ে কোনরূপ
 অস্ত্র না লইয়া, আত্মরক্ষার জন্য একগাছি ছড়ি পর্যন্ত না
 লইয়া সুনীলা বাঘের খাঁচার প্রবেশ করিয়া যে আশ্চর্য
 ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা বাহারি না দেখিয়া-
 ছেন তাঁহাদের বুঝানো অসাধ্য। সেকালের “ইংলিশম্যান”
 পত্রের ইংরেজ সম্পাদক তাঁহার বিষয়ে লিখিয়াছিলেন—
 “হিন্দু রমণীগণ অবলা বলিয়াই কথিত; কিন্তু সুনীলাসুন্দরী

একান্ত নির্ভয়ে আত্মরক্ষার কোন ব্যবস্থা না করিয়া অক-
 বচীর অধিককাল হুইটী বস্ত্র ব্যতীক সহিত একান্ত নির্ভয়ে
 ও অবিচলিত ভাবে তাঁহার কৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন।
 বিস্তৃষ্ট, সামান্য বস্ত্রে, আত্মরক্ষার কোন ব্যবস্থা না
 করিয়া অর্ধঘণ্টার উপর বাঘ-মাছুবে প্রকৃত মল্লযুদ্ধ এবং
 ব্যাডমিন্টনে ভীষণ উত্তেজিত করিয়া পিকরের প্লাটফর্মের
 উপর একেবারে লম্বমান হইয়া শয়ন ও লক্ষ্যগণ পূর্বক
 ব্যাড কটক গ্রীবাদেশ ঘন ঘন দংশন করান ও পরস্পর ঘন
 ঘন চুষন ও আলিঙ্গন গ্রহণ—এরূপ লোমহর্ষক শোণিত-
 শোষক ব্যাপার আর কেহ দেখাইয়াছেন কিনা সন্দেহ।
 ব্যাডের খেলা ব্যতীত সুনীলাসুন্দরী ট্র্যাপিজ ও লেভার
 প্রভৃতিতেও ব্যায়াম কৌশল দেখাইতে পারিতেন এবং সেই
 সকল খেলায় তিনি অল্প সাহস, কৌশল ও শক্তিসত্তার
 পরিচয় দেন নাই।

সার্কাসক্রীড়ায় সুনীলার পরে যে বঙ্গমণী প্রসিদ্ধি লাভ
 করিয়াছিলেন তাঁহার নাম সুসরী। ইনি হস্তিপৃষ্ঠে উপবিষ্ট
 হইয়া সুন্দরবনের ব্যাডের সহিত খেলা দেখাইয়া
 অতৃতপূর্ব খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। স্থানিকিত হস্তি-
 পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া হস্তিপৃষ্ঠে উপবিষ্ট বস্ত্র ব্যাডের সহিত
 তিনি ঘেরূপ আশ্চর্য কৌশল ও বীরত্বের সহিত ক্রীড়া
 করিয়াছেন, তাহা যুগে দেখিলেও লোকে আতঙ্কিত হইয়া
 উঠে। ইহারই উল্লেখ করিয়া সেকালে কবি গাহিয়া-
 ছিলেন—

“কাঁদায়ে কলনা

গর্জে বাধাসনা

বঙ্গবীরাজনা বয়ে মরণে।”

সুনীলাসুন্দরীর ভগিনী কুমুদিনীও লেভার ও অস্ত্র খেলা
 ব্যতীত অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া নানাবিধ নরনরক
 খেলা দেখাইতেন। গ্রাম অর্ধপতাকী পূর্বে বাঙ্গালী
 অবলা জাতির একজনের দ্বারা অধারোহণ ও অশ্বপৃষ্ঠে
 নানারূপ অলচালনা দর্শককে কিরূপ বিমুগ্ধ করিত তাহা
 অজ্ঞান করা যায়। গ্রেট বেঙ্গল সার্কাসের সহিত এই
 তিনজন বীর রমণী ব্রহ্ম, মালয় উপদ্বীপ, জাভা, সুমাত্রা
 প্রভৃতি দেশের নগরে নগরে বাহিয়া বিশেষ সম্মান লাভ
 করিয়াছিলেন। তথা হইতে শিনাং ও পরে সিঙ্গাপুর

পূর্ণাঙ্গ বিজয়-পর্বে খেলা দেখাইয়া অর্ধে ও সমানে ভূবিভা হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

“গ্র্যাস ব্যানালিং”, “ক্রীণ লেভার”, “বল”, তার এবং ঈপিঞ্জের খেলা দেখাইয়া যে বঙ্গবালিকা বোসেস্ সার্কাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম মূলতানবালা। পরে ইনি বোড়ার চড়িতে শিখেন এবং অন্নদিনের মধ্যেই একজন “বেয়ার ব্যাক রাইডার” হইলেন। বোড়ার কাছে ফেন্ট ধরিয়া কোন একটি বেড়া বা আগড় লাফাইবার কালে (hurdle jum) বোড়ার সহিত উঠানামা করিয়া ঐ বেড়া ভিক্তানকে “ভলটিং এক্ট” বলা হয়। মূলতানবালা অতি দ্রুত এবং সুন্দরভাবে এইরূপ “ভলটিং এক্ট” করিতে পারিতেন।

অল্প বয়স হইতেই মূলতানবালার সাহসের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার বয়স আট কি নয় বৎসর হইবে, সেই সময়ে জাহাজের উপর এক হাতী তাঁহাকে শুঁড়ে জড়াইয়া ধরিয়া উঠু করিয়া লইয়া শুঁড়টি একেবারে ডেকেবাহিরে লংজের দিকে প্রসারিত করিয়া দেয়। বালিকা ভীত না হইয়া জলের উপরে শূন্য স্থলিতে থাকে। কিছুক্ষণ পরে হাতীটি মূলতানবালাকে নিরাপদে ডেকে নামাইয়া দেয়।

প্রায় পঁচিশ ছাব্বিশ বৎসর পূর্বে বালকালী মেয়ে প্রমীলাসুন্দরী এ্যাক্রোব্যাটস্ সার্কাসে খেলা দেখাইয়া লোকের বিশেষ আশ্রয়িতা ছিলেন। বেণীবাবুর এ্যাক্রোব্যাটস্ সার্কাসে ইনি খেলা দেখাইতেন। লোক বোঝাই পাড়ী পাড়ী বর্শা দিয়া ঠেলিয়া দিতেন, ত্রিশমণ ওজনের পাথর বুকের উপর ভাঙিতেন, তিনমণ ওজনের গোলা লইয়া খেলা করিতেন। ইনি বোসেস্ সার্কাসেও খেলা দেখাইয়াছেন।

বোসেস্ সার্কাসে অপর যে সকল বঙ্গরমণী কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে হুচিভা ও সুকুমারীর নাম উল্লেখযোগ্য। হুচিভা বল, ‘ল্যাভার’ ও ‘স্ল্যাকওয়াইর’ (Slack wire) প্রভৃতির খেলা দেখাইতেন এবং কনিষ্ঠা সুকুমারী ভাল “বেয়ার ব্যাক রাইডার” হইয়াছিলেন। অজ্ঞাত জী খেলোয়াড়গণের মধ্যে রাজবালা, শশীকলা, গোলাপ ও বলভের নাম উল্লেখযোগ্য। শশীকলা “ভল” ও “নিভল” নামক দুইটি ব্যায়ের সহিত খেলা

দেখাইতেন। গায়ত্রী দেবী নারী একজন বঙ্গরমণী অস্বাভাবিক নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন।

ইদানীং কালে “জেমিলী সার্কাসে” কুমারী রেবা রকিত নারী এক বঙ্গ বীরাক্ষণা নানাবিধ ক্রীড়াকৌশল প্রদর্শন করিয়া রমণী বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছেন। চতুর্থ বার্ষিক প্রেক্ষার ছাত্রী কুমারী রকিত বকের উপর ভারী “রোলার” উত্তোলন, কঠা বারা বর্শা ফলকের মুখে লৌহদণ্ড বাকান, পৃষ্ঠদেশে ধারালো তরবারি রাখিয়া পেটের উপর প্রস্তর ভগ্ন করা এবং বন্ধকের লক্ষ্যভেদে কৃতিত্বের অল্প পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল স্বর্গীয় হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়ের নিকট হইতে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে “দেবী চৌধুরাণী” উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। অতঃপর সার্কাসে যোগদান করিয়া বুকের উপর হস্তি উত্তোলন করিয়া এবং ২৫০ পাউণ্ড স্রীং টানার খেলা দেখাইয়া প্রভূত ধন ও গৌরব অর্জন করিয়াছেন।

পরবর্তীকালেও কয়েকজন বঙ্গরমণী বিভিন্ন সার্কাসে যোগদান করিয়াছেন। ইহা ঘটনা হিসাবে যেমন আনন্দদায়ক তেমনি অপরিমিত গৌরবাত্মকও। হৃকর ব্রতের পরীক্ষার এবং হুঃসাহসের তপস্তায় বালকালার নারীসমাজ যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া আসিয়াছেন, তাহাতে বালকালী-জাতির মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে। বঙ্গরমণীর এই শরীর পটুতার কাহিনী জাতির ইতিহাসে স্থানলাভের যোগ্য।

—

প্রসূতি-পরিচর্যা ও শিশুমঙ্গল

কুমারেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম.বি

গর্ভাবস্থায় প্রসূতির নিজের ও গর্ভস্থ-সন্তানের মঙ্গল ও ছোট-বড় বিপদ-দুর্ঘটনার আশঙ্কা-মোচনের উদ্দেশ্যে হুচিকিংসক ও অভিজ্ঞ দ্বিতীয় কাছে শারীরিক অবস্থা পরীক্ষার্থে বাবার সময়, পরিষ্কার একটি বিশিষ্ট বা বোতল প্রসূতির প্রভাতকালীন মূত্রের নমুনা (sample of the first urine in the morning of the would-be

এ ছাড়া প্রস্থতি-অবহার, প্রয়োজন থাকুক বা না থাকুক, নরকাই কোন অভিজ্ঞ দন্ত-চিকিৎসকের (Dentist) কুশলান্বিত, মেডিক্যাল সরকারী কারখানা, প্রস্থতি-অবহার করলে কারো অঙ্গ বিত্তর নাশারকর হাতের রোগ দেখা

দাঁতের সুস্থতা বজায় রাখা ছাড়া স্তনের বন্ধ সেতুটিও যে
প্রত্যেক প্রস্থতিরই অংশ পালনীর কর্তব্য—এ কথা স্মরণ
করিয়ে দিলে অনেকেই হয়তো নিত্য 'বাড়ানাড়ি' বা
অগ্রাসনিক আলোচনা মনে করতে পারেন। এমন ধারণা
পে.ষণ করা কিন্তু বুদ্ধিসঙ্গত নয়। কারণ, পান্চাঙ্ক
সভ্যতা রীতির অন্ধ-মহুকরণে আমাদের দেশের শিক্ষিত
সমাজে আমকাল, মাতৃ-সুতনদান প্রথা আমকাল প্রায়
তিরোহিত হতে শুরু করেছে...তার পরিবর্তে ইরানী
'মোডল দুধ' (Milk Bottle) বা 'মাইপোব' আর 'মোডেল-
দুধ' (Milk Powder) খাওয়ানোর প্রথা শহর ছেড়ে
পল্লীগাম অঞ্চলেও ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে। তার
ফলে, প্রস্থতি ও নবজাত শিশু—উভয়েরই বখেই অশকার
ঘটেছে। কারণ, এ দুগের প্রখ্যাত খাজাবিজ্ঞানশাস্ত্র
খ্যার কেদারনাথ দাস, ডাঃ উইলিয়ামস্ প্রস্থতি মনীষী
ছাড়াও, বিশ্বের অভ্যন্তর আধুনিক চিকিৎসক ও খাজাব
সকলেই একমত প্রকাশ করেছেন যে সন্তান প্রসবের পর
প্রস্থতির অঙ্গদুর সুব্যবহার সত্ত নবজাত শিশুকে সন্তান
করানো একান্তভাবে আবশ্যক। কিন্তু এই সব আধুনিক
বিশেষজ্ঞদের সুচিন্তিত অতিমত অগ্রাহ্য অবহেলা করে এ
দুগে ক্রমশঃই কৃত্রিম-খাদ্যে আমরা এত বেশী অত্যন্ত হয়ে
উঠেছি যে নবজাতকের মেহ-মনের উত্তরোত্তর গঠন, বৃদ্ধি
এমন কি, জীবনধারণের সত্ত মাতৃ-দুগই যে একমাত্র পুষ্টি

কর—খোঁচ ও হুস-খাচ, সেই আসল সত্যটুকুও আজ আধুনিক সভ্যতার চোখ-বাঁধানো মোহিনী-মারার অলীক জৌলুবার বলকানিতে শোচনীয়ভাবে তুলতে বসেছি, তুলতে বসেছি বলেই—অজ আমাদের বাঙলাদেশের ঘরে ঘরে অপূর্ণ নীর্বাকার, স্বাস্থ্যহীন যোগতীর্ণ স্বাস্থ্য-পঙ্ক-নিপুঞ্জ নিরানন্দময় শিশুদের ভীড়... ভবিষ্যতে এরাই কি সর্বপে তুলে ধরে রাখবে—বাঙলার আর বাঙালীর গৌরবময় ঐতিহ্যের পতাকা!... মনে রাখতে হবে—শিশুই জাতির ভবিষ্যৎ... আজ যারা মাতৃসুস্থ সুখ-পান করে তিলে তিলে বড় হয়ে উঠছে, আগামীকাল তারাও নৈহিক ও মানসিক সম্পূর্ণতা লাভ করে সামনে এসে দাঁড়াবে—দেশের ভাগ্য-নিয়ন্তা হয়ে! তাই সবার আগে প্রয়োজন—ভাদের সুপুট, নভেড, সুদীপ্ত-বলীমান দেহে-মনে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী করে গড়ে তোলা... ১২২ সে কাজের গুরুদায়িত্ব ভার রয়েছে শুধু আমাদের দেশের প্রত্যেক প্রসুতি-জননী হাতে সুচিকিৎসকের হাতে... অভিজ্ঞা খাজী হাতে। সেইজন্য ভবিষ্যৎ সন্তানের খাজ ভাণ্ডার বাতে তার সুস্থ-সবল দেহ-মন গঠনের উপযুক্ত পুষ্টিকর আহাৰ্য উপাদান পরিবেষণ করতে পারে, সেদিকে যথোচিত দৃষ্টিদান করা আজ একান্ত প্রয়োজন এবং সেই প্রয়োজনীয়তার কথা মনে করেই প্রত্যেক প্রসুতিরই উচিত—নিজের শারীরিক সুস্থতার নথকে সদা-সজাগ দৃষ্টি রাখা। প্রসুতির পক্ষে বিশেষ কোনো কার্যকারণে অভ্যস্ত ধরণের শারীরিক যন্ত্রাদির যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা সব সময়ে সম্ভবপর না হয়ে উঠলেও, নিয়মিতভাবে প্রত্যাহ সকালে এবং রাত্রে গরম ও ঠাণ্ডা জলে স্নান কর সাক্ষ্য করে, স্নানের 'বোটা' বা চুই (Tits of both the breasts) দুটিকে শুকনো-নরম তৈরালে বা কাপড়ের সাহায্যে দুহে পরিষ্কার রাখা একান্ত আবশ্যক। সুবিধায় পান্ডাত্য-চিকিৎসক সার ট্রি কিং ও বনামথডা। প্রবীণা খাজী লিড়িয়ার্ডের মতে, এ ব্যবস্থা অহসরণের কলে, প্রসুতির স্নান সুপুট, সুগঠিত ও পর্যাপ্ত দুগ্ধ-সম্পদে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে এঁরা দুজনে সম্প্রতিভাবে আরো অভিনব প্রক্রিয়া করেছেন যে প্রয়োজনমতো, প্রসুতির স্নানের 'বোটা' বা 'চুই' দুটিতে অল্প একটু 'অলিভ অয়েল' (Olive oil) কিবা 'বোরোগ্লিসারিনের' (Boroglycerine) প্রলেপ লাগিয়ে হাতের

আঙুলের সাহায্যে তাপোভাবে মার্জনা করে নিলেও অনেক সময় বিশেষ উপকার পাবেন। এ ভাবে স্নানের 'বোটা' বা 'চুই' মার্জনায় জন্ত, অলিভ অয়েল বা বোরোগ্লিসারিনের পরিবর্তে 'স্পিরিট' বা 'মলম' ব্যবহার করা উচিত নয়। কারণ, 'স্পিরিট' ব্যবহারে স্নানের চামড়া শুক হয়ে ফেটে যায় এবং 'মলমে' বেজে ওঠে। মার্জনা-কালে, হাতের আঙুলের সাহায্যে স্নানের 'বোটা' দুটিকে ঈষৎ ভোরে টানানি করে অবস্থা শক্ত হ্রস্ব দিয়ে যবে নেওয়া 'প্রয়োজন। প্রথম দিকে এ ভাবে যবা-মাজার কলে, প্রসুতির সামান্য কষ্টভোগ হলেও, পরে সর্বিশেষ উপকার পাবেন। তাছাড়া স্নানদ্বয়ও এভাবে মার্জনা করা দরকার। কারণ নিয়মিত মার্জনায় কলে, স্নানে অচিরেই দুগ্ধদারা সুপ্রবাহিত হয়। মার্জনা ছাড়াও, প্রসুতির স্নানে নিয়মিতভাবে সূর্যাকিরণের তাপ দেওয়া দরকার। এ ছাড়া অভিজ্ঞ খাজী-চিকিৎসককে দিয়েও পরীক্ষা করিয়ে প্রসুতির স্নানদ্বয়ের ভালমন্দ অবস্থা, সময় থাকতেই সুনির্দিষ্ট করে নেওয়া উচিত এবং যথোপযুক্ত পরীক্ষার পর, তাঁদের উপদেশ পরামর্শমুসারে প্রত্যেকটি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা-বিধি নিয়মিতভাবে মেনে চলা সকল প্রসুতিরই একান্ত পালনীয় কর্তব্য।

এ সব নিয়ম-পালন ছাড়াও প্রসুতির শারীরিক স্বাস্থ্য এবং মানসিক প্রকৃতি বজায় রাখার জন্ত অভিজ্ঞ চিকিৎসক-খাজীর পরামর্শমতো প্রত্যহ যথোচিত ব্যায়াম ও বিশ্রামের ব্যবস্থার দিকে সজাগ-দৃষ্টিদান করা বিশেষ আবশ্যক। অনেকেরই ধারণা—প্রসুতি-অবস্থার আদৌ কোনো শারীরিক ব্যায়াম অঙ্গসঞ্চালন বা কাজকর্ম করা উচিত নয়। এমন ধারণা রাখা কিন্তু ভুল। কারণ, বিশ্বের প্রবীণ ও প্রখ্যাত খাজীবিশিষ্টাংশবৃন্দের মতে, প্রসুতি-অবস্থার নিত্যন্ত অঙ্গভাবে দিন কাটানো শুধু অহুচিতই নয়, ভবিষ্যৎ জননী ও গর্ভস্থ-সন্তানের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষেও যথেষ্ট ক্ষতিকর। কারণ, প্রসুতি-অবস্থার ভবিষ্যৎ-জননী দেহে-মনে যে সব আত্যন্তিক-পরিবর্তন সূচিত হয় এবং জঠর-কন্দরে ক্রম-বর্ধমান ক্রম-শিশুর গঠন-পুষ্টি ও ভূমিষ্ঠপাতের উদ্দেশ্যে নিরন্তর যে অভিনব-প্রক্রিয়া চলে, তার কষ্ট-হুঁতোগ, বিশ্রামহীন অনেকাংশে লাঘব হতে পারে—যদি সকল প্রসুতিই সুচিকিৎসক-খাজীদের

পরামর্শদ্বারা নিত্য অলসভাবে শুয়ে-বসে দিন না কাটিয়ে প্রঃঃ নিয়মিতভাবে অল্প-বিস্তর শারীরিক-ব্যায়াম, অঙ্গ-সঞ্চালন এবং হালকা-ধরণের সাংসারিক কাজকর্মে লিপ্ত থেকে নিজের ও অনাগত-সন্তানের স্বাস্থ্যরক্ষার দিকে যথোচিত দৃষ্টিদান করেন। তবে যে সব মহিলা যেজন্ম অথবা নানান কার্যকারণে পড়ে প্রসূতি অবস্থাতেও অল্পকালের জন্য প্রয়োজনীয় বিশ্রাম-সুখ উপভোগের সুযোগ-সুবিধা বা ফুরশটুকুও পান না, প্রসঙ্গক্রমে তাঁদের এ বিষয়ে ছ'একটি পরামর্শী কথা বলে রাখি। অর্থাৎ, প্রসূতি-অবস্থায় নিত্য অলসভাবে দিন কাটানো, যেমন বাঞ্ছনীয় নয়, তেমনি দৈনন্দিন বিশ্রাম উপভোগের প্রয়োজনীয়তা-টুকু উপেক্ষা করে সারাক্ষণ শুধু সংসারের হাড়ভাঙা-পরিশ্রম বা স্বাভাবিক-অবস্থায় থাকাকালীন অভ্যাস মতো দৌড়-ঝাঁপ, খেলাধুলা, ব্যায়াম অহুশীল প্রভৃতি অত্যধিক অঙ্গ-সঞ্চালন করাও উচিত। একালের অভিজ্ঞ খাত্তাবিশারদেরা অতিমত প্রকাশ করেন যে সাধারণতঃ, প্রসূতি-অবস্থায় নিজের ও গর্ভস্থ-সন্তানের শারীরিক-স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখার উদ্দেশ্যে, প্রত্যেক মহিলারই স্বাভাবিক নিয়মে সাধ্য মতো এবং যথোচিত বরসংসারের কাজকর্ম করা উচিত... তবে অহেতুক খুব বেশী পরিশ্রম বা ছুটোছুটি-লাফঝাঁপ কিংবা ভারী জিনিসপত্র উঠানো-নামানো অথবা ঘন ঘন উঁচু সিঁড়ি ওঠা-নামা প্রভৃতি সাময়িকভাবে বর্জন করাই ভালো। স্বাভাবিক অবস্থায় যে সব মহিলার টেনিস, ব্যাডমিন্টন, বা স্কেটবল, সাঁতার প্রভৃতি খেলাধুলা করার অভ্যাস আছে, প্রসূতি-অবস্থায় গোড়ার দিকে, অভিজ্ঞ চিকিৎসকের উপদেশ পরামর্শদ্বারা, বিশেষ সাবধানে এমনকি ঘরগের ক্রীড়াস্থানে সাময়িকভাবে যোগদান করতে পারেন... তবে কিছুদিন বামেই এ সব প্রমাণপেক শারীরিক অহুশীল মূলত্বী রেখে, উষ্ণ মাঠে, ময়দানে, বাগানে কিংবা বাড়ীর ছাদে, বারান্দায়, উঠানে বা কোনো সমতল স্থানে প্রত্যহ নিয়মিতভাবে হেঁটে বেড়ানোই তাঁদের শরীর, মন-স্বাস্থ্য রাখার জন্য একান্ত কর্তব্য। এ ছাড়া প্রসূতি-অবস্থায় পর্যাপ্ত পরিমাণে মুক্ত-বায়ু সেবনেরও সবিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। তাই প্রসূতির পক্ষে, সারাক্ষণ বন্ধঘরে আটক হয়ে থাকা বাঞ্ছনীয় নয়... বরং যতটা সম্ভব—খোলা-বায়ুয় থেকে বিস্তৃত-বায়ু সেবন করলে

ওখু বে তাঁদের শারীরিক অবস্থার প্রচুর উন্নতি হয়ে তাই নয়, উপরন্তু মানসিক প্রকৃষ্টতাও বৃদ্ধি পাবে সবিশেষ। কারণ, প্রসূতির শারীরিক অবস্থার উন্নতি-অবনতির মাত্রা বিচার বনিষ্ঠভাবে অনেকখানি নির্ভর করে তাঁর মানসিক ক্ষুতি, প্রকৃষ্টতা বজায় রাখার উপর। এই জন্যই প্রসূতি অবস্থায় মহিলাদের সর্বদাই শান্তি, আনন্দময় পরিবেশে রাখা এবং হাসি-খুশী স্বভাবের আত্মীয়পরিজন, বন্ধুদের প্রীতিদায়ক সংসর্গে প্রকৃষ্টভাবে কালাতিবাহিত করার পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা দেওয়া একান্ত আবশ্যক। এ ব্যবস্থার ফলে, প্রসূতির শরীর, মন উভয়েরই যে যথেষ্ট ক্রমোন্নতিলাভ ঘটে, এমন দৃষ্টান্তও আমাদের আশেপাশে নিত্যই নজরে পড়ে।

তবে প্রসূতির পক্ষে, গর্ভস্থ-সন্তান ভূঁঠি হবার আগের তিনমাস বিশেষ সাবধানে থাকা প্রয়োজন। কারণ, মাতৃ-গর্ভে জগাবস্থা থেকে দিনে দিনে অপ্রসূত শিশু ক্রমেই সুপুষ্ট পরিণত হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে প্রসূতির শারীরিক অবস্থারও, যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটে এবং তাঁর দৈহিক ওজনও প্রায় সাত-আটসের বৃদ্ধি পায়। এই পরিবর্তন ও ওজন-বৃদ্ধির ফলে, সন্তান-প্রসবের কয়েকমাস পূর্বে প্রসূতির ঘেহের ভরিসামোয় ব্যতিক্রম ঘটে বলেই, তাঁর পক্ষে আগের মতো সহজে ও স্বাভাবিকভাবে ওঠা-বসা, বা নড়া-চড়া করা সম্ভব হয় না... বরং এতটুকু অসাধ্যবান হলেই, দৈহিক ভারসমতা যথার্থ বজায় রাখার ক্ষমতা হারিয়ে অনেক সময় অত্যধিক পা টলে পড়ে গিয়ে গুরুতর আঘাত পান, এমন কি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে দুর্ভাগ্যক্রমে নিজের ও গর্ভস্থ-সন্তানের জীবনসঙ্কটেরও সম্মুখীন হয়ে দাঁড়ান। এই সব কারণেই প্রসূতি অবস্থায় শেষভাগে, প্রত্যেক মহিলারই, নিজের ও অনাগত-সন্তানের মঙ্গলের জন্য, চলা-ফেরার বিষয়ে সবিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। তাই অভিজ্ঞ-খাত্তাবিশারদেরা অধুনা সর্বদাই প্রসূতিকে উঁচু-গোড়ালীর জুতো ব্যবহার, অথবা সিঁড়ি ওঠা-নামা বা অসমান-অমিতে চলাফেরা, অবাধে গাড়ী চড়ে দূর ভ্রমণে বেরনো প্রভৃতি নানা বিষয়ে সাময়িকভাবে নিষেধ থাকতে সুপরামর্শ দিয়ে থাকেন। তাছাড়া নিয়মিত ব্যায়াম-হুশীলনে শরীর, মন, পুষ্ট, সবল ও সুস্থ থাকে বলেই, আনন্দ-কাল খাত্তাবিশারদগণ চিকিৎসক এবং খাত্তাবা অনেকেরই

প্রস্তুতির ক্ষেত্রে বিশেষ ধরনের যে সব ব্যায়াম পদ্ধতিরও ব্যবস্থা বিধান করেন, তাঁদের উপদেশ মতো সেগুলি প্রত্যাহ কিছুকণে অভ্যাস করা দরকার। প্রস্তুতির পক্ষে, চিকিৎসকের পরামর্শ অস্বাভাবিক, এ সব সহজ সরল অনার্যাস-সাধ্য হালকা ধরনের ব্যায়াম—গোড়ার দিকে দু'তিম মিনিট থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে ক্রমশঃ দশমিনিটকাল পর্যন্ত নিয়মিতভাবে অনুশীলন করা চলে। এমন কি, প্রস্তুতির শারীরিক অবস্থা বোধোচিত অল্প সবল থাকলে, সন্তান এসবের মাত্র সপ্তাহ খানেক পরেও, চিকিৎসকের উপদেশানুসারে আঁতুড়-বর, হাসপাতালে শয্যাশায়িত থেকেও বিশেষ নির্দিষ্ট করেকটি ভঙ্গীতে শুধু হাত-পা সঞ্চালন করে প্রস্তুতির অনার্যাসেই তাঁদের পূর্ব অভ্যাস মতো ব্যায়াম চর্চার রীতি অব্যাহত রাখতে পারেন।

প্রস্তুতি-পরিচর্যার বিষয়ে এবারের আলোচনা শেষ করার আগে, আধুনিক খাত্ত্রীবিজ্ঞানবিদদেরা নিয়মিত-ভাবে অনুশীলনার্থে তবিত্ত্ব-জননীর প্রাত্যহিক-বিজ্ঞানের উপযোগী যে বিশেষ-ব্যবস্থা-বিধি প্রণয়ন করেছেন, তারও মোটামুটি হমিশ দিয়ে রাখি। তাঁদের মতে, প্রস্তুতি-অবস্থার—বিশেষভাবে সন্তান-এসবের মাস তিনেক আগে থেকেই, প্রত্যেক ভাবী-জননীরই উচিত—প্রত্যাহ প্রতিবার পূর্ণ-আহার্যাদির পর, নিজের কোমরের পরিধান-বস্ত্র আলগা করে দিয়ে সমতল ও নরম শয্যা় চিং হয়ে শুয়ে অন্ততঃপক্ষে ঘণ্টাখানেক সময় নিশ্চিন্ত-আরামে 'গড়িয়ে' (আরামের দেশের সনাতন মেরেলী ভাষায়) পরম শান্তিতে বিজ্ঞান-সুখ উপভোগ করা। এমনভাবে পরিপূর্ণ-বিজ্ঞান গ্রহণের-কালে, শুধু যে প্রস্তুতিরই স্বাস্থ্যোন্নতি হবে তাই নয়, গর্ভস্থ-সন্তানের ক্রমিক-গঠন, পুষ্টি ও পরিণতির পক্ষেও খেটে সহায়তা করবে।



রূপগর্গ দেবী

মহিলাদের দৈহিক শ্রী-সৌন্দর্য্য সুদীর্ঘকাল অক্ষুর-অটুত রাখার উপযোগী বিশেষধরনের করেকটি ব্যায়ামভঙ্গী-অনুশীলনের কথা ইতিপূর্বেই বলেছি...এবারে মেয়েদের মুখের রূপলাবণ্যশোভা সম্পাদনের ক্ষেত্রে যে সব ব্যায়াম-চর্চা প্রয়োজন—তারই মোটামুটি পরিচয় দিই।

শুধু অঙ্গপ্রত্যঙ্গের স্থায়ীগড়ন আর গাত্র-বক মন্থণ গৌরবর্ণের হলোই কোনো মহিলাকে পুরোপুরিভাবে 'সুন্দরী,রূপসী' বলা চলে না...কারণ, এ সব দৈহিক-সৌন্দর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখের গঠনও বেশ পরিপাটি নিখুঁত ধরনের হওয়া আবশ্যিক। তবে সচরাচর লোকে কথায় বলে যে—'চাঁদেও কলঙ্ক আছে'! এক্ষেত্রেও ঠিক তাই! বাস্তবিকই, সর্বাঙ্গীণ সুন্দর দেহের গঠন, আগাগোড়া মন্থণ উজ্জল গৌরবর্ণ গাঁয়ের বক আর নিখুঁত মুখশ্রী লাভ্যের অধিকারিণী অতুলরূপবতী নারী সহজে বড় একটা নজরে পড়ে না—সারা দেশে খুঁজে বেড়ালে, হয়তো বা হাজারে মাত্র দশজন, সব বিষয়ে নিখুঁত সুন্দরী এমন সুরূপা-নারীর বর্ণন মেলে। কাণ্ডেই সর্বতোভাবে রূপসী নারীকে ছুনিয়াতে যখন এতই দুর্ভাগ্য, তখন চেহারার অঙ্গ-বিস্তার খুঁত-ক্রটি থাকলেও, মোটামুটিভাবে সচরাচর আমরা বাঁধের সুন্দরীরূপবতী বলি, সেই সব মহিলা যদি নিয়মিত রূপচর্চার করেকটি অভ্যাবস্ত্রকীয় সহজ সরল বিধি নিয়মাবলী...অর্থাৎ, দৈহিক দান, অঙ্গ-প্রসাধন, সুনিয়মিত খাদ্য পানীয় আহার, কোঠপরিষ্কার, ব্যায়াম-অনুশীলন, বোধোচিত কারিকপরিচয় ও বিজ্ঞান

তপস্যাস, সুস্ত্যাস, শেবন, প্রয়োজনানুযায়ী বেশভূষা ধারণ প্রভৃতি, বিবিধ বিষয়গুলি সম্বন্ধে অতুসরণ করে চলেন, তাহলে অনায়াসেই তাঁরা দেহের, মুখের ও গাত্রবস্ত্রের লাবণ্য-শ্রী, সৌকুমার্য এবং সুসামঞ্জস্য বজায় রাখতে পারবেন সুদীর্ঘকাল—এমন কি, পরিণতবৃদ্ধবয়স পর্যন্ত। আধুনিক বিশেষজ্ঞদের মতে,—মানব দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাধির পুষ্টি এবং গাত্রবস্ত্রের বর্ণ-লালিত্য প্রধানতঃ নির্ভর করে—সুবিবেচিত খাদ্য-পানীর উপর—তাছাড়া নিয়মিতভাবে উপরোক্ত বিধি-নিয়মাবলী পালনে ও প্রাত্যহিক ব্যায়াম অহুশীলনেও শারীরিক রূপ-লাবণ্যের প্রকৃত উন্নতিসাধন সম্ভব হয়। এমন কি, দেহের বা মুখের গড়নে যদি অঙ্গবিস্তার খুঁত থাকে, একালের শরীর-তত্ত্ব বিশেষজ্ঞদের পরামর্শানুসারে বিধিবদ্ধ অভিনব কয়েকটি ব্যায়ামপালনে সহজ উপায়েই সে সব দোষ ক্রটিরও সুসংস্কার করা চলে। ব্যায়াম অহুশীলনের ফলে, দেহের গঠন কি উপায়ে নিখুঁত হুন্দর করে তোলা যায়, তার মোটামুটি পরিচয় ইতিপূর্বেই দিয়েছি। সুতরাং সে বিষয়ে বিশদ আলোচনা না করে, আধুনিক বিশেষজ্ঞদের মতে, মুখের শ্রী-সম্পাদনে সহজ, সরল, অনায়াসসাধ্য যে কয়টি ব্যায়াম অহুশীলন প্রয়োজন, আপাততঃ, তারই মোটামুটি হদিশ দিই।

সচরাচর বয়স বৃদ্ধি, অথবা অনিয়মিত খাদ্য, পানীয় গ্রহণ, অসংযমী বিলাস বা অত্যধিক দিবাশ্রমাদি কিম্বা বংশগত শারীরিক গ্রন্থির গোলযোগ প্রভৃতি নানান কারণে অনাবশ্যক যেন-বৃদ্ধির ফলে, অনেক রূপসী-মহিলারই মুখের নীচের দিকে অর্থাৎ, চিবুকের তলদেশে বেশ পুরু আরেক প্রহ মাংস চর্কির স্তর বা 'ডবল্ চিন' (Double Chin) দেখা দেয়। এ ধরনের 'ডবল্ চিন' বা 'দু-পুরু চিবুক' মহিলাদের রূপ-সৌন্দর্যের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর। কারণ, এভাবে চিবুকের তলদেশে যেন বৃদ্ধির ফলে, তাঁদের মুখের সুশ্রী-সুভৌল রমণীয়তা ক্রমেই হুলুও বিলী-বমানান ধরণের হয়ে ওঠে—দেখলে মনে হয়, বয়স যেন হঠাৎ অনেকখানি বেড়ে গিয়েছে। আধুনিক বিশেষজ্ঞদের মতে, একটি নিশ্চয় করে মুখের সুশ্রী-সুঠাম গঠন আর রূপলাবণ্য অটুট অন্তর বজায় রাখতে হলে, নীচের ১ নং চিত্রে 'চিবুক-মর্দনের' (Chin Massage) যে অভিনব

ব্যায়াম পদ্ধতিতে দেখানো হয়েছে, সেটি নিয়মিতভাবে প্রত্যহ রাতে শয্যাগ্রহণের পূর্বে অন্ততঃ পক্ষে মিনিট দশেককাল সম্বন্ধে অহুশীলন করা প্রয়োজন। এ ব্যায়ামটির অহুশীলন পদ্ধতি হলো—চুই হাতের তালুতে প্রথমে



পরিমাণে ক্রীম বা পমেড-ভ্যাশেলিন অথবা অলিভ-অয়েল কিম্বা নারিকেল তেল চেলে, হাতের তালু দুটিকে তৈলাক্ত করে নিন। তারপর ডান হাতের আঙ্গুল-গুলির সাহায্যে ধীরে চাপ দিয়ে, মুখের তলদেশে অর্থাৎ বাঁ-দিকের চিবুকের গোড়া থেকে শুরু করে বাঁ-দিকের ঘাড়ের পিছনদিক পর্যন্ত তৈলাক্ত হাতে বেশ ভালো ভাবে অবিরাম রগড়ে বেশ কিছুকণ সম্বন্ধে 'মর্দন' (Massage) করুন। কয়েকবার এভাবে 'মর্দনের' পর, হাত বদলে নিন এবং পূর্ববর্ণিত পদ্ধতিতে এবার বাঁহাতের আঙ্গুলের সাহায্যে, উপরের ২ নং চিত্রের ভঙ্গীতে ডানদিকের চিবুকের গোড়া থেকে ডানদিকের ঘাড়ের পিছন দিক পর্যন্ত অঙ্গুরণভাবে কিছুকণ তৈলাক্তহাতে বার কয়েক 'মর্দন-মর্দন' করবেন। এমনভাবে মিনিট দশেককাল একবার ডানহাতের তৈলাক্ত আঙ্গুলের সাহায্যে বাঁদিকের চিবুক ও ঘাড়, এবং রীতি বদল করে আরেকবার বাঁহাতের তৈলাক্ত আঙ্গুলের সহায়তায় অঙ্গুরণ ভঙ্গীতে ডানদিকের চিবুক ও ঘাড়ের অংশে অবিরাম 'মর্দন-মর্দন' করা প্রয়োজন। প্রত্যহ রাতে নিয়মিত এভাবে 'মর্দন-মর্দনের' ব্যায়াম পদ্ধতিটি অহুশীলনে চিবুকের তলদেশে ও ঘাড়ের অংশে রক্তচলাচল ত্বরান্বিত হবার ফলে, মুখের নীচের দিকে অনাবশ্যক যেন স্ফর বা চর্কি আদিক্য লোপ পাবে এবং মহিলাদের

রূপ-সৌন্দর্য হানিকর ‘ডবল চিন’ অর্থাৎ, ‘দু-পুরু চিবুকের’ চিহ্নস্বাক্ষর থাকবে না।

মহিলাদের চিবুকে বা থুত্নীতে দোব ত্রুটি থাকলে... অর্থাৎ, মুখের তলদেশের গড়ন বাঁকা বা বেয়াড়া বেমানান হাঁড়ের হলে, সে খুব সংস্কারের জন্য বিশেষ ধরণের যে ব্যায়াম পদ্ধতিটি অঙ্গসংরক্ষণ করা দরকার—নীচের ২নং চিত্রে তার মোটামুটি হদিশ দেওয়া হয়েছে।



এ ব্যায়ামের অঙ্গশীলন পদ্ধতি হলো—ইতিপূর্বে উল্লিখিত প্রকার ছই হাতের তালু তৈলাক্ত করে নেবার পর, উপরের ২নং ছবির ভঙ্গীতে আঙুলের সাহায্যে বাঁদিকের কানের নীচের ও থুত্নীর উপরের গালের মাংসল মেমবহল অংশ ছই হাতের বুকাপুষ্ঠ আর তল্লনীর সংজোর চাপ দিয়ে, গালের হাড়ের উর্ধ্বে তুলে ধরুন এবং কয়েক মুহূর্তের জন্য সে জায়গাটিতে তৈলাক্ত হাতের আঙুলের চাপ দিয়ে বার কয়েক ধীরে ধীরে গালের অংশ টিপে ও ছেড়ে, পরকণ্ঠেই নীতি বদল করে, হবহ আগের মতো ভঙ্গীতে—তবে এবারে হাতের আঙুলের চাপ দিয়ে বাঁদিকের গালের উপরদিক থেকে ক্রমশঃ চিবুকের নীচের দিকে নেমে গিয়ে পুনরায় চিবুকের মাংসল মেমবহল অংশ সম্বন্ধে কিছুকণ ‘ডলাই-মলাই’ (massage) করুন। এমনভাবে অন্ততঃ পক্ষে দশ মিনিট ধরে হাতের আঙুলের সহায়তায় কিছুকণ বাঁদিকের চিবুংগাল ও থুত্নী, এবং কিছুকণ অঙ্গরূপ ভঙ্গীতে ডানদিকের চিবুংগাল ও থুত্নী ভালভাবে চাপ দিয়ে অবিরাম ‘ডলাই-মলাই’ ও ‘টেপ্পটিপি’ করতে হবে, জরহলেই চিবুক আর থুত্নীর দোব ত্রুটি অচিরেই নিশ্চিহ্ন হয়ে অপক্লপ শ্রীসৌন্দর্যে মহিলাদের মুখের গড়ন ও লাবণ্য আদোষ বোধী রমণীর মনোরম করে তুলবে।

হানাতাবেয় কারণে এবারে মহিলাদের মুখের শ্রীসম্পাদনের উপযোগী আরো কয়েকটি ব্যায়াম পদ্ধতির পরিচয় দেওয়া সম্ভব হয়ে উঠলো না। আগামী সংখ্যার সেগুলির মোটামুটি হদিশ দেবার বাসনা রইলো।

—



হাতের কাজ

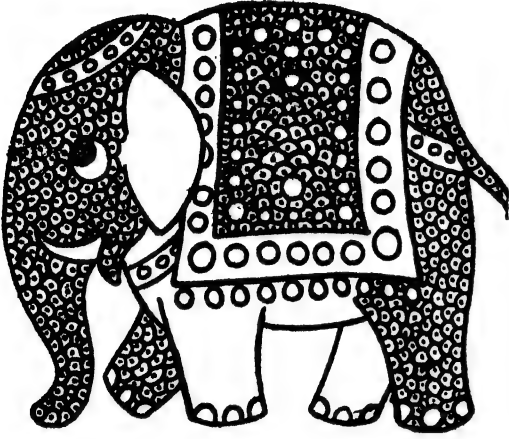
মাছের আঁশের কারু-শিল্প

রুচিরা দেবী

গত সংখ্যায় আলোচনা প্রসঙ্গে মাছের আঁশের গারে বিভিন্ন রঙের ছোপ ধরানো এবং আবশ্যকমতো হাঁড়ের বগুচে পুঁতি, চুম্বকি সংগ্রহের বিষয়ে মোটামুটি যে সব হদিশ দিয়েছি, সেই মতো এই বিশেষ ধরণের কারুশিল্পের উপযোগী বিবিধ উপকরণ জোগাড় হবার পর, কাপড়ের জমিতে ইতিপূর্বে ‘ট্রেসিং’ পদ্ধতিতে ছকে রাখা ধাতির নক্সাটিকে আগাগোড়া নিখুঁত পরিপাটিভাবে একের পর এক নানারঙে ছোপানো তিজা নরম মাছের আঁশ সাজিয়ে ভরাট করে তোলায় কাজে হাত দিতে হবে। সুনিপুণ স্তম্ভর ছাঁদে এমনভাবে কাপড়ের জমিতে আঁকা বিচিত্র নক্সাটিকে কুটিয়ে তুলতে হলে, সচরাচর যে বিশেষ শিল্পরীতি অঙ্গসংরক্ষণ করা হয়ে থাকে, আপাততঃ তারই পরিচয় দিই।

কাপড়ের জমিতে আঁকা হাতীর নক্সা চিত্রটিকে ধাবাধ ভাবে রূপদানের জন্য, পছন্দমতো নীল, শাদা অথবা ছাই রঙে ছোপানো মাছের আঁশগুলি বেন আগাগোড়া তিজা নরম অবস্থায় থাকে—সেদিকে সজাগ দৃষ্টিমান করা বিশেষ প্রয়োজন। কারণ, এধরণের কারুশিল্পসামগ্রী রচনাকালে

মাছের আঁশগুলি ভিজা নরম অবস্থায় না থেকে যদি শুকিয়ে শক্ত কড়কড়ে হয়ে ওঠে, তাহলে কাজের সময় রীতিমত অসুবিধা ভোগ করতে হবে...তাছাড়া শিল্প সামগ্রীটিও শেখ পর্যন্ত অসুন্দর বেরাড়া ছাঁদের হয়ে ওঠার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। কাজেই এ বিষয়ে সতর্ক নরম রাখা একান্ত দরকার। কাপড়ের জমিতে আঁকা নক্সাটিকে কি ভাবে একের পর এক মাছের আঁশ সাজিয়ে বসিয়ে সুচারুছান্দে ফুটিয়ে তুলতে হবে, তার সুস্পষ্ট হদিশ মিলবে—নীচের ছবিটি থেকে।



হাতীর যে মক্সা চিত্রটি আঁকা রয়েছে, সেটির কোনো একদিকের প্রান্ত সীমা থেকে একের পর এক পাশাপাশি সারবন্দীভাবে পছন্দমতো বিভিন্ন রঙে ছোপানো মাছের-আঁশগুলিকে নিখুঁত ও পরিপাটি ধরণে সাজিয়ে বসাতে হবে। কাপড়ের জমিতে পাশাপাশি সারবন্দীভাবে মাছের-আঁশগুলিকে সাজিয়ে বসানোর সময়—প্রত্যেকটি আঁশের উপরে মানানসই-রঙের চুম্বকি আর পুঁতি বসিয়ে হুট-হুতোর সেলাই দিয়ে সেটিকে পাকাপোক্ত-ধরণে গঁথে নিতে হবে। কাপড়ের জমিতে এমনভাবে মাছের-আঁশ বসানোর চিত্রাচরিত-নিয়ম হলো—একটি আঁশের উপরে চুম্বকি ও পুঁতি বসিয়ে হুতোর ফোড় তুলে পাকা-সেলাই দিয়ে সেটিকে বেশ আঁটসাঁটভাবে গঁথে নিয়ে, প্রথমেক আঁশের প্রায় অর্ধেকটুকু ঢেকে অপর আঁশটিকেও পূর্বোক্ত-প্রকার চুম্বকি পুঁতির চাপ-সমত সেলাই দিয়ে পাকাপোক্তভাবে কাপড়ের জমির সঙ্গে সেঁটে বসিয়ে

যেওয়া। হুটী-শিল্প সবচেয়ে ধীরে অল্প-বিস্তর অভিজ্ঞতা আছে, উপরের নক্সাটি দেখলেই তাঁরা বিশেষ ধরণের এই কারুশিল্প-রচনার পদ্ধতিটি সহজে এবং সুস্পষ্টভাবেই অনু-ধাবন করতে পারবেন। অর্থাৎ, উপরের নক্সা-চিত্রে হাতীর দেহের বিভিন্ন অংশে ‘ফুটকি-চিহ্নিত’ ছোট-ছোট যে সব ‘গোলাকৃতি-নিশানা’ দেখানো রয়েছে, ঠিক তেমনিভাবেই কাপড়ের জমিতে একের পর এক ভিজা নরম ও পছন্দমতো রঙে ছোপানো মাছের আঁশগুলিকে পাশাপাশি সারবন্দী ছান্দে চুম্বকি পুঁতি গঁথে সেলাই করে সাজিয়ে বসাতে হবে। এইভাবেই শুধু নক্সার আঁকা হাতীর দেহাংশেই নয়, কারুশিল্পীর ব্যক্তিগত কচি ও অভিজ্ঞতার অনুসারে, সুসজ্জিত সালকারা হাতীর গলার, মাথার ও পিছন দিকের মালা বন্ধনীগুলি এবং পিঠের উপরের ঝালরদার চাদর প্রভৃতিও যথোচিত-উপায়ে রঙচঙে মাছের-আঁশ আর পুঁতি-চুম্বকি বসিয়ে অনায়াসেই অপকল্প শোভামণ্ডিত করে তুলতে পারবেন। তবে আমাদের মতে, হাতীর পিঠের ঝালর এবং মাথার, গলার ও পিছনের মালা-বন্ধনী প্রভৃতির জন্য, মাছের-আঁশের বদলে, শুধু ছোট-বড় নানাধরণের চটকদার পুঁতি-চুম্বকি ব্যবহার করাই বিধেয়। কারণ, কারুশিল্প-সামগ্রী তাহলে এক-বেয়েমীর ক্রটিমুক্ত হয়ে, আরো অপকল্প-মনোরম সর্কাজ-সুন্দর অভিনব রূপধারণ করবে—এই আমাদের ধারণা। শিল্পীদের সুবিধার জন্য আপাততঃ, সহজ-সরল অভিজ্ঞ-সাধারণ একটি নক্সার সাহায্যে মাছের-আঁশের কারু-শিল্পের অভিনব-পদ্ধতির মোটামুটি আভাস দেওয়া হলো। শারদীয় উৎসব উপলক্ষ্যে আগামী সংখ্যায় এই ধরণের কারু-শিল্পের আরো কয়েকটি বিচিত্র-আলংকারিক নক্সা-নতুন নক্সা-নমুনার কলাম্বুরাগিণীদের সাধারণহার দেবার বাসনা রইলো।

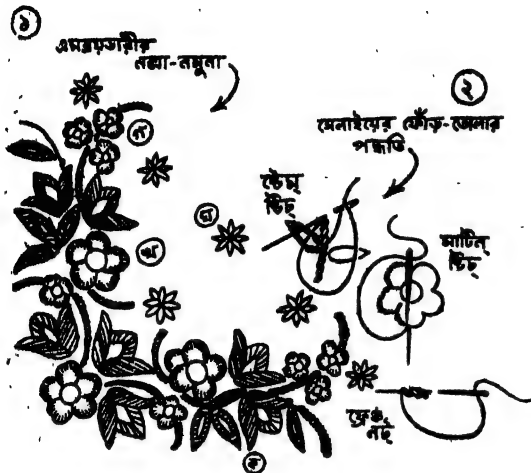
—

এমব্রয়ডারীর নতুন নক্সা-নমুনা

হিরণ্ময়ী দেবী

ধর-সংসারের নৈনন্দিন কাজকর্মের অবসরে যে সব মহিলার ছোট-বড় সৌখিন ও দরকারী নানারকর হুটী

শিল্প-সামগ্রী বচনার দিকে বেশীক আছে, তাঁরা সৰ্বস্বাই নতুন-নতুন ধরণের বিচিত্র ‘প্যাটার্ন’ (Patterns) বা ‘নকসা-নমুনা’ (Design-motifs) সংগ্রহের অন্ত বিশেষ উৎসুক। এবারে তাই তাঁদের সেলাইয়ের কাজের সুবিধার জন্য, অভিনব-ছাঁদের একটি এম্ব্রয়ডারীর নতুন নকসা-উপহার দিচ্ছি।



উপরে ফুল-লতা-পাতার সাঁজানো এম্ব্রয়ডারী-সুচী-শিল্পের উপযোগী যে ‘আলংকারিক-নক্সার’ (Decorative-motif) কাপড়ের জমির সঙ্গে মানানসই এমন ধরণের বিভিন্ন রঙের সূতোর সাহায্যে সেলাই দিয়ে নমুনাটি দেখানো হয়েছে, সেটিকে সূচাকণ্ঠে রুমাল, ‘স্কার্ফ’ (Scarf) কুশানের ওয়াড়, টেবিল-রুখ, ‘রানার’ (Runner), বিছানা-ঢাকা, পর্দা, বালিশের ওয়াড়, কাপড়ের তৈরী ব্যাগ প্রভৃতির ‘কিনারা-চিত্রণের’ (Corner Design) কাজে ব্যবহার করা যাবে। তবে খেয়াল রাখবেন—কাপড়ের জমির রঙ যদি গাঢ়-ধরণের হয়, তাহলে হালকা-রঙের সূতো এবং কাপড়ের জমির রঙ হালকা-ধরণের হলে নক্সাটি বাতে আগাগোড়া মানানসই দেখান এমন সব গাঢ় রঙের সূতো বেছে নিয়ে এম্ব্রয়ডারী সুচীশিল্পের কাজ করতে হবে। ধরুন—কাপড়ের জমি পাতি-লেবুর মতো কিক-হল্লের রঙের (Lemon Yellow Colour) একেজ, উপরের ‘প্যাটার্ন’ (Pattern) বা নক্সার ‘ক’-চিহ্নিত বর্টার মতো ছাঁদের ফুলগুলি এম্ব্রয়ডারী করতে হবে—গাঢ়-লাল (Scarlet বা Crimson Red) রঙের

সূতো দিয়ে; ‘খ’ চিহ্নিত ফুলগুলি রচনা করবেন—কিক নীল (Light Blue) বা আশমানী কিম্বা কিরোজা (Mauve) রঙের সূতোর সাহায্যে; ‘গ’ চিহ্নিত ছোট ছোট ফুলগুলি সেলাই করার জন্য বেছে নেবেন সাঁপা রঙের (Cream or white Colour) সূতো। এ সব ফুলের ভিতরকার গোলাকার অংশ রচনা করবেন কমলা লেবুর মতো কিক কমলা রঙের সূতো দিয়ে এবং উল্লিখিত প্রত্যেক ধরণের ফুলই এম্ব্রয়ডারী করতে হবে উপরের ২নং চিত্রে দেখানো ‘স্যাটিন স্টিচ’ সেলাইয়ের ফৌজ তুলে। ‘ঘ’ চিহ্নিত তারার মতো ছাঁদের ছোট ফুলগুলি এম্ব্রয়ডারী করবেন উপরোক্ত গাঢ় লাল রঙের সূতো এবং ‘স্যাটিন স্টিচ’ সেলাই পদ্ধতির সাহায্যে। নক্সার দেখানো পাতার অংশ রচনার জন্য—সবুজ রঙের সূতো ব্যবহার করে উপরের ২নং চিত্রের ভঙ্গীতে ‘স্টেম স্টিচ’ (Stem Stich) পদ্ধতিতে সূতোর ফৌজ তুলে সেলাই দিতে হবে। লতার অংশ এম্ব্রয়ডারী করবেন—গাঢ় সবুজ রঙের সূতো এবং উপরের ২নং ছবিতে দেখানো ‘ফ্রেন্চ নট’ (French Knot) সেলাইয়ের সাহায্যে। তাহলেই দিবিয়া স্তম্ভ স্থানর সহজ উপায়ে উপরের নক্সা নমুনার বিচিত্র প্রতি লিপিতিকে এম্ব্রয়ডারীর কাজ করে নিখুঁত ছাঁদে সুচীশিল্পের কাপড়ের জমিতে কুটিয়ে তোলা সম্ভব হবে। মোটামুটি এই হাশিষ্টকু জানিয়েই এবারের মতো আলোচনা শেষ করছি। বারাস্তরে এমন ধরণের আরো কয়েকটি নতুন নতুন সুচীশিল্পের নক্সা নমুনার আভাস দেবার চেষ্টা করবো।



স্থধীরা হালদার

বাঙলা দেশে চিরকালই বাছ, ছব, তরী-তরকারী আর কল-পাকুড়ের অন্ত বিখ্যাত। কিন্তু সম্প্রতি এমনই দুদিন

জুজু হয়েছে। যে বাজারে আনাকাল টাটকা-সরস এ সব সাবঙ্গী সংগ্রহ করাই দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে উঠছে ক্রমশঃ... মাঝে মাঝে অন্ন-সন্ন বা কিছু বা মেলে—তাও অস্বিস্মৃ... সাধারণ গৃহস্থের কেনার ক্ষমতার বাইরে। অথচ, সংসারে প্রিয়জনদের পাতে ভালমন্দ পাঁচ রকমের সুখাচ্ছ মুখরোচক খাবার রান্না করে সব্বদে পরিবেশনের বাসনা কোন অগৃহিণীরই বা নেই! তাছাড়া সেই আবহমানকাল থেকেই বাঙালীর ঘরেঘরে ‘বারো মাসে হেরো পার্কণের’ পালা তো লেগেই রয়েছে। ছোট-বড় এ সব উৎসব-অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে বাড়ীতে লোকজনকে আমন্ত্রণ জানিয়ে সাধারণে ভূরি-ভোজনে আপ্যায়িত করাও দিন-দিন খুবই হুমুস্কার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে... তরী-তরকারী, ফল-পাকুড়, দুধ-মিষ্টানের কথা ছেড়ে দিলেও, রসনা-তৃপ্তিকর মাছ-মাংস জোগাড় করাও ইদানীং রীতিমত কঠিন কাজ! বাঙালীরাশে মাছের এমন সঙ্গীণ অভাব ঘটবে—এ কথা কেউ কোনোদিন কল্পনাও করতে পারেনি এবং এ সঙ্কট-মোচন যে কবে সম্ভব হবে—তারও কোনো সুস্পষ্ট ধারণা নেই কারো। কাজেই এই অপ্রত্যাশিত খাত-সঙ্কটের দিনে আমিষ-রান্নার কথা আলোচনা না করে বরং, অভিনব মুখরোচক একধরনের নিরামিষ খাবারের রন্ধন-প্রণালীর পরিচয় দিই।

এবারে যে নিরামিষ খাবার রান্নার কথা বলছি, সেটির নাম—‘বাটাট্যাচা প্রকার’। এটি ভারতের মহারাজ্যীয় অধিবাসীদের বিশেষপ্রিয় অপরূপ সুখাচ্ছ এক ধরনের নিরামিষ খাত। এ খাবার রান্নার প্রণালী নিত্যন্তই সহজ সরল এবং এ জন্য যে সব উপকরণ প্রয়োজন—সেগুলিও রীতিমত সুলভ বরোমা ধরনের। কাজেই বাড়ীতে নিজের হাতে অভিনব উপায়ে এই মহারাজ্যীয় নিরামিষ খাতটি রান্না করা যে কোনো মহিলার পক্ষেই এমন কিছু কঠিন বা ব্যয়বহুল ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে বলে ধারণা হয় না।

অন্ততঃপক্ষে, চার-পাঁচজন আত্মীয়-অতিথিকে আপ্যায়নের উদ্দেশ্যে মহারাজ্যীয় প্রখ্যাত ‘বাটাট্যাচা প্রকার’ খাবার রান্নার ভক্ত যে সব উপকরণ দরকার, গোড়াতেই তার একটা গোটা মুঠি বর্ধ দিয়ে রাখি। অর্থাৎ, এ খাবার বাসানোর জন্য চাই—৪টি পুষ্কট বড় আলু, ৪টি বড় সাইজের পেঁয়াজ, ৪টি কাঁচা লড়া, শিকি [১১] আঁচ ধনেশাক, শিকি [১২] খানা নারিকেল, চারের পেয়ালার এক-পেয়াল পরিমাণ ছত্রি, চারের চামচের আধচামচ পরিমাণ

জীরা, বড় চামচের তিনচামচ পরিমাণ ঘি এবং আনাক-মতো পরিমাণে খানিকটা গুঁড়ো ছুন।

কর্দমতে উপকরণগুলির সংগ্রহ হবার পর, উনানের আঁচে ডেক্চি চাপিয়ে, সেই ডেক্চিতে প্রয়োজনমতো পরিমাণে জল দিয়ে আলুগুলিকে স্নিদ্ধ করে নিন। ফুটন্ত জলে আলুগুলি স্নিদ্ধ হবার অবসরে, ছুরি বা বটির সাহায্যে ধনেশাক, লড়া আর পেঁয়াজগুলিকে মিহি-ছাঁদে কুচো করে নিন এবং নারিকেলের টুকরোটিকে স্নিহভাবে কুরে রাখুন। এ কাজ সারা হলে, উনানের আঁচে-বসানো রন্ধন-পাত্র থেকে আগাগোড়া-স্নিদ্ধ আলুগুলিকে নামিয়ে, সেগুলির খোসা ছাড়িয়ে আঁচ-ফালিতে ভাগ করে পরিষ্কার একটি পাত্রে আলাদা সরায়ে রাখুন। এবারে পুনরায় উনানের আঁচে রন্ধন-পাত্র চাপিয়ে আনাকমতো ঘি-সহযোগে মিহিছাঁদে কুচোনো পেঁয়াজ ভেজে নিন। এভাবে ভাজার ফলে, পেঁয়াজের কুণ্ডের রঙ বাগামী-ধরণের হলে, সেগুলিকে রন্ধন-পাত্র থেকে তুলে অল্প একটি পাত্রে সব্বদে তুলে রাখুন এবং রন্ধন-পাত্রটিকে পুনরায় উনানের আঁচে বসিয়ে গরম-বিয়েতে স্নিদ্ধ দানাগুলিকে বাগামী-রঙের করে ভেজে নিন। এবারে শুধু নারিকেল-কোরাটুকু-বাদ রেখে, রান্নার বাকী উপকরণগুলি মিশিয়ে ফেলুন উনানের আঁচে-বসানো রন্ধন-পাত্রের ঐ গরম-ঘি আর সত্ত-ভাজা স্নিদ্ধ দানার সঙ্গে। তারপর উপরোক্ত এই মিশ্রণেব সঙ্গে রন্ধন-পাত্রে ১১ ভাগ পরিমাণে জল মিশিয়ে আলু টুকরোগুলি ভালোভাবে গরম না হওয়া অবধি কিছুক্ষণ ধটিয়ে নিয়ে রন্ধন-পাত্রটি উনানের উপর থেকে নামিয়ে সত্ত রান্না-করা খাবারটিকে সব্বদে অল্প একটি পরিষ্কার পাত্রে তুলে রাখুন। তাহলেই মহারাজ্যীয়-প্রখ্যাত ‘বাটাট্যাচা প্রকার’ খাবার রান্নার কাজ শেষ হবে। রান্নার পালা চুকলে, খাবারটি পরিষ্কার পাত্রে তুলে রাখার পর, সেটির উপর স্নিহ-পরিপাটিভাবে আনাকমতো পরিমাণে কিঞ্চিৎ নারিকেল-কুরো ও পেঁয়াজ-কুচো ভালো ছাড়িয়ে দিয়ে সাধারণে প্রিয়জনদের পাতে অভিনব এই মহারাজ্যীয় খাতটি পরিবেশন করুন। অপরূপ-মুখরোচক এই রন্ধন-ধরনের ‘বাটাট্যাচা-প্রকার’ খাবারটির সুখাদ গ্রহণ করে তাঁরা সগাই আপনাদের হাতের রান্নার রীতিমত তারিক করবেন।

আগামী সংখ্যায় এমনি অভিনব ধরনের আরেকটি ভারতীয় খাবার রান্নার হাশি দেবার বাসনা রইলো।

প্রশ্ন



সাত বছর বিয়ে হয়েছে। চার বছরের ছেলের মা—। তবু বিনতার গলাছেড়ে চোঁবার উপায় নেই। মাথার ওপর খন্ডর শান্তডী বর্তমান। গলা ফাটিয়ে হাঁক ডাক করাটা এখনো ঠিক আসেনা। মানায় না। আর পারেনও না।

হস্ত দস্ত হয়ে এখন ওষর দেখে, দু একবার চাপা গলায় ডাক দিয়েও যখন সাড়া মিলল না, তখন অগত্যা বিমলার শরণাগত হতে হল। বা তো বিমলা একবার রাজার দিকে। দেখতো মুখপোড়া কোন বারান্দার পড়ে পড়ে ঘুরোচ্ছে—না গুলি খেলছে! না কি কোন পানের দোকানে আড্ডা মারছে?

অধেক কাঁট দেওয়া ঘর ফেলে একেবারেই নড়বার ইচ্ছে ছিলনা বিমলার। তবু যেতে হল। তবে বাবার আগে কাঁটাখানা সজোরে মেঝেতে আছড়ে ফেলে বিমলা নই অস্থপাতে স্বামীর বিয়ে উঠল: দেখ বৌদি, এবার

থেকে তোমাদের ঐ সোহাগের লবাব-পুতুরকে ডাকবার আর একটা লোক রেখে দিও। দিনের মধ্যে তোমাদের হাজারবার ফরমাস। দেখতো বিমলা, ছোট্টো বিমলা। বলি কেন শুনি? এক-আধদিন নয়, পেরতেক দিন। কই বিমলা তো মরে গেলেও বাড়ির বাইরে পাটি বার করেনি? রাত দিন ঐ এক কাজ হয়েছে আমার! হাতের কাজ ফেলে ফেলে রাজা ঘাট দোকান ছুটব; কি, না লবাবের ব্যাটা লবাবকে ডেকে ডেকে বাড়ি আনতে হবে। কই, এই যে এত কাজ পড়ে থাকে, কেউ তো 'আহা' বলেও নিজেরা করে দেয়না?

বিমলার এ ছেন মুখ শোনা বিনতার পুরোনো অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। মিনতি করে জবাব দিল, আহা অত রাগ করছিল কেন বলতো? আজ বাড়িতে খাওয়া দাওয়ার কামেলা, তাই সকাল সকাল—

বিমলার চড়া কান্ড কঠে বিনতার নম্র মুহু গলা চাপা পড়ল। বলি হ্যাঁগা বৌদি, চোখের ওপর সাঁচটাকে তুমি

আর শাক চাশা দিওনি। আর খাওয়া হাওয়ার কায়েলা বলি অজ্ঞান কি? কোন্ দিন চোন্দবার ও হোঁড়াকে ইক না পাড়তে হয়? কোন সময় ও রান্নাঘরে ছদও খির হয়ে বলে থাকে? তোমাদের পংসা সস্তা, তাই অত জাইনে দিয়ে অমন নোক রেখেছ। হত অজ্ঞ বাড়ি, কবে দূর করে খেদিয়ে দিত। আকারা দিয়ে দিয়ে মাথায় তুলেছ তোমরা। যা বলব বাবা, পষ্ট মুখের ওপর বলব। আমার নাম বিমলা। ঢাক গুড় গুড় কথা বলিনা আরি। হ'।

চাকের মত চেষ্টাতে তুই খুব পারিস। এখন চূপ কর তো। বিনতা ইলারায় খন্তর শান্তড়ীর ঘরের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করল বিমলার। শুনতে পাবেন। গলাখানা বটে তোর বলিছারি।

শুনল তো ভারী বয়েই গেল। চোখ মটকে ঠোঁট উল্টে যেতে যেতে বিমলা গজগজ করতে লাগল। একেই বলে এক চোখো নজর। একটা প্রাণী, সারাদিন খেটে খেটে মরে যায়, তার দিকে কেউ তাকিয়েও দেখে না। আর একটা কচকে হোঁড়া, গাল টিপলে দুধ বেরোয়, ফাঁকি বাজের একশেষ, তাকে একেবারে মাথায় তুলে রেখেছেন। কি বিস্তান্ড, কি মহাতারত কসো উনি করেন, না ছুবেলা মান্তর দু ইাড়ি ভাত উনি ফুটিয়ে দিচ্ছেন! পোড়া কপাল আমার।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এখন বিমলার পোড়া কপালের 'বিস্তান্ড' শোনার মত সময় নেই বিনতার। কার্তিক মাসের ছোট বেলা। এখনি সন্ধ্যা হবে। রান্নাবান্না এখন কিছুটা বাকী। ছুটির দিন আজ। খেয়ে, কিছুটা কাজ গুছিয়ে উঠতেই ফেরী হয়ে গেল। আর খেয়ে উঠেই গোপলা এমন ডুব মারল যে এখন কপাল চাপড়াতে ইচ্ছে হচ্ছে বিনতার।

বিমলাও এই স্বযোগে এককাঠি মেজাজ চড়িয়ে রেখেছে। ওকে দিয়েও যে আজ কোন সুবিধা হবে, মোটেই সে ভরসা হচ্ছে না বিনতার।

কে জানতো হোঁড়াটা আজই আবার এমন হাওয়া হয়ে যাবে?

হস্তাঙ্গা নেয়কহারায় গোপালচন্দ্র আজ একবার বাড়ি ফিরলে হয়! বিনতা রজা চের পাইয়ে বেবে। সত্য

সত্য আর সচ্ছ হয় না। বারোমাস তিরিশ দিন ওর এই টহল মারা। যখন তখন। সময় অসময় নেই। বিমলা কি আর মিথ্যে রেগে যায়?

ডুটংকমটা এখনো পুরো পরিষ্কার করা হয়নি। নতুন নতুন মোরাদাধাকী ফুলদানি দুটো বার করতে হবে। টেবিল রুখ পালটাতে হবে। নতুন পর্দার সেটটাও লাগাতে হবে দরজা জানলার।

ঘরের লোকটিও হয়েছে বিখকুঁড়ে। কালই বলেছিল ভজন দুই রজনীগন্ধার কাড় আনতে। কাল সন্ধ্যা গেল। সারা সকাল গেল, ফুল এলোনা। একটা কথা কানে তোলেনা। কোন কাজ বললেই এখন নয়, তখন হবে। এক বুলি। এবেলা নয় ওবেলা হবে। শুয়ে বলে গড়িয়ে ছুটির দিনটা দিব্যি কাবার করে দিল। একটা উপকার তাকে দিয়ে হয়না বিনতার। বিনতা একলা মাছ। কদিক সামলাবে? নতুন বিয়ে হওয়া দাদাবৌদি, লেই সঙ্গে নন্দ নন্দাই এদের খেতে বলে এখন পুরো কায়েলা পোয়াতে হচ্ছে ওকেই।

অবশ্য মাংস আরও কটা রান্না ওবেলাই হয়ে গেছে। শীত পড়েছে। খারাপ হবেনা। কিন্তু এবেলার কায়েলাও তো বড় কষ্ট নয়? মাংসের চপ, তেটেকির ক্রাই, ক্রা.য়ড্.রাইস্—সবুই বাকী।

আর সময় বুকেই গোপাল ডুব মারল?

এত সব কাজ সারা করার পর আছে নিজের সাজসজ্জা।

ভাগ্যিস ছেলের কাজকর্ম কিছুই করতে হয়না বিনতাকে। সে সব তো শান্তড়ীর ঘাড়ে। খাওয়ালো সামলানো। সেদিক দিয়ে খুব বেঁচে গেছে বিনতা।

উত্তেজিত অবস্থার শোবার ঘরে ঢুকতে ঢুকতেই বলল, ওগো শুনছো? তোমাদের আররের গোপাল ঠাকুর এখনো আসেনি। সবকাজ পড়ে আছে। একলা হাতে কী করব বলতো? কী হবে এখন?

কর্মহীন ছুটির দিনের আলস্ত পরমানন্দে উপভোগ করছিল পরিতোষ। একলা নয়। চারবছরের ছেলের সঙ্গে। বুদ্ধ বুদ্ধ খেলী চলছিল এতক্ষণ বিছানার ওপর। বাগিশের পর বাগিশ সাজিয়ে হিমালয় পাহাড়। খোকন জগদান দৈনিক। তার টন বন্ধুটা দিয়ে সে বহু শব্দ

ধারেল করেছে। তারি স্বাক্ষর বিছানাময়। চাঁদর
ভোষক ওলেটি পালট। বেন বড় বয়ে গেছে।

সেই দিকে তাকিয়ে কী হবের উত্তর পর্বত অপেক্ষা
করা গেলনা। তার আগেই ধৈর্যচ্যুতি ঘটল বিনতার।
কী আকল তোমার বলতো? কী অবস্থা করে রেখেছ
বিছানাটার? পরিষ্কার তো আমাকেই করতে হবে।
ছি ছি। এমন করে কোন নাহবে ঘরদোর বিছানাপতর
তচনচ করে, ভাবতেও পারিনা।

আমি কিছু করিনি। সব ঐ তোমার ছেলে
করেছে। তোমার পায়ের শব্দ পেয়েই ঠাকুরার ঘরে
পালিয়েছে। একান্ত ভালমাস্তবের মত পরিতোষ নির্বিকার-
চিত্তে অস্থপস্থিত ছেলের ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ে নিশ্চিন্ত
মনে শুয়ে শুয়েই একটা সিগারেট ধরাল।

এই যে! একুশি বিছানাময় ছাই উড়বে। কী
হচ্ছে শুনি? বিনতা ব্যস্ত হয়ে পরিতোষের হাত থেকে
সিগারেটটা কেড়ে নিয়ে ধমক লাগাল। একটা দিন কি
পরিষ্কার রাখতে পারনা ঘরটা? যত সব নোংরা কাণ্ড।
ছুচোখে দেখতে পারিনা।

পরিতোষ অগত্যা উঠে বসল। অজুনের বিনয় করে
বলল, প্রীজ! দাঁও লম্বীটি!

আগে একটা কাজ করে দেবে বল, তারপর দেব।
বিনতা নরম হল না।

আজ্ঞা করে দেব। বল কি কাজ?

ঘর ছেড়ে দ্যা শুরে একবার বেরোও।

কোথায়? সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে?
আমেরিকা? ইংলও আফ্রিকা জার্মানী বুলগেরিয়া? হকুম
কর। সিগারেটার স্মৃষ্টান দিয়ে অধনিমীলিত চোখে
বিনতার দিকে তাকাল পরিতোষ।

থাক থাক। আর অতদূরে যেতে হবে না। সদর
রাস্তার একটু এদিক ওদিকে গেলেই হবে। গোপাল
এখনো আসেনি। যেখান থেকে পারো ওকে ধরে নিয়ে
এসো। অর্ধেক রাত্তা, ঘরদোর শুছোনো সব পড়ে আছে।
উজনে আঁচ পর্বত দেওয়া হয়নি। মায়ের আবার কাল
থেকে অথলের বাধাটা বেড়েছে। আমি একা কি করি
বলতো?

কেন এখন কেন? রাখবার সময় হ'ল ছিল না?

হাজার বার তখন বারণ করিনি? ওসব ব্যাক্সা ছোঁড়া
ঠাকুর দিয়ে রাস্তার কাজ চলে না। দারিদ্র জান নেই।
সময়ের জান নেই। তখন তো কান দাঁওনি আমার
কথায়? ছেলে মাহুব, হাতে ধরে শিখিয়ে পড়িয়ে নিলে
পরে ভালই হবে, কে বলেছিল এসব বড় বড় কথা?
লেকচার দেবার সুযোগ পেয়ে পরিতোষ আর নিজেকে
সামলাতে পারল না।

আমি? আমি ওকথা বলেছিলাম? আমি কি বাড়ির
গিри? আমার কথায় কোন কাজটা হয় শুনি? বিনতাও
সমানের স্বাক্ষর দিয়ে উঠল। তোমার মা-ই বললেন, আহা
কতকালের পুরোনো লোকটা! দেশে গিয়ে মাঝা গেল।
তারি ছেলে। এসেই যখন পড়েছে অতদূর থেকে, কি
আর করা যাবে, সঙ্গে সঙ্গে তোমরাও তো সার দিলে।
আহা! ছেলেমাহুব! বিদেশে এইটুকু বরসে এসেছে
কোথায় আর যাবে! তুমি বল নি এ কথা?

বলেছিলাম বুঝি? কি জানি, মনেও নেই। ব্যাপারটা
ক্রমশ জটিল গুণগোলের দিকে এগিয়ে চলেছে দেখে
মিনমিন করে উঠল এবার পরিতোষ। না হয় বলেছিলাম,
কিন্তু আশ্চর্য্য তো আর দেইনি তা বলে। আদর দিয়ে
দিয়ে ওকে মাথার তুলেছে কে শুনি?

যা তা বল না বলছি আমার নামে। আমার বয়েই
গেছে ওকে প্রায়শ দিতে। বাবা মা আর তুমি তিনজনের
আদরেই ও গোলার গেছে।

আমি! বিনতার অভিযোগ নত্যাং করে হেসে উঠল
পরিতোষ। নিজের স্ত্রী পুত্রকেও পর্বত প্রায়শ দেইনা,
তাতে আবার রাস্তার ঠাকুর! সকাল দশটার বেরিয়ে বাই,
সন্ধ্যাবেলা ফিরে আসি। বাছাখনের চুলের টিকিটাও
আমার নজরে পড়েনা। ইাক ভাক হয়ে নিজের স্ত্রীকেই
কাছে পাই না একদণ্ড। থাক থাক চোখ রাখতে হবে
না। যাকি যাকি।

শোর। রজনীগন্ধাও নিয়ে এসো ঐ সঙ্গে। ঐ
পোনো বিবল। আবার চোঁচাচ্ছে—কি হল দেখি
আবার।

শাওভীর ঘরের দারাকার দাঁড়িয়ে বিবল হাত মুখ
নেড়ে চোঁচাচ্ছে। উনি নাডিকে দুধ খাইয়ে আন। পরাতে
পরাতে বিবলকে বসক বিবলেন, একটু আঙুলে কথা বলনা।

অমন পাড়া কাটিয়ে চোঁড়াহীন কেন? পাওরা গেল না?
না না। কোথাও নেই।

ভাল করে দেখেছিল? দেখ গে বা—হয়তো ছাতে,
ঘরের কোণে, খাটের তলার কি কোন ঘুণ্টিতে পড়ে পড়ে
ঘুসোচ্ছে বেইশ হয়ে।

সব জায়গা গুরু খোঁজা খুঁজেছি মা। কোথাও
নেই। বিমলা হৃদিকে হৃথানা হাতে 'নেই'এর মুদ্রা
দেখাল। এ কি তোমার ছুঁচ? যে চোখে দেখা যাবে
না? স্মৃতি? যে হাওয়ার উড়বে? সোনা দানাও নয়
যে চোরে চুরি করে নিয়ে যাবে। তাও বলি মা, পরের বাড়ি
কাজ করতে এয়েছে ছোড়া, মনেই হয় না। ঠুটো জগ-
রাধের মত বলে বলে তোমাদের আদর কাড়ছে! এত
আদিত্যোতা ভাল নয়। তুমি কিছু বলনা বলেই তো এত
বাড় বেড়েছে—

তুই ধামতো বিমলা। এ বাড়িতে কোন কথা বলার
জো আছে? আত্মা আমি দিইনি। যারা দেবার,
তারাই দিচ্ছে। বাড়ির কর্তা কিছু বলে না বলেই তো
অমন হয়েছে।

কর্তা প্রস্তুত হয়ে নাতিকে বেড়াতে নিয়ে বাবার জন্তে
ঘর ছেড়ে বারান্দার এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন। গিন্নির কথা
বলার ধরণটা বীকা পথে যাচ্ছে দেখে নাতির হাত ধরে
টানলেন, আর হাতুড়াই, সন্ধ্যো-লা হির পড়তে শুরু
হয়েছে আজকাল। একটু তাড়াতাড়ি না গেলে বেড়ানো
হবে না। সন্ধ্যার আগেই ফিরতে হবে তো আবার?

গৃহিণী শুনেও শুনলেন না। ভারী মুখে জেরা করলেন,
কাল শুনছিলাম ছোঁড়াকে কি বেন বলছিলে? তুমিই
কোথাও পাঠিয়েছ বুঝি ওকে? আকসের মাথা কি
একেবারেই খেয়েছ? শুনছো রাতে ওরা সব আসবে,
খাবে। বৌমা একা হাতে সব সামলাচ্ছে। আমার শরীর
ভাল নয়। আর তুমি তাকে চিঠি দিয়ে ভবানীপুর
পাঠালে?

আঃ, কী যে বল। বিরক্ত হয়ে জবাব দিলেন
কর্তা। আমি আবার কখন ওকে চিঠি দিয়ে পাঠালাম?
কাল সকালে একবার বলার মধ্যে বলেছিলাম, সময় হলে
স্বপ্নাবধি বাড়ি একখানা চিঠি দিয়ে আসিল। তা ছোঁড়া
তোমাদের দাননেই আমার মুখের ওপর বলে বলল, ওর

নাকি কাল থেকে আজ অবধি স্বপ্নাবধি অবকাশ হবে না।
যত দোষ নন্দ দোষ। এখন আমার বাড়ি চাপাও বলে
বলে। কথাটা বলেছিলাম, তার ফল।

গৃহিণী বেগতিক দেখে রণকৌশলের ধারা বদলালেন।
আজই না হয় কোথাও পাঠানি। পাঠাও তো প্রায়ই।
ডাইং ক্লিনিং বা, পোষ্টাশিসে বা, অমুকবাবুর বাড়ি বা—
কাজে ফাঁকি দিতে শিখেছে তোমার এখানে ওখানে
পাঠানোর চোটে। একবার বাড়ি থেকে বার হলে আর
ও তাড়াতাড়ি ঘরে করে কখনো?

আমার কাছ থেকে ও কাজে ফাঁকি দিতে শিখেছে?
আমি ওকে এখানে ওখানে পাঠাই? কর্তা রাগে আগুন
হয়ে উঠলেন। আহুক আজ হারামজায়া বাড়িতে। দূর
করে দেব। একটা কাজের না, মাইনে নেবার গোসাই।
মাস গেলে এক কাঁড়ি টাকা তো ঠিক নেও, কোন উপকারে
লাগে ওকে শুনি? তখনি আমি পই পই করে বারণ
করেছিলাম, ওইটুকু একটা বাচ্চা ছোঁড়াকে আমার কাজে
রেখনা রেখনা। তা কেউ আমার কথার কাণ দিল
তখন?

আমি রেখেছি না তুমি? গৃহিণীর গলা সপ্তরে চড়ল।
তুমি আর তোমার ছেলে, বৌ একেবারে গলে গেলেন।
আহা! বাপটা মরে গেল! যাবে কোথায়, খাবে কি।
খাক, এখানেই খাক। তখন মনে ছিলনা? একটা দল
এগারো বছরের এতটুকু ছেলে শুদের রাগা করে খাওয়াবে
তুবেলা। কি করে ও? কিছু না। পরমাণু যাচ্ছে,
গতরও যাচ্ছে। সব কাজ ঐ বৌমাই করে দিচ্ছে।
আমার কি চোখে পড়ে না? আহুক আজ। ওর একদিন
কি আমার একদিন।

চার বছরের নাতি এতক্ষণ দাঁহ দিদির ঝগড়া শুনে
কষ্ট হয়ে উঠছিল। তার এখন বেড়ানোর সময়। দায়ের
হাত ধরে টানাটানি করে সেও স্বপ্ন ধরল, তলনা ও হাতু,
বেলাতে তলনা। ঝগড়া কলছো কেন, চল—

সত্যি সত্যি এ বাড়ির প্রত্যেকটি মানুষের মেজাজ
খারাপ করে দেবার মত অসীম ক্রমতা গোপালচন্দ্রের
আছে।

নেহাং ছেলেমানুষ। কিন্তু সেটা বরসে। তুমি-
বুদ্ধিতে বোধ হয় বুড়োদের ও হার মানার।

ওর বাবা এ বাড়ির রাঁধুনীর কাজ করেছে বহু বছর।
লোকটি কাজের ছিল। বছরে দুবার করে দেশে যেত।
ছুটার দিন এদিক ওদিক করলেও কটক থেকে আবার
বধাসময়ে কিরে এসে মনিববাড়ি কাজে লাগত। লোকটা
ভালমানুষ ছিল। কর্তা গিন্নি ভালও বাসতেন খুব।

কিন্তু বছর খানেক আগে ছুটি নিয়ে প্রত্যেকবারের মত
দেশে গিয়ে আর কিরে এলোনা। উষ্ম হয়ে চিঠি লেখা
হল। তার উত্তরও এলোনা।

মাস দুয়েরেকর মাথার বছর দশেকের কচি মুখের
গোলগাল ফর্সা ছেলেরা চোখ মুহুতে মুহুতে এবাড়ি এসে
দাঁড়াল একটা গায়ছা আর একটা ফতুয়া সঞ্চল করে।
গলায় একগাছা পৈতেও ছিল অবশ্য।

ওর রুপ একমাথা চুল, হেঁড়া ময়লা ধূতি আর
শুকনো মুখের দিকে তাকিয়ে বাড়ির কারু মুখ দিয়েই আর
কোন কথা সরল না।

ওই মুখ খুলল। বাবা মারা গেছে। ওর মা আর
খুড়োই ওকে এখানে পাঠিয়েছে দেশের লোকের সঙ্গে।
চাকরি না করলে থাকে কি? বাবা বলে গেছে, এ বাড়ি
চুকলেই ওর চাকরি হয়ে যাবে।

চাকরি! রান্নার কাজ করবে ঐ ছোড়া?
বলে কি?

পাগল, না মাথা খারাপ?

কথা শুনে বাড়ির লোকেরা হাসবেন কি কাঁদবেন ভেবে
পেলেন না। কিন্তু তখনকার মত ছেলেরা মুখের উপর
কেউ আর কোন কথা বললেন না। কিন্তু আড়ালে সবাই
একমত হলেন। এসেই যখন পড়েছে, ছেলেমানুষ, থাকুক
কটা দিন। এর মধ্যে দেখে শুনে একটা লোক রেখে
দিলেই হবে। আর তারপর ওকে বুঝিয়ে স্বাক্ষরে দেশে
পাঠিয়ে দিলেই হবে। ওই টুকু ছেলে রান্না করবে?
একি ছেলে খেলা না কি?

কিন্তু কটা দিন গেল। কটা সপ্তাহ গেল। কটা মাস
গিয়ে প্রায় বছর ঘুরতে চলল, গোপাল এ বাড়ি কারেই
দিয়েই অধিষ্ঠান করল। অন্ত কোন রাঁধুনীও আর এলোনা।

আর সব চরে আশ্চর্যের কথা, ওতক দেশে পাঠাবার
কথা আর কার মনেও এলোনা। মুখ ফুটেও কেউ
নে কথা।

রান্না? নেহাৎ পুরুষানুক্রমে ওর বাবা, ভত্ত বাবা,
ভত্ত বাবা এট কর্মই করে এসেছিল বলেই বোধ হয়
কিছুটা জানে। কোনমতে ভাত, ডাল, ভাজাটা করতে
পারে। বাধাকী সবই বিনতা অথবা তার শাকুড়ীই করে
নেন। সদাসর্বদা গোপালের সঙ্গে সঙ্গে একজনকে রান্না
ঘরেই থাকতে হয়। তাই ঠিক সময়ে ভাত পান অফিসের
লোক ছুটি।

এই আছে। এই নেই। খোকনের ভারী প্রিয়পাত্র।
তার সঙ্গে খেলাতেই জমে গেছে তরকারির কড়া উত্তনে
চাপিয়ে। ষোকানে গেল তো বাড়ি ফেরার নাম নেই।
গুলি খেলছে রান্নার সমবয়সী ছেলেগুলোর সঙ্গে। ভাত
চাপিয়ে পান খেতে ছুটেবে দোকানে।

কাঁহাতক সহ করা যায়? দিনের পর দিন?

বাড়ির গিন্নি রেগে আগুন হয়ে ওঠেন। মাইনের
বেলা তো এক পরসী কম নেবেন। ওর বাবা এতকাল
কাজ করে যে মাইনে নিয়ে গেল, এ মুখপোড়া চাকরিতে
চুকতে না চুকতেই সেই মাইনের বহাল হল। তবু যদি
একটু কাজের হত! মাস কাবার হোক একবার। দূর
করে তাড়িয়ে দেব। কেন, লোকের স্বভাব? মাইনে
কি কম দি? স্বকমারি হয়েছে ওকে রাখা।

কর্তাও সমানে সায় দেন। বড় মুখ ছোড়ার। একটা
কাজ করতে বললে মুখের ওপর জবাব, পারবনা, করব না।
সকাল থেকে রান্নার গিয়ে খেলা? একটা উপকার যদি
না হয়, মিছিমিছি অমন লোক রাখার কি মানে হয়?
টাকা কি সত্তা?

রেগে যায় বিনতাও। অফিস টাইমের কর্ম ব্যস্ততার
ছুটোছুটি করতে করতে, তরকারি চাপাতে চাপাতে গলা না
ছাড়লেও, মুখ ছাড়তে কষ্ট করবেন। সৎ রান্নাই যদি
নিজেরা রেখে নেব, তবে ধর্মের সাক্ষী গোপাল ঠাকুরকে
আর রেখে লাভ কি? বেশ মজা হয়েছে দেখছি। সাত
সকালে বাবু চাউনি খেয়েই একবারে উঠাও। ও বিমলা,
বা না লক্ষ্মীটি, দেখনা একবার গেল কোথায়? সদরে
দাঁড়িয়ে না হয় একবার হাঁক পাড়—

স্বযোগ পেয়ে বিমলাও একবারে রণচণ্ডী বৃত্তি ধারণ
করে। সাত সকালেই স্বক হল তো? একটু আগেই না
হাঁক পাড়লার? দেখ বৌদি, তোমাদের বাড়ি বাসন

বাক্য, কাপড় কাচব, ঘর মুছব, মশলা পিষব এই সব কাজের জন্তেই মাইনে নি। বাড়তি কাজের জন্তে বাড়তি মাইনে না দাও তো মজা একটা লোক রাখ। সতেরো বার গলা ফাটিয়ে দেই বজ্রাঘাত ছোঁড়াটাকে আমি ডাকতে পারব না।

রাগ করে পরিতোষও। বলিহারি বাবা বাড়ির লোককে! পঁচিশ টাকা মাইনে দিয়ে কী লোকই রেখেছে সব! আরে বাপু, ওর বাপ পুরোনো লোক ছিল, অনেক কাল কাজ করে গেছে, সেন্টিমেন্টে লাগে—মাস মাস দু-পাঁচ টাকা দেশে পাঠিয়ে দাও। কিন্তু এমন অকর্ম্মার ধাড়ীকে রেখে লাভটা কিসের? এক প্যাকেট সিগারেট আনতে দিয়েছি ঘণ্টা খানেক আগে, সে বোধ হয় একেবারে খাস সিগারেট কারখানা থেকে তৈরী করে নিয়েই ফিরবে! কি মুশকিল।

রাগ করেনা শুধু এ বাড়ির বড় অদরের বাচ্চা ছেলেটা। খোকন।

গোপালকে না হলে তার একদণ্ড চলে না।

অজ্ঞ কোন খেলাধুলো না থাক, দাঁহর কিনে দেওয়া রঙিন ছবির বইগুলো খুলে খুলে ও গোপালকে ছবি দেখাবে বসে বসে। তখন গোপালের হাজার কাজ থাকলেও কারু ডাকবার উপায় নেই। কেঁদে কেটে অনর্থ করবে তা হলে খোকন।

হুতরাং গোপালকে পায়কে?

ঘোড়া ঘোড়া খেলা। গল্প বলা। গুলি, ঘুড়ি লাটাই ইত্যাদিতে হাতে খড়ি দেওয়া, পরমানন্দে চলে গোপালের তিন বছরের খোকনের সঙ্গে।

যত দোষ থাক গোপালের, সব চেয়ে বড় দোষ ও খেতে ভুলে যায়। স্নান করতে ভুলে যায়, ঘুমোলে ওকে টেনে ভুলতে হয়। রাত্তার গেলে ও বাড়ি ফিরতে চায়না।

ওর পেছনে তাই রাত দিন টিক টিক করতে হয় বিনতাকে। বাড়ির গিন্নিকে। এক বাচ্চা সামলাতে হিমশিম, আবার কপালে জুটেছে আর একটা! মজা মন্দ নয়!

কিন্তু অজ্ঞদিন বা ইচ্ছে করুক গে, আজ পই পই করে বলা শেষে ও খেয়ে উঠেই ও হাওয়া হয়েছে। বাড়ি শুধু লোক রেগে আঙন হয়ে আছে গোপালের উপর।

না আর নয়। আর এজ্বর আহুতার আকারে কি হবেওয়া চলবে না ওকে। বাড়ি ঢুকলেই সোণা বলে দেওয়া, ভোমার ঝারা হবেনা বাপু, তুমি অজ্ঞ কোথাও কাজ জুটিয়ে নাও। কিবা দেশে চলে যাও।

এ রকম ফাঁকিবাজ উড়নচণ্ডীকে দিয়ে আর যাই চলুক, রাত্রার কাজ চলে না।

প্রত্যেকেই একমত। প্রত্যেকেরই এক কথা। ওকে তাড়াও। ঢের হয়েছে। স্বপ্নের চেয়ে বস্তি ভাল।

গোপালের কপাল এবার সত্য সত্যই পুড়ল। এ বাড়ির অন্ন উঠল তার।

* * * *

ডজন দুধেক রজনীগন্ধা কেনবার পর মনে হল, একটা অঙ্কুর কেনা একান্ত দরকার। বাড়ি ফেরার পথে পরি-তোষ ষ্টেশনারী দোকানের দিকে এগিয়ে যেতেই চোখে পড়ল। হেলতে হুলতে গান গাইতে গাইতে শ্রীবাস গোপালচন্দ্র বাড়িমুখে চলছেন।

ওহে গোপালচন্দ্র, এদিকে এসো। পরিতোষ দাঁড়াল। দাঁদাবাবু গলা শুনে চট করে গান বন্ধ করে, মুখখানা যথাসম্ভব করুণ করে, গোপাল এগিয়ে আসে।

আজ যে বাড়িতে লোকজন থাকে, কাজকর্ম আছে, হাশ নেই? কোঁন চুলোয় গিয়েছিল হতভাগা?

আপনার সেই বেরাণ্ডার সিক্রেট এদিকের দোকানে পাওয়া যায়না কিনা, তাই একটু ওদিকের দোকানগুলোর খুঁজতে গিলাম যে দাঁদাবাবু—

সিগারেট খুঁজতে তুমি পথে পথে টহল মেয়ে বেড়াচ্ছ কাজে কাকি দিয়ে? হতভাগা শরতান কোথাকার! কে তোকে বলেছিল সেই ব্রাণ্ডের সিগারেট আজই কাজ কামাই করে দোকানে দোকানে খুঁজে বেড়াতে? বা, বাড়ি বা একবার, ভোর জন্তে সবাই সন্দেশের চৌড়া নিয়ে বসে আছে। এত করে বলি, একটু কাজে মন দিতে পারিগ না বাপু?

গোপালের চোখ ছল ছল করে। হাতখানা মাথার টিকিতে চলে যায়।

এদিক ওদিক ভাকিয়ে পরিতোষ পকেট থেকে কয়েক আনা পরলা বার করে ওর হাতে গুলে দেয়। আজ ভোর কপালে যা আছে, তা ভগবানই আনেন। বা, চায়ের

দোকান থেকে চা খেয়ে পান খেয়ে বাড়ি চোক। এমনতেই দেবী করেছিল, না হয় আর দু-পাঁচ মিনিট লেট হবে।

পরশা কটা নিয়ে ট্যাকে গুঁজতে গুঁজতে গোপাল বলে, দাদাবাবু, আপনি আমার বাড়ির মধ্যে একটু ভাল-বাস। দুটো ভাল কথা কও। আর কেউ গোপালকে দু-চোখে দেখতে পারে না। গালমন্দ করে।

পরিতোষ ঘেতে ঘেতে ধমক দেয়, বা বা, আর ফার-লাঘো করতে হবেনা। এই শোন, সিগারেটের কথা বেন বলিসনি—বাড়িতে। খবরদার!

ধূর্ত চতুর চোখে মুচকে হাসে গোপাল। না দাদাবাবু। কক্ষণে বলব না।

নাতিকে বেলুন কিনে দিচ্ছিলেন কর্তা। নাতিই দেখাল, দাঁড়, ও দাঁড়, গোপালকে দেখে। ওকে বেলুন দাওনা একতা।

সঙ্গে সঙ্গে চিংকার করে উঠলেন কর্তা, এই গোপালা, লম্বাভিন ছিল কোথায় আঁ? বাড়িতে কাজের ঝাড়াট, আর তুই জেনে-শুনে ডুব মারলি? কোন কথা তোর মনে থাকে না?

মনে তো ছিল বড়বাবু। গোপাল যথাসম্ভব গলাটা কাঁদো কাঁদো করল। কিন্তু আপনার সেই কাকটার জন্তে দেবী হয়ে গেল।

আমার কাজ! আমার আবার কোন কাজে তুই কোথায় গিয়েছিলি? কর্তা আকাশ থেকে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে শক্তও হন মনে মনে।

সেই যে ফরম, ঐ যে টাকার পাঠার বাতে করে লিখে, আর আপনার খাম পোষ্টকার্ড আনতেই পোষ্টাপিসে গেলাম বড়বাবু। কী ভীড় বাবু, কী ভীড়। লম্বা লাইন। দাঁড়াতে দাঁড়াতে পা ব্যথা হয়ে পেল বাবু, মাথা ধরে গেল।

পেরেছিল? টাকা পেলি কোথায়? খাম পোষ্ট-কার্ডের?

পেলার আর কোথায় বাবু? এখানেই মত লাইন—মাথার ব্যথানা—

ছটির দিন। পোষ্টাপিস খোলা কি বন্ধ এসব ভাববার সময় পেলেন না কর্তা। ঠেকিয়ে উঠলেন, আর তাকে

পোষ্টাপিসে কে যেতে বলেছিল শুনি? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লাইন দিয়ে মাথা ধরাতেই বা বলেছিল কে? বা একবার বাড়ি। ভাল করে তোর মাথাধরা সারিয়ে দেবে খন বাড়ির লোকেরা। এই ছোড়া, আবার চললি কোথায়?

আজ বাড়িতে বাবু। লাইনে দাঁড়িয়ে দেবী হয়ে গেল, গিন্নিয়াকে বলতে হবে—

দাঁড়া। শোন এদিকে। কর্তা জঙ্কিত করে ভেবে নিলেন তাঁর সফটজনক অবস্থাটা। তারপর পকেট থেকে কয়েক আনা পরশা বার করে ওর প্রার-প্রসারিত হাতে ফেলে দিলেন। মোড়ে ডাক্তারখানা থেকে মাথাধরার দুটো বড়ি কিনবি। আর চায়ের দোকানে চা। ওষুধ, চা গিলে তারপর বাড়ি ঢুকবি। বুঝলি?

আজ্ঞে হ্যাঁ বড় বাবু। ওঃ খুব মাথার ব্যথনা। গোপাল কপালে হাত দিয়ে মুখ কঁচকাল।

সমস্ত দিন টো টো করে ঘুরলে হবেনা? বা ডাক্তার-খানায়। হ্যাঁ শোন, পোষ্টাপিসের কথা বেন বলিসনি বাড়িতে।

না বাবু, তাই কি বলতে পারি? গোপাল আতর্প-বিস্তৃত হাসি হেসে প্রচণ্ডবেগে এধার থেকে ওধার ঘাড় নাড়ল। কক্ষণে বলব না। বাড়িতে এত লোক আছে, কিন্তু আপনার মত কেউ আমাকে এত ভালবাসেনা বড়-বাবু। সবাই গাল মন্দ করে। দুটো খিট্টা কথা বলেন। আপনি আছো, তাই—

গোপালের চোখ ছল ছল। মুখ কাঁদো কাঁদো।

বলবে কি? তোর স্বভাবের জ্বালার বাড়ির সবাই অভিষ্ট। বা পালা। বেশী দেবী করিসনি বেন। বহুনি তো কপালে আছেই, না হয় দু-পাঁচ মিনিট দেবীই হবে। বড়িটা কিনে খাস কিন্তু—

হ্যাঁ বাবু। এই ডাক্তারখানার বাড়ি।

চোকবার মুখেই বিষলার সঙ্গে দেখা।

হস্তবস্ত হয়ে বাইরে ছুটছিল। গোপালকে দেখেই ধমক দাঁড়াল। এদিক ওদিক তাকিয়ে গলা নাগিয়ে চোখ মুখের গভীর ইঙ্গিত করে বলল, এই যে মৃৎশোভা হতজাড়া এরই? বাড়ি চোকবার কথা মনে পড়েছে? বা, বা একবার! খেলা আর খেলা! কতদিন গল্পিছি-

ভরে বীহর, লোকের বাড়ি কাজ করতে এসে অত খেলা কেন? তা বিয়লা যে বাসন মাজে! ছোটনোক! বি! তার কথার কান দিবি কেন? বোক এবার ঠেলা —তোর চাকরির দকারফা!

বিয়লা কথাকটা শেষ করেই আবার পা চালাল। গোপাল ওর দিকে তাকিয়ে মুখ ভেংচে জিত বার করে ভেতরের দরজা দিয়ে আস্তে আস্তে বাড়ি ঢুকল।

এই যে! বাবুর বাড়ির কথা মনে পড়েছে এতক্ষণে! তা বাপু আর একটু বাধে একেবারে তাত খাবার সময়ে হাজির হলেই পারতে!

গিন্নি গলার জোরে বাড়ি মাথায় করলেন। গোপাল কোন জবাব না দিয়ে মাথা নীচু করে দাঁড়াল তাঁর সম্মুখে। অপরাধীর মত।

গিন্নি আবার চড়া গলায় শুরু করলেন, ছিলি কোথায় বীদর? বাড়িতে লোকজন থাকে, বোমা হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে, রান্না তো ছাই করবি, একটু হাতে হাতে জোগাড় দেওয়া, একটু রান্নাঘরে স্থির হয়ে বস, তাতেও কঁাকি? আশুক আজ কতী, দেখিস তোর কি হাল হয়।

গোপাল বতদূর সম্ভব করণ কণ্ঠে মিন মিন করল, আমি কি করব বড়মা, আপনি সেই সুগন্ধি জরদার কথা বলেছিলেন, আমি তাই ভাবলাম, আমার দেশের লোক বাড়ি যাবে, তাকে একবার বলে আসি, মায়ের জন্তে ভাল জর্দা এক কোটো যেন আনে। কি বলব মা, কটক সহরে ভেয়ন জর্দা আর কেউ বিক্রি করে না। একদিন মুখে দিলে আর আপনি জীবনেও ভুলতে পারবেন না। মনে নেই বড়মা, সেই একদিন আপনাকে এনে দিয়েছিলাম?

মুখপোড়া, আজ তোকে কে বেতে বলেছিল? বেলা কাবার করে তুই বাড়ি ঢুকলি? এতটুকু কাণ্ডজান নেই? দাদাবাবু, বৌদি, বড়বাবু সবাই যেনে আগুন হয়ে আছে। আচ্ছা আঁকেল তো তোর?

কোন সময় গলাটা নরম হয়ে গেছে, টের পান নি গিন্নি। কয়েক পা এগিয়ে এসে এখার ওখার ভাল করে নজর করে চাপা গলায় আবার বললেন, হী করে দাঁড়িয়ে না থেকে দূর করে ঘরে এলো একবার, কাজ আছে।

মাথা চুলকাতে চুলকাতে গোপাল ঘরে ঢুকল। এই যে চা-টা আছে। নে চট করে খেয়ে নে। ঝোকন

সন্দেশ খায়নি, ডিসের সন্দেশ দুটো খেয়ে নে। নব্বই দিন হটর হটর। খেয়ে হাত মুখ ধুয়ে তবে রান্নাঘরে ঢুকবি।

গোপাল আদেশ পালনে তৎপর হল।

গোপাল বাড়ি ফিরেছে মা? বোমার লাড়া পাওয়া গেল রান্নাঘর থেকে।

সঙ্গে সঙ্গে গিন্নি আবার স্ত্র বদলালেন। হ্যা গো বোমা। তোমাদের আলালের ঘরের দুলাল বাড়ি ঢুকেছেন। নাও এবার কুল বিম্বিস্তর দিয়ে পুজো কর। মাসকাবার হলেই মাইনে নিয়ে দুধ হয়ে বাড়ি হতচ্ছাড়া। ঢের সহ্য করেছি। আর নয়। টাকা ছড়ালে লোকের অভাব? ঘরে ঘরে মাজবে রান্নার লোক রাখছে না? শোন বোমা, আজ তো বাছা তোমার ননদ নন্দাই দাদা বৌদি সবাই আসছে। একটা ভাল রান্নার লোকের কথা বলে রেখো। যেন একটু ভার ভারিকি হয়। এমন অন্নবাসী অকাজের ছোঁকা আর নয়। পষ্ট কথা মলে দিলাম বাপু। একটা ব্যবস্থা না করলে আর চলছে না। এ ছোঁড়াকে রেখে আমার হাড় মাস ভাঙ্গা ভাঙ্গা হয়ে গেল।

গিন্নির কথার স্রোতের মধ্যে গোপালচন্দের চা সন্দেশ খাওয়া সারা হটর গেছে। ধীরে স্তব্ধ সে এবার বৌদির মুখোমুখি হবার জন্তে পা বাড়াল রান্নাঘরের দিকে।

গিন্নি গলা নামিয়ে ফিল ফিল করে বললেন, এই হত-ভাগা, শোন। বৌদি একটু গালমন্দ করলে চুপ করে থাকবি। বুঝলি তো?

সঙ্গে সঙ্গে বাড় কাত করল গোপাল। বুঝিতি বড়মা! আপনি যা একটু আমাকে ভালবাস বাড়ির মধ্যে। আর কেউ দেখতে পারে না। সবাই গালমন্দ করে।

তোর দোষে করে। কথা শুনলেই পারিস সবায়? যা যা, দাঁড়িয়ে থাকিসনি আর। বেলা পড়ে এলো যে।

গোপাল রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে চলল।

গিন্নি আবার গলা ছাড়লেন, বোমা, আমি এখনি যাচ্ছি। চপ-গুলো গড়ে দিছি গিয়ে। ওর দাদা কোঁ কোন কাজ হবে না।

বিনভা রান্নাঘর থেকেই চেষ্টা করে জবাব দিল, মা যা। আপনাকে এখন আসতে হবে না। চা-টাঠাঠা হয়ে যাবে।

আপনি বরং চা খেয়ে কাপড় কেচে একেবারে আহ্নন।
পুর তো করাই আছে। ছুঁনে মিলে করে নেব'ধন।
আর এতক্ষণ ফাঁকি দিয়েছে ঐ গোপালকে দিয়েই দেখুন
না সব কাজ আমি করিয়ে নিচ্ছি। ওর মজা বার
করছি।

ঐ ছোঁড়ার কাজের কথা তুমি আর বলনা বোমা!
আবার জল ওঠেন গিল্লি। সমস্ত বেলা কাটিয়ে অকস্মার
টেকি এখন হাজরে দিতে এলেন।

হা বলেছেন মা! রাগ রাগ গলার বিনতা জবাব দেয়।
এই তো পাশের বাড়ির মাসিমারাই দেখুন না কেমন লোক
রেখেছেন। কী কাজের! আর খুব ভাল রান্নাও নাকি
জানে। কোন আমেলা নেই। হাঁক ডাক নেই। বাড়ি
জোলপাড় নেই। শুধু রান্নার কথাটি বলে দাও, বাস!
আর উঁকি মেয়ে দেখতে হয় না। দশজন বিশজন খাক,
আমেলা পোয়াতে হয় না, কেন মা—আমার বাপের বাড়ি?
দেখেন নি? কি চমৎকার কাজের লোক? তার হাতের
রান্নাও তো খেয়েছেন মা। একেবারে মল্লও তো নয়।
মাইনেও কম।

মল্ল বলছো কি বোমা। চমৎকার রান্না। কেমন
হালি খুশী ঠাণ্ডা মাহুখটা। তোমার মাকে বলে রেখ,
ঠিক অমন একটা লোক সন্ধান হলেই যেন আমাদের খবর
গেন। আচ্ছা, আমি তবে কাপড়খানা কেচেই আসি
বোমা। তুমি জলখাবারটা খেয়ে নাও ততক্ষণে।

গিল্লির সাড়া আর পাওয়া গেল না। বাথরুম থেকে
বেরোতে ওর বেশ কিছুক্ষণ লাগবে। নিশ্চিত হল বিনতা।
এখনি উনি কাপড় কাচতে যাবেন।

শাওড়ীর কান পর্যন্ত পৌঁছয় এমন ভাবে গলা তুলে
বিনতা স্বাকার দিয়ে উঠল, দয়া করে তাহলে বাড়ি কিরেছ?
আজ্ঞে আজ তোমার দাদাবাবু আর বাবা, তোমার কি দশা
হয় দেখ। একটা কাজ যদি তোমার দাদা হয়। বলি সব
দাদাবাবুর কাজগুলো যদি আমরাই করব, তবে, তুই কি
করবি? পথে পথে টহল মেয়ে বেড়াবি? গুলি খেলবি?
ঘুড়ি ওড়াবি? খোকনের সঙ্গে রাতদিন খেলা করবি, আর
খসে খসে মাইনে নিবি?

এবার আর এতটুকুও কাবু হল না গোপাল—সমানে
জবাব দিল, তোমার জন্তেই তো কিরতে দেবী হল।

আমার জন্তে! আমি আবার তোকে কোথায়
পাঠালাম? বিনতা অবাক হয়ে গোপালের মুখের দিকে
তাকাল। গলার জোর নিতক হয়ে এলো।

তুমিই তো বলেছিলে সেদিন, কোন বাজারে জলপাই
আমলকি পাওয়া যায়? ভাঁশা পেয়ারা আর কামরান্না
পাওয়া যায়? আমাকে দেখে আসতে বলনি?

শক্তি বিনতা গলা নামাল, আ গেল বা মুখপোড়া!
তোকে কি আমি আজ যেতে বলেছিলাম? কোথায়
তাড়াগুলি খেলছিলি, বাড়ি এসে এখন আমার নামে
দোষ দিচ্ছস। আচ্ছা শরতান ছেলে বাবা তুই?

বিশ্বাস হল না, গোপাল শুধু মিথ্যা কথা বলে বুঝি?
ন'হাত ধুতিখানার খুঁট খুলে গোপাল দুটো ভাঁশা পেয়ারা
আর গোটাকতক জলপাই বার করে বিনতার কৌচড়ে
কেলে দিয়ে মুখ ভার করে হাঁড়ী হৈসেলে হাত
লাগায়।

তাড়াতাড়ি সেগুলো যথাস্থানে লুকিয়ে রেখে মুখ টিপে
হাসে বিনতা। নে হয়েছে। আর কাজ দেখাতে হবে
না। সেই কখন গেরে বেরিয়েছিল—চট করে কিছু খেয়ে
নে। মা বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসার আগে। এখনি
তোমার দাদাবাবু, বড়বাবু বাড়ি আসবেন। কপালে আজ
তোমার অনন্ত দুর্গতি আছে। রেগে সবাই আগুন হয়ে
আছেন। শুনলি তো মায়ের কথা? তোকে ছাড়িয়ে
দেবেন মাসকাবারে। কোন কন্দের নোস তুই।

ইস্ ছাড়ালেই হল আর কি? আমি গেলে
তো?

গোপালের গলাও সমানে চড়ে।

বাঁবি না মানে? নহুন লোক রাখবে এরা। আর
এদেরই বা দোষ কি বল? তুই বোজ বোজ আমাদের
জালিয়ে থাকি? কে সহ করবে বল? এই নে ধর, এই
দিকে সরে আর। পরোটা দুখানা আলুর দম দিয়ে খেয়ে
নে। ওই চা রেখেছি তোমার জন্তে। গরম আছে এখনো।
আগে খেয়ে নে। মুখ শুকিয়ে গেছে। কোথায় ঘুরিস
বলতো সারাদিন? কিসে পায়নি?

খুব কিসে পেরেছিল বৌদি। ভাল হয়ে বসে পরোটা-
আলুর দম খেতে খেতে ধরা গলার গোপাল জবাব
দেয়।

ভাতো পাবেই। এই যে আর একখানা। ছেলে
মাছ, সমস্ত দিন হটর হটর করলে কি হয়? কাল থেকে
ঘুমোবি। বুঝলি? দুপুরে বেকনো ছাড়তে হবে।

তুমি বা বলবে, আমি তাই শুনবো বৌদি। চা টা যে
ঠাণ্ডা হয়ে গেছে বৌদি?

ওরা? দাঁড়া দাঁড়া গরম করে দি একটু।

হ্যাঁ তাই দাঁও। বাড়ির মধ্যে তুমি ছাড়া আর কেউ
আমাকে একটুও ভাল বাসেনা বৌদি। ডেকে ছুটো
ভাল কথাও বলেনা। কেউ দেখতেও পারেনা। তুমিই
বা একটু—

ছায়া নেই শুধু আলো

ঐগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায়

দু'ধারে ভরা ক্ষেত, মাঝেতে আলিপথ,
তাহারি বুক বেয়ে ছোটো যে মনোরথ।

উদার নীলাকাশে,
শারদ আলো হাসে,
বহুধা অপরূপা শ্রামল সুবাস্য,
পল্লী-মাঠে-মাঠে মাধুরী মুরছায়।

প্রভাতী আলো করে বনানী তরুশিরে,
সোনালী মায়া আঁকে তটিনী নীরে-নীরে।

বলাকা উড়ে চলে—
আকাশ-তলে-তলে—
দখিন-সমীরণে আসে যে আগমনী
বরণ-ভালা হাতে মাটির মা-ধরণী।
বনের পথে পথে শেকালি আলিপনা
দোপাটি-শতদলে কাহারি আরাধনা।

কাশের ফুলে ফুলে
অমল হাসি ফুলে,
স্বপ্নে হ'তে কি গো জননী নামে আজি
শিশিরে ধোয়া-মোছা তাই কি তৃণরাজি!

তাই কি ভরে মন খুসীর আমেজেতে,
হৃদয় মমর হৃথের আশেতে!

হারানো স্বপ্নস্মৃতি,
অতীত কলগীতি,
ভরিছে আজি-যেন হৃদয় কূলে কূলে,
দুখেরি শত জালা যেতেছি যেন তূলে!

তাই কি ডাকে যেন দূরের নীলাকাশ
শ্রেকৃতি-বনে-বনে গীতির পরকাশ।

বাতাসে শিহরণ,
পুলক হরষণ,
অসাড় মনে জাগে জীবন-জাগরণ,
শরৎ-ঋতু-সোনা-কাঠির পরশন।

জীবনে কত দুখ, কত শত নিরাশা,
অভাব, অনটন কত যে গো হতাশা।

সবই যে মুছে যায়
বারেক যেন তার
শরতের মধুমাস জীবনের সবদিক,
ছায়া নেই, শুধু আলো, চেয়ে থাকি অনিদিষ্ট।



দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া

ঐতিহাসিক ভঙ্গিমা

সম্প্রতি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাজনৈতিক গগনে ক্ষুদ্র এক-খণ্ড মেঘের উদয় হইয়াছে। হয়ত ইহা শরভের মেঘের মতই অচিরে মিলাইয়া যাইবে। কিঞ্চিৎ ক্রমে ক্রমে বড়হইয়া ইহা আকাশ ছাইয়া ফেলিবে এবং বৃষ্টি ও ঝড়-ঝঞ্ঝার সৃষ্টি করিয়া বিষম উপজ্বলের কারণ হইবে—অনেকে এরূপ আশঙ্কা করিতেছেন এবং এই আশঙ্কা একেবারে অমূলক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। এই উপজ্বল ঘটিলে যে ভারতও তাহার চটে পৌঁছিতে পারে এরূপ আশঙ্কাও অস্বাভাবিক নহে।

ইতিহাসে দেখা যায় যে হিন্দুরা চিরদিনই বাহিরের জগতের সন্ধানে উঠানীন—অবস্থা-বিপর্যয়ে যে বাহির হইতে কোন বিপদ ঘটিলে পারে এই সম্ভাবনা কোন দিনই তাহারিগকে বিচলিত করে নাই। সুতরাং বিপদ স্বতন্ত্র না একেবারে ঝাড়ে আসিয়া পড়ে, ততক্ষণ তাহারা এ বিবরে কোন সম্ভান বা উদ্বেগবোধ করে না। আরবে নবজাগ্রত মুসলমানশক্তি যখন পারস্য ও অন্তান্ত দেশ ধ্বংস করিয়া ভারতের অতিমুখে অগ্রসর হইতেছিল; যখন একে একে প্রাচীন রাজ্যগুলি দ্রুতবেগে তাহাদের হাতে পরাজিত হইতেছিল, তখনও ইহা এদেশে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে নাই। মুসলমানেরা সিন্ধুদেশ আক্রমণ করিবার পূর্বে ভারত এ বিবরে সচেতন হয় নাই। ইহার সহস্র বৎসর পূর্বে গ্রীকবীর আলেকজান্ডার সমস্ত পশ্চিম-এশিয়া জয় করিয়া সিন্ধুনদ পার হইবার পূর্বে তাঁহার আক্রমণের সম্ভাবনামাত্র কোন ভারতবাসী আশঙ্কা করে নাই। সম্প্রতি চীনদেশ ধীরে ধীরে তির্যক আক্রমণ করিয়া যখন ক্রমে ক্রমে হিমালয় পার হইয়া ভারতে একটির পর একটি খাঁটি দখল করিতেছিল—তখন ভারতসরকার কর্তৃক বৎসর ধাং ইহার প্রতি কোন গুরুত্ব আরোপ করে নাই

এবং সমস্ত এই সংবাদটি পর্যন্ত কাহাকেও জানিতে দেয় নাই। তারপর যখন একেবারে বিপুল চীনাবাহিনী লাডাক ও আসামের মধ্য দিয়া ভীমবেগে অগ্রসর হইল তখন অকস্মাৎ ভারতবাসী জাগিয়া উঠিল। কিন্তু সে ক্ষুদ্রকর্ণের নিজাতত্ত্ব। অস্ত্র নাই, পোষাক নাই, যুদ্ধের অস্ত্র কোন প্রস্তুতি নাই—সুতরাং ভারতগৈরিক পশ্চাৎ হটিতে লাগিল—সরকারী কর্মচারীরা তেজপূর সহরের মায়্যা ত্যাগ করিয়া ভীত ভ্রান্ত নরনারীকে পশ্চাতে রাখিয়া সিন্ধুদেশের প্রাণ বাঁচাইলেন। দুর্বলের সহায় ভগবান—তাঁই চীনারা আর অগ্রসর হইল না। প্রকারান্তরে বলিল তোমাদের কান মলিয়াছি, জুতা মারিয়াছি, আর অপমান করিব না। আমরাও প্রাণ লইয়া পলাইতে পারিয়াছি ইহাতেই খুশী হইলাম। চীন-ভারতের এই যুদ্ধের কাহিনী পৃথিবীর ইতিহাসে অকৃতপূর্ব বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য। এই যুদ্ধে সহস্রাধিক ভারতীয়সৈন্য (সম্ভবতঃ আরও অনেক বেশী) হত, আহত ও বন্দী হইয়াছে, কিন্তু একটি চীনা সৈন্য বন্দী হয় নাই, হত বা আহত হইয়াছে এরূপ সংবাদও জানা যায় নাই। জীবনভরিয়া ইতিহাসে কত যুদ্ধের কথাই তো পড়িয়াছি—কিন্তু এরূপ যুদ্ধের কাহিনী শুনি নাই বা কোন বইয়ে পড়ি নাই।

সম্প্রতি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্রুত বেগে যে পট পরিবর্তন হইতেছে আমাদের দেশে তাহার সম্ভান খুব কম লোকই রাখে। স্বাধীনতা লাভের পর আমরা বহু দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিয়াছি—এখনও করিতেছি এবং ভবিষ্যতেও করিব। কিন্তু আমাদের পরম গর্বের বিষয় যে পণ্ডিতজীর পররাষ্ট্রনীতি ভারতের দুখ পৃথিবীতে উজ্জ্বল করিয়াছে। কিন্তু কেবল গৌরব লইয়া পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকা যায় না—প্রত্যক্ষ বাস্তবকে কোন মতেই অস্বীকার করা যায়

ভারতবর্ষ



প্রাচীন দুর্গ (বাগের)

ଉତ୍ତରାବଳି (କାବିରୀ)

କାବି : ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଃ

না। স্বাধীন হইবার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের দুইটি সম্রাট প্রবল হইয়া উঠিল—পাকিস্তানের সহিত সন্ধ ও কান্দীর সন্ধে ব্যবস্থা। ১৭ বৎসরের মধ্যে এ দুইটি সম্রাটের সমাধান তো দূরের কথা তাহার সম্ভাবনাও দেখা বাইতেছে না। ভারতসীমান্তে পাকিস্তানের হানা পূর্ববৎ চলিতেছে। ভারতসরকারের মৌখিক প্রতিবাদ ভারতে ও পাকিস্তানে সমানরূপে হাঙ্গামনক বলিয়া গণ্য হইতেছে। পূর্বপাকিস্তানের হিন্দুদের শোচনীয় অবস্থার কোন উন্নতি হয় নাই, বরং ইহা ক্রমশঃই খারাপ হইতেছে। কান্দীর-সম্রাটও ক্রমশঃই গুরুতর হইয়া উঠিতেছে। সত্তর বৎসর যাবৎ গৌরবোজ্জ্বল বৈদেশিক নীতি পরিচালনার এই এক দিক। আর একদিক হইল চীনাগের সঙ্গে পঞ্চশতাব্দের মালা বদল ও তাহার ফলে তিব্বতের ধ্বংস ডাকিয়া আনা। সন্ধির শর্ত ডাকিয়া চীন যখন তিব্বত দখল করিল তখন ভারতসরকার নিরপেক্ষ। এই তিব্বতের পথ দিয়াই যে এক দিন চীন ভারত আক্রমণ করিতে পারে এরূপ সম্ভাবনার কথা কলিকাতায় সত্য করিয়া ভারতের অনেক গণ্যমান্ন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বলিয়াছিলেন। ভারতসরকার এই আশঙ্কাকে বিদ্রূপ করিয়াছিল এবং বাংলার কংগ্রেসসদস্যেরা কলিকাতায় ঐ সত্য বরকট করিয়াছিল। কিন্তু যখন তাহা সত্য সত্যই ঘটিল, তখন তুল ক্রটি লজ্জা স্বীকার না করিয়া দামামার শব্দে আমাদের বৈদেশিক নীতির মহিমা চতুর্দিকে প্রচারিত হইল।

এবারে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মেঘ ঘনাইয়া উঠিয়াছে। অবশ্য ইহা একেবারে আকস্মিক নহে, কারণ গত দশ বৎসর ধরিয়াই ইহার সূচনা আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু ভারত এদিকে দৃষ্টি দেয় নাই। তাই হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক রাজনীতি বিষয়ের একজন অধ্যাপক বলিয়াছেন যে কম্বো, কিউবা ও বেলগ্রেডের ব্যাপারে ভারতের যথেষ্ট উৎসাহ দেখা যায়, কিন্তু লাওস ও ভিয়েতনামের যে সকল ঘটনায় ভারতের নিরাপত্তা বিপদগ্রস্ত হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা সে সন্ধে ভারতসরকার ভেতন কোন উৎসাহ দেখায় না।

ভারতের সহিত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সন্ধ এবং কিল্লণে এখানকার ঘটনায় ভারত বিপদগ্রস্ত হইতে পারে তাহা বুঝিতে হইলে কিছু পূর্বকথা আলোচনার দরকার।

ভারতবর্ষের পূর্বে ও চীনের দক্ষিণে এশিয়া মহাদেশের অংশ অবস্থিত তাহাই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া নামে অভিহিত হইবার মধ্যে যে বিস্তৃত ভূখণ্ড আছে তাহা ইন্দোচীন এবং তাহার দক্ষিণের দ্বীপময় অংশ ইন্দোনেশিয়া নামে খ্যাত এই দুই অংশেই প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্বে আদি অসভ্যতা বিদ্যমান ছিল। ভারতবাসীরা বাইরা এই সব অঞ্চলে রাজ্য ও বড় বড় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে এবং ঐ সমুদয় দেশের চিরস্থায়ী বাসিন্দা রূপে ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতা বিস্তার করে। ইন্দোচীনে ব্রহ্মদেশ, জামদেশ (থাইল্যান্ড), মলয় উপদ্বীপ, কম্বুজ (কাম্বোডিয়া), চম্পা (ভিয়েতনাম) ও লাওস প্রভৃতি অনেক পার্বত্য প্রদেশে বহু হিন্দু ও বৌদ্ধ রাজ্য রাজত্ব করেন। সংস্কৃত ও পালি ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা হয়, বিরাট মৌদ্র, মন্দির, স্তূপ ও বিহার এবং বহু দেবদেবীর মূর্তি নির্মিত হয় এবং ভারতীয় সামাজিক ও শাসনপদ্ধতি আচার-ব্যবহার প্রভৃতি প্রচলিত হয়। ইন্দো-চীনে কম্বুজরাজগণ এবং দ্বীপময় ইণ্ডোনেশিয়ার শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজগণ বিরাট, সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। আকোরভাট, বড়বুহর প্রভৃতি বহু মন্দির ও স্তূপ আজও তাঁহাদের কীর্তি বহন করিতেছে এবং ভারতীয় শিল্পকলার উৎকৃষ্ট নিদর্শন হিসাবে বিশ্বের বিশ্বাস হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

খ্রীষ্ট জন্মের পর প্রায় ষেড় হাজার বৎসর পর্যন্ত ভারতীয় সভ্যতা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অব্যাহত ছিল। তারপর ধীরে ধীরে ইসলাম সভ্যতা ইহার কোন কোন অংশে প্রভাব বিস্তার করে। ত্রয়োদশশতাব্দীর শেষে ইহা মুসলমান দ্বীপে এবং পরে ক্রমে ক্রমে বলিষীপ ও আর কয়েকটি ক্ষুদ্র দ্বীপে ও বড় বড় দ্বীপের অংশ ব্যতীত ইন্দোনেশিয়ার সবত্রই পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইসলাম সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইন্দো-চীনে চম্পা (ভিয়েতনাম) ও মলয় উপদ্বীপ মুসলমান সভ্যতা গ্রহণ করে কিন্তু ব্রহ্ম, জামদেশ, ও কম্বুজ পূর্বের মত বৌদ্ধধর্মের প্রধান কেন্দ্র ছিল। অত্যাগ্র অঞ্চলে বৌদ্ধ এবং কনফুসিয়াসের ধর্মের প্রভাব ছিল।

ইসলাম ধর্মের প্রাচীর সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বেই ইউরোপীয়গণ দক্ষিণ-এশিয়ার আধিপত্য বিস্তার করিতে আরম্ভ করে। বোঙ্কশতাব্দী হইতে বিংশশতাব্দীর

মধ্যে একরাত্রি ভ্রমদেশ ব্যতীত আর সকল অংশেই ইউরোপীয়গণ প্রভুত্ব করে। ইন্দোনেশিয়ার বীপপুঞ্জে ওলন্দাজেরা বিরাট সাম্রাজ্য গঠন করে। ইন্দোচীনে ব্রহ্মদেশ ও মালয় উপদ্বীপে ব্রিটিশ এবং কঙ্গুজ, ভিয়েতনাম ও লাওস অঞ্চলে ফরাসীরা প্রভুত্ব করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানীরা ক্ষতবেগে এই সমুদ্র দেশ অধিকার করে এবং ব্রিটিশ, ফরাসী ও ওলন্দাজদের প্রভুত্ব একেবারে বিলুপ্ত হয়। এই সকল দেশেই জাপান “এশিয়া এশিয়াবাসীরা জন্ত” এই নীতি প্রচার করে। ফলে লোকের মনে স্বাধীনতা লাভের স্পৃহা জাগিয়া ওঠে। জাপান যুদ্ধে পরাজিত ও ঐ সমুদ্র দেশ হইতে বিতাড়িত হইলেও ইউরোপীয়দের প্রতি বৈরিতা ও তাহাদের অধীনতা পাশ হইতে মুক্তি লাভের আকাঙ্ক্ষা—এই দুয়ের যে বীজ জাপান-আক্রমণকারীরা রোপণ করিয়াছিল তাহা ক্রমে বিশাল বৃক্ষের আকার ধারণ করিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইংরেজ, ফরাসী ও ওলন্দাজেরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তাহাদের প্রভুত্ব পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্যোগ করিল—কিন্তু দেখিল যে অবস্থার গুরুতর পরিবর্তন হইয়াছে।

ইংরেজেরাই প্রথমে বিনা গোলমালে নতুন পরিবেশ স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইল। ব্রহ্মদেশে কিছু পরিমাণ প্রভুত্ব রাখিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া তাহারা ব্রহ্মদেশকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিল। ভারতবর্ষেও দুইটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপিত হইল। মালয় উপদ্বীপে বহুকাল পর্যন্ত তাহারা প্রভুত্ব বজায় রাখিল, ইহার কারণ পরে আলোচিত হইবে।

ফরাসিগণ কাম্বোডিয়া ও লাওস এই দুই দেশের উপর অধিকার ত্যাগ করিলেও এ দুয়ের পূর্ববর্তী ভিয়েতনাম প্রদেশে অর্থাৎ টংকিং, আনাম ও কোচিন-চারণার পুনরায় প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল। কারণ সমুদ্রের উপকূলস্থিত এই স্বর্ধীর্ষ ভূখণ্ডে লালনদী (Red River) ও মেকংগীর মোহানা ধুনুজনে ও শতসম্পদে সমৃদ্ধিশালী ছিল ও ইহার বন্দরগুলিতে বাণিজ্যের সুবিধা ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আরম্ভেই এখানে ভিয়েত-মিন্ (viet menh অর্থাৎ ভিয়েতনামের স্বাধীনতা লব্ধ) নামে একটি বল গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইহার নায়ক

হিলেন রাশিয়া ও চীনে কমিউনিষ্টদের দীক্ষিত হো-চি-মিন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে এই দেশের ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা সম্বন্ধে মিত্রশক্তিদের মধ্যে মতভেদ হয়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট বলিলেন—ইহা আর ফরাসি-দ্বিগকে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না—চীনের জাতীয়তাবাদী চিয়াং কাই শেকের গভর্নমেন্ট ইহা দখল করুক। কিন্তু বাণানুবাদেদের পর স্থির হয় যে আপাততঃ সাময়িকভাবে চীন ও ব্রুটেন যথাক্রমে ইহার উত্তর ও দক্ষিণ ভাগ দখল করুক—পরে ফরাসিরা ফিরিয়া আসিলে সমগ্র দেশটি তাহাদের হাতেই দেওয়া হইবে। জাপানী সৈন্য আত্মসমর্পণ করিবার প্রায় একমাস পরে ব্রিটিশসৈন্য ভিয়েতনামে পৌছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে হো-চি-মিন ভিয়েতনাম গণ-তন্ত্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইলেন। ১৯৪৬ খৃঃ ফেব্রুয়ারী মাসে চীনসৈন্য উত্তর ভিয়েতনাম পরিত্যাগ করিল এবং ফরাসিরা হো-চি-মিনের সঙ্গে একটা আপোষ করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু স্বাধীনতা তো দূরের কথা, পুরাপুরি স্বায়ত্ত শাসনের অধিকারও ফরাসিরা দিতে স্বীকৃত হইল না। অবশেষে ১৯৪৬ খৃঃ শেষভাগে ফরাসিরা হো-চি-মিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। কিন্তু ফরাসীরা যুদ্ধে বিশেষ সুবিধা করিতে পারিল না। ১৯৪৯ খৃঃ চীনে কমিউনিষ্ট দলের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল এবং তাহাদের সাহায্যের ফলে হো-চি-মিন দুর্ধ্ব হইয়া উঠিল। তখন ফরাসিরা বাও দাই নামে আনামের ভূতপূর্ব সম্রাটকে সিংহাসনে বসাইয়া তাঁহার সহিত সন্ধি করিল। ফরাসিরা যুক্তরাষ্ট্রকে বুঝাইল যে প্রকৃতপক্ষে হো-চি-মিনের সহিত যুদ্ধ কমিউনিষ্ট চীনের সঙ্গে যুদ্ধেরই নামান্তর। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রও ফরাসিদের সাহায্য করিল। কিন্তু যুদ্ধে ফরাসিরা কোন মতেই জয়লাভ করিতে পারিল না। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের পূর্বেই ৩৩,০০০ ফরাসিসৈন্য নিহত, হয়, ইহা হইতেই যুদ্ধের গুরুত্ব বোঝা বাইবে। মাঝে মাঝে কিছু সাক্ষ্য লাভ করিলেও ১৯৫৪ খৃঃ ফরাসিরা যুদ্ধে জয়ের আশাত্যাগ করিল। ১৯৫৪ খৃ জেনেভাতে যুক্তরাষ্ট্র, ব্রুটেন, রাশিয়া ও চীনের বৈদেশিক মন্ত্রীরা সমবেত হইয়া দুই দলের মধ্যে নিম্নলিখিত শর্তে যুদ্ধ বিরতির ব্যবস্থা করিল :

ভিয়েতনামের যে অংশ সপ্তদশ-সম্রাজ্ঞবাদের (latitude) উত্তরে অবস্থিত, তাহা ভিয়েতনামের অর্ধাংশ হো-চি-মিনের অধিকারে থাকিবে। ইহার দক্ষিণ-অংশে বাও দাই স্বাধীনভাবে (?) রাজত্ব করিবে—অশ্রু ফরাসিরা তাহাকে সাহায্য করিবে। ১৯৫৬ সনে সমগ্র দেশে নতুন নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হইবে এবং নির্বাচিত সদস্যগণ ভিয়েতনামের ভবিষ্যৎ শাসন প্রণালীর ব্যবস্থা করিবেন।

কিন্তু এই ব্যবস্থা কার্যকরী হইল না। কারণ দেশের দুই অংশের দুই গভর্ণমেন্টের মধ্যে নানা অজুহাতে গোল-মাল চলিতে লাগিল। হো-চি-মিন সম্পূর্ণরূপে চীনের কমিউনিষ্ট গভর্ণমেন্টের দলভুক্ত হইলেন। দক্ষিণ-ভিয়েতনামে আভ্যন্তরিক অনেক গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা হইল। হো-চি-মিনের কমিউনিষ্টদল গোপনে প্রচার কার্য চালাইতে লাগিল। বাও দাইর পরিবর্তে অল্প শাসনকর্তা নিযুক্ত হইল—বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী অধিবাসীগণের প্রতি অকথ্য অত্যাচার ও উৎপীড়নের ফলে দেশমধ্যে অশান্তি ও বিদ্রোহের আগুন জলিয়া উঠিল। হো-চি-মিনের দল ইহা অনায়াসেই জয় করিতে পারিত, কিন্তু তাহা হইলে কমিউনিষ্ট চীনের প্রভুত্ব সমগ্র ইন্দোচীনে বিস্তৃত হইবে এই আশঙ্কায় যুক্তরাষ্ট্র দৈন্ত ও অস্ত্র-শস্ত্র পাঠাইয়া ইহা রক্ষার ব্যবস্থা করিল। মোটের উপর এখন ফরাসিরা দক্ষিণ ভিয়েতনামের রাজনৈতিক ক্ষেত্র হইতে সরিয়া গিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্ররক্ষিত দক্ষিণ ভিয়েতনামের সহিত চীনের সাহায্যে পরিপুষ্ট উত্তর ভিয়েতনামের বেষারেষি চলিতেছে। সম্প্রতি উত্তর ভিয়েতনাম যুক্তরাষ্ট্রের নৌবহর আক্রমণ করিয়াছে—এই অজুহাতে যুক্তরাষ্ট্র ও উত্তর ভিয়েতনামে বিমান পোত হইতে বোমা নিক্ষেপ করিয়াছে। আদ্য ব্যাপার এই যে নতুন নির্বাচন হইলে হো-চি-মিনের দল যে সমগ্র ভিয়েতনামে আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিবে শত্রু-মিত্র কাহারও সে বিষয়ে সন্দেহ নাই এবং তাহার ফলে যে সমগ্র দেশটি কমিউনিষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হইবে সে বিষয়েও সন্দেহের অবকাশ নাই। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্র ও হো-চি-মিনের বিরোধ গণতন্ত্রের সহিত কমিউনিষ্ট নীতির যুদ্ধের একটি অধ্যায় মাত্র এবং সম্ভবতঃ ইন্দোচীনে ইহাই শেষ অধ্যায়। কারণ কাবোডিয়া ইতিমধ্যেই কমিউনিষ্ট চীনের মিত্রতা—অর্থাৎ আত্মগত

বীকার করিয়াছে। লাওসে ভিয়েতনামের মতন কমিউনিষ্টদল বেশ প্রবল, কারণ ইহার চীন ও উত্তর ভিয়েতনামের সাহায্য পাইতেছে। আরও দুইটিদল আছে—একদল কমিউনিষ্টের বিরুদ্ধবাদী—আর একদল নিরপেক্ষ। যুক্তরাষ্ট্র এই দুই দলের কখনও একটি কখনও অপরটির সাহায্যে কমিউনিষ্ট-দলকে পরাস্ত করিতে চাহেন। এদেশের অন্ত ও জেনেভাতে ব্যবস্থা হইয়াছে যে লাওসের লোকেরাই শাসনের ব্যবস্থা করিবে—বাহির হইতে চীন, উত্তর-ভিয়েতনাম বা যুক্তরাষ্ট্র কোন দলকে কোন সাহায্য করিতে পারিবে না। যে কমিশনের উপর এই ব্যবস্থাসূচকারী কার্যপরিচালনার ভার দেওয়া হইয়াছে ভারতগভর্ণমেন্ট তাহার সভাপতি। কিন্তু যতদূর নির্ভরযোগ্য সংবাদ পাওয়া যায় তাহাতে মনে হয় ভারত এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন—একদিকে কমিউনিষ্ট-চীন ও ভিয়েতনাম, অপরদিকে যুক্তরাষ্ট্র প্রায় প্রকোপিত। দৈন্ত, অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্রের আয়দানি করিতেছে। কমিশন তাহার প্রতিরোধ করিতে অনিচ্ছুক অথবা অসমর্থ। এক্ষেত্রেও যুক্তরাষ্ট্র একাকী গণতান্ত্রিক পক্ষ হইয়া লড়িতেছে।

ইন্দোনেশিয়াতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বেই জাতীয়তাবাদী দল প্রবল হইয়া ওঠে। এই দলের নায়ক সুকর্ণকে ওলন্দাজসরকার কারাবদ্ধ ও নির্বাসিত করে—কিন্তু জাপানীরা যখন ইন্দোনেশিয়া জয় করে তখন সুকর্ণও তাহার দল জাপানীদের সঙ্গে যোগ দেয় এবং জাপানীরাও তাহাদের হাতে দেশশাসনের কতক ভার দেয়। ওলন্দাজেরা যখন যুদ্ধের পর ফিরিয়া আসিল তখন সুকর্ণ জাভা ও সুমাত্রার গণতন্ত্রশাসনের অধিনায়করূপে প্রতিষ্ঠিত। ওলন্দাজেরা বহুদিন যাবৎ ইহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কিন্তু অবশেষে ১৯৪৯ খৃঃ শেষভাগে ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করে।

মলয় উপদ্বীপে মালয় জাতি ছাড়া আরও বহু জাতির বাস—ইহাদের মধ্যে চীনা, ভারতীয় ও ইউরেশিয়ান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহাদের মধ্যে চীনারাই সংখ্যায় বেশী। সমগ্র অধিবাসীর শতকরা ৪৪.৭ জন চীনা ও ৪৩.৫ জন মালয়। সমগ্র দেশটিও ১০.১২টি হুয় কুয় রাজ্যে বিভক্ত। এই অল্পই ব্রুটশ এখানে তাহাদের অধিকার অনেকদিন অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল। কারণ মলয়ের

অধিবাসীরা স্বাভ্যাসের দাবী করিলেও সকলে মিলিত হইয়া কোন একটি শাসনভঙ্গ স্বীকার্য্যে গড়িয়া তুলিতে পারে নাই। প্রথমে সিঙ্গাপুর নাম দিয়া বাকী এগারটি রাজ্য লইয়া একটি যুক্তরাষ্ট্র (Malay federation) গঠিত হয়। পরে ১৯৬৩ খৃঃ এই এগারটি রাজ্য এবং সিঙ্গাপুর ও বোর্নিও দ্বীপে ব্রিটিশ অধিকৃত তিনটি রাজ্যের মধ্যে দুইটি সারাক্ষরিক ও সারা (উত্তর বোর্নিও) লইয়া “মলয়ালিয়া যুক্তরাষ্ট্র” গঠিত হইয়াছে। কিন্তু ব্রিটিশ অধিকৃত তৃতীয় প্রদেশ—জায়েই ইহাতে যোগদান করিতে অস্বীকৃত হইয়া স্বাধীনতা লাভের জন্য এক মুক্তিফৌজ গঠন করিয়া বিদ্রোহ করে (১৯৬২)। বোর্নিওর কতক অংশ ইন্দো-নেশিয়ার গণতন্ত্রশাসিত রাষ্ট্রের অধীন। ইহার নায়ক সুকর্ণ এই বিদ্রোহের সমর্থন ও সাহায্য করেন। পরে মলয়ালিয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইলে তিনি প্রকাশ্যে ইহার প্রতিবাদ করেন এবং ইহাকে ধ্বংস করিবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন। কারণ তাঁহার বিশ্বাস যে ব্রিটনেরা মলয়ে তাহাদের আধিপত্য পরোক্ষভাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্যই মলয়ালিয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিয়াছে। সম্প্রতি ইন্দোনেশিয়ার সৈন্য মলয় উপদ্বীপ আক্রমণ করিয়াছে—এবং সুকর্ণ একজন কমিউনিষ্টকে মন্ত্রী নিযুক্ত করিয়াছেন। সুতরাং এরূপ সন্দেহ করা অমৌকিক নহে যে তিনিও চীনের সাহায্যে মলয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইতে মনস্ত করিয়াছেন।

এই পরিস্থিতিতে ভারতের অবস্থা কি তাহা বিবেচনা করা বাউক। চীন যে পূর্ব-এশিয়ার কমিউনিষ্ট আধিপত্য স্থাপনের অভিলাষী সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কেবলমাত্র আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রই ইহার প্রতিষেধক। ভারতের দুই প্রতিবেশী পূর্বে ব্রহ্মদেশ ও পশ্চিমে পাকিস্তান। পাকিস্তান প্রকাশ্যে চীনের সহিত ভারতের বিরুদ্ধে যোগদান করিয়াছে। ব্রহ্মদেশ যে চীনের সহিত নৌহাঙ্গী রক্কে বিশেষ আগ্রহাশিত তাহাও বেশ বোঝা যায়। চীনদেশ ভারত আক্রমণ করিয়া বেক্স অনায়াসে জয়লাভ করিয়াছে

তাহাতে চীনের সামরিক ও রাজনীতিক স্বার্থা বধেই বাড়িয়াছে—এবং এশিয়ার ভারতের প্রতিপত্তি সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়াছে। ভারতের সামরিক শক্তি যে কত দুর্বল ও অসংসারশূন্য তাহা সকলেই বুঝিতে পারিয়াছে। সুতরাং ইচ্ছা থাকিলেও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কোন রাজশক্তি চীনের বিরোধিতা করিয়া ভারতের সহিত মিত্রতা করিবে তাহার সম্ভাবনা খুবই কম। ভারত স্বাধীন হইবার পরে পৃথিবীর মধ্যে এই বৃহত্তম গণতন্ত্র যে এশিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামে নায়কের পদ গ্রহণ করিবে অনেকে এরূপ আশা করিয়া ছিল। কিন্তু ভারতের গৌরব ও প্রতিপত্তি সমূলে ধ্বংস করিয়া চীন সকলের মন হইতে সে আশা দূরীভূত করিয়াছে। এ বিষয়ে চীনের ভারত অভিযান সম্পূর্ণরূপে সার্থক ও সফল হইয়াছে। এখন প্রশ্ন এই যে চীন কি ইহাতেই সন্তুষ্ট থাকিবে—না ভারতে আধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা করিবে। এই দ্বিতীয় প্রশ্ন একেবারে অমূলক বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই। অন্ততঃ ইহার জন্য সর্বস্বকমে প্রস্তুত থাকা আবশ্যক। ভারতের চারিদিকে যদি সর্বত্রই কমিউনিষ্টচীনের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বাড়িতে থাকে তবে চীনের পক্ষে যে পরিমাণ সুবিধা ভারতের পক্ষে সেই পরিমাণ অসুবিধা। সুতরাং সমর থাকিতে থাকিতেই ইহার প্রতিবিধানের চেষ্টা করা উচিত। এ বিষয়ে আমাদের ততপূর্ব প্রধান মন্ত্রী যে খুব অবহিত ছিলেন তাহা মনে হয় না। কারণ লাওস ও ভিয়েতনামে কমিউনিষ্ট দলের প্রতিপত্তি ক্রমশঃই বাড়ার জন্য তিনি কোন চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া জানা নাই এবং ইউরোপীয় ও আমেরিকার রাজনীতিকেরা এজন্য তাঁহাকে অভিযুক্ত করিয়াছেন। পূর্বে বলিয়াছি ভারতবাসী চিরদিনই পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতি উদাসীন থাকার পরম্পরায়িত্য শৃঙ্খল পাবে দিয়া বহুবার তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে। কেহ বোধিয়া শেখে—কেহ ঠেকিয়া শেখে। পুনঃ পুনঃ ঠেকিয়াও কি আমরা অতীত ইতিহাসের নিকট হইতে কিছুমাত্র শিক্ষালাভ করিব না?



নরেন্দ্র নাথ মিশ্র

ডিকসন লেনে এক বছর বাড়িতে চায়ের নিয়ন্ত্রণ সেবে গ্যালিক ট্রাটের ট্রায়ে একা একা কিরে চলেছিল মিনতি, স্বামী নিরুপম সঙ্গে আসতে পারেনি, জরুরী কাজে আটকে পড়েছে। চার বছরের ছেলে সন্ত আদবার জ্ঞান বায়না ধরেছিল, আনে নি। শান্তডীর কাছে রেখে এসেছে, আসবার সময় তার লে কি কামা? কিন্তু কীদলে কি হবে—তরঙ্গী খান্দবীর বাড়িতে স্বামীর সঙ্গে আসা যায়, কিন্তু ছেলেকে আনতে কেমন বেন লক্ষ্য করে। তা ছাড়া বেলার এখনও ছেলেপুলে হয়নি, ওই বা কি ভাবত!

কিন্তু ফেরার সময় মিনতি তাৎহে অল্প কথা। আনলেই হোত, আনলেই হোত ছেলেটাকে। ওর সেই অভিমানে ফুলে-গুঠা ফুলের তুলতুলে ছুটি চোঁট বারবার চোখের সামনে ভেসে উঠছে মিনতির। ওর সেই অবিরাম কামা ভেসে আসছে কামে—আহা, নিজের রক্ষীণ জামাটি : ছোট স্কুতো নিজেই এগিয়ে এনেছিল, কত সাধ করেছিল,

কত আশা করেছিল মায়ের সঙ্গে বেরবে। মিনতি ছাড়া আনেনি, আনলেই পায়ত, অকণ আর বেলা দুজনেই ছেলেপুলে খুব ভালবাসে, আনলে ওরা খুশিই ছোত :

ট্রায়ে গুঠার আগে মোড়ের দোকান থেকে ছেলেপুলে জ্ঞান এক বাক্স চকোলেট কিনে নিয়েছে মিনতি, চকোলেট ভারী ভালবাসে সন্ত, পেলে খুব খুশী হবে। বাড়ী গিয়েই চকোলেটগুলো ওর হাতে তুলে দিয়ে মিনতি চেয়ে চেয়ে দেখবে ওর খুসি-ভরা মুখ। মেঘ বৃষ্টির পরে সোনালী রোদের ঝিকিমিকি। কিন্তু হাতে কি আর দিতে নেবে এই ট্রাম কোম্পানী। কত আন্তে আন্তে গাড়ী চালালে দেখ, যেন গরুর গাড়ী চলেছে। প্রত্যেক ঠেপে দেয় করছে, কত আর লোক গুঠবে। অকণ ফেরৎ লোক ; গাড়ী তো বোকাই হয়ে গেছে। দাঁড়বার জায়গা নেই মাহবের, বড় আহাম্মক এই কণাকটরটি।

বা হোক রাজীবাম্বারের এই টপটার আর বেশী দাঁড়ায়নি গাড়ীটা, একটু তাড়াতাড়িই ছেড়েছে, গাড়ীটার

এই ক্ষতিটুকু শেষ পর্যন্ত বজার থাকলে মিনতি বাচে। তাড়াতাড়িই পৌঁছতে হবে ওকে, না হলে ছেলে আবার ঘুমিয়ে পড়বে, বেশি কান্নাকাটি করলে বেশী তাড়াতাড়ি ঘুমোয়।

“টিকিট”। একটু চমকে উঠে বিরক্ত হয়ে মুখ ফেরাল মিনতি, কণ্ডাকটর এসে দাঁড়িয়েছে, শুধু দাঁড়িয়ে নেই—অপলক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। কি অতঃ!

মুখ ফিরিয়ে ছোট ব্যাগটি খুলে একখানি ছ-আনি বের করল মিনতি, দিতে গিয়ে দেখে কণ্ডাকটর নেই, একবার টিকিট চেয়ে কণ্ডাকটর যদি চলে যায়, গিয়ে আশে-পাশের অল্প লোককে টিকিট দিতে থাকে তাহলে মানুষ বিরক্ত না হয়ে পারে! ছ-আনিটি ব্যাগে না রেখে হাতে করে বসে রইল মিনতি। কণ্ডাকটর যখন চলে যাচ্ছিল পরমা দেওয়ার অল্প হাতটা একটু এগিয়ে দিল। কিন্তু কণ্ডাকটর যেন তার কথা ভুলে গেছে। মিনতির দিকে সে তাকালও না। তাকে পাশ কাটিয়ে অগ্নিদিকে গিয়ে টিকিট কাটতে ল'গল। বড় অবস্থি বোধ করল মিনতি। কণ্ডাকটরের এই আচরণের মধ্যে কোথায় যেন এক ধরনের অবজ্ঞা আছে, আছে অসম্মান আর তচ্ছিন্নতার ভাব, ‘তোমার ওই দুটি পরমা ট্রাম কোম্পানীর না হলেও চলতে পারে।’ কিন্তু ট্রাম কোম্পানির চলতে পারে, মিনতির চলবে না। টিকিট মিনতিকে নিতেই হবে। কারো অবজ্ঞা সহ্য করতে পারবে না। কণ্ডাকটর আশ্রক এদিকে, ওকে তখন ডেকে হুকুম করবে মিনতি, বলবে ‘টিকিট দাও’।

কিন্তু কণ্ডাকটরের আসবার লক্ষণ নেই, ওর অল্প তো আর সারাক্ষণ বাড়ি ফিরিয়ে থাকা যায় না, তাই ফের সামনের দিকে তাকাল মিনতি। একটু বাদেই আড়চোখে চেয়ে দেখল কণ্ডাকটর আবার কাছাকাছি এসেছে আর বারবার তাকাচ্ছে তার দিকে। মিনতি আবার পরমা দিতে গেল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কণ্ডাকটর উঠাও। আবার সেই চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে মিনতি, অবশি ও এসে কাছাকাছি দাঁড়িয়েছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে মিনতিকে চোখে সেই নিশ্চল লুকু দৃষ্টি।

একবার মনে মনে একটু হাসল মিনতি। এতক্ষণে সে

বুঝতে পেরেছে ব্যাপারটা। অবজ্ঞা নয়, অমনোযোগ নয়, তার লক্ষ্যে অতি মনোযোগী হয়েছে ক্রীমান কণ্ডাকটর। তাই চলছে এই লুকোচুরির পালা। একবার টিকিট কেটে নিলে তো পালা ফুরিয়েই যায়, শেষ হয়ে যায় নাটক। বারবার এদিকে আসবার, এদিকে ঘোরাঘুরি করবার কোন অজুহাতই থাকে না। কিন্তু কণ্ডাকটরের তা ইচ্ছে নয়। ও চাইছে অজুহাতটি শেষ পর্যন্ত রক্ষা করতে, নাটকটাকে তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে না ফেলতে, যবনিকা ফেলতে ওর মন চাইছে না।

অথচ কাণ্ড দেখ, লোকটির বয়স হয়েছে, যথেষ্টই বয়স হয়েছে, পঞ্চাশ তো বটেই, বেশীও হতে পারে চেহারায় যেন আরো বেশী বলেই মনে হয়। এতক্ষণ ওর বয়স আর চেহারার দিকে মিনতির নজর পড়েনি। কণ্ডাকটরের আবার বয়স কি, তার আবার চেহারা কি? মোটা থাকীর পোষাকে ঢাকা, কাঁধে ব্যাগ ঝোলানো, ওরা সবাই তো এক রকম দেখতে, সব বয়সে সব চেহারায় ওরা এক। অল্প সময় কে বা ওদের দিকে তাকায়, পরমা দিতে টিকিট নিতে তাকাবার দরকার হয় না। কিন্তু আজ তাকিয়ে দেখল মিনতি, বয়স হয়েছে লোকটির। মাথার চুল পাক ধরেছে। গোয়ালজাগা বিশ্রী মুখ—গাল দুটি বসে গেছে, চোখ দুটির তো সবই গেছে। যারনি শুধু মেয়েছেলের দিকে তাকাবার লোভ। আশ্চর্য্য পুরুষের এই লোভ বোধহয় মরলেও যায় না, যখন কোন মেয়ের দিকে তাকায়, তখন একবার নিজের কথা ভাবেনা। ভাবে না নিজের বয়স, নিজের চেহারা। নিজের সামনে তো আরনা থাকে না, নিজের চোখকে তাই দেখতে পায়না তারা। যদি পেত তাহলে অতি বড় কামুক লম্পটের চোখও বোধ হয় লজ্জা পেত।

অবশ্য ট্রামে, বাসে, রাস্তায় নানাবয়সী পুরুষের এই-ধরনের দৃষ্টি লক্ষ্য করবার অভ্যাস মিনতির আছে। স্থলদরী বলে খ্যাতি আছে মিনতির, স্বাস্থ্যও ভাল, বোকা যায়না তার চকিৎস-পচিশ বছর বয়স হয়েছে, সিঁচুর না পরলে বোকা যায় না বিয়ে হয়েছে, ছেলে হয়ে গেছে। কেবল স্বামী কেন তার বন্ধু-বান্ধবদের মুখদৃষ্টিও যে মিনতিকে খুসি করে না তা নয়। কিন্তু তাই বলে কি সকলের দৃষ্টিই সওয়া যায়, তার স্থান-কাল-পাত্র ভেদ নেই।

কিন্তু লোকটি বড়ই বাড়াবাড়ি শুরু করেছে, টিকিট ভেদাচ্ছেই না, কেবল আসছে আর যাচ্ছে। আর লুকিয়ে লুকিয়ে কেবল তাকাচ্ছে তার দিকে, মাঝে মাঝে নিশ্চয়ক নিশ্চয় হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ছে। মিনতিকে একটু নড়তে চড়তে উলখুল করতে দেখলেই ও সরে যাচ্ছে। বখনই একটা ষ্টপের আসছে ওর যেন আশঙ্কা হচ্ছে মিনতি এই বুঝি নেমে যায়। যাওয়ার জো থাকলে মিনতি নীরতও। কিন্তু তার দুর্ভাগ্য তাকে একেবারে ডিপো পর্যন্তই বেঁচে হবে। ডিপোর কাছেই তাদের বাসা। অবশ্য ট্রামটা বদলে নিতে পাবে, কিন্তু এই ভিড় ঠেলে উঠা-নামাও তো কম অসুবিধা নয়।

ট্রামে দ্বিতীয় কোন মেয়ে নেই, অফিস ফেরৎ কেরানী-কুল কেউ বসে কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ বা ঝুলতে ঝুলতে ঝিমোতে ঝিমোতে যাচ্ছে। আর কোন দিকে তাদের চোখ নেই। কোন ব্যাপারে কোন ঔংস্কা নেই। শ্রান্ত ক্লান্ত দেহটাকে এখন কোন রকমে বাড়ীতে পৌঁছে দিতে পারলেই যেন বাঁচে। মনে পড়ল স্বামীর কথা, নিরুশ্বাসও এদেরই একজন। সেও এমনি করে নিজেই পৌঁছে দেয়।

সহযাত্রীদের উপর রাগ করতে পারল না মিনতি। ওদের কাছে নালিশও জানাতে পারল না। কি হবে নালিশ করে? নালিশ করবার কোন প্রত্যক্ষ কারণ তো নেই! কণ্ডাকটরের আচরণ আর তো কেউ বুঝতে পারছে না। মিনতিই কেবল টের পাচ্ছে, সত্যিই কত-খানি অশোভন, কতখানি অসম্মানকর এই কণ্ডাকটরের ব্যবহার। অস্বস্তিতে মন ভরে উঠল, রাগে গা জলে যেতে লাগল মিনতির।

ওমা, কাণ্ড দেখ, এরই মধ্যে একেবারে ডিপোর মধ্যে এসে পড়েছে। ট্রাম থেকে লম্বাই নেমে গেছে। নামেনি শুধু সে আর কণ্ডাকটর—একেবারে মুখোমুখি একেবারে সাম্না সামনি, একেবারে একা, কিসের একটা ভয়ে গা শিরশির করে উঠল মিনতির। কিন্তু পরক্ষণেই নিজের ভীকৃতাকে নিজেই ধমক দিল, দিনের বেলা রাস্তাভরা লোকজন তার ওর কিসের কিন্তু কেবল নিজেই ধমক দিলেই চলবে না। ধমক দিতে হবে ওই কণ্ডাকটরটাকেও পৌঁছ নিতে হবে, শিকা দিতে হবে।

মিনতি উঠে দাঁড়াল, একেবারে মুখোমুখি দাঁড়াল।

দাঁড়িয়ে মনের সমস্ত তেজ, সমস্ত জ্বালা, সমস্ত রক্তভা গলায় ঢেলে দিয়ে বলল, ‘টিকিট দাও, টিকিট দিচ্ছ না কেন?’ কণ্ডাকটর মুহূর্তকাল তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, এবার তার কোন সন্দেহ নেই, লজ্জা নেই, লুকো-চুরি নেই, তাকিয়ে থেকে একটু বাদে আস্তে আস্তে বলল—‘টিকিট দরকার নেই, টিকিট আমি তোমার কাছ থেকে নেব না মা।’

মিনতি স্তম্ভিত হয়ে গেল, মা! কি বলছে লোকটি। একেবারেই মা? কিন্তু পরক্ষণেই মিনতির হাসি পেল, পুরুষেরা এমন ভীক স্ববিধেবাদী জাতই বটে। লজ্জা মেয়ের কাছে ওরা এমনিই নরম হয়ে পড়ে। এক ধমকেই ওর মুখ থেকে কেমন মা বুলি বেরিয়েছে দেখ!

মিনতি বলল, ‘কেন, টিকিট দেবে না কেন?’ কণ্ডাকটর একটুকাল চুপ করে থেকে বলল, ‘আমার মেয়েটি ঠিক অবিকল তোমার বয়সী, তোমার মতই দেখতে ছিল, আজ তেইশ দিন হোলো সে মারা গেছে।’ কণ্ডাকটরের চোখ দুটি ছল ছল করে উঠল। থাকীর মোটা হাতায় চোখ মুঁল কণ্ডাকটর।

ট্রাম এসে ডিপোতে থেমেছে, দুজনে নিঃশব্দে নেমে এল গাড়ী থেকে, মিনতি একটু থেমে দাঁড়াল। কণ্ডাকটর বলল ‘আমার ডিউটি শেষ হয়ে গেছে।’ ও আরো কি বলতে চায় বুঝতে পারল মিনতি, বলতে চায় তুমি ঘেয়ো না। তুমি একটুকাল দাঁড়াও তোমার মুখে আমার মর মেয়ের মুখ আরও একবার দেখে নি। মিনতি দাঁড়াল বেশীক্ষণ ওকে অপেক্ষা করতে হোল না। তিন-চাণ মিনিটের মধ্যেই অফিসে চামড়ার ব্যাগটা রেখেই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল কণ্ডাকটর।

এর মধ্যে মিনতির অনেক কথা মনে হয়েছে, সত্যি ওর তো বোঝা উচিত ছিল। চেহারা দেখে চেনা উচিত ছিল। এই শোকার্ত পিতৃমৃত্তিকে সে চিনতে পারেনি রুঢ় ভাবায় অপমান করেছে তবে মনে মনে লজ্জিত হোল মিনতি। ভাবল কমা চেয়ে নেবে।

‘তুমি এখনো দাঁড়িয়ে আছ মা।’ কণ্ডাকটর এত পাশে দাঁড়াল, ঠিক আত্মচরিত্রিক ভঙ্গিতে কমা চাইলে সন্দেহ হোল মিনতির। বলল, ‘আপনার লজ্জা অপেক্ষা করছিলাম, কি হয়ে মারা গেল আপনার মেয়ে।’

কখনে সামনের দিকে এগুতে লাগল, কণাকটর বলল, 'টাইকয়েড। কিন্তু তুমি আর আমাকে আপনি আপনি করো না মা—তুমিই বলো। সে-ও তুমিই বলতো। শেষ-বরসের বড় আদরের মেয়ে ছিল কি না। ওই একটাই ছিল। একটু চোখের আড়াল করতে পারতাম না, মা, আড়াল করতে চাইতাম না। এখন কি করে থাকব, মা। এই বুড়ো কণাকটরের মা তাক নিজের সেই কচি ছেলের মা বলির মত বড় মধুর, বড় মমতায় ভরা মনে হোল মিনতির, মনে পড়ল নিজের ছেলের কথা। চোখের আড়াল করা, চোখের আড়ালে রাখা কঠিনই বটে। মাত্র অল্প সময়ের জন্য ছেড়ে কি ছটকটানিটা সে করছিল, সব মনে পড়ল মিনতির। একটা লক গলির মুখে এসে কণাকটর বলল, 'তুমি কোন্ দিকে যাবে?' মিনতি বলল, 'আর একটু এগোতে হবে আমাকে, এই সামনের গলি, কণাকটর বলল, 'আমিও এই গলিতে থাকি যদি কিছু মনে না করো, একটা কথা বলি, এই কাছেই আমার বাসা। আমি তো দেখলুম এবার ওর মাকে একটু দেখিয়ে নিতুম।

মিনতি খেমে দাঁড়াল, একটু বেন ইতস্ততঃ করল। তারপর আঙুটে আঙুটে বলল, 'আচ্ছা চলুন', কণাকটর খুশি হয়ে বলল, 'আমার লক্ষী, রূপে গুণে ঠিক আমার সেই লক্ষীটি, কিন্তু চলুন নয় মা বল চল' সে-ও তাই বলত। কোথাও দ্বিধা হয়ে দাঁড়াতে পারত না বলত চল, চল, তোমার গলায় আমি তার গলা সুনতে পাচ্ছি মা।

পুরনো একতলা বাড়ী, ছোট্ট ছোট্ট পাশাপাশি দুখানা ঘর, একখানার দরজা বন্ধ, আর একখানার খোলা। সেই খোলা দোরের সামনে দাঁড়িয়ে কণাকটর ডাকল, 'ওগো, দেখ এসে কি এনেছি, কাকে এনেছি'।

'কাকে এনেছ' ? বলতে বলতে একটি শ্রোতা জীলোক একখানা শাড়ী পরবে হাতে ভুগাছা মোটা মোটা শাঁখা, বেরিয়ে এল কণাকটরের জী, আটপোরে আধময়লা এক-হারা চেহারা, ভবু যোবনে হুন্দরী ছিল বোকা যায়। টানা টানা বড় বড় নাক চোখ, মাঝা কঙ্গা রঙ।

কণাকটরের জী একমুহূর্ত মিনতির দিকে অপলকে ডাকিয়ে রইল, তারপর হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠল, 'ওরে আমার লক্ষীয়ে! ওগো তুমি কি পাষণ, তোমার মনে কি হারামায়া নেই! একে তুমি কেন আনলে এ মিনতি

তুমি কেন আমাকে কেন বেধালে। বাকে আর কোন কালে বেধতে পাব না তাকে ফের কেন দেখলুম। কণাকটর বোধহয় ঘটনার এই পরিণতি আশা করেনি, মুহূর্তকাল হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে সে আর ঘরে রইল না সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। জীর দৃষ্টি, জীর সেই করুণ কাতর তিরস্কার সহ্য করা আর বোধহয় তার পক্ষে সম্ভব নয়, এতদিন ধরে অনেক সয়েছে।

মিনতির চোখের সামনে থেকে থাকী পরা সেই কণাকটরের মূর্তিটি এতক্ষণ বাদে অদৃশ্য হয়ে গেল। মিনতিও চলে আসছিল। কিন্তু কণাকটরের জী আগতে দিল না। এক হাতে চোখ মুছে, আর এক হাতে হাত ধরল মিনতির, বললে এলেই যদি ঘরে এনো, একটু বসে যাও।

মিনতি ঘরে ঢুকল, আসবাবপত্রবিহীন দরিত্রের সংসার দেয়াল থেকে চূর্ণবালি ঝরে পড়ছে, একটি পাটি ছিল এককোণে খাড়া করা কণাকটরের জী সেটি এনে পেতে দিয়ে বলল, 'বোসো, পাটিতে শুতে সে বড় ভালবাসত।

বসল মিনতি বসে বসে অনেক কথাই সুনতে হল। কণাকটরের মেয়ের গুণ বৃদ্ধির কথা, মা-বাপের উপর তার ভক্তি শ্রদ্ধার মাধা মমতার কথা, শেষে উঠল অহুতের প্রসঙ্গ ভুগে ভুগে কি করে মারা গেল। ওবু খেতে চাইত না। চাইত কেবল কুপখ্য করতে, বলত, একবার উঠতে পারলে হয়। আমি তোমাদের কোন মানা সুনব না সব খাব, সব দেখব, সব আরগার বাব সব সাখ মিটাব। অভাগী সব সাধই মিটিয়েছে। ফের চোখের জল মুছল কণাকটরের জী।

কার সঙ্গে কথাবলছ দিদি, চার পাঁচ বছরের কঙ্গাপানা হুন্দরী একটি মেয়ে ছুটেতে ছুটেতে এসে ঘরে ঢুকল। ঢুকেই থমকে দাঁড়াল, বেন শ্রিং-বেগুয়া পুতুলটির হঠাৎ শ্রিং কেটে গেছে। কণাকটরের জী বলল—টুনি, এদিকে আর কিছু টুনি বোটেই নেদিকে গেল না। বাপিয়ে পড়ল মিনতির কোলে, বলল, 'তবে নাকি তুমি ঘরে গেছ, তবে নাকি তুমি নেই! এই তো তুমি আমাকে ছেড়ে কোথায় লুকিয়ে ছিলে, এতদিন কোথায় ছিলে!'

মিনতি ছল ছল চোখে মিশ্রবে ওর পিঠে হাত বুলাতে লাগল তারপর এক সময় চকোলেটের পুরো ব্যাগটা ওর হাতে তুলে দিলো, ওর হাতে খুলে দিল, চকোলেট ছাড়া টুনিকে তার বেগুয়ার আর কি-ই-বা আছে।

টুনি তখন চকোলেট পেয়ে খুব খুশি। খুব অন্তমনস্ক মিনতি এক ফাঁকে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল, সঙ্গে সঙ্গে টুনির চোখ পড়ল তার দিকে। বলল, ‘ওকি পালাচ্ছ যে, বাবা দেখবে না বুঝি! বাবা তো একুশি এসে পড়বে। দিবা, দেখে আবার পালাচ্ছে, বাবার সঙ্গে দেখা না করেই পালাচ্ছে।’

মিনতির মুখ হঠাৎ আরক্ত হয়ে উঠল, দিবার উপর চৌকিদারীর ভার দিয়ে মিনতি আবার চকোলেটের বাস্কেল মন দিয়েছে। ঘর থেকে ছুজনেই বেরিয়ে এসে সন্ধ্যা বারান্দায়। টুনির দিবা বলল জামাই পাশের ঘরেই থাকে। মেয়েকে বাতে চোখের আড়াল না করতে হয় সে জগ্ন কাছেই রেখেছিলাম, দেখবে ওদের ঘরটা।’

মিনতি ব্যস্ত হয়ে বলল, ‘না, না, আমার দেবী হয়ে যাচ্ছে। আমি এবার যাই।’

টুনির দিবা বলল, একটু দেখেই যাওনা।’

মিনতি বলল, ‘চলুন।’

তেজানো দরজা একটু হাত দিয়ে ঠেলে দিল টুনির দিবা। মিনতি ঘরে ঢুকল না। আগের ঘরের সঙ্গে এ-ঘরের তেমন কিছু তফাৎ নেই, মেঝেতে গুটানো ছোট্ট বিছানা, আর শিমুরের কাছে দেয়ালে ঝোলানো একটি বেহালা।

তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিল, বলল, ‘এবার আমি যাই।’ টুনির দিবা বলল, আর একটু বসবে না, আর একটু দেবী করে যাবে না। এই অজরোধের মধ্যে লজ্জার আভাসটুকু একেবারে গোপন রইল না। সে লজ্জা মিনতির সমস্ত মনে ছড়িয়ে পড়ল।

মিনতি অক্ষুট করে বলল, ‘না’। সদর দরজার দিকে এগুতে এগুতে টুনির দিবা বলতে লাগল। একেবারে কাণ্ডিকের মত চেহারা, কে বলবে বামুন কারেডের ঘরে ছেলে নয় অনেক খুঁজে-পেতে জোড় মিলিয়ে ছিলুম। একটু নিঃশ্বাস ফেলে টুনির দিবা ফের বলল, ‘একুশি এসে পড়বে, বেশিক্ষণ বাইরে থাকেনা কাজ হয়ে গেলে চলে আসে—ঘরে বসে বসে বাজায়।’

মিনতি জিজ্ঞেস করল, ‘কি কাজ করে।’ টুনির দিবা বলল, ‘ওই একই কাজ, ট্রাম কোম্পানীর কণ্ডাকটরি। উনিই জুটিয়ে দিয়েছিলেন, শ্রামবাজার লাইনে আছে এখন। ডিউটি শেষ হয়ে গেছে। এবার এল বলে।’ মিনতি বলল, ‘কণ্ডাকটর। সেও কণ্ডাকটর।’

টুনির দিবা আবার বলল, ‘চ্যা, উনিই দিয়েছেন টিক করে। মিনতি আর দাঁড়াল না। গলিতে নেমে তাড়াতাড়ি চলতে লাগল। পাছে দেখা হয়ে যায়। কিন্তু দেখা তো যে কোন দিন হতে পারে, শ্রামবাজার লাইনে তো কম যাতায়াত করেনা মিনতি। যে কোন দিন খাণ্ডী পরা অথচ সন্দরপানা একটি যুবক কণ্ডাকটর কণ্ডাকটর এগিয়ে টিকিট কাটতে এসে হঠাৎ ধমকে দাঁড়াতে পারে। তারপর টিকিট না কেটে সেও মরে যাবে। আড়াল থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখবে, কাছে আসতে চাইবে। তবু আসতে পারবে না।

মিনতি সব টের পাবে। সব জানবে, সব বুঝবে, তবু কিছু বলতে পারবে না।

আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

প্রসিত রায়চৌধুরী

রামেন্দ্রসুন্দর তব কি স্মৃতিত হাসি,
সে হাসিতে জেগেছিল দীনা বঙ্গবাণী,
কীর্ণ বত বঙ্গপুণী হ’য়েছিল জানি
হাতের ছোঁয়ায় তব কুসুমের রাশি।

সুন্দর হৃদয় তব রামেন্দ্রসুন্দর,
গরিবার লেশ হীন আনন্দ প্রভাস
বাক্যর হয়েছ তার গ্রন্থ “দ্বিজানন্দ,”

বাংলা ভাষায় লেখা বিজ্ঞান-নিবন্ধ।

সে সুন্দর হাসি আর সুন্দর হৃদয়

উৎসাহে গেরেছিল রবীন্দ্রের জয়

পঞ্চাশৎ জন্মবর্ষে শ্রী জয়তিধি।

রবীন্দ্রের প্রীতিধন্য রামেন্দ্রসুন্দর

বাঙালীর “সংস্কৃতি” জেনেছিল সত্য,

বাঙালীর চিত্তলোকে অতিথি আবার।



হুমুদ্রস্তম্ভ সন্মিলন—

বঙ্গ সাহিত্য সন্মিলনের বিগত বার্ষিক অধিবেশনে হির হইয়াছিল যে প্রবীণ সাহিত্যিকগণকে একে একে সম্মানিত সদস্তরূপে গ্রহণ করা চাইবে এবং সন্মিলন কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের গৃহে বাইরা তাঁহাদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করিবেন। ঐ নির্দেশ মত গত ১৩ই সেপ্টেম্বর রবিবার সন্মিলনের কার্যকরী সভাপতি শ্রীকালীকঙ্কর সেনগুপ্ত, সহ-সভাপতি শ্রীকীর্ত্তনাথ মুখোপাধ্যায়, সাধারণ সম্পাদক শ্রীসুধেন্দ্রনাথ নিয়োগী, সদস্ত শ্রীমুখানন্দ চট্টোপাধ্যায় বর্দ্ধমান হইয়া ২৫ মাইল দূরে কাটোয়া মহকুমার নতুন হাটের নিকট কোগ্রামে বাইরা কবির শ্রীকুমারজ্ঞান মল্লিককে সন্মিলন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে ছিলেন শ্রীসিদ্ধানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীসৌরানন্দ চট্টোপাধ্যায়। বেলা ১১টার জিপ-বোগে পৌছিয়া তাঁহারা কুল্লু নামক ছোট নদী পার হইলে কবি পুত্রধর, ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীপৃথীলাল মল্লিক ও অধ্যাপক শ্রীকোশাধীনাম মল্লিক নদীর ঘাটে সকলকে অভ্যর্থনা করেন। কবির সারা জীবন কুল্লু ও অজয় নদের সঙ্গম স্থলে নিজ গৃহে বাস করেন। ৩২ বৎসর নিকটস্থ মাধবপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের কাজ করার পর প্রায় ২০ বৎসর তিনি অবসর জীবনযাপন করিতেছেন। কবিগৃহে পৌছিয়া কবিকে মালা, অভিনন্দন পত্র, নামাংলী ও বাঁটী দ্বারা অভিনন্দিত করিয়া সকলে প্রণাম করেন। কোগ্রাম চৈতন্য-মঙ্গল প্রণেতা সাধককবি লোচন দাঁসের পাট। সকলে সে পাট, হানীর মঙ্গলচণ্ডী মন্দির ও কবি কুমারজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত নীল-লোহিত শিবমন্দির দর্শন করেন। ৫।৬ ঘণ্টা কবিগৃহে থাকিয়া সকলে কবির আতিথ্য, দেহ শ্রীভিলাতের পর ৫ টায় রাত্রী করিয়া কলিকাতার কিরিয়া আসেন।

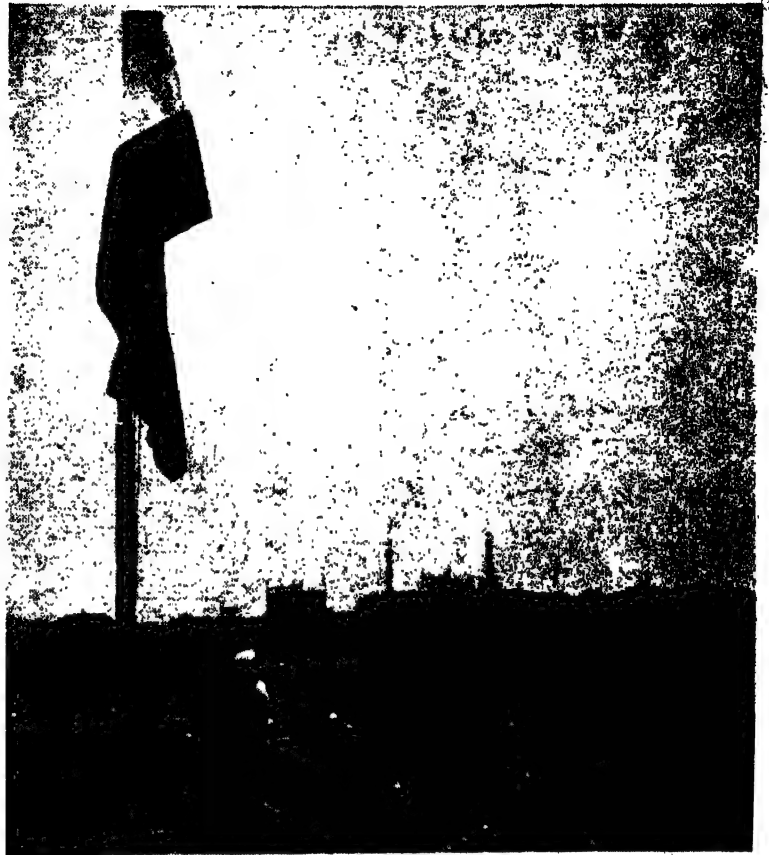
নরেন্দ্রচন্দ্র সেনগুপ্ত—

খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও আইনবিদ ডাঃ নরেন্দ্রচন্দ্র সেনগুপ্ত গত ১৯শে সেপ্টেম্বর বিকালে তাঁহার বালীগঞ্জের বাড়ীতে ৮১ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যোগদান করিয়া তিনি ১৯০৭ সালেই কংগ্রেসে বাংলার একজন প্রেষ্ঠ কর্মী বলিয়া পরিচিত হন। তিনি আইনজীবী হিসাবে যৌবনেই প্রভূত খ্যাতিলাভ করেন। তিনি আজীবন সাহিত্যসেবী ছিলেন এবং ‘ভারতবর্ষে’ তাঁহার লিখিত বহু উপন্যাস প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার ২ পুত্র ও ৫ কন্যা বর্তমান। ঢাকার ও কলিকাতার আইনের অধ্যাপক ও বিশিষ্ট আইনজীবী হিসাবে সর্বজন প্রিয় হইয়া ছিলেন। আমরা তাঁহার মৃত্যুতে শ্রদ্ধা-বিয়োগ বেদনা অনুভব করিতেছি ও তাঁহার শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

কলিকাতার নতুন প্রধানমন্ত্রী—

ভারতবর্ষের নতুন প্রধানমন্ত্রী জীলালবাহাদুর শাহী গত ২০শে সেপ্টেম্বর এক দিনের ভ্রম কলিকাতায় আসিয়া কলিকাতা বর্পোরেশনের মানপত্র গ্রহণ করেন ও গাড়েরমাঠে বিরাট জনসভায় বক্তৃতা করেন। তাঁহার পত্নী ললিতা দেবী তাঁহার সঙ্গে ছিলেন এবং শ্রীমতী ললিতা কালীঘাটে কালীমন্দিরে বাইরা কালীমাতাকে পূজা করিয়া আসিয়া ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রহ্লাদচন্দ্র সেন, প্রদেশ কংগ্রেস-সভাপতি শ্রীঅমরকুমার মুখোপাধ্যায় ও কংগ্রেস নেতা শ্রীমতুল্য ঘোষ সারা দিন জীলালবাহাদুর শাহীর সহিত থাকিয়া সর্বত্র তাঁহার উপযুক্ত সম্মানের ব্যবস্থা করেন। সে দিন আরও কয়েকজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কলিকাতায় ছিলেন এবং প্রধান-মন্ত্রীর সকল কাজে সাহায্য করিয়া ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ আজ নানা সমস্যার কর্কশিত—শ্রীশাহীর আগমন ও

ভারতবাসীর সপ্তদশ
স্বাধীনতা উৎসব উপলক্ষ্যে
অবিরাম ধারাবর্ষণকে উপেক্ষা
করে দিল্লীর ঐতিহাসিক লাল
কেন্দ্রার ময়দানে সমবেত বিরাট
জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণদানরত
প্রধান মন্ত্রী জীলান্দাহাঙ্গর
শাস্ত্রীকে দেখা বাইতেছে।



ভারতের রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণ
দিল্লীর রবীন্দ্র ভবনে "Jawaharlal
Nehru's Vision and our Goal"
নামক প্রদর্শনীটি দেখছেন। রাষ্ট্রপতি
সহিত তথ্য ও বেতার দপ্তরের কর্মী
শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও উপমন্ত্রী
শ্রীম, আর, পট্টিভি রমণকেও দেখা
বাইতেছে।

কলিকাতা দর্শনের কলে কোন কোন সমস্তার সমাধান
হলে তাঁহার পশ্চিমবঙ্গে আগমন সার্থক হইবে।

মায়ারাগী ঘোষ—

পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের সভ্য, রবিবারের সভ্য,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভার সভ্য,
কলিকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের ট্রস্টী ব্যারিষ্টার শ্রী—



মায়ারাগী ঘোষ

কিশোর বোম্বের পত্নী মায়ারাগী ঘোষ গত ২রা সেপ্টেম্বর
মাত্র ৫২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন জানিয়া
আমরা দুঃখিত হইলাম। তাঁহার এক মাত্র পুত্র শ্রীজয়
কুমার ঘোষও ব্যারিষ্টার। মায়ারাগী যেদিনীপুরের
খ্যাতিমান ঐশ্বর্যনাথ বসুর একমাত্র কন্যা ছিলেন।
তিনি সমাজসেবিকা হিসাবে ও তাঁহার বাসস্থান ১২৭ এ
স্ট্রংবস রোড অঞ্চলে তিনি সর্বজন পরিচিতা ছিলেন।

অন্যোপনিষৎ প্রকাশ—

গত ১০ই সেপ্টেম্বর কলিকাতার প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ নেতা ও
ভিক্ষু অনাগরিক ধর্মপান মহাশয়ের জন্মশতবার্ষিক উৎসব
অনুষ্ঠিত হইয়াছে। তিনিও স্বামী বিবেকানন্দের মত ১৮৯১
সালে আমেরিকার চিকাগো ধর্মসম্মিলনে যোগদান করিয়া
বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বর্তমান সময়ে কলিকাতা ও
ভারতের নান্যাহানে যে সব নূতন বৌদ্ধমন্দির নির্মিত

হইয়াছে, ধর্মপান মহাশয়ের চেষ্ঠা তাঁহাদের সাক্ষ্য দান
করিয়াছে। তিনি কলিকাতায় নূতনভাবে বৌদ্ধগ্রন্থ
প্রকাশ করিয়া বৌদ্ধধর্ম প্রচারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।
আমরাও এই শতবার্ষিক অনুষ্ঠানে তাঁহার দানের কথা শ্রদ্ধার
সহিত স্মরণ করি ও তাঁহার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাই।

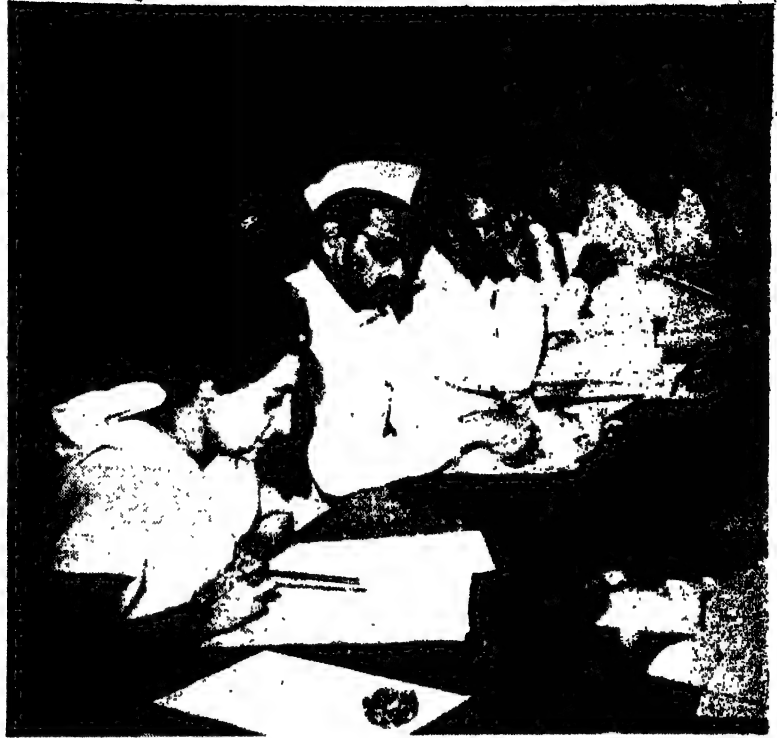
মনোজ্ঞান গুপ্ত—

খ্যাতিমান লেখক ও সাহিত্যিক মনোজ্ঞান গুপ্ত ৮ই
সেপ্টেম্বর সংসা কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে
৬২বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন জানিয়া আমরা
দুঃখিত হইলাম। ১৯০২ সালে তাঁর জন্ম, ১৯২২ সালে
বি-এস সি পাশ করিয়া ২ বৎসর টাটার কারখানায় কাজ
করার পর ১৯২৪ সাল হইতে তিনি বেঙ্গল কেমিকেল
কারখানায় রাসায়নিকের কাজ করেন। তিনি 'ভারতবর্ষ',
'প্রবাসী' প্রভৃতি পত্রিকায় লেখক ছিলেন এবং প্রাথমিক
বস্তু, প্রকৃতিবিজ্ঞান, জগদীশচন্দ্র বসু, শ্রীমতীজ্ঞাননাথ বসু
প্রভৃতি বহু বৈজ্ঞানিকের জীবনী লিখিয়া প্রকাশ করিয়া-
ছিলেন। তিনি প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক রামপ্রাণ গুপ্তের
কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন এবং তাঁহার একমাত্র পুত্র আনন্দপ্রাণ
গুপ্ত পিতার মৃত্যুর সময় রাশিয়ায় ছিলেন—১০ই সেপ্টেম্বর
তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। আমরা তাঁহার বিধবা
পত্নী, একমাত্র পুত্র, দুই কন্যা, দুই জামাতা ও ভৃত্যকে
আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করি।

ব্রজেননাথ শীল—

গত ৩রা সেপ্টেম্বর কলিকাতার খ্যাতিমান দার্শনিক ও
অধ্যাপক আচার্য ব্রজেননাথ শীলের জন্মশতবার্ষিক উৎসব
অনুষ্ঠিত হইয়াছে। তিনি দীর্ঘকাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে
দর্শন শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপকের কাজ করার পর মহীশূর
বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার নিযুক্ত হইয়াছিলেন।
তিনি বিরাট পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য সঘর্ষে
আলোচনা করা কঠিন। তিনি অধ্যাপক হিসাবে ও দর্শন
সম্বন্ধে বহু গ্রন্থের লেখক হিসাবে বিদগ্ধ সমাজে চিরকাল
সমাদৃত ও পূজিত হইবেন। আমরা তাঁহার জন্মশতবার্ষিক
উপলক্ষে তাঁহাকে শ্রদ্ধা প্রণাম জানাই এবং প্রার্থনা করি,
বাংলাদেশে তাঁহার মত বহু মনীষার আবির্ভাব হইয়া বাংলা
দেশকে সমৃদ্ধ করুক।

প্রতিরক্ষা দপ্তরের জন-
সংযোগ কমিটির একটি অধি-
বেশনে ভাষা ও বেতার মন্ত্রী
শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, স্বরাষ্ট্র
মন্ত্রী শ্রীগুলজারিলাল নন্দ
প্রভৃতিকে দেখা যাচ্ছে।



মক্কা গমনের প্রাকালে ভারতের রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লী
রাধাকৃষ্ণণকে নতুন দিল্লীর পালাম বিমান বন্দরে বিদায়
জানাচ্ছেন উপ-রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হুসেন, প্রধান মন্ত্রী
শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীগণ এবং কূটনৈতিক
দপ্তরের সভ্যগণ !

লোকনাথ বল—

চট্টগ্রাম অজ্ঞাগার লুঠন ঘটনার অন্ততম নেতা, কলিকাতা কর্পোরেশনের ১নং ডেপুটি কমিশনার লোকনাথ বল গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর শুক্রবার সন্ধ্যার পর সহসা ৫৭ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন জানিয়া আমরা মর্মান্বিত হইলাম। তিনি সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত অফিসে কাজ করিয়া বাড়ী ফিরিবার পথে মোটরগাড়ীতেই অসুস্থ হন এবং মেডিকেল কলেজে নীত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। সেদিনও আমরা কলিকাতা মিউনিসিপাল মিউজিয়াম হলে অজ্ঞাগার লুঠন সম্বন্ধে তাঁহার সুদীর্ঘ ও প্রাণবন্ত ভাষণ শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। তাঁহার পত্নী শ্রীমতী প্রতিমা বল প্রসিদ্ধ সমাজসেবী—তাঁহাদের একটি ১৪ বৎসরের মেয়ে ও একটি ৮ বৎসরের ছেলে। আমরা শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করি।

শ্রীবীরেন মিত্র—

উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবীরেন মিত্র পদত্যাগ করার তাঁহার স্থানে নূতন নেতা নির্বাচনের জন্ত গত ১৮ই সেপ্টেম্বর ভুবনেশ্বরে উড়িষ্যার কংগ্রেসদলের সমস্তদের এক সভা হইয়াছিল। কংগ্রেস-নেতা শ্রীঅতুল্য ঘোষ কংগ্রেসসভাপতি ও কেন্দ্রীয় প্রধান মন্ত্রীর নির্দেশে ঐ সভা পরিচালনা করিতে গিয়াছিলেন। আইনসভায় ৮৬ জন সদস্যের মধ্যে ৮০ জন ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন। ৭৫ জন সদস্যের ভোটে শ্রীবীরেন মিত্র পুনরায় কংগ্রেসদলের নেতা নির্বাচিত হইয়াছেন। মাত্র ৭ জন সদস্য তাঁহার বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছিলেন ও ১ জন সদস্য শ্রীবনমালী পট্টনায়ক নিরপেক্ষ ছিলেন। শ্রীমিত্রের নির্বাচনে উড়িষ্যার সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

কৃষি অসহায়তার পল্লিষদ—

ভারতের কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী শ্রীসি-সুব্রহ্মণ্যম গত ২৭শে আগষ্ট এক প্রকল্প ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদের ইতিহাস ও কার্যাবলীর কথা প্রকাশ করিয়াছেন। ৩৫ বৎসর পূর্বে ১৯২৯ সালে এই পরিষদের জন্ম হয় এবং এত দিন ধরিয়া ঐ পরিষদ কৃষি সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া ভারতে কৃষির উন্নতির জন্ত চেষ্টা করিতেছে। আজও ভারতের অধিবাসীদের মধ্যে তিন-চতুর্থাংশ লোক কৃষির উপর নির্ভরশীল—কিন্তু ভারতে অত্যন্ত শিল ও বাণিজ্য

সম্বন্ধে যত ব্যাপক চেষ্টা ও গবেষণা হইয়াছে, কৃষি সম্বন্ধে তাহা করা হয় নাই। পাট চাষ করিয়া আমরা ভারতের বাহির হইতে সব চেয়ে বেশী বিদেশী মুদ্রা অর্জন করিয়া থাকি—সে জন্ত পাট চাষের গবেষণা বেশী হইয়াছে। কিন্তু আটা, চাল প্রভৃতি শস্য ও দুগ্ধ আমদানীর জন্ত আমাদের কম টাকা ব্যয় হয় না। চেষ্টা করিলে সে টাকা বিদেশে না পাঠাইয়া আমরা দেশে রাখিতে পারি। কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী সে বিষয়ে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। কিন্তু সে বিষয়ে কি ব্যাপক চেষ্টা হইবে?

কেন্দ্রীয় অনাহা প্রস্তাব—

দিল্লীর লোকসভায় একদল বিরোধী সদস্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাহা প্রস্তাব উত্থাপন করায় ৬ দিন ধরিয়া তাঁহার আলোচনার পর গত ১৮ই সেপ্টেম্বর ঐ প্রস্তাব ভোটে-অগ্রাহ্য হইয়াছে। ৬ দিন বহু বিরোধী সদস্য সরকারী কার্যের সমালোচনা ও নিন্দা করিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সরকার পক্ষের সদস্যগণও তাহার উত্তর দিয়াছেন। প্রধান মন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী সর্বশেষে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের নেহরু নীতিতে অটল বিশ্বাসের কথা ঘোষণা করেন এবং বিশ্ব শান্তি, নিরপেক্ষতা ও গণতান্ত্রিক সমাজবাদ সম্বন্ধে সরকারের কর্ম পদ্ধতি ঘোষণা করেন। অনাহা প্রস্তাবের পক্ষে ৫০ জন ও বিপক্ষে ৩০৭ জন সদস্য ভোট দেন এবং ১৩ জন সদস্য কোন পক্ষে ভোট দেন নাই। ভোটের সংখ্যা হইতে বুঝা যায়—ভারত এখনও নেহরুনীতিই পূর্ণভাবে সমর্থন করেন এবং শ্রীশাস্ত্রীর নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রিসভার প্রতি তাঁহাদের পূর্ণ আস্থা আছে।

অমলপ্রসাদ ভৌগুড়ী—

পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন অর্থ মন্ত্রী, আজীবন কংগ্রেস-সেবক ও সমাজ কল্যাণ কার্যে নিযুক্ত নেতা অমলপ্রসাদ ভৌগুড়ী গত ১৫ই সেপ্টেম্বর ৬৯ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি অগুরুত্ব ছিলেন, তাঁহার বিধবা পত্নী বর্তমান। তিনি মেদিনীপুর জেলার ষাটাল মহকুমার কীরপাই গ্রামের অধিবাসী ছিলেন এবং এম-এসসিতে প্রথম শ্রেণীর দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিয়া ছিলেন। ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র বোসের দৃষ্টিতে ঐ মহান পণ্ডিত

হয়, তিনি তাহার সমস্ত ছিলেন এবং গত ১১ বৎসর নানা গঠনমূলক কাজের সহিত নিজেকে যুক্ত রাখিয়া ছিলেন। তিনি নানা পুণের অধিকারী ছিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুতে আমরা স্বজন-বিয়োগ বেদনা অনুভব করিতেছি।



নেদারল্যান্ডের পররাষ্ট্র মন্ত্রী মাননীয় ডঃ জে, এম, এ, এইচ লুনস্ কিছদিন আগে নতুন দিল্লীতে আগমন করেছিলেন। ঐতিহাসিক লাল কেল্লা দর্শনের সময় ডঃ লুনস্ ও তাঁর দল-বলের এই চিত্র গৃহীত হয়।

দিল্লীতে হেম সান্ত্বালকে হত্যা—

কেন্দ্রীয় সরকারের সলিসিটর জেনারেল, কলিকাতার খ্যাতিমান আইনজীবী হেম সান্ত্বাল মহাশয় গত ২ই সেপ্টেম্বর রাত্রে তাহার দিল্লী ২২ আকবর রোডের বাসাবাড়ীতে নিজ শয়ন ঘরে হৃৎকর্পণ কর্তৃক নিহত হইয়াছেন। তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৬২ বৎসর—তাঁহার পত্নী ও ২ কন্যা বর্তমান। বাড়ীতে তিনি একাই ছিলেন। কলিকাতা সমাজে সান্ত্বাল মহাশয় ও গু প্রসিদ্ধ আইনজীবী বলিয়া পরিচিত ছিলেন না, সামাজিক লোক হিসাবেও তিনি জনপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার গৃহের পাচক, ভৃত্য প্রভৃতিকে প্রেষার করা হইয়াছে। হত্যার কারণ অজ্ঞাত। সে বিষয়ে পুলিশ তদন্ত চলিতেছে। তাঁহার

মৃত্যুতে বাংলার একজন খ্যাতনামা নবীদার অভাব হইল।

আনন্দমূলক জন্ম শতবার্ষিক—

গত ২৩শে আগষ্ট বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে এ যুগের অন্ততম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান সাহিত্যিক, অধ্যাপক ও বিজ্ঞানী আচার্য্য রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদীর জন্মশত বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সাহিত্য পরিষদের সভাপতি আচার্য্য শ্রীমুখ্যতীকুমার চট্টোপাধ্যায় সভার পৌরোহিত্য করেন এবং মুখ্য-স্রো শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন সভার উদ্বোধন করেন। ত্রিবেদী মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী চঞ্চলা দেবী এক শত প্রদীপ জালিয়া সভার কার্য্যারম্ভ করেন। সভার সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র সিংহ বোষণা করেন যে আচার্য্যের কতকগুলি অপ্রকাশিত শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ হইয়া পরিষদ এক স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ করিবেন। সাহিত্য সাধক চরিত-মালায় প্রকাশিত আচার্য্য ত্রিবেদীর জীবনীও এই সময়ে পুনঃপ্রকাশিত হইয়া সুলভে প্রচারের ব্যবস্থা হওয়া উচিত। ত্রিবেদী মহাশয়ের দানে বাংলাদেশ সমৃদ্ধ আমরা যেন সে কথা কোন সময়ে বিস্মৃত না হই। বাংলার সকল সমাজের পাঠকগণের মধ্যে ত্রিবেদী মহাশয়ের কথা প্রচার করিলে তাহা জানিয়া বর্তমান যুগের মাহাত্ম উপকৃত হইবে।

ব্রজীন্দ্র ভট্টাচার্য্য সম্পর্কনা—

গত ১২শে সেপ্টেম্বর শনিবার সন্ধ্যায় বড়দহ গ্রামে মিউনিসিপাল কমিশনার শ্রীসত্যজয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহে বারাকপুর মহকুমা সমিতির উদ্যোগে এক সভার ভাটপাড়া-নিবাসী শ্রীরবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কলিকাতা মিউনিসিপাল গেজেটের দ্বারা সম্পাদক নিযুক্ত হওয়ার তাঁহাকে সন্মোদনা জ্ঞাপন করা হয়। শ্রীকীর্ত্তননাথ মুখোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন এবং নৈশাটির শ্রীঅতুলচরণ দে পুরাণরত্ন, বারাকপুরের শ্রীশচীন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়, কুলীনপাড়ার শ্রীকরবীররণ মুখোপাধ্যায়, ভাটপাড়ার শ্রীতোলানাথ ভট্টাচার্য্য, বন্দীপুরের শ্রীশরদিন্দু নারায়ণ ঘোষ, নাটাগড় পানশীলার শ্রীঅশোক-কুমার চক্রবর্তী প্রভৃতির বীন্দ্রনাথের জীবন ও গুণাবলী বর্ণনা করিয়া বক্তৃতা করেন। গৃহস্থানী সভ্য, লম্বাবাণ্ডু সম্মোচিত ভাষণ দেন ও সকলকে আদর যত্নে ছুঁই করেন।



কুমারী চন্দ্রা আচার্য—

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্যবিভাগের সহকারী অধিকর্তা ৩২।৭ বিডন ষ্ট্রীট নিবাসী ডাক্তার রমেশ আচার্যের কন্যা কুমারী চন্দ্রা আচার্য এ বৎসর কলা ভারতীয় বাৎসরিক প্রতিযোগিতার ফোক নৃত্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে এবং কিশোর কল্যাণ পরিষদ হইতে লোকনৃত্যে অভিজ্ঞান-পত্র লাভ করিয়াছে। আমরা কুমারী চন্দ্রার জীবনে অধিকতর সাফল্য কামনা করি।



ষারাকপুর মহিরাপুর্বে ভোলানন্দ মহাসি আজ্ঞে নূতন সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের উদ্বোধনে উপস্থিত—দক্ষিণ হইতে—পণ্ডিত শ্রীশ্রীজীব ভারতীর্থ, বিচারপতি শ্রীশ্রীশ্যামবিহারী মুখোপাধ্যায়, শ্রীকীর্ত্তননাথ মুখোপাধ্যায় ও স্বামী জ্যোতির্গদানন্দ গিরি।



জোড়া খুনের মামলা

Rajat Bhunia.

ডঃ শ্রী পঞ্চানন ঘোষাল

তখনও আমি পুলিশের ডিপুটি কমিশনার-এর পদে উন্নীত হই নি। সহনগরপালরূপে দক্ষিণ শহর-তলি বিভাগে বহাল আছি। বেলগাছিয়া পল্লটিকিংসালর হতে ফিরে সবেমাত্র কালীঘাট ফাঁড়ি সংলগ্ন আমার নিজস্ব অফিসে এসে বসেছি, এমন সময় অফিসের মুন্সীবাবু একটি জরুরী ফাইল আমার সামনে মেলে ধরলেন। উদ্বর্তন কর্তৃপক্ষ আজই এই ফাইল আমার মস্তব্য সহ ফিরে পেতে চান। দুই জন বাবজীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেদী—রাজ্যপালের নিকট আবেদন করেছে। তাদের বক্তব্য যে “তারা বৌবনের শেষ সীমায় এসে পৌঁচেছে। এক্ষণে তারা বিবাহ করে সম্ভাবে জীবনধারণ করতে ইচ্ছুক। এইজন্য তাদের বাকী মেয়াদ রদ করে এখনি মুক্তি না দিলে তাদের জীবন নষ্ট হয়ে যাবে।” আমি আড় চোখে চেয়ে দেখলাম—ভবানীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার অমুক বাবু দশাশরবশ হয়ে তাদের মুক্তির জন্য সুপারিশ করেছেন। আমি এই ফাইলের কয়টি পাতা উন্টানো মাত্র আমার দশবৎসর পূর্বেরকার একটি কল্পণ ঘটনা মনে পড়ে যায়। হ্যাঁ হ্যাঁ। দশ বাঁ বাবো বৎসর পূর্বে আমার বালাসুন্দর ভবানীপুর থানার তৎকালীন অফিসার-ইন্সপেক্টর সাথে সাথে এই মামলাটি আমিও তদারক

করেছিলাম তো বটে! আদ্যম নিষ্ঠুরতার সঙ্গে এই ফাইলের শেষ পাতায় আমি এইদিন মস্তব্য লিখেছিলাম—‘না না। আমি ভবানীপুর থানার অফিসারের সঙ্গে এক মত হতে পারছি না। এরূপ এক নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের ছোঁতাধের মেয়াদ রদ করে এতো শীঘ্র তাদের মুক্তি দেওয়া কোনও ক্রমেই উচিত হবে না।’

আমার এমন স্বভাব যে কোনও এক স্থির সিদ্ধান্তে আসতে আমার কখনও এক মিনিটও দেরী হয় নি। একটু আগে পণ্ডহাসপাতালেতেও এমনি একটি হুকুম এমনিতাবে আমি দিয়ে এসেছি। কয় বৎসর যাবৎ আমার একটি অস্তি-প্রিয় টেরিয়ার ডগ ছিল। বহুরাত্রে বাড়ী ফিরলেও সে ভেগে থেকে আমার গাড়ীর আঃরাঃের জন্য অপেক্ষা করতো। রাত্রি দুটা পর্য্যন্ত আমার অপেক্ষার ভেগে বাড়ীর পরিজনগণ ঘুমিয়ে পড়লে দরজা খোলার জন্য হাঁক-ডাক করে সেই তাদের আগিয়ে দিয়েছে। এই কুকুরটিকে কয়দিন আগে আমি হাসপাতালে দিয়ে এসেছিলাম। এই দিন অতি প্রত্যাষে আমি টেলিফোনে সংবাদ পেয়ে ঐ হাসপাতালে বাই। চিকিৎস-কারী চিকিৎসক আমাকে হত্যা করে জানিয়ে দেয়—আপনার এই কুকুরকে বাঁচানো যাবে না। এদিকে বহুশয়ও বড্ড কষ্ট পাচ্ছে, তাই করেক

সেকেও মাত্র ভেবে তাঁকে আমি উত্তর করেছিলাম—‘দেখ
কিন্তু হিম। ইন্ডেকলেন দিয়ে মারুন। আমার আশে পাশে
আরও ভিনজন বহিরাগত মানুষ আমার আদেশ তনতে
পেলো। এদের মধ্যে হাসপাতালে অবস্থিত তাঁর প্রিয়
পাপির লজ্জা উদ্বিগ্ন। একটি কুহুর-বিলাসী মহিলা অত্যন্ত
বলে উঠেছিল—‘ওঃ কি নিষ্ঠুর! আমার ঠিক পিছনে
দাঁড়িয়ে ছিলেন নাতানা প্রেসের প্রোগ্রাইটর অমুকবাবু।
তিনি অবাধ হয়ে আমাকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠেছিলেন,
আপনার খুব ক্লিয়ার কাট অর্ডার তো। অন্দি স্পট এমন
ডিসিন্‌নেওরা আমি কল্পনা করতে পারি না। আমি কিন্তু
আমার অন্তরের নিষ্ঠুর প্রবেশে এই সময় অন্ততব করে-
ছিলাম—একটি মমতাহীন চাপা নিষ্ঠুরতা। এইরূপ এক
নিষ্ঠুর মনোবৃত্তির পরে আমি এইদিন সকালে নিজের
অফিসে ফিরেছি। তাই এত শীঘ্র এমন একটা মন্তব্য
লিখতে আমার কোনও অসুবিধে হয়নি।

এই সময় আমার মনে পড়ে যায় যে বারো বৎসর
পূর্বে এমনি পশুপক্ষীর মতই বিনাদোষে দুজন নিরীহ
অসহায় আত্মীয়-স্বানীরা নারীকে অতীব নিষ্ঠুরতার সহিত
হত্যা করতে এরা ইতস্ততঃ করে নি। অফিসের সুযোগ্য
মুন্সীবাবু নির্গিপ্তভাবে এই জরুরী ফাইল নিয়ে চলে গেল,
এতক্ষণে ডেসপ্যাচরুমে চলে গেল। এই তুলে যাওয়া
ঘটনাটি আমার চোখের সামনে তালা ফুলের মত প্রক্ষুণ্ণিত
হয়ে উঠেছে।

আমি এই সময় কলিকাতা পুলিশের গোয়েন্দাবিভাগে
মার্জার এক্সপার্টরূপে বহাল আছি। গোয়েন্দাবিভাগের
তৎকালীন ডিপুটি পুলিশ কমিশনার শ্রীহীরেন্দ্র সরকার
আই, পি, মহোদয়ের নিকট হতে একটা স্লিপ পেলুম।
তাতে ব্লু পেনসিলের আঁচড়ে লেখা ছিল—‘ডবল মার্জার
ইন্ডোয়ানীপুর। গো! এমিষ্ট লোক্যাল পুলিশ। যে
নিড্‌ইওর হেল্প।’ স্থানীয় পুলিশ এবিষয়ে আমার সাহায্য
প্রার্থী। আমিও তাদের সাহায্য করার জন্য উৎসুক। আমি
ক্ষতগত্বিতে প্রাণে তবানীপুর থানার উপস্থিত হয়ে প্রাথমিক
সংবাদ বইতে এই খুন সম্পর্কে প্রাথমিক সংবাদটি
পড়ে নিলাম। এই প্রাথমিক সংবাদের সারমর্মের কিছু
অংশ নিয়ে উদ্ধৃত করে দিলাম :—

আমার নাম শ্রী অমুক—পিতার নাম অমুক। আমি

এই ষ্টাটের একটা নবর বাড়ীতে বাস করি। বর্তমানে আমি
যেকার জীবনবাণন করছি। বৈদ্যুতিক লেখাপড়া না শেখায়
চাকুরী পাই নি। আমার অতিবৃদ্ধা দ্বিবিমাতা এবং ত্রিশ
বা তদুর্ধ্ব বৎসর বয়স্ক মামীমা অমুক ষ্টাটের একটা নবরের
নিজস্ব বাড়ীতে থাকেন। আমার অপুত্রক মামাবাবু
বিদেশে চাকুরী করেন ও এখানে তিনি বিদেশে
কর্মস্থলে আছেন। দ্বিবিমা ও মামীমা একজন ঠিকার
মদতে তাঁদের কলকাতার বাড়ীতে বসবাস করেন।
আমি মধ্যে মধ্যে তাঁদের ঐ বাড়ীতে যাই ও খবরাখবর
নিই এবং প্রয়োজন হলে তাঁদের প্রয়োজন অনুযায়ী কাঁধকর্ণ
করে দিই। আমার মামী ও মামা অপুত্রক থাকলে আমিই
তাঁদের উত্তরাধিকারী হবো। আমি একমাত্র ভাগিনের
বিধায় মামীর স্নেহ আমার উপর অপরিণীম। এইদিন
সকাল আটঘটিকা আনাজ সময় আমি তাঁদের বাড়ীতে
গিয়ে সজ্জিত হয়ে যাই। আমি দেখি যে বৃদ্ধা দ্বিবিমা
ঠাকুর ঘরের ছুরারে এবং মামীমা তাঁর শোবার ঘরে কর্তৃত-
গলা অবস্থায় পড়ে রয়েছেন। এই দেখে আমি হতমিস্রল
হয়ে এক দৌড়ে থানার এসে এই জোড়া-খুন সম্পর্কে
আমার ধান ধারণা মত জোড়ার দিতেছি।”

আমি একটি চেয়ারে বসে এই প্রাথমিক সংবাদ আরও
একবার সাবধানে পড়ে চিন্তাময় হলাম। আমি থানার
উপস্থিত আর সবদের জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে এই
সংবাদ অনুযায়ী তদন্তের জন্য থানার খোদ বড়বাবু হুঁজুন
সহকারী সমস্তিবাহারে আর এক ঘণ্টা পূর্বে ঘটনাস্থলে
রওনা হয়ে গিয়েছেন। এরপর আর বেরী না করে আমি
এই এলাকার পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত ঘটনাস্থলে এসে
পৌঁছলাম।

বড় রাস্তা হতে একটা গলির-পথ একটি পাঁচিলঘেরা
একতলা বৃহৎ সাবেকী বাটার সদর ছুরার পর্যন্ত এসে ধেয়ে
গিয়েছে। এই ছুরারে প্রবেশ করে সামনে দেখা যায়
একটা নাতিদীর্ঘ মেটো উঠান। এই উঠানের পশ্চিমে ও
দক্ষিণ দিকে পর পর ঘরের সারি। এই ঘরগুলির সমুখ
ভাগে উচ্চ প্রশস্ত L-সেপত্‌ পাকা রোয়াক। এই কল-
কাতা শহরের বাড়ীতে ও উঠানে একটি তুলসী রক দেখা
যায়। এই তুলসী গাছের উপরে ঝুলানো বালবীর কাঁপি
হতে তখনও টপ, টপ করে জলের ফোটা করে পড়ছে।

এই ভুলনীমকের সমুখে ঠাকুরঘরটির চৌকাঠে মাথা রেখে ঘোরাকের উপর একটি ভুলনীম মালা মূত্রির ভিতর ধরে এক অশীতিপর বৃদ্ধার গুণ্ডে রয়েছে। তাঁর কৃকিত-চোখের কপেরি উজ্জ্বল হতে বুঝা যায় যে তিনি একদা বড়-বয়ে জয়ে বড় বয়ের বোঁ হয়েছিলেন। ঠাকুর ঘরের রথাস্থলের সিংহাসনে উপবিষ্ট আরাধ্য গৃহদেবতা গোপাল ঠাকুরের দিকে তাঁর উন্মুক্ত কঠিন চোখ তখনও ফিরানো রয়েছে। আমি এইবার সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম যে এই অশীতিপর বৃদ্ধার গলদেশের ভলে চাপ চাপ রক্ত জমাট বেঁধে পড়ে রয়েছে। এই অধুনা হতভাগ্য বৃদ্ধার গলদেশের উপরিভাগ সন্তবতঃ কোনও ক্ষুরধার অস্ত্র দ্বারা পেরিড়ে কেটে দেওয়া হয়েছে। দূর হতেই সেই ক্ষতের গহ্বরে লাল মাংসের পেশী ঘেরা রক্তরাঙা কণ্ঠনালীটি স্থম্পষ্ট রূপে দেখা যায়। অলক্ষ্যে আমার মুখ দিগে অক্ষুণ্টকর একটি মাত্র শব্দ বার হয়ে এলো—ওঃ বাপস্!

মৃতদেহের উপর পাহারারত জনৈক হুন্মের নোকর যষ্টিধারী সিপাহী এতক্ষণ অস্ত্র দিকে মুখ করে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। আমি আসার পর আর একবার মৃত্যু বৃদ্ধার দেহের দিকে চেয়ে দেখে পরক্ষণে আবার তার মুখটা অস্ত্র দিকে ফিরিয়ে নিল। কিন্তু এতো বিহ্বল হওয়া কোনও তদন্তকারী অফিসারের সাজে না। এদিকে নিকটে কোনও থানা অফিসারকেও দেখা যায় না। শুধু একজন জমাদার সদর দরজার ওপারে ভীড় সরাতে ব্যস্ত।

‘আরে! অফিসার লোক কাঁহা গিয়া?’ আমি এই-বার উপস্থিত এই সিপাহীকে জিজ্ঞাসা করলাম—‘হাম্ শুনা কি বড়বাবু খুদ আ’গয়া। উনলোক সব আতি কাঁহা কাঁহা দ্যায়।’

‘হুয়। এক খবর মোতাবেক উনে লোক কুটিকে। পিছুকে বাগিচাপর গিয়া’। মৃতদেহের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে পাহারারত সিপাহী একটু দূরে সরে দাঁড়িয়ে উত্তর করল, ‘আউর একঠো জননাকো লাল পিছুকো কামরামে গিরা-কয়ে দ্যায়। আপ বাইরে না উবার। এক সিপাহী উহা-পর তি মজুত দ্যায়।’

কোনও এক অজ্ঞাত বনজাতিক কারণে অফিসাররা হাজার ভদ্রত্বে হল। বেঁধে এসে হল বেঁধে এক স্থান হতে ছাটাইয়ে নিয়ে থাকেন। কদাচ তাঁরা ঘটনাস্থলের

চতুর্দিকে নিজেদের ছড়িয়ে দিতে পেরেছেন। আমি দেখলাম যে এই ক্ষেত্রেও এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হয়নি। মৃতদেহগুলি না সরানো পর্যন্ত অবচেতন মনে একজন অপরাধনের অবর্তমানে বোধ হয় অসহায় ভাব অনুভব করেন। এই একই কারণে বোধহয় আমিও অজ্ঞাত অফিসারদের সঙ্গে মিলিত হবার ক্ষেত্রে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম। তবুও একবার এই বাড়ীর এক শয়ন ঘরে পড়ে থাকা অপর মৃত-দেহটি দেখা প্রয়োজন মনে করলাম। এই শয়ন ঘরের দুয়ারের এপারে অপর এক পাহারারত যষ্টিধারী সিপাহী মোতায়ন ছিল। আমাকে চিনে সে সেলাম করে একটু সরে আমার কক্ষে পথ কবে দিল।

একটি অর্দ্ধায়ত্না শুভ্রাঙ্গ পরিহিতা নারী তাঁর বৃদ্ধা শাশুড়ীর মতই কবিত-গলদেশ অবস্থায় ঘরের চৌকীর সামনে পড়ে আছে। উপরে কড়িতে সুলানো দাঁড়ে বসে একটি ভোতা পাখীর দিকে তাঁর হাতটি প্রসারিত। তাঁর ডান হাতের অঙ্গুরে ছড়িয়ে পড়া তেজা ছোঁলার মধ্যে একটা খালি বাটি—এই বাটি পাখীর খাদ্য কয়েকটি ছোঁলা বুক করে পড়ে রয়েছে। হঠাৎ পাখীটি শিকলভক্ত মৃত-দেহের দিকে ঘাবার কয়েকবার ব্যর্থ চেষ্টা করে। তারপর দুর্বোধ্য ভাবায় কয়েকটা বাক্য উচ্চারণ করলো। প্রথম শব্দ হুটি হতে শেষের শব্দ হুটির স্বর আমার কাছে সম্পূর্ণ পৃথক ঠেকে। আমার মনে হয়, সন্ত সন্ত যেন এই পাখী দুই ব্যক্তির কাছে এই দুইটি শব্দ শিখে নিয়েছে। কিন্তু কোনও অহমান কদাচ প্রমাণরূপে গণ্য হতে পারে না। তবে ছোঁলাসহ বিপর্যস্ত বাটিটি হতে আমি বুঝতে পারি যে-নিহত হবার অব্যাহিত পূর্বে এই মৃত্যু নারী তার প্রিয় পক্ষীটিকে আহ্বান করছিলেন। চৌকীর কিনারায় একটা সিঁহুরের কোঁটা ও এক কোণে সিঁহুর মাথানো একটা মোটা চিকরীও পড়ে থাকতে দেখা যায়। আমি এ থেকে বুঝতে পারি যে এর আগে শেষ-বারের মত তিনি একটু সিঁহুরও পরে নিয়েছেন। এরপর আমি স্তম্ভপনে ঘরে ঢুকে দেখি যে ঘরের কাঠের মজবুত আলমারী খোলা। ঐ আলমারীর দুয়ারের গায়ে একটি চাবি লাগানো। ঐ মৃত্যু মহিলার আঁচলে একটি কোণের কৃকিত খঁট হতে বুঝা যায় যে এই কোণ হতে ঐ চাবিটা

খুলে নেওয়া হয়েছে। এই আলমারীর ভিতরকার জুতা ও বস্ত্রাদির বিপর্যাস্ত ভাব হতে বুঝা যায় যে এখানে থেকে কয়েকটি মূল্যবান দ্রব্য বা অলঙ্কারাদি অপহৃত হয়ে থাকবে। এই হত্যার অন্ততঃ একটি উদ্দেশ্য যে রাণাজানি তথা জব্বাপহরণ—তা আশার দ্বারা বাকী থাকে নি। এংপর আমি এই বাড়ীর পিছনে বাগানে গিয়ে অবগত হই যে সেখানে একজন মাত্র সিপাহীকে পাহারারত রেখে তদন্তকারী অফিসাররা পিছনের গেটের পথে অস্ত্র তদন্তে গিয়েছেন। এই ঘটনাস্থলের গেটে একজন জমাদার ও কিতরে এই তিন সিপাহী ব্যতীত অন্য কোনও ব্যক্তি উপস্থিত নেই। কিন্তু এতে নিরবচ্ছিন্ন চিন্তার স্বযোগ পাওয়ায় আমার কোনও অস্থবিধে হয় নি। আমি বাড়ীর ভিতর ফিরে এসে তুলসীমঞ্চের পাদপিঠে পড়ে থাকা হৈলসিঙ্ক মাতীর প্রদীপটির দিকে একবার চেয়ে দেখলাম। এই তুলসীমঞ্চে এই প্রদীপটি আর কোনও দিন জ্বলবে না। তারপর ঘরের ভিতর হতে একটা কেনাকারার খালি টিন বার করে তার উপর বসে ভাবতে লাগলাম যে, এই হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী সম্ভাব্য হত্যাকারী কে বা কারা হতে পারে? আমি এই সময় লক্ষ্য করলাম যে ঐ নিহত বধূটির কক্ষে যেতে হলে ঠাকুরঘরের গা ঘেঁসে রোয়াকের উপর দ্বিগে সেখানে যেতে হবে। আমি এবার বেশ বুঝতে পারি যে কোনও অপরিচিত ব্যক্তির পক্ষে শাওড়ীকে এড়িয়ে তার ঘরের বো-এর কক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। আমার মনে হয় যে নিশ্চয় কোনও পরিচিত ব্যক্তি ঐ বধুর ঘরে ঢুকে অতিক্রমে তাকে পর্যাদন্ত করে হত্যা করেছে। এই পরিচিত হত্যাকারীর পক্ষে ঐ বুঝা শাওড়ীকে সাক্ষীগুরুপে বেঁচে থাকতে দেওয়া সম্ভব হয়নি। তাই পরক্ষণেই তাকেও তাদের ঐ ভাবে হত্যা করতে হয়েছিল। এ ছাড়া আমি আরও বুঝি যে এই পরিচিত হত্যাকারীর সাহায্যকারীরূপে আরও এক বা দুই ব্যক্তি উপস্থিত না থাকলে এতো সহজে এদের পর্যাদন্ত করে নিহত করা সম্ভব হতো না। আমি অস্থব্র করতে থাকি যে আমার তদন্তক্ষেত্রের আরম্ভন যেন সঙ্কচিত হয়ে এসে উদ্বীর্ণ কেশবস্থলের দিকে এগিয়ে আসছে। এখন এই স্বপ্ন-স্মার্তন ক্ষেত্রের মধ্য হতে প্রকৃত অপরাধীদের খুঁজে বার করা আর খুব অসম্ভব মনে হয় না। ঠিক এই সময়ে আমার চিন্তাজাল ছিন্ন-

ভিন্ন করে সেখানে ভবানীপুর থানার বড়বাবু ও তাঁর সহকারীরা এক ব্যক্তিকে পাকড়াও করে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। এই ব্যক্তিটি ছিল এই বাড়ীর ঠিকা বি অমুক রাণী।

‘আরে! আপনি তা’হলে এসে গিয়েছেন’—অতি আগ্রহের সহিত বড়বাবু অমুকবাবু বললেন, ‘সকালে দু’বার আপনাকে ফোন করেছি। পরিশেষে গোয়েন্দাবিজ্ঞানে একটা মেসেজ পাঠাতে বাধ্য হলাম। মামলাটা বোধ হয় ভিটেট্ট হয়ে গেল। আমাদের সংবাদদাতা অমুকবাবু আর এই ভদ্রবংশীয়া বি অমুকরাণীর সাক্ষ্যই বোধহয় আসামীর সাক্ষ্য হয়ে যাবে। এই ভদ্রবংশীয়া দাসী অমুকরাণীর বিবৃতিটা আমি ইতিমধ্যে লিখে নিয়েছি। এটা একবার পড়ে দেখুন—

আমি ধীরে স্থানীয় থানার বড়বাবুর হাত হতে ডায়েরী-বুকটি গ্রহণ করে এই ভদ্রবংশীয়া স্ত্রীমতী দাসী অমুকরাণীর বিবৃতিটি পড়তে শুরু করে দিলাম। এই বিবৃতিটি বিশ্বাস করলে এই মামলার সমাধানের জন্য আর কোনও চিন্তা থাকবার কথা নয়। কিন্তু আমার অন্তস্তলের আমার পুলিশী মন যে এতে সায় দিতে চায় না। আমার মনে হয়—যে হয় কোথায়ও একটু গোলমাল হয়ে গিয়েছে কিংবা নিপুণতম এক বড়বান্ধ গভীর হতে গভীরতর হয়েছে। আমি এই বিশ বৎসর বয়স্কা স্ত্রীবেশা নিটোল স্বাস্থ্যের অধিকারিণী স্ত্রীমতীর দিকে একবার সন্দ্বিগ্ধভাবে চেয়ে দেখে তার বিবৃতিটি আরও একবার পড়ে নিলাম। এই প্রয়োজনীয় বিবৃতির প্রয়োজনীয় অংশ নিয়ে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

‘আমার নাম অমুকরাণী, পিতার নাম অমুক। আমি অতো নম্বর বাড়ীর একটি কামরায় থাকি। এই বাড়ীর দিদিমা ও দামীমার পরিচর্যার জন্যে এক সর্ববংশীয়া কর্মঠ মেয়ের প্রয়োজন হওয়ার আমি ছয় মাস পূর্বে এখানে নিযুক্ত হই। আমি সকাল আটটায় এসে এদের রান্নাবান্নার সাহায্য করতাম এবং রাত দশটায় এদের অস্ত্রান্ত কাব-কর্ষ শেষে আমি বাড়ী ফিরতাম। এইদিন সকালে সাতটার সময় বখারীতি আমি ও-বাড়ী দ্বারার জন্যে প্রস্তুত হয়েছি। এমন সময় একজন নাম না জানা যুবক সেখানে এসে আমাকে কাছে না আসতে বলে

পেল। ভক্তলোক বললে যে ওনার দুজন সকালে পদ্ম-
পুত্রে আশ্বীরে বাড়ীতে যাবেন। এক্ষণে আমি যেন
দু'দিন পরে ও'বাড়ীতে যাই। এই খবর পেয়ে খেয়ে দেয়ে
আমি শুয়ে পড়েছিলাম। এমন সময় খানার বড়বানু আমাকে
এই সাংঘাতিক ও মর্মান্তিক সংবাদ দিলেন। উপরোক্ত
নাম না জানা যুবককে এর আগে আমি মাত্র একদিন
দেখেছি। এই বাড়ীতে সে সেদিন দাদাবাবুর সঙ্গে কথা
কইছিল, সে প্রায় আজ হতে মাস দুই আগেকার ঘটনা হবে।

মুতা শাওড়ী ত তাঁর বধুর যে আশ্বীর যুবকটি খানার এই
খুন সম্পর্কে খবর দিয়েছে, সে তখনও পুলিশের সাথে থেকে
তদন্ত কার্যে সহায়তা করছিল। এমন কি সেই ব্যক্তি
খানার অফিসারদের ঐ পরিচারিকার বাড়ীতেও নিয়ে
গিয়েছে। আমি স্থির নেত্রে একবার ঐ যুবকটির
আপাদমস্তক দেখে নিলাম। এই বিষয়ে আমি
তাকে যা যা প্রশ্ন করেছিলাম এবং ঐ দিন সে তার যা যা
উত্তর দিয়েছিল তা নিয়ে উদ্ধৃত বরে দেওয়া হলো।

প্রঃ—তোমাদের এই পরিচারিকাটি যা ব.বার তা
তোমার সামনেই বলেছে। এখন ঐ নাম না জানা যুবকটি
তোমার কোনও বন্ধু কি-না তা আমাকে বলে দিতে হবে।
অবশ্য এই পরিচারিকারও বুঝা উচিত ছিল যে এই ভাবে
তাকে খবর দেওয়ার মধ্যে যথেষ্ট অস্বাভাবিকতা আছে, এই
অশিক্ষিতা স্ত্রীলোক তার ধ্যান-ধারণা মত কাণ করেছে।
কিন্তু এক্ষণে তাকে আমি খুব বেশী দায়ী করতে পারছি না।
কিন্তু, বাপু, তুমি এই বিষয়ে তোমার দায়িত্ব এইভাবে
এড়াতে পারো না। তোমার ঐ বন্ধুটির নাম তোমাকে
বলতে হবে।

উঃ—আজ্ঞে! আমি এই অদ্ভুত কাহিনী শুনে পর্যাস্ত
ভাবছি যে আমার পরিচিত-স্বস্ত্র ঐ যুবকটি কে হতে
পারে? এমনও হতে পারে যে কোনও ছট লোক ছুতা
করে এই বাড়ীতে এসে সজ্জুক সন্ধান নিয়ে গিয়েছে। কিন্তু
আমি তার ভেবে চিন্তেও কাকুর সঙ্গে ঐরূপ একটা মূল্য-
কাণ্ডের বিষয় মনে আনতে পারছি না।

এই সময় হঠাৎ আমার লক্ষ্য পড়লো নিহতা নারী
ঘরের আশ্বীর স্থানীয় ঐ যুবকটির কেশ ও বেশের প্রতি।

এই যুবকটির পায়ে লপেটা পামস ও পরণে ইজের ও
একটা নীল সার্ট। মাথার তৈলবিহীন চুল ত্রাক্রান্ত
করা রয়েছে। আমি আরও লক্ষ্য করলাম ঐ নীল সার্টের
এক স্থানে দগ্ধকৃত কয়েকটি ফুটা। আঙনের ফুলিল
অতর্কিতে পড়লে মাত্র এইরূপ ছিঁদ্রের স্রষ্টি হতে পারে।
আমি গবেষকের দৃষ্টিতে এই সত্ত্বকৃত সজ্জিত সার্টটির প্রতি
দৃষ্টি প্রসারিত করে বুঝলাম যে এই মামলার কিনারা হতে
আর দেরী নেই।

‘হুম! তুমি তো দেখছি একজন বিচক্ষণ ও সাবধানী
ছোকরা’। আমি মৃতাদের আশ্বীর স্থানীয় ঐ যুবকটিকে
জিজ্ঞাসা করলাম, ‘এখন বলা দিক তোমার সার্টে অতো
পোড়া দাগ ও ছিঁদ্র কি করে হলো? ঐ ছিঁদ্রসমূহের চার
পাশে তো সত্ত্ব সত্ত্ব পোড়ার দাগ দেখা যায়!’

‘আজ্ঞে! আজ সকালে দিদিমাদের বাড়ী আসার সময়
আমি কয়েকটা বিড়ি খেয়েছি।’ আমার এই প্রশ্নে একটু
মাত্রও অপ্রতিভ না হয়ে ঐ যুবকটি উত্তর করলো, ‘ঐ সময়
কয়েকটি আঙনের ফুলিল অতর্কিতে আমার জামার উপর
ছিটকে পড়ে। আমি তাড়াতাড়ি ওগুলো নিবিয়ে ফেলি
বটে, কিন্তু জামাটা আমার ভাতে স্থানে স্থানে পুড়ে
যায়। এই গোলমালের মধ্যে এটা আর আমি বাড়ীতে
ছাড়তে যেতে পারি নি।’

এই যুবকটির এই উত্তরে তার উপর আমার সন্দেহ
না কমে বরং তা আরও বেড়ে যায়। আমি তার মাথার
বাক-ত্রাসড চুল ও পায়ের লপেটা জুতা হতে বুঝি যে, এই
যুবক দেশী বিড়ি খাবার মানুষ নয়। যদিও কিছু খায়
তো দামী বিলাতী সিগারেট খাবে। এইটুকু মনে উদয়
হওয়া মাত্র আমি অতর্কিতে তার একটি পকেটে হাত
ঢুকিয়ে দিলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে আমার মৃষ্টির মধ্যে
একটা ছাভানা সিগারেটের টিন বার হয়ে এলো। এরপর
এই যুবকটির মুখে আর কোনও কথা সেরে না।

[তদন্তে প্রকাশ পায় যে এই যুবক তদ্রূপ ঐ বন্ধুর সাথে
এদের খুন করে গহনা অপহরণ করে তা বিক্রী করে।
এদিকে সার্টে রক্তের ফোটা লাগাতে বাড়ীর আঙনে ঐ
সকল স্থান পুড়িয়ে দেয়।]

স্বপ্নশেষ

ঐশ্বর্যতোর সাতাল

মধু নেই,—তুধু আছে শূন্য এ তাও !
 দুঃসহ বিক্রম একীয়ে প্রকাণ্ড !
 নিঃসীম রিক্ততা
 আনে কোন্ তিক্ততা,—
 হলাহল-সিক্ত যে আজ ব্রহ্মাণ্ড !
 সংসার নয়,—এ যে আছি কারাকক্ষে ;—
 কোথা মারা-কজল—উজ্জল চক্রে ?
 কই সেই কল্লনা,—
 ছন্দের আল্পনা ?—
 একী রাক্ষস-কুধা জলছে রে বকে !
 কোথা তোর মনোচোর স্নানর ?—প্রান্ত,
 কুতীর হাটে তুই কোথা পারি কাণ্ড !
 শেষ হ'ল শিকার,
 আগে আজ শিকার ;—
 বপ্নবিহীন প্রাণ ক্ষিপ্ত অশান্ত ।

অলি নেই—আছে তুধু ভাগাড়ের মন্দি,
 কুঞ্জে কোয়েল কই ?—তাকে পেঁচা পক্ষী !
 কান্দন-মারা নাই,
 অশথের ছায়া নাই ;—
 ভরহীন মরু হ'য়ে উঠ'লো ভুলোক কি ?
 একী ঘোর দুর্দিন ! একী দুর্ভাগ্য !
 পানিয়ার ঝাঁকে জ্বাখ লাখ লাখ কাক গো !
 নিদাক্ষণ রিষ্টি যে
 উল্টেছে হুটিকে ;—
 পঙ্কজ নেই তাই—আছে শুধু পাক গো ।
 কাঁচ আর কাকন নয় আজ ভিন্ হে,—
 মাকালের মরুময় ! পাকালের দিন এ !
 আর তবে চল ঘাই,
 আর দরকার নাই ;—
 বিদায়ের সঙ্গীতে বাধ্ তোর বীণকে !



আগন্তক গৃহস্থ : হ্যাঁ মশাই...সাত সকালে এই লম্বা 'লাইন' দিয়েছে কি
 জন্ত ?

'লাইনে' অপেক্ষায়, মৎস্ত-সন্ধানী : যদি কোনো মাছওয়াল ভুল করে হঠাৎ
 এদিকে এসে হাজির হয়—তাই !

শিল্পী—পৃথ্বী দেবশর্মা

আগমনী

শরৎকালে মায়ের পূজা

ডালি কে সাজালে ।

জলেতে পাতা পল পাতা

সরসী ছেয়েছে শত কমলে ।

হুল পল্লগুলি পাশড়ি খুলি

কুলেরি নেশা গ্রাণে আগালে

কি পরিপাটি রাধা ফোপাতি

অর্ঘ্য সাজালে জবা বিঘ দলে

গগন মাঝে শখ বাজে

মঙ্গল ঘট বারিধ কলে

পথ দেখাতে উলকা হাতে

তড়িং বালা চলে দলে দলে ।

কথা—অমুরুপা দেবী

স্বর ও স্বরলিপি—শ্রীরবীন্দ্রমোহন বসু সঙ্গীতবিশারদ

- II পা দা মা পা | দা পদা গসাঁ র্গসাঁ | গা ধা গা পা | গা দপা -1 -1
শ র ৎ কা . লে . . মা য়ে র পু . জা . .
জ্ঞা রা জ্ঞা দা | মা -1 জ্ঞা রজ্ঞা | ঋ সা -1 -1 | -1 -1 -1 -1 II
জা . লি কে . . সা . . জা লে
সা জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা | -1 জ্ঞা -1 -1 | জ্ঞা রা মা জ্ঞা | রা সা -1 -1
জ লে তে পা . তা . . প . দ্ব পা . তা . .
সা রা মা পা | দা সঁ -1 -1 | গধ গা পা গদা | পা -1 -1 -1 II
স র সী ছে য়ে ছে . . শ ত ক ম লে . . .
II মা মা গা দা | দা দা দা গা | গা সঁ সঁ সঁ | গা ঋ সঁ -1
হ ল প . দ্ব গু লি . পা প ড়ি . খু . লি .
সঁ জ্ঞা র্গজ্ঞা -1 | ঋ সঁ -1 -1 | গা সঁ ঋ সঁ গা | দা পা -1 -1
কু লে রি . নে শা . . গ্রা ণে জা . . গা লে . .
পা পা পা -1 | পা পা -1 -1 | দা গা পদা দপা | মা মা -1 -1
কি প রি . পা টা . . রা জা দো পা টা . . .
সা -1 মা মা | মা মা পা মা | জ্ঞা রজ্ঞা সা ঋ | সা -1 -1 -1 II
অ . ধ্য সা জা লে জ বা বি . ষ দ সে . . .
II মা মা মা গা | দা দা গা -1 | সঁ -1 সঁ -1 | জ্ঞা ঋ সঁ -1
গ গ ন মা . কে . . শ . ঋ . বা . জে .
সঁ জ্ঞা র্গজ্ঞা | -1 ঋ সঁ -1 | গা সঁ ঋ সঁ -1 | গা দা পা 1
ম . ক ল . ঘ ট . বা রি দ . জ . লে .
পা পা দা পা | -1 পা -1 -1 | পা দা গা পদা | দা পা মা -1
প থ দেখা . তে . . উ ল কা হা . তে . .
সা মা মা মা | মা -1 পা মা | জ্ঞা রজ্ঞা সা ঋ | সা -1 -1 -1 II
ত ড়ি ঙ বা জা . চ লে দ . লে দ লে . . .

গ্রহ-জগৎ

মিহিরাচার্য

অনেক অমুরাণী প্রাৰণে প্রকাশিত লটারী প্রাপ্তির সম্বন্ধে আরো কিছু আলোচনার জন্তে অমুরোধ করেছেন। তাই এবারে সেই সম্বন্ধেই কিছু আলোচনা করব।

লটারী পাওয়ার জন্ত তিনটি ঘরের বিচার বিশেষভাবে দরকার। সে তিনটি হচ্ছে, ধনস্থান (লগ্ন বা চন্দ্রস্থিত রাশি যেটি বর্গবিচারে বলবান হবে—সেই ঘরটিকেই এক নম্বর ঘর বলে ধরে নিতে হবে—একথা আগেই বলেছি) অর্থাৎ দ্বিতীয় ঘর, পঞ্চমস্থান ও একাদশস্থান। এই ঘরের অধিপতি গ্রহ যদি নবাংশে বলবান হয়ে নিজের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করে, তাহলেই সেই আঁতকের লটারীপ্রাপ্তি ঘটতে পারে। লটারীর ব্যাপারে পঞ্চম স্থানকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। কারণ এই পঞ্চম স্থানটি দূত (Speculation) স্থান। কিম্বা ঐ তিনটি ঘরের অধিপতি যদি নিজের ঘরে কুগ্রহ দৃষ্ট বা কুগ্রহযুক্ত হয়ে না থাকেন, তাহলেও পাবার বিশেষ সম্ভাবনা। এক্ষেত্রে ঐ তিন অধিপতিরা কোন সম্বন্ধ না করলেও হবে। কিম্বা ঐ তিনটি ঘরের অধিপতি যদি বর্গোত্তরী নবাংশ পান তাহলেও পাবার সম্ভাবনা।

এইবার নবাংশ ও বর্গোত্তরী নবাংশ কাকে বলে তা বলছি। যে কোন বর্গবিচারে গ্রহক্ষুট অর্থাৎ গ্রহটি রাশির কোন অংশ, কোন কলা বা বিকলায় আছে তা জানা চাই। এ না হলে বর্গবিচার সম্ভব নয়। বারোটি রাশির মধ্যে চারটি করে রাশি এক একটি জাতের। তাদের সংজ্ঞা হল—চর, স্থির, দ্ব্যাত্মক। চর মানে গতিশীল, স্থির মানে গতিহীন, আর দ্ব্যাত্মক মানে গতিশীল ও গতিহীন এই উভয় গুণসম্পন্ন। আরো একটু পরিষ্কার করে

দিই। মেঘ, কর্কট, তুলা ও মকর হল চররাশি। বুধ, সিংহ, রশ্মিক, কুম্ভ হল স্থির রাশি। আর বাকীগুলি, মিথুন, কন্যা, ধনু, মীন হল দ্ব্যাত্মকরাশি।

নবাংশ হচ্ছে, একটি রাশিকে (এক একটি রাশি ৩০ অংশ—এক অংশে ৬০ কলা—এক কলায় ৬০ বিকলা) সমান ভাগে বিভাগ করা। প্রতি ভাগের পরিমাণ হল ৩ অংশ ২০ কলা।

এই এক একটি ভাগকে নবাংশ (নব+অংশ) বলে। এই এক একটি ভাগের এক একজন মালিক। কেমন কোরে মালিক নির্ণীত হবে, তার নিয়ম নীচে দিলাম।

চররাশির প্রথম বিভাগের মালিক, সেই রাশিরই অধিপতি গ্রহ। যেমন ধরুন মেঘ (চররাশি) রাশি, এর প্রথম ভাগের (৩২০) মালিক মেঘরাশিরই অধিপতি গ্রহ মংগল। এইখান থেকে পরের পর ন'রাশি ন'টি ভাগের অধিপতি। দ্বিতীয়ের বুধ, অর্থাৎ শুক্রগ্রহ, তৃতীয়ের মিথুন অর্থাৎ বুধগ্রহ, চতুর্থ অংশের কর্কট অর্থাৎ চন্দ্রগ্রহ। এমনি ভাবে নটি ঘর পরের পর হবে।

স্থিররাশির আরম্ভ হবে, সেই রাশি থেকে নবম ঘর বা রাশি যেটি, সেইটি থেকে পর পর নটি রাশি। ধরা যাক বুধ। বুধ হল স্থিররাশি। অতএব এর প্রথম ভাগের অধিপতি হবেন নবমরাশির অধিপতি। বুধ থেকে গোণা যাক নবম ঘর। গুণে পাওয়া গেল মকররাশি নবম ঘর। অতএব নিয়মাত্মক প্রথম ভাগের অধিপতি হল মকররাশির অধিপতি শনিগ্রহ। ওই ঘর থেকে পরের পর গুণে আহ্নন নয়টি ঘর। দেখবেন কন্যা এসে নয় শেষ হবে। অতএব দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ কোরে

পরের পর এই সব রাশির অধিপতি গ্রহেরা ঐসব নবাংশ-ভাগের অধিপতি হবে।

এইবার দ্ব্যাদ্ধরাশি। এর আরম্ভের নিয়ম হচ্ছে সেই রাশি থেকে পঞ্চমরাশি যেটি। সেই পঞ্চমরাশি থেকে শুরু হয়ে ডানদিক ঘুরে পরের পর নটি রাশি। যেমন ধরা যাক মিথুনরাশি। এটি দ্ব্যাদ্ধক। অতএব এর আরম্ভ হবে পঞ্চম রাশি থেকে। গুণে দেখা গেল মিথুন থেকে পঞ্চমরাশি হচ্ছে তুলা। তুলার অধিপতি শুক্র। অতএব মিথুনের প্রথম যে ৩ অংশ ২০ কলার ভাগ, তার নবাংশাধিপতি গ্রহ নির্ণীত হল শুক্র। এইবার পরের পর নটি রাশি গুণে আসুন। শেষ হবে দেখবেন ঐ মিথুনেই। পরের পর এই গুণে আসা রাশিগুলির অধিপতি গ্রহগুলি হোল এই নটি ভাগের নবাংশাধিপতি। আশা করি, নবাংশ ভাগ ও তার অধিপতি সম্বন্ধে পরিষ্কারভাবে বুঝতে পেরেছেন। এইবার তিনটি রাশিরগ্রহ দিয়ে উদাহরণ দিচ্ছি।

ধরুন আপনার রবিগ্রহ কর্কটে আছে ০, ১৬ অংশ ২২ কলায়। কর্কটরাশিটি চররাশি। প্রথমে যে ভাগ করে দিয়েছি কোন্ কোন্ রাশি, চর, স্থির, দ্ব্যাদ্ধক—তাই দেখলেই বুঝতে পারবেন। তাহলে নিয়ম অনুযায়ী চর রাশির আরম্ভ হচ্ছে সেইরাশি থেকে। এইবার এক একটি রাশিতে আঙুল রাখুন, আর মুখে মুখে ৩ অংশ ২০ কলা কোরে (কারণ ৩২০ কোরে একটি ভাগ) যোগ করে যান ও সেই সংকে পরের পর রাশিতে আঙুল দিতে থাকুন ও লক্ষ্য করুন রবিগ্রহ যে অংশে যে কলায় আছে আপনার যোগ-দেওয়া অংশ এবং কলা তাকে অতিক্রম করছে কি না।

যেমন আঙুল দিলেন আপনি প্রথমে কর্কটে। কারণ চররাশির আরম্ভ হচ্ছে সেই রাশি থেকে। তারপর ৩২০+৩২০ যোগ করে মুখে বললেন ৬৪০ এবং আঙুল বাড়িয়ে দিলেন পরের রাশি সিংহে। তারপর ঐ ৬৪০ এর সঙ্গে যোগ করলেন মুখে মুখে ৩২০—যোগফল হল ১০ অংশ। অমনি আঙুল তলে গেল পরের রাশি কন্যায়। একবার তাকিয়ে দেখে নিলেন রবির অংশ কলাটিকে আপনার মুখে উচ্চারণ করা অংশ কলা অতিক্রম করে যাচ্ছে কি না! না, যায় নি। অতএব ঐ দশ অংশ

যোগফলে আবার যোগ করলেন ৩২০—হোল ১৩ অংশ ২০ কলা। অমনি আঙুল এগিয়ে দিলেন পরের রাশি তুলায়। না, এখনও রবির অংশ-কলাকে আপনার মুখে মুখে যোগ দেওয়া অংশ-কলা ছাড়িয়ে যায় নি। আবার ১৩ অংশ ২০ কলায় ৩২০ যোগ করলেন, যোগফল হোল ১৬ অংশ ৪০ কলা, আঙুলও সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে গেছে বৃশ্চিকে। তাকিয়ে দেখলেন রবির ১৬ অংশ ২২ কলা পড়ছে এরই মধ্যে। অতএব রবিগ্রহের নবাংশাধিপতি হল বৃশ্চিকরাশির অধিপতি মঙ্গল। রবির অংশ-কলা যদি ১৬৪২ হত (?) তাহলে বৃশ্চিক উত্তীর্ণ হয়ে নবাংশভাগ পড়ত ধরুতে। নবাংশাধিপতি হোত বৃহস্পতি।

তদ্রূপ ঐ রবি যদি সিংহে থাকত ঠিক ঐ অংশ কলাতে, তাহলে স্থিররাশির নিয়মানুযায়ী আরম্ভের রাশি হোত নবমরাশি অর্থাৎ সিংহ থেকে নবম মেঘ রাশি থেকে। তারপর ঐ মেঘে আঙুল দিয়ে ঠিক ঐ পদ্ধতিতে গুণে বার করতে হত। আর রবি যদি থাকত কন্যারশিতে, তাহলে কন্যা দ্ব্যাদ্ধকরাশি হওয়ার জন্য কন্যা থেকে পঞ্চমরাশি মকর থেকে শুরু হয়ে ঠিক ঐ ভাবে পরের পর গুণতে হোত যতক্ষণ না রবিস্থিত অংশ-কলা আপনার মুখে মুখে যোগ করা অংশ-কলার অন্তর্গত হয়। বর্গোত্তরী নবাংশ কাকে বলে? গ্রহ যে রাশিতে থাকবে, সেই রাশির নবাংশ পেলেই সে বর্গোত্তরী নবাংশ পাবে। তাহলে চররাশিতে বর্গোত্তরী পেতে হলে গ্রহকে ৩ অংশ ২০ কলার মধ্যে থাকতে হবে। স্থিররাশিতে ১৩ অংশ ২০ কলা থেকে ১৬ অংশ ৪০ কলার মধ্যে থাকতে হবে, দ্ব্যাদ্ধক রাশিতে থাকতে হবে ২৬ অংশ ৪০ কলা থেকে ৩০ অংশের মধ্যে।

এ ছাড়া অর্থাৎ ঐ তিনটি বর দ্বিতীয়, পঞ্চম ও একাদশ ছাড়া আরো দুটি বর দেখতে হবে, যে কথা আগেও বলেছি, এখনও বলছি। লগ্ন বা চন্দ্রলগ্ন, যেটিকে প্রথম বর বলে ধরবেন, সেইটি ও সেই প্রথম বর থেকে নবম বরটি।

প্রথম বরের অধিপতি যদি দুর্ভাগ, পীড়িত, কুগ্রহবৃদ্ধ বা দৃষ্ট হয়, তাহলে পাবার আশা অনেক কমে যাবে। প্রথম বর মানে, যার জন্মকুণ্ডলী তিনি নিজে। অজীর্ণ-পীড়িতমাতৃবর কাছে যেমন নানা প্রকার খাদ্যবস্তুর

স্বাক্ষর থাকলেও ভোগ করার উপায় নেই, এও ভেমনি। আর নবমস্থান হচ্ছে ভাগ্য স্থান। ভাগ্যস্থান থেকে পূর্ব-পুণ্যের বিচার হয়। হিন্দুজ্যোতিষীরা পূর্বজন্মের স্বকৃতি-ভুক্তিতে বিশ্বাসী। স্বতরাং পূর্বপুণ্য আছে কিনা দেখতে হবে। জ্যোতিষীদের অভিমত পূর্ব পুণ্যস্থান ভাল না হলে, ঐশ্বর্য, স্বথ, অর্থ, ধন, সম্মান প্রভৃতি ভোগ সম্ভব হয় না।

আখিনের গ্রহ-সংস্থান

রবি কস্তায়—উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রে। ১০ই হস্তা নক্ষত্রে। ২৩শে আখিন চিত্রায়। সংক্রমণ সময়ে চন্দ্র ধনু রাশি—পূর্বাষাঢ়া নক্ষত্রে। বুধ সিংহে, মঘায়। ২রা পূর্বফল্গুনীতে ১১ই উত্তরফল্গুনীতে—১২ই কস্তায়—১৮ই হস্তায়—২৩শে চিত্রায়। ৩০শে আখিন চন্দ্র ধনিষ্ঠায়। শনি কুন্তে শত-ভিষা নক্ষত্রে। বৃহস্পতি বৃষে কৃত্তিকায়। মংগল প্রথমে পুষ্যায়—১৫ই অশ্লেষায়।

ব্যক্তিগত রাশি ও লগ্নফল

(যাদের লগ্ন ও রাশি ভিন্ন তাঁরা ছুটি ফলই সামঞ্জস্য করে পড়বেন)।

মেঘ রাশি

এ মাসে পিতাপুত্রের সম্বন্ধ সুখকর হবে। কিঞ্চিৎ লাভের আশা দেখা দেবে—কিন্তু মনের মত হবে না, দেবী হতে থাকবে। এ মাসে ভাগ্যবল আপনার বিশেষ বলবান্। ৩রা তারিখের পর পত্নীর শরীর কিঞ্চিৎ অসুস্থ হতে পারে। ১৩ তারিখের পর অসুস্থতা না থাকার সম্ভাবনা। অধিনী-নক্ষত্রে জন্ম হলে ৮৯ তারিখে লাভের সূচনা দেখা যায়। ২৬শে আখিনের পর বেশ কিছু আনন্দ পাবেন। ১৩ তারিখের পর কর্মস্থানে কোন সহকর্মী অপরাধের সৃষ্টি করতে পারে। অনুভা প্রণয়ার্থী ছেলে-মেয়েরা ২৬শে আখিনের পর শুভফল পাবেন নিজ নিজ সম্বন্ধে।

শ্রব রাশি

এ মাসে নানা প্রকারে সাংসারিক স্বথ ও স্বাচ্ছন্দ্য উপলব্ধি করবেন। পত্নীর কারণে ব্যয়বৃদ্ধি হতে পারে।

কর্ণের জাগরণ ১১ তারিখের পর কোন অসুস্থতাদেব আশা করতে পারেন। আত্মীয়-কুটুম্বের কারণে সংসারে সামান্য চাপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ১০ই আখিন (রোহিণী নক্ষত্রে জন্ম হলে) হঠাৎ অর্থপ্রাপ্তিতে উৎফুল্ল হবেন। সম্ভানেরা বিনিমিত্তাব দেখাবে। চিঠিপত্রের জবাব সহজেই পাবেন। নিজের শরীর সামান্য গণ্ডগোল করতে পারে, কিন্তু ভেমন ভয়ের কারণ নেই। অনাদারী কোন টাকা অনেকদিন পড়ে থাকলে, এমাসে আংশিক পাবার আশা করতে পারেন।

মিথুন রাশি

আত্মী নক্ষত্রে জন্মালে ১৩ তারিখে অথবা ১৬ তারিখে বিনা আয়্যাসে অর্থলাভ হতে পারে। শারীরিক ছোট-খাট রোগের সম্ভাবনা। আর্থিক সমস্যার অবকাশ নেই বললেই হয়। ব্যবসাদার হলে ১৩ই আখিনের পর উন্নতির পথ খুঁজে পাবেন। গৃহের আসবাব, সংস্কার প্রভৃতিতে কিছু ব্যয় হওয়ার সম্ভব। ১৩ই তারিখের পর পুত্র-কস্তাদের অসহিষ্ণুতাব আপনাকে চঞ্চল কোরে তুলবে। ভ্রমংক্রান্ত বা ঘরবাড়ীর ব্যাপারে, যদি কোন গোলযোগ থাকে, এবার তা মেটার আশা দেখতে পাবেন।

কর্কট রাশি

গত কয়েকমাস ধরে যে বাধা-বিঘ্ন, শত্রুতা, ঋণ প্রভৃতিতে নাজেহাল হয়ে পড়ছিলেন, এ মাসে সে সবের মীমাংসা করার হদিশ খুঁজে পাবেন। ক্রমশঃ মাসটি ভাগ্যই থাকবে। ১০ তারিখে দূর্ভাগ্যে আকর্ষণ থাকলে লাভ হবার সম্ভাবনা দেখা দেবে। পত্নীর প্রথরা ভাব আপনাকে মাঝে মাঝে পীড়া দিতে পারে। পুত্রকস্তারা উন্নতির অভিযুক্তে বাবার চেষ্টা করবে। কোন প্রতিদ্বন্দ্বী মামলার ভয় দেখাবে। নিজের স্বাস্থ্য অবহেলার জন্তে ক্লিষ্ট বোধ হতে পারে, কনিষ্ঠ ভ্রাতারা ভাল ব্যবহারের দ্বারা সাহায্যের জন্য হাত বাড়াবে।

সিংহ রাশি

বেশ আনন্দেই কাটবে মাসের গোড়ার দিকটা। আর বাড়বে। প্রয়োজনের সময় যার সাহায্য চাইবেন, সেই তা হালিমুখে দেবে। ১২/১৩ তারিখের মধ্যে প্রায় কাঙ্ক্ষিত সাফল্য লাভ করবেন। কিন্তু শেষ দিকে একটা সপ্তাহ কিছুটা দন্দা থাকবে। হঠাৎ গুপ্তশত্রুতা আবিষ্কার করে

নিজের পরিস্থিতি সম্বন্ধে সাবধান হবেন। ব্যবসায়ী বা ঠিকাদার হলে নতুন কাজের চুক্তি পেতে পারেন। চাকুরে-দের পদস্থ ব্যক্তি বা ওপরওয়ালাদের নজরে পড়ার আশা আছে মাসের শেষের দিকে। অভিনেত্রী, শিল্পী প্রভৃতি পেশাজীবীদের এ মাসে নতুন কাজ ও আর্থিক সুবিধা দেখা দেবে।

কস্তুরাশি

উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রজাত ব্যক্তির এ মাসে ভাগ্যবৃদ্ধির আশা করতে পারেন। অপর নক্ষত্রজাত ব্যক্তির ভ্রমণে আনন্দ পাবেন। ১৩ তারিখের পরে সম্মান লাভ, চাকরিতে উন্নতির আশা, অর্থলাভ প্রভৃতি ঘটবে। মাসের প্রথম দিকে ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। পুত্রকন্যারা এ মাস বিশেষ আনন্দে কাটাবে। অশুভের উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেবে। কোন কোন চাকুরে বদলী হওয়ার সংবাদ পাবেন এবং তা আর্থিক উন্নতিসূচক হবে। স্ত্রীর সাহচর্য ও সাংসারিক বৃদ্ধি আপনার গৃহস্থালীর শৃঙ্খলাকে হৃদয় করবে।

ভুল্লুশাশি

পত্নীর স্বাস্থ্যহানি ঘটতে পারে অবশ্য জন্মকোষ্ঠিতে মঙ্গল যদি কুপ্রভাবশালী হয়। ধনভাগ্য বেশ ভালই যাবে। অনাদারী টাকা আদায় না হতে পারে, কিন্তু নানাপ্রকারে অর্থপ্রাপ্তি হবে। ভ্রমসম্পত্তি কেনার ইচ্ছা হতে পারে—গৃহ-সংস্কারেরও যোগ আছে। ভাগ্যবলে অনেক অর্থপাবার যোগ দেখা যায়। যদি কোষ্ঠী বলবান ও হঠাৎ প্রাপ্তির যোগ সম্পন্ন হয়, লটারীও পেতে পারেন। পুত্রকন্যারা কিঞ্চিৎ দুর্বিনীত হয়ে উঠবে। নিজের শ্লেষাধিকা কারণে শারীরিক ক্লেশ সম্ভব। স্বামী নক্ষত্রজাত ব্যক্তির ২১শে আশ্বিন শুভ কিছু ঘটায় সম্ভাবনা।

অশ্বিনিক শাশি

শনি-মংগলে নক্ষত্র কারণে যোগাযোগ হওয়ার অনেক আশা-ভরসা পাবেন। কিন্তু সাক্ষ্য তদন্তরূপ হবে না। রক্তচাপ বৃদ্ধি বা কোন কারণে রক্তপাত হতে পারে। কনিষ্ঠের সঙ্গে সামান্য কারণে বচসার সম্ভাবনা। শত্রুরা স্বর্কি নিয়ে আপনার ক্ষতির চেষ্টা করতে পারে। ব্যয় এতো বৃদ্ধি পাবে যে, সামলে ওঠা কঠিন হবে। দূতাদি কারণে লোকসান হবার সম্ভাবনা। পত্নীর ব্যবহার রুদ্ধ হবে—প্রতিকথার অসন্তুষ্টি প্রকাশ পাবে। মাসের শেষের দিকে কিছুটা লাভনা পাবেন।

অশ্বিন শাশি

মাসের প্রথম দিনটি বেশ ভাল যাবে। পুত্রকন্যার

উন্নতি এ মাসে ভেদন হওয়ার সম্ভাবনা নেই। যারা পড়াশোনা করে, তাদের লেখাপড়ার বিষয় দেখা দেবে। পদস্থ ব্যক্তির নিম্নতন কর্মচারীদের ওপর বিরাগভাজন হবেন। ব্যবসাদারেরা অনাদারী টাকা আদায়ে বেকার ঘোরাঘুরি করে বিরক্ত হবেন। সব দিকেই জবুজবু অবস্থা দেখা দেবে। মাসের প্রথম দিকে স্ত্রীর স্বাস্থ্যহানি ঘটায় সম্ভাবনা। নতুন লাভজনক কাজ ব্যবসায়ীদের হাতে ভবিষ্যতের জন্য আসতে পারে। সাংসারিক শৃঙ্খলা বিধি-হবে। কুটুম্ব আগমনে মানসিক অশান্তি দেখা দেবে।

অশ্বিন শাশি

এর আগের মাসটি যেমন গেছে, এ মাসটিও তেমনই যাবে। ব্যবসাদার হলে ব্যবসার, চাকুরে হলে পদোন্নতির বা কোথাও সুযোগ-সুবিধামত বদলীর কথা চলবে, আশাও হবে—কিন্তু কিছুতেই সফল হবেন না। কোথাও ভ্রমণে আনন্দ পেতে পারেন ২৩ তারিখের পর।

প্রথমে দিকে যতটা হতাশার চাপ বৃদ্ধি পাবে শেষের দিকে ততটা নয়। চাকুরীজীবির শেষের দিকে সুবিধা কিছু কিছু পাবেন। অনুষ্ঠা মেয়েদের বিয়ের কথাবার্তা পাকা হতে পারে।

কুন্ত শাশি

কনিষ্ঠভ্রাতার উন্নতির সূচনা হবে। কোন কিছুই চুক্তিতে সহ করে লাভবান হতে পারেন। বাসস্থানের কাছাকাছি কোন ভূমি কেনবার ইচ্ছা দেখা দেবে। অতিরিক্ত ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। স্ত্রীর শরীর মোটামুটি মঙ্গল যাবে না। উদর-পীড়ায় সামান্য ক্লেশ পেতে পারেন। ৭-৮ তারিখ আপনার পক্ষে শুভ সূচনা করতে পারে। ছেলে মেয়েদের সম্বন্ধে শুভ সংবাদ পেতে পারেন। বিশেষ থেকে প্রভাগত ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হতে পারে। বেকার-ব্যক্তি সাময়িক ভাবে চাকরী পেতে পারেন।

মীন শাশি

হঠাৎ সঞ্চিত অর্থ নিয়োগ করে ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারেন। অবিবাহিতেরা বিবাহের কথাবার্তা পাকা করে ফেলতে পারেন কিংবা রেজেষ্ট্রি বিয়ে হতে পারে। গৃহ-ভূমি বাবদে বেশ কিছু ব্যয় হবে। কন্যার সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হওয়া সম্ভব। স্ত্রী কিন্তু পুত্রের মাসটা বেশ মানিয়ে চলবেন হাসিমুখে। অশুভ মাতুলের নিরাময় সংবাদ পাবেন। আপনার শরীর মোটামুটি ভালই যাবে। মাসের শেষে কিছু সঞ্চয়ের আশা করতে পারেন।

বেদান্ত দর্পণে নেতাজী

পণ্ডিত শ্রীকামাখ্যাচরণ ভট্টাচার্য্য, স্মৃতিরত্ন সরস্বতী

আশা ও নিরাশায় স্বদীর্ঘ উনিশটি বৎসর অতিক্রম হইল।
আজও দেশবাসীর চিত্তপটে প্রাণ জাগে—নেতাজী কি
জীবিত ?

কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির মতামত এবং কয়েকটি
সংবাদপত্রের মাধ্যমে বিচার করিলে মনে হয়, নেতাজীর
মৃত্যু-সংবাদ হয়তো ভ্রান্ত।

শৌলমারীতে নেতাজীরূপ “সাধুজী”র রহস্তপূর্ণ
আবির্ভাব প্রচারিত হওয়ার পর হইতে কিছুসংখ্যক
সাধারণ সংবাদপত্র, কয়েকজন জ্যোতিষী—এমন কি কোন
কোন সাধু সন্ন্যাসী পর্যাস্ত, তেজোদীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা
করিতেছেন—“নেতাজী জীবিত এবং সময় হইলেই তিনি
আত্মপ্রকাশ করিবেন”।

কেহ কেহ বলেন—“নেতাজী আত্মপ্রকাশ করিবেন—
নিজ পরিচয়ে নহে, গুরুজীরূপে”।

আবির্ভাবের নির্দিষ্ট সময় না বলিয়া—“সময় হইলেই
বা গুরুজীরূপে”—এই সমস্ত ঘোষণা যেন হৈয়ালীর
মতই মনে হয়।

“নেতাজী যথা সময়ে আত্মপ্রকাশ করিবেন”—এই
রূপ সমবেত কণ্ঠ ধ্বনি হইতে, যে ঢেউ বাতাসে জাগে,
উৎসাহে-ভরা সেই দোলা বিশেষ করিয়া বাঙ্গালীর হৃদয়েই
লাগে এবং জনগণ কৃষ্ণপঙ্কের অন্ধকারেও গুরুপঙ্কের
চন্দ্র দেখিতে পান।

অগণিত দেশবাসী “ঐ” মধুময় দিনের প্রতীক্ষায়—
কিন্তু কালের গতি বহিরা যায়।

লীলাময় নেতাজী! তুমিই কি কলিযুগে কৃষ্ণ ভগবান ?
তোমার স্বীকৃত চরিত্রে একি অপরূপ মায়া!

স্বদেশ হইতে অন্তর্ধান, ফৌজ গঠন, বিবাহ, সন্তানলাভ,
মৃত্যু সংবাদ, জীবিত ঘোষণা, শৌলমারীর সাধুজী পর্যাস্ত,
সব কিছুই কি প্রােহলিকা ?

নেতাজীর জায় দেশহিতৈষী একনিষ্ঠ বীর সাধক,
এইরূপ পরাধীন দেশে দ্বিতীয় জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া
প্রমাণ কোথায় ?

সমগ্র ভারতবর্ষে এমন কোন ব্যক্তি আছেন, যিনি
নেতাজীর আত্মপ্রকাশে—তাহার পতাকাতলে উপস্থিত না
হন ? যিনি স্বয়ং দল সৃষ্টিকর্তা, তাহার জন্ম দল গঠনের
প্রয়োজন কি ?

বেদান্তের চক্ষু জ্যোতির্বিজ্ঞান ; উক্ত বিজ্ঞান রূপ
দর্পণে দেখা যায়—১৮৯৭ সনে ২৩শে জ্যৈষ্ঠারী দিবা ১২
টার পর ১টার পূর্বে নেতাজী কটক নগরে জন্মগ্রহণ
করেন।

আবির্ভাবের সময়, মৃত্যু-সংবাদের মতই রহস্তাবৃত।
ঐ সময়ে মাত্রাজের স্থানীয় সময়ানুসারে-ভারতীয় সময়ের
প্রচলন থাকায়, ভারতের প্রায় সর্বত্রই উহা ব্যবহৃত
হইত।

মাত্রাজ সময় দিবা ১০টা ৩২ মিনিট ও কটক স্থানীয়
সময় ১১টা ২ মিনিটে মেঘলগ্নের উদয় হইয়া মাত্রাজ সময়
১২টা ২০ মিনিট ও কটক স্থানীয় সময় ১২টা ৪৩ মিনিটে
সমাপ্তি ঘটে। উহার পর বৃষ লগ্নের উদয় হয়।

১২টা হইতে ১ টার মধ্যে মেঘ ও বৃষ উভয় লগ্নের উদয়
হওয়ায়, জ্যোতির্বিদগণ অনেকেই মেঘ, আবার কেহ কেহ
বৃষলগ্নের কল্পনা করেন।

নেতাজীর পিতার হস্তলিপি হইতে জানা যায়—“১২ টার
পর কয়েক মিনিটের মধ্যেই নেতাজী জন্মগ্রহণ করেন”।

মাত্রাজ ১২টা ২০ মিনিট ও কটক স্থানীয় সময় ১২টা
৪৩ মিনিটের মধ্যে জন্ম হইলে, মেঘ লগ্নের তৃতীয় ত্রেকোণে
জন্ম হইয়া থাকে। কোন রাশির নবাংশে, তুলা অথবা
ধনু—ইহা লইয়াও সংশয়।

নেতাজীর জীবনে সকল বিষয়েই যদি ভারতবাসীর
অন্তরে সন্দেহ জাগে, তবে জন্মলগ্ন নির্ণয়ে জ্যোতির্বিদগণ
নিঃসন্দেহ হইতে পারেন, কোন পুণ্যবলে ?

যদি বৃষ লগ্নে জন্ম হয়, তাহা হইলে লগ্নে, শনি ও
রাহু-দৃষ্ট মঙ্গল। তৃতীয়ে, রবি ও বুধ-দৃষ্ট কেতু। চতুর্থে,
শুক্র ও শনি-দৃষ্ট বক্রী-বৃহস্পতি। পঞ্চমে, রাহু-দৃষ্ট চন্দ্র।
ষষ্ঠমে মঙ্গল-দৃষ্ট শনি। নবমে, রবি, বক্রী-বুধ এবং রাহু !

জৈমিনি মতে পরমাণু গণনা—লগ্নপতি ও অষ্টমপতি, লগ্ন এবং চন্দ্র, লগ্ন ও হোঁরালাগ্ন, তিন প্রকার নিয়মের মধ্যে দুই প্রকারে অন্নায় যোগ প্রাপ্ত হওয়ার, অন্নায় যোগই স্থিরীকৃত হয়। কোন প্রকার আয়ুর্কাল বৃদ্ধি না হওয়ার ও বিবিধ নিয়মে অন্নায় যোগ প্রাপ্ত হওয়ার, বিশেষতঃ লগ্নপতি ও অষ্টমপতি এবং আয়ুস্থান দূষিত হওয়ার, পরাশর মতে দীর্ঘায়ু যোগ পাওয়া গেলেও, জাতক অধম-মধ্যায়ু-ভোগী হইয়া থাকেন—ইহাতে সন্দেহ নাই।

দশমস্থান হইতে রাজ্য, আকাশ, প্রভৃতি প্রভৃতি

বিচার করিবার নির্দেশ পাওয়া যায়। কৰ্মাধিপতি শনি অষ্টমে শক্রগৃহে, শক্রদৃষ্ট হইয়া থাকায় এবং অষ্টমপতি মঙ্গল পুনরায় লগ্নপতি হইয়া দ্বিতীয়ে অবস্থান পূর্বক শনি ও রাহু দ্বারা দৃষ্ট হওয়ার, উচ্চস্থান অথবা আকাশ হইতে পতন, অগ্নিদগ্ধ, রাজ্য উদ্ধার হেতু প্রাপত্যাগ প্রভৃতি ঘট্য কারণ না হইবার যুক্তি কোথায়?

সাধু মহাত্মাদের ভবিষ্যদ্বাণী ব্রহ্মবাক্য ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই। নেতাদ্বী আত্মপ্রকাশ করিবেন কিনা তাহা ভবিষ্যতই বলিতে পারে।

কেশ ও মস্তিষ্কের পরম হিতকারী

মনোরম গন্ধযুক্ত “ভুঙ্গল” আয়ুর্বেদীয়
মতে প্রস্তুত মহাভুঙ্গরাজ কেশ তৈল।
ইহা ঘন কৃষ্ণ কেশোদগমে সহায়তা
করে এবং মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা রাখে।

ভুঙ্গল

সুগন্ধি মহাভুঙ্গরাজ
কেশ তৈল



নতুন সুদৃশ্য ছোট শিশি প্রচলিত
হইয়াছে বড় শিশিও লীজ্বই
পাওয়া যাইবে।



দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ কলিকাতা-২৯

শ্রীশৈলেন কুমার চট্টোপাধ্যায়



বন্ধ জানলার কাঁচের গায়ে একটু ছ'টি করে জম্ছে বৃষ্টির ফোটা। আর সেই দিকে অপলক নয়নে চেয়ে বসে আছে বাহুদেব বহুরার। মনের মধ্যে তার আশা যাওয়া করছে বিগত পাঁচ বছরের কত লেখা—হ্যাঁ, লেখাই। শুধু লেখা, আর লেখা! শুধু উত্তর, আর প্রত্যুত্তর! চিঠির পরে চিঠি। সে এক বিরাট কথপোকথন শুধু লেখার মধ্য দিয়ে। কত আশা, কত আনন্দ, কত উচ্ছ্বাস, কত উৎসাহ, সব এইক্ষণে মনে পড়ে যাচ্ছে বাহুদেবের। ...হঠাৎ যেন সে নীচের দিকে নেমে গেল চট করে। চমকে উঠে আসনের হাতল শক্ত করে ধরে বাহুদেব। কিন্তু তারপরই জোরে ছলে উঠল সব। মেঘ ঘন হয়ে চেপে এসেছে জানলার কাঁচের ওপর। সামনেই ফুটে উঠল আলোর লেখা—“Fasten Seat Belt,” ইউরোপ-

গামী প্লেনের খাড়া বাহুদেবের এই প্রথম প্লেনে চড়া। তাই ‘বাল্পিং’-এর অভিজ্ঞতা তার নেই। ঘন মেঘের মধ্যে প্লেনের ছলুনিতে অসোয়াস্তি বোধ করলেও সামলে নিতে তার সময় লাগে না। সিট, বেল্ট শক্ত করে বেঁধে সে এই উপান-পতনের বেগ সহ্য করতে লাগল। বমি তার হল না অত্যাশ্চর্য অনেক যাত্রীর মতন, আর অসোয়াস্তিটাও সহ্য হয়ে গেল আন্তে আন্তে। একটু পরেই মেঘ পাতলা হয়ে গেল। দেখা গেল মেঘমুক্ত স্থানীয় আকাশ, আর সেই নীলের ওপর দিয়ে সাততরে চলল স্বচ্ছন্দ গতিতে তাদের প্লেন। বাহুদেবও আন্তে আন্তে আবার ফিরে আন্তে লাগল তার সেই কেলি আশা ভাবনায়। প্রথমেই মনে পড়ে গেল সেই প্রথম চিঠির কথাটা। সেই চিঠি, যা তার জীবনের মোড় ফিরিয়ে দিয়েছিল! যার জের টেনে চলেছে সে এই স্বদীর্ঘ পাঁচ বছর—আর যার টানে সে

চলেছে আজ হৃদয়ের সন্ধানে। সেই চিঠি—সেই স্বপ্নপাত, সেই শেষের আরম্ভ! সেই আরম্ভকে শেষ করতে, তাকে পূর্ণতা দিতেই আজ বাহুদেব চলেছে ফরাসী রাজধানী প্যারিসের পথে। মনে পড়ে গেল পাঁচ বছর আগের সেই সকালের কথা।

সকাল বেলায় চা খেতে খেতে খবরের কাগজের পাতাটা উল্টে-পাল্টে কর্ণখালির বিজ্ঞাপনগুলি দেখছিল বাহুদেব। এমন সময় পিয়ন দরজার তলা দিয়ে চিঠিটা গুঁজে দিয়ে চলে গেল। নীল খামের চিঠিটার যেন কি একটা বিশেষত্ব রয়েছে বুঝে তাড়াতাড়ি বাহুদেব তুলে নেয় চিঠিটা। ঠিকই তো, চিঠিটা আসছে সাগরপারের দেশ থেকে। একেবারে ফরাসী রাজধানী প্যারিস থেকে। অবাক হয়ে যায় বাহুদেব। কিন্তু নাম ঠিকানা সবই তার—তুল কিছু হয়নি পোষ্ট-অফিসের। আন্তে আন্তে কাঁপা কাঁপা আঙ্গুলে খাম খুলে বার করে টাইপ্‌করা একখানা চিঠি। ইংরাজীতে লেখা চিঠিটার মর্মার্থ হচ্ছে :—প্রিয় মিঃ বাহুদেব, অপরিচিতা মহিলার কাছ থেকে এরকম চিঠি পেয়ে নিশ্চয়ই আপনি অবাক হয়ে গেছেন। ভাবছেন আপনার ঠিকানা আমি পেলাম কোথায়। সব কথাই লিখছি, আপনি একটু ধৈর্য ধরে পড়ুন। কিছুদিন আগে আপনার এক সহপাঠি বন্ধু এদেশে এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়েছিল। তাঁর দেশের কথা, তাঁর বন্ধুবান্ধবের কথা প্রভৃতি অনেক গল্পই তিনি আমার কাছে করেছেন। আপনার অনেক প্রশংসাও আমি তাঁর কাছে শুনেছি। তিনি যখন প্যারিস ছেড়ে যান তখন আমি আপনার ঠিকানাটা তাঁর কাছ থেকে চেয়ে নি। তাঁরপর অনেকদিন ভেবেছি আপনাকে চিঠি লিখে জানি যে আপনি আমার লেখনি-বন্ধু (‘পেন্‌-ফ্রেন্ড’) হতে রাজী আছেন কিনা। কিন্তু সাহস হয় নি। ইংরাজী ভাষায় আমার দখল কম। লেখাতে হয়ত তুল অনেক হয়েছে এবং হওয়াটাও স্বাভাবিক, তবুও আশা করি আমার বক্তব্য বুঝতে আপনার বিশেষ অসুবিধা হবে না। ইংরাজী আপনারও নিজের ভাষা নয়, আমারও নয়। চেষ্টা করলে আমিও হয়ত একদিন আপনার ‘মতই ভাল ইংরাজী’ লিখে ফেলতে পারব—হয়ত আপনার মাতৃভাষা বাংলাও লিখতে পারব। তবে এর অস্ত্র চাই প্রেরণা, আর সেই

প্রেরণাটাই পাব যদি আপনি আমার সঙ্গে পত্র-বিনিময়ে রাজী থাকেন।

নিজেকে আমার অত্যন্ত নিঃসঙ্গ বোধ হয়। বয়স আমার মাত্র কুড়ি। আপনি হয়ত ভাবছেন এই বয়সের মেয়ের প্যারিসের মতন জায়গায় নিঃসঙ্গ বোধ হওয়াটা একটা অস্বাভাবিক। হয়ত তাই। কিন্তু আমি ঠিক অল্প মেয়েদের মতন নই। আমার বয়সী মেয়েদের মতন হুল্লোড় করে বেড়ান আমার ধাতে নয় না। আমি ভালবাসি নির্জনতা, আর প্রকৃতির সান্নিধ্য। তাবলে মনে করবেন না যেন আমি কবি বা লেখিকা। তবে সাহিত্য আমি ভালবাসি এবং কবিতা ও গল্প ইত্যাদি নিয়মিতরূপেই পড়ে থাকি। লেখবার চেষ্টা কখনও করিনি—এই চিঠি-টাই বোধ হয় আমার সবচেয়ে বড় লেখা।

বাই হোক, আপনি যদি আমার মতন একটি সাধারণ বিদেশী মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে ইচ্ছা করেন, তাহলে বিশেষরূপে বাধিতা হব। আর একটা কথা আপনাকে জানাই ভারতীয়দের আমি খুবই পছন্দ করি। তাদের যেন আপন জন বলেই মনে হয়—কেন তা বলতে পারব না।

এত বড় চিঠি লিখে ফেলে আপনার অনেকটা সময় নষ্ট করেছি। এবার আপনাকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে এখানেই শেষ করছি। আর আশা করছি আপনার কাছ থেকে শীঘ্রই উত্তর পাব। ইতি, আপনার বিশ্বস্ত—
—ফ্রান্সোয়া বার্দো

হ্যাঁ, উত্তর দিয়েছিল বাহুদেব, তবে খুব শীঘ্র নয়। ভাবতে হয়েছিল ক’য়েকদিন। তারপর একদিন—প্রায় সারাদিনই চিঠির মুশবিদা করে, অনেকগুলি কাগজ ছিড়ে, শেষকালে একটা চিঠি খাড়া করেছিল এবং দুক দুক বক্ষে ও কল্পিত হস্তে তা পোষ্টও করেছিল। আজও সেই প্রথম চিঠির প্রতিটি অক্ষরই তার মনে আছে—এখনও যেন তা চোখের সামনে ভাসছে। সেই চিঠিতে লিখেছিল বাহুদেব—

“প্রিয় মানামোজেস্ বার্দো,

আপনার চিঠির দ্বারা আপনাকে জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। এই চিঠি লিখে এবং আমার লেখনী

বন্ধু হতে চেয়ে আপনি আমাকে বখেটে সম্মান দিয়েছেন। সে সম্মানের বোণ্য হয়ত আমি নই এবং আপনার স্বন্দর চিঠির বোণ্য উত্তরও হয়ত হচ্ছে না—তবুও যদি আপনার ভাল লাগে তাহলে প্রত্যুত্তর দেবেন, আর আমাদের বন্ধুত্বও তাতে পাকাপাকি হয়ে যাবে। কেমন?

আচ্ছা, এইবার আমার সম্বন্ধে কিছু কিছু আপনাকে জানাই। আমার বয়স এখন পচিশ। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে এ যাবৎ চেষ্টা করছি কোনও লাভজনক ব্যবসা গড়ে তোলবার বা ভাল চাকুরি জোগাড় করবার। কিন্তু আজ পর্যন্ত তার কোনটাই হয়ে ওঠে নি। তবে আশা ছাড়ি নি। চেষ্টা করে যাচ্ছি নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবার, কিন্তু কবে তা হবে বলতে পারি না। আপনাদের দেশে এবং ইউরোপ ও ইংলণ্ডের শহরগুলিতে বেড়াতে যাবার ইচ্ছা মনের কোণে জমে রয়েছে অনেকদিন থেকেই; কিন্তু এই ব্যয়বহুল ভ্রমণের উপযুক্ত অর্থসঞ্চয়ন করে উঠতে পারি নি বলেই সে ইচ্ছাও ফলবতী হয় নি। ভবিষ্যতেও হবে কি না জানি না। তবে চেষ্টা ছাড়ব না, বিশেষ করে আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার পর এই ভ্রমণের ইচ্ছা যেন বিগুণ বৰ্দ্ধিত হয়েছে।

বাই হোক, আশা করি আপনি এ পত্রের উত্তর সত্তর দিনে আমাদের বন্ধুত্ব বন্ধনকে সুবৃদ্ধ করে কেলবেন, এবং আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি যে আমি নিয়মিতভাবে আপনার চিঠির উত্তর দিয়ে যাব।”

... ..

বাহুদেব তার কথা রেখে চলেছে এই দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে। প্রতিটি চিঠির সে উত্তর দিয়ে গেছে নিয়মিত ভাবে। ফ্রাঁসোয়াও তাকে চিঠি লিখে এসেছে ঠিক নিয়মে। প্রথম প্রথম মাসে একটি, পরে মাসে দুটি, শেষে প্রতি দশমাসে একখানি করে উত্তর প্রত্যুত্তর দিয়ে এসেছে দু’জনে এই দীর্ঘকাল ধরে।

কত বকমের মে চিঠি। প্রথম প্রথম লেখালিখি হয়েছে অতি সতর্কভাবে সত্ৰম, শালীনতা ও ভদ্রতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে। তারপর চিঠিও বড় বেড়েছে, অন্তরঙ্গতাও সেই অল্পপাতে বেড়ে গেছে। হয়েছে কোটোর আদান-প্রদান, উপহার বিনিময় এবং শেষে যা হবার তাই হয়েছে—দু’টি

হৃদয় বাঁধা পড়েছে প্রেমের বাঁধনে। হাজার হাজার মাইলের ব্যবধান পেরিয়ে অদেখা অজানা দু’টি মন ধরা দিয়েছে দু’জনের কাছে আকুল আগ্রহে। সাগরপারের বিদেশিনী এ দেশের ছেলেকে ভালবেসেছে শুধু তার লেখা পড়ে, তার ছবি দেখে। তার চিঠির ভাষা তাকে প্রেমে উন্মাদিনী করে তুলেছে। প্রতিজ্ঞা করেছে সে বাহুদেবের কাছে, যদি বিয়ে করে তো তাকেই করবে, আর কাককে নয়! পাল্টা প্রতিজ্ঞা বাহুদেবও করেছে। লিখেছে তার বধু একমাত্র সেই হতে পারে—অন্ত নারীর স্থান বাহুদেবের জন্মে নেই। আরও লিখেছে বাহুদেব, সে একদিন তার দেশে যাবেই, তাকে বরণ করে নিয়ে আসবার জন্তে। সেই কথার বৃষ্টি আজ রাখতে চলেছে বাহুদেব।

এর পর আছে আরও কত চিঠি—কত অহুসার, কত অহুযোগ, কত অভিযোগ, কত অভিমান, কত আশা, কত নিরাশা, কত দুঃখ, কত সুখ, কত আনন্দ, কত আত্মদাদ, কত যে বেদনা, কত উন্মাদ। আর কত সে সম্বোধন মিষ্টি, মধুর। বাহুদেবকে ফ্রাঁসোয়া লেখে ‘দেব’ বলে। ‘দেব’-এর মানে সে জেনেছে ‘দেবতা’। বাহুদেব যে তার জীবন-দেবতা। তার নামও পালটে একটা মিষ্টি বাঙ্গালী নাম চেয়েছিল ফ্রাঁসোয়া। বাহুদেব অনেক ভেবে তার নামকরণ করেছে ‘পত্নীলেখা’। মানেটা বুঝে এ নাম তার খুবই পছন্দ হয়েছে। ছোট করে বাহুদেব শুধু ‘লেখা’ বলেও তাকে সম্বোধন করে।

সব কথা এসে আজ ভিড় করছে বাহুদেবের মনে—মুখে তার ফুটে উঠছে মুহু হাসির রেখা, পরিতৃপ্তির প্রকাশ। চিঠির মাধ্যমে তাদের নৈকট্য এত ঘনীভূত হয়েছে যে আজ বাহুদেবের সব ভাবনা চিন্তার অংশীদার হয়ে দাঁড়িয়েছে ফ্রাঁসোয়া—তার অদেখা দমিতা। তার হাতেই যেন বাহুদেব তুলে দিয়েছে তার সব ভাবনা চিন্তার ভার নিঃশেষে। চিঠি লিখে তার মতামত না জেনে সে করে না কিছুই। তার পারিবারিক, সাংসারিক সব ব্যাপারেই তার মত নিয়ে সে চলে। ফ্রাঁসোয়াও জানায় তাকে তার সব কিছু। বাহুদেবের পরামর্শ মত সেও চলে। নিঃসন্দেহ বাহুদেবকে হাজার হাজার মাইল দূর থেকেও সে চালিয়ে নিয়ে চলেছে স্নেহে, মমতায়, ভালবাসায়। বাহুদেবকে কেজ্জ করেই তার সব ভাবনা আর চিন্তা।

আর কিছু যেন তার মনে নেই। বাস্তবের অবস্থাও সব কিছুই যেন বাস্তবের অমূল্য করে, উপভোগ করে ঠিক তাই। শয়নে স্বপনে সে খালি তার ফ্রান্সোয়াকে ফ্রান্সোয়ার চিঠির মধ্যে দিবে। কল্পনায় সে মাঝে মাঝে তার 'পত্রলেখা'কেই ভাবে। আর পরিশ্রম করে চলে চলে যায় ফ্রান্সোয়াকে নিয়ে কখনও নোতরদাম-এর শান্ত



নোতরদামের শান্ত পরিবেশে.....

অর্থোপার্জনের অন্তে। শুধু এক চিন্তা প্রচুর অর্থ না হলে সে তো তার প্রিয়তমার কাছে যেতে পারবে না, দেখতে পাবে না তাকে ও তার দেশকে। মহানগরী প্যারিসকে সে ভালবেসেছে তার প্রিয়রই মতন। ফ্রান্সোয়ার চিঠি থেকে তার পাঠান অঙ্কন ছবির মধ্য দিয়ে প্যারিসের পথ-বিপথ, অলি-গলি, হোটেল-রেষ্টোরা, বিপণী, আট-গ্যালারী প্রভৃতি সব দ্রষ্টব্য স্থানের সঙ্গেই যেন বাস্তবের পরিচয় হয়ে গেছে। নিজের চোখে না দেখলেও বাস্তবের তার প্রিয়র চোখের মধ্যে দিয়েই যেন প্যারিসের সব কিছুই আজ জেনে ফেলেছে, দেখে ফেলেছে। প্যারিসের আলো, হাওয়া, গন্ধ; তার চপলতা, চকলতা, বিলাসিতা; তার শান্তি ও শিথলতা; তার প্রাচীনতা ও আধুনিকতা—

পরিবেশে, কখনও আর্ক-ডু-ট্রাম্প-এর আসে পাশে—সাঁজেলিস এর পথে পথে, কখনও আইফেল টাওয়ার-এর উচ্চ শিরে, কখনও বা লুভের-এর শিল্প সম্ভারের মধ্যে। আবার কখনও সে চলে যায় কল্পনার ঘোড়া ছুটিয়ে রাতের প্যারিসের অলিতে-গলিতে ফ্রান্সোয়ার হাত ধরে, গিয়ে চোকে 'মুলা রুজ'-এর মতন কাকোতে ও রেষ্টোরা—নাচে, গায়, পান করে, হল্লোড় করে সারা রাত ধরে, ঘরে ফেরে খলিত চরণে ফ্রান্সোয়ার কাঁধে ভর দিয়ে, শেষ রাতে। ফ্রান্সোয়াকে নিয়ে, প্যারিসকে নিয়ে তার কল্পনার যেন শেষ নেই।

বাস্তবের মনে হয় পূর্ব জন্মে সে নিশ্চয় জন্মেছিল ইউরোপে, খুব সম্ভব করাবী দেশেই। তা না হলে প্যারিসের

ওপর তার এত টানই বা হবে কেন, আর ফরাসী ভাষাই বা এত তাড়াতাড়ি সে শিখল কি করে। অবশ্য ফ্রাঁসোয়ার প্রেরণা ও কল্‌কাতার ফরাসী শিক্ষকের সাহায্যও তার নিজের একনিষ্ঠ চেষ্টাই তাকে ফরাসী ভাষা শিখতে সাহায্য করেছে। এখন সে অনর্গল না হলেও চলন সহী কথাবার্তা বেশ বলতে পারে ও ফরাসী ভাষাতে লিখতেও পারে, যদিও খুব শুদ্ধ হয় না।—হ্যাঁ, ফ্রাঁসোয়াও কি কিছু শেখে নি বাসুদেবের কাছ থেকে? নিশ্চয়ই শিখেছে। ইংরাজী সে সুন্দর লিখছে, আর বাংলা ভাষায়ও কিছু কিছু বাক্য সে ভালই লিখতে পারে, বিশেষ করে সব চিঠিতেই সে একটি কথা বাংলায় লিখে থাকে—‘আমি তোমায় ভালবাসি’।

একবার তাদের এই ভালবাসা সম্বন্ধে ফ্রাঁসোয়া লিখেছিল—“সত্যই কি এ সম্ভব? আমরা দু’জন কাউকে চাক্ষুষ দেখি নি, নেই কোনও সম্পর্ক অথচ শুধু চিঠির মধ্যে দিয়ে এত দীর্ঘস্থায়ী গভীর প্রেম কি করে সম্ভব হল দেব?” অনেক ভেবে, অনেক মন ঘাঁটাঘাঁটি করে লিখেছিল বাসুদেব—“বাসুদেব মন যেন একটি তারের যন্ত্র। ঠিক হাতের ছেঁয়াটি পেলেই তা ঠিক সুরে বেজে উঠবে, তা দূর থেকেই হোক বা অতি কাছ থেকেই হোক। তবে ভাল লাগা আর ভালবাসা কিন্তু এক নয়। প্রথম দর্শনে অনেককেই অনেকের ভাল লাগে, কিন্তু তাই বলে সেটাই যে খাঁটি ভালবাসা বা প্রেম তা যেমন নয়, আবার সত্যিকার ভালবাসা হলোই যে তা চিরস্থায়ী হবে, কোন দিনই ভাঙ্গন ধরবে না, তাও তেমনি সত্য নয়। প্রেমকে, ভালবাসাকে স্থায়ী করতে হলেও চাই স্বার্থতাগ, চাই সাধনা। গভীর দীর্ঘস্থায়ী প্রেমও সামান্য কারণে ভেঙ্গে যায়, বরঞ্চ স্বামী-স্ত্রীর পুরাতন দাম্পত্য প্রেমও নষ্ট হয়ে যায়—হুয় বিবাহ-বিচ্ছেদ। আমাদের সনাতন ভারতীয় প্রথায় বিবাহিত অদেখা, অচেনা, অজানা দুটি নরনারীর বিবাহোত্তর কালের ধীরে ধীরে জেগে ওঠা প্রেম আজীবন স্থায়ী হয়—প্রদীপের অচঞ্চল স্নিগ্ধ শিখার মতন জেগে থাকে চিরজীবন। আবার তোমাদের পশ্চিমী প্রথায় বহুদিন ধরে দেখা শোনা, মেলামেশা, মন বোঝাবুঝি অর্থাৎ কোর্টশিপ করে যে বিবাহ হয়, তাও হয়ত ভেঙ্গে যায় দু’দিনেই। তাই বলি, প্রেমের গতি বড়ই দুর্লভ।” “হুতরাং”, লিখেছিল বাসুদেব, “ও নিজে মাথা ঘামিও না। কেন যে

হুত, কেন যে হয় না, আর কেন যে টেকে না—তা বোঝা শক্ত বাসুদেবের পক্ষে। তবে যুগে যুগে মানব-মানবী পরস্পরের প্রেমে পড়েছে—হুথও পেয়েছে, হুথও পেয়েছে, হাসি কান্নায় ভরে গেছে তাদের মন, কিন্তু এই প্রেমকে এড়াতে পারে নি বাসুদেব। কারণ, এ যে সৃষ্টি রক্ষার সত্ত্ব ভগবানের অমোঘ বিধান।”

হঠাৎ কার হাতের মূহুর্স্পর্শে চমকে ওঠে বাসুদেব। ফিরে তাকাতেই গোখাচোখি হয়ে গেল এক জোড়া নীল চোখের সঙ্গে। মধুর হাসিমাখা মুখে সুন্দরী এয়ার-হোস্টেস্‌ এগিয়ে দেয় খাবারের ট্রে। থিদে, ভেটোর কথা এতক্ষণ যেন ভুলে ছিল বাসুদেব। সামনে এই সুখান্ড সম্ভার দেখেই তার স্ত্রীর উদ্বেগও হল চকিতে, আর স্ত্রী নিবৃত্তিতে মনঃসংযোগও করল তৎক্ষণাৎ।

খেতে খেতেই ভেবে নিল বাসুদেব, হয়ত এমনি করেছে তার তরুণী প্রিয়। তাকে খাবার এনে দেবে—এমনি মধুর হেসে, এমনি ছবিও নয়নে চেয়ে। কত কথাই হবে তাদের খেতে খেতে। কল্‌কাতায় এক বৃদ্ধা মা ছাড়া তার সংসারে আর কেউ নেই। কথা বলার অভাবে, তাই বাসুদেব মাঝে মাঝে হাঁপিয়ে ওঠে। ভাবে ফ্রাঁসোয়ার সঙ্গে দেখা হলে কথা হয়ত তার খামবেই না দিনে রাতে। চিঠিতে কি আর মা বলা হয়েছে। জমে রয়েছে কত কথা মনের আঁনাচে কানাচে। দেখা হলোই সব বেরিয়ে আসবে অবরোধবদ্ধ শ্রোতের মত।

খাওয়া শেষ করে আসনে গা এলিয়ে দেয় বাসুদেব। পকেট থেকে বার করে সম্বন্ধে রক্ষিত ফ্রাঁসোয়ার একটা ফোটা। এই ফোটাট দে পাঠিয়েছিল যখন বাসুদেব নিজের একটি ফোটা পাঠিয়ে তাকে ও একটা ফোটা পাঠাতে অনুরোধ করেছিল। ফ্রাঁসোয়া রক্ষা করেছিল বাসুদেবের সে অনুরোধ এই ফোটাটা পাঠিয়ে। এটা একেবারে গোড়ার দিকে ব্যাপার। তারপর বাসুদেব তার নিজের কয়েকটি ফোটা মাঝে মাঝে তুলে তাকে পাঠিয়েছে। কারণ ফ্রাঁসোয়া প্রায়ই তার নতুন ফোটা দেখতে চায়—দেখে দেখে যেন তার আর সাধ মেটে না। কিন্তু নিজের বেলায় সে ‘ক্যামেরা-সাই’। নিজের ছবি ঐ একটিই সে পাঠিয়েছে, আর পাঠাতে চায় না। লেখে—ক্যামেরায় সামনে বসে, আর কোটাগ্রাফারের নির্দেশে এদিক ওদিক



ফ্রাঁসোয়া

ঘাড় ফিরিয়ে, মুখের নানা রকম 'এঙ্গেল' করে, ফোটোগ্রাফারের দিকে চেয়ে মিষ্টি হাসি মুখে এনে ছবি তুলতে তার মোটেই ভাল লাগে না। তাছাড়া সে তো প্রথমেই জানিয়েছে সে সাধারণ তরুণীদের মতন 'প্রগল্ভা' নয়। ফোটো তোলায়, মাজাতিবিক্ত সাজ-গোজ করে নিজেকে দেখান, এ সব তার ভাল লাগে না। সে নবীন হলেও অতি-আধুনিক নয়।—বাস্তবের বোধ হয় সেই জন্মেই এত ভাল লাগে তাকে। লিখেছে বাস্তব 'যা তোমার ভাল লাগে না তা করে ছবি তুলতে হবে না। এ-কালের সাজ-সরঞ্জাম আধুনিক। যে তুমি নও তা জেনে খুসিই হয়েছি, ফ্যাশন্ ফ্যান্সি ফরাসী মেয়েদের মতন অতটা না হলেও আমাদের দেশেও আজকাল মাস্কফ্যাক্টরে এনায়েল করা মুখ ও বিসদৃশ সজ্জার সজ্জিতা অতি-আধুনিকাদের সাক্ষাৎ পথে-ঘাটে হারিশাই পাওয়া যাচ্ছে। পাইপ-প্যান্ট ও স্ক-স্ মণ্ডিত উৎকট সাজে ছেলেরাও পান্না দিচ্ছে। তোমার আগ্রহী সৌন্দর্যকে প্রসাধনের আতিশয্যো দৃষ্টিকটু করে তোলবার প্রয়োজন নেই। তোমার সৌন্দর্য যে কত অপরূপ তা তোমার ছবি থেকেই বোকা যায়। যে একখানি ছবি পাঠিয়েছ তাই আমার কাছে

বন্টে ! এই ছবির মধ্যে দিয়েই তোমাকে আমি পাচ্ছি, আর রক্তমাংসের তোমাকে দেখব যেদিন ওখানে তোমার কাছে গিয়ে হাজির হব।" বাস্তবের সেই সাধ পূর্ণ হতে চলেছে। কয়েক ঘণ্টা পরেই সে তার অদেখা, অন্তর-তম মাহুটিকে চাক্ষুষ দেখতে পাবে, কথা বলতে পারবে, স্পর্শ করতে পারবে।

... ..

ফ্রাঁসোয়ার কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিল বাস্তব। কতক্ষণ কেটে গেছে খেয়াল নেই। এয়ার হোটেলের মুহু আহবানে চোখ খুলে দেখে সামনেই জলছে আলোর লেখা—'Fasten Seat Belt'.—রোম্ এয়ার-পোর্ট-এর ওপর এসে গেছে তাদের প্লেন—স্পট দেখা যাচ্ছে নীচে রোম নগরীর সৌধ শ্রেণী, সেন্ট পীটার্স স্কোয়ারের বিরাট চত্বর, কলসিয়ামের ভগ্নাবশেষ আর পথে পথে অসংখ্য ফোয়ারার জলচ্ছাস। এই প্রাচীন নগরীর বিশেষ আকর্ষণ থাকলেও বাস্তবের কিন্তু এখানে থাকতে চায় না, শুধু এখানে কেন কোনখানেই সে আর অপেক্ষা করতে চায় না—সে শুধু ছুটে যেতে চায় তার প্রিয়তমার কাছে। দেশ দেখা, ঘুরে বেড়ান এ সব পরের কথা, এখন শুধু তার একমাত্র চিন্তা ফ্রাঁসোয়ার সাক্ষাৎলাভ।

বেশিক্ষণ তাকে আর অপেক্ষা করতে হল না এয়ার পোর্টে। প্লেনে ওঠবার ডাক পড়ল। এবার সোজা প্যারিসের পথে। বাস্তবের স্বপ্ন-নগরী, সৌন্দর্য ও ফ্যাশনের লীলাকুমি, তার প্রিয় আরবাসস্থল।...আবার বার করল বাস্তবের পকেট থেকে ফ্রাঁসোয়ার ছবিটা আর তন্ময় হয়ে চেয়ে রইল তার অনিন্দসুন্দর মুখের দিকে। কতক্ষণ পরে এয়ার হোটেলের হাভের মুহু স্পর্শে ধ্যান ভঙ্গ হল বাস্তবের। স্মিতমুখে একবার ছবিটার ওপর চোখ বুলিয়ে নিলে, উজ্জল চোখে মধুর ভক্তিয়ার হেসে এয়ার হোটেল জানিয়ে দিল তার যাত্রা ও প্রতীকার শেষ হতে চলেছে—নীচেই প্যারিস নগরী। ঈষৎ আরক্ত উজ্জল মুখে বাস্তবের জাগ্রত স্নানকে ধন্যবাদ, আর উৎসুক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল নীচের দিকে, বেন ফ্রাঁসোয়াকে সে এক ওপর থেকেই দেখতে পাবে কোন জানালায় বা পথের ধারে। কিছুক্ষণ পরেই তার অবীর প্রতীকার শেষ হল।

ধেন্ এসে নামল প্যারিস্ এয়ার পোর্টে। কাউন্সেলর হাক্কা চুকিয়ে বাইরে এসে হাক্কা ছাড়ল বাস্বেদেব। মনে হল একবার, ফ্রাঁসোয়া'কে তার আগমনের খবর দিলেই বোধ হয় ভাল হত। এখনই দেখা হয়ে যেত, আর তার থাকবার ব্যবস্থাও সে করেই রাখতো। তাকে আর এখন ভাবতে হত না থাকা থাওয়ার জ্ঞে। কিন্তু তখনই মনে হল তাহলেতো আর ফ্রাঁসোয়া'কে চম্কে দেবার, তার আকস্মিক আগমনের আনন্দের আলোড়নে তাকে উষ্মিত, উচ্ছ্বসিত, উচ্ছ্বলিত, উদ্দীপিত করবার সুযোগ মিলত না। মনে মনে বাস্বেদেব কল্পনা করে নিল আকস্মিক আনন্দে উদ্ভাসিত ফ্রাঁসোয়া'র রমণীয় মুখচ্ছবি।

কাজ চালাবার মত ফরাসী ভাষা জানা থাকায় বিশেষ কোনও অসুবিধা হল না তার। অপেক্ষমান ট্যান্ডিতে উঠে একটি মাঝারি গোছের হোটেলে এসে উঠল বাস্বেদেব। ঠিক করল থাওয়া দাওয়া সেবে বিকালের দিকে ফ্রাঁসোয়া'র ঠিকানায় গিয়ে দেখা করবে ওর সঙ্গে। তারপর রাতের থাওয়া, কালকের প্রোগ্রাম ইত্যাদি সব ঠিক হবে তারই কথা মত।

লাঞ্চ-এর পরই বেরুবে মনে করল বাস্বেদেব কিন্তু ফরাসী খাতের গুণে সুকোমল শয্যার আকর্ষণ সে কিছুতেই কাটাতে পারল না। শুয়ে পড়ল একটুকণের জ্ঞে। সঙ্গে সঙ্গে তন্ময় এসে ভর করল তার চোখের পাতায়। কিন্তু ফ্রাঁসোয়া'র চিন্তা সে ছাড়তে পারল না—তন্ময় বাস্বেদেবের সামনে অভিমানভরা মুখে যেন এসে দাঁড়াল ফ্রাঁসোয়া। তার কাছে এখনই না গিয়ে, তার সঙ্গে দেখা না করে বাস্বেদেব কিনা এখন যুগ্মে! তার অনিন্দ্যসুন্দর মুখে অমর-গের সঙ্গে রাগের অভিব্যক্তিও যেন ফুটে উঠেছে। বাস্বেদেব তার হাত ধরে তাকে কি বোঝাতে গেল, কিন্তু ফ্রাঁসোয়া ছুটে চলে গেল তার কাছ থেকে, তার স্বর্ণ-কেশদাম হাওয়ায় উড়িয়ে। বাস্বেদেব “ফ্রাঁসোয়া” বলে চিৎকার করে ডেকে উঠল, আর সঙ্গে সঙ্গে তেঁকে গেল তার স্বপ্ন। ধড়মড় করে উঠে বসল বাস্বেদেব। তাড়াতাড়ি মুখহাত ধুয়ে তৈরী হয়ে নিল। ঘোর নীল রঙের দামী স্ফুট-টা পরে নিল। নীল রং ফ্রাঁসোয়া'র ভারী পছন্দ, তাই এই স্ফুট-টা অনেক খরচ করে ক্রিয়ে এনেছে কল্কাভায় এক বিখ্যাত টেলরিং শপ থেকে। ফ্রাঁসোয়া'র জ্ঞেও এনেছে একটি

দামী আকাশ নীল রঙের বেনারসী শাড়ী ও তার সঙ্গে ম্যাচ করা রাউন্ড-পিস্। ভারতীয় মেয়েদের মতন শাড়ী পরবার ইচ্ছা ওর অনেকদিনের। আজ সে সাধ তার মেটাবে বাস্বেদেব—নিজে হাতে তাকে শাড়ী পরাবে।

সাজগোজ শেষ করে বাস্বেদেব শাড়ীর প্যাকেটটা হাতে করে হোটেলের রিসেপ্শন্স কাউন্টারে গিয়ে দাঁড়াল। তরুণী রিসেপ্শনিষ্ট মিষ্টি হেসে তার কি দরকার জানতে চাইল। বাস্বেদেব ফ্রাঁসোয়া'র ঠিকানা বলে জেনে নিল কোন রাস্তা দিয়ে সে ঐ ঠিকানায় সহজে যেতে পারবে। তারপর সে যেন হাওয়ায় উড়ে চলল। রাস্তায় নেমে প্রথমেই চোখ পড়ল এক ফুলওয়ালীর দিকে। কিনল একগুচ্ছ রক্তগোলাপ। স্মিত হেসে ফুলবালা পরিষে দিল একটি গোলাপ কুড়ি তার কোটের বাটনে হোলে। ধন্যবাদ জানিয়ে লঘু পায়ে হেঁটে চলল বাস্বেদেব। রাস্তায় দুধারে সুসজ্জিত বিপণীগুলির শো-কেসে ধরে ধরে সাজান রয়েছে মনোহোভা দ্রব্যসম্ভার। দেখলেই যেন নিতে ইচ্ছে করে। একটি জুয়েলারী দোকানের সামনে থমকে দাঁড়াল বাস্বেদেব। শো-কেসের মধ্যে সাজান রয়েছে কত সুন্দর সব আংটি—“এনগেজ্‌মেন্ট রিং”! বাস্বেদেবের ইচ্ছে হল একটা কিনে নেয়, আর ফ্রাঁসোয়া'র সঙ্গে দেখা হবার মাত্র তার চম্পক-কলি সদৃশ সুকোমল, সুগঠিত অঙ্গুলীতে পরিষে দিয়ে তাদের “এনগেজ্‌মেন্ট”কে একেবারে পাকাপাকি করে ফাল। কিন্তু ফ্রাঁসোয়া'র ঠিক কোন আংটিটি পছন্দ হবে তা বাস্বেদেব মনে মনে ঠিক করতে পারল না। তার চেয়ে বরঞ্চ ওকে সঙ্গে করে এনে, ওর পছন্দমত কিনে ওর হাতে পরিষে দেবে। এই ভেবে বাস্বেদেব আর দাঁড়াল না। দ্রুত পায়ে এগিয়ে চলল আশে পাশে আর বিশেষ না তাকিয়ে। কিছুদূর গিয়ে পেয়ে গেল একটা ট্যান্ডি। ঠিকানাটা ড্রাইভারকে বলে উঠে পড়ল।

এপথ ওপথ ঘুরে শহরের প্রায় প্রান্তে একজায়গায় এসে ট্যান্ডি থামল। ড্রাইভার নেবে অঙ্গুলী সংকেতে দেখিয়ে দিল একটা সুক রাস্তা। এই সেই রাস্তা—যে রাস্তার নাম সে দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে লিখে আসছে চিঠির খামের ওপর! ট্যান্ডির ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে হেঁটে চলল বাস্বেদেব। সুক রাস্তার দুধারে ছোট ছোট অগলয় বাড়ী। রাস্তাটাও পুরান আমলের

বলে মনে হয়। কিন্তু বাহুদেবের এখন রাস্তার ভালমন্দ বিচার করবার মতন মনের অবস্থা নয়—সে আগ্রহ ব্যাকুল মনে, উৎসুক দৃষ্টিতে দুধারে লক্ষ্য করতে করতে চলেছে। হয়ত এখন দেখা হয়ে যাবে তার অদেখা কিন্তু অতিজ্ঞান প্রিয়তমা পড়লেখার সঙ্গে। হঠাৎ একটা বিবর্ণ দরজার পাশের নম্বরটায় তার চোখ পড়ে গেল। হ্যাঁ, এই তো সেই তার অতিপরিচিত, বহুলিখিত নম্বর! থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বাহুদেব। শরীরের মধ্যে কেমন একটা শিহরণ খেলে যায় যেন। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে কয়েকটা সিঁড়ি উঠে দরজাটার নামনে এসে দাঁড়ায় বাহুদেব। দরজার পাশে কোনও কলিং বেলের বোতাম দেখতে পেল না সে। অগত্যা দরজার ওপরে লাগান বড় কড়াটাকেই জোরে ঠুঁকে দেয় দরজার ওপর। কড়া ঠোকার আওয়াজ মিলিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাহুদেব নিজের হৃৎপিণ্ডের আওয়াজও যেন শুনতে পেল! অদম্য আগ্রহে, অধীরতায় যেন সে ফেটে পড়ছে! আর বুঝি নিজেকে সামলে রাখতে পারছে না বাহুদেব! এখুনি চিৎকার করে উঠবে কি সে “ফ্রান্সোয়া, আমি এসেছি” বলে! নিজেকে সংযত করে বাহুদেব। আবার ভারী কড়াটাকে ঠোকে জোরে জোরে দরজার ওপর। চূপ করে দাঁড়ায় একটু। কপালে জমে ওঠা ঘামটা মুছে ফেলে ক্রমাল দিয়ে। এবারে যেন দরজার ওপারে একটা আওয়াজ পাওয়া যায়। হঠাৎ থমক করে দরজার ওপরে একস্থানের খানিকটা কাঠ সরে গিয়ে একটা চকুস্ফোণ ফেঁকরের সৃষ্টি হয়। তার ওপারে দেখা যায় একগোছা সোনালী চুলে ঢাকা কপালের ভল্লার একজোড়া উৎসুক নীল চোখ। নীল চোখ স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে তার দিকে। আনন্দে, উত্তেজনায় বাহুদেব চিৎকার করে ওঠে ফরাসী ভাষায়—“পত্রলেখা, আমি এসেছি।” নীল চোখে ঘনায় বিষ্ময়! চোখ সরে যায়, ফোঁকর বন্ধ হয়। থমকে যায় বাহুদেব—থমকে যায় যেন তার বুকের ধুকধুকানী! হঠাৎ শব্দ হয় ভেতর থেকে দরজার হড়কো খোলার। সোজা হয়ে দাঁড়ায় বাহুদেব—ক্রত তালে আবার চলতে থাকে বুকের স্পন্দন, কপালে ফুটে ওঠে আবার স্বদেশের রেখা। একটা শব্দ করে খুলে যায় দরজাটা—ওধারে দেখা যায় নীলনয়না, স্বর্ণকেশী একটি মেয়েকে। উত্তেজিত, উৎসুক বাহুদেব হাত বাড়িয়ে

দিল তার দিকে গোলাপগুচ্ছ শুদ্ধ। মেয়েটির মুখে-চোখে ফুটে ওঠে বিস্মিত হাসির রেখা। স্মিট ফরাসী ভাষায় প্রশ্ন করে—“ম’সিয়ে, আগনি কার জন্তে এসেছেন দয়া করে জানাবেন কি?” হকচকিয়ে যায় বাহুদেব। তাইতো! এতো ফ্রান্সোয়া নয়! এষে একেবারে বালিকা! পঁচিশ বছরের যুবতী বলে একে সে ভুল করল কি করে? তাছাড়া সুন্দরী হলেও ফ্রান্সোয়া পাঠান ছবির মতন অত সুন্দর মুখতো এর নয়! প্রদারিত হাত গুটিয়ে ফেলে চট করে নিজেকে সামলে নেয় বাহুদেব। মাথাটা স্বল্প হুইয়ে অভিযান জানিয়ে বাহুদেব তার ভুলের জন্ত দুঃখ প্রকাশ করে, আর জানায় সে এসেছে সুহর ভারতবর্ষ থেকে মাদামোজেল বার্দোর সঙ্গে দেখা করতে। তার শিষ্টাচারে খুসী হয় মেয়েটি কিন্তু বিষ্ময়ের ভাব লেগে থাকে তার মুখে। আত্মস্বান জানায় তাকে ভেতরে আগবার জন্তে। পুলকিত অন্তরে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করে বাহুদেব। সামনেই বসবার ঘর। দরজায় তার ঝুলছে একটা ভারী পদ্ম, আর তার পাশ দিয়ে উঠে গেছে কাঠের সিঁড়ি দোতলার দিকে। মেয়েটি তাকে বসতে বলে তার নাম জানতে চাইল। বাহুদেব স্পষ্টকরে উচ্চারণ করে তার নাম বলল। মেয়েটি তার ফরাসী উচ্চারণে বার দু’য়েক নামটা আঙড়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে চলে গেল।

একটা চেয়ারে বসে পড়ে বাহুদেব। আবার আরম্ভ হল তার সেই উদগ্র প্রতীক্ষা। খালি মনে হচ্ছে এই বুঝি সিঁড়ি দিয়ে হুড়মুড় করে ছুটে নেবে অসুবে ফ্রান্সোয়া আর ঝাপিয়ে পড়বে তার বুকে! তারপর? না আর ভাবতে পারে না বাহুদেব। অবৈধ হয়ে উঠে ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে শুরু করে দেয় সে। পুরাণ আসবাবে সজ্জিত বহু ঘরটার মধ্যে তার যেন দম বন্ধ হয়ে আসে। টাই-এর বাঁধন একটু আলগা করে দিয়ে সে আবার বসে পড়ে। শাড়ীর পাকেটটা একবার হাতে নিয়ে নামিয়ে রাখে। গোলাপগুচ্ছ নিয়ে খানিকটা নাড়াচাড়া করে। হঠাৎ মনে হল কেউ যেন নিবন্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে তার দিকে! কিন্তু ঘরে তো কেউ নেই? তবু তার মনে হতে লাগল কেউ যেন তাকে সতর্কপণে একাগ্র দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছে। উঠে দাঁড়াল বাহুদেব। পিছনের দিকে ফিরতেই দরজার ভারী পর্দা যেন নড়ে উঠল। চকিতে বাহুদেব এগিয়ে যায় আগ্রহ

ব্যাকুল মনে—সরিয়ে দেয় পর্দাটা একটানে! সঙ্গে সঙ্গে সে তার ওপর থেকে সরিয়ে নিয়ে হস্তগত লাঠির ওপর তার মুখোমুখি হয়ে পড়ে এক বর্ষীয়সী মহিলার! কলকাতা দিয়ে, আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে



সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলেন

মহিলাটি চমকে ওঠেন, আর হতচকিত বাহুদেব তার ব্যবহারের অজ্ঞ ক্রমা প্রার্থনা করতেও ভুলে গিয়ে স্থানীয় মতন দাঁড়িয়ে থাকে। পুরু চশমার মধ্য দিয়ে স্থির দৃষ্টিতে মহিলাটি তার দিকে চেয়ে থেকে তাকে ইঙ্গিতে বসতে বলেন। এবারে সঙ্ঘ ফিরে পায় বাহুদেব। তাড়াতাড়ি মাথা হুইয়ে অভিবাদন জানিয়ে, বলে “আমি আসছি তারতবর্ষের কলিকাতা নগরী থেকে, ফ্রাঁসোয়ার সঙ্গে দেখা করতে চাই। তার সঙ্গে কি দেখা করার এখন সুযোগ হবে?” বুঝা মহিলাটি তার কথার উত্তর না দিয়ে, তাঁর হাতে ধরা কাগজের উপর কিছু লিখে, তাঁর পিছনে দাঁড়ান সেই কিশোরীটির হাতে কাগজটি দিয়ে তাকে কি ইঙ্গিত করলেন। বালিকাটি কাগজটির লেখা পড়ে নিয়ে বাহুদেবের সামনে এসে বলল—“উনি বাকুশক্তি হারা, তাই আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারলেন না। আপনি যেন এজ্ঞ কিছু মনে করবেন না। উনি আপনাকে আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে বলছেন। আপনি দয়া করে আসন গ্রহন করুন। আর আপনার পারিবারিকানাটিও উনি জানতে চান।” মেয়েটি চুপ করলেই বাহুদেব এখানকার হোটেলের ঠিকানাটা বলে আরও কিছু বলবার উপক্রম করতেই দেখল, বুঝা তার একাগ্র দৃষ্টি

ওপরে উঠতে লাগলেন। বিম্বিত বাহুদেব আর কোনও কথা বলার সুযোগ না পেয়ে একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আবার ঘরের মধ্যে এসে বসে পড়ল।

কেটে গেল বেশ কিছুক্ষণ। সেই মেয়েটিয় দেখা নেই। ভারতে থাকে বাহুদেব—ফ্রাঁসোয়ার কি কিছু হয়েছে? সে কি এখানে নেই? ঐ বুঝাই বা কে? ওগ কি কোনও আত্মীয় বা অভিভাবিকা? কিন্তু ফ্রাঁসোয়া তো এঁর কথা কখনও তাকে জানায় নি। মহিলাটি ওরকম অদ্ভুত দৃষ্টিতেই বা তাকে লক্ষ্য করছিল কেন? ভেবে ভেবে কোনও কুল কিনারা পায় না বাহুদেব। ফ্রাঁসোয়ার কোনও অজানা বিপদাশঙ্কাও তাকে উদ্ভিন্ন করে তোলে।

পায়ের শব্দে তার চিত্তান্তর ছিন্ন হয়ে যায়। চোখ তুলে দেখে সেই মেয়েটি একটি চিঠির খামি হাতে করে তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। খামিটি তার হাতে দিয়ে মেয়েটি বলল—“কর্ত্তার শরীর ভাল নয়, তাই আপনার সঙ্গে বেশিক্ষণ আলাপ করতে পারলেন না। আপনি তাঁকে ক্ষমা করবেন। তিনি আপনাকে বিদায় জানিয়েছেন আর এই চিঠি দিয়েছেন। আপনার হোটলে গিয়ে এটি পড়ে দেখবেন।” কথা কটি বলে চিঠিটা তার হাতে দিয়েই

মেয়েটি সোজা গিয়ে বাহিরের দরজা খুলে দাঁড়াল। অগত্যা বাহুদেবকে তার বিহ্বলতা কাটিয়ে আস্তে আস্তে এসে দাঁড়াতে হল দরজার কাছে। কিন্তু মেয়েটি তাকে কোনও কথা বলবার সুযোগ দিল না। মিষ্টি হেসে শুভরাত্রি জানিয়েই দরজার পাশে সরে দাঁড়াল। বাহুদেবকেও বেরিয়ে আসতে হল রাস্তায়। দরজাও বন্ধ হয়ে গেল সশব্দে—তার আশা, আকাঙ্ক্ষার যেন সমাধি রচনা করে।

স্বপ্নাকার রাস্তায় দাঁড়িয়ে বাড়ীটার দিকে চেয়ে বাহুদেবের বুক থেকে একটা দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে এল। নিজের নিশ্বাসের শব্দে চমকে উঠল বাহুদেব, তারপর বিহ্বল ভাবটা কাটিয়ে ফেলে ধীরে ধীরে হেঁটে চলল। হাতে ধরা খামটাকে একবার ভাবলে খুলে ফেলে। কিন্তু রাস্তায় পড়ার অসুবিধে হবে ভেবে সে এগিয়ে চলল বড় রাস্তার দিকে। মনে তার তখন চিন্তার তরঙ্গ খেলছে। ফ্রাঁসোয়া যে ও বাড়ীতে নেই তা সে বেশ বুঝতে পারছে। সে থাকলে বাহুদেব এসেছে জানলে সে স্থির থাকতে পারত না—ছুটে আসত তার কাছে। কিন্তু ঐ বোবা বৃদ্ধা যেন কেমন রহস্যময়ী—কিছু যেন গোপন করতে সে চায়। কি সে গোপন করতে চায়? ফ্রাঁসোয়াকে কি তার সঙ্গে দেখা করতে দিতে সে চায় না? তাতে তার কি লাভ? ফ্রাঁসোয়ার জীবনে গোপনীয় রহস্যময় কি কিছু আছে?—ভেবে পায় না বাহুদেব। নিজের ওপর তার রাগ হয়। কেন এরকম ছেলেমানুষি করতে গেল। ফ্রাঁসোয়াকে জানিয়ে এলেই তো হত, তাকে ভয়ানক রকম 'সারপ্রাইস' করতে গিয়েই তো এই রকম হল! এখন একমাত্র ভরসা তার পকেটে রাখা চিঠিটা। ঐ চিঠিতেই হয়ত এই রহস্যের সমাধান আছে।

চলার গতি বাড়িয়ে দিল বাহুদেব। বড় রাস্তায় পড়ে ট্যাক্সির সন্ধানে এদিক ওদিক চাইতে চাইতেই একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল। তার হোটেলের ঠিকানা বলে উঠে পড়ে বাহুদেব। পকেটের চিঠিটা একবার হাত দিয়ে অচুতব করে নেয়। তারপর চুপ করে গা এলিয়ে দিয়ে বসে থাকে বাহুদেব। রাস্তার দু'ধারের সাজান বিপণির দ্রব্যসম্পদ, আলোকজ্ঞান কাফে-রেস্তোরার সারি, আলোকোদ্ভাসিত পথে স্রবশ নর-নারীর ভীড়, আধুনিকতম

পোষাকে সজ্জিতা প্রাণোচ্ছল তরুণ-তরুণীদের কলহাস্ত—কিছুই আর বাহুদেবের চিন্তকে আকৃষ্ট করতে পারছে না যেন। তার স্বপ্ন-নগরী প্যারিসের সব আকর্ষণ যেন তার কাছে শেষ হয়ে গেছে—প্যারিস যেন আজ তার কাছে মৃত!

হোটেলের দরজায় এদে দাঁড়াল ট্যাক্সি। স্বপ্নোখিতবৎ বাহুদেব ভাড়া ও বক্শিস দিয়ে ভিতরে গেল। রিসেপ্‌সনিষ্ট-এর স্মিত হাসির প্রত্যুত্তর না দিয়ে, নিরাসক্ত মুখে ঘরের চাবি নিয়ে লিফ্টে উঠে পড়ল। চারতলায় তার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করেই খামটা পকেট থেকে বার করল বাহুদেব। একটু স্থির হয়ে নিম্নে সংযত করে নিয়ে খামটা ছিঁড়ে বার করল দীর্ঘ চিঠিটা। কম্পিত আঙ্গুলে চিঠিটা খুলেই অতি পরিচিত হস্তাক্ষর দেখেই বিস্মিত আনন্দে চমকে উঠল বাহুদেব! এ যে ফ্রাঁসোয়ার লেখা—তার পত্রলেখার পত্র! কিন্তু বাড়ীতে থেকেও সে কেন দেখা করল ন তার সঙ্গে? তবে কি অজ্ঞ কারও সঙ্গে তার ইতিমধ্যে, ...কিন্তু তা কি সম্ভব? আর ভাবতে পারে না বাহুদেব। টেবল ল্যাম্পটা জ্বলেই চেয়ারে বসে পড়ে সে, আর রুদ্ধ নিঃশ্বাসে চিঠিটা পড়তে আরম্ভ করে দেয়।

ফ্রাঁসোয়া লিখেছে—

“দেব, প্রিয়তম আমার,

আমার মন বলছে, অশ্রুভারাক্রান্ত আমার এই মন বলছে, এই আমার তোমাকে লেখা শেষ চিঠি। অস্থির হওয়া না প্রিয়, বৈধা ধরে চিঠিটা সবটা পড়, তাহলেই সব কিছু তোমার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

দীর্ঘ পাঁচ বছরের অতৃপ্ত নয়ন আমার তোমাকে আজ দেখে তৃপ্ত হল। যথ্য হলাম আমি, যথ্য হল আমার গৃহ। চমকে উঠলে তুমি? এখনি এতটা উত্তলা হওয়া না প্রিয়, আরও অনেক বিষয় তোমার জ্ঞান সঞ্চিত হবে আছে এই চিঠির মধ্যে। চোখ আমার জলে ভরে আসছে ক্রমে ক্রমে, হাত কাঁপছে তাই লিখতেও দেয়ী হচ্ছে। কিন্তু তুমি যে বসে আছে নীচে! কতক্ষণ বসিয়ে রাখব অধীর প্রতীক্ষায় আমার দেবুলা 'দেব'-কে? কিন্তু কি করব বল? চিঠিই যে আমার লিখতে হবে, কথা বলবার

শক্তি যে আমার নেই—আমি যে বোবা! ইয়া দেব, তুমি যা আশা করছ তাই। তোমার ক্রীন্দোরা শ্রিয়া, তোমার প্রিয়তমা পত্রলেখা হচ্ছে সেই, যে কুরূপা বৃদ্ধাকে একটু আগেই তোমার সামনে তুমি দেখেছো! ইয়া দেব, আমিই সেই বৃদ্ধা!

যুগায় তোমার মুখ কি কৃষ্ণিত হয়ে উঠল দেব? যুগা ভরে আমার চিঠিটা কি তুমি ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছ? না, না, দেব, তা কর না। আমার অহুরোধ, তোমার ক্রীন্দোরার অহুরোধ, তোমার পত্রলেখার শেষ ভিক্ষা—চিঠিটা তুমি দয়া করে সবটা পড়, তারপর আমার সম্বন্ধে যা ইচ্ছা তুমি তাই মনে করবে, আমি তো আর বাধা দিতে যাব না। আমি জানি দেব তুমি এই ভাগ্যহীনীর অহুরোধ রক্ষা করবে, কারণ তুমি যে দেব—আমার দেবতা।

এবারে তোমাকে জানাচ্ছি এই অভাগিনীর কাহিনী যা এতদিন সম্বন্ধে লুকিয়ে রেখেছিলাম তোমার কাছ থেকে। পাছে তুমি চিঠি না লেখ, পাছে তোমার বন্ধুত্ব, তোমার অন্তরঙ্গতা, তোমার প্রেমকে হারিয়ে নিঃসঙ্গ জীবন বাপন করতে হয় সেই ভয়েই তোমাকে সব কথা জানাতে পারি নি। প্রতারণা করেছি তোমার সঙ্গে, তোমার জীবনকে বইয়েছি অশ্রু খাতে, হয়ত নষ্ট করেছি তোমার জীবনকে। আমার এ ক্রটির সংশোধন নেই, আমার এ দোষের ক্ষমা নেই, আমার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই—তা আমি জানি দেব। আমি অতি স্বার্থপরের মতন কাজ করেছি—আমি স্বীকার করছি দেব, কিন্তু তোমার প্রতি আমার প্রেম, প্রীতি, ভক্তি, ভালবাসা যে অকৃত্রিম তা তুমি জেনো। তোমাকে আমি প্রাণের চেয়ে অধিক ভালবেসেছি এ কথা তুমি বিশ্বাস কর দেব।...হয়ত তুমি হাসছ, যুগান্তের হাসছ এই কপটচারণী বৃদ্ধার প্রেম বিবেচনে। কিন্তু সত্যি বলছি দেব, তোমাকে প্রেম জানাবার জন্যে এই চিঠি আমি লিখছি না—আমার উদ্দেশ্য সব কিছু আজ পরিষ্কার ভাবে তোমাকে জানিয়ে সংশয় তারাক্রান্ত তোমাকে মুক্ত করা, আর আমার এত দিনের কপটচরণে তারাক্রান্ত মনকে তীর অহুরোধের দহন থেকে মুক্তি দেওয়ার চেষ্টা করা।

এবারে শোন আমার কথা—একবারে গোড়ার থেকেই

বলি। বাপ-মায়ের একমাত্র সন্তান আমি। ছেলে বেলাতেই মাকে হারাই। তারপর বাবার কাছেই মানুষ হই। বাবা কাজ করতেন এক সংবাদ পত্রের অফিসে। তাঁর লেখার হাত ছিল ভাল, মাহিনাও ভালই পেতেন। তিনি আমাকে যথেষ্ট মেহ করতেন এবং আমাকে মানুষ করবার চেষ্টা করতেন। ভাল স্থলে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। পড়া-শোনাতেও অ-মি ভালই ছিলাম। তারপর স্থল ছাড়-বার বয়স হল আমার। স্থলের শেষ পরীক্ষা হয়ে গেল। এক সহপাঠীর সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠেছিল ইতিমধ্যে। মাঝে মাঝে তার সঙ্গে খিমেটারের শো-তে, পিকনিকে, নাচের আসরে যেতাম। একদিন তার রেসিং মোটোরে করে নাচের আসর থেকে বাড়ী কিরছি—রাতের প্যারিসের বৃকের গুণর দিয়ে রেসিং কৌর ছুটে চলেছে উদ্দাম গতিতে, হঠাৎ পাশের এক গলির ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একখানা বড় গাড়ী! আমার সঙ্গী ছেলেটি পারল না দুর্ঘটনা এড়াতে—ঘটল প্রচণ্ড সংঘর্ষ! মাথায় ও পারে দারুণ আঘাত লেগে সজা-হীনা হয়ে পড়লাম—দু'দিন পরে জ্ঞান কিরল হাসপাতালে। ডান পায়ের হাড় ভেঙ্গে গেছে, আর মাথায় প্রচণ্ড আঘাতের ফলস্বরূপ বাকশক্তি লোপ পেয়েছে। সঙ্গী ছেলেটির ঘটনা স্থলেই মৃত্যু হয়েছিল। কয়েকমাস হাসপাতালে থেকে ভাঙ্গা পা জোড়া লাগল বটে, কিন্তু বাকশক্তি আর কিরল না—সেই থেকে হয়ে গেলাম বোবা। যৌবনের প্রারম্ভেই আমার সব আশা আকাঙ্ক্ষাও ঘেন হয়ে গেল বোবার মত স্তব্ধ!

সেই থেকে দেব, আমি একাকি, নিঃসঙ্গ, নিস্তব্ধ! আমার সঙ্গী ছেলেটির ঐ দুর্ঘটনার মৃত্যুর পর থেকে আমার কেমন ঘেন মনে হত আমিই তার মৃত্যুর জন্ত দায়ী এং আর কারও সঙ্গে মিশতে পারতাম না। তাছাড়া বোবা মেয়ের সঙ্গে কেই বা মিশতে আসবে? বাবা যতদিন জীবিত ছিলেন আমাকে ভাল করবার, সুখী করবার আগ্রহ চেষ্টা করেছেন। তাঁর আগ্রহেই আমি বাড়ী বসে বসে জার্মান, ইংরাজী প্রভৃতি কয়েকটি ভাষা শিখা করি। কিন্তু বাবারও বয়স হয়েছিল, আর আমার এই অবস্থা তাঁর মনেও হেনেছিল প্রচণ্ড আঘাত। এক দিন তিনিও চলে গেলেন এই পৃথিবীতে আমাকে একে-বারে একলা রেখে।

বাণী মারা বাবার আগে আমার ভ্রাতৃ বধাধা ব্যবস্থা করে গেছিলেন। তাঁর বহু কষ্টে জমান টাকার স্বপ্ন থেকে এবং বদভাবাচার পিছনের অংশটুকু ভাড়া দিয়ে আমার মতন একটি প্রাণীর একরকম করে চলে যায়। খাওয়া পরা ও বইপড়া ছাড়া আমার আর কোনও বিশেষ খরচও নেই। মাঝে মাঝে জার্মান ও ইংরাজীতে তর্জমা করেও কিছু কিছু আয় হয়।

এই ভাবেই চলছিল আর চলেও যেত হয়ত শেষ পর্যন্ত। কিন্তু বিধাতার বিধানে ঘটে গেল অল্প রকম। একদিন একটি মেয়ে এসে আমার কাছে একটি জার্মান ভাষায় লেখা চিঠির তর্জমা করিয়ে নিতে। তারপর প্রায়ই মেয়েটি আসত শুধু তর্জমা করাতেই নয়—জার্মান ভাষায় চিঠিও লিখিয়ে নিত আমাকে দিয়ে, আর শিখতও আমার কাছ থেকে। যদিও সে আমার থেকে বয়সে অনেক ছোট তবুও সিমোনের সঙ্গে হয়ে গেল বিশেষ বন্ধুত্ব। চিঠি লেখালেখি করত সিমোন একটি জার্মান ছেলের সঙ্গে। ছেলেটি যখন প্যারিসে এসেছিল তখন দু'জনের ভাব হয়েছিল। কিন্তু ছেলেটি করাসীভাষা বুঝত অতি সামান্যই আর সিমোনেরও জার্মান ভাষায় জ্ঞান ছিল ঐ রকমই, কিন্তু তবুও দু'জনার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়েছিল। তারপর কার্ল জার্মানীতে ফিরে গিয়েও সিমোনকে ভুলতে পারে নি—প্রায়ই চিঠি লিখত তাকে ভাড়া ভাড়া করাসী ও জার্মান ভাষায়। করাসী ভাষায় চিঠি দিলে সে বুঝতে পারবে না বলে, সিমোন আমাকে দিয়ে চিঠিগুলি লিখিয়ে নিত জার্মান ভাষায়। চিঠিগুলি লিখতে হত আমাকে সিমোনের কথা শুনে এবং নিজের ভাষায় প্রেরণপত্রাকারে। এই ভাবেই গড়ে উঠেছিল তাদের গভীর ভালবাসা। তারপর একদিন কার্ল-এর কাছ থেকে আহ্বান এসে। সিমোনও সে আহ্বানে সাড়া দিয়ে হামবুর্গ-এ চলে গেল। তাদের বিবাহের সংবাদ দিয়েছিল সিমোন। তারপর আর তাদের কোনও খবর পাই নি। বিবাহিত জীবনে নিশ্চয়ই তারা সুখী হয়েছে।

বাইহোক, সিমোনের এই পত্র-প্রেরণের ঘটনার থেকে আমার মনেও ঐ রকম একটা কিছু করবার বাসনা বেশ বানা বাঁধতে থাকে। সেই সময় আলাপ হল তোমার বন্ধু

অসীম রায়ের সঙ্গে। অসীম প্যারিসে এসে থাকবার আরগী খুজছিল। বিজ্ঞাপন দেখে আমার এখানে এল। আমিও ভারতীয় ছাত্রকে সাহায্যে আহ্বান জানালাম থাকবার জন্য। সুদর্শন, মিষ্টভাবী অসীমকে আমার খুব ভাল লেগেছিল। আমার নিজের কোন ভাই ছিল না। তাকে আমার নিজের ছোট ভায়ের মত মনে হত। তার সঙ্গে মিশে। আমার মনে ভারতীয়দের ওপর, বিশেষ করে বাঙালীদের ওপর বিশেষ প্রীতি ভাব জন্মে ছিল। কথা প্রসঙ্গে একদিন তাকে জানাই তার দেশের কোনও বাঙালী ভ্রাতৃলোক কি আমার সঙ্গে পত্রালাপে রাজী হবে? একটু ভেবে নিয়ে সে তোমার নাম ঠিকানা আমার দিয়েছিল। আর তোমার গুণের, জ্ঞানের ও স্বভাবের উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা করে আমার বলেছিল, আপনি ওর সঙ্গে পত্রালাপ করে আনন্দ পাবেন। কিছুদিন পরে অসীম প্যারিস থেকে চলে যায়। পরে বিমান দুর্ঘটনায় তার শৌচনীয় মৃত্যু সংবাদে স্তম্ভিত হয়ে বাই। আজও অসীমের কথা মনে পড়লে চোখ আমার জলে ভরে ওঠে, দেব। আজও তার স্মৃতিতে তার মৃত্যু দিনে আমি প্রার্থনা করে থাকি।

হ্যাঁ, তারপর যা বলছিলাম, অসীম চলে যাবার পর অনেক ভেবে তোমাকে প্রথম চিঠিটা লিখলাম। তার আগে রোম ও লণ্ডনের দুটি ভ্রাতৃলোকের ঠিকানা পেয়েছিলাম এবং আমার প্রকৃত পরিচয়, বয়স, অবস্থা সব খোলাখুলি ভাবে জানিয়ে, তাঁদের পত্র-বন্ধু হবার ইচ্ছা প্রকাশ করে চিঠি দিয়েছিলাম। লণ্ডনের ভ্রাতৃলোক দু'খ প্রকাশ করে জানিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর পক্ষে আমার পত্র-বন্ধু হওয়া সম্ভব হবে না। আর রোমের ভ্রাতৃলোকের কাছ থেকে কোনও উত্তর আজ পর্যন্ত পাই নি। পাছে তোমার কাছ থেকেও প্রত্যাখ্যাত হই তাই ভেবেচিন্তে প্রভাষণের আশ্রয় নেওয়াই ঠিক করলাম। কিন্তু সত্যি বলছি দেব, ভগবানের নামে শপথ করে বলছি তোমার ক্ষতি করবার, তোমাকে দুঃখ দেবার, তোমাকে হতাশ করবার ইচ্ছা—তোমার সামান্যতম কোণের কারণ হবার অভিপ্রায় আমার একেবারেই ছিল না। যখন তুমি আমার কোটো চেয়ে পাঠিয়েছ তখনও প্রভাষণ করেছি। আমি জানতাম আমার সভ্যকার কোটোগ্রাফ দেখলে তুমি হয়ত আর

আমার সঙ্গে পত্রালাপ করবে না। তাই তোমার কাছে পাঠালাম কার ফোটা জান? সিমোনের! সিমোন লতাই হুন্দরী। ওরকম সৌন্দর্য সচরাচর দেখা যায় না। এখান থেকে বাবার আগে সিমোন আমার প্রতি তার প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ তার একটা ফোটা আধাকে উপহার দিয়েছিল। সেই ফোটাটাই আমি তোমার কাছে পাঠিয়েছিলাম। যার ফোটা দেখে তুমি ভুলেছিলে, যার মানস-মুষ্টির ধ্যানে ভুগ্ন হয়েছিলে, সে আমি নই দেব, সে সিমোন—যে তোমাকে চেনে না, যাকে তুমিও জান না! আর যার লেখা পড়ে তোমার ভাল লেগেছে সে হচ্ছে এই অকাল বৃদ্ধ, কুসঙ্গী পোড়া ফ্রান্সোয়া, তোমার ‘পত্রলেখা’!

সবই তোমায় আজ পরিত্যক্ত করে জানালাম দেব—জানালাম হতভাগিনী ফ্রান্সোয়ার বার্থ জীবনকাহিনী। তোমাকে আর বসিয়ে রাখব না। আমি বুঝতে পারছি তুমি অধৈর্য হয়ে উঠেছ—সংশয় দোলায় ভুলছে তোমার মন, তোমাকে আর কষ্ট দেওয়া ঠিক নয়; কিন্তু তোমাকে যেতে দিতেও ইচ্ছে করছে না, কারণ আমি জানি তোমাতে আমাতে আর দেখা হবে না—প্রথম ও শেষ দেখা আমাদের হয়ে গেছে। কিন্তু আমি এ রকম চাই নি, স্বার্থপরের মতন চেয়ে ছিলাম তুমি যেন কখনও এখানে না আস—তোমার সামনে যেন আমাকে দাঁড়াতে না হয়। তাই কোনদিন আমি তোমাকে এখানে অসতে উৎসাহিত করি নি। প্যারিস সম্বন্ধে তোমার সমস্ত কৌতুহল মিটিয়ে এসেছি ছবি পাঠিয়ে, বিষদ বর্ণনা দিয়ে। আর তোমার মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে যে আমিই তোমার দেশে যাব, তোমাকে আসতে হবে না। কিন্তু তোমাকে কি আটকে রাখতে পারলাম? সেই তুমি এলে, আমাকে দেখলে, আমার সব কিছুই জানলে! আমার দুর্ভাগা আবার আমাকে মর্মান্তিক আঘাত হানল! তবে আমারও কি কিছু লাভ হয় নি? হচ্ছে বই কি। তোমাকে দেখেছি আমি দু’চোখ ভরে। ছবি দেখে তোমার সম্বন্ধে যা ধারণা ছিল তার চেয়ে তুমি অনেক হুন্দর, অনেক কান্তিময়। তোমাকে দেখে দেখে আমার আশা মিটছিল না, কিন্তু প্রত্যাহারের মন নিয়ে তোমার সামনে আর বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারি নি, তোমার সামনে বাবার সাহসও আমার আর নেই।

কিন্তু আর নয়। এবারে আমি শেষ করছি আমার শেষ পত্র—শেষবারের মতন তোমাকে আমার স্নেহ, প্রীতি, প্রেম জানিয়ে।

বিদায় প্রিয়তম বন্ধু, বিদায়—

ইতি,

তোমার

অভাগিনী “পত্রলেখা”।

চিঠি পড়া শেষ হয়ে যার—নিশ্চয় বাহুদেব বলে থাকে প্রস্তর মূর্তির মত। মস্তক যেন তার ঝাঁক হয়ে গেছে, চিত্তা-শক্তি যেন তার লোপ পেয়েছে! হঠাৎ দরজার করাঘাতের শব্দে তার সম্বিং ফিরে আসে। অবশ দেহটাকে কোনও রকমে তুলে এনে দরজা খুলে দেয়। অপেক্ষমানা পুষ্টি-চারিকা জানার ডিনারের সময় প্রায় শেষ হতে চলেছে, মশিনে এখন খেতে যাবেন কি? স্বপ্নোন্মিতবৎ বাহুদেব বলে রাহে সে কিছুই থাকে না। বিম্বিত পরিচারিকা তার রক্তলেশশূন্য ফাঁকশে মুখের দিকে চেয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে জানতে চায়, মশিনের কি শরীর খারাপ হয়েছে? সামলে নিয়ে বাহুদেব বলে সে বাইরে থেয়ে এসেছে—এখন আর তার ক্ষুধা নেই। পরিচারিকা চলে যায়। বাহুদেব আবার দরজা বন্ধ করে এসে চেয়ারে বসে পড়ে। চিঠিটা নিয়ে নাড়াচাড়া করে খানিকক্ষণ। বড্ড গরম মনে হয়। সামনের ভিনিসিয়ান উইণ্ডোটা খুলে দেয়—চোখের সামনে জেগে ওঠে রাতের প্যারিসের আলোকমালা। সারাদিনের কর্তব্যক্রান্তি ঝেড়ে ফেলে হুন্দরী প্যারিস যেন আলোকে, গন্ধে, পুষ্পে, বসনে সজ্জিত হয়ে জেগে উঠেছে। নিশ্চল মূর্তির মতন খোলা জানালায় ধারে দাঁড়িয়ে থাকে বাহুদেব—নিম্নমুখে নেয়ে আকাশের গায়ে পেপে থাকে আইকেল টাওয়ারের আলোর দিকে চেয়ে থাকে, আর হাতের মুঠিতে তার দরজা থাকে পত্রলেখার শেষ পত্র।

হঠাৎ যেন তার চৈতন্যোদয় হয়। বরষা মধো পার্শ্চাত্যী করে অস্তির পূর্বে, তারপর মনস্তির করে তুলে নেয় কোনোর রিসিভার। রিসেপশন কাউন্টারে জানায় সে কালকেই প্যারিস ত্যাগ করতে চায়। তারতগামী কোনও প্লেনে যেন তার যাবার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। আবার এসে দাঁড়ায় জানালায় ধারে। প্রান্তরে দেখে রাতের প্যারিসকে—তার স্বপ্ন-নগরী প্যারিস ক, তার কল্পনা-হুন্দরী পত্রলেখার প্যারিসকে।

একটু পরেই বেছে ওঠে ফোনের ঘণ্টা। হোটেলের রিসেপশন কাউন্টার থেকে তাকে জানিয়ে দেয় আগামী কাল সকালের বোম্বাটগামী প্লেনে তার যাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ধন্যবাদ জানিয়ে এবং তার বিল ঠিক করে রাখতে বলে বাহুদেব রিসিভার রেখে দেয়।

চেয়ারটা টেনে নিয়ে এসে জানালায় ধারে বলে বাহুদেব। তারকাখচিত আকাশের আর আলোকেভূষিত পথের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে তার মনে খেলতে থাকে চিন্তার লহরী। অদেখা, অচেনা সিমোনের অনিন্দ্যহুন্দর মুখশ্রীর পাশে ভেসে ওঠে ফ্রান্সোয়ার বার্ককো জীর্ণ, বলীবেখাক্তি হুল মুখচ্ছবি। তার সাথে মনে পড়ে যার ফ্রান্সোয়ার লেখা অগণিত অপরূপ চিঠিগুলির কথা। তার

লালিত্যে, ভাবের মাধুর্য্যে, প্রেমের প্রকাশে, মেহের আভি-
শ্যে, মনের আবেগে, হৃদয়ের উত্তাপে ভরপুর সেই সব
অতুলনীয় পত্রাবলীর কথা মনে পড়ে যায় বাহুদেবের। প্রস্ন
জাগে তার মনে, কাকে সে ভালবেসেছে? সিমোনের
ছবিকে, না ক্রাসোয়ার পত্রাবলীকে? ভেবে পায় না
বাহুদেব। কিন্তু মনস্ত্রিয় সে করে ফেলেছে। প্যারিসে
আর সে থাকতে পারবে না। হেঁকে গেছে তার স্বপ্নের
ঘোর, কেটে গেছে তার বীণার তার।—তার দীর্ঘদিনের
স্বপ্ন হল না সম্ভব, অসম্ভবত বাহুদেব তাই পালাতে চায়
এখান থেকে—প্যারিস থেকে, ইউরোপ থেকে, এখান
থেকে বহুদূরে তার নিজের ঘরে সে গিয়ে নিঃশ্বাস ফেলতে
চায়।

* * * * *

ধীরে ধীরে ফুটে ওঠে ভোরের আলো। ছাওয়ার
মত দাঁড়িয়ে থাকা আইফেল টাওয়ার আলোর পরশে



দেখতে পায় না দূরে দাঁড়িয়ে থাকা মহিলাটিকে

স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয় তার লোহ শরীর নিয়ে। উৎসব
শেবে ক্রান্ত নর্তকীর মত রাত্রের প্যারিসও যেন ঝিমিয়ে
পড়ে উষার আগমনে। অনিত্রা ক্রান্ত বাহুদেবও চেয়ার
ছেড়ে উঠে পড়ে। মূখ হাত ধরে স্ট্রোকেশটা ঠিক করে

নেয়। আর ক্রাসোয়ার চিঠিটা সন্মুখে ডাক করে থামে
ভরে পকেটে রাখে। তারপর ধীরে ধীরে নীচে নেমে এসে
বসে ব্রেকফাস্ট টেবিলে। ব্রেকফাস্ট শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে
ওয়েটার আনার ট্যাক্সি অপেক্ষা করছে তাকে এয়ারপোর্টে
নিরে বাবার জন্তে। হোটেলের বিল ও বক্শিসের পুরু
মিটিয়ে, বিদায় সন্ধ্যাণ জানিয়ে স্ট্রোকেশ ও এয়ারবাগ
হাতে অপেক্ষমান ট্যাক্সিতে এসে ওঠে বাহুদেব। কিন্তু
তার চোখ পড়ে না রাস্তার ওপারে ল্যাম্পপোস্টের আড়ালে
লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মহিলা মূর্তিটির দিকে।
ট্যাক্সি ছুটে চলে বিমান বন্দরের পথে।

এয়ারপোর্টে এসে পাসপোর্ট ইত্যাদির ব্যাপার চুকিয়ে
কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় বাহুদেবকে। তারপর ডাক
পড়ে প্লেনে ওঠবার। অত্যাশ্চর্য্য ব্যক্তির সঙ্গে অপেক্ষমান
বিমানের সিঁড়ির কাছে এসে পৌঁছায় বাহুদেব, তারপর
একবার শেষবারের মত পিছনের দিকে তাকিয়ে মনে

মনে প্যারিসকে বিদায় জানিয়ে
উঠে যায় প্লেনের মধ্যে, বসে গিয়ে
জানালার ধারের একটি আসনে।
বন্ধ হয় প্লেনের দরজা, সিঁড়ি যায়
সরে। একটু পরেই স্থতীত্র শিব-
শব্দে গর্জন করে ওঠে জেট চালিত
ইঞ্জিন।

আকাশে জমছে মেঘ, বাহু-
দেবের মনেও। জানলার ধারে
ভারাক্রান্ত মনে উদ্গত অশ্রুকে
যেন রোধ করবার জন্তে মুখে হাত
চেপে বসে থাকে বাহুদেব। কিন্তু
সে দেখতে পায় না দূরে দাঁড়িয়ে
থাকা সেই মহিলাটিকে—তার
পত্রলেখাকে। গর্জন করে লাফিয়ে
উঠে প্লেন আকাশের গায়ে, সান্দ্র-
নয়নে উর্দ্ধ দিকে চেয়ে থাকে
ক্রাসোয়া—এক হাতে বুক চেপে
ধরা আছে তার নীল শাড়ী প্যাকেট

আর অর্ধশত গোলাপ গুচ্ছ।

জানলার কাঁচের ওপর জমছে একটি ছুঁটি করে বুড়ির
কোঁটা, আর জলভরা চোখে সেই দিকে চেয়ে নিখর হয়ে
বসে থাকে বাহুদেব বহুবার।

পাট ও পাঁচ

শ্রী 'শ'—

॥ চলচ্চিত্রের চাহিদা ॥

ভারতে নিয়মিতভাবে চলচ্চিত্র নির্মাণ আরম্ভ হয়েছে পচিশ বৎসরেরও আগে। সুদীর্ঘ এই কালের মধ্যে ভারতীয় চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীও শিল্পীরা নিষ্ঠাভরে ভারতীয় চলচ্চিত্রের উন্নতির জন্য চেষ্টা করে এসেছেন। এতদিনে তাঁদের সে ঐকান্তিক চেষ্টার, নিষ্ঠার, অধ্যবসায়ের ফল ফলছে। বাংলা চিত্র আজ বিশ্বময় খ্যাতি ও সম্মান লাভ করছে। বোম্বাই-এর হিন্দী চিত্রও কলকাতার দিক থেকে প্রায় পান্চাত্য চিত্রের সমতুল্য হতে চলেছে।

ভারতীয় চিত্রের এই উন্নতির জন্য বিদেশে ভারতীয় চিত্রের রপ্তানিও বেড়ে গেছে। সেই সঙ্গে বিদেশে ভারতীয় ছবি রপ্তানির আরও যে নির্ভরযোগ্যভাবে বেড়ে চলেছে সরকারী পরিসংখ্যানে সেই তথ্যটিও উল্লেখ্য হইবে।

১৯৬৪ সালের প্রথম তিন মাসে সর্বাধিক চিত্র রপ্তানি করা হয় এবং তা থেকে উপার্জিত হয় ৭৪ লক্ষ টাকা। গত বছর ঠিক একই সময়ে এই আয়ের পরিমাণ ছিল মাত্র ২৯ লক্ষ টাকা।

চলচ্চিত্র রপ্তানির আয় ১৯৬১-৬২ সালে ১৪৯ লক্ষ টাকা থেকে ১৯৬৩-৬৪ সালে ২১২ লক্ষ টাকায় উঠেছে। ভারতীয় চিত্রের রপ্তানির সকল কেন্দ্রেই এই উন্নতি পরিলক্ষিত হয়।

ভারতীয় চিত্রের এই উন্নতির দিনে ভারতীয় চিত্র-শিল্পের সেই পূর্বসূরীদেরই স্মরণ করা উচিত, যারা শত ঐতিহ্যবাহী মধ্যে—বিষয়, বিশদ, বিশুদ্ধতাকে উপেক্ষা করে চিত্র-শিল্পের সাধনায় প্রাণপাত পরিশ্রম করে গেছেন—এই শিল্পের সেবার জীবন উৎসর্গ করেছেন। তাঁদের সাধনা-

লক্ষ ঐকান্তিক চেষ্টার ফলই আজ আমরা ভোগ করছি! তাঁদের মধ্যে অনেকেই হয়ত আজ আর ইহ-ভগতে নেই। সেই অমর আত্মাদেরই আজ আমরা শ্রদ্ধাশ্রুত চিত্তে স্মরণ করছি।

* * *

অবসান—অবসান ৪

চলচ্চিত্র প্রযোজক সংস্থাসমূহের আন্তর্জাতিক ফেডারেশন ভারতের তৃতীয় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবটিকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। আগামী জাহ্নবীর মাসে নয়াদিল্লীতে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। পরে ২২শে থেকে ২৮শে জাহ্নবীর পর্যন্ত কলিকাতায় এই চলচ্চিত্র সপ্তাহ পালিত হবে।

উৎসবে চলচ্চিত্র প্রেরণের জন্য ৭০টি দেশকে আহ্বান জানান হয়েছে। অংশ গ্রহণকারী দেশগুলি একটি করে কাহিনী চিত্র ও একটি করে খণ্ড চিত্র পাঠাতে আরো ছবিগুলি ১৯৬০ সালের ১লা জাহ্নবীর পর নির্মিত হওয়া উচিত।

প্রতিযোগিতামূলক এই উৎসবে অ-প্রতিযোগিতা প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করা হবে। তা ছাড়া এই সময় একটি আলোচনা চক্রেরও আয়োজন করা হবে বলে জানা গেছে।

* * *

টোকিওতে ২৯শে সেপ্টেম্বর থেকে ২রা অক্টোবর পর্যন্ত যে আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে তাতে ভারতও অংশ গ্রহণ করছে।

এই চলচ্চিত্র উৎসবে ভারতীয় ছবি-হিসেবে প্রদর্শনীর জন্য নির্বাচিত হয়েছে ভারতের তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয়ের 'কিনাস ভিভিসন' কর্তৃক নির্মিত প্রামাণ্য ছবি 'মালওয়া'।

* * *

সম্প্রতি লণ্ডনে সভ্যজিৎ রায়ের 'দেবী' চিত্রটি প্রদর্শিত হয়েছে এবং শীর্ষস্থানীয় ব্রিটিশ চিত্রদর্শনালোচকগণ এই ছবিটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসাও করেছেন।

'ডেইলী টেলিগ্রাফ'এর চিত্র-সমালোচক প্যাট্রিক

দেখাচ্ছে। বিজ্ঞান—এই দিনের মধ্যে তির হৃদয়ের অস্তর ভর করেছেন।



গিবস্ লিখেছেন, সত্যজিৎ রায়ের প্রতিটি ছবি আত্ম-
চিহ্নিত এবং 'দেবী' তার ব্যক্তিক্রম নয়।

মি: গিবস্ আরও লিখেছেন, সত্যজিৎ রায়ের বিশেষত্ব

এই যে, তিনিই একমাত্র পরিচালক, ইয়োহোনে ধার ছবি
নিয়মিতভাবে প্রদর্শিত হয়।

'দি গভিয়ান্স'এর সমালোচক আয়ান্ রাইই সত্যজিৎ



শ্রীমতী শ্রীমতী—বাংলা ও বোম্বের চিত্র জগতের সর্জনন স্বেচ্ছা।

দায়ের 'দেবী'কে চলচ্চিত্রে এক আশ্চর্য সাহিত্যরূপে মনস্তাত্ত্বিক গভীরতায় এবং অস্বাভাবিক দিক থেকে আখ্যাত করেছেন।

শ্রীমতীর ছবিগুলিতে একটি সার্বজনীন আবেদন আছে, যেটি রবিন্সন ক্রিস্টিয়ান্স টাইমস'এ লিখেছেন : অথচ তাতে ও তদীতে তাঁর ছবি সম্পূর্ণভাবে ভারতীয়।

“ইন্ডিনিং ট্যাণ্ড” পত্রিকাটিতেও ‘দেবী’ ছবিটির উচ্চ প্রশংসা করা হয়।

* * *



কলিকাতার সিটি ব্যাঙ্ক ক্লাবের একটি বিচিত্রানুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করছেন প্রথাতা কোয়েষাটুর ভগিনীদ্বয় হেমা ও গীতার ছাত্রী কুমারী গীতা গোপালকৃষ্ণন। সঙ্গীত পরিবেশনরত কোয়েষাটুর ভগিনীদ্বয়কেও দেখা যাচ্ছে।

* * * * *

আপানের চলচ্চিত্র শিল্পে মন্দা চলছে। এই মন্দা বছরে আপানে সিনেমা দর্শকের সংখ্যা শতকরা ৫০ ভাগ হ্রাস পেয়েছে বলে এক আমেরিকান সার্ভে রিপোর্টে প্রতিপন্ন হয়েছে।

এই সার্ভে রিপোর্টে প্রকাশ, ১৯৬০ সালে আপানে সিনেমা দর্শকের সংখ্যা ছিল ১০,০০০,০০০; কিন্তু গত মন্দা বছরে আপানে সিনেমা-দর্শকের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫,১১,০০০।

আপানের চলচ্চিত্র শিল্পকে ক্রমশঃ ক্রমশঃ জানা গেছে যে আপানের চলচ্চিত্র শিল্পের বর্তমানে বড় দুর্দিন চলছে এবং এর প্রধান কারণ হলো টেলিভিশন।

আপানে বর্তমানে চলচ্চিত্র শিল্পের এমন দুর্দবস্থা চলছে যে কয়েকটি ফিল্ম কোম্পানী টেলিভিশন-ছবি প্রযোজনা শুরু করেছে, আর কোনও কোনও কোম্পানী হোটেল বা অন্যান্য ব্যবসা খুলছে।

আমেরিকান সার্ভে রিপোর্টে আরও প্রকাশ, হলিউডেও কিছুকাল আগে চলচ্চিত্র শিল্পে ঠিক এই রকম সমস্যা দেখা দিয়েছিল; কিন্তু বর্তমানে হলিউড পুনরায় প্রায় সেই আগের মতই অবস্থায় ফিরে এসেছে।



হাওড়ার “নৃত্যম” সংস্থার একটি অনুষ্ঠানে নৃত্যরতা হু’জন শিওশিল্লী।



‘নৃত্যম’-এর সদস্যগণ পণ্ডিত নেহরুর স্বত্বতে মৌনভাষা পালন করছেন।

কর্তা : রবীন্দ্রনাথ

রঙ্গীন চিত্রের সেক্সারের ব্যাপারে বোঝাইতে এক নতুন পদ্ধতির প্রবর্তন করা হয়েছে। এই পদ্ধতি অল্পসংখ্যক ছবির দৃশ্যগুলি প্রথমে সেক্সারের অল্প পেশ করতে হবে এবং সে-গুলো অল্পমোদন পেলে তবেই গানের চিত্রায়ণ করা চলবে।

সেই কারণে স্ববোধ মুখার্জির ইস্টম্যান কলারের ‘এপ্রিল ফুল’ ছবিটি সেক্সারের নিকট প্রেরিত হয়েছে। এর দুটি গানের চলচ্চিত্রায়ণ এখনও বাকি আছে।

ছবিটির গানে স্বর দিয়েছেন শঙ্কর জয়কিষণ এবং প্রধান দুটি চরিত্রে অভিনয় করেছেন বিশ্বজিৎ ও সায়াবা বাহু। আগামী অক্টোবর মাসে ছবিটি মুক্তিলাভ করবে।

* * *



পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার স্পীকার শ্রীকেশবচন্দ্র বসু কিছুদিন পূর্বে যখন লণ্ডনের বুন্স হাউস-এ ‘বি-বি-সি’-র ষ্টুডিওতে গমন করেছিলেন তখন ‘বি-বি-সি’-র বাংলা অঞ্চল “বিচিত্রা”-র প্রযোজক শ্রীবিনয় রায় শ্রীবাসুহ সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারে অংশ গ্রহণ করেন। চিত্রে শ্রীবিনয় রায় (বামে) ও শ্রীকেশবচন্দ্র বসুকে দেখা যাচ্ছে।

বোম্বাইয়ের অভিনেতা-পরিচালক সুনীল দত্ত এবারে একথানি নতুন ধরণের ছবি তৈরীর কাজে হাত দিয়েছেন।

চিত্রটির কাহিনী রচনা করেছেন শ্রীমতী নাগিস, সুনীল দত্ত। ছবিটি তৈরী হবে মাত্র একটি ‘সেট’এ এবং চরিত্রও থাকবে মাত্র একটি। সুনীল দত্ত স্বয়ং এই চরিত্রে অভিনয় করেছেন। অত্যাশ্চর্য চরিত্রগুলি শুধু নেপথ্য কণ্ঠস্বরেই বোকা বাবে। সারা ছবিতে মাত্র দুটি গান থাকবে। আর ছবিটি পরিচালনা করবেন সুনীল দত্ত নিজে।

* * *

গতবছরের বহু জনপ্রিয় বাংলা চিত্র ‘উত্তর কান্দনীর’কে হিন্দীতে রূপায়ণের আয়োজন চলছে। প্রধান দুটি পুরুষ চরিত্রে অশোককুমার ও ধর্মেন্দ্র অভিনয় করবেন। মা ও মেয়ের বৈভব-ভূমিকায় সূচিত্রা সেনই রূপ দেবেন। পরিচালনা করবেন অসিত সেন এবং স্বর রচনার দায়িত্ব রোশনের।

* * *

উত্তমকুমার ফিল্মস-এর পরবর্তী চিত্র “গৃহদাহ”-র সূটিং শুরু হচ্ছে আগামী নভেম্বর মাসে। প্রধান তিনটি চরিত্রে অবতীর্ণ হবেন উত্তমকুমার, সূচিত্রা সেন ও নৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।

শরৎচন্দ্রের এই বহুপঠিত উপন্যাসটিকে প্রথম চলচ্চিত্রে রূপায়িত করেন নিউ থিয়েটার্স। তখন এর পরিচালনার দায়িত্বে ও প্রধান চরিত্রে ছিলেন প্রমথেশ বড়ুয়া।

* * *

ইউনাইটেড সিনে প্রডিউসার্সের প্রথম প্রয়াস ‘ধানা থেকে আসছি’ চিত্রটির কাহিনী বিদেশী কাহিনীর ছায়া নিয়ে রচিত। নাটকের প্রধান চরিত্র এক পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর। এই ভূমিকায় উত্তমকুমার রূপ দিচ্ছেন আর অত্যাশ্চর্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন মাধবী মুখোপাধ্যায়, ছায়া দেবী, কমল মিত্র, দিলীপ মুখোপাধ্যায়, অঞ্জনা ভৌমিক, জহর রায় প্রভৃতি।

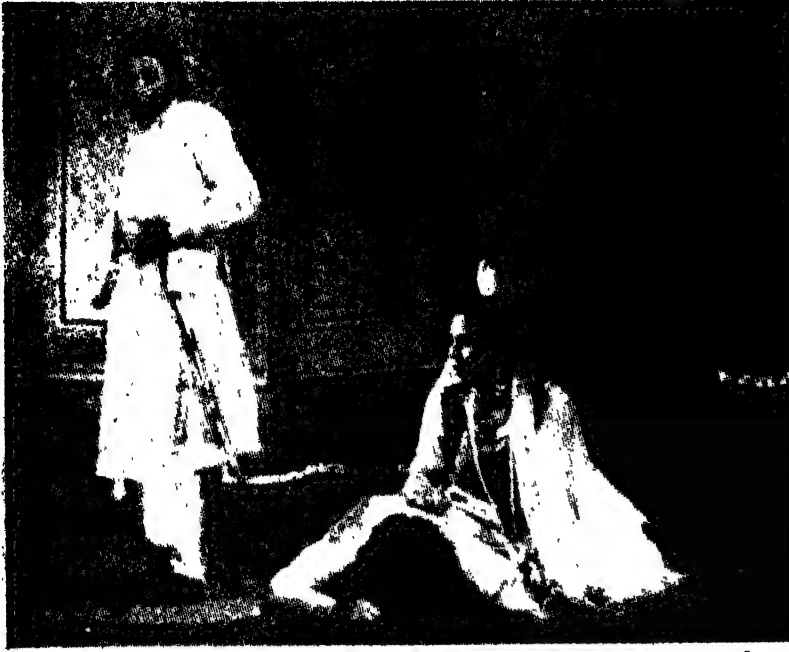
* * *

হেমন গুপ্তর পরবর্তী ছবিটির নাম হচ্ছে ‘অনামিকা’। অক্টোবরের প্রথমই এর সূটিং শুরু হবে। ছবির মুখ্য দুই শিল্পী হলেন অনিল চট্টোপাধ্যায় ও মাধবী মুখোপাধ্যায়। অত্যাশ্চর্য বিশেষ ভূমিকায় থাকবেন রত্না গুপ্তা, পৃথ্বরাজ কাপুর ও গীতাবতী। হেমন্তকুমার ছবিটিতে স্বরারোপ করবেন।

* * *

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং আরও এগারো জন লেখকের লেখা ‘রসচক্র’ উপন্যাস অবলম্বনে “জয়া” নামের একটি ছবি তৈরী হচ্ছে। পরিচালনা করছেন চিত্ত বসু।

সঙ্কায়ণী, সার্বিজী চ্যাটার্জি, মলিনা দেবী, লিলি চক্রবর্তী, অনিল চ্যাটার্জি, পাহাড়ী সাত্তাল, তরুণকুমার এবং অমলকুমারকে এর বিভিন্ন চরিত্রে দেখা যাবে।



শ্রী অমল সরকার রচিত
ও রঙমহলে অভিনীত
ঐতিহাসিক নাটক “মসনদে
মোগল”-এর একটি দৃশ্যে
শ্রীজীবন গোস্বামী ও শ্রীমতী
গীতা দেকেকে দেখা যাচ্ছে।

কাপুরুষ ও মহাপুরুষ এবং সত্যজিৎ রায়

শৈলেশ মুখোপাধ্যায়

কাপুরুষ সে নিশ্চয়ই। অসহায় নারীর অশ্রু তাকে
জাগাতে পারিনি। নির্বাক বিশ্বয় স্থাপুর মত দাঁড়িয়ে
থাকে—দেহমন বৃষ্টি দুর্বলতায় আচ্ছন্ন। ভবিষ্যতের স্বপ্ন
সৌধ বিলীন হয়ে যাচ্ছে—বার্থতায় ভরে উঠছে
প্রেমভিত্তির তবুও কোন চাকলা নেই—নেই পুরুষের
দীপ্ত কর্ণের প্রতিবাদ।

বাইরে বৃষ্টিঝরা রাত্রি আর ভিতরে বক্ষলগ্না প্রেমসী
—অশ্রুসিক্তা করুণা। তথাপি অমিতাভ মুক্ত—পৌরুষ
তাকে বিদায় জানিয়েছে। করুণা ছুটে এসেছে আসন্ন-
বিচ্ছেদের বার্তা নিয়ে। করুণার মাথা উভয়ের প্রেমাত্মরূপ
সহ করতে পারেননি তাই তিনি বদলী হবার আজুহাতে
করুণাকে নিয়ে বাইরে চলে যাবার সব ব্যবস্থা ঠিক করে
ফেলেছেন।

করুণা মামাকে অস্বীকার করতে চায়। আর্টস্কুল

ছেড়ে দিয়ে চাকুরী করবে,—স্বাধীন হবে। শুধু অমিতাভ
তার পাশে থাকলে আর কোন চিন্তা নেই কিছু ভাবতে
হবে না। করুণা বিহ্বলী হুল্লরী। বি, এ পাশ করে
আর্টস্কুলে পড়ছে। অমিতাভ সবল—হুল্লর ঘুবক, উচ্চতর
অর্থনীতির ছাত্র। কলেজজীবনের পারস্পরিক ভাব-
বিনিময় উভয়ের মাঝে যে পূর্বরূপ সৃষ্টি করেছিলো—
কল্পনার রঙীন আকাশে যে ইঙ্গিত রচিত হয়েছিলো—আজ
বাস্তবের রূঢ় আঘাতে সব কিছু ভেঙে যাবে। বার্থ
হবে জীবন সাধনা। করুণা তাই স্থির সঙ্কল্প গ্রহণ করেছে।
চাকুরী নেবে—পরাজয়ভার হবে অবগান। কিন্তু
অমিতাভ যেন দ্বিধাগ্রস্ত। চোখের সামনে বৃষ্টি কুয়াসার
ঘন আবরণ। কি করে সম্ভব হবে? রঙীন আকাশে
কালবৈশাখীর রক্ত তাণ্ডব দেখা দেবে। না—না এ হতে
পারেনা। মমতাহীন সংসার তাড়ের কমা করবেনা।



আর, ডি, বানশাল প্রযোজিত ও সত্যজিৎ রায় পরিচালিত কাপুরুষ ও মহাপুরুষ চিত্রের কাপুরুষ চিত্রাংশে
মাত্রাবী মুখোপাধ্যায় ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।

বাস্তবের কঠোরতা চূর্ণ করে দেবে তাদের স্বপ্ন ও সাধনা—করুণাকে অমিতাভ বুঝাতে চায় জলধারা নেমে আসে করুণার চোখে। অমিতাভকে সে বোঝাতে চায়—হৃদয় হয়তো সাময়িক অস্থবিধা দেখা দেবে কিন্তু পরম আনন্দে সে তা সহ্য করবে। তাইতো আজ এসেছে অমিতাভর কাছে তার আত্মপ্রতিষ্ঠার দাবী নিয়ে, পার্থিব মিলনের মাঝে অপার্থিব প্রেমের পূর্ণ মর্বাদা দিতে। শিশুর মত কঁদে ওঠে করুণা। অমিতাভ তাকে আরও কাছে টেনে নেয়। প্রিয়তমা নারীর অশ্রু ঘোছাতে বয়ে পুরুষের চোখেও জলধারা নেমে আসে অমিতাভও বুঝি কাপুরুষের মত বিচলিত হয়ে ওঠে।

উপরতলার তিনকোণা ঘরখানিতে চলছিলো এই মর্মস্পর্শী নাটকের অভিনয়। অপরিহার্য হলেও ঘরখানিতে যুবক অমিতাভর ব্যক্তিগত জীবনগুলি ইতস্ততঃ

সাজানো রয়েছে। অর্থনীতির দই খাতা পেন্সিল টেবিলের উপর খোঁচা পাচ্ছিলো। এ্যাসটে-তে অর্ধদশম অনেকগুলো মিগারেট তরুণপুুষের অদ্বিতীয় শখার উপর দাবাখেলার সরঞ্জাম। ঘরের মাঝে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিল অমিতাভর আঁকা ছবি। নিভৃত অন্তরে যে পুরুষ আশ্রয় পেয়েছে—দরদী শিল্পী তার নিপুণ তুলিতে এনেছে তার জীবন্ত প্রতিকৃতি। ছবির উপর ‘কে’ অক্ষরটি ইংরেজীতে লেখা রয়েছে।

বিচিত্র পরিবেশের এ কাহিনীর উৎস সত্যজিৎ রায় পরিচালিত “কাপুরুষ ও মহাপুরুষ” চিত্রের “কাপুরুষ” চিত্রাংশের প্রযোজনা করছেন প্রখ্যাত চিত্র-প্রযোজক আর, ডি, বানশাল। কথা সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত ‘জনৈক কাপুরুষের কাহিনী’ অবলম্বনে নিমিত্ত হচ্ছে—‘কাপুরুষ’। চিত্রনাট্য রচনা করছেন পরিচালক সত্যজিৎ রায়।

করণ ও অমিতান্ত রূপে আত্ম প্রকাশ করবেন মাধবী
সুখোপাধায় ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। নিউ থিয়েটার’
দ্ব’নব্ব্ব টুডিওতে সেদিন স্থটিং হচ্ছিল। শিল্পীদের স্থটি
অভিনয় সত্যজিৎ বাবুকে আনন্দ দিয়েছে কারণ তাঁর মুখে
দেখলাম পরিতৃপ্তির চিহ্ন। সেদিনের চিত্রগ্রহণ দেখতে
এসেছিলেন আর, ডি. বি. সর্বাধিকার বিমল দে। কর্মব্যস্ত
মাছুষটি রবিবারের অবকাশকেও প্রশ্রয় দেন নি—একান্ত
মনে চিত্রগ্রহণ দেখছিলেন।

স্রষ্টা সত্যজিৎ‌র নবতম স্থটি “কাপুরুষ ও মহাপুরুষ।”
ছটো পৃথক্ গল্পের সমন্বয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র নির্মিত হবে।
‘মহাপুরুষ’ চিত্রাংশ গড়ে উঠবে পরশুরাম (রাজশেখর
বসু) রচিত ‘বিরিক্‌বাবা’ কাহিনীকে কেন্দ্র করে।

চিত্রগ্রহণ সময়ে সত্যজিৎ‌ রায় যেন রহস্যলোকে চলে
যান। নিজের তন্ময়তা অন্তরেও প্রভাবিত করে, শিল্পী
ও কলা কুশলীরাও যেতে উঠেন কাজের ইন্সাদনায় ধান।
গভীর পরিচালকের স্বজনীশক্তি ব্যক্তিস্বাচ্ছন্দ্য ভুলে যায়।
স্থটি করে মহৎশিল্প কর্ম। সত্যজিৎ‌ সত্যজিৎ‌ রায়
মহাসত্যের সাধনায় আত্মমগ্ন থাকেন। বিরতির সময়ে
শিল্পী ও কলা কুশলীরা যখন আহাৰ্য গ্রহণ করে সাময়িক
অবকাশ আনন্দে যেতে ওঠেন, পরিচালক সত্যজিৎ‌ রায়
সেটে বসেই সামান্য আহাৰ গ্রহণ করেন। এবং একান্ত
মনে পরবর্তী ‘শট’ এর পরিকল্পনা করেন। কাজের সময়
তিনি ছয়ত সামান্যতম বিশ্রাম গ্রহণ করতে রাজী নন।
এ তাঁর প্রাত্যহিক অভ্যাস। বহুদিন বিভিন্ন সেটে
তাঁকে দেখছি অথচ এ অভ্যাসের কখনও ব্যতিক্রম
দেখিনি। ব্যক্তিগত আহাৰ্য সম্পর্কে তিনি উদাসীন কারণ
কয়েক টুকরো ‘স্নাউউইচ’ তাঁর প্রধান খাদ্য। তাও ঐ
সময় সেটে অন্ত কেউ উপস্থিত থাকলে তিনি ভাগ করে

থেতে চান। সেদিন আমি খুবই বিব্রত বোধ করছিলাম।
বিরতির সময়ে আলোচ্য মেস ঘরের বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ
করছিলাম, তিনি আমার তাঁর আহাৰ্যের অংশ গ্রহণ করতে
আহ্বান জানালেন। চমকে উঠলাম—তাঁকে উপেক্ষা
করবার ধৃষ্টতা আমার নেই অথচ এই কর্মকান্ত পুরুষসিংহের
ঐ সামান্য আহাৰ্যের অংশ গ্রহণ করতে আমার বিবেক
কষাঘাত করছিলো। সৌভাগ্যবশতঃ আমি রক্ষা পেলাম
সত্যজিৎ‌বাবুর একান্ত সচিব অনিল চৌধুরীর অস্থানে।
ফ্লোরের দরজা থেকে তিনি আমায় উচ্চকণ্ঠে জানালেন
যে টেলিফোন-এ আমায় ডাকছে—দৌড়ে পালিয়ে এলাম।

সত্যজিৎ‌ সত্যজিৎ‌ রায়, বিশ্বের অগ্রতম শ্রেষ্ঠ
পরিচালক। ‘চাক্রলতার’ গগন চূষী সাকল্যের পর ‘কাপুরুষ
ও মহাপুরুষ’ স্থটির মাঝে আত্মমগ্ন। প্রতিটি ক্ষুদ্রতম
জিনিসের প্রতিও তাঁর সমাগ দৃষ্টি। স্থটির প্রয়োজনে
তিনি কোনরূপ আপোষ করতে রাজী নন। মেস ঘরের
বাস্তব পরিবেশ স্থটি করতে তিনি কলকাতা শহরের
বিভিন্ন মেস পরিদর্শন করে এসেছেন।

‘কাপুরুষ’ চিত্রাংশের অল্প একটি বিশিষ্ট চরিত্রে অংশ
নিচ্ছেন হারাদন বন্দ্যোপাধ্যায়। ‘মহাপুরুষ’ চিত্রাংশের
প্রধান চরিত্রগুলিতে থাকবেন চাক্রপ্রকাশ ঘোষ, রবি
ঘোষ, গীতালি রায় প্রভৃতি। আলোচ্য চিত্রের স্ব-
স্থটি করবেন পরিচালক স্বয়ং।

‘কাপুরুষ’ ও ‘মহাপুরুষ’ বাংলা তথা ভারতীয় চিত্র-
জগতে নতুন আলোক শিখা প্রজ্জ্বলিত করবে। মুখ
বিশ্ব চিত্রামোদী জনসাধারণ সত্যজিৎ‌ রায়ের নবতম
স্থটিকে অভিবাধন জানাবে একথা নিশ্চিত। বিশ্বের
দরবারে ভারতীয় চিত্রের যে মর্যাদা তিনি এনেছেন—
‘কাপুরুষ ও মহাপুরুষ’ সে-আসন আরও দৃঢ় করবে।





সম্পাদনা : শ্রী প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়



লেখক : শ্রী প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

খেলার কথা

ক্ষেত্রনাথ রায়

আই এফ এ শীল্ড ৪

১৯৬৪ সালের আই এফ এ শীল্ড ফাইনালে উঠেছিল দুই পুরাতন প্রতিদ্বন্দ্বী—মোহনবাগান এবং ইষ্টবেঙ্গল। খেলাটি শেষ পর্যন্ত ১—১ গোলে ড্র যায়। প্রথমার্ধের খেলায় কোন গোল হয় নি। দ্বিতীয়ার্ধের ১৬ মিনিটে ইষ্টবেঙ্গল দলের মৌলিক প্রথম গোল দিয়ে দলকে ১—০ গোলে অগ্রগামী করেন। খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ের প্রায় তিন মিনিট আগে মোহনবাগান' পেনাল্টি কির্' পায় এবং তা থেকে জার্ণেল সিং গোল করেন (১—১)। এই দিনের খেলায় দুই দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে। খেলার শেষে ইষ্টবেঙ্গল তাঁবুতে জলপানের নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে মোহনবাগান-দলের হুঁজন খেলোয়াড় একদল উগ্র সমর্থকের হাতে নিগৃহীত হন। 'পেনাল্টি কির্' সম্পর্কে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব কর্তৃপক্ষ যে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন আই এফ-এর টুর্নামেন্ট কমিটি তা অগ্রাহ্য করে পুনরায় ফাইনাল খেলার দিন (শনিবার, ২৮শে সেপ্টেম্বর) ধার্য করেছেন।

এই নিয়ে মোহনবাগান এবং ইষ্টবেঙ্গল দলের মধ্যে ৭ বার আই এফ এ শীল্ড ফাইনাল খেলা হল। এই দুই দলের মধ্যে অতীত পূর্বের ৬টি ফাইনাল খেলার ফলাফল—

ইষ্টবেঙ্গল দলের জয় ৪ এবং মোহনবাগানের জয় : ১। ১৯৬৯ সালে মোহনবাগান এবং ইষ্টবেঙ্গল দল যুগ্ম বিজয়ী হয়েছিল। তাছাড়া ১৯৫৯ সালেও মোহনবাগান এবং ইষ্টবেঙ্গল দল ফাইনালে উঠেছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত খেলা হয়নি।

এই নিয়ে আই এফ এ শীল্ড ফাইনালে উঠলো মোহনবাগান ১৭ বার এবং ইষ্টবেঙ্গল ১৩ বার। ১৯৭২ সালে মোহনবাগান বনাম রাজস্থান দলের শীল্ড ফাইনাল হুঁদিন ড্র যায় এবং খেলাটি পরিত্যক্ত হয়। ১৯৭৯ সালে মোহনবাগান বনাম ইষ্টবেঙ্গল দলের শীল্ড ফাইনাল খেলা হয় নি। ইতিপূর্বে মোহনবাগান আই এফ এ শীল্ড জয়ী হয়েছে ৩ বার এবং ইষ্টবেঙ্গল ৭ বার।

ভারতীয় অলিম্পিক হকি দল :

ভারতীয় অলিম্পিক হকি দলের নিউজিল্যান্ড সফর শেষ হয়েছে। সফরের ১৪টি খেলার মধ্যে ভারতীয় হকি দলের জয় ১৫টি খেলায় এবং মাত্র ১টি খেলায় (১ম টেস্ট) পরাজয় ঘটেছে। সফরের খেলার তালিকায় ছিল ৩টি টেস্ট খেলা। প্রথম টেস্টে নিউজিল্যান্ড ৩—১ গোলে জয়ী হয়ে অগ্রগামী হয়। দ্বিতীয় টেস্টে ভারতবর্ষ ৫—১ গোলে জয়ী হলে খেলার ফলাফল সমান ১—১ দাঁড়ায়। তৃতীয় অর্থাৎ শেষ টেস্টে ভারতবর্ষ ৮—২ গোলে নিউজিল্যান্ডকে পরাজিত করে ২—১ খেলায় অগ্রগামী হয়ে টেস্ট সিরিজে 'রাবার' সম্মান লাভ করে।

ভারতের গা ফুটবল :

মালয়েশিয়া স্বাধীনতা দিবস উৎসব উপলক্ষে অর্গুস্তি ৭ম

বার্ষিক মারমেকা ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে ব্রহ্মদেশ ১—০ গোলে ভারতবর্ষকে পরাজিত করে এই জয়লাভের পুরস্কার 'আব্দুল রহমান ট্রফি' পেয়েছে। ব্রহ্মদেশ এই প্রতিযোগিতায় এই প্রথম ট্রফি জয় করলো। ফাইনাল খেলার ৬৫ মিনিটে ব্রহ্মদেশ গোল দেয়।

১৯৬৪ সালের মারমেকা ফুটবল প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী দেশের সংখ্যা ছিল ৯টি। প্রথমে এই ৯টি দেশকে দু'ভাগ করে ('ক' গ্রুপে ৫ ও 'খ' গ্রুপে ৪টি দেশ) লীগ প্রথায় খেলানো হয়। 'ক' গ্রুপে ভারতবর্ষ অপরাধিত অবস্থায় লীগ তালিকায় শীর্ষস্থান লাভ করে। 'খ' গ্রুপে শীর্ষস্থান পায় ব্রহ্মদেশ। ভারতবর্ষ ৪—০ গোলে কম্বোডিয়াকে ২—১ গোলে থাইল্যান্ডকে, ০—২ গোলে জাপানকে এবং ২—১ গোলে দক্ষিণ কোরিয়াকে পরাজিত করে। অপর দিকে 'খ' গ্রুপের চ্যাম্পিয়ান ব্রহ্মদেশ ৩—১ গোলে মালয়েশিয়াকে এবং ১—০ গোলে দক্ষিণ ভিয়েতনামকে পরাজিত করে। ব্রহ্মদেশের পরাজয় ঘটে ২—৪ গোলে ফরমোজার কাছে। গত বছরের রহমান ট্রফি বিজয়ী ফরমোজা ২—৫ গোলে 'খ' গ্রুপের সর্বনিম্ন স্থান অধিকারী মালয়েশিয়ার কাছে অপ্রত্যাশিতভাবে পরাজিত হলে ব্রহ্মদেশের পক্ষে 'খ' গ্রুপের তালিকায় শীর্ষ স্থান লাভ সহজ হয়।

রহমান ট্রফি বিজয়ী দেশ : ১৯৫৮ ও ১৯৫৯ মালয় ; ১৯৬০ মালয় এবং কোরিয়া (যুগ্ম বিজয়ী) ; ১৯৬১ ও ১৯৬২ ইন্দোনেশিয়া ; ১৯৬৩ ফরমোজা ; ১৯৬৪ ব্রহ্মদেশ।

গিলেট ক্রিকেট কাপ :

ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় বার্ষিক নট আউট ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনালে গত বছরের বিজয়ী সাসেক্স কাউন্টি ক্রিকেট দল ৮ উইকেটে ওয়ারউইকশায়ার কাউন্টি ক্রিকেট দলকে পরাজিত করে 'গিলেট কাপ' জয়ী হয়েছে।

কাউন্টি ক্রিকেট লীগ :

১৯৬৪ সালের ইংলিস কাউন্টি ক্রিকেট লীগ প্রতিযোগিতার ওরফারশায়ার কাউন্টি ক্রিকেট দল লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে।

অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দল :

১৯৬৪ সালের ইংল্যান্ড সফরে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট

দল ৩০টি প্রথম শ্রেণীর খেলায় যোগদান করেছিল। এই লোর ফলাফল : অস্ট্রেলিয়ার জয় ১৯, পাকিস্তান ৩ (প্রামর্গান, ওয়ারউইকশায়ার এবং এন্সলোর বিপক্ষে) এবং খেলা ড্র ১৬।

প্রথম শ্রেণীর খেলায় অস্ট্রেলিয়ান দলের পক্ষে ব্যাটিংয়ের গড়গড়তা তালিকায় প্রথমস্থান পান অধিনায়ক ববি সিম্পসন—খেলা ২২, ইনিংস ৩-, নট আউট ৮ বার, মোট রান ১,৭১৪, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ৩৯৯ (৪র্থ টেস্ট) এবং গড় ৫৭'১০। এই তালিকায় দ্বিতীয় স্থান পেয়েছেন দলের সহ অধিনায়ক ব্রায়ান বুথ—মোট রান ১,৫৫৯, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান নটআউট ১৯৩ এবং গড় ৫৫'৩৩। সফরের প্রথম শ্রেণীর খেলায় অস্ট্রেলিয়ান দলের এই সাতজন খেলোয়াড় হাজার রান বা তার বেশী রান করেছেন : সিম্পসন (১,৭১৪), বুথ (১,৫৫৯), কাউপার (১,২০৭), ও'নোল (১,৩৬৯), লরী (১,০১), বার্জ (১,১১৪) এবং রেডপাথ (১,০৭৫)।

প্রথম শ্রেণীর খেলায় বোলিংয়ের গড়গড়তা তালিকায় প্রথম স্থান পেয়েছেন নীল হক—১,৬৪৪ রানে ৮ টি উইকেট (গড় ১২'৮০)। অবশিষ্ট দলের পক্ষে সর্বাধিক উইকেট পেয়েছেন গ্রাহাম ম্যাককজি—১,৯৭৬ রাণে ৮৮টি উইকেট (গড় ২২'৪৫)। অস্ট্রেলিয়ান দলের পক্ষে প্রথম শ্রেণীর খেলায় এই আটজন সেঞ্চুরী করেছেন : সিম্পসন (৫টি), লরী (৫টি), ও'নোল (৪টি), বুথ (৩টি), কাউপার (৩টি), বার্জ (৩টি), রেডপাথ (২টি), এবং জার্মান (১টি)—মোট ২৫টি।

ভারতীয় অলিম্পিক দল ৪

জাপানের রাজধানী টোকিও সহরে আগামী ১০ই অক্টোবর তারিখে অষ্টাদশ অলিম্পিক গেমসের উদ্বোধন হবে। এই অলিম্পিক ক্রীড়াঙ্গণে যোগদানের উদ্দেশ্যে ভারতীয় অলিম্পিক দল গঠন করা হয়েছে। ভারতবর্ষ নয়টি অঙ্গুষ্ঠানে যোগদান করবে এবং এইভাবে বিভিন্ন অঙ্গুষ্ঠানে প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয়েছে : এ্যাথলেটিক্সে ১০ জন, হকিতে ১৮ জন কুস্তিতে ৮ জন, ভারোত্তোলনে ৩ জন, মুষ্টিযুদ্ধে ২ জন, সুটিংয়ে ৩ জন, সাইকেল চালনায় ৫ জন, জিমনাস্টিকে ৫ জন এবং ডাইভিংয়ে ২ জন।

ডাঃ বি সি সান্না শীল :

পশ্চিমবাংলার আন্তঃ রেলা স্কুল ফুটবল প্রতিযোগিতার
ফাইনালে বড় জাগুলিয়া গোপাল একাডেমী (নদীয়া)
৩-১ গোলে কৃষ্ণনাথ কলেজিয়েট স্কুলকে (মুর্শিদাবাদ)
পরাজিত করে ডাঃ বি সি রায় শীল্ড পুরস্কার লাভ করেছে
এবং সেই সঙ্গে ১৯৬৪ সালের সর্বভারতীয় স্কুল ফুটবল
প্রতিযোগিতায় (সুব্রত মেমোরিয়াল কাপ) পশ্চিমবাংলার
পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্যতা লাভ করেছে।

পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে এ পর্যন্ত সর্বত্র কাপ জয় করেছে
১৯৬১ সালে রাণী রামমণি স্কুল এবং ১৯৬৩ সালে বাটা-
নগর হাইস্কুল।

সম্ভবন প্রতিযোগিতা :

জাশক্তাল সুইমিং এসোসিয়েশনের উদ্যোগে আজাদ হিন্দ বাগে অহুষ্ঠিত বাৎসরিক সম্ভরণ প্রতিযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের ১১টি সম্ভরণ রেকর্ড ভঙ্গ হয়। মহিলা বিভাগে (জুনিয়র) সেট্রাল সুইমিং ক্লাবের সভ্য অপু ব্যানার্জি দুটি অহুষ্ঠানে (১০০ মিটার ব্যাক স্ট্রোক এবং ১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল) রাজ্য রেকর্ড ভঙ্গ করেন।

মঙ্গল চ্যাম্পিয়ান

পুরুষ বিভাগ (সিনিয়র)—বি এন রেলওয়ে; পুরুষ
বিভাগ (ইন্টারমিডিয়েট), পুরুষবিভাগ (জুনিয়র) এবং
মহিলা বিভাগ (সিনিয়র)—গ্রাশনাল হুইমিং এসোসিয়েশন,
মহিলা বিভাগ (জুনিয়র)—সেন্ট্রাল হুইমিং ক্লাব এবং
বালক বিভাগ (১৬ বছরে নীচে)—গ্রাশনাল হুইমিং
এসোসিয়েশন।

আজাদ হিন্দ বাগে আয়োজিত সেন্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের
বাৎসরিক সম্মেলন প্রাতিযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের চারটি



সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের সভ্য কুমারী অপু ব্যানার্জি
সম্ভরণ রেকর্ড ভঙ্গ হয়েছে। সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের সভ্য
কুমারী অপু ব্যানার্জি ১০০ মিটার ব্যাকস্ট্রোক এবং ৪০০
মিটার ফ্রি স্টাইলে নতুন রাজ্য রেকর্ড স্থাপন করেন।

ডেভিস কাপ :

১৯৬৪ সালের ডেভিস কাপ লন্ টেনিস প্রতিযোগিতায় ইণ্ডার-জোন ফাইনালে অষ্ট্রেলিয়া ৫-০ খেলায় অইডেনকে পরাজিত করেছে। এই জয়লাভের ফলে অষ্ট্রেলিয়া চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে অর্থাৎ ফাইনালে আমেরিকার সঙ্গে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছে।

ফেডারেশন টেনিস কাপ :

মহিলাদের আন্তর্জাতিক লন্ টেনিস ফেডারেশন কাপ প্রতিযোগিতার ফাইনালে অট্টেলিয়া ২-১ খেলার গতি বহরের বিজয়ী আমেরিকাকে পরাজিত করেছে। মহিলাদের এই দলগত আন্তর্জাতিক লন্ টেনিস প্রতিযোগিতাটি ১৯৬৩ সাল থেকে আরম্ভ হয়েছে।

== অহিত্য মহাবাদ ==

প্রহ্লাদ গীতা }
পাতঞ্জল দর্শন }

ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার

ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার ইতিমধ্যেই হিন্দু ধর্মগ্রন্থের অনেক অহুবাদ প্রকাশ করে ধর্মপিপাসু জগতে নিজের আসন তৈরী করে নিয়েছেন। ত্রিমদ্ভাগবতের প্রহ্লাদো-পথ্যানের বাঙলা অহুবাদকে তিনি প্রহ্লাদ-গীতা নামে অভিহিত করেছেন। পাতঞ্জল দর্শন যোগপ্রণালী বিষয়ক শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। ব্রহ্মচারীজীর সরল সহজ অহুবাদ ও তার সঙ্গে সঙ্গে অহুধান অতি জটিল বিষয়কেও সহজবোধ্য করেছে। এই সকল অহুবাদ গ্রন্থের বহুল প্রচার সর্ব সময়েই বাঞ্ছনীয়।

(৩নং অন্নদা নিয়োগী লেন, কলিকাতা ১৩ থেকে লেখক কর্তৃক প্রকাশিত। প্রতিটির মূল্য পঞ্চাশ নং পঃ)

শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

সাংখ্য-জ্যোতিষ : সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

আলোচ্য গ্রন্থে সাংখ্যাত্ত্বের মাধ্যমে ভাগ্যগণনার পদ্ধতি ব্যক্ত করা হয়েছে। পাশ্চাত্য ভাবধারার অব-গাহন করে গ্রন্থকার বিষয়বস্তুর ওপর নিজস্ব চিন্তাধারা ও

উদ্ভাবনীশক্তির অভিনবত্ব দেখিয়েছেন। সাংখ্য-জ্যোতিষ বা Numerology প্রাচীন মিশরে প্রচলিত ছিল, বহু শতাব্দী পরে তার পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছেন কেবলো প্রভৃতি পাশ্চাত্য জ্যোতিষীরা। সাংখ্যার ওপর যে মানব জীবনের বিশেষ প্রভাব আছে ভারতবর্ষ সুপ্রাচীন কাল থেকেই অবগত। সাংখ্যকে অবলম্বন করে পার্শ্ব ও অর্থাধিব স্তরে আর্থিকবিদ্যা বিশেষ আলোকসম্পাত করেছেন। তাঁরাই বলে গেছেন যে মানব জীবনে সাংখ্যার উল্লেখযোগ্য প্রভাব আছে। ভবিষ্যৎ বিষয়ে গণনা সম্পর্কে হিন্দু-জ্যোতিষীরা সাংখ্যকে বহুকাল আগে প্রাধিকৃত দিয়েছেন। মাত্র একটি নমুনার সাহায্যে কি ভাবে প্রকৃত কর্তার জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সুন্দররূপে বলা যায়, সাংখ্য-জ্যোতিষের মধ্যে সে সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। গ্রন্থকারের বিদগ্ধতা ও মৌলিকত্বের পরিচয় পাওয়া গেল। গ্রন্থ-থানিতে গ্রন্থকারের সাংখ্যাত্ত্বমূলক গবেষণা ও অহুশীলন সার্থক হয়েছে। আশা করা যায় জ্যোতিষের প্রতি অহুরাগী ব্যক্তিমাতেই সাংখ্যজ্যোতিষ পড়ে আনন্দ লাভ করবেন।

[প্রকাশক—শ্রীভোলানাথ মুখোপাধ্যায় সেকপুড়া, মেদিনীপুর। মূল্য—২'২৫ পঃ]

উপাধ্যায়

সম্পাদকদ্বয়—শ্রীফণীকুমাৰ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে কুমারেশ তর্কাতার্ক কর্তৃক ২০৩১১, বিধান সরণী, (পূর্বতন কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট,)
কলিকাতা ৬, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে ১১০৬৪ তারিখে মুদ্রিত ও প্রকাশিত



কাঠিক-১৩৭৬

প্রথম খণ্ড

দ্বিপঞ্চাশত্তম বর্ষ

পঞ্চম সংখ্যা

পল্লীকেল্লিক ভারতবর্ষ ও তাহার ত্যাগধর্মী সভ্যতা

শ্রী প্রহ্লাদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল

পৃথিবীর আদিভূত সভ্যতার জন্মস্থান—জগজ্জননী, জগৎ-তারিণী, পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ। এই সভ্যতার মূলে সভ্যতায়ী, সভ্যধর্মী তপঃনিষ্ঠ, ত্যাগধর্মী ঋষিকুলের পারমার্থিক স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান। ঋতুপোবনের শাস্ত্র-সিদ্ধ সমাহিত ভাবধারার পরিবেশে ইহার বিকাশ। এই সভ্যতা শাশ্বত ও সনাতন। একান্ত এই সভ্যতা অমৃতমুখী ও ত্যাগধর্মী। পরাধীন ভারতে এই ত্যাগধর্মী সভ্যতা রাজনৈতিক কোলাহল ও ভোগবিলাস হইতে দূরে পল্লীর নিভৃত অঞ্চলে আশ্রয়লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। বাধীন ভারতেও এই সভ্যতা কোনরূপে আশ্রয়লাভ করিতে পল্লীমাতার বিজ্ঞ-বক্ষিত-শতছিন্ন অঞ্চলে প্রস্থ!

বর্তমান পৃথিবী পাশ্চাত্য ভোগধর্মী সভ্যতার মোহে মুগ্ধ। পাশ্চাত্য সভ্যতা মূলতঃ সহরকেল্লিক। এই সভ্যতার মূলে রাজনৈতিক ক্ষমতালব্ধ কতিপয় মনীষিহইত আইন। ইহা ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত জীবনের ও তাহার ভোগের শাস্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার উদ্দেশ্যে সৃষ্ট। পারমার্থিক ভাবধারার সহিত ইহা সম্পূর্ণ সম্পর্কবিহীন। একান্ত এই সভ্যতা ভারতীয়-সভ্যতার বিপরীতধর্মী। ভারতীয়-সভ্যতার উন্নতি হইয়াছিল তাহার অধ্যাত্মবাদকে কেন্দ্র করিয়া এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার উন্নতি হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে তাহার মরজীবন ভোগকে কেন্দ্র করিয়া জড়-বিজ্ঞানের বিস্ময়কর উন্নতির পথে।

পরাদীন ভারতে ভারতীয় ত্যাগধর্মী সভ্যতা আশ্রয়-
লাভে সমর্থ হইয়াছিল পল্লীবাসী শিক্ষিত, অশিক্ষিত
নরনারীর সহজ-সরল-নিরাড়ম্বর জীবনবোধের মধ্যে এবং
তাহাকে উদ্দীপ্ত এবং উজ্জীবিত রাখিয়াছিল যাত্রা, কথ-
কতা, লোকগীতি, নানারূপ ব্রত, পূজাপার্বণ এবং তাহার
নানাবিধ আচার ও অলুচান। পরাদীন ভারতে এইরূপ
লক্ষ লক্ষ পল্লীগ্রামে ভারতীয় সভ্যতার দীপশিখা অগ্নান
ছিল এবং রিক্ততা ও বঞ্চনা সত্ত্বেও শান্তিপূর্ণ ছিল। পরাদীন
ভারতমাতার লক্ষ লক্ষ পল্লীকণ্ঠার একটি পল্লীর কথা আমি
এখন বলিব। সেই শান্ত-স্নিগ্ধ তপোবনের ভাবধারায়
সজীবিত পল্লীর নাম বলিয়া কোন লাভ আজ আর নাই।
কারণ, ভারতমাতার স্নেহময় কোড় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া
যে লক্ষাধিক পল্লীকণ্ঠা স্বাধীনতার নির্ময় পরিহাসে রিক্ত-
বঞ্চিতা-দীন-হীন-ধ্বিতা-নিগূহীতা হইয়াছে—এই পল্লীটি
তাহাদের অন্ততম।

কেন এবং কোন্ অপরাধে ভারতমাতার স্তম্ভকরিত
পীুষধারা হইতে এই সকল পল্লীকণ্ঠা বঞ্চিত হইল—এই প্রশ্ন
সেই সকল পল্লীবাসীর কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিলে সপ্তদশ-
বর্ষ পূর্বেও তাহাদের অসহায় বাস্পরুদ্ধ কণ্ঠ হইতে কোন
শব্দ বহির্গত হইত না—শুধু তাহাদের ক্ষোভ ও দুঃখপূর্ণ
অশ্রুময়ী বাণী তাহাদের বক্ষকে প্রাবিত করিয়া তাহাদের
পদতলের মৃত্তিকাকে সিক্ত করিত। কিন্তু আজ সেই
সর্বহারাদের চক্ষু হইতে সমস্ত অশ্রুর উৎস বিস্কৃত হইয়াছে।
আজ যদি তাহাদের চক্ষু হইতে কিছু বহির্গত হয় তাহা
তাহাদের রিক্ত-বঞ্চিত হৃদয় হইতে সত্তা উদ্গত ও তপ্ত
জীবন্ত কয়েক ফোটা রক্ত! স্তবরাং ঐ প্রশ্ন এই প্রবন্ধে
নিরর্থক এবং দুঃখগর্ভ বলিয়া পরিত্যক্ত।

ঐ পল্লীগ্রামটি ছিল একটি আদর্শ ব্রাহ্মণ পল্লী। গ্রাম
অর্ধসহস্র ব্রাহ্মণ পরিবারের বাসভূমি ছিল ঐ গ্রামে। দুই
চারঘর ধোবা, নরসুন্দর, দাই, বাজনাধার, সুরধর প্রভৃতি
বাহা গ্রামবাসীর জীবন ও ধর্ম রক্ষার জন্ত নিত্য ও
নৈমিত্তিকভাবে প্রয়োজন, তদতিরিক্ত ঐ গ্রামে অন্ত কোন
জাতির বাসভূমি ছিল না। পূর্বে অধিকাংশ বাড়ীতে
লক্ষ্যন্ত শিক্ষার জন্ত টোল ছিল—সে স্থানে ছাত্রগণের বিনা
ব্যয়ে আহার, বাসস্থান ও শিক্ষা মিলিত। অবশ্য ইংরাজী
শিক্ষার আক্রমণে এবং জীবিকার স্বযোগ অধেবণে ইহার

বহু পরিবর্তন হইয়াছিল তথাপি একেবারে নিঃশেষিত হয়
নাই। ঐ গ্রামের কেহ জমিদার ছিল না। সকল
পরিবারের কিছু কিছু নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর ছিল। সকলের
ছিল সহজ-সরল-নিরাড়ম্বর জীবন। ‘দেশপুত্র ভট্টাচার্য’
বলিয়া সেই স্থানে তাহাদের অফুরন্ত সম্মান ছিল। ধন ও
পাণ্ডিত্য সম্পদ তাঁহাদের সামান্য ছিল কিন্তু তাঁহারা দরিদ্র
ছিলেন না। অভাববোধের ভারতমোহে দরিদ্রতা। ভোগ-
বিলাসের অভাব একজন কোটীপতিকে দারিদ্র্য দুঃখে ক্লিষ্ট
করিতে পারে; আবার ভোগবিলাসত্যাগী একজন
ব্যক্তিকে রাজ্যভোগ স্থখে স্থখী রাখিতে পারে। বাংলার
তথা ভারতের স্বপ্রসিদ্ধ নৈমায়িক ‘বুনো রামনাথ’ তিস্তিড়া
পত্রনির্ধাসসহ অর্ধপেট আহার করিয়া পরম সুখী ছিলেন।
তাঁহার কোন অভাব ছিল না—কি শাস্ত্র বিষয়ে কি পার্থিব
সম্পদে। তাঁহার মত পরম ধনী ব্যক্তি বর্তমান ভোগায়তন
অবদূর কোটীপতিগণের কল্লনার বাহিরে। আমাদের বাংলা-
কালে ঐ গ্রামে দুই চারিটি ভিন্ন ইষ্টক নির্মিত গৃহ ছিল না।
প্রতি প্রাতে শয্যাভ্যাগ করিয়া দক্ষ মৃত্তিকা দর্শনকে তাঁহারা
অন্তত মনে করিতেন। প্রতি বৎসর বর্ষাকালে গ্রামটি
একটি ঘোঁড়ার আকার ধারণ করিত। তখন নৌকা হিন্ন
চলাচল অসম্ভব ছিল। তখন গ্রামবাসী ভট্টাচার্য মহাশয়-
গণ নৌকাযোগে শিশুবাড়ী গমনাগমন করিতেন—দীক্ষিত
শিষ্যগণকে পারমার্থিক বিষয়ে উপদেশ দিয়া এবং অদীক্ষিত-
গণকে দীক্ষাদান করিয়া তাঁহাদের শিষ্যগণের পরম কল্যাণ
করিতেন। সেই সময় শিষ্যগণ তাঁহাদিগকে বাহা কিছু
দান করিতেন তাহা তাঁহারা তাঁহাদের বাৎসরিক শারদীয়া
পূজার ব্যয় করিয়া রাজ্য হর্ষবর্ধনের মত সম্পূর্ণ রিক্ত
হইতেন। প্রায় প্রতি গৃহে গৃহদেবতা ছিল। তাঁহাদের
বারমাসে তের পার্বণ হইত। সেই গৃহদেবতার ভোগ
উপকরণ তাহাদের দৈনিক স্মৃতিচিহ্নিত করিত। অন্নপ্রাশন,
উপনয়ন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি শাস্ত্রীয় কর্মে ভূরিভোজনের
ব্যবস্থা সামাজিকভাবে সকলের জন্ত তাঁহারা করিতেন।
পল্লীসমাজের অলংকার দলাদলি থাকিলেও তাহা গ্রামের
মুকুতি বা দলপতিগণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিত। গ্রাম-
বাসী যুবকগণ জাতিধর্ম-দলাদলি নির্বিশেষে গ্রামবাসীর
আপদে বিপদে বা শুভকর্মে একপ্রাণ মন লইয়া যোগদান
করত: নিবিড় আনন্দ লাভ করিতেন। ঐ গ্রামে ইংরাজী

শিক্ষার কোন ব্যবস্থা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক পর্যন্ত ছিল না। পরে অবশ্য একটি মধ্য ইংরাজী স্কুল এবং পরে তাহা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। স্বাধীনতা লাভের সময়ে ঐ গ্রামে এমন কোন পরিবার ছিল না যে পরিবারে কোন স্নাতক ছিলেন না। তথাপি আগে যেরূপ গ্রামে বিদ্যালয়কার, স্কুলকার, তর্কভূষণ, বিদ্যাবূষণ প্রভৃতি গৃহে দুইএকজন থাকিতেন পরবর্তী পর্যায়ে সেইরূপ কাব্যতীর্থ, স্মৃতিতীর্থ, তর্কতীর্থ প্রভৃতির অভাব চলিত। মহামহোপাধ্যায় আন্তোয় তর্কভূষণ ঐ গ্রামের একজন কৃতি বিদ্বান পুরুষ। ইংরাজীশিক্ষার প্রবল বক্তা প্রাচীন শিক্ষাধারাকে সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করিতে সক্ষম হয় নাই।

ঐ গ্রামের প্রথম ইংরাজীশিক্ষিত পুরুষ অনাদিনাথ। স্বগ্রামে ইংরাজী শিক্ষার সম্ভাবনা না থাকায় তাহার মাতুলালয়ে ইংরাজী শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করেন। ঐ বিদ্যালয়ে তাহার সহপাঠী ছিলেন স্বপ্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ রায়-বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র। খগেন্দ্রবাবুর সহিত অনাদিনাথের সকল বিষয়ে প্রতিযোগিতা থাকিত এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনাদিনাথ প্রতিযোগী খগেন্দ্রনাথকে অতিক্রম করিতেন। তথাপি খগেন্দ্রনাথ ও অনাদিনাথ অভিন্নহৃদয় বন্ধু ছিলেন। অনাদিনাথ যখন ডাক্কলেজে বি, এ, পড়িতেন তখন তাহার সহপাঠী ছিলেন স্বনামধন্য রাজকর্মচারী শ্রীযুক্তমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরেশচন্দ্র ঘটক, শ্রীতারকচন্দ্র রায়। তখন এই চারিটি ছাত্র ডাক্কলেজের চারিটি সমুদ্রল তারকার মত ছিলেন। পরবর্তী পর্যায়ে অনাদিনাথ পল্লীগ্রামের একটি বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা গ্রহণ করেন এবং যতীন্দ্রমোহন, স্বরেশচন্দ্র এবং তারকচন্দ্র ডিপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে অধিষ্ঠিত হন এবং পরিশেষে জিলা ম্যাজিস্ট্রেটপদে কার্য করিয়া অবসর গ্রহণ করেন। বর্তমানে শ্রীতারকচন্দ্র রায় ভিন্ন সকলেই স্বর্গত। শ্রীতারকচন্দ্র রায় একজন স্বপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক এবং 'ভারতবর্ষের' লেখক-গোষ্ঠীর অন্যতম।

অনাদিনাথ 'ডবল অনার' লইয়া বি, এ, পাশ করেন এবং সামান্য বেতনে পল্লীগ্রামের একটি উচ্চইংরাজী বিদ্যালয়ের হেডমাস্টার পদে ব্রতী হন। তাহার অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু খগেন্দ্রনাথ সেই সংবাদ অবগত হইয়া কলিকাতার

একটি প্রসিদ্ধ স্কুলের হেডমাস্টারীপদ গ্রহণ লক্ষ্য অনাদিনাথকে সংবাদ দেন। অনাদিনাথ ছিলেন পল্লীগ্রাম। এতদ্ব্যতীত তিনি খগেন্দ্রনাথকে পরের উত্তরে জানান—কলিকাতার শিক্ষা দিবস জ্ঞাত শিক্ষিত লোকের অভাব কোন দিন হইবে না। পল্লীগ্রামে শিক্ষা দিবস লোকের বিশেষ অভাব। পল্লীর বাস্তবতা পরিচয় করিয়া শহরবাসী হওয়া এবং মাতৃত্বমিত্যাগ প্রায় এক কথা। সুতরাং তিনি নিজের পল্লীভবন ত্যাগ করিবেন না। তিনি প্রতিদিন অধিকাংশ শিক্ষাবিগণের মতো ছাউনি মাইল পায় হাটিয়া স্কুলে যাইয়া শিক্ষাদান করিতেন এবং দিনান্তে স্বগ্রামের বাসভবনে প্রত্যাবর্তন করিতেন। তাহার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এইরূপ কষ্টসাধন করিয়া শিক্ষাদান করিয়াছিলেন। তাহার অটুট স্বাস্থ্য ছিল এবং তিনি একজন প্রসিদ্ধ ফুটবল খেলোয়াড় ছিলেন। তাহার চেষ্ঠায় তাহার স্বগ্রামে রণজিৎ (রাজতী) টিমের উদ্ভব হয় এবং তাহার 'এ' 'বি' 'সি' তিনটি শাখায় বিভক্ত হয়। বিভিন্ন গ্রামের মাঠে খেলিয়া তাহার দল জয়মালা গ্রহণ করে। তাহার শিক্ষাদানপদ্ধতি এবং কৌশলশক্তি তদানীন্তন যুবক সমাজে আদর্শগণ্য ছিল। তাহার হৃদয় ছিল কৃষ্ণের মত কোমল—স্বচ্ছ কর্তব্য পরিচালনে বজ্রের মত কঠোর। কর্তব্যের অনাদিনাথ এবং অবসর-যাপক অনাদিনাথ সম্পূর্ণ দুই বিভিন্ন ব্যক্তি। যাহায়া তাহাকে এই দুই রূপে দেখিয়াছেন, তাহারা কোন্টি তাহার প্রকৃতরূপ বুঝিতে না পারিয়া বহু সময় বিভ্রান্ত হইয়াছেন। তখনকার দিনের পল্লীগ্রামের স্কুলের বেতন ছিল সামান্য। তাহাও সকল মাসে সময়মত প্রাপ্তব্য ছিল না। পল্লীগ্রাম অনাদিনাথের এই দুঃখবরণ এবং কষ্ট সাধন ছিল—বিল্যাসেব নামাস্তর। অনাদিনাথ ছিলেন মধ্যম। তাহার স্নেহ ও কনিষ্ঠ অপূর্ণ দুই ভ্রাতা ছিলেন। তিন ভ্রাতা তাহাদের বর্গত পিতৃপ্রাণে তাহাদের সাধার অতিরিক্ত ব্যয় করিয়া নিকটবর্তী দশ বার গ্রাম লইয়া যে একটি সমাজ, সেই সমাজের সকল ব্রাহ্মণকে ক্রী ভোজনে পরিহৃত করেন এবং তজ্জন্য তাহাদের পৈত্রিক সম্পত্তির এক বৃহত্তম অংশ পরহস্তগত হয় এবং তাহাদের জীবনে এক চরম আর্থিক সমস্যার সৃজন করে। দুঃখ কষ্টকে পায়ের ডুতা করিয়া চিত্তকে নির্ভাবনায় রাখিয়া তিনি

জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত শিক্ষাদান করিয়া এবং অবসর সময়ে পল্লীর জনগণ মধ্যে নির্মল আনন্দ বিতরণ করিয়া জীবনের পরিসমাপ্তি করিয়া ছিলেন। ভারতের সনাতন শাস্ত্র-ভ্যাগধর্ম তাঁহার মধ্যে মূর্ত ছিল, একথা বলা যাইতে পারে।

অনাদিনাথ ছিলেন সহজ-কবি। সময়ে অসময়ে অনেক সুপ্রসিদ্ধ গানের হস্তজনক অঙ্করণ করিতেন। কলিকাতার মেয়ে থাকিবার সময়ে পল্লীগ্রামের ছাত্রগণের তাহাদের স্বয়ং গৃহের সংবাদ লগ্ন উগ্রীব থাকা স্বাভাবিক। এজন্য তাহাদের ডাকপিণ্ডনের আগমন প্রতীক্ষা-চাতক পক্ষীর মেঘবর্ষণের প্রতীক্ষার মতো ছিল। এক দিন অনাদিনাথ সুপ্রসিদ্ধ ডাকপিণ্ডনের আবির্ভাবে তিনি গান ধরেন—“এস হে পিণ্ডন সখা। তুমি ঐ রূপে দাও দেখা, তোমার পায়ে নাগরাই জুতা ছে!” অনাদিনাথ অসংখ্য ভাল গান করিতে পারিতেন না। এজন্য গীতিকর্ষ কেহ সঙ্গে থাকিলেই তাহার কবিত্বের সুপরিষ্করণ হইত।

একদিন তিনি জ্বলের কার্ণশেষে দিনান্তে তাঁহার সগ্রামে ফিরিতে ছিলেন, তাঁহার সঙ্গে ছিলেন তাহার ভ্রাতৃপুত্র সম্পর্কীয় পঞ্চানন। পথে তাঁহার যজমান ধনী গিরিধর মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা। তিনি জনৈক পথ চলিতেছেন এমন সময় অনাদিনাথ দেখেন—পথিপার্শ্বের একটি গৃহের সম্মুখে একটি পরিপুষ্ট ছাগবৎস খুঁটার সহিত বন্ধ। দেখিয়া তিনি সেখানে দাঁড়াইয়া পঞ্চাননকে ডাকিয়া তাহার কানে একটি সুপ্রসিদ্ধ গানের সুর বলিয়া নিজের গানের পদ বলিতে লাগিলেন এবং পঞ্চাননের গান চলিতে লাগিল—

কে তুমি হে পশুবর! আছো স্থখে দাঁড়িয়ে
খুঁটাতে আবদ্ধ তবু লেজে “হাগড়া” জড়াইয়ে।

(হাগড়া একরূপ বস্ত্রফল)

তুমি সিংহ নহ, ব্যাঘ্র নহ, হস্তী নহ, মহিষ নহ
তুমি সিংহের মামা ভোমল দাগ, তুমি শুধু খাও

ঘাস খাটো পুচ্ছ নাড়িয়ে।

মানবে অসাধ্য বাহা, তোমাতে সুসাধ্য তাহা

আহামরি! আহা! আহা! হাগো (কবিরাজী)

বড়ী পাকাইয়ে।

তোমার মাংস সত্ত্ব সত্ত্ব রন্ধনে পাতে পড়ে অস্ত
কি ছার দেবতা ভোগ মণ্ডা মিঠাই হারাইয়ে।

তোমা পেলে গিরিধর, করবে অতি সমাদর—

লতিবে অসীম পুণ্য ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়ে ॥

গানের অন্তর্নিহিত উদ্বেগ গিরিধরবাবুর বৃত্তিতে দেবী হইল না। তৎক্ষণাৎ তিনি নগদ মূল্যে ছাগবৎসটি কিনিয়া লইলেন এবং সেই রাত্রেই অনাদিনাথ সহ কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবকে সমাংস আহাৰ্য্য দানে পরিতৃপ্ত করিলেন।

সেই গ্রামের অঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ একজন সুপ্রসিদ্ধ যাত্রা-নাট্য লেখক। তাঁহার প্রায় শতাধিক নাটক বিভিন্ন যাত্রাদলে প্রশংসার সহিত অভিনীত হইয়াছে। তিনি কলিকাতা ব্রাহ্মবয়েজ স্কুল সংস্কৃতির প্রবীণ পণ্ডিত ছিলেন। প্রতি বৎসর শারদীয়া পূজার সময়ে তাঁহার গ্রামের ছাত্রগণ ও তাহাদের অভিভাবকগণ কর্তৃক তাঁহার প্রণীত নূতন কোন নাটকের অভিনয় হইত। পল্লীগ্রাম সেই সময় যাত্রামোদে উৎফুল্লিত থাকিত। অঘোরচন্দ্র সকল ছুটিতে অর্থাৎ গ্রীষ্ম, পূজা ও বড়দিনের বন্ধে সগ্রামে আসিতেন। সেই সময় তাহার বাড়ীতে সকাল-সন্ধ্যায় একটি মজলিস বসিত—সে মজলিস দিনে বিপ্রহর ও রাত্রেও তদ্রূপ সময়ে ভঙ্গ হইত। ঐ সময়ে এই স্থানে নানা সাহিত্য ও কবিতার সমালোচনা ও নানাবিধ হাস্যরসের অবতারণাও হইত। অঘোরচন্দ্র নিঃসন্তান ছিলেন। এজন্য গ্রামের যুবকবৃন্দ তাঁহার মাতা ও পত্নীর স্নেহের অধিকারী ছিলেন। একদিন পঞ্চানন গোপনে অনাদিনাথকে জানাইলেন—অঘোরচন্দ্রের বাড়ীতে তাঁহার এক শিষ্য একটি বড় কাঁঠাল দিয়া গিয়াছে। গ্রীষ্মের অপরাহ্ন। অঘোরচন্দ্রের গৃহ সম্মুখের বারান্দায় মজলিস বসিয়াছে, এমন সময় পঞ্চানন সহ অনাদিনাথের আগমন এবং সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চাননের গান এবং অনাদিনাথের পদসংযোগ—গানটি একটি প্রসিদ্ধ গানের প্যারোডি।

“এখনও তারে চোখে দেখিনি, শুধু গন্ধ পেয়েছি।

গন্ধ পেয়ে জ্বন্তে জল ছেড়ে দিয়েছি।

তনেছি তার গা ভরা কাঁটা তার বোঁটাতে জাঁঠা

বল মাউই! তারে এনে ভেঙে দেবে কি ?

অধোরচক্ষের বুঝা-মাতা বিব্রত হয়ে বললেন—“ওটা ভাল পাকেনি! কেন আজই নষ্ট করবি?”

প্রত্যুত্তরে গান চলিল—

ত্রিমেঘ কাঁঠালের ঐ এক ধারা।

বাহিরে কাঁচা দেখালেও, ভিতরে পাকা সারা

ভেঙে দেখে মাউই! সব রোঁয়া রসে ভরা

গরম গরম মুড়ি সহ খেতে দিবে কি?

দেখিতে দেখিতে গ্রামের অনেক যুবক ও কিশোর সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। সকলের সমবেত আগ্রহে সেই বৃন্দাধার কাঁঠালটির সম্ব্যবহার সম্পূর্ণ হইল। অনাদিনাথ তৎকালীন এমন কোন প্রচলিত গান ছিল না যাহার প্যাংঝোডি তিনি মুখে মুখে করেন নাই। সেগুলি সংগ্রহ ও রক্ষার কোন ব্যবস্থা না থাকায় তাহার অন্তিম বিলুপ্ত হইয়াছে। ঐ পল্লীর অল্প একটি উজ্জ্বল নক্স প্রসিদ্ধ নাট্যকার শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়। তিনিও একজন ত্যাগ-নিষ্ঠ আত্মভোলা কর্মী।

উপযুক্ত গৃহে উপযুক্ত সময়ে নিমন্ত্রণ গ্রহণের প্রত্যাশ-মতিত্ব ছিল অনাদিনাথের অসাধারণ। গ্রামের চক্রবর্তী বাটীতে নূতন জামাতা আসিয়াছে। চক্রবর্তী পরিবারের অবস্থা স্বচ্ছল। পুত্র হইতে বৃন্দাধার কয়েকটি রোহিত যন্তু ধৃত হইয়াছে এবং বৃন্দাধার এক খাদী ছাগল বিষ্ণুপুত্রায় আত্মদানে বাধ্য হইয়াছে—নানারূপ চর্বচোষ্য লেছ পেয়েই ব্যবস্থা হইতেছে। এই সংবাদ দাবানলের মতো গ্রামবাসিগণের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইল। অনাদিনাথ সবে মাত্র তাহার কর্মস্থল হইতে অগৃহে প্রত্যাগত হইয়াছেন। গ্রামের কয়েক ভোজন-রসিক যুবক অনাদিনাথকে অজুরোধ করিলেন—আজ রাজে চক্রবর্তী বাটীতে নিমন্ত্রণ গ্রহণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সকলের সনিবন্ধ অজুরোধে অনাদিনাথ কতব্য স্থির করিয়া যুবকবৃন্দকে সমস্ত পরামর্শ দান করিলেন এবং তাহাদ্বিককে যথাস্থানে যথাকর্তব্য কি বুঝাইয়া দিলেন। কোনো বাড়ীতে নূতন জামাতা বা কোন অত্যাগত কেহ আসিলে গ্রামবাসিগণের তাহাদের সহিত পরিচিত হইবার জন্য আগমন করিবার রীতি গ্রামে বর্তমান। অনাদিনাথ তাহার সঙ্গী দীনবন্ধু জ্যোতিঃশাস্ত্রী সহ চক্রবর্তী বাটীর দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন। তখন সন্ধ্যা প্রায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। চক্রবর্তীদর

বাড়ীটি বহুবিস্তৃত। সমুদ্র দিকে সামান্য কিছু কোণ জল আছে। তাহার কাছে আসিয়াই অনাদিনাথ “কিসে কামড়াইল” বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন—চক্রবর্তী বাটীর বহির্বাটীর অঙ্গনে অনাদিনাথ বলিয়া পড়িলেন। দীনবন্ধু তাহাকে কোলে করিয়া “সাপ্, সাপ্” চীৎকার করিলেন। দেখিতে দেখিতে যে যেখানে ছিল সে স্থান হইতে সকলে ছুটিয়া আসিল। অনাদিনাথের পায়ে দুই বিন্দু রক্ত রেখা, পায়ে ভাগা বাধা হইল। অনাদিনাথ মুহূর্ত্ত। গ্রামের ওঝা আসিল—ঝাড়ফুৎ, মছোচ্চারণ, সঁরষা-পোঁড়া চলিতে লাগিল। সকলের মুখে হায় হায় শব্দ। যুবকদল লাঠি সোটা লইয়া জঙ্গল পিটাইতে বাস্তু। অনাদিনাথকে বাহিরে চণ্ডীমণ্ডপ গৃহের পারাঙ্গায় একটা শয্যায় শয়ন করান হইল। গ্রামে সর্পভয় অত্যধিক। একজ্ঞ অনেক বাড়ীতে সর্পের ঔষধ ‘লেশ্মিন’ থাকে। তাহা নত স্থানে দেওয়া হইল। প্রায় অর্ধঘণ্টা পরে অনাদি চক্ষু উন্মীলন করিয়া আবার চক্ষু মুদিলেন। সকলের মুখেই আশার ভাব দেখা গেল। আর ভয় নাই! ও দিকে এক বিষম কাণ্ড। চক্রবর্তী বাটীর পরিবারবর্গ সকলেই বহির্বাটীতে আসিয়াছিলেন। রক্ষণগৃহের দ্বার উন্মুক্ত ছিল। রক্ষণ গৃহ হইতে সমস্ত মাংস অহুত হইয়াছে। এদিক ও-দিক হুই একথণ্ড পড়িয়া আছে। চক্রবর্তী বাটীর রক্ষণগৃহের পশ্চাতে একটি প্রকাণ্ড জঙ্গল। রাজ্যে প্রতিদিন গুগল ডাকে। হুতরাং সকলের ধারণা হইল, শৃগাল কতৃক সমস্তই ভক্ষিত হইয়াছে। অনাদিনাথের ওখানে তখনও বহলোক। শৃগাল কতৃক সমস্ত মাংস ভক্ষিত হইয়াছে অনাদিনাথ শুনিলেন। অতিক্রীণস্বরে বলিলেন তাহার ভাগ্যদেবে চক্রবর্তী পরিবারের এই কতি হইল। অনাদিনাথ ক্রীণকণ্ঠে বলিলেন—শাপবর্তী কোন গ্রাম হইতে আর একটি খাদী চেষ্টা করিতে এবং তাহার মূল্য তিনি দিবেন। বলাবাহুল্য এক ঘণ্টা মধ্যেই পূর্বমত মাংস সংগৃহীত হইল। অনাদিনাথের অমূল্যদান রক্ষা পাইয়াছে ইহাও পরম আনন্দের বিষয়। চক্রবর্তী পরিবার অনাদিনাথের পিতার যত্নমান ছিলেন এবং তৎকালে অনাদিনাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতাই বাস্তবিক ক্রিয়া করেন—একজ্ঞ চক্রবর্তীপরিবারের সকলেই মহা উদ্বিগ্ন ছিলেন। সকল দিক রক্ষা পাওয়ার যুবকবৃন্দের মুখে আনন্দের ধ্বনি উথিত

হইতে লাগিল, অতিরিক্ত একটি খাদ্য সংগৃহীত হইল। পুঙ্খ হইতে আরো মৎস্য ধৃত হইল। আনন্দে চক্রবর্তী মহাশয় যুবকবৃন্দকে আহারের নিয়ন্ত্রণ করিলেন। পরে অবশ্য অনাদিনাথের সর্পাঘাত-অভিনয় নিয়ন্ত্রণ-গ্রহণের একটি ফাঁদ ইহা প্রকাশ পাইতে বিলম্ব হইল না। সেই রাত্রে গ্রামের যুবকবৃন্দ ভূরিভোজে পরিতৃপ্ত হইলেন। আনন্দ উৎসব হাসি তামাসা গভীর রাত্রি পর্যন্ত চলিল। উপযুক্ত সময়ে এরূপ নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ গ্রামবাসিগণের পক্ষে দোষাবহ ছিল না। কারণ নিয়ন্ত্রণকারী পরিবার এরূপ-ভাবে নিয়ন্ত্রণ করিবার সৌভাগ্যলাভে পরম পরিতৃপ্ত হইতেন। আমাদের বাল্যকালে দেখিয়াছি—কোন বাড়ীতে নূতন জামাই আসিলে প্রামের প্রায় সমস্ত গৃহেই তাহার নিয়ন্ত্রণ হইত এবং জামাই দেখিতে আগন্তুক সকলেই জামাতা-বাজীর সঙ্গে আহারে পরিতৃপ্ত হইতেন। তাহার ফল হইত নিয়ন্ত্রণকারী পরিবারের অনেকেই শেষ পর্যন্ত অল্প বা অধিক খাণ্ডিতেন বা যৎসামান্য বস্ত্র ধারা উদরপূর্তি করিতেন। পাশ্চাত্যপ্রথায় নিয়ন্ত্রণকারী ও নিয়ন্ত্রিতগণের একসঙ্গে আহার বিধি। কিন্তু প্রাচ্য প্রথায় নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি সর্বশেষে আহার করেন। নিজে অনাহারী থাকিয়া অপরকে ভোজনে তৃপ্তিদান ভারতীয় ত্যাগধর্মী প্রথা। সামাজিক ক্রিয়া-কর্মে বর্তমানে এই প্রথা চলিতেছে। এরূপ অনাহারবিলাসে পল্লীবাসিগণের আনন্দের উৎস থাকিত।

আমি যে পল্লীগ্রামের কথা বলিতেছি—সে গ্রামে ছিলেন ভোজনরসিক স্বনামধন্য পুঙ্খ আধমণী কৈলাস। পরিপূর্ণ আহারের পর তিনি অধর্মণ মিষ্টায় আহার করিতে সক্ষম ছিলেন এবং তাহা সম্পূর্ণরূপে পরিপাক করিয়া তাঁহার স্বাস্থ্য রক্ষা করিতেন। অতিরিক্ত আহার তখনকার দিনে পল্লীগ্রামে অসম্মানের বিষয় ছিল না। আধমণী কৈলাসের গ্রামে ‘পাচসেরী’ ‘দশসেরী’ ভোজন-রসিকের অসম্ভাব ছিল না। কোন ক্রিয়াকর্মের বাড়ীতে তাঁহার একসঙ্গে একদিকে আহারে বসিতেন। এজন্য সেই গ্রামে ‘পূবসারি’র প্রসিদ্ধি ছিল। ঐরূপ তদানীন্তন খুলনা জিলায় “আলগড়া” গ্রামের মধ্যসারি প্রসিদ্ধি ছিল। এরূপ আহার দেখিবার জন্য তখনকার দিনে বহুজনসমাগম ও বহুনিমন্ত্রণী সমাগত হইতেন। বর্তমানকালে

বিশুদ্ধ আহার্য বস্ত্র সংগ্রহ করা যেরূপ অসম্ভব, পাশ্চাত্য ভোগবাদী সত্যতার মোহে সকলেই আত্মকেন্দ্রিক ভাবাপন্ন হওয়ায় ভোজনরসিকগণের সম্মান বিলুপ্ত হইয়াছে।

এই গ্রামাঙ্গীনে যেমন এক দিকে আহার বিহারে একটি সার্বজনীনভাবে বর্তমান ছিল, নিত্য নৈমিত্তিক পূজা অর্চনার মধ্যেও সার্বজনীন ভাব ছিল। “সকলে আমরা পরের তরে” এই মহাবাক্যের মূর্ত্যস্থান ছিল ভারতের পল্লীগ্রাম। ভারতবর্ষের সাধকগণের ভ্রমস্থান এই পল্লী-মাতার নিভৃত প্রদেশে। আমি যে আদর্শ-স্থানীয় একটি পল্লীগ্রামের কথা লিখিলাম সেই গ্রামের একটি কথা শ্রীশ্রীকাশীধামে যাইয়া পরমা সিদ্ধি লাভ করেন। তিনি গত ১৩৫০ সালে ১২ই বৈশাখ তারিখে মরদেহ ত্যাগ করিয়া পরমপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। বর্তমানে কাশীধামে তাঁহার মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়া নিত্য পূজা অর্চনা চলিতেছে। তাঁহার সাধন জীবনে তাঁহার শরীরে নানা দেবদেবীর মূর্তি এবং নানা মন্ত্র ও বীজের প্রকাশ হইত। এই অদ্ভুত কাণ্ডের প্রকাশ অনেকে তাঁহাদের বাহ্যক্ষে দেখিয়াছেন। সাধক শ্রবর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় তাঁহাকে দেখিয়াছেন এবং তাঁহার ভূমিকাসহ “শ্রীশ্রীসিদ্ধিমাতা প্রসঙ্গ” নামক একখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ পুস্তক-প্রকাশিকা গ্রন্থকর্তা শ্রীমতী রাজবালা দেবী ১৯৪৮ গণেশমহলা বেনারস এ থাকেন।

পল্লীপ্রাণ অনাদিনাথের তেজস্বিতার একটা ঘটনা উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। তিনি যখন যশোহর জিলার অন্তর্গত লক্ষ্মীপাশা ডি, সি, ইন্সটিটিউশনের হেডমাষ্টার তখন তদানীন্তন ডিভিসনাল ইন্সপেক্টর স্কুল পরিদর্শনে আসেন। ইন্সপেক্টর খাঁ সাহেব হেডমাষ্টারের নিকট যেরূপ বিনয় এবং জো-হকুম মনোভাব আশা করিয়াছিলেন তাহা না পাইয়া তাহার নানা কার্যে নানা দোষ ত্রুটির উল্লেখ করিতে থাকেন। অনাদিনাথ তাহার স্বভাবস্থল নম্রতায় অকূঠ তীব্র ভাষায় প্রতিকথার প্রতিবাদ জানাইয়া যান। ইন্সপেক্টর সাহেব অবশেষে বিস্তৃত হইয়া পরিদর্শন পুস্তকে স্কুলের হেডমাষ্টার সম্বন্ধে তীব্র মন্তব্য লেখেন। ইন্সপেক্টর সাহেবের মন্তব্যে ইংরাজী ভাষায় ব্যাকরণঘটিত কতকগুলি ভ্রমপ্রসাদ থাকায় তাহা অনাদিনাথ সাহেবের গোচরীভূত করিলে,

তাহা সাহেবের ক্রোধাগ্নিতে স্তূভীভূত স্বরূপ হয়। ইহার ফলে স্কুলে যে সরকারী সাহায্য ছিল তাহা বন্ধ হইয়া বিজ্ঞানটি দুর্দশার সম্মুখীন হয়। স্কুলের কতৃপক্ষ অনাদিনাথকে তাহার ক্রটি স্বীকার করিয়া ইন্সপেক্টর সাহেবের মনোরঞ্জন করিবার নির্দেশদান করেন। অনাদিনাথ পদত্যাগ বাসনা প্রকাশ করিলে স্কুলের ছাত্রগণ তাঁহার পদত্যাগের বিরুদ্ধে একযোগে দণ্ডায়মান হয়। ইহাতে স্কুলটি ভাঙ্গিবার উপক্রম হয়। তৎকালীন সম্পাদক মহাশয় তখন পদত্যাগ করেন। ত্রীজ্যোতিষচন্দ্র চক্রবর্তী বি, এল মহাশয় সম্পাদক পদ গ্রহণ করেন। স্কুলের ঘাটতি পূরণ জ্ঞাত চাঁদা গ্রহণ করা হয় এবং অনাদিনাথ স্বয়ং স্বপ্রণোদিত হইয়া তাঁহার

বেতনের অর্ধেক প্রতিমাসে চাঁদা দিতে থাকেন। একজন শিক্ষকের পক্ষে একরূপ স্বার্থভাগ খ্যাত অসুগমীয়। তাঁহার মত উপযুক্ত একজন শিক্ষাবিদকে পাইলে পাশ্চাত্য অনেক স্কুল ধ্বংস হইত। ইন্সপেক্টর সাহেব অনাদিনাথের এইরূপ স্বার্থভাগের সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত হন এবং পুনরায় স্কুল পরিদর্শন করিয়া সরকারী সাহায্যের পুনঃ প্রাপ্তি করেন।

অনাদিনাথের মতো পল্লীপ্রাণ শিক্ষাবিদ যে পল্লীতে জন্ম গ্রহণ করেন সেই পল্লী দত্ত। সেই পল্লীগায়ের প্রায় সমস্ত গ্রামবাসী আজ উদ্ধাস্ত হইয়া তাবতমাতার স্বাধীনতার পাদমূলে দিকোঁত। তথাপি খণ্ডিত ভারতের অখণ্ড সাধনা মিলিলাভ করুক ইহা ভগবৎ চরণে প্রার্থনা। ঐ শুভমঙ্গল ঐ।

ফিরাতের দিগন্তে ছাড়া

মন্দাকিনী ভাঙ্গুড়ী .

কত জন যোঁর দুয়ারে এসেছে ফিরাতের দিগন্তে ছাড়া,
অহরোধ অতি তুচ্ছ তাদের রাখিতে পারিনি তায়।
কেহবা চেয়েছে এক মুঠো ভাত, বলেছি হবেনা ভাই,
খাওয়া দাওয়া সব মিটে গেছে দেখে হৈলে কিছুই নাই।
পুরান বস্ত্র লাগি কোন জন আসিয়াছে কাছে মম,
বলেছি, হবেনা এবে যাও তুমি, হয়েছি পাষণ্ড সম।
হয়ত কেহবা কোন দিন এসে যোগেছে থাকিতে ঠাই,
বলিয়াছি তাকে, অকুলান স্থান কোথা বল ঘর পাই।
“ডার খরচ চেয়েছে বালক করুণ আঁখিটি মেলি,
মিথ্যা বলেছি, ক্ষমা নাই যার, হেটমুখে গেছে চলি।

চাকরীর তরে ছয়ত বেকার এসেছে তরুণ ছেলে,
খালি নাই পদ, ফিরাতের দিগন্তে, বেঁচেছে চলিয়া গেলে।
যদি কেহ এসে বিপদে পড়িয়া চেয়েছে অর্থ দার,
অমনি সরিয়া পড়েছি তখন, মুখটি করিয়া ভার।
আপদে বিপদে স্বজন বন্ধু দেবা আসিয়াছে কাছে,
এড়িয়ে গিয়েছি স্বার্থে আমার আখাত লাগে বা পাছে।
সেই সব ঋণ এখন আমার অনেক হ’য়েছে জমা,
শোধ করিবার শক্তি কোথায়, করে সব মোরে ক্ষমা।
বুঝিনি তখন বারে বারে নাথ তুমি গেলে ফিরে ফিরে,
তাইতো এখন সদাই আমি যে ভাসি নহনের নীরে।

এ জীবনে কতু আপন করিনি ফেলিয়াছি দূরে যারে,
সমবেদনায় বুকের মাঝারে টেনে যেন নিই তারে।



গীতাভাবনী



স্বাধীনতা কল্যাণ - রাস

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

তেইশ

রমাকে আশীর্বাদ করে সাধুজি নমিতাকে রমার কাছে রেখে ফিরে গেলেন দেহতে। আলোক নিয়ে গেল তাঁকে মোটরে। দেহর পুণ্যসলিলা ইন্দ্রায়ণী নদীতে স্নান ক'রে ওদের হৃদয়ের মনের তাপ জুড়িয়ে গেল। সাধুজির ঘরে এসে বসতে সাধুজি বললেন : “আজ আর তর্ক প্রসঙ্গ আলোচনা নয় বাবা। আশ্রয় মেলে শুধু ভজনে, নাম গানে, তাঁর শরণ নিলে। গাও শুধু আত্মসমর্পণের গান। ধরো ফের নমিতার বাধা ঐ গানটি—ওর গান বড় সুন্দর। মেয়েরা সহজেই চলে হৃদয়ের হৃদয়ে। বড় প্রাণস্পর্শী ওর সেই গানটি, যেটি রমা সেদিন ওর সঙ্গে গাইছিল—‘তমসা যখন ছেয়ে আসে।’ গানটি হচ্ছে যাকে তোমরা সাহেবরা বলে authentic.”

আলোকও এ গানটি বড় ভালো বাসত। আজ মনটাও ওর ভার ছিল রমার কথা ভেবে—তাই গান জ'মে উঠল। দেখতে দেখতে—শুধু হুরেলা হ'য়ে নয়, ভজন হ'য়ে :

“তমসা যখন ছেয়ে আসে
অকূলে জপিতে যেন পারি :
‘সে আমাদের বাসে, ভালো বাসে,
রবে আমি তারি অভিসারী।’

শৈল তাহার দুর্গম,
কালোয় আলোক মুখ কাঁপে,
তবু সবি নয় ছায়া-প্রম
অপার-বিশ্বরী প্রাণে কাঁপে।

গায় সে : ‘অচিন পাথারে যে
দেয় কাঁপ অরি’ কাণ্ডারী,
না জেনেও জানে আঁধ'রে সে
স্বাধাও স্বধার অভিসারী।’

গানের শেষে সাধুজি অনেকক্ষণ ভাবসমাধিতে মগ্ন থেকে একদৃষ্টে তাঁর ঘরের সামনে তুকারামের ছবির দিকে তাকিয়ে রইলেন। পরে হঠাৎ বললেন, “তুকারাম আমার আদর্শ কেন জানো? কারণ জীবনে নানা দুঃখ দৈহিক দুর্ভিক্ষের সঙ্গে তিনি লড়াই ক'রে গেছেন, অতাব অনটন উপবাসের মধ্যেই কেটেছে তাঁর সারা জীবন—তবু কোনো দিনই তাঁর ইষ্ট বিঠোবার পায়ে ছাড়া আর কোথাও ঠাই চান নি। বাপ মাকে হারালেন—সতেরো বৎসর বয়সে, দুর্ভিক্ষে স্ত্রী মারা গেল একুশ বৎসর বয়সে, দেখতে দেখতে সঙ্গতিপন্ন হ'ল পথের ভিখারী। কিন্তু ঐ যে বললাম—তুকারাম তো চাননি সম্পদ, প্রতিষ্ঠা, সংসার, পরিবার, দেহস্থখ। দিনের পর দিন অনশনে অর্ধাশনে কাটাতেন নাম কীর্তনে—হয় ইন্দ্রায়ণীর তীরে, না হয় বিঠোবার মন্দিরে। তাঁর একটি অভঙ্গে তিনি গেয়েছেন—
বলেই সুর ক'রে :

“চাইল আমার জনে জনে করতে নাথের চরণ ছাড়া।
ধনধান স্থখ চায় না তুকা—বোকে না সংসারী ঘরা।
বিঠল করেন দাস যাকে তাঁর—দীক্ষা সে পার

ভায়ের কাছে

যারা হরিয় দাস হয়—তাঁর মন্ত্রপ্রাপি' বুকের মাঝে ॥



সাধু তাদের নাম—বারা রয় সব ছেড়ে তাঁর চরণ ধরি'।
প্রেমের ঋণে তাদের কাছেই পড়েন বাঁধা বন্ধু হরি ॥”

চক্ষিণ

মহুভাই ফিরে এল ম্লান মুখে। নমিতা ও রমা
জিজ্ঞাসা করতে কিছুই বলল না, ঘরে গিয়ে বিছানায়
শুয়ে পড়ল। নমিতা ভয় পেয়ে আলোককে টেলিফোন
করতে আলোক এসে ওকে সঙ্গে করে গেল ভক্তির
কাছে। ভক্তিকে নমিতা বলল যে, সম্ভবতঃ অলিভিয়া
মহুভাইকে টেলিফোনে ভয় দেখিয়েছে—মহুভাই দুর্বল তো
—ভয় পেয়েছে। শুনে ভক্তি একটু আশ্চর্য হয়ে বলল: “সে
কি? অলিভিয়া কোথাকার কে? রমা আমাকে
বলেছিল যে, সে একদিন মাতাল হয়ে বেলেলামি করেছিল
ব'লেই তাকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।”

আলোক (একটু চুপ করে থেকে): ভক্তি দি, রমা
আপনাকে সবটা বলেনি। শুধু মাতাল হওয়াই নয়—
আরো কিছু ঘটেছিল যা রমা মুখে আনতে পারে নি।

নমিতা (সবিস্ময়ে): কেমন ক'রে জানলে?

আলোক: গুরুদেব আমাকে বলেছিলেন। রমা
কেবল তাঁকেই বলেছিল সব কাহিনী। সে বলা যায় না।

ভক্তি: আমি শুনেও চাই না। আমি কেবল
একটা কথা জানতে চাই—মহুভাইয়ের আজ মন খারাপ
হয়েছে কি অলিভিয়ার তর্জনগর্জনে?

নমিতা: অসম্ভব নয়। ও-জাতের মেয়ে তো ভয়
বা লোভ দেখিয়েই কাজ হাসিল ক'রে থাকে। (একটু
পরে) তুমি একটুবার চলো ভক্তি দি।

ভক্তি: আমি গিয়ে কী করব বলো ভাই—যখন
জানি যে শোভনার মোহ ওর কাটেনি?

নমিতা: কাটেনি—এখনো?

ভক্তি: কাটলে কি অলিভিয়া ওকে ভয় দেখাতে
পারত?

আলোক: কিন্তু হয়ত অলিভিয়ার দরুণ নয়—হয়ত
মহুভাই মনমরা হয়ে আছে কান্সারের জ্ঞা।

ভক্তি: না, তা হ'লে সে ফিরে এসে তোমাদের কাছে
গোপন করত না। এর মূলে আছে ঐ শয়তানী।
(আলোককে) তুমি একবার যাও গুরুদেবের কাছে।
না—চলো আমিও বাণে।

নীলমণিকে ফের মালতীর কাছে দিয়ে আলোক,
নমিতা ও ভক্তি সোজা গেল সাধুজির কাছে। তিনি সব
শুনে অনেকক্ষণ চোখ বুজে রইলেন। তাবস্থ অবস্থায়
বললেন: “ঠাকুর!... ঠাকুর!... ঠাকুর!... রমাকে
দেখো।”

পচিশ

প্রায় আধঘণ্টা বাদে সমাধি ভাঙলে সাধুজি চোখ
খুলে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন দিগন্তে দৃষ্টনিবন্ধ ক'রে।
তারপরে একটু একটু ক'রে সহজ চে:নায় ফিরে এসে
বললেন ভক্তিকে: “আচ্ছা, তুমি অলিভিয়াকে জানতে?”

ভক্তি: না। আর জানার ইচ্ছেও হয় নি কোনোদিন।
তবে নমিতা ওকে দেখেছিল চ'তিনবার।

নমিতা (সাধুজির প্রস্রাবস্থক চোখের দিকে চেয়ে):
ই্যা, গুরুদেব, আমি মহুভাইয়ের ওখানে আমাকে দেখতে
মাকে মাকে খেগাম তো? তাই ওকে এড়িয়ে যাওয়া
সম্ভব হয়নি।

সাধুজি: তার নামে অনেক গুজব শুনেছি।

নমিতা: গুজব নয়—সত্যি। কিন্তু তার কথা আমি
আলোচনা করতে চাইনে। আপনিই তো বলেন
রক্ষিণদেব-চালচলনের আলোচনা করলেও সাধনার ক্ষতি
হয়!

সাধুজি: হয় তো বেটেই। কিন্তু আমি তার প্রসঙ্গ
তুললাম শুধু এই জ্ঞে যে—এই মাংস দেহল্যম যে শোভনার
সঙ্গে পরায়ণ করছে সমস্তের পারে একটু ঘরে—কোনো
হোটেলেরই হবে।

ভক্তি: বলেন কি গুরুদেব? শোভনা শেষে কি-
না এত নিচে নামল যে অলিভিয়ার সঙ্গে—

কপাটা শেষ হল না অফ-গাবগে।

সাধুজি: মা, মাংস আর বিশেষ ক'রে মেরে—
যখন একবার নামতে শুরু করে তখন শেষ পর্যন্ত না নেমে
প্রায় পামতে পারে না। (নমিতাকে) আচ্ছা, সাটা-
ক্রুজ ঠিক কী ঘটেছিল বলোতো? আমি ভুলে গেছি।
কিন্তু হয়ত মন দিয়ে শুনি নি সেদিন।

নমিতা: না গুরুদেব, ভোলেন নি আপনি, কারণ
আমিই সব কথা খুলে বলিনি। হচ্ছেছিল কি রমাকে
আনতে আমিও গিয়েছিলাম তো গত দোমবারে? সাটা

কুঞ্জে চারের ঘরে মনুভাইয়ের সঙ্গে আমি রমার কথা আলোচনা করছিলাম—এমন সময়ে মনুভাই শ্—শ্ করে উঠল—সঙ্গে আমাদের ঠিক পিছনের টেবিল থেকে একটি মেয়ে উঠে গেল। তার মুখটা ভালো দেখতে পাইনি আমি—কারণ একটা মোটা Veil ছিল—কিন্তু মনুভাই বললেন যে অলিভিয়া। তারপর সে আমেরদাবাদে টেলিফোন করেছিল মনুভাইয়ের সঙ্গে কথা কইতে চেয়ে। কিন্তু মনুভাই টেলিফোন ধরে নি।

সাধুজি : ও। তা হ'লে ব্যাপারটা জলের মতন সাক্ষ্য হ'য়ে গেছে। কারণ আমি দেখলাম সে শোভনাকে বলছে উইল পাণ্টানোর কথা।

নমিতা (ব্রত হ'য়ে) : বলছে ? আমরা ভেবে ছিলাম সে শুধু ভয় দেখাচ্ছে ব্র্যাকমেল করতে।

সাধুজি : শুধু ভয় দেখানো নয় মা, একেবারে হাতে কলমে। সে বলছিল অনেক কথা। সব বলতে ভালো লাগে না। বড় নোংরা কথা। তবে রমাকে একটু সাবধান ক'রে দেওয়া দরকার ভেবেই বলছি তাকে—তোমরা ফেরবার পথে বলতে ভুলোনা যে শোভনার সঙ্গে অলিভিয়ার একটা চুক্তি মতন হয়েছে। সে শোভনার হ'য়ে দাঁড়াবে—তুজনে জোট করে ভয় দেখাবে মনুভাইকে যে, উইল না বদলালে শোভনা কোর্টে যাবে undue influence এর চার্জ এনে, আর সে—মানে অলিভিয়া—কোর্টে সাক্ষী হবে যে মনুভাই লম্পট, বলবে সব কেলেকারির কথা। ভয় পেয়ে মনুভাই উইল পালটাতে বাধ্য হবে, তখন শোভনা অলিভিয়াকে দেবে কুড়ি হাজার টাকা।

আলোক : বলেন কি ? শোভনাদেবী টাকার জন্তে ব্র্যাকমেলারের সঙ্গে চুক্তি করলেন—নিজের স্বামীকে আদালতে অপদস্থ ক'রে ভয় দেখাতে রাজি হ'য়ে ? এষে—এষে অভাবনীয় গুরুদেব ! তুর্জনকে দমন করবেন কথা দিয়েও ঠাকুর কী ক'রে সয়ে আছেন এমন পাণ্ডিত্যের ? দারুণভূতো মুরারিই বটে !

নমিতা : বাবা, বাবা, বাবা ! তুমি যে কী হুমকাম ক'রে কথা বলো—

ভক্তি (ঝঙ্কার ক'রে কঁদে) : গুরুদেব ! কী পাপে আমার এমন বোন হ'ল ? কী হবে এখন রমার ?

সাধুজি : পাপ না মা—কালোর পটেই আলো ফোটে বেশি। তবে রমার জন্তে ভেবো না।

নমিতা (উদ্বিগ্নকণ্ঠে) কিন্তু ধরুন যদি ও এখন আসে শোভনার সঙ্গে।

সাধুজি : যদি বলছ কেন ?—আসবেই আসবে—শোভনার সঙ্গে সেই চুক্তিই হয়েছে—ঠাকুর আমাদের দেখিয়ে দিলেন।

আলোক : গুরুদেব, একটা প্রশ্ন মনে আসছে কিছুতেই ঠেকাতে পারছি না অপরাধ নেবেন না। কিন্তু আপনার ঠাকুর আপনার মতন স্ববোধ সাধুদের যেটুকু দেখিয়ে দেন, তার ফলে আমরা—মানে অবোধ অসাধুরা—যেন আরো উদ্ভ্রান্তই হয়ে পড়ি।

নমিতা : বাবা, ফে—র এই ভাষা গুরুদেবের সঙ্গে ?

সাধুজি : না মা, বলুক ও। গীতায় বলেন নি কি ঠাকুর : “তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া—উপদেশ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনঃ তত্ত্বদর্শিনঃ”—অর্থাৎ জানতে যদি চাও তবে যাও তাঁদের কাছে যারা জানী তত্ত্বদর্শী—তাঁদের কাছে নত হও, জিজ্ঞাস্য হও, ও সেবা ক'রে ভক্তিমান হও। আলোক বাবাজি যখন নত হ'তে নারাজ নন, আর গুরুসেবায় বিশ্বাস করেন তখন পরিপ্রশ্ন করার অধিকারী বৈ কি। তাছাড়া বললে মানে, অভিমানের গ্যাস বেরিয়ে গেলে—মানুষ হালকাও তো হয় খানিকটা।

আলোক : ধন্যবাদ, গুরুদেব ! আপনাকে ভালোবাসি সব থেকে কেন—বলব ? আপনি জানী ভক্তিমান ও পুণ্যাত্মা ব'লে তো বটেই, কিন্তু আরো বেশি এই জন্তে আপনি আমাদের মতন গড়পড়তা অবিশ্বাসীর দুঃখ বোঝেন অর্থাৎ দরদী।

সাধুজি (নমিতাকে) : সেদিন কী বাউলটা গাইছিলেন মা—“মনের কথা কইব কি সই, কইতে মানা, দরদী নৈলে প্রাণ বাঁচেনা”—না ?

আলোক : সত্যিই বাঁচেনা গুরুদেব, তাই তো কাঁদে ছেড়েও ছুটে ছুটে আসি আপনার কাছে—বখনই প্রাণ বেশি আনচান ক'রে ওঠে। আজ কিন্তু আপনিই আমো ফ'গ্যাসাদে ফেললেন—অজুনের ভাষায় : “বান্ধিপ্রণেব

বাক্যেন বুদ্ধিঃ মোহয়সীব মে—” উন্টোপান্টা কথা বলে বুদ্ধি আমার আরো ঘুলিয়ে দিলেন। বলিহারি!

সাধুজি (হেসে) : কিন্তু বুদ্ধি ঘুলিয়ে গেল কী দুঃখে শুনি? শোভনাদেবীর অশোভন আচরণের জন্তে, না অলিভিয়া দেবীর কন্দিবাজির জন্তে?

আলোক : এ-দুয়ের একটাও নয়। কারণ মন্দ-লোক কুপথ্যেই চলে এ দেখে দেখে আমাদের সকলেরই খানিকটা গা-সওয়া গোছের হ’য়ে গেছে। আমার বুদ্ধি ঘুলিয়ে যাচ্ছে ভাবতে—এই দুই মহীয়সী মিলে সড় করছে কী উদ্দেশ্যে? না, এক অসহায় ভক্তিমতীকে লাঞ্ছনা ক’রে তার প্রাণ্য থেকে বঞ্চিত করতে। যখন হঠাৎ তার বাপের স্মৃতি হ’ল তখন ঠাকুর কী ব্যবস্থা করলেন? না, এই দুই কুচক্রীর চক্রান্তে ছবল বাপ হোক নাজেহাল, আর বেচারি মেয়ে আসন্নগ্রসবা অবস্থায় এমন দিশেহারা হোক—যার দুঃখে শেয়াল-কুকুরও কাঁদবে। অথচ উঠতে বসতে গীতার আশ্বাস শুনি : ঠাকুর কথা দিয়েছেন—“পরিভ্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্টতাং...সম্ভবামি যুগে যুগে?” তবে হয়ত কলিতে সবই উন্টে যায় তাই হয়ত এ-যুগে সজ্জনের লাঞ্ছনা ও দুর্জনের জয়জয়কারই যুগধর্ম?

নমিতা : বাবা বাবা বাবা! তোমার মুখ একবার ছুটলে—

সাধুজি : ছুটতে দাও মা, আমাদের ঠাকুরটি ছোটোছুটিতেও পিছপাও নন—বরং অনেক সময়ে ছুটিয়ে ক্রান্ত ক’রেই তিনি অশান্তকে শান্ত করেন। (আলোককে) শোনো বাবা, সৃষ্টির আদিম কাল থেকে দেখতে পাও না কি যে, দুর্বৃত্তরা শেষে হার মানলেও প্রথমদিকে অনেক সময়েই জিতেছে? বেশি দূরে যাবার দরকার কি? যখন ক্রান্ত পড়ল তখন ক্রম জ্ঞাপন ও ইতালীর বড় ঠাকুর সয়েছিলেন—মানে sanction করেছিলেন—মানতেই হবে, কারণ কোনো কিছুই সংসারে ঘটতে পারে না তিনি veto করলে বা মঞ্জুর না করলে। কিন্তু তারপরে কী হ’ল বলো তো? হিটলার, মুলোলিনি, টোজোর শ্রীবুদ্ধি বা লক্ষ্যনিদ্ধি হ’ল কি? বাবা, ঠাকুরের সব চাল কেউই বুঝতে পারে না, কিন্তু একটা অকাটা সত্য কি চোখে পড়ে না তোমার—যে, হাজার ওঠা-পড়ার পরেও—ভুবতে ভুবতেও মাছুষ শেষে তলিয়ে যায় নি? এ-বিরাট

বিংশলীলার মধ্যে অগণ্য মানুষের জঘন্য কর্মকলে গড়ে উঠেছে এক এমন কুটিল গোলকধাঁধা যে, মাছুষ আজ চোখে দেখছে সর্গের ফুল। বটেই তো। কিন্তু তবু চোরাবালিতে “গেল গেল” বলে মাছুষ হাহাকার করলেও বারবারই মজতে মজতে সে বেঁচে যায় নি কি?—কুসৃত্তির ভূকানে ভরাডুবি হবার মুখে ভাঙা তরী বারবারই তীরে পৌছয় নি কি—যার ফলে পরে আবার আরো বড় জাহাজ গ’ড়ে মাছুষ পাড়ি দিয়েছে অকূলে? অর্থাৎ বারবার দারুণ সঙ্কটে পড়া সত্ত্বেও মাছুষের সভ্যতা মরিয়া-না-মরা রামের মতনই ভুবে গিয়েও ফের তার তর ক’রে তেলেই চলেছে—বিলুপ্ত হয়নি আজো। সমষ্টির জাতির বেলায় একথা যদি সত্য হয়, তাহলে শুণু ব্যস্তির বেলায়ই হবে অসত্য—এটাই কি তোমাদের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির শেষ রায়, অবিখ্যাসের শেষ সিদ্ধান্ত? বাবা, ঠাকুর মাছুষকে তাঁর বিরাট বিংশলীনা বুঝবার বুদ্ধি আজো দেন নি, তাই জ্ঞানিগ্রেহরাও শেষে নাজেহাল হ’য়ে বলতে বাধ্য হয়েছে যে, তাঁরা মাত্র কিছুকাল দেখতে পান, তারপরে সবই ঝাপসা। কিন্তু এটুকু তিনি আমাদের বুঝবার শক্তি দিয়েছেন যে, কোনটা শ্রেয় আর কোনটা মাত্র প্রেয়। আর চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন অশুস্তিবার যে, প্রেয়কে বরণ করার ফলে অনেক সময়ে প্রথম দিকে সহজ-পন্থীদের কিছু শ্রীগ্রহি হ’লেও—খতিয়ে তারাই জেতে বারো শ্রেয়কেই বরণ করে প্রেয়কে ছেড়ে। যদি সব সময়ে শ্রেয়-বাদীরা হেরেই মরত, তাহলে কেউই শ্রেয়কে চাইত না। বলবে—প্রেয়বাদীরা প্রথম দিকে অনেক সময়ে জেতে; মানি—কিন্তু শেষে টেকে কি? টেকে না, কারণ এইই হ’ল ঠাকুরের চিরন্তন বিধান : সত্যমেব জয়তে নানুতম—সত্যই বাঁচে মিথ্যা মরে। (মুহ হেসে) অবিশ্রি যার মন আত্মরিক ছাচে ঢালা—কিনা যার দৃঢ় বিশ্বাস—এর উন্টোটাই সত্য : অধর্মই টেকে, ধর্ম ডোবে—সে মিথ্যার পথেই চলবে, বটেই তো। তাই তাকে বলা যথা : “গুরুদেব গুরুমা বা রমাকে আদর্শ না ক’রে মহুভাই শোভনা ও অলিভিয়ার পদাঙ্ক অমুসরণ কোরো না, “কারণ” সে পরম ক’রে দেখতে চাইবেই চাইবে—অধর্মের পথে খতিয়ে স্বথ লাভ হয় না দুঃখ। কেবল এইটুকু লক্ষ্য কোরো যে, মহুভাই বা অলিভিয়া

যা শোভনা স্থখী হয় নি—মাহুঘের শ্রদ্ধা পায় নি—
যেখানে হাজার হাজার লোক গুরুদেব বা গুরুমার
ছৌওয়ায় পবিত্র হয়েছে, শ্রদ্ধা করতে শেখার ফলে জ্ঞান
ও শান্তি পেয়েছে, দুঃখ ও দৈন্তের মধ্যেও পেয়েছে পথের
পাথর। তাছাড়া আর একটা কথা: শোভনা ও
অলিভিয়া রমাকে লাঞ্ছনা করতে এ-অবস্থার পুণ্য
আসবে—হয়ত কাল-পরন্তর মধ্যেই আসবে। তোমরা
বলছ—না এলে শালো হ'ত। কিন্তু কেমন ক'রে
জানলে—তাদের এ-সময়ে আস'র ফল খতিয়ে ভালো হবে,
না মন্দ?

আলোক: খতিয়ে কোথাকার জল কোথায় দাঁড়াবে
কেউই বলতে পারে না আগে থেকে—মানি, কিন্তু রমার
এই দুর্বল অবস্থায় তাকে ফের লাঞ্ছনা করতে আসবে এই
দুই কুচক্রা—শবতেও মুণ্ডে পড়ছি। আপনি কি বলতে
চান যে, দুঃখ দুঃখ দেয় না? না, বলবেন বেদান্তের
গর্জনে কিম্বা শঙ্করভাষা আওড়ে যে, যেহেতু হাত পুড়ে
গেলে জলুনিটাও মায়া, সেহেতু “মায়াময়ম্ ইদম্ অখিলম্
হিত্বা—ব্রহ্মে লীন হও?”

সাধুজি (হেসে): বাবা, আমি গুরুদেবের কাছে
বেদান্তের মায়াবাদেও দীক্ষিত হইনি, শঙ্করপন্থী হবার
নির্দেশও পাই নি। আমরা হ'লাম লীলাবাদী—তাই স্থখ,
হাসি-অশ্রু, আশা-নিরাশা জীবন-মরণ কিছুই মায়া বলি
না। এও আমি মানি যে, যদি এই বিপুল দেহমনপ্রাণ
লীলার রঙ্গ-মঞ্চে দুঃখ দৈন্য পাপ প্লানি—এসবই নিছক
মায়াদেবীর ছায়ানৃত্য হ'ত, তাহলে সে-ছায়া আবহমানকাল
মাহুঘের ইতিহাসে দেশে দেশে যুগে যুগে জীবনের মান-
চিহ্নের বারো আনা জায়গা জুড়ে থাকত না। আমি শুধু
বলতে চাই যে অনেক সময় দুঃখের মধ্যে দিয়েই মাহুঘের
চেতনার বিকাশ দ্রুততর হয়—ভাগবতী-লীলার পুষ্টি হয়।
একটা দৃষ্টান্ত দিই: যুধিষ্ঠিরের জুয়াখেলায় আসক্তি
ছিল। এ আসক্তিকে তিনি প্রত্যাখ্য দিয়েছিলেন। সেই
কর্মফলে দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা তাঁকে সহ্যে হ'ল। আর সে
কী বিভৎস লাঞ্ছনা বলো তো? কল্লনা কঁরো তো একবার
তোমার ঘরের নিরপরাধা কুলবধূকে তোমার সামনে
বিবস্ত্রা করছে এক দৃশ্য! এ-অবস্থায় কৃষ্ণ এসে তার
লজ্জানিবারণ ক'রে ভগবতী রূপার ভোজবাজি দেখালেও

প্রশ্ন আসে বৈকি—দ্রৌপদীর এহেন লাঞ্ছনা হতে পারল কী
ক'রে? এ-প্রশ্নের কেবল একটিমাত্র সত্ত্বের আছে: যে
দ্রৌপদীর এ দুঃসহ লাঞ্ছনা না হ'লে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়ে
পাপিষ্ঠ কৌরবকুল নিমূল হত না—পাণ্ডবরা সব সহ্যে
রাজি ছিল—পারেনি কেবল তাদের প্রাণপ্রিয়র এই অপ-
মান। কাজেই কৃষ্ণের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্তে দ্রৌপদীকে হ'তে
হল উপলক্ষ্য বা রক্তরাঙা মুঘল বাই বলো—যার তাপে
কৌরবকুল গুঁড়ো হ'য়ে গিয়ে কুরুক্ষেত্রে নব ধর্মরাজ্যের
পত্তন হ'তে পারল।

আলোক। সবই বুঝলাম গুরুদেব, কোল প্রশ্ন আগে
এতে দ্রৌপদীর সাহসনা কোথায়—রাজনন্দিনী রাজবৎস
হয়েও কেন তাকে হ'তে হ'ল রক্তরাঙা মুঘল? কী দুঃখ
সহ্যে হ'ল তাকে ভাবুন তো?

সাধুজি। দুঃখ যে দারুণ কে অস্বীকার করছে?
কিন্তু গাছকে বিচার করতে হয় ফল দিয়েই তো। এ-
দুঃখের ফল কী হ'ল—দ্রৌপদীর চরিত্র মহিমময় হয়ে উঠে
সমস্ত মহাভারতকে দীপ্যমান ক'রে ধরে নি কি তাঁর
তেজস্বিতা ও তত্ত্বের আলোয়? সীতা সাবিত্রী যদি
দুঃখ না পেতেন তবে তাঁদের চরিত্র কি আজো প্রতি সতী-
লক্ষ্মীর অস্তরে প্রেরণা জোগাতে পারত? তেমনি
শোভনা ও অলিভিয়া যদি পাপিষ্ঠা না হ'ত তা হ'লে রমা
কি ফুটে উঠত এমন ছবিখানি হয়ে? (নমিতাকে)
আমি বলছি না মা, যে শোভনা ও অলিভিয়া কাল আসে
এ আমি চাই। কিন্তু হয়ত ঠাকুর চান—জানিনা, কারণ
ঠাকুর আমাকে জানানো দরকার মনে করেন নি। আমি
শুধু তোমাদের এইটুকু বলতে পারি যে তিনি যদি ওদের
আসা সত্যিই চেয়ে থাকেন তবে তার কারণ এই যে, ওদের
আসা দরকার ছিল তাঁর কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যসিদ্ধির
জন্তে—একে লীলা নাম দাও বা না দাও!

আলোক (স্বক)। উদ্দেশ্য? কী উদ্দেশ্য? ধরুন
যদি ওরা কাল এসে পড়ে—মনে করেন কি, মহুতাই পারবে
ওদের দুঃখনের সামনে দাঁড়াতে?

সাধুজি: না। মহুতাইয়ের যদি সে মনের জোর
থাকত তবে ওর আজ এ-দুর্গতি হত না। বাবা, তোমরা
সব কিছুই জ্ঞেই আমার ঠাকুর বেচারীকে দায়ী করো।
মহুতাইকে গুরুদেব গোঁরী আমি সাবিত্রী সবাই কত

বুঝিয়েছিলাম কী বলব। ঠাকুরের করুণা বাঁচায় আমাদের নানা ভাবেই, অনেকদিন তিনি সঙ্গে থাকেন আমাদের কৃকীর্তি—তিনি চান ব'লে—পাপী পাপের জগ্রে অতুতপ হয়ে অশান্ত হ'য়ে ফিরবে অধর্ম ছেড়ে ধর্মের দিকে। কিন্তু যখন সে কিছুতেই ফেরেনা—ইচ্ছে ক'রে জেনে শুনে সাপ পোষে, তখন সে পাপ-মিতালির ফল না ফ'লে পারে?

আলোক : কিন্তু সে-ফল ভুগতে হচ্ছে এখানে কাকে? বহু জলে পুড়ে রমা সব একটু স্থখ শান্তি পেয়েছিল—

সাধুজি : বাবা, ঠাকুর আমাদের সর্বদা স্থখশান্তির মধোই রাখতে চান না যে। তিনি চান আমাদের বিকাশ—যার ফলে মানুষ স্থখ দুঃখের পারে গিয়ে পায় পরমানন্দে চির প্রতিষ্ঠা—যখন স্থখের মধ্যে বিকাশ বন্ধ হয় তখনই দুঃখ আসে। কিন্তু দুঃখের মধ্যে অনেক সময়েই এমন বিকাশ হয়—বিশেষ ক'রে যারা তাঁকে চায় তাদের—যে বিকাশ স্থখের মধ্যে দিয়ে হতে পারত না। কিন্তু এজগ্রে চাই দুঃখকে শাপ ব'লে দেগে না দিয়ে তাঁর বিধান ব'লেই স্বীকার করা। এরই নাম আত্মসমর্পণ। স্থখের দিনে তাঁর জয় গান না করে কে? কিন্তু যখন চোখের সামনে আলোও কালো হয়ে আসে তখনো যে হার মানে না কেবল তারই চোখে সেই কালোর নবজন্ম হয় আলোর আলোর।

ভক্তি (অশ্রুজলকণ্ঠে) : সব বুঝেও তবু প্রাণ কঁাদে গুরুদেব—আরো এই ভেবে যে, আমার জগ্ৰই রমার হৃদশাপ হ'ল। তাই আপনার দুটি পায়ে পড়ি—আপনি ওকে বাঁচান এ-দুর্লয়ে।

সাধুজি : কে কাকে বাঁচায় মা? রাখতেও তিনি, মারতেও। আর দুঃখ কার নাম? যে তাঁর চরণে সত্যি শরণ নিয়েছে তার কাছে বিষও হবে অমৃত, ফণারও মাখায় মণি জলে উঠবে অন্ধকার কাঁটাবনে তাকে পথ দেখাতে—এই দীক্ষাই আজ পেতে হবে রমাকে, বলতে হবে মনে প্রাণে (উদ্বীপ্ত কণ্ঠে গান ধ'রে দিলেন) :

“দুঃখ আমায় চাইলে দিতে পাব না আর দুঃখ আমি।

তোমার তরে দুঃখ, শ্রামল, স্থখ হবে—যে দিবসযামী।

আশা-রভিণ স্থখের তরে

মন বার আঁজো কেমন কয়ে,

তোমার পরশ ছাড়াও আরও নানা হরষ চায় যে যামী !
তাকে পারে দুঃখ দিতে—চায় যে মাঝা যশ প্রণামী।

যে চায় তোমায় আশৈশবই থাকুক না তার হাজার কটি, কটি নিয়ে পড়ে, শ্রামল, তোমারি তো পায়ে লুটি :

তাকে তুমি নেবে না কি?

স্থখ দিয়ে হায় দেবে কীকি—

স্থখেও যার মন ভরে না—হোক না সে স্থখ হাজার

দামী ?—

দুঃখ দেবে তার কেমনে দুঃখ যে পায় স্থখ অনামী ?”

ছান্দিশ

নমিতা ফেরবার পক্ষে মোটের ভক্তিকে বলে : আর চোখের জল ফেলোনা দিদি।

ভক্তি : এ দুঃখের বরষা নয় ভাই, আনন্দাশ। সত্যি বলছি নমিতা, আমার সব দুঃখ গলে তৃপ্তি হয়ে গেছে আজ। আমার মন উঠেছে গান গেয়ে : এমন গুরু যে পেয়েছে দুঃখ তাকে আর দুঃখ দেবে কেমন ক'রে? (আলোককে) এ আমার কথা নয় ভাই। নীলমণি তখন আমার গভে তিন মাসের শিশু। আমি হঠাৎ মারা গেলেন। তাঁকে ভাদে! বেমেছিলামও সত্যি। তাই দুঃখ পাই নি এমন নয়—কিন্তু সে-দুঃখ আত্মকে দুঃখ দিতে পারে নি সত্যিই—এনে দিয়েছিল মুক্তির স্বাদ। আর তার কারণ আমার নিজের মনের জোর নয়—গুরুর করুণ। সেই গুরু আজ রমার জগ্রে সাক্ষাৎ ঠাকুরের কাছে দরবার করেছেন—এর পরেও ভাবনা? তবে আর শরণ নেওয়ার মানে কি? গুরুদেব সে-সময়ে আমাকে কী বলেছিলেন আনো? শু্য একটি শ্লোক—কিন্তু তার পিছনে ছিল তাঁর করুণা, তাই শ্লোকটি হয়ে উঠেছিল আমার কাছে মন্ত্র। বলেছিলেন : যদি কেউ তার কোনো গুরু-ঘোড়া কারুর কাছে বিক্রি করে—তারপরে সে পশুর ভাব কার? না, ক্রেতার, বিক্রেতার আর কোনো দায় থাকে না। তেমনি যে-ভক্ত সত্যি তার তত্ত্বমনপ্রাপকে গুরু বা ইষ্টচরণে নিবেদন করেছে তার আর কোনো দায়ই থাকে না, সব দায় ঠাকুরের। শ্লোকটি আমি মুখস্থ করেছিলাম চিন্তা'ং কুর্গার রক্ষাটের বিক্রীতদ্য যথা পশো :।

তথ্যপূর্ণ হরৌ দেহং বিঃসেদস্ত রক্ষণাং ॥

(গাঢ় কণ্ঠে) না, আমি আজ বাব না রমার কাছে। তোমরা শুধু বোলো—এই কথাটুকু যে, তার কাছে হুংখ আসতে পারে কেবল মুক্তি কাতর রূপে। কারণ গুরুদেব তার নিয়েছেন তার, দরবার করেছেন সাক্ষাৎ ঠাকুরের কাছে। ভক্তি আঁচলে চোখ ঢাকে।

সাতাশ

ভক্তিকে নারায়ণপেঠে পৌঁছে দিয়ে আলোক ও নমিতা গেল রমার গুহানে। রমাকে নমিতা সব কথাই বলল—কেবল অলিভিয়ার প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে। আলোকের ইচ্ছা ছিল বলবার, কিন্তু নমিতা মোটরে ওকে মানা করল, বলল: “অনেক সয়েছে, দুদিন একটু শান্তিতে থাক। তাছাড়া অলিভিয়া পুনায় না আসতেও তো পারে।”

হুংখের দীক্ষা সম্বন্ধে সাধুজি বা যা বলেছিলেন সব রমাকে ব’লে উঠবার সময় নমিতা বলল: “রাত হ’ল চললাম ভাই। ভক্তিদি হুচরদিনের মধ্যেই আসবে অনাখাত্রম থেকে এক মাসের ছুটি নিয়ে। আর আমি তো আছিই। দরকার হ’লেই টেলিফোন করিস—ছুটে আসব। সত্যি, আমারও মনে ভরসা এসে গেছে। তোর জন্তে আর ভাবব না। ভক্তিদিও বলছিল—কী বাবা? হাসছ যে!

আলোক বলল: “ভাবব না বললেই কি ভাবনা ছাড়ে মা? কমলী নহী ছোড়তী। তবে একথা জানি যে, রমা অনেক ভাগ্য ক’রে এসেছে—এমন সদগুরু তার জন্তে ভাবেন—ঠাকুরের কাছে দরবার করেন!”

নমিতা টুকল: “তবু বোলো তোমার বিশ্বাস কম।”

* * *

১০ই জুলাই প্রবর গুহানে সাধুজি ভজন করলেন। অনাখাত্রমের দাসীরা, মেয়েরা ও শিশুরা সবাই তুকারামের ভজনে তাঁর সঙ্গে ঘোয়ার দিল। ১১ই সকালে সাধুজিকে আলোক ফের দেহতে পৌঁছে দিয়ে বাড়ী ফিরতেই নমিতা বলল: বাবা, শুনছি নাকি পনশেট বাঁধ টলমল করছে। ভাঙলেই তো পুনা ভেসে যাবে বস্ত্রায়।

আলোক হেসে উড়িয়ে দিল: “দূর! যত সব

alarmist এর দল। ভয় দেখাতে ওদের কী যে আনন্দ! একটা গুজব পেলে হয়।”

নমিতা একটু ভেবে বলল: “কিন্তু বাবা... যদি ধরো এটা গুজব না হয়—তা হ’লে রমার কী অবস্থা হবে? মহুতাইয়ের বাড়িটি একেবারে নদীর পাড়েই—লোকের বলছে হঠাৎ জল আসবে—কখন যে আসবে কেউ জানে না। আর ওর যে অবস্থা, বুঝতেই তো পারো?”

“আরে দূর! পুণায় বস্ত্রা? শুনেছে কেউ? যত সব আশাঢ়ে গল্প!”

“তুমি বাবা কী যে! শুনছি পনশেট বাঁধ তাড়লে, সেই বিপুল জলের তোড়ে নাকি খড়্গবাসলার বাঁধও ভাঙতে পারে। তা হলে?”

আলোক (হেসে): একা রামে রক্ষা নেই তা স্বগ্রীব দোসর! পনশেটে শানালো না, তার উপর চাই খড়্গবাসলা! কোথেকে জোটাস তুই এসব গুজব?”

নমিতা (বলল): সাস্থন হাঁসপাতালে। যে-ছুটি নাসের কাছে কাজ শিখতে যাই না? তারাই বলছিল।

আলোক (হো হো ক’রে হেসে): এতক্ষণে বোঝা গেল। ওদের একত্রে জীবনে এই ধরণের গুজবেই শুধু আসে বৈচিত্র্য—রোমান্স, রোমান্স!

নমিতা: কিন্তু ধরো যদি বস্ত্রা সত্যি আসেই রাতদুপুরে যখন রমা থাকবে ঘুমিয়ে—

আলোক: ওঃ! যদি—যদি—যদি! বাঃ—পালা:। না না, শোন্—তোকে বলতে ভুলে গেছি—মেদিন সাধুজি তোর ‘তমসা যখন ছেয়ে আসে’ গানটি আমার মুখে ফের শুনতে চাইলেন।

নমিতা: বাঃ! তুমি কি গুটা জানো? মানে স্বর?

আলোক (হেসে): ঠিক জানি না—তবে শুনেই মেরে দিলাম! না না, ঠাট্টা নয়—সাধুজি খুব সুখ্যাতি করছিলেন তোদের। বললেন: “মেয়েরা হৃদয়ের হুকুম মেনে চলে সহজেই—আর বাবা চলে—তাদের প্রেমের ঋণে হরি বাঁধা পড়েনই পড়েন।” ব’লেই হেসে, এ-হেন ঋণগ্রস্ত হরি ঋণ শুধবেন কি রমারূপিনী ঋণদাত্রীকে বানের জলে ভাসিয়ে দিয়ে? বাঃ! পাত্রে পিণ্ডর বই কী পড়লি এত রাত জেগে?

আটাশ

রমা টেলিফোন করল নমিতাকে ১১ই জুলাই : “দিদি
শীগগির এসো। বড় বিপদ।”

আলোক নমিতাকে নিয়ে ছুটল। রমা নমিতাকে
দেখেই বলল : “দিদি, সেই যেয়েটা” ব’লেই ফুঁপিয়ে
ফুঁপিয়ে কান্না।

* * *

নমিতার আদরে শান্ত হ’য়ে রমা বলল সব।

“এইমাত্র টেলিফোন করেছে সে—”

“অলিভিয়া?”

রমা : ওর নাম উচ্চারণ করাও পাও দিদি। বলল
কি জানো? বলল—সে কথা কী ক’রে মুখে আনব
দিদি? (ফের চোখে আঁচল দেয়)

নমিতা : বলতে হবে না ভাই, গুরুদেব আমাদের
কালই বলেছিলেন। তোমার মা আদালত করবেন উইল
নিয়ে, আর ও বলবে—যা ও জানে।

রমা : গুরুদেব বলেছিলেন? কই বলো নি তো
কাল?

নমিতা : না, ভেবেছিলাম ভোর মন খারাপ হবে—
রাতে হয়ত ঘুমতে পারবি নে। তাছাড়া আমরা ভেবে-
ছিলাম—ভার ভাবনা কী যার জন্তে গুরু ভাবছেন—আর
এমন গুরু।

রমা (চোখ মুছে) : ঠিক বলেছ দিদি। আর ঠিক
সময়েই আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছ যে যে-মেয়ে পেয়েছে
গুরুপার রক্ষাকবচ—তাকে বিধিতে পারে না কোনো
অমঙ্গলের বাণ। তাছাড়া দিদি, দুঃখ যদি এখনো
আমাকে শুধু দুঃখই দেয় তবে কিসের সাধনা করলাম
এতদিন, আর কোন মুখেই বা গুরু গুরু করি? না, আর
অধীর হব না। কেবল দিদি, বাবার জন্তে বড় কষ্ট হয়।
বাবা কেমন যেন একেবারে মিইয়ে গেছেন—কাকুর সঙ্গে
দেখা করেন না। আমি ডাকলেও বলেন : এখন থাক,
একটু একলা থাকতে চাই।

নমিতা : কিন্তু কী হয়েছে? অলিভিয়া কী বলল
তোমাকে?

রমা (শান্ত কণ্ঠে) : বলল অনেক কথা। সে মুখে
উচ্চারণ করাও পাও।

আলোক : তবু শুনি। আমাদের জানা দরকার।

রমা : বলল যে, ও পিটো সাহেবের কাছে তুনেছিল
বাবার কৌতুকলাপের কথা, কিন্তু বিশ্বাস করে নি।
কিন্তু শেষে একদিন বাবা ওকে দূরে বনের মধ্যে এক
ডাকবাংলোয় নিয়ে গিয়ে একলা পেয়ে নির্জনে—সে বলা
যায় না দিদি—(হুহাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে
কান্দে)।

নমিতা : এ-সব ওর বানানো—অন্ততঃ যাঁরো
জানা। কিন্তু মরুক গে তুই কান্দিস নে ভাই। আর
বলতেও হবে না কিছু। আর একটু নাম কর।

রমা : না, বলব। (চোখ মুছে) ও বলল—কলে
নাকি ওর একটি সম্ভান হয়। তখন বাবা ওকে দশ
হাজার টাকা দিয়ে কলকাতা পাঠিয়ে দেন। কলকাতায় ও
এক বৎসর কী করেছিল তা অবশ্য আমাকে বলে নি,
তবে বলল—দশ হাজার টাকার আর কদিন চলে—ভাই ও
বাবার কাছে আরো কিছু টাকা চাইতে এসেছিল তাঁর
অপিসে, কিন্তু বাবা ওকে খেদিয়ে দেন। তখন বাধ্য
হ’য়ে ও জুজুতে গিয়ে মাকে সব বলে। মা টেলিফোনে
এইমাত্র আমাকে যা মুখে আসে তাই ব’লে গালমন্দ করে
বললেন তিনি কাল ফিরে আসছেন—ঐ মেয়েটাকে নিয়ে।
বাবাকে গিয়ে একথা বলতুই তিনি একেবারে ভেঙে
পড়লেন—বিছানায়। আমি যেতে আমাকে বললেন :
“আমাকে একটু ছেড়ে দাও মা, আমি ভেবে দেখি।
আমার মাথার মধ্যে সব গোলমাল হ’য়ে গেছে।” (কঁপে
কেলে) এখন কি হবে দিদি, আমি আমার জন্তে ভাবছি
না, কিন্তু বাবার এত কষ্ট যে দেখতে পারি না, একে
ক্যাপার—তার উপরে—

আলোক : তোমার মা কবে আসবেন বললেন?

রমা : আমাকে তো বলেছিলেন—কাল ফিরবেন
বাবা বললেন সম্ভবতঃ ভোরবেলা মোটরে রওনা হবেন—
এখানে পৌঁছবেন দশটা নাগাদ। বাবাকে নাকি মা তর
দেখিয়েছেন—বধেতে তাঁর নিজের বিশ্বাসী উকিলের সঙ্গে
পরামর্শ করছেন। দরকার হ’লে নাকি মামসাও করবেন—
বাবার মাথা খারাপ হয়েছে প্রমাণ ক’রে।

আলোক : মজুতাইকে একথা বললেন কে? তোমার
মা?

রমা :—না—ঐ মেয়েটা—যার নাম মুখে আনাও
পাপ। সেই তো যার সঙ্গে চক্রান্ত করছে।

নমিতা (ওর কণ্ঠ বেটন ক'রে) : ভাবিসনে। কাল
ওরা আসে আলোক—তুই চল আমার সঙ্গে।

রমা : না দিদি, গুরুদেব যখন আমাকে এখানেই
ধাকতে বলেছেন তখন আমি আর কোথাও যাব না।

নমিতা (একটু ভেবে) : কিন্তু শুনছি বজা—

আলোক : না না—ওসব বাজে গুজব।

রমা : গুজব হোক বা সত্যি হোক আমার কাছে
একই কথা। গুরুদেবের অহুমতি বিনা আমি এখান থেকে
যাব না। তাছাড়া বাবা একলা—তাকে ছেড়ে যাব কেমন
ক'রে ?

আলোক : আচ্ছা আমি গুরুদেবকে ফোন করছি।
তোমাকে জানাব।

* * *

ফোন করতে সাধুজি বললেন : “না, রমা ওখানেই
থাকুক।

আলোক (টেলিফোনে) : লোকে বলছে পনশেট
ডায়াম না কি ভেঙেছে—বজা আসতে পারে দু একদিনের
মধ্যেই।”

সাধুজি (টেলিফোনে) : হোক। বজা যদি আসেও
—রমার কিছু হবে না।

[ক্রমশঃ]

ধাত্রীরূপা

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ প্রতিহার

বিচিত্রিত ধাত্রী ধরা স্নানোজ্জ্বল ধূল ধূসর !
ছন্দোময়-ছন্দোহীনে গঠিত যে বৈষত ধাত্রীরূপা !
বৈপুল্য-ক্ষীণতাধারা দুয়ে মিলে হেথা একাকার
পাখিব রজের পাশে রজোহীন অতি অপরূপা !

আকাশ-চাঁদোয়া-তলে পাণ্ডু পৃথ্বী রেদাক্ত পঙ্কিল !
লালাশ্রাবী পতঙ্গের নৃত্যগানে বীভৎস ভয়াল।

আকাশ বাসরে হোথা মেঘে মেঘে
রামধনু-শোভা !
পাখিব পুষ্পের পাশে রোগ-শোক মূর্তি
করাল !
কুটিল ক্রুরতা আর কাপট্যের নগ্ন বীভৎসতা—
তারি পাশে রেহ-প্রেম পৃথ্বী-পদ্মে
অতি মনোলোভা !



স্বামীজীর মতবাদ

৬শ্রীলকুমার ঘোষ বি-এল, বিগ্লাবিনোদ

প্রার্থনাকালে আমাদের মনে যে ভাবময়রূপের উদয় হয় তাহা ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা আমাদের সর্বতোভাবে কর্তব্য। ঈশ্বর-চিন্তা আমাদের মনে পবিত্রতা আনে—আনে দৈর্ঘ্য, সহনশীলতা, প্রেম ও মৈত্রীভাব।

১। মূর্তিপূজা

চিকাগো বক্তৃতায় অমরসাধক স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, (১৯৯১৮৯৩)—“কলেই বৃক্ষের পরিচয়। যখন দেখি যে যাহাদিগকে ঐকান্তিক বলা হয়, তাঁহাদের মধ্যে এমন মানুষ আছেন, যাহাদের মতো নীতিজ্ঞান, আধ্যাত্মিকতা ও প্রেম কখনও কোথাও দেখি নাই, তখন মনে এই প্রশ্ন উদ্ভিত হয়: পাপ হইতে কি কখন পবিত্রতা জন্মিতে পারে?”

কুসংস্কার মানুষের শত্রু বটে, কিন্তু ধর্ম্মাক্রান্ত আরও খারাপ। খ্রীষ্টানরা কেন গীর্জায় যান? ক্রুশই বা এত পবিত্র কেন? প্রার্থনার সময় কেন আকাশের দিকে তাকানো হয়? ক্যাথলিকদের গীর্জায় এত মূর্তি রহিয়াছে কেন? * হে আমার ভ্রাতৃবৃন্দ, নিঃশ্বাস গ্রহণ না করিয়া জীবনধারণ করা যেমন অসম্ভব, চিন্তাকালে মনোময়রূপবিশেষের সাহায্য না লওয়াও আমাদের পক্ষে সেইরূপ অসম্ভব। ভাব পরম্পরাক্রমে জড়মূর্তি দেখিলে মানসিক ভাববিশেষের উদ্দীপন হয়, বিপরীতক্রমে মনে ভাব বিশেষের উদ্দীপন হইলে তদনুরূপ মূর্তিবিশেষও মনে উদ্ভিত হয়। এই জন্ত হিন্দু উপাসনার সময়ে বাহ্যপ্রতীক ব্যবহার করে। সে বলিবে—তাহার উপাস্ত দেবতার মন স্থির করিতে প্রতীক সাহায্য করে। সে তোমাদেরই মতো জানে, প্রতিমা ঈশ্বর নহে, সর্বব্যাপী নয়। আচ্ছা

বলতো, ‘সর্বব্যাপী’ বলিতে অধিকাংশ মানুষ প্রকৃতপক্ষে সারা পৃথিবীর মানুষ কি বুঝিয়া থাকে? ইহা একটি শব্দ মাত্র—একটি প্রতীক। ঈশ্বরের কি বিস্তৃতি আছে? তা যদি না থাকে, তবে ‘সর্বব্যাপী’ শব্দটি আবৃত্তি করিলে আমাদের মনে বড় জোর বিস্তৃত আকাশ অথবা মহাশূন্যের কথাই উদ্ভিত হয় এই পর্য্যন্ত।”

“হিন্দু ধর্ম্ম” শীর্ষক একটি শিক্ষাগ্রন্থ ও চিন্তাশীল গ্রন্থক চিকাগোর ধর্ম্ম সভার নবম দিবসের অধিবেশনে তিনি পাঠ করেন, তাহা হইতে পুস্তক মন্তব্য উদ্ধৃত হইয়াছে।

বিশ্ব-বন্দিত বিবেকানন্দ আরও জানাইয়াছেন, আপ্ত বাক্য বেদ হইতে হিন্দুগণ তাহাদের ধর্ম্মলাভ করিয়াছেন। তাহারা বেদসমূহকে অনাদি ও অনন্ত বলিয়া বিশ্বাস করেন। একখানি পুস্তককে ‘অনাদি ও অনন্ত’ বলিলে হাত্তকর বলিয়া মনে হইতে পারে বটে, কিন্তু ‘বেদ’ শব্দ দ্বারা কোন পুস্তক বিশেষ বুঝায় না। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে যে আধ্যাত্মিক সত্যাদমুত আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, বেদ সেই সকলের সঞ্চিত ভাণ্ডার স্বরূপ। আবিষ্কৃত হইবার পূর্বেও মাধ্যাকর্ষণের নিয়মাবলী যেমন সর্বদাই বিद्यমান ছিল এবং সমুদয় মৃত্যু সমাজ তুলিয়া গেলেও যেমন ঐগুলি বিद्यমান থাকিবে, আধ্যাত্মিক জগতের নিয়মাবলীও সেইরূপ। আত্মার সহিত আত্মার যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ, প্রত্যেক জীবাত্মার সহিত সকলের পিতাম্বরূপ পরমাত্মার যে দিব্য সম্বন্ধ—অবিদ্যুত হইবার পূর্বেও সেগুলি ছিল এবং সকলে বিদ্যুত হইয়া গেলেও ঐগুলি থাকিবে।

২। ভগবৎ-প্রেম

বিশ্ববরেণ্য স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় পুরম্মা বক্তৃতাদানে সকলের দ্রাণে প্রেরণার আলোক জ্বলাইয়াছেন। তিনি ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের

* প্রোটেষ্ট্যান্টদের মনে প্রার্থনাকালে এত ভাবময়রূপের আবির্ভাব হয় কেন?

২৫শে সেপ্টেম্বর চিকাগোর তৃতীয় ইউনিটেরিয়ান চার্চের বক্তৃতাগুহে বাগিতাপূর্ণ আলোচনায় “ভগবৎ-প্রেম” বিষয়ে যে বাগী উদাত্তকণ্ঠে শুনান তাহাতে শ্রোতৃবর্গ বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। পরদিন ২৫শে সেপ্টেম্বর চিকাগো হেরাল্ড নামক বিখ্যাত সংবাদপত্র সপ্রশংস বিবরণীতে উহার সারাংশ এই ভাবে প্রকাশ করে:—“ঈশ্বর পৃথিবীর সর্বত্র পুঞ্জিত হন, কিন্তু বিভিন্ন নামে এবং বিভিন্ন উপায়ে। মহান ও সুন্দর ঈশ্বরকে উপাসনা করা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক, এবং ধর্ম মানুষের প্রকৃতিগত। সকলেই ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে এবং ঈশ্বরের প্রত্যুত্তর প্রেমই মানুষকে দান, দয়া, ত্রায়পরতা প্রভৃতি সংস্কারে প্রণোদিত করে। সকলেই ঈশ্বরকে ভালবাসে, কারণ তিনি প্রেম স্বরূপ।”

অন্ধের মত জড়বিজ্ঞানের অহুসরণ তাঁহার নীতিবিকঙ্ক ছিল। তিনি পাশ্চাত্যের জড়বাদী দর্শন অহুমোদন করিতেন না, বরং অধ্যাত্মতত্ত্বের অঙ্গীকারে অপার আনন্দ অনুভব করিতেন। মানসিক উৎকর্ষ সাধনের আদর্শ ছিল প্রাচীন প্রাচ্য সভ্যতার মহামুগ্ধতা, উদারতা ও ব্যাপক প্রেম ধর্ম। আকাঙ্ক্ষা অচ্যুত প্রসব করে, বার্ষ আকাঙ্ক্ষা পরম জালা, বিষাদ ও নৈশাশ আনয়ন করে বলিয়া নিকাম কর্ম ও বাসনা-শূন্য আচরণ হিন্দুশাস্ত্রে বহুবধি ধ্বনিত হইয়াছে।

৩। পরাভক্তি

পরভক্তি ছিল তাঁহার কাম্য। নিকাম যোগী নিবিড় সাধনা বলে যে অপার্থিব রত্ন লাভ করিয়াছিলেন তাহা অপ্রতিহত অবিকল্প পরাভক্তি। এই ভক্তির গুণে প্রাজ্ঞপ্রবর অনিত্য বস্তুর প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছিলেন, জগৎবাসীকে ভ্রাতৃসম্বোধন করিয়া প্রেমালিঙ্গন দিতে পারিয়াছিলেন। আমেরিকা হইতে ফিরিয়া এই কথ্যযোগী মাদ্রাজ, কলিকাতা ও হিমালয়ে তিনটি কেন্দ্র স্থাপন করিয়া ধীর ভাবে প্রচার কার্য আরম্ভ করাই ভাল মনে করিলেন। বেদান্তধর্মের মহৎ আদর্শ প্রচার কার্য মানবের আত্মোন্নতির চরম ও প্রকৃষ্ট পন্থা তিনি বিশ্বাস করিতেন। এ কারণ আমেরিকা মহাদেশে তৎক্ষণাৎ স্বামী সারদানন্দ ও ইংলণ্ডে পুতচরিত্র স্বামী অঞ্জনানন্দ বেদান্ত রূপে ছাত্র সমাজ কর্তৃক সাদরে গৃহীত হইয়াছেন দেখিয়া জনকল্যাণকামী বিবেকানন্দ আনন্দে

আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। “বাদশী ভাবনা বস্ত্র লিকিতবর্তি তাদৃশী”—এই মহৎ বাক্য অহুসারে দেখা গেল স্বামীজীও ভক্ত মিসেস ওলিবুল তাঁহার ভারত প্রত্যাগমনের বার্তা শুনিয়া তাঁহাকে জানাইলেন—ভারতীয় কার্যের জন্ত তিনি প্রয়োজন মত অর্থ প্রদান করিতে সম্মত আছেন। ইহা তিন্ন প্রস্তাবিত রামকৃষ্ণ সন্ন্যাসী সমাজের জন্ত যে একটি স্থায়ী মঠ নির্মাণ করিবার সঙ্কল্প তিনি করিয়াছেন দানশীলা পুণ্যবতী এই মহিলা উক্ত মঠ প্রতিষ্ঠাকল্পে তাহার ব্যয়-ভার বহন করিবেন।

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা আগস্ট রবিবার অপরাহ্নে পাশ্চাত্য দেশে Thousand Island park-এ শিষ্যমণ্ডলীর নিকট তিনি বলিয়াছিলেন, “Until we realise God for ourselves we can know nothing about Him. Each man is perfect by his nature, prophets have manifested this perfection, but it is potential in us”. (Inspired Talks)

৪। অধৈতবাদ

দূরদর্শী তত্ত্বজ্ঞানী স্বামীজী অধৈতবাদের আদর্শে জীবন নিয়ন্ত্রিত করিয়া রাখিয়া ছিলেন। ঈশ্বরের সবা সর্বত্র অনুভব করিতে পারিলে, মনের মধ্যে যত কলুষ, আবিলতা, বৈতভাব দূীভূত হয়। অপূর্ণ অধৈতভাবে মন-প্রাণ উজ্জল ও প্রফুল্ল হইয়া উঠে। ঈশ্বর হাতে জীব পৃথক বলিয়া প্রতীয়মান হয়না,—জড় ও জীব এক হইয়া যায়। তাঁহার সর্বব্যাপকত্ব গুণ উদ্ভাসিত হয়, প্রচারিত হয়। জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভিন্ন অবস্থা উপলব্ধি করিতে পারিলে পরমার্থ-লাভের পন্থা স্ফুট হইয়া উঠে। স্বামীজী সেইজন্ত অধৈতবাদী বোদ্ধান্তপ্রচারে মনোনিবেশ করিয়া ছিলেন। মহর্ষি শঙ্করাচার্য এই মূল্যবান তত্ত্ব ও জনপ্রিয় দর্শন নৈপুণ্যের সহিত যেভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা প্রবিশদানযোগ্য।

৫। মানব-প্রেম

মানব-প্রেম অদ্ভুতকর্ম্য অমিত-ভেজা স্বামীজীর রোমাঞ্চকর জীবনে সাক্ষ্যের কারণ বলা বাইতে পারে। তাঁহার বিশাল স্বদয়ে মানব-প্রেম যে নিগূঢ়ভাবে বাসা বাধিয়াছিল তাহার পরিচয় তাহার জীবনচিহ্নে নানা ভাবে প্রতিকলিত। দলিত, পতিত সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁহার

অকৃত্রিম করুণা সর্বজন-বিস্তৃত। অল্পমত জাতি সর্বত্র তাঁহার স্নেহের পাত্ৰ হইয়া অনাবিল প্রেমের অংশ গ্রহণ করিত। বাক্সলার শ্রেষ্ঠ নাট্য-শিল্পী পরম শ্রদ্ধাভাজন স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বলিয়াছেন—তোদের স্বামীজীকে অদ্ভুত প্রতিভাশালী বেদান্তের পণ্ডিত বলিয়া ভালবাসিনা, তাঁহার করুণায় সতত ত্রব হৃদয়ের মতই তাঁহাকে ভালবাসি।

একদিন আমেরিকার এক প্রমোক্তর সভায় একজন পরম পবিত্রস্বভাব স্বামীজীকে প্রশ্ন করিয়া বসিলেন, “স্বামীজী, অপবিত্রতার মূর্তিস্বরূপিণী বেঙ্গাগণ দ্বারা সমাজে অকলাগ ভিন্ন আর কিছু হয় কি? ধীরপ্রজ স্বামীজী সহনশীল হৃদয়ে তৎক্ষণাৎ করুণামিত্ত কর্ণে উদর দিলেন, “পথে দণ্ডায়মানা তাহাদের দেখিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিও না। তাহারাই বর্ণের মত দাড়াইয়া শত শত সতীকে লম্পটের অস্ত্রায় অত্যাচার হইতে রক্ষা করিতেছে বলিয়া ধন্যবাদ দিও। তাহাদিগকে ঘৃণা করিও না।” বাৎসবে উক্ত হইয়াছে—পাপকে ঘৃণা করিও, পাপীকে নহে।

মানব-প্রীতি তাঁহার এত প্রবল ছিল যে ইহার প্রভাবে তিনি ১৮৯৬ খ্রিঃ ৬ই জুলাই লণ্ডন হইতে এক শিষ্যকে লেখেন, এংলো ইণ্ডিয়ানদের মধ্যেও দেবত্ব উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। সহ স্তুতি ও ধৈর্যের সহিত, ৩৩ বৎসর বয়সেও বেঙ্গাগণের সহিত এক বাড়ীতে বাস করিতে পারি, ঘৃণা আসেনা।

অজ্ঞ, দরিদ্র, নিপীড়িত ব্যক্তির কথা বাদ দিলেও উদারচিত্ত স্বামীজী পতিতা নারী ও সমাজে চির-দুর্গতিদের পর্য্যন্ত করুণার সহিত আহ্বান করিয়া গিয়াছেন।

অনন্ত অসীম বিশ্বসংসারে যে মহাশক্তি সকল ব্যবধান তাক্রিয়া নিজ বশে সমস্ত আনিতে পারিয়াছেন তিনি বকী, পুরুষোত্তম। সেই এক বিরাট পুরুষবলী সর্বভূতান্তরায়ী একরূপকে বহুরূপে পরিণত করিতে পারিয়াছেন, তাহাকে যে সকল ধীর পুণ্যবান ব্যক্তি আত্মস্বরূপ দেখেন তাঁহাদেরই শাখত স্থখ অন্তদের নহে, (কঠ ২।২।১২), যিনি সকল অনিত্যের মধ্যে নিত্য, কিংবা সকল নিত্যের মধ্যে নিত্য, সকল চেতনার মধ্যে যিনি চেতন, যিনি এক থাকিয়াই বহুর কাম বিধান করিতেছেন, যে ধীরগণ তাঁহাকে আত্মস্ব

অনুদর্শন করেন, তাঁহাদেরই শাখতী শক্তি,—ইতরদের নহে। (কঠ ২।২।১৩)।

স্বামীজী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতিরস, বাদ, লাধনা, চর্চা, উপাসনা, কুরাতি, অশাশ্বত, অস্বাভাবিক পরিবেশের মধ্যে চেতনার স্পর্শ, ভগবানের রূপ অমুভব করিতেন।

৬।শিক্ষাদান

জয়পুর হইতে ক্ষেত্রী ২০ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত। অভাখনা সভায় সকলে উপবেশন করিলে রাজকম্বারীগণ, সন্দর ও উপস্থিত মহাপ্রবাসীগণ একে একে স্বামীজীর পদপূজা গ্রহণ করিয়া প্রথা অনুসারে তাঁহাকে সকলে দুই টাকা করিয়া প্রত্যেকে নমস্কার দিলেন। রাজা বাহাদুর বয়ংজিন সতঃ মুগ্ধ নমস্কার দিয়া অভিনন্দনপত্র পাঠ করিলেন। পরাশ্রমে স্বামীজী রাজ-দরবারে শিক্ষা বিস্তারের প্রয়াসে প্রীত হইয়া তাঁহার ভাবনে বসিলেন—শিশু পক্ষে শিক্ষা দিতে হইলে তাহাদের প্রীতি অগাধ ব্যবস্থা সম্পন্ন হইতে হইবে। বিশ্বাস করিতে হইবে যে শিশু শিশু-শ্রমের শক্তির আধার। শিশুদিগকে শিক্ষাদিবার সময় আমোদগকে আর একটি বিষয় স্বরূপ রাখিতে হইবে তাহারাও বাহাতে নিজেরা চিরা কল্পিতে শিখে, তৎসিঙ্গে চন্দ্রমাহ দিতে হইবে। এই মৌলিক চিন্তায় অভাবই ভারতের বর্তমান দীনবন্ত্য কারণ। যদি এই ভাবে ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া হয় তবে তাহারা মাছুষ হইবে, এবং জীবনসংগ্রামে নিজেদের সমস্তপুণ্যে সমর্থ হইবে।

বিশেষ সন্তব্যাপার অনুধাবন-যোগ্য। এই অসীম সৃষ্টি রহস্য বিশাল ও অলৌকিক, ইহা কতকগুলি নিয়মাবলীর বিষয়কর বা উদ্ভাবিত সমাবেশ মাত্র নহে। অনন্ত কাণ্ড-কারণের ইহা বন্ধন স্বরূপ নহে। এই নিয়মের উদ্ভে প্রত্যেক পরমাণু ও শক্তির মধ্যে আছে প্রাণ, আছে জীবন, সত্তা। ইহার মধ্যে অমৃত্যুত রহিয়াছেন এক অসীম ক্ষমতাশালী বিরাট পুরুষ, ইহার আজ্ঞায় বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, অগ্নি প্রজলিত হইতেছে, মেঘ বারি-বর্ষণ করিতেছে এবং মৃত্যু ভগতে ভ্রমণ করিতেছে।

ভয়ানকায়ি স্তপতি ভয়ানকায়ি তর্ক্যঃ।

ভয়ানকায়ি বায়ুশ্চ মৃত্যুর্দাবতি পঞ্চমঃ ॥

[কঠোপনিষদ ২।৩০]

৭। উত্তরাধিকার

উত্তরাধিকার সূত্রে যে সকল গুণ লাভ করা যায় তাহা বর্তমান বিজ্ঞানসম্মত। বৈজ্ঞানিক চিন্তা দ্বারা, পরীক্ষা-মূলক পদ্ধতি লইয়া যে সকল যুক্তি প্রয়োগ করা হয় তাহা নিতান্ত অনিবার্গ্য রূপে ফলপ্রসূ। বিজ্ঞান-সম্মত রীতিতে পর্যবেক্ষণ করিলে এবং অনুমান-সাপেক্ষ সিদ্ধান্ত বিচার করিলে বুঝা যায় জীবতত্ত্ব শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে, ইহা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত এবং অপরিহার্য্য সকল বিবেচনা-বোধে সম্মুখ। এ কারণ বৈজ্ঞানিক পন্থা গ্রহণ করা যে সমীচীন তাহাতে সন্দেহ নাই।

স্বামীজী জলদগন্তোর কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন, আমরা অস্বীকার করিতে পারি না, শরীর মাত্রেই উত্তরাধিকার সূত্রে কতকগুলি প্রবণতা লাভ করে, কিন্তু সেগুলি সম্পূর্ণ দৈহিক। এই দৈহিক প্রবণতার মাধ্যমেই মনের বিশেষ প্রবণতা ব্যক্ত হয়। মনের এরূপ বিশেষ প্রবণতার কারণ পূর্বজন্মস্থিত কর্ম। বিশেষ কোন প্রবণতা সম্পন্ন জীব সদৃশ বস্তুর প্রতি আকর্ষণের নিয়মামুসারে এমন এক শরীরে জন্মগ্রহণ করে, যাহা তাহার ঐ প্রবণতা বিকশিত করিবার সর্বশ্রেষ্ঠ সহায়। ইহা সম্পূর্ণভাবে বিজ্ঞান-সম্মত, কারণ বিজ্ঞান অভ্যাস দ্বারা সব কিছু ব্যাখ্যা করিতে চায়, অভ্যাস আবার পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠানের ফল। সূত্রাং অনুমান করিতে হইবে, নবজাত শ্রাণীর স্বভাবও তাহার পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠিত কর্মের ফল এবং যেহেতু তাহার পক্ষে বর্তমান জীবনে ঐগুলি লাভ করা অসম্ভব, অতএব অবশ্যই পূর্বজীবন হইতেই ঐগুলি আসিয়াছে।

শিষ্টগণ ও আচার্য্যেরা বলেন, সাত্বিক কর্মের ফল নির্মল স্ব্থ, রাগসিক কর্মের ফল দুঃখ ও তামসিক কর্মের ফল মূঢ়তা বা পশুজন্মস্থলভ দৃশ্যমান অজ্ঞানতা (গীতা ১৪।১৬)

৮। ঈশ্বর রূপা

যোগীবর ভরুণ-সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন হিন্দুধর্ম্ম সৰ্ব্বদে এইরূপ : বেদ শিক্ষা দেন—আত্মা ব্রহ্ম-স্বরূপ, কেবল জড় পদার্থভূতে বদ্ধ হইয়া আছেন। এই বন্ধনের শৃঙ্খল চূর্ণ হইলেই আত্মা পূর্ণত উপলব্ধি করেন। এই পরিত্রাণের অবস্থার নাম ‘মুক্তি’—সকল প্রকার অপূর্ণতা, মৃত্যু ও দুঃখ হইতে—মুক্তি।

ঈশ্বরের রূপা হইলেই কেবল এই বন্ধন ঘূচিয়া যাইতে

পারে। আর পবিত্র হৃদয় মানুষের উপরই তাঁহার রূপা হয়। অতএব পবিত্রতাই তাঁহার রূপা লাভের উপায়।” (চিকাগো বক্তৃতা দ্রষ্টব্য)।

সৃষ্টিকর্তা বিধাতাপুরুষ গীতার ১৮শ অধ্যায়ে বলিয়াছেন, সকল প্রকার আশিষ বিসর্জন দিয়া মনপ্রাণ আমাতে অর্পণ করিয়া সমস্ত কর্ম করিলে ভক্ত আমার অহুগ্রহে অক্ষয়স্থান প্রাপ্ত হন। ৫৬॥ আশাতে চিত্ত সমর্পণ করিলে, আমার রূপায় হস্তর সংসারও তাহার কারণসমূহ অতিক্রম করিতে পারিবে, নচেৎ তুমি পুরুষার্থের অযোগ্য হইবে।

১৮।৫৮॥

স্বামীজীর জ্ঞানগর্ভ উপদেশ পাঠে, নিকম্ব ও সাধনা-পুত জীবনযাপন পদ্ধতি সন্দর্শনে এই প্রতীকমান হয় যে, তিনি ছিলেন সংশয়াভীত, চিন্ময় ও চিরভাষ্যর। “সন্ন্যাসায় গীতিতে প্রতিভাত হইয়াছে অধৈতবাদের সারস্বত

একমাত্র মুক্তজ্ঞাতা আত্মা হয়

অনাম অরূপ অক্লেদ নিশ্চয়।

তাঁহার আশ্রয়ে এ মোহিনী মায়া

দেখিছে এ সব স্বপনের ছায়া।

স্বামীজীর সীমিত জীবন অক্লান্ত পরিশ্রমে জগদ্ধিতার লিপ্ত থাকিলেও তাঁহার মন ও চিন্তা ছিল অনৌম জ্যোতির্লোকে প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার প্রশান্ত অন্তর উৎসারিত আলোকে ভাসিয়া উঠিয়াছিল সুস্পষ্টরূপে এমন এক বিপ্লবের চিন্তা যাহা মহনীয়, উদার এবং পবিত্র। সমাজসংস্কারকের সে সমুজ্জল মূর্তি অত্যন্ত কল্যাণকর এবং নিতান্তই অল্পময়। তিনি অত্যাচার-পিড়িত, অর্দ্ধাঙ্গনে মৃতপ্রায় জন-সাধারণ, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, পণ্ডিত ও বুদ্ধিজীবী, রাজা ও পুরোহিতের শোষণের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে চাহিয়া বলিয়াছেন, “আমি নেড়েচেড়ে এদের ভেতর সাড়া আনতে চাই, এজন্য আমার প্রাণান্ত পণ। অমোঘ ময়বলে এদের জাগাব। উত্তীর্ণত জাগ্রত এই অভয়বাণীই স্তন্যে আমার জন্ম, তোরণা ঐ কাজে আমার সহায় হ। যা গাঁয়ে গাঁয়ে দেশে দেশে এই অভয়বাণী আচণ্ডাল ব্রাহ্মণকে শোনাগে। সকলকে ধরে ধরে বলগে যা—তোমরা অমিতবীর্য অমৃতের অধিকারী।” স্বামীশক্তি সংবাদে এইরূপ বহু সত্য কথিত হইয়াছে। তাঁহার স্নেহময় অনন্ত ধারায় নিষিক্ত অসংখ্য জীবন

যতাবনীয় পুণ্যসমূহে উজ্জল ও প্রাণ-চকল হইয়া উঠিয়াছে।

২। সেবা-ধর্ম

ক্রান্তবর্ষী ধর্মনিষ্ঠ সমাজনেতার উদাত্তবাণীর পরশ-মাধুরী ও কর্মচিন্তা ও সেবাধর্মের অরুণ দান আনয়ন করে ভক্তির স্রোত, স্রাব্য বস্তা। এবং সমাজপেবার পবিত্র আনন্দ।

প্রাচীন ভারতে ঔপনিষদিক যুগে ঋষিবাক্যে পুনর্নিত হইয়াছে, অস্মিন্ সর্বাণি ভূতানি আয়ৈবাতৃষ্ণিজানতঃ। তত্র কো মোহঃ কঃ শোকঃ একত্বমুদ্যতঃ॥” (ঈশ-উপনিষদ-৭) বিজ্ঞানী পুরুষের যে জীবনে সর্বভূত সর্বভূত থাকিয়াও আত্মাই বলিয়া গিয়াছে, একত্ব অত্ব-দর্শনকারীর সেই জীবনে শোকই বা কি বস্ত, মোহই বা কি বস্ত? পরবর্তী মত্রে উদ্গীত হইয়াছে পুরুষোত্তমের স্বরূপ— তিনি সর্বগামী, শুক্র, অকায়, ব্রহ্মহীন, স্নায়ুহীন, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ, কবি, মনীষী, পরিভূ, স্বয়ম্ভু। তিনি নিত্যকাল অর্থ সমূহকে যথাযথ ছন্দে বিধান করিতেছেন। ৮॥

সেবার স্বর গীতায় বস্তুত হইতে দেখা যায় যথা তদ্বিক্ষি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়। ১৪।৩৪॥

ধর্মের মানি হইতে ভগবৎকে বিমুক্ত করিতে এবং মানব চিন্তের অভ্যুত্থান জগৎ অব্যয় অক্ষয় অখণ্ড বিরাট-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া বলিয়াছিলেন,

“যে নিকায়কর্মী বা সন্ন্যাসী একান্তিকী অচলা ভক্তির দ্বারা সর্বভূতস্ব নারায়ণকে উপাসনা করেন, তিনি ত্রিগুণাতীত হইয়া ব্রহ্ম লাভে সমর্থ হন।” ১৪।২৬॥ তিনি আরও বলিয়াছেন, “আমি অব্যয়, অমৃত, সনাতন, জ্ঞানযোগরূপ ধর্মপ্রাপ্য ও অব্যভিচারী সূত্বরূপ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা। সম্যক জ্ঞানের দ্বারা প্রত্যগাত্মার পরমাত্মারূপে নিশ্চিত হন। ইহাই ব্রহ্ম লাভ, কারণ যে ব্রহ্মশক্তি ভক্তাভ্যুগ্রহাদি প্রয়োজন বশতঃ সংসারে প্রবৃত্ত হন, সেই শক্তিব্রহ্ম আমিই।” (গীতা ১৪।২৭)। শ্রীভগবানের উক্তি “যেহেতু আমি ক্ষরের অতীত এবং অক্ষর হইতেও উত্তম সেই হেতু ইহলোকে ও বেদে আমি পুরুষোত্তম নামে প্রখ্যাত (১৫।৮)।

জ্যোতিষ্ময় মহাবাহু স্বপ্রকাশ পুরুষোত্তম অটোদশ অধ্যায়ে বহু আশার বাণী শুনাইয়াছেন, তথায় উল্লেখ করিয়াছেন—

“বিবেক বুদ্ধিদ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক সমস্ত কর্ম আমাতে সমর্পণ করিয়া মৎপরায়ণ হও এবং সিদ্ধিতে ও অসিদ্ধিতে হর্গবিষাদশূন্য রূপ বুদ্ধিযোগ অবলম্বন পূর্বক আমাতে সর্পিদা চিত্ত সমাহিত কর (১৮।৫৭)। হে ভায়ত, সংসার-ভুখ নাশের জগৎ চিন্তা, বাক্য, কথ্য দ্বারা তুমি সর্বতোভাবে তাহারই শরণাপন্ন হও। তাহার প্রসাদে তুমি বিমল কান্তি ও শান্ত পদ লাভ করিবে, পরম শান্তির অধিকারী হইবে। (১৮।৬২)।

১৮২৭ খৃষ্টাব্দে আমোজী সেবাধর্মের আদর্শে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং পরবৎসর ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে “সেবাধর্মে দীক্ষিত একদল আত্মনের মতন তেজস্বী ও জ্ঞানানন্দে তৈয়ারি কার” জগৎ বেলুডমঠ স্থাপন করেন।

“জ্ঞানযোগের” সম্পদশ সংস্করণের ৮৪ পৃষ্ঠায় আমোজী যে চিত্তাগত বাণী প্রকাশ করিয়াছেন তাহা এইরূপ : নিত্যশুদ্ধ, নিত্যপূর্ণ, অপরিণামী অপরিবর্তনীয় এক আত্মা আছেন; তাহার কখনও পরিণাম হয় নাট, আর এই সকল বিভিন্ন পরিণাম সেই একমাত্র আত্মাতেই প্রতীত হইতেছে মাত্র। উহার উপরে নাম রূপ এই সকল বিভিন্ন স্বপ্ন-চিত্র অঙ্কিত করিয়াছে।

ভগবৎ প্রেমের বিশ্লেষণ বিষয়ে আমোজী অতি মধুর-ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন “ভক্তিরহস্তের” অষ্টম সংস্করণের ১৪৭ পৃষ্ঠায়। এ স্থলে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা হইল : ঘোর স্বার্থপরতার মদোন্মত্ত দেখা যায় “বু-এর এই ‘অহং’-এর ক্রমশঃ বিস্তৃতি ঘটতে থাকে। সেই এক অহং একটা লোক, বিবাহিত হইলে দুইটা হইল, ছেলেপুলে হলে অনেক-গুলি হইল—এইরূপে তাহার অহংএর বিস্তৃতি হইতে থাকে অবশেষে সমগ্র ভগৎ তাহার আত্মস্বরূপ হইয়া যায়। উহা ক্রমশঃ বর্ধিত হইয়া সার্বজনীন প্রেম—অনন্ত প্রেমে পরিণত হয়, আর সেই প্রেমই ঈশ্বর।



তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী

হাসছে সকলে।

খুশিতে ডগমগ হ'য়ে হাসছে বন্ধুবান্ধব-আত্মীয় স্বজন।
ওদের হাসির বৈঠকে যোগদান করতে পারছেন না দীননাথ।
হাসি দেখলে চাপাকান্না বৃকের ভেতর উঠছে।...

একসময় হাসির খোঁজে অস্থির হয়ে পড়েছিল দীননাথ।
নিজের মনের কোণে খুঁজতো। পথখান্না খন্দের পরিবার-
বর্গের চোখেমুখে অনুসন্ধানীদৃষ্টি ফেরাতো ঝঞ্ঝের
ফাঁকে ফাঁকে।

এতো তল্লাসেও, হাসি পাগল দীননাথ, তার আকাংক্ষিত
হাসি দেখতে পায়নি কারো চোখেমুখে।

দোকানে খন্দের এসেছে প্রতিমা কিনতে। ছেলে
অমরনাথ আর্টস্কুলে পড়া শিল্পী—দেখাচ্ছে বোঝাচ্ছে
জ্যামিতির ছকমাণা নিয়ম-কানুনে তৈরী প্রতিমা।—
পিরামিডিক্যাল—ত্রিকোণের মধ্যে, চারকোণার কিউবি-
ক্যাল, স্তম্ভপাটার্ণের সিলিন্ড্রিক্যাল, গোলের ভেতর
ক্ষিপ্রাক্যাল।

খন্দেরদের ঠোঁটের কোণে প্রশংসার হাসি ফুটে উঠছে।
পুত্রের গালে খাঁজ পড়ছে গৌরবের হাসিতে। দেখলে
খানিকক্ষণ সেকলে বৃদ্ধ দীননাথ চেয়ে চেয়ে। মন ভরল
না। মনে হল, ধনীর ধন্যবাদ আর গৌরব-গরবের
মিতালী ঘটছে জ্যামিতির মাপেরই মতো—এ যেন
যান্ত্রিক হাসি।

হাসির কলরোল শুনতে পেল রাস্তায় সেদিন। দোকান
থেকে বেরিয়ে এলো ত্রিংশতিতে দীননাথ। যতো সবার
মুখ দেখছে, ততো বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে যাচ্ছে।—শব্দযাত্রী-
দের হাসির লহর। বোধহয় বৃদ্ধ মরায় বিষয় পেল
এরা সব, তাই উত্তরাধিকারীর উল্লাস এদের হাসির রবে।
বৃদ্ধশবের খাটপুট নিয়ে নাচানাচি করে চলার বহর এতো!

দোকানের লাগোয়া চালাঘরের ভেতর যখন গেছে,
তখন দেখেছে, জী-পুত্রবধূ-নাতিনাতিনী যেন এক একটি
বিষাদগ্রস্ত প্রতিমা। অভাব-অনটনের নিম্পেষণে
নিস্তেজ। হাসির ফোয়ারা শুকিয়ে গেছে একেবারে।
বিফল হয়ে ফিরে এসে, ভার্য উঠেছে আবার দীননাথ।
আবার রঙের মাটির সরায় তুলি ডুবিয়েছে। দুর্গা-
প্রতিমার মুখে বুলিয়েছে। চোখ-ঠোঁটে রঙের বাহুতে
হাসি ফোটাতে চেষ্টা করেছে। পারে নি। হাসির
জয়গায় কান্নাই এনে ফেলেছে যেন প্রতিগারে। বার বার
প্রতিমার মুখ-চোখ-ঠোঁটের রঙ তুলে ফেলতে হয়েছে
তাকে এই একই কারণে। তার হাতের মূর্তি জীবন্ত
হয়ে ওঠে তুলির ছোঁয়ায়। স্বর্গীয় হাসি হেসে ওঠে।
বনেদি-ঘরের বৃদ্ধেরা এখনো বলে সে কথা। তাই এই
বয়সে বাটের কোঠা পেরিয়েও—অসমর্থ দেহ নিয়ে ঠাকুর
গড়তে হয়। ছেলের গড়ামূর্তি পছন্দ হয় না বাবুদের।
তার গড়া চাই! ভেতর ভেতর রাগে কেটে পড়ে দীন-
নাথ বাবুদের ওপর।—সে পারছে না। অভাবের তাড়নায়
যে তারও ভাবের খলি শূন্য হয়ে গেছে—এটা কেউ
বোঝেনা। শুধু জুলুম আর জুলুম!

মূর্তিগড়া—দোকানের ভার অমরনাথের ওপর দিয়ে
নিশ্চিন্ত হ'তে চেয়েছিল, হওয়া গেল না। ঠাকুরদার
খন্দেরদের ছেলেরা বাবার জীবদ্দশায় বেহাই দেয়নি।
বাবার খন্দেরদের ছেলেরাও তাকে দিচ্ছে না।
দেবেও না।

পূজার দিন যতোই এগিয়ে আসছে, ততোই যেন
দীননাথ উগ্রমেজাজী হয়ে উঠছে। সদাহাসিখুশি মাটির
মাল্লু দীননাথের ব্যতিক্রম ঘটছে। সকলে বিস্মিত—
তটস্থ।

কাউকে কিছু বলতে পারছে না দীননাথ—নিজের নোবেদনার কথা। বলতে গেলে, আত্মসম্মানের কপাট ভেঁষায় মুখে তক্ষুণি। এদিকে দাক্ষণ হুচিস্তা বেড়েই লেছে—ভাড়াভাড়ি মূর্তি শেষ করতে না পারলে, জোর সময় বিপদে পড়বে লোকে তার জন্তে। পূর্ব স্তনাম ধর করে বা' তা' মূর্তি গড়েও দেওয়া যায় না কিছুতেই। লাকের চোখে ধুলো দেওয়া বাপ ঠাকুরদার কোণ্ঠিতেও লখা নেই।

দীননাথ, আশ্রয় চেষ্টা সম্বন্ধে মনোমতো করে তুসতে পারছে না মায়ের মুখথানাকে।—অস্থির নাশিনী করুণাময়ী হস্তবদনে অস্থিকে বধ করে মূর্তি দিচ্ছেন। ধ্যানের এই ভাবরূপ সারাজীবন ধরে প্রতিমায় ফুটিয়েও এখন অপারক হচ্ছে! আশ্চর্য! সহাস্তবদনাকে নিজের মনের ধ্যানে আনতে পারছে না এক মুহূর্তও। মায়ের মিস ফুটেছে না তাই।

নিজের ওপর দিক্কার এলো দীননাথের। ভাগ্যের নরম পরিহাস। এই রকম যখন মানসিক অবস্থা—সেই সময় একদিন ঈশ্বর হাঁসি দেখতে পেল হঠাৎ। দেখতে পল বড় করুণ অবস্থার ভেতর দিয়ে।

ভারায় উঠে, দিক্কারা পথিকের মতো, মায়ের মুখে এখন রঙ চড়াচ্ছে দীননাথ। দোকানের লাগোয়া চালাঘরের রজা ঠেলে, এসে উপস্থিত হ'ল দু'বছরের নাতনী—রতন গি। চোখে জল। জলের সংগে আঙ্গুরের স্রবের বায়না। কে মন মেজাজ সপ্তমে চড়েই আছে তার ওপর সোনায় দাগা গোলা নাতনীর ছিচকাতনেপনা। বিরক্ত হ'য়ে ঠল দীননাথ। নাতনীকে ভেতরে যেতে বললে, মকালে। হিতে বিপরীত হ'ল। রতনমণির গোঁয়ের রান্না উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল। অগত্যা তার থকে নামতে হ'ল দীননাথকে।

নাতনী আলমারীতে সাজানো সারবন্দী মাটির ফলের ঠিকে আড়ল দেখাচ্ছে কেবল। রঙের-কারিগরির হিমায় নকল ফল আসল দেখাচ্ছে—তাজা—একেবারে যেন গাছ থেকে পাড়া হয়েছে সবে। খেয়াল ধরলে, ফল-গুলো পাবার জন্তে হলুদুল বাধায় রতনমণি। এ কাণ্ড টে মাঝে মাঝে। অল্প সময় আদর করে, দোকান ঘর থকে সরিয়ে নিয়ে যায় রতনমণিকে দীননাথ। ফলের

নেশা ভোলাবার চেষ্টা করে। ভোলায়ও। এবারে কিন্তু কোনো চেষ্টাই করল না সে সব। বরং আলমারী থেকে একটা মাটির আম বার করে ওর হাতে দিলে ভাড়াভাড়ি বিদায় করবার জন্তে।

নিমেষে চোখের জলে হাসির কলক উল্লে পড়ল রতনমণির। বাহ্যিক কল পেয়ে মুখভরা হাসি।

বিমুগ্ধ চোখে দেখছে এই হাসি দীননাথ। এই হাসিই যেন খুঁজছিল সে এতোদিন ধরে। মনের জড়তা অবসাদ কেটে গেল মুহূর্তে। দ্বিগুণ শক্তি এসে পড়ল দেহমনে। ভাগ্য উঠল। তুলি হাতে নিলে!...

ফুটল স্বর্গীয় হাসি মুগ্ধমূর্তির মুণের ভাঁজে ভাঁজে।—আগের স্তনাম অক্ষুণ্ণ হয়ে থাকবে দীননাথের। লোকে বলবে, জীবন্ত প্রতিমা। দীননাথ মরেনি এখনো। বঁচে আছে। তুলি তার মৃতসজীবনী!

দীননাথের চোখে মুখে খুশি উপচে পড়ছে। প্রতিমার মুখ দেখছে বার বার। দেখেও সাপ মিটেছে না। অল্প-বারে নিজের অস্থিরের হাসি প্রতিমার মুখে প্রলেপ দেয় সে। এবারে সে উৎসে তার অকাল পেগেছে। নাতনীর হাসির রঙে তুলি ডুবিয়েছে। আগেকার সমস্ত শিল্প-কৌশলের মাদুয় যান বলে দিচ্ছে তার এই নতুন সৃষ্টি!

তারম্বরে বৈদে উঠল রতনমণি। বাকল বোধহয় ঠকেছে দাড়র কাছে। মাটির আমে দাঁত বসিয়ে আঘাত পেয়েছে।

পিছন ফিরে তাকিয়ে এ দৃশ্য দেখলে দীননাথ। বুকের ভেতর মোচড় দিয়ে উঠল। নাচে নেমে এসে, কোলে তুলে নিলে নাতনীকে। প্রতিমার দিকে তাকালে একবার। প্রতিমা হাসছে আর বাৎস করছে যেন তাকে। এই তুমি স্রষ্টা! সৃষ্টির অহংকার! ঠকিয়ে হাসি চুরি!

চোখে জল এলো দীননাথের অনিচ্ছাকৃত দোষের জন্ত। অন্তমনস্ক হ'য়ে—রতনমণিকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল দোকান থেকে।

রতনমণির শিশুমন যখন ভুলল। কান্না ভুলল। দেখা-দৃশ্য ভুলল না কিন্তু দীননাথ। দৃষ্টান্তের মতো মনের গভীরে দাগ কেটে বসেছে। অল্পবারের মতো প্রতিমাকে জীবন্ত করে ভোলায় কৃতিত্ব তার এবারে এতোটুকু নেই। চুরিকরা হাসির প্রলেপ দেবীর মুখে।

প্রতিমা দেখে সবাই হেসেছে। পঞ্চমুখে প্রশংসা করেছে। বলেছে, মা আমাদের সদানন্দময়ী হাসিমুখী!

সরে গেছে তক্ষণি দীননাথ। খন্দেরদের কথাগুলো যেন কানে গরম সীসেগলা ঢেলেছে। এ স্থখ্যাতি পাবার অধিকারী সে নয়।

মূর্তিটি নিয়ে ছেলের সংগে, জীর সংগে, বন্ধুবান্ধব—সকলের সংগেই ভীষণ মন কষাকষি শুরু হ'ল দীননাথের। কিছুতেই মূর্তিটি বেচবে না সে। ওরাও নাছোড়বান্দা—বেচতেই হবে।

সমবয়সীরা বললে, ভীমরথী ধরেছে। তা না হ'লে এতোবড় একটা যোগ কি কেউ ছেড়ে দেয়! আশ্চর্য! লক্ষ্মী-সরস্বতী একসঙ্গে—যশ-অর্থ!

জী ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল—পুলো চলে গেলে তো মূর্তি পড়ে পড়ে কান্দবে, তখন হাসি থাকবে কোথায়! মূর্তি ঘরে রাখলে, হাসি দেখলে কি পেট ভরবে? সারা বছরের পেটের যোগাড় তো এই সময়! কথা শুনেলেও গা জলে ওঠে। বলে কিনা ও মূর্তিতে আমার দেওয়া নেই কিছু, বেচার অধিকারও নেই তাই। মাথা খারাপের আর থাকি কোথায়? বলি তবে কার?

কার? বলতে গিয়েও পারল না দীননাথ। কথা জড়িয়ে গেল। সরম এলো। নিজের দুর্বলতা চাপতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল মৌনধর্মের আড়ালে।

অমরনাথও বোঝালে বাবাকে। দ্বিগুণ থেকে চতুর্গুণে দর উঠেছে। এই বেলা, আর দেবী নয়। পুরোনোরা

পায়ের স্রতো ছিঁড়িয়ে, ঘটপুজো করবে বলে চলে গেছে। এবারে ছেলের দলও সরবে কিন্তু। এখনো ঝাঁকটা রয়েছে—জামিতির মাপের প্রতিমা ভালো লাগছে না। এই মূর্তিই প্রাণবন্ত ঠেকছে ওদের চোখে। মওকা ছাড়া ঠিক হবে না।

না, না, না। তিনটে অগ্নিজ্বর যেন কষাঘাতে আহত হয়ে বুক ছিঁড়ে বেরিয়ে এলো দীননাথের।

হতভম্ব স্তব্ধ সকলে।

দীননাথের এই ধমুক-ভাঙা পণকে ভাঙতে নিভৃত্তে পরামর্শ চলল। বন্ধুবান্ধব জী-পুত্র এক জোট হল।

খন্দের এসেছে।

দীননাথ চোখের সামনে অবিস্মৃত ঘটনা দেখছে। বাক্য সরছে না মুখে। স্থাপুর মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার অহুমতির প্রত্যাশা না করেই সকলে মিলে লরীতে তুলে দিলে প্রতিমা। বিক্রি হয়ে গেছে! অপরিসীম আনন্দে মশগুল সবাই। একটি প্রতিমায় এতোগুলো টাকা আর এতো স্থখ্যাতি কেউ পায়নি এই কুমারপাড়ায় এর আগে কখনো।

মূর্তি চলে যাচ্ছে। লরীর গতি বাড়ছে। ময়ূর থেকে দ্রুত হচ্ছে। বড় রাস্তায় আরো বাড়ল। অদৃশ্য হয়ে গেল লরীসমেত প্রতিমা।

সমবেত সকলের হো-হো-হ'-হা শব্দের হাসি যেন দীননাথের কানে করুণকান্নার সুরে বাজছে—রতনমণির কান্না!

বিবেকানন্দ

শ্রীতারকপ্রসাদ ঘোষ

সংশয়-সংস্কৃত মন অপেক্ষার-প্রান্তরে কঠিন,
তারি ভলে নিকষের গহনান্ত বিশাল বিস্তার
কোন্ সত্য-কাঞ্চনের স্পর্শ লাগি' সমূলে নিহাঁর
ক'রেছিল দ্বিধাহীন, যোদ্ধাবাদী অপূষারী স্বপ্ন!—
প্রজ্ঞার সারিণ্যে তাই মাহুঘের পুনঃাবিকার
প্রতিভাত হ'ল সেই হিমাতুর অবসর ক্ষণে;—
প্রভুল প্রশয়-দৃষ্টি, বাণী তব প্রাণের স্পন্দনে

উৎসারিল কালোত্তর জাগৃতির সম্পৃক্ত সত্তায়!—
তোমার আয়ুর ভেজ, সামুদ্রিক সহন-বিস্তার
কর্ম-ক্লিজ্ঞান-সূত্রে সঞ্চারিল শক্তির-বিদ্যুৎ
শিব-বক্ষে নৃত্যপরা যথা তার অক্ষরন্ত কণা
সমগ্র সত্তায় পূর্ণ—পুঞ্জ-ঘন আরাধ-আবাস,
হে বীর বিবেকানন্দ, তুমি তার প্রমুখ ব্যঞ্জন—
রূপাতীত রূপায়ণ, অপকূপ অপূর্ণ অদ্বুত!

পশ্চিমবাংলার হস্তশিল্প—৩

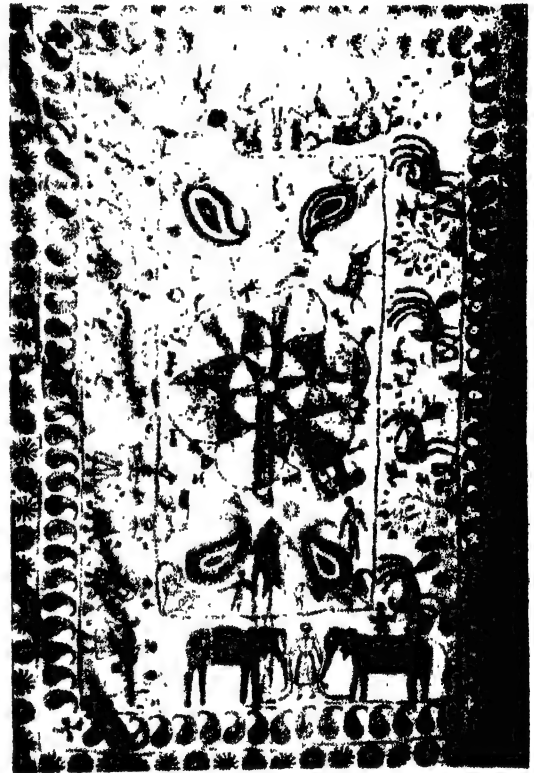
কাশ্যপ শর্মা

নীলম্বরীর ইতিকথা

এদেশের রেশমী সাড়ীর মহিমা কীর্তন দেখা যায় মধ্যযুগীয় সাহিত্যে। বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে পড়া যায় যে রাবাকৈ কালা পাটের সাড়ী পরতে মানা করা হচ্ছে, কারণ কালা (কৃষ্ণ) নাগের সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে, ‘আগুন পাটের সাড়ী’ বা ‘অগ্নি পাট সাড়ী’ ছিল অত্যন্ত দামী আর একমাত্র বড় ঘরের মহিলাদেরই পরিধেয়। ‘পাট’ শব্দ সংস্কৃত ‘পট্’ শব্দ হতে এসেছে। বেণমকে বলা হোত চীন পট বা চীনাংশুক। বাংলাদেশে পাটের সাড়ী বলতে রেশমের সাড়ীই বুঝিয়ে এসেছে। বিষ্ণুপুরে বর্তমান ধরে পাটের সাড়ী বোনা হয়ে এসেছে। এ সাড়ীও নানা রকমের কারুকার্যের জন্ম বিখ্যাত। এ ধরনের কোন কোন সাড়ীতে রক্ষণ স্তোত্র দিয়ে বনে অলঙ্করণ করা হয়। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রেশমী সাড়ীর উপর নানা রকম ডিজাইন ছাপাবার রেওয়াজই চলে এসেছে। রেশমের ছাপা সাড়ী আজও মুরশিদাবাদে প্রচুর তৈয়ারী হয়। আর দিনে দিনে নানা রকম নতুন নজার অবতারণা করে ক্রেতা-চিকিত্তকে জয় করবার প্রয়াস পাচ্ছেন বাংলার স্থানপুণ কলাবিদ, তাঁত-শিল্পীরা। এ ক্ষেত্রে সরকারী উদ্যোগও প্রশংসনীয়। নানা রকমের নতুন ডিজাইনের আকর্ষণ দিয়ে তাঁরা সমৃদ্ধভাবে সাহায্য করছেন এই শিল্পীদের। মুরশিদাবাদ ছাড়া রেশমবস্ত্রের অত্যন্ত উৎপাদন কেন্দ্র মালদহ আর বাকুড়া জেলা। এছাড়া বীরভূম ও পুরুলিয়া এবং মেদিনীপুরের আনন্দপুর অঞ্চলেও রেশমবস্ত্রের উৎপাদন হয়। পশ্চিমবাংলার এই সব জেলাতে প্রতিবছরে প্রায় দেড় কোটি টাকার রেশম বস্ত্র উৎপন্ন হয়। রেশমী-বস্ত্রের জন্ম বিখ্যাত পশ্চিমবাংলার কয়েকটি স্থানের নাম : গণকর, মির্জাপুর, ইসলামপুর (মুরশিদাবাদ), সোনামুখী, বিষ্ণুপুর (বাকুড়া), মালদহ, আনন্দপুর (মেদিনীপুর),

সিংবাজার, রত্ননাথপুর (পুরুলিয়া) বনহাৰিষ্ণুপুর, তাঁতিপাড়া (বীরভূম)।

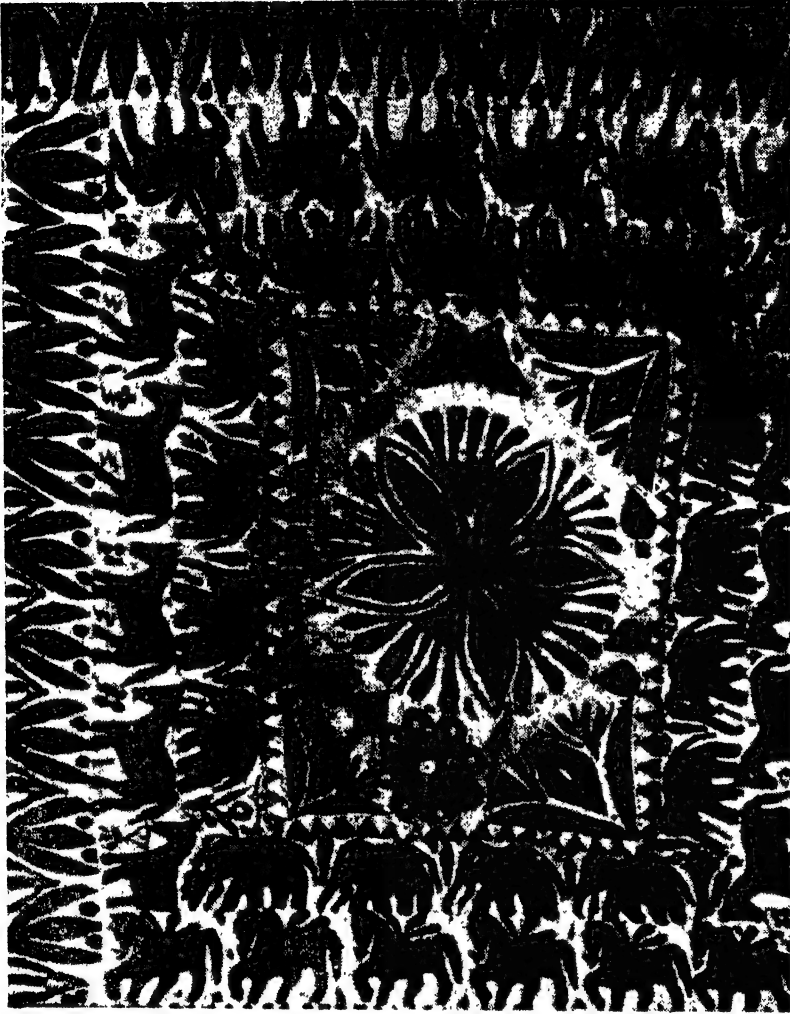
রেশমশিল্পের সঙ্গে সঙ্গেই বেড়ে চলেছে কৃত্রিম রেশম



শস্যাবরণে শিল্প সৌন্দর্য

অথবা রেশমের উৎপাদন। রেশমশিল্পের অনেক ক্ষেত্রেই অধুনা কৃত্রিম-রেশমের সাড়ী বোনা হচ্ছে। আর এ সাড়ীর বয়নে রেশমীসাড়ীর অনেক অলঙ্করণই অনুল্লেখ করা হচ্ছে।

কৃত্রিম রেশমের সাহায্যে বস্ত্র উৎপাদনেও বহু ব্যক্তি নিযুক্ত আছেন এবং বর্তমানে সম্ভাব্য সমিতির সদস্যেরা



নানারকম জীবজন্তুর চিত্র সম্বলিত কাঁথা

কেবলমাএ বিষ্ণুপুর অঞ্চলে বছরে প্রায় দুই লক্ষ টাকার বস্ত্র উৎপাদন করেন।

পাটভিত্তি হতেও পশ্চিমবঙ্গের কাপড় তৈয়ারী হয়। এই শিল্পে নিযুক্ত জনসংখ্যা ও তাদের উৎপাদন উপেক্ষণীয় নয়।

রেশমীসাড়ীর মতন বাংলার সুতির সাড়ীরও নাম বহুজনবিদিত। নানা রঙে বোনা এই সাড়ীর নাম থেকে এদের স্বরূপ বোঝা যায়। যেমন গজাঙ্গলী—বলতেই মনে পড়ে স্বচ্ছ সাদা নরম বুনাটের সাড়ী—যা পরলে কোমলাকে আরো কোমল করে দেয়। মেঘভঙ্গর

নীলাধরী, ময়ূরপেখম, আশমান তারা, অগ্নিকুল সাড়ীর নামও আমাদের প্রাচীন লোকসাহিত্যে ছড়িয়ে আছে। জামদানী সাড়ীর নাম না করলে বিবরণ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এ সাড়ীর জমিতে নক্সাগুলি এমনরয়ডারী করে বসান। নক্সাগুলি তেরছা ভাবে সাজান। অলঙ্করণের সম্ভারই জামদানী সাড়ীতে তার বৈশিষ্ট্য এনে দিয়েছে। নক্সাতে নানা আকারের ফুল লতাপাতা কঙ্কার ব্যবহার জামদানী সাড়ীতে দেখা যায়। তাছাড়া জ্যামিতিক অঙ্কনের কাজও এ সাড়ীতে প্রচুর চলে।

ঢাকা জেলার বসাক সম্প্রদায়ের লোকেরা ‘কানিচা’

কাঁথার কঙ্কার নক্সা



গামে বিশেষ এক রকম কাপড়ের সৃষ্টি করেছিলেন। কাশিদা কাপড়ের সমস্ত জমিই নিজায় ঢাকা। এক সময় খ্যাতনামা কাশিদার, বিশেষকরে কাশিদা কুমারের দস্তাভ আদর ছিল এবং সেকালে এর রপ্তানীও হোত হইল পরিমাণে।

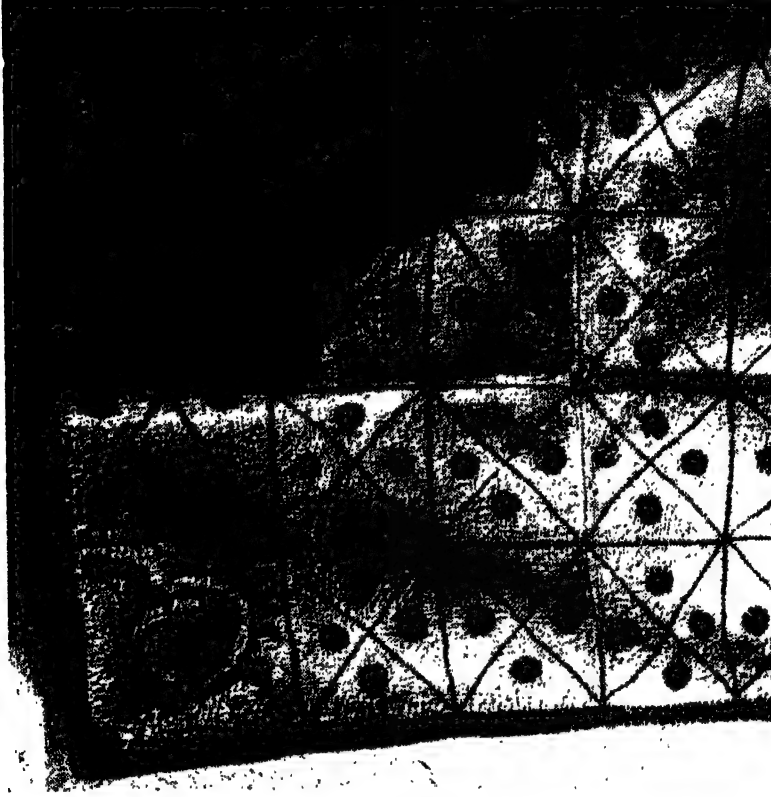
ঢাকার বসাকেরা আজ অনেকেই পশ্চিমবাংলায় গসেছেন। আর পশ্চিমবাংলাতেই এখন তৈয়ারী হচ্ছে ঢাকাই জামদানী, আর ঢাকাই কাশিদা।

১৯৪০ সালে তথ্য-অনুসন্ধানকারী কমিটির হিসাবে সে সময়ে পশ্চিমবাংলায় মোট তাঁত ছিল ৪৩,০০০। বর্তমানে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১ লক্ষ ৫৪ হাজার (অক্টোবর ১৯৬৩)। এর মধ্যে ৭৭ হাজারের বেশী তাঁত সমবায় সমিতির অন্তর্ভুক্ত এবং বর্তমান সমবায় সমিতির সংখ্যা এক হাজারেরও বেশী। কলের সঙ্গে তাঁতের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁত নিজগুণেই টিকে আছে।

তাঁতশিল্পের উন্নয়ন প্রচেষ্টায় পশ্চিমবাংলা এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে তাঁতশিল্পে পশ্চিমবাংলার দান বিশেষভাবে স্বীকৃত। তথ্য উৎপাদনের দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় যে বর্তমানে সারা ভারতের মোট উৎপাদনের দশ-শতাংশ তাঁতের কাপড় এখানে তৈয়ারী হচ্ছে। অগচ্ ভারতের মোট তাঁতের তুলনায় পশ্চিমবাংলার তাঁতের সংখ্যা ৫ শতাংশ। সুতরাং গড়ে প্রতি তাঁতের উৎপাদন অন্ত্যান্ত রাজ্যের চেয়ে এখানে বাড়ছে এবং ভবিষ্যতে আরও বাড়বে আশা করা যায়।

কর্মসংস্থানের দিক দিয়ে তাঁতশিল্পের গুরুত্ব সর্বাবধি-সম্মত। কৃষির পরেই এর স্থান এ রাজ্যে। ১৯৬৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শেষে ৩ লক্ষ ৩৮ হাজারের ওপর কর্মী প্রত্যক্ষভাবে এই শিল্পে নিয়োজিত ছিল।

অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পশ্চিমবাংলার তাঁতশিল্পের গুরুত্বের অন্ত এর প্রতি সরকারী দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট



বুড়িয়ার কাঁথা

১, ২, ৩ ও ৪ নং ছবিগুলির আলোকচিত্র শ্রীহরী বন্দ্যোপাধ্যায় নিয়েছেন।

হয়েছে এবং তাঁতশিল্প উন্নয়নের জন্তু এবং তাঁতশিল্পীদের সাহায্যের জন্তু সংকারী অনেক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে। এর মধ্যে তাঁতবস্ত্রের বিপণন তাঁতশিল্পীদের মূলধন দিয়ে সাহায্য করা, শিক্ষার ব্যবস্থা করা—এ সব ব্যবস্থাও আছে।

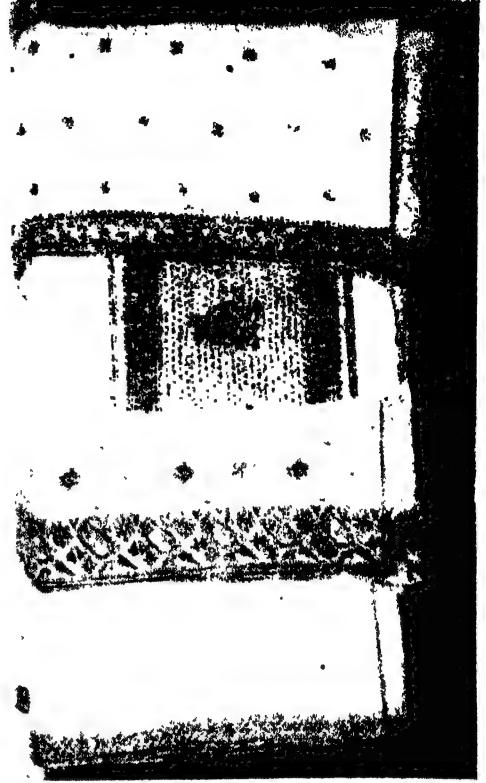
কিন্তু সবচেয়ে অসুবিধার সৃষ্টি করেছে কাঁচামালের অভাব। সূতোর জন্তু বাংলার তাঁতশিল্পী এতদিন পর-মুখ পেক্ষা হয়ে রয়েছে—আর সূতোর বাজার এই বইয়ের বিশেষতঃ দক্ষিণের সওদাগরদের দক্ষিণের উপরই নির্ভর করেছে বাংলার তাঁতের কাপড়। বছরে ৪ কোটি পাউণ্ডের মত সূতে পশ্চিমবাংলার চাহিদা। এই অভাব মেটাবার জন্তু কয়েকটি সূতোর কলের পরিকল্পনা হয়েছে।

তার মধ্যে বর্তমানে ৫০ হাজার টাকার যে সূতোকল চালু হয়েছে তা থেকে এখানকার সমস্তের কিছু লাভব হয়েছে মনে হয়।

পশ্চিমবাংলার বাটিকের কাজ সম্বন্ধে কিছু না বললে বস্ত্রশিল্পের কথা শেষ হয় না। অনেকের ধারণা বাটিকের ভয়ানক ঘবীপ, আর সেখান থেকে একাজ এখানে আমদানী করা হয়েছে। এ সম্বন্ধে মতবৈধ আছে। ভারতে বাটিকের কাজের বহুপ্রাচীন নিদর্শন আছে—যার বয়স খৃঃ পূর্ব তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত টানা যায়। মসলৌপত্তনের 'কামকারী' কাজ আদতে বাটিকেরই এক রূপ।—অবশ্য বর্তমানধারায় বাটিকের কাজ ঘবীপ থেকেই এসেছে শাস্ত্রিনকেন্দ্রন হয়ে। বাটিকের কাজে মোমের আর

বজ্রের ছাঁচ দিয়ে বজ্রের নকশারকম অলংকরণ করা হয়।

অঙ্গাবরণের ক্ষেত্রে শিল্পীমন যে উৎকর্ষের পরিচয় দিয়েছিল—অস্ব সাধারণ ক্ষেত্রেও তার অভাব হয়নি। বাংলাদেশের কাঁথা অতি তুচ্ছ জিনিষে তৈয়ারী। পুরোনো কাপড় আর পাড়ের স্ততো দিয়েই সাধারণতঃ এই আবরণের সৃষ্টি। নবাগত শিল্পসস্তানের জন্ম মা দিদিমা'দের অবসর সময়ের এই শিল্পকাজ এখনও গ্রামে গ্রামে চলে আসছে। কাঁথা একেবারেই বাংলার নিজস্ব জিনিষ। শয্যার আবরণ ও গাত্রাবরণ হিসাবে গৃহস্থের ঘরে সমাদৃত। নক্সার কাজের জন্ম বিখ্যাত অনেক কাঁথাই দেখতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ, প্রাণ সাইজের কাঁথা ৭ই' X ৩ই' আতনের হয়। তিন খানা বা তিন চারখানা কাপড় পর পর বেখে, সেগুলিকে লম্বালম্বি সেলাই করে নেওয়া হয়। এক দিক থেকে আরম্ভ করে সারা কাপড় সেলাই করা শেষ করে আবার সেই প্রান্তে ফিরে আসাই হলো কাঁথা সেলাইয়ের মোটামুটি নিয়ম। নানা রঙের স্ততো দিয়ে ফুল, পাতাপাতা, মাছঘের নুঁতি ইত্যাদি দিয়ে নকসা করে সারা কাঁথার জমিতে সেলাই করা হয়। এক একটি কাঁথা শিল্পে অপরূপ—শিল্পরসিককে আনন্দ দেবার যথেষ্ট ক্ষমতা রাখে।



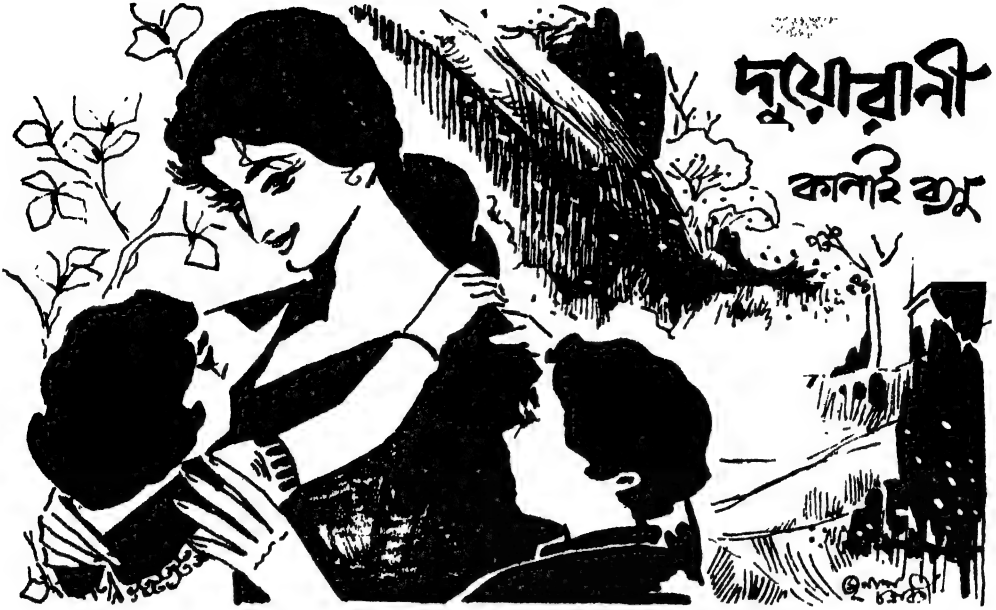
ভাঁড়ের শাড়ীর অলংকরণ বৈচিত্র্য

অভিযান

শ্রীশ্রীশীলকৃষ্ণ সেনগুপ্ত

যে বাণী বলার মেলেনি স্বেযোগ, যে কথা পেলো না ভাষা—
তা'রই 'পরে মোর আশা ;
তা'রই 'পরে মোর সাধন-সফল সিদ্ধ-সম্পদ সুর
মুছিত স্মধুর—
হবে চিরকাল বিশ্ববাসীর অন্তর-বাণী তারে
অশ্রুত স্বাক্ষরে !
এং বাথার হাহাকার শুনি বকনা বিকোতে
সংঘাতে, লাভে, লোভে—
এই তপোবন ধ্যান হুজ বিশাল বিশ্ব 'পরে
শান্তির অন্তরে।
শুনি—সে কালের শরাঘাতাহত বিরোগ-বিমুচ্ছন
ক্রোধের জন্মদে :
সদুপায়ের রক্ষ-শক্তি বীতংস বিক্রমে
এবেশি ভারত-ভূমে—

ভিক্ষুর বেশে ক'রেছে চরণ সীতা মা'রে উল্লাস—
সত্যাদর্শ নাশি'।
আজ বজ্রের আক্রোশ জাগে অস্তরে বার বার
প্রতিশোধ চায় তা'র !
অবহেলিত সে কপিদল আর কাঠ-বিড়ালীয়ে নিয়ে
সমুদ্রে নাপ দিয়ে,
মাতৃশক্তি অন্তর-বাণী বন্দিনী জানকীরে
সম্মান সম্ভারে
পরাজিত করি সফল বিয়ে আনিবো ফিরায়ে ফের
স্বদেশেতে আমাদের।
অসিখিত এই মহাকাব্যের শাশ্বত রামায়ণ
হবে তাই রূপায়ণ,
বিরচিত হবে মহান যুগের মহান উপাখ্যান :
এ যে তা'রই অভিযান !



বৈশাখ মাস শেষ হইতে চলিল। ঘেঘের চিহ্নমাত্র নাই, কালবৈশাখীর আবির্ভাব হয় নাই। মর্ত্তপ্ততাপে দেশ জলিয়া যাইতেছে। লোক অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে।

বিহারের এক ছোট সহরের এক ছোট স্কুলে এক শুক্র-বারে বেলা একটায় হঠাৎ ছুটি হইয়া গেল, স্থানীয় কোন বড়লোকের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ উপলক্ষে। ছেলে মেয়েরা শোক মানে না। মর্ত্তও মানে না। অপ্রত্যাশিত ছুটির আনন্দে হৈ হৈ করিয়া বাহির হইয়া গেল। শিক্ষিকাদের মনে শোক হইয়াছে অহুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু উপরি ছুটি কয়েক ঘণ্টা মাত্র হইলেও পাইয়া খুশী হইয়াছেন। তাঁহারা প্রায় সকলেই গৃহী ও এখানকার অধিবাসী। গৃহের টানে মর্ত্তওদেবকে মাথায় রাখিয়া তাঁহারা গৃহে চলিয়া গেলেন।

শ্রীমতী রায় এখানকার লোক নছেন, এখানে আত্মীয় বন্ধু কেহ নাই, গৃহ সংসার এখনও হয় নাই। অন্নদিন হটল চাকরি লইয়া আসিয়াছেন। তাঁহারই মতো প্রবাসিনী এক শিক্ষিকার সঙ্গে একটি ছোট বাসা করিয়া আছেন। সেই নীরস বাসায় ফিরিবার তাড়া নাই।

লাইত্রেয়ী-ঘরে বসিয়া আনালাপ বাহিরে রোজরুদ্ধ

মাঠের দিকে চাহিয়া শ্রীমতী ভাবিতে লাগিলেন কোথায় যাওয়া যায়। আলাপ বন্ধ হইতে মন কিছু হয় নাই। তা ছাড়া কাহারও বাড়ীতে যাইতে ইচ্ছাও করে না। যদি মেঘ করিত, যদি একটা নদী থাকিত কাছাকাছির মধ্যে, যদি নদীর ধার নির্জন হইত, তাহা হইলে সেখানে গিয়া বেড়ানো বা চুপ করিয়া বসিয়া থাকা যাইত। কিন্তু এতগুলি বন্ধির আবদার পূরণ হইবার নহে।

নদী না থাক, মেঘ না থাক, খর রোজের দিনে যাইবার জায়গাও থাকে। এমন রোজ্রে মনকে টানে ঘনছায়াচ্ছন্ন আমবাগান। কচি হোক, কাঁচা হোক, কিছু না কিছু মেলেই। আর মেলে আলোর ঝিলিমিলি, গাছের ছায়া, বনের হাওয়া, পাতার মর্মর, পাখীর ডাক মেশানো ছপরের নিস্কলতা। কিন্তু এ-ও স্বপ্ন। এ-স্বপ্নে কেবল দেশের জন্ত মন কেমন করা বাড়ে। দেশের জন্ত, মাগের জন্ত, ছোট ভাইটির জন্ত মন কেমন করে।

ঘণ্টাখানেক কাটিল লাইত্রেয়ীতে বসিয়া, বইয়ের পাতা উন্টাইয়া, বাহিরে চাহিয়া। আর ঘরের মধ্যে মন টিকিল না। বই তুলিয়া রাখিয়া শ্রীমতী পথে বাহির হইয়া পড়িলেন। রক্ষণ ছাতা দিয়া মাথা রক্ষা করিয়া চলিতে লাগিলেন, বাসার দিকে নহে, অস্ত্র দিকে। বাসায় গরম

বিছানায় পড়িয়া এ-পাশ ও-পাশ করা, ঘনঘন জল খাওয়া ও পাখা নাড়া বই তো নয়। অগ্রমনে পথ চলিতেছেন শ্রীমতী। যাহাকে বলে বেদিকে হুচোখ যায় সেই দিকে চলিতেছেন। এমন সময় দেখিলেন একটা প্রকাণ্ড লরি এদিক হইতে আসিতেছে। তাহাকে রাস্তা ছাড়িয়া দিতে এবং চক্ৰ তাড়িত ধূলি হইতে যথাসম্ভব দূরে থাকিতে শ্রীমতী পথের একান্ত ধারে দাঁড়াইলেন। সেই ধারে তাহার পিছনে একটা জঙ্গল। ধূলিজালে সহস্র গোধূলি স্ফুট করিয়া লরি চলিয়া গেল। নাকে কুমাল চাপিয়া শ্রীমতী পথে পা বাড়াইয়াছেন। অগ্রমনক বলিয়া শুনিতে পাইলেন না পিছনের মুহু শব্দকণ্ঠের ডাক—“শোনো, এই শোনো।”

শ্রীমতী অগ্রসর হইলেন। আবার ডাক—“এই শোনো না, এই।” এবার কানে আসিল। শিশুর কণ্ঠ। যবজ্বাই তাঁহাকে নহে। তথাপি পিছন ফিরিয়া ছিলেন শ্রীমতী। পিছনে জঙ্গল বা ভূতপূর্ণ বাগান। সেই জঙ্গলের ধারে ভাঙ্গা নীচু পাঁচিলের ওপারে ফকরী পাঁচ ছয় এবংসরের একটি মেয়ে দাঁড়াইয়া তাঁহার পানে চাহিয়া আছে। তিনি ফিরিতে ছোট হাত নাড়িয়া বলিল—“শোনো না।”

শ্রীমতী জিজ্ঞাসা করিলেন—“আমায় বলছো থুকু? কী বলছো?”

উত্তর—শুনিলেন “থুকু কেন? আমি থুকু না।”

সকৌতুকে শ্রীমতী বলিলেন—“তবে তুমি কে?”

“আমি—আমি হুজি—আমি কে রে দাদা?”

প্রশ্নটা পাশের এক ঝোপকে। ঝোপ উত্তর দিল—“কেশবতী।”

থুকু বলিল—“হ্যাঁ, আমি কেশবতী, বুঝলে? আমার নাম কেশবতী, আর ওর নাম (ঝোপকে নির্দেশ করিয়া) ওর নাম হলো—”

ঝোপ বলিল—“কাঞ্চনকুমার।”

“হ্যাঁ, ওর নাম কাঞ্চনকুমার। ও হোলো রাজপুত্র, আর আমি রাজকন্যা। বুঝতে পেরেছ?”

শ্রীমতী বলিলেন—“বুঝতে পেরেছি। তা কেশবতী, তুমি আমাকে ডাকছো কেন গো? কী বলছো?”

কেশবতী বলিল—“তুমি ঘূটে কুড়োতে পারো? ঘূটে?”

কাজটা কঠিন নয়, যদি মালিক আপত্তি না করে। কিন্তু উদ্বেগ না জানিলে কুড়ানো নিরর্থক এবং বিনামূল্যে প্রাপ্তিস্থানটাও জানা দরকার। হুজি শ্রীমতী বলিলেন—“হঁ, পারি বই কি। কোথায় ঘূটে?”

কেশবতী জিজ্ঞাসা করিল—“আর কোথায়? বন থেকে কাঠ, আর—আর কী রে দাদা?”

অদৃশ্য কাঞ্চনকুমার বলিল—“তুকনো পাতা আর বনের ফলটল।”

কেশবতী বলিল—“হ্যাঁ, বন থেকে কাঠ আর তুকনো পাতা কুড়িয়ে অনতে পারো? আর বনের ফল পাড়তে পারবে?”

কাজের ফল বাড়িতেছে। তা হোক, সকল কাজেই তাহার পারদর্শিতা আছে জানাইয়া শ্রীমতী যখন রাজকন্যার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন, তখন রাজকন্যা খুশী হইয়া ডাকিল—“ওরে দাদা, পারে, সব পারে। তুই আয় না।”

এইবার এবার অদৃশ্য রাজপুত্র ঝোপের অন্তরাল হইতে আশ্চর্যপ্রকাশ করিল। হাকপ্যাট হাকমাট পরা ধূলি-দুসর বহর আটেকের কাঞ্চনকুমার জালাকিত করিয়া কয়েক মুহূর্ত শ্রীমতীকে আশাদায়ক নিরীক্ষণ করিল, তারপর বলিল—“নাঃ, হবে না।”

কেশবতীর পছন্দ হইয়াছিল, সে বলিল—“কেন হবে না? বলছে তো পারে, ঘূটে কুড়োতে পারে, সব পারে, বলছে তো।”

রাজপুত্র গম্ভীর ভাবে বলিল—“ঠিক কাপড় পরতে পারে না। ও-রকম করে কাপড় পরলে কি হয়?”

কেশবতী বলিল—“কেন, বেশ তো কাপড় পরেছে?”

এই প্রশ্ন শ্রীমতীও করিলেন, মনে মনে। বহুমূল্য না হইলেও পরিধেয় সঙ্গন্ধে এবং তাহা পরিধানের পারিপাট্য লইয়া তাঁহার মনে একটু গর্ব আছে। কিন্তু এই ক্ষুদ্র বিচারকের কঠিন দৃষ্টিতে তাহার বেশ-বাসে কী দোষ ধরা পড়িল?

কেশবতীর প্রশ্নের উত্তরে তাহার দাদা বলিল—“এরকম করে নতুন কাপড় পরলে হয় না। তুমি কিছু

জানোনা থুকে। তার চেয়ে আমি মতির মাকে বলবো-
'খন। সেই ঠিক হবে।'

কেশবতী প্রবল জ্বরে মাথা নাড়িয়া বলিল—“চাই
না আমি মতির মাকে। বিচ্ছিন্ন মতির মা। আমি
কিছুতেই তাকে নেবো না। আমি চলে যাচ্ছি।”

বলিতে বলিতে থুকের কর্ণে ক্রন্দনের সুর লাগিল। সে
মুখ ফিরাইয়া দ্রুত চলিতে শুরু করিল। তখন থুকের দাদা
তাহার কাছে গিয়া তাহার গলা জড়াইয়া কানে কানে
কী বলিল। থুকে মাথা নাড়িল এবং দাদার কানে কানে
সেও কী বলিল।

দুই ভাই বোনে পরামর্শ চলিতেছে, শ্রীমতী দাঁড়াইয়া
আছেন। অজানা প্রতিদ্বন্দ্বিনী মতির মার সহিত বেশ-
বাসের প্রতিযোগিতায় হারিয়া ও ঘুঁটে কুড়াইবার কর্মে
অমনোনিত হইয়া তাহার দাঁড়াইয়া থাকিবার কোনও
প্রয়োজন ছিল না, যুক্তিসঙ্গত কারণও ছিল না। তথাপি,
পরাজয়ের লজ্জা মাথায় লইয়া, শ্রীমতী উৎসুকচিত্তে
দাঁড়াইয়া রহিলেন কেন, কে জানে।

কয়েক সেকেন্ড মাত্র। তারপর কেশবতী ছুটিয়া
আসিল। পিছনে কাঞ্চনকুমারও আসিল। ভাঙ্গা
পাচিল ডিঙ্গাইয়া কেশবতী শ্রীমতীর কাছে আসিয়া
জিজ্ঞাসা করিল—“তোমার ছেঁড়া কাপড় আছে? ছেঁড়া
কাপড় পরতে পারো তুমি?”

ঘুঁটে কুড়ানোর অপেক্ষা সহজ কাজ। দুপ্রাপ্য বস্তুও
নয়। কিন্তু উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া কেশবতী বলিল
—“মতির মা'র ছেঁড়া কাপড় আছে। আমি তোমাকে
চেয়ে এনে দেবো।” এবং মন্তব্য করিল—“মতির মা'কে
আমার একটুও পছন্দ হয় না।” বলিয়া সে শ্রীমতীর
একটি হাত আপন দুই হাতে ধরিল।

কেশবতীর কথা ও কাজের মিলিত অর্থ অস্পষ্ট নহে।
তবু নিজের সম্বন্ধে ভালো কথা নিজের কানে শুনিতে
ভালো লাগে। শ্রীমতী জিজ্ঞাসা করিলেন—“আমাকে
পছন্দ হয়?”

ষাড় হেলাইয়া ও টানা স্বরে কেশবতী বলিল—
“হ্যাঁ-হ্যাঁ।”

“কিন্তু তোমার দাদার যে পছন্দ হয়নি।”

“তুমি একটু থাকো না, ওর পছন্দ হবে। আর ছেঁড়া

কাপড় পরলেই, জামাটামা পরবে না, বুকে ? - তুমি তো
গরীব মানুষ শুধু ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরলেই না ওর
পুব পছন্দ হবে। না রে দাদা।”

সে শ্রীমতীর হাত আকর্ষণ করিয়া বলিল—“তুমি ছেঁড়া
কাপড় পরে তবে তো ঘুঁটে কুড়াবে। না গো।”

“হ্যাঁ, তা তো বটেই।” বলিয়া শ্রীমতী নিবোধের
মতো জিজ্ঞাসা করিলেন—“ঘুঁটে কুড়িয়ে কী হবে গো?”

কেশবতীর বিশ্বাসের সীমা রহিল না। চোখ বড়ো
করিয়া বলিল—“ও মা : দুয়োরানী বুকে ঘুঁটে কুড়াবে না ?
তবে আমাদের মানুষ করবে কী করে?”

কাঞ্চনকুমার ইতিমধ্যে এক পা এক পা করিয়া কাছে
আসিয়াছিল। সে স্মরণ করাইয়া দিল—“আর বন থেকে
কাট-কাট কুড়াবে, কাট লতাপাতা সব দিয়ে তবে তো
রান্না করবে।”

কেশবতী দাদার কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিল—
“তবে তো রান্না করবে। নইলে কী দিয়ে রান্না করবে
বল?”

শ্রীমতী আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন—“ও, হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে
পড়েছে।”

তখন কেশবতীও আশ্বস্ত হইয়া আর একটু প্রবলভাবে
তাঁহার হাত আকর্ষণ করিল।

এবং বলিলে আপনারা বিশ্বাস করিবেন না, শ্রীমতী
বিনা আপত্তিতে আক্লষ্ট হইলেন। শ্রীমতী যুক্তিগত
পড়িয়াছেন, দর্শনশাস্ত্র পড়িয়াছেন। আরও কতো জ্ঞানের
বই পড়িয়াছেন। তা'হা সত্ত্বেও, যুক্তি না বুঝিয়া, কারণ
দর্শন না করিয়া, নিতান্ত অজ্ঞানের মতো কেশবতীর সঙ্গে
চলিলেন ও পাচিল ডিঙ্গাইলেন। চলিতে চলিতে
অজ্ঞানের মতই জিজ্ঞাসা করিলেন—“এখন আমার
কোথায় যাবো? তোমাদের বাড়ী?”

কেশবতী বলিল—“না গো, ভয় নেই। বাড়ীতে
যাবো কেন? বনে যাচ্ছি।”

ইহা অবশ্য ভয়সার কথা। ভয়সা করিয়া চলিলেন
শ্রীমতী। বাড়ীতে ভয়, বনে ভয়, বন মনোরম, একথা
শ্রীমতীর বয়স হইবার পর মনে ছিল না। কেশবতী
ভয়সার উপর আরও ভয়সা দিল, প্রলোভন দেখাইল—
“খুব ভীষণ বন, জানো? কী বন রে দাদা?”

দাদা বলিয়া দিল—“অজগর বন।”

“হ্যাঁ, অজগর বন। এস্তো বড়ো বড়ো (দুই হাত সারিত করিয়া দেখাইল) সব বাঘ সিংগি আছে, বন ভর্তি, ছাপ্পাছাপ্পি।”

দাদা বলিল—“আর রাকোস।”

“হ্যাঁ, আর রাকোস রাকুসি কস্তো আছে বনের ভেতরে। বুঝলে?”

তবে আর ভাবনা কী? একত্রে এত বাঘ সিংহ রাকস ও রাকুসীর প্রত্যক্ষ সঙ্গ লাভের নিশ্চিত সম্ভাবনা, এ একটা দুর্লভ সৌভাগ্য। মানব জীবনে কদাচিৎ মেলে। বলা বাহুল্য, যাহার মেলে, তাহার বোধহয় একবারই মেলে, দ্বিতীয়বার নহে। সেই দুর্লভ ভাগ্যে ভাগ্যবতী শ্রীমতী অতএব অজগর বনে প্রবেশ করিতে চলিলেন।

ঘন-পত্র, বৃহৎ ও প্রাচীন গাছ, দীর্ঘ ঘাস, চোরকাটা, আগাছা, ছোটো বড়ো নানা ঝোপঝাড়, উচু-নিচু ভূমি, জঙ্গলপাতার রাশি, পথের রেখা নাই, স্থানে স্থানে নিবিড় ছায়া, স্থানে স্থানে প্রখর রোদ, পাখীর ডাক, কঠ-বিড়ালীর বিচরণ, জনমানব নাট,—সবস্বত্ব মিলিয়া এ একটা মনোরম রাজ্য, নতুন জগৎ বটে। লোকসমাজের বাহিরে, স্কুল কমিটির ভূগোলের পারে এ স্থান। নানা “খলে আবদ্ধ ম’হুকের মুক্তির স্থান।

সৌখীন শাড়ীর নিয়ভাগ প্রায় অর্ধেকটা অজরিত হইল চোরকাটায়। উচুনিচু ভূমিতে পা মচকাইল এবং ‘মনবধানতাবশতঃ একবার গাছের নিচু ডালে মাথা ঠুকিয়া গেল। ক্রমে শাড়ী গুটাইয়া জাহুর কাছে তুলিলেন। এখানে অহুন্দর কুটিলচিত্ত নর-সমাজ নাই, আছে মনোহর বাঘ সিংহ ও সরল রাকস। শ্রীমতী জিজ্ঞাসা করিলেন—“কতদূরে গো অজগর বন?”

কেশবতীর ভয় হইল ঘুঁটে কুড়াইবার কাঠকুটা জালিয়া রান্না করিবার এমন স্থপাত্রীতি বুঝি বন অনেক দূর নাথিয়া ফিরিয়া যায়। সে বলিল—“এই তো কাছেই গো। এসে পড়িচি। ঐ যে তালগাছটার নিচে দিচ্ছে—”

কাঞ্চনকুমারের ভৌগোলিক জ্ঞান বেশী, সে তাড়াতাড়ি সংশোধন করিয়া দিল—“খেং, কাছে বুঝি বন হয়?” হাত তুলিয়া অনির্দেশের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া

বলিল—“উট তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে নদী পেরিয়ে মস্ত উচু পাছাড় পেরিয়ে তারপর—তারপর—”

বনে যাইতে হইলে কত ত্রিপ্রাস্তর, কত নদী, কত পর্বত পার হইতে হয় এবং আরও কত দুরতিক্রমা ব’ধা বিপত্তি আছে, তাহা স্মরণ করিতে চেষ্টা করিতেছে কাঞ্চনকুমার। কিন্তু কেশবতীর বৈধ রহিল না, তাছাড়া আশঙ্কাও আছে, অজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ সঙ্গিনী পাছে অত দুর্গম বনে যাইতে ভয় পাইয়া সরিয়া পড়ে। তাই সে দাদাকে আর স্মরণ করিবার অবসর দিল না। বলিল—“না গো, আজ আমরা সেই খনে ক ধূরের বনে যাবো না। আজ এট কাছেই একটা ছোটো অজগর বন আছে না, সেইখানে যাবো। না রে দাদা?”

দাদা বলিল—“হ্যাঁ।”

অধিক দূর না হোক কিছু নদী পর্বত উত্তরণ করিতেই হয়। এই যাত্রাপটু নতুন লোক, জানিবে কী করিয়া। তাই রাককতা ও রাজপুত্র পথ চিনাইয়া ও প্রয়োজন-মতো নির্দেশ দিয়া লইয়া চলিল। কাঞ্চনকুমার হাত দেড়েক মাপের কঞ্চি জাতীয় একটা প্রকাণ্ড লাঠি লইয়া আগে আগে চলিয়াছে। হঠাৎ বলিল—“দাড়াও, নদীর ধারে এসে পড়েচি।” বলিয়া কঞ্চি দিয়া মাটিতে এক রেখা টানিয়া দিল ও কায়ক পা আগাইয়া গিয়া একটি রেখা টানিয়া দিরায়া আসিয়া বলিল—“তুমি সঁতার কেটে আসতে পারবে তো? সঁতার কাটিতে না পারলে ডুবে যাবে কিছ।”

কেশবতী বলিল—“ভীষণ বড়ো নদী! ডুবে যাবে কিছ।”

শ্রীমতীর এখন সঙ্গ গুণে সাহস বাড়িয়াছে, শক্তিরও অস্ত নাই। বলিলেন—“হ্যাঁ পারবো। তোমরা আগে আগে সঁতারে যাও।” সভাই তিনি কেশবতী ও কাঞ্চনকুমারের দৃষ্টান্তে মাথা নিচু করিয়া দুই হাতে অদৃশ্য জল কাটিতে কাটিতে সেই ভীষণ গভীর বিস্তৃত নদী অনায়াসে সঙ্করণে পার হইলেন। এই রূপে পর্বত চিনাইয়া দিয়া ও তাহা উত্তরণ করাইয়া তাই বোন তাঁহাকে লইয়া চলিল।

কাঞ্চনকুমার বলিল—“কাল জুজুর বেলা, বধন আর্দেক

স্বাভাৱে খুটখুটি অন্ধকার হবে, তখন সেই অনেক ধূৱের বনে যাবে, কেমন বোনটি ?”

কেশবতী বলিল—“হ্যাঁ। “শ্রীমতীকে বলিল—“তোমার কিচ্ছু ভয় নেই। আমার হাত ধরে যাবে। আমি চক্চকে পাতর দিয়ে আলো জ্বালবো—”

কাঞ্চনকুমার বলিল—“চক্চকে পাতর নয় বোনটি, চকমকি পাতর।” নতন মাহুৱের সম্মুখে ভুল সংশোধন কৰাতে কেশবতী সন্তুষ্ট হইল না। একেত্রে ভুল স্বীকার কৰাও চলে না, সে বলিল—“জানি জানি। চকমকিও বলে চক্চকেও বলে। চক্চক্ করে না বুঝি? হ্যাঁ গো, চক্চক্ করে না ?”

শ্রীমতী জীৱনে চকমকি পাথর দেখেন নাই, তাই নিশ্চিন্ত জোৱেৰ সহিত বলিলেন—“চক্চক্ কৰবে না? বাঃ, খুব চক্চক্ কৰে।”

কাঞ্চনকুমার আৰ কথা বাড়াইল না। এই খুঁটে-কুড়ানীটা অনেক বিষয়ে অজ্ঞ হইলেও, বয়স হইয়াছে। সুতৰাং সে চকমকি সম্বন্ধে তৰ্ক না কৰিয়া পাথৰটাকেই উড়াইয়া দিল। বলিল—“আলো জ্বালেই হবে না। আমার কাছে তো মাণিক থাকবে, সাপের মাথার মাণিক, তাতেই তো চার দিক আলো হয়ে যাবে। হ্যাঁ।”

বহুকণ পথ চলিয়া—সুদীৰ্ঘ আধ মিনিটও হইতে পারে, অজ্ঞগৰ বনে উপনীত হইলেন শ্রীমতী। একটা ভাঙ্গা চালাবৰ এখনও কোন বকমে খাড়া হইয়া আছে। দেয়ালের চালাৰ অনেক অংশ অহুস্থিত। দরজা জানালার বালাই নাই, মেঝেতে আগাছার জঙ্গল হইয়াছে। এককালে হঠতো মালীর ঘর ছিল। দাওয়ার একধারে উদান ছিল, কালিকৃষ্ণৰ প্ৰলেপ এখনও আছে দেখালে। আবার পরে বোধহয় গোশালা হইয়াছিল। ঘরের কোনে মেঝেতে অৰ্দ্ধপ্ৰোথিত ভাঙ্গা গামলা ও খোটা তাহার সাক্ষ্য দেয়। মাহুৰ ও গল্প কতকাল এ আবাস ত্যাগ কৰিয়াছে তাহা অসুমান কৰা শক্ত। এখন ইহা নিৰ্বাসিতা দুয়োৱাণীৰ উপযুক্ত কুটির বটে।

কুটির ঘেমনই হোক, স্থানটি আদৰ্শ। রাজ্যৰ ৰাজত্বের বাহিৰে, মাহুৱের দৃষ্টি কলুৱের আশঙ্কা নাই, সভ্য সমাজের স্পৰ্শ দোষ লাগে নাই। চলিতে গেলে পায়ের তলায় পাতার রাশি বৰষিয়া ওঠে। স্বৰ্ণের রৌত্ৰকে এস্থান

গাছের ডালপাতায় হাঁকিয়া তবে গ্রহণ করে, চাঁদের আলো এখানে শুধু আলোই নহে, আলপনা আঁকিবার রঙ, নক্সা কৰিবার ৱেশম। কবে কোন ধনীৰ সখের বাগান ছিল, সখ শেষ হইয়াছে, সখ কৰিবার মাহুৰ শেষ হইয়াছে। তারপর অরণ্যে পরিণত হইয়া পড়িয়াছিল। এই দুইটি শিশু সেই অরণ্যকে নতন আবিষ্কার কৰিয়াছে।

কুটিরের সম্মুখে আসিয়া কেশবতী বলিল—“তুমি রান্না করতে পারো? আর নদী থেকে জল আনতে হবে, জানো তো?”

কাঞ্চনকুমার বলিল—“আমি তোমাকে নদীতে নিয়ে যাবো, তাহলে রাকোস তোমাকে কিচ্ছু বলবে না।”

শ্রীমতী বলিলেন—“তাহলে আমি ঠিক যেতে পারবো। কাঞ্চনকুমার যদি সঙ্গে যাও, তবে আমার কিচ্ছু ভয় কৰবে না। নদীতে চান করে কলসী ভরে জল এনে ৰান চড়িয়ে দেবো।”

কেশবতী বলিল—“আমিও নিয়ে যাবো তোমাকে নদীতে। দাদা আর আমি।”

নদীতে যাওয়া আসার কালটিতে দুয়োৱাণীৰ উপর দাদার একাধিকার তাহার তালো লাগিল না। তাই সে বলিল—“আমিও যাবো।”

এবার ভালো না লাগিবার পালা কাঞ্চনকুমারের। সে বলিল—“তুমি ধাবে না বোনটি। তুমি গিয়ে কী করতে? তুমি কি রাকোসকে মারবে? আমি তীর ধখক নিয়ে যাবো, নদীর ধারে যে রাকোস আছে তার সঙ্গে যুক্ত করবো।

কেশবতী চুল ছুলাইয়া বলিল—“না।”

কাঞ্চন বলিল—“রাকোস নেই? নদীর ধারে রাকোস নেই বুঝি? জিজ্ঞেস কর না। নদীর ওপারে পাহাড়ে চূড়োর ওপোর রাকোসের দুগুণ নেই? হ্যাঁ গো?”

কেশবতীর ও যুক্তি আছে। সে বলিল—“কই তোমার তীর ধখক? তীর ধখক নেই, তয়োৱান নেই, তোমাকে রাকোস খেয়ে ফেলবে। না গো?”

সে-ও শ্রীমতীৰ মুখের দিকে চাহিল। দুইজনেই দুয়োৱানী মায়ের সমর্থন চাহে। শ্রীমতী দেখিলেন এক জনকে সমর্থন কৰা চলিবে না। আবার সমর্থন না

নাওয়াও পার নাই। তর্ক হইতে কলহ ও কলহ হইতে কলহ বৈশী দূর নহে। তিনি বলিলেন—“আচ্ছা, আমি লেছি শোনো। দুজনের কথাই ঠিক। রাকোস তো নদীর ধারে থাকেই, আর তীর ধক্ক ভরোয়াল অবিশিষ্ট। তাই তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে। কিন্তু তারা দিনের বেলা বেরোয় না কিনা, খালি রাত্তিরে বেরোয়—”

কাকুনকুমার বলিল—“আমি জানি। ওরা রাত্তিরে চলেতে বেরোয়, আর দিনের বেলা খালি ঘুমোয়, কেবল ঘুমোয়।”

শ্রীমতী বলিলেন—“হ্যাঁ, দিনের বেলায় একেবারে অচেতন হয়ে ঘুমোয় পাহাড়ের ওপোরে শুয়ে শুয়ে।”

কেশবতী সংশোধন করিয়া দিল—“ওপোরে নয়, পাহাড়ের নিচে, অনেক নিচে থাকে।”

শ্রীমতী সংশোধন মানিয়া লইলেন—“হ্যাঁ, ঠিক বলেছো। পাহাড়ের ওপোরে গর্ত আছে, সেই গর্ত দিয়ে দিড়িতে নেবে পাহাড়ের নিচে অনেক তলায় একটা দরজা আছে, সেই দরজা দিয়ে—”

কাকুনকুমার গল্পের বাহিরে থাকিবার পাত্র নয়। বলিল—“ম-স্তো বড়ো দরজা। আকাশের মতন উচু।”

শ্রীমতী বলিলেন—“তা আর বলতে। ও রে কবাব, যেমন উচু তেমন ভারি।”

কেশবতী বলিল—“ভীষণ ভারি।”

নদীতে বাওয়ার সমস্তা মূলত্ববি রহিল। রাকসদের পাতালপুরীর ভীষণ বাড়ীর মনোহর আকর্ষণে রাজপুত্র কাকুনকুমার মন ভুলিল—সঙ্গে সঙ্গে বোধহয় হুয়োরানীরও। তিনি একটি গাছের ছায়ায় করাপাতার আসনে বসিলেন দুই পাশে দুই শিশুকে লইয়া। রাকসের বাড়ীর ঘর ‘সড়ি ছাদ বাগান সব প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণের মতো বর্ণিত হইতে লাগিল। সংই ভীষণ ও সুন্দর। রাকসের বাড়ী হইতে রাকসের গল্পে আসিতে দেরি হইল না। দেশ বিদেশের রাকস, রোমাঞ্চকর তাহাদের রূপ, বিচিত্র তাহাদের আচরণ। এক সময়ে কেশবতী হুয়োরানীর কোলের উপর উঠিয়া বসিল। কাকুনকুমার তাহা লক্ষ্য করিল, কিন্তু সে বড় হইয়াছে, দাঙ্গা হয়, কোলের ভাগ লইয়া স্বগড়া করিল না। হুয়োরানী যার একটি জাহর

কিছুটা অধিকার করিয়া করতলে চিবুক স্থাপন করিয়া গল্প শুনিতে লাগিল।

যখনই রাকস রাকুনী হাট মাট খাট করিয়া প্রকাণ্ড গাছ বা পাথর লইয়া তাড়া করিয়া আসে, কেশবতী হুয়োরানী মা’র গলা জড়াইয়া ধরে এবং কাকুনকুমার তাহার কোলের কাছে আরও নিবিড় হইয়া বসে।

বেলা পড়িয়া আসিল। হঠাৎ দেখিলে খেয়াল হইল শ্রীমতীর। হাতের বড়ির দিকে চাহিয়া গল্প থামাইতে হইল। গল্প থামে কিন্তু শেষ হয় না। ইতিপূর্বে যেখানেই গল্প শেষ হইতে চাহিয়াছে, শ্রোতাদের “তারপর?” মন্তব্যে সঞ্জীৱিত হইয়া সেখান হইতেই তাহাকে আবার নূতন করিয়া চলিতে হইয়াছে। কিন্তু এবার হুয়োরানীকে বলিতে হইল—“তারপর কাল বলবো, কেমন? এবার বাড়ী যেতে হবে কিনা।”

শিশুরা খেলা করে, অবোধ, কিন্তু তাহাও নির্বোধ নহে। তাই বোন দুজনেই বুঝিল এষ্ট মাত্রাট বনে আসিয়া হুয়োরানী সাজিয়া ঘুঁটে কুড়াটতে রাজী হইলেও, তাহাদের বাড়ীর কেহ নয়, যেমন বাহির হইতে আসিয়াছে তেমন বাহিরে চলিয়া যাইবে।

না গিয়া’য়ে উপায় নাই। তাই হুয়োরানীকে আবার নিবাসনে বাইবার জন্ত উঠিতে হইল। রাকসের ঘরে ভাঙ্গা পাচিলের এ পারে সঙ্গে সঙ্গে আসিল রাজপুত্র কাকুনকুমার। তাহাদের আদর করিয়া চুমা খাটয়া বিদায় লইলেন শ্রীমতী। তাহারা বলিল—“কাল এসো, আসবে তো?” শ্রীমতী বলিলেন—“হ্যাঁ। তোমরা আসবে তো?” তাহারা বলিল—“হ্যাঁ-না।”

শ্রীমতী বলিলেন—“কাকুকে বোলোনা, আমার কথা কাকুকে বোলোনা। বেশ মজা হবে, কেমন?”

যাহা অপরকে বলিতে নাই, কেবল তাহারাই জানিবে, সে-জানার গৌরবে বয়স্হরাও মোহিত হয়, শিশুদের তে কথাই নাই। কাহাকেও না বলাই তো মজা। তাই বোন ঘাড় কাত করিয়া স্বীকৃত হইল—“আচ্ছা।”

কেশবতী বলিল—“তুমিও কাকুকে বোলো না, হ্যাঁ?”

শ্রীমতীও ঘাড়, হেলাইয়া স্বীকার করিলেন—“আচ্ছা।”

বাগান হইতে বাহির হইয়া পথে নামিলেন শ্রীমতী

বাগান হইতে নহে, এক জগৎ হইতে বাহির হইয়া অস্ত্র জগতে ফিরিয়া আসিলেন। এ রূপকবার জগতের কথা কাহাকে বলিবেন? বলিলে বিশ্বাস করিবার মতো বুদ্ধি কাহার আছে? এ খেলার কথা কাহাকেও বলিবার নয়।

বাসায় ফিরিয়া শ্রীমতী দেখিলেন, সহবাসিনী মাধবীদি তখনও ফিরেন নাই। স্কুলের বাহিরে তাঁহার ছাত্রী আছে। সকাল সকাল ছুটি পাইয়া ছাত্রীর বাড়ী গিয়াছেন। এতক্ষণ শ্রীমতী কোথায় ছিলেন, এ কৌতূহলী প্রশ্নের বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়া হাঁক ছাড়িয়া বাটিলেন শ্রীমতী। মাধবীদি খেলা ভালবাসেন না। আর বুড়া বয়সে শিশুদের সঙ্গে ছেলেখেলার পাগলামি শুনিলে তিনি সহ্য করিতে পারিবেন না।

সোদন সন্ধ্যায় নিত্যকার পড়াশোনায় বসিতে ইচ্ছা হইল না। স্কুলের ত্রৈমাসিক পরীক্ষা আসিতেছে, তাহার প্রথম প্রথম তৈয়ারীর কাজ রহিয়াছে, সে কাজ পড়িয়া রহিল। বাড়ীতে চিঠি লিখিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন সকালে, সে সঙ্কল্প মনে পড়িল না। মন ঘুরতে লাগিল কোন অরণ্যে এক রাজপুত্র এক রাজকন্যার সঙ্গে বিনা কাজের বাঁশী বাজাইয়া অকারণ খুশীর নেশায়।

পরদিন সকালে উঠিয়া প্রথমেই মনে পড়িল স্কুল আছে, স্কুলের কঠিন আছে, কিসের পর কী করিতে হইবে তাহার বাধা ছক আছে। এ চিন্তা ভালো লাগিল না। তারপর মনে পড়িল আজ শনিবার, স্কুলের ছুটি হইবে দেড়টার সময়, তখনও দিনের অনেক সময় অনেক খানি আলো হাতে থাকিবে। সেই সময়ও সেই আলো বিধিযুক্ত, নিম্নহীন কাজহীন শিশু-ইচ্ছার স্বাধীন নিয়ন্ত্রণে সার্থক হইবে। এ চিন্তায় মন খুলী হইল।

মাধবীদির সকালেও একটি ছাত্রী আছে, তিনি বাহির হইয়া গেলে শ্রীমতী তাঁহার ট্রাক লইয়া বসিলেন। রাণী হইয়াছেন, রাণীর ধোঁগা বেশ চাই। রাণী-বেশ খুজিতে লাগিলেন। সাধারণ রাণী নয়, দুয়োরাণীর বেশ। খুজিয়া না পাইয়া হতাশ হইয়া শ্রীমতী ভাবিতে লাগিলেন স্বকিয়ার কাছে হাত পাতিলে খুব খারাপ দেখাইবে কিনা এবং কথাটা গোপন রাখা যাইবে কিনা। কত অল্প জগৎবদ্বিহিত স্বকিয়ার

কৌতূহল মিটাইতে পারা যাইবে, সেও একটা ভাবিবার কথা। জামা কাপড় ট্রাকে তুলিয়া রাখিতে গিয়া লক্ষ্য হইল—ট্রাকের তলদেশে যে কাপড়টি আস্তরণ রূপে রহিয়াছে সেইটির প্রতি। বাহির করিয়া তাঁজ খুলিয়া শ্রীমতী বলিলেন ইউরেকা। এ শাড়ী যেন দুয়োরাণীর জুই রাখা ছিল। দুয়োরাণীর মতোই নূতন অবস্থায় ইহার মূল্য ছিল, কদর ছিল। এখন পুরাতন হইয়া পরিত্যক্ত ও লোকচক্ষুর অন্তরালে নির্বাসিত। এককালের আকাশি রঙ এখন বিবর্ণ হইয়া মলিন দেখাইতেছে। পরিধানের যোগ্য করিতে দুই তিন জামগার লম্বা সেলাই দিতে হইবে। এক জামগায় গিঠ দিলে আরও শোভা হয়। তাহাই করিলেন। শাড়ীর সমতুল্য করিতে একটি পুরাতন জামাকে কিছু ছিঁড়িয়া লগতে হইল।

এতক্ষণে কাঞ্চনকুমারের পরীক্ষার পাস করিবার মতো পোষাক জোগাড় করিয়া নিশ্চিত হইলেন শ্রীমতী। পোষাক কাগজে মুড়িয়া রাখিলেন। তারপর আর দুই একটি প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া লইলেন। পোষাক ও অস্ত্র সব দ্রব্য একটি কাঠের হাতোলওলা নস্ট্রাকর কাপড়ের খলিতে ভরিয়া তাহাদের উপর বইখাতা চাপা দিয়া স্কুলে লইয়া গেলেন।

স্কুলের ছুটির পর শ্রীমতী লাইব্রেরীতে গিয়া একটি বই লইয়া বসিলেন। মাধবীদি যাইবার সময় দেখিলেন শ্রীমতী গভীর অভিনিবেশসহ বই হইতে খাতায় কী লিখিতেছেন।

মাধবীদি চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে অভিনিবেশ চলিয়া গেল। লেখা শেষ হইল।

স্কুল হইতে বাহির হইয়া শ্রীমতী প্রথমে গেলেন বাজারে। তেমন সময়ে গ্রামাঞ্চলের ছোট সহরে দোকান বাজার বন্ধ হই থাকে। দোকানীদের এইটা স্নানাহার ও বিশ্রামের সময়। আবার দোকান খোলে অপরাহ্নে। এই জানা কথাটা শ্রীমতী উৎসাহবশে তুলিয়া গিয়াছিলেন এখন কী করা যায়? হতাশ হইয়া এদিক ওদিক দেখিতে দেখিতে ফিরিয়া চলিলেন। একটা সাধ হইয়াছিল মনে, তাহা আজ পূর্ণ হইবে না। অদৃষ্ট বিরূপ। কাল আবার দেখা যাইবে।

অদৃষ্ট কিস্ত বিরূপ নহে। ফিরিবার পথে দেখিলেন

একটি কাঁপবন্ধ দোকানের পাশের সরুগুলির মুখে এক ব্যক্তি মুখ ধুইতেছে। গলিপথে দোকানের খিড়কি দরজা। ব্যক্তিটি দোকানের মালিক বটে। জিজ্ঞাসা করিতে কাজ হইল। অসময় হইলেও খরিদদার ফিরাইল না দোকানী। খিড়কি দরজার দাঁড়াইয়া সগুদা শেষ করিয়া শ্রীমতী আবার পথ ধরিলেন এবং যথাসাধ্য ও যথালোভন দ্রুত পদে চলিতে লাগিলেন। কালিকার রাস্তার মোড়ে আসিয়া দূর হইতে যখন দেখিলেন বাগানের সেই ভাঙ্গা পাচিলের উপর দুইটি শিশু দাঁড়াইয়া আছে, তখন তাহার মন শান্ত হইল। উহারা বিপরীত দিকে চাহিয়াছিল, তাহার আবির্ভাব জানিতে পারে নাই, ক্ষণকাল পরে এদিকে ফিরিতে তাহাদের উৎসুক চোখ আনন্দে নাচিয়া উঠিল। মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হইল। পাচিল হইতে লাফ দিয়া নামিয়া দুজনে ছুটিয়া আসিল। শ্রীমতীর আনন্দের সীমা রহিল না।

সেদিন নিবাসিত রাজপুত্র ও রাজকন্যার বনবাসের স্থখ অপরিমেয় হইল। ভাঙ্গা কুটিরঃ দাওয়াতে উভয়কে পরস্পরের চোখ টিপিয়া ধরিয়া বসিতে বলিলেন শ্রীমতী। লুকোচুরি খেলার গন্ধ পাইয়া ভাই বোন উৎসাহিত হইল। তাহাদের ঐ ভাবে বসাইয়া শ্রীমতী নিঃশব্দ পদে কুটিরের ভিতরে প্রবেশ করিলেন। মিনিট দুই পরে বাহির হইল দুঃখিনী ঘুঁটে-কুড়ানী দুয়োরাণী। পা টিপিয়া টিপিয়া দাওয়া হইতে নামিল।

ছেলে মেয়ে অধীর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—“চোখ ছাড়বো?” কোনও সাড়া নাই। কিন্তু হঠাৎ অতি নিকটে কোথায় খসখস্ খব্বখব্ব শব্দ উঠিল। শব্দটা অপরিচিত। এদিকে ওদিকে সরিয়া বেড়াইতেছে। আর চোখ টিপিয়া নির্বাক নিষ্ক্রিয় বসিয়া থাকা সম্ভব হইল না। চোখ ছাড়িয়া দিল। যাহা দেখিল তাহা বৃষ্টিতে পারিল না। সম্মুখের জমিতে ছেঁড়া সেলাই করা গিঁঠ বাঁধা ময়লা শাড়ী ও ছেঁড়া জামা পরা, কপালের উপর হইতে টান করিয়া মাথার পিছনে ফুঁটি বাঁধা চুল, একটি মেয়ে একটা গাছের পাতাগুলি ডাল দিয়া উঠান কাঁটাইতেছে। তাহার গলায় হার নাই, হাতে চুড়ি নাই, বড়ি নাই, পরে জুতা নাই। কপালে গালে ধূলা মাটির দাগ, শাড়ীর আঁচল কোমরে জড়ানো।

আধুনিক বেশবাস-প্রদান-সজ্জিত। মানুষটির পরবর্তে এই নতন মানুষটিকে তাহার প্রথমে চিনিতে পারিল না। কয়েক মুহূর্ত বিস্মিত গোঁথে চাহিয়া রহিল। নতন মানুষটি তাহাদের দিকে পিছন ফিরিয়া কাজ করিতেছিল। এইবার তাহাদের পানে চাহিয়া হাসিমুখে বলিল—“ওমা, তোমরা ঘুম থেকে উঠে সকাল থেকে কোথায় ছিলে? পাহাড়ে গিয়েছিলে বুঝি?”

কাকনকুমার উৎফুল্লমুখে বলিল—“দুয়োরাণীকে!” কেশবতী বলিল—“দুয়োরাণী!” দুইজনে ছুটিয়া আসিয়া দুইপাশ হইতে দুয়োরাণীকে জড়াইয়া ধরিল। কেশবতী নাচিতে লাগিল—“আমার দুয়োরাণী!”

“ওমা, ছাড়ো, ছাড়ো, আমার কাজ আছে যে। ছাড়ো।” বলিয়া কাঁটা ফেলিয়া দুয়োরাণী একটা ভাঙ্গা মুড়ি (কুটিরের মধ্যে পাওয়া) লইয়া জড়ো করা শুকনো পাতাগুলি তাহাতে তুলিতে গেল।

ছেলেমেয়ে কাজ করিতে দিল না। হাত হইতে মুড়ি টানিয়া লইয়া বলিল—“না, কাজ করতে হবে না, কিছু করতে হবে না।” দুইজনে আবার জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—“দুয়োরাণী, আমাদের দুয়োরাণী!”

তখন কাজ ফেলিয়া পাতার রাশির আসনে বসিয়া দুয়োরাণী দুই ছেলে মেয়েকে কোলের কাছে টানিয়া চুমো খাইয়া বলিল—“ও কী গো? দুয়োরাণী কী? অজ্ঞ লোকেরা বলবে দুয়োরাণী, তোমরা বুঝি দুয়োরাণী বলবে? তোমরা তো বলবে—” কিন্তু তাহার কী বলবে তাহা বলিতে পারিলেন না শ্রীমতী। লজ্জা করিবার মানুষ যদিও কেহ নাই এই বনের মধ্যে, তথাপি কথাটা মুখে বাধিয়া গেল।

কাকন বলিল—“তবে আমরা কী বলবো?”

বুদ্ধি দিল কেশবতী। তাহার মনে পড়িল। বলিল—“আমাদের তো বা হয়, আমি তো দুয়োরাণীর মেয়ে। মা হও না? হ্যাঁ গো?”

কন্যার গালে চুষন করিল দুয়োরাণী। পুত্রও বক্ষিত হইল না মায়ের আদর হইতে। তখন কাকনকুমার বলিল—“একটা গল্পো বল না মা।” কেশবতী বলিল—“একটা নয়, ছোটো গল্পো বল মা। বাঘের গল্পো।” তারপর বলিল—“তোমাকে এখন খুব ভালো দেখাচ্ছে।”

তিনিয়া শ্রীমতী আনন্দিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিতে গেলো, একথা ইতিপূর্বে শুনে নাই, তাহা নহে। তিনিয়া এখনও লজ্জিত হইয়াছেন, কখনও বিরক্ত হইয়াছেন। শ্রী হইয়াছেন কখনও। কিন্তু এমন আনন্দ কখনো পান নাই।

দুয়োরাণী বলিল—“আগে বুঝি ভালো দেখাছিল না?”
কাঞ্চনকুমার বলিল—“না।”

স্পষ্ট কথা। কেশবতী বলিল—“একটু একটু ভালো দেখাছিল, এখন বেশী বেশী খুব ভালো দেখাচ্ছে।”

কালিকার মতো কেশবতী কোলের উপর উঠিয়া বসিল। বলিল—“আমাকে আর একটা চুমু খাও। দুয়োরাণী কষ্ট মনে তাহার ইচ্ছা পূরণ করিল। কেশবতী “ওকেও চুমু খাও।” দুয়োরাণী বলিল—“সে তোমাকে বলে দিতে হবে না গো মেয়ে। আমি জানি।”

কাঞ্চনকুমার বলিল—“তোমাকে খুব ভালো দেখাচ্ছে। কালকের চেয়ে ভালো দেখাচ্ছে, সোন্দর দেখাচ্ছে।”

দুয়োরাণী হাসিয়া বলিল—“শোনো ছেলের কথা শোনো।”

কাঞ্চন ও কেশবতী সত্য কথাই বলিয়াছে। ভালো-বাসার আলো শ্রীমতীকে উহাদের চোখে নূতন করিয়া স্নন্দর করিয়াছে। যে আমাকে ভালোবাসে সে স্নন্দর। যে আমার ভালোবাসা গ্রহণ করিয়া খুশী হয় তাহার চোখে আমি স্নন্দর। ভালোবাসার সৌন্দর্য রূপের সৌন্দর্যের উপর নির্ভর করে না। রূপ সস্তা, সাধারণ, তাহা সকলের চোখের অগ্নি। ভালোবাসার দেওয়া সৌন্দর্য মহার্ঘ্য, অসাধারণ, যে ভালোবাসে, যাহাকে ভালবাসে, সেই বিশেষ মানুষদেরই দৃষ্টিগোচর।

গাছের তলায় বসিয়া দুয়োরাণী তাহার ছেলের মেরেদের গল্প বলিতে লাগিল। বাঘের গল্প, শিয়ালের গল্পের স্রব ধরিয়া রাক্ষস আসিল। রাক্ষস না আসিলে বন মানায় না। রাক্ষসকে নিধন করিতে রাজপুত্র প্রয়োজন। হস্তিনাপুরের পাঁচ রাজপুত্র আসিল। দ্বিতীয় রাজপুত্র কর্তৃক একচক্রানগরে বকরাক্ষস নিধনের পালা হইল। অযোধ্যার দুই কিশোর রাজপুত্র কর্তৃক তাড়কা রাক্ষসী নিহত হইল। তারপর চার রাজপুত্রের বিবাহোৎসবে অযোধ্যার লোকেরা কী বিপুল ভোজ পাইয়াছিল, সেই

ভোজ প্রস্তুত করিতে কী বিরাট রান্নাঘর তুলিতে হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা বানাইতে গিয়া দুয়োরাণীর একটা প্রয়োজনীয় কথা মনে পড়িল। সে ব্যস্ত হইয়া বলিল—“ও মা, অনেক বেলা হয়ে গেল যে, আর নয়, উঠি।”

ছেলেমেয়ে তাহার চেয়ে ব্যস্ত হইয়া বলিল—“না, না, বেলা হয়নি, কিছু বেলা হয়নি। তুমি থাকো। গল্প বল।” তাহারো জড়াইয়া ধরিল দুয়োরাণীকে। তাহাদের ভয় হইয়াছে ইহারই মধ্যে বুঝি দুয়োরাণী না চলিয়া যাইবে।

“বাঃ, আর কি গল্প বলবার সময় আছে? রান্নাবান্না করতে হবে না? সকালে কাঞ্চন বনের মধ্যে থেকে যে হরিণটা শিকার করে এনেছে সেটা রান্না করতে হবে।”

কাঞ্চন ও কেশবতী আশ্চর্য হইয়া শোনে। দুয়োরাণী বলিল—“আমি ঘুঁটে কুড়িয়ে কাঠকুটো কুড়িয়ে এনেছি না করবো বলে?”

কাঞ্চন জিজ্ঞাসা করিল—“তুমি ঘুঁটে কুড়িয়ে এনেছ? কখন গেলে?”

দুয়োরাণী বলিল—“সেই যে সকাল বেলা, তুমি যখন তীর ধনুক নিয়ে শিকার করতে গেলে, তখন।”

কাঞ্চনকুমারের মনে পড়িল। সে বলিল—“ও, ই্যা, ই্যা।”

কেশবতী বলিল—“আমিও তীর ধনুক নিয়ে গিয়েছিলুম, না গো?”

দুয়োরাণী বলিল—“না, তুমি তো আমার সঙ্গে নদীতে গেলে চান করতে। চান করে নদী থেকে কলসী ভরে দুধনে জল নিয়ে এলুম, সেই যে, মনে নেই? তুমি আর আমি, জল আনলুম না?”

কেশবতীরও মনে পড়িল। বলিল—“ই্যা, ই্যা. মস্তো-বড়ো কলসী করে জল আনলুম, না গো?”

দুয়োরাণী বলিল—“তাহলে যাই রান্নাটা করে ফেলি। বেলা দুপুর হতে চলে। অত বড়ো হরিণটা রাখতে হবে। কী করে এমন বড়ো হরিণ কাঞ্চনকুমার নিয়ে এলো, তাই ভাবছি।”

কাঞ্চন লাফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—“এই এমন করে টানতে টানতে আনলুম—একোবড়ো হরিণ। আরও বড়ো আনতে পারি।”

হঠাৎ কেশবতী বলিল—“হরিণের মাংস ভালো না, বড়ো কাঁটা। আমি খাই না।”

হুয়োরানী জিজ্ঞাসা করিল—“তবে তুমি কী মাংস ভালোবাসো গো?”

“চিংড়ি মাছ।”

“ওমা, তাই তো। তুমি তো চিংড়ির মাংসই ভালোবাসো। আমার কী ভুলো মন! তাই ভুলেই তো সকালে নাইতে গিয়ে নদী থেকে চিংড়ি ধরে নিয়ে এলুম তোমার অন্তে।”

কাঞ্চন বলিল—“আমিও চিংড়ির মাংস ভালোবাসি। আর হাঁসের ডিম।”

কেশবতী বলিল—“আমিও।”

হরিণের মাংস খাইতে কেমন কে জানে। ভালো না হইবারই কথা। যে রকম গাছের মতো শিং মাথায়, ছবিতে দেখা যায়! কিন্তু পরিচিত স্বাভাৱ চিংড়ি ও হাঁসের ডিম নিষ্কটক ভালো, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

হুয়োরানী বলিল—“নিশ্চয়। হুজনেই চিংড়ি আর হাঁসের ডিম খাবে। আচ্ছা, এবার তোমরা এইখানে বসে খেলা কর। কোথাও যেয়োনা। আমি রান্নাটা সেরে তোমাদের ডাকবো।”

কেশবতী বলিল—“তুমি রান্না করতে যাবে? আমি তোমার সঙ্গে রান্না করবো।”

“ওমা, সে কী কথা? তুমি যে রাজকন্তে। রাজকন্তেরা কি রান্না করে? কোথাও শুনেছো?”

রাজকন্তা জবাব দিল না।

“কাঞ্চনকুমার, তুমি শুনেছো রাজকন্তেরা রান্না করে?”

কাঞ্চনকুমার গভীর মুখে বলিল—“না। রাজকন্তেরা রান্না করে না তো।”

হুয়োরানী বলিল—“রাজকন্তেরা সোণার খাটে গা রূপোর খাটে পা দিয়ে শুবে শুবে হীরের বাটিতে পান খায় আর—”

আরও কী কী রাজকন্তাযোগ্য কাজ আছে তাহা উদ্ভাবন করিবার প্রয়োজন হইল না। রাজপুত্র বলিয়া দিল। “আর নদী থেকে জল আনে কলসী করে আর বন থেকে ফলটুল কাঁচ টাট কুড়ায়।”

অতএব কেশবতী রন্ধনরূপ হেয় কাজের ইচ্ছা ত্যাগ করিল। ছেলে মেরেকে বসাইয়া হুয়োরানী ভাহার পাকশালায় প্রবেশ করিল। ভিতর হুইতে বলিল—“আমি টু না বললে তোমরা কেউ ভেতরে আসবে না, বুললে ততক্ষণ তোমরা খেলা কর।”

ব্যবস্থাটা মন্দ নয়। কিন্তু যতক্ষণ টু ডাক না আসে, ততক্ষণ কী খেলা করা যায়? হুয়োরানী না যখন ছিল না, বা থাকে না, তখন হুই তাই বোন যে সকল খেলা খেলিত, এখন তাহাদের কোনটাই মনে পড়িল না। হুই-তনে সেই ভাঙ্গা ঘরের কবাটহীন ঘরের দিকে লাগ্নহ প্রতীক্ষায় চাহিয়া রহিল। কয়েক মেকের মাত্র পরে কেশবতী ডাকিয়া বলিল—“কই, টু বলচো না?”

টু আসিতে অবশ্য দেরি হইল না। হুয়োরানীর রন্ধন-পটুতাই শুষ্ক অসাধারণ নহে, রন্ধনের ক্ষিপ্ততাও বিষয়কর। টু শুনিয়া হুইজন ছুটিল। ভিতরে আসিয়া আনন্দে বিষয়ে তাহাদের বড়ো চোখ আরও বড়ো হইল। ছেলেমেয়েকে আনন্দিত দেখিলে কোন মা না আনন্দিত হয়। তাহা ছাড়া স্বহস্তে রান্না করিয়া ছেলেমেয়েকে খাইতে দিবার আনন্দ তো আছেই। হুয়োরানী সানন্দে বলিল—“এই নাও, যা হোক করে এই চিংড়ির কাটলেট আর হাঁসের ডিমের কারি করেছি। দেখ দাঁকি বেয়ে কেমন হোগো।”

রন্ধন প্রাপটিকের হুই খানি ভিসে চার খানি করিয়া চিংড়ির কাটলেট ও চিংড়ি করিয়া ঠসের ডিমের কারি রাজপুত্র রাজকন্তার সমুখে ধরিয়া দিল হুয়োরানী। বিজ্ঞ নিবোধ ব্যক্তির উপস্থিত থাকিলে কাটলেটগুলির চেহারা দেখিয়া সেগুলিকে বিস্মৃত জান করিত, এমন কি অন্ধের মতো উহাদের উপর বিস্মৃত কোম্পানীর নামও পড়িয়া ফেলিত। এবং ডিমের কারিকে চিনিতে না পারিয়া বলিয়া বসিত এগুলি ছানা ও চিনি সহযোগে তৈয়ারী, বাজারে যাহা সন্দেহ নামে চলে। কিন্তু নির্বাসিতা হুয়োরানীর পুত্র কন্তা ভেমন নিবোধ ও অন্ধ নয়। জ্ঞান বর্ণ স্বাদ যতই বিস্মৃত ও সন্দেহের মতো হোক না, খাওয়া শুলিকে চিংড়ি ও ডিম বলিয়া গ্রহণ করিতে তাহাদের কোনও অসুবিধা হইল না।

শ্রীমতী ভাহার সুস্থিতে হুইখানি চামচ আনিতে ভোলেন নাই। হুয়োরানী সেই চামচ ছেলেমেয়ের হাতে

দিল, খাবাও ধূলি-মলিন হাত লাগাইতে হইল না। কাট-লেট চর্বণ করিতে করিতে কাঞ্চনকুমার বলিল—“এই সব তুমি নিজে রান্না করেছ ? সব ?”

দুয়োরানী বলিল—“আর কে রাঁধবে বল ? আমার কি বামুনঠাকুর আছে। আর এই অজগর বনের মধ্যে বামুন-ঠাকুররা কে আসবে ?”

কেশবতী বলিল—“তুমি খাচ্ছ না ? তোমার খাবার কই ? বা রে !”

দুয়োরানী বলিল—“আমি কি এখন খেতে পারি বাছা ? তোমাদের খাওয়া হোক, তারপর হাঁড়ি হেঁসেল তুলে তবে ভো আমার খাওয়া গো ?”

হাঁড়ি চেনে কেশবতী, কিন্তু হেঁসেল তাহার অপরিচিত বস্তু। সে বস্তুটিকে তোলা যে কেমন কাজ, তাহাও তাহার অজ্ঞাত। তবে সে কাজের জন্ত তাহার হুশিষ্ণু নাই। সে চামচে করিয়া একটু ভিমের কারি তুলিয়া ধরিয়া বলিল—“না, তুমি খাও, হাঁড়ি টাড়ি পড়ে থাকুক গে।”

দুয়োরানী বলিল—“ছি, ছি, ছেলেময়ের খাবার থেকে কি খেতে আছে ?”

কাঞ্চনকুমার বলিল—“হ্যাঁ খেতে আছে, নিশ্চয় খেতে আছে। মা ভো একদিন খেয়েছিল, না বোনটি ? মা খায়নি ?”

কেশবতী বলিল—“হ্যাঁ। আমার থালা থেকেও খেয়েছিল। আর বাবাও তো খায় আমার থালা থেকে।”

দুয়োরানী বলিল—“বাড়ীর মা’র কথা আলাদা। আমি যে বনের মা।”

এ বৃক্ষের উত্তর ভাবিয়া পাইল না ভাই বোন। তখন কেশবতী প্রবলতর বৃক্ষ প্রয়োগ করিল। বলিল—“খাও বলছি, লীগগির খাও, নইলে আমি তোমার মেয়ে হবো না।”

এত বড়ো শাস্তির ভয় সহ্য করা শক্ত। অতএব সেই ছোট হাতটি ধরিয়া তাহার চামচটি দুয়োরানীকে মুখে তুলিতে হইল। তখন আর একটি ছোট হাত আর একটি চামচ ধরিল তাহার মুখের কাছে।

দুয়োরানী বলিল—“কী রকম রান্না হয়েছে তা ভো বলে না ?”

কাঞ্চন বলিল—“বেশ ভালো হয়েছে।”

কেশবতী বলিল—“খু-উ-ব ভালো হয়েছে।”

রন্ধন ভালো হইয়াছে, আহারও ভালো হইল। কিন্তু ক্রীমভীর খলিতে জলের সংস্থান ছিল না, সুতরাং দুয়োরানী তাহার পুত্র কস্তার মুখ আঁচলে মুছিয়া দিল। তারপর খালের মধ্যে ডিস চামচ পুরিয়া দুয়োরানী হাঁড়ি হেঁসেল তুলিতেছে, এমন সময় দূরে কোণায় কে যেন কাহাকে ডাকিতেছে এমন ধ্বনি আসিল। দুয়োরানীর কানে ধ্বনিই আসিল, ডাক আসিল না। সে ডাক তাহাকে নয়, কর্ণও অচেনা বলিয়া সে ধ্বনির কোন অর্থ হইল না। কিন্তু কাঞ্চন কেশবতী ঠিক শুনিতে পাইল।

কাঞ্চন বলিল—“ঐ রে বোনটি, মতির মা তোমাকে ডাকছে।”

কেশবতী বলিল—“আমাকে নয়, তোকে ডাকছে দাদা। ঐ দেখ, বগ্লে মণ্টু-উ-টা।”

কাঞ্চন বলিল—“না ওটা খু-কু-উ-উ বগ্লে। তোমাকেই ডাকছে।”

দুয়োরানীর হেঁসেল তোলা হইয়া গেল। কাঞ্চনকুমার বলিল—“খুকুকে ডাকলে মতির মা, তুমি শুনেছ ?”

কেশবতী বলিল—“দাদাকে ডাকছো, না গো ? তুমি শুনেছ না ?”

দুয়োরানী নিরপেক্ষ সত্য কথাই বলিল—

‘হুজনের কথাই ঠিক। হুজনকেই ডাকছে।’

নেপথ্য হইতে ডাক আসিল—“মণ্টু খুকু লীগগির বাড়ী এসো। মা ডাকছেন।”

মণ্টু বলিল—“আমি যাবো না।”

যে স্বরে বলিল তাহা দূরবর্তী মতির মা’র কর্ণগোচর হইবার নহে। খুকুও তেমনই অশুচ স্বরে বলিল “আমিও যাবো না।”

দুইজনেরই প্রকৃত বক্তব্য এই যে—এখন বাইতে ইচ্ছা নাই। এখনই খেলা শেষ করিবার সময় আসে নাই। দূরের মানুষকে বলা নয়, কাছের মানুষকেই বলা হইয়াছে। কিন্তু হায়, কাছের মানুষের কী অধিকার আছে ইহাদের ধরিয়া রাখিবার।

বেলা যে পড়িয়া আসিয়াছে, গাছের ছায়া দীর্ঘ হইয়াছে, আকাশের সীসা রঙ বদলাইয়া নীল হইয়াছে, বাতাসে তাণের খরতা কমিয়াছে। পৃথিবীতে কেবল

একটি অরণ্যে একটি নির্বাসিতা হুজুরানী এবং তাহার গুপ্তরাজপুত্র ও রাজকন্যা আছে তাহা নয়। অরণ্যের বাহিরে মতির মা আছে, আরও অনেকে আছে, অরণ্যের মধ্যে বাহাদুরের পদার্পণে ইহার রমণীয় শোভা অপূৰ্ণ হইয়া ইহা বিক্রী জ্বলে পরিণত হইবে। সুতরাং মতির মা যেন এখানে না আসিয়া পড়ে। আসিলে হুজুরানীর মূহ বিপদ।

হুজুরানী বলিল—“বিকেল হয়ে গেছে, বোনটিকে নিয়ে বাড়ী যাও বাবা মণ্টু।”

মণ্টু বলিল—“মণ্টু নয়, কাঞ্চনকুমার।”

হুজুরানীর সঙ্গে কাঞ্চনকুমারেরই সাক্ষাৎ, মণ্টু নয়। ল সংশোধন করিয়া হুজুরানী বলিল—“হ্যাঁ, হ্যাঁ, কাঞ্চন-মার। কিন্তু এবার বাড়ী যেতে হবে যে, নইলে মা গ করবেন।”

কাঞ্চন বলিল—“তুমিও তো মা।”

কেশবতী প্রতিধ্বনি করিল—“তুমি বুঝি আমাদের মাও?”

হুজুরানী বলিল—“হ্যাঁ নিশ্চয়। আমি মা নই তা কী? কিন্তু সে খালি ছপুৰ বেলায়। আর এই নের মধ্যে। কিন্তু এখন যে বিকেল হয়ে গেছে—আর ভীতে যে মা আছেন তাঁর যে মন কেমন করছে তাহার জ্ঞে।”

খুঁ বলিল—“তোমার মন কেমন করে আমাদের জ্ঞে? আমরা চলে গেলে?”

শ্রীমতী খুঁকে ও মণ্টুকে দুই হাতে জড়াইয়া লইয়া লিলেন—“ভীষণ মন কেমন করে, তা আর বলতে। কিন্তু এবার বাড়ী না গেলে মতির মা এসে পড়বে, তখন হা মুক্তি হবে।”

খুঁ বলিল—“মতির মা এলে কিন্তু আমি খেলবো না, কছুতেই খেলবো না।”

শ্রীমতীরও তাহাই মত। মতির মা'র সহিত থলা চলিবে না, এ আশঙ্কা তাঁহার আছে। শিশুর হিত আলাপ আত্মীয়তা ও খেলা সহজ। তাহাদের আছে পরিচয়ের বালাই নাই, নাম ধাম জাতি কুল পেশা ইয়া প্রশ্ন উঠ না। যে মানুষটিকে তাহারা গ্রহণযোগ্য লিয়া মনে করে, কেন করে তাহা জানে না—তাহাকে

বিনা পরিচয়ে বিনা প্রশ্নে গ্রহণ করে। কিন্তু মতির মা'র সহিত সাক্ষাৎ স্থাপন শুধু চারি চকুর মিলনের দ্বারাই সম্ভব হইবে না। সত্যি মহা মুক্তি হইবে মতির মা'র আবির্ভাবে। এ যুগে বাহা জল সেই হুজুরানীগিরি ছাড়িয়া শ্রীমতীকে পলাইতে হইবে।

শ্রীমতী ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—“তাড়াতো বলছি গো, লীগিরি বাড়ী যাও। মতির মা এসো বলে। কাল আবার এসো। আর মতির মা'কে আমার কথা বোলো না, কারকে বোলো না।”

দুই জনেই সার নিল। “আচ্ছা। কাল তুমিও এসো। কারকে বোলো না, বুঝলে?”

সেদিন বাগানের প্রান্ত সীমায় আসিয়া শিবায় দেওয়া-নেওয়া হইল না। মতির মা'র আক্রমণ হইতে হুজুরানীর অরণ্যকে রক্ষা করা দরকার। মতির মা'র ডাক আবার শোনা গেল। মণ্টু খুঁ হুজুরানীর কুটির হইতেই বাড়ীর দিকে ছুটল। তাহারা চলিয়া গেলে রানীবেশ ও রানীর সংসার থলির ভিতর ঢুকিল। থলিট দেয়ালের গায়ে ঝুলিল। ইহাদের সঙ্গে হুজুরানীকে বনে রাখিয়া শ্রীমতী বন হইতে বাহির হইলেন।

*

বাসায় ফিরিয়া শ্রীমতী দেখিলেন—মাধবীদি ও হুজুরানীর মধ্যে প্রবল বিতণ্ডা হইতেছে। গৃহস্থানী দেখেন মাধবীদি। তিনি জানেন যে সংসারের কঠিনপদ সপক্ষে সদা সর্কে না থাকিলেই সেগুলি অস্বাভাবিক কঠিন থাকে। তিনি আরও জানেন যে দাসদাসীরা স্বযোগ পাইলেই মনবের মিনিস আত্মসাৎ করিতে থাকে। সুতরাং কোনও দাস বা দাসীকে বিশ্বাস করিতে নাই। ফলে হুজুরানীর সঙ্গে চাল ডাল মি তেল সাবান ইত্যাদির হিসাব লইয়া তাঁহার বাস বিতণ্ডা প্রায় নিত্যকার ঘটনা। শ্রীমতীও ভালো লাগে না। কোন দিনই ভালো লাগে না। আর আরও বেশী খাণ্ডপ লাগিল। হুজুরানীর সংসারে অভাব যতই থাকুক, অবিবাহিত নাই, কলরব প্রচুর আছে, কলহ নাই। সেই বে-হিসাবের শাস্তি হইতে সন্ত ফিরিয়া এই হিসাবের সংসারের অশান্তি তাঁহার অসহ্য লাগিল। কিন্তু সহ্য না করিয়াও উপায় নাই। প্রতিবাদ করিলে মাধবীদি কেশিয়া গিয়া হয় দাসীর চৌপাশপ্রাধ প্রমাণ করিতে

লাগিয়া যাইবে, নয় শ্রীমতীকে গৃহস্থালীর ভার নিজহাতে লইতে বলিবেন। গৃহিণী হইবার সাধ বা সাধা কোনটাই না থাকাতে শ্রীমতী নীরবে নিজের ঘরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া আত্মরক্ষা করিতে চাহিলেন। কিন্তু দরজা বন্ধ করিলেই শব্দের পথ রোধ করা যায় না। কানে আসিল—“আমার জিনিস না পাওয়া গেলে আমি নিশ্চয় বলবো, একশো বার বলবো। আর তুমি লোক নেই বাড়ীতে, তুই জানবি না তো কে জানবে? জিনিস বার করে দে, আমি কিছু বলবো না।”

শুক্লিয়ার কোনও উত্তর নাই। তবে সে বোধকরি এতক্ষণে মাধবীদির কথা মানিয়া লইয়াছে। শ্রীমতী নিশ্চিন্ত বোধ করিলেন।

কিন্তু সে কয়েক সেকেন্ড মাত্র। তারপরই শুক্লিয়া দরজা ঠেলিয়া শ্রীমতীর ঘরে আসিল ও জানাইল—সে আর কাজ করবে না, চোরির বদনামি সহিতে সে রাজী নহে, মাহিনা বাহা পাওনা আছে কবে দিবেন ছোট দ্বিদিমণি বলিয়া দিন, না দিবেন তাহাও বলুন, সে এখনই চলিয়া যাইবেই। তাহার জামা কাপড় গামছা ও পিতলের ঘটিটি হাতে করিয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছে শুক্লিয়া।

ছোট দ্বিদিমণিকে কিছু বলিতে হইল না। বড়ো দ্বিদিমণি ঘরে প্রবেশ করিলেন এবং বলিলেন—“না কাজ করিস, চলে যাবি। তার আবার ছোট দ্বিদিমণিকে বলবার কী আছে? কিন্তু যাবার আগে আমার জিনিস বার করে দিয়ে যাবি। এই সকালে দেখেছি, আর নেই? নেই বলেই নেই? পাখা গজিয়েছে, না? জিনিস ফিরিয়ে দিয়ে, যেতে হয় যাও, দূর হয়ে যাও। এই আমার শেষ কথা।” বলিয়া মাধবীদি বাহির হইয়া গেলেন। শেষ কথা বলার পর অবশ্য থাকিবার প্রয়োজন নাই।

এবার শ্রীমতীকে কথা কহিতেই হয়। তিনি বলিলেন—“কী পাওয়া যাচ্ছে না, খুঁজে দেখ না শুক্লিয়া। সত্যিই তো, বাড়ী থেকে যাবে কেন? আর যাবেই বা কোথায়? ভালো করে খুঁজলেই পাবি। যা, দেখগে যা।”

মাধবীদি বাহিরে গেলেও কাছেই ছিলেন নিশ্চয়। তিনি পুনঃ প্রবেশ করিলেন। শেষ কথার পরও কথা শেষ হয় নাই। বলিলেন—“কোথায় পাবে? বাড়ীতে

থাকলে তো খুঁজে পাবে। বাড়ীতে কোথাও নেই। আমি খুঁজে না দেখে বলি না। বাড়ী থেকে জিনিস বেরিয়ে গেছে, এ আমি ঠিক বলে দিলাম।”

মাধবীদি চলিয়া যাইতেছেন। শ্রীমতী জিজ্ঞাসা করিলেন—জিনিসটা কী?

মাধবীদি বলিলেন—“চামচ। ভালো চামচ ছ’ছানা উবে গেছে। কেউ চুরি করেনি, কেবল উবে গেছে।”

অল্পদিকে ফিরিয়াই কথা বলিলেন মাধবীদি। তাই দেখিতে পাইলেন না চোরের মুখের ভাব। দেখিলে চুরি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতেন।

শুক্লিয়া বলিল—“আমি চামচ চোরি করবো? ন সোনা আছে, না টাঙ্গি আছে। এতো কুঠিতে কাজ করেছি আমি। কেউ আমাকে চোর বলেনি, তুমি আমাকে ছুটি দাগ দ্বিদিমণি—”

এতক্ষণে কথা সরিল শ্রীমতীর মুখে। বলিলেন—“তুমি চুরি করনি শুক্লিয়া। চামচ আছে, হারাননি যাও, তুমি কাজ করগে।”

শুক্লিয়া বলিল—“না দ্বিদিমণি, চোর বদনামি নিয়ে আমি কাজ করতে পারবো না। আমি হাত জোড়চি আমার ছুটি দিন।”

শ্রীমতী ব্যাগ হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া শুক্লিয়ার হাতে দিয়া বলিলেন—“না, না, তুই চোর নস আমি জানি। যা, রাগ করিসনি।”

শুক্লিয়া মুখ গোঁজ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, করতলের টাকা অন্তরে কাজ করিতেছে। শ্রীমতী আবার বলিলেন—“যা শুক্লিয়া কাজ করগে যা, চামচ যদি হারিয়ে থাকে তার অন্তে তোর দোষ নেই, আমি জানি।

মাধবীদি আসিলেন, গভীর মুখে বলিলেন—“এখন থেকে ঘরের কাজ তুমিই দেখে চালাও শ্রীমতী। এই চাবি আর হিসেবের খাতা রইল।”

দড়ি বাঁধা গোটা ছুই চাবি ও একটা বাঁধানো খাতা টেবিলের উপর রাখিয়া মাধবীদি ফিরিয়া যাইতে ছিলেন। শ্রীমতী বলিলেন—“চামচ চুরি যারনি মাধবীদি। যদি গিয়েও থাকে, শুক্লিয়া চুরি করেনি।”

মাধবীদি বলিলেন—“ভালো কথা। খুব ভালো কথা। কিন্তু তুমি সংসার দেখ।”

শ্রীমতী বলিলেন—“চামচ আমি নিয়েছি।”

হুকিয়া বিস্মিত হইল। মাধবীদি বিস্মিত হইলেন না, তাঁহার রাগ বাড়িল, বলিলেন—“হঁ, বুঝেছি।” অর্থাৎ এত সহজে তুলিবার পাণ্ডী তিনি নন।

শ্রীমতী বলিলেন—“তুমি বিশ্বাস করছো না মাধবীদি? সত্যি আমি চামচ দুটো নিয়েছি। বা, হুকিয়া, তুই তোর কাজে যা।”

হুকিয়া মাধবীদির পানে একবার চাহিয়া লইয়া বলিল—“না, দিদিমণি, আমি যখন চোরি করেছি, আমাকে ছুটি দিয়ে দিন।”

মাধবীদি বলিলেন—“মিছে কথা বলিসনে হুকিয়া। তুই চুরি করেছিস আমি একবারও বলিনি। আমার জিনিস গেছে, বার করে দাও, এই আমার কথা। তুমি ছাড়া আর দ্বিতীয় লোক কার করে না বাড়ীতে।”

হুকিয়া জবাব দিতে যাইতেছিল, শ্রীমতী তাহাকে থামাইয়া বলিলেন—“তোকে কিছু বলতে হবে না, তুই কাজ করগে যা।”

হুকিয়া প্রশ্ন করিলে মাধবীদি বলিলেন—“এটা কী হচ্ছে? উদারতা? মহত্ব? তারপর? যতবার যা চুরি যাবে—এবার থেকে কত কী যাবে দেখা, সব তুমি নিয়েছ বলে রক্ষে করতে পারবে তো? বেশ, কোরে। এ যে বিশপেরও ওপোর যাও তুমি।”

“না মাধবীদি, বিশপ্‌স্‌ ক্যাণ্ডলস্টিক্‌স্‌ নয়, চোরকে প্রমাণ করার মহত্বও নয়। সত্যিই আমি নিয়েছি কিনা, তাই।”

“সত্যিই তুমি নিয়েছ তাই? বটে? বেশ, বার করে দাও দিকি।”

মুহু হাসিয়া শ্রীমতী বলিলেন—“বার করে দিতে পারবো না। কিন্তু আমি নিয়েছি।”

মাধবীদি জলিয়া উঠিলেন—“আমি কচি খুকি নই শ্রীমতী, আমাকে স্ত্রীকা বোঝাস নে। চামচ তুই নিয়েছিস। দু দুটো চামচ। কিন্তু তোর ঘরে নেই, বাড়ীতে কোথাও নেই, তুই আলাদা সংসার পেতেছিস, না? মহত্ব হচ্ছে? মিথ্যে কথা বলে মহত্ব হয় না, বলি।”

শ্রীমতীর মুখের গোড়ায় উত্তর আসিল—“আলাদা

সংসারই পেতেছি’, কিন্তু সে কথা কাহাকেও বলা যায় না যে।”

বলা যায় না বলিয়া উত্তর দিতে পারিলেন না শ্রীমতী। বলিলেন—“তোমাকে বিশ্বাস করতে পারছি না। কিন্তু কাল তুমি পাবে, তোমার চামচ পেয়ে যাবে।”

“তা পাবো না কেন। চামচ এমন কিছু হুপ্পাও নয়, হুপ্পাপাও নয়। এখানকার বাজারেও পাওয়া যায়। কাল কিনে এনে দেবে, চোরকে রক্ষে করতে নিজে দণ্ড দেবে। এ নইলে আর মহত্ব কী?”

শ্রীমতী হাসিয়া বলিলেন—“ওঃ, তুমি ওকালতিতে গেলে না কেন মাধবীদি? স্কুল-মাস্টারীতে তোমার টালেন্ট নষ্ট করেছে। ফৌজদারি উকিল হলে তুমি দশ হাজার টাকা কামাতে পারতে মাসে। তোমার যা মাথা।”

“থাক, আর ঠাট্টা করতে হবে না। খুব হয়েছে।” বলিলেন মাধবীদি। স্বরটা কিকিৎ নামিয়াছে। বোধ করি তাঁহার অনিচ্ছাস্বত্ত্বেও নামিয়াছে। প্রশংসায়, বিশেষ করিয়া রূপের ও বুদ্ধির প্রশংসায় নরম হয় না, এমন মন খুব কমই আছে।

“থাকগে, তোমাকে আর চামচ কিনে দণ্ড দিতে হবে না। চামচ আরও আছে।”

বলিয়া মাধবীদি ফিরিলেন। শ্রীমতী বলিলেন—“চুরি করলে দণ্ড দিতেই হয়। কিন্তু নতুন চামচ তোমায় কিনে দেবো না। তোমার পুরোনো চামচ দুটোই তুমি পাবে। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।”

“আমার আবার নিশ্চিন্ত। থাক, যা হয় হোক, উড়ে যাক, পুড়ে যাক, তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার তো থেকে। আমি আর কথাটি কইবো না।”

মাধবীদি চলিয়া গেলেন।

শ্রীমতী নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। প্রান্তিকের ডিগ্‌ জুইখানির তিরোধান কখন বা মাধবীদির গে চরে আসে, কখন আবার নতুন আক্রমণ ঘটে, এই শঙ্কায় উদ্ভিন্ন হইয়া রহিলেন। কিন্তু তাগ্য অতটা অপ্রদর হইল না। মাধবীদি মাথা ধরিয়াছে বলিয়া সন্ধ্যার চাও রাজির আহ্বার নিজের ঘরেই সারিলেন। শ্রীমতী সাধিয়া

খাওয়াটলেন তাঁহাকে। রান্নাঘর ভাঁড়ার ঘর সে রাজে পদ্বির্দন হইল না। স্বকিয়া ডিশের অভাব যদি বা লক্ষ্য করিয়া থাকে, তাহার উল্লেখ করিল না। আবার ডিশচুরির দায়ে পড়িবার মতো নিবুঁকি সে নয়।

পরদিন রবিবার। শ্রীমতীর বেলা অবধি ঘুমাইবার ও বিছানায় গড়াইবার দিন। মাধবীদি অনিয়ম বশুতঃ প্রায় কদাপি দেন না। যথারীতি ভোরে উঠিয়া নিয়ম-কার প্রাতঃভ্রমণ সারিয়া হেডমিস্ট্রের বাড়ী গেলে টুকরা কথা ও দরজার শব্দে সে সংবাদ পাইয়া শয্যা-নিশ্চিন্ত আরামে আবার চোখ বুজিলেন। ঘটনাক্রমে পড়ে স্বকিয়া আসিয়া ডাকিল। বলিল, তাহার একটু আজি আছে। শ্রীমতীর ভয় হইল। আবার কী? কিসের আজি? স্বকিয়া বলিল—“আজ আমাকে ছুটি দিবেন দ্বিদিমণি? আমি—”

শ্রীমতী রাগিয়া বলিলেন—“আমি জানি না, যা দূর হয়ে যা। সব মিটিয়ে দিলুম, টাকা দিলুম, তবু জ্বালাতন। বেশ, যা, তোকে কাজ করতে হবে না।”

গৃহস্থালীর ঝগড়াটো এমনিতেই তাঁহার ভালো লাগে না। প্রয়োজনে যখন করিতে হয় তখন কর্তব্যজ্ঞানেই করিতে হয়। কিন্তু আজিকার দিনটিতে এই সংসারের খাচায় বাধা পড়িয়া দুয়োরাগীর সংসার হইতে বঞ্চিত হইবার কল্পনাও তাঁহার সহ্য হইল না।

স্বকিয়া বলিল—“সে ছুটি নয় দ্বিদি, মেলা দেখতে যাবো, তাই একবেলার ছুটি চাইছি। বাচ্চাদের নিয়ে মেলা দেখতে যাবো। কাম কাজ আমি সব করে দিয়ে দুফোরে একটু সবে সবে যাবো, সন্ধ্যা বেলায় আসবো না দ্বিদিমণি, এই ছুটি চাইছি।”

শ্রীমতী উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“মেলা দেখতে যাবি? ছেলেদের নিয়ে? কিসের মেলা রে?”

স্বকিয়া বলিল—“সে আয়াসের একটা পরব আছে। তাহলে ছুটি মঞ্জুর দিদি?”

“তাঁহা? বড় দ্বিদিমণিকে বলেছিস?”

“না দ্বিদি, বড়দ্বিদিকে তুমি বোলো।”

বলিয়া স্বকিয়া চলিয়া যাইতেছিল। শ্রীমতী

বলিলেন—“শোন না স্বকিয়া, ইঁহা, মেলাতে কী জিনিস আসে রে? আমাকে নিয়ে যাবি দে তে?”

স্বকিয়া হাসিয়া বলিল—“হায় আমার কপাল! তুমি কী দেখবে দ্বিদিমণি? দেহাতি মেলা। গরীব গাঁইয়া মাছঘের বিকি-কিনির জিনিস আসে, আর বাচ্চাদের খেলনা দোলনা কিছু থাকে। না তোমাদের দেখবার, না কিনবার।”

শ্রীমতী তখন আর কিছু বলিলেন না। স্বকিয়ার ছুটি মঞ্জুর করিয়া এ প্রসঙ্গ শেষ করিলেন। কিন্তু তাঁহার মাথায় মনে মনে ঘুরিতে লাগিল। স্বকিয়া রান্না করিয়া চলিয়া গেল। শ্রীমতী স্নানাহার তাড়াতাড়ি সারিয়া মেলা দেখিতে বাহির হইলেন। তখন বেলা মাত্র একগোঁস বাকিয়া ছ। ভাগো ঘোর খবর পাওয়া গেল নচেৎ তবু বাধা হইত। বহু হইয়া কী অজুহাত দেওয়া যাইত? মাধবীদি বলিলেন—“বাকি বাও! মাথা ধরাপ হোলা নাকি?”

বলিবার কথাই। যে মাছঘর রবিবারে ও ছুটির দিনে বেলা একটা না বাজিলে স্নান করিতে নামে না এবং স্নানাহারের সময়টুকু ছাড়া প্রায় সারাদিনই বাহার বিছানায় গড়াইয়া কাটে, তাহার আজ হইল কী? আর তাহাও কিনা খোঁটা গেলো লোকের মেলা। মাথা ধরাপ না হইলে ঐ মেলা দেখিতে ছোটো কলিকাতার গ্রাজুয়েট মেয়ে? আর এই প্রচণ্ড সূর্য মাথায় করিয়া!

মাথা ধরাপ না হইয়াও গ্রাজুয়েট মেয়ে এমন সময়ে এমন মেলায় ছুটিতেছে কেন, সে কারণ তো কাহাকেও বলিবার নয়। বলিলে মাথা ধরাপেরই প্রমাণ দেওয়া হইবে।

স্বকিয়া বাড়ী গিয়া ছেলেমেয়েদের খাওয়াইবে, নিজে খাইবে, বিশ্রাম করিবে, তারপর রোজের কাঁক কমিলে ছেলেমেয়ে লইয়া মেলায় যাইবে। স্তব্ধ মেলায় ক্ষেত্রে তাহার সহিত দেখা হইবার ভয় নাই। শুধু দেখা হইলে বিপদ নাই, বিপদ হইত মাষ্টার দ্বিদিমণির কেনা জিনিসগুলি দেখিলে। এ-সব কিনিবার কোনও কৈফিয়ৎ শ্রীমতীর নাই। অথাৎ কাহাকেও বলিবার মতো নাই।

মেলাতে ধান, গম, চাল, ডাল, কাপড়, জামা, ধামা,

কুলো, গরু, ছাগল, প্রভৃতি সাধারণ তুচ্ছ বস্তুই বেশী থাকিলেও, অতি শ্রেয়োজনীয় ও লোভনীয় বস্তুও কিছু আছে। চক্চকে টিনের তরবারি আছে। স্বক্কে কাগজ জড়ানো টেঁচাডির তীর ধুক আছে। টুকুকে লাল রঙের উপর কুচকুচে কালো পাকানো গোঁফ আঁকা গোলাচোখ উঁচু নাক ও আকর্ষণ দাঁতলা রাক্ষসের মুখোশ আছে, নানা রঙের টুকটুকে পুঁতির মালা এবং কড়ির বালা আছে, ধবধবে শাদা সোনার কাকাতুয়া ও অমূল্য ময়ূরপুচ্ছের পাখা আছে। এ জগতে সুখী হইবার ও প্রিয়-জনকে সুখী করিবার জন্ত ইহার চেয়ে বেশী সম্পদকে আশা করিতে পাবে? ইত্যাদের উপর ছোট একট মাটির সোরাই, দুইখানি ভসু ও দুইখানি চামচ কিনিয়া মেলার সৎদা শেষ করিলেন শ্রীমতী। নিজের দুইটি মাত্র হাতে এত রাজ-সম্পদ বহন করা যায় না। একটি ছোকরাকে বাহক রূপে সঙ্গে লইলেন। পথে মিষ্টানের দোকান হইতে খাজ ও সোরাই ভরিয়া পানীর জল সংগৃহীত হইল। দুয়োরানীর অরণ্যের প্রবেশ পথের অদূরে বাহককে বিদায় দিলেন শ্রীমতী।

তখন কাঞ্চনকুমার ও কেশবতী আসে নাই। শ্রীমতীর সুবিধা হইল। সংসার গুছাইয়া দুয়োরানী দাওয়ায় বসিয়াছে, এমন সময় রাজপুত্র রাজকন্যা আসিয়া উপস্থিত হইল। দুয়োরানী মাকে পূর্বেই হাজির দেখিয়া তাহারা অতিশয় খুশী হইল। তার পর একে একে অমূল্য ধন সম্পত্তি পাইয়া খুশীর সীমা রহিল না। মা ও ছেলে মেয়ের মধ্যে আদর চুবনের প্রতিযোগিতা চলিল। শ্রীমতীর বুক ভরিয়া উঠিল।

সেদিন বর্তমান পৃথিবী ও কালের সীমানার বাহিরে এক অজগর বনের মধ্যে এক নির্বাসিতা দুয়োরানীর কুটিরের সম্মুখে কত যে ভীষণ দুর্গত কাণ্ড ঘটিল, তাহা একালের পৃথিবীর লোক জানিতে পারিল না তাই বন্ধ। জানিলে বিশ্বাস করিত কিনা সন্দেহ। কাঞ্চনকুমার নামে এক অসমসাহসী রাজপুত্র উন্মুক্ত তরবারি ও উত্তর তীরধনু লইয়া তপোবন রক্ষা কার্যে অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দিল। সেদিন পলকহীন গোল চক্ষু, রক্তহীন উদগ্র নাসিকা ও নিত্য-প্রসারিত আকর্ষণ দশনপংক্তি সমেত সুওধারী যে দুরাচার রাক্ষস বারবার তপোবনে হানা দিল,

সে মায়াবী শাদী পরিয়া আসিয়াছিল বলিয়া রক্ষা পাইল না। রাজপুত্রের ধনু ও তীর অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে বন্ধ থাকিলেও তাহার অব্যর্থ শর সন্ধানে মায়াবী রাক্ষসকে বারবার ধরাশায়ী হইয়া বারবার প্রাণ ত্যাগ করিতে হইল। সেদিন সেই অরণ্য মধ্যে দৈত্যের মায়ায় বন্দি কেশবতী নামে এক রাজকন্যা নানাবর্ণের মহামূল্য মুক্তামালা গায় ও রত্নবলয় হাতে পরিয়া দুইচোখ খুলিয়া গভীর নিদ্রায় অচেতন হইয়া বসিয়াছিল। চোখ বুজিয়া ঘুমাইবার প্রাচীন প্রথা এই রাজকন্যার মেটেই মনোপূত নয়, কারণ চোখ বুজিলে কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। আর দৈত্যগৃহে অদৃশ্য সোনার পলক থাকিলেও তাহাতে শুইয়া জামায় পুণা লাগানোতে রাজকন্যার দুয়োরানী মায়ের আপত্তি থাকায় কেশবতী বাঁসয়া চোখ খুলিয়া নিদ্রাঘরে অচেতন রহিল। রাজপুত্র আসিল মায়াঘুম ভাঙাইয়া রাজকন্যার চেতনা আনিতে। বুদ্ধরূপী বন-দেবতাদের প্রসাদে বনে সোনার কাঠির ছড়াছড়ি। যাহাদের চোখের দৃষ্টিতে, হাতের স্পর্শে ও মনের ইচ্ছায় সোনা জন্মায়, তাহাদের সোনার অভাব হয় না। সে-সোনা বণিকের মুখাপেক্ষা নহ, ধনিকের ভাগ্যে তাহা বন্দা হয় না, তত্ত্বের সিধকাঠি তাহার নাগাল পায় না। উৎসাহী রাজপুত্র মুঠি মুঠি সোনার কাঠি বণণ করিয়া রাজকন্যার চৈতন্য ফিরাইতে প্রবৃত্ত হইল। অতিসংখ্যক কাঠির অতিমাত্রায় স্পর্শে রাজকন্যার চৈতন্য অতিশয় প্রথর হইয়া জাগিল। তেজস্বিনী রাজকন্যা উতাক্ত হইয়া অস্ত্রবিনাই শুণু হাতে হুকপ্যাণ্ট পরিহিত এক রাক্ষসকে তাড়া করিয়া দূরে খেদাইয়া দিল।

আবার এক সময়ে কাঞ্চনকুমার রাজপুত্র যুগয়ায় গিয়া দূর বন হইতে যাবতীয় বাঘ সিংহ গণ্ডার ভিঁমি মাছ ও জলহস্তী প্রভৃতি শিকার করিয়া আনিল এবং কেশবতী রাজকন্যা সোরাই কাঁখে বসাইয়া নদী ও স্বর্ণা হইতে এমন হুমিষ্ট জল লইয়া আসিল যে সেই জলে দুয়োরানী-মা বাঘ সিংহ প্রভৃতির মাংসকে রান্না করিয়া সন্দেশের মতো কোমল ও মিষ্ট করিয়া পুত্র কন্যাকে পরিবেশন করিল।

দুধা ও পিপাসা শান্ত হইলে দুই ভাই বোন মায়ের দুই জাহ্নু অধিকার করিয়া বসিল। কেশবতী বলিল—“আজ

এই মাটাকে কিছুতেই যেতে দেবো না। নারে দাদা ?”

কাঞ্চন মায়ের আঁচল এক হাতে জড়াইয়া লইয়া অল্প হাতে ভরবারি উঠাইয়া বলিল—“পালাতে গেলেই কেটে ফেলবো। ঘাঁচ করে কেটে ফেলবো।”

দুয়োরানী ভীত কাতর কণ্ঠে বলিল—“ওমা গো, কেটে ফেলবে কী গো ? কেটে ফেলে যদি আর না বাঁচি ? তা হলে মতির মা দুয়োরানী হবে তো ? বেশ।”

এই দুয়োরানীটার মরিয়া যাওয়া এবং মতির মায়ের তাহার স্থান গ্রহণ, এই ঘটনার সম্ভাবনা সমান অসম্ভব। কেশবতী তাড়াতাড়ি মায়ের কানে কানে বলিল—“সন্তোষকারের কাটবে না গো, মিচিমিচি কাটবে, বুঝলে ?”

কাঞ্চন দেখিল তাহার কথায় কাজ হইয়াছে। বলিল—“তুমি চলে যাবে না বল না। তাহলে তো কাটবো না। বল ?”

কী জবাব দিবেন শ্রীমতী ? এই নির্বাসনের স্বর্ণ হইতে নির্বাসিত না হইবার উপায় আছে কি ? এবং সেই নিরুপায় দুঃখের অনিবার্যতা ইহাদের বিশ্বাস করাইবার উপায়ই বা কোথায় ? ইহারা সব বিশ্বাস করে বলিয়াই বিচ্ছেদের অনিবার্যতা বিশ্বাস করে না। ইহারা বলে “যেতে নাহি দিব।”

কেশবতী বলিল—“বল না, ওমা, তুমি চলে যাবে না—বল না।”

দুয়োরানী মতির মায়ের শরণ লইল। মাহুঘটির নহে, তাহার নামটির। ভক্তরা বলেন—নাম ও নামী অভেদ, তবু নামী হইতে নামের প্রভাব অধিক। দুয়োরানী বলিল—“চলে যাব কেন ? লুকিয়ে থাকবো। তা নইলে মতির মা যে দেখে ফেলবে। ডাকতে ডাকতে যদি এখানে এসে পড়ে—ওরে বাবা, মতির মার সঙ্গে দেখা হলে আমি তো ভয়েই মরে যাবো। তাহলে আর একটুও খেলতে পারবো না।”

কথাটা মিথ্যা নয়। এ আসরে মতির মা, শুধু মতির মা কেন, অপর যে কোনও ব্যক্তির উপদ্রব তাই বোনেরও ভয়ের কারণ। কেহই তাহা সহ্য করিতে প্রস্তুত নহে।

কিন্তু নতুন বীরত্বের আশ্বাস পাইয়া কাঞ্চনকুমার এখন অকুতোভয়। হাতে অস্ত্র থাকিতে অহুশস্থিত শত্রু

নিধনে-তাহার আলস্য নাই। সে দাঁড়াইয়া উঠিয়া তরবারি আন্দোলিত করিয়া বলিল—“মতির মা’কে কেটে ফেলবো, কাঁচ করে কেটে ফেলবো এখানে এসে।”

দুয়োরানী বলিল—“তাতেও হবে না। মতির মা যে কিছু জানে না। কেটে ফেলেও আবার বেঁচে উঠে সবাইকে বলে দেবে আমার কথা।”

এরকম নিরুজ্জ্বল রাক্ষসের কথা শোনা গিয়াছে বটে, যাহারা মরিয়া গিয়াও আবার বাঁচিয়া উঠিয়া যুদ্ধ করে। কেশবতী তাহার দাদাকে বুঝাইয়া বলিল—“মতির মা’টা বোকা কিনা, বুঝিলি দাদা, কেটে ফেলেও কথা কইবে।”

কাঞ্চন বলিল—“নিইর কোথাকার।” তাহার ভাষার ভাঙারে এই শব্দটি নতুন সংগৃহীত হইয়াছে। শব্দটি তাহার ভালো লাগিয়াছে, ব্যবহার করিতে ভালো লাগে।

দুয়োরানী মায়ের প্রস্তাবই ভালো। কাঞ্চনকুমার বলিল—“তুমি কোথায় লুকিয়ে থাকবে ?”

কেশবতী বলিল—“এই ঘরে থাকবে ? রাস্তিরে ভয় করবে না ?”

দুয়োরানী বলিল—“এই ঘরে কেন ? আমি থাকবো যেখানে রোজ লুকিয়ে থাকি। থাকি না ? তোমরাও তো লুকিয়ে থাকো। বিকেল হয়ে গেলে তোমরা চলে যাও, কোথায় থাকো, আমি জানি না, আমি চলে যাই, কোথায় থাকি তোমরা জানো না। বেশ মজা হয়। আবার এইখানে এসে দেখা হয়। কেমন মজা হয় লুকোচুরি খেলার মতন, নয় ?”

বক্তার ও শ্রোতার শুনেই অনেক মজার উপলক্ষি হয়, বস্তুর বা ঘটনার গুণে নয়। এমন হাসিমুখে এমন স্বরে দুয়োরানী প্রতিদিনের লুকোচুরির মজা ব্যক্ত করিল যে অস্বীকার করিতে ইচ্ছা হইল না। কাঞ্চন বলিল—“আমরা যে কোথায় লুকিয়ে থাকি সে তুমি কিছুতেই খুঁজে পাবে না। বোনটি, বলিস নি।”

কেশবতী বলিল—“তুমি মনে করছো কাছেই থাকি, তা নয়, সে অ-নে-ক দূরে এক জায়গায় থাকি। না রে দাদা ?”

দুয়োরানী বলিল—“একদিন দাঁড়াও না আমি ঠিক খুঁজে বার করবো। তোমরা খুব আশ্চর্য্য হয়ে যাবে আমাকে দেখে।”

কাঞ্চনকুমার বলিল—“আমিও খুঁজে বার করবো তোমার ঘর। দেখো না।”

কেশবতী বলিল—“তুমি একলা থাকো ঘরে? তোমার ভয় করে না?”

“ভয় করবে কেন? আমি তো বড়ো হয়েছি গো।”

কাঞ্চন দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—আমিও বড়ো হয়েছি। আমি তোমার ঘর দেখতে যাবো। নিশ্চয় যাবো।

কেশবতী আরও এক পদ অগ্রসর হইল, বলিল—“আমি তোমার কাছে শোবো। রাত্তি?”

এটা কাঞ্চনেরও মনেব কথা। নেহাৎ বড়ো হইয়াছে বলিয়া বলিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেছিল। ঘর দেখিতে বাওয়ার প্রস্তাব মধুর অভাবে গুড়ের ব্যবস্থা। এখন ছোট বোনের সাহসে সাহস পাইয়া সে বলিল—“আমিও শোবো।”

মায়ের কাছে শিশু পুত্র কন্যা শুইতে চাহে, ইহাতে মায়ের কী বলিবার আছে। অতএব ছুয়োরানী জবাব দিতে পারিল না। জবাবের জন্ত পুত্রকন্যার দৃষ্টিত্যাগ নাই। কারণ এটা অধিকারের কথা, অমুমতির অপেক্ষা রাখে না।

কেশবতী বলিল—“আমি ডান দিকে শোবো।”

কাঞ্চনকুমার বলিল—“না, আমি ডান দিকে শোবো, তুমি বাঁদিকে।”

মায়ের দক্ষিণ ও বামদিকের মধ্যে কী প্রভেদ আছে, কে জানে। কিন্তু এক অংশীদার যদি বিশেষ করিয়া একটা দিক দাবী করে, তবে অপর অংশীদারও কেন সেই দাবী করিবে না?

কেশবতী বলিল—“না। আমি আগে বলিচি।” বলিয়া সে ছুয়োরানীর ডান হাতটি নিজের ক্ষুদ্র হাত দুইটি দিয়া জড়াইয়া ধরিল।

কাঞ্চনকুমার গভীর স্বরে বলিল—“খুকু, আমি দাঁদা হই না? আমি তোমার চেয়ে বড়ো না?”

যুক্তি যেমনই হোক, কথাটা অস্বীকার করা যায় না।

কেশবতী তখন সেবা যুক্তি প্রয়োগ করিল। মায়ের হাতটা ছুঁড়িয়া ভাগ করিয়া মুখ ঘুরাইয়া বলিল। ছুয়োরানী সানন্দে তাহাকে লইয়া ছেলেমেয়েদের কলহ

উপভোগ করিতেছিল। কিছু বলিল না। কিন্তু বেচারী কাঞ্চনকুমার এই পরিস্থিতির জন্ত প্রস্তুত ছিল না। ছোট বোনের অভিমানরূপ অকাটা যুক্তির খণ্ডন না পাইয়া মামলা সালিশীতে দিল। বলিল—“আচ্চা, মা যা বলবে। কেমন? রাত্তি?”

কেশবতী হাঁ, না, কিছু বলিল না। মুখ ঘুরাইয়াই বসিয়া রহিল। কাঞ্চন বলিল—“আমার কথা ঠিক না, মা? আমি বড়ো, আমি ডান দিকে শোবো, না?”

কেশবতী এবার ফিরিয়া বলিল—“না, আমি শোবো। না মা?” বলিয়া মায়ের হাতখানি পুনরায় হস্তগত করিল।

ছুয়োরানী উৎকণ্ঠ রোয়েদাদ দিল। কেশবতীকে বলিল—“দাঁদা কিনা বড়ো হয়, তাই দাদার কথা শুনবো, কেমন?” এবং কেশবতীর প্রতিক্রিয়া প্রকাশের সময় না দিয়া প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কাঞ্চনের দিকে ফিরিয়া বলিল—“কিন্তু খুকু ছোট বোন বলে খুকুর কথাটা দাদাকে রাখতেই হবে। নিশ্চয় রাখতে হবে। কী বল?”

কাঞ্চন সন্ধি করিবার জন্ত প্রস্তুত ছিল। বলিল—“হ্যাঁ।” প্রকৃতপক্ষে কাহার ভাগে কোন দিকটা পড়িল, তাহা যে নিশ্চিতভাবে নির্ণীত হইল, এমন বলা যায় না। কিন্তু তাহার প্রয়োজনও হইল না। মাকে লইয়া দায়-ভাগের মামলা এইখানেই মিটিল।

তিন দিনের তর্গাপূজায় যেমন নবমীর রাত্রিতেই উৎসবের উল্লাস সবচেয়ে বেশী হয়, তেমনি ইহাঙ্গের কল্ল-লোকের খেলা আজ তৃতীয় দিনে সর্বাধিক জমিয়াছিল। আজ খেলা শুরু হইয়াছে শীঘ্র, খেলা হইয়াছে নানা উপকরণ লইয়া নানা বিচিত্র রকমের। আবার আজ মতির মা'র ডাক আসিলই না, তাই মিলনের কালও দীর্ঘতম হইল। কিন্তু দীর্ঘতমেরও শেষ হয়। ক্রমে ছুয়োগাণীর অরণ্যের আলো স্তান হইল। খেলা ভাঙার কথা যেন মনেই ছিল না, মনে করিতে হইল। খেলা ভাঙিতে হইল।

রূপকথার সংসার, রাজপুত্রের অস্ত্রশস্ত্র, রাজকন্যার রত্নভরণ ও রাক্ষসের রূপ—সব ছুয়োরানীর কুটিরে গচ্ছিত রাখিয়া মটু ও খুকুকে লইয়া জীমতী বাহিরে চলিলেন।

বিদায়ের হুঃখ আজ ছেলেমেয়ের পক্ষে সহজ হইয়া আসিয়াছে। তাহারা উবেগহীন চিত্তে শ্রীমতীর দুই হাত ধরিয়া বকিতে বকিতে চলিল। আজ খেলা শেষ হইয়াছে, কাল শুরু হইবে। এ তো নিত্যকার খেলা। কিন্তু শ্রীমতীর মন কাতর হইয়া আছে। তিনি জানেন আজ যে খেলা শেষ হইল কাল তাহা শুরু হইবে না, পরশুও হইবে না, পর পর করদিই হইবে না। কাল সোমবার।

কিন্তু সে কথা তিনি বলিতে পারিলেন না।

বাগানের সীমানায় আসিয়া শ্রীমতী বলিলেন—“আর আসতে হবে না। এবার তোমরা বাড়ী যাও।”

কেশবতী ও কাক্ষন সম্মুখে বলিল—“না।”

“না কী গো? বাড়ী যাবে না তো যাবে কোথায়?”

কাক্ষন বলিল—“তোমার বাড়ী যাবো।”

কেশবতী বলিল—“তোমার বাড়ী যাবো। তা নইলে তোমাকে যেতে দেবো না।”

স্বার্থহীন বিধাহীন ঘোষণা।

“কিন্তু যেতে নাহি দিব”র পরও বাইতে দিতে হয়। ক্ষুদ্র শিশুমুষ্টিতে সংসারের মানুষের দুর্বীর যাত্রা বন্ধ করা যায় না।

শ্রীমতী বাসায় ফিরিয়া সেই জঙ্গলের মধ্যে ঘুরিতে লাগিলেন, যেমন পূর্বে দুই দিন ঘুরিয়াছেন। কিন্তু পূর্বে দুই দিন আবার সেখানে শীত দিহিবেন জানিয়া মন আশ্বস্ত ছিল। আজ সে আশ্বাস নাই। কাল হইতে শুক্রবার পর্যন্ত পুরা স্থল। ছাত্রীদের ছুটি সাড়ে তিনটায়, কিন্তু শিক্ষিকাদের ছুটি ঘটাত্তানেক পরে। সামনেই পরীক্ষা আসিতেছে, তাহার প্রস্তুতি চলিবে।

সোমবার ও মঙ্গলবার ছুটফট করিয়া কাটিল। দুইটি শিশুসদয় এই বন্ধনা কেমন করিয়া সহিতেছে? বন্ধনা বই কি। খেলা যে শুরু হইবে না, এ সংবাদ তো দেওয়া হয় নাই—বরং আশাই দেওয়া হইয়াছে যে এ খেলা নিত্যই চলিবে। বুধবার বিকালে শ্রীমতীর আর ধৈর্য রহিল না। ছুটির ঘট্টা পড়িবার পর অতিরিক্ত কর্তব্যের জন্ত বসিলেন না। বইপত্র ডেস্কে বন্ধ করিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। একজনকে বলিয়া গেলেন একটা জরুরি প্রয়োজনে বাইতেছেন, অল্পক্ষণ পরেই ফিরিবেন।

ক্ষুদ্রপদে অরণ্যের ধারে আসিয়া দেখিলেন কেহ তাঁহার জন্ত অপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া নাই। থাকিবার কথা নয়। এমন অপরাহ্ন বেলায় তাঁহাকে উহার প্রত্যাশা করে না। কিন্তু শ্রীমতীর মানস চক্ষুতে যে তিনি নিরন্তর দেখেন দুটি শিশু এই পথের ধারে সর্বক্ষণ তাঁহার আশার প্রতীকায় দাঁড়াইয়া আছে। হতাশায় অভিমানে তাহাদের হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। তাই যুক্তিহীন কল্পনায় শ্রীমতী বুঝি মনে করিয়াছিলেন পথের ধারে তাহাদের দেখিতে পাইবেন।

মতির মা যদি এত শীঘ্র না ডাকিয়া থাকে, তবে রাজপুত্র রাজকন্যা এখনও দুয়োপ্রাণীর বনে খেলা করিতেছে। আশার ছলনায় মানুষ অনেক বৃথা কাজ করিয়া থাকে। শ্রীমতী বাগানে প্রবেশ করিলেন। না, বাগান আজ অরণ্যই বটে। কেহ নাই।

আরও দুইদিন কাটিল। কোন মতেই শ্রীমতী সময় করিতে পারিলেন না। অবশেষে, বহু বিলম্বে, শনিবার আসিল। বেলা দুইটা নাগাৎ শ্রীমতী স্থল হইতে বাহির হইলেন। আজ স্থির করিয়াছেন মটু ও খুককে সঙ্গে করিয়া তাহাদের বাড়ীতে বাইবেন, তাহাদের মায়ের সঙ্গে আলাপ করিবেন। শনিবার রবিবারের গভীর বাহিরে যখন স্তব্ধ হইবে মটু খুককে দেখিয়া আসিবেন। ইচ্ছা হইয়াছিল বাজার হইতে বনবাসের জন্ত কিছু খাদ্য সংগ্রহ করিবেন। কিন্তু দেরি হইবার ভয়ে সেদিকে গেলেন না। দীর্ঘ পাঁচদিন দুটি শিশু তাঁহার জন্ত প্রতীক্ষা করিয়া আছে, দীর্ঘ পাঁচদিন তিনি তাহাদের সঙ্গে মিলিতে না পারিবার হুঃখ সহিয়া আছেন। সে প্রতীক্ষাকে সে হুঃখকে আর পনেরো মিনিটের দ্বারাও প্রলম্বিত করা সহিবে না।

আজও কেহ দাঁড়াইয়া নাই বনের প্রান্তে, পথের পাশে। তা, কতক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে। কতদিনই বা পারে? আশা ত্যাগ করিয়া নিজেবাই খেলিতেছে, নিত্য যেমন খেলে। ভালোই হইয়াছে, পথের উপর রাগ অভিমানের পালা চলিলে কেহ হয়তো দেখিয়া ফেলিত। এখন বনের মধ্যে অপ্রত্যাশিত উপস্থিত হইলে বিশ্বাসের আনন্দে উহার রাগ করিতে ভুলিয়া যাইবে। শ্রীমতী বনে প্রবেশ করিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া শুকনা পাতার উপর পদশব্দ পরিহার করিয়া চলিলেন।

কেহ নাই। আঙ্গিনায় নাই। কুটিরে নাই। ইত্যন্ততঃ ঘুরিয়া দেখিলেন, কোথাও নাই। তবে এখনও আসে নাই। শ্রীমতী হাত ঘড়িতে দেখিলেন দুইটা বাজিয়াছে। এখনও ঘণ্টা দুই, দুই কেন, মতির মা না ডাকিলে তিন ঘণ্টাও হইতে পারে, থেলা চলিবে। গ্রীষ্মের দীর্ঘ দিনের এখনও অনেকখানি বেলা অবশিষ্ট আছে। শ্রীমতী কুটিরে প্রবেশ করিলেন। দুয়োরানী বাহির হইল। এইবার প্রতীকার পালা।

মতির মা কি দুপুরের নিদ্রা ত্যাগ করিয়া এতক্ষণ গল বলিতেছে? না, পাঁচ দিনের নিরাশায় দুয়োরানীকে পরিত্যাগ করিয়া মণ্টু ও থুকু ঘরেই থেলিতেছে? কেমন করিয়া খবরটা দেওয়া যায় যে দুয়োরানী আসিয়াছে। বিলম্বি ঘর ছাড়িয়া এই স্থলর বনে চলিলা এস।

কেহ আসিল না। তিনটা বাজিয়া গেল। সাড়ে তিন বাজিল। কেহ আসিল না। কী হইল? সারা দুপুর বিকাল ঘরে বন্দী হইয়া থাকিবার ছেলে মেয়ে তো উহার নয়। স্বস্থ থাকিতে নয়।

অকস্মাৎ বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল শ্রীমতীর। স্বস্থ আছে তো? এ সন্দেহ তাড়নো গেল না। যতো মনে করেন স্বস্থ থাকিবে না কেন, নিশ্চয় স্বস্থ আছে, এমন স্বস্থ দেখিয়া গিয়াছেন সেদিন, ইহারই মধ্যে অস্বস্থ হইবে কেন? কিন্তু সন্দেহ যায় না। ভাবিতে ভাবিতে সন্দেহ আশঙ্কায় ও আশঙ্ক বিশ্বাসে দাঁড়াইল। অস্বস্থ না করিলে উহার আসিতই। কাহার অস্বস্থ? এক জনের, না দুই জনেরই? শিশুদের অস্বস্থ প্রায়ই সংক্রামক হয়। কিছু মাত্র অসম্ভব নয় যে থুকু ও মণ্টু শয্যাগত হইয়া পড়িয়া আছে। যত রকম শৈশব ব্যাধির কথা শ্রীমতীর মনে পড়িতে লাগিল। সবগুলিই সাংঘাতিক হইতে পারে। অনেক সময় প্রথম হইতে উপযুক্ত যত্নের ও সাবধানতার অভাবে ব্যাধি বিষম রূপ ধারণ করে। এই রকম চিন্তা মন হইতে বড়ই দূর করিতে চেষ্টা করেন, ততই ছনিবার হইয়া মনকে আচ্ছন্ন করিতে থাকিল।

তখন সেই নকল দুয়োরানীর নকল মাতৃহৃদয়ে নকল পুত্রকন্ডার জন্ত অভিমান আসল উবেগ বহুলা স্বর হইল। আর হ্রিৎ হইয়া বসিয়া থাকা চলিল না। সেই পরিত্যক্ত বাগানের ডাকা চালায় বসিয়া পড়ন্ত বেলায় রান

আলোয় নিঃসঙ্গ দুয়োরানীর নির্বাসন আরম্ভ হইল। রাজপুত্র রাজকন্তা রাজবাটিতে আছে, কিন্তু তাহাদের কাছে বাইবার পথ নাই, অধিকার নাই। এ নির্বাসন অসহ্য।

কুটিরের মধ্যে দুয়োরানীকে ছাড়িয়া শ্রীমতী বাহিরে আসিলেন। আসিবার সময় চোখে পড়িল মেঝের উপর এক স্থানে খোলামকুটি দিয়া লেখা: “আড়ি আড়ি।” মণ্টু লিখিয়াছে। থুকু এখনও লিখিতে শিখে নাই। সেই বড়ো বড়ো আঁকা বাঁকা চারিটি অক্ষর মণ্টুর হইয়া মুখ ভার করিয়া শ্রীমতীর মুখের পানে চাহিয়া আছে। সে মুখ প্রশম করা এখনই, এই মুহূর্তে অবশ্য কর্তব্য।

বাগানের পাশের যে রাস্তা দিয়া শ্রীমতীর আসা যাওয়া, সেটা একটা বড়ো রাস্তায় পড়িয়াছে। বড়ো রাস্তায় আসিয়া মোড় ফিরিয়া অল্প দূরে দেখিলেন ফটক, ফটকের পিছনে বাড়ী। রাজবাড়ী না হোক, ধনীর প্রাসাদ তাহাতে সন্দেহ নাই। যেমন সখের বাগান এখন জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে, সখের বাড়ীও তেমনি অবশ্যে অব্যবহারে জীর্ণ বিবর্ণ হইয়া আছে। তথাপি বড়লোকের বাড়ীর ফটক। অনাহুত অপরিচিত দরিদ্রের প্রতি তাহার ক্রুটি স্বভাবসিদ্ধ। কিন্তু সমস্ত সংকোচ সংশয় দ্বিধা প্রবল সন্দের দ্বারা জয় করিয়া শ্রীমতী ফটক অতিক্রম করিলেন। কয়েক মিনিট পরে শ্রীমতী সেই ফটক পুনরায় অতিক্রম করিয়া পথে ফিরিয়া আসিলেন। রূপকথার থেলা শেষ হইয়াছে।

রূপকথার থেলা চিরন্তনে শেষ হইয়াছে, ইহাই উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন শ্রীমতী বাসায় ফিরিয়া। রাজপুত্র কাকিনকুমার, রাজকন্তা কেশবতী আর তাঁহার সহিত থেলা করিবে না, তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিবে না, তাঁহার আদর লইবে না। এ জীবনে তাহাদের সহিত আর দেখা হইবে না।

মণ্টু ও থুকু তাহাদের বাপমায়ের সঙ্গে কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছে। হাওয়া বদলের জন্ত এই বাড়ী লইয়া ছিলেন। আরও কিছুদিন থাকিবার কথা ছিল, কিন্তু হঠাৎ বাবু আসিয়া সকলকে লইয়া চলিয়া গিয়াছেন। দুয়োরানীর কাছ হইতে এইটুকু মাত্র সংবাদ লইয়া

আসিয়াছেন শ্রীমতী। দারোগার বক্তব্য শুনিয়াছে আর ফিরিয়া আসিবার সম্ভাবনা নাই।

রূপকথা তো শেষ হইয়াছে। শ্রীমতীর কথা কিছু বাকী আছে। শ্রীমতীর কিছু ভালো লাগে না। কাজ ভালো লাগে না। পড়া ভালো লাগে না। বেড়াইতে ভালো লাগে না। কেবল মনে হয় সেই তো গেলেন উহাদের বাড়ীতে, আর পাঁচদিন আগে কেন গেলেন না। মণ্টু খুঁ হাত ধরিয়া টানিয়াছিল, কেন গেলেন না। গেলে তো এমন করিয়া তাহার হারাইয়া বাইত না। মন হ হ করে, কারা পার।

সপ্তাহখানেক মনের মধ্যে অনেক ভোলাপাড়া করিয়া অবশেষে পরের রবিবারে শ্রীমতী দারোগার সহিত আবার দেখা করিয়া ঠিকানা সংগ্রহ করিলেন। রাতে অনেক ভাবিয়া অনেকক্ষণ আগিয়া মণ্টু খুককে চিঠি লিখিলেন। খুক পড়িতে জানে না, মণ্টু পড়িয়া চিনাইবে। মণ্টুর পড়িবার মতো শিশুহাতের লেখার অক্ষরপে বড়ো বড়ো বাক্য অক্ষরে লিখিলেন :

“তোমরা কেমন আছ, তোমাদের জন্তে আমার মন কেমন করছে, খুব মন কেমন করছে। তোমরা কবে আসবে। আমার সঙ্গে আড়ি নয়, ভাব, চিরকাল ভাব। চিঠি লিখো। ওপোরে ঠিকানা দিলুম। ইতি দুয়োরানী।” চিঠির মাথার নিজের নাম ও ফুলের নাম লিখিলেন।

চিঠি ডাকে ফেলিয়া একটু শান্তি পাইলেন শ্রীমতী। একেবারে হারাইয়া যাওয়া রক্ষা হইল। চিঠি তো শুক সংবাদবহ মাত্র নয়, চিঠি যে দুই হৃদয়ের মধ্যে স্পর্শযোগ। এই চিঠির দ্বারা তিনি মণ্টু খুককে স্পর্শ করিলেন, উত্তর আসিলে তাহার মধ্যে উহাদের স্পর্শ পাইবেন, হাতের অক্ষরের মধ্যে তাহারের দেখা পাইবেন। উত্তরের অন্ত দিন পণিতে লাগিলেন শ্রীমতী।

উত্তর আসিল না। দিন গেল, সপ্তাহ গেল, মাস গেল, মাসের পর মাস গেল। উত্তর আসিল না। সব আশা বাইবার পরও চিঠি লিখিয়া নতুন আশার সঞ্চার হইয়াছিল। এ আশা ভঙ্গ যেন পূর্বের অপেক্ষা দুঃসহ। এতদিনে দুয়োরানীর নির্বাসন সম্পূর্ণ হইল।

সময়ে সকল দুঃখ সহিয়া যায়। আলল পুত্রবিরোগ

সহে, এ তো নকল পুত্র-বিচ্ছেদ। তবে কাহারও কিছু শীঘ্র সহে, কাহারও বড়ো দেরিতে।

শরৎকাল আসিল। বিহারের আকাশে বাতাসেও তাহা অনুভব করা যায়। পূন্নার ছুটি এ দেশে বড়ো ছুটি নয়। কিন্তু শ্রীমতী দেশে বাইবেন। এক মাসের ছুটির দরখাস্ত করিয়াছেন। ছুটি মঞ্জুর হইবার আশা নাকি নাই। মাধবীদি বলিয়াছেন, এত অল্পকাল কাজ করিয়া এত দীর্ঘ ছুটি পাওনা হয় না।

শনিবার। স্কুলের ছুটির পর লাইব্রেরী ঘরে বসিয়া বই পড়িতেছেন শ্রীমতী। শনি রবিবার বড়ো বেকী মন কেমন করে, বড়ো বেকী একা বোধ হয়। বাসায় বাইতে ইচ্ছা করে না। মার জন্ত ছোট ভাইটির জন্ত মন অস্থির হইয়াছে।

ফুলের দাসী আসিয়া খবর দিল এক সাহেব আসিয়াছেন শ্রীমতীর সহিত দেখা করিতে। বাঙ্গালী সাহেব। শ্রীমতী জিজ্ঞাসা করিলেন “আমার সঙ্গে ? ঠিক শুনেছিস ?”

“হ্যাঁ, দিদি, আপহিকা সাথ।”

কে আসিবে তাঁহার কাছে ? এই বিদেশে তাঁহার সহিত দেখা করিবার মতো বাঙ্গালী সাহেব কে আছে ? সংশয় ও বিস্ময় লইয়া শ্রীমতী প্রধান শিক্ষিকার ঘরের দিকে চলিলেন। দাসী বলিল—বড়দি’দমণির কামরায় নয়, ভিজিটর কামরায় বসিয়া আছেন সাহেব। শ্রীমতী আরও বিস্মিত হইলেন। শিক্ষিকাদের সহিত অপরিচিত কেহ দেখা করিতে আসিলে বিশেষতঃ তিনি পুরুষ হইলে, প্রধানার ঘরেই সাক্ষাৎ করার নিয়ম এবং তাঁহার সম্মুখে।

ভিজিটরস্ রুমে যে তত্ত্বলোক বসিয়া আছেন তিনি যে সম্পূর্ণ অপরিচিত তাহাতে সন্দেহ নাই। মূল্যবান বিলাতী সাজে ও চেহারাতে সম্পদ ও সম্মান প্রকাশ পাইতেছে। মুখে বয়সের ছাপ লাগিয়াছে কিন্তু প্রৌঢ়ত্বের নয়, পূর্ণত্বের। বোধ করি বয়স্ক ও ধনী ব্যক্তি দেখিয়া প্রধানা সরাসরি সাক্ষাতের অহুমতি দিয়াছেন। জানলা দিয়া দেখা বাইতেছে পথের উপর স্বকৃৎকে মোটর গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে।

শ্রীমতী ঘরে ঢুকিতে তত্ত্বলোক উঠিয়া নমস্কার করি-

লেন। শ্রীমতী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—
“আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন?”

ভদ্রলোক বলিলেন—“আজ্ঞে না, আমি শ্রীমতী বলে
একটি মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে চাই।”

“আমারই নাম শ্রীমতী রায়।”

মাক করবেন। তা হলে দেখছি এক নাম বলে
গোলমাল হয়েছে। আমি যাকে চাইছি সে একটি ছোট
মেয়ে, এখানে পড়ে বোধহয়।”

শ্রীমতী বলিলেন—“কিন্তু এতুলে ও নামে কোনও
ছাত্রী তো নেই।”

“নেই? সে কী? সাত আট বছর, কিন্দন বছরও
হতে পারে—”

“ঐ বয়সের মেয়ে তো অনেক আছে। কিন্তু ঐ
নামের তো নেই। আচ্ছা, আপনি দেখলে চিনতে
পারবেন? সোমবার আসবেন—”

“আজ্ঞে না, আমি চিনি না, কখনো দেখিনি তাকে।”
বলিয়া ভদ্রলোক মুহু হাসিয়া বলিলেন—“আপনি খুব
আশ্চর্য হচ্ছেন, হবারই কথা। জানি না চিনি না
অথচ দেখা করতে এসেছি, তাও একটি ছোট মেয়ে।
ব্যাপারটা এমন কিছু নয়। হয়েছে কী, মেয়েটি আমার
ছেলে মেয়ের বন্ধু, তাদের সঙ্গে খেলা করতো।”

কালো আকাশে অকস্মাৎ বিহ্বাতের ঝিলিক উঠিয়া
যেমন অন্ধকার ভেদ করিয়া আলো দেখা দয়, তেমনি
শ্রীমতীর চিন্তে একটা চঠাৎ আলোর চমক লাগিল। তিনি
বলিয়া ফেলিলেন—“আপনি খুঁ মটুর বাবা? আপনিই
মিষ্টার আর, সেন? ঐ বাগান বাড়ীতে ছিলেন?”

ভদ্রলোক বিস্মিত হইলেন। তাই উত্তর দিতে দুই
এক মুহূর্ত দেরি হইল। সেই দুই এক মুহূর্ত শ্রীমতী দ্রুত
হুক বুকে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ভদ্রলোক
বলিলেন—“আপনি খুঁ মটুর চেনেন? বাঃ।”

এই সৌভাগ্য আশ্রীত ও আকস্মিক। ইহার
আনন্দের আঘাত সংলাইতে শ্রীমতী একটা চেয়ারের
পিঠ শক্ত করিয়া ধরিয়া ফেলিলেন। ভদ্রলোক বলিলেন—
“আমার নাম শ্রীমতী রায়। আপনিই সেই চিঠি
लिখেছিলেন?” কিন্তু—

শ্রীমতী ধীরে ধীরে বলিলেন—“হ্যাঁ আমিই ওদের

সেই বন্ধু। ওদের সঙ্গে খেলা করতুম। ওদের বন্ধু বলে
ঐ রকম ওদের মতন করে চিঠি লিখেছিলুম।”

আর সেন চূপ করিয়া আছেন। শ্রীমতী জিজ্ঞাসা
করিলেন—“ওরা এসেছে আপনার সঙ্গে?”

সেন বলিলেন—“না।”

হঠাৎ উদ্বিগ্ন হইয়া শ্রীমতী বলিলেন—“ওরা ভালো
আছে? খুঁ মটুর ভালো আছে তো?”

শ্রীমতীর এই উদ্বিগ্ন প্রশ্ন ও কঠোর ব্যাকুলতা সেনকে
বিস্মিত করিল। তিনি বলিলেন—“হ্যাঁ ভালো আছে।
আমি এখানকার বাড়ীটাতে জিনিস পত্র যা আছে পাঠাবার
ব্যবস্থা করে বাড়ীটা ছেড়ে দিয়ে যেতে এসেছি। আজ
রাত্রেই চলে যাবো।” শুনিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া শ্রীমতী
বলিলেন। খুঁ মটুর ভালো আছে, উদ্বেগের শান্তি।
তাই নিশ্চিন্ত। তাহার আর আসিবে না, আর তাহাদের
সঙ্গে দেখা হইবে না, আশার শেষ। তাই নিশ্চিন্ত।
আর তাহার কিছু বলিবার নাই।

সেন নিজেই বলিলেন—“আপনার চিঠি ওরা দেখেনি
এখনও। ওরা আমার বাড়ীতে নেই। আমিও বাড়ী
ছিলুম না, কলকাতার ছিলুম না। দিন দুই হলো
ফিরেছি। কাগজ পত্র যা জমে ছিল, সব দেখা হয়নি,
ব্যাগে ভরে নিয়ে গাড়ীতে উঠেছিলুম। সকাল থেকে
বাড়ীর ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত ছিলাম। সে সব একরকম
সারবার পর ব্যাগের মধ্যে হঠাৎ আপনার চিঠিটা চোখে
পড়লো। ভাবলুম ওদের বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে আসি।
ফিরে গিয়ে খুঁ মটুরকে বলবো।”

শ্রীমতী নীরবে একটু দ্বান হাসিলেন। আর কি
তাহাদের মনে আছে এই নির্বাসিতা দুঃখরানীটাকে? রূপ-
কথার মতো মিথ্যা বনবাসিনী দুঃখরানীকে কি মনে আছে
রাজপুর রাজকন্ডার?

কী আশ্চর্য! সেন যেন শ্রীমতীর অহুত প্রশ্নের
জবাব দিলেন। বলিলেন—দুঃখরানী তা হলে আপনিই?
সেবার বধন এসেছিলুম নিয়ে যেতে, তখন ওরা বলেছিল
বনের মধ্যে আমাদের একটা দুঃখরানী আছে লুকিয়ে।
খালি আমরা জানি, আর কেউ জানে না। আমি জানতুম
সে ওদের বানানো দুঃখরানী। মটুর কল্পনা শক্তি
অত্যন্ত প্রখর। আর খুঁ তো দাদার প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ওরা

বলে, চিলের পিঠে চড়ে চাঁদের সঙ্গে গল্প করে এলুম। ওরা পুকুরের মধ্যে মাছেদের বাড়ীতে বেড়াতে যায়। ওদের বনের মধ্যে দুয়োবানীও আমি সেই রকম ভেবেছিলুম। ওদের মাকে দেখেছেন তো? রোগ শয্যার বন্দী হয়ে পড়ে ছিলেন—”

শ্রীমতী বলিলেন—একটু কুষ্ঠার সঙ্গেই বলিলেন—“না, আপনার জীবন সঙ্গে আমার কোনদিন দেখা হয় নি। খুকু-মটু-র সঙ্গে আমার পরিচয় আপনারদের বাড়ীর সদর দরজা দিয়ে হয় নি।” একটু থামিয়া শ্রীমতী বলিলেন—“আমাকে ঘুটে কুড়োবার জন্তে পছন্দ করে ডেকেছিল খুকু।”

সকৌতুক কৌতুহলে সেন জিজ্ঞাসা করিলেন—“কী রকম?”

শ্রীমতী সেই প্রথম দিনটির স্মৃতিতে ফিরিয়া গিয়াছেন, দেখিতেছেন বাগানের ধারে ফ্রকপরা মেয়েটি ডাকিতেছে, ‘এই শোনো, শোনো না।’ একটি ছোট নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া শ্রীমতী বলিলেন—

“সে অনেক কথা। সে কি আপনার শোনবার সময় হবে? যদি সময় হয়, যদি কোনও কাজের ক্ষতি না হয় তো বলি।”

“কিছু ক্ষতি হবে না, কোনও কাজই নেই—আমার। বরং আমিই আপনাকে কাজ থেকে আটকে রেখেছি।”

“না, আমার কাজ হয়ে গেছে। এইবার যাবো।”

“বাসার যাবেন তো? আমার সঙ্গে গাড়ী আছে। যদি আপত্তি না থাকে—”

“না, বাসার যেতে ইচ্ছে করছে না। গাড়ীতে আপত্তি নেই। যেখানকার কথা সেখানে গিয়ে বলবো। চলুন।”

যে আনন্দের অমৃত কাহিনী কাহাকেও বলা যায় নাই, শুনিলে বুঝিবে এমন বন্ধু কেহ নাই বলিয়াই বলা যায় নাই, তাহা শুনিবার লোক পাওয়া গিয়াছে। শুনাইবার আগ্রহে শ্রীমতী উৎসুক হইয়া উঠিলেন। অনাস্থীয় পুরুষের সঙ্গে একগাড়ীতে বেড়ানো বুভুক্ষী শিকারিঙ্গীর পক্ষে শোভন কিনা, দেখিলে কে কী বলিবে, এ সব প্রশ্ন মনে উদয় হইল না। শুনিবার লোক তো অপেক্ষা করিবে না। এখন না বলিলে আর বলিবার সময় পাওয়া মাইবে না। মনে অল্প প্রশ্ন উদয় হইবার সময় ছিল না।

আবার সেই অরণ্য। অরণ্যের মধ্যে সেই কুটির। কুটিরের সম্মুখে সেই অঙ্গন। কুটিরের দাওয়াতে বসিয়া এক রাজপুত্র ও এক রাজকন্তা এবং তাহাদের এক নির্বাসিতা দুয়োবানী-মা’র গল্প বলিলেন শ্রীমতী। প্রথম দিনের খুকুর আহ্বান হইতে শেষ দিনের ‘যেতে দেবো না, কিছুতেই যেতে দেবো না, অবধি সব বলিয়া গল্প শেষ করিলেন।

সেন নীরবে শুনিয়াছেন, এখনও নীরব আছেন। শ্রীমতীর আর কিছু বলিবার নাই। সেনের নীরবতার এখন শ্রীমতীর মনে হইল অবোধ শিশুদের সহিত তিনি যে ছেলেমানুষি করিয়াছেন তাহা শুনিয়া কী জানি উনি কী ভাবিতেছেন। কত নির্বোধ নিলজ্জ মনে করিতেছেন তাঁহাকে। পরিণতবয়স্ক অপরিচিত এই পুরুষটিকে সেই অবোধ ও অবোধা ছেলেমানুষির কাহিনী এমন বিশদ ভাবে বলা উচিত হয় নাই, শোভন হয় নাই।

বলিবার আগে এ কুষ্ঠা এ লজ্জা তো আসে নাই! বলিবার আগ্রহে উৎসুক ছিলেন, আনন্দ ও পেন্দনা একা ভোগ করা বা সহ্য করা সহজ নয়। যাহারা আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ তাহারাই পারে। তাহাদের সংখ্যা বিরল।

শ্রীমতী বলিলেন—“কী রকম ছেলেমানুষি বোকাশি করেছি বুড়ো বয়েসে তাই শুনে আশ্চর্য হয়ে গেছেন, না?”

সেন কী ভাবিতেছিলেন, বলিলেন—“না। তাহলে আমার কথাও একটু বলতে হয়। মটু খুকু সত্যিই রাজপুত্র রাজকন্তা। আমার ঠাকুরমা আদর করে আমার নাম রেখেছিলেন রাজ্যেশ্বর, তার থেকে ডাক নাম হলো রাজা। তবে ওদের কাছে আমি প্রধানতঃ রাক্ষস বা দৈত্য। রাজার সঙ্গে রাজপুত্রের যুদ্ধ বড়ো একটা হয় না কিনা। দৈত্য রাক্ষসের সঙ্গেই হয়। যে ক’দিন বাড়ী থাকি, সকাল বেলায় বিছানার বগলেক্সে রাজপুত্র ও দৈত্যের গদাযুদ্ধ প্রতিদিনের ঘটনা। দৈত্যের প্রতিদিনই মৃত্যু হয়। বালিশগুলোরও মধ্যে মধ্যে হয়। মৃত্যুর পরও দৈত্যের নিস্তার নেই। মৃত দৈত্যের পিঠে কাঁধে উঠে রাজপুত্র রাজকন্তার দেশদ্রাব্য হয় বিছানা জুড়ে।”

একটুকু থামিয়া রাজ্যেশ্বর বলিলেন—“মনে হচ্ছে কি যে বুড়ো বয়সে এ কী ছেলে মানুষি?”

শ্রীমতী শ্রিতমুখে মাথা নাড়িলেন। রাজ্যেশ্বর বলিলেন—

“ওদের হাওয়া লাগলে বয়সটা গাছের শুকনো পাতার মতো গা থেকে মন থেকে ঝরে পড়ে যায়। মণ্টু খুকুর আসল জীবন কল্পনার জগতে। আপনাকে পেয়ে ঐ তিনটে দিন ওরা সত্যিকার বেঁচে ছিল। কলকাতায় গিয়ে থুকুকে একদিন বলতে শুনলুম ‘ভাল লাগছে না। মা’র কাছে যেতে ইচ্ছে করছে। না রে দাদা?’ মণ্টু বলে ‘আজ রাত্তিরে, নিশ্চিৎ রাত্তিরে, বুঝলে থুকু, পক্ষীরাঙ্গ ঘোড়ায় চড়ে ছুটবে মা’র কাছে চলে যাবো’। তখন বুঝিনি যে আপনার কথা বলছে। মনে করেছিলুম -”

কথা শেষ না করিয়া থামিলেন রাজ্যেশ্বর। শ্রীমতী জিজ্ঞাসা করিলেন— “কেন, ওরা কি মা’র কাছে ছিল না তখন?”

রাজ্যেশ্বর বলিলেন—“এখান থেকে গিয়ে ওদের মাকে নিয়ে ধরমপুর স্ট্রানটেরিয়ামে রেখেছিলুম, কাছাকাছি বাসা নিয়ে আমাকে থাকতে হয়েছিল। মণ্টু থুকুকে কলকাতায় আমার এক বন্ধুর বাড়ীতে রেখে গিয়েছিলুম। এইবার বাড়ীতে নিয়ে আসবো।”

শ্রীমতী জিজ্ঞাসা করিলেন—“ওদের মা কেমন আছেন?”

“তিনি নেই। ওরা এখনও জানে ওদের মা বেড়াতে গেছেন। মায়ের সঙ্গছাড়া ওরা চিরকাল। থুকু জন্মাবার পর তিনি শয্যা নিয়েছিলেন। ডাক্তারের বারণ তো ছিলই, তা ছাড়া রোগে ভুগে ভুগে বড়ো ঝিট খিটে হয়ে গিয়েছিলেন, ছেলে মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক প্রায় ছিলই না। ধরমপুর থেকে ফিরে ওদের দেখতে গেলুম। থুকু বলে—‘জানো বাবা, আমরা কাল সকালে পক্ষীরাঙ্গ ঘোড়ায় চড়ে বনের মধ্যে মা’র কাছে চলে যাবো, না রে দাদা?’ রাজ্যেশ্বর চুপ করিলেন।

আকাশে পক্ষীরাঙ্গের দেখা নাই। কয়েকটি চিল নিশ্চিন্ত নিশ্চেষ্ট স্থখে ভাসিয়া যাইতেছে। রাজ্যেশ্বর বলিলেন—“কী দেখছেন? পক্ষীরাঙ্গ আসছে কিনা?”

শ্রীমতী ছলছল চোখে বলিলেন—“হুঁ”।

রাজ্যেশ্বর বলিলেন—“মায়ের আদর না পাওয়াটাই ওদের অভ্যাস হয়ে গেছে। বাড়ীতে একটা পিসি মাসীও নেই। আপনার কাছে আদরের আদ পেয়েছে, আপনার কোলে উঠে, আপনাকে জড়িয়ে ধরে আবার আদর চেয়েছে।”

শ্রীমতীর চোখের জল আর চোখে ধরিল না। কত সামান্য আদর করিয়াছেন, আরও বেশী কেন করেন নাই।

রাজ্যেশ্বর বলিলেন—“ওদের অবস্থা আমি বুঝতে পারি। আমারও মাকে মনে পড়ে না। কিন্তু আমার এক পিসিমা ছিলেন, নিঃসন্তান বিধবা। আমি মায়ের অভাব বুঝতে পারিনি। তাঁকে মা বলে ডাকতুম।”

যে কথা শ্রীমতীর মনে বারবার আসিল, সে কথা তিনি বারবার মনেই চাপিয়া রাখিলেন, মুখে আনিতে পারিলেন না। রাজ্যেশ্বর সেন বৃদ্ধ হন নাই, অর্থের অভাব নাই, তাঁহার ছেলে মেয়েকে মাতৃহীন করিয়া রাখিবার দরকার কী? এ কথা আশ্চর্য বন্ধুরা বলিতে পারেন, বলিবেনও হয়তো। অপরিচিতা শ্রীমতী তাঁহার ছেলেমেয়ের দুয়ো-রানী মা হইয়া কেমন করিয়া সে কথা বলেন।

আর তো কোনও কথা নাই। রাজ্যেশ্বর হাতগড়ি দেখিলেন। শ্রীমতী দেখিলেন গাছের ছায়া দীর্ঘ হইয়াছে, দুয়োরানীর কুটির অঙ্গনের আলো যান হইয়া আসিয়াছে। দুয়োরানীর দিন শেষ হইল। এবার বিদায়।

সেই বনের প্রান্তের সেই ভাঙ্গা প্রাচীর অবধি আসিলেন। রাজ্যেশ্বর শ্রীমতীকে বিদায় দিতে। বলিলেন—“যদি কখনও কলকাতায় আসেন, আমাদের বাড়ী আসবেন, থুকু মণ্টুর সঙ্গে দেখা করবেন। আসবেন তো? আমি ওদের বলবো আপনার কথা।”

শ্রীমতী বলিলেন—“না। কিছু বলবেন না। আমার যাবার কথা। আমার সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা কিছু বলবেন না।”

রাজ্যেশ্বর বিস্মিত হইলেন, বলিলেন—“বলবো না? আচ্ছা। নমস্কার।”

শ্রীমতী নমস্কার করিতে তুলিয়া গেলেন। এমন কখনও ভুলেন না। আজ তুলিলেন। চলিয়াও গেলেন না। স্তম্ভরাজ রাজ্যেশ্বরও দাঁড়াইয়া রহিলেন।

কণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া শ্রীমতী বলিলেন—“আপনি তখন বলছিলেন আপনার পিসিমার কথা। থুকু মণ্টুর একটা পিসি থাকলে তাঁর কাছে ওদের রাখতেন?”

রাজ্যেশ্বর বলিলেন—“তিনি যদি ওদের ভালবাসতেন, আদর করে নিতেন, রাখতুম বই কি। সেহ আদর বিনাও

ছেলেগা মাছ হ'য়, শিক্ষা নীক্ষা সভ্যতা সবই হ'য়, কিন্তু একটা বড়ো অভাব জীবনে থেকে যায়। ওদের যদি তেমন পিসি মাসি একটা থাকতো !

শ্রীমতী আবার দুই মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—“পিসির বাড়ী যদি পল্লীগ্রামে, গভীর পল্লীগ্রামে হোতো ?”

রাজেশ্বর বলিলেন—“গভীর পল্লীগ্রাম মানে বন জঙ্গল পুকুর নদী বাঁশঝাড় আমবাগান ধানের মাঠ—এই সব তো ? সেই তো মণ্ডু খুকুর জগত ।”

শ্রীমতী বলিলেন—“পিসি যদি খুব গরীব হোতো ?”

এবার রাজেশ্বর এক মুহূর্ত দেরি করিলেন উত্তর দিতে। একটা ছোট নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—“পিসিমার বাড়ীটা মনে পড়ছে। ওদের পিসি থাকলে, আমার পিসিমার মতো পিসি থাকলে, ওটা কোনও প্রশ্নই হতো না। আমার পিসিমাও বড়লোক ছিলেন না। আমি তাঁর বাড়ীতেই ছিলাম। পিসিমা নিজের হাতে গরুর জাব দিতেন, আমি বাছুর বাধতুম। ওটা প্রশ্নই নয় ।”

শ্রীমতী আর প্রশ্ন করিলেন না। আর কিছু তাঁহার জানিবার নাই। বলিলেন—“আচ্ছা, আমি যাই ।”

রাজেশ্বর বলিলেন—“নমস্কার ।”

শ্রীমতী এবারও প্রতিনমস্কার করিলেন না। হঠাৎ নীচু হইয়া রাজেশ্বরের পারের ধলা লইয়া প্রণাম করিলেন। অতি বিস্ময়ে রাজেশ্বর এই আকস্মিক প্রণাম এড়াইবার সময় পাইলেন না। প্রণাম সাধিয়াই শ্রীমতী ফিরিয়া অতি দ্রুতপদে চলিতে শুরু করিলেন।

সোমবার সকালে শ্রীমতীর পদত্যাগপত্র পাইয়া প্রধান শিক্ষিকা বলিলেন—“আপনার ছুটি মজুর হতেও পারে, আমি বিশেষ করে বলেছি সেক্রেটারিকে ।”

শ্রীমতী বলিলেন—“না, ছুটির জন্তে নয়। ছুটির দরকার নেই ।”

মাধবদী বলিলেন—“কলকাতার কোনও স্কুল কাজ পেয়েছিস বুঝি ? কত দেবে ? আমার ভ্রমশ্রমে একটু খবর নিস ভাই ।”

শ্রীমতী বলিলেন—“কলকাতায় নয়, দেশেই থাকবো। আমাদের গাঁয়েই একটা পাঠশালা আছে ।”

মাধবদী বিশ্বাস করিলেন না।

সমাপ্ত

কাব্য চর্চা

শ্রীঅক্ষুরচন্দ্র ধর

চারদিকে তো অভাব খালি,—দেশের কপাল মন্দ,
সংস্রবীর ভাঙ্গা হাতে ভাবের দোকান বন্ধ !

হাজির খুঁজে মিল মিলেনা
যায়না কোথাও ছন্দ কেনা,
স্বর, তান, লয় কারো সাথে নাই কারো সম্বন্ধ ।

সস্তা দামে নাম কিনিতে এই সুযোগে আমরা
ধাঙ্গা মেয়ে দখল ক'রে একটা তাহার কামরা
যাই ক'রে এক কোণে তারি
ভেজাল মালের দোকানদারি
দুধের দামে ঘোল বেঁচে যাই, আমের নামে আমড়া ।

পাণ্ডাও নয়, গাওও নয়, যখন চাহে প্রাণ যা,
তাই লিখিয়ে, লই ভিজিয়ে শান্তিরামের গাফা ।

কাব্য কোথায় ? সব তো খালি
বাজে কথার জোড়াতালি ;
বান্দ্যাকি, ব্যাস, কালিদাসের শ্রদ্ধা অভিধান খা : !
পাঠকেরা কেউ বলে—“ছি,—এই কি আবার পণ্ডা !
বামন হ'রে চাঁদ পেতে সাধ প্রগল্ভতার হৃদ !”

নৃতন যুগের সুযোগ গ্রহণ
কেউ বলে,—“বেশ, মন্দ কি ও ?
নৃতন চলুক, হোক বা না হোক অর্থ কারো বোধ্য ।
সরস্বতী নাই সদরে ; এখন তিনি চেইজে
হয়তো আছেন ওয়ালটেরার, নয় হিমালয় রেঞ্জ-এ ।

তা' নাহলে কমল বনে
বসে বসে ক্ষুর মনে
কপালে কর যেনে তিনি কতই কাঁদিতেন যে ।

রোগও মনের কথা শোনেন—

বিশ্ব শ্রী মনতোষ রায়

শরীর আর মন ওরা হল এক কথায় থাকে বলা যেতে পারে সম্ভব তাই। একে অস্ত্রের সর্কক্ষেত্রে সংবেদনশীল। তাই বিজ্ঞান মতে মানসিক পরিস্থিতি দ্বারা দেহ এবং দৈহিক পরিস্থিতির দ্বারা মন প্রভাবান্বিত হয়ে থাকে। ঠিক তাই দেখা যায় যদি কেউ কোন টুক জাতীয় বস্তু বা ঐ রূপ কোন জাতীয় বস্তু খাবার কথা চিন্তা করেন কিংবা খেতে দেখেন মুখে তখন আপনাকেই জল মানে সেলাটভা নিঃসরণ হতে থাকে। ঠিক তেমনি কোন অস্বাভাবিক বস্তু দর্শন বা হয়তো আপনার আমার স্বভাববিরুদ্ধ— তেমন জিনিষ দেখলে বা স্পর্শ করলে অনেক সময় আপনাকেই শরীরের ভেতরের বিভিন্ন কলকলার মধ্যে বিশেষ করে হজমের বস্তু এবং সেন্সারী নার্ভ গুলিতে বিপর্যয় ক্রিয়া অচ্যুত হয়ে দেহ ও মনে নানারকম বিভ্রান্তি ঘটতে পারে। সুতরাং এ কথাই স্বীকার্য যে এই মন আর দেহ এই দু'এর মধ্যে কত নিবিড় আত্মীয়তা। আসল কথা 'কারো ছাড়া কারো নাহি চলে।'

ব্যায়ামের ঝাঁর বা ব্যায়ামাচারী ঝাঁর— তাঁরা যেন শরীরচর্চার সাথে সাথে মনের বিভিন্ন চর্চা থেকে কখনো বঞ্চিত না হন। এই অনুরোধ করার যথার্থ উদ্দেশ্য হল— ব্যায়ামচর্চাকারীরা যেন একটি গোটা মানুষ বলে পরিচিত হন—কাংক্ষণ মন চর্চা থেকে নিজেকে বঞ্চিত রেখে শুধু মাত্র শরীর চর্চা দ্বারা এই মহাজীবনের চরম সার্থকতা কোন ক্ষেত্রেই লাভ করা সম্ভবপর হয় না।

আমরা বলি বা আমরা সবাই জানি যে শরীর চর্চা করলে দেহ রোগ মুক্ত হয়,—অবশ্য কখনো আমি একেবারে উড়িয়ে দিতে যদিচ পারি না—কিন্তু কেন রোগমুক্ত হয়? হয় মনের প্রতি অজান্তসারে বিশ্বাস স্থাপন করা হয় বলে। সে ক্ষেত্রে যদি মনের প্রভাব কোন কারণে বিভাঙিত হয়ে যায়—একমাত্র ঐ দৈহিক ব্যায়াম চর্চা রোগকে কিছুতেই ঠেঁকিয়ে রাখতে পারে না। তাই শাস্ত্র

বলে যে রোগ বলতে আমরা যা বুঝি তার শতকরা বেশীর ভাগ রোগই মনের দ্বারা প্রভাবিত।—তার যথার্থ প্রমাণ স্বরূপ বলা যেতে পারে—

মনের গুণগোল থেকে কত রকম রোগ আসে :—

সাধারণ বা অসাধারণ জন্ম ভ্রান্তি থেকে :—যেমন



মল্লর রায় (বয়স—১৪) অরবিন্দশ্রী শ্রেষ্ঠ দেহী

(বিশ্ব শ্রী মনতোষ রায়ের পুত্র)

ধরুন বসন্ত, কলেরা রোগ। এসব কারণে ভয় থেকেও আপনি দেহে ঐ জাতীয় রোগের বীজাণু মনোবিজ্ঞান মতে সংক্রামিত হতে পারে। খোসা, পাঁচড়া, দাণ ইত্যাদি বৃক্ক লোকের গা কিংবা তাদের পোষাক পরিচ্ছদ খুঁতখুঁতে

মন নিয়ে যা তরে তরে স্পর্শ করলে দেখা যায় অনেক সময় নিজের মধ্যে ঐ জাতীয় রোগের উপসর্গ।

হৃদরোগের ব্যাপারেও প্রায় তাই—। এই হৃদরোগের উপসর্গগুলি হঠাৎ কারো মধ্যে যখন প্রকট হয়ে দেখা দেয়—কোন একজন সুস্থ মানুষও অবচেতন ভাবে ভেবে বসেন তাই তো ঠিক অমন ধরনের উপসর্গতো আমাতেও প্রকাশ পাচ্ছে? এই যে সন্দেহ বাতিকগ্রস্ত ভাব তার কলেও দেখা যায় অকারণে একজন সুস্থ মানুষ হৃদরোগকে ভেঁকে নিয়ে আসেন।

তখন অবাধ হয়তো হবেন, এমন অনেক দৈহিক শক্তিমান মানুষ আছেন—যারা বেশ নিয়মিতভাবে ব্যায়াম চর্চা করে শরীরটাকে মজবুত করেছেন তারাও অনেক সময় নানারকম বই পুস্তকে বিভিন্ন রোগের বিভিন্ন রকম বিবরণ পড়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন, আর ভাবেন—তাইতো মাঝে মাঝে এসব লক্ষণ তো আমার মধ্যেও বিরাজ করে? জাহলে কি হবে? শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যদিও যে সব রোগ কুল কিনারায় ছিল না ক্রমশ তা নতুন অতিথির বেশে আগমন করতে থাকে। বিশেষ করে লক্ষ্য করার বিষয় যৌন সংক্রান্ত বিষয়ে—। ঐ জাতীয় বইপুস্তক পড়ে অল্পস্বল্প মনের পরিচয় স্বরূপ উদ্ভট বোত্বহল বশতঃ যৌন-প্রকৃতির বিভিন্ন দিক পরীক্ষামূলক ভাবে অন্বেষণ ও প্রয়োগ করার কলে—সুত্রভাঙ্গা এবং এমন কি যৌন-ব্যাধির সূচনা দেখা দিয়ে কত কি আশা ভরসাকে পঙ্গু করে দিয়ে যায়।

তত্ত্ব :—এই তত্ত্ব বড়ো মারাত্মক ব্যাপার। এতে অনেক সময় মৃত্যুর সাথে পরিচয় হতে পারে। শরীরের জোর তরকে দুঁরে রাখতে পারে না, স্বাস্থ্যবান হলেই যে সে তরকে জয় করতে পেরেছে তেমন কোন কথা নেই, তরকে দূর করতে পারা যায় একমাত্র মনের জোর দ্বারা।

ছোট একটা গল্প শুনবেন?—বিরিট একটা মনো-বিজ্ঞানের পরীক্ষা। এই পরীক্ষাকাজ চালান হবে একজন সুস্থ স্বাস্থ্যবান ব্যায়ামবীরের ওপর দিয়ে—। একজন ডাক্তার মতলব পাকালেন। ১২২ ডাক্তারি হঠাৎ সেই ব্যায়ামবীরকে বললেন রক্তের দেখা চড়ে—কি হে রক্তের হঠাৎ কাসি কেন?—মজাটাতো ভাল নয়, কিন্তু অমুক ডাক্তারকে একবার দেখিয়ে নিও।—অতীত

মন নিয়ে গেল। ডাক্তার বললেন—X-Ray করতে হবে, X-Ray হল। আসলে দোষ কিছুই নেই—অবশ্য তাকে দোষ আছে জানানো হল। একবার রক্ত পরীক্ষা করতে হবে তুমি অমুক ডাক্তারের কাছে যাও। মনের ভেতর প্রতিক্রিয়া সূত্র হল, আসলে অশান্তির কলে পা মেত্র-মেত্র সূর্যকে জ্বরের আখ্যা দেওয়া হল, রক্ত পরীক্ষা হল, দোষ নেই। একেত্রেও দোষ আছে জানানো হল, চিকিৎসকের নির্দেশ শেল খাত বিজ্ঞান ইত্যাদি। আর সতাই ছদিন পর এসে গেল। কাসি নিয়মিত সূত্র হল। পুনরায় ক্রমিক ভাবে সব পরীক্ষা হল—এবার ডাক্তাররা সবতাই যেন রোগের বীজাণু পেলেন এবং সত্যিকারের চিকিৎসা সূত্র করলেন যাতে ওকে বাঁচানো যায়—, দুর্ভাগ্য ওকে শত চেষ্টা করেও আর বাঁচানো গেল না, কারণ মন তার ভেঁকে চুরমার হয়ে গিয়েছিল—অল্পের কোন কিয়দাই হল না। এমনও হয়।

এক ভজ্রলোক পায়খানায় বসে দেখতে পেলেন একটা ইঁহর আশে পাশে ঘোরা ফেরা করছিল, এখন আর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না এখন—তখন নিশ্চয়ই তার গুহ্বার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে। এ নিয়ে মহাপ্রলয়, দেখা দিল মানসিক ব্যাধি। বহুভাবে চিকিৎসিত হয়েও কোন ফল যখন হল না, তখন এক মনোবিজ্ঞানী ডাক্তার বললেন ভাল করে দেখোই আমি। ডাক্তার তার গুহ্বার থেকে ঠিক ইঁহর বের করে দিলেন, এক নিমেষে তার সমস্ত রকম আত্মা অংশদ দূর হয়ে গেল। আসলে ডাক্তার চিকিৎসা করা কালীন একটি ইঁহর সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং পেটাই কোশলে তাকে দেখান হয়েছিল। (Principle & Practice of Naturopathy of E. W. Cardinphy)

বিশ্বাস :—এবার শুধুন কি অদ্ভুত বস্তু। হৃদয়ে প্রকৃত বিশ্বাস স্থাপন করতে পারলে নানারোগে অসম্ভব উপকার পাওয়া যায়। অল্পস্বল্প ভাবনা-চিন্তা এবং কাঁচুরতা যেমন বিভিন্ন রোগকে আশ্রয় করতে পারে—তেমনি সুস্থ ভাবনা-চিন্তা এবং হৃদয় থেকে মজল কামনা নানারকম রোগকে অনেক দূরে সরিয়ে রাখতে পারে, প্রাথমিক রূপ এখানে লিটার নিবেদিতার কথা স্বয়ং করা বসতে পারে। যখন বেশে মনের মহাপ্রলয় পড়ে পেরে—মৌলিক ভাব

ভয়ে-আতঙ্কে অবস্থায় হঠাৎ যাবার মত। এগিয়ে এসে-
ছিলেন সেই সিঁটার নিবেদিতা। মাহুকের মনের ভয়-
ত্রাসকে বিদূরিত করার মানসে সিঁটার নিবেদিতা আত্ম-
বিশ্বাসে নির্ভর হয়ে এবং আরও কিছুসংখ্যক মাহুকে
বাক্য দ্বারা বিশ্বাসের মধ্যস্থতা উপলব্ধি করিয়ে কাঁপিয়ে
পড়েছিলেন সেই প্লেগ মহামারীর বুকে। কিন্তু তাঁদের
মধ্যে কেউ কি প্রগাঢ় হয়েছিলেন—না মরে গিয়ে-
ছিলেন? মরেননি একজনও। ঈশ্বরের পুত্র যিশু,
তগবান বুদ্ধ এবং মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের জীবন-আলেখ্যে
ঠিক এ জাতীয় দৃষ্টান্ত বিরল নয়। কাজে কাজেই যেখানে
আত্মপ্রত্যয় আছে সেখানে মৃত্যু ভাবনার কাতরতা আসে
না—রোগ বীজাণুও সহসা শরীরে প্রবেশ করতে পারে না।
এই জিনিষ মনোবিজ্ঞান দিয়ে বিচার করলে তার বার্থ
সত্যটুকু সহজেই উপলব্ধি করা সম্ভব হয়, তাছাড়া ধরুন
দেহবিজ্ঞানের দিক দিয়েও যদি বিচার করা যায় তাহলেও
এই সত্যই প্রমাণিত হয় যে, রোগ দেহস্থিত কর্তৃক
এক অকর্মণ্যতার প্রত্যক্ষ পরিচয়। আবার সেই অকর্মণ্য
যন্ত্র বিশ্বাস প্রতিষ্ঠার প্রভাবে এবং স্পর্শের আকর্ষণে সহসাই
উজ্জীবিত হয়ে কর্মতৎপরতা লাভ করে রোগ দোষ নাশ
করতে পারে।

আচ্ছা বলুন তো সত্য কি না? অনেক সময় হুড়হুড়ী
দেবার মতলব পাকালেও অনেকের হাসির উদ্রেক হয়
কিনা? বা পারের তলার হুড়হুড়ী দিলে সারা পাঁটা
কৈপে ওঠে কিনা? এখানে দেহাত্মকীয় স্বাধীন দর্শনও
স্পর্শন চাকল্যের বার্থ পরিচয় পাওয়া যায়, ঠিক তেমনি
যেখনি যখন একটি শিশুকে ঘুম পাড়াবো এই মনোভাব
যদি সূক্ষ্মভাবে রাখা যায়—কোলে ভুলে ঘুম পাড়াবার
কারদা কান্না সব প্ররোগ তখন সূক্ষ্ম ভাবেই দেখা দেয়
এবং শিশুও ঘুমিয়ে পড়ে।—কিন্তু সেখানে যদি আপনার
মন অস্থির বা বিরক্তির ভাব গোপন করতো—শিশুর
মনেও তা প্রতিফলিত হতো। ঘুম পাড়াবার অস্ত্র
কৌশলগুলিও বর্থাবধিভাবে প্রয়োগ করতে পারতেন না।
এটা ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞান (applied psycho-
logy)। বাই হোক এমনি ভাবেই অবচেতন মনে
বিশ্বাসের ধাঁধা দূর করিয়ে মানবিক রোগ মুক্ত করা যায়।
বিজ্ঞান যখন এই মনোবিজ্ঞানের প্রাণী বিভাগ করি

মিনস কোরলেন, তখন তার প্রথম পদ্ধতিকে নাম দেওয়া
হল "Suggestion" বা "ভাবনা"। এই Suggestion
অনুষ্ঠানের প্রয়োগ কৌশল জানতে হলে এই মনো-
বিজ্ঞান সযত্নে বেশ কিছু প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ জ্ঞান থাক
ব্যবক—যার দ্বারা রোগী নিজের রোগকে ভুলে দিয়ে
ভয়-ত্রাসকে দূরে ঠেলে রাখতে পারেন।

আসলে ভাবনা-তথা Suggestion কাকে বলে?
এই বিষয়টি জানতে হলে আসলে জ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের
মনোবুদ্ধির ভাবনা বুদ্ধি দিয়ে অপরের মনের ভিতর নির্দিষ্ট



মিঃ ইতিয়া—বিশ্বনাথ বসু
(শ্রীমনোভাব রায়ের ছাত্র)

ভুল ভ্রান্তিকে কোণে দূর করে বিশ্বাস উৎপন্ন করা এবং
ঐ বিশ্বাসের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ নির্দিষ্ট ব্যক্তির দেহে ও
মনে দারুণতর মতো এক অপরূপ আন্দোলন সূত্র হতে
থাকে আর ঐ আন্দোলনই নির্দিষ্ট রোগ মূক্তির ঈশ্বর।

এছাড়া আরও একটি অতুত পদ্ধতি আছে। সে
পদ্ধতিটি বেশ অল্প ধরণের। ধরুন এমনও তো হতে
পারে—বিশেষ কোন কারণে বা কৌশল প্রয়োগের জরুরী
কর্তৃক কোন মনোবিজ্ঞানীর বাক্য প্রয়োগ কৌশল কোন

যতই রোগীর মনোমত হচ্ছে না। অথচ সেই রোগীর ভাল হবার আশা অতি প্রবল। নানা ধরণের ডাক্তার বৈজ্ঞানিক উপায়। কিন্তু তা বলে কি সেই রোগীর জীবনের প্রয়োজন সংসার থেকে দূরিয়ে গেছে এটাই ধরে নিতে হবে? না, তা নয়। আছে আরও একটা পথ। সেই পথ ও পদ্ধতির নাম হল Auto-Suggestion. Suggestion যেমন কথার বাহুতে সম্বোধিত হয়ে কাজ করতো Auto-Suggestion-এর ব্যবহার পদ্ধতি কিন্তু একেবারে অন্য ধরণের।

Auto-suggestion (স্বকল্প ভাবনা) :—তখন নিজের নিজের মনু ভাবনা মনে প্রাণে গ্রহণ করে ব্যাধি আরোগ্যের আশ্রয় চেষ্টা করে থাকে। কারণ সাধারণতঃ মানুষের ধারণা এবং চিন্তা বিশেষ কাজে প্রয়োজন অনুযায়ী রূপান্তরিত হয়ে থাকে। অতএব কোন ভাবনা এবং ধারণাকে অবচেতন মনে পৌঁছে দিতে পারলেই দেখবেন আপনার অজান্তসারে আপনার মনের ওপর এমন কি দেহের ওপর তার প্রয়োজন অনুসারে কাজ এগিয়ে চলেছে।

প্রমাণ ও প্রতিকার—যেমন ধরুন কিছুতেই সকালে ঘুম থেকে উঠতে পাচ্ছেন না। অথচ কাল খুব সকালে একটা বিশেষ দরকারে ঘুম থেকে উঠতেই হবে—একত্রে আপনি যদি রাত্রে ঘুমাবার আগে বিছানার ওপর বজাসনে বা পদ্মাসনে বসে চোখ বন্ধ করে একাধারে মনে বেশ করে কবাব—ধরুন ২১।৫ মিঃ জপ করেন কিংবা আবৃত্তি করেন যে কাল সকালে আমার খুব ভোরে উঠতেই হবে—হবে—হবে। দেখবেন সত্যি সত্যিই সকালে ঘুম ভেঙে যাবে। স্বল্প যখন প্রাণ মন থেকে নেমে আসে তা সত্যে পরিণত হবেই হবে। যেমন ধরুন ভয়ের চিন্তা—এই চিন্তা অবচেতন মনে পৌঁছে গিয়ে অনেক সময় সত্যরূপ ধারণ করে এক কেলেঙ্কারী সৃষ্টিও করে থাকে। Thoughts become realities এমনি করে আমাদের অবচেতন মনে সুস্থ এবং অসুস্থ ভাব বা ধারণা মনের মধ্যে বাস। বেঁধে যেমন নানা রোগ ভালও হতে পারে—আবার তেমনি নানা রকম রোগের আবির্ভাবও হতে পারে। এই কঠিন ভয়ের ওপরই স্বল্প ধারণা বা ভাবনা সৃষ্টিভিত্তিক।

আত্ম প্রত্যয়—অসুস্থ পত্র খান কেন? রোগ সারাবার জন্য তো? কিন্তু চিন্তা করুন তো সবক্ষেত্রে কি অসুস্থে রোগারোগ্য হয়? হয় না। এমনও হয়—ডাক্তার রোগীর কোন পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে অসুস্থের বদলে রং জল, ইনজেকশানের বদলে গ্লুকোজ ওয়াটার ব্যবহার করেন, তাতেই কিন্তু রুগী দিব্যি ভাল হয়ে যায়। একেত্রেও মনোবিজ্ঞানের এক বিশেষ বৃত্তি রয়েছে। রুগী কিন্তু অসুস্থ ভেবেই গ্রহণ করেছেন এবং তাই নির্দিষ্ট রোগের যথার্থ উপশম পেয়েছেন—এখানে একটা বিশেষ বৃত্তি নিহিত ছিল সেটা হল প্রথমত ডাক্তারের নিজের আত্ম-বিশ্বাস—দ্বিতীয়তঃ ডাক্তারের প্রতি রোগীর শ্রদ্ধা—তৃতীয়তঃ তার সন্মতি আছে যে কোন ভাবেই হোক—তৃতীয়তঃ তার বাচনভঙ্গিতে দৃঢ়তা—আর সাজপোষাকেও কিছুটা নির্ভর করে। এই প্রকৃতিগুলি রোগীর মনে ভীষণভাবে রেখাপাত করে। আসলে অসুস্থ পত্র স্বল্প ভাবনার এক রকম বাহক বলা যেতে পারে। দৈব, টোটকা বা স্বপ্ন প্রমত্ত নানা রকম গাছ-গাছড়া এবং বিশেষ দ্রব্যসম্ভার ইত্যাদির মধ্যে প্রাচীন শাস্ত্রীয় ভিত্তি ও আয়ুর্বেদীয় গুণ সন্নিবেশিত থাকলেও আসলে আত্ম বিশ্বাস ও তক্তির জোরে রোগী তার রোগ মুক্তি লাভে সহায়তা লাভ করে থাকেন। সেক্ষেত্রে রোগী যদি তার একমাত্র রোগটাকেই প্রাধান্য দিয়ে অহরহ চিন্তা করেন—বলে দিচ্ছি কিছুতেই তার সহসা ফল পাবার সম্ভাবনা নেই। আরও ফলাফল হয়—রোগীর সামনে বসে অপর কোন ব্যক্তির যদি সহায় ভূমিকা লইলে দুঃখ প্রকাশ করতে থাকেন অতীত বর্তমান প্রমাণাদির স্ত্র ধরে। মনে রাখুন তেমন সর্বনৈশ লোকের রোগীর দ্বিতীয়মাত্র কদাচ থাকতে দিতে নেই। তার কারণ রোগী ভয় পেলে তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ক্রমশঃ কিছু হারাতে অনেক—বাত্তে সময় আরোগ্যের বাইরে চলে যায়—ঠিক যেমন তুচ্ছ মনে করতে পারলে শত করা ২০ ভাগ রোগী নিজেকে হালকা মনে করতে পারেন। আমাদের এই দেহের মধ্যে অবচেতন মনই সমস্ত শক্তির মাধ্যম।

অবচেতন মনঃশক্তির প্রভাব!—অবচেতন মন দেহের অগণিত স্নায়ু তন্ত্র ইত্যাদির তেজ দিয়ে দেহের অপরাধন বস্তুগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে। এই যে আমাদের দৃষ্টি

নৈমিত্তিক জীবনের জিন্সা অনবরত এক চলচল এবং আরও সব বস্তুর নিয়মিত পরিচালনা—এ সবকিছুই অবচেতন মনের দ্বারা স্বাভূতির সাহায্যেই নিত্য অনুষ্ঠিত হয়ে এসেছে প্রকৃতির বিধানমত। যখন স্বকল্প ভাবনা চিন্তা বা ধারণার দ্বারা যে কোন স্বস্থ চিন্তা অবচেতন মনে স্থির করা যায় তখনও কিন্তু ঠিক একই নিয়মের অধীনে থেকে কাজ হয়েই চলে। আমার মনে হয় এর আর কোন বিকল্প স্বস্থ বৃত্তি নেই। Mr. C. Harry Brooks তার “the Practice of mutto-suggestion” বইএ একথাগুলি যথার্থই স্বীকার করেছেন।

স্বকল্প ভাবনার মন্ত্র :—রোগ যখন এলো—“আমি ভাল হয়ে উঠবোই—কারণ প্রকৃতির প্রদত্ত শক্তিরূপী রোগের ধ্বংসক আঁইন-কায়ন মেনে চলবোই। কয়েক দিনের মধ্যেই আমার শরীরে লুপ্ত বল ফিরে আসবে, ফের আমি সমস্ত আনন্দ উৎসবে ধোগ দিতে পারব। নিশ্চয়ই আমি আমার জ্ঞানের অজ্ঞাতসারে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় দেহের প্রতি অবিচার করেছিলাম তাই এই পরিণতি—আর কখনো এমন করবো না।” এই ভাবনা মনে প্রাণে জপ করতে পারলে রোগের হাত থেকে রেগাই পাওয়া যাবেই।

রোগ যখন ভাল হতে শুরু করলো—“আমি এখন পূর্ণাঙ্গক বেশ ভাল বোধ করছি। এই শক্তি আমার শরীরে দীর্ঘ দিন স্থায়ী হবে।” একথাগুলি কখনো কখনো মনেমনে আবার কখনো বা উচ্চস্বরে আবৃত্তি করতে হবে, স্নাতকঃ এ পদ্ধতিটি রাত্রে শোবার সময় এবং সকালে বিছানা থেকে উঠবার সময় এ জাতীয় স্বকল্প ভাবনা করা পূর্ব ভাল। কারণ ঐ দু’টি সময় মনটা প্রায় সবদিক দিয়েই শূন্য থাকে—অথবা শূন্য করে নিতে হয় চোখ বন্ধ করে আপন চেষ্টার দ্বারা। Mr. Arnold, m, D, “Defec-tive memory and their treatment”—বইএ এক আয়গার বলেছেন—

“স্বকল্প-ভাবনা যখন গ্রহণ করবেন তখন আপনার শরীরকে সম্পূর্ণ ভাবে শিথিল করে (Relax) করে যেবেন কারণ তাতে অবচেতন মনের প্রকৃতিগত ক্ষমতা লাভে সহায়তা করবে। অত্যাশংক্য দ্বারা যখন আরও অজ্ঞাত হয়ে যাবেন তখন আর আপনাকে চোখ বন্ধ করে মনঃসংবন আনবার প্রয়োজন হবে না” Mr. Charles-

Bandeum—তার suggestion and Muti-suggestion বইএ এই কথা বলেছেন যে এই চিন্তা ট্রান্স-বাসে-মাঠে-মহাদানেই শুধু নয় কোন মাহুকের সঙ্গে কথা কইতে কইতেও সম্ভব করা যায়। ইনি আরও বলেছেন অবচেতন মনে ভাবনা প্রেরণের সময় তুলেও কখনো রোগ সহজে চিন্তা করতে দেই,—ভাবতে হবে সাময়িক এই দুর্বলতা বা রোগ নিশ্চয়ই কেটে যাবে। রোগের ইতিহাস জ্ঞান মনে চিন্তা করলে রোগারোগ্য অন্তরায় হয়ে



ক্রীশঙ্কর সাহা (ভারতের মিঃ মালম্যানের দ্বান্দ-আপ—
ক্রীমনোভোব রাভের ছাত্র)

দাঁড়ায়। স্বকল্প ভাবনা দ্বারা যে ধরনের স্বস্থ অবস্থা লাভ করার ইচ্ছা প্রাণে জাগে সেই অবস্থার সঞ্চয় লইতে হইবে। মনে রাখবেন নিয়মাত্মকতা এবং অধ্যবসায় (Regularity and persistance) স্বকল্প ভাবনার একমাত্র প্রাণ। স্বকল্প ভাবনা গ্রহণ করা কালে ইচ্ছা-শক্তির প্রয়োগকৌশল আপাততঃ বন্ধ রাখুন—কারণ স্বকল্প ও ইচ্ছাশক্তি সমগোষ্ঠির নয় তাবের আলাদা প্রয়োগ বিধি। তাই ইংরেজিতে বলে the greatest enemy of auto suggestion is effort,

প্রমাণ :—যখন আপনার কোন একটা জটিল সমস্যা সমাধান কিছুতেই হচ্ছে না,—তখন আর ওটা নিয়ে আপনি ব্যতী মাথা ঘামান না কেন, বরং তাতে সমস্যা আরও জটিলতর হয়ে দেখা দিতে পারে। সেক্ষেত্রে যদি আপনি ঐ সমস্যাটিকে অরণ করে আপাততঃ সটান ত্যজে বা একটু ঘুমিয়ে নিতে পারেন, দেখবেন সমাধানের পথ আপনার স্বপ্নের গোরুরে এসে গেছে।

ইচ্ছাশক্তি (will Force) যে সর্জনশক্তিমান একথা অনস্বীকার্য, তবে এই স্বকল্প ভাবনা ইচ্ছা শক্তির স্বার্থ স্থান নয়, কারণ সচেতন মনকে ঘুম পাড়িয়ে অবচেতন মনকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে হয়। আর তাইতো তন্ত্রাত্মক ব্যবহার এই জাতীয় ভাবনা চিন্তা অধিক ফলপ্রসূ। এটা সম্পূর্ণ বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে ভাবনা করতে হয়। confidence is half the cure,

সচরাচর কি কি মারাত্মক রোগ আরোগ্য হতে পারে? মোটামুটি ভাবে বলা যেতে পারে ন্নারবিক দুর্বলতা (Neurasthenia) অনিদ্রা, শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ক্রম্প (Spasm) মুত্রথারণের অক্ষমতা, হিষ্টিরিয়া, যুগী, অরণশক্তি হীনতা, হাপানী, গুরুধারণ ক্ষমতা ইত্যাদি আরও অনেক রোগ এই স্বকল্প ভাবনা দিয়ে ভাল ভাবে চিকিৎসা করা যায় ও আরোগ্য করা যায়।

চিকিৎসা পদ্ধতি

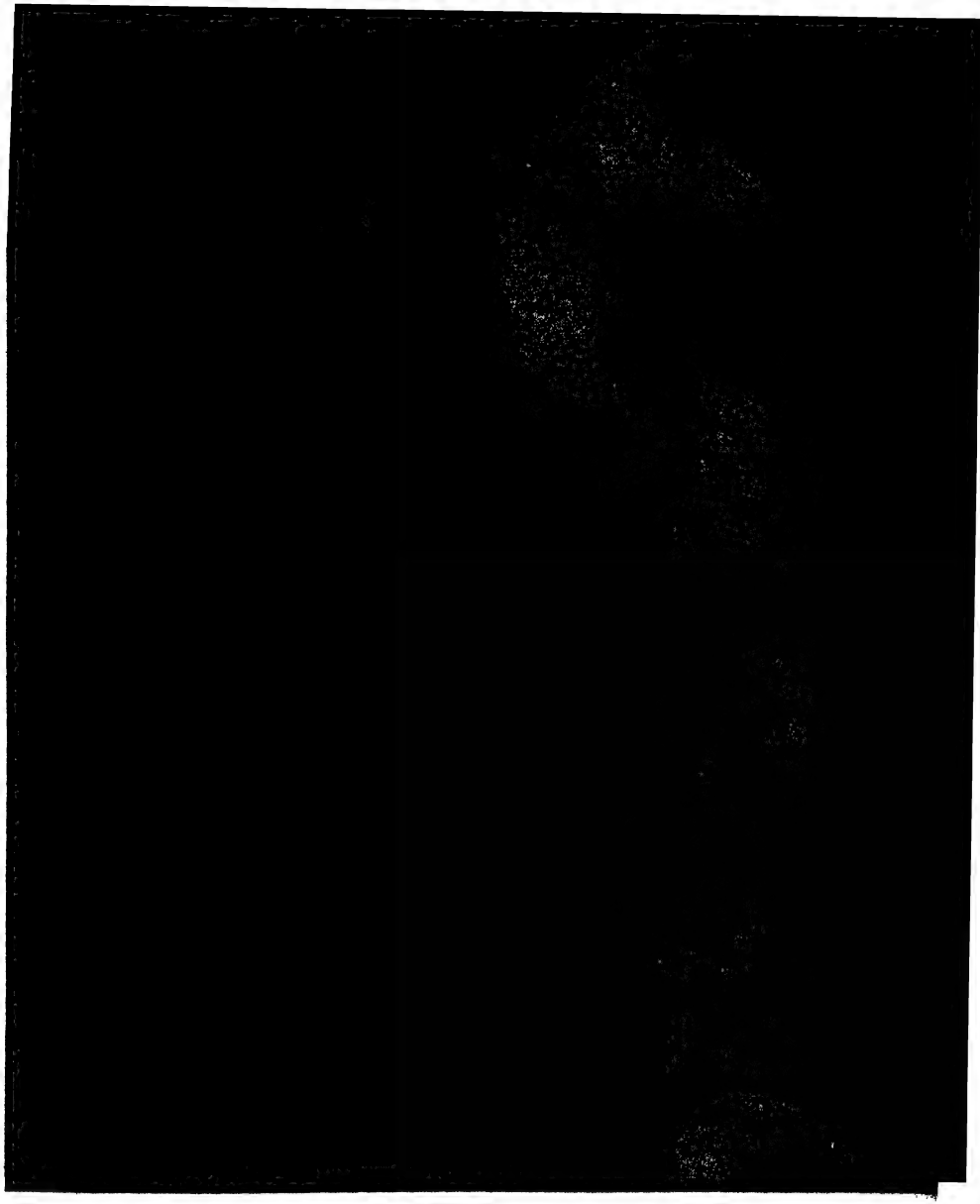
অনিদ্রা :—চিৎ হয়ে শোবার আগে “গোমুখাসন” অভ্যাস করে দেহকে শিথিল করে দিন, এবারে জোরে বা আন্তে আবৃত্তি করুন—“ঘুম আমার আসছে, দেহটি ক্রমশঃ শান্ত হয়ে আসছে—এখনই ঘুমিয়ে পড়বো, এবার বা কাৎ হয়ে ঐ কথা চিন্তা করুন—তার পর ডান কাৎ হয়ে—দেখবেন ঠিক ঘুমে হুঁচোখ আচ্ছন্ন হয়ে আসছে।

হিষ্টিরিয়া :—অনেক সময় আমরা ঘাবড়ে যাই,—বুঝি এবারই প্রাণটা বেরিয়ে যাবে। এ-রোগ থেকে রেহাই পাওয়ারটা খুব একটা কঠিন কাজ নয়, বরুন “আজ থেকে আমার মনের শক্তির মতুন করে ধরা দেবো। হিষ্টিরিয়ার উপসর্গ শুরু হবার আগেই আমি টের পাবো তখনই আক্রমণ থেমে যাবে। ঐ আক্রমণের উপক্রম হলেই ভাবতে হবে “জান আমার অব্যাহত থাকবে।” আমি

ক্রমশঃ শান্ত হয়ে যাবছি, আমার আত্মসম্মতি এসে গেছে আর আমার কোন ভয় নেই”—মোটামুটি এই কথাগুলি আবৃত্তি করতে হবে বেশ খানিকক্ষণ আমি বিশ্বাস করি। এতে নিশ্চয়ই উপকার হবে, আর নিয়মিত শ্রমজীবন বহুশ্রাসন এবং অর্জুনস্যোলোসন অভ্যাসে খুব উপকার হবে।

ন্নারবিক দুর্বলতা রোগে (neurasthenia) :—এ জাতীয় রোগ মারাত্মক না হলেও মনের দুর্বলতার শেব পর্যন্ত সত্যিই মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে। অশান্তির দ্বারা মানসিক অবসাদ মাত্রের একটা স্বাভাবিক ধর্ম। কারণ হয়তো এমন বিশেষ কিছু একটা জটিল নয় তবুও মনের যেন এক অসহ্য যন্ত্রণা। বাইরে থেকে লোকে বুঝতে অনেক সময় ঠিক পারে না—আর বার হয় তাও যে তার ইচ্ছাধীন সেটাও সত্য নয়। আপনি থেকেই একটা সমস্যার সৃষ্টি হতে থাকে। তাতে কেউ বা কেঁদে শান্তি পান, কেউ বা নীরবে অন্তমনস্ক হয়ে নিশ্রাণের মতন পুতুল হয়ে থাকতে ভালবাসেন, আবার কেউ বা মায়ুর উত্তেজনার মানসিক বিকৃতির ইজিত স্বরূপ মারধর—ট্রিনিয়পজ ভেঙ্গে তচনচ্ করে ঐ উত্তেজনা বন্ধ করতে চান, তা কিন্তু তখন মনের স্বপ্রবৃত্তির গোপন ইজিতেই সম্ভাব্য করার চেষ্টা চলে। তবে মনের এই ন্নারবিক উত্তেজনার তাপটা ২৫ দিন থাকে, তার পর আন্তে আন্তে তিমিত হয়ে যাবার কথা, কিন্তু ঘন ঘন এ জাতীয় আঘাতের ফলে ন্নারবিকগণী ভীষণ কমজোরী হয়ে মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত মাত্র হয়ে পড়েন। তখনকার অবস্থা অতি চিন্তনীয়। এমন কি মৃত্যু চিন্তাও তার কাছে অতি আরামপ্রদ মনে হতে থাকে। তবে এ ট্রিনিয় প্রাথমিক অবস্থা থেকেই প্রশমিত করা যেতে পারে তার ২১টি পদ্ধতি বলছি। ঐ রকম স্বাভাবিক মানসিক অবস্থা আসামাত্র চোখ বুজে কপালে হাত বুলিয়ে নিয়ে অন্ততঃ ১ মিনিট নিবিষ্ট মনে ঘন ঘন আবৃত্তির মত বলে চলুন “ঠিক ভাল হয়ে যাচ্ছে—ভাল হয়ে যাচ্ছে”—জোরে শব্দ করুন, এতেই দেখবেন উত্তেজনা বা রোগ চিহ্নের ছায়া দূর হয়ে যাবে। তারপর ডান হাতখানা নেড়ে ঝাড়া দিয়ে বলুন বাবা!! চলে গেছে। স্বকল্প ভাবনা দ্বারা একে দূর করা বার বিশ্বাস রাখুন। প্রতিদিন ২১ বার অভ্যাস করবেন।

ভারতবর্ষ



আলোয়াকালে।

সত্যো : নীপক চন্দ্র



মামেশ্বরম্ ও মাদ্রাজ)

ফটো : বিজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

যদি একটি প্রথা বলতি,—যদি শুয়ে বা চেয়ারে হেলান দিয়ে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করে, হালকা করে (Relax) হাত দু'টো ডলপেটে রেখে বীর থেকে ক্রমশঃ উঠবার বলুন “শা—স্তি শাস্তি শা—স্তি।” অশান্ত মন শান্ত হবে। অভ্যাস করে দেখুন। এর জন্য আসন রয়েছে অর্জুন্যেন্দ্রোয়ান সলভাসন পদ্মভাসন অন্ততম।

ভৌতলাভী বধিরতা এবং শ্রবণশক্তি হীনতা ; সব ভাল হতে পারে এই স্বকল্প ভাবনা দ্বারা এবং কতকগুলি নিত্য অভ্যাস দ্বারা।

যেমন ভৌতলাভী স্বকল্প ভাবনা মনের মধ্যে শুদ্ধভাবে পুর্বে রেখে খুব ধীর স্থিরভাবে পদ্ম ও গজ আকৃতি করতে হবে খুব ভোরে এবং গভীর রাত্রে।

বধিরতা—ঐ একই ভাবনা মনে ধারণ করে মুখবন্ধ করে কানের পর্দার ওপর দিয়ে মুখে একটা দীর্ঘ আওয়াজ রাখুন একসঙ্গে। করেকবার করুন। প্রতিবার শেষে মনে করবেন—“আমি আশে পাশের সব কথা শুনেতে পাচ্ছি। এর জন্য কর্ণপিঠাসন, সিংহাসন, কপালভাতি প্রাণাশ্বাস খুব কার্যকর।

শ্রবণশক্তি হীনতা :—স্বকল্প ভাবনার সাথে মিতালী রেখে আপনি প্রত্যহ সকালে ও রাত্রে শোবার আগে ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত এবং উল্টো দিক থেকে ৯৯-৮-২৭ এ ভাবে গুণতে থাকুন। এবার শুয়ে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত আপনার সমস্ত কাজকর্ম ক্রমশ গভীর ভাবে চিন্তা করুন। অভ্যাসযোগে সব ফিরে পাবেন। এর জন্য শশভাসন

সলভাসন, পশ্চিমোদ্যানাসন খুব ভালভাবে কাজ করে শীর্ষাসনেও খুব ভাল ফল পাওয়া যায়, অবশ্য যদি শ্রবণ এবং চোখ ভাল থাকে।

যে কোন ব্যাধি বেদনাও ঐ ভাবে স্বকল্প ভাবনা দ্বারা মুকল পাওয়া যায়। ব্যাধি বেদনা স্থানে হাত রেখে মানসিকে হোগীদের মত হাত বুলিয়ে চোখবুলিয়ে ভাবতে হলে “কমে যাচ্ছে—কমে যাচ্ছে,”—এবং মনকে বদারই অস্ত্র দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারলে আরও অল্প কয়েকদিন পাওয়া যাবে। এতে যৌন ক্রমতাও অতি বৃদ্ধি লাভ করে, দাম্পত্য জীবন সুখকর করে। শুধু তাইবা কেন?—ঈশ্বরধ্যানে মনকে নিবিষ্ট করতেও এই ভাবনার সফল যোগিতা সফলতার সাক্য দেয়। আধ্যাত্মিক চরিত্রে গঠনে এই সাধনা অতিফলপ্রসূ, কারণ তখন আত্মবিশ্বাসের প্রদীপ ওঠে। এই আত্মবিশ্বাস স্বকল্প ভাবনার রূপান্তর মাত্র। তাই মনের সবলতা ও শক্তির প্রতিষ্ঠা—যে কোন দুর্বলতা বা হীনতাকে দূরে ঢেলে রাখতে পারে।

তবে সব কথার সার কথা হল যেহেতু স্বকল্প ভাবনা। কারণ যেহেতু ও মনে যে ধারণার ব্যাধিই আত্মকল্প না কেন দূষিত পদার্থ যদি দেহে সঞ্চিত না থাকে—তা হলে উল্লিখিত ‘স্বকল্প-ভাবনা (Auto-Suggestion) শীঘ্র কাজ করে ঐ ‘জাতীয় রোগকে বিদূরিত করতে পারে। তাই বলছি—ব্যায়াম ও যোগ প্রত্যেকেরই নিয়মিত অঙ্গবিশুদ্ধতার অভ্যাস রাখা—মানে সত্য স্বাস্থ্যের ভিত্তি দৃঢ় রাখা একটুতেই হার মানতে হবে না।



হাস্তরসস্রষ্টা কেদারনাথ

সন্তোষকুমার অধিকারী

১৯১৫ সালে কাশী থেকে একটি ব্যঙ্গ কবিতার বই বেরোয়। বইটিতে লেখকের ছদ্মনাম দেওয়া ছিল নন্দিশর্মা। এই বইটিতে কাশীর ও কাশীবাসী বাঙ্গালীর সরস পরিচয় দেওয়া ছিল। সে পরিচয় যেমন বিচিত্র তেমনি সরস। বইটি বাঙ্গালী পাঠক সমাজে আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। অনেকেই সেদিন ভাবতে পারেনি যে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থটির লেখক কে? কেউ বললেন—লেখক স্বয়ং রসরাজ অমৃতলাল, কেউ বললেন—ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। বইটির নাম ছিল “কাশীর কিষ্কিণ্ণ।”

সেদিনের সাহিত্য সাধনার কথা বলতে গিয়ে কেদারনাথ লিখেছিলেন,—অন্তরে কিছ সাহিত্য প্রীতির আসন পাতাই ছিল। কোথাও না লিখলেও বাড়ীতে একখানা খণ্ডা খাতা খোলা থাকতো অবসর বিনোদনের উপায়-রূপে। এই খাতাখানিকে তার নিভৃত স্থান থেকে উদ্ধার করেন কাশীরই এক ছাপাখানার মালিক—মণিভূষণ নাথ। এই ক্ষুদ্র কবিতার বইটি—কাশীর কিষ্কিণ্ণ—লেখক কেদার নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে যে খ্যাতি এনে দিল, তার ফলেই পরিণত বয়সে তাঁর পরিভ্রম সাহিত্য-লাভনা নতুন করে শুরু হলো। বাংলা সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর রসসাহিত্য সৃষ্টির গৌরব যারা পেয়েছেন—কেদার নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (বা দাদামশাই) তাঁদের অন্ততম। বাংলা সাহিত্যে হিউমার (Humour) সৃষ্টির ক্ষমতার তিনি দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী এবং শরৎচন্দ্রের সমধর্মী। তাঁর রচনায় যে সূক্ষ্ম রসবোধ স্বভঃ উৎসারিত হয়েছে তার মধ্যে কোন মালিন্য ছিলনা। যুহু তিরস্কার হয়ত ছিল, কিন্তু তীব্র স্নেহের আঘাত নয়।

বাংলা সাহিত্যে খাটি হিউমারের স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র। “কমলাকান্তের দপ্তর” ও “লোকরহস্তে” বঙ্কিমচন্দ্র হাস্তরসকে

মার্জিত ও পরিমিতরূপে সৃষ্টি করলেন। বঙ্কিম সাহিত্যের মননশীলতা ও বাগবৈদগ্ধ্য কেদারনাথকে অভিভূত করেছিল। তাঁর বাংলাসাহিত্যে রসরচনার প্রবৃত্তি হওয়ার কারণই ছিলেন বঙ্কিম। এ-কথা কেদারনাথ নিজের মুখেই স্বীকার করেছেন।

“বঙ্গদর্শন—বিশেষ করে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা আমাকে এতই মুগ্ধ করেছিল যে ইংরাজি লেখার মোহ একদম মুছে গেল।……আমাকে তখন বঙ্গদর্শন টেনেছে, বিশেষ কমলাকান্ত স্বয়ং।”

কেদারনাথের রসরচনার প্রথম আরম্ভ আত্মমানিক ১৩০৩ সালে। তখন তাঁর বয়স ৩০। ‘বঙ্গবাসী’ পত্রিকার ইঙ্গনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় “পঞ্চানন্দ” লিখছেন। কেদারনাথও ‘বঙ্গবাসী’ ও দৈনিক চন্দ্রিকায় চুটকি হাস্তরসাত্মক লেখা শুরু করলেন—নন্দিশর্মার ছদ্মনামে। প্রথম প্রথম তাঁর লেখা আকর্ষণাত্মক ছিল। “ভোটভিক্ষা” কবিতাটি তাঁর বিশেষ পরিচিত কোন ব্যক্তিকে তীব্র আঘাত দেয়। অহতপ্ত হ’য়ে কেদারনাথ তাঁর রচনার স্লেষাত্মক ভাব বর্জন করার সংকল্প করেন। পরবর্তী যুগে তিনি নতুন ক’রে যখন লিখতে শুরু করলেন, তখন তাঁর মনে আর শাপিত স্নেহের জ্বালা নেই। তাঁর মন তখন সমবেদনার স্রিষ্ট। যা মেকি, যা কৃত্রিম, তার প্রতি যে যুহু তিরস্কার তাতে বিজ্ঞপের তীব্র কশাঘাত নেই। বয়ঃ হাস্তরসকে অতিক্রম করে তাঁর রচনায় করুণরসের প্রাবল্য ঘটেছে। কেদারনাথের উল্লেখযোগ্য সাহিত্য কর্ম ‘আমরা কি ও কে’, ‘কবুলতি’, ‘কোষ্ঠির কলাকল’, ‘তাহাড়ি মশাই’, ‘আই ছাণ’।

বঙ্কিমচন্দ্র ছাড়া সাহিত্যে হাস্তরসের স্রষ্টা হিসেবে যারা কেদারনাথের পূর্বসূরী—তাঁদের মধ্যে ছিলেন দীনবন্ধু মিত্র, শরৎচন্দ্র, অমৃতলাল ও ইঙ্গনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অমৃতলাল ও ইজনাথ দুজনেরই রচনার মূল ছিল ‘স্রাটোর’। বিশেষভাবে অমৃতলাল বেন সংস্কারকের ভূমিকা নিয়ে এসেছিলেন। তিনি আধুনিক বা নব্য ভাবকে ব্যক্ত করেছেন শালনকঠোর ভঙ্গিতে। কিন্তু কেশবানাথের রচনা নিছক হাস্তরসের উৎস ছিল। উদ্দেশ্যমূলক ভঙ্গি নিয়ে তিনি লিখতে বসেননি। তাঁর লেখার হাসির সঙ্গে বেশানো ছিল করুণ বেদনার অঙ্গভূতি। নিজের সম্বন্ধে কেশবানাথ বলেন—বরাবরই আমি বাজে কথাই পক্ষপাতী। বাজে কথাই লিখে থাকি। বাজে কথাই আমার প্রিয়।

কেশবানাথের গল্পকথনে একটা মজলিসী ভাব ছিল। চাক্ষুরিস্থজে তিনি বহু জায়গায় ঘুরেছেন। প্রচুর অভিজ্ঞতার আলোকে উজ্জল তাঁর চেতনা। অথচ ভঙ্গিতে রয়েছে নিরাসক্তি। বাস্তব জীবনের টুকরো টুকরো ঘটনা নিয়ে তাঁর গল্প। এইসব খণ্ড ঘটনার মধ্যে তিনি কোতুকুর রস খুঁজে পেয়েছেন। তাঁর বাক্যটুঙ্গ অসাধারণ। শব্দকে মুচড়িয়ে তার মধ্যকার রস বার করেছেন। রকমারি ভঙ্গিতে শব্দকে প্রয়োগ করে পাঠককে হাসিয়েছেন।

“কালীর কিঞ্চিৎ” কবিতার বই “উড়ো বৈ” ও তাই। এই দুটি কবিতার বইয়ের ভাষায় ষিজেজলালের প্রভাব পড়েছে বলে মনে হয়। যখন তাঁর “কালীর কিঞ্চিৎ” থেকে পড়ি—

“সেই ক্যানানের চুল ছাঁটা—সেই অলটার বৃকে
টাই বাধা আর কলার আঁটা, সিগারেট মুখে,

অথবা

“আমাদের লক্ষ্মীরা সব বোনেন বসে উল
পরিষ্করের মধ্যে শুধু বাঁধেন নিজের চুল।”

তখন লক্ষ্য থাকেনা যে ষিজেজলাল কেশবানাথকে প্রভাবান্বিত করেছেন। এ ধারণা আরও দৃঢ় হয় তাঁর ‘প্যারডি’ কবিতায়।

“Curl ছলিল ছগালে বাহের—রমণীমূলক মনকি
চরণে পম্পু রেশমী ওড়না—ভিটেটার রেখে বন্দী।
পত্নীরে বারি প্রিয়তমা বলে—বাণে দিয়ে তার

তিথারী বেশ

তুই বটেইত তাদের জননী—বটেই ত তুই তাদের দেশ।”
কেশবানাথের মনে যন্ত্রণার অঙ্গভাব ছিল। বাক্যবর্ষ দেশবাসী ও অধঃপতিত দেশের অঙ্গ ছিল গভীর বেদনাবোধ। সাধারণ বাক্যলী চরিত্রে পৌরুষের অভাব তাঁকে তীব্র আঘাত দিয়েছে। গোটা দেশের মানুষের মধ্যে যে গোলামিমূলক হী-মস্ততার ভাব দেখা দিয়েছিল, তিনি তাকে বারবার তিরস্কার করেছেন। ‘আই হাজ’ বইয়ে মুহম্মদাবুর মুখে এই তীক্ষ্ণ চরিত্রহীন জাতীয় মনোভাবের বর্ণনা :—বারা হারমনিয়র বাজিয়ে সিগারেট টানতে টানতে গায় “বন্ধ আমার” না হয় “বন্দেমাতরম” তারা দেশকেই ব্যক্ত করে। তিরিশ টাকার চাক্ষুরি পেলেই সব চূপ—কৃতার্থ। তখন বন্দেমাতরম।

শিবুদার মুখে “আই হাজ” এর ব্যাখ্যা তুলবার নয়।

“আমাদের আই (I) বলে কিছু নেইরে।—সব ইট (It)—“থার্ড পার্সন Singular! Iটা আমাদের খুটো অভিনয়ের ‘মুখোস’।”

কেশবানাথের সমসাময়িক আর একজন হাস্তরসস্রোতা হলেন পরশুরাম। পরশুরামের কৃত্তিক অভিনব ঘটনা সংস্থাপনে ও উদ্ভট কল্পনায়। এ বিষয়ে তিনি ঐলক্যনাথের সমগোত্রীয়। কিন্তু কেশবানাথ রস জমিয়েছেন কথার সাজগোজে ও বাক্যচাতুরীতে। তাঁর মনে সমবেদনার অঙ্গভূতি। তাঁর গল্পের অনেক জায়গাতেই কারুণ্য নিবিড় হ’য়ে উঠেছে। হাসি যে কখন অশ্রুজলে মুখ ডুবিয়েছে তা’ বুঝে ওঠা যায় না। তাঁর ভাষা সহজ ও সরল—অনেক ক্ষেত্রে আত্মজীবনী বলার ভঙ্গিতে লেখা। বহিম, রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর বুদ্ধিদীপ্ত রসবোধ বাংলাভাষায় যে হিউমারধর্মী সাহিত্যপ্রবাহের স্রষ্টি করেছে কেশবানাথ সেই ধারারই সার্থক বাহন।

তোমাকে হাসিরাশি দেবী

আবার তোমায় দেখলেম,—

দেখলেম,— আনন্দের
ফ্রেমে আঁটকানো ছবির মত
ব'সে আছি চূপ ক'রে।

পথের দিকে মেলে রেখেছ

ছুটি চোখের উদাস দৃষ্টি।

ও দৃষ্টি যেন পথিকদের ব'লছে—

‘তোমাদের চিনি। জানি

এই বাওয়া আর আসার তাগাদা,

তাই কোনও আগ্রহ

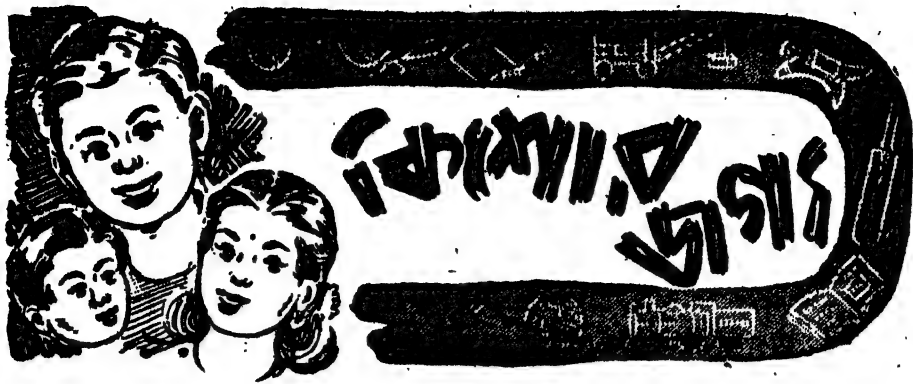
নেই আনবার,

ওৎসুক্যও নেই তাব'বার।’

আর আমি দেখলেম,

তোমায় নতুন চোখে দেখ'লেম ॥





পূজার পরে

শ্রীজ্ঞান

বাংলা দেশের মহান উৎসব, বাংলার হিন্দুর মহাপূজা, আর বাংলার ছেলেমেয়েদের মহৎ অগ্রচর্চনের পরিসমাপ্তি হয়েছে এ বৎসরের মতন। আবার আগামী বছরে দেবী দুর্গার আগমনে বাংলার ঘরে ঘরে আনন্দের সাড়া জাগবে—শত চুংকটে গীড়িত বাংলা মায়ের প্রাণে আবার নতুন আশার সঞ্চার হবে—অভাবে, অভিযোগে ক্ষতবিক্ষত বাংলার সংসারে কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্যের স্পর্শ হয়ত লাগবে—ছেলে মেয়েদের মুখে ফুটে উঠবে হাসি, অন্ধে উঠবে নতুন পোষাক, আনন্দ উৎসবে যেতে উঠবে সবাই। কিন্তু তার তো এখন দেবী আছে অনেক, মাঝে পড়ে আছে পুরো একটা বছর! এই সময়টা কাজের সময়। উৎসব শেষ হয়েছে, এবার কর্মের আহ্বান এসেছে। তোমাদের অর্থাৎ ছাত্রদের প্রধান কর্ম কি? লেখাপড়া। ছাত্রাণাং অধ্যয়নং তপঃ—অধ্যয়নই ছাত্রদের তপস্কা বা একান্ত করণীয় কর্ম ও কর্তব্য। সুতরাং তোমাদের সেই প্রধান কর্মের প্রতি, কর্তব্যের প্রতি নিশ্চয়ই তোমরা এবার মন দেবে। কর্ম তো সকলকেই করতে হবে, কারণ, কর্ম ছাড়া মানুষ তো থাকতে পারে না। গীতার শ্রীভগবান বলেছেন—

ন কণমপি কশ্চিদ্ধি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ ।

কার্যতে হবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈগুণৈঃ ॥ ৩৫
অর্থাৎ, কেহ কখনও কর্ম না করয় কণকালও থাকতে

পারে না, স্বভাবজাত সবাদিশুভসমুহই মাতৃশব্দে অবশ করে কর্ম করায়।

কর্ম সবাইকেই করতে হয় এবং সর্দাই করতে হয়, তবে দেখবে সে কর্ম যেন সংকর্ম হয়—হুকর্ম না হয়। আর কর্তব্য কার্য না করে আসলো, আড্ডার কাল কাটান অজায়ই শুধু নয়—এতে শরীর ও মনের প্রকৃত কতিসামনও করা হয়। অকর্মণ্যতা সর্বদাই পরিতাজা—এ কথাটা মনে রাখবে। গীতার শ্রীকৃষ্ণকে আরও বলেছেন—

নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কং জায়েজকর্মণঃ ।

ন তে শরীরযাত্রাপি চ প্রসিধ্যোকর্মণঃ ॥ ৩৮
অর্থাৎ, তুমি সর্বদা কর্ম কর, কারণ কর্ম না করা অপেক্ষা কর্ম করা ভাল। কর্ম না করলে তোমার শরীর রক্ষাও সম্ভব হবে না।

কর্ম যখন করতেই হবে, তখন কর্তব্য কর্ম করাই শ্রেয়। আর কর্তব্য কর্মে অবহেলা করা অহুচিতই শুধু নয়, অত্যন্ত ক্ষতিকরও; আর সে ক্ষতির পরিমাণ এত বেশী হতে পারে যে সারা জীবনই হয়ত তার জের টেনে চলতে হবে। উত্তরকালে ফেলে আসা পাঠ্যজীবনের দিকে চেয়ে হয়ত মনে হবে, কেন তখন কর্তব্যে অবহেলা করেছিলাম, কেন পড়াশুনায় কৃণকি দিয়েছিলাম, কেন শুধু উৎসবে আনন্দে মেতে ছিলাম। কিন্তু যখন মনে এ অঙ্গশোচনা

জাগবে, তখন সে ক্রটি সংশোধনের সময় চলে গেছে—
যেথেকে গেছে শুধু হতাশা তার অহুশোচনা।

তাই বলি, উৎসব তো শেষ হয়েছে—এবার কর্ণে ব্রতী
হও, কতব্যে অবহেলা কর না, কর্ণে কঁাকি দিও না।
সামনেই তোমাদের পরীক্ষা। এবার তোমাদের কতব্য
কর্ম লেখাপড়া মন দিয়ে কর। ফল শুভ হবেই, আর
সে শুভ ফল ভোগ করবে সারাজীবন ধরে।



আলেকজান্দার ডামা

রচিত

দী কাউন্ট অফ্ মন্টি ক্রিস্টো

সৌম্য গুপ্ত

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

সে কাহিনী শুনে সজল-চোখে মিনতিভরে মার্লে'ডিজ
বললে,—আমার মুখ চেয়ে তাকে তুমি কমা কবো,
এড্‌মণ্ড!...

কাউন্ট বললে,—বিধাতার বিধান অমাত্ত করতে
বলো?...যে বিধাতা আমাকে নির্দম-মৃত্যুর মুখ থেকে
বাঁচিয়ে সুবিচারের শক্তি-সামর্থ্য দিয়েছেন! অসম্ভব!...
দীর্ঘ চৌদ্দ বছর কী অমানুষিক দুঃখ-বাতনা আমি ভোগ
করেছি...তার শোধ আমি নেবো কড়ার-গুড়ার—
অপরোধীদের উপযুক্ত শাস্তি দিয়ে!...এই আমার একমাত্র
লক্ষ্য!...এর আর নড়চড় নেই এতটুকু!

—বেশ, তাই যদি তবে শোধ নাও কার্নিলের উপর...
আমার উপর দিয়ে নয়...আমার পুত্রের উপর দিয়েও নয়!

...এতদিন আমিও কী বাতনা...কী দুঃখ ভোগ করেছি,
তুমি জানো না...বুঝবে না!

কাউন্ট বললে,—তুমিও বাতনা সহ্যেছো?...বিনাদোষে
তোমার বুড়ো বাবা কষ্টে-দুঃখে-অনাহারে মারা গিয়েছে?
...যে-যেরেকে মারুব ভালোবেসে মাথার মণি করবে,
তেমন মেরেকে ভালোবেসে তুমি দেখেছো সে মেরে
তোমার দুর্জন-দুশমনকে বিবাহ করেছে?...তার বিবাহ
করে সুখে-অলঙ্ঘ্যে বাস করছে, আর তুমি বিনাদোষে
দুশমনের চক্রান্তের ফলে, অন্ধকার-গারদে পড়ে নরক-বস্ত্রণা
ভোগ করেছ!...

মার্লে'ডিজ বললে,—না, তা দেখিনি...তবে যাকে
আমি প্রাণের চেয়েও ভালোবেসেছিলুম, তাকে দেখছি—
সে আমার একমাত্র ছেলেকে হত্যা করতে উদ্বৃত্ত!

এ কথা শুনে কাউন্ট গভীর হয়ে কি যেন চিন্তা করলো—
তারপর নিখাস ফেলে বললে,—বেশ, তাই হবে!...
তোমার ছেলের প্রাণ নষ্ট হবে না...আমিই মৃত্যুবরণ
করবো!

—অসীম তোমার অন্তগ্রহ, এড্‌মণ্ড!...কিন্তু তুমিও
দেখবে—আমার মনে এখনো তোমার উপর সেই আগের
মতোই ভালোবাসা আছে!...আজ তাহলে আমি!...
বিদায়!...

মার্লে'ডিজ চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই কাউন্টের মনে
অহুশোচনা ভাগলো...সে ভাবলো,—কি নির্কোষ আমি!
শোধ নেবার জন্য কেন আমি সেদিন তখনই আমার
ছদ্মটাকে গুঁড়িয়ে চূর্ণ করে দিইনি!...

পরের দিন ভোরের আলো ফোটবার সঙ্গে সঙ্গেই
ম্যাক্স মিলিয়ান এলো কাউন্টের কাছে...হাতে একটা
পিস্তল তুলে নিয়ে কাউন্ট বললে,—আমাকে কখনো তুমি
পিস্তল ছুঁড়তে দেখেছো?...

—না!

—তাহলে দ্যাখো।

দেওয়ালের গায়ে চিড়িতনের টেকার চার কোণ পেরেক
দিয়ে গেঁথে, সেই টেকার চিড়িতনের তিনটি কালো-
গোলকে এবং বোটার লক্য করে কাউন্ট পিস্তল চাঙা
করি দিলো...গুলির চোট লেগেও দেওয়ালে-গায়ে তাল

রইলো অটুট—তথু এই কালো-গোলক তিনটি আর বোটা তেল করে গেল সেই গুলি।

আশ্চর্য্য হয়ে ম্যাক্সমিলিয়ান বললে,—অদ্ভুত আপনার হাতের টিপ্...তবে, আমি মিনতি করছি, আপনি এ্যালাবার্টকে এ্যাণ্ড মারবেন না...তার মায়ের কথা মনে রাখবেন।

কাউন্ট বললে,—ঠিক বলছো, ম্যাক্সমিলিয়ান...আমি এ্যালাবার্টকে মারবো না—এ্যালাবার্ট আমাকে মারবে!

—কিন্তু কাউন্ট...

নিখাস ফেসে কাউন্ট বললে,—অনেককাল আমি বেঁচেছি, ম্যাক্সমিলিয়ান...বাঁচার আর সাধ নেই আমার।

ঘড়ীর কাঁটায় তখন ছ'টা বেজে দশ মিনিট...‘ডুয়েল্’-লড়াইয়ের মাঠে পিস্তল হাতে নিয়ে কাউন্ট আর ম্যাক্সমিলিয়ান অধোভাবে অপেক্ষা করছেন, ওদিকে এ্যালাবার্টের কিন্তু তখনও দেখা নেই!

বেশ খানিকক্ষণ অপেক্ষা করবার পর, অবশেষে এ্যালাবার্ট এলো সেখানে—সঙ্গে তার দুই দল।

কাউন্টের সামনে এসে এ্যালাবার্ট বললে,—আপনি শুধুন এবং বন্ধুণী তোমরাও সকলে শোনো...কাউন্টকে আমি যে কথা বলতে এসেছি।...

এই বলেই কাউন্টের পানে তাকিয়ে এ্যালাবার্ট বললে,—আমার বাবাকে আপনি লাহিত করেছেন, সেজন্য আপনাকে আমি ‘ডুয়েল্’ লড়াইয়ে আহ্বান করেছিলুম।...বত বড় অপরাধই তিনি করে থাকুন, তার জন্য আপনি তাঁকে চূর্ণ করবেন—সে অধিকার আপনার নেই, এই বুঝেছি।...কিন্তু, এখন আমি যা শুনেছি—বলছি!...আপনার সম্পূর্ণ অধিকার আছে, তাঁকে ধরিয়ে দিয়ে অপদস্থ করার...লাহনাভোগ করানোর!...তার জন্য আপনি যে বাতনা ভোগ করেছেন দীর্ঘ চৌদ্দ বছর, তা সত্যই অমাহুষিক। এ সব কথা জেনে, আমি এসেছি আপনার কাছে—আপনার মার্জনা তিক্ষা করতে!...সব কথা না জেনে যে অন্তায় ব্যবহার করেছি আপনার সঙ্গে, সেজন্য আমার ক্ষমা করুন।...

এ্যালাবার্টের কথা শুনে কাউন্ট সাধরে তার দুই হাত চেপে ধরে আবেগোজ্জ্বলিত-বর্ণে বললে,—সর্বান্তঃকরণে

আমি হোমায় সব দোষ ক্ষমা করলুম, এ্যালাবার্ট!...হুঁহু হও...দীর্ঘজীবী হও তুমি!

ওদিকে ফার্নান্দ বসে আছে বাড়ীতে...অধীর-আতুল হয়ে—‘ডুয়েলের’ ফল-ফল কি হলো, খবর জানবার জন্য। তার অন্তর ফিরে আসে...তাই ফার্নান্দ জিজ্ঞাসা করলে,—‘ডুয়েলের’ কি হলো?...

অন্তর বললে,—‘ডুয়েল্’-লড়াই হয়নি, হুজুর!...এ্যালাবার্ট-সাহেব কাউন্টের কাছে মার্জনা চেয়ে বিবোধ মিটিয়েছেন।

খবর শুনে ফার্নান্দ রাগে জ্বল উঠলো...কালবিলম্ব না করে তখন তলোয়ার নিয়ে ফার্নান্দ এলো কাউন্টের গৃহে! সটান গিয়ে কাউন্টের সঙ্গে দেখা করে ফার্নান্দ সন্দেহ বললে,—আমার চেলে ‘ডুয়েল্’ লড়াই বাটে, আমি কিন্তু ‘ডুয়েল্’ লড়াই...আনো তোমার তলোয়ার!...

নিরীক-দৃষ্টিতে কাউন্ট চেয়ে রইলো ফার্নান্দ পানে...চোখে তার কৌতুক! অগত্যা তাকিয়ে থেকেই কাউন্ট সখান থেকে সরে যাবার জন্য ঘেঁষা না বাড়িয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে হাতের তলোয়ার উঠে ফার্নান্দ সন্দেহ বললে—তার আগে একটা কথা!...তোমার বুকে এ তলোয়ার বেঁধবার আগে আমি জানতে চাই...কাউন্ট অফ মণ্ডি ক্রুইটো...এই নাম-রহস্যের অন্তরালে কি তোমার পরিচয়?...তুমি কে?...

পলকের জগৎ ফার্নান্দের পানে তাকিয়ে অবিচলিত-কণ্ঠে কাউন্ট বললে,—এখনি চিনতে পারবে।

এ কথা বলেই কাউন্ট সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল—ফিরলো খানিক পরে—নাবিকের বেশে!...ফিরেই ফার্নান্দের সামনে দাঁড়িয়ে কাউন্ট বললে,—চেয়ে জাখো, ফার্নান্দ—আমি কে, চিনতে পারছো?

কাউন্টের পানে তাকিয়েই ফার্নান্দ চমকে উঠলো—যেন ভূত বেথেছে—সে একেবারে স্তম্ভিত!—মূহূর্ত্তকাল ভালভাবে ঠাণ্ডা করেই অলিত-কণ্ঠে ফার্নান্দ বললে,—এড্‌মণ্ড্‌দাস্ত?

কাউন্ট কোনো জবাব দিলো না...মুখে-চোখে জারি কৌতুকের ঝিলিক! ফার্নান্দের মুখেও আর কথা নেই!—কোনোমতে ভারী পা দুখানা ঠেলে টলতে টলতে গিয়ে

সে-বাঁহের কটকের সামনে-থাকা তাঁর নিজের গাড়ীতে এসে বসলো—কোচোয়ানকে বললে,—বাড়ী...বাড়ী চলো...দীর্ঘগিরি!—

বাড়ীতে এসে কার্নান্দ দেখে—মার্সেডিজ আর আলবার্ট সামান্য কিছু জিনিষপত্র শুছিরে নিয়ে বাড়ী ছেড়ে চলে বাবার উভোগ-করেছে!

আলবার্ট বললে,—কিছু ভেবো না, মা—এ বাড়ীতে আর নয়!—আমি কোজে যোগ দিতে চলেছিলাম—কোজের কাজে যে খ্যাতি অর্জন করবো, তাতে শুধু আমি গৌরব বোধ করবো না—তুমিও মা, গৌরব বোধ করবে!

ছেলের পানে স্থির-দৃষ্টিতে চেয়ে সনিধাসে মার্সেডিজ বললে,—আমিও মার্সেলে (merseilles) ফিরে যাবো... সেখানে জপ-তপ করে ভগবানের সেবার নিজেকে সঁপে দিয়ে জীবনের বাকী দিনগুলো কাটাবো।

এমন আলোচনার পর, মার্সেডিজ আর আলবার্ট বাড়ী থেকে বেরলো...দূর থেকে ফার্নান্দ দেখলো সব ধরের জানালার পর্দা সরিয়ে...দেখলো—তার স্ত্রী আর ছেলে দুজনে গাড়ীতে উঠে বসেছে!

তাদের গাড়ী বাড়ীর ফটক পার হয়ে পথে বেরানোর সঙ্গেই ঘরে পিস্তলের শব্দ...দুঃখে-অপমানে-মানিতে ফার্নান্দ শেষ পর্যন্ত পিস্তলের গুলিতে আত্মহত্যা করলো!

ফার্নান্দের মৃত্যুর পর, জেরার্ডের পালা...

জেরার্ডের স্ত্রী কাউন্টের সঙ্গে বিব-তব্বের সম্বন্ধে কত কি আলোচনা চালানেন...কাউন্ট বললো,—এমন আছে; যার জোরে পত-পাখী, এমন কি, মাকুষেরও মৃত্যু নিশ্চিত...অথচ, মৃত্যুর পর কেউ বুঝতেই পারবে না যে বিশ্বের কলে মৃত্যু হয়েছে! এ মৃত্যু দেখলে, লোকে বুঝবে—যেন সম্মান-যোগে প্রাণ হারিয়েছে!...বিধাস না হয়—পরখ করে দেখতে পাবেন!

কাউন্ট এ বিষ় দিলে জেরার্ডের স্ত্রীকে—এবং বিব-সেবার পর, হঠাৎ একদিন হলো ভ্যালেনটিনের বৃদ্ধ মাতার মৃত্যু! ডাক্তারকে স্পষ্টভাবেই জিজ্ঞাস্য করা হলো—ডাক্তার বললেন,—লক্ষণ যা দেখলাম, তাতে তো বেশ বুঝছি—সম্মান-রোগ ছাড়া আর কিছু নয়!

মাতার মৃত্যুর পর, বিধবা মাতামহী এসে উঠলেন

জেরার্ডের গৃহে—ভ্যালেনটিনের স্মৃতিহে! মাতামহী এ বাড়ীতে থাকবার সময় একদিন রাতে বাগানে ভ্যালেনটিনের সঙ্গে দেখা, ম্যাক্স মিলিয়ানের—দুজনে দুজনকে ভালবাসে—পছন্দ করে! কাজেই দেখা হতেই ভ্যালেনটিন ম্যাক্স মিলিয়ানকে জানালো,—দ্বিধিমার খুব শক্ত অস্থ—ডাক্তারেরাও দেখছি বেশ চিকিত্ত হয়ে উঠেছেন তাঁর সম্বন্ধে!

ম্যাক্স মিলিয়ান খোঁখালো,—এ বাড়ীতে থাকা উচিত হবে না, ভ্যালেনটিন...এমন করাল-রোগের ছায়া ঘনিয়ে রয়েছে এখানকার আকাশে-বাতাসে!...বরং চলো, এখান থেকে অত্র কোথাও নিরাপদ জায়গায় সরে...আমার সঙ্গে চলো...আমাকে বিবাহ করবে! বিবাহের পর, প্যারিস শহর ছেড়ে দূরে কোথাও গিয়ে থাকবো—তারপর তোমাদের এখানে আবার ফিরে আসবো—আমাদের আত্মীয়-বন্ধুরা যখন তোমার সঙ্গে এ-বাড়ীর বিরোধ মিটিয়ে দেবেন!—

ভ্যালেনটিনের কিন্তু প্রবল আপত্তি—সে বললে,—না ম্যাক্স...দ্বিধিমাকে এমন রোগশয্যায় ফেলে আমি কোথাও যাবো না!...তাছাড়া বাবা!...বাবার মনেও বড় অশান্তি!...এঁদের দুজনকে ছেড়ে—

পরের দিন ভ্যালেনটিনের মাতামহীর হলো—মৃত্যু!

আন্তকণ্ঠে জেরার্ড সখেদে ডাক্তারকে বললে,—এ কি হলো, ডাক্তার!...বিধাতার এ কী অভিশাপ!...

জেরার্ডের বৃদ্ধ-পিতা নোতিয়ারও পক্ষাঘাতে পঙ্ক হয়ে তখন তাঁর পুত্রের গৃহেই বাস করছিলেন। রোগ-শয্যাশায়ী তাঁর সেবার জন্য বাড়ীর খাশ ভৃত্য সবসেই দামী কাঁচের পেলাসে-ভরে লিমনোমেড এনেছিল—কিন্তু রোগে ভুগে এমনই অকচির তাঁর জন্মেছিল যে বৃদ্ধ সে লিমনোমেড মুখেও স্পর্শ করেননি একবিজ্ঞ! কাজেই মিছে অপচয় হবে, এই ধারণার রোগীর ঘর থেকে বেরিয়ে এসেই ভৃত্য সে লিমনোমেডটুকু পান করে—এরং পান করার সঙ্গে সঙ্গেই আচমকা হলো তাঁর মৃত্যু! খবর শেয়েই ডাক্তার ছুটে এসেছিলেন অবিলম্বে—কিন্তু বখাঙ্গাধা ও বৃধপত্র-চিকিৎসার ফলেও, তিনি কোনোভাবেই

পারলেন না—ভৃত্যকে বাঁচাও! ভৃত্যের মনে আগলো
সন্দেহ!

জেরাড' সশঙ্কিত হয়ে ভৃত্যকে বললে,—মৃত্যু এসে
আমাকে ঘিরেছে, ভৃত্য!

ভৃত্য বললেন,—মৃত্যু নয়—পাপ!

জেরাড' বললে,—পাপ?—আমার বাড়ীতে?—

ভৃত্য বললেন,—হ্যাঁ!—আপনার খণ্ডর আর শাওড়ী
মারা গেলে—কার লাভ?—অর্থাৎ, তাঁদের সম্পত্তি
পাবে কে?

জেরাড' কোনো উত্তর দিলো না—নিরাক-দৃষ্টিতে
চেয়ে বইল ভৃত্যের দিকে।

ক্রমশঃ

ত্রিবিক্রম ভট্ট

শ্রীরামচুলাল ভট্টাচার্য

সংস্কৃত সাহিত্যে ত্রিবিক্রম ভট্টের একটি বিশিষ্ট স্থান
আছে। তিনি “নলচম্পু” বা “নয়নজীকথা” ও “মদালসা-
চম্পু” নামে দুখানা বই লেখেন। “চম্পু” শব্দের একটা
বিশেষ মানে আছে। গজ পুণ্ড্র মিশিয়ে যে কাব্য
লেখা হয় তাকেই বলে “চম্পু”। এই বইতে ত্রিবিক্রম
ভট্ট তাঁর বংশ পরিচয় জানিয়েছেন। এ ছাড়া বরোদা
রাজ্যের অন্তর্গত নবসারী বা নৌসারী গ্রামে একটা
প্রাচীন তাম্রলিপি পাওয়া গেছে তা থেকে আমরা জানতে
পারি যে তিনি মাগধের রাজা (বর্তমান বোম্বাই
প্রদেশের অন্তর্গত মানখোড়ের) রাষ্ট্রকূটকুলচূড়ামণি তৃতীয়
ইন্দ্ররাজের রাজসভার শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর
সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কিংবদন্তীটি প্রচলিত আছে।

অনেকদিন আগে মহারাষ্ট্র প্রদেশে ইন্দ্র নামে এক
রাজা ছিলেন। হুশাসক ও বিজ্ঞানসাহী বলে রাজার
খুব খ্যাতি ছিল। বড় বড় পণ্ডিতেরা তাঁর রাজসভা
অলঙ্কৃত করে থাকতেন। বিভিন্ন দেশ থেকে পণ্ডিতেরা
যখন এই রাজ-সভায় আসতেন রাজা তাঁদের উপযুক্ত সম্মান
দেখাতেন। দেবাদিত্য ভট্ট ছিলেন এই রাজসভার
বিদগ্ধবাকীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। এমন কোনো শাস্ত্র ছিলনা

যে শিবের তাঁর পাণ্ডিত্যের অভাব ছিল। তাঁর
পাণ্ডিত্যের খ্যাতি বিভিন্ন দেশের রাজসভায়
ছড়িয়ে পড়েছিল যে অনেক পণ্ডিতই তাঁকে
করতেন এবং তাঁকে তর্কযুদ্ধে হারিয়ে দিতে চাইতেন।
কিন্তু কেউই তাঁকে হারিয়ে দিতে পারেন নি। শেষে
তর্কযুদ্ধ করতে আর কেউই আসতে চাইতেন না।

এতবড় পণ্ডিত ও খ্যাতিমান লোকের মনে কিছু
একটুও শঙ্কি ছিল না। কারণ তাঁর একমাত্র পুত্র
ত্রিবিক্রম ভট্ট ছিল যেমন দুরন্ত তেমনিই শাস্ত্রপাঠে
অমনোযোগী। পণ্ডিত-পিতা চেয়েছিলেন যে পুত্রও তাঁর
মত খ্যাতিমান হোক। আর কোন পিতাই বা তা না
চান? কথাই আছে “সবয় জয়মিচ্ছতি, পুত্রোঃ শিষ্যোঃ
পরাজয়ম্”। পিতা-পাণ্ডিত্যে সর্বত্রই জয়ী হতে চান কেবল
পুত্র ও শিষ্যের কাছে পরাজয় কামনা করেন।

এমনি করে দিন যেতে লাগল। পণ্ডিতেরা হুযোগ
গোঁজেন কেমন করে দেবাদিত্য ভট্টকে বা ইন্দ্ররাজ্যকে
তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করবেন। একদিন একজন পণ্ডিতের
ভাগ্যে এই হুযোগ ঘটে গেল। তিনি খবর পেলে
কোনো এক কর্মোপলক্ষে দেবাদিত্য ভট্টকে কয়েকদিনের
জন্তে দূরদেশে যেতে হয়েছে। তিনি তাড়াতাড়ি ইন্দ্র-
রাজার রাজসভায় এসে উপস্থিত হলেন এবং নিজেকে
দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত বলে ঘোষণা করে বললেন যে তিনি
অন্য সমস্ত পণ্ডিতদের তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করেছেন বাকী
কেবল এই রাজ্য। যদি এখানে এমন কোনো পণ্ডিত
থাকেন যিনি তাঁর সঙ্গে তর্কযুদ্ধ করতে প্রস্তুত—তবে
তিনি তাঁকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে আহ্বান করছেন।
আর যদি কেউ না থাকেন তবে তাঁকেই জয়মালা দেওয়া
হোক।

রাজা তখন দেবাদিত্য ভট্টকে ডেকে আনতে আদেশ
করলেন। দেবাদিত্য ভট্ট দেশের বাইরে গেছেন শুনে
সভায় অন্যান্য পণ্ডিতদের তর্কযুদ্ধ করতে আহ্বান
করলেন। কিন্তু তাঁরা কেউই রাজী হলেন না। তখন
রাজা দেবাদিত্য ভট্টের পুত্র ত্রিবিক্রম ভট্টকেই ডেকে
আনতে আদেশ দিলেন।

ত্রিবিক্রম দুরন্ত হলেও খুব বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি
যখন শুনলেন যে রাজা তাঁকে পিতার অধঃপন্থিতে

দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিতের সঙ্গে তর্কযুদ্ধ করছে ভেঁকে পাটিয়েছেন তখন তিনি খুব চিন্তাচ্বিত্ব হলেন। তাঁর খুব দুঃখ হল কেন এতদিন শাস্ত্রপাঠ না করে দিন কাটিয়েছেন। আজ তাঁর পিতার ও রাজ্যের সম্মান বিপন্ন। কেমন করে এ সম্মান তিনি অক্ষুণ্ণ রাখবেন! তখন তিনি উপায়ান্তর না দেখে তাদের গৃহে প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞাধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর আরাধনা করতে গেলেন। আকুল হয়ে দেবীকে তিনি ডাকতে লাগলেন। সরস্বতী তাঁর প্রার্থনার সঙ্কট হয়ে বর দিলেন যে পর্যন্ত না তাঁর পিতা ফিরে আসেন চতুষ্কণ পর্যন্ত সরস্বতী ত্রিবিক্রমের মূখে বিরাজ করবেন ও তাঁর পিতার ও রাজ্যের সম্মান রক্ষা করবেন। কিন্তু যে মুহূর্তে দেবাদিত্য ভট্ট ফিরে আসবেন সেই মুহূর্তে তিনি ত্রিবিক্রমকে ছেড়ে চলে যাবেন।

সরস্বতীও কাছ থেকে এই বর পেয়ে ত্রিবিক্রম মহোৎসাহে রাংসভায় গোলন আর তর্কযুদ্ধে দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিতের সমস্ত গর্ব খর্ব করে দিলেন। পণ্ডিত লজ্জায় সেই মুহূর্তেই সেই দেশ থেকে পলায়ন করলেন। আর ত্রিবিক্রম খট্ট রাজসম্মানে ভূষিত হয়ে হাতীর পিঠে চড়ে বাড়ী ফিরলেন।

বাড়ী ফিরে তিনি ভাবলেন যে পিতা ফিরে আসলেই ত' তাঁর পাণ্ডিত্যের শেষ হয়ে যাবে। সুতরাং তার আগেই তাঁকে এমন কিছু লিখে রাখতে হবে যাতে তাঁর বংশ চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে। কি নিয়ে লিখবেন এই ভাবতে ভাবতে তাঁর মনে পড়ল—

“পুণ্যশ্লোকো নলোবাজা পুণ্যশ্লোকো যুধিষ্ঠিরঃ।

পুণ্যশ্লোকো চ বৈদেহী পুণ্যশ্লোকো জনার্দনঃ॥”

তখন তিনি পুণ্যশ্লোক নলরাজার ও দময়ন্তীর বিষয় অবলম্বন করে গড়ে পড়ে মিশিয়ে এক কাব্য রচনা করলেন এবং তার নাম দিলেন ‘নলচম্পু’ বা ‘দময়ন্তী কথা’। এই নলচম্পু সাতটি অধ্যায় আছে। কিন্তু ত্রিবিক্রম সপ্তম অধ্যায় শেষ করতে পারেন নি, কারণ তার আগেই তাঁর পিতা দেবাদিত্য ভট্ট বিদেশ থেকে ফিরে আসেন এবং সরস্বতী পূর্ব সর্ভ অস্থায়ী অস্থিহিতা হন।



চিত্রগুপ্ত

এবারের পূজোব ছুটির দিনগুলি তোমরা সবাই আত্মীয়-স্বজন আর বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে মিলেমিশে বেশ আনন্দেই কাটিয়েছো, কিন্তু ...সে আনন্দের রেশ আজো তোমাদের মনে হবে রেখেছে অপূর্ণ স্মৃতি-সৌরভে। তাই ছুটির আনন্দোৎসবের সেই স্মৃতি সৌরভ যাতে আগে বৈশী মধুর ও অমম্বমাট হয়ে ওঠে, তারই উদ্দেশ্যে, আপাততঃ বিচিত্র-অভিনব আজব-মজার একটি বিজ্ঞানের খেলাও কথা বলি। এ খেলার কলা কোশল রপ্ত করা নিতান্তই সহজ-সরল কাজ এবং কারসাজি দেখানোর জন্য সামান্য যে কয়েকটি সাজ-সরঞ্জাম প্রয়োজন—সেগুলি জোগাড় করাও এমন কিছু দুঃসাধ্য বা ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার নয়। অল্প চেষ্টাতেই, তোমরা অনায়াসে তোমাদের আত্মীয়-বন্ধুদের মজলিশে আজব-মজার এই বিজ্ঞানের বিচিত্র-কারসাজিটি দেখিয়ে তাঁদের রীতিমত তাক লাগিয়ে দিতে পারবে। খেলাটির নাম—‘ফুলের রঙ-বদলানোর ভেদী’।

এ-ধরণের ভেদী বাজী দেখানোর জন্য যে সব সাজ-সরঞ্জাম দরকার, গোড়াতেই তার একটা মোটামুটি ফর্দ দিয়ে রাখি। অর্থাৎ, এ খেলা দেখানোর জন্য চাই—লাল রঙের একটি জবাফুল, একটি ধূসরী, অল্প একটু ধূসর গুঁড়ো, টিকে-করলা আর গন্ধকের গুঁড়ো, এক বাকস বেশলাই, এক চাঙড় বরফ এবং বরফ-রাখার উপযোগী একটি বড় পাত্র।

এ সব সরঞ্জাম জোগাড় হবার পর. ভেদীর আজব কলা কোশল রপ্ত করার পালা। আসরে দর্শকদের সাথে খেলা দেখানোর সময়—প্রথমেই বেশলাইয়ের সাহায্যে

টিকে-করলা আর ধূনোর গুঁড়ো দিয়ে সাজানো ধূতীতে আগুন জালিয়ে নাও। এবারে পাশের ছবিতে যেমন



দেখানো হয়েছে, ঠিক তেমনি ভঙ্গীতে জলন্ত-ধূতীটিকে সমতল টেবিল বা জমির উপর সাবাননে বলিয়ে রেখে, আগুনের মধ্যে ধীরে ধীরে খানিকটা গন্ধকের গুঁড়ো ঢেলে দাও। এভাবে গন্ধকের গুঁড়ো ঢেলে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই জলন্ত ধূতী থেকে ধূপের মতো শাদা-রঙের ধোঁয়া উঠতে শুরু করবে। শাদা-রঙের ধোঁয়া ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ছবির ভঙ্গীতে ধূতীর জলন্ত-আগুনের ঈষৎ-উপরে লাল-রঙের ঐ জবা-ফুলটিকে হাঁশিয়ারভাবে কিছুক্ষণ ধরে রাখো তাহলেই দেখবে—জলন্ত ধূতীর ঐ গন্ধকের ধোঁয়ার তাপ-স্পর্শে টুকটেকে-লাল রঙের জবাফুলটির রঙ বদলে গিয়ে নিমেষের মধ্যেই ক্রমশঃ শাদা হয়ে উঠবে। গোথের স্মৃতিতে বিজ্ঞানের আজব-কৌতব দোলতে নিমেষের মধ্যেই জবাফুলের লাল-রঙ বদলে শাদা হয়ে যাবার দৃশ্য দেখে দর্শকরা যখন বিস্ময়ে অবাক, ঠিক সেই মুহূর্তে শাদা-রঙের ঐ জবাফুলটিকে জলন্ত-ধূতীর গন্ধকের ধোঁয়া থেকে সরিয়ে এনে কিছুক্ষণ বরফের চাউড়-তরায় পাত্রে কনকনে-ঠাণ্ডা জলের মধ্যে ছবিতে রাখো—তাহলেই দেখবে, জবাফুলের শাদা-রঙ বেরাপুর বদলে গিয়ে পুনরায় আগের মতোই দিবা টুকটেকে লাল-রঙের হয়ে উঠবে।

এই হলো—বিজ্ঞানের রহস্যময়-আজব নিয়মে 'ফুলের রঙ-বদলানো ছেঁকোর' খেলাটির আসল রহস্য।

খেলার কলা-কৌশলের মোটামুটি পরিচয় তো পেলে, এবারে নিজের হাতে-কলমে পরখ করে ত্যাখো এর বিচিত্র কারদা-কোরামতী।

আগামী সংখ্যায় এমনি ধরনের আরেকটি নতুন রকমের খেলার ছবিশ দেবার বাসনা রইলো।



মনোহর মৈত্র

১। ত্রিভুজের হেঁয়ালী ৪



উপরের ছবিতে ছোট-বড় পাল-তোলা আর উড়ন্ত নিশান-জাঁটা যে নৌগাটি দেখাচ্ছে—সেটি আঁকা হয়েছে কয়েকটি ত্রিভুজ সাজিয়ে। ছবিটি ভালোভাবে দেখে হিসাব কষে বলো, তো—মোট কতগুলি ছোট-বড় ছাঁদের ত্রিভুজ সাজিয়ে পাল তোলা আর নিশান-জাঁটা নৌকার চিত্রটি রচনা করা হয়েছে?

‘কিশোর-অপভ্রম’ সভ্য-সভ্যাদেশ

কৃত্তিক ঈশ্বর :

২। টাকার বত আর কেনা যায়, তত আনার মাত্র নয়টি আর মেলে। হিসাব কবে বলতে পারে—টাকার কয়টি আর মিলবে ?

রচনা : গোপালচন্দ্র পাণ্ডা (কলিকাতা)

৩। তিন অকবে নাম তার,

স্বপ্নধুর স্বপ্ন বাজে তার...

‘স্বাত্মকর বিদায় নিলে,

কিছু নাহি রয় হার।

রচনা : দীরেন্দ্রনাথ মোদক (বাশবেড়িয়া)

পতমাসেনর ‘ঈশ্বর আর হেঁয়ালির

উত্তর :

১। এ হেঁয়ালির সমাধান করা যায় খুবই সোজা উপায়ে। সে উপায়টি মাথা ঘামিয়ে হিসাব কবে বার করবার প্রয়োজন নেই...সামান্য একটু মগজের বুদ্ধি খরচ করে গত সংখ্যায় প্রকাশিত কালির আঁচড় টেনে ঈশ্বর সমান-রেখাটির পাশেই, সেটির চেয়ে আকারে বড় আরেকটি বেথা একে দিলেই খুব সোজা উপায়েই হেঁয়ালির সমাধান হয়ে যাবে।

২। জবাব।

৩। পিতা, পুত্র এবং পৌত্র।

পতমাসেনর তিনটি ঈশ্বরের সঠিক

উত্তর দিক্রেছে :

কল্লু মিশ্র (কলিকাতা), রণি ও রিণি মুখোপাধ্যায় (কাইরো), হাবলু, টাংলু, হুয়া ও পুতুল (হাওড়া), লোয়াংকান্ত ও বিজয়া আচার্য (কলিকাতা), পুপু ও ফুটন মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা), কবি ও লাড্ডু হালদার

(পানাগড়), সন্তোষ, মুরারি, সঞ্জয় ও সুনীল (কলিকাতা), লক্ষ্মিমিত্রা ও শর্মিষ্ঠা রায় (কলিকাতা), বুবু ও মিশু গুপ্ত (কলিকাতা), কুলি বন্দ্যোপাধ্যায় (বালীগোবিন্দ), অনাবিল দত্ত (ভালকৌলী), লোকু ও মোনা বন্দ্যোপাধ্যায় (রাঁচী), স্বধাংক, হিমাংক, হারান ও স্নীতাংক মুখোপাধ্যায় (শিলিগুড়ি), কমলেশ রায়চৌধুরী (কলিকাতা), পৃথ্বীশ ও মনতোষ (বর্ধমান), সুনীলকুমার ঘোষ (বঙ্গছত্র)।

পতমাসেনর দুটি ঈশ্বরের সঠিক

উত্তর দিক্রেছে :

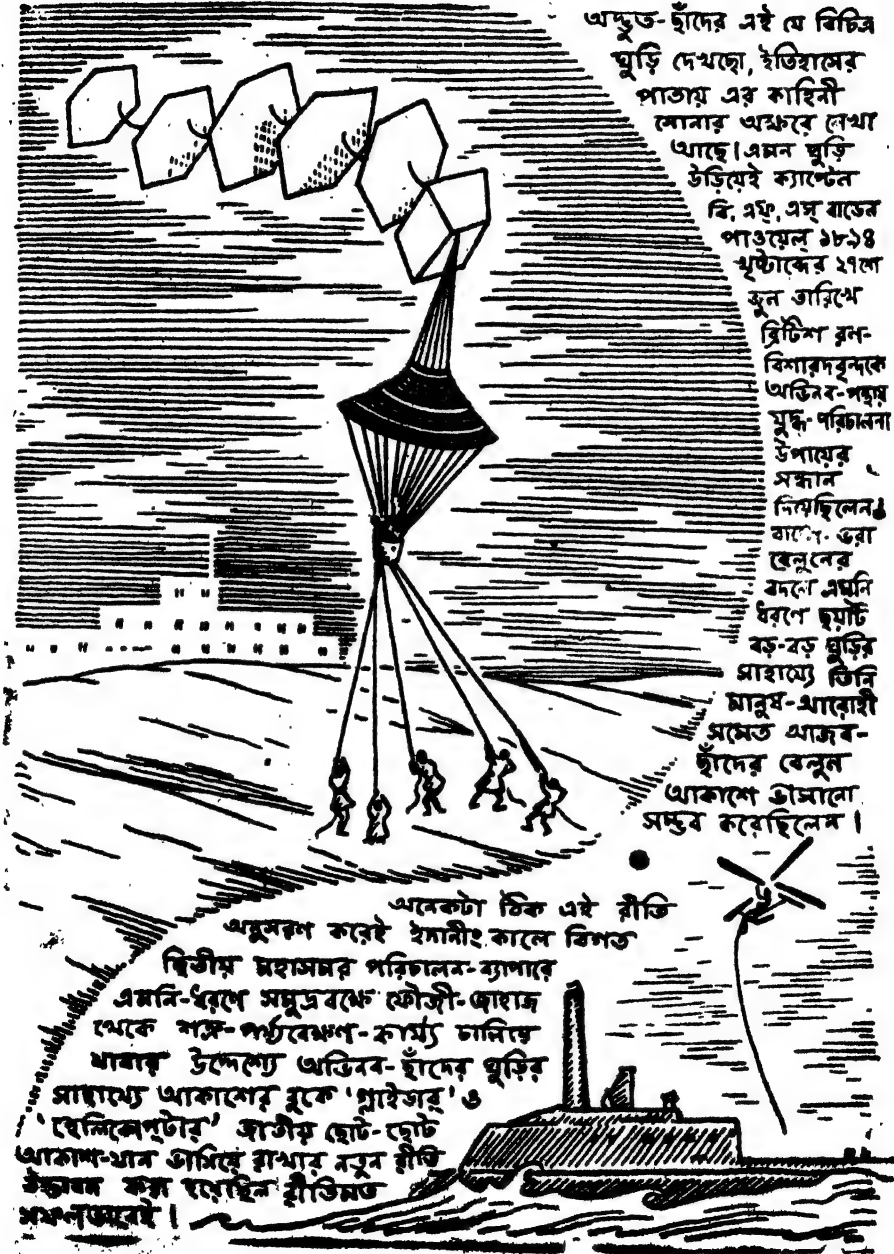
দেবকী ও বিশ্বনাথ সিংহ (নগরাদা), কল্যাণ, শচীন, ইন্দ্রদত্ত, বিমল ও রজত (কলিকাতা), সমী, পুলক, খরু ও খোকন চট্টোপাধ্যায় (কলকাতা), অভিজিৎ হালদার (আলিগড়), লক্ষ্মী, পুপু, সত্য ও ভারতী (কলিকাতা), যমিতা, সঞ্জিতা ও মঞ্জুশ্রী (কলিকাতা), নন্দকিশোর, শিশি, সমীর, তপতী ও তামসী গোস্বামী (ভালাইগোড়া), রণধীর ও দীপকর নিয়োগী (কলিকাতা), শুভা, স্বপ্নাঙ্ক ও তাপস (বিজয়পুর), লক্ষ্মী ও লক্ষ্মী গুপ্ত (শাকনাড়া), মদন, বালি, ভারতী, মিত্র, বুবু ও মঞ্জু সরকার (নগর), কমা, সীমা, দীপালী, অপর্ণা, রীতা ও ব্রজেন্দ্রদীপ বাগচী (কোঁচ), স্বপ্নাঙ্ক ও বনানী সিংহ (মদনপুর), বাণী, শুভ্র ও পার্থ হাজরা (আড়ুই শাকনাড়া), দেবানীষ মৈত্র (কলিকাতা) দীরেন্দ্রনাথ মোদক (বাশবেড়িয়া)।

পতমাসেনর একটি ঈশ্বরের সঠিক

উত্তর দিক্রেছে :

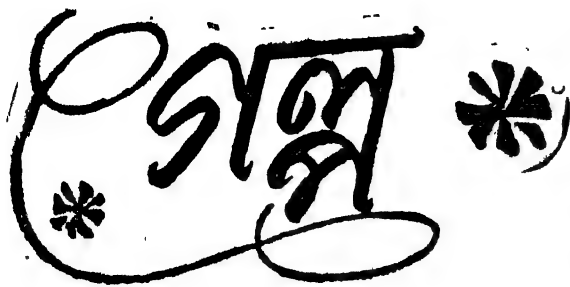
রবি, দীপিকা ও মুনমুন বন্দ্যোপাধ্যায় (বারানসী), সত্যচরণ দাস (কলিকাতা), সমরেন্দ্র রায় (বোকাই), স্বকৃষ্ণকুমার, সুনীতিকুমার, মনোরমা, গৌরীবালা ও মদনমোহন মিশ্র (রাণপুর), নরেন্দ্রনাথ ঘোষ (খলসী), কুহিরাম, শিবরাম, গোপাল ও শশাঙ্কেশ্বর মিশ্র (কইনান)।

ধুড়ির কথা



অদুত-হাঁদের এই যে বিচিত্র
 ধুড়ি দেখছো, ইতিহাসের
 পাতায় এর কাহিনী
 সোনার অক্ষরে লেখা
 আছে। এমন ধুড়ি
 উড়িয়ে ক্যান্টন
 বি. এফ. এন্ড বাডেন
 পাওয়েল ১৮৯৪
 খৃষ্টাব্দের ২৭লা
 জুন তারিখে
 ব্রিটিশ রান-
 বিয়ারদবন্দকে
 অতিবহন-পদ্ধতি
 যুদ্ধ পরিচালনা
 উপায়ের
 সন্ধান
 দিয়েছিলেন।
 বাণেশ্বরী
 বেলুনের
 বদলে এঘনি
 ঘরোয়া ছোট
 বড়-বড় ধুড়ি
 প্রাচ্যে তিনি
 মানুষ-আবাসী
 সমেত আক্রমণ-
 হাঁদের বেলুন
 আকাশে ভাসানো
 সম্ভব করেছিলেন।

অনেকটা ঠিক এই নীতি
 অনুসরণ করেই ইদানীং কালে বিমত
 দ্বিতীয় মহাসমর পরিচালন-ক্যাম্পে
 এমন-ধরণে সমুদ্রবক্ষে জোজী-জাহাজ
 থেকে নঙ্গ-পর্চবেষণ-কার্য্য চালিয়ে
 খাবার উদ্দেশ্যে অতিবহন-হাঁদের ধুড়ি
 প্রাচ্যে আকাশের নুকে 'গ্লাইডার' ও
 'হেলিকপ্টার' জাতীয় ছোট-ছোট
 আকাশ-যান ভাসিয়ে রাখার নতুন নীতি
 উদ্ভাবন করা হয়েছিল নীতিমত
 অনুসরণেই।



বিলিফ্

সুনীল রায়

দৈনন্দিন জীবন চারিদিক। বহুদিকেই চোখ মেলে থাকানো থাকুক জল চোখে পড়ে। পথ-ঘাট, দূরবিস্তৃত ধানের ক্ষেত সব ভূবে গিয়ে জলের একটা ঘোলাটে সাদা চাঁদর সারা জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। কেবল দু-চারটে বড় গাছ মাঝে মাঝে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। এখানে ওখানে ভালছে কুঁড়ের চাল, ভাঙা গাছের ডাল, কচুরীপানার খুপ। একটা শূন্য স্তব্ধতা সেই আদিগন্ত জলের ওপর ধমকে দাঁড়িয়ে আছে।

সনাতন শালতির ওপর দাঁড়িয়েছিল। ওর যোগা ছিগছিগে দেহটায় এখন একটা ঝুঁকু কাঠিন্য। উত্তেজনার চোখ দু'টা চকচক করছিল সনাতনের।

আমার কিন্তু মল্ লাগছিল না। শালতির ওপর চাল, চিঁড়ের বস্তা আর শাড়ী-জামা কাপড়ের গাঁট নিয়ে আমি ঐ বস্তার জলের দিকে তাকিয়ে সনাতনের মহৎ অন্তঃকরণটার কথাই ভাবছিলাম।

অথচ আমি নিজে এতটা উৎসাহ অহুভব করিনি। চায়ের কাপ হাতে নিয়ে দৈনিক সংবাদপত্রে সচিহ্ন বস্তার খবর দিনের পর দিন পড়ে গেছি, আলোচনা করেছি এবং কখনও কখনও বা রক্তবস্ত্রের কর্ণধারদের দোষা-তোপ করেছি বস্ত্রাজনিভ মাছুষের সমূহ কাঁঠির জন্ত। কিন্তু সনাতন—। সনাতনের কথাই আলাদা। সনাতনই আমার টেনে আনল এখানে বিলিফের কাছে।

নেহাঁতই নিরীহ ছুল-মাঠার আমরা দশটা-চারটে দেশের ভবিষ্যৎয়ের পড়িয়ে দিন গুলরণ করি। দেশ-সেবার গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার নিজে কল্পনা করে কৈশোরে ও যৌবনে অনেকবার রোমাঞ্চিত হয়েছি। কিন্তু কৈশোরের একটা নির্ধর স্থিতি মনে থাকার ওদিকে আর পা বাড়াইনি। সে সময় বিলিফী ট্রামে টিল ছুঁড়তে গিয়ে পিঠে পুলিশের বাটনের যুহু আঘাত বারবার ওপথে যেতে আমার নিস্ত করত। তারপর বড় হয়ে পুলিশের টিয়ার গ্যাস, শুলী আর জেলখানার ভয়াবহতার কথা ভেবে দেশসেবার আগ্রহটা একেবারেই চেপে গিয়েছিল।

কিন্তু সনাতনও ছুল-মাঠার। আমরা বি, এ, পাশের ডক্‌মা এঁৎ ঐ পথেই ঢুকে পড়েছি। দক্ষিণা বাই হোক, ইচ্ছা আছে। ছুল-মাঠার হয়েও সমাজসেবার আগ্রহটা আমার মত ওর নিজে আনেনি, বরং দিনের পর দিন তা আরও জলন্ত হয়ে উঠেছে। সনাতনকে এ জন্তে আমি প্রাধ্বা করেছি মনে মনে। দশটা-চারটে ছুল মাঠারী করেও ও যে এখনও বিশেষ এক জীবে পরিণত হয়নি উপরন্তু সমাজ সম্পর্কিত বৃহৎ প্রশ্নটা মনে রেখেছে এ জন্তে আমার হৃদয়ের স্বতোৎসারিত ভক্তি সহজেই ও আকর্ষণ করতে পেরেছে।

সনাতন বলেছে—জাখ্ অঙ্গন, এই ঠিক পথ। কি দরকার আমাদের বেশী পরসায়। তবু তো মাঠারী করলেও থানিকটা দেশের কাজ হবে। ধর্ম কর্ম না করা গেলেও ধর্মের তাগটুহু তো ভাল। তাছাড়া তুই বা ভীতু আর কুঁড়ে, ভোকে দিয়ে তো আর অস্ত্র কাজ হবে না। হোর পক্ষে এই মাঠারীই ভাল।

সনাতনের স্ফুটন্ত সিদ্ধান্তে আমি কোনদিন আপত্তি করতে পারিনি এবং তা আমার অনেক ক্ষেত্রেই স্ক্রুস্তিক বলে মনে হয়েছে। আমি রাজী হয়ে গিয়েছিলাম।

—আর একটা কথা কি জানিস, সনাতন একবার হয় নিজেছিল।—বিরে—আমাদের করা উচিত নয় আর ও হবেও না। কারণ মেরেগুলো বা চার, আমাদের ভার কোনটাই নেই। তোরাও নেই, আমরাও নেই। টাকাত

নেই, রূপও নেই। অতএব—আমরা দেশের জন্মেই জীবনটা উৎসর্গ করব বলে ঠিক করে কলেছিলাম।

—রাজনীতি তুই পারবি না। লাঠি, গুলি, টিয়ার গ্যাস। নানান মত, নানান তত্ত্ব। আমিও ওসব করতে চাইনা। তার চেয়ে দুজনে সমাজসেবা করেই জীবনটা কাটাও, ব্যস। এই আজ থেকে আমাদের লাইন।

—কিন্তু একটা কথা কি জানিস অন্নন,—ডানহাতের তর্জনীটা তুলল সনাতন—সমাজের সেবা করতে গেলেও গায়ের জোরের দরকার। তোর যদি ক্ষমতাই না রইল তাহলে দেশের কাজ তুই আর কি করবি। এ জন্মে আমি একটা ব্যবস্থাও ভেবে রেখেছি। ঐ বড় রাস্তার ওপর পাঞ্জাবীদের প্রেম হোটেলটা দেখেছিস তো, ওখানে লগ্নায়ে তিনদিন করে কটি আর মাংস খাব দুজনে, খুশি।

সনাতনের আশ্চর্য্য দূরদৃষ্টি দেখে আমিও আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিলাম। সনাতনের বা আমার স্বাস্থ্য সমাজ সেবার মত কঠিন কাজের উপযোগী কি না সে সম্পর্কে প্রথম থেকেই আমার মনে সন্দেহ লগ্নেই ছিল। এখন দেখলাম সনাতন সে কথাটাও ভেবে দেখেছে।

এরপর প্রায় বিনা বিতর্কেই আমরা একটা স্থির — লক্ষ্যে আসতে পেরেছিলাম এবং আমাদের যৌবন সঞ্জাত কর্মপ্রেরণা একটা ‘লাইন’ পেয়ে গিয়েছিল।

আজ সেই লাইনের কাছেই সনাতন আমাদের টেনে এনেছে। আশা করা বন্ধ সনাতন। একসঙ্গে পাশ করেছি, কলী রোজগারও এক আরগার স্তবধার—

—দেখছিলাম একবার দেশের সোনারটা অন্না। তাখ্, চোখ খুলে ভাল করে একবার তাকিয়ে তাখ্। ঘরকুণো হয়ে বসে থাকিস, চায়ের দোকানে বসে লম্বা লেকচার কাড়িস আর এদিকে বাংলা দেশটা একেবারে—

সনাতনের সঙ্গে তুলনা করলে নিজেকে আমার মতিহী ভারী ছোট মনে হয়। সংসদে থেকেও আমার জগন্ময় নন্দীর্ঘতা আজও ঘুচে না। মহন্তর, বৃহন্তর কারণে নিজেকে আজও উদ্বোধিত করতে পারলাম না। অথচ সনাতন, সেও তো আমারই মত একটা মানুষ। ও বা পারে, আমি তা পারিনা কেন!

সনাতন লম্বা করে কথা বলে বাড়িল মাটির সঙ্গে।

দামোদর, রূপনারায়ণ আর ঐ মরা খালের মত সরস্বতী— সেও তালিয়ে দিয়েছে গেরামের পর গেরাম। জোত অদি সব ডুবে গেল, গরু-ছাগল সব ভেসে গেল; মাটির ঘর, কুঁড়ের চাল—চিহ্নটা নেই বাবু আর কিছু।—আর সেই কালরাত্তিরে রূপনারায়ণের বাঁধ ভাঙল—হাজার হাজার লোকের ঝুড়ি কোদাল নিয়ে কি চেষ্টা বাবু। এখন জোত বুজল কয়েকে, ওদিকের নতুন বাঁধের ওপর দিয়ে জল কাঁধা ভেঙে লোক হাঁটেতে পারছে, কিন্তু তখন সব একাকার।

—অন্না শুদ্ধিস, শুধু ছেলেমেয়ে পড়িয়ে দেশের সেবা হয় না। আমি মরমে মরেই ছিলাম। সনাতনের কথায় এবার নিজেকে অপরাধী বলে মনে হোল। ভাবলাম আজ যখন স্ব-বাগ এসেছে, তখন পাণের প্রায়শ্চিত্ত করবই।

শ্রেন থেকে মাইল খানেক জল-কাঁধা পেতে আমরা চারটে দল মালপত্র নিয়ে শালভিটে এসে উঠেছি। আমার দলে আমি আর সনাতন। আর তিনটে দল তিনদিকে গেছে। পবে আসতে আসতে কিছু কাপড়-জামা বিলিয়ে দিয়েছি। এবার খানকয়েক প্রায় ধুয়ে-মুছে বাওর মাটির বাড়ীর পাশে একটা ছোট পাঁকা বাড়ী আমাদের চোখে পড়ল।

—নে, চিড়ের বস্তাটা এবার খোল অন্না। সনাতনের দৃষ্টিও দেখলাম ঐদিকে।

উঁচু জাগায় জল কমে এসেছে। শালভিটা বাড়ীর কাছে যেতেই সনাতন লাফিয়ে নেমে পড়ল। অনেক ডাকাডাকির পর দরজা খুলে দাঁড়ালেন এক মহিলা। সঙ্গে একটা খুকী, আর পাণের জানালার উকি দিল নীল শাড়ী পরিহিতার একজোড়া ভাগর কালো গোথ।

আমি বোধহয় জানলার দিকে অন্তমনস্কভাবে তাকিয়ে ছিলাম। সনাতন ধমক দিল—

—ই করে দেখছিলাম কি! চাল-চিড়ের বস্তা আর কাপড় জামা নিয়ে আর বাড়ীর ভেতর।

সনাতন হুকুম দিয়েই খালাস। চাল-চিড়ের বস্তা আর কাপড় জামার গাঁট নিয়ে বাওর আমার একার পক্ষে কষ্টসাধ্য। কিন্তু দেশের কাজ আর সনাতনের আদেশ—ছুটাই অলক্ষ্য। অনেক কষ্টে যখন একটি

একটি করে সেগুলো নিয়ে বাড়ীর ভেতর গেলোম দেখি
স্নাতন বকৃত্য কুড়ে দিয়েছে।

এটেই স্নাতনের খতাব। বেখানাই বাকু, লখা
বকৃত্য না করে স্নাতন সেখান থেকে উঠবে না।

—মা, এই আমাদের লাইন। আপনাদের এতবড়
বিপদে আমরা পাশে এসে দাঁড়াব না—দেশের এই
হুগুতিতে আমরা কাছে নাগব না—লেখাপড়া শিখে বি, এ
পাশ করলাম কেন তবে—অমায়ব তো নই, ইত্যাদি
ইত্যাদি।

তাই তো বাবা, তে মাদের মত ছেলেরা আছে বলেই
তো আমরা আজও টিকে আছি। ভয়মহিলা বিগলিত
হোলেন।

—কি যে বলেন মা, এটা আমাদের একটা পবিত্র
কর্তব্য। স্নাতনের অনর্গল বকৃত্য আমার কাছে
এক একসময় পীড়াদায়ক, কখনও বা হাসির উল্লেখ
করে। কিন্তু সেদিকে স্নাতনের জ্ঞেপ নেই। সমানে
বলেই চলেছে—

জুল-মাষ্টারী করি মা, বললাম ছুটি দাঁও। দেশের
জাক আমার কাছে সবচেয়ে বড়। আর ছুটি না দাঁও
তো হইল তোমার চাকরী। কিসের ভয় বলুন না মা,
কে আর আছে আমার—বিহে-খা যখন করিনি—

ঐ স্নাতনের বড় দোষ। দম-দেওয়া কলের গানের
মত কথা বলে চলে, হাঁড়ির খবর শুনে দিয়ে বলে। বিহে
এখনও হয়েছে কি না হয়েছে জানাবার কি দরকার।

আধ-বস্তা চিঁড়ে আর বেছে বেছে খান ছয়েক ভাল
শাড়ী স্নাতন নামিয়ে দিল যেহেতু। এতগুলো কাপড়
এক বাড়ীতে, দেওয়ার আমি অস্বস্তিকর্মে বোধহয় কিছু
বলে ফেলতে বাচ্ছিলাম, স্নাতন তা লক্ষ্য করে ওর সেই
স্নাতনী নেতা জুলত গুদীতে বলল—

বস্তাগুলো নিয়ে শালভিতে গিয়ে তুই ততক্ষণ ব'ল।
আমি বাচ্ছি একটু পরে।

ওর আদেশের হুটী আমার কাছে পরিচিত। অপত্যা
আমার উঠে এসে শালভিতে বসতে হোল।

বেশ কিছুক্ষণ পর স্নাতন ঐ বাড়ীটা থেকে বা'র
হোল। হাসিমুখ। এতগুলো বস্তাপীড়িত বাহুবকে
রিলিক করার দৌরব নিয়ে ও কিরছে। হাসিমুখে

তার ও দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে—সেই ভাগের কাপো
চোখ দুটিও এখন খুলিতে উজল।

স্নাতন শালভিতে এসে বসে মুখ গভীর করল।

আমি বললাম—চিঁড়ে তো প্রায় উল্লাড় করে—
ওখানেই চলে দিয়ে এলি, আর আমাকাপড় তো মোটে
খানচ'রেক আছে। আর কোথাও রিলিক দেওয়ার
দরকার নেই বোধহয়।

স্নাতন আমার কথাটা কানে নিল বলে মনে হোল
না। কয়েকটা মাছরাঙা হোঁ মেরে উড়ে বেড়াচ্ছিল।
সেদিকে তাকিয়ে স্নাতন বলল—

—এই তো আমাদের দেশের অবস্থা। বছরের পর
বছর বস্তার ভেঙ্গে যাচ্ছে। একটা পরিবার আজ অসহায়
অবস্থার দিন কাটাচ্ছে। ছুটি স্ত্রীলোক আর একটা
শিশু।

—অম্মা, বলতে পারিস, এদের কি হবে? সব ডুবে
বেতে বলেছে যে!

আমার মনে হোল সত্যিই তাই। স্নাতনের চিন্তিত
মুখের দিকে তাকিয়ে আমি বিশ্বাসী প্রাবনের মধ্যে
নোরাকে স্রবণ করার চেষ্টা করলাম। বেখলাম নোরা
নয়—একমাত্র স্নাতনই শালভি নিয়ে এই নিখিল
বারিধির মধ্যে ভেসে রয়েছে।

স্নাতনের চিন্তা আমাকেও চিন্তিত করে তুলল।
খানিক পরে বললাম—কি করবি তাহলে?

স্নাতন কোন জবাব দিল না। ধবধবে লাদা এক-
ঝাঁক উড়ন্ত বকের দিকে চেয়ে রইল।

অনেক পরে গভীরভাবে বলল—এই আমাদের লাইন।
তুই ফিরে যা, তুই পারবি নে। বড় শক্ত লাইন, আমাকে
একাই সব করতে হবে।

খুবই মর্মান্বিত হলোম। স্নাতনকে আমি প্রজ্ঞা করি
মনে মনে। ওর বিরাট হৃদয়টা দেশের দুঃখে অহরহ
কাঁদছে আমি সব সময় দেখতে পাই। তাতে আমার
মত অলস, কর্মবিমুখ মাহবত অহুপ্রাপিত হয়। কিন্তু
সেই স্নাতনই এখন আমাকে বলছে কিরে যেতে।
লামাত্র রিলিক দিয়ে দেশেবার দৌরবটুকু ও আমার
কেড়ে নিতে চাইছে।

কিন্তু নাজা পয়ঃ। 'চিরকাল স্নাতনী দেখাশুই' আমি

অত্যন্ত—পরিচালিত। হুতরাং তরতরই আনাকে
কিরে আসতে হোল।

এরপর অনেকদিন স্নাতনের দেখা পাইনি। খবর
নেবার চেটা করেও খবর পাইনি। হঠাৎ একমাসেরও
পর স্নাতন একদিন এসে হাজির হোল।

কি ব্যাপার তোর? কোন খবর নেই—তুলে বাস
না। তোর মনের বাড়ীর ঠিকানার দু-হু'খানা চিঠি
দিলান—অবাক নেই। বক্তার মল তো কবে ল'রে গেছে।
কি করছিলি এতদিন? কি ভেবেছিলি কি?

একদমে অনেকগুলো কথা বলে আমি হাঁপাচ্ছিলাম।
স্নাতন কিন্তু আমার একান্ত সংসারক্লান্ত ও উবির মনের
জাঁচ পেয়েও একটুও বিচলিত হোল না। তা শুধেও
আমি আমার বললাম—তোর কি রিলিকের কাজ এখনও
শেষ হয়নি?

—তুই তুলে বেতে পারিস অজ্ঞা কিন্তু আমাদের লাইন,
আমি তুলতে পারি না।

কথা বলতে বলতে আমার কাঁধে কাঁকানি দিয়ে বলল
—চল হোটেল চল, সেখানেই সব বলব।

দীর্ঘদিন পর আমার প্রেম-হোটেলের একটা নিয়িবিজি
ঘরে এসে বসলাম তখনে।

স্নাতন একবার তীক্ষ্ণ চোখে চারপাশ দেখে নিয়ে
গলা নামিয়ে বলল—অজ্ঞা, বোমা বানাতে পারিস?
বোমা—

আমি হোটেলের চেয়ারেই বসেছিলাম কি বেকের
পড়ে গিয়েছিলাম ঠিক মনে নেই; তবে মনে হ'য়েছিল—
আদি ঠিক আমি নেই—অথবা সামনে যে লোকটা বলে
আছে সে সমাজসেবী স্নাতন নয়।

খানিকপরে স্নাতনের হাতে আর একটা কাঁকানি
খেয়ে কের এই কথা তুললাম—

—কিরে, পারিস কিনা, বল না। বোমা বানাতে
পারিস?

এবার স্নাতনের দিকে তাকালাম। উকোবুকো তুলে
ককে এখন তরানক মনে হচ্ছে। তরে তরে বলে কেললাম
—না তো।

ককে উঠল স্নাতন। চাপা কিলকিলে গলার
কল—ইতিহাস! তুই না মারেল-গ্যাঙ্কুয়েট! একটা

সামান্য বোমার করলো জামিন না। আরে এমনি
হাইড্রোজেন, ডুবল-তে বোমার কথা বলছি না—এমনি—
মানে অভিনায়ী বোমা।

তারপর স্বগতোক্তি করল, আমার যে আর্টস ফিল্ম
সত্যিই নিয়তিশয় লজ্জিত হলাম। আমি একজন মারেল
গ্যাঙ্কুয়েট, অথচ একটা সামান্য বোমাও বানাতে পারি না।

হঠাৎ একটা বুদ্ধি এল আমার মাথায়। বললাম—
আজ্ঞা, এক কাজ করলে তো হয়। আমাদের পাড়ার
রামগুণ্ডাকে বললে নিশ্চয়ই হয়। ওরা তো ওসব বানাই
পারে। ওদের বললে—

—কে? কার কথা বলছিস? স্নাতন প্রশ্ন করল।

—আরে রামগুণ্ডা মানে ঐ রাম—পাড়ার লোকে
যাকে রামবাবু বলে ডাকে।

—ননুলে। স্নাতন আর একবার ধমকে উঠল।
মনে মনে খুবই ক্ষুব্ধ হলাম। একটা দুটো অভিনায়ী
বোমা বন্ধুর বিপদে যদি না তৈরী করে দিতে পারলাম,
তাহলে আমার দ্বারা আর কি হবে।

কিন্তু বিপদ। বিপদটাই বা কি হোল স্নাতনের।
এতকণে যেন আমার সমিৎ ফিরে এল। আসল কথাটাই
তো এখনও জানা হয়নি স্নাতনের কাছ থেকে।

অনেক সাধ্য-সাধনার পর স্নাতনের মুখ থেকে অল্পে
অল্পে বেরতে লাগল—

—তুই তো দারিদ্র্যজনহীনের মতন চলে এলি সেখান
থেকে।

—তুইই তো চলে আসতে বললি আমার। আমি
বাধা দিলাম।—চুপ কর, বাজে বকিস না। স্নাতন
খামিয়ে নিয়ে আমার বলে চলল এই দীর্ঘ একটা মাস-মাসে
স্নাতনকে কি কঠোর পরিশ্রমই করতে হয়েছে তারই
সবিস্তার কাহিনী শোনাল স্নাতন একটু একটু
করে।

—রিলিকের কাজ হাতে নিয়ে ওদের বাড়ীতে গিয়ে
বখন পড়লাম, কি ভাবল স্নাতন উদাস চোখে—কি করি
বল, একটা সহায়-সম্মতীন পরিবারকে তো আর কলের
মধ্যে কেসে আসতে পারিনে—আমাদের লাইন—

হুতরাং এই একটা বাস স্নাতনকে ওদের বাড়ী বেতে
হয়েছে। চাল-চিঁড়ে দু-এক করে দিয়ে এসেছে। উৎস

বাড়ী-জামা-কাপড় সবই দিৱেছে এবং আৰও কি কি সব দিৱেছে। আৰ শেৰ পৰ্য্যন্ত বকুলকে—

বকুল ? বকুল আবার কে রে ? আমি সোজা হয়ে বসলাম চেয়ারটার ওপর।

ঐ মেয়েটি—সেই বড় মেয়েটি। সনাতনের গলাটা বড় যোলায়েৰ শোনা।

হঠাৎ উজ্জ্বলিত হ'লে উঠল সনাতন।

—জানিস, বকুল আমসব খেতে খুব ভালবাসে। ক'ণার নিয়ে গিয়েছিল।

কথাটা বলে ফেলেই সনাতন চকিতে আত্মসংবরণ করে নিল। আবার গম্ভীর হয়ে গেল।

—ঐ বকুলকে পড়াতে হচ্ছে। সামনেই ওর কুল পাইন্ডাল পরীক্ষা। কি করব—এই বখন আমাদের দাইন।

এ পর্য্যন্ত শুনে গেলাম। কিন্তু বোমা ?

এতকণে সনাতন দার্শনিকের মত একটু হাসল।—
লেছিলাম না, সমাজের সেবা করতে গেলেও গায়ের জ্বায়েৰ বরকার হয়। কারণ কুমি ভাল করতে চাইলেও লোকে বুঝবে না। এখানেও ঠিক তাই হয়েছে। পরের টপকার করা বাঁদের সহ হয় না—ঐ গ্রামের এই রকম একমূল লোক সনাতনকে শাসিয়েছে যেন সে-আর এ গ্রামে না চোকে। বকুলের মাও তবু পেয়ে গেছে। সনাতনকে ওদের বাড়ী যেতে নিবেদন করেছে। কিন্তু তাই বলে পোটা কতক লোকের ভয়ে সনাতন ভোঁ আৰ পিছিয়ে আসতে পারে না। একটা অনহাৰ—

হুতবাং বোমা। এতকণে ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। চোখের সামনে বস্তার জল আবার স্খতে পেলাম। বস্তার জল সরে গেছে, কিন্তু বজুর স্বরে আর এক প্রাণবন্তা দেখা দিয়েছে।

হঠাৎ কি ভেবে উঠে পড়ল সনাতন।

—ঠিক আছে, শনিবার রেডি হয়ে থাকিস। আমার দকে দাবি।

আবার সেই রিলিক। এবার দেশের জন্তে, সন্তে—
সনাতনের জন্তে।

গ্রামে পা দিয়ে আমার খালপ্রাণ ক্ষতভর হ'য়েছিল, মুখে-চোখেও হুতবো—একটা আতঙ্কের ছায়া পড়েছিল

কিন্তু সে কথা সনাতন'ক বলা যায় না, বলতে পারিওনি। কারণ যে মহৎ উদ্দেশ্যে আমরা উৎসর্গীকৃত প্রাণ, সেখানে তুচ্ছ প্রাণের ভরকে প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। কাপুকবের মত বলা যায় না—আমি যেতে পারব না।

সামনে চলতে চলতে আমরা গ্রামের হাটের কাছে এলাম। বকুলদের বাড়ী আর বেশী দূরে নয়। জন-কয়েক লোক কিছুদূরে জটলা পাঁকিয়েছিল। আমাদের দেখেই ছেলে, চোখে চোখে ইশারা ক'রে এবার গলা খাঁকারি দিয়ে এগিয়ে এল।

তারপর বোধহয় কয়েকটা মুহূর্ত। কোথা দিয়ে কি ঘটে গেল আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। সনাতন আমার একটা ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল আর নিজে গিয়ে দাঁড়াল একটু দূরে—একটা উঁচু জায়গায়। সনাতনের চীৎকারে আমার সখিৎ কিয়ে এল।

—বা'র কর বোমাগুলো অজ্ঞা, দেখি একবার। সনাতন হালকা-কে এরা চেনে না। দেখি একবার কার কত বুকের পাটা—

ওর চীৎকার উত্তরোত্তর বিকট হ'য়ে উঠল—

প্রাণের মায়া যদি থাকে তাহলে আর এক পাও এগোবে না। এক একটি বোমাতে সব কটার মাথা এখানে রেখে দিয়ে দাব।

উঃ সে কী ভীষণ মূর্তি সনাতনের। চকিতে হাতের ব্যাগটা থেকে বড় বড় তুবড়ীর মত বোমা হাওে নিয়ে দাঁড়িয়েছে—ওরা তো দূরের কথা আমি পর্য্যন্ত আর এক পাও এগোতে সাহস পেলাম না।

হতভম্ব লোকগুলো প্রথমটার এক পা এক পা করে তিন পা পিছিয়ে গেল, তারপর পেছন কিয়ে উর্জ্বাসে দৌড়ল। বাবার সময় চীৎকার করে বলে গেল—শাপা বোমা এনে গায়ের মধ্যে হাবলা করছে—পুলিশে খবর দোব।

পলানপন লোকগুলোর দিকে চেয়ে আমি কার্টের পুতুলের মত দাঁড়িয়েছিলাম। বুকেটা আমার অরও জোরে ওঠা-নামা করছিল। গলাটা শুকিয়ে গিয়ে কি যেন একটা জমাট বেঁধে এসেছিল। অনেককণ পর আমার মূখ দিয়ে শুধু একটা কথা বা'র হোল—

—বোমা—

হোঁ হোঁ করে প্রাণখোলা হাসি ধেনে উঠল সনাতন।
দ্বিবিধের হাসি। বুক টান করে আমার সামনে এসে
দাঁড়াল বেন ছদ্মবেশী বৃহন্নলা।

—আরে দূর বোকা, বোমা কোথায়! হেঁড়া কাপড়,
টুকরো চট, রঙচঙে কাগজে জড়িয়ে মুখে পগতে লাগিয়ে
দিয়েছি। বি, এ, তে আমার তো সারেন্স ছিল না—
আর্টস্ নিয়েছিলাম যে। চল, ঐ বকুলদের বাড়ী।

বকুলের বাড়ীতে ঢুকতেই বকুলের মা কঁদো কঁদো
হ'য়ে ছুটে এলেন—

তুমি আমার কেন এলে বাবা। গাঁয়ের লোক ছোট
পাকিয়ে তোমার মারবার চেষ্টা করছে। আমাদেরও
ছনাম করছে—তুমি চলে যাও বাবা। আমাদের সত্যিই
তুমি অনেক উপকার করেছ, তবু তুমি চলে যাও—

বকুলের মার ভয়কাতর মুখের দিকে তাকিয়ে সনাতন
লশায়ে হাসতে লাগল—

কিছু ভাববেন না মা, সব ব্যাটাকে ঠাণ্ডা করে
দিয়েছি। এই বে বোমা—

সনাতন বাগ থেকে একটা বোমা বার করে দেখিয়ে
হাসতে লাগল।

দরজার কাছে ধমধমে মুখে এসে দাঁড়াল বকুল
বকুলই নিশ্চয়। সেই ভাগর কালো চোখ। কালো
মেঘের মত একরাশ কালো এলোচুল পিঠময় ছড়িয়ে
পড়েছে। বকুলকে হুন্দরীই মনে হোল।

সনাতন ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকল। অনেককণ
কিসকিস করে কথা হচ্ছিল ওদের। আমাকে বাইরে
দালানে বসিয়ে রেখে গিয়েছিল। আমি বাইরে বসে
ওদের চাপা কথাবার্তা শোনার চেষ্টা করছিলাম।

প্রায় দশমিনিট পর—ফেসফোসানি শুনলাম। কি
হোল! বোধহয় বকুল কঁদছে। সনাতন অনর্গল
বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছে। আর বকুল কঁদতে কঁদতে 'না'—
'না' বলছে।

এরপর আরও পনেরো মিনিট বাদে বখন সনাতন
ঘর থেকে বেরিয়ে এল তখন ওর মুখ দেখে মনে হোল
সনাতনের জর হয়েছে।

—চলে আর—

আর কোন কথা নয়। সনাতন আমাকে নিয়ে

বাড়ীর বাইরে চলে এল। আমার আশঙ্কা হোল বকুল
হরতো ওর—মা'র—মত ওকে আসতে নিষেধ করল।
কিন্তু সনাতন আমার কোন কথা বলার সুযোগ পর্যন্ত
দিল না। সেই সনাতনী নেতৃত্ব।

কিছুদূরে একটা খালের বাঁশের গুলের ওপর আমাকে
নিয়ে দাঁড়াল সনাতন। তারপর উদাস শূন্য মনে অনেক
কণ ধেমে ধেমে একটির পর একটি বোমা খালের জলে
ফেলতে লাগল।

সব বোমা ফেলে দিয়ে সনাতন কঁাকা আকাশটার
দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। দেখলাম সনাতনের
চোখছুটো আঁতে আঁতে জলে তরে আসছে।

—কঁদছিল? আমি এতকণে আরতা আরতা
করলাম।

—সব-মিথো।

—কি মিথো?

—বকুল আর পড়বে না আমার কাছে।

—না পড়ল তো ভারী বয়েই গেল। চটপট বোকার
মত বলে ফেলার আ'ম।

—তুই কোনদিন মাছুষ হ'তে পারবিনে অজা। এটাই
বে আমাদের লাইন।

আমি আত্মবাহী সনাতনের দিকে তাকিয়ে রইলাম।
সনাতনকে দেখে দেখে আমার বিশ্বাস আরও বাড়তে
লাগল। কি এত মাথাব্যথা পড়েছে সনাতনের যে এত বিপদ
তুচ্ছ ক'রে একটা অচেনা অজানা মেরেকে পাশ করাতে
হবে। শুধু আমাদের লাইন বলেই এত খুঁকি নেওয়া।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সনাতন বলল—চল।

সেই চলে এলাম আমরা দুজনে। বকুলের বাড়ী
নিষেধ, বকুলের প্রত্যাখ্যান। সনাতন আর—ওসুখো
হয়নি। আমিও নিশ্চিন্ত ছিলাম। জোর করে কারোকে
ভাল করা যায় না। যারা তর পেয়ে ওর নিঃস্বার্থ উপকার
কিরিয়ে দিয়েছে সনাতন তাদের জন্তে আর কি করতে
পারে। কিন্তু আমার চোখের সামনেই সনাতন ক্রমশঃ
বদলে যেতে লাগল। কেবল গভীর আর উদাসীন হয়ে
থাকে; কথা বললও তালু করে অবাক দেয় না। ওর
মুখে আঁতে আঁতে দাড়ি বাড়তে লাগল এবং সে দাড়ি মূর
ভক্তি হয়ে নীচের দিকে নামতে লাগল।

—কি ব্যাপার তোর, নানিভের সঙ্গে অসহবাসিতা করছিল কেন? কি বিশ্রী বাড়ি বেখেছিল।

—অশৌচ—সনাতন শুধু একটি কথা বলল।

আমি খুব আশ্চর্য হ'য়ে গেলাম। সনাতনের কোন আত্মীয়বিরোগের কথা আমি শুনিনি। তেমন কিছু হলে নিশ্চয়ই জানতে পারতাম।

—অশৌচ কিসের?

—সমস্ত দেশের জন্তে অশৌচ।

—দেশের জন্তে অশৌচ পালন করছিল—সে আবার কি রে? আমি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলাম—অনশনও করছিল নাকি?

—না শুধু অশৌচ। আর হুঁ গোলা সনাতনের সেই অনর্গল বক্তৃতা।

—বেশটা জাহান্নামে গেছে—মাহবের কোন আশ্বর্ষ নেই।

—সবাই অর্থ আর কন্যতার জন্তে লালায়িত। কেউ কাউকে ভালবাসে না—মাহবের দলর মরে গেছে।—সব জুতো বিখাস হারিয়েছে মাহব—সন্দেহ আর হিংসার রাজত্ব চলেছে—ইত্যাদি ইত্যাদি।

সে যে কত ভাল ভাল কথা সেদিন সনাতন বলেছিল তা লিখে রাখলে আচ্ছ হরতো মনে থাকত।

কিন্তু সনাতন কেন যে এসব কথা বলতে আরম্ভ করল আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারলাম না। আমি স্বীকৃতমত চিন্তিত হ'য়ে পড়লাম। আমার মনে হোল ও ঠিক হুঁ নেই; ওর মাঝার হরতো কিছু গোলযোগ ঘটেছে। বিশেষ ক'রে ওর রোগা খাটো চেহারাটা এখন একমুখ দাড়িতে আচ্ছন্ন থাকার—আমার সন্দেহ আরো বনীকৃত হ'য়ে উঠল।

এ অবস্থায় কি করা কর্তব্য কিছুই ঠিক করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত একদিন মামীকেই ধরে পড়লাম। আমার মামী যথেষ্ট আধুনিক। কলকাতার কলেজের এককালীন মেধাৱী ছাত্রী। সমাজ সেবাও এককালে কিছু কিছু করেছেন।

মামীকে গিয়ে বললাম—সনাতনকে বাঁচাতেই হবে।

মামী আমার কথা-কাজ বুঝেবে প্রথমটার দাবকে

গিয়েছিলেন; তারপর সবকথা শুনে সনাতনকে একদিন নিয়ে আসতে বললেন।

সনাতনকে গিয়ে বললাম—আমার ছোটমামীকে জানিস তো? চল, তাকে ডেকেছেন।

কেন? সনাতন জিজ্ঞেস করল।

—তা তো জানি না, তবে চল না একবার দেখা করে আসবি।

আমার আসল উদ্দেশ্যটা সনাতনের কাছে গোপন করলাম।

—মামীও এককালে কিছু কিছু সোভাল কাজ করেছে রে—চল না একটু আলাপ করে আসবি।

সনাতন রেগে উঠল।

—ঐ মেয়েদের সঙ্গে দেখা করতে বলবে না আমার। সোভাল কাজ ওরা আবার করবে কি—ওদের জেই কাজ পণ্ড হয়।

সনাতনের কাছ থেকে এরকম কথা এই প্রথম শুনলাম। হঠাৎ কি সনাতনের মত বললে গেল না কি? মেয়েদের লব্ধে সনাতনের বয়ঃ আগ্রহই দেখেছি এর আগে। সমাজের অর্ধেককে আমরা ঘরে বদ্ধ করে রেখেছি। ওদেরও কাজে লাগান দরকার।

আর সেই সনাতনই উল্টো কথা বলছে এ ন। মামীর সঙ্গে দেখা পর্যন্তও করতে চাইছে না।

তবু সংসারে অঘটনও ঘটে। অনেকদিন সাধ্য-সাধনার পর বেদিন সনাতন মামীর সঙ্গে দেখা করল সেদিন থেকে সনাতনও বদলাতে লাগল। এখন আর মেয়েদের লব্ধে কোনরূপ জ্বিপ মন্তব্য করে না, মুখ ফিরিয়ে চলেও যায় না। বয়ঃ দিনে দিনে মামীর সঙ্গে ওর বনিষ্টতা বাড়তে লাগল এবং শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক-দিন মামীর কাছে সনাতনকে দেখতে পেতাম। মামী ও সনাতনের সঙ্গে কি সব পরামর্শ করতেন। মাকে মাকে দেখতাম সনাতন পোষ্ট অফিসে বাজে ঘন ঘন, আর মামীও কাকে কেবল চিঠি লিখতেন। এ সবই আমাদের আড়াল করে।

আমি অধৈর্য হয়ে উঠলাম। এরকম লুকোচুরি করার কি আছে। শেষে একদিন আর না থাকতে-পেরে আমি মামীকে জিজ্ঞেস করে বললাম—

—তোমরা তো বেশ লোক। আমাকেই বাহ বিয়ে
করবে চুচুপি কি করছ কিছুই বুঝতে পারছিনে। কি
বুঝলে বল তো?

—বুঝব আর কি! সমাজসেবা না ঘোড়ার ডিম।
তোমার সনাতন বহুলকে বিয়ে করতে চায়। মামী
মুচকে হাসলেন।

হপ করে মামীর ওপর আমার ভীষণ রাগ হয়ে
গেল। বোধহয় সুঁবিও পাکیয়েছিলাম। অস্ত্র কেউ
হ'ল কি হোত বলা যায় না, নেহাত মামী বলেই সেদিন
ধেমে গিয়েছিলাম। সনাতনের সমাজসেবা সম্বন্ধে কেউ
কটাক্ষ করলে বা তার আন্তরিকতার সন্দেহ করলে আমি
কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারি নে।

মামী কিন্তু একটুপরেই অকাট্য প্রমাণ হাজির
করলেন। বহুল আর বহুলের মায়ের চিঠি। সব ব্যবস্থাই
পাকা হয়ে গেছে। তবে সবটুকুই গোপনে করা হবে।
গাঁয়ের লোক কেউ আগে থেকে কিছু জানতে পারবে না।

সনাতনকে চিনতে সেদিন আমার একটু কা
হ'য়েছিল। বুকের দাঁড়ি অগম্যত। মাথার চুল ঠৈল
সিঁধ্য হ'য়ে সবরবিত্ত এবং নতুন সিকের পাঞ্জাবীতে ঞ।
সনাতন চেহারাটাই বদলে গেছে।

সনাতনকে একদৃষ্টে দেখতে লাগলাম। ওর বিশেষ
তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার মনটা দার্শনিক হ'য়ে
উঠল। দেখলাম এই সেই নিত্য লীলা। ভাবলাম
ইনি সনাতন—ইনিই আদিত্যে ছিলেন, ইনিই পুনর্নব।
সনাতনম্ এনম্ আত : উভাত্ত্যং পুনর্নব।

অনেক পরে বললাম—তোর মনে এই ছিল!

সনাতন হাসল না। আগের মতই গভীর হয়ে বলল—
নাঃ, তুই কোনদিন মাহুব হতে পারবিনে অঞ্জা।
আমাদের লাইনটা—

ওদের বাসরে দাঁড়িয়ে আমার ঐ কথাটাই মনে
হ'য়েছিল। সনাতন লাইনটা ঠিকই ধরেছে—অন্তত
একজনকেও ও রিলিফ দিতে পেরেছে।

এ বিবাদ মিটিবেনা

শ্রীঅসিতবরণ চৌধুরী

তোমার সাথে আমার বিবাদ মিটিবেনা আর...।
নীলাক্ত আকাশের আবরণে ঢাকা
পৃথিবীটা বেকুবের মত শুধু বার বার
এঁকে দিবে ব্যর্থ
ক্লাস্তিহীন অস্থলিত বিবৃতির রেখা।
আমি তার বকের নাড়ীর ধন।
গোপন অহের তাপে,—শ্রেমের বেদনা দিয়ে
আমারে সে কবেছে লালন।
আপনার হৃৎ নীড়ে
একান্ত লুপ্ত ছিণো আপনারি
হাসি অঞ্জন নিয়ে।

তোমার শাণিত চকু ঈগলের তীর তৃষা মেখে
অকস্মাৎ ছিন্ন করে তার গুপ্ত নাড়ীর কামনা।
নিকরূপ দহ্য তুমি; দীপ্ত তব মায়ারহীন চোখে
অলস ঈর্ষার অগ্নি...।
ধূসর ধ্বংসের ক্ষেত্রে আরোক্তিত তোমার সাধনা।
তবু দেখি হুঃসাহস পৃথিবীর লোমে ঢাকা বৃকে।
তোমার অনন্ত ধ্বংস,—তার'পরে করিছে রচনা
নিঃশীর্ণ জীবন-তৃষা;...অন্তহীন হত্যার কোকুকে
তোমার তাণ্ডব নৃত্য...।
তাই এই বর্ণিকের চির-বিত্রোহিতা
তোমার বিকছে বহু,—এ বিবাদ কত মিটিবেনা।

সেখানে হইতে লাগিল। প্রথমে হরিকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, মতিলাল হ্র, ব্রহ্মনাথ দাস ও মহেন্দ্রলাল বহু ভাড়া লন, তাহার পর মহেন্দ্রলাল বহু একা, তাহার পর অর্ধেন্দ্রাবু, অলকৃষ্ণ মিত্র, মতিলাল হ্র ও নিমাইচরণ বহু, তাহার পর বেণারদী দাস ভাড়া লইয়াছিলেন। এক্ষণে (‘বিশ্ব-কোষ’ গ্রন্থ-রচনাকালে) অমরেন্দ্রনাথ দত্ত এই নাট্যালা ভাড়া লইয়া ক্লাসিক-থিয়েটার নামে এক সম্প্রদায় গঠন-পূর্বক যোগ্যতার সহিত অভিনয় চালাইতেছেন।

এমারল্ড থিয়েটারের পতন হইলে গিরীশবাবুর যত্নে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র শ্রীনাগেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায় জ্ঞানানাল থিয়েটারের অধিনেতা ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে মিনার্ভা থিয়েটার নামে নতুন নাট্যালা স্থাপন করেন। গিরীশ-বাবুর ম্যাকবেথ ও “মুকুলমুক্তা” এখানকার প্রথম অভিনীত পুস্তক। অর্ধেন্দ্রাবু এখানকার নাট্য-শিক্ষক ছিলেন। শ্রীদেবকর্ত্ত বাগচী এখানে সঙ্গীতাদ্যাপক হন। মিনার্ভা থিয়েটারের ধ্বংস ও বৎসরের মধ্যে ঘটে। এই সময়ে গিরীশবাবু কিছুদিন ঠায়ে, কিছুদিন মিনার্ভায়, এইরূপে কাটাইতেন। এক্ষণে (‘বিশ্ব-কোষ’ গ্রন্থ-রচনাকালে) শ্রীব্রজ মনোমোহন পাণ্ডে মিনার্ভা থিয়েটার চালাইতেছেন। মূল অধিকারী নাগেন্দ্রবাবুর হাত হইতে এই সম্পত্তি অনেক দিন বিক্রীত হইয়া গিয়াছে।

যখন এমারল্ড ধ্বংস হয়, সেই সময়ে কবি ও রাজকৃষ্ণ রায় মেছুয়াবাজার স্ট্রীটে বীণা-রঙ্গভূমি নামে নাট্যালা স্থাপন করিয়া বালক অভিনেতা দ্বারা অভিনেত্রীর কাণ্ডা চালাইয়া বাবসা করিতে প্রবৃত্ত হন। তিনি সফলকাম হন নাই। পরে স্ত্রী-অভিনেত্রীও লওয়া হয়। কিছুতেই বীণা দাঁড়াইল না। রাজকৃষ্ণবাবু স্বর্ণগ্রস্ত হইয়া বেচিয়া ফেলিলেন। সেখানে শ্রীলক্ষ্মণ চক্রবর্ত্তী (জ্ঞানানাল থিয়েটারের অভিনেতা) মিটি থিয়েটার স্থাপন করেন। তাহাও অল্প দিন চলিয়াছিল। অবশেষে এক্ষণে (‘বিশ্ব-কোষ’ গ্রন্থ-রচনাকালে) এখানে একবল পাংসী নাট্য-সম্প্রদায় উদ্ভূতে অভিনয় করিতেছেন। এখন (‘বিশ্ব-কোষ’ গ্রন্থ-রচনাকালে) বাঙ্গালার সকল জেলার সখের রঙ্গমঞ্চ দুই হয়। সর্বত্রই থিয়েটারের অদর।

বাঙ্গালীর নাট্যালায় (বিশ্ব-শতকের প্রারম্ভকাল অবধি) সর্বশ্রেষ্ঠ ইতিহাসিক একজন (‘বিশ্ব-কোষ’ গ্রন্থ

প্রকাশকালীন আমলে) বাঙ্গালী নাট্যালায় হইয়া রীতিতে অভিনয় হইয়া থাকে। একটিকে গিরীশবাবুর স্থল অর্থাৎ রীতি ও অপরটিকে মুক্তকীর (অর্ধেন্দ্রাবু) স্থল বা রীতি বলে। গিরীশবাবুর রীতিতে কি পদ্ধতি অভিনয়ে কি গন্ত-অভিনয়ে অভিনেতার। যেন একটা কবিতার স্থর ধরিয়া শ্রোতৃস্থলকর উপায়ে অভিনয় করিতে থাকে। ইহাতে স্বরের উন্নয়ন ও অবনয়ন সঙ্গ-জ্ঞাত নিম্পন্ন হয়। মুক্তকীর রীতিতে কি গন্ত কি পদ্ধতি কথোপকথনের স্থরে অভিনীত হয়, কেহ কোনরূপ সঙ্গল স্থর অবলম্বন করিয়া আবৃত্তি করে না। ইহাতে আবৃত্তিও গুণে শ্রোতৃস্থলকর করিবার দিকে দৃষ্ট দেওয়া অপেক্ষা বক্তব্য বিষয়ের ভাবেই প্রতি বেক্ষ লক্ষ্য রাখা হয়। গিরীশবাবুর রীতি আজকাল (‘বিশ্ব-কোষ’ গ্রন্থ-প্রকাশনার যুগে) বহু বিস্তৃত। মুক্তকীর রীতি তত বিস্তৃত হইবার অবকাশ পায় নাই। গিরীশবাবু এই নাটক রচনা করিয়া এক্ষণে (‘বিশ্ব-কোষ’ গ্রন্থ-প্রকাশনাকালে) প্রধান নাটককার ও বঙ্গীয় গায়িক বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। আর অমরেন্দ্রলাল বহু মহাশয় অভিনয়োপযোগী সামাজিক নাট্যরঙ্গ রচনা করিয়া প্রসিদ্ধ দীনবন্ধু বিদ্যে-আসন লাভ করিয়াছেন। গিরীশবাবুর রীতি সর্বদা অত্যন্ত হয় বলিয়া অল্পবিদ্যা অভিনেতার সংখ্যা আ-কাশ (‘বিশ্ব-কোষ’ গ্রন্থ-প্রকাশনাকালে) অনেক বৃদ্ধি। পুঙ্খ-অভিনেতা অপেক্ষা আজকাল (‘বিশ্ব-কোষ’ গ্রন্থ-প্রকাশনার আমলে) স্ত্রী-অভিনেত্রীরা বেশী উন্নতিপ্রিয়ানী ও শিক্ষা-প্রিয় হইয়া থাকে।”

বাঙলা রঙ্গালয়ের প্রবর্তন ও গোড়ার দিকের মোটা-মুটি ইতিহাসের এসব তথ্য-পরিচয় পাওয়া যায় অধ্যক্ষ-দ্বন্দ্বাপা ‘বিশ্বকোষ’ গ্রন্থে। ‘বিশ্বকোষ’ গ্রন্থের ‘রঙ্গালয়’ শীর্ষক প্রবন্ধে যে সকল তথ্য-বিবরণ পরিবেশিত হয়েছে, সেগুলির সযত্নে কিছু কিছু মতান্তর থাকলেও, সেগুলোর বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের বিচিত্র ক্রমোন্নতির বেশ একটি চমৎকার-কৌতূহলোদীপক ধারাবাহিক-চিত্রের স্পষ্ট আভাস মেলে। তাই একালের অল্পসঙ্খ্যে পাঠক-পাঠিকাদের কৌতূহল আগ্রহ নিবারণের উদ্দেশ্যে অভীত-যুগের বাঙলা-

রক্ষকের সেই সব অরণীর কীৰ্ত্তি-কাহিনীর কিছু কিছু পরিচয় দেওয়া হলো। ছোট-বড়, ভালো-মন্দ নানান চিত্তাকর্ষক ঘটনা-প্রবাহের মধ্য দিয়ে ভেসে চলে বাঙালীর নাট্যকলায় যীরে ধীরে কিতাবে ক্রমবিকাশ লাভ করেছে, তার আদি-যুগের অপরূপ একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আজো অর্ণাকরে লিপিবদ্ধ রয়েছে সেকালের সুপ্রসিদ্ধ 'বিশ্বকোষ' গ্রন্থের পাতায়। পরবর্তী যুগের বাঙালী-রজার সম্পর্কে আধুনিক কালের গবেষক-পণ্ডিতদের বহু মনোজ্ঞ রচনা আর ভাষ্য-বিবরণ ছড়িয়ে

আছে বিবিধ গ্রন্থ-পত্রিকার প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী— তাই তার পুনরুল্লেখ আপাততঃ নিষ্প্রয়োজন। নাট্যকলা-চর্চা ছাড়াও, সেকালের দেশী ও বিদেশী সমাজে লোক-রঞ্জনের উদ্দেশ্যে আরো নানা ধরনের যে সব প্রমোদ-বিলাসের অতিনব-বিচিত্র ব্যবস্থাদি প্রচলিত ছিল, আগামী সংখ্যায় একালের কলারসিকদের কাছে তারও কিছু কিছু ঐতিহাসিক তথ্যের পরিচয় দেবার বাসনা রইলো।

ক্রমশঃ

অনুনাট্য

নটিকেতা ভরদ্বাজ

(মহাকবি লোকসঙ্গীতের ১৩০ সংখ্যক সনেটের অনুবাদ)

প্রিয়ার চোখের সঙ্গে সূর্যের তুলনা বহুদূর ;

প্রবালের রক্তরাস আরো দীপ্ত তার

ওঠ সংসারগের চেরে ;

তুমার স্তম্ভতা বহি, তবে তার দুঃখক দৈবং পাণ্ডুর ;

কেশ যদি তুম্বী, তবে বৃক্ষ তুম্বীওছে তার মাথা

আছে ছেরে ।

গোলাপ দেখেছি বহু—গোলাপী ও খেত,

রক্ত নানান বর্ণের,

কিন্তু সে উজ্জল গণ্ডে দেখিনি তো সে সব গোলাপ,

মাধুর্য উল্লাস আছে ঢের বেশী কোনো কোনো গন্ধ

নিধাসের

প্রিয়ার নিঃশ্বাসে নেই সেই সব মদির সংলাপ ।

আমর প্রতিতে তার চারুকণ্ঠ লোভনীয় ; তবু জানি স্থির সজীভের স্বধোরা আরো বেশী মধুর মোহনন ।

দেবীদের পথক্রমা প্রতিভাত হইনি কত আমার দৃষ্টির ;

কিন্তু প্রিয়ার পদছন্দ পড়ে মাটিতেই—ভঙ্গম হয়েছে বখন ।

এবং ভাষাণি তানি কী আশ্চর্য,—সমস্ত তুলিত তুলনা

আমার প্রিয়ার কাছে পরিহীন—সে যে অতুলনা ।



আধুনিক বাংলা কবিগান

শ্রীপরমানন্দ হালদার এম-এ

কবিগান বাংলার আদিম সমাজ ব্যবস্থার একটি বিশেষ অবদান। কিন্তু কবে ও কি ভাবে প্রথম কবিগানের প্রচলন হয়েছিল—তা' আত এই বিশেষত্বাধী বৃক দাঁড়িয়ে বলা কঠিন। শুধু ভ্রম্যমান এবং বিচার বিবেচনার মাধ্যমে বলা যেতে পারে যে কবিগান প্রাচীন যুগের মানুষের মনের একটি চরম অভিব্যক্তি—আর তা' সুর, ছন্দ, তাল ও ভয়ের মাধ্যমে আনন্দ পরিবেশের জন্ত সৃষ্টি হয়েছিল। তাই কবিগানের জন্মস্বর নির্ধারণ করতে হলে আমাদের সেই ইশারাময় অন্ধকার যুগের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে। একথা বলা যেতে পারে যে—কবিত্ব শক্তি মানুষের জন্মগত অধিকার—আর তার উপাদান জুগিয়েছে বাংলার ভলংগু। বাংলার এই ভলংগু মানুষের মনকে উদাস করে সর্গভুক্ত করতে শিখিয়েছে—তাই উদাস প্রাণের মাধুর্য লক্ষ্যে নিয়ে সে নিভেকে উজাড় করে দিয়েছে ভাবের সাধনার। সুতরাং আমরা দেখতে পাই বাঙ্গালীর খাত্ত কোমলতা দিয়ে গড়া এবং জন্মগত দিক দিয়া সে রিক্ত ও বৈরাগী। এই স্বভাবগত রিক্ততা ও বৈরাগ্য সুর এবং ছন্দে গ্রথিত করে মানুষের প্রাণের ওজ্রীতে ওজ্রীতে নূন মূর্ছনার সৃষ্টি করে চলেছে যুগের পর যুগ। তাই উদাসী মানুষের কণ্ঠে বারে বারে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে—‘উদাসী পথিক শুনেছি তোমার বা'কুল ধাঁশীর কামনা’। সে কামনা তো কোন দিন বাঙ্গালীকে ধরে রাখতে পারেনি ভোগবাসনার মধ্যে—সে কামনা ভোগবাসনার উর্ধ্বে এক নূতন প্রাণের সন্ধান। কিন্তু কি সে হয়েছে আর কি সে পেয়েছে—এই চাওরা পাওরার চিরস্থান বন্দ সর্গ-কালের মানুষের কাছে এক বিরাট দ্বিজালা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এইর কবিগানের উৎপত্তি সম্পর্কে আমাদের সন্ধ্যা প্রবেশ করা যেতে পারে। পূর্বেই বলেছি যে কবিত্ব শক্তি

মানুষের জন্মগত অধিকার এবং সেই সৃষ্টি সে মনের গহনে এক নূতন প্রেরণা সৃষ্টি করে থাকে। এই প্রেরণা সুর ও ছন্দের মাধ্যমে গ্রথিত হয়ে গানের সৃষ্টি হয়েছে। বাংলা ভাষার জন্মগত কোন লিখিত সাহিত্যের সম্বন্ধে আমরা পাই না। সুতরাং সেই যুগের মানুষের জীবন ধারা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান সীমিত এবং সে সম্পর্কে পণ্ডিত-দ্বিগের মধ্যে চরম মতভেদ বিস্তারিত। সুতরাং কবিগানের উৎপত্তির সন্ধানে এসে আমরা সে বিতর্কে প্রবেশ করতে চাই না। মোটের উপর বলা যেতে পারে যে, সাহিত্য-সৃষ্টির বিবর্তন ইতিহাসে মৌখিক সাহিত্য থেকে আমাদের ব্যাখ্যা সুর—আর তার ব্যাখ্যা পথে কবিতাই মানুষের আদিম সৃষ্টি। তা'লে বলা যেতে পারে যে মৌখিক কবিতা সৃষ্টির মধ্য দিয়ে মানুষের কাণ্ডালোকে প্রথম অভিনয়। আর মৌখিক কবিতাই যদি মানুষের আদিম সৃষ্টি হিসাবে ধরা যায়—তবে তা' সুর ও ছন্দের মাধ্যমে গান হিসাবে আত্ম প্রকাশ করেছিল অর্থাৎ গানই তার সহজাত মৌখিক সৃষ্টি। পৃথিবীতে গানের উপর অ'কর্ষণ নেই এমন লোকের সংখ্যা নিতান্ত কম আছে। তাই গানই সর্গকালের সর্গ-মানুষের সার্বজনীন চিত্তচুম্বিত সৃষ্টি—আর এই সৃষ্টিই আদি যুগের মানুষের প্রথম প্রয়াস হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। তাই মানুষের মন সংগীতময়। সংগীতের মূর্ছনা মানুষের মনকে উদ্ভাসিত করে তেলে—আবার অশান্ত হয়ে শান্তির অ'র বাগী লান করে থাকে। সুতরাং আমরা দেখতে পাই সংগীতের মধ্যে বৈরাগ্য ও আস'ক্ত দুই-ই বিস্তারিত।

বাংলা ভাষার উপায়ে মানুষের নিজের মনকে উজাড় করে দিয়েছে সংগীতের সাধনার—আর তাই কলে সে ফুটে গেছে যুগ ও কালের ব্যাধান। বর্গ ও মর্গ ক এক সৃষ্টি গ্রথিত করে এই মাটির জগতে সৃষ্টি করেছে নন্দন-

কানন। মাছুষ আর পণ্ড হিংসারবে তুলে গিয়ে তন্ময় হয়ে গেছে এই স্রের মূর্ছনায়। আবার এই মাছুষের স্রের বন্ধারে মর্ত্তভূমিতে নেমে এসেছে বারিবিন্দু—হিংস্র বিবাক্ত সর্প তন্ময় হয়ে গেছে স্রের মূর্ছনায়। স্তরায় দেখা যাচ্ছে মাছুষ স্রের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করে অসাধ্য সাধন করতে পেরেছে। তাই অনুমান করে বলা যেতে পারে যে বাংলা ভাষাসাহিত্যে তন্ময়ত্বে সংগীতের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

আদিযুগ হতেই মাছুষের আত্মবিক গতি সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করা। তাই সারাদিন কঠোর পরিশ্রমের পর মাছুষ চায় আনন্দ ও পরম্পরের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান করতে। এই প্রয়োজনে দেখা যায় যে প্রাচীন গ্রাম্য সমাজ ব্যবস্থায় সন্ধ্যার পর কোন বারোয়ারী ভায়গায় মজলিসের আসর বসত। সেখানে গান বাজনা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে তারা আনন্দ উপভোগ করত। এই ধরনের আসর গ্রাম্যসমাজ ব্যবস্থায় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকেও দেখতে পাই। সেই দিক দিয়ে অনুমান করে বলা যেতে পারে যে এই ধরনের মজলিসের আসর হতে কবি-গানের প্রথম পদক্ষেপ। কিন্তু বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম যুগে কবি গানকে সাহিত্যের অঙ্গীভূত হিসাবে দেখা হয় নি। তার কারণ বিজ্ঞপণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু প্রথম যুগের কবিগানের মধ্যে যে কিছু পরিমাণে কৃষিবৃত্তির উপাদান ছিল তা' নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। তাই সাহিত্যের দরবারে তার স্থান হরনি বলে মনে করা যেতে পারে, অথবা গানের মধ্যে যে সাহিত্যাকৃতির কোন নিদর্শন থাকতে পারে একথা হয়ত কেউ সেদিন ধারণা করতে পারে নি। কবিগানের মধ্যে যে বিশাল রস ভাণ্ডার নিহিত আছে তা' তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় দাঁড়িয়ে কেউ মনে করতে পারেনি এবং ইহার মধ্যে যে অপরিচীত সাহিত্যিক মূল্য বিরাজমান তা' তাদের কল্পনার বাইরে ছিল। তাই দেখতে পাওয়া যায় যে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ যুগান্তরের পথে দাঁড়িয়েও আধুনিক চিন্তাধারার পথিকৃতি হয়ে কবিবর ঈশ্বর গুপ্তের দৃষ্টি এদিকে সর্বপ্রথম আকৃষ্ট হয়। তিনি কবিগানের মধ্যে এক বিশাল রসভাণ্ডারের সন্ধান পেয়েছিলেন। কিন্তু এইসব গান কবিগানের সুরকারদের মুখে মুখে স্মৃতি—

তাই ইহার কোন মলিন দৃষ্টাব্দের নেই। তার কারণ কবি সুরকারগণ প্রতিপক্ষীয় কবি সুরকারদের প্রেমের উত্তর আসরে ছাড়িয়ে সুর ও ছন্দের মধ্য দিয়ে দিতে হত। এই ধরনের উত্তর প্রত্যুত্তর দেওয়া খুব সহজ নয়। ইহাতে যথেষ্ট জ্ঞান ও উপস্থিতি বুদ্ধির প্রয়োজন। তা'ছাড়া ইহার জ্ঞান প্রয়োজন সহজাত কবিত্বশক্তি, প্রত্যাশম-মতিত্ব এবং বিভিন্ন বিষয়ের উপর অসাধারণ জ্ঞান বা পাণ্ডিত্য। এই সব কবি সুরকারগণ পৌরাণিক শাস্ত্র, ধর্মগ্রন্থ ও সামাজিক বিষয়সমূহ অধ্যয়নের দ্বারা অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করে তার মধ্য হতে কবিগানের উপাদান সংগ্রহ করত এবং যুক্তিতর্কের মধ্য দিয়ে তারা এই সব বিষয়ের উপর সুচিন্তিত আলোচনা করত। তা' একদিক দিয়ে যেমন রসগ্রামী হত—অন্য দিকে তেমনি ঐ সব বিষয়ের বিভিন্ন ব্যাখ্যা সম্ভব হত। সে সব বিষয় মলিখিত থাকায় তা' লোকচক্ষুর অন্তরালে চাপ পড়ে গেছে—তার ফলে ভবিষ্যৎ বংশধরেরা ঐ সকল বিষয় থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে এই সব প্রতিভাবান কবি সুরকারগণ এ বিষয় যত নেননি এবং তাঁরা হয়ত আধিক রোজগারের কথা বেশী ভাবে চিন্তা করে-ছিলেন। এই সব গানের যে বিরাট কাব্য মূল্য থাকতে পারে, তারা যেমন তা' চিন্তা করেনি—তেমনি তৎকালীন সংস্কৃত-অভিমানী পণ্ডিতগণ এ বিষয় উদাসীন থাকায় বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডারের এক বিশাল সম্পদ আজ বিলুপ্ত পথে। কবিবর ঈশ্বর গুপ্ত প্রাচীন কবিগানগুলি সংগ্রহের জন্য ঘোষণা করেছিলেন যে যারা ঐ গানগুলি সংগ্রহ করে দিতে পারবেন তাদের কাছে তিনি সারা জীবন কৃতজ্ঞ হয়ে থাকবেন। তখন তার প্রচেষ্টার ফলে সামান্য কিছু কবি-গানের পদ সংগৃহীত হয়েছিল। সেগুলি আজ বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডারে নিজেদের স্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছে। এইসব প্রাচীন কবি সুরকারদের মধ্যে হর ঠাকুর, ভোলা মন্ডল, রাম বহু, এটনি ফিরিকার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের এই কবিগানের দ্বারা লুপ্ত-প্রায়—এবং বর্তমানে কবি গানের বদলে কতকগুলি ধরা-বাক্য বিষয়ে তর্কোপাত্তা অণ শ্রোত বর্জ্য রেখে সুরকার পৃষ্ঠপোষিত হয়ে আজও বেঁচে আছে।

কিন্তু অনেকে মনে করেন যে কবিগানের দ্বারা

প্রাচীন কবি গায়কদের পক্ষে সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। এ বিষয় তাদের ধারণা সঠিক বলে মনে করা যায় না। এ বিষয় আমার ধারণা যে উল্লিখিত কবিগানের ধারা কোন দিন লুপ্ত হয় নি। যুক্তি এবং তথ্য দিয়ে দেখান যেতে পারে যে কবি গান বাংলা দেশের দুটি অঞ্চলকে কেন্দ্র করে দুটি ধারায় প্রচলিত ছিল। একটি ধারা পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চলের রূক্ষ আবহাওয়াতে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল—যা' আজ তুর্কী গানের ধরাবাঁধা পথ দিয়ে ক্রীণ শ্রোত বজায় রেখে চলেছে। কাবার ঠিক সেই সময় পূর্ববঙ্গের নদীমাতৃক জলীয় আবহাওয়াতে কেন্দ্র করে অল্প ধারাটি গড়ে উঠেছিল। সেই থেকে পূর্ববঙ্গে এই কবিগানের ধারা এখনও বিद्यমান। তবে দেশবিভাগের পরে পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের উপরে যে আঘাত এসেছে—তার ফলে তাদের উপর যে অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি হয়েছে তা' স্বত্তেও এই সব কবিগানের সুরকারগণ এখনও নিক্তদের অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছে। হঠাত অনতিকালের মধ্যে ইহাও লুপ্ত হয়ে যাবে। কবিগান পূর্ববঙ্গের পলিমাটির কোবল স্তর ভেদ করে যে সাংস্কৃতিক বনিয়াদ গড়ে তুলেছিল—তার মধ্যে একটা সুরচির পরিচয় পাওয়া যায়। তার কারণ এই সব কবিগানের রচনাগুলি কোনদিন রুচিকে পীড়িত করেনি। হয়ত আদি রসের কিঞ্চিৎ প্রভাব এর মধ্যে ছিল। কিন্তু কোন আলোচনা রসজ্ঞ করে তুলতে হলে তার মধ্যে আদিরস কিছু না থাকলে শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করা সম্ভব হত না। দেশবিভাগের পরে কতিপয় কবি সুরকার এদেশে চল আসতে বাধ্য হয়েছে এবং কঠোর অর্থনৈতিক দুরবস্থা তাদের এপথ ত্যাগ করতে বাধ্য করেছে। পূর্ববঙ্গের এই কবিগান বিশেষ করে ঢাকা, ময়মনসিংহ, খুলনা, যশোর, বরিশাল ও ফরিদপুর জেলাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। তার কারণ এইসব জেলাকে কেন্দ্র করে যে উচ্চ সাংস্কৃতিক বনিয়াদ সৃষ্টি হয়েছিল—তারই পরিপূরক হিসাবে কবিগানকে ধরে লওয়া যেতে পারে। কেননা পশ্চিমবঙ্গে যেমন জমিদার ও উচ্চ-জোতদার শ্রেণীর মনোরঞ্জনের জন্য কবিগানের প্রসার হয়েছিল—তেমনি পূর্ববঙ্গে শিল্পিত মাহুঘের ও কৃষক শ্রেণীর মনোরঞ্জনের এবং আনন্দ বর্দ্ধনের জন্য কবিগান প্রসার লাভ করেছিল। বার জন্ম খিরেটার বা সিনেমা

ততটা জনপ্রিয়তা সেখানে অর্জন করতে পারে নি। তার জন্য কবিগান পূর্ববঙ্গ হতে কোন দিন লুপ্ত হয় নি। পূর্ববঙ্গের এইসব কবি সুরকারদের মধ্যে তারক সরকার, হরিহর সরকার, মনোহর সরকার, হরিরঞ্জন সরকার, চন্দ্রকান্ত সরকার, রাজেন্দ্রনাথ সরকার, নকুল সরকার, নিশিকান্ত সরকার, বিজয় সরকার, পুলিন সরকার, মনোরঞ্জন সরকার, অনাদি সরকার প্রভৃতি কবি সুরকারদের নাম উল্লেখ এখানে করা যেতে পারে। এদের মধ্যে অনেকে জনপ্রিয়তার শীর্ষাশনে আরোহণ করেছিলেন এবং অনেকেরই রচনার মধ্যে যথেষ্ট সাহিত্যিক মূল্য বিद्यমান। অনেকগুলি রচনা যা' সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে তার অনেকগুলি পদ বিদ্যাপতি বা চণ্ডীদাসের পদগুলির সমকক্ষতা দাবী করতে পারে। সে সমস্ত পদগুলি সময়সূত্রে সন্নিবেশিত করার ইচ্ছা থাকল। তবে মোটের উপর বলা যেতে পারে যে এই সব আধুনিক কবি গায়কদের অনেকেরই রচনার মধ্যে যথেষ্ট সাহিত্যিক মূল্য নিহিত আছে এবং এগুলি যদি আজ সংগ্রহ করার ব্যবস্থা হত তবে বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডারে একটি অমূল্য সম্পদ রক্ষিত হতে পারত। কিন্তু হুঃখের বিষয় অনেক পরলোকগত কবি সুরকারের রচনাসমূহ আজ সংগ্রহ করা এক দুর্লভ ব্যাপার এবং তাদের সম্যক পরিচয় আজ কালের গহবরে বিলীন হতে চলেছে। তাদের মূল্যবান রচনাসমূহের মধ্যে যে জীবন নন্দনজাত হলো হল প্রকাশ পেয়েছে তার কিছু পরিচয় পরবর্তী সময়ে সন্নিবেশিত করার স্পৃহা ও কোতূহল রইল। এইবার গানের পদ্ধতিগুলির কিছু উল্লেখ এখানে করা যেতে পারে।

কবি গানের কতকগুলি পদ্ধতি সম্পর্কে এখানে কিছু বলা যেতে পারে। এ সম্পর্কে সাধারণতঃ কয়েকটি পদ্ধতি আমরা দেখতে পাই। তার মধ্যে বিশেষত মালসী, টপ্পা, ভোরগান, কবিগান (রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ক গান) এবং সর্বশেষে জোটার গান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জোটার গানের অর্থ গানের সমাপ্তির মূখ্য দুই সুরকার এক সঙ্গে আঙ্গুরে দাঁড়িয়ে বিতর্ক বিষয়ের উপর একটা ববনিকা টেনে থাকে। কবি গানের বিষয়বস্তু এত বিস্তৃত যে তা লিখে রাখা অসম্ভব। মালসী

গান (সবী সংবাদ, বিহু প্রভৃতি) গুলি আবার চিত্র ন, পাড়ন, সুকার (১ম, ২য় ও ৩য় সুকার) মিল (১ম ও ২য়) মুখ, পেচ, খোচ ও অন্তরা প্রভৃতি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। এইগুলি সুর ও ছন্দের মাধ্যমে কবি সুরকার প্রোত্যাহের সম্মুখে প্রথম গেয়ে থাকে এবং পরে দোহারগণ বর্জ্বক তার অনুসরণ করে সেই গান পরিবেশন করে থাকে। অল্প নিকটীয়া গানের মধ্যে ধূম, ছড়া ও পাঁচালী বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। এই সমস্ত গানের মধ্যে দিয়ে প্রতিজ্ঞায় সুরকারের কাছে প্রশ্ন ও তার প্রশ্নের উত্তর দান করা হয়ে থাকে। পূর্ববঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে এই প্রকার কবি গান চলে আসছে। পরগর দুই তিন দিন ধরে গান চলতে থাকে—আর প্রোত্যাহ অগৌর আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে থাকে দুই কবির অশ্রুজবির দিকে এবং বিদগ্ধ প্রোত্যাহ সেই বিশাল রস ভাণ্ডার হতে রস সংগ্রহ করে চলেছে। কবি গানের নামে সে কি থিরাটি আগ্রহ ও উদ্দীপনা—দুঃখ হুগতর হতে মাহু বহু চুটে আসছে কবি গান শুনে। এই কবি সুরকারের শিক্ষাগত যোগ্যতা বিশেষ কিছু নাই—তথাপি তারা বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের শাস্ত্র অধ্যয়ন করে মস্ত জীবনের সঙ্গে এক করে নিয়েছে এবং যে কোন প্রশ্নের উত্তর তারা অল্প শাস্ত্রের দৃষ্টান্ত তুলে তা খণ্ডন করতে চেষ্টা করে। দুঃখের বিষয় এই সব কবি সুরকারের সহজাত মৌলিক প্রতিভা লোকচক্ষুর অস্ত-রালে রয়ে গেল। যদি শিক্ষিত জনমানুষের দৃষ্টি এদিকে নিঃস্থত হত তবে তা দিয়ে বাঙ্গালা সাহিত্যে একটি নতুন সম্পদ সৃষ্টি করা যেত। অনেক কবি সুরকার আছেন যারা কঠোর দুঃখ দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে নিজেদের জীবন পথে এগিয়ে চলেছেন এবং স্বাভাবিক সৃষ্টির অভাবে বহু প্রতিভা সমূল নষ্ট হয়ে গেল। এ কলঙ্ক সমগ্র বাঙ্গালী জাতির। তা' ছাড়া তাদের রচিত গানগুলি সংগ্রহ করে রক্ষা করার কোন ব্যবস্থা হয় নি এবং কারো সপ্রদ দৃষ্টি এদিকে নিবদ্ধ না হওয়ার সমস্ত কিছু কালের গম্বীর লুপ্ত হয়ে গেল। বাংলার জল বায়ু মাটিতে কবি গানের উৎপত্তি এবং সেই দিক দিয়ে এগুলি বাঙ্গালীর নিজস্ব সম্পদ বলা যেতে পারে। মাহু বহু সাংস্কৃতিক ক্রম বিকাশের দিক দিয়ে এর দান অপরিসংখ্য।

এ বিষয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার দপ্তরকে জানিয়ে তাদের নিকট হতে কোন সৃষ্টিস্থিতি অতিমত পাওয়া সম্ভব হয় নি। হয়ত পূর্ববঙ্গের সাংস্কৃতিক ধারাকে সুরক্ষিত করার তারা কোন প্রয়োজন উপলব্ধি করেন নি, অথবা এর শুদ্ধতা তাদের কাছে অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হয়েছে। সভ্যতার ক্রমবিকাশ এবং সাংস্কৃতিক মানদণ্ড নিয়ন্ত্রণের দিক হতে এর যে মূল্য আছে এবং বঙ্গ সাহিত্য ভাণ্ডার যে বৈচিত্র্য দিয়ে ঘেরা সে কথা আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। সাহিত্যিক কৌলঙ্গ বেন বঙ্গ সাহিত্যের যে বিভিন্ন দিক আছে তার মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে না পারে, সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। আর এই সব লুপ্ত কথা পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় আমাদের নিয়োজিত হইতে হবে। তা' হলে বাংলা-সাহিত্য ভাণ্ডারের এই বিশেষ নিকটীয় যথাযথ শুদ্ধতা এবং মূল্য দেওয়া হবে। এই প্রোত্যাহের স্বর পরিসরে দুই একটি কবি গানের উল্লেখ করে বক্তব্য শেষ করা যেতে পারে। শ্রীরাঙ্গেন্দ্র নাথ সরকারের 'শ্রীক্ষ-কীর্তনে'র গানটি এখানে উল্লেখ করে বিচার করা যেতে পারে।

চিত্রন—বাঙালি অ'মেশে,

দিক্‌চৌদা'সে,

রচিত শ্রীক্ষ কীর্তন।

পাড়ন—ও তার বত কথা,

ভাতে শুধু প'জিতা,

সুশিবার হৃদয় নিদর্শন।

১ম সুকার—এ মদিন নিভৃত নিভূর বাসে,

রাইকে বলে ভালবেসে,

প্রাণ বনদালী,—

এই লগ প্রেব পু'স্পর শেষের অঙ্গলি,

করে পক্ষ-ইন্দ্রিয় চিত্তার্থ,

চাঁরাইলাম আমি পরমার্থ,

দুল্লভ জনম গেল ব্যর্থ,

আর তো চাহি না রাই রস-কেলী।

মিল—আম'র বিহার দেও ভয়ের সত,

আমি অগামে বাই,—

তখন তাই তনে কঁদে কব রাই,

একি বল, কল।

মুখ—তুমি যাবে যথা,
আমার নিবে তথা,
এই না কথা ছিল ॥

পেচ—রিষার বলিষা নাথ কি দায় ঘটালে,
আমার জন্ম সাগরে বাঢ়ব অনল উঠালে,
কে তোমার সাথিয়ে ছিল করিতে পীরিত,
বল, বল, এই কি নাকি পুরুষের রীতি,
আগে কত না করেছি মানা,
আমায় ছুইওনা, ছুইওনা

বলে কত না করেছি মানা,
মথুরার হাটে যেতে,
সখির সাথে পথে পথে,
কত বার বয়ে দিলে বাধা,
আমারে ভালবাসিতে,
তোমার ঐ ভাল বাঁশীতে,
ডেকেছিলে বলে রাধা, রাধা,—
আমার সেই শরে প্রাণ পাণী বিধে,
কাল কাল গেল হে কৈদে কৈদে,
তোমার না পাইব যত দিন,
কৈদে কৈদে গত দিন,
করিব স্বরূপ রূপ ধ্যান বন্ধু হে,—
তাজিয়ে ব্রজ ভূমি,
কোন দেশে যাবে তুমি,
অন্তর জেনে হে অন্তর্যামী,
ছুটো কথা বল ।

* * *

অন্তরা—বন্ধুরে, আমারে কান্দায় কেন তুমি থাক হুখে,
তোমার বত রকম আগুন আছে,
দিয়ে বাণ হে আমার বুকে ।
বন্ধু তোমার ভালবাসার ভূলে,
কাল কালি দিলাম কুলে,
লোক সমাজে বের হব কোন মুখে ।
আমি ডুব দিব অকুল পাথারে,
তোমার প্রেম পীরিতের দুঃখে ॥
বন্ধু তোমার বত দুঃখ রাপি,
আমার বকে না পরশে আসি,

যদি ভালবাসি দূর থেকে,
আমি বাই যদি অকুলে মিশে,
যাব পীরিতের স্থিতি রেখে ।

* * *

২য় কুকার—আগে জানতাম তুমি রসিক হৃদয়,
করে কত সাধন ভজন,
লভিলে আমার,
তোমার পীরিতের যে আতিকুল বায়,
বন্ধু তোমার অদর্শনে,
দিন যাবে অশ্রু বরষণে,
আকর্ষণে বিকর্ষণে,
একদিন কেন পাব না তোমায় ।

এই কবিগানটির মধ্যে রাধ-কৃষ্ণ প্রেমের মধ্য দিয়ে নারক-
নারিকার প্রেম-বিরহের একটি বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে ।
নারীর হৃদয়ে যে প্রেমের শাস্ত্র ফল্গুনারা প্রবাহিত—তার
অভিব্যক্তি গানটির মধ্যে চমৎকার ভাবে ফুটে উঠেছে ।
এই গানের প্রতিপক্ষীয় কবি শ্রীনকুলেশ্বর দরকারের
প্রেমিক কৃষ্ণের উত্তরটি এখানে সম্মিলিত করা হ'ল ।
তা'হলে ঋগ ও উত্তর দুটি পাশাপাশি রেখে বিচার করলে
গানটির কাব্যিক মূল্য অসুখাবন করতে সুবিধা হবে ।

চিতান—তখন রসময়ীর রসালোপে,
বলে রসময় কানাই ।

পাড়ন—তুমি স্বামী প্রেমের পাড়ী,
প্রেম তীর্থেব সঙ্গী,
কাম গায়ত্রী তোমার জানা নাই ।

১ম কুকার—রাগে নিতাম শ্রীবন্দাবনে,

নিত্যলীলা তোমার সনে,
করি আমি অবিরাম,
আমার আরাধ্যা শ্রীবাধামাম,
রৈলোকা পৃথিবী পত,
যত্রপুরি বন্দারণ্য,
তোমার নিরাম প্রেম সাধনার ক্ষত,
পত হ'ল ব্রজধাম ॥

মিল—তোমার গুণে হ'ল আমার ইন্দ্রিয় দমন,
অগ্রকৃত নবীন বদন,
হয়েছি তোমার গুণে ।

মুখ—রাধে তোমার প্রেমের দেনা,
শোধ হবে না, আমার জীবনে ॥

পেচ—ব্রজভূমি ছেড়ে আমি কোন দেশে যাব,
ষেবছাড়া দেশ, তাবের আবেশ,
বে দেশে পাব,
আর থাকব না এ ভুলোকে,
চলে যাব সেই গোলকে,
থাকব নিত্য প্রেম আলোকে,
তুমি আমি দুইজনে ॥
বললে উঠালে পারের তরীতে,
এখন হয় ডুবে মরিতে,
মরার ভয় কর না আর,
কতু মরণ হয় না প্রেমিকার,
কামের বেহে জরা মরা,
তাদের আছে ভাঙ্গাগড়া,
মধুর কৃষ্ণ প্রেমে যারা জারা,
জরা মরার পরপার ॥

অন্তরা—বললে দিন হবে অন্ধ বরষণে,
আকর্ষণে বিকর্ষণে,
পাব কি হে নন্দলাল,
ধরে নাকো আশা ভরীর হাল,
ত্রিদাম শাপের সেই আকর্ষণ,
মর্ত্যলোকে পেলে দরশন,
এবে ক্ষণস্থায়ী বিচ্ছেদ বিকর্ষণ,
স্থায়ী-মিলন অনন্তকাল ॥

৩য় সূকার—বললে কথা ছিল বাবে যথা,
আমাকেও নিবে তথা,
হয়েছে কি বিস্মরণ,
রবে যুগ যুগান্ত এমিলন,
তোমার প্রেম রস আবাদিতে,
গৌর হব নন্দীয়াতে,
থাকবে আমার সাথে দিব্যরাসে,
হয়ে রূপের আভরণ ॥

এই ধূমা গানটির মধ্যে কবিস্বরকারের স্পর্শকাতর

মনের ভিতর দিষ্টে শাখত প্রেমের চরম অভিব্যক্তি ফুটে
উঠেছে। প্রেমিক আশা নৈরাশ্রের দোলাচল বৃত্তির মধ্য-
দিয়ে প্রেমিকাকে যে সাধনা বাক্য দিয়ে অগ্নীয় প্রেমের
চিত্র দেখেছেন—সে প্রেম চিরন্তন ও শাখত। সে প্রেমের
ক্ষয় নাই—যুগ যুগ ধরে সে প্রেম হৃদয়ে ধরে রাখা যায়।

এইবার ত্রিনিশিকান্ত সরকারের একটি ধূমা গানের
কথা আলোচনা করে বর্তমান পর্যায়ের আলোচনার
যবনিকা টানা যেতে পারে।

আমার পরাণ যারে চায়,

দিনের শেষে পথে বসে আমি আছি তার আশায় ॥

১। যার লাগিয়া কীদে আমার প্রাণ,
একলা বসে বিজন ঘরে করি তাহার ধ্যান,
যদি জুড়ায় আমার পোড়া পরাণ,
সেই প্রেমের ব্যতাস লেগে গায় ॥

২। আমার মত নিশীথ তারা,
বুঝি সারা নিশি জেগে জেগে কাঁদিয়া সারা,
তাইতে ঝরে পড়ে শিশির ধারা,
এ বেন সেই বিরহীর কান্নায় ॥

আমার পরাণ যারে চায়... ।

* * *

এই কবি গানটির মধ্য দিয়ে কবি নিশিকান্তের স্পর্শকাতর
মনের একটি করুণ অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছে। সারা
দিনের বিরহধর্ম হৃদয় নিয়ে প্রেমিকা অপেক্ষমানা,
যদি দিনের শেষে প্রেমিকের দর্শন পাওয়া যায়। মাহুকের
জীবনে যে সব হাসি কান্না, প্রেম বিরহের দোলাচল বৃত্তি
আছে—তা'ই বাংলা সাহিত্যের উপাদান হিসাবে মাহুকের
জীবনে বৈচিত্র্য ও রসের সঞ্চার করেছে। এই কবি
গানের বিভিন্ন গানের মধ্যে তা' সার্থক ভাবে ফুটে উঠেছে
—যা' সংগ্রহ করতে পারলে তার সাহিত্যিক মূল্য বাংলা
সাহিত্য ভাণ্ডারে একটি অক্ষর জিনিষ হয়ে থাকত এবং
রসপিপাসু বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক বিনিময়ের একটি মূল্যবান
দ্রব্য হতে পারত। রস পিপাসু বাঙ্গালী সে রস
থেকে বঞ্চিত হয়ে আজ কি রুচিবিকৃতির পরিচয়
দেবে ?



আধুনিকতার গতি কোন দিকে ?

সতী চক্রবর্তী

ভারতে শিক্ষার বত প্রসার হচ্ছে আধুনিকতার গতি তত বেশী বিচিত্র ও বহুমুখী হচ্ছে। এ যুগের আধুনিকতা অম্লকরণ করে আধুনিকতার পরাকাষ্ঠা দেখাচ্ছেন। শুধু অম্লকরণ নয়, আগেকার আধুনিক ইংরেজী শিক্ষিতরা যেমন বিলেত গিয়ে মেম বিয়ে করে ফিরে এসে নিজের সভ্যতার গৌরব প্রকাশ করত, তেমনি আজকালকার ভারতের আধুনিকরা সাহেব বিয়ে করে নিজের প্রগতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করছে মাদ্রাজী মেয়ে অ্যামেরিকান বিয়ে করছে, বাঙ্গালী মেয়ে ফানৌ, জার্মান কিংবা ইংরেজ বিয়ে করে স্বন্দর “বল্ডান্স” করে বেড়াচ্ছে। এই নেচে বেড়ানোর সুখ কার কত দিন স্থায়ী হচ্ছে জানা নেই। আর এ সম্বন্ধে ভেবেও কোন লাভ নেই। কারণ সকলেই জানেন কোন সুখই কোন কালে চিরস্থায়ী হয় না।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে বিদেশী বিবাহের মধ্যে আধুনিকদের আধুনিকত্ব কতখানি প্রকট হচ্ছে। পণ্ডিতেরা বলেন, পরদেশীর সঙ্গে বিবাহে বিন্দুমাত্রও আধুনিকতা নেই। গ্রীক-সেনাপতির কস্তা হেলেন চন্দ্রশুপ্তকে বিয়ে করেছিলেন। চীনের রাজকস্তা বিয়ে করেছিলেন পারস্তের রাজকুমারকে। প্রাচীনকালের আরবদের মধ্যে পরদেশী বিবাহের বিশেষ আগ্রহ ছিল। ওদের প্রবাদ ছিল—
“Marry the distant; marry not the near. The

newer filleth the eye.” আমাদের চোখের কাছে যে নতুনতর, সেই আমাদের প্রাণ-মন হরণ করে নেয়। সেই প্রাচীন প্রবৃত্তিই আমাদের আধুনিকদের প্রোৎসাহিত্ব করছে বিদেশীয় যুবকদের পাণিগ্রহণে। এতে আধুনিকতা কিছ নেই!

তা’হলে আধুনিকদের আধুনিকত্ব কোথায়? আমরা এক মাঝামাঝী জামাইবাবু সেদিন আমাদের নিয়ে সিমেন্টা গিয়েছিলেন। “আমাদের সামনের সারিতে বসেছিল কয়টি আধুনিক। তাদের কারো পরণে গাউন, কারো সালোয়ার পায়জামা, কারো বা সাড়ী, সকলেরই টোটে রঙ। আর সে রঙটাকে উজ্জ্বল করে তুলেছে সিগারেটের আলো। (তখন সিনেমা হলে ধূমপান নিষিদ্ধ হয়নি।) জামাইবাবু বললেন: দেখেছ? ওরা সব আধুনিক—সিগারেট টানছে! বড়দি প্রতিবাদ জানালেন: ধোঁয়া টানলেই আধুনিক হওয়া যায়? এদের চেয়ে অনেক বেশী ধোঁয়া টেনে থাকে আমাদের ঠুংরী মেথরাণী—সে তো তা’হতে খুবই আধুনিক।—হেসে উঠলাম আমরা। আমাদের হাসিতে চকিত পেছন ফিরে তাকাল আধুনিকরা। তাদের সকলের চোখে যেন একই প্রশ্ন: তারা কি তবে আধুনিক নয়?

ধূমপান আধুনিকতার পরিচায়ক কিনা তা নিয়ে তর্কে প্রয়োজন নেই। তবে সিগারেট টানা যে—যে কোন কুল

নারীর পক্ষে কৃতিকর পশ্চিমের ভাস্কর্যেরা সে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন। তাঁরা বলেন : যে সমস্ত গর্ভবতী নারী সিগারেটের ধূমপান করেন তাঁদের মধ্যে অকালীন গর্ভপাতের অল্পপাত অপেক্ষাকৃত বেশী।

ইংলণ্ডের ল্যাংকেশায়ারে ১৩৫৭টি গর্ভবতী নারী নিয়ে অঙ্গসজ্জানের ফলে ডাক্তারদের মনে এ বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছে যে গর্ভপাতের উপর ধূমপানের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। ঐ সকল নারীদের মধ্যে শতকরা ৪৫ জন ধূমপান করত। সিগারেটসেবী নারীদের মধ্যে গর্ভপাতের হার সিগারেট-সেবন যারা করে না তাঁদের তুলনায় ছিল। তা ছাড়া, ধূমপায়ী মায়ের শিশুদের ওজন গড়ে ধূমপানে বিরত মায়ের শিশুদের চেয়ে সাড়ে আট আউন্স কম হয়েছিল। পশ্চিমের নারীরা এখন ধূমপানের কুফল বোধ হয় বৃদ্ধিতে পারছে।

ভারতের আধুনিকাদের মতিগতি যে-ভাবে বিদেশীদের অনুকরণে খেয়ে চলেছে তাতে দেশের ভবিষ্যৎ যে কি হবে তা বলা যায় না। তাঁরা কি একবার ভেবে দেখবেন না যে দেশের অগ্রগতি যাতে বাহত হয় তার মধ্যে অগ্রগতির বিন্দুমাত্র চিহ্ন নেই ?

—

প্রসূতি-পরিচর্যা ও শিশুমঙ্গল

কুমারেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম.বি

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

৬

আধুনিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানবিদগণ-চিকিৎসকদের মতে, প্রসূতি-অবস্থায় প্রত্যেক ভাবী-জননীরই আহা-বিহার প্রভৃতির মতোই যথাচিত পোষাক-পরিচ্ছদ ব্যবহারের বিষয়েও বিশেষভাবে নজর দেওয়া প্রয়োজন। প্রসূতি-অবস্থায় খুব আটসাঁট শাড়ী-জামা, বডিস্, পেটিকোট প্রভৃতি পোষাক-পরিচ্ছদ আদৌ ব্যবহার করা উচিত নয়। কারণ, তার ফলে, গর্ভস্থ সন্তান ও প্রসূতি উভয়েরই শারীরিক গোলযোগ ও স্বাস্থ্যহানির সবিশেষ আশঙ্কা ঘটে থাকে। কাজেই এ-সময়ে প্রসূতির পক্ষে বেশ

হালকা এবং ঢিলা-ধরণের পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান করাই সঙ্গত। প্রসূতি-অবস্থায় শাড়ী, সায়ী, পেটিকোট প্রভৃতি পরিচ্ছদ ব্যবহারকালে, কোমরে খুব এঁটে না থাকে এমনভাবে আলগা বা ঢিলা ধরণে গেরোর ফাঁশ দিয়ে কাপড় পরিধান করাই ভালো—তাহলে পেটের উপর অবধা চাপ পড়ে কোনো অসুবিধা বা আগু-বিপদের সম্ভাবনা থাকবে না। যে সব মহিলা শাড়ীর বদলে ঘাগরা, পায়জামা বা 'স্কাট' (Skirt) ব্যবহার করেন। তাঁদের পক্ষেও উপরোক্ত নিয়মটি বিশেষভাবে মেনে চলা দরকার। তাছাড়া 'স্কাট' ব্যবহার কালে, তাঁর যদি কাঁধ থেকে ঝোলানো অথবা বডিস্ থেকে আঁটা ঢিলা-ঢালা-ছাঁদের পরিচ্ছদ ব্যবহার করেন তাহলে যথেষ্ট অসুবিধা এবং স্বাস্থ্যহানি বোধ করবেন। অবশ্য প্রসূতি-অবস্থায় গোড়ার দিকে, অর্থাৎ, প্রথম তিনমাসকালে পোষাক-পরিচ্ছদ সযত্নে খুব একটা কড়া-কাঁড়-ব্যবস্থা অবলম্বন বা আগাগোড়া পরিবর্তন-সাধন করার বিশেষ প্রয়োজন না থাকলেও, এ সময়ে কিস্ত সজোরে ঘাগরা, পায়জামা, সায়ী আর কাপড়ের গিট বা 'স্কাটের' কোমরবন্ধ (Belt) কিংবা আঁটসাঁট 'কর্সেজ্' (Corset) সর্বদাই বর্জনীয়। তাছাড়া যে সব প্রসূতির উদরের পেশী দুর্বল, অভিজ্ঞা থাকে বা স্তন্যবিশেষের পরামর্শমতো এ সময়ে তাঁরা বিশেষ-ধরণে তৈরী 'মেটার্নিটি-বেল্ট' (Maternity Belt) বা 'প্রসূতিকালীন কোমর-বন্ধনী' ব্যবহার করলে সবিশেষ উপকৃত হবেন। প্রসূতিদের উপযোগী এই বিশেষ-ধরণের 'বেল্ট' বা 'কোমর-বন্ধনী' ব্যবহারের ফলে, ভাবী-জননীর স্তন, উদর, কোমর এবং জরায়ুর উপর অবধা কোনো চাপ পড়ে না এবং গর্ভস্থ-সন্তানের ক্রম-বৃদ্ধি পুষ্টসাধনের পক্ষেও কোনো অন্তরায় সৃষ্টি করে তোলে না। বহু অভিজ্ঞ স্বাস্থ্য-চিকিৎসক প্রসূতি-অবস্থায় মহিলাদের জন্য যে বিশেষ-ধরণের অন্তর্বাস-পরিচ্ছদাদির ব্যবস্থা করে থাকেন, সেগুলি সচরাচর স্পোর্টস্‌স্টেপ-ইন (Sports step-in) অথবা সাঁতারের সময় (Swimming Costume) যেমন অঙ্গরাধা ব্যবহার হয়ে থাকে—অনেকটা সেই ধরণের। তবে এ ধরণের অঙ্গরাধা-পরিচ্ছদের রেওয়াজ অবশ্য সাধারণতঃ পাকিস্তান-মহাজেরা মহিলাদের মধ্যেই বেশী দেখা যায়—আমাদের দেশের

মহিলা-মহলে প্রসূতি-অবস্থায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোমরে চিলাভাবে গিট বা কবি দিয়ে শাড়ী পরার রীতি অহুত হয়ে থাকে। তাছাড়া বহু প্রবীণ-সুচিকিৎসকই আত্মকাল অতিমত প্রকাশ করেন যে প্রসূতি অবস্থায় মহিলাদের আদৌ আঁটসাঁট-ধরণের কোনো প্রকার বন্ধ-বন্ধনী (Brassire) ব্যবহার করা যুক্তিস্কৃত নয়। কারণ, স্বাভাবিক-অবস্থার মতো এ সংযোগ বন্ধ-বন্ধনী ব্যবহারে প্রসূতির স্তন ও স্তনের বোটার স্বেচ্ছাবে বৃদ্ধি-পরিপুষ্টির শুধু প্রচুর অসুবিধাই নয়, বরং সবিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনাও দেখা দেয়। অনেক আধুনিক ধাত্রীবিজ্ঞাবিশারদেও প্রসূতি-অবস্থায় মহিলাদের বিশেষ এক ধরণের ‘কোমর-বন্ধনী’ বা ‘মেটার্নিটি-বেল্ট’ (Maternity Belt) পরিধান করার সুপরামর্শ দিয়ে থাকেন। বিশিষ্ট ছাঁদে তৈরী এ-ধরণের কম-বেশী দামের নানারকম ‘মেটার্নিটি-বেল্ট’ সচরাচর বড় বড় শহরের বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। কাজেই শহরবাসিনী-প্রসূতিদের পক্ষে, এ ধরণের ‘কোমর-বন্ধনী’ বা ‘মেটার্নিটি-বেল্ট’ সংগ্রহ করা এমন কিছু দুঃসখা ব্যাপার নয়। তবে যে সব পল্লীবাসিনী-প্রসূতি বিশেষ ভাঁদে রচিত এ-ধরণের ‘মেটার্নিটি-বেল্ট’ বা ‘কোমর-বন্ধনী’ ব্যবহার করতে চান, তাদের পক্ষে, অবশ্য এগুলি আত্মীয়-বন্ধুদের সহায়তায় শহরের দোকান থেকে সংগ্রহ করে আনা অথবা ঘরে বসে সেলাই করে বানিয়ে নেওয়াই সুবিধাজনক। এ ধরণের ‘মেটার্নিটি-বেল্ট’ বা ‘কোমর-বন্ধনী’ রচনা করা খুব একটা কঠিন কাজ নয়—বিশেষতঃ হুটীশিল্পে যাদের অল্প-বিস্তর দক্ষতা আছে—সামান্য চেষ্টা করলেই তাঁরা এগুলি অনায়াসেই ঘরে বসে বানিয়ে নিতে পারবেন। এ-ধরণের ‘মেটার্নিটি বেল্ট’ বা প্রসূতিদের ব্যবহারোপ-যোগী ‘কোমর-বন্ধনী’ বানানোর জ্ঞান সচরাচর বেশ মোলায়েম নয়ম ‘তোয়ালের কাপড়’ বা ‘Towel-Cloth’ বা দেশী ‘মলমল’ জাতীয় কাপড় ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সাধারণতঃ লম্বায় সওয়া ষেড়গজ (১½ গজ—১½ গজ) এবং চওড়ায় একগজ দুই ইঞ্চি (১গজ ২” ইঞ্চি) মাপের কাপড় নিলেই এ-ধরণের ‘মেটার্নিটি-বেল্ট’ বা ‘প্রসূতিদের কোমর-বন্ধনী’ বানানোর কাজ চলবে। বিশেষ-ধরণের এই ‘কোমর-বন্ধনী’ রচনার রীতি

হলো— প্রসূতির ‘কুচকী’ বা ‘Groin’ থেকে স্তন-ঘরের তলদেশ পর্যন্ত বেহাংশের যে ব্যবধান, তার মাপ নিয়ে কাপড়ের টুকরোর চওড়া দিক স্থির করা। তারপর সামনের দিকের কাপড়ের ৩’ ইঞ্চি জায়গা মুড়ে, উপরের দিক থেকে এক-চতুর্থাংশ ($\frac{1}{4}$) বাদ দিয়ে আকৃতিতে অনেকটা ঠিক তীরের ফলার মতো ধরণে পটি মুড়ে পরিচ্ছদটির উপর দিক থেকে নীচের দিকে ইতিপূর্বে বর্ণিত প্রণায় এক-চতুর্থাংশ ($\frac{1}{4}$) কাপড় বাদ রেখে সেলাই দেবেন। কাপড়ের উপরদিকে তিন ইঞ্চি (৩”) মাপ থাকলেও, নীচের দিকে বস্তির কাছে যতই অগ্রসর হবেন, ততই তীরের ফলার ছাঁদে ক্রমশঃ সৰু ধরণে সেলাই শেষ করতে হবে। এভাবে সেলাইয়ের ফলে, ‘বন্ধনীটি’ প্রসূতির ‘কটিদেশ’ বা কোমরের মাপের সঙ্গে ঠিকমতো খাপ খেয়ে বসবে। ‘বন্ধনীটি’ যাতে বরাবর যথাযথ জায়গায় বজায় থাকে, সে জ্ঞান প্রসূতির নিত্যমের কাছে সেলাইয়ের-কাপড়ের নীচের দিকে এক-চতুর্থাংশ জায়গা থেকে দু’পাশে দুটি ‘ঝুলনী’ বা ‘সাসপেন্ডারস্’ (suspenders) সুব্যবস্থা করা প্রয়োজন। পাক্ষাত্য-মহিলাদের পরিচ্ছদ-রীতি অনুসারে যারা ঝালু পর্যন্ত লম্বা মোজা ব্যবহার করেন, এ ‘ঝুলনী’ বা ‘সাসপেন্ডারস্’ দুটি তাঁদের পরিধেয় দুটির উপর-প্রান্তে সংযুক্ত করে দিতে পারেন। তবে আমাদের দেশের মহিলারা, অর্থাৎ ঝাড়া শাড়ী, ঘামরা প্রভৃতি পরেন এবং পাক্ষাত্য-মহিলাদের মতো মোজা ব্যবহার করেন না তাঁদের পক্ষে এ ‘বন্ধনী’ পরিধানের রীতি হলো—প্রসূতির নিত্যমের তলদেশ দিয়ে এনে কাপড়ের সামনের দিকে ‘ঝুলনীর’ ফাঁশ এঁটে দিলে, ‘বন্ধনীটি’ নাড়াচড়ার ফলে, সহজে সরে বা স্থানচ্যুত হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকবে। ‘ঝুলনীর’ দুদিকের দুটি ফাঁশ আঁটা ছাড়াও, ‘বন্ধনী’ যাচ্ছে আলাগা হয়ে স্থানচ্যুত হয়ে না পড়ে, সে জ্ঞান ‘বন্ধনীর’ উপরাংশে অর্থাৎ, প্রসূতির দু’দিকের কাঁধের উপর দিয়ে দুটি ‘টানা’ দেবার উদ্দেশ্যে, দুই ইঞ্চি (২”) চওড়া এবং ৩৬” ইঞ্চি থেকে ৪০” ইঞ্চি লম্বা স্ট্র্যাপ-সেমিজের মতো দুটি কিতা ৪” ইঞ্চি থেকে ৬” ইঞ্চি ব্যবধান রেখে পরিধানটিতে সেলাই করে দিতে হবে। এ-ধরণের ‘কোমর-বন্ধনী’ বা ‘মেটার্নিটি-বেল্ট’ পরিধানকালে, প্রসূতির পক্ষে বিছানায় চিত্ত হয়ে শুয়ে

পোষাকটি দেহে এঁটে স্থিতিভাবে সেক্টিপিন গেঁথে বেশ কায়েমী করে নেওয়ার উচিত। ‘বন্ধনী’ পরিধানের রীতি হলো—প্রথমে নীচের দিকে ১৮” থেকে ২’ ইঞ্চি বাদ রেখে, স্থূণের অংশের কাপড় বেশ ঝাঁটসাঁটভাবে টেনে সামনের দিকে লম্বালম্বি-ভঙ্গীতে একটি সেক্টিপিন এঁটে, সামান্য ব্যবধানে পরপর আরো অন্ততঃ চারটি সেক্টিপিন গেঁথে পিছদটি কায়েমী ধরণে অঙ্গে ধারণ করা। তারপর ‘বন্ধনীর’ উপরাংশে টানা-দেবার ফিতা দুটিকে একের পর এক কাঁধের উপর দিয়ে ডানদিকেরটি বাঁ-দিকে এবং বাঁ-দিকেরটি ডান-দিকে—অর্থাৎ, X-চিহ্নের মতো ছাঁদে নিতর ও ফুঁচকীর ছ’পাশে মজবুতভাবে ফাঁশ দিয়ে এঁটে নিতে হবে। পাশ্চাত্য-প্রধায় মোজার সঙ্গে এ ধরণের ‘বন্ধনীর’ ফিতার ফাঁশ আঁটতে হলে অবশ্য শয্যায় শয়নের বদলে, প্রস্থতির পক্ষে দাঁড়িয়ে পরে নেওয়াই সুবিধা এবং স্বচ্ছন্দ্যও বেশী।

পোষাক-পরিচ্ছদ ছাড়াও, প্রস্থতি-অবস্থায় মহিলাদের যথোচিত-ধরণের জুতা ব্যবহারের দিকেও বিশেষ দৃষ্টিদান করা দরকার। আগেকার আমলে আমাদের দেশের মহিলা-সমাজে সচরাচর জুতা ব্যবহারের বিশেষ রেওয়াজ না থাকলেও, ইদানীং তার ব্যাপক-ব্যবহার সুপ্রচলিত হয়েছে—এমন কি, পল্লী-অঞ্চলেও। কাজেই যথোচিত জুতা ব্যবহারের দিকে প্রস্থতিদের রীতিমত নজর রাখা প্রয়োজন। একালের অভিজ্ঞ ধাত্রীবিজ্ঞাবিশারদদের মতে প্রস্থতি অবস্থায় উঁচু গোড়ানীর জুতা আদৌ ব্যবহার করা উচিত নয়।—তার ফলে, প্রস্থতির ও গর্ভস্থ সন্তানের সুপ্রসব-সংক্রান্ত ব্যাপরে নানান অসুবিধা ও বিপদ দেখা দিতে পারে। তাছাড়া খুব বড়-চামড়ার তৈরী জুতাও যেমন প্রস্থতির পক্ষে একান্তই বর্জনীয়, পক্ষান্তরে, খুব নয়ম-চামড়া বা সৌখিন কাপড় দিয়ে বানানো জুতাও ব্যবহার করা অসুচিত। তবে শীতকালে এবং শীত-প্রধান অঞ্চলের প্রস্থতিদের জুতা ব্যবহার করা বিশেষ প্রয়োজন। কারণ, জুতা-বিহীন অবস্থায় বিচরণের কলে, অতিবেই ঠাণ্ডা লেগে তাঁদের শরীর খারাপ হইবে অস্থূল হবার বখেই সম্ভাবনা থাকে। কাজেই মোটামুটিভাবে, সকল প্রস্থতিরই কর্তব্য—অভিজ্ঞ স্থতিকিংসকের পরামর্শ-জুসারে চামড়ার চটি-চমল, ত্যাগাল বা উপযুক্ত কোনো

জুতা পরিধান করে নিজের ও ভাবী-সন্তানের স্বাস্থ্যরক্ষার দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা। খুব সরু-স্থূণের বা কচা-আঁট নয়, ভিতরে বেশ স্বচ্ছন্দে পা খেলে, প্রস্থতি অবস্থায় এমন ধরণেরই চওড়া-স্থূণওয়ালা জুতা ব্যবহার করাই সমীচীন।

আগামী সংখ্যায় প্রস্থতি পরিঃখ্যা ও শিশুসকল স্বস্থে আরো কয়েকটি দরকারী-প্রসঙ্গ আলোচনার বাসনা রইলো।
(ক্রমশঃ)



হাতের কাজ

কাঁদা-মাটির কারু-শিল্প

রুচিরা দেবী

ইতিপূর্বে সংসারের দৈনন্দিন কাজকর্মের অবসরে নিজের হাতে কাজ করে রঙ-বেরঙের কাপড়ের টুকরো, কাগজ-কার্ডবোর্ড আর কাগজের মণ্ড (Paper pulp), মাছের আঁশ, চামড়া, রেশম ও পশমের স্ত্রো, পুরোনো তোয়ালে মোজার টুকরো প্রভৃতি হরেক’রকম উপকরণের সাহায্যে বিচিত্র-অপকৃপ ছাঁদের বিবিধ সৌখিন-স্বন্দর ও নিত্য প্রয়োজনীয় কারুশিল্প সামগ্রী রচনার যেমন হৃদিশ দিয়েছি এবারেও তেমনই ধরণের আরেকটি অভিনব-প্রসঙ্গের আলোচনা করছি। এবারের প্রসঙ্গটি হলো—‘কাঁদা-মাটির কারু-শিল্প’।

সচরাচর দেখা যায় যে কাঁদা-মাটির তাল নিয়ে নিত্যর খেয়াল-খুশীমতো ছোট বড়, ভালো-মন্দ নানা-ছাঁদের নানান সামগ্রী গড়ে তোলার দিকে আমাদের দেশের শিশু ও বয়স্কদের রীতিমত অহরহাগ। কারণ, কাঁদা-মাটির সঙ্গে নদী-নাড়ক বাঙলা দেশের জনসাধারণের ঘনিষ্ঠ-

নিবিড় স্বর্ধ-সম্পর্ক অবস্থানকাল থেকে চলে আগছে। তাই ইতিহাসের আদিম যুগ থেকে আজও পর্যন্ত এদেশের অধিবাসীরা স্থল-স্থল-শস্ত্রামলা মাটির বৃকে নিপুণ কোশলে নানা রকম ফল-ফল, তরী-তরকারী, সোনার কসল ফলানো ছাড়াও, নিছক কৃষ্টি-কলা চর্চার ঐকান্তিক-আগ্রহে সামান্য কাঁদা-মাটির তাল দিয়ে অভিনব-প্রখ্যাত হরেক-ছাঁদের এত সব বিচিত্র-অপরূপ ঘট, কলসী, সরি, খালা, বাটি, গেলাস, কুঁজো, হাঁড়ি-কুড়ি প্রভৃতি ধরকরার নিত্য-প্রয়োজনীয় তৈজস-সস্তার আর মনোরম-সুন্দর পুতুল-প্রতিমা, খেলনাপত্র, সৌখিন-কারুকার্যময় দেউল-মন্দির ইয়ারতের ইট, টালি, পোড়ামাটির পাটা (Terra-Cotta Plaques) প্রভৃতি বিবিধ কারুশিল্প-সামগ্রী রচনার কাজে যে অসামান্য পটুতার পরিচয় দান করেছেন, বিশ্বের কলা-রসিক-সমাজে তার কদর অসাধারণ। বাস্তবিক, কাঁদা-মাটির কারুশিল্প-রচনার বাঙলার মুংশিল্পীদের বহুখুঁ-প্রতিভা এমনই অনন্তসাধারণ যে দুনিয়ার আর কোথাও সহজে তার তুলনা মেলে না। তাই এবারে বাঙলার সেই প্রখ্যাত-সনাতন অভিনব-অপরূপ লোক-কলা—“কাঁদা-মাটির কারু শিল্প” সম্বন্ধে মোটামুটি কিছু হদিশ দিচ্ছি।

অনেকের ধারণা—কাঁদা মাটির কারু-শিল্প সামগ্রী রচনা নিত্যন্তই দুঃসাধ্য-কঠিন কাজ...বিশেষ দক্ষতা না থাকলে, কারো পক্ষেই এ-ধরনের শিল্প-কাজে সাফল্যলাভ সহজে সম্ভব নয়। এমন গোড়া ধারণা পোষণ করা কিন্তু অহুচিত। আসলে, কাঁদা-মাটির কারু-শিল্প সম্বন্ধে মোটামুটি কয়েকটি সহজ সরল নিয়ম-পদ্ধতি জানা থাকলে, যে কোনো শিক্ষার্থী সামান্য চেষ্টাতে অনায়াসেই সোজা উপায়ে নিজের হাতে পুরোপুরি নিখুঁত-পরিপাটি ধরনের না হলেও অল্প-বিস্তর মনোরম-সুন্দর ছাঁদের নানা রকম ছোটখাটো সৌখিন ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী গড়ে তুলতে পারবেন। তবে সে সব নিয়ম-পদ্ধতির পরিচয় দেবার আগে, কয়েকটি দরকারী বিষয় জেনে রাখা ভালো।

কাঁদা-মাটির তাল নিয়ে সৌখিন অথবা দৈনন্দিন ব্যবহারের উপযোগী কোনো কারুশিল্প-সামগ্রী রচনার সময় মুংশিল্পীকে সর্বদাই খেয়াল রাখতে হবে যে সব রকম মাটিতে সব ধরনের কাজ করা যায় না...অর্থাৎ,

পুতুল-প্রতিমা-খেলনা প্রভৃতি সচরাচর যে-জাতের মাটি ব্যবহার হয়, ঠিক তাই দিয়েই হাঁড়ি, কলসী, সরি, বাট, গেলাস, প্রভৃতি নিত্য-প্রয়োজনীয় সাংসারিক তৈজসপত্র বা ইট, টালি, খোলা প্রভৃতি বহুভাবে তৈরী করা সম্ভব নয়। কাজেই বিশেষ ধরনের কাঁদা-মাটির কারুশিল্প-সামগ্রী বানানোর সময় এমনি নানান অহুবিধা দেখা দেয় বলেই অভিজ্ঞ মুংশিল্পীরা তাঁদের বিভিন্ন-ছাঁদের হাতের কাজের জন্য মোটামুটিভাবে—দো-আঁশ মাটি, বেলে মাটি, পলি বা ধ্বশ মাটি, কাঁদা-মাটি আর এঁটেল মাটি—এই পাঁচটি বিশেষ-শ্রেণীতে মাটিকে বিভক্ত করেছেন।

দো-আঁশ মাটিতে সাধারণঃ বালির ভাগ আর আবশ্যকীয় জৈব-পদার্থ থাকে নিত্যন্তই অল্প—প্রায় অর্ধেকেরও কম...বাকীটুকু শুধুই কাঁদা। তার ফলে, দো-আঁশ মাটিতে চট্‌চটে-বাধুনি ভাবেরও যেমন অভাব, বালির স্বল্পতার জন্য কারুশিল্প-সামগ্রী রচনার পক্ষেও তেমনি অহুবিধা জনক। কাজেই সচরাচর চাষবাস করে কেবলমাত্র ফসল-ফলানো ছাড়া মুংশিল্পীদের সৌখিন-সুন্দর কারুকালা-চর্চার ব্যাপারে দো-আঁশ মাটি বিশেষ খুব উপযোগী নয়। তবে সুন্দর-শিল্পকলার কাজের জন্য অল্পপুঙ্খ হলেও, দো-আঁশ মাটি ইট, টালি, খোলা প্রভৃতি নানা রকম প্রয়োজনীয়-সামগ্রী রচনার কাজে ব্যবহার করা যায়।

বেলে-মাটিতে অবশ্য বালির ভাগ খুব বেশী থাকে... তবে মাটির কণা অল্প থাকে এবং সেগুলিও তেমন সুন্দর নয়। তাই এ মাটিতে জলধারণের ক্ষমতার একান্ত অভাব সহজেই শুকিয়ে বরবরে হয়ে যায়। কাজেই মুংশিল্পের কাজের পক্ষে এ-ধরনের মাটি বিশেষ হুবিধার নয়—তবে শাক-সজী, তরী-তরকারী ফলনের আর হিসাবমতো পরিমাণে এঁটেল-মাটির সঙ্গে মিশিয়ে মুংশিল্পের কাজ করার পক্ষে বেলে-মাটি অবশ্য বেশ উপযোগী হয়।

পলি বা ধ্বশ-মাটি ফসলের পক্ষে খুব উপযোগী হলেও মাটির কারুশিল্পের ঠিক তেমনটি নয়। কারণ, নদীতীরে সংগৃহীত এ-ধরনের মাটিতে সচরাচর থাকে—জোয়ারের জল-স্রোতে পরিবাহিত বিবিধ রাসায়নিক লবণ (Chemical Salts), জৈব আর খনিজ-পদার্থ।

কাঁদা-মাটি নামে পরিচিত হলেও, নিছক-কাঁদা-মাটিতে

কিছু মংশিল্লের কাজ করা বিশেষ সুবিধাজনক নয় আর দীর্ঘস্থায়ী হয় না। তার কারণ, এ মাটিতেও থাকে বিবিধ জৈবপদার্থ আর বালির প্রাচুর্য। ভিজা-অবস্থায় কাদা-মাটি দিয়ে মংশিল্লের কাজ করা সম্ভব হলেও, এ ধরণের উপাদানে বহন-গুণের একান্ত অভাব থাকার দরুন, রোদ বাতাস লেগে এ মাটি দিয়ে গড়া শিল্প-সামগ্রী শুকিয়ে গেলে অল্পকালের মধ্যে বালু-কণার মতো নিতান্ত সহজেই ঝরে পড়ে যায়। তার ফলে, মংশিল্ল-সামগ্রীটি বিশেষ দীর্ঘস্থায়ী ও স্থায়-পরিপাটি ছাঁদের হয়ে ওঠে না।

মংশিল্লের কাজের জন্য সব চেয়ে উপযুক্ত হলো—এঁটেল-মাটি। এঁটেল-মাটির সূক্ষ্ম কণাগুলিকে জল দিয়ে ঠেলে মেখে নিলে আগাগোড়া বেশ ময়েন-দিয়ে-মাখা লুচির ময়দার তালের মতো চট্‌চটে-আঠালো ধরণের হয় এবং সে মাটিতে কোনো সৌখিন-ছাঁদের কারুশিল্প-সামগ্রী গড়ে ওঠে-বাতাসে শুকিয়ে নিলে সেটির নরম তুলতুলেভাব ঘুচে গিয়ে আগাগোড়া বেশ পাথরের মতো শক্ত-মজবুত, দীর্ঘস্থায়ী আর কুচকুচে কালো-রঙের হয়ে ওঠে। এই কারণেই মংশিল্লীরা সচরাচর পুতুল-প্রতিমা খেলনা প্রভৃতি সৌখিন কারুশিল্প সামগ্রী রচনার কাজে এঁটেল-মাটি ব্যবহার করে থাকেন। তাছাড়া হিসাব মতো পরিমাণে এঁটেল-মাটির সঙ্গে বালি-মাটি সংমিশ্রিত করে তারা সাধারণতঃ ছোট-বড় নানা ছাঁদের হাড়ি, কলসী, ঘট-ফুলদানী, সরা-গেলাদ-ভাঁড় প্রভৃতি নিত্য-প্রয়োজনীয় সামগ্রী বানিয়ে তোলেন।

সাধারণতঃ, মংশিল্লীর প্রয়োজন এবং পছন্দ মতো উপ-রোক্ত এই পাঁচটি বিশেষ-ধরণের উপাদান ব্যবহার করেই সৌখিন ও দরকারী মাটির কারুশিল্পী সামগ্রী রচিত হয়। তবে একেবারে আনকেরা-ধরণের মাটি দিয়ে কোনো মংশিল্প-সামগ্রীই বানানো যায় না। কাজেই বৃষ্টি-পন্থায় টেকসই-ধরণের যে কোনো মংশিল্প-বানাতে হলেই, গড়নের মাটিকে উপযুক্তভাবে হিসাব মতো পরিমাণে জল দিয়ে মেখে আগাগোড়া তৈরী করে নেওয়া দরকার। তবে এবারের স্থানভাবের কারণে সে সম্বন্ধে আলোচনা করা সম্ভব নয়। তাই আগামী সংখ্যার এ বিষয়ে মোটা-মুঠি আভাস দেবার বাসনা রইলো।

তবে এবারের মতো প্রসঙ্গ শেষ করবার আগে,



রূপকথার রাজার
পুতুল



রূপকথার রানী
পুতুল

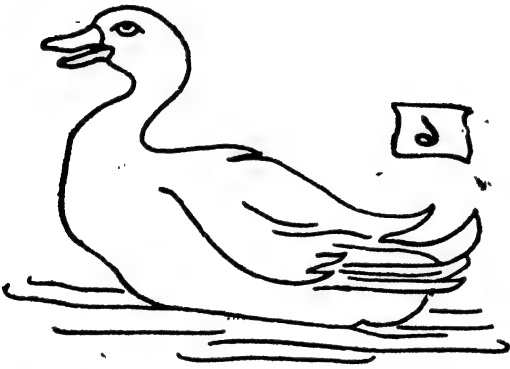
শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য উপরে দুটি সহজ-সরল ছাঁদের বিচিত্র নক্সাদার পুতুল অথবা ঘর-সাজানোর উপকরণ রচনার নক্সা-নমুনা প্রকাশিত করা হলো। বারম্বার কাদা-মাটির সাহায্যে এই দুই ধরণের সৌখিন-অভিনব মংশিল্প-সামগ্রী তৈরীর কলা-কৌশলের হৃদিশ জানানোর চেষ্টা করবো।

কমণ:

শুচী-শিল্পের নতুন নক্সা-নমুনা

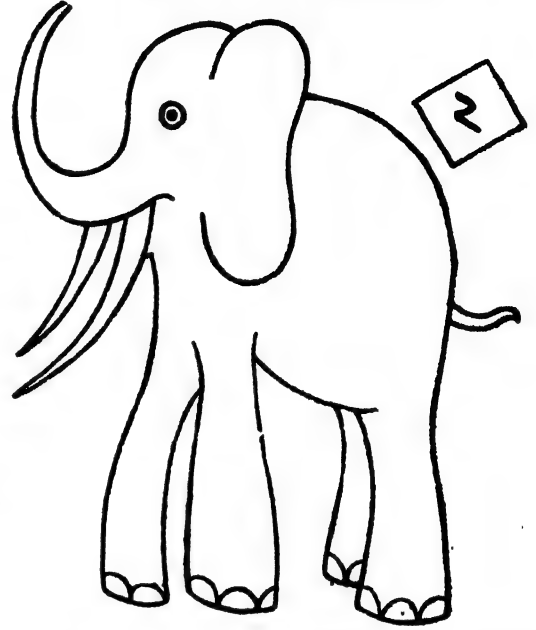
হিরণ্যী দেবী

সহজ উপায়ে নানারকম রঙীন সূতের সাহায্যে সূচী, রেশমী বা পশমী কাপড়ের উপর বিভিন্ন এম্ব্রয়ডারী-সেলাইয়ের কাজ করে ছোট ছেলেমেয়েদের ক্রক, রম্পার, সান্-সুট, নিকারবোকার প্রভৃতি পোষাক-পরিচ্ছদ বাতে অশোভিত-মনোরম ছাঁদের বানিয়ে তোলা যায়, সেই উদ্দেশ্যে এবারে কয়েকটি নতুন-ধরণের নক্সা-নমুনা উপহার দেওয়া হলো। রঙ-বেগুনের সূতো দিয়ে এম্ব্রয়ডারী ছাড়াও, মানানসই-ধরণের রঙীন-কাপড়ের টুকরো দিয়ে 'এ্যাপ্লিক'-পদ্ধতিতে (Applique-Work) সূচীশিল্পের কাজ করেও এসব নক্সা-নমুনা অনায়াসেই ফুটিয়ে তুলতে পারবেন।

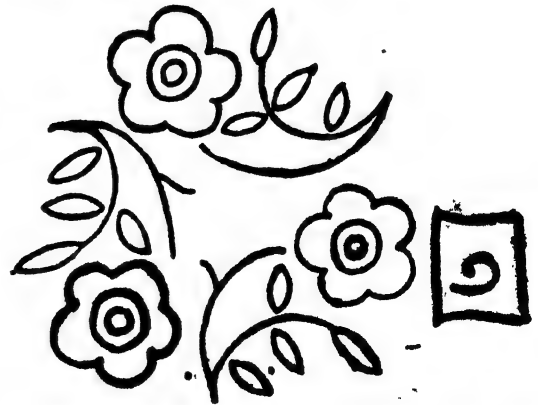


উপরের ১নং ছবিতে অপে-ভাসন্ত হ'লে যে নক্সা-নমুনাটি দেখানো হয়েছে, হালকা বা গাঢ় ধরণের যে কোনো নীল, সবুজ, হলুদে, লাল, কালো, কাপড়ের শাদা, ক্রেক-হলুদে, গোলাপী, আশমানী বা কালো রঙের সূতের সাহায্যে এম্ব্রয়ডারী কিংবা জবির কাপড়ের রঙের সঙ্গে মানানসই দেখায়, এমন কোনো রঙীন-কাপড়ের টুকরোর সাহায্যে 'এ্যাপ্লিক' সূচীশিল্পের কাজ করে অনায়াসেই এবং দ্রুত স্বন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা যাবে।

নীচের ২নং চিত্রে ও'ফ-তোলা হাতীর যে বিভিন্ন নক্সা-নমুনাটি দেখানো হয়েছে, সেটিকেও সহজেই রচনা করা যাবে—সূচীশিল্পের উপরোক্ত উত্তর-প্রাধাভেই।



জীব-জন্তুর ছবির বদলে ছোট ছেলেমেয়েদের পোষাক-পরিচ্ছদে যদি কোনো ফুল-লতা-পাতার সৌধিন-স্বন্দর কারুকার্যময়—নক্সার ছাঁদ ফুটিয়ে তোলায় বাসনা হয়, তাহলে নীচের ৩নং চিত্রে যে বিভিন্ন নমুনাটি দেখানো হয়েছে, সেটিকে উপরোক্ত উত্তরবিধ-প্রকার অনায়াসেই সূচীশিল্পের কাজে ব্যবহার করতে পারেন।



কাগজেই সেলাইয়ের নক্সা বেছে নেবার সময়, ছোট

ছেলেমেয়েদের মতামত জেনে নেওয়াটাই বোধহয় সর্বোচ্চ
দরকার—তাই নয় কি?—অর্থাৎ, কোন নজ্ঞাটি
তাঁদের বেশী পছন্দ হয়—মন ভরে তোলে আনন্দে-
উন্নত।



সুধীরা হালদার

এবারে বলছি—আমাদের দেশের গুজরাট-অঞ্চলের
অধিবাসীদের বিশেষ-প্রিয় অভিনব-স্বভাৱ বিচিত্র এক-
ধরণের মিষ্টান্ন রান্নার। এ খাবারটির নাম—‘বাহুলি’।
অপকৃত-মুখরোচক মিষ্টান্ন-জাতীয় এই গুজরাতি-খাবার
রান্নার রস যে সব উপকরণ প্রয়োজন গোড়াতেই তার
একটা মোটামুটি বন্দ দিয়ে রাখি। অর্থাৎ, গুজরাটী-
প্রখ্যাত ‘বাহুলি’ রান্নার রস চাই—চাষের পেয়ালার চার-
পেয়লা পরিমাণ দুধ, গোটা আঠক বাঁদাম, তিনটি ছোট
এলাচ, বড় চামচের দু’-চামচ চিনি আর চায়ের চামচের
এক-চামচ চরোলা। উপরের বস্তুসমূহ উপকরণগুলি দিয়ে

তিন-চারজননের আহারের উপযোগী ‘বাহুলি’ মিষ্টান্ন রান্না
করা যাবে।

উপকরণগুলি সংগ্রহ হবার পর, রান্নার কাজে হাত
দেবার আগে প্রথমেই বাদামের খোসা ছাড়িয়ে সেগুলিকে
আগাগোড়া মিহি-ছাঁদে কেটে নিন। এ কাজ সারা হলে,
ছোট এলাচগুলির খোসা ছাড়িয়ে, এলাচের দানা আগা-
গোড়া বেশ মোটা-ধরণে গুঁড়ো করে রাখুন। তারপর
উনানের আঁচে রন্ধন-পাত্র চাপিয়ে, সে পাত্রে দুধটুকু ঢেলে,
কিছুক্ষণ হাতার সাহায্যে অনবরত নাড়াগোড়া করে ভাল-
ভাবে জাল দিয়ে ফুটিয়ে নিন। এমনভাবে জাল দিয়ে
ফোটানোর ফলে, চার-পেয়লা দুধ ঘন এবং ক্রমে দেড়-
পেয়লার পরিণত হলে, সেই ঘন-দুধের পাত্রে চিনি
মিশিয়ে, মিশ্রণটিকে আরো কিছুক্ষণ উনানের আঁচে রেখে
ফুটিয়ে নেবার পর, দুধ-ভরা রন্ধন-পাত্রটি উনানের উপর
থেকে নামিয়ে ফেলুন। তাহলেই রান্নার পালা শেষ হবে।
এবারে ঐ ফুটন্ত-ঘন দুধের পাত্রে বাদামের কুচি, ছোট-
এলাচ-দানার গুঁড়ো আর চরোলা মিশিয়ে, সমুদায় করা
‘মিশ্রণটিকে’ কোনো পরিষ্কার-নীতল জায়গায় রেখে
‘জুড়োতে দিন। এভাবে জুড়িয়ে নেবার ফলে, ‘মিশ্রণটি’
আগাগোড়া বেশ ঘন-থকথকে জমাট-ধরণের হয়ে উঠলে,
খাবারটি সযত্নে প্রিয়জনদের পাতে পরিবেষণ করুন—
আপনার হাতের রান্না বিচিত্র-অভিনব এই ‘বাহুলি’
মিষ্টান্নের উপাদেয়-স্বভাদে তাঁরা যে পরম পরিতৃপ্তি লাভ
করবেন—সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

আগামী সংখ্যায় এমনি ধরণের আরেকটি বিচিত্র-
অভিনব ভারতীয় খাবার রান্নার পরিচয় দেবার বাসনা
রইলো।





আর্টিষ্ট

ব্রজগোপাল মারা

প্যালেটের সবকটা রং ওর মনের রসে গুলে খেয়েছে অনন্ত! সেই রংয়ে ছবি আঁকে সে। ছবি আঁকে সে মনের পটে। সেই ছবি টাঙিয়ে রাখে সেই দেওয়ালে—বার আদি নেই, অন্ত নেই। বার অধিকারী একমাত্র সে। সে দেওয়াল অনন্তর মন।

কিন্তু আর্টিষ্ট অনন্ত আজ যদি কবিতা লিখতে জানত, তাহলে শব্দী রায়কে নিয়ে এখনি কবিতা লিখে ফেলত। সেটা পারলনা বলেই, শব্দীকে আঁকে নিল ওর সেই মনের পটে। ইচ্ছে রইল, কোয়ার্টায়ে ফিরে ক্যানভাসের ওপর ফোটাতে সে ছবিটা।

ছবি আঁকাটা তার পেশা নয়। পেশায় সে উদয়ন্তনগরের এ্যাসিস্ট্যান্ট স্টেশন মাস্টার। ছবি আঁকাটা তার নেশা। সেই নেশার ঘোরেই কলকাতার বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়স্বজন সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে এখানে এসে, এই পাণ্ডববর্জিত জায়গায় পড়ে মরছে। এ ব্যাপারে ওর নিজস্ব মতটা হ'ল—ছবি আঁকা, গান বা ললিতকলার যে কোন একটা দিক নিয়েই বলনা কেন, পেশা হিসেবে নিলেই তার অর্থ-মূল্য ছাড়া আর কোন দামই থাকেনা। ও বলে, যে কাজের প্রেরণা আনে একজন বা একটি বিশেষ গোষ্ঠীর ফরমাস্ থেকে, কালের কটিপাথরে যাচাই হওয়ার সময় কাকিটা তার ধরা পড়বেই পড়বে।

ওর এই বড় বড় কথাগুলো যখন কলকাতার বন্ধুমহলে বলে বেড়াত, তখন বাহবা পেত সহজেই। কিন্তু শেষেবে দেখা গেল,—ওর সেই বন্ধু, তাদের অনেকেই খ্যাতিনামা হয়েছে শুধু বাংলা দেশেই নয়, ভারতের বাইরেও। আর অনন্ত পড়ে রয়েছে যে তিমিরে সেই তিমিরে।

বন্ধুরা ওর অসাক্ষাতে বলত, হুচারটে প্রবন্ধটি পড়ে

বড় বড় বুলি আওড়ান যায় সহজে। কিন্তু বাস্তব বলে একটা কথা আছে তো? তার কঠোরত্বকে অস্বীকার করবে কে! অর্থক বাদ দিখে কোন কথাই ভাবা যায়না একালে। এটা অর্থনৈতিক যুগ। আর কিছু নাহোক, রং তুলি ক্যানভাসটাও তো আর গাছের ফল নয়। তবে সেটাকে বড় করে না দেখলেই হল। এটা সময়েরও যুগ বটে। ওর বন্ধুরা বুদ্ধিমান ছিল নিশ্চয়।

তবে, অনন্ত যে একেবারে বোকা, সে কথাও বলা যায়না। পেটের চিন্তা তাকেও করতে হয়েছে। দৈনন্দিন রুটীনে বাঁধা কর্মমাসী কাজই করতে হয় তাকে এখন। আর্টিষ্ট হিসেবে নয়। গৌ বজার রাখতে গিয়ে মূল্য দিতে হয়েছে তাকে পুরোমাত্রায়। আর্টিষ্ট অনন্ত গোঁধরীকে এখন মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয় রেলের ঘানি টেনে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত।

আজকেও যেমন ডাউন প্রাক্টিকমটার ওপাশে ওয়েটিং রুমের পাশে ফেলিংয়ের যে গেটটা আছে, অনন্ত দাঁড়িয়েছিল তার একপাশে। এখানে দাঁড়িয়ে আগন্তুক যাত্রীদের কাছ থেকে সে টিকট সংগ্রহ করে। এটাও তার কাজ। অনন্ত জানে,—রেলকর্মচারীদের জন্মে একটা অলিখিত নিয়মাবলী অদৃশ্যভাবে টাঙান থাকে রেলওয়ের সর্বত্র। তাকে না মেনে উপায় নেই। না মানলে অনেক সময় চাকরীতেও নাকি অদৃশ্য হাতের টান পড়ে। কোন্ কাজটা কার সে বিচারবোধ নেই সে হাতের।

কিন্তু আজকে, ওই টিকিট সংগ্রহের সময় অনন্ত যে কাজটা করে বসল, সেটা লিখিত অলিখিত কোন নিয়মের মধ্যেই পড়েনা। কাজটা গরিব। ওর অফিসঘরের দেওয়ালে টাঙান রেলকোম্পানীর ছাপানো নিয়মাবলীটার

লেখা আছে,—‘কোন কর্মচারী কর্মরত অবস্থায় অন্তরমনক হয়ে কাজে গাফিলতি করলে তাকে শাস্তি পেতে হবে।’ অনন্তরও তাই পাওয়া উচিত। কিন্তু চার্জসীট দেওয়ার মত এখন এখানে কেউ নেই। এ ট্রেনের জোয়াল এখন অনন্তর কাঁধে।

আর কাজটা গহিত হলো এমন কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে বাওয়ার মত নয়। হুপূরের যে গাড়িটা ‘এটেণ্ড’ করতে ও দাঁড়িয়েছিল, সেই গাড়িটা থেকে বারানামল, তারি আর সবাই স্থানীয় জানা চেনা লোক। কিন্তু আজকে অনন্ত আর একজনকেও চিনতে পেরে ওর সেই রঙিন মনে ঠার দিকে তাকিয়ে দেখেছিল মাত্র। দ্বিতীয় জ্রোণীর কামরা থেকে একজন বৃদ্ধার সঙ্গে একটি স্ত্রীর ফুটফুটে বাচ্চাকে কোলে নিয়ে বিনি নামলেন, তাঁকে দেখতে গিয়েই ও যে এখানে ডিউটি করতে দাঁড়িয়েছে, লেটাই ভুলে গেল। বাতীরী কে কি দিয়ে গেল হাত বাড়িয়ে, কোন খেয়ালই রইলনা তার।

অবশ্য এমনিতে। বাঙালি দেশ থেকে অনেকটা দূরে বাঙালী ছেলের পক্ষে অমন একটা দৃশ্য তাকিয়ে দেখবার মতও বটে। অনন্তও না তাকিয়ে পারল না—গাড়িটা প্রাটকর্ম ছেড়ে চলে গেছে ততক্ষণে। ফুটফুটে বাচ্চাটা ছটফট করতে করতে কোন সময় কোল থেকে নেমে পড়ে গুটগুটে পা-ছুটে নিয়ে দৌড়তে আরম্ভ করেছে, মহিলাটিও দৌড়াচ্ছেন ওর পেছন পেছন ওকে ধরার জন্তে। সব মিলিয়ে প্রাটকর্মের লাল কাকর আর নীল আকাশের পটভূমিতে স্ত্রীর একটি ছবি। অনন্ত অভিভূত হয়ে গেল, চরমকৃত হল আরও। যখন শুনল ওরই নাম ধরে ছেলেটিকে বকছিলেন মহিলাটি। সে তখন ধরা পড়ে গেছে মায়ের কাছে। মহিলাটি নিশ্চয় ওর মা।

ওভাবে তাকিয়ে থাকার আরও একটা কারণ ছিল, অনন্ত ওদের চেনে। অনন্ত জানে, শর্বরী বাচ্ছ তার মামাখত্তরের কাছে। সঙ্গের বৃদ্ধাটি ওর শাওড়ী। এখান থেকে পূর্বদিকে কিছুটা ভ্রমতে এগুট্রাক রোডের ধারে যে ক্লাওয়ার মিলটা আছে সেই মিলের মালিক করুণাস্বর বস্তু বৃদ্ধার ছোটভাই, শর্বরীর মামাখত্তর তিনি।

কিন্তু শর্বরীর ছেলের নামের সঙ্গে ওর নিজের নামের ওরকম মিল থাকার ব্যাপারটা অনন্ত ঠিক বুঝতে পারল

না। ভাবনাটা রইল রাস্তিরেও, বতকণ না দেওয়ার লে টাঙান খড়িটা পর পর নটা ঘটা বাজিয়ে জানান দিলে,—শেষ গাড়ী আসার সময় হয়েছে এবার। অনন্তর ভাবনাটা ছিল শর্বরীর ছেলের নামের সঙ্গে ওর নিজের নামের মিল থাকার ব্যাপারটা নিয়েই। এত নাম থাকতে ‘অনন্ত’ নামটাই শর্বরী তার ছেলের নামের জন্ত বেছে নিল কেন! কবিশুদ্ধর একটা গানের কলি মনে পড়ে গেল এই মুহূর্তে। তাহলে নাম হিসেবে অনন্ত কি খুব সেকেন্দে নয়? ওসব নিয়ে আর কিছু ভাববে না ঠিক করল সে। কে কোথায় তার ছেলের কি নাম রাখল,—সে কথা মনে করে ওর এই নিলিখ্ত জীবনকে আনন্দিত বা বিষাদময়, কোনটাই করতে রাজী হয় সে।

এতক্ষণে খেয়াল হল ওর, এদিকটার লুচলে। যদিও রাস্তিরে খুব একটা ভয় নেই। তবুও জানলাটা বন্ধ করার জন্তে উঠে দাঁড়াল। জানলাটার কাছ বরাবর গিয়ে বন্ধ না করেই আবার ফিরে এল টেবিলটার কাছে। আসনে রাখা টেলিফোনের জেনারেটর হ্যাণ্ডেলটা ঘুরিয়ে রিসিভারটা ভুলে নিল কানের কাছে। আগের ট্রেনের সঙ্গে কিছু কথাবার্তা চললো প্রথমে। তারপর পাশে রাখা একটা খাতা টেনে নিয়ে ট্রেন রিসিভিংয়ের ভারেরী লিখতে লিখতেই হেঁকে বলে উঠল,—চৌবে, ঘণ্টা লাগা দো। আওর দেখো তো কোই টিকট খরিদনোবালা ছায় রানছি।

জী আচ্ছা।—উত্তরটা এল তৎক্ষণাৎ। মনে হল, বাইরে প্রাটকর্মের ওপর অঙ্ককারের যে আন্তরনটা পড়েছে, তার গারে ধাক্কা লেগেই কথাটা উত্তর হয়ে ফিরে এল অনন্তর কাছে।

ঘণ্টা পড়ার ঠিক সাত মিনিট পরে ট্রেনটা এখানে এসে পৌঁছবে। রেল কোম্পানীর ছাপরারা বোতামগুলো সাধা রংয়ের যে কোটটা অনন্ত এতক্ষণ পড়েছিল, তার পকেট থেকে বিড়ি আর দেশলাই বার করে একটা বিড়ি ধরাল সে। জলন্ত বিড়িটাকে দু’আঙলের মাঝখানে ধরে হাতটা মুঠো করল প্রথমে। তারপর মুঠোটাকে মুখে লাগিয়ে সজোরে টান দিল একটা। হিস্ হিস্ করে আগুয়াল হল মুখটার কাছে। আরেবে চোখ দুটো বুজে এল তার।

বিড়ি খাওয়ারটা তার নতুন নয়। এখানে আসার

গোড়ার দিক থেকেই ট্রেন আসার দেরী থাকলে সমস্ত কাটানোর অস্ত্রে ওটা তার প্রায় অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। অবশ্য, প্রথমদিকে অনন্ত সিগারেটই খেত। কিন্তু এই পোড়া দেশে ও জিনিষটা টপ করে পাওয়া যায় না। তিনটে ষ্টেশনের আগের অংশন ষ্টেশন থেকে আপ ট্রেনের গার্ডকে পরসাদ দিয়ে দিলে পরের দিন ফিরতী ডাউনে পাওয়া যেতে পারে সিগারেট। অথচ বায়েলা অনেক তাতে। প্রায়ই গার্ডেরা শুধু ভুলে গেছি বলেই কাজ সারত বলে নয়, সিগারেটের অভাবে বিড়িতে কাজ সারতে গিয়েই ভাল লেগে গেল বিড়ি। অস্ত্র কারণও ছিল দু-একটা। স্থানীয় লোকদের মধ্যে বেশীর ভাগই চাষ-ভূষা শ্রেণীর। তাদের অনেকেই এসে থাকে নানা প্রয়োজনে ‘টিশনমাস্টারবার’ কাছে’। কথায় কথায় বিড়ি আর দেশলাই এগিয়ে দেওয়াটা তাদের সম্মান দেওয়ার সামিল। না নিলে কিংবা চলেনা বলে তারা ক্ষুব্ধ হতে পারে, প্রথম প্রথম এই ভেবেই অনন্ত হাত পেতে নিত। কিন্তু এখন আর বিড়ি না হলে মন ওঠেনা। মাঝে মাঝে হাতে আসা দু-একটা সিগারেট খেয়ে দেখেছে, বড্ড পানসে লাগে সে’গুলো।

অনন্তর বিয়ে থা হয়নি। বুড়ো বাপ মা আছেন হুগলী জেলার মুগলা গ্রামে। সেটাই ওর দেশ। এখানেও একলা থাকে। সে ধরণের কোন তাগিদ নেই সাত-তাড়াতাড়ি ঘরে ফেরার। তবুও এই ট্রেনটা ‘পাশ’ হয়ে গেলেও কোণার্টারে ফিরবে। দুবেলা স্নান করাটা তার পুরণো অভ্যাস। তাই প্রথমেই স্নান করবে সে। তারপর স্নান শেষে সারাদিনের গারে দেওয়া রেলের ইউনিকর্মটার দিকে আর তাকাবে না। তার বদলে লুজি আর কতুয়া-গোছের একটা আমা চড়িয়ে ইজেলের সামনে গিয়ে দাঁড়াবে। সামনের ক্যানভাসটার ওপর কিছুক্ষণ চোখ বোলাবে প্রথমে। তারপর তুলিব গোছা থেকে তুলি আর রংয়ের প্যালেটটা হাতে তুলে নেবার আগে গোটাচারেক মোমবাতি জেলে দেবে সে ইজেলের সামনে দাঁড় করান উচু টুলটার ওপর। সন্দেহ নেই, বন্ধুদের কাছে বলা ওর বড় বড় কথাগুলো এই অর্থনৈতিক যুগে অবশ্যই ভুল ছিল। সেই জ্বলন্তই প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে তার। দিনের বেলায়, সূর্যের আলোর ছবি আঁকার সুযোগ নেই আর্টিস্ট অনন্ত চৌধুরীর।

ছবি আঁকবে বলে অনন্ত প্যালেটে রং বার করছিল টিউব থেকে। ইজলে টাডান-ক্যানভাসটার দিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতে কি মনে হল ওর, রং বার করা বন্ধ করে ঘরের কোণে দাঁড়ান টেবিলটার কাছে এগিয়ে গেল। ড্রয়ারটা টেনে তা থেকে বার করল কলম আর চিঠি লেখার প্যাড। কি যেনতাবল কিছু সময়। তারপরে লিখল।—

প্রিয় সন্দিপন,

এ চিঠিটা পেয়ে একটু অবাক হবে চিঠি লেখার ব্যাপারে আমার স্মৃতি হয়েছে দেখে। ইদানীং অনেক-গুলো চিঠির উত্তর না পেয়ে হতাশ হয়েছে লেখা বন্ধ করেছ তুমি। আমারও আজ লিখব পাগ লিখব করে আর হয়ে ওঠেনি।

বাক সেকথা। যে অস্ত্রে এই হঠাৎ চিঠি। সেটাই বলি,—স্ববীরদের টুডিঙতে আমাদের সঙ্গে যে শর্বরী রায়ের দেখা হয়েছিল শেষবারের মত সেই শর্বরীকে আজকে আবার দেখতে পেলুম। ভুলতে পারিনি তাকে। শর্বরী রায়কে ভুলে যাওয়াটা সহজ নয় আমাদের পক্ষে। মনে আছে, তোমার আমার আর শর্বরীর মধ্যে একটা সরল বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল আট স কলেজে ঢোকায় শুরুতেই। সেই বন্ধুত্ব অক্ষত ছিল শেষের দিকেও। কলেজ ছাড়ার পরেও আমরা কাজ করেছি একসঙ্গে। ছবির একজিভিশনও করেছিলুম আমরা তিনজনে মিলে। অবশ্য এর আগেই আমার আর শর্বরীর নাম নিয়ে কলেজের আনাচে কানাচে ক্যাণ্টিনের আড্ডা মাথা ছেলে-মেয়েদের দল কিছু রটনা করে বেড়াতে। তোমার কিন্তু কোন দিকেই কান ছিল না। তুমি প্রায় নির্লিপ্তই ছিলে।

সহানুভব তুমি। যখন বুঝতে পারলে, তখনই উঠে পড়ে লেগে গেলে আমাদের বিয়ের ব্যাপারে। মনে আছে, একটা প্রস্তাব নিয়ে গিয়েছিলে শর্বরীর বাবার কাছে। আর তারপরই বড়লোক বাবার কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত সুযোগ এল শর্বরীর। ছবি আঁকার উচ্চতর শিক্ষা লাভের অস্ত্রে শর্বরী বিদেশে বাক এই তাঁর ইচ্ছা। সেদিন স্ববীরদের টুডিঙতে বলে শর্বরী কেঁদেছিল। মুখ ফুটে কিছু বলতে পারেনি। বুঝতে পেরেছিলুম, ততময়

বাবু সরাসরি তোমার প্রভাবে 'না' বলতে পারেননি। শর্বরীকে বিদেশ বাবার স্বযোগ দিয়ে ঘুরিয়ে বলেছিলেন—শর্বরী আর আমার ভবিষ্যৎ সম্পর্কটা তাঁর ইচ্ছানুসারে নয়। আর ছবি আঁকিয়ে বাঙালী ছেলে-মেয়েদের বিদেশে শিক্ষানবিশী করাটা যে সামান্য ব্যাপার নয়। তা তুমিও জান, আমিও জানতুম।

তাই বোধহয়, শর্বরীকে সেই দোটার থেকে বাঁচানোর জন্যে দৈব আমার সহায় হয়েছিল সেদিন। রেলের এই চাকরিটা পেয়ে গিয়েছিলুম প্রায় বিনা ভাষায়। চাকরির দরকার ছিল আমার। আমার মত আর্থিক অবস্থায় শুধু ছবি আঁকে পেট চলতো না।

তারপর অনেকগুলো দিন কেটে গেছে। শর্বরীকে ভোলবার চেষ্টা করেছিলুম। বলতে লজ্জা নেই, তোমাকে চিঠি না লেখার সেটাও একটা কারণ। আর কিছুদিন পরে সত্যিই মন থেকে ঝেঁপে যেত শর্বরী। কিন্তু তা আর হ'ল না। সেই শর্বরীকে আজকে আবার দেখলুম। সবচেয়ে অবাক ব্যাপার কি জান? তার মা কিংবা শর্বরী, কেউই চিনতে পারল না আমাকে। ঘোব নেই ওদের। দাড়ি-গোঁফে আবৃত আমার মুখটাকে দেখলে তুমিও হয় ত' পারবেনা আজ।

আর তুমি তো জান, ছবি আঁকাটা আমার নেশা। সেই নেশা ছিল আমার চোখে। সেই চোখে দেখেছিলুম আমি শর্বরীকে, শর্বরীর কোলে তার ছেলেকে, ওর কপালে বড় করে পরা সিঁড়রের টিপটাকে। স্বপ্নের একটা ছবির মত মনে হচ্ছিল ওকে। ম্যাডোনার বেন জীবন্ত প্রতিমূর্তি। সত্যিই সন্দেহ, কড়া ভারমিলিয়নের অমন স্বপ্নের ব্যবহার সচরাচর চোখে পড়ে না।

এই পর্যন্ত লিখে লেখা খামাল অনন্ত। কি যেন আবার জাবল কিছু সময়। তারপর প্যাড থেকে লেখা কাগজ-গুলো হিঁড়ি নিয়ে ওর সামনে যে মোমবাতিটা জলছিল, তার শিখার দিকে মেলে ধরল। অনন্তর ঘরের আলো বিগুণ হ'ল কিছুক্ষণের জন্য। অনন্ত তার বন্ধুকে নতুন করে লিখল—

তাই সন্দেহ,

আশা করি কুশলে আছ। তোমার ছবি আঁকার খবরও আশাকরি ভাল। খবরের কাগজের কল্যাণে জানতে পেরেছি, কিছুদিন আগে দিল্লীতে তোমার একটা 'এক রং প্রদর্শনী' হয়ে গেল। তোমার উন্নতির অবাধগতি দেখে শিহরিত হচ্ছি। এই শিহরণ আরও বৃদ্ধি পাক আমার—এই প্রার্থনাই করি।

কলকাতায় আমাদের একজীবিশনের কথা মনে আছে তোমার? শর্বরী রায়েব খবর কিছু জানো? ওকি বিদেশ থেকে ফিরেছে। অনেকদিন তোমার সঙ্গেও চিঠি দেওয়া নেই। শর্বরীকে তো প্রায় ভুলেই গেছি। শর্বরী রায়েবকে ভুলে গেলেও তোমাকে কখনও ভুলবনা আমি। তুমি আমার অনেক করেছ। কৃতজ্ঞতাভরা মনে সে কথা স্মরণ করি আমি সব সময়।

প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিও,

তোমার অনন্ত

অনন্ত খুব ছোট করে শেষ করল চিঠিটা এবারে। ঠিক করল, কালই তাকে পাঠিয়ে দেবে। তারপর চেয়ারটা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ইজেক্টার সামনে এগিয়ে গেল আবার, পুরণো ক্যানভাসটা নামিয়ে নতুন একটা রাখল তার ওপর। ওর ইচ্ছা, শুধুমাত্র তিনটে রং নিয়ে নতুন একটা কম্পোজিশনে হাত দেবে এবার।

কিন্তু আকাশ তো শুধু নীল নয়। আকাশ সব রংয়ের সম্মেলন ক্ষেত্র। চিত্রকলার এই সহজ কথাটা আর্টিষ্ট অনন্ত চোখুড়ীও জানে বৈকি। তবুও শুধু তিনটে রং বেছে নেওয়ার কারণ—ওর বর্তমান ছবিটিতে থাকবে শুধু একটি রংয়ের প্রাধান্য। সেটা লাল রং, সেই লাল দেবে আকাশে। কড়া ভারমিলিয়নে আঁকবে শর্বরীর শাড়িটাও। আর শর্বরীর মুখ সে আঁকবে না। সেখানে থাকবে নারী মুখের একটা আভাষ মাত্র।



কবিরাজ ইন্দুভূষণ সেন—

গত ৫ই অক্টোবর সোমবার রাত্রিতে কলিকাতার প্রসিদ্ধ কবিরাজ ইন্দুভূষণ সেন, আয়ুর্বেদ শাস্ত্রী, ডি-এস সি তাঁহার কলিকাতা ৭০১১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটস্থ বাস ভবনে ৬২ বৎসর বয়সে সহসা পরলোকগমন করি গেলেন। তিনি নদীয়া জেলার শান্তিপুত্রের নিকটস্থ হরিপুরের অধিবাসী ছিলেন এবং তাঁহার পিতা কবিরাজ সত্যচরণ সেন কলিকাতায় খ্যাতিমান চিকিৎসক ছিলেন। যৌবনে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয় হইতে কবিরাজী চিকিৎসা শিক্ষা করিয়া তিনি ৪২ বৎসরেরও অধিক কাল চিকিৎসা ব্যবসারে ব্রতী ছিলেন এবং গত প্রায় ২৫ বৎসর নানাভাবে শ্রামদাস বৈদ্যশাস্ত্রপীঠের সহিত সংযুক্ত ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি কয় বৎসর পুরুলিয়ায় এক দাঁতব্যা আয়ুর্বেদ চিকিৎসালয়ে কাজ করিয়াছিলেন। তিনি সারা জীবন ধরিয়া আয়ুর্বেদ সম্বন্ধে শত শত প্রবন্ধ লিখিয়া নানা দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রে প্রকাশ করিতেন এবং ভারত-বর্ষেরও নিয়মিত লেখক ছিলেন। তাঁহার রচিত বাঙ্গালীর খাড়া, বাংলা দেশের গাছপালা ও ৭৩ প্রভৃতি বহু পুস্তক জনপ্রিয় হইয়াছিল এবং তিনি সাহিত্যবাসর প্রতিষ্ঠা করিয়া গত ৩০ বৎসর কাল কলিকাতার সাহিত্যসেবীদের সহিত ঘনিষ্ঠ সংযোগ রাখিতেন ও তাহাদের নানাভাবে সাহায্য করিতেন। তিনি আয়ুর্বেদ বিষয়ে কয়েকখানি মাসিক পত্রেরও সম্পাদক ছিলেন এবং শেষজীবনে নিজে আয়ুর্বিকাশ নামক একখানি মাসিকপত্র চালাইতে ছিলেন। তাঁহার মত বহুবৎসর মহাপ্রাণ ব্যক্তির সংখ্যা কম। আমাদের সহিত তাঁহার দীর্ঘ ৪৩ বৎসরের ঘনিষ্ঠতা ছিল, কাজেই তাঁহার মৃত্যুতে স্বজনবিরোগ বেদনা অতীব করিতেছি ও তাঁহার শোকসন্তপ্ত পুত্র-কন্যা, আত্মীয় স্বজনকে সমবেদনা জ্ঞাপন করি। প্রার্থনা করি, তিনি যে আয়ুর্বেদ প্রচারের জন্য আত্মজীবন আগ্রহের সহিত কাল

করিয়া গিয়াছেন তাহা যেন আবার সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া ভারতবাসীর কল্যাণ সাধনে সমর্থ হয়।

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন—

গত ৪ঠা নভেম্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন কাল প্রকাশিত হইয়াছে। মিঃ লিটল বেনজ মনসন অধিক ভোট পাইয়া প্রেসিডেন্ট এবং ব্রিহৎ 'হামফ্রে ডাইস-প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইয়াছেন। সেনেটর গোল্ডওয়াটার প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হইয়া পরাজিত হইয়াছেন। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট তাঁহার নির্বাচনে শতকরা ৬১ ভোট পাইয়া রেকর্ড সৃষ্টি করিয়াছিলেন। জনসন সে রেকর্ড ভঙ্গ করিয়াছেন। জনসন পাইয়াছেন ৩৯০৪২১৭ ভোট, তাঁহার প্রতিদ্বন্দী গোল্ডওয়াটার পাইয়াছেন—১৫১৪২৭৬১ ভোট। জয়লাভ করার পর জনসন ঘোষণা করিয়াছেন— শান্তির জয়লাভ করা আমাদের আশা তাহা করিব ও যেখানে যাওয়া প্রয়োজন তথায় যাইব। জনসনের ভয়ে জগতের সকল লোক সন্তুষ্ট হইবে, কারণ বাহারা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করিতেছে, তাহারা আমেরিকা ও রুসিয়ার নূন ব্যবস্থায় পৃথিবীর শান্তি ভঙ্গ করিবার চেষ্টা হইতে বিরত হইতে বাধ্য হইবে—নচেৎ তাহাদের ধ্বংস অনিবার্য হইবে।

সাংবাদিক অগ্নিনি গুপ্ত—

খ্যাতিমান সাংবাদিক, আনন্দবাজার পত্রিকা ও হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডের দিল্লীস্থ ভারপ্রাপ্ত প্রাক্তন কর্মী অগ্নিনি-কুমার গুপ্ত গত ৪ঠা নভেম্বর রাত্রিতে ৫৬ বৎসর বয়সে কলিকাতায় স্থূলকাল কারনানী হাসপাতালে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার বিধবা স্ত্রী, ২ পুত্র ও ২ কন্যা বর্তমান। বরিশাল জেলার গৈলা গ্রামের প্রসিদ্ধ কবিরাজ বংশে ভগ্নগ্রহণ করিয়া ছাত্রাবস্থায় তিনি রাজনীতিতে যোগদান করেন এবং এম-এ পাশ করিয়া কয়েক বৎসর অধ্যাপকের কাজ করিয়া ১৯৩৭ সন হইতে হিন্দুস্থান

ট্যাণ্ডারের সহকারী সম্পাদক ছিলেন। তিনি কয়েকবার ইউরোপ ভ্রমণ করিয়াছিলেন—বেথুন কলেজের প্রিন্সিপাল হুটিনো গুপ্তা (দাস) তাঁহার ভগিনী ছিলেন। তিনি বহুবার কারাবরণ করেন এবং সারা ভারতে তাঁহার প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিল। তাঁহার অকাল বিরোধে সংবাদিক রাজাই হুঃখিত হইবেন—আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সমবেদনা জ্ঞাপন করি।

কালোবাজারীর দমনে অভিনব কার্য—

কালোবাজারীদের দমন করিবার উদ্দেশ্যে বিচারের নূতন ব্যবস্থা করিয়া গত ৫ই নভেম্বর রাষ্ট্রপতি দিল্লিতে এক নূতন আইন জারী করিয়াছেন। বিচারে অবাধ বিলম্বের জন্য কালোবাজারীরা নানাতাবে সুবিধা পায়—নূতন আইনে সে সব সুবিধা বন্ধ করা হইবে এবং দ্রুত অসাধু ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সঙ্গে ১ বৎসর কারাদণ্ড দেওয়া হইবে। সারা দেশে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি—বিশেষ করিয়া খাদ্য ব্যবসারে যে দুর্নীতি দেখা দিয়াছে, তাহা বন্ধ না করিলে সাধারণ শান্তিপ্রিয় দেশবাসীদের রক্ষা করা যাইবে না। সেজন্য শ্রীমন্তলাল নন্দের বিশেষ চেষ্টায় এই নূতন আইন জারী করা হইয়াছে। এখন ইহার স্বফল দেখা দিলে দেশের লোক আশ্বস্ত হইবে এবং খাত্তের বাজারে মুনাফা বন্ধ হইলে মাড়ব অর্থনৈতিক অসুবিধা হইতে রক্ষা পাইবে।

কান্দীর গোলাম মহম্মদ প্রেরণ—

কান্দীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বন্ডা গোলাম মহম্মদকে ২৫শে অক্টোবর শ্রীনগরে প্রেরণ করা হইয়াছে। কান্দীরের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজি-এম-সাদিক এই প্রেরণার আদেশ দেন। গোলাম মহম্মদের বিচারের জন্য একজন বিশেষ বিচারপতি নিযুক্ত করা হইবে—তাঁহার বিরুদ্ধে দেশজোহী কার্যের বহু অভিযোগ আছে।

সিংহলের চাকর—

সিংহলের অলুরাধাপুর হইতে মহাবোধিবুদ্ধের ২টি চাকর ২৫শে অক্টোবর দিল্লিতে আনা হইয়াছে। সিংহলের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী সিন্ধিকো বন্দর-সংরক্ষক আন্তর্জাতিক ভাবে চাকর ২টি ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমন্তলাল নন্দকে প্রেরণ করিলে সেগুলি দিল্লির বুদ্ধ-ভবনী পার্কে রোপন

করা হইবে। ভারতের সচিব সিংহলের আড়াই হাজার বছরের এই সম্পর্ক দৃঢ় করাই বুদ্ধ রোপণের উদ্দেশ্য।

আজ্ঞা নাতিমুদীন—

অবিভক্ত বাংলার মন্ত্রী, ঢাকা নবাব পরিবারের সন্তান আজ্ঞা নাতিমুদীন গত ২২শে অক্টোবর হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া ১ বৎসর ২য়সে ঢাকার পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি পাকিস্তানেরও প্রধান মন্ত্রী ছিলেন এবং সম্ভ্রতি সমস্ত বিরোধী দলকে একত্র করিয়া তাহার নেতা হইয়া মিস্ ফাতিমা জিন্নাকে তাঁহার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সাহায্য করিতেছিলেন। তাহার পত্নী, ২ পুত্র ও ১ কন্যা বর্তমান। ১৯২১ সাল হইতে সক্রিয় রাজনীতিতে যোগদান করিয়া তিনি ভারতে ও পাকিস্তানে জনপ্রিয় নেতা হইয়াছিলেন। উচ্চ শিক্ষা, বংশ মর্যাদা ও কর্মশক্তি তাঁহাকে উচ্চ সম্মান দান করিয়াছিল। সংযুক্ত বাংলার মন্ত্রিসভা কালে বহু সময়ে আমরা তাঁহার সহৃদয় ব্যবহার ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইতাম।

শত শত কোটি কাল টাকা—

গত ২৬শে অক্টোবর কলিকাতার প্রকাশ পাইয়াছে যে বোম্বায়ে চিত্র তারকাদের কালো টাকা সরকার বাজেয়াপ্ত করার পর কলিকাতার একমল ধনী তাঁহাদের শত শত কোটি কালো টাকা রাজস্বদান ও উত্তর প্রদেশের গ্রামাঞ্চলে সরাইয়া ফেলিয়াছে। আরও, মুম্বাইয়ের প্রভুত্ব কালিক দিবার জন্য কলিকাতার একমল অসাধু ব্যবসায়ী শত শত কোটি টাকা গোপন করিয়া রাখিয়াছে এ সংবাদ সর্বজনবিদিত। ভারতরাষ্ট্রের পুলিশ প্রভুতির কর্তব্যে অবহেলা ও অনগ্রসর কারণে ঐ টাকা সরকার বাজেয়াপ্ত করিতে পারে নাই। ধরা পড়ার ভয়ে ব্যবসায়ী ও ধনীরা এখন ঐ টাকা গ্রামাঞ্চলে আত্মীয় বন্ধন ও বন্ধ বান্ধবদের গৃহে সরাইয়া ফেলিয়াছে। পুলিশ একটু সতর্ক হইলে ঐ টাকার সন্ধান পাইবে এবং দুর্নীতিমুক্ত পুলিশ এখনও তাহা বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবে। আমরা এ বিষয়ে সরকারকে কঠোরতার সহিত কর্তব্য পালন করিতে আবেদন জানাই।

ভারতে পাক-মুসলমান অনুপ্রবেশ—

কারোতে বিশ্বরাষ্ট্র সম্মিলনে ভারতের পক্ষ হইতে

এক পুস্তিকা বিতরণ করা হইয়াছে। তাহাতে লিখিত আছে—১৯৫১ হইতে ১.৬১ সাল দশ বৎসরে আসাম, পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা রাজ্যে অত্যধিক পাকিস্তানী মুসলিম অল্পপ্রবেশ করিয়াছে। গত দশ বৎসরে আসামে মুসলিম অধিবাসীর সংখ্যা বাড়িয়াছে—৩৯ শতাংশ, পশ্চিমবঙ্গে ২৮ শতাংশ এবং ত্রিপুরায় ১৮ শতাংশ। ভারতে ৫ কোটি মুসলমানের বাস এবং পৃথিবীর যে সকল দেশে মুসলমান বাস করে, সংখ্যা হিসাবে ভারত তাহার তৃতীয়। এই ভাবে ভারতে, বিশেষ করিয়া আসাম, পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে এই তিনটি রাজ্যও পরে পাকিস্তানে পরিণত হইবে। এ সমস্যা সমাধানের উপায় কি? শাস্ত্রী মহাশয়কে এ বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থায় মনোযোগী হইতে হইবে।

সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ—

২২শে অক্টোবর ষ্টকহলম হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে ক্রাস্দের জাঁ পল সার্ভে সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পাইয়াছেন। কিন্তু শ্রী সার্ভে কর্তৃপক্ষকে জানাইয়াছেন যে তিনি কোন পুরস্কার লইবেন না। এবারে পুরস্কারে সর্বাপেক্ষা অধিক অর্থ ছিল—তাহার পরিমাণ ২৭,০০০ ক্রাউন। ফরাসী দেশে এ পর্যন্ত মোট ১১ জন সাহিত্যিক নোবেল প্রাইজ পাইলেন। শ্রী সার্ভে'র অর্থ নোবেল ভাণ্ডারে ফিরিয়া যাইবে। যিনি প্রকৃত সাহিত্যিক, তিনি কোন পুরস্কার প্রার্থী হন না।

কলিকাতায় রেশনিং—

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন ৪ দিন দিল্লীতে থাকার পর ২২শে অক্টোবর সন্ধ্যায় কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। এখানে আসিয়া তিনি সাংবাদিকদের জানানাইয়াছেন—অনুগ্রহে যে ব্যবস্থাই হউক, কলিকাতা ও সহরতলোতে পুরা রেশনিং প্রথা চালু করা হইবে। তাহার ফলে ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের চাল, চিনি ও আটার সময়্যার সমাধান হইবে। এ অঞ্চলে বহু সমবায় ভাণ্ডার গঠিত হইয়া পরিচালিত হইতেছে—তাহাদের মধ্য দিয়া রেশনিং চালু করা হইলে দেশবাসী উপকৃত হইবে।

সিংহলে ভারতীয় সমস্যা—

গত ২২শে অক্টোবর সিংহলের প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী বন্দরনারায়ক সহিত ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীলাল বাহাদুর

শাস্ত্রীর এক চুক্তি হইয়াছে। তাহাতে সিংহলহ ভারত-বাসীদের মধ্যে ৩ লক্ষ লোককে সিংহলের নাগরিক করিয়া লওয়া হইবে, ৫ লক্ষ ১৫ হাজার ভারতীয়কে ভারতবাসী আগামী ১৫ বৎসরে ভারতে ফিরাইয়া আনিবে এবং বাকী ১ লক্ষ ৫০ হাজার ভারতবাসী সৎকে আগামী জাহাজী মাংসে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে। এতদিন এই ৯ লক্ষ ৭৫ হাজার ভারতবাসী সিংহলে রাষ্ট্রীয় অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া বাস করিতেছিল। শ্রীমতী বন্দরনারায়ক ৬ দিন দিল্লীতে থাকিয়া শ্রীলাল বাহাদুর শাস্ত্রীর সহিত এ বিষয়ে আলোচনার পর সমস্তার সমাধান করিয়াছেন।

কংসাবতী পত্তিকল্পনা—

বাঁকুড়া জেলার কংসাবতী ও কুমারী নদীর বস্তা হইতে বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও হুগলী জেলার একাংশকে রক্ষা করার চতু তথায় ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে যে পরিকল্পনার কাজ হইয়াছে, তাহার প্রথম অংশ সম্পূর্ণ হওয়ার গত ৬ই অক্টোবর পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন বাঁধের নিকট যাইয়া জলধারা দাঁতের উদ্বোধন করিয়াছেন। রাজস্ব ও সেচ মন্ত্রী শ্রীভানুদাস তত্তাচার্য এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রী শ্রীমতী পূর্ণবা মুখোপাধ্যায় তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। ঐ কার্য শেষ করিতে আরও ২০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। ইহার ফলে প্রায় ৯ লক্ষ একর জমিতে সেচের জল দেওয়া সম্ভব হইবে। কংসাবতীর কাজ শেষ হইলে মোট ৭৭ হাজার একর জমী চাষের সুবিধা পাইবে ও ৩২ হাজার একর জমী ভাণ্ডারে পরিণত হইয়া অন্ততাবে দেশকে সমৃদ্ধ করিবে।

পাকিস্তানী অনাচার—

আমেরিকা ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশকে অস্ত্র-শস্ত্র দান করিয়া সাহায্য করিয়াছে—ঐ সাহায্যের সত্বেও ভারত বা পাকিস্তান কেহই পরস্পরের বিরুদ্ধে ঐ অস্ত্র ব্যবহার করিবে না। কিন্তু ৬ই অক্টোবরের সংবাদে জানা যায় যে পাকিস্তান কাম্বোয়ের সীমান্তে বুদ্ধবিরতি রেখায় এ পারে ভারতীয় সৈন্যদলকে মার্কিন অস্ত্র-শস্ত্রের সাহায্যে আক্রমণ করিতেছে। ভারতের পক্ষ হইতে এ বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে এবং ভারতহ মার্কিন রাষ্ট্রপুত নিজে যাইয়া কাম্বোয়ে ঐ সকল মার্কিন অস্ত্র ব্যবহৃত হইতে দেখিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু "ডোরা

না শোনে ধর্মের কাহিনী”—পাকিস্তান সামরিক কর্তৃপক্ষ কোন কথাই শুনে না। শেষ পর্যন্ত কি ভারতকে পাকিস্তানের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে?

ভারতকে জলদীপ্তির তৎপরতা—

ভারত সীমান্তে লাদকের একটি অংশ সৈন্তমুক্ত রাখা হইয়াছিল—তথ্য ভারতীয় বা চীনা কোন সৈন্তদলকেই প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। গত ১ই অক্টোবর খবর পাওয়া যায় যে চীনা সৈন্তরা লাদকের ঐ অংশে অবৈধ প্রবেশ করিয়া ভারত আক্রমণের জন্য তথ্য সৈন্ত সমাবেশ করিতেছে। ভারত চীনের এই বে-আইনি কার্যের প্রতিবাদ করিয়াছে এবং প্রতিবাদ স্বরূপ চীনকর্তৃক আহত একটি বৈজ্ঞানিক সম্মিলনে যোগদান করে নাই—ঐ সম্মিলন পিকিংয়ে অনুষ্ঠিত হয় এবং উহা বিজ্ঞান কর্মীদের ১২৬৪ সালের বিশ্ব-ক্ষেত্রাংশন বলিয়া ঘোষিত হয়। বাহা ইউক, তাজীচীন নানাভাবে সর্বদা ভারতকে বিব্রত করে এবং কালের সাহায্যের সম্ভাবনা হইলেই ভারত আক্রমণ করিবে বলিয়া মনে হয়।

ভারতের বাহিরে প্রশান মন্ত্রী—

শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী নতুন প্রধানমন্ত্রী হইয়া গত ২রা অক্টোবর সর্বপ্রথম ভারতের বাহিরে কার্যরোতে নিরপেক্ষ দেশ সমূহের শীর্ষ সম্মিলনে গিয়াছিলেন। তাহার পূর্বে শ্রীশাস্ত্রী একবার মাত্র নেপালে গিয়াছিলেন। ঐ দিন মহাত্মা গান্ধীর জন্ম দিন ও শ্রীশাস্ত্রীরও জন্ম দিন ছিল। তিনি বিমান বন্দরে বাইরা ভারত ত্যাগের পূর্বে বৃদ্ধা মাতার চরণধূলি লইয়া তাঁহার আশীর্বাদ গ্রহণ করেন। শেষ পর্যন্ত তাঁহার কার্যরো ভ্রমণ সাকল্যমণ্ডিত হইয়াছে—তিনি শীত্রেই ইউরোপের কয়েকটি দেশ ভ্রমণে বাইবেন। বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে ভারতকে পৃথিবীর সকল লোকের সহিত মৈত্রী রক্ষা করিয়া, সকল দেশের সাহায্য ও সহযোগিতা লাভ করিয়া উন্নতির পথ প্রশস্ত করিতে হইবে। কেন্দ্রের অন্তর মন্ত্রীরা প্রায়ই বিদেশে বাইরা থাকেন—কিন্তু প্রধান মন্ত্রীর বিদেশ ভ্রমণ নানা কারণে ভারতের পক্ষে কল্যাণকর হয়।

ইন্দ্রকুমার চৌধুরী—

খ্যাত্তিম সাংবাদিক, আনন্দবাজার পত্রিকার কর্মী ইন্দ্রকুমার চৌধুরী গত ১ই নভেম্বর তার ৪টার (৩কবার

রাত্রি শেষে) ৮২ বৎসর বয়সে কলিকাতা ১৭৭ সি বিবেকানন্দ রোডের বাসভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি নোয়াখালি জেলার লায়সরের বিখ্যাত সিংহ চৌধুরী বংশের সন্তান—যৌবনে সট্‌হাও শিবিয়া ও পরে নিজস্ব বাংলা সট্‌হাও উদ্ভাবন করিয়া ১৯০১ হইতে ১৯৫১ পর্যন্ত আনন্দবাজার পত্রিকার ঠাক রিপোর্টারের কাজ করিয়াছিলেন। আর্থিক ও সচ্ছন্দ ব্যবহারের জন্য তিনি সর্বজনপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা স্বজন-বিয়োগ বেদনা অনুভব করিতেছি।

বামপন্থী নেতার দল ধ্বংস—

একদল বামপন্থী সর্বদা ভারতে কংগ্রেসী শাসন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার করিয়া দেশের লোককে ভ্রান্ত পথে চালিত করার চেষ্টা করিতেছিল। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে সেরূপ একদল বামপন্থী নেতাকে এপ্রচার করা হইয়াছে—তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন উগ্র এম-পি, এম-এল-এ ও এম-এল-সি আছেন। কঠোরতার সহিত সরকার এ বিষয়ে কাজ না করার দেশে অশান্তি বাড়িয়া বাইতেছিল—কাজেই সকল চিন্তাশীল ব্যক্তি সরকারের এই কার্যে সম্ভাব্য প্রকাশ করিয়াছেন। একদিকে পাকিস্তানী অধিবাসীদের অপপ্রচার ও অপবাদকে বামপন্থী কর্মীদের মিথ্যা প্রচার—এ দেশে সকল গঠন-মূলক কাজে বাধা দিতেছে—তাঁহার প্রতীকার হওয়া সত্ত্বেও প্রয়োজন হইয়াছিল। আমরা এ বিষয়ে সরকারকে অবহিত হইতে দেখিয়া আশ্বস্ত হইয়াছি।

ভারত হইতে পাকিস্তানী বিতাড়ন—

গত কয়েক মাস ধরিয়া ভারত সরকারের নির্দেশ মত পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলিকাতার বিভিন্ন প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান হইতে পাকিস্তানী কর্মী বিতাড়নের কাজ আরম্ভ করিয়াছেন। কলিকাতা কর্পোরেশন, ডক, কলিকাতা ইলেক্ট্রিক সান্সাই, রেল প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানে হাজার হাজার পাকিস্তানী কর্মী কাজ করিতেছে। তাঁহাদের দেশে ফিরিয়া বাইতে অসুযোগ জানাইয়া নেতৃগণ দেওয়া হইয়াছে। কতকগুলি বিদেশী লাহাজ কোম্পানী পাকিস্তানীদের বিতাড়নে সম্মত হইয়া নানাভাবে সাপ্তা করিতেছে। কিন্তু পাকিস্তানের সহিত ভারতের যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী, সে জন্য ভারতের প্রয়োজনীয় বিবিধ

হইতে পাকিস্তানী না তাড়াইলে ভারত-স্বাধীনতা করিতে পারিবে না। এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ আদেশ দেওয়ার পশ্চিমবঙ্গের সরকারী কর্তারা ক্ষত কান করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এ বিষয়ে সাধারণের সহযোগিতা পাইলে সরকার আরও শীঘ্র কাজ করিতে পারিবেন।

সাহিত্যতীর্থে সাহিত্যিক সম্মিলন—

কলিকাতা ৬৭ পাথুরিয়া ঘাটা স্ট্রীটে বিখ্যাত মল্লিক-বাড়ীতে গত ৯।১০ অক্টোবর সাহিত্যতীর্থে বার্ষিক সাহিত্য সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। শ্রীশৈলজানক মুখোপাধ্যায়, শ্রীপরোজ কুমার রায়চৌধুরী, শ্রীহৃদাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনরেন্দ্র দেব, কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় প্রভৃতি সম্মিলনে ভাষণ দেন। শ্রীদেব খ্যাতনামা স্বর্গত কবি অক্ষয়কুমার বড়ালের ভাষন ও কাব্য সম্বন্ধে সুদীর্ঘ আলোচনা করেন। তীর্থের সম্পাদক অকবি রমেন্দ্র নাথ মল্লিকের চেষ্টায় এই সম্মিলনটি সর্ব প্রকারে সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছিল। ঐ উপলক্ষে তীর্থ একখানি বার্ষিক পুস্তকও প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রাদেশ মন্ত্রিসভার অনুষ্ঠান—

চীন কর্তৃক ভারত আক্রান্ত হইলে ২৪ পরগণা জেলার টাকী গ্রামে পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভার একদিন অধিবেশন হইয়াছিল। ঐ সময় বসিরহাট হইতে টাকী পর্যন্ত সমগ্র এলাকা উৎসাহ ও উদ্দীপনার ঢকল হইয়া মন্ত্রীদ্বিগকে সত্বনা জ্ঞাপন করে ও সাধারণ মানুষেরা মন্ত্রীদের সহিত নানাভাবে মিলিত হওয়ার সুযোগ গ্রহণ করে। গত ৩রা নভেম্বর আবার নদীয়া জেলার হরিণবাটা দ্বন্দ্ব

উৎপাদন কেন্দ্রের ইন্সপেক্টর বাংলোতে পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভার এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এবার বাহিরের বেশী জাঁকজমক ছিল না—তবে মন্ত্রীরা সারাদিন তৎপর থাকিয়া পরস্পর নানা সমস্যার আলোচনা করিয়াছেন ও সমস্ত সমাধানের উপায় নির্ণয় করিয়াছেন। পরী গ্রামে মন্ত্রিসভার অধিবেশন নানাদিক দিয়া বেশ-বাসীর পক্ষে কল্যাণদায়ক হয় সন্দেহ নাই।

নন্দিনী ও কল্পনা—

কলিকাতা ১৪, সি-আই-টি বিল্ডিংস হইতে সি-আই-টি টেনাণ্টস্ এসোসিয়েশনের পরিচালনার গত পূর্বার সন্ধ্যা কল্পনা নামক এক শারদীয় সাহিত্য প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে কবি কালিদাস রায়, নরেন্দ্র দেব, বীজপ্রসাদ ভট্টাচার্য, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির কবিতা এবং রণজিৎ কুমার সেন, সুধীরকুমার মুখোপাধ্যায়, কলীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, গোপাল হালদার প্রভৃতির রচনা আছে। শ্রীশিবকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় লিখিত কলিকাতার গৃহসংস্করণ মোঃসেনের উপায় প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য। ইহা সমস্তদের মধ্যে বিতরণের জগা প্রকাশিত। শ্রীইন্দিরা দেবী ও শ্রীহনুভি ওপ্তার সম্পাদনার কলিকাতা-৬, ৬এ, কাঠিক বহু লোক হইতে নন্দিনী নামক একখানি পূজা বাধিকী প্রকাশিত হইয়াছে। দাম তিন টাকা। বহু রচনার পূর্ব, সবই মহিলাদের লেখা। লেখকদের মধ্যে আছেন, জ্যোতির্ময়ী দেবী, রেণুকা রায় এম-পি, সীতা দেবী, শান্তা দেবী, শৈলবালা ঘোষজায়া, বাসন্তী দেবী, রাধারানী দেবী, আশা পূর্ণা দেবী, উমা দেবী, লীলা মজুমদার প্রভৃতি। সংকলনখানি মনোজ ও তথ্যবহন হইয়াছে। এরূপ প্রচেষ্টা অভিনন্দনের যোগ্য।



ডাইফোটার বোঝা



গৃহস্বামী—এই যে...নাও!—সাত-সকাল থেকে তামাম্ বাজার চুঁড়ে
 ষণ্টার পর ষণ্টা ঠায় 'লাইন্' নিয়ে দাঁড়িয়ে 'এনেছি
 তোমার করমামমতো ডাইফোটার সওগাত!...পঁচিশ
 টাকা জোড়ার ইলিশমাছ...পনেরো টাকা সেরের সন্দেশ
 ...পাঁচ টাকা কিলোর সরষের তেল...চল্লিশ টাকা মণের
 গোলাওরের চাল...আর বত্রিশ টাকা জোড়ার কাঁচি-
 পাড় ধুতি!...

শিল্পী—পৃথী দেবশর্মা

প্রতিশ্রুতি পালন

চাঁদমোহন চক্রবর্তী

স্থান-তবানীপুর—একটি ঘরে ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত কতকগুলি পাণ্ডীপুঁথী ছড়ান। একটি খালু হকার তামাক টানছিলেন জ্যোতিষী রামনাথ জ্যোতিরত্ন অশ্রমসঙ্ঘ—চিন্তাক্রিষ্ট মুখে।

আপনিই জ্যোতিষী মশাই ?

রামনাথ ত্রস্তে উঠে বসলেন স্থিরভাবে কাপড় চোপড় নামলে।

কি চাই, আপনার ?

হঠাৎ আপনার সাইনবোর্ড দেখে চুকে পড়লাম আপনার ঘরে।

বেশ বাবা, বেশ হয়েছ! বসো, বসো—

আচ্ছা, আপনি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান বলতে পারেন ?

পারি একথা বললে ভুল হবে—চেষ্টা করি, অনেক সময় মিলেও যায়।

আগন্তুক আশ্চর্য হলো জ্যোতিষীর সরল ব্যবহারে ও সৌম্য মূর্তি দেখে। চৌকির এক কোণে বসল, বন্ধু সহ।

জ্যোতিষী তাকাল যুবকের প্রশান্ত প্রতিভাবীপ্ত মুখের দিকে—আচ্ছা বাবা দেখি তোমার হাতখানি—

যুবক কোঁতুললী মুখে হাত বাড়াল—

জ্যোতিষী যুবকের হস্তরেখা পরীক্ষা করল পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে—

মুখে ফুটে উঠল বিষয়ভাব—বা হাত চাইল—যুবক বাড়িয়ে দিল হাত জ্যোতিষীর দিকে।

জ্যোতিষী সোজা হয়ে বসল—খানিকক্ষণ দুই চোখ বুজল। বলল—কি জানতে চাও বাবা ?

যুবক জ্যোতিষীর হালচাল দেখে হলো বিস্মিত—কোঁতুললভর্য্য কণ্ঠে বলল—বেকার কত দিন থাকবো ? কি দেখলেন ?

জ্যোতিষী বলল—বেকার তুমি থাকবে না, বাবা।

তুমি হবে বিখ্যাত দেশপ্রেমিক, কবি, ভক্ত ও আইন-জীবী। তুমি তো সামান্ত লোক নও বাবা !

যুবক বিজ্ঞপ কণ্ঠে বলল—আমার কাছে একটি পরস্যাও নাই—আপনি স্তোকবাক্যে ভোলাতে পারবেন না আমাকে। বর্তমান বলুন—আমার হস্তরেখার কি দেখলেন ?

—বর্তমান তোমার দুঃসময়—পিতৃরিষ্ট ঘোপ—আমের—তোমার যে রাশি নক্ষত্র তাতে তুমি পিতৃবিস্তহীন, বাবলুদী—যীর উত্তম শেঠার হবে অগাধ অর্থের মালিক—আবার সব বিলিয়ে দিয়ে হবে ফকীর—কি অদ্ভুত ভাগ্যবান ব্যক্তি !

—থাক! থাক! আর বলতে হবে না—আমি এবারে উঠি—

যুবক চিন্তাক্রিষ্ট মুখে চলে গেল—জ্যোতিষী বিস্মিতভাবে তাকিয়ে রইল যুবকের গতিপথে।

আবার ফিরে এলো যুবক—জ্যোতিষী প্রশংসক মুখে তাকাল যুবকের দিকে।

—আচ্ছা পণ্ডিত মশাই, বলতে পারেন আমার ক্রয় বাবা এবারে সেরে উঠবেন ?

—বড়ই কঠিন প্রশ্ন করলে বাবা ? তোমার বাবার ঠিকুজী বা হাত না দেখে এই প্রশ্নের সঙ্গুত্তর সম্ভব নয়, বাবা !

—আচ্ছা, আর একদিন আসবো, বাবার জন্ম তারিখ বা ঠিকুজী নিয়ে।

যুবকের সংগী বলল,—পণ্ডিত মশাই, এর বাবা তবানীপুর তথা বাংলা দেশের বিখ্যাত এটর্নী কুবনমোহন দাশ, আপনি নিশ্চয়ই জানেন ?

জ্যোতিষী উৎসুক কণ্ঠে বলল, নিশ্চয়ই জানি, তবে আমার জ্ঞান গবীষ ব্রাহ্মণের পক্ষে কখনও লাক্ষ্য হবার সুযোগ হয় নি, বাবা।

এবারে জ্যোতিষী মশাই, যুবকের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, তোমার নামটি জানতে পারি বাবা ?

উত্তর দিল—চিত্তরঞ্জন দাস।

—নামটি তো বেশ ! আমার ভবিষ্যৎ বাণী, তুমি বাবা চিত্তহরণ করবে সর্বসাধারণের—তুমি হবে দিগ্‌বিজয়ী নেতা, সর্বদিকে, সর্ব বিষয়ে—আমার এই কথা লিখে রাখো তোমার নোট বইয়ে।

চিত্তরঞ্জন বিনীতকণ্ঠে বলল, পণ্ডিত মশাই, আমার প্রতিশ্রুতি রইল আপনার এই ভবিষ্যৎ বাণী সত্যি হলে আমি আপনাকে পুরস্কৃত করবো আপনার অতিক্রমিত মত—কিন্তু আজ আমি রিক্তহস্ত—পিতা আমার তথ্য বাত্যা, ক্ষতসর্বশ্ব।

চিত্তরঞ্জন চিন্তাক্রান্ত মনে রাতারা বেরিয়ে এলেন।

এই ঘটনার কয়েক মাস পরে চিত্তরঞ্জনের বাবা মারা গেলেন—অর্থাভাব, পিতার ঋণভার, অসংখ্য ঘাতপ্রতিঘাতে চিত্তরঞ্জন ক্ষতবিক্ষত হলেন। অসীম অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতার গুণে তিনি ধাপে ধাপে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠা করলেন আইন ব্যবসায়ে। শ্রীমদ্রবিন্দ্রের সংশ্রবে এসে স্নাতকস্নেহীকৃত হলেন। ইংরেজের দণ্ডনীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন। শ্রীমদ্রবিন্দ্রের বিখ্যাত বিচার প্রসঙ্গে তিনি নিজের বিশ্ববিখ্যাত আইনজ্ঞ বলে প্রতিষ্ঠালাভ করলেন। শ্রীমদ্রবিন্দ্রকে করলেন মুক্ত আদালতের বিচারে। দিকে দিকে প্রতিভাভ হলে চিত্তরঞ্জনের প্রতিভা, খ্যাতি ও দেশ প্রেম। তিনি বিলাসিতার জ্বোতে গা ভাসালেন কিছু দিন। চিত্তরঞ্জন বহু অর্থ উপার্জন করলেন, পিতার পাওনাদারদের বা উত্তরগণদের তাদের প্রাপ্য টাকা পরিশোধ করলেন। তিনি মুক্তহস্তে দান করলেন গরীব দুঃখীকে।

মহাত্মা গান্ধী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সক্রিয় অহিংস আন্দোলন শুরু করলেন, সবরমতো আশ্রম তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হ'ল। হিমালয় হ'তে কল্যাণমারিকা পর্বত ভারতবাসী হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, শিখ, পাঠান সর্বজাতি সর্ব সম্প্রদায় একতাবদ্ধ হ'য়ে প্রতিজ্ঞা করলেন, আমরা স্বাধীনতা অর্জন করব। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজকে ছাড়তে হবে ভারত। পরম হল—বৈষম্যবিক হল

দেশ-বিশেষ হতে অস্ত্র শস্ত আমদানী করে ইংরেজদের ধ্বংস করে ভারত স্বাধীন করার সংকল্প গ্রহণ করল—উল্লাসকর, সুদীর্ঘ প্রভৃতি যুবকবৃন্দ আত্মোৎসর্গ করল ফাঁসী কাঠে। ইংরেজ প্রমাদ গণল। গণ-আন্দোলন রাষ্ট্র বিপ্লবে পরিণত হ'ল।

সেই ক্ষণে মহাত্মা গান্ধী প্রচার করলেন ভারত স্বাধীন হ'বে অহিংসা নীতিতে—তার এই আন্দোলন ব্যর্থ হলে তিনি ইংরেজদের সংগে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করলেন। হিমালয় হ'তে কল্যাণমারী পর্বত সেই আন্দোলনে সাড়া দিল—দলে দলে স্বাধীনচেতা যুবকেরা সরকারী চাহুরী ত্যাগ করল—ব্রিটিশ শাসকের আদালতে ওকালতী বর্জন করল। কলেজ ছুল থেকে ছেলেরা বেরিয়ে পড়লো মহাত্মার অসহযোগ আন্দোলনকে সাফল্য মণ্ডিত করতে। বহু ভারতবাসী রাজা, নাইট প্রভৃতি ইংরেজদের দত্ত খেতাব ত্যাগ করল। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ জুঁক হয়ে বর্বোচিত চণ্ডনীতি শুরু করলেন স্বাধীনতা সংগ্রামকে ব্যর্থ করতে।

সেই শুভ মুহূর্তে চিত্তরঞ্জন তাঁর বিলাস ব্যসন ত্যাগ করে মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নিলেন—বিশুদ্ধ খাদী পরিধেয় বরণ করলেন। সেই সংগে তিনি পেলেন শ্রীকৃষ্ণের বাণী—“সর্বধর্ম্য পরিত্যজ্য মামেকং শ্রবণং ব্রজ” তিনি হলেন কৃষ্ণ প্রেমে মাতোয়ারা—পরম বৈষ্ণব। দেশবাসী স্তম্ভিত হলো ত্যাগ, দান ও তত্ত্ব দেখে।

কিছুদিন পর চিত্তরঞ্জন ইংরেজ আদালতে ব্যারিষ্টারী ব্যবসা বর্জন করবেন মনস্থ করলেন—তিনি মকেসদের ডেকে ডেকে ফিরিয়ে দিতে শুরু করলেন তাদের ‘ত্রিকস্’—কাগজপত্র। তিনি তখন আইনজীবীগণের শীর্ষস্থানে পৌঁছেছিলেন—তার এই ত্যাগে দেশবাসী হল বিম্মিত—বহুবাক্যবেরা পরামর্শ দিলেন ওকালতীর অর্থ দ্বারা সাহায্য করতে স্বাধীনতা সংগ্রামকে—কিন্তু তাহা তিনি অগ্রাহ্য করলেন।

সেইক্ষণে একদিন দ্বারদেশে দেখা দিলেন এক প্রশান্ত সৌম্যমূর্তি ব্রাহ্মণ—চিত্তরঞ্জনের দ্বার তখন উন্মুক্ত সর্বজাতি ও সর্ব সাধারণের নিকট। ব্রাহ্মণ প্রশ্ন করলেন, আমি দেখা করতে এসেছি চিত্তরঞ্জন দাসের সংগে।

চিত্তরঞ্জন সহাস্ত মুখে সাধরে গ্রহণ করলেন আগন্তুক ব্রাহ্মণকে। প্রশ্ন করলেন—কি চাই বলুন? ব্রাহ্মণ উত্তর করলেন—আমি চাই তোমার প্রতিশ্রুতি পালন?

চিত্তরঞ্জন বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—প্রতিশ্রুতি?

কি প্রতিশ্রুতি? আমি কখন করেছি আপনার সংগে?

ব্রাহ্মণ দীপ্তকণ্ঠে বললেন, স্মরণে পড়ে। একদিন তুমি গিয়েছিলে আমার জ্যোতিষালয়ে তোমার এক বন্ধু সহ। কলেনি কি আমার গণনা অক্ষরে অক্ষরে? তুমি তখন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে আমাকে পূর্বস্কৃত করবে যদি সত্য হয় আমার ভবিষ্যৎ বাণী। আজ আমি এসেছি জানাতে আমার দাবী।

চিত্তরঞ্জনের স্মৃতিপথে উদ্ভিত হল সেই ইতিকথা— তিনি বললেন, হাঁ, চিনেছি, আপনি সেই ভবানীপুরের জ্যোতিষী ঠাকুর। আমি নিশ্চয়ই প্রতিপালন করব আপনার আদেশ—বলুন কি চাই।

ব্রাহ্মণ কুণ্ঠিত ভাবে বললেন, বাবা, আমি আজ বিপন্ন আমি কস্তাধারগ্রস্ত—আগামী সপ্তাহে স্থির করেছি কস্তার বিবাহ কিন্তু আমি রিক্তহস্ত।

চিত্তরঞ্জন মলিন মুখে বললেন, এতদিন কেন আসেন নি পণ্ডিত মশাই? আমিও যে রিক্তহস্ত।

ব্রাহ্মণ অস্বাভাবিক বদনে বললেন, বাবা দরকার হয় নি তাই আসি নি—আজ নিরুপায় হয়ে এসেছি তোমার দ্বারে। তোমার অস্থবিধা হয় আমি চলে যাব। এই বলে ব্রাহ্মণ হলেন প্রস্থানোদ্ভূত। চিত্তরঞ্জন বাধা দিলেন ব্রাহ্মণকে। মুখে বললেন—পণ্ডিত মশাই, দাঁড়ান আমি করব আপনার ভাগ্যপরীক্ষা।

চিত্তরঞ্জন ডাকলেন তাঁর 'বাবু' (মহতী) কে—জিজ্ঞাসা করলেন কিরিয়ে দেওয়া হয়েছে কি সব 'ত্রিকস্' মকেসদেব। 'বাবু' জানাল একটি 'ত্রিক' ফেরৎ নেয়নি—এক বড় পাটরি

আগামী কালই তার তনানীর দিন। তিনি নির্দেশ দিলেন বাবুকে খবর দিতে সেই মকেসকে, তিনি নিজেই চালাবেন সেই মোকদ্দমা। ব্রাহ্মণকে অহরোধ কলেন দেখা করতে আগামী রাতে।

সেই মকেস যখন খবর পেল চিত্তরঞ্জন স্বয়ং পরিচালনা করবেন তার মোকদ্দমা সে পেল হাতে স্বর্ণ—ছুটে এলো রাতে এটর্নীর সহ মোকদ্দমার জন্ত তৈরী হ'তে। এটর্নী প্রশ্ন করেছিল—হঠাৎ কি কারণে তিনি রাজী হলেন এই মামলা করতে—কিন্তু চিত্তরঞ্জন দিলেন না কোন উত্তর। মকেস খুব খুসী, চেক বই বের করে জানতে চাইল, কত হবে টাকার অঙ্ক—ফিস্ বাবদ। চিত্তরঞ্জন বললেন—চেক দেবেন না। আমার চাই নগদ টাকা—পরিমাণ আপনার অভিকৃতি, আমি কিছু 'ডিম্বাণ্ড' করব না। এই আমার শেষ মামলা হবে আদালতে।

এটর্নী ও মকেস মুখ চাওয়া চারি করল আশ্চর্য হয়ে। এই প্রস্তাবে রাজী হলো মকেস—কালই কোর্টে নগদ টাকা দেবে বলে গেল।

পরদিন সন্ধ্যায়। জ্যোতিষী এলেন চিত্তরঞ্জনের গৃহে বথাসময়ে। চিত্তরঞ্জন বাবুকে আদেশ করলেন মকেলের দেওয়া টাকা আনতে। বাবু টাকার খলি এনে হাজির করলো। চিত্তরঞ্জন বিনীতভাবে অহরোধ জানাল ব্রাহ্মণকে গ্রহণ করতে সেই অর্থ। ব্রাহ্মণ কৃতজ্ঞভাবে অর্থ গণনা করে বললেন, বাবা, এয়ে ২০,০০০, টাকা। এত টাকার তো আমার দরকার নাই। আমার পাঁচ হাজার টাকা হলেই চলবে।

চিত্তরঞ্জন সহাস্যে বললেন, ঠাকুর, এই অর্থে আমার কোন অধিকার নাই—এ যে আপনার ভাগ্যে এসেছে। গ্রহণ করুন—আমার প্রতিশ্রুতি পালন করতে দিন।

কৃতজ্ঞতার জ্যোতিষীর কণ্ঠ বাস্পরুদ্ধ—উর্ধ্বে হুঁহাত তুলে বাস্পরুদ্ধকণ্ঠে বলল—ধন্ত, বাংলার দাতাকর্ণ!





মিহিরাচার্য

আলোচনা

রবি হচ্ছেন গ্রহের রাজা। তেজে, প্রতাপে, দীপ্তিতে ও আকারে রবি সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও ঐশ্বর্যশালী গ্রহ বলে নির্ণীত। এই গ্রহরাজকে কেন্দ্র করে অপর সকল গ্রহেরা নিরন্তর ঘূর্ণিত হন। রবির কারণেই অন্ত্যন্ত গ্রহ উদ্ভিত ও অতৃপ্ত হয়। শুধু তাই নয়, রবির অবস্থান ও দূরত্ব অনুযায়ী অন্ত্যন্ত গ্রহগণের গতি শীঘ্র, মন্দ, বক্রী ও মার্গী প্রভৃতি অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

রবির তেজে সামনে এগুতে না পেয়ে গ্রহরা যখন পিছু হাটেন : সেই অবস্থাকে বক্রী বলে অভিহিত করা হয়। আবার ব'গ্ন সোজা হাটেন তখন তাকে মার্গী বলা হয়। কোন কোন জন্মকুণ্ডলীতে দেখবেন গ্রহের নামের পাশে উ, অ বা বং লেখা থাকে। এর অর্থ হচ্ছে উদ্ভিত, অতৃপ্ত বা বক্রী। অর্থাৎ জাতকের জন্মকালে ঐ সব গ্রহগুলির ঐ ঐ অবস্থা ছিল। বক্রী গ্রহের ফলের লব্ধে মোটামুটি শাস্ত্রে বা লেখে, তা হচ্ছে, ঐ গ্রহসূচিত ফল বিলম্বিত হয়। কিন্তু অতিক্রমতার দেখা গেছে সব সময় না হলেও জন্মকালীন বক্রী গ্রহ গোচরে ভাল ঘরে বক্রী হলে এবং জন্মকালীন গ্রহ থেকে ত্রিকোণে বা তৃতীয় একাদশ লব্ধ পেলো ফলদান করে। ভাল কি খারাপ ফল, তা নির্ভর করবে গ্রহটি কোন ঘরের মালিক তার ওপর। অবশ্য ফলদান করার ক্ষমতার বলবত্তা বর্গবিচার থেকেই করতে হবে।

সুতরাং, যে রবিগ্রহের সৌরজগতে এতো প্রভাব, যার গমনাগমন, স্থিতি, দূরত্ব-নৈকট্য প্রভৃতির ওপর অন্ত্যন্ত গ্রহের নিরন্তর ও গতি নির্ভর করে, তিনি রাজ্যের ভাগ্য

নিরন্তর ব্যাপারেও নিশ্চয়ই গুরুতর রকমের পোর্ট-ফোলিও যে কুক্ষীগত করে আছেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই।

রবি গ্রহ একমাসে একটি রাশি ভোগ করেন। বিশেষ ভাবে বলবান থাকেন বৈশাখ ও ভাদ্রমাসে। এখন কথা হচ্ছে যে-সব ব্যক্তি বৈশাখ মাসে জন্মেছেন, তাঁরা সবাই কি ভাল এবং একই রকম ফল রবিগ্রহের কাছে পাবেন? না। কারণ, বৈশাখ মাসে জন্মান ব্যক্তিদের রবি যদিও একই অর্থাৎ মেঘ রাশিতে রবি আছেন বটে কিন্তু জন্মলগ্ন থেকে নিশ্চয়ই একঘরে থাকবেন না।

এইখানে লগ্ন লব্ধে একটা মোটামুটি কথা বলে নেওয়া যাক। লগ্ন জিনিষটি কি? লগ্ন একটি বিন্দু, যেটি অক্ষ কবে বের করতে হয়। বৈশাখ মাসে জন্মালে যেমন রবি মেঘরাশিতে থাকেন, তেমনি এক একটি সময়ে জন্মালে এক একটি লগ্ন হয়। যে মাসে জন্মান যায়, সেই মাসে রবি যে রাশিতে থাকেন, সেইরাশি থেকে লগ্ন আরম্ভ হয় এবং মোটামুটি ধরে রাখুন, দু'ঘণ্টা অন্তর লগ্ন বদল হয়ে পরের রাশিতে নির্ণীত হয়। এখানেও রবি গণনার কেন্দ্র।

ধরুন একজন জন্মেছেন বৈশাখ মাসে সূর্যোদয়ের পর মোটামুটি দু'ঘণ্টার ভেতর। তাহলে রবি মেঘরাশিতে থাকার দরুন, তাঁর লগ্ন হবে মেঘরাশিতে। অপর জন জন্মেছেন ঐ বৈশাখ মাসেরই দু'ঘণ্টা থেকে চারঘণ্টার মধ্যে। তাহলে তার লগ্ন হবে পরের রাশি বৃষভে। এমন করে মোটামুটি দু'ঘণ্টার লগ্ন এগিয়ে যাবে রবিকে পেছনে ফেলে।

যেমন বৈশাখ মাসের ১লা তারিখে রবি যেখানে

থাকেন, ১৫ তারিখে তার থেকে অনেক এগিয়ে যান, তেমনি ঐ দু'ঘণ্টার হিসাবও রবির এগিয়ে যাওয়ার অনুপাতে এগিয়ে যাবে। যেমন ধরুন ১লা তারিখে রবি যদি মেঘরাশির এক বিন্দুতে থাকেন, তেমনি ২ ঘণ্টার পরে লগ হবে বুধরাশির এক বিন্দুতে। আবার মাসের ১৫ তারিখে রবি যখন ১৫ নম্বর বিন্দুতে থাকবেন তখন ওদিকেও বুধরাশির ১৫ নম্বর বিন্দুতে লগ হবে। এটি হল সূক্ষ্ম হিসাব—এর অন্ত্রে ত্রৈরাশিকে অনুপাত কয়েত হবে। তাহলে যিনি দু'ঘণ্টার মধ্যে জন্মালেন তাঁর রবির অবস্থিতি হল লগ্নে, আর যিনি দু'ঘণ্টার পরে জন্মালেন তার লগ্ন হল বুধ, রবির অবস্থিতি হল দ্বাদশে। লগ্নে স্থিতি আর দ্বাদশে স্থিতি এক কথা নয়। কারণ লগ্ন থেকে জাতকের যাবতীয় শুভ সংযোগের বিচার হয়, আর দ্বাদশ থেকে বিচার হয় ইহলোকে যাবতীয় ক্লেশের—যেমন ক্ষয়, ক্ষতি, বিদেশ ও কারাবাস এবং পরিলৌকিক মোক্ষের বিচার হয়।

তাহলে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে লগ্ন থেকে যে ঘরে গ্রহের অবস্থিতি, সেই ঘর অনুযায়ী গ্রহের শুভাশুভ ফল দেয়।

লগ্ন থেকে রবি কোন্ ঘরে থাকলে কি ফল দেন, সে সম্বন্ধে পরবর্তী সংখ্যায় আলোচনা করার ইচ্ছে রইল।

দ্বাদশরাশির ফল

মেঘরাশি

অগ্নিনিজাত ব্যক্তির মাধ্যম, গুরুণীর উত্তম ফললাভ। কৃত্তিকার মধ্যমাধ্যম।

কনিষ্ঠ ভ্রাতার সহিত জীবন বিরোধ। প্রতিবেশীর সহিত বিবাদ, ধর্মভাব দেখাইয়া প্রভাবপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। অর্থপ্রাপ্তিতে বিষ ও বিলম্ব। ভূমি হইতে কৃষি লাভ। ব্যাপারে শুভ—দূতে লাভ। জীলোকের মধ্যম।

কর্কটরাশি

কৃত্তিকার উত্তম, রোহিণীর মধ্যম, মৃগশিরার অধমোত্তম।

মাসের প্রথম দিক মন্দ চলবে না, পরে ব্যয় বৃদ্ধি,

হতাশা। কাজের উপর ১৮ তারিখ পর্যন্ত অত্যন্তীর্ণ চাপ ও ব্যস্ততা বৃদ্ধি। পরে কৃষি আনন্দ সংবাদ প্রাপ্তি। সম্ভাবনের পড়াশোনার বিষয়, পত্নীর শারীরিক ক্লেশ। সম্ভব স্থলে পুত্র সম্ভাবনা। জীলোকের মধ্যম।

মিথুনরাশি

মৃগশিরার অধম, আর্দ্রার মধ্যম, পুনর্বসুর উত্তমোত্তম। মাসের প্রথমার্ধে ভাগ্যহানি ও হতাশা, পরে হঠাৎ বিপত্তীর্ণের উপায়প্রাপ্তি। কুটুম্ব বিবাদ, বুদ্ধিবংশ। সম্ভাবন বুদ্ধিতে মানসিক ক্লেশ। লভ্যাংশে আশাবৃদ্ধি। জামাতার ক্লেশ। ১০।১১ তারিখ শুভ। জীলোকের দেহকষ্ট।

কর্কটরাশি

পুনর্বসুর অধম—পুষ্যাভাতব্যক্তির মধ্যম, অশ্বিনার অধমোত্তম।

কারো কারো অকস্মাৎ ভাগ্যের উত্থান পতন দেখা যায়। মাসের শেষের দিকে দারাবদ্ধ সম্পত্তি ও অনার্য্য টাকার সম্বন্ধে হবিধা ও স্বেযোগ দেখা দেবে। সামান্য রক্তপাত ও অর্শ রোগে ভোগার সম্ভাবনা। অর্ধের অপ্রতুলতা থাকবে না। সাংসারিক শৃঙ্খলা বিনষ্ট হবার সম্ভাবনা। জীলোকের উৎকর্ষ ও ভীতি।

সিংহরাশি

মঘার অধম। পূর্বফল্গুনীর মধ্যমোত্তম। উত্তর-ফল্গুনীর উত্তমোত্তম।

এ মাসে কেউ কেউ চাকরী পেতে পাবেন। বাদ্যের বদলীর চাকরী, তাঁরা দূর দেশে বদলী হয়ে যেতে পাবেন। চিঠিপত্রের জবাব খুব তাড়াতাড়ি পাবেন। ব্যবসায়ীরা শেষের দিকে উৎসেগ থেকে নিষ্কৃতি পাবেন। কোন ব্যক্তি দূর দেশ থেকে ঘরে ফিরে আসবেন। জীলোকের মানসিক শান্তি ও সামাজিকতা বৃদ্ধি পাবে।

কন্যারাশি

উত্তরফল্গুনীজাত ব্যক্তির মধ্যম। হস্তার উত্তম। চিত্রার অধম।

ব্যয়বৃদ্ধি ও ধনক্ষতির সম্ভাবনা—পত্নীকর্তৃক লংসারে অশান্তি সৃষ্টি হবার ঈগিত আছে। শত্রুরা বশীভূত থাকবে। কর্মে পরিবর্তন পট্টার কারণ উদ্ভূত হবে। কু-সম্পত্তি বা বাসস্থান নিয়ে বিবাদ কলহ প্রভৃতি দেখা দিতে

পারে। ধানের বানবাহন আছে, বা ঐ সংক্রান্ত ব্যবসা আছে, তাঁদের অটলতা স্থিতি হওয়া আশ্চর্য নয়।

ত্রীলোকদের গুণগুণবৃদ্ধি—কিঞ্চিৎ স্বাস্থ্যহানি।

ভুল্পা দ্রামি

জৈষ্ঠাষাঢ়ব্যক্তির অধম। বাতীজাত ব্যক্তির উত্তম। বিশাখাষাঢ় ব্যক্তির অধম।

১৬।১৭ তারিখ দুটি শুভ। মাসের ৯ তারিখের পর মানসিক চাকলা বৃদ্ধি পাবে। প্রণয়াকাজী ব্যক্তির মানসিক ক্লেশ পাবেন। অকারণে ব্যয়বৃদ্ধি পাবে। অর্থহানির সম্ভাবনা দেখা যায়। সম্ভানসন্ততির ১৭ তারিখ থেকে পড়াশুনায় আগ্রহ ও নিয়মাত্মকতা দেখাবে। কোন প্রকার কর্তব্যব্যপদেশে ঘোরাঘুরি করতে হবে। পত্নীর স্বাস্থ্যহানি।

হস্তিচক্র দ্রামি

১৯ তারিখটি শুভ। বিশাখাষাঢ়ব্যক্তির অধম। অহরহাধার মধ্যম—জ্যেষ্ঠার মধ্যমোত্তম।

গৃহস্থালীতে জীর মুন্সিয়ানার পরিচয় পাবেন। মাতৃ-পীড়া লভ্য হলে। জীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উদ্বেগ দেখা দিতে পারে, সম্ভব হলে অপারেশন প্রভৃতি হবার সম্ভাবনা। মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে জ্বর পাবেন। সম্ভানেরা অবাধ্য হয়ে বিপরীত ব্যবহার করবে। ১২ তারিখ থেকে ভুল্পান্তি ক্রয়ের ইচ্ছা দেখা দিতে পারে।

ত্রীলোকদের কর্মলাভ ও নানা প্রকারে আনন্দ।

শ্রবু দ্রামি

মূলার শুভ। পূর্বাষাঢ়ার মধ্যম—উত্তরাষাঢ়ার উত্তম।

মাসটা অনিশ্চিত, উৎকর্ষ ও নানা আশার দোলায় কাটবে—বিশেষ কোন ফললাভ হবে না। কনিষ্ঠ ভ্রাতার উন্নতি—ভগিনীর পীড়া। প্রণয়াকাজীদের মনস্তাপ ও অপবাহ। ছোটখাট দুর্ঘটনা (বানবাহন সম্বন্ধে) মাসের প্রথমে দিকে ঘটতে পারে। লাভের ব্যাপারে অলাভই বেশী দেখা যায়।

অক্ষর দ্রামি

উত্তরাষাঢ়ার উত্তম, শ্রবণার মধ্যম—ধনিষ্ঠার অতি উত্তম। ২৬ তারিখটি শুভ।

ধনাগর—সকল শুভ। "সম্ভানদের ভেমন শুভ দেখা যায় না। লসারের কেউ বিদেশ থেকে পারে। মাসের

মাসামাসির পর লাভযোগ আছে। দ্যুতক্রীড়ার ২৫।২৬ তারিখে সাফল্য। বেকার ব্যক্তিদের এ মাসে চাকরী পাবার সম্ভাবনা। কলাবিভাগের ছাত্রীদের নানা সুযোগ। ব্যবসায়ীরা নতুন সুযোগ পেতে পারেন। ত্রীলোকরা নানা-ভাবে নিজেদের প্রতিভা প্রকাশ করবেন।

সুস্ত দ্রামি

ব্যয়বাহল্য সম্বন্ধে নানা প্রকারে আনন্দ ও সুখ। আর্থিক দিক মাসের মাসামাসি পর্যন্ত বিশেষ অস্থির ও অনিশ্চিত। পত্নীর দিক থেকে সাহায্য না পাওয়ায় মধ্যে মধ্যে মানসিক গ্লানি। সম্ভানদের সাফল্য দেখা যায়। কনিষ্ঠ ভ্রাতার পরিবর্তন ও ভয়। মাতৃস্বাস্থ্য গণ্ডগোল করতে পারে।

ত্রীলোকদের সামাজিকতা ও সুখ বৃদ্ধি।

মীন দ্রামি

উৎকর্ষা, উদ্বেগ ও ব্যবসায়ীদের আরকর-সাড়াশীর ফাঁদে পড়ার নিদারুণ ভয়ে মুখ শুকিয়ে উঠবে। কারো কারো হৃদরোগ দেখা দিতে পারে। সংসারে অব্যাহিত ব্যক্তির আবির্ভাবে অসন্তুষ্টি দেখা দিতে পারে। পুত্র-কন্ডার উদ্ভট বুদ্ধিতে চালিত হবে মাসের প্রথম দিকে। মাসের মাসামাসি মামলার সম্ভাবনা।

ত্রীলোকদের মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রসবাদি হলে কষ্ট অনিবার্য—১৫ তারিখের পর নির্বিঘ্নে।

দ্বাদশ লগ্নের ফলাফল

লগ্ন :

এই মাসের ১২ তারিখ পর্যন্ত নানা শক্রতা ও মানসিক অসন্তুষ্টি। পরে নিজ প্রতিভা, বুদ্ধি ও সম্ভবস্থলে পুত্রের চেষ্ঠার সাফল্য। মাসের তৃতীয় সপ্তাহে ঋণদান ও গ্রহণ ব্যাপারে সুযোগ সুবিধা। ভ্রাতার কারণে নানা বিপত্তির স্থিতি, কিন্তু নানা প্রকারে মাসের শেষাংশে ধনলাভ।

সম্ভানদের মধ্যম ফল। ত্রীলোকদের মধ্যবিধ।

বৃষ :

দৃষ্টিশক্তির হ্রাস ঘটতে পারে। হঠাৎ প্রচুর লাভ বা প্রচুর লোকসানের সম্ভাবনা হতে পারেন। এটি নির্ভর

করছে অসুস্থতার রাস্তা বলবত্তা ও কোন ঘরে আছেন তার উপর। ব্যয়ের পরিমাণ অনেক কষাকষি করেও কমাতে পারবেন না। ১৭ তারিখের পর পত্নীর কারণে কিছু খোঁয়া গিয়ে লোকসান দেখা দিতে পারে।

সন্তানদের মধ্যম—স্ত্রীলোকদের অধ্যম।

মিথুন :

বিলাস বাসন ও পানভোজনাতির মাজা বেড়েই চলবে। এই কারণে স্বাস্থ্যহানি ঘটতে পারে। মাসের প্রথমদিকে জ্বর, রেল প্রভৃতি থেকে অর্থলাভ ঘটতে পারে। কুটুম্বদের কেউ অগ্নিভিত্তিতে পড়ে সম্ভব হতে পারেন। কনিষ্ঠ ভগিনীর পীড়া দেখা দিতে পারে। ১৭ তারিখের পর ভাগ্য পরিবর্তন ঘটতে পারে। পুত্রকন্যাদের উন্নতি হবে। স্ত্রীর শরীরে গোপনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত রোগের প্রকাশ ঘটবে। স্ত্রীলোকদের অনেকে কাজকর্ম পেয়ে আনন্দ পাবেন।

কর্কট :

মাসের প্রথম সপ্তাহ ভাল যাবে না। তারপর থেকে অর্থাগমের নতুন পথ আবিষ্কৃত হবে। সব কাজই কিছু চিলে ও মনঃগতিতে চলতে থাকবে। কোন কোন গুপ্ত শত্রুর সন্ধান সহজে পেয়ে যাবেন। স্ত্রীর স্বাস্থ্য তেমন ভাল যাবে না—পিতার স্বাস্থ্যও অসুস্থ। কনিষ্ঠ ভ্রাতার গোপনে বিবাহের বা প্রণয়ের সম্ভাবনা। কর্ম স্থানে হঠাৎ উচ্চপদস্থ ব্যক্তির আবির্ভাবে উৎকর্ষ ও বিশৃঙ্খলা। পুত্রকন্যার দ্বারা সাহায্য পাবেন।

স্ত্রীলোকদের বিষমঙ্গল মাস।

সিংহ :

চিঠিপত্র লেখা ও অবাব পাওয়ার প্রথমের দিকে বিলম্ব ঘটবে। মাসের মধ্যভাগে ধনাগমের পথ সুগম। ছোটখাট ভ্রমণের দ্বারা লাভবান হতে পারেন। ১৬১৫ তারিখে দূতক্রীড়ার অর্থ হবার সম্ভাবনা।

দূর ভ্রমণে ব্যয় ও বিপদ দুইই বর্তমান। স্ত্রীর সাহায্য সব সময়েই পাবার যোগাযোগ আছে। সন্তানসম্পত্তি উন্টো বুদ্ধি পোষণ করে মনঃপীড়ার কারণ হবে।

স্ত্রীলোকদের মধ্যম ফল।

কন্যা :

মাসের প্রথম দিকে কনিষ্ঠপীড়িত, অর্থাগমের নতুন আশা প্রভৃতি দেখা যায়। শেষের দিকে গৃহাদির সংস্কার

বা পরিবর্তন সক্ষম করা যায়। মাসের শেষের দিকে মামলা—মোকদ্দমা হবার সম্ভাবনা। শত্রুরা অবশেষে হবে। বেকারের কর্মলাভের সম্ভাবনা। ভাগ্যানাশের ভীতি দেখা দিতে পারে। ১৫১৬ তারিখ শুভ।

স্ত্রীলোকের পক্ষে স্ত্রীরোগ বৃদ্ধি।

তুলা :

অনন্দে সিংহে শুভ, মাসের প্রথমদিকে বেশ কিছু লাভ করে মনে আনন্দ পাবেন। ২ তারিখের পর ব্যয়বৃদ্ধি হবে। শেষের দিকে অর্থাগম হবে। নানা প্রকারে এ মাসে আনন্দ পাবেন প্রচুর। কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভগিনীর সম্বন্ধে কোন নিরানন্দকর সংবাদ পেতে পারেন। পুত্রকন্যাদের বিভ্রাটের প্রচুর সুযোগ। স্ত্রীর সাহায্য প্রচুর পাবেন।

স্ত্রীলোকের সর্বপ্রকার শুভ।

বৃশ্চিক :

সারা মাসটি নানা ঝগড়াটে ও বিরূপিত্তিতে চলবে। দুর্বুদ্ধির আশ্রয়ে ব্যয়, অর্থনাশ প্রভৃতি ঘটান সম্ভাবনা। কর্মে নানা প্রকার ঝগড়া বৃদ্ধি হবে। সরকারী কর্মচারীদের উপর অতিরিক্ত চাপ ও বুদ্ধিবৃত্তির যাচাই কর্ম হওয়ার সম্ভাবনা। অংশীদারীর ব্যবসায়ীরা নানা আইনের ফাঁদে পড়ে কাতর হবেন। ছোট খাট ভ্রমণে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। স্ত্রীলোকদের সাংসারিক বিশৃঙ্খলা।

মেষ :

সারা মাসই শরীর ভাল যাবে না। শয্যা-শাটী হবেন না বটে! সরকারী কর্মচারীর শত্রুতা কিবা সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে সহকর্মীর শত্রুতা দেখা যায়। অর্থাগম মধ্যম প্রকার। নীচস্থ মঙ্গলের অস্ত্র রক্তপাত বা দুর্ঘটনাদি ঘটতে পারে। রক্তচাপের রোগীরা হঠাৎ বিভ্রান্ত হয়ে পড়তে পারেন। স্ত্রীর দ্বারা মাসের স্বাস্থ্যকিছু কিছু লাভ হতে পারে। ঋণদান করে কিছু অর্জন করতে পারেন।

মকর :

ধনসঞ্চয় পরিমিত হবে। গৃহিনীর স্বাস্থ্যের কারণে ব্যয় পরিবর্তন প্রভৃতি প্রয়োজন হতে পারে। বান-বাহনের মালিক হলে তা নিয়ে বিরক্তি উৎপাদিত হবে। সন্তানেরা আরবুদ্ধি করার মন দেবে। স্ত্রীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উৎকর্ষ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। বেকার মেয়েরা বা ছেলেরা

কর্মলাভ করতে পারেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভগিনীর কারণে কিছু ব্যয় হওয়া সম্ভব।

শ্রীলোকদের মাসটি ভাল নয়।

কৃত্ত :

ধনাগম ঘেমন হবে সফল তজ্জপ হবেনা। নানা কারণে উর্ধ্বগামী ব্যয়ের মাত্রা আপনাকে পীড়িত করবে। মাসের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে বিনা আয়াসে কিছু কিছু ধনলাভ হতে পারে।

অমণকালে শ্রী অগ্রহ্ন হয়ে কষ্ট পেতে পারেন, তবে সাংঘাতিক কিছু নয়। ব্যবসায়ী হলে, সরকারী আয়-করের ফাঁদে পা দিতে পারেন। পেশাজীবীদের মাসটি ভাল থাকে। সম্ভান-সম্ভতির ছবিনীত ভাব পোষণ করতে পারে।

শ্রীলোকদের সামাজিকতা বৃদ্ধি পাবে—সামান্য পীড়ার বোগও আছে।

মীন :

ছোটখাট অমণের ফল নিফল প্রমাণিত হবে। চিঠির জবাবে বিলম্ব—চেঁটার অসাক্ষ্য—প্রার্থিত ব্যক্তির সঙ্গে দেখা না হওয়া প্রভৃতি ঘটবে। ঠিকাদায়েরা আশায় আশায় দিন কাটাবেন। যদিও জ্ঞাত্য কারণে ব্যয় করবেন, তবু সেই ব্যয়ের চাপ আপনাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলবে। জুয়া-স্পেকুলেশন প্রভৃতিতে লোকশান হবার সম্ভাবনা। শ্রীর সহিত মতের অমিল ঘটবে। বেকার ব্যক্তির কর্মলাভে হতাশ হবেন।

শ্রীলোকদের মধ্যম। অন্তঃসম্বাদের ভয়।

কোষ্ঠীর বিচার

জ্যোতি বাচস্পতি

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

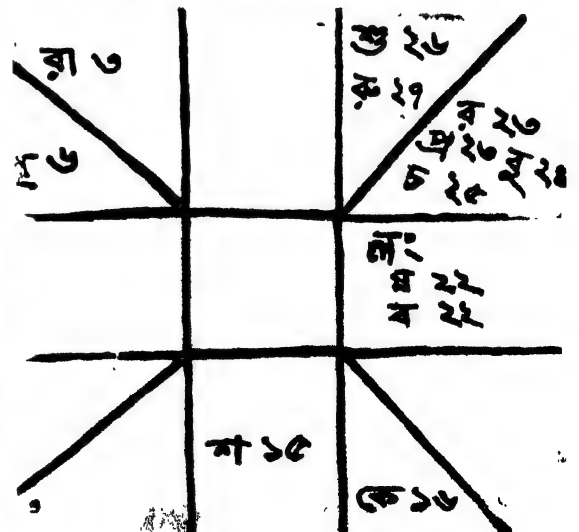
জাতচক্র বা জন্মকুণ্ডলী

ফলিত জ্যোতিষের মতে কোন ব্যক্তির জীবনের ফলাফল বলতে হ'লে গোড়াতেই দরকার ঐ ব্যক্তির জন্ম সময়ের রাশিচক্র। অর্থাৎ, তাঁর যে সময় জন্ম সেই সময়ে তাঁর জন্মস্থানের আকাশে রাশি, গ্রহ, নক্ষত্র, ইত্যাদি কি ভাবে ছিল তা সূক্ষ্মভাবে জানা চাই। জন্ম সময়ের গ্রহ-ক্ষুট ও ভাব-ক্ষুট কব্লেই তা জানা যায়। যে কোন স্থানের যে কোন সময়ের গ্রহ-ক্ষুট ও ভাবক্ষুট কি ক'রে কব্লেতে হয় তা মংগলীত “সরল জ্যোতিষে” বিস্তারিত ভাবে দেওয়া হয়েছে, এখানে তার পুনরুৎপন্ন নিশ্চয়োজন। ভাবক্ষুট ও গ্রহক্ষুট পেলে, কি রকম ক'রে তা লিপিবদ্ধ করা হয়ে থাকে এবং কি ভাবে তা লিপিবদ্ধ করা উচিত, এখানে সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করব। এ আলোচনায় একটু দরকার আছে এই জন্তে যে, জন্মকুণ্ডলীর এই গণিতাংশ এমন-ভাবে চোখের সামনে থাকা দরকার, যাতে বিচারের সব চেয়ে সুবিধা হয়। আমাদের দেশে সাধারণতঃ তিন রকম প্রণালীতে গ্রহ সংস্থান লিপিবদ্ধ করা হয়ে থাকে। (১) বঙ্গদেশ ও উৎকল প্রচলিত প্রণালী (২) পশ্চিম ভারতে প্রচলিত প্রণালী (৩) দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত প্রণালী।

শ্রীশ্রী বঙ্গদেশ প্রবর্তক পুরবঙ্গদেশের জন্ম সময়ের গ্রহসংস্থান

যদি এই তিন প্রণালীতে লিখে দেখাতে হয়, তা হ'লে এই রকম হ'বে—

বঙ্গদেশ ও উৎকল প্রচলিত প্রণালী



পশ্চিম ভারত প্রচলিত প্রণালী

১২ ক	১০ স	৯ ক
১	৭ স	৬
২ স	৮	৫

দক্ষিণাঙ্গে প্রচলিত প্রণালী

ক	স	ক	স
১২ ক			
১০ স			
৯ ক			
৮ স			
৭ ক			
৬ স			
৫ ক			
৪ স			
৩ ক			
২ স			
১ ক			

বঙ্গদেশ ও উৎকলে যে ধরনে রাশিতে গ্রহ সংস্থান লিপিবদ্ধ করা হয় তাতে, রাশিগুলির স্থান চক্রের মধ্যে নির্দিষ্ট। অর্থাৎ, এই প্রণালীতে লিপিবদ্ধ করা একটি গ্রহ সংস্থান পেলেই বুঝতে হবে যে, উপরে ঠিক মাঝের চারকোণা ঘরটি মেঘরাশি, তার বাঁয়ের তিন কোণা ঘরটি বুধ রাশি, তার পরেরটি বিধুন, এই রকম ভাবে পর পর রাশিগুলি আছে। এদের গুণতে হবে ঘড়ির কাঁটা বে-ভাবে চলে ঠিক তার উল্টোভাবে। যে গ্রহ যে রাশিতে আছে, ছকটিতে সেই রাশির ঘরের মধ্যে সেই গ্রহের আত্মকরটির পাশে সংখ্যা দিয়ে জানানো হয় তা কোন নক্ষত্রে আছে। কোন রাশিটি জন্ম সময়ে পূর্বে দিকে উঠেছে, অস্ত কথার কোন রাশিটি নয় তা জানানো হ'বে থাকে, সেই রাশির ঘরে লং এই সাঙ্কেতিক শব্দটি লিখে। লগ্নের পাশে নক্ষত্র লেখবার প্রথা নেই।

পশ্চিম ভারতে যে ধরনে রাশিচক্র লেখা হয়, তাতে

রাশিগুলির স্থান নির্দিষ্ট থাকে না। এ হিসাবে উপরের চৌকো ঘরটি লগ্নকে বোঝায় এবং প্রত্যেক ঘরের মধ্যে যে ১, ২, ৩ ইত্যাদি অঙ্ক আছে, তা দিয়ে রাশি বোঝানো থাকে। ১ মানে মেঘ, ২ মানে বুধ ইত্যাদি। যেমন উপরের কুণ্ডলীতে মাঝার চৌকো ঘরটিতে ১০ মানে মকর রাশি এবং তা মাঝার উপরে থাকতে সেইটেই লগ্ন। সেখানে ম, ব লেখার মানে, মকর রাশিতে মঙ্গল ও বক্রণ আছে। এই মতেও লগ্নের রাশির পরে অস্ত রাশিগুলি পর পর ঘড়ির কাঁটার গতির উল্টোদিকে লিখতে হয়।

দক্ষিণাঙ্গে প্রচলিত প্রণালী তিন ধরনের। এই প্রণালীতে বাংলায় প্রচলিত রাশিচক্র লেখার পদ্ধতির মত রাশির ঘরগুলি নির্দিষ্ট বটে, কিন্তু ঘরগুলি উল্টোদিক দিয়ে পড়তে হয়। এই মতে ছকটির উপরের বাঁ-কোণের ঘরটি মীন, তার ডান পাশের ঘরটি মেঘ, তার পরেরটি বুধ ইত্যাদি। জৈমিনি-স্বত্বের বিচারের সময়, দৃষ্টি প্রভৃতির বিচারে, এইরূপ চক্রের উপযোগিতা আছে। সে কথা পরে বলব।

এই তিন রকম রাশিচক্র দিয়ে আমাদের দেশে জন্ম সময়ের গ্রহ সংস্থান লিপিবদ্ধ করা হয়, এর কোনটিই কি চিত্রের দ্বারা, কি অঙ্কের দ্বারা, জন্ম সময়ে, জন্মস্থানের আকাশের একটা সঠিক ধারণা দিতে পারে না। এই তিন রকম চক্রের কোনটিই দেখে বোঝা সম্ভব নয় যে, জন্মকালে, জন্মস্থানের আকাশে ঠিক কোন কোন তারগণ কোন রাশি নক্ষত্র বা গ্রহছিল। বাংলাদেশের হিসাবে লেখা রাশিচক্রে তবু কোন গ্রহ কোন নক্ষত্রে আছে তার উল্লেখ থাকে, পশ্চিম ভারতের বা দক্ষিণাঙ্গের হিসাবে লেখা কুণ্ডলীগুলিতে তাও থাকে না। বাংলা দেশে যে হিসাবে রাশিচক্র লেখা হয়ে থাকে, তাকে একই পরিবর্তিত ক'রে নিয়ে এমন ভাবে লেখা যেতে পারে, যাতে ক'রে এর ত্রুটি অনায়াসেই শুধরে যেতে পারে। আমার মতে জন্মকালের গ্রহ ও তারার সংস্থান, এই ভাবে লেখা উচিত। যেমন আগের লেখা কুণ্ডলীটি এই ধরনে লিখলে, একই সঙ্গে রাশিচক্রে গ্রহদের আপেক্ষিক অবস্থান এবং জন্মস্থানের আকাশের অবস্থান দুইই সহজে গোঁজা যায়—

[ক্রমঃ

পাট ও পাঁচ

শ্রী—

॥ প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা ॥

মহান ব্যক্তিদের জীবনী অবলম্বনে চলচ্চিত্র নির্মাণ সব দেশেই করে আসছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে এই মহৎ প্রচেষ্টার অভাব বিশেষ করেই পরিলক্ষিত হয়। মহাজীবনের ও জীবনীর অভাব আছে—এ কথা একেবারেই বলা চলে না। পৌরানিক ও ঐতিহাসিক যুগ থেকে আরম্ভ করে এই আধুনিক কাল পর্যন্ত বহু ক্ষণজন্ম। মনীষীর জন্ম এ ভারতের বৃক্কে হয়েছে—বহু মহাপুরুষের আবির্ভাবে ধন্য হয়েছে এ ভারত ভূমি। কিন্তু তাঁদের মহাজীবনী পুঁথির পাতায় বা লোকমুখে নিবদ্ধ হয়ে রয়েছে—চলচ্চিত্রের রূপালী পর্দায় প্রতিফলিত হয়ে আবালবৃদ্ধবনিতার মন হরণে সমর্থ হয় নি। অবশ্য কিছু কিছু জীবনী-চিত্র যে তৈরী হয়নি তা নয়; তবে তুলনায় সেগুলি নগণ্য।

কর্ণবহুল ও ঘটনাবহুল জীবনীই চলচ্চিত্রে রূপায়ণের সবচেয়ে উপযোগী। অতীতের কথা ছেড়ে দিয়েও এই বর্তমান কালেই এমন এক ঘটনাবহুল রোমাঞ্চকর জীবনী আমাদের সামনে রয়েছে যার তুলনা বিরল! এই মহাজীবনী ভারত যাতার মহান, সম্মান, স্বাধীনতা যুদ্ধের মহান সৈনিক, দেশপ্রেমে উৎসর্গিত প্রাণ, মহানায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। নেতাজীর পূর্ণাঙ্গ, প্রামাণিক ও তথ্যবহুল জীবনী চিত্রের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। সুখের বিষয় এ বিষয়ে অনেক চিত্র-নির্মাণতাই চিন্তা করছেন এবং ‘ভারতী চিত্রম’ নামের একটি সংস্থা এ বিষয়ে অগ্রণী হয়েছেন। এই ভারতী চিত্রম “নেতাজী সুভাষ” নামে নেতাজীর জীবনী অবলম্বনে একটি হিন্দী চিত্র নির্মাণে ব্রতী হয়েছেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইন্দলের যে স্বাধীন আত্মা

হিন্দ বাহিনী অধিকার করে নিয়েছিল সেই আয়গাটিতেই সম্প্রতি “নেতাজী সুভাষ” চিত্রের শুভসূচনা অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকোইরেং সিং এবং মণিপুর বিধানসভার সদস্যবৃন্দও উপস্থিত ছিলেন।

পরদিন থেকেই ছবিটির নিয়মিত চিত্র-গ্রহণ শুরু হয় মাউডাক ও বিষ্ণুপুর অঞ্চলে। আজাদ হিন্দ ফৌজ এবং ব্রিটিশদের সঙ্গে এই সব স্থানে বড় রকমের যুদ্ধ হয়েছিল। এই চিত্রেও সেই সব দৃশ্য দেখতে পাওয়া যাবে।

এই চিত্রে নেতাজীর ভূমিকায় রূপদানের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন প্রেমনাথ। অন্যান্য বিশেষ ভূমিকাগুলিতে রয়েছেন বীণা রায়, বলরাজ সাহনী, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, গজানন জাগীরদার এবং নাজির হোসেন প্রভৃতি। শেখোক্ত শিল্পী যুদ্ধের সময় “আই-এন-এ”-র প্রমোদ বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং তিনিই ছবিটির চিত্রনাট্য এবং সংলাপও রচনা করেছেন।

চিত্রটি পরিচালনা করছেন ‘সুদীরাম’, ‘বাঘা বতীন’ প্রভৃতি চিত্রখ্যাত হিরণ্ময় সেন।

চিত্রটির আন্তর্জাতিক দৃশ্যগুলি কলিকাতা ও বোম্বাই-এর ষ্টুডিওতে তোলা হবে। বহিদৃশ্যগুলির কিছুটা কাবুলে এবং সম্ভবত কিয়দংশ দূর প্রাচ্যেও তোলা হতে পারে।

এ ছাড়া বিলাতে ইংরাজী চিত্রের একমাত্র বাঙ্গালী প্রযোজক ও চিত্রনাট্যকার শ্রীউমেশ মল্লিক ও তাঁর সহকর্মী জেনেট বেনেট বর্তমানে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ভারত ত্যাগের কাহিনী অবলম্বনে একখানি চিত্রনাট্য রচনায় ব্যস্ত রয়েছেন। ছবিটির নামকরণ করা হয়েছে “এস্কেপ্, অফ্, চেন্সবোস” (চেন্সবোস নামেই নেতাজী জাপান ও ইউরোপে পরিচিত)। এ ছবির আখ্যানাংশ লন্ডনের ‘ডেলী টেলিগ্রাফ’ ও ‘ইভিনিং নিউজ’-এর রোমাঞ্চকর বিবরণীর ভিত্তিতে রচিত। এই ছবিটি নির্মাণের জন্য জোকাল নামে এক ক্রোড়পতি উদ্যোগী হয়েছেন এবং তাঁর বহু বিখ্যাত অভিনেতা শিটার সেলার্সকে নেতাজীর ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য আহ্বানও করেছেন বলে শ্রীমল্লিক জানিয়েছেন।

চিত্রের নামকরণটি আমাদের মনঃপুত না হলেও শ্রীমন্টিকের এই উদ্যমকে এবং “ভারতী চিত্রম্”-এর প্রশংসনীয় প্রচেষ্টাকে আমরা অভিনন্দিত করছি।

—

অন্যান্য অন্যান্য ৪

তপন সিংহের পরবর্তী চিত্রটি হবে “অতিথি” নামে। রবীন্দ্রনাথের এই অসাধারণ ছোট গল্পটির পরিচালনার দায়িত্ব ছাড়াও শ্রীমন্টিক প্রথম দেখা যাবে সঙ্গীত পরিচালকরূপে। নিউ থিয়েটার্স ‘একজিবিটস’ প্রাইভেট লিমিটেডের এই চিত্রে একটি নতুন শিশু শিল্পীরও সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে।

* * *

প্রযোজক-পরিচালক শক্তি সামন্তের পরবর্তী ছবিটির নাম হচ্ছে ‘আধি রাত’। এর প্রধান দুটি চরিত্রে অভিনয় করবেন শর্মিলা ঠাকুর ও মনোজকুমার। শক্তি সামন্ত স্বয়ং ছবিটি পরিচালনা করবেন এবং সুরযোজনা করবেন ও. পি. নাথার।

‘আধি রাত’-এর বহির্দৃশ্যগুলি গৃহীত হবে গোয়া, ম্যাকালোর, কালিকট ইত্যাদি অঞ্চলে।

* * *

প্রভাত মুখোপাধ্যায় কলিকাতায় একটি হিন্দী ছবি তৈরী করার পরিকল্পনা করেছেন বলে খবর পাওয়া গেছে। বলরাজ সাহনীকে এই চিত্রের প্রধান শিল্পীরূপে দেখা যাবে।

* * *

অজয় কর-এর নতুন ছবি “কাঁচ-কাটা ছীরে”র চিত্র-গ্রহণ এই সপ্তাহেই শুরু হচ্ছে বলে জানা গেল। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় হচ্ছেন নায়ক, আর নায়িকার ভূমিকায় থাকবেন খুব সম্ভব মাধবী মুখোপাধ্যায়। বিকাশ রায়কেও একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় দেখা যাবে।

* * *

হেয়েন গুপ্ত পরিচালিত “অনারিকা” নামক চিত্রের একটি দৃশ্যে অংশ গ্রহণের জন্য হিন্দী চিত্রজগতের জনপ্রিয় শিল্পী শশিকলা সম্প্রতি কলিকাতায় এসেছিলেন। এই চিত্রের অল্প দুটি প্রধান ভূমিকায় শিল্পী হলেন অনিল চট্টোপাধ্যায়

ও রত্না গুপ্ত। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এই চিত্রের সঙ্গীত পরিচালক।

* * *

এইচ, জি, গ্রোভাকম্পন্সের ‘স্বর্ষতপা’ ছবির শুটিং রাধা ফিল্মস টুডিওতে চলছে। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের কাহিনী অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করেছেন অগ্রদূতগোষ্ঠী। প্রধান করেকটি চরিত্রের শিল্পী হচ্ছেন উত্তমকুমার, সখ্যা রায়, পাহাড়ী সান্তাল, ছায়া দেবী ও শ্রীমান বাবলু। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ছবিটির সঙ্গীত পরিচালক।

* * *

হিন্দী চিত্রজগতের নামী শিল্পী দিলীপকুমারকে এবারে একটি বাংলা ছবিতে অভিনয় করতে দেখা যাবে। ছবিটির নাম “পাড়ী”। অরাসহর ওই নামেরই কাহিনীর ভিত্তিতে রচিত এই ছবিতে দিলীপকুমার অবতীর্ণ হবেন এক জেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট-এর ভূমিকায় এবং ছবির দুটি মুখ্য চরিত্রে থাকবেন ধর্মেন্দ্র ও শ্রীমতী প্রণতি ভট্টাচার্য।

নিউ ইণ্ডিয়া পিকাসের পতাকাভালে “পাড়ী” ছবিটি কলকাতাতেই তোলা হবে এবং এর গীত-রচনা ও সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন সঞ্জিল চৌধুরী। হেমন্তকুমারের কণ্ঠে ছবির একটি গান সম্প্রতি বকিংহাম রেকর্ড করা হয়েছে।

* * *

“সাজ ও আওয়ার সিনে এটার প্রাইজস”-এর “হুতা ও দেবতার গ্রাস” রাধা, পূর্ণ এবং অমৃত প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির প্রতীক্ষায় রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের একটি ছোটগল্প ও একটি দীর্ঘ কবিতা অবলম্বনে নির্মিত এই দুটি ছবি এক সঙ্গে দেখানো হবে। ছবি দুটি পরিচালনা করেছেন পার্শ্ব প্রতিম চৌধুরী এবং সুর-রচনার দায়িত্ব সম্পন্ন করেছেন ভি, বালসারা। ‘হুতা’ ছবিতে অভিনয় করেছেন শর্মিলা ঠাকুর, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, অমৃত গুপ্ত, লিলি চক্রবর্তী, গীতা দে প্রভৃতি। আর ‘দেবতার গ্রাস’ চিত্রের প্রধান শিল্পীরা হলেন বিকাশ রায়, রমা গুহ ঠাকুরতা, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি।

* * *

অনেকদিন পরে চলচ্চিত্রকার প্রভাত মুখোপাধ্যায় একটি বাংলা ছবি করেছেন। ছবিটির নাম ‘দেবতার

দীপ'। ত্রিমুখোপাখ্যায়ের রাষ্ট্রীয় সম্মানপ্রাপ্ত অসহীয়া চিত্র 'পুবেষণ'-এর বাংলা রূপ এটি। বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দিয়েছেন: অনিল চট্টোপাধ্যায়, মাধবী মুখোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, দীপ্তি রায়, জহর রায়, ভাসু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।

শত্ৰু মিত্র ও অমিত্র মৈত্র রচিত "কাঞ্চনরত্ন" নাটকটি 'বহরুপী' সাফল্যের সহিত অভিনয় করেছেন এবং প্রেক্ষাগৃহে অনেকেই দেখেছেন। এই সকল নাটকের চলচ্চিত্ররূপ দিয়েছেন চলচ্চিত্র-প্রযাস সংস্থা।

বহরুপী সম্প্রদায়ের শিল্পীরাই ঐ ছবিতে অভিনয় করেছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন: তৃপ্তি মিত্র, অরুণ মুখোপাধ্যায়, গঙ্গাশঙ্কর বসু, শোভেন মজুমদার, লতিকা বসু প্রভৃতি। এ-ছাড়া আছেন তরুণকুমার, সুরভা, বিপিন গুপ্ত প্রভৃতি। স্বরকার হচ্ছেন ভি, বালসারা। ছবিটি শীঘ্রই মুক্তি পাবে।

রহস্য-চিত্র "কে তুমি?" এখন মুক্তির প্রতীক্ষায় রয়েছে। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন অনিল চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, বিকাশ রায়, সবিতা চট্টোপাধ্যায় (বোম্বাই), তরুণকুমার, পাহাড়ী সান্তাল প্রভৃতি। রবীন চট্টোপাধ্যায় চিত্রটির স্বরকার।

আর, ভি, বনশালকৃত মগধী চিত্র "মোরে মন মিতো-রা"র চিত্রগ্রহণ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ব্যঙ্গবহুল এই চিত্রটির বিভিন্ন ভূমিকায় রূপ দিয়েছেন: হেলেন, কুমারী নাজ, বেলা বসু, সবিতা চট্টোপাধ্যায়, অমৃত গুপ্ত, ছায়া দেবী, সজিতকুমার, সখীরকুমার, বিপিন গুপ্ত, পাহাড়ী সান্তাল প্রভৃতি।

'মোরে মন মিতোরা'র গানগুলিতে কণ্ঠদান করেছেন সুমন কল্যাণপুরী, মারা দে, আশা ভোঁসলে, মহম্মদ রফি, মুকেশ প্রমুখ জনপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পিবৃন্দ।

চিত্রাভিনেত্রী গীতাবালীর প্রথম ছবি "রানো"র (ইস্টম্যানকলার) চিত্রগ্রহণ সম্প্রতি শুরু হয়েছে। এই পাঞ্জাবী ছবিটি সম্পূর্ণই বহির্দৃশ্যে গৃহীত হবে এবং ৩৫ দিনের মধ্যে এর শুটিং শেষ হবে বলে প্রকাশ। প্রধান ভূমিকায় গীতাবালী ও ধর্মেন্দ্র অভিনয় করেছেন।

প্রাচ্যবাণী নাট্য সম্প্রদায় অধ্যক্ষা ড: রমা চৌধুরীর পরিচালনায়, সুবিখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিত ও কবি পরলোকগত ড: বভীন্দ্র বিমল চৌধুরী বিরচিত দশটি সংস্কৃত নাটক

দিল্লী, অরুণ, জামনগর, দারকা এবং শুধার বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে অভিনয় করে আটটি পদক, একটি শিল্প এবং বহু পুরস্কার লাভ করেছেন। প্রথম অভিনয় হয় দিল্লীতে রাষ্ট্রপতি ভবনে রাষ্ট্রপতি ড: রাধাকৃষ্ণনের উপস্থিতিতে। তিনি আশীর্বাদ স্বরূপ প্রাচ্যবাণীকে পাঁচশত টাকা দান করেন। রাজস্থানের রাজ্যপাল ড: সম্পূর্ণানন্দও জয়পুরে অভিনয় দর্শনে সন্তুষ্ট হয়ে পুরস্কার প্রদান করেন।

বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে শ্রেষ্ঠ পরিচালিত চিত্রের গৌরব অর্জন করার পর, আর ভি বনশাল প্রযোজিত ও সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'মহানগর' চিত্রটি যেন্নিকো চলচ্চিত্র উৎসবের বিশেষ আমন্ত্রণ লাভ করেছে। উৎসবটি আগামী ১৪ই নভেম্বর শুরু হয় শেষ হবে ২৪শে নভেম্বর।

বিবাহের পর এলিজাবেথ টেলর এবং তাঁর নবতম স্বামী রিচার্ড বাট'নকে যে ছবিটিতে সর্বপ্রথম অভিনয় করতে দেখা যাবে তার নাম "দি স্ট্রাওপাইপার"। সম্প্রতি মন্ট্রালের লোকেশনে মেট্রো গোল্ডুইন্‌ মারায় প্রযোজিত এই চিত্রের কয়েকটি বহির্দৃশ্য তোলা হয়েছে।

ভারতের আগামী তৃতীয় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে অংশ গ্রহণের জন্য এ পর্যন্ত ৩২টি দেশ তাদের সম্মতি জানিয়েছে। এছাড়া আরও কয়েকটি দেশের কাঁহ থেকে এ ব্যাপারে অবিলম্বে সম্মতি পাওয়া যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। এমন কি রাষ্ট্রসংঘও এই উৎসবে একটি ছবি পাঠাচ্ছেন। এটি অবশ্য প্রতিযোগিতার বাইরে থাকবে।

এবারকার উৎসবটি যেহেতু প্রতিযোগিতামূলক হবে, সেইজন্য যে-সব ছবি ১৯৬৩ সালের ১লা জানুয়ারীর পর তৈরী হয়েছে এবং যা ইতিপূর্বে অন্য কোনো প্রতিযোগিতামূলক উৎসবে দেখানো হয়নি, কেবলমাত্র সেই সব চিত্রই এই উৎসবে যোগদানের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

কয়েকটি দেশ ইতিমধ্যেই তাদের ছবির নাম পাঠিয়েছে। এদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল:—সুইডেনের 'ব্রোলপস্বেসেরার' (পরিচালনা: আকে ফালক), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'আইল্যাণ্ড অব দি ব্লু ডল্‌ফিন' (পরিচালনা: জেমস, বি, ব্রাউন), পোল্যান্ডের 'কাকে ক্রম দি পার্ট' (পরিচালনা: জান রাইব-কাউস্কি), চেকোস্লোভাকিয়ার 'জানোসিক' (কাহিনী ও পরিচালনা: পলো বারেলিক), ফ্রান্সের 'এল হোম ভি বিও' এবং সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের 'ব্রাইডস্‌ মাদার'।

উৎসব চলাকালে চলচ্চিত্র শিল্পের বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনা হবে এবং দেশবিদেশের চলচ্চিত্র বিশ্লেষণ এই আলোচনার অংশ নেবেন।



সম্পাদনা : শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়



স্বদেশের চট্টোপাধ্যায়

খেলার কথা

ক্ষেত্রনাথ রায়

অষ্ট্রেলিয়া বনাম ভারতবর্ষ ৪

১৯৬৪ সালের ইংল্যান্ড সফর সমাপনান্তে অষ্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দল স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পথে ভারতবর্ষের মাটিতে তিনটি টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচ খেলে গেল। এই নিয়ে অষ্ট্রেলিয়া সরকারীভাবে তিনবার ভারত সফরে এলো। সরকারীভাবে প্রথম আসে—জনসনের নেতৃত্বে ১৯৫৬-৫৭ সালে এবং দ্বিতীয়বার রিচি বেনোর নেতৃত্বে ১৯৫৯-৬০ সালে। ১৯৬৪ সালের ভারত সফরে ববি সিম্পসন অষ্ট্রেলিয়া দল পরিচালনা করেছিলেন। অষ্ট্রেলিয়া বনাম ভারতবর্ষের ১৯৬৩ সালের টেস্ট সিরিজটি অমীমাংসিত থেকে গেছে। মাদ্রাজের প্রথম টেস্টে অষ্ট্রেলিয়া ১৩৯ রানে জয়ী হয়। বোম্বাইয়ের দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় ভারতবর্ষ ২ উইকেটে জয়ী হলে খেলার ফলাফল সমান ১-১ দাঁড়ায়। কলকাতার তৃতীয় টেস্ট খেলায় জয়-পরাজয়ের যীমাংসা হয়নি। পাঁচদিনের খেলা তিন দিন খেলা হওয়ার পর বন্ধ থাকে। বৃষ্টির দরুণ মাঠের অবস্থা খারাপ ছিল; কলে চতুর্থ এবং পঞ্চম দিনে খেলা আরম্ভ করাই সম্ভব হয়নি। ১৯৬৪ সালের অষ্ট্রেলিয়া বনাম ভারতবর্ষের টেস্ট সিরিজটিতে 'রাবার' অমীমাংসিত থেকে যায়। এই টেস্ট সিরিজটি ছিল উভয় দেশের চতুর্থ সরকারী টেস্ট ক্রিকেট সিরিজ। চারটি সরকারী টেস্ট সিরিজের ফলাফল : অষ্ট্রেলিয়ার 'রাবার' জয় ৩ বার এবং সিরিজ অমীমাংসিত ১ বার (১৯৬৪ সাল)। এই চারটি টেস্ট সিরিজের ১৬টি টেস্ট খেলার ফলাফল : অষ্ট্রেলিয়ার জয় ২, ভারতবর্ষের জয় ২, এবং খেলা ড্র ২। অষ্ট্রেলিয়া ১৯৪৭-৪৮ সালের টেস্ট সিরিজে ৪-০ খেলায় (ড্র ১), ১৯৫৬-৫৭ সালের টেস্ট সিরিজে ২-০ খেলায় (ড্র ১) এবং ১৯৫৯-৬০ সালের টেস্ট সিরিজে ২-১ খেলায়

(ড্র ২) 'রাবার' জয়ী হয়।

প্রথম টেস্ট ৪

অষ্ট্রেলিয়া : ২১১ রান (বিল লরী ৬২ এবং নরমান ও'নীল ৪০ রান। বাপু নাথকানী ৩১ রানে ৫ এবং কপাল সিং ৪৩ রানে ৩ উইকেট পান) ও ৩৯৭ রান (ববি সিম্পসন ৭৭, ভিভার্স ৭৪, বার্জ ৬০ এবং লরী ৪১ রান। নাথকানী ২১ রানে ৬ এবং বজনে ৫৩ রানে ২ উইকেট পান)।

ভারতবর্ষ : ২৭৬ রান (পাতোদি নট আউট ১২৮ এবং চান্দু বোরবের ৪৯ রান। গ্রাহাম ম্যাকক্লি ৫৮ রানে ৬ উইকেট পান) ও ১৯৩ রান (হুমমত সিং ৯৪ এবং মঞ্জরেকার ৪০ রান। ম্যাকক্লি ৫৩ রানে ৪, হক ২৬ রানে ২ এবং ভিভার্স ২৮ রানে ২ উইকেট পান)।

মাদ্রাজে অহুস্তিত প্রথম টেস্ট খেলার পঞ্চম দিনে চাপানের নির্দিষ্ট সময়ের ১৯ মিনিট আগে জয়-পরাজয়ের নিশ্চয়ি হয়—অষ্ট্রেলিয়া ১৩ রানে জয়ী হয়।

দ্বিতীয় টেস্ট ৪

অষ্ট্রেলিয়া : ৩২০ রান (পিটার বার্জ ৮০, বেরী জার্মান ৭৮ এবং ভিভার্স ৬৭ রান। চন্দ্রশেখর ৫০ রানে ৪ এবং নাথকানী ৬৫ রানে ২ উইকেট পান) ও ২৭৪ রান (কাউপার ৮১, ব্রায়ান বুথ ৭৪ এবং বিল লরী ৬৮ রান। চন্দ্রশেখর ৭৩ রানে ৪ এবং নাথকানী ৩৩ রানে ৪ উইকেট পান)।

ভারতবর্ষ : ৩৪৮ রান (পাতোদি ৮৬, জয়সীমা ৬৬ এবং মঞ্জরেকার ৫৯ রান। ভিভার্স ৬৮ রানে ৪ এবং কলোনী ৬৬ রানে ৩ উইকেট পান) ও ২০৬ রান (চ উইকেটে। সরদেবাই ৫৬, পাতোদি ৫৩, মঞ্জরেকার ৩২, দুর্গানী ৩১ এবং বোরবের নট আউট ৩০ রান। কনোলী ২৪ রানে ৩, ম্যাকক্লি ৪৩ রানে ২ এবং ভিভার্স ৮২ রানে ২ উইকেট পান)।

বোম্বাইয়ের দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় ভারতবর্ষ ২ উইকেটে অষ্ট্রেলিয়াকে পরাজিত করে—অষ্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ভারতবর্ষের এই দ্বিতীয় জয়। প্রথম

জয় হয়েছিল ১৯৫২-৬০ সালের টেস্ট সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট খেলার (কানপুর) ১১৯ রানে।

বোম্বাইয়ের আলোচ্য দ্বিতীয় টেস্ট খেলাটি যেভাবে উষ্ম ও উত্তেজনার মধ্যে শেষ হয়েছে তাতে টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে নিঃসন্দেহে এই খেলাটি অস্বরণীয় হয়ে থাকবে। এই খেলাটির বিশেষত্ব, কোন একদল খেলার একটানা প্রাধান্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়নি। ভাগ্যবশী বারবার এক দলের কাঁধ ছেড়ে অন্যদলের কাঁধে ভর করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষ তাঁকে ঘরে বেঁধে রাখতে পেরেছিল।

টসে জয়ী হয়ে অস্ট্রেলিয়া প্রথম ব্যাট ধরে। প্রথম দিনের খেলার তাদের ৬টা উইকেট পড়ে ৩০১ রান ওঠে। দ্বিতীয় দিনে ৩২০ রানের মাধ্যম অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস শেষ হলে ভারতবর্ষ খেলার বাকি সময়ে ৪টে উইকেট খুইয়ে ১৭৮ রান সংগ্রহ করে। তৃতীয় দিনে ৩৪১ রানের মাধ্যম ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস শেষ হলে ভারতবর্ষ ২১ রানে অগ্রগামী হয়। এই দিনে অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় ১টা উইকেট পড়ে ১১২ রান ওঠে—তখন অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে খেলার গতি। কিন্তু চতুর্থ দিনে ২৭৪ রানের মাধ্যম অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয়ে যায়। অস্ট্রেলিয়ার মেরুদণ্ড ভেঙেছিলেন চন্দ্রশেখর এবং নাদকাণী। লাকের সময় অস্ট্রেলিয়ার রান ছিল ২০৫ (৩ উইকেটে)। লাকের পরের খেলাতে তারা ভেঙে পড়ে। অস্ট্রেলিয়ার ২৪৭ রানের মাধ্যম চন্দ্রশেখর তাঁর একই ওভারে ত্রিভাস এবং বৃথকে খালি হাতে বিদায় করেন। নাদকাণী ৪টে উইকেট পান মাত্র ১৬ রানে—২.৪ ওভার এবং মেডেন ৫। লাকের পর অস্ট্রেলিয়া ৬টা উইকেট খুইয়ে ৮০ মিনিটের খেলায় ৬২ রান সংগ্রহ করেছিল। অস্বস্থ থাকার ও'নীল দ্বিতীয় ইনিংসেও ব্যাট করতে নায়েননি। ফলে ২৭৪ রানের মাধ্যম ২ম উইকেট পড়ার সঙ্গে সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসের খেলাও শেষ হয়। তখন খেলার জয়লাভের জন্তে ভারতবর্ষের ২৫৪ রান করার প্রয়োজন হয়। চতুর্থ দিনের বাকি দু'ঘণ্টার খেলায় ভারতবর্ষের তিনটে উইকেট পড়ে গিয়ে ৭৪ রান ওঠে। খেলার জয়লাভ করতে আরও ১৮০ রানের প্রয়োজন—হাতে জমা আছে ৭টা উইকেট এবং সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা খেলার সময়। ভারতবর্ষের দিকেই খেলার গতি।

কিন্তু পঞ্চম দিনের খেলার প্রথম ৭৫ মিনিটে ভারতবর্ষের আরও তিনটে উইকেট পড়ে যায়—ভারতবর্ষের তখন রান দাঁড়ায় ১২২ (৬ উইকেটে)। তখনও জয়লাভের জন্তে

১৩২ রান তুলতে বাকি—হাতে জমা চারটে উইকেট। অস্ট্রেলিয়ার বুঠোতে তখন খেলার লাগান। এই সময়ে অস্ট্রেলিয়ারও জয়লাভের সম্ভাবনা আট আনা ছিল। দলের এই সঙ্গীন সময়ে ৭ম উইকেটের জুটি পতোদি এবং মঞ্জরেকারের দুখ চেয়ে রইলেন সবাই। তাঁরা দৃঢ়তার সঙ্গে খেলতে লাগলেন। লাকের সময় ভারতবর্ষের রান দাঁড়ালো ১৪৬ (৬ উইকেটে)—পার্তোদির রান ১৬ এবং মঞ্জরেকারের ২ রান। জয়লাভের জন্তে ভারতবর্ষের ১০৮ রান তুলতে হবে। চা-পানের বিরতির সময় ভারতবর্ষের জয় লাভের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিল কোর বোর্ডে ২১৫ রান (৬ উইকেটে)—জয়লাভের জন্তে আর মাত্র ৩৯ রান দরকার। উইকেটে তখন অপরাধিত ছিলেন পতোদি (৫০ রান) এবং মঞ্জরেকার (৩৯ রান)। কিন্তু চা-পানের পর সব আট মিনিট খেলা হয়েছে এবং চা-পানের সময়ের রানের সঙ্গে একরূপও যোগ হয়নি এমন সময় দলের ২১৫ রানের মাধ্যম মঞ্জরেকার নিজস্ব ৩৯ রান করে আউট হলেন। সপ্তম উইকেটের জুটিতে মঞ্জরেকার এবং পার্তোদি দলের ২৩ রান যোগ করেছিলেন। দলের ২২৭ রানের মাধ্যম পার্তোদি (৫৩ রান) খেলা থেকে বিদায় নেন। নবম উইকেটে বোরদের সঙ্গে জুটি বাঁধলেন ইঞ্জলিং সিংহী (উইকেট-কীপার)। দলের রান ২২০, হাতে আর জমা দুটো উইকেট এবং ভারতবর্ষের জয়লাভের জন্তে আর ৬০ রানের প্রয়োজন। তখন উত্তেজনা এবং উষ্মে খেলার অস্ত্র চোহরা। টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে খেলার শেষ দিকে এই রকমের উত্তেজনা এবং উষ্মের সৃষ্টি খুব কম খেলাতেই হয়েছে। দৃঢ়তার সঙ্গে খেলতে লাগলেন বোরদে এবং ইঞ্জলিং সিংহী। রান তোলায় তারা নেন বোরদে। দলের রান ২৪৮ (৮ উইকেটে), জয়লাভের জন্তে আর মাত্র ৬ রান দরকার। আর খুচরো এক রান করে নয়, ভিত্তাসের বলে বো দে পর পর দুটো বাউণ্ডারী করে জয়লাভের প্রয়োজনীয় রানের (২৫৪ রান) থেকে দু'রান বাড়তি করলেন, ২৫৬ রান (৮ উইকেটে) দাঁড়ালো। ভারতবর্ষের ২ উইকেটে জয় হলো। নবম উইকেটের জুটিতে বোরদে এবং ইঞ্জলিং সিংহী দলের ৩২ রান যোগ করেছিলেন—এই রানের মধ্যে বোরদে একাই করেছিলেন ২৯ এবং ইঞ্জলিং সিংহী ৩ রান। বোরদে (৩০ রান) এবং ইঞ্জলিং সিংহী (৩ রান) নটআউট থাকেন। বেলা ৪—৩১ মিনিটে দ্বিতীয় টেস্ট খেলার জয়-পরাজয়ের নিশ্চয়ি হয়।

সম্মাদকব্ধ—শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

কলকাতা চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে কুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক ২০.১১.১১, বিধান সঙ্গী, (পূর্বতন কর্তৃত্ববাহিনী স্ট্রীট,)

কলিকাতা ৬, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস দ্বারা ১৪.১১.৬৪ তারিখে মুদ্রিত ও প্রকাশিত



অগ্রহায়ণ-১৩৭৬

প্রথম খণ্ড

দ্বিপঞ্চাশত্তম বর্ষ

ষষ্ঠ সংখ্যা

বেদ ও প্রাচীন শাস্ত্রে স্বদেশ প্রেম

শ্রীমতী রেখা সিংহ

স্বদেশ প্রেম বলতে আমরা যে অর্থ গ্রহণ করে থাকি, তা' মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির একটি বিশেষ দান। গৃহাবাসী প্রাগৈতিহাসিক মানব স্বীয় আশ্রয়ক্ষেত্রেই তৎপর থাকত। তারপর যখন সে পরিবার গঠন করে বাস করতে লাগল, তখন পরিবারকে বাঁচাবার জন্য সে নিজের শ্রাণ বিপন্ন করতে ভয় পেতনা। ধীরে ধীরে সমাজ গঠন করে বাস করার প্রেরণা তার হৃদয়ের হিংস প্রবৃত্তিগুলিকে অনেকটা প্রশমিত করে, দয়া, মায়ী প্রেম ইত্যাদি সুকুমার বৃত্তিগুলিকে একে একে জাগিয়ে তুলতে লাগল। তারপর, তারা যে স্থানে বংশপরম্পরাক্রমে বাস করতে

লাগল। সেই স্থানের প্রতিঃ তাদের হৃদয়ের নিবিড় স্থলে একটি মহান স্থান গড়ে উঠতে লাগল। Home-sickness বা Nostalgia মাহুষের একটি আদিম প্রবৃত্তি বলে ধরে নিতে পারা যায়। কিন্তু বাঁচাবার আতিশুল্লিক মধ্যে এধরণের ভাবধারা গড়ে উঠবার অবকাশ পায় নি। তাই, আমরা দেখি প্রাচীন বাঁচাবার আর্থদের রচনার প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তির প্রতি তাদের শ্রদ্ধা ও ক্ষণেই স্নেহভক্তি প্রদর্শিত হলেও কোন একটি স্থান বিশেষের জন্য তাদের একটি বিশেষ মমতা বা আকর্ষণপূর্ণ মনোভাব তাঁরা দেখিয়ে বাননি। যখন আর্থেরা এদেশে এলেন, তখন

গৃহবাসী জীবিতগণের নাগরিক সভ্যতার স্পর্শ তাঁরা পেলেন। ধীরে ধীরে তাঁদের বাসাবসর প্রকৃতি প্রশস্তি হল। তাঁরাও এ স্থানে নগর নির্মাণ করে, নদীর তটভূমি অধিকার করে বাস করতে লাগলেন। ক্রমে ক্রমে সেই স্থানবিশেষ বা নদীবিশেষের সাহায্যের সহজে তাঁদের ধারণা জাগ্রত হয়ে উঠতে লাগল। ধর্মপ্রবণ জাতি হিসেবে ভারত ধর্মের মধ্য দিয়েই স্বদেশকে ভালবাসতে শিখেছিল। তবে তাঁদের এই ধারণার মধ্যে কোন সন্দেহতা বাস বাধেনি। ভারতের প্রাচীন আদর্শ শিখা মহেশ্বর, মাতা পার্বতী, ত্রিভুবন স্বদেশ ও হুটুই সমগ্র বহুধা। এই সময় হতেই তাঁদের রচনার স্থান-বিশেষের ও নদীবিশেষের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা প্রকটিত হতে দেখি। এই সময় থেকেই গঙ্গা যমুনা সিন্ধু কাবেরী ইত্যাদি তাঁদের শাস্ত্রে আরাধ্যা মাতৃহানীয়া হয়ে উঠল। তাঁরা বলে বলে ভারতবর্ষের পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে নানাভাগে বিভক্ত হয়ে অগ্রসর হতে লাগলেন, এবং দেশের অধিবাসীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে এক সংস্কৃতি বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে এক জাতি হিসেবে গড়ে উঠতে লাগলেন। তাঁদের শাস্ত্রেও আমরা সেই একসূত্রে গ্রথিত হওয়ার নিদর্শন পাই। রাষ্ট্র, রাষ্ট্রসভা ইত্যাদি শব্দগুলি তাঁদের পরম্পর মিলনেই স্ফোতক। অথর্ববেদের দু'একটি শ্লোকেও এই দুটি শব্দের উল্লেখ রয়েছে। একরাজার ছত্রপতাকার নিয়ে এবং একই সীমাবদ্ধ স্থানের মধ্যে বাস করতে করতে তাঁদের মধ্যে ধীরে ধীরে একজাতীয়তা বোধ গড়ে উঠতে লাগল। অবশ্য অধুনা প্রচলিত “গ্রাশত্য়ালিজম” এর সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক ছিল না। তাঁরা জানতেন উন্নত ধরণের শান্তিপূর্ণ জীবন ধারণ করতে হলে সকলের একমন এক মন হয়ে কাজ করতে হবে। কয়েকটি শ্লোকের মধ্যে এই তথ্যেই আভাস পাই। যেমন—

সকচ্ছন্দম্ সমধন্দম্ সংবো মনাসি জানতাম্

দেবাতাগং যথাপূর্বে সংজানানা উপাসতে।

সমানো মন্তঃ সমিতিঃ সমানী সমানঃ মনঃ

সহচিত্ত মেবামি।

সমানং ব্রহ্মবতিব্রহ্মণ্যে বঃ সমানেন বো হবিষা

জুহোমি। ভালবাসি।

সমানী আকৃতিঃ সমানা দৃষ্টমানি বঃ

সমানমন্ত বো মনো যথ বঃ জুহোমি। মণ্ডল ১০,

অধ্যায় ১২ সূক্ত ১২১। শ্লোক ২—৪

অন্যভূমিকে যাতা মনে করার শিক্ষা ঋষিগণই তাঁদের বংশধরদের দিয়ে গেছেন। অথর্ব বেদের পৃথিবী নামক সূক্তের বহুশ্লোকেই পৃথিবী: বিবিধ ঐশ্বর্যের কথা বলা হয়েছে। ভূমাতা কেমনভাবে তাঁর মহানদের পালন করছেন, তেজ, অন্ন, বল ইত্যাদি দান করে তিনি মহুয্য সকলকে সুখে বাস করতে সাহায্য করছেন—ইত্যাদি বিষয়ে কয়েকটি শ্লোক ঐ পৃথিবীসূক্তের মধ্যে পাওয়া যায়। বৈদিক কবি উচ্ছ্বসিত ভাবে ভূমাতার রূপ ও ঐশ্বর্যের বর্ণনা দিয়েছেন এই শ্লোকগুলির মধ্যে। পৃথিবী তাঁর নিকট স্বর্ণ নির্মিত* বলে মনে হয় একথাও লিখেছেন। স্বর্ণের সঙ্গে প্রিয় পদার্থের তুলনা করা বেদের মতই প্রাচীন মনে হয়।

মহত সর্বস্বং মহতী বিভূবিত মহানবেগ এজযুর্বে

পথুঠে।

মহাংস্তেজো রক্ষত্যগ্রমাদম্। সা নো ভূমে প্ররোচয়
হিরণ্যসেব সংদৃশি মা নো দ্বিকৃত কশ্চন ॥—১৮নং

শ্লোক পৃথিবীসূক্ত অথর্ববেদ।

অর্থাৎ—হে পৃথিবী তুমি একত্রিত হবার জন্য এক মহান ভবন স্বরূপ; তোমার বেগ ভীষণ, তোমার কম্পনও ভীষণ। মহারাজাধিরাজ, ঐশ্বর্যবান পরমাত্মা তোমাকে রক্ষা করেন। হে সর্বোৎপাদক পৃথিবী, তুমি আমার নিকট সুবর্ণসদৃশ প্রতীত হও। আমার প্রতি কেহ যেন শত্রুতা না করে। আর্য ঋষিগণ বলছেন—যে ভূমিপালক রাজা প্রজাবর্গকে শাসন করার ক্ষমতা, জ্ঞান, কার্য করবাৎ দৃঢ়সঙ্কল্প, তপোবল ইত্যাদি রাজোচিত গুণাবলী-সকলই পৃথিবী মাতারই দান স্বরূপ লাভ করেন। তাঁরই রূপায় আমার প্রজাকুল অন্ন-গোধন ইত্যাদি পরিবৃত্ত হয়ে সুখে কাল যাপন করতে পারে। ভূপতি ও প্রজাগণ উভয়েই এক পৃথিবীর সন্তান। ভূপতি লোক নারক স্বরূপ—তিনি সমগ্র প্রজাকুলের আদর্শ, প্রজাগণকে

* তুলনীয়—আমার সোনার বাংলা আমি তোমায়

স্থাপন করা তাঁর কর্তব্য। তিনি যেন শক্তির মহ-
মত্ততার নিজের কর্তব্য ও খীর পদের দায়িত্ব বিন্ধত না
হন। স্লোকটি নিম্নলিখিত রূপ—

সত্যং বৃহদৃভূমং দীক্ষা তপো ব্রহ্ম যজ্ঞঃ

পৃথিবীং ধারয়ন্তি ।

স। নো ভূতন্ত ভবান্ত পত্ন্যাকং লোকং

পৃথিবী নঃ কৃণোতু ।

পৃথিবীস্কৃত ।

পার্থিব স্বথস্বাচ্ছন্দ্যের জন্ত প্রার্থনা করেও কয়েকটি স্লোক
রয়েছে। তাদের মধ্যে একটি—

ভূমে মাতনি ধেহি মা ভদ্রয়া স্প্রতিষ্ঠিতম্ ।

সংবিধানা দিবা কবে প্রিয়ারং মা ধেহি ভূত্যাং ।

ভ৩নং স্লোক পৃথিবীস্কৃত ।

অর্থাৎ হে ভূমি! হে মাতঃ আমাদের ভূমি কল্যাণ ও
স্বথকারিণী লক্ষ্মী দ্বারা উত্তমরূপে প্রতিষ্ঠিত কর। হে
অমৃতধামিনী দেবী, ভূমি প্রকাশমান সূর্য দ্বারা সুসজ্জত হয়ে
আমাকে শ্রী, ধনসম্পত্তি ও বিভূতি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কর।

এরপর পুরাণের যুগে আর্ষদের উপনিবেশের সীমা বর্ণিত
হয়ে তাঁদের নিকট ভারতবর্ষ একটা বিশিষ্ট ভৌগোলিক
সীমান্ত রূপ পেলো। তখন থেকেই শাস্ত্র তাঁদের শেখাল
“জননী জন্মভূমিস্ত স্বর্গাদপি গরীয়সী”। ‘আকুমাৱী হিমাচল’
কথাটি পৌরাণিক যুগেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। ভারতের
অন্তর্গত বিভিন্ন নদনদী পাহাড় পর্বত, নগর নগরী সকলই
তৎকালীন ভারতবাসীদের নিত্যান্ত আপন হয়ে উঠে
তাঁদের শাস্ত্রান্বিতে স্থান লাভ করল। ধর্মভাবপ্রধান এই
জাতি তখন এই দেশের বৈচিত্র্যের মধ্যে ও ঐক্য
সহজেই খুঁজে পেলো। পূজার আবাহন মন্ত্রে দেশের প্রধান
প্রধান নদীর নাম, * তীর্থ হিসেবে বিভিন্ন নগর নগরীর
নাম কীৰ্ত্তিত হতে লাগল—তাঁদের তৎকালীন সাহিত্যে।
দেশের ঐশ্বৰ্য্যে তারা গৌরব অহুতব করতে শিখল। বিষ্ণু-
পুরাণে আমরা নিম্নলিখিত স্লোকটি পাই। পরাশর মুনি
‘জম্ব্বীপ অর্থাৎ ভারতবর্ষ ও অন্ত্যস্ত ভূখণ্ডের পরিচয় দিতে
গিয়ে নারদকে বলেছেন—

শ্রীপরশর উবাচ—

উত্তরং যৎ সমুদ্রস্ত হিমাল্যেষৈব দক্ষিণম্ ।

বর্ধং তদ্বারতং নাম ভারতী যত্র সন্ততিঃ ।

আর এই ভারতবর্ষ—

অত্রাপি ভারতং শ্রেষ্ঠং জম্ব্ব্বীপে মহামুনে ।

যতো হি কর্মভূরেবা দ্বতোহন্তা ভোগকৃষয়ঃ ।

বিষ্ণুপুরাণ . তৃতীয় অধ্যায়

জম্ব্ব্বীপের মধ্যে ভারতই শ্রেষ্ঠ—কেন না এটি কর্মভূমি—

অন্তস্থানসমূহ ভোগভূমি।

আর সেইজন্মই—

গায়ন্তি দেবাঃকিল গীতকানি ধন্যান্ত তে

ভারতভূমি তাগে ।

স্বর্গাপবর্গাশ্চ মার্গভূতে ভবন্তিত্যয়ঃ

পূর্ববাঃ সুরবাঃ ।

কর্মণ্য সঙ্কলিত তৎফলানি সংনস্ত বিষ্ণো

পরমাত্ম ভূতে ।

অবাণ্য তাং কর্ম মহীমনস্তে ভস্মিলয়ঃ বে

স্বমলাঃ প্রদ্বান্তি ।

অর্থাৎ—

স্বর্গ এবং মোক্ষের আশ্রয় বে পথ, এমন ভারতবর্ষে
যিনি জন্মগ্রহণ করেন, তিনি স্বর্গের দেবতা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ
হয়ে থাকেন।

আবার নামে পুরাণের মধ্যেও আমরা পাই—

ক্ষীরোদধেয়কন্তং যদ্ হিমাল্যেষৈব দক্ষিণম্ ।

জ্যেয়ং তদ্বারতবর্ধং সর্বকর্ম ফলপ্রদম্ ।

অত্রাপি দেবা ইচ্ছন্তি জন্ম ভারত ভূতলে ।

সঙ্কিতং স্মৃহৎ পুণ্যমক্ষয়ং স্মরণং শুভম্ ।

এবং ভারতভূত্যাং প্রশংসন্তি দিবৌকসঃ ।

ব্রহ্মাণ্ডাপি বিশেষেণ যতোগক্ষয়ভীরবঃ ।

তস্মাৎ পুণ্যতমং ভেতরং ভারতবর্ষ মৃত্যুম্ ।

দেবানাং তুর্লভং বাপি সর্বকর্ম ফলপ্রদম্ ।

অর্থাৎ ভারতবর্ষ পুণ্যতম ভূমি রূপে দেবতাগণ কর্তৃকও
উচ্চ প্রশংসিত হয়ে থাকে।

উপরোক্ত স্লোক কয়েকটি পড়লে সন্দেহ থাকে না,

পুরাণের যুগেও এদেশের অধিবাসীবিগণ স্বদেশকে কতটা
উচ্চে স্থান দিতেন। তাই এদেশে জন্মগ্রহণ করাটাকে

* গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরী সরস্বতী—ইত্যাদি
পূজার মন্ত্র।

তারা মহাপুণ্যফল স্বরূপ মনে করতেন। হিমালয়ের দক্ষিণেও সমুদ্রের উত্তরে স্থিত এই তৃথুনিবাসীগণ সকলে এক পুণ্য কর্মভূমির অন্তর্ভুক্ত ও নিজেদের একজাতীয় মনে করতেন। নদী বিশেষ ও স্থান বিশেষের মাহাত্ম্যের প্রতি এই ভারতবাসীগণের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। তারা যে স্বদেশকে ভালবাসতেন, এই শ্লোকগুলি তারই প্রমাণ। তবে তাঁদের এই একজাতীয়তা বোধের মধ্যে কোন উগ্রতা ছিল না। তাঁরা ছিলেন অধ্যাত্ম ধারণা-প্রবণ জাতি। নিজের দেশকে বিশ্বের সকল দেশাপেক্ষা উচ্চ স্থান দিলেও—বিশ্ব মানবতাবোধের ভারটাই তাঁদের হৃদয়ে লদা আগ্রত ছিল। তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন—

বস্তু সর্বাণি তুতানি আত্মৈবাহুদ্বিমানতঃ।

তত্র কো মোহঃ কঃ শোকঃ একস্ত মহাপশুতঃ।

পাশ্চাত্যের বিবর্তমান জাতিগুলির উদ্ভূত জাতীয়তা বোধের সঙ্গে এর কোন সাদৃশ্য নেই। যার সম্বন্ধে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

The truth is that the spirit of conflict of conquest is at the crigin and in the centre of western nationalism. Its basis is not social co-operation. It has evolved a perfect organisation of power, but not spiritual idéalism—Nationalism in the West—R. N. Tagore, Page—21.

অবশ্য তাঁরা জানতেন বিশ্বের সঙ্গে একাত্মতাবোধ বহু সাধনা সাপেক্ষ। তা' অর্জন করবার জন্য বহু ত্যাগ ও তিতিকার প্রয়োজন—সে পথ 'স্বরশ্ম ধারা নিশিতা হরতারা।' তবু তাঁরা সেই পথেরই পথিক ছিলেন। জুয়ার জন্তই সাধনা তাঁরা প্রেরণার মনে করতেন। পূর্বোক্ত জাতীয়তাবোধ এই কারণেই এঁদের মধ্যে উগ্ররূপ ধারণ করতে পারেনি।

কালিদাসের রচনার আমরা তাঁর প্রচ্ছন্ন স্বদেশপ্রেমের বহু পরিচয় পাই তৎকালীন ভারতবর্ষের নন্দনদী গিরিকন্ডর বনউপবন, নগর-নগরীয় পুষ্কালুপুষ্ক ছবি তাঁর রচনার স্পষ্টায়িত হয়েছে। সেগুলিকে স্বদেশের সৌন্দর্যে মুগ্ধকর কবির স্বদেশের প্রতি প্রার্থ্য নিবেদন বললে খুব বেশী ভুল হয় না। প্রকৃতবশেষে প্রকৃতিকে না ভালবাসলে,

দেশের ঐশ্বর্ষ্যে গৌরব অমুভব না করলে বা দেশের রাজচক্রবর্তী—জাতীয়বীরের 'শৌর্ষ্যে মুগ্ধ না হলে, এ প্রকৃতির রচনামৃষ্টি তিনি অবশ্য করতে পারতেন না। 'চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য'—জনশ্রুতিমতে যার সভাকবি তিনি ছিলেন—তাঁর ও তদীয় পিতা সমুদ্রগুপ্তের দ্বিধিজন্য কাহিনী তাঁকে রঘুর দ্বিধিজন্য-কাহিনী বর্ণনা করার প্রেরণা দিয়েছিল। সেই বর্ণনার মধ্যদিয়ে আমরা বৈচিত্র্যময় অথচ অথগু ভারতের একটি উজ্জল ছবি পাই। এখানে তিনি যেন চারণ কবির কাজ করেছেন। বিক্রমাদিত্যের বীরত্ব তিনি রঘুর বীরত্ব বর্ণনার ছলে রচনা করেছেন। বীর রঘু স্বীয় শৌর্ষ্যবান দ্বারা পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ সমগ্র ভারতভূমি একছত্রের তলায় আনয়ন করেন। রঘুবংশকাব্যের মধ্যে এই বিজয় কাহিনী পাঠকরলে ভারত-বর্ষের একটি ভৌগোলিক সীমান্তগত পূর্ণরূপ হৃদয়ে অঙ্কিত হয়ে যায়। হিমালয়ের সম্বন্ধে গৌরব প্রকাশ করে তিনি তাকে "পৃথিব্যা ইব মানবণ্ডঃ" বলেছিলেন। দেশের সমগ্র প্রকৃতি তাঁকে আনন্দ দান করেছে—সেই আনন্দ তিনি প্রকাশ করে গেছেন প্রকৃতির স্বন্দ্রবর্ণনার মধ্য দিয়ে। 'সেবর্ণনা স্বপ্নরঙীন নয়, প্রকৃত উজ্জল বাস্তব চিত্র, যদিও সেগুলি উপহার ছটায় পাঠকের মন স্বপ্নময় করে তোলে। কিন্তু কালিদাসের কাব্যে স্বদেশ প্রেম থাকলেও অধুনাতন পাশ্চাত্য দেশাগত জাতীয়তার ভিত্তির উপর যে সর্কারী স্বদেশ প্রেমের ভিত্তি, তার সঙ্গে এর সাদৃশ্য খুবই সামান্য রয়েছে। কোন দেশের মাহাত্ম্যের মধ্যে আত্ম-পর ভাব বতব্ব না আগ্রত হয়, তৎক্ষণ পাশ্চাত্যজাত দেশ প্রেম জন্মলাভ করতে পারেনা। জাতীয়তার সমালোচনা করে একটি নিবন্ধে বাট্রাণ্ডি রাসেল যথার্থই বলেছেন যে It began in France with Joan of Arc's resistance to the English, It began in England with resistance to the Spanish Armada and found its first Literary expression in Shakespeare," ইত্যাদি। কিন্তু পূর্বোক্তভিত্ত ভারতের স্বাধ মনোবী বা কবিগণের সাহিত্যিক দানের মধ্যে যে দেশের প্রতি ভালবাসার পরিচয় পাওয়া যায়, তা' সম্পূর্ণ স্বার্থগতহীন। স্বার্থহীনতা শূন্য বলেই অশোক তাঁর রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে যে শিলালিপিগুলি খোদিত

করিয়েছিলেন,—তাতে নিজেকে প্রজাগণের পিতাম্বরূপ ঘোষণা করতে পেরেছিলেন। অবশ্য দেশের মানুষদের ভালবাসা যদি স্বদেশপ্রেম হয়, তবেই তাকে সে ভ্রমী ভুক্ত করা যেতে পারে; এবং একথা জোরের সঙ্গে বলা যেতে পারে, যে, দে শিলালিপিতে অশোকের কেবলমাত্র মানব প্রেমই নয়, স্বদেশ প্রেমেরও নিদর্শন রয়েছে। নীচে অশোকের খোলিও ভৈরবে প্রাপ্ত অমুশাসনের কিয়দংশ উদ্ধৃত করা হল।

“দেবানং পিয়ে জেবং সহি...সমাপায়ং মহামতপ লদ বচনক বিতরিয়া—অং কি ছি দদামি, হকংতং ইছামি হকং কিত্তি? সব মুনসো মে পজা, অথ পজায়ে ইছামি কিং তিসে সবেনো হিত স্থথেন স্তজেয়ু, অথ পজায়ে ইছামি কিং তমে সবেন হিতস্থথেন স্তজেয়ুতি হিদলোগিক পাললোকিকেন হেবং মেব মে ইছা সব মুনসেসু সিয়া (।) অং (।) পাপু নেয়ু লামা জেবং ইছতি অহু বিগিনা হেয়ু মমিয়াযে অস্বসেয়ু মে স্থথংমেবচ লছেয়ু মম ও নোথ (।) এবং চ পাপুনেয়ু য মগতি নে লাজা (।) এছ কি যে থমিতবে (।) মমং নিমিতং চ থংম চলেয়ুতি জিদলোগং চ পললোগং চ আলথয়েয়ু (।) ইত্যাদি। অর্থাৎ “দেব প্রিয় এইরূপ কহিতেছেন—সমীপস্থিত মহাপাত্রগণকে রাজবচনানুসারে বলিতে হইবে যে, আমার যাহা মত তাহা প্রচারিত হউক ও সকলে তদনুযায়ী কার্য করুক আপনাদিগের প্রতি আমার উপদেশ আমার সেই উদ্দেশ্য সাধনের মুখ্য উপায়। সকল মহুযাই আমার পুত্রতুল্য।

আমি যেমন ইচ্ছা করি যে আমার পুত্রগণ সর্বপ্রকার মঙ্গল ও সুখলাভ করুক, সেইরূপ ইচ্ছা করি যে সকল মহুযাই ঐহিক ও পারত্রিক সর্বপ্রকার সুখ লাভ করুক, যদি আপনারা জানিতে চাহেন যে “অবিজিত প্রত্যন্ত বাসিগণের সম্বন্ধে আমাদের প্রতি রাজার কি আদেশ?” এ বিষয়ে আমার এই অভিপ্রায় জানিবেন যে আমি ইচ্ছা করি যে তাহারা নিকষেগে থাকুক। আমার প্রতি আশ্বাস স্থাপন করুক, তাহারা আমার নিকট স্থখই ভোগ করিবে কখনও দুঃখভোগ করিবেনা। রাজা যতদূর সম্ভব তাহাদের প্রতি কমানীল হইবেন এই কথা তাহারা সম্যক উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করুক। ইহাধারা তাহাদের ইহ পরলোকের আরাধনা হইবে।” ইত্যাদি রাজনীতি ও ধর্মনীতি এই উৎসবের সময় সাধন পূর্বক অশোক প্রজাগণকে পুত্রের ত্রায় শাসন করে গেছিলেন। প্রাচীন অপভ্রংশ সাহিত্যের নিবর্ণন স্বরূপ অশোকের অমুশাসন-গুলির মধ্যে অশোকের এই প্রজাপ্রেমের কথা লিখিত রয়েছে।

পেট্রিয়ারিটিকম্ বা পাশ্চাত্য স্বদেশ প্রেম আমাদের দেশে ইংরেজ শাসন আরম্ভ হবার পরে দেখা গেছে একথা সত্য। তবে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল ইত্যাদি কবি ও সাহিত্যিকগণের রচনায় যে স্বদেশ প্রেমের পরিচয় আমরা পাই—বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের রচনায় সেগুলির মধ্যে প্রেমেরই আধিক্য দেখা যায়; এবং দেশের পূর্ব ঐতিহ্যই এর মূলে রয়েছে বলা যেতে পারে।



প্রাণবানী

শ্রীমতী সত্যবতী দেবী

পূর্বপ্রকাশিতের পর

উনত্রিশ

পরদিন—১২ই জুলাই—সকাল আটটার ঐক্য আলোকের কাছে ছুটে এ'ল ওর টু-সিটার-এ। বলল : “তুই নাকি পনশেট বাঁধ ভাঙল ব'লে।”

আলোক (চা খেতে খেতে) : নমিতাও কাল সকালে বলছিল এ-গুরুবের কথা—রটিয়েছে তার সবজাস্তা সখী নাস'রা। বত সব! নে—চা খা।

ঐক্য (চুমুক দিয়ে) : না রে, ‘বত সব’ টব নয়। এবার তুই নমিতা ব্যাপার! আমাকে কাল রাতে বলেছেন একজন ইঞ্জিনিয়ার যিনি পনশেট বাঁধের খবর রাখেন। তাই আমি শুধু বলতে এসেছি তোকে যে, রমাকে এক্ষুণি নিয়ে আর, আর দেরি করিস নি। হঠাৎ জল এলে সে তো ছুটতেও পারবে না। মালতীও বলল এই কথাই।

নমিতা : বলি নি বাবা! তোমার সব তাতেই অবিশ্বাস।

ঐক্য (হেসে) যে সাধুকে অবিশ্বাস করে সে কি অসাধুকে গড় করবে নাকি? না—আমি বলি কি—হয়ত বাঁধ না ভাঙতেও পারে—তবু সাবধানের মার নেই এও কি বিশ্বাস করবি নে?

ক্রিং...ক্রিং...ক্রিং...

আলোক (টেলিফোন ধরে) : কে?

টেলিফোনে মালতী : দাদা, আমি মালতী। আপনার বন্ধুকে এক্ষুণি পাঠিয়ে দিন। পনশেট ভাষা ভেঙেছে।

আলোক : সত্যিই ভেঙেছে, না ওজব?

টেলিফোনে মালতী : সত্যিই ভেঙেছে—রেডিওতে এইমাত্র খবর দিল যে, মৃত্যু নদীতে হ হ করে জল আসছে।

আলোক : হয়ত—

টেলিফোনে মালতী : হয়ত টরত নয়—তুই নাকি জল আর একটু বাড়লেই টেলিফোন, বিদ্যুৎ সব বন্ধ—

বলতে বলতে খট শব্দ—টেলিফোন নীরব। নমিতা ঘরের একটি হুইচ টিপল—বুধা! আলোক ছুটল মোটরে কাছের “পাওয়ার হাউস”—এ খবর নিতে। তারা বলল মেঘলা মুখে—শুধু যে শহরের বহু তারই বিকল তাই নয়—“কম্লে কম্” সাত-আট দিনের আগে বিদ্যুৎ চলবে না, এমনকি হয়ত দুতিন সপ্তাহ পুণাবাসীদের লঠন জেলে রাত কাটাতে হ'তে পারে।

আলোক মোটর নিয়ে বাড়ি ফিরেই দেখে ওর এক সিঁচি বন্ধু সাইকেলে ছুটে এসেছে দারুণ ভয় পেয়ে। বলল তাদের পল্লী “ওয়ার্ডে বাড়ি”—তে কুল কুল করে জল আসছে। কাঁদো কাঁদো মুখে বলল : “কী হবে ডাক্তারবাবু? তুই নাকি সারা পুণাবাসের বস্ত্রাং ডুববে।”

আলোক জোর ক'রে মুখে হাসি টেনে বলে : “অত ভয়ের কারণ নেই—আমি আসছি, দেখি কি করতে পারি—কেবল দেখবেন প্যানিক না হয়। দরকার হ'লে আমার বাড়ির সামনে মাঠে তাঁবু খাটানো বাবে—ভড়-কাঠেন না, কারণ গণেশখিলে জল আসবে না।”

ত্রিশ

আলোক নমিতাকে মোটরে নিয়ে ছুটল “ওয়ার্ডে

বাড়ি"-র অভিমুখে, সেখান থেকে সঙ্গম ত্রিজে বাবে রমার খবর নিতে।

কিন্তু রুবি কলেজের উত্তর দিকে পৌছতে না পৌছতে কানে ভেসে আসে কলরব! ওরাকড়ে বাড়ি-তে এসেই চক্ৰবর্তী! এ কী ব্যাপার! শুধু যে নানা বাড়ির নিচু প্রাঙ্গণে জল ধৌ ধৌ করছে তাই নয়—মিনিটে মিনিটে হু হু ক'রে বাড়ছে, চোখে স্পষ্ট দেখা যায়! দু'একটি বাড়ির বাগানে এক হাঁটু জল ঠেলে চীংকার করতে করতে আসছে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, প্রোট-প্রোট, যুবক-যুবতী, বালক-বালিকা। রাস্তাটা চার পাঁচ ফুট উচু ব'লে সবাই সেখানে ছুটে এসে জমায়েৎ হচ্ছে। প্রতি বাড়িরই দোতলার জানলায়, ছাঁদে, পাঁচিলে কেবল মানুষের মাথা আর মাথা—খুঁকে দেখছে জলের কোঁঠি! মুখ চোখে তাদের ভয়ের অঙ্ককার। কেবল কয়েকটি ছ' সাত বছরের শিশু একটি গাড়ি বারান্দায় নেচে কুঁদে আছলান্দে আটখানা।

একটা বাড়ি থেকে এক পঙ্ক বৃদ্ধকে ছ'জন যুবক ধরা-ধরি ক'রে টেনে আনছে। কুহুর-বেড়াল সাঁতার দিচ্ছে। ছ'একটি বাড়ির বাগানে শিশুরা পার হচ্ছে কোমর-জলে মগ্ন বয়স্কদের কাঁধে চড়ে। ওকে দেখে ওর কয়েকটি সিঁদ্ধি বন্ধু উদ্বিগ্ন মুখে বলল: “কী হবে ডাক্তার বাবু?” ও কী উত্তর দেবে ভাবছে এমন সময়ে ছ' তিনটি সিঁদ্ধি মহিলা ওদের মোটরের দিকে ছুটে এসে নমিতার হাতে গুজে দিল ওদের গহনার বাক্স।

নমিতা চিন্তিত মুখে আলোককে জনান্তিকে বলল: “ওরা বলছে চারদিকে চোর। তবে বাড়ি রেখে আসি? রাস্তার ঘোরা চলে কি পরের গহনা নিয়ে?”

আলোক অগত্যা মোটর ফেরাল বাড়ির দিকে। ফিরে গহনাগুলি লোহার সিঁদ্ধিকে পুরে তবে বাবে রমাদের পাড়ায়। একটু দেরি হয়ে গেল—কিন্তু এখনো তো জলের ভেদন তোড় হয় নি। রমা ডুবে রাস্তার ভয় নেই—ছাঁদও তো আছে।

মোটরে চলতে চলতে নমিতাকে একথা বলতেই সে বলল: “কিন্তু তুমি জুলে গেলে বাবা, ওদের ছাদে উঠবার সিঁদ্ধি কোথায়?”

বলতে বলতে নমিতার চোখে জল এল, বলল:

বললাম—ওকে কাল নিয়ে আসতে—দেখ তো, নিয়ে এসে—”

বাকি কথা শেষ চোখের জলের যেশে।

আলোক ওর মাথার হাত রেখে বলল: “এখন কারায় সময় নয়—চলু বাই সঙ্গম ত্রিজে।” ব'লে বাইরে গিয়ে মোটরে উঠতে উঠতে: “আমিও তো কাল চেয়েছিলার—শুরুদেব যে বললেন রমার কোনো ভয় নেই—এই জন্তেই তো বলি মা, যে বিশ্বাসেরও বাড়াবাড়ি ভালো নয়—”

নমিতা চিৎকার ক'রে উঠল: “বাবা! রমা!”

একত্রিশ

ভল্ ক'রে মোটর ঢুকল ওদের গেটের মধ্যে। রমার পাশে আরোহী সারথি আলোকের এক রুগী, সিঁদ্ধি, নাম—মির্চন্দানি।

নমিতাকে দেখেই রমা ভেঙে পড়ল ওকে জড়িয়ে ধ'রে। ওর কাঁধে মাথা রেখে সে কী কারা: “দ্বিদি... দ্বিদি...”

দুধার থেকে রমার দুবাহ ধ'রে আলোক ও নমিতা রোকগম্যনাকে ভিতরে নিয়ে যায়। রমা নমিতার কোলে মুখ ডুবিয়ে শুধু কাঁদে হু হু ক'রে।

আলোক বেরিয়ে এসে মির্চন্দানিকে বলে: “কী ব্যাপার?”

মির্চন্দানি (কষ্ট মুখে): আর কী? সেই দজ্জালটার কাণ্ড! আপনাকে সেদিন বলছিলাম না—মহুতাইয়ের শনি ও যম ঐ ক্লাট। পাড়ার কি একজনও ওকে দেখতে পারে?

আলোক: কাল তো জুহুতে ছিলেন না?

মির্চন্দানি: হ্যাঁ আজ সকাল সাড়ে নটায় মোটরে ফিরেছেন সতীলক্ষ্মী:—জুহুতে নেচে কুঁদে। সঙ্গে এসেছে কে জানেন? সেই গভর্নমেন্টা—ক্যাণ্ডালাস!

আলোক: অলিভিয়া?

মির্চন্দানি: আর কে Public menace!

আলোক: তা তো হ'ল, কিন্তু মহুতাই কী করছেন?

মির্চন্দানি (ঠোট বেকিরে): কী আর করবেন? বা বরাবর ক'রে এসেছেন স্ত্রী বাই করুন না কেন—জো কুহুর মেমসাহেব—বাল্মা হাজির!

আলোক : কিন্তু রমা আপনার সঙ্গে এল হঠাৎ ?
একটু খুলে বলুন—ধাঁধা লাগছে।

মির্চন্দানি (হেসে) : ধাঁধা শুধু আপনারই না ভক্তার সাহেব। পাড়া শুধু লোকের ধাঁধা লেগেছে। উঃ! সে কী চিংকার জানেন না। আমি ছুটে এলাম আরো দুজন প্রতিবেশীকে নিয়ে ভাবলাম বুঝি কোনো ভাকাত কি ধুলে! এসে দেখি দজ্জালটা আপ্রাণ চোঁচাচ্ছে বারান্দায় রণচণ্ডী মূর্তি ধরে—আর রমা দুহাতে মুখ ঢেকে ফুলে ফুলে কাঁদছে।

আলোক : আর মমুতাই ?

মির্চন্দানি : তার কথা আর বলবেন না। ওটা কি একটা মাহুষ—যে জীর কথায় বাদর নাচে! দেখলাম সে খ' হয়ে শুধু চেয়ে আছে। চোখের দৃষ্টি কেমন যেন—আপনি তো ওর ভক্তার—পাগল টাগল হয়ে যায় নি তো ?

আলোক : না। তবে পেটে ক্যান্সার—

মির্চন্দানি : ক্যান্সার!

আলোক : ভক্তারে তো তাই বলছে—কিন্তু মরুক গে, শুনি কী হ'ল ?

মির্চন্দানি : ঐ তো বললাম—রণচণ্ডী ফিরে এসেই আপ্রাণ চোঁচাচ্ছেন, বলছেন ওকে : “বেরিয়ে যা বেরিয়ে যা বাড়ি থেকে—এই মুহূর্তে!”

আলোক : আপনার সামনেই ?

মির্চন্দানি (হেসে) : আপনি বিজ্ঞ হ'য়েও মাঝে এমন ছেলেমানুষের মতই কথা বলেন ভক্তারবাবু, যে মনে হয় বুঝি আপনি এ-জগতে হঠাৎ উড়ে এসেছেন কোনো একটা দেবলোকটোক থেকে। সবাই জানে মিসেস্ কাপাডিয়া রাগলে একেবারে ক্ষেপে যান যাকে বলে—আমি কী বলছেন? আমার সঙ্গে দুজন সিঁদ্ধি প্রতিবেশিনী ছুটে এসেছিলেন। কিন্তু রণচণ্ডীর কি তখন দ্বিবিদিক জ্ঞান ছিল? আমরা না থাকলে হয়ত মেরেটার গারে হাত তুলতেন—ওর এ অবস্থায় কী যে হ'ত কে বলতে পারে? কারণ—বললাম না—রণচণ্ডীর সঙ্গে এসেছিলেন চামুণ্ডা—(ব্যঙ্গ হেসে) জুড়ি মিলেছে খাসা—শেখীর সঙ্গে শিশাটী। হবে না কেন? Like attracts like বলে না? হয়ত—ব্যখার ব্যাখী আর কার নাম

বলুন? (হঠাৎ জ্বর বদলে) কিন্তু একটা অপূর্ব দৃষ্ট দেখলাম ভক্তার সাহেব—সচক্ষে না দেখলে হয়ত বিশ্বাস করতে পারতাম না। আহা! (কমাল বের করে চোখ মুছে) সত্যি সে অভাবনীয়! কিন্তু ভাবুন পরিবেশটা—মমুতাই দুহাতে মুখ ঢেকে ব'সে—ভেড়া মুখ ঢাকলে বলতাম—ভেড়ার মতন—(একটু হেসেই তৎক্ষণাৎ গভীর হ'য়ে, গঢ়কণ্ঠে)—ওদিকে খুশান পেত্নীটা খিল খিল করে হাসছে : “কেমন? হয়েছে তো? আমাকে দূর ছাই ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছিলে ভেবে যে বাপ রক্ষা করবে। এখন তাকে কে রক্ষা করে দেখি। ফাঁকি দিয়ে ওকে দিয়ে ডাম্‌ড্‌ উইল লিখিয়ে নেওয়া—তারপর সে যে কী সব নোংরা স্রাং—মুখে আনা যায় না।

আলোক : তারপর ?

মির্চন্দানি : রমা হঠাৎ চোখের দল মুছে চাইল পেত্নীটার দিকে। বলল : “আমি উইলের কথা জানতাম না—টাকাও চাই নি কোনোদিন। আমি শুধু চাই—বাবাকে তোমরা কষ্ট দিও না। যদি কথা দাও তবে আমি এই মুহূর্তে লিখে দিচ্ছি সব বিষয় প্রবীরের নামে।” আর বলবার সে কী ভক্তি ভক্তার সাহেব! ঐ লাক্ষ্য খুশান পেত্নীটাও হকচকিয়ে গেল, বলল : “লিখে দেবে?” রমা বলল : “হ্যাঁ, যে ঠাকুরের কৃপা পেয়েছে তার কাছে টাকা মাটি হয়ে গেছে। আমি—“বলতে না বলতে রণচণ্ডী—মানে মিসেস্ কাপাডিয়া—রেগে আগুন হ'য়ে এগিয়ে এসে চিংকার করে বললেন : তুমি মির জায়গা পাস নি, না? বেরিয়ে যা বাড়ি থেকে এক্ষুণি। দেবদান চোর দেখেছি। যা একগি—বেরো, বেরো, বেরো—এই মুহূর্তে—এক কাপড়ে। তখন আমি আর থাকতে পারলাম না, এগিয়ে রমাকে লোভ ক'রে টেনে নিয়ে এলাম আমার ঘোঁটরে ক'রে।

আলোক : আর মমুতাই ?

মির্চন্দানি : দুহাতে মুখ ঢেকে শুধু কঁপেই সারা—ওটা কি মাহুষ, ভক্তার সাহেব? বার বার ওর কথা তুলছেন কেন? পাড়ার সবাই জানে ও জীর বান্দা—bond slave ভেড়ার কাছে আপনি কী আশা করেন বলুন তো—যে-বুড়ো বরসেও যে-কোনো বদনীকে নিয়ে ঢোলাচল করতে লক্ষ্য পায় না, মেরের বরনী কুমায়ীকে

করণী ক'রে তার হুমবরদায় হয়—কিন্তু বাই এখন—
আপনি ওকে দেখবেন। আহা—এই অংস্থার—
advanced state—তা ভালোই হয়েছে, আপনিও
ডাক্তার, নমিতাও নাস—ও ঠিক আরগায়ই এসে
পড়েছে।

আলোক : একটু বলবেন না?—আরো কিছু
জিজ্ঞাসা করবার ছিল।

মির্জানি : কী?

আলোক : আপনারা কজন ছিলেন উপস্থিত?

মির্জানি : দু'তিন জন গিয়েছিলাম—তার পর
চেষ্টামেচি শুনে আরো কয়েকজন এসে হাজির হ'ল।
গেটের বাইরে ভিড় জ'মে গেল।

আলোক : আপনাকে বহু ধন্যবাদ। ভগবানই
আপনাকে পাঠিয়েছিলেন ওকে বাঁচাতে। কেবল আর
একটা প্রশ্ন : শুনি না কি পনশেট ড্যাম ভেঙেছে।
শুধব না সত্যি?

মির্জানি : ঠিক বলতে পারি না। আমি সেই
খবর নিতেই যাচ্ছি এখন রেডিও আপিসে। আমার
নিজের তো মনে হয় না যে পুণায় বজা হ'তে পারে।
মুতা কি একটা নদী ডাক্তার সাহেব?—একটা নৌকাও
কি কোনোদিন দেখেছেন মুতার জলে? তবে আর
একটা দাব্বা শুধব বটেছে—খড়গবাসলা বাঁধও না কি
ভাঙতে পারে। তাই বাই—কারণ আমার বাড়ি যদিও
একটু উঁচু মাটিতে—তবু মুতা নদীর ধারে তো—একটু
সাবধান হওয়া ভালো। তবে আমার স্ত্রী ছেলে মেয়েকে
কাল বসে পাঠিয়ে দিয়েছি। আমি আছি বাড়ী
আগলাতে।

আলোক (হেসে) : নদীকে ঠেকাবেন না কি দুই
বাহুর বাঁধে—বীরবলে?

মির্জানি : না, তবে ভাকব—ঠাকুর—এসো আবার
মাহ অবতার হ'য়ে আমার বাড়টাকে কাঁধে করো—
সাধুজি বলেন তিনি ভক্তবৎসল। আর—আর আমিও
সাধুজির কাছে ময় নিরেছি।

আলোক : তাই না কি? এতদিন বলেন নি তো?

মির্জানি : আমার স্ত্রী এসব বিশ্বাস করেন না তাই
লুকিয়ে লুকিয়ে ধর্ম করি ডাক্তার সাহেব। ঠাকুরকে

চুপি চুপি ডাকি বিপদে পড়লে—কারণ স্ত্রী জানতে
পারলে যে বিপদ তার ভো আর কাটান নেই—
হা হা হা।

আলোক : আপনার বুক বল আছে বৈ কি। নৈলে
এমন সময়েও হাসতে পারেন?

মির্জানি : মহুতাই বলে প্রায়ই বাইরণ না কে
বলেছেন—মাছুষ হাসে প্রাণের দ্বায়ে—নৈলে পাছে কেঁদেই
সারা জীবন যায়। যা দেখে এলাম স্বচক্ষে—সত্যিই
ট্রাজিডি—একটা জগজ্জাত মাছুষ তেড়া বনে গেল গা।
ট্রাজিডি নয়?—বলুন তো? হ্যা শুধুন, সাধুজি কেমন
আছেন?

আলোক : ভালোই—দেহতে শান্তিতে আছেন সব
দিক দিয়েই।

মির্জানি : অমন কথা বলবেন না। কত তাৎপ
তিনি আমাদের সংসার জন্তে। সেদিন এসেছিলেন
আমার মেয়েকে দেখতে তার টাইফয়েড শুনে, আর তিনি
আসবার পরদিনই আপনি বললেন বিপদ কেটে গেছে,
মনে আছে?

আলোক : তিনি এসেছিলেন তার আগের দিন।
জানতাম না তো!

নমিতা বারান্দা থেকে ডাকল : “বাবা! রমা মুর্ছা
গেছে—এস শীগগির।”

মির্জানি : “আপনি ওকে সামলান ডাক্তারবাবু।
আমি বাই।

বজ্রিণ

মিনিট কুড়ি পচিশ বাদে রমা একটু শান্ত হ'য়ে কাঁদতে
কাঁদতে যা বলল—শুনে আলোক ও নমিতা উভয়েই ভক্তিত
হ'য়ে গেল। অলিভিয়াকে নিয়ে এলেন কি না শোভনা
দেবী স্বামীর উপর আরো চাপ দিতে! সাধুজি গতকাল
বলেছিলেন বটে ওদের ছুঁনের চুক্তির কথা, কিন্তু
আলোক নমিতা বা ভক্তি কেউই বিশ্বাস করতে পারে নি
যে শোভনা দেবী সত্য সত্যি এই জাতের মেয়ের সঙ্গে
ব্রাক্ষ্মণের চক্রান্ত করতে পারেন মহুতাইকে তার দেখিয়ে
কের উইল পাণ্টে দিতে। তাই রমা চোখে অন্ধকার
দেখল—আরো ঘেঁষে যে মহুতাইয়ের মুখে একটি কথাও
ফুটল না। বলতে বলতে রমা কেঁদে ফেলল, বলল—

বোধহয় অনিভিত্যকে আনার উদ্দেশ্যও ছিল তাই—
বাথকে বিহ্বল ক'রে কাজ হাসিল করা”।

নমিতা আগুন হ'য়ে উঠল : “বিহ্বল করব বললেই
কাউকে বিহ্বল করা যায় না কি—মানে, যদি সে মাহু
হয়?”

আলোক (নমিতার কাঁধে হাত রেখে) : অত
অধীর হ'লে তো চলবে না মা! রমার কথা একটু
ভাবো! এখন মাথা খুব ঠাণ্ডা রাখা চাই। গুরুদেব কি
বলেন নি—“সময় যোগ উচ্যতে?” শুনি কী হ'ল তার
পরে।

রমা (অশ্রুগাঢ় কণ্ঠে) কী আর হবে কাকাবাবু?
মা আমাকে বা মুখে আসে তাই বলে গাল দিয়ে চিংকারে
পাড়া মাথায় ক'রে শেষে বললেন : দূর হ—শরতানী!
আমি হুধকলা নিয়ে সাপ পুবেছি। এক্ষণি এক কাপড়ে
বেরিয়ে বা।

নমিতা (গলা পরিষ্কার ক'রে) : তারপর?

রমা : তারপর আর কি? তাগো এই সময়ে
মির্জান্নিজি এসে পড়লেন বেন দেবদূত হয়ে—আমাকে
জোর ক'রেই নিয়ে এলেন তাঁর বাড়িতে। তার পরে
তাঁর মোটর বার ক'রে এখানে পৌঁছে দিয়ে গেলেন।

রমা ফের করার ভেঁড়ে নমিতার কোলে লুটিয়ে
পড়ে। এমন সময়ে বাইরে গোলমাল শুনে চোখ মুছে
উঠে বসল। আলোক ছুটে বাইরে গিয়ে নমিতাকে
ডাক দিল। নমিতা ছুটল গেটের দিকে। একটু পরে
রমাও বেরিয়ে এসে গেটের কাছে দাঁড়াল।

তারপর বে-দৃশ্য ওদের চোখে পড়ল সে সত্যিই
অভাবনীর :

সার সার লোক ছুটেছে চতুঃশূলী কালীমন্দিরের
দিকে। মন্দিরটি পাহাড়ের উপরে, সেখানে রোজই
যাত্রীরা ধর্মা দিতে যার সাঁক-সকালে, কিন্তু এভাবে ভয়
পেয়ে জনতা হু'তে ওরা কখনও দেখিনি।

আলোক গেট পেরিয়ে একজনকে জিজ্ঞাসা করল :
“কি হয়েছে?” সে মারাত্মকত্বে বলল একগল্গা কথা,
সবটুকু আলোক ধরতে পারল না কারণ তার ভাবা
বোঝা মারাত্মক—ভবে ভাবার্থটা বুঝতে বেগ পেতে হ'ল
সে। পুণ্য ভুবল ব'লে, সন্ধ্যা ব্রিজ ভেঙে গেছে, গণেশখিল

রোডেও জল এল ব'লে—এখন প্রাণ বাঁচাতে হ'লে শুধু
পাহাড়ে ওঠা ছাড়া গত্যন্তর নেই। ব'লেই সে আলোক
দিয়ে দেখাল পাহাড়ের চূড়ায়। আলোক সবিস্ময়ে উপর
দিকে তাকিয়ে দেখে, অবাক কাণ্ড!—সার দিয়ে
পিপড়ের মতন খুদে খুদে মাহু চলেছে, একদল কালী-
মন্দিরের পাহাড়ে, আর একদল গুহিকার প্রশস্ততর চূড়ায়
—যেখানে আলোক কতবার বেড়াতে গেছে নমিতাকে
নিয়ে।

আলোক বলল : “শুনলে তো—গুহবসন্তাটেরা কী
বলছেন?”

রমা বলল : “গুহব নয়, কাকাবাবু! আমি আজ
সকালে নটার সময়ে স্বচক্ষে মৃত্যুর বে-রূপ দেখে এসেছি—
সে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। মির্জান্নিজিও আমাকে
বললেন মোটরে যে, যদি এর উপরে খড়্গ বাসলার বাঁধও
ভাঙে তাহ'লে শুধু রাস্তা বা ব্রিজ নয়—নদী-তীরের
বাড়িগুলোর একটাও বাঁচবে না—বিশেষতঃ একতলা
বাংলোগুলো। কী হবে কাকাবাবু! বাবা...বাবা...
ব'লে ও টেলিফোন করতে ছোটো।

ভেতর

কিন্তু তখন কে কাকে টেলিফোন করে? সব
নিশ্চুপ। শহরের বিদ্যুৎপ্রবাহও ঠাণ্ডা। রমা আরও ভয়
পেয়ে গেল। ওকে ভরসা দিয়ে নমিতার জিন্দার রেখে
আলোক মোটর ইাকিয়ে চলল সন্ধ্যা ব্রিজের দিকে। এর
পরে আর গুহব ব'লে হেসে উড়িয়ে দেয় কেমন ক'রে?

রাস্তার সে কী ভীষণ ভিড়! পথে প্রথমেই পড়ে
রেডিও অফিস, সেখানে নেমেই চক্ৰবর্তী! অধ্যক্ষ মুখ
মেঘলা করে বললেন অনেক কথা গড় গড় ক'রে, তার
সারমর্ম এই যে, লক্‌ডি ব্রিজ, নিউ ব্রিজ, সন্ধ্যা ব্রিজ সব
জলের নিচে—খড়্গবাসলার বাঁধ ভেঙেছে বেলা এগারটার।
পুণার প্রায় অর্ধেক জলমগ্ন, হয়ত আরও বাড়বে বজ্রার
জল।

আলোক উদ্বিগ্ন হয়ে ছুটল সন্ধ্যা ব্রিজের দিকে বহু-
ভাঁয়ের খবর নিতে। গিয়ে বা দেখল তা চোখে না
দেখলে বিশ্বাস করতে পারত না।

শীর্ণ মৃত্যু নদী পল্লীর মতই ফুলে উঠেছে। আর জলের

সে কী গর্জন! অথবা প্রবাহিনী যে এক মুহূর্তে দানবীর মতন মহাকাশ হতে পারে কে ভেবেছিল?

সকল ত্রিভুজের হিংস্র নেই। রাস্তার ডাইনে-বামে নানা বাগানে নৌকা ক'রে উচু রাস্তার দিকে লগি ঠেলে আসছে কত যে ছেলে-মেয়ে, প্রোচ-প্রোচা, বুদ্ধ-বুদ্ধা! মোতায়ন-করা পুলিশ ও সৈনিকরা নানা বাড়ির বাসিন্দাদের ট্রাকে ক'রে পাঠিয়ে দিচ্ছে কোথায় কে জানে? সম্ভবতঃ কোনো “রিলিক ক্যাম্প”-এ। রাস্তার ঘোড়ে সাইকেলের পাশে দাঁড়িয়ে বহু আরোহী মজা দেখছে। একজন দুঃখমণ চেহারার লোককে জিজ্ঞাসা করতেই সে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে জবাব দিল যে, সাইকেল “সেফ”—যদি জল হঠাৎ এদিক পানে লাফিয়ে আসে তো সাইকেলে ক'রে চম্পট দেবে চোখের পাতা না পড়তে। আলোক মনে মনে বলল, “বাহবা, বাহবা! আর সেই সঙ্গে অবিশ্রিষ্ট ঐ সজাগ চোখ এদিক্ ওদিক্ টুঁড়বে কোন্ কৰ্ত্তাহীন বাড়ীতে ঢুকে কোথায় কী হাতিয়ে নেওয়া যায়! (ও মিথো সন্দেহ করে নি, দুদিন বাদেই কাগজে বেরিয়েছিল—একজন ডাকসাইটে চোর পর পর পনেরটি বাড়ি থেকে গ্রামোফোন, বাসন ও রেডিও চুরি ক'রে বামাল ধরা পড়েছে।)

হঠাৎ চমকে ওঠে: ধপাং ধ-স্! পুলের কাছে একটা মস্ত গাছ মাটির সঙ্গে ধ্বংসে প'ড়েই তীরবেগে ছুটল চেইনের মাথায়। কন কন কনকাং—ঐ ডনদিকে একটা মালগুদামের টিনের ছাদ ভেঙে পড়ে, আর চেউ-গুলো তাকে ছোঁবল মারা সুরু করে অসহ্য ক্রোড়ে। ওদিকে আর এক বিচিত্র দৃশ্য! অগণ্য পাটল-বাঙা মহাকায় উমিনাগিনী ফণা ভুলে ছুটেহে ফুঁশতে ফুঁশতে—কাকে ছোঁবল মারবে! এদিকে ডাঙার ছোট ছোট গাছ সবই ডুবে গেছে, শুধু কয়েকটির উপরের মাত্র হ'একটি ডাল দেখা যাচ্ছে। মহীকুণ্ডলির ডালে ডালে লোক আগ্রাণ চীংকার করছে, চাদর নেড়ে পুলিশকে ডাকছে: “বাঁচাও বাঁচাও!” কিন্তু জলের এ-বিপর্যয় ভোড়ে নৌকা নিয়ে সেখানে পৌঁছবেন কোন্ অতী-কাণ্ডারী? কয়েকটি মোতাল্লা বাড়ির জান্না থেকে এক রাশ মাথা ঝুঁকে সতয়ে দেখছে চেয়ে নিরীহ মৃত্যু নদীর করালী কান্দি। এখানে ওখানে নিচু জমিতে ধাপরার ছাদে, লালরঙা অর্ধবৃত্তাকার টিনের মাথার বস্তার্তের কাঁপছে আতঙ্ক।

সর্বোপরি, চারদিকে সে কী চীংকার সোরগোল! খানিকটা প্রকাণ্ড বস্তিতে আগুন লাগলে যেমন হয়।

আলোক স্বভাবে ভীক বা ‘নার্ভাস’ নয়, কিন্তু এ যে স্থানকালীর তাণ্ডবৃত্তা প্রণয়ের হিংস্র ক্রোধের তালে তালে! বুকের মধ্যে জেগে ওঠে সত্ত্ব-জ্বর—awc!

দেখতে দেখতে জল আরো ফুলে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে সাইকেলে একদল আগ্রাণ ছোট্ট পিছন দিকে। গেল, গেল, গেল! রাশি রাশি পিঁপে কেনেস্তারা টেবিল-চেয়ার আসবাবপত্র উন্মত্ত হয়ে ছুটে চলেছে। ওদিকে একটা পাড় ভেঙে পড়ল। আহা! দশ পনের জন লোক জলে প'ড়েই ভেসে চলল চীংকার ক'রে পাগলের মত—বাঁচাও! কিন্তু কে কাকে বাঁচাবে? উমিষ্টভাবের এ-মল্লভূমিতে নৌকা ভাঙ্গাবে কোন্ ভীমকাণ্ডারী? হঠাৎ পাশের একজন বলল: “দেখুন দেখুন! গল্প বাছুর মাহুঘ মোষ তীরবেগে ভেসে চলেছে সন্ধ্যা ত্রিভুজের উপর দিয়ে। সত্যিই তো! অলোকের বুকের মধ্যে রক্ত ক্ষত বয়—হৃৎপিণ্ড পঙ্করে হাতুড়ি মারছে। ও মহুভাইয়ের কথা শ্রেক ভুলে গিয়ে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। হঠাৎ মনে হয়—হয়ত কল্পান্তে যে-প্রলয়ের বর্ণনা পুরাণে পড়া যায়, বৃষ্টি সে-প্রলয়ের আভাষ দিতেই আসেন স্থানকালী থেকে থেকে! কিম্বা বলা যেতে পারে—যখন আমরা ভুলে যাই শিবকে, তখন বোধহয় চক্র-দ্বারে রক্ত আসেন আমাদের মনে করিয়ে দিতে যে, জীবনের নগণ্য দীপটির চারপাশেই রাশি রাশি মৃত্যুর করাল জল! বাইবেলের একটি বিখ্যাত সূত্র মনে বেজে ওঠে।

“In the midst of life we are in death!”

হঠাৎ গুর চেতনা ফিরে এল—এ কী। মহুভাইয়ের খবর নিতেই এখানে হস্তদন্ত হয়ে ছুটে আসা না? রমা জিজ্ঞাসা করলে কী বলবে? রাস্তা থেকে একটু বাঁদিকে একটা কাকরের রাস্তা, তার পরেই মহুভাইয়ের বাংলো। ও কাকরের রাস্তায় পা বাড়াতোই এক সৈনিক হাঁ হাঁ ক'রে ছুটে এসে বলল। “ওদিকে যাবেন না স্ত্র; জল বাড়ছে।”

“আমার এক বন্ধু—”

সৈনিক হাসল, “ওদিকে সব বাড়িই ডুবে গেছে

শ্রু! বন্ধু কী করছিলেন? ঘুমছিলেন?” বলেই হস্ত নাড়িয়ে। “মাফ করবেন শ্রু! কিন্তু দয়া করে এখন এখানে তিড় বাড়াবেন না। বড়গবাসলার বাঁধও ভেঙেছে—এ বস্তা তারই জল। পনশেটের পিঠে খড়গ-বাসলা। কাজেই জল আরো অনেক উঠবে—আধ মিনিটে। আপনি ফিরে যান—কোথায় থাকেন?”

“গণেশখিন্দ রোডে—চতুঃশ্রী মন্দিরের কাছে।”

“ওঃ। বড় বেঁচে গেছেন শ্রু!”

“কিন্তু আমার বন্ধু—”

“আপনাকে কে এ ডাকছে চান্দর নেড়ে—”

আলোক চমকে বাঁকিকে তাকাতেই দেখে একটা বাছারী রঙের টালির ছাদে একটি মাত্র মানুষ আগ্রাণ টেঁচাচ্ছ। আলোক চমকে ওঠে, মহুতাই তো বটে! এতক্ষণে আলোককে দেখতে পেয়েছে তিড়ের মধ্যে। কিন্তু একী মূর্তি!—জামা ভিজ্জে, চুল উকো-খুকো, চোখ লাল!

আলোক ছুটে যাবে—এমন সময়ে সৈনিক ওর বাহ চোপে ধরল: “কোথায় যাচ্ছেন শ্রু? ডুবে মরতে? বড় রাস্তা ছাড়বেন না—বদি আত্মহত্যা করতে না চান।”

“আত্মহত্যা কী বলছেন? দেখছেন না ঐ টালির ছাদে আমার বন্ধু কাপাডিয়া ডাকছেন?”

“অ্যা! বিখ্যাত নিযুতপতি মহুতাই কাপাডিয়া?”

আলোকের এত দুঃখেও হাসি পায়: “টেকচাঁদ! কী নামই করেছ জাহ্ন!” কিন্তু হাসি চেপে বলে: “হ্যাঁ, আর বলুন দেখি—এছেন মহাজনকে না বাঁচালে মান থাকে?” বলেই তার হাত ছাড়িয়ে জলে নামে—হাঁটু জল...কোমর জল...বুক জল আর এক পাও এগুনো অসম্ভব। শ্রোত প্রবল। তত্ত সৈনিকটি ছুটে এসে একটা দড়ি ছুঁড়ে দিল: “বদি যাবেনট এই দড়িটা ধরুন অন্ততঃ। আলোক ফের হাসে মনে মনে: “কোড়পতি সুনলে টনক না নড়ে পারে?” যাহোক ও দড়ি ধরে একটু তরঙ্গ পেয়ে টালির ছাদের কাছে পৌঁছে এবাব গর্দা জলে দাঁড়িয়ে চেষ্টা করে বলল: “মহুতাই! বাঁচতে বদি চাও তো নেমে এসো একপাি আর কালবিলম্ব না করে—ভর নেই এখানে চার পাঁচ কুটের বেশি জল হবে না—আমি

আছি দড়ি ধরে। ওরা টেনে তুলবেই তুলবে আমাদের দু’জনকে।

মহুতাই পাগলের মতন হাহাকার করে উঠল, “শোভনা...প্রবীর ভেসে গেছে...বাঁচান তাদের ডাক্তারবাবু...দোহাই ”

এত দুঃখেও আলোকের হাসি এল: “বদি ভেসে গিয়ে থাকে তাহলে বাঁচাব কেমন করে?”

মহুতাই পাগলের মত নদীর দিকে দেখিয়ে: ঐ দিকে এদিকে—

সৈনিক চেষ্টা করে ধমকে বলে: “সে হবে এখন—আগে আপনি নেমে আসুন তো!”

মহুতাই বলল: “আমি এখানে বেশ আছি—শোভনা—প্রবীর—”

আলোক উম্মার হুরে বলল: “বেশ আছ? মাথা খারাপ! এ টল্মলে টালির ছাদ কখন ভেঙে পড়বে কে বলতে পারে? কথা শোনো, নেমে এসো—হ্যাঁ। হ্যাঁ, ঝাঁপ দাও বদি বাঁচতে চাও। ভয় নেই আমি ধরব—ডুব যাবে না। এখানে এখনো ডুব-জল হয় নি, কিন্তু হ’ল বলে।”

মহুতাইয়ের তখন সাড় এল—ঝপাং করে জলে পড়ল ঝাঁপিয়ে। আলোক এক হাতে দড়ি অন্য হাতে মহুতাইয়ের কব্জি চেপে ধরে টেনে এনে বড় রাস্তায় ওর মোটরে তুলে শৃঙ্খলিন ক’রে গণেশখিন্দের দিকে চলল কিরে।

মহুতাই বুক চাপড়ে হাহাকার করে উঠল: “আমার সব গেছে তাই...শোভনা প্রবীর রমা—”

আলোক মোটর খামিয়ে বলল, “অশান্ত হোয়ো না। রমা অন্ততঃ বেঁচেছে।”

মহুতাই ককিয়ে কেঁদে ওঠে: “আমাকে কেন ভোলাচ্ছ তাই? আমি তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি...সে রাস্তায় বেরিয়ে গেল...আহা...মা-দারা মেরে...আমি কাপুক, ইমবেসাইল...একটি কথাও কইতে পারলাম না—চোখ বুঁজে রটলাম স্ত্রীর ভয়ে। ভেবেছিলাম একটু পরেই শোভনার চোখ এড়িয়ে বেরব—কিন্তু ও আর অস্তিত্ব দোহের কাছে ব’সে রইল। আমি ভাবলাম একটু বাধে রমা কিরে আসবে। কিন্তু সে এলো না—এলো এক রাশ জল—দশ পনেরো মিনিটের মধ্যে। আমি কোনো-

মতে সত্যায় দিয়ে একটা গাছের গুঁড়ি ধরে পরে সে-গাছ থেকে লাফিয়ে এই ছাদে উঠলাম—কিন্তু শোভনা ও প্রবীর টাল সামলাতে পারল না...যেয়েটাও নিশ্চয় রাস্তায়ই ডুবে মরেছে—ঠিক হয়েছে...আমার সাজা হবে না তো হবে কার ?” বলে কপালে করাঘাত করে, মাথার চুল টেনে ছেঁড়ে।

আলোক ওর হুঁহা'ত চেপে ধরে ধমকায় : “পুরুষ-মহুশ না? ধামো! বলছি, রমা রাস্তায় ডোবে নি! মির্চানি তাকে মোটরে ক’রে আমার ওখানে পৌঁছে দিয়ে গেছে।”

“রমা বেঁচেছে? বেঁচেছে?” মহুশাই লাফিয়ে ওঠে। কিন্তু তার পরেই ভেঙে পড়ে : “কিন্তু আমার প্রবীর... শোভনা, ও হো হো হো হো!” আলোক আর বিরক্তির না ক’রে সোজা মোটর চালিয়ে দেয়। মিনিট কয়েক পরে যখন মোটর ওর বাংলোয় পৌঁছল তখন পিছনের সীটে মহুশাইয়ের সংজ্ঞা নেই। মূর্খা গেছে। মন্দের ভালো।

চৌত্রিশ

মহুশাইকে ঘরে এনে খাটে শুইয়ে দিয়ে রমাকে ধাক্কা মেরে ক’রে বাইরে এসে—চাপা স্বরে নমিতা আলোককে বলে : “বাবা! আমার কেমন যেন বিশ্বাস হচ্ছে না! এ কি ভাবা যায়?”

আলোক ওর দিকে চেয়ে বলে : “সত্যি...আমার... কি বলব? মনে কেবলই স্বাকার দিয়ে উঠছে গুরুদেবের সেদিনকার একটি কথা—“ঠাকুর কোন্ শয়তানকে যে কোন্ বোড়ের চালে কখন কিস্তিমাং করবেন, আগে থাকতে কেউ আন্দাজ করতে পারে না।”

নমিতা (সোৎসাহে) : যা বলছে বাবা! আমিও ভুলতে পারছি না। ভাবো তো, যদি অলিভিয়া না যেত শোভনার কাছে—তাহলে আজ ওরা ফিরে আসত না। আর ফিরে না এলে ওরা ডুবে মরত না, কিন্তু রমা মরতই মরত। কোন্ পথ দিয়ে এলেন রমার ভারক! ভাবতেও যেন ধাঁধা লাগে।”

আলোক উঠে বারান্দার পায়েচারি ক’রে চিত্তিত মুখে।

নমিতা লজ্জা নেয়। বলে : “কী ভাবছ বাবা?”

“একটা প্রশ্ন মনে আগে—”

নমিতা হেসে কলে : “বাবা বাবা:—তোমার মনে প্রশ্ন যেন সমুদ্রের ঢেউ—একটা ভাঙতে না ভাঙতে আর একটা গর্জ্জে ধেয়ে আসে! কেবল আমি জানি কি ভাবছ তুমি।”

“কঙ্কণো না।”

“বাজি?”

“বলতে পারলে তুই পারি বোড়া। না পারলে আমাদের দিতে হবে হাতী।”

“এরি নাম fairness বটে! তবে বোড়া বোড়াই সহী—মোটর হাঁকাতে হাঁকাতে হাত হয়ে উঠল হাত। বোড়ায় চড়লে হাত একটু বিশ্রাম পাবে, ফুলাও কমবে। তুমি ভাবছিলে—সাধুজি জানতেন কিনা যে, রমাকে ওরা যথাকালে ভাড়িয়ে দেবেই দেবে—যাঃ কলে তার প্রশ্ন বাচবে আর কুচক্রী কৈকেয়ী, মহুশা আর শিত্ত হুঃশালন হেসে যাবে।”

আলোক : তুই সেদিন মহুশাই কী ভাবছিল বলে দিয়েছিল বটে। কিন্তু কী ক’রে টের পাস বল তো?

রমা ডাকল : “বাবা জেগেছেন।”

ওরা গিয়ে কাছে দাঁড়াতেই মহুশাই ফের চোখ বুজল। নমিতা জিজ্ঞাসা করল—চা আনবে কি না।

রমা বলল : “দেখ বাবা, কাকাবাবু এসেছেন আর দ্বিধা জিজ্ঞাসা করছেন একটু চা খাবে?”

মহুশাই মাথা নাড়ল, পরে কণীকণ্ঠে বলল : “বড় দুর্বল।...মাথার মধ্যে বহুশা...”

বলেই চোখ বোজে ফের।

* * *

নমিতা মহুশাইকে চামচে ক’রে ওভালটিন খাওয়ার পরেই সে নেতিয়ে পড়ল। রমা তখন নেত্রে আলোকের দিকে তাকাতাই আলোক বলল : “না। মূর্খা নয় এবার। যা খেয়েছে ত বিষম। ঘুমিয়ে পড়েছে। utter prostration—যত ঘুমোয় ততই ভালো।

দোত্রে ঠক্...ঠক্...ঠক্...

নমিতা ছুটে বেরিয়ে এসে দোর খুলেই, এ কী? গুরুদেব! বলেই গড় হয়ে প্রশ্রাম।

আলোক রমাকে নিয়ে বেরিয়ে প্রশ্রাম ক’রে সাধুজিক বসালো নিয়ে গিয়ে পূজার ঘরে। রমার কাহিনী বলতে

যাবে—এমন সময় সাধুজি ধামিরে বললেন : “বলতে হবে না। আমি জানি সব। ঠাকুর আমাকে দেখিয়ে দিয়েছেন। আমি বলি নি—রমার কিছু হবে না।” রমা তাঁর পায়ে মাথা রেখে চুপ ক’রে রইল। সাধুজি বললেন : “তোমার তো ব্যবস্থা হ’ল মা, এখন খবর নিতে হবে নারায়ণ পেঠে।”

আলোক বলল, “অসম্ভব। মৃত্যুর বে রণচণ্ডীমূর্তি যেখে এলাম সঙ্গম ত্রিজে—নারায়ণ পেঠে নিশ্চয় এখন অন্ততঃ বিশফুট জল। তাছাড়া এখন তো সব ত্রিভুই বন্ধ—ওপারে পৌছবেন কী করে?”

সাধুজি : হোলকার ত্রিভু শুনছি খোলা আছে।

আলোক : সন্দেহ।

সাধুজি : না। আমি দেহ ক্যান্টনমেন্ট থেকে এলাম একটা মিলিটারি লরিতে। আমাকে সাধু দেখে ওরা তুলে নিল দয়া ক’রে। তাদের মুখেই শুনলাম যে, কেবল হোলকার ত্রিভু একটু দূরে ব’লে তার উপরে এখনো জল ওঠে নি।

আলোকের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, “তাহলে একটু বসুন আপনি, আমি খোঁজ নিয়ে আসছি।”

সাধুজি বললেন : “না, বসব না। আমিও যাব।”

নমিতা মিনতির স্বর ধরে : “আমিও বাবা! লক্ষ্যে টি!”

“কিন্তু মহুতাই?”

রমা বলল : “আমি তো আছি। আপনি যদি পারেন খোঁজ নিয়ে আসুন ঞ্জবদা, মালতীদি আর মাসীমার।”

পর্যটন

তিনজনে মোটরে বেরতেই এক বিচিত্র দৃশ্য চোখে পড়ল : রাস্তার ভিড় ফুলে উঠেছে—পথে ফুটপাথে অশ্রান্ত শোভাবাত্রী চলছে গৃহহারা ভয়ঙ্কর নরনারীর। সঙ্গে সঙ্গে অগ্ন্য সাইকেল, গরুর গাড়ি, হাতে-ঠেলা গাড়ি, কোথাও বা ভয় বরষের মা চলেছেন শিশুকে—হয় কোলে নিয়ে, না হয় পারাধুলেটরে। তবে অধিকাংশই চলেছে ছোট ছোট জটলায়—দেখলেই মনে হয় এক একটি দরিদ্র পরিবার চলেছে তাদের স্বত্বকিঞ্চিৎ স্বথালব্ধ নিয়ে। সাধুজি আঙুল দিয়ে দেখালেন পাহাড়ের দিকে। সেখানে পিল্ সিল্ ক’রে লোক উঠছে উপরের দিকে।

হোলকার ত্রিজে পৌছতেই এক অফিসার বাধা দিলেন। “কোথায় যাবেন?”

“ওপারে।”

“আপনার বাড়ি ওপারে?”

“না।”

“তাহলে সাপ করবেন। শুধু পুলিশ, মিলিটারি আর বাহুর ওপারে বাড়ি তারা যেতে পারে।”

নমিতা বলল। “নারায়ণ পেটের খবর বলতে পারেন কি?”

অফিসার হাসলেন “নারায়ণ পেঠ? one of the worst affected areas, নারায়ণ পেঠ আজ ভেনিস হয়ে গেছে। কেবল রাস্তায় গণ্ডোলা চলতে পারে না—এই যা।”

নমিতা আলোককে ফিস্ ফিস্ ক’রে বলে। “বড় অফিসার।”

সে শুনতে পেয়ে হেসে বলে। “এখন আর বড় ছোট নেই, ম্যাডাম। জল সবাইকে কাঁধে সমান করে দিয়েছে। বাঁদিকে তাকান একবার—ঐ গাছের দিকে।”

ওরা তাকালো। নিচু ভূমিতে জল ঝে ঝে করছে। একটি জলমগ্ন গাছের শুধু একটি ডাল উজ্জ্বিত হয়ে দুলছে। সে ডালে একটি বেড়াল, একটি পুটকার ইঁদুর, আর দু’টি সাপ নিশ্চল হয়ে পাশাপাশি আসীন—যেন “সহাবস্থান” মঞ্চে দীক্ষা নিয়ে।

* * *

আলোক মোটর ঘোরাতেই সাধুজি বললেন। “জংলি মহারাজ রোডের দিকে একবার গেলে হয়। সেখানে মোটর যেতে দেবে কি?”

অফিসার শুনতে পেয়ে বললেন। “লকড়ি ত্রিজের অর্ধেক জলে ডুবে গেছে। একটি দোতলা বাড়ির মাথাও জলের উপরে নেই। সন্তাজি পার্কও তখৈবচ। জল আরও বাড়বে। তাই বেশিদূর যাবেন না। আর একটি অমরোধ। সাইট—সীইং এখন থাক। পুলিশ ও মিলিটারি সে-কাজের ভার নিয়েছে সে-কাজে সবচেয়ে বেশি বাধা দিচ্ছেন তাঁরা—ধারা জল দেখতে বেরিয়ে ভিড় করে কুর্তি করছেন মনের সাথে।”

সাধুজি হেসে বললেন ইংরেজিতে। “আমরা ঠিক তাদের দলে নই। নারায়ণ পেঠে আমার এক বন্ধু আছেন। জংলি মহারাজ রোডেও। আমার এই সঙ্গী ডাক্তার বন্ধুর বাড়িতে হুঁজন বসাত’ আশ্রয় নিয়েছেন। আমরা চাই আরও দু’ একজনকে হেঁকে তুলতে—যদি পারি অবশ্য।”

অফিসার টুপি ধুলে সময়মে, “I beg your pardon Sadhuji, don’t take it personally, please!”

[ক্রমশঃ]

বাঙলার চর্যাপদ

ডক্টর দুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

রাগ গবড়া

হুঁলি হুঁলি পিটা ধরণ ন জাই ।
 কুখের তেঁতুলি কুস্তীয়ে থাখ ।
 আঙ্গন ঘরপন হুন ভো বিআতী ।
 কানেট চোরি নিল অধরাভী ॥
 সহসা নিদ গেল বহুড়ী জাগঅ ।
 কানেট চোরে নিল কা গই মাগঅ ॥
 দিবসই বহুড়ী কাউই ডরে ভাঅ ।
 রাতি ভইলে কামরু জাঅ ॥
 আইননি চর্যা কুজুরীপাদ্ গাইউ ।
 কোড়ি মাঝ এক হিঅতি সমাইউ ॥

পদটি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদ-বলীর অন্তর্গত। পদটি গের গবড়া বা গউরা রাগে; পদ-কর্তা কুজুরীপাদ।

কায় সাধনের সঙ্কেত রয়েছে পদটিতে। দেহযোগী বা দেহতত্ত্বজ্ঞান বাতীত এর রসাস্বাদন সম্ভব নয়। সেই জন্য বাহ্যতঃ অসম্ভব প্রচেলিকায় পদটি আচ্ছন্ন বলে মনে হয়। এর বহিঃকর্ম ও আভ্যন্তরীণ অর্থ সম্পূর্ণ বিস্তারিত।

দ্রৌকপকে দোহন করায় পাতে দুগ্ধ ধরে রাখা যাচ্ছে না—এতই বেশী দুগ্ধ হয়েছে, কুমীরে থাচ্ছে গাছের তেঁতুল। (কুখের—কুখের) ওগো বধূ! শোন, ঘরের দিকেই আঙ্গিনা; চোর কর্তৃত্ব চুরি করে নিয়ে গেল মাঝরাতে। শব্দ নিমিত্ত, আর বধু ভেগে আছে; চোরে যে-কর্তৃত্ব অপহরণ করে নিয়ে গেল, তা কোথায় গিয়ে পাওয়া যায়। বধু দিবসই কাকের ভয়ে ভীত, কিন্তু রাত্রি হলে সে কামরু চলে যায়। কুজুরীপাদ এইরূপ বৈচিত্র্যের গান গাইলেন; কিন্তু কোটির মধ্যে একজনের জ্বরে এর অর্থ প্রবেশ করল।

ডক্টর বহিরর্ষের তটিলতা ছিন্ন করলে কায়সাধনে সহজানন্দ উপভোগ করার বিষয় এবং আচার্যের উপদেশে তাত্ত্বিক

যোগ পদ্ধতিতে নিঃসত্যাবীকৃত বোধিচিত্তের সাহায্যে সহজানন্দপ্রাপ্তির কথাই জানা যায়।

হুঁলি অর্থাৎ দুই বাতে লীন হয়েছে, একপ অর্থাৎ মহা-সুখকমলকে দোহন করায় সহজানন্দরস পীঠে অর্থাৎ বজ্র-মণি-আদি ২৪টি দেহের পীঠ স্থানে ধরে রাখা যাচ্ছেনা; এত অধিক দুগ্ধরূপ মহাসুখরসের সঞ্চার হয়েছে যে সেই রস দেহপাত্র থেকে উপছিয়ে পড়ছে। দেহবুদ্ধির তেঁতুল-রূপী ত্রিগুণ গতি সম্পূর্ণ বোধিচিত্তকে ভক্ষণ বা আত্মসং-করছে কুস্তীয়ে অর্থাৎ কুস্তক সমাধিতে যোগী বোধিচিত্তকে আয়ত্ত করে সহজানন্দরস পান করছেন। কুস্তক সমাধি-মগ্ন সাধক যোগী দেহ মনন করে এত মহাসুখরসের অধি-কারী হয়েছেন যে তিনি দেহপাত্রে তা আর ধরে রাখতে পারছেন না।

ওগো বিআতী পরিত্যক্তাবস্থায় নৈরাশ্র্য দেবি, দেহ-বুদ্ধির নিকটেই সহস্রাবপদে মহাসুখরসের আঙ্গিনা বা স্থান; অধরাতে অর্থাৎ যোগসাধনার মধ্যবর্তী অবস্থার প্রবেশাদিবাভদোষরূপ কর্তৃত্ব অপহরণ করে নিল প্রত্য-শ্রবশ্রুতারূপ চোর। রাত্রি অর্থে জ্ঞান; অধরাত্রি বা গভীর নিশীথে অর্থাৎ যোগসাধনার চরমোৎকর্ষকালে সাধক শ্রুতজ্ঞান লাভ করেন; তখন কর্তৃত্ব অর্থাৎ রেচক-পুরকাদির শক্তি ও বৈতজ্ঞান বিনষ্ট হয়। কঠোর সংযম-সাধনায় বস্ত্রভগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন প্রাজ্ঞ সাধক নৈরাশ্র্য শক্তিতে অদ্বয় মহাসুখের অবিকারী হন।

সহসা অর্থাৎ শাস-প্রশাস বা রেচকপূর্বকর কার্য শুরু বা নিমিত্ত হয়ে পড়ে সাধনোপিত প্রজ্ঞাজ্ঞানের অক্লান্ত-কালে; তখন বধু অর্থাৎ পরিত্যক্তাবস্থায় তুণ্ডলিনীশক্তি-রূপিনী নৈরাশ্র্য দেবী দেহমধ্যে জাগ্রত হয়ে অবস্থান করেন; অর্থাৎ যোগী প্রজ্ঞাভোগে শাসপ্রশাস রুদ্ধ করে তুণ্ডীয়ানন্দে নিমগ্ন হন, আর প্রকৃতিরূপিনী অবস্থিতকা ভাববিকল্প পরিহার করে নিত্য জাগ্রত থাকেন সেই বেহে।

এই বহুভূতী অর্থাৎ যোগলব্ধ পরিণতাবস্থাতী নৈরাখ্যা দেবী দিবসে বা চিন্তের আগ্রহ অবস্থায় কাকরূপ কালের বিধ্বংসী মূর্তি তথা অগন্তের ভীষণ পরিণাম লক্ষ্য করে সর্বদাই ভীত; কিন্তু রাজিতে অর্থাৎ প্রজাজ্ঞানের উদয়ে ইঞ্জিয়াদির স্বস্থিঃহেতু সেই পরিণতাবস্থাতী বা নিবৃত্তি-বোধিচিত্ত কামরূপ অর্থাৎ কাম্যস্থান মহাস্থচক্রে গিয়ে তুরীয়ানন্দ লাভ করেন। চিন্তের সজাগ অবস্থায় হয় বস্ত-অগন্তের জ্ঞান; তখন পরিনৃশ্চয়ান অগন্তের প্রতি ইঞ্জির-বর্ণের গভীর আকর্ষণ ঘটে। ফলে, চঞ্চলমন সাধনার সমাহিত হতে পারে না। ভোগপুষ্ট ইঞ্জিরচিত্তকে মায়ার আলোকিত করে রাখে; কঠোর সাধনা ও সংযমে সেই ইঞ্জিরালোকিত চিত্তকে প্রজাজ্ঞানের গভীরাকারে নিয়ে যেতে হয় যেখানে রূপরসাদির কখনও প্রবেশ ঘটেনা। স্তবরাং, প্রবৃত্তি নিরুদ্ধ করে স্বকঠোর সাধনা করলে যোগের পূর্ণ অবস্থায় কাম্যবস্ত লাভে সহজানন্দ-প্রাপ্তি নিশ্চিত।

আলোচ্য পদে সাধনভবের গোপনীয়তা রক্ষার বিশেষ প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়, কারণ পদটি হচ্ছে যোগতত্ত্বমূলক ও গুহ্যসাধনাপ্রয়ী। কোনো বিশেষ গুট ও গুহ্য সাধনার সাধক ছিলেন প্রাচীন ও মধ্যযুগের যোগীরা; তাঁরা সাধন পদ্ধতি ও অহুত্ব-প্রকাশে প্রহেলিকাময় ভাষা ব্যবহার করতেন। যোগতত্ত্বে প্রজাহীন জনগণ যাতে সাধনার রহস্য উপলব্ধি না করতে পারেন সেজন্যই প্রহেলিকাময় ভাষার প্রয়োগ। এই ভাষাকে সন্ধ্যা বা সন্ধ্যা বলা হয়েছে। সন্ধ্যায় যেমন সমস্ত বিষয় স্পষ্ট হয়না, তেমনই চর্চার ভাষাও কিছু বোঝা যায়, আবার কিছু অবুজও থেকে যায়। এই ভাষার উল্লেখ পাই বৌদ্ধতন্ত্র ও তার টীকা-টিপ্পনীতে এবং পালি ও সংস্কৃত বৌদ্ধশাস্ত্রে। পঞ্চাশত্রে, যে ভাষা বা শব্দের অর্থ সম্যক অহুধ্যান (সম-যত্ন বা যত্ন) করে বুঝতে হয় এবং যার অর্থ বিশেষভাবে নির্দিষ্ট তা 'সন্ধ্যা' ভাষা। চর্চার অর্থ যেকোন গুট রহস্যময় তাতে তার ভাষাকে সন্ধ্যা বা সন্ধ্যা উভয়ই বলা যেতে পারে।

প্রহেলিকা ভাষার ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায় ঋগ্বেদ ও অথর্ববেদের নানা স্থানে। মূল অর্থের গোপন বুদ্ধির প্রয়াসই এর উদ্দেশ্য। বেশে যখন তন্ত্রশাস্ত্রের এল জোয়ার,

তখনই দেখা গেল সন্ধ্যা বা সন্ধ্যাভাষার বহন-প্রচলন। যাতে সাধারণ মানুষের হাতে পড়ে বিকৃত না হয়, সেজন্যই এ-ভাষা ব্যবহারের উদ্দেশ্য। দীক্ষিত সাধক ব্যতীত বিশেষ বিশেষ শব্দের অর্থোপলব্ধি সাধারণের পক্ষে সম্ভব নয়; এই কারণে প্রহেলিকাময় পারিভাষিক শব্দের অর্থ অদীক্ষিত সাধারণ জনগণমাজের নিকট অবুজ। চর্চাপদে আছে বৌদ্ধ সহজিয়া তান্ত্রিক সাধনার ইঙ্গিত। এই হেতু আলোচ্যপদে দু'লি, পিটা, কুস্তীর, বিদ্যাতী, সন্ধ্যা, কামরূ, অধরাভী, কানেট ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ রয়েছে।

অতঃপর আলোচিত পদের পদকর্তা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করে বক্তব্যের উপসংহার করব।

কুক্কুরীপাদ বা কুক্কুরীপা ভণিতার এ-পর্যন্ত তিনটি পদ পাওয়া গিয়াছে। পাদ বা পা কথাটি গৌরবসূচক ও পূজ্যবাচী, রামায়ণে (১:১০৪) 'রামপাদপ্রসাদক, পঞ্চতমে 'দেবপাদ', 'বাসীপাদ', উত্তররামচরিতে (১:১২) 'ভাতপাদ' ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়েছে। স্তবরাং আলোচ্য পদে পদকর্তা নিজের সম্বন্ধে সম্ভ্রমসূচক পাদ বা পা কথাটি ব্যবহার করতে পারেন না। এই হেতু মনে হয়, পদটি কুক্কুরীপাদের কোনো ভক্ত শিষ্যের রচনা। কুক্কুরীপাদ রচিত 'মহামায়া সাধন' নামে একখানি গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয় তাঁর চর্চাগীতি পদাবলীতে। তাতে নিম্নোক্ত বক্তৃতিটি পাওয়া যায়,—

হসে সহি বিকসিষ কমলু প্রবোহিউ বজ্জে।

অলল ললহো মহাস্থহেণ আগোহিউ পচে ॥

(ওলো সখি, বিকশিত কমলটি বজ্র বা শূণ্ডতা ঝাঝা প্রবোধিত হোক; আর সেই পরম নোল্লব্যময় পদটি মহাস্থহেতু নৃত্যধামে আরোহণ করুক)

কুক্কুরীপা, ভূস্বরূপা, চৈঠনপা ইত্যাদি ভণিতার মধ্যে সাধক হইত আত্মগোপন করে ছদ্মনাম ব্যবহার করেছেন। এই ছদ্মনাম ব্যবহারের পেছনে নিজের গৌরব প্রকাশের অনিচ্ছাই মুখ্য মনে হয়।

আর একটি পদ সম্বন্ধে এবারে আলোচনা করছি।

রাগ গবড়া

এক সে চণ্ডিনী দুই ঘরে সান্ধ্য।

চীৎস বাকল্য বাকনী বাক্য।

সহজে থির করি বাক্যনী বাক্য ।
 তে অজরামর হোই দিচ্ কাক্য ॥
 দশমি দুআরত চিহ্ন দেখইআ ।
 আইল গরাহক অপণে বহিআ ॥
 চউশঠী ঘড়িয়ে দেত পসারা ।
 পইঠেল গরাহক নাহি নিসারা ॥
 এক ঘড়ুলী সুরুই নাল ।
 ভনন্তি বিকআ থির করি চাল ॥

চর্যাগীতির অন্তর্গত এই পদটি। পদ-কর্তার নাম বিকআ। পদটি যে গান করা হত তারও পরিচয় রয়েছে গবড়া বা গউরা রাগ-উল্লেখ।

আলোচ্য পদে সহজাবস্থা লাভের ইঙ্গিত ও যৌগিক পদ্ধতির বর্ণনা রয়েছে মদচোলাই ও শুঁড়ির দোকানে মদ বিক্রয়ের রূপকের দ্বারা। পদটির রসাস্বাদন সাধারণের পক্ষে সম্ভব নয়। অসম্ভব প্রহেলিকার আচ্ছন্ন পদটির অর্থ দেহযোগী ব্যতীত অসুধাবন করা শক্ত। আত্মস্বরূপ অর্থ দেহযোগী আবিষ্কার না করলে বহিরর্থ দ্বারা পদের রসাস্বাদনে মনে অতৃপ্তি থেকে যায়, পক্ষান্তরে আত্মস্বরূপ অর্থও যে সর্বদা কায়সাধনাত্মক তাও জোর করে বলা যায় না। প্রকৃত কায়সাধন ব্যতীত এর অর্থনির্ণয় ও অর্থগ্রহণ উভয়তই দুঃসাধ্য।

পদটির বহিরর্থ এই—সেই এক শুঁড়িগিন্নি দুই ঘরে প্রবেশ করে, চিকন বকলে বাক্যনিকে বন্ধন করে। সহজকে স্থির করে বাক্যনী এমনভাবে বন্ধন কর, যাতে অজরামর হয়ে দৃঢ়বদ্ধ লাভ হয়। দশমী দ্বারে চিহ্ন দেখে গ্রাহক অন্ন পথ বেয়ে উপস্থিত হল। চৌবাটি ঘড়ায় পসরা দেওয়া আছে; তাই দেখে সেখানে প্রবিষ্ট গ্রাহক আর নির্গত হল না। একমাত্র ছোট ঘড়া, আর তার নলও সফ, তাই দেখে বিকআ বলেন, স্থির করে নলটি চালনা কর।

অস্বর্ণিহিত অর্থে দেহযোগীর সহজানন্দ লাভের প্রণালী উল্লিখিত হয়েছে। সহজানন্দ-লাভ অত্যন্ত সংযমসাপেক্ষ ও আয়াসসাধ্য। স্বকঠোর সংযমে সাধক একবার যদি সহজানন্দরসের আশ্বাদ পান, তবে বস্তুজগৎ বা পার্থিব ভোগান্তির মধ্যে তিনি কখনও আর ফিরে আসেন না।

দেহযোগী সিদ্ধি লাভ করেন একমাত্র পরিত্যক্তাবস্থিত-কায় সাহায্যে। এই শক্তিকেই তত্ত্বিনী বলা হয়েছে।

দেখা যায়, প্রায় সমস্ত শক্তির আধার নারীশক্তি। কালী, তারা, ষোড়শী প্রভৃতি দশমহাবিভার প্রত্যেকেই নারী-শক্তি। কেউ কেউ রাধাকেও তত্ত্বজ্ঞ শক্তিরূপে কল্পনা করেছেন। সমগ্র বিশ্বের চেতনরূপিনী প্রকৃতিও নারী-শক্তি। দেহসাধক যে সহজানন্দ রস লাভ করেন তা নারীশক্তি তত্ত্বিনী অর্থাৎ অবস্থিতিকা শক্তির সাহায্যেই। দেহসাধনার মধ্যে তাত্ত্বিক বোধ সহজিয়া সাধনের ইঙ্গিত রয়েছে। এই সাধনার ইড়া, পিঙ্গলা ও সূর্য্যা—এই ত্রিনাড়ীতত্ত্ব কখনও সম্প্রতিভাবে উল্লিখিত, আবার কখনও রূপক উৎপ্রেক্ষার মাধ্যমে হৈয়ালীভাষায় বর্ণিত। মধ্যনাড়ী সূর্য্যা বোধতত্ত্বে অবস্থী বা আস্থিতিকা। ইনি কোথাও তত্ত্বিনী ডোহী—আবার কোথাও চণ্ডালী, নৈরামণি, সহজ-সুন্দরী অর্থেও গৃহীত। এঁরা সাধারণের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে; স্বকঠোর সাধনার এঁদের লাভ করতে হয়। সেজন্য এঁদের ডোমনী শব্দই ইত্যাদি অস্পষ্টা রমণী রূপে কল্পনা করা হয়েছে।

আলোচ্যপদে মধ্যনাড়ী সূর্য্যা তত্ত্বিনী বা অবস্থিতিকারূপে উল্লিখিত। সেই তত্ত্বিনী শক্তি দুই ঘরে অর্থাৎ পার্শ্বস্থিত বৈতজ্ঞানরূপ ইড়া পিঙ্গলার ঘরে প্রবেশ ক'রে অর্থাৎ পরিপন্থী উক্ত নাড়ীদ্বয়কে বনীভূত ও আব্রহ্মাণ্ড ক'রে স্বস্থানে অধিষ্ঠিত আছেন। যোগীর বৈতজ্ঞান অর্থাৎ স্থখদুঃখ বোধ বিলুপ্ত না হলে তিনি অবস্থিতিকা বা সাধনশক্তি লাভ করতে পারেন না। দুই ঘরের অর্থাৎ যোগ-পরিপন্থী সেই বৈতবোধকে ধ্বংস ক'রে, অবস্থিতিকা শক্তি চিকন বাকলে অর্থাৎ অবিত্যারহিত প্রভাবরশ্মিতারূপ বকল দ্বারা বাক্যনী বা স্থখপ্রমোদ রূপী বোধচিত্তকে বন্ধন করে। বাক্যনী মধ্যপানে যেমন স্থাহুভূতি হয়, বোধচিত্তকে লাভ করলেও দেহসাধক সেইরূপ অতীন্দ্রিয় স্থাহুভূত করেন। পাভলা কাপড় দিয়ে যেমন মদ চোলাই করতে হয়, তেমনই অবিত্যারহিত শূন্যতারূপ সূক্ষ্ম আবরণে বোধি-চিত্তকে বেঁধে রাখতে হয়। স্থখে স্থাহুভূতি ও দুঃখে দুঃখ বোধ না থাকলে হয় শূন্যতার উৎপত্তি। স্তব্ধতা বোধিচিত্তকে বন্ধন করে আশ্বাদন করতে হলে চাই চিকন বকল অর্থাৎ প্রভাবর শূন্যতা।

সহজানন্দকে স্থির করে বোধিচিত্তকে বন্ধন কর, যাতে অজরামর হয়ে দৃঢ়বদ্ধ লাভ হয়। চকলচিত্তে-বোধিলাভ

নলদ্বয়; সুতরাং ইঞ্জিনিরোধে চিত্তকে অচিন্ত্যতার আনতে হয় সহজানন্দে সহায়তার। চিত্ত নিঃস্রাবীকৃত হলে অরা বা মৃত্যুর ভয় থাকেনা। প্রজ্ঞা ও উপায়ের মিলিতাবস্থাতে মহাস্থবের উৎপত্তি; স্থব্রু:খাতীত মহাস্থবের অবস্থাকে বলা হয় আনন্দময় অবস্থা। বোধিচিত্ত যখন মহাস্থবচক্রে অবস্থান করে তখনই হয় মহানন্দ-লাভ। বৌদ্ধভক্তে নির্মাণচক্র, ধর্মচক্র, সন্তোষচক্র, মহাস্থব-চক্র—এই চারটি চক্রের কথা বলা হয়েছে। নাভিদেশে নির্মাণচক্রে বোধিচিত্তের প্রথম উদ্ভব; তখন যে অমৃতভূতি, তা শুধু আনন্দ; উর্ধ্বমুখী হয়ে বোধিচিত্তের ধর্মচক্রে প্রবেশে হয় পরমানন্দ-লাভ; তারপর সন্তোষচক্রে ও মহাস্থবচক্রে উপস্থিত হয়ে বোধিচিত্ত যথাক্রমে বিরমানন্দ ও সহজানন্দ লাভ করে। এই সহজানন্দ-লাভে ইঞ্জিরগুলি পড়ে ভুমিয়ে, মন অন্তর্মুখী হয়, সমস্ত জাগতিক চেষ্টা হয় বিলুপ্ত, আর দেহ তখনই মহাস্থবে মূর্ত্তিত হয়ে পড়ে। আলোচ্য পদে তাই সাধক বলছেন, সহজানন্দকে দেহে স্থায়িতাবে অবস্থান করিয়ে বোধিচিত্তকে চিরকালের জন্য আবদ্ধ কর; এতে দেহ দৃঢ় হয়ে অজর ও অমর হয়ে থাকবে।

সেকালে শুঁড়ির দোকানের চিহ্ন ছিল খেত পতাকা। কোথাও ঐ চিহ্ন দেখলেই গ্রাহক বুঝতে পেরে এবং কাকেও জিজ্ঞাসা না করে নিজেই দোকানের ভিতর চলে যেত; সেই রূপ দশমী দ্বার অর্থাৎ নির্বাণলাভের পথ বৈরচন দ্বারে মহাস্থবরসের সন্ধান পেয়ে গ্রাহক অর্থাৎ প্রাপ্ত বোধিচিত্ত স্বয়ং এসে উপস্থিত হয়। দেহামৃত মহাস্থবরস সহস্রার কমলে অবস্থান করে শীর্ণস্থানে এবং সেখান থেকে শঙ্খিনী নামে স্রব বক্র নলের সাহায্যে নিরগামী হয়। যোগসাধনার শঙ্খিনীর এই মুখকে দশমীদ্বার বলা হয়েছে। ইঞ্জিনিরোধপূর্বক যোগসাধনার দেহমধ্যস্থিত দশমদ্বার অর্থাৎ শঙ্খিনীর মুখ বন্ধ করে মহাস্থবরসকে রক্ষা করতে হয়। বোধিচিত্ত অবিভাংশে প্রাপ্ত থাকে; কিন্তু অবিভাংশে আগ্রস্ত হয়ে সে যদি মহাস্থবরস বা সহজানন্দ-রসের সন্ধান পায় তবে আপনাই এসে সেখানে উপস্থিত হয়; তখন চিত্ত আর বস্তুজগতের জ্ঞান থাকেনা, সহজানন্দরসে বিস্তার হয়ে পড়ে।

চৌষটি বস্তুর অর্থাৎ দেহভাণ্ডের মধ্যে সর্বত্র মহাস্থবরস

ছড়িয়ে আছে; অথবা দেহমধ্যে একরূপভাবে মহাস্থবরস সঞ্চারিত হয়েছে যে ৬৪ দণ্ড বা দ্বিবারাত্র ধরে সেই রস আবাদনহেতু দেহমধ্যে প্রতিষ্ট গ্রাহক বা বোধিচিত্ত আর সেখান থেকে নির্গত হলনা। মহাস্থবরসাবাদনে বিস্তার বোধিচিত্ত আর বস্তুজগতে বা পার্থিবভোগাসক্তির মধ্যে পুনরাগমন করল না। একবার মহাস্থবামৃত পান করলে বস্তুজগতের প্রতি আকর্ষণ চিরতরে নষ্ট হয়ে যায়।

মদ চোলাই করার একটিনাত্র ঘড়া, আর তার নলও স্রব; সুতরাং সাবধান হয়ে মদ চোলাই করতে না পারলে জ্বিনিস নষ্ট হয়ে যেতে পারে; সেইরূপ একমাত্র অবধূতিকা সংবৃন্তিসত্য ও পরমার্থসত্যকে সংঘটন করে বলে তাকে ঘটা বা ঘড়ুগী বলা হয়েছে, আর সেই অবধূতিকার গ্রাহ-গ্রাহক ভাব ও পার্থিব ভোগ ক্ষীতি একেবারেই নেই বলে তার নলও স্রব। অবধূতিকার এই স্রব পথেই বোধি-চিত্তকে স্থিরভাবে চালনা করতে হবে—এই কথা সিদ্ধাচার্য বিজ্ঞা বলছেন। অবধূতিকার পথই স্রব্রা নাতীর পথ, আর সে পথ অতি সংকীর্ণ; পথের দু-পাশে যোগপরিশ্রী ইড়া ও পিজলা অথবা গ্রাহ ও গ্রাহক দুই আভাসদ্বয় বা বৈরজ্ঞান বর্তমান। ইড়া-পিজলা সর্বদাই অবধূতিকাকে গ্রাস বা স্বহানচ্যুত করার চেষ্টা করে; অবধূতিকা কবলিত হলেই সাধক আবার বস্তুজগতের মধ্যে ফিরে আসেন, আর তখনই তার সাধনা হয়ে যায় ব্যর্থ। সেই জন্য সিদ্ধাচার্য বলছেন যে অবধূতিকার সেই স্রব পথে বোধিচিত্তকে চালনা করতে হবে যোগীকে সংযমসাধনার বস্তুজগত থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে।

মদচোলাই ও শুঁড়ির দোকানে মদবিক্রয়ের বর্ণনার রূপকের দ্বারা সহজানন্দরস প্রাপ্তির অরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় হৈয়ালির মাধ্যমে পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে ধর্মদাসের ধর্মমঙ্গলে;—

পশ্চিমোদয় দিতে গেছে পাণ্ডের ভাগিনা

সেই হইতে মননানগরে মদ মানা।

বৎসর অবধি হইল নাই সাক্ষা বাছা

জন্ম কিছু রূপা সোনা সব গেল বাধা।

আপনার বৃত্তি রাখি পরবৃত্তি করি

অবশেষে হৈল ধন গেল ধরগারি।

(ঐতব্য শ্রীহুমার সেন—চর্যাপিত্তপদাবলী, পৃষ্ঠা ১২৮)

অন্তঃপর পদকর্তা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত রচনা; কারণ নিজের গৌরব প্রকাশ নিয়ে কেউ হল। করেন।

আলোচিত চর্যার পদকর্তার নাম বিরুঝা। এঁর লিখিত একটিমাত্র চর্যা পাওয়া যায়। লক্ষ্য করার বিষয়, তথিত্যয় ক্রিয়াপদটি রয়েছে বহুবচনে। গৌরবার্থ বহুবচনের প্রয়োগ দেখা যায় প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের অনেক স্থানে। যেমন—

বড়াই কহন্তি কথা বসি তার মাঝে।

গোপী সে নিঃবাস ছাড়ে বোলন্তি বিবাদে।

(দ্রষ্টব্য সংস্কৃতি 'গোপাল বিজয়' পৃষ্ঠা ১৭২, ১৫৭)
'বড়াই কহন্তি' বা 'গোপী সে বোলন্তি' লিখেছেন কবি; এখানে তিনি বড়াই বা গোপীর গৌরবার্থ ক্রিয়াপদের বহুবচন ব্যবহার করতে পারেন; কিন্তু আলোচিত চর্যাপদে 'ভবন্তি বিরুঝা' থাকায় নিশ্চিত মনে করা যেতে পারে যে পদটি সিদ্ধার্থ বিরুঝার গুণমুক্ত কোনো শিষ্যের

ভিক্রমী অনুবাদে 'কর্মচণ্ডালিকা' নাম গীতি, দোহা-কোষ এবং বিরূপ-পদচতুষ্টয় নামে বিরুঝার ভিনখানি রচনা পাওয়া যায়। তারানাথ বলেছেন—'বিরুঝা ছিলেন কাহুপার নামান্তর; কাহুভণিতার এক চর্যার তার প্রমাণ মেলে—

কেহো কেহো তোহোরে বিরুঝা বোলই।

রাহুল সাংকৃত্যায়ন তাঁর 'পুরাতত্ত্ব নিবন্ধাবলী'তে বিরুঝাকে বলেছেন কাহুপার গুরু। নবম শতকের শেষার্ধ্বে তাঁর আবির্ভাব—তাই রাহুলজীর ধারণা। সিদ্ধার্থের আবির্ভাবকাল খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে। সুতরাং নবম শতকের শেষার্ধ্বে বিরুঝার আবির্ভাবকাল নির্ণয়ে সতর্ক থাকা সঙ্গত নয়।

জীবন নদীর কূলে কূলে

শ্রীশক্তিপদ মুখোপাধ্যায় .

জীবন নদীর কূলে কূলে
ভাঙা গড়ার খেল
খেলেছি ভাই আপন মনে
সকাল সন্ধ্যা বেলা
সত্যিকারের হৃদয় নিয়ে
চেনা মুখের আলো
একদিন সে দীপ্তটুকু
বেসেছিল তার আলো।
ছায়ার ঘেরা তীরে তীরে
সেদিন মনোবনে
শান্ত চোখের দৃষ্টি পথে
পড়তো কবে কবে।
কতো হৃদয় দীপের শিখা
নিভলো প্রতিকূলে

কতো হৃদয় দেবতা হীন
পুজার বাসি ফুলে।
জীবন নদীর কূলে কূলে
শুভির গাড়া ঘাটে।
আসে না কেউ তরী বেয়ে
বেচা কেনার হাটে।
অনেক ভালোবাসার আলো
আজও তবু জ্বলছে
শেষ হতে ছায় হল না শেষ
হৃদয় যেন বলছে।
ভালোবাসার মোহাই দিয়ে
সকল দেশ পাওনা
মিটিয়ে কেলা কঠিন বটে
যতো দূরেই যাওনা।

অসুরের দেশে সুরেন বংশ

রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আদিযুগে পূর্বসমুদ্র বা বঙ্গোপসাগর বধন হিমালয়ের পাদদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, সেই সময়ে একটি সংকীর্ণ পয়ঃপ্রণালীর ব্যবধানে দুইটি পাশাপাশি দ্বীপ ছিল। ঐ দ্বীপ দুইটির উত্তর-পূর্বে ছিল পূর্ব-আর্যাবর্ত (দিনাজপুর জেলার পূর্ব অংশ ও সমগ্র রংপুর জেলা)। আর পশ্চিমে ছিল পশ্চিম-আর্যাবর্তের অন্তর্গত বীরদেশ বা বর্তমান সাঁওতাল পরগণা। পূর্বপার্শ্বের দ্বীপটি গোপালক ও রাহিবীপালকগণ কর্তৃক অধিকৃত হওয়ার উহার নাম হয় গোড়। পরে ঐ দ্বীপে মুনিঋষিগণ আগমন করিয়া একটি বিস্তীর্ণ জলাভূমির পাহাড়ীর উপর পীঠস্থান স্থাপন করিয়া ঐ পীঠস্থানের নাম দেন দেবী পাটলা (পাতাল চণ্ডী)। চন্দ্রবংশীয় নহষের পুত্রের নাম ছিল যষাতি। রাজার অভিষাগে তাঁহার একপুত্র তুর্কহু বৃষলত্বপ্রাপ্ত হন এবং স্কন্ধ বা বন নামে অভিহিত হইয়া পশ্চিম পার্শ্ব দ্বীপটিতে আসিয়া বসবাস করেন। কাজেই ঐ দ্বীপটির নাম হয় স্কন্ধ। পরে চণ্ড (চাঁড়াল) ও মুণ্ড (মুণ্ডা) প্রভৃতি অনার্য্য সম্প্রদায়ভুক্ত জাতিবর্গও তাঁহার সহিত যোগদান করে। তুর্কহুর বংশধরগণের নামও হয় স্কন্ধ।

কিছুদিন পরে মহিবীপালকগণের সহিত পাতাল-চণ্ডী নিবাসী মুনিঋষিগণের সংঘর্ষ বাধে। তাহার ফলে রাজশক্তি আহৃত হইয়া মহিবীপালকগণকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। ইহাই হইল মহিষাসুর-বধ, আর ঐ পাতাল-চণ্ডী হইলেন ত্রীশ্রীচণ্ডী এবং রাজশক্তি হইলেন দেবতাগণের শক্তি।

পুনরায় কিছুদিন পরে নিস্কন্ধ (গোপালক, বাহারা বন নহেন) ও স্কন্ধবাসী স্কন্ধগণের (বনগণের) সহিত মুনিঋষিদের পুনরায় সংঘর্ষ বাধে। অনার্য্য গোষ্ঠীবর্গও স্কন্ধ-নিস্কন্ধগণের সহিত যোগদান করে। রাজশক্তি পুনরায় আহৃত হইয়া মুনিঋষিদের বিপক্ষ শক্তিকে পরাজিত করেন। ইহাই হইল চণ্ড-মুণ্ড-বধ ও স্কন্ধ-নিস্কন্ধ-বধ। কাজেই

আদি গোড়কে অসুরের দেশ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

যষাতি রাজার অপর পুত্র পুরু প্রথমে পিতৃরাজ্য লাভ করেন। পরে যষাতি রাজার অপর পুত্র যত্ব কর্তৃক তিনি রাজ্যচ্যুত হইয়া পুত্র জয়েজয় সহ পূর্ব আর্য্যাবর্তে আসিয়া ঐ প্রদেশের পূর্বপ্রতিষ্ঠিত নাগবংশীয় রাজগণকে বিভাড়িত করিয়া পূর্ব-আর্য্যাবর্তে দৈত্যরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। আর যত্ব পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধারপূর্বক পশ্চিম-আর্য্যাবর্তে দেবরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন।

দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু ছিলেন ঐ পুরুরাজার অধস্তন উনবিংশ পুরুষ। বিশ্বকোষ “চন্দ্রবংশ” শব্দের বংশ-তালিকা মধ্যে হিরণ্যকশিপুর স্থানে উৎস্রথ, হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদের স্থানে ফেন, প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচনের স্থানে সূতপা এবং সূতপার পরবর্তী পুরুষের নাম বলি লিখিত আছে। আবার বিশ্বকোষ বলি শব্দ মধ্যে লিখিত আছে যে প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন হইতে বলির জন্ম হয়। এই বলির একশত পুত্র হয়, তন্মধ্যে বাণরাজ্য শ্রেষ্ঠ এবং এই বলিকে দমন করার জন্য ভগবান্ বামনরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। আবার জীবনীকোষ, প্রথম খণ্ডের ৮৯৩ পৃষ্ঠায় বলি শ্রমকে বর্ণিত আছে যে, বিরোচনের পুত্র বলির দৌহিত্রী বজ্রজালাকে রাবণ-অম্বুজ কৃত্তকর্ণ বিবাহ করিয়াছিলেন। ইহা রামায়ণের উক্তি।

এক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে যে কুরুবংশীয় দৈত্যরাজগণের সহিত যষাতি বংশীয় অপর কোন শাখাসম্ভূত বাণরাজার পিতা বলির সঙ্গে একটা ভয়ানক জট পাকিয়া রহিয়াছে। কেননা বাণরাজার পিতা বলির আবির্ভাব ঘটয়াছিল মহাভারতের যুগে। এই বাণরাজার কন্যা অর্থাৎ বাণরাজার পিতা বলির পৌত্রী উষা নিজ সহচরী চিত্রলেখার সাহায্যে ত্রীকূলের পৌত্র অনিলককে মানসপতিরূপে হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন। হিরণ্যকশিপু এবং তৎপুত্র প্রহ্লাদের

আবির্ভাব ঘটয়াছিল বসিহ অবতার কালে। প্রহ্লাদের পৌত্র বলিরাজার আবির্ভাব ঘটয়াছিল বামন অবতारे এবং এই বলির দৌহিত্রী বজ্রজালার সহিত রামায়ণের যুগে কুন্তকর্ণের বিবাহ হইয়াছিল। সুতরাং বাণহুহিতা উবা এবং দৈত্যপতি বলি-দৌহিত্রী বজ্রজালার মধ্যে বহু বর্ষ ব্যবধান রহিয়াছে। আবার দৈত্যপতি বলি অপুত্রক ছিলেন, পরে দীর্ঘতম স্বর্ষির ঐরসে রাণী স্নেহকার গর্ভে তাঁহার পঞ্চপুত্র জন্মগ্রহণ করেন। আর বাণরাজার পিতা বলি একশত পুত্রের পিতা ছিলেন। এক্ষেত্রে দৈত্যবংশীয় হিরণ্যকশিপু, প্রহ্লাদ, বিরোচন এবং বলির সঙ্গে বাণরাজার পিতা বলির কোনই সম্বন্ধ নাই।

হিরণ্যকশিপু প্রপৌত্র মহারাজা বলির রাজত্বকালে বজ্রপাগরের মধ্যে আরও কয়েকটি দ্বীপের উদ্ভব হয় এবং হিমালয়প্রদেশের পাদদেশে তীরস্থ নামে একটি দ্বীপ বা উপদ্বীপের সৃষ্টি হয়; তাহাই বর্তমান মিথিলা বা ষারভাঙ্গা। যতদূর সম্ভব মিথিলার উত্তরে (নেপাল) ছিল রাক্ষস রাজ্য। রামায়ণের যুগে দৈত্যপতি বলিরাজার সখা জন্মের পুত্র সুনন্দ (তাড়কার স্বামী ও মারীচের পিতা) ছিলেন রাক্ষস রাজ্যের রাজা। রাক্ষস রাজ্যের পূর্বে ছিল প্রাগজ্যোতিষ প্রদেশ ও কামাখ্যা (কাম্যক বন); ইহা গুহলোক নামে খ্যাত ছিল। গুহলোকের পূর্বে ছিল গন্ধর্ব্বরাজ্য এবং গন্ধর্ব্বরাজ্যের পূর্বে চীন-সমুদ্রের উপকূলভাগ বিজ্ঞানর দেশ (কিন্নর দেশ) নামে খ্যাত ছিল। পূর্ব আর্ধ্যাবর্তের পূর্বে অপর একটি উপদ্বীপ ছিল। ঐ উপদ্বীপটিতেও নাগবংশীয় রাজগণ রাজত্ব করিতেন। রাজা জয়েজয়ের নাগবজ্র সম্পন্ন (নাগবংশীয়-গণ রাজা জয়েজর কর্তৃক বিভাঙিত) হইলে পর পূর্ব আর্ধ্যাবর্তের নাগবংশীয়গণও পূর্ব আর্ধ্যাবর্তের পূর্বপার্শ্বস্থ নাগরাজ্যে বাইরা নাগবংশীয়গণের শক্তি বৃদ্ধ করেন। এই নাগরাজ্যটিই বর্তমান আসাম। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকালে মহাবাহু বক্রবাহন এই নাগরাজ্যের রাজা ছিলেন। মহাভারতের যুগে প্রাগজ্যোতিষ প্রদেশের রাজা ছিলেন পৌণ্ড্র বাহুবল এবং ঐ প্রদেশ পুণ্ড্রদেশ আখ্যা লাভ করিয়াছিল। ইহা তৃতীয় পুণ্ড্র, দ্বিতীয় পুণ্ড্র হইতেছে বর্তমান বাকুড়া জেলা আর আদিপুণ্ড্র হইতেছে বর্তমান বালদহ জেলার

অন্তর্গত উত্তর বয়েজতুবি। মহাভারতের যুগে চিত্রবর্ধ-বংশীয়গণ গন্ধর্ব্বরাজ্য শাসন করিতেন।

বলিরাজা যখন বামনরূপী মহাযোগীর আদেশে ও নির্দেশে গোড়ের পাভালচণ্ডী পীঠস্থানের মুনিঋষিগণের আশ্রয় লন, তখন তাঁহার গুরু ও প্রধানমন্ত্রী শুক্রাচার্য গোড়ের দক্ষিণ-পূর্বস্থ একটি ক্ষুদ্র দ্বীপকে আশ্রয় করেন। ফলে ঐ দ্বীপটির নাম হয় শুক্রবাড়ী-চৌডলা। বলিরাজার ক্ষেত্রস্থ পাচজন পুত্র অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও হুঙ্গ প্রত্যেকে পুরোক্ত নব উদ্ভূত এক একটি দ্বীপ অধিকার করিয়া নিজ নিজ নামে নামকরণ করেন। কনিষ্ঠ হুঙ্গ পুরোক্ত হুঙ্গ দ্বীপকেই অধিকার করিলে ঐ দ্বীপবাসী তুর্কস্থ বংশীয় হুঙ্গ (যবন) গণ প্রহুঙ্গ নামে পরিচিত হয় আর বলিরাজপুত্র হুঙ্গের বংশধরগণ হুঙ্গ নামে অভিহিত হয়। আর ইক্ষাকু রাজার পুত্রও শুক্রাচার্যের প্রিয়শিষ্য দণ্ড পশ্চিম আর্ধ্যাবর্তের অন্তর্গত বর্তমান বিহার প্রদেশে রাজ্য স্থাপন করেন। তাহাই পরবর্ত্তীকালে দণ্ডভুক্তি নামে পরিচিত হইয়াছিল। ঐ প্রসঙ্গে ইহাও বলা যায় যে ইক্ষাকুরাজার জ্যেষ্ঠ তিন পুত্র—বিকুক্তি, নিমি ও দণ্ড পশ্চিম আর্ধ্যাবর্তের মধ্যস্থলকে তিনভাগে ভাগ করিয়া তিনজনই নিজ নিজ রাজ্যস্থাপন করেন। আর বাকী ৯৭ জন পশ্চিম আর্ধ্যাবর্ত মধ্যে ঐ তিন রাজ্যের চতুর্দশর্থে নিজদের আধিপত্য বিস্তার করেন।

মহাভারতের যুগে অঙ্গ, পুণ্ড্র, হুঙ্গ, গোড় ও মিথিলা ক্রমশঃ নন্দনদীর ব্যবধানে পরস্পর মিলিত হইয়া পূর্ব আর্ধ্যাবর্তের সহিত যুক্ত হয় এবং গঙ্গাকে ব্যবধান রাখিয়া ঐ সমগ্রপ্রদেশ পশ্চিম-আর্ধ্যাবর্তের সহিতও যুক্ত হয়। কিন্তু আদিশুরের সময় পর্য্যন্ত বঙ্গ (পূর্ববঙ্গ) উত্তরবঙ্গ হইতে সমুদ্রশাখা কর্তৃক বিচ্ছিন্নই থাকে। আর কলিঙ্গ প্রদেশ (বর্তমান মেদিনীপুর) আনুমানিক মহাভারতের যুগ পর্য্যন্ত পশ্চিম-আর্ধ্যাবর্তের সহিত বিচ্ছিন্নই থাকে। অপর দিকে বীরদেশ সহ দামোদর প্রদেশ (বর্তমান বাকুড়া ও তৎসহ দামোদর নদের উভয় পার্শ্বভূত্ববি) আদি যুগ হইতেই বুদ্ধি পাইতেছিল। অহুমান, মহাভারতীয় যুগের পরে উৎকল ও কলিঙ্গ দেশ একত্রযোগে পশ্চিম আর্ধ্যাবর্তের বর্ধিত অংশের সহিত যুক্ত হয়। আর বগড়ীভূমির উদ্ভব হইয়াছিল গোড়ের সেন-রাজার

সরসাময়িক কালে বা পালরাজগণের রাজত্বের শেষ দিকে।

পুরুবংশীয় রাজগণের মধ্যে নিজনিজ প্রদেশে কোন বংশ কতদিন রাজত্ব করিয়াছেন, তাহার সঠিক সন্ধান না পাওয়া গেলেও অঙ্গবংশের সঠিক পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন, বলিপুর অঙ্গের বর্ষপুর্বে জয়লাভ করেন, শ্রীরামচন্দ্রের পিতৃবন্ধু লোমপাদ দশরথ। লোমপাদ দশরথের প্রপৌত্রের নাম চম্প। ইনি বর্তমান পুর্ণিয়া সহরের সন্নিকটে চম্পানগরী স্থাপন করেন, তাহাই দ্বাতা কর্ণের রাজধানী। চম্পের প্রপৌত্র-পুত্রের নাম ছিল বৃহন্নলা, বৃহন্নলা পুত্রের নাম ছিল বিজয়, আর বিজয়ের প্রপৌত্র-পুত্রের নাম ছিল অধিরথ। ইনি হৃতবৃষ্টি অবলম্বন জন্ত ক্ষত্রিয় সমাজে নিম্নিত হইয়াছিলেন। তৎপরে দ্বাতা কর্ণ অঙ্গরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হন।

দ্বাতা কর্ণ যে সময়ে অঙ্গরাজ্য শাসন করিতেন, সেই সময়ে বিরাট রাজা পুণ্ড্র, গোড় ও অঙ্গের অর্ধাংশ দ্বিতীয় মৎস্তদেশের শাসনকর্তা ছিলেন। অহুমান, সুক্রবংশীয় রাজগণ বহু পূর্বেই স্বর্ধ্যবংশাধীন সগর বংশীয় 'ভগীরথ' কর্তৃক রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন। তৎপরে পুণ্ড্র বংশীয় রাজগণ ও ভগীরথ কিছা তাঁহার কোন বংশধর কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হইয়াছিলেন। বিরাট রাজাও হয়ত ভগীরথের কোন আত্মীয় পুরুষ ছিলেন এবং তিনি হয়ত বহুবংশীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন। কেননা সগর রাজার মাতা বাতবী ছিলেন বহুবংশীয়া, ঐ প্রসঙ্গেই অহুমিত হয় যে মহাতারতীয় যুগ পর্যন্ত কলিঙ্গ দেশে কলিঙ্গ বংশীয় ও বঙ্গে বঙ্গবংশীয় ক্ষত্রিয় গণই নিজ নিজ প্রদেশ শাসন করিতেন। পরে কলিঙ্গ-দ্বীপ পশ্চিম আর্ধ্যাবর্তের সহিত যুক্ত হইলে বীরদেশের বীরবংশীয়গণ ঐ প্রদেশে অধিপত্য বিস্তার করিয়া নিজেদেরকে বীর্য নামে অভিহিত করেন। আর বর্ষ ও চটুল দ্বীপ বঙ্গের সহিত পরস্পর যুক্ত হইলে বঙ্গে বর্ষ এবং খড়্গ বংশের আবির্ভাব ঘটে। তৎপরে ব্রহ্মক্ষত্রিয় (কারহ) বুঝকেতুর প্রভাবে তাঁহাদের ক্ষত্রিয় প্রভাব ধ্বংস হয় এবং তাঁহারাও কালক্রমে কারহ আখ্যা লাভ করেন। মুসলমান আগমনের পূর্বে পর্যন্ত বঙ্গদেশে কারহ প্রভাবই বিস্তৃত ছিল। আর মুসলমান আগমনের বহুদিন পর পর্যন্ত বঙ্গ ও কলিঙ্গ প্রদেশে কারহ প্রভাব অক্ষয় ছিল।

কলিঙ্গ প্রদেশে আরও কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। আদিতে পশ্চিম-আর্ধ্যাবর্তের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূল অর্থাৎ বর্তমান সাঁওতাল পরগণার উত্তর সীমান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া ছোটনাগপুরের শৈলমালা পর্যন্ত নিবিড় বনে আচ্ছাদিত ছিল এবং মাঝে মাঝে ঐ প্রদেশে দাণ্ডানল প্রজলিত হইত। তজ্জন্ত ঐ প্রদেশ বীরদেশ নামে অভিহিত হয়। কেননা 'বী' শব্দের অর্থ প্রজনন। আর 'র' বর্ণের অর্থ এখানে পাবক। অর্থাৎ যে প্রদেশে পাবকের প্রজনন কার্য সংঘটিত হয়, তাহাই বীরদেশ।

ঐ বঙ্গ বিভাগের রাজগণ পার্বত্যপ্রদেশে সমুদ্রোপকূলে রাজত্ব করার দরুণ তাঁহারা অপরাঙ্গের রাজা বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। অহুমান, সেই হেতু তাঁহারা বীর রাজা নামে অভিহিত হন। এমন কি পরশুরামও তাঁহাদিগকে হত্যা করিবার সুযোগ গ্রহণ করিতে পারেন নাই বলিয়া মনে হয়। কেননা তিনি কশ্যপমুনি কর্তৃক অহুক্রম হইয়া ক্ষত্রিয় নিধন কার্যে ভাগ পূর্বক ঐ প্রদেশের রাজাদের আশ্রয় লাভ করেন। পরে শ্রীরামচন্দ্রের বীরত্বদর্শনে পুনরায় উত্তেজিত হইয়া শ্রীরামচন্দ্রের মিথিলা হইতে অবোধায় ফিরিবার পথে তাঁহার গতিরোধ করেন এবং শ্রীরামচন্দ্রের নিকট পরাজিত হইয়া দাক্ষিণাত্যে পলাইয়া গিয়া কোকন প্রদেশ (বর্তমান কেরোল) জয় করতঃ সেইখানেই শেষ জীবন পর্যন্ত অতিবাহিত করেন।

ঐ বীররাজগণ ক্রমশঃ রাজ্যবিস্তার করিতে আরম্ভ করিতে থাকেন। অহুমান, এমন সময়ে কলিঙ্গদেশের কলিঙ্গবংশীয় রাজগণ হীনবীৰ্য্য হইয়া পড়েন এবং তৎসহ কলিঙ্গ দ্বীপ পশ্চিম-আর্ধ্যাবর্তের সহিত যুক্ত হইয়া যায়, তখন ঐ বীর রাজগণ ঐ প্রদেশ জয় করিয়া রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন এবং বীরবংশোদ্ভব বলিয়া নিজেদেরকে হয়ত বীর্য নামে অভিহিত করেন। ঐ বীরবংশই কালক্রমে বিরাট নামে পরিচিত হইয়াছে। ঐ কলিঙ্গ প্রদেশ মহাতারতীয় যুগের পরে মৎস্ত নামে অভিহিত হইয়াছিল এবং ইহা তৃতীয় মৎস্ত। আর আদি মৎস্ত বর্তমান মৌর্য প্রদেশ, ইহা মন্তপ্রোক্ত মৎস্ত।

এখানে পরশুরাম সন্ধে একটু আরও আলোচনা করা প্রয়োজন, নাচং পাঠকমণে কৌতূহল জাগিতে পারে। লোম বংশাধীন (চন্দ্রবংশীয়) পুরুবংশ বংশীয় রাজা

সহোদ্রের পত্নী ঐকাকী অজমীড়, হুমীড় ও পুরুষীড় নামে তিন পুত্র প্রসব করেন। অজমীড়ের দ্বিতীয় পত্নী কৌশলীর গর্ভে অজমীর জন্ম লাভ ঘটে। এই অজমীর আবির্ভাব ঘটয়াছিল তামল মন্ডর অর্থাৎ ৪র্থ মন্ডর সময়ে ঐ সময়ে ইনি সপ্তমি মধ্যে গৃহীত হইয়াছিলেন। এই সময়ের কিছু পূর্বে স্বর্ধাবংশের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্ধের আবির্ভাব ঘটয়াছিল। আর তাহার কিছু পরেই পূর্কোক্ত চন্দ্র-বংশের প্রতিষ্ঠা লাভ ঘটে। রাজা ভগীরথ ছিলেন স্বর্ধের অধস্তন পঞ্চদশারিংশ (৪১) পুরুষ। স্মরণ্য যে অজমীর ভগীরথের সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তিনি ঐ অজমী হইতে বত্স। অজমীর, রাজা ভগীরথের সমসাময়িক জন্ম ছিলেন অপর একজন ঋষি। রামায়ণের আদি পর্বের ৪৩ স্কন্ধে তিনি কেবল “মুনি” আখ্যা লাভ করিয়াছেন। কোন কোন পুরাণ দুই অজমীতে অট্-পাকাইয়া স্বর্ধাবংশের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্ধের সমসাময়িক আদি অজমীকে বিতরণভাবে স্বর্ধের অধস্তন পঞ্চদশারিংশ পুরুষ ভগীরথের সময়েও টানিয়া আনিয়াছেন।

অজমীর, রাজা ভগীরথের সমসাময়িক অজমী দ্বিজ ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং তৎকালীন অবহেলিত প্রদেশে স্বকীয়পে (যবন রাজ্যে) বসবাস কর্তা হার বংশ পরিচয় ঠিকভাবে রক্ষিত হয় নাই। মালদহ জেলায় কালিয়াচক থানার অন্তর্গত “জাহির ঘাটা” এখনও তাঁহার নামের সহিত অভিহিত থাকিয়া তাঁহার স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে।

পূর্কোক্ত সপ্তমি আদিঅজমী ছিলেন ঋগ্বেদোক্ত অজমী এবং ইহার বংশধারা এইরূপ :—সহোদ্রের পুত্র অজমীড়, অজমীড়ের পুত্র অজমী, অজমীর পুত্রের নাম ছিল বলাকাধ, এবং বলাকাধের পুত্রের নাম ছিল কুশিক। ইহারই বংশধর গণ কৌশিক গোত্রীয়, এই কুশিকের পুত্রই কনৌজাধিপতি গাধি। গাধির পুত্র ঋষি বিশ্বামিত্র এবং কস্তা সত্যবতী। এই গাধিপুত্র বিশ্বামিত্র হরিশ্চন্দ্র রাজার বা তৎপিতা ত্রিশঙ্কুজার সময়ের বিশ্বামিত্র হইতে বত্স।

স্বর্ধাবংশের আদিপুরুষ ছিলেন পরমেশ্বর, পরমেশ্বরের প্রপৌত্র-পুত্রের নাম ছিল স্বর্ধ। ইনিই স্বর্ধাবংশের প্রতিষ্ঠাতা। স্বর্ধের পুত্রের নাম ছিল বৈবস্বত মন্ড। ইনি ছিলেন সপ্তম মন্ড। এই সপ্তম মন্ডর পূর্ববর্তী চান্দ্র

মন্ডর সময়ে বিশ্বামিত্র ঋষি ছিলেন সপ্তমির মধ্যে গণ্য। কাজেই ইনি দেবর্ষি ছিলেন, এবং ইহার পিতা গাধি ছিলেন ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব। তাহা ছাড়াও ইহার ত্রয়োপতি ঋগীক তপঃ প্রভাবে এবং সত্যবতীর ভুলে ইনি ব্রাহ্মণ্য লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আর ইহার জন্মগত ক্ষত্রিয় প্রভাব সত্যবতীর পুত্র জন্মগতিতে অর্পিত হইয়াছিল। কাজেই ব্রাহ্মণ্য লাভের অন্ত ইহাকে কঠোর তপস্বী করিতে হয় নাই। ইনি ঋগ্বেদোক্ত বিশ্বামিত্র। ইনি ছিলেন বৃহস্পতির স্ত্রী সহোদর উত্থা ঋষির স্ত্রী মমতার গর্ভজাত বৃহস্পতি ঋষির পুত্র তরঙ্গাক এবং উক্ত গর্ভে উত্থা ঋষির নিজ ঔরসজাত পুত্র দীর্ঘতমা ঋষির পুত্র গোতম ঋষির সমসাময়িক। এই দীর্ঘতমা ঋষির ঔরসেই পূর্কোক্ত দৈত্যপতি বলিরাজার পত্নী স্বদেবার গর্ভে, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও স্বদেব জন্মলাভ ঘটে। এই সময়ে ঋগীক মুনির অপর পুত্র শুক্রাচার্য্য দৈত্যকুলের গুরু ছিলেন।

রাজা হরিশ্চন্দ্রের পিতা ত্রিশঙ্কুর আবির্ভাব ঘটয়াছিল বৈবস্বত মন্ডর অধস্তন ত্রিংশ পুরুষে। স্মরণ্য হরিশ্চন্দ্রো-পাখ্যানোক্ত বিশ্বামিত্র দেবর্ষি বিশ্বামিত্র হইতে বত্স এবং ইনি ত্রিশঙ্কুজার নামে পরিচিত ছিলেন। কাজেই ইহারও জন্মলাভ ব্রাহ্মণ কুলেই হইয়াছিল। ইনি দ্বিতীয় বিশ্বামিত্র।

তৃতীয় বিশ্বামিত্রের আবির্ভাব ঘটয়াছিল স্বর্ধাবংশীয় সৌগম বা কাম্যাবাদের পিতা স্বদাসের সময়ে। স্বদাস ছিলেন রাজা হরিশ্চন্দ্রের অধস্তন উনবিংশ পুরুষ। ইহার সন্তানই স্বদাসের পুরোহিত বলিষ্ঠের কলহ হয় এবং শেষ পর্যন্ত কঠোর তপঃপ্রভাবে ইনি ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়া ব্রহ্মর্ষি আখ্যা লাভ করেন। ইনিই প্রকৃত পক্ষে ক্ষত্রিয় কুলোদ্ভব ছিলেন।

৪র্থ বিশ্বামিত্রের আবির্ভাব ঘটয়াছিল ত্রিরাশচন্দ্রের পিতা দশরথের সময়ে। রাজা দশরথ ছিলেন পূর্কোক্ত স্বদাসের অধস্তন একাদশ পুরুষ। এই বিশ্বামিত্রের আশ্রয় বত্সদ্রুমতব বান্দলা দেশের উত্তর সীমান্তে হিমালয় পার্বত্যে—প্রাগ্‌জ্যোতিষ প্রদেশের সন্নিহিত কোন স্থানে ছিল। তৎকালে তাড়কাবধ জন্ত ত্রিরাশচন্দ্রকে ঐ প্রদেশে আনিয়া তাঁহার দ্বারা তাড়কারাগী বধ, গৌতমজায়া অহল্যা উদ্ধার ও মিথিলার (দারভাঙ্গার) রাজবাড়িতে বরধর

ভগ্নসাধন করিয়া সীতাদেবীর বিবাহকার্য সম্পাদন করান।

পূর্বোক্ত ধৈবতমত মত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীরামচন্দ্র পর্যন্ত ঐ বংশীয় বাবড়িজন রাজা ক্রমান্বয়ে রাজত্ব করিয়াছেন। অথচ পুরাণকারগণ উক্ত সময়ের বিভিন্ন বিখ্যাতিকে এক করিয়া দিয়াছেন। তৎকালীন ঐ বাবড়ি জন রাজার কালানুগুণে দুই-তিন হাজার বর্ষের কম নহে।

এখন পরশুরাম প্রসঙ্গে আসা যাক। তৃণমুনির পুত্র ঋচীকের সহিত গাধিকস্ত্রী সত্যবতীর বিবাহ হয়। সত্যবতীর গর্ভে জমদগ্নির জন্ম হয়। তিনি প্রসেনজিৎ রাজার কস্ত্রী রেণুকাকে বিবাহ করেন। রেণুকার গর্ভে মহাবীর পরশুরামের জন্ম হয়। ইনি জমদগ্নির পঞ্চমপুত্র এবং ইনি পিতৃ আজ্ঞা পালনজন্য পিতৃগুণের (ব্রাহ্মণ ও কত্রিয় সম্বন্ধাচারী) অধিকারী হইয়াছিলেন। পরশুরামের জন্মস্থান ছিল, বেনার বোলায় অন্তর্গত তুলসী পাহাড়ের নিকটবর্তী ভার্গবপুরে (বর্তমান নাম খয়েরাগড়)। কিন্তু তাঁহার পিতা জমদগ্নি ঋষির আশ্রম মিথিলার পার্শ্বেই কোন স্থানে ছিল। বযাতিরাজপুত্র বহুরপুত্র হৈহৈরাজ্য কান্ত-বীর্ধার্জুন (ইহার রাজধানী ছিল বর্তমান জব্বলপুরে) ঋষি জমদগ্নি ও তৎপুত্র পরশুরামের বীরত্ব দর্শনে ঈর্ষান্বিত হইয়া নিজপুত্রগণ সহ পিতাপুত্রের অহুপস্থিতি সময়ে তাঁহাদের আশ্রম হইতে গোবৎসাদি হরণ করিয়া লইয়া যান। পরশুরাম উক্ত সংবাদ জ্ঞাত হইয়া মাক পথে বাইরা তাঁহাদিগকে পরাজিত করিয়া নিজ গোবৎসাদি পুনরায় ফিরাইয়া আনেন। পরে তাঁহার অহুপস্থিতি কালে হৈহৈরাজ্যপুত্রগণ আশ্রমে প্রবেশ করিয়া জমদগ্নি ঋষিকে হত্যা করিয়া পলায়ন করেন। এখন হইতেই পরশুরাম কত্রিয়নিধন বজ্র আরম্ভ করেন। আর কত্রিয়াগণ নিজ নিজ শিশুকুমারগণকে ব্রাহ্মণ, বৈশ্য বা অনার্য সম্প্রদায়ভুক্ত পরিবারবর্গের আশ্রমে স্থাপন করেন। কত্রিয়নিধন জন্ত সামাজিক এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিচারে দেশ কলঙ্কিত হইতে থাকে। তখন কস্ত্রপ মুনির অহুরোধে পরশুরাম উক্ত কার্যে নিবৃত্ত হইয়া দ্বীপ-প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন। আর কস্ত্রপ মুনি ঐ সব পরাজিত কুমারগণকে আনিয়া নিজ নিজ শিশুসিংহাসনে উপবেশন করান।

ইতি পূর্বেই বলা হইয়াছে যে পরশুরাম শ্রীরামচন্দ্রের নিকট পরাজিত হইয়া কোকন প্রদেশে বাইরা রাজ্য স্থাপন করেন। পরবর্তী কালে হৈ হৈ রাজবংশের একটি শাখা পরশুরামের প্রতিষ্ঠিত রাজবংশকে পরাজিত করিয়া কেরোল প্রদেশ জয় করেন এবং ত্রৈকুটে রাজধানী স্থাপন করেন।

বযাতিপুত্র তুরঙ্গর বংশধরগণ স্কন্দ (যবন) নামীয় অসুর এবং পুরুষ বংশধরগণ দৈত্য আখ্যালাভ করিয়াছিল, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। আর বহুর বংশধরগণ বহু-বংশীয় দেব, সুর বা সেন উপাধিতে অথবা সুরসেন উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। পরবর্তীকালে যে শাখাটি দাক্ষিণাত্যে গমন করেন, সেই শাখাটি কলুচুরি বা চেদী রাজবংশ নামে খ্যাত হয়। মগাধ গুপ্তসাম্রাজ্যের শেষ-দিকে অর্থাৎ হর্ষবর্দ্ধনের আবির্ভাবের কিছু পূর্বে ঐ চেদী রাজবংশীয় নৃপতিগণ পুনরায় প্রবল হইয়া মধ্যভারত আক্রমণ করেন এবং গোড়রাজ্যে দেববংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহাদের মধ্যে একজনের নাম ছিল কর্ণদেব। এই কর্ণদেব হর্ষচরিতে কর্ণসেন নামে উক্ত হইয়াছেন। ইনি রাজ্যমাটির গৌরবরবি গুপ্তবংশীয় কর্ণসেন হইতে স্বতন্ত্র। দেববংশীয় কর্ণসেনের (কর্ণদেবের) আবির্ভাব ঘটয়াছিল ৫ম শতাব্দীতে আর রাজ্যমাটির গুপ্ত বংশীয় কর্ণসেনের আবির্ভাব ঘটয়াছিল একাদশ শতাব্দীতে। রাজ্যমাটির গুপ্ত বংশীয় কর্ণসেনের প্রতিষ্ঠিত কর্ণসেনপুরী বা কাগসোণা নগরী কর্ণসুবর্ণ নগর হইতে স্বতন্ত্র। কর্ণদেবের প্রতিষ্ঠিত রাজধানী কর্ণসুবর্ণ ছিল রাজমহলের পরপারে, স্কন্দ বীপের উত্তর সীমান্তে। কর্ণসুবর্ণ নগরের নামকরণ কোন ব্যক্তি বিশেষের নামের সহিত জড়িত নহে। জহ্নু-মুনির সুবর্ণ নামক যজ্ঞক্ষেত্র এবং কালিন্দী নদীর (পবন দূতের মতে যমুনা এবং ভট্ট গ্রন্থেও মতে কর্ণ) তীরভূমি বা কর্ণ একত্রে নাম গ্রহণ করিয়াছিল কর্ণসুবর্ণ। মহাসামন্ত শশাঙ্কদেব ছিলেন ঐ চেদী বংশীয় কায়স্থ কর্ণদেবের স্ত্রীযোগ্য বংশধর।

এ স্থানে নরেন্দ্র গুপ্ত বা শশাঙ্ক গুপ্ত প্রসঙ্গেও কিছু বলা ভাল। কেননা ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ দুই শতাব্দীকে লইয়া একটা ভয়ঙ্কর অটু পাকাইয়া রাখিয়াছেন; বাহার বলে বর্তমান সরকার বাহাদুরকে বিজ্ঞাত করা হইতেছে এবং তৎসহ কতিপয়ও করা হইতেছে।

যে সময়ে মহাসামন্ত শশাঙ্কদেব কর্ণস্বর্ণ নগরে থাকিয়া হুদ্র বীপসহ অজরাধ্য শাসন করিতেন, সেই সময়ে তাঁহার অধীনে থাকিয়া গুপ্তবংশীয় নরেন্দ্র গুপ্ত বা শশাঙ্ক গুপ্ত পৌণ্ড্রবর্ধন রাজধানীতে থাকিয়া গোড় ও পুণ্ড্র বীপ শাসন করিতেন। কর্ণবর্ধন ও ভাস্করবর্ধার প্রথম আক্রমণেই নরেন্দ্র গুপ্ত কামরূপগতি ভাস্কর বর্ধা কর্তৃক পরাজিত ও নিহত হন। মহাসামন্ত শশাঙ্কদেব এবং নরেন্দ্র গুপ্ত বা শশাঙ্ক গুপ্ত উভয়েই বড় গন্ধার পূর্বপারে ছিলেন, বড় গন্ধা বা বিভীরা তাম্রবীর পশ্চিম পারে কেহই রাজত্ব করেন নাই।

কর্ণস্বর্ণ নগর বর্তমান রাঢ় প্রদেশে নহে। যে সময় হইতে মহানন্দার পূর্বপার বরেন্দ্র আখ্যা লাভ করে, সেই সময় হইতে পুরাণকারক এবং ঐতিহাসিকগণ মহানন্দার পশ্চিমপ্রদেশ অজ, গোড় ও হুদ্রকে রাঢ় নামে পরিচিত করান।

স্ববিখ্যাত অশোক তুপ ও বাশিতা সজ্জারাম (রক্তবর্ণ-ভাতিবৃত্ত বিহার বা মঠ) বা রক্তবিটি (রক্তবসনা অপসারী) রাজ্যমাটিতে ছিল না। উহা ছিল পৌণ্ড্রবর্ধনের প্রায় ৫ মাইল পশ্চিমে। অর্থাৎ গোড়ের উত্তরে, অজ রাজ্যের দক্ষিণে, পুণ্ড্রবর্ধনের পশ্চিমে এবং কর্ণস্বর্ণ নগরের পূর্বে উহার অবস্থিতি ছিল।

কর্ণবর্ধনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ভাস্করবর্ধা মিথিলা, অজ, পুণ্ড্র, গোড় ও হুদ্রসহ সমগ্র পূর্ব-আর্য্যাবর্তের আধিপত্য লাভ করেন। আর বর্তমান রাঢ়প্রদেশসহ সমগ্র পশ্চিম আর্য্যাবর্ত মগধাধিপতি মাধবগুপ্তের পুত্র আদিত্যসেনের হস্তে যায়। ভাস্করবর্ধা এই নবপ্রাপ্ত রাজ্যকে পাঁচ ভাগে ভাগ করিয়া প্রত্যেক রাজ্যে এক একজন সামন্ত রাজা প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহাদের মধ্যে তাঁহার নিজ বংশধর কর্ণদেব মহাসামন্ত পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন পৌণ্ড্র-বর্ধনে। আর কবিশূর সামন্ত পদে হুদ্রের রাজধানী কর্ণ-স্বর্ণ নগরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র মাধব-শূর মহাসামন্ত পদ লাভ করিয়াছিলেন। তৎপরে আদিশূর বা জয়ন্ত পুণ্ড্র, গোড়, হুদ্র, অজ ও মিথিলা এই পঞ্চ বিভাগের একত্রাধিপতি হইয়া রাজাধিরাজ উপাধিতে ভূষিত হন। তাঁহার পুত্র মহারাজ কুশুর পালবংশীয় নৃপতি রাজ্যে বর্ণপালদেব কর্তৃক বিভাজিত হইয়া বর্তমান রাঢ়-

প্রদেশের দক্ষিণে বাইরা সপ্তমতী ব্রাহ্মণদের সাহায্যে রাজ্য জয় পূর্বক রাজত্ব করিতে থাকেন। কুশুরের বংশধরগণ ১০৬১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাঢ়প্রদেশের নানা স্থানে রাজত্ব করিয়াছেন। এই বংশের শেষ রাজা লক্ষ্মীশূর। তাঁহার বংশধরগণ পূর্ববঙ্গে বাইরা কুশুরা রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। বারভূঁইয়ার অন্ততম লক্ষণমাণিক্য এই শূরবংশেরই বংশধর।

এই শূরবংশের আদিশূর কবিশূর কোন্ বংশোদ্ভব এবং কোথা হইতে আসিলেন, তাহার কোনই সন্ধান মিলে না। মথুরা প্রদেশে আদিত্যে বাহারী রাজত্ব করিতেন তাঁহার শূরেন বংশীয় কবিশূর; এই শূরেনবংশীয় কবিশূরগণ আবার বহুবংশেরই একটি শাখা। ইতিপূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে যে, বিরাট রাজা ছিলেন বহুবংশীয়। বিরাট রাজার পতনের পর বহুবংশীয় বিভিন্ন শাখারই লোলুপ-দৃষ্টি পড়ে গোড় সিংহাসনের প্রতি। কলে কালক্রমে স্বযোগ স্ববিধাভায়ে বহুবংশের শাখা চেণীরাজ বংশীয়গণ দেব উপাধি ধারণ করিয়া গোড়ে আগমন করেন। হরন্ত বহুবংশের অপর শাখা শূরেন বংশীয়গণ তাঁহাদের সহিত যোগদান করেন। মহাসামন্ত শশাঙ্কদেবের অবসানে এই বংশীয় কবিশূর ভাস্করবর্ধার শ্রিরত্নাভন হইয়া কর্ণস্বর্ণের সিংহাসন লাভ করেন। শূরেন রাজ্য ত্যাগ করার পর হরন্ত তাঁহার শূর উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। শূর শব্দ দেব শব্দেরই রূপান্তর। গোড়রাজ্য আদিত্যে অশুর ও দৈত্যের রাজ্য ছিল ইহা পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে। পূর্বে ক্রমান্বয়ে দেব ও শূরের আবির্ভাব ঘটে। অতঃপর হুদ্রের বংশীয় অপর শাখা সেন উপাধি ধারণ করিয়া দাক্ষিণাত্য হইতে আসিয়া পালরাজ্যের (শক বংশীয় কারক রাজ্যের) অবসান ঘটাইয়াছিলেন।

এই সেনবংশের আদিশূর সামন্ত সেন। তিনি রাজেন্দ্র চোলের সহিত আসিয়া কিরিগার পথে বর্তমান রাঢ় প্রদেশের দক্ষিণে স্বর্ণরেখা নদীতীরে কাম্বীপুর (বর্তমান নাম কামিয়ারী) নামক স্থানে রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁহার পুত্র হেমন্ত সেনও পিতৃরাজ্যে রাজত্ব করেন। তাঁহার পুত্র বিজয় সেন ১০৭২ খৃষ্টাব্দে গোড় সিংহাসন অধিকার করেন। তাঁহার পৌত্র লক্ষণ সেন ১১৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গোড়ে রাজত্ব করেন। তৎপরে বড় (পূর্ববঙ্গ)

ও কলিক প্রদেশ কিছুদিন ব্যবত তাঁহার এবং তাঁহার বংশধরগণের শাসনাধীন থাকে।

১১৯৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মুসলমান রাজগণ গোড় রাজত্ব করেন। মাঝে রাজা গণেশ কিছু দিন রাজত্ব করিয়াছিলেন। শেষের দিকে গোড় হইতে আদি ভাগীরথীর পশ্চিম পারে টাঁয়ার রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। শেষে মানসিংহ ১৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দে রাজধানী রাজ-মহলে স্থানান্তরিত করেন। এই বংশেরই সুসেন বংশ কর্তৃক গোড় সিংহাসন অধিকৃত হয়।

এই সেন বংশ প্রসঙ্গে বহু আলোচনা এবং বহু মতামত দৃষ্ট হয়। কেহ বলেন—তাঁহার কায়স্থ বা ব্রহ্ম ক্ষত্রিয় ছিলেন। কেহ বলেন—তাঁহারা বৈদ্য ছিলেন, আবার প্রকৃত্তে মহান ভারত প্রাণেতা বলেন যে আদিতে তাঁহারা ব্রাহ্মণ ছিলেন, কিন্তু ক্ষত্রিয়রূপে বাঙ্গলার আসিয়া রাজ্য-পন করেন। কিন্তু আবুলকজলের মতামতসারে দেখা যায় যে বঙ্গদেশে ২৪২৮ বর্ষ ক্ষত্রিয় অধিকার, তৎপরে ২০৩৮ বর্ষ কায়স্থ প্রভাব চলিয়াছিল, তাহার পরেই মুসলমান আগমন ঘটে। (বিখকোষ, বঙ্গদেশ ৪০৮ পৃ: প্রট্যা)

সেন বংশ যদি কায়স্থ ছাড়া অন্য জাতি হইতেন তাহা হইলে আবুলকজলের মত ঐতিহাসিক তাঁহার উল্লেখ নিশ্চয়ই করিতেন। বঙ্গাল-চরিতেও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তাঁহারা ব্রহ্মক্ষত্রিয় বা কায়স্থই ছিলেন। তাঁহাদের বংশধরেরা পূর্ববঙ্গে কায়স্থ ঘরেই বৈবাহিক সূত্রে জড়িত হইয়াছিলেন। অনেকে হয়ও তাঁহাদের সেন উপাধি দেখিয়া তাঁহাদিগকে বৈদ্য বলিয়া মনে করিতে পারেন। কিন্তু কায়স্থগণও সময় সময় সেন উপাধি ধারণ করিতেন। যেমন কর্ণসুবর্ণ নগরে রাজধানী-প্রতিষ্ঠাতা কর্ণদেব এবং তাঁহার পুত্র রুদ্রদেব ভট্টগ্রহে কর্ণসেন ও বৃষসেন নামেই অভিহিত হইয়াছেন। তাহা ছাড়া শূর শব্দের অর্থ যেমন দেব, তেমনি সেন শব্দের অর্থও দেব। কাজেই গোড়ের দেব বংশ, শূর বংশ ও সেন বংশ একই বংশের, যত বংশের এক একটি শাখা। তাঁহাদের মধ্যে দেব বংশ হইতেছে আদি যত বংশের শাখা। আর শূরবংশ ও সেনবংশ মথুরা প্রদেশের শূরসেন বংশের দুইটি বিভিন্ন শাখা। শূরবংশ হইতে দেব বংশের সহিত আসিয়া শূরসেন শব্দের প্রথমাংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। আর সেন বংশ হয়ত কর্ণটি প্রদেশে বাইরা একপ্রণীয়া শূরভাবাপন্ন বা নিকট ব্রাহ্মণ (কর্ণটি ব্রাহ্মণদিগের ৪র্থ শাখা) শাখার সহিত বিবাহাদি সূত্রে আবদ্ধ হইয়া এই শূরসেন শব্দের প্রথমাংশ বাদ দিয়া শেষ অংশ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

বাহাই হউক, মুসলমান রাজগণ যেমন বিনা বাধায় গোড় সিংহাসন অধিকার করেন, তেমনি মানসিংহ রাজধানী রাজমহলে স্থানান্তরিত করার সঙ্গে সঙ্গে এক দল সুসেনবংশীয় গোড় অধিকার করেন। তাঁহারা শুধু সেন বংশেরই আদিপুরুষ নহেন, সমগ্র মানব জাতিরই নাকি আদিপুরুষ। তাঁহারা গোড় রাজধানীকে তিন-ভাগে বিভক্ত করিয়া তিনটি শাখা রাজধানীতে অবাধে অধ্যাপিও রাজত্ব করিতেছেন। এই তিনটি বিভাগ উত্তরে দারবাসিনী বিভাগ (এই স্থানে মাটির গড়ের সম্মুখভাগে ভগবতীর স্তূপহং প্রস্তরমূর্তি বসান আছে), মধ্যে পাতালচণ্ডী বিভাগ (এই স্থানে মুনিক্ষিদের দেবী-পীঠস্থানে বেদী রহিয়াছে), আর দক্ষিণে গোড়েশ্বরী বিভাগ (রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষের দক্ষিণে গোড়েশ্বরীর বেদী অবস্থিত, খ্রীষ্টীরামকেলী এই বিভাগের উত্তরপূর্ব সীমান্তে অবস্থিত)। তাঁহাদের একে কোলিঙ্গের ছাপ না থাকিলেও কোলিঙ্গ প্রসঙ্গে তাঁহারা সেন রাজাদের অপেক্ষাও সম্ভাগ। কেন না গোড়ের পশ্চিম পার্শ্ব সুন্দ বা আদি নদীয়া বড়গঙ্গার গঙ্গাজলে পুনঃ পুনঃ বিধৌত হইলেও সুন্দবীপ আদিতে ধ্বনগণ কর্তৃক অধিকৃত হওয়ার তাঁহারা অধ্যাপিও উহাকে পতিভের দেশ বলিয়া মনে করেন এবং এই প্রদেশের অভ্যন্তরভাগে যান না। যদিই বা কেহ কখন যান, তবে তিনি রাজদণ্ডাভ্যাস ভোগ করিবার জন্যই বাইরা থাকেন। কিন্তু সুন্দবীপের পূর্ব সীমান্তে ভাগীরথী তীরে তাঁহাদের নিজস্ব তিনটি কোটালখানা আছে। যেমন উত্তরে রামচন্দ্রপুর (রামাবতী) হইতে মধুঘাট, মধ্যে নাজিরপুর, আর দক্ষিণে কদমতলা হইতে খিড়কীঘাট (রাজপ্রাসাদের ঘাট বা লক্ষণসেনের পলায়নের ঘাট)। ভাগীরথীতীরে এই রামচন্দ্রপুর হইতে খিড়কী ঘাট পর্য্যন্ত তাঁহারা টহলদারী করেন। অজমান, রামচন্দ্রপুর হইতে খিড়কী ঘাট আদিতে গোড় বীণেরই অন্তর্গত ছিল; পরে ভাগীরথীর গতি পরিবর্তনের ফলে সুন্দ বা আদি নদীয়ার অন্তর্গত হইয়াছে। মানসিংহের আধিভাবে গোড় পতিভের দেশ আখ্যা লাভ করে। এই সুসেনবংশীয়গণ খ্রীঃসাম্রাজ্যের সঙ্গে দাক্ষিণাত্য হইতে আসিয়া বহু পূর্ব হইতেই নাকি গোড় উপকণ্ঠে বসবাস করিতেছিলেন। কাজেই পতিভের দেশ তাঁহাদের অধিকৃত হয়। আর বাইরা কোলিঙ্গ ছাপ লইয়া গঙ্গা বা বড় গঙ্গা পারে অপেক্ষা করিতেছিলেন, তাঁহারা উহাকে পতিভের দেশ বলিয়া অবহেলার চক্ষে গ্রহণ করেন। কাজেই সাধারণতঃ যুগেও গোড় পতিভের দেশ হইয়াই রহিয়াছে।



অর্চনারায়ণ ভট্টাচার্য

কাছের যারা বেই শোনে সেই চম্কে ওঠে।

সে কি! “পিংক্‌ প্যারাডাইসের” নাম শোনে নি। বলেন কি মশাই?

কথাটা নেহাৎ অবাস্তব নয়। এ অঞ্চলে পিংক্‌ প্যারাডাইসের নাম শোনে নি এমন লোক দুর্লভ। শুধু দর্শনীয় নয়, একটু স্বাভাব্যও যেন জড়ানো আছে এই বাড়ীটির সংগে।

দিনের বেলা যে দেখেছে সে সহজে তোলে নি। সকাল বেলায় কল্মলে রোদ হেসে উঠবার সাথে সাথে লাড়া প’ড়ে যায় চারদিকে। এখানে ওখানে টুকটুকে লাল পশি ফুলের হাসিখুশী মুখ সর্বদা চোখে প’ড়বে। আর পাখীদের কিচির্ মিচির্ শুনে আস্তে আস্তে এখানে ডালিয়াদের তজ্রা ভাঙে। গ্রাস হাউসের স্বচ্ছ আবরণের নীচে মহার্ঘ দেশী বিদেশী ফুলেরা রঙীন চোখ মেলে তাকায়। যেন পাশাপাশি একরাশ রঙের অটলা ব’সেছে।

বাগান বাড়ীটা এখানে সকলেই চেনে। স্থবিখ্যাত উদ্ভিদবিজ্ঞানবিদ্যার ডাঃ বোসের গবেষণাগার—ছোটখাট একটা বোটানিক্যাল গার্ডেনও বলা চলেতে পারে। রকমারী সস্তা-দামী, দুর্লভ ও সুলভ রঙীন ফুলের গাছে ভর্তি বাগানটা। গত পনের বছর ধ’রে শুধু ফুল নিয়েই গবেষণা ক’রে আসছেন ডাঃ বোস। নানা বর্ণাঢ্য ফুলের সম্ভারে সাজানো বোটানিক্যাল গার্ডেনটা কারুর নজরে না প’ড়ে উপায় নেই।

দোতালার বায়ল্কনীটার রোজ সকালে একবার শুকু ভংগিতে এসে দাঁড়ান ডাক্তার বোস। হাতে থাকে হুয়ারিত চারের পেরালা—প্রভাতী চারের আয়েজে মুখটা খুশিতে ঝলমল ক’রে ওঠে। স্পষ্ট হাতরাই চট্টি পায়ের

দিয়ে সামনের কাকর ঢালা পথ দিয়ে আস্তে আস্তে একবার এসে দাঁড়ান গ্রাস-হাউসের সামনে। অপত্যস্নেহে একবার তাকান টিউলিপের চারাগুলি দিকে। তারপর দুর্লভ এক শ্রেণীর অর্কিডের দিকে তাকিয়ে কি যেন এক অদ্ভুত আনন্দের সন্ধান পান।

ল্যাবরেটরীর হাড়-ভাঙা খাটুনির আগে এই এক-টুকুরো স্বপ্ন অবসর। লাকের আগে আর কোনদিকেই কাজের ফুরসৎ পাবেন না তিনি। গত পনের বছর ধ’রে এই কটনে কোনদিন ফাঁক পড়েনি। ঘড়ির কাঁটার নিয়মে কোন ছেদ পড়ে নি—কোন ছন্দপুতন ঘটে নি কোনদিন।

একটা প্রচণ্ড নির্জনতার আত্মগোপন ক’রে কোন অবাচ্ছন্দ্য বোধ করেন নি ডাঃ বোস। কোনও দিনও না। যেন বাইরের ঝামেলার হাত থেকে রক্ষা পাবার উদ্দেশ্যেই এই প্রাকৃতিক বর্মের সৃষ্টি।

কিন্তু মাত্র সপ্তদশকাল ঘটনা। এই কটন নির্জনতা ভেদ ক’রে অশুভ নক্ষত্রের মত উদয় হ’য়েছিল যে অপরিচিত লোকটি—তার খবর হয়ত লোকসমাজ রাখে না। কিন্তু ডাঃ বোস আজও তার কথা ভুলতে পেরেছেন কি? আজও কি সে কথা ভারতে শরীরের লোমে অবাচ্ছন্দ্য জেগে ওঠে না?

দায়োয়ানেরা হৈ হৈ ক’রে এনে হাজির ক’রল এমন একজন লোককে বাকি দেখলে পাগল ব’লে সন্দেহ হয়। উদ্ভ্রান্তের মত চেহারা, পরণে বিবর্ণ একটা ক্রানেলের প্যান্ট, গায়ের ব্রাউন্‌ রঙের কোটটা ময়লা—তালি-মারা। সম্ভবতঃ লোকটি অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান। বয়সে সে তরুণ—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। গায়ের রঙ এক-কালে বোধ হয় বেশ কসাঁ ছিল—এখন বোদে পুড়ে তামাটে হ’য়ে গেছে। কপালে দৃষ্টিভার রেখা দাগ কেটে

ব'সেছে—চোখে ক্লান্তির কালি। কাঁধ থেকে কোলানো আঁধ ময়লা একটা ক্যান্ডাসের ব্যাগ—তার মধ্যে থেকে বাগান থেকে পাড়া সস্তা তাজা কতকগুলি ফুল উকি মারছে।

ছোট্ট লাল ব'ল, “রোজ ফুল চুরি ক'রে বাবুসাব, আজ বহুত মেহনতসে পাকড় লিয়া।”

রাসিকবেশ ব'ল, “হাঁ বাবুজী। বহুত ছুশ'ম্ন আছে সাহেবটা।”

জুজুটি কুটিল হ'য়ে উঠেছিল ডাঃ বোসের মুখ। তবু যেন বতটা কঠোর হবেন তেবেছিলেন ততটা কঠোর হ'তে পারলেন না। গভীর মুখের মাংসপেশী খানিকটা শিথিল হ'য়ে এল।

ব'ললেন, “নাম কি তোমার? ফুল চুরি ক'রছিলে কেন ছুরি?”

হালির একটা সরু রেখা খেলে গেল লোকটির মুখে। ইংরেজীতে উত্তর দিল লোকটি।

ব'ল, “আমার নাম ভিভিয়ান শিখ্।”

—“তুমি কিসের জন্ত এখানে আস? ফুল চুরি ক'রতে?”

চুপ ক'রে রইল ভিভিয়ান। কথার উত্তর দিল না। হাতালের মত ঘোলাটে দৃষ্টিতে একবার শুধু কিয়ে তাকাল ডাঃ বোসের মুখের দিকে।

—“চুপ ক'রে আছ কেন? কথার জবাব দাও?”

হাটির দিক থেকে মাথা তুলে এবার কিয়ে তাকাল ভিভিয়ান। ধারালো ছুরির মত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। সব কিছু যেন তেজ ক'রতে চায় ঐ তীব্র দৃষ্টি দিয়ে।

ব'ল, “শিখা কথা ব'লব না ডক্টর। সত্যিই আমি এখানে আসি। ফুল চুরি ক'রতেই আসি। কিন্তু স্তনেছিলার আপনি একজন বড় বোটা নিই। আপনাকে একটা ছোট্ট সহজ প্রশ্ন ক'রব—জবাব দেবেন?”

চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলছে যেন ভিভিয়ান। ওর সম্মোহনী দৃষ্টির সামনে কেমন যেন নিস্তেজ হ'য়ে পেলেন ডাঃ বোস।

ভিভিয়ান ব'ল, “এই ফুল নামধের জিনিষটি আসলে কি ব'লতে পারেন? মাত্র দু-অক্ষরের শব্দ—রঙীন

কয়েকটা পাপড়ি আর তার স্বগন্ধ মিলে ঐতরী। অতি সামান্য জিনিষ কিন্তু অসামান্য নয় কি?”

গোঁড়ের রেখার কোঁতুক ও তাক্ষিল্যের হাসি ফুটে উঠল ডাঃ বোসের। এত বড় উদ্ভিদবিজ্ঞানবিদদের কাছে এই শিশুর মত সরল প্রশ্নের আশা করেন নি কোনদিন। পাগলের খেয়াল চরিতার্থ ক'রতে গিয়ে কতকগুলি অমূল্য সময় নষ্ট হ'চ্ছে শিখা। শিখা। বাই হোক নিরুপায়। টেবিলের পাশের কাচের আলমারীর দিকে হুঁকে প'ড়ল তাঁর শরীর।

ঘরের কোণে একটা কোঁচের দিকে আঙুল দেখিয়ে দিলেন ডাঃ বোস। ক্লান্ত পায়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে এল ভিভিয়ান—গিয়ে ব'লল সেখানে।

ভিভিয়ানের সামনে কয়েক মিনিট পরেই এনসাই-ক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার একটা বক্সকে তুল্য এগিয়ে এল। তাকিয়ে রেখ'ল ভিভিয়ান—গাল পেঙ্গিল দিয়ে দাগ দেওয়া কালো অক্ষরগুলিকে। উদ্গ্রীব হ'য়ে উঠ'ল ভিভিয়ানের চোখ—বিজ্ঞানের ভাষায় ফুলের বিশ্লেষণ।

কিন্তু এতেও যেন সন্তুষ্ট হ'ল না ভিভিয়ান। ঠোঁটের গোড়ায় আবার কোঁতুকের হাসি খেলে গেল তার। অবজ্ঞার ভংগীতে কিয়ে তাকাল সে। ব'ল, “আপনারা সব একই দলের ডক্টর। বৈজ্ঞানিকেরা সব একই জাতের। মাইক্রোস্কোপের নীচে জীবনকে চুলচেরা বিচার ক'রে দেখতে চান। কিন্তু পান কি? ওতে জীবনের সমস্ত রস নিংড়ে নিয়ে চ'লে যায়। শুধু খোলা প'ড়ে থাকে।”

তারপর কি রকম একটা যেন অস্বাভাবিক মুখের ভাবান্তর হ'ল ভিভিয়ানের। যেন হ'ল কোন দ্ব্যতীত স্বৃত্তিকে রোমন্থন ক'রতে চাইছে ভিভিয়ান। একটা চাপা দীর্ঘ নিঃশ্বাস প'ড়ল। তারপর দার্শনিকের গভীরতা নিয়ে কথা ব'লল সে।

ব'ল, “ফুল কি জিনিষ তার হিসেব বৈজ্ঞানিকেরা রাখে না। হয়ত আরিও রাখতাম না। কিন্তু আজ জেনেছি হাটিতে জন্মালেও ফুল এক অপার্থিব জিনিষ। আমাদের জন্ম-মৃত্যুর সংগে এর অবিস্মৃত সন্ধ। জন্ম-জন্মান্তরের যোগ।”

কথার মাঝে মাঝে উঠে দাঁড়াল ভিভিয়ান। হাতালের

মত টল্‌তে টল্‌তে এক পা এগিয়ে এল মারনে। হারনার মত একবার দপ্‌ ক'রে আগুন জ'লে উঠল চোখে। তারপর কিস্ কিস্ ক'রে ব'ল—“এই হুগন্ধি ফুলের সঙ্গে আমারে মৃত্যুর সম্বন্ধ আরও ঘনিষ্ঠ। জানেন আপনি ?”

অসহ্য বয়সী একটা সারা বৃকের ভিতরটা বেন দুম্‌ড়ে দুম্‌ড়ে ছিঁড়ে কেলছে ভিত্তিরানের। অতিশয় প্রাণীর মত মুখের বেধার ফুটে উঠছে বয়সীর ছাপ। মনের যে সব বিকোভ বেধনার বোকা আবর্জনার মত জমে আছে তার কবল থেকে মুক্তি পেতে চায় বেন ও। হাকা হ'তে চায় বেন। বৃকের ভিতরটা কে বেন ধারালো ছুরি দিয়ে কুরেকুরে কাটছে, টের পায় ভিত্তিরান।

ডাঃ বোসের ঘরের এক প্রান্তে কোঁচের উপর এলিয়ে প'ড়ে ক্লান্ত গলায় ভিত্তিরান ব'ল—“এক গ্রাস জল !”

* * *

পাঁচ বছর আগে ভিত্তিরান কল্লনাও করেনি এইভাবে ডাঃ বোসের গবেষণাগারে ব'লে থাকবার কথা। আর তার প্রয়োজনই বা ছিল কি। ফুটন্ত জলের নেশায় যৌবন তখন টগ্‌ বগ্‌ ফুটছে। জীবনকে উপভোগ ক'রতে শিখেছিল ভিত্তিরান।

প্রাচীন গোথিক স্থাপত্যের রীতিতে তৈরী পুরনো ক্যাথিড্রালের সেই চূড়াটা। বিরাট ক্লক বড়িটাতে পনের মিনিট অন্তর ছন্দের টুংটাং বেজে উঠত। ক্লক-টাওয়ারের চূড়ার পাশ দিয়ে ভোরের সোনালী রোদে চক্‌ দিয়ে উড়ত কাহার ব্রাউনের সাঁদা—কালো—থয়েরী পোষা পায়বার স্বাক।

সীজার কার্পেটি-সবুজ লনের মধ্যে ব'লে সহজেই করেক শতাব্দীর আঁদম বস্ত্রতার মধ্যে কিরে বাওয়া যেত। মাথার উপর কুকচূড়া গাছের লাল লাল ফুল ক'রে ক'রে প'ড়ত মৃতি মৃতি। বাহার গাছটার ডালে ব'লে একটা নাম-না-জানা পাখী মুহূর্ৎ শিব দিত। কখন কখন উড়ন্ত সবুজ বিড়াতের মত এক স্বাক উড়ন্ত টিয়ার ভীত ডাকে—চকিতে চকল হ'য়ে উঠে ব'গত ভিত্তিরান। একদিন ছুদিন নয়। দিনের পর দিন।

ক্যাথিড্রালের করার (chair) বয় ভিত্তিরান শিখ্‌। অনাথ অবস্থার কুড়িয়ে এনে থাকে রাহুব ক'রেছেন কাহার

ব্রাউন্‌ সেই ভিত্তিরান। প্রার্থনা সংগীত গাইবার সময় দলের মধ্যে অমন বিষ্টি গলাছিল না কার।

কুকচূড়া গাছের নীচে ব'লে শেলীর কবিতার বই হাতে নিয়ে অনেকদিন তয়র হ'য়ে ভেবে দেখেছে ভিত্তিরান। সারা ক্যাথিড্রালটার চারদিকে কেমন যেব একটা বিবাদের মায়ী আছে। সেই বিবাদ পিড়মাতৃহীন ভিত্তিরানের অতিশয় জীবনে কেমন বেন কুরাশার মত ধোঁয়াটে ব'লে মনে হ'ত। শেলীর কবিতা প'ড়তে পড়তে উনবিংশ শতকের গভীরে মন চ'লে যেত ভিত্তিরানের। মনে এসে লাগত সেই শতকের বেধনা আর বিবাদের চেটে। ভাবতে ভাবতে মন বড় খারাপ হ'য়ে যেত তার। মনে হ'ত নিজেরে ব্যক্তিস্বও একদিন এইভাবে ব্যর্থ হ'য়ে যাবে।

কিন্তু একদিন ছায়াঘন দুপুরে বাহার গাছের নীচে ব'লে কীটস্‌ প'ড়তে প'ড়তে নিজের চোখের লাবনে আরেকটা জানলা খুলে গেল ভিত্তিরানের। কীটস্‌ প'ড়ে মনে হ'য়েছিল জীবনকে উপভোগ করার গান খুব বেশী দুকোনর। তবে তো বাঁচবার অধিকার আছে। জীবন-পাত্রের মদের শেষ কেনাটুকুও নিঃশেষে পান ক'রে নাও। একটা বস্ত্র আনন্দের নেশায় ত'রে উঠেছিল ভিত্তিরান।

অথচ সেই আনন্দের প্রকৃতিটা যে কি রকম ভিত্তিরানের কল্পনার তা কোনদিন আসে নি।

ক্যাথিড্রালের বিরাট হলঘরে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা সংগীত গাইবার সময় কেমন বেন চম্‌কে উঠেছিল সেদিন ভিত্তিরান। শিরার শিরার অস্বস্তি ক'রেছিল অতৃপ্ত এক জালা। পাইপ্‌ অর্গ্যান্‌ বাজাতে বাজাতে এরিক্‌ বাউণ্ডার অবাক হ'য়ে থাকিয়েছিল ওর মুখের দিকে। কই ভিত্তিরানের তো কোনদিন স্বরে ভুল হয় না। কাহার ব্রাউনের নিজের হাতে গড়া ছাত্র।

ভিত্তিরানও প্রথমটা ভালো ক'রে বোঝে নি। বোঝেনি নবাগতা করাস্‌ গাল্‌ সিল্‌ভিয়া মিলের মধ্যে কি মাদকতা আছে। গ্রীক ভাস্করের হাতে তৈরী খেজ-পাথরের বেন একটি মানবী মূর্তি। পায়ের নখ থেকে চোখের তুফতে কোন খুঁতপায় ত্রি ভিত্তিরান। রেশমের মত নয়ন—চিকণ মনে হ'ত ওর ঘন গভীর সোনালী চুল।

অতীত ভাবানু মনে হ'ত ওর বড় বড় কালো চোখ দুটিকে।
গলার কর্ণধর শুনে চমকে গিয়েছিল সকলে। নারীকর্ষ
এত মিষ্টি হয়! ঠিক যেন গীটারের স্বংকার। কই
টোলা আছে, এমিলি আছে, লিজা আছে—কারুর গলা
তো অমনি নয়। সিল্ভিয়া যখন মেয়েদের মধ্যে দাঁড়িয়ে
প্রার্থনা সংগীত গায় তখন যেন রাজেন্দ্রাণীর মত মনে হয়
ওকে। এক রাশ স্বগন্ধ যেন স্পৃহ হ'য়ে অমে আছে সে
আরগায়।

ফাদার ব্রাউন সেদিন যখন উদাস্ত কণ্ঠে “Imitation
of Christ” থেকে sermon প'ড়ে শোনাচ্ছিলেন সেদিন
যেন তন্নয় হয়ে গিয়েছিল ভিভিয়ান :

“Love is a great thing, yea, a great and
thorough good by itself it makes everything
that is heavy, light ; and it bears evenly all
that is uneven.”

“Love feels no burden, thinks nothing of
trouble, attempts what is above its strength,
pleads no excuse of impossibility ; for it
thinks all things lawful for itself and all
things possible.”

শুনতে শুনতে চোখাচোখি হ'য়ে গেল দুজনের।
লক্ষ্যায় চোখ নামিয়ে নিল সিল্ভিয়া। ভিভিয়ান কিন্তু
চোখ সরিয়ে নেয় নি—এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে লক্ষ্য ক'রেছে
কেমন আবীরের আভার লাল হ'য়ে উঠেছে সিল্ভিয়ার
নিটোল শেভাত মুখ।

তুধু একবার নয়। একাধিকবার পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল
এ দৃষ্টের।

পুরুষকণ্ঠের সুর আল্টো আর নারীকণ্ঠের সুর
লোব্রাণো গুলিয়ে যেত দুজনেরই। পাইপ্ অর্গ্যানের
মিষ্টি স্বংকারের মাকখানে দুজনের চোখাচোখি হ'লেই
সব ভুলিয়ে যেত রসাতলে। প্রৌঢ় এবিক্ বাউণ্ডান্
অবাক হ'য়ে দেখত কি ক'রতে চ'লেছে এরা। বিন্মরে
বিস্ফারিত হ'য়ে উঠত চোখ দুটা।

সিল্ভিয়া মিল্ আর ভিভিয়ান স্মিথ। সন্ধ্যার পিরানোর
মিষ্টি টুং টাং এর মত দুটি নার পংশাপাশি একসাথে বেজে
উঠত। কোন ছন্দে গরমিল হ'ত না।

চেরী গাছের কালো ছায়ার নীচে ব'লে বাগারী ঘোষের
খেলা দেখতে দেখতে ভিভিয়ান ব'লেছিল সিল্ভিয়াকে।

—“তুমি ফুল ভালবাস না?”

—“সন্দেহের কোন কারণ আছে কি?”

কিছু না ব'লে সিল্ভিয়ার সোনালী চুলে একটা রক্ত
গোলাপ গুঁজে দিয়েছিল ভিভিয়ান। তার জবাবে কয়েকটা
শেত গোলাপের পাপড়ি ছিঁড়ে কোঁকুকে ছুঁড়ে দিয়েছিল
সিল্ভিয়া—ভিভিয়ানের মুখের উপর।

তারপর একটা মুহূর্ত।

“হাউ নটি! নাও ড্রাউন্ড ইন্ এ কিস্।”

সিল্ভিয়াকে জড়িয়ে ধ'রে তার নিটোল গালে নিজের
স্মারকচিহ্ন রেখে দিয়েছিল ভিভিয়ান। কোন আপত্তি
করেনি সিল্ভিয়া।

তারপর ছবিষ মত অনেকগুলি ঘটনা ঘটে গিয়েছিল।
কোনদিন আপত্তি করে নি সিল্ভিয়া। ফাদার ব্রাউন
যেদিন ভিভিয়ান আর সিল্ভিয়ার হাত দুটা একত্র ক'রে
পবিত্র শপথ উচ্চারণ করিয়েছিলেন সেদিনও নয়। তুধু
মিষ্টি একটু হেসেছিল।

শেত গোলাপের তোড়াটা হাতে নিয়ে ফিস্ ফিস্ ক'রে
ব'লেছিল ভিভিয়ানকে, “এই ফুল জিনিসটা আমার এত
অপূর্ব লাগে ভিভিয়ান!”

ভিভিয়ান ব'লেছিল, “সত্যিই তাই সিল্ভিয়া। মাহুঘ
আর স্বর্গের মধ্যে যেটুকু ব্যবধান তা দূর ক'রে দেয় এই
সামান্য ফুল।”

সেদিনকার সেই পবিত্র দিনটাকে আজও প্রতি বছর
সন্ধান ক'রে আসছে ভিভিয়ান। ফুলের উৎসবে সাজিয়ে।
কিছুকের মত জলজলে চোখ জোড়া দেখে সব কিছু যেন
ভুলে যেতে ইচ্ছা করে ভিভিয়ানের। মেসীর গোথের দিকে
তাকিয়ে শেলী যেমন সব ভুলে যেত।

প্রতি বছর বিকেলে ফুলের একটা স্কন্দর তোড়া তৈরী
করে ভিভিয়ান। ঐ দিনটা তাদের বিয়ের স্মরণোৎসব।
মাকখানে থাকে রক্ত গোলাপ আর শেত গোলাপ।
দেবদাক আর ঝাউএর পাতা দিয়ে সম্পূর্ণ ক'রে তোলে
সবকটা।

সন্ধ্যাবেলা সিল্ভিয়ার হাতে প্রতিবার হাসিমুখে
তোড়াটা ভুলে দিতে কোন ফুল চুক হয় না। সিল্ভিয়ার

মুখের দিকে—চোখের দিকে তাকিয়ে স্বপ্নশিও দ্রুত তালে ওঠা নামা করে ভিত্তিয়ানের। আবারের মত লাল হ'য়ে ওঠে সিলভিয়ার মুখ। চোখের কোণে হাসি চিক্ চিক্ ক'রে ওঠে।

বলে, “ধন্যবাদ ভিত্তিয়ান! এর চাইতে দারী উপহার আরি করনাও ক'রতে পারি না কোনদিন।”

তুখু সামান্য কটি কথার আশায় যেন সারা বছর অপেক্ষা ক'রে থাকে ভিত্তিয়ান। বুকের রক্তে জোয়ারের ছলাং টের পায়।

এর পরে ভিত্তিয়ানের বন্ধুরা আসে একে একে। বড় গোলটোবিলটার চারপাশে ব'সে ব'সে হৈ হল্য করে সকলে। মাঝখানে বড় ফুলদানীতে সাজানো থাকে ফুলের তোড়াটা।

আসে দোড়কাপের খেলোয়াড় গোমেজ সাট্রিক্ আর বেহালাবাদক বিল্ এমার্সন। সেই সাথে আসে ব্রিজ্ খেলোয়াড় জ্যাক্ মর্গ্যান, প্যাট্ বাট্‌লার্ আর তার মাতাল বন্ধু টম্ কব্‌বেল্।

ওদের জন্ত গ্রাসে ক'রে চেরীর সরবৎ নিয়ে আসে সিলভিয়া। আদর্শ গৃহকর্ত্তী। ডিক্যাণ্টে হইকি আর সোডা আন্তে আন্তে পাক্ ক'রে নিয়ে এক কোণে বুম্ হ'য়ে ব'সে থাকে মাতাল টম্ কব্‌বেল্।

পান—ভোজন শেষ করে নিয়ে হৈহৈ ক'রতে ক'রতে অনেক রাতে বোড়িয়ে যায় বন্ধুর দল। ফুলের তোড়াটাকে ফুলদানী থেকে তুলে আরেকবার বুকের কাছে এনে আত্মাণ নেয় সিলভিয়া।

বলে, “তোমার চুমোর মত মিষ্টি, ডার্লিং!”

আরেকবার ভিত্তিয়ানের মাতাল আলিঙ্গনের মধ্যে নিজেকে আত্মসমর্পণ ক'রে দেয় সিলভিয়া।

তোড়াটা হাতে নিয়ে ভিত্তিয়ান বলে, “ঠিক তোমার ফুলের মত মিষ্টি গন্ধ! তাই না ডিয়ারি?”

বছরের পর বছর একই নিয়মে এইভাবে দিনগুলি কেটে গেছে। কসিলের পুরনো স্তূপে তাদের হয়ত সন্ধান পাওয়া বাবে।

সেবারের শুভরাজিতে হঠাৎ কি রকম যেন পুরনো স্বপ্নের ভল কেটে গেল অকস্মাৎ। একটা গড়ে ওঠা স্বন্দর জীবন যেন অপ্রত্যাশিত আঘাতে ধাক্কা খেয়ে বোবা হ'য়ে গেল কের।

সেদিন রাতে বন্ধুরা চ'লে যাবার পর নতুন একটা জিনিষ লক্ষ্য করল ভিত্তিয়ান। ফুলদানীর উপর আজকের ফুলের তোড়াটা নেই। আনাচ—কানাচ সারা রাতে ভর ভর ক'রে খুঁজেও কোথাও পাওয়া গেল না তোড়াটা। মনের মধ্যে কেমন যেন একটা কাঁটার মত জিনিষ বস ক'রে বিধে রইল ভিত্তিয়ানের।

সিলভিয়া তখন ঘর-কমার কাজ ক'রছিল শোবার ঘরে।

“আমার ফুলের তোড়াটা কোথায় জান?” সংশয়ী ব্যাকুল চিন্তে প্রশ্ন ক'রল ভিত্তিয়ান।

“ঠিক মনে প'ড়েছে না।” কাজ ক'রতে ক'রতে মুখ না তুলেই উত্তর দিল সিলভিয়া।

কেমন যেন গভীর দেখাল ওর মুখ। বুকের ভিতরটা কেমন যেন কেঁপে উঠল ভিত্তিয়ানের। তবে কি সিলভিয়া কাউকে—?

আর সেই কাঁটাটা যেন নড়ে চড়ে আরও গভীর হ'য়ে চেপে ব'সল ভিত্তিয়ানের বুকের উপর। ক্রান্তিকর দিনগুলি অসহনীর মনে হ'ল। একটা অজানা আশঙ্কার শিরু শিরু ক'রে উঠল বুকের ভিতরটা।

এই ভাবান্তরটা কেন হ'ল টের পায়না ভিত্তিয়ান। অতলে তলিয়ে দেখলে সন্দেহ মনটা যেন কি সব খুঁজে খুঁজে কেরে। চিন্তার জালে জট পাকিয়ে সব একাকার হ'য়ে যায়।

আর সেই সাথে বিল্ এমার্সনের মুখটা হঠাৎ কেমন যেন মনে পড়ে যায় ভিত্তিয়ানের। অনেক বার চোখে প'ড়েছে ওর নেকড়ের মত চক্‌চকে কুখার্ত চোখ। সিলভিয়ার দিকে কখন কখন তাকিয়ে থাকত বিল্। চোখে লোলুপ দৃষ্টি।

অথচ সেদিনকার ফুলের অন্তর্ধান কাহিনীর সংগে বিলের কোন যোগ আছে কি? আর সিলভিয়ার দৃষ্টিটা অমন ঠাণ্ডা—মুখটা অমন গভীর মনে হয়েছিল কেন সেদিন? বিলের মুখে নিজের রূপের প্রশংসা শুনে সিলভিয়াকে কতদিন গর্বে ফীত হ'তে দেখেছে ভিত্তিয়ান।

একটা হৃৎস্পন্দ যেন সংক্রামক রোগের মত ধীরে ধীরে অসংখ্য বীজাণুতে মন ছেয়ে ফেলেছে ভিত্তিয়ানের। কতক-

গুলি জটিল অংকের হিসাব ক'বে ক'বে আঙে আঙে হাণ ছেড়ে দেয় ভিত্তিয়ান।

কিন্তু সেদিন গল্পের টেবিলে বিসদৃশ কাণ্ড ঘটে গেল একটা।

টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি প'ড়ছিল সেদিন। বজ্রবের আসার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। কিন্তু রাত আটটার সময় রেন্ কোট মুড়ি দিয়ে হাজির হ'ল এসে বিল্ এমার্সন্।

কোণের চেয়ারে হুইটম্যানের কবিতার বই হাতে নিয়ে ব'সেছিল ভিত্তিয়ান। অসম্ভব দৃষ্টিতে লক্ষ্য ক'রেছিল ওর আগমন। হঠাৎ থিল্ থিল্ হাসির শব্দে তাকিয়ে দেখল কিলের একটা কৌতুকে খান্ খান্ হ'য়ে ভেঙে প'ড়ছে সিল্ভিয়া আর বিল্।

আর সব ক'রতে পারল না ভিত্তিয়ান। চীৎকার ক'রে উঠল বজ্রগজীর হয়ে।

“এই মুহূর্তে এই অসম্ভব হাসি বন্ধ কর ব'লছি। তোমরা দুজনেই।”

গজীর হ'য়ে গেছে সিল্ভিয়া। কোন উত্তর দিল না। অশ্রুমানের কাঁজে সারা মুখটা বিবর্ণ হ'য়ে উঠেছে বেশ বোকা বার।

সেদিন রাতে বিছানার ওয়ে পরিকার গলায় কৈকিরং তলব ক'রেছিল সিল্ভিয়া।

—“অভিনটকীয়তার মধ্যে বেশ একটু খুঁকি আছে ভিত্তিয়ান। অনেক সময় জিনিষটা অভিনেতাকে স্বর্গকের কাছে হাঙ্গাম্পদ ক'রে তোলে।”

—“তোমার প্রেমের মর্ম বুঝতে আমি অক্ষম।”

অসহিষ্ণু গলায় উত্তর দিল ভিত্তিয়ান।

—“আমি শুধু আজ সন্ধ্যার টেবিলের সারনে তোমার বীরত্বপূর্ণ অভিনয়ের কথা ব'লছিলাম।”

“বীরত্বপূর্ণ অভিনয়।” অন্ধকারের মধ্যেও চোখ জ'লে উঠল ভিত্তিয়ানের।

“সিল্ভিয়া তুলে বেও না—সব ব্যাপারে আমি তোমাকে জবাবদিহি ক'রতে বাধ্য নই।”

“ঠিকই ব'লেছে। তোমার কর্তৃত্ব অধীকার ক'রি আমার সাথে কি।”

একটু বেন হোঁচট খেল ভিত্তিয়ান। বিজ্ঞপের খোঁচার সুখের মাংসপেশীগুলি কটিন হ'য়ে উঠেছে। বজ্র

গোছের একটা শব্দ আঘাত হানবার ভক্ত নিজেকে প্রস্তুত ক'রে নিল ভিত্তিয়ান।

চীৎকার ক'রে ব'ল, “একটু বাস্তব কথাবার্তা ব'লতে শেখ সিল্ভিয়া। হেয়ানী ক'র না।”

একটু বম নিল ভিত্তিয়ান। তারপর কের দাঁতে দাঁত চেপে ব'ল—“একটা প্রেমের স্পষ্ট জবাব চাই আমি। তোমার সংগে বিলের এখনকার সম্পর্কের স্বরূপটা কি?”

—“বিলের সংগে সম্পর্ক? তোমার ইংগিতটা একটু অতর্ক মনে হ'চ্ছে ভিত্তিয়ান।” তুর্ক কুঁচকে বম সিল্ভিয়া।

চোখ উগ্র হ'য়ে উঠল ভিত্তিয়ানের। ব'ল, —“আমি স্ত্রীর সংগে লুকে'চুরি খেলতে চাই না সিল্ভিয়া। আমার কথার ইংগিত এবং কারণ তোমার কাছে নিশ্চয় জুর্বোধ্য নয়। সব কথা জেনেও না জানার তাগ করাটা আর বাই হোক পরিচ্ছন্ন মনোভাবের পরিচায়ক নয়।”

অন্ধকারেও স্পষ্ট বোকা গেল বিবর্ণ হ'য়ে উঠেছে সিল্ভিয়ার মুখ।

ব'ল, “তুমি এতটা নীচ আমি জানতাম না ভিত্তিয়ান। একটা কুংসিং আর হিংস্রক মনকে এতদিন চিনতে পারি নি।”

সারা রাতটা সেদিন ঘুমোতে পারে নি ভিত্তিয়ান। কুংসিং এবং হিংস্রক মন! গরম লোহা দিয়ে কাণ দুটো গুড়িয়ে দিয়েছে কে যেন। বুকের ভিতরটা যেন গনগনে আগুনে দাউ দাউ ক'রে জ্বলেছে।

কুকুড়া গাছটা লাল ফুলে ফুলে ছেয়ে গেছে বাগানের কোণটার। মনে হ'চ্ছে স্ব'রে প'ড়ছে কোঁটা কোঁটা বজ্রের বিন্দু। গাছের নীচে ব'লে ব'লে সারা দিনটা মনটা কেমন উদ্বাস হ'য়ে গেল ভিত্তিয়ানের। সারনের গাছের ডাল থেকে শীঘ্র দিয়ে উড়ে গেল একটা নাঁহ—না—জানা পাখী। ক্যাণ্ডিডালের পেটা বড়িতে ঢং ক'রে একটা বা'জল। কুকু-টাওয়ারের উচ্চ চূড়ার পাশ দিয়ে কাছার ট্রাউনের সাধা-কালো—থরিরি উজ্জল পাররার স্ব'ক তখনও চক্রাকারে উড়ছে। দূরে হোষ্ট টাউনের লীমানা পেরিয়ে শালবন থেকে উড়ে আসা ঠাণ্ডা হাওয়া হাক আবার বুলিয়ে দিয়ে বাছে শরীরে। অনেক দূরে বন উদ্যোগ হ'য়ে চ'লে গেছে ভিত্তিয়ানের।

ভাবতে ভাবতে মনটা পক্ষাঘাতের আক্রমণে যেন অসাড় হয়ে আসে। সেই বিশেষ দিনটার স্মৃতি দিয়ে তোড়া আর বাধবে না ভিত্তিয়ান। স্কুলের মত স্কুলের—স্কুলের মত নিষাপ সিল্ভিয়ার জন্ত তৈরী করা উপহার! সব কিছুই—কোন একটা বিক্রয়ের আঘাতে বন্ধ হয়ে গেছে যেন আজ। বুকের ভিতরটায় একটা ধারালো করাতের স্পর্শ—নিঃশাসে একটা কষ্ট টের পায় ভিত্তিয়ান। ভাবতে কঠিন লাগে—সেই সিল্ভিয়া আজ অজ্ঞাতপ্রায়। বিশ্বাস ক'রতে মন চায় না। মনে হয় এ অসম্ভব। সিল্ভিয়াকে ছেড়ে যে পাগল হয়ে বাবে ভিত্তিয়ান। কোন ধৃত বিল্ এমাসনের ক্ষমতা নেই সিল্ভিয়াকে গ্রাস ক'রে নেবার।

কিন্তু কই। অনেকগুলি অভিশপ্ত বিকেল কেটে গেছে। বেসুরো এবং বেতাল ভাবেই চ'লছে সব কিছু। আজ সিল্ভিয়ার চোখের দিকে ভিত্তিয়ানের ভাবতে ভয় করে। রসাল ঠোঁটের গোড়ায় একটা বিষাক্ত দৃঢ়তা জমাট বেঁধে র'য়েছে। চিবুকের নীচে কঠিন ভাব। ভুরু ভংগীতে উপেক্ষা।

ভিত্তিয়ানের মনের ঝাপসা কালো ছায়াটা আরও যেন ঘন কালো হয়ে উঠেছে এ কদিন। বিলের সাথে সন্ধ্যাবেলা ব'লে গল্পের আসর—হাসির মাঝাটা আরও যেন বেড়ে গেছে সিল্ভিয়ার। চ'লতে চ'লতে ভিত্তিয়ানের মুখোমুখি হ'লে চোখের কোণে হাসি আর দম্প ক'রে অ'লে ওঠে না—বরঞ্চ থম্‌থমে গভীর মনে হয় যুথের ভাব।

দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অবিশ্বাসের আঙুনে বুক ভুলে ভিত্তিয়ানের—সন্দেশের বিষে পুড়ে থাক্ হয় মন। ককচুড়া গাছের নীচে ব'লে নেকড়ের মত হিংস্র লব্ধ হ'য়ে ওঠে চোখ।

সেদিন বিকেল বেলা ক্যাথিড্রালের বাগানের গোলাপ-ঝাড় থেকে একটা রক্ত গোলাপ হাতে তুলে নিয়েছিল ভিত্তিয়ান। হঠাৎ একটা অসহ্য বজ্রণার মোচড় দিয়ে উঠল মনটা। মনে প'ড়ে গেল ভিত্তিয়ানের। অনেক দিন আগে একবার সিল্ভিয়ার সোনালী চুলে রক্ত গোলাপ ওঁজ দিয়েছিল একটা। এই বাগানেরই এক নির্জন কোণে ব'লে ব'লে।

অনেকগুলি চিত্তার জটিল জাল মাঝার শিরা উপশিয়ার জালা ধরিয়ে দিল ভিত্তিয়ানের। একটা স্বপ্নের অট অনে উঠল। সত্যি যদি এখনো ভিত্তিয়ানকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে আসে সিল্ভিয়ার মন। যদি এখনও নরম গলায় এসে বলে সিল্ভিয়া, ভিত্তিয়ান আমি একটুও বদলাই নি। “সবটাই তোমার মনের জুলা।” এ আশা তো ছুরাণা নীও হ'তে পারে। সেদিনকার রক্তগোলাপ কি এতই মূল্যহীন?

মাঝে মাঝে তাই মনে হয় সিল্ভিয়া নিরপরাধ। কখনো কখনো ভিত্তিয়ানের যুথের দিকে তাকিয়ে একটা বেদনাকরুণ ভাব ফুটে ওঠে ওর চোখে। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে আন্তে আন্তে ছায়ার মত স'য়ে যায় সিল্ভিয়া। একটা অহুশোচনা চুপিসাড়ে উকি মাঝে ভিত্তিয়ানের মনে।

সন্ধ্যাবেলা কাবার্ডের সামনে দাঁড়িয়ে কাজ ক'রছিল সিল্ভিয়া। বহুদিন ধ'রে ছদ্মনের কথা বন্ধ। দরজার সামনে এসে দাঁড়াল ভিত্তিয়ান। চোখে অপরাধীর দৃষ্টি—মুখ ক্যাশে। একটা শেব বোঝাবুঝির প্রত্যাব নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে ভিত্তিয়ান। গরমিলের বদলে মিলের সর্ভ নিয়ে।

ছ'এক মিনিট ইতস্তত ক'রল ভিত্তিয়ান। তারপর নরম গলায় আন্তে আন্তে ব'ল, “সিল্ভিয়া, আমরা ঝগড়া-ঝাঁটি অনেক ক'রেছি। বিশ্বাস কর, আর আমার একটুও ভালো লাগছে না। পূরণো মনোমালিন্য তুলে বাঁওয়া কি এতই কঠিন? আমরা কি আবার নতুন ক'রে স্নেহ ক'রতে পারি না? সত্যি ব'লছি, দিনের পর দিন জীবন অসহ্য ব'লে মনে হ'চ্ছে আমার।”

ক্রান্তিহুটল মুখ তুলে কিরে তাকাল সিল্ভিয়া। বড় বড় চোখের কোণে বিরক্তির বাষ্প। ক্রান্তির ভারী শিথিলতা রক্তের মত লাল ঠোঁটের গোড়ায়। সাপের মত সোনালী কঁোকড়ানো চুলের রাশ ঝাড়ের কাছে কেমন আপত্তির ভংগীতে জড়ানো।

ক্রান্ত গলায় অনেক অপ্রসিদ্ধি স্বরে অনেক দূর থেকে যেন কথা ব'লছে সিল্ভিয়া।

—“দোহাই ভিত্তিয়ান, আমাকে একটু একলা শান্তিতে থাকতে দাও।”

‘একলা’ এবং ‘শান্তি’! সান্নাভ ছুটি কথা যেন ভিহু-

ভিত্তিসের অধ্যুৎপাদ্যে ঘটিয়ে দিল। এক মুহূর্তে কপালের
স্বাস্থ্যপেশী আর চোখালের হাড় কঠিন হ'য়ে উঠল ভিত্তি-
রানের। চোখ দুটো কুটিল হ'য়ে এল সেই সাথে। মনের
নরম ভাবটা খেঁৎলে গেল ভিত্তিরে অভূত ভাবে। এতই
অস্বাভাবিক ভিত্তিরানের সংগে সিল্ভিয়ার কাছে। এতই
অশান্তির বীজাণুহাক ভিত্তিরান! কই এতদিন তো এ
রকম ছিল না! গভীর রাতে ভিত্তিরানের উষ্ণ বুকের
উপর মাথা রেখে সিল্ভিয়া! কিস্ কিস্ ক'রে ব'লেছে,
“আমো কিছুক্ষণ ভিত্তিরান, সারা রাতে! আমার শান্তিতে
কাটুক।”

সমস্ত মাথার রক্ত চন্মন্ ক'রে উঠল ভিত্তিরানের।
সিল্ভিয়ার একটা হাত চেপে ধরল ভিত্তিরান। বোকা-
পড়ার ভংগীতে কঠিন হ'য়ে উঠল চোখের দৃষ্টি।

হুঁচোখে অগ্নিৎর্ষণ ক'রল সিল্ভিয়া। “হাত ছাড়,
ইউ ক্রট্!”

ক্রট্! সারা পৃথিবী যেন একবার অন্ধকার বে'খল
ভিত্তিরান। তারপর অভূত একটা দানবীয় মস্ততা এসে
সহসা যেন গ্রাস ক'রল সমস্ত বুদ্ধি বিবেক। অলস্ত কয়লার
মত ধক্ ধক্ ক'রে চোখ জলে উঠল ভিত্তিরানের। চিতা-
বাঘের মত হিংস্র হ'য়ে উঠল হাতের পেশী।

লম্বা হুঁহাত বাড়িয়ে সিল্ভিয়ার ঘোমের রত নরম
সাদা গলা চেপে ধ'রল ভিত্তিরান। পাইথন্ বের-
শিকারকে জড়িয়ে ধরে ঠিক সেইভাবে। তারপর সিল্ভি-
য়ার নরম গলার উপর ভিত্তিরানের অঙ্গুরের মত দশটা
আঙুলের দশটা ছাপ ধীরে ধীরে ব'সে গেল। কোথাও
কিছু বাধ'ল না। একেবারে অভিনয়ের মত।

তারপর আঙে আঙে ফের সমস্ত পৃথিবী অন্ধকারে
দেখল ভিত্তিরান। পারের কাছে মাটি স'রে বাছে যেন
ক্রমশঃ—চারদিক ঢাকা একটা ফিকে অন্ধকার ধীরে ধীরে
নেমে এসে গ্রাস ক'রে ফেলছে যেন সব কিছু।

* * *

“বিশ্বাস করুন ডাঃ বোস, এরপ্রতিটি কথা সত্য—
আমার জীবনের অলস্ত সত্য! এখনও ব'লবেন আপনি
যে, ফুলের সংগে আমাদের মৃত্যুর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ নয়? অথবা
কি আশ্চর্য, এর পিছনেই সারাটা জীবন ঘুরে মরছি। এ
চাইতে বড় ট্রাজেডী ভাবতে পারেন ডক্টর?”

ডাঃ বোস আচ্ছরের মত ব'লে রইলেন। ঠিক সেই
মুহূর্তে কোন উত্তর তাঁর মনে আসে নি, লোকটি যে বাগাড়ে
অনধিকার প্রবেশ ক'রেছে সে কথাও নয়।

সেক্সপীয়ার

অধ্যাপক আশুতোষ সেনগুপ্ত

মূল রচনা : ম্যাথু আর্নল্ডের ‘সেক্সপীয়ার’।

জাত সর্বজন—তুমি তুমিই অজাত!
আমাদের প্রেমবানে অন্ধত, অটল
হাস্তানন তুমি যেন মৈনাক অচল—
তারকার দলে শুধু তব বার্তা রাজে,
প্রোথিত তোমার পদ সিদ্ধু জল মাঝে,
নভের অন্তর বেশে তোমার আগারি,
পাশদেখে কুতূহলী নরেন বিহার

তোমার রহস্তভেদে বৃথা পণ্ডিত;
তোমার সংবাদ সূর্য্য, নক্ষত্রের দলে,
বতস্র, বরষু, তুমি আপনি তাকর,
অলক্ষ্য-ভীবনে অগ্নি ভালই করিলে।
যে হুংথ অমর-আত্মা পীড়ে নিরস্তর,
যে হীনতা, যে বেদনা মাথা করে নত,
তব বিজয়িনী কাব্যে প্রকাশিত বতঃ।

জীবনী সাহিত্যে বসওয়েল ও গ্রীম

অধ্যাপক শ্রীশান্তিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

বসওয়েলের কোন বন্ধ বসওয়েলকে বলিয়াছিলেন, “you have made them all talk Johnson.” তাহার উত্তরে বসওয়েল বলিলেন “yes, I may add, I have Johnsonised the land, and I trust they will not only talk, but think, Johnson.”

গ্রীমা একদিন শ্রীগ্রীমকৃষ্ণকথামৃতকার গ্রীমকে লিখিলেন “তোমার নিকট যে সমস্ত তাঁহার কথা আছে তাহা সবই সত্য। একদিন তোমার মুখে শুনিয়া আমার বোধ হইল, তিনিই ঐ সমস্ত কথা বলিতেছেন।” বসওয়েলের মত ‘গ্রীম’ ইহার কোন উত্তর দিলেন কিনা জানি না। কিন্তু সত্যের এক স্পন্দস্বরের রূপস্রষ্টি করিলেন সেই রূপই শ্রীগ্রীমকৃষ্ণকথামৃত।

মনে হয় তিনি গ্রীমকৃষ্ণের কথাকে ছাপার অক্ষরে তুলিয়া পুঁতিয়াছেন, ভবু তাঁহার পাতাগুলি প্রায় তেমনি সবুজ তেমনি তাজাই রহিয়াছে। গ্রীমকৃষ্ণের বিশেষ ভাষা, বিশেষ রীতি, তাঁহার সেই প্রাচীন সরলতাটুকু তিনি রক্ষা করিতে পারিয়াছেন।

জীবন সাহিত্য হইবে অথচ তাহার পারিপার্শ্বিক সত্যটুকু বিসর্জন দিবে না, Imagination এর এই শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থা ভাষা কঠিন। রোমান্টিক সাহিত্য পড়িতে পড়িতে Imagination এর ঐ বদ্বাহীন রূপই দেখিতে শিখিয়াছি। দেখি নাই তো যে সত্যকে সহজে দেখিলে এবং সেই দেখার অনায়াস রূপটি কী স্বন্দর সাহিত্যই না স্রষ্টি করে। কথামৃতলেখকও কি ভাবিতে পারিয়াছিলেন যে শুধু সেই অমৃতকথা লিপিবদ্ধ করিতে করিতে তিনি ‘জীবনকথা’ রচনা করিয়া ফেলিবেন।

আমাদের গার্হস্থ্য জীবনে যে আকাঙ্ক্ষা-কামনা, যে শুষ্ক একান্তস্রষ্টি জাগাইয়া রাখিতে চাই, এই গার্হস্থ্য জীবনের হৃৎস্পন্দনা মিটকাইয়া বহুর দীপটি নিরন্ত

জ্বালাইয়া রাখিতে ছি—গ্রীমকৃষ্ণকথামৃত যে সেই দীপালোক। গ্রীমকৃষ্ণ যে সেই আরতির বিগ্রহ, ‘গ্রীম’ শুধু সেই বিগ্রহটির রূপস্রষ্টি করেন নাই, তাঁহার আরতির দীপটিও আলিয়াছেন।

জীবনী সাহিত্যের পথপ্রদর্শক ডঃ জনসন দেখাইলেন যে জীবনী সাহিত্য আমাদেরই জীবনের পাশে পাশে আর একটি জীবন কথা রচনা করে। সেই জীবন কথাকে সহজেই আমরা আমাদের করিয়া লই। ঐ জীবন কথার সাথে আমাদের আস্তর কথার যে লীলার স্রষ্টি হয়, সেই লীলারসই নাকি Biographyর মুখ্য কথা। দুইটি সত্যের এই জঘন্যসংবাদই নাকি জীবনী সাহিত্যের রস-স্রষ্টির মূলে, কিন্তু জীবনকে উনকৃত বা অতিকৃত করিয়া লইবার উপায় নাই; বিষয়কে এখানে কবিত্বের অধিবাসনে নতুন হইবার উপায় নাই। সত্যের বাঁধা পথে চলিতে হইবে। তাঁহার মতে—“Biography lies midway between falsehood of fiction and the useless truth of history.”

কিন্তু এমন করিয়া জীবনী সাহিত্যের সত্য ও কল্পনার মধ্যবর্তী পথটির বাঁধা রাখা ধরিয়া চলিয়া তো গ্রীমকৃষ্ণ জীবনী বুঝিবার উপায় নাই। গ্রীমকৃষ্ণজীবন যে আমাদের কাছে symbolএ পরিণত হইয়াছে। তাহার নামটিকে কেন্দ্র করিয়া যে বাসনার স্রষ্টি হইয়াছে, সেই বাসনা বা সংস্কার হইতে স্বভাবতঃ রসস্রষ্টি ঘটে, লেখক জনচিত্তের এই শুষ্কতার আবেগটিকে রক্ষা করিয়াও সত্যের পথে চলিয়াছেন। লেখকের সত্যনিষ্ঠা ও গভীর সংবেদন ফলেই এইরূপ সম্ভব হইয়াছে।

একপ্রকার সজ্ঞান স্রষ্টি প্রেরণা বসওয়েলের জনসন জীবনী রচনার মূলে রহিয়াছে। বাস্তব কলে বিশ্বের, সাথে সাথে লেখক উহার formটিও প্রথমেই দেখিতে পাইয়াছেন। তাই লেখক অনায়াসে বলিতে পারিলেন

"As it is. I will venture to say that he will be seen in this mov work completely than any man who has ever yet lived." বসওয়েল তাঁহার এই জীবনী সাহিত্যকে Odysseyর সাথে তুলনা করিয়াছেন কারণ, "Amidst a thousand entertaining and instructive epioodes the Hero is never long out of sight." শ্রীরামকৃষ্ণকথামূলের সম্বন্ধে কিন্তু এমন করিয়া বলা চলে না। উহার প্রধান চরিত্র শ্রীরামকৃষ্ণ নহে 'শ্রীরামকৃষ্ণকথা' এক অপূর্ণ বিষয় যেন তজ্জিক্কেই এই গ্রন্থের নায়ক করিয়াছে। অথচ লেখকের তজ্জি রোমান্টিক আবেগে নিজেকে বড় করিয়া তুলিয়া ধরে নাই। বসওয়েলের লেখা পড়িলে তাঁহার style এর কথা বার বারই মনে হয়। কিন্তু 'শ্রীম'র style যেন আমাদের সকলের style কারণ উহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের খেয়ালই থাকে না।

সমালোচক Nicolson জীবনীসাহিত্যকে 'pure' এবং impure বা উহার বিভক্ত এবং মিশ্ররূপ দেখাইয়াছেন, এবং বলিয়াছেন যে একপ্রকার তজ্জিচেতনা জাত জীবনী সাহিত্য প্রায়ই ঐ 'impure' শ্রেণীতে পড়ে, অর্থাৎ এখানে সত্যের সেই দীপ্তিগুণ বা intellectual quality কে ছাপাইয়া ক্ষতিগণ বা লেখকের emotion কেবলই প্রধান হইয়া উঠিতে চায়। তাহার মতে জীবনী সাহিত্যকে প্রধানতঃ সত্যের পথে চলিতে হইবে বলিয়া ঐ সাহিত্য কখনও সত্যের দীপ্তিগুণ বা intellectual quality কে ছাড়াইয়া বাইতে পারিবে না। তিনি কার্লাইলের সেই কথাকে স্বীকার করিতে চাহেন না যে "The history of man kind is the history of its greatmen," এই ধরণের কথার মধ্যে তিনি Biographyর সত্যরূপের সাধনার পরিচয় পান নাই। ইহা তাঁহার মতে Hagiography সৃষ্টির মূলকথা। ভিক্টোরিয়ান যুগে নাকি Biography নামে তাই Hagiography সৃষ্টি হইয়াছে। বসওয়েল সার্থক জীবনী-সাহিত্য স্রষ্টা কারণ জীবনের শুধু সত্যছবি তিনি অঙ্কন করেন নাই, তাহার চলমান রূপটিও তিনি গ্রহে ধরিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু এমন করিয়া কেবল সংজ্ঞার পর সংজ্ঞা রচনা করিয়া বসই ঐ hagiography অঙ্গসারে 'শ্রীম'

রচিত কথামূতকে বিচার করিতে বাই দেখিতে পাই যে ঠিক মিলিতেছে না। দেখি—

মাছুবের দিব্যরূপটির কথা বলিতে বলিতে পারি-পার্বিকের মধ্যে সেই রূপটি কেমন অনারাসে স্থান করিয়া লইয়াছে। কেমন অনারাসে চারিদিকের 'জীবন কথা' আগিয়া সেই দেবকথার চারিদিকে ভীড় করিতেছে। ধরের কথা হইতে কত সহজে মাছুব দিব্যকথার উত্তীর্ণ হইতেছে আবার সহজেই ধরে ফিরিয়া আসিতেছে। এই আসা যাওয়ার কী সুন্দর রসরূপই না সৃষ্টি হইয়াছে। ভক্তগণ যেন সেই রসরূপের কীর্তন করিতেছেন। জীবন ও জীবনাতীতের এই মিলন তো ভারতবর্ষের জীবনে অলৌকিক নহে, উহাই তো real বা অতিপ্রাকৃত, স্মরণ্য ধারার জীবনে এই অতিপ্রাকৃতের মিলন ঘটিল তাহাকে পারিপার্শ্বিক শুদ্ধ তুলিয়া ধরায় যে সাহিত্যসৃষ্টি হইল তাহা যে অসাধারণ জীবনীসাহিত্য।

বাংলা সাহিত্যে আদিতে শ্রীচৈতন্যচরিতামূর্তে জীবনী সাহিত্যের যে রূপটি পাই তাহা নিতান্তই পণ্ডিতদের কথা। উহার একটি পণ সংস্করণই যেন কথামূত। জীবনে অমৃত আবাদনের প্রবৃত্তি হইতে সেই বোড়শ শতাব্দী হইতে এই ধরণের অমৃত কথার সৃষ্টি হইয়া চলিতেছে। বসওয়েলের মত সম্ভান একটি comic sense সেখানে জাগিয়া নাই, বসওয়েলের এই comic sense একদিকে জীবনের একটি বলিষ্ঠ রূপ আঁকিয়া চলিতেছে, অপরদিকে একটি বিশেষ কৌতুকবোধ জাগ্রত করিয়া রাখিতেছে, এই কৌতুক-বোধ ক্রমশই ইংরাজী সাহিত্যে তীব্রতর হইয়া উঠিতেছিল এবং stracheyর মধ্যে উহা একপ্রকার ব্যাধে পরিণত হইল। জীবনকে বিভিন্ন দিক হইতে দেখিবার প্রয়াসে তাহাদের সাহিত্যসৃষ্টি। দূর হইতে জীবনকে দেখার বিচিত্রপ্রয়াস সেখানে কৌতুকরসাপ্রসিত হইয়া জীবনকে স্মরণ করিয়া তুলিয়াছে।

কিন্তু আমাদের সাহিত্য তো তেমন নহে; জীবনকে আমরা কেবলই আমাদের দিব্যচেতনার সাথে মিলাইয়া লই। আমাদের real এখনও রামায়ণ মহাকাব্যের real হস্তরসের দৃষ্টিবিলাসের অবকাশ তো এখানে নাই। আমাদের ঐ real এরই নব্যব্যাখ্যা পাইলাম শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামূর্তে। জীবনকথা এখানে ব্যাখ্যা হইয়া উঠিয়াছে সেই পরম অতিপ্রাকৃতের জীবন ব্যাখ্যা।

তাই মনে হয় জীবনকে গতিশীল দেখাইবার যে শিল্প চেষ্টাকে Nicolson "Boswell formula" বলিয়াছেন এখানে তাহা পাই না। জীবন এখানে কয়েকটি চিত্রের সমষ্টি; কিন্তু সেই চিত্রগুলি একটি জীবনকে হয়ত পূর্ণ জাগ্রত করে নাই, হয়ত সেই হাত্তরস পরিষ্কৃত 'round character' পাই নাই; কিন্তু কয়েকটি অপূর্ণ চিত্র পাইলাম, সেই অমৃত কথার চিত্র।

তৎকথার চিত্রকর দানের অপূর্ণ কহতাহিল শ্রীমাম-কৃষ্ণের। এই চিত্ররূপের মধ্য হইতে আমাদের গার্হস্থ্য জীবনের রূপটি ফুটিয়া উঠিত। অথচ তাহা সাধারণ হইয়াও অসাধারণ হইয়া উঠিত। ইহাই তো grand style Aristotle এর মতে বাহ্যকে বলা চলে to be clear without being mean পরমশাস্ত্রের বিষয় এই যে শ্রীমামকৃষ্ণকথামূলে 'শ্রীম'ও ঐ চিত্ররূপ পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছেন। লেখকের কথা বিভিন্ন চিত্রগুলির মধ্যে সংযোগ রক্ষা করিতেছে এবং সেই সংযোগ রক্ষাটুকুই তাহার কাজ। এই কাজও এত অনায়াসকৃত সে উহার অস্তিত্বও পরিলক্ষিত হয় না।

"সন্ধ্যা হইল। করাশ ও কালীমন্দিরে ও ওরাধাকান্তের মন্দিরে ও অন্তান্ত ঘরে আলো জালিয়া দিল। ঠাকুর ছোটখাটটিতে বসিয়া জগন্মাতার চিন্তা ও তৎপরে ঈশ্বরের নাম করিতেছেন। ঘরে ধূনা দেওয়া হইয়াছে, এক পার্শ্বে একটি পিলস্বে প্রদীপ জলিতেছে। কিয়ৎকাল পরে শাঁখঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। ওকালীবাড়ীতে আরতি হইতেছে। গুরা দশমী তিথি, চতুর্দিকে চাঁদের আলো।"

উপরের উদ্ধৃতি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে লেখক কত সহজে সত্য ঘটনাটি বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু এই সত্যবর্ণনা 'অভাবোক্তি' বলিতেও যেম বাধে। অথচ এই বর্ণনার মধ্যে কত সহজে সূত্র গৃহকোণ হইতে মন্দির হইতে, সমগ্র বিধে আলো জলিয়া ওঠার কী সুন্দর কাহিনী ব্যক্ত হইল। লেখক মন্দিরের কালর ঘণ্টার আরতির আলোর কথা বলিতে বলিতে কত সহজে সেই আলোকে সমগ্র বিধে ছড়াইয়া দিলেন, বলিলেন—

"গুরা দশমী তিথি, চতুর্দিকে চাঁদের আলো" শ্রীমাম-কৃষ্ণের কথার পাশে পাশে লেখকের এই চিত্র রচনা এক 'অমৃত কথাকেই আপন করিয়া তুলিতেছে। পুঙ্খানুপুঙ্খ

প্রাণণ যেমন পরিষ্কার করিয়া লওয়া হয়, গদ্যাকল ছিটাইয়া তুল করা হয়, লেখকও যেন ভেতন করিয়া কথার ছিটাইয়া চিত্রগুলিকে রাখিবার স্থান করিয়া লইতেছেন।

বসওয়েল নিজেকে ক্ষুদ্র করিয়াছেন, কিন্তু সেই দীনতা ভেদ করিয়াও তাঁহার সজ্ঞাটি জনসন চিত্রের পাশাপাশি চলিতে থাকে, বসওয়েলের জনসন জীবন চরিত্রের ছবি তুলিলে জনসনের পার্শ্বে অবনতমস্তকে উপবিষ্ট বসওয়েলের ছবিটিও পাওয়া যাইবে, কিন্তু শ্রীমামকৃষ্ণ কথামূলের ছবি তুলিলে শ্রীমামকৃষ্ণের একক জীবনের একটি তত্ত্ব চিত্র জাগিয়া উঠিবে। শ্রীম সেই ছবি তুলিবার অহংকৃত প্রচেষ্টার কখন যে সেখান হইতে পালাইয়া গিয়াছেন কেহই জানিতে পারেন নাই।

আমরা সাহিত্যে "রস"কে বড় স্থান দেই। ইংরাজী সাহিত্যে দেয় 'সৌন্দর্য্যকে' তাই রসানন্দে আমরা সাহিত্যের formকে অব্যবহার করি, আর সৌন্দর্য্যের আবেগে ইংরাজী সাহিত্যে কেবলই formকে মানিতেছে, এবং সেই form এর দ্বারা সাহিত্যের আনন্দকে পরিচ্ছন্ন করিয়া তুলিতেছে। শ্রীমামকৃষ্ণকথামূলের মূল আনন্দ রূপটি ঐ রসানন্দের, কিন্তু সেই রসস্রোতই প্রবাহিত হইয়া মাটির সাথে সহজ বন্ধন স্থাপিত করিয়াছে। মাটিও সোনা হইয়া উঠিয়াছে। বসওয়েলের 'Rapid style' এর পাশে শ্রীম রচনা static বলিয়া মনে হয়, কিন্তু ঐ স্থিতিশীলতা শাস্ত্রসংক্রান্ত। বসওয়েলের ক্ষুদ্রতায় সময়ের গতির পটভূমিকার জীবনের ক্ষয়ক্ষতির কথা জাগিয়া উঠে কিন্তু শ্রীমামকৃষ্ণকথামূলে যেন অনন্তের পটভূমিকার জীবনের কথা। জীবনের প্রত্যক্ষ স্পর্শের অভাব এবং শ্রীমামকৃষ্ণের ব্যক্তি জীবনের বিশেষ কথার সমৃদ্ধ নহে বলিয়া অনেকে হয়ত ইহাকে Biography বলিবেন না। এমনকি প্রথম খণ্ডে কত তাড়াতাড়ি লেখক শ্রীমামকৃষ্ণ জীবনী বলিয়া গিয়াছেন। যখনই কথোপকথনে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন লেখক তখনই যেন আত্মহ হইয়াছেন। কোন রকমে যেন ঐ অমৃত কথার আসিয়া পড়াই তাঁহার উদ্দেশ্য। কখনও বা 'কথামৃত' গানে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। তৎকথার- এমন সঙ্গীত ব্যাখ্যা বাংলা গ্রন্থে দুপ্রাপ্য।

বহুক্ষেত্রে অলৌকিকতার স্বযোগে fact fiction হইয়া উঠিতে পারিত। কিন্তু তত্ত্বের অনাবিল নিষ্ঠার

শ্রীরামকৃষ্ণের তত্ত্ব ভীষ্ম কত বাস্তবিক হইয়া উঠিয়াছে। পরমপুরুষ লেখক শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লৌকিক ও অলৌকিকের মিশ্রণে যে shock সৃষ্টি হয় তাহার মোহ কাটাইতে পারেন নাই। তাহার গ্রন্থে এই shockজাত চমৎকর্তি বার বারই আত্মারের অভিভূত করে। কিন্তু একটি সহজ ভঙ্গিতে হৃদয় অতিসিক্ত হইয়া উঠে না। লেখকের কাহিনী বর্ণনার ক্ষমতার এবং ঘটনার চমৎকর্তি সংস্থাপনের মধ্যে আবর্তিত হইতে হইতে সহজ ভক্তির সুরটি কেবলই কাটিয়া বাইতে থাকে।

পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ পড়িতে পড়িতে কখনও লেখককে ভুলি না, আর শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের চিত্রগুলি দেখিতে দেখিতে শ্রীরামকৃষ্ণময় ছাড়া কিছুই দেখি না। বর্ণনার নাট্যরূপ বসন্তেরলে দেখিয়াছি, দেখিয়াছি

জনসনের চিঠি, জনসনের কথোপকথনের অপূর্ণ উপস্থাপন শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ও নাট্যরূপ পাইয়াছে শ্রীরামকৃষ্ণ কথোপকথনে। কিন্তু ইহার নাট্যরূপ বারবারই এক অপূর্ণ lyric রূপ লাভ করিয়াছে। শুধু বিভিন্ন গানগুলির জড়ই নহে, সমস্ত চিত্রগুলির পিছনে মনে হয় সংকীর্ণতার খোল করতাল বাজিয়া চলিয়াছে। উহার স্ল 'গায়ক' শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং এবং অসংখ্য চরিত্রগুলি সেই পরম সঙ্গীতের মোহাৱের কাজ করিতেছে। আর শ্রীঃ?— বোধহয় ঐ সংকীর্ণতার কোন নীরব কোণে দাঁড়াইয়া তন্মগ্নভাবে ভাল দিয়া চলিয়াছেন এবং আপন অন্তরে সমগ্র উৎসংটিকে ভরিয়া লইতেছেন। আপন অন্তরের নিবেদনটি হয়ত বা ঐ সংকীর্ণতার ছন্দে ছন্দে বাজিয়া উঠিতেছে।

বিভূক্তি

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

কীর্ত্তান কীৰ্ণ পুণ্য মোদের
নৃতন তপঃ শক্তি চাহে,
আবার জোরায় আনতে হবে—
সে আগ্রহে সে উৎসাহে।
স্বপ্ন লক্ষ্য ভেদ করিবার
শক্তি সায়ক চাই পুনঃ তার।
সব প্রায়িকা করবে হরণ
বৈশ্বানরের দহন দ্বাহে।

২

বিলাসিতা, শিথিলতা—
অগম্যচার দূর করিতে,
লড়তে হবে বিতর্কি বে—
পঞ্চভণের হোমায়িতে।

অধঃপতন হচ্ছে যে দিন,
খেচ্ছাচারী ময় কি স্বাধীন,
শৃঙ্খলই সে আনবে ডেকে
গড়বে বানর, শিব গড়িতে।

৩

শঙ্খ, বিবারণ, ডকা, বাজুক
ঝাঙা নিশান, উদ্ভব রহে।
অবলাদ ও অপরাধের
জঘন্ততার আর কি বহে?
সবাই সেনা, সবাই যে বীর—
গর্জ হবে এই পৃথিবীর,
অমৃতের হার পুণ্য বারা
কারও ভারী ভূতা নহে।

কলম্বাসের পূর্বে আমেরিকা আবিষ্কার

শ্রীভাগবতদাস বরাট

আমেরিকার প্রথম আবিষ্কারক কলম্বাস—এ তথ্য সবারই জানা আছে। স্পেন দেশের তদানীন্তন রাজা ক্রিস্টিনাও ও রাণী ইসাবেলার অর্থসাহায্য নিয়ে ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত ইতালীয় নাবিক ক্রিস্টোফার কলম্বাস তারতবর্ষ আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে সমুদ্রযাত্রা করেন। তাঁর প্রথম আবিষ্কার বামাস, কিউবা ও অপরূপ পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং তৃতীয়বারের সমুদ্রযাত্রার তিনি দক্ষিণ আমেরিকার নিম্নকৃষিতে অবতরণ করেন ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে।

এরপর অপর এক ইতালীয় নাবিক আমেরিগো ভেসপুচি ১৪৯৯ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার পৌঁছান। তিনি জানতেন না যে তাঁর ঠিক এক বৎসর আগে কলম্বাস আমেরিকার এসেছিলেন। তিনি ভাবলেন যে তিনিই এই দেশটির প্রথম ও প্রধান আবিষ্কারক। সুতরাং ঐ নতুন দেশের নাম তিনি স্বনামে রাখা করেছিলেন। অনেকের ধারণা,—এই দু'জনই আমেরিকার আবিষ্কারক। এ কথা ঐতিহাসিক সত্য।

কিন্তু কয়েক বছর পূর্বে দীর্ঘ গবেষণার পর দক্ষিণ আফ্রিকার একজন বৈজ্ঞানিক এই প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে দৃঢ়তর প্রতিবাদ করেছেন। তাঁর মতে কলম্বাসের প্রায় ৪০০ বৎসর পূর্বে কয়েকজন আরবীর নাবিক কর্তৃক আমেরিকার প্রথম আবিষ্কার হয়। উইট ওয়াটারস্ ব্যাণ্ড নামক বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ ডি. ডবলিউ. জেক্স জোহানসবার্গের এক সভার জানান যে কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের প্রায় চার শ' বৎসর পূর্বে কয়েকজন আরবীর নাবিক আমেরিকা আবিষ্কার করেন। তাঁদের আবিষ্কারের কাল ১০০০ খৃষ্টাব্দে বা তার কিছু পরে বলে মনে হয়।

কলম্বাস যখন আমেরিকার মাটিতে পদার্পণ করেন সেই সময় তিনি দেখতে পান যে সেখানে কতকগুলো

ছোট ছোট নিগ্রো কলোনী গড়ে উঠেছে; এই নিগ্রোরা আরবাধিকৃত অঞ্চলের ক্রীতদাসদের বংশধর। প্রাক-মালিকদের অত্যাচার থেকে উদ্ধার পাবার মানসে তারা গোপনে এই সকল স্থানে এসে বসবাস করে।

অধুনা টেক্সাস নদীগর্ভে কতকগুলো নিগ্রো হাঘাটিক কবাল পাওয়া গেছে। এই কবালসমূহ প্রাপ্তির পর এই ধারণা আরও বহুত্ব হয় যে কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের পূর্বে অপর কারো দ্বারা আমেরিকা নিশ্চয়ই আবিষ্কৃত হয়েছে। ডাঃ জেক্সের অতিক্রম এই যে আরবেরাই আফ্রিকাত্ত পশু বীজ নিয়ে গিয়ে সর্বপ্রথম আমেরিকার কৃষিকার্যের প্রবর্তন করে এবং আমেরিকা-ভাষা শাস্ত্রাধিগ আফ্রিকার নিয়ে আসে।

কলম্বাসই যে প্রথম আমেরিকা আবিষ্কারক নয়,—এ কথা স্বীকার করেন কানাডাবাসী স্থলী ঐতিহাসিক জন মারে জিবন। কয়েক বৎসর গভীর গবেষণার পর জন মারে জিবন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে ৪৯৯ খৃষ্টাব্দে এশিয়াবাসী চৈনিক বৌদ্ধভিক্ষু হিউগান প্রথম প্রশান্ত মহাসাগর অতিক্রম করে আমেরিকা আবিষ্কার করেন। তাঁর “Steel of Empire” গ্রন্থে এ বিষয়ের উল্লেখ করে তিনি বলেছেন,—“America was first discovered from abroad by a Chinese Buddhist Priest named Hul Sien, who crossed the Pacific and landed somewhere around what is now Vancouver in 499 A. D.”

অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব ৪৯৯ সালে জনৈক চৈনিক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী প্রশান্ত মহাসাগর অতিক্রম করে বর্তমান ভ্যাঙ্কোভারের নিকট কোনও স্থানে অবতরণ করেন। কোন বিদেশী কর্তৃক ইহাই প্রথম আমেরিকা আবিষ্কার।

উক্ত আমেরিকার আবিষ্কারক যে একজন চৈনিক তা

প্রমাণ করবার জন্যে Steel of Empire গ্রন্থের লেখক বহু তথ্যের উল্লেখ করেছেন। Liang রাজবংশের রাজত্বকালে “ফুসাঙ” পরিভ্রমণ করেছেন বৌদ্ধ ভিক্ষু হিউ সান। ইহা ঐতিহাসিক সত্য। পরবর্তীকালে কয়েকজন ভৌগোলিক ও প্রাচ্যদেশীয় পণ্ডিত আমেরিকাকে ফুসাঙ নামে অভিহিত করেছেন। রাজবংশের ইতিহাসের এক অধ্যায়ে এইরূপ উল্লেখ আছে—“During the reign of * Tsi Dynesty in the first year of the year (A. D 499) Came a Biddhist priest from the kingdom, Who bore the cloister name of Hocischin (or Hui Sien meaning universal compassion) to the present district of Hunwong who narrated that Fusang is about 20,000 chinese miles in an easterly direction from Tahau (Alaska) and east of the middle kingdom.”

* চীনের ইতিহাস হতে জানা যায় যে ৪৯৯ খৃষ্টাব্দে ওখানে টসি (Tsi) রাজবংশ রাজত্ব করত।

Tom Macinnes নামে আর একজন কানাডার লেখক “Chinook Days” নামক একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। এতে তিনি লিখেছেন যে “Chinese had visited Nootka in the west coast of vancouver island a thousand years before Columbus discovered America.”

অর্থাৎ কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের এক হাজার বৎসর আগে চীনারা ভ্যাঙ্কুভারের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত নোটকাতে এসেছিল।

প্রাচ্য দেশীয় বিখ্যাত পণ্ডিত Samuel Couting এই মত স্বীকার করেন।

চীনদেশের ইতিহাস পাঠে আমরা জানতে পারি যে সেখানে ৪৯৯ খৃষ্টাব্দে Tsi রাজবংশ রাজত্ব করত। এই Tsi রাজবংশের মুদ্রা জনৈক নাবিক কর্তৃক নোটকাতে আবিষ্কৃত হয়েছে ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে।

সে যাই হোক, এই সব তথ্য হতে প্রমাণিত হয় যে কলম্বাসের আমেরিকার পদার্পণের পূর্বে আমেরিকা আবিষ্কৃত হয়েছিল। কলম্বাস আমেরিকার প্রথম আবিষ্কারক নয়।

দোপাটি

মিনতি নাথ

সাজিয়ে দেব তোমার খোঁপা
আজ দোপাটি ফুলে
রাজ্য চৌটে কেমন দেখ
হাসছে ফুলে ফুলে।
স্বরমাপরা নয়ন দুটি
হেসেই যেন কুটো কুটি
লুটোপুটি খায় দোপাটি
আপন মনের ভুলে
কালো নয়ন ভুলে।

ফুলের সারি সাজিয়ে দেব
জাঁখির প্রদীপ জ্বলে
কবি যেমন ছন্দ মেলায়
উদাস নয়ন মেলে—
পাত'র পাশে যেমন করে
ঐ দোপাটি আছে পড়ে
ওড়ন ওড় মাখায় পরে
আবেশ নয়ন ভুলে
এলো খোঁপা ফুলে।

টেম-টিউব

নারায়ণ চক্রবর্তী

[একাক নাটিকা]

দুপুরবেলা

পাত্রপাত্রী

সত্যেন	...	উচ্চশিক্ষিত যুবক।
হরিহর	...	সত্যেনের বাবা।
বিনয়	...	সত্যেনের বন্ধু।
		পুলিশ অফিসার।
ডঃ সূর্যশর্মা	...	হুমানমল ল্যাবরেটরীর ডিরেক্টর।
হুমান মল	...	কোটিপতি
সুজয় মল	...	ব্যবসায়ী।
লক্ষ্মণ মল	...	হুমান মলের ছেলে।
সঞ্জয়	...	কেমিষ্ট।
রামনাথ পোদ্দার	...	ধনী ব্যবসায়ী।
রামদহিন দ্রুবে	...	ল্যাবরেটরীর বেয়ার।
মুনিয়া	...	হুমান মলের কর্মচারী।
ডাঃ রায়	...	চিকিৎসক।
মনোরমা	...	সত্যেনের মা।
অঞ্জলি	...	সত্যেনের বোন।
বেলা	...	বিনয়ের বোন।

প্রথম দৃশ্য

[কলকাতার ক্র্যাট বাড়ি, দেড়খানা ঘর, সামনে একটু বারান্দা। চারদিকে দারিদ্র্যের হুস্পট ছাপ। বড়ো ঘর-খানায় তক্তাপোবে মলিন বিছানা পাতা। শিওরের কাছে একটি টুলে ছোটবড়ো গুয়থের শিশি। বিছানায় শুয়ে আছেন প্রৌঢ় গৃহস্থানী হরিহর, পত্নী। দেওয়ালে দু'তিনটে ক্যালেন্ডার। তক্তাপোবের নীচে এক কাঁড়ি জিনিষপত্র, বাস, তোরঙ্গ। এককোণে আলনার খাড়ি, দারা, সেমিজ, হুড়ি, গেঞ্জি, পাত্রাবি বুলছে।]

হরিহর। (দুর্বল কণ্ঠে) অঞ্জলি—অঞ্জলি—অঙ্—
অঞ্জলি। (ঘরে ঢুকে) কী বলছ বাবা ?
হরিহর। সত্যেন কি ফেরেনি এখনো ?
অঞ্জলি। না বাবা, দাদা এখনো ইউনিভার্সিটি থেকে
কেরেন নি—
হরিহর। তোর মা কোথায় ?
অঞ্জলি। মা দরজা খুলে বাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে
দাদার জন্য। ডাকব মাকে ?
হরিহর। না না, থাক, কিন্তু সত্যেন কের কিয়ল না
এখনো ? ক'টা বাজল বল দেখি—
অঞ্জলি। দেড়টা বেজেছে বাবা। বাবা—এ বুঝি
দাদা এলো—
হরিহর। আঁ! সত্যেন এসেছে ? অঙ্, আমার একটু
তুলে ধরত মাঁ, বিছানার বলিয়ে দে, উঃ এই অর আমার
এমন কাবু করে ফেলেছে।
অঞ্জলি। দিচ্ছি বাবা—
(অঞ্জলি এগিয়ে এসে হরিহরকে তুলে বিছানার বলিয়ে
দিল। দরজার কাছে পদশব্দ)

সত্যেনের প্রবেশ, পেছনে পেছনে মনোরমা এলেন।
সত্যেন। (সবগে ঘরে ঢুকে হরিহরের পায়ে হুলো
নিরে) বাবা—বাবা, আমি ফাষ্ট ক্লাস সেকেন্ড হয়েছি,—
এ কী ! বাবা তুমি এমন করছ কেন ? কী হল তোমার ?
মানারমা। অরটা বাড়ল নাকি ?
হরিহর। না না। হয়নি কিছু। অর নয়, আনন্দের
চেটে এসে আমার সারা শরীরটাকে বেন ছলিয়ে দিয়ে
গেল। আঃ, সত্যেন, বাবা, কাছে আর, তোকে একটু
বেশি। আহা, কতো মেগা হয়ে গেছিস তুই,—আর

তুই তুই কেন, তোর মা, অঞ্জু—সবাই,—অতাবের নিখাস
সবার রক্ত শুবে নিচ্ছে—

মনোরমা। অমন করে বোলোনা তুমি, আমরা বেশ
আছি।

হরিহর। হ্যা, বেশ তো থাকবেই। কলকাতা সহরে
গোপা শুভি বেড়শো টাকা আয়ে চারজন লোক যে
কতো ভালো থাকতে পারে তা কি আর আমি জানি না?
খুব জানি। জানবো না কেন, আমি যে ইকনমিক্স এর
এম-এ, তবে পা তেঁকে পড় হয়ে না পড়লে হয়তো এতটা
ছয়বছর হ'ত না তোমাদের—

মনোরমা। ওগো তুমি খামো তো। আজ আনন্দের
দিনে কী সব দুঃখের পাঁচালী গাইছ—

হরিহর। আনন্দের দিন বলেই তো দুঃখের কথা-
গুলো মনে ঝাঁক করে আসছে। এগিয়ে গিয়ে সত্যনকে
যে একবার দুঃখ জড়িয়ে ধরব সেটুকু ক্ষমতাও যে আজ
আমার নেই। এ যে কতোবড়ো দুঃখ—

সত্যন। আমি তো তোমার পাশেই আছি বাবা,
এই যে তোমাকে হুঁরে আছি—

হরিহর (আবেগ করে) সত্যন, তুই আমার হীরের
টুকরো ছেলে—

[বাইরে থেকে গলার আওয়াজ]

বিনয়। সত্যন আছিল নাকি?

সত্যন। (সাড়া দিয়ে) কে? বিনয় দা? আরে
এসো এসো—

[পুলিশ ইন্সপেক্টরের ইউনিফর্ম পরা বিনয় ঘরে
চুকলো, সঙ্গে কুড়ি একশ বছরের একটি সুন্দরী, সুচারু-
সজ্জা যুবতী]

বিনয়। শুধু বিনয় নয় রে, বেলাও আছে সঙ্গে।
মোটর বাইকে লালবাজার যাচ্ছিলাম, হঠাৎ দেখি কলেজ
স্ট্রীট ট্রাম ষ্টপে ট্রামে উঠবার নিফল চেষ্টা করছে বেলা।
আমাকে দেখতে পেয়েই হুকুম করল মোটর বাইকের
পেছনে করে তোমার বাড়িতে পৌঁছে দিতে। অল্প
কোনো যেরে ওর আগেই তোকে অভিনন্দন জানাবে এ
চিন্তাও ওর অসহ—

বেলা। (চাপা স্বরে) আঃ, কী হচ্ছে দাদা! মাসীমা
বেশোমশায় রয়েছেন না?

বিনয়। আই অ্যাম সরি। পুলিশের কাজ করে
করে একেবারে কাঠখোঁটা বনে গেছি, তাই অস্থানে
অস্থিত কথা গুলো মুখ কঁকে হড় হড় করে হড়ক অল্প-
প্রপাতের মতো বেরিয়ে আসে। ওয়েল। আমার ডিউটি
শেষ, এবার আমি বাই—

মনোরমা। সে কি বাবা বিনয়, এখনি যাবে কি?
একটু মিষ্টি মুখ করে যাও। সত্যনের এম, এস, সি,
পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে, ফার্স্ট ক্লাস সেকেণ্ড হয়েছে ও—
অঞ্জু, যা তো মা, রাস্তাঘরে নারকেল নাড়ু আছে, প্লেটে
করে নিয় আর তো চারটি—

অঞ্জলি। এখনি আনছি মা, বিনয় দা পালিও না
কিন্তু—

বিনয়। বেলায় কাছে সব কথা শুনেছি মাসীমা।
আই কংগ্রেচ্যুলেট—ইউ সত্যন, ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্ট করেছে
তুমি—

সত্যন। ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হলে তোমার এ কথা মেনে
নিতে আপত্তি করতাম না বিনয়দা।

বিনয়। আমার নামের অর্থগত গুণটুকু বেশ আশ্চর্য
করেছিল তুই সত্যন—

[প্লেটে করে চারটি নারকেল নাড়ু আর এক গ্লাস জল
নিরে ঘরে ঢুকলো অঞ্জলি]

অঞ্জলি। এই নাও বিনয়দা, জল আর নারকেল নাড়ু,
—রসগোল্লা খাওয়ার সময়টা আমাদের নেই—

বিনয়। (প্লেট নিয়ে) অঞ্জলির জর হোক। উঃ, বা
তেটা পেয়েছিল,—আর পাবেই বা না কেন? সেই
কোন সকাল থেকে অনবরত টো টো করে মরছি—

অঞ্জলি। চোরগুলো সব রাতারাতি সাধু হয়ে গেলে
বেশ হয়, তাই না বিনয়দা?

বিনয়। (জল খেয়ে) আঃ, বাঁচলুম। চোরগুলো
সাধু হোক বা না হোক, তেজালওয়ালারা দেশছাড়া হলে
যে প্রাণটা বাঁচে আমার—

অঞ্জলি। ও, তোমার বুকি তেজাল ধরবার ভিটটি
পড়েছে আজ কাল?

বিনয়। হ্যা, আর সত্যি বলছি অঞ্জলি দেশের লোকের
দুঃখ কষ্টের কথা মনে পড়লে ওদের ধরে ধরে জেলে পুঁজবায়
অল্প আমার হাত নিশাশ করতে থাকে। চায়ে তেজাল

চিন্তিত, চলে, ছু, বি, ভেদ, আটা, ভাল, মলাপাতি, সব কিছুতেই নারায়ক রকরের তেজাল চলছে, এমন কি ওষুধও বাব যায় নি—

অঞ্জলি। তা ওদের ধরে ধরে জেলে পুরতে বাধাটা কি তোমার তনি? ওরা তো সমাজের ছুই ব্রণ, ওদের নিষ্কি করে দেওয়াই তো উচিত—

বিনয়। উচিত তো বটেই অঞ্জলি কিন্তু ব্যাটারা এমন সেয়ানা আর এমন আটখাট বেঁধে কাজ করে যে তাদের টিকির নাগাল পাওয়াও শক্ত, তা ছাড়া—

অঞ্জলি। তা ছাড়া?

বিনয়। বলা উচিত নয়, তবু গোপনে বলছি, কিছু অসামু সরকারী কর্মচারী ওদের রীতিমতো সাহায্য করে থাকে, সবচেয়ে মুন্সিল তো দেখানাই—

মনোরমা। তবু তুমি লেগে থাকো বাবা বিনয়, এতে তোমার কর্তব্য করাও হবে আবার দেশের লোকের সেবা করাও হবে। দেখ না তেজাল জিনিষ খেয়ে খেয়ে ছেলে-বুড়ো সবার কী হাল হয়েছে, অথচ মাহুষের স্বাস্থ্য না থাকলে সবই বেকার।

হরিহর। ভারতবর্ষ না হয়ে এ যদি অন্য কোনো দেশ হ'ত তা হলে এ সব অসামু ব্যবসারীদের ধরে ধরে গুলি করে মারা হ'ত। একটা লোককে খুন করলে বিচারে তার কাঁসি হবার বিধান আছে, কিন্তু ঠাণ্ডা মাথায় যারা হাজার হাজার জীপুস্বের জীবনে অভিপাণ ডেকে আনছে তাদের ওপর আমাদের সরকারের রক্ত রোষ কেন যে নেমে আসে না তা বুঝি না।

সত্যেন। তুমি অত উত্তেজিত হোয়ো না বাবা, শান্ত হও—

হরিহর। কী করে শান্ত হব সত্যেন? আমার বুকের ভেতরে যে অভিযোগের ভিস্ত্রিয়াস জলছে—

বিনয়। দেহীতে হলেও গভর্নমেন্ট এ বার তেজাল বন্ধ করার ক্ষেত্রে উঠে পড়ে লেগেছেন। আপনি জাবধেন না। সমসাময়িক, কিছুদিনের মধ্যেই আমরা তাদের শাস্তি করে ফেলব। আচ্ছাঃ আমি এবারে চলি। এসো সত্যেন, বারান্দার দাঁড়িয়ে তোমার সঙ্গে দুটো কথা বলে যাই—

সত্যেন। চলো,—বেলা তুমি একটু বোসো, আমি এখনি আসছি—

[দরজা দিয়ে বারান্দার এলো হ'লনে]

বিনয়। এম, এস, সি, তো পাশ করলে, এবার কি করবে?

সত্যেন। ইচ্ছা ছিল রিসার্চ করব,—বিজ্ঞান লক্ষীর আলীবাঁদে নহন কিছু আবিষ্কার করব। এ খপ্প আমরি বহুদিনের, কিন্তু—

বিনয়। খুব ভালো কথা, খুব ভালো কথা সত্যেন! আমাদের দেশে বিজ্ঞানগবেষকদের খুবই অভাব, তোমাদের মতো মেধাবী ছেলের দল এগিয়ে না এলে এই অভাব পূরণ হবে কী করে বলো? বিজ্ঞান কলেজে রিসার্চ করার সুযোগ নিশ্চয়ই পাবে—

সত্যেন। কিন্তু পেনেল সে সুযোগ নিতে পারছি কই বিনয় দা?—

বিনয়। তার মানে?

সত্যেন। আমাদের আর্থিক অবস্থা তো আর তোমার অহানা নয় বিনয় দা,—মায়ের গায়ের গয়নার পেনেল সোনালুকুণ্ড আমার পড়বার খরচ মেটাতে গিয়ে নিঃশেষ হয়ে গেছে, এই বয়েসেও মাকে স্কুলে শিক্ষিকার কাজ করতে হচ্ছে, অঞ্জলির পড়ার খরচ আছে, ওর বিয়ের কথাও ভাবতে হবে। বাবা বেকার কাজেই রিসার্চ স্টাইপেন্ডের সামান্য কটা টাকা দিয়ে সংসারের খিঁচ মেটাবো কী করে?

[বেলায় প্রবেশ]

বেলা। এখন তা হলে কী করবে তুমি সত্যেন দা?

সত্যেন। কলকাতার কোনো ফার্মে একটা চাকরী চেষ্টা করব—

বেলা। এত ভালো রেজাল্ট করে শেষে এই?

সত্যেন। কী আর করব বলো? আমার যে মুন্সীর জোর নেই, থাকলে হয়তো জাতীয় গবেষণাগার স্কলার কোনো একটাতে ঢুকতে পারতাম। ওকি, বিনয় দা, তুমি কি চললে নাকি?

বিনয়। হ্যাঁ তোমার কথা শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল। আমি চললুম। বেলাকে পৌছে দিও বিকেলে। চলি—

সত্যেন। আচ্ছা—

বিনয়ের প্রস্থান

বেলা। সত্যেন, তোমার এই সাক্ষ্যে আমার মনে
বে কী আনন্দ—

সত্যেন। মুখ ফুটে বলতে হবে না, তোমার ঐ
স্বকথকে মুখখানাই মনের সব কথা প্রকাশ করে দিচ্ছে—

বেলা। মনের সব কথাই কি আর মুখে ফুটে
ওঠে ?

সত্যেন। ওঠে বৈকি বেলা, আর ভালোবাসার
চোখ থাকলে তা পড়ে নিতে একটুও অসুবিধা হয় না।

বেলা। সত্যি বলছ ? পড়তে পেরেছে আমার
মন ?

সত্যেন। পেরেছি বই কি বেলা, শুধু আজই নয়,
অনেক আগে, অনেক দিন ধরে—

বেলা। আমার কাছে তোমার মন কিন্তু এখনো
অজ্ঞাত মহাদেশই হয়ে আছে সত্যেন।

সত্যেন। তা হয় তো এই জগৎ যে আমার মনের
মহাদেশ জুড়ে আছে অসংখ্য সমস্তার বিশাল অরণ্য,
তোমার চোখের আলো ঢুকতে পারে না সেখানে।

বেলা। সমস্তাগুলো হু' জনের মধ্যে ভাগ হয়ে
গেলে হয়তো হাকা হয়ে যেতো সত্যেন।

সত্যেন। তা হয়তো যেতো, কিন্তু হৃদয়লব্ধীকে
টেনে এনে হারিজ্যের আসনে বসাতে আমার বাধে বেলা—

বেলা। হৃদয় যদি পূর্ণ থাকে তবে হারিজ্য তাকে
স্পর্শ করতে পারবে না সত্যেন, প্রেমই সব অভাব দূর
করে দেবে—

সত্যেন। ব্রহ্মল তোমাদের সংসার বেলা, তাই
নির্ময় হারিজ্যের সত্যিকারের চেহারাটা তোমার চোখে
পড়ে নি, তাই এমন কথা বলতে পারলে। ভাবাবেগ,
মহৎ আদর্শবাদ, সব কিছুই গুঁড়িয়ে বার অভাবের নিষ্ঠুর
চাকার ভলার, ধ্বংস হয়ে যায় চরিত্র।

বাইয়ের দরজার ঠক ঠক শব্দ

“ লছমন। (বাইরে থেকে) সত্যেন, বাড়িতে, অম্বাছো
নাকি ? সত্যেন—

বেলা। কে বেন 'ডাকছে তোমাকে,—আমি বাই,
মাসীমার কাছে গিয়ে একটু খসি গে— বেলায় প্রস্থান

(সত্যেন দরজার দিকে এগিয়ে গেল)

সত্যেন। (দরজার দাঁড়িয়ে) কাকে চান

লছমন। এই যে সত্যেন, কংগ্রাচুলেশন কংগ্রাচুলেশন
—তুই তো সেই রকম যোগাই আছিল দেখছি—

সত্যেন। কিন্তু আপনি কে ? চিনলাম না জো
আপনাকে—

[লছমন ভেতরে এলো। পরণে নিখুঁত স্ট্রট। ভুড়ি
বেণ্টের শাসন অমাস্ত করবার লক্ষণ দেখাচ্ছে। কপালে
খেঁত চন্দনের ফোটা; কানের লতিতে খেঁত চন্দন, সোনার
মাকড়ি, মাথায় রেশমী পাগড়ি]

লছমন। সে কি রে। আমাকে চিনতে পারলি না,
আমি যে লছমনমল হুমানমল, তোর ক্লাস ফ্রেন্ড। হিন্দু
স্কুলে এক সঙ্গে বসতাম, ম'নে নেই ?

সত্যেন। (লছমনের হাত চেপে ধ'রে) বলি কি ?
তুই সেই লছমন ? একেবারে মারোয়াড়ী বনে গেছিল যে.
ভুঁড়িখানাও বাগিয়েছিল মল না—

লছমন। বাঃ বেশ কথা তো তোর ! মারোয়াড়ী
ছেলে মারোয়াড়ী বনব না তো কি বাঙালী বনব ? আর
ভুঁড়ির কথা কি বলছিল, আমাদের ইষ্ট দেবতা গণেশ
ঠাকুরের ভুঁড়ির কাছাকাছিও যেতে পারলাম কই ?

সত্যেন। কিন্তু ছেলেবেলায় তোর যে বড় সাধ ছিল
যে বাঙালীর মতো কথা বলবি, বাঙালীর মতো কাপড়
পরবি, বাঙালীর আচার ব্যবহারের নকল করবি, তেল,
আটা, তিসি, ভুঁড়ির পখই মাড়াবি না,—আর এখন দেখছি
একটা হাতির মতো মূটয়েছিল। হাতির আবার ভুঁড়ি
থাকে না, তোর তো তা ও আছে দেখছি—

লছমন। (কৃত্রিম কোপে) এই, খবরদার,—ভুঁড়ি
তুললে ভালো হবে না বলছি—

সত্যেন। তা না হয় নাই তুললাম, কিন্তু এতদিন
পরে তুই আমার বাড়ি চিনে এলি কি করে ?

লছমন। বাঃ, ছেলেবেলায় তোদের বাড়িতে কতবার
এলেছি মনে নেই তোর ? তোর কাছে এলে হোমস্টিক
গুলো করে নিয়ে যেতাম।

সত্যেন। ম্যাট্রিক হু' বার কেল করে সেই যে
কোথায় উঠাও হয়ে গেলি আর দেখাই পাইনি তোর।
কী করছিল এখন ?

লছমন। হাত বাবল—

সত্যেন। হানে?

লছমন। বাবার কারবারে ঢুকেছি, চুটিয়ে বিজ্ঞানেস করছি। আমার বাবাকে চিনিস তো? হুমানমল গুজরমল।

সত্যেন। পদ্মভূষণ হুমানমল তোর বাবা। তিনি তো কোটিপতি রে—

লছমন। তা হু'দশ কোটি টাকা খাটছে বৈ কি আমাদের ব্যবসাতে—

সত্যেন। আর আমার হু'দশ পরসারও মুরোদ নেই।

লছমন। চাকরী করতে চাস?

সত্যেন। 'মেধো ভাত খাবি? না হাত ধুয়ে বসে আছি'র মতো কথা বলছিস যে। শুধু চাই বললে খুব কমই বলা হল,—একুশি পেলে বর্তে বাই—

লছমন। ইয়াকী রাণ, আমি সিরিয়াসলি বলেছি কথাটা।

সত্যেন। আমিও কম সিরিয়াস নই লছমন।

লছমন। তবে শোন, চাকরীটা আমার বাবার হাতেই। বিজ্ঞান চর্চার বাবার ভয়ানক উৎসাহ। পাতিপুত্রে তাঁর একটা বিয়াট ল্যাবরেটরী আছে, আধুনিকতম সরপাতি সব আছে সেখানে, আমিই তার ম্যানেজার। দশবারোজন বিজ্ঞানী কাজ করছে সেখানে। তুই এবার ফলিত রসায়নে খুব ভালো ভাবে এম-এস-সি পাশ করেছিস শুনেই বাবা তোর সম্বন্ধে খোঁজ করতে বললেন আমাকে।

সত্যেন। বলিস কি লছমন, তোর কথা শুনে যে সেই সাধা রাজহস্তীর রাজা খোঁজার কথা মনে পড়েছে—

লছমন। খোঁজ নিতে গিয়ে তো আমি তাক্কব বনে গেছি, বার খোঁজে বেরিয়েছি শেষকালে সেই কিনা আমার ক্লাসক্রেণ্ড সত্যেন! বল, আমাদের ল্যাবরেটরীতে কাজ করবি তুই?

সত্যেন। কিন্তু আমি যে—

লছমন। তুই কি ভাবছিস তা আমি জানি সত্যেন। তবু নেই, আমরা মায়েরাডী হলেও মাইনে-পত্র ভালোই দিয়ে থাকি। আপাততঃ মাসে লাঞ্ হু'দশ টাকা পাবি—

সত্যেন। লাঞ্ হু'দশ।

লছমন। হ্যা, আর ভালো কাজ দেখাতে পারলে সেটা মাসে হাজার টাকা হয়ে বেতে দেবী হবে না, কী, রাজী?

সত্যেন। (লছমনকে আবেগের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে) সত্যি বলছিস লছমন? আমি স্বপ্ন দেখছি না তো?

লছমন। সত্যি রে সত্যি। তুই তা হলে রাজী?

সত্যেন। রাজী? কী বলছিস তুই? একশো বার রাজী, হাজারবার রাজী, আঃ, আমাকে মহা কুস্তিভা থেকে বাঁচালি তুই লছমন। আর আর ভেতরে আর যা বাবার সঙ্গে একবার দেখা করে যা, একটু চা—ওরে অঙ্ক—

লছমন। না ভাই, আজ একটু ভাড়া আছে, বাইরে গাড়ি দাড়িয়ে জরুরী কাজে আমাকে আসানসোল বেতে হবে একুশি। তুই তা হলে কাল বেলা দশটার বড়বাজারে আমাদের গদীতে আসিস, আমিও থাকব সেখানে।

সত্যেন। কী কাজ করতে হবে আমাকে?

লছমন। আমাদের ল্যাবরেটরীতে ডিরেক্টরের নির্দেশ মতো রিসার্চ করবি। তবে গীতা হু'দশ গোপনীয়তার শপথ নিতে হবে আগে—

সত্যেন। গোপনীয়তার শপথ?

লছমন। হ্যা, এটা আমাদের কোম্পানীর নিয়ম, যাতে আমাদের ল্যাবরেটরীর গোপন তথ্য বাইরে পাঁচার না হয়ে যায় তার জন্তই এই ব্যবস্থা। তোর বাবড়াবার কোনো কারণ নেই, কারণ তুই যার অধীনে রিসার্চ করবি সেই ডক্টর সেনশর্মাও এই শপথ নিয়েছিলেন।

সত্যেন। ডক্টর সেনশর্মা? কোন্ সেনশর্মা?

লছমন। ডক্টর কমল সেনশর্মা।

সত্যেন। বলিস কি লছমন? যিনি গতবার নিখিল ভারত বিজ্ঞান সম্মেলনে ফলিত রসায়ন শাখার সভাপতি ছিলেন?

লছমন। হ্যা রে হ্যা, তিনিই। তিনিই আমাদের হুমানমল ল্যাবরেটরীর অধ্যক্ষ, তিনি হাজার টাকা মাইনে তাঁর।

সত্যেন। ডক্টর সেনশর্মার মতো আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন বিজ্ঞানীর অধীনে রিসার্চ করা তো মহা সৌভাগ্যের কথা লছমন, আমার আর কোনো আপত্তি নেই—

লছমন। তা হলে ঐ কথাই বইল। কাল সকাল দশটার, আচ্ছা, এবার আমি চলি সত্যেন—

[প্রস্থান]

সত্যেন। (স্বগতঃ) একেই বলে 'খোদা বব্ দেতা তব্ ছল্লর ফোড়কর দেতা'। মাসে সাড়ে ছ'শো টাকা মাইনে, তার ওপর ডক্টর সেনশর্মার সঙ্গে কাজ করা— (উচ্চকণ্ঠে) মা, মা, বেলা, অঞ্জলি—আর ভাবনা নেই,— দুঃখের দিনের অবগান হয়েছে, আর আমাদের ভাবনা নেই—

দ্বিতীয় দৃশ্য

[বিরাট লেবরেটরী। পেছন দিকে নানা ধরণের আধুনিক যন্ত্রপাতিতে ঠালা একসার অপারেশন টেবিল, লম্বা অ্যাপ্রণ পরা তিন চারজন বৃদ্ধ একমনে নানা রিএজেন্ট নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। সামনের দিকে ফাঁকা জায়গায় একটা প্রকাণ্ড সেক্রেটারিয়েট টেবিল, পাশেই ছুটি ইম্পাতের আলমারি। বিভলভিং চেয়ারে বসে প্রোট গবেষক ডক্টর কমল সেনশর্মা একটা মোটা খাতার কী বেন লিখে চলেছেন একমনে। তাঁর পরণে দারি সুট, গভীর মুখে ভীম দর্শন চুরুট]

বিকেলবেলা

ডঃ সেনশর্মা। (স্বগতঃ) পিঁপড়ের মতো মাছব জন্মাক্কে, মাছবে মাছবে ছেয়ে গেল গোটা পৃথিবী, পৃথিবীর তার লাঘব হবে কী করে? বৃদ্ধ বৃদ্ধ, রোগেও মাছব মরে না আর, তাহলে উপায় কি?

(পেছনের পরীক্ষণ কেন্দ্র থেকে দ্রুতপথে এগিয়ে এলো সত্যেন, তার হাতে একটা টেট টিউব)

সত্যেন। আপনি কি এখন খুব বিজি আছেন ডক্টর সেনশর্মা?

ডঃ সেনশর্মা। কী বলতে চাও সত্যেন?

সত্যেন। টেট টিউবে ব্রাউন প্রেসিপিটেট পড়ছে তার।

ডঃ সেনশর্মা। ব্রাউন প্রেসিপিটেট? কৈ দেখি দেখি—হ্যাঁ, তাইতো, (উৎক্লষ করে) চরৎকার চরৎকার রেকর্ড। তোমার কাজ খুব পরিষ্কার সত্যেন—(স্বগতঃ) এই পেরেছি অমোঘ উপাধান—

সত্যেন। দশদিনের অক্লান্ত পরিশ্রমে এক্সপেরি-

মেন্টটা সকল হয়েছে বটে, কিন্তু এটা কী কাজে লাগবে তা তো বুঝলাম না আর—

ডঃ সেনশর্মা। তা না বুঝলেও কতি নেই সত্যেন। আমার নির্দেশ মতো শুধু কাজ চালিয়ে যাও তুমি—

সত্যেন। গত তিন মাস ধরে তো তাই করছি আর, বেশ ক'টা এক্সপেরিমেন্ট লাক্সেসফুলও হ'ল, কিন্তু কী শিখলাম আমি? কী লাভ হ'ল আমার?

ডঃ সেনশর্মা। লাভ? তোমার? তোমার লাভ মাস গেলে মোটা মাইনে আর বাকী লাভটুকু কোম্পানীর।

সত্যেন। কিন্তু কি উদ্দেশ্যে এসব পরীক্ষা চালানো হচ্ছে তা তো—

ডঃ সেনশর্মা। বুঝতে পারছ না, না? বুঝতে চেও না সত্যেন, শপথ ভঙ্গ হবে, চোখ কান বুলে শুধু কাজ করে যাও—

সত্যেন। এই ল্যাবরেটরী ঘিরে রয়েছে একটা গভীর রহস্যের আবরণ, এতে আমার দম বন্ধ হয়ে আসচে ডক্টর সেনশর্মা—অথচ এতো বড়ো মডার্ন ল্যাবরেটরী, এত সব অতি আধুনিক ইকুইপমেন্টস, নিপুণ সহকর্মী, সবার ওপর আপনায় মতো একজন মাষ্টার গাইড, মন আনন্দে ভরে থাকবার কথা। প্রতিটি সকল এক্সপেরিমেন্টের পর মনে যে তৃপ্তির ঢেউ ওঠে তা মুহূর্তের মধ্যে কোথায় বেন মিলিয়ে যায়। এর কারণটা কি তা বলতে পারেন আর?

ডঃ সেনশর্মা। পারি বইকি সত্যেন। যে রহস্যের আবরণের কথা বললে একটু আগে, তাই শুধে নিচ্ছে সব।

সত্যেন। কিন্তু কেন, কেন? কেন তা হবে ডক্টর সেনশর্মা? অজ্ঞানের অন্ধকারে প্রজ্ঞার আলো ফেলাই তো বিজ্ঞানীর ধর্ম, এ ধর্ম থেকে আমি বিচ্যুত হব কেন আর?

ডঃ সেনশর্মা। এর বেশী কিছু জানতে চেও না সত্যেন।

সত্যেন। কিন্তু এই অন্ধকারে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে আর, এই রহস্যের গুরুত্ব আর আমাকে যে পিবে আরছে—

ডঃ সেনশর্মা। এ নিষেধণ কি দারিদ্র্যের নিষেধণের চেয়েও কঠোর সত্যেন?

সত্যেন। আপনি কি বলতে চাইছেন ডক্টর সেনশর্মা?

ডঃ সেনশর্মা। তোমার হাতে এখন প্রতি মাসে মোটা টাকা আসছে, তার ফলে তোমার বাবার স্বচিকিৎসা হচ্ছে, তোমার বোন হাসিমুখে কলেজে যাচ্ছে, তোমার মা ছুগ সেক্রেটারীর জুতুটিকে এখন আর ততটা পারোয়া করছেন না,—জীবনে এ সবার কি কোনো দাম নেই সত্যেন?

সত্যেন। আছে ডক্টর সেনশর্মা—

ডঃ সেনশর্মা। তাহলে আর কিছু জানতে চেওনা, বুঝতে চেওনা, আমার সঙ্গে ডিস্‌কাস্‌ করতে চেওনা, শুধু অধীত বিভ্রাৎ আমার নির্দেশে পরিচালিত করে যাও। তোমার এক মাসের কাজে খুশী হয়েছেন হুমানমল গুজর মল, আগামী মাস থেকে তুমি সাড়ে সাতশো টাকা পাবে—

সত্যেন। সাড়ে সাত শো! কিন্তু এত টাকা পাবার উপযুক্ত কোন কাজটা আমি করেছি ডক্টর সেনশর্মা?

ডঃ সেনশর্মা (অধীর কঠিন স্বরে) আর কোনো কথা নয় সত্যেন, আর কোনো প্রশ্নও নয়। তোমার ডেকে তোমার পরবর্তী কাজের নির্দেশ পৌছে গেছে, যাও,—কাজে লেগে যাও—

সত্যেন। বাচ্ছি স্যার। কিন্তু এই টেট টিউবের ব্রাউন প্রেসিপিটেটটা আমার ভাবিয়ে তুলেছে, গিনিপিগের কিডনীতে এর একটা অদ্ভুত ক্রিয়া লক্ষ্য করেছি—

ডঃ সেনশর্মা। (ক্রুদ্ধ গর্জনে) আঃ সত্যেন বিরক্ত কোরো না আমাকে, তোমার কোঁতুহল একদিন তোমার সর্বনাশ ডেকে আনবে—গো টু ইয়োর জব্‌ এণ্ড বি কুইক—

[সত্যেন আরও কী যেন বলতে গেল, কিন্তু ডক্টর সেনশর্মার রুদ্রমূর্তি দেখে থেমে গেল। আন্তে আন্তে স্বরের কোণে তার কাজের টেবিলের দিকে ফিরে গেল।

ডঃ সেনশর্মা। (আপন মনে) সত্যেনের কোঁতুহলটা বড়ই বেশী দেখছি। ওর বিবেকটা টাকার আকর্ষণে যেমি হয়ে যায় নি এখনো, তাই ওকে আমার ভয়,—কে? কে ওখানে?

লছমনের প্রবেশ

লছমন। আমি লছমন ডক্টর সেনশর্মা—

ডঃ সেনশর্মা। ও, এসো, বোস এই চেয়ারটার। কী ব্যাপার লছমন?

লছমন। বাবুজী সে দিন যে জিনিষটা নিয়ে পরীক্ষা করতে বলেছিলেন তা কি করা হয়েছে ডক্টর সেনশর্মা। বড্ড ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন বাবুজী, আমাদের গুদামে আর মাল রাখবার জায়গা নেই কিনা—

ডঃ সেনশর্মা। হ্যাঁ হয়েছে, সত্যেনই করেছে, যাখা আছে ছেলেটার—

লছমন। হেঁই হেঁই, সে জন্তাই তো ওকে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে এসেছিলাম ডক্টর সেনশর্মা, যেমন ওক চেলাটিও তার তেমনি হওয়া চাইতো—তা হলে পরীক্ষাটা সফল হয়েছে ওর?

ডঃ সেনশর্মা। হাঁ, দিয়ে গেল এইমাত্র,—এই যে,—দেখ না—

(টেট টিউব উঁচু করে দেখালেন)

লছমন। কই দেখি দেখি—

(লছমন টেট টিউবটা হাতে তুলে নিল, দেখতে লাগলো লুক জলজলে চোখে)

বাঃ, খাসা রং তো, ঠিক লরবের তেলের রং—! খাসা মিশ খাবে—

ডঃ সেনশর্মা। পরিমাপ মতো এই ত্রাণটি মেশালে শতকরা দশভাগ ওজন বেড়ে যাবে, যদি বা গন্ধে বিন্দুমাত্র তফাৎ হবে না, তবে এই ত্রাণটি রক্তের যেত কণিকাকে আন্তে আন্তে ধ্বংস করে ফেলবে বলে মনে হয়—

লছমন। তা করুক না ডক্টর সেনশর্মা, আমাদের ভাতে কি? আমাদের শ্রেফ মুনাকা গোটা নিয়ে কথা। এই নিন আপনার টেট টিউব। বাবুজী খুব খুশী হবেন এই নতুন আবিষ্কারের কথা শুনে। আচ্ছা, সত্যেনের গলা শুনছিলাম একটু আগে, ওকি কিছু আঁচ করেছে এখানকার ব্যাপার ল্যাপার?

ডঃ সেনশর্মা। না, আঁচ এখনো করে নি, তবে—

লছমন। তবে?

ডঃ সেনশর্মা। তবে ওর মনে একটা বেরাড়া কোঁতুহল চাড়া দিয়ে উঠেছে বলে মনে হচ্ছে। এক কাজ করো, ওর সাইনেটা এবার ঝড়িয়ে দাও লছমন। জানো তো, টাকার মধ্যে বিব আছে, সে বিবে আচ্ছন্ন হয়ে থাক

ওর মন, অসাড় করে তুলুক ওর শরীর, দেখবে তখন সব কৌতূহল, সব অল্পলক্ষিসা মরে যাবে, ও হয়ে যাবে এই টেই টিউবটার মতোই নিস্তা—

লছমন। ঠিক আছে ডক্টর সেনশর্মী বলব আমি বাবুজীকে, বাবুজীর কোনো অমত হবে না কারণ আপনি যখন বা বলেছেন তাই তো মঞ্জুর হয়ে এসেছে চিরকাল—

ডঃ সেনশর্মী। হ্যাঁ, সে স্বাধীনতাটুকু তোমার বাবা আমাকে দিয়েছেন বলেই আমি টিকে আছি এখানে। এখানে আমার কথাই আইন, আমার নির্দেশ অমোঘ, কিন্তু যে দিন এর ব্যতিক্রম হবে সে দিন আমার রক্তমূর্তি দেখতে প্রস্তুত থেকো লছমন—

লছমন। না না, সে কি কথা, ব্যতিক্রম হবে কেন? আপনি নিশ্চিত থাকুন স্যার, সে দিন কখনো আসবে না। আমার কারবারী লোক, আপনার মতো বিজ্ঞান প্রতিভার দাম আমরা জানি—

ডঃ সেনশর্মী। সত্যোৎকণ্ঠ আমি আমার মতো করেই গড়ে তুলব, ওর ওপর কেন যেন আমার একটা স্নেহ জন্মে গেছে—

লছমন। আমি তা হলে এখন যাই স্যার, বাবুজীকে নিশ্চিত করি গিয়ে—

ডঃ সেনশর্মী। বাও—

লছমনের প্রস্থান

ডক্টর সেন শর্মী উঠে দাঁড়ালেন। চুকটে ঘন ঘন চান দিয়ে দেখলেন যে চুকটটা নিতে গেছে—

ডঃ সেনশর্মী। (স্বগতঃ) চুকটটাও দেখছি সময় বুঝে নিতে গেছে, আমার কিন্তু নিততে এখনো ঢের দেয়ী, দিয়াশলাইটা আমার কোথায় গেল? এই যে পেয়েছি, —আঃ-কাঠিগুলো জলছে না কেন? দিয়াশলাই এর বাকরের বগলে গোবরের পুঁটুলি দেখছি, দেশটা যে জেজালে ছেয়ে গেল,—বাক্ নিশ্চি হয়ে বাক সব, এ মরুভূমি হীন জাতির বেঁচে থাকার কোনো অর্থ হয় না—

[হাত দুটো পেছনে মুঠো করে বেঁধে টেবিলের সামনে, সম্মুখ কাঁকা জায়গাটুকুতে পাইচারী করতে লাগলেন]

হ্যাঁ, অর্থ। অর্থই সব। সবাই বলে যে টাকাই সব কিছু কিনতে পারে বর্তমান হুনিয়ার, মান, সম্মান, সম্মান প্রতিপত্তি, এমন কি স্বাধীনও সব কিছুই কেনা যায়

টাকার জোরে। আর আমার অনেক টাকা কিন্তু কই, তবু বুকের ভেতরে চেপে বসে নেই পুরোনো বেঘনাটাকে তো সন্ন্যাসে পারলাম না এখনো, তুলতে তো পারলাম না তাকে! সে পাশে থাকলে জীবনের গতিপথ হয়তো অন্য ধারায় বইতো। উঃ কতকাল, আর কতকাল এই দুঃসহ জালা বুকে বসে নিরে বেড়াবো। স্থনীতি,—আমার আসতে একটু দেয়ী হয়ে গিয়েছিল, তাই কি তুমি অভিমানে দূরে সরে গেলে!

সঞ্জয়। (একপেরিমেন্ট টেবিলে কাজ করতে করতে মুখ ফিরিয়ে) স্যার—

ডঃ সেনশর্মী। (ধমক দিয়ে) ভোট ডিটার্ব মি সঞ্জয়—নিজের কাজ করে বাও—

সঞ্জয়। তাই তো করছি স্যার, কিন্তু—

ডঃ সেনশর্মী। কিন্তু কী?

সঞ্জয়। এ ইকোয়েশনটার তুল আছে বলে মনে হচ্ছে স্যার, কেমিক্যাল রি-এ্যাকশানে ঠিক রেজাল্ট আগছে না—

ডঃ সেনশর্মী। তুল? আমার তুল? অসম্ভব—কমল সেনশর্মী জীবনে কোনোদিন তুল করে নি,—হ্যাঁ, মাত্র একবার ছাড়া, আর সেই মারাত্মক তুলের জন্যই তার জীবনটা হুমহাড়া হয়ে গেছে—

সঞ্জয়। সে তুল শোধরাবার আর কি কোনো উপায় নেই স্যার?

ডঃ সেনশর্মী। না সঞ্জয়, আর কোনো উপায় নেই আমার ছোট তুলের পর আমারই দেশের লোক আরও বড়ো তুল করে বসেছে, তুলের পাহাড় তৈরী হয়ে গেছে আর এটা এমনই মজবুত পাহাড় যে সদিচ্ছার কোনো ডিনামাইট দিয়েও এটা ভাঙা সম্ভব নয় আর—

সঞ্জয়। একজন বিজ্ঞানী হয়ে আপনার একথা মার্জি কি করে স্যার—

ডঃ সেনশর্মী। এমন অনেক অজ্ঞাত অস্ত্রকার সম্ভব আছে যার ওপর বিজ্ঞানও তার প্রথম আলো ফেলতে পারে না, মলকে ভালো আর ভালোকে মল করা বিজ্ঞানোদ্ধারতার বাইরে সঞ্জয়।

সঞ্জয়। কিন্তু মাল্লবের পক্ষে তা সম্ভব স্যার, সদিচ্ছ থাকলে সমস্তর সমাধান আপনিই হয়ে যায়—

ডঃ সেনশর্মা। তা বার বটে, কিন্তু সে মন জীবন্ত, তাজা হওয়া চাই সঙ্গ, মাহুকের মন আজ মরে গেছে, সঙ্গ—মরে গেছে সব সঙ্গী। বার্থ আজ বিকট মূর্তি ধরে সারা পৃথিবী চেষ্টে বেড়াচ্ছে, মাহুকের জাতিতেই আজ মরণ ধরে গেছে। এ জাতিকে নিশ্চিহ্ন করে দিলেই আবার পৃথিবীর বকে নতুন মাহুকের ফসল ফলবে—

সঙ্গ। আগনার কথা শুনে ভয় পাচ্ছি স্তার—

ডঃ সেনশর্মা। ভয় পাচ্ছ? ভয়? হাঃ, হাঃ, হাঃ, হাঃ, হাঃ, (হঠাৎ পাগলের মতো হেসে উঠলেন)।

বেয়ারা রামদহিনের প্রবেশ

রামদহিন। হজুর হজুর—

ডঃ সেনশর্মা। ক্যা মংতা রামদহিন?

রামদহিন। এক আওরং বাহর যে খড়ী বা, সত্যেন বাবুলে ভেঁট করেকে মালতান—

ডঃ সেনশর্মা। আওরং? কৈসী আওরং?

রামদহিন। হাম নৈ থে পহচানী—সেয়ানা আউর খুবহুরং বা—

ডঃ সেনশর্মা। বোল দেও কোই বাহর কা আদমী কো হিঁয়া আনা মনা টৈ, ভেট নেহী হোগা—

রামদহিন। লেकिन হজুর—

ডঃ সেনশর্মা। (ধমক দিয়ে) দিক মং করো,— বাও—

অঞ্জলি ব্যস্ত পায়ে ঘরে ঢুকে দোর গোড়ায়

এসে দাঁড়াল

অঞ্জলি। আমাকে মাপ করবেন, অহুমতির অপেক্ষা না করেই ভেতরে এসেছি, বড্ড বিপদে পড়েছি বলেই—

ডঃ সেনশর্মা। (ঘুরে দাঁড়িয়ে অঞ্জলির মুখে তাকিয়ে) একী, সুনীতি!! তুমি এখানে? কী আশ্চর্য! আমি যে একটু আগেই তোমার কথাই ভাবছিলাম—

অঞ্জলি। সুনীতি? সুনীতি আপনি কাকে বলছেন? আমার নাম তো অঞ্জলি,—

ডঃ সেনশর্মা। (স্বগতঃ) হুঁজনের চেহারায় এত মিল। হঠাৎ একে দেখে আমার মনে হচ্ছে যে কালের অবগুষ্ঠন-টুকু ঘুচিয়ে দিয়ে অনেক দিন আগের সেই চিরচেনা সুনীতি যেন তার ছলছল লাংগোর জোয়ারে ভেসে এসে দাঁড়িয়েছে আমার সামনে—

অঞ্জলি। (স্বগতঃ) এই বুড়োটা কি রকম লোক? সেই থেকে একদৃষ্টে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে, কী বিজ্ঞী—(প্রকাশ্যে) ইয়ে,—আমার দাদা সত্যেনবাবুকে একটু ডেকে দিন না দয়া করে, বড্ড দেবী হয়ে যাচ্ছে যে—

ডঃ সেনশর্মা। আই আম সো সরি, আমি তোমাকে অন্ত কেউ বলে ভেবেছিলাম প্রথমে,—আমারই ভুল, কিছু মনে কোরোনা তুমি,—ই্যা কি বলছিলে সত্যেনের কথা?

অঞ্জলি। তিনি আমার দাদা, তাঁর সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই, জরুরী দরকার—

ডঃ সেনশর্মা। তোমার দাদা এখন একটা রিসার্চ নিয়ে ভরানক ব্যস্ত আছেন, এখন তো তাকে ডাকা যাবে না—

অঞ্জলি। কিন্তু আমাকে যে দেখা করতেই হবে—

ডঃ সেনশর্মা। (স্বগতঃ) কথাগুলোও অবিকল সুনীতির মতো—(প্রকাশ্যে) দেখা করতেই হবে? এতই তাড়া—

অঞ্জলি। বাঃ তাড়া হবে না? মা যে হঠাৎ ভরানক অস্থস্থ হয়ে পড়েছেন, খুব বাড়াবাড়ি, আমি তো দাদাকে নিরোঁ যেতেই এসেছি—

ডঃ সেনশর্মা। বটে! কী হয়েছে তোমার মার?

অঞ্জলি। আজ দুপুরে ক্রান্তিতে নিতে হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে গেছেন, সমস্ত শরীরে শিঁচুনী, হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। হেডমিস্ট্রেস একটা ট্যাক্সি ডেকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন।

ডঃ সেনশর্মা। ডাক্তার ডাকো নি?

অঞ্জলি। ই্যা, খবর পেয়ে ডাক্তার রায় এসে দেখে ছুঁটো ইন্জেকশন দিয়েছেন, তিনিই বললেন—তাড়াতাড়ি দাদাকে ডেকে আনতে—

ডঃ সেনশর্মা। ভয় নেই, ইন্জেকশন পড়েছে,—এবার তাড়াতাড়ি সেরে উঠবেন তোমার মা।

অঞ্জলি। মা দাদাকে দেখবার অন্ত খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন, ডেকে দিন না দাদাকে,—বড্ড দেবী হয়ে গেল—প্রীত্—

ডঃ সেনশর্মা। আচ্ছা—আচ্ছা, আমি কিছু ব্যবস্থা করে,—(উচু গলায়) রামদহিন—

রামদহিন। (দূর থেকে) হজুর—

ডঃ সেনশর্মা। ইথার আগ জলদি—

রামদহিনের প্রবেশ

রামদহিন। ফরমাইয়ে মালিক—

ডঃ সেনশর্মা। সত্যেনবাবুকে বলাও,—ত্বরন্ত।

রামদহিন। বহুত আচ্ছা হজুর,—

[প্রস্থান]

ডঃ সেনশর্মা। অঞ্জলি, তুমি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছো, বোসো ঐ চেয়ারটা—

তু'জনে দু'টি চেয়ার নিয়ে বসল

ডঃ সেনশর্মা। তোমার বাবা নেই?

অঞ্জলি। আছেন—

ডঃ সেনশর্মা। কি করেন তিনি?

অঞ্জলি। প্রফেসরি করতেন আগে, কিন্তু হঠাৎ একদিন চলন্ত বাসে উঠতে গিয়ে এক্সিডেন্ট করে বা-পাটি তেড়ে যায়,—

ডঃ সেনশর্মা। আই আম সো সরি, তোমার মা বুঝি স্থলে পড়ান?

অঞ্জলি। আজ্ঞে ইয়া—

ক্রম পড়ে সত্যেনের প্রবেশ

সত্যেন। আমার ডাকছিলেন স্যার? একি! অঙ্ক?

তুই এখানে?

অঞ্জলি। (উঠে দাঁড়িয়ে) দাদা, মা হঠাৎ ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়েছেন—

সত্যেন। সে কিরে। কখন?

অঞ্জলি। আজ দুপুরে পেপ্সিনোজেন ট্যাবলেট খাবার পরেই শরীরটা মার কেমন কেমন করছিল, কিন্তু জ্ঞা গ্রাহ্য না করেই মা স্থলে গিয়েছিলেন—

সত্যেন। তারপর?

অঞ্জলি। তারপর ক্লাস নিতে নিতে মাথা ঘুরে পড়ে গিয়ে অজ্ঞান।

সত্যেন। পেপ্সিনোজেন ট্যাবলেট তো মা বরা-বরই খান, কিন্তু এ রকম তো এর আগে হয় নি কখনো—

অঞ্জলি। ডাক্তার রায়ও তাই বললেন, তারপর পেপ্সিনোজেনের কাইলটা আমার কাছ থেকে চেয়ে নিলেন—

ডঃ সেনশর্মা। পেপ্সিনোজেন? তোমার মা পেপ্সিনোজেন ট্যাবলেট খান? কিন্তু কেন?

অঞ্জলি। ছেলেবেলা থেকেই মার পেটে ঝাঁকে মাঝে একটা ভয়ানক ঘন্ত্রণা হয়—

সত্যেন। তাই ডাক্তার রায় মাঝে পেপ্সিনোজেন ট্যাবলেট খেতে বলেছিলেন,—আমি তা হলে বাই স্যার,— এক্সপেরিমেন্টার বেটুকু বাকী আছে সেটুকু কাল এসে শেষ করব, চল অঙ্ক—

ডঃ সেনশর্মা। একটু দাঁড়াও,—(স্বগতঃ) ছেলেবেলা থেকে মাঝে মাঝে পেটে ভয়ানক ঘন্ত্রণা! পেপ্সিনোজেন পেপ্সিনোজেন,—তাইতো—(প্রকাশ্যে) অঞ্জলি, তোমার মা কি ছেলেবেলায় ঢাকার থাকতেন?

অঞ্জলি। ইয়া, পার্টিশনের আগে, কিন্তু কেন বলুন তো—

ডঃ সেনশর্মা। (অস্থির ভাবে উঠে দাঁড়িয়ে) (স্বগতঃ) কী আশ্চর্য বোগাযোগ! একি তবে সে? (প্রকাশ্যে) সত্যেন, আমিও যাবো তোমাদের সঙ্গে—

সত্যেন ও অঞ্জলি। (একসঙ্গে) সে কি! কোথায়?

ডঃ সেনশর্মা। তোমাদের বাড়ি, তোমার মাঝে দেখতে—

সত্যেন। হঠাৎ এ খেয়াল হল কেন স্যার?

ডঃ সেনশর্মা। পেপ্সিনোজেন ট্যাবলেট যে হজুমান-মল গুজরমল,—না না, এ আমি কী বলছি,—মানে তোমার মায়ের অসুস্থের কথা শুনে মনটা হঠাৎ কেমন যেন চক্‌ল হয়ে উঠেছে, মরা মন যেন আবার বেঁচে উঠেছে—

অঞ্জলি। মরা মন?

ডঃ সেনশর্মা। ইয়া, বাকি হারিয়ে আমার মন মরে গিয়েছিল আজ তারই কথা বার বার মনে আসছে, মনে পড়ছে আমার প্রথম যৌবনের সঙ্গিনী স্ত্রীত্বের কথা,—বাকি হারিয়ে আমি পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিলাম,—তার পেটেও মাঝে মাঝে একটা ভয়ানক ঘন্ত্রণা হ'ত, বেদনার নীল হয়ে যেতো সারা শরীর,—তাই দেখেই তো আমি ফলিত রসায়নে এম, এস, সি পাশ করে ওষুধ তৈরীকরার ব্যাপারে রিসার্চ করতে জার্মেনী গিয়েছিলাম—যাতে তার এ দুঃসহ ব্যথা সারাবার ওষুধ আবিষ্কার করতে পারি—

অঞ্জলি। তার পর? সারিয়ে ফুললেন কীকে?

ডঃ সেনশর্ম। কাকে সারাবো? আমি কিরে আসবার আগেই যে সে ফেরার হয়ে গেল—

সত্যেন। বলেন কি স্ত্রীর ফেরার?

ডঃ সেনশর্ম। কাকি দিল আমাকে—

অজলি। আহা, মারা গেছেন বুঝি?

ডঃ সেনশর্ম। না না, মারা সে যায়নি। আমি জামেনী থেকে ফিরে আসবার আগেই তারতর্ষ স্বাধীন হল, বাংলা দেশ তেজে হুঁ টুকরো হল, আর সেই অন্ধকার দিনে দাক্ষার প্রাণে আমার জন্ত চির জীবন প্রতীক্ষা করে থাকবার কথা তুলে কোথায় যেন ভেগে গেল স্মৃতি,—

সত্যেন। আহা—

ডঃ সেনশর্ম। ফিরে এসে হিন্দুস্থান আর পাকিস্তানের সব ব্যয়গায় আমি তাকে খুঁজেছি, কিন্তু দেখা আর পাইনি, হয়তো কোনো দাক্ষাবাহের হাতে লুটের মাল হিসেবে পড়ে জীবন্ত কবর হয়ে গেছে তার, কিংবা হয়তো কোনো—কিন্তু সে কথা এখন থাক, চলো আমার গাড়িতে, তোমাদের পৌঁছে দিয়ে আসি, কোনো যেরে স্মৃতির মতো কষ্ট পাচ্ছে ভাবলে আমি আর স্থির থাকতে পারি না—

সত্যেন। তবে চলুন স্ত্রীর—

তিন জনের প্রস্থান

(ষ্টেক্স আন্তে আন্তে অন্ধকার হয়ে এলো)

তৃতীয় দৃশ্য

[হুমানমল গুজরমের গদী! সামনে ফরাসের ওপর তাকিয়ার ঠেস দিয়ে বসে আছে হুমানমল গুজরমল। বয়েস প্রায় ষাট, শক্ত গড়ন। পরণে খাটো ধুতি, গারে সাদা ফতুয়া, কপালে সাদা চন্দনের কোঁট, কানে মাকড়ি, বাহুতে পাঁচ ছ ভরি ওজনের সোনার তারিজ বাঁধা। বিপুল ভুড়ি, বাঘের মতো প্রকাণ্ড মুখ। সামনে ডিনটে টেলিফোন।

পেছন দিকে চার পাঁচ জন কর্মচারী লাল মলাটের খেরো খাতার কিসের হিসেব লিখেছে। কুলুঙ্গিতে গণেশ ঠাকুর। পেছনে দুটি আধুনিক লোহার সিঁদুক, তার মাঝার ভেল-সিঁদুর লাগানো] (বিকেল বেলা)

হুমানমল। (সাদা রংএর টেলিফোন তুলে) হ্যালো বোবাই?...কে বলছেন? হাঁ হাঁ—আমিই হুমানমল

গুজরমল,...গদী থেকে কথা বলছি, আচ্ছা:...গদাম ভেল কি তাও যাচ্ছে...ঠিক আছে, বিশ লাখ টাকার মাল ধরে রাখুন,...হাঁ—

রামনাথ পোন্ধারের প্রবেশ

[পাকানো চেহারা, বয়েস আন্দাজ করা শক্ত, তোবড়ানো গাল, চোখে মুখে ধূর্ততা, খন্দরের ধূতি পাঞ্জাবি পরা, মাঝার গান্ধীটুপি]

রামনাথ। রাম রাম হুমানমলবাবু—

হুমানমল। (কোন রেখে) আরে আরে রামনাথবাবু যে, কী মনে করে? বহন—ওরে মনিয়া, পোন্ধার মশাকে ঠাণ্ডা সরবৎ দে—

রামনাথ। গন্তর্ঘমেট বড়ো বাড়াবাড়ি শুরু করেছে হুমানমলবাবু, আমি তো আর মাল ধরে রাখতে সাহস পাচ্ছি না—

(সরবৎ হাতে মনিয়ার প্রবেশ)

হুমানমল। নিন, আগে সরবৎ খান, ঠাণ্ডা হন।

রামনাথ (সরবৎ খেয়ে মাস ফিরিয়ে দিয়ে) ঠাণ্ডা হবার জন্ত সরবৎ খাবার দরকার ছিল না হুমানমলবাবু, তবে আমার হাত পা এমনিতেই ঠাণ্ডা হয়ে এগেছে—

মনিয়ার প্রস্থান

হুমানমল। বিজনেস করে আপনার চুল পেকে গেছে বটে, কিন্তু বুদ্ধি এখনো পাকেনি রামনাথবাবু—

রামনাথ। এ আপনি কি বলছেন হুমানমলবাবু? গত একমাস ধরে ছোট বড়ো সব রকমের মন্ত্রীদের হুমকিগুলো কি থবরের কাগজে পড়েন নি?

হুমানমল। পড়েছি বৈ কি, বেডিওতে ভি শুনেছি—

রামনাথ। তবে?

হুমানমল। পড়েছি আর মনে মনে হেসেছি—

রামনাথ। ঐ গরম গরম পাণ্ডা ভরতি বক্তৃতা পড়ে আপনি হেসেছেন?

হুমানমল। হাসব না তো কি! আপনি কি ঐ সব হুমকিগুলো সত্যি বলে মনে করে বসে আছেন?

রামনাথ। হ্যাঁ, তা কিছুটা—

হুমানমল। কিছু না, কিছু না, ও সব হচ্ছে শ্রেক্

ভাঁওতা—

রামনাথ। ভাঁওতা, কাকে?

হুম্মানমল। পাব্লিক নামে ছোটছেলেকে
ভোলবার কথা ওসব, উচ্চাংগের রাজনীতি, আপনি ওসব
নিরে মোটেই মাথা ঘামাবেন না রামনাথবাবু—

রামনাথ। কিন্তু সেদিন যে বেশী দামে চাল বিক্রী
করবার জন্ত আমাদের পাড়ার ছিদামমুদীকে ধরে নিয়ে
গেল পুলিশ—

হুম্মানমল। আরে সে তো ধরবেই,—ছিদাম মুদী,
রামধন পসারী, বাহাদুর দাস, ক্ষিরি মেছুনী, নফরা
জেল, এদের তো ধরবেই পুলিশে, বিচারে দশবিশ টাকা
জরিমানাও হবে, খবরের কাগজে সরকারের সুখ্যাতি
বার হবে,—তা বলে কি আর আমি আপনি ধরা পড়ব?
তা পড়ব না—

রামনাথ। কিন্তু—

হুম্মানমল। এর মধ্যে আর কিন্তু বলে কিছু নেই
রামনাথবাবু, আপনি নিশ্চিন্ত মনে চুটিয়ে বাবসা চালিয়ে
যান, কোনো মিক্রার সাধা নেই যে আমাদের গারে হাত
দেয়। এই যে আমরা পার্টি কাণ্ডে হাজার হাজার টাকা
টাকা দিচ্ছি সে কি মাগ্না? পাব্লিকের কাছ থেকে
সে টাকা স্বল্প সময়ে তুলে নিতে হবে না? মজীরা যতো
গরম গরম বক্তৃতা কল্পন আর যতো হুমকিই দিন,
আমাদের গারে আঁচটিও লাগবে না জানবেন।

রামনাথ। এটিকে গোয়েন্দা পুলিশ কিন্তু পাড়ার
পাড়ার মজুদ তেল চাল আর ভেজালের খোঁজে ছোক
ছোক করে বেড়াচ্ছে—

হুম্মানমল। করুক না, ছোক না ঘুরে ঘুরে হয়রান,
আমাদের ভয়টা কি? ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে রাখব বোয়ালদের
মুখ বন্ধ করা আছে, চুনোপুঁটির কি করতে পারে
আমাদের?

রামনাথ। কিন্তু আমি বলি কি মজুদ চালের আধা-
আধি এখন বাজারে ছেড়ে দি, বাজার বেশ তেজী আছে,
ভাল লাভ লোটা বাবে—

হুম্মানমল। ও কথা মনের কোণেও স্থান দেবেন না
রামনাথবাবু, চালের দর তো মোটে পরতাল্লিশ টাকার
উঠেছে, বাট টাকার উঠুক তখন গুদাম খালি করার কথা
ভাবা বাবে, তা ছাড়া—

রামনাথ। তা ছাড়া আবার কি?

হুম্মানমল। তা ছাড়া এখন একসঙ্গে বাজারে অভ
ছাড়লে দাম পড়ে বাবে—

রামনাথ। দেখবেন শেষে অতি লোভে তাঁতি নই
না হয়—

হুম্মানমল। আরে না—

(টেলিফোনের শব্দ : ক্রিং ক্রিং ক্রিং)

(ফোন তুলে) হ্যালো, ...কে? স্বরজপ্রসাদ?...
কী ব্যাপার ...ও, ঠিক আছে, ...কটকে তার করে দাও,
গুদাম থেকে এক দানা চালও যেন কলকাতার না
পাঠায়, ই্যা পাথর কুচির ওয়গন আনলোড করে সে-
গুলো মিলে পেয়াই করে নিও, আর সেই সঙ্গে কিছু
বালি...সের প্রতি যেন দু'ছটাক ওজন বেড়ে যায়—ই্যা ই্যা
...আর শোন, বাজারে বত বাদাম তেল পাবে সব কিনে
গুদামজাত করো...আথেরে কাজে লাগবে...ই্যা ই্যা,
ভেজাল দেবে বই কি...আমি ল্যাবরেটরীতে ফোন করে
জেনে নিচ্ছি কি জিনিষ মেশাতে হবে...ই্যা ঠিক আছে,
আমি লুম্মানমলকেই পাঠাবো...আচ্ছা আচ্ছা ..

ফোন রেখে দিল

রামনাথ। কে ফোন করছিল হুম্মানমলবাবু?

হুম্মানমল। রথভলার গুদাম থেকে আমার কর্মচারী
স্বরজপ্রসাদ—

রামনাথ। ল্যাবরেটরীর কথা কী বলছিলেন?

হুম্মানমল। পাতিপুকুরে আমার একটা ল্যাবরেটরী
আছে জানেন না?

রামনাথ। ই্যা, তা তো জানি, ওষুধ তৈরী হয়
সেখানে—বিজ্ঞানের উৎসাহদাতা বলে বাজারে আপনার
কতো নাম, গত বছর পদ্মভূষণ হলেন তো শুধু এই
জগ্রেই—

হুম্মানমল। আপনি এখনো ছেলেরাভবই আছেন
রামনাথবাবু,—আমি কারবারী লোক, ওষুধ তৈরী করতে
গেলে পোদাবে কেন আমার—

রামনাথ। তবে কী হয় সেখানে?

হুম্মানমল। বড় বড় বৈজ্ঞানিকরা রিসার্চ করেন
সেখানে, মাসে পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচা হয় আমার ঐ
ল্যাবরেটরীর পেছনে—

রামনাথ। বাঃ, বিজ্ঞানের উন্নতির জন্ত এত টাকা

খরচা করেন আপনি? তাই হো দেশে আপনার এত স্থান—

হুমানমল। আরে রাম রাম! বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য বেন আমার রাতে ঘুম হচ্ছে না। খরচা করি শ্রেক্‌ নিজের উন্নতির জন্য—লাখ লাখ টাকা আমদানী হচ্ছে ঐ ল্যাবরেটরী থেকে!

রামনাথ। তাই বলুন। আমি এ দিকে ভাবছিলাম যে আপনার মতো ধুরন্ধর কারবারী লোকের মাথায় আর এ বদখেয়াল চাপল কেন?

হুমানমল। রামনাথবাবু, আপনি আমার নিজের লোক, তাই দুটো ভেতরের কথা বলতে আমার আপত্তি নেই। এটা হচ্ছে বিজ্ঞানের যুগ। ভেজালের কারবারে এই বিজ্ঞান যে কী আশ্চর্য সাহায্য করছে তা শুনে তাক লেগে যাবে আপনার। আমার কামধেয়ু ঘি'র নাম শুনেছেন তো?

রামনাথ। হাঁ হাঁ। কামধেয়ু ঘি'তো বাজারের আর সব ঘি-কে কোনঠাসা করে, ধরতে গেলে কান্না করে দিয়েছে—বাজার একেবারে ছেয়ে গেছে 'কামধেয়ু ঘি'এ—

হুমানমল। বছরে পাঁচ লাখ টাকা আমদানী হয় ঐ ঘি থেকে। কোনো কেমিস্টের বাবারও কমতা নেই যে ওটা আসল ঘি না বলে। সেইজন্যই তো ডক্টর সেন-শর্মাকে অত খাতির করে চলি আমি। 'কামধেয়ু ঘি'র সঙ্গে গরু বা মোষের দুধের কোনো সম্পর্কই নেই—

রামনাথ। বলেন কি হুমানমল বাবু—

হুমানমল। হাঁ, ওটা তৈরী হয় আমার পাতিপুকুরের ল্যাবরেটরীতে ডক্টর সেনশর্মার কমুলা অহুসারে—

রামনাথ। বটে! ডক্টর সেনশর্মার মাথা তো খুব—

হুমানমল। পনেরো বছর আগে জার্মেনী থেকে রসায়ন বিজ্ঞানে বিরাট এক ডিগ্রী নিয়ে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। গন্তর্ঘমেণ্টের চাকরী খুজছিল। মুকব্বীর জোর নেই,—কে ওকে মোটা মাইনের সরকারী চাকরী দেবে? শেষটার আমার নজরে পড়ামাত্র ওকে লুফে নিলাম আমি। ভেজাল ওষুধ তৈরী করার কাজে ওর কোনো জুড়ি নেই বাংলাদেশে—

(লাল টেলিফোন বেজে উঠল : ক্রিং ক্রিং ক্রিং)

(ফোন তুলে) হ্যালো, হাঁ আমি হুমানমল হুমানমল কথা বলছি। কী বললেন? আমার পাতিপুকুরের ল্যাবরেটরী সার্চ হবে?.....একী অসম্ভব কথা!...ও, ও, বুঝলাম...কখন? কাল দুপুরে?..হ্যাঁ হ্যাঁ, খবরটা দিয়ে সত্যিই খুব উপকার করলেন মিষ্টার গুপ্ত, আচ্ছা, একদিন গদীতে আসবেন, প্রণামী নিয়ে যাবেন...ঠিক আছে, এখন সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে—

রামনাথ। কী ব্যাপার হুমানমলবাবু?

হুমানমল। (বিরক্ত হয়ে) আঃ, সব কথা জানতে চাইবেন না রামনাথ বাবু, আপনি এবারে আসুন, আপনার সঙ্গে যে লেনদেন করবার কথাটা ছিল তা প'রে একদিন হবে—

রামনাথ। (উঠে দাঁড়িয়ে) দেখলেন তো, মন্ত্রীরা শুধু ফাঁকা আওয়াজই করে না—

হুমানমল। ফাঁকা না আসলি সে আমি বুঝব, আপনাকে তার জন্য ভাবতে হবে না, কারবারী লোককে ঘায়েল করা অত সোজা নয়, বাঁচবার হাজার পথ খোঁজা আছে—

রামনাথ। আচ্ছা, আপনি তবে সেই খোঁজা পথই খুঁজে বার করুন, আমি এখন বাই, রাম রাম—

হুমানমল। রাম রাম

এ মুনিয়া

রামনাথের প্রস্থান

(ভৃত্য মুনিয়ার প্রবেশ)

মুনিয়া। ক্যাঁ কঁহতে হৈ মালিক?

হুমানমল। লছমনমল কো বুলাও জলদী—

মুনিয়া। আতি বুলা লাতা হৈ মালিক—

মুনিয়ার প্রস্থান

হুমানমল। (স্বগত:) পুলিশ আমার পাতিপুকুরের ল্যাবরেটরীর হদিশ পেলে কি করে? এ নিশ্চয়ই ঐ সত্যেন ছোকরার কাজ, আচ্ছা গোলমালটা মিটুক, দেখে নেব তাকে। ভাগিন্দা পুলিশ মহলে আমার হুঁচার জন দোস্ত আছে, তাই খবরটা আগাম পেলাম। মালপত্র সব তাড়াতাড়ি সরিয়ে ফেলতে হবে।

(লছমনের প্রবেশ)

লছমন। হঠাৎ তলব কেন বাবুজী—

হুম্মানমল। ঘরের কথা বাইরে চলে যাচ্ছে লছমন, এর কারণ কি ?

লছমন। ঘরের কথা বাইরে ?

হুম্মানমল। হাঁ, খবর পেলাম যে পুলিশ আমার পাতিপুকুরের ল্যাবরেটরী সার্চ করবে—

লছমন। সে কি কথা বাবুজী ?

হুম্মানমল। তুমি এখনি চলে যাও লোকজন নিয়ে, মাল পত্র সব সরিয়ে ফেল, বিশেষ করে ভেজাল ওষুধ তৈরী করবার কোনো মাল মশলা যেন পুলিশের হাতে না পড়ে, বুঝলে ?

লছমন। ঠিক আছে বাবুজী। কিন্তু আমি ভাবছি যে পুলিশ-এ গোপন কথা জানলো কি করে ?

হুম্মানমল। তোমার বন্ধু সত্যেন নতুন ঢুকেছে ল্যাবরেটরীতে, আমার মনে হয় এ তারই কাজ, আমি খবর পেলাম যে পুলিশ ইনস্পেক্টর বিনয় বোস ওর দোস্ত—

লছমন। তা যদি হয় তা হলে আমাদের হাত থেকে ওর আর নিস্তার নেই। বন্ধু বলে রেয়াৎ করব না তাকে, হাঁ—

হুম্মানমল। তুমি কাল্ মিক্রাকে পাঠিয়ে দাও আমার কাছে, সত্যেনকে সরিয়ে দেবার ব্যবস্থা আমিই করব। মনে নেই সেই ভয়ানক সাধু ইনকাম্‌ট্যাক্স অফিসারের কথা ? ঠিক ভেমন করেই সরাতে হবে এই সত্যেনকে—কিন্তু তুমি আর দেরী করোনা লছমন, এক্ষণি রওনা হয়ে যাও—

লছমন। আচ্ছা বাবুজী

প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

[সত্যেনের বাড়ি। ভেতরের ঘরের বিছানায় মনোরমা নিশ্চল হয়ে শুয়ে আছেন, মাথার কাছে বসে তার মাথার হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন হরিহরবাবু। সামান্য ঝঙ্কলতার চিহ্ন ছড়িয়ে আছে চারদিকে।]

সদয় সন্ধ্যা

হরিহর। (মনোরমার মুখের ওপর খুঁকে) মনোরমা, মনোরমা, এ কি কথা বলছ না কেন ? বুকের ব্যাখ্যাটা

একটু কমল ? আঃ, অঞ্জলি এখনো ফিরল না কেন, একা একা এখন আমি কী করব—

(সবেগে বেলা'র প্রবেশ)

বেলা। কী, কী হয়েছে মাসীমার ?

হরিহর। ঐ দেখনা, মড়ার মতো পড়ে আছে, ডেকেও সাড়া পাচ্ছি না, কিন্তু তুমি কোথেকে এলে বেলা ? কে তোমাকে খবর দিল ?

বেলা। অঞ্জলি সত্যেনদাকে ডাকতে গেল পাতিপুকুর, পথে আমাদের বাড়িতে নেমে আমাকে বলল, 'মা একা আছে তুমি একবার যাও বেলাদি'—তুনেই আমি চলে এলাম—

হরিহর। বেশ করেছ, একা একা বড় ভাবনার পড়ে ছিলাম।

বেলা। ডাক্তার রায়কে ডেকে আনব একবার ?

হরিহর। ডাকতে হবে না তিনি নিজেই আসবেন বলে গেছেন, ঐ দেখ, জ্ঞান ফিরল বোধ হয়—

মনোরমা। (চোখ মেলে তাকিয়ে দুর্বল স্বরে)
তেঁটার বুক ফেটে যাচ্ছে,—একটু জল—

বেলা। জল ? এখনি দিচ্ছি মাসীমা—

(কাঁচের গ্লাস নিয়ে ঘরের কোণের কুঞ্জো থেকে জল গড়িয়ে এনে একটু একটু করে ঢেলে দিল মনোরমার মুখে)
এখন কেমন বোধ করছেন মাসীমা ?

মনোরমা। আমি বোধ হয় আর বাঁচব না বেলা, তোমাদের বিয়েটা দেখে যেতে পারলাম না এই যা দুঃখ—

বেলা। অমন কথা বলবেন না মাসীমা, ডাঃ রায় মস্ত বড়ো ডাক্তার, তাঁর চিকিৎসার নিশ্চয়ই ভালো হয়ে উঠবেন।

মনোরমা। বাঁচতেই তো আমি চাই বেলা, বাঁচার আমার বড়ো সাধ, এতদিনে একটু সুখের মুখ দেখেছি—
সত্যেন কোথায় মা ?

বেলা। অজু তাকে ডাকতে গেছে, এখনি এসে পড়বে, ঐ যে, বাইরে পারের শব্দ শুনছি—

[দ্রুত পায়ে ঘরে ঢুকলো সত্যেন, সঙ্গে অঞ্জলি, একটু পেছনে ডক্টর সেনশর্মা]

সত্যেন। মা—মা—কী হয়েছে তোমার মা ?

মনোরমা। সত্যেন এলি? কাছে আর বাবা, ভোর মুখখানা একবার দেখি—

সত্যেন। এই যে আমি মা—

মনোরমা। অবিকল—অবিকল তাঁর মতো দেখতে—
জীবন্ত প্রতিচ্ছবি—

সত্যেন। মা—কী বলছ তুমি মা? অজু,—মা তুল বকছে, শিগ্গির ডাক্তার রায়কে নিয়ে আর—

মনোরমা। না বাবা, তুল আমি বকছি না, তবে বেশ বুঝতে পারছি যে আমু আমার ফুরিয়ে এসেছে, উনি রইলেন, অজু রইলো, বেলাকে দেখিস, ও বড়ো ভালো মেয়ে রে,—একি! অজুর পাশে দাঁড়িয়ে ও কে? (চীৎকার করে) কে? কে ওখানে দাঁড়িয়ে?

ডঃ সেনশর্মা। (এগিয়ে এসে) আমি—আমি কমল সুনীতি—

মনোরমা। (উঠে বসবার চেষ্টা করতে করতে) কমল! তুমি—তুমি—এতদিনে এলে, আমি যে—

ডঃ সেনশর্মা। উঠো না, উঠো না—(ধরে আন্তে আন্তে মনোরমাকে শুইয়ে দিয়ে)—তোমার দেখা পেলাম এতেই আমার এতদিনের প্রতীক্ষা সার্থক হল সুনীতি—

মনোরমা। সেই তুমি এলে,—কিন্তু কতো দেরিতে, কত দেরিতে—

ডঃ সেনশর্মা। সে দেরীর জন্ত আমি দায়ী ছিলাম না সুনীতি, দায়ী ছিল দ্বিতীয় মহামুক, সে সময়ে শত্রুপক্ষ জার্মেনী থেকে কোনো মতেই আসা গেল না—

মনোরমা। অনেকদিন আশায় আশায় থেকে শেষে শুধু লোকসজ্জা মুছবার জন্তই ওঁকে সব কথা খুলে বললাম, উনি আমার পায়ে ঠাই দিলেন, তোমার ছেলেকে নিজের ছেলে বলে মানুস করলেন—

ডঃ সেনশর্মা। আমার ছেলে! এ তুমি বলছ কি সুনীতি?

মনোরমা। হ্যাঁ, আমাদের মুহূর্তের অসংখ্যের ফল ঐ সত্যেন,—আমি এখন মৃত্যু পথের পথিক তাই কোনো কথা আর গোপন করতে চাই না কমল—

ডঃ সেনশর্মা। কিন্তু এসব কথা তো কোনোদিন সুপাক্ষরেও—

মনোরমা। তোমার জার্মেনী বাবার আগের দিনের

ঘটনা এটা, কিন্তু তোমার তো কিছু না জানবার কথা নয় কমল, আমি নিজের হাতে চিঠি দিয়েছি তোমাকে—

ডঃ সেনশর্মা। আমি অমাত্য ছিলাম না সুনীতি, বিশ্বাস করো তোমার সে চিঠি পেলে মহাসমুদ্র সাঁতারে পার হয়ে আসতাম আমি—

মনোরমা। তোমাকে অবিশ্বাস করলে আমি যে নিজের ওপরই বিশ্বাস হারিয়ে ফেলব কমল, তুমি আজ দেশে জ্ঞানী গুণীদের মধ্যে একজন, এ যে আমার কত বড়ো গর্ব, কতো বড়ো দুঃখ—

ডঃ সেনশর্মা। সব মিথো, সব মিথো সুনীতি, আমি আর সে কমল নই, তোমাকে হারিয়ে মাহুকের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিলাম আমি, আমি আর এক অজ্ঞান নায়ক—

মনোরমা। একী বলছ তুমি! উঃ মাগো—

হরিহর। (মুখের ওপর বুক পড়ে) কী হল,—কী হল মনোরমা—

ডঃ সেনশর্মা। তুমি অমন করছ কেন সুনীতি, কোথায় তোমার কষ্ট হচ্ছে বলো, একটিবার বলো, আবার আমি সেই আগের মতো কমল হব সুনীতি, পাপে ভরা পৃষ্ঠা ক'টা জীবনের শাতা থেকে ছিঁড়ে ফেলব, শুধু তুমি স্বস্থ হও, সেরে-ওঠো, পেয়ে আবার হারানো আমার সইবে না সুনীতি—

মনোরমা। (কষ্টের সঙ্গে) বুকের ভেতরটা কেমন যেন অবশ হয়ে যাচ্ছে,—উঃ, মাগো,—কমল, কোথায় তুমি? একী—ঘরটা অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে কেন?

ডঃ সেনশর্মা। ডাক্তার, ডাক্তার,—একজন ডাক্তার চাই এক্ষুণি,—সত্যেন, বাবা,—তুমি ছুটে বাও, মাকে বাঁচাও, টাকার জন্ত ভেবো না,—সুনীতি—সুনীতি—

ডাক্তার রায়ের প্রবেশ

ডাক্তার রায়। বেতে হবে না, আমি নিজেই এসেছি, কই দেখি,—আপনারা একটু সরে দাঁড়ান—

(রোগিনীকে পরীক্ষা করে দেখে গভীর মুখে সিরিজ বায় করে একটা ইনজেকশন দিলেন)

সেব চেষ্টা হিসাবে এই ইনজেকশনটা দিয়ে দেখা যাক।

ডঃ সেনশর্ম। দেখ চেষ্টা। এ আপনি বলছেন কি ডাক্তারবাবু? অস্থখটা কি এভই সিরিয়াস?

ডাক্তার রায়। আসল অস্থখটা এমন কিছু সিরিয়াস ছিল না, তাকে সিরিয়াস করে তুলেছে একটি ভেজাল ওষুধ—

ডঃ সেনশর্ম। ভে-জা-ল-ও-বু-ধ!

ডাক্তার রায়। ইয়া, ভেজাল পেপ সিনোজেন ট্যাবলেট। আমি অ্যানালিসিস করে তার ভেতর সায়ানাইড পেয়েছি। ও কি, কী হল আপনার?

ডঃ সেনশর্ম। (অতি কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে) কই দেখি সেই স্পিরিয়াস ফাইলটা—

ডাক্তার রায়। এই যে নিন—

ডঃ সেনশর্ম। (ফাইলটা ছেঁ। মেরে নিজের হাতে নিয়ে একদৃষ্টে দেখতে দেখতে) স্বগতঃ হুম্, কোনো সন্দেহই নেই, ওঃ ভগবান্, এ আমি কী করেছি, কী করেছি (প্রকাশে) স্তনীতি—স্তনীতি—শোনো, আমিই—আমিই তোমাকে—

ডাক্তার রায়। কী বলছেন আপনি? স্তনীতি কে?

ডঃ সেনশর্ম। (নতজাহ্নু হয়ে মনোরমার মাথার কাছে মুখ নিয়ে) স্তনীতি,—আমিই তোমাকে খুন করেছি, আমাকে তুমি কোনোদিন ক্ষমা কোরো না—

ডাক্তার রায়। ব্যাপারটা তো কিছুই বুঝতে পালাম না, এমন করছেন কেন ইনি, সত্যেন, কে এই ভয়লোক?

সত্যেন। আমার বাবা!

ডাক্তার রায়। (চমকে উঠে) তোমার বাবা!

সত্যেন। হুম্মানমল ল্যাবরেটরীর ডিরেক্টর ডক্টর কমল সেনশর্ম।

ডাক্তার রায়। আপনিই বিখ্যাত ডক্টর সেনশর্ম। আমার সৌভাগ্য যে আপনার দেখা পেলাম—

ডঃ সেনশর্ম। সৌভাগ্য নয় ডাক্তারবাবু, এ আপনার দুর্ভাগ্য—

ডাক্তার রায়। এ কী বলছেন ডক্টর সেনশর্ম?

ডঃ সেনশর্ম। আমি অপরাধী ডাক্তারবাবু, মানব-সমাজের অস্বস্ততম অপরাধে অপরাধী আমি। স্তনীতির মতো কতো শত নীচবনদীণ আমি নিতিনে দিয়েছি আমার বিবাক নিখালে—

হরিহর। তার মানে?

[পুলিশ অফিসারের ইউনিফর্ম পরিহিত বিনয়ের প্রবেশ, সঙ্গে দু'জন কনেটবল]

বিনয়। তার মানে আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি মেশোমশায়, ডক্টর সেনশর্ম, আপনাকে আমি ভারত বন্ধা আইনে গ্রেপ্তার করলাম,—লিপাহি,—হাতকড়া লাগাও—

কনেটবল এগি'য় এসে হাতকড়া লাগিয়ে দিল।

সত্যেন। এ তুমি কী করলে বিনদো।

ডঃ সেনশর্ম। সত্যেন, আমার অপরাধ গুরুতর, তুমি অফিসারকে তার কর্তব্য পালন করতে দাও,—অফিসার, আমি প্রস্তুত। সায়ানাইডের বিবে আচ্ছন্ন স্তনীতি ঘুমিয়ে পড়েছে,—আমি জানি ওর এ ঘুম আর ভাঙবে না। আমার বাতে ফাঁসি হয় আপনি তার ব্যবস্থাই করুন অফিসার—

সত্যেন। বাবা,—বাবা—

বিনয়। বিচারের তার আমার ওপর নয় ডক্টর সেনশর্ম, সে তার আদালতের। তবে আপনি যদি রাজসাক্ষী হয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে সব কথা খুলে বলেন তা হলে সরকারের অহুকম্পা পেতে পারেন—

ডঃ সেনশর্ম। অহুকম্পা আমি চাই না অফিসার, আমি চাই ঘণা, ইয়া, সবাই আমাকে ঘৃণা করুক, সবাই আমাকে দিকৃত করুক, এ অভিশপ্ত জীবনের অবসানই আমি চাই। তবে যাবার আগে বারো আমাকে এ পথে নামিয়েছিল তাদের মুখোশ আমি খুলে দেব। বারো টাকার জোরে আমার বিজ্ঞানপ্রতিভাকে মাহুঘের কল্যাণকর কাজে নিযুক্ত না করে নিযুক্ত করেছিল ভেজাল খাবার আর ভেজাল ওষুধ তৈরী করার কাজে—তাদের ওপর সরকার আর সমাজের নিষেধ রোধ নেমে আসুক এই আমি দেখতে চাই—

বিনয়। তা আপনি দেখতে পাবেন ডক্টর সেনশর্ম, লছমনমল হুম্মানমলকে আমরা গ্রেপ্তার করেছি, হুম্মানমল গুজরমলের বাড়িও একত্রে ঘিরে বেলেছে পুলিশ।

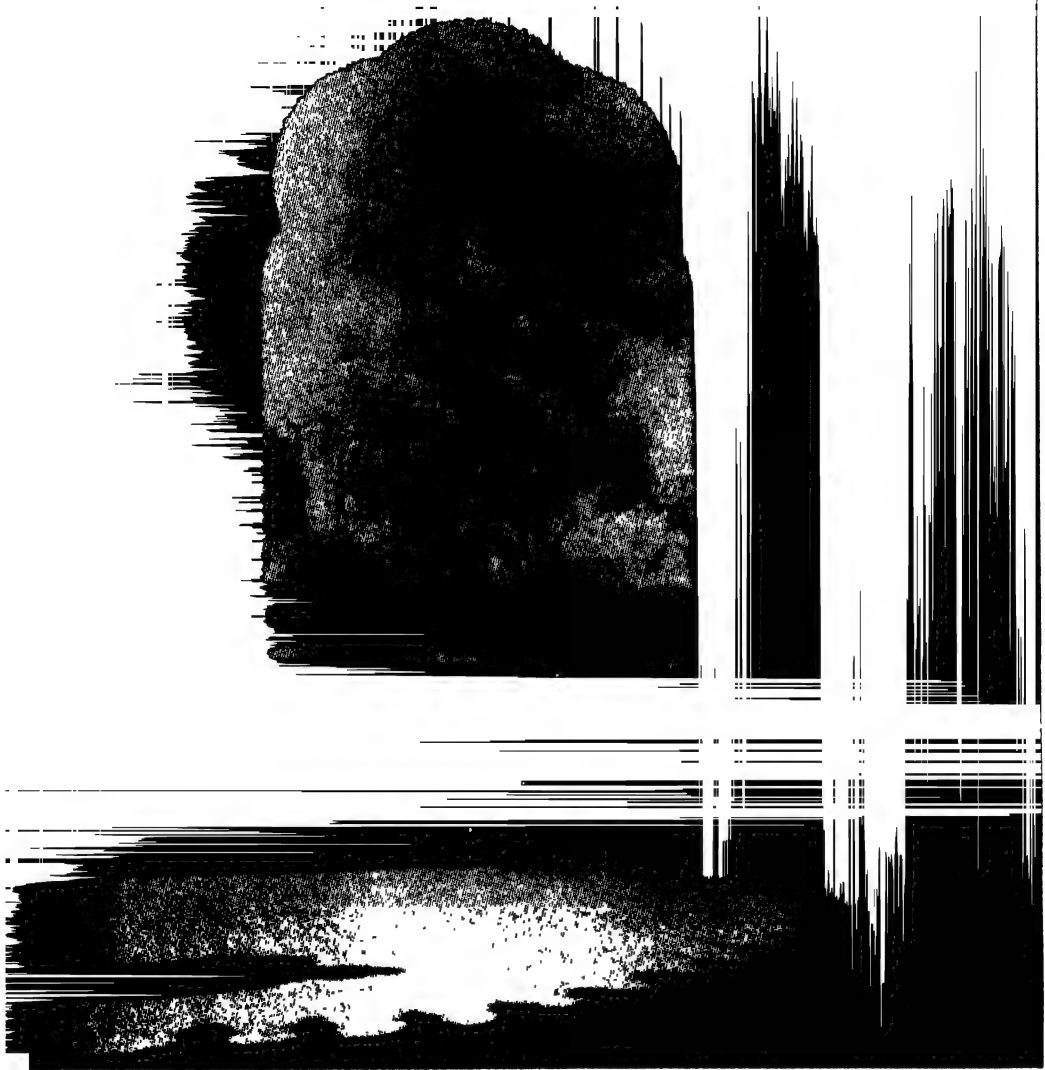
ডক্টর সেনশর্ম। আপনি ওদের চিনলেন কি করে অফিসার?

বিনয়। একটু আগেই যে আমরা পাতিপুকুরের হুম্মানমল ল্যাবরেটরীতে হানা দিয়েছিলাম। আপত্তিকর



রূপায় ভাবত

ফটো: বামকিঙ্কর সিংহ



ইতিহাসের দ্বারপথে

কটো : সন্তোষকুমার দাস

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

জিনিষপত্র সরাবার সময়ে হাতে নাতে গ্রেপ্তার করেছি লছমনকে। আমাদেরই পাতা ফাঁদে ধরা পড়েছে সে, তা না হলে তাদের সেই দুর্গম গুপ্ত স্থানের খোঁজ আমরা কোনোদিনই পেতাম না—

ডঃ সেনশর্মা। ভালোই হয়েছে—পৃথিবী মানিস্তক হোক—

বেলা। কিন্তু ডক্টর সেনশর্মা যে এখানেই আছেন তা তুমি কি করে জানলে দাদা?

বিনয়। ল্যাবরেটরীর বেরারা রামদহিন ছবে আমাদেরই লোক, ছদ্মবেশে বেরারা সেজে ঢুকেছিল ওখানে—

ডঃ সেনশর্মা। কী আশ্চর্য! ওকে তো একটা হাবা-গোবা লোক বলেই জানতাম আমি—

সত্যেন। বিনয়দা, তুমি আমাকেও অ্যারেস্ট করো, বাবার মতো আমিও তো ঐ একই অপরাধে অপরাধী—

ডঃ সেনশর্মা। না না, সত্যেন, তুমি কেন অপরাধী হতে বাবে? তুমি ফুলের মতোই নিম্পাপ, পবিত্র। তুমি তো কিছুই জানতে না ভেতরের ব্যাপার, সে শুধু জানতাম আমি—

সত্যেন। কিন্তু আমার হাত দিয়েও তো কতো ভেজালের উপকরণ বেরিয়েছে, ঐ কালোবাজারীর পাপের টাকার বিব আমার শরীরে ঢুকেছে—আর সেই পাণেই বুঝি মা আজ আমাদের ছেড়ে যাচ্ছেন। আমাকে তুমি অ্যারেস্ট করো বিনয়দা, তোমার কর্তব্য পালন করো—

বেলা। (ছুটে এসে সত্যেনের হাত ধরে) এ কী পাগলামী করছ তুমি সত্যেন—

এত কথা জানার পরও কি আমার ওপর তোমার ঘৃণা হয় না বেলা—

বেলা। ঘৃণা! ঘৃণা হবে কেন সত্যেন? তোমার জন্মের জন্ত তো তুমি দায়ী নও, না কেনে যে কাজ করেছে তার জন্তও না, তবে কেন মিছিমিছি মনে কষ্ট পাচ্ছ আর আমাকেও কষ্ট দচ্ছ—

বিনয়। তুমি সরকারের পক্ষে প্রধান সাক্ষী হবে সত্যেন, তোমার মতো প্রতিভাবান বিজ্ঞানীকে বারো টাকার লোভে সমাজ ধ্বংসের কাজে লাগাতে পারে তাদের মতো ঘৃণা জীব আর অগতে নেই, আদালতে তাদের আলম চেয়ারটা প্রকাশ করে দেবে সত্যেন।

অঞ্জলি। দাদা, বাবা, ঐ দেখ না বেন কেমন করছে, মা—মা—

হরিহর। ডাক্তার রায়,—দেখুন দেখুন আপনার পেনশেন্টকে দেখুন।

(ডাক্তার রায় এগিয়ে এলেন)

অঞ্জলি। মা, মা, অমন করছ কেন মা? কোথাকি তোমার ওষ্ট হচ্ছে মা?

সত্যেন। (মনোরমার পারে মাথা ঝুঁজে) আমার পাণেই তোমার এ দশা মা—

ডঃ সেনশর্মা। অফিসার, জীবন্ত নরক কি একেই বলে? আমার বুকের ভেতরেই কি বাসা বেঁধেছে সেটা?

বিনয়। চুপ করুন, মাসীমা কী বেন বলছেন—

মনোরমা। (বিকৃত উচ্চারণে প্রলাপের ঘোরে) আমার সব কষ্ট দূর হয়ে যাচ্ছে ক্রমে ক্রমে,—এই তো ঢাকা নগর, ঐ বড়ি গঙ্গা, ঐ রমনার মাঠ—আঃ, কী সুন্দর নরম সবুজ ঘাস,...কমলদা, এসো না, মাঠে নেমে দু'জনে লুকোচুরি খেলি, আমি তোমাকে ঠিক খুঁজে বার করব; কমলদা, তুমি জার্মেনী বাবে? মস্ত বৈজ্ঞানিক হবে তুমি, দেশ বিদেশের সম্মান কুড়াবে। আ ম—আমি তোমার বোংগা মই কমলদা, আমি চলে যাচ্ছি, ঐ যে, কারা বেন হাতছানী দিয়ে ডাকছে আমাকে, বাই, বাই,—ছোটখর থেকে বড়ো ঘরে বাই,—আঃ—

সত্যেন ও অঞ্জলি। (মনোরমার ওপর উপুড় হয়ে পড়ে) মা—মা—

ডঃ রায়। তোমাদের মা আর নেই সত্যেন—

বেলা। মেশোমশার পড়ে যাবেন যে, আমাকে ধরুন, বহন এই চেয়ারটাতে—

ডঃ সেনশর্মা। সুনীতি, দেখা পেয়েও আমার তোমাকে হারগাতে হল, এরকম আর কেউ দায়ী নয়, দায়ী শুধু আমি। টাকার নেশা আমাকে ভুল পথে নিয়ে গিয়েছিল। আমি কোনো দিনই তোমার বোংগা ছিলায় না। হরিহর-বাবু মহাপ্রাণ, তুমি বোংগা অশ্রুই পেয়েছিলে। অফিসার, আপনার লক-আপে নিয়ে চলুন আমাকে। আমার সঙ্গে বিব নাহি, একমাত্র ফাঁসির দাড়ই মুছতে পারে সে বিব।

বিনয়। সিপাহী—লে চলো আগামীকো।

(ডঃ সেনশর্মাকে নিয়ে কনেটবল দু'জন আর বিনয় আঙু আঙু বেরিয়ে গেল। স্টেজে আছে আছে নেদে এলো অন্ধকার)

বাংলাগল্প : সাংবাদিকতা : ব্রহ্মবান্ধব উপাখ্যায়

শ্রী প্রশান্তকুমার গঙ্গোপাধ্যায় এম. এ.

ব্রহ্মবান্ধব উপাখ্যায়ের আঁসলনাম ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এ নাম সংসার জীবনের। অথচ সংসার তিনি করেন নি। বিবেকানন্দের সহাধ্যায়ী। দুই বন্ধুর জীবনাচরণে তাই ঐক্যও দেখা যায়।

বাংলা সাহিত্যে আর একজন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিরল-খাত হয়ে আছেন। নামে ও পদবীতে এমন লাদৃশ ও কদাচিৎ ঘটে। শুধু নামে বা পদবীতেই বা কেন, অল্প বিষয়েও আছে ঐক্য। প্রথম ভবানীচরণের চন্দ্রনাম ‘প্রমথনাথ শর্মা’। এ নামেই তিনি লিখেছেন ‘কলিকাতা কমলালয়’ ‘নববাবুবিলাস’, নববিবিবিলাস। উনিশ শতকের দুই দশকের ভবানীচরণ (সমাচার চক্রিকার প্রকাশ বর্ষ) ওরফে প্রমথনাথ শর্মাও সাংবাদিক। ব্রহ্মবান্ধব অর্থাৎ দ্বিতীয় ভবানীচরণও সাংবাদিক। দুজনেই হিন্দু সংস্কৃতি ও সংস্কারে গভীর আশাহীন। প্রথম ভবানীচরণ শুরুতে ব্রহ্মবাদী—রায়মোহন রায়ের সমর্থক। মৃত্যুর ঘটনার পরে তিনি ‘সংবাদ চক্রিকা’ প্রকাশ করেন। প্রথম ভবানীচরণ সাংবাদিক, জাতীয় সংস্কার ও সংস্কৃতিতে আস্থাশীল। দ্বিতীয় ভবানীচরণ (উপাখ্যায়) প্রথম জীবনে ব্রাহ্ম, পরে খ্রীষ্টান, শেষে গোময়ভক্ষণ দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করেন। ইনিও সাংবাদিক, সংস্কার অহুগামী ও দেশাত্মবাদী। ‘সংবাদ-চক্রিকা’র প্রমথনাথ শর্মা (প্রথম ভবানী) ব্যক্তিবিজ্ঞপের শলাকায় নগরবিলাসীদের বিদ্ধ করতে বিধা করেন নি। দ্বিতীয় ভবানীচরণ (উপাখ্যায়) স্বদেশ চিন্তায় আত্মমগ্ন। ইংরেজ বিরোধিতার জলন্ত অগ্নিপিত্ত। এঁরও লেখায় বিজ্ঞপ-ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণতা আছে। আছে রক্তরসিকতা। কিন্তু এ বিজ্ঞপ নিরাসক্ত প্রেমিকের। ব্যক্তি কেন্দ্রিক নয়।

উপাখ্যায়ের সাংবাদিকতার সঙ্গে চলতি যুগের আংশিক-জন্মের সবটাই অমিল। আবার প্রথম ভবানীচরণের

সাংবাদিকতার সঙ্গেও আছে অনৈক্য। এই অনৈক্য, বৈসাদৃশ্যকে যুগের বিচারে দেখতে হবে।

সংবাদপত্রের সব কিছুই সাময়িক নয়। উপাখ্যায়ের “সন্ধ্যায়” বা প্রকাশিত হতো তার সবটাই সময় গভীতে আবদ্ধ নয়। কালকে অস্বীকার করে তাঁর কিছু কিছু রচনা বাংলা গল্পে অক্ষয় পরমায়ু অর্জন করেছে। অস্বীকার করা চলে না, অষ্টাদশ শতক থেকে আজকের সাহিত্য ও সাহিত্যিক সাময়িকপত্রকে আশ্রয় করেই গড়ে উঠেছে।

ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন : “...আদি নিবাস হুগলী জেলা।...অল্প বয়সে কেশব সেনের অহুগামী হয়ে ব্রাহ্ম হন। পরে প্রথমে প্রোটেষ্ট্যান্ট ও তারপরে ক্যাথলিক সাধুদের কঠোরতা দেখে তিনি ঐ ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং সে ক্ষেত্রে Roman Catholic Monk হন।...‘সন্ধ্যায়’ নানা রকম গরম গরম হাস্য-রসাত্মক প্রবন্ধ বাহির করতো। ...উপাখ্যায় মহাশয় বাংলা সাহিত্যে কি দিয়ে গেছেন তা আজকালকার লোক উপলব্ধি করে না।...উহাতে চলতি বাংলার রসাত্মক টীকা-টিলনী থাকত। একবার তিনি লিখলেন—হাইকোট স্বদেশী শৃংখর। আমার মকদ্দমার সময় আমি statement দিয়া আদালতের সঙ্গে অসহযোগ করিলাম। পরের দিন ম্যাজিস্ট্রেট আমার উকিল আওতোব চৌধুরীকে বলিল : Where do we stand now ? সেই দিনই ‘সন্ধ্যায়’ বার হলো—“তোমরা এখন বাবুঘাটে দাঁড়িয়েছ।” (ব্রহ্মবান্ধব উপাখ্যায়—শ্রীবলাই দেবশর্মা লিখিত পুস্তকের ত্রুটি থেকে)।

ঐতিহাসিক নজীর বলে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পুস্তনে বাংলা গল্পসাহিত্যের ব্যাপক শুরু। এই যুগই বৈচিত্র্যাত্মিকতার গভীর ধীর বিকাশ। রায়মোহন রায়ের সাংবাদিক ভাবা, মৃত্যুঞ্জয়ের প্রবোধচক্রিকার টাইল ভবানীচরণের (প্রমথনাথ শর্মা) সংস্কার-বদ্ধ সাংবাদিক রচনা-

শৈলী, অক্ষয়কুমার দত্তের তত্ত্বাবধিনীত ভাষা এক নয়। সাময়িক সাহিত্য তথা সংবাদপত্রের ভাষারীতি, উপস্থাপন-পদ্ধতি, বাকাবিক্রাস, পদগঠন পৃথক হওয়াই স্বাভাবিক।

‘সন্ধ্যা’ও দৈনিক সংবাদপত্র। প্রচলিত দৈনিকের সঙ্গে ‘সন্ধ্যা’র তফাৎ অনেকটা ভাষাও স্বতন্ত্র। সে ভাষা নতুন ধরণের। মুখের ভাষার লেখা সবচেয়ে কঠিন। বলতে কি, প্রথম চৌধুরীর চলিত ভাষা সাধারণ পাঠকের কাছে হৃদয় সংবাহী নয়। এ ভাষার রস-বোদ্ধাদের একটা শ্রেণী আছে। সে শ্রেণী বিদগ্ধ পাঠকেরা। কিন্তু ‘সন্ধ্যা’র পাঠক বিদগ্ধ এবং অ-বিদগ্ধ সকলেই। উপাখ্যান ‘সন্ধ্যা’, ‘করালী’ ও ‘স্বরাজ’-পত্রিকার যে ভাষা-রীতি নিয়েছিলেন তার কিছু কিছু অনুসরণ দেখি বারীজকুমার ঘোষ সম্পাদিত “যুগান্তর” (বিপ্লব যুগের) এবং কাজী নজরুল সম্পাদিত “ধুমকেতু” ও উপাখ্যান ভাব-শিষ্য বলাই দেবশর্মার লেখায়। দৈনিক পত্রিকায় চ্যাটাং চ্যাটাং, রসাল ভাষার ব্যবহার সার্থকভাবে ইনিই করেছেন। সে ভাষার নমুনা : “ছেলেরা দেখ দেখে (look look)—বোলে আমার পানে ছুটে আসে—পুরুষেরা মুচকে হাসে—আর মেমসাহেবরা একটু শিউরে উঠে বা অল্প দন্তকটিকোন্মদী বিস্তার করে।...আমি মনে করেছিলাম কেবল আমারই এই চরিত্র। তা নয়। আমার সব দেশীভাষাকে নজর-শিহরলি আর মুহূন্ম হাসি সহিতে হয়। তবে ইংরেজের পুষিাপুতুর সঙ্গে ছাটকোট পরিলে—কতকটা গোজামিল দিলে বেঁচে যাওয়া যায়।...বদি রংটা মটরভালবাটার মতন হয় আর খুব পুষিাপুতুরি করা হয়—তা হোলে রেহাই পাওয়া যেতে পারে।

...এখানে একজন ভারতবাসী আছেন। ইনি ঝন্-ঝনে সংস্কারক।

...এঁর রংটা একেবারে নাজলধরশ্যাম।...

...গ্রামান্তরে গেলাম। চাবাকুবা দেখে মনে ধারণা হয় যে, ইংরেজরা আমাদের মতনই মূব্ব। সেই চাব করে, মরাই বাঁধে, গরু চরায়।...অজ্ঞ-কার্ডে এক স্ত্রী-লোকের সত্য আছে। আমাকে সেই সত্যার হিন্দু গৃহ-স্থালী সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে হয়েছিল। এক অধ্যাপকের ঘরগী ভারি বিড়বা—সত্যাপতি (পত্নী) ছিলেন। ঘরের পাল সত্যার উপস্থিত আর হৃদয়জন পুরুষও ছিল।

আমাদের ছোটমেয়েরা কি রকম পুষাপুতুরের স্বপ্নকূটের ব্রত করে—গোলাপ টগর পাতায় বলেছিলাম। হিন্দু বিবাহের বিবরণ শুনে তারা ভারি খুশি। ঢেলা ভাণালি, শয্যা ভোলালি, বাগরঘর ইত্যাদিও বলতে হয়েছিল। ছাঁদনাতলায় বর কানমলা ও কীল খায় শুনে ঘরনীকে কেবল হো হো হাসি। ঘাটে নাইতে গিয়ে মেয়েমা কি রকম কমিট করে—শাড়ী কেবল ক’নে বউকে শায়েজ করে, স্বামী স্ত্রী অস্ত্রের সামনে বিশেষ গুরুত্বের সম্বন্ধে দেখাশোনা বা কথা কহিতে পারে না—আমরা ভালবেসে বিয়ে করিনে, বিয়ে করে ভালবাসি। সেদিন কোটে পণভরের মকদ্দমায় এক গ্রিনেট দাখিল হয়েছিল। তারমর্ম এইরূপ—আমার প্রণয়ী (ভাী স্বামী) আমাকে প্রাণের অপেক্ষা ভালবাসে—তা আমি জানি, কিন্তু যদি কোন আকস্মিক কারণে আমার বিবাহ না করে তাহলে আমি ১৫০ টাকা পাইলেই সন্তুষ্ট হইব, আর সব প্রেমপত্র (Love letters) কিরাইবা দিব। প্রেমের বাবসাধারি বাহবা সত্যতা।” (‘বিলাতপ্রয়াসী সন্ন্যাসীর চিঠি’)

এ পত্র বঙ্গবাসীতে প্রকাশিত হয়। ‘বিলাত কেরত সন্ন্যাসীর চিঠির’ আরো নমুনা :

“মহামায়ার রূপায় আমি দেশে কিরে এসেছি। বেঁচে গেছি, হার জুড়িয়েছে ...খাবার সময় যে একটু ই করে খাবো তার যো নেই। আবার যদি খেতে খেতে আওয়ার হয়—একটু সপ্ সপ্ চপ্ চপ্ মড় মড় বা কট্ কট্—তাহলে নিন্দার আর সীমা থাকে না। এখানে ঘরে এসে ই করে খেয়ে বাঁচি।...আহা সজনে খড়খড়ি কী মিট—যেন বিরহীর পুনর্মিলন-স্থলের আভাস পাওয়া যায় :

সজনে শাক বলে আমি সকল শাকের হেলা।

আমার ডাক পড়ে কেবল টানাটানির রেলা।

সজনে—বাস্তবিকই ভূমি বিপদের বন্ধু। আবার লাউতগা ভাতে—কচুর শাক, মোচার ঘট ও কচি আমড়ায় টক খেয়ে মনে করেছি যে পারতপক্ষে বঙ্গমাতার কোল ছেড়ে আর কোথাও যাব না।...এতে স্বদেশপ্রাণ, স্বজাতি-প্রেমিক ব্রহ্মস্ববের পরিচয় পাই। এ রচনা দেশ-কেন্দ্রিক। দেশপ্ৰীতির এ এক স্বতন্ত্র রীতি। মাঝে মাঝে সাংবাদিক ঝাঁক ও পরিহাস টিপ্তনীর রঙ্গ-রসিকতা বিশেষ এ লেখা সাহসে উঠেছে। প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের

গভীরতা এতে অল্পপস্থিত। বা আছে, তার কাছে পাণ্ডিত্যের দৃষ্টি রূপ হয়ে যায়। উপাখ্যায় পাণ্ডিত্য প্রকাশ না করে তাবের প্রকাশ করেছেন। সে তার স্বদেশী ভাব। তার সমৃদ্ধ এই লিরিক্যাল গল্প বাংলা গল্পের এক নতুন শৈলী। পূর্বে ও পরে এ শৈলীর খুব অল্পই অহুসরণ হয়েছে। বাংলা দেশে দু'একজন মাত্র এই রচনার দ্বারা পরবর্তীকালে অল্পপ্রাণিত হয়েছেন।

উপাখ্যায়ের রচনা প্রকাশের ক্ষেত্র সাময়িকপত্রিকা। তাঁর বেশ-চেতনার প্রকাশও সাময়িকপত্র। সাময়িক-পত্রের লেখার যে চটুলতা ও হৃদয় নিবিড়তার অল্পপস্থিতি থাকে, উপাখ্যায়ের রচনায় সে অভাব দেখা যায় না। লেখার ধার ও ধারা তীক্ষ্ণ কিন্তু চটুল নয়। আঘাত ব্যক্তিকে নয়, সমষ্টিকে। আঘাত যেটুকু তা পরাধীন জাতির আত্ম চেতনাকে জাগাবার জন্য। এই জাগরণের জন্য উপাখ্যায় যে রীতি অহুসরণ করেছিলেন, তাকে বাংলা গল্পের নিজস্ব ও মৌলিক ধারা বলা চলে। তাই 'সন্ধ্যা' পত্রিকা তথা পত্রিকাস্তরে লেখা প্রবন্ধসমূহকে 'উপাখ্যায়ী-টাইল' বলা সম্ভব। এঁর বচনবিজ্ঞাস, ভাষা প্রয়োগ এবং উপস্থাপনা রীতিতে প্রাচীনের অহুসরণ নেই, আবার প্রচলিত রীতির আত্মগত্যাও নেই। ব্যবহারের কৌশলে প্রবাদ প্রবচনগুলি উপাখ্যায়ী সাহিত্যকে সমৃদ্ধও কম করেনি। উপাখ্যায়ের ভাষা ও পদবিজ্ঞাস পদ্ধতি প্রবাদ প্রবচন জাতীয়। দৃষ্টান্ত : "এই গোলাম গড়ে প্রাণ থাকিতে চায় না। বরাজ গড়ে বাইতে প্রাণ উড়ু উড়ু করিতেছে।" (সন্ধ্যা ১৯০৬)। "কালী মাইকি বোমা "গঙ্গাভলে বাঁধা গোস্বামী," "মদন-ছাপা" (মটন-চপ), "ফিরিঙ্গির ছায়ায় হালেন হোসেন," "ফিরিঙ্গি-সাজিও না," "ধানী-লক্ষার ঝাল," "দাওয়াই তো দাওয়াই কাবুদী দাওয়াই," "গোলদীঘির গোলাম খানা" (বিশ্ববিজ্ঞান)। এগুলি উপাখ্যায়ী বচন। নিজস্ব গৌরবে মণ্ডিত। তিনি বলভেন, সুদী মাকাল, পানের দোকানী সবাই পড়বে সন্ধ্যা। কাজেই সকলের বোধগম্য ভাবার প্রতি তাঁর আত্মগত্যা লক্ষ্য করা যায়।

এ ভাষা পশ্চিম বঙ্গের মুখের ভাষা। আটপৌরে শব্দও যে সাহিত্যে চলনীয়, উপাখ্যায় এ' কথা বুঝতেন। তাই তাঁর লেখার আঞ্চলিক শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন,

'এলোপাতাড়ি', 'ঠোকর', 'লাঠি ডগা ভাতে' (পূর্ববঙ্গে 'নিছ'), 'বকাবকি-ঝাকাঝাকি'-ইত্যাদি। এরই সঙ্গে রয়েছে তরল সংস্কৃতায়িত শব্দ। আমিষী পত্রাবলীতে যেমন ইংরেজী বাংলা হিন্দী আশ্রয় নিয়েছেন, উপাখ্যায়-জীও সেই পথ নিয়েছেন। তবে পাল পার্শ্ব জাতীয় রচনাগুলি সুদী মাকালের পড়বার জন্য নয়। এ-গুলি পাশ্চাত্য ভাব বিলাসী, ইংরেজী শিকার অল্প বাঙালীকে পড়বার ভগ্নে।

সাহিত্যিক গরজ অপেক্ষা জাতীয় সংস্কৃতির প্রতি তাঁর অহুরাগ ছিল অধিক। সেই গরজের তাগিদে তিনি 'সন্ধ্যা', 'করালী' ও 'বরাজ' পত্রে কলম ধরেছিলেন। এ ধরার পেছনে সাংবাদিক মন, চোখ ও কানই কাজ করেছে। সে মন ও চোখ সমৃদ্ধ সামাজিকের। তাই জাতীয় রচনাগুলি হৃদয়-সংবাদী হতে পেরেছে। পেরেছে বলেই তাঁর স্বপ্নপরিমিত প্রবন্ধাদি বাংলা-গল্পের এক বিশিষ্ট অধ্যায়।

ব্রজবান্ধবের পরিচয় দ্বিবিধ : সাংবাদিক ও স্বদেশ-সেবক। আগে দেশসেবক পরে সাংবাদিক। সাংবাদিকতার সাহিত্যিক প্রেরণা ও উপলব্ধি অপরিহার্য। আধুনিক যুগের সাংবাদিকতার ভাব অপেক্ষা ওখোর আধিক্য স্বীকৃত। ভাবমুখী সাংবাদিকতার যুগ অবসিত কিন্তু একথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, স্বদেশী যুগের সাংবাদিকতার ভাবের প্রাধান্য অপরিহার্য না হয়ে উপায় ছিলনা। ভাবের ছুটি দিক উজ্জ্বলী এবং আত্ম-প্রত্যয়ী। উপাখ্যায়ের সাংবাদিক রচনা শুধু আবেগ উজ্জ্বল নয়, আত্মমুখী ও আত্মসচেতনী। এ ভাব জাতীয় ভাব, যাকে বলেছি 'বরের ভাবনা'।

ব্রজবান্ধবের সাংবাদিক রচনা কোন্ কারণে সাহিত্য গুণ সম্পন্ন? ছোট-খাটো বিষয় ভাবনার মধ্য দিয়ে তিনি জাতির আত্মসচেতনকে চেয়েছিলেন প্রবুদ্ধ করতে। আর এই কারণেই অবলম্বন করেননি কোন কঠিন বিষয় ভাবনা। লোক সাধারণ যা বুঝতে পারে তাকেই তিনি হৃদয়প্রাণী করে তুলতেন। এই বাছাই করার মধ্যেই সাহিত্যিক কলাকৃতি। 'শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব', 'জামাই-বধী', 'মানদাতা', '৮ কোজাগর লক্ষ্মীপূজা', 'শিব চতুর্দশী', 'দোললীলা' প্রবন্ধে জাতির পালপার্কণ তথা সংস্কার ও

সংস্কৃতিকে ভাল ধরেছিলেন। এ জাতীয় রচনা অনেকেই লিখেছেন, কিন্তু তা ভাষা ও উদ্ভৃতির ভাবে আড়ষ্ট হয়ে পড়েছে। তাঁর আবেগনের ‘কলা কোশল :

“সেই মঙ্গল দিবসে আমি নিজেকে নিবেদন করিব—
তারতের ভূত ভবিষ্যৎ বর্ষমানকে নিবেদন করিব—
অদেশীয় সমস্ত বস্তু নিবেদন করিব। এই উৎসর্গের
পর নিবেদিত অদেশজাত জবাকে উপেক্ষা করিলে
মহাপাতকে পড়িবে—পিতৃপিতামহ’দগের অবমাননা
করিবে ও মূল্যধার কৃষ্ণের বিরোধী হইবে।...এক-
টুকরা প্র তজ্ঞা পত্র স্বাক্ষর করিয়া বিদেশীর প্রতি
ক্রোধ প্রকাশ করিলে অদেশগাহুগ জন্মায় না।”
—‘শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব’।

“হিন্দুর বিবাহ এক যজ্ঞ। সংসার রক্ষার মহা-
ব্রতে আমার ভোগস্বথকে বলিদান দিতে হইবে।
ইহাই বিবাহের উদ্দেশ্য। তাই হিন্দুর গৃহে উবেল-যৌবন
ব্রতটির দাম্পত্যকে ধর্মবিধির দ্বারা সংযত করা হয়।...
...বিবাহ যজ্ঞে যে লোকরক্ষারূপ মঙ্গল কামনা করা
হইয়াছিল তাহারই সিদ্ধির জন্য স্বথময় বধীশটা অটুটিত
হয়।”—

“জামাই বধীশ”

“তুমি বাহাতে ক্ষুদ্রতার ভিতর দিয়া মহংকে দেখিতে
পার তাহাই এই জন্য তিনি ছোট হঠা আসেন। আর
তুমি যদি সেই প্রেমের বিকাশে কেবল ক্ষুদ্রতাই
দেখ তাহা চাইলে আর গতি হইবে না। সাবধান—
আজ স্নানযাত্রার দিনে ক্ষুদ্রতা ছাড়িয়া দাও।

“আজ স্নানযাত্রার দিনে ভেদ তুলিয়া যাও।
অসীম অম্বর হইতে স্বর স্বর ধারা করিতেছে—
বিপুল ভূমণ্ডল অভিষিক্ত হইতেছে। ভাল
করিয়া বুঝিলে জানিতে পারিবে যে ইহা
বিশ্বরূপের স্নানযাত্রা ভিন্ন আর কিছুই নহে।...বে
মুহুর্তে ছোটর ভিতরে বড় দেখিবে সেই মুহুর্তে
তোমার মুক্তির পথ খুলিবে।”—‘স্নানযাত্রা’।

“আমাদের শরীর একটি জীবন্ত রথ। সর্বদাকী
সর্বব্যর্থ্যমী সর্বনিরস্ত। চৈতন্যরূপ আত্মা এই রথের
স্বামী। কর্মচক্রে ইহা তড়িত, ঘূর্ণিত হইতেছে।

কদিস্থিত দ্ব্যবীকেশ যেক্রপ নিরোগ করিতেছেন
সেইরূপ ইহা চলিতেছে।...

“...এদ আজ রথ দেখিতে যাই। আমাদের ছোট
মন, ছোট বুদ্ধি। এস ঐ রথে বিশ্বরথ আরোণ করি,
আর ঐ ছোট জগন্নাথটিকে দেখিয়ে বিশ্বনাথের ধ্যান
করি।” ‘রথযাত্রা’।

“যে পূজা বেদে নাই—সে পূজা পুত্ৰাই নয়। বেদে
যদি কোন পূজা থাকে তো শিবপূজাই আছে।.....

“...শিবচতুর্দশীর দিনে কালের কাল মহাকালের পূজা
করিতে হইবে। ঐ কালশিখর সংসার-শ্মশানে উঁহার
ঘোর রূপ দেখ। তাঁহার উদ্ভবন হইতে কোটি সূর্যের
তেজের স্তায় সংহার কোপের জাগা বাহির হইতেছে।
তাঁহার ভূতগণ অটুরোল তুলিয়া ভীষণ রক্তভঞ্জে নাচিয়া
বেড়াইতেছে। আর স্বয়ং মহামারা নৃত্যকালী রূপ ধারণ
করিয়া নৃত্য করিতেছেন ও জয়া-বিজয়া—আর কত
ভাকিনী যোগিনী মুণ্ডমালিনীকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। তর
পাইও না—ঐ যে কস্তুর ঘোররূপ দেখিতেছ—উঁহার
অন্তরে শাস্ত্র অব্যবহার অধৈর্যরূপ লুক্কায়িত আছে।...

“...এই বেদমন্ত্রের দ্বারা ভোলানাথের পূজা কর।
তিনি আন্ততোষ, তিনি ঘোররূপ ছাড়িয়া শান্তরূপ ধরিবেন।
তিনি ভেদ বিনাশের ভিতরে অমৃত পথ দেখাইয়া দিবেন—
তোমার শিবলিঙ্গের প্রারশ্চিত হইবে।” ‘শিবচতুর্দশী’।

“এই দোললীলা বিশ্ববাপিষা চলিতেছে। ধরাধামে
নববসন্ত সমাগমে এই লীলার বিশেষ ঘট। গ্রীষ্মের
অসাড়তা নাই—বর্ষার ঝটিকা নাই—শীতের হিমপাত নাই।
আবার সকল দিক নির্মল ও আনন্দময়। কোথা হইতে
ধীর সমীরণ বুক বুক বহিয়া আসিতেছে আর প্রকৃতিকে
দ্রুত দ্রুত বিধূনিত করিতেছে। ঐ যে সরসী লহরী তুলিয়া
নাচিতেছে আর বিকশিত কমলদলকে নাচাইতেছে উহা
শ্রীহরির দোলা। তিনি ঐ লহরী-বিকম্পিত কমলদোলায়
শ্রীস্বর্ণকমল রাখিয়া তুলিতেছেন। ঐ যে বজ্রবী বিজড়িত
নব পল্লবিত কুম্ভ-পরিপূরিত তরুর অনিলম্পর্শে মৃদুমন্দ
তুলিতেছে—উহাতে তিনিই দোলায়মান হইয়া বিরাজ
করিতেছেন। প্রকৃতি হাসে আর দোলে—প্রকৃতির
ঠাকুর হাসে আর দোলে।...কৃষ্ণে কৃষ্ণে মালকে মালকে
কতই না লালের খেলা—ও যে আবার ঠাকুরের রক্তলীলা।

“...দে দোল দে দোল—আজ প্রকৃতি তাহার দেবতাকে দোলাইতেছে। আমিও এই দোলপূর্ণিমায় আমার অচল-অটল অরূপ ঠাকুরকে স্বয়ং দোলায় বসাইয়া দোলাইব ও প্রেমের ফাগু—প্রকৃতির লাল রঙে—ভক্ত ভগবান দোহে লালে লাল হইয়া যাইব।” ‘দোলদীপ’।

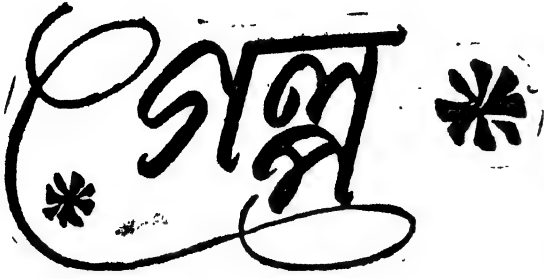
উদ্ধৃতিগুলি থেকে কি পাচ্ছি? সমাজ, সংস্কার, ধর্ম ও উৎসবের সঙ্গে আমিষ ও ক্ষুদ্রকে পরিহারের ঐকান্তিক আবেদন। প্রতীক ছেড়ে অরূপ অনন্তকে ভালবাসার স্বয়ংসিদ্ধ। স্বদেশীয় উৎসবকে বিশ্বউৎসবে রূপান্তরিত করার ঐদার্য। রয়েছে প্রকৃতি প্রণতার নিষ্ঠা। প্রবন্ধগুলিতে শাস্ত্রীয় বচনের উদ্ধৃতির অটলতা অল্পপস্থিত। যা বুঝেছেন, আত্মপ্রত্যয়ী স্বয়ং দিয়ে তাকে ভাব-বন্ধ করেছেন। অথচ, তৎসম-ভক্তব শব্দের অঙ্গাঙ্গি মিলনে কোথাও লঘুতার সৃষ্টি হয়নি। প্রবন্ধ-মানভাও অটুট আছে। ভাবমুখী গদ্য লিরিক্যাল। উপাখ্যায়ের গছও এই লিরিকের পরিমিত উচ্ছ্বাস। এসব রচনাকে মন-শীল প্রাক্কের বা গবেষণাধর্মীর নয়। নয় তার কাহণ, রচনাগুলি ভাব-বন্ধ। ভাবের ঘরে জ্ঞানের ও মননধর্মের ছুঁয়াগর্ভা থাকে না।

লেখাগুলি মূলস্বরূপে দেশকেন্দ্রিক। দেশাত্মবোধের চেতনাকে জাগাবার চেষ্টাই এতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

উপাখ্যায় লিখেছেন অল্প। তাঁর স্বল্প পরিমিত লেখাকে চার ভাগে ভাগ করা চলে। প্রথম, দৈনন্দিন রাজনৈতিক ঘটনার কথা। ইংরেজ বিবেচ, জাতি-প্রীতি। গরম গরম ভাষায় এসব রচনা পূর্ণ। আর এইগুলিই সাময়িক লেখা। সময়ের প্রয়োজনে এগুলির উদ্ভব। এদের প্রয়োজনও সীমিত। কিন্তু এরা “বিপ্লবী বাংলার সাহিত্যে” স্থান লাভের যোগ্য। দুই, পালপার্বণ নিয়ে লেখা। এতে সমাজ সংস্কার ও ধর্মের মধ্য দিয়ে দেশাত্মবোধকে জাগাবার প্রয়াস আছে। আসলে এইগুলিই সাহিত্যিক রচনা।

তিন, ‘আমার ভারত উদ্ধার’। দেশ উদ্ধারের প্রেরণায় তিনি কি করেছেন তাই অহংসর্ষব ঘটনাবলি পরিচয় আছে। এতে রয়েছে কেমন ভাবে তিনি লেকচারে আকৃষ্ট হন : “শ্রামের দ্বীপী তুমি যেমন গোপীজন উন্মত্ত—আমিও তবু। আমার পিতামহী বলিতেন—লেকচারেই দেশটাকে খেলে।” শুধু লেকচারই নয়, দেশের স্বাধীনতার জন্তে সৈনিক হবার প্রচেষ্টার কথাও এই ক্ষুদ্র-আত্মপরিচিতিতে রয়েছে। বলছেন : “কলম বাজিতে হইবে না, তলোয়ার বাজিতেই ভারত উদ্ধার হইবে।” তাই গোয়ালিয়রে দৈনিক ও যুদ্ধবিজ্ঞা শিখে ফিরিঙ্গি তাড়াবার চেষ্টা করেন। চার, বিলাতবাজী, প্রবাসী ও বিলাত-ফেরত সন্ন্যাসীর চিঠিগুলি। এতে ভ্রমণকাহিনীর আমেজ রয়েছে। সমাজ-ধর্ম শিক্ষা ও দেশাচারের নানা সংবাদে এ লেখা পূর্ণ। বিদেশটা যে কেমন, তাদের জীবন যাত্রা, খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ, তাদের মেয়ে-পুরুষের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অনেক কথাই তিনি বলেছেন। কিন্তু কাউকে ছোট করার বা বড় করার প্রয়াস এ সব রচনায় নেই।

বাংলার সাময়িক তথা দৈনিক পত্রের পাতায় দেশের পাল-পার্বণকে কেন্দ্র করে দেশাত্মবোধক প্রবন্ধের স্রষ্টা ব্রহ্মবাক্য। এর আগে এ জাতীয় প্রবন্ধ যে লেখা হয়নি, তা নয়। কিন্তু সে সব লেখার সঙ্গে উপাখ্যায়ের রচনার তফাৎ মূলে। অর্থাৎ উপাখ্যায়ের রচনার মূল বিষয়-ভাবনা এদের নিয়ে এবং তার প্রসার ও কল্পিততা এদের ওপরই নির্ভর ছিল। পাক্ষাত্য-সত্যতা ও শিক্ষার প্রসার এবং সেই সঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রাম স্বরূপ সময় থেকে উপাখ্যায় দেশকে চেনার ও চেনাবার যে পদ্ধতি নিয়েছিলেন, নানা কারণেই তা নতুন। এসব রচনা সাহিত্যসৃষ্টির জন্তে না হলেও এরা বাংলা গদ্যসাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান পাবার যোগ্য।



উপ

রথীন সরকার

ডালহৌসী টু কলেজস্কয়ার। বড়ো জোর আধঘণ্টার পথ। কিন্তু এটুকু পথই অতিক্রম করতে আপনাকে গলদ-ঘর্ম হতে হবে। বিশেষ করে আপনি যদি অফিস ফেরত হন! দেখবেন এক এন্ট্রি বাস আসছে যেন টালমাতাল হয়ে। থামছে কি থামছে না। কিন্তু তারই মধ্যে সক্রণ আবেদন আসবে, একটু করণ মিনতি—দাদা, পা রাখার জায়গাটা—

অথচ সেই সৌভাগ্যবান ফুটবোর্ডটি তখন দু'ভঙ্গন পদযুগলের মহিমায় মগ্নিত। নেহাৎ বাস চড়িয়েরা রীতিমত কসরৎ জানা লোক—তাই বা রক্ষে।

ফিরছিলাম বাতুড়ঝোলা হয়ে। ভেতরে অসহ্য চাপ মাহুবে মাহুবে জমাট বেধে গেছে। তাই ট্রাপিজের খেলা দেখাচ্ছিলাম ফুটবোর্ডে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই। হঠাৎ ভেতরে একটা গুঞ্জন শুরু হলো—চোর—চোর।

বক্তব্য অস্থগান করবার পূর্বেই অঘটনটা ঘটে গেল। প্রচণ্ড কাঁকানি দিয়ে বাসটা থেমে গেল। আর একদল ছড়মুড় করে নেমে পড়লেন একটা জোয়ান ছোকরাকে টানতে টানতে। পথচারী লোক থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। একে একে জনতা।

—কি হয়েছে মশাই?

—কি জানি তাই বলুন। পকেটমার, পকেটমার।

—পকেটমার! আমার পাশের ভদ্রলোক চিংকার করে উঠলেন, দিন দিন আচ্ছা করে গোটা দুই রকম দিয়ে

দিন। ব্যাটার শিক্কা হোক। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, দেখেছেন কত দিন দুপুরে ডাকাতি।

বললাম, ওদের আর দিন রাত্রি কি বলুন। এই সেদিন বড়বাজারের মোড়ে এক ছোকরাকে সোঁক বেদর গ্রহণ! তারপর বলবো কি মশাই—দশটা মিনিও কাটেনি, পিঠের বেদনা মরেনি, সেই ছোকরাকে হ্যারিসন রোড দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে একদল জনতা। কি ব্যাপার? না—সেই একই অপরাধ হাতদাফাই। কি বলণে বলুন? ও ওদের স্বভাব। কথায় বলে না স্বভাব যায় না ম'লে—

কিন্তু কথা আর শেষ করতে হলো না। বাসের বসি বেজে উঠলো।

আবার ছুটলাম উর্ধ্বধামে। রেসের ঘোড়াও বোধহয় অমন ছুটেতে পারেনা। নেহাৎ বাস চড়িয়ে অত্যন্ত লোক, তাই কারুর কাঁধের ফাঁক দিয়ে হাতের তল দিয়ে সড়াং করে গলে গেলাম পাকালি মাহের মতো।

বাস তখন চলতে শুরু করেছে।

কিন্তু গুঞ্জন থামলো না, ভাগ্যিস আপনি হাতে নাতে ধরে ফেলেছিলেন তাইতো, নইলে এখনই তো দিচ্ছিলো পকেটটা শ্রেক গুড়ের মাঠ করে।

ওপাশ থেকে আর এক ভদ্রলোক চিংকার করে উঠলেন, তা কত ছিলো মশাই পকেটে।

—আজ্ঞে সাড়ে তিন শ'।

—সাড়ে তিন শ'।

—উঃ! চিন্তা করতে পারেন। এদের আবার পণে হাটবার উপায় আছে, সর্বত্র চোর ছাচোড় আর পকেট-মার। গেল, গেল, চোর ডাকাত আর পকেটমারে রাজত্বটা ভরে গেল মশাই।

—তা আর কি করবেন বলুন। ওপাশের আর এক ভদ্রলোক ব্যঙ্গ করে উঠলেন: যে যুগে আমরা বাস করছি, সে যুগের সবই যে মেকী। বাইরে শুধু জৌলুশ, খুটো সভ্যতার জাক জমক। কিন্তু ভেতরে কি দেখছেন? দেখবেন—অন্ধকার আর অন্ধকার—দেখ জোড়া দুর্নীতি। মাহুব আম এত নীচে নেমে গেছে যে—

আলোচনাটা আর শেষ হলো না।

ততক্ষণে গাড়ি এসে থেমেছে কলেজস্ট্রীটের মোড়ে।

আর সেই মুহূর্তে একটা প্রচণ্ড ধাক্কা অনুভব করলাম
ভেতর থেকে। তারপরই এক তরলোক বোমার মত
ছিটকে ফুটপাথে গিয়ে পড়লেন। আর—

আর সবার অলঙ্ঘ্য তখন হৃদয় পার্কের কলমটি গড়াতে
গড়াতে আমার পায়ের কাছে এসে থেমেছে। মাত্র এক
মুহূর্ত। কিন্তু সেই এক মুহূর্তের সুযোগই সচিবহার করলাম।

এদিক ওদিক ইতস্ততঃ তাকাতে তাকাতে লেটি পায়ের

ভলার চালান করে নিয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

এবার আর নীতিতত্ত্ব কানে গেল না। বোকামান
ছেলেটির মুখও ভেসে উঠলো না। যা ভেসে উঠলো তা
হলো আমার বড়ো মেয়ে রীণার ব্যাকুল ছুটি আঁখি, বাবা
আমায় কিছ্র এবার একটা ভালো পেন কিনে দিও।
দেখো না এ পেনে মোটেও লেখা যায় না। আমাদের
ক্লাশে সবার ভালো পেন আছে।

দ্বিজাসা

কবিকঙ্কণ হেমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

কঙ্কাহত বেদনার ক্রন্দন বকে ধরে
বসে আছি। রান হয়ে গেছে আজ আনন্দ বাতী
মরুপথে। সম্মুখে শুধু দু-ফোটা লোনা জল
তাও শুকিয়ে সাদা হয়ে ফুটে উঠেছে।
আমি একটা বেদনার ভালপিও।

যারা এসেছিল বলেছিল তুমি কি
তোমার দুর্গম চলার পথে
আমরাও লাখী হব। তারা দাঁড়িয়ে পড়েছে,
ঠেলে দিয়ে আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়ে দিয়েছে
বলেছে আর প্রয়োজন নেই—
তুমি একটা নিশ্চল হতপিও।

কৈফিয়ৎ নেই আমার। লজ্জা, ভয়, ভাবনা
সব থেকে দূরে সরে গেছি।

একটা কাল পাখরের
জীবন আমার। নিশ্চল হতবাক হয়ে
অবাক বিস্ময়ে চেয়ে আছি। দূর দিগন্তের রেখা
আজ আরও সরে সরে বাচ্ছে দূরে।

নিবিড় অন্ধকারের পথে চলেছি একা,
বেদনার বোঝা আজ রক্তের গোলাপ
হয়েছে জানি। এই কি আরম্ভ না শেষ,
সম্মুখে শুধু একখানা জিজ্ঞাসার চাকা
এগিয়ে চলেছে দূর হতে দূরে।





সেকালের আদ্যোদ্য-প্রদ্যোদ

পৃথিবীর মুখোপাখ্যায়

ছোট-বড় বিভিন্ন ধরনের সৌধিন ও পেশাদারী রজার ছাড়াও, প্রাচীন কলিকাতা সহরাকালের প্রমোদ-বিলাস-ভ্রমণী দেশী এবং বিদেশী অধিবাসীদের চিত্ত-বিনোদনের উদ্দেশ্যে আরো নানান অভিনব ব্যবস্থা ছিল—সেকালের পুরোনো পুঁথি পড়ে তারও বিবিধ পরিচয় পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় ঊনবিংশ-শতকের গোড়ার দিকে ভারত-প্রবাসী বিলাতী সমাজের বিলাসী-সৌধিন সাহেব-বিবি, আর তাঁদের প্রবর্তিত পাশ্চাত্য কৃষ্টি সভ্যতার অহুকরণ-প্রয়াসী এদেশী শিক্ষিত-সম্ভ্রান্ত গোলাম-অহুচরবৃন্দের মনোজ্ঞানের জন্ত ইংরাজ-বণিকদের হাতে-গড়া কলিকাতা শহরে তখন হামেশাই—বিশেষতঃ শীতের মরত্তমে, সুদূর ইউরোপের নানান দেশ থেকে বিভিন্ন-অভিনব বহুবিধ প্রমোদাহুষ্ঠানের হল এসে হাজির হতো—শ্রোত চকল ভাগীরথী নদীর কূলে বাঙলার এই বিশিষ্ট জনাকীর্ণ ব্যবসা-বাণিজ্যের মহামিলন-ক্ষেত্র। অধুনা রেওয়ার না থাকলেও, মাত্র কয়েক বছর আগে...অর্থাৎ, বিগত বিত্তীয় বিশ্ব-যুদ্ধের পর্বেও প্রতি বছরই দুনিয়ার নানান দেশ থেকে শীতের মরত্তমে কত যে ছোট-বড়, ভালো মন্দ ভ্রাম্যমান সার্কাস, ম্যাজিক, নাচ-গান-বাজনা আর রঙ্গাভিনয়কারীর হল আনাধের এখানে আনন্দ-বিভরণের সফরে এসেছেন, তার আর ইয়ত্তা নেই। আনন্দ-পরিবেষণের বিভিন্ন রীতিটি স্বক হয়েছিল কিন্তু সেকালে—এদেশে বিলাতী বণিক-সম্প্রদায়ের

শীঠস্থল গড়ে ওঠার সঙ্গে। দেশী-বিলাতী সমাজের বিলাসী-সৌধিন জনগণের চিত্ত-বিনোদনের উদ্দেশ্যে বিদেশাগত সেকালের এই সব ভ্রাম্যমান কলাবিদ্যের কীৰ্ত্তি-কাহিনীর প্রচুর পরিচয় খেলে প্রাচীন সংস্কৃত-পত্রে। একালের অহুসন্ধিৎসু পাঠকপাঠিকার কৌতূহল নিবারণের জন্য নীচে তার কয়েকটি নমুনা প্রকাশিত হলো।

(ক্যালকাটা গেজেট, ২৭শে মার্চ, ১৮২০)

Mermaid and Sea-Monster's Head

Just brought in on the ship *Indian Oak*, the first that have ever been seen in India. These natural curiosities were found on the beach at Olra by some Fishermen, and brought to the Emperor's court at Jedo, the Capital of Japan... The greatest Care has been taken of them, and the Mermaid in particular is in the most perfect state, and well worthy the notice of the Public. The esteemed value of this once supposed fabulous creature may be in some measure estimated by the numerous offers received for the purchase of it, the last of which was the sum of Sixty Rupees 9000, and this sum

refused...Terms of admission for each person
Sixca Rupees 6 Cash.

N. B — No credit can upon any account be
allowed,

* * *

বিদেশী আদর্শায়করণে, এদেশেরও কয়েকজন উৎসাহী
কলাবিদ সেকালে রীতিমত ক্রীড়া-চাতুর্ঘ্যের পরিচয়
দিয়েছিলেন—প্রাচীন সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত টুকরো
খপরটি তারই স্পষ্ট নক্সার।

* * *



(সমাচার দর্পণ, ২০শে নভেম্বর, ১৮২৪)

ভোজবিজ্ঞা।—রাম স্বামী নামে একজন এতদেণীয়
লোক আমেরিকা দেশে ভোজবিজ্ঞাপ্রভাবে একুশ বৃক্সল
একখান ভলবার (ভলোয়ার) পুনঃ পুনঃ গ্রাসোদগায়
করিয়া অনেককে চমৎকৃত করিয়াছে ও আপনার থলি
পূর্ণ করিতেছে।

* * *

থিয়েটার, অপেরা, ভোজবিজ্ঞা প্রভৃতি বিবিধ কৌতুক
ক্রীড়া প্রদর্শন ছাড়াও, সেকালের ইউরোপীয় কলাকুশলী-

শিল্পীরা খৃষ্টীয় উনবিংশ-শতকের গোড়ার দিকেই এদেশের
লোকজনকে তাক লাগিয়ে দেবার আরেকটি অভিনব-
উপায়েরও ব্যবস্থা করেছিলেন। তখনকার আমলে
ছিন্নিয়ার কেনো দেশেই একালের মতো 'ছায়াকবি'
বা 'Cinema' দেখানোর আদৌ কোনো ব্যবস্থা ছিল না।
কারণ, সে যুগে 'ছায়াকবি' বা 'Cinema' ছিল লোকের
কল্পনাভীত...চলচ্চিত্র-শিল্পও ছিল সম্পূর্ণ অনাবিষ্কৃত।
তবে 'photography' বা 'আলোক-চিত্র' গ্রহণের কলা-
কৌশল তখন, একালের মতো এক উন্নত-ব্যাপক না
হলেও, পাশ্চাত্য-জগতে বেশ কতকটা স্বপ্রচলিত হয়ে
উঠতে শুরু করেছে। আলোক-চিত্রশিল্পের কলা-কৌশলের
ক্রমোন্নতির ফলেই—পাশ্চাত্য সৌখিন-সমাজে অচিরেই
দেখা দিল—'ম্যাজিক-লন্ঠন' বা 'Magic-lantern'-এর
কারু-কলা...এবং প্রাচ্যভ্রমণকারী এক ফরাসী শিল্পীর
আগ্রহ-উৎসাহে খৃষ্টীয় উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে
আমাদের দেশে জনসাধারণের আসরে সর্বপ্রথম প্রদর্শিত
হলো—সে যুগের নব-উদ্ভাবিত এই অভিনব-বিচিত্র
কারু-কলা-কৌশল। নতুন-ধরণের এই চিত্র-প্রদর্শনের
ফলে, সেকালে আমাদের দেশে জনগণের মনে যে প্রতি-
ক্রিয়া দেখা দিয়েছিল...তার পরিচয় মেলে নীচে উদ্ধৃত
প্রাচীন সংবাদ-পত্রের ছোট্ট মন্তব্যটিতে।

(সমাচার দর্পণ, ১০ই ডিসেম্বর, ১৮২৫)

কলিকাতা ॥—অনেকে অবগত আছেন যে কলিকাতায়
অনেক দিবসাবধি থিয়েটার-গোকানিক নামে একটা যাত্রা
মধ্যে মধ্যে রাত্রিযোগে হইত। সেখানে পৃথিবীর কতক
উৎকৃষ্ট নগর ও স্থানের নক্সা উত্তমরূপে লোকেরদিগকে
দর্শন বাইত। গত মঙ্গলবার ঐ যাত্রা শেষবার হইয়াছে
এবং সেই যাত্রাকর সাহেব সেই সকল ছবি বিক্রয় করিতে
উদ্যত হইয়াছেন। যদি কলিকাতায় বিক্রয় হয় তবে ভালই,
নতুবা তিনি সে সকল ছবি ক্রান্তদেশে ফিরিয়া লইয়া
বাইবেন।

* * *

সেকালের এ সব বিচিত্র আনন্দ-অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা ছাড়াও, প্রাচীন কলিকাতার সৌখিন-বিলাসী ইউরোপীয় সমাজের কলারসিক অধিবাসীদের চিত্র-বিনোদনের আরেকটি অভিনব উপায় ছিল—শহরের বিশেষ বিশেষ স্থানে আয়োজিত চাককলা বা চিত্র-প্রদর্শনী...পৃষ্ঠীয় উনবিংশ-শতকের গোড়ার দিকে প্রকাশিত সংবাদ-পত্রের বিজ্ঞাপনে তর স্বন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। সে আমলে শহরের কোথাও একালের মতো স্থায়ীভাবে স্থাপিত 'আর্ট গ্যালারী' বা 'চিত্র-প্রদর্শনী' ভবন ছিল না। তাই সেকালে হয় শহরের 'টাউন হলে', কিংবা কয়েকটি নামজাদা চিত্র-ব্যবসায়ীদের দোকান-ঘরের সুবিস্তৃত-অন্ধনেই প্রতি বছরই বিলাত থেকে নানা ধরনের চিত্র-সম্পদ আয়নারী করে এ সব চাককলা-প্রদর্শনীর আয়োজন করা হতো এবং সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে কলারসিক দর্শকদের সাদরে আমন্ত্রণ জানানো ছিল সে যুগের রীতি। এ সব চিত্র-প্রদর্শনীতে প্রবেশের জন্য সেকালে দর্শকদের বেশ মোটা টাকা খরচ করে টিকিট কিনতে হতো। প্রদর্শনী দেখে কোনো ছবি পছন্দ হলে, সেকালের সৌখিন-ক্রেতাকে ছবির দাম দিয়ে দিতে হতো চিত্র-ব্যবসায়ীর হাতে। সচরাচর কোন ধরনের চিত্র এ সব প্রদর্শনীতে রাখা হতো, তার পরিচয় মিলবে নীচে উদ্ধৃত সেকালের সংবাদ-পত্রের বিজ্ঞাপন থেকে।

(ক্যালকাটা গেজেট, ২১শে নভেম্বর, ১৮১৭)

The proprietor of the panorama of the Battle of Waterloo most respectfully informs the Public, that it will be opened for inspection on Monday next. Admission for the first few days only, by the advice of his Friends, Five Rupees, instead of Three; Children half price.

(ক্যালকাটা গেজেট, ৩০শে জানুয়ারী, ১৮২৬)

Pengelly, Mortimer & Co. have the honor to acquaint the Public, with their having received the immense Painting of the Battle of Waterloo which, having been exhibited to the Admiring Thousands of the British Metropolis, has been sent to the City of Palaces for the gratification of the Indian community.

It is Intended to exhibit it at a reasonable price, and when put up, Admission Tickets will be issued.

Other Particulars will be given in a future Advertisement.

Miscellaneous Depot.

(ক্যালকাটা গেজেট, ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৮২৬)

The Waterloo Painting

The Large and Beautiful Picture is now put up.

Admission Tickets, price Four Rupees cash, can be had of the undersigned.

It Having been suggested, that persons wishing to see the picture frequently, should be admitted at all periods by paying Ten Rupees per Mensem, a book will be kept for registering names; so that the payment of Ten Rupees in advance, will entitle the person paying, to an Admission Ticket at all times (Sundays excepted) for Thirty days from the payment.

The Room has been hung with pier Glasses, to allow of the painting being seen by reflection supposed to be the most advantageous mode of viewing it.

The sale price of the picture is Sixty Rupees Nine Thousand; the superb gold frame, measures about 13½ feet by eight feet and a half.

The Likenesses are said to be the life.

Design, by Alexander Sauerweid, Esquire.

Portraits, by George Cifnt Esquire, A. R. A.
Painting, by Abraham Cooper, Esquire, R. A.
The Admission Rates have been fixed from
 judgement of several scientific *Gentlemen*.

Pengelly, Morttmer & Co.

Notice

A Gentleman having stated that the large
Picture of the Battle of Watterloo, now exhibit-
 ing at our Rooms, has been seen by him before
 in Calcutta; we deem it fair to notice it to the
 public; that all who hereafter come to see it,
 may do so with their eyes open:—We have given
 the dimentions, and the names of the Artists
 employed on it.

The Frame left London on the H. C. Ship
 "Marquis of Wellington" in 1825, and *Painting*
 in the same year, on the private Ship 'George
 Home.'

We are entirely in *India*—if however it has,
 there must still be numbers who have not seen
 it; and probably numbers more, who would not
 regret the opportunity of seeing it again;—for
 it is allowed to be a most beautiful production—
 the likeness faithful—and the whole execution
 in a highly spirited style.

Pignelly, Mortimer & Co.

(ক্যালকাটা গেজেট, ১ই ডিসেম্বর, ১৮২৫)

Beautiful Oil Paintings

In handsome Gold Frames (being the
 remainder of our *investment of Pictures*)—re-
 ceived on saturday, may be seen at our Rooms.

Pengelly, Mortimer & Co.

পরবর্তীকালে চিত্র-ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ছাড়া তখনকার
 আমলের বিলাতী-সমাজের কলারসিকেরা শহরে নিজেদের
 একটি সমিতি গড়ে তুলে চিত্র-প্রদর্শনের ব্যবস্থা
 করেছিলেন।

(ক্যালকাটা গেজেট ৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৮৩১)

Exhibition of Paintings, &c. 1831.—A collec-
 tion of Drawings and paintings will this day be
 exhibited at the Town Hall and will remain open
 from 10 to 5 O' clock on weekdays only until
 further notice.

Terms of Admission

For Gentlemen Single Ticket Rs, 2
 Ticket for the season Rs, 4
 Ladies admitted free of Charge
 W, Carr, secy, Brush Club
 February 1, 1831

[ক্রমশঃ]



স্বামী বিবেকানন্দের দূরদর্শিতা ও ভবিষ্যৎবাণী

শ্রীসমর দত্ত

A man may possess a colossal intellect while his faculty of observation may be of feeblest kind.

Sir Archibald Geikie.

এমন বহু দেশনেতা দেখা যায় যারা প্রখর বুদ্ধি-সম্পন্ন। কিন্তু দৃষ্টি শক্তি বিশেষ ক'রে দূরদৃষ্টির অভাবে তাঁদের বহির্গত তেজস্বিতা, অপরিমিত প্রশংসিতা ও অনন্ত-সাধারণ একাগ্রতা নিজ নিজ ক্ষেত্রে শিক্ষা সাধনে ব্যর্থতার পর্যাবসিত হয়েছে। দেশনেতা বোলতে সাধারণতঃ যা বোঝায়, মানব-প্রেমিক বিবেকানন্দ ঠিক তা ছিলেন না। তিনি ছিলেন সর্বোপরি ভারত-প্রেমিক এবং তাঁর ভারত-প্রেম নির্জীব, ক্রীড়, ভীক ভাববিলাস ছিল না। ভারতের দুর্দশা, তার পরাধীনতা, তার লাহুনা স্বামীজিকে বেদনায় ব্যাকুল ক'রে তুলেছিল। সেটাজন্ত তিনি তাঁর দুর্জয় পৌরুষ, অসামান্য আত্মিক শক্তি, অতুলীয় ধী-শক্তি—সব কিছু নিবেদন করেছিলেন পরাধীন ভারতের রাজনৈতিক মুক্তির উদ্দেশ্যে। যে মহাত্মানব বেদান্তকেশরী বীর সন্ন্যাসীরূপে বিখ্যাত হয়েছিলেন সেই ব্রহ্মবিদ পুরুষেরই জীবনবোধ ও জীবনচিন্তার মূল লক্ষ্য ছিল ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক তথা সর্বাঙ্গীণ মুক্তি।

জাতির পূর্ণায়ত্ত বিকাশ সাধনের জন্য বিদেশী প্রগতি-শীল আদর্শের অমূল্য গ্রহণের প্রয়োজনীয় হলেও যথেষ্ট নয়। এর জন্য চাই আত্মত্যাগী সম্প্রদায়। তাই জাতিভেদ, সম্প্রভতা, অশিক্ষা ও আত্মনির্ভরহীনতার সহস্র পাকে জড়িত জাতির জীবনের সামগ্রিক অবস্থাটিকে তিনি যে শুধু তাঁর অন্তরদৃষ্টি দিয়ে নিখুঁতভাবে দেখেছিলেন তা নয়, তাঁর দূরপ্রসারী দৃষ্টি সমকালীন ভারতবর্ষের ঐক্যপূর্ণ অবস্থা অভিক্রম করে ভবিষ্যৎ ভারতের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার চিত্রটির উপরও প্রতিফলিত হয়েছিল। তাই মুক্তিস্বামী ভারতবর্ষের নানারূপ

সমস্যা সম্বন্ধে দূরদৃষ্টা বিবেকানন্দের ভবিষ্যৎবাণী বিশেষভাবে অর্থব্য।

দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য ভ্রমণ শেষ ক'রে ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর একদা মেলডমন্টে তাঁর দর্শনপ্রার্থী একজন যুবককে তিনি ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা কালে বলেন—What India needs to-day is bomb.' মৃত্যুর পূর্বে ১৯০২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি এই অভিমত প্রকাশ করেন এবং ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দে বাঙলাদেশে ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদীর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আন্দোলনে সন্যাসবাদীগণ কর্তৃক বোমা ব্যবহৃত হয়। (এই প্রসঙ্গে আলিপুর বোমার মামলা যার সঙ্গে স্বামী অরবিন্দ জড়িত ছিলেন তা স্মরণীয়)। স্বামীজির জীবনীকার বিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত রোমঁ রোলঁ তাঁর এই মন্তব্যের তাৎপর্য উপলব্ধি ক'রে লিখেছেন :—

The Indian Nationalist Movement Smouldered for a long time until vivekananda's breath blew the ashes into flame and erupted violently three years after his death in 1905.

স্বামীজি তাঁর স্মৃতি বিজ্ঞেয় দৃষ্টি দিয়ে দেখেছিলেন যে ভদ্রানীন্তন কংগ্রেসের কাঁথাবলী মুক্তি আন্দোলনের সুদূর ভিত্তি পত্তনের পক্ষে উপযোগী নয়। বছরের পর বছর গতাহুগতিক প্রস্তাব পাশ করা ছাড়া আর কোন কাজ তখন কংগ্রেসের ছিল না। পূর্বযুগের বঙ্গদেশী জিনিষ ব্যবহারের আন্দোলনও তখন অহুস-বিনয় ও ভীকার রাশি রাশি প্রস্তাবের তলায় চাপা পড়ে গেছে। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আন্দোলনে তখন কাবেশন-নিবেদনকারী রাজনীতিজ্ঞদের প্রভাব পড়েছে। সেদিন ভয় ও কাপুরুষতা জাতির প্রাণকে পঙ্ক ক'রে তুলেছিল। আত্ম অধিষ্ঠান সেদিন কর্মশক্তিকে এমন করে দমিয়ে রেখেছিল যে আত্ম-বিশ্বাস, সাহস ও পৌরুষ কিরিয়ে আনাই সেদিন ছিল,

ভারতবর্ষের মুক্তি সাধনার সবচেয়ে বড় কাজ। এই বৈপ্লবিক ব্রত সাধনে এগিয়ে এলেন একদল উজ্জ্বল তরুণ। তারপর বিদেশী শাসকদের হাত থেকে দেশে উদ্ধার করবার জ্ঞান তাঁদের বিকশিত বল প্রয়োগ করতে হবে এবং এই বল-প্রয়োগ নৈতিক—এই বিশ্বাস নিয়ে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাঙালি বৈপ্লবিক আন্দোলনের প্রতীকশ্রেণী এলেন অরবিন্দ ঘোষ, বাবীন্দ্র ঘোষ, সত্যেন্দ্র বসু প্রমুখ বিপ্লবীগণ। তারপর প্রাণ নিবেদনের রক্তরাঙা পথ ধরে এলেন বহু মুক্তিকামী সাধকেরা। তারপরের ইতিহাস যে আঁকাবাঁকা পথ ধরে জাতিকে যেতে হয়েছে মুক্তির সন্ধানে তার ইতিহাস। সে ইতিহাসের পাতা উন্টে গেছে স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে।

ভারতবর্ষ কিভাবে স্বাধীন হয়েছে—হিংসার পথে অথবা অহিংসপন্থায়—কিন্তু এই দুই উপায়ের সংমিশ্রণে সে কথাটা আগেচলন এখানে না করেও নিশ্চয়তার সঙ্গে এ কথা বলা যেতে পারে যে অগ্রিমুগের সজ্ঞানবাদীদের কার্যকলাপের দান জাতির স্বাধীনতা তহবিলে বড় কম নয়, কারণ সেই জমাট ভয় ও কাপুরুষতার দিনে তাঁদের জ্ঞানই জাতি আত্মবিশ্বাস ফিরে পায়, ফিরে পায় সাম্য ও আত্মত্যাগের উদ্দীপনা। আর এই প্রসঙ্গে স্বামীজির অস্ব-দৃষ্টিগ্রস্ত ভবিষ্যদ্বাণী (দেশের মুক্তি আন্দোলনে আজ সে জিনিষটার প্রয়োজন তা বোঝা) বিশেষ উল্লেখনীয়।

স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যে ভারতের জাতীয় জগরণের মহাজ্ঞে কংগ্রেসের কার্যাবলীর দিকে স্বামীজি মনোযোগ দিয়েছেন কি না তৈনিক ব্যক্তির এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন—‘কংগ্রেসের আন্দোলনের দিকে আমি খুব মনো-সংযোগ করেছি এমন কথা বলতে পারি না, কারণ আমার কার্যক্ষেত্র বিভিন্ন; তবে এই আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ এবং আমি সর্বাসক্ত: করণে এর সাফল্য কামনা করি।’ তিনি আরো বলেন—‘ভারতবর্ষে বিভিন্ন জাতির সমন্বয়ে একটি মহাজাতি সৃষ্টি হ’তে চলেছে এবং এ দেশে গণতন্ত্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠায় এই মহাজাতি দেশের রাজনৈতিক রক্ষণকে এক বিরাট ভূমিকা অবতীর্ণ হবে।’

আজ ভারতবর্ষ স্বাধীন-সার্বভৌম-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। কোন প্রাচীন রিপাবলিকের রক্ত নামে মাত্রই ভারতবর্ষ ‘রিপাবলিক’ রূপে পরিচিত নয়। এর প্রত্যেকটি লাইনে

আধুনিক গণতান্ত্রিক ভাবধারার পূর্ণ প্রকাশ পরিস্ফুট। আমাদের পন্থিত সংবিধান প্রদত্ত মৌলিক অধিকার, উদ্দেশ্যমূলক বিধান, যুক্তরাষ্ট্রীয় ভিত্তিতে রাজ্য সংগঠন, প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার ইত্যাদি ব্যবস্থা নিশ্চয় প্রশংসনীয়। কিন্তু এ সত্ত্বেও এ দেশে যে সমাজ ব্যবস্থা প্রচলিত তাতে গণতন্ত্রের পরিপন্থী শক্তি সমূহের অস্তিত্ব পরিস্ফুট হয়। হিন্দু সমাজে প্রচলিত বর্ণ বৈষম্য হিন্দু সমাজের পক্ষে যেমন বিপজ্জনক, ঠিক সেইরকম গুরুতর বাধাও শক্তিশালী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের পক্ষে। অবশ্য অস্পৃশ্যতাকে ভারতের শাসনতন্ত্রে অপরাধ ব’লে ঘোষণা করা হয়েছে। দ্বিধাহীন ভাষায় বলা হয়েছে যে শ্রেণী ও বর্ণ বৈষম্য হেতু কাহাকেও জনগণের মৌলিক অধিকার হ’তে বঞ্চিত করা চলবে না। ভোটদানের ব্যাপারেও সামাজিক বৈষম্য কোন রকম বাধার কারণ হ’তে পারবে না। কিন্তু আইনের দৃষ্টিতে সমাজ ও রাষ্ট্রে অনিষ্টকর বৈষম্যমূলক বাধা না থাকলেও জনগণের রাজনৈতিক চিন্তাধারা যতদিন না গণতন্ত্রের উপযোগী হিসাবে পরি-চালিত হয় ততদিন গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার সফলতা সুদূর-পর্যন্ত।

বিশ্বের কথা এই যে ভারতবর্ষের বৃহত্তম জনতার গণ-তন্ত্র সন্থে কোন ধারণাই নেই। যুগযুগান্তর ধরে আমরা যে সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে বাস করছি, যে উৎপাদন ব্যবস্থা আমাদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে তার কোন বৈপ্লবিক ও সামগ্রিক পরিবর্তন ঘটেনি। ভারত-বর্ষের ছয় লক্ষ গ্রামে সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ৮০ জনের বাস এবং এই বিরাট জনসংখ্যার অধিকাংশ এখনও গ্রাম্য মনোভাবের দ্বারা আচ্ছন্ন। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের আদম-শুমারির রিপোর্ট অনুসারে ভারতবর্ষের সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ১৬৬ জন অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন। এই ন্যূনতম মান-দণ্ডে বিচার করেও ৬ কোটি লোক লেখা পড়া জানার পথ্যায় পড়ে। এর মধ্যে ডিগ্রী ও ডিপ্লোমাধারী লোকের সংখ্যা মাত্র ১৮ লক্ষ। গ্রাজুয়েট নারীর সংখ্যা মাত্র ৩৭ হাজার, অথচ পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের গৌরব বিচারে আমাদের দেশের ভোটদাতার সংখ্যা সর্ববৃহৎ অর্থাৎ ১৮ কোটি কিম্বা সমস্ত প্রাপ্ত বয়স্ক নরনারীর ভোটাধিকারের উপর আমাদের গণতন্ত্র দণ্ডারমান। কিন্তু অতীকে

আমাদেৰ দেশেৰ অধিকাংশ মানুহ অৰ্থাৎ ৩০ কোটিই বৰ্ণ জ্ঞানহীন, আবার এই সমগ্র জনসংখ্যাৰ দৈনিক আয়, জীৱিকাৰ উপায় এবং স্বাস্থ্য, বস্ত্ৰ ও গৃহেৰ কথা চিন্তা কৰলে দেখা যাৰে যে বাস্তব বিচাৰে আমাদেৰ দুৰ্গতি অগ্নিসীম—কেননা বুটেনে বৰ্ষন গড়ে মাথা পিছু মাসিক আয় ৩৮২ টাকা, মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰে বৰ্ষন ৭৩৭ টাকা ভাৰতবৰ্ষে তখন মাত্ৰ ২৩ টাকা। তবুও এ কথা অনস্বীকাৰ্য্য যে স্বাধীন ভাৰতে গণতন্ত্ৰেৰ বীজ বোনা হ'ছে এবং আশা কৰা যায় অনতিদূৰ ভবিষ্যতে প্ৰকৃত গণতান্ত্ৰিক শাসন ও স্বাধিকাৰেৰ সোনাৰ ফল ফলবে, কাৰণ ১৯৬১ সালেৰ আদমশুমারিৰ ৱিপোর্ট পাঠে দেখা যায় যে ভাৰত বৰ্ষে শিক্ষিত জনসংখ্যাৰ হাৰ এবং মাথাপিছু মাসিক আয়েৰ হাৰ গত দশ বৎসৰে (১৯৫১—১৯৬১) অনেকটা বেড়েছে। এতদ্ব্যতীত উন্নত ধৰণেৰ উৎপাদন প্ৰণালীৰ ব্যবস্থা কৰা হয়েছে এবং জনসাধাৰণেৰ বাসগৃহেৰ সমস্তাৰ সমাধানও বহুপাশে কৰা হয়েছে, এই কাৰণে স্বামীজিৰ উল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণী বিশেষ প্ৰাধিকানযোগ্য।

ঊনবিংশ শতাব্দীৰ বাঙলাৰ নব যুগেৰ সাধনমন্ত্ৰ ছিল মানব প্ৰেম,মানুহই বড়—মানুহ আগে, ব্ৰহ্ম পৰে, ভগবানেৰ তেহত দিয়ৈ মানুহকে নয়, মানুহেৰ ভেতৰ দিয়ৈই ভগবানকে লাভ কৰতে হ'বে। ভগবানেৰ মহিমা নয়, মানুহেৰ মহিমাই মানুহকে উপলব্ধি কৰতে হ'বে, মানুহকে বিশ্বাস কৰতে হ'বে, এই বিশ্বাসই আত্মবিশ্বাস এবং এতেই মানুহেৰ আত্মা আগবে। এই ছিল বিবেকানন্দেৰ বাণী। তাই যুগাচাৰ্য্য বিদেশকানন্দ মানুহেৰ তুংখ-বেদনাকে কেন্দ্ৰ ক'ৰে তাঁৰ সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা, বিশ্বাস, প্ৰেম, জ্ঞান এবং সক্তি মানব সেৱায় নিয়োজিত কৰেছিলেন, তিনি বলেছিলেন—A hundred thousand men and women ...should go over the length and breadth of the land preaching the gospel of salvation, the gospel of equality.

এই কথা বৰ্ষন তিনি বলেছিলেন ভাৰতবৰ্ষ তখন পৰাধীন। বিদেশী বণিকেৰ শোষণেৰ ফলে দেশেৰ প্ৰাণ-শক্তি তখন নিঃশেষিত, প্ৰাচীন শিক্ষা-সংস্কৃতিৰ বিৰাট ঐতিহ্য বিপৰ্য্যস্ত, খনিজ-কৃষিজ-বনজ সকল ধনদম্পদ অপহৃত ও নষ্ট।

পৰাধীনতাৰ শৃংখলে আবদ্ধ সৰ্ব্বস্বত্ব জাতিৰ সবচেহ তাঁৰ এই বাণী সৰ্ব্বতোভাবে প্ৰযোজ্য। কিন্তু আজ ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীন। স্বাধীন ভাৰত নানাকৰ্ণ গঠনমূলক কৰ্ম অল্পস্থানে ব্যাপ্ত, স্বাভাৱতই প্ৰশ্ন ওঠে স্বাধীন ভাৰত-সমক্ষে স্বামীজিৰ এই কথাগুলি তাৎপৰ্য্যপূৰ্ণ কিনা। এই প্ৰশ্নেৰ মীমাংসায় উপনীত হ'তে গেলে ভাৰতেৰ বৰ্ত্তমান অৰ্থনৈতিক চেহাৰাটো একটু দেখে নিতে হয়।

দুটি পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাৰ কাজ শেষ হয়েছে। দ্বিতীয় পৰিকল্পনাৰ অন্ততম ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল সমাজ-তান্ত্ৰিক হাঁচের সমাজ গঠন। কথা ছিল পৰিকল্পনাৰ লক্ষ্য হ'বে জনগণেৰ জীৱন মানেৰ উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধন, আয় ও সম্পদ বৰ্দ্ধনে বৈশম্য হ্ৰাস এবং অধিকতৰ সমন্বয়োগ-বিশিষ্ট সমাজ গঠন। কিন্তু এসব লক্ষ্য পূৰণ তো হয়ই নি, লক্ষ্যগুলিৰ সান্নিধ্যও পৌছানো যায়নি। পৰিকল্পনা কৰ্ত্তৃপক্ষেৰ হিসাব অনুসাৰে গত দশ বৎসৰে অৰ্থাৎ দুটি পৰিকল্পনাৰ কাজ শেষ হওয়ার পৰ জাতীয় আয় শতকৰা ৪২ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। মাথাপিছু আয়ও ভোগ বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্ৰমে ২০ শতাংশ ও ১৬ শতাংশ। কিন্তু এ হোলো গড়পড়তা হিসাব। জনসাধাৰণেৰ কোন কোন শ্ৰেণীৰও অংশেৰ মাথাপিছু আয় ও ভোগবৃদ্ধিৰ হাৰ গড়-পড়তা আয়েৰ চেয়ে অনেক বেগী। অনেকেৰ ক্ষেত্ৰে ঐ হাৰ গড়পড়তা হাৰেৰ সমান, কিন্তু বিপুলসংখ্যক অংশেৰ ক্ষেত্ৰে ঐ আয় ও ভোগবৃদ্ধিৰ হাৰ গড়পড়তা হাৰেৰ চেয়ে শুধু কমই নয়, অনেকেৰ ক্ষেত্ৰেই নেতিবাচক। এই রকম অবস্থান ন না কাৰণ আছে। পৰোক্ষ-কৰেৰ ক্ৰমবৰ্দ্ধমান বোঝা তাঁৰ মধ্যে অন্ততম, জনসাধাৰণেৰ মাথাপিছু আয় যা বেড়েছে কৰ বৃদ্ধিতেই তা খেয়ে গেছে। ১৯৫০ থেকে ১৯৬০—এই দশ বৎসৰে প্ৰত্যেক কৰ বেড়েছে ২০ কোটি টাকা, অথচ পৰোক্ষ-কৰ বেড়েছে ৩৮০ কোটি টাকা। এৰ উপৰ আবার মুদ্রাস্ফীতি, গত পাঁচ বৎসৰে মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে ৩০ শতাংশ। অৰ্থনীতিৰ সাধাৰণ নিয়মানুসাৰে মুদ্রা-স্ফীতিৰ ফলে কতিপয় হয় নিৰ্দিষ্ট আয়সম্পন্ন লোকেৰা অৰ্থাৎ দেশেৰ প্ৰমজীবি মানুহ। লাভবান হয় শিল্পপতি ও বড় বড় ব্যবসায়ী গোষ্ঠীগুলি। এ ক্ষেত্ৰেও ঠিক তাই হয়েছে। সমাজতান্ত্ৰিক সমাজ গঠনেৰ এড় বড় বুলিৰ পেছনে উৎকট অৰ্থনৈতিক অসাম্য ক্ৰমাগত বেড়েই

চলেছে। ২টি পরিকল্পনার কলে প্রায় রাজ্যের তুলনায় পঞ্চাশগুণি—লাভবান হয়েছে। আবার গ্রাম্যকলে উন্নয়নের সুবিধাগুলো হস্তগত করেছে কৃষি মজুরের পরিবেশে জমির বৃহৎ মালিক মহাজনগণ। শহরাকলে শিল্পশ্রমিক ও বেতনভূক কর্মচারীদের চাইতে শিল্পশ্রমিক, বড় বড় কারবারী, ফাটকাব্যজ ইত্যাদি প্রধানত লাভবান হয়েছে। দেশী ও বিদেশী পুঁজিপতিগণ শিল্প বাণিজ্য তথা আর্থিক জগতের উপর নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্য বিস্তার করে জাতীয় আয়ের এক বিরাট অংশ করায়ত্ত করেছে। মধ্যবিত্ত আঙ্গ শোচনীয় আর্থিক জীবনযাত্রার দিশাহারা। চাষী, মজুর, তাঁতী প্রমুখ নিম্ন শ্রেণীর মানুষ আঙ্গ ফসল ফলিয়েও উপবাসী, কাপড় বুনেও বিবস্ত্র, রক্ত ও ঘর্ম্ম বিন্দু দিয়ে শিল্পোৎপাদন করেও দারিদ্র্যের জগদঙ্গ পাথরের তলার জামা পিঠ। তাই প্রকৃত সমাজতন্ত্র বা সর্বপ্রকার বৈষম্যমুক্ত ব্যবস্থা দূর করে সুখী ও সমৃদ্ধিশালী এবং শিক্ত ও সংস্কৃতির আলোকে উজ্জ্বল জীবন যাপনের পথ উন্মুক্ত করে দেবে তার জন্ত প্রয়োজন প্রচার ও আন্দোলন। স্বাধীনতার পুরোক্ত কণাগুলি কি অদ্ভুত তাঁর দূরদর্শিতার পরিচায়ক! কি অশ্রুতপূর্ব তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী।

এই প্রসঙ্গে আরো একটা কথা বলা যেতে পারে। শুধু ভারতবর্ষের নিম্ন শ্রেণীর সর্বস্বাধীন মানুষের সর্বস্বাধীন মুক্তির কথা তিনি চিন্তা করেননি। ভারতের ভৌগোলিক সীমানা ছাড়িয়ে সমগ্র পৃথিবীর সর্বস্বাধীন মানুষের দাসত্ব মোচন এবং সার্বিক কল্যাণের কথা—তাঁর নিত্য চিন্তার বিষয় ছিল। প্রাচীন ভারতের অবিস্মরণীয় বেদান্তের ধার্মিক মতো নব্যবিজ্ঞান যুগের আধুনিক জাগরণকে আহ্বান করে তিনি এক মহান ঐক্য রূপের সন্ধান দিয়ে গেছেন। তাঁর হৃদয়িত বিশ্ব-চেতনা রূপ পেয়েছিল বস্তুর মধ্যে লায়ত বাক্ত জীবনের প্রতি সীমাহীন প্রীতি এই সর্বভাষা সন্ন্যাসীর চিন্তকে এমনই উজ্জ্বল করেছিল যে তিনি বলিষ্ঠ ঘোষণা করেছিলেন—The only god in whom I believe is the sum total of souls and above all I believe in my god the wicked, my god the miserable, my god the poor of all races.

এই লায়ত সর্বস্বাধীন মানুষের মুক্তির আহ্বানে ভারতবর্ষের কায়মী স্বার্থে বাহকগণ ও শ্রেণী আত্মজাতোর গর্বোক্ষোভ ব্যক্তিগণের কাছ থেকে তিনি কোন সাড়া পাননি। পাশ্চাত্য দেশগুলির জনসাধারণের অবস্থাও

যে তখন (পঞ্চাশ-ষাট বৎসর আগে) খুব উন্নত ও সমৃদ্ধ ছিল তা বলা যায় না। শ্রেণীচেতনা তখন তাঁদের মধ্যে প্রকট হয় নি। বৃটশ সাম্রাজ্য বাহের দাপটে তখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জনগণ অর্জরিত। সাম্রাজ্যবাদী বৃটেন তখন পরবর্তমানত জনদৌলত ভোগে যত সাম্রাজ্যলিপ্সু ফ্রান্স তখন উপনিবেশ এবং অধীনস্থ রাজ্যের সংখ্যা বাড়তে বাস্ত। পুরাণো রীতিনীতি এবং অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে ফেলে।

সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পোন্নত দেশরূপে পৃথিবীর সামনে নিজে তুলে ধরতে আত্মানী তখন ব্যাপ্ত। রাশিয়া তখন খেচ্চাচারী জার শাসিত একটি কৃষিপ্রধান দেশ। প্রগতিশীল নায়কদের নেতৃত্বে সে দেশের জনসাধারণ তখন মুক্তিযুদ্ধের বাস্ত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তখন নিজে বেল গুছিয়ে নিয়েছে এবং তার জনতন্ত্রের স্বর্ণচূড়া বাতে গগনস্পর্শী হয় সে সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছে।

এদিকে এশিয়া মহাদেশে তুরস্কের অবস্থা সঙ্কটজনক। সামন্ততন্ত্র এবং ধর্ম্মীয় ভিত্তিতে শাসিত তুরস্কের প্রভাবশীল (বৃটেন, অষ্ট্রিয়া, রাশিয়া ইত্যাদি) ও পেতে অপেক্ষমান ছিল। সুযোগ পেলেই ইউরোপের এই কয় মানুষকে ছিঁড়ে টুকরা টুকরা করে ফেলবে। শিল্পব্যবসায় এবং রপ কোণে পশ্চিমশীল হয়েও আশানের শাসকদের মন তখনও সেই সামন্তযুগই পড়েছিল। চীনের অবনৈতিক অবস্থায় তখন ভাঙন ধরেছে। দেখান তাই পিং বিদ্রোহ সবেমাত্র ঘটে গেছে, ধর্ম্মান্তরকরণে খ্রীষ্টান মিশনারীদের অসহনীয় অত্যাচার চলেছে, চীন বিদেশী শক্তির দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। চীনের এই রকম অবস্থা দেখে স্বাধীন মন্তব্য করেছিলেন :—China is like a disorganised mob.

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশের এই রকম রাজনৈতিক অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থা স্বাধীন তাঁর পরিশীলিত জ্ঞানবৃত্তির বাপকতার এবং তাঁর উদার, সম্মুখ ও বিশ্বমুখী দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে বিচার করে এই উপসংহারে উপনীত হয়েছিলেন যে :—

Perhaps Russia will be the first proletarian state in the world,

১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর এই রচনায় ভাবীকালের ইতিহাসের পাতার আশোক সম্পাত করেছিল এবং ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব জন্মগ্রহণ করেছিল। সত্য সত্যেই প্রত্যক্ষ হোলো সেই মহাযুদ্ধের যুদ্ধবিহ্বলিত বহিঃপ্রকাশ।



পরীক্ষা ও শিক্ষা

শ্রীজ্ঞান

তোমাদের অনেকেই পরীক্ষা হয়ে গেছে। কলাকল
কিন্তু সকলকারই যে একই রকম হবে না এ তোমরা
সকলেই জান। যারা মন দিয়ে পড়াশুনা করেছে—
একাগ্রচিত্তে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের পড়ানো শুনেছ, অনগ্রমনা
হয়ে পাঠাভ্যাস করেছে—তারা পরীক্ষায় যে ভাল ফল
দেখাবেই তাতে সন্দেহ নেই মোটেই। কিন্তু যারা পড়া-
শুনায় ফাঁকি দিয়েছে—আলসে-আড়ায় কালহরণ করেছে,
আমোদে-আত্মোদে সময় অপব্যয় করেছে, উৎসবে-অনুষ্ঠানে
মত্ত হয়ে অমূল্য সময় নষ্ট করেছে,—পরীক্ষায় যে তাদের ফল
ভাল হবে না তাতো জানা কথাই; এমন কি অনেকে হয়ত
উত্তীর্ণই হতে পারবে না—পাবে না প্রোমোশন, পড়ে
থাকবে একই ক্লাসে! কিন্তু সেটা কি খুব গৌরবের হবে?
কিংবা কোনও রকমে প্রোমোশন পাবার জগ্গে ফাঁকি
দিয়ে, নকল করে ও অজ্ঞান অসাধু উপায় অবলম্বন করে
যেন-তেন-প্রকারেণ উত্তীর্ণ হওয়াটাও কি খুব শ্লাঘার বস্তু
হবে? তোমরা, যারা ছাত্র ও পরীক্ষার্থী, তাদের আজ
এ বিষয়ে বিশেষ করে ভেবে দেখতে কল্পবোধ করি।
লেখাপড়া করার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে জ্ঞান লাভ করা, -
তুচ্ছ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াই নয়। পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রের
যদি কোনও জ্ঞান লাভ না হয়ে থাকে, তাহলে তার
লেখাপড়া করা বৃথাই হয়েছে বুঝতে হবে এবং উত্তর-
কালে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে এদের পদে পদে বাধা,

বিয়ের ও অকৃতকার্যতার সম্মুখীন হতে হবে, হয়ত অনেক
ক্ষেত্রে হাস্যান্বিতও হতে হবে! আর যারা নিষ্ঠাভয়ে
পাঠাভ্যাস করে পরীক্ষায় সাফল্য অর্জনের সঙ্গে
জানার্জনও করেছে, তারা ভাবীজীবনে শুধু স্বপ্রতিষ্ঠিতই
হবে না, অপরকেও তাদের দৃষ্টে, সহযোগিতায়,
সাহচর্যে অগ্রপ্রাণিত করে তুলবে।

স্বামী বিবেকানন্দ বলে গেছেন, ফাঁকি দিয়ে কখনও
কোনও বড় কাজ হয় না। স্বামীজীর এ কথাটা তোমরা
মনে রেখ। ফাঁকি দিলে নিজেদেরই সেট ফাঁকির ফাঁদে
পড়তে হয়, এটাও জেনে রেখ। আমাদের মহান গ্রন্থ
গীতার শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে একস্থানে বলেছেন।—

উদ্ধারদাস্তানাস্তানং নাস্তানমবদাদয়েৎ।

আত্মৈব হ্যস্মিনো বদ্ধরাষ্ট্রৈব রিপুর্নাস্তানঃ ॥ ৬ঃ

অর্থাৎ, স্বকৃত যত্নের দ্বারা নিজের উদ্ধার সাধন করা
কর্তব্য। নিজেকে অধঃপাতিত করা উচিত নয়। যাহুব
নিজেই নিজের বন্ধ, আবার নিজেই নিজের শত্রু।

যারা লেখাপড়া বা জানার্জনের জন্ত কষ্ট করতে রাজী
নয়, বা যারা অগ্নায়ালে ফাঁকি দিয়ে পরীক্ষা পাশের
মার্টিফিকেট লাভ করতে চায়, তারা নিজেদেরই নিজেরা
ফাঁকি দেয়, নিজেদের প্রতি নিজেরাই শত্রুর মতন আচরণ,
করে নিজেদের অধঃপাতিত করে!

আশা করি তোমরা, 'এই কিশোর জগতের পাঠক

পাঠিকারা, কেউই পড়াশুনার কখনও ফাঁকি দেবে না
বা অসাধু উপায়ে পরীক্ষার উত্তীর্ণ হবার চেষ্টাও কখনও
করবে না। সব সময়ই মনে রেখ তোমাদের ওপর রয়েছে
বিশেষ দায়িত্ব—তোমাদের কার্যকলাপের ওপর নির্ভর
করছে ভবিষ্যতের অনেক কিছুই। তোমাদের সাধুতা,
সততা, একনিষ্ঠতা আমাদের সমাজের, জাতির ওবা দেশের
পরম মূল্যবান—এর ওপরই নির্ভর করছে আমাদের দেশের
ভবিষ্যৎ; আর সে ভবিষ্যতকে উজ্জ্বল করে তোলবার
দায়িত্ব স্তম্ভ রয়েছে তোমাদের মতন কিশোর-কিশোরীদের
ওপরই! তোমাদের সততা, সাধুতা, অধাবসায়, এক-
নিষ্ঠতার ভারতের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে
উঠুক এবং তোমরাও জানে, শুণে, গড়িমায় দীপ্ত হয়ে ওঠ—
এই প্রার্থনা, এই কামনাই আমরা করি।



আলেকজান্ডার ড্রামা

রচিত

দী কাউন্ট অব,
মন্টি ক্রিস্টো

সৌম্য গুপ্ত

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

ডাক্তার বললেন,—ওঁরা মায়া গেলে, ওঁদের সম্পূর্ণভাবে
একরাজ্য নাভী—আপনার কত্যা ভ্যালেন্টিন...তাই না?
জেরার্ড চমকে উঠলো...বললে,—বলেন কি...ভ্যালেন-
টিন!...না, না...অসম্ভব!

ডাক্তার বললেন,—তিন-তিনজনের মৃত্যু...রোগ নেই
কোনো রকম চিকিৎসার অবসর মিললো না...হঠাৎ
মৃত্যু!...মৃত্যু নয়—তিন-তিনটে মাহুৎ খুন!...আপনি
হাকিম—অপরোধীকে সাজা দেওয়া আপনার কাজ!

জেরার্ড বললে,—না, না...ভ্যালেন্টিন সম্পূর্ণ নির্দোষ!
আপনি বলেন কি...আমার ঘেরেকে আদালতে দাঁড়
করিয়ে তার ফাঁশি দেবো!

ডাক্তার নিশ্বাস ফেললেন...বললেন,—বেশ আপনি যা
ভালো বুঝবেন, করবেন—তবে আমার স্পষ্ট কথা—
আপনার বাড়ীতে যদি এর পর কারো অস্ব্থ করে তো
আমাকে ডাকবেন না...ডাকলে আমি আসবো না!

ক'দিন পরে ভ্যালেন্টিনের কঠিন অস্ব্থ...জেরার্ড নিজে
এলো ডাক্তারকে ডাকতে...চট করে আহুন ডাক্তার...
ভ্যালেন্টিনের শক্ত অস্ব্থ—বুঝি সেও এবার যায়।

খবর শুনে ডাক্তারের হুঁচোথ বিফারিত...তিনি
বললেন,—ভ্যালেন্টিন! তাহলে আমার সঙ্গেই মিথ্যা!

তিনি অবিলম্বে এলেন ভ্যালেন্টিনকে দেখতে।

ভ্যালেন্টিনের অস্ব্থের খবর শুনে ব্যস্ত হয়ে ম্যাক্স-
মিলিয়ানও এলো কাউন্টের কাছে...কাউন্ট বলেছিলেন—
যখন দরকার মনে করবে, তুমি আমার কাছে এসে
আমাকে বলবে।

ম্যাক্স মিলিয়ানকে দেখেই কাউন্ট শুধোলেন,—
ব্যাপার কি?

ম্যাক্স মিলিয়ান বললে,—জেরার্ডের কত্যা ভ্যালেন্টিন
বুঝি বাঁচবে না!

কাউন্ট বললেন,—তাতে আমার কি! বিধাতার
অভিশাপ আছে ও-পরিবারের উপর...ওঁদের কেউ
বাঁচবে না!

কাতর-কণ্ঠে ম্যাক্স মিলিয়ান বললে,—কিন্তু আমি
তাকে ভালোবাসি, কাউন্ট!

কাউন্ট বললেন,—ভ্যালেন্টিনকে ভালোবাসো!...এ
লক্ষীছাড়া বংশের ঘেরেকে তুমি ভালোবাসো!

ম্যাক্স মিলিয়ান বললে,—ভ্যালেন্টিন বড় ভালো...তার
উপর যে পীড়ন চলেছে বিধাতার...

কাউন্টের মনে পড়লো—ম্যাক্সমিলিয়ানের পিতা
মোরেলের কথা...তার মনিব মোরেল!...মোরেল তাঁর
জন্ত বা কয়েছেন—সে ঋণ জীবন দিলেও শোধ হবার নয়!

কাউন্ট বললেন,—বেশ, আমি তোমাকে সাহায্য
করবো!...ভেবো না...ভ্যালেন্টিন বাঁচবে!

ওদিকে চারদিন চাররাত্রি ভ্যালেন্টিন প্রায় মূর্ছিতের
মতো রোগশয্যায় পড়ে আছে...অন্ন-বিকারে প্রলাপ বকছে
হঠাৎ মুছার ঘোর ভাঙলে চোখ মেলে চাইতেই দেখে
—ঘরে ধীরে ধীরে প্রবেশ করছে—কাউন্ট অফ মন্টি-
ক্রিস্টো!

আচম্কা কাউন্টকে দেখেই ভ্যালেন্টিন জ্বাক্কে
উঠলো! অভয় দিয়ে কাউন্ট বললেন,—ভয় নেই...আমি
তোমাকে দেখছি...তোমাকে আমি সারিয়ে বাঁচিয়ে
তুলবো—ম্যাক্সমিলিয়ানের জন্ত!...ক'দিন আমি চারদিকে
নজর রেখেছি...কারা তোমার কাছে আসে...কেন আসে
...তাও লক্ষ্য করছি!...তোমার জলে, দুখে, গর্বের গ্লানে
বিষ মিশিয়েছে...আমি সে বিষ ফেলে দিয়েছি!...তোমাকে
সজাগ থাকতে হবে—রাত্রি বারোটা পর্যন্ত!...ঐ সময়েই
আসে খুনী!

একটু পরেই ঘড়ীর কাঁটার ঢং-ঢং করে বাজলো—রাত্রি
বারোটা!...কাউন্ট ভ্যালেন্টিনকে বললেন,—ঐ রাত
বারোটা বাজছে...এবারে সে আসবে! তুমি ঘুমের ভাণ
করে চোখ বুজে বিছানায় পড়ে থাকো...তাহলেই দেখতে
পাবে, কে আসে!...ভয় নেই...আমি ঐ দরজার আড়ালে
লুকিয়ে থাকবো...দরকার হলেই...

এ কথা বলেই কাউন্ট নিঃশব্দে সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে
গেলেন...ভ্যালেন্টিনও তাঁর উপদেশমতো চোখ বুজে
নিঃশব্দে বিছানায় শুয়ে রইলো!...হঠাৎ ঘরে খশ্খশ্
পায়ের শব্দ...সে শব্দ শুনে ভ্যালেন্টিন চোখ মিটমিট করে
চোরে দেখলো—ওদিককার দরজা খুলে নিঃশব্দে ঘরে ঢুকলো
আগাগোড়া বজ্রাবৃত্তা এক নারী-মূর্তি...ধীরে ধীরে সে মূর্তি
এগিয়ে এলো তার বিছানার পাশে...পালঙ্কের পাশে
টেবিলে রাখা ছুখের গ্লাস...সেই গ্লাসে বজ্রাবৃত্তা-মূর্তি কি
যেন মেশালো!...ভ্যালেন্টিন দেখেই চিনলো...বজ্রাবৃত্তা
সেই নারী-মূর্তি—তারই বিমাতা!

নিমেষের মধ্যেই নিঃশব্দে তার কাজ শেষে বজ্রাবৃত্তা
মূর্তি ঘর থেকে চলে গেল! এ সব রহস্যের কৌতুকলাপের
পরিচয় পেয়ে ভ্যালেন্টিন তো স্তম্ভিত!

পরে ভ্যালেন্টিন এ কথা জানালো কাউন্টকে...বললে,
এ বাড়ী থেকে আমি চলে যাই যদি ওর হাত থেকে
নিস্তার পাবার জন্ত?

কাউন্ট বললেন,—যেখানে যাবে, ছায়ার মতো ও
তোমার পিছনে ফিরবে...নিস্তার নেই কোথাও!

ভ্যালেন্টিন আকুলভাবে বললে—তাহলে উপায়?

কাউন্ট বললেন,—আমি যা বলবো, অক্ষরে অক্ষরে
তা তোমাকে পালন করতে হবে!...আমি যা খেতে দেবো,
খাবে...ভয় পেলে চলবে না!...আমার উপর বিশ্বাস
রাখতে হবে!...খুব ঘুমাবে...যদি ক'দিনের মধ্যে ঘুম
ভাঙে, তবু ভয় পেয়ো না!...চূপচাপ থাকলে জেনো—
তোমার আর ম্যাক্সমিলিয়ানের উপর, দুজনের মঙ্গলের জন্ত
একজন হিতাকাঙ্ক্ষী-বন্ধু—সারাক্ষণই বাপের মতো সজাগ-
নজর রাখছে!...পারবে, এ বিশ্বাস রাখতে?

কাউন্টের মুখের পানে তাকিয়ে অবিলম্বে কণ্ঠে ভ্যালেন-
টিন বললে,—পারবো!

কাউন্ট তখন ভ্যালেন্টিনকে কি যেন একটা বড়ি
খেতে দিলেন। বড়িটি খাওয়ানোর পর কাউন্ট বললেন,
—এখন তাহলে আসি!...কেনো ভয় নেই...এ বাঁচা
তুমি প্রাণে রক্ষা পেরেছো, জেনো!

পরের দিন ভ্যালেন্টিনকে সকলে দেখে মৃতের মতো
পড়ে আছে...নাড়ীতে স্পন্দন নেই...শ্বাস-প্রশ্বাস নেই...
নোস্তিয়ার তখন জেরার্ডকে বললেন,—কে এমন হত্যা
করেছে?...

জেরার্ড বললে,—এর বিচার আমি করবো!...এ
প্রাণের জন্ত, তাকেও প্রাণ দিতে হবে!...

যথাসময়ে ভ্যালেন্টিনের দেহ হলো কবিরত...কাউন্ট
তখন এলেন ম্যাক্সমিলিয়ানের কাছে...ম্যাক্সমিলিয়ান
তখন শোকে-দুঃখে অধীর হয়ে আত্মহত্যার সঙ্কল্প করে
একখানি পত্র লিখতে বসেছে!

কাউন্ট বললেন,—আত্মহত্যা করতে চাও?...

ম্যাক্সমিলিয়ান বললে,—হ্যাঁ!...কারো সাধ্য নেই,
আমাকে বাধা দেবে!

কাউন্ট বললেন,—বটে!...আমি বাধা দেবো!...
মোরেলের পুত্র আজ মরতে পাবে না!...

ম্যাক্সমিলিয়ান বললে,—হঠাৎ আমার বাবার কথা
বললেন কেন?

শ্বির-কণ্ঠে কাউন্ট বললেন,—তার কারণ, তোমার
বাবা আমার দারুণ বিপদের দিনে আমার পরম-বন্ধুর কাজ
করেছিলেন...তিনি আমার প্রাণ বাঁচাবার জন্য কি চেষ্টা
না করেছিলেন!...আশ্চর্য্য হলো না...আমি কে, জানো?
...আমি হলুম—এডমণ্ড হাউস!

কাউন্টের আসল পরিচয় পেয়ে ম্যাক্সমিলিয়ান চমকে
উঠলো!

কাউন্ট বললেন,—শোনো ম্যাক্সমিলিয়ান—তোমাকে
আমি প্রাণের চেয়েও বেশী ভালোবাসি!...আমার নিজের
ছেলে থাকলে, সে ছেলেকে এর চেয়ে বেশী ভালোবাসতুম
না!...আমি শপথ করেছি, তোমাকে বাঁচাতে হবে...তার
কারণ, একদিন তুমি স্বাধী হবে!

এ কথার সঙ্গে সঙ্গেই কাউন্ট সঙ্গেহে ম্যাক্সমিলিয়ানের
হাত দু'খানি নিজের হাতে নিয়ে বললেন,—আমাকে কথা
দাও—একমাস অন্তত: আত্মহত্যার কথা চিন্তা করবে না
...তোমাকে বাঁচাতে হবে!...আমায় আশাহারা করো না,
বৎস!

কাউন্টের কথা শুনে ম্যাক্সমিলিয়ান কণকাল স্তব্ধ-
দৃষ্টিতে ঠাঁর পানে তাকিয়ে দৃঢ়কণ্ঠে বললে,—কথা দিচ্ছি,
একমাস আমি আত্মহত্যার বিষয় মনেও আনবো না!

| ক্রমশ:



চিত্রগুপ্ত

এবারে শোনো—বিজ্ঞানের আরেকটি বিচিত্র-মজার আজব
রহস্যময় খেলার কথা। এ খেলাটির নাম দেওয়া যায়—
'বিনা-ফুয়ে বেলুন ফোলানোর কারসাজি'। খেলাটির
কলা-কৌশল নিতান্তই সহজ-সরল...একটু চেষ্টা করলেই
বিজ্ঞানের এই আজব-মজার কারসাজি দেখিয়ে খুব সোজা
উপায়ে তোমরা তোমাদের আত্মীয় বন্ধুদের 'রীতিমত
তাক লাগিয়ে দিতে পারবে। এ খেলার কেরামতী
দেখানোর সামান্য যে কয়েকটি সাজ সরঞ্জাম দরকার,
সেগুলিও অতি সাধারণ যেরোয়া সামগ্রী...তোমাদের
অনেকের পক্ষেই এ সব জিনিষ জোগাড় করা এমন কিছু
ব্যয়বহুল বা কঠিন কাজ নয়। তাই বিজ্ঞানের এই আজব
কারসাজির খেলা দেখানোর জন্য যে সব উপকরণ
প্রয়োজন, গোড়াতেই তার একটা মোটামুটি ফর্দ দিয়ে
রাখি। অর্থাৎ, বিনা ফুয়ে বেলুন ফোলানোর কশরৎ
দেখাতে হলে দরকার—একটি জল শূন্য বোতল...সাধা-
রণতঃ, বাজারে আজকাল সরু ছাঁদের মুখওয়ালা যে সব
বোতলে সোডা লেমোনেড সরবরাহ করা হয়ে থাকে, সেই
ধরনের জিনিষ হলেই চলবে। বোতল ছাড়া আরো
জোগাড় করা চাই—ছোট বা মাঝারি সাইজের একটি
রবারের তৈরী বেলুন (Rubber baloon) বেলুনের
মুখে বাধবার উপযোগী খানিকটা লম্বা সূতো একটি মাঝারি
সাইজের গামলা কিম্বা ডেকচি এবং এক কেটলী ফুটন্ত-
গরম জল।

ফর্দমতো সাজ-সরঞ্জামগুলি সংগ্রহ হবার পর, আসবে
দর্শকদের সামনে একটি টেবিল অথবা টুলের উপর

পরিপাটিভাবে এ সব সামগ্রী সাজিয়ে রেখে তোমাদের আত্মীয়-বন্ধুদের সাদরে আহ্বান জানাও যে তাঁদের মধ্যে এমন বাচ্চাদের কে আছেন, যিনি হাত দিয়ে কিম্বা মুখের ফুঁয়ের সাহায্যে ঐ টেবিল বেঞ্চি বা টুলের উপরে সাজানো রবারের বেলুনটিকে আদৌ স্পর্শ না করে, সেটিকে কেবল-মাত্র বিজ্ঞানের আজব-বাহুযন্ত্রে খুব সোজা উপায়ে অনায়াসে আগাগোড়া বাতাস ভরে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে পরিপাটিনিটোল গোল-ছাঁদের বানিয়ে তুলতে পারবেন।

তোমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আসরের দর্শকদের মধ্যে কয়েকজন হয়তো উৎসাহভরে নিজেদের বাহাদুরী দেখানোর উদ্দেশ্যে নানা রকম কারদা-কেরামতীর পরিচয় দিয়ে এমন আজব-উপায়ে বেলুনে বাতাস ভরে নিটোল-গোল ছাঁদে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে তোলাবার জ্ঞাত এগিয়ে আসবেন, কিন্তু বিজ্ঞানের আসল-রহস্যটি অজানা থাকার দরুণ, তাঁদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হবে শেষ পর্যন্ত এবং রবারের বেলুন যেমন না ফোলানো অবস্থায় রাখা ছিল, আসরের মাঝখানে বরাবর ঠিক তেমনিই রয়ে যাবে। অবশেষে একে একে এঁরা সবাই যখন কারসাজি দেখাতে এসে হার মানবেন, তখন স্নেহ করো—তোমাদের কেরামতীর পালা।

কিন্তু সে কেরামতী কি উপায়ে দেখানো সম্ভব, আপাততঃ তারই মোটামুটি হুঁশি দিয়ে রাখি।

অর্থাৎ, আসরের দর্শকদের সামনে স্তূভভাবে বিজ্ঞানের এই আজব-কারসাজি দেখাতে হলে, গোড়াতেই শূন্য-বোতলটিকে খাড়াভাবে টেবিল, বেঞ্চি বা টুলের উপর রাখো। তারপর ফুঁ দিয়ে বাতাস-ভরাবার জ্ঞাত রবারের বেলুনের মুখের ফুটোটিকে বেশ ভালোভাবে এঁটে বসিয়ে দাও ঐ শূন্য বোতলের মুখে—পাশের ছবিতে যেমন দেখানো রয়েছে, অবিকল তেমনি ভঙ্গীতে।

এভাবে বোতলের মুখে রবারের বেলুনটিকে এঁটে বসানোর সময়, বেলুনের গলায় সূতোর ফাঁশিও পরিচয় দিতে ভুলো না কারণ, বিজ্ঞানের আজবলীলার ফলে, বেলুনটি ধীরে ধীরে বাতাস-ভর্তি হয়ে আগাগোড়া নিটোল বলের মতো গোলাকার ধারণ করলেই, সূতোর ফাঁশি টেনে সেটিকে অনায়াসে এমন মোক্ষমভাবে বেঁধে নিতে পারবে যে বেলুনের ভিতর থেকে বাতাসের ঘন ফাঁক

গলে সহজে বাইরে বেরিয়ে যাবার একটু উপায় না থাকে।

উত্তোগ-পর্কের এ কাজটুকু সারা হলে, বেলুন আঁটা শূন্য বোতলটিকে উপরের ছবির ভঙ্গীতে গামলা কিম্বা ডেকচিতে খাড়াখাড়াভাবে বসিয়ে রেখে খুব সাবধানে কেংলী থেকে ফুটন্ত গরমজল ঢেলে পাত্রটি ভরে তোলাও। এমনি ভাবে গামলা কিম্বা ডেকচিতে গরমজল ভর্তি করার কিছুক্ষণ বাদেই ফুটন্ত-জলের তাপে শূন্য-বোতলটি ক্রমশঃ উত্তপ্ত হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই দেখবে ঐ বোতলের মুখে-আঁটা রবারের বেলুনটিও ধীরে ধীরে দিবি ফুলে কেঁপে আগাগোড়া নিটোল-গোলাকার হয়ে উঠতে শুরু করেছে।

এমন আজব-কাণ্ড কেন ঘটে, জানো?...শোনো তাহলে...এর আসল রহস্যের কথা খুলে বলি তোমাদের।

তোমাদের সকলেরই হয়তো জানা আছে যে গরম তাপ পেলে বাতাস আয়তনের বেড়ে যায়—এই হলো বিজ্ঞানের বিচিত্র নিয়ম। এ রীতি অহুসরণ করেই—‘বিনা-ফুঁয়ে বেলুন ফোলানোর’ আজব কারসাজিটি দেখানো সম্ভব। অর্থাৎ, বেলুন-আঁটা শূন্য-বোতল বসিয়ে রাখা পাত্রটির ভিতরে কেংলীর ফুটন্ত গরম-জল ঢেলে দেবার ফলে, বোতলটি জলের তাপে ক্রমশঃ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে বোতলের ভিতরের বাতাসের আয়তনও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ, সেটির মুখে



রবারের বেলুন আঁটা রয়েছে বলে বোতলের ভিতরকার বাড়তি-বাতাস এতটুকু বাইরে গলে বেরিয়ে আসতে পারেনা। কাজেই বোতল-বদ্ধ সেই বাড়তি বাতাস তখন আয়তন বৃদ্ধির ফলে, ক্রমশঃ ঠেলে উঠে সেঁদিয়ে যায় ঐ

বোতলের মুখে-অঁটা রবারের বেলুনের কন্দরে এবং তারই অন্তর বেলুনটি ধীরে ধীরে ফুলে ফেঁপে বাতাসে ভরাট হয়ে দ্বিবিয় সহজ-উপায়ে নিটোল-গোলাকার রূপধারণ করে। এবারের আজব মজার বিজ্ঞানের কারসাজিটির এই হলো আসল রহস্য।

আগামী সংখ্যায় এমনি বিচিত্র অভিনব আরেকটি নুতন ধরনের মজার খেলার হৃদিশ দেবার ইচ্ছা রইলো।



মনোহর মৈত্র

১। গানের হেঁজালী ৪

ন, ম, জ, অ, ন, গ, না, ণ, ক, ঝ, ঙ, ধি, হে, ঙ, গা, ত, ভা, ব, ভা, তা, জা, বি, পা, ধা, সি, শু, দ্রু, ব, ট, মা, ল, ধা, দ্রা, রা, বি, রা, ড, ক, ঙ, ল, ব, উ, দ্যা, ল, হি, বি, ১, ঝা, ষ, য, ল, না, ম, জা, জু, গ, উ, ল, ধি, জ, ত, ল, দ, র, ব, শু, ত, ভ, মে, জা, না, গে, আ, ত, শু, শী, ভ, মা, ব, ষ, গে, ঝ, গা, ত, হে, জ, ব, ধা, গা।

উপরে এলোমেলোভাবে যে সব অক্ষর ছাপা রয়েছে, সেগুলিকে যদি মগজের বুদ্ধি খাটিয়ে পর-পর ঠিক মতো সাজিয়ে বসাতে পারো, তাহলে খুব সহজেই খুঁজে পাবে আমাদের দেশের সুপ্রসিদ্ধ কবির রচিত সর্জনশ্রিয় একটি দ্বিতীয়-সদ্বীতের প্রথম কয়েকটি পংক্তি। হঠাৎ দেখলে, এ হৈমালির মীমাংসা যতটা সোজা মনে হবে, আসলে কত কাছটা ঠিক ততখানি সহজ নয়। কথারটা খাটি কনা—এক টুকরো কাগজ আর পেন্সিল নিয়ে নিজেরা কি খাটিয়ে উপরের ঐ একরাশ অক্ষর পর-পর সাজিয়ে

বসানোর চেষ্টা করে দেখলেই তোমরা স্পষ্ট বুঝতে পারবে। কাজেই নিজেরা হাতে-কলমে পরখ করে দ্ব্যর্থোত্তম। এবারের এই আজব হৈমালির সঠিক সন্ধান যদি আমাদের দপ্তরে লিখে পাঠাতে পারো চটপট, তাহলে পরের মাসের সংখ্যায় সবাইকে জানিয়ে দেবো তোমাদের নাম-ধাম।

কল্যাণী মুখোপাধ্যায়

‘কিশোর-জগতের’ সত্য-সত্যাসনের

রচিত শাঁখা :

২।

চার অক্ষরে নাম আমার...খেতে স্বাদু বিশেষ এক-ধরনের মরশুমী ফল। প্রথম ও শেষাক্ষর জোড়া দিলে, মাছ ধরা যায়। দ্বিতীয় আর তৃতীয় অক্ষর জোড়া দিলে বোঝায়—বালুকাময় বিস্তীর্ণ অঙ্গন। প্রথম অক্ষর দুটিতে বোঝায়, বিশেষ এক-ধরনের স্বাদু-মুখরোচক ফলের নাম...আর শেষাক্ষর দুটিতে সহজেই কাগজের বৈক লাইন টানা যায়। বলো তো—এ ধাঁধার উত্তর কি?

রচনা : অরুণ ও মণীন্দ্র চক্রবর্তী (আড়িরাবহ)

৩।

তিন অক্ষরে নাম...খাকে আমাদের মাথার খুলির ভিতরে। প্রথম অক্ষর বাদ দিতে, সেটি মিলবে দজীর দোকানে আর শেষের অক্ষরটি বাদ দিয়েই হয়ে যাবে জল রাখবার পাত্র। বলো তো, সেটি কি?

রচনা : খুন্ ও টুকু (লিঙ্গুর)

পত্নাসের ‘শাঁখা’ আর হেঁজালির

উত্তর :

১। ১০টি জিভুজ।

২। টাকায় ১২টি আম।

৩। সানাই।

পত্নাসের তিনটি শাঁখার সঠিক

উত্তর দিয়েছে :

কুলু মিত্র (কলিকাতা), নোরাণ্ড ও বিজয়া আচার্য (কলিকাতা), রিনি ও রনি মুখোপাধ্যায় (কাইরো), গুডুল, স্বপা, হাবলু ও টাবলু (হাওড়া), পুপু ও কুটিন

মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা), বাপি, বুভায় ও পিট, গঙ্গোপাধ্যায় (বোম্বাই), সত্যেন, মুরারি, সত্য ও হুনীল (ভিলাই), বাপা ও বুনা মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা), দেববর বন্দ্যোপাধ্যায় (ব্যাঙ্কালোর),

পত্নীমাসের ছুটি শ্রীশ্রীর সঠিক

উত্তর দিকেরে :

বুঝ ও মিঠু গুপ্ত (কলিকাতা), কবি ও লাডু হালদার (পানাগড়), শুভা, সোম, অরিন্দম ও করুনা বড়ুয়া

(কলিকাতা), শ্রীমাদাস দেবশর্মা (উত্তরপাড়), নিশানাথ ও উষানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতা), শীলা মিত্র (বিশজোনী), অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় (আলীগড়), নরেন্দ্রনাথ খোসা (খলসী), বাণী, শুভ ও মিলন হাজরা (আড়ুই),

পত্নীমাসের একটি শ্রীশ্রীর সঠিক

উত্তর দিকেরে :

বিশনাথ ও দেবকী সিংহ (গয়া), বাপা ও শিবাজী রায় (কলিকাতা)।

খেলায় সাথী—



বাদ্যযন্ত্রের কথা

দেবশর্মা বিচিত্র

কষ্টে সজীত হাতাও, বিবিধ ধরনের
বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে সুর-সঙ্গীত ও
বিচিত্র সঙ্গীতানুষ্ঠানের আগ্রহ
মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। সে
পরিচয় মেনে মানব-সভ্যতা
বিকাশের আদি-যুগ থেকেই।
ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আদিম-
মানবের মনে দেখা দিয়েছিল
সঙ্গীত-চর্চার সৌখিন
অনুরাগ। যে যুগে বাদ্যযন্ত্র হিমায়ে
আদিম-মানবের আরম্ভ-
অনুরাগে রাজানো হতো
সামান্য দুটি কাঠি।



তারপর ... কাল-কালে ক্রমশঃ সভ্যতা

বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আদিম-মানব
একদা দৈনন্দিন কাজকর্মের কোন
এক ফাঁকে সহসা সন্ধান পেয়েছিল
সুন্দর তারের সাহায্যে সুর-সঙ্গীত
চর্চার উপযোগী অভিনব-বিচিত্র
ধরনের বাদ্যযন্ত্র বানিয়ে তোলার
অপূর্ব কলা-কৌশল। সেই থেকেই
সুর হলো - মানব-সমাজে তারের
বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারের ইতিহাস।

আর প্রাচীন যুগের মিশর রাজ্যের
সুসজ্জিত অধিবাসীরা সুন্দর সুর-সঙ্গীতের
আলাপ করতেন তাঁদের উদ্ভাবিত
বিচিত্র-অভিনব ধরনের এই 'হার্প'
(HARP) বা বীণ-সেতারের মতো
অপরূপ-সৌখিন তার-যন্ত্রে।
কালের প্রবাহে মিশরের আদি-
যুগের রাজসিদ্দাদের পরম-প্রিয়
এই তার-যন্ত্রের ব্যবহার অধুনা
অপ্রচলিত হলেও, ওদেশের খাদুঘরে
এখনো চোখে পড়ে সেকালের
এমনি কয়েকটি বাদ্যযন্ত্রের নমুনা।



দ্রাণী



গান

রাগ—ভৈরবী তাল—দাদরা

সোনালী ধানের কামনা কাঁপিছে,

বুক ভ ১ মধু তার,

গন্ধ ছড়ারে বিছানার আসন

রচি নব উপহার ॥

এস পরবাসী মুখ ভরা হাসি

দুয়ারে দুয়ারে ঐ বাজে বা শ,

ধুলার বিছারে আছে রাশি রাশি

আহ্বান সবাকার ॥

কুশাগী বধুব আখির স্বপনে

কুশাগের বুক নাচে,

বোদ-বল-মল আকাশের গায়ে

স্নায় প্রাণ আজ বাচে ।

এস মেলি হাত তুলে লও সবে

মাটির দানে এ মহোৎসবে

সবার হৃদয় বাঁধা হোক তবে

রাখি ভয়-বাতার ।-

রচয়িতা—কামাখ্যা সরকার

স্বরলিপি—শ্রীকালীনাথ মুখোপাধ্যায় (সঙ্গীতবিশারদ)

১ স। জা পা	১ পা পা পা	১ পা দা পামা	১ মা পা মা
সো না লী	ধা নে ব	কা ম না	কা পি ছে
১ স। দা পা	১ মা মা খা	১ জা সা সা	১ -১ -১ -১
বুক ভ	রা ম ধু	ভা . ব	. . .
১ সা মা মা	১ মা মা মা	১ মা পামা জামাপা	১ পা পা পা
গ ন ধ	হ ডা রে	বি ছা . . .	আ গ ন

১	জা	দ	দা		দা	মা	দা		সী	১	সী		-১	-১	-১	I
	র	তি	ন		ব	উ	প		হা	১	র		.	.	.	
১	সা	দা	পা		মা	সা	খা		জা	সা	সা		-১	-১	-১	II
	বু	ক	ড		হা	ম	ধু		তা	.	র		.	.	.	
১	দা	মা	দা		সী	সী	সী		সী	সী	না		খী	সী	সী	I
	এ	স	প		র	বা	সী		যু	খ	ড		হা	হা	সি	
১	সী	খী	খী		খী	খী	খী		সী	খী	জা		খী	জা	খী	I
	হু	হা	রে		হু	হা	রে		ঐ	.	বা		জো	.	বা	সি
১	সী	খী	সী		গা	সী	গা		দা	গা	দা		পা	পা	পা	I
	ধু	লা	র		বি	ছা	রে		আ	হে	হা		সি	হা	সি	
১	সা	দা	পা		মা	সা	খা		জা	সা	সা		-১	-১	-১	II
	আ	১	হা		ন	স	বা		কা	.	র		.	.	.	
১	সা	খা	মা		মা	মা	মা		মা	পা	জা	মা	পা	পা	পা	I
	ক	বা	গী		ব	ধু	র		আ	বি.	.	১	১	১	নে	
১	জা	দা	দা		দা	দা	গা		দা	পা	-১		-১	-১	-১	I
	ক	বা	গে		র	ব	ক		না	চে	
১	পা	দা	পা		মা	মা	মা		জা	পা	মা		জা	খা	সা	I
	মো	ব	ক		ল	ম	ল		আ	কা	শে		র	গা	রে	
১	সা	মা	মা		মা	পা	জা	মা	পা	পা	-১		-১	-১	-১	I
	ব	হা	এ		১	আ.	.	১	১	১	১		.	.	.	
১	দা	মা	দা		সী	সী	সী		সী	সী	না		খী	সী	সী	I
	এ	স	মে		সি	হা	ড		কু	লে	ল		ও	স	বে	
১	সী	খী	খী		খী	খী	খী		সী	খী	জা		খী	সী	সী	I
	মা	টি	র		দা	নে	র		এ	১	হো		ড	স	বে	
১	সী	খী	সী		গা	সী	গা		হা	গা	দা		পা	পা	পা	I
	স	বা	র		হু	১	১		বা	১	হো		ক	ড	বে	
১	সা	দা	পা		মা	সা	খা		জা	সা	সা		-১	-১	-১	II
	হা	বি	জ		১	১	১		জা	.	১		.	.	.	



পূর্ণকল্প

বিমানকুমার রাজগুরু

দরজাটা তেলিতে দিয়ে এলো স্থলতা। মনটা বড় খারাপ হয়ে আছে। তাছাড়া পাড়াটা খারাপ। বেড়াল, কুকুর তো আছেই, অত্যাশ্চর্যই চোর হাচড়েরও। মূল্যবুদ্ধি আর খারাপ লোকের বুদ্ধি পাশাপাশি হাঁটছে এখন। কদমে কদম। সংবাদপত্রগুলি তো, অণুর বাবা বা দু-একদিন নিয়ে আসে কালকূ বেহেসিবী খরচ বলে বার জন্তে উক্তিও করেছে সে, চোর বাটপাড়ের কাহিনীতে ভরা। এছাড়া আবার পেশাল (ইংরেজী কথাটা এবং ঐ ধরনের আরো দু'একটি কথাও শিখেছে এর আগের পাড়ার, পাড়াটা কিছু ভালো ছিল) আইন আদালতের পাঠ। সাবধানের মার নেই। স্বামী বাইরে বেরলেই দরজা বন্ধ। একটা কিছু পটকে দিলেই আত্মান্তরে পড়া। সেটা কেনা মানেই অস্ত্রদিকের ব্যর সন্ধান। প্রয়োজনের অভিরিক্ত জিনিষ নেই বাড়ীতে। আর তার অর্থই, স্বামীর দুঃখ। তার কথার ঐটেই এসব বাড়ীর প্রয়োজনের অভিরিক্ত, অদরকারী। অথচ অভ্যাসটা ওর খারাপ। যাত্রা খাওয়ার পর একটু গরম দুধ না পেলে ত্রাংপর দিন পেটের গোলমাল। বারবার জল খাওয়া, পেট চাপড়ানো, আর যেজাজ খিটখিটে।

এ নিধে ঠাট্টাও করেছে সে স্বামীকে--কুখি তো অণুরও অধম।

মনের উপর, মনকে নিয়ে রাহুকের বসতি আর বেলাতি হুই-ই। মন ভালো থাকলে সব কিছুই ভালো, না হলে তাবৎ ব্রহ্মাও খারাপ, অদৃষ্ট স্থলগোলা! ভালো মন থাকলে ঠাট্টার যোগ দিয়েছে তার স্বামী—অণু তো তবু দুধ পায়...কি বলতে কি বলবে, আলগা-হওয়া মুখে কি বেকবে (ব'দ্বিও বুঝতে তার লক্ষ্যাক্রম হয়) তাই ক্রমের চেয়ে স্বামীর মুখে হাঁচচাপা দিয়ে অশ্রুতক

মিষ্টতর করেছে। আবার স্বামীর মন তার থাকলে পলা তার হয়েছে—সত্যি, বাবা বা বে কী অভ্যাস করিয়ে ছিলেন। এসব ঘরে ওসব বিদ্যাসিতা...

মন হয়ে এসেছে স্থলতা। গায়ে গা ঠেকেছে। লাফনার বিলি কেটেছে চুলে। মিষ্টি হাতে চুলের গোড়ার গোড়ার নখ টেনেছে। আরো আঙুলে আঙো দরদরখা স্বরমিরা স্বর বেরিয়েছে—আমি কি তাই বলেছি, আমি কি তাই বলতে পারি?

কোনো কোনো দিন হয়তো ঐ একই কারণে, কিংবা অন্য কোনো অধরূপ কারণে আর তারী গলা না, কক্ষ হয়েছে গলা। কলকারখানার লোক, যেমন গলা হয়ে থাকে মাঝে মধ্যে—কগড়া করছে। সে কগড়া মিটিয়েছে রাতের বিছানায় নয়তো অণু। বিছানায় বা বাবার মধ্যে যে ব্যবধানটুকু ওর রচনা—বিছানার বাইরে সেটা যেটাবার বেন দাখি নিয়েছে ও।—বাকি, বেলু। ওপাড়ার দস্তরী ছিল ওটা। কলেজ-ফেরতা প্রফেসরগুলি, ছুগ-ফেরতা মাষ্টারগুলি, কোর্ট-ফেরতা উকিল মোক্তারগুলি বসতো বাড়ীগুলোর গিছনে পশ্চিমখোলা মাঠটার। আর স্থলতা ভাবতো, এখনো ও তো—হ্যাঁ এখনো তাবে, ওদের কি এইসব সাধারণ জিনিষগুলি নিয়ে মন তারী হয়, কগড়া করে? আর এসব প্রশ্নের উত্তর 'না' হয়ে আসে স্থলতার কাছে। অতি সাধারণবিন্দু আর মধ্যবিন্দু চিন্তা নিজেই ছাড়া সবাইকেই বিস্ত্রাণী দ্যাখে। নিজেদের জীবনের ছলনা কখন হীনমন্ত্র করে তোলে নিজেদের।

মধ্যবিন্দুর সংসার ছলনার ভরা। আমকের ঘটনার জের ধরেই চিন্তা করতে লাগলো স্থলতা। ব'দ্বিও ওদা গ্রিক সাধারণবিন্দু, তবুও স্থলতা নিজেই তাবে মধ্যবিন্দু। বড়লোক আর খেতে-না-পাওয়া লোক ছাড়া সবাই

স্বাধীন—ঠিক এই পরিপ্রেক্ষিতেই ও নিজেকে ভাগে স্বাধীন-বিশ্ব। বহুলোক আর গরীব লোকের জীবনে বোধহয় হলনা নেই। তাই শোধহয় ওদের বাচার কাক নেই, ঠিক নেই। নিজেকে কেমন মার খাওয়া কান্ড ঘুরিয়ে থাকে ছেলেটার পাশে সে অসহায় বোধ করতে লাগলো ও।

বেড়ার ধারে ঐ চুপমায়া মেটে গাছটাকে দেখলো খানিকক্ষণ, কেমন বিরক্ত হলো। শূন্যে ডাকালো। চক্রাকারে ঘূর্ণমান একটা চিল কিংবা পাখি চোখে পড়লো—তাও খারাপ লাগলো।

খামী চলে গেলে অন্তর্দ্বন্দ্ব তাহলেও কাজ থাকে। ছেলেটাকে একটু আদর করা। একটু সাজানো, দুটো আবেল তাবোল বকা, তারপর ঘুম পাড়ানো। কিন্তু আর প্রকৃতপক্ষে বড় কষ্টকা লাগছে স্বলতা। ছেলেটা মার খেয়ে কাঁদতে কাঁদতে নিজেই ঘুরিয়েছে। ওকে নিরেই খামীর সঙ্গে বগড়া।

ঘটনাটা চশমা ভাঙ্গা। গগলুস ভাঙ্গা। খামী এখন অগ্নয় একটা খেলনা তৈরীতে ব্যস্ত, নিজে রান্নায়, অগ্ন তখন চশমায়। ফলে চশমা ভেঙেছে।

—তাংলি, তাংলি বহুমায়াইস ছেলে—

গলার জোরেই ছুটে আসতে হয়েছিল স্ব তাকে। উন্ন শেরে অগ্ন আশ্রয় নিয়েছিল তার কোলে।—আঃ চুপ কর ছোটো ছেলে—

ছোটো ছেলে চশমা তাংলি কি চশমা নতুন হয়—
—এই হতজ্ঞাড়া—টান মেরেছে ছেলেটাকে। আচমকা টানে হতজ্ঞ হারেছে স্বলতা। হাত ছেড়ে গ্যাছে। (ও নিশ্চয় ঐ রকম আঘাত হিতে চায়নি) এতক্ষণ পরে কথাটা ভিত্তি করতে পারলো স্বলতা। কারণ ভাঙ্গার জোড় খাওয়াত হয় ঘটনা, ৯৯ সময়। কিন্তু তখন স্বলতা গিয়েছে বেগে।

—নিজের জিনিষ নিজে বাগিয়ে রাখোনা কেন?

—সব কিছু আমাকেই করতে হবে? রান্নার কাজ ছেড়ে রাশিলাহেবার এ-কাণ্ডটা কি খুব কষ্টকর হতো?
কথার মনে পড়তে কেমন একটু তালি ফালি পেল স্বলতা। লোকটা হাতুড়ি ঠুকলে কি হবে—ক-হুই। আর এই কথাটাতেই অনেক হলনার একটা ধরা পড়ে গ্যাছে আজ।

—রান্না ছাড়া কান্না নেই জোয়ার সংসারে? না করতে হয় কোন্ কান্না? কটা লোক যেনেছ কুসি?

দুর্বলের দুর্বল স্থানে যা। দুর্বলতা চাকতে ভোড়ে বেরিয়েছে অনেক কথা। কথার কথা বাড়ে। বেড়েওছে। কিন্তু এতক্ষণে স্বলতার রাগ অনেকটা পড়েছে। ঘেরন ফোরাণর জল করে আঙে আঙে। অহুতাপ হচ্ছে। সত্যিইতো কাজে বাধার মুখে বগড়া। কড়া রদদুরে চোখ বহি চড়ে যায় তাহলেই কাজের তুল আর তাহলেই, তাহলেই... সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিখর হয়ে গেল স্বলতার, রেহের ভিতর একটা ভীত তরল প্রোভল অহুতব করতে পারলো স্বলতা। শ্রোততার ভীত বেগটা, তার দুঃসহ নাচন যে অহুত হলো তাইনা সেই প্রলয়ধরী নৃত্যটা অকস্মাৎ স্তনান্তরের মধ্যে গিয়ে স্তব্ব হয়ে যেন লুকিয়ে রইল। হিংস্র খাপস যেন পুনর্বীর বেকনোর আশার আশ্রয় নিল কোণে। শিউরে উঠলো স্বলতা। চোখগুলো বুজে কেন। স্তব্ব হয়ে গেল স্বলতা। 'না, না, বার কেউ নেই তাঁর ভগবান আছে।' উপুড় হয়ে ঘুমন্ত ছেলেটার পিঠে সঞ্চরমান হাত হঠাৎ থমকে থেমে ক্ষত-গতি লাভ করলো। তুল, তরাল চিন্তাটাকে নিতুলভাবে প্রমাণ করলো ওর ক্ষত সঞ্চরমান হাত।

অহুশোচনার দৃশ্য হলো স্বলতা। সবচেয়ে চেপে থাকা একটা ইচ্ছাকে কলহের মুখে কেন প্রকাশ করে কেন সে। তুমি কি তাই, খামীর অক্ষম ইচ্ছাটাকে যেন ব্যঙ্গ করে বলেছে সে। সত্যি হোমার রেস্ট নেই, আমার তাহলেও অক আছে, নাকি আছে। ও, টি, টা একটু বাড়ালেই, অন্তত এই কিছুদিনের জন্যে একটা রাঁধুনী কার কি... ইচ্ছাটা অক্ষম বলেই হয়তো মাকপথে থেমে থেকেছে খামী।

—খুব হয়েছে, এতে মেরেদের কষ্ট হয়না, বলেছে সে, কিন্তু একটু কি ইচ্ছেও হয়নি ঐ রকম একটা ব্যবস্থা। কিন্তু দিনের জন্তে করতে? মনে মনে পুলকিত হয়নি কি খামীর সে অক্ষম কল্পনার? রাঁধুনী থাকবে ঘরের কাছে ব্যস্ত। খামীর দুটন বিন্দুস্নেহে মারানার বদে তার সঙ্গে গল্প। অগ্ন সারনে সারনে, দুটো দুটো করবে। হুজনেই হয়তো সেদিকে কখনো ডাকাবে। হঠাৎ ঘের লক্ষ্য করবে

অণু কতটা বড় হয়ে গেল। এই তো সেদিনের কথা। কিছু মনে পড়বে। লক্ষা লাগবে, ভালো লাগবে দুজনেরই। পড়ালেখার কথা হবে তার। দুপুরে তাকে কাজল পরাবে, পরে থাকা ইজেরটা ঠিকঠাক করে দেবে। গারে পিঠে পাউডার লাগিয়ে ঘুম পাড়াবে। তারপর ওদিকে স্বামী ঘুমিয়ে পড়লে অলস স্বাস্থ্যে নিজেকেও বিছানার ঢেলে দেবে, হাতে হরতো একটা সিনেমা পত্রিকা সরল গল্প থাকবে তাতে। পড়ার শেষে যেন মনে প্রশ্ন না জাগে— কেন এমন হলো। ঠিক এইরকম একটি নিরবচ্ছিন্ন জীবন একটি নিটোল মুখের ছায়া কি কখনো ঘোলায়িত হয়নি তার মনের গভীরে? (আশ্চর্য্য কি এই, এই প্রায় সবগুলিই স্থলতা প্রতিদিন করে আসছে—কিন্তু নিজেই জানেনা সে কথা)।

এই সব দিনের দুপুরের নিঃসংগতা বড় বিস্ত্রী। দিন বড় মল্লাক্রান্ত। ধরবোধ বাইরে পড়ে থাকে। পথ চলতি শব্দ নেই। প্রথমে জাগে চিন্তা। হেঁড়া খোঁড়া। আগের জেরটানা চিন্তা বর্তমানে পৌঁছয়। বর্তমান ভাবনার। চিন্তা আর ভাবনা পরিব্যাপ্ত হয় সমগ্র চেতনায়। ক্রমে চেতনাও অবশ হয়, অলস হয়। তখন ভাবে স্থলতা অবস্থাটা অন্তরূপ নিলে অর্থাৎ ভালো হলে এই সব মনান্তর থাকতো না। বড় বড় সমস্তার অনায়াসে সমাধান হতো। একদিকের ব্যরতার বহনের জন্তে অন্তরিকের ব্যর সন্ধান করতে হতো না। মিথ্যে করে বলতে হতো না কাউকে—এ পাড়াটার তো অনেক-দিন রইলুম—দেখি অন্ত পাড়াগুলোও। কলকারখানার মালুম লাফকাপ না করে একজারগায় থাকতে পারে না যে, বলে স্বামী গরবিনীর লক্ষাটুকু মুখে লেপন করতে হতোনা। অতএব মনের মধ্যে স্মৃতি হতোনা ছলনায় চাপা দেওয়া কোনো ফাঁকের, কোনো কঠের। এ যেন ঠিক সৌখিন বাড়ীর কোথাও গিয়েছে কেটে। সেই-টেকে উপর উপর পলস্তার মেরে রং দিয়ে বাড়ীর সমস্ত রঙের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া। কিন্তু সে ঘর বৈধিহীন টিকবে না। তার ফাঁক তো ফাঁকি দিয়ে চাপা রইল। সে তো পড়ে যাবে কিছুকাল পরে। কিন্তু কই জীবন তো পড়ে যাবে না, বলে পড়ছে না, খেমে থাকছে না। সে তো চলছে। পড়বো পড়বো

করেও তো টিকে থাকছে। তাহলে কি উপরটা তুল, তুল হবে কেন—সেটা যে বাড়ী, এটা যে জীবন। আরো হস্তকর চিন্তার এসে একবার থাকলো স্থলতা।

সেই মুখে ছিল ছেলে, চিন্তার, ভাবনার। এলানো চিং হয়ে শুয়ে থাকা দেহটা প্রমাণ করলো সেটা। ছেলেটার দিকে পাশ ফিরলো স্থলতা। ছেলেটা এক-পাশে শুয়ে। পিঠটা ওর স্থলতার সাংগনে পড়লো। হাত-বুলিয়ে আদর করলো ছেলেটাকে—ঘাম বিন্দুগুলো মুছিয়ে দিল নিজের কাপড় দিয়ে। ‘কত আশনার, কত ভীষণ নিজের এই নরম শীতল দেহটুকু।’ সমস্ত বুক জুড়ে নরম শীতল দেহটুকুকে চেপে ধরতে ইচ্ছে হলো স্থলতার। ‘ছেলেটা যেন বড় হয়ে যায়? মারের কোলজুড়ে গগা জড়িয়ে ঠিক এইরকম বরাবর কেন থাকে না! গলা জড়িয়ে, বুক জড়িয়ে ধরার, এই অতলে তলিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন, এই চাপ স্বপ্ন ছেলে বড় হয়ে গেলে থাকে! ছেলে বড় হলো মা স্বস্তি পায়, কিন্তু স্বপ্ন তো এখন। আচ্ছা অণুও তো বড় হবে যাবে।’

ছেলেটাকে কিন্তু বুক টানলো না স্থলতা। বরং কহুইয়ের ওপর তর দিয়ে ডান হাতের তালুতে গাল রেখে বাঁ হাতে ধরা নিজের একগাছি চুল দিয়ে ছেলের নাকের নীচে হুঁড়ুহুড়ি দিয়ে আগাবার চেষ্টা করলো স্থলতা। ‘কিন্তু বার্থ হলো।—“উঃ কী ঘুম রে বাবা। বেলা যে গেল!” স্পষ্ট উচ্চারণ করলো কথাগুলো স্থলতা এবং শেষের কথাটার নিজেই যেন জেগে উঠলো। সত্যি তো বেলা যে গ্যাছে। তাড়াতাড়ি কলে যেতে হবে। না হলে লখা লাইনের পিছনে দাঁড়াতে হবে অনেককাল। মুখ বাঁকা মোক্তারের বৌ, আর কিন্তু খোপার বৌ আগে গেলে তো আর দেখতে হচ্ছেনা। একগাছা বাগতি কলসী। আর ততোধিক ওদের বক্তব্য। পাড়ার গেজেট।

তাড়াতাড়ি উঠলো। বাগতি কলসী নিয়ে ঘেরিয়ে গেল স্থলতা। দুজনের পরে তবুও দাঁড়াতে হলো স্থলতাকে। চূপচাপ দাঁড়িয়েই থাকলো স্থলতা। স্থল বলেজের ছুটি হয়েছে। ছেলেমেয়েরা আসছে। সামনের মেয়ে ছুটতে তো চিনে নিয়েছে স্থলতা। একটির লখা বেলী—ছাপা শাড়ি, অন্তটির খোঁপা চুল, একরঙা শাড়ী। ওরা আরো নীচে দিকের পাড়ার থাকে। সে দিকেই চলে যাবে।

বাঁবার সময় ফুলতার দিকে ছুটেনেই ডাকাবে। চোখ-
চেনার হানি হাসবে। তিনজনই চোখের চেনা। চোখেই
হাসবে। পিছনে আসা ছেলে দুটি এইখানটা পেয়েই ভাইনে
বাক নেবে। আড়ালে চাইবার চেষ্টা করবে ঘেরে দুটি।

কলে নিজের কলসী লাগালো ফুলতা। ঘেরে দুটি
কাছে এসে পড়লো। হাসলো চোখে। ফুলতাও হাসলো।
ওর চোখ যেন আরো কিছু বল। সারা'রনের বিরক্তি

আর চিন্তা আর ভাবনা সেই হানির সঙ্গে সঙ্গে কোথায়
চলে গেল। কল থেকে কলসীটা ভূসেই কোমরে বসালো।
বসন্তে গিয়েই তলপেটে বিচ করে বেঘনা অহুতব করলো
ফুলতা। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মনে একটা ভরল আনন্দ বয়ে
গেল ফুলতার। পায়ে জোর এল। অণু ঘুম থেকে উঠবে।
স্বামী কারখানা থেকে ফিরবে। কত কাজ! পা চালালো
ফুলতা।

জাতিস্মরণ

শ্রী আশুতোষ সাখ্যাল

এই মতো কতো শত মরীচেরা পল্লীর প্রাঙ্গণে,
ঝঙ্কত প্রমরগীতে, সমাধীর্ণ বিস্তৃত-রঙ্গণে,
নখর কুলারখানি বাধিয়াছি তোমার আমার—
আজি কি গিরেছ তুলে স্বপ্নসম শেষ ত্রিষামার ?
কতো অন্ন মৃত্যু বাহি' কতোবার এমনি গুপ্তিত
হেথিয়াছি অশ্লক ঐ মুখ সরম-কুণ্ঠিত,
ভুলুপ্তিত লভাসম লীন হবে বাসক শয্যার
নববধূবেশে তুরি। এমনি সহস্র রাজিছার
কপোতীর বৃকে তব কান পেতে শুনেছি স্পন্দন,
প্রথম প্রেমের স্বাদ দেহপাত্রের করেছি ভুঞ্জন !
এবারের লীলা হবে একদিন হবে অবসান,—
নবজন্মতীরে সখি, করিবে কি আবার আহ্বান
নবীন মুরতি ধরি' কহুঝুঝু ব'জারে কাকণ
অপ্রিয় ? হায় অহি, আর কতু হবে কি মিলন !

শান্ত

শান্তলীল দাশ

শতান আঘাত হানে ব'রে বারে আর
প্রভাতের তিৎ কেঁপে ওঠে বারবার।
মনে হয়, ওই হিংস্র নখদংষ্ট্রাবাত
ছিন্ন গিন্ন করে দেবে সব অকস্মাৎ।
যা কিছু হৃদয় শুভ্র নিঃশেষে নিঃশেষ
হয়ে যাবে, হবে শুধু ধ্বংস অবশেষ
ভস্মরাশি, শয়্যানের দুর্দান্ত প্রতাপ
বৃকে নিয়ে ; কী নিষ্ঠুর রূঢ় অভিলাপ।
সব শকা দুঃ ব্যয়, নেমে আসে ধীরে
কজের প্রচণ্ড দণ্ড শরতানের শিরে।
ধূলার লুপ্তিত হয় বৃথা দস্ত তার,
যু চ ব্যয় নিঃশেষেই সমস্ত আঁধার।
আঁধার আবার জাগে প্রসন্ন আশাস,
আলোকের, আনন্দের, দীপ্ত নীলাকাশ।





পাত্রী ও পছন্দ

মীরা ঘোষ

রাষ্ট্রসংঘের সমাজ বিজ্ঞানীরা ভাষা বিচার করে বলেছেন ...“এখনকার আধুনিক মেয়েদের সংসারে আরও কঠিন কাজ করতে হয়। কাবুলীওয়ালা থেকে মুদীর দোকানের তাগাদাকে ঠেকিয়ে রাখতে হয়, বা কানাকড়ি দিয়ে বিদায় করতে হয়। সংসারের শত দারিদ্র্যের মধ্যেও মাথা ঠাণ্ডা রেখে স্বামী সন্তানের শতসহস্র দৈনিক চাহিদাকে মেটাতে হয়। স্বন্দু সংসারকর্মীর পারিশ্রমিক তাই পঁচিশ বছর আগের তুলনায় অন্ততঃ আটগুণ বেশী। রাষ্ট্রসংঘের বিশেষজ্ঞের বিচারে তাদের মূল্য প্রায় চারহাজার থেকে পাঁচহাজার টাকা।”

কিন্তু রাষ্ট্রসংঘের বিজ্ঞানীদের মত বাই হোক না কেন, বাঙালী ঘরের সাধারণ মেয়ের দাম কী সত্যিই বেড়েছে? সেই মেয়েটির কথা মনে পড়ছে।

তধু গৌরবর্ণা বললেই সবটুকু বলা হয়না, অহুস্টি না করেও দুখে-আলতা রঙ তাকে বলা বেতে পারে। সামান্য উত্তেজনার কারণ ঘটলেই ওর গালের লালিমা ছড়িয়ে পড়ে সারা মুখে। শিক্ষিতা ও আর্ট,—যনী পিতার ধনগর্ভে জন্ম নেন ছাড়া কেলে নি সেটা প্রথম পরিচয়েই বোকা যায়। এমন মেয়ের পাত্র পেতে দেবী হবে না, সাধারণভাবে এই ধারণাই সবার মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু আপনি যদি একথা বলেন তাহলে এইটুকুই বলা যায় এখনও আপনি বাংলাদেশের পাত্রপক্ষকে চেনেন নি! তাই

হাজার মাইলের দূরত্ব থেকে দেখাশোনা করতে এসে মেয়ের বাবা যখন শোনেন সম্ভাব্য পাত্র ইঞ্জিনীরর ছেলের পিতৃদেব নগর বনহাজারের কমে কথাই বলেন না, তখন যদি ভুল্লোকের ব্রহ্মরক্ত পর্যন্ত জালা করে উঠে, তাঁকে খুব ঘোষ দেওয়া যায় কী?

স্নেহে স্বস্ত্রে বারা মেয়েকে এতদিন মাহুয করেছেন, লেখাপড়া শিখিয়েছেন তাঁরা যে মেয়েকে যথাসাধ্য দেখেন এতো স্বতঃসিদ্ধ। আর সেই যথাসাধ্য যে নিত্যন্ত অল্প হবে না তাও তো তাঁদের আর্থিক অবস্থা দেখে বোকা যায়। তবে কেন এই হীনমস্ততার পরিচয়? আর আরও আশ্চর্য্য এই যে সেই ছেলেটিও তো বিংশ শতাব্দীর যুবজনোচিত দৃঢ়তা নিয়ে এগিয়ে এলো না! দাঁড়ালো না এই অন্ত্যায়ের বিরুদ্ধে সরব প্রতিবাদ জানিয়ে!

রবিবাসরীর পত্রিকার ‘পাত্রী চাই’ পৃষ্ঠা খুললে বা চোখে পড়ে, তা হলো প্রকৃতহৃন্দরী, গৌরবর্ণা, শিক্ষিতা, বীর্ঘাঙ্গী, ছন্দোময়ী, গান বাজনা জানা ইত্যাদি...। সর্বগুণাবিতা পরমাহৃন্দরী মেয়েটি যার অস্ত্র চাওয়া হচ্ছে তিনি হয়ত রূপে গুণে একেবারেই এর বিপরীত। আর এই ‘সর্বগুণাবিতা’ হওয়ার প্রয়োজন তধু মেয়েদের অন্তই। ছেলেদের ক্ষেত্রে একলো বাতলা মাত্র! তধুবাত্র লেখাপড়া শিখে একটা-ভাকরী করতে পারাই তার গুণপনার খ্রৌ উদাহরণ! সে তাঁলো স্পোর্টস্‌ম্যান কিনা, বাজনার তার

যথেষ্ট পারদর্শিতা আছে কিনা, ধর্মোবর্ণ কিনা, ইত্যাদি তার পক্ষে নিতান্ত আবশ্যকীয় নয়। এ ক্ষেত্রে সেই পুরণো প্রবচনই প্রযোজ্য,—‘হীরের আংটির আবার বাঁকা আর সোজা।’ শুধুমাত্র পুরুষ হবে ভয়ানোই তার দাম বাড়ানোর পক্ষে যথেষ্ট। তাই পাত্র কেরান বোণাবার চেটায় আজও বাঙালীর মেয়েকে আত্মসম্মানের প্রদর্শক শিকের তুলে রেখে পাড়াপ্রতিবাসীর বিরক্তি উৎপাদন করে হারমোনিয়াম সহযোগে গান শেখার নামে ৫ সুরো চিৎকার করতে হয়। শেখার ইচ্ছে না থাকলেও শিখতে হয় গিটার।

সবাইকে সবার চোখে সমান হুমকি লাগে না। ইংরাজী প্রবচন উদ্ধৃত করে বলা যায়—“বিউটি লাইজ ইন দ আইজ অফ দ কিংডোম।” সেদিকে কিছুই বলবার নেই। কিন্তু আশ্চর্য লাগে তখনই যখন দেখি, যে যা নয়, তাকে তাই করার ব্যর্থ চেষ্টা করা বা অসুত কোন কারণ দেখিয়ে প্রত্যাব নাকচ করা। তাই পাত্রপকের বলতে বাধে না—‘সবই তো ভাল চশমাটা যদি না থাকত ...’ অর্থাৎ হয়ে তাবি এঁরা কী মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেবেন না চশমার সঙ্গে ?

আজকাল দীর্ঘাকী মেয়েই সবাই চান। এঁরা ভুলে যান সাধারণ গড়পড়তা বাঙালী মেয়ের উচ্চতা চারফুট দীর্ঘাকী হুইকি মাত্র। অবশ্য যে নিজে লম্বা তার জীবনসঙ্গিনীও হবে, এ চাওয়ার মধ্যে অর্থোক্তিকতা নেই। কিন্তু সেই চাহিদার গা তানিয়ে পাঁচফুট চারইকি লম্বা পাত্র যখন পাঁচফুট লম্বা মেয়েকে অপছন্দ করে লম্বা কমে গুরুহাতে, তখন হতবাক হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। অবশ্য স্বামীর চাইতে লম্বা জী এ দৃশ্য খুব বিরল নয় আজও। কিন্তু দর্পকের পক্ষে সে দৃশ্য খুব সুখম ঠেকে না। এক দম্পতির কথা জানি যে ভদ্রলোক শুধু এই কারণেই সঙ্গীক কোন পার্টি ইত্যাদিতে যান না।

তবে এর বিপরীত উদাহরণও মেলে বৈকি। সেই ছেলেটির কথাও জানি যে কস্তাপকের কাছে খাবার অভিরিক্ত পণের দাবী শুনে আপত্তি জানিয়ে প্রায় বিনা পণেই সেই মেয়েটিকে বিয়ে করেছে এবং বহুদূর জানি সে অসুখী হয় নি। তবে এ উদাহরণ তো অতি কম, “কোটিকে গটিক” মাত্র। কাগজে কলমে দেখি শিকারান

নাকি বেড়েছে—শিক্ষিত জনসাধারণের সংখ্যা বিগত পঞ্চাশবছরের তুলনায় অনেক বেশী। কিন্তু সে শিক্ষা কী শুধুমাত্র পুঁথিগত বিভ্রান্তেই সীমাবদ্ধ থাকবে। সে শিক্ষা কি মনের উদারতা আনবে না,—বাঙালী যুব-সমাজকে পণপ্রথার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে উৎসাহিত করবে না ?—তবে সে শিকার সার্থকতা কোথায় ?

প্রসূতি-পরিচর্যা ও শিশুমরল

কুমারেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম.বি

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

৭

প্রসূতি-অবস্থায় স্তনের যত্ন নেওয়া বিশেষ দরকার। কারণ, নবজাত শিশুর শারীরিক স্বাস্থ্য, জন্মবৃদ্ধি ও পুষ্টি মূলতঃ নির্ভর করে প্রসূতির স্তন্য-দুগ্ধের উপর। তবে ক্রমঃ বিবরণ যে এ সম্বন্ধে আমাদের দেশের শিক্ষিত মহলে সমাজের অনেকেই আজকাল বড় বেশী নজর দেন না। তাঁর ফলে, অধুনা আমাদের দেশে শিক্ষিত-সমাজে শিশুদের মাতৃস্তন্য-দানের রীতি প্রায় বাতিল হয়ে যাবার দুঃস্বপ্ন আর এসে দাঁড়িয়েছে এবং অধুনা মহলে সমাজের সৌখিন-রেওয়ার অহঙ্করণে সুদূর পল্লীগ্রামাঞ্চলে পর্যন্ত মায়ের দুগ্ধের বদলে কৃত্রিম বা ঢোকা-দুগ্ধ পান করিয়ে শিশুদের লালন-পালনের ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে অস্বস্ত হতে শুরু করেছে। অর্থাৎ এই সৌখিন রীতি অহঙ্করণে, প্রসূতি এবং নবজাত-শিশু—উভয়েরই যে কতখানি অপকার ঘটছে, সে দিকে কারো এতটুকু দৃষ্টিবানের আগ্রহ নেই। সম্মান-প্রসবের পর, প্রসূতির জরায়ুর স্বাভাবিক ও সুস্থ অবস্থা ফিরে আসার জন্য নবজাত-শিশুকে নিয়মিতভাবে মাতৃস্তন্য পান করানোই যে উচিত এবং একান্ত প্রয়োজনীয় কর্তব্য—সে বিষয়ে সুবিখ্যাত ধাত্রীবিজ্ঞানবিদ ডাঃ উইলিয়াম্‌স্‌, স্বর্গীয় ডাঃ কেমারনাথ দাস প্রমুখ বিচক্ষণ দৈবী ও বিলাতী চিকিৎসকেরা সকলেই একমত।

ইতিপূর্বেই বলেছি যে প্রসূতি অবস্থায় প্রত্যহ নিয়মিত-

ভাবে ঠাণ্ডা অথবা ঈষৎ গরম জলে ধুয়ে সাক্ এবং তখনো নরম তোয়ালে দিয়ে সযত্নে ঘষে মুছে রাখলে, মহিলাদের স্তনের গঠন সুপরিপুষ্ট ও দুগ্ধ-সকারে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। এ সযত্নে পান্চাত্যের সুপ্রসিদ্ধা খাজী লিভিয়ার্ড এবং অন্যরকম প্রবীণ চিকিৎসক স্ত্রীর ট্রাবি কিং প্রভৃতি অনেকেই তাঁদের আন্তরিক সমর্থন ব্যক্ত করেছেন এবং প্রস্তুতিদের বিশেষভাবে উপদেশ দিয়েছেন যে নবজাত সন্তানের মঙ্গলার্থে প্রত্যেক জননীই যেন তাঁর স্তনের বোঁটা বা চুবি (Nipples or Tits) সুস্থ রাখার উদ্দেশ্যে প্রত্যাহ নিয়মিতভাবে ভালো করে ধুয়ে-মুছে অল্প একটু জলপাইয়ের তেল (Olive oil) দিয়ে বেশ টেনে টেঁপে কাঁচনা বা সংবাহন (Massage) করেন। তাঁদের মধ্যে—এ ব্যাপারে আদৌ স্পিরিট (Rectified spirit or Alcohol) কিংবা মলম (Ointment) ব্যবহার না করাই ভালো। কারণ, স্পিরিট ব্যবহারে প্রস্তুতির স্তনের চর্ম শুক হয়ে ওঠে ও কেটে যায় এবং মলম ব্যবহারে আগা-গোড়া হেজে ওঠে। তাছাড়া প্রত্যাহ নিয়মিতভাবে প্রস্তুতির স্তন ধোয়া-মোছাও পর দীর্ঘ কষ্টকর ও অস্ববিধাজনক হলেও—শক্ত বৃকষ দিয়ে ঘষে-মেজে রাখার জন্য তাঁরা বিশেষ উপদেশ দিয়েছেন। স্তনদ্বয় প্রত্যাহ এভাবে ঘষা-মাজার ফলে, পর্যাপ্ত দুগ্ধ সঞ্চয় প্রভৃতিতে সব উপকার সাধিত হয়, প্রস্তুতি অচিরেই তার সুস্পষ্ট ফলাফল উপলব্ধি করতে পারেন। এই সব ব্যবস্থা-বিধি ছাড়াও তাঁরা প্রস্তুতিদের প্রতিদিন নিয়মিতভাবে স্তনে সূর্যকিরণের তাপ লাগানোরও যে সবিশেষ সুপারিশ করেছেন, তার ফলেও প্রচুর হিতসাধন ঘটে।

প্রস্তুতি-অবস্থায় স্নানাহার, বিশ্রাম ও শয়ন বথোচিত, সুনিয়ন্ত্রিত ও নিয়মিত হলে, শুধু যে জননীর শারীরিক-বাহ্য এবং মানসিক প্রেক্ষতা অক্ষুণ্ণ থাকবে তাই নয়, উপরন্তু গর্ভস্থ সন্তানও যথাযথভাবে সুপরিপুষ্ট ও সুস্থ-সবল হয়ে উঠবে। তবে স্বাভাবিক অবস্থাকালে মহিলার প্রতি রাসে যে সময়ে ঋতুমতী হতেন, প্রস্তুতি অবস্থায় সেই বিশেষ সময়টিতে তাঁদের সকলেরই কিকিং সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। অর্থাৎ, এই মাসিক-ঋতুকালীন সময়ে তাঁদের সবাইকেই চলাফেরা, ব্যায়াম, বিশ্রাম ও বিবিধ সাংসারিক কাজকর্ম রীতিমত সাবধানে এবং আগাগোড়া

উপহারভাবে হ্রাসের কল্পিত হবে। কারণ, এ সব বিষয়ে অজ্ঞতা এবং অসাবধানতার ফলে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রস্তুতিদের সচরাচর নিত্যকাল অসরয়ে গর্ভপাত হতে দেখা যায়।

প্রস্তুতি-অবস্থায় আহার-বিহারে বথোচিত সাবধানতা অবলম্বন না করার ফলে, বহু মহিলাকেই কোষ্ঠকাঠিন্য বা পেট অপরিষ্কার থাকার গোপলযোগে সবিশেষ অস্ববিধা-অস্বচ্ছন্দতা ভোগ করতে হয়। এ দুর্ভোগের কবল থেকে রেহাই পাবার উদ্দেশ্যে, অনেক প্রস্তুতি প্রায়ই নানা রকম কড়া ও নরম ধরণের জোলাপ (Purgative বা Laxative) ও ওষুধ সেবন করেন।... তাঁদের অল্পস্বল্প মনোমত জোলাপ-সেবনের রীতিটি কিছু অজ্ঞ-খাজীবিজ্ঞা-বিদ্যারদের মধ্যে আদৌ সমীচীন নয়। বরং এভাবে জোলাপ-সেবনের পরিবর্তে প্রস্তুতি মহিলারা যদি প্রত্যাহ নিয়মিতভাবে... প্রয়োজনানুসরণ পরমাণে ফলমূল, শাক-সব্জী ও পর্যাপ্ত জলপান করেন তা কোষ্ঠ গাঠিত্বের দুর্ভোগ অশান্তির উপশম হবে অনেকখানি। তাছাড়া নিয়মিতভাবে কোষ্ঠ সাফের উদ্দেশ্যে প্রস্তুতিরা যদি রোজ রাতে শয্যা গ্রহণের আগে চায়ের চামচের দু'চামচ 'সিরাপ অফ ফিগস্' (Syrup of Figs) বা ডুম্বের আরেক কিংবা হাল পনেরো দোঁটা 'লিকুইড এক্সট্রাক্ট অফ ক্যাস্কারা' (Liquid Extract of Cascara) সেবন করেন, তাহলে বিশেষ উপকার পাবেন। প্রস্তুতিদের পক্ষে পেট পরিষ্কার রাখা ও নিয়মিত দান্তের আয়ে করা একটি সহজ উপায় আছে। সে উপায়গুলি হলো—প্রতিদিন সকালে শয্যাভ্যাগের পর নিয়মিতভাবে এক গ্লাস জল পান করা অথবা রোজ প্রাতঃরাশের পর নিরম করে একটি আপেল-ফল কিংবা আপেল অভাবে গাজর খাওয়া প্রভৃতি। এ সযত্নে সুবিখ্যাত খাজীবিজ্ঞাবিশারদ প্রবীণ চিকিৎসক স্ত্রীর ট্রাবি কিং পরামর্শ দেন যে প্রস্তুতি অবস্থায় কোষ্ঠ বদ্ধতার দুর্ভোগ অস্ববিধা থেকে রেহাই পেতে হলে—প্রত্যাহ ছয় আউন্স কিসমিস এবং সম পরিমাণে খেজুর (Dates), ডুম্ব (Figs), 'প্রপল্' (Prunes) বা আখরোটি (Alumut) বেক ভালোভাবে গিবে নির্দিষ্ট তার সঙ্গে অর্ধ আউন্স গ্লিসেরিন (glycerine), চারো চামচের দু'চামচ নু অর্থাৎ দু'চামচ সোনাখুঁপার পানীয়

(Senna leaves) শুভ্রা মিশিরে পরিষ্কার একটি কাঁচের লিপিতে রেখে দিতে হবে এবং রাত্রে শয্যা গ্রহণের পূর্বে প্রয়োজনবোধে একচামচ পরিমাণে এই বিচিত্র মিশ্রণটি সেবন করলে সবিশেষ ফল লাভ হবে। সংগ্রহের অস্থবিধা হলে, এ মিশ্রণটি থেকে আথরোট ও সোনাশুখীর পাতা বাহ দেওয়া যেতে পারে এবং মধু আর গ্লিসারিনের পরিবর্তে সরেস-জাতের গুড়ও ব্যবহার করা চলবে।

প্রসূতি অবস্থার মহিলাদের মানসিক উৎফুল্লতা ও শান্তি বাজান্য বজায় রাখার দিকে সবিশেষ দৃষ্টিগান করা একান্ত আবশ্যিক। প্রসূতি যাতে সর্বদাই দিবিয়া হাসি-আনন্দে ভরপুর শান্তিময় পরিবেশে থাকেন—প্রত্যেক গৃহেই উপযুক্ত স্থাব্যস্থা করা বিশেষ দরকার। সচরাচর দেখা যায় যে প্রসূতি অবস্থার...বিশেষতঃ, জীবনে সর্বপ্রথম জননী হবার সময় বহু মেয়েই নিজেদের অজ্ঞতা বা যথোপ-যুক্ত অভিজ্ঞতার অভাবে, গর্ভে সন্তান ধারণকালে অহেতুক নানা রকম অজানা বিপদের সম্ভাবনার সীতিমত ভীত-ভ্রম হয়ে ওঠেন। যে কোনো কারণেই হোক, প্রসূতিদের পক্ষে কিন্তু মনে মনে এমন ধরনের অলীক-আতঙ্ক পোষণ করা উচিত নয়...বরং তার চেয়ে বাড়ীর অভিজ্ঞা আত্মীয়া বা বনিষ্ঠ কোনো পরিচিতা বাড়বী কিম্বা সুনিপুণা ধাত্রী অথবা স্ত্রীচিকিৎসকের সঙ্গে এ সম্বন্ধে খোলাখুলিভাবে আলোচনা-আলোচনা করে তাঁদের স্তিমিত মূল্যবান পরামর্শ উপদেশ অস্থানে নিজেদের দেহ-মনের যথোচিত সাবধা-মতা অবলম্বন ও বহু নেওয়ারই সমীচীন। কারণ জগতের প্রায় সকল অভিজ্ঞ-প্রবীণ ধাত্রীবিজ্ঞাবিশারদেবরাই অভিমত প্রকাশ করেন যে জননী হবার আগ্রহে-উৎসাহে প্রসূতি-অবস্থার বেশীর ভাগ মহিলাদেরই শরীর ভালো এবং মন প্রফুল্ল হয়ে ওঠে। তবে যদি কোনো বিশেষ কারণে প্রসূতির শারীরিক বা মানসিক অস্থস্থতার লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহলে সে ক্ষেত্রে নিছক চক্ষুসজ্জা বা মিথ্যা স্কো-চের বশে প্রকৃত তথ্য গোপন না করে অবিলম্বে অভিজ্ঞ চিকিৎসক বা ধাত্রীর সহায়তা নেওয়া একান্ত প্রয়োজন। প্রসূতি-অবস্থার নিজেদের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা বজায় এবং গর্ভ-সন্তানের সর্বাঙ্গীণ পরিপুষ্টি-সাধনের উদ্দেশ্যে, প্রত্যেক মহিলাকেই সংসারের দৈনন্দিন-কাজ-কর্মের মধ্যেই যথোচিত আহার বিহার-বিজ্ঞানের সুবোপ-

স্থবিধা আর প্রয়োজনীয়কারী অবস্থার স্থাব্যস্থা করে নিতে হবে। স্থাবী ও বৌধ-পরিধারে অগতঃ এখনও এ ব্যাপারে সচরাচর অনেকখানি স্থবিধা মেলে—তবে যেখানে দামী-স্ত্রী একক-সংসারে, সেখানে কিন্তু প্রসূতিকে অভিজ্ঞ-সেবনীলা আত্মীয়া-বাড়বী বা সুপরিচিতা প্রতি-বেশিনীদের সম্বন্ধ-সহায়তা গ্রহণ করাই বিধেয়।

সাধারণভাবে, প্রসূতি-অবস্থার মহিলাদের পক্ষে দূর-ভ্রমণ, সেলাইয়ের কল চালানো, উচু-নীচু রাস্তার সজোরে গাড়ীতে চড়ে পাড়ি দেওয়া, স্বয়ং মোটর বা সাইকেল চালানো, প্রচুর দৈহিক-পরিশ্রম-সাপেক্ষ ব্যায়াম, বোড়-ঝাঁপ বা ক্রীড়াঙ্গণলন, অধিকক্ষণ ঠাণ্ডা জলে শরীর ডুবিয়ে স্নান বা স্নাত্যর কাটা, উঁচু টুল, মই কিম্বা শিঁড়িতে আরোহণ প্রভৃতি যথাসম্ভব বর্জন করাই বাঞ্ছনীয়। এ সম্বন্ধে আমাদের দেশে প্রাচীন একটি প্রবাদ বাক্য সুপ্রচলিত আছে—প্রসঙ্গক্রমে তার উল্লেখ করা যেতে পারে। লোকে কথায় বলে—“আটে কাঠে”...অর্থাৎ, প্রসূতি-অবস্থার আটমাসকালে পূর্ণাঙ্গ করলেই শারীরিক স্বাস্থ্যরক্ষা এবং অবাধে চলা-ফেরার বিষয়ে মহিলাদের সবিশেষ সাবধান ও সচেতন হওয়া দরকার। তাছাড়া মানসিক প্রফুল্লতা, বজায় রাখার জগতঃ এ সময়ে প্রসূতিদের পক্ষে কোনো কারণেই কোনো অপ্রিয়-ঘটনার লিপ্ত থাকা কিম্বা কোনো রকম দীর্ঘতম তরতর এবং শোকময় দৃষ্ট পারদর্শন অথবা নিদারুণ আতঙ্ককর ব্যাপারে জন্ত-সচকিত হয়ে ওঠা আদৌ মঙ্গলজনক নয়। কারণ, প্রসূতি অবস্থার মনে আচমকা কোনো রকম কোথ শোক হুৎ হুন্ডিত্য ভর কিম্বা অনিষ্ট আশঙ্কার প্রবল আলোড়নে ভাবী-জননী এবং গর্ভস্থ সন্তান—উভয়েরই অপরিণীম এমন অনেক অপকার ঘটে যে—তবিষ্যতে সারা জীবনেও তার ক্ষতি সহজে অপসারণ করা সব সময় সম্ভব হয়ে ওঠে না। এই জন্তই প্রসূতিকে সর্বদা সুন্দর, শান্তিপূর্ণ এবং আনন্দ-ময় পরিবেশে রাখার দিকে সম্বন্ধ দৃষ্টিগান করা একান্ত দরকার...কারণ, সু-মাতার গর্ভেই হয় সন্তানের বিকাশ।

এছাড়াও প্রসূতি অবস্থার সচরাচর অভ্যস্ত আরো যে সব অস্থবিধার কারণ ঘটে, আগামী সংখ্যার বোটাটুটি ভাবে সেগুলির আলোচনা করার বাসনা রইলো। [ক্রমশঃ]



রূপর্ণা দেবী

গতবারের মতো এবারও, অভিজ্ঞ-আধুনিক রূপচর্চা-বিশারদদের গবেষণা-গ্রন্থত মহিলাদের মুখের রূপ-লাংগা-শোভা বর্ধন-বনোন্নয়ন করে তোলার উপযোগী বিশেষ ধরনের আরো কয়েকটি সহজ-সরল ব্যায়াম-পদ্ধতির পরিচয় দিচ্ছি।



মহিলাদের মুখের ত্রি-সৌষ্ঠব ও সৌকর্য্য সাধনের জন্ত, উপরের তনু ছবিতে দেখানো ব্যায়াম-ভঙ্গীটি বিশেষ উপযোগী হবে বলেই আধুনিক-বিশেষজ্ঞেরা অনেকেই সুচিন্তিত অতিমত প্রকাশ করেছেন। এ ব্যায়ামের অঙ্গীকরণ-পদ্ধতি হলো—উঁচু পিঠাওয়ালা বসন্ত একটি চেয়ারে (High Backed chair) বসে বসে, বোঁকের দু'হিকে হাত দু'খানি লম্বালম্বি-

ভাবে নীচের দিকে প্রসারিত করে দিবে বসন্ত-মুঠিয়ে চেয়ারের আসনের প্রান্তভাগ আঁকড়ে ধরে, উপরের তনু ছবির ভঙ্গীতে ধীরে ধীরে নিখাস-গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে মাথাটিকে পিছনদিকে হেলিয়ে দিবে। ব্যায়ামের এই বিশেষ-ভঙ্গীটি অঙ্গীকরণকালে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, চেয়ারের পিছনদিকে মাথা হেলিয়ে দেবার সময় চিবুকটি যেন উর্দ্ধমুখী থাকে এবং মাথাটিও যতখানি সাধ্য নীচের দিকে ঝুলিয়ে রাখা হয়। কিছুক্ষণ এমনিভাবে মাথাটিকে পিছন দিকে হেলানো অবস্থায় রেখে, নিখাস গ্রহণ ও ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে কয়েকবার ধীরে ধীরে মুখ কঁাক করুন ও মুখ বুকুন। এভাবে মুখ-খোলা এবং মুখ-বন্ধ করার সময়, আপনার মুখের পেশীগুলিতে যেন বেশ টান বা চাড় পড়ে—সেদিকে দৃষ্টি রাখা প্রকান্ত প্রয়োজন। এমনিভাবে অন্ততপক্ষে দশবার, মুখ খোলা এবং মুখ-বোঁজার এই ব্যায়াম-ভঙ্গীটি অভ্যাস করার পর, ধীরে ধীরে নিখাস-গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে পিছনদিকে-হেলানো, মাথাটিকে পুনরায় সামনের দিকে স্বাভাবিক-অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে আসুন। মাথাটি সামনের দিকে স্বাভাবিক-অবস্থায় ফিরিয়ে আনার সময়, দু'চোখের দৃষ্টি যেন সম-রেখায় (on a level line) থাকে—সেদিকে খেয়াল রাখা একান্ত আবশ্যিক।

এমনিভাবে পিছনদিক থেকে মাথাটিকে সামনের দিকে স্বাভাবিক-অবস্থায় ফিরিয়ে আনার পর, চিবুক ভান-কাঁধের উপর রেখে ধীরে ধীরে নিখাস-গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে দেহের ভানদিকে যতখানি সম্ভব মাথা হেলান। তবে এ ভঙ্গীটি অঙ্গীকরণের সময় খেয়াল রাখবেন যে চিবুক স্পর্শ করবার জন্ত কদাচ যেন কাঁধ উপর দিকে তোলা না হয় এবং চিবুক সামনের দিকে না হেলে পড়ে বরাবর কাঁধের উপরেই স্থাপিত থাকে। এ ভঙ্গীটির অভ্যাসকালেও, আগের মতোই ধীরে ধীরে নিখাস গ্রহণ ও ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে মুখ-খোলা এবং মুখ-বন্ধের রীতি অঙ্গীকরণ করা এবং মুখের পেশীগুলিতে যেন বহালভব টান বা চাড় পড়ে, সেদিকেও নজর রাখা একান্ত প্রয়োজন।

বুঁকে-চলা বা বোঁড়াভাবে হাঁটুর ফাঁড়ানোর কালে, অনেক মহিলার রূপ-ত্রি-ব্যুৎপাদন-কালের যত জটিলে বিশেষ কষ্টগ্রস্ত হয়। এ কষ্ট মোচন করা সম্ভব—

8



হাতের কাজ

কাদা-মাটির কারু-শিল্প

রুচিরা দেবী

নিয়মিতভাবে উপরের দিকে ছবিতে দেখানো ব্যায়ামভঙ্গী অভ্যাল-অভ্যসীলনে। এ ব্যায়ামের অভ্যাস-পদ্ধতি হলো—সহতল জমি বা আসনের উপর সটান দাঁড়িয়ে কিম্বা বসে, ঘনাবয় সিধা-খাড়াভাবে মাথা উঁচু রেখে ধীরে ধীরে নিখাল গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে চিবুকের নীচের দিক দিয়ে ডান হাত উবুড় করে গলা ও চিবুকের তলদেশ পর্যন্ত মুখের আগাগোড়া অংশ মুচু চাপ দিয়ে ঘর্ষণ-মর্দন করা। এভাবে ঘর্ষণ-মর্দনকালে হাতে অল্প একটু ‘অলিভ-অয়েল’ (Olive Oil) বা ‘ক্রীম’ (Cream) জাতীয় তৈলাক্ত-পদার্থ প্রলেপিত করে নেওয়া ভালো। ঘর্ষণ মর্দনের সময়, প্রথমে ডান-হাত উবুড় করে চিবুকের ডান-দিক থেকে বাঁ-দিকে এবং পরে অঙ্গুরণ-ভঙ্গিতে বাঁ হাত উবুড় করে চিবুকের বাঁ-দিক থেকে ডান-দিকে অন্ততঃ পাক বা নশেক এমনভাবে মালিস করতে হবে। এ ব্যায়াম-পদ্ধতি নিয়মিত অভ্যাসের ফলে, মুখের খুঁত-জটি অচিরেই যে চেন করা সম্ভব।

আগামী সংখ্যায় এমনি ধরনের আরো কয়েকটি সহজ সরল ব্যায়াম-পদ্ধতির পরিচয় দেবার ব্যালনা রইলো।

মুঠুভাবে চৈকস্ট-মজবুত ধরণের মৃৎশিল্প-সামগ্রী বানাতে হলে, কোন্ কাজের জন্য কি ধরণের কাদা-মাটি ব্যবহার করা দরকার এবং সরাসরি আনকোরা-মাটি দিয়ে যে নিখুঁত-সুন্দর কাজ করা যায় না—সে কথা ইতিপূর্বেই বলেছি। কাজেই কাদামাটি দিয়ে বিভিন্ন-ছাঁদের খেলনা, পুতুল, প্রতিমা, প্রতিমূর্তি, ফুলদানী, ফুলের টব, ঘট, কলস, ইন্ডি-কুড়ি, ভাঁড়-সরা-গেলাস, থালা, বাটি, টালির পাটা প্রভৃতি বিবিধ ধরণের সৌধিন ও নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিষ-পত্র গড়ে তোলার জন্য বিশেষ-পদ্ধতিতে বিভিন্ন প্রকারের মাটিকে হিসাবমতো পরিমাণে জল মিশিয়ে মেখে কাজের উপযোগী করে তোলা দরকার। এভাবে মৃৎশিল্প-সামগ্রী রচনার কাজের উপযোগী কাদা-মাটি মাথা ও তৈরী করে নেওয়া—প্রাচীনতম পরিভ্রম, কলাকৌশল-নৈপুণ্য এবং অল্প-বিশ্বস্ত অভিজ্ঞতালব্ধ রাসায়নিক হিসাবনিকাশের ব্যাপার। তবে এ সব ব্যাপার রপ্ত করে নেওয়া, এমন কিছু দুঃসাধ্য-কঠিন কাজ নয়...মোটামুটি কয়েকটি মূল তথ্য জেনে রাখলেই যে কোনো শিক্ষার্থী অনায়াসেই নিখুঁত-পরিপাটি ছাঁদে মনোরম-সুন্দর বিভিন্ন ধরণের সৌধিন ও নিত্য-প্রয়োজনীয় মৃৎশিল্প-সামগ্রী রচনার কাজে সর্বিশেষ কলা-নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে পারবেন। সাধারণতঃ, এঁটেল-মাটি ও বালি-মাটি—এ দুই প্রকারের কাদা-মাটিতেই মৃৎশিল্প সামগ্রী রচিত করা হয় প্রাচীন।

কাঁদা-মাটি দিয়ে মুংশিল্ল সামগ্রী বানাতে হলে, প্রথমেই কাজের উপযোগী মাটি তৈরী করে নেওয়া প্রয়োজন। মাটি তৈরীর মোটামুটি নিয়ম হলো—মুংশিল্লের শিল্প-সৃষ্টির প্রয়োজন অনুযায়ী বিশেষ শ্রেণীর মাটি বাছাই করে নেওয়া। কোন ধরনের কাজের পক্ষে কি শ্রেণীর মাটি ব্যবহার করতে হবে—সে বিচারের ভার মুংশিল্লী করবেন নিজের শিল্প সৃষ্টির প্রয়োজন অনুসারে। কাজেই এ সম্বন্ধে কোনো ধরা-বাঁধা নিয়মের নির্দেশ দেওয়া চলে না। যাই হোক, পছন্দমতো মাটি বাছাই করে নেবার পর, মাটির মধ্যে থেকে যাবতীয় বালি, কঁকর, পাথর-কুচি, কাঠকুটোর টুকরো, প্রভৃতি অপ্ৰয়োজনীয় আবর্জনা দ্রুত সাক করে ফেলা দরকার। মাটি সাক হলে, মুংশিল্লীর প্রধান কাজ—হিসাবমতো পরিমাণে জল এবং বিশেষ-ক্ষেত্রে, পাটের কুচো, তুঁব, বালি-মাটি বা এঁটেল-মাটি প্রভৃতি আরো কয়েকটি উপকরণ মিশিয়ে মাটির সূক্ষ্ম-কণাগুলিকে আগাগোড়া ছাতের তালুর সাহায্যে বেশ ময়েন-দিয়ে-বাঁধা লুটির ময়দার তালের মতো চটকে-ঠেঁশে মেখে মুংশিল্ল-সামগ্রীর চনার উপযোগী চটচটে-আঁঠালো ধরনের বানিয়ে তোলা। এভাবে মাটির তাল মাখার সময় নরম রাখা দরকার—মাটিতে যেন প্রয়োজনোতিরিক্ত এতটুকু জল-বাঁধাস না রয়ে যায় এবং মাটির সূক্ষ্ম-কণাগুলি যেন আগাগোড়া বেশ ভালোভাবে ভেঙে-গুঁড়িয়ে মিলে-মিশে একাকার হয়ে ওঠে। সচরাচর হাঁড়ি-কুড়ি, সরি, বাটি, থালা, গেলাস, ইট, টালি প্রভৃতি নিত্য-প্রয়োজনীয় মোটা-ছাঁদের অতি-সাধারণ মুংশিল্ল-সামগ্রী বানাতে হলে কাজের উপযোগী এঁটেল মাটির তালটিকে মোটামুটিকাবে জল আর আদ্যাজমতো পরিমাণে অল্প-বিস্তর বালি-মাটি মিশিয়ে আগাগোড়া ভালোভাবে চটকে-ঠেঁশে মেখে নিলেই চলবে। কিন্তু পরিপাটি-ছাঁদের খেলনা, পুতুল, প্রতিমা, প্রতিমূর্তি, ঘট, কলস, ফুলদানী, ফুলের টব, বিচিত্র নকশাদার টালি কিছা পাটা প্রভৃতি মনোরম-সুন্দর সৌখিন মুংশিল্ল সামগ্রী রচনার জন্য, কাজের উপযোগী এঁটেল-মাটির তালটিকে সমস্ত আদ্যাজমতো পরিমাণে জল ও পাটের কুচো, তুঁব প্রভৃতি বিভিন্ন প্রয়োজনীয় উপকরণাদি মিশিয়ে মাটির সূক্ষ্ম-কণাগুলিকে বিহি-ছাঁদে আরো ভালোভাবে চটকে ঠেঁশে রেখে ময়েন-দিয়ে-বাঁধা লুটির ময়দার তালের মতো

আগাগোড়া বেশ তুলতুলে-নরম ও আঁঠালো-চটচটে ধরনের করে তুলতে হবে। কারণ, নিত্য-প্রয়োজনীয় মুংশিল্ল-সামগ্রী রচনার মোটা-কাজের জন্য ময়দার তালের মতো খুব সূক্ষ্ম বিহি-মোলায়েম গুঁড়ো-মেশানো নরম-তুলতুলে আঁঠালো-চটচটে কাঁদা-মাটি ব্যবহার করার প্রয়োজন না থাকলেও, খেলনা, পুতুল, প্রতিমা, প্রতিমূর্তি প্রভৃতি সৌখিন-সুন্দর সূক্ষ্ম-কাককলার মুংশিল্ল-সামগ্রী বানানোর জন্য উপরোক্ত-ধরনের কাঁদা-মাটির তাল একান্ত অপরিহার্য উপকরণ।

সচরাচর শ্রোতবহা-নদী-কূলে—বিশেষতঃ বাকের কিনারা থেকেই মুংশিল্ল-সামগ্রী রচনার উপযোগী কালো-রঙের এঁটেল-মাটি এবং হালকা-হলদে রঙের বালি-মাটি সংগ্রহ করা হয়। এঁটেল-মাটির বিশেষ গুণ হলো—এটি বেশ নরম-মোলায়েম এবং চটচটে আঁঠালো ধরনের। এমন আঁঠালো-চটচটে এবং মোলায়েম-নরম ধরনের হয় বলেই—মুংশিল্লের কাজে এঁটেল-মাটির সবিশেষ কদর আছে। বালি-মাটিতে কিন্তু এই আঁঠালো-চটচটে নরম এবং মোলায়েম-কাজের বিশেষ অভাব—তার ফলে, বালি-মাটি আগাগোড়া ধুলোর মতো সূরসূরে বিহি-ছাঁদের দানা হয়েই থাকে। তাই বালি-মাটি দিয়ে এঁটেল-মাটির মতো সহজে অনায়াসে সৌখিন-সুন্দর নিখুঁত-মোলায়েম সূক্ষ্ম-কাককলার কাজকর্ম করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। তবে অনেক সময় এঁটেল-মাটির সঙ্গে অল্প-পরিমাণে বালি-মাটি মিশিয়ে কিছু কিছু মোটা-ধরনের মুংশিল্ল-সামগ্রী বানানোর যে সব কাজ করা হয়—তার হকিম ইতিপূর্বেই দিয়েছি, গত সংখ্যায় প্রকাশিত বিভিন্ন ধরনের কাঁদা-মাটির প্রসঙ্গালোচনাকালে কাজেই এ বিষয়ে আর নতুন করে কিছু বলা নিপ্রয়োজন। তবে শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য আগাততঃ, এঁটেল-মাটির গুণাগুণ বিচারের একটি সহজ-পাঠ্য পরিচয় দিয়ে রাখি। অনেকের ধারণা—কাঁদা-মাটির রঙ কালো হলেই, সেটি এঁটেল-মাটি হবে। এমন ধারণা কিন্তু ঠিক নয়। এঁটেল ছাড়াও, বিশেষ-ধরনের আরো নানান কারণে বিভিন্ন শ্রেণীর কাঁদা-মাটির রঙও কালো হতে পারে। কাজে-কাজেই মুংশিল্লের কাজের উপযোগী কালো-মাটি, বর্ণা-এঁটেল কিনা, কেউ ভালোভাবে পরখ করে নেওয়া দরকার। এভাবে মাটির গুণাগুণ পরখ করে দেখবার খুবই সহজ—

সরল বিশেষ একটি উপায় আছে। সে উপায়টি হলো—নমুনা-হিসাবে কাঁদা-মাটির খানিকটা তাল হাতে তুলে নিয়ে, তাইতে সামান্য একটু জল মিশিয়ে চটকালে, মাটি যদি বেশ আঠালো-চটচটে বোধ হয় তাহলেই বোঝা যাবে যে সেটি হচ্ছে খাঁটি-জাতের এঁটেল-মাটি। এই ধরণের এঁটেল-মাটি দিয়েই সাধারণতঃ মৃৎশিল্পের বিবিধ সৌধিন-সুন্দর সামগ্রী বানানো হয়ে থাকে। তবে নদী-তট থেকে সস্ত-সস্ত এঁটেল-মাটির তাল সংগ্রহ করে এনেই তাই দিয়ে মৃৎশিল্প-সামগ্রী বানানো চলে না। কারণ সস্ত-সংগৃহীত মাটির তাল থেকে গোড়াতেই ব্যবতীয় কাঠি-কুটো, কঁকর-পাথর, চিল-পাটকেল আর অনাবশ্যক ময়লা-আবর্জ্যাদি ভালোভাবে বাছাই ও সাক্ষ-স্বতরো করে না নিলে, শিল্পীর হাতে-গড়া মৃৎশিল্প-সামগ্রীটি আগাগোড়া মোলারেম-সুন্দর ও পরিপাটি হাঁদের হয়ে ওঠে না...উপরন্তু, রচিত শিল্প-সামগ্রীটির নানা আয়গায় অল্প-বিস্তর চিল-পাথর কঁকরের ছোট-বড় টুকরো আর নিত্য প্রয়োজনীয় কাঠি-কুটি-বড় প্রভৃতি জঙ্কাল-আবর্জ্যের খোঁচখাঁচ লেগে থাকে বলেই, এ-ধরণের অপরিষ্কার মাটিতে তৈরী মৃৎশিল্প সামগ্রী আগাগোড়া বেশ পরিপাটি-নিখুঁত হাঁদের গড়ে তোলা সম্ভব হয়ে ওঠে না এবং রচনাকালে মৃৎ-শিল্পীকে, বিবিধ অস্ববিধা ভোগ করতে হয়। তাই মৃৎশিল্প-সামগ্রী রচনার উপযোগী কাঁদা-মাটিকে, নদীর কূল থেকে সংগ্রহ করে আনার সঙ্গে সঙ্গেই অপ্রয়োজনীয় কাঠিকুটি-জঙ্কাল আর ইট-পাথর-কঁকরের টুকরোগুলিকে আগাগোড়া নিখুঁত-ভাবে বাছাই ও সাক্ষ-স্বতরো করে নেওয়া হয়কার।

এরনিভাবে গোড়াতেই কাঁদা-মাটি থেকে ব্যবতীয় আবর্জনা বাছ দিয়ে আগাগোড়া পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে তোলবার পর, সেটিকে জল দিয়ে যেখে ময়েন-দিয়ে-মাখা লুটির ময়দার তালের মতো বেশ মোলারেম-নরম এবং আঠালো-চটচটে ধরণের করে তুলতে হবে। কারণ, ইতিপূর্বেই বলেছি, মৃৎশিল্পের কাজের উপযোগী কাঁদা-মাটি ময়দার তালের মতো নরম-মোলারেম ও আঠালো-চটচটে নাহলে, সেটি 'দিয়ে শিল্পীর অ-কিচি-অস্বাভী' বিস্তর হাঁদে সৌধিন বা নিত্য প্রয়োজনীয় কোনো মৃৎশিল্প সামগ্রীই বানানো চলেবে না। কাজেই সহজ, সুন্দর ও

পরিপাটিভাবে কাঁদা-মাটির শিল্প-কর্ম করতে হলে, মৃৎ-শিল্পীকে এ বিষয়ে রীতিমত নজর রাখতে হবে।

মৃৎশিল্পের কাজের উপযোগী মাটি তৈরী করে নেওয়ার সহজ উপায় হলো—বাড়ী-ঘর রচনাকালে সচরাচর বাসি-চূণ-স্বরকীর যেমনভাবে তাগাড় মাখা হয়, ঠিক তেমনি-

জন চর্চিত গর্ত



ভাবেই উপরের ১নং নক্সার নমুনা-অনুসারে সংগৃহীত কাঁদা-মাটির তালের চারিদিকে ঈষৎ-উঁচু প্রাচীরের 'বেড়' দিয়ে বিবে, সেই বেড়ের ভিতরে-মাখা কাঁদা-মাটির তালটির চূড়ায় মাঝখানে একটি গর্ত করে, সে গর্তে আলাদাভাবে পরিমাণে জল ঢেলে মাটির তালটিকে অল্পতঃ-পক্ষে ২২।২৪ ঘণ্টাকাল ভিজিয়ে রেখে আগাগোড়া নরম, মোলারেম ও খলপলে ধরণের বানিয়ে তোলা চাই। তারপর সচরাচর যেমন-পদ্ধতিতে ময়েন দিয়ে লুটির লজ্জ ময়দার তাল মাখা হয়, ঠিক তেমনি ধরণে জলে-ভিজানো ঐ কাঁদা-মাটির তালটিকেও হাতের বা পায়ের সাহায্যে আগাগোড়া বেশ ভালোভাবে ঠেঁশে-চটকে তুলুতলে-হাঁবে মেখে নেওয়া দরকার। এভাবে বেড় রচনার অস্ববিধা হলে, নীচের ২নং নক্সার নমুনা-অনুসারে বড় গায়লাতেও

জন চর্চিত গর্ত



উপরোক্ত-উপায়ে কাঁদা-মাটির তাল ভিজিয়ে রাখা চলে। ছোটখাটো-ধরণের মৃৎ-শিল্প সামগ্রী বানানোর লজ্জ হাঁদে দিয়ে প্রয়োজন মতো আর মাটি মেখে নিলেই চলবে... তবে কাঁদা-মাটি দিয়ে বড়-ধরণের কোনো জিনিষ গড়তে হলে, সাধারণতঃ কুমারেরা যেমনভাবে পায়ের সাহায্যে

মাটির বিরাট তাল চট্‌ক-ঠেলে মেখে নেয়, তেমনিভাবেই কাজ করতে হবে। এভাবে হাত বা পা দিয়ে ঠেলে-চট্‌কে মেখে মৃৎশিল্প-সামগ্রী রচনার উপযোগী মাটি তৈরী করে নেবার সময়েই দীর্ঘস্থায়ী ও অমৃত-ধরণের গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে, কাঁচা-মাটির সঙ্গে পাটের কুচি, তুঁত প্রভৃতি বিভিন্ন উপাদান মিশিয়ে দেয়া হয়।

এর'ন-পদ্ধতিতে কাঁচা-মাটির তালটিকে আগাগোড়া ভালোভাবে মেখে তৈরী করে নেবার পর, সেটিকে একখণ্ড ভিলে-কাপড় দিয়ে সিল্ক-অবস্থার ঢেকে রাখাই রীতি। কারণ, মাটি শুকিয়ে গেলে, সে মাটিতে মৃৎশিল্প-সামগ্রী রচনা করা যায় না। সঞ্চয়কালে বাতাসে ভিলে-কাপড় শুকিয়ে গেলে, সেই কাপড়টির উপরে জলের ছিটা ছড়িয়ে দিয়ে পুনরায় আগের মতোই স্থিসিক্ত এবং সঁাত্‌সেঁতে অবস্থায় রেখে দেওয়া দরকার। এভাবে তৈরী-কাঁচা-মাটির তালকে দীর্ঘকাল মৃৎশিল্পের কাজের উপযোগী ভিজা-সঁাত্‌সেঁতে এবং ময়নার তালের মতো নরম-মোলায়েম ও আঠালো-চট্‌চটে অবস্থায় রাখা সম্ভব। মোটামুটিভাবে, মৃৎশিল্প-সামগ্রী রচনার উপযোগী মাটি-তৈরী এবং মাটি-মজুত রাখার এই হলো সহজ-সরল চিরাচরিত প্রথা।

শিক্ষার্থীদের মধ্যে খাদের এভাবে মাটি তৈরী করে নেওয়ার অসুবিধা আছে, তাঁরা অবশ্র স্থানীয় কুমোরদের সহায়তায় তাঁদের ব্যক্তিগত-প্রয়োজনমতো মৃৎশিল্প-সামগ্রী রচনার উপযোগী কাঁচা-মাটির তাল সংগ্রহ করে নিতে পারেন।

এবারে এই পর্য্যন্তই বললুম...আগামী সংখ্যায় কাঁচা-মাটির কাজ করতে হলে, বিশেষ-ধরণের যে সব সাজ-সরঞ্জাম দরকার, সেগুলির মোটামুটি পরিচয় দেবার বাসনা রইলো।

ক্রমশঃ



পশমী-সূতোয় বোনা শীতের কাডিগ্যান-জ্যাকেট হিরণ্ময়ী দেবী

শীতের মরুতমে সংসারের দৈনন্দিন কাজকর্মের অবসরে আজকাল নিজের হাতে ছোট-বড়, গৌখিন ও নিত্য-প্রয়োজনীয় নানা ধরণের পশমী-সূতোয় বোনা পোষাক-পরিচ্ছদ রচনার দিকে প্রায় প্রত্যেক মহিলারই বিশেষ উৎসাহ-স্বাগ্রহ নজরে পড়ে। এবারে তাই পশমী-সূতোয় বোনবার উপযোগী সহজ-সরল-অনার্যসামান্য নুতন প্যাটার্নের একটি কাডিগ্যান-জ্যাকেটএর কথা আলোচনা করছি।

আলোচনার সুবিধার জন্ত, ধরে নেওয়া বাক—মহিলা-দের সচরাচর-ব্যবহাযোগ্য প্রমাণ-সাইজের এই কাডিগ্যান-জ্যাকেটটির মাপ হবে :—

ঝুল—২০' ইঞ্চি

ছাতি—৩২" ইঞ্চি

হাতা—১২" ইঞ্চি

উপরের মাপমতো কাডিগ্যান-জ্যাকেট বুনতে হলে, উপ-করণ চাই—১০ আউন্স তিন-তারের পশম (10.03 3-Ply Wool) ১০ নং ও ১২ নং পশম-বোনবার কাঁটা ছ'জোড়া এবং পশমের রঙের সঙ্গে মানানসই ও সৌখিন-ছাঁদের এটি বোতাম।

এ সব উপকরণ সংগ্রহের পর, বোনবার পালা শুরু করতে হবে ১২নং কাঁটায় পোষাকের সূত্বের আগের ডানদিক থেকে পর-পর ৩০টি ঘর কূলে। এভাবে চার

কাঁটা রিব বুনে পোষাকের প্রথম বোতামের ঘর বানাতে হবে। একাজের সময় যেদিকে পটি বানাবেন, সেদিকটিতে ২টি ঘরের পর ৪টি ঘর বন্ধ করবেন এবং ঘুরে এসে পুনরায় ঐ ৪টি ঘর তুলে নেবেন। বোনার সময় হিসাব রাখবেন যে ‘রিব’ (rib) খেন মাপে ৪” ইঞ্চি চওড়া হয়। এমনভাবে ৩২” ইঞ্চি বোনবার পর, পোষাকের দ্বিতীয় বোতামের ঘর বানাতে হবে এবং ‘রিব’ বোনার পালা শেষ করে কার্ডিগ্যান-জ্যাকেটের হাতার-বগলের দিকে ৩টি বাড়াতে হবে।

এ কাজ সারা হলে পছন্দমতো প্যাটার্ন অনুসারে পশমী-শুভোর সাহায্যে জ্যাকেটের ‘Body’ বা ‘দেহাংশ’ রচনার হাত দেবেন—১০নং বোনবার-কাঁটা ব্যবহার করে। জ্যাকেটের ‘বডি’ বা ‘দেহাংশ’ বোনবার সময় পোষাকের সুমুখের দিকে সুদৃশ ‘পাড়’ বা ‘বর্ডার’ (border) রচনার জন্য পর-পর ৮টি ঘর বরাবর সোজা সন্ধান-লাইনে বুনে তুলতে হবে। পোষাকের নীচের দিকে তৃতীয় বোতাম বসানোর জন্য মাপ অনুযায়ী ‘পটি’ ও বোতামের ঘর রচনা করতে হবে। কার্ডিগ্যান-জ্যাকেটের সামনের দিকের ‘বডি’ বা ‘দেহাংশ’ বোনবার সময় প্রত্যেক ৭ কাঁটা অন্তর পটিতে একটি করে জোড়া বুনে যেতে হবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না কাঁটার ৫৩টি ঘর বোনা হয়, ততক্ষণ এই রীতি অনুসারে কাজ করে যাবেন। মোট ১৩” ইঞ্চি বোনা হলে, জ্যাকেটের হাতা ও বগলের ছাঁদ (shape) সুস্পষ্ট-পরিপাটি হয়ে উঠবে। জ্যাকেটের বগল-মোহড়ার ছাঁদ রচিত হবে—তিন কাঁটার ৩টি, ২টি ও ৩১টি—এই ধরণে বুনে। এই সঙ্গে পটিতেও জোড়া বুনে যেতে হবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত ৩৭টি ঘর তোলা না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত এ রীতি অনুসারেই কাজ করে যাবেন। এবারে ২” ইঞ্চি বোনবার পর, ‘পাড়’ বা ‘বর্ডারের’ পাশে ২টি জোড়া বুতে হবে। কাঁটার ৬৫টি করে ঘর তুলে ৩” ৩২” ইঞ্চি বুনে যাবেন। অতঃপর ২৭টিতে জ্যাকেটের কাঁধের ‘সেপ’ (shape) বা ‘ছাঁদ’ রচিত হবে এবং কাঁধের ঘর বন্ধ করে, ‘পাড়’ বা ‘বর্ডারের’ (border) ১২” ইঞ্চি অংশে ৮টি ঘর সোজা-লাইনে বুনে গিয়ে ঘর বন্ধ করবেন। এমনি ভাবে কাজ করে কার্ডিগ্যান-জ্যাকেটের সুমুখের ডানদিকটি বোনবার পর

অনুরূপ-রীতিতে পোষাকের সুমুখের বাঁ দিকের অংশটিকে আগাগোড়া বুনে কেটেতে হবে। তাহলেই মহিলাদের পরিধানোপযোগী কার্ডিগ্যান-জ্যাকেটের সামনের অংশটি বোনার কাজ শেষ হবে।

সামনের অংশ বোনার পালা শেষ হলে, পোষাকের পিঠের বা পিছনের দিকের অংশটিকে পরিপাটি ছাঁদে বুনে জেলার কাজে হাত দিতে হবে।

কার্ডিগ্যান-জ্যাকেটের পিঠের বা পিছনের অংশ বোনবার জন্য গোড়াতেই ১২নং কাঁটার ১১০টি ঘর তুলে ৪” ইঞ্চি ‘রিব’ (rib) বা ‘পটি’ বুনে তোলা প্রয়োজন। ‘পটি’ বা ‘রিবের’ প্রান্ত-সীমার দুই পাশে ১০টি করে ঘর বাড়িয়ে তুলবেন। তারপর যতক্ষণ পর্যন্ত ১৩” ইঞ্চি অংশ বোনা শেষ না হয়, ততক্ষণ ১২নং কাঁটার পোষাকের সুমুখ-দিকের ‘বডি’ বা ‘দেহাংশ’ বোনার অনুরূপ-পদ্ধতিতে বরাবর বোনবার কাজ করে যাবেন। অতঃপর, পোষাকের সামনের অংশে যেমনভাবে ঘর তুলে জ্যাকেটের হাতা ও বগলের ‘ছাঁদ’ বা ‘সেপ’ (shape) রচনা করেছেন, তবু তেমনি ধরণেই আগাগোড়া বুনে যেতে হবে। এবারে যতক্ষণ পর্যন্ত না কাঁটার ৬২টি ঘর বোনা শেষ হয়, ততক্ষণ প্রত্যেক কাঁটার দু’দিকে ১টি করে ঘর বন্ধ করতে হবে। এবারে পোষাকের সুমুখের অংশের মতোই জ্যাকেটের ঝুল সুনির্দিষ্ট করে কাঁধের ‘সেপ’ বা ‘ছাঁদ’ বোনার কাজ চুকিয়ে ফেলতে হবে ঘর বন্ধের সঙ্গে সঙ্গে।

এ কাজটুকু মিটলে কার্ডিগ্যান-জ্যাকেটের ‘হাতা’ বোনবার পালা শুরু করতে হবে। জ্যাকেটের হাতা রচনার জন্য—১২নং কাঁটার ৩২” ‘রিব’ (rib) বা ‘পটি’ বুনে এক সঙ্গে ১২টি ঘর বাড়িয়ে তুলতে হবে। তারপর ১০নং কাঁটা ব্যবহার করে বুতে হবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না কাঁটার ৮৪টি ঘর বোনা হয়, ততক্ষণ প্রত্যেক ৮ কাঁটা অন্তর দুই পাশে ১টি করে ঘর বাড়িয়ে বুনে যেতে হবে। এমনভাবে ১৫২” ইঞ্চি বোনা শেষ হলে, জ্যাকেটের হাতার মোহড়ার ছাঁদ সুস্পষ্ট-পরিপাটিভাবে রচিত হয়ে উঠবে। এবারে প্রত্যেক কাঁটার দু’পাশে ১টি করে ঘর বন্ধ করবেন এবং কাঁটার বধন ৬৪টি ঘর হবে তখন সব ঘরগুলি একসঙ্গে বন্ধ করতে হবে। তাহলে, দ্বিখি

পরিপাতিতাবে কার্ডিগ্যান-জ্যাকেটের গিঠের বা পিছনের দিকের অংশ বোনার কাজ শেষ হবে।

এমনি উপারে পোষাকের সাজনের ও পিছনের—উত্তর-দিকের অংশ বোনার কাজ শেষ হলে, কার্পেট-সেলাইয়ের ছুঁচ ও মানানসই-রঙের মজবুত-খাপি সূতোর সাহায্যে আগাগোড়া হুটুগবে সেলাই দিয়ে, পোষাকের হৃদয়ের ও পিছনের দিকের হাতা অংগের দেহাংশ পাঁজা-পোক্ত-ধরণে একত্রে জোড়া লাগিয়ে দিলেই মহিলাদের ব্যবহারোপযোগী কার্ডিগ্যান-জ্যাকেট রচনার কাজ সহজেই সম্পন্ন হবে।



সুধীরা হালদার

শীতের মরশুম এসে গেল...বাজারে আজকাল শিম, বেগুন, বরবটি, কপি, কড়াইগুটি, ঢেঁড়শ, টোম্যাটো প্রভৃতি নানা রকম শীতের সব্জী দেখা দিয়েছে...তাই এবারে শিম দিয়ে রান্নার উপযোগী অভিনব-ধরণের একটি দক্ষিণ-ভারতীয় খাবারের পাক-প্রণালীর হৃদয় বিজি। বিচিত্র-উপাদেয় নিরামিষ-জাতীয় এই দক্ষিণ-ভারতীয় খাবারটির নাম—‘শিমের হুটু’!

অভিনব-ধরণের আহারোপযোগী ‘শিমের হুটু’ রান্নার

অন্ত যে সব উপকরণ দরকার, গোড়াতেই তার যোগ্যতা তালিকা দিয়ে রাখি। অর্থাৎ, এ খাবারটি রান্নার জন্য চাই—আখপোয়া শিম, আখখানা নারিকেল, একটি বড় পেরাজ, চারের চারের সিকি-চামচ লবঙ্গ গুঁড়ো, প্রয়োজনমতো পরিমাণে খানিকটা গুড়ো-নুন আর বড় চামচের এক-চামচ পরিমাণ ঘী।

কর্মমতো উপকরণগুলি সংগ্রহ করার পর, রান্নার কাজে হাত দেবার আগে শিমগুলিকে বেশ মিহিভাবে কুটে পরিকার-জলে ধুয়ে সাক্ করে নিন এবং নারিকেলটিকেও কুল্লীর সাহায্যে আগাগোড়া মিহি-ধরণে কুরে ফেলুন। তারপর পেরাজটিকেও বেশ মিহি-ছাঁদে কুচিয়ে নিন।

এ সব প্রাথমিক-কাজ সারা হলে, উনানের আঁচে রন্ধন-পাত্র চাপিয়ে, সে পাত্রে বিগরম করে পেরাজের কুচো-গুলিকে ভালোভাবে ভেজে নিন। কিছুক্ষণ এভাবে ভাজার কলে, পেরাজের কুচোগুলি আগাগোড়া বেশ বাদ-মী-রঙের হলে, উনানের আঁচে বসানো রন্ধন-পাত্রে রান্নার বাকী উপকরণগুলি মিশিয়ে অল্প একটু জলের ছিটে দিয়ে সেই ‘মিশ্রণটিকে’ খানিকক্ষণ ফুটিয়ে পাক করুন। এমনিভাবে পাক করার সময়, হাতা বা খুস্তির সাহায্যে গায়ে মাঝে নেড়েচেড়ে রন্ধন-পাত্রের ‘মিশ্রণটিকে’ চিমে-আঁচে রেখে রাখবেন এবং ঠিকছক্ষণ বাদে ‘মিশ্রণটি’ আগাগোড়া বেশ সু-সিদ্ধ ও নরম হলে, উনানের উপর থেকে রন্ধন-পাত্রটিকে নামিয়ে নেবেন। তাহলেই দক্ষিণ-ভারতীয় প্রখ্যাত ‘শিমের হুটু’ খাবার রান্নার কাজ শেষ হবে।

অন্ত:পর প্রিয়জনদের পাতে সাদরে পরিবেষণের পালা। দক্ষিণ-ভারতীয়দের বিশেষ-প্রিয় অভিনব-ধরণের বিচিত্র-উপাদেয় এই নিরামিষ-জাতীয় ‘শিমের হুটু’ খাবারটি যে তাঁদের রসনার পরিতৃপ্তি সাধন করবে—এ কথা আশ্রয় নিঃসন্দেহেই বলতে পারি।

অ-গাখী সংখ্যায় আঁচে কটি অপরূপ মুখরোচক ভারতীয় খাবারের পাক-প্রণালীর হৃদয় দেবার বাসনা রইলো।

শ্রীঅবাসেন্দ্র 'শিব'

শ্রীহৃৎশ্যামোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

[ভারতের মননের ইতিহাসে 'শিব'-চেতনা এক অপূর্ণ লক্ষ্য। যুগ যুগান্তর ধরে এই 'শিব'কে আমরা গড়েছি, ভেঙেছি, লাঞ্ছিত করেছি, হাশন করেছি, বেদবেদান্তের পরমতত্ত্ব পরিণত করেছি, আবার তাকে টেনে নিয়ে গেছি হাটে মাঠে বাটে, ভাঙ খাইয়েছি, কঁাদল করিয়েছি, নিবাতনিকম্প মহাযোগীকে করেছি গরীব নেশাখোর ক্ষানবাসী পাগল তোলানাথ—এই 'শিব'কে নিয়েই কল্পনা করেছি তিনি মহেশ্বরভক্ত নাসাগ্রবদ্ধদৃষ্টি দেবতা না বেদের রক্ত, হিরণ্যকেশিনী গৃহস্থত্বের শতরত্নের প্রতীক না ভক্তদের দেবতা পশুপ, শিবদেবতাদের মানসভৌম ইঞ্জিরপত্রভরী না মহাভারতের বিগবাসু নর; ঘোর ব্রহ্ম-চারী, উগ্র মহাতপা। ইনিই কি মহাকাল, অলোকিতেশ্বর, লোকনাথ, বজ্রস্ব, বজ্রধর, তোষীশবরীর লীলাসহচর, আচার্যী, 'নৈঃশব্দ' কক্ষে ও বক্ষে বিহার করেন মহা-জুগচক্রে। তামিল সত্য পরিষদের সভাপতি 'শিব' কবি-মনীষ, কান্নীরের কুনীশরা, দক্ষিণের শৈবসিদ্ধাচারী, তামিল নারনারা, বাংলার আগমবাণীশরা সৃষ্টি হিত লংকার তিরোতাৎ অকুগ্রহের পকক্রিয়ার মধ্যে কোন্ পরিপূর্ণ 'ঐক্য' পেতে চেয়েছিলেন। আমরা আচার্য শংকরের কাছে শুনেছি যে তিনি অজ, তিনি নিত্য, তিনি শাশ্বত, তিনি চিদানন্দরূপ—তার তত্ত্ব নেই নিজা নেই, বেশ নেই, বেশ নেই। আধুনিক কালেও মহামনীষি বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ এই চেতনাকে রূপ দিয়েছেন। 'শিব', 'শিব', ছিল বিবেকানন্দের মুখের মূল। অমরনাথে তিনি অমরলিঙ্গের সঙ্গে একাত্ম হয়ে-ছিলেন। 'শিব' ছিল তাঁর 'নেত্র' পায়ে নিয়ে বাবে। কালী হচ্ছেন সেই শিবেরই Vision। রবীন্দ্র চেতনাতেও এই শিবকে দেখেছি নানা বেশে, স্বভেদের রক্তদেবতার মধ্যে, ধ্যাননিমগ্ন আপনি-মগ্ন ভক্তের মধ্যে, নৃত্যরত নটরাজে, হরসৌরীর প্রেমে, ধূর্তির মুখের পানে পার্বতীর হাসিতে, ক্ষানচরী ভৈরবের, পরিচয় ভ্রোভিতে, শিশু-

তোলানাথে, তিরিয়ারত শিবশংকরে, জীবনের মুক্তধারার কবির দাঁড়ায়, নম শক্তার রয়োত্তার। শিবের মূর্ত্য-রূপই তাঁকে চকল করেনি, যখন বিগাহে চলে বিলোচন, জীবনের পরিপূর্ণ কল্যায়ের আদর্শই শিবমূর্তিতে রূপায়িত রূপায়িত করেছিলেন কবি।

শ্রীঅরবিন্দ পরিপূর্ণ যোগের আসনে বসে 'শিব'-চেতনাকে অর্থনাতীশ্বরের যে স্তরে নিয়ে গেছেন তারই একটি নমুনা নিয়ে প্রবৃত্ত হলো। 'শিব' সবদিক প্রথম কবিতা তিনি লেখেন তাঁর যৌবনে। এ কবিতাটি শেষের যুগের—১৬-১৭-১৯৩৩ সালের। এই তিন স্রষ্টা পুরুষের 'শিব' চেতনাকে নিয়ে আলোচনা করবার ইচ্ছা রইলো। রবীন্দ্রনাথের কবিতার কয়েক লাইন মনে পড়ছে...

অসীম আকাশে মহাতপস্বী মহাকাল আছে জাগি
জাগিও বাহারে কেহ নাহি জানে,
দেখনি যে দেখা আছে কোনো খানে
সেই অতাবিত কল্পনাভীত লাসি...
মহাকাল আছে জাগি।
তুবাংতুকী শুভ্র নীরংতার উধে
নিরলকার অনন্তের প্রতীক
বলে আছেন একাকী, রক্তগিরিনিভ
শান্ত দীপ্ত স্তব্ধ একটি মহান সত্তা
আত্মার দেবতা;
শান্তির অমিমর ছাতির পিছনে লগ্নে রক্তিত
নর বরষের একটি অনিন্দ্য মূর্তি।
কিন্তু তাঁকেও এসে স্পর্শ করলো তরঙ্গ
আর একটি অসীম আনন্দের অনাগত ছন্দ
মহাযোগী চোপ খুললেন, দেখলেন
লীলাধীন গভীরতার অন্তর পেরিয়ে
আনন্দোজলা মহাপ্রকৃতির সুক প্রমাণ
বা অজ্ঞানের নৈশবের মাঝেও

পাছে বীরে বীরে প্রকাশ ;
 হাতার যোগনিহা গেছে টুটে
 সেই অর্থ ভাগবশে ভরাই হলো দুই বিনিময়
 পক্ষের দিকে চাইলেন প্রকৃতি
 স্বকের প্রতিটি স্পন্দনে ভেগে উঠলো আলোড়ন
 ছন্দস্বর অগতে এলো প্রবল নর্তন
 সেই নৃত্যের তালে তালে প্রাণ গেলো বিবশবিধ

অন্ন নিলে যন
 তখন তিনিই নিজের মুখকে
 তুলে ধরলেন তাঁর দিকে
 তিনিই যে তিনি
 প্রকৃতির আলিঙ্গনে ধরা পড়লো পৃথক
 পৃথকের অঙ্গেই প্রকৃতি
 লুপ্ত লাকিয়ে পড়লো সত্যের উন্মুক্ত বকে।

কালো-ঘোড়ার দাগট



কালো-ঘোড়া :—চিঁহিঁহিঁহিঁহিঁ.. আমি উদার... আমি
 দুর্দয়... আমি শান্তি-হৃদয়ের শনি, আমি
 লোভাতুর... বন্ধন-হারা, মানি না
 শাসন, মানি না পাহারা, দুর্বীর স্বধা...
 তেজে ছুটে চলি জুনিয়াবে আমি তৃণসম
 গনি... সোমারী সামান্য-হও !
 শিরী—গৃধী দেবশর্মা



খাদ্যভাণ্ডারের পরিস্থিতি—

গত আগষ্ট মাস হইতে পুরা ৪ মাস কাল দিন দিন দেশের খাদ্যবস্থা জটিল হইয়াছে ও তাহার ফলে সারা ভারতে বিক্ষোভ হইতেছে। কেবলে খাদ্যভাণ্ডারের ফলে বিপুল বিক্ষোভ হইয়াছে ও ভারতের সকল রাষ্ট্র হইতে কেন্দ্রীয় সরকার খাদ্য সংগ্রহ করিয়া কেবলে প্রেরণ করিয়াছেন। তাহার পর গুজরাটে ও মণীপুরে খাদ্যভাণ্ডারের জন্য নানারূপ বিক্ষোভ হইয়াছে—পুলিস লাঠি ও গুলী চালাইয়া তাহা বন্ধ করিতে পারে নাই—শেষ পর্য্যন্ত অবস্থা শাস্ত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে দারুণ খাদ্যভাণ্ডার চলিলেও বিক্ষোভ তত বেশী হয় নাই। কয়েকটি জেলায় ছাত্র বিক্ষোভ দেখা দিলেও তাহা শাস্ত করা হয়। কিন্তু এই কয়মাস খাদ্য মূল্য বৃদ্ধির ফলে জনসাধারণের দুর্গতির সীমা নাই। অক্টোবর মাসে পূজার সময় একদল লোক বোনাসের টাকা পাইয়া তাহা স্বারা খাদ্য সমস্তার সমাধান করে—বাহার্য বোনাস পায় নাই—তাহাদের সংখ্যাই অধিক—শতকরা ৮০ জন সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করিয়া, এমন কি অনেকে তৈজসপত্র বিক্রয় করিয়া খাদ্য সংগ্রহ করিয়াছে। চাউল দুপ্রাপ্য হইল—৭৬ পরসার চাউল লোকে ১ টাকা ২৫ পংসা কিলো দরে ক্রয় করিতে বাধ্য হইল। পূজার সময় কিছু বেশী চাউল পাওয়া গেল এবং তাহার পর হইতে চাউল সমস্যা কতকটা কমিয়া গিয়াছে। তখন গম ও আটা বেশী পরিমাণে পাওয়া বাইত—আবার নভেম্বরের প্রথম হইতে গম দুপ্রাপ্য হইয়াছে—টাকা দিয়াও গম পাওয়া যায় না। পূজার একমাস পূর্বে হইতে চিনি উধাও হইল—পূজার সময় শুষ্ক দিয়া বা ঐ জাতীয় লাল চিনি দিয়া মিঠাই প্রস্তুত হইল—শুষ্ক বা লাল চিনির ব্যবহার কম ছিল না, গত ১ মাস বাৎসর্য্যে তাহা নাই—১০৫ পরসার কিলোর চিনি ১৬০ পরসার দরে বিক্রয় হইতেছে। চাল, আটা ও চিনি রেশন দোকানে পাওয়া

যায়—পূজার সময় সরকার রেশন দোকান হইতে ময়দা ও হুজি দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল, কিন্তু তাহার পরিমাণ এত কম যে শতকরা মাত্র ৩৫ জন লোক ময়দা হুজি পাইয়াছে। তাহার কল ও ভাড়াদিগকে কম দিন ধরিয়া সর্বত্র ঘোরাঘুরি ও ছুটাছুটি করিতে হইয়াছে। আবার এখন আর তাহা ঘোটেই পাওয়া যায় না। বাকালী ডাল প্রিয়—ডালের দর ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া ২০ পরসার স্থলে ১৪০ পরসার হইয়াছে—তাহাও এখন আর ছোলায় ডাল বা মটর ডাল আরো পাওয়া যায় না। এ সকল জিনিষ লোকে হঠাৎ বেশী পরিমাণে খাওয়া অভ্যাস করে না—কাজেই মনে হয়—মজুতদারদের কাছে ডাল আছে—তাহা বাজারে না ছাড়িয়া কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করা হইয়াছে। সর্বশেষ কথা—সরিষার তেল। বাকালী বহু শত বৎসর সরিষার তেল ব্যবহার করে। এক নমুনা সরিষার তেলের সের ছিল ৩ আনা—তাহা বাড়িয়া এখন সরিষার তেলের সের হইয়াছে ৪ টাকা—কিন্তু তাহাও আবার অধিকাংশ সময় আরো পাওয়া যায় না। বহু ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে তৈজসপত্র লইয়া গত ৩৪ মাসকাল কলিকাতার পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিয়াছি। সরিষার তেল না পাইয়া লোক ক্রমে তিলের তেল ও বাঁদাম তেল খাওয়া অভ্যাস করিতেছে। সরিষার তেলের সমস্যা যে এত কঠোর হইতে পারে, এ কথা পূর্বে কেহ কখনও কল্পনাও করে নাই। তাহা সত্যে পরিণত হইল। নারিকেল তৈলও ৪।৫ টাকা সের—তাহাও অধিক পরিমাণে পাওয়া যায় না। বাঁদাম তেল বা তিলের তেল ৪ টাকা দরে পাইলে সুলভ বলিয়া আমরা মনে করি। উন্নতিরকারীরা অবস্থাও ঐকশ। ১৩৭০ সালে পশ্চিম বাংলার আলুর চাষ ভাল হয় নাই—১৩৭১ সালে প্রায় ১ টাকা কিলো দরে সারা বৎসর আলু কিনিতে হইয়াছে—তনা বাইতেছে ১৩৭১ সালেও আলু ভাল হইবে না—কাজেই আলুর দাম ক্রমশঃ বাড়িবে, তাহা কবিবার

কোন সম্ভাবনা নাই। আলুর দামের অল্পগায়ে বাজারে অত্যন্ত তরী ভরকারীর দাম স্থির হয়—কাজেই আলুর দাম বেশী হওয়ার বেতন, বরখাটি, সির, কুলকপি প্রভৃতিও ১ টাকা হিসেবে হয়ে বিক্রীত হইতেছে। লাল কুমড়া এক সময়ে লোকে খাইত না—তাহাও ১ টাকা কিলো হইয়াছে। কেন এমন হইল? লোকসংখ্যা বাড়িয়াছে সত্য—পূর্ব পাকিস্তান হইতে ১ কোটিরও অধিক লোক পশ্চিমবঙ্গে আগিয়াছে; উড়িষ্যা, বিহার ও উত্তর প্রদেশ হইতে পশ্চিমবঙ্গে শ্রমিক আগমন বন্ধ হয় নাই। কিন্তু তাহাদের অল্প নিত্য ব্যবহার্য খাদ্য উৎপাদনে কি আমরা আদৌ সচেষ্ট হই নাই। দাম বাড়া আভাবিক—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন বৃদ্ধি হয় নাই কেন? সে বিষয়ে সরকারী কর্তৃপক্ষের প্রয়াস করিয়া কোন উত্তর পাওয়া যায় না। তাহার পর ডিম, মাংস ও মাছের কথা। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় বাঙ্গালীকে ছাগল, হাঁস, মুরগী প্রভৃতি পালন করিতে বার বার উপদেশ দিভেন—আমরা সে কথায় কর্ণপাত করি নাই—কাজেই এক-ছোড়া ডিম ৫০ পরসী ও মাংসের কিলো ৫ টাকা কিনিতে হয়। পূর্ব পাকিস্তান হইতে মাছ আসা বন্ধ—পশ্চিমবঙ্গে যে মাছ উৎপন্ন হয়, আমাদের চাহিদার তুলনার তাহা অতি কম—কাজেই বাজারে মাছ পাওয়া যায় না—ভাল মাছ ৬ টাকা কিলোর কম দর নাই—সাধারণ মিল্লবিস্তের তাহা নাগালের বাইরে। পশ্চিমবঙ্গের মৎস্যমন্ত্রী মধ্যে মধ্যে আশ্বাস দেন উত্তর প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থান হইতে তিনি মাছ আমদানী করিবেন—কিন্তু কার্যতঃ তাহার কিছুই দেখা যায় না। চিংড়ীমাছ আমরা বাল্যকালে এক পরসী সের দরে কিনিয়াছি—এখন তাহাই ২ টাকা কিলো দরে বিক্রীত হইতেছে। তাহাও রোজ বাজারে পাওয়া যায় না। কত ঘটনা করিয়া সমুদ্রের মাছ ধরার ব্যবস্থা করা হইল—কিন্তু সাগরও বোধ হয় আমাদের ভাগ্যক্রমে শুধাইয়া গেল—সাগরের মাছ পাওয়া গেল না। কলিকাতার কাছে গঙ্গায় এক সময় প্রচুর ইলিস মাছ ধরা হইত—ইলিস মাছও আর পাওয়া যায় না—গঙ্গার অত্যন্ত যে সব মাছ পাওয়া যাইত তাহাও আর পাওয়া যায় না। জেলেরা মাছের পরিমাণ কম বলিয়া মাছ ধরা ছাড়িয়া দিয়াছে! আমরা ৩৫ বৎসর পূর্বে কয়েকদিন স্কন্দরবন অকলে নদীর উপর বাস করিয়াছিলাম, সে সময়ে সেখানে

প্রচুর মাছ ধরা হইত দেখিতাম—এখন সেখানেও মাছ আর মাছ পাওয়া যায় না। ৪০ বৎসর পূর্বে বসিরাহাট অকলে ইচ্ছামতীর উপর দিয়া নৌকার বাতায়াকালে কত মাছ দেখিতাম—সে মাছ কোথায় গেল? এখন আর তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। বাঙ্গালী শিক্ষিত যুবকরা কি এই সকল খাদ্যসম্ভার কথা চিন্তা করিবেন না? মহাত্মা গান্ধী নির্দেশ দিয়াছিলেন—যে, যে কোন কাজই করুক না কেন, প্রত্যেক মানুষকে সারা দিনের মধ্যে এক ঘণ্টা সময় করিয়া লইয়া খাদ্য উৎপাদনে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। এ কথা কি আজ নূতন করিয়া শুনাইবার প্রয়োজন নাই? দেশে দুধ শুধু দুগ্ধাপ্য নহে, জম্বু। পূজার সময় এক কিলো দুধের দাম কয়দিন ২ টাকা হইয়াছিল। দুধ উৎপাদনে আমরা কেহ আগ্রহশীল নহি। বাজার হইতে বেবী ফুড কি নিয়া আনি, শিশুদ্বিগকে খাইতে দিয়া থাকি। জুনিতিগরায়ণ ব্যবসায়ীদের কুপায় সে বেবীফুডও বাজার হইতে অদৃশ্য হইয়াছে। বেবী ফুডের মূল্য কখনোনাও হইতেছে না—কারণ দুধ পাওয়া যায় না। আমরা বহুবার দেশের শিক্ষিত ও ধনী যুবকগণকে খাদ্য উৎপাদনে ব্রতী হইতে আহ্বান জানাইয়াছি—কিন্তু সবই অরণ্যে যোজন, কেহ সে কথায় কর্ণপাত করে না। আমরা বেচ্ছার নিজেদের সংশ্লেষ ধ্বংস করিব—কে আমাদের সে পথ হইতে উদ্ধার করিবে?

অসমঙ্গ মুখোপাধ্যায়—

প্রবীণ সাহিত্যিক অসমঙ্গ মুখোপাধ্যায় গত ১লা ডিসেম্বর মঙ্গলবার রাত্রিতে ৮৩ বৎসর বয়সে তাঁহার কলিকাতা নিউ আলিপুর, ৫২, কৈলাশ পণ্ডিত লেনের বাড়ীতে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি ডেপু জুরে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার আদিনিবাস ২৪ পরগণা জেলার জয়নগর-রজিলপুরে—তিনি কালীঘাটে অন্নগ্রহণ করিয়াছিলেন ও কয়েক বৎসর হৃদযন্ত্রের ব্যর্থতা করিয়াছিলেন। তাঁহার বিধবা পত্নী ইন্দুবালা দেবী, ৭ পুত্র ও ৩ কন্যা বর্তমান। তিনি সারাজীবনে প্রায় ৫০ খানি গল্পের বই ও উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া তিনি গান, কবিতা, প্রহসন, নাটক, প্রবন্ধ, স্কল পাঠ্য বই প্রভৃতি বহু লিখিয়াছিলেন। এ বৎসর বঙ্গসাহিত্যসম্মিলন তাঁহাকে বিশিষ্ট সম্মতি করিয়া সম্মানিত করিয়াছিল। তিনি বহুকাল ধরিয়া

‘ভারতবর্ষের’ লেখক ছিলেন—আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করি।

নেতাজী স্মৃতিচিহ্ন—

রবিবাসর নামক সাহিত্যিক সমিতির দীর্ঘকালের সম্পাদক ও কিছুকালের সর্বাধ্যক্ষ নরেন্দ্রনাথ বসু গত ১৫ই নভেম্বর রবিবার বেলা ২টার সময় কলিকাতা ৪৫ আনহাট স্ট্রীট বাড়ীতে ৭৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি এক সময়ে বাঁশরী নামক সাহিত্যিক সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক ছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন ‘ভারতবর্ষের’ লেখক ছিলেন ও নানাবিধ গ্রন্থের লেখক ছিলেন। তাঁহার ৪টি বিবাহিতা কন্যা বর্তমান। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করি।

শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত—

প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরুর মৃত্যুতে লোকসভায় যে আসন শূন্য হইয়াছিল সেই আসনে উক্ত প্রদেশের সুলপুর কেন্দ্রে হইতে জহরলালজীর ভগিনী শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত গত ২৩শে নভেম্বর লোকসভায় সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন। তিনি তাঁহার বিরোধী অপেক্ষা ৫৮ হাজার ভোট বেশী পাইয়াছেন। শ্রীমতী পণ্ডিত রাজনীতিক্ষেত্রে সুপরিচিত—তিনি বহু বৎসর ইংলণ্ড, আমেরিকা, রাশিয়া প্রভৃতি দেশে ভারতের রাষ্ট্রদূতের কাজ সুখ্যাতির সহিত সম্পাদন করিয়াছেন। তিনি এখন ভারতে থাকিয়া দেশ সেবা করিবেন।

রাঁচীতে কংগ্রেসনেতা সম্মেলন—

গত ২১শে ও ২২শে নভেম্বর দুই দিন ধরিয়া রাঁচীতে আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ, মণিপুর ও নেপাল কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দ এক সম্মেলনে সমবেত হইয়া ভারতের পূর্বাঞ্চলের সকল সমস্যার কথা আলোচনা করিয়াছেন। কংগ্রেস নেতা শ্রীমতীল্য ঘোষ ২ দিনই সভার সভাপতিত্ব করেন এবং কংগ্রেস-সভাপতি শ্রীকারমাজ সন্মেলনের উদ্বোধন করিয়া বলেন—নেতাদের বৎসরে অন্ততঃ পক্ষে একবার করিয়া গ্রামে গিয়া বাস করা উচিত। সম্মেলনে নিম্নলিখিত বিষয়ে ৪টি প্রস্তাব গৃহীত হয় (১) উড়িষ্যা সমস্যা (২) ছাত্র উচ্চশিক্ষা (৩) বিভিন্ন রাজ্যের ভাষা শিখিয়া সাংস্কৃতিক ঐক্যের শক্তি বৃদ্ধি ও (৪) মণিপুর,

নেপাল ও নাগাল্যান্ডে কংগ্রেস সংগঠনের শক্তি বৃদ্ধি। শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের প্রভাবে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বিভিন্ন রাজ্যের মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ সংঘে ভয়ঙ্কর ব্যবহার কথা আলোচিত ও নীতি পরিবর্তনের দাবী করা হইয়াছিল।

নেতাজী স্মৃতিচিহ্ন—

গত ৩০শে নভেম্বর দিল্লীতে নেতাজী স্মৃতিচিহ্ন বহু জীবন সম্বন্ধে একটি আলোক-চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন হইয়াছে। দিল্লীর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য শ্রীচিহ্নাশ্বিনী দেশমুখ অহুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ও লোকসভার অধ্যক্ষ সর্দার হরমুখ সিং এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। শ্রীদেশমুখ নেতাজীকে বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপ্রধান বলিয়া উল্লেখ করেন। সভার নেতাজীর জীবনকথা বিশেষ ভাবে আলোচিত হয়। বর্তমান সময়ে নেতাজীর সাহস, বীরত্ব, কর্মশক্তি ও সর্বোপরি দেশাত্মবোধের কথা সর্বত্র আলোচিত হইলে দেশ উপকৃত হইবে। দিল্লীতে বাঁহারা তাঁহার জীবন কথা ছবিতে দেখাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, আমরা তাঁহারে অতিনন্দন জানাই।

চার্চিলের জন্মদিন—

ইংলণ্ডের গত মহাবুদ্ধকালের প্রধানমন্ত্রী ও বহু রাজনীতিবিদ স্যার উইনষ্টন চার্চিল গত ৩০শে নভেম্বর ৯৫ বৎসর বয়সে পরিত্যক্ত করিয়াছেন। তিনি এই বয়সেও বেশ শক্ত আছেন। এই দিন তাঁহার গৃহে জন্মোৎসবে ৬০ হাজার পর ও টেলিগ্রাম প্রেরিত হইয়াছে। আমরাও যি: চার্চিলকে তাঁহার ৯৫তম জন্মদিনে অতিনন্দিত করি।

আনন্দবাজার পত্রিকার রাঁচি

কার্য্যালয়—

গত ২১শে নভেম্বর সভার রাঁচিতে আনন্দবাজার-পত্রিকা, হিন্দুস্থান-ট্যাগার্ড ও বেশ পত্রিকার নূতন কার্যালয়ের উদ্বোধন উৎসব হইয়া গিয়াছে। কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকারমাজ নূতন গৃহের উদ্বোধন করেন ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীমহম্মদ সিং একটি আলো আপনাইয়া দেন। উৎসবে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী কে. বি. লহার সভাপতিত্ব করেন। বিহারের রাজ্যপাল শ্রীমহম্মদনয় আলোকার, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, কংগ্রেস নেতা শ্রীমতীল্য ঘোষ প্রভৃতি বহু নেতা উৎসবে বক্তৃতা

করেন ও আনন্দবাজারজিকা প্রভৃতি সংবাদপত্রগুলি দেশকে তাঁহার সংগঠন কার্যে যে ভাবধারা দান করিয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। শ্রীমশোক কুমার সরকার মহাশয়ের কৃতিত্বে আনন্দবাজার পত্রিকার পত্রগুলি আজ উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়ার সকলে তাঁহার কার্যের প্রশংসা করিয়াছেন।

ভীষ্মক আক্রমণে আশংকা—

গত ৩০শে নভেম্বর দিল্লীতে সৈন্তবিভাগের প্রধান-দিগের এক সভায় ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীচাবন জানাইয়াছেন—চীন বর্ত্তক ভারত আক্রমণের আশঙ্কা

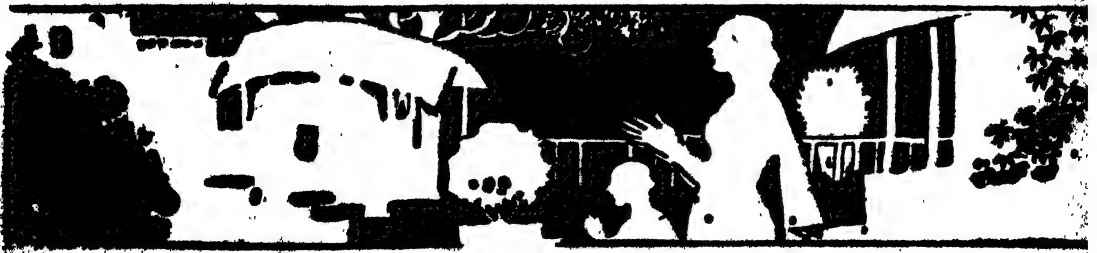
১৯৬২ সালে যে অবস্থায় ছিল, এখনও সেই অবস্থায় আছে। চীন ভারতের সমগ্র উত্তর সীমান্তে প্রচুর সৈন্তসংগ্রহ করিয়াছে ও অস্ত্রশস্ত্র আনিয়া জমা করিয়াছে। চীন ভারতের সহিত কোন আপোষবহীনাংশে করিতে চাহে না—বরং পাকিস্তান বাধাতে ভারত আক্রমণ করে, সে ক্ষণে চীন সর্বদা পাকিস্তানকে উৎসাহিত করিয়া থাকে। তবে ভরসার কথা ভারত সরকার চীন আক্রমণের প্রতিরোধ ব্যবস্থার ক্ষেত্র রাখে নাই। ভারত আক্রান্ত হইলে বহু লোক মারা যাইবে বাটে, কিন্তু ভারতীয় সৈন্তরা চীনকে তাড়িয়া দিতে সমর্থ হইবে।

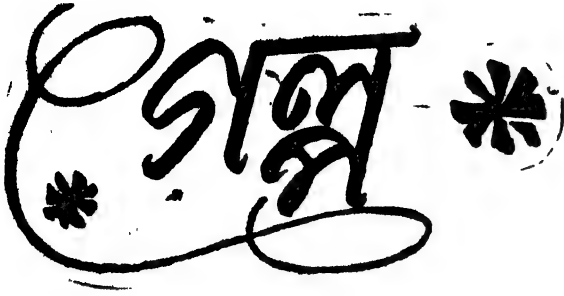
দেস্‌দিমোনা

শ্রীসুধীর গুপ্ত

উদ্ভাস্ত ভারণ্য-ভীম যোমাঞ্চনামর
সে হৃদয় দিনগুলি আশ্রয় মনে পড়ে ;
সাহিত্য-কাননে—কৃষ্ণে হৃদয় নেশা-ভরে
মকরন্দ-লুক্ক মস্ত ভ্রমর-হৃদয়
করিয়াছে আনাগোনা। অহো কী বিশ্বর,
উত্তাল 'ওথেলো'-মহাকাব্য-মর্ম্মরে
বেধিন আনিল আতি এ ভুল-অস্তরে !

সে স্নেহ-রোমাঞ্চ—মূর্ছার বিশ্বস্তিরণ নয়।
'ওথেলো'-কাতার-কান্তি অমৃত-মন্দির
দেস্‌দিমোনার মূর্তি, দাম্পত্য-প্রেমের
ক্লেশ-বিহীন-শ্রীষ্ট-সত্তা। সাহিত্য-সংসার
স্বর্গের সমৃদ্ধি পেলো হেন স্বপ্নের
অচিন্ত্য দীর্ঘাতি লাভে। সে কি তুলিবার !
দেস্‌দিমোনা যে পুষ্প অনিন্দ্য স্বর্গের।





নেশা

মধুকর

শান্তমণ্ড তার মাথা নিয়ে ঘুম ভাঙলো গুরুপদর। কাল রাতের উজ্জ্বল নেশার থিরোয়ি ভাঙতে সকালের অনেকটা সময় খরচ হল—এই ভেবে ভীষণ বিরক্ত হল। জানালায় ভাঙা কপাটের ফাঁক হালকা রোদ ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে। এক সার পিঁপড়ে হলুদ রঙের রেখাটা পার হয়ে বাজে। পিঁপড়ের লাইনটাকে অনেকক্ষণ ধরে দেখলো গুরুপদ, ঘোরের মধ্যে। চোখ দুটো তারতার, কোণার পাকা-করমচার লাল রস মাখানো যেন। সমস্ত মুখটা বিস্ময় ভেতোতেতো, পচা দুর্গন্ধ লালা জমা। 'এতো খারাপ লাগছিল, মুখ নাড়ার ভরে লক্ষ্মীকে ডাকলোনা।' নিজেই বিছানা থেকে ওঠে গাড়ু গামছা নিয়ে নর্দমার ধারে গেল।

সারা বিছানার রাতের উজ্জ্বলতার পরিষ্কার চিহ্ন—জুয়ড়ীর নেশার পরীক্ষা হয়ে গেছে বিছানাটার উপর দিয়ে।

কাল জিতেছে গুরুপদ, বেশ কিছু টাকা। দিন সাতেক অন্ততঃ লক্ষ্মীকে আর কাঁচা করলার উত্তন ধরাতে হবেনা। বোড়ের মাথার পাঞ্জাবী হোটেলের কবা মাংস আর হাতে-গড়া নরম গরম কুটিতে ভোফা পেট ভরাতে পারবে জু'জন। কটা দিন বেশ দিল্লাসা করেই কাটিয়ে দেবে।

বেশ শব্দ করে কুলকুচো করে গুরুপদ, চোখে মুখে জল ছিটোয় বারবার। খোয়াড়ি ভাঙছে তার আঙুলে অস্থির। বোট জোড়া আপনা থেকে কখন ছুঁচলো, হয়ে গেছে, টের পায়না গুরুপদ। হাওয়ার ধাক্কা সেরে বোটের ক্ষয়বৃদ্ধ

থেকে ভীষণ শিলের মতো শব্দ ওঠে—চমকে ওঠে মনের আনন্দে নিঃশব্দে ধমকে ওঠে—'আ-রে শালা!'

এ গলির দিন আর রাত প্রকৃতির নিয়মে চলেনা। নিজেদের কজিরোজগারের ধান্দা কিকির অলুয়ারী চলে, মানে চালিয়ে নিতে হয়। কাজের জোয়ালে যে যেভাবে বাঁধা পড়েছে, বিজ্ঞান আর কাজের সময়টাকে তাকে তেমন করেই ভাগ করে নিতে হয়, দিনের বেলাই ঘরের কাঁপ জানালা বন্ধ করে রাতের ঘুম ঘুমিয়ে নেয়—বাহের কাজ কারবার রাত বিরেতে। সে হরেক, কোনটা বৈধ কোনটা বা আইনের রাস্তা চোখকে ফাঁকা দিয়ে চুপিসারে। সে কাজ যেমনি বিপজ্জনক তেমনি অনিশ্চিত। জীবন নিয়ে জুয়াখেলা চালিয়ে যার মাহুব নামধারী প্রাণীগুলো, নিশাচর জীবের মত অন্ধকারে এদের চোখও জলে ধুক ধুক করে।

এ গলির বাসিন্দা গুরুপদ—উভচর। দিনে রাতে কখন ঘুমোয় কখন জেগে থাকে কেও বলতে পারেনা। দিনের কাজটা তার তত্ত্ব—অন্ততঃ আইনের চোখে। কিন্তু রাতের কাজটা কি আইনের লোকেরা, কি সাধারণ গৃহস্থ—কেও ভালো চোখে দেখেনা। ময়লা চিটচিটে এক জোড়া তাস আর সমশ্রেণীর কতগুলো মাহুব নিয়ে রাতের কারবার বস্তীর কানাগলির গোলক বাঁধা পেরিয়ে ওরা এসে হাজির হয় আড্ডায়। বাইরের কোন লোকের পক্ষে এর লোলুপ সন্ধান সহজসাধ্য নয়, হোকনা সে মত বাবা টিকটিকি।

কোন কোনদিন আড্ডা ভাগার পর খুসীমনে বাড়ী কেঁরে গুরুপদ, মুখে চলতি হিন্দীসিনেমার গানের ছ' একটা কলি। পকেটে একমুঠো অগোছালো টাকা, মগজ অনেক শিথিল তরল পানীরেই প্রভাবে। হঠাৎ অকারণে 'হেসে ওঠে হাছা করে।

আর সেদিন হেসে গিয়ে শূন্য পকেটে বাড়ী কেঁরে, সেদিন গুরুপদের চেহারা অন্তরকর। মুখে সেদিন গান নেই, আকর্ষক মহগিলে চলাভেঙে কেমন বেগমাল ভাব। গানের বহলে মুখথেকে জুয়ড়ীর মতো ছুটতে থাকে অজস্র আর অপ্রাণ্য গালি গালাজ।

সেদিন লক্ষ্মীর ভীষণ কষ্ট। বেসামাল মাহুবটার হাজির

কিন্তু চক্ৰ আর লাগি খেঁদে ঘেরেতে ছিটকে পড়ে। বল
পাকিয়ে বাঁওয়া শরীরটা বার বার তুলে তুলে ওঠে। কিন্তু
কীদে না লক্ষ্যী। কেঁটে কানড়ে মুখ বুজে পড়ে থাকে,
নোনাবল্লভ হাড়িরে পড়ে কাটা বোটার কাক দিয়ে, কিন্তু
নোনাবল্লভের হাথ লক্ষীর কাছে এর চেয়ে অনেক বেশী।

একটু পরেই মাটি থেকে শরীরটাকে তুলে গুরুপদর বসি
পরিষ্কার করে গাত দিয়ে, টেনে হিঁচড়ে অট্টভঙ্গ দেহটাকে
বিছানার নিরে তুলে, ঠাণ্ডা জলে গামছা ভিজিয়ে বার বার
করে গা মুছিয়ে দেয়, হাতপাখা দিয়ে বাতাস করে।
অন্তেষ্ট হয়ে গেছে—এই মারের পর এমন সেবা করা।

টাকা নিয়ে ঘরে যেদিন কেয়ে সেদিনটা আবার অস্ত্র-
রকম। আদরে আদরে বিশেষাঙ্গ হয়ে বার লক্ষী। বৌকে
আছা করে বলে চটকে পিষে একেবারে হাঁপ তুলিয়ে ছেড়ে
দেয় গুরুপদ। যেমে নেয়ে একসা হয়ে বার লক্ষী। আর
খাওয়া—না এই আদর, কোনটাতে বেশী বসণা বুকে
ওঠতে পারে না। কিন্তু বুকেও চার না বেন। এই
বিষঘুটে বিকৃত আদর খাওয়াও অভ্যাগ হয়ে গেছে তার।
বরক খুসীই হয় সে। গুরুপদর অভ্যাগার আর আদর
ছুটোতেই পরম রমণীয় কি একটা খুঁজে পায় লক্ষী, আর
সে পাওয়ার আনন্দের চোখ দুটে। বার বার ক্লিক
যেয়ে ওঠে।

নেশা করলেও যেয়ে মাহুঘের নেশা নেই গুরুপদ—
লক্ষীই তার সব, তার জীবনে একমাত্র নারী। আর সেই
আরম্ভেই অত অভ্যাগারের পরও হাসি মুখে পরদিন ভোর
হতে না হতেই কাঁখে কলসি নিয়ে জল আনতে ছুটে,
হাত বুঝিয়ে গল্প করে গুরুপদর, জল আনতে বাওয়া
ঝেরেঘের সংগে। আক্লাবে তুলতে তুলতে বাড়ী আসে
ওঘের ঈর্ষাকাতর মুখের ছবি সারা মনে ভরে নিয়ে।
গুরুপদর জ্বরার নেশার মতো এও একটা নেশা হয়ে
দাঁড়িয়েছে লক্ষীর। সারা বস্তীর ঘেরেঘের কেউ বুকে হাত
দিয়ে বলুক দেখি লক্ষীর মতো একগুঁড়ু নিয়ে ওরা ঘর
করে।

সেদিন বিকেলেই খবরটা জনতে পেল গুরুপদ। জ্বর
খেলায় লক্ষী বিকৃতিই শোনাল। বিড়ীর পাকানো ধোঁয়া
হাওয়াতে হাওয়াতে বয়ে—এবার লাও সর্দার, (গুরুপদকে
সর্দার বর্কির বলেই ধরে) এদের মধ্যে কেতার জগত।

ওরই বেশী। তাইতো ওর শরীর প্রকৃতি আর বিশেষ
তর কানের অন্তও তাকে ওরা শরীর করে। তোমার
জারিজুরি সব ভেঙে গেল।

ভেতরে ভেতরে কৌতুহল মেলে ওঠলেও নির্দিষ্ট মুখে
গলগল করে ধোঁরা ছাড়ো গুরুপদ। হাঁড়ের কীকে
বিড়ীটাকে আটকে রেখে ভাজিনা করে বলে—কি ভেঙে
গেল বরি ?

—তোমার সর্দারি গো সর্দারি, মুক্তি হাসে বিকৃতি,
সর্দারেরও সর্দার আছে জানোত ? রাজার যেমন রাজা ?
য়েগে ওঠে গুরুপদ—শালা, তাপতা না করে কি বলতে
চাস সোণা বলে কেল, নইলে....

নইলে কি হবে বুকেতে পেয়ে চুপা পিছিয়ে বলে বিকৃতি,
তারপর ওখান থেকেই বলে—আমাদের রামাইকে
চেনোত ? ঐ যে গো চটকলে কাজ করে ? তার এক
তাইপো এসেছে নাকি। কি বেন শালা নার তার, ও সব
তন্দরলোকেঘের মত নার মনেও থাকে না। হ্যাঁ হ্যাঁ
সুন্দরন্দর না কি বেন। তারি হাঁসিয়ার মালুম হল। বড়ো
বড়ো সব লাইট কেলাবে নাকি ও সব খেলে। রামাই তো
বগল বাজিয়ে লাফাচে দেখে এলু : রোজ বাজি যেতা
তোমার নাকি আর চলবে না, ওম হয়ে বসে থাকে গুরুপদ।
কোন কথা বলে না। বিড়ীটা কখন নিতে গেছে। বাওয়া
বলে হিজিবিজি অট্টভ কটে গুঁ।

বিকৃতি ব্যঙ্গ করে—কি ওস্তাদ, এক সুরেন্দর তোমার
মুখে কুসুপ এঁটে ছিল। হায় হায় এই.....

কথা শেষ হলনা বাজখাই ধমকে আতকে ওঠে
বিকৃতি। বাওয়া থেকে এক লাফে ঘরে ঢুকে গুরুপদ,
বেতে বেতে বলে—গুরুপদ সাঁপুই কোন শালাকে ভদ্র
করেনা, সে বলে দিস তোদের রামকানাইকে। আর
এও বলবি আজ সন্ধ্যাতেই পরীক্ষা হবে। খুসীমনে শিক
হিতে হিতে খবর হিতে হবে বিকৃতি। ওস্তাদের চুপ সেয়ে
ধাকাতো সে সত্যি বাবড়ে গিয়েছিল। গুরুপদকে নাকি
তালবাসে বিকৃতি।

সেই পরীক্ষাই আরম্ভ হল, তবে আর সব পরীক্ষাতেই
ফেল হবে এই তাগা নিয়েই গুরুপদ খেলায় বসেছে মনে
হয়। ওর বার বার কোলা মুখটার দিকে তাকাতো
পারেনা বিকৃতি। মনের পাশঘরে একজোড়া পিরা কি

অসম্ভব মোটা হয়ে ওঠেছে, এক সময় ওটা কেটে পড়বে মোটা হয়ে হতে, এই ভাবে বিতৃষ্ণিত ভয়ে হাতে ধরা বিড়ীটাতেও টান দিতে তুলে গেছে। কখন ওটা নিজে মেছে! জ্বলেছে গুরুপদর চোখ। বত হারছে রেখা চোখে বাজে শুভ। কালকের জেতা বাজির টাকাটা কখন রাশাই দিয়ে নিয়েছে। বিতৃষ্ণিতকে বাড়ী পাঠিয়ে শেষ সবল তেরোটি টাকাও আনাতে হয়েছে। তারও মোটা পাঁচেক মাত্র হাতে।

সমস্ত বরটা ধরবার করছে কিসের এক চাপা আতঙ্ক, কালিগড়া লঠনটা ভাঙ্গা চিমনির পাল দিয়ে গলগল করে কালো ধোয়া ছড়াচ্ছে ঘরে। বাইরে থেকে একটা পোক এসে বার বার ঝাঁপিয়ে পড়ছে চিমনিটার উপর। ওটার পাখা ঝলসে বাজে, তবু আবার ফিরে আসছে। আবার আবার। এ কোন সর্বনেশে নেশা!

ছবার বিতৃষ্ণিত হাতধরে টেনেছে গুরুপদর—আর না সন্ধার, বলতে চায়; রাত অনেক হয়েছে।

ছবারই যেসে ওঠেছে সুরেন্দ্র, আর ছবারই টেনে নিয়েছে গুরুপদ।

বাইরে অন্ধকার রিরি করছে। ভেতরে অস্পষ্ট আলোর ওনের তুতুড়ে ছায়া পড়েছে দেয়ালে। তুত চোপেছে গুরুপদর ঘাড়। সুরেন্দ্রর ঠোঁটের একচিলতে হাসিটা কালিগড়া চিমনিটার চাইতেও ধরন। খুনে আঙন হয়ে গেল, যখন শেষ সবল ছুঁচকার নোটটাও রাশাই সুরেন্দ্রর লোক হিসেবে নিজের পকেটে তুলে রাখলো।

বুক পকেটটা ফুলে ওঠেছে। খুব বেশী টাকা নয়, অবশ্য ভাঁজ করে রাখলে এর পাঁচ দশ গুণও রাখা যায়।

বিতৃষ্ণিত আশা করেছিল এবার ঐ সর্বনেশে খেলাটা বন্ধ হবে। সব খুঁইয়ে, উঠি উঠি ভাব করে পাটা তক্ত-পোষ থেকে তুলেও ছিল, কিন্তু সুরেন্দ্রর একটা কথা বেন বড় ধরিয়ে আবার বসিয়ে দিল। বিতৃষ্ণিতর পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঠাণ্ডা একটা 'স্রোত' বয়ে যায়। আর কি লুহ করতে পারবে ওস্তাদ? ওর সবল হাতে দু'টি টিপে ধরবে শরতানটার। একটা মাঝামাঝির আশঙ্কির হিম হয়ে বলে থাকে। কিন্তু আজ একি হল সন্দাঁকের। অত বড় কথাটা শুনেও ও চুপ হয়ে রইল।

তাসজোড়াটা গোছাতে গোছাতে সুরেন্দ্র বলেছিল—নাও এবার হলত সন্দাঁক-র। বাও বাঁকী দিয়ে বোঁএর আঁচল ধরে যুঝাওগে। তুনেহি খাপসুরং বোঁ নাকি তোমার—আর খুব পেয়ারও করে...হাঃ হাঃ হাঃ—প্রাণখোলা অটহাসিতে কেটে পড়ে সুরেন্দ্র। তাইপোর কুৎসিত রসিকতার খিক খিক করে হাসে রাশাইও। কোথায় একটা ঘুমাণা ছেলে ককিয়ে ওঠলো।

কিছুক্ষণের অন্তর বরটা বেন বাজপড়ার মতন শুক হয়ে রইল। নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারেনা বিতৃষ্ণিত—গুরুপদর কথাগুলো সে ঠিক শুনেছে কিনা। ওস্তাদ বলেছে তো ঠিক—না খেলা শেষ হয়নি। শেষ সবল আছে একটা, ই্যা আমার বউটা, ওকেই বাজি রাখলাম। জিতলে এক বাজির জন্তে তোমার, হেরে গেলে আমার সব টাকা আমাকে ফিরিয়ে দেবে, বল বাজি?

অত বে পাকা খেলোয়ার্ড সুরেন্দ্র, সেও বাবড়ে গেল। কিন্তু অল্প একটু পরেই আবার কাকা ভাইপোতে চোখা-চোখি হল। মুখে একটা কুৎসিত হাসি ঝুলিয়ে রেখে সুরেন্দ্র বলে—সমাদার সব বাজিতেই বাজি। কিন্তু তুমি?...তোমার কথা শেষ পর্যন্ত ঠিক থাকবেতো, না...

সুরেন্দ্রর গলাকে বেন খাবা মেরে নীচে নামিয়ে দিল—‘গুরুপদ সাঁপুই কথার খেলাপ করেনি কোনদিন’।

তারপর বতকণ পর্যন্ত তাস বাটাবাটি চালাচালি হল, অলাড় হয়ে বলে রইল বিতৃষ্ণিত। সমস্ত ব্যাপারটাই একটা হুঃখণের মতো মনে হচ্ছে তার কাছে।

আজ নেশা করেনি গুরুপদ, তবু চিরদিনের সেই চেনা পঞ্চটা দিয়ে আসতে বার বার হুমড়ি খেয়ে পড়ছিল। বড়ী বাড়ীর সন্দাঁক গলি, প্রায়ই ধাক্কা লাগছিল এপাশে ওপাশে দর্বার বেড়ার। পাশাপাশি ছজন আসা বারনা, নয়তো ডাকে করে ধরেই ঘরে নিয়ে তুলতো বিতৃষ্ণিত। অবশ্য সন্দাঁক বাজি হত কিনা কে জানে। তবু সাবধানে অন্ধকারে চোখের দৃষ্টি দুটোকে অস্বাভাবিক ভীত করে সন্দাঁকের পেছনে আসছে সে, বদি ঠাণ্ডা পড়ে যায়—পেছন থেকে ধরে কেলেবে এই আশার।

আজিয়ার থেকে এখন পর্যন্ত একটাও কথা বলেছি গুরুপদ। অববরত একটা চিত্তাই তার মনটাকে ধর

বার হুয়ে হুয়ে থাকিল—লক্ষীকে কেমন করে বলবে কথাটা। এ সর্ব্বশেষে কথাটা কি করে উচ্চারণ করবে। চোখে গেল আসে স্বরেন্দ্রর লোকী হুহুয়ের মতো মুখখানা।

শরতান ভর করেছিল তার মাথার—নইলে এ কাদে সে পা দিল কি করে, সাধারণ হুহু মাথার কেউ এমন একটা বাজি ধরতে পারে? মনে মনে একটা অস্বাভাবিক গালি দেয়—কিন্তু আগা যেটেনা এতে। লক্ষীকে ঐ মাংসখেকো জানোয়ারটার হাতে ভুলে দিতে হবে—কথা দিয়েছে গুরুপদ। সে যদি পুলিশে খবর দেয়? নিজের বোকে পরের হাতে ভুলে দেবার অধিকার কি তার আছে! কিন্তু সে নিজে? পুলিশ সমস্ত ব্যাপারটা জানতে পারলে সে নিজেও তো রেহাই পাবেনা, স্বরেন্দ্রর সঙ্গে জেলের দরজা তার জন্তও খোলা থাকবে। তা ছাড়া স্বরেন্দ্র বে-পাড়ার হলেও মস্তো দল আছে তার। লক্ষীকে সহজে না দিলে জোর করে ছিনিয়ে নেবে। কোলকাতার রাজ্য হরতো একদিন লোকে একটা লাশ পড়ে থাকতে দেখবে—সে লাশ গুরুপদ। শিটবে ওঠে গুরুপদ। না-না ছাগলের মতো রাতার মরে পড়ে থাকতে পারবেনা। যে ভাবেই হোক লক্ষীকে বাজি করাতেই হবে। দরকার হলে মুখ হাত-পা বেঁধে পৌঁছে দিয়ে আসবে স্বরেন্দ্রর দরজার। হু হু করে পা চালায় গুরুপদ। অবাক হয়ে তাকে অহুসরণ করে বিকৃতি।

সারা রাতা পা চালিয়ে হেঁটে বাড়ীর কোণার এসে আবার থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। কোথা থেকে যে কি একটা বাধা দিচ্ছে। মনের সাহস লোপ পেয়ে যাচ্ছে। বিকৃতি আন্তে আন্তে ওজাদের পিঠে হাত দিয়ে, কি করবে কিছু না বুকেই হঠাৎ গলা খাঁকারি দেয় একটা। আর সে সঙ্গেই জেগে থাকা লক্ষী টেরি হাতে দরজা খুলে বাইরে আসে। অন্ধকারে ভুতের মতো দাঁড়িয়ে থাকা মূর্তি ছুটোর দিকে অনেক বিশ্বাস নিয়ে ডাকিয়ে থাকে। এমন ঠাণ্ডা হবে গুরুপদ কোনদিন বাড়ী আসেনা, এমন চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকেনা।

—কি হয়েছে তোরাবের, ঘরে আসছোনা কেন?—লক্ষীর কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই বোঝানো ঠেকছে। হুতিয়ার দুখ কালো হয়ে বার। বিকৃতিই আগে দাঁড়ায়

ওঠে বলে। প্রবীণটা এক কোণার বেধে দরজার হেঁকে দিয়ে দাঁড়ায় লক্ষী। নিঃস্বর বস্তীর মধ্যে ওর চুড়ির আওয়াজ শোনা যায়। কাণা গলার বিকৃতিক বলে—কি হয়েছে বলোত, তোমরা অত চুপ মেয়ে যাছো কেন?

—এ্যা—না মানে কিছু না, মানে...সব্বিস... বিকৃতি কিছু বলার সাহস পায়না বিকৃতি।

কিন্তু গুরুপদ আবার সাহস করে পেরেছে। অন্ধকারের ভেতর থেকে গমগম করে ওঠে ওর কণ্ঠস্বর—স্পষ্ট, কেটে কেটে বেরচ্ছে শব্দগুলো—তোকে যেতে হবে লক্ষী। বাজি ধরে খেলেছিলাম। ছেয়ে গেলে এক রাত্রি স্বরেন্দ্র। ঘরে থাকতে হবে।

একটা চাঁৎকার, নয় তো বুক ফাটা কারা—এরকম কিছু একটা শোনার জন্য প্রস্তুত হয়ে বসেছিল গুরুপদ। শিকারী বাঘের মতো ওংপেতে বসেছিল। শব্দ করার সঙ্গে সঙ্গেই টুটি টিপে ধরবে। কিন্তু—স্পষ্ট লক্ষ্য করলো একটু কালো হয়ে উঠেই সারা মুখ হাসিতে ছেয়ে গেল লক্ষীর। সতের সাত শিখিন হয়ে এল দুঃখেরই। প্রস্তাব করা হয়ে গেছে, হুতিয়ার বাঁকা বাড় থেকে নেরেহে—তাতেই বিকৃতি নিশ্চিত, আর গুরুপদ সাঁপুই তার পরাজয়ের মানি ভোলায় জন্ত প্রতিশোধ নিতে চাইছে লক্ষীর উপর দিয়ে। অহুশোচনা নেই তার মনে? এমন তো ছেয়ে গেলেই সে করে। গায়ের কাপড় খুলে অবন চিহ্ন হু-দশটা লক্ষী দেখাতে পারবে। গুরুপদ পরাজয় লক্ষীর শরীকে বাগ কেটে রাখে। কিন্তু লক্ষীও আত্ম প্রতিবাদ না করে শান্তিটা মাথা পেতে নিল? একবারও না করলে না!

সেদিন রাতে স্বরেন্দ্রর ঘরে যে কুৎসিত আর অস্বাভাবিক হাওয়া বয়েছিল তার সাক্ষী কেও নেই। অস্তিত্ব গুরুপদ বারনি দেখতে। একটা পাখরের মূর্তির মতো দাঁড়ায় বলে রইল সে। আর এই প্রথম উপলব্ধি করলো লক্ষীকে সে ভালোবাসে—তার শরীরের চেয়ে বড়ো আর একটা জিনিষের জন্য। তাকা চৌকাঠে মাথা ঠোকে নিফল আক্রোশে। ভাবে ছুটে গিয়ে লক্ষীকে ছিনিয়ে নিয়ে আসে—কিন্তু স্বরেন্দ্রর বিশাল মস্ত শরীরটা আবার তাকে জড় পাইয়ে দেয়। দরজা খোলা রেখে বস্তী থেকে বেরিয়ে পড়ে। এখানে বলে থাকতে পারছেন কিছতেই। নির্জন

সাঁজা দিয়ে পাগলের মতো হাটতে থাকে। দুই নগরটাকে
কর বড়ো নিষ্ঠুর, ক্ষেপাত মনে হয়। লাবি ঘেরে বদি
চূর্ণ করে দিতে পারতো সব নগরটাকে!

লম্বী করে আহুক। কাল সকালেই শহর ছেড়ে
চলে যাবে ওরা। দূরে বহু দূরে। বেখানে বতী নেই,
নেই সুরেন্দ্র রামাই এর দল—নেই কানাগলি আর
সাঁজালের চীৎকার। বেখানে আছে শুধু খোলা মাঠ
আর নদী—আর ধানক্ষেত। সেখানে বর বেঁধে থাকবে
ওরা দুজনে। খাবার অন্ন জোগাড় করবে মাথার ঘান
পায়ে কেলো সারাদিন সারারাত খেটে। কোন কু-চিন্তা
আর প্রলোভনকে মনে স্থান দেবে না। সারারাত রাত্তর
সাঁজার ঘুরে বেড়ায়—আর সান বাঁধানো রাত্তর উপর
খুঁখু ছিটোর গুরুপদ।

সকাল হল এক সময়। পাখী ডাকা ডাকা ঘোবের
সকাল নয়। খাটালের গরু-ঘোষ আর জেগবাঁটা
মুগলীর কর্কশ হরের সকাল। মরা আলো অতি সতর্কতার
একটু উকিছুঁকি দেয় বতীতে। বেন কার নিবেদ আছে
এখানে ঢুকতে। চোখে মুখে, সারা শরীরে আলো নিয়ে
বতীতে ঢুকে পড়ে গুরুপদ। অজুর্ন মণ্ডলের খাটালটা
পায় হয়ে আসতেই দেখলো বিভূতি গোড়ে আসছে।
উত্তেজনার তার চোখ মুখ লাল। দর নিয়ে বলে—ওতাহ,
সারারাত কোথায় ছিলে তুমি? এদিকে কি কাণ্ড হয়েছে
জানো। সুরেন্দ্র বলেছে তোমাকে পেলো আর রাখবে না।
মতো শিল্পির পাখো এখান থেকে পালিয়ে বাও তুমি।

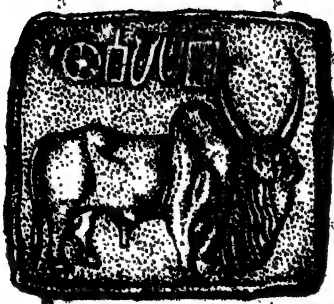
গুরুপদ অবাক হয়ে বলে—কেন কি হয়েছে, আদিতো
কথা য়েবেছি।

‘সে কথা তো তুমি বলছো, কিন্তু ওরা বিবেল করবে
কেন? লম্বী বৌদি তো কালরাত্তে সুরেন্দ্রর ঘরে
যারনি!

—যারনি? উত্তেজনার বিভূতির হাতটা চেপে ধরে
গুরুপদ। কি বলছিল তুমি?

—তবে আর বলছি কি ওতাহ! সেই রাগেই তো
কাল রাত্তে ওরা হামলা করেছে তোমার ঘরে। তোমাকে
না পেয়ে জিনিষ পত্র তেড়ে চুরে তচনচ্ করে দিয়ে
গেছে।’ তারপর ওতাহের হাতটা গভীর সারার অড়িয়ে
ধরে বলে—জাগিয়া তুমি ছিলে না ওতাহ, নইলে তোমাকে
খুন করে ফেলতো।

—খুন করে ফেলতো—পেলে তো শালারা—হাঃ হাঃ
করে হেসে ওঠে। তারপর হঠাৎ খেমে গিরে মুখটা
উজ্জল করে বলে—লম্বী যারনি নারে—হুতাচার ঘরে?
আমি জানতাম লম্বী ও কাজ করতে পারে না। ও অমন
ঘেরে নয়।’ চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে গুরুপদর—
ওকে আমি খুঁজে বার করবোই—হ্যাঁ বিভূতি ওকে খুঁজে
বের করতেই হবে। ওকে আমার দরকার রে। বলে
আর দাঁড়ায় না গুরুপদ। কানাগলি পেরিয়ে বড় রাত্তর
দিকে হাটতে থাকে সে। বিভূতি ছ’ চোখ মেলে দাঁড়িয়ে
দাঁড়িয়ে ওর চলে যাওয়া দেখে। কাঁপলা হয়ে আসছে
বারবার, বারবার চোখ দুটো হাত দিয়ে মোছে সে।



কোঠার বিচার

জ্যোতি বাচস্পতি

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

	৫ম ২৪/১০	৬ম ২৪/১০	৭ম ২৪/১০	
১ম ২৪/১০	২ম ২/১১ ৩ম ২৪/১০ ৪ম ২৪/১০		৩য় ২৪/১০ ৪য় ২৪/১০ ৫য় ২৪/১০	২য় ২৪/১০
৭ম ২৪/১০			৬য় ২২/১০ ৭য় ২২/১০ ৮য় ২২/১০	
৮ম ২৪/১০		৯ম ২০/১১	১০ম ২/১১	১১ম ২৪/১০
	১২ম ২৪/১০	১৩ম ২৪/১০	১৪ম ২০/১০	

এই চক্রে ইচ্ছা করলে, প্রত্যেক গ্রহের বা পাশে নক্ষত্রের অক্ষ এবং তান পাশে ক্ষুণ্ণের অংশ, কলা লেখা যেতে পারে। যেমন উপরের কুণ্ডলীতে য ২২।১০ লেখা আছে, তার বহলে ২২ম ২২।১০ লেখা চলে। এর অর্থ হবে বহল ২২ নক্ষত্রে অর্থাৎ প্রবণা নক্ষত্রে ও মকরের ২২ অংশ ১০ কলার আছে। কিন্তু আমার মনে হয় এলেখা বাহুল্য মাত্র।

কেন-না, যিনি কোঠী বিচার করবেন, গ্রহের ক্ষুণ্ণ দেখাবার জন্য তাঁর বলতে পারা উচিত তা কোন্ নক্ষত্রে আছে। বাই হোক, যাঁদের অহুবিধা হবে তাঁরা এই ভাবে গ্রহের বাঁদিকে নক্ষত্রটি লিখে নিতে পারেন।

কোঠীবিচারে আত্মকারক

আমাদের দেশের অধিকাংশ জ্যোতির্বিদ কোঠীবিচারের সময় সাধারণতঃ লগ্ন ও গ্রহের রাশিহিত নিয়েই বিচার করতে থাকেন। যে রাশিহিত লগ্ন হোক তাঁরা তার দ্বিতীয় রাশিকে দ্বিতীয় ভাব, তৃতীয় রাশিকে তৃতীয় ভাব—এই রকম ধরে এবং সেই সেই রাশিই গ্রহকে দ্বিতীয় তৃতীয় ইত্যাদি ভাব বিচার করার চেষ্টা করেন। যেমন, কোন

ব্যক্তির যদি মেঘ লগ্ন হয়, তাহলে তাঁরা মেঘই গ্রহকে লগ্নই, বুধই গ্রহকে দ্বিতীয়ই, সিংহই গ্রহকে পঞ্চমই, বহুই গ্রহকে নবমই মনে ক'রে বিচার করবেন এবং তাঁরা মজলকে লগ্ন-অষ্টম-পতি, শুক্রকে দ্বিতীয়-সপ্তম-পতি, শনিকে দশম-একাদশ পতি বলবেন। যদিও প্রায় প্রত্যেক জ্যোতিষ গ্রন্থে ভাব সাধনের নিয়ম দেওয়া আছে, তা হ'লেও জ্যোতির্বিদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক লোকের হাতে তার ব্যবহারিক প্রয়োগ দেখা যায়। বিচারের বেলার তাঁরা ভাব ছেড়ে দিয়ে রাশি নিয়ে পড়েন। দ্বিতীয় ভাবই গ্রহ, তৃতীয় ভাবই গ্রহ, তৃতীয় রাশিই গ্রহ। ধারা শিক্ষিত জ্যোতির্বিদ তাঁরা অবশ্য জানেন যে, ভাবক্ষুণ্ণ এবং গ্রহক্ষুণ্ণ নিয়ে বিচার করা উচিত, কিন্তু তাঁদেরও সে সম্বন্ধে নানারকম গোলযোগ উপস্থিত হয়ে থাকে। অনেক সময় বিশোত্তরী বা অষ্টোত্তরী দশা বিচারের নিয়ম এবং ভাব-বিচারের নিয়ম নিয়ে একটার ঝড়ে আরেকটাকে চাপিয়ে তাঁরা গুণগোলের সৃষ্টি করেন এবং এই নিয়ে নানা মূর্খির নানা মতের সৃষ্টি হয়। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ভাব-বিচারের সময়ও বিশোত্তরী দশা বিচারের পারিতোষিক শুভগ্রহ, পাপগ্রহ নিয়ে বিচার করতে বলেন। অনেকে রাশিকে বাহ দিয়ে কেবল ভাব-কুণ্ডলী নিয়েই বিচারের পক্ষপাতী। আসল কথা রাশি, গ্রহ এবং ভাব সম্বন্ধে সঠিক বৈজ্ঞানিক ধারণা না থাকতেই, এরকম গোলযোগ সম্ভব হয়েছে। একথা এখানে অগ্রাসনিক হ'লেও বলা প্রয়োজন। কেন না রাশি, গ্রহ ও ভাব সম্বন্ধে সঠিক ধারণা না হ'লে আত্মকারকের ব্যাপার (অন্ততঃ আশি বাকে আত্মকারক বলছি তার ব্যাপার) বুঝতে অহুবিধা হবে।

রাশি ও গ্রহ-পুর্বার্ধগলি, কি, তা দিয়ে জ্যোতির্বিদের

মধ্যে অর্থাৎ প্রাচ্য জ্যোতির্বিদ্যের মধ্যে বিশেষ মতভেদ নেই। প্রাচ্য জ্যোতির্বিদ্যেরা নাক্ষত্র রাশি বা নিরয়ন রাশিকেই রাশি বলে থাকেন। পশ্চাত্য জ্যোতির্বিদ্যের সঙ্গে এ সবক্ষে আমাদের মতভেদ থাকলেও, এখানে তা আলোচ্য নয়। আমরা এই প্রবন্ধে রাশি বলতে নিরয়ন রাশিকেই বুঝব। গ্রহ বলতে আবিক্রান্ত অনাবিক্রান্ত সমস্ত গ্রহ তার সঙ্গে সূর্য্য, চন্দ্র, মঙ্গ, কেতু এই চারটিকে বুঝতে হবে।

তার বস্তুগুলি যে কি, এ সবক্ষে খুব স্থম্পষ্ট ধারণা কোন জ্যোতিষের গ্রহে দেখেছি বলে মনে হয়না। প্রাচ্য বা পশ্চাত্য অধিকাংশ গ্রহে তার সবক্ষে বা কিছু লিপিবদ্ধ আছে, তা পড়ে মনের মধ্যে একটা গোলযোগেরই সৃষ্টি হয়। কোন কোন জায়গা পড়ে মনে হয়, তাবগুলি রাশির মতই ব্যাপক পদার্থ—একটা রাশির কোন এক বিন্দু থেকে—অপর রাশির আর একটা বিন্দু পর্য্যন্ত—সমস্তটাই একটা তার। আবার, আর একটা জায়গা পড়লে, এই রকম ধারণা আসে যে, তাবগুলি এক একটি বিন্দুমাত্র। তার কববার যে সব নিয়ম আছে, তাতে তারকে বিন্দু ছাড়া আর কিছু মনে করা যায় না, এবং তার যদি বিন্দু না হয়, তাহ'লে তাবফুট কথাটি—নিরর্থক হয়ে যায়, এবং কোন একটি তাবের সঙ্গে কোন গ্রহের কোন রকম প্রেক্ষা (aspect) অসম্ভব হয়ে পড়ে। কাজেই, পাঠকের মনে তার-সবক্ষে একটা সঠিক বা পরিষ্কার ধারণা কোন মতেই গড়ে উঠতে পারে না। পশ্চাত্য গ্রহগুলিতে এক তাবফুট থেকে পরবর্তী তাবফুট পর্য্যন্ত সমস্তটাকেই প্রথমোক্ত তাবের অন্তর্গত বলে ধরা হ'য়ে থাকে, যেমন মঙ্গ যদি সিংহের ২০ অংশ হয় এবং দ্বিতীয় তার যদি হয় কস্তুর ১০ অংশ, আর মঙ্গল যদি থাকে কস্তুর ৫ অংশে, তাহলে পশ্চাত্যমতে মঙ্গলকে মঙ্গল বলেই মনে করতে হবে। প্রাচ্যমতে কিন্তু মঙ্গল হবে দ্বিতীয় মঙ্গ, কেননা প্রাচ্যমতে তাবফুটটিকে তাবের মধ্যবিন্দু বলে ধরা হ'য়ে থাকে, এবং দু'টি তাবের ঠিক মাঝখানে একটি বিন্দুকে দুই তাবের সীমাবিন্দু বলা হয়—একে প্রাচ্যেরা তাবলক্ষি বলেন। কাজেই উপরের উদাহরণটিতে মঙ্গল তার শেষ হয়েছ, কস্তুর ৫ অংশে এবং সেইখান থেকেই দ্বিতীয় তাবের মঙ্গ।

এখন জ্যোতিষকে যদি বিজ্ঞান বলে স্বীকার করা যায়, তাহ'লে এ দুটাই ঠিক হ'তে পারে না, মঙ্গল একমতে মঙ্গল ও অন্য মতে দ্বিতীয় মঙ্গ হওয়া কোন মতেই সম্ভব নয়। অতএব, এখানে আমাদের বুঝতে হবে যে গোড়ার কোন জায়গার গঙ্গা আছে। রাশি আশ্রয় হয়ে যাই যে, যদিও অন্ততঃ ৫০:৬০ বৎসর ধ'রে আমাদের দেশে শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রাচ্য ও পশ্চাত্য জ্যোতিষের চর্চা চলে আসছে, তবুও এদিকে কারও মঙ্গর পড়েনি।

আমল কথা তাবগুলি বিন্দু-মাত্র। গণিতের দ্বারা কিছু মাত্র ধারণা আছে, তিনিই বুঝতে পারবেন, তার কববার বা নিরয়ন আছে তাতে তারকে বিন্দু ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। এই বিন্দুগুলি কি? আমার মতে কোনও এক বিশেষ সময়ে কোন এক বিশেষ স্থানে যে বারটি বিন্দু দিয়ে পৃথিবী রাশিচক্রের প্রভাবকে গ্রহণ করেন, সেই বারটি বিন্দুই সেই সময়ের তাব-বিন্দু। এই বারটি বিন্দুর উপর যে সকল গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব পাকে, তারাই শুধু সেই সময়ের পৃথিবীর উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে, এবং যে গ্রহ বা নক্ষত্রের যতখানি প্রভাব (কম বা বেশী) কোন তাব-বিন্দুর উপর থাকে, ঠিক ততখানি প্রভাবই সেই সময়ে পৃথিবীর সেই স্থানের উপর অভিব্যক্ত হয়। আর, সেই সময় যে ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করে, তার উপরও সেই সকল গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব এই ভাবেই পড়ে থাকে। এই উপপত্তিটির উপর আমি বিশেষ ভাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। কেন না, আশ্চর্য্যকর সবক্ষে এর পরে যা বলব, তার ভিত্তি এরই উপর। এই উপপত্তি ভুল বা ঠিক, সে ভর্তুকি এখানে করব না, অন্ততঃ এর চেয়ে যুক্তি সম্বল কোন উপপত্তি এখনো আমি পাই নি।

জৈমিনি সূত্রে আছে—“আত্মাধিক কল্যাণিভিন্নতোগঃ-সপ্তানামষ্টানাং বা”—এর সোজা অর্থ এই—রাহকে বাহ দিয়ে সাতটি বা রাহ ধ'রে আটটি গ্রহের মধ্যে যে গ্রহের কল্যাণ সব চেয়ে বেশী সেই গ্রহই আত্মকারক।

টীকাকারেরা এর মানে করেছেন যে, যে গ্রহের ক্ষুদ্রতর অংশ সবচেয়ে বেশী তাকেই আত্মকারক বলে গণ্য করতে হবে। আবার মনে হয়, এই অর্থ একমাত্র অর্থোক্তিক নীলকণ্ঠ তার সুবোধিনী টীকার “কল্যাণিভিঃ” কথাটির দ্বারা করেছেন—“কল্যাণঃ আত্মঃ অংশাভিন্নতঃ”

অংশাধিকারিণি ধাবৎ" অর্থাৎ "কলাধি" মানে কলাধি কিনা অংশ, "কলাধিতিঃ" মানে "অংশাধিতিঃ", বারানসী হিন্দু ইউনিভার্সিটির জ্যোতিষ শাস্ত্রের অধ্যাপক পণ্ডিত রামবন্দন ওবা তাঁর টীকার লিখেছেন—"কলাধিতিঃ কলা-শব্দভাষ্যশব্দচক্ৰাৎ অংশাধিতিঃ" কলা শব্দের মানে অংশও হয়, অতএব কলাধিতিঃ মানে অংশাধিতিঃ—তার পোষকতা স্বরূপ তিনি বলেছেন "বুদ্ধবাক্যে ভাগশব্দেনা-পাংশস্ত-প্রসিদ্ধিহিতাৎ ঋষিণা কলাধিতিরিত্যুক্তম্" অর্থাৎ—বুদ্ধের (পরশুরামের) বাক্যে ভাগশব্দ দ্বারা অংশকে বুঝায়, অতএব ঋষি (জৈমিনি) "অংশাধিতিঃ" বলতে "কলাধিতিঃ" বলেছেন। টীকাকারেরা সকলেই প্রমাণ করতে উদ্যোগ হয়েছেন যে, যদিও জৈমিনি লিখেছেন যে, কলা তিনি বলতে চেয়েছেন অংশ। আমার কাছে কিন্তু কথটা একটু বিসদৃশ বলে মনে হয়। জৈমিনি তো অনার্যসেই লিখতে পারতেন—"আত্মাধিকোংশাধিভিন্নভোগঃ" তা না লিখে তিনি "কলাধিতিঃ" লিখেন কেন? এই আত্মকারকের লক্ষণ তিনি দিচ্ছেন "স ইষ্টৈবদ্ধমোক্ষয়োঃ" অর্থাৎ আত্মকারক গ্রহ বন্ধন এবং মুক্তির কর্তা। এর মানে এই যে, যে কোন কে ধীতে আত্মকারক গ্রহই সবচেয়ে বলবান—সেই গ্রহই কোঙ্গীর হর্তা-কর্তা-বিধাতা। যদি ধরা যায় যে, যে গ্রহের ক্ষুদ্র সবচেয়ে বেশী (অংশহিসাবে) সে-ই আত্মকারক, তাহলে অনেক সময় দেখা যাবে যে সারাদিনের মধ্যে একটি মাত্র গ্রহই আত্মকারক হয়ে থাকে, এবং তাহলে সেদিন বস্তু ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করবে সকলেরই ফল প্রায় একই রকম হবে। আমার মনে হয় এটা সম্পূর্ণ অ-মুক্তিবৃত্ত। আমি বলতে চাই, জৈমিনি এখানে যে "কলাধিতিঃ" বলেছেন, এর মানে ক্ষুদ্রের অংশকলা নয় এর মানে ভাবস্থিতির বল কলা—যাকে চরবল, ক্ষয়বল বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। যে গ্রহ ঠিক ভাব-বিন্দুর উপরে পড়ে, তার পূর্ণ বল অর্থাৎ ৩০ কলা বল। গ্রহটি ভাব-বিন্দু থেকে বড়দূরে থাকে, তার বলও সেই অনুপাতে কমে যায়। যদি ধরা যায় যে, "আত্মাধিকঃ কলাধিতিঃ ভোগঃ" মানে যে গ্রহ ভাববিন্দুর সবচেয়ে নিকটবর্তী অর্থাৎ যে গ্রহের চরবল বা ক্ষয়বল সব চেয়ে বেশী কলা, সে-ই আত্মকারক, তাহলে কষ্ট-করনাও করতে হয় না, এবং আত্মকারকের সবচেয়ে সঙ্গত অর্থও আবিষ্কৃত হয়। এই অর্থই ঠিক প্রকৃত প্রচলিত অর্থ যে

তুল, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ পাওয়া যায়, একখানা নিম্নলিখিত কোঙ্গী নিয়ে চুই-মতে আত্মকারক ঠিক করে বিচার করে দেখলে।

অবশ্য, আমি এ কথা বলি না যে, আমি জৈমিনি মহতের আত্মকারকের বা অর্থ করেছি, শুধু, এইটুকু দিয়েই ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আত্মকারক নির্ণয় করা চলেবে। আমি একথাও বলতে চাই না যে, জৈমিনি মহতের আত্মকারকের বা লক্ষণ দেওয়া হয়েছে—তা স্ব-সম্পূর্ণ। আমি এ প্রবন্ধে দেখাতে চাইছি যে, শুধু লগ্ন ও গ্রহসংস্থান দিয়ে সব বিচার করা চলে না। প্রত্যেক কুণ্ডলীতে এক একটি প্রধান গ্রহ আছে, যার দ্বারা সৃষ্টিত ফলাফল অন্ত সকল গ্রহকে অতিক্রম করে প্রবল হয়ে থাকে। জৈমিনির মতে তারই নাম আত্মকারক।

কেবল লগ্নাধি ভাব ও গ্রহসংস্থান দিয়ে যে একটা কোঙ্গীর সঠিক বিচার করা যায় না, এবং যে কোন কোঙ্গীর বিচার করতে হলে যে তার ভাগানিরস্তা গ্রহ তা আগে ঠিক করা প্রয়োজন, পাশ্চাত্য জ্যোতির্বেত্তারাও এটা লক্ষ্য করে এসেছেন। তাঁরা এই গ্রহের নাম দিয়েছেন Ruler বা Ruling Planet—এ সম্বন্ধে এ্যাপলেন লিখে লিখেছেন—

"The ruling Planet" is either the lord of the ascending sign, or else that planet which is strongest or most prominent in the horoscope.

অর্থাৎ লগ্নাধির অধিপতি কিবা যে গ্রহ কুণ্ডলীর মধ্যে সব চেয়ে বলবান অথবা যে গ্রহের প্রভাব সবচেয়ে বেশী সেই গ্রহই ভাগানিরস্তা (Ruling Planet)।

কিন্তু কোন্ গ্রহ সব চেয়ে বলবান তা ঠিক করবার নিয়ম-নির্দেশের বেলায় তিনি বলেছেন—

No hard and fast rule can be given to indicate which this will be ; and this is one of the many points that must be left to the judgement of the astrologer. Sometimes one planet seems to dominate the whole of the character and destiny ; while in the other cases two or even more may have equal way. Planets in the four angles have the first claim to consideration, as they are always important, and of them the first house is the most im-

portant and the fourth the least. - If any planet is rising, it will be part ruler; if more than one rises, then that which is strongly sign, or nearest to the clasp of the ascendant is ruler and of the considerable importance, but attention must also be given to any planet close to the clusps of the tenth and seventh houses as well as to any that may be in close aspect to the degree rising. The planet that is in closest aspect to the Sun is always important.

অর্থাৎ কোন গ্রহ যে ভাগ্য নিয়ন্তা (ruling planet) হবে সে সবচেয়ে কোন ধরা-বাঁধা নিয়ম বেওয়া যায় না, এবং এটা অনেকটা জ্যোতিষীদের নিজের বিচার-বুদ্ধির উপর ছেড়ে দিতে হয়। অনেক সময় দেখা যায় যে, কুণ্ডলীর মধ্যে একটা গ্রহই জাতকের চরিত্র এবং ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করছে; আবার অনেক সময় এ-ও দেখা যায় যে, ছোটো, ভিনটে গ্রহও সমানভাবে জাতকের জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করছে। কেন্দ্রস্থ গ্রহগুলিই সকলের আগে লক্ষ্য রাখা উচিত, কেননা; তাদের প্রভাবই বেশী হওয়া সম্ভব, কেন্দ্রের মধ্যে সবচেয়ে প্রবল লগ্ন এবং সবচেয়ে দুর্বল চতুর্থ। যদি লগ্নে কোন গ্রহ থাকে, তাহলে অনেক ক্ষেত্রে সেই গ্রহ আংশিক ভাবে ভাগ্যনিয়ন্তা হয়ে থাকে, যদি

একাধিক গ্রহ লগ্নে থাকে, তাহলে রাশিবিভক্ত হিসাবের যে গ্রহ বলবান্ অথবা যে গ্রহ লগ্ন-বিন্দুর নিকটতম সেই গ্রহই ভাগ্যনিয়ন্তা হয়ে থাকে। যদি লগ্নে কোন গ্রহই না থাকে তাহলে লগ্নাধিপতিই ভাগ্যনিয়ন্তা হয়। কিন্তু যদি কোন গ্রহ দশম কি সপ্তম ভাববিন্দুর কাছাকাছি থাকে, তাকেও দেখা দরকার, কিবা যদি কোন গ্রহ লগ্ন-বিন্দুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ প্রেক্ষার (close aspect) বদ্ধ হয়, তাহলে তার দিকেও লক্ষ্য রাখা উচিত। তা ছাড়া, রবির সঙ্গে যে গ্রহের ঘনিষ্ঠ প্রেক্ষা থাকে সে গ্রহেরও একটা গুরুত্ব আছে।

পাশ্চাত্যগণ ভাগ্যনিয়ন্তা গ্রহ বা Ruling planet এর যে লক্ষণ দিয়েছেন, তা থেকে এটুকু বোঝা যায় যে তাঁরাও লক্ষ্য করেছেন, যে গ্রহ লগ্ন, দশম, সপ্তম বা চতুর্থ এই চারটি কেন্দ্র ভাববিন্দুর যে কোনটির খুব কাছে থাকে, সে গ্রহ প্রায়ই ভাগ্যনিয়ন্তা হয়ে থাকে। অর্থাৎ আমাদের প্রাচ্য জ্যোতিষের ভাব্যর, কেন্দ্রস্থ গ্রহগুলির মধ্যে যার চরবল বা ক্ষয়বল সবচেয়ে বেশী কলা সেই গ্রহই পাশ্চাত্য-দের মতে ভাগ্যনিয়ন্তা বা Ruling planet; এই লক্ষণের সঙ্গে জৈমিনির আত্মকারকের আশি বা অর্ধ করেছি তার সাদৃশ্য আছে, তথাৎ এইটুকু যে পাশ্চাত্যেরা বলেছেন কেন্দ্রবিন্দুর নিকটতম গ্রহ Ruling planet, জৈমিনি বলেছেন যে কোন ভাববিন্দুর নিকটতম গ্রহ আত্মকারক। [ক্রমঃ]



পাট ও পাঠ

ক্রি.প—

॥ প্রামাণ্য চিত্রের প্রাধিক্য ॥

ভারত সরকারের “কিন্ম ডিভিশন্” নির্ধিত প্রামাণ্য (ডকুমেন্টারী) চিত্রগুলি বৈচিত্র্যে ও বৈশিষ্ট্যে যে বিশ্ব-চিত্রসংসদেবিশেষ দৃষ্ট আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছে, তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে এ বছরের তিনটি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ভারতীয় প্রামাণ্য চিত্রের প্রথম পুরস্কার লাভ করার থেকে।

গত জুলাই মাসে ইতালীতে অনুষ্ঠিত নৃত্য বিষয়ে চতুর্থ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র পর্যালোচনা উৎসবে ভারতীয় প্রামাণ্য চিত্র “দি ড্যান্সিং ফিট” লোক-নৃত্য সম্পর্কিত শ্রেষ্ঠ চিত্র হিসাবে ‘সিটি অব্ জেনোয়া’ কাপ্ লাভ করেছে।

শওনের কমনওয়েলথ্ কিন্ম এওয়ার্ড উৎসবেও ভারতের পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত স্বপ্ন কাটুর্ন চিত্র “এ গ্রেট প্রবলন্” শ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য চিত্র রূপে বিবেচিত হয়ে রৌপ্য পদক ও যোগ্যতার ডি প্লামা অর্জন করেছে।

এরপর নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত সান্ফ্রান্সিস্কোর আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবেও ভারতের “ওয়ার্ন ডে” চিত্রটি শ্রেষ্ঠ চিত্রের সম্মান ‘গোল্ডেন্ গেট্’ পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে।

এ ছাড়া কালে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে “গৌতম দি বুদ্ধ” এবং ভিক্টোরিয়া আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রোৎসবে “হিমালয়ান্ হেরিটেজ্”, এই চিত্র দুইটিও ‘অনারেবল্ বেন্শান্’ পুরস্কার লাভে সমর্থ হয়েছে।

ভারত সরকারের এই ‘কিন্ম ডিভিশন্’ এ পর্যন্ত তাঁদের নির্ধিত প্রামাণ্য চিত্রের অল্প বেশে ও বিদেশে সর্বসম্মত ২৪৬টি পুরস্কার লাভ করেছে।

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব কেবল ভারতীয় প্রামাণ্য

চিত্রের এই বিষয় অভিযানে এ দেশের চিত্রসংসদেবিশেষ যে সন্তোষ লাভ করবেন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু কাহিনী চিত্রের ক্ষেত্রেও ভারতীয় চলচ্চিত্রের বিশেষ অগ্রগতি আমরা প্রত্যাশা করি। বিশ্বের অন্ততম শ্রেষ্ঠ পরিচালক সত্যজিৎ রায় রুত করেকটি বাংলা চিত্র ও হিন্দীভাষী দু’একটি কাহিনী চিত্র আন্তর্জাতিক সম্মান লাভে সমর্থ হলেও কাহিনীচিত্রের ক্ষেত্রে ভারত যে এখনও অনেক পেছিয়ে আছে সে বিষয়ে দ্বিমত নেই। তবে ভারতীয় চিত্র



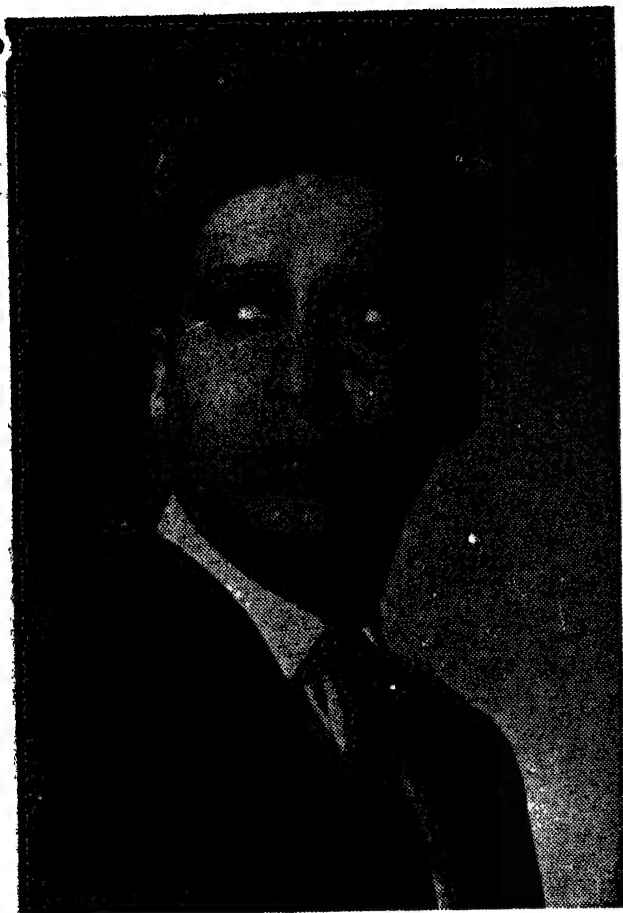
নবাগতা নোম্মা

নির্ধাতারা এ বিষয়ে সজাগ হয়ে উঠেছেন বলেই মনে হয় এবং আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে ভারতীয় কাহিনী চিত্রও ক্রি ক্রি সম্মানে ভূষিত হয়ে ভারতীয় চিত্রের উচ্চ মানের পরিচয় প্রদানে সমর্থ হবে।

ভারতীয় প্রামাণ্য চিত্রের এই উন্নতি করণের জন্য আশ্চর্য্য আমরা ভারত সরকারের “কিন্ম ডিভিশন্”কে আশাব্যক্তি আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং আশা করছি ভবিষ্যতে

জীবনের নির্দিষ্ট চিত্র আরও অর্ধাঙ্গাভিত্তিক সন্ধান বহন করে আনবে।

উপকৃত অবলম্বনে এর চিত্রনাট্য রচনা করেছেন চিত্র-পরিচালক মৃণাল সেন। ছবিটি পরিচালনা করেছেন অজয় কর। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও মাধবী মুখোপাধ্যায় নায়ক-



বাঙলার সর্বসমগ্র নায়ক
সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

অভিনেত্রী ও

লজ্যজিৎ রায়ের 'কাপুরুষ ও মহাপুরুষ' চিত্রটি বাংলা দেশের বাইরে হিন্দীতে 'ডাব' করে দেখানোর আয়োজন করা হচ্ছে বলে জানা গেল।

আর, ডি, বনশলেক্স নতুন চিত্র 'কীচ-কাটা হীরের' 'চিত্র-প্রদর্শন' কাণ্ড শুরু করেছে। প্রবোধকুমার সাত্তালেক

নারিকা চরিত্রে অভিনয় করেছেন। বিকাশ রায়, সার্বিজী চট্টোপাধ্যায়, হান্না দেবী প্রভৃতি অজ্ঞাত ভূমিকায় আছেন।

তরুণ নকুম্বার "আলোর শিখানা" ও "একটুকু কানার" পর যে ছবিটির কাছে হাত দিয়েছেন তার নাম "পান্ডা-শালা"। এ্যাণ্ড্রাইক বোভের এক মহাইশানার পটভূমিতে এর কাহিনীটি লিখেছেন জীবকুম্বার অরং। ছবিটি আসা-গোড়া বহির্ভূতে স্থায়ী হবে বলে জানা গেছে। স্থায়

বোম্বাই চিত্রজগতের সর্বজন
সেহ-খতা অধিনেত্রী
মীনা কুমারি



চারিখিটিতে অভিনয় করবেন অরুণকুমার। হেমন্তকুমার
মুখোপাধ্যায় এই চিত্রের লক্ষীত পরিচালনা করবেন।

চট্টোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, তরুণকুমার, রবি ঘোষ, লক্ষ্মী
রাণী, শ্রাম লাহা, যোগেশ্বর রায় প্রভৃতি।

কে, জি, প্রোডাকশন্স স্বেচ্ছা বোম্বের 'কান্তিধারা'
এবং স্বেচ্ছা বহুর 'পাখির বাসা' উপস্থাপন দুটির বাংলা
চিত্রগ্রহণ কর করেছেন বলে জানা গেল।

আগামী বছরের আত্মসমী মাসে উক্ত ছবি দুটির স্টিং
শুরু হবে। ছবি দুটি পরিচালনা করবেন সম্ভবত পার্শ্ব
প্রতিম চৌধুরী।

গত অক্টোবর মাসে ইন্দ্রপুরী টুডিওতে 'লাইট এন্ড
শেড'-এর প্রথম ছবি "এই করেছ ভালো"-র নিয়মিত চিত্র
গ্রহণ শুরু হয়েছে। অভিনয়শ্রেণী আছেন কাজ বন্ধ্যো-
পাধ্যায়, রবি ঘোষ, তরুণকুমার ও নবাগত শ্রামস্বরূপ।
স্বরচিত কাহিনী ও চিত্রনাট্য অবলম্বনে ছবিখানি পরি-
চালনা করছেন বিখ্যাত ভট্টাচার্য।

পরিচালক স্তিত বহুর পরবর্তী ছবিটির নাম হ'ল "গৃহ
সম্মানে"। প্যারিস-ভাংস শিকচালের এই ছবিখানির প্রধান
ভূমিকাগুলিতে অংশ নেবেন অনিল চট্টোপাধ্যায়, ললিতা

পূর্বচল ফিল্ম প্রযোজিত এবং আর, ভি, বনশঙ্কর,
পরিবেশিত "স্বাক্ষর কুমার"-এর স্টিং মৃণাল সেনের পঙ্কি-
চালনার চলছে। আগামী বর্ষের কাহিনী অবলম্বনে

ছবিটির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন পরিচালক স্বয়ং।
শৌমি চট্টোপাধ্যায় ও অপরী দাসগুপ্ত এই চিত্রের দুই
প্রধান শিল্পী।

জৈন প্রোডাকশনের আগামী ছবিটি স্থখ্যাত সাহিত্যিক
হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের 'বৃত্ত' গল্প অবলম্বনে প্রস্তুত
হচ্ছে। ছবিটি পরিচালনা করছেন তারাপদ দেব এবং স্ব-
শ্রুটির দায়িত্ব নিয়েছেন ডি, বালসাগর।

মিতালী কিশোরের পরবর্তী ছবি হচ্ছে "গুল্মহর"।
কাহিনীক চট্টোপাধ্যায় চিত্রটি পরিচালনা করছেন এবং
নারায়ণ কুমার অভিনয় করবেন বিশ্বজিৎ। আর খুব
সম্ভব নায়িকার চরিত্রটিতে রূপ দেবেন মালী সিংহ। কমা
শুভাঙ্করতা এবং বসন্ত চৌধুরীকে এই চিত্রের দুটি বিশিষ্ট
কুমারী দেবা দাবে বলে আশা করা যায়।

বিকৃতভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বাক্স বদল" কাহিনীটিকে
ডি, এম, প্রোডাকশন চিত্রে রূপায়িত করেছেন। ছবিটি
শীঘ্রই কলকাতার বিশিষ্ট চিত্র গৃহগুলিতে মুক্তিলাভ
করবে।

অপরী দাসগুপ্ত "বাক্স বদল"-এর নায়িকা এবং
নারায়ণ চরিত্রে রূপদান করেছেন শৌমি চট্টোপাধ্যায়।
অজ্ঞাত চরিত্রে আছেন সত্যজিৎ তট্টাচার্য, গীতালী রায়, ইলা
চট্টোপাধ্যায়, সুপ্রভা, চারুপ্রকাশ ঘোষ প্রভৃতি।

চিত্রটি পরিচালনা করেছেন নিতাই দত্ত।

ভ্রামল মিত্র প্রযোজিত 'রূপহারা' চিত্রের দ্বিতীয় চিত্র
"রাজকন্যা"র শ্রুটি এগিয়ে চলেছে। ভ্রামল মিত্রের সঙ্গীত
পরিচালনার ও আশা ভোমলের কণ্ঠে কয়েকটি গানের
রেকর্ডিং-এর কাজ সম্প্রতি সমাপ্ত হয়েছে গোবেতে। এ-
ছবির কাহিনীকার ও চিত্রনাট্য রচয়িতা হলেন স্বর্ষিক
বটক। বিভিন্ন চরিত্রে অংশ গ্রহণ করেছেন উত্তমকুমার,
সবাগতা বীণা ঘোষ, শেখর চট্টোপাধ্যায়, ভাহু বন্দ্যো-
পাধ্যায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় ও তরুণকুমার। ভ্রাহাড়া
একটি বিশিষ্ট কুমারী দীর্ঘদিন পর আত্মপ্রকাশ করেছেন
শ্রীমতী জ্যোতী দেবী।

রাজশ্রী প্রোডাকশনের চিত্র নিবেদন "লোকী" আর
একশত চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করেছে। এই কিশোর
চিত্রের আবেদন বহু বর্ষককে তৃপ্ত করেছে। জানা গেছে,
মধ্যপ্রদেশ সরকার এ ছবিকে প্রমোদ-কর থেকে 'সেই'ই
বিয়েছেন। পণ্ডিতেরিতেও এ ছবির কত কোনো প্রমোদ-
কর দিতে হবে না।

প্রযোজক-পরিচালক প্রমোদ চক্রবর্তীর ইন্ডিয়ান কলার
চিত্র 'লাভ ইন্ টোকিয়ো'র শ্রুটি বোম্বাইয়ে আরও
হয়েছে।

শচীন ভৌমিকের লেখা একটি কাহিনী অবলম্বনে তৈরী
এই "লাভ ইন্ টোকিয়ো"তে স্বরশ্রুটির দায়িত্ব নিয়েছেন
শঙ্কর-জরকিষণ এবং এর প্রধান দুটি চরিত্রে অভিনয়
করছেন জয় মুখার্জি ও আশা পারেশ।

ছবিটির একটি বৃহৎ অংশ টোকিয়োতে তোলা হবে।
একজন শ্রীচক্রবর্তী শিল্পী ও কলাকুশলীদের নিয়ে টোকিও
যাবেন এবং সেখানে কয়েক সপ্তাহ অবস্থান করবেন।

সরকার প্রোডাকশনের বাংলা ছবি "একটুকু হোয়া
লাগে"র চিত্রগ্রহণ বোম্বাইয়ের আদেবী ষ্টুডিওতে শুরু
অগ্রসর হচ্ছে। ছবিটি পরিচালনা করছেন কমল সঙ্করদার
এবং সঙ্গীত পরিচালনার রয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

বিশ্বজিৎ ও কিশোরকুমার এই চিত্রের প্রধান চরিত্র
দুটিতে অভিনয় করেছেন, আর নায়িকার চরিত্রটিতে রূপ
দিয়েছেন নবাগতা আজরা।

বর্তমানে বোম্বাইয়ে পদ্মশ্রী প্রোডাকশনের "কদার"
নামে যে হিন্দী ছবিটি তোলা হচ্ছে, সেটিতে উত্তমকুমার ও
আশা পারেশ নায়ক-নায়িকা রূপে অভিনয় করছেন।

ভারতীয় বার্তাভিষা এবং আর, ডি, বনশদেব দুই
প্রচেষ্টার রাজশ্রী-বনশল প্রোডাকশন নামে সম্প্রতি একটি
নতুন প্রযোজক সংস্থার পত্তন হয়েছে। এই নতুন সংস্থাটি
কলকাতার ডিল্লী ছবি প্রযোজনা করবে বলে জানা গেছে।

এই প্রোডাকশনের প্রথম ছবিটি তোলা হবে ইন্ডিয়ান
কলারে।

বিশ্ব-খ্যাত মস্কিরনে লেখক বরিস পাস্তার্নাকের নোবেল পুরস্কারজয়ী উপন্যাস 'ডক্টর জিভাভো' চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত হতে গেলো। চিত্রটির প্রযোজক হচ্ছেন কার্লো পল্লি এবং পরিচালনা করবেন ফেলিক্স গোন। নার-ভূমিকার অভিনয়ে জন্ত নির্বাচিত হয়েছেন 'লরেন্স অব অ্যারেবিয়া'-খ্যাত ওয়ন শরিক।

স্কোনে ছবিটির দুটি শীটই আবৃত হবে।

ভারত সরকারের উদ্যোগে মাদ্রাজে প্রতিষ্ঠিত হিন্দুস্থান কোটো ফিল্ম ম্যানুফ্যাকচারিং কোং-এর কটোকিন্স

তৈরীর কাজ আগামী বছরের শেষভাগে শুরু হবে বলে জানা গেছে।

ক্যান্ট্রী নির্মাণের জন্য বরাদ্দ অর্থ এগারো কোটি টাকার মধ্যে বরপাতি ও বরবাড়ী নির্মাণের জন্য নয় অক্টোবর পর্যন্ত মোট লাঞ্চে ছয় কোটি টাকা ব্যয়িত হয়েছে। কিন্তু তৈরীর জন্য সেলুলোয় ইয়ানিটেড নামক প্রয়োজনীয় উপাদানটি তৈরী করার জন্য মহিশূরের অ্যানিটেড লিঃ মহীশূরের মালিকানাতে একটি প্রাইভেট বলাঙ্কেন। তাছাড়া কোটোকিন্স তৈরীর শিবিব ইত্যাদি অভ্যাবস্ত্যকীয় জ্রব্যগুলি তৈরীর জন্য একটি সংস্থার উপর ব্যয়িত হওয়া হয়েছে।

আগামী "পৌষ" সংখ্যা থেকে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হবে :

শ্রীপ্রফুল্ল রায়ের উপন্যাস অট্টালিকার পাখি



শ্রীমতী লীলা বিদ্যাস্তের
—নাটক—

বাসন্তী মাঝরাতে স্বপ্ন

(মহাকবি সেন্সপীয়রের "মিড্‌সামার নাইটস্ ড্রিম্" নাটকের সম্পূর্ণ অনুবাদ।)

শ্রীকমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের
সচিত্র ভ্রমণ কাহিনী

দক্ষিণাত্যঃ

মার্জার কথা

অনন্তর অজ্ঞানত্ব

—ম্যাও।

—শুধুমাও!

মায়ের ভাকে সাড়া দিবে কাছে এগিয়ে বার বিভাল-
ছানা, বা বললে, ভোর জন্ত মাছের কাঁটা এনেছি, মুখ-
পোড়া!

ছানাটা তার জবাব দেবার অবকাশ পেলো না। তার
সামনে নাবিরে দেওয়া কাঁটা খেতে আরম্ভ করলো। তারী
খুশী বিভালছানা। যা তার সামনে সামনের ছুট থাবা
গেড়ে বলে দেখতে লাগলো ছেলের থাওয়া। বললে,
খেতে শেখ এমনি করে। নইলে আর কতদিন মাইএর
বাঁট চুবি। আর পারিনে।

হঠাৎ পাশের ঘরে শব্দ হতেই ছুটে গেল বেড়াগটা।
কোন বিপদ এলো কি? না কোন শত্রু? বাচ্চাটা
আছে। তার কত গণ্ডা শত্রু! শিলুটা তো ওকে মাংসার
জন্ত বোঝাকরা করে। কালো ভূতের মত চেছারা। হিংসে
হয় আমার কচি ছেলেটাকে দেখে। কিয়ে এলো। বুড়োটা
শব্দ করছে।

শিলু আর টনা দু'জন এদেরই সাথে বাঁস করে একই
বাড়ীতে, একই ঘরে। আর থাকে খেঁদি। খেঁদি আজ-
কাল বুড়ো হয়েছে। তাই তার সবচেয়ে বেশী হিংসে
আমাদের দিকে চেয়ে। পাশ দিয়ে বাচ্চাটা যখনই যায়
আর অমনি ক্যাচ করে থাবা মারে। বলে মরিসনে মুখ-
পোড়া? আমার বাচ্চাকে ছুঁ চোখে দেখতে পারে না।
আমি আদর করে বাচ্চাকে কখনো বসি মুখপোড়া বলেই
থাকি, তাই বলে ও বলবে নাকি? দোষের তেভর আমার
বাহার মুখের খানিকটা রং কালো। তাছাড়া সারাটা
শরীর কেমন স্থল্লর সাদা ধবধবে। পিঠের ডানদিকে
একটুখানি কালো। সে যে কত স্থল্লর দেখতে!

মায়ের কত গর্জ, কত আল্লাহ এই বাচ্চাকে নিয়ে।
কোন ভয় নেই—সামান্য দেয় ছেলেকে। ওর মুখের
সামনে লেজ নাড়াতে থাকে যা। খেলা শেখাতে চায়।

একটু চটপটে গড়ে তুলতে চায়। নইলে ইহর ঘরবে কি
করে! ওমা! দেখ, খেলতে-খেলতে লাকিয়ে মায়ের
গলা জড়িয়ে ধরেছে। যা ওকে মুহু থাবা মেরে খেলা
করছে। কিসকি নিয়ে বলছে, তারী আল্লাহ হয়েছে।

কিন্তু আল্লাহ মায়েরও বেশী। সে বেশীকণ ওকে
ছেড়ে থাকতে চায় না। পাছে তার আদরের ছেলেকে
কেউ মারে। বাড়ীর লোকজন কেউ কখনো বাচ্চার দিকে
চাইলে সে তরে মরে। চোখ পাকিয়ে তাকায় দেখিকে।
কিবা ক্যাচ-ক্যাচ করে গর্জ করে থাকে। বাচ্চাকে
ইসারা করে সরিয়ে নিয়ে যায়। নিয়ে যায় পাটের নিচে
অথবা কাগজের গাদার আড়ালে। পা ছেটে দেয় আদর
করে। খুব আনন্দ পায়!

—ম্যাও—ও।

মায়ের নজর পড়েছে হঠাৎ দরজার দিকে। পাশের
বাড়ীর হলোটা এসেছে দরজার কাছে। ওঁত পেতে
আছে। সুযোগ পেলেই বাচ্চাকে মেরে ফেলবে। হলোটা
কোন বাচ্চাকে, কোন পুরুষকে দেখতে পারে না। পেলেই
মেরে ফেলবে। ভীষণ স্বার্থপর ওটা! পুরুষ জাতটাই
এই রকম বুকি। ঘেরা ঘরে যায় বেড়াগটার। এই হলোটাই
শ্রীতকাল পার হতে না হতেই পাড়ার সব বেড়াগদের
অতিষ্ঠ করে তোলে। তারী বহুভাবের! এতটুকু মারা
দয়া নেই!

বাড়ীর নতুন বোটা খাটে পা ঝুলিয়ে বলে পা
ছুটো দোলাচ্ছে, আর বাচ্চাটা গিয়ে তার পায়ে থাবা
মেরে খেলা করছে। বসি বোটা মেরে দেয় লাগি? তরে
মায়ের বুক কাঁপছে। চোখ পাকিয়ে আছে বোটার দিকে।
বোটা একবার বাচ্চাটাকে লক্ষ্য করে পা ছুটো তুলে বলে
বুকে পিঠে পাউভার ছড়াতে বাস্ত হলো। বাক, তবু
রক্ষে। এত খবরদারী আর করতে পারে না যা। দরজার
দিকে চেয়ে দেখে হলোটা চলে গেছে। বাচ্চা জা লক্ষ্য
করে ছুটে গেছে দরজার কাছে। আর মায়ের লেকি তরা

বহি হুলাটা। সুক্ৰমে থাকে, তাহলে একেবারে মেরে
কেলবে না ওকে। ছুটে গেছে বাচ্চাকে আগলাতে।

পিলু এসেছে মুখ চাটতে চাটতে। কোথা থেকে কিছু
খেয়ে এসেছে নিশ্চয়ই। কারো স্তম্ভীত চোখের দৃষ্টি, অথবা
বাচ্চাৰ খাওয়াখনি দৃষ্টি চাকী দুয়ো বাটি শেষ করে এসেছে,
কিবা বাহের বাটি।

মায়ের মনে কত দুখ। বাচ্চাটা যে কতদিনে বড় হবে,
কতদিনে যে ডেকে-চুয়ে, কেড়ে-কুড়ে খেতে শিখবে।
তাহলে বাঁচা যায়। নিজেও ওর মত কোথাও গিয়ে দু'গুণ
কাটাকে পারে না। ভাল করে না খেতে মেরে মায়ের
শরীর খারাপ হয়েছে। তাই বাটেও দুখ নেই বেন! আর
কত দুখই বা দেওয়া যায়?

দুদিন আগেও বাচ্চাটা ঘরের বার হতো না। আজ
কয়েকদিন থেকে ওর মা ওকে ডেকে-ডেকে বাইরে নিয়ে
যাচ্ছে। নিয়ে যেতে চেষ্টা করছে ঐ ছুটি দেওয়ালের
মাঝখানের আঁতাকুড়ে। ওখানে বত বাহের কাঁটা, চোয়াল,
মাথা, ভাত, তরকারী পড়ে থাকে। তা ওদিকে সে
যেতেই চায় না। আগে মুখে করে ইচ্ছে মত এদিক-
ওদিক নিয়ে যাওয়া যেতো, আজকাল বড় হয়েছে, টানতে
কষ্ট হয়।

টনার মেরে এই বেড়ালটা। কিন্তু মা-মেরের সম্পর্ক
আর নেই। বড়ো হলে কেউ কারো সাথে সম্পর্ক রাখে
না। সবাই পৃথক। কেউ কারো আত্মীয় নয়। যে
বেমন ভাবে পারছে খাচ্ছে-মাচ্ছে ক্ষুধা করছে। এদের
বাড়ীর অনেকে এই বেড়ালগুলোকে বলতো চীনা কোজ।

এবার এই টনারও বাচ্চা হবে মনে হচ্ছে। টনাও
কারো কোন বাচ্চা বা বুড়োকে বরদাও করতে পারে না।
পাশ দিয়ে এই বাচ্চাটা গেলে সে কি রাগ! ফ্যাচ্-ফ্যাচ্
করে থাবা মেরে দেবে।

রাত হলে বাচ্চাটা মায়ের কাছে ঘুমাবে। মাকে মাকে
ভারী অভির্ভ করে তোলে। যে বুড়োটা এই বেড়ালদের
সবসময় আশ্রয় দিয়েছে, সে অকৃতজ্ঞ। তাইই মায়ের এরা
এ বাড়ীতে বাহাদুরী দেখাচ্ছে দীর্ঘ দিন ধরে। নইলে এ
স্তম্ভীত কেউ, এদের স্থান দিতে চায় না। রাতদিন ঐ
বুড়োটা এদের ভালবাসা লক্ষ্য করে।

বাচ্চাটা ছুটে গিয়ে তাই বুড়োর জীর্ণ বিছানার উত্তাপে

নিজের বেহ উত্তপ্ত করে ঘুমাতে যায়। ওর মাও যায়,
যায় আরো টনা, পিলু, খেঁদী। বুড়ো আদর করে, চোখ
মাড়িয়ে কখনো তর দেখায়। ওরা কেউ তর পায় না।
তর পায় বুড়োর তাই, তাই-বো, আর তার ছেলে-বোকে।
ছেলে-বো ভো একেরারে গড়াহস্ত।

—ওম্মাও!

মা তার বাচ্চাকে দেখতে পাচ্ছে না। কোথায় বেন
চলে গেছে। তাই ডাকছে। বাচ্চাকে ডাকতে-ডাকতে
এঘর-ওঘর করতে থাকে বেড়ালটা। ঐ দিকের ঘরে
খাটের নিচে বসে বাচ্চাটা কি বেন শুকছে। খাটের উপর
মুখোমুখি বসে বুড়োবুড়ি। বেড়ালটা বাচ্চাৰ গা চাটতে
চাটতে শুনতে পেলো বুড়ী বুড়োকে বলছে, আমাদের
সে দিন আর ফিরে আসবে না গো! সেই প্রচণ্ড আনন্দ
লেই স্থখ।

বুড়োর একটা দীর্ঘশ্বাস বের হলো। বললে, আজকাল
ছেলে-বোদের আনন্দ দেখেই আনন্দিত হতে হবে।
আমাদের বোবন যে চলে গেছে গো!

তাতে বেন অশ্রুভট্ট হলো বুড়ী। বললে, কি যে
বলো! এরই স্তম্ভের তোমার বুঝি বোবন চলে গেল।
কত বাসু হলো? খবরের কাগজে পড়ছো না, বিনোদ
আশি বছর, নুৰুই বছরের মিনসেরা বিয়ে করতে বো
আর তুমি কিনা—

—আরে কনকটাপা, তাদের কথাই আলাদা! তারা
সব খুব খার, তাই।

—আমিও খাওয়াবো তোমাকে!

বেড়ালটা আর থাকতে পারেনা না। বাচ্চাটা আদর
ছুটে পালালো। তার পিছু পিছু ছুটলো। রাত হয়েছে।
কোথায় বাবে, কে ধরে আছড়ে মারবে। না, সে বাইরের
ঘরে ছেলে-বোয়ের খাটের নিচে ঢুকেছে।

—ম্যাও-ও!

আদর করে কাছে গিয়ে বাচ্চাৰ মুখের উপর বুখ
মাখে। বলে, ছুট ছেলে, রাতদিন ছুটছটি। কোথাও
হিংস্র থাকবে না রাতের বেলায়! হুলাটা ডেকে
দেখতে গেলে যে মেরে কেলবে!

বাচ্চাটা অবাক হয়ে মায়ের মুখের দিকে চেয়ে থাকে।
ঠিক তার একটু পরেই বুড়োটা পাশের ঘর থেকে

কলে উঠলো। কালির দাপটে অস্থির হয়ে ওঠে।
বহিঃস্থিত লোকটা। কেউ তার দিকে দেখবার নেই।
সে বেকত অসহায়। বিড়ালটা কান পেতে শোনে, লক্ষ্য
করে সব কিছু, সবায় গতি-বিধি। সে যদি মাহুবই হতো
তাহলে বুড়োটাকে সেবা করতো। পরক্ষণেই তাবে, যদি
সে মাহুব হতো তাহলে হরতো অত্যধিক স্বার্থপর হয়ে
উঠতো। এ রকম মারামরত থাকতো না। পদ্ম বলেই
বোধ হয় মাহুব হতে পারিনি।

এমন সময় বাচ্চাটা আবার কোথায় বেন ছুটলো।
বেড়ালটা তার শিছু ছুটলো। নতুন বোটা স্বামীকে নিয়ে
খাটের উপর ওরে আছে—তারই পাশে গিয়ে হাজির
বাচ্চাটা। বিড়ালটা এবার তার বাড়ি কামড়ে ধরে
লাকিয়ে নিয়ে এলো।

—মাও, ওঁও।

হেগে গেছে বেড়ালটা। বললে, নতুন বউটা যদি
য়েগে যায় তাহলে তোকে আমার সাথে বেটিয়ে বার করে
কেনে বাড়ী থেকে। রাতে ওদের বিছানার বাবিনে কখনও।

—সি—উ।

বাচ্চাটার খিদে পেয়েছে। ও দুখ খাবে। আর কথা
নেই, যা তাকে দুখ পাওয়াতে বললো। যতদিন না এটা
বড় হচ্ছে, ততদিন তার কাছে থাকতে হবে। নিজের
আনন্দের সন্ধান। মায়ের কত খুশী, যখন ওকে আদর করে
দুখ পাওয়ার, কিবা গা কেটে দেয়। বাচ্চাদের গারে কি
হৃদয় মিস্ট গন্ধ। এই বাচ্চার আর একটা বোন হয়েছিল।
সে মরে গেছে। অকৃতকার্য সমাধিবাবু বলে, ওর মা—ই
ওকে ঘেঁষে কেলেছে। কিন্তু সে কথা কেউ বিশ্বাস করে না।

সমাধিবাবু বলে, আছড়ে ঘেঁষে না ফেললেও নিশ্চয়ই
ঘেঁষেছে দুখ খেতে ঘেঁষনি। নইলে মরলো কেন?

কেউ কেউ বলে, তা হলেও হতে পারে। সমাধিবাবু
ওদের দিকে লক্ষ্য রাখে।

একটু পরেই বেড়ালটা কানজুটো খাড়া করলো।
নতুন বোটা তার স্বামীকে বলছে, ও বাড়ীর মিলনবাবু খুব
ভাল লোক, তাই না? সবাই ভালবাসে লোকটাকে।

—বাক্সে কথা! আমি ওকে ঘৃণা করি। অনেকেই
ঘৃণা করে। অত্যধিক বহলোক।

—তাহলে বীরেশবাবু কেমন? বীরেশবাবুর চেহারা
কিছু বেশ।

—বীরেশবাবু মাজাল, বহমান। সন্ধ্যা শামসি কেউ
লোকটা বলতে পারে না, সবাই নীরবে লক্ষ্য করে।
কঠোরনের সর্বনাশ করেছে।

—ও বাবা! ভীত হর নতুন গোটা।

বেড়ালের পায়ের ধাবা প্রসারিত হয়, লক্ষ্যলো ঘেঁষিয়ে
আসে। কেন বেন খাস কক্ষ হয়ে আসে। বাচ্চা হরতো
বন্ধ হয়ে গেছে। চারিদিকে চেয়ে দেখে।

বোটা জিজ্ঞেস করলে, আচ্ছা, তোমার জ্যাঠাবাবু
বিরে করলেন না কেন?

—যেহেতু উনি মোটেই পছন্দ করেন না। তা কে
বিরে হবে?

—কিন্তু কে বেন বলছিল, ওর মা মরে বাবার পর
ব্যথিত হয়ে আর বিরে করতে চাননি।

—বাক্সে কথা।

সেই মুহূর্তে ঘরের কোণে একটু শব্দ হতেই বেড়ালটার
কানে ঢুকছে। গোথ মেনে দেখেছে সেদিকে। ছুটে
গেছে চুপি চুপি। ওঁও পেতে থেকে একসময় সেই
ইচ্ছাটাকে ধরে কেলেছে। তারপর পেটাকে মুখে করে
নিয়ে এসেছে বাচ্চার কাছে। নিজে খানিকটা খেয়ে
বাকীটুকু বাচ্চাকে তুলে তার সামনে দিয়েছে। বাচ্চাটা
একবার সেটা শুঁকে খেয়ে কেলেছে। তখন মায়ের কি
যে আনন্দ! বাক্সে খেতে নিচ্ছে তাহলে!

আবার মায়ের কোলের কাছে ঘুরিয়ে পড়লো বাচ্চা।
জারগাটা বেশ গরম। খুব আদারপ্রদ জারগাটা।

শেষ রাতের দিকে সমাধিবাবুর কালির শব্দ ভেসে
এলো। তার একটু পরেই নতুন বোটার চুড়ির কন্ডম্বানি
ভেসে উঠলো। কিছু পরেই সে বেন বলছিল তার স্বামীকে—
জুসি লক্ষ্যে ভাল! তোমার কেন যে এত ভাল লাগে।
সবার চেয়ে তুমি ভাল, খুব ভাল।

—সত্যি?

—হ্যাঁ।

বেড়ালটার চোখ বন্ধ হলো। একটা স্বপ্নবান বেগ
হলো। ঘুমতে চাইলো, ঘুম এলো না।



সম্পাদনা : শ্রী প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়



৮৫খান্ডনেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

খেলার কথা

ক্ষেত্রনাথ রায়

টোকিও অলিম্পিক গেমস :

জাপানের রাজধানী টোকিও নগরে আধুনিক কালের অষ্টাদশ অলিম্পিক গেমস মহাসমারোহে এবং সাকল্যের সঙ্গে সুসম্পন্ন হয়েছে। রেকর্ড সংখ্যক দেশ (৮৪) এবং প্রতিযোগীরা বোগদান, বিভিন্ন খেলাধুলার নতুন বিশ্ব এবং অলিম্পিক রেকর্ডের ছড়াছড়ি, স্বপ্নোবন্ত এবং সর্বোপরি খেলাধুলার জাপানের অহুকরণীয় নিষ্ঠা—এই সমস্তের সমন্বয়ে টোকিওতে অস্থিতিত এই অষ্টাদশ অলিম্পিক ক্রীড়াঙ্গঠানটি আধুনিককালের অলিম্পিক গেমসের ইতিহাসে একটি পৃথক অধ্যায় যোজনা করেছে। টোকিওর এই অলিম্পিক গেমসটি ছিল এশিয়ার ভূখণ্ডে প্রথম অলিম্পিক গেমসের আসর।

এ্যাথলেটিক্স : অলিম্পিক গেমসের প্রধান আকর্ষণ এ্যাথলেটিক্স অঙ্গঠানে আমেরিকা এবারও সর্বাধিক পদক জয় করেছে—পুরুষ বিভাগে স্বর্ণ ১২, রৌপ্য ৬ ও ব্রোঞ্জ ৩ এবং মহিলা বিভাগে স্বর্ণ ২ ও রৌপ্য ২—মোট পদক সংখ্যা ২৫টি।

সাঁতার : পুরুষ ও মহিলা বিভাগ নিয়ে মোট

১৮টি অঙ্গঠানে স্বর্ণ পদক পেয়েছে আমেরিকা ১৩, অস্ট্রেলিয়া ৪ এবং রাশিয়া ১। সাঁতারের মোট ৫৪টি পদকের মধ্যে একা আমেরিকাই পেয়েছে ২০টি—স্বর্ণ ১৩, রৌপ্য ৮ এবং ব্রোঞ্জ ৮।

ওয়টার পোলো : স্বর্ণ পদক হাঙ্গেরী, রৌপ্য পদক যুগোস্লাভিয়া এবং ব্রোঞ্জ পদক রাশিয়া।

ডাইভিং : পুরুষ এবং মহিলা বিভাগের মোট ১২টি পদকের মধ্যে আমেরিকা পেয়েছে ৮টি (স্বর্ণ ৩, রৌপ্য ২ এবং ব্রোঞ্জ ৩), জার্মানী ২টি, রাশিয়া এবং ইতালী একটি করে।

ভলিবল : পুরুষ বিভাগে স্বর্ণ পদক পেয়েছে রাশিয়া, রৌপ্যপদক চেকোস্লোভাকিয়া এবং ব্রোঞ্জপদক জাপান। মহিলা বিভাগে স্বর্ণ পদক জাপান, রৌপ্য পদক রাশিয়া এবং ব্রোঞ্জ পদক পোল্যান্ড।

ফুটবল : স্বর্ণপদক হাঙ্গেরী, রৌপ্যপদক চেকোস্লোভাকিয়া এবং ব্রোঞ্জ পদক জার্মানী।

কাইনালে হাঙ্গেরী ২—১ গোলে চেকোস্লোভাকিয়াকে পরাজিত করে দ্বিতীয় বার স্বর্ণ পদক জয়ের গৌরব লাভ করে। ১৯৫২ সালে হাঙ্গেরী প্রথম স্বর্ণ পদক জয় করেছিল।

হকি ৩ স্বর্ণ পদক ভারতবর্ষ, রৌপ্য পদক পাকিস্তান এবং ব্রোঞ্জপদক অস্ট্রেলিয়া। **কাইনালে ভারতবর্ষ ১—**১ গোলে পাকিস্তানকে পরাজিত করে সাত বার স্বর্ণপদক জয়ের গৌরব লাভ করে। **ভারতবর্ষ উপবৃষ্টি ৯** বার (১৯২৮—৫৬) স্বর্ণ পদক জয় করে ১৯৫০ সালের বোম্বে

অলিম্পিকের ছবি খেলার কাইমানে, —১ পোলে
ইকিহানের কাছে পরাজিত হয়েছিল।

বাস্কেটবল : বর্তমান আমেরিকা, য়োপ্য পদক
রাশিয়া এবং রোজ পদক রেজিল।

আমেরিকা উপরূপরি সাতবার স্বর্ণ পদক পেয়ে
রেকর্ড স্থাপন করেছে। বাস্কেটবল প্রতিযোগিতার অত্র
কোন দেশ স্বর্ণ পদক জয় করেনি।

হুস্তিযুদ্ধ : মোট দশটি অহুষ্ঠানের মধ্যে স্বর্ণ পদক
জয় করেছে রাশিয়া ৩, পোল্যান্ড ৩, ইতালী ২, জাপান ১
এবং আমেরিকা ১।

হুস্তি : ক্রিস্টাইল এবং গ্রিকো-রোমান—এই দুটি
বিভাগে মোট অহুষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ১৬টি। স্বর্ণ পদক
পেয়েছে জাপান ৫, বুলগেরিয়া ৩, রাশিয়া ৩, হাঙ্গেরী ২,
ফ্রান্স ২ এবং যুগোস্লাভাকিয়া ১।

ভারোত্তোলন : স্বর্ণপদক পেয়েছে রাশিয়া ৪,
জাপান ২, পোল্যান্ড ১ এবং চেকোস্লোভাকিয়া ১।

ব্যক্তিগত ক্রীড়াচাচুর্ষ্য

টোকিও অলিম্পিক গেমসে দ্বারা ব্যক্তিগত ক্রীড়া-
চাচুর্ষ্যের পরিচয় দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে এই কয়েকজনের
নামক্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য :

জন কল্যাণ্ডার (আমেরিকা) পুরুষদের সঁতারে চারটি
স্বর্ণপদক জয় করেন।

জন ফ্রেজার (অস্ট্রেলিয়া) উপরূপরি তিনটি
অলিম্পিকে মহিলাদের ১০০ মিটার ক্রিস্টাইল সঁতারে
স্বর্ণপদক জয়ের রেকর্ড করেন। উপরূপরি তিনটি
অলিম্পিকে সঁতারের কোন ব্যক্তিগত অহুষ্ঠানে স্বর্ণ পদক
জয়ের রেকর্ড ইতিপূর্বে কোন পুরুষ বা মহিলা সঁতারক
প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি।

আলফ্রেড অর্টার (আমেরিকা) পুরুষ বিভাগের
ডিসকাস নিক্ষেপে স্বর্ণ পদক জয়ী হ'লে উপরূপরি তিনটি
অলিম্পিকের ডিসকাস অহুষ্ঠানে স্বর্ণপদক জয়ের রেকর্ড
করেন।

বিরাচেন্ডাত আইভানোভ (রাশিয়া), বোরিংয়ের
সিকলস কালস অহুষ্ঠানে উপরূপরি তিনটি অলিম্পিকে স্বর্ণ-
পদক জয়ের রেকর্ড করেন।

আগেবে বিকিলা (ইথিওপিয়া) ম্যারাথন খেলে

উপরূপরি দ্বিতীয়বার প্রথম স্থান লাভের রেকর্ড করেন।
এমন কি অলিম্পিক গেমসে ইতিপূর্বে কোন একজনের
পক্ষে দু'বার স্বর্ণপদক জয় করাও সম্ভব হয়নি।

জিমনাস্টিক :

সর্বাধিক পদক পেয়েছে জাপান।

জাপানের পদক—স্বর্ণ ৫, য়োপ্য ৭ এবং রোজ ১।

পদকের খতিয়ান

টোকিও অলিম্পিক গেমসে পদক লাভের তালিকায়
প্রথম চারটি দেশ :

	স্বর্ণ	য়োপ্য	রোজ	মোট
আমেরিকা	৩৬	২৬	২৮	৯০
রাশিয়া	৩০	৩১	৩৫	৯৬
জাপান	১৬	৫	৮	২৯
জার্মানী	১০	২২	১৮	৫০

অস্ট্রেলিয়া বনাম ভারতবর্ষ :

তৃতীয় টেস্ট :

অস্ট্রেলিয়া : ১৭৪ রান (সিম্পসন ৬৭ এবং লরী ৫০
রান। হুয়াগী ৭০ রানে ৬ এবং হুস্তি ৩৮ রানে ৩ উইকেট
পান) ও ১৪৩ রান (১ উইকেটে)। সিম্পসন ৭১, লরী নট
আউট ৪৭ রান। হুস্তি ৩০ রানে ১ উইকেট)

ভারতবর্ষ : ২৩৫ রান (বোরদে নট আউট ৬৮,
জয়দীয়া ৫৭ এবং সরদেয়াই ৪২ রান। সিম্পসন ৪৫ রানে
৪ এবং ভিভার্স ৮১ রানে ৩ উইকেট পান)।

কলকাতার রুজি স্টেডিয়ামে অহুষ্ঠিত অস্ট্রেলিয়া বনাম
ভারতবর্ষের তৃতীয় টেস্ট খেলা হু বার। পাঁচ দিনের
খেলার শেষ দু'দিন বৃষ্টির দরুণ মাঠের অবস্থা খেলার
অহুস্থলে না থাকার খেলা আরম্ভ হয়নি।

অস্ট্রেলিয়া বনাম পাকিস্তান :

করাচীতে অহুষ্ঠিত অস্ট্রেলিয়া বনাম পাকিস্তানের টেস্ট
খেলা হু বার।

সংক্ষিপ্ত কোর

পাকিস্তান : ৪১৪ রান (ইব্রাহীম ১৬৬, কাহির ৯৬,
ইনতিকাব আলম ৫৩ এবং আলিক ইকবাল ৪১ রান।
এব্রাহাম হুয়াকেরি ৬৩ রানে ৬ উইকেট পান) ও ২৭০ রান
(৮ উইকেটে জিরেহাউ। জাহেদ হাকি ৩২, ভিভার্স
৪৪ রানে ২ এবং হুয়াকেরি ৩২ রানে ২ উইকেট পান)

